

স্ববাসী

Cole - H04315-59 - P5662

সচিত্র মাসিক পত্র

৩৭শ ভাগ, প্রথম খণ্ড

(50)

বৈশাখ—আশ্বিন

১৩৪৪

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

বৈশাখ—আশ্বিন

৩৭শ ভাগ ১ম খণ্ড—১৩৪৪ সাল

বিষয়-সূচী

অচল সিকি (গল্প)—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু	২৭২	কলিকাতা হিন্দু অনাথ-আশ্রম ও হিন্দু বিবাহ-সম্রা	
অজগর পুষ্টিবার বিচিত্র অভিজ্ঞতা (সচিত্র)—		(সচিত্র)—শ্রীসরসীলাল সরকার	৬
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	৮০২	কসুমসেরিয়াম (সচিত্র)—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	৮
অতীশ দীপকরের জন্মস্থান (আলোচনা)—		কাছে ও দূরে (কবিতা)—শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২
শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত	৮২০	কাব্য-বিচারে নিকষ-পাথর—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	৫
অস্তরীনের পত্র : ভারত-শিল্পের অত্মশীলন—		কাব্যবিচারে প্লেটো—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়	৪
শ্রীমদোরঞ্জন গুপ্ত ও শ্রীঅর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৬৪২	কান্দীর মানমন্দির (সচিত্র)—শ্রীহুমায়ুনরঞ্জন দাশ	৬
অন্ধ্র দেশ (সচিত্র)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৪১৪	ক্যাণ্ডীয় নাচ (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫
অব্যক্তা (কবিতা)—শ্রীমণীশ ঘটক	৭৭০	গদ্যফড়িং (সচিত্র)—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	...
অভিষেক (কবিতা)—শ্রীহরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৭৩	গৌড়পাদ—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	১৭৩
অলক-ঝোরা (উপন্যাস)—শ্রীশান্তা দেবী	৭৩, ২৬৩, ৪০৭, ৫৫৬, ৬২২, ৮৬২	গণতন্ত্রের স্বরূপ—শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার	৭
অসময় (কবিতা)—শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী	৬৭৬	চন্দননগরের প্রদর্শনী দর্শনে (সচিত্র)—প্রত্যক্ষদর্শী	:
আদিম ধরনী (কবিতা)—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	৮৫৩	চিড়ির জীবনযাত্রা-প্রণালী (সচিত্র)—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	...
আধেক উড়ে যায় স্বপ্ন নীলিমায় (কবিতা)—		চিত্র-পরিচয় P, 5662	৭৩২
শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী	৮৩৪	চেকোস্লোভাকিয়ার উদ্ধারকর্তা প্রেসিডেন্ট মাসারিক	
আমাদের জনশক্তি ও কর্মশক্তি—শ্রীহুমায়ুনরঞ্জন বসু	৪২৮	(সচিত্র)—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন	...
আরবের পুনর্জন্ম (সচিত্র)—শ্রীমোগেন্দ্রচন্দ্র বাগস	৬১৩	চৈত্র-বেলা (কবিতা)—শ্রীমণীশ ঘটক	...
আলোকের পুত্র (কবিতা)—শ্রীহেমলতা দেবী	৫০০	জড়ের রূপ (সচিত্র)—শ্রীঅশোককুমার বসু	...
আলোচনা	২৭২, ৫২৬, ৫৩১, ৬২৮, ৮২০	জন্মদিন (কবিতা)—শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী	...
ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্র—শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়	৫১০	জন্মদিন (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
উম্মুখ (কবিতা)—শ্রীশান্তি পাল	৮২২	জলমিশ্রিত খাটি হুস্ত (গল্প)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	
ঋষিকাহিনী ও ঋষিপদ্ম—শ্রীসীতানাথ তত্ত্ববুদ্ধ	৭	জল-শামুক (সচিত্র)—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	
এক বৎসরে (কবিতা)—শ্রীহরেন্দ্রনাথ মৈত্র	৬৬০	জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, স্বর্গীয় (সচিত্র)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ	
এক যে ছিল নারী, ও নগরী (গল্প)—শ্রীরজত সেন	৫৩৩	জাপানের পুষ্পোৎসব (সচিত্র)—শ্রীচাক্রবালা মিত্র	
কথা (কবিতা)—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	৩৩০	ভালভাতের ব্যবস্থা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন	
কন-দেখা (গল্প)—শ্রীআশালতা সিংহ	৫০৩	ভিস্‌গাস্‌টিং (গল্প)—শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য	...
কবি হুইটম্যানের বাণী—শ্রীকিত্তিমোহন সেন	৭২০		

ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন (আলোচনা)—	প্রেমের যুগ (কবিতা)—শ্রীকুমার চক্রবর্তী	...	৫৭২
শ্রীহরবিমল দাস	কলিত রসায়ন চর্চার নূতন দিক (সচিত্র)—		
শ্রীমতীর শাখত মহাদান (কবিতা)—শ্রীঅশোক	শ্রীকানাইলাল মণ্ডল	...	৮৩২
চৌধুরী	বঙ্গে নারী-নির্ধাতন ও তাহার প্রতিকার—		
দেশ (সচিত্র)—শ্রীচন্দ্রশঙ্কর বিদ্যালঙ্কার ও	শ্রীমুকমল দাশগুপ্ত	...	৪২৬
শ্রীধরকুমার জৈন	বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থার গতি ও		
বেণী (উপন্যাস)—শ্রীজীবনময় রায় ২৬, ১২১, ৩৬০, ৫১২	প্রকৃতি (সচিত্র)—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	১২৫, ৪২৮	
ব্য-প্রসঙ্গ—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল	বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থার গতি ও প্রকৃতি		
শ বিদেশের কথা ১৬৩, ৩১৩, ৪৬২, ৬১৩, ৭৫৩, ২০১	(আলোচনা)—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	৪২৭
শ্রীজৈনলালের রসরচনা ও দেশপ্রীতি—শ্রীযতীন্দ্রমোহন	বর্তমান অগম্যাপী দুর্গতি—শ্রীক্ষিত্তিমোহন সেন	...	৮৬২
বাগচী	বর্ধার বনে-জঙ্গলে (সচিত্র)—শ্রীমুখা বিদ্য	...	৬৬১
নতুন কাল (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বর্ধার (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	...	৬৭৭
নবনারী সমাজে নিবেদন—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	বাংলার ফুটরশিল্পে ঘি-উৎপাদন (সচিত্র)—		
নারী ও পরন্ত (গল্প)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	শ্রীসত্যীশচন্দ্র দাসগুপ্ত	...	৫৩৮
নিবেদন (কবিতা)—শ্রীনিরুপমা দেবী	কাঁকড়াই ছাতি স্মরণীয় ঘটনা—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	...	৩২৩
নিশীথে (কবিতা)—শ্রীহরেন্দ্রনাথ মৈত্র	বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালা (আলোচনা)—		
নিবিড় দেশে সওয়া বৎসর (সচিত্র)—রাহুল	শ্রীনির্মলচন্দ্র দে, শ্রীশীতলচন্দ্র রায়	...	২৭২
সংকল্পায়ন ১০৪, ২৮২, ৪৩২, ৫৭২, ৭২২, ৮৭৩	বাঙালীর ব্যবসায়—জনৈক সাধারণ ক্রেতা	...	৬৭৪
হুটু মোক্তারের সওয়াল (গল্প)—শ্রীতারশঙ্কর	বাংলা বাপান—শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ	...	২০০
বন্দ্যোপাধ্যায়	বানান-বিধি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪২২, ৫৬৩	
পঞ্চশত (সচিত্র) ৬৬, ২৫২, ৪৩৩, ৫৭৩, ৭০২, ৮০২	বাসা-বদল (গল্প)—শ্রীবিজয় গুপ্ত	...	৫৫১
পদ্মচিহ্ন ও ইসলাম (আলোচনা)—শ্রীক্ষিত্তীশচন্দ্র	বিক্রমপুরের শিল্পসম্পদ (সচিত্র)—শ্রীযোগেশচন্দ্রনাথ গুপ্ত	২০২	
সরকার	বিজ্ঞান (আলোচনা)—শ্রীসুন্দারনাথ শর্মা	...	২৭২
পলাতকা (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিদেশী রাজকুমার (গল্প)—শ্রীশশীল জানা	...	৮৫৪
পুণ্যাহ (কবিতা)—শ্রীহরেন্দ্রনাথ মৈত্র	বিধবা (গল্প)—শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ	...	২২৫
রুকের মন (কবিতা)—শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিবিধ প্রসঙ্গ ১৪৩, ২৮৭, ৪৪৫, ৫২৩, ৭৩৩, ৮৮১		
স্বপ্ন-পরিচয় ৮৩, ২৭৭, ৩২২, ৫৪৭, ৬৮৮, ৮৩০	বিরহে (কবিতা)—বনমল	...	৪৩
পাণ্ডে-মাকড়সার জীবন-বৈচিত্র্য (সচিত্র)	বৃক্ষ-সভাসই—শ্রীকালিকারঞ্জন কাকুনগো	...	৪
চলিত দণ্ডনীতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বেলিনে জবাহরলাল (আলোচনা)—শ্রীমিনতি সিংহ	৪৩০	
গাম (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	বোড়াল গ্রামে সেন-রাজার প্রাচীন কীর্তি (সচিত্র)		
বীণ পুরোহিত (কবিতা)—শ্রীহরেন্দ্রনাথ মৈত্র	—শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র	...	৭০
ভাত-রবি—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত	ব্যায়ামচর্চার সীমানা—শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার	...	২২২
স্তি (কবিতা)—শ্রীঅমিয়া দেবী	ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালী ও ব্রহ্মদেশে পণ্ডিত জবাহরলালের		
দীন ভারতের নারী-কবি শীলা ভট্টাচার্য্য	অভ্যর্থনা (আলোচনা)—শ্রীশশীলকুমার দাশগুপ্ত	৪২২	
শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	ভক্তিবর্ধের বীজ ও বিকাশ—শ্রীগোতানাথ তত্ত্বভূষণ	৭০৭	

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা—শ্রীরাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৩৪৭	শিরঃপীড়ার মহোৎসব (সচিত্র গল্প)—শ্রীমনোজ বহু	
ভারতীয় বজ্রট—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়	... ১৬৩	শেখ ব্রহ্ম-মুন্সে বীর বাঙালী সৈনিক—শ্রীঅজিতকুমার	
ভারতীয় ব্যাকিং—শ্রীঅনাথগোপাল সেন	৪৪, ১৮০	মুখোপাধ্যায়	...
ভাবারহস্ত—শ্রীবীরেশ্বর সেন	... ৩৩১	শেখ ব্রহ্ম-মুন্সে বীর বাঙালী সৈনিক (আলোচনা)—	
ভাবারহস্ত (আলোচনা)—শ্রীযতীন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী	৫৩১	শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার	...
মধু-মঞ্জুবা (কবিতা)—শ্রীরসিকলাল দাস	... ৮৭২	শ্রীচৈতন্য ও ওড়িয়া ভাষা—শ্রীকুমদবন্ধু সেন	...
মহাষ্টমী (গল্প)—শ্রীতারাপদ রাহা	... ৩৩৫	সংশয় (কবিতা)—শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...
মহিলা-সংবাদ (সচিত্র)	১১৪, ২৮৬, ৪৩১, ৫৭৭, ৮৩৫	সংস্কৃতব্যাকরণের প্রাচীন ও নবীন পদ্ধতি—	
মাটির বাসা (উপন্যাস)—শ্রীসীতা দেবী	৭১২, ৮২২	শ্রীবিদ্যুৎশেখর ভট্টাচার্য	... ৬৮
মেঘকন্ডা (গল্প)—শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়	... ৮০০	সাধী (কবিতা)—শ্রীইলারাগী মুখোপাধ্যায়	... ৩
মধ্যলোকে—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী	... ৫০৮	সায়াক (গল্প)—শ্রীপাটুগোপাল মুখোপাধ্যায়	... ৬৪৫
মৃত্তিকা (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত	... ৭৮৬	সার্থক চেষ্টা (কবিতা)—শ্রীঅধিকান্ত রায় চৌধুরী	৬৪২
যাবার মুখে (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ১	সিদ্ধকাম (কবিতা)—শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ মৈত্র	... ৫৩২
যার লাগি তোর... (গল্প)—শ্রীমনোজ গুপ্ত	... ৮৪৩	স্বনয়নীর মৃত্যু (গল্প)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	... ৭৭১
কুগাঁড়র (গল্প)—বনফুল	... ৪০৩	স্বপ্নির সীমায় (কবিতা)—শ্রীরসময় দাশ	... ৩৮৯
রক্ষা-কবচ (গল্প)—শ্রীসীতা দেবী	... ২৪১	সেকালের ছাত্রসমাজ—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১
রবিবারের কর্দ—শ্রীপুষ্প দেবী	... ১২০	সেতু (গল্প)—শ্রীশরদ্দিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	... ৮৬
রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ—শ্রীকিরণবালা সেন	... ৫৮	সেতু (সচিত্র)—শ্রীস্বধানন্দ চট্টোপাধ্যায়	... ৮১৩
—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত	... ১৮৮	সেলমা ল্যাগেরলভ্ (সচিত্র)—শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ	... ৮৩৭
রেশমী হাতো (গল্প)—শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৬১	স্বয়ম্বর (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	... ৩২৭
রাঁচির কথা (সচিত্র)—শ্রীশরৎচন্দ্র রায়	... ২৭	স্বরলিপি	... ৪৩৫
লক্ষ্মী-প্রবাসী বাঙালীর নববর্ষোৎসব (সচিত্র)—		স্মৃতি (কবিতা)—শ্রীরাজেন্দ্রকুমার ভৌমিক	... ৬৫
শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়	... ৪৬৯	স্রোতের মুখে (কবিতা)—শ্রীস্বরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	... ৪২৭
লক্ষ্মী (গল্প)—শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ মিত্র	... ২১৯	হয়ত (কবিতা)—বনফুল	... ৩৩৪
লেখন (কবিতা)—শ্রীসায়না কর	... ৮৭	হুইটম্যান (সচিত্র)—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	... ২১
শনির দশা (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ৬১৯	হুতোম-প্যাচার লুকোচুরি (সচিত্র)—শ্রীগোপালচন্দ্র	
শহরে মেয়ে (গল্প)—শ্রীসীতা দেবী	... ৩৩০	ভট্টাচার্য	...

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধানিনী সমিতি	...	৮২৮	কয়েকটি প্রদেশে মজিহ গ্রহণের সর্ব	...	১৪৪.
বাণী শ্রামক ও বিত্তহীন 'মধ্যবিত্ত' বেকার	..	৭৫০	কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের উন্নতিচেষ্টা	...	৪৬২
রৈচন্দ্র চক্রবর্তীর কৃতিত্ব	...	৬০৮	কলিকাতার একটি হিন্দুস্থানী বালিকা-বিদ্যালয়	...	৮৮৯
কংগ্রেসের সভাপতি কে হইবেন ?	...	৪৪৭	কলেজে না-পড়িয়া আই-এ ও বি-এ পরীক্ষা দেওয়া	...	৮৮৬.
গান বন্দীদের কথা	...	৮২২	কাকোরি বন্দীদের অভিনন্দন	...	৮২৪
বন্দীদের প্রায়োপবেশন	..	৭৩৬	"কালান্তর"	...	৩০৫
র আয় হইতে শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ !	...	৭৫২	কানীপ্রসাদ জায়সবাল	...	৭৫০
ও সরোজ	...	৮৮১	কৃষ্ণকুমার মিত্রের চিত্রপ্রতিষ্ঠা	...	৩০৮
প্রতিবাদ মিথ্যা হইল	...	৬০৩	কৃষ্ণনগরে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন	...	৭৫০.
এক রকম সাহিত্যিক নিষেধ	...	৬০৪	কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক	...	৬০৮.
হইতে শ্রীহট্ট বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা	...	৭৫২	গান্ধীজীর দাবী সম্বন্ধে ভারতসচিবের উত্তর	...	৪৬০
মজিসভা	...	১৬০	গোরা নৈন্ডদের পাঁচ বার আহ্বার	...	৩০৬
ভারতবর্ষে কেন আছে	...	২৮৭	গোরাধিগকে সেলাম করিতে ছাত্রদিগকে বাধ্য করা	...	৬০৬.
-বিরাগ	...	২০০	যুঁ'বির জোরে জাপান এশিয়ার মধ্যে নহে		১৫৩
শিম সীমান্তে কৃত্তী বাঙালী	...	১৫৪	চীন ও জাপানে আবার যুদ্ধ	...	৬০২
ইউটম্যান স্মৃতিসভা	...	৭৪২	জবাহরলাল নেহরু ও ক্ষুদ্রলল হক	...	২২৫
হিন্দুসমাজ	...	৪৫৯	জবাহরলাল নেহরুর ব্রহ্মদেশ দর্শন	...	৩০১
সর্বক ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী কার্য	...	৫২৭	জমিদার ও রায়ত	...	৮৮৩.
মন্ত্রিমণ্ডল	...	৮২৭	জমীর খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	...	৪৫৭.
অবাধ্যতার শাস্তি দিবার হিড়িক	...	৩০১	জাতীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা	...	২২৫
আগামী অধিবেশনের সভাপতি	...	৫২২	জামেনীর বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা	...	১৬০.
আদর্শ মুসলমান জনসাধারণকে	...	৫২২	জিন্না-রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংবাদ	...	৬০৭
ইবার চেষ্টা	...	৩০১	টোকিওর বিশ্বশিক্ষা-কনফারেন্সে ভারতীয়	...	৩০৬.
প্রতি ভারতসচিবের অহরোধ	...	৪৪৬	প্রতিনিধিবর্গ	...	৩০৬.
মজিহ অস্বীকার সম্বন্ধে ভারতসচিব	...	১৫৭	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "প্রতীক"	...	৮৮২.
মজিহ গ্রহণ—"ঝগড়া উঠা রহে হমরা ?"	...	৫২৩	ঢাকায় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন	...	৪৬২.
the stoops to conquer ?"	...	৫২৩	ঢাকায় মেডিক্যাল কলেজ আবঙ্গক	...	১৬০
এসময়ী সম্বন্ধে আমাদের আশঙ্কা	...	৮২৮	তুই তুমি আপনি সে তিনি	...	৭৪৬।
	...	৮২৮	ভূতীয় বায়িক দিব্য-স্মৃতি উৎসব	...	১৫৩

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার	১৫১	“বঙ্গীয় মহাকাব্য”	.
শিক্ষকলাল রায়ের স্মৃতিরক্ষা	৪৬৪	বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কলকাতায় অধিবেশন	..
দীর্ঘ প্রীত্বাবকাশে ছাত্রছাত্রীদের কাজ	৩০৮	বঙ্গে যাত্রাভ্যন্তর অস্থিবিধা	..
দেশহিতসাধনে মন্ত্রিসভার সামর্থ্য	৫২৬	বঙ্গে হত্যাকাণ্ডের সংঘটন	..
দীর্ঘরদের উপর অভিযান	১৫১	বঙ্গের বঙ্গো	..
নারীশিক্ষা সমিতি	৮৮৮	বঙ্গের বাহিরে ফল রক্ষার চেষ্টা	..
নিখিল ভারতীয় প্রাচ্য কনফারেন্সে বাংলা ভাষার স্থান নাই	৩০৬	বঙ্গের বাহিরে ‘বন্দেমাতরম্’ ; বঙ্গে ‘গন্ধে	.
নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন	১৫১	কাতরম্’ ?	.
নিষিদ্ধ পুস্তক—সেকালের ও একালের	৬০৩	বঙ্গের ব্যবসায়িক বাঙালী ও অবাঙালী	..
নতুন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাসমূহ	১৪৫	বঙ্গের মন্ত্রিসভা	.
নৌকায় চক্ষুচিকিৎসালয়	১৫২	বঙ্গের মন্ত্রিসভার তৎকালীন জাতিদের প্রতিনিধি	.
পঞ্জাবে জলসেচনের জন্ত আবার নয় কোটি টাকা ব্যয়	৪৫৫	বঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা বিল	.
পদ্মবুলের ছবি ও “ঐ”	৪৫২	বঙ্গের লবণশিল্প	.
পর্যায়ী জাতি ও আন্তর্জাতিক বিধি	৫২৮	বর্ধিত অপেক্ষাও অধম অবস্থায় পতন	.
পল্লী-উন্নয়নের জন্ত ভারত-গবর্নমেন্টের দান	১৫২	বাংলা বানান	.
পহেলা এপ্রিলের হরতাল	১৫৩	বাংলার টাকা বাংলাকে ধার দিয়া স্বয়ং গ্রহণ	.
পাটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট	১৪৮	বাংলার মহিলা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব	.
পাটকলের ধর্মঘটের অবসান	২২৫	বাঙালীর দ্বিতীয় পাটকল	—
পাটনায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন	৮৮৬	বি. এ. পরীক্ষায় ছাত্রদের কৃতিত্ব	.
পুন্য মাক্তি মন্দিরে সত্যগ্রহ	২২১	বিনা-বিচারে বন্দীদের মুক্তি দাবী	.
পূজার ছুটি ও ছাত্রছাত্রীদের কর্তব্য	৮২৭	বিপ্লব	.
পূজার বাজারে বাঙালীর তৈরি জিনিস ক্রয়	৮২৭	বিমলানন্দ নাগ	.
প্যালেস্টাইন ত্রিখণ্ডিত করিবার প্রস্তাব	৬১০	বিলাতে ভারতীয় দিভিল সার্ভিসে প্রবেশার্থী	.
প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় বাঙালী	২২৬	বিশ্বভারতী বাংলা বহিঃচাহিতেছেন	.
“প্রত্যেক শহরে উদ্যোগ-আশ্রম চাই”	৪৬৮	বিহটার রেলওয়ে দুর্ঘটনা	.
প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অবসরগ্রহণ	৬০৫	বিহারের দু-জন তৎকালীন জাতির মানুষ	.
“প্রবাসী সম্মেলনী” ও “মধ্যভারতী”	৮২২	বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগ ও ধর্মমূলক সম্প্রদায়ভেদ	.
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-সম্মেলন	২২৩	বেকার-সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে বঙ্গচিন্তা	.
প্রাশস্তব্রহ্মদিগের শিক্ষা	৬১০	বোম্বাইয়ে কংগ্রেসীদের গৃহবিবাদ	.
প্রায়োগবিশেষ সম্বন্ধীয় আন্দোলন সম্পর্কে শান্তি	৮২৩	বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভার কার্যতালিকা	.
ফিলিপাইন দীপপুঞ্জের স্বাধীনতালাভ নিকটতর	৩০৬	ব্যবসা ও বাণিজ্য এবং ভূমি ও আপনি	.
“ফুকা” প্রকার বিরুদ্ধ আন্দোলন	৩০৫	ভাঙিবার নিমিত্ত গড়া	.
ফ্রান্স-অধিকৃত ভারতে বাণ্যবিবাহ নিষেধ	৩০৬	ভারতবর্ষ ও চীনের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় সম্পর্ক	.
বঙ্গীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ	৬০৬, ১৫২	ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা	.
বঙ্গীয় মন্ত্রিসভীদের বিভাগ	৬০৫	“ভারতমাতা আমাদের সংমা”	.

সংক্ষেপ ভারতের ভূতত্ত্ব জমীলাট	...	৪৬৮	রাজা বর্ষ জর্জের রাজ্যাভিষেক	...	৩০৭
পাচিবেল ভক্তিমা ও মন্ত্রিস্থের ফেরী	...	১৫২	রাষ্ট্রনৈতির রত্নমণ্ডে অভিনয়	...	৪৬১
তৃতীয় ললিতকলার অধ্যাপকের পদ	...	৬০৫	রেঙ্গুন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বন্দ্ব	...	৪৬৭
ভারতে “প্রাদেশিক আন্দোলন”ে ব্রিটেনের স্থিতি	...	৭৩৩	রেবতীমোহন দাস	...	১৬২
ভারতের কার্পাস এবং ম্যাঞ্চেস্তারের স্থতা ও কাপড়	...	৪৪২	রেলের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধি	...	৩০৮
মৌসামি সামরিক বিদ্যালয়	...	৩০৭	ললিতমোহন কর, অধ্যাপক	...	৮২১
‘ternacular’ মানে কি দাসভাষা	...	৬০১	“লোকশিক্ষা-সংসদ”	...	৭৪৮
মৌসামি রিভিউ হইতে অসুস্থতা ব্যতিরেকে প্রবন্ধ উদ্ধার	...	৮৮২	শান্তিনিকেতনে “রবিবাসর”	...	১৫৬
সংক্ষেপে সংক্ষেপের দাবী	...	৩০০	“শেষ অক্ষয়ুৎ বীর বাঙালী সৈনিক”	...	৮২০
মৌসামি গ্রন্থ ও কংগ্রেস	...	১৪৪	জামাচরণ গুপ্ত	...	১৫৬
মৌসামি শৈলবিহার	...	১৬০	জামাদাস মুখোপাধ্যায়	...	২২৩
মৌসামি গান্ধী, কংগ্রেস ও মন্ত্রিস্থগ্রন্থ	...	৪৪৫	“জি”	...	৪৫৩
মৌসামি শিক্ষাবোর্ড	...	৪৬৫	সংখ্যালবিশিষ্ট মল্লের মনিস্তা সংক্ষেপে অধ্যাপক কীথ	...	১৪৬
মৌসামি বিজ্ঞানে কেন হিন্দী শিখান হইবে	...	২০০	“সংবাদপত্রে সেকালের কথা,” প্রথম খণ্ড	...	৮২৮
মৌসামি প্রাপ্ত রাজবন্দীদের প্রতি কর্তব্য	...	৬০৬	সম্মানন দমনের ব্যয়	...	৭৪৫
মৌসামি মানদের কংগ্রেসে যোগ না দিবার কারণ	...	৪৫৪	সরোজ ও জী সংক্ষেপে কনফারেন্স	...	৮৮২
মৌসামি মনীর মুখল	...	৮৮৩	“সর্বনাশ” ও “পৌষ মাস”	...	১৪৩
মৌসামি রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নের সভা	...	৮২৬	সার্বজনিক শিক্ষা ও বেকার-সমস্যা	...	৭৪৮
মৌসামি দিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক উৎসব	...	১৫৬	সামাজিক ব্যবহার ও অল্প পারিশ্রমিকের কাজ	...	৭৪৭
মৌসামি হুমেন্ডান স্পোর্টিং ক্লাবের জয়	...	৬১০	সিনেমাতে নৃত্য	...	৪৬৮
মৌসামি “মুখমজল কমিটি”	...	১৬১	স্বভাবাবুকে কংগ্রেস-সভাপতি করিবার প্রস্তাব	...	৪৬৪
মৌসামি সেনাধিকার সরকার	...	৬০২	স্বভাবাবুর বক্তৃতা	...	১৫০
মৌসামি সেনাচক্র বন্দোপাধ্যায়	...	১৬২	স্বদেশচক্র রায়	...	২২৪
মৌসামি সেনাধিকার জন্মোৎসব	...	৩০৫	“সে”	...	৬০৬
মৌসামি সেনাধিকার বালিকা শিক্ষাসভা	...	৬০৪	সৈনিক বিভাগের ব্যয়	...	২০০
মৌসামি সেনাধিকার মুক্তির প্রস্তাব	...	৪৬৩	সোরাবজী পোচখানাওয়াল	...	৬০৭
মৌসামি সেনাধিকার কলেজের ব্যাপার	...	৮২৫	“হিন্দু” ও “গৌড়লিক” ভাষা	...	৪৫০

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

শ্রী অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—		শ্রী কিতমোহন সেন—	
শেখ ব্রহ্ম-মুখে বীর বাঙালী সৈনিক ... ৬৬৭		কবি হুইটম্যানের বাণী ... ৮৬	
শ্রী অজিতকুমার বসু—		বর্তমান জগৎদ্বাপী দুর্গতি ... ৮৬	
অচল সিকি (গল্প) ... ২৭২		শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার—	
শ্রী অনাথগোপাল সেন—		পদ্মচিহ্ন ও ইসলাম (আলোচনা) ... ২৮	
ভারতীয় ব্যাক্তি ... ৪৪, ১৮০		শ্রী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য—	
শ্রী অমিয়া দেবী—		অজগর পুঁথিবার বিচিত্র অভিজ্ঞতা (সচিত্র) ... ৮০২	
প্রশান্তি (কবিতা) ... ৪২		কস্মসেরিয়াম (সচিত্র) ... ৮১২	
শ্রী অমূল্যচন্দ্র সেন—		গঙ্গাকড়ি (সচিত্র) ... ৮১২	
চেকোশ্লোভাকিয়ার উদ্ধারকর্তা		চিড়ির জীবনযাত্রা-প্রণালী (সচিত্র) ... ৮১২	
প্রেসিডেন্ট মাসারিক (সচিত্র) ... ২৩১		জল-শায়ক (সচিত্র) ... ৮১২	
শ্রী অর্জুনকুমার মুখোপাধ্যায়—		পিপড়ে-মাকড়সার জীবনবৈচিত্র্য (সচিত্র) ... ৮১২	
অন্তরীনের পত্র : ভারত-শিল্পের অহুশীলন ... ৬৪২		হতোম-প্যাটার লুকোচুরি (সচিত্র) ... ৮১২	
শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়—		শ্রী চন্দ্রশঙ্কর বিজ্ঞানকার—	
ভারতীয় বজ্র ... ১৬৩		তুষারের দেশ (সচিত্র) ... ৮১২	
শ্রী অশোক চৌধুরী—		শ্রী চাক্রবর্তী মিত্র—	
তুমি যত্নের শাখত মহান (কবিতা) ... ৬৫৬		জাপানের পুশ্পোৎসব (সচিত্র) ... ৪২৬	
শ্রী অশোককুমার বসু—		শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ—	
জড়ের রূপ (সচিত্র) ... ৬২২		বিধবা (গল্প) ... ২৭	
শ্রী আশালতা সিংহ—		অনেক সাধারণ ক্ষেত্র—	
কনে-দেখা (গল্প) ... ৫০৩		বাঙালীর ব্যবসার ... ৬৭৪	
শ্রী ইলারাকী মুখোপাধ্যায়—		শ্রী জীবনময় রায়—	
সাবী (কবিতা) ... ১০৮		জিবেবী (উপজ্ঞান) ... ২৬, ১২১, ৩৬০, ৫১২	
শ্রী উপেন্দ্রনাথ বোশাল—		শ্রী তারাপদ রাহা—	
দ্বিবা-প্রসঙ্গ ... ৭৭২		মহাষ্টমী (গল্প) ... ৩৩৫	
শ্রী উপেন্দ্রনাথ সেন—		শ্রী তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—	
ভালভাতের ব্যবস্থা ... ৮০৬		হুটু মোস্তারের সপ্তাহাল (গল্প) ... ৩৩৫	
শ্রী কানাইলাল মণ্ডল—		শ্রী নীলেশ মুখোপাধ্যায়—	
ফলিত রসায়ন-চর্চার নতুন দিক (সচিত্র) ... ৮৩২		মেঘকল্প (গল্প) ... ৩৩৫	
শ্রী কালিকারঞ্জন কাছনগো—		শ্রী নীলেশচন্দ্র সরকার—	
বৃক্ষ-সত্তসই ... ৪		শেখ ব্রহ্ম-মুখে বীর বাঙালী সৈনিক (আলোচনা) ... ৩৩৫	
শ্রী কীরণবালা সেন—		শ্রী দেবপ্রসাদ ঘোষ—	
রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ... ৫৮		বাঙালী বাণান ... ৩৩৫	
শ্রী কুমুদবন্ধু সেন—		শ্রী ধর্মকুমার জৈন—	
শ্রী চৈতন্য ও গুড়িয়া জাতি ... ৫৬২		তুষারের দেশ (সচিত্র) ... ৩৩৫	
		শ্রী নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়—	
		মহোৎসব বাঙালীর সববর্ষোৎসব (সচিত্র) ... ৩৩৫	

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু—		শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—	
স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সচিত্র)	 ৭৫৩	বর্ষায় (গল্প)	... ৬৭৭
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র—		স্বপ্নধরা (গল্প)	... ৩২৭
লক্ষ্মী (গল্প)	... ২১৯	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—	
শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত—		অদ্ভুতমেশ (সচিত্র)	... ৪১৪
অতীশ দীপকরের জন্মস্থান (আলোচনা)	... ৮২০	শ্রীবীরেশ্বর সেন—	
শ্রীনিরুপমা দেবী—		ভাষারহস্য	... ৩৩১
নিবেদন (কবিতা)	... ৭৭৮	শ্রীবৃন্দাবননাথ শর্মা—	
শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—		বিজয়া (আলোচনা)	... ২৭৯
কাছে ও দূরে (কবিতা)	... ২১১	শ্রীমণীষ ঘটক—	
সংশয় (কবিতা)	... ৫৩০	অব্যক্তা (কবিতা)	... ৭৭০
শ্রীনির্মলচন্দ্র দে—		চৈত্র-বেলা (কবিতা)	... ২৪০
বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালা (আলোচনা)	... ২৭৯	শ্রীমনোজ গুপ্ত—	
শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়—		যার লাগি ভোর... (গল্প)	... ৮৪৩
সায়াহ (গল্প)	... ৬৪৩	শ্রীমনোজ বসু—	
শ্রীপুষ্প দেবী—		শিরঃপীড়ার মহৌষধ (গল্প)	... ৫০
রবিবারের স্বপ্ন (কবিতা)	... ১২০	শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত—	
প্রত্যক্ষদর্শী—		অস্তরীনের পত্র : ভারত-শিল্পের অচুশীলন	... ৬৪৯
চন্দননগরের প্রদর্শনী দর্শনে (সচিত্র)	... ২৫০	শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়—	
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত—		কাব্যবিচারে প্রেটো	... ৪৭৭
প্রভাত-রবি	... ৩৯	শ্রীমিনতি সিংহ—	
রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ	... ১৮৮	বেসিনে জবাহরলাল (সচিত্র)	... ৪৩০
বনফুল—		শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী—	
বিরহে (কবিতা)	... ৪৩	অসময় (কবিতা)	... ৬৭৬
যুগান্তর (গল্প)	... ৪০৩	আধেক উড়ে যায় স্বপ্ন নীলিমায় (কবিতা)	... ৮৩৪
হয়ত (কবিতা)	... ৩৩৪	জন্মদিন (কবিতা)	... ৩৫৯
শ্রীবিজয় গুপ্ত—		শ্রীযতীন্দ্রকুমার পালচৌধুরী—	
বাসা-বদল (গল্প)	... ৫৫১	ভাষারহস্য (আলোচনা)	... ৫৩১
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার—		শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার—	
নবনারীসমাজে নিবেদন	... ৭৯৭	গণতন্ত্রের স্বরূপ	... ৩৭০
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—		শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী—	
কাব্য-বিচারের নিকষ-পাথর	... ৫৮৮	প্রাচীন ভারতের নারী-কবি শীলা-ভট্টাট্টরিকা	... ৬৩৯
ছইটম্যান (সচিত্র)	... ২১২	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী—	
শ্রীবিহারক ভট্টাচার্য—		ঈজিপ্টের রসরচনা ও দেশপ্রীতি	... ৩৫৫
ডিসগাস্টিং (গল্প)	... ৬৫৭	মেঘালোকে	... ৫০৮
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য—		শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—	
গোড়পাদ	১৭৩, ৭৬৭	সুকাশের ছাত্রসমাজ	... ২১
সংস্কৃতব্যাকরণের প্রাচীন ও নবীন পদ্ধতি	... ৬২২	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত —	
শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত—		বিক্রমপুরের শিল্পসম্পদ (সচিত্র)	... ২০৯
যুক্তিকা (গল্প)	... ৭৮৬	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—	
শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র—		আরবের পুনর্জন্ম (সচিত্র)	... ৬১৩
বোড়াল গ্রামে সেন-রাজার প্রাচীন কীর্তি (সচিত্র)	৭০	বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থার গতি (সচিত্র)	১

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—			শ্রীশান্তি পাল—	
বাঁহুড়ার ছুটি শ্রবণীয় ঘটনা	...	৩২৩	উষ্ম (কবিতা)	... ৮২৯
শ্রীরত্ন সেন—			শ্রীশীতলচন্দ্র রায়—	
এক যে ছিল নারী, ও নগরী (গল্প)	...	৫৩০	বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালা (আলোচনা)	... ২৭৯
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—			শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা—	
পুরুষের মন (কবিতা)	...	৮২১	প্রণাম (কবিতা)	... ৮২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—			শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ—	
ক্যাণ্ডীয় নাচ (কবিতা)	...	৪৭৫	বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থার গতি	
জয়দিন (কবিতা)	...	৩২১	ও প্রকৃতি (আলোচনা)	... ৪২৭
নতুন কাল (কবিতা)	...	৭৮১	শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—	
পলাতকা (কবিতা)	...	১৩৯	আদিম ধরনী	... ৮৫৩
প্রচলিত দণ্ডনীতি	...	৭৬৪	কথা (কবিতা)	... ৩৩০
বানান-বিধি	৪২২, ৫৬৩		শ্রীসত্যীশচন্দ্র দাসগুপ্ত—	
যাবার মুখে (কবিতা)	...	১	বাংলার ছুটিরশিল্পে খি-উৎপাদন (সচিত্র)	... ৫৩৮
শনির দশা (কবিতা)	...	৩১৯	শ্রীসরসীলাল সরকার—	
শ্রীসময় দাশ—			কলিকাতা হিন্দু অনাথ-আশ্রম ও হিন্দুর বিবাহ-	
স্থিতির সীমায় (কবিতা)	...	৩৮৯	সম্রাট (সচিত্র)	... ৩৭২
শ্রীসিকলাল দাস—			শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়—	
মধু-মজুধা (কবিতা)	...	৮৭২	ইংলেণ্ডে ভারতীয় ছাত্র	... ৫১০
শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়—			শ্রীসাধনা কর—	
মুখোপাধ্যায়—			লেখন (কবিতা)	... ৮৭
ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা	...	৩৪৭	শ্রীসীতা দেবী—	
শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়—			মাটির বাসা (উপজ্ঞান)	৭১২, ৮২২
জলমিশ্রিত খাঁটি ছদ্ম (গল্প)	...	৪৮১	রক্ষাকবচ (গল্প)	... ২৪১
নারী ও পরশু (গল্প)	...	১৪	শহরে মেয়ে (গল্প)	... ৩৯০
হুনয়নীর মৃত্যু (গল্প)	...	৭৭১	শ্রীসীতানাথ তত্ত্ববোধ—	
রাহুল সাংকৃত্যায়ন—			ঋষিকাহিনী ও ঋষিপদ্মা	... ৭
নিবিষ্ট দেশে সওয়া বৎসর (সচিত্র)	১০৬, ২৮২,		ভক্তিধর্মের বীজ ও বিকাশ	... ৭০৭
৪৩৯, ৫৭৯, ৭২২, ৮৭৩			শ্রীহুমায়ুন দাশগুপ্ত—	
শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ—			বকে নারীনির্ধাতন (আলোচনা)	... ৪২৬
সেল্‌মা ল্যাগেরলড (সচিত্র)	...	৮৩৭	শ্রীহুমায়ুন চক্রবর্তী—	
শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার—			প্রেমের মৃত্যু (কবিতা)	... ৫৭২
ব্যায়ামচর্চার সীমানা	...	২২২	শ্রীহুমায়ুনরঞ্জন দাশ—	
শ্রীশরৎচন্দ্র রায়—			কালীর মানসমির (সচিত্র)	... ৩৮০
রাঁচির কথা (সচিত্র)	...	২৭	শ্রীহুয়াংতু গুপ্ত—	
শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—			আলোচনা	... ৬৯৮
সেতু (গল্প)	...	৮৮	শ্রীহুয়াকান্ত রায়চৌধুরী—	
শ্রীশান্তা দেবী—			সার্থক চেষ্টা (কবিতা)	... ৬৪২
অলখ-বোরা (উপজ্ঞান)	৭৩, ২৬৩, ৪০৭,		শ্রীহুয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়—	
৫৫৬, ৬৯৯, ৮৬২			সেতু (সচিত্র)	... ৮১৩
			শ্রীহুয়িমল দাস—	
			ঢাকার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন (আলোচনা)	৫৩১

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মৈত্র—		শ্রীহরিশঙ্কর দাশগুপ্ত—	
এক বৎসরে (কবিতা)	... ৬৬০	ব্রহ্ম-প্রবাসী বাড়ালী ও ব্রহ্মদেশে পণ্ডিত জবাহর-	
নিশীথে (কবিতা)	... ৭২৫	লালের অভ্যর্থনা (আলোচনা)	... ৪২০
পুণ্যাহ (কবিতা)	... ২০৭	শ্রীহরিশঙ্কর বহু—	
প্রবীণ পুরোহিত (কবিতা)	... ৩৫১	আমাদের জনশক্তি ও কর্মশক্তি	... ৪৯৮
সিদ্ধকাম (কবিতা)	... ৫০২	শ্রীহরিশঙ্কর বিদ্য—	
শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী—		বর্ধার বনে-জঙ্গলে (সচিত্র)	... ৬৬১
শ্রোতের মুখে (কবিতা)	... ৪৩৭	শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—	
শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—		রেশমী স্ত্রী (গল্প)	... ৬১
অভিষেক (কবিতা)	... ৬৭০	শ্রীহরেন্দ্রনাথ দেবী—	
শ্রীহরিশঙ্কর জ্ঞান—		আলোকের গুহ (কবিতা)	... ৫০০
বিশেষী রাজকুমার (গল্প)	... ৮৫৪		

চিত্র-সূচী

অজগর, পোষা	৮০২, ৮১১	আফ্রিকা, দক্ষিণ	
শ্রীঅজগর আমল	... ১১৫	—অবসরবিলাস	... ৪৩০
শ্রীঅতুলপ্রতাপ সিংহ	... ৪৩০	—উত্তমাশা অন্তরীপ	... ৪৩২
শ্রীঅনুগ্রহবান্ধ কালে	... ৮৩৫	—উদ্ধৃত	... ৪৩৩
অন্তর্মহোদয়ীর বাঘাবর জাতির আবাস	... ৫৬০	—এলফ ষ্ট্রীট, জোহান্নেসবার্গ	... ৪৩৩
অন্ধ দেশ		—কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়	... ৪৩২
—অন্ধ মহিলাদের জলবহন	... ৪১৬	—ক্লারেন্স গিরিনকট	... ৪৩২
—কবি মহাশয়	... ৪১৭	—জঙ্গল	... ৪৩৩
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বহু	... ৭৫৮	—ঈশভালের স্বর্ণখনি	... ৪৩২
শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী	... ৬০৮	—ভারবানের বেলাতুমি	... ৪৩২
অলেগের দুর্গের পাদমূলে ব্রিটিশ রণতরী	... ২৫৬	—বীর	... ৪৩৩
শ্রীঅশোক বহু	... ৩১৮	—ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত	... ১৩৮
অগ্নি		—“সুপ্রভাত”	... ৪৩৩
—ভরু	... ৭০৭	আবিসিনিয়া-কুমারী, স্বাধীন অবস্থায়	... ১১৩
—পার্বত্য সরোবর	... ৭০৭	আমীর আবদুল্লা	... ৫৫০, ৬১৪
—ঈশবাসে আনার্যদের জনতা	... ৭০৬	শ্রীআমোদরজন সেন	... ৭৫৮
—সালংসবুর্গ	... ৭০৬	আম্মানারাজু, জি.	... ১১৬
—সালংসবুর্গে গ্রামবাসীদের নৃত্যোৎসব	... ৭০৬	আম্মোর, এম. এ. টি	... ২০২
আইনষ্টাইন	... ৬২৩	আরব, হাজ্রামাউট	... ৮৭২
আজানা, স্পেন-গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট	... ১২৬	আলকো, তুতপূর্ব স্পেন-বৃষ্টি	... ১২৫
আধুনিক কোষ	... ৬২৫	শ্রীআলমোহন দাস	... ৬১২
“আগামান-দ্বিস” উপলক্ষ্যে দ্বিতীয় মহিলাগণ	... ২০৮	আন্তোনিও বোব	... ২০১

আশ্রয় (রঙীন)—শ্রীধরপতি বহু	... ৩৬৮	খেলাঘর (রঙীন)—শ্রীনেত্রনাথ ঘোষ	... ৬৪২
শ্রীহিন্দু মুখোপাধ্যায়	... ৪৭১	গজাফড়ি	৭০২-১০
ইবন সাউদ	... ৬১৬	গঙ্গোপাধ্যায়, আর. পি.	... ৪৭১
ইয়াতুব হাসান, মিসেস	... ১১৫	গজবর্ষ-বৃত্ত	... ৪৭২
উড়িয়া-জয়পুরের মহারাজার মূর্তি	... ৪৭৪	গয়াধর, পণ্ডিত	... ১০৫
এজোব্যাকটেরিয়া	... ৮৩২	গান্ধী ও অজান্ত নেতৃবর্গ, হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলনে	১৪০
ক-কণার দিক্‌পরিবর্তন	... ৬২৫	গান্ধী, মাদ্রাজে হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলনে	... ১৪০
কবি-গান (রঙীন)—শ্রীপ্রহ্লাদ কর্ণকার	... ৭৮৪	গুলমর্গ	
কলমা গ্রামের বুড়াকালীর লিহাসন ও মন্দিরের		—গ্রীষ্মকালের দৃশ্য	১১১-১৪
কপাট	২০২-১০	—ডাকঘর	... ১১২
কলাই গাছের শিকড়ে উৎপন্ন স্ফোটক	... ৮৩২	—তুবারপুরী, গুলমর্গ	... ১১১
শ্রীকলাবন্তী বাথিঙ্গা	... ২৮৬	—তুবারাবৃত পথ	... ১১২
কলিকাতা হিন্দু অনাথ-আশ্রমের বালক-বালিকাগণ	৩৭২	—প্রধান বাজার	... ১১১
শ্রীকল্লুরীবাঈ গান্ধী	... ১৪০	—মহারাষ্ট্র-মন্দির	... ১১৩
কাঞ্চিরস্থানের গৃহে প্রবেশের বিচিত্র ব্যবস্থা	... ৮০২	—হোটেল	... ১১৪
কাঞ্চিরস্থানের পাণরক গ্রাম	... ৮৮১	শ্রীগোবিন্দবল্লভ গহ	... ৭৬০
কাবালেরো, স্পেন-গণভবনের সমর-সচিব	... ১২৬	ঘাটে (রঙীন)—শ্রীসত্যরঞ্জন মজুমদার	... ৬১২
কামালপাশা ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী	... ১৩০	চন্দ, ডাঃ এস. কে.	... ৬১৮
শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	... ২০৩	চন্দ্রনগর, অষ্টাদশ শতাব্দী	... ২৫৬
কাথোজ		চারুচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ	... ১৫৫
—অরণ্যমধ্যে বৃক্ষমূর্তি	... ৮০৮	চিড়ি ও চিত্তি-কাঁকড়া	২৫৭-৫৮, ২৬১-৬২
—কিন্নরী-বৃত্ত	৫১৮, ৮০৮	চিয়াং কাই শেক, শ্রীমতী	... ৮৮২
—গজবর্ষ-বৃত্ত	... ৫১৮	চীন	
—চলন্ত পুস্তকাগার	... ৮০৮	—চাংশায় রাজপথ নির্মাণ	... ৮৮৮-৫
—পালি বিদ্যালয়-চিত্রাবলী	... ৮০৮	—তরুণদল	... ১২২
—পুস্তকভরী-উৎসব, আম্রায়	... ৮০২	—দক্ষিণ-পূর্ব কান্সর দৃশ্য	... ৫৬২
—“বিনয়পিটক” গ্রন্থ সংরক্ষণের পুস্তকাধার	... ৮০৮	—নানকিং, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়	... ৮৮৮
—বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা ভবন	... ৮০৮	—নানকিং, প্রধান বিচারশালা	... ৮৮৮
—মন্দিরে রাজার আগমন	... ৮০২	—নানকিং, বিদ্যালয়ে শিশুদের স্বাস্থ্যপরীক্ষণ	৮৮৮
—রমাল লাইব্রেরি-চিত্রাবল.	... ৮০৮	—বীশের তৈরি ডেলা	... ৫৬২
—রাজতরী “মহাচক্রী”, সাইগন	... ৮০২	—মহিলা সম্ভরণবীর	... ৮৮২
—শিকারী-দল	... ৮০২	—শাংহাইতে কাপড়ের কল	... ৮৮২
কান্দিপ্রসাদ জায়সবাল	... ৭৫২	—সুন-ইয়াং-সেন স্বাস্থ্যসৌধ, ক্যান্টন	... ৮৮২
কান্দির মানমন্দির ও যন্ত্রাদি	... ৩৮৫	চোং-খ-পার জয়স্থলে উৎসব	... ৭২৪
কিউটা বন্দর	... ১২৫	‘ছো’-বৃত্ত, সেরাইকেলা	... ৩১২
কুড়মি ওঝাইন	... ৩১	জননী—শ্রীহৃদীররঞ্জন খাডগীর	... ৬২
কুম্ভপ্রসাদ বসাক	... ৬০৮	জবাহরলাল ও ইন্দিরা নেহরু, চট্টগ্রামে	... ২০৮
কাস্তমনি দত্ত	... ৩৭৭	জবাহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা নেহরু, বেঙ্গিনে	৩৮৭-৮৮
কীরোদেবের বহু	... ৭৫৮	জবাহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা নেহরু, রেঙ্গুনে	... ৩৮৬
খাদিপ্রতিষ্ঠান গোশালা	৫৪৩-৪৫	জয়সিংহ, সপুয়াই	... ৩৮১
খারে, এন. বি.	... ৭৬০	জর্জ, যট ও সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ	৩০২-১০
খের, বি. জি.	... ৭৬০	জলশায়ুক	৪৩৩-৩৪

জাপান		শ্রীনীলিমা মুখোপাধ্যায়	২৮৬
—আইরিস বন	৪২৫	নৃত্যভিত্তিক—শ্রীমদ্ভাষিকিনী চট্টোপাধ্যায়	২৮১
—চেরীফুলের উৎসবে নৃত্যগীত	৪২১	নৃত্যভিত্তিক—শ্রীপ্রভাত নিয়োগী	২৮১
—জাপানী নিয়ন্ত্রণাধীন যৌগে জাপানী সভ্যতার		নেপালের প্রতিনিধিবর্গ, সম্রাট বর্ষ জঙ্কের	
বিস্তার	৫১৯	রাজ্যাভিষেক	৩১১
—জাপানের চন্দ্রমল্লিকা	৪২২	পঞ্চচারিণী—শ্রীপ্রভাত নিয়োগী	৮৩৬
—টবে উৎপন্ন চন্দ্রমল্লিকা	৪২৬	পল্লীপথে (রঙীন)—শ্রীবাহুদেব রায়	৩২১
—টোকিওর উত্তানে চেরীফুল দর্শনার্থী নরনারী	৪২১	পশ্চিম-ভিব্বতের বিহার	৭২৬
—পিওনী ফুল	৪২৫	পাঠান রাইফেল-মিল্লী	১৩০
—পুষ্পিত চেরীগাছ	৪২৪	পিপড়ে-মাকড়সা	৫৭৫-৭৬
—ফুল সাঝাইতে রত তরুণী	৪২২	পৃথিবীর বৃহত্তম সেতু	১৩৩
—বিচিত্র পত্রপুষ্পে সজ্জিত ফুলদানি	৪২২	পোল্যান্ড	
—সম্রাটের প্রাসাদে প্রবেশের সেতু	৫১৯	—ওয়ার্ল্ড'র বাজার	১৩৮
—সৈন্যদলের উৎসবে কৃত্রিম যুদ্ধোদ্ভবন	৪৬৯	—পূর্বভূমি রাজপ্রাসাদ	৮৬৯
জাপান রণতরী 'ডায়োম্যাণ্ড'	৫৬৩	—লাজিন্জি প্রাসাদ ও উত্তান	৮৬৯
জাপানীতে হিটলারের প্রভাব বিস্তারের বার্ষিকী	১৩৯	—লোক-নৃত্য	৮৬৮
জাহারক, সব বেসিল	১২৭	—শোপার স্বভিত্তিক	৭০৭
জানেজনাথ চক্রবর্তী	৭৫৪	—শোবিন্দ্র স্বভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত মূর্তি	১৩৭
জ্যাকেরিয়া, এ. কে. এম.	৩১৭	প্যারিস হইতে প্রোটন নির্গমন	৬২৬
টোকিও বিশ্বশিক্ষাসম্মিলনে ভারতবর্ষের মহিলা-		প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী	১৩৯
প্রতিনিধিবর্গ	৪৩২	প্যাণ্টোইন	
ভেনী অভিমুখে ইতালীয় সেনাদল	১২২	—ইহুদী উপনিবেশে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক	
ভেনীতে আবিসিনিয় সেনার বেশরক্ষার শেষ চেষ্টা	১২৩	যন্ত্রাদির ব্যবহার	৫৫০
শ্রীভক্তসভা সেন	৫৭৭	—ফেলাহীন	৫৫০
তাজহাটের বয়স্কউটগণ গৃহসংস্কারে রত	৭৫৭	—যাযাবর বেহুইন	৫৫০
শ্রীতারার দেবরাস	৫৭৭	—হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন	৫৫০
তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র	৮৭৩	শ্রীপ্রতিমা মিত্র, চাঁদপুরে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	২০২
তিব্বতের সিদ্ধনদের খেয়া	৭২৪	প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	৩৭৭
তীর্থযাত্রী (রঙীন)—শ্রীবিজয়মোহন জিহ্মা	২৬২	প্রাচীর রাজপ্রাসাদ	২৩৯
তীর্থযাত্রী (রঙীন)—শ্রীমণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭৫	প্রিয়-প্রসাদন (রঙীন)—শ্রীইন্দুব্রজ গুপ্ত	৭৩২
তুরস্কের বৃষ্টি নগরের দৃশ্য	৫৫১	প্রাচ	৬২৩
মলাই লামার প্রাসাদ	৮৭০	ফাসিট ও তাহার বিরোধী দলের সংঘর্ষ, লণ্ডন	২০৭
দিব্য-স্বভি-উৎসব	১৫৪	বধু (রঙীন)—শ্রীবাহুদেব রায়	৩২
দীপকর শ্রীজ্ঞান	১০৭	বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, ডাঃ	২০৩
হুই বোন (রঙীন)—শ্রীপ্রভাত নিয়োগী	৬৪	বনভোজন (রঙীন)—শ্রীশান্তি গুহ	৫৬৬
দোলন-চাঁপা (রঙীন)—শ্রীনন্দলাল বহু	১	বরিশাল জেলা মহিলা-সম্মিলনী	৪৩১
দ্বিজেন্দ্রলাল স্বভি-উৎসব, কুমিলগর	৪৬৫	বর্ধায়—শ্রীপ্রভাত নিয়োগী	৮৩৬
ধানভান (রঙীন)—শ্রীবিজয়মোহন জিহ্মা	২৬২	শ্রীবিজয় মিত্র	৪৭১
শ্রীনাগাম্মা পাটিল	৫৭৮	শ্রীবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত	১১৫
নাভা পর্বত অভিযানে বঙ্গপ্রান্ত জাপান দল	৫৬৩	বিদ্যাতিন রম্মি	৬২৪
নাহাশ পাশা	১৩৫	বিদ্যাতিনের পথরেখা	৬২৪
নীরববরণী দেবী	৩১৬	বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতি, এডিনবরা	২০৬

শ্রীবিধুরঞ্জন সেন	...	৭৫৮	মজোলিয়ার উৎসবের যাত্রীদল	...	৮৮০
শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	...	৭৫৯	মজোলীয় বধু	...	৮০৯
বিমলানন্দ নাগ	...	১৫৫	মণিপুরী রমণী—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা	...	৪৪৪
বিশ্বধর্ম সন্মেলন, লণ্ডন	...	৪৬৮	মন্দিরের ঘাট (রঙীন)—শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৬১	
শ্রীবিষনাথ দাস	...	৭৬০	শ্রীমনীষা সেন	...	৫৭৭
বুড়াপেটের একটি মনোরম উদ্ভান	...	১৩৭	মরক্কোতে মুর-সেনাদিগের শিক্ষা	...	১১৮
বেনেশ	...	২৩৬	শ্রীমসিলামণি আম্রল	...	১১৫
বোড়াল গ্রামে সেন-রাজার প্রাচীন কীৰ্ত্তি			মক্কাতে ডাক-ষ্টীমার	...	৫৫১
— ত্রিপুরহুন্দরী দেবীর অষ্টধাতু মূৰ্ত্তি	...	৭১	মহাস্থানগড়	...	১৫৩
— ত্রিপুরহুন্দরী দেবীর বর্তমান মন্দির	...	৭০	মাক্কাহুয়ের শাসনকর্তা	...	৩১১
— সেন-রাজার আমলের ইট	...	৭০	মার্কনি	...	৭৫৬
— সেন-রাজার দীর্ঘিকা	...	৭২	মার্কনির শবযাত্রা	...	৭০৭
ব্রহ্মদেশ			শ্রীমালতী চৌধুরী	...	৫৭৭
— অরশ্যের পথে	...	৬৬৩	মাসারিক	...	২৩৫
— কৰ্মস্থলের বাংলা	...	৬৬৫	"মিউজি গিমে"র বৃত্তমূৰ্ত্তিনিচয়	...	৮০৯
— কেরিণ বালিকাদের সঙ্গে লেখিকা	...	৬৬২	মিলিকান	...	৬৯৭
— গোয়ানে কৰ্মস্থলের পথে	...	৬৬৩	মুখ্তালা, জি. এ	...	১১৬
— গ্রাম	...	৬৬৭	মুসোলিনির লিবিয়া পরিদর্শন	১২১-২২	
— গ্রামের বাজার	...	৬৬৭	মেক্সিকোতে জনবিক্ষোভ	...	১৩১
— ঘরমুখো চাবীদল	...	৬৬৭	মেঘালোকে (রঙীন)—শ্রীমণীজ্ঞানেশ গুপ্ত	...	৪২০
— চাবী	...	৬৬৬	মোরান সাহেবের বাগানবাড়ী, পোন্দলপাড়া	...	২৫৬
— জঙ্গলে খনির দৃশ্য	...	৬৬৩	মোগীজ্ঞানাথ সরকার	...	৬০৯
— জঙ্গলের পথে করেষ্ট-বাংলায় রাজ্যচাপন	...	৬৬৩	শ্রীরজনীকান্ত দত্ত	...	৬১২
— জঙ্গলের পথে রাজ্যচাপনের বাংলা	...	৬৬১	রঞ্জন-রশ্মি, তাম্রের দ্বারা প্রতিবিক্ষিপ্ত	...	৬৯৮
— পশুবিজ্ঞানশালা	...	৬৬৭	শ্রীরণেন্দ্রনাথ বসু	...	৯০১
— প্যাগোডায় বৃত্তমূৰ্ত্তি	...	৬৬৬	শ্রীবি বায়,	...	৪৭২
— বেস-ক্যাম্পের বাংলা	...	৬১২	রবীন্দ্র-জন্মোৎসব, কলিকাতা	...	৩১৮
— মৌলমিনের বন্দর ও পথের দৃশ্য	...	৬৬৬	রবীন্দ্রনাথ (রঙীন)—শ্রীধীররঞ্জন খাস্তগীর	...	৫১০
— রাখাল	...	৬৬৬	শ্রীমা বসু	...	৮৩৫
— রেঙ্গুনে জলজীড়	৬৬২, ৬৬৫		শ্রীমা মুখোপাধ্যায়	...	২৮৬
ব্রিটেনের নৌ- ও বিমান-শক্তি	...	১৩২	রাঘব বে নাশাশিবি	...	৬১৪
ভাইটামিন এ, লইয়া নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা	...	৮৪০	রাজনারায়ণ বসুর বাস্তবচিটার ধ্বংসাবশেষ	...	৭২
ভারত জুট মিলসের উদ্বোধন	...	৬১১	রাজপরিবার	...	৩১০
ভিয়েনা	...	৭০৬	শ্রীরাজসোপালাচারী	...	৭৬০
ভূদেব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ	...	২৫৬	রাদারফোর্ড	...	৬৯৩

রামাধরে—শ্রীনন্দলাল বসু	৪৪৪	লাসা (পূর্বাঙ্গবৃত্তি)	...	৪৩৭
রামমোহন রায়ের সমাধিস্থল, ব্রিটল	৫০১	—নেপালী সপ্তদাগর	...	৫০২
রামেশ্বর তীর্থ	১০৬	—পথ	...	৫০২
রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটার ভগ্নাবশেষ,		—সে-রা বিদ্যায়তন	...	৫০২
গোম্বলপাড়া	২৫১	শকুন্তলা (রঙীন)—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র	...	২৬৩
রাসপঞ্চাধ্যায়ের পুঁথির চিত্রাবলী	২৫৩-৫৫	শক্তকর্তন (রঙীন)—শ্রীত্রিভুজমোহন জিহ্মা	...	২৬২
রাঁচি		শাহাহাঁয়ের মেয়র	...	৪৬৩
—ওরাও ছাত্র	৩০	শাস্ত্ররক্ষিত	...	১০৫
—ওরাও নরনারীর মৃত্যু	৩১	শান্তিনিকেতনে চীনভবনের দ্বারোন্মোচন ৩০৩-০৪, ৩১২-২০	...	৪৩১
—ওরাও মুগ্ধ শিক্ষাসভার পরিচালিত ছাত্রাবাস	৩১	শাহ, আর.	...	৪৪০
—ওরাও শিক্ষক ও ছাত্রগণ	৩১	শাহজাদী (রঙীন)—শ্রীপরিতোষ সেন	...	৫১, ৫৩, ৫৭
—কোড়োয়া জাতির ফুটার	২৮	শিরঃপীড়ার মহোৎসব	...	৮৩৫
—খাড়িয়া গ্রামনেতা	৩০	শোভনা দেবী	...	৪৫২
—খাড়িয়া-পরিবার	৩২	শ্রীশোভা দাসগুপ্তা	...	১৫৫
—ঈষ্টান ছাত্রদের তাঁবু	২৭	ভ্রামাচরণ গুপ্ত	...	৫০৬
—দশমঘাট জলপ্রপাত	২৭	শ্রীকৃষ্ণ সিংহ	...	৫০৮
—বীরহোর রমণী ধাত্ত ফুটিতেছে	৩০	সতীদেহকঙ্কে শিব (রঙীন)—শ্রীহুয়ারী দেবী	...	৩১৭
—মুগ্ধ যুবক ও তাহার জীপুত্র	২৮	শ্রীসনৎকুমার রায় চৌধুরী	...	১২৩
—শঙ্খনদী	২৮	সিদ্ধাপুর কবর	...	১২৪
—সাঁওতাল গ্রামনেতা	২২	"সিপিয়োর আফ্রিকা জয়"—চিত্রে সাম্রাজ্যবাদ	...	৫৫১
—হো জাতির পুরুষ	২১	সিরিয়ার টেল-বিশের স্ক্রাম গৃহাবলী	...	৪৩২
—হো যুবক	২২	শ্রীসীতা জাহান-আরা	...	৮৮৩
শ্রীকৃষ্ণী লক্ষ্মীপতি	১১৬	হুংহুই, কমাণ্ডার	...	৩১৮
রুসভেন্টের দক্ষিণ-আমেরিকায় দৌড়া	১৩১	শ্রীহুয়ারীজন খাঙ্গলী	...	১৫০
লক্ষ্মী বৈশাখী স'ম্মলনীর কর্ম্মবৃন্দ	৪৭২	শ্রীহুভাষচন্দ্র বসু, সর্ঘর্দনা-সভায়	...	৮১৭
শ্রীলক্ষ্মী কুম্ভারামী ভারতী	১১৬	সেতু—অবিচ্ছিন্ন কড়ি-নির্মিত সেতু	...	৮১৮
লক্ষ্মীদেবী আমল, ডা:	১১৪	—ইম্পাতের খিলান সেতু	...	৮১৫
লভিকর রহমান, নবাবজাদা	২০৮	—গুয়েরমাউথ সেতু	...	৮১৮
লাসা		—ককরেষ্টক বৃত্তান্ত সেতু	...	৮১৬
—উত্তর দ্বার	৭২৩	—কাদিকের ক্লেবেল রাজপথ	...	৮১৩
—হুপ	৫০২	—কুলন সেতু	...	৮১৭
—তিব্বতী কয়েদী	৫৭২	—টাইবার নদীর উপর প্রাচীনতম প্রস্তর সেতু	...	৮১৮
—তিব্বতী ভক্তলোক, সপরিবারে	৪৩৭	—তিব্বতের ওয়ানাদপুরের সেতু	...	৮১৫
—দলাই লামার প্রাসাদ	৫০২	—পাটী-গার্ডার	...	৮১৬
—দৃষ্টাবলী	৪৩৮	—পিন-সংযোজনায় চিত্র	...	৮১৪
		—মধ্যগামী শ্রেণীর সেতু	...	

সেতু (পূর্বাভূত্ব)

—শিরোগামী শ্রেণী	... ৮১৪
—সিডনী হারবার সেতু, অস্ট্রেলিয়া	... ৮১৬
—সিরিয়া নদীর উপর খিলান সেতু	... ৮১৮
—স্বকুর সেতু	... ৮১৯
—হাবড়ার নতুন পুল	... ৮১৯

সেলমা ল্যাংগবলভ

সোজি কাওয়াবে, মেজর-জেনারল	... ৮৮৯
----------------------------	---------

সোরাবজী পাচখানাওয়ালা

সৌদী আরবের সৈয়দুল	... ৬১৩
--------------------	---------

শ্রীসৌরাষ্ট্র বহু

শ্রীসৌরাষ্ট্রমোহন সরকার	... ৩১৬
-------------------------	---------

স্পেন

—আলকাজার	... ১৩৫
—ইতালীর রাজদূতের স্পেনের বিদ্রোহী- নায়ককে স্বীকার	... ১২২
—গণতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে গুল্মোৎসব	... ১১৭
—গণতন্ত্রবাদের আরম্ভে আনন্দ-উৎসব	... ১১৭
—গণতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠায় বালিকাদের শোভাযাত্রা	... ১২৫
—গণতন্ত্র-সহায়ক “আন্তর্জাতিক” দল	... ১২৮
—নাৎসী গোলন্দাজ অধ্যক্ষের মাদ্রিদে গোলাবর্ষণের ব্যবস্থা	... ১৩৪
—বিদ্রোহীদলভুক্ত মুরসেনা	... ১১৮, ১২৭
—বিদ্রোহী মুরসেনার হস্তে গণতন্ত্রবাদিনী	... ১২৮
—বিদ্রোহীহস্তে বন্দী মিলিসিয়া সৈন্য	... ১২৮

স্পেন (পূর্বাভূত্ব)

—মাদ্রিদ অভিমুখে কাসিট ট্যাক-চালক	... ১৩৪
—মাদ্রিদ ষ্টেশন, বোমানিক্সেপে বিক্ষুব্ধ	... ১২০
—মাদ্রিদে বোমাবর্ষণ	... ১১৯-২০
—মাদ্রিদের মিলিসিয়া-রক্ষী	... ১৩৩
—স্বৈচ্ছাসেবিকার আহ্বান	... ১১৯
স্পেন হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত শিশুদের শিবির, সাউদাম্পটন	... ৯৬৮
হংকং	... ৮৮৮
হজ আমীন এল-হসেনী	... ৬১৫
হবিব-উল্লা, বেগম	... ৫৭৮
হাইড্রোজেন-অণু	... ৫২৫
হাওল্যাণ্ড দ্বীপ	... ৫৬৩
হার্টের গবে (রঙীন)—শ্রীতারক বহু	... ১৬৯
হারাসী, জাপানের প্রধান মন্ত্রী	... ১৩৬
হিটলারের জন্মোৎসব	... ৩১১
‘হিগেনবুর্গ’, জার্মান বিমানপোত	... ৩১১
হিন্দুকুশ পর্বতের উচ্চসীমান	... ৮৮১
শ্রীহিরণ্ময়ী বহু	... ৪৭৩
হিলিয়াম কোষ	... ৬২৫
হুইটম্যান	... ২১৩-৪
হুতোম-প্যাচা	... ৬৬-৬৮
হেমলিনী রায় চৌধুরাণী	... ৩১৫
শ্রীহেমপ্রভা মজুমদার	... ২৮৬
শ্রীহেমলতা দেবী ও অমৃত	... ৮৩৫



দোলন চাঁপা

শ্রীমদলাল বসু

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা

চিত্রাধিকারিণী শ্রীযুক্তা শ্রীমতী দেবীর সৌজদে



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নাম্যাম্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

৩৭শ ভাগ

১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৪৪

১ম সংখ্যা

যাবার মুখে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাক্ এ জীবন,

যাক্ নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা

ছুটে যায়, যাহা

ধূলি হয়ে লোটে ধূলি'পরে, চোরা

মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা

রেখে যায় শুধু কঁাক ।

যাক্ এ জীবন পুঞ্জিত তার জঞ্জাল নিয়ে যাক্ ।

টুকরো যা থাকে ভাঙা পেয়ালার,

ফুটো সেতারের সুরহারা তর,

শিখা-নিবে-যাওয়া ব'তি,

অপ্লশেষের ক্রান্তি-বোঝাই রাতি ;—

নিয়ে যাক্ যত দিনে দিনে জমা-করা

প্রবঞ্চনায় ভরা

নিষ্ফলতার সযত্ন সঞ্চয় ।

কুড়ায়ে ঝাঁটায়ে মুছে নিয়ে যাক্, নিয়ে যাক্ শেষ করি'

ভাঁটার স্রোতের শেষ-খেয়া-দেওয়া তরী ।

নিঃশেষ যবে হয় যত কিছু কঁাকি
 তবুও যা রয় বাকি—
 জগতের সেই
 সকল কিছুর অবশেষেতেই
 কাটায়েছি কাল যত অকাজের বেলায়,
 মন ভোলাবার অকারণ গানে কাজ ভোলাবার খেলায়।
 সেখানে যাহারা এসেছিল মোর পাশে
 তারা কেহ নয় তারা কিছু নয় মানুষের ইতিহাসে,
 শুধু অসীমের ইসারা তাহারা এনেছে আঁখির কোণে,
 অমরাবতীর নৃত্যনূপুর বাজিয়ে গিয়েছে মনে।
 দখিন হাওয়ার পথ দিয়ে তারা উকি মেরে গেছে ঘারে,
 কোনো কথা দিয়ে তাদের কথা যে বুঝাতে পারি নি কারে।
 রাজা মহারাজ মিলায় শূণ্যে ধুলার নিশান তুলে,
 তারা দেখা দিয়ে চলে যায় যবে ফুটে ওঠে ফুলে ফুলে।
 থাকে নাই থাকে কিছুতেই নেই ভয়,
 যাওয়ার আসায় দিয়ে যায় ওরা নিত্যের পরিচয়।
 অজানা পথের নামহারা ওরা লজ্জা দিয়েছে মোরে
 হাটে বাটে যবে কিরেছি কেবল নামের বেসাতী ক'রে॥

আমার ছুয়ারে আঙিনার ধারে ঐ চামেলির লতা
 কোনো ছদ্মিণে করে নাই কুপণতা।
 ওই যে শিমূল ওই যে সজিনা আমারে বেঁধেছে ঋণে,—
 কত যে আমার পাগলামি-পাওয়া দিনে
 কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে থাকা মধুর মৈতালিতে,
 নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ বৈতালিতে।
 সকালবেলার প্রথম আসোয় বিকালবেলার ছায়ায়
 দেহপ্রাণমন ভরেছে সে কোন্ অনাদিকালের মায়ায়।
 পেয়েছি ওদের হাতে
 দূর জনমের আদি পরিচয় এই ধরণীর সাথে।

অসীম আকাশে যে প্রাণ-কাঁপন অসীম কালের বৃকে
 নাচে অবিরাম, তাহারি বারতা শুনেছি ওদের মুখে ।
 যে মন্ত্রখানি পেয়েছি ওদের সুরে
 তাহার অর্থ মৃত্যুর সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে দূরে ।
 সেই সত্যেরি ছবি
 তিমিরপ্রাস্তে চিন্তে আমার এনেছে প্রভাত রবি ।
 সে রবিরে চেয়ে কবির সে বাণী আসে অস্তরে নামি'
 "যে আমি রয়েছে তোমার আমায় সে আমি আমারি আমি ।"
 সে আমি সকল কালে,
 সে আমি সকল খানে,
 প্রেমের পরশে সে অসীম আমি বেঞ্জে গুঠে মোর গানে ।

যায় যদি তবে যাক্,
 এল যদি শেষ ডাক,—
 অসীম জীবনে এ ক্ষীণ জীবন শেষ রেখা এঁকে যাক্,
 মৃত্যুতে ঠেকে যাক্ ।
 যাক্ নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা
 ছুটে যায়, যাহা
 ধূলি হয়ে লুটে ধূলি'পরে, চোরা
 মৃত্যুই যার অস্তরে, যাহা
 রেখে যায় শুধু কাঁক—
 যাক্ নিয়ে তাহা, যাক্ এ জীবন যাক্ ॥

শান্তিনিকেতন

২২ মাঘ, ১৩৪৩



বৃন্দ-সতসই

ঢাকায় বচিত অষ্টাদশ শতাব্দীর একখানি নীতিকাব্য

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কাম্বুনগো

শাহজাদা অজীমুশ্শান্ যখন হুবে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার হুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন তখন সম্রাট আওরঙ্গজেবের অহুমতিক্রমে তাঁহার দরবারী হিন্দী কবি বৃন্দাবনজী বা বৃন্দ শাহজাদার সহিত ঢাকায় আসেন। সম্রাট-পৌত্রের চিত্তবিনোদনার্থ এখানে থাকিয়া তিনি হিন্দী ভাষায় একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নাম ‘দৃষ্টান্ত-সতসই’; কিন্তু সাধারণতঃ ইহা বৃন্দ-সতসই নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। গ্রন্থসমাপ্তি-দোহার কবি লিখিয়াছেন—

সম্বত সসি রস বার সসি,
কাতিক সুদি সসি বার।
সার্তে ঢাকা শহর মৈ,
উপজ্যো রহৈ বিচার।

অর্থাৎ ১৭৬১ বিঃসং কার্তিক মাসের ৭ তারিখ সোমবার এই রচনা সমাপ্ত হয়। ইহার পূর্বে বৃন্দ কবি ‘ভাব পঞ্চাশিকা’ (১৭৫৩ বিঃসং) ও ‘শৃঙ্গার শিফা’ (১৭৫৮ বিঃসং) কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

কবি বৃন্দাবনজী শাকদ্বীপী ভোজক ব্রাহ্মণ বংশে বোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত মেড়তা শহরে ১৭০০ বিঃসং স্ত্রীপ্রতিপদ বৃহস্পতিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ২৮ বৎসর বয়সে তিনি বোধপুরাধিপতি মহারাজ যশোবন্ত সিংহের নিকট হইতে মেড়তার কিছু জমি জাগীর পাইয়াছিলেন। ঐ জমি আজ পর্যন্ত কবির বংশজগণ ভোগদখল করিয়া আসিতেছে। ইহার দুই বৎসর পরে বৃন্দ কবি দিল্লী গিয়াছিলেন। সেখানে কোন মুসলমান আমীরের সুপারিশে আওরঙ্গজেবের দরবারী কবি মনোনীত হইয়া দৈনিক ১০ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। কথিত আছে, তিনি শাহজাদা মোয়াজ্জম ও তাঁহার পুত্র অজীমুশ্শানের শিক্ষকতাও করিতেন। ১৭৬২ বিঃসং (১৭০৬ খৃঃ) কবি ‘বচনিকা’ নামক ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করেন। উহাতে সামুগঢ়ের প্রথম যুদ্ধে দারা শুকোর

অন্ততম রাজপুত সেনাধ্যক্ষ মহারাজ রূপসিংহের অসামান্য বীরত্বের বর্ণনা আছে। ১৭৬৫ বিঃসং তিনি সামুগঢ়ের দ্বিতীয় যুদ্ধের ঘটনাবলী অবলম্বনে ‘সত্য-স্বরূপ’ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ বৎসর কিশনগড়-নরেশ রাজসিংহজী সম্রাট প্রথম বাহাদুর শাহর (মোয়াজ্জম) অহুমতিক্রমে কবি বৃন্দকে নিজ রাজ্যে লইয়া আসেন এবং ভাল জাগীর দিয়া তাঁহাকে কিশনগড়েই রাখিয়া দিলেন। সেই সময় হইতে তাঁহার বংশধরগণ আজও কিশনগড়েব আশ্রয়ে বসবাস করিতেছে।

আধুনিক ঢাকাকার পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ শুক্লজী বৃন্দ-সতসই কাব্যকে জীপাঠোপযোগী কবিতা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমি ইহার ঐ বৈশিষ্ট্যটুকু উপলব্ধি করিতে পাবি নাই। এই কাব্যে জীজ্ঞাতির প্রতি কোন বিশেষ শ্রদ্ধা বা পক্ষপাতিত্ব কিছুই নাই—আছে জীজ্ঞাতির উপর পুরুষের চিরন্তন অবিশ্বাস। ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার ঐতিহাসিকের বিচার্য বিষয় নহে। কাব্য সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা ও লোকের মনোবৃত্তির দর্পণ-স্বরূপ ঐতিহাসিকের কাছে আদৃত হইয়া থাকে। আমরা কয়েকটি দোহা উদ্ধৃত করিয়া অম্ববাদ ও ঐতিহাসিক টিপ্পনসহ বাঙালী পাঠক-পাঠিকার কাছে নিবেদন করিব।

১। ফিকী পৈ নিকী লগৈ, কহিয়ে সময় বিচারি।
সবকো মন হর্ষিত করৈ, জ্যোঁ বিবাহ মে গারি।

কিকে (মন্দ) কথাও ভাল লাগে যদি সময় বিচার করিয়া বলা যায়; যেমন বিবাহের সময় গালাগালি সকলেব মন হর্ষিত কবে।

কোন বাঙালী বিবাহ-বাসরে গালাগালি খাইয়া উৎফুল্ল হয় না। হয়ত কোন কোন অঞ্চলের লোকেরা এই উৎকট আনন্দের অধিকারী। উহাদের মধ্যেও ব্যতিক্রম দেখা যায়। আমার জ্ঞানেক জীবিত-দার পণ্ডিত-বন্ধু দ্বিতীয় পক্ষ করিবার সময় দিল্লী হইতে এক জন পাঞ্জাব-

বাসী পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক বরষাজী হিসাবে যুক্তপ্রদেশের কোন গ্রামে গিয়াছিলেন। বিবাহ-আসরে উপস্থিত হইবার পূর্বে অন্তরমহল হইতে প্রত্যেক বরষাজীর নাম চাহিয়া পাঠান হইল; পাঞ্জাবী অধ্যাপক মহাশয় ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। পরে বিবাহমণ্ডপে এক জনের পর আর এক জন বরষাজীর নামে অকথ্য গালাগালি যখন স্থললিত স্ত্রীকণ্ঠে গীত হইয়া বিবাহবাসর মুখরিত করিল তখন তিনি প্রমাদ গণিলেন। বন্ধুবরের রসবোধ তেমন প্রথর ছিল না; গালাগালিতে তাঁহার পালা আসিবা মাত্র তিনি প্রায় লঙ্কাকাণ্ড বাধাইয়া দিলেন, এবং ক্রোধে দিশাহারা হইয়া সোজা দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন।

২। কুল বল জৈস্টো হোয় সো, তৈসী কবি হৈ বাত।
বণিক-পুত্র জানে কথা, গঢ় লেবে কী ঘাত।

বাহার যে-কূলে জন্ম এবং যে-কপ শক্তি সে-সেকপ কথাই বলিয়া থাকে। বানিয়াব (বৈজ্ঞেব.) ছেলে কেলা দখলেব ফিকির কোথা হইতে জানিবে?

চিরকাল বৈজ্ঞেরা হিন্দুস্থানে কাপুরুষ বলিয়া স্থণিত। তথায় বানিয়ার সাহস সন্মুখে অনেক গল্প আছে। জাঠদের দেখাদেখি কোন এক বানিয়ার ছেলের সিপাহী হওয়ার সুখ হইয়াছিল। সে জাত ডাঁড়াইয়া পণ্টনে ভর্তি হওয়ার জন্য রেক্রুট সাহেবের (Recruiting officer) কাছে উপস্থিত হইলে সাহেব বলিলেন, তোমাকে পরীক্ষা দিতে হইবে; তুমি ঠিক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, আর আমার সিপাহী তোমার মাথার টুপি নিশানা করিয়া গুলি ছুঁড়িবে। বানিয়ার ছেলে সাহসে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সাহেব খুব খুশী হইয়া বলিলেন, “বহৎ আচ্ছা বাহাদুর; লাও তুমরা টোপী”। বানিয়ার ছেলে সংকোচের সহিত বলিল, “হুজুর কাপড়াত্তী দেলাইয়ে”। সাহেব ব্যাপাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া বিদায় করিলেন।*

* জাতিবিশেষ সন্মুখে এইকপ ধাবণায় অনেকের প্রতি অবিচার করা হয়। এ বিষয়ে দ্বিতীয় বার্ষিক “দিব্য-স্মৃতি সভা”র ঐতিহাসিক যত্ননাথ সরকার মহাশয় বলিয়াছিলেন:

“বাজপুতদের মত বীৰ জাতি ভারতে আব কেহ নাই, জগতেও বিরল। এই বাজপুতগণ নিজকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গর্ব করে, অপর জাতিকে ঘৃণা করে; পশ্চিম অঞ্চলে কোন লোককে নীচ বা ভীক বলিতে হইলে চলিত ভাষায় বলা হয় “সে তো বাণিয়া”—অর্থাৎ দোকানদার, বৈজ্ঞজাতি। অথচ এই বাণিয়া জাতীয় লোক বাজপুত

৩। কব-বিগরী সুরদেব বচাই, জৈসে বণিক বিসেব।
হীগ মরিচ জিরো কই, হগ মব জর লিখ দেত।

যে কাজ হাতের দোবে বিগড়াইয়া যায়, জিহ্বাব জুগে তাহা শোধবাটয়া যায়। যেমন বানিয়া (দোকানদার) লিখিয়া দেয় “হগ-মর-জর”; অথচ পড়বার সময় হীগ মরিচ ও জিরাই পড়ে।

বানিয়াদের মধ্যে এরূপ সাংকেতিক লেখা সেকালে প্রচলিত ছিল; এখনও আছে তাহাদের ব্যবসা-সম্পর্কীয় ভাষা। অন্ত জাতি বুঝিতে পারে না।

৪। নৃপতি-চৌর-জঙ্গ-অনলতে ধনি কো ভয় উপজায়।

... ..

রাজা, চৌর, জল, ও অগ্নি ধনবানের ভয় জন্মাইয়া থাকে।

হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যে অনেক সময় যথেষ্টাচারী রাজারা ধনী লোকেব ভয়ের কারণ ছিলেন। মোগল-রাজ্যে অনেক সময়ে রাজপুরুষেরা বিনা কারণে ধনী সাহকাবগণকে কয়েদ করিয়া মোটা জরিমানা আদায় করিতেন। কুরুক্ষেত্র-অঞ্চলে শিখ-আধিপত্যের সময় ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল বলিয়া জনপ্রবাদ প্রচলিত

রাজাদের সৈন্তদলের নেতা হইয়া যুদ্ধজয় কবিয়াছে একপ ঘৃণাত্ত রাজপুতনাব ইতিহাসে অনেক পাইয়াছি। ভাবত-বিখ্যাত মহারাণা রাজসিংহেব দেওয়ান দয়াল শা—অর্থাৎ সাহকাব বা বণিক—এ বাজার সূর্য্যবংশী ক্ষত্রিয় সেনা চালাইয়া মুঘল বাদশাহেব দলবল বিধ্বস্ত কবেন। জয়পুরেব বাজা ঈশ্বরীসিংহেব মন্ত্রী হবগোবিন্দ নাটানী বা বাণিয়া, তাঁহাব কাছোয়া বাজপুত সেনার নেতা হইয়া বাজমহলেব মহাযুদ্ধে শত্রু পবাজয় কবেন। আব একজন বাজপুত রাজার বণিয়া কণ্ঠচাৰী প্রভুব আদেশে সেনানায়ক হইয়া যুদ্ধে প্রাণ দেন। সেই যুদ্ধ আবহু হইবাব পূর্ব্বক্ষেণে তাঁহাব সঙ্গী অহংকারী ক্ষত্রিয় সর্দাবগণ ঠাট্টা কবয়া তাঁহাকে বলেন—“শাহজী! আজ তো আটা ময়দা ওজন কবিবাব দিন নয়!” তিনি উত্তব কবিলেন, “ভাই সকল! আজ তোনবা দেখিবে আমি দুই হাতে তবাজু ধরিয়া আটা বিক্রয় করিতেছি।” - এই কথা বলা মাত্র শাহজী ঢাল ফেলিয়া দিয়া, ঘোড়াব লাগাম নিজ দাঁতে কামড়াইয়া ধরিয়া, দুই হাতে দুই তববাল লইয়া, জুতাব আঘাতে ঘোড়া ছুটাইয়া সকলেব আগে শত্রুদলেব মধ্যে গিয়া বহুঘব মত পড়িলেন, আর শত শত আঘাত পাইয়া শেষ মূহুর্ত্ত পর্যন্ত লড়িয়া প্রাণ বিসর্জন কবিলেন।

এগুলি সব সত্য ঘটনা, সমসাময়িক লিখিত ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, এগুলি মিথ্যা কল্পস্রষ্ট বা তর্কেব কাল্পনিক প্রমাণ নহে। ক্ষত্রিয় জাতিষেব অভিমানী কোন রাজপুত ইহাদের অধিক বীরত্ব ও সাহস দেখাইবাছে?

স্বতরাং আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা সত্যই বলিয়াছেন—গুণাঃ পূজাহানং ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।” —প্রবাসীর সম্পাদক

আছে। শিখ-শাসন ছিল অরাজকতার প্রতীক। এক্ষণে
এখনও লোকে বলিয়া থাকে “শিখ-সাহী রামরৌলা।”

৫। কোউ কর্হে হিতকী কর্হে, সো তাকো অভিরাম।
সৰ্বে উডাবত কাগ কৌ, পৈ বিরহিনী বলি দেত।

যে কেহ শুভকথা শুনায়ে, তাহাকেই লোক সমাদর করিয়া
থাকে। যেমন কাককে সকলেই তাড়াইয়া দেয়; কিন্তু প্রোবিত্ত-
ভর্তুকা বিরহিনী উহাকেই ভোজ্যাদি প্রদান করে। (কাক প্রিয়-
সমাগম-সংবাদ আনয়নকারী বলিয়া স্ত্রীলোকের বিশ্বাস)।

৬। অপনে লাগচ কে লিয়ে, হুখল আবে দায়।
কান বিধাবে খায় শুড়, পহিরে বীর বধায়।

লোভের জগ্গ হুখও সহ করা যায়; যেমন (কানে সোনা
পরিবাব লোভে) স্ত্রীলোকেরা শুভ খাইয়া, স্পথ লইয়া কান
বিধাইতে বসে।

৭। সোঁ সেবা রাজান কী, দীনী কঠিন বতায়।
জোঁ চুখন ব্যালী-বদন, সিংহমিলন কে ভায়।

ভূজঙ্গিনীৰ মুখ-চুখন কিংবা শার্দূলের সহিত মৈত্রী, যেমন
কঠিন, তেমনই কঠিন ইহাতেছে রাজসেবা বা সরকারী চাকরী।

ষেচ্ছাচারী রাজার সেবা চিরকালই বিপজ্জনক। প্রাচ্য
ও প্রতীচ্যের মধ্যযুগের ইতিহাস ইহার প্রমাণ।

৮। সেইর নুপ গুস্ত তিয় অনল,
মযভাগ জগ মাহি।

হৈ বিনাস অতি নিকটত, দুৰ রহৈ ফল নাহি।

সমসারে রাজা, গুস্ত, স্ত্রী এবং অগ্নির মধ্যম রকম সেবা করাই
প্রশস্ত। ইহাদের অধিক কাছে গেলে (অতি সেবা করিলে)
সর্বনাশ হয়; এবং অতি দূরে থাকিলে কোন ফলপ্রাপ্তি ঘটে না।

৯। প্রভু সোঁ বাত দুই ন তউ, করিয়ে আবজ মুখেন।
কল্পিনী আতুবতা লিখী, হবি কহ জানত হৈ ন।

মালিকের কাছে কোন কথা অজানা থাকে না; তবুও মুখে

প্রার্থনা জানান কর্তব্য। যেমন, কল্পিনী স্বপ্নের ব্যথা পত্রবোপে
কুককে জানাইয়াছিলেন; কেন ভগবান কি ইহা জানিতেন না?

বৃন্দ কবি পাকা দরবারী ছিলেন। চাটুভাদের যাহা-
মাত্র তিনি ভালরকম জানিতেন।

১০। ছলবল সঠে বিচারি কৈ, অরি হনিয়ে অনায়াস।
কিরো একেলে জোণসুত, নিশি পাণ্ডব কুল নাস।

সময় বিচার কবিরা ছলনা খাবা শত্রু নাশ করিবে; যেমন
জোণপুত্র অশ্বখামা একাকী বাহে পঞ্চপাণ্ডবের বংশ নাশ করিয়া-
ছিলেন।

মহাত্ম্যরতে যাহা নিন্দনীয়, মধ্য যুগে হিন্দু নীতিকার
উহাই অকুণ্ঠিত চিত্তে সমর্থন করিয়াছেন; তখনকার হিন্দু-
দিগের নৈতিক অবনতির ইহা অন্ততম প্রমাণ।

১১। জহা সনেহী তই রহত, ভ্রমত-ভ্রমত মন আয়।
কিরত কটোরী মজকী, চোরহি পৈ ঠহায়।

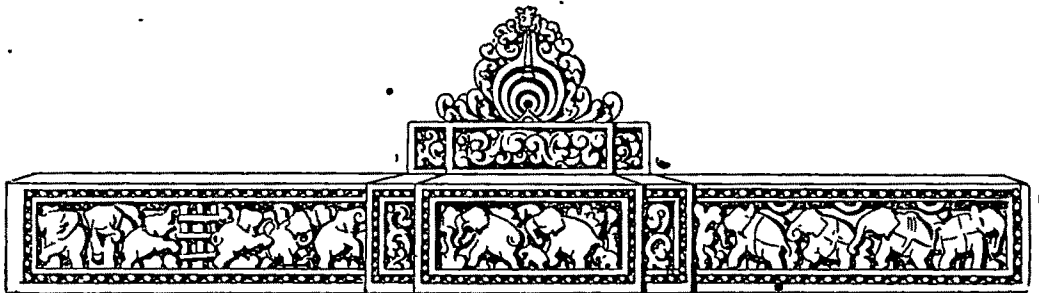
সে-যুগেও লোকের “বাটি-চালান” মজ্জে বিশ্বাস ছিল।
কবি বলিতেছেন—প্রেমাস্পদ যেখানে থাকে মন ঘুরিয়া
ঘুরিয়া এখানে স্থিতিলাভ করে; যেমন মজ্জের দ্বারা চালিত
বাটি চোরের কাছে আসিলেই থামিয়া যায়।

১২। জথা জোপ সব মিলত হৈ, জোঁ বিবি লিখোঁ অঁকুর।
খল শুড় ভোগ গঁবারণী, রাণী পান কপুর।

অর্থাৎ, বিধাতা যাহার ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন তদনুসারে
লোক পাইয়া থাকে; যেমন রাণী পাণ-কপূর খাইতে পান;
গ্রাম্যস্ত্রীরা খাইতে পায় সরিষার খৈল ও শুড়।

খাদ্যরূপে সরিষার খৈলের ব্যবহাব এখন কোথায়ও
আছে কিনা জানা নাই।

বৃন্দ কবির বহু উপমা ও নীতিবাক্য পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য
লোকদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এ-বিষয়ে কে
কাহার কাছে শুণী এই মীমাংসার ভার ভাবাত্মবিদের
উপর রহিল।



ঋষিকাহিনী ও ঋষিপন্থা

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ

‘ঋষি’ শব্দের অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা। বেদের ব্যাখ্যাকার ও ও আচার্য্যদের মতে বৈদিক মন্ত্র নিত্য সত্য, যে সত্য অনাদি পুরুষের অঙ্গীভূত হয়ে আছে, সসীম পুরুষের জ্ঞান ও উপদেশের উপর নির্ভর করে না এবং এই অর্থে অপৌরুষেয়। বেদ আর জ্ঞান যদি একার্থক হয়, তবে বেদ নিত্য সত্য, অপৌরুষেয় বটে। যে সসীম পুরুষ অনাদি পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগবশতঃ নিত্য সত্য দর্শন কবেন, তিনিই ঋষি। আজকাল যে কোন বিদ্বান বা সাধু পুরুষকেই ঋষি বলা হয়, যে কোন সাধু বাক্যকেই মন্ত্র বলা হয়। কিন্তু ঋষি ও মন্ত্রের মূল এবং শ্রেষ্ঠ অর্থে এরূপ বলা ঠিক নয়। সেই অর্থে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি কে আর কে নয়, তা বুঝতে গেলে মন্ত্রের কিছু আভাস, নিত্য সত্যের অন্ততঃ কণিক দৃষ্টি, আবশ্যক। উজ্জ্বল স্থায়ী দৃষ্টি লাভ করলে, বিশেষতঃ সেই দৃষ্টি অন্তরায়ী জীবন লাভ করলে, মাহুয প্রকৃত ঋষি নামের উপযুক্ত হয়। বা হোক, আমি আজ উপনিষদের ঋষিগণ সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে বলব। ঔপনিষদ ঋষি, ঋীদের উপদেশ প্রকৃত বোদ্ধান্ত, তাঁদের সংখ্যা জন বারের বেশী নয়। তাঁদের মধ্যেও ঋারা বিশিষ্ট, আমি তাঁদের কাহিনী ও পন্থা, তাঁদের মত ও শাখাভেদ, সম্বন্ধেই আজ বলব। এদেশে, বঙ্গদেশে, বোদ্ধান্তমত বলে যা চলিত, তা প্রধানতই ঔপনিষদ ঋষিদের প্রাচীন ও আধুনিক ব্যাখ্যাভাদের মত। ঋষিদের মত সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান অতি অল্প লোকেরই আছে। বা সাধারণতঃ বলা ও লেখা হয়, তা বিস্তৃত বোদ্ধান্ত নয়, তার মধ্যে ভেজাল অনেক থাকে। সেই ভেজাল সাংখ্য ও বৌদ্ধ মত থেকে গৃহীত। আমি যা বলতে যাচ্ছি, তা গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য যাই হোক, তা ঋষিদের নিজ মত, তাতে অন্য মতের মিশ্রণ কিছুই নেই। তবে আমি যে ভাবে ঋষিমত ব্যাখ্যা করব, তাতে আমার পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব থাকা কিছুই বিচিরা নয়। কিন্তু আমি ঋষিদের যে যে

উক্তি উদ্ধৃত করব ও যে সকল উক্তির নির্দেশ দেব তা থেকে আপনাবা সহজে বিচার করতে পারবেন আমাব ব্যাখ্যা প্রকৃত ব্যাখ্যা কি কাল্পনিক ব্যাখ্যা। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা করে ঋষিকাহিনী বলতে আরম্ভ করি।

উপনিষদের সময়ে আমাদের জাতীয় জীবনে ব্যবসায়-ভেদে বর্ণভেদ আরম্ভ হয়েছে। ঋষিদের মধ্যে কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয়, তা অনেক স্থলে বোঝা যায়। ব্রাহ্মণ জাতীয় ঋষিকে বলা হয় ব্রহ্মর্ষি, ক্ষত্রিয় জাতীয় ঋষিকে বলা হয় রাজর্ষি। যেমন আকর্ণি ও যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মর্ষি, জনক ও প্রবাহণ রাজর্ষি। এই দুই শ্রেণীর ঋষি ছাড়া আর এক শ্রেণীর ঋষি আছেন ঋীদের বলা হয় দেবর্ষি। বৈদিক ৩৩ জন দেবতার মধ্যে ঋাদের ব্রহ্মজ্ঞ বলে মনে করা হ’ত, যেমন প্রজাপতি, ইন্দ্র, সনৎকুমার, নারদ, তাঁদেবই বলা হয় দেবর্ষি। তথাকথিত দেবতারাই প্রকৃত মাহুয, অথবা কোন ব্রহ্মর্ষি বা রাজর্ষি নিজেকে অজ্ঞাত রাখবার জন্তে তাঁর উপদিষ্ট বিষয়কে প্রসিদ্ধ কোন দেবতার উপর আরোপ করেছেন, যাতে তা সহজে গৃহীত হয়। উপনিষদ-যুগের যাজ্ঞবল্ক্য আর শ্রুত বা দার্শনিক যুগের জৈমিনি বলেন, বেদের ৩৩ জন দেবতাই ভৌতিক বা মানসিক শক্তির ব্যক্তিকরণ মাত্র, কেহই বিগ্রহবান অর্থাৎ শরীরধারী ব্যক্তি নন। ঋথাস্থানে আমি দেখাব, উপনিষদের দেবর্ষিগণ প্রকৃত পক্ষে আত্মবিলোপপ্রয়াসী প্রচ্ছন্ন রাজর্ষি মাত্র।

যাহোক, ছান্দোগ্যের ঋষ্ঠাধ্যায়ের ব্রহ্মর্ষি উদ্যালক আকর্ণি ও তাঁর পূর্বে ঋেতকেতুর কাহিনী থেকে আরম্ভ করা যাক। তাঁদের আখ্যায়িকা আপনারা এই বেদী ও মঞ্চ থেকে বার বার শুনেছেন, সেই জন্তে আজ আমি তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র করব। বার বৎসর গুরু গৃহে বোদ্ধাধ্যয়ন করেও, অর্থাৎ বৈদিক সংহিতা পড়েও, ঋেতকেতু সেই বস্তুকে জানতে পারেন নি, যাকে জানলে মূলে সব বস্তুই জানা হয়, অদৃষ্ট

বস্তু দেখা যায়, অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞানগোচর হয়। সে-বস্তুর জ্ঞান বেদের সংহিতা পড়ে জানা যায় না। তা পাওয়া যায় উপনিষদ ঋষিদের উপদেশে। সেই উপদেশ পিতার নিকট প্রার্থনা করাতে আরুণি বললেন, নরুণের উপাদান লৌহ, বলয়াদি অলঙ্কারের উপাদান স্বর্ণ, মৃন্ময় পাত্রের উপাদান মৃত্তিকা। এই উপাদানগুলি জানলে যেমন লোহার, সোনার, ৬ মাটির তৈরি সব জিনিষই সাধারণ ভাবে জানা হয়, তেমনি বস্তু মাত্রেই উপাদান একটি পরম বস্তু আছে, সেটিকে জানলে মূলে সব বস্তুকেই জানা হয়। সেই বস্তুকে জানাও যেমন কঠিন ব্যাপার নয়, কারণ সেই বস্তু আমাদের প্রত্যেকেই ভিতরেই আত্মরূপে রয়েছেন। আরুণি খেতকেতুকে নানা দৃষ্টান্ত সহ নয় বার বললেন,

“তৎস্ম অসি খেতকেতো”—“হে খেতকেতো, তুমি হচ্ছে সেই বস্তু।”

প্রকৃত আত্মজ্ঞান না হ'লে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান আর আত্মার সহিত বিশ্বের সম্বন্ধ জ্ঞান হ'লে দেখা যায়, যাকে আমরা বিশ্ব বলি তা প্রকৃত পক্ষে একটি অনন্ত আত্মা, আর সেই আত্মাই আমাদের আত্মা, অন্তরাত্মা, পরম আত্মা। ঈশ্বর যে সমুদায় বস্তুর উপাদান কাবণ, সমুদায় জগৎকার্য্যে কৰ্ত্তা, তা ত কোনও ইতিহাস বা বৈজ্ঞানিক বিকাশক্রম দ্বারা জানা যায় না। তা জানা যায় কেবল আত্মার ভিতরে ঢুকলে। আত্মার ভিতরে ঢুকলে আর আত্মার সঙ্গে জগতেব সম্বন্ধ বুঝবার চেষ্টা করলে দেখা যায় সমুদায় বস্তুর অগ্রে অর্থাৎ মূলে, সমুদায় ঘটনার অগ্রে অর্থাৎ কারণরূপে, রয়েছেন একমাত্র অদ্বিতীয় সংবস্তু। তিনি সর্বদা বলছেন,

“বহু স্যাম্ প্রজারেষু”,—আমি বহু হই, আমি প্রাণীরূপে উৎপন্ন হই।”

বহু বস্তু ও প্রাণী, বস্তু ও প্রাণীর বহু পরিবর্তন, তাঁর নিত্য অদ্বৈত স্বরূপের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আর তাঁর নিত্য স্বরূপ থেকে দেশ কালে প্রকাশিত হচ্ছে। আরুণি নিজ আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন কবেই,—তাঁর সৃষ্টির ইচ্ছা, সৃষ্টির শক্তি, সৃষ্টি কার্য্য প্রত্যক্ষ ক'রেই, তাঁর বাণী আশ্চর্য্যে শুনেই,—তাঁর উক্ত সৃষ্টি-প্রণালী উচ্চারণ বা লিপিবদ্ধ করে থাকবেন। সৃষ্টিতে আমরা তিনটি মূল ভাব দেখতে পাই,—

(১) প্রকাশ, (২) গতি বা পরিবর্তন, (৩) এই দুয়েব অভাবাত্মক সত্তা। তেজ্জে প্রকাশ বা জ্ঞান দেখতে পাই। অল্প অর্থাৎ জলে দেখতে পাই গতি আর অল্প বস্তু সন্নিষ্ট বা বিল্লিষ্ট করবার শক্তি। মৃত্তিকা থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়, তাই আরুণি মৃত্তিকাকে বলেছেন অন্ন। মৃত্তিকায় প্রকাশ ও গতি নেই, বরঞ্চ মৃত্তিকা প্রকাশ ও গতিকে বাধা দেয়। এ'ব বাধকতা (resistance) আর রূপ-গন্ধাদি গুণ দেখে আরুণি এ'কে মৌলিক সৃষ্ট বস্তুব মধ্যে তৃতীয় বস্তু বলে গণ্য করে থাকবেন। তিনি বলছেন, সংবস্তু প্রথমে তেজ্জ হলেন, দ্বিতীয়তঃ অণু হলেন, তৃতীয়তঃ অন্ন অর্থাৎ মৃত্তিকা হলেন। তার পর এই তিন বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত করে তিনি অন্নাত্ম বস্তু হলেন। আরুণির মতে এই তিন বস্তু আর তাদের মিশ্রণ সবই দেবতা, সজ্ঞান সংবস্তুর সসীম প্রকাশ, জড়বস্তু ব'লে কোন বস্তু নেই। তাঁর দার্শনিক মত বিজ্ঞানবাদ (Idealism)। চিন্তাজগতে তাঁর বিজ্ঞানবাদই বোধ হয় প্রথম। খ্রীষ্ট-জন্মের অন্ততঃ এক হাজার বছর আগে এই বিজ্ঞানবাদ আবির্ভূত হয়। তখন যে অল্প কোন বিজ্ঞানবাদ ছিল, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্তমান জ্ঞানের আলোকে আরুণির বিজ্ঞানবাদ অতিশয় স্থূল (crude) ব'লে বোধ হ'তে পারে। কিন্তু সজ্ঞান সংবস্তু ছাড়া কোন বস্তু থাকা অসম্ভব, এই নিত্য সত্য, এই অনাদি অপৌরুষেয় মন্ত্র, যে তিনি সাক্ষাৎ ভাবে দেখেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অনাদি সংবস্তু যে অমর, অবিনাশী, আমরা যাকে মৃত্যু বলি, তার পরেও যে এই বস্তু থাকবে, এই সত্য তিনি স্পষ্টরূপেই শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু সংবস্তু যে সসীম ব্যক্তি বা বস্তুরূপে প্রকাশিত হন, সেই রূপগুলি যে অবিনাশী, তা আরুণি মানেন নি। সৃষ্টি অর্থাৎ স্বপ্নহীন নিত্য আমরা ব্যক্তির বোধ হারিয়ে সংবস্তুব সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যাই, জাগ্রৎ অবস্থায় আবাব ব্যক্তির বোধ ফিরিয়ে পাই, মরণান্তে যে আমরা আমাদের ব্যক্তির বোধ ফিরিয়ে পাব, তা আরুণি শিক্ষা দেন নি। তাঁর দর্শনের এই অসম্পূর্ণতা দূব করবার জন্তে কোন কোন বিশিষ্ট ঋষি কি উপায় অবলম্বন করেছিলেন তা আমরা পবে দেখব।

বাক্সনের বাস্তবদৃশ্য আরুণির শিষ্য ছিলেন, কিন্তু গুরু

অপেক্ষা তিনি অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। বৃহদারণ্যক উপনিষদে নানা স্থানে, নানা ভাবে, তাঁর মত ব্যাখ্যাত হয়েছে। বিশেষ ভাবে দ্বিতীয়াধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণে আর চতুর্থাধ্যায় পঞ্চম ব্রাহ্মণে মৈত্রেয়ীর সহিত কথোপকথনে এবং তৃতীয়াধ্যায় তৃতীয় ও চতুর্থ ব্রাহ্মণে জনকের সহিত আলোচনায় তাঁর মত খুব স্পষ্টরূপেই বিবৃত হয়েছে। আত্মাকে না জেনে কিছুই জানা যায় না, আব আত্মা যা জানে তা আত্মারই অন্তর্ভূত, যাজ্ঞবল্ক্যের এই বিজ্ঞানবাদ আত্মণির বিজ্ঞানবাদ থেকে অনেক পরিমাণে বিকশিত। কিন্তু এই বিজ্ঞানবাদ শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি কোন স্পষ্ট বিচার বা বিশ্লেষণ-প্রণালী অবলম্বন করেন নি। উপমা অবলম্বন করে এই মাত্র দেখিয়েছেন যে যেমন ঢাক, বাঁশী বা বীণার শব্দ স্বতন্ত্র ভাবে ধরা যায় না, কেবল এসকল যন্ত্র ও যন্ত্র-বাদককে ধরলেই শব্দ ধরা হয়, বাদ্য ও বাদককে ছেড়ে শব্দের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনি আত্মাকে ছেড়ে কোন বস্তুকে ধরা যায় না, প্রকৃতপক্ষে জানা যায় না, আত্মাকে ধরলেই বস্তু ধরা হয়, আত্মাকে জানলেই বস্তু জানা যায়, আত্মা থেকে বস্তুর কোন স্বতন্ত্রতা নেই। কিন্তু বিষয় ও বিষয়ী, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার, এই একত্ব, এই অদ্বয়, স্বীকার করেও যাজ্ঞবল্ক্য স্বপ্ন ও সুষুপ্তির বিচার করতে গিয়ে এই অদ্বয়প্রণালী রক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর কাছে বোধ হয় যে স্বপ্নে আংশিক ভাবে আর সুষুপ্তিতে সম্পূর্ণ ভাবে বিষয় ও বিষয়ী, জগৎ ও জীব, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আর জীব বা আত্মা ছাড়া যখন জগৎ কিছু নয়, তখন সেই অবস্থায় জগৎ প্রকৃত পক্ষে থাকে না। আত্মা সেই অবস্থায় নির্বিষয় ও নির্বিশেষ বোধমাত্র নিয়ে থাকে। আত্মার এই যে নির্বিষয় ও নির্বিশেষ অবস্থা, এই যাজ্ঞবল্ক্যের মতে আত্মার স্বরূপ। আমরা যাকে মৃত্যু বলি, সেই অবস্থায় আত্মা এই স্বরূপ নিয়েই থাকবে, তার পক্ষে জাগতিক, পারিবারিক, সামাজিক বা নৈতিক ভেদ কিছুই থাকবে না। মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য পুনর্জন্মের কথা কিছুই বলেন নি। জনকের সহিত সংবাদে যেন পশ্চাৎ চিন্তার (after-thought) মতন তিনি বলেছেন, যত দিন আত্মাতে বাসনা-কামনা থাকবে, তত দিন কর্মফলাহুসারে ভিন্ন ভিন্ন আকারে আত্মার পুনঃ পুনঃ জন্ম হবে। বাসনা

কামনা শূন্য হয়ে, আত্মকাম বা আশুকাম হয়ে, যে জীব দেহত্যাগ করবে সে পুনর্জন্ম না হয়ে নির্বিষয় নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হবে। এই একীভূত বা বিলীন হওয়াকে বৈদান্তিক আচার্যেরা বলেন সন্ধ্যোমুক্তি।

এক শ্রেণীর ঋষিদের দ্বারা এই মতেব যে প্রতিবাদ হ'ল, তা পরে বলছি। তা বলবার আগে যাজ্ঞবল্ক্যের শিক্ষার আর একটা দিক বলছি, যে দিকটা পরবর্তী সময়ে ভক্তিগাত্র-প্রবর্তক বৈষ্ণবাচার্যদের দ্বারা বিশেষরূপে বিকশিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে শিখিয়েছেন যে যেমন আত্মজ্ঞান অল্প সকল জ্ঞানের ভিত্তি ও আশ্রয়, তেমনি আত্মপ্রেম অল্প সমুদায় প্রেমের ভিত্তি ও আশ্রয়। আমবা যে পিতা-মাতা, পতি-পত্নী, ভ্রাতা-ভগ্নী, পুত্র-কন্যা, স্বজাতি প্রভৃতিকে ভালবাসি, তার কারণ আমরা আত্মার সঙ্গে তাঁদের অল্পাধিক পরিমাণে একত্ব অনুভব করি। যাদের সঙ্গে এই একত্ব অনুভব করি না, তাঁদের আমরা ঘৃণা বা উপেক্ষা করি। কিন্তু যখন আত্মজ্ঞান উজ্জল ও বিকশিত হয়, যখন দেখা যায় যে, কেউই অন্যাত্মা নয়, সকলেই আত্মার সঙ্গে এক, তখন আর কারণও প্রতি ঘৃণা থাকে না, তখন—

“আত্মনন্ত কামায় সর্বঃ প্রিয়ঃ ভবতি।”

আত্মকামে, আত্মার অমুরোধে, সকলে প্রিয় হয়ে যায়। এই মতে যে তাঁর নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ আর তাঁর একেতে বহুর বিলয়বাদ অর্থহীন, অসম্ভব, হয়ে যায়, তা যাজ্ঞবল্ক্য বুঝতে পারেন নি। অল্প কোন ব্রহ্মাণি যে বুঝতে পেরেছিলেন তাও বোধ হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য যে ভাবে আত্মার স্বরূপ বর্ণনা কবেছেন, আত্মাকে যে রকম নির্বিষয়, নির্বিশেষ, অচিন্তনীয়, অনির্কলনীয় করে কেলেছেন, তাতে আত্মার ভিতর প্রেম থাকা অসম্ভব। প্রেম, ভালবাসা, ভাল চাওয়া, সুখ বা শ্রেয় চাওয়া, এতে ভেদ, বিশেষত্ব, বিচিন্নত, থাকা চাই; জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, প্রেম ও প্রেমপাত্র, ভোগের বিষয় ও বিষয়ী, এই দ্বৈততাব থাকা চাই, আর দ্বৈতের সঙ্গে অদ্বৈত ভাবও থাকা চাই। ভেদ জেনেও, স্বীকার করেও, যে পরকে উপেক্ষা করে কেবল নিজেকে ভালবাসে, তার ভালবাসাটাকে আমরা ভালবাসা না বলে স্বার্থপরতা বলি, আর প্রশংসা না করে অশ্রদ্ধা করি। প্রকৃত ভালবাসার লক্ষণই হচ্ছে নিজেতে সন্তুষ্ট না থেকে

পরকে চাওয়া আর পরকে আপন ভেবে তাতে তৃপ্তিলাভ করা। প্রকৃত জ্ঞানের ভিতরে যে ভেদাভেদ, ভেদের অবিরোধী অভেদ, আর অভেদের অবিরোধী ভেদ, দেখা যায়, প্রেমে এই লক্ষণ আরও উজ্জ্বল। যাজ্ঞবল্ক্য এই সত্য বুঝতে পারেন নি। এখনও এদেশে ও বিদেশে বুদ্ধিপ্রধান (intellectualist) অধৈতবাদীরা তা বুঝতে পারেন না। যা হোক, আমাদের প্রাচীন রাজর্ষিরা, ক্ষত্রিয় ঋষিরা, ব্রহ্মবিদের মতের অসঙ্গতি-দোষ বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁরা মূল ব্রহ্মবাদ গ্রহণ করেও ব্রহ্মর্ষিদের অসম্যক দার্শনিক মত, তাঁদের অসামাজিক সম্মানবাদ, আর বৈনাশিক লব্ধবাদের ভ্রম লক্ষ্য করে এসকল মতের প্রতিবাদ ও প্রতিকার করেছিলেন। তাঁরা যা করেছিলেন তার বিবরণ আছে ছানোগ্যের সপ্তম ও অষ্টমাধ্যায়ে, বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠাধ্যায়ে, আব কোষীতকির প্রথম ও তৃতীয়াধ্যায়ে। ছানোগ্যে ও কোষীতকির তৃতীয়াধ্যায়ে তাঁরা দাঁড়িয়েছেন প্রজাপতি, ইন্দ্র ও সনৎকুমার, এই তিন জন দেবর্ষির পশ্চাতে। বৃহদারণ্যক এবং কোষীতকির প্রথমাধ্যায়ে তাঁরা প্রবাহণ ও চিত্র এই দুজন রাজর্ষির চরণভলে তাঁদের পুরোহিত উদালক আকর্ণিকে বসিয়ে এই ব্রহ্মর্ষির অজ্ঞাত পরলোকতত্ত্ব, ব্রহ্মলোকের বার্তা ও জীবের প্রতি ব্রহ্মের প্রেমব্যস্ততা শিখিয়েছেন। এসব বিষয়ে বঙ্গদেশের বৈদাস্তিকদের অনভিজ্ঞতা দেখে আমি অবাক হই। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণও নির্দোষী নন। তাঁদের বৈদান্ত-চর্চাও এবিষয়ে অসম্পূর্ণ। যা হোক, উপনিষদের এই উপেক্ষিত অথচ গৌরবান্বিত অংশ, উপনিষদ ধর্ম্মে এই ক্ষত্রিয়প্রভাব, সংক্ষেপে বর্ণনা করি। এই রাজর্ষিরা দার্শনিক বিচারের অঘটন-প্রণালীটা (logic of comprehension) বেশ শক্ত করে ধরেছেন আর সেই প্রণালী অবলম্বন করেই যাজ্ঞবল্ক্যের নির্বিশেষ অধৈতবাদের ভ্রম দেখিয়েছেন। এতদ্বিষয়ক কাহিনীগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করি। যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বুঝিয়েছেন যে সৃষ্টিতে জাগ্রৎ ও স্বপ্নের সমস্ত বিচित्रতা বিলীন হয়ে যায়, আত্মা নির্বিষয় ও নির্বিশেষ হয়ে যায়। তাঁর মতে এই তৃতীয় অবস্থাই আত্মার স্বরূপ। মরণাঙ্কে, মুক্তির অবস্থায়, আত্মা এই স্বরূপেই অবস্থিত হবে। মাণ্ডুক্যের মতে আত্মার একটা চতুর্থ অবস্থা আছে, সেটাই শ্রেষ্ঠতম। কিন্তু সেটা

তৃতীয়াবস্থা থেকে আরও সূক্ষ্ম। তাঁর মতে তৃতীয়াবস্থা ঈশ্বরভাব। এই ঈশ্বরভাব বশতই লয়ের একত্ব থেকে সৃষ্টির বিচित्रতা ফিরে আসে। চতুর্থ অবস্থা ঈশ্বরভাবেরও উপরে। সে অবস্থা একেবারে অনির্বচনীয়, তাতে আসা যাওয়া, বিচित्रতা, এসব কিছুই নেই; অথচ মাণ্ডুক্য তাকেই ‘আত্মা’ বলেছেন, ‘বিজ্ঞেয়’ বলেছেন।

ছানোগ্যের অষ্টমাধ্যায়ে, প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোধনের আখ্যায়িকায় এই মতেরই সমালোচনা করা হয়েছে এবং আত্মার চতুর্থ অবস্থাকে সমস্ত বিচित्रতার আধার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গল্পটা এই। প্রজাপতি আত্মার স্বরূপ ও ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি শিক্ষা দিচ্ছেন শুনে দেবতাদের দিক থেকে ইন্দ্র, আর অশ্বরদের দিক থেকে প্রহ্লাদেব পুত্র বিরোধন, তাঁর শিষ্য হলেন। প্রজাপতি যে ভাবে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন, তাতে শিষ্যদের বোধ হ’ল যেন গুরুর মতে দেহ আর আত্মা একই আর সাংসারিক হৃৎভোগই জীবের পরম শ্রেয়। এই শুনে শিষ্য দুজনই শাস্ত্রমনে চলে এলেন। বিরোধন অশ্বরলোকে ফিরে গিয়ে এই “আত্মরূপ উপনিষদ”ই প্রজাপতির মত বলে শিক্ষা দিলেন, কিন্তু ইন্দ্র যেতে যেতে এই মতের অসম্ভাবকরতা বুঝতে পেরে পথ থেকে ফিরে গেলেন আর গুরুকে তাঁর অসম্ভাবের কথা বললেন। গুরু তাঁকে ক্রমশঃ স্বপ্ন ও সৃষ্টির কথা বললেন। ইন্দ্র কিছুতেই সন্তুষ্ট হলেন না। সৃষ্টি সত্ত্বা তিন বললেন এই অবস্থায় আত্মা কোন বিষয় জানে না, নিজেকেও জানে না, এই অবস্থায় সে বিনষ্ট হয়, অন্ততঃ বিনষ্টপ্রায় হয়, এতে সম্ভোগের বিষয় কি আছে? এই কথাতে যে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিবাদ করা হ’ল, তা সহজেই বোঝা যায়। যা হোক, তখন প্রজাপতি আত্মার চতুর্থাবস্থার কথা বললেন। তিনি এর যে বর্ণনা দিলেন তা মাণ্ডুক্যের চতুর্থাবস্থার ঠিক উটে। তিনি বললেন যে এই অবস্থায় আত্মা পরম জ্যোতিতে জ্যোতিমান্ন হয়ে, অর্থাৎ সর্বাধার সর্বময় ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব অল্পভব করে, উত্তম পুরুষ হয় এবং মনোরূপ দিব্যচক্ষুতে ব্রহ্মলোকের নিত্য বস্তু সকল দর্শন করে ব্রহ্মলোকে চিরবাসের অধিকারী হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সৃষ্টি, এই সকল পরিবর্তন শরীরী আত্মার, পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য, এই সকল পরিবর্তনের অতীত। জীবের ব্রহ্মলোকে বাস স্থলদেহ থাকতেই আরম্ভ হয়,

দেহান্তেও চলতে থাকে। কোন লোকে, কোন ভোগে, মুক্তাঙ্গার অনধিকার নাই, সকলই তার আয়ত্ত। ইন্দ্র এই রূপে আশ্চর্য শিক্ষা করে দেবলোকে চলে গেলেন। সেখানে এলেন রাজা দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন। তাঁর যুদ্ধকৌশলে প্রীত হয়ে তাঁকে ইন্দ্র বরস্বরূপ আশ্চর্য শিক্ষা দিলেন। যে তরু এই সেদিন নিওহিগেলিয়ান দার্শনিকেরা পাশ্চাত্য জগৎকে শিখিয়েছেন, সেই তরুই অন্ততঃ তিন হাজার বছর আগে এদেশে রাজর্ষি বা ইন্দ্রের মুখ দিয়ে শিখিয়েছিলেন। ইন্দ্র প্রতর্দনকে বললেন, মানুষের পরম শ্রেয় আমাকে জানা। ‘আমাকে’ অর্থ ‘আত্মাকে’। আত্মার দুটো দিক, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, বিষয় ও বিষয়ী। ইন্দ্র এদের বলেন ‘ভূতমাত্রা’ ও ‘প্রজ্ঞামাত্রা’। অজ্ঞানী এই দুটো দিককে দুটো পৃথক বস্তু মনে করে, সে জানে না, বোঝে না, যে একটাকে ছেড়ে আর একটা অর্থহীন, অসম্ভব। এই জ্ঞেয়-জ্ঞাতরূপী আত্মাই একমাত্র গোটা জিনিষ (concrete reality), এর বাইরে কিছুই নেই। দেশকালের সীমার দিক থেকে দেখলে একে বলতে হয় সসীম। কিন্তু সসীম অসীমকে ছেড়ে থাকতে পারে না। সসীমের ভিতরে অসীম, অসীমের ভিতরে সসীম রয়েছে। বিষয়-বিষয়ীর মূল কথা সসীম-অসীমের এই ভেদাভেদ। প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় সসীম অসীমকে জানেন, অসীম সসীমকে আত্মপরিচয় দেন। তাঁদের পরস্পরের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, অবিনাশী। যা হোক, এই যে দুটো ঋষিকাহিনী বললাম,—প্রথম প্রজ্ঞাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ, আর দ্বিতীয় ইন্দ্র-প্রতর্দন-সংবাদ, এই দুটোতে আরাগি ও যাজ্ঞবল্ক্য আর তাঁদের অল্পবর্তী পিঙ্গলাদ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্যের নির্কির্শেব অদ্বৈতবাদের মূল ভ্রম দেখান হয়েছে। আরও তিনটি কাহিনী আছে যেগুলিতে এই মূল ভ্রমের ফল,—ঈশ্বরের প্রেম ও জীবাত্মাব অমরত্ব অস্বীকার,—এই দুই মতের ভুল দেখান হয়েছে। এই তিনটি আখ্যায়িকাতেই গুরু হচ্ছেন এক এক জন রাজর্ষি, আর শিষ্য হচ্ছেন নির্কির্শেব অদ্বৈতবাদের প্রবর্তক আরাগি। প্রথমটি আছে ছান্দোগ্যের পঞ্চমাধ্যায়ে, দ্বিতীয়টি বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠাধ্যায়ে, আর তৃতীয়টি কোষীতকির প্রথমমাধ্যায়ে। আরাগির পুত্র ঋতকেতু পিতার প্রতিনিধি-

রূপে রাজর্ষিদের ব্রহ্ম সম্পাদন করতে গিয়েছিলেন। রাজর্ষিরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি পিতার কাছে ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষালাভ করেছেন কি না। ঋতকেতু বললেন, শিক্ষালাভ করেছেন। কিন্তু রাজর্ষিরা তাঁকে পরলোক সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি সে সকলের উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি পিতার নিকট গিয়ে নিজের অসম্পূর্ণ শিক্ষা সম্বন্ধে অভিযোগ করলেন। পিতা বললেন যে রাজর্ষিরা যে-সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি নিজেই সে-সকলের উত্তর জানেন না। আরাগি তখন রাজর্ষি প্রবাহণ ও চিত্রের নিকট গিয়ে তাঁদের কাছে পরলোকতত্ত্ব শিক্ষা করলেন। এ-বিষয়ে কোষীতকিতে চিত্র যা বলেছেন তাই সর্বোৎকৃষ্ট। জীবাত্মা যে ইহ-পরকালে ক্রমশঃ নানা স্তরের ভিতর দিয়ে ব্রহ্মলোকের দিকে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও অগ্নি জীবাত্মাদের সহিত অচ্ছেদ্য যোগের দিকে অগ্রসর হয়, তা কোষীতকির প্রথমমাধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। রূপকের ভাষায় বলা হয়েছে ব্রহ্ম শ্রুতি ও মনোবৃত্তিরাগী দেবকামিনীদিগকে বলেন, তোমরা আমাবশ নিয়ে ঐ সাধকের দিকে ধাবিত হও, অর্থাৎ আমার সম্মানে সম্মানিত করে তাকে আমার নিকট নিয়ে এস। নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদী জীবের প্রতি ব্রহ্মের এই ব্যস্ত প্রেম স্বীকার করেন না, অথচ যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মপ্রেম ব্যাখ্যা থেকে জীবের প্রতি ব্রহ্মপ্রেম নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হয়। যাহোক, ব্রহ্মের আদেশে পাঁচ শত দেবকামিনী নানা উপহার সহ সাধকের নিকট উপনীত হয়ে তাঁকে ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত করেন। সেই সাজে সজ্জিত হয়ে সাধক অনায়াসে আর অর্থাৎ রিগ্ণু নামক হ্রদ, ইষ্টহানিকর মুহূর্ত্ত অর্থাৎ অনর্থক সময় নষ্ট করা রূপ দোষ, বিজরা নদী, ও ইল্যবৃক্ষ অর্থাৎ জগৎ সম্বন্ধে পার্শ্বিক ভাব, অতিক্রম করেন। ব্রহ্মলোকের নিকটবর্তী হয়ে তিনি ক্রমশঃ ব্রহ্মগন্ধ, ব্রহ্মরস, ব্রহ্মভেদু ও ব্রহ্মবশ সন্তোষ করতে করতে ব্রহ্মের সম্মুখীন হন। ব্রহ্মকে প্রজ্ঞারূপ দিব্য সিংহাসনে আসীন দেখতে পান। ব্রহ্মের সহিত তাঁর দীর্ঘ কথোপকথন হয়।

‘কোহসি’ ?—‘তুমি কে’ ?

ব্রহ্মের এই প্রশ্নের উত্তরে সাধক বলেন—

“ত্বম্ আত্মাংসি, বহুত্বম্ অসি, সোহমস্মি”—তুমি আত্মা, তুমি যে আমিও সে।

অর্থ্যাৎ “তোমার সঙ্গে আমি ভেদাভেদ ভাবে যুক্ত।” তার পর সাধক উপাসনা নদীতীরে, পূর্বাগত মুক্তাত্মাদের সহিত চিরবাস করতে ব্রহ্মের আদেশ লাভ করেন।

“ন চ পুনরাবর্ততে, ন চ পুনরাবর্ততে”। (ছান্দোগ্য ৮।৫।১)

সেখান থেকে অবিদ্যা ও ক্ষুদ্র কামনা-যুক্ত সাংসারিক জীবনে তিনি আর ফিরে আসেন না। এই হ’ল ঋষি-পন্থা। এই পন্থার সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ আধুনিক ব্রহ্মবাদীদের পন্থার কি কোন পার্থক্য আছে? মূলে আমি ত কোন পার্থক্য দেখি না। মূল সত্য সম্বন্ধে কালে কোন পার্থক্য হয় না। মূল সত্য নিত্য, অপৌরুষেয়। কালপ্রবাহে অবাস্তর বিষয়ে পরিবর্তন হয়। মূল বিষয় অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু নিত্য পুরাতন বস্তুও সাধককে সাধনশ্রমের দ্বারা আবিষ্কার করতে হয়। এই আবিষ্কারে তা আবিষ্কারকর্তার কাছে নূতন বলে মনে হয়। জীবন্ত সাধকের কাছে নিত্য পুরাতন ব্রহ্ম দিনে দিনে, মুহূর্তে মুহূর্তে, নূতনরূপে প্রকাশিত হন। যা হোক, ঋষিপন্থাটা আমি যা বুঝেছি, তা সংক্ষেপে পুনরুক্তি করে আজকের কাজ শেষ করি।

দেশে কালে প্রকাশিত জগৎ, যে জগৎ আমরা দেখি, শুনি, স্পর্শ, আশ্রয় ও আশ্বাদন করি, যে জগৎ আমরা স্মরণ, বিচার ও চিন্তা করি, তাকে লোকে বলে জড়জগৎ। ঋষিরা বলেন—

“সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম—নিশ্চয়ই এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম। (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)

ঋষিরা কেন এই অদ্ভুত কথা বলেন, তার আভাস আমি আমার প্রবন্ধে কতকটা দিতে চেষ্টা করেছি। যা কিছু আমরা জানি, যাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বলি, তার সঙ্গে জ্ঞাত আত্মাকে জানি, আত্মাকে তাঁর সহিত সংযুক্ত বলেই জানি। অন্তরূপে জানা অসম্ভব। এসকল জানা বস্তুকে যখন স্মরণ করি, বিচার করি, চিন্তা করি, তখনও আত্মার সহিত সংযুক্ত ভাবেই স্মরণ, বিচার ও চিন্তা করি। অন্তরূপে স্মরণ, বিচার ও চিন্তা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রত্যেক জ্ঞান, স্মৃতি, বিচার ও চিন্তাতে আমরা যাকে নিজ আত্মা বলি

তাঁই বিবিধ বিজ্ঞান-সম্বন্ধিত হ’য়ে প্রকাশিত হয়। বিশেষ বিশেষ দেশ ও কালে যা আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, তা বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র অংশ। কিন্তু এই অংশকে আমরা বিশ্বের, সমষ্টি জগতের, ব্যষ্টি বা আংশিক প্রকাশ বলে ভাবতেই বাধ্য হই। এরূপ ভাবনা ছাড়া আর কোন প্রকার ভাবনা সম্ভব নয়। সমষ্টি জগৎ ভাবতে গিয়ে আমরা আত্মাকে,—যাকে নিজ আত্মা বলি সেই আত্মাকেই—সমষ্টি বা বিশ্বাত্মারূপে ভাবতে বাধ্য হই, অন্তরূপ ভাবনা অসম্ভব। বিশ্বাত্মাই ব্রহ্ম, সর্বাধার বৃহৎ বস্তু। ঋষিরা কেন

“সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম”—

এই অদ্ভুত বাক্য বলেন, যে বাক্যকে বেদান্তের একটি “মহাবাক্য” বলা হয়, তা এখন আপনারা বুঝতে পারবেন। আমরা নিজ আত্মাবেই ব্রহ্ম বলে ভাবতে বাধ্য হই, একথা বুঝলে বেদান্তের আর একটি “মহাবাক্যের” অর্থও আপনারা বুঝতে পারবেন। সেটি হচ্ছে—

“অন্নমাত্মা ব্রহ্ম”—এই আত্মা ব্রহ্ম (মাণ্ডুক্য ২)

আরুণি যেতকেতুকে যে অদ্ভুত বাক্য বলেছিলেন, যেটি আর একটি বৈদান্তিক “মহাবাক্য”,—

“তৎত্বম্ অসি যেতকেতো”

সেই বাক্যেবও এই অর্থ, এই হেতু। এই পর্য্যন্ত গেল নির্বিশেষে অদ্বৈতবাদ, ব্রহ্মবিদের অদ্বৈতবাদ। তার পরে আসছে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—রাজর্ষিদের অদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদ বা হৈতাদ্বৈতবাদ। এতেও এক অর্থও সর্বাধার পরব্রহ্মই স্বীকৃত হন, কিন্তু তিনি নির্বিশেষ নন, নির্বিষয় নন। এক অর্থও অনন্ত ব্রহ্মের কাছে কিছুই অজ্ঞাত নয়, গুপ্ত নয়। কিন্তু জীবাশ্মার জীবনে জ্ঞান-অজ্ঞানের, স্মৃতি-বিস্মৃতির, নিদ্রা-জাগরণের, দ্বন্দ্ব সর্বদাই চলছে। এই দ্বন্দ্ব নির্বিশেষ অনন্ত দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না, কেবল অনন্ত ও সান্ত্বের সম্বন্ধ দ্বারাই ব্যাখ্যাত হয়। প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়াতে এই সম্বন্ধ, সসীম-অসীমের সহযোগিতা, ভেদাভেদ, প্রকাশিত হয়, প্রমাণিত হয়। দর্শন, শ্রবণাদি জ্ঞানে সসীমের নিকট অসীম আত্মারূপে ও বিশ্বরূপে প্রকাশিত হন। নিদ্রা-জাগরণে অনিদ্র পুরুষ নিদ্রাশীলের কাছে প্রকাশিত হন। স্মৃতি-বিস্মৃতির দ্বন্দ্ব ভোলাব নিবট অভোলা প্রকাশিত হন। এক অনন্ত আত্মাতে সসীম অসীমের এই দ্বৈতাদ্বৈত, এই

ভেদভেদ, স্বীকার না করলে কিছুই ব্যাখ্যা হয় না, জীবলীলা, জগৎ-লীলা, সবই অব্যাখ্যাত থাকে। ব্যাখ্যা আরও উজ্জ্বল হয় প্রেম-তত্ত্বে। এক নিবির্ভয় নির্বিশেষ পরমাত্মা কেমন করে আর কেনই বা এই জীব-লীলা, জগৎ-লীলা করছেন, তা বোঝা যায় না। লীলা বা কথের মূল দেখি আমরা প্রেমে। যাকে আমাদের জ্ঞান বলি, তাতে যেমন ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়, যাকে আমাদের প্রেম বলি তাতেই, তেমনই, ব্রহ্ম-প্রেম প্রকাশিত হয়। পবন পিতার, পরম মাতার, অনন্ত বক্ষ অসংখ্য সন্তান নিদ্রিত রয়েছে, তিনি তাদের না জাগিয়ে, লালন পালন না করে, শিক্ষা না দিয়ে, তাদের প্রেমাকর্ষণ না করে, থাকতে পারেন না, এই তাঁর জীব-লীলার, জগৎলীলার, একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। ঔপনিষদ ঋষিদের উপদেশে আমি এই ব্যাখ্যাই পাই। এই ব্যাখ্যার অমূল্য সাধনপন্থাও আমি তাঁদের উপদেশে এবং তাঁদের প্রভাবে প্রভাবিত গীতা, ভাগবত প্রভৃতি সাধন-গ্রন্থে পাই। যিনি সর্বাপেক্ষা আমাদের অন্তরতর, সত্য অন্তরতর, প্রেমে অন্তরতর, তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতার আভাস মাত্র পাওয়া যায় মাতা-পুত্রের, পতি-পত্নীর, সখ্যে। আমাদের উপর তাঁর যা দাবী, তার সঙ্গে ছেলের উপর মায়ের দাবীর বা পতি-পত্নীর পরস্পরের উপর দাবীর তুলনা হয় না। এই দাবী অনুভব করলে সাধন-প্রণালী সহজেই নির্ণীত হয়। রাজর্ষিরা এই প্রণালীকে বলেন, “দেবযান পথ”। তাঁরা যে রূপকের ভাষায় এই প্রণালী বর্ণনা করেছেন, তা আপনারা এই মাত্র গুনলেন। তাঁদের রূপক অতি স্বচ্ছ। শ্রুতি ও মনোবৃত্তিক্রপণী দেব-কামিনীরা সাধককে ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত করেন, এর অর্থ ব্রহ্মবিষয়ক মহাবাক্যগুলির মর্ম বুঝলে আমরা সাধন-চেষ্টায় বল পাই। সাধনের প্রথম চেষ্টাই

রিপু-হৃদ পার হওয়া,—কৃত্রিম বাসনা-কামনাগুলিকে বিবেকের অধীন করে চিত্তকে শুদ্ধ করা। দ্বিতীয় চেষ্টা “ইষ্টেহা মুহুর্তাঃ” অতিক্রম করা অর্থাৎ এমন ভাবে সময় কাটান যাতে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের অনিষ্ট না হয়। তার পর বিজরা নদী পার হওয়া অর্থাৎ আলস্য, জড়তা ছেড়ে চির উত্তমশীল হওয়া। তার পর ‘ইন্দ্র-বৃক্ষ’ ছাড়ান অর্থাৎ বিশ্বকে জড়ময় বোধ না করে চিন্ময়রূপে দেখা। তখন থেকে ব্রহ্মগন্ধ অনুভূত হয়, ব্রহ্মকে না দেখলেও তাঁর সর্বস্বীয় সব কথা, সব চেষ্টা, চিন্তাকর্ষণ করে। তার পর ব্রহ্মরস অনুভব, উপাসনার মিষ্টতাস্বাদন। তার পর ব্রহ্মভেদ প্রাপ্তি, যাতে সব সংস্কার-চেষ্টা, সাধন-চেষ্টা, সহজ হয়ে যায়। তার পর ব্রহ্মবিশিষ্ট প্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মানুভব বশতঃ প্রাপ্ত সমুদায় সম্মান নিরহংকারে ব্রহ্মসম্মান রূপে অনুভব করা। তার পর ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকারে তাঁর সঙ্গে আত্মত্বের ভূমিতে অভেদবোধ, অথচ সসীম-অসীমের ভেদবশতঃ ‘তুমি’ ‘আমি’র ভেদদর্শন। এই ভেদভেদবোধ স্থায়ী হওয়ার নামই ‘ব্রহ্মলোক’, ব্রহ্মলোকে চিরবাস। এই অবস্থা আমার এখনও হয় নি, পরন্তু অতি দূর বলেই মনে হয়। ঋষিক, সাময়িক, অনুভব বশতঃ আর ঋষিদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে এর কথা বললাম। আমাদের বর্তমান আধ্যাত্মিক দুর্গতির নানা কারণের মধ্যে প্রধান একটা কারণ ঋষিদের কথা না জানা বা জেনেও ভুলে থাকা। এই জন্তেই জীবনের এই সম্মতকালে আপনাদিগকে একটু বিশেষ ভাবে আজ ঋষি-কাহিনী ও ঋষি-পন্থা স্মরণ করিয়ে দিলাম। হয়ত আর বলবার অবসর হবে না, তাই আপনাদিগকে প্রজ্ঞার সহিত নমস্কার করে বিদায় গ্রহণ করি।*

*ভক্তাবদ্যা সভার সাপ্তাহিক উৎসবে পঠিত প্রবন্ধ।



নারী ও পরশু

জীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শান্তিপুর হইতে সোমবারের সকালে যে ট্রেনটা কলিকাতায় আসে তাহাতে সপ্তাহান্তিক টিকিটধারীর সংখ্যাই বেশী। যাত্রীর ভিড় বেশী হইলেও ট্রেনে কোলাহল থাকে কম। কারণ রবিবারে সাংসারিক বহু কৰ্ম শেষ করিতে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আলাপ ও পরিচয় কালাইয়া লইতে, পরিজনের কাহাকেও আদর, কাহাকেও নূতন জিনিষ কিনিয়া দিবার প্রীতিশ্রুতি, আগামী শনিবার বাড়ী আসিবার কালে শহর হইতে যে-সব জিনিষ আসিবে তাহার বর্দ ভৈর্য ইত্যাদিতে রাজি একটু গভীর হইয়াই পড়ে; অতঃপর শয়ন মাজ্জই যে নিদ্রা আসে না, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু নিজের হক সীমানায় অনধিকারপ্রবেশ নিদ্রাদেবী পছন্দ করেন না। ট্রেনে আসিয়া বসিলেই তিনিও ছুটি চোখে চাপিয়া বসেন, হুতরাং কোলাহলের পরিবর্তে শান্তিই বিরাজ করে ট্রেনখানিতে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল ধরিয়া নিদ্রাদেবীর একাধিপত্য থাকে, তার পর দৈনিক যাত্রীদের কোলাহলে সপ্তাহগামীদের সঙ্কচিত হইয়া বসিতে হয়; নিদ্রা যায়, থাকে আলস্য। খানিক চাহিয়া, খানিক চোখ বুজিয়া, খানিক পা তুলিয়া, খানিক বা বেঞ্চে দেহ এলাইয়া সেই নিদ্রাজড়িত আলস্য-উপভোগ দেখিবারই জিনিষ। কিন্তু নিষ্করণ হালিশহর ষ্টেশনে পৌঁছিতেই—সেটুকুরও শেষ হইল। গাড়ীর দুয়ার খুলিয়া জন-তিনেক লোক ছুটি জীলোককে উঠিবার জন্য পুনঃ পুনঃ তাড়া দিতে লাগিল।

এই সব ছোটখাট ষ্টেশনে অল্পদূর হইতে আগত ট্রেনও এক মিনিটের বেশী থামে না, অথচ জীলোক ছুটির প্রাটেকরম ত্যাগ করিবার বিশেষ তাড়া দেখা গেল না। আহ্বানকারী লোক তিনটি জীলোক ছুটির গজেন্দ্রগমনে খেন ক্ষেপিয়া গেল এবং উহারই মধ্যে জন-দুই গাড়ী হইতে নামিয়া ছুটি জীলোক ছুটির নিকটে গেল ও কোন কথা

না বলিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া ট্রেনে তুলিল।

ট্রেনে ত তুলিল, জীলোক ছুটিও তারত্ববে চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকারে যাহার চোখে যতটুকু তন্দ্রা লাগিয়া ছিল এক নিমেষে দূর হইয়া গেল এবং সকলেই খাড়া হইয়া বসিয়া প্রণ করিতে লাগিলেন,—কি, কি, ব্যাপার কি ?

লোকগুলির চেহারা কাল। কাল হইলেই তাহারা যে মজুরশ্রেণীর হইবে এমন কথা নহে, কিন্তু সত্য বলিতে কি তাহারা ওই শ্রেণীরই। কেহ চাবী, কেহ হয়ত পাটকলে মজুর খাটিয়াও থাকে। কাল, বেঁটে এবং কথাবার্তায় গ্রাম্যমূলভ কর্কশও যথেষ্ট। জীলোক ছুটির মধ্যে একটির বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে, আর একটি যুবতী—কোলে তার মাস-ছয়কের একটি শীর্ণ শিশু—কোলাহলে ও জ্বন্দনে হয়ত ভীত হইয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া স্তম্ভপান করিতেছে। দু-জনেরই কাপড় অত্যন্ত ময়লা, মাথার চুলগুলিরও তেমন যত্ন নাই। অভাবে ও অপরিষ্কারে দেহের লালিত্য ত নাই-ই—বয়স অসুমান করাও দুঃসাধ্য। কাঁদিতেছিল দুই জনেই। বুড়ী কাঁদিতেছিল—তাহাকে টানিয়া ট্রেনে তোলা হইয়াছে—হাতে পায়ে সামান্ত চোট লাগিয়াছে সেই জন্য, বউটির কান্না অন্ত ধরনের। বুড়ী কিছুক্ষণ কাঁদিয়া সঙ্গীদের গালি দিয়া চূপ করিল, বউটি কিন্তু কাঁদিতেই লাগিল। যত ক্ষণ নৈহাটা ষ্টেশন না আসিল, তত ক্ষণ সে রোদনের মর্ম্মার্থ কেহ গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

নৈহাটা আসিতেই সন্দেহের নিরসন হইল। লোক তিনটি নামিল, বুড়ীও বিনা আপত্তিতে নামিল ও বউটিকে নামিতে বলিল। কিন্তু ছেলে কোলে চাপিয়া বউ এবার তারত্ববে চীৎকার করিয়া উঠিল,—ওগো আমায় কেটে ফেলবে গো, আমায় কেটে ফেলবে।

আর একবার ট্রেনের সকলে সচকিত হইয়া উঠিলেন। বউটির চীৎকারে তিনটি লোকই অস্থির হইয়া উঠিল, কেহ বউটির হাত ধরিয়া নামাইবার চেষ্টা করিল, কেহ বা কণ্ঠস্বর স্বাভাসম্ভব কোমল করিয়া বউটিকে সাঙ্ঘনা দিবার ছলেই যেন কহিল, ভয় কি, নেমে এস না।

বউ কিন্তু এক ভাবে জ্ঞানালার কাঠ চাপিয়া ধরিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, ওগো আমায় কেটে ফেলবে গো, আমায় কেটে ফেলবে।

পার্টিকুলার লোক জমিয়া গেল, অদূরে রেলওয়ে পুলিশের লাল পাগড়ি দেখা গেল—কামরার লোকগুলিও সমস্বরে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—কি, ব্যাপার কি?

লোক তিনটি বউয়ের চীৎকারে স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং মনে মনে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হইলেও সে ক্রোধ প্রকাশ করিল না। একবার হালিশহর হইতে টানিয়া বউটিকে উহার ট্রেনে তুলিয়াছে, পুনরায় বল প্রকাশ না করিলে সাধ্য কি উহাকে নামায়। চারি দিকেব গোলমালের মধ্যে শেষ চেষ্টাশ্বরূপ বউটির হাতে উহার হেঁচকা টান দিল। বউ তখন প্রাণপণ শক্তিতে জ্ঞানালার কাঠ চাপিয়া ধরিয়াছে—গর্ভেব মধ্যে মুখ লুকাইলে সাপের যে অবস্থা হয়, সেইরূপ। যদিও উহাদের টানাটানিতে বউয়ের ডান হাতখানি ছিড়িয়া যায় তথাপি ট্রেন হইতে বউকে যে নামাইতে পারিবে সে ভরসা কম। এদিকে দর্শকেরা লোকগুলির উপর ক্রোধিয়া উঠিতেই উহার বউটির হাত ছাড়িয়া পুনরায় অতুলন-বিনয় স্বরূপ করিল,—ওগো বাছা, তোমার পায়ে পড়ি নাম। ব্যগ্রতা করি নাম।

বউ কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিল—ওগো কেটে ফেলবে গো, কেটে ফেলবে।

এক জন বলিল, তবে একটু চূপ করে বস, আমি তোমার টিকিট নিয়ে আসি।—বলিয়া সে সরিয়া পড়িল।

দেখা গেল, তাহার সঙ্গীরাও তাহার অল্পবর্তী হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, টিকিট লইয়া কেহ ফিরিল না।

স্বাভাসময়ে বউ বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িল এবং কামরার মধ্যে বউ পুনরায় ঘোমটা টানিয়া নিশ্চিন্ত মনে ছেলেকে স্তম্ভপান করাইতে লাগিল।

এত বড় একটা ঘটনার পর বউ নিশ্চিন্ত হইতে পারে,

ট্রেন-বাজীরা চোখ বুজিয়া থাকেন কি করিয়া? কি করিয়া পরম আরামে পান চিবাইতে চিবাইতে তাঁহাবা ছিন্ন কাহিনীর স্তম্ভ ধরিয়া অগ্রসর হন বা তাস পাতিয়া ‘সেতু’ রচনায় মনোনিবেশ করেন? সকলেই বউটির মুখের পানে চাহিয়া সকাতরে, সর্বিনয়ে ও সনির্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন।

বউ কাহারও প্রশ্নবাশির প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া পাশের বর্ষায়সী হিন্দুস্থানী মহিলার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলিতে লাগিল।

বোঝা গেল হিন্দুস্থানী মহিলাটি বাংলা বোঝেন ভাল এবং অন্তান্ত বাজীর মত এই ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহারও কৌতূহল কিছুমাত্র কম নহে।

হিন্দুস্থানী রমণীর পানে বউ যখন মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছে ও ঘোমটা অল্প নামাইয়া অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিয়া চলিয়াছে, তখন আসল খবর বাহির হইতে মিনিটখানেকও বিলম্ব হইবে না। প্রবল জলোচ্ছ্বাস বীধ বাধিয়া কতক্ষণ রাখা যায়। প্রথমে বাঁধের তলদেশ চোমাইয়া জল গড়াইতে থাকে, তার পর হুহু শব্দে বত্মা আসে। ট্রেনস্থ লোক-গুলির কৌতূহলের ক্ষল—বত্মাবেগ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে আশাতীত রূপে সমুদ্রিশালী হইয়া উঠিবে, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

হিন্দুস্থানী রমণী বউয়ের কাহিনী শুনিয়া ট্রেনস্থ সকলের প্রশ্নেব যে-ভাবে উত্তর দিলেন, তাহাতে বোঝা গেল, বাংলা বলার ক্ষমতা উহার আছে এবং জীলোক হইয়া জী-স্বপ্নের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দক্ষতাও কোন বঙ্গরমণীর চেয়ে কম নহে।

বউয়ের নাম সুশীলা। বাপের বাড়ী সোদপুর। বাপের অবস্থা মোটেই সচ্ছল নহে। পাটের কলে কাজ করিয়া ষাণ্ডা পায় তাহাতে বৃহৎ পরিবারের কোনক্রমে দিন-গুজরান হয়। মেয়েরাও কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকে। না করিলে এক বেলা উপবাস অনিচ্ছিত। যেমন অন্তের বাড়ী খান ভানা, ভাল তৈয়ারী করা, গোবর কুড়াইয়া ঘুঁটে তৈয়ার ও বিক্রয়, কোন গৃহস্থবাড়ীতে কলসী করিয়া গলাজল ঘোগানো ইত্যাদি। দিন না চলিলেও

মেয়ের বিবাহ না দিলে চলে না। সুতরাং নৈহাট-নিবাসী পাটকলের মজুব ঘনশ্যামের সঙ্গে বিনা-পণে স্ত্রীলার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ হইবার পর জানা গেল, ঘনশ্যাম ইতিমধ্যে দুটি পত্নীর পাণিপীড়ন করিয়াছে। একটি মরিয়াছে—আর একটি বর্তমান। যেটি বর্তমান সেটির সঙ্গে বিনিবনাও না হওয়ায়—তৃতীয় দারগ্রহণ।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঘববসত করিতে গিয়া স্ত্রীলা দেখিল, দ্বিতীয়া হাজির হইয়াছে। হয়ত সপত্নীর হাতে সংসার-সাম্রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া বনবাসিনী হইতে সে একান্ত অনিচ্ছুক।

পাটকলের মজুব—সংসার তার সাম্রাজ্যই বটে। তবু বহুজনপরিবৃত স্ত্রীলার পিজালয়ে যে-অভাব অহরহ লাগিয়া আছে, এখানে তার তীব্রতা কিছু কম। সংসারে একপাল ছেলেমেয়ে নাই, নারী-গোষ্ঠীর কোলাহল নাই, কলহ নাই, দুই বেলা কি রান্না হইবে বলিয়া মাথা ঘামাইতে হয় না।

ঘনশ্যাম লোকটি নেহাৎ মন্দ নহে, স্ত্রীলাকে আদরবশত যথেষ্টই করিল, এমন কি নিজের পকেট হইতে চাবির গোছা বাহির করিয়া বউয়ের ঝাঁচলে বাধিয়া দিয়া কহিল—আজ থেকে নিজের সংসার বুঝেই চলিবে নাও।

স্ত্রীলা নেহাৎ বালিকাবধু নহে, বলিল—দিদি যদি কেড়ে নেয় ?

ঘনশ্যাম হাসিয়া দেওয়ালের পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল—কোন কথা কহিল না।

লগ্ননেব আলোয় দেখা গেল—একখানা চকচকে জিনিষ সেখানে টাঙানো রহিয়াছে—অনেকটা কুড়ুলের মত।

স্ত্রীলা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কি ?

ঘনশ্যাম হাসিয়া বলিল—ওই দিয়ে পরশুরাম মাতৃহত্যা করেছিলেন—ওর নাম টাঁজি। বেজায় ধার ওতে। তোমার দিদি যদি কথা না শোনে ত...বুঝলে—বলিয়া নিজের রসিকতায় টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

ভয়ে স্ত্রীলার মুখ এতটুকু হইয়া গেল। সপত্নীকে সে সহ্য করিতে পারিবে না সভ্য, তাই বলিয়া টাঁজির ঘা খাইয়া সে বেচারী প্রাণ দিবে! ঘনশ্যামের মনে কি একটুও মায়া নাই, ভয় নাই ?

কিন্তু ভাবনার অবসর ঘনশ্যাম তাহাকে দিল না। এমন ভাবে স্ত্রীলাকে আদর করিতে লাগিল—যাহাতে ঐ সব চিন্তার কণমাত্রও আর তাহার মনে অবশিষ্ট রহিল না।

সপত্নীর নাম কাহ্ন—ভাল নাম কাদম্বিনী। সকালে মিলের বান্ধি শুনিয়া ঘনশ্যাম যাই বাহিরে গিয়াছে—অমনই হাসিতে হাসিতে সে স্ত্রীলাব ঘরে ঢুকিল। বলিল, কি লো, আদরিণী রাধা, বলি সারা নিশি কাটল কেমন ?

স্বামীর আদর পাইয়া স্ত্রীলা তখন সভ্যকার সম্রাজ্ঞী হইয়াছে ; হাসিয়াই বলিল, মন্দ কি !

কাহ্ন বলিল—মন্দ নয় তা জানি। তৃতীয় পক্ষের কিনা ! কিন্তু আমাদের বেলায়ও অমনি আদর, অমনি হাতে টান তুলে দেওয়া ছিল। তার পর এক দিন—

সে সহসা চুপ করিল।

কৌতূহলী স্ত্রীলা বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এক দিন কি ?

—সে পরে বুঝবে'খন, এখন ব'লে লাভ কি !

স্ত্রীলার শত অল্পবোধেও কাহ্ন মুখ খুলিল না। হাসিয়া বলিল—চাবিটা দে দেখি, দুখানা পরোটা ভাজি। যা থিদে পেয়েছে !

স্ত্রীলা সবিস্ময়ে বলিল—এই সাত-সকালে পরোটা খাবে ?

কাহ্ন বলিল—কি করি বল, আদর খেয়ে ত পেট ভরাই নি—পরোটা দিয়েই পেট ভরাতে হবে। গুণনিধি ষটী-দুই পরে ফিরবেন, তখন মাথা কুটলেও মুড়ির আখলা মিলবে না।

স্ত্রীলা বলিল—তা যাই হোক, মেয়েমানুষের এত সকালে খাওয়া অলক্ষণ।

হিহি করিয়া কাহ্ন হাসিয়া উঠিল। কহিল, অলক্ষণ ! অলক্ষণই ত ! এ বাড়ীতে স্বলক্ষণ করবে কে লো ? তুমি ? ওরে আমার গিমি রে ! দেখা যাক কদিন গিন্নীপনা চলে। আর একটি এলে তুমিও জুলজুল করে পরোটার জন্তে চেয়ে থাকবে আর হাত পাতবে। চাবি গিয়ে উঠবে তাঁর ঝাঁচলে।

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলিয়া স্ত্রীলা কি বলিতে যাইতে-

ছিল বাধা দিয়া কাছ বলিল—আমার দিকে চেয়ে দেখ দিকি, ধর্মত বল—আমি তোমার চেয়ে কুচ্ছিত কি? সত্য বলিতে কি, কাছ হুন্দরী। বয়সে হুন্দরী চেয়ে কিছু বড় হইলেও তেমন বড় দেখায় না। রং ফরসা, অঙ্গসৌষ্ঠব আছে, পান খাইয়া ঠোট দুখানি তার লাল টুকটুকে। ফরসা কাপড় পরে, হাসিয়া কথা বলে। পাটকলের মজুরের জী হইলেও কাছ হুন্দরী বটে।

হুন্দরীর উত্তর না পাইয়া কাছ দেওয়াল হইতে আরসী টানিয়া মুখের সম্মুখে নাচাইতে নাচাইতে বলিল, তোমার চেয়ে আমার রং শুধু ফরসা নয়, নাক টিকলো, চোখ বড়, কপাল ছোট, ঠোট পাতলা, চুল কোঁকড়া। তোমার চেয়ে আমার কথা অবশ্য এক দিন মিষ্টি ছিল, আজ নয়। গড়ন? দাঁড়াও ত ভাই, দাঁড়াও না?—বলিয়া আরসী বিছানার উপর রাখিয়া হুন্দরীকে সে ছুই হাতে বেঁটন করিয়া ধরিল।

অগত্যা হুন্দরী উঠিল।

সে উঠিতেই কাছ হিহি করিয়া হাসিয়া কহিল, ইং—তুমি বড় ডেঙা। অন্ধকারে যদি চালের বাতা ধরে দাঁড়াও ত...হি—হি—হি।

হুন্দরী বিরক্ত হইয়া বলিয়া পড়িল ও ঝাঁকালো স্বরে বলিল, যাও।

কাছ হাসি থামাইল না, বলিল, যাবই ত। এ বাড়ীর মজা কি জান? যেমন জ্বাঝা তেমন দেবী না হইলে মানায় না—তৃপ্তি নেই। দিদি ছিল আমার চেয়ে হুন্দরী, আমি এলাম এক কাঠি নিরেস, আর তুমি? যেমন জ্বাঝা তেমন দেবী।

হুন্দরীর বিরক্তির বদলে পুনরায় বিশ্বয় জাগিল। কহিল, দিদি কে?

কাছ বলিল, দিদি—দিদি। তোমার—আমার। যিনি পাটরাণী গো। আমি যখন নতুন বৌ এলাম, তখন দিদির আঁচল থেকে চাবি উঠল আমার আঁচল, আর লুকিয়ে দুখানা পরোটা খাবার জুড়ে দিদি এমনি করেই আমার কাছে হাত পাতল। আমি তখন হুন্দরীরাণী কিনা—তোমার মত গ্যাবারে ছুঁয়ে পা পড়ে না। বললাম,—এই তুমি যা বললে গো—‘সাত স্বকালে খিদে—কি অলক্ষণ’ তার পর এক দিন ঘুম থেকে উঠে দেখি চাবি নেই আঁচলে।

খোজ—খোজ। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি, পরোটা তৈরি হ’চ্ছে, তরকারী নেই। শুধু পরোটাগুলো সে সেকছে আর গরম গরম খাচ্ছে। কি অলক্ষণ বল ত!

এতক্ষণে কাছের হাসি থামিল, মুখখানি কেমন যেন ধমধমে হইল, গলাব হালকা স্বরটি ক্রমশ মুহু হইয়া আসিল। বলিল, কর্তা বাড়ী এলেন—অমনি বললাম সব কথা। কর্তা খানিক চুপ করে থেকে হাসলেন। তার পর দেওয়াল থেকে ওই সর্ব্বনেশে অজ্ঞখানা হাতে নিয়ে আঙুল ঠেকিয়ে ধার দেখতে লাগল। মুখে শুধু বললে, নষ্ট স্বভাবের মেয়েরা চুরি করে শুনেছিলাম—আজ চোখে দেখলাম। আচ্ছা, কাল এর ব্যবস্থা হবে।

—কেমন ভয়ে গা কেঁপে উঠল। অনেক ক্ষণ ঘুমুতে পারি নি। সকালে উঠে দেখি, ও কলে কাজ করতে গেছে, দিদি নেই। বাড়ী এলে জিজ্ঞাসা করলাম, দিদিকে দেখছি না। হেসে বললে, তাকে আর দেখতেও পাবে না। ওই দেখ—ব’লে দেওয়ালে টাঙানো চক্চকে অজ্ঞখানা দেখিয়ে দিলে। বেশী নয়, দুটি ফোঁটা রক্ত ওর গায়ে লেগে ছিল, ভয়ে হয়ত চীৎকার করতে যাচ্ছিলাম, ও মুখ চেপে ধরে শাসনের স্বরে বললে, চুপ, চোঁচিয়েছ কি দিদিব সাথী হ’তে হবে। চুরি করার ফল।

কাছ চুপ করিল, হুন্দরী পাখরের মতই বলিয়া রহিল। ভয়ে তার নিশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। কাছই সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পুনরায় হাসিয়া উঠিল, কাজ কি ভাই চুরি করে, ওর শাস্তি ত জানি!

হুন্দরী ভয়ে ভয়ে বলিল, তুমি পরোটা খাবে, উনি যদি জানতে পারেন? সে-ও ত চুরি করা!

কাছ বলিল—চুরির সাক্ষী কে? তুমি নিশ্চয়ই বলবে না?

মুহূর্ত্তবে ভয়ে ভয়ে হুন্দরী বলিল, না।

—তবে? বলিয়া কাছ কি ভাবিতে লাগিল।

হুন্দরী ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিল, তোমাকে ত উনি অত ভালবাসতেন, তোমার এ-দশা হ’ল কেন?

কাছ বলিল—দশা মানে—হতভাবতা ত? তা কেন হবে না? আমিও ত কম হুন্দরী নই, দিদিব স্বভাব যে আমাকেও পাবে না, তা কে বলতে পারে!

স্বশীলা বলিল—কি স্বভাব ?

কাহ্ন বলিল, আঃ নেকি ! স্বভাব ভাল নয় আর কি !

স্বশীলা বলিল—ও, বউকে সন্দেহ করা এর রোগ তা হ'লে ?

কাহ্ন শব্দ জ্বোরে হাসিয়া উঠিল, এতক্ষণ একটু বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে তবু। ... তবে তোমার কোন ভয় নেই। কেউ তাকাবে না ব'লেই ত সোদপূরের শ্রাওড়াতলা থেকে তোমায় কুড়িয়ে এনেছে গো, স্মরণ রাণী !

বার-বার নিজের রূপের নিন্দায় স্বশীলা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। সরোষে কহিল,—তুমি দূর হও।

কাহ্ন যাইতে যাইতে বলিল, এই বাঁশী বেজে উঠল—শ্রাম আসছেন ঘরে। আজ আর পরোটা খাওয়া হ'ল না, যাই।

আশ্চর্যের বিষয়, স্বশীলা সে-বিষয় স্বামীকে কিছুই বলিল না। যদিও ঘনশ্রামের কাছে সে ভাল ব্যবহার পাইয়াছে এবং চাবি আঁচলে বাঁধা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়াছে মাছঘটিও তাহাব হাতের মুঠায় আসিল, তথাপি ওই পরশুর পানে চাহিয়া ভয়ে সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। হয়ত কাহ্নর স্বভাবচরিত্র ভাল নহে—সেই দোষে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। মর্যাস্তিক ব্যথা না পাইলে কেহ কি অকারণে পত্নী ত্যাগ করিতে পারে ?

কাহ্নর সব কথাই যে সত্য এমন হইতে পারে না। জীব চরিত্রে স্বামীর এই অকারণ সন্দেহ—ইহাতে সংসারে যে কত অশান্তি আনে ! কাজ নাই ঘনশ্রামের কাছে ওই সব কথা বলিয়া, কাহ্ন যদি চুপি করিয়া দু-খানা পরোটা ভাজিয়া খায়, থাক। ধরা না পড়িলেই হইল। মাঝে হইতে সে কেন অশান্তি টানিয়া আনে ?

ঘনশ্রাম যদি বলে—বউ, এবার পূজায় কি চাই, বল ? স্বশীলা আদরে গলিয়া প্রার্থনা জানায় না, ঢাকাই শাড়ী কিংবা আড়াই-প্যাচ তাগা। কখনও সে বলে না, এক দিন নৌকায় চড়াইয়া গঙ্গার ওপারে চুঁচুড়ায় বাঁড়েশ্বর দর্শন করাইয়া আন।

রান্না সে ভাল করিতে পারে না। স্বামী যে-সব খাও-

জ্বোরে নাম করেন সে-সব জিনিষ সে কখনও চোখেও দেখে নাই। সে জানে শাকের কয়েক প্রকার তরকারি ; মূল্য, বেগুন, আলু, কাঁচকলা আর কুমড়া তার পরিচিত। স্বামীর রুচিবর্ধনে তার অক্ষমতা দিন দিন তাকে স্ত্রিয়মাণ করিয়া তুলে। আর দেওয়ালে-টাঙানো ওই পরশু দেখিলেই বৃকের স্পন্দন বাড়িয়া উঠে—সারা দেহ কেমন যেন এলাইয়া পড়ে। ওই পরশুর পানে চোখ রাখিয়া স্বামী-সোহাগিনীর অনেক সাথিই তাই বৃকের তলায় জমাট বাঁধিয়া যায়।

এ-দিকে চাবি পাইয়া কাহ্নর সাহস বাড়িয়া গিয়াছে। আপন মনে সে ভাঁড়ার খোলে, পরোটা কখনও কখনও লুচির আকার ধারণ করে, কখনও হুজি, চিনি ও ঘি দিয়া মোহনভোগ তৈয়ারী করে, কখনও সবটা আপনি খায়, কখনও বা স্বশীলাকে ডাকিয়া ভাগ দেয়।

স্বশীলা ভয়ে ভয়ে কাহ্নর কথা শোনে আর ভাঁড়ারের পানে চাহিয়া ভাবে অতিসতর্ক স্বামী যদি কোনদিন বি-ময়দার হিসাব তলব কবেন ? তখন কি দশা হইবে কাহ্নর, আর কোথায় থাকিবে স্বশীলা ?

দেড় বৎসরের মধ্যে তেমন দুর্দিন অবশ্য আসিল না। ইতিমধ্যে স্বশীলার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। তাহাকে ভালবাসিয়া ঘনশ্রাম অর্থের মমতা কিছু হ্রাস করিয়াছে। ঘনশ্রামের অন্তরের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষুধা—কুরুপা স্বশীলাকে পাইয়া খানিকটা যেন পবিত্র হইয়াছে। যখন-তখন তাই সে আদর করিয়া বলে—বউ, যাদের জন্তে সংসার তাবা কাছে না থাকলে কি ভাল লাগে ? আমি বাড়ীঘর ভালবাসি, টাকা ভালবাসি, জমিজমা-ভালবাসি—সব আলাদা আলাদা, কিন্তু তোমাকে ভালবেসে মনে হয়, এই সমস্ত জিনিষ আর আলাদা নেই—এক জায়গায় এসেছে। এই ভালবাসার ফল এই সোনার টুকরো।—বলিয়া ছেলেকে সে স্নেহে চুষন করে।

এক দিন ভালবাসার কথা উঠিলে স্বশীলা ক্রুদ্ধে বলিল, ও-কথা দিদিদের বেলায়ও ত বলতে।—ঘনশ্রাম ঈষৎ আহত হইয়া বলিল, কে বললে এ-কথা ? কাহ্ন বুঝি ?

স্বশীলা ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, বাঃ রে ! সে বলবে কেন ?

—তবে সে কি বলেছে ? বলিয়া ঘনশ্রাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বশীলার পানে চাহিল।

এঁখর দৃষ্টির তাপে স্নানীলা শুকাইয়া উঠিল। এত দিন ভাল করিয়া সে স্বামীর পানে তাকায় নাই। আদর-সোহাগের মুহূর্তে চক্ষু মুদ্রিয়া সে সব উপভোগ কবিয়াছে, সাংসারিক উপদেশ দেওয়ার পানে চাহিয়া শুনিয়াছে আর বাড় নাড়িয়াছে। ঘনশ্রামের পবিপুষ্ট গৌণ জোড়ার উপর বসন্তের দাগে ভর্ষি ওই চ্যাপ্টা নাক আর তার হু-পাশে আরক্ত বিক্ষারিত চোখ...স্নানীলা ভয়ে চক্ষু মুদ্রিল।

ঘনশ্রাম সেদিন আর কোন কথা না বাড়াইয়া স্নানীলাকে আদর-সোহাগ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে উঠিয়া বলিল,—ভাঁড়ারের চাবিটা আমায় দাও ত? ও-বেলা জিনিষপত্র মিলিয়ে কিনে আনতে হবে।

বয়সচালিতের মত স্নানীলা ঘনশ্রামের হাতে চাবি তুলিয়া দিল।

ঘনশ্রাম চলিয়া গেলে কাছ হাসিতে হাসিতে দেখা দিল, কই গো স্নায়োরানী, চাবিটা দেখি?

কাছকে দেখিয়া ভয়বিমূঢ় স্নানীলার রাগ হইল। ইহার জন্তই ত যত হাকামা। স্বামী আজ সন্নেহ করিয়া চাবি লইয়া গিয়াছেন, জিনিষপত্রের হিসাব লইতে গিয়া যদি অনর্থপাত না হয় ত স্নানীলার নামই মিথ্যা।

কাছ স্নানীলার ভ্রুকুটি দেখিয়া আপন স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল—শরতের আকাশে মেঘ কেনে গো, রাখে? চাবিটা দাও?

স্নানীলা রাগিয়া বলিল—আর লুচি-পরোটা খেতে হবে না, যার চাবি সে নিয়ে গেছে, আজ বিকেলেই হিসেব মেলাবে।

—বটে।

—বেকাবে লুকিয়ে খাওয়ার মজাটা।

কাছ গম্ভীর হইল না, তরল কণ্ঠে বলিল—মানে টাঙি দিয়ে মাখাটা কচাং করে কেটে ফেলবে? তা ফেলুক গো, দিদির মত না খেয়ে মরব না ত! সে বড় বালাই বে লো, ও হাতের স্বখে মাখা কাটবে, আর চিড়িমাছের মত বেকাবে না এক ফোঁটাও রক্ত! দূর, দূর, দিদিও যেমন! হাসিতে হাসিতে কাছ চলিয়া গেল।

ছপুরে হিসাব তলব হইল না, সন্ধ্যার পর ভাঁড়ার খুলিয়া ও খাতা মিলাইয়া ঘনশ্রাম স্নানীলাকে ডাকিল।

স্নানীলা কাঁপিতে কাঁপিতে ঘনশ্রামের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে সে বলিল, কত দিন থেকে এ-ব্যবসা চলছে?

স্নানীলা কথা কহে না দেখিয়া ঘনশ্রাম কথিয়া উঠিল, তবু চূপ করে বইলে? মেয়েমাছুষ কুকুবের জাত, লাথি না মারলে সিধে হয় না কিনা? বলিয়া বোধ হয় লাথি মাবিবার জন্তই আগাইয়া আসিল। স্নানীলা কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল ও ডুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঘনশ্রাম লাথিটা আর তাহার গায়ে মারিল না, মেঝের পাঠুকিয়া বলিল—বল্ হারামজাদী, কে করে এই সব? এই চুরি?

দেওয়ালে চকচকে টাঙ্কি টাঙানো রহিয়াছে, ঘনশ্রামও এমন কিছু দূরে দাঁড়াইয়া নাই, একবার হাত বাড়াইলেই হইল। স্নানীলা ত চিড়িমাছ নহে যে কাটিলে এক ফোঁটা রক্ত বাহির হইবে না, বিশেষ এত দিন লুচি পরোটা ও মোহনভোগের আশ্বাদ সে-ও কোন না লইয়াছে? অজ্ঞে শ্রী না হউক, দেহে বস্ত্র ও মাংস কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে ত! সেই রক্ত ও মাংসের মায়ায়ই স্নানীলা কাঁদিতে কাঁদিতে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—আমি না, দিদি।

—কে করে ত, চাবি পেতে কোথায়?

স্নানীলা বলিল, আমার আঁচল থেকে খুলে নিত জোর করে। বারণ করলে শুনত না।

—আমায় বল নি কেন এত দিন? জ্যা, আমায় বল নি কেন?

—তোমার দিবি দিয়ে বারণ করেছিল যে।

অগ্নান বদনে স্নানীলা মিথ্যা কথা বলিল।

অভাব ও অশিক্ষার মধ্যে সে বরাবর মাহুষ হইয়াছে। পরের গাছের লাউ কুমড়া বা আম জাম কত চুরি করিয়াছে, ভোজবাড়ী হইতে জঞ্জাল ফেলিবার ছলে তরকারির খোসার মধ্যে লুকাইয়া মাছের টুকরা সে বাড়ীতে আনিয়াছে; কাপড় ঢাকা দিয়া ক্ষীরের ভাঁড় আনিয়াছে ও নির্জন কলাতলায় দাঁড়াইয়া চুমুক দিয়া সবটা খাইয়াছে! মিথ্যা কথা এত বলিয়াছে যে সত্য কথা কি বস্ত্র তাহা স্নানীলার সত্য সত্যই জানা নাই। আপনাকে বাঁচাইতে সে যে কাছর স্বন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইবে, তার আব আশ্চর্য্য কি!

ঘনশ্রাম আবারের মেঘের মত থমথমে চোখে দেওয়ালের পানে চাহিল; খানিক আগাইয়া আসিয়া টান্ধিখানি হাতে তুলিয়া আঙুল দিয়া তাহার ধার পরীক্ষা করিল, অতঃপর যেন কিছু হয় নাই এমন ভাবে সেখানা যথাস্থানে রাখিয়া বলিল—যাও, উঠে রান্না করগে। আজ সকাল-সকাল খেয়ে একটু ঘুমবো। কাল ভোরবেলায় ডিউটি আছে।

রান্না যা করিল সে সুনীলাই জানে। কোনটায় ছুন পড়িল না, কোনটায় ঝাল দিল বেশী; ভাল ধরিয়া একটু গন্ধও বাহির হইয়াছিল বইকি।

কিন্তু খাইতে বসিয়া ঘনশ্রাম অণুমান অহুযোগ করিল না। অল্প দিন খুঁত ধরিয়া অনেক জিনিষ পাতে ফেলিয়া বাখে, আজ পরিতোষ সহকারে ভাল, তরকারি, ভাত চাহিয়া চাহিয়া খাইল। খাওয়া শেষ হইলে সুনীলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—ঘরে এসে আলো জ্বল না যেন, আমি ঘুমব।

ইতিমধ্যে কাছুর সঙ্গে সুনীলার কয়েক বার চোখাচোখি হইয়াছে, কিন্তু সুনীলা ভয়ে কি লজ্জায় কথা কহিতে পারে নাই। তাহাকে মুহূর্তের জন্তও সাবধান করিয়া দিতে পারে নাই যে আজ আবার ঘনশ্রাম টান্ধিতে হাত দিয়া তাহার ধার পরীক্ষা করিয়াছে। ভাবিল, একই বাড়ীতে এত কাণ্ড হইয়া গেল—কাহ্ন কি কিছুই শোনে নাই? কিছুই বোঝে নাই?

পরদিন প্রাতঃকালে সুনীলা বুঝিতে পারিল, কাছুর সবই শুনিয়াছে ও বুঝিয়াছে। না বুঝিলে এতক্ষণ সে হাসিতে হাসিতে আসিয়া হয়ত বলিত, কি লো সুনীলো, কাল রাত্তিরে মানের পালা জমল কেমন? বলি, ছয়রাগীর কি হেঁটে-কাটা ওপরে কাটা?

যাক, বাঁচা গিয়েছে কাছুর পলাইয়াছে। না থলাইলে... হঠাৎ সুনীলার বুকখানা গুর গুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মনে পড়িল কাছুর কথা, সকালে উঠে দেখি ও কলে কাজ

করতে গেছে, দিদি নেই।... আর টান্ধিতে ছ-ফোঁটা রক্ত।

ছটিয়া সুনীলা শোবার ঘরে গেল ও হিড় হিড় করিয়া টুলখানা টানিয়া যে-দেওয়ালে টান্ধি টান্ধান ছিল—সেইখানে আনিল। তার পর টুলের উপর উঠিয়া সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টান্ধির পানে চাহিল। না, চক্চকে অস্ত্রখানির কোথাও শোণিতচিহ্ন নাই। প্রভাতের আলোয় সে যেন পূর্বাপেক্ষা নিফলক শোভায় দীপ্যমান।

তবু বৃকের স্পন্দন খামিতে চাহে না, মনের সন্দেহ ঘোচে না। কম্পিত হাতে অস্ত্রখানি তুলিতে গিয়াই সুনীলার নজর পড়িল তার বাঁটের দিকে। প্রভাতের উজ্জ্বল আলোয় দৃষ্টি তাহার প্রভারিত হইল না। অদৃশ্য জীবাণু যেমন অণু-বীক্ষণের সাহায্যে স্পষ্টতর হইয়া উঠে তেমনই ওই ছ-ফোঁটা ক্ষ্যাকাসে রক্ত পরশুর কাঠের বাঁটে লাগিয়া আছে। কাছুর রক্ত! হতভাগিনী কাছুর রক্ত!

চীৎকার করিয়া সুনীলা টুল হইতে পড়িয়া গেল।

* * *

কতক্ষণ পরে জানে না, জ্ঞান হইতেই সে চোখ মেলিয়া দেখিল সারা ঘরখানি লালে লাল হইয়া গিয়াছে। পবন্তর গা বহিয়া রক্ত ঝরিতেছে, টুল রক্তে মাখা। সুনীলার কাপড়, কেশ, হাত ও গহনা সবই লাল। আকাশের কোলে আরক্ত সূর্য গাছের মাথা ও বাড়ীর ভাঙা প্রাচীর রাঙাইয়া আকাশেও যেন আগুন ধরাইয়া দিয়াছে।

কাছুর দিদি গিয়াছে, কাছুর নাই—এবার পালা সুনীলার। ওই নারী-শোণিত-লোলুপ পরশু অত্যাশ্রয় ক্ষুধায় শাপিত দৃষ্টিতে যেন সুনীলার পানে চাহিয়া আছে! শূণ্য-শূণ্যস্তরের তৃষ্ণা উহার নিষ্ঠুর ইম্পাত-পিচ্ছিল বক্কে দেহে ছাদশ সূর্যের জ্যোতিতে জ্বলিতেছে।

সুনীলা আর অপেক্ষা করিল না। দুই বাছ বাড়াইয়া স্থপ্ত শিশুকে কোলে টানিয়া লইল ও তাহার অকাল-নিজ্জান্ধজনিত চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া উর্দ্ধ্বাসে ছুটিতে লাগিল।

সেকালের ছাত্রসমাজ

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

সেকালের ছাত্রসমাজের সহিত একালের ছাত্রসমাজের যে কত প্রভেদ, তাহা আমার মত বুছেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই প্রভেদ বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায় ছাত্রদের বেশ-ভূষায় এবং আচার-ব্যবহারে।

আমরা যখন হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে পড়িতাম তখন বাইসিকেল ছিল না। সকল ছাত্রই পদব্রজে স্কুলে যাতায়াত করিত, দুই-চারি জন ধনবানের সন্ধান ঘরের গাড়ীতে যাতায়াত করিত। আমাদের বাটী হইতে হুগলী কলেজ প্রায় তিন মাইল। কিন্তু আমাদের প্রত্যহ দুই বেলা এই তিন মাইল তিন মাইল ছয় মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিতে হইত না। আমাদের সময়ে কলেজে ও স্কুলে ছাত্র লইয়া যাইবার জন্য অনেকগুলি নৌকা ছিল। প্রত্যেক নৌকায় বার-চৌদ্দ জন করিয়া ছাত্র যাইত। হুগলী কলেজ গঙ্গার উপরেই অবস্থিত, গঙ্গার পশ্চিম কূলে, উত্তরে বাঁশবেড়ে হইতে দক্ষিণে ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া এবং গঙ্গার পূর্ব তীরে উত্তরে কাঁচড়াপাড়া হইতে দক্ষিণে শ্রামনগর মূল্যাবোড় পর্যন্ত সকল জনপদ হইতেই শত শত ছাত্র নৌকাযোগে যাতায়াত করিত। এইরূপ প্রায় পশ্চিম-ত্রিংশ খানা নৌকা ছিল। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক নৌকাতেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র থাকিত। আমাদের নৌকাতে, আমাদের উপর শ্রেণীস্থ এবং কলেজেরও কয়েক জন ছাত্র যাতায়াত করিতেন। তাঁহাদের সম্মুখে আমরা কখনও চপলতা বা বাচালতা করিতে সাহস করিতাম না, করিলেও তাঁহারা কখনও তাহা উপেক্ষা করিতেন না, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে চপলতা করিতে দেখিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৈর্য শাসন করেন, উচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্রগণ আমাদের সময়ে সেইরূপ নিম্নশ্রেণীস্থ ছাত্রগণের অশিষ্ট ব্যবহার দেখিলে শাসন করিতেন, এমন কি কর্তৃমর্দন পর্যন্ত করিতেন। আমরা আমাদের এক ক্লাস বা দুই ক্লাস উপরের ছাত্রদিগকেও অগ্রজের মতই সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতাম। আমাদের কোন ক্রটি দেখিয়া

তাঁহারা শাসন করিলে আমরা বিনা প্রতিবাদে তাঁহাদের শাসন মানিয়া লইতাম।

আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন কলিকাতার ছাত্রসমাজ কিরূপ ছিল জানি না, কারণ সে-সময় আমি কদাচিৎ কলিকাতায় আসিতাম, কলিকাতায় ছাত্রসমাজের সহিত আমার কোন পরিচয় ছিল না। কিন্তু সেকালের চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী প্রভৃতি স্থানের ছাত্রসমাজের সহিত, একালের স্থানীয় ছাত্রসমাজের তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পাওয়া যায় যে, গত পঞ্চাশ-ষাট বৎসরে, ছাত্রসমাজে শিষ্টাচার সম্বন্ধে কি ঘোরতর পরিবর্তন হইয়াছে। এখন দেখিতে পাই যে, নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণের অধিকাংশই তিন-চারি ক্লাস উপরের ছাত্রগণের সহিত সমকক্ষভাবে “ইয়ার্কি” দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না, কিন্তু আমাদের সময়ে আমরা এক ক্লাস উপরের ছাত্রদিগের সহিত সমান ভাবে মিশিতে কুষ্ঠা বোধ করিতাম। খেলার সময় উচ্চতর বা নিম্নতর ক্লাসের ছাত্রদিগের সহিত মিলিত হইয়া খেলা করিতাম বটে, কিন্তু জীড়ান্দেজেও দুই এক বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ বা দুই এক ক্লাস উপরের ছাত্রদিগকে যথোচিত সম্মান করিতাম। যাহারা সেরূপ সম্মান করিত না, তাহাদিগকে আমরা অভ্যস্ত মনে করিতাম।

আমরা যখন হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন আমাদের ক্লাসেব ধৈর্য-সকল ছাত্র বোড়িতে থাকিত, তাহারা মধ্যে মধ্যে চন্দননগরে বেড়াইতে আসিত। সে-সময় চন্দননগরেব মসিমে কুর্জান নামক এক জন ফরাসী ভদ্রলোক নিজের বাড়ীতে একটা ছোটখাট পুস্তশালা করিয়াছিলেন। তাহাতে সিংহ, বাঘ, হায়না, গজার, জিরাফ, বনমাহুষ এবং নানা জাতীয় পশু এবং কয়েক প্রকার বানর ছিল। ঐ সাহেব নিজের নবনির্মিত অট্টালিকাও নানা প্রকার বহুমূল্য সাজসজ্জায় সজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সুসজ্জিত আবাস ও পুস্তশালা দেখিবার জন্য প্রত্যহ বহু

লোকের সমাগম হইত। আমাদের সতীর্থদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই উহা দেখিবার জন্ত অবকাশ পাইলেই চন্দননগরে আসিত এবং আমাদের বাটী কুর্জ্জন সাহেবের বাটীর অদূরে ছিল বলিয়া প্রায়ই আমাদের বাটীতে আসিত। উহারা আমাদের বাটীতে আসিলে আমার জননী তাহাদিগকে জল-বোগ না করাইয়া ছাড়িতেন না। দূরবর্তী স্থানেব ষে-সকল ছাত্র বোর্ডিঙে থাকিত, তাহাদের পক্ষে প্রতি শনিবারে বাটী যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ “মুখ বদলাইবার জন্ত” মাঝে মাঝে আমাদের বাটীতে আহাব করিত। তাহারা শনিবারে স্কুলের ছুটির পর আমাদের সঙ্গে নৌকা করিয়া চন্দননগরে আসিত এবং সোমবার প্রাতে আহারাদি করিয়া আমাদের সঙ্গেই আবার স্কুলে যাইত। আমার ষে-সকল সতীর্থ আমাদের বাড়ীতে আসিত, তাহারা সকলেই আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিত, মাও তাহাদিগকে “তুই” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমার ছোট ভাই ও ভগিনীরা তাহাদিগকে “দাদা” বলিয়া ডাকিত। ভ্রাতৃত্বিতীয়াব পবের রবিবারে আমার মা তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন।

সেকালে ছাত্রসমাজে ধূমপান ছিল না বলিলে বোধ হয় অতুক্তি হয় না। আমার বয়স যখন চৌদ্দ কি পনের বৎসর, সেই সময় আমার কোন সহপাঠীর অগ্রজকে আমি চুর্কট খাইতে দেখিয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়াছিলাম। তিনি তখন বোধ হয় কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়িতেন। তাহার পূর্বে আমি কোন ছাত্রকে ধূমপান করিতে দেখি নাই। আমাদের ধারণা ছিল যে বয়োবৃদ্ধ লোকেই ধূমপান করে, ছাত্রজীবনে উহা অস্পৃশ্য। আমাদের ছাত্রাবস্থায় সিগারেটের প্রচলন ছিল না। তাহারা ধূমপান করিত, তাহারা হুঁকা কলিকার সাহায্যে সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবেই ধূমপান করিত; বাঙালীদের মধ্যে কদাচিৎ চুর্কট ব্যবহৃত হইত, আমবা জানিতাম চুর্কটটা সাহেবদিগেরই ব্যবহার্য। অমজকাল দেখিতে পাই সিগারেট ও বিড়ি ছাত্রসমাজে পান ও চায়ের মত বহুল প্রচলিত হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি সেকালে স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে তাম্বুলের ব্যবহারও খুব অল্পই ছিল। পান খাইলে জিব মোটা হয়, ইংরেজী শব্দের ঠিক উচ্চারণ হয় না, বোধ হয় এই ধারণা সেকালে ছাত্রসমাজে বদ্ধমূল

থাকাতেই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে তাম্বুলচর্চণের প্রথা খুব অল্প ছিল।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় মফস্বলের কোথাও ফুটবল খেলা ছিল না। কলিকাতাতেও তখন বোধ হয় অতি অল্প লোকেই ফুটবলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সেকালে জিম্নাষ্টিকেরই প্রচলন ছিল। প্রায় প্রত্যেক বড় বড় স্কুলে ছাত্রদের শরীরচর্চার জন্ত প্যারালাল বার, হোরাইজন্টাল বার এবং ট্রাপিজ বার ছিল। স্কুলের বাহিবে প্রায় প্রতি পাড়াতেই একটা করিয়া জিম্নাষ্টিক গ্রাউণ্ড বা আখড়া ছিল, সেখানে দশ-পনের জন বালক ও যুবক বৈকালে মিলিত হইয়া জিম্নাষ্টিক করিত। জিম্নাষ্টিক ব্যতীত কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতির আখড়াও ছিল। ভেলদিগ্‌দিগ্ বা কপাটীখেলা বাঙালী বালক ও যুবকগণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ক্রীড়া ছিল। কিন্তু সেকালে আমাদের এই জাতীয় ক্রীড়াতে প্রতিযোগিতা ছিল না। স্থানীয় বালক ও যুবকগণ আপনাদের মধ্যেই এই খেলা করিত, অন্য স্থানের ছেলেদের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইত না। পশ্চিম কি গ্রীষ্ম বৎসর পূর্বে আমি ‘দৈনিক হিতবাদীতে’ বাংলার জাতীয় ক্রীড়া সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম যে, কি সভ্য কি অসভ্য সকল সমাজেই কোন-না-কোন প্রকার জাতীয় ক্রীড়া আছে। এই কপাটীখেলা বাংলার জাতীয় ক্রীড়া; অতি প্রাচীন কাল হইতে বাংলার বালক এবং যুবক সমাজে কপাটী খেলার প্রচলন আছে। ঐ প্রবন্ধ প্রকাশের কিছু দিন পরে, চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা এবং ‘প্রবর্তক’ নামক মাসিক কাগজের সম্পাদক, আমার স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় তাহার সম্বন্ধিত বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণের মধ্যে কপাটী খেলা উন্নত প্রণালীতে প্রবর্তিত করেন এবং ঐ খেলার কতকগুলি নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন ও সেই পুস্তিকার মুখবন্ধ স্বরূপ, ‘হিতবাদী’তে প্রকাশিত আমার সেই প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করেন। মতিলালই প্রথমে ভেলদিগ্‌দিগ্ খেলার প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে একটি “শীল্ড” বা ঢাল প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহার পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার জন্ত চন্দননগরের পালপাড়া,

গোন্দলপাড়া প্রভৃতি পল্লী ছাত্রগণের দ্বারা কয়েকটি ভেলদিগ্দিগ্ সমিতি গঠিত হয়। আজকাল কলিকাতা, বালী, কোলগর, শ্রীরামপুর, হাওড়া, হুগলী, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে বহু কপাটি বা ভেলদিগ্দিগ্ সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং বেশ সমারোহের সহিত ঐ খেলার প্রতিযোগিতা হয়। মতিবাবু আমাদের এই জাতীয় ক্রীড়াকে “ফুটবল” “ক্রিকেট” “টেনিস” প্রভৃতি বৈদেশিক ক্রীড়ার সমান মর্যাদা প্রদান করিয়া দেশবাসীর খন্তবানভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। জাতীয় খেলাধুলার প্রতি অমুরাগ আত্মমর্যাদাজ্ঞানেরই পরিচায়ক।

আমার মনে হয় যে, সেকাল অপেক্ষা একালেব ছাত্র-সমাজে আত্মমর্যাদাজ্ঞান প্রবল হইয়াছে। সেকালে ছাত্র-সমাজে দেশাত্মবোধ ছিল না বলিলে বোধ হয় অতুক্তি হয় না। আমাদের সমসাময়িক ছাত্রসমাজে স্বদেশপ্রেম বা স্বদেশাত্মরূপেব স্মৃতিপাত হইয়াছিল কবির হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতসঙ্গীত হইতে। তাহার সেই :—

বাজরে বাণা বাজ এই ববে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জ্ঞাত মানের গৌরবে
ভাবত শুধুই ঘুমায়ে বয়।

আবৃত্তি করিতে করিতে সেকালের যুবকদেব হৃদয় উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিত। কিন্তু সেই উৎসাহ ঐ কবিতার আবৃত্তিতেই শেষ হইত। সেকালে কোন বাঙালী কোন খেতাবের সহিত যে মারামারি করিতে পারে, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারিতাম না। কোন খেতাব কোন অন্ত্যায় কার্য বা অত্যাচার কবিলে তাহার প্রতিকার আমরা অসম্মত বলিয়াই মনে করিতাম। সেকালেব বাঙালীর এই ভীকৃত দর্শনে স্বর্গীয় কবি রাজকৃষ্ণ বায় লিখিয়াছিলেন—

একটা সাহেব যদি বেগে ওঠে
শতটা বাঙালী প্রাণভয়ে ছোটে
‘দে বে জল’ বলি ভূমিতলে লোটে
বুবিব প্রহারে কাতর হয়।

সত্যই এখনকার পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে বাঙালীর ভীকৃত ও কাপুরুষতা এইরূপই ছিল। সেই জন্ত আমরা বাল্যকালে যখন গল্প শুনিলাম যে, সব সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথ একাকী চার-পাঁচটা গোরাকে মল্লযুদ্ধে হঠাইয়া দিয়াছেন, বিলাতে গিয়া সেখানে সাহেবের সঙ্গে মারামারি করিয়া নাম কিনিয়াছেন, তখন আমরা জিতেন্দ্রনাথকে অভিমানব বলিয়া মনে করিতাম। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, যে, এক জন ফিরিঙ্গী, কি একটা কাবুলী রেলের গাড়ীর একটা কক্ষ একাকী অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, অন্ত্য কক্ষে যাত্রীব খুব ভিড় হইয়াছে অথচ কোন যাত্রী সাহস করিয়া সেই ফিরিঙ্গী বা কাবুলীর অধিকৃত কক্ষে প্রবেশ করিতেছে না, কি জানি পাছে সে অপমান করে। এই অপমানের ভয়ে ত্রাস্য অধিকার পরিত্যাগ যে কত বড় অপমান, সেকালের অতি অল্প বঙালী তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। একালের ছাত্রসমাজের তুলনায় যে সেকালের ছাত্রসমাজ অত্যন্ত ভীক ও কাপুরুষ ছিল তাহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই।

মনে পড়ে ১৮৮৭ বা ৮৮ খ্রীষ্টাব্দে একবার ফরাসী গবর্নমেন্ট ফরাসী ভারতে conscription বা বাধ্যতা-মূলক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে চন্দননগরে জনসাধারণের মধ্যে বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। কন্সক্রিপশন আইন অনুসারে যাহাবা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে, তাহাদিগকে বিদেশে গিয়া যুদ্ধ করিতে হয় না, যদি কখনও শত্রুপক্ষ তাহাদের দেশ আক্রমণ করে, তবেই তাহাদিগকে দেশরক্ষার জন্ত যুদ্ধ করিতে হয়। ফরাসী ভারতে ঐ আইন প্রবর্তিত হইলে কোন ভারতীয় ফরাসী প্রজাকে ভারতের বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করিতে হইত না, যদি কোন শত্রুপক্ষ ভারতে ফরাসী অধিকার আক্রমণ করিত তাহা হইলেই সেই শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। ফরাসী ভারতে সেরূপ যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না, সুতরাং চন্দননগরের কোন যুবক কন্সক্রিপশন তালিকাভুক্ত হইলেও তাহাকে কখনই কোন বর্ণক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে হইবে না, ইহা জানিয়াও লোকে ভয়ে অস্থির হইয়াছিল এবং যাহাতে ফরাসী ভারতে বাধ্যতামূলক সমর-শিক্ষা প্রবর্তিত না-হয়, সেজন্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল। ঐ আবেদনের ফলেই হউক বা অন্য যে

কারণেই হউক, ক্রান্তের কর্তৃপক্ষ ফরাসী ভারতে কনক্রিপশনের আইন প্রবর্তিত করেন নাই। যে চন্দননগর সেকালে কনক্রিপশনের ভয়ে অস্থির হইয়াছিল, সেই চন্দননগরই ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে, ইউরোপীয় মহাসমরে সর্বাঙ্গে স্বেচ্ছায় বাঙালী যুবকদলকে সৈনিকরূপে প্রেরণ করিয়াছিল। চন্দননগরের যুবকগণকে স্বেচ্ছায় সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখিয়া পণ্ডিতেরা, কারিকল, মাহে প্রভৃতি ফরাসী উপনিবেশের যুবকগণ যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল। ভার্দুনের রণক্ষেত্রে বাঙালী গোলন্দাজ সেনার সাহস ও রণকৌশল দর্শন করিয়া এক জন প্রবীণ ফরাসী সেনাপতি তাহাদের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভার্দুনের রণক্ষেত্রে যদি এক রেজিমেন্টে বাঙালী গোলন্দাজ সেনা থাকিত তাহা হইলে বহু পূর্বেই জার্মান সেনাকে ভার্দুন পরিত্যাগ করিতে হইত। এখন যদি ফরাসী গবর্নমেন্ট থাকায় ফরাসী ভারতে বাধ্যতামূলক সমরশিক্ষার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, তাহা হইলে চন্দননগরের শত শত বাঙালী যুব স্বেচ্ছায় সমর-বিদ্যা শিক্ষায় অগ্রসর হইবে, তাহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই। পচিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে চন্দননগরের যুবক-সমাজের মনোভাবের এই প্রবর্তন বিস্ময়কর নহে কি ?

আজকাল আমরা দেখিতে পাই, জলপ্রাবন, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব রোষে বিগ্ন জনগণকে রক্ষা ও সাহায্য করিবার জন্ত ছাত্রসমাজই অগ্রণী হয়। দেশহিতকর কার্যে অর্থের প্রয়োজন হইলে, ছাত্রগণই সর্বাঙ্গে অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। একরূপে সেকালের ছাত্রসমাজে অজ্ঞাত, এমন কি ধারণারও অতীত ছিল। আমাদের বয়স যখন আট বৎসর কি নয় বৎসর, সেই সময়ে মাদ্রাজে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সে-যুগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ‘স্বল্প সমাচার’ ছাত্রসমাজের বিশেষ প্রিয় ছিল। সেই ‘স্বল্প সমাচারে’ মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষের এক-খানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সকলকে আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করিবার জন্ত আবেদন করা হইয়াছিল। বোধ হয় সেই চিত্র দর্শন ও আবেদন পাঠ করিয়া আমাদের স্কুলের শিক্ষকদিগের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল, তাই তাহারা এক দিন প্রত্যেক ক্লাসের ছাত্রদিগকে দুই আনা বা এক আনা করিয়া টাকা দিতে বলিয়াছিলেন। আমরাও

টাকা দিয়াছিলাম। কিন্তু সেই দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদিগকে সাহায্য করিবার জন্ত স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীর বা কলেজের ছাত্রদিগকে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া পৃথক ডিস্কা করিতে দেখি নাই। এই সকল ব্যাপারে যে সেকালের ছাত্রসমাজ অপেক্ষা একালের ছাত্রসমাজে কর্তব্যজ্ঞান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেকালের ছাত্রদের তুলনায় একালের ছাত্রগণ অত্যধিক বিলাসী হইয়াছে। একালের ছাত্রগণ ফুটবল প্রভৃতি ক্রীড়ার জন্ত ব্যপারোনাশিত পরিশ্রম করিতে পারে বটে, কিন্তু সাংসারিক কার্যে তাহারা অত্যন্ত বাবু হইয়া পড়িয়াছে। এখনও পল্লীগ্রামে অনেক স্কুলের ছাত্রসমাজে শহরের ছাত্রদের মত বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই সত্য, কিন্তু বালক ও যুবকগণ যেরূপ অহুঙ্কারপ্রবণ, তাহাতে আর কিছু দিন পরে পল্লীগ্রামের ছাত্রসমাজেও বিলাসিতা প্রবেশ করিবে সন্দেহ নাই। সকল দেশেই রাজধানীই বিলাসিতার কেন্দ্রস্থল। রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট বস্তার জলের মত ধীরে ধীরে দেশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কলিকাতার ছাত্রসমাজের অহুঙ্কার করে পল্লীগ্রাম অঞ্চলের ছাত্রগণ। সুতরাং কলিকাতার ছাত্রসমাজের সকল বিষয়েই বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

আমরা বাল্যকালে, চন্দননগর গড়ের স্কুলে পড়িতাম। গড়বাটা নামক পল্লীতে ঐ স্কুলটি অবস্থিত বলিয়া লোকে সংক্ষেপতঃ উহাকে গড়ের স্কুল বলিত। ঐ স্কুল আমাদের বাটী হইতে অনূন দেড় মাইল বা তিন পোয়া দূরে। আমার বয়স যখন সাত বৎসর কি আট বৎসর তখন আমি ঐ স্কুলে প্রবেশ করি। আমাদের বাটার নিকটে, ফরাসী মিশনারীদের “সেন্ট মেরিজ ইনষ্টিটিউশন” নামে আর একটি স্কুল ছিল কিন্তু তাহাতে ইংরেজী ও বাংলা শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না, ফরাসী শিক্ষার প্রতি মিশনারীদের ষাঁক ছিল বলিয়া তথায় ফরাসী শিক্ষাটাই ভালরূপ হইত। ঐ স্কুলে ফরাসী-বিভাগে ছাত্রদের বেতন ছিল না, সেজন্য ঐ স্কুলে ফরাসী-বিভাগে দরিদ্র ছাত্রগণই অধ্যয়ন করিত। তাহারা বাংলা এবং ইংরেজী শিক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন, তাহারা পুত্রদিগকে গড়ের স্কুলেই ভর্তি করিয়া দিতেন। সেই জন্ত আমবা বাটার কাছে সেন্ট মেরিজ ইনষ্টিটিউশন

ধাবিতেও দেড় মাইল দূরবর্তী গড়ের স্কুলেই ভর্তি হইয়াছিলাম। অন্যান্য পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, ফরাসী গবর্ণমেন্ট মিশনারীদিগের হাত হইতে লোকশিক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করাতে সেট মেরিছ ইনষ্টিটিউশনের মিশনারী শিক্ষকগণ চন্দননগর হইতে প্রস্থান করেন। গবর্ণমেন্ট ঐ স্কুলের নাম পরিবর্তন করিয়া উহাকে “ডুপ্পে কলেজ” নামে অভিহিত করিলেন, কিন্তু তখন উহাতে কলেজ বিভাগ ছিল না, এন্ট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত ছিল। কয়েক বৎসর পরে উহাতে কলেজ ক্লাস খোলা হয়। গবর্ণমেন্টের হাতে আসিবার পূর্বে হইতেই ডুপ্পে কলেজে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।

সেকালের ছাত্রসমাজের প্রসঙ্গে ডুপ্পে কলেজের ইতিহাস অবাস্তব হইলেও, বাটীবা কাছে স্কুল থাকিতেও কেন আমরা গড়ের স্কুলে ভর্তি হইয়াছিলাম, পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। চন্দননগরের পশ্চিমে, বেঙ্গড়, নবগ্রাম, আলতাড়া প্রভৃতি গ্রামের বহু ছাত্রও গড়ের স্কুলে পড়িত। গড়ের স্কুল হইতে ঐ সকল গ্রামের দূরত্ব দুই ক্রোশ, আড়াই ক্রোশ হইবে। সুতরাং ঐ সকল গ্রামের ছাত্রগণকে গড়ের স্কুলে পড়িবার জন্য প্রত্যহ চার-পাঁচ ক্রোশ পদব্রজে যাতায়াত করিতে হইত। গ্রীষ্মের প্রথমে বৌদ্ধ, বর্ষার বৃষ্টিধারা মাথায় করিয়া দশ-বার বৎসর বয়স্ক বালকগণ দুই ক্রোশ আড়াই ক্রোশ দূরবর্তী স্কুলে পড়িতে যাইত, ইহা একালের কলিকাতা বা মফস্বলের শহরবাসী ছাত্রগণ বোধ হয় ধারণাই করিতে পারে না। তাহার ফুটবল গ্রাউণ্ডে খেলার সময় বোধ হয় সাত-আট মাইল দৌড়াদৌড়ি করিতে পারে, কিন্তু এক মাইল দূরবর্তী স্কুল বা কলেজে যাইতে হইলে ট্রাম কিংবা বাস না হইলে যাইতে পারে না। একদিন এক জন ভদ্রলোক ছুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন, “আজকালকার ছেলেরা ফুটবল খেলিবার সময় এক ঘণ্টা ধরিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে কষ্টবোধ করে না, কিন্তু বাজারে বা দোকানে যাইতে বলিলেই তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়। সেদিন আমাব ছেলেকে বাজারে যাইতে বলাতে সে উত্তর করিল সাইকেলে লিক্ হয়েছে, কি করে যাব?” বলা বাহুল্য যে একালের অধিকাংশ ছেলেরই সাংসারিক কার্যে কোথাও যাইতে হইলেই বাইসিকলে লিক্ হয়।

আমরা বাল্যকালে বোধ হয় মাসের মধ্যে পনের কি

ছুড়ি দিন জুতা না পরিয়াই স্কুলে যাইতাম। আমাদের যে জুতা ছিল না তাহা নহে। ‘দেড় মাইল পথ যাইব, নাইবা জুতা পায়ে দিলাম’ এই কথাটাই মনে হইত। আমাদের সময়ে স্কুলের বোধ হয় অর্ধেক ছাত্র নগ্নপদেই স্কুলে যাইত আব আজকাল সেই গড়ের স্কুলে শতকরা পাঁচ জন ছেলে নগ্নপদে যায় কিনা সন্দেহ। সেকালের ছাত্রসমাজে বেশ-ভূষাব পারিপাট্য ছিল না বলিলেই হয়। একথানা পরিধেয় কাপড় এবং গায়ে একটা জামা—তা সেই জামায় বোতাম থাকুক আর নাই থাকুক, ইহাই ছিল সাধারণ ছাত্রের বেশ। শীতকালে সেই জামাব উপর একথানা মোটা চাদর অথবা দোলাই। যাহারা একটু সাজসজ্জা করিয়া যাইত তাহাদিগকে সকলে বাবু বলিয়া লজ্জা দিত। স্কুলে কোন ছাত্রের মাথায় ‘সিন্‌তা’ বা ‘টেরি’ ছিল না। আমবা যখন হগলী কলিজিয়েট স্কুলে এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতাম, তখন শিবচন্দ্র সোম মহাশয় হেড মাস্টার ছিলেন। কোন ছাত্র সিন্‌তা কাটিয়া স্কুল গেলে তিনি সেই ছাত্রের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে চুল এলোমেলো করিয়া দিতেন এবং বলিতেন, cultivate the inner part of your head, not the outer part. একালের ছাত্রদের বেশভূষার পারিপাট্য সম্বন্ধে অবিক বলি নিশ্চয়োক্তন, সকলেই তাহা দেখিতে পাইতেছেন। একদিন এক জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ট্রামে কয়েক জন স্কুলগামী ছাত্রকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “এখনকার ছেলেরা সেজেগেজে শতবাবড়ী যাইতেছে কি স্কুলে যাইতেছে তাহা বলা বঠিন।” কথাটা মিথ্যা নহে।

পুত্রকল্যাণের স্কুলের বেণাভূষা জোগান এবালের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের পক্ষে একটা দায় হইয়াছে। এই দায় আবও বাড়াইয়াছে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী। সেকালে একথানা ‘কথামাল’, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, চবিতাবলী, পদ্মপাঠ প্রথমভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ, লোহারামের ব্যাকরণ, শিশুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূগোলমুহুর্ত, প্রসঙ্গকুমার সর্কাবেদিকারীবা পাঠ্যগণিত বহু বৎসর ধরিয়া স্কুলে চলিত। গৃহস্থ একবার কয়েকখানা পুস্তক কিনিয়া কিছু দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইতেন, সেই পুস্তক তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, মধ্যম পুত্র, তৃতীয় পুত্র প্রভৃতি পবে পরে অধ্যয়ন করিত। ইংরেজী

স্কুলেও একরূপ ছিল, বার্ণার্ড শ্বিথের বা পি. ঘোষের এলেক্সা, এরিথমেটিক, ইউক্লিডের জিয়মেট্রি, লেনিজ গ্রামার, লেখুত্রিজের সিলেকশনস্ প্রভৃতি পুস্তক বহু বৎসর ধরিয়া বিদ্যালয়ে পঠিত হইত। দ্বিতীয় ছাত্রের উপর ক্লাসের ছাত্রদের নিকট হইতে পুস্তক চাহিয়া লইয়া পড়িত। ছাত্রগণ প্রথমে স্নেটে অঙ্ক করিয়া পরে সেই অঙ্ক খাতাতে তুলিত। গড়েব স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ পর্য্যন্ত স্কুলে স্নেট লইয়া যাইত। আজকাল প্রতীবৎসব নতুন নতুন পাঠ্যপুস্তকেব ব্যবস্থা হওয়াতে দরিদ্র ছাত্রদের অভাবকবর্গ অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। কেবল পাঠ্যপুস্তকে নিস্তার নাই, সঙ্গে সঙ্গে তাহাব অর্থ-পুস্তকও চাই। আমাদের সময়ে এত অর্থ-পুস্তকেব ছড়াচড়ি ছিল না। আমরা ছুঁকোঁধ্য শব্দের অর্থ ডিক্শনারি বা অভিধান দেখিয়া বাহির করিতাম ও খাতাতে লিখিয়া লইতাম। আমরা এট্রাস ক্লাসে উঠিয়া প্রথমে ইংরেজী সাহিত্যেব অর্থ-পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলাম। সংস্কৃতের অর্থ-পুস্তক দ্বিতীয় শ্রেণীতে কিনিয়াছিলাম। আজকাল নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের হাতে বড়-একটা স্নেট দেখিতে পাই না; অঙ্ক, শ্রুতিলিখন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই কাগজে কলমে করিতে হয়। আমরা যখন নিম্ন শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন "একদাবসাইজ বুক" নামক খাতা কিনিতে পাওয়া যাইত না, অন্ততঃ মফস্বলে ছিল না, কলিকাতায় ছিল কি না বলিতে পারি না। আমরা ডিক্শনারি বা অভিধান দেখিয়া যে-খাতার শব্দেব অর্থ লিখিতাম, সে-খাতা আমরা নিজেরাই তৈয়ারী করিতাম। স্তত্রাং সবল ছাত্রের খাতা ঠিক একই আকারেব হইত না।

আমাদের সময়ে ষ্টীল পেনের প্রচলন খুব অল্প ছিল। বাংলা হস্তাক্ষেবেব জন্ত কঞ্চি, শব, খাগড়া বা পাগড়ে কলমীলতাব কলম ব্যবহার করিতাম, ইংরেজী হস্তাক্ষেবেব জন্ত কুটল পেন বা হংসখুচ্ছ লেখনী ব্যবহার কবিতাম। বালকবালিকারা প্রথমেই ষ্টীল পেনে লিখিতে আরম্ভ করিলে হাতের লেখা পাকিতে বিলম্ব হয় এবং নিবেব ধোঁচাতে অনেক সময় কাগজ চিঁড়িয়া যায়। আমরা বোধ হয় স্কুলে তিন-চারি বৎসর পবে ষ্টীল পেনে হাত দিয়াছিলাম। কুইল পেনের ব্যবহার আজকাল নাই বলিলেই হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর আমি কলিকাতায় কোন সপ্তদাগরী আগিসে কৰ্ম করিয়াছিলাম। সেই আগিসের বড়সাহেব কখনও ষ্টীল পেন ব্যবহার করিতেন না, তিনি সর্বদাই কুইল পেন ব্যবহার করিতেন,

অনেক সময় খাগড়ার কলমেও লিখিতেন। তিনি অবসর লইয়া স্বদেশে যাইবার সময় আফিসের বড়বাবুকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার জন্ত যেন মধ্যে মধ্যে কিছু খাগড়ার কলম কাটিয়া তাঁহার কাছে পাঠান হয়। বড়সাহেব বহু দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন বড় বাবু প্রতি বৎসর বড়দিনেব উপহারস্বরূপ পাঁচ-ছয় ডজন খাগড়ার কলম কাটিয়া তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিতেন।

আমরা যে-বৎসর হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, সেই বৎসর স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরুদ্ধে আদালত-অবমাননার অভিযোগ ও বিচাবে তাঁহার কারাদণ্ড হয়। এই ঘটনাই বোধ হয়, বাঙালী ছাত্রজীবনে রাজনীতিক আলোচনার সূত্রপাত করে। সুবেন্দ্র বাবুব কারাদণ্ড হইবার পর, কলিকাতার অধিকাংশ স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা কয়েক দিনের জন্ত পাদুকা ত্যাগ করিয়া শুধু পায়ে বিদ্যালয়ে গিয়াছিল। হুগলী কলেজেও কলিকাতার সেই তরঙ্গ লাগিয়াছিল; কলেজ ক্লাসের অনেক ছাত্র পাদুকা ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু আমাদের হেডমাষ্টার মহাশয় স্কুল-বিভাগের ছাত্রদিগকে পাদুকা ত্যাগ করিতে নিষেধ করাতে আমরা পাদুকা ত্যাগ করি নাই। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ উপলক্ষেই আমাদের দেশের ছাত্রগণেব মধ্যে রাজনীতিক আন্দোলন প্রবর্ত হইয়াছিল। বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ সম্বন্ধে সুবেন্দ্র বাবু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দেশে দেশে বক্তৃতা করিয়া ছাত্রসমাজে দেশাশ্রাবোধের সঞ্চার করিয়া ছিলেন, ছাত্রগণ পিকেটিং প্রভৃতি দ্বারা সেই দেশাশ্রাবোধ কার্যে পরিণত করিয়াছিল। তাহার পূর্বে ছাত্রসমাজকে দলবদ্ধভাবে অল্পকণ কোন কার্য কবিতে বড় দেখা যাইত না। ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ কবিয়া বাঙালীর তথা বাংলার ছাত্রসমাজে, জাগরণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

একালেব ছাত্রসমাজে যেমন অনেক গুণ আছে, সেইরূপ অনেক দোষও প্রবেশ করিয়াছে। সেকালের ছাত্রসমাজও দোষেগুণে মিশ্রিত ছিল। বাহাবা সেকালের ছাত্রসমাজ দেখিয়াছেন, এবং একালেরও ছাত্রসমাজ দেখিতেছেন, তাঁহারা সহজেই উভয় কালের ছাত্রসমাজের পার্থক্য বৃদ্ধিতে পারিবেন। সেকালের ছাত্রসমাজের স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি আকর্ষণ এবং আত্মমর্যাদাজ্ঞান কম ছিল, একালের ছাত্রসমাজে অবিনয়, অশিষ্টতা, বিলাসিতা এবং সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে ঔদাসীন্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা আমরা অর্থাৎ বৃদ্ধের দল বেশ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই।

রাঁচির কথা

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, রাঁচি

সকলেই জানেন যে রাঁচি ছোটনাগপুরের প্রধান শহর, এবং বিহার প্রদেশের দ্বিতীয় রাজধানী ও বিহারের লাটসাহেবের গ্রীষ্মাবাস। কলিকাতা হইতে আড়াই শত মাইল দূরে, এবং প্রায় ২২০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

স্বাস্থ্যোন্নতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্ম প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক বাঙালী রাঁচিতে আগমন করেন। রাঁচির স্থায়ী বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যাও অল্প নহে। কিন্তু এখানকার দ্রষ্টব্য স্থান ও জ্ঞাতব্য তথ্যগুলির পরিচয় অনেকেরই নাই। এই প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে স্থূলতঃ দুই-এক কথা বলিতেছি।



দশমবাঘ। ইহা রাঁচি জেলায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত

প্রথমতঃ, এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা। প্রকৃতিদেবী এই পার্শ্বত্যা মালভূমিতে সৌন্দর্য বিতরণে বিশেষ কার্পণ্য করেন নাই। স্থানে স্থানে সুদূরবিস্তৃত ফলফুল-শোভিত বনরাজি, ইতস্ততঃ ক্ষুদ্র-বৃহৎ পাহাড় ও তাহার সাহস্রদেশে ও উপত্যকার স্থানে স্থানে ধাপে ধাপে শ্রামল শস্যক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে আকাবীকা পার্শ্বত্যা শ্রোতস্বতী খরবেগে প্রবাহিতা, কোথাও নদীগর্ভে ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডসমূহ মস্তকোত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান, কোথাও বৃক্ষলতাসমাক্ষন্ন

গিরিগাত্রে শীর্ণকায়া বারণার জল প্রবহমান ও স্থানে স্থানে আদিম অধিবাসীদের সরল শাস্ত্র নিভৃত পল্লী। বস্তুতঃ পরিমিত, অল্পগ্রন্থ স্বাভাবিক সৌন্দর্যে এই অরণ্যবহুল মালভূমি নয়নাভিরাম। স্থানে স্থানে কচিং মহান ভাবগম্ভীর ভীমকাস্ত নৈসর্গিক দৃশ্যও বর্তমান। এই মালভূমিতে উৎপন্ন স্ববর্ণরেখা, শঙ্খা, কাঞ্চী প্রভৃতি কয়েকটি নদী কোনও কোনও সরলোন্নত পাহাড় উল্লঙ্ঘন করিয়া সমতলভূমিতে পতনকল্পে মনোমুগ্ধকর জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে, ও নিম্নে পতিত হইয়া অরণ্যাবৃত সঙ্কীর্ণ গিরিবন্ধের মধ্য দিয়া মনোহর সর্পিলা গতিতে খরশ্রোতে প্রবাহিত হইতেছে।



দশমবাঘ জলপ্রপাতের সন্নিকটে আদিম-নিবাসী গ্রীষ্টান ছাত্রগণ তাহাদের পাত্রী শিক্ষকের সহিত তাঁবুতে অবস্থান করিতেছে

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পদে এ প্রদেশ অল্পবিস্তর সমৃদ্ধ হইলেও এখানে মহামুকৃত দৌব-শিল্প, কারু-শিল্প ও মূর্তি-শিল্পের নিদর্শন অপেক্ষাকৃত বিরল। প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যে কয়েকটি সামান্য নিদর্শন এখানে বর্তমান, তাহার কোনটিই আনুমানিক চারি-পাঁচ শত বর্ষের পূর্ববর্তী নহে। রাঁচি হইতে ৪০ মাইল দূরস্থ 'ভোএসা' বা নগরের



শঙ্খ নদী। নদীগর্ভে ও তীরে ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রস্তরসমূহ মস্তকোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান



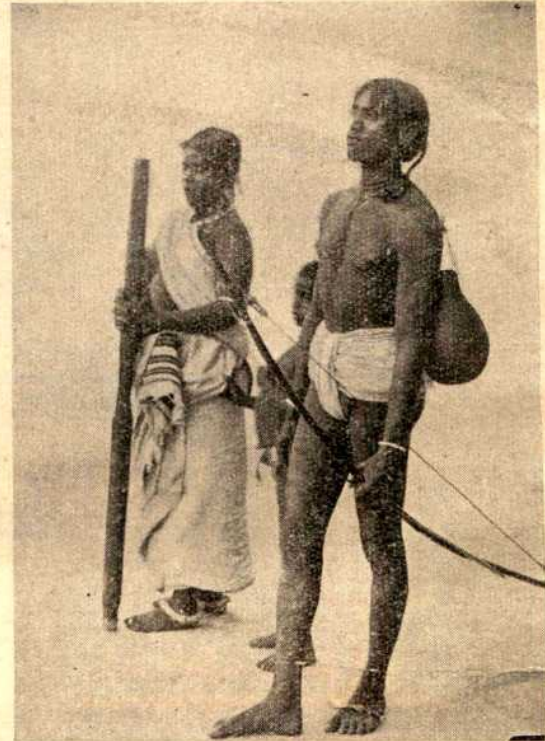
গ্রাম্য (ডিহি-) কোড়োয়া জাতির কুটার

‘নগরতন’ প্রাসাদ ও মন্দিরগুলির ভগ্নাবশেষ এবং রাঁচির সন্নিবর্তিত চুটিয়া, বোড়েয়া, ও জগন্নাথপুর গ্রামের মন্দিরগুলি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিশ্চিত। রাঁচি হইতে ৩০ মাইল পূর্বে বৃড়াডিহি গ্রামের প্রাচীন দেউলের ধ্বংসাবশেষ ও হৃন্দর দেবীমূর্তি আরও দুই-তিন শত বৎসরের পুরাতন বলিয়া মনে হয়।

আরও পূর্ববর্তী কালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টীয় যুগের প্রারম্ভ হইতেই বাহিরের সহিত এ প্রদেশের যোগাযোগ আদান-প্রদান চলিত। প্রমাণস্বরূপ রাঁচি জেলায় খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর কুশান সম্রাটদের

কয়েকটি মুদ্রা ও আনুমানিক তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্তী অনেকগুলি “পুরীকুশান” মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরবর্তী গুপ্ত, পাল ও সেনবংশীয় রাজাদের কিংবা উড়িষ্যার ভৌম অথবা গঙ্গবংশের রাজাদের কোনও মুদ্রা এ পর্যন্ত এখানে আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু কয়েকটি মোগল সম্রাটের এবং জৌনপুরের পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলমান সার্কি রাজাদের অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, “পুরীকুশান”

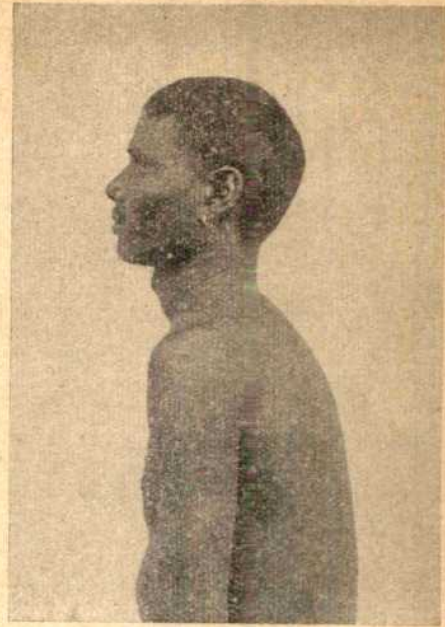
মুদ্রার বিশেষত্ব এই যে এ পর্যন্ত কেবল ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যাতেই এই মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। রাঁচি, মানভূম,



হস্তে তীরধনু ও পৃষ্ঠে কাড়িয়ার জলপাত্র লইয়া একটি মুণ্ডা যুবক ও তাহার স্ত্রী পুত্র। স্ত্রীর হস্তে ধান্স কুটিবার মুখল। পুরুষটির মস্তকে লম্বা টিকি



একটি হো যুবক



হো জাতির পুরুষ

(বরাহভূম) সিংভূম (রাখা-খনি), ময়ূরভঞ্জ, বালেশ্বর, পুরী ও গাজপাতে প্রাপ্ত এই সমস্ত পুরীকুশান মুদ্রায় কোনও রাজার নাম খোদিত নাই। বস্তুতঃ কেবলমাত্র কয়েকটি মুদ্রায় 'টঙ্ক' শব্দ ব্যতীত অন্য কোনও লেখ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

আর একটি অনুধাবনযোগ্য বিষয় এই যে, এই সব প্রদেশের ও তৎসম্বন্ধিত কোনও কোনও স্থানের নামের অস্ত্রে 'ভূম' প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেমন 'মানভূম' 'বরাহভূম' 'সিংভূম' 'ধলভূম' 'শিখরভূম' 'ভঙ্কভূম' (ময়ূরভঞ্জ), 'মল্লভূম' (বিষ্ণুপুর) 'তুঙ্গভূম' (মেদিনীপুর), 'বীরভূম' প্রভৃতি। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত 'রসিক-মঙ্গল' পুস্তকে ছোটনাগপুরও 'নাগভূম' নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই সমস্ত ভৌমাস্থ প্রদেশের সহিত 'পুরীকুশান' মুদ্রার রাজাদের বিরূপ সম্বন্ধ ছিল এবং 'ভূম' শব্দটি কোনও বিশেষ রূপে সংজ্ঞিত করে কি না এ সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সমুদ্রতীরস্থ বালেশ্বর জেলা ও তৎসংলগ্ন মেদিনীপুর জেলার অনেকগুলি স্থানের নামের

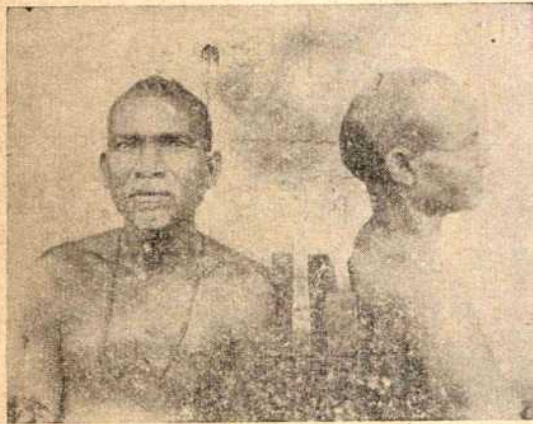


তিনটি সাঁওতাল গ্রামনেতা

অস্ত্রে 'চর' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়, যেমন মেদিনীপুর জেলার 'ককড়াচর', 'ময়নাচর', 'বরাইচর', 'কুন্ডলচর', 'দাঁতনচর', ইত্যাদি;—উত্তর বালেশ্বরে 'ভেলোরাচর', 'সরখাচর', 'কোমরদাচর', 'মুলদাচর', 'বংশদাচর' (বস্তা), 'আগ্রাচর', 'নাথোচর' ইত্যাদি। হয়ত যেমন সমুদ্রতীরস্থ ও নদীগর্ভস্থ পলিপড়া ভূখণ্ডকে 'চর' আখ্যা দেওয়া হয়, তেমনি এই



একটি বীরহোড় রমণী উদুখল ও মুঘলে ধাতু কুটিতেছে।
নিম্নে ধাতু ঝাড়িবার কুলা



দুইটি খাড়িয়া গ্রাম-নেতা

সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল এককালে 'ভূম' নামে অভিহিত হইত এবং ঐ নাম অধিকন্তু একটি বিশেষ কুষ্টির (Highland culture এর) পরিচায়ক ছিল।

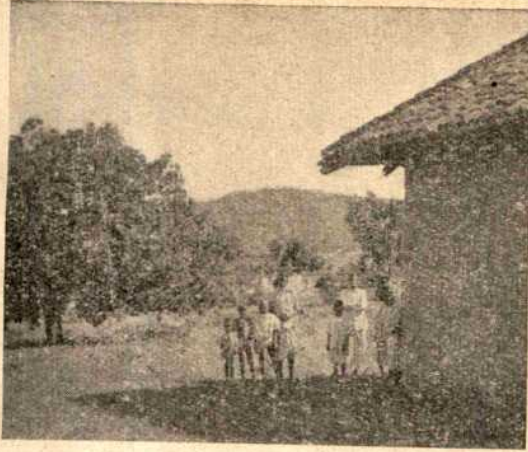
ছোটনাগপুরের কোনও স্থানে অশোক-স্তম্ভ বা অশোকের শিলালিপি নাই ও সমুদ্রগুপ্ত, খারবেল প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী রাজাদের অভিযানের কোনও প্রমাণ বা কিম্বদন্তী নাই।

মহাভারতের পাণ্ডবদিগ্বিজয়ের বিবরণে পাণ্ডবদের এই প্রদেশে আগমনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, এজ্ঞা ছোটনাগপুর 'পাণ্ডব-বর্জিত' দেশের মধ্যে পরিগণিত হয়। তবে স্থানীয় কিম্বদন্তী এ প্রদেশকেই জরাসন্ধের কারাগার বলিয়া নির্দেশ করে এবং প্রমাণস্বরূপ বলিয়া থাকে যে এখানকার কাকের স্বর অপেক্ষাকৃত মৃদু, এবং এখানকার টিকটিকি আদৌ টকটক শব্দ করে না।

ঐতিহাসিক কাল ছাড়িয়া স্বদূর প্রাগৈতিহাসিক কালের বিস্তৃত অতীতের সন্ধান করিলে দেখা যায় যে, মানবসভ্যতার উন্মেষ যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত এ প্রদেশের ধরিত্রীর স্তরে স্তরে প্রত্নমানব নানা প্রকার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। পুরাতন প্রস্তর (Palaeolithic) যুগ, নব-প্রস্তর (Neolithic) যুগ, প্রস্তর-তাম্রমিশ্র (Chalcolithic) যুগ ও তাম্র যুগের অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কারাদি এ-প্রদেশে কোথাও কোথাও যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কিছু নমুনা পাটনার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও তাহা হইতেই ছোটনাগপুরকে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের অগ্রদূতের পক্ষে ভারতের অন্যতম আদি পীঠস্থান বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে এই পীঠস্থানে সাফল্যকামী তীর্থযাত্রীর অভাব। নব-প্রস্তর যুগের ও তাম্র যুগের প্রস্তরনির্মিত সনাদিভবন ও সনাদিতত্ত্ব নির্মাণ আজ পর্যন্ত অত্রতা মুণ্ডা, হো প্রভৃতি দুই-একটি জাতির মধ্যে প্রচলিত।



তিনটি খীষ্টান ও'রাও ছাত্র



ওঁরাও গ্রাম-বিদ্যালয়ের সম্মুখে ওঁরাও শিক্ষক ও ছাত্রগণ
এখানকার প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর-তাম্র যুগের “অম্বর”
সভ্যতার নিদর্শনগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।*

তার পর, এখানকার বর্তমান কালের অধিবাসী ও
বিশেষতঃ আদিম অধিবাসীদের কথা। এ সম্বন্ধেও
ছোটনাগপুরের বৈশিষ্ট্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এ প্রদেশ
মানব-সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের—বিশেষতঃ নানা অসভ্য
ও অর্দ্ধসভ্য আদিম জাতিদের—আবাস-ভূমি।

মানবের ক্রমশঃ উন্নয়ন ও নিত্য-প্রসাধ্যমান
সম্পূর্ণতার আকাজক্ষা কিরূপে মানবজাতিকে সভ্যতার নিম্নতম
স্তর হইতে ক্রমিক উচ্চতর স্তরে লইয়া গিয়াছে, তাহার
ধারাবাহিক ইতিহাস অহুশীলনের পক্ষেও ছোটনাগপুর
নৃতত্ত্ববিৎদের একটি স্বর্ভূমি (El Dorado)।

এখানে ওঁরাও, মুণ্ডা, খাড়িয়া, বীরহোড়, হো, সাঁওতাল
প্রভৃতি অনেকগুলি জাতি সভ্যতার শৈশব যুগের জীবন্ত
নিদর্শনস্বরূপ বহু শতাব্দীর নির্যাতন ও বেদনার ভার
বহন করিয়া “মূঢ়-মান মূঢ় মুখে” নতশিরে অবস্থান
করিতেছে। ছোটনাগপুরের অহুশীল বন্ধুর ভূমিতে
বহুগুণ্যাপী প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে তাহাদের
সভ্যতার গতি বহুকাল যাবৎ রুদ্ধ থাকায় এই সমস্ত জাতির
পক্ষে বিশেষ বিপত্তির কারণ হইলৈও, ইহারাই এতাবৎকাল
সভ্যতার নিম্নতর স্তরগুলির প্রতিকৃতি সংরক্ষণ করিয়া
মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস অহুশীলনের পথ স্ফুগম

* Journal of the Bihar and Orissa Research
Society, September, 1920, দ্রষ্টব্য।



গ্রাম-পতাকা হস্তে ওঁরাও নরনারীর নৃত্য



একটি কুড়মি ওকাইন (ভূত-চিকিৎসক রমণী) মন্ত্র-
তন্ত্র প্রয়োগের পূর্বে পূজা করিতেছে

করিয়া রাখিয়াছে। এজ্ঞা ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব ও
ভাষা-তত্ত্ব এমন কি স্বকুমার সাহিত্য অহুশীলনের পক্ষেও
এই সমস্ত পশ্চাৎপদ জাতির অস্তিত্ব নিরর্থক নহে; বস্তুতঃ
বিশেষ সহায়ক। কবির ভাষায় ইহাদের সম্বন্ধেও বলা
যাইতে পারে—

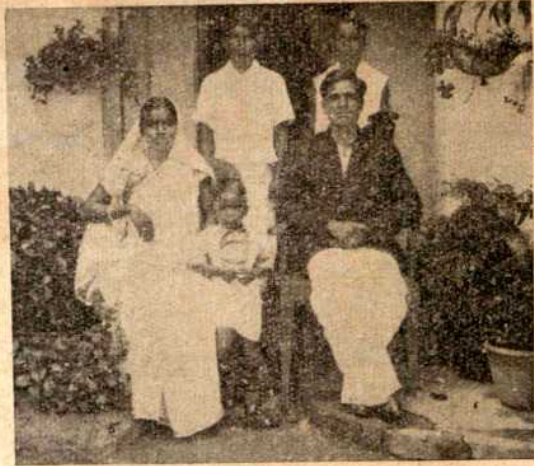
যে নদী মরুপথে হারানো ধারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।
জীবনে আজও বাহা রয়েছে পিছে
জানি হে জানি তাও হয় নি মিছে।



ও'রাও-মুণ্ডা-শিক্ষাসভায় পরিচালিত বাঁচিহু ছাত্রাবাসের ছাত্র
ও পরিচালকগণ। ইহার ঐক্য নহে। ইহার
সকলেই স্বধর্মনিরত

ছোটনাগপুরের আদিম জাতিগুলি সভ্যতার নিম্নতর
স্তরবিহীনতার বিরূপ জীবন্ত পরিচায়ক সে সত্বে স্থলভাবে
দুই-এক কথা বলিতেছি।

এখানকার পার্শ্বত্যা কোড়োয়া, বীরহোড়, পহিড়া, খেঁড়ে
প্রভৃতি মুগয়াজীবী ও বন্যজলমূলভোজী কয়েকটি যাবাবর
জাতি সভ্যতা-সোপানের প্রায় নিম্নতম-স্তরের উদাহরণস্থল।
খাদ্যাদ্যেণে লাঠি, কুঠার ও তীর-ধনুক লইয়া বন হইতে
বনান্তরে—খণ্ডভাবে না হউক দুই-চারিটি বা ততোধিক
পরিবার একত্রে—ঘুরিয়া বেড়ায়। অতীবাদি দুইটি কাষ্ঠখণ্ড
পরস্পরের সহিত ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে। মুষিক
বা পক্ষী প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিকার দুই খণ্ড তাপরক্ত প্রস্তরের
মধ্যদেশে রাখিয়া ঝলসাইয়া আহার করে। মুগয়াল্লহু হরিণ
প্রভৃতি বৃহত্তর জন্তুর মাংস জলে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে।
ইহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া দেখিয়াছি যে, কখনও
কখনও কয়েকটি পরিবার দুই-তিন দিন যাবৎ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ
কোন প্রকার শিকার না পাইয়া প্রায় অনশনে আছে এবং
পরে শিকার হস্তগত হইলে লোলুপভাবে অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস
আকর্ষণ ভোজন করিতেছে। ইহাদের কোনও কোনও জাতি
অনতিপূর্বে আম-মাংস ভক্ষণ করিত বলিয়া বিস্ময়
আছে। ইহাদের বালক-বালিকা ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ
ধরিয়া সানন্দে গলাধঃকরণ করে। এখন পর্য্যন্ত কোনও
কোনও পরিবার সময় সময় বস্ত্রের অভাবে বৃক্ষপত্র বা বকলের
পরিচ্ছদ পরিধান করিতে বাধ্য হয়। ইহাদের পত্রকুটীরগুলি
এত অল্প যে, হামাগুড়ি দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়;



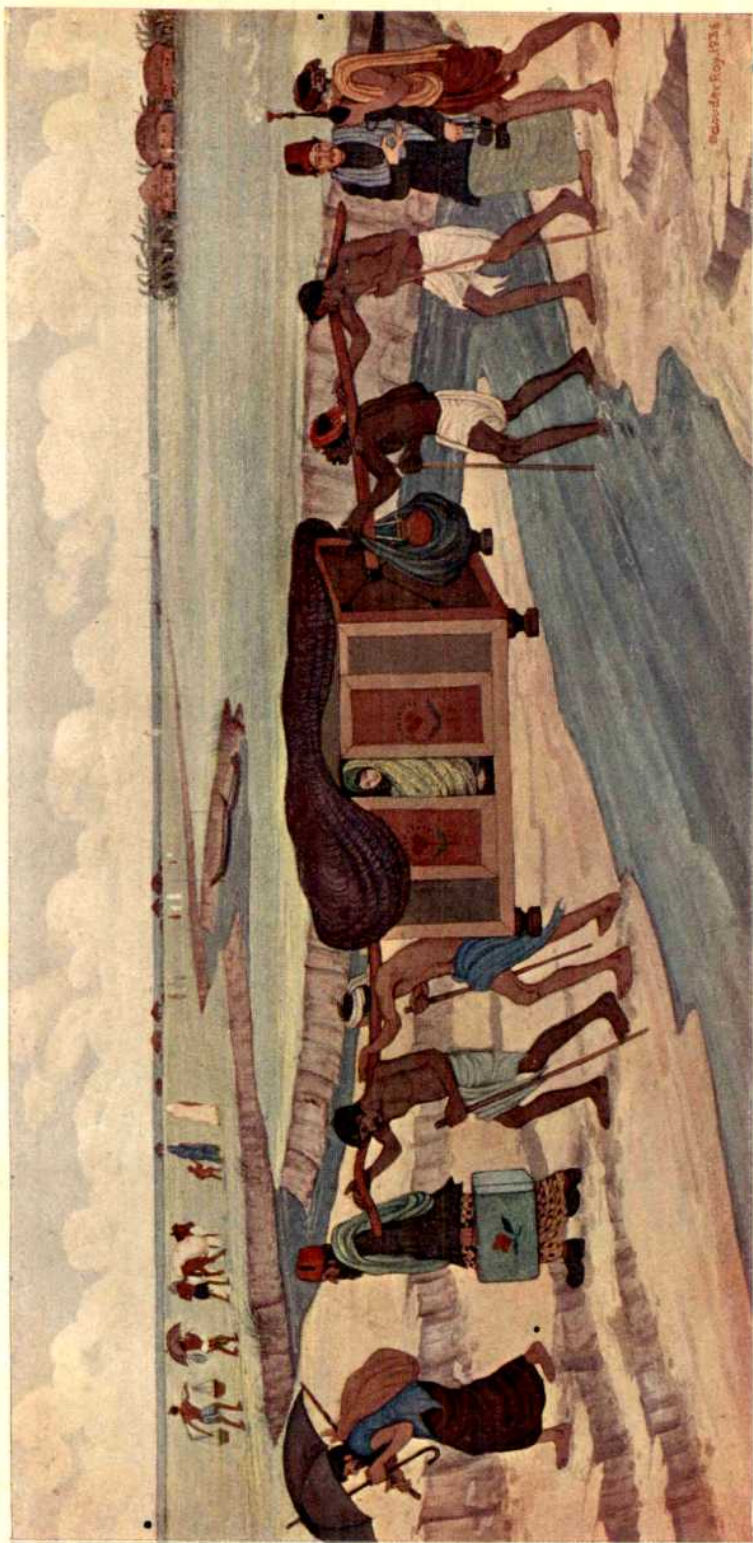
একটি শিক্ষিত খাড়িয়া পরিবার

কিন্তু এমন স্থানিগুণভাবে নির্মিত যে বর্ষার সময় তন্মধ্যে
প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি, যে, ভিতরে বিন্দুমাত্র বৃষ্টির জল
প্রবেশ করিতে পারে না এবং তাহার অভ্যন্তরদেশ
বেশ গরম থাকে।

এইরূপে এই সমস্ত অসভ্য জাতিরাও প্রকৃতির সঙ্গে
কতকটা সংগ্রাম করিয়া ও আংশিকভাবে সামঞ্জস্য সাধন
করিয়া লইয়া থাও, আবাসস্থান ও পরিচ্ছদাদির সমস্যা
এক প্রকার সমাধান করিয়া লইয়াছে।

ক্রয়-বিক্রয়ের পরিবর্তে দ্রব্যবিনিময় (barter) প্রথা
ইহাদের মধ্যে সমধিক প্রচলিত। ইহার খাদ্য সংগ্রহ করে
মাত্র, উৎপাদন করে না। যথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহের জন্য বিত্তীয়
অরণ্যভূমির প্রয়োজন হয়। এজন্য বহু-সংখ্যক পরিবার
একত্র দলবদ্ধ হইয়া এক স্থানে বাস করিতে পারে না।

যদিও খাদ্যসংগ্রহে ইহাদের প্রায় সমস্ত শক্তিই
নিয়োজিত হয়, তথাপি এই নিরক্ষর ও প্রায় নিরস্ত জাতিদের
মধ্যেও পারিবারিক ও সামাজিক বিধি বিধান ও
নীতি-ধর্মের স্বরূপ হইয়াছে; বিবাহ, জাতকর্ম
ও অন্ত্যোষ্ঠিক্রমের সরল পদ্ধতি নির্দিষ্ট হইয়াছে
এবং দেবতার নিকট বলিদানের ও মানতের প্রথাও দৃষ্ট
হয়। প্রত্যেক দল এক বা একাধিক দলপতি মনোনীত
করিয়া সমাজবন্ধনের স্বরূপ করিয়াছে। বৃদ্ধবলে বাহ্য
প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের এবং নৃত্য-গীতাদির দ্বারা



বধু
শ্রীবাহুদেব রয়

অবাসী প্রেস, কলিকাতা

ভাবরাজ্যের মধ্য দিয়া আত্মপ্রসারের যে প্রয়াস প্রাণী-জগতে মানব-জাতির বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক তাহার উন্মেষ ও কিঞ্চিত্ত বিকাশ সভ্যতার এই নিম্নতম স্তরের জাতিদের মধ্যেও প্রকটিত।

ইহাদের প্রায় সমস্তের এ-প্রদেশের গোড়াইত, বাসী, তুরি, ডোম, ভূঁইয়া প্রভৃতি ‘দাস’ জাতির স্থান। ইহার প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে এবং অধিকতর উদ্যমশীল জাতিদের সহিত জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ক্ষেত্রদাস (field-labourer), ধীবর, বাঘ্যকর প্রভৃতি রূপে ও নানা উচ্চবৃত্তি ও বিভিন্ন অমার্জিত হস্তশিল্প (rude handicrafts) দ্বারা কথঞ্চিৎ জীবিকা অর্জন করে। আত্মনির্ভরতা ও আত্ম-সম্মান হারা ইয়া এই সমস্ত অজ্ঞান-জাতি স্বীয় বিশেষ কোনও কৃষ্টি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে নাই। কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রভাবে ইহাদের আচার-ব্যবহারে বৎসামাত্র হিন্দু ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহা নামমাত্র। ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও জাতি এখনও গো-মহিষাদি ও মৃত পশুমাংস ভক্ষণ করে এবং সে জন্য ইহারা হিন্দুদের ‘অম্পৃষ্ঠ’। যাহা হউক, ইহাদের মধ্যেও বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মের প্রভাবে কচিৎ কখনও ব্যক্তিগত জাগরণ, তপস্কা ও মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছে। আর বর্তমান কালে শিক্ষার প্রভাবে ও মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মহাত্মব ব্যক্তিদের প্রেরণার ফলে এই সমস্ত জাতি সভ্যতা-সোপানের উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিবার জন্য যত্নবান হইতেছে।

যাযাবর আদিম জাতিদের অব্যবহিত উচ্চতর স্তরে এ প্রদেশেব বিরজিয়া, অম্বর, ডিহিকোড়িয়া প্রভৃতি কয়েকটি জাতি। ইহারা ‘ঝুম’ বা ‘দাহি’ প্রথাষ আদিম ভাবে ভূমিকর্ষণ দ্বারা খাদ্য উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে। জঙ্গলের এক অংশ অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম-সারবৃত্ত ভূমিতে স্ফুট্রাণ কাষ্ঠদণ্ড কিংবা লৌহফলকবৃত্ত আদিম ‘খোস্তা’ দ্বারা সামাত্র্য করণ করিয়া বীজ বপন করে ও ভূট্টা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি উৎপাদন করে। দুই-তিন বৎসর এক স্থানে এইরূপ ‘ঝুম’ চাষ করিয়া উহা পরিত্যাগ করে ও জঙ্গলের অপর এক অংশে সেই প্রথাষ চাষ করে। অধুনা ক্রমে জঙ্গল বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় সর্বত্র এ-প্রথা রহিত হইতেছে। এইরূপ আদিম ভাবের কৃষির দ্বারা খাদ্য

সংগ্রহের পথ অপেক্ষাকৃত স্বগম ও ধান্যভ্রব্যের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য হওয়ায় ঐ সব জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি, ও অবকাশ ও স্বাচ্ছন্দ্যের কিঞ্চিত্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং গৃহ ও গৃহসজ্জা, বস্ত্রালঙ্কার ও যন্ত্রপাতির অপেক্ষাকৃত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কতিপয় পরিবার একত্র দলবদ্ধ হইয়া গ্রাম স্থাপন করে। এইরূপ সংযুক্ত শক্তির সাহায্যে সমাজবন্ধন অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইয়াছে এবং পরম্পরের সহযোগিতায় ইহার প্রকৃতিব উপর অপেক্ষাকৃত অধিকতর আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

যদিও ঝুমরা ইহাদের উপজীব্য নহে, তবুও ইহার অবসর বা প্রয়োজন মত কখনও কখনও বস্ত্র পশুপক্ষী শিকার করিয়া ভক্ষণ করে। নিম্নতর যাযাবর জাতিদের অপেক্ষা অধিকতর অবসর ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের ফলস্বরূপ অবসরবিনোদন ও জীবনের সৌকর্য্য সাধনের পক্ষে ইহাদের অধিকতর সুবিধা ঘটয়াছে। ইহাদের নৃত্যগীতাদি, সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড ও পূজা-পার্বণে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহাদের পরবর্তী উচ্চতর স্তরে স্থায়ী কৃষিজীবী ওরাও, মুণ্ডা, দুখখাড়িয়া প্রভৃতি আদিম জাতি। অনেকগুলি পরিবার একত্র সম্মিলিত হইয়া বহুকাল হইতে স্থায়ী ভাবে একই গ্রামে বাস করিতেছে ও কৃষিদ্বারা পরম্পরের সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রকারের ফসল উৎপাদন করিতেছে। খাদ্যের ও লোকবলের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য, আর্থিক সাচ্ছন্দ্য ও অবসরবহুলতাপ্রযুক্ত ইহার স্বয়ং গ্রামের মাতব্বরদিগের নেতৃত্বে স্থানিয়িত গ্রাম-শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। স্বখে-দুখে, ধর্মে-কর্মে, পূজা-পার্বণে, নৃত্য-গীতে সমস্ত গ্রামের মন-প্রাণ একতায় সম্মিলিত হইয়া পল্লীজীবনের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। প্রতিজ্ঞ প্যারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থার মধ্যেও এখনও পর্যন্ত ইহাদের অনেক পল্লীব অধিবাসীরা নিবিড় সংহতিবদ্ধ। ইহা আমাদের আধুনিক পল্লী-সংস্কারকদের প্রশ্রয়ান্বিত। এইরূপ মিলনে যেমন ইহাদের বাহ্য-সম্পদ বৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছিল, তেমনই সামাজিক ও ব্যক্তিগত আত্ম-প্রসাব ও মানসিক সম্পদও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

মানবের “নিত্য প্রসার্যমান সম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা”

এই সব জাতির স্বগ্রামেই পর্যাবসিত হয় নাই। ক্রমে অনেকগুলি গ্রাম একত্র সম্মিলিত হইয়া এক একটি বৃহত্তর সম্বন্ধ (confederacy) স্থাপন করিয়াছিল। এগুলির নাম ‘পারহা’ বা পীড়। পারহাশ্ব প্রত্যেক গ্রামের গ্রাম-মুখ্য বা মুণ্ডা (মণ্ডল) ও গ্রাম-পুরোহিত (পাহান) সম্মিলিত হইয়া একটি “পারহা-পঞ্চায়ত” গঠিত হইয়াছিল। এগুলি এখনও বর্তমান। ইহারা গ্রাম্য-পঞ্চায়তের বাঘের বিরুদ্ধে আপীল বিচার করিত ও এখনও করে। কোনও কোনও ক্ষুদ্রতর বিষয়ের মীমাংসা গ্রাম্য-পঞ্চায়তের বিচার-ক্ষমতার বহির্ভূত, সেইগুলিও “পারহা-পঞ্চায়তের” নিকট বিচারের জন্য প্রেরিত হইত ও এখনও হয়।

পারহার প্রত্যেক গ্রামের বিশেষ পদ নির্ণীত ছিল ও নামতঃ এখনও আছে। বিভিন্ন গ্রামকে ‘রাজা’, ‘দেওয়ান’, ‘লাল’, ‘ঠাকুর’, ‘কোটোয়ার’ প্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যায় অভিহিত করা হয়। এইরূপ পদবী-বিশেষ প্রত্যেক গ্রামের ক্ষমতা ও কর্তব্য নির্দিষ্ট ছিল ও এখনও অল্পবিস্তর আছে। প্রত্যেক গ্রামেব নির্দিষ্ট চিহ্নযুক্ত পতাকা ছিল ও এখনও আছে। এক গ্রামের পতাকা-চিহ্ন অপর গ্রাম স্বৈচ্ছায় অনুকরণ কবিলে পূর্বে বৃদ্ধ হইত এবং এখনও দাঙ্গাহাঙ্গানা হয়। এখনও এক পারহার সঙ্গে অপর পারহা বা পারহাশ্ব কোনও গ্রাম আত্মরক্ষণিক মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয় ও গ্রাম-পতাকার আদান-প্রদান করে। ইহাদের কোনও কোনও জাতির মধ্যে কিঞ্চিদন্তী আছে যে, বিভিন্ন গ্রাম-সম্বন্ধ বা পারহা এইরূপে একত্র সংযুক্ত হইয়া বিশেষ বিশেষ শক্তিমান গ্রাম-নেতার নেতৃত্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিল।

ইহাতেও ইহাদের আত্ম-প্রসারের প্রয়াস নিরন্তর হয় নাই। বিভিন্ন পারহাগুলিও একত্র সম্মিলিত হইয়া নিকিষ্ট সময়ে বৎসরে এক বা একাধিক বার একত্র মৃগয়া করিত ও এখনও করে এবং নৃত্য-গীত উৎসবে সম্মিলিত হইত ও এখনও হয়। এইরূপ জাতীয় (tribal) সম্মেলন “পারহা-যাত্রা” নামে এ প্রদেশে খ্যাত।

এই “পারহা-যাত্রা”গুলি কেবল নৃত্য-গীতের উৎসব-স্থল নহে। ইহাদের সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় তাৎপর্য, উপকারিতা ও গুরুত্ব অপ্রিধানযোগ্য। স্থানান্তরে এখানে সে সম্বন্ধে আর কিছু বলা সম্ভব নয়।

এই ঔরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, হো, খাড়িয়া প্রভৃতি জাতি-গুলি যেমন এক কালে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সভ্যতায় উন্নতির পথে কিয়দূর অগ্রসর হইয়াছিল, তেমনই ইহাদের হৃদয়ের অল্পভূতিও কিয়ৎ পরিমাণে পরিমূর্ত হইয়াছিল। গীতি-কবিতায় তাহাদের জীবন-বাস্তব ও হৃদয়-ভাবের প্রকাশ একবারে উপেক্ষণীয় নহে।

সভ্যতর জাতিদের গান ও কবিতায় যেমন তাহাদের স্বথ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, প্রেম-ভক্তি, রোষ-কণ্ঠা প্রভৃতি হৃদয়ের ভাববৈচিত্র্যের প্রকাশ দেখা যায়, এই নিরক্ষর আদিম জাতিদের গানেও তেমনি ভাবের উচ্ছ্বাস প্রাণস্পর্শী ধ্বনিতে ফুটিয়া উঠিতে চেষ্টা করে। হৃদয়ের রূপ অল্পভব করিয়া ইহাদের প্রাণেও ভাবের তরঙ্গ উদ্ভিত হয় এবং অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় অসীমের দিকে ধাবিত হয়। ভাবের নিবিড়তায় তাহারা মন্ত্র-অপের জ্বায় একই শব্দ ও বাক্য তাহাদের গানে পুনরাবৃত্তি করিয়া রসকপের অল্পভূতি স্থায়ী করিতে প্রয়াস পায়; ভাবের আতিশয্যে তাহাদের শরীরে স্পন্দন আসে এবং নৃত্যেব দ্বারা অপরিমূর্ত হৃদয়ভাব ও রসাল্পভূতি স্ফুটতর হয়।

এ সম্বন্ধে একটি বিশেষ অবধানযোগ্য কথা এই যে, বর্তমান সভ্যতর জাতিদের এক শ্রেণীর বস্তুতাত্ত্বিক লেখক-দের রচনার জ্বায় এই আদিম জাতিদের গীতি-কবিতা ভোগলিপ্যার পরিপোষক নহে। যদিও এই সকল জাতির জীবনের আদর্শ সবিশেষ উচ্চ নহে বরং তাহারা স্বভাবতঃ জড়বাদী, তত্রাপি ইহারা সাধারণতঃ গীতি-কবিতায় জীবনের নিকট দিক বর্জন করিয়া বিস্তৃত রস ও ভাবের প্রকাশ দ্বারা নিত্য সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস পায়,—আধুনিকতা ও অতি-বাস্তবিকতার দোহাই দিয়া মনুষ্য-জীবনের পঙ্কিন মানিময় দিক উজ্জ্বল বর্ষে চিত্রিত করে না।

আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই নিরক্ষর অসভ্য জাতিগুলির কোনও কোনও গানে পার্থিব-স্বর্থের ও মানব-জীবনের নশ্বরতা ও মৃত্যুর পরপারের প্রাহেলিকা প্রভৃতি জীবনের ধৈ-সমস্ত সমস্তা আবহমান কাল হইতে সর্বদেশে কবি-হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়াছে, সেই সব ভাব ও চিন্তাধারারও আভাস বর্তমান।

এই শ্রেণীর গীতেই বঙ্গদেশের সহিত ছোটনাগপুরের

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর কোন কোন গীতের শেষ কলিতে বৈষ্ণব-পদাবলীর “বিদ্যাপতি ভনে” প্রথায় রচয়িতার নামোল্লেখ আছে। কোনও কোনও গীতের বিষয়বস্তু ও ভাবেও বাঙালী বৈষ্ণব-কবিদের প্রভাব লক্ষিত হয়। কোনও কোনও গীত-রচয়িতার বিনন্দ দাস প্রভৃতি কয়েকটি নাম দেখিয়া তাহাদিগকে বাঙালী বৈষ্ণব-কবি বলিয়া মনে হয়। কোনও কোনও মুণ্ডা-গীতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব-ধর্ম এক সময় অত্যন্ত অসত্য মুণ্ডা, খাড়িয়া প্রভৃতি জাতির মধ্যে সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ইহার প্রমাণ তাহাদের কোনও কোনও আচার অহুষ্ঠানে এখনও বিদ্যমান। মুণ্ডা জাতির বিবাহের প্রধান অহুষ্ঠান “সিন্দুরি-রাকাব” বা “সিন্দুর-দান”। অদ্যাবধি মুণ্ডা জাতির বিবাহে “সিন্দুর-দানে”র অন্তে “রাধে রাধে” ধ্বনি, এবং খাড়িয়া জাতির বিবাহের অন্তে “হরিবোল” ধ্বনি, করিবার প্রথা প্রচলিত। কিন্তু এই ধ্বনির অর্থ উহারা এখন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে। আধুনিক মুণ্ডারা বলে “রাধে রাধে” ধ্বনির অর্থ “বিবাহ সমাপ্ত হইল” (আড়ানি টুটুঘানা) এবং খাড়িয়ারা বলে “হরিবোল” শব্দের অর্থ “হার-বএল” অর্থাৎ “লাজল ও বলদ”।

এই সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে যে সমস্ত কৃষ্ণ-রাধা বিষয়ক সঙ্গীত এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে, তাহারও মূল-অর্থ ও ইঙ্গিত ইহারা এখন বিস্মৃত হইয়াছে। কোনও কোনও স্থলে যুবক-যুবতীর প্রেম-সঙ্গীতে “কদম দারু”, “রাধা-কৃষ্ণ” প্রভৃতি বাক্যাংশ লিখা পাইয়াছে।

নিম্নে এইরূপ একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি। একটি মুণ্ডা-যুবতীর প্রেমাস্পদ গরু চরাইতে মাঠে ও বনে ঘুরিতেছে। যুবতী বৃঁই ও চামেলী ফুলের মালা গাঁথিয়া তাহার প্রেমাস্পদের অপেক্ষা করিতেছে ও দীর্ঘ অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া প্রেমাক্ষ মোচন করিতে করিতে এই গীত গাহিতেছে :—

“গাড়া বাপা কদম সুবা,
হেও হেও হুতি তাদার,
‘রাধা রাধা’ মেস্তে কুড়ুই ওড়োগকেনা,
হুরিগিপো গুপিতানা।
বৃঁই-চামেলি গুতুতানা, নোকোরে তাইলা
গাতিম ছবাকানা।

বা’ তাদার ভালা ভালা, সুপিন তাদার
হালা হালা,
কাইল সেলতে মেদ-দা জোরোতানা।
ওকোরে তাইলা গাতিম ছবাকানা ?
তেসন মেদ-দা জোবেতানা,
বেসন গাড়া-দা লিগিতানা।
ইচা-বাঁবে রসি জোরোতানা,
ওকোরে তাইলা গাতিম ছবাকানা ?”

[কথায় কথায় (literal) অম্ববাদ]

“নদীকূলে কদম মূলে,
প’রে কালো পাড়ের হুতি,
কষ্টতে পুরি ‘রাধা রাধা’ ধ্বনি
বঁধু মোর গোখন চরায়।
হেখা বঁসে গাঁথি আমি বৃঁই-চামেলি মালা।
বধু মোব কোথা আছে বঁসে ?
সাজাতে তায় গাঁথিছি সুন্দর ফুলের মালা,
বঁধেছি সুন্দর স্ঠাম বেণী।
চক্রে আমার অঙ্ক করে বঁধুর অদর্শনে।
বঁধু মোর কোথা আছে বঁসে ?
শ্রোতের জলের মত আঁখিজল বহে অবিরাম।
ইচা ফুলের মধু যেমন অবিশ্রান্ত করে,
আঁখিজল মোর করিছে তেমনি।
হার, বঁধু মোর এতকণ কোথা বসি রয় ?”

রাঁচি জেলার পূর্বভাগে বৃঁ, তামাড় প্রভৃতি পাঁচ-পরগণার কোনও কোনও মুণ্ডা-পরিবার এখনও বৈষ্ণব-মত অঙ্গুর রাখিয়াছে এবং তত্ত্বাত্ত কুড়মী প্রভৃতি কোনও কোনও জাতির মধ্যে বৈষ্ণব-মত এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অসংখ্য “বৃঁমুর” প্রভৃতি গীত প্রচলিত আছে ও এখনও রচিত হইতেছে। বৃঁ পরগণায় কিয়দস্তী আছে যে, খ্রীষ্টোত্তমাব্দে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পুরী হইতে মথুরা গমনকালে রাঁচি হইতে ২৭ মাইল দূরবর্তী বৃঁ গ্রামে বিশ্রাম করিয়াছিলেন ও কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়াছিলেন। এখনও প্রতি বৎসর মহাপ্রভুর জন্ম-তিথিতে সেখানে বাৎসরিক উৎসব হয় ও মেলা বসে। এখানকার বৈষ্ণবদের বিশ্বাস যে, এই প্রদেশের সম্বন্ধেই “খ্রীষ্টোত্তমচরিতামৃত” বলা হইয়াছে :—

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা,
কটক ভাইনে করি বনে প্রবেশিলা।
* * * * *
মথুরা যাবার স্থলে আসি ঝাঝিও,
[ভিন্নপ্রায় লোক তাঁহা পথ পাখও]

নামপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।
চৈতন্তের গুচ-লীলা বুঝে শক্তি কার ?
কারিখণ্ডে ছাবর জলম ছিল বত,
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমোতে উন্নত।
বেই প্রাম দিয়া যান বাহা করেন স্থিতি,
সে-সব প্রামের লোকের হয় কৃষ্ণভক্তি।”

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বঙ্গদেশে যে রামপ্রসাদ-প্রমুখ ভক্ত শাস্ত্র কবিদের রচিত শ্রীমদ্-সঙ্গীতে মুখরিত হইয়াছিল এ-অঞ্চলে তাহার প্রচারের প্রমাণ দৃষ্ট হয় না, অত্রত্য কুড়মী প্রভৃতি জাতির মধ্যে বৈষ্ণব-মত এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কালীপূজার পরিবর্তে তাহার পরদিবস ইহার গিবিগোবর্দ্ধনের পূজা করে। কিন্তু এই সমস্ত স্বভাবতঃ শক্তি-পূজক জাতি এই পূজাতেও দৃষ্টি ও পুষ্পের নৈবেদ্য ব্যতীতও কৃষ্ণছাগ এবং কুকুট বলিদান করে, এবং গিরিগোবর্দ্ধনের মূর্তি বলিয়া একটি গোময়ের এবং একটি লাল মাটির লিঙ্গ-মূর্তির সম্মুখে এই সমস্ত নৈবেদ্য নিবেদন ও বলি প্রদান করে।

এখানকার ঐরাও প্রভৃতি আদিম জাতিদের ও কয়েকটি সভ্যতর হিন্দু জাতির মধ্যে যে ‘ভগত’ বা ‘ভক্ত’ সম্প্রদায় বর্তমান, তাহাও বৈষ্ণব গুরুদের প্রভাবে গঠিত হইয়াছে। ছোট্টনাগপুরের পূর্বভাগে বাংলা দেশের গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এবং মধ্য ও পশ্চিম ভাগে রামানন্দী সম্প্রদায়ের মত অধিক প্রচলিত।

সর্বশেষে এই জেলার বাঙালীর সংস্কৃতির কথা। বঙ্গতঃ রাঁচি জেলার পূর্বভাগের পাঁচ-পরগণা ও তৎসংলগ্ন হাজারিবাগ জেলার দক্ষিণ-পূর্বস্থ গোলা প্রভৃতি পরগণায় কুড়মী, সোঁয়াসী ও তাঁতি প্রভৃতি জাতিদ্বিকে ভাষায়, সংস্কৃতিতে এবং হ্রত জাতিতেও (Alpine বংশোদ্ভব) বাঙালী বলা হইতে পারে। আর ঐ প্রদেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাখ প্রভৃতি বাঙালী জাতিরা বঙ্গতঃ বঙ্গদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে—দুই তিন শত বৎসরের মধ্যেই—এখানে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। এই পাঁচ-পরগণার পূর্বসীমায় মানভূম জেলার বাংলা ভাষা, উত্তর সীমায় হাজারিবাগ জেলার গোলা প্রভৃতি পরগণার কুরমালি বা “খোঁটা” বাংলা, দক্ষিণ সীমায় খরসোঁয়া ও সরইকেলা

রাজ্যের মিশ্রিত উড়িয়া-বাংলা, এবং পশ্চিমে অষ্ট্রিক জাতি-ভুক্ত মুণ্ডা ও খাড়িয়া প্রভৃতি ভাষা, দ্রাবিড়ী ঐরাও ভাষা ও আর্য হিন্দী ভাষা। ঐ-প্রদেশের বিচিত্র জাতিভেদের ও ভাষাভেদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া পাঠকের মৈথ্যের উপর আর অত্যাচার বুদ্ধি করিব না। কেবল এখানকার কুড়মী প্রভৃতি জাতির বিকৃত বাংলা ভাষার বর্তমান পরিণামের সামান্য আভাসমাত্র দিব।

পাঁচ-পরগণার বাংলা ভাষা মগাহি হিন্দীর সংমিশ্রণে কিছু বিকৃত হইয়া “কুরমালি বাংলা” বা “করমালি” বা “খোঁটা বাংলা” নামে অভিহিত হইতেছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের সেলস রিপোর্টে এই নামই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশ হইতে বিহার পৃথক হইবার পর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দেব সেলস রিপোর্টের এক স্থলে ইহাকে “খোঁটা বাংলা” ও অপর স্থলে “মগাহি হিন্দীর অপভ্রংশ”, “a corrupt form of Magahi Hindi”, বলা হইয়াছে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের বিহার সেলস রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, “এই খোঁটা বুলি হিন্দী কি বাংলা বলা কঠিন; তবে যখন ১৯১১ সনের আদমশুমারীতে ইহা হিন্দীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, তখন মোটের উপর এবারেও তাহাই করা ভাল মনে হয়।” “It is impossible to say that Khotia is either Hindi or Bengali. As it was treated as Hindi in 1911, it was thought better on the whole to treat it as such again on the present occasion.”

এই কুরমালী বা খোঁটা বাংলা যে মূলতঃ দেশভেদে সামান্য বিকৃত আসল বাংলা, এখানকার কুড়মী জাতির “করম গীত” ও “কুরম গীত” ও “ভানোই-গীত”গুলি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। নিম্নে উদ্ধৃত “করম গীতে” কবি বিলাপ করিতেছেন যে, অন্নপূর্ণা করিতে গিয়া মানব ভগবানের ও পরকালের কথা বিস্মৃত হয় এবং কাম-বিষে জর্জরিত হয়।

‘করম’ গীত

ভূবা কুটাইতে নরু বিষরলর হরিহর,
অন্তকালে পলু ভুলি গেল।

হোহোরে, নরজন্ম বিধি কাছে দেল ?
 মাতাপিতা দূরে গেল, দাসী পিয়ারী ভেল ;
 শুকছে কপটচিত ভেল ।
 ওহোরে নরজন্ম বিধি কাছে দেল ?
 বিধে সংসার ঘেরি দেল ।
 ওহোরে নবজন্ম বিধি কাছে দেল ?
 ব্রজদাস কহে, একখাটি মিছা লহে ;
 হেলাতে লোকা ডুবি গেল ।
 ওহোবে নরজন্ম বিধি কাছে দেল ?

এইরূপ অসংখ্য “কবয় গীত” “সুমর গীত” ও “ভানোয়াই” গীত এই প্রদেশে প্রচলিত আছে ও এখনও এইরূপ অনেক গীত রচিত হয়। অধিকাংশ গীতের ভাষা বাংলা ও কুরমালি ভাষার মধ্যবর্তী বা transitional ভাষা। ইহাকে কুরমালির “সামু ভাষা”ও বলা যাইতে পারে। সাধারণ বাঙালী এ-ভাষাকে বাংলা ভিন্ন অন্য কোনও আখ্যা দিবে না।

আর খাটি কুরমালি গ্রাম্য ভাষাকেও মূলতঃ বাংলা ভাষা বলিয়াই মনে হয়। আর একটি খাটি কুরমালি “ভানোয়াই” গীতের নমুনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হইবে। স্বীয় ভাস্কর-পত্নী (কুরমালি বুলিতে “জেরানী”) বা বড়-জার দুর্ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া ছোট-জা (“দেওরাণী”) প্রতিবেশীদের নিকট এই গীতে আক্ষেপ করিতেছে যে, তাহাদের দুই জায়ের কলহে সে নির্দোষী হইলেও সকলে তাহাকেই দোষী বলে; বস্তুতঃ তাহার বড়-জা রক্তনশালার ভিতরে বসিয়া উপাদেয় খাদ্য ভক্ষণ করে এবং তাহাকে বারাগুয়া কেবল এক খালা “বাসী” বা পাক্তা ভাত খাইতে দেয়। গীতের শেষ কলিতে রচয়িত্রীর নাম “অর্জুনা” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। গীতটি এই :—

‘ভানোয়াই’ গীত

শুনা গো আসো পড়শী,
 ঘাবমাহান মোএ হৌলো দোষী ।
 শুনা গো আসো পড়শী ।
 ওএ খালক ভিতর ভিতর,
 মোকে দেলাক বাহেইর বাহেইর ।
 শুনা গো আসো পড়শী ।
 মোকে মুহাএ দেলাক,
 এক ছিপা বাসী ।
 শুনা গো আসো পড়শী ।

অর্জুনা কহয় বাণী,
 এহে লেকে ইখার টানাটানি
 শুনা গো আসো পড়শী ।

এইরূপ আর একটি “ভানোয়াই” সঙ্গীত নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার বিষয় ‘রামাভিষেক’; রচয়িতার নাম বিনন্দ সিং। ইহাতে খোঁটাই ভাব পরিস্ফুট।

“ভানোয়াই” গীত

“দোশরথ ডগুধারী”, দিন শুভক্ষণ করি,
 নেওতা^১ ভেজল^২ তিন পুরে ।
 লায়েকে^৩ যতক মুনিবরে ।
 ডগুহুত সিংহাগনে, করল সে সমর্পণ,
 তিলক দেওকে^৪ রঘুবরে ।
 লায়েকে যতক মুনিবরে ।
 পত্র লিখিয়ে লিখি, দুতগণে দেহ ডাকি ।
 তুরন্ত^৫ ধাওল^৬ চহু^৭ ওরে^৮ ।
 লায়েকে যতক মুনিবরে ।
 পত্র পায়েকে^৯ ঋষি^{১০} দুঃখী মনে ভেলা^{১১} সুখী ।
 বিনোদিয়া^{১২} আনন্দ অন্তরে ।
 লায়েকে যতক মুনিবরে ।

সীমান্ত প্রদেশের ভাষায় বেক্রপ সাক্ষ্যদোষ ঘটনা থাকে, কেবল তাহাই কুরমালি নামধেয় এই বাংলায় দৃষ্ট হয়। এখানকার যে যে স্থানে এই ভাষা প্রচলিত আছে অনতিকালপূর্বে সে সব স্থানের বিদ্যালয়সমূহে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত; কিন্তু বাঙালী ও বাংলা ভাষার দুর্ভাগ্যক্রমে স্থানীয় বাংলা ভাষার নূতন নামকরণ হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের বালকদিগকে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তে খাটি হিন্দী পাঠ্যপুস্তক পড়িতে হইতেছে। এজন্য বর্তমানে ছোটনাগপুরের একটি প্রধান সমস্তা এই যে, কি উপায়ে এই অঞ্চলে বাঙালী সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখা যায়।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বিহার ও ছোটনাগপুর বঙ্গ-প্রান্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে ছোটনাগপুর বাংলা দেশ ছিল ও

১। ডগুধারী = বাজদগু-ধারী। ২। নেওতা = নিমন্ত্রণ।
 ৩। ভেজল = পাঠাইল। ৪। লায়েকে = আনিবার জন্ত।
 ৫। তিলক দেওকে = বাজটিক দিবার জন্ত। ৬। তুরন্ত = তৎক্ষণাতঃ।
 ৭। ধাওল = সোড়িল। ৮। চহু ওরে = চারি দিকে। ৯। পায়েকে = পাইয়া। ১০। ঋষি = ঋষি। ১১। ভেলা = হইল।
 ১২। বিনোদিয়া = বিনন্দ বা বিনোদ নামের অপভ্রংশ।

আমরা বঙ্গবাসীই ছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখন “প্রবাসী” বলিয়া গণ্য হইতেছি।

এই দুর্ভোগ আগাতন্তঃ অনিবার্য। এ জন্ত এখন অহুশোচনা বুঝা। এক্ষণে অত্র “প্রবাসী” বাঙালীর প্রথম কর্তব্য বাংলার কৃষ্টির সহিত আমাদের সাংস্কৃতিক যোগ অক্ষুণ্ণ রাখা এবং দ্বিতীয় কর্তব্য আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখিয়া স্থানীয় সমাজের সহিত যোগসূত্র রচনা করা। এই যোগসূত্র রচনার ও সৌহার্দ্য বন্ধনের জন্ত বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যথা—উভয় সমাজের সাহিত্যিকদের সংসদে সম্মিলন; সাধারণ লোকহিতকর অহুষ্ঠানে উভয় সমাজের নেতাদের সহযোগিতা; উভয় সমাজের পরহিত-ব্রতীদের সম্মেলন হইয়া ক্রান্তিনির্কীর্ণে লোক-সেবা, ইত্যাদি। ইহা দ্বারা উভয় সমাজের মধ্যে ভাবগত ঐক্য ঘনীভূত হইয়া মনের ও আত্মার প্রসার বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ঐক্য-

সাধনেব আর একটি প্রকৃষ্ট উপায়—বস্তুতঃ আমাদের একটি বিশেষ কর্তব্য—স্থানীয় পূর্বতন অধিবাসীদের মধ্যে বাঙালীর সংস্কৃতি প্রচার এবং স্থানীয় সমাজের সাহিত্য ও অস্ত্রান্ত্র সংস্কৃতির পর্যালোচনা করিয়া তাহাতে যাহা কিছু গ্রহণোপযোগী কল্যাণকর উপাদান আছে তাহা সমাহরণ ও যথাযোগ্য সমীকরণের প্রচেষ্টা। এইরূপে ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদানের দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি ও স্থানীয় লোকদের এবং তথাকথিত “প্রবাসী” বাঙালীর হৃদয়-মনের প্রসার বৃদ্ধি অবশ্যসম্ভাবী।

আমাদের এই সমস্ত কর্তব্য পালনের জন্ত ও বাঙালীর গৌরবমণ্ডিত সংস্কৃতি প্রবাসেও অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত এবং সেই সংস্কৃতির ক্রমিক উন্নতির সহিত সমগতিতে চলিবার জন্ত, বাংলা দেশের চিন্তানেতা ও কর্মবীর মনীষীদের সাহায্য ও সহযোগিতা, উপদেশ ও প্রেরণা আমাদের অবশ্য-প্রয়োজনীয়।

সাথী

শ্রীহীলারঙ্গী মুখোপাধ্যায়

আঁখার রাতের বিজন পথে
চলতে যেদিন হবে,
তুমি বি মোর সেই রজনীর
হবে সাথী তবে ?

পরশে মোর অভয় ভরি
আসবে কি হে প্রদীপ ধরি ?
আমার আত্মল আঁখি কি গো
তোমার পানেই রবে,—
আঁখার রাতের বিজন পথে
চলতে যেদিন হবে ?

সেদিন যখন আসবে আমার,
ঘনিষে শুধু উঠবে আঁখার ;
হাতটি ধরি সোহাগ ভরে
বঁধু কি মোর লবে ?—

আঁখার রাতের বিজন পথে
চলতে যেদিন হবে ?

আপন দ্বারা রইবে দূরে,
কাদবে না প্রাণ ব্যথার সুরে ;
তুমি কি নাথ প্রবশে মোর
আঁখার বাণী কবে—
আঁখার রাতের বিজন পথে
চলতে যেদিন হবে ?

প্রভাত-রবি

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

[প্রবন্ধটি সম্বন্ধে একটু ভূমিকার প্রয়োজন। এক দিন গল্পগুচ্ছের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মুখে তাঁর পদ্ম-জীবনের এমন একটি অনিবিড় চিত্র পেয়েছিলাম যে, পরে তাকে লেখায় ফুটিয়ে তোলবার লোভ সঘরণ করতে পারি নি। কিন্তু স্বভাব উপর নির্ভর করে অন্তের বক্তব্যের বিষয়বস্তুকে যদি-বা অনেকাংশে রক্ষা করা যায়, তার ভাষাগত প্রাণশক্তিকে অধিকৃত রাখা সাধ্যাতীত। তথ্যায়ের পারস্পর্য এবং পুঙ্খানুপুঙ্খতা সম্বন্ধেও শ্রবণশক্তির উপর অত্যধিক আস্থা রাখা বিপজ্জনক। প্রবন্ধটি তাঁকে দেখাতে গিয়ে এই ছোটো দিকেই তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। সবটে না পড়লে তাঁর সম্বন্ধে অন্তর্কৃত আলোচনায় হস্তক্ষেপ করতে তিনি চান না। এবার দ্বায়ে কেলে এই প্রবন্ধে তাঁকে কথোপকথনের অংশগুলি তাঁর নিজের ভাষাতেই লিখে দিতে বাধ্য করেছি।

সেদিন আমাদের সঙ্গে আলাপ-উপলক্ষ্যে পশ্চিমতীর্থ-গামীর চিত্তপটে পূর্বদিগন্তবর্তী প্রভাত-রবির যে চিত্রটুকু সহসা প্রতিকলিত হয়েছিল সেটি পাঠকদের কাছে উপস্থিত করে তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করতে পারি।

আমাদের আশা আছে যে, “জীবন-স্মৃতি”তে জীবনের যে-পর্বে এসে তাঁর কলম খেমেছে, সেখান থেকে তার পরবর্তী জীবনের মর্থলোকের রসান্বাদ তিনিই আবার এক দিন আমাদের দিতে কার্পণ্য করবেন না।—লেখক]

মাটির বাড়ী “শ্রামলী” ভেঙে পড়ার পর রবীন্দ্রনাথ এখন তার পাশে একটি ছোট বাড়ীতে বাস করছেন। একখানি মাত্র ঘর, তিন দিকে খোলা বারান্দা, পিছনে স্বানাগার। অনেক দিন থেকেই তাঁর ইচ্ছে, বাহুল্যবর্জিত এই ধরনের একখানি ছোট বাড়ীতে তিনি থাকবেন। তাই এই নতুন বাড়ীটি সম্প্রতি তৈরি হয়েছে। একখানি পুরোপুরি মাটির বাড়ী হ’লেই তাঁর আন্তরিক অভিলাষ

পূর্ণ হ’ত, কিন্তু “শ্রামলী”তে মাটির ছাদের পরীক্ষা যখন সফল হ’ল না,* তখন অগত্যা কংক্রিটের ছাদই তৈরি করতে হয়েছে, কিন্তু দেয়ালগুলো মাটির। ঘরের ভিতরে একখানি খাট, একটা টেবিল, খানকয়েক চেয়ার, মোড়া এবং বই রাখবার একটা তাক। বারান্দায় দু-একটি লেখবার টেবিল এবং কতকগুলি চেয়ার। এই তাঁর জীবনযাত্রার আয়োজন।

সন্ধ্যার পর অধ্যাপকবন্ধু শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়কে নিয়ে গিয়েছি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ফটকের কাছে যেতেই দেখলাম, একলা বসে আছেন ঘরে। চাকর একটা ছোট টেবিল এগিয়ে দিল সামনে, তিনি একখানি বই খুলে পড়তে বসলেন। একটু ইতস্তত বোধ করলাম, এই সময়ে গিয়ে পড়ার ব্যাঘাত জন্মান উচিত কি না। কিন্তু বিকেলবেলা তিনি ব্যস্ত ছিলেন বলে দেখা করতে পারি নি, তখনই খবর দিয়ে গিয়েছিলাম যে, সন্ধ্যার পর আসব। তাই সাহস করে ছুজনে ঢুকলাম ঘরে। তিনি আসন দেখিয়ে দিলেন বসতে। বললেন—“এই দেখ, একখানা neo-physics-এর (নব-পদার্থবিজ্ঞানের) বই নিয়ে পড়তে বসেছিলাম। আমাদের মায়াদ্বাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চলেছে যেন। আধুনিক কালের মানুষ আমি। বিজ্ঞানেই এই যুগের সর্বপ্রধান প্রকাশ। এই প্রকাশদ্বারার সঙ্গে যোগ না রাখতে পারলে এই কালের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আমি ত অবসর পেলে সাহিত্যের বইয়ের চেয়ে বিজ্ঞানের বই-ই বেশি পড়ি। তাই mathematics (গণিত) না জেনে

* কবিব মন্তব্য—আবার চেষ্টা হবে মাটির ঘরের পুনঃ-সংস্কার। যে অভিজ্ঞতা সম্মুখ হয়েছে, তা ব্যবহারে না লাগানোই যথার্থ লোকসান,—ঘর পড়ে যাওয়াটা নয়।

neo-physics (নব-পদার্থবিজ্ঞান) যতখানি বোঝা যায়, বুঝতে চেষ্টা করছি। কিন্তু এখন বয়স হয়েছে, সব সময় পেরে উঠি না। তার উপর তোমরা সবাই মিলে আমাকে আরও মূর্খ বানিয়ে দিচ্ছ, একটু বসে পড়াশোনা করার অবসরই পাই না। কক্ষ-কোলাহলের অভ্যন্তরে আসার পর থেকে সহস্র রকমের দাবী মেটাতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। এককালে সমস্ত শক্তি দিয়ে যা হোক একটু কিছু কাজ করতে পেরেছি বলে যে হঠাৎ একদিন আগিসের সাজ পরে মাঝ রাত্তার মুখ খুবড়ে পড়ে অস্তিম নিখাস টানতে হবে, এ কখনই আদর্শ হতে পারে না। তাই ঠিক করেছি, যখন-তখন আর তোমাদের আসতে দেব না। একটা বাঁধা সময় ঠিক করে দেব, ঐ সময় তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করব, এ ছাড়া অন্য সময়ে নয়। আমার অস্থিররাও যে যখন-তখন এসে ঘুর ঘুর করবে, তাও চলবে না। একটা ঘণ্টা কাছে, রাখব, যখন কিছু দরকার হবে, আমিই ডেকে পাঠাব।”

আমরা মনে মনে কুণ্ঠিত হয়ে পড়লাম এই অসময়ে আসার জন্য। কিন্তু তিনি যে ব্যক্তিবিশেষকে সম্বোধন করে কিছু বলছিলেন, ঠিক তা নয়; নিজের মনকে নিয়েই যেন নাড়াচাড়া করছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তাকপোর কথা অনেকেই অনেকবার বলেছেন। বঁসে বঁসে তখন শুধু ভাবছিলাম, ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে নব নব জ্ঞানলাভের এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা এবং জীবনকে নতুন শৃঙ্খলার মধ্যে গড়ে তোলার এই যে সাধনা, বার্কাক্য একে লেশমাত্র জান করতে পারে নি, জরা কাছেও বেঁধতে পারে নি, এই ত মনের চিরনবীন সজীবতা, যেখানে আজও কবি জেগে আছেন আপন আনন্দের পরিপূর্ণতায়।

আমরা ভাবছিলাম, কিন্তু তিনি কথা বন্ধ করেন নি। আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন—“ভেবো না চিরকাল আমি এই ভাবে ফাঁকি দিয়ে কাটিয়ে এসেছি। তোমাদের ইচ্ছুল কলেজে গিয়ে বিদ্যা অর্জন করার সৌভাগ্য ত জীবনে ঘটল না, তবুও আজ শিক্ষিত সমাজে আমি যে হরিজন শ্রেণীতে গণ্য হই নি, বিদ্যাজীবীদের জাতে উঠতে পেরেছি, সেটা অমনি হয় নি। আমার ইচ্ছুল পালানোর যে পরিমাণ শুজন, অল্প পাজায় পড়াশোনা চর্চার বাটখারা চাপিয়েছি

সেই পরিমাণেই। সেটা ইচ্ছাপূর্বক। সে-সব দিনের কথা মনে পড়ে, যখন ইংরেজীতে কাঁচা অধিকার থাকতেও এক সলতে জালা বেড়ির তেলের লঠন জেলে রাত আড়াইটা পর্যন্ত বই পড়েছি। এই যুগের পট পরিবর্তন হ’ল শিলাইদহে পদ্মার বোটের উপর।”

বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন এক অনির্বচনীয়ের স্পর্শ লাগল, মনে হ’ল, তাঁর গভীর দৃষ্টির সম্মুখে জেগে উঠছে কতকাল আগেকার পিছনে-কেলে-আসা অতীত জীবনের ছবি। অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইলাম, যে-সাধনার অন্তরালে কবি থাকেন আত্মগোপন করে, আজ তার ইতিবৃত্ত স্তনব তাঁরই মুখ থেকে।

তিনি তখন আপন মনে বলে যাচ্ছেন—“বোটো ছিলাম আমি একলা, সঙ্গে ছিল এক বুড়ো মাকি, আমার মত চুপচাপ প্রকৃতির, আর ছিল এক চাকর, ফটিক তার নাম। সেও ফটিকের মতই নিঃশব্দ। নির্জনে নদীর বুকে দিন বয়ে যেত নদীর ধারারই মত সহজে। বোট বাঁধা থাকত পদ্মার চরে। সেদিকে ধু-ধু করত দিশন্ত পর্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ বালুরাশি, জনহীন, তৃণশ্রহীন। মাঝে মাঝে জল বেধে আছে, সেখানে শীত ঋতুর আমন্ত্রিত জলচর পাখীর দল। নদীর ওপারে গ্রাছপালার ঘন ছায়ায় গ্রামের জীবন-যাত্রা। মেয়েরা জল নিয়ে যায়, ছেলেরা জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটে—চাবীরা গোন্ধ মোব নিয়ে পার হয়ে চলে অল্প তীরের চাবের ক্ষেত্রে, মহাজনী নৌকা গুণের টানে মধুর গতিতে চলতে থাকে, ডিঙি নৌকা পাটকিলে রঙের পাল ডিঙিয়ে ছ হ করে জল চিরে যায়, জেলে নৌকা জাল বাচ করতে থাকে, যেন সে কাজ নয়, যেন সে খেলা, এর মধ্যে প্রজাদের প্রাত্যহিক স্তম্ভ আমের গোচরে এসে পড়ত তাদের নানা প্রকার নাগিশ নিয়ে, আলোচনা নিয়ে। পোষ্টমাষ্টার গল্প শুনিye যেত গ্রামের সদ্য ঘটনা এবং তার নিজের সঙ্কট সমস্যা নিয়ে, বোষ্টমী এসে আশ্চর্য লাগিয়ে যেত তার রহস্যময় জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করে। বোট ভাসিয়ে চলে যেতুম, পদ্মা থেকে পাবনার কোলের ইছামতীতে, ইছামতী থেকে বড়লে হড়ো সাগরে, চলনবিলে, আজাইয়ে, নাগর নদীতে, যমুনা পেরিয়ে সাজাদপুরের খাল বেয়ে সাজাদপুরে। দুই ধারে কত টিনের ছাদওয়াল গল্প,

কত মহাজনী নৌকার ভিড়ের কিনাবায় হাট, কণ্ঠ ভাঙনধবা তর্ক, কত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ছেলেদের দলপতি ব্রাহ্মণ-বালক, গোচারণের মাঠে রাখাল-ছেলের জটলা, বনঝাউ-আচ্ছন্ন পদ্মাতীরের উচু পাড়ির কোটরে কোটরে গাঙ-শালিকের উপনিবেশ। আমার গল্পগুচ্ছের ফসল ফলেছে আমাব গ্রাম-গ্রামান্তবের পথে-ফেরা এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভূমিকায়। সেদিন দেখলুম একজন সমালোচক লিখেছেন, আমার গল্প অভিজাত সম্প্রদায়ের গল্প, সে তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করে না। গল্পগুচ্ছের গল্প বোধ হয় তিনি আমার ব'লে মানেন না। সেদিন গভীর আনন্দে আমি যে কেবল পল্লীর ছবি এঁকেছি তা নয়, পল্লীসংস্কারের কাজ আরম্ভ করেছি তখন থেকেই—সে সময়ে আজকের দিনের পল্লীদরদী লেখকেরা 'দরিদ্র-নারায়ণ' শব্দটার সৃষ্টিও করেন নি। সেদিন গল্পও চলেছে, তারই সঙ্গে বনিষ্ঠস্বরে বাঁধা জীবনও চলেছে এই নদীমাতৃক বাংলা দেশের আতিথে। লোকসমাজের বাইরে কত দিন নিঃসঙ্গ অবস্থায় সময় কাটিয়েছি, হয়ত বহুকাল একটি কথাও বলি নি কারো সঙ্গে, মাঝি এবং চাকরের সঙ্গেও না, এমন কি, গান গাওয়ারও প্রয়োজন বোধ করি নি, অথচ কোন অভাব, কোন আকাজ্জাই অনুভব করি নি, যথার্থই তখন আপনার মধ্যে আপনি ছিলাম সম্পূর্ণ।”

উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস ক'রে উঠলাম,—এইভাবে কথা না ব'লে নির্জনে কত দিন ছিলেন, বছর খানেক, না, তারও বেশী? এই আকস্মিক প্রশ্ন যেন তাঁকে বিব্রত করে তুলল, অসহায়ভাবে বললেন—“দেখ আমি বাস করি eternityর (অনান্তনন্তকালের) মধ্যে, সময়ের জ্ঞান আমার কিছুমাত্র থাকে না।”

আমাদের চোখের সামনে যেন জেগে উঠল, কবি ব'লে আছেন মহাকালের গলার মালায় প্রদীপ্ত মণির অগ্নান জ্যোতিতে। বুঝলাম, যিনি মৃত্যুর পর অমরতা লাভ করেন, তিনি পাখিব জীবনেও থাকেন অসীম কালেরই অহুত্ব নিয়ে। আস্তে আস্তে আবার জিজ্ঞেস করলাম—এই ভাবে একটানা ছিলেন বোধ হয় অনেক দিনই?

—“তা নিশ্চয়ই ছিলাম। কারণ, মনে আছে, পদ্মার কোলে বসে দেখেছি, ঋতুর পর ঋতুর পরিবর্তন। গ্রীষ্মকালে হৃপ্তবেলায় আকাশ থেকে ঝোঁদুর বালুব কণায় কণায়

ফুলিঙ্গ ছড়াত। চোখ যেত বলসে। আমি বোর্টের ছাদে বিচলি বিছিয়ে কলসী কলসী জল ঢালাতুম। বোর্টের জানালায় থসথসের পর্দা থাকত ঝোলানো। কিন্তু যখন হাওয়া উঠত, তার সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম বালি সমস্ত বাধা কাটিয়ে উড়ে এসে পর্দার ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে বিছানা, চেয়ার, টেবিল, বইয়ের উপর ছড়িয়ে পড়ত। গ্রীষ্মের ঋতুমুষ্টি আমি উপভোগ করতাম, কোন নালিশ আমার মনে জাগত না। যখন কাজ থাকত ওপারে কাছারিতে, দিন কাটত সেখানে। সন্ধ্যার সময় একটি ছোট ভিড়ি বেয়ে ফিরতি পথে পার হতুম। অন্ধকাবে মন্থণ কালো তবঙ্গহীন নদীর উপর দিয়ে যখন খেয়া দিতুম তখন, কোথাও একটিও নৌকা নেই—আকাশে সন্ধ্যাতারা আর দূরে আমার নির্জনে বোর্টের জানালার ভিতর দিয়ে দেখা যেত সন্ধ্যারীপ। যে সব বুনো হাঁস দিনের বেলায় কুমোরখালির বিলে চরতে গিয়েছিল, সব ফিরে এসেছে চরের জলাশয়ে, কোথাও একটু শব্দমাত্র নেই। সন্ধ্যার পর ছাদের উপর চেয়াবে বসতাম, ঝিরঝিরে বাতাস এসে শরীর জুড়িয়ে দিত। প্রায়ই সেখানেই ঘুমিয়ে পড়তাম, হঠাৎ গভীর রাত্রে জেগে দেখেছি, তারান্ডরা আকাশ বিস্তৃত চোখে তাকিয়ে আছে সহস্র দৃষ্টি মেলে। মাঝে মাঝে কোন খবর না দিয়ে উঠেছে কালবৈশাখী। বালি উড়ত তার পথ বেয়ে, মেঘের পিছনে মেঘ ছুটত আকাশে, হি হি ক'রে উঠত নদীর জল একটা ফ্যাকাসে আলোয়। কাক চিল বাসায় ফেরবার পথে ঝড়ের সঙ্গে গালা দিতে পারত না, নেমে পড়ত চরে, বালুর মধ্যে ঠোঁট গুঁজতে গুঁজতে পাখা ঝটপট করত। শুনতে পেতুম কোথায় নদীর পাড় ভেঙে পড়ছে। নৌকোগুলি তাড়াতাড়ি কোনো-মতে নদীর কোলের মধ্যে ঢুকে পড়েই খুঁটো গেড়ে নোডব ফেলে টিকে যেত। মনে আছে, একবার শরভেব ঝড়ে পড়েছিলুম। হাওয়ার বেগ নোডরহুত্ব নৌকো ঠেলে নিয়ে যেতে চায় মাঝ দরিয়ায়। মাঝি মোটে একজন, দাঁড়ি নেই। ঝোলা ঝোলা পোষাক হুত্ব ঝাঁপিয়ে পড়লাম নদীতে। সাঁতারে ছিলুম নিপুণ। ডাঙায় এসে যখন উঠলাম, পকেট হাতড়ে দেখি, চাবিগুলো গেছে কখন জলেব নীচে তলিয়ে। হঠাৎ হাওয়া গেল উলটিয়ে, নদীর দিক থেকে তীরের দিকে। বোর্টটাকে ঠেলে তুলে দিল ডাঙায়।

এই পরিহাসের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করলে চাবিও বাঁচত, কাপড়ও ভিজত না।”

কথার শ্রোতে একটু বাধা পড়ল, ক্ষতিমোহন বাবুর দ্বী শ্রীযুক্তা কিরণবালা দেবী এলেন। তিনি আসন গ্রহণ করার পর আবার চলল সেই কাহিনীর অল্পবৃদ্ধি। নিঃশব্দ রাজি, ঘরের মাধ্যমে বসে আমরা তিনজন শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিছি সেই অপূর্ণ কাহিনী।

—“নদীতে কীট-পতঙ্গের উপদ্রব ছিল অত্যন্ত বেশী। তাদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটা বড় মশারি বানিয়ে নিয়েছিলাম, সমস্ত বোট জুড়ে খাটানো যেত। রাত্রে জানালা খুলে শুভ্রাম, শেষরাত্রে জেগে উঠে সেই জানালা দিয়ে প্রতিদিন ফেঁথাম, ভোরবেলাকার শুকতারি আপাধুর আকাশে আমার শিঙেরের কাছে নিশ্চয়। মনে হ’ত, একটি স্বচ্ছ, নির্মল দিন আমাকে অভিনবিত করতে এল, আজ যে একটা কিছু গাবই, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় জাগত না মনে। ঘুম থেকে উঠেই মুখ ঘুমে যেতাম চব্বের দিকে, মাইল দুয়েক হেঁটে আসতাম, দৌড়তামও কখনো। বোটে কিরে এলে ফটিক নিয়ে আসত এক বাটি ডালের নুপ, সেটুকু খেয়ে বসতাম লিখতে। কি লিখব, আগে থেকে কিছুই জানতাম না, শুধু জানতাম যে, একটা কিছু হবেই। হ’তও তাই।

“প্রথম মৌরনে যখন পা দিয়েছি, বিবাহও হয়েছে। সমসারযাত্রায় তোন সমারোহ ছিল না। মাসহারা পেতুম প্রথমে দেড় শো, তার পরে দুশো। তখন ছাত্রদের সম্বন্ধে আমার দাক্ষিণ্য ছিল নির্দিষ্ট। তাদের সকলকে আমি চিনতামও না, গড়ানো কি রকম করছে কিম্বা আদৌ করেছে কি না, এ সব সংবাদ দেওয়ার কোন দায়িত্বই তাদের ছিল না। বৃষ্ণতে পারতাম, অনেক স্থলেই ঠকছি, কিন্তু ঠকায় নি এমন পাত্রও ত ছিল। মনে আছে, একটি বরিশালের ছেলে তিন বছর ধরে ব্যর্থ অধ্যয়নায় বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু অর্থ হিসেবে তার দুশেটা ব্যর্থ হয় নি। অপকর্মের জন্য গৌরব দাবী করা উচিত নয়, কৃতজ্ঞতা দাবী করাও মৃঢ়তা। একটি ছাত্রের কথা শুধু মনে আছে। সে এল আমার সঙ্গে দেখা করতে, বলল—আপনার হয় ত মনে নেই, কিন্তু আপনি ছ বছর মেডিক্যাল

কলেজে আমার পড়ার খরচার সাহায্য করে এসেছেন। আপনার আশীর্বাদে আমি ডাক্তারি পাস করেছি এবং সম্প্রতি আয়ুর্বেদের বই একখানা ভর্ত্তি করেছি, তারই এক কপি আপনাকে দিতে এলাম। যাই হোক, বলছিলাম, আর্থিক সম্বলতা যাকে বলে, প্রথম বয়সে তা আমার ছিল না। বই পড়বাব সখ ছিল, অনেক সময় এক সেট কিনে পড়া হয়ে গেলে হকারকে বেচে আর এক সেট কিনতুম। গ্রন্থালোপ বন্ধ ভালো মরে বেচে দেবেন লোভ দেখিয়ে গাড়ি বোঝাই করে বই নিয়ে গেলেন। মূল্য পাব আশা করেছিলুম ব’লে ভাগ্যদেবী হেসেছিলেন। বোধ করি উত্তরাধিকারীদের কাছে চেষ্টা করলে কিনে নেওয়া সম্ভব হতে পারে।

“সাধনা”র যুগে প্রধানত শিলাইদহেই কাটিয়েছি। কলকাতা থেকে বলুর (বলেঙ্গনাথ ঠাকুর) ফরমান আসত, গল্প চাই। গ্রাম্যজীবনের পথ-চলতি কুড়িয়ে পাওয়া অভিজ্ঞতার সঞ্চয় সাজিয়ে লিখেছি গল্প। তখন ভাবতাম কলম বাগিয়ে বসলেই গল্প লেখা যায়। তার পরে প্রমাণ হয়েছে কথাটা সত্য নয়। অর্থাৎ, মাহ তখন ভেবেছিল, যেহেতু জলে সাঁতার দিতে বাধে না, শুকনো ডাঙাতেও বাধবে না। শুকনো ডাঙার ধারণাটা তখন অস্পষ্ট ছিল। ‘সাধনা’র যুগে শুধু গল্প লিখে নিষ্কৃতি ছিল না, কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা, সম্পাদকীয় মন্তব্য, সবই লিখতে হোত। স্মরণ্য একদা ‘সাধনা’ বন্ধ ক’রে দিয়ে তবে ছুটি নিতে হ’ল।”

জিজ্ঞেস করলাম—আপনার আহারটা কি ডালের নুপ দিয়েই যেত।

—“না। সাহিত্যিকতার অহঙ্কার করব না। তখন মাংস খাওয়া অভ্যাস ছিল, ফটিক সন্ধ্যার পর এনে দিত কার্টলেট-জাতীয় বাদ্য লুটির সহযোগে। তার পরে অধ্যয়নের মশারি থেকে নিদ্রায়নের মশারিতে ঢুকতেম। পরের দিন সকালে আবার উঠত শুকতারি, তার সঙ্গে শুভদৃষ্টি বিনিময় ক’রে শাস্ত্রশ্রোত দৈনন্দিন জীবনের স্বপ্ন হোত। সেকালে বাংলা দেশে লেখকজীবন ছিল অপেক্ষাকৃত নিষ্কটক। পাঠকও ছিল অল্প, বিচারকও ছিল তথৈবচ। বিচারক জাতটা হিংস্র স্বভাবের। তবু তাদের দাঁত নখ তখন এত

করে গজায় নি। তখনো বন্ধিমের যুগ, কবি বলতে নবীন সেন ও হেম বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি সহজেই ছিলাম লোকচক্ষুর অন্তরালে। বাংলা দেশে সে-যুগে পথে ঘাটে ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে কাগজের কুশাকুর গজিয়ে ওঠে নি। তা ছাড়া ধারা ছিলেন খ্যাতনামা লেখক, তাঁদের লোকে সন্মম করত। ফস্ কঁরে বন্ধিমের সঙ্গে ছদ্মতার দাবী করা তখন যার-তার সাহসে কুলোত না—সেই দুর্গমতার আড়ালে তাঁরা মান রক্ষা করতে পেরেছেন। তখন আমার নিত্য ব্যবহারের পোষাক ছিল ধুতি, গায়ে শুধু চাদর এবং পায়ে চটি জুতো। প্রাতঃকালে বেলফুল ভুলে সেই চাদরের খুঁটে বঁধতুম। চুল রেখেছিলাম লম্বা, এই কবিশ্বের ডেক ধারণের জন্তে আজ আমি অত্যন্ত লজ্জিত।

“সাধনা”র যুগের পর আমি প্রথম উপভাস লিখি ‘চোখের বালি’। বইখানি যন্ত্র কঁরে লিখেছিলুম এবং ভালই হয়েছে বলে আজও আমার বিশ্বাস। ‘নৌকাডুবি’র মধ্যে অনেক গল্প রয়ে গেছে। এরই কিছুকাল পরে একদিন রামানন্দ বাবু আমাকে কোনো অনিশ্চিত গল্পের আগাম মূল্যের স্বরূপ পাঠালেন তিনশো টাকা। বললেন, যখন পারবেন লিখবেন, নাও যদি পারেন আমি কোনো দাবী করব না। এত বড়ো প্রস্তাব নিষ্ক্রিয় ভাবে হজম করা চলে না। লিখতে বসলুম ‘গোরা’—আড়াই বছর ধরে মাসে মাসে নিয়মিত লিখেছি, কোনো কারণে একবারো ফাঁক দিই নি। যেমন লিখতুম তেমনি পাঠাতুম। যে সব অংশ বাহ্যিক মনে করতুম, কালির রেখায় কেটে দিতুম, সে সব অংশের পরিমাণ অল্প ছিল না। নিজের লেখার

প্রতি অবিচার করা আমার অভ্যাস। তাই ভাবি সেই বর্জিত কাগিগুলি আজ যদি পাওয়া যেত, তবে হয়ত সেদিনকার অনাদরের প্রতিকার করতুম।

“এই ভাবে কেটেছে জীবনের এক পর্ব। তার পরে এসেছি জনতার মধ্যে। সমাজের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে, খ্যাতি বেড়েছে, সেই সঙ্গে লোকের অজস্র রকম দাবীও বেড়েছে। তার পরে আছে বিশ্বভারতী এবং সময়ে অসময়ে মাঝে মাঝে তার জন্ত অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা। তোমাদের মধ্যেও সময়ে সময়ে ঘটেছে মতভেদ এবং মনান্তর, তারও টেড এসে লাগে। নানাদিক দিয়ে সহস্র জটিল বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। কিন্তু এরও প্রয়োজন ছিল, জীবনের পর্বে পর্বে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হ’ল। আজ জীবনের সান্নাধ্য বসে বসে ভাবি, আর একবার পদ্মার বুকে সেই নির্জনচারী জীবনে ফিরে যাব। ঠিক সেই স্পর্শ হয়ত পাব না, কিন্তু জীবনের চক্রগতি পূর্ণ হবে, গ্রামের স্নেহচ্ছায়, প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্যের মধ্যে নদীতীরে একদা যে জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল, আজ তারই অবসানবেলায় আবার ফিরে যাব সেই নদীরই কোলে।”

শেষ হ’ল তাঁর কাহিনী। আমরা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। তরুণ তাপসের যে সাধনাময় মুক্তি এতকাল শুধু কল্পনাতেই সমুজ্জ্বল ছিল, হয়ত মনে মনে তারই সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলাম আজকেকার কাহিনীর এই নব পরিচিত রবীন্দ্রনাথকে। কিছুক্ষণ পরে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম পদ্মাচরের সেই আপনভোলা, ভাবোন্মত্ত রবীন্দ্রনাথেরই কথা ভাবতে ভাবতে।

বিরহে

“বনফুল”

মেঘেতে ঢাকা গগনতল
নীরব দশ দিশি
হৃদয় আছে অনর্গল
গভীর ঘন নিশি।

মুক্ত করি স্থপিত্যার

সে আসে যায় বারম্বার
ধরিতে গেলে থাকে না আর
আঁধারে যায় মিশি

হৃদয় থাকে স্বপ্নাতুর
ঘনায় ঘন নিশি।

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

১

ইহার প্রাচীনত্ব

দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ভারতীয় বৌদ্ধ ব্যাঙ্কেব সংখ্যা আজ পর্যন্ত নিতান্ত নগণ্য হইলেও ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে ব্যাঙ্কিং-প্রথা এদেশে প্রচলিত ছিল না ইহা মনে করিলে গুরুতর ভুল করা হইবে। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে, মহর সময় হইতে আধুনিক ব্যাঙ্কিঙের প্রায় অধিকাংশ রীতিনীতিই বিস্তৃতভাবে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। সর্বসাধারণের অর্থ ও তৈজসাদি গচ্ছিত রাখা, সাধারণ বা চক্রবৃদ্ধি হারে হুদ ধরিয়া টাকা ধার দেওয়া, ছত্তি কাটা, চালানী মাল বীমা করা, জাবেদা খাতা (day book), নগদান খাতা (cash book) ও খতিয়ান (ledger) সাহায্যে অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুল্কস্বত্বের সহিত হিসাব রাখা, এই সবই তাহার জ্ঞানিত ও করিত। এতদ্ভিন্ন ভারতের বিভিন্ন স্বাধীন রাজত্ববর্গের স্বতন্ত্র মুদ্রা থাকায় ঐ সব মুদ্রার বিনিময় ও মূল্য নির্ধারণ করাও দেশীয় মহাজন বা সাহকরদের একটি প্রধান কাজ ছিল— যেমন অধুনা আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ পাশ্চাত্য একশ্রেণী ব্যাঙ্কগুলি করিয়া থাকে। খ্রীষ্টের তিন শত বৎসর পূর্বে লিখিত চাণক্যের অর্থশাস্ত্রেও আমরা আধুনিক ব্যাঙ্কিঙের প্রায় সর্ববিধ কার্যবিবরণ দেখিতে পাই। ইহা জাতীয় গর্বপ্রসূত মিথ্যা অহঙ্কার নহে, ইংরেজ পণ্ডিতগণই ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মুসলমান আক্রমণের সূচনায় ভারতে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়, সেই সময়ে ব্যাঙ্কিঙের প্রতিপত্তি ও প্রসার স্বভাবতই কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। জনসাধারণ তখন মহাজন ও বণিকদের নিকট ধনসম্পত্তি গচ্ছিত না রাখিয়া নিজেদের নিকটে নানা গোপন উপায়ে সঞ্চিত রাখাই অধিকতর নিরাপদ মনে করিত। অবশ্য, সেই সময়েও বিভিন্ন রাষ্ট্র-সমূহকে প্রয়োজনমত অর্থ সাহায্য করিবার জন্ত তাহাদের প্রত্যেকের সহিত কোন মহাজন- বা শ্রেষ্ঠ-পরিবারের সংশ্ল

ষাক্তি এবং তাহারাই ঐ সব রাজ্যে অর্থসচিবের পদ অধিকার করিতেন। বাংলার নবাবগণের বংশানুক্রমিক ব্যাঙ্কার ছিলেন জগৎ শেঠের পরিবার। এজেন্সী হাউসের সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ষ্টেট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকেও ইহাদের নিকটই টাকা ধার করিতে হইত।

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ব্যাঙ্কিঙে পার্থক্য

আধুনিক ব্যাঙ্কিঙের সহিত ভারতীয় ব্যাঙ্কিঙের পার্থক্য এইখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

(ক) আধুনিক ব্যাঙ্কগুলি পুঁজি সর্বসাধারণের নিকট হইতে অংশ বিক্রয় ও আমানত গ্রহণ করিয়া তোলা হয় এবং অশীদারগণের দেনা বা দায়িত্ব তাহাদের অংশের পরিমাণ অবধি সীমাবদ্ধ। কিন্তু পুরাতনপন্থী মহাজন ও “বাণিয়া”গণ বেশীর ভাগ নিজেব অর্থ দ্বারাই মহাজনী ও ব্যাঙ্কিং কাজ-কারবার পরিচালনা করিয়া থাকে এবং তাহার দায়িত্বও ঐরূপ সীমাবদ্ধ নহে।

(খ) দেশীয় মহাজনদের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা বা শুধু ব্যাঙ্কিঙের কাজই করে না, সঙ্গে সঙ্গে আমদানি, রপ্তানি, “রাখি” কারবার এবং অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যেও লিপ্ত হইয়া থাকে। ইহা আধুনিক ব্যাঙ্কিঙের সাধারণ নীতিবিরুদ্ধ হইলেও ‘টমাস কুক,’ ‘পি এণ্ড ও’ ব্যাঙ্কগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, ব্যাঙ্কিঙের সহিত অন্যান্য নিরাপদ ব্যবসা, কিংবা ব্যবসার সহিত ব্যাঙ্কিং পাশ্চাত্য দেশেও থানিকটা আছে।

(গ) দেশীয় সাহকরদের কাজকর্মের সহিত পাশ্চাত্য ব্যাঙ্করীতির আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপারে প্রভেদ রহিয়াছে। আইনতঃ কোন বিধিনিষেধ না থাকিলেও ঐ সব দেশীয় সাহকর, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ স্বর্ণকার ব্যাঙ্কারদের মত কখনও নোট প্রচলন করে নাই। চেকের সাহায্যে ক্লিয়ারিং হাউস মারফতে দেনা-পাওনা মিটাইবার

সহজ ব্যবস্থাও ইহাদের নাই। অবশ্য, ছুটিদ্বা বা বহুকাল হইতে ইহারা আংশিকভাবে চেকের কার্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছে; কিন্তু আধুনিক কালে চেকের সহায়তায় অর্থের প্রয়োজন যেভাবে সংসাধিত হইতেছে, দেশীয় ছুটিদ্বারা সেই উদ্দেশ্য সমপরিমাণে কখনও সাধিত হইতে পারে না। এই জন্মই দুই-চারিটি চেক বা শেঠজীর নাম বাদ দিলে আর সকলে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং ভারতের বহির্বাণিজ্যের কর্তৃত্ব আজ পরহস্তগত।

বর্তমান সময়ে যদিও ভারতের বড় বড় নগরে ও বন্দরে বৃহৎ আধুনিক ব্যাঙ্ক ও তাহাদের শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহাদিগকে জাঁকজমকের সহিত বহু টাকার কাজকর্ম করিতে আমরা দেখিতে পাই, তথাপি এখনও ভারতের অন্তর্বাণিজ্যে দেশীয় মহাজনদের প্রভাব প্রতিপত্তি নিতান্ত নগণ্য নহে। বিদেশীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলি ভারতের বহির্বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রায় বোল আনাই যোগাইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত ইহাদের সম্পর্ক আজ তেমন ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে নাই। ভারতের গ্রাম পল্লী-প্রধান মহাদেশের অগণিত কাজ কাববারের পক্ষে ইহাদের আরোজন এবং ব্যবস্থা মোটেই প্রচুর ও যথেষ্ট নহে। কারণ বড় বড় নগর ও বন্দর ব্যতীত ভারতের অসংখ্য জনপদের সহিত ইহাদের কোনকণ সংশ্রব নাই। তাই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের দাবী এই সব দেশীয় মহাজনই আজও পূরণ করিয়া আসিতেছে। কৃষক, কারিগর, ক্ষুদ্র দোকানদার বা ব্যবসায়ীগণকে ইহারাই প্রয়োজনমত অর্থদান দিয়া থাকে। কৃষিপ্রধান দেশের কৃষিজাত পণ্য জরুরি করিয়া ইহাবাই শহবে বন্দবে চালান দিয়া থাকে এবং দেশীয় ও বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য পল্লী গ্রামের হাটে গঞ্জে ইহাদের অর্থানুকূল্যেই আমদানী হইয়া থাকে। কৃষকের চাষের খরচ ইহারাই যোগাইয়া থাকে এবং ফলনের সময় উপস্থিত হইলে উহা খরিদ ও চালানের জন্য ইহারাই নগদ টাকা সহ গ্রামে গ্রামে উপস্থিত হয়। আজকাল ইহাদের অনেকে নগদ টাকার পবিবর্ত্তে সরকারী ছুটি খরিদ করিয়া রাখিতে শিখিয়াছে; কারণ দান বা মাল খরিদের জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন হইলে ইম্পিরিয়াল কিংবা অন্য কোন

যৌথ ব্যাঙ্কে উহা সহজেই ভাড়াইয়া লওয়া চলে। শহরে বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে মক্ষঃস্থলের অসংখ্য ব্যবসায়ীর সম্পর্কে আসিবাব এবং তাহাদের অবস্থা জানিবার সুযোগ বা সুবিধা হয় না। সেই জন্মই ব্যবসায়িক বিশেষ পবিচিত বড় কারবারী ভিন্ন অপর কাহাকেও টাকা দান দেওয়া ইহাদের পক্ষে তেমন সহজ ও সম্ভবপর নয়। এতদ্ভিন্ন দেশীয় মহাজনগণ আমানতের জন্য উচ্চতর হারে সুদ দেয় এবং অপেক্ষাকৃত সহজ সর্বোচ্চ টাকা ধার দেয়। এই সব কাবণে ইহাদের কর্মক্ষেত্রে নিতান্ত কম প্রশস্ত নহে এবং বড় বড় যৌথ ব্যাঙ্কের ইহারা নিতান্ত নগণ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নহে।

আবার অন্য ভাবে দেখিতে গেলে, রাজধানীর টাকার বাজার এবং পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ব্যবসায়ী ও চাষীর মধ্যে ইহারাই যোগ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে। হুদূর পল্লী-জমির ফসল কোন্ পথে কি উপায়ে শহবে চালান হয় তাহার অনুসন্ধান লইলেই এই কথার সত্যতা বুঝিতে পারা যাইবে। এইকণ অনুসন্ধান করিলে আমবা দেখিতে পাইব, গ্রাম্য ছোট ব্যাপারী প্রথমতঃ তাহাব সামান্য পুঁজি হইতে নগদ অর্থ দ্বারা পণ্য খরিদ করিতেছে। যখন তাহার পুঁজি নিঃশেষিত হইয়া আসে, তখন সে তাহার ক্রীত পণ্যের মাত্রবরিতে নিদিষ্ট একটা সময় মধ্যে পবিশোধ করিবার কড়ারে (সাধারণতঃ ত্রিশ কিংবা ষাট দিন) গঞ্জের মহাজন হইতে টাকা ধার করে। আবার গঞ্জের মহাজন, টাকার প্রয়োজন হইলে, তাহার অপেক্ষা বড় মহাজনের নিকট তাহার খরিদা পণ্য জিন্মা রাখিয়া এবং গ্রাম্য মহাজনের ছুটি বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই মহাজন আবার ঐ ছুটিতে স্বাক্ষর করিয়া উহার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শহরের ব্যাঙ্কে তাহা বিক্রয় করতঃ নগদ অর্থ পাইতে পারে। এই উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ব্যাপারী বা মহাজনের সহিত শহরের আধুনিক ব্যাঙ্কের যোগসূত্র গৌণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক হিসাবে পাশ্চাত্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে দেশীয় মহাজনী কারবারের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। বরঞ্চ, অনেক ক্ষেত্রে নগদ টাকাকড়ি পাঠাইবার হান্দামা হইতে ইহারা রক্ষা পাইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, প্রয়োজনমত অতিরিক্ত টাকা সংগ্রহের সহজ সুযোগও

ইহারা অনেকটা লাভ করিয়াছে। ব্যবসাদারদের হুণ্ডি ক্রয় করিবার সময় ইহারা “ব্যাঙ্ক রেট” অপেক্ষা শতকরা দুই-তিন টাকা অধিক বাট্টা ধরিয়া লয় এবং উহা পুনরায় ব্যাঙ্কের নিকট “ব্যাঙ্ক রেটে” বিক্রয় করিয়া থাকে। এইভাবে মাঝ হইতে ইহাদের শতকরা দুই-তিন টাকা লাভ থাকিয়া যায়। গ্রাম্য ব্যবসায়ীর হুণ্ডি সোজা হুজি শহরের ব্যাঙ্ক গ্রহণ করিতে রাজী হয় না, ধনী ও পবিচিত্ত মহাজন এই সব হুণ্ডি স্বাক্ষর করিয়া টাকার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে তবেই শহরের ব্যাঙ্ক উহা গ্রহণ করে। সেই জন্যই এইসব মহাজনের পক্ষে হুণ্ডি ক্রয়বিক্রয় দ্বারা এই লাভের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। স্নাতনপন্থী অনেক মহাজন আজকাল তাহাদের ব্যবসাকে আধুনিক ছাঁচে রূপান্তরিত করিতেছে এবং অনেকে চেকের প্রচলন পর্যন্ত শুরু করিয়াছে।

ভারতে আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এক্ষণে আমরা ঋণসাধ্য সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ব্যবসা করিবার জন্য যে সব “এজেন্সী হাউস” এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে কাজকর্মের সুবিধার জন্য কলিকাতায় সর্বপ্রথম একটি ব্যাঙ্ক বিভাগ খোলেন। নীলকুঠী, অম্মান্ত ফ্যাক্টরী, গণ্যবাহী জাহাজ ইত্যাদি জামিন রাখিয়া ইহারা ইংরেজ ও দেশীয় কুঠিয়াল ও ব্যবসায়ীগণকে টাকা দান করিতেন। আমানতী সুদের হার উচ্চ হওয়ায় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী ও ইংরেজ বণিকগণ তাহাদের সম্বন্ধে অর্থ এই সব এজেন্সী হাউসে গচ্ছিত রাখিতেন। কিন্তু ইহারা অধিক লাভের আশায় নানাবিধ দুসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৮৩০-৩২ সালে ব্যবসাসঙ্কট উপস্থিত হইলে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পায়। “ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্তান” নামে কলিকাতা শহরে ভাবতের যে সর্বপ্রথম বেসরকারী বোঁথব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, উহাও ১৮৩০-৩২ সালের দুসময়ে উঠিয়া যায়। তৎপরে কলিকাতার কতকগুলি বড় বড় ব্যবসায়ীর সহযোগিতায় “ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক” নামে আর একটি বেসরকারী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৪৮ সালে তাহার অস্তিত্বও লোপ পায়। এদিকে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদমূলে ১৮০৬ সালে ভারতের প্রাচীনতম প্রাদেশিক বোঁথ ব্যাঙ্ক, “ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল” প্রতিষ্ঠিত

হয়। ইহাব ৫০ লক্ষ টাকার মূলধন মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যোগাইয়াছিলেন। “ব্যাঙ্ক অব বোম্বে”র প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৪০ সালে—৫২ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া। কিন্তু শেয়ার স্পেকুলেশনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ১৮৬৮ সালে ইহা উঠিয়া যায়। তৎপরে ঐ বৎসরই এক কোটি টাকা মূলধন লইয়া “ব্যাঙ্ক অব বোম্বে”র দ্বিতীয়বার গোড়াপত্তন হয়। ১৮৪৩ সালে ৩৬ লক্ষ টাকা মূলধনে মাদ্রাজের প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সব প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের অবস্থা অনেকটা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মত ছিল। প্রথমতঃ ইহাদের মূলধন আংশিকভাবে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যোগাইয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী এই সব ব্যাঙ্কে সম্পাদক (সেক্রেটারী) ও কোষাধ্যক্ষের পদ অধিকার করিতেন এবং ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কতিপয় পরিচালকও (ডিরেক্টর) মনোনয়ন করিতেন। ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত বাবতীয় সরকারী কাজকর্ম এই সব প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক মারফতে সম্পন্ন হইত।

১৮৬২ সাল পর্যন্ত নোট প্রচলনের অধিকারও এই সব প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের হাতেই ছিল। কিন্তু এই সময়ে ঐ অধিকার গবর্ণমেন্ট স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু তব্বিন্ময়ে সরকারী তহবিল এই সব প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কে রক্ষিত হইতে থাকে।

“প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক আইন”মূলে ১৮৭৬ সালে গবর্ণমেন্ট এই সব ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের প্রদত্ত মূলধন তুলিয়া লয়ন এবং পরিচালক, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ মনোনয়ন বা নিয়োগের অধিকার পরিত্যাগ করেন। ইহার ফলে সরকারী সংগ্রহ অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও গবর্ণমেন্টের পক্ষে সাময়িক ঋণগ্রহণের বন্দোবস্ত করা, সরকারী তহবিলের একটা নির্দিষ্ট ন্যূনতম অংশ গচ্ছিত রাখা ইত্যাদি কর্মভার তখনও ইহাদের উপর ছিল। এতদ্বিধা ইহাদের হিসাব পরীক্ষা করা, কোন বিষয়ের সংবাদ বা তথ্য দাবী করা, সাপ্তাহিক হিসাব প্রকাশে ইহাদিগকে বাধ্য করা, ১৮৭৬ সালের আইনমূলে সরকারী অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৮৭৬ সাল পর্যন্ত দশ বৎসর কাল, কলিকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ—এই তিন প্রাদেশিক রাজধানীর সরকারী তহবিল

প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কেই থাকিত। কিন্তু এই সব ব্যাঙ্ক হইতে প্রয়োজনমত মঞ্চস্থলে টাকা পাঠাইতে নানারূপ অসুবিধা ঘটিতে থাকায়, ১৮৭৬ সালে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ নগরীতে গবর্ণমেন্ট নিজেদের রিজার্ভ ট্রেজারী (খাজনাখানা) স্থাপন করেন। এই সময় হইতে সরকারী তহবিলের অধিকাংশ অর্থই এই সব খাজনাখানায় রক্ষিত হইত—দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য আবশ্যকীয় সামান্য তহবিল মাত্র জেলা ট্রেজারীতে (খাজনাখানায়) থাকিত। প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে সরকারী তহবিল গচ্ছিত রাখিবার যে ন্যূন পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছিল, তদপেক্ষা কম অর্থ ঐ সব ব্যাঙ্কে রাখিলে গবর্ণমেন্ট তজ্জন্ত ঘাটতি তহবিলের উপর একটা হুদ দিতে স্বীকৃত হন। কার্য ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ন্যূন পরিমাণ অপেক্ষা অধিক অর্থই এই সব ব্যাঙ্কে গবর্ণমেন্টের গচ্ছিত থাকিত। কলিকাতা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে পৌষ হইতে জ্যৈষ্ঠ এই ছয় মাস কেনাবেচার কাজ জোরের সহিত চলিয়া থাকে এবং অর্থের প্রয়োজনও এই সময়েই বেশী হয়। বাংলা দেশে শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক এই চারি মাসই কৃষিজাত পণ্য ও অন্যান্য জিনিষের কেনা-বেচার মরসুম। আবার অন্তর্দিকে সরকারী রাজস্বের বেশীর ভাগ আদায় হয় পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে। ইহা হইতে দেখা বাইতেছে যে, ব্যবসার মরসুমের সময়, যখন টাকার বাজারে অধিক অর্থের প্রয়োজন, সেই সময়ে বহু অর্থ রাজস্ব বাবদ সরকারী তহবিলে আসিয়া জমা হইতে থাকে। এই অর্থ সারা বৎসরের খরচ বাবদ গবর্ণমেন্ট ধরিয়া রাখেন। ফলে টাকার বাজারে ব্যবসার জন্য অর্থের অনটন ঘটে।

ব্যাঙ্কিং ও সরকারী তহবিল

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ঋণ দিনের মেয়াদে সরকারী তহবিল হইতে প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের মারফতে জনসাধারণকে টাকা ধার দিবার একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করা হয়। গবর্ণমেন্ট এই প্রস্তাবে প্রথমতঃ সম্মত হন নাই। কর্তৃপক্ষ হইতে এই কথা বলা হয় যে, আকস্মিক কোন কারণে টাকার প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেন্টকে বিপদে পড়িতে হইবে এবং ভারতের রাজনৈতিক অবস্থায় এরূপ সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণ তাহাদের নিজ

সঞ্চিত অর্থদ্বারা ব্যবসা না করিয়া যদি সহজলভ্য ধারের টাকায় ব্যবসা করিবার সুবিধা পায়, তাহা হইলে ব্যবসার পক্ষেও ইহা পরিণামে মঙ্গলজনক হইবে না। অনেক আন্দোলনের পর ভারতসচিব এই প্রস্তাব অগ্রমোদন করিলেন বটে; কিন্তু সরকারী টাকার জন্য প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলিকে ব্যাঙ্ক রেটে হুদ দিতে হইবে এইরূপ নির্দেশ করিলেন। গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক রেটে টাকা ধার করিয়া আনিয়া উহা পুনরায় ব্যবসায়ী-মহলে ধার দিয়া সুবিধা হইবে না মনে করিয়া প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলি এই সর্ব্তে সরকারী টাকা লইতে অসম্মত হয়। চেম্বারলেন কমিশন (১৯১২-১৩ সালে) এই অবস্থার প্রতিকার কর্ত্তে দুইটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাহারা বলেনঃ হয় সরকারী খাজানা-খানা (Reserve Treasury) উঠাইয়া দিয়া সরকারী তহবিল এই সব প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কে রাখা হউক, নয়ত “ব্যাঙ্ক রেট” অপেক্ষা শতকরা এক কিংবা দুই টাকা কম হুদে প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারী অর্থ ধার দেওয়া হউক। সাধারণ অবস্থায় গবর্ণমেন্ট জনমতকে পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা করিলেও বিগত লড়াইয়ের সময় নিজ স্বার্থেব জন্য অর্থের পবিমাণ বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হইলে, গবর্ণমেন্ট সরকারী তহবিল হইতে বহু টাকা প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক-সমূহেব হস্তে অর্পণ করেন—উদ্দেশ্য ক্রেডিট-মূলে এই টাকা জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলে তাহারা অনায়াসে গবর্ণমেন্টকে সমর-ঋণ বাবদ টাকা ধার দিতে পারিবে। বহু আন্দোলনে যাহা সম্ভব হয় নাই, বিগত যুদ্ধের ফলে তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল। অবশেষে ১৯২১ সাল হইতে রিজার্ভ ট্রেজারী তুলিয়া দিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কেই সরকারী টাকা গচ্ছিত রাখা হয়।

সর্বসাধারণের অর্থ গচ্ছিত রাখা, গবর্ণমেন্টের, মিউনিসিপ্যালিটির কিংবা অন্যান্য কতকগুলি নির্ভরযোগ্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঋণপত্র মূলে টাকা ধার দেওয়া, হুণ্ডি ক্রয় বিক্রয় করা, নিরাপত্তার জন্য মূল্যবান সিকিউরিটি গচ্ছিত রাখা, গবর্ণমেন্ট ও কতকগুলি বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে ধারের বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি প্রাদেশিক ব্যাঙ্কসমূহেব নির্দিষ্ট কার্য ছিল। কিন্তু এই সব ব্যাঙ্কের বিদেশী অর্থ কেনা বেচা করিবার কিংবা বিদেশ হইতে টাকা ধার করিবার

অধিকার ছিল না। এমন কি, কি পরিমাণ অর্থ দান দেওয়া হইবে, কত দিনের মেয়াদে দেওয়া হইবে, কি জাতীয় জামিন-মূল দেওয়া হইবে, তৎসম্বন্ধে ইহাদের উপর নানারূপ বিধিনিষেধ ছিল। প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলির সহিত গবর্ণ-মেন্টের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় ইহাদের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা জনসাধারণের নিকট খুবই উচু ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, সরকারী তহবিলের একটা বড় নির্ধারিত অংশ প্রায় সর্বদাই এই সব ব্যাঙ্কে আমানত থাকিত। গবর্ণমেন্টের পক্ষে ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি এই সব ব্যাঙ্কে সম্পন্ন করিত। এই সব কারণে ইহাদের পক্ষে ব্যাঙ্ক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে একাধিপত্য লাভ করা সহজ হইয়াছিল।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রস্তাব

কিন্তু নোট প্রচলন ও মুদ্রা সম্পর্কীয় অগ্রান্ত্র যাবতীয় বিলি ব্যবস্থার ভার গবর্ণমেন্টের হাতে থাকায় এবং প্রাদেশিক আধা সরকারী ব্যাঙ্কগুলির সহিত অগ্রান্ত্র যৌথ-ব্যাঙ্কের ও মধ্যস্থলের মহাজনগণের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকায় টাকার বাজারে একটা অনিশ্চিত ও বিশৃঙ্খল অবস্থা চলিয়া আসিতেছিল। কোন সময়ে ব্যবসার অল্পপাতে টাকার বাজারে অর্থাভাব ঘটিতেছিল, আবার কোন সময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ বাজারে ছড়াইয়া পড়িয়া জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি ও আলস্যজনিক অস্থবিধা ঘটাইতেছিল। এমন কোন কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না যাহা ধার (ক্রেডিট) বা মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের ব্যবস্থা করিতে পারে। লড়াইয়ের পর ১৯২০ সালে ক্রসেলস্ নগরে যে আন্তর্জাতিক আর্থিক বৈঠক বসে তাহাতে যে-সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নাই সেই সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহযোগিতা ভিন্ন কোন দেশের আর্থিক ব্যবস্থা স্থানীয়ভিত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে, ইহাও ঐ বৈঠকে স্বীকৃত হয়। ইহার ফলে আমেরিকার ও যুরোপের যে সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অভাব ছিল সেই সব দেশে কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষেও এইরূপ ব্যাঙ্কের অভাব বহুদিন হইতে অনুভূত

হইয়া আসিতেছিল। এক দিকে গবর্ণমেন্টের হাতে ছিল সরকারী তহবিল, নোট প্রচলনের ক্ষমতা ও বিদেশের সহিত অর্থ আদান-প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা, অন্য দিকে ব্যাঙ্কগুলির হাতে ছিল তাহাদের স্বতন্ত্র তহবিল। এই দুইটি বিভিন্ন আর্থিক শক্তির মধ্যে কোনরূপ স্থানির্দিষ্ট সম্পর্ক না থাকায় টাকার বাজারে উল্লিখিত অনিশ্চয়তার উদ্ভব হইতেছিল। এই সহযোগিতার অভাবে অনেক ব্যাঙ্কেব নগদ তহবিল আকস্মিক প্রয়োজনের পক্ষে প্রচুর না হওয়ায় উহাদের বিপদের সম্ভাবনা থাকিয়া যাইতেছিল। ১৯১৩-১৪ সালে কতকগুলি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ায় এবং আর্থিক ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীবৃন্দের যথোচিত অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি না থাকায়, বিশেষজ্ঞ-পরিচালিত একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা অধিকতর অনুভূত হয়। এইরূপ একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অগ্রান্ত্র ব্যাঙ্ক ও মহাজনদের সহযোগিতায় একটা স্থানির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিতর দিয়া দেশের যাবতীয় আর্থিক বিলিব্যবস্থা কবিতো পারিবে; ফলে সরকারী ও বেসরকারী ধনভাণ্ডার দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে অধিকতর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে পারিবে; জিনিষের মূল্য স্থির রাখার যে অত্যধিক আবশ্যিকতা হইয়া পড়িয়াছে তাহা সুসাধ্য হইবে; বেসরকারী ব্যাঙ্ক ও মহাজনদের টাকার প্রয়োজন হইলে কিংবা আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাদের একটা আশ্রয়স্থল মিলিবে—ইহাই ছিল ভারত-বাসীর এই দাবীর গোড়ার কথা।

এক শত বৎসর পূর্বে ১৮৩৬ সালে সর্বপ্রথম এইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রস্তাব কয়েকজন ব্যবসায়ী উপস্থিত করিয়াছিলেন। তৎপর ১৮৬৭ সালে তিনটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে একত্র করিয়া একটি নিখিল ভারতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের তৎকালীন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ডিক্‌সন সাহেব করিয়াছিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। ১৮৯৮ সালে ফাউলার কমিটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৯০১ সালে লর্ড কুর্জেন এই বিষয়টি পুনরায় বিশেষভাবে বিবেচনা করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিলেও কার্যতঃ কিছুই হইয়া উঠে নাই। ১৯১২-১৩ সালে চেম্বারলেন কমিশনের স্বনামখ্যাত সদস্য কেইনস্ সাহেব তিনটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক

একত্র করিয়া একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করাই সর্বাপেক্ষা
সহজ ও সুবিধাজনক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং এইরূপ
ব্যাঙ্কের একটি খসড়া পর্যন্ত প্রস্তুত করেন। প্রাদেশিক
ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষগণ নিজেদের স্বাধীন সত্তা এইভাবে লোপ
করিয়া সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আসিতে সম্মত হন নাই এবং
প্রথম হইতেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া আসিতে
ছিলেন। কিন্তু ইহার অসম্মত হইলে পাছে গবর্ণমেন্ট
একটি নূতন পুরাদস্তুর সরকারী ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন এবং
ইহার গবর্ণমেন্ট হইতে এ-যাবৎ যে সব সুযোগ ও সুবিধা

ভোগ করিয়া ফাপিয়া উঠিয়াছেন তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া
যায়, এই আশঙ্কায় তাহারা অবশেষে তিনটি ব্যাঙ্কের
সম্মিলনে ও অন্ত্যান্ত সর্বোৎসাহে সম্মত হন। তাহারই ফলে
বৃদ্ধাবসানের পর ১৯২১ সালে মিঃ কেইনসের প্রস্তাবানুযায়ী
তিনটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের সমন্বয়ে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অব
ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাহা দ্বারাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের
উদ্দেশ্য মোটেই সাধিত হয় নাই; কেমন করিয়া তাহা
পরে প্রকাশ পাইবে।

প্রশান্তি

শ্রীঅমিয়া দেবী

চিরন্তন আসে নবরূপে ; —

মানস-মন্দির মাঝে নৈবেদ্য-সম্ভারে গন্ধধূপে

জ্বালায়ে প্রাণের আলো মুগ্ধচিন্তা রহে বসি

প্রতীক্ষার বাতায়নতলে,

আপনাবে অভিযুক্ত করি গত বরষের আনন্দ-ব্যথার

অশ্রুজলে।

সুখে দুঃখে চাহি উর্দ্ধপানে

চলেছে মানবযাত্রী অনাগত ভবিষ্যের অন্তর সন্ধানে

দিনে দিনে বর্ষ বর্ষ ধরি ;

কোন্ দূর-দূরান্তের লক্ষ্য অহুসরি ;

চিরন্তন যাত্রা তার মিশে যায় পায়ে পায়ে

প্রতিপলে হারানো অতীতে,

যাত্রা তবু চল সবণিতে।

ধূলার এ ধরণীতে যাহাদের প্রাণের পবন

মন্দাকিনী-ধারা আনি উত্তর জীবনপথ করিল সরস,

যারা মোর জীবনের বর্ষে বর্ষে এনে দিল

রিক্ত এই প্রাণশাখা ভরি

স্নিগ্ধ জ্বালিতা রাশি, বর্ষে গন্ধে অপক্কপ পত্রপুষ্প

কোরক-মঞ্জরী ;

পরানের রঞ্জে, রঞ্জে, ছমারে ছমারে

যার ফুকারিল বাঁশী নবজীবনের মঞ্চে

ভাক দিয়া বারে বারে বাবে,

পঞ্চাশত দেহ-মনে তারুণ্যের আনিল সংবাদ,

অমৃতের বার্তা আনি মুছে দিল অন্তরের সর্বমানি

সর্ব অবসাদ,

পরম পাথের দানে যারা মোর যাত্রাপথে

প্রাণপশ্চি করিল সঞ্চার,

আজ এ নবীন বর্ষে তাহাদের করি নমস্কার !

যারা দিল ব্যথা,

নিবিড় বেদনছায়ে পরিম্লান ভুলের বারতা

বিরহের মালাভোরে গাঁথি দিয়া দূরান্তের যারা গেল চ'লে

ফুলমালা ছিন্ন করি অবহেলে ফেলে দিয়ে

পঞ্চধূলিতলে,

পরিপূর্ণ প্রাণে

তাদেরো বরণ করি আজ মোর অন্তরের গানে।

যাহাদের নিমগ্ন চেতন

আপন অজ্ঞাতে মোর সুখদুঃখ অহর্নিশ করেছে বহন,

জানা ও অজানা মোর বন্ধু যত নিকট দূরের

এনেছি তাদেরি লাগি স্নগভীর ভালবাসা বহু দিবসের,

যাহাদের প্রাণতীর্থে চিন্তা মোর মুহূর্ত্তেরো লভেছে আশ্রয়

গাহি আজ তাহাদের জয়।



শ্রীমদোজ বসু

ঘাটে নৌকা। সতীশ মহা তাড়াহুড়ো লাগিয়েছে—ও মাসীমা, এখনও হ'ল না? যেতে যেতে বর এসে যাবে যে—

গিন্নি তাড়াহুড়ো দালানে ঢুকলেন; পথের সম্বল কিছু পান-সুপারি বেঁধে নিতে হবে। গিয়ে দেখেন, অবাক কাণ্ড! খাটের উপর একনাশ কাপড়চোপড় ছড়ানো, অল্পপমা তার মাঝখানে চুপচাপ বসে আছে।

এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন, তার পর ধীরে ধীরে কাছে এসে তিনি মেয়ের পিঠের উপর হাত রাখতে অল্প রূপ করে উপুড় হয়ে পড়ল।

—যাবি নে?

অল্পপমা বাড় নাড়ল।



...ধীরে ধীরে কাছে এসে তিনি মেয়ের পিঠের উপর হাত রাখলেন

অথচ কটাখানেক আগে সে এখানে এসেছে, তখন তার এ মত ছিল না। এ খেয়ালী মেয়ের অন্ত পাওয়া ভার। বাড়ীর মধ্যে জোর খাটতে পারেন এক কর্তা। তিনি

আজ চার দিন বাড়ীছাড়া, বিয়েবাড়ী কতাকর্তা হয়ে বসেছেন।

সতীশ এসে বলল—অল্প, তোর মতলবটা কি, বল দিকি—

—মাথা ধরেছে—

—তা হ'লে এছুনি ওঠ। নৌকোর গিয়ে বস; গাড়ের হাওরায় মাথা ছেড়ে যাবে...

অল্পপমা সে কথাই জবাব দিল না; মাথা তুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল—আর দেবী ক'রো না মা, তোমরা চলে যাও—

হুহুয়ের হুহু, এর উপর কিছু বলা যায় না; কোন দিন গিন্নি বলেনও না। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা যে মোটেই সামান্য নয়। একটু ইতস্তত করে তাই একবার শেষ চেষ্টা করলেন—তুই চল, নয়ত আমি যাব না—

অল্প শাস্ত স্বরে বলল—মাথা ধরেছে; এছুনি হয়ত জ্বর আসবে। সেখানে গিয়ে একটা গোলমাল ঘটবে বসব, সে কি ঠিক হবে? তুমি চলে যাও মা, মালতীর বিয়ে...না গেলে চল কখনও—ছিঃ—

সতীশ ব্যথিত স্বরে বলল—তুমি

যাচ্ছ না অল্প, মালতী কিন্তু এ জন্মে তোমার সঙ্গে কথা বলবে না, তা ব'লে দিচ্ছি—

কথাটা ঠিক, মালতী বড় দুঃখ পাবে। এই বছর দুই

আগে তার বিয়ের দিন মালতী কত আশ্রয়-আশ্রয় করেছিল, কবিতা ছাপিয়েছিল, হেসে ঠাট্টা করে তর্ক করে সে-মাহুটকে একেবারে নাকানি-চোবানি খাইয়েছিল। অল্পপমা চোখে জল আসবার মত হ'ল। চমৎকার লোক কিন্তু যা হোক—দিব্য নির্ঝিকার ভাবে কলকাতায় বসে আছেন, অথচ দুই-তুখানা চিঠিতে বিয়ের তারিখ জানানো হয়েছে, সমস্ত কথা লেখা হয়েছে, কিছু জানানো বাকি নেই। ভরসা ছিল, নিতান্ত পক্ষে আজকের ডাকে পার্শেল এসে পড়বে। কিন্তু গিওন এসে চলে গেল। শুধু হাতে এখন সে যায় কি করে?

দু-হাতে মুখ ঢেকে ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে অনেক কষ্টে অল্পপমা কান্না সামলাল। কাতর কণ্ঠে বলল—আমি পারছি না সতীশদা, সজ্জি বড় কষ্ট হচ্ছে। যদি ভাল থাকি একটা নৌকো নিয়ে মাধব-কাকার সঙ্গে যাব। তোমরা এখন যাও—

মাধব প্রতিবেশী—এদের বাড়ী ব গোমস্তা।

অগত্যা তাই ঠিক হ'ল। মাধবকে বলে-কয়ে গিনি রওনা হয়ে গেলেন।

প্রায় দশটা-দুই কেটেছে। অল্পপমা তেমনি শুয়ে। চোখের জল গোর মুখের উপর শুকিয়ে আছে। একটুখানি সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কে-একজন যেন বাহবেষ্টনে তাকে ঘিরে ফেলল। ধড়মড় করে উঠে দেখে, কলকাতার আসামীটি স্বপ্ন এসে হাজির।

অল্পপমা মুখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রভাত ছাড়বার পাত্র নয়, ঘুরে অল্প সামনে গিয়েই—ফেন কত ভয় পেয়ে গেছে—শব্দে আবার পিছিয়ে দাঁড়াল।

রাগ করলেও মানবে না, এই জন্ত লোকটির 'পরে আরও রাগ হয়। হাসলে ত এখন একেবারে পেয়ে বসবে,—অল্প অনেক কষ্টে মুখ গম্ভীর করে রইল।

মুহুর্তে প্রভাত বলল—মাথা ছাড়ল?

—কে বলেছে? তোমার কলকাতায় তারে খবর গেল বুঝি!

—তারে নয়, অস্তরে। তার পর মাধব-কাকার মুখে

সেটা বাঁচাই হয়ে গেল। একটু থেমে অল্প মুখের দিকে চেয়ে অবস্থাটা আন্দাজ করে নিল। বলতে লাগল—দোষ ছাপাখানার—তারা দেবী করে দিল—ডাকে পাঠান গেল না।...না না কৈফিয়ৎ দিচ্ছি না—ওতে দোষ কার্টে না জানি, তাই ত কলেজ পাগিয়ে ট্রেন ধরলাম। আবার মুন্সিল কি রকম!—স্টেশনের ঘাটে নৌকা নেই—এই ছ-মাইল ছুটে ছুটে এসেছি।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলে প্রভাত চুপ করল। ঘাট থেকে হাতমুখ ধুয়েই এসেছে, চেহারা কথাবার্তায় বুঝবার জো নেই যে সে ক্লান্ত। কিন্তু ও মাহুটের ধরণই ঐ রকম। অল্প ব্যস্ত হয়ে উঠল; তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাড়িল, প্রভাত এসে পথ আটকে দাঁড়াল।

—ঐ দেখে নাও তোমার প্রীতি-উপহারের বাঙাল... আর এই কানের ছল। ডেলভেটের কেসটি সে অল্প হাতে দিল। বলল—বাচ্ছ কোথায় গো?...একুনি রওনা হয়ে পড়—বিয়ের আগে পৌঁছে যাবে।

আনন্দে অল্প মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, রাগ-টাগ কোথায় উড়ে গেছে। বলল—যাব—তুমি ব্যস্ত হয়ে না। কোন্ সকালে বেরিয়েছ—তোমার ঠিক ক্ষিমে পেয়েছে—পায় নি?

বাড় নেড়ে প্রভাত বলল—হ্যাঁ, আকর্ষণ ক্ষিমে—তোমা-কেই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে। যেতে দিচ্ছি না—জান ত কথামালায় বলেছে, উপস্থিত ছাড়তে নেই।

মুখ টিপে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। অল্পপমা বলে উঠল—সরো,—ছি-ছি... ঐ হাসছেন ওঁরা দেখে দেখে—

অপ্রতিভ হয়ে প্রভাত চারিদিকে তাকাল।—কই? কারা?

দুই অল্প তত ক্ষণে বরজা অবধি চলে গেছে। দেয়ালের উপর দিকে দেখিয়ে চঞ্চল পায়ে সে বেরিয়ে গেল। দেয়ালে বিভাসাগর ও দেশবন্ধুর ছবি। প্রভাত উদ্দেশে প্রণাম করে হাসিমুখে খাটের উপর বসল।

ক্ষুধার সন্ধে প্রভাত অত্যাঙ্গি করে নি। ভুলোর মা লুচি ভাজছে, অল্প পরিবেশন করতে লাগল। খালীটা একদম নিঃশেষ করে পুরো একটি মাস জল খেয়ে তবে সে

কথা কইল। বলল—কাল চলে যেতে হবে, থাকবার জো নেই—

অল্পপমা ভালমাহুষের মত বলল—খাওয়ার হাঙ্গামা ত থাকল না—ভুলোর মাকে বলে যাব, বিছানা-টিছানা করে দেবে।...অহুবিধে হবে না।

প্রভাত প্রসন্ন করল—বিষেবাড়ী সমস্ত রাত কাটাতে নাকি ?

অল্পপমা বলল—স্বামী ত চোখের পাতা এক করতে দেবে না। তার পর কালকে মাসীমার চিলেকোঠা দখল করব। সেখানে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছি নে।

গভীর হয়ে প্রভাত উঠে পড়ল।

একটু পরে অহু তরী হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রভাত বলল—দেখ, একটা কথা ভাবছি, কাজ যখন হয়েই গেল, রাতে রাতে রঙনা হয়ে পড়ি। অনর্থক কালকের কলেজটা কামাই করে ফল কি ?

অল্পপমা মাথা ছুঁয়ে সায় দিল—তা ঠিক, রবিবারের কলেজ কিছুতে কামাই করা যায় না।

বার দিন ক্ষণ হিসাব করে মাহুষ সব সময় কথা বলে না। কিন্তু প্রভাত ঠকবার ছেলে নয়। একটু উৎসাহে বলল—যায়ই না ত। আমাদের প্র্যাকটিকাল ক্লাস সমস্ত রবিবারে—

অল্পপমা নিরুত্তরে জুতোজোড়া এনে প্রভাতের সামনে রাখল।—তবে এইটা পরতে আজ্ঞা হোক—

—তোমার সঙ্গে যাব নাকি ?

হেসে উঠে অহু বলল—সেটা কি ভাল হবে ? নেমস্তন্ন একলা আমার,—তেমায় ত বলেনি। বিনি-নেমস্তন্ন যোগা—ছিঃ—

প্রভাত মন্তব্য করল—যেতে আমার বয়ে গেছে—

অহু বলল—বাটে সতীশ-দা আমার জন্ত নোকা নিয়ে আছেন ; তোমাকে ঐধান থেকে আর একটা ঠিক করে দেওয়া যাবে। রবিবারের ভয়ানক কলেজ—সে ত কিছুতে কামাই করা যাবে না...

রাগে রাগে প্রভাত জুতো পরল ; নিজের ব্যাগটা নিয়ে এগিয়ে চলল।

এটা সেটা দিয়ে অল্পপমাও একটি মোট বেঁধেছে কম

নয়। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আবদারের হুরে বলল—বা-রে, ওটা ?

প্রভাত বলল—লোকজন কেউ নেই নাকি ?

—কোথায় ? নীলমণিকে বাবা নিয়ে গেছেন। ভুলোর মা মেয়েমাহুষ—সে ত পারবে না। মাধব-কাকাকেই বা বলি কি করে ?

প্রভাত বিরক্ত গলায় বলল—তবে ঘাট থেকে মারিরা এসে নিয়ে যাবে। মুটেগিরি করা আমার ব্যবসা নয়।

অল্পপমা বলে উঠল—সমস্ত রাত ধরে তবে ঐ হোক ? বললে কেন আমার যেতে ? বিয়ে দেখে আমার কাজ নেই, আমি যাব না।

মুখ ভার করে সে স্কিরে দাঁড়াল।

অতএব নিজের ব্যাগ বাঁ-হাতে নিয়ে সেই মোট টেনে তুলতে হ'ল। দস্তরমত ওজন আছে ; কাপড়চোপড়, বালিশ, তোষক, শতরঞ্চি—গোটা সংসারই যেন সঙ্গে চলেছে।

প্রভাত বলল—মতলব কি ? মাসীমাব বাড়ী পাকা-পাকি বসত করবে নাকি ?

অহু অভয় দিল—না, বুধবার নাগাদ চলে আসব। তার বেশী নয়। মাসীমার সঙ্গে সেই রকম কথা। কাজের বাড়ীতে কত মাহুষ-জন এসেছে—কোথায় বিছানা, কোথায় কি,...আমার আবার পরের বিছানায় ঘুম হয় না—তাই শুঁঘিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—

ঘাট খুব কাছেই ; কিন্তু প্রভাতের মনে হ'তে লাগল, কত যুগ চলেছে—পথ আর ফুরায় না। বোকার ভায়ে হাতের কল্লই অবধি ছিঁড়ে পড়ছে। অহু প্রস্তাব করল—আহা, মাথায় কর না কেন। জামাই আছ—আছ ; রাতে কে দেখেছে, কে-ই বা চিনবে—

তা ছাড়া উপায়ও কিছু ছিল না। স্কিরে পাঞ্জাবীর উপর ছুই কাঁধে সে ছ-হাতের বোকা চাপাল। বর্ষাকাল—রাস্তায় জলকাদা ; চিকচিকে জ্যোৎস্না পড়ে কোন্টা জল, কোন্টা মাটি ঠিক করবার জো নেই। জলের উপর পাম্পস্ফ সমেত পা পড়ে, জল কাদা ছিটকে উঠে মুখ চোখ ডাসিয়ে দেয়। অহু ঠাট্টা করে ওঠে—দেখো দেখো—বিছানায় লাগে না কেন। বিষেবাড়ী কত কুচুখ এসেছে তারা বলবে কি।

অনেক দূরে ঘাটে পৌছান গেল। কিন্তু কোথায় নৌকা, কোথায় বা সতীশ-দা! ভাঁটার টানে জল নেমে গেছে, নদীর বুকে অনেক দূর অবধি নোনা কাদা কে-যেন বস্তু করে নিকিয়ে বেখেছে।

অল্প বিবেচনা করে বলল—তা হ'লে ওরা ঠিক বাঁওড়ের মুখে নৌকা বেঁধে আছেন।—

অতএব আবার সেই বাঁওড় অবধি। প্রকাণ্ড এক বটগাছ—মার নদী পর্যন্ত গাছপালা ছড়িয়ে দিয়েছে; ফাঁকে ফাঁকে জোয়ার পড়েছে। দেখা গেল, বয়েছে বটে একখানা ছোট পানসী। প্রভাত ডাকতে লাগল—মাঝি, মাঝি!

কারও সাড়া নেই। বিরক্ত হয়ে সে নেমে পড়ল। নৌকায় পৌঁছে গলুয়েব উপব বোঝা নামিয়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে বীচল। নৌকার দাঁড় বোটে সমস্ত রয়েছে—কিন্তু মানুষ নেই। জিজ্ঞাসা করল—এই নৌকো ত বটে?

অল্প বলল—বা-রে এদুর থেকে বোঝা যায় বুঝি।



বটের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে অল্প নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পড়েছে...

বটের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দুই পা ছড়িয়ে দিব্য নিশ্চিন্ত ভাবে সে বসে পড়েছে। প্রভাত বলল—ওখানে থাকলে চলবে না কি? আসতে হবে না?

—আলতা ধুয়ে যাবে যে।

বাঁধের সঙ্গে-প্রভাত বলল—তবে কি করতে হবে, অল্পমতি হোক?—

বেহায়া অল্প ফস করে ব'লে উঠল,—হাঁগো, তুমি একটু

নিয়ে যাও না? এক ফালি জোয়ার পড়েছে তার মুখে; তরল কণ্ঠে সে বলতে লাগল—অত বড় বোঝা দুটো নিয়ে গেল—আর আবার বেলাতেই পারবে না?

প্রভাতও বোধ করি মনে মনে সেই তুলনা করে দেখল; নিরুত্তরে ফুলে উঠল। তার পর এদিক ওদিক চেয়ে—যেন পালকের তৈরি মানুষ—অল্পকে সে স্বচ্ছন্দে কাঁধের উপর ফেলে আবার কাদায় নেমে গড়ল।

মাঝামাঝি পর্যন্ত বীর বিক্রমে এসে হঠাৎ প্রভাত থমকে দাঁড়াল। 'কেলে দিলাম—'

অল্প ভয়ে জাঁকড়ে ধরল।—না, না, পায়ে পড়ি—আমার কাপড়চোপড় সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে—

—তবে কথা দাও।

—কি?

—রাত্রেই ফিরে চলে আসবে—

অল্প তৎক্ষণাৎ স্বীকার করল—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ বললে শুনি নে। পা ছুঁয়ে দিব্য করে বল, যা হয় একটা কিছু বলে যেমন করে পার চলে আসবে—

এবার অল্প খিল খিল করে হেসে উঠল।—হ্যাঁ গো মশাই, হ্যাঁ। আপনি না বললেও তাই করা হ'ত। পশুগুলো মা'র জিন্দায় ফেলে দিয়ে তফুনি আবাব এই নৌকোতে ফিরে আসব। মশাইকেও তাই টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভেবেছিলাম, আগে কিছু বলব না, তা হবার জো আছে?

নৌকায় উঠে অল্প সতরঞ্চি বিছিয়ে গড়িয়ে পড়ল। হুঁ আঙুলে রগ চেপে ধরে বলল—উহু—হু—ছিড়ে পড়ছে মাথা। ওগো, বসে বসে কি করছ,—একটু টিপে দাও না গো—বলেই আবার হেসে উঠল। আজ যেন তার কি হয়েছে, কেবলই হাসি পাচ্ছে।

প্রভাত হাসল না; চিন্তিত স্বরে বলল,—কিন্তু মাথা ধরা বললে সতীশ-দা ভুলবেন না, অল্প একটা মতলব বের কর। কোথায় সতীশ-দা?

অল্পপমা বলল—বোনের বিয়ে, বাড়ীতে কত কাজকর্ম—
তিনি কি এখানে বসে রয়েছেন ?

—বললে যে, তিনি নৌকো নিয়ে আছেন। এ পানসী
ক'র ভবে ?

অল্পপমা তাকিলের সঙ্গে বলল—জেলের ক'রও
হবে বোধ হয়।

—চমৎকার। কিছু ঠিক নেই এদিকে ত বিছানা-
পতর পেতে ঘরসংসার সাজিয়ে বসেছ। প্রভাত চীৎকার
সুরু করল—মাঝি। মাঝি।

ভাঁটার জলের কল কল শব্দ, পাড়ের উপর ঝিঁঝির
ডাক, বটের পাকা ফল খেতে এসে বাছড় পাখা ঝটপট
করছে...তা ছাড়া কোন দিকে আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

অল্পপমা বলল—জেলপাড়া কি এখানে ? এক ক্রোশ
হু ক্রোশ পথ। সমস্ত রাত চোঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না।
দরকাব কি—এ রাইচরণের নৌকো—সে ভাল লোক, বাবার
প্রজা—কতবার গিয়েছি এই নৌকোয়—ডাকতে হবে
না, তুমি চল।

প্রভাত এবার সত্যি চটে উঠল।—হ্যাঁ, ঐটে বাকি
আছে, মাঝি হ'য়ে নৌকো বেয়ে তোমায় নিয়ে যাই,—লোকে
ধস্ত ধস্ত করবে—

অল্পপমা অমনয়ের হুবে বলল—তা আর কি করবে
বল। উপায় ত নেই। রাত্রে কেউ দেখতে পাবে না।
আড়ালে আবড়ালে লোকে অমন কত কি ক'রে থাকে।
তুমি এত করলে—কলকাতা থেকে ছুটে এলে—আর
মালতীর বিয়ে দেখা হবে না, তাত হয় না।

প্রভাত রাজী নয়।—তোমার মাধব কাকাকে ডাক
গিয়ে। পারেন ত তিনি পৌছে দিন—

অল্প বলল—তুমি জোয়ান যুবো, রোয়িং ক'রে মেডেল
পাও, তুমি বড় দিলে—আর বড়ো মাহুষ মাধব-কাকা
দেবেন পৌছে ? জানি, যাওয়া হবে না—মাথা-ধরার উপর
অনর্থক এই রাত্রে হাঁটাইটি—

নৌকোর গলুয়ে প্রভাত চুপচাপ বসে আছে, ওদিকে
ছইয়ের মধ্যে অল্পপমা শুয়ে পড়েছে কি কি করছে কিছুই

বোঝা যাচ্ছে না। খানিক পরে 'ঝপ্পাস' ক'বে দিল
বোঁঠের এক টান।

চারি দিক জ্যোৎস্নায় ডুবে আছে; হাটখোলায়
দোকানের আলো দেখা যাচ্ছিল, দেখতে দেখতে তাও
পিছনে পড়ে গেল। অল্পপমা বাইরে এসে বসেছে।
প্রভাত বলল—কোথায় খালে ঢুকতে হবে, বলে দিও।
পথ চেন ত সত্যি ?

অল্প বলল—খুব, খুব—এক বাক আগের থেকে ব'লে
দেব। আর বলতেও হবে না—বাজনাই বলে দেবে।
একটুখানি রাখ ত বোঁঠে—

মুহূর্তকাল দু-জনে উৎকর্ষ হয়ে শুনল। অল্পপমা চোখ
বড় বড় ক'রে উজ্জল মুখে বলল—শুনতে পাচ্ছ না ? ঐ যে
বাজনা—শোন—

অনেক দূর থেকে ঢোলের অস্পষ্ট আওয়াজ আসছিল।
অল্প বলল—আর কি ? পৌছে ত গেলাম। খুব মজা
লাগছে কিন্তু—আমার মাথাধরা ছেড়ে গেছে।
আঃ তোমার এই বোঁঠে বাগ্মীর জালায় আমি যাই
কোথায়—

প্রভাত বলল—না বাইলে নৌকো চলবে কেন—

অল্প রাগ ক'রে বলল—চ'লে কাজ নেই। সব তাজে
তুমি ব্যস্তবাগীশ। এত সকাল সকাল বিয়েবাড়ী গিয়ে কি
করব শুনি। আন্তে আন্তে চালাও—

এ প্রস্তাবে প্রভাতেরও খুব মত আছে। আলগোছে
সে বোঁঠে ধরে রইল। পানসীর গতি মন্থর হল।

অল্পপমা বলতে লাগল—এই রকম যদি যেতে থাকি
—কেবলই যেতে থাকি—

প্রভাত বলল—তা ত হবে না। জোয়ার এলে নৌকো
উঠে মুখো ফিরবে—

অল্প জেদ ধরল—খরো, জোয়ার যদি না-ই আসে—

অতএব জোয়ার না আসাই সাব্যস্ত হ'ল। প্রভাত
বলল—তা হ'লে বে অব্ বেঙ্গলে পড়ব—

—তার পর ?

—তার পর সাগরের মাঝখানে। চারি দিকে কালো
জল, জলকিনারা নেই—পাহাড়ের মতো ডেউ...—

—উ, কি চমৎকার ? আহ্লাদে অল্প হাততালি দিয়ে

উঠল।—কেমন নাগরদোলায় মত দোলা যাবে। কি
হৃন্দর।

প্রভাত বলল—হৃন্দর না হওয়াই সম্ভব। পানসী
ভূস করে অথই জলে ডুব দিয়ে বসতে পারে—

—বাঃ বাঃ—তার পর ?

প্রভাত বলতে লাগল—বড় বড় হাউর, কুমীর—

অহু প্রতিবাদ করে উঠল—না, তুমি কিছু জান না—
হাউর-কুমীর না আরও কিছু। কত মণি-মুক্তো-প্রবাল
সেখানে—মস্ত বড় রাজবাড়ী—সোনার পালঙ্ক—

প্রভাত বলল—বাজনা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কিন্তু ; এসে
পড়েছি। তার পর হেসে উঠে বলল—এইবার ঠিক করে
বল অহু, পাতালের রাজবাড়ী সোনার পালঙ্কে শুতে যাবে
না বিয়েবাড়ীর বাসর জাগবে ?...

অহুপমা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—সত্যি, বিয়ে
দেবার লোভ আমার নেই তেমন। তুমি এক কাজ
করবে—

আবার একটু ভেবে নিয়ে বলল—মাসীমাদের ঘাটে
উঠে চট করে পদ্মার কাগজগুলো কারো কাছে দিয়ে এস—
বাবার হাতে যেন পৌঁছে দেয়—ব্যস। তার পর নৌকোর
করে খুব বোরা যাবে।

কৈষ্কিন্তের হুরে বলতে লাগল—মানে, আর কিছু
নয়...ভাবছি, অত ভিড়ের মধ্যে মাথাধরা আবার হয়ত
বেড়ে যাবে।...তুমি হাসছ কেন বল ত ? মিছে কথা বলছি
না কি ?

প্রভাত ঘাড় নেড়ে বলল—হাসি নি ত। কি
সরুনাশ—হাসি কোথায় দেখলে ? ঠিক কথাই ত বলেছ—
নৌকোর বেড়ানো—শিরঃপীড়ার ভাল অষুধ।...কিন্তু পথ
দিতে গিয়ে আমায় যদি ও-বাড়ীর কেউ চিনে ফেলে—
তখন ?

অহু বলল—আর আমিও একলাটি বুঝি নৌকোর
বসে থাকব—যা আমার ভয়...হি-হি-হি—

তার পর বলল—যাচ্ছ কোথায় গো ? ভাইনে বোরাও—
এই যে খাল—

খালের জল নদীতে পড়ছে, উজান ঠেলে নৌকো উঠবে।
অহু ধাঁ করে কোমরে আঁচল জড়িয়ে লগি হাতে উঠে

দাঁড়াল। বলল—একা তোমার ক্ষমতায় কুলোবে না,
নৌকোর মাথা ঘুরিয়ে দাও এইবার—

প্রভাত সকাভরে বলল—ও মুক্তি দেখে আমারই মাথা
ঘুরে পড়বার জোগাড়—নৌকো ঘুরোবো কি। স্থিরো ভব,
অহু লম্বিটি,—

বগীর চাঁদ উচু বাঁধের আড়ালে ঢলে পড়ল। আবছা
আঁধারে চারিদিক রহস্যময় হয়ে উঠেছে। জোয়ারে খালের
জল ফুলের উপর অল্প অল্প আঘাত দিতে শুরু করেছে। হু-
জনে কত গল্প চলেছে—গল্পের শেষ নেই।

মাঝে একবার প্রভাত বলে উঠল—ঠিক যাচ্ছি ত ?

অহু বলল,—হ্যাঁ-হ্যাঁ—ঐ যে বাজনা—

—কিন্তু আঁধার হয়ে পড়ল যে—

অহু বলল—ফেরবার সময় একটা আলো জোগাড় করে
আনতে হবে—

জোয়ারের জল ফেঁপে উঠেছে, চৈচো ও শোলার জঙ্গলের
মধ্যে খালের সীমা মিলিয়ে আসছে। সেই জঙ্গলের দিক
থেকে একটা তালের ডোঙা সন সন করে বেরিয়ে এল।
ডোঙার লোক হাঁক দিল—কারা ?

—বিয়েবাড়ী যাচ্ছি।

কিছু না বলে ডোঙা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রভাত সঙ্কল্প ভাবে বলল—এত সময় ত লাগবার কথা
নয়।

অহুপমা বলল—আর ত এসে গেছি। বিলটা ছাড়িয়ে
সারি সারি তিনটে তাল গাছ—মাসীমাদের ঘাট সেই
খানটার—

চলেছে—চলেছে—তালগাছ আর আসে না। রাত
কত হয়েছে, কে জানে ? অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। প্রভাত
হাত-ঘড়ি দেখবার চেষ্টা করল, নজরে এল না। ক্রান্ত
হয়ে প্রভাত বোটে রেখে দিল।—নিশ্চয় ভুল পথে এসেছি।
কোথায় ঘাট ?—খানবনে এসে পড়ছি যে—

অহুপমা বলল—ঐ যে ঢোল বাজছে—

বিরক্তির হুরে প্রভাত বলল—ঢোল কেবল তোমার
মাসীমার বাড়ী বাজছে—তা ত নয়। আজ বিয়ের দিন—

বিয়ে আরও কত জায়গায় হচ্ছে। তিন চার ঘণ্টা বেয়ে মরছি—বিলের শেষ হয় না, এ কি রকম ?

জুনে অল্প গা ছমছম করে উঠল। শুকনো মুখে বলল—তা হ'লে, গ্রাম বেদিকে সেই মুখো চালাও। কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া যাবে—

অনেক দূরে অস্পষ্ট আলোর রেখা—সেই আলো লক্ষ্য করে প্রভাত প্রাণপণে লগি ঠেলতে লাগল। খালি আর নেই—একগলা ধানবন। তারই মধ্য দিয়ে চলল। আরও খানিক গিয়ে নৌকো নড়ে না। কাদার মধ্যে আটকে গেছে; লগি ব'লে যায়—জোর পাওয়া যায় না।

অল্পপমা বলল—ভাকাতের বিলে এসে পড়িনি ত ?

প্রভাত নামল। একটু একটু জল আছে; জলকাদায় প্রায় কোমর অবধি ডুবে গেল। কুমোর মধ্যে পাট পচছে, দুর্গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে নৌকো টেনে চলেছে—কিন্তু কোথায় গ্রাম, কোথায়ই বা খাল।

দূরে আবার খট খট শব্দ পাওয়া গেল; লগি ঠেলে ডোঙা বা নৌকো নিয়ে কেউ চলেছে। প্রভাত টেঁচিয়ে পথ জিজ্ঞাসা করবে, কিন্তু তার আগেই অল্প খুব ব্যাকুল হয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে টেনে তাকে নৌকোয় তুলে নিল।

—ব্যাপার কি ?

অল্প বললে—চূপ, চূপ। কানের কাছে মুখ দিয়ে বলতে লাগল—ঠিক ভাকাতের বিলে এসে পড়েছি। বড় ভয়ানক জায়গা—মাহুঘ ঘেরে কাদার নীচে পুঁতে রাখে। আমার গায়ে গয়না রয়েছে—

চোখের জল হঠাৎ বর বর করে গড়িয়ে পড়ল। নিশ্চক্ষে দু'জনে পাশাপাশি বসে রইল। ধানবনের মশা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ছে—কিন্তু পাছে শব্দ হয়, নড়াচড়ার জো নেই। মাথার উপর তারা ঝিলঝিল করছে। এক-এক বার জোরে হাওয়া দেয়, ধানগাছ খস খস করে, ...শত সহস্র মাহুঘ ঘন চূপি চূপি কথা ব'লে ওঠে। ভাকাতের বিলের অনেক গল্প অল্প আঁশেব শুনে এসেছে...হাজার হাজার মাহুঘ খুন হয়েছে এখানে—কত শিশু, কত বুড়ো, কত কুলবধু...। নিশুতি রাতে ধানবনের মধ্য দিয়ে ককালগুলো যদি একের পর এক বেরিয়ে আসে—এসে

নৌকো ঘিরে সারবন্দী সব জামাই মেয়ে দেখতে দাঁড়িয়ে যায়। অল্প চোখ বুজে প্রভাতের কোলের উপর মুখ ঢেকে পড়ল।

এরকম ভাবেই বা চলে কতক্ষণ। আশ্বে আশ্বে মাথাটা নামিয়ে আবার প্রভাত নেমে পড়ল। নৌকো অবিশ্রান্ত টেনে চলেছে, রাজির হিমের মধ্যে গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে...মাঝে মাঝে আর ঘন পেরে ওঠে না—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপায়। অনেক ক্ষণ চূপ করে দেখে অল্প আর পারল না—কাতর কণ্ঠে বলল—ওঠো—যা-হয় হোক—নৌকো থাক এখানে—

প্রভাত নাছোড়বান্দা; মাথা নেড়ে বলল—আর একটু—অল্প বলল—জোর নাকি ? তুমি উঠবে কিনা বলো—প্রভাতের হাত টানতে গিয়ে নিজেই নেমে পড়ল।

প্রভাত রাগ করে বলল—শরীর খারাপ তার উপর জল বসানো ঠিক হচ্ছে কি ?

—নৌকো-বাওয়া মাঝি, ভাস্করীর তুমি জান কি ?

ব'লেই অল্প খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসি তার একটা রোগ,—যত দুঃখ হোক, না হেসে সে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না।

প্রভাত বলল—জল বাড়ছে, তুমি ওঠো—এইবার খাল পেয়ে যাব বোধ হয়—

খালই বটে। অনেক কষ্টের পর ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। ভরা জোয়ারে ফুল ছাপিয়ে বিলের অনেক দূর অবধি জল এসেছে। হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে দু-জনে গা হাঁট পা ধুয়ে নৌকোয় উঠল। প্রভাত লগি ধরে খালের ফুলে ফুলে উজান বেয়ে চলল। তার পর নদীতে এসে পড়ল।

নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল—রক্ষে পাওয়া গেল। যে ভয় তুমি দেখিয়েছিলে।

অল্প বলল—উঃ, আমরা কত এগিয়ে এসে পড়েছি। এমন মাহুঘ তুমি, গল্প করতে গেলে আর জ্ঞান থাকে না—

প্রভাত বলল—আর গল্প করছি না, তুমি নজর রেখো। ফিরতি পথে চলেছি—বাড়ী ছেড়ে আবার এগিয়ে না পড়ি—

অল্পপমা বলল—সে রকম আনাড়ী নই ? এক বাঁক আগের থেকে বলে দেবো—দেখো।

সেখানটায় নদী বড় সর, ছ-পারের গাছপালা বুঁকে পড়ে ভয়ানক আঁধার করেছে। ক্লান্ত প্রভাত চূপচাপ বোঁটে ধরে বসে আছে, স্রোতের টানে নৌকো আপনি চলছে। ওপারের দিক থেকে হঠাৎ কর্কশ কণ্ঠের আওয়াজ এল— নৌকো নিয়ে গেল কোন্‌ স্রুশ্ণি গো? দেখ ত কি জালা।

আর একজন বলল—আজকাল বড় উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। একটা বিহিত হওয়া দরকার—

—বিহিত আজই হবে। যাবে কোথায়? উড়ে যেতে পারবে না ত। দেখতে গেলে দাঁড়ের ঘায়ে মাথা দুঁকাঁক করে দেবো। চল দিকি—

পাড়ের কাছে জঙ্গল, প্রভাত লগির ধাক্কা দিয়ে প্রাণপণ বলে নৌকোর মাথা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। অল্প বলল— উ হু—কেমন—আমার হাত ছড়ে গেছে—

প্রভাত বলল—কোন্‌ নৌকোর কথা বলছে, আমাদের এটা নয়ত?

—কি জানি।

বিরক্ত কণ্ঠে প্রভাত বলল—বেশ লোক ভুমি! এই যে বলছিলে, এ তোমাদের প্রজার নৌকা—



...হারিকেন উঁচু করে দেখছে...

আবার একটা ধাক্কা দিয়ে প্রভাত নৌকোর আর খানিকটা কেমন-ঝাড়ের নীচে ঢুকিয়ে দিল। অল্প শিউরে উঠল—কেমনে সাঁপ থাকে—

প্রভাত বলল—সাপের বিষের চিকিৎসা আছে, মাথা দুঁকাঁক হলে আর জোড়া দেওয়া যাবে না। ঐ ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছে—

বপু বপু করে তিন-চারটা দাঁড় ফেলে খুব জোবে একখানা নৌকো আসছে—কাছে এসে পড়ল—একেবারে হাত দুই তিনের মধ্যে। প্রভাত বলল—চূপ, চূপ!— ওদের নিখাস পড়ছে কিনা সম্ভব। হঠাৎ বিপুল বেগে দাঁড় এসে লাগল এ-নৌকোর গারে—অল্পম! যেখানে বসে আছে, প্রায় সেই জায়গাটায়।

বাবা গো—অল্প আর্দ্রাদ করে উঠল। এমন কাঁপছে, বুঝি বা জলেই পড়ে যায়।

কি? কি? কারা?

অপর নৌকো দাঁড় থামিয়েছে। হারিকেন উঁচু করে দেখছে—আলোয় প্রথমটা চোখে ধাঁধা লাগে—তার পর দেখা গেল, যাক মাথা দুঁকাঁক করার মাছ—সতীশ-দাদা।

অল্প বলল—সতীশ-দা, আমি—আমি—

ছইয়ের মধ্যে থেকে অল্প মা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।

—খুঁকী নাকি? ঘাটে কি কবিস? তিনি অবাক হয়ে গেছেন, বলতে লাগলেন—একলাটি প'ড়ে আছিস—বব ঘরে ঢুকতেই তাই তাড়াতাড়ি সতীশকে নিয়ে চলে এলাম।... তোরা বুঝি এখন রওনা হচ্ছিস? মাধব কোথায়? ও মাধব।

অল্প বলল—মাধব-কাকা নেই—

সতীশ বলল—তবে কার সঙ্গে যাচ্ছ? কার নৌকো? মাঝি কোথায়? নৌকোর মাঝি অগত্যা বোঁটে রেখে এসে দর্শন দিলেন।

—বাবাজী?

সতীশের দিকে তাকিয়ে প্রভাত আমত-আমতা করে বলতে লাগল—কি করা যায়, বলুন। মাথাধরায় ছটফট করছিল—বলল, জলো হাওয়ায় নৌকায় গিয়ে বসব।

সতীশ উদ্ভিগ্ন স্ববে জিজ্ঞাসা করল—এখন আছে কেমন? —সেয়েছে। কি রকম কাদার প্রলেপ লাগিয়েছে দেখছেন না, ও বড় ভাল ঝুঁধ—

অল্পমার দামী শাড়ীতে চুলের উপর কপালে নোনাকাদার অপরূপ ত্রী খুলেছে। আঁধারে এতক্ষণ নজরে আসে নি। সেদিকে তাবিয় মুহূ হেসে প্রভাত মুখ ফিরিয়ে নিল।

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

শ্রীকিরণবালা সেন

ওরা কার্তিক, হেমন্তের শুরুসন্ধ্যা। আশ্রমের হিমঝুরী গাছগুলিতে থাকে-থাকে ফুলের বরণ। নেমেছে। গাছগুলির তলাও সাদা ফুলে ছেয়ে আছে। এই সন্ধ্যায়, গুরুদেবকে প্রণাম করতে তাঁর গাছপালাঘেরা মাটির ঘরের দিকে ধ্রুংলাম। ঘরে গিয়ে দেখি, ঘরখানি আলোতে উজ্জ্বল আর তার মধ্যে বসে আছেন শুভ হৃদয়ের তাপসমূর্ত্তি। তাঁর চোখদুটিতে ফুটে আছে শিশুর মত সরলতা আর একটা ব্যাকুল ভাব। এ ব্যাকুলতা কিসের? সামনে একখানি মোটা বই খোলা রয়েছে। পড়ছিলেন মনে হ'ল। এখন হোটে একটা টেবিলের সামনে, চেয়ারে সোজা হয়ে বসে, অধ্যাপক প্রভাত গুপ্ত ও অধ্যাপক শৈলজা বাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। পড়ায় ঠর যে কি প্রীতি সেই কথা বলছিলেন, অথচ এখন সময় পান না এই দুঃখ। এখন বুঝলাম এই ব্যাকুলতা প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণার। শ্রোতের ধারার মত কথা চলছিল, তাই আমিও বসে পড়লাম সেইখানে।

বই পড়তে চিরকালই কি আনন্দ পেয়েছেন সেই কথা বলছিলেন। সকল রকম বিষয়েরই বই পড়বার একান্ত আগ্রহ ছিল। কবি তিনি, কিন্তু শুধু সাহিত্য পড়েই যে ঠর পিপাসা মেটে তা নয়। বিজ্ঞানও খুব পড়েন। কঠিন নীরস বিষয় আমবা যাকে ব'লে থাকি, তাতেও তাঁর কৌতূহল কম নয়। কবি হ'লেও তিনি ন'না বিষয়েই রীতিমত অভিজ্ঞ। পৃথিবীতে যত রকম চিন্তার খাবা প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত চল এসেছে, কোনটাতে বঞ্চিত হ'তে তাঁর ইচ্ছা নেই। ভার পর সেই সব চিন্তার সঙ্গে তাঁর চিন্তাও মিলিত হয়।

পড়বার এত আকাঙ্ক্ষা ছিল, অথচ প্রথম বয়সে এমন সময়ও গিয়েছে যে এই পড়া ঠকে কষ্ট ক'রে পড়তে হয়েছিল। ইচ্ছাহুয়ারী বই কিনে পড়বার মত অর্থের সচ্ছলতা তখন ছিল না। তাই হৃদয় এক প্রস্থ বই কিনতেন, পড়া হ'লে

সেই বই বিক্রী ক'রে সেই অর্থ দিয়ে আবার অল্প বই কিনে পড়তেন।

পড়ার আনন্দের কথা বলছিলেন, এক সময়ে তিনি বোটে নিৰ্জ্জনে থাকতেন। সারাদিন বিস্তর কাজ থাকত, সময় পেতেন না, রাত্রে আবার পোকার উপজব ছিল। তাই বোটের কামরা-জোড়া একটা মস্ত মশারি ছিল। সন্ধ্যার পরে সেই মশারিটা ফেলে তাব মধ্যে আলো জ্বলে রাত ছপূর অবধি পড়তেন। কোন কোন দিন ছপূর রাতও পার হয়ে যেত।

এখনও পড়বার প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, পড়তে আনন্দও খুব পান, কিন্তু সময় কোথায়? এখন কাজের বোঝা কত! তার সঙ্গে নানা জটিলতার বন্ধন, নানাকণ দায়িত্ব চারদিকে। তাই এক এক সময় ঠর মনে হয়, আর একবার যদি অতীতের সেই দায়মুক্ত আনন্দের দিনগুলির মধ্যে ফিরে যেতে পারতেন। অবকাশ-সময়ও তবে পূর্ণ ক'রে নিতে পারতেন, নিরালায় চুপ ক'রে বসে থেকে। এই জন্মই এক এক সময় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

এই কথা প্রসঙ্গে অতীতের স্মৃতি ভেসে উঠল তাঁর মনে। ব'লে যেতে লাগলেন, বোটে এক সময়ে কি রকম নিৰ্জ্জনে ছিলেন। এমন একলা কি ক'রে দিনের পর দিন তিনি কাটিয়েছেন, তাবলে অবাক হই। থাকতেন নিৰ্জ্জনে পদ্মার চরে, বোটে। কোন লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না। এমন হ'ত যে, দিনে একটি কথা বলবারও কারণ ঘটত না। গান তো একা গাওয়া চলে, তাও গাইতেন না। তাঁর সঙ্গে একজন বুড়ো মাঝি আর একজন অল্পচর থাকত। অল্পচরটির নাম ছিল ফটিক। সেও কথা কইত না, তার নাম সার্থক ক'রে ফটিকের মতই নীরব থাকত, শুধু সময়মত প্রয়োজনীয় জিনিষটি সামনে দিয়ে যেত। প্রয়োজনেরও কোন বাহুল্য ছিল না। সমস্ত দিনে শুধু

এক বাটি ডালের সূপ খেতেন। সকালে খানিকটা হেঁটে বেড়াতে, যখন ফিরতেন তখন সূপের বাটি কটিক ওঁর সামনে দিয়ে ধেত। তিনি খেয়ে কাজ আরম্ভ করতেন। সারাদিন আর কিছু খেতেন না। তাঁর খাওয়া ছিল সন্ধ্যার সময়। তাতেও কোন রাজসিকতা বা বাহ্যিক থাকত না। শরীর তখন তাঁর খুব ভাল ছিল। শক্তি ছিল অসাধারণ, শরীরে তখন সবই স্ফূর্ত হ'ত। খুব ভাল সাঁতাব জানতেন। ওনেছি সাঁতরে পদ্মাও পার হতেন। পদ্মার এই নির্জনবাসের সময়টি ছিল সাধনার যুগ। ওঁকে খুব খাটতে হ'ত তখন। সমস্ত দিন লিখতে হ'ত। গল্পের পর গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, কত লিখতেন। সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখতে হ'ত। লেখা বেছে নিতে হ'ত। এত কাজ, কিন্তু ক্লান্তি ছিল না কিছুতে। মনে ছিল সে-সময়ে অসাধারণ বল, নিজের শক্তির উপর এতটুকু অবিশ্বাস ছিল না। সব করতে পারেন; মানুষের যোগ্য কোন কাজ না-করবার মত আছে, এমন মনেই হ'ত না। “সব কিছু পারি” এমন একটা ভাব ছিল। “নির্ব্বরের স্বপ্নভঙ্গ” যদিও এই সময়ের অনেক পূর্বে লেখা তবু তার কয়েকটি লাইন এখানে মনে হয়।

একটি লাইন—

“এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোব।”
পরের কয়েকটি লাইন—

“যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যত কাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ভূবতে পারি।”

তাই বলছিলেন, এত যে লিখতেন, তাতে একটুও বেগ পেতে হ'ত না, অতি অনায়াসে লিখে যেতেন। পত্রিকায় গল্প চাই, তাগিদ আসত। তখনই লিখতে বসতেন। লেখা হু, হু করে এগোতে থাকত। গল্প লেখা তখন কোন কঠিন ব্যাপার বলে মনে হ'ত না, বরং লিখতে আনন্দ বোধ করতেন। “সাধনা”র সম্পাদক ছিলেন তখন, কিন্তু শুধু সম্পাদকের কাজ করেই তখন রেহাই পেতেন না। পুরো কাগজই তখন এক রকম তাঁকে চালাতে হ'ত।

“সাধনা”র লেখা পড়তে আমাদের এত ভাল লাগে কেন বুঝি। “সাধনা”র বিষয়গুলি আর তার সহজ সরল প্রকাশের ধরণ, সব মিলে পড়তে ভাল লাগে। ঐ সময়ের

ওঁর নিজের লেখা আর ওঁরই বাছাই করা লেখকদের লেখায় পত্রিকা ভরা; তাই এত সুন্দর হয়েছে।

দিনের পর দিন, কত কাল এই রকম নির্জনে কাটিয়েছেন, কিন্তু এ-জন্ম কোন অভাব বোধ করেন নি। ক্রমাগত লিখেছেন, রচনা করেছেন, পড়েছেন আর অবসর-সময়ে চুপ করে বসে উপলব্ধি গভীর আনন্দে ডুবে গিয়েছেন।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখার বিরাম ছিল না; যুঁহুচোখে চেয়ে দেখেছেন প্রকৃতির সৌন্দর্য, আর অন্তর দিয়ে অল্পভব করেছেন পাশের সব গ্রামের সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ।

গ্রামের জীবনযাত্রা, নিস্তব্ধ হুপুরে গ্রামের শান্ত কাজের ধারা, সকাল-সন্ধ্যার রূপ, ঘাটের কত বিচিত্র রূপ, এ সবই তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। নদীর চর, ধানের ক্ষেত, নদীর সুন্দর পারের ঘন বনশ্রেণীর অস্তরালে গ্রামের অস্পষ্ট ছবি, চারি দিকের এই অসংখ্য রূপ ওঁর চোখ এড়ায় নি। এই সব দেখার আনন্দ অল্পভবের অভিজ্ঞতা ওঁর লেখায় কত দেখতে পাই। কত সুন্দর করে নদীর কথা কত গল্পে, কত প্রবন্ধে, কত কবিতায় লিখেছেন। নানা ঋতুতে পদ্মার রূপের কত বর্ণনা তাঁর লেখায় দেখি। সে-সব যখন পড়ি, মনে হয় যেন সেই ছবি চোখের সামনে দেখছি। “নিশীথে” গল্পটিতে হেমন্তের সন্ধ্যার আর রাত্রির জ্যোৎস্নাপ্লাবিত চরের কি সুন্দর বর্ণনা। ওঁর “ছিন্নপত্র” বইখানি পড়লে নদীর আর তার দুই তীরের অশেষ সৌন্দর্যের রস পেতে আর কিছু বাকি থাকে না।

“গল্পগুচ্ছের” গল্পে গ্রামের অতি সাধারণ ঘরের কথা যখন পড়ি, আশ্চর্য্য হয়ে যাই। কি করে তিনি এদের কথা এমন ভাবে জানলেন। বাইরের থেকে দেখতে গেলে তাঁর পক্ষে এটা কঠিন বলেই মনে হয়। কিন্তু তাঁর হৃদয় কতখানি এই সব প্রাকৃতজ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, তাই ভাবি।

তিনি কতদিন এরূপ নির্জনে বোটে ছিলেন আর বছরের কোন কোন ঋতু পদ্মায় কাটিয়েছেন, জানতে ইচ্ছা হয়। অবশ্য, ওঁর লেখাতেই সেটা অনেকখানি অল্পমান হয়। ওঁর “পদ্মা” কবিতাটিতে দুটি লাইনে আছে,

“নিভূতে শবতে প্রীয়ে শীতে বরষায়
কতবার দেখা শুনা তোমায় আমার।”

সমস্ত দিন কাঠ করতেন কিন্তু সন্ধ্যার পর আর লিখতেন না। কোন দিন ঐ সময়ে পড়তেন। কোন কোন দিন আবার সন্ধ্যায় বোর্টার ছাদে গিয়ে চেয়ারে বসতেন। তখন চারি দিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসত। শরীরেব উপর দিয়ে ধীরে ধীরে হাওয়া বয়ে যেত। নীচে জলের শব্দ, উপরে সারা আকাশ ভরে যেত তারায়। তিনি তার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যেতেন। তাঁর “ছিন্ন পত্রে” এক জায়গায় লিখেছেন—

“যখন সন্ধ্যাবেলা লোটোব উপর চূপ ক’বে বসে থাকি তখন আমার সর্বদা এক সমস্ত মনেব উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী একটা বৃহৎ উদার যাক্যহীন স্পর্শ অম্লভব করি। কী শান্তি কী স্নেহ। কী মহত্ব। কী অসীম করুণাপূর্ণ বিবাদ; এই লোকনিলয় শতক্ষেত্র থেকে ওই নির্জ্বল নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয় বাশিতে আকাশ কানায় কানায় পবিপূর্ণ হয়ে ওঠে; আমি তার মধ্যে অবগাহন ক’বে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি।”

এই রকম ছাদে বসে থেকে কোন দিন বা ঘুমিয়ে পড়তেন। জেগে দেখতেন দুটো কি আড়াইটে বেজেছে, তখন নেমে গিয়ে শুয়ে পড়তেন। একদিন নির্জ্বল অপরাহ্নে তিনি বিছানায় পড়ে ‘মানস স্মারী’ কবিতাটি লিখেছিলেন। সেদিনের কথা বললেন। যখন বলছিলেন তখন তাঁর চোখে এমন একটি স্বতিনয়ন ভাব ফুটে উঠল যে মনে হচ্ছিল সেই দিনটির ছবি বর্তমানের মত আজ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, “বেশ মনে আছে ‘মানসী’ কবিতাটি লিখছি, লেখা যখন শেষ হ’ল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল পদ্মার উপর। সন্ধ্যাতারাটি উঠল কালো জলে তার জলন্ত কিরণরেখা বিছ ক’রে। ওপারে গ্রামের কুটারে জলে উঠল সন্ধ্যার প্রদীপ।”

অনেক রাতে বিছানায় গিয়ে শুতেন। সেই ঘুম ভাঙত, পাশের খোলা জানালা দিয়ে দেখতেন শুকতারাটি জল জল করছে। ঐদিকে তাকিয়ে মন আনন্দে ভরে যেত। মনে হ’ত, যে-দিনটি আজ ঠিক সামনে উদয়াগত হচ্ছে, সেটি স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, নির্মল—দিনটি ওর সার্থক হবে। এই নির্মল উদায় নিঃক্ষেপেও অমল শুভ্র একটি তরুণ তাপসের মত মনে হ’ত। তখনকার এক কবিতায় তরুণ তাপসের এক মুষ্টি দেখতে পাই। তার ক’টি লাইন মনে পড়েছে—

“সেদিন নদীর নিকবে অরুণ
অঁকিল প্রথম সোনার লেখা
মানব লাগিয়া তরুণ তাপস
নদীতীরে ধীরে দিলেন লেখা।”

এই কবিতাটি সব পড়লে নির্মল উদার অপক্লপ একটি স্পর্শ পাওয়া যায়।

এক সময়ে তাঁর বেশ ছিল কাপড়ের উপর খালি গায়ে একখানি চাদর আর পায়ে চটিজুতা। এই বেশে তিনি সর্বত্রই ঘুরে বেড়াতেন, কোন কুঠা ছিল না।

সেই সময়ে ভোরবেলা উঠে এক মুঠো বেলফুল তুলে তাঁর চাদরের কোণায় বেঁধে নিতেন। অল্প গন্ধদ্রব্য বা সেট কিছু ব্যবহার করতেন না। বললেন, সেই এক যুগ গেছে। তার পর পর্কের পর পর্ক কত এল গেল। সাহিত্যেরও যেমন এক এক পর্ক এক এক ধারায় চলেছে, জীবনের স্বখ-দুঃখেরও তাই—পর্কের পর পর্ক নানা ধারায় চলেছে।

ক্রমশঃ তিনি এসে পড়লেন জনতার মধ্যে। তার পর এপর্যন্ত কত লোকের কত রকম দাবী মিটিয়ে আসতে হয়েছে, এখনও তার অবসান হয় নি। কত দায়িত্ব, কত জটিলতা তাও বলেছেন, এ-সকলেরও প্রয়োজন ছিল জীবনে।

সেদিন যতটা বলেছিলেন তাতে আরও লিখবার ছিল। যোগ্য লোক যারা সেখানে ছিলেন তাঁরা সেটা লিখেছেন। যতটুকু আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে ও আমার ক্ষমতায় ফুলিয়েছে তাই আমি লিখলাম। কবির স্বখ-দুঃখকে অন্তরালে রেখে তাঁর সৃষ্টি অপূর্ণ সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে বিকশিত হয়েছে। বিশ্বের লোক আজ তাই মুগ্ধ। এখন তাঁরই লেখা একটি কবিতার কয়েকটি লাইন দিয়ে শেষ করি,

“তবু সে সবার উর্দ্ধে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য্য-কমল
আনন্দের স্বর্য্য পানে। তার কোনো ঠাঁই
দুঃখ দৈন্ত্য হৃদ্বিনের কোনো চিহ্ন নাই।”

রেশমী স্মৃতি

শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

৫

গ্রামের পথ যেখানে ঢালু হয়ে মাঠের বুকে মিশেছে, তারই দু-পাশে ভিজে বালির মঠ তৈরি করত অর্ধ-উলঙ্গ রাখালের দল; পল্লীৰ জীবন্ত দারিদ্র্যের কয়েকটি নয় মূর্তি।

আঁচল-ভরা পদ্মের মুণাল আর গলায়-জড়ানো সাপলার গোছা ছুলিয়ে সোনা রোজ দুপুরে সেই পথে বাড়ী ফিরত তার বাপের সঙ্গে। সোনার বাবা প্রতাপের জীবিকা ছিল মাছ-ধবা। ভোরে উঠে কোমরে খালুইটি বেঁধে, জালখানি ঘাড়ে নিয়ে প্রতাপ কাজে যেত; আর সোনা প্রতিদিন দুপুরে রান্না সেয়ে তাকে ডেকে আনত বিল থেকে। একটি দিনের জন্তও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ত না। সোনার মা নেই; তাই প্রতাপ তাকে পালন করেছে বাপ ও মায়ের সবটুকু দাবী সমানে মিটিয়ে।

লোকে বলে—বাপের কাছে মানুষ হয়েছে ব'লে সোনা মেয়েদের মত চলতে শেখে নি। পনের বছরের মেয়ে, তবু এতটুকু লজ্জা নেই। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে এখনও সে চাঁদ-হোয়া-ছুঁয়ি খেলা করে; গাছে উঠে কালঝিল্লা দেয়, ছোট্টাছুটি, লাফালাফি—আরও কত কি।

লজ্জা হয়ত সোনার সত্যি নেই। পাহাড়ী ঝরগার মত গতি তার অবাধ উম্মুক্ত। তবে মাঝে মাঝে সে-গতি স্তব্ধ হয়,—লজ্জায় নয়, কিসের অভাবে। তখন আব সোনাকে খেলাধুলোর জিসীনানায় পাওয়া যায় না। গ্রামের পুবে, নদীর বঁকে যেখানে হুইয়ে-পড়া মাদার গাছটির ভালপালাগুলি জলের বুকে আঁচড় কেটে ঝিবু ঝিবু ক'রে দোলে, সেইখানে ব'সে সোনা আনমনে ভাবে তার মায়ের কথা। ওই ওপারে, বাঁশবনের উত্তরে—খেজুর গাছটার বাঁয়ে তার মা আঙনের বিছানায় শুয়েছে। সা—ত বছর আগেকার কথা, তবুও সোনার বেশ মনে আছে।

নাওয়া-খাওয়া সব ভুলে সোনা সকাল থেকে দুপুর অবধি তেমনি উদাস মনে ব'সে থাকে নদীর ধারে। হয়ত

আচম্বিতে তার চমক ভাঙে, যখন ললিত পিছন থেকে ডাক দিয়ে ওঠে—সোনা,—সোনামণি।

লম্বা ঘাড়টি ফিরিয়ে সোনা মুখ তুলে চায়। ললিত হাত-তালি দিয়ে এগিয়ে আসে; গুন্‌গুন্‌ হুয়ে বলে—‘সোনামণি লক্ষ্মী আমার ঘিরে এস ঘর। রাঙা চেলি পরিয়ে দেব, আনব রাঙা বর।’

সোনার বিষন্ন মুখ হঠাৎ একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ললিত তিরস্কারের সঙ্গে বলে—‘খোৎ’। ললিত হাসে।

সে'না চোখ রাঙিয়ে বলবার চেষ্টা করে—‘ভাল হবে না বলছি ললতে। কাদা দেব গায়ে।’

সোনার লজ্জা নেই। কিন্তু লজ্জাহীন যে কৌপীনধারীর দল সেদিন বালি নিয়ে খেলা করত পথের পাশে ব'সে, আজ তারা কাপড় পরে। সোনাই তাদের সম্মুখ শিখিয়েছে। শুধু তাই নয়, সোনার মন জোগাবার নেশায় তারা আজ সভ্য হবার চেষ্টা করে পরস্পরকে ডিঙিয়ে।

ললিত এখনও মাখালি-মাখায় গরু নিয়ে যায় মাঠে; কিন্তু ভিজে বালির মঠ তৈরি করে না। চাতুর দীঘির বাগানে বুড়ো বটগাছটার ডালে ব'সে বাঁশী বাজায়।

সোনা যখন বাপকে ডেকে নিয়ে বিল থেকে ফিরে আসে, ললিত নিবিষ্ট মনে বাঁশীতে ছুঁ দেয়—‘আজ বেন সখি হ'ল এত বেলা, জলকে যাবি নে ?’

বেশ লাগে। জনবিরল মাঠের পথে চলতে সোনা মাঝে মাঝে থমুকে দাঁড়ায়; এক মনে বাঁশী শোনে।

ললিত যেন সোনার সেই সময়টুকু মুখস্থ ক'রে রাখে। কোন কোন দিন বাঁশীটি পথে ফেলে রেখে সে আড়ালে লুকিয়ে থাকে। বাঁশের বাঁশী; এক দিকে খানিকটা পিতলের সরু তার জড়ানো, অল্প দিকে রেশমী স্মৃতিব খোপনা-বাঁধা কালট। সোনা দেখেই চিনতে পারে। পায়ের আঙুল

জড়িয়ে নিমেষে সে ঠাণ্ডাটি কুড়িয়ে নেয়। দেখে ললিতের হাসি পায়, বুকের ভিতর কেমন একটা আনন্দের ছোঁয়া লাগে। কিন্তু ভয়ে সে চূপ ক'রে থাকে। ইচ্ছা হয়—চীৎকার ক'রে ওঠে, ছুটে গিয়ে সোনার হাত থেকে বাঁশীটি নিয়ে আবার একটা নতুন গান বাজিয়ে তাকে শোনাও; কিন্তু পারে না। সোনার মেজাজ তার বেশ জানা আছে।

প্রতাপ গরীব হ'লেও পাড়ায় তার প্রতিপত্তি কম ছিল না। আর সোনার দুরন্তপনা অপ্রতিহতভাবে বেড়ে উঠেছিল শুধু প্রতাপের সেই খাতিরের স্বযোগ নিয়ে। প্রতাপের মেয়ে, তার ওপর মাতৃহীন; তাই প্রতিবেশীরা সোনার দোষত্রুটি সম্বন্ধে এসেছে। কিন্তু এবার যেন সোনা ক্রমেই তাদের মনে অশান্তির ছায়াপাত করতে লাগল।

শেষ পর্য্যন্ত প্রতিবেশীরা উত্বেগ হয়ে উঠল আপন আপন ছেলে নিয়ে। গরীবের ছেলে; এতকাল ছোট একখানি কাপড় আর লাল গামছাখানি নিয়ে তারা সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু সোনা পছন্দ করে না, এই মন্তব্যখন তাদের পরিচ্ছদের কোঠা পর্য্যন্ত পৌঁছল, তখন মা-বাপ চঞ্চল না হ'য়ে পারলে না।

ললিতের বাপ নেই। বিধবা মা ছোট তাই বোনের ভরণপাষণ সে-ই করে রাখালী ক'রে। কিন্তু এখন সেই সামান্য আয়ে তার সল না। আগের মত ললিত ময়লা ছোট কাপড় প'রে গামছা ঘাড়ে বেরতে লজ্জা পায়। একটা গেঞ্জি ও পরিষ্কার একখানা কাপড় তার চাই-ই। নইলে সোনা বলে—‘নোংরা,—অসভ্য।’

ললিত ভাবতে পারে না সোনার আক্কেশ শুধু তার উপর কেন? বিজ্ঞ, বলাই, কেনারাম—এদের ত সোনা কোন কথা বলে না। মাঝে মাঝে মনে হয় সোনা হয়ত তাকে দেখতে পাবে না। ভাবতে ললিতের দুঃখ হয়।

ললিতের কিন্তু সোনাকে খুব ভাল লাগে। সোনা বেশ। যেমন তার গায়ের রং, তেমনি বড় বড় ছোটো গোখ। সোনার অগোচরে সে কত দিন দেখেছে—মেয়েদের আগে আগে সোনা চলে কলসীটি কাঁখে নিয়ে। হাত-ভরা রেশমী-হুড়ি চপল গতির তালে তালে কনুঠন শব্দে

গায়ে গায়ে টলে পড়ে। কলসীর জল ছলকে পড়ে মস্তণ বাহর উপর।

সোনা ও ললিত হয়ত তখনও আপন আপন মনের অবস্থা বুঝতে পারে নি। কিন্তু প্রতিবেশীরা বুঝেছিল অনেকখানি। কেনাবামের পিসি সৌদামিনী আর সঙ্ক করতে পারলে না। স্নানের ঘাটে একদিন বৌ-ঝি সবারই সামনে সৌদামিনী সোনাকে নানান কথা শুনিয়ে দিলে। ‘এত বড় দ্বিজী মেয়ে সে, তবুও লজ্জাসরম নেই। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে অত ভাব, ললিতের সঙ্গে অমন মাথা-মাথি; কে না বোঝে? ও মেয়ে যদি উচ্ছন্ন না যায়, তোরা খুন্সি পুড়িয়ে আমার পিঠে দাগ দিস।’

সোনা দুরন্ত ছিল, কিন্তু মুখরা ছিল না। সৌদামিনীর কথায় তাব আপাদমস্তক জলে উঠল; কিন্তু কোন উত্তর না দিয়ে সে স্নান সেবে গম্ভীর মুখে উঠে গেল।

প্রতাপ তখনও বিল থেকে ফেরে নি। জলেব কলসীটা নামিয়ে রেখে সোনা ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল; বুক জুড়ে জেগে উঠলো মায়ের অভাব। সোনা বোধ হয় জীবনে সেই প্রথম ভাবল নিজের কথা। অসহায় জীবনের সব দুঃখ সজীব হয়ে উঠল চোখের জলে। মা থাকলে কখনই এমন কথা সৌদামিনী-পিসি বলতে পারত না।

সোনা ভাবতে পারে না—কি অজ্ঞায় সে করেছে। ছেলেবেলা থেকে ওদের সঙ্গে সে খেলা করে। ললিত তার চেয়ে মাত্র চার বছরের বড়। ললিতের মা সোনাকে কত ভালবাসে। ওপাড়ার হারু পণ্ডিত যখন পাঠশালা করেছিল, তখন ললিত রোজ তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেত পাঠশালায়। ইচ্ছল থেকে ফেরবার সময় ললিতের মা তাকে কিছু না খাইয়ে ছাড়ত না।

ছেলেবেলার কত কথা সোনার মনে ছবির মত ভেসে ওঠে। ললিতের বাপ যখন মরে, তখন ললিত তৃতীয় মানে পড়ে। হারু পণ্ডিত অনেক ক'রে বুঝিয়েছিল যে, পড়া ছেড়ে দিলে ললিতের বোকামি হবে। কিন্তু উপায় কি? অতবড় সংসারটাব ভার পড়ল পনের বছরের ললিতের ওপর। ললিত ন-কড়ি চাটুজ্যের বাড়ীতে তিন টাকা মাইনের রাখালী নিলে। সোনা তখনও পাঠশালায় যায়।

পাঠশালা ছাড়তে ললিতের কম দুঃখ হয় নি, কিন্তু মুখ

ফুটে সে কোন কথা বলে নি, পাছে তার মায়ের মনে কষ্ট হয়।
ঐটুকু বয়সেই ললিত সংসারের দুখ-কষ্টের বোঝা মাথায়
নিয়ে চাকরি করতে লাগল। মনের কথা সে একমাত্র
সোনার কাছে খুলে বলেছিল।

চণ্ডীতলার মাঠে ললিত যখন গরু চরাতে যেত, রোজ
আঁচল ভরে সে বনকুল আনত সোনার জন্তে, সোনা বনকুল
ভালবাসে। পাকা পাকা ফুলগুলি বেছে, ধনে পাতা, ছন আর
কাঁচা লক্ষা দিয়ে তারা ফুলহুলু মাখত। এক এক দিন লক্ষার
ঝালে সোনার মুখচোখ যখন লাল হয়ে উঠত, ললিত ব্যস্ত
হয়ে হাঁড়ি কলসী খুঁজে বেড়াতে একটু পাটালির জন্তে। দুপুর-
বেলায় গরুগুলি বাধান দিয়ে ললিত জমির আলো আলো ধান
ফুড়িয়ে বা জমা করত, তাই দিয়ে রোজ সে সোনার জন্তে
তিলে খাজা, গুড়-ছোলা, বেগুনী—কত কি নিয়ে আসত।

ভাবতে সোনার বুকের ভিতরটা ঘোচড় দিয়ে ওঠে। এই
ত সেদিনও তার বাপের অস্থখে ললিত কত করেছে।
ঝড়ঝুপ্টা মানামানি ছিল না; বেলায় অবেলায় সে কতবার
হাঁটাইটি করেছে শঙ্করপুরের গোবিন্দ ভাস্করের বাড়ী।
সেদিন ত সৌদামিনী-পিসিরা দেখতে আসে নি।

দুপুর গড়িয়ে যায়। প্রতাপ মাছ ধরে বাড়ী ফিরল; সঙ্গে
আজ সোনা নেই। ললিতের বাঁশী কেঁদে কেঁদে থেমে গেল।
বটগাছের ছায়ায় গরুগুলি দাঁড় কবিয়ে রাখালেরা পাঁচনি
দিয়ে ছলাছলি খেলা করে; ললিত আনমনে দূরে দাঁড়িয়ে
ভাবে—হয়ত সোনার কথা। আজ সকালেও সে সোনাকে
দেখেছে ছখলমির শাক তুলতে, অথচ প্রতাপ বাড়ী
ফিরল একা। এত দিনের বাঁধা-ধরা নিয়ম হঠাৎ আজ
উল্টে গেল। ললিত কারণ খুঁজে পায় না।

ঘাটের কথাটা ঘাটেই শেষ হয় নি, পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে
পড়ল অনেক দূর। প্রতাপ সন্ধ্যার পর হুকো-হাতে যখন
মতি বাগদীব পরচালায় এসে বসল, তখন সৌদামিনী সেই
কথাই বিনিয়ে বিনিয়ে বলছিল গিরি-বৌকে। প্রতাপকে
দেখে তার উৎসাহ বাড়ল ছাড়া কমল না।

গরু বাছুর বেঁধে, গোয়ালে ধোঁয়ার জাগাল দিয়ে ললিত
আজকাল যায় হরিনারাণের কাছে কবিগান শিখতে।
হরিনারাণ বলেছে—‘ছেলেটির যেমন বুদ্ধি আর গলায়

আওয়াজ, তাতে ক’রে বেশ বোঝা যায় যে, কালে সে এক জন
মস্ত কবিগুণালা হবে।’ কথাটা নিজের কানে শুনে অবধি
ললিতের বুকখানা ভবিষ্যতের স্বপ্নগৌরবে ভরে উঠেছে।
যত বার সে ভেবেছে, তত বারই তার মনে হয়েছে সোনার
কথা। সোনা যদি একথা হরিনারাণের মুখ থেকে শুনত
তা হ’লে খুব বিশ্বাস হ’ত তার। অনেক বার ভেবেছে
সোনাকে বলবে, কিন্তু পারে না। কেমন লজ্জা করে।

গানের আখড়ায় যাওয়ার পথে ললিত সোনাদের বাড়ী
হয়ে গেল। সারাদিনের মধ্যে সেই সকালে একবার সে
সোনাকে দেখেছে। দুপুর থেকে মনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা
লাগে।

সোনা তখন উনানে ভাত বসিয়ে তালের শুকনো
মোচাগুলো টুকরো করো ক’রে ভেঙে জাল দিচ্ছিল।
ফুলদীতে কেরোসিনের ডিবেটি মিটমিট ক’রে জ্বলছে।
সোনাব পায়ের কাছে দই-মুখী বিড়ালীটা পেটের ভিতর
পা গুটিয়ে শুয়ে আছে। ললিত একদৃষ্টে চেয়ে বইল।
বড়লোকদের মেয়ের চেয়ে সোনা কি কম রূপসী।

ললিত একটু ইতস্ততঃ ক’রে ডাকলে—সোনা।

সোনা উত্তর দিল না। তেমনি আনমনে বসে উনানে
জাল দিতে লাগল।

‘তোমার কি কোন অস্থখ ক’রেছে সোনা?’—বলে
ললিত একটু এগিয়ে দাঁড়াল।

সোনার বাড়টা যেন আরও হুইয়ে পড়ল। ললিতের
মুখপানে না চেয়ে সোনা এক নিঃশ্বাসে বললে—‘ললিত-দা,
তোমার কি কোন দরকাব আছে? দরকার থাকে ত
বাবা যখন থাকবে, তখন এস। বাড়ীতে কোন পুরুষ-
মানুষ নেই; বাত ক’রে কেন বেড়াতে এলে তুমি?’ বুকের
ভিতর যেন তার নিঃশ্বাসগুলো অসম্ভব রকম দ্রুত হয়ে
উঠল।

ললিত হতভম্ব হয়ে গেল। সোনার সামনে দাঁড়িয়ে
তার কথাগুলো স্পষ্ট শুনেও যেন বিশ্বাস হ’ল না। এও কি
সম্ভব? না-না; নিশ্চয়ই সোনা ছটুঁমি ক’রে আজ তাকে
শাস্তি দেবার জন্তে একথা বলছে। ললিত নির্বাক দাঁড়িয়ে
রইল।

এবার সোনা মুখ তুলে ললিতের পানে চেয়ে বললে,

‘দাড়িয়ে রইলে যে এখনও ? যাও—বাড়ী যাও,—’ সোনার গলা যেন বন্ধ হ’য়ে আসে।

ললিত আর কোন কথা না ব’লে ধীরে ধীরে দাওয়া থেকে নেমে গেল। সাঁঝের অন্ধকার তখন গাঢ় হয়ে এসেছে।

পাথরের পুতুলের মত সোনা তেমনি নিশ্চল ব’সে রইল। তার চোখ দুটো হয়ত তখন জলে ডুবে উঠেছে। ললিত উঠান পাব হয়ে আর একবার সোনার দিকে ফিরে চাইলে। অন্ধকারে সোনার কপাল ও চুলগুলোর ওপর আগুনের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

পাড়ার লোকেব তাগিদে প্রতাপ সজাগ হয়ে উঠল—সোনার বিয়ে আর না দিলে নয়। আগে আগেও সে দু-এক বার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সোনাই বাধা দিয়েছিল, বাবাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না ব’লে। মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ে তার দিতেই হবে; বিশেষতঃ তাদের সমাজে এত বড় আইবুড়ো মেয়ে ঘরে রাখতে কেউ সাহস পায় না। প্রতাপকে দশ জন ভালবাসে, তাই তাব মুখ চেয়ে এত দিন কেউ কোন কথা বলে নি। কিন্তু এমন কি ক’রে আর কত দিন চলে ?

সেদিন সোনা বলেছিল—বাপ ছেড়ে সে কোথাও থাকতে পারবে না; আর আজ প্রতাপ নিজেই ভাবে—সোনাকে ছেড়ে সে বাঁচবে কেমন ক’বে ? সোনার মা যখন তার কোলে ঐ একরকমি মেয়েটি দিয়ে চলে গেল, প্রতাপ চোখের জল মুছেছিল তার জীবনের সম্বল ঐ মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে। প্রতাপ আর বিয়ে করে নি। জীবনের আট-দশটি বছর কেটে গেল শুধু সোনার সঙ্গে পুতুলখেলা ক’রে। কত নিশুতি রাতে প্রতাপের চোখে ঘুম ছিল না; সোনাকে বুকে ক’রে সে পথে পথে ঘুরেছে।

ললিত আর সোনাদের বাড়ী আসে না। সারাটি দিন থাকে মাঠে; সকাল আর সন্ধ্যায় কবিগান অভ্যাস করে। এক বছরের ভিতর ললিত হবিনারাণের এক জন প্রধান সংক্বেদ হয়ে উঠেছে। ওস্তাদজী ছাত্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে অকুণ্ঠ মনে তাঁর শিকার ঝুলি নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছেন ললিতের অঙ্কলিতে। জয়নগরের বাজারে সেদিন কবিগান গেয়ে ললিত খুব নাম কিনেছে। ললিতের কথা নিয়ে গাঁয়ে

যে গর্ক-আলোচনা শুরু হয়েছে, তা সোনার অগোচর নেই।

অনেক হাঁটাইটির পর প্রতাপ সোনার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছে পলাশজাঙ্গার নিমাই মোড়লের ছেলের সঙ্গে। ছেলেটি ভাল; কলকাতায় কোন ছাতার কারখানায় কাজ করে। গ্রামে নিমাই মোড়লের বেশ খ্যাতির আছে। বোশেখের মাঝামাঝি কাজটা মিটিয়ে ফেলতে পারলে প্রতাপ সোমাস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। কিন্তু যত দিন যায়, সোনা যেন ততই মন-মরা হয়ে আসে। প্রতাপ অনেক চেষ্টা কবেছে সোনার মনের কথা জানবার জন্তে; সোনা কিছুই প্রকাশ করে না।

আগে সোনা পথে-ঘাটে প্রায়ই ললিতের দেখা পেত; কিন্তু এই একটি মাস সে একদিনের জন্তও ললিতকে আর দেখে নি। ললিত এখন রাখালী ছেড়ে কবিগানের দল করেছে। সোনা ভাবে—সে এমন কি গুরুতর দোষ করেছে, বা ললিত মাপ করতে পারে না! ললিতকে যেদিন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, সেদিন যে সোনা নিজে কত বড় আঘাত সহ করেছে, তা ললিত ভাবতেও পারে না।

চৈত্রের শেষ। শিবের গাজন; সোনা সারাদিন উপোসী আছে। সেই শেষরাত্রে শিবের মাথায় দুধ-গঙ্গাজল দিয়ে তার পর একটু প্রসাদ মুখে দেবে। কাল ছিল সংঘম আর মাস-ভক্তদের জাগরণের রাত। চন্দনপুরের বড়ো শিবতলায় ললিতের কবিগানের বায়না ছিল। মস্তবড় আসর; বিখ্যাত কবিওয়াল জব্বারির সঙ্গে ললিতের পান্টাপান্টি গান হয়েছে; ললিতের স্থানম রাতারাতি ছড়িয়ে পড়েছে তলাটময়। জব্বারির মত অত বড় কবিওয়ালার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাত্র বিশ বছরের ছেলে ঐ ললিত সারারাত্রি সমানে গান চালিয়েছে।

রাত্রি তখন এক প্রহরের বেশী নয়। চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের কত লোক জমা হয়েছে। পাড়ার ছেলেরা কোলাহল ক’রে চারি দিকে ছোট্টাছুটি করে। অতদিন এতক্ষণে সাবা গ্রাম নিশুতি হয়ে আসে; কিন্তু আজ আর শিশুর চোখেও ঘুম নেই। মাঝরাতে শ্রাণ-ভৈরব আসবে; কাঁটা-ভাড়া, আগুন খেলা, তার পর হবে ভক্তদের ধূপবাণ নাচ।



ছই বোন
শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সোনা পূজা দিয়ে বাড়ি ফিরছে, পথে কেনারামের সঙ্গে দেখা। কেনারাম এখন ললিতের দলে দোহারি করে। চন্দনপুরের মেলা থেকে তারা গান গেয়ে ফিরছিল। ওদের দেখে সোনা পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল।

আজ ত সেখানে গান হবার কথা; তবে ওরা বাড়ী এল কেন? হঠাৎ একথা মনে হ'তেই সোনার বুকের ভিতরটা যেন কেমন পাক খেয়ে গেল। উপবাস-ক্লিষ্ট স্বরে যথাসাধ্য জোর দিয়ে সোনা ডাকলে—কেনারাম—

কেনারাম থমকে দাঁড়াল। একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে—কে, সোনা?

—হ্যাঁ। তোমাদের যে আজ চন্দনপুরে গান হবার কথা ছিল।

—হবে না। বিকেল থেকে ললিতের ওলাওটা হয়েছে। তার মাকে নিতে এসেছি।

সোনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত অবশ হয়ে এল।

নৈবেদ্যের থালা হাত থেকে ঝনঝন ক'রে গড়িয়ে পড়ল। আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

কেনারামের হাতখানা ধ'রে বিহবল ভাবে সোনা জিজ্ঞেস করলে—বাঁচবে ত কেনারাম?

—সে বুড়ো শিবের দয়া বোন।

—আমি যাব কেনারাম। আমায় নিয়ে চল—

সোনা পথের মাঝখানে পঙ্কর মত ব'সে পড়ল। মনে হ'ল পৃথিবীটা যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে টলমল করে; এখনই প্রলয় হবে।

কেনারাম সোনার মাথায় হাতখানা রেখে বললে—তুই যাব সেই চন্দনপুর? লোকে কি বলবে সোনা?

—লোকের বলায় আমার কি যায় আসে কেনারাম? সোনার সংজ্ঞা হয়ত লুপ্ত হ'য়ে আসছিল। চোখের সামনে অম্পষ্ট হয়ে ভাসে সেই বাঁশের বাঁশী আর রেশমী হাতোর ঝালর।

স্মৃতি

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার ভৌমিক

অন্তহীন বিশাল আকাশে,
দৃষ্টি মোর খোঁজে কার ভাষা।
তব্রা লাগে যুহুল বাতাসে,
ভেসে আসে কার ভালবাসা ॥

মেঘে ভাসে কার হাতছানি,
ডাকে মোরে কোন্ দূর দেশে।
ব্যথা জাগে কাঁপে বুকখানি,
কাঁদে আশা নিফল প্রয়াসে ॥

মর্মভাঙা স্বপনের রেখা,
কেলে-আসা দিবসের স্মৃতি।
বার বার পিছু ফিরে দেখা,
তাই দিয়ে মালা মোর গাঁথি ॥

বিশ্বস্তির তলে ডুবে যাই,
সত্তা মোর হারায় চেতন,
স্বথ হুঃ অহুভূতি নাই,
তুমি আস মৃত্যুর মতন ॥

সংসার

হুতোম-প্যাচার লুকোচুরি

প্যাচা একটি সর্বজনপরিচিত নিশাচর পাখী। দিনের বেলায় কদাচিৎ ইহাদিগকে বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়। কাক, চিল, শকুনি প্রভৃতি পাখীদিগকে যেরূপ দলে দলে যেখানে-সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় ইহাদের সংখ্যা সেরূপ বেশী নহে; মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে দুই চারিটি দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। একে সংখ্যায় কম, তাহাতে রাত্রিবেলায় চরিয়া বেড়ায় বলিয়া ইহারা খুব কম লোকেরই নজরে পড়িয়া থাকে। তথাপি বালক-বৃদ্ধ সকলের নিকটেই প্যাচা বিশেষ পরিচিত। দেখিবামাত্রই প্যাচা বলিয়া চিনিয়া লইতে কাহারও অস্ববিধা হয় না, অত্যাশ্চর্য্য পাখীর মত

এমনভাবে সজ্জিত যে, মনে হয় যেন নাকের মত উঁচু হইয়া আছে; তাহার একটু নীচে হইতেই ঈষৎ বক্র ঠোঁটটি খাড়াভাবে নীচের দিকে চলিয়া গিয়াছে, ঠোঁটের অধিকাংশই প্রায় পালকে ঢাকা থাকে। হুতোম-প্যাচাদের মাথার দুই দিকে বিভালের কানের মত খাড়া খাড়া দুইটি পালকের কান আছে, এই কান দুইটিকে ইচ্ছামত শোয়াইয়া রাখিতে বা খাড়া করিতে পারে; প্যাচার শরীরের তুলনায় চোখ দুইটি এত বড় যে সহজেই ইহাদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু অতবড় চোখ সত্ত্বেও ইহাদের দৃষ্টি প্রায়ই সম্মুখের দিকে নিবদ্ধ থাকে। দিনের আলো মোটেই পছন্দ করে না, প্রায়ই চোখ বুজিয়া থাকে। রাত্রির হইলেও ইহারা



লতাপাতার ঝোপে বসিয়া হুতোম-প্যাচা
অন্ধনির্মীলিত নেত্রে নিদ্রা যাইতেছে

চিনিবার জ্ঞাত বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। ইহার প্রধান কারণ—ইহাদের অদ্ভুত চেহারা। সাধারণ পক্ষিশ্রেণীভুক্ত হইলেও ইহাদের মুখাবয়ব অত্যাশ্চর্য্য পাখী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মুখখানা গোলাকার—চেপ্টা থালার মত, মধ্যস্থলে শিকারী বিভালের চোখের মত দুইটি বড় বড় গোলাকার চোখ। উভয় চোখের মধ্যস্থিত পালকগুলি



হুতোম-প্যাচা শিকারের আশায় বসিয়া আছে

দিনের বেলায় যে কোন জিনিষ দেখিতে পায় না তাহা নহে, তবে অনেকটা কম দেখে বলিয়াই মনে হয়।

প্যাচা রাত্রির পাখী হইলেও দিবাচর শিকারী পাখীর সঙ্গে ইহাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাধারণতঃ



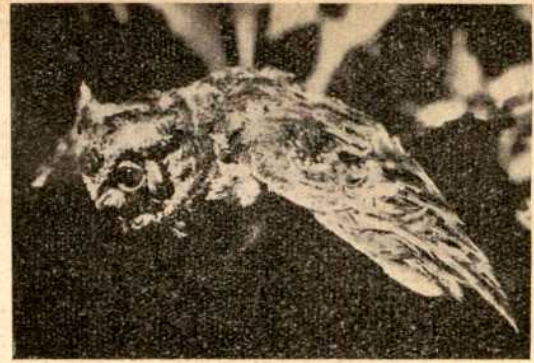
হুতোম-প্যাচা ঝোপের মধ্যে বসিয়া প্রসাধনে রত

হুই জাতীয় প্যাচা দেখিতে পাওয়া যায়, এক রকম কুনো-প্যাচা, আর এক রকম শিং-বা লম্বা কান-ওয়ালা বুনো-প্যাচা। কুনো-প্যাচার বৈজ্ঞানিক নাম Strigidae, আর বুনো-প্যাচার নাম Bubonidae। এই দুই জাতীয় প্যাচার মধ্যে প্রায় দুই শতেরও অধিক বিভিন্ন শ্রেণীর প্যাচা দেখিতে পাওয়া যায়। কুনো-প্যাচার বৈশীর্ভাগই ঘরের কোণে, পুরান বাড়ীর ফাটলে, নিখুঁত গুদাম বা গোলাঘরে বাস করিয়া থাকে। বুনো-প্যাচা অপেক্ষা আকারে ইহারা অনেক ছোট হইয়া থাকে। শিং-ওয়ালা বুনো প্যাচার সাধারণতঃ বড় বড় গাছের কোটরে, তক্তাবশেষ পাখীর পালক, হাড়গোড়ের সহিত সামান্য খড়কুটা সংগ্রহ করিয়া বাসা নির্মাণ করিয়া থাকে। শীতপ্রধান মেরুপ্রদেশ হইতে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই প্যাচা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ৬৭ ইঞ্চি হইতে প্রায় দুই ফুট লম্বা হইয়া থাকে। অধিকাংশ প্যাচার গায়ের রংই ঈষৎ সাদা ও ধূসর রঙের মিশ্রণ। এতদ্ব্যতীত ধূসর, বাদামী, হলুদে, সোনালী ও সাদা রঙের প্যাচারও অভাব নাই। ইহাদের পাখি নখ পর্যন্ত পালকে ঢাকা থাকে। প্রত্যেক পায়ে চারটি করিয়া বাঁকানো শক্ত নখ আছে। নখগুলি এত তীক্ষ্ণ ও জোবালো যে, কোন জিনিস একবার আঁকড়াইয়া ধরিলে অক্ষত অবস্থায় ছাড়িয়া আনা হুদর। নখ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ইহারা যে-কোন শত্রুকে সহজেই কাবু করিয়া ফেলিতে পারে। ইহারা পাখী, ইঁদুর, ব্যাং, মাছ ও নানাবিধ পোকামাকড় খাইয়া থাকে। পায়ের নখ দিয়াই শিকার ধরে এবং বাসায় আনিয়া নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া খাইবার আগে, ঠোঁট ব্যবহার করে না, নখ দিয়াই ঠোঁটের কাজ হইয়া থাকে। ঠোঁটও ভয়ানক

লতাপাতার মধ্যে বসিয়া প্যাচা নিদ্রা ঘাইতেছে

ধারালো এবং শক্ত। সাপ যেমন ফণা ধরিয়া হেলিয়া ছলিয়া থাকিয়া থাকিয়া ছোবল মারে, ইহারাও সেইরূপ থাকিয়া থাকিয়া অদ্ভুত এক প্রকার হিস্ হিস্ শব্দ করিতে করিতে শিকারকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া খাইয়া থাকে। প্যাচার বাসার কাছে প্রায়ই ভুক্ত প্রাণীর হাড়গোড় শুপাকার হইয়া জমিয়া থাকে। অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর শুপাকার হাড়গোড় দেখিয়া সেই স্থানে প্যাচার বাসস্থানের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। ইহাদের বাসানির্মাণে কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেকে আবার অল্প পাখীর পরিত্যক্ত বাসাতেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। কোন কোন জাতের প্যাচা আবার মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া অথবা অগ্নির পরিত্যক্ত গর্তে বাস করিয়া থাকে। ইহারা তিন-চার হইতে সাত-আটটা পর্যন্ত ডিম পাড়িয়া থাকে। সাধারণতঃ একসঙ্গে সবগুলি ডিম পাড়ে না। অনিয়মিতভাবে মাঝে মাঝে ডিম পাড়িয়া থাকে। কাজেই অনেক সময়ই দেখিতে পাওয়া যায়—বাসায় বাচ্চা থাকা সত্ত্বেও তাহাদের পাশে আরও কয়েকটি ডিম রহিয়াছে। বাচ্চার আহাৰ বোঁগান ও ডিমে তা দেওয়া একসঙ্গেই চলিতে থাকে। এই জগৎ স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সর্বদা ডিম ও বাচ্চা লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। সময়ে সময়ে দেখা যায় স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া একসঙ্গেই ডিমে তা দিতেছে।

প্যাচা ইঁদুরের ভয়ানক শত্রু। যেখানে প্যাচা বাসা বাঁচে তাহার আশেপাশে নেটি ইঁদুর প্রভৃতির উৎপাত খুবই কম হইয়া থাকে। বাসায় বাচ্চা থাকিলে প্রতি দশ-পনের মিনিট অন্তর



শিকার ধরিবার জন্য ছতোম-প্যাচা উড়িয়া আসিতেছে

ছতোম-প্যাচা ডানা মেলিয়া আততায়ীকে ভয় দেখাইতেছে

এক-একটা শিকার ধরিয়া বাসায় লইয়া আসে, হৃৎযান্ত্রের পর অন্ধকার হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ছতোম-প্যাচার বাসা ছাড়িয়া বাহির হয় এবং কোন উঁচু ডালে বসিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া গুরুগম্ভীর আওয়াজে ডাকিয়া থাকে, তাহার পর শিকারাদেয়ণে বাহির হয়। অন্ধ-নিমজ্জিত ভাসমান মংশ্রকেও ইহার ছোঁ মারিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। দুইটি প্যাচা একত্র হইলেই অনেক সময় ঝগড়াঝাঁটি করিয়া অতি কর্কশ কণ্ঠে ক্যাচম্যাচ শব্দ করিয়া থাকে। আততায়ীকে ভয় দেখাইবার সময় ঠোঁট দিয়া খট্ খট্ করিয়া এক প্রকার শব্দ করিয়া থাকে, কখন কখন বা উহাদিগকে ঘড়ঘড় শব্দ করিতে শোনা যায়। রাত্রির প্রহরে প্রহরে দুইটি প্যাচা একসঙ্গে কিচিরমিচির করিয়া ডাকিয়া ওঠে। কখন কখন বা বিভালের মত মিউ মিউ করিয়া ডাকে। ইহাদের ডানার পালক অত্যন্ত কোমল; ধূসর রঙের উপর কালো বা বাদামী দাগকাটা। শিকারী পাখীদের নিঃশব্দে উড়িয়া বেড়াইবার প্রয়োজন নতুবা একটুতেই শিকার ভড়কাইয়া যাইতে পারে। পালক কোমল বলিয়া প্যাচাদের উড়িবার সময় মোটেই শব্দ হয় না। ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে ঈগল-প্যাচা নামে প্রায় দুই ফুট লম্বা এক প্রকার ছতোম-প্যাচা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নিঃশব্দে উড়িয়া গিয়া বড় বড় খরগোস হরিণ-শিশু, ছাগল-ছানা প্রভৃতি ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়। উত্তরমেরুসন্নিহিত প্রদেশসমূহের তুষারাবৃত স্থানে এক প্রকার বড় বড় সাদা প্যাচা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মস্তকে বিভালের কানের মত খাড়া খাড়া পালক নাই, ইহারাও বড় বড় জন্তর বাচ্চা প্রভৃতি শিকার করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুই-তিন রকমের প্যাচা দেখিতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট প্যাচাদের মধ্যে ধূসর রঙের প্যাচার সংখ্যাই বেশী। সাদা প্যাচাগুলিকে মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। ছতোম-প্যাচার আকারে প্রায় দেড় ফুটেরও অধিক বড় হইয়া থাকে। আমাদের দেশে সাদা প্যাচাকে লক্ষ্মীপ্যাচাও বলিয়া থাকে। হিন্দুদের বিশ্বাস—প্যাচা লক্ষ্মীদেবীর বাহন। যেখানে সাদা প্যাচা বসে বা বাস করে, সেখানেই লক্ষ্মীদেবী আনাগোনা করিয়া থাকেন—ইহাই সাধারণের

ধারণা। কালো অথবা ধূসর রঙের ছোট ও বড় ছতোম-প্যাচাকে কাল-প্যাচা বা নিম-প্যাচা বলে। কাল-পুরুষকে লোকে যমরাজ বলিয়া জানে। ছতোম-প্যাচা ও কাকেরা নাকি যমের দূত। কাকেরা দিনের বেলায় ও প্যাচার রাত্রিবেলায় দৌতাকাঁচা চালাইয়া থাকে। এই জন্ত ছতোম প্যাচা সম্বন্ধে সাধারণের মনে একটা ভীতিপূর্ণ ধারণা আছে। বিশেষতঃ ইহার সময়ে সময়ে বিভালের মত মিউ মিউ বা নিম্ নিম্ শব্দে ডাকিয়া থাকে। এই নিম্ নিম্ শব্দের অর্থই নাকি কাহাকেও যমপুরীতে লইয়া যাইবার পূর্বসূচক। আমাদের দেশীয় ছোট প্যাচাদিগকে জ্যোৎস্নারাজিতে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ছতোম-প্যাচার প্রায়ই লোকের নজরে পড়িয়া থাকে। পাড়াগাঁয়ের অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে বা বনে জঙ্গলে বড় বড় গাছের উপর হৃৎযান্ত্রের কিছুক্ষণ পরেই এই ছতোম-প্যাচাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্বাঞ্চলের লোকেরা ইহাদিগকে ভুতুম বলিয়া থাকে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে রোজই তাহার প্রত্যেকে এক একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে “বুবুম বুম্” করিয়া ডাকিতে থাকে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই ডাক প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া চলিতে থাকে। এই ডাক কর্কশ নহে এবং বহুদূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে চতুর্দিকে আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছে, পাখীরা বাসায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে; চারিদিকেই যেন একটা গম্ভীর ভাব—এই অবস্থার সঙ্গে ছতোম-প্যাচার ডাকের গাম্ভীর্যের যেন পরিষ্কার একটা সঙ্গতি অনুভূত হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—ছতোম-প্যাচা ‘মগরেবের’ নামাজের ‘আজান’ দেয়। এই তথাকথিত ‘আজান’ দিবার সময় ছতোম-প্যাচাকে পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ডাকিবার সময় ঠোঁটের নীচে হইতে গলা ও গাল দুইটা মস্তবড় একটা বলের মত উঁচু হইয়া ফুলিয়া ওঠে। তখন দেখিতে আরও ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে। ভাঁটার মত বড় বড় দুইটা গোলাকার চোখ আর কান দুইটা তখন বিভালের কানের মত খাড়া হইয়া ওঠে। শরীরের বাকী অংশ দেখিতে না পাওয়া গেলে হঠাৎ একটা বড় রকমের বিভালের মুখ বলিয়াই ধারণা জন্মে। মুখের চেহারায় ডাকে এবং ইহর-শিকারে বিভালের সঙ্গে যেন অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, গাছের তলায় বা নির্জন স্থানে সঞ্চিত পাখীর পালক বা ছোট ছোট প্রাণীর স্তূপাকার হাড়গোড় দেখিয়া সেই স্থানে প্যাচার বাসার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এমনই ইহাদের গায়ের ডোরা-কাটা রং এবং নিঃশব্দে লুকায়িত ভাবে অবস্থান করিবার ক্ষমতা যে অতি নিকটে গেলেও সহজে ইহাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। আশেপাশের ডালপালার সঙ্গে এমন ভাবে মিলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে যে, অতি সহজেই লোকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটয়া থাকে। দিনের আলো ইহারা মোটেই সহ্য করিতে পারে না; চোখের পাতা বুজিয়া নিদ্রা গিয়া থাকে। শত্রুর আনাগোনা টের পাইলে ডাব্‌ডাবে চোখ মেলিয়া কানের পালক খাড়া করিয়া মাপের মত অদ্ভুত ধরণে হেলিয়া ছলিয়া এদিক-ওদিক নজর করিয়া দেখে। পূর্বেই বলিয়াছি, চোখ বড় হইলেও ইহাদের নজর প্রায়ই সম্মুখের দিকে আবদ্ধ থাকে। এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলে সহজে ইহাদের নজর পড়ে না। আবার পাশের দিকে ঘাড় ফিরাইল ত সেই দিকেই হেলিয়া ছলিয়া একদৃষ্টে শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করে। সেই সময় ইহাদের মুখভঙ্গী দেখিতে সত্যি অদ্ভুত। শত্রু অতি নিকটে আসিয়া পড়িলে ঠিক মাপের মত ফোঁস ফোঁস করিয়া ঠোঁট দিয়া খট খট করিতে থাকে। বেগতিক দেখিলে উড়িয়া গিয়া ঝোপঝাড়ের ভিতর

আত্মগোপন করিয়া থাকে। চোখের সামনে উড়িয়া গিয়া অল্প স্থানে বসিলেও গায়ের ধূসর ও কালো রঙের ডোরার জন্ত ডালপালার সঙ্গে যেন একত্র মিশিয়া যায়। লুকোচুরির এইরূপ অবস্থা কৌশল জানা থাকিলেও ইহাদের ডাব্‌ডাবে চোখ ও অদ্ভুত ফোঁস ফোঁস শব্দে শত্রুর কাছে ধরা পড়িয়া যায়। তবে তীক্ষ্ণ নখ ও ধারালো ঠোঁটের কামড়ে ভয়ে সহজে কেহ ইহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারে না। একবার ঠোঁট দিয়া কামড়াইয়া ধরিলে আর ছাড়ে না। কাক প্যাচার ভয়ানক শত্রু। একবার কোন রকমে দেখিলেই হয়। দলে দলে জুটিয়া পিছু তাড়া করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে গায়ের রং মিলাইয়া লুকোচুরি করিতে পারে বলিয়াই, খোলা বাসায় অবস্থান করিলেও সন্ধানী কাকেরা পর্য্যন্ত ইহাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারে না। তবে একবার কোন রকমে সন্দেহ হইলেই চাঁৎকার করিয়া অল্প সকলকে ডাকিয়া আনে। চাঁৎকারে ভয় পাইয়া প্যাচাও চোখ বুজাইয়া কান খাড়া করিয়া ফোঁস ফোঁস করিতে থাকে। তখন সকলে মিলিয়া ইহাকে ঠোকরাইয়া বাসা হইতে বাহির করিয়া আনে। পাখী ধরিবার জন্য প্যাচার কোটরে হাত ঢুকাইয়া ফোঁস ফোঁস শব্দে ও ঠোঁটের কামড়ে রক্তপাতের ফলে, সর্পাঘাত হইয়াছে মনে করিয়া, সময়ে সময়ে আতঙ্কে অনেকে গাছ হইতে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

[এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত চিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত]



জননী

শ্রীমধীররঞ্জন খাস্তগীর

বোড়াল গ্রামে সেন-রাজার প্রাচীন কীর্তি

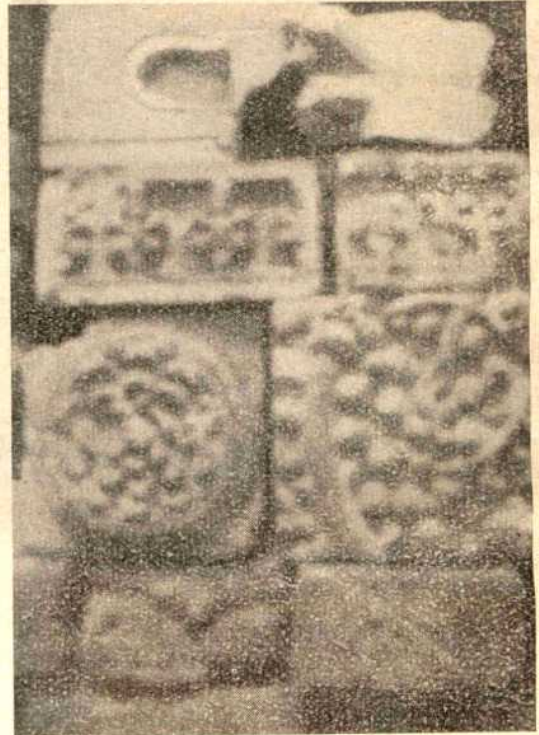
শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র

জেলা ২৪-পরগণার অন্তর্গত বোড়াল গ্রাম টালিগঞ্জ হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রাম। কালীঘাটতটবাহিনী আদিগঙ্গা এককালে এই গ্রামের প্রান্তভাগে প্রবাহিতা ছিলেন। পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পর্তুগীজ ব্যবসায়িগণের বাণিজ্যতরী গমনাগমনের সুবিধার জ্ঞাত এক জন ধনাঢ্য মোগল খিদিরপুর হইতে রাজগঞ্জ পর্য্যন্ত একটি খাল

সকল স্থানে গঙ্গার বিস্তৃত খাদরেখা পড়িয়া আছে ও মধ্যে মধ্যে ভগ্নাবশিষ্ট বড় বড় বাঁধাঘাট ও পতনোন্মুখ মন্দিরাদি অতীত কীর্তির সাক্ষ্য দিতেছে। প্রাচীন পর্তুগীজ মানচিত্রে গঙ্গার এই বিস্তৃত অঞ্চলে অবস্থিত বোড়াল ও অন্ত্যান্ত প্রসিদ্ধ গ্রামসমূহের উল্লেখ আছে। সর্ব যত্নাথ সরকার মহাশয় যাহাকে “ভারতে জাতীয়তার পিতামহ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ৩রাজনারায়ণ বহু মহাশয় এই



ক্রিপসুন্দরী দেবীর বর্তমান মন্দির



সাত শত বৎসর পূর্বেরকার সেন-রাজার আমলের ইট

কাটাঁইয়া আদিগঙ্গাকে সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত করাইয়া দেন। ফলে খিদিরপুর হইতে জয়নগর-মজিলপুর পর্য্যন্ত আদিগঙ্গার স্রোত ক্রমে রুদ্ধ হইয়া যায়। বর্তমানে ঐ

বোড়াল গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহার বালাজীবন এই স্থানেই যাপিত হয়। এই স্বনামধন্য মহাপুরুষের

বাস্তুভিটার ধ্বংসপ্রায় দৃশ্য আজিও
এই গ্রাম ব্যথিত হৃদয়ে বহন করিতেছে।

স্বর্গীয় বহু মহাশয় তাঁহার “গ্রাম্য
উপাখ্যান” নামক পুস্তকে বোড়াল
গ্রামের আদ্যোপান্ত ইতিহাস এবং
গন্ধার উল্লিখিত প্রাচীন বিবরণসমূহ
বর্ণন করিয়াছেন। তিনি আরও
লিখিয়াছেন, ‘কায়স্থকৌস্তভ’-প্রণেতা
রাজনারায়ণমিত্র উদ্ভাবন করেন যে,
বোড়াল গ্রাম সেন-বংশীয় রাজাদিগের
মধ্যে শ্রীমান্ সুযোগ্য সেনের রাজধানী
ছিল। এই রাজধানীতে তিনি এক
মহাযজ্ঞ করেন। ইতিহাসে এই
যজ্ঞের কথা উল্লিখিত আছে (‘গ্রাম্য
উপাখ্যান’, পৃ. ১)।

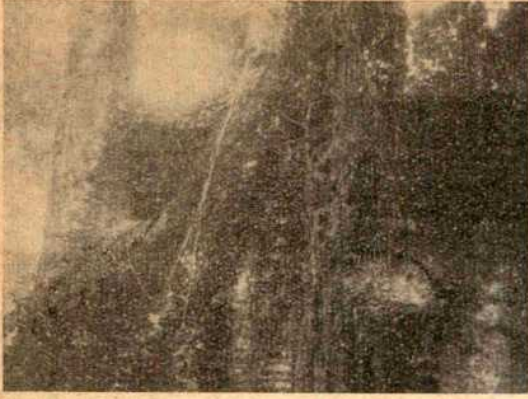
বস্তুতঃ বোড়াল গ্রাম যে এক
কালে কোন রাজার রাজধানী ছিল,
তাহা অদ্যাপি বর্তমান কতকগুলি
ধ্বংসাবশিষ্ট কীর্তির নিদর্শন হইতে
প্রমাণিত হয়। এই গ্রামে একটি
বিশাল দীঘিকা আছে যাহার জলকর
ছিল ৪২৯ বিঘা। ‘গ্রাম্য উপাখ্যানে’
লিখিত আছে, “এই দীঘি সর্কপক্ষে
বৃহৎ বলিয়া ইহা কেবল দীঘি নামে
খ্যাত—যেমন ইংরেজীতে বলে The
Dighi”—পৃ. ৬। অধুনা এই বিশাল
দীঘি মজিয়া গিয়া জমাট দামে ঢাকিয়া
গিয়াছে, মাত্র মধ্যস্থলে কিছু জল
আছে।

এই বোড়াল গ্রামে রাজা সুযোগ্য সেনের অপর আর
একটি কীর্তি আছে। তিনি এই দীঘির পূর্বকূলে এবং
পূর্বোক্ত আদিগন্ধার বিস্তৃত খাদের পশ্চিম তীরবর্তী স্থানে
ত্রিপুরসুন্দরী পাঠ নামক এক বৃহৎ দেবালয় স্থাপন করেন।
এক বিরাট যজ্ঞের অহুষ্ঠান করিয়া এই মন্দিরে তিনি
ত্রিপুরসুন্দরী মূর্তি (ষোড়শী) প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা

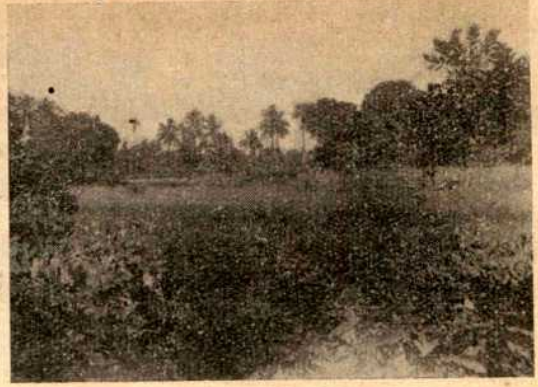


ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর অষ্টধাতু মূর্তি (ছয় শত বৎসর পূর্বে সেন-রাজা কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত মূর্তির অঙ্কুরণে নিখিত)

আজ হইতে প্রায় সাত শত বৎসর পূর্বের, অর্থাৎ
ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা। রাজনারায়ণ বহু
মহাশয় এই দেবী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “দীঘির
উপকূলে ত্রিপুরসুন্দরী পাঠ নামে একটি মন্দির ছিল,
এক্ষণে তাহার ভগ্নাবশেষ অতি অল্পই আছে।” ‘গ্রাম্য
উপাখ্যান’, পৃ. ৭। দেবীর সেই সুবিশাল মন্দির



রাজনারায়ণ বসুর বাঙালিটার ধ্বংসাবশেষ



সেন-রাজার দীর্ঘিকার বর্তমান অবস্থা

কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও বোড়ালের গ্রামাশ্রী নষ্ট হইয়া যায়।

পরে ৩জগদীশচন্দ্র ঘোষ এই গ্রামখানি আনুমানিক ২৫০ বৎসর পূর্বে মুসলমান স্ববেদারদের নিকট হইতে “জঙ্গল-কাটি পত্তনি” রূপে প্রাপ্ত হইয়া গ্রামের মধ্যে লোক বসতি বৃদ্ধি ও লুপ্ত কীর্তিসমূহের পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার তিরোধানের পর উক্ত কার্য্য মন্দীভূত হইয়া পড়ে। পরে শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ (৩জগদীশ ঘোষের অধস্তন নবম পুরুষ) উক্ত দেবালয়ের উন্নতি সাধনের জন্ত চেষ্টা করিতে থাকেন ও ত্রিপুরসুন্দরী মঠের স্তূপ খনন করাইতে আরম্ভ করেন। তবে একার অর্থ ও সামর্থ্যে উক্ত ব্যয়-বহুল কার্য্য বেশী দিন চালান সম্ভবপর হয় নাই। তবে যে-পর্য্যন্ত খনন করান হইয়াছিল (১৩০২-৩ সালে) তাহা দ্বারাই মন্দির ও মন্দিরসংলগ্ন অগ্ন্যাশ্রয় গৃহাদির স্বদৃঢ় ও সুপ্রশস্ত ভিত্তি আবিষ্কৃত হয়, বিচিত্র ধরণের ও কারুকার্য্য-খচিত বহু ইট ও দেবীর একটি ধাতুনির্মিত যন্ত্র পাওয়া যায়।

ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত ঐ সমস্ত ইষ্টকের একটি চিত্র এই স্থানে দেওয়া হইল। এই ইষ্টকগুলি এমন

স্বদৃঢ় যে দেখিলে মনে হয় যেন সদ্যোনির্মিত। এই-গুলি আকৃতিতেও বিভিন্ন প্রকার। ইহার কতকগুলি গোল, কতকগুলি চতুর্ভুজ ও কতকগুলি ত্রিকোণ।

এই পীঠস্থানের উন্নতিকল্পে ১৩৪১ সাল হইতে “ত্রিপুরসুন্দরী সেবা সমিতি” নামক একটি সমিতি গঠিত হয় ও এই সমিতি উক্ত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের উন্নতি-মূলক যাবতীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। ইহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বহু উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। দেবীর পুরাতন মূর্তির অমুকরণে গত ২৩শে মাঘ ১৩৪১ সালে দেবীর একটি সুবৃহৎ অষ্টধাতুমূর্তি নির্মিত হইয়াছে ও নিত্য সেবার্চনা চলিতেছে। এই অতি প্রাচীন পীঠস্থানে আসিয়া দূরাগত যাত্রীদের যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে না হয় সে ব্যবস্থাও এই সমিতি হইতে করা হইতেছে।

এত বড় অষ্টধাতুমূর্তি ২৪-পরগণার কোন দেবালয়ে নাই। তবে অর্থাভাববশতঃ এই বিশাল মূর্তির উপযুক্ত মন্দির অদ্যাপি পুনর্নির্মিত হয় নাই। উপস্থিত একটি ক্ষুদ্র প্রাকোষ্ঠে দেবীর পূজার্চনা চলিতেছে।



অলখ-বোরা

শ্রীশান্তা দেবী

পূর্ব পরিচয়

[চন্দ্রকান্ত শিব নরানন্দোড গ্রামে শ্রী মহামায়া, ভগিনী হৈমবতী ও পুত্রকণ্ঠা শিব ও হুথাকে লইয়া থাকেন। হুথ শিব পুজার সময় মহামায়ার সঙ্গে মামার বাড়ী যায়। শালবনের ভিতর দিয়া লম্বা মাঝির গরুর গাড়ী চড়িয়া এবারেও তাহার রতনজোড়ে দামামাহাশর লক্ষণচন্দ্র ও দিদিমা ভুবনেশ্বরীর নিকট গিয়াছিল। সেখানে মহামায়ার সহিত তাঁহার বিধবা দিদি সুরধুনীর খুব ভাব। সুরধুনী সংসারের কড়ী কিন্তু অন্তরে বিরহিণী তর্কণী। বাপের বাড়ীতে মহামায়ার খুব আদর, অনেক আত্মীয়বন্ধু। পুজার পূর্বেই সেখানকার আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে হুথার দিদিমা ভুবনেশ্বরীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে মহামায়া ও সুরধুনী চক্রে অন্ধকার দেখিলেন। মহামায়া তখন অস্তঃসংসা, কিন্তু পোকের ঔদাসীন্দ্বে ও অশৌচের নিয়ম পালনে তিনি আপনার অবস্থার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। তিনি আপন গৃহে কিরিয়া আসিলেন। মহামায়ার দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পর হইতে তাঁহার শরীরের একটা দিক অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। শিশুটি ক্ষুদ্র দিদি হুথার হাতেই মানুষ হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্ত কলিকাতায় গিয়া গ্রীর চিকিৎসা করাইবেন স্থির করিলেন। শৈশবের লীলা-ছুষি ছাড়িয়া অজানা কলিকাতায় আসিতে হুথার মন বিরহ ব্যাধি হইয়া উঠিল। পিনিমাকে ও চিরপরিচিত গৃহকে ছাড়িয়া ব্যক্তি ও শক্তি মনে হুথ মা বাবা ও উন্নতি শিবুর সঙ্গে কলিকাতায় আসিল। অজানা কলিকাতায় নতুনদের ভিতর হুথ কোনও আশ্রয় পাইল না। পীড়িতা মাতা ও সংসার লইয়াই তাহার দিন চলিতে লাগিল। শিব নতুন নতুন আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াইত। চন্দ্রকান্ত হুথাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিবার কিছুদিন পরে একটি নবাগতা মেয়েকে দেখিয়া অকস্মাৎ হুথার বন্ধুত্বীতি টকলিয়া উঠিল। এ অমূল্য তাহার জীবনে সম্পূর্ণ নতুন। স্কুলের মধ্যে থাকিয়াও সে ছিল এতদিন একলা, এইবার তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হৈমবতীর সঙ্গে অতিরিক্ত ভাব লইয়া স্কুলের অন্তরেই ঠাট্টা-তামাসা করে, তাহাতে হুথ লজ্জা পায়, কিন্তু বন্ধুত্বীতি তাহার নিবিড়তর হইয়া উঠে। হৈমবতীর চোখের ভিতর দিয়া সে নিজেকেও যেন নতুন করিয়া আবিষ্কার করিতেছে। পুজার সময় মাদিমা সুরধুনী কলিকাতায় যোনকে দেখিতে আসতে, হুথ সেই কাকে বিবুকে লইয়া একবার নরানন্দোড ঘুরিয়া আসিল। মন কিন্তু যেন কলিকাতায় কেলিয়া গেল। হুথ নিজের আসন্ন যৌবন সম্বন্ধে নিজে ততটা সচেতন নয়, কিন্তু মাদিমা পিনিমা হইতে আরম্ভ করিয়া পাশের বাড়ীর মণ্ডলগৃহিণী পর্যন্ত সকলেই তাহাকে সাদাশ্রম সাবধান করিয়া দিতেছে।

হৈমবতী কল্যাণ হুথ প্রথম নি সম্পর্কীয় যুবকদের সঙ্গেও মিশিতে আবদ্ধ কবিল। দক্ষিণেশ্বরে একদিন দল বাঁধিয়া অনেক বেড়াইয়া আসিল। দলে চাবন্ধন যুবক ছিল, সুহেত্র, সুবেশ, ভ্রপন আর নিখিল। ভ্রপন অতিশয় হুপুকা, সুদেশ মোটা, কালো, ছোট-খাট মানুষ, বেশী কথা বলে না, তবে প্রথরবৃষ্টি ও ভীতনী। সহস্র কাঠখোটা সোহের

মানুষ, সাবাক্ষম মানবজাতির শুকপিবি কবিত্তে ব্যস্ত। নিখিল দীর্ঘাকৃতি, জামবর্ণ সদাহাস্যময়।

স্কুলে একদিন মেয়েমহলে সহাতর্ক হইয়া পেল। মেয়েদের যাবী নির্বাচন ভালবাসিয়া নিজে কবা উচিত, না উচিত চোখ বান বুড়িয়া মা বাপের হাতেব পুতুলের মত পার হইয়া যাওয়া। মনীষা একদিকে, মেহলতা আর-একদিকে। হুথ এ বিষয়ে আগে কিছু ভাবে নাই, এখন ভাবিতে চেষ্টা করিয়াও কুল পাইল না। সনাতনপন্থী জীবনব্যাজ দেখিতেই সে অত্যন্ত, কিন্তু এখন আবার মনে সংশয় জাগে হয়ত আব এক ধর্মের জীবনও আছে, তাহাতে মানুষের নিজের মন তাহার একমাত্র কাণ্ডারী। এক হস্ত সে পথে বাহারা চলে তাহা সবলেই ভুল কবে না।

বাহা ছিল তর্ক-আলোচনার বিষয়, মানুষের জীবনেই তাহার পরিচয় পাইতে হুথার দেয়ী হইল না। হৈমবতী জ্যাঠামহাশয় নরেশ্বর তাঁহার কন্যা মিলির বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত; কিন্তু নিজের মনকে কাণ্ডারী করিয়া ইতিমধ্যে মিলি সুবেশকে অন্তরে বরণ করিয়াছে, বিমুখ আত্মীয়স্বজনের তর্জন-গর্জন, অগুনয় বিনয়, কিছুতেই সে টলিল না। অবশেষে এক বছরের জন্য মিলিকে বেসুনে পিসি কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হটল, যদি হান-পরিবর্তনে তাহার মত পরিবর্তন ঘটে। মিলির ঘোষিনী মৃষ্টি দেখিয়া কাব্যেব অর্থ হুথার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল—৩ টিন সঙ্কল্প লইয়া মিলি চলিয়া গেল, হৈমবতী ও হুথার কৈশোর-নাট্যে যবনিকা পড়িয়া নতুন অঙ্কের আরম্ভ হইল।]

২১

নদী ও সাগরের সঙ্গম দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন একটি রেখাতে আসিয়া তাহার দৃষ্টি হইয়াছে, রেখাব এপাবে এক বং ওপারে আর এক বং। কিন্তু যত কাছে আসা যায়, এই সীমাবেখা আব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোন স্থানে যে নদীর মাটিগোলা জল শেষ হইয়া সমুদ্রের পান্নার বং স্রু হইয়াছে কিছুতেই ধবা যায় না। এমন ধীরে ধীরে এক বং আর এক বঙেব ভিতব মিশিয়া গিয়াছে যে, যে অপলকে তাকাইয়া থাকে তাহার কাছে দুই এক বলিয়া মনে হয়। কিছু স্বপ্নেব জন্ম দৃষ্টি সরাইয়া লইলে তবে দুইটিকে ভিন্ন বলিয়া চিনিতে পারা সম্ভব।

মানুষের কৈশোর এবং যৌবনও তেমনই। তাহাব সন্ধিক্ষণ যে কোনটি বলা যায় না। কৈশোবেব লীলা চপলতা কখন যে যৌবনবেদনাব গভীরতার মধ্যে যৌবনস্বপ্নের

প্রাচুর্যের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া দেয় কেহ বলিতে পারে না। কোন্ রাজের অঙ্ককারে কিশোর বালক বাল্যলীলার মাঝখানে সুমাইয়া কোন্ ঘোবন-প্রাতে জীবনের নূতন রসের সন্ধানে ছুটিয়াছে কেহ কি জানে? কিন্তু দূর হইতে ইহাদেরও যেন একটা সীমারেখা দেখা যায়। সুধা কখন যে জীবনের পথে শৈশবকে পিছনে ফেলিয়া আসিল তাহা সে নিজে বলিতে পারে না, কিন্তু ফুলের পর্ক শেষ করিবার বৎসর খানিক পরে অনেক সময় সে দূর হইতে যেন কলিকাতায় নবাগতা সুধার দিকে মমতার সহিত তাকাইয়া দেখিত। আজিকার সুধা সে সুধা নয়। তাহার জীবনের গতি কোথায় যেন একটু মোড় ফিরিয়া গিয়াছে, তাহার প্রসার অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে। শৈশবে ও কৈশোরে জীবনে যে সম্পদ সে অর্জন করিয়াছিল তাহা হারাইয়া যায় নাই, কিন্তু নূতন জীবনের যাত্রাপথে অসংখ্য বৈচিত্র্যের অন্তরালে তাহারা যেন একটু চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

হৈমন্তীর প্রতি সুধার চানে কিন্তু কিছুমাত্র ভাঁটা পড়ে নাই। বরং তাহার মনে একটা অভিমান জন্ম হইয়া উঠিতেছিল যে মিলি-মিদি রেঙুনে চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই হৈমন্তী যেন ধীরে ধীরে কেমন একটু বদলাইয়া যাইতেছে। সেই স্বপ্নভরা চোখ, সেই ধ্যানমগ্ন ভাব সবই আছে, কিন্তু তাহার স্বপ্ন, তাহার ধ্যানের রূপ যেন পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। সে এখন স্বপ্নে ধ্যানে যে-লোকে বিহার করে সেখানে সুধা যেন প্রবেশপথ খুঁজিয়া পায় না; সুধাকে যেন পিছনে ফেলিয়া সেখানে সে ব্যাকুল আগ্রহে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে চায়। সুধা তাহাকে দৈবাৎ সচেতন করিয়া দিলে হৈমন্তী মধুর হাসিয়া সুধার দুই হাত চাপিয়া ধরে, বলে, “সুধা, তুমি আমাকে কি ভাব? আমার উপর খুব রাগ কর তুমি, না?”

কেন যে সুধা তাহার উপর রাগ করিবে একথা হৈমন্তী স্পষ্ট করিয়া বলে না, তবু যেন স্বীকার করে কোন একটা কারণে সে তাহার বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে না, বন্ধুর একাগ্রচিত্ততার প্রতিদান সে দিতে পারিতেছে না। সুধা কিছু বলিত না, কিন্তু ক্ষুব্ধ হইত কেন হৈমন্তী তাহার কাছে মনের কথা বলে না, হৈমন্তীর মনে কি বেদনা, কি স্বপ্নের মায়া তাহাকে আপন-ভোলা

করিয়াছে সুধাকে বলিলে সে ত খুশী হইত, হৈমন্তীর হৃৎস্ব স্ব স্ব কিছুকে আপনায় করিয়া লইবার ক্ষমতাতেই ত তাহার বন্ধুত্বের মূল্য।

সন্ধ্যার পর হৈমন্তীদের বাড়ীতে গেলে হৈমন্তী সুধাকে লইয়া ছাদের উপর চলিয়া যাইত। সূর্যাস্তের সোনালী রং তখনও আকাশের গায়ে একটুখানি লাগিয়া আছে, পিছন হইতে রাজির অঙ্ককার ছায়া অর্ধেক আকাশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ছাদে বসিবার জন্য হৈমন্তী একটা সস্তা মাদুর সংগ্রহ করিয়া আনিত, কিন্তু সেখানে তাহাদের বসা হইত না। বেখানে ছাদের আলিসার উপর হৈমন্তীর জ্যাঠাইমা ঘিরের টিনে মাটি দিয়া বেগ ও হুই ফুলের গাছ লাগাইয়া ছিলেন, হৈমন্তীও একটা রঙীন চীনা টবে রজনীগন্ধার ঝাড় বসাইয়াছিল, সেইখানে ফুলের গন্ধের মধ্যে আলিসার উপর হেলান দিয়া তাহারা দাঁড়াইত। হয়ত হৈমন্তী গুনগুন করিয়া গান ধরিত,

“মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে

রাখিব এ হাত তব হৃদয় হাতে

প্রিয়তম হে জাগ জাগ জাগ।”

তাহার হাত-সুধার হাত দুখানির ভিতর থাকিত, কিন্তু তাহার দৃষ্টি কোন্ স্তরের পথে চলিয়া যাইত, তাহার নিশ্বাস গভীর হইয়া ফুলের গন্ধের ভিতর মিলাইয়া যাইত। হৈমন্তী বলিত, ‘তোমার মুখে ভাই ঐ গানটা ভারি সুন্দর লাগে, তুমি গাও না’ —

“ওগো সূর্য বিপুল সূর্য, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।

মোব ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই সে কথা যে বাই পাসরি।”

সুধা গাহিবার সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তী ধরিত,

“দিন চলে যায়, আমি আনমনে

তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে

ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী।”

হৈমন্তীর দৃষ্টি সজল হইয়া উঠিত, তাহার চোখে এমন করিয়া জলকণা কাঁপিয়া উঠিত সুধা কখনও দেখে নাই। কেন হৈমন্তী কোন কথা বলে না, সুধার মন ব্যাখ্যাত্তরিত উঠিত। কিন্তু সে ব্যথা সে বেদনা কি স্পষ্ট হৈমন্তীর জন্য? সুধা বুঝিতে পারিত, এ বেদনা স্পষ্ট হৈমন্তীর বেদনার সহানুভূতি নয়, কোন্ স্তরের আত্মল পিয়াসা তাহার বক্ষেও জাগিয়া উঠিয়াছে, সেও যেন কাহার আশা-পথ চাহিয়া

আছে, সেই অজানা-অতিথির মুখ কেন চেনা যায়, কেন চেনা যায় না; কিন্তু এই আখ-চেনার অস্তরাল হইতেও সুধাকে সে ডাকিতেছে, সুধা নাগাল পাইতেছে না। ফুলের গন্ধের মত তাহার একটুখানি আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাকে ধরা যায় না, তাই এই বেদনার সৃষ্টি।

কোনদিন তাহাদের ছাদের সত্যর ছেলেরা আসিয়া পড়িত। একটা মাদুরের পাশে আর একটা মাদুর পড়িত। আজ আর দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা কাটানো চলিত না। হৈমন্তী সেতার ও কাব্যগ্রন্থ লইয়া আসিত, ছেলের হাতে এক এক খানা নূতন ইউরোপীয় নভেল। সম্প্রতি বাহারা নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, তাহাদের রচনা কে কত বেশী পড়িয়াছে তাহা লইয়া আলোচনা ও তর্ক লাগিয়া বাইত। মহেন্দ্র প্রমাণ করিত যে সে সকলের চেয়ে বেশী পড়িয়াছে এবং ঔপন্যাসিকদের আদি-অন্ত সব তাহার নখ-দর্পণে।

একদিন নিখিল বলিল, “তুমি ক্যাটালাগ দেখে কন্টিনেন্টাল অথরদের নাম মুখস্থ কর, আর মলাটের উপরের সিনপসিস পড়ে এসেই সকলের আগে বক্তৃতা শুরু কর। আমরা বোকা মানুষ সব বইটা পড়ে তার পরে কথা বলব।”

হৈমন্তী বলিল, “আপনি ওরকম করে ভুললোককে চটাবেন না, শেষে টোলের পণ্ডিতদের মত লড়াই লগে যাবে।”

মহেন্দ্র এসব ঠাট্টা-তামালা গায়ে মাখিত না, সে মেটারলিঙ্ক ও ইবসেনের তুলনামূলক সমালোচনা এবং বার্ণার্ড শ ও অস্কার ওয়াইল্ডের রসবোধের মাপকাঠি লইয়া আরও বিশদ উৎসাহে কথা বলিতে থাকিত। থাকিয়া থাকিয়া সকলের অলক্ষ্যে আপনার চুলের পালিশে হাত বুলাইয়া লইত ও গলার চামরটা কখনো কখনো টানিয়া বসাইত।

নিখিল বলিল, “এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা বাজে রসচর্চার নষ্ট না করে ভরমুজের রস কি আমাদের রসের আধাশ নিলে ঢের কাজের হত।”

হৈমন্তীর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সে আজিখ্য তুলিয়া গিয়াছে। সুধাকে উপরে বসাইয়া সে নীচে ছুটিয়া গেল

সরবৎ আনিতে। কাঠের একটা পালিশ-করা ট্রের উপর বেঁটে মোটা ছোট ছোট কাচের গেলাসে কোন দিন রক্তাক্ত ভরমুজের সরবৎ, কোনদিন বা আমপোড়ার সোনালী সরবৎ লইয়া সে আধঘণ্টা খানিক পরে উঠিত।

স্বপ্নভাষিণী সুধা ছেলেরদের মাঝখানে বসিয়া কি কথা বলিবে খুঁজিয়া পাইল না, সময়টা কাটাওয়া দিবার জন্য তপনকে বলিল, “আপনাকে তত ক্ষণ একটা গান করতে হবে।” তপন কথা কম বলিলেও গানে তাহার কণ্ঠ সহজেই সবাক্ হইয়া উঠিত। সে গান ধরিল,

“হাতখানি ঐ বাড়িরে আন মাও গো আমার হাতে,
ধরব তারে ভরব তারে বাধব তারে সাথে,
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায় সেই কথা বলিও
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশ খানি দিও।”

নিখিল বলিল, “গানটি সুন্দর, কিন্তু বন্ধু কে? দেবতা, না মানবী?”

তপন বলিল,

“আর পাব কোথা?”

দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।”

মহেন্দ্র বলিল, “তোমরা কি কবির ভাষার ছাড়া কথা বলবে না? নিজেরদের ভাষা ভুলে গিয়েছে? যদি কাব্য-চর্চাই করতে চাও ত বই সামনে রয়েছে, খুলে আরম্ভ কর না। রোজ আধঘণ্টা পড়লেও অনেক এগিয়ে যাওয়া যায়। ইচ্ছা করলে সংস্কৃত কাব্যও ধরতে পার। আমাদের ঐদিকেই ঝোক বেশী। আমাদের কবিরা সকলেই ত স্বপ্নী সংস্কৃত কবিদের কাছে।”

সুধার মন এদিকে বাইত না, গানের সুরের ভিতর তাহার মনটা ঘুরিয়া বেড়াইত। কি সুন্দর গলার স্বর তপনের, যেন ঝরণার জলের মত ঝরিয়া পড়িতেছে, যেন চার লাইন গানের ভিতর মানুষের প্রাণের সকল গভীরতম কামনার কথা উজাড় করিয়া চালিয়া দিতেছে। কিন্তু এ কি শুধু স্বকণ্ঠের মোহ, এ কি শুধু কবির বাণীর অপূর্ণ সৌন্দর্য্য যাহা সন্ধ্যার অকাশকে এমন করিয়া ভরিয়া ভুলিয়াছে? অন্তরের তন্ত্রীতে যে কথার প্রতিধ্বনি ঝঙ্কত হইয়া উঠিতেছে, তাহার পিছনে কি প্রাণের আহ্বান নাই? সুধার এত কথা জানিবার কি প্রয়োজন তাহা সে নিজেই জানে না ভাল করিয়া, তবু ইচ্ছা করে জানিতে এই গানের

স্বরের অন্তরাল দিয়া ওই নবীন প্রাণ কাহাকে কি বলিতে চায়।

হৈমন্তী কোমরে আঁচল জড়াইয়া ট্রের ভারে ঈষৎ হেলিয়া উপরে আসিয়া পড়িলে ছেলেদেব মধ্যে কোলাহল পড়িয়া যাইত, সুখার চিন্তার ধারা কাটিয়া যাইত। সবতের পর সেতার বাজিত, হয়ত নূতন শেখা কোনও গানের স্বর সকলের মুখে গুন গুন করিয়া ফুটিয়া উঠিত। এ-পাশের ও-পাশের বাড়ী হইতে মেয়েরা গানবাজনা শুনিবার জন্য জানালা কি ছাদের আলিশা হইতে মুখ বাড়াইত। তার পর আবাব ইমুল কলেজ, স্বদেশী গানবাজনার কত ছোট ছোট কথা উঠিত, বাহার আবু এক মুহুর্তের বেশী নয়। মহেন্দ্র অনেক সময় গভীর স্বরে বলিত, “মানুষের জীবন কি এই রকম ছোট কথার আলোচনাতেই নষ্ট করবার জন্ত? জীবন ত খুব লম্বা জিনিষ নয়, দু-দিনেই ফুরিয়ে যাবে, তাকে হিসাব করে খরচ করা দরকার।”

তখন বলিত, “কথা হাঙ্কা বলেই নিঃশ্বাসের বায়ুর মত মানুষের প্রাণকে বাঁচিয়ে বেখেছে। গুরুত্বের কথাকে পরিপাক করা যায় না। ভারী হাওয়ায় নিশ্বাস আটকে যায়, ভারী খাবারে বৃহজ্জম হয় একথা মান ত।”

মহেন্দ্র বলিত, “তাই বুঝি তুমি এত হাঙ্কা কথা বল যে কানে শোনা যায় না?”

নিখিল বলিত, “কেন, গানের স্বরের চেয়ে স্মিট কথা কি আর কিছু আছে? ও কথা বলে গানে, কিন্তু কাজ করে কোদাল কুপিয়ে।”

মহেন্দ্র বলিত, “ও, আই বেগ ইওর পার্ডন, তুমি যে ব্যাক টু ভিলেজের বড় পাণ্ডা, তা ভুলে গিয়েছিলাম। বাস্তবিক এ-বিষয়ে আমাদের মধ্যে কখনও ভাল করে আলোচনা হয় না, এটা বড় ছুঃখের বিষয়। এক-দিন একটা বন্ধু-সভা ডাকা থাক, কি বল? কার কি মত ঠিক জানা যাবে। আমার মনে হয় না এই উন্নতির যুগে মানুষের আবাব পিছন ফেরা উচিত।”

হৈমন্তী বলিত, “মহেন্দ্র-দা, গাছের পরিণতি তার ফলে ফলে, কিন্তু তাই বলে তার শিকড়গুলোকে কেটে ফেললে উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয় না। গ্রাম যে আমাদের প্রথম ধাত্রী, তাকে এক গণ্ডুয় জল দিতেও যদি আমরা

ভুলে যাই, তাহলে আমাদের প্রাণে রস জোগাবে কে?”

মহেন্দ্র বলিত, “কেন, গ্রামকেও কি ক্রমশ শহরের আদর্শে ভুলে আনা যায় না? শহরের যা মন্দ তা বাই যাবে, যদি প্রতি গ্রামই শহর হয়ে ওঠে। তাহলে শহরে মানুষের ভীড়ে স্বাস্থ্য খারাপ হবে না। বোজগারী পুরুষরা চলে আসাতে গ্রামে জীলোক বেশী আর সহরে পুরুষ বেশী হয়ে ব্যালান্স নষ্ট, নীতি ছুট হবে না। যে যার নিজের গ্রামে বসে নাগরিক স্বথ সুবিধা ভোগ করবে।”

সুখা অনেক ক্ষণ পরে কথা বলিত, কারণ গ্রাম তাহার জন্মভূমি, শৈশবের লীলাভূমি। সে বলিত, “যদি গ্রামে বসে আমরা মিউনিসিপ্যাল মার্বেটে ফল কিনি, বাথ-টবে স্নান করি, মোটর চড়ে কাপড়ের দোবানে যাই, লণ্ড্রিতে কাপড় কাচাই, তা হলে যে-মাটির পৃথিবীতে আমরা জন্মেছি, তার স্পর্শ জীবনে কোনও দিন পাওয়া হবে না; আমরা কল হয়ে উঠব কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ ও সৌন্দর্য থেকে কতখানি যে বঞ্চিত হলাম সেটা জানবার সুযোগ পর্যন্ত পাব না। নিজের হাতে লম্বা গাছ লাগিয়ে তার সাদা ফুলগুলি ফোটা থেকে লাল টকটকে পাকা লম্বাটি পাড়া পর্যন্ততে গ্রামের মেয়ে যে আনন্দ পায় শহরে এক পয়সায় এক মুহুর্তে এক ঠোঁড় লম্বা কিনে শহরে মানুষ কি সে সুখ পায়? সে কেনে পয়সার বদলে শুণ্ড মশলা, আর এ পায় প্রতি পায়ে পায়ে নূতন আনন্দ। আধ মাইল হেঁটে গিয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েরা যখন রোদপোড়া শরীর নিয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন সেই শ্রোতের শীতল জলের ভিতর যে স্নিগ্ধতা, সেই খোলা আকাশের নীচে জলধারার মধ্যে যে মুক্তি স্নানের ঘরে টবে বসে শহরের ছেলেমেয়ে কি কখনও ত্যাগ বন্দনা করতে পারে? জীবনের অনেক নিবিড় আনন্দের সঙ্গে শহরের ছেলেমেয়ের কখন পরিচয়ই হয় না।”

মহেন্দ্র বলিল, “আপনি ত বেশ পয়েন্ট ধরে তর্ক করতে পারেন! আপনাকে কি ইচ্ছা যে আমরা আবাব সব সেই বৈদিক যুগে ফিরে যাই? মেয়েরা ঘরে ঘরে দুখ দুইবে, ছেলেরা লাঙল চালাবে আর গাছতলায় বসে বেদগান করবে!”

সুখা বলিল, “তা মেয়েরা ঘরে ঘরে বসে মোটা হওয়া আর ছেলেরা চোখে চশমা দিয়ে ডিসপেনসিয়া করার চেয়ে তা অনেকটা ভাল বইকি।”

নিখিল বলিল, “ভাগ্যিস আমার চোখে চশমা নেই, না হলে আমি ত একেবারে ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে যেতাম। বাই হোক তপন তোমারই জয় জয়কাব। বল দেখি তোমার আদর্শ গ্রামে কোন চাকরি খালি আছে কি না। তাহলে আমরাও সব সেখানে ঢুকে পড়ব।”

তপন বলিল, “আমার গ্রামের লোকেরা চাকরি করে না। তারা লাঙল চালায়, কোদাল কোপায়, চরকা কাটে, তাঁত বোনে।”

হৈমন্তী বলিল, “নিখিলদা’র ঠাট্টা শুনবেন না। আপনাদের গ্রামে কি রকম কাজ সব হয় সত্যি বলুননা।”

তপন খুব বেশী কথা বলে না। সে বলিল, “এই সাধারণ সব কাজ আর কি। তাই দলবদ্ধ হয়ে করা আর বুদ্ধি খাটিয়ে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে একটু উন্নতি করা। আমি মুখে আর কি বলব? আপনারা একদিন গিয়ে দেখে এলে ত বেশ হয়।”

হৈমন্তী বাইতে তৎক্ষণাৎ রাজি। “বাবাকে বলি, যদি যেতে দেন নিশ্চয় যাব সবাই দল বেঁধে।”

নিখিল বলিল, “খালি মহেন্দ্রকে বাদ দেওয়া হবে। ও সেখানে কিনা কি চেয়ে বসবে তার ঠিক কি।”

নীচভলা হইতে ডাক আসিড, সেদিন সতু আসিয়া বলিল, “মহেন্দ্র-দা, জ্যাঠাইমা বললেন আজ আপনারা এখান থেকেই খেয়ে যাবেন।”

নিখিল বলিল, “আর আমরা?”

হৈমন্তী হাসিয়া বলিল, “বোকা ছেলে, সকলের নাম বলতে পার না? প্রত্যেককে বল।”

সতু বলিল, “দিদি, সুখাদি, মহেন্দ্রদা, নিখিলদা, তপনদা আপনারা সবাই দয়া ক’বে আমাদের সঙ্গে দুটি শাক-ভাত খাবেন চলুন।”

সভা ভাঙিয়া গেলে দূরের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজার শব্দ শুনিতে শুনিতে সকলে নীচে নামিত।

২২

হৈমন্তীদের বাড়ী হইতে রাত করিয়া ফিরিলে-সুখার

ভাল করিয়া ঘুম হইত না। মাথার ভিতর অনেক রাত পর্যন্ত কত কথা যে ঘুরপাক খাইত তাহার ঠিক নাই। মুখে সে সেখানে খুব কমই কথা বলিত; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া মনে মনে কাহারও বা যুক্তি খণ্ডন কাহারও বা পক্ষ সমর্থন অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলিত। অপর পক্ষের হইয়া নূতন নূতন কথার অবতারণা সে আপনার মনেই করিত, আবার তাহার উত্তরও নিজেই দিত। কে যে কি রকম কথা বলিবে তাহার একটা খসড়া তাহার কাছে যেন লেখা থাকিত। প্রত্যেকের মুখে প্রত্যেকের মত কথা দিয়া এবং নিজে তাহার জবাব দিয়া যে নৈপুণ্য সে দেখাইত, তাহাতে তাহার মনটা খুশী হইত। কিন্তু এমন করিয়া একটা কথাও যে সে বলিতে পারে না, ইহাতে তাহার দুঃখও হইত। তাহার ইচ্ছা করিত মহেন্দ্রের সব ফুট ওর্ক ও নিখিলের রসিকতার জবাব সে বিছানায় শুইয়া নিজের মনে যেমন করিয়া দেয় তাহাদের সামনেও যেন তেমন করিয়াই দিতে পারে। কিন্তু সে জ্ঞানিত কথা বলা সত্বে অহেতুক লজ্জাকে সে অল্প দিনে কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। তপন তাহারই মত কম কথা বলে, তাহার হইয়াও সুখা মহেন্দ্র ও নিখিলের অনেক কথার জবাব নিজের মনে দিয়া রাখিত। কিন্তু এ জবাব কখনও কাহারও কানে পৌঁছিত না।

সুখা কলেজে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পড়াশুনা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, এখন কলেজে বাইবার আগে সকালে ও ফিরিবার পর সন্ধ্যায় যেটুকু সময় সে পায় তাহাতে তাহার সংসারের কাজ ও কলেজের কাজ হইয়া উঠে না। কাজেই সকালে তাহাকে উঠিতে হয় ভোর পাঁচটায়, রাত্রেও যখন শুইতে যায় তখন প্রায় এগারটা বাজে, পথে “বুল্ফি মালাই”এর ডাক খামিয়া গিয়াছে, শেষ ঝামঙলা লোক-ভারের অভাবে ঘড়াং ঘড়াং আওয়াজ করিয়া নাচিয়া চলিয়াছে, ফুটপাথে ও বাড়ীর বাহির দিকের রোয়াকে ও বারান্দায় সারি সারি ছিন্নবাস কুলি মজুর শুইয়া পড়িয়াছে। হোলির দিনের আগে বাড়ীর সামনে হিন্দুস্থানী ফিরিওয়ালারা সারা দিনের কচুরি, ঘুনি, গজা ইত্যাদির ফিরি সারিয়া পুকুরের ধারে ছারপোকা-ভর্তি খাটোলা ও খাটিয়া পাতিয়া রাত্রি একটা দুটি পর্যন্ত খঙ্গনী ও ঢোল গিটাইয়া এক সুরে গান গাহিয়া চলিত। বিছানায় শুইলেও

সহজে ঘুমাইবার জো ছিল না। তাহার উপর যেদিন হৈমন্তীদের বাড়ী হইতে নানা কথা মাথায় লইয়া স্থা ফিরিত সেদিন প্রায় সারা রাত্রিই বিনিদ্র কাটিয়া যাইত।

সেদিন অনেক রাত জাগিয়া স্থা ভোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, পাঁচট-র বদলে ছ'টাও বাজিয়া গিয়াছে। মহামায়া দেয়াল খরিয়া স্থার খাটের কাছে আসিয়া ডাকিতেছেন, “ও স্থা, ওঠ না রে, বেলা হ'ল। যে। ওই দেখে সিঁড়িতে কে পাগড়ী মাথায় চিঠি হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। দিদিমণিকে চিঠির জবাব দিতে হবে বলছে।”

স্থার ভোরবেলাকার আধ-ঘুমের মধুর স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, “উঃ, ঘরে রোদ এসে পড়েছে যে!”

মুখ ধুইয়া চিঠি হাতে করিয়া দেখিল, হৈমন্তী লিখিয়াছে, “স্থা, আজ শনিবার তিনটার পর আমরা তপনবাবুর গ্রাম দেখতে যাব। আর কোনও সঙ্গী পেলাম না, তাই স্থানীয় বাবুকে ধরেছি সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্তে। তোমাকে নিশ্চয় করে যেতে হবে। যদি শিবুকে নিয়ে যেতে চাও ত তাকেও তৈরি রেখো, ছেলেনদের এসব কাজ এখন থেকে দেখা ভাল। তুমি আসবেই, জবাব দিও। ইতি তোমার হৈমন্তী।”

শিবুর তখনও প্রায় মাঝ রাত্রি। স্থা তাহাকে গিয়া একটা ঠেলা দিল। শিবু সভ্যই বলিল, “আঃ, দুপুর রাত্রে জালাতন করো না। আমি এখন তোমাদের কর্মসূচি খাটতে পারব না।” স্থা আবার ঠেলা দিয়া বলিল, “আমাদের জন্তে খেটে খেটে ত তোমার হাড়ে খুণ ধরে গেছে, এখন নিজের জন্তে একটু দয়া ক'রে খাট। তপন বাবুর গ্রাম দেখতে আমরা যাব, তুমি যাবে কি না বল।”

শিবু চোখ কচল-ইয়া উঠিয়া বসিয়া খানিক কি ভাবিল, তাহার পর বলিল, “আচ্ছা, যেতে পারি।”

গ্রাম বেশী দূরে নয়, কলিকাতার বাহিরেই একটা নীচু ধরণের জায়গায়। কক্ষির বেড়ার উপর মাটি লেপা খড়ের চাল কিম্বা হোগলার ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট বাড়ী। খুব কাছে কাছে পান-বোঝাই অসংখ্য ডোবা ও পুকুর; যে ডোবা-গুলি বর্ষার আকস্মিক জলে হুট হইয়া পথের মাঝখানে পড়িয়াছে, তাহার উপর ছুই-তিনটা বাঁশ ফেলিয়া সৰু সঁকে

তৈয়ারী হইয়াছে। গ্রামের ভিতরে পথ বলিতে তেমন কিছু নাই। মাঠের উপর ও ক্ষেতের আলের উপর দিয়া পার্শ্ব-চলা পথ উচু নীচু হইয়া কখনও কাদায় নামিয়া কখনও খান-খন্দ ডিঙ্গাইয়া চলিয়াছে। পুরুষে কাঁধে বোঝা লইয়া, স্ত্রীলোকে ছেলে কোলে করিয়া, রাখাল বালক গরু তাড়াইয়া সব এই পথেই চলিয়াছে। মাঝে মাঝে চূণ বালি খসিয়া-পড়া নোনা-ধরা ফাটা দেয়ালের পাকা বাড়ী খিড়কির পুকুরের উপর সুঁকিয়া পড়িয়াছে।

স্থাদের খার্ড ক্লাস গাড়ীতে চড়িয়া সকলকে একটা স্টেশন হইতে হাটিয়া যাইতে হইবে। তপন বলিয়াছে গ্রামে সে গ্রামের মানুষদের মত খার্ড ক্লাসেই যায়। কাজেই সকলেই তাই চলিল। শিবু ও সতু দুই বালকও ইহাদের সঙ্গে লইয়াছে, কারণ তাহারা পাড়ারগায়ে ছোটোপাটি করিতে ভালবাসে। হাওড়া স্টেশনে গিয়া দেখা গেল কোথা হইতে সুরেশ ও আসিয়া জুটিয়াছে। স্থা ও হৈমন্তী তাহাকে সচরাচর দেখিতে পায় না, আজ অনেক দিন পরে তাহাকে দেখিয়া দুই জনেই খুশী হইল।

তপনের পিতামাতা এই গ্রামেরই মানুষ। কার্য-উপলক্ষে নানা দেশ-বিদেশে বাস করিয়া এখন তাঁহারা কলিকাতার বাসিন্দাই হইয়াছেন। কিন্তু গ্রামে তাঁহাদের ঘরবাড়ী সমস্তই আছে। তিন চার বিঘা জমির উপর পাকা বাড়ী, গোয়াল, টেকিশাল, পুকুর, নারিকেল গাছের সারি, দুই দশটা আম কাঠাল, একোণে-ওকোণে বাঁশঝাড়—কিছুই অভাব নাই। গ্রীষ্মকালে আম-কাঠালের সময় বৎসরে একবার করিয়া তাঁহারা গ্রামে আসেন। গরমের দিনে দুই বেলা পুকুরের জলে ডুব দিয়া স্নান করিতে, সকাল সন্ধ্যা গাছের ডাব কাটিয়া গেলাস ভর্তি ভর্তি জল খাইতে এবং প্রত্যহ নিজের হাতে কল পাড়িয়া ফুল তুলিয়া টুকরী বোঝাই করিতে বাড়ীর ছেলে-বুড়া সকলেরই খুব ভাল লাগিত। কিন্তু বৃষ্টির দিনে গ্রামের পথে চলিতে গেলে এক হাঁটু কাঁদা না ভাঙিলে চলে না, গ্রামের ভাঁতি কুমার কামারেরা পেটের ভাতের অভাবে পরের বাগান রাতারাতি উজাড় করিয়া কিম্বা পোড়োবাড়ীর মরজা জানালা আসবাব চুরি করিয়া অভাব মোচনের চেষ্টা করে দেখিয়া তপনের বড় কষ্ট হইত। প্রত্যেক বৎসরই দেশে আসিয়া দেখা যাইত বাড়ীর কাঠ-কাঠরা এটা ওটা সেটা কত

কি চুরি গিয়াছে। জিনিষ কিছুই মূল্যবান নয়, কিন্তু বার বার চুরি যাওয়ার অস্থবিধা আছে, মাহুকের উপর বিশ্বাসও একেবারে চলিয়া যায়।

তখন এম-এ পাস করিবার পর এই গ্রামের কাজ লইয়াই থাকিবে ঠিক করিয়াছিল। গ্রামে একটা ইন্সুল খুলিয়া ও গোটা দুই-চার তাঁত বসাইয়া প্রথম সে কাজ আরম্ভ করে। উত্তর কাজের জন্তই তাহাদের বাড়ীতে স্থান যথেষ্ট ছিল। তার পর ধীরে ধীরে লাইব্রেরী, পথ মেরামত, ঔষধ বিতরণ, বন্ধক রাখিয়া অতি সামান্য হ্রদে কর্কি দেওয়া, কুস্তির আখড়া ইত্যাদি নানা জিনিষের ধীরে ধীরে সূত্রপাত হইতেছে। মাহুকের উপার্জনশক্তি ও সততার উন্নতির দিকেই তাহার সকলের চেয়ে নজর বেশী।

পড়ন্ত রৌদ্রে মাঠের পথ ভাঙিয়া তাহারা যখন গ্রামে পৌছিল তখন সারাদিনের রৌদ্রে মাটি ভাঙিয়া ঝাঁঝ উঠিতেছে। তপনের ইন্সুলের ছেলেরা অতিথিদের জন্ত তাহার বাড়ীর বারান্দা ঘাটখানিক আগেই ধুইয়া রাখিয়াছিল। এখন তাহাতে শীতল পাটি পাতিয়া দিয়াছে। প্রত্যেকের পা ধুইবার জন্ত একটি করিয়া মাজা গাছুতে জল ও তাহার উপর লাল গামছা দিয়া রাখিয়াছে। মেয়েদের জন্ত বিছানার চাদরের পরদা টাঙাইয়া বাঁশের টাটের ঘেরা হাত মুখ ধুইবার স্থান করিয়াছে।

সকলের হাত পা ধোয়া হইলে তখন বলিল, “এবার তোমাদের আতিথ্যের আসল আয়োজন দেখি।”

বড় বড় পাখরের থালা হাতে ছেলেরা দেখা দিল। থালায় মুগের ডাল ভিজা, ছানার টুকরা, চিনি, পানফল, শাঁখআলুর টুকরা, পাকা কলা, আম, অন্ন করিয়া সব সাজানো। একটি করিয়া পাখর-বাটিতে বেগের পানা, ও পাখরের •গেলাসে ডাবের জল।

এক জন আধুনিক ভাবাপন্ন ছেলে একটা কাঁসার থালায়
← উপর গুটি চার করিয়া পেয়ালা পিরিচ সাজাইয়া আনিয়া বলিল, “আমাদের চা ঠোন্ড সবই আছে, ক’ পেয়ালা চা করব বলুন, ক’রে দিচ্ছি।” মেয়েদের লক্ষ্য করিয়াই বিশেষ ভাবে বলা হইতেছিল, কাজেই জবাব তাহাদেরই দিতে হইবে। স্বধা বলিল, “আমার বেশী চা খাওয়া অভ্যাস নেই, আমার জন্তে চা করবেন না।”

ছেলেটি না দমিচা বলিল, “আমি কোকোও ক’রে আনতে পারি, পাঁচ মিনিট মাত্র সময় লাগবে, বেশী দেবী হবে না।”

হৈমন্তী বলিল, “কোকোর প্রয়োজন নেই, বেগের পানা ডাবের জল খেয়ে আর কি কিছু খাওয়া যায়?”

ছেলেটি অগত্যা পেয়ালা পিরিচ লইয়া চলিয়া গেল।

নিখিল বলিল, “ওহে তপন, ছেলেদের শহর ও গ্রামের এমন সমন্বয় করতে শিখিও না। এতে ত মাহুকের আয় বাড়বে না, ব্যয়ই বাড়বে।”

তখন বলিল, “সমস্ত বিছাই গুরুর কাছ থেকে শেখা বলতে মাহুকের আত্মসম্মানে একটু লাগে, তাদের স্বল্প বিজ্ঞা এবং জ্ঞানও যে কিছু আছে, তাও ত তারা দেখাতে চাইবে।”

এই বাড়ীতেই স্কুলের ঘর, জলযোগের পর ছেলেরা দেখাইতে লইয়া চলিল। বেশ বড় বড় ঘর, কোন ঘরে মাহুর পাতিয়া ক্লাস হয়, কোন কোন ঘরে বেকি এবং ডেক্সও আছে।

নিখিল জিজ্ঞাসা করিল, “তোমাদের ইন্সুলে এমন জাতিভেদ কেন? কেউ বসে রাজাসনে আর কেউ বসে একেবারে মাটির কোলে?”

তখন বলিল, “ছেলেদের জিজ্ঞাসা কর কেন জাতিভেদ।”

একটি ছেলে রসিকতাক্রমে গম্ভীরভাবে গ্রহণ করিয়া উত্তর দিল, “যে সব ছেলেদের বয়স কম তারা নিজেদের জন্তে বেকি তৈরি করতে পারে না, তাই তাদের মাহুর কিনে দেওয়া হয়। আমরা কাঠের কাজ শেখবার জন্তে নিজেদের জিনিষই আগে তৈরি করতে শিখি।”

মহেন্দ্র বেকিতে হাত ব্লাইয়া বলিল, “কাপড়চোপড় ছেঁড়বার সস্তাবনা অবশ্য আছে, কিন্তু তাহলেও এরা জিনিষ মন্দ করে নি। নিজেদেরই কাপড় ছিঁড়লে পরের বার সাবধান হয়ে খোঁচা পেরেকগুলোর উপর নজর দেবে।”

ছেলেদেব ডেক্সের সঙ্গে দেরাজও ছিল। মহেন্দ্র একটা দেরাজ টানিয়া দেখিল চাকিবন্ধ। তখন বলিল, “চাবি ছেলেদের কাছে আছে। ওহে আজকে কার চাবির পালা নিয়ে এস দেখি।”

হৈমন্তী বিস্মিত হইয়া বলিল, “চাবির পালা মানে?”

তপন বলিল, “ছেলেদের জিনিষপত্রের ভার প্রত্যেকের উপর আলাদা করে নয়। এক এক দিন এক এক জন সকলের জিনিষপত্রের ভার নেয়। সেদিন সকলের চাবি তার কাছে থাকে। যদি কারও কোন জিনিষ হাবায় তার জন্ত সে দায়ী হয়।”

নিখিল বলিল, “তুমি কি টেমট নট এর (‘লোভে ফেলো না’র) উল্টা খিওরি প্রচার করছ?”

তপন বলিল, “একটু এক্সপেরিমেন্ট করে দেখছি, মানুষ এই রকম ক’বে লোভ জয় করতে পারে কি না। পরকে ঠিকানো আর পরের জিনিষ চুরি করা মানুষের যে সেকেণ্ড নেচার হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এর কবল থেকে উদ্ধার না পেলে আর মুক্তি নেই।”

শিব বলিল, “মুক্তি আছে তপন-দা, যদি সেই রকম মার মারা যায়, যাতে জীবনে আর কোনদিন গায়ের ব্যথা না সারে।”

সকলে হাসিয়া উঠিল। সতু বলিল, “তাহলে যাদের গায়ের জোর বেশী, তারা সব চেয়ে বেশী চুরি করবে।”

তপন বলিল, “মানুষের শক্তি আর স্বযোগ থাকলেও সে যে নিলোভ হতে পারে এবং সমাজগত ও ব্যক্তিগত ভাবে তাতেই যে মানুষ লাভবান হয়, এটা লোকে কবে শিখবে জানি না।”

মহেন্দ্র বলিল, “যে-দেশের শ্রীকৃষ্ণ বলে গিয়েছেন ‘মাকলেবু কদাচন’ সে দেশেব কাছে তোমার এ ফিলসফি ত অতি সামান্য জিনিষ।”

তপন বলিল, “সামান্য হতে পারে, কিন্তু বিরাটটা বোঝাবাব বুদ্ধি পর্যন্ত যাদের লোপ পেয়ে গেছে, তারা সামান্যটা শিখলেও যে মুমূর্ষুর জল গণ্ডুষ হয়। ছোট হতে হতে আমরা ত মরতে বসেছি। বিদেশের লোকের কাছে মুখ দেখাতেও আমাদের লজ্জা করে যখন মনে করি ‘আমার দেশের কত লোক জীলোককে একলা পেলে তার মান মর্যাদা বাখে না, অসহায় দেখলে তার সর্বস্ব কাডতে পারে আর সামান্য ছুঁচাব পরসাব জন্তেও চোর কি ঠগ নাম নিতে লজ্জা পায় না।”

স্কুল ঘর ছাড়িয়া সকলে বাগানে চলিল। বাগানে

প্রত্যেক ছেলেকে ছোট ছোট জরি দেওয়া হইয়াছে তরকারির ক্ষেত করিবার জন্ত।

তপন বলিল, “ছেলেরা নিজেদের বাড়ীতে এই তরকারী নিয়ে যেতে পারে, বিক্রীও করতে পারে। বিক্রীর লাভের পরসাব অর্ধেক স্থল পায়।”

হৈমন্তী বলিল, “বাড়ীর নাম করে সব তবকারী বেচেও ত পরসাব ওরা নিজে নিতে পারে।”

তপন বলিল, “পারে বটে, কিন্তু এটা আমাদের স্থলের ছেলের পক্ষে একটা মোরতর অন্তায়। কেউ ধরা পড়লে তাকে স্থল থেকে বাব করে দেওয়া হয়। এমন কি কারও বাড়ীর লোকে বাগানের জিনিষ চুরি কবেছে জানা গেলে সে বাড়ী ছেলেদের আর নেওয়া হয় না।”

সুখা বলিল, “আপনি ভয়ানক কড়া মাষ্টার। এ সব বিষয়ে এই রকম কড়াই কিছু হওয়া উচিত। ‘আহা গরীব বেচারী’ বলে আমরা যে ছেড়ে দি, সেটাই ওদের আরও মাটি করে।”

সুখাব কথায় উৎসাহিত হইয়া তপন তাহার মুখেব দিকে চাহিয়া বলিল, “এই একটা গ্রামের ছেলেগুলোকে যদি মানুষ করে মরতে পারি, বুঝব পৃথিবীর কোন একটা কাজে লাগলাম।”

মহেন্দ্র বলিল, “বিলেত থেকে ঘুরে এসে যখন একটা সার্ভিসে ঢুকবে আর মাস গেলেই এক গোছা নোট পাবে, তখন কি তোমার এত কথা মনে থাকবে?”

তপন বলিল, “পরকে লোভ জয় করতে গেঁথাতে হ’লে নিজের লোভটা আগে জয় করতে হয়। ওসব সার্ভিস-টার্ভিসের কোন আশা আমি রাখি না, রাখতে চাইও না।”

শিব বলিল, “আপনি যে কেবল বলেন, ‘বিলেত যাব বিলেত যাব’, তবে কি করতে যাবেন সেখানে?”

তপন হাসিয়া বলিল, “তোমারও কিউরিওসিটি (কৌতুহল) হয়েছে? যাব শুধু বিলেত নয়, যুরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, সর্বত্র পৃথিবীর আর সব মানুষ আমাদের চেয়ে কত উন্নত তাই দেখতে। শুনেছি অনেক, চোখেও ত দেখা দরকার।”

শিব বলিল, “শুধু দেশ দেখতে আপনার বাব এত পরসাব

দেবেন? আমাকে কেউ দিত ত আমি সারা পৃথিবী ঘুরে আসতাম।”

তপন হাসিয়া বলিল, “বাবা টাকা না দিলে কি আর যাওয়া যায় না? আমি নিজেই না হয় দেব। মাটি কুপিয়ে একলা মাহুষের খরচ কি আর জমাতে পারব না?”

শিবুর আত্মসম্মানে যা লাগিল, বলিল, “অল রাইট, আমিও মাটি কুপিয়ে টাকা রোজগার করব। এই পড়াটা শেষ হোক না, দেখুন ঠিক আপনার চেলা হব।”

স্বধীন্দ্র বাবু এতক্ষণ নীরবেই দলের সঙ্গে ঘুরিতে ছিলেন, তিনি বলিলেন, “গুটি কতক মেয়েকেও তোমার চেলা করে নাও না হে তপন; মেয়েরা যদি কাজে না নামে ত মেয়েদের টেনে-তুলবে কে?”

হৈমন্তী ও কৃষ্ণা সাগ্রহে তপনের মুখের দিকে তাকাইল। স্বধা কিছু বলিতে পারিল না; হৈমন্তী বলিল, “আমার পড়া শেষ হয়ে গেলে আমি আপনার গ্রামে কাজ করতে আসব।”

মহেন্দ্র বলিল, “আমাদের দেশ এখনও এতটা উন্নত হয় নি যে ঘর ছেড়ে অল্পবয়স্ক মেয়েরা বাইরে কাজ করতে এলে সেটাকে ভাল চোখে দেখবে। তোমার বাবা কখনই এ সব পছন্দ করবেন না।”

হৈমন্তী বলিল, “যখন যথেষ্ট বড় হব, তখন ভাল কাজে যদি বাবা বাধা দেন, তাহলেও কি বাবার কথা মেনেই চলতে হবে?”

মহেন্দ্র বলিল, “অবশ্য হবে। তুমি যে অল্প বয়সে সব কিছুতেই তাঁর মুখাপেক্ষী।”

হৈমন্তী বলিল, “আচ্ছা, দিন আহুক, দেখা যাবে। বাবা বাধা দেবেন, আগে থেকে ধরে নিতে চাই না, আর ‘যদিই দেন তখন অন্ত পছা আছে কি না সেই দিনই ভাবব।’

মহেন্দ্র স্বধাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি বলেন?”

তপনও যেন স্বধার উত্তর শুনিবার জন্য সরিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বধার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে একটু খামিয়া একটু খামিয়া অনেক কষ্টে বলিল, “আমার এখনও জবাব দেবার সময় আসে নি। আমি এই পর্যন্ত বলতে পারি যে ঘরে বসে যথাসাধ্য এই কাজে আমি আপনাদের সহায় হ’তে চেষ্টা করব।”

তপন যেন একটু নিরাশ ভাবে অশ্রুদিকে তাকাইল। স্বধা ব্যথিত হইয়া বলিল, “আমার ঘরের কর্তব্য বড় কি বাইরের কর্তব্য বড়, আমি এখনও ভাল করে ঠিক করতে পারি না। মন ত যুক্তিভরকের ধার ধারে না, মন এখনও ঘরকেই বড় করে রেখেছে।”

স্বধীন্দ্র বাবু বলিলেন, “তুমি খুব ওজন করে কথা বল দেখছি। মেয়েদের পক্ষে ঘরের কর্তব্য ফেলে বাইরে চলে আসা সহজ নয়। তুমি যে উৎসাহের মুখে সে কথাটা ভুলে বড় কথা বলতে চেষ্টা কর নি, দেখে আশ্চর্য লাগছে।”

মহেন্দ্র বলিল, “কিন্তু ঘরকে ফেলে আসবাব শক্তিও এক দল মেয়ের থাকা চাই, না হ’লে দেশকে দেখবে কে? যুদ্ধের সময় স্বামী পুত্রের কর্তব্য ভুলে যেমন পুরুষকে মরণের মুখে এগিয়ে যেতে হয়, আমাদের এই দুর্গতিব দিনে মেয়েদেরও তেমনি করে ঘর ভুলে পথে নেমে আসতে হবে।”

হৈমন্তী বলিল, “কথাটা সত্যি। ঘরকে ভোলায় সাধনাও আমাদের করা দরকার। দেখি আমি পেরে উঠি কি না।”

বাগানের পর তিন-চারটা পুকুরের মাঝখানে বীকা বীকা আলের মত পথ দিয়া তাহারা ছেলেদের কুস্তিবে আখড়া দেখিতে চলিল। পুকুরগুলো এত কাছে কাছে যে মাঝের পথটুকু কাটিয়া দিলেই এক হইয়া যায়। পথে পাশাপাশি দুই জন চলা যায় না, একের পিছনে এক করিয়া চলিতে হয়। পুকুরের জলে মেয়েরা বাসন মাজিতে, কাপড় কাচিতে, গা ধুইতে নামিয়াছে, আবার কেহ ঘড়া করিয়া সেই জলই ঘরে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। নিখিল বলিল, “আমাদের দেশে মানুষ এত মরে কেন না ভেবে, এততেও বেঁচে আছে কি করে তাই ভাবা উচিত। দেখছ ত কি খাচ্ছে আর কিসে মুখ ধুচ্ছে।”

তপন বলিল, “তবু ত এ গ্রামে খাবার জলের আমরা একটা আলাদা পুকুর রেখেছি।”

আখড়ার কাছে তেঁতুলতলায় বীধানো বেরীতে পাঁচ বৎসর হইতে পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের নানা বয়সের মানুষ কাজকর্ম ফেলিয়া জটলা পাকাইতেছে, আর গল্প কবিত্তেছে, কেহ বা বসিয়া অবাক হইয়া শুধু শহরের মেয়ে দেখিতেছে।

নিখিল বলিল, “এদের কি কোন কাজ নেই ?”
তপন বলিল, “গ্রামের মানুষ কাজ করতে চায় না।
ষত ক্ষণ পেটে এক মুঠো ভাত আছে, তত ক্ষণ ওরা বসে
থাকবে। তবু ত আমাদের পাল্লায় পড়ে অনেক কাজে
নেমেছে।”

অঙ্ককার ঘনাইয়া আসিতেছিল, সুধাবা বাড়ীর পথে
ঠেগনে চলিল। গ্রাম দেখিয়া তাহার ভাল লাগিল বটে,
কিন্তু মন অস্বাভাবিক বিষণ্ণ হইয়া গেল। জীবনে বড়
আদর্শের প্রতি তাহাব অদ্ভুত টান ছিল। আমাদের এই

হতভাগ্য দেশেই আদর্শ বড় হওয়ার প্রয়োজন বেশী, ইহা
সে বুঝিতে শিখিয়াছিল। ত্যাগের আনন্দ তাহার কাছে
মস্ত আনন্দ ছিল, তাই তাহার দুঃখ হইতেছিল এই দুর্ভাগ্য
দেশের জন্য সে ত কিছুই ত্যাগ করিতে পারিতেছে না।
দুঃখ হইতেছিল ওই দেবমূর্তির মত সুন্দর যুবাটির ত্যাগের
আদর্শের কাছে সে ত পৌছিতে পারিতেছে না। মনে
হইতেছিল ইহাকে তাহার প্রাণপ্রিয় কাজে একটুখানি
সাহায্য করিতে পারিলে যেন স্বধার নিজের জীবনটাও ধস্ত
হইয়া যায়, অথচ তাহার করিবার উপায় নাই। [ক্রমশঃ]

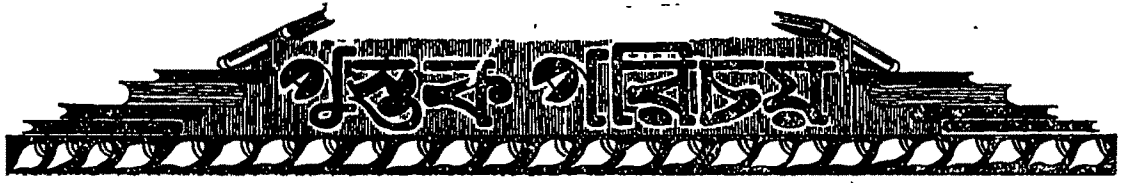
প্রণাম

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

তোমার কবিতা গানে ধনিয়া উঠেছে প্রাণে
নব নব সুর ;
বেজেছে তোমার বাণী, খুলেছে গুপ্তনখানি
প্রকৃতি-বধুর ।
তোমার সঙ্গীত-রাগে জীবনে জোয়ার জাগে
প্রখর ছুঁয়ার ;
ছুটি সাগরের পানে, উঠি আকাশের পানে,
এই ধরণীর ধূলি ভুলি বার বার ।
তোমারি যে কাব্য ধরি' জীবনের অর্থ করি
তোমার গানের সুরে স্বর্গ ছোঁয় ভূমি ।
বিশ্বের হৃদয় চেন, আমরা তোমারি জেনো,
আমাদের ভূমি ।

তোমার আনন্দচ্ছন্দ গুপ্তে আনে নব গন্ধ,
শশ্পে স্ত্রামলতা,
সে সুর নারীর মনে একটি পরম ক্ষণে
আনে কোমলতা ।
সে কবিতা কি যে বহে ! তীব্র শোভে রক্ত বহে
বীরের হৃদয়ে ।
আর সব সাধারণ, আর সব পুরাতন,
ভূমি তাহা নহে ।
তুনি গাথা, তুনি গান, সে-সব তোমারি দান,
লই তব নাম ;
আছে তারা, তুমি রবি, ওগো জীবনের কবি,
তোমারে প্রণাম ।

[ববীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে 'রবি-বাসবে'র অধিবেশন উপলক্ষে পঠিত]



বঙ্গীয় শব্দকোষ—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। শান্তিনিকেতন। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১০ আনা, ডাকমাওল এক আনা।

এই উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ বাংলা অভিধানখানির বিস্তারিত বিবরণ অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পূর্বে প্রবাসীতে দিয়াছেন এবং ইহার প্রশংসাও তিনি করিয়াছেন। আমরাও একাধিক, বাব ইহার পবিচয় দিয়াছি। ইহা যে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যাগায়ে, বাংলা দেশ ও আগামেব সমুদয় কলেজেব প্রত্যাগায়ে এবং সমুদয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রত্যাগায়ে রাখা উচিত তাহাও একাধিক বাব লিখিয়াছি। তন্মিন্ন জ্ঞানানুযায়ী বাঙালী মাত্রেবই, সামর্থ্য থাকিলে, পারিবারিক প্রত্যাগারে যে ইহা রাখা আবশ্যক, তাহাও বলা বাহুল্য।

ইহার ৪১শ খণ্ড বাহির হইয়াছে। তাহার শেষ শব্দ 'জিজ্ঞাসা'। ইহা চাবি ভাগে বিভক্ত এবং প্রায় ৪০০০ পৃষ্ঠায় শেষ হইবে। ১৩০৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাহির হইয়াছে। প্রথম ভাগ স্ববর্ণ ২৩ খণ্ডে শেষ হইয়াছে। প্রতি মাসে এক এক খণ্ড বাহির হয়। প্রতি খণ্ড ৩২ পৃষ্ঠা পবিমিত। এক একটি পৃষ্ঠা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রবাসীর পৃষ্ঠা অংশে স্বেচ্ছা ইচ্ছা করিয়া বড়। ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক ও বার্ষিক তিন নিয়মে মূল্য গৃহীত হয়। যে খণ্ডগুলি বাহির হইয়াছে প্রাকগণ্য স্থবিধা অনুসারে এক এক বাবে কয়েক খণ্ড করিয়া কিনিতে পারেন। শ্রীযুত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শান্তিনিকেতনে টাকা পাঠাইলে কিবা ভ্যালুপেয়েবল ডাকে পাঠাইতে বলিলে তদনুযায় ব্যবস্থা করা হয়। ঝাঁহারা কলিকাতার নগর কিনিতে চান, তাঁহারা কলেজ স্কোয়ারেব বুক কোম্পানীর দোকানে ও ২১০ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিটের বিশ্বভারতী প্রত্যাগারে অভিধানখানি পাইবেন।

প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাট্টা, এম্-এসসি, পি-আর-এস প্রণীত। প্রকৃতি কার্যালয়, ৫০ নং কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই বইখানি ২০১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহার পৃষ্ঠা লম্বায় প্রবাসীর সমান চৌডায় প্রবাসীর চেয়ে এক ইঞ্চি কম। ২০১ পৃষ্ঠার এত বড় বহির দাম এক টাকা অত্যন্ত কম।

পুস্তকখানি সাত্তিশয় প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানের অস্ত্রাস্ত্র শাখারও পরিভাষার এইরূপ গ্রন্থ রচিত হওয়া আবশ্যক। গ্রন্থকার তাঁহাব এই বইখানি রচনা করিবার নিমিত্ত বিষয়কর পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি প্রাণিবিজ্ঞানের ইংরেজী শব্দগুলির কেবল নিজের গড়া কথা বা প্রতিশব্দ দিয়া কর্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে মনে করেন নাই। তিনি বিভিন্ন পত্রিকা ও পুস্তক হইতে বাংলা সমার্থবোধক পরিভাষা সঙ্কলন করিয়াছেন। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবার এক অপরকে সেই

স্বযোগ দিবার অভিলাষে প্রকাশেব বর্ণানুক্রমে পারিভাষিক শব্দগুলি সাজাইয়াছেন। সংক্ষেপে নিজের মন্তব্যও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রত্যেক ইংরেজী শব্দের প্রাণিবিজ্ঞানবিষয়ক ইংরেজী অর্থ হেণ্ডবর্সনয়ুগলেব ইংরেজী অভিধান হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বাংলা পরিভাষা-শ্রেণীদের নামগুলি এবং কয়েকখানি দীর্ঘনাম মাসিকপত্রের নামসমূহ আভ্যন্তর সঙ্কেতে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অবিকাংশ স্থলে জার্মান, ফ্রেন্স, ইতালীয় ও লাতিন শব্দও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এখন শুধু বাংলা বিজ্ঞানয়ুগলের জন্ত নহে, বিশ্ববিজ্ঞানয়ুগের প্রবেশিকা পরীক্ষাব জন্তও বাংলা বহি লিখিত হইতেছে। মাসিকপত্রেও অনেকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন। অবৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং পুস্তকাদিতেও বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা আবশ্যক হয়। তন্মিন্ন, প্রাণিবিজ্ঞানের ছাত্র ও শিক্ষক মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুলগুলিতে এবং আয়ুর্বেদীয় বিদ্যালয়ে বিস্তার আছেন। সুতরাং বহুসংখ্যক শিক্ষিত লোকের এইরূপ পরিভাষাব বহি ব্যবহার করা আবশ্যক হইবে।

বঙ্গপরিচয়, প্রথম খণ্ড। হুবীকেশ সীরিজ্, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ৯ নং পঞ্চানন যোব সেনহু কলিকাতা ওরিয়েন্ট্যাল প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২।০ টাকা। পৃষ্ঠাব সংখ্যা প্রায় তিন শত। পৃষ্ঠার আকাব প্রবাসীর চেয়ে লম্বায় এক ও চৌডায় প্রায় দুই ইঞ্চি কম।

গ্রন্থকার "ভাবতপরিচয়" লিখিয়া ভাবতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ বেকশ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। "বঙ্গপরিচয়" লিখিয়া বাংলা দেশ সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভেব সেইরূপ উপায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই প্রকার অত্যন্ত দরকারী বহি লিখিয়া বাঙালীমাত্রেবই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

গ্রন্থখানি তাড়াতাড়ি প্রকাশ কবিবার জন্ত তিনি প্রথমার্ধ আগে ছাপাইয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডও শীঘ্র বাহির হইবে।

প্রথম খণ্ডে ২৭টি পরিচ্ছেদে বাংলা দেশের নিয়লিখিত বিষয়গুলিব বিবরণ দেওয়া হইয়াছে :—

বাংলা দেশ ; তাহার ভূতত্ত্ব, জলবায়ু, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, নৃত্ত্ব, ভাষা, সীমান্ত, আয়তন ও জনসংখ্যা, বিবাহ-জন্ম-মৃত্যু, প্রবাসী ও 'পরদেশী', স্বাস্থ্য ও ব্যাধি, শহর ও গ্রাম, উপজীবিকা, অক্ষম ও অকর্মণ্য, সমাজ ও বর্ণ, ইতিহাস, জাতীয় জীবন, শিক্ষা সাহিত্য, শাসন ও ব্যবস্থাপক সভা, শাসন-ও বিচার- বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, পুর্ন্তবিভাগ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, মুনিসিপালিটি, এবং জমির বংশাবলম্ব ও রাজস্ব।

বাংলার শিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার অস্ত্রাস্ত্র বিবরণ অপেক্ষা বিস্তৃততর বিবরণ লিখিয়াছেন। ঠিকই করিয়াছেন।

পুস্তকখানি লিখনপঠনকম বাঙালী মাঝেরই অবগুপঠ্য।

আমরা বহিখানির ভূমিকার একটি কথা সন্ধে কিছু বলিতে চাই। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :-

“বাঙালী ষ্ট্যাটিষ্টিক্স” খাঁটিতে চায় না; অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার সম্পাদিত এবং ডক্টর নবেন্দ্রনাথ লাহা পরিচালিত ‘আর্থিক উন্নতি’ এ বিষয়ে বাঙালীকে অনেকটা তৈয়ারী করিয়াছে। বাঙালী উচ্চ সংখ্যাতত্ত্ব আলোচনার মন দিয়াছে—তাহাব প্রমাণ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের চেষ্টায় Statistical Society স্থাপন। সংখ্যাতত্ত্বের দ্বারা দেশেব অবস্থা যত বিশদরূপে জানা যায়, এমন বোধ হয় আব কোনো বিজ্ঞানেব দ্বারা হয় না।”

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এবং ডক্টর নবেন্দ্রনাথ লাহা ষ্ট্যাটিষ্টিক্স সন্ধে বাহা কবিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই খুব প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁহাদের পত্রিকাখানি বাহিব হইবার আগে হইতেই অল্প কোন কোন মাসিকপত্র সংখ্যা দ্বারা ব্যস্ত অল্পবয়স্ক তথ্য বাঙালী পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আসিতেছে না কি? অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এই বিষয়ে কিছু করার ফলে “উচ্চ সংখ্যাতত্ত্ব আলোচনার” প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এরূপ ধারণা জন্মান বোধ হয় গ্রন্থকাবের অভিপ্রেত নহে।

রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রবেশক—

দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য তিন টাকা। শান্তিনিকেতন হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠাব সংখ্যা পঞ্চাশতাবিধ। পৃষ্ঠার আকার প্রবাসীভ চেয়ে মৈথ্যে এক ও প্রস্থে দুই ইঞ্চি ছোট। এত বড় পুস্তকেব তিন টাকা দাম বেশী নয়।

আমাদের মনে পড়িতেছে, এই গ্রন্থেব প্রথম খণ্ডেব পরিচয় দিবার সময় লিখিয়াছিলাম, যে ভবিষ্যতে যে-কেহ রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত লিখিবেন তাঁহাকে ইহাব সাহায্য লইতে হইবে। দ্বিতীয় খণ্ড সন্ধে এই কথা বলিতেছি।

গ্রন্থকাব কবির জীবন সন্ধে বহু তথ্য পাঠিয়াছিলেন ও সংগ্রহ করিয়াছিলেন অনেক। বিস্তার তথ্য এই গ্রন্থে তিনি নিবন্ধ কবিয়াছেন। তাহাব অধিকাংশ ঠিক বলিয়া মনে হইল। কিছু কিছু ভুলও কিছু আছে। সমুদয় দেখাইয়া দেওয়া এখানে সম্ভবপর হইল না। বর্ণগুচ্ছ এবং শব্দেব অপপ্রয়োগও আছে। তৎসমুদয়ের তালিকা দিতে পারিলাম না। শব্দেব অপপ্রয়োগের তিনটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। চতুর্থ পৃষ্ঠায় আছে, “মন তাঁহাব আদর্শবাদে, সৌন্দর্য্যবাদের ভূমিতে পরিপূর্ণ।” এখানে আদর্শবাদ শব্দটির প্রয়োগ ঠিক হয় নাই। ১৪শ পৃষ্ঠায় আছে, “সেটা ইহাদের মনেব ক্ষিপ্তসত্তা।” মনেব কি হাত আছে? ৩৩শ পৃষ্ঠায় আছে, “ইতিমধ্যে ম্যাকমিলান কর্তৃক ‘স্বীতাঞ্জলি’ প্রকাশিত হওয়ার উদ্যব ব্যাপ্তি খুবই হইয়াছিল।” এখানে ব্যাপ্তি শব্দটি অপপ্রয়ুক্ত হইয়াছে মনে হয়।

অনেক শব্দেব বানানে বাংলায় যেখানে রেকেব নীচে ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হয় গ্রন্থকাব সেখানে একটিমাত্র বর্ণ ব্যবহাব করিয়াছেন। যেমন তিনি সর্ব্ব পূর্ব্ব কর্তৃক, ধর্ম্ম, না লিখিয়া লিখিয়াছেন, সর্ব, পূর্ব, কর্তৃক, ধর্ম। কিন্তু বাঙালীরা ত উচ্চারণ করে না, সর্ব্ব, পূর্ব্ব

কর্তৃক, ধর্ম্ম, তাহারা হুটা ব, ত, ম উচ্চারণ করে—তাহা যত স্পষ্ট বা অস্পষ্টই হউক।

গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের পুস্তকসমূহের এবং নানা কার্যের ও মতের নিরপেক্ষ আলোচনা কবিবাব চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা প্রশংসনীয়। অবশ্য আমরা তাঁহার সব মন্তব্যের অম্লমোদন করি না। কোন কোনটির পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নাই। যেমন তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির কূট ব্যাপার ভাল বুঝেন না (৪৩১ পৃষ্ঠা)। এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত।

গ্রন্থকাব পুস্তকখানিকে জীবনী ভিন্ন রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রবেশকও বলিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক মন্তব্যগুলি কোন কোন স্থলে সাহিত্যরসসম্ভোগে পাঠকদিগকে সমর্থ করিবে, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহাদিগকে ভ্রমেও ফেলিবে। বাহা হউক আমাদের নিম্নেরও সাহিত্যসমালোচকের আসনে কোন দাবী নাই; সুতরাং এ-বিষয়ে অধিক কিছু লিখিব না।

এই গ্রন্থখানির দুই খণ্ড উপলব্ধ করিয়া পরে আমাব একটি প্রবন্ধ লিখিবাব ইচ্ছা আছে। তাহাতে কতকগুলি সামান্ত কথা থাকিবে যেকণ বা বাহা অপেক্ষা সামান্ত বহু তথ্য এই গ্রন্থে আছে। এই ভ্রান্ত আপাততঃ আর কিছু না লিখিয়া, গ্রন্থকারেব পরিচয়ের প্রশংসা কবিয়া এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত সন্ধে জ্ঞানলাভের পক্ষে এই গ্রন্থের একান্ত আবশ্যকতা দেখ্চার স্বীকাব করিয়া, আমাব বক্তব্য শেষ করি।

প্রান্তিনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক

সম্ভাব সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—বিহারভারতী গ্রন্থালয় কলিকাতা। মূল্য ১০ আনা।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের প্রান্তিন ছাত্রছাত্রীদের যে উপদেশ দিয়াছেন সেইগুলি এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি আশ্রমটিকে কি রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন কিরূপ একটি সম্পূর্ণ জীবনেব আদর্শ এখানে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, কেমন করিয়া তিনি প্রথম প্রথম ইহার কাজ করিতেন কিরূপ পরিশ্রম করিতেন তাঁহার আর্থিক অসচ্ছলতা সন্ধেও কি কবিতেন, সকলের মধ্যে কিরূপ একটি প্রীতিব সূত্র ছিল—এবং নানা বিষয় সন্ধে এই পুস্তক হইতে জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়। পড়িতে পড়িতে কত মনোজ্ঞ চিত্র মানসচক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। ইহা কেবল শান্তিনিকেতনেব প্রান্তিন ছাত্রদের নহে, অল্প বহু পাঠকপাঠিকারও সমাদর লাভ করিবে। ইহাব চিত্রগুলিও আশ্রম সন্ধে ধারণা স্পষ্টতর করিবে।

বিখ্যাজননীতির কথা—ডাঃ ভারকনাথ দাস, এম্-এ,

পিএইচডি কর্তৃক লিখিত। সর্ব্বস্বতী লাইব্রেরী ১ নং বমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য এক টাকা আট আনা।

রেলওয়ে, স্ট্রিমার ও এনোপেনেব কল্যাণে পৃথিবীটা ছোট হইয়া গিয়াছে। তাবের সাহায্যে টেলিগ্রাফ ও বেতারবার্তা দ্বারাও অল্প এক প্রকাবে পৃথিবীটা ছোট হইয়াছে। ছাপাখানাব, ফোটোগ্রাফী এবং ফোটোগ্রাফের সাহায্যে ছবি প্রস্তুত কবিবার প্রক্রিয়ার নানা উন্নতি হওয়ার পৃথিবীর দূরতম স্থানের ও তথাকাব

জীবজন্তু ও মানুষদের সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হওয়া আগেকার চেয়ে খুব সহজ হইয়াছে। এইরূপ অবস্থার সব দেশের সব জাতির মানুষের মধ্যে সম্ভাব্য ও মৈত্রী স্থাপিত হইলে ও বাড়িলে অশ্বের বিষয় হইত। বিশ্বমৈত্রীই ইচ্ছা অনেকের মধ্যে জন্মিয়াছেও। কিন্তু হুঃখের বিষয় দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে ভীষণ সংঘর্ষ ও যুদ্ধ এবং তাহার সম্ভাবনা অধিক হইয়াছে। এখন কেবল নিজের দেশের রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি বুঝিলেই চলিবে না—সব দেশ ও জাতির ভাগ্য পরস্পরের সহিত জড়িত। এই জন্ত, যেমন পাকা ব্যবসাদার হইতে হইলে পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রের বাজারদর জানিতে হয় তেমনি সম্যক জ্ঞানবিশিষ্ট রাষ্ট্রনীতিবি—বিশেষতঃ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের কৰ্ম্ম—হইতে হইলে বিশ্বরাজনীতির খবরও রাখিতে হইবে। আমরা আদার ব্যাপারী জাহাঙ্গীর খবরে আমাদের কি দরকার?—বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। শ্রীযুক্ত তাবকনাথ দাস মহাশয়ের এই গ্রন্থখানি পাঠকদিগকে বিশ্ববাস্তবীকরণে জানিতে বুঝিতে সমর্থ করিবে। ইহার ভাষা সহজ।

র. চ.

হুনিয়াদারী—ঈচাকচন্দ্র দত্ত প্রণীত। প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

বইখানি পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছি। যদিও ছোটগল্পের বই আজকাল নাকি বাজারে অচল, তবু পাঠককে খুশি কবির বা ক্ষমতা ইহাদের কিছুমাত্র কমিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য ছোটগল্পগুলি বাস্তবিক ছোটগল্প হওয়া চাই। উপন্যাসকে চাপিয়া ছোট করিয়া দিলেই ছোটগল্প হয় না। বীরবলের ভাষায় প্রথম তাহা ছোট হওয়া দরকার। দ্বিতীয়, গল্প হওয়া প্রয়োজন। আলোচ্য বইখানিতে যে গল্পগুলি আছে তাহা ঐ মাপে মাপিলেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। দত্ত-মহাশয় পাকা লেখক হুনিয়ার সহিত কাববার তাঁহার বহু দিনের। জীবনের ঐতিক বা কমিক কোন দিকটাই তাঁহার চোখ এড়ায় নাই। কেবল জীবনের হুঃখ আর বেকার-সমস্যা সমাধানের চেষ্টার আজকাল অধিকাংশ বাংলা গল্প লেখক ব্যতিব্যস্ত, দত্ত-মহাশয়ের কল্যাণে আমরা একটু মুখ বদল করিয়া বাঁচিলাম।

শ্রীসীতা দেবী

রবীন্দ্র-জীবনী ২য় খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক ও অধ্যাপক বিশ্বভারতী। ১৩৪৩। মূল্য ৩/- পৃঃ ৪২২। গ্রন্থকাব কর্তৃক প্রকাশিত। ২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, টিকানার বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়েও পাওয়া যায়।

‘রবীন্দ্র-জীবনী’র বর্তমান খণ্ডে, ১৩১২ সালে ৫১ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের বিলাত-ভ্রমণ হইতে আৰম্ভ করিয়া ১৩৪৩ সালে ৭৫ বৎসর বয়সে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতিবাদ-সভার তাঁহার সভাপতিত্ব পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রমুখী কর্ম্মাবলী বিবৃত হইয়াছে। দেশে ও বিদেশে রবীন্দ্রনাথ যে অসামান্য শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়াছেন, (সাময়িক এমন কি রুট সমালোচনার সহিত অংশতঃ একান্ত হইয়া থাকিলেও যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি—নিবিড়, সত্য ও একান্ত) —ওহু সার্বভৌম কবির নিকট

তাহা নিবেদিত হয় নাই, সর্ববিধ দৈন্ত ভয় ও বন্ধন হইতে যিনি আমাদের মুক্তি চাহিয়াছেন, ও তাহার সাধনকল্পে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছেন, সেই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যেও তাহা নিবেদিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেব আলোচনা যথোচিত না হউক কথঞ্চিৎ হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম ও মনীষার আলোচনা এখনও সম্যকরূপে কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। সে-বিষয়ে বাঁহারা আলোচনা করিতে চাহেন, নিষ্ঠা- ও বহুশ্রম-প্রসূত এই তথ্য-গ্রন্থখানি তাঁহাদের নিকট সমাদর পাইবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রন্থকার তথ্য-সংগ্রহে বেরূপ প্রশংসনীয় নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন গ্রন্থেব আলোচ্য বিষয়েব গঠনসৌষ্ঠবে সেরূপ নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই; তথ্যের দিক দিয়াও মুখ্য ও গৌণ নির্বাচন পূর্বক তুচ্ছ ও অনাবশ্যক বিষয়েব পবিত্রকনে সেকপ পটুতা দেখাইতে পারেন নাই। এই বহি পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের কোন ভাব-মুষ্টি পাঠকের মনে জাগ্রত ও বহুমূল হয় না। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন “বাহা লিখিয়াছি তাহাকে ইতিহাস বলা যায় না, বলা উচিত ক্রনিকেল। পাঠকদের সম্মুখে তাঁহার বিচিত্র কর্ম্মমর, কাব্যময় জীবনের ঘটনাগুলি সাজাইয়া দিয়াছি।” কিন্তু মাত্র ক্রনিকেল কি “জীবনী” হইতে পারে? পূর্বোদ্ধিখিত কারণে ও ক্রতগতি বিবরণ-প্রণালীতে আলোচ্য বিষয়েব সত্য পবিচয়ের ধারা গ্রন্থের বহু স্থানে ব্যাহত হইয়াছে। ক্রনিকেল-রূপে বিচার করিলেও ঘটনাগুলি যথোচিত নৈপুণ্যের সহিত “সাজাইয়া” দেওয়া হইয়াছে কিনা সন্দেহ; কেবল ঘটনার পারস্পর্য্যরক্ষাকেই “সাজাইয়া” দেওয়া বলা চলে কি? আলোচ্য বিষয়ের সহিত মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ সংশ্লিষ্ট কোন কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার অনেক সময় হুবে বসিয়া গিয়াছেন, বহু সামান্য ও অবাস্তব বিষয়েও প্রবেশ করিয়াছেন—তাতে মূল বিষয়ের প্রতি পাঠকের চিত্ত আকর্ষণের আশুকুল্য হয় নাই।

আর একটি কথা। সমগ্র জীবিত পূর্বতন সহকর্ম্মীদের সম্বন্ধে অপর এক জন সহকর্ম্মিকে সত্যের অস্ববোধে বিকপ মন্তব্য প্রকাশিত করিতে হইলেও, তাহা শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহিত করা বাঞ্ছনীয়। এই পুস্তকেব অনেকস্থানে এই গুণটি লক্ষিত হয় না।

গ্রন্থখানি মূল্যবান বলিয়াই ইহার ত্রুটিগুলিও তুচ্ছ কবা চলে না। রবীন্দ্রনাথের জীবনের সাধারণতঃ বিস্তৃত ও অপরিজ্ঞাত বহু ঘটনা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; এরূপ শ্রম ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী ইতিপূর্বে একত্র সংকলিত হয় নাই, গ্রন্থকারই এ-বিষয়ে পথপ্রদর্শক।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বাংলা শব্দতত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

এই গ্রন্থে বাংলা শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই বাংলা ভাষা প্রাকৃত ভাষা পুস্তক ইহাব ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়, বাংলা ব্যাকরণ। বাংলা চলিত ভাষার অর্থৎ কলিকাতা অঞ্চলের শিক্ষিত লোকের ভাষার সংস্কৃত শাসনের সীমা কত দূর স্বাভাবিক ভাবে আছে এবং কত দূর জোর করিয়া চালানো হইতেছে

তাহা এই বইখানির সাহায্যে ভাল করিয়া বোঝা যায়। বাংলা ভাষায় কথা আমবা সকলেই বলি, বাংলার লিখিও আমরা অনেক; কিন্তু এই ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবাব অবসর আমাদের অল্প লোকেরই আছে। আমবা বাংলাব নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ চালাই, আবাব বাংলার নামে কখনও স্বরচিত ভাষাও চালাই, কোন আইন আমরা মানি না। চলতি বাংলা আজকাল সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিকই নিজের ইচ্ছামত মাতৃভাষাকে বাঁকাইয়া চুরাইয়া সাহিত্যের দরবাবে দাঁড় করাইতেছেন। ইহাতে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের বড়ই বিপদে পড়িতে হইবে। কাহার ভাষাকে বাংলা ভাষা বলিয়া যে তাহার প্রহণ করিবে ভাবিয়া পাইবে না। রবীন্দ্রনাথের “বাংলা শব্দতত্ত্ব” বাঙালী প্রত্যেক সাহিত্যিকের পড়া উচিত এবং তাঁহাব সপক্ষে বা বিপক্ষে যাহার যাহা বলিবার আছে তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত।

এই বইখানিতে বাংলা ব্যাকরণের সমগ্র রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহা বৈয়াকরণিকদের বাংলা ব্যাকরণ রচনায় বিশেষ সহায় হইবার অধিকারী।

‘বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত’ ‘ভাবাব ইঙ্গিত’ ও ‘অম্মবাদ-চর্চা’ এই প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্যিকদের অনেক শিখিবার জিনিষ আছে। অন্তর্ভুক্তিতেও অবশ্য আছে, তবে সবগুলির নাম এখানে কবাব প্রয়োজন নাই।

সাহিত্যের পথে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, “বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান, মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তাঁব সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে বিষয়ের সাধারণ্য নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক কিছুই আসে যায় না। মানুষ কল্পনার জগতে হোতে চায় নানা থানা, রামও হয়, হুম্মানও হয়, ঠিকমতো হোতে পারলেই খুসি।”

এই কথাগুলিই বাব-বাব নানা রকমে তিনি এই পুস্তকে বলিয়াছেন। কিন্তু এ ছাড়া আবও যা বলিয়াছেন সন্দেশে তাহার মর্ম বলা আমাদের পক্ষে সহজ নয়। ভূমিকার শেষে তিনি যাহা বলিয়াছেন শুধু সেইটুকু তুলিয়া দিই, “মনস্তত্ত্বের কোঁড়ুল চরিতার্থ কবা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধিতে মাংলামির অসংলগ্ন এলোমেলো অসংবদ্য এবং অপ্রমত্ত আনন্দের গভীরতা প্রায় সমান আসন পায়। কিন্তু আনন্দ সজ্ঞাগে স্বভাবতই মানুষের বাহ-বিচাব আছে। কখনো কখনো অতিতৃপ্তির অস্বাস্থ্য ঘটলে মানুষ এই সহজ কথাটা ভুলব ভুলব কবে। তখন সে বিরক্ত হয়ে স্পষ্টতার সঙ্গে কুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাতে চায়। কুপথ্যের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, তাই মুখ বখন মরে তখন তাকেই মনে হয় ভোজ্যে চরম আরোহণ। কিন্তু মন একটা স্তব্ধ হয়...তখনকার সাহিত্য দ্বৈগুণ আধুনিকতার ভঙ্গিমা ত্যাগ করে চিরকালীন সাহিত্যের সঙ্গে সরলভাবে মিশে যায়।”

এই বইখানিতে ১২৯৮ হইতে ১৩৪১ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের প্রাক্তিত্য বিষয়ক বচন আছে। সকল সাহিত্যসমিধান ও সাহিত্যব্যবসায়ীর ইহা পড়িয়া দেখা দরকার। শ্রীশান্তা দেবী

দুর্গাপূজা-চিত্রাবলী। শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবিষ্ণু-পদ রায়চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৬। ক্রাউন চার পেজি ৭০+১/০ পৃষ্ঠা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কখন কখন এমন একটা কাজ করিয়া বসেন যাহার কোন কাবণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া পর্য্যালোচনা করিলে যে-পরিমাণ কল্পনার অভাব ও আড়ষ্ট পরামর্শগতিকতার প্রভাব লক্ষিত হয়, তাতে চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী মহাশয়দের এই পুস্তকটির প্রকাশ পুরাপুরি ব্যাখ্যাত হয় না। অতএব এই শিল্প, সাহিত্য, কল্পনার রূপকথাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হঠাৎপ্রাপ্ত ওতবুদ্ধিব দল বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। কষ্টকল্পিত অথবা কষ্ট-আন্তে ‘মিসিস’ প্রচাব করিয়া পাণ্ডিত্য খ্যাতি অর্জনই যে-পণ্ডিতবৃন্দের চিরস্বামী আবেগ, তাঁহাব যে এই ময়ল, হুম্মব, চিত্রকথাটি প্রকাশ করিয়া বাংলাব পাঠকসাধারণের মনোবঞ্জন চেষ্টা করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য হইলেও প্রশংসনীয়। পুস্তকটিতে কঠোর ধর্মতত্ত্বকে এতটা সহজ ও উপভোগ্য আকারে পাঠকের হস্তে দেওয়া হইয়াছে, যাহা হিন্দুধর্ম-প্রচারের ইতিহাসে বর্তমান কালে আর কোথাও হয় নাই। যাহারা হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের নিকটও শুধু চিত্রসাহিত্যের দিক দিয়া ও পুবাণের সহজ ব্যাখ্যান হিসাবে পুস্তকটির আদর হইবে।

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভুতিটি অপূর্ণ হইয়াছে। “ক্যামেরা” যে প্রাণের ধবব কখনও পায় না এই চিরে চৈতন্যদেব সেই ধববটি পূর্ণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আমরা আশা কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই জাতীয় প্রচেষ্টা এইখানেই শেষ হইবে না। যে মাটির আশ্রয়ে সরস ও হুম্মব তরলতা প্রাপ্ত পাইয়া ধরার বন্ধ অলঙ্কৃত করিয়া পৃথিবীবাসীকে আনন্দ দেয়, সেই মাটিই আবাব আশ্রয়ের স্পর্শে ইষ্টকের রূপ ধারণ করে। জ্ঞান ও বিভাও তেমনই কখন বিদ্যার্থীকে পুষ্ট দান করে, আবাব কখন অতিপাণ্ডিত্যের তেজে এমন রূপ ধারণ করে যাহাতে বিদ্যার্থী সে জ্ঞান ও বিদ্যার প্রভাবে শুধু আত্মতৃপ্তি নয়—মনের, প্রাণের, জীবনের কোন আশ্রয় তাহাতে পায় না। স্বতরাং শুধু কটিন প্রাণহীন বিদ্যার আড়ত হইয়া থাকিা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই ভাল নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্ব নেতা শ্রীহুস্ত শ্রীমানপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মনে সম্ভবতঃ কোন নূতনতর প্রেরণার সঞ্চার হইয়াছে। ইহা অতি আনন্দ ও আশার কথা।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

লে মিজেরাবল্—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। কমলিনী সাহিত্য মন্দির, ২২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা মাত্র।

‘নীলপাখী’র লেখক শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই শিশুসাহিত্যে যে প্রতিভা অর্জন করিয়াছেন ভিত্তর হৃগোব সবিখ্যাত উপন্যাস ‘লে মিজেরাবল্’ বহিখানি বাংলা দেশের বালকবালিকাদের উপাস্য করিয়া প্রকাশ করিয়া তিনি সেই প্রতিভা কায়ম করিয়া লইলেন। পৃথিবীর উপন্যাস-জগতে মহত্তম জীবনের যতগুলি আদর্শ আছে জীবন ভালবাসন (জীবন ভালবাসা) তাহাদের অন্ততম। বাংলা দেশের ছেলেকদের শৈশবেই সেই আদর্শের সহিত পরিচয়ের স্ববোধ্য করিয়া দিয়া গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অভিভাবকদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। মূল পুস্তকখানি স্ববহু, পৃথিবীর বৃহত্তর উপন্যাসের ইহা একটি, ইহার ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক অংশ-শিল্পের নিকট নীরস ঠেকিতে পারে। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়

পুস্তকটির গদ্যংশ অতি সহজ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাষা ও ভাবের দিক দিয়া এই পুস্তকটি অতিভাবকেরা নির্বিক্রে তাহাদের ছেলেমেয়েদের হাতে দিতে পারেন; এই বৃঙ্গে শিশুসাহিত্যের কোনও পুস্তক সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। পুস্তকটির ছাপা বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপটের ছবিটি স্থূলব। চিত্রসমভাবে পুস্তকটির মূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তিস্তিডী—ছেলেদের সচিত্র কবিতা। শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কুম্ভ লাইব্রেরী, ২২ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ১০।

‘সুস্তিপথের কবি প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাঁহারা এক সময়ে প্রবাসীর পৃষ্ঠায় দেখিয়া বাংলা সাহিত্যে নতুন ও শক্তিশালনের আবির্ভাব সম্ভাবনার পুলকিত হইয়াছিলেন বাহিরের চাপে নিরুদ্ধবাক্য প্রত্যন্ত বাবু অনেক দিন তাহাদের আশাতঙ্গ-দোষে দোষী ছিলেন। শিশুসাহিত্যপথে আবার তিনি যাত্রা শুরু করিলেন ইহা অত্যন্ত আশার কথা। মিল ও ছন্দের এমন মিশ্র হাত দুই—এক জনের আছে, কিন্তু এই সরস ও সহজর অনুভূতি অক্ষত দ্রলভ। তিস্তিডী যে ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিবে তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। ছবিগুলিও খুব সুন্দর হইয়াছে। কবি লিখিয়াছেন,

তিস্তিডী তিনবৃগে আজগুবি যুটি ;

বুড়োদের টুক লাগে, ছেলেদের মিষ্ট।

আমরা বুড়া হইরাছি, কিন্তু তিস্তিডী মিষ্টই লাগিল।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

লেখন

শ্রীসাধনা কর

রঙীন আবরণে ঢাকা নীলাভ কাগজে
এল তোমার দূতী,
দূরের পরশ রাঙিয়ে গঠে মনে।
বসে আছি একা—
সামনে তোমার লেখা চিঠি,
আকাশে ফিকে মেঘের জটলা,
নীচে জনাকীর্ণ নগরী,
উডছে ধূলা,
হাঁকছে ফিরিওয়াল,
ছুটে চলে চক্ষুধান ;
বসন্ত যে এসেছে তার খবর দিল
গৃহস্থের খাচায় বাঁধা কোকিল
অতি কাতর স্বপ্ননে।
সমস্ত ছাপিয়ে ভেসে বেড়ায় কার ছবি।—
বিবশ হুপু
ফাঙনে ধরেছে আমার বোল

আকাশের গল্প—শ্রীক্ষিত্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম-এস-সি
প্রণীত। ভট্টাচার্য গুপ্ত এণ্ড কোং লি প্রকাশিত। দাম সাড়ে বারো
আনা।

ছেলেমেয়েদের বইখানি পড়িতে ভালই লাগিলে। লেখকের দৃষ্টি
বৈজ্ঞানিকের,—লেখনী সাহিত্যিকের। তিনি এই তারকার বিষয়ে
মূল কথাগুলি সোজা ভাষায় বেশ সরস করিয়াই বলিয়াছেন।

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

মেঘমল্লার—শ্রীজগেন্দ্রকুমার শ্রাম প্রণীত। মিনার্জ প্রেসে
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত। ক্রিয়মগ্ধ, শ্রীহট্ট। দাম আট
আনা।

ইহা একখানি একান্ত গীতি নাটক। আমাদের দেশে মনস্তত্ত্বের সঙ্গে
বিশেষ বিশেষ সত্য এবং সৌন্দর্য্য বিশাইয়া যে সব শ্রেষ্ঠ গীতি নাটকের ও
পর্য্যন্ত যুগ্ম হইয়াছে এই নাটিকাখানি যে তাহার অন্ততম ইহা দৃঢ়তা-
সঙ্গে বলা যাইতে পারে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে সাক্ষার এবং সজীব করিয়া তাহাকে বস্তুরূপে
টানিয়া আনা এবং সেই অভিল্লিখ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে মুগ্ধি দ্বারা নাটকে
সজীব করিয়া বিভিন্ন রসাতত্ত্বের সাহায্যে তাহাকে পাঠকসমাজে
পরিবেশন করা সাধারণ গ্রন্থকারের দ্বারা সম্ভবপর নহে। বিশেষ প্রতিভা
এবং সেই প্রতিভা কবিত্বমণ্ডিত হওয়ার চাই। গ্রন্থকারের সেই প্রতিভা
এবং কবিত্ব শক্তি দুইই আছে। তাহাব ফলস্বরূপ সৌন্দর্য্য এই নাটিকা
অপকপ সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

সত্যকার সৌন্দর্য্যবোধসম্পন্ন সাহিত্যসেবিকের নিকটে এই
‘মেঘমল্লার’ অক্ষর হইয়া থাকিবে।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

একটা পথহাবা স্রমের ভুল সন্ধান
শুনশুনিয়ে বেড়াচ্ছে,
নির্জল ঘরে
আলসে এলিয়ে দিয়েছে দেহ
থসেছে আঁচল,
কপালের উপর উড়ে পড়ছে
অশান্ত চুল।
সামনের টেবিলে চিঠি লিখবার কাগজ ;
খুঁটিনাটি সরঞ্জাম,
—টাইমপিস্ বেজে চলেছে।
আনমনে মুখে কুটে হাসির রেখা,
মনে অজানা ব্যথা বাজে,
ভরে গেল রঙীন পাতা লেখাতে।
যে বঁধু ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে
ধরা দিল তোমার দীঘল চোখে,
প্রবাসের পরশখানি তোমারি ঘরে।

সেতু

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

হঠাৎ সন্ধ্যাকাত শিশুকণ্ঠের কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল...পাশের ঘর হইতে কে যেন জলদমস্ত স্বরে বলিল,—
'লিখে রাখ, ওরা চৈত্র রাত্রি ১টা ১৭ মিনিটে জন্ম'...

রাত্রে এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। কিছুতেই তুলিতে পারিতেছি না; এত স্পষ্ট, এত অদ্ভুত। আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অহিদন্ত রঞ্জুল, বৃদ্ধ অসিধাবক তণ্ডু, লালসাময়ী রম্মা—

এ কি স্বপ্ন? না—আমারই ময়চেতস্তের স্বভিকন্দর হইতে বাহিব হইয়া আসিল আমার পূর্বতন জীবনের ইতিবৃত্ত। পূর্বতন জীবন বলিয়া কিছু কি আছে? যত্ন হইয়া জানি, কিন্তু সেইখানেই ত সব শেষ। আবার সেই শেষটাকে স্মৃক ধরিয়া নূতন কোনও জীবন আরম্ভ হয় নাকি?

আমার স্বপ্নটা যেন তাহারই ইঙ্গিত দিয়া গেল। একটা মানবের জীবন—সে মাছুষটা কি আমি?—উল্টা দিক দিয়া দেখিতে পাইলাম; এক যত্ন হইতে অল্প জন্ম পর্য্যন্ত। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে ফুল ফল আবার বীজ—ইহাই জীব-জগতের পূর্ণ চক্র। কিন্তু এই চক্র পরিপূর্ণ ভাবে আমাদের দৃশ্যমান নয়, মাঝখানে চক্রাংশ খানিকটা অব্যক্ত। যত্নাব পর আবার জন্ম—মাঝ দিয়া বিশ্ববণের বৈতরণী বহিয়া গিয়াছে। আমার স্বপ্ন যেন সেই বৈতরণীর উপর সেতু বাঁধিয়া দিল।

সত্যই কি সেতু আছে? আমি বৈজ্ঞানিক, কল্পনার ধার ধারি না। আলোকরশ্মি ঋজু রেখায় চলে কি না, এই বিষয় লইয়া গত তিন বৎসর গবেষণা করিতেছি। কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। কাল আমার কাজ শেষ হইয়াছে। হাঙ্কা মন ও হাঙ্কা মস্তিষ্ক লইয়া শয়ন করিতে গিয়াছিলাম। তার পর ঐ স্বপ্ন! ভাবিতেছি,

এ-স্বপ্ন যদি অলীক কল্পনাই হয়, তবে সে এই সকল অদ্ভুত উপাদান সংগ্রহ করিল কোথা হইতে? আমার জাগ্রত চেতনার মধ্যে ত এ-সকল অভিজ্ঞতা ছিল না। কল্পনা কি কেবল শূন্যকে আশ্রয় করিয়া পল্লবিত হয়? রক্তের মধ্যে সামান্য একটু কার্বন-ডায়ক্সাইডের আধিক্য কি নিরবয়ব 'নাস্তি'কে মূর্ত বাস্তব করিয়া তুলিতে পারে?

জানি না। আমার যুক্তি-বিধিবদ্ধ বুদ্ধি এই স্বপ্নের আঘাতে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

যে-শিশু কাদিয়া উঠিল, সে কে? আমি? আর সেই জলদমস্ত কণ্ঠস্বর!—পুরাতন ডায়েরী খুলিয়া দেখিতেছি, ৩৫ বৎসর পূর্বে ওরা চৈত্র রাত্রি ১টা ১৭ মিনিটে আমার জন্ম হইয়াছিল।

দেখিতেছি, আমার সম্মুখে অত্যুজ্জল অজার-পিণ্ড জলিতেছে। বৃহৎ অজার-চুল্লী, ভজার ফুৎকারে উগ্র নিধূম প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, আবার ভজার বিরামকালে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ রক্তিমবর্ণ ধারণ করিতেছে। এই অগ্নির মধ্যস্থলে প্রোথিত রহিয়াছে আমার অসি-ফলক।

কক্ক ঈষদঙ্ককার; চাবি দিকে নানা আকৃতির লৌহ-ফলক বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কোনটি খড়্গের আকার ধারণ করিতে কবিত্তে সহসা থামিয়া গিয়াছে; কোনটি নগের আকারে শূল অথবা মুদগরে পবিণত হইবাব আশায় অপেক্ষা করিতেছে। প্রাচীরগাত্রে স্তম্ভসম্পূর্ণ ভল্ল অসি লৌহজালিক সজ্জিত বহিয়াছে। অজার-পিণ্ডের আলোকে ইহার ঝলসিয়া উঠিতেছে, পুনবায় ম্লান অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে।

এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে স্বপ্নলোকে জাগিয়া উঠিলাম। জলন্ত চুল্লীর অদূরে বেজাসনে বসিয়া আমি করলয় কপোলে দেখিতেছি, আর অসিধাবক তণ্ডু অগ্নির সম্মুখে বসিয়া ভজা চালাইতেছে।

এই দৃশ্য আমার কাছে একান্ত পরিচিত, তাই বিস্মিত হইতেছি না। চেতনার মধ্যে ইহার সমস্ত পূর্ব-সংযোগ নিষ্ক্রিয়ভাবে সঞ্চিত রহিয়াছে। এই ছায়াঙ্ককার-কক্ষটি উজ্জ্বলিনীর প্রসিদ্ধ শব্দ-শিল্পী তত্ত্বর যন্ত্রাগার। আমি দক্ষিণ মণ্ডলে উপনিবিষ্ট শকবাহিনীর এক জন পত্তিনায়ক—আমার নাম অহিন্ত রঞ্জুল। আমি তত্ত্বর যন্ত্রাগারে বসিয়া আছি কেন? অসি সঙ্ঘার করিবার জন্ত? তত্ত্বর মত এত বড় অসি-শিল্পী শুনিয়াছি শক-মণ্ডলে আর নাই, সে অসিতে এমন ধার দিতে পারে যে, নিপুণ শিল্পী তাহার দ্বারা আকাশে ভাসমান কাশ-পুষ্পকে দ্বিধাশিত করিতে পারে। কিন্তু এই জন্মই কি গত বসন্তোৎসবের পর হইতে বার-বার তাহার গ্রহে আসিতেছি?

চুম্বী আলোকে তত্ত্বর মুখের প্রত্যেক রেখাটি দেখিতে পাইতেছি। শীর্ণ, রক্তহীন মুখ; শুষ্ক ও ক্ষয় রোম চুম্বীর দাহে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, গণ্ডের চর্ম ক্ষুণ্ণিত হইয়া হ্রস্ব-অস্থিকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। ললাটের দুই প্রান্ত নিম্ন। অস্থির বক্র নাসিকা এই জরাবিধবস্ত মুখের চর্মাবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইবার প্রয়াস কবিতোছে। মুখখানা দেখিলে মনে হয় মৃতের মুখ, শুধু সেই মৃত মুখের মধ্যে কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু দুটা অস্বাভাবিক রকম জীবিত,—ভ্রমরেক মুখ সর্পের চক্ষুর মত যেন একটা বিবাক্ত জিহ্বাস্য বিকীর্ণ করিতেছে।

তত্ত্বর যন্ত্রচালিতের মত কাজ করিতেছে। আমার অসি-ফলক অঙ্গার হইতে বাহির করিয়া রসায়ন-মিশ্র জলে ডুবাইতেছে, সন্তর্পণে ফলকের ধার পরীক্ষা করিতেছে, আবার তাহা অঙ্গারমধ্যে প্রোথিত করিতেছে। তাহার মুখে কথা নাই, কখনও সেই সর্পচক্ষু আমার দিকে ফিরাইয়া অতর্কিতে আমাকে দেখিয়া লইতেছে, তাহার গীত-দন্ত মুখ ঈষৎ বিস্তৃত হইয়া বাইতেছে, অথরোষ্ঠ একটু নড়িতেছে—যেন সে নিজ মনে কথা কহিল—তার পর আবার কণ্ঠে মন দিতেছে।

আমিও তাহার পানে চাহিয়া বসিয়া আছি, কিন্তু আমার মন তাহাকে দেখিতেছে না। মন দেখিতেছে—কাহাকে?—রজা! লালসাময়ী কুহকিনী রজা! আমার ঐ উদ্ভট অসি-ফলকের জ্বালা কামনার শিখারূপিণী রজা!

একটা তীক্ষ্ণ বেদনা স্তূচীর মত হৃদযন্ত্রকে বিদ্ধ করিল। তত্ত্বর দেহ ভাগ করিয়া আপাদমস্তক দেখিলাম। এই জরাগলিত দেহ বৃদ্ধ রজার ভর্তা। রজা আর তত্ত্বর বৃকের মধ্যে একটা ঈর্ষা-কেনিল হাসি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল—ইহাদের দাম্পত্য জীবন কিরূপ? নিজের দেহের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। বক্ষে বাহুতে উদ্ভত পেশী আফালন করিতেছে—পঁচিশ বৎসরের দগ্ধিত যৌবন! তত্ত্বর শক-রক্ত যেন শুভ্র চর্ম ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে।—আমি গোলুপ চোরের মত নানা ছলে তত্ত্বর গৃহে যাতায়াত করিতেছি, আর তত্ত্বর—রজার স্বামী।

রজা কি কুহক জানে? নারী ত অনেক দেখিয়াছি,—তীরনয়না গর্বিতা শক-দুহিতা মদনোৎসবের ক্ষুরিতাধরা অবস্থিকা, বিলাসভঞ্জন গতি রতিকুশলা হাস্যময়ী লাট-ললনা। কিন্তু রজা—রজার জ্ঞাতি নাই। তাহার তাম্র-কাঞ্চন দেহে নারীত্ব ছাড়া আর কিছু নাই। সে নারী। আমার সমস্ত সত্তাকে সে তাহার নারীত্বের কুহকে জয় করিয়াছে।

একবার মাত্র তাহাকে দেখিয়াছি, মদনোৎসবের কুহুম-অরুণিত সায়াক্ষে। উজ্জ্বলিনীর নগর-উদ্যানে মদনোৎসবে যোগ দিয়াছিলাম। এক দিনেব জন্ত প্রবীণতার শাসন শিখিল হইয়া গিয়াছে। অবরোধ নাই, অবগুষ্ঠন নাই—লজ্জা নাই। যৌবনের মহোৎসব। উদ্যানের গাছে গাছে হিন্দোলা ঢুলিতেছে, গুল্মে গুল্মে চটুলচরণ নাগরিকার মঞ্জীর বাজিতেছে, অসম্মত অঞ্চল উড়িতেছে, আসব-অরুণ নেত্র তুলুতুলু হইয়া নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। কলহাস্য করিয়া কুহুমপ্রলিখদেহা নাগরী এক তরুণ্য হইতে গুল্মান্তরে ছুটিয়া পলাইতেছে, মধ্যপথে ধমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া দেখিতেছে, আবার পলাইতেছে। পশ্চাতে পুষ্পের জীড়া-ধন্থ হস্তে শবরবেশী নায়ক তাহার অঙ্গসরণ করিতেছে। নিতৃত লতানিকুলে প্রপন্নী মিথুন কানে কানে কথা কহিতেছে—কোনও যুগনয়না বিলম্বমুখে নিজ চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিতেছে—তুমি আমার চক্ষে কুহুম দিয়াছ! প্রপন্নী তরুণ সযত্নে তাহার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া অরুণাত নয়নের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে, তার পর ফুৎকার দিবার ছলে গুটু-হাস্ত-মুকুলিত রক্তাধর সহসা চুম্বন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে

মিলিত কণ্ঠের বিগলিত হান্ত লতামঞ্জুরের সুগন্ধি বায়ুতে শিহরণ তুলিতেছে।

শত শত নাগর নাগরিকা এইরূপ প্রেমোদে মত্ত—নিজের হৃদয়ে সকলেই নিমজ্জিত, অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর নাট। যৌবন চঞ্চল—বসন্ত ক্ষণস্থায়ী; এই স্বল্পকাল মধ্যে বৎসরের আনন্দ ভরিয়া লইতে হইবে। বৃহৎ কিংবদন্ত বৃক্ষমূলে বেদীর উপর স্নিগ্ধ সুরভিত আসব বিক্রয় হইতেছে—পৈণ্ডী গোড়ী মাধুক—নাগরিক নাগরিকা নির্বিচারে তাহা পান করিতেছে; অবসন্ন উদ্দীপনাকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া আবার উৎসবে মাতিতেছে। কঙ্কণ নৃগুর কেশবের ঘনৎকার, মাদলের নিকণ, লাস্ত্র-আবর্তিত নিচোলের বর্ণচ্ছটা, স্থলিত কণ্ঠের হান্ত-বিজড়িত সঙ্গীত;—নির্লজ্জ উন্মত্ত ভাবে কন্দর্পের পূজা চলিয়াছে।

নগর-উপবনের বীথিপথে আমি একাকী ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। মনের মধ্যে একটা নিলিণ্ড স্থাবশেষ ক্রীড়া করিতেছিল। এই সব রসোন্নত নরনারী—ইহারা যেন নট-নটী; আমি দর্শক। সুরাপান করিয়াছিলাম, কিন্তু অধিক নয়। বসন্তের লঘু-আতপ্ত ব্যতাসের স্পর্শে বাকশী-জনিত উল্লাস যেন আমার চিত্তকে আত্মস্থ-লিপ্সার উল্কে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। চারি দিকে অধীর আনন্দ-বিহ্বলতা দেখিতেছিলাম; মনে আনন্দের স্পর্শ লাগিতেছিল, আপনা আপনি উচ্চকণ্ঠে হাসিতেছিলাম, কিন্তু তবু এই ফেনোচ্ছল নর্ষ-শ্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিতেছিলাম না। আমি সৈনিক, নাগরিক সাধারণ আমাকে কেহ চিনে না; তাই অপরিসরের সঙ্কোচ ছিল; উপরন্তু এই অপরূপ মধু-বাসরে বোধ করি নিজের অজ্ঞাত-সারেই গাঢ়তর রসোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম।

উপবনের মধ্যস্থলে কন্দর্পের মর্ষর-দেউল। স্নরবীথিকার দেউল ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে, বাহতে বাহ শৃঙ্খলিত করিয়া লীলায়িত ভজিমায় উপাস্ত দেবতার অর্চনা করিতেছে। তাহাদের স্বল্পবাস মেহের মদালস গতির সঙ্গে সঙ্গে বেনী-বিসপিত কুম্ভল ছলিতেছে, চপল মেথলা নাচিতেছে। চোখে চোখে মদসিক্ত হাসির গুঢ় ইঙ্গিত, বিভ্রাৎক্ষুরণের স্তায় অতৃপ্তিত্ত্র প্রাবিলাস, যেন মদনপূজার উপচার রূপে উৎসৃষ্ট হইতেছে।

আমি তাহাদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলাম। পুষ্পধরা মদনবিগ্রহকে প্রণাম করিয়া মদনের কিস্করীদের প্রতি সহাস্ত দৃষ্টি ফিরাইলাম। আমাকে দেখিয়া তাহাদের নৃত্য বন্ধ হইল, তাহারা পুষ্প-শৃঙ্খলের মত আমাকে আবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তার পর তাহাদের মধ্যে একটি বিধাধরা যুবতী বিধা-মন্ডর পদে আমার সম্মুখে আসিল। আমার মুখের পানে চাহিয়া সে চক্ষু নত করিল, তার পর আবার চক্ষু তুলিয়া একটি চম্পক-অঙ্গুলি দিয়া আমার উন্মত্ত বক্ষ স্পর্শ করিল। দেখিলাম, তাহার কালো নয়নে কোন অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষার ছায়া পড়িয়াছে।

আমি কৌতুকভরে আমার কুঞ্চিত কেশ-বন্ধন হইতে একটি অশোকপুষ্প লইয়া তাহার চূড়া-পাশে পরাইয়া দিলাম, —তার পর হাসিতে হাসিতে নগরবধূদের বাহুরচিত্ত নিগড় ভিন্ন করিয়া গ্রহণ করিলাম।

ক্ষণকালের জন্য সকলেই মুক হইয়া রহিল। তার পর আমার পশ্চাতে বহু কলকণ্ঠের হান্ত বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিল। আমিও হাসিলাম, কিন্তু পিছু ফিরিয়া দেখিলাম না।

ক্রমে দিবা নিঃশেষ হইয়া আসিল। পশ্চিম গগনে আবীর-কুঙ্কমের খেলা আরম্ভ হইল। দিগ্ধরাও যেন মদন-মহোৎসবে মাতিয়াছে।

উজ্জানের এক প্রান্তে একটি মাধবীবিতানতলে প্রস্তর-বেদীর উপর গিয়া বসিলাম। স্থান নির্জন; অদূরে একটি কৃত্রিম প্রস্তবণ হইতে বৃত্তাকার আধারে জল বরিয়া পড়িতেছে। মণি-মেথলায়িত জলরাশি সারাক্ষর স্বর্ণাভ আলোকে টলমল করিতেছে, কখনও রবিরশ্মিবিদ্ধ চূর্ণ জলকণা ইন্দ্রধনুর বর্ণ বিকীর্ণ করিতেছে। যেন স্তম্ভরী রমণীর অধীর চঞ্চল যৌবন।

আলস্তম্ভিমিত অন্যমনে আলোকের এই জলক্রীড়া দেখিতেছি এমন সময় সহসা একটি কুঙ্কম-গোলক আমার বক্ষে আসিয়া লাগিল; অঙ্গ-আবরণ কাটিয়া সুগন্ধিচূর্ণ দেহে লিপ্ত হইল। সচকিতে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, একটি নারী লতাবিতানের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়া ক্ষণকালের জন্ত রুদ্ধবাক হইয়া গেলাম, বোধ করি হৃদয়ঙ্গের স্পন্দনও কয়েক মুহূর্তের জন্ত থামিয়া গেল। তার পর হৃদয় উন্নতবেগে আবার স্পন্দিত হইতে

লাগিল। চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বিস্ফারিত নেত্র
তাহার দেহের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া তাহার সম্মুখীন
হইলাম।

তাম্রকাননবর্ণা লোলযৌবনা তরুণী; কবরীতে মল্লী-
মুকুলের মালা জড়িত, মুখে চূর্ণ মনঃশিলার প্রলেপ,
কিংকটক-ফুল গুণ্ডাধর হইতে যেন রতি-মাদকতার মধু
ক্ষরিয়া পড়িতেছে। কর্ণে কর্ণিকার কলি গণ্ডের
উত্তাপে স্নান হইয়া গিয়াছে। পত্রলেখা-চিক্রিত
উরসে লুতা জালের ভ্রায় স্তম্ভ কঙ্করী, তদুপরি
স্বচ্ছতর উত্তরীয় যেন কান্দীরবর্ণ কুহেলী দ্বারা অপূর্ণ
চন্দ্রকলাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। নাভিতটে
আকৃষ্ট নিচোল; চরণ দুটি লাক্ষারস-নিষিক্ত।

এই বিমোহিনী মূর্তি কুটিল অপাঙ্গে চাহিয়া নিঃশব্দে
মুহু মুহু হাসিতেছে। তাহাকে আপাদমস্তক দেখিয়া
আমার বৃকের মধ্যে ভয়ের মত একটা অল্পভূতি গুরু গুরু
করিতে লাগিল। সহসা আমার এ কি হইল? এই ত
কিছুকাল পূর্বে মদন-পূজারিণীদের নীরব সঙ্কেত হাসিমুখে
উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখন!

অবরুদ্ধ অস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কে?

তাহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ বিদগ্ধ হইল, দশনপঙ্ক্তিতে
বিজলী খেলিয়া গেল। বক্সিম কটাক্ষে ঋদ্ধ বিলসিত
করিয়া সে বলিল—‘আমি রজা।’

রজা! তাহার কণ্ঠস্বর ও নামোচ্চারণের ভঙ্গীতে
আমার দেহে তীব্র বেদনার মত একটা নিপীড়ন অনুভব
করিলাম। আমি তাহার দিকে আর এক পদ অগ্রসর
হইয়া গেলাম। ইচ্ছা হইল—কি ইচ্ছা হইল জানি না।
হাসিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হাসি আসিল না।

মদনোৎসবে অপরিচিত তরুণ-তরুণীর সাক্ষাৎকার ঘটিলে
তাহারা কি করে? হাসিয়া পরস্পরের দেহে কুসুম নিক্ষেপ
করে, ছুই-চারিটা বজ্রকৌতুকের কথা বলে, তার পর নিজ
পথে চলিয়া যায়। কিন্তু আমি—মৃঢ় গ্রামিকের মত
তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শেষে আবার প্রশ্ন
করিলাম—‘কে তুমি?’

এবার সে ভদ্র কণ্ঠে কৌতুক ভরিয়া হাসিল, হাসিতে
হাসিতে বেদীর উপর আসিয়া বসিল; অথর নয়ন এবং

অর একটি অপূর্ণ চটুল ভঙ্গিমা করিয়া বলিল—‘দেখিয়াও
বুঝিতে পারিতেছ না? আমি নারী।’

কথাগুলি যেন দৈহিক আঘাতের মত আমার বৃকে
আসিয়া লাগিল। নারী—হাঁ, নারীই বটে। ইহা ভিন্ন
তাহার অন্ত পরিচয় নাই। পুরুষের অন্তর-গুহায় যে
অনির্বাক্ত নারী-স্বা জলিতেছে, এই নারীই বুঝি তাহাতে
পূর্ণাঙ্গীত দান করিতে পারে।

তার পর কতক্ষণ এই লতাবিতানতলে কাটিয়া গেল
জানি না। রজার লালসাময় যৌবনতরী, তাহার মাদক দেহ-
সৌরভ অগ্নিময় স্রবীর মত আমাব রক্তে সঞ্চারিত হইল।
আমি উন্নত হইয়া গেলাম। কিন্তু তবু—তাহাকে ধরিতে
পারিলাম না। ধনুকের গুণ যেমন বাণকে নিজ বক্ষে
টানিয়া লইয়াই দূরে নিক্ষেপ করে, রজা তেমনি তাহার
দেহের কুহকে বার-বার আমাকে কাছে টানিয়া আবার দূরে
ঠেলিয়া দিল। আমি তাহাকে স্পর্শ করিতে গেলাম,
সে চপল চরণে সরিয়া গেল—

বলিল ‘তুমি বুঝি ব্যাধ? কিন্তু স্বন্দর ব্যাধ, বল—
হরিণীকে কি এত শীঘ্র ধরা যায়?’

তদন্তরে বলিলাম, ‘আমি ব্যাধ নই, তুমি নিষ্ঠুর
শবরী—আমাকে বধ করিয়াছ। তবু কাছে আসিতেছ
না কেন?’

এবার সে কাছে আসিল। আমার স্পন্দমান বক্ষের
উপর একটি উষ্ণ রক্তিম করতল রাখিয়া ছদ্ম গাভীরো
বলিল, ‘দেখি।’ তার পর যেন ভ্রমভাবে ভ্রত সরিয়া গিয়া
কহিল, ‘কই বধ করিতে ত পারি নাই! বোধ হয়
সামান্য আহত হইয়াছ মাত্র। তোমার কাছে ঘাইব না,
তুনিয়াছি আহত ব্যাঘ্রের নিকটে ঘাইতে নাই।’

এই চটুলতার সম্মুখে আমি ব্যর্থ হইয়া রহিলাম।

তখন সে আবার আমার কাছে আসিল। কজ্জল-
দূষিত চক্ষু আমার সর্বাঙ্গ লেহন করিয়া একটা অর্ধ-নিশ্বাস
ত্যাগ করিল। অক্ষুট স্বরে কহিল, ‘তুমি বোধ হয়
ছদ্মবেশী কন্দর্প।’

আমি তাহার ছুই বাহু চাপিয়া ধরিলাম; শরীরের
ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেল। তাহাকে নিজের
দিকে আকর্ষণ করিয়া গাঢ় স্বরে বলিলাম, ‘রজা—’

এই সময় যেন আমার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া লতাবিতানের বাহিরে কিয়দূরে কর্কশ কণ্ঠে আহ্বান আসিল,—‘রজা—! রজা—!’

উৎকণ্ঠ হইয়া রজা শুনিল; তার পর হাত ছাড়াইয়া লইল। আমার মুখের দিকে চাহিয়া এক অদ্ভুত হাসি তাহার কিংকক্ষ্ম অথরে খেলিয়া গেল। সে বলিল, ‘আমার মদনোৎসব শেষ হইয়াছে। আমি গৃহে চলিলাম।’

‘গৃহে চলিলে!—যে ডাকিল সে কে?’

রজা আবার নিদাঘ-বিদ্যুতের মত হাসিল, ‘আমার—ভর্তা।’

অকস্মাৎ মৃদগরাবাতের মত প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া যেন বিমুগ্ধ হইয়া গেলাম—‘ভর্তা।’—

রজা লতাবিতানের ঘারের দিকে চলিল। যাইতে যাইতে গ্রীবা ফিরাইয়া বলিল, ‘আমার ভর্তাকে দেখিবে? লতার অন্তরালে লুকাইয়া দেখিতে পার।’ তীক্ষ্ণ বক্ষিম হাসিয়া রজা সহসা অদৃশ হইয়া গেল।

মূঢ়বৎ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম; তার পর লতামণ্ডপের পঙ্কজসরাল সরাইয়া বাহিরে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিলাম।

রজা আর তত্ত্ব মুখোমুখী দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধ তত্ত্বের সর্প চক্ষু সন্দেহে প্রাণর; রজার রক্তাধরে বিচিত্র হাসি।

তত্ত্ব কর্কশকণ্ঠে বলিল, ‘উৎসব শেষ হইয়াছে, গৃহে চল।’

রজা ক্লান্তবিজড়িত ভঙ্গীতে দুই বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া দেহের আলস্ত দূর করিল, তার পর বলিল, ‘চল।’

তত্ত্ব একবার লতাবিতানের দিকে কুটিল দৃষ্টিপাত করিল, একবার যেন একটু স্থিতি করিল, তার পর বৃদ্ধ ভঙ্কুরের মত বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিল। রজা মম্বর পদে তাহার পশ্চাতে চলিল।

যাইতে যাইতে রজা একবার নিজের কবরীতে হাত দিল; কবরী হইতে একটি রক্ত কুসুমক খসিয়া মাটিতে পড়িল।

আমি বাহিরে আসিয়া কুরুবকটি তুলিয়া লইলাম। রজা তখন দূরে চলিয়া গিয়াছে, দূর হইতে ফিরিয়া চাহিল। ‘প্রদোষের ছায়ামান আলোক যেন তাহার সর্বদা নিঃশব্দ সঙ্কেত করিয়া আমাকে ডাকিল।’

আমি দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। জনাকীর্ণ নগরীর বহু সর্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে রজা নগর-প্রান্তের এই দীন গৃহের অভ্যন্তরে অদৃশ হইয়া গেল। দেখিলাম, গৃহের প্রাচীরে দুইটি অসি চিত্রিত রহিয়াছে।

তার পর নানা ছুতা করিয়া অসিধাবক তত্ত্বের গৃহে আসিয়াছি। অধীর দুর্নিবার অন্তরে স্থির হইয়া বসিয়া হৃষোগেব প্রতীক্ষা করিয়াছি। তত্ত্বের যজ্ঞাগারের পশ্চাতে তাহার বাসগৃহ; সেখানে রজা আছে, দূর হইতে কচিং তাহার নৃপুংলিঙ্গন শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছি; চোখে মুখে উগ্র কামনা হয়ত প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তত্ত্ব কুটিল বক্র কণ্ঠকে আমাকে নিরীক্ষণ করিয়াছে। কিন্তু রজাকে দেখিতে পাই নাই—একটা তুচ্ছ সঙ্কেত পর্য্যন্ত না—

তত্ত্বের কর্কশ নীরস কণ্ঠস্বরে স্মৃতিতন্ত্রা ভাঙিয়া গেল। সচেতন হইয়া দেখিলাম, সে শীর্ণ অঙ্গুলির প্রান্তে আমার অসির ধার পরীক্ষা করিতেছে, আর কেশহীন দ্রু উন্মিত করিয়া শুষ্ক স্বরে কহিতেছে—‘অসির ধার আর বনিতার লজ্জা পরের জন্ত, কি বলেন পণ্ডিত-নাটক?’

বলিলাম,—‘অসির ধার বটে। বনিতার লজ্জার কথা বলিতে পারি না, আমি অনুচ্চ।’

‘আমি বলিতে পারি, আমি অনুচ্চ নহি—হা হা—’
তত্ত্বের গুণ্ঠাধর তৃণগর্ভ বায়সের মত বিভক্ত হইয়া গেল—
‘কিন্তু আপনি যদি অনুচ্চ, তবে এত তন্ময় হইয়া কাহার ধ্যান করিতেছিলেন? পরজীর?’

আকস্মিক প্রশ্নে নির্বাক হইয়া গেলাম, সহসা উত্তর জোগাইল না। তত্ত্ব কি সত্যি আমার মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে? আত্মসম্বরণ করিয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিলাম—‘কাহারও ধ্যান করি নাই, তোমার শিল্প-নৈপুণ্য দেখিতেছিলাম।’

বিকৃত হাস্য করিয়া তত্ত্ব পুনশ্চ অসি অঙ্গার মধ্যে প্রোথিত করিল, বলিল—‘অহিদন্ত রঞ্জুল, আপনি হৃদয়ের হৃৎপুরুষ, এই দীন অসিধাবকের কারু-নৈপুণ্য দেখিয়া আপনার কি লাভ হইবে? বরং নগর-উত্তানে গমন করুন, সেখানে বহু রসিকা নগর-নায়িকার কলা-নৈপুণ্য উপভোগ করিতে পারিবেন।’

আমার মনে একটু ক্রোধের সঞ্চারণ হইল। এই হীন-

জাত বৃদ্ধ আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। দ্বিৎ ক্রক স্বরে বলিলাম—‘আমি কোথায় যাইব না-যাইব তাহা আমার ইচ্ছাধীন। তুমি সেজন্য ব্যস্ত হইও না।’

তত্ত্ব আমার পানে একটা চকিত-গুপ্ত চাহনি হানিয়া আবার কার্ধ্যে মন দিল।

কিয়ৎকাল পরে বলিল—‘ভাল কথা, পত্তি-নাথক, আপনি ত বোদ্ধা; শত্রুর উপর অসির ধার নিশ্চয় পরীক্ষা করিয়াছেন।’

গভীর হাসিয়া বলিলাম—‘তা করিয়াছি। দুই বৎসর পূর্বে দেবপাদ বাহুদেব কণিক যখন তোমাদের এই উজ্জয়িনী নগরী অধিকার করেন, তখন বহু নাগরিকের কণ্ঠে আমার অসির ধার পরীক্ষা করিয়াছি।’

তত্ত্বর চক্ষু দুটা ক্ষণেক আমার মুখের উপর নিম্পলক হইয়া রহিল; তার পর শীৎকারের মত স্বর তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল—‘পত্তি-নাথক আপনি বীর বটে। কিন্তু সেজন্য কৃতিত্ব কাহার?’

‘কাহার?’

‘আমার—এই হীনজন্মা অসিধাবকের। কে আপনার অসিতে ধার দিয়াছে? আমারই মার্জিত অস্ত্রের সাহায্যে আপনারা আমার ভ্রাতা-পুত্রকে হত্যা করিয়াছেন, জী-কণ্ঠাকে অপহরণ করিয়াছেন।’

আমার মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। বলিলাম—‘শক-জাতি বর্কর নয়। তাহারা বৃদ্ধ করিয়াছে কিন্তু নারীহরণ কদাপি করে নাই।’

তত্ত্ব কণ্ঠে ধলতার বিষ মিশাইয়া বলিল—‘তা হইতে পারে। তবে বোধ হয় শকজাতি পরজীকে চুরি করিতেই পটু।’

ক্ৰোধের শিখা আমার মাথায় জলিয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বর অভিশ্রাবও বুঝিতে পারিলাম; সে আমার সহিত কলহ করিতে চাহে—যাহাতে আমি আর তাহার গৃহে না আসি। রন্ধার লালসায় আমি তাহার গৃহে আসি ইহা সে বুঝিয়াছে। কিন্তু বুঝিল কি করিয়া?

কষ্টে ক্ৰোধ দমন করিয়া বলিলাম—‘তত্ত্ব, তুমি বৃদ্ধ, তোমার সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে চাহি না। আমার অসি যদি তৈয়ার হইয়া থাকে, দাও।’

সে অসি জলে ডুবাইয়া আবার অঙ্গুলির সাহায্যে ধার পরীক্ষা করিল। বলিল—‘অসি তৈয়ার হইয়াছে।’

তত্ত্বর সহিত কলহ করিয়া আমার লাভ নাই। তাহাকে তুষ্ট করিবার অভিশ্রায়ে আমি পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম—‘এই লও পঞ্চ নাগক—তোমার পুংস্কার।’

তত্ত্বর দুই চক্ষু সহসা তাহার অঙ্গারকুণ্ডের মতই জলিয়া উঠিয়া আবার নিবিয়া গেল। সে চেষ্টাকৃত ধীর স্বরে বলিল, ‘আমার পরিশ্রমের মূল্য এক নাগক মাত্র। বাকী চার নাগক আপনি রাখুন, অন্তত প্রমোদ ক্রয় কবিত্তে পারিবেন।—কিন্তু অসির ধার পরীক্ষা করিবেন না?’

উদগত ক্রোধ গলাধঃকরণ করিয়া আমি বলিলাম, ‘করিব, দাও।’ বলিয়া হাত বাড়াইলাম।

তত্ত্ব কিন্তু অসি দিবার কোনও চেষ্টাই করিল না, তির্যক চক্ষু চাহিয়া বলিল, ‘পত্তি-নাথক, নিজের উপর কখনও নিজের অসির ধার পরখ করিয়াছেন? করেন নাই। তবে এইবার করুন।’

বৃদ্ধের হস্তে আমার অসি একবার বিদ্যুতের মত বলসিয়া উঠিল। আমার শিরজ্ঞাণের উপর একটি শিখি-পুচ্ছ রোগিত ছিল, দ্বিখণ্ডিত হইয়া তাহা ভূতলে পড়িল।

এইবার আমার অবরুদ্ধ ক্রোধ একেবারে ফাটিয়া পড়িল। এক লম্ফে প্রাচীর হইতে খড়্গ তুলিয়া লইয়া বলিলাম, ‘তত্ত্ব, বৃদ্ধ শৃগাল, আজ তোমার কণ্ঠচ্ছেদন করিব।’ জলন্ত ক্রোধের মধ্যে একটা চিন্তা অকস্মাৎ স্মৃতি মত মস্তিষ্কে বিদ্ধ করিল—‘তত্ত্বকে যদি হত্যা করি তাহাতেই বা দোষ কি? বরং আমার পথ পরিষ্কার হইবে।’

কিন্তু তাহাকে আক্রমণ কবিত্তে গিয়া দেখিলাম—কঠিন ব্যাপার। বিন্ময়ে আমার ক্রোধ ডুবিয়া গেল। জর-শীর্ণ তত্ত্বর হস্তে অসি ঘুরিতেছে রথ-নেমির মত, অসি দেখা যাইতেছে না, কেবল একটা ঘূর্ণমান প্রভা তাহাকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। আমি হট্টিয়া গেলাম।

গরলভরা স্বরে তত্ত্ব বলিল, ‘পত্তি-নাথক অহিহস্ত রঞ্জল, লতা-মণ্ডপে লুকাইয়া চপলা পরজীর অঙ্গস্পর্শ করা সহজ, পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করা তত সহজ নয়।’

আবার তাহাকে আক্রমণ করিলাম। বুঝিতে বাকী

রহিল না, তত্ত্ব আরম্ভ হইতেই আমার অভিপ্রায় জানে। লভাবিতানে চুরি করিয়া আমাদের দেখিয়াছিল। কিন্তু এত দিন প্রকাশ করে নাই কেন? আমাকে লইয়া খেলা করিতেছিল?

অসিতে অসি লাগিয়া ক্ষুণ্ণ ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্য বৃদ্ধের কৌশল, সে একগদা হটিল না। আমি ঘোড়া, অসিচালনাই আমার জীবন, আমি তাহার অসি-নৈপুণ্যের সম্মুখে বিষহীন উরগের স্রাব নির্বীৰ্য্য হইয়া পড়িলাম। অপ্রত্যাশিতের বিষয় আমাকে আরও অভিভূত করিয়া ফেলিল।

অকস্মাৎ বজ্র-নির্বোধের মত তত্ত্বের স্বর আমার কর্ণে আসিল,—‘অহিদন্ত রঞ্জুল, শক-লম্পট, এইবার নিজ অসির ধার নিজবক্ষে পরীক্ষা কর—’

তার পর—কি যেন একটা ঘটয়া গেল।

অবাক হইয়া নিজের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম, অসির বাঁকা ফলক আমার বক্ষপঙ্ক্তরে প্রোথিত হইয়া আছে।

তত্ত্ব আমার পঙ্ক্তর হইতে অসি টানিয়া বাহির করিয়া লইল। আমি মাটিতে পড়িয়া গেলাম। একটা তীব্র মৈহিক যন্ত্রণা যেন আমার চেতনাকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। আর কোনও ক্রেশ অল্পভব করিলাম না। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত অল্পভব করিলাম, তত্ত্ব কর্ণ উল্লাসে বলিতেছে, ‘অহিদন্ত রঞ্জুল, রক্তা তোমাকে বধ করে নাই, বধ করিয়াছে তত্ত্ব—তত্ত্ব—তত্ত্ব—’

* * *

আমার দেহটার সহিত আমার যেন একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সে আমাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি বায়ুহীন কারা-কূপে আবদ্ধ বন্দীর মত প্রাণপণে মুক্ত হইবার জন্য ছটফট করিতেছি। এই টানাটানি ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। তার পর হঠাৎ মুক্তিলাভ করিলাম।

প্রথমটা কিছুই ধারণা করিতে পারিলাম না। তত্ত্বের যন্ত্রণাহে আমি দাঁড়াইয়া আছি, আমার পায়ে কাছে একটা বলিষ্ঠ রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া আছে। আব, তত্ত্ব ঘরের কোণে খনিজ দিয়া গর্ত খুঁড়িতেছে এবং ভয়াবহ চোখে বার-বার মৃতদেহটার পানে ফিরিয়া তাকাইতেছে।

ক্রমে মনন শক্তি ফিরিয়া আসিল। বুঝিলাম, তত্ত্ব আমাকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য! আমি ত মরি নাই! ঠিক পূর্ব্বের মতই বাঁচিয়া আছি। অনির্করচনীয় বিষয় ও হর্ষ মন ভরিয়া উঠিল।

অল্পভব করিলাম, আরও কয়েক জন ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কাহাকেও চিনিলাম, কাহাকেও বা চিনিতে পারিলাম না। এক জন আমার কাছে আসিয়া মুহূর্ত্তান্তে বলিল, ‘চল, এখানে থাকিয়া আর লাভ নাই।’

রক্তার কথা মনে পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। একটি বদ্ধ কক্ষে ক্ষুণ্ণ গবাক্ষপথে সে বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে; শুধু চোখে ছবির বলক, ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ দশনে অধর দশন করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া, তাহার অন্তস্ত কাছে দাঁড়াইয়াও কিন্তু আমার লেশ মাত্র বিকার জন্মিল না। সেই তত্ত্ব লালসা-ফেনিল উন্নততা আর নাই। দেহের সঙ্গে দেহ-জাত আবিলতাও যেন ঝরিয়া গিয়াছে।

অতঃপর আমার নূতন জীবন আরম্ভ হইল। পার্শ্বব সময়ের প্রায় দুই সহস্র বর্ষব্যাপী এই জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা সহজ নয়। আমার স্বপ্নে আমি এই দু-হাজার বৎসরের জীবন বোধ হয় দুই ঘণ্টা বা আরও অল্প সময়ের মধ্যে বাপন করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা বর্ণনা করিতে গেলে দুই হাজার পৃষ্ঠাতেও কুলাইবে না।

জীবিত মাহুয স্থান এবং কালের আশ্রয়ে নিজের সত্তাকে প্রকট করে। কিন্তু প্রেতলোকে আত্মার স্থিতি কেবল কালের মধ্যে। নিরবয়ব বলিয়া বোধ করি তাহার স্থানের প্রয়োজন হয় না।

শরীর নাই; তাই রোগ কামনা ক্ষুধা তৃষ্ণাও নাই। দেহ-বোধ প্রথম কিছু দিন থাকে, ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়। গতির অব্যাহত স্বচ্ছন্দতা আছে, অভিলাষমাত্রেই যেখানে ইচ্ছা যাওয়া যায়। অর্ঘ্যের জলন্ত অগ্নি-বাস্পের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, লেশমাত্র তাপ অল্পভব করি নাই। শৈত্য-উত্তাপের একান্ত অভাবই এ রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা।

এখানকার কালের গতিও পার্শ্বব কালের গতি হইতে পৃথক। পৃথিবীর এক অহোরাত্রে এখানে এক অহোরাত্র

হয় না ; পার্শ্বব এক চান্দ্র মাসে আমাদের অহোরাত্র। এই কালের বিভিন্নতার জন্য পার্শ্বব ঘটনা আমাদের নিকট অতিশয় দ্রুত বলিয়া বোধ হয়।

অবাস্থ স্বচ্ছন্দতায় আমার সময় কাটিতে লাগিল। কোটি কোটি বিদেহ আত্মা এখানে আমারই মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নারী আছে, পুরুষ আছে ; সকলেই স্বচ্ছানুসারে বিচরণ করিতেছে। আপাতদৃষ্টিতে কোনও প্রকার বিধি-নিষেধ লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা অদৃশ্য শক্তি সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। সেই শক্তির আধার কে, জানি না ; কিন্তু তাহার নিঃশব্দ অহুশাসন লক্ষ্যন করা অসাধ্য।

সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। এখানে জ্ঞানের পথে বাধা নাই ; বাহার মন স্বভাবতঃ জ্ঞানলিপ্সু সে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে পারে। মর্ত্যলোকে যে-জ্ঞান বহু সাধনায় অর্জন করিতে পারা যায় না, এখানে তাহা সহজে অবলীলাক্রমে আসে। আমি আমার ক্ষুদ্র মানবজীবনে যে-সকল মানসিক সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা সঞ্চয় করিয়াছিলাম তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইয়া গেল। অকলঙ্ক জ্ঞান ও প্রীতির এক আনন্দময় অবস্থার মধ্যে উপনীত হইলাম।

রবি চন্দ্র গ্রহ তারা ঘুরিতেছে, কাল অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। নশ্টের শনিগ্রহ বোধ করি ষাট বারেরও অধিক সূর্যমণ্ডলকে পরিক্রমণ করিল। তার পর এক দিন আদেশ আসিল—ফিরিতে হইবে।

অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে সূর্য চন্দ্রকর অবলম্বন করিয়া আলোকের বেগে ছুটিয়া চলিলাম।

পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলাম। হরিৎবর্ণ বিপুল শস্ত-প্রান্তর চন্দ্রকরে ছলিতেছে ; পরমানন্দে তাহারই অঙ্গে মিলাইয়া গেলাম।

আমার সচেতন আত্মা কিন্তু অস্তিত্ব হারাইল না—একটি আনন্দের কণিকার মত জাগিয়া রহিল।

তার পর এক অন্ধকারলোকে প্রবেশ করিলাম। স্বাপ্নর মত নিশ্চল, আশ্রয়—কিন্তু আনন্দময়।

সহসা একদিন এই যোগনিদ্রা ভাঙিয়া গেল। ব্যথা অল্পভব করিলাম ; দেহাঙ্গভূতির যে যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছিলাম তাহাই নূতন করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিল।

যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল ; সেই স্বাসরোধকর কারাক্ষুপের ব্যাকুল যন্ত্রণা। তার পর আমার কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া এই যন্ত্রণা অভিব্যক্তি লাভ করিল—তীক্ষ্ণ ক্রন্দনের স্বরে।

পাশের ঘর হইতে জ্বলদমদ্র শব্দ শুনিলাম,—“লিখে রাখ। ওরা চৈত্র রাত্রি ১টা ১৭ মিনিটে জন্ম।”

সঙ্গে সঙ্গে মনের উপর বিস্মরণের যবনিকা পড়িয়া গেল। আমি জাগিয়া উঠিলাম।



ত্রিবেণী

জিজীবনময় রায়

পূর্ব পরিচয়

ধনী জমিদার শচীন্দ্রনাথ ঞয়গে ত্রিবেণীর কুস্তমেলার তার হুম্মরী পত্নী কমলা ও শিশুপুত্রকে হারিয়ে বহু অসুস্থতান্নেব পর হতাশতরুচিত্তে ইউরোপে বেড়াতে যায়। লগনে পৌঁছেই ঞরে বেহঁশ হয়ে পড়ে। লগনে পালিত পিতৃহীন চাকুরীজীবী পার্কেতী অল্লাস্ত সেবার তাকে হুহু করে এক বিবাহিত না ঞেনে তাকে ভালবাসে। পরে শচীন্দ্রের অনুরোধে পার্কেতী তারতবর্ষে ফিরে কমলার স্মৃতিকল্পে এক নারী-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। প্রতিষ্ঠানের নাম কমলাপুরী।

এদিকে, বৎসরের পর বৎসর নারীপ্রতিষ্ঠানের চক্রে আবর্তিত কার্যপরম্পরায় পার্কেতীর মন এক এক সময় শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তবু তার অজ্ঞানবৃত্তি প্রেমের মোহে শচীন্দ্রের এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে সে দূরে যেতে পারে না। শচীন্দ্রের অন্তরে কমলার স্মৃতি ক্রমে নিম্প্রভ হয়ে আসে, তবু জীবী প্রতি একনিষ্ঠতায অত্যন্ত তার চিত্ত পার্কেতীর প্রত্যক্ষ জীবন্ত প্রেমের প্রভাবকে জোব করে অস্বীকার করে তখচ পার্কেতীর প্রতি কুতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সূত্রে তার আকর্ষণ নেড়ে চলে। এই দ্বন্দ্বের আন্দোলনে তার চিত্ত দোলায়মান।

এবাগ থেকে মৃত্যুতাল উপেক্ষনাথ কমলাকে কঁাকি দিয়ে কলকাতার এনে তাকে বাড়ীতে বন্ধ করে এবং অত্যাচারে কমলা একলা পাশের বাড়ীতে নন্দলাল ও তার স্ত্রী মালতীর আশ্রয়ে ছুটে গিয়ে পড়ে। কঠিন পীড়ার সমস্ত নামের স্মৃতি তার মন থেকে মুছে যায়। নন্দ কমলের রূপ আকৃষ্ট। কমলা এই দুর্দৈব থেকে মালতী ও নিজেকে বাঁচাবার জন্তে এক হাসপাতালে নাসের কাজ শিখতে যায়। সেখানে ডাক্তার নিখিলনাথের সহায়ত্বিত ও সাহায্য লাভ করে। এদিকে স্নেহময়ী সরলা মালতী কমলার পুত্র অজয়কে তার নিসন্তান মাতৃহৃদয়ের সব স্নেহটুকু উজাড় করে ভালবেসেছে। এ-বাড়ীতে কমলাকে নাম দেওয়া হবোহে জ্যোৎস্না।

নিখিলনাথ স্ননহিতব্রতী। একদা বিদ্রবী হেরে সীমার আলানে জীরাপুয়ে গিয়ে তার পূর্ব নারক সত্যবানকে এক পোড়ো বাড়ীতে হুতকল্প অবস্থায় দেখে। প্রথম দর্শনেই সেরেটিকে তার অসাধারণ বলে মনে হয়। সত্যবানের মুখে পুলিসের গুলিতে তাদের দলের সকলের মৃত্যু, নিজে আহত অবস্থায় সীমার সাহায্যে গ্রাম থেকে প্রাণান্তরে, এ বনে জঙ্গলে পণিত্যন্ত কুটীরে পালিয়ে বেড়ানোর ইতিহাস, সীমার বীরত্ব কে দেশপ্রীতির কথা শুনে এবং নিজের চোখে তার প্রান্তিহীন একনিষ্ঠতা দেখে তার প্রতি অশ্রুজ হয়।

বিদ্রবের আশ্রনে এতগুলি মহামূল্য প্রাণকে বিসর্জন দেওয়ার মৃত্যুকালে অসুতপ্ত সত্যবান সীমাকে এই আশ্বন থেকে বাঁচাবার জন্তে নিখিলনাথকে বলে।

নন্দলাল হাসপাতালে আত্মীয় হিসাবে কমলার সঙ্গে প্রায় দেখা করতে যায় এবং তার বিকৃত চিত্তের আক্রোশে একদা নিখিলনাথ সন্ধ্যাে কমলাকে অপমান করে এক তারই সন্ধ্যাে কিছুদিন তাকে এড়িয়ে চলতে থাকে।

মালতীর বহু সাধ্যসাধনার পর মালতীর সঙ্গে সে কমলের হাসপাতালে গেল।

কমলা হুস্তিত্তার সাখার বস্ত্রপায় পীড়িত হয়ে পড়েছিল।

সত্যবানের মৃত্যু। পথ দেখিয়ে নিখিলকে নিয়ে সীমার পলায়ন এবং নিখিলের অমুন্নয় সন্ধ্যাে কঠিন সূত্রে নিখিলকে ঞ্টেনের পথ দেখিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে সীমার বনের মধ্যে প্রবেশ।

শচীন্দ্র মনে মনে বহু তোলাপাড়ার পর, পার্কেতীর প্রতি করুণাতেই বোধ করি, তার প্রতি তার উদ্ব্রান্ত চিত্তের প্রেম-নিবেদনের চেষ্টায উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে উন্মত্ত হ'ল কিন্তু পার্কেতীর সামনে সে চপলতা করতে মনে বাধা পেয়ে নিবৃত্ত হ'ল।

লক্ষ্যে ফিরে যাবার পথে পার্কেতী শচীন্দ্রকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলে যে তার প্রতি শচীন্দ্রের করুণাপরবশ আশ্বনিবেদনকে সে প্রেম বলে গ্রহণ করতে পারে না। পত্নীর প্রতি তার প্রেম কমলাপুরী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মহাসমাধি লাভ করেছে এমন মিথ্যার দ্বারা শচীন্দ্র যেন নিজেকে এবং পার্কেতীকে ভোলাতে না চায়। কথার আঘাতে শচীন্দ্রের আশ্বকল্পগত চিত্ত আহত হল—সে নিজের হৃদয়ের গতির দিক নির্ণয় করতে মনস্থ করে ফিরে এরাগে গিয়ে, টিকানা না দিয়ে পড়ে পার্কেতীকে নিজের সন্কল্প জানালে। পার্কেতী নিজের বেরনা নিয়ে একাকী কমলাপুরীর কর্কশক্ষেত্রে মধ্যে নিজেকে বিস্মৃত হবার সাধনার মন দিলে।

নিখিল সীমার আশ্রকে নিজে সম্পূর্ণ অবহিত থাকার পীড়িত কমলার সন্ধ্যাে নিতে পারে নি। কমলা কঠিন শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মালতীর অনুবোধে নন্দলালের বাড়ী ফিরে গেল। নন্দ এই পীড়ার সেবার সন্ধ্যাে তার অব্যয় চিন্তকে সন্ধ্যাে করতে না পারে একদা রাত্রে অসহায় কমলাকে চুখন করলে। কমলার উদ্ভেজনাপূর্ণ কাতরোক্তিতে ঞেগে মালতী তার স্বামীকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেলে এক কিছুকাল স্বামীকে সে সহ করতে পারল না। ভীক নন্দ নানা উপায়ে আবার স্নেহশীলা মালতীর দ্বন্দ্ব লাভ করলে কিন্তু বহু চেষ্টাতেও অন্তরে নিজেকে সম্পূর্ণ শাসিত কবতে পারলে না।

সত্যবানের মৃত্যুর পর বহু ক্লেশস্বীকার করে সীমা পূর্বপরিচিত রঙ্গলালের সাহায্যে বিদ্রবী দল গুঁড়ে দমদমের এক বাগানে আশ্রানা করলে। নারীভবন বলে একটা প্রতিষ্ঠান করে সে অনিন্দিতা দেবী নাম নিয়ে কলকাতার জমিয়ে বসল এবং নিখিলনাথকে দলে আনবার প্রার্থে এবং তার প্রতি গোপন আকর্ষণে তাকে নিজের কার্যকলাপের কথা ব্যক্ত করলে। নিখিলও নিজের সাধ্যমত সীমাকে এই বিদ্রবপন্থাে ফেরাবার চেষ্টার প্রায় হতাশ হয়ে নন্দলালের গৃহ হতে প্রত্যাগত অপমানিত কমলাকে নন্দের আক্রমণ থেকে রক্ষা এবং তার শাস্তপ্রভাবে বিদ্রবকিরোধী তর্কে তাকে শিক্ষিত করে সীমার চিত্ত পরিবর্তনের আশায় কমলাকে নারীভবনে রাখলে। কমলা নিখিলকে তার জীবনের ইতিহাস জানালে এবং নিখিলও সীমাকে সে-কথা বললে।

ইতিমধ্যে হাসপাতালের কোনো আশ্বহত্যাশ্রোস্ত ব্যাপারে ইনসপেক্টর ভুলু দত্তের সঙ্গে তার দেখা হয়। পূর্বকালে ভুলু দত্ত নিখিলের সে-কালের বিদ্রবী দলে ছিল। তাকে বুলডগ বলে ওরা ডাকত। সীমা



शकुन्तला
त्रिशताक्षनाथ मित्र

प्रवासी प्रेस, कलकत्ता

সকাল পুলিসের খবর পাবার আশায় ভুল হস্তের সঙ্গে নিখিল বস্তুতালিয়ে নিলে।

সীমার সঙ্গে কমলার হুমুতা হ'ল। নিখিলের শিক্ষাযাত্রী ভক্তের মুখে কমলার কাছে পার্কতীর কথা শুনে এতকড় নারী প্রতিষ্ঠানকে নিজের কাছে লাগাবার আশায় কমলাপুরী গেল। সেখানে শচীশ্রের কথা শুনে, তাকে দলভুক্ত করবার মতলবে বলভপুত্র ম্যানেজারের কাছে থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে সে শচীশ্রের সন্ধানে প্রয়াণে গেল।

কমলাল বহু অহুসঙ্কানের পর কমলার ঠিকানা সংগ্রহ করে নারীভবনের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। অবশেষে রজনাল এবং তার সঙ্গীরা পুলিসের গোয়েন্দা মনে করে একটা তাকে হত্যা করলে। কমলা মালতীর কাছে গেল।

নিখিল নিশ্চর করে বুঝতে পারেনি যে সীমার দলের এই কাম। তাই সীমাকে এই ঘটনা জানিয়ে সতর্ক করে দেবার উদ্দেশ্যে সীমার সন্ধানে কমলাপুরী ও বলভপুত্র গেল—কিন্তু ব্যর্থ হ'লে ফিরে আসতে হ'ল। পথে লকে সারেন্ডের কাছে এবং ভোলানাথের কাছে গিয়ে একটা জামতে পারলে যে শচীশ্রনাথ জ্যোৎস্নার বাসী।

নম্বের হত্যাকারীদের সে বিচারে চেষ্টা ক'বে যে পরোক ভাবে হত্যার প্রকল্পের পাশে লিপ্ত হচ্ছে এরূপ অনুতাপ মনে থাকলেও সীমার মোহে সে সেকথা সস্ততি আমল দিল না।

৫৩

সীমা পার্কতীর চিঠি পেয়ে কিছু আশ্চর্য হ'ল। অকস্মাৎ এ মতি-পরিবর্তনের কারণ সাব্যস্ত করতে না পেয়ে তার মনে একটা অস্বস্তিকর সন্দেহ প্রথমে তাকে একটু বিচলিত করেছিল—পার্কতী কি কিছু সন্দেহ করেছে? ইতিমধ্যে তার সম্বন্ধে কোন গোপন তথ্য সংগ্রহ করেছে না কি! অনেক চিন্তা করেও তার কোন সঙ্গত কারণ স্থির করতে না পেয়ে ভাবলে “ও আমারই চোরের মন তাই।”

তবু ট্রেনে উঠে পার্কতী সম্বন্ধে চিন্তাই তাকে পেয়ে বসল। পার্কতী যে এত অল্প বয়সে এরকম একটা প্রতিষ্ঠানের অস্তুরালে সমস্ত বহিঃসংসার হ'তে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বেচ্ছায় বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছে, এর রহস্যটুকু ট্রেনের অলস অবসরে, পার্কতীর মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে তার মনকে অবহিত করে রাখলে। যদিচ পার্কতীর বিপুল কর্মপ্রবাহের মধ্যে কোথাও সে শৃঙ্খলার অভাব এবং শৈথিল্য দেখতে পায় নি তবু তার কথায়, তার প্রতি পদবিক্ষেপে, তার নিজের প্রতি ঔদাসীন্দ্বে এমন একটা ক্লান্তি এবং অবসাদের আভাস পাওয়া যায় যে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের প্রাণদাতার পক্ষে যা সম্পূর্ণ আশ্চর্য। যে উৎসাহের আগুন, আবেগের বাষ্প বুকের ভিতর ভিতর

জমে উঠলে পশ্চাতের বিপুল যুতভারকে আনন্দময় গতি দান করা যায়, পার্কতীর মধ্যে সেই প্রেরণার বাষ্পাবেগ ঘেন শ্রান্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু কেন! তার অভ্যাস-পীড়িত মায়ের স্মৃতিমাত্র যদি তাকে এই নির্ধাতিত বঙ্গবিধবাদের হিতসাধনে উৎসাহিত করত তবে অকারণে তা নিশ্চয় হয়ে আসবার কারণ ঘটত না। তা ছাড়া যে-শচীশ্রনাথের হাঁকিতে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় তার সামান্য ঠিকানা পর্যন্ত পার্কতীর জানা ছিল না, এ কেমন ব্যাপার! অথচ তার ঠিকানার অহুসঙ্কান করে আমার সঙ্গে তার কাছে যাবার উৎসাহ-উজ্জ্বল ত কোন অভাব দেখা যায় নি! এক মুহূর্তেই সে সমস্ত কর্তব্য অস্ত্রের অসমর্থ দুর্বল স্বল্পে অর্পণ করে, সমস্ত পরিত্যাগ করে শচীশ্রের অহুসঙ্কানের উদ্দেশ্যে আনন্দেই প্রস্তুত হয়ে নিষেহিল। তখন, অকস্মাৎ তার মতি-পরিবর্তনের যে কটা কারণ সম্ভব তা সে মনে মনে বিচার করে দেখতে লাগল, তার নিজের প্রতি পার্কতীর হঠাৎ কোন সন্দেহ উপস্থিত হবার কারণ সে খুঁজে পেল না। ভাবলে তা হ'লে শচীশ্রের কাছে যাওয়ায় বাধা দেওয়ার কথাই সে সর্বপ্রথমে বিবেচনা করত এবং কোনপ্রকার ভয় আচরণ করে পত্রে তার অক্ষমতা জ্ঞাপন করা অপেক্ষা পুলিসের সাহায্যে সংবাদ দেওয়াই সে সহজ পছন্দ ব'লে বিবেচনা করত। দ্বিতীয় কারণ হ'তে পারে যে হঠাৎ কমলাপুরী থেকে তার জরুরী কাজের ডাক এসেছে। কিন্তু, সে কথা সীমার কাছে গোপন করবার কোন কারণ নাই, সে অনায়াসেই তাকে লিখে পাঠাতে পারত; বিশেষত যখন সে শচীশ্রের কাছেই যাচ্ছে এবং কমলাপুরী সম্বন্ধে সংবাদ শচীশ্রের নিকট পাঠানো তার পক্ষে স্বাভাবিক। তা ছাড়া সে যে শচীশ্রের সন্ধান নিয়ে তার কাছে যেতে যেতে মধ্যপথ থেকে ফিরে গেল কমলাপুরীরই বিশেষ কাজে, একথা শচীশ্রের কাছে না-জানাবার কোন সম্ভব কারণ নেই। অর্থাৎ শচীশ্র যেমন তার কাছে আত্মগোপন করে আছে সেও তার এই অহুসঙ্কানের অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত উৎসাহ গোপন করতেই চায়। পূর্বাপর চিন্তা করে সে একটা জিনিষ মনে মনে আবিষ্কার করলে।

শচীশ্রের অজ্ঞাতবাস, পার্কতীর উৎসাহ, এবং পরিশেষে

পার্কতীর এই আকস্মিক ব্যবহারের সঙ্গে কমলাপুরীতে পার্কতীর যে ক্লান্ত উদাস মূর্তি সে দেখেছিল তার যেন একটা নিগূঢ় যোগ আছে। চিন্তা করতে করতে পার্কতীর প্রত্যেকটি আচরণ, শচীন্দ্র-সংক্রান্ত পার্কতীর সমস্ত কথা আলোচনা করে তার কাছে ক্রমেই সব যেন পরিষ্কার হয়ে এল। শচীন্দ্র এক পার্কতীর মধ্যে যে একটা স্বপ্ন-ঘটিত ঘটনার অবদান ঘটেছে এ সম্বন্ধে তার যেন আর সংশয় থাকতে চাইল না। ব্যঙ্গপূর্ণ হাসিতে তার মুখটা ভরে উঠল। মনে মনে বললে, ‘বাংলাদেশের এই সব নেড়ানেড়ীদের দিয়ে আবার দেশের স্বাধীনতা কিরবে! যারা নিজেদের লীলা নিয়েই দিনরাত মত্ত তারা আবার প্রাণ দেবে দেশের জন্তে!’ পার্কতীকে আরও মূল্যহীন, বস্তুহীন বলে তার মনে হতে লাগল। তাবলে, শচীন্দ্রকে দেশের কাছে ভজাবার চেষ্টা পঞ্চম্রম হবে। এদের কাছে রক্ত-লালকেও তার মাহাত্ম্যের মত মাহাত্ম্য বলে মনে হ’ল,—রক্ত-লালের মধ্যে অন্তত এই রক্ত করে বেড়াবার জ্বাকামি নেই।

আসল কথা, নিখিলের প্রতি এই প্রকার স্বকুমার মনোবৃত্তি অধুনা তার কঠোর চিন্তেও বোধ করি অন্তরে অন্তবে গোপনে দুর্বলতার সঞ্চার করেছিল। নিজের সেই দুর্বলতার আভাসকে তীব্র স্বপ্নায় অস্বীকার করবার উদ্বেজনার কাউকে সে শাস্তভাবে সহজভাবে বিচার করবার ঐশ্বর্য মনে মনে রক্ষা করতে পারছিল না। তার নিজের চিন্তের অবজ্ঞাত, সদ্যজাগৃত স্বপ্নাববেগের বিরুদ্ধে তার নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে অন্তরে তার সংগ্রাম চলছিল এবং সেই সংগ্রামে, তার মগ্ন অন্তরে তার পরাজয়ের চেতনায় তাকে নিজের প্রতি এবং অপরের প্রতি নিষ্ঠুর করে তুলেছিল।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে সে একখানি একা করে শহরটির ভূপরিচয়ের একটা মোটামুটি ধারণা করে নিলে। শচীন্দ্রের বাড়ীতে গিয়ে যখন সে পৌঁছল, বেলা তখন পড়ে আসছে। ভগ্নপ্রাচীরবেষ্টিত নিস্তব্ধ বনাকীর্ণপ্রায় এই গৃহে প্রবেশ করতে সহসা সন্দের সাহসে কুলত না। হঠাৎ দেখলে, বাড়ীটিতে লোক আছে বলে ধারণাই হয় না। বাড়ীর এক পাশের ঘর থেকে অল্প অল্প ধুমোদানীরণ-রেখা লক্ষ্য করে সে গিয়ে ধীরে ধীরে ওড়া নাড়া দিতে লাগল।

মিনিট গাঁচেক পরে দরজা খুলে একটি রুদ্রমূর্তি হিন্দুস্তানী পাচক (মহারাজ) “কোন ছদ্ম রে” বলে সীমাকে দেখে অপরাধ-ভয়েই হোক বা জীলোক-জ্ঞানে সমীহ করেই হোক—এমন বিমূঢ় হয়ে পড়ল যে বাক্যব্যয়মাত্র না করে পিছন ফিরে উর্দ্ধ্বাসে ছুটে ছাদে তার মনিবের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ’ল। এবং অত্যন্ত উত্তেজিত স্বপ্নের সঙ্গে বলতে লাগল, “মাইজি, আয়ী হয়ে ছুঁর। হামারা কুছ কহুর নহি হয়। ময়নে সোঁচা কি কোই বদমাস...”

শচীন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠে বললে, “মাইজি কি রে? মাইজি কোথেকে এল?” হঠাৎ তার মনে হ’ল মৃত কমলা তার দ্যানলোক থেকে অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিল; কিংবা কমলা কি জীবিত? সে কি সত্যই ফিরতে পারে না?

“হা ছুঁর, মাইজি বেশক।”

“কি রকম দেখতে রে, খুব গোর?”

“হঁ। নহি এতনা গোর নাহি।”

শচীন্দ্র বুঝতে পারলে কমলা নয়। কমলা হওয়া সম্ভবও নয়। যে মৃত তাকে জীবিত কল্পনা করার শিশুজ্ঞানোচিত ছুরাশা এখনও তাকে পরিত্যাগ করে নি মনে করে তার হাসি পেল। যেয়েটি যে পার্কতী-এ-বিষয়ে তার সন্দেহ রইল না, এবং পার্কতীর স্নেহের এই নিদর্শনে তৎক্ষণাৎ মনটা তার কমলার চিন্তা থেকে পার্কতীর প্রতি করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠল।

নীচে নেমে সে সীমাকে দেখবার পূর্বেই “পার্কতী” বলে ডেকে বেরিয়ে এল এবং একজন অপরিচিত তরুণীকে দেখে অকস্মাৎ যেন ভয়ভা করবার ভাবাও খুঁজে পেল না।

শচীন্দ্রকে বিভ্রত হয়ে পড়তে দেখে সীমা বললে, “আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই, কিন্তু গত কয়েক দিন শুধু আপনার পরিচয়ই নিয়ে বেড়িয়েছি এবং অবশেষে আপনার গ্রামে গিয়ে আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করে এখানে এসেছি। পার্কতী দেবীও আমার সঙ্গে আসতেন, কিন্তু কিছু বাধা পড়ায় তিনি আসতে পারেন নি। আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম। আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করতে যে-বেগ পেতে হয়েছে তাতেই বুঝছি এমন নিরঙ্কনবাস আপনি ইচ্ছে করে

করেন নি এবং লোকে এখানেও আপনাকে এসে বিরক্ত করবে তা কখনই আপনি চান না।”

শচীন্দ্র এই মেয়েটির এই অসময় অকস্মাৎ একাকী আগমনে সত্যই এমন বিস্মিত হয়েছিল যে সহসা কি ভাবে তাকে সম্ভাষণ করবে ভেবে পাচ্ছিল না। সীমার বিরক্ত করার বারংবার উল্লেখ শচীন্দ্র লক্ষিত হয়ে বললে, “না না, বিরক্ত কি, নির্জন বাস আমার একটা খেয়াল। আমন ভিতরে, হাত মুখ ধুয়ে একটু চা-টা খান, তার পর কথা হবে। ছি ছি আপনাকে অকারণে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।” ব’লে সীমার সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ ক’রে বলতে লাগল, “কিন্তু এখানে আপনার খুব কষ্ট হবে। জীলোক ত কেউ বাড়ীতে নেই—”

সীমা হেসে বললে “কেন। এই ত আমিই রয়েছি। অবিশ্রিৎ যে-লোক সারা ভুবন ধাওয়া ক’রে আপনাকে এসে ধরেছে তাকে জীলোক বলতে আপনার রুচিতে বাধবে—”

হিন্দুস্থানী সূত্য ও পাচকের সঙ্গে নির্জনবাসে কাটিয়ে শচীন্দ্রের মনে মনে নিজের অজ্ঞাতে যে মার্জিত জনের সঙ্গে আলোপের তৃষ্ণা জেগেছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। সীমার এই সহজ রহস্যালোপে সে খুশী হয়ে হেসে বললে, “আপনার উত্তর শুনে আমার একটা গল্প মনে হ’ল। প্যারিসে একটা লোকানে লেখা ছিল, ‘ইংলিশ ইজ স্পোকন হিয়ার’। এক ইংরেজ সফরী অর্থাৎ টুরিষ্ট সেখানে গিয়ে যা বলে তা কেউ বোঝে না; সে ত চটেই খুন—শেষে প্রপ্রাইটারের পরিচিত একজন ইংরেজীদানীশ এলে সফরী বললে, ‘এমন মিথ্যা কথা লিখে রাখার মানে কি? কেউ এখানে ইংরেজী বলে না, এমন কি বোঝেও না।’ তখন সেই ইংরেজীবাদী ফরাসী ভ্রমলোকটি হেসে বললে, ‘কেন মসিয়ে, আপনি কি এখানে ইংরেজী বলছেন না। ইংরেজী এখানে বলা হয় ছাড়া আর ত কিছু লেখা হয় নি?’ ফরাসী জুয়াচুরির নমুনা দেখে ইংরেজটি তৎক্ষণাৎ ঘাড় ফিরিয়ে চটে চলে গেল। গল্পটা অবশ্য জন-বুলের রসিকতাজ্ঞান সত্ত্বে একটা ফরাসী গল্প।”

“তাই ব’লে আপনি ঘাড় ফিরিয়ে চলে যাবেন না। আপনাকে আমার বড্ড দরকার। না না, আপনি যত

হবেন না। আমি আপনার চাকরকে দিয়ে সব ঠিকঠাক করিয়ে নিচ্ছি। আপনি কিছুমাত্র ব্যস্ত হবেন না।”

চাকরকে ডেকে “মা জীর” খেদমত করবার হুকুম দিয়ে সে ছাড়ে চলে গেল। সীমার এত সহজ সপ্রতিভ ভাবে তার মনটাও কি জানি কেন বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল। পার্শ্বতীর সংবাদের জন্তু তার মনের মধ্যে চঞ্চলতা থাকলেও সে সম্প্রতি তা প্রকাশ করলে না।

৫৪

সীমা ইচ্ছা ক’রেই প্রায় পরিচিত আত্মীয়ের মত সহজ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার দিয়ে তার কাজ শুরু করেছিল। অল্প দু-এক দিনের মধ্যেই তার কার্য সাধন করতে হ’লে প্রথম থেকেই শচীন্দ্রের মনে আত্মীয়ের নিশ্চিন্ত সহজ বিশ্বাস উৎপাদন করা আবশ্যক। চাকর-বাকরের কাছে শচীন্দ্রের ছোট বোন বলে পরিচয় দিয়ে সে সহজেই তাদের আত্মীয়তা অর্জন ক’রে নিয়েছিল; এবং শচীন্দ্রের সমস্ত চিন্তে তার সহজ স্বচ্ছন্দ মনের স্নেহ-প্রভাব বিস্তার করতে তাকে বেশী বেগ পেতে হয় নি।

কলকাতায় তখন অনিশ্চিত দেবীর নাম একেবারে অপরিচিত ছিল না। এক সময় শচীন্দ্রের মনেও নারী-ভবনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছিল। আজ সীমার সঙ্গে বসে তার নারীভবন সম্পর্কে সে বিস্তৃত আলোচনা শুরু ক’রে দিল।

সীমা তার অভ্যাস এবং নিয়ম অনুসারে তার সমস্ত আলোচনাকে যেমন ভারতবর্ষের মুক্তির প্রসঙ্গ নিয়ে উপস্থিত করে আজও তেমনি নিজেদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বললে, “কিন্তু এরকম কাজ হয়ত আরও দশজন বাংলাদেশে করছে, কিংবা এর চেয়েও অনেক বিস্তৃত জীব্যাবস্থিত সুপরিচালিত নারীপ্রতিষ্ঠান হয়ত আরও গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক ভারতবাসীর যেটা প্রধান কাম্য হওয়া উচিত সেই স্বাধীনতার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কাজকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা তাদের মধ্যে নেই। আপনার প্রতিষ্ঠিত কমলাপুরীর বিরাট ব্যবস্থার মধ্যেও সেই জিনিষটারই অভাব অল্পভব ক’রে এসেছি। পার্শ্বতী দেবীর ত ও সম্বন্ধে কোন উৎসাহই নেই, থাকার কথাও নয়। কিন্তু

কোন মানুষের মধ্যে এই স্বাধীনতার প্রেরণাকে নির্দোষিত করে লোকশিক্ষা দেবার রীতিটা ত আমার মনে হয় জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত করে শুধু সঙ্গী স্বার্থাঘেবী গণ্ডে তোলারই তুল্য। এ-বিষয়ে আপনার মতটা স্পষ্ট করে জানতে চাই।”

শচীন্দ্র হাঁকাভাবে হেসে বললে, “যে-মত নিজের কাছেই সুস্পষ্ট নয় তাকে অন্ত্রের কাছে বলতে গেলে অধিকাংশ বানিয়ে বলাই হয়। জানেন ত, আমরা বাংলাদেশের জমিদার; দেশের সঙ্গে আমাদের যেটুকু সম্পর্ক সেটুকু জমিদারীসংক্রান্ত। সেই জমিদারীটুকুকে রক্ষা করতে হ’লে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয় স্বর্ধ্যাস্ত-আইনের দিকে। সেই আইনের হাতে আত্মরক্ষা করতে, যাদের বেশ বলছেন, তাদেরই অস্থিগুরুচূর্ণ না করে আমাদের উপায় নেই। স্বতরাং দেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করবার মনোবৃত্তি কোন কালে আমাদের গণ্ডে গুঠে না। ইংরেজী শিক্ষায় বড় জোর কেউ একটা হাই স্কুল, একটা চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী, মেয়ে স্কুল এই করেই বাহবা পেয়ে এসেছি। দেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতেও সর্বনাশের ভয়ে মনে মনে চটে উঠি। স্বাধীনতার কথা আমাদের ভাবতে নেই, ভিতরে ভিতরে এমনি একটা সংস্কার ঠাড়িয়ে গেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা! ও দুটো পরস্পরবিরোধী কথা—কি বলেন, তাই না?”

নিখিলনাথের সঙ্গে ভরক সীমা যে রকম অধৈর্য হ’য়ে পড়ত এ ক্ষেত্রে তা হবার কারণ ছিল না। নিখিলনাথের কাছে সে যে প্রকাণ্ড আশা নিয়ে উপস্থিত হ’ত এখানে তার বিপরীত ধারণা নিয়েই সে স্তব্ধ করেছিল। তাই শচীন্দ্রের পরিহাস-ছলেও নিজেদের এই আত্মবিলেপণে বরং একটু খুশীই হ’ল মনে মনে। শচীন্দ্রকে বর্তটা ইংরেজপদবিবেহী স্বতপুট অপদার্থ শ্রেণীর ব’লে সে ভেবেছিল, সে দেখলে যে ঠিক সে-শ্রেণীর জীব সে নয়। তা ছাড়া, বোধ করি অমায়িক প্রসঙ্গ আচরণে শচীন্দ্রের বিশ্বাস এবং বন্ধুত্ব অর্জন করার আবশ্যকও তার ছিল। তাই সে আলোচনাটা অস্ত্র রাস্তায় পরিচালিত করবার চেষ্টা করলে। বললে, “কথাটা একরকম আপনি ঠিকই বলেছেন। স্বাধীনতা আনতে গেলে আপাতবিশৃঙ্খলা এবং সুখস্বচ্ছন্দ্যশান্তি-বিপর্যয়ের যে

ছবি আমাদের চিত্তে জেগে ওঠে আমাদের ‘বোতাম-খাঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান, পোষমানা প্রাণে’ তা ধারণা করতেও আমরা আতঙ্কিত না হয়ে থাকতে পারি না। তবু দেখুন, মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি এমনি স্বাভাবিক যে ইচ্ছা করেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক যে-বিধবাগুলির শিক্ষার ব্যবস্থা আপনি করেছেন তাদের মনে সেই পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করবার শক্তি দেবার জন্মেই তা করেছেন। তাই আপনি আপনার সমস্ত শক্তি, সমস্ত অর্থ, সমস্ত চিন্তা আনন্দে নিয়োগ করে চলেছেন। আপনি ঠিক পথই নিয়েছেন। যে স্বাধীনতার বীজ তাদের মধ্যে আপনি ছড়াচ্ছেন একদিন তা—”

শচীন্দ্র তার নিজের প্রশংসাতেই হোক বা তার কমলাপুরীর নিগূঢ় ব্যাখ্যাতেই হোক একটু বিচলিত হ’য়ে বাধা দিয়ে সলজ্জ হেসে বললে, “দেখুন প্রশংসা শোনা পাপ, মিথ্যে প্রশংসা শোনা আরও পাপ। প্রথমত কমলাপুরী সঘনো কোন প্রশংসাই আমার প্রাপ্য নয়; এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কৃতিত্ব পার্শ্বতী দেবীর। তিনি লক্ষ বার প্রশংসা পাবার যোগ্য—তিল তিল করে নিজেকে দান করে তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ সঞ্চার করেছেন। (শচীন্দ্র সঘনো পার্শ্বতীর প্রায় অচরুপ উক্তিগুলি স্মরণ করে কিছু কৌতুক কিছু কৌতুহলে সে শচীন্দ্রের প্রতি একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিলে)। তাঁর মধ্যে জনহিতের গভীর প্রেরণা না থাকলে আজ এই প্রতিষ্ঠান সম্ভবই হ’ত না।—”

সীমা হাসি চেপে ভালমানুষের মত হসে বললে, “পার্শ্বতী দেবীও আপনার সঘনো প্রায় ঐ কথাই বলছিলেন। বললেন, ‘আমি ত কর্মচারী বই ত নয়। শচীন বাবুই এর সব।’” সীমা ইচ্ছা করেই কথাটাকে বিকৃত করে বললে।

শচীন্দ্র আহত হ’য়ে জিজ্ঞেস করলে, “কর্মচারী! তিনি বললেন ?

“হুঁ, বললেন এর মধ্যে তাঁর কোন হাত নেই, কর্তৃত্বও নেই।”

“না না সে কি কথা। তিনিই সব। এর প্রত্যেকটি পরিকল্পনা, প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষ, প্রত্যেকটি অহুতান তাঁরই প্রাণের প্রাণসে সঞ্জীবিত। আমি এর কে। আমি

কিছুই না। মানবের হিতসাধন কোন দিন আমার চিন্তকে চঞ্চল করে নি। দেশের সেবা এমন কি বাংলার সেবা কিংবা নারীজাতির মঙ্গলসাধন, কোন কালে আমার চিন্তে স্থান পায় নি। আমার পত্নীর স্মৃতিকল্পে যে-কোন একটা কিছু করতে পারলেই আমি তৃপ্ত হতাম। পার্কতী, পার্কতীই তাঁর প্রাণ দিয়ে হৃদয় দিয়ে এবং অক্লান্ত সেবা দিয়ে একে গড়ে তুলেছেন। তা নইলে জনহিতটি ও-সব আমি কখনও চিন্তাও করি নি। কর্মচারী! তিনিই কমলাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী—”

কথাটা ব’লেই শচীন্দ্রের একটু বিসদৃশ বোধ হ’তে লাগল। সে লজ্জিত হয়ে চুপ করে গেল। উচ্ছ্বাসের মুখে তার পত্নীর স্মৃতির প্রতি এ যেন একপ্রকার অবমাননা। সে অল্পদিকে ফিরে নিজের এই অপরাধ অল্পভব করতে চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে-ভাব তার মন থেকে মুছে গিয়ে পার্কতী যে নিজেকে ‘কর্মচারী মাদ্র’ ব’লে উল্লেখ করেছে, পরিত্যক্ত পার্কতীর সেই উক্তি অভিমানজনিত কল্পনা করে, অল্পতপ্ত চিন্তে মনে মনে সেই বিষয় আলোচনা করতে লাগল।

শচীন্দ্রের ও পার্কতীর মনোভাব সম্বন্ধে সীমার আর কোন সন্দেহ রইল না। ‘অধিষ্ঠাত্রী দেবী’ কথাটা তার কানে কৌতূকাবহ বোধ হ’লেও কথাটাকে সে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেল। যদিও তার মনে আর সন্দেহ ছিল না যে শচীন্দ্র তার কথায় তাদের কাজে এসে বোগ দেবে না, তবু সে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখলে। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে মনে মনে একটা মোটামুটি রিহারসাল দিয়ে, সংযত অথচ ভাবালুতার আভাসে স্নিগ্ধ গভীর স্বরে সে বলতে লাগল “দেখুন, সত্য কথা বলতে কি, জনহিতব্রত, অর্থাৎ নিছক লোকের মঙ্গলের জন্তে কিছু করা, মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। ওটা সভ্যজগতে স্বরূপ হ’য়েছিল আত্মরক্ষার্থে। ক্রমে মানুষ যত পাকা সামাজিক জীব হয়ে উঠতে লাগল ততই ও-জিনিষটার উপর একটা মহত্তর উদ্দেশ্য আরোপ করলে এবং পুণ্যলোভী মানুষকে পরহিতসাধনে প্ররূক করে তুললে। কিন্তু স্বাধীনতার ইচ্ছা আমাদের জন্মগত, মজ্জাগত হুতরাং স্বাভাবিক। তাই মানুষ প্রতিনিয়ত ধর্মের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে কেবল মুক্তি কামনা করে

চলেছে। আর এক দল স্বার্থাশ্রয়ী মানুষ যুগের পর যুগ এদের বাঁধতে চেয়েছে বৈরাগ্যের, সংযমের, শান্তির লোভ দেখিয়ে। কিন্তু পারে নি। মানুষ মানুষের চাপে মুক্তির নিশ্বাসের জন্তে হাঁপিয়ে উঠেছে। সেই আদিম তৃষ্ণা, সেই মহান চেষ্টা, কেউ টুটি চেপে মারতে পারে না। সেই তৃষ্ণা এই আমাদের মধ্যেও, জড় ব’লে নিষ্কর্ষ ব’লে, মৃত ব’লে যাদের জীবিতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে—তাদের মধ্যেও তীব্র ব্যাকুল চিন্তাপ্রাণী কান্নায় কেটে পড়তে চাচ্ছে। স্বভাবের সেই শ্রেষ্ঠতম, মহত্তম, পবিত্রতম সম্পদলাভে কেন আমরা নিজেকে বঞ্চিত করে রাখব?—আমরা মহাকাশের মূল্যে ক্রয় করা একমুষ্টি উচ্ছ্রিষ্টের লোভে লৌহপিঞ্জরের মধ্যে ব’সে নিমীলিত নেত্রে ইষ্টনাম জপ করব কেন?”

বলতে বলতে সীমা উঠে এসে সহসা শচীন্দ্রের ছটো হাত ধরে বললে, “দেখুন, আপনার চাকরদের কাছে আপনার বোন ব’লে আমি পরিচয় দিয়েছি। এই প্রগলভা ছোট বোনটির কথা শুনুন। বেড়ে ফেলুন আপনার ভাববিলাসী মনের জড়তা। নেমে আসুন আপনার সমস্ত শক্তি নিয়ে যেখানে মানুষের চাপে মানুষ পিষে মারা যাচ্ছে, মানুষের দেবতা যেখানে লাহিত হয়েছে। আপনার সমস্ত অর্থ দিয়ে সেই শ্রমশ্রমকে মুক্তির্থে পরিণত করুন।” ব’লে সে ভাবাবেগে অভিভূত হয়েই যেন তাব স্থির দৃষ্টি আকাশের দিকে তুলে চুপ করে পাশে বসে পড়ল।

শচীন্দ্র অবাক হ’য়ে চাইল তার মুখের দিকে। ভাবলে এমনি করে নিজেকে তুলে একটা মহত্তর কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মহারা হ’তে পারলে সে বেঁচে যেত। অপরিচিতা তব্বী মেয়েটির অপূর্ব নিষ্ঠা, দেশের কাজে আত্মদানের মহত্ব তাকে অভিভূত করতে লাগল। কি যে তার কাজেব স্বরূপ তা সে ঠিকমত জানে না; কিন্তু এই নিঃসঙ্গ মেয়েটি যে তার গৃহ, তার সমাজ, তার ব্যক্তিগত সমস্ত সুখস্বচ্ছন্দ্য আরাম-আনন্দ পরিত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছে, সহায়-সহায়ত্বভূতিবিহীন নিষ্ঠুর সফারের মধ্যে, তাদেরই জন্তে যাবা তার আহ্বানকে বাতুলের প্রলাপ ব’লে অলঙ্কার করবে,—এরই করুণা তার মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করলে। তবু তার বড় প্রিয় সেই স্বস্তি-মন্দিরের পবিত্রতা অল্প সামসারিক বিব্রোভের আঘাতে আবিল হয়ে উঠবে, এ সে ভাবতে পারে না।

সে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, “দেখুন আপনার বাইরের পরিচয় আমি জানি নে; কিন্তু এই অল্পক্ষণের মধ্যে আপনার অন্তরের যে-পরিচয় আমি পেয়েছি তাকে তুচ্ছ করতে পারি এত স্পর্ধা আমার নেই। আপনার বয়স অল্প কিন্তু আপনার ত্যাগে, আপনার নিষ্ঠায় আপনি আপনার বয়স এবং আপনার বন্ধনকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। সমস্ত বন্ধনকে অতিক্রম করতে না পারলে কেউ আপনার মত এমনি করে বেরিয়ে পড়তে পারে না। সেই বন্ধনই আমাকে আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্যে এমন করে আবদ্ধ করে রেখেছে। শক্তি আমার কিছুই নাই, যা নিয়ে আপনার বিরাট মুক্তি-কামনার তীর্থে অর্ঘ্য দান করতে পারি।” ব’লে একটু থেমে বললে, “পার্বতী দেবী ছাড়া আজ আমার পক্ষে এ-প্রতিষ্ঠানও গ’ড়ে তোলা অসম্ভব হ’ত। বাকী আমার যেটুকু শক্তি সে আমার পিতৃদত্ত অর্থ—তার যতটুকু আমি কমলাপুরীর কল্যাণে ব্যয় করি ততটুকুই আমার সাধনা এবং যতটুকু আমার নিরুদ্ধিষ্ট পুত্রের স্বরণে সঞ্চিত রাখি সেইটুকুই আমার নিরাশ্রয় চিন্তের ছরাশা—বাকী আর আমার কিছুই নেই। আপনি আপনার নারীভবনকে আপনার মুক্তিমনে গ’ড়ে তুলুন, কমলাপুরীর সমাধিমন্দিরকে সমাধিক্ষেত্র ব’লেই জানবেন—সে আমার ব্যক্তিগত জীবনের গোপন তীর্থ। আমাকে ক্ষমা করবেন, বাইরের জনতার মুক্তি-কোলাহল দিয়ে আমার সেই নির্জনতাকে ক্ষুদ্র করা আমার সম্ভব নয়।”

সীমা মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল। ভাবলে রক্ত-দার কথাই ঠিক। এরা আবার জমিদারীর মাল্লা, টাকার মাল্লা ছাড়বে। বেশ মজার কথা; অর্ধেক টাকা মৃত্যু পত্নীর জন্তে সমাধি আর বাকী টাকা পালানো ছেলের জন্তে জমা দি, আছে বেশ। এই সব প্যানপেনে লোকেরা কি ইচ্ছে করে নাববে? ণ্ডতোর চোটে এরা বাবা বলে। দাঁড়াও তোমাকে একবার রক্ত-দার হাতে কেলি, সেই তোমার ঠিক জুখ। ওসব নাকে কাছার ভব্য চারুকলার সে ধার ধারে না। ভাবলে, দেশটা জুড়েই কি এই যাত্রার দলের নায়ক-নায়িকা ছাড়া আর মানুষ নেই? দাঁড়াও তোমাকে নিয়ে একবার খাঁচায় ত পুরি—তার পর।

মুখে অভ্যস্ত সহৃদয় বন্ধুত্বের ভাব টেনে এনে সে বললে,

“দেখুন, আমি না জেনে হয়ত আপনাকে অকারণে উভাস্ত করেছি। আপনার নির্জন-সাধনার পবিত্রতাকে আমার অশাস্ত চিন্তের কোলাহল দিয়ে আমি নষ্ট করতে চাই না। আপনার কমলাপুরী দেখে আমার মনে হয়েছিল যে আমার দেশের মুক্তিকামনার পথে আপনি আমার কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছেন। তাই বড় আশা করেছিলাম যে আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে যা সম্ভব হয় নি আপনার সাহায্যে তাকে সফল করে তুলব। কিন্তু বুঝতে পারছি আপনার মন অস্থির হয়ে বাঁধা। আপনাকে আর বিরক্ত করব না। কালই আমাকে ফিরে যেতে হবে; আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। তা ছাড়া—” ব’লে সে যেন চিন্তাকুল হ’য়েই একটু চুপ করলে।

শচীন্দ্র এই মেয়েটির হতাশ পীড়িত চিন্তের ব্যথিত কণ্ঠে একটু লজ্জিত হয়ে বলতে লাগল, “দেখুন, অকারণে আমার শক্তি সত্ত্বে একটা আশা পোষণ করেছিলেন ব’লেই আজ হতাশার কথা বলছেন। আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। যে তুষের শস্য কীটে নিঃশেষ করেছে তাকে আছাড় মারলে আর কি কিছু পাবেন? কিন্তু কি যেন বলতে গিয়ে আপনি চুপ করে গেলেন; কেন? কোন কথা? কোন ভৎসনাই আমার পক্ষে অগ্রযজ্ঞ নয়। এই কথাই ত বলছিলেন যে, ‘তা ছাড়া আপনার অপরাধতা এত স্পষ্ট করে আগে বুঝতে পারি নি’; অকারণে দেশের কাজের এতগুলো পর্যা এবং সময় আপনার অপব্যয় হ’ল। আপনি যদি কিছু না মনে করেন তবে আমার সামান্য শক্তি অহুসারে আপনাকে অল্প কিছু পাথের-স্বরূপ দেব, আর—”

সীমা বাধা দিয়ে বললে, “না না, ও-রকম কথা আপনার সত্ত্বে আমার মনেই হয় না। আমি অল্প কথা ভাবছিলাম। কিন্তু আপনাকে সে-কথা জানালে আমার নবলব্ধ বন্ধুটি আমাকে ক্ষমা করবেন কি না, তাই ভাবছি।”

‘নবলব্ধ বন্ধু’ বলতে নিজের কথা মনে করে শচীন বললে, “আমি কিছু মনে করব না। আপনি নিশ্চিন্ত মনে যা খুশী বলে যেতে পারেন। শক্তি আমার অবশ্য—”

“না না, আপনার কথা হচ্ছে না। আমি পার্বতী দেবীর কথা বলছি।” ব’লে সে আবার চিন্তাশীল হয়ে পড়ল।

“পার্কতী!” ব’লে শচীন্দ্র উৎকণ্ঠিত হয়ে লোজা হ’য়ে বসল। বলুন তিনি কি বারণ করেছেন নাকি বলতে?

মনে মনে কৌতুক অল্পভব ক’রে নিরীহ কণ্ঠে সীমা বললে, “না ঠিক বারণ করেন নি। তবে তিনিও এখানে আমার সঙ্গেই আসছিলেন কি না। তা, হঠাৎ আসা বন্ধ হয়ে গেল।”

শচীন আরও উৎকণ্ঠা প্রকাশ ক’রে বললে, “কেন, তিনি কি অস্থস্থ হ’য়ে পড়েছেন? কই এসে ত কিছু বলেন নি।”

“অস্থস্থ হয়ে পড়েছেন বললে ঠিক হবে না। আমি ভেবেছিলাম আপনি জানেন। মানে—”

“আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি দয়া ক’রে একটু খুলে বলুন।”

সীমা নিজের অভিনয়ে খুলী হ’য়ে একটু বেধে বেধে বললে, “তিনি ত আজ মাস দুই কি-একটা কলিক-পেনে ভুগছেন। আমার সঙ্গে আসার সব ঠিক। তা কলকাতায় এসে কাল এত ব্যথা হ’ল যে আর আসা সম্ভব হ’ল না। ডাক্তার ত বলছে ম্যাপেণ্ডিসাইটিস্। অপারেশন করা দরকার।”

“ম্যাপেণ্ডিসাইটিস্। তাঁকে কেলে এলেন? মানে, তাঁকে দেখবার কে রইল? আমার বাড়ীতে ত কোন— একটা নাস ঠিক ক’রে—”

সীমাব হাসি বাধা মানতে চাইছিল না। অনেক সামলে কৌতুকের হাসিকে চেঁচায় একটু সহায়ভূতির হাসিতে পরিণত ক’রে সে বললে, “কিছু চিন্তা করবেন না। তাঁকে আমাদের বাড়ীতে মার কাছে, দাদার হেপাজতে রেখে এসেছি। বেলগাছিয়াতে আমার এক দাদা ডাক্তার আছেন, তাঁকে দিয়ে পরস্ত গিয়ে সব বন্দোবস্ত করব ব’লে পার্কতী দেবীকে কথা দিয়ে এসেছি। তাই তাড়াতাড়ি

করছি। আপনাকে বললে যে আপনি চিন্তিত হ’য়ে পড়বেন এই আশঙ্কায় বোধ হয় তাঁর আপনাকে জানাতে আপত্তি ছিল। তা ছাড়া আপনার মন-টন ভাল নেই, আপনার শাস্তি নষ্ট করতে বোধ হয়—”

“শাস্তি নষ্ট।” পার্কতীর অভিমানের খাঁকাটা মনে মনে অল্পভব ক’রে বললে, “আমার ভারি অস্থায় হ’য়ে গেছে। স্বার্থাঙ্ক হ’য়ে আমি এই দুমাস কারো সংবাদই নেই নি। ও, তিনি আমার জন্তে যা করেছেন। জানেন, বিলেতে আমি মরতেই বসেছিলাম। তিনি সেবা ক’রে আমার বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। ছি ছি।” ব’লে সে নিতান্ত অহুতপ্ত হয়েই চিন্তা করতে লাগল।

শিকার ফাঁদে পা রাখলে শিকারীর মনে যেমন উজ্জাস উত্তেজনার স্রষ্টি হয়, অথচ স্বল্প নিষ্ঠুরতার জমাট মূর্তির মত তার দিকে সে স্থির উদ্গ্রীব হয়ে চেয়ে থাকে, সীমা ঠিক তেমনি ক’রে শচীন্দ্রের মনের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। অল্প অপেক্ষা করতেই তার শেষ প্ল্যানটুকুও পূর্ণ হ’ল।

শচীন বললে, “আপনি আজই কলকাতা থেকে এসেছেন তাই বলতে লজ্জা হচ্ছে। দেখুন, শেষ-রাত্রে একটা ট্রেন আছে, কাল সন্ধ্যায় পৌছবে। আমি বরং তাতে চলে যাই। আমাকে আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা ব’লে দিন, তা হ’লেই হবে। কিছু মনে করবেন না। কিছুমাত্র আন্তিত্য করতে পারলুম না, আবার আপনাকে একলা—”

সীমা হেসে বললে, “আমার কিছু কষ্ট হবে না। আমি সঙ্গেই যেতে পারব। ও রকম ট্র্যান্ডল্ করা আমার অভ্যাস আছে। আমি গেলে দাদাকে দিয়ে সব ঠিক ক’রে দেব। আপনি কিছু সন্কোচ করবেন না। দমদমায় আমাদের বাড়ী—সেখান থেকে বন্দোবস্ত করা সোজাই হবে।”

(ক্রমশঃ)



নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাহিত্যায়ন

১২

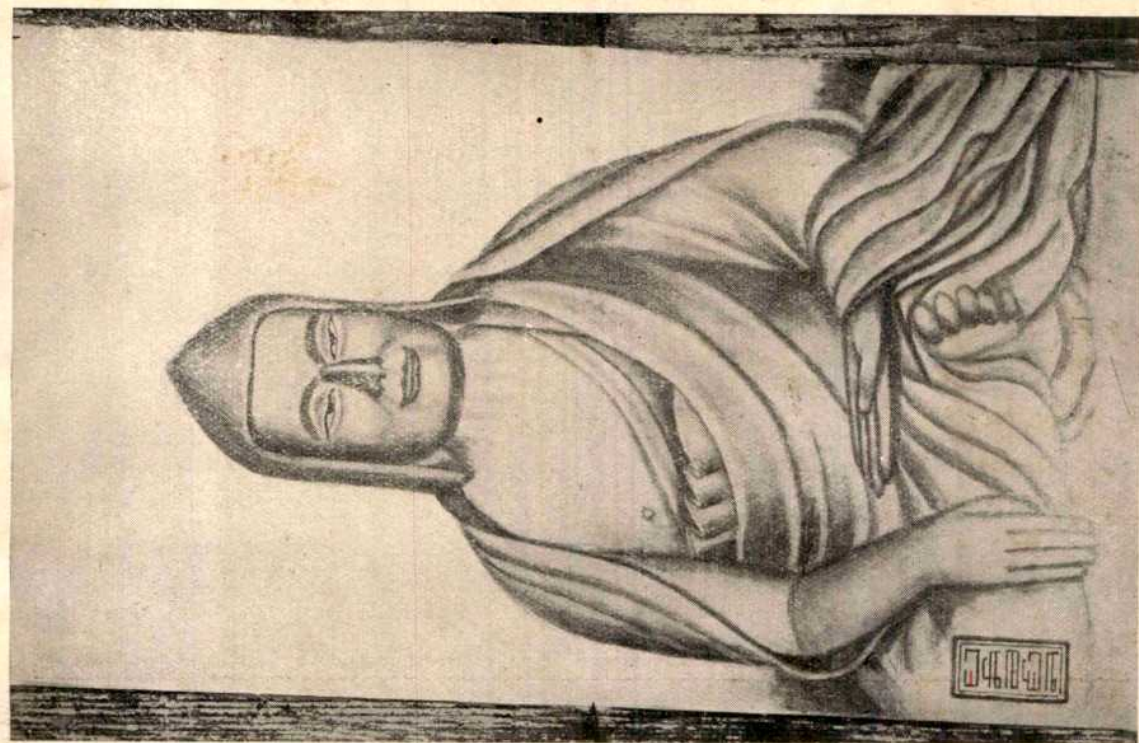
বৌদ্ধধর্মে চারিটি প্রধান দার্শনিক মত বা “বাদ” প্রচলিত আছে; বৈভাবিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। বৈভাবিকদিগের প্রধান গ্রন্থ কাভ্যায়নৌপুত্র লিখিত ‘জ্ঞান-প্রস্থান’। এই শাস্ত্রের ছয় অঙ্ক; এতদ্ব্যতীত বহুবন্ধুর অভিধর্মকোষের উত্তরে লিখিত সঙ্ঘভজের স্তায়াম্বসার গ্রন্থও ইহাদের শাস্ত্রের অন্তর্গত। সৌত্রান্তিকদিগের প্রধান গ্রন্থ আচার্য বহুবন্ধু রচিত ‘অভিধর্মকোষ’। বৈভাবিক দর্শনের পরিচয় চীন ভাষায় এবং চৈনিক লিপিতে মাত্র পাওয়া যায়। বহুবন্ধুর অভিধর্মকোষ কয়েকখানি টাকা ও ভাষ্য সহ ভোট ভাষায় বর্তমান। যোগাচারিগণ বিজ্ঞানবাদী ও মাধ্যমিক শূন্যবাদী, যোগাচারের প্রধান আচার্য অসজ। তিনি বহুবন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; অসজ পেশওয়ার নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শূন্যবাদের প্রধান আচার্য নাগার্জুন। এই দুই মত মহাবানের অন্তর্ভুক্ত। চীন জাপানের বৌদ্ধেরা বিজ্ঞানবাদী ও ভোটীয়েরা শূন্যবাদী; শূন্যবাদ বজ্রবানের সহায়ক, সুতরাং ভোটদেশে তাহার প্রভাব স্বাভাবিক।

আচার্য শাস্ত্ররক্ষিত যদিও মাধ্যমিক সিদ্ধান্তের উপরে মধ্যমকালকাররূপ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তথাপি তিনি বিজ্ঞানবাদীই ছিলেন। ভোট ভাষায় লিখিত তাঁহার জীবনীসংলগ্ন তষ সংগ্রহের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়। শাস্ত্ররক্ষিত তাঁহার সমসাময়িক ও পূর্বকালের সর্ববিধ দার্শনিক মতের গভীর বিচার-সংগ্রহ যে অপূর্ব গ্রন্থে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। এই গ্রন্থে ৩৬৪৬ শ্লোক বড়বিশ্ব অধ্যায় বা “পরীক্ষা” আছে।

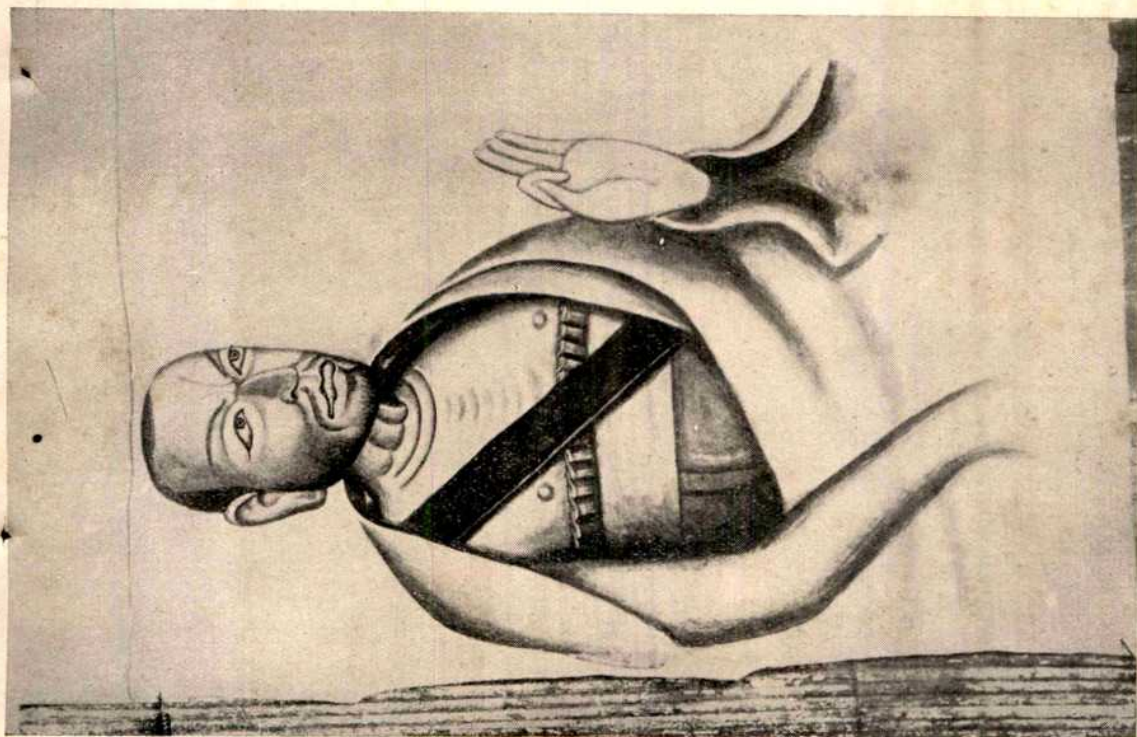
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সমধিক সম্মানিত। দীপঙ্করের তিব্বতীয় নাম “অভিশা”, “জোবো” (স্বামী), বা “জোবো-জে” (স্বামী ভট্টারক)। ইহারা দুই জনেই সহোর প্রদেশের রাজবংশে উদ্ভূত। বাঙালী পণ্ডিতগণ ‘অভিশা’কে বাঙালী প্রমাণ করেন। ‘বৌদ্ধ গান ও দোহা’ নামক পুস্তকের ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এইরূপে জালঙ্ঘরী কাছ সরজ আদি কবিদেরও বাঙালী দাঁড় করাইয়াছিলেন। যাহা হউক, সহোর বঙ্গদেশে নয় বিহারে, বিক্রমশিলার নিকটবর্তী অঞ্চলে; মুসলমানদিগের আগমনের পূর্বে এ অঞ্চল ‘ভাগল’ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সহোর মাণ্ডলিক রাজ্য ছিল; উহার রাজধানী ছিল বর্তমান কহল গ্রামের নিকটস্থ কোন স্থানে; দশম শতাব্দীতে রাজা কল্যাণশ্রী ইহার শাসক ছিলেন। ঐ সময় বঙ্গের পালবংশের বিজয়নরজা বঙ্গ ও বিহার উভয় প্রদেশেই উড়িতেছিল, রাজা কল্যাণশ্রী তাঁহাদের অধীন ছিলেন। তাঁহার রাণী শ্রীপ্রভাবতী “কাক্ষনরজ” রাজ-প্রাসাদে ভোটীয় জল-পুক-অর্ধ বর্ষ (৯৮২ খ্রি:) এক পুত্রসন্তানের জন্মদান করেন, উত্তরকালে ইনিই ইতিহাসে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে প্রসিদ্ধ হন। রাজা কল্যাণশ্রীর পদ্মগর্ভ, চন্দ্রগর্ভ ও শ্রীগর্ভ নামক তিন পুত্রের মধ্যে ইনি মধ্যম। তিন বৎসর বয়সে কুমার চন্দ্রগর্ভ “নাতিদূর” বিক্রমশিলায় অধ্যয়ন করিতে গেলেন এবং এগার বৎসর বয়সে গণিত ও ব্যাকরণ উত্তমরূপে আয়ত্ত করিলেন।

প্রারম্ভিক অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে কুমার ভিক্ষু হইয়া নিশ্চিন্ত মনে বিচারজ্ঞান করিতে সঙ্কল্প করিলেন। একদিন ভ্রমণকালে জঙ্গলের মধ্যে এক পাহাড়ে গিয়া শুনিলেন সেখানে মহাবৈয়াকরণ পণ্ডিত জেতারি বাস করেন। কুমার তাঁহার নিকট গেলে তিনি প্রশ্ন করিলেন, “তুমি কে?” কুমার উত্তর দিলেন, “আমি এই দেশের স্বামীর পুত্র।” জেতারির নিকট এই উত্তর অভিমানীর বাক্য

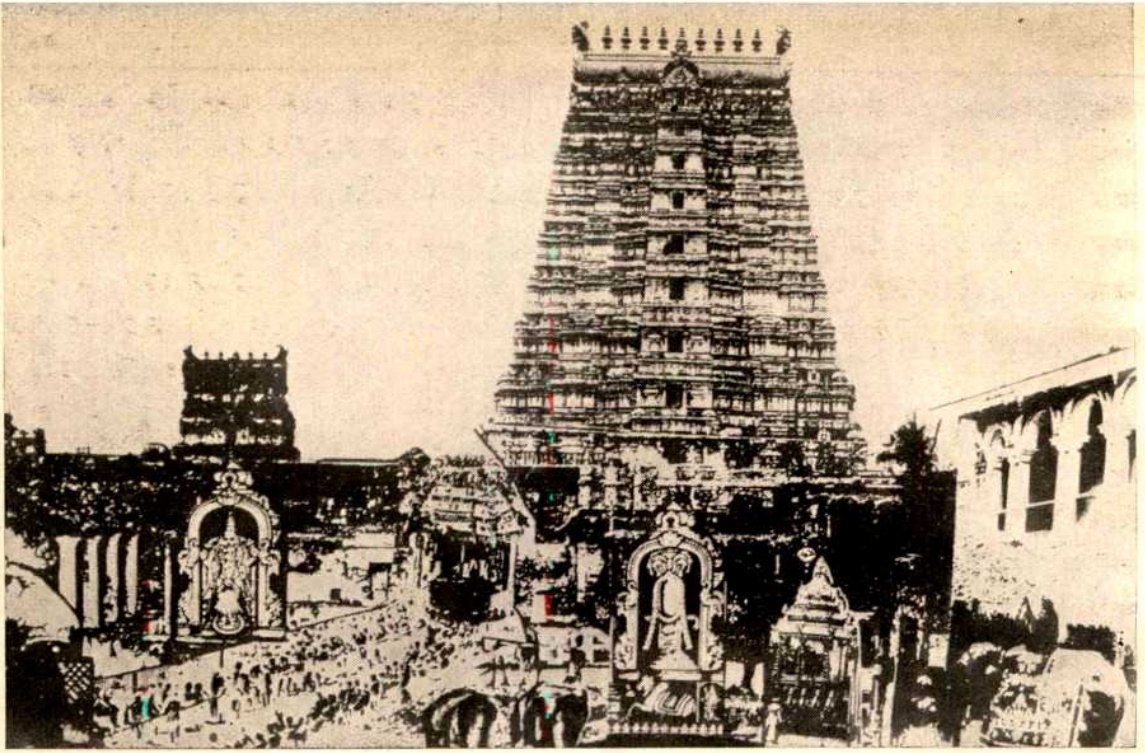
ভোটদেশে ভারতীয় আচার্যদের মধ্যে শাস্ত্ররক্ষিত ও



শান্তরক্ষিত [খ্রী: ৭৪০-৮৪০]



পণ্ডিত গয়াধর [খ্রী: ১০৬০]



বিখ্যাত তীর্থ রামেশ্বর। শিবরাত্রি উপলক্ষে প্রতিবর্ষের দ্বাদশ এয়ারেও এখানে বহু জনসমাগম হইয়াছিল



রামেশ্বরের সহস্রতন্ত্র মণ্ডপ

বলিয়া মনে হওয়ায় তিনি বলিলেন, “আমার স্বামী নাই, দাস-নাই, রক্ষকও নাই, তুই যদি ধবণীপতি তবে চলিয়া যা।” মহাবৈরাগী জ্ঞেতারির কথা কুমার পূর্বেই শুনিয়াছিলেন; সুতরাং অতি বিনয়ের সহিত নিজের সংকল্পের বিষয় তাঁহাকে নিবেদন করিয়া গৃহত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জ্ঞেতারি তাঁহাকে নালন্দা যাইতে উপদেশ দিলেন।

বৌদ্ধধর্মে মাতাপিতার অল্পমতি বিনা কেহ জ্ঞানপথের অথবা ভিক্ষু হইতে পারে না। অতিকষ্টে অল্পমতি লইয়া কয়েক জন অল্পচব সহ কুমার চন্দ্রগর্ত নালন্দা চলিলেন। বিহাবে যাইবার পূর্বে তথাকার রাজার নিকট গেলে তিনি কুমারের পরিচয় প্রাপ্তির পর বিক্রমশিলা ছাড়িয়া এতদূরে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চন্দ্রগর্ত নালন্দার প্রাচীন ও অস্তিত্ব গুণাবলী ব্যাখ্যা করায় রাজা পবন সমাদরেব সহিত নালন্দায় কুমারের থাকিবার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বিংশ বৎসব বয়সের পূর্বে ভিক্ষু হওয়া সম্ভব নহে, কুমার সে সময় দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালক মাত্র; সুতরাং নালন্দায় স্থবির বোধিভদ্র কুমারকে জ্ঞানপথের দীক্ষা দান করিলেন, পীত বস্ত্র ধারণের সহিত তাঁহার নাম হইল দীপঙ্কর জীজ্ঞান। সে সময় আচার্য্য বোধিভদ্রের গুরু অবধূতীপাদ (অন্ত নাম অম্ববজ্জ, অবধূতীপা, মৈত্রীপুণ্ড বা মৈত্রীপা) রাজগৃহে কালশিলার দক্ষিণে নির্জনবাস করিতে ছিলেন। তিনি মহাপণ্ডিত ও সিদ্ধ ছিলেন। বোধিভদ্র দীপঙ্করকে লইয়া আচার্য্য অবধূতীপাদের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহাব অল্পমতিক্রমে দীপঙ্করকে তাঁহার নিকট শিক্ষার জন্য ছাড়িয়া আসিলেন। ১২ হইতে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত সেখানে থাকিয়া তিনি উত্তমরূপে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন।

অষ্টাদশ বৎসর বয়সে দীপঙ্কর মন্ত্র-শাস্ত্র শিক্ষার জন্য সে সময়ের বিখ্যাত তাম্রিক, চুরাশী সিদ্ধেব অন্ততম ও বিক্রমশিলা বিহারের উত্তর দ্বারের দ্বারপণ্ডিত, নারোপার (নাডপাদ) নিকট গেলেন এবং একুশ বৎসব বয়স পর্যন্ত তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। দীপঙ্কর ছাড়া প্রজ্ঞারক্ষিত, কনকশ্রী ও মনকশ্রী (মাণিক্য) ইহারাও নারোপার প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিব্বতেব মহাসিদ্ধ মহাকবি জেচুন মিনা-য়ে-পার গুরু মব-বা লোচবাও নারোপার শিষ্য ছিলেন।

ঐ সময় বুদ্ধগয়ার মহাবিহারের প্রধান এক বিদ্বান ভিক্ষু ছিলেন। ইহার নাম অন্ত ছিল, কিন্তু বজ্রাসন



দীপঙ্কর জীজ্ঞান (তিব্বতী পট হইতে)

অর্থাৎ বুদ্ধগয়া-বাসী ছিলেন বলিয়া ইনি বজ্রাসনীয় বলিয়াই খ্যাত। নারোপার নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দীপঙ্কর বজ্রাসন-মতিবিহার-নিবাসী মহাশ্রবির মহাবিনয়ধর শীল-বক্তিতের সমীপে গিয়া তাঁহাকে গুরু করিয়া উপসম্পাদা (ভিক্ষু-দীক্ষা) লাভ করিলেন।

একত্রিশ বৎসব বয়সে দীপঙ্কর তিন পিটক ও তন্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত হয় নাই। এখন স্ববর্ণদ্বীপের (সুমাত্রা) আচার্য্য ধর্মপালের সুখ্যাতি শুনিয়া শিক্ষালাভেব আশায় তাঁহার নিকট যাইবার সংকল্প করিলেন। তখন ধর্মপালের পাণ্ডিত্যগৌরবের খ্যাতি তাঁহার প্রসিদ্ধ ছাত্রবর্গ—রত্নাকরশাস্তি, জ্ঞানশ্রীমিত্র, রত্নকীর্তি—এদেশে যথেষ্ট প্রচার করিয়াছিলেন। দীপঙ্কর তাহার ফলে বুদ্ধগয়া ছাড়িয়া সমুদ্রতটে ও সেখান হইতে চৌদ্দ মাস ধবিয়া সমুদ্রপথে ভ্রমণের পর বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্ববর্ণদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। সেখানে শুনিলেন আচার্য্য-দেবের সম্মুখে পৌছানই-স্বকঠিন ব্যাপার, সুতরাং সে চেষ্টা না করিয়া দীপঙ্কর বর্ষকাল এক নির্জন স্থানে

বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে দুই-এক জন করিয়া ডিম্ফু তাঁহার নিকট আসা-বাওয়া করাতে তাঁহার বিজ্ঞাবস্তার পরিচয় বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং শেষে স্ববর্ণদীপীয় আচার্যের শিষ্যপদবাচ্য হইতে কোন বাধা রহিল না। দ্বাদশ বর্ষকাল আচার্য মহীপালের নিকট সকল শাস্ত্র—বিশেষ ভাবে দর্শনশাস্ত্র, “অভিসময়ালঙ্কার” বোধিচর্য্যাবতার” প্রভৃতি—অধ্যয়ন করিয়া, পরে রত্ন-দীপ ও নিকটস্থ অম্মান্ত্র দেশ দেখিয়া দীপকর ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভারতে আসিয়া তিনি বিক্রম-শিলা বিহারে রহিলেন। তাঁহার বিশেষ যোগ্যতা দৃষ্টে তাঁহাকে ৫১ জন পণ্ডিতের উপর ১০৮টি দেবালয়ের তত্ত্বাবধায়কের কার্যে নিযুক্ত করা হইল। ইহাদের কথা বলা হইয়াছে তাঁহার ছাড়াও তাঁহার আচার্য্যবর্গের মধ্যে সিদ্ধ ভোষী, ভূতিকাটিপাদ, প্রজ্ঞাভদ্র ও রত্নাকরশাস্ত্রির নাম করা যাইতে পারে। উহার গুরু অবধূতীপা সিদ্ধা-চার্য্য ডমরুপার শিষ্য; ডমরুপা মহান সিদ্ধ ও কবি কহুপার (কৃষ্ণাচার্য্যপাদ, সিদ্ধাচার্য্য জলন্ধরীপার শিষ্য) শিষ্য ছিলেন। কহুপা তাঁহার সময়ে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রাবাদী হিন্দী কবি ছিলেন।

গুপ্ত-সম্রাটগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের যে স্থান, পালরাজবংশে ধর্ম্মপালের নাম ও পদমর্যাদা তদ্রূপ ছিল। গঙ্গাতটে এক জম্বর ছোট পাহাড় দেখিয়া মহারাজ ধর্ম্মপাল সেখানে বিক্রমশিলা বিহার স্থাপন করেন। এই পরাক্রান্ত নৃপতির কৃপাদৃষ্টি থাকায় এই বিহার অল্পদিনেই বিশাল রূপ ধারণ করে। নালন্দার দ্বায় ইহাকে বহুকালব্যাপী ক্রমোন্নতি-সোপান অভিক্রম করিতে হয় নাই। এখানে অষ্ট মহাপণ্ডিত ও এক শত আট পণ্ডিত এবং বহু দেশী বিদেশী বিদ্যার্থী থাকিত। দীপকরের সময় সত্ত্ববস্ত্রের ছিলেন রত্নাকর, অষ্ট মহাপণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন শান্তিভদ্র, রত্নাকরশাস্ত্রি, মৈত্রীপা (অবধূতীপা) ভোষীপা, স্ববিরভদ্র, স্বত্বাকর সিদ্ধ (কাশ্মীরী) ও অতীশা (দীপকর স্বয়ং)। বিহারের ভিতরে অবলোকিতেশ্বরের মন্দির ও পরিক্রমায় ছোট বড় ৫৩টি তান্ত্রিক দেবালয় ছিল। যদিও পালরাজ্যের মধ্যেই নালন্দা, উজ্জয়িনী ও বজ্জাসন (বুদ্ধগয়া)—অন্ত এই তিনটি মহাবিহার ছিল, তথাপি বিক্রমশিলার উপরেই

পালরাজ্যের বিশেষ রূপা বর্ধিত হইত। সেই যৌর তান্ত্রিক যুগে ইহা তন্ত্র-মন্ত্রের বিরাট দুর্গবিশেষ ছিল। চুরাশী সিদ্ধের প্রায় সকলেই পালবংশের রাজস্বকালে উদ্ভূত এবং তাঁহাদের অধিকাংশই এই বিক্রমশিলা বিহারের সহিত সঙ্গিষ্ট ছিলেন। তিব্বতী লেখকদিগের মতে এই বিহারের সিদ্ধগণ নিজেদের দেবতা স্বক প্রভৃতির সাহায্যে ও মন্ত্রতন্ত্র বলিপ্রদান আদি মন্ত্রের বলে বহুবার বিহার-আক্রমণকারী “তুর্কক”- (তুর্ক-মুসলমান) দিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

তিব্বত-সম্রাট শ্রোং-চন-গম্বো, ঠি-শ্রোং-দে-চন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য বহু যত্ন করিয়াছিলেন। প্রতিকূল অবস্থার ফলে উহাদেরই বংশধর ঠি-ক্যি-দে-জীমা-গোনু লাসা ছাড়িয়া উন্নী প্রদেশে (মানসসরোবর হইতে লদাখের সীমা পর্য্যন্ত) চলিয়া গিয়া সেখানে রাজ্যস্থাপন করেন। ইহারই পৌত্র মডুং-দগু-খোরে নিজের দুই পুত্র (দেবরাজ ও নাগরাজ) সহ ভিক্ষু হইয়া জাতপুত্র লু-লামা-য়েশে-ওকে রাজস্ব প্রদান করেন (দশম শতাব্দী)। রাজা য়েশে-ও (জ্ঞানপ্রভ) দেখিলেন দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম শিথিল হইতেছে, লোকে ধর্ম্মতত্ত্ব ভুলিয়া যাইতেছে। তিনি অমুতব করিলেন যে ইহার প্রতিকার না করিলে পূর্ব্বজগণ-প্রজ্জলিত এই প্রদীপ নিবিয়া যাইবে। প্রতিকার-চেষ্টায় তিনি রত্নভদ্র (রিন্-ছেন-সঙ-পো, পরে লো-ছেন-রিম্পো-ছে) প্রভৃতি ২১টি সঙ্ঘশক্ত ভোটার বালককে দশবর্ষ কাল স্বদেশে উত্তমরূপে শিক্ষা দান করিয়া পরে বিদ্যাধ্যয়নের জন্য কাশ্মীরে প্রেরণ করেন। সেখানে তাহারা পণ্ডিত রত্নবজ্রের নিকট শিক্ষালাভ করিতে থাকে, কিন্তু যখন ঐ ২১ জনের মধ্যে কেবলমাত্র দুই জন, রত্নভদ্র ও হুপ্রজ্ঞ (লগু-প-শে-রব), জীবিত অবস্থায় ফিরিলেন তখন রাজা অতিশয় দুঃখিত ও নিরাশ হইলেন। কিন্তু তাহাতেও রাজা নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন, যখন ভারতের দ্বায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তিব্বতীয়দের বাঁচিয়া থাকা মুশ্কিল, তখন ভারত হইতে কোনও উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিতকে এখানে আনাই প্রমুখ। তিনি ইহাও শুনিয়াছিলেন যে বিক্রমশিলায় দীপকর শ্রীজ্ঞান নামে এক মহাপণ্ডিত আছেন, তিনি ভোটদেশে আসিলে ধর্ম্মের শ্রোত ফিরানো চুকু হইবে না। এই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েক জন

লোককে প্রচুর স্বর্ণ দিয়া বিক্রমশিলা পাঠাইলেন। তাহার সেখানে গিয়া দীপঙ্করকে সমস্ত জানাইল কিন্তু তিনি তিক্তত যাইতে রাজী হইলেন না।

ভোটরাজ ইহাতেও হতাশ হইলেন না। তিনি এবার প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ সঞ্চয় করিয়া ভারত হইতে কোনও মহাপণ্ডিতকে আনিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। রাজকোষে যথেষ্ট সোনা ছিল না, সুতরাং তাহা সংগ্রহ করিবার জন্ত তিনি লোকজন লইয়া সীমান্ত দেশে গেলেন। সেখানে তাঁহার প্রতিবেশী গরু-লোগ দেশের রাজা তাঁহাকে বন্দী করিলেন।

পিতা বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া লুহা-লামা চ-ছুপ-ও (বোধি-প্রভ) তাঁহার মুক্তির চেষ্টায় গরু-লোগ দেশে গেলেন। কথিত আছে গরু-লোগ-রাজ ভোটরাজের মুক্তির পরিবর্তে বিস্তর স্বর্ণ চাহিয়াছিলেন। চ-ছুপ-ও যে-পরিমাণ স্বর্ণ একত্র করিয়াছিলেন তাহা যথেষ্ট নয় জানিয়া তিনি আরও স্বর্ণ সংগ্রহের জন্ত দেশে ফিরিবার পূর্বে একবার বন্দী পিতার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে সকল কথা জানাইলেন। রাজা যশে-ও তাঁহাকে স্বর্ণভক্ত দিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, “তুমি জান আমি বৃদ্ধ, বড়জোর আর দশ বৎসর পরমায়ু আছে, যদি আমাকে উদ্ধার করিতে রাজকোষ শূন্য হয়, তবে ভারত হইতে পণ্ডিত আনা সম্ভব হইবে না এবং ধর্ম্মেরও সংস্কার হইবে না। ইহাপেক্ষা ধর্ম্মের জন্য যদি আমার দেহান্ত হয় এবং তুমি ঐ স্বর্ণ দিয়া ভারত হইতে পণ্ডিত আনাও তাহা অনেক ভাল। এই রাজ্যকেই বা বিবাস কি, সে যদি স্বর্ণ লইয়া পরে আমাকে মুক্তি না দেয়? অতএব হে পুত্র, তুমি আমার চিন্তা ছাড় এবং সমস্ত সোনা দিয়া অভিশা-র নিকট দূত পাঠাও। আশা আছে আমার বন্দীদশার কথা শুনিয়া ভোটদেশে ধর্ম্মের চিরস্থিতির জন্তও তিনি আসিবেন। যদি তিনি একান্তই না আসেন, তবে উহার পরের জ্যেষ্ঠর কোনও পণ্ডিতকে আনাও।” এই বলিয়া ধর্ম্মবীর যশে-ও পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। ইহাই পিতা-পুত্রের শেষ দেখা।

চ-ছুপ-ও দেশ-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃ আজ্ঞানুসারে ভারতে দূত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। উপাসক শুভ্র-খং-পা ইতিপূর্বে ভারতে দুই বৎসর বাপন করিয়া-

ছিলেন। তিনিই এই ভার লইলেন এবং তাঁহার সঙ্গী হিসাবে নগ্র-ছোনিবাসী ভিক্সু ছুল্-টিম-গাল-বা (শিলবিজয়) ও অস্ত্র কয়েক জনকে লইলেন। এইরূপে দশ জনে বিপুল স্বর্ণসম্ভার লইয়া নেপালের পথে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিক্রমশিলায় পৌছাইলেন (জোম্-তোন-রচিত গুরু-গুণ ধর্ম্মাকর ৭৭ পৃঃ)। ইহারা বিক্রমশিলার সম্মুখের গঙ্গার ঘাটে যখন পৌছাইলেন তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। খেয়ার নৌকা লোকে পরিপূর্ণ, সুতরাং মাঝি ইহাদিগকে পরের ক্ষেপে লইয়া যাইবে এই আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেল। ওপারে বিক্রমশিলার বিরাট প্রাকার ও দেউল দেখিয়াই তিব্বতীয় রাজীরা পথকষ্ট ভুলিয়াছিলেন, কিন্তু খেয়া নৌকার দেৱীতে তাঁহাদের সন্দেহ হইল মাঝি আর সেদিন ফিরিবে না। নিষ্কর্মন নদীতটে বিরাট স্বর্ণরাজী লইয়া তাঁহাদের ভয় হইতে লাগিল, সুতরাং তাঁহারা বালুর তলায় স্বর্ণ লুকাইয়া রাজি বাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সময় মাঝি নৌকা লইয়া ফিরিয়া আসিল। রাজীরা তাহাকে দেৱীর জন্ত সন্দেহের কথা বলায় সে বলিল, “তোমাদের ঘাটে ফেলিয়া রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে আমি চলিয়া যাইতে পারি।”

নদীপথে তাঁহারা মাঝির নিকট গুলিলেন বিহারের দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পশ্চিম দ্বারের সম্মুখস্থ ধর্ম্মশালায় রাজি বাপনের জন্ত তাঁহারা ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সময় বিহারের তোরণের উপরস্থ কক্ষবাসী ভোটভিক্সু গ্য-চোন-সে তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিয়া, স্বদেশবাসী জানিয়া তাঁহাদের নিকট ধবরাধবর লইতে আসিলেন। কথাবার্তায় তাঁহারা অভিশা-কে লইতে আসিয়াছেন জানিয়া তিনি পরামর্শ দিলেন যে ইহারা যেন প্রথমে বিদ্যার্থীরূপে বিহারে প্রবেশ করেন, কেননা মূল উদ্দেশ্য সকলে জানিলে পরে অভিশা-কে লইয়া যাওয়া দুর্ব্বল হইবে। তিনি আরও বলিলেন যে পরে স্বযোগ বুঝিয়া তিনিই দূতের সহিত অভিশার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিবেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের বাসনা নিবেদন করিতে পারিবেন।

তিব্বতীয় দূতগণের পৌছিবার কিছুদিন পরেই বিক্রমশিলায় পণ্ডিত-সভা বসিল। গ্য-চোন সকল বিখ্যাত পণ্ডিতের সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ করাইলেন। বিখ্যাত

পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত আলাপের ফলে রাজদূত বুঝিলেন অতিশা-র স্থান কত উচৈ।

আরও কিছুকাল পবে গ্য-চোন্‌ স্বেগে বৃষ্টিয়া তাঁহাদের অতিশার গৃহে লইয়া নিভূতে আলাপ করাইলেন। তিব্বত-দূতগণ অতিশাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সম্মুখে স্বর্ণরাশি নিবেদন করিয়া, ভোট-রাজ যেশে-ও কি-ভাবে বন্দী হইয়াছিলেন ও তাঁহার অস্তিম কামনা কি ছিল সকল কাহিনী শুনাইলেন। দীপঙ্কর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া অতি বিচলিত হইয়া বলিলেন, “নিঃসন্দেহ ভোটরাজ যেশে-ও বোধিসত্ত্ব ছিলেন। আমি তাঁহার কামনা ভঙ্গ কবিব না, কিন্তু তোমরা জান আমার উপর ১০৮ দেবালয়ের তত্ত্বাবধানের ও অল্প অনেক কার্যের ভার আছে। এ সকলের ব্যবস্থা করিতে আমার ১৮ মাস সময় লাগিবে। তাহার পব আমি যাইতে পারিব। এখন স্বর্ণরাশি তোমরা রাখ।”

ভোট-রাজদূতগণ ইহা শুনিয়া অধ্যয়নের ছুতা করিয়া বিহারে রহিয়া গেলেন। অতিশা যাত্রার উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে একদিন সময়মত তিনি সজ্জাবির রত্নাকরপাদকে সমস্ত কথা বলিলেন। রত্নাকর দীপঙ্করের সহিত একমত হইতে পারিলেন না। তিনি এক দিন ভোটীয় সজ্জনদের ডাকিয়া বলিলেন, “ভোট আয়ুত্ম। আপনারা-বিদ্যার্থীরূপে বিহারে প্রবেশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা কি সভ্য যে আপনারা আসলে অতিশাকে লইয়া যাইবার জন্তই আসিয়াছেন? এ সময় অতিশা ভারতীয়দের চক্ষুরূপ, দেখিতেছেন না পশ্চিম দিকে তুরস্কদের উপদ্রব চলিতেছে। যদি এই সময় অতিশা দেশান্তরে চলিয়া যান তবে এখানে ভগবানের ধর্ম্মস্বর্ঘ্যও অন্ত যাইবে।”

অতিকষ্টে সজ্জাবিরের অহুমতি পাওয়া গেল। অতিশা স্বর্ণ ভোট গ্রহণ করিয়া তাহা চার অংশে বিভক্ত করিলেন। এক অংশ পণ্ডিতদিগকে দান এবং দ্বিতীয় অংশ বজ্রাসনে (বুদ্ধগয়া) নিবেদন করিলেন; তৃতীয় অংশ রত্নাকরের হস্তে বিক্রমশিলা সজ্জাব জন্ত ও শেষ চতুর্থীংশ রাজ্যব অল্প ধর্ম্ম-কৃত্যের জন্ত দান করিয়া নিজের লোকজনকে ভোট-দূতদিগের সহিত পুস্তক ও অস্ত্রাস্ত্র আবশ্যক দ্রব্যসহ নেপালের পথে পাঠাইলেন। পরে তিনি স্বয়ং “লোচবা” (ভারতীয় পণ্ডিতের সহায়ক তিব্বতীয় দ্বিভাষী) ও অল্প লোকজন—সর্ব্বসমেত বার জন—লইয়া বুদ্ধগয়া যাত্রা করিলেন।

বজ্রাসন ও অস্ত্রাস্ত্র তীর্থ দর্শন করিয়া পণ্ডিত ক্ষিতিগর্ভ আদি বিংশতি জনের মণ্ডল লইয়া আচার্য্য দীপঙ্কর ভারতসীমার নিকট এক ছোট বিহাবে উপস্থিত হইলেন। দীপঙ্করের শিষ্য তোম্-তোন্ তাঁহার গুরু-গুণ ধর্ম্মাকবে লিখিতেছেন,

“স্বামীর ভোট প্রস্থানের সময় ভারতে (বুদ্ধ) শাসন অন্তাচলগামী। ভারতের সীমার নিকট অতিশা দেখিলেন তিনটি ছোট অনাথ কুকুরশাবক পথের পাশে পড়িয়া আছে। ষষ্টি বৎসরের বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কি এক অনির্কচনীয় ভাবের প্রেরণায় নিজ মাড়ভূমির অস্তিম চিহ্ন স্বরূপ এই তিনটি কুকুরশাবককে নিজ চীববে (ভিক্ষু-পরিধানবস্ত্র) উঠাইয়া লইলেন।”

তিব্বতে প্রবাদ, আজও ঐ তিনটি কুকুরের জাতি ডাঙ-প্রদেশে বর্ত্তমান আছে।

ভারতসীমা পার হইয়া অতিশার মণ্ডলী নেপাল-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে নেপাল রাজধানীতে উপনীত হইলেন। নেপালরাজ মহাসমাদরে তাঁহাদের রাজঅতিথিক্রমে অভ্যর্থনা করিলেন এবং দীপঙ্করকে নেপালে থাকিবার জন্ত অতি আগ্রহের সহিত অল্লনয় করিলেন। তাঁহার সনির্কচ অল্লরোধে অতিশাকে এক বৎসর কাল নেপালে থাকিতে হইল। সেখানে নানা ধর্ম্মাচরণের মধ্যে এক রাজকুমারকে তিনি ভিক্ষু-দীক্ষা দিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর মহারাজ নেপালকে এক পত্রও লিখিয়াছিলেন, তাহার ভোটীয় অহুবাদ এখনও তঞ্জুরে বর্ত্তমান।

নেপাল হইতে প্রস্থান করিয়া দীপঙ্কর যখন থং বিহারে উপস্থিত হইলেন তখন ভিক্ষু গ্য-চোন্‌-সেং-এর পীড়ার জন্ত তাঁহাকে সেখানে কিছুদিন থাকিতে হইল। বহু চেষ্টাতেও ভিক্ষু গ্য-চোন্‌কে বাঁচাইতে পাবা গেল না এবং তাঁহার জ্ঞান বিধান বহুশ্রুত দ্বিভাষীর বিরোধে অপার হুখে ও নিরাশায় দীপঙ্কর বলিলেন, “আমার ভোটযাত্রা বিফল হইল, আমি দ্বিভাষী-বিনা সেখানে কি করিতে পারিব?” শীলবিজয় ও অল্প দ্বিভাষীগণ তাঁহাকে অনেক কষ্টে প্রবোধ দিলেন।

বুদ্ধ পণ্ডিতের পথকষ্ট নিবারণের জন্ত ভোটরাজ চঙ্-ছুপ-ও নিজ রাজ্যে মহাযত্নে নানা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভোটনিবাসী জনসাধারণ তখন এই স্বর্ঘ্যপ্রভ মহাপণ্ডিতের দর্শনেব জন্ত লাল্যযিত। এইরূপে পথে ভোট-জনসাধারণকে ধর্ম্মমार्গ দেখাইতে দেখাইতে তিব্বতীয় জল-পুরুষ-অথ বহর (চিহ্নভাহু সখৎসর = ১০৪২ খ্রিঃ) আচার্য্য দীপঙ্কর ত্রীজ্ঞান ৬১ বৎসর বয়সে ডংরী অর্থাৎ পশ্চিম-তিব্বত প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। রাজধানী থোলিঙ পৌছিবার পূর্বেই ভোটরাজ অনেক পথ আগাইয়া তাঁহাকে লইতে আসিলেন এবং নানা স্তুতিসহকারে অভ্যর্থনা-সমারোহের মধ্যে তাঁহাকে থোলিঙ বিহারে লইয়া গেলেন। “স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বজ পূজ্যতে।”

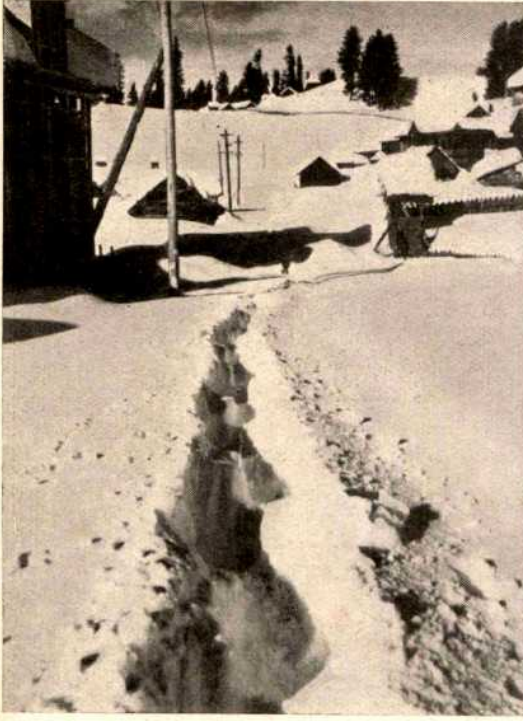
* তখন মহাঅর গজনবীর মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু মধ্য-এশিয়ার ইস্লাম ও বৌদ্ধধর্ম্মেব সংঘাত চলিতেছে।



গুলমর্গের প্রধান বাজার—বরফ পড়িয়া দোকানের সাইনবোর্ড পর্যন্ত সব ঢাকিয়া গিয়াছে



তুষারপুরী গুলমর্গ



গুলমর্গের পথে—চারিদিক তুষারাবৃত



গাছের উপর বরফ পড়িয়া গুণ্ডাকার ধারণ করিয়াছে



গুলমর্গের ভাকঘর—চারিদিক তুষারাবৃত



প্রীত্বকালে গুলমর্গের দৃশ্য



মহারাজী মন্দির

গুলমর্গ

তুষারের দেশ

শ্রীচন্দ্রগুপ্ত বিজ্যালঙ্কার ও শ্রীধনকুমার জৈন

শীতকালে কাশ্মীর যাওয়ার মত মনের অবস্থা ইতিপূর্বে কখনই হয় নাই, এবার তাহাই ঘটিল। দেখি, চারিদিক বরফে চাপা পড়িয়াছে। দিনের বেলা তাপমানযন্ত্র প্রায় শূন্যে গিয়া ঠেকিয়াছে।

ঝিলম নদীর ক্ষীণ জলধারা আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে বরফের চড়া। প্রথমেই গুলমর্গ হিল-ষ্টেশনে যাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, এমন সুন্দর ও মনোরম দৃশ্য পৃথিবীতে অল্পই দেখা যায়। বার মাসের মধ্যে সাত মাস এ-স্থান বরফেই চাপা থাকে। কেবল পাঁচ মাসের জন্ত এখানে ইলেক্ট্রিক, ডাকঘর, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বর্তমান যুগের আবিষ্কারগুলি কাজে লাগে।

গুলমর্গ হইতে দুই হাজার ফুট উচে থিলানমর্গ অবস্থিত। সেখানে পাহাড়ের উপরে ‘আল-পথর’ নামে একটি ঝিল আছে, সমুদ্র হইতে প্রায় ১৪৫০০ ফুট উচে। এখানে বার মাসই বরফ জমিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে এখানে দূর-দুরান্তের হইতে অনেক লোক ভ্রমণ করিতে আসে। আশ্বিনের পর হইতেই এ-স্থান জনশূন্য হইয়া যায়।

টনমর্গের ডাক-বাংলো পর্যন্ত আমরা কোনমতে মোটর-যোগে গেলাম, তার পরেই গুলমর্গ যাইতে দুই হাজার ফুট



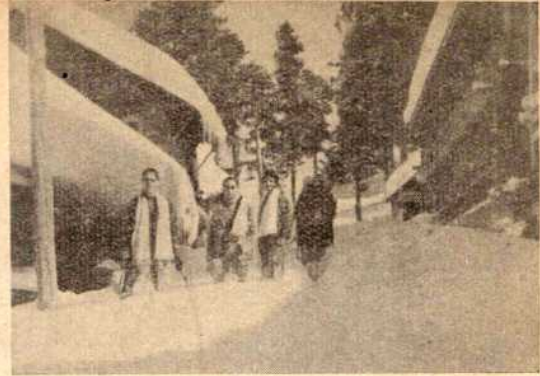
গ্রীষ্মকালে গুলমর্গের পথের দৃশ্য

চড়াই। পঁচিশ-ত্রিশ জন কুলির সাহায্যে আমরা উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা বরফের উপর দিয়া বহু কষ্টে ও যথেষ্ট উৎসাহের সহিত চলিয়া আমরা উপরে গিয়া পৌছিলাম।

উপর হইতে এক দিকে গুলমর্গের সম্পূর্ণ দৃশ্য ও অপর দিকে অনেক উচে কাশ্মীরের মনোহর ঘাটের দৃশ্য দেখিয়া দেহ-মনের অবসাদ দূর হইয়া গেল। দেখিলাম, সেখানকার বাজার-হাট, হোটেল, বাড়ীঘর সবই বরফে চাপা।



গ্রীষ্মকালে গুলমর্গের দৃশ্য



গুলমর্গের একটি হোটেলের সম্মুখে লেখকের ভ্রমণসঙ্গী দল

সব বাড়ীরই নীচের তলা বরফে ডুবিয়া আছে, ছাদেও যথেষ্ট পরিমাণ বরফ, আবার চারি দিকে বরফ ঝুলিয়া আছে। প্রায় এক ঘণ্টা ভ্রমণের পর দেখিলাম যে, আধ মাইলের বেশী চলা হয় নাই। ইচ্ছা হইল কোথাও একটু বসিয়া বিশ্রাম করি, কিন্তু বসিলে আর রক্ষা নাই, জড়ভরতের অবস্থা প্রাপ্ত হইবার যথেষ্ট ভয় আছে।

স্বর্যাস্তের পরই বরফের উপরিভাগ জমিয়া নিরেট হইয়া যায়। তখন সেখানে থাকিলে বিপদ হইতে পারে, তাই নীচে নামিতে আরম্ভ করিলাম। নামিতে অবশ্য খুব কম সময়ই লাগিয়াছিল।

[এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত চিত্রগুলি শ্রীচন্দ্রগুপ্ত বিজ্ঞানকার কর্তৃক গৃহীত]

মহিলা-সংবাদ

নূতন ভারত-শাসন আইন অনুসারে গঠিত বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভাসমূহে অনেক মহিলা নির্বাচিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যা শ্রীমতী উমা নেহরুর ফোটোগ্রাফ গত চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত করিয়াছিলাম। এই সংখ্যায় মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যাদের ফোটোগ্রাফই প্রধানতঃ মুদ্রিত হইল। অত্যাগ প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যাদের চিত্রও প্রবাসীতে ক্রমশঃ মুদ্রিত হইবে।



ডাঃ লক্ষ্মীদেবী আন্দা
মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যা



শ্রীমতী অঞ্জলয় আশ্রয়, মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।



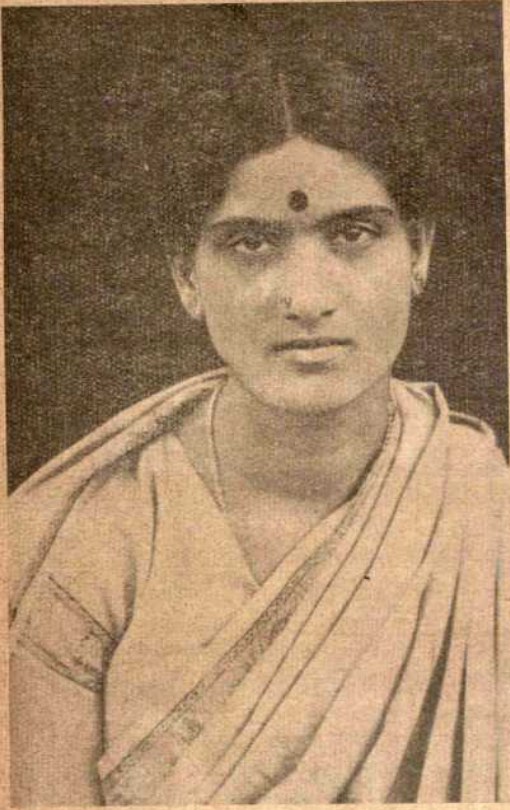
শ্রীমতী মসলামনি আশ্রয়, মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।



শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।



মিসেস ইক্বাল হোসাইন, মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।



কুমারী জি. আনন্দরাম, মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য



শ্রীমতী কৃষ্ণী লক্ষ্মীপতি, মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য



শ্রীমতী লক্ষ্মী কুম্ভখামী ভারতী, মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য

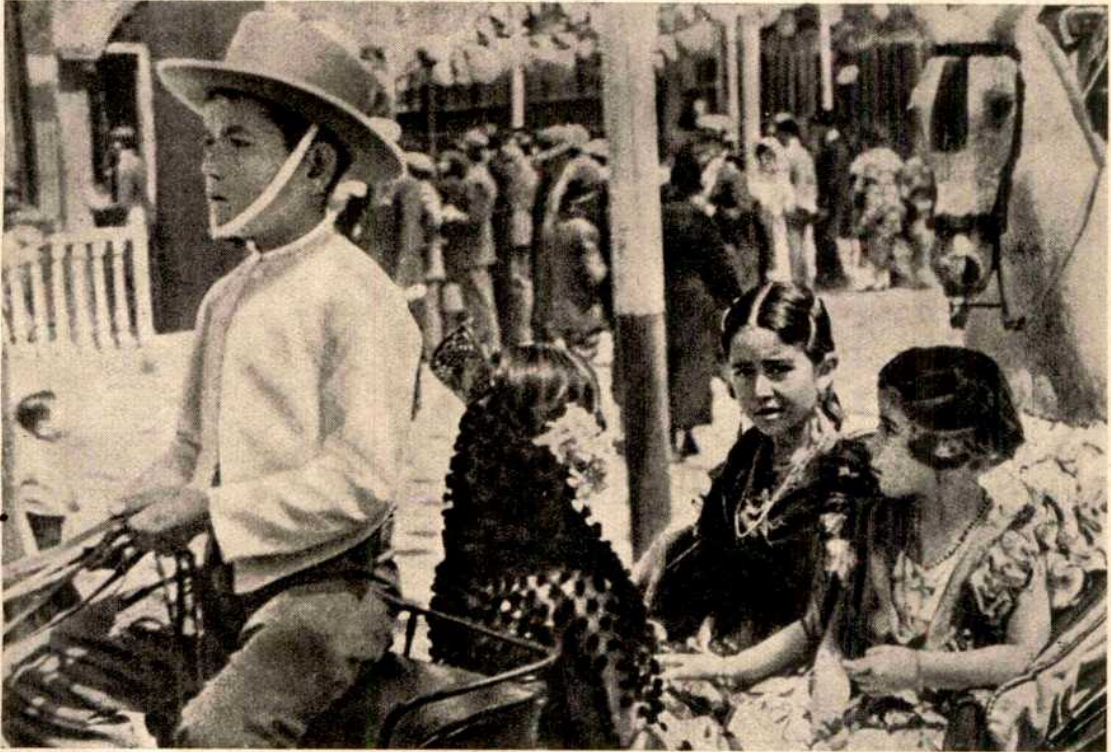


সিংহল-নিবাসিনী কুমারী জি. এ. মুথুভাল পূর্বে মাদ্রাজ সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ে ছাত্রী ছিলেন। বর্তমানে তিনি শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্রী। তিনি মৃত্তিগঠনে বিশেষ পারদর্শিনী হইয়াছেন। মাদ্রাজ শিল্পবিদ্যালয়ে তৎকর্তৃক গঠিত একটি মৃত্তি সহ তাঁহার ফোটোগ্রাফ প্রকাশিত হইল।

বহির্জগৎ



১৪ই এপ্রিল, ১৯৩১। মাদ্রিদে গণতন্ত্রবাদের আরম্ভ উপলক্ষে জনসাধারণের আনন্দ-উৎসব



স্পেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় এক পুষ্পোৎসবে তরুণদিগের শোভাযাত্রা। এই তরুণদিগের
ছিন্ন শব্দ হয়ত আজ মাদ্রিদে পড়িয়া আছে



মরক্কোতে স্পেন জয়ের জগ্ন মূর-সেনাকে শিক্ষাদান করা হইতেছে। ইহাদেরই পূর্বপুরুষগণ এই বিদ্রোহী
স্পেন-সেনাদের পূর্বপুরুষ কর্তৃক স্পেন হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল



দক্ষিণ স্পেনের অভিমুখে বিদ্রোহীদলভুক্ত মূর সৈন্যদল



“গণতন্ত্র রক্ষার জন্ত অঙ্গধারণ কর!”
স্বৈচ্ছাসেবিকার আহ্বান



স্বাধীন অবস্থায় আবিসিননীয়-কুমারী। দুই সহস্র বৎসর
পরে ইহাদের দাসত্ব বরণ করিতে হইল।
ইয়োৰোপীয় সভ্যতার জয়!



মাদ্রিদে বোমাবর্ষণ। এই নারীর
সর্ব্বাংশ গিয়াছে



মাদ্রিদে বোমাবর্ষণ সময়ে গৃহীত চিত্র।
ইহাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে



বোমানিক্ষেপে বিধ্বস্ত মাদ্রিদ স্টেশন



মাদ্রিদে বোমাবর্ষণ। আধুনিক সভ্যতার:একটি দৃশ্য



মুসোলিনির লিবিয়া পরিদর্শন। মুসোলিনি ও লিবিয়ার গবর্নর মার্শাল বালবো একটি মসজিদ দর্শনে আসিয়াছেন



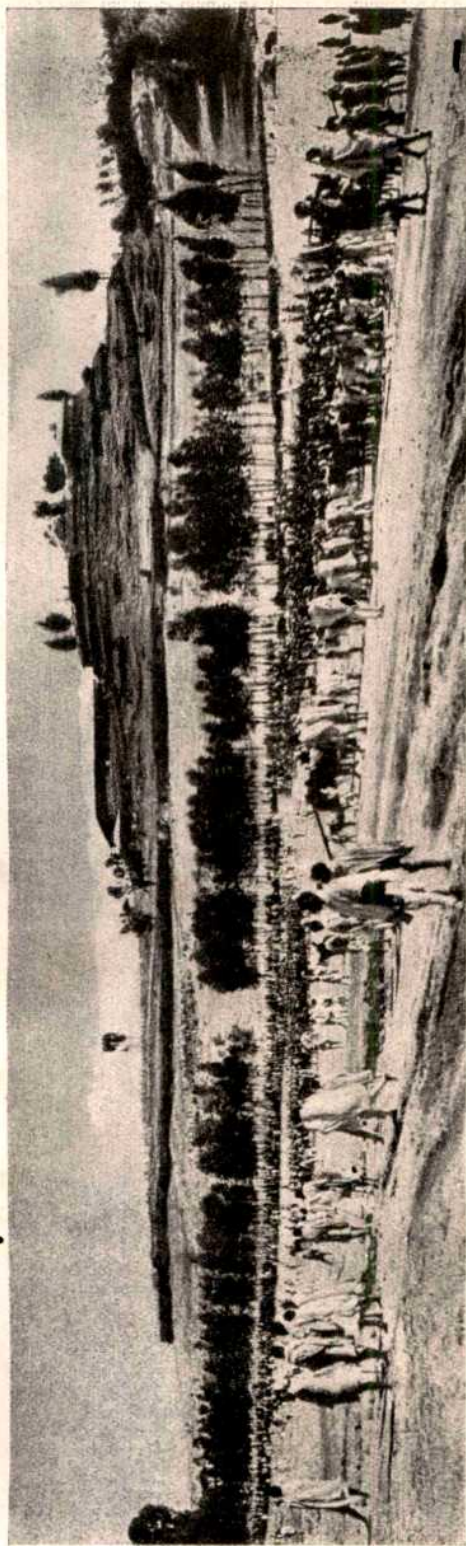
লিবিয়ার অধিবাসিগণ মুসোলিনিকে অভ্যর্থনা করিতেছে। মুসোলিনি নিজেকে 'ইসলাম-রক্ষী' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন



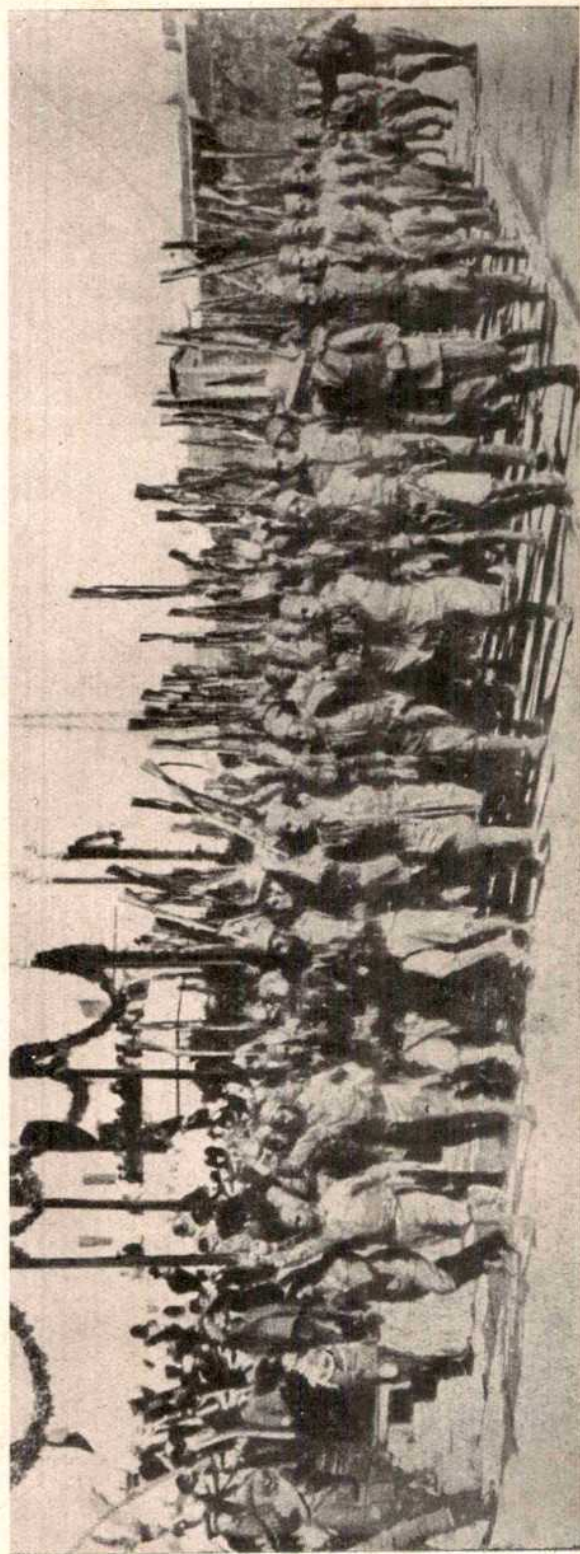
লিবিয়া পরিদর্শনে মুসোলিনি। মুসোলিনি অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছেন



ইতালীয় রাজদূত স্পেনের বিদ্রোহী নেতাকে স্বীকার করিয়া লইতেছেন



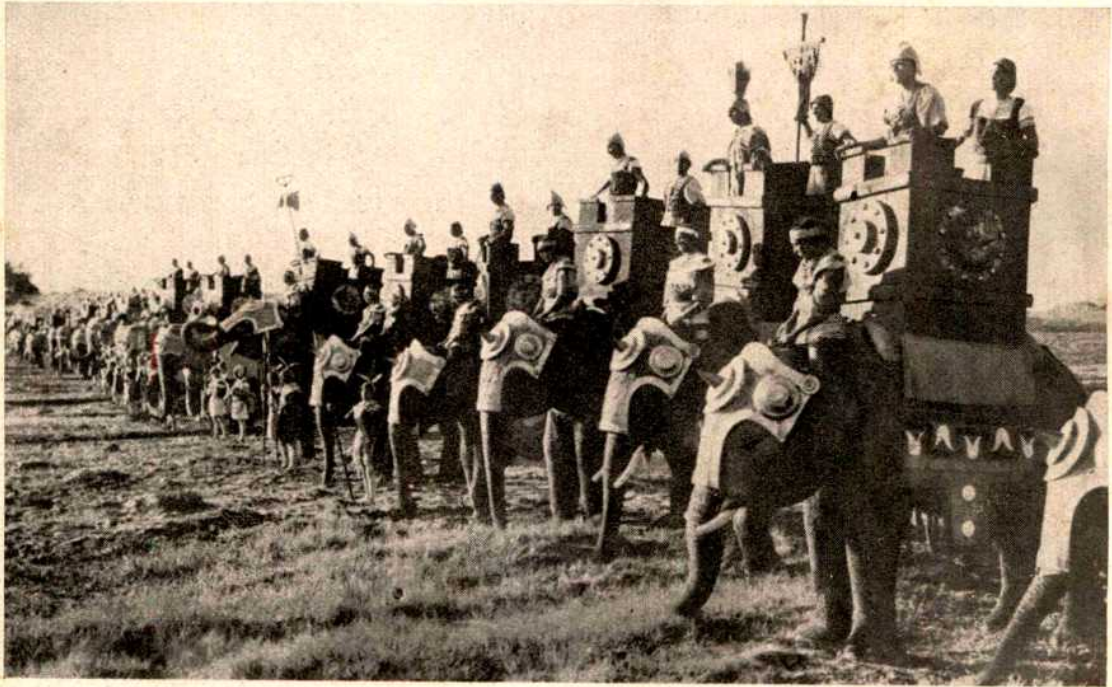
ভেসীতে আর্বির্সিনীয় সেনার দেশরক্ষার শেষ চেষ্টা।



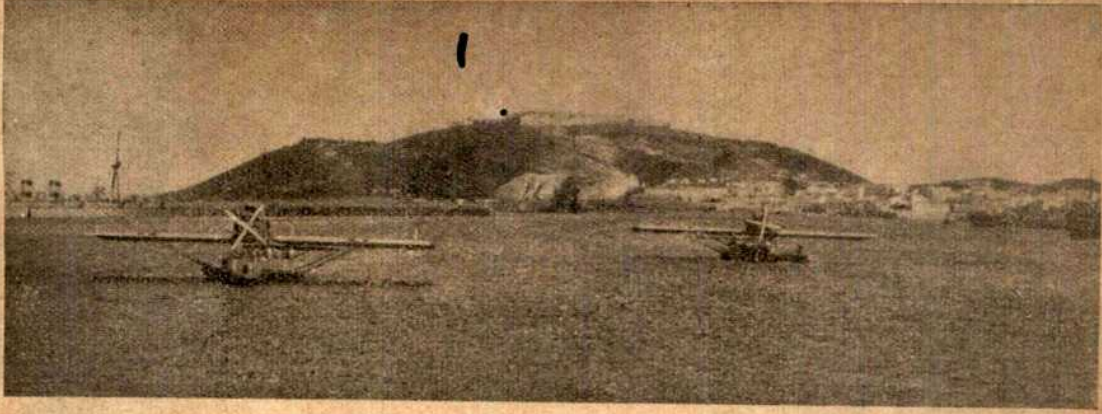
ইটালীয় সেনাদলের ভেসী অভিমুখে যাত্রা।



চিত্রে সাম্রাজ্যবাদ—প্রাচীন রোম সেনাধ্যক্ষ সিপিয়ো বর্ত্তক আফ্রিকাজয়ের চিত্র সম্প্রতি সিনেমায়
তোলা হইতেছে। এই চিত্র ফ্যাসিষ্ট-মণ্ডলীর সহায়তায় তোলা হইয়াছে



“সিপিয়োর আফ্রিকা জয়”—অন্য একটি দৃশ্য



মরক্কো, কিউটা বন্দর। ইহা জার্মানী বা ইটালী হস্তগত করিলে জিরাটারের কোনও মূল্য থাকিবে না।

বন্দরে বিদ্রোহী সৈন্যবাহক জার্মান ডর্নিয়ার হাইড্রোপ্লেন রহিয়াছে

বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থার গতি ও প্রকৃতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা ভীষণ দুর্দিনের আভাস পাওয়া যাইতেছে। স্পেনের অন্তর্বিপ্লবের পরিণতি ভাবিয়া সকলেই আজ চিন্তিত। বর্তমানে যে-বৎসর শেষ হইতে চলিল তাহাতেই ইহার কারণগুলি সব উদ্ভূত হয় নাই, তবে এই সময় তাহা ক্রমশঃ পাকাইয়া উঠিয়া ইদানীং একটা অনিশ্চিত অবস্থায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কাজেই এই সময়কার প্রধান ঘটনাগুলির আলোচনা এখন অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ইদানীং অন্তর্জগতে যে-সব সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে তাহার মূল অন্তর্ধান করিতে হইলে গত বিশ বৎসরের কতকগুলি প্রধান প্রধান সন্ধি, চুক্তি ও ব্যাপারের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হেবর্সাই সন্ধি, রাষ্ট্রসংঘ, ওয়াশিংটন নৌচুক্তি, লোজান সন্ধি, লোকার্নো চুক্তি, লণ্ডন নৌচুক্তি, নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন, কেলগ্ চুক্তি প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান বিষয়ের এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে। জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার ও রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ, জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয়, সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রসংঘ প্রবেশ প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গেও আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত। বর্তমানে আমরা যে-অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছি প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহা জার্মানীর রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগের সময় হইতে আরম্ভ হয়।

বিগত মহাসমরে জার্মানী পরাজিত হইলেও তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির কথা বিজয়ী শক্তি-বর্গ, বিশেষ করিয়া



ভূতপূর্ব স্পেন-নৃপতি আলফonso



স্পেনের গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট আজানা



গণতন্ত্রের সমর-মন্ত্রী লারগো কাবালেরো

ফ্রান্স, কখনও তুলিতে পারে নাই। এই কারণ তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখার জন্ত কোন চেষ্টারই ক্রটি হয় নাই। কিন্তু যখন সে হিটলারের অধীনে সজ্জবদ্ধ হইয়া ও রাষ্ট্রসম্মত্যাগ করিয়া সমরশক্তি বাড়াইতে লাগিয়া গেল তখন সকলেই ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, রাষ্ট্রসম্মত মারকত তাহাকে জব্দ করিবারও চেষ্টা চলিতে লাগিল। এমন সময় একরূপ একটি ঘটনা ঘটিল যাহা পরবর্তী যাবতীয় আলাপ-আলোচনার মোড় ফিরাইয়া দিল। এই ব্যাপারটি হইল ১৯৩৫ সনের ১৮ই মে অন্যান্যিরপেক্ষ ভাবে ব্রিটেন ও জার্মানীর মধ্যে ১০০ : ৩৫ আন্তঃপাতিক নৌচুক্তি। এই নৌচুক্তির কথা প্রকাশ হইবা মাত্র সকলেরই টনক নড়িল। জার্মানীর চিরশত্রু ফ্রান্স বিচলিত হইল সকলের চেয়ে বেশী। যাহাকে সে এককাল পরমাশ্রম্য বলিয়া মনে করিয়াছে সেই ব্রিটেনকে ছাড়িয়া অতঃপর সে ইটালীর দিকে মুখ ফিরাইল, ইহার কর্ণধার মুসোলিনীকেই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিল। ব্রিটেন-জার্মানীর নৌচুক্তির বিরুদ্ধে এই যে ফ্রান্স-ইটালীয়ান আঁতাত, এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই ইটালীর আবিদীনিয়া বিজয়ের মূলে, রাষ্ট্রসম্মত নিষ্ক্রিয়তা-তথা ব্যর্থতার মূলে, আবার ইহাই পরবর্তী স্পেন-বিস্ত্রোহ ও অন্যবিধ ব্যাপার-গুলি সম্ভব করিয়া দিয়াছে।

মহাসমরের পর বিজিত জার্মানীর ছায় বিজয়ী ইটালীও

মিত্রশক্তিগুলির চক্রান্তে পড়িয়া কম নাজেহাল হয় নাই। মুসোলিনী ইটালীর কর্ণধার হইয়া বার-বার বৎসরের মধ্যে ইহাকে একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত করিলেন। তাঁহার শক্তি যতই বাড়িতে লাগিল ততই তিনি বিদেশে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যম হইলেন। এখন ফ্রান্সকে হাতে পাইয়া তাঁহার এই উদ্দেশ্য সাধন সহজ হইয়া গেল। মুসোলিনী এই স্বযোগে আবিদীনিয়া অভিযান আরম্ভ করিয়া দিলেন। এক দিকে ব্রিটেন ও অন্য দিকে ফ্রান্স—



১৫ই এপ্রিল ১৯৩১। গণতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে
উল্লসিতা বালিকাদিগের শোভাযাত্রা



যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহীদলভূক্ত মুর-সেনা।



লুণ্ঠনরত মুর-সেনা।

এই উভয়ের টানা-হেঁচড়ায় পড়িয়া রাষ্ট্রসংঘের ইটালীকে সায়েস্তা করিবার সকল ব্যবস্থাই ব্যর্থ হইল। ইটালী গত বৎসর এপ্রিল মাসে আবিসীনিয়া জয় করিয়াছে। তবে ইহাকে স্বায়ত্তে আনিতে এখনও আড়াই লক্ষ সৈন্য সেখানে মোতায়েন রাখিতে ইটালী বাধ্য হইয়াছে। আবিসীনিয়াবাসীরা যে নতমস্তকে ইটালীর আধিপত্য স্বীকার করিয়া লয় নাই, সম্প্রতি হাবসী-নেতা রাস দেস্তার ও আদ্রিস আবাবার বহু সংখ্যক অধিবাসীর হত্যা-ব্যাপারে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

গত ১৯৩০ সনে স্পেনবাসীরা রাজা আলফন্সোকে তাড়াইয়া দিয়া স্পেনে একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। তখন হইতেই কিন্তু রাজার পক্ষপাতী এক প্রবল দল সেখানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহারাই এই কয় বৎসর সাধারণতন্ত্রের উচ্ছেদে তৎপর থাকিলেও বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইটালীর আবিসীনিয়া বিজয়পর্ষ শেষ হইবার পূর্বেই, গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে সেখানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে গণতন্ত্রের পক্ষপাতী দলগুলি প্রায় সর্বস্বই জয় লাভ করে এবং নিয়মাত্মক ভাবে



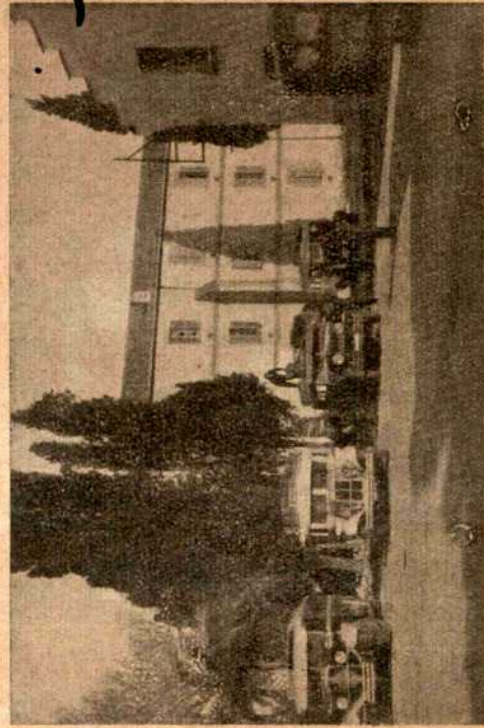
যুদ্ধান্ত-ব্যবসায়ী মরু বেলিল জাহারক

ইহার মৃত্যুতে পুদিবীতে শান্তির সম্ভাবনা কিছু বাড়িল। ইহার চক্রান্তে বহু যুদ্ধ ও লক্ষ লক্ষ লোকের আগনাগম হইয়াছিল

তাহাদের হস্তেই শাসনভার চলিয়া আসে। ইহাতে রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ধনী ও ধর্মবাজকের দল অতিমাত্র



বিদ্রোহী মুর সেনার হাতে বন্দিনী গণতন্ত্রবাদিনী

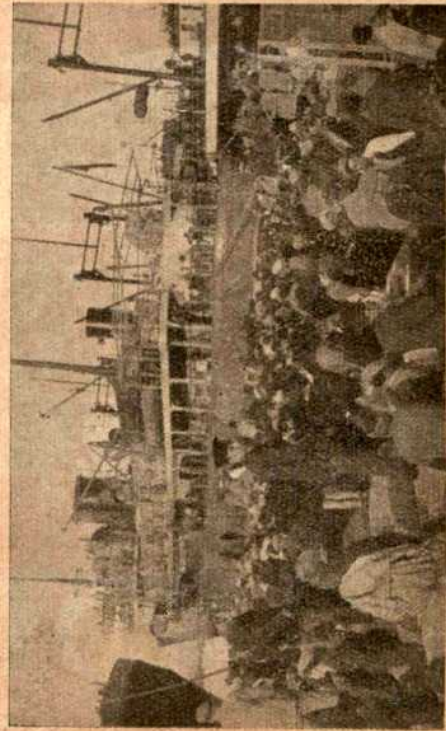


গণতন্ত্রবাদের আন্তর্জাতিক সহায়ক সেনার স্বে নবাতা—পরপিনিয়ান, ফ্রান্স

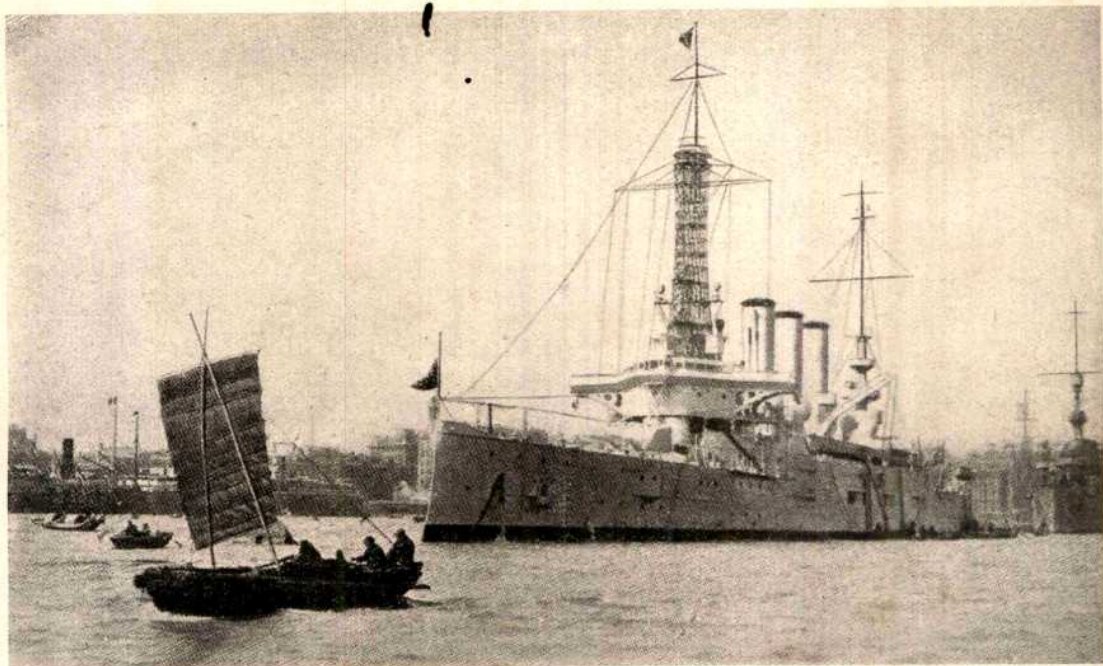


বিদ্রোহী হাতে বন্দী গণতন্ত্রবাদী মিলিসিয়া সৈন্য ।

ভুলি করিয়া হত্যা করার পূর্বে নামধাম লিখিয়া লওয়া হইতেছে । দুত্যাভয়ের চিহ্নও নাই !



গণতন্ত্রবাদ-সহায়ক “আন্তর্জাতিক” দলের স্পেনবাতা—ওরান বন্দর



শিঙ্গাপুর বন্দর



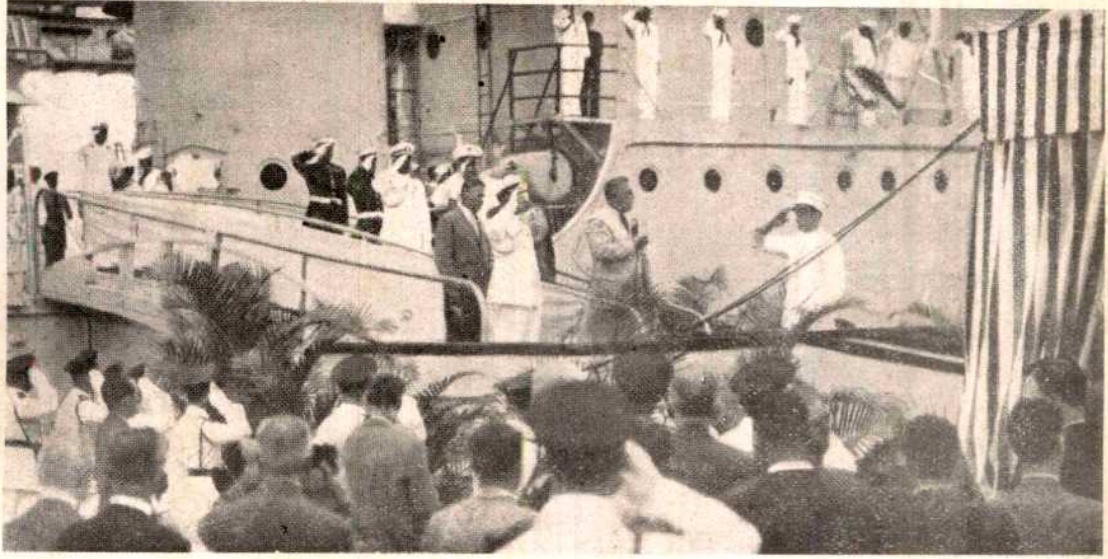
চীনের তরুণদল সামরিক শিক্ষায় গাড়িয়া উঠিতেছে



দার্দানেলিসে তুরস্কের অধিকার প্রতিষ্ঠা-চুক্তি সম্পাদনাস্থে প্রত্যাগত মন্ত্রীকে
অভ্যর্থনায় কামাল পাশা ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী



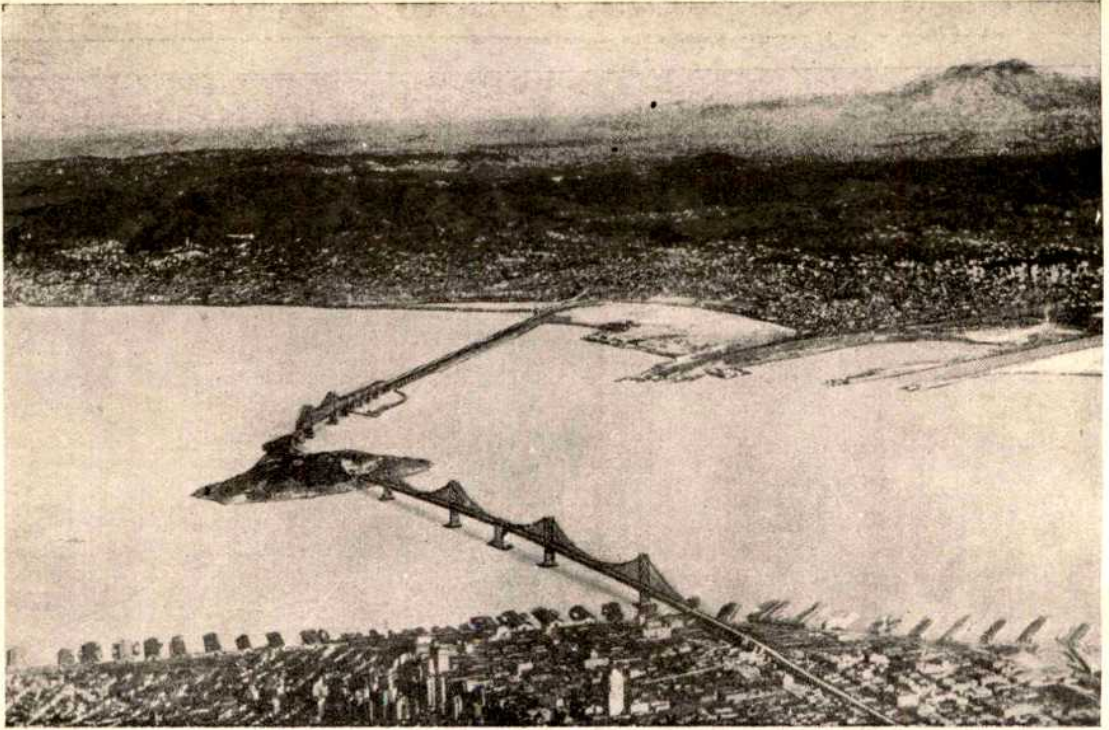
স্বাধীন পাঠান রাইফেল মিস্ত্রী। ইহাদের সাহায্যেই সীমান্তের পাঠান “লস্কর” অস্ত্রধারণে সমর্থ হয়



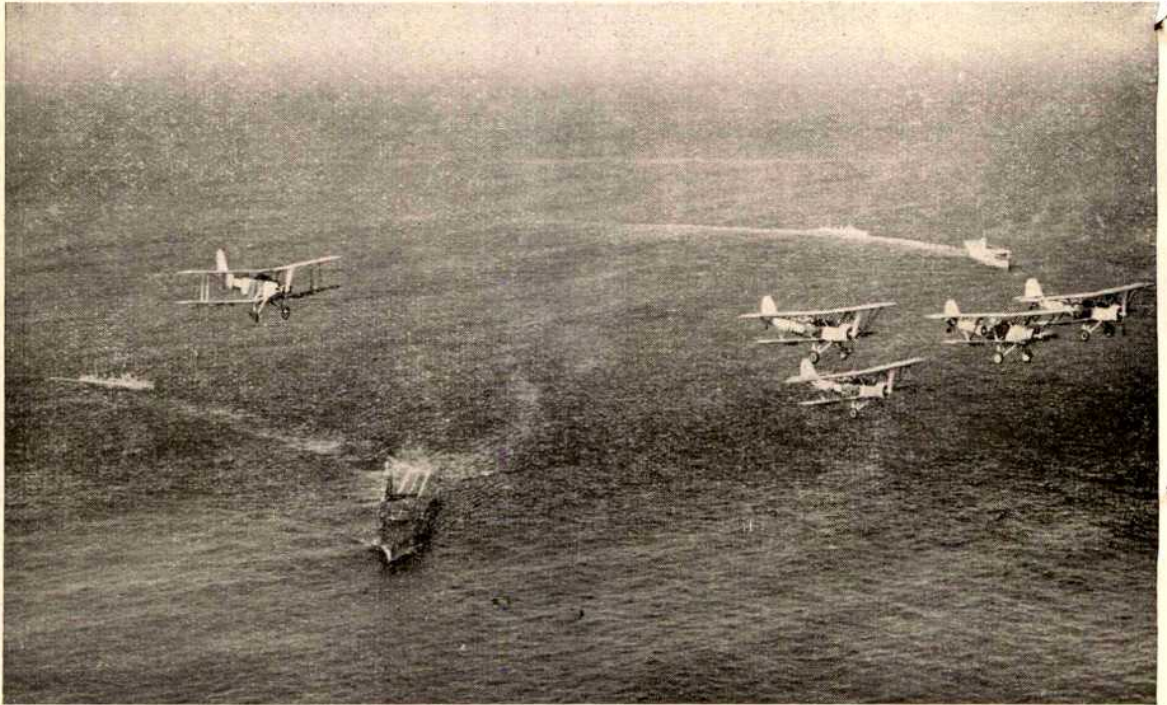
সাম্য-মৈত্রীর দূত প্রেসিডেন্ট রুসভেল্টের দক্ষিণ-আমেরিকায় দৌত্য। এই দৌত্যের ফলে
আমেরিকায় যুদ্ধবিপ্লবের ভয় স্বদূর-বিতাড়িত হইয়াছে। বন্দরে প্রেসিডেন্ট
জাহাজ হইতে অবতরণ করিতেছেন



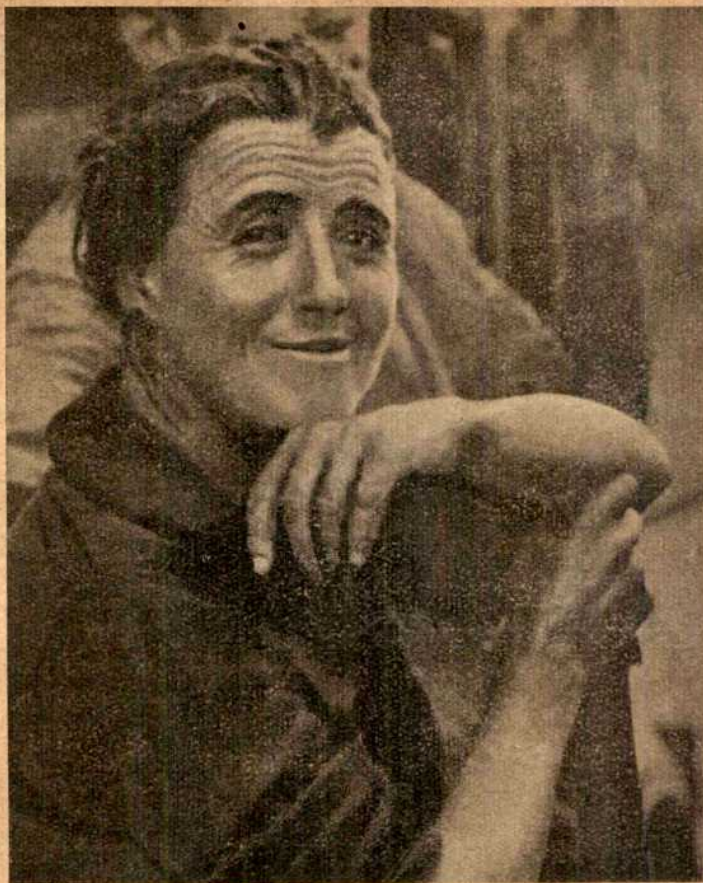
গণতন্ত্র বনাম সোসিয়ালো-কমুনিজম।— মেক্সিকোতে জনবিক্ষোভের চিত্র



পৃথিবীর বৃহত্তম সেতু। আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকো এবং ওকলাণ্ড শহর এই সেতু দ্বারা
যুক্ত হইল। ইহা দ্বিতল ও সাড়ে চারি মাইল লম্বা



সমুদ্রবক্ষে ব্রিটেনের নৌ-ও বিমান-শক্তির ক্রীড়াপ্রদর্শন



মার্কিনদের অদম্য সাহস। সমূহ বিপদের মধ্যেও এই মিলিয়ন রক্ষা-নিশ্চিত নির্ভর:

বিচলিত হইয়া পড়িল এবং সৈন্যদলকে হাত করিতে প্রয়াস পাইল। তাহারা এই কার্যে প্রথম হইতেই নাংসী ও ফাসিস্টদের সাহায্য লাভে সমর্থ হইয়াছে। ইহার পরিণতি কিরূপ ভীষণ হইয়া পড়িয়াছে তাহা পরে বলিতেছি।

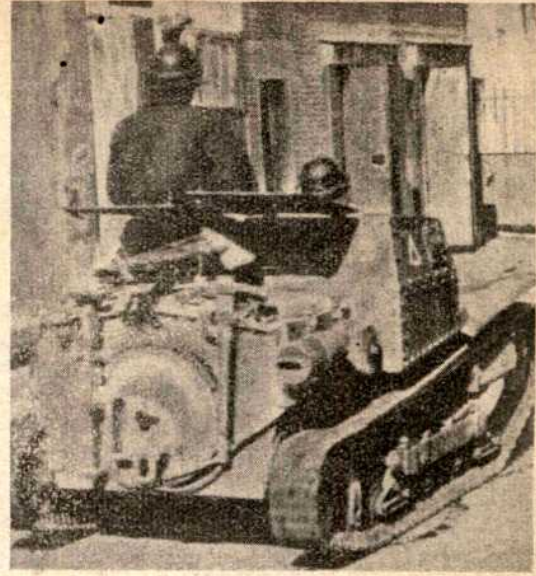
ইহার পর মার্চ মাসের প্রথমের জার্মানী রাইনল্যাণ্ডে সৈন্য সমাবেশ করিয়া বিশ্ববাসীকে তাক লাগাইয়া দিল। হেরদাই সন্ধির মুণ্ডপাত হইল, লোকার্ণো চুক্তি ধসিয়া গেল, শাস্তির ক্ষীণ আশাও লোপ পাইল—নানা স্থানে এই রব উঠিল। তবে জার্মানী ইহার যে কারণ দেখাইল তাহা কিন্তু একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া গেল না। ব্রিটেন-জার্মানী নৌচুক্তির পর ফ্রান্স ইটালীর সঙ্গেই শুধু মিতালি করে নাই, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গেও পারস্পরিক সাহায্য-

মূলক একটি চুক্তি করিয়া বসিয়াছিল। এই চুক্তি ফ্রান্স-সোভিয়েট চুক্তি নামে পরিচিত হইয়াছে। পূর্বেকার লোকার্ণো-চুক্তির নিরিখে এই চুক্তি একান্ত অনাবশ্যকই শুধু নহে, পরন্তু উহার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, এই কারণে জার্মানী লোকার্ণো-চুক্তি ভঙ্গ করিয়া রাইনল্যাণ্ডে পুনঃপ্রবেশ করিল বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ব্রিটেন-জার্মানী নৌচুক্তিতে যেমন বর্তমান অনর্থের প্রথম পর্বের সূচনা বলিয়াছি জার্মানীর রাইনল্যাণ্ডে প্রবেশে তেমনই দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভ।

ব্রিটেন জার্মানীর মিত্র হইতে পারে, তাহার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু আত্মরক্ষা তাহার সর্ব-প্রথম কর্তব্য, আর আত্মরক্ষা করিতে হইলে ফ্রান্সের সঙ্গেই তাহাকে বরাবর সহযোগিতা করিতে হইবে। ওদিকে



সভ্যতায় জার্মানীর দান। নাৎসী গোলন্দাজ অধ্যক্ষ,
মাত্রিদে গোলাবর্ষণের ব্যবস্থা করিতেছেন



সভ্যতায় ইটালীর দান। মাত্রিদে অভিমুখে
ফ্যাসিষ্ট ট্যাঙ্ক-চালক,

আবিসীনিয়া সমরে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে যেরূপ মন-কষাকষি আরম্ভ হইয়াছিল, সমর শেষ হইবার দিকে তাহার তীব্রতা কমিয়া আসিতেছিল। জার্মানী যখন কাহারও তোহাফা না রাখিয়া রাইনল্যান্ডে সৈন্ত সমাবেশ করিল তখন আর ব্রিটেন স্থির থাকিতে পারিল না, ফ্রান্স ও বেলজিয়মের সঙ্গে পুরাদস্তুর ইতিকর্তব্যতা সংক্ষেপে আলোচনা শুরু করিয়া দিল। যদি একান্তই যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে কি ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, পরস্পরের সৈন্ত-বিভাগের মধ্যে তাহারও আলোচনা চলিল। এদিকে ফ্রান্সে নূতন নির্বাচন আসিল। ইটালীর ভক্ত লাভালের পরিবর্তে মঃ মুসোলিনি অধীনে বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক দলগুলি ফ্রান্সের শাসনভার গ্রহণ করিল। ইহারা ইটালীর আবিসীনিয়া-অভিযানের বিরোধী, ব্রিটেনের মতাবলম্বী। কাজেই পুনরায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সে মিলন হইতে বিলম্ব হইল না। যদি-বা কিছু বাধা থাকিত জার্মানীর হঠকারিতায় তাহাও কোথায় মিলাইয়া গেল।

এখন দেখা যাইতেছে, ইটালীর আবিসীনিয়া সংগ্রামে ফ্রান্সের সম্মতি থাকিলেও ঘটনাচক্রে শেষ পর্য্যন্ত সে আর ইহার মধ্যে থাকিতে পারিল না। ব্রিটেন ও ফ্রান্স

আঁতাত ঘনীভূত হইলে সোভিয়েট রুশিয়া যে তাহার সঙ্গে যুক্ত হইবে এমন আশঙ্কা হইতে লাগিল। স্পেনে সাম্যবাদ আড্ডা গাড়িয়াছে। ফ্রান্সেও ত সমাজতান্ত্রিকরা প্রবল। গত বৎসরের প্রারম্ভে যখন এই অবস্থা তখন ইটালী কিরূপে জার্মানীর সঙ্গে সজ্জবদ্ধ হইতে পারে রোমের ফুটনৈতিক-মহলে তাহারই আলোচনা শুরু হইল। এই রাষ্ট্র দুইটির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ আঁতাত কি কি কারণে অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়িল তাহাই এখন বলিব।

আবিসীনিয়া বিজয়ে ইটালী শক্তিমান হইয়াছে। কিন্তু তাহার শক্তিমত্তা প্রকাশের যে রূপ সভ্য জগৎ দেখিতে পাইল তাহাতে ভূমধ্যসাগরের তীরে স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির আতঙ্কের সীমা রহিল না। ফ্রান্স এবং ব্রিটেনও যে আতঙ্কিত হয় নাই তাহাও কেহ হালফ করিয়া বলিতে পারিবে না। ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিকদল শাসনভার লাভ করিয়াই তাহার তাঁবেদারিভুক্ত সিরিয়াকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিল। তুরস্ক ক্ষুদ্র হইলেও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু লোজান সন্ধি অনুসারে দার্দানেলিস প্রণালী প্রভৃতি তাহার কতকটা অঞ্চলও রাইনল্যান্ডের মত নিরস্ত্র-

কৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। এখন কিন্তু ইটালীর শক্তি অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে, সম্মুখস্থ ভোডেকানিজ দ্বীপাবলীতে



ট্যেপস নদীর উপর টলিডো-আলকাজার

তাহার আড্ডা। কাজেই এ অবস্থায় তাহার ঐ অঞ্চল নিরস্ত্রীকৃত রাখা কোন মতেই সমীচীন নহে—তুরস্ক রাষ্ট্র-সংঘের নিকট এই প্রস্তাব পেশ করিল। অতি দ্রুতই এই প্রস্তাবের আলোচনা শুরু হইল। বর্তমান বৎসরের প্রথম দিকে স্ত্রাইজারল্যাণ্ডে মন্ত্রোক্ত এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘের আনুজ্যে একটি বৈঠক বসে ও এ-বিষয় মীমাংসা হইয়া যায়। তুরস্ক অল্পমতি পাইবা মাত্র দার্দেনেলিস অঞ্চলে সৈন্য স্থাপন করিয়াছে, ঐ অঞ্চলে দুর্গাদি নির্মাণেও সে এখন ব্যস্ত। মন্ত্রো বৈঠকে তুরস্কের পররাষ্ট্র-সচিব মঃ আরাস যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা তাহার স্বদেশবাসী কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছে।

সিরিয়া ও তুরস্কের কথা বলিলাম। ব্রিটেনও কিন্তু বসিয়া রহিল না। ইটালী কর্তৃক আবির্মানিয়া বিজয়ে ব্রিটেনের ত টনক নড়িয়াছেই, তাহার অধীনস্থ মিশরও কিন্তু কম চঞ্চল হয় নাই। মিশর ও ব্রিটেনের শোচনীয় দ্বন্দ্বের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বহুদিনপুষ্ট তাহারাও যে সহসা একটা আপোষ-নিষ্পত্তির জন্ম ব্যগ্র হইয়া পড়িল তাহাতে

তাহাদের চাঞ্চল্যের ও আসন্ন বিপদের আশঙ্কার গভীরতাই সূচিত করে। গত বৎসর জুন-জুলাই মাসে উভয়ের মধ্যেই সন্ধি হইয়া গেল, মিশর স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত হইল। দেশরক্ষা, স্বয়ং খাল প্রভৃতি বিষয়ে অবশ্য ইংরেজের সঙ্গেই তাহাকে চলিতে হইবে। মিশর এখন রাষ্ট্রসংঘের এক জন স্বাধীন সভ্য হইবার অধিকারও লাভ করিয়াছে।



নাহাশ পাশ। ইহারই নায়কত্বে ইক মিশর চুক্তি সম্পন্ন হয়

এই প্রসঙ্গে আর একটি ব্যাপারেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। সিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, মিশর স্বাধীন হইয়াছে, ইংরেজের আনুজ্যে আরবভূমি আজ নূতন মুক্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ইরাক, ট্রান্সজর্ডান, ইমেন, সৌদি আরব তুরস্কের নাগপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া আজ সবল স্বাধীন ও উন্নত হইতে চলিয়াছে। ইহার। এখন ইংরেজের সঙ্গে নানা সন্ধিতে আবদ্ধ। ইটালীর আবির্মানিয়া বিজয়ের পর হইতে তাহাদের ইংরেজপ্রীতি আরও যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, বর্তমানে প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি হইল এই আরব দেশ। কিন্তু সমগ্র আরবভূমিতে যখন ইংরেজরা এইরূপ অভিনন্দিত হইতেছে তখন ক্ষুদ্র প্যালেষ্টাইনে এত হাদ্দাম কেন? প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল, প্যালেষ্টাইনে ইহুদী ও আরবদের মধ্যে হাদ্দামা চলিয়াছে, কমিশন-কমিটি স্থাপনে, নানারূপ প্রলোভনে বা দমননীতির প্রবল প্রকাশেও কয়েক লক্ষ আরবের সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটাইতে পারিল না। চারি দিকে যখন জাতভাইয়েরা দেশ শাসনের ক্ষমতা লাভ

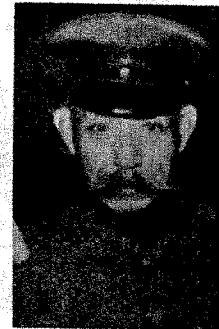
করিয়াছে তখন উহারাও যে পরের হুকুমে চালিত বা শাসিত হইতে চাহিবে না ইহা বুঝা বিশেষ কঠিন নয়।

য'হা হউক, আবির্দানিয়া বিজয়ের পর যখন ফ্রান্স, ব্রিটেন, তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি ছোট পাকা যা আত্মক্ষার নানা কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিয়া গেল তখন ইটালী নিজেকে নিতান্ত একাকী মনে করিতে লাগিল। আবার ফ্রান্স ও স্পেনে সমাজতন্ত্রীদের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় নিজের শৈশবশাসনে বিরাজিত এই আশঙ্কাও দেখা দিল। জার্মানীরও এই আশঙ্কা, কারণ সেখানকার নাস্তাবাদও ইটালীর ফাসিষ্ট-তন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার আশঙ্কা আরও বাড়িয়া গেল। জার্মানী ও ইটালীতে মিলন ঘটনা পরস্পরায় একান্তই স্বাভাবিক হইয়া পড়িল। এতদিন অস্ত্রিয়া লইয়া ছিল ইটালী ও জার্মানীর মধ্যে মতভেদ। মুসোলিনীর আগ্রহাতিশয্যে লিড্রই ইহা দূরীভূত হইল। গত ১১ই জুলাই মুসোলিনীর মধ্যস্থতায় জার্মানী অস্ত্রিয়ার সার্কভোমন্স স্বীকার করিয়াছে।

ইটালী ও জার্মানীর মধ্যে মিলন সংঘটিত হইবার পরই উভয়ের মনোগত অভিপ্রায় হইল ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ক্ষমতা কিরূপে হ্রাস করা যায়। ইহারা সর্বদা গণতন্ত্রের নিপাত কামনা করে, সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদকেও ইহারা বিষদৃষ্টিতে দেখে। স্পেনের ব্যাপারে কিন্তু গণতন্ত্র ক্ষয়সের দোহাই দিল না। সেখানে সাম্যবাদ আড্ডা গাড়িতে চলিয়াছে এই অছিলায় তাহার বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিল। পূর্বে বলিয়াছি, স্পেনে একদল রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যড়যন্ত্র লিপ্ত হইয়াছিল, ইটালী ও জার্মানী তাহাতে ইন্ধন জোগাইতেছিল। যাই ইটালী জার্মানীর মধ্যে জাতাত প্রতিষ্ঠিত হইল অমনি এই দল চান্স হইয়া উঠিল। গত ১৮ই জুলাই স্পেনে ইহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। এই রাষ্ট্র দুইটি প্রকাশে বিদ্রোহী পক্ষকে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। স্পেনের এই বিপ্লব আজ এপ্রিল মাসেও শেষ হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এখন যেরূপ অবস্থা পাড়াইয়াছে তাহাতে ইহাকে ক্ষুদ্রাকারে একটি মহাসমর বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। কারণ সরকার পক্ষে

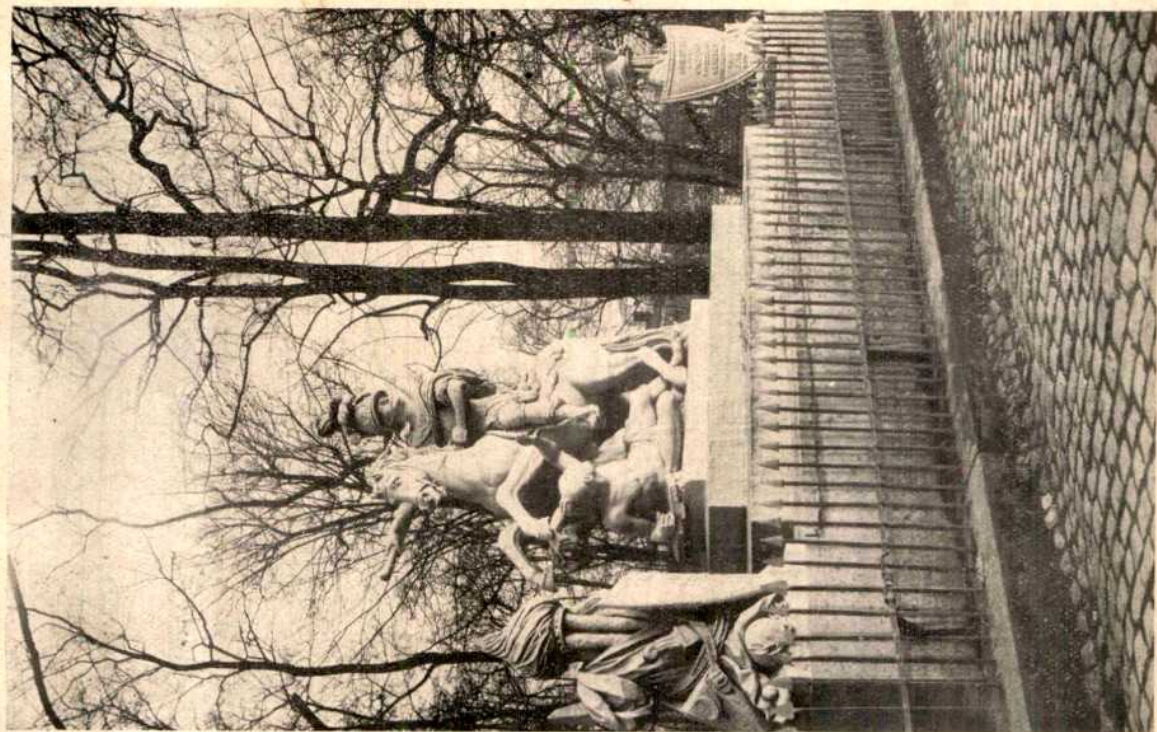
আন্তর্জাতিক বাহিনী নামে বিভিন্ন দেশের লোকেরা যুদ্ধ করিতেছে, বিদ্রোহী-পক্ষে লড়িতেছে জার্মানী ও ইটালীর সুশিক্ষিত সেনানী। জার্মানীর সৈন্য-সংখ্যা ত্রিশ লাখ হ্রাস পাইয়াছে। সে নাকি চেকোস্লোভাকিয়া-সীমান্তে সৈন্য-সমাবেশে ব্যস্ত। তবে ইটালীর সৈন্য এক লক্ষের উপরে পাড়াইয়াছে। আন্তর্জাতিক বাহিনী ইহাদের তুলনায় নগণ্য। স্পেন-বিপ্লবের একটা হেস্ত-নেস্ত করিতে এখন ইটালীই কেন লাগিয়া গিয়াছে তাহার রহস্য ভেদ করিবার জন্য আর একটি ব্যাপারের উল্লেখ পরে করিতেছি। এনিকে স্পেন-বিদ্রোহের আশু পরিসমাপ্তির জন্য রাষ্ট্রসভ্যের আহুকুল্যে লওনে 'নন-ইন্টারভেনশন কমিটি' নামে একটি কমিটি বসানো হইয়াছে। তবে রাষ্ট্রসভ্যের দ্বায় ইহার নিক্রিয়তাও সুপরিষ্কৃত। অতঃপর আর যাহাতে স্পেনে অস্ত্রশস্ত্র বিধা সৈন্যসামন্ত বিদেশ হইতে প্রেরিত না হইতে পারে তাহার জন্য স্থলে ও জলে স্পেন-সীমান্তে পাহারাদার নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা কতটুকু সাফল্যলাভ করিবে বা আদৌ সাফল্যলাভ করিবে কিনা তাহা এখন বলা কঠিন।

সোভিয়েট রুশিয়াও বর্তমানে আমাদের কম দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তাহার ধনবল, জনবল, অস্ত্রবল প্রচুর। জার্মানী ও ইটালীর মত সেখানেও ডিক্টেটরীয় শাসন,

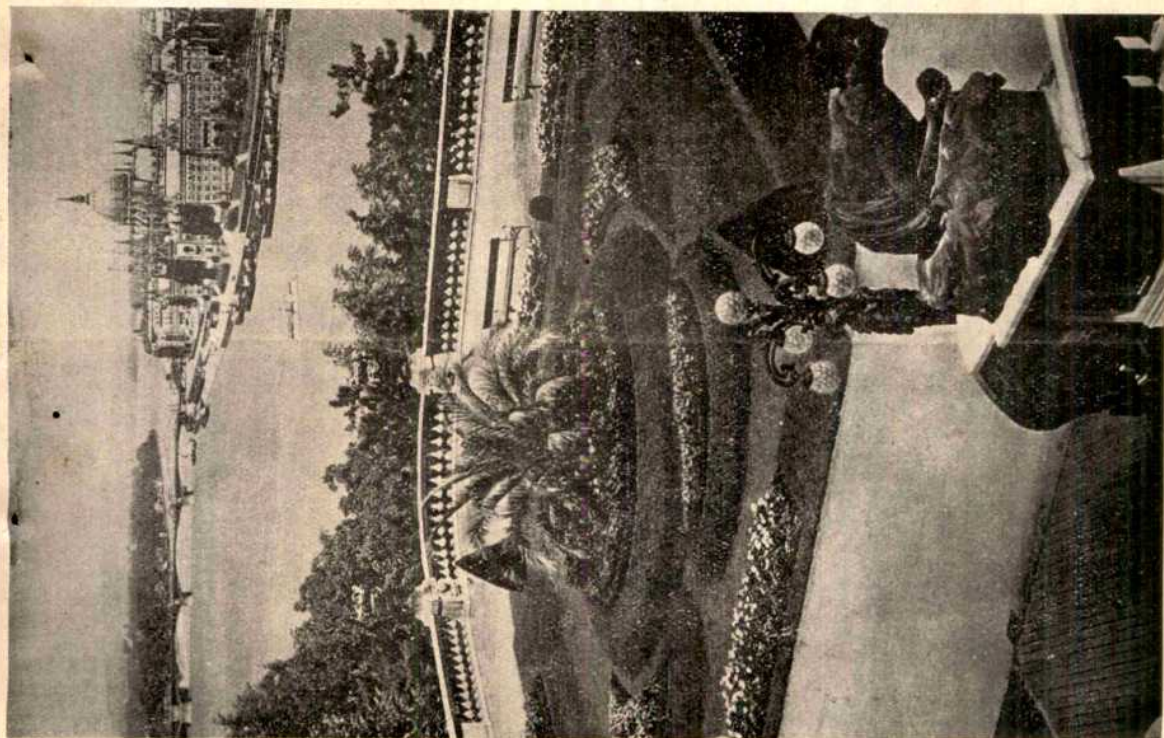


জাপানের দমরবাহী নুতন কর্ণধার, প্রধান মন্ত্রী হায়াসী

তবে ইহাদের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, রুশিয়া সাধারণের মঙ্গলের জন্যই নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছে। পর-রাজ্য হরণ করিবার বা সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার কল্পনা ইহার নাই। গত নবেম্বর মাসে এখানেও গণতন্ত্রমূলক শাসন প্রবর্তনের



পোল্যান্ড : ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কবিজয়ী রাজা সোবিস্লব স্বত্বকল্পে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি



বুডাপেস্টের একটি মনোরম উদ্যান



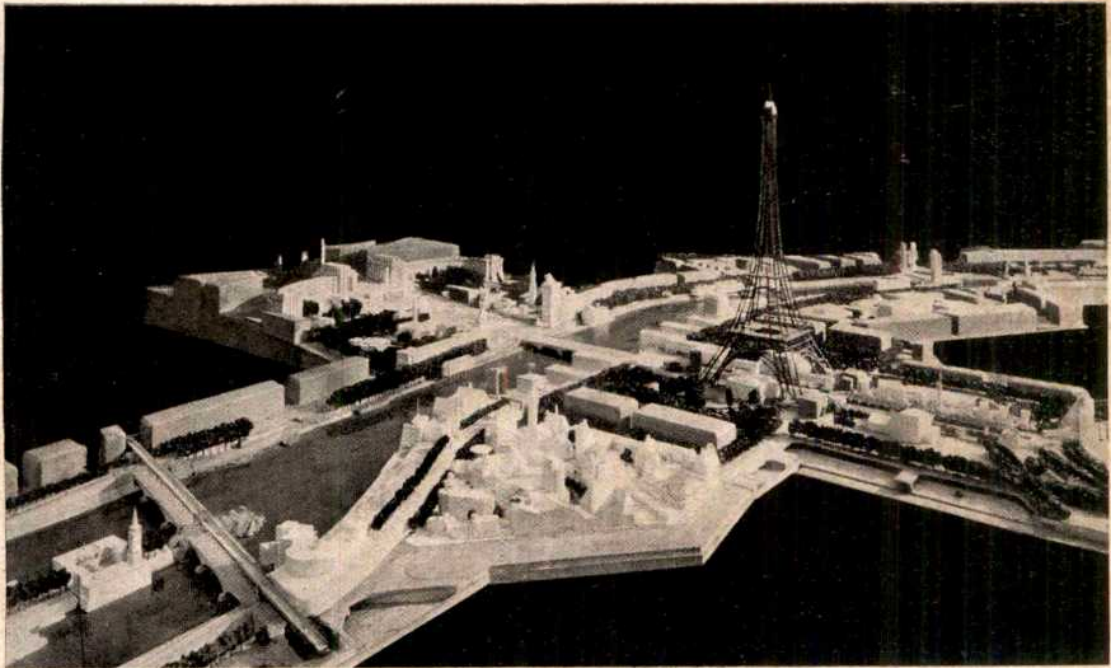
দক্ষিণ রোডেশিয়ায় অবস্থিত ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের দৃশ্য



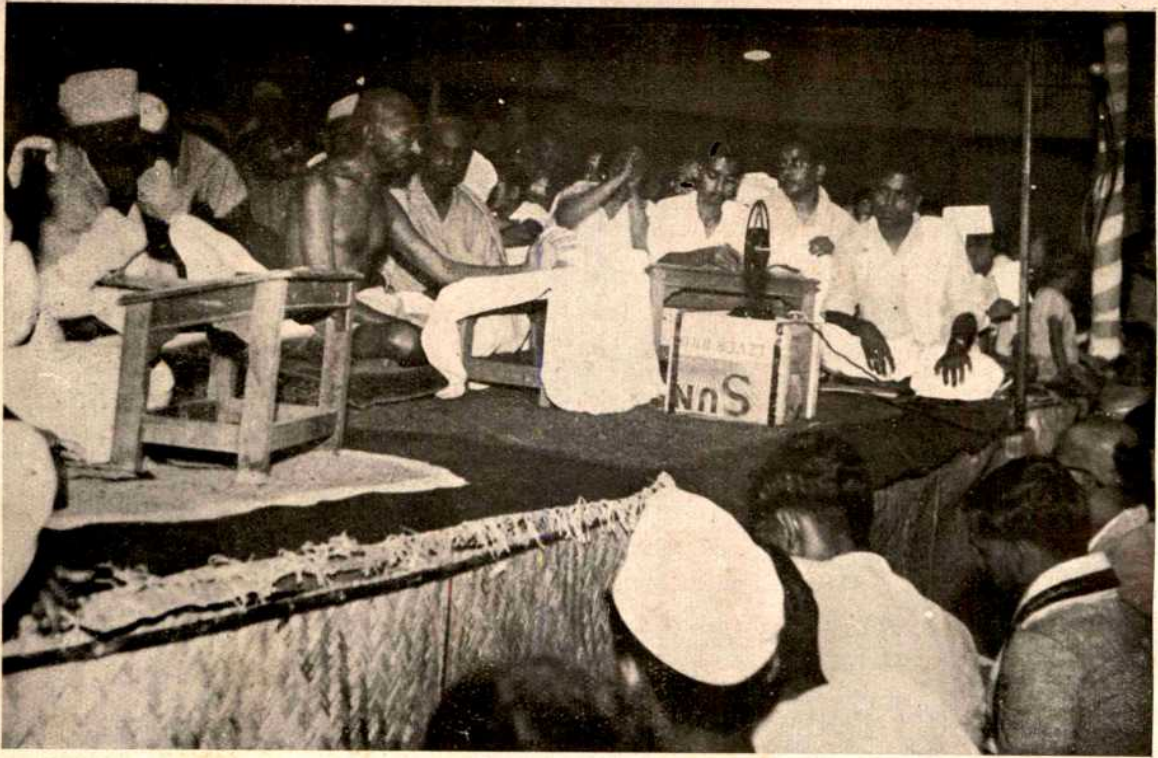
ওয়ার্ল্ডস-র বাজার



১৬ জার্মানীতে হিটলারের প্রভাব-বিস্তারের বাৎসরিক উৎসব। বার্লিন ব্রাণ্ডেনবর্গ ফটকে মশালধারীদের শোভাযাত্রা



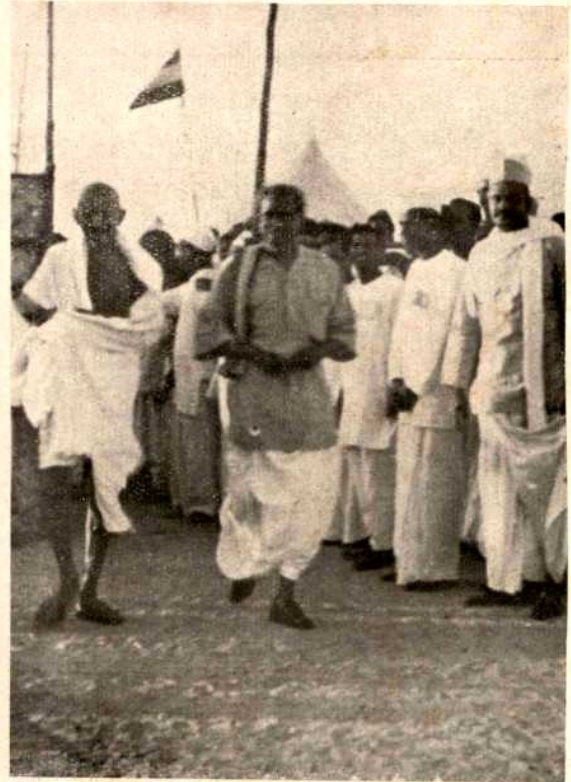
প্যারিসে আগামী আন্তর্জাতিক শিল্প ও ললিতকলা প্রদর্শনীর মডেল



মাদ্রাজে নিখিল ভারত হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর অভিভাষণ



হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনে শ্রীমতী কঙ্করীবাদি গান্ধী
ও অগ্রাচ্ছ প্রতিনিধিবর্গের আগমন



হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী
ও অগ্রাচ্ছ নেতবর্গের আগমন

ব্যবস্থা হইয়াছে। জার্মানী ও ইটালী গণতন্ত্র বা সাম্যবাদ কোনটাই পছন্দ করে না। এই জন্ত ইশিয়ার বিরুদ্ধে তাহাদের জ্ঞানক কোপ। এই কোপের আর একটি কারণ হইল, রুশিয়া ভাবী আক্রমণ-আশঙ্কায় তাহার পশ্চিম সীমান্তে চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ডের পাশ দিয়া ঘাঁটি নির্মাণ করিয়াছে, সেখানে বহু রুশ সৈন্য বর্তমান।

সোভিয়েট রুশিয়ার পূর্ব সীমান্তে রহিয়াছে জাপান। জাপানও কতকটা ফাসিষ্ট মতাবলম্বী, সোভিয়েট সাম্যবাদের সে ঘোর শত্রু। পূর্ব সীমান্তও রুশিয়া বেশ সুরক্ষিত করিয়াছে। জাপানের ইহা আদৌ কাম্য নহে। একারণ ইহার বিরুদ্ধে জাপানের ষড়যন্ত্র বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে জাপান ও জার্মানীর মধ্যে রুশিয়ার বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই জাপ-জার্মান চুক্তি আসন্ন অনর্থের তৃতীয় পর্বেব স্থচনা করিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই চুক্তির দ্বারা পূর্বে জাপান ও পশ্চিমে জার্মানীর প্রাধান্য ও শক্তি পরস্পর স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জাপানের আওতায় পড়িয়াছে। জেনেরল হায়াসির নেতৃত্বে সমরপন্থীরা জাপানে প্রবেশ হইয়া উঠিয়াছে। এতকাল ব্রিটেন যেন আন্তর্জাতিক ব্যাপারে বিশেষ দৃঢ়তা দেখায় নাই। কিন্তু জাপ-জার্মান চুক্তির পর সেও অত্যধিক তৎপর হইয়া নানারূপে সমরায়োজনে লাগিয়া গিয়াছে।

ইটালী কর্তৃক আবিসলিনিয়া অধিকারের পর ব্রিটেন যেরূপ ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে মোটামুটি সদয় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল সেইরূপ ভূমধ্যসাগর ছাড়াও প্রাচ্য-সাম্রাজ্যে বাতায়ানের পথ বাহাতে সুরক্ষিত হয় তাহার দিকে মন দিল। এক সময় দক্ষিণ-আফ্রিকা ব্রিটেনের হস্ত হইতে একেবারে মুক্ত হইতে চাহিয়াছিল, অস্ট্রেলিয়ায়ও একটি দল পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছিল। কিন্তু বর্তমান বর্ষের প্রথম হইতেই যেন সব বদলাইয়া গেল। দক্ষিণ-আফ্রিকা আত্মরক্ষার উপায় সাধনের জন্ত ব্রিটেনের শরণাপন্ন হইল। উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় ইটালীর ক্ষমতা যতই বাড়িতেছে, জার্মানীর উপনিবেশের দাবী যতই তীব্র হইয়া উঠিতেছে ততই, কি দক্ষিণ-আফ্রিকা, কি অস্ট্রেলিয়া সকলেই ব্রিটেনের

আশ্রয় চাহিতেছে। ব্রিটেনও ইশিয়ার হইয়া গিয়াছে, শতবর্ষ আগেকার মত এখন আবার পূর্ব-আফ্রিকা ঘুরিয়া প্রাচ্য সাম্রাজ্যে যাইবার ব্যবস্থা করিতে তৎপর হইয়াছে। ইতিমধ্যে সে কিন্তু একটা ফুট চালও চালাইয়াছে। গত ১লা জুলাইয়ারী ইটালীর সঙ্গে একটা 'ভূমধ্যসাগর চুক্তিতে' আবদ্ধ হইয়াছে। এই চুক্তিতে ভূমধ্যসাগরে বাহাতে ব্রিটেনের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় ইটালী তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছে। স্পেনে কিন্তু ইটালীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আজ যে লক্ষ্যধিক সৈন্য সেখানে লড়াই করিতেছে তাহা কি তবে এই চুক্তিরই ফল?

ব্রিটেন সম্প্রতি তাহার রণসজ্জার একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছে। বার্ষিক তিন শত মিলিয়ন পাউণ্ড হিসাবে পাঁচ বৎসরে পনের শত মিলিয়ন পাউণ্ড খরচ করা হইবে। জল, স্থল ও বিমান-বাহিনী প্রত্যেকটি এইরূপে বর্ধিত হইবে। পূর্ব-পশ্চিমের সকল ঘাঁটি পাকা করিয়া নির্মাণ করা হইবে। সিঙ্গাপুর-ঘাঁটি নির্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে। চীনের গাঙ্গে হুকঙে আর একটি বড় রকমের ঘাঁটি নির্মিত হইবে। ইহাতে খরচ হইবে আশী লক্ষ পাউণ্ড। ব্রিটেনের কর্ণধারগণ এই বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন যে, ইহা দ্বারা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ স্বগম হইবে। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই কিন্তু ইহার পরিণাম ভাবিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। আর একটি বৃহত্তর, সমবৈর বুরি আর বিলম্ব নাই। জগতে ধাতব ও অস্ত্রান্ত জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি ইহাই স্মৃতিত করিতেছে।

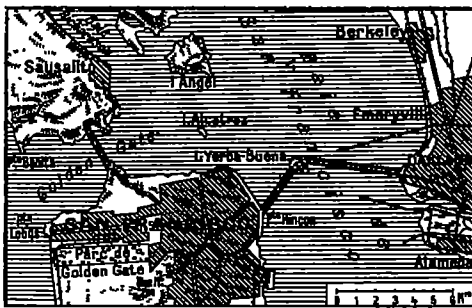
বর্তমান বৎসরে অন্তর্জগতে কি কি প্রধান প্রধান ঘটনা সংঘটিত হইল তাহারই আলোচনা করিলাম। ইহার মধ্যে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্রই আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু কয়েকটি এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে যাহার মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইবার কারণ নাই। সাম্রাজ্য যাহাদের আছে তাহাদের মধ্যে বিবাদ দ্বন্দ্ব কলহ লাগিয়াই থাকিবে। দুর্বল যাহারা তাহারা সবল হইলে সাম্রাজ্যবাদীদের শিক্ষা হইতে পারে, উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া ক্ষমিত্ব হওয়াও সম্ভব। মহাচীন এতকাল সাম্রাজ্যবাদীদের লীলাভূমি হইলেও এ বৎসর যে-সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে তাহার সহিতই ব্যস্ত করিতেছে। এ বৎসর দক্ষিণে ক্যান্টনে, উত্তর চীনে ও সেদিন সিঙ্গান প্রদেশে যে ভিনটি

ঘটনা ঘটনা গেল তাহাতে বুঝা যায় চীন যুগ-যুগান্তের নিচু হইতে যেন জাগিয়া উঠিয়াছে, বিদেশীর আক্রমণ-অত্যাচার আর সে সহ্য করিবে না। সেনাপতি চ্যাং হুয়ে লিয়াং চীন রাষ্ট্রনায়ক চিয়াং কাই-শেককে কয়েকদিনের জন্য আটক রাখিয়া জগদ্বাসীকে এই কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি চিয়াং কাই-শেকের কর্মকোশলে মহাচীন আজ একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

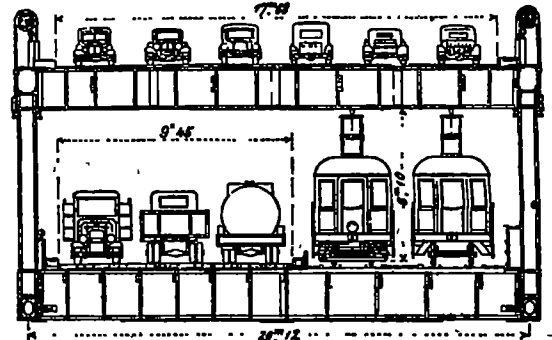
এ বৎসরকার আর একটি প্রধান ঘটনা মিঃ রুজভেল্টের দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি পদে নির্বাচন। তিনি আমেরিকা হইতে যুক্ত-নিবারণের জন্য অল্পরোধ জানাইয়াছেন। সম্প্রতি সানফ্রান্সিসকোতে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির একটি শান্তি-বৈঠক হইয়া গিয়াছে। তাহাতে তিনি এই বাণী ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধই সব অনিষ্টের মূল, সুতরাং যুদ্ধের কারণগুলি বিদূরিত করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, জগতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যুদ্ধের কারণগুলি লোপ করিতে হইলে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্ব প্রকার বাধা তুলিয়া দিতে হইবে। তাঁহার এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার সম্ভাবনা বর্তমানে কম দেখা যায় বটে, কিন্তু এইরূপ কোন ব্যবস্থা না হইলে যুদ্ধ বন্ধ হইবে না।

নানা দেশ সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম, কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি বলিবার আছে? আন্তর্জাতিক ব্যাপার-গুলিতে ভারতবর্ষের কি কোনও স্থান নাই? ভারতবর্ষে ইদানীং স্বায়ত্তশাসনের নামে প্রদেশে প্রদেশে এক ভয়া শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মুক্তির পথ আছে কি? ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমসীমান্তে আফ্রিদী, ওয়াজিরি ও মমন্দদের দমন করিতে বহু যুগ কাটিয়া গেল, গত কয়েক মাসাবধি গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে তাহাদের উপদ্রব দমন করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা চলিতেছে। চীনের আত্মসংগঠন, আমেরিকার শান্তি স্থাপন প্রচেষ্টা বর্তমান বৎসরে কিছু আশার সন্ধান দিতেছে বটে, কিন্তু কি বিশ্বের সর্বত্রই যেরূপ ঘটনা-পরম্পরা লক্ষ্য করা যাইতেছে তাহাতে সর্বত্রই একটা আসন্ন অনর্থপাতের আভাস পাওয়া যায়। হেরসাই সন্ধির অ-বিচার আর তাহাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য পরবর্তী বিবিধ সন্ধি ও চুক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির চক্রান্ত ও রণসজ্জা—এ সকলের পরিসমাপ্তি হইবে আর একটি মহাসমরে—বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ অল্পমান করিতেছেন। ভবিষ্যের গর্ভে কি নিহিত আছে কে বলিতে পারে?

২৫ এপ্রিল, ১৩৪৩।



সানফ্রান্সিসকো এক গুরুত্বপূর্ণ শহর। ইহার মধ্যের উপদ্বীপের নতুন সেতুতে বন্ধন করা হইল



নতুন সেতুর উপরে ছোট মোটর গাড়ীর পথ; নীচের তলায় তিনটি লরীর ও দুইটি ট্রাকের পথ

বিবন্ধ প্রসঙ্গ

“সর্বনাশ” ও “পৌষ মাস”

কথায় বলে, ‘কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস।’ ভারত-বর্ষের নূতন শাসনবিধানের ফলে ইতিমধ্যেই দেশের সর্বনাশ হইয়াছে, দেশ ছারখার হইয়াছে, বলিলে ঠিক সভ্য কথা বলা হইবে না। যাহাব অমুমান যাহাই হউক, সকলকেই ফলেব জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে, এবং তাহা কি প্রকার, যথাসময়ে বলিতে হইবে। এখন ত শাসন-বিধানের শুধু প্রাদেশিক অংশ অমুসারে সবেমাত্র কাজের আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু নূতন শাসন-বিধানে গণতান্ত্রিকতার ও নিয়ম-তান্ত্রিকতার সর্বনাশ যে হইয়াছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। এই নূতন আইন দ্বারা গবর্ণর-জেনার্যাল ও প্রাদেশিক গবর্ণরদিগকে নামে নিয়মতান্ত্রিক শাসক কিন্তু কাজে স্বৈচ্ছাকারী অর্থাৎ ডিক্টেটর করা হইয়াছে।
১. তাঁহাদিগকে যত প্রকার ক্ষমতা যে পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে তাহা কোন নিয়মতান্ত্রিক দেশের রাজা বা শাসকের নাই, কোন কালে ছিল না।

নিয়মতান্ত্রিকতা ও গণতান্ত্রিকতার এই যে সর্বনাশ, ইহাতে কতকগুলি লোকের ‘পৌষ মাস’ হইয়াছে। যাহাদের ‘পৌষ মাস’ হইয়াছে, তাহারা বিশেষ কোন একটিমাত্র ধর্মসম্প্রদায়ের লোক নহে, যদিও তাহাদের মধ্যে মুসলমানের আত্মপাতিক সংখ্যা বেশী।

• কিন্তু ধীরভাবে চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, যে, যাহার দ্বারা নিয়মতান্ত্রিকতা ও গণতান্ত্রিকতাব সর্বনাশ হইয়াছে এবং যাহার ফলে দেশের বিষম অনিষ্ট হইবে, তাহা হইতে কাহারও প্রকৃত ‘পৌষ মাস’ উদ্ধৃত হইতে পারে না।

‘পৌষ মাস’টা হইয়াছে কি প্রকার বলিতেছি। ছয়টি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসওয়ালারা সদস্যেরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই ছয়টি দলের নেতাদের ঐ ছয়টি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করিবার আইনানুযায়ী অধিকার

ছিল। গবর্ণরেরা তাঁহাদিগকে ডাকিয়াও ছিলেন। কিন্তু নিখিলভারতীয় কংগ্রেসকমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁহারা গবর্ণরদিগের নিকট হইতে ঐ প্রতিশ্রুতি চান, যে, গবর্ণরেরা মন্ত্রীদের শাসন-বিধান-সম্বন্ধে কাজ-কর্মে বাধা দিবেন না, হস্তক্ষেপ করিবেন না। গবর্ণরেরা সেই প্রতিশ্রুতি দেন নাই; এবং পরে ঐ ছয়টি প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ কোন কোন দলের সদস্যদিগকে লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। যে পাঁচটি প্রদেশে কংগ্রেসওয়ালারা সদস্যেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হন নাই, তথায় পূর্বেই মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল।

এই এগারটি প্রদেশে মোট যত জন মন্ত্রী হইয়াছেন, তাহার মধ্যে পঁচিশ জন মুসলমান, সাতাশ জন হিন্দু, দুই জন পারসী, দুই জন খ্রীষ্টিয়ান এবং এক জন শিখ। এই সকল মন্ত্রীদের মনে হইতে পারে, যে, তাঁহাদের পৌষ মাস হইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায়েরও হয়ত তাহা মনে হইবে। হিন্দু-সমাজের, অন্ততঃ অধিকাংশের, নিশ্চয়ই তাহা মনে হইবে না। পারসীদের তাহা মনে না হইতেও পারে। খুব সম্ভব শিখদের তাহা হইবে না। খ্রীষ্টিয়ানদের কথা বলিতে পারি না।

এগারটি প্রদেশের এগাব জন সরদার মন্ত্রীর মধ্যে সাত জন মুসলমান, তিন জন হিন্দু ও এক জন পারসী।

আমরা একাধিক বার দেখাইয়াছি, যে, স্বাধীন ইউরোপের স্বাধীন দেশসকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর দেশের সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর শ্রেণীব লোকেরাও পবাবীন ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা আমলাতন্ত্রানুগৃহীত সম্প্রদায় বা শ্রেণীর চেয়ে শিক্ষায়, জ্ঞানে, স্বাস্থ্যে, আর্থিক অবস্থায় এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার-শালিতায় শ্রেষ্ঠ, এবং রাজ্যতন্ত্রহীনরপেক্ষভাবে ভারতবর্ষের যে বিশাল হিন্দুসমাজ কতকটা অনগ্রসর, তাহারাও সকল বিষয়ে ইউরোপের অনগ্রসরতম স্বাধীন দেশের অনগ্রসরতম শ্রেণীর লোকদের চেয়ে অনগ্রসর।

অন্তএব শাসকদের খেলালে পরাধীন দেশের কাহারও

কাহারও পৌষ মাস হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হইলেও, সমগ্র দেশের ও জাতির পৌষ মাস কেবল নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ফলেই হইতে পারে।

সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতের অধিবাসীর সংখ্যা, ১৯৩১ সালের সেন্সাস অনুসারে, ২৫,৬৭,৮৪,০৫২। তাহার মধ্যে হিন্দু প্রায় ১৮ কোটি, মুসলমান সাত কোটির কিছু কম। উভয় সমাজের লোকসংখ্যা বিবেচনা করিলে মনে হইতে পারে, যে, মুসলমান সমাজের পৌষ মাসটাই বেশী রকম হইয়াছে। কিন্তু সমাজের সফল মানুষের মধ্যে স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাধীন মনোবৃত্তির বিকাশ রূপ যে পরম মঙ্গল, তাহার কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি কেবল আর্থিক উন্নতির দিকটাই দেখা যায় তাহা হইলে কয়েক জন সরদার মজী ও অন্ত্র মজী ৬,৭০,২০,৪৪৩ জন মুসলমানের কি সুবিধা করিয়া দিতে পারিবেন?

মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ও কংগ্রেস

কংগ্রেস বর্তমান শাসনবিধি নষ্ট করিতে চাহেন, এই প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিবার পর, আমাদের মতে কংগ্রেসের পক্ষে মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের সম্ভব যে ঠিক হয় নাই তাহা আমবা আগে আগে যাহা লিখিয়াছি তাহা হইতে পাঠকেরা বুঝিয়া থাকিবেন। কোন দলের লোকদের পক্ষেই যে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ঠিক নয়, ইহাও আমাদের মত। তাহার কারণও আগে আগে যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে। একটা কারণ এই, যে, নূতন ভাবভঙ্গান মন্ত্রীদিগকে দায়িত্ব দিয়াছে, কিন্তু ক্ষমতা দেয় নাই। য-কোন দিকে দেশের হিত হইবে না বা যথেষ্ট পরিমাণে হইবে না, তাহার ক্ষমতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সাক্ষরভাবে মন্ত্রীদিগকে ও পরোক্ষভাবে ভারতীয় জনগণকে দায়ী ও দোষী করিবে; কোন অনিষ্ট ও ক্ষতি হইলেও তাহাদিগকে দায়ী ও দোষী করিবে। কিন্তু বস্তুতঃ হিত করিবার ও অহিত নিবারণ করিবার মত যথেষ্ট ক্ষমতা নূতন আইন মন্ত্রীদিগকে দেয় নাই। তন্নিম্ন ইহাও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য, যে, আইনটা রাজস্বের অধিকাংশ টাকা ব্যয়ের উপর ব্যবস্থাপক সভাকে ও মন্ত্রীদিগকে অধিকার দেয় নাই। কার্যতঃ টাকা সম্বন্ধে এবং আর সকল বিষয়েই গবর্নরকে সর্বস্বত্ব করা হইয়াছে।

এরূপ অবস্থায় নিম্নস্তরের ভাগী হইবার ক্ষমতা মজী হওয়া কাহারও পক্ষে উচিত হয় নাই। টাকার লোভে, মুন্সি হইয়া পোষ্য পরিবার লোভে, 'মন্ত্রগণ্য' হইবার লোভে, দেশহিত করিতে পারিবার ভ্রান্ত বিশ্বাসে, বা অন্ত্র অনির্দিষ্ট কারণে যাহারা মজী হইয়াছেন, আমাদের কথাগুলো তাঁহাদের ভাল লাগিবে না। মজী হইয়া কেহ কোন ভাল কাজই করিতে পারিবেন না, ইহা আমাদের বক্তব্য নহে। ইচ্ছা থাকিলে অল্পস্বল্প ভাল কাজ কেহ কেহ করিতে পারিবেন। কিন্তু দেশের মহত্তর ও প্রধান হিত সাধনের উদ্দেশ্যে এই অল্পস্বল্প হিত সাধনের লোভ সংবরণ করা কর্তব্য। সকল রাজনৈতিক দলের লোকই মন্ত্রিত্ব অস্বীকার করিলে ব্রিটিশ জাতি ও জগতের অন্যান্য জাতি বুঝিত, যে, নূতন শাসনবিধিটা একটা ফাঁকি—মাহা খাটি সত্য কথা। তাহা হইলে আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম সফল হইবার, আমাদের স্বশাসন লাভ করিবার, সম্ভাবনা অধিকতর হইত। অবশ্য, কতকগুলি লোক মজী হইয়াছে বলিয়াই যে স্বাধীনতাসংগ্রাম বিফল হইবে বা তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা নহে। স্বাধীনতালাভপ্রচেষ্টা খুব জোরে চালাইতে হইবে।

এখন ইংলণ্ড ও ভারতে ইংরেজরা এবং ইংরেজভক্ত ভারতীয়েরা যে কংগ্রেস দ্বারা দরখাস্ত করাইয়া বড়লাটের সহিত গান্ধীজীর দেখাসাক্ষাৎ করাইয়া একটা রফার চেষ্টা করিতেছে, তাহা সফল হইলে দেশের পক্ষে তাহা অনিষ্টকর হইবে। নূতন শাসনবিধিটার সহিত কোন রফা হইতে পারে না। কংগ্রেস যদি রফা করে, তাহা হইলে উহা অশ্রদ্ধেয় হইবে। মহাত্মাজী রফা করিলে সমাজতন্ত্রী দলের বিরোধিতা আরও বাড়িবে। কংগ্রেসের চাওয়া উচিত সম্পূর্ণ স্বশাসনের অধিকার—নূনকল্পে কেবলমাত্র ভারতীয় লোকদেরই মত অনুসারে নির্দিষ্ট অল্প কয়েক বৎসরে ক্রমশঃ বিকাশ দ্বারা সম্পূর্ণ স্বশাসনের অধিকার লাভ করিবার ক্ষমতা।

[এই সমস্ত কথা হাউস অব লর্ডসে ভারতসচিবের বক্তৃতার আগে লেখা।]

কয়েকটি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সর্ত

আমরা বলিয়াছি, কংগ্রেসের বা অন্ত্র কোন দলেরই

মন্ত্রিস্থ গ্রহণ করা উচিত নয়। চৈত্রের ‘প্রবাসী’তে আমরা দেখাইয়াছিলাম, যে, ছয়টি প্রদেশে মন্ত্রিস্থ লইলে দেশের সর্বত্র কংগ্রেসের নীতি একবিধ না হইয়া বিবিধ হইবে এবং তাহা অনিষ্টকর হইবে। যাহা হউক, যে কয়টি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসওয়ালারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াছেন, কংগ্রেস তথায় একটি সৰ্ভে মন্ত্রিস্থ গ্রহণের সঙ্কল্প করেন। সৰ্ভটি এই, যে, গবর্ণর প্রধান মন্ত্রীকে এই প্রতিশ্রুতি দিবেন, যে, তিনি মন্ত্রিসভার শাসন-বিধানসম্বন্ধে কোন কাজে বাধা দিবেন না বা হস্তক্ষেপ করিবেন না। কোন গবর্ণর এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন নাই। তাঁহাদের সকলের জবাব এক ছাঁচে ঢালা। তাহার কারণ, তাঁহাদিগকে উপরওয়ালা ভারতসচিবের হুকুম তামিল করিতে হইয়াছে। তাঁহাদের কৈফিয়ৎ এই, যে, তাঁহারা নূতন শাসনবিধিটা অল্পসারে ওরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। এই কৈফিয়ৎটা ঠিক কিনা, তাহার বিস্তারিত বিচার ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় অনেকে করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন উহা ঠিক, কেহ বলিয়াছেন উহা ঠিক নয়। এরূপ আলোচনা যে একেবারেই মূল্যহীন, তাহা মনে করি না। আমরা যতটা জানি, আইনটার কোথাও এমন কোন ধারা নাই যেটা বলে, যে, গবর্ণর এরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। কিন্তু আমরা সংক্ষেপে ও সোজাসজি ইহাই বুঝি, যে, আইনে এ-বিষয়ে স্পষ্ট কোন নির্দেশ না-থাকিলেও, গবর্ণরদের এরূপ প্রতিশ্রুতি না দিবার (তাঁহাদের দিক্ হইতে) যথেষ্ট কারণ ছিল। নূতনশাসনবিধিটা তাঁহাদিগকে স্বেচ্ছাকারী হইবাব ক্ষমতা দিয়াছে, তাঁহাদিগকে নামতঃ না হইলেও কার্যতঃ ভিক্টোর করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীদের নীতির অনুসরণ করিয়াই আইনটা এইরূপ করা হইয়াছে। গবর্ণরদের ক্ষমতার কোন সঙ্কোচ তাঁহারা স্বেচ্ছায় করিলেও তাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের নীতি ব্যাহত হয়। সুতরাং স্বেচ্ছাতেও তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষমতা সঙ্কোচ করিতে পারেন না। কংগ্রেসের দাবী অনুসারে তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ক্ষমতার সঙ্কোচ করিতে হইলে তাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের নীতি ত ব্যাহত হইতই, অধিকন্তু তাঁহারা নিজ নিজ যে প্রেষ্টিজ বজায় রাখিবার নিমিত্ত সর্বদা অবহিত, তাহারও হানি হইত।

কংগ্রেসের সৰ্ভের মধ্যে এই রকম একটা অল্পচাবিত প্রতিশ্রুতি উহা ছিল, “আমরা বলছি, আমরা খুব লক্ষ্য

হেলে হব; অতএব, হে লাটসাহেব, তুমিও বল, তুমিও খুব লক্ষ্য হেলে হবে।” কংগ্রেস চান, নূতন শাসনবিধি অচল করিতে, ধ্বংস করিতে। তাহার মধ্যে রহিয়াছে দুর্দান্ত ‘দস্তিপনা’। লক্ষ্য হেলে নাজা তাঁহাদের পক্ষে বেমানান হইবে।

আমাদের মনে হয়, গবর্ণররা যে কংগ্রেসের সৰ্ভে রাজী হন নাই, তাহা কংগ্রেসের পক্ষে বিধাতার বর (godsend) বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। বেগতিক দেখিয়া ব্রিটিশ-পক্ষ ও তাহাদের ভারতীয় ভক্তের দল কংগ্রেসকে ভজাইবার চেষ্টা করিতেছে বা করিবে। তাহাতে কংগ্রেস-নেতাদের হৃদয় গলিলে বা একটুও মন ভিজিলে কংগ্রেসের মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কষ্টক রোপিত হইবে। [ভারতসচিবের বক্তৃতার পূর্বে লিখিত।]

নূতন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাসমূহ

যে পাঁচটি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ নহেন, সেখানে অকংগ্রেসী দলের মন্ত্রীদের নিয়োগে কোন প্রশ্ন উঠে নাই। কিন্তু যে-সব প্রদেশে কংগ্রেসী সদস্যেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানেও অস্ত্রাস্ত্র দলের লোকদের দ্বারা, যাহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের লোক তাঁহাদের দ্বারা, মন্ত্রিসভা গঠন করিবার নূতন আইনসম্বন্ধে ক্ষমতা গবর্ণরদের আছে কিনা এবং তাঁহারা যে এইরূপ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন তাহা আইনসম্বন্ধে হইয়াছে কি না, এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। এক কথায় এই প্রশ্নের ইা কিংবা না উত্তর দেওয়া যায় না। আমাদের যতটা মনে পড়িতেছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করিতে না চাহিলে গবর্ণর কি করিবেন, ১৯৩৫ সালের আইনে সে বিষয়ে কোন নির্দেশ নাই। গবর্ণরদের কাছে যে রাজকীয় উপদেশ-পত্র (Instrument of Instructions) আসিয়াছে, তাহাতে সাধারণতঃ গবর্ণরের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন উপদেশ আছে। কিন্তু এরূপ দলের লোকেরা মন্ত্রী হইতে না চাহিলে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের লোকদিগকে লইয়া গবর্ণর মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিবেন না, এরূপ কোন নিবেদনাত্মক ধারা নাই। তবে উপদেশ-পত্রে একটা খুব সাঙ্ঘনাদায়ক কথা আছে। আছে এই, যে, গবর্ণরের কোন

কাজ উপদেশ-পত্রাঙ্কযায়ী নহে এই অজুহাতে তাহা অবৈধ বিবেচিত হইবে না। অর্থাৎ নিরঙ্কুশঃ গবর্ণরাঃ।

যাহা হউক, নূতন আইন অনুসারে গবর্ণররা যত দিন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন না-করাইবার অধিকারী, তত দিন, কংগ্রেসের প্রভাব যে ছয়টি প্রদেশে অধিকতম প্রমাণিত হইয়াছে, সেখানেও গবর্ণররা আরামে থাকিবেন। ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলেই এই ছয়টি প্রদেশে গবর্নেন্ট “পরাজিত” ও “তিরস্কৃত” হইতে থাকিবেন। তাহার বাহা অর্থ ও ফল, তাহা সুবিদিত। [ভারতসচিবের বক্তৃতার পূর্বে লিখিত।]

সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে

অধ্যাপক কীথ

বিলাতে মূলশাসনবিধিঘটিত (constitutional) প্রশ্ন সম্বন্ধে অধ্যাপক বেরিডেল কীথের মত খুব প্রামাণিক বিবেচিত হইয়া থাকে। কংগ্রেসী দল মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সম্মত না-হওয়ায় যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের লোক দিয়া যে-সব মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তিনি স্কটসম্যান নামক কাগজে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিচে মুদ্রিত হইল :

MADRAS, APRIL 6.

The London correspondent of the *Hindu* cables : Prof. Berriedale Keith, Britain's greatest constitutional authority, in a letter to the *Scotsman* declares that Mahatma Gandhi and the Congress at his initiative possess the essential merit of having studied the principles of responsible government and realized what Sir Samuel Hoare never grasped—that it is wholly incompatible with executive safeguards. The India Act has suffered from the outset from the grave defect that it made responsibility unreal by placing special responsibilities on the Governors.

Prof. Keith adds that to say, as Lord Erskine and Lord Brabourne have said, that they would give the ministers all help, sympathy and co-operation is meaningless, for the Act itself gives powers and imposes duties on the Governors which reduce the ministerial responsibility to a farce. It is regrettable that the Governors were not authorized to give much more definite pledges. Prof. Keith declares that the formation of minority ministries is a negation of responsible government and says that sooner the Governors take charge of the Government the better, for adds Prof. Keith, the forms of responsible government should not be used to conceal the breakdown.—A. P. I.

অধ্যাপক কীথের মন্তব্যের তাৎপর্য—

- মিঃ গান্ধী এবং, তাহার প্রাবল্লিক প্রেরণায়, কংগ্রেস জনগণের নিকট দায়ী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি অঙ্গীকার করিয়া তাহা বুঝিয়া-

ছেন, এবং সর্ব সামুয়েল হোব বাহা কখনও নিজেব বুদ্ধিগম্য কবিত্তে পাবেন নাই তাহা তাঁহাবা উপলব্ধি কবিত্তে পাবিয়াছেন। তাহা এই, যে, শাসকবর্গকে নিবাপদপ্রভুত্বশালী করাব সহিত দায়িত্বশীল শাসন-তন্ত্রের কোন সম্ভবিত বা সামঞ্জস্য থাকিত্তে পাবে না। ভারত-শাসন আইন গোড়া হইতেই এই গুরুতব গলদপ্রসূত হইয়া আছে, যে, ইহা গবর্ণরবদেব উপর বিশেষ কতকগুলি দায়িত্বভাব অর্পণ করিয়া এবং তাঁহাদিগকে তদুপযুক্ত ক্ষমতা দিয়া দায়িত্বমূলক শাসনব্যবস্থাকে অসার ও অবাস্তব কবিসাছে।

মন্ত্রাজ্ঞা ও বোম্বাইয়েব লাটেরা যে বলিয়াছেন যে তাঁহাবা মন্ত্রীদিগকে সব সাহায্য, সহায়ভূতি ও সহযোগিতা দিবেন, তাহা অর্থহীন; কারণ ভারতশাসন আইনটাই গবর্ণরদিগকে একপ সব ক্ষমতা দিয়াছে এবং এমন সব কর্তব্যের ভাব তাঁহাদেব স্বন্ধে চাপাইয়াছে যাহাব দ্বাবা মন্ত্রীদের দায়িত্বকে প্রহসনে পরিণত কবা হইয়াছে।

ইহা পরিতাপেব বিষয়, যে, এতদপেক্ষা অধিকতর সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিবাব ক্ষমতা গবর্ণরদিগকে (কর্তৃপক্ষ কর্তৃক) প্রদত্ত হয় নাই।

ব্যবস্থাপক সভাসমূহেব কেবল সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলি হইতে লোক লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন দায়িত্বমূলক শাসনতন্ত্রেব সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি ও বিকলচরণ। গবর্ণরবা শীঘ্র নিজেব হাতেই সব রাষ্ট্রীয় কাজেব ভার গ্রহণ কবিলেই ভাল হয়; কাবণ, দায়িত্বমূলক শাসনতন্ত্রেব বাস্তব আকৃতিব দ্বাবা ইহা গোপন করিবাব চেষ্টা করা উচিত নহে, যে, শাসনবিধানটা ভাঙিয়া পড়িয়া বিকল ও অচল হইয়াছে।

শাসকবর্গের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করিলে তাহা যে জনগণের নিকট দায়ী শাসনতন্ত্রের সহিত খাপ খায় না, এই সোজা কথাটা যে সর্ব সামুয়েল হোরের মত ঝামেলা লোক বুঝেন নাই, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। তিনি এটা খুবই বুঝিতেন ও বুঝেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও তিনি শাসকবর্গের শৈরশাসন ভাবতবর্বেকে গণতান্ত্রিকতার ছোঁড়া কাঁধায় মুড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন ও দিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের লোকেরা ছাড়া ভারতবর্ষের অল্প অনেক লোকও দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্রের মূলনীতি বুঝে এবং তাহার সহিত শাসকবর্গের নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের অসঙ্গতিও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। [ভারতসচিবের বক্তৃতার পূর্বে লিখিত।]

বঙ্গের মন্ত্রিসভা

ভারতবর্ষের এগারটি প্রদেশের মধ্যে সংখ্যায় সকলেব চেয়ে বেশী মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন বঙ্গে। সংখ্যায় আধিকা অনুসারে যদি কাজের উৎকর্ষ বাড়িত, তাহা হইলে এত জন

মন্ত্রীর নিয়োগ নিষ্পাদন বিষয় হইত না। কিন্তু বঙ্গের মন্ত্রিসভা অল্প সব প্রদেশের মন্ত্রিসভার চেয়ে অধিকতর কার্যদক্ষ হইবে বা দেশের হিতসাধনে অধিকতর সমর্থ হইবে, এক্ষণে অনুমান করিবাব কোন হেতু দেখিতেছি না। এই জন্ত এতগুলি লোককে চাকরী দেওয়ার সমর্থন করিতে পারিতেছি না। বস্তুতঃ, মন্ত্রীরা যদি সকলেই খুব যোগ্য লোক হইতেন, তাহা হইলেও সকলকে কাজ দেওয়া ঠিক হইত না। বঙ্গে যোগ্য অথচ বেকার লোক অনেক আছেন, কিন্তু সকলকে ত সর্বসাধারণের অর্থে কাজ দেওয়া যায় না ও হয় না। প্রকৃত বিবেচ্য এই, যে, মন্ত্রিসভার করণীয় কাজ যাহা, তাহা কয় জন লোকের দ্বারা হইতে পারে। অনেকে বলেন, চারি জনের দ্বারাই সব কাজ হইতে পারে। কিন্তু কাহারও অনুমানে উপর নির্ভর না করিয়া, যত জন লোকের দ্বারা বঙ্গের কাজ এত দিন চলিয়া আসিতেছিল, তত জন লোক নিযুক্ত করিলে নিশ্চয়ই কাজ চলিতে পারিত। এত দিন তিন জন মন্ত্রী এবং শাসনপরিষদের চারি জন সদস্য কাজ চালাইতেন। এখন সাত জন হইলেই নিশ্চয়ই যথেষ্ট হইত। উমেদারের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় এবং কতকগুলি লোককে কাজ না-দিলে তাহাদের ও তাহাদের দলের লোকদের ভোট পাওয়া যাইবে না এইরূপ আশঙ্কা থাকায় সরদার মন্ত্রী মোলবী ফজল হককে এগার জনের মন্ত্রিসভা গড়িতে হইয়াছে। অভাব, মন্ত্রীরা বাংলা দেশের সেবার জন্ত নহে, বাংলা দেশ মন্ত্রীদের সেবার জন্ত, এখন ইহাই মনে করিতে হইবে।

সরদার মন্ত্রীকে বাদ দিলে বাকী দশ জনের পাঁচ পাঁচ জন মুসলমান ও হিন্দু সমাজ হইতে লওয়া হইয়াছে বটে; কিন্তু আমরা যেমন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচনে তেমনই মন্ত্রী মনোনয়নেও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধী। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা যোগ্যতাকেই একমাত্র মাপকাঠি করিবার পক্ষপাতী। অল্প নানা দেশের মত বঙ্গে যদি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রথা অনুসারে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হইত, তাহা হইলে রাজনৈতিক দলের মধ্যে কংগ্রেস দলের সদস্যই বেশী নির্বাচিত হইত এবং তাহাদের মধ্যে কংগ্রেসের জাতীয় উপদলের লোকই হয়ত সংখ্যায় বেশী হইত। ধর্মসম্প্রদায় অনুসারে সদস্যদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী

হইত। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এমনভাবে করা হইয়াছে যাহাতে হিন্দুর প্রভাব কমে এবং স্বাধীনতালিপ্সু শিক্ষিত জন-সমষ্টির প্রভাবও কমে।

সদস্য নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রভাব স্পষ্ট অঙ্কিত হওয়ায় কেবলমাত্র যোগ্যতার বিচারে মন্ত্রী মনোনয়নের কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং মন্ত্রীদের মধ্যে কাহার যোগ্যতা কতটুকু তাহাব বিচার অনাবশ্যক। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলস্বরূপ যেমন ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের প্রাধান্য হইয়াছে, সেইরূপ সেই কারণেই মন্ত্রিসভাতেও মুসলমানদের প্রাধান্য হইয়াছে। তন্নিম্ন, নিজের বৈষয়িক, সাংসারিক ও ব্যক্তিগত কাজ চালাইবার সামর্থ্য না থাকিলেও এবং সেই অসামর্থ্য প্রকাশভাবে বিদিত থাকিলেও, অল্প কারণে মানুষ রাষ্ট্রেব এক-একটা বিভাগের কাজ চালাইবার যোগ্য বিবেচিত হইতে পারে, বঙ্গের মন্ত্রিসভা ইহাও সর্বসাধারণকে জানাইয়া দিতেছে। গণতান্ত্রিক প্রথা অনুসারে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচন হইলে এবং মন্ত্রিসভাও তদনুসারে গঠিত হইলে এই প্রকার কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার কারণ ঘটিত না, ব্যবস্থাপক সভায় কত জন কোন্ সম্প্রদায়ের লোক তাহা গণনা করাও অনাবশ্যক হইত। বিচার কেবল যোগ্যতারই হইত, এবং তাহাই হওয়া উচিত।

চাষীদের হিতের জন্তই প্রথমে কৃষক, প্রজা বা রায়তের স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা ১৯২১ সালে বঙ্গে আরম্ভ হয়। আরম্ভ করেন পরলোকগত কেশবচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার সহকর্মীরা। ইহা তখন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ছিল। ইহাতে তখন পরলোকগত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, সর্ব প্রকৃষ্ট রায়, মোলবী আবদুল করীম এবং মোলবী ফজল হক যোগ দিয়াছিলেন। পরে সর্ব আবদুর রহিমও ইহাতে যোগ দেন। কিছুদিন পূর্বে কিন্তু মোলবী ফজল হক প্রজাপাটী নাম দিয়া যে দল গড়িয়াছেন, তাহা সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে হিন্দু সভ্যের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে—যদিও হিন্দু রায় এখনও বিস্তর আছে ও ভবিষ্যতেও থাকিবে।

মোলবী ফজল হক এই প্রজাপাটীর প্রতিনিধিরূপেই নির্বাচন-দণ্ডে জয়ী হইয়াছিলেন। নির্বাচিত হইবার পূর্বে

তিনি প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার জন্ত কোন কোন কাজ করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রিসভার দ্বারা প্রজাদের স্বার্থরক্ষা তিনি কি প্রকারে করিবেন বুঝা যায় না। এই মন্ত্রিসভায় কেহ বলেন দেড় গুণা কেহ বলেন দুই গুণা জমীদার আছেন। প্রজাপাটীর প্রতিনিধি কেহ বলেন এক জন কেহ বলেন দুই জন আছেন। আমরা এরূপ মনে করি না, যে, জমীদার ও প্রজার স্বার্থ নিশ্চয়ই পরস্পর-বিরোধী। উভয়ের স্বার্থের সামঞ্জস্য হইতে পারে মনে করি। কিন্তু যে কারণেই হউক, উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধিতা জন্মিয়াছে। বিরোধের ক্ষেত্রে যে-কেহ প্রজার স্বার্থরক্ষা করিবেন বলিয়াছেন, তাঁহারই দেখা উচিত প্রজার দল পুঙ্ক কিনা। কিন্তু বঙ্গের মন্ত্রিসভায় জমীদারের দলই পুঙ্ক।

মৌলবী ফজল হক প্রজাপাটীর প্রতিনিধিরূপে প্রজাদের স্বার্থরক্ষার মনোযোগী হইতে পারিবেন না বলিয়া ঐ দলের ২৮ জন সদস্য তাঁহাকে একটি খোলা চিঠিতে কিঞ্চিৎ স্পষ্ট কথা শুনাইয়াছেন।

শিক্ষা-বিভাগ সর্বত্রই একটি অভাবম্ভর বিভাগ। বঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার উপজন্মে উহার দ্বারা মুসলমানদের প্রকৃত কল্যাণ হইতেছে না, অথচ হিন্দুদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জ্ঞান আর্থিক সাহায্য ও উৎসাহ পাইতেছে না। শুনা গিয়াছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার আনান্দপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শিক্ষামন্ত্রী করা হইবে। তাহা হইলে এক জন বাস্তবিক যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ হইত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে ও ভূতপূর্ব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি হিন্দুর উপর আক্রমণ নীরবে সহ্য করেন নাই—যদিও মুসলমানের কোন অনিষ্টও করেন নাই। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত মুসলমানেরা তাঁহাকে গচ্ছন্দ করে না। সম্ভবতঃ এই কারণে তাঁহাকে মন্ত্রী করা হয় নাই। হয়ন্ত লাটগাহেবও তাঁহার উপর খুব সন্তুষ্ট নহেন। গত কনভোকেঞ্চে তিনি দেশকে অপ্প্রেশন (অত্যাচার) এবং সার্ভিলিটি (দাসত্ব) হইতে মুক্ত করা শিক্ষিত যুবকদের কাজ বলিয়াছিলেন। অবশ্য, এইরূপ কথার রাজনৈতিক অর্থই একমাত্র অর্থ নহে—অন্ত অর্থও হইতে পারে; কিন্তু রাজনৈতিক অর্থও হইতে পারে। এবং

সরূপ অর্থ করিলে এরূপ কথা যিনি বলেন তাঁহার আমলা-তন্ত্রের প্রায় না হইবার কথা।

নির্বাচন যখন চলিতেছিল তখন প্রজাপাটীর পক্ষ হইতে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, যে, বিনা বিচারে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে। কিন্তু এই অঙ্গীকার পালন করা যে কর্তব্য, তাহা বর্তমান মন্ত্রিসভা মনে করিবেন বলিয়া মনে হয় না। বিনাবিচারে বন্দী হওয়াটা আমলাতন্ত্রের মত মুসলমানেরাও সাধারণতঃ একটা হিন্দু সমাজের সংক্রামক ব্যাধি মনে করেন। মন্ত্রিসভা প্রধানতঃ মুসলমান। বিনাবিচারে বন্দীদের মুক্তি বিশেষ করিয়া কংগ্রেস দলের একটি দাবী। কিন্তু বর্তমান মন্ত্রিসভায় কংগ্রেস দলের কেহ নাই। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার আগে কংগ্রেসওয়াল ছিলেন বটে এবং তাঁহার অর্থনৈতিক বিষয়ে যোগ্যতাও আছে; কিন্তু তিনি কংগ্রেস দলের অন্ততম লোকরূপে নির্বাচিত হন নাই ও নির্বাচিত হইবার পরে কংগ্রেসের সভ্যত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। তাহা হইলেও তিনি বিনা-বিচারে বন্দীদের মুক্তিপ্রার্থী হইতে পারেন। কিন্তু এক আশা জনের চেষ্টায় কি হইবে? বিশেষতঃ যখন আমলাতন্ত্র বিরোধী এবং ভূতপূর্ব গবর্নমেন্টের, সহিত একান্তাসম্পন্ন খোঁজাখোঁজ নাজিমুদ্দিন সাহেব আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

বঙ্গের মন্ত্রিসভায় তফসিলভুক্ত জাতিদের প্রতিনিধি

বঙ্গের মন্ত্রিসভায় তফসিলভুক্ত জাতিদের দুই জন প্রতিনিধি আছেন। তাঁহারা শিক্ষায় অনগ্রসর জাতিদের শিক্ষার জন্ত সরকারী টাকা বেশী করিয়া দেওয়াইতে পারিলে তাঁহাদের মন্ত্রী হওয়া কতকটা সার্থক হইবে।

পাটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট

পাটকলগুলার আশী হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করিয়াছে। দরিদ্র শ্রমিকরা বিশেষ অসুবিধা অনুভব না করিলে অর্দ্ধাশন ও অনশনের সম্ভাবনা সত্ত্বেও ধর্মঘট করে না। সুতরাং ব্যাপক ধর্মঘট হইলেই সাধারণতঃ বুঝা উচিত যে শ্রমিকদের সভ্য

অভিযোগ আছে। গণতান্ত্রিক দেশসকলে শ্রমিকরা ধর্মঘট করিলে গবর্নেন্ট ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সালিসী দ্বারা উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এদেশে গবর্নেন্ট সাধারণতঃ তাহা করেন না। তন্নিম্ন এক্ষেত্রে ধনিকরা ইংরেজ। পার্টকল ধর্মঘট হওয়ায় গবর্নেন্ট ১৪৪ ধারার প্রয়োগে শ্রমিকদের নেতাদিগের স্বচ্ছন্দ গমনাগমনে বাধা দিয়াছেন, যাহারা শ্রমিক নেতা নহেন এরূপ কোন কোন কংগ্রেস কর্মীর উপরও উক্ত ধারা প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রমিকদিগকে দলবদ্ধভাবে প্রকাশ্য সভা করিবার ও মিছিল বাহির করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

নূতন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সাহা সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব আনিয়া এই ধর্মঘটের প্রতি গবর্নেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে সরকার মন্ত্রী মোলবী ফজলুল হক সাহেব সরকারপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের একটি পরামর্শ-সভা আহ্বান করিয়া বিবাদভঞ্জন করিবেন বলিয়াছেন। ফলে শ্রমিকদের অভিযোগের প্রতিকার হইলে তাহা সমস্যার বিষয় হইবে।

বঙ্গে স্বভাষচন্দ্রের সম্বন্ধ

সাড়ে পাঁচ বৎসর বন্দী থাকিবার পর স্বভাষচন্দ্র মুক্তি লাভ করায় আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্ত এবং তাহার সম্বন্ধনা করিবার নিমিত্ত গত ২৩শে চৈত্র কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ভারতীয় অধিবাসীদের একটি সভা হয়। এরূপ বিরাট সভা কচিং দেখা যায়। অল্পমিত হইয়াছে, যে, পঞ্চাশ হাজার লোক ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। তন্নিম্ন চারি পার্শ্বের বাড়ীর বারান্দা ও ছাদে এবং বৃক্ষশাখাতেও বিস্তর লোক ছিলেন। স্বভাষচন্দ্রকে ফুলের মালা এত দেওয়া হইয়াছিল, যে, যে-কোন মল্লবোদ্ধার পক্ষেও তাহা বহন করা দুঃসাধ্য। শান্তিনিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথ যে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন তাহার অর্থ, “সমগ্র জাতির কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমি স্বভাষকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি।” সভাপতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক নিম্নমুদ্রিত প্রস্তাব দুটি উপস্থাপিত ও সভাকর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

সরকারী নীতির নিন্দা

বৃটিশ গবর্নেন্ট বিনা অভিযোগে ও বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত বঙ্গজননীর বহু সন্তানকে আটক রাখিবার যে অজায় ও স্বেচ্ছাচারমূলক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, এই সভা তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে।

যাহাদিগকে বিনা অভিযোগে ও বিনা বিচারে বর্তমানে আটক রাখা হইয়াছে তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার এবং বিভিন্ন বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিবার জন্ত বাংলার জনসাধারণের দাবী এই সভা জানাইতেছে।

ভারতের স্বাধীনতার জন্ত যে সমস্ত রাজবন্দী নীরবে ও নির্ভীক সহিষ্ণুতার সহিত দুঃখভোগ করিতেছেন, এই সভা তাহাদিগকে আন্তরিক অভিনন্দন ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

রাজবন্দীদের আত্মহত্যা

বাংলার কতিপয় রাজবন্দী আত্মহত্যা করায় এই সভা গভীর শঙ্কা ও উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। যেহেতু এইরূপ আত্মহত্যা ঘটয়াছে, সেই হেতু এই সভা মনে করে যে, যে-অবস্থায় রাজবন্দীদের রাখা হয় তাহা অসহনীয়। যে-সব রাজবন্দী আত্মহত্যা করিয়াছে তাহাদের বিষয়ে ও রাজবন্দীদিগকে যে-অবস্থায় রাখা হয় তৎসম্পর্কে প্রকাশ্য তদন্ত করিবার জন্ত এই সভা দাবী জানাইতেছে। এই সভা ঐ সব রাজবন্দীদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাইতেছে।

প্রস্তাব দুটি উত্থাপন উপলক্ষ্যে সভাপতি যাহা বলেন, তাহা সংক্ষেপে এই :—

আমি নিশ্চয়ই জানি এই প্রস্তাব দুইটি সম্বন্ধে সভাস্থ কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না এবং সকলেই ইহা সমর্থন করেন। আমি জানি আমরা মৃদু ভাষায় যাহা বলিয়াছি তাহার চেয়ে কঠোর মন্তব্য সকলে অন্তরে পোষণ করেন।

গবর্নেন্টের এই নীতিতে কেবল বিনা-বিচারে বন্দীরা ও তাহাদের আত্মীয়স্বজনরাই যে দুঃখ পাইয়াছেন ও পাইতেছেন তাহা নহে, সমগ্র দেশের ক্ষতি হইয়াছে। গবর্নেন্ট জগৎকে জানাইয়াছেন, এই নীতির উদ্দেশ্য সন্ত্রাসনবাদের ও সন্ত্রাসক দলের উচ্ছেদ সাধন। তাহার আলোচনা আমরা অনেক বার করিয়াছি। নূতন কিছু বলিবার নাই। গবর্নেন্ট কর্তৃক ব্যক্ত সন্ত্রাসনবাদ ও সন্ত্রাসক দলের উচ্ছেদবিষয়ক উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত অবলম্বিত বিনা-বিচারে বন্দী করা রূপ উপায়টার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী।

স্বভাষ বাবুকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিবার পূর্বে



স্বভাষচন্দ্র বসুর সঞ্চর্চনা-সভায় “বন্দেমাতরম্” গীত হইবার সময় মালাভূষিত স্বভাষচন্দ্র দণ্ডায়মান

ও পূর্বে সভাপতি কিছু বলিয়াছিলেন। পাঠানস্তর ঘাড়া বলিয়াছিলেন, তাহা এই :—

“আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ষাঁদের হাতে আছে তাঁরা স্বভাষচন্দ্রকে কণ্টকের মুকুট পরিয়েছেন। আমরা ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে আমাদের প্রীতি জানাচ্ছি।”

অভিনন্দনের উত্তর দিতে উঠিয়া আবেগে স্বভাষবাবুর কণ্ঠস্বর মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া যাইতেছিল। তিনি নিজের ভাবের উচ্ছ্বাস দমন করিতে পারিতেছিলেন না ; মধ্যে মধ্যে তাঁহার চক্ষু সিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি বক্তৃতা দিবার সময় অত বড় বিরাট সভার বিপুল জনসমষ্টি মস্তমুগ্ধবৎ নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগময়ী ভাষার স্বাক্ষর তাহাদের অন্তর স্পর্শ করিয়া তাহাদিগকেও অশ্রুসিক্ত করিয়া তুলিতেছিল।

স্বভাষবাবু তাঁহার লিখিত বক্তৃতাটি সমস্তই দাঁড়াইয়া

পড়িয়াছিলেন। ছুঃখের বিষয়, তাহাতে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পায়। আশা করি, এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের কুফল অল্পকাল-স্থায়ী হইবে।

স্বভাষবাবুর বক্তৃতা

স্বভাষবাবুর বক্তৃতার সমস্ত কথাই অনুধাবনযোগ্য। আমরা কেবল তাঁহার দু-একটি কথার আলোচনা করিব। স্বভাষবাবু বলিয়াছিলেন :—

ভারতবর্ষ একটা অখণ্ড সত্য ; অতএব ভারতের মুক্তি সাধন করতে হ'লে সকল প্রদেশ ও সম্প্রদায়কে একযোগে এবং এক নীতি অনুসারে কাজ করতে হবে। প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা পরাধীন জাতির উন্নতির বিশেষ পরিপন্থী। তাই স্বাধীনতাকামী যারা, তাদের কর্তব্য এমন একটা উদার সামাজিক ও অর্থনৈতিক

কার্যক্রম নিয়ে সজ্জবদ্ধ হওয়া—যার দ্বারা প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার ভেদনীতি সমূলে ধ্বংস হতে পারে।

এই সমস্তুই সত্য কথা। ভারতবর্ষ যে বার বার পুরনো পনত হইয়াছে, ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ পরাধীনতাশা ছেদন করিয়া কখন কখন স্বাধীন হইলেও সমগ্র ভারতবর্ষ যে স্বাধীন থাকিতে বা হইতে পারে নাই, তাহার একটি কারণ এই, যে, সমগ্র ভারত ছোট ছোট স্বাধীন অংশে বিভক্ত ছিল, সমগ্র ভারত একটি অখণ্ড দেশ বলিয়া আপনার সত্তা অক্ষুণ্ণ করিয়া সম্মিলিত চেষ্টা করিতে পারে নাই।

প্রাদেশিকতার আমরা বিরোধী। কিন্তু এখানে একটা কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক। অনেক অবাঙালী নেতার কাজে ও কথায় এই ভাব প্রকাশ পায়, যে, বাঙালী যদি অন্ধকর্তৃক বন্ধশেষণ বন্ধ করিতে চায়, বাঙালী যদি বন্ধের আভ্যন্তরীণ সব ব্যাপারে তেমননি কর্তৃ হইতে চায় যেমন অন্ধ প্রদেশের লোকেরা তাহাদের প্রদেশে কর্তৃ, তাহা হইলে সেটা বাঙালীর প্রাদেশিকতা! আমরা ইহা বাঙালীর প্রাদেশিকতা মনে করি না। এই তথাকথিত প্রাদেশিকতা বর্জন করিয়া নিখিলভারতীয় দেশভক্ত হওয়া যায় বা হইবার চেষ্টা করা উচিত, আমরা এরূপ মনে করি না। ‘পর-ভালাগ্রে’ হইতে হইলে ‘ঘর-জালাগ্রে’ হওয়া একান্ত আবশ্যক, এরূপ মনে করি না। আমরা এরূপ ইঙ্গিত করিতেছি না, যে, উপরে বেরূপ অবস্থিত মনোভাবের আভাস দিলাম, স্বভাষবাবুর মনে সেরূপ কোন ভাব আছে। তিনি নিজের কথা খুলিয়া বলিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের কথাও খুলিয়া বলিতেছি।

বাংলা দেশের কংগ্রেসী গৃহবিবাদের দক্ষন যে নিখিল-ভারতীয় মহাগণসভায় বন্ধ উপেক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা আমরা জানি। কিন্তু বাঙালী বলিয়াই বাঙালীর কথা উপেক্ষিত হয়, বাঙালী বলিয়াই বাঙালীর স্বার্থ অবহেলিত হয়, এরূপ দৃষ্টান্ত ও প্রমাণও দেওয়া যায়। এই অবহেলা সহ না-করা প্রাদেশিকতা নহে।

একটা অবাস্তব কথা এখানে বলি। বাঙালীর প্রতি বিরূপতার একটা দৃষ্টান্ত স্বভাষবাবুর অবদিত নহে। স্বর্গীয় বিঠলভাই পটেল সমগ্র ভারতবর্ষেরই কল্যাণার্থ স্বভাষবাবুর পরিচালনায় বিদেশে প্রচারকার্যের নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা তাহার উইলে রাখিয়া যান। এই টাকাটা কেন দাতার ইচ্ছানুসারে প্রদত্ত ও ব্যয়িত হইতেছে না তাহার আলোচনা বন্ধের অন্ধ কোন কাগজে হইয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু ‘প্রবাসী’তে হইয়াছিল।

সাম্প্রদায়িকতা পরাধীন জাতির উন্নতির বিশেষ পরিগণ্ঠী, এবং তাহা স্বাধীন জাতিরও স্বাধীনতা রক্ষার সামর্থ্য কমাইয়া দিতে পারে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু বাহারা অসাম্প্রদায়িক হইতে চান, কোন সম্প্রদায়েরই সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় দেওয়া

তাঁহাদের উচিত নয়, কাহারও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে রফা করা তাঁহাদের উচিত নয়, এবং ছোট বা বড় কোন সম্প্রদায় বা উপসম্প্রদায়ের প্রতিই অবিচার বা জবরদস্তিতে তাঁহাদের যোগ দেওয়া উচিত নয়। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, করিয়াছেন, তাহাতে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। শেষের দিকে কংগ্রেস যে এ বিষয়ে কতকটা ঠিক কথা অন্ততঃ কথায় বলিয়াছেন, তাহা সাম্প্রদায়িক-বাটোয়ারা-বিরোধী লোকদের প্রভাবে এবং “কংগ্রেস জাতীয়” দলের উদ্ভবে ঘটিয়াছে।

গণতান্ত্রিক আদর্শ হইতে এক চুলও সরিয়া না-গিয়া অসাম্প্রদায়িক হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের সব লোক স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় যোগ না দিলে দেশকে স্বাধীন করা যাইবে না, এই রূপ মনে করা ও বলা আমরা ঠিক মনে করি না। হিন্দু-সমাজেরও বিস্তর লোক ত স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দেয় নাই; কিন্তু তাহার জন্ত ত কখনও কোন কংগ্রেসনেতা বলেন নাই, যে, হিন্দু মহাসভার সঙ্গে বা বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘের সঙ্গে একটা রফা করা যাক, নতুবা দেশ স্বাধীন হইবে না। কিন্তু বিস্তর মুসলমান স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ না-দেওয়ায় সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত মুসলমানদের সঙ্গে রফা করিতে কংগ্রেস নেতারা পশ্চাৎপদ হইবেন না, এইরূপ লক্ষণ স্পষ্ট। আমরা ছোট বড় কোন সম্প্রদায়কেই উপেক্ষা করিতে বলিতেছি না। সকলেরই জন্ত কংগ্রেসের দ্বার মুক্ত থাকা আবশ্যক। কংগ্রেস সকলকেই নিজের দলে আনিতে সর্বদা সচেষ্ট ও প্রস্তুত থাকিবেন—সংখ্যাবহুল সম্প্রদায়কে যেমন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেও তেমন। কিন্তু নিজের আদর্শকে হীন করিয়া, অংশতঃ ত্যাগ করিয়া বা আদর্শ হইতে কতকটা বিচ্যুত হইয়া কাহাকেও লইতে গেলে কংগ্রেসের সেই শক্তিশীন দশা হইবে যে-দশা হয় ভূত ঝাড়িবার সরিষার মধ্যেই ভূত ঢুকিলে।

কংগ্রেসের এই বিশ্বাস থাকা উচিত, যে, “আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়ী হইবই। যদি সকল সম্প্রদায়ের লোক এই সংগ্রামে যোগ দেন তাহা হইলে জয় অপেক্ষাকৃত সহজে ও অল্প সময়ে হইবে। কিন্তু কেহ কেহ যোগ না-দিলেও জয় হইবে—যদিও তাহা কঠিনতর ও অধিকতর সময়সাপেক্ষ হইবে। অতএব আমরা সংগ্রামে লাগিয়া রহিলাম। সকলকেই আমাদের হৃৎথের ও আনন্দের, লাঞ্ছনার ও গৌরবের অংশী হইতে আহ্বান করিতেছি।” যদি মনে করা ও বলা হয়, যে, অমুকেরা না আসিলে স্বাধীনতা লব্ধ হইবে না, তাহা হইলে সেই অমুকেরা “আত্মবিক্রয়ের” খুব চড়া দাম হাঁকিতে থাকিবে।

পৃথিবীতে যত দেশে যত জয়লাভান্ত স্বাধীনতা-সংগ্রাম

হইয়াছে, তাহার সবগুলোই কি ছিল সেই সেই দেশের সব ধর্মসম্প্রদায়ের ও সব রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত সংগ্রাম ?

‘জয়কোভে’ মনোভাব পৃথিবীর সব দেশে আছে। প্রথম প্রথম সন্দেহে ভয়ে দলে ভিড়িতে অনেকে দ্বিধা বোধ করে, কিন্তু জয়ের সম্ভাবনা দেখিলে অনেকে আসিয়া জুটে। সম্প্রতি যে কাহারও কাহারও কংগ্রেসে যোগ দিবার আভাস দেখা যাইতেছে, তাহা এই মনোভাবের পরিচায়ক।

সুভাষবাবু নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সন্ধ্যাে বিস্তারিত কিছু না বলিলেও তাহার কিছু আভাস দিয়াছেন।

আমার ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি বিষয়ে আমি আপাততঃ কিছু না বলতে পারলেও একটা কথা আমি আপনাদের কাছে খুলেই বলতে চাই। ভবিষ্যতে আমি অনেকটা সময় ও শক্তি নিখিল-ভারত সমস্তা ও কার্যাবলীর জন্ত নিয়োগ করতে ইচ্ছা করি। এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, আমার বিশ্বাস যে, রাজনীতিক্ষেত্রে অথবা অর্থনীতিক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি ও চরম সাফল্য নির্ভর করছে সমগ্র ভারতব্যাপী আন্দোলনের পরিণামের উপর। সুতরাং অগ্রগত প্রদেশে আমাদের যা কর্তব্য তা অবহেলা করে কেবল একটা প্রদেশের কাজ নিয়ে আমরা পড়ে থাকতে পারি না। তা যদি করি তাহলে যে ব্যাপক আন্দোলনের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তা ক্ষীণবল হয়ে পড়বে। নিখিল-ভারত ব্যাপারে আমার কর্তব্য করেও আমি বাংলার সেবায় ও আমার শক্তি এবং সময় নিয়োগ করতে পারি এবং সেরূপ ইচ্ছাও আমার আছে। কিন্তু বস্তুতঃ তা করে উঠতে পারব কিনা তা নির্ভর করে বাঙ্গলার আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর। প্রথমতঃ, বাঙ্গলার যেসব দল বা উপদল এতাবৎকাল আত্মকলহে ব্যাপ্ত ছিল, এসব অর্থহীন ঝগড়া বিবাদ থেকে ভবিষ্যতে তাদের সরে দাঁড়াতে হবে এবং দলগত মনোভাব পরিহার করে একটা উদার সামাজিক ও অর্থনীতিক কার্যক্রম নিয়ে একযোগে সকলের সঙ্গে তাদের কাজ করতে হবে। শুধু কংগ্রেসের বিভিন্ন দলকে নয়—হিন্দু ও মুসলমান জনসমাজকে উদারনীতি ও কার্যক্রমের দ্বারা সংহত করে তুলতে হবে। এই মিলনের সৌধ গঠন করবার জন্ত যদি বর্তমান দল ও দলগত মনোভাব চিরকালের তরে বিসর্জন দিতে হয়, তাহলে তাও নিঃসন্দেহে আমাদের করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় মহাসভা কর্তৃক নির্দিষ্ট নীতি ও কর্মপন্থা বাঙ্গলাকে সর্বাঙ্গতঃ গ্রহণ করতে হবে এবং যাতে এই নীতি ও কর্মপন্থা কেহ লঙ্ঘন না করে, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ যত্নবান হতে হবে।

তিনি ‘তৃতীয়তঃ’ ও ‘চতুর্থতঃ’ যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলাম না; কারণ সেই সেই বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে চাই না।

সুভাষবাবু যে নিখিল-ভারতীয় মন্ত্রণায় ও কাজে অনেকটা সময় ও শক্তি নিয়োগ করিবেন, এই সঙ্কল্প সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। এরূপ সঙ্কল্প করিবার কারণ তিনি নিজের বিবেচনা অনুসারে ও নিজের ধরণে বলিয়াছেন এবং ঠিকই

বলিয়াছেন। নিখিলভারতীয় ব্যাপারে বঙ্গের যোগ্য নেতাদের সংযুক্ত থাকার প্রয়োজন আমরাও অনুভব করি।

অন্য সব-প্রদেশ-নিরপেক্ষভাবে বঙ্গদেশ যেমন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারিবে না, ইহা যেমন সুভাষবাবু বুঝিয়াছেন ও বলিয়াছেন, তেমনই অন্য সব প্রদেশেরও বুঝা ও অনুভব করা উচিত, যে, বাংলাকে বাদ দিয়াও ভারতের বাকী অংশগুলিও লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারিবে না। নিখিল-ভারতীয় ব্যাপারে যথেষ্ট সময় ও শক্তি দিলে হয়ত সুভাষবাবু অগ্রগত প্রদেশের নেতা ও অন্য কর্মীদিগকে ইহা বুঝাইতে ও অনুভব করাইতে পারিবেন।

কিছুদিন হইতে নিখিল-ভারতীয় ব্যাপারসমূহে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যেন বাংলা দেশটার অস্তিত্বই নাই। বাঙালীর অস্তিত্ব অনুভব করান আবশ্যক। এটা শুধু বাঙালীর অহমিকা তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত বলিতেছি না। বাঙালীর অস্তিত্ব অনুভব করিলে সমগ্র ভারতবর্ষের লাভ আছে, না-করিলে ক্ষতি আছে। যোগ্য বাঙালীরা নিখিল-ভারতীয় ব্যাপারে ও বঙ্গের বাহিরে অগ্রগত প্রদেশের প্রাদেশিক ব্যাপারে সহযোগিতা করিবার সুযোগ যখন যখন পাইবেন তখনই যদি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে বাঙালীর অস্তিত্ব সর্বত্র অনুভূত হইবার সম্ভাবনা বাড়িবে।

নিখিল-ভারতীয় কাজে সময় ও শক্তি নিয়োগ করিয়াও সুভাষবাবু বাংলার কাজ করিতে পারিবেন মনে করেন। আমরাও তাহা মনে করি। বস্তুতঃ, নিখিল-ভারতীয় মন্ত্রণায় ও কাজে তাঁহার প্রভাব ও সাফল্য বহুপরিমাণে বঙ্গ তাঁহার প্রভাব ও সাফল্যের উপর নির্ভর করে। বাংলা তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সমর্থন করিতেছে, অন্তরে ইহা বুঝিলে তাঁহার কথার দাম ও ওজন বাড়িবে। অবশ্য, নিজের প্রদেশের লোকেরা কোন ব্যক্তির মূল্য না বুঝিলেও যে অগ্রগত তাঁহার কার্যকারিতা ও প্রভাব থাকিতেই পারে না, এমন নয়। কিন্তু, কাহারও সন্ধ্যাে এরূপ ব্যক্তির অবসর না থাকাই ভাল, যে, তিনি “গায়ে মানে না আপনি মোড়ল।”

সুভাষবাবু, বঙ্গ যে-যে রকম আভ্যন্তরীণ অবস্থা ঘটিলে, এই প্রদেশে কাজ করিতে পারিবেন, উপরে তাহার বিবৃতির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। এ-বিষয়ে আরও যাহা তিনি বলিয়াছেন, তাহা এই :—

আমি অবশ্য এখন বলতে পারছি নে যে, সূস্থ হয়ে ফিরে আসবার পর আমি বাঙ্গলার কংগ্রেসের কাজে হাত দিব কি না। সে সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে বাংলার পরিস্থিতির উপর। তবে আমি আমার বন্ধু ও সহকর্মীদের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন একথা বিবেচনা করেন যে, ভবিষ্যতে আমাদের সহযোগিতা যদি তাঁরা চান তাহলে বাংলার কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানের এবং বাঙ্গলার

কংগ্রেস কার্যক্রমের একটা আমূল পরিবর্তনের জগৎ তাঁহাদের প্রস্তুত হইতে হবে।

বঙ্গের প্রতিনিধি রূপেই বঙ্গের কোন বাঙালীর নিখিলভারতীয় কোন সমিতিতে স্থান হইতে পারে। হুতরাং সেরূপ সমিতিতে সেরূপ কোন বাঙালীকে স্থান পাইতে হইলে বঙ্গের কাজ কিছু করিতেই হইবে।

কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলি ও অন্ত্যন্ত বিষয় সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় কিছু বলিব না। কিন্তু স্বভাববাবু যে বলিয়াছেন, যে, “জাতীয় মহাসভা কর্তৃক নির্দিষ্ট নীতি ও কর্মপন্থা বাংলাকে সর্বাস্তঃকরণে গ্রহণ করতে হবে এবং যাতে এই নীতি ও কর্মপন্থা কেহ লঙ্ঘন না করে, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ যত্নবান হইতে হবে,” তাহা সাধারণ ভাবে অনুসরণীয় নির্দেশ হইলেও, তিনি অবশ্যই এমন আশা করেন না, যে, প্রত্যেক বিষয়ে কংগ্রেসী বাঙালীরা অবিচারিত ভাবে দাসত্ব লিখিয়া দিবে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দ্বারা স্বাভাবিকতা ও গণতান্ত্রিকতার ঘোরতর শত্রুতা করা হইয়াছে এবং সমগ্র ভারতের হিন্দুদের—বিশেষ করিয়া বাঙালী হিন্দুদের—যোগ্যতানুযায়ী সার্বজনিক কাজ করিয়া দেশের সেবা করিবার সুযোগ কমান হইয়াছে ও তদ্বারা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তাহাদের প্রভাব কমানিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তথাপি কংগ্রেস পূর্ণমাত্রায় বাঁটোয়ারাটার বিরোধিতা না-করায় “কংগ্রেস জাতীয়” দলের উদ্ভব হয়। এই দলের লোকদিগের লাঞ্ছনা করিতে কংগ্রেস ক্রটি করেন নাই। ভিন্ন ভিন্ন ওজুহাতে তাঁহাদের কাহারও কাহারও বিরুদ্ধে শাস্তির

(disciplinary actionএর) বিধানও হইয়াছে। কিন্তু এই দলের নেতা ও সর্বাধ্যক্ষ পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ার বিরুদ্ধে কংগ্রেস কিছুই করিতে পারেন নাই।

তৃতীয় বার্ষিক দিব্য-স্মৃতি উৎসব

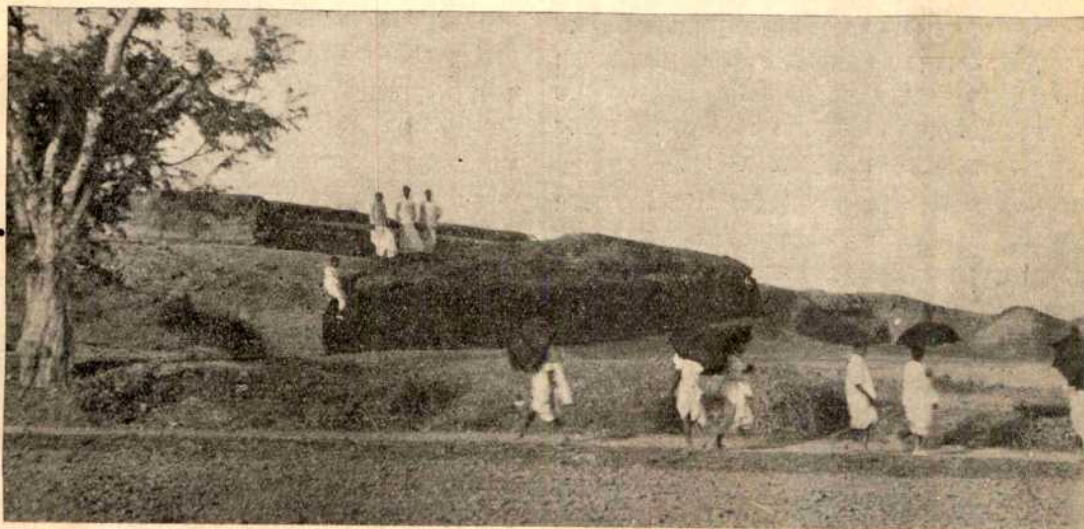
গত ১০ই চৈত্র বগুড়া শহরের ৭ মাইল দূরবর্তী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাস্থানগড়ে তৃতীয় বার্ষিক দিব্য-স্মৃতি উৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসবে বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ছয় হাজার মহিলা ও পুরুষ—হিন্দু ও মুসলমান—যোগদান করিয়াছিলেন।

বগুড়ার নবাবজাদা খান বাহাদুর মহম্মদ আলি, কে, বি, এম-এল-এ, ইংরেজীতে একটি সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা সভার উদ্বোধন করিলে বালিকাগণ কর্তৃক একটি সঙ্গীত গীত হয়। বগুড়ার ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণ এবং সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয়ের অভিভাষণ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

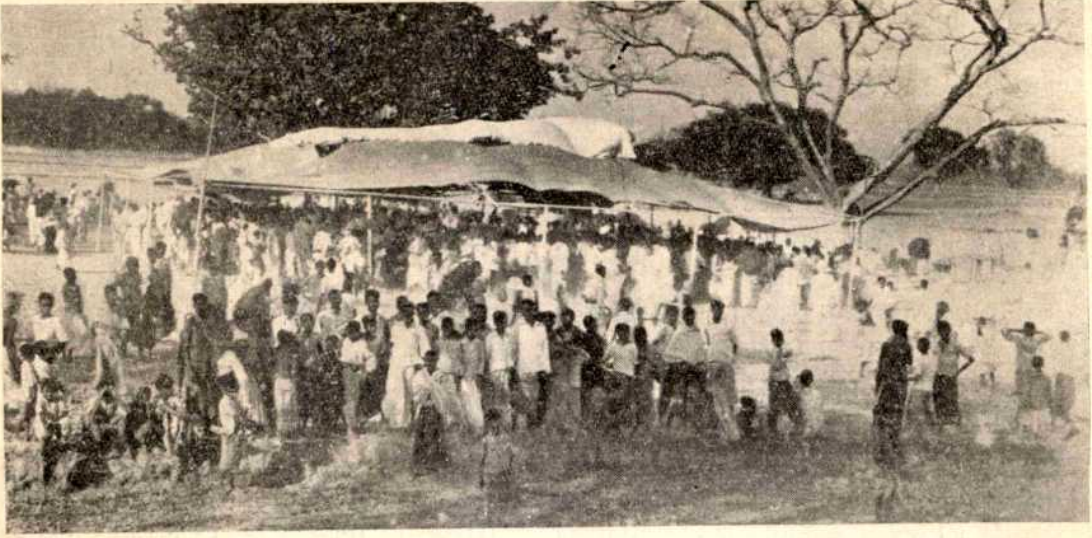
বার্ষিক কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত হইয়াছে, যে, দিব্যের জয়ন্তীটি গবর্নমেন্ট কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে।

সভায় আলোচিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবগুলির কয়েকটি নীচে মুদ্রিত হইল :—

১ম—মহাবীর দিব্য কর্তব্যবোধে অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে যেরূপ কার্য করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া এই সভা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন।



মহাবীরগড়



দিব্য-স্মৃতি উৎসবের সভাস্থলের জনতা

২য় (ক) দিনাজপুর জেলার পত্নীতলা থানার দিবরগ্রামে একাদশ শতাব্দীতে বরেন্দ্রাধিপতি দিব্যের প্রতিষ্ঠিত দিবর দীঘিটিকে উহার স্বত্বাধিকারিগণ উস্তরোস্তর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতেছেন বলিয়া এই সভা বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টকে বাঙ্গালার এই কীর্তিচিহ্নটি পুরাকীর্তিরক্ষাবিষয়ক আইন দ্বারা সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাইতেছেন।

(খ) উক্ত দীঘি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক পুরাকীর্তিরক্ষাবিষয়ক আইন দ্বারা বাহাতে সম্বর সংরক্ষিত হয় তজ্জন্ম আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে এই সভা পুরাতত্ত্ব-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

৩য়—একাদশ শতাব্দীতে মহাবীর দিব্য সর্বসাধারণের স্বীকৃতিতে অত্যাচারপীড়িত বরেন্দ্রভূমির শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার পুণ্যপ্লোক ভাতৃপুত্র ভীমের ইতিবৃত্ত বাহাতে বধ্যাযথ ভাবে ইতিহাসে স্থানলাভ করে তজ্জন্ম এই সভা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকবর্গকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন।

চতুর্থ—দিব্য-বংশীয় রাজগণের কীর্তিরাজি আবিষ্কার ও তাহা সংরক্ষণ কল্পে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন এবং খনিত স্থানে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি বাহাতে ভারতবর্ষে রক্ষিত হয় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন জন্ম একটি সাব-কমিটি গঠিত হউক।

প্রথম বাবিক দিব্য-স্মৃতি উৎসবে প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতত্ত্ববিৎ রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এবং দ্বিতীয় বাবিক দিব্য-স্মৃতি উৎসবে ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিৎ যদুনাথ সরকার মহাশয় সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। তৃতীয় বাবিক উৎসবেও এক জন কৃত্তী ঐতিহাসিক ও ইতিহাসাধ্যাপক সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন। ইহাদের অভিভাষণগুলি হইতে এবং গত (চৈত্র) মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত

মহারাজ দিব্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কৃত্তী বাঙালী

পেশাওয়ারের শ্রীযুক্ত ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ পাণ্ডুরাম নিকটবর্তী ইলছোবা-মোঙলাই গ্রামের অধিবাসী। তিনি এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালা কলেজ হইতে, প্রবাসী-সম্পাদকের তাহার প্রিন্সিপ্যাল থাকিবার সময়, ইন্টার-মোডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পেশাওয়ারে সরকারী আসিষ্ট্যান্ট সার্জন নিযুক্ত হন। পরে সেই কাজে ইস্তফা দিয়া তিনি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। অনেক ইংরেজ বলে, পাঠানরা বাঙালী-দিগকে ভীক বলিয়া অবজ্ঞা করে। কিন্তু দেখিতেছি, চাকবাবু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস-প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন এবং এবার দু-জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে বহুসংখ্যক ভোটে পরাজিত করিয়া তথাকার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। ১৯২৯-৩০ সালে তিনি সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তিন বার নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন। এই বৎসর তিনি কংগ্রেস প্যালেমেন্টারী বোর্ডের সহকারী সভাপতি মনোনীত হন এবং সীমান্ত প্রদেশ হইতে একমাত্র তিনি কৈজপুর কংগ্রেসে নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে গিয়াছিলেন। তিনি একবার ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে



ডাক্তার চাক্রবর্তী

ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত হইয়াছিলেন এবং ১৯৩১ সালে যখন সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস কমিটি বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয় তখন কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

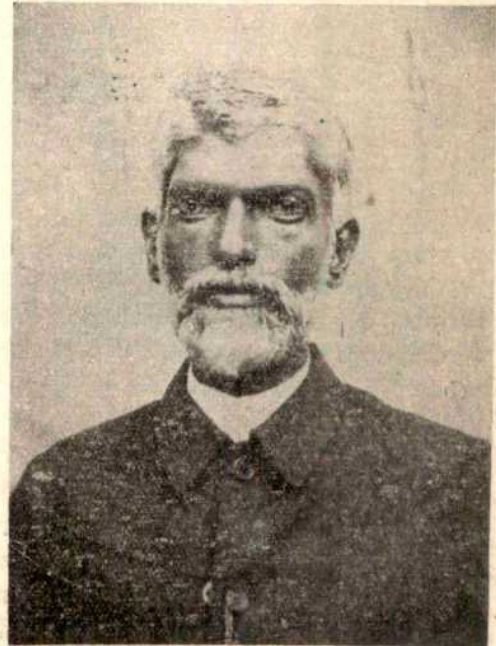
পেশ্তা বাদাম বেদানা প্রভৃতির ব্যবসা কলিকাতায় খুব লাভজনক। চাক্রবর্তী বাঙালীদের দ্বারা তাহা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টা কেন সফল হয় নাই জানি না। ব্যবসা-বুদ্ধিবিশিষ্ট কোন বাঙালী এই ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে চিঠি লিখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া এই কথা লিখিতেছি। শুধু পেশাওয়ারই তাহার যথেষ্ট ঠিকানা।

বিমলানন্দ নাগ

পরলোকগত রেভারেণ্ড বিমলানন্দ নাগ বাঙালী খ্রীষ্টিয়ানদের এক জন সুবিদিত নেতা ছিলেন। ছাত্রদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া তিনি তাহাদের কল্যাণসাধনের চেষ্টা করিতেন। তিনি খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের নানা কর্মবিভাগে অবৈতনিক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সুবক্তা ও বিতর্ক-নিপুণ ছিলেন। যে অতিঅল্পসংখ্যক বাঙালী খ্রীষ্টিয়ান রাজনীতিক্ষেত্রে কিছু কাজ করিয়াছেন নাগ মহাশয় তাহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ভারত-সভার উপসভাপতি, গ্রামশিক্ষালিবার্যাল লীগের প্রথম সম্পাদক এবং মিসেস বোশাট কলিকাতায় যে কংগ্রেসের সভানেত্রী হন তাহার সম্পাদক হইয়াছিলেন।



রেভারেণ্ড বিমলানন্দ নাগ



শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গুপ্ত

শ্রীযুক্ত শ্রীমাচারণ গুপ্ত

শ্রীযুক্ত শ্রীমাচারণ গুপ্ত বহু বৎসর কলিকাতার বেথুন স্কুলে যোগ্যতার সহিত প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়া পেন্সান গ্রহণ করেন। তিনি বিহারের আরা শহরেও একটি বিজ্ঞানবিশেষের প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। সাধু চরিত্র ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য তিনি ছাত্রী ও ছাত্রদের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি কিছু কাল শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন।

মন্দিরের গাঙ্গে এখনও বাঙ্গলার পরিচিত বৌদ্ধাবশেষ লেখা—নমঃ তথাগতস্, নীলকণ্ঠ, বজ্র, বজ্র, চক্র নমঃ তথাগতস্—ইত্যাদি বহু-বহু মন্ত্র। এই মন্দিরের উপরতলায় পাঁচ কোণে পাঁচটা চূড়া, সম্মুখে একটি গম্বুজ। এই বন্দিক ছিলেন দক্ষিণ-বঙ্গের মানুষ। কোথায় তাঁহার জন্মস্থান? তবে তিনি নাকি বাংলা দেশ হইতে বাঙ্গালীর জাহাজে যান। তাহা হইলে খুব সম্ভব তাম্রলিপ্তি হইতেই গিয়াছেন। তখনও তাম্রলিপ্তির গৌরবের কিছু অবশেষ ছিল মনে হইতেছে।

শান্তিনিকেতনে “রবিবাসর”

মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক উৎসব

গত চৈত্র মাসে মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন সুপণ্ডিত মরমী ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়। তাঁহার অভিভাষণটি সাধারণ অভিভাষণের মত নহে। নিজের চিন্তা ও আন্তরিক অল্পভব হইতে নূতন কথা শুনাহঁতে সমর্থ হইলেও, তিনি সাধারণতঃ বৈদিক ও তৎপরবর্তী যুগের সংস্কৃত শাস্ত্র ও অস্ত্রাঙ্গ গ্রন্থ হইতে এবং মধ্য-যুগের হিন্দীভাষী সাধু সন্তদিগের বাণী হইতে রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া শ্রোতা ও পাঠকদিগকে উপহার দিয়া থাকেন। তাঁহার মেদিনীপুরের অভিভাষণটিও এইরূপ বহুবিধ সংগ্রহে পূর্ণ। এইরূপ হিন্দী ও সংস্কৃত অমূল্য বাণীর মধ্য হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ কিছু খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। তাহার পরিবর্তে তাঁহার অভিভাষণটি হইতে অল্প একটি ছোট অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

এইখানে প্রায় তের বৎসর পূর্বেরকার একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথের সহিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ ও আমি তখন চীনের পুণ্ড্রস্থানগুলির পরিক্রমা করিতেছি। একদিন শুনিলাম বাঙ্গলা দেশের একটি বৌদ্ধসাহুর মঠ পিকিনে আছে। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই মে অর্থাৎ ২৯শে বৈশাখ তারিখে গেলাম সেই মন্দিরটি দেখিতে। মন্দিরটার পাঁচটা চূড়া। এইরূপ মন্দির চীনে দেখি নাই, ইহা বাঙ্গলা দেশের পঞ্চরত্ন মন্দিরের ধরণে। তাহার সারা গায়ে সংস্কৃত সব মন্ত্র লেখা। চীনেয়া এই মন্দিরকে বলেন, “বু তা স হু” অর্থাৎ পঞ্চচূড়া-মন্দির। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে “বন্দিক” নামে এক জন দক্ষিণ বঙ্গের বৌদ্ধ সাধক দেশত্যাগ করিয়া চীনদেশে যান। তিনি ধর্মীর সন্তান ছিলেন। কেন যে তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে হইল, তাহা বলা কঠিন। তিনি পাঁচটা স্বর্ণময় বুদ্ধমূর্তি ও কয়েকটা বহুমূল্য বুদ্ধসিংহাসন লইয়া দেশ ত্যাগ করেন। নির্ধাতন বা লুণ্ঠনের ভয় তাঁহার দেশ-ত্যাগের কারণ ছিল কি না জানি না। সব দ্রব্য তিনি চীনসম্রাটকে উপহার দেন। সম্রাট সেগুলি এই মন্দিরে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন। চীনদেশেই সাধু “বন্দিক” তাঁহার শেষ জীবন কাটাইয়াছেন। চীনা ও তিব্বতী শিল্পীদের লইয়া তিনি এই মন্দিরটি সুসম্পন্ন করেন। চীন-সম্রাট ছিলেন মিং বংশের। তিনি একটি স্বন্দর বজ্ররত্নাসন প্রস্তুত করাইয়া এই মন্দিরে স্থাপিত করেন। সেই

“রবিবাসর” নামক সাহিত্যগোষ্ঠীর অধিনায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ইহার সভাপতিগণকে নিমন্ত্রণ করায় ইহার ৩০শে ফাল্গুন রবিবারের অধিবেশন শান্তিনিকেতনে হইয়াছিল। সেখানে সভোর যে ভূরিভোজনাদি করিয়া ছিলেন এবং যে সাহিত্যিক ও শব্দতাত্ত্বিক আলোচনা হইয়াছিল তাহার বৃত্তান্ত খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অল্পলেখনও বাহির হইয়াছে। বিশ্বভারতীর পরিচয় প্রবাসীর পাঠকপাঠিকাদিগকে নূতন করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। সুতরাং এই উপলক্ষ্যে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিব না। এখানে কেবল বক্তব্য এই, যে, কলিকাতার কতকগুলি ভদ্রলোক যে কম্পী রবীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরিচয় পাইলেন, ইহা সম্ভবতঃ বিষয়। “বিচিত্রা”র সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (অবশ্য ভূরিভোজনের প্রতিদানস্বরূপ নহে) যে একটি প্রস্তাব করেন, তাহা উল্লেখযোগ্য এবং আমরা তাহার সমর্থন করিতেছি। তিনি বলেন, বাঙালী পুস্তক-প্রকাশকেরা ও গ্রন্থকারেরা যে-সকল বাংলা পুস্তক প্রকাশ করিবেন, তাহার এক এক খণ্ড বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে উপহার পাঠাইবেন। আইন অনুসারে প্রকাশকেরা গবন্মেণ্টকে প্রত্যেক পুস্তক তিনখানি বিনামূল্যে দিতে বাধ্য। বিলাতী আইনে তথাকার প্রকাশকেরা ব্রিটিশ মিউজিয়ম, বডলীয়ান লাইব্রেরী প্রভৃতিতে বিনামূল্যে পুস্তক দিতে বাধ্য। বঙ্গের পুস্তকপ্রকাশকেরা নিজেদের আইন নিজেরা করিয়া তাহা নিজেদের উপর খাটান। অবশ্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদকেও একখানি করিয়া বহি বিনামূল্যে দিতে ভুলিবেন না।

বিনা-বিচারে বন্দীদের মুক্তির দাবী

“সিভিল লিবার্টি” শব্দ দুটির বাংলা ঠিক কি হওয়া উচিত জানি না। স্বাধীন এবং পরাধীন দেশ ও জাতির প্রত্যেক মানুষের বিনা-বিচারে বন্দীকৃত না হইবার, সভাসমিতি আহ্বান করিবার ও তাহাতে যোগ দিবার, লেখা ও মুদ্রণ কথায় মত প্রকাশ করিবার, মিছিল করিবার ও তাহাতে

যোগ দ্বিবার অধিকার এবং এই প্রকার অন্য অধিকারসমূহকে সিবিল লিবার্টি বলা হইয়া থাকে। বিনাবিচারে বন্দীকৃত না হইবার অধিকার একটি প্রধান অধিকার। ইহাকে বাংলায় (পৌর ও জনপদ) জনগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার বলা যাইতে পারে। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার ও রক্ষার জন্য বঙ্গ ও ভারতবর্ষের অন্তর্গত সিবিল লিবার্টিজ স্লুনিয়ন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্বন্ধ গঠিত হইয়াছে। বঙ্গের সম্বন্ধ আটটি বিবৃতিপত্র এ পর্যন্ত বাহিব করিয়াছেন। তাহা হইতে বিনাবিচারে বন্দীদের এবং তাঁহারা যে যে পরিবারের লোক তাঁহাদের দুঃখদুর্দশা কতকটা হ্রদয়ঙ্গম হয়। এই সব দুঃখের কাহিনী বহু বৎসব ধরিয়া কিছু কিছু খবরের কাগজে বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহার সম্যক প্রতিকার এই বন্দী ও বন্দিদীগকে বিনা সঠিক মুক্তি না দিলে হইতে পারে না। অতএব, তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত। যদি বন্দী ও বন্দিদের এবং তাঁহাদের আত্মীয় জনের গ্রাসাচ্ছাদনাদি বিষয়ক কোনও অভিযোগই না থাকিত, তাহা হইলেও, কাহাকেও প্রকাশ্য বিচারে অপরাধী প্রমাণ না করিয়া স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে, এই উৎকৃষ্ট ও স্বাভাবিক নীতি অঙ্গসরগর্ভই বিনাবিচারে বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত হইত। কিন্তু অন্য একটি কারণেও গবন্মেণ্টের দমননীতির অন্ততঃ এই অংশটি বর্জিত হওয়া আবশ্যিক। তাহা আমরা বঙ্গের মন্ত্রিসভাকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

এই দমননীতি বঙ্গের জনগণের তরুণতরুণীদের, বালব-বালিকাদেরও, হৃদয়মনের উপর, অন্তরের উপর, মনুষ্যত্বের উপর একটা দুর্ভয় হৃদয় বোঝাব মত হইয়া আছে। তাহার চাপে তাহাদের মনুষ্যত্ব পূর্ণ বিকাশ ও ক্ষুণ্ণি লাভের সম্বোগ ত পাইতেছেই না, পবন তাহা পিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। ফলে, তাহাদের প্রতিভা, তাহাদের সার্বজনিক কর্মোৎসাহ এবং তাহাদের কর্মশক্তি, কর্মীত্ব ও কৃতিত্ব যাহা হইতে পারিত, তাহা হয় নাই, হইতেছে না, এবং, দমননীতি প্রত্যাহত না হইলে, তাহা হইবে না।

অতএব, বঙ্গের মন্ত্রীরা যদি তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের সপক্ষে কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করিতে চান, তাহা হইলে বিনা-বিচারে বন্দী-বন্দিদীগকে সর্বহীন মুক্তি প্রদান করুন।

দেখিতেছি, বোম্বাইয়েব মন্ত্রিসভার যে কার্যতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, রাজবন্দীদিগকে মুক্তিদান তাহার অন্তর্গত।

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব অস্বীকার সম্বন্ধে ভারতসচিব

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব লর্ডসে (অভিজাত কক্ষে), ভারতবর্ষে কংগ্রেসওয়াল সদেরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

করিতে অস্বীকার করায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে আমরা আগে যাহা লিখিয়াছি, তাহার পব এই সম্বাদ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। ভারতসচিব লর্ড জেটল্যান্ড যাহা বলিয়াছেন, তাহার সাবমর্থ এই, যে, কংগ্রেস যেরূপ প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিল আইনানুসারে গবর্ণরেরা তাহা দিতে পারেন না, অতএব তাঁহারা কংগ্রেসের দাবীর উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিকই বলিয়াছেন। ভারতসচিব এইরূপ কথা ভিন্ন অন্য কিছু বলিতে পারেন না; কাবণ গবর্ণরেরা সবাই যে একই ধরনের জবাব দিয়া ছিলেন তাহা ভারতসচিব কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা উপদেশের প্রতিধ্বনি মাত্র—গবর্ণরেরা গ্রামোকোন রেকর্ডের কাজ করিয়াছিলেন।

ভারতসচিবের কথার উত্তরে যাহা গান্ধী প্রস্তাব করিয়াছেন, কংগ্রেসেব মনোনীত এক জন, গবন্মেণ্টের মনোনীত এক জন এবং এই দু-জনেব মনোনীত তৃতীয় ব্যক্তি সালিস মনোনীত হউন; ইহার বিচার করিয়া স্থির করুন, কংগ্রেসের বাস্তব প্রতিশ্রুতি গবর্ণরেরা দিতে পাবেন কিনা এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সদস্যদিগকে লইয়া গঠিত মন্ত্রিসভাগুলি আইনসম্মত কিনা। ভারতবর্ষের লক্ষ্যের দিকে তাহার অগ্র-গমনাধিকার যদি কার্যতঃ মানিয়া লওয়া হয়, কংগ্রেস তাহা হইলেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবে, নতুবা করিবে না।

কংগ্রেস গবর্ণরদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন, যে, তাঁহারা মন্ত্রীদেব আইনসম্মত কোন কাজে বাধা দিবেন না। গবর্ণরবা কেন যে সেরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না, তাহা একটা কারণ ভারতসচিব এই বলিয়াছেন, যে, গবর্ণরদিগকে বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতা দিবার একটা উদ্দেশ্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা; অতএব গবর্ণরবা প্রতিশ্রুতি দিলে তাঁহারা এই কর্তব্য করিতে পারিবেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন, যদি কোন হিন্দু প্রধান প্রদেশের মন্ত্রিসভা মুসলমানদেব বা কোন মুসলমান-প্রধান প্রদেশের মন্ত্রিসভা হিন্দুদের শিক্ষালাভার্থ আবশ্যক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমাইয়া দেয়, তাহা হইলে এরূপ কাজ আইনসম্মত হইবে, আইনবিরুদ্ধ হইবে না; কিন্তু গবর্ণর যাহাতে এরূপ কাজে বাধা দিতে পারেন, সেই জন্য তাঁহাকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষা করিতে পারিবেন না।

ভারতসচিবের এইরূপ তর্ক ও দৃষ্টান্তের সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন :—ভারতসচিবকে সেই পুণ্ডিত অতি-পরিচিত “ভেদ জ্ঞানাইয়া শাসনকার্য চালাও” গুণ্টা বাজাইতে দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি। সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ অবহেলা করিলে কংগ্রেস দু-দিনও টিকিতে পারিবে না।

ভারতবর্ষকে পরস্পরবিরোধী নানা দলে বিভক্ত করিয়া কংগ্রেস কখনও গণতন্ত্র স্থাপন করিতে পারিবে না। গবর্ণরদের বিশেষ ক্ষমতাগুলি না থাকিলেও, যদি কখন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা-সমূহ গঠিত হয়, তাহা হইলে তাহারা সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ পদদলিত করিলে বা অন্য অন্যায় কিছু করিলে, তাহারা নিজেরাই নিজেদের সমাধি খনন করিবে।”

ভারতসচিবের তর্ক ও দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে আমরাও দু-একটা কথা বলিতে চাই। আমরা অহুমানের উপর নির্ভর করিব না, বাস্তবের উপর নির্ভর করিব। প্রতিশ্রুতিটা চাহিয়া-ছিলেন কংগ্রেস। কংগ্রেসের পক্ষে যে সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থহানি করা সম্ভব, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষাংশ বৎসরের প্রস্তাবাবলীর মধ্যে তিনি একটা প্রস্তাবও দেখাইতে পাবেন কি যাহার দ্বারা সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ নষ্ট হইয়াছে বা হইতে পারে? সমগ্র ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করিবার জন্য কংগ্রেস বরাবর ব্যগ্র; সেই জন্য কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটার মত বিধাত্ত জিনিষটাকেও প্রকারান্তরে প্রস্তাব দিয়াছে।

যে ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেসী সদস্যেরা প্রতিশ্রুতি চাহিয়া-ছিলেন, সেই ছয়টিই হিন্দুপ্রধান প্রদেশ। সদস্যেরা কোথায় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের শিক্ষার জন্য প্রদত্ত সরকারী স্বযোগ কমাইয়াছে কিংবা সরকারী টাকায় হিন্দুদের বেশী স্বযোগ করিয়া লইয়াছে, ভারতসচিব বলুন।

ইহার উল্টা দৃষ্টান্ত আমরা দিতেছি। লর্ড জেটল্যাণ্ডের সাধ্য থাকে ত তিনি আমাদের ভুল দেখাইয়া দিউন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মুসলমানপ্রধান। সেখানে হিন্দী ও গুরুমুখী নিষিদ্ধ করিয়া হিন্দু ও শিখদের শিক্ষার ব্যাঘাত জন্মান হইয়াছে। পঞ্জাব মুসলমানপ্রধান প্রদেশ। সেখানে নাগরী লিপির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া হিন্দুদের অসুবিধা করা হইয়াছে।

বঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ, মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই প্রদেশে সরকারী সমুদয় অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ানদি সকলেই পড়িতে পারে। তথাপি মুসলমানদের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রভৃতিতে মোট ছাত্র-সংখ্যার একটা অংশ সংরক্ষিত আছে; হিন্দুদের জন্য কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে তাহা নাই। কেবল মুসলমানদের জন্য

বহুসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। কেবল হিন্দুদের জন্য আছে শুধু সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু স্কুল—তাহাও হিন্দুদের টাকায় স্থাপিত ও পরিচালিত। মুসলমানদের জন্য বিশেষ বিশেষ বৃত্তি, ছাত্রাবাসে বিনা খরচায় বা অল্প খরচে থাকিবার ব্যবস্থা প্রভৃতি আছে। তাহাদের জন্য আলাদা আসিষ্ট্যান্ট ডিরেক্টর, ইন্সপেক্টর, ইন্সপেক্ট্রেস, ইত্যাদি আছে; হিন্দুদের জন্য তাহা নাই। মুসলমানদের মজবুরে জন্য যত সরকারী সাহায্য আছে, হিন্দুদের টোলের জন্য তাহা অপেক্ষা খুব কম টাকা দেওয়া হয়। কেবল হিন্দুদের শিক্ষার জন্য বঙ্গে গবর্নেন্ট যত খরচ করেন, কেবল মুসলমানদের জন্য ন্যূনকল্পে তাহার ১৫:১৬ গুণ বেশী করেন। অথচ শিক্ষায় অনগ্রসর শ্রেণী হিন্দুদের মধ্যে অনেক আছে।

তর্ক করিবার বেলায় ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা নিরপেক্ষের উদ্ভূত আসনে বসিয়া বহু উচু কথা বলেন। কাজের বেলায় সে-সব হজম করিয়া ফেলেন। লর্ড জেটল্যাণ্ড ত নিজেই বঙ্গের গবর্ণর ছিলেন। তিনি বঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষাসম্বন্ধীয় ব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্ব পরিহার করিবার নিমিত্ত কি করিয়াছিলেন?

ব্রিটেনে অতি দীর্ঘকাল ইহুদী, রোমান ক্যাথলিক এবং ননকনফর্মিষ্ট খ্রীষ্টিয়ানদের উপর অবিচার ও অত্যাচার হইয়াছে। অন্য অনেক দেশেও একরূপ পক্ষপাতিত্ব আছে। কিন্তু তথাপি, অন্য কোন তথাকথিত নিরপেক্ষ জাতি তাহাদিগকে পদানত করুক, ইহা কোন প্রকৃত স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তি চাহিতে পারে না। প্রত্যেক জাতি নিজেদের দোষ নিজেরাই সারিয়া লউক, ইহাই আদর্শ। ইংরেজরা কি নিজেরদের দেশের পূর্বোন্নিখিত সম্প্রদায়গুলির প্রতি আচরণের উন্নতি করে নাই? ইংরেজরা যদি ভারতবর্ষে বাস্তবিকই নিরপেক্ষ হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার চিরকাল এখানে প্রভুত্ব করিবেন, ইহা বাহনীয় হইতে পারে না। আমরা নিজেরদের দোষ নিজেরা সারিয়া লইব, লইতেছি এবং ইতিমধ্যেই কতকটা লইয়াছিও।

উপসংহারে গান্ধীজী বলিয়াছেন :—

“আমাকে ইহা বলিতে হইতেছে বলিয়া আমার দুঃখ হইতেছে, কিন্তু সত্যবাদী হইতে হইলে আমাকে বলিতেই হইবে, যে, লর্ড জেটল্যাণ্ডের বক্তৃতা এমন এক জন

মাহুঘের বক্তৃতা যিনি নিজের ত্রায়সঙ্গত অধিকার অপেক্ষা
নিজের ভরবারি সম্বন্ধে অধিকতর চেতনাবান।”

—

বিহারের দু-জন তফসিলভুক্ত জাতির মানুষ

বিহার একটি হিন্দুপ্রধান প্রদেশ। সেখানে কংগ্রেসী
সদস্যেরা মন্ত্রিসভা গঠন করিতে রাজী না হওয়ায় এক জন
মুসলমান সদস্য সরকার মন্ত্রী রূপে দু-জন “অবনত” জাতির
হিন্দু সদস্যকে মন্ত্রী করিতে চেষ্টা করেন। তাহাদের এক
জনের মাসিক আয় ৮০ টাকা, অন্যের ৫০ ; বৎসরে হাজারও
নয়। তাঁহারা কিন্তু কংগ্রেসের আদর্শ ও নীতিকে অগ্রাহ্য
করিয়া বার্ষিক বহু সহস্র টাকার মন্ত্রিস্ব লইতে অস্বীকার
করিয়াছেন। এই তফসিলভুক্ত জাতির সংখ্যালঘিষ্ঠ।
ইহারা কংগ্রেসকে এতটা ভাল বাসেন যে খুব মোটা বেতনের
লোভও সংবরণ করিলেন। অথচ লর্ড জেটল্যান্ড নিজের
যুক্তির সমর্থনের জন্য কল্পনা করিলেন, যে, কংগ্রেস সখ্যা-
লঘিষ্ঠদের প্রতি অবিচার করিলে তাহার প্রতিকারের জন্য
গবর্নরদিগকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

—

পহেলা এপ্রিলের হরতাল

গত পহেলা এপ্রিল নূতন ভারতশাসন আইনের
প্রাদেশিক অংশ জারি হইয়াছে। তারিখটা আগে হইতে
বোধিত হইয়াছিল। কংগ্রেসও আগে হইতে এই অহরোধ
জানাইয়া রাখিয়াছিলেন, যে, ঐ দিন আইনটার প্রতিবাদ-
স্বরূপ যেন সর্বত্র হরতাল হয়। হরতাল বাহাতে না-হয়
তাহার চেষ্টা সবকারী হুকুমে পুলিশ সর্বত্র—বিশেষতঃ বঙ্গে,
করিয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। হরতাল সমস্ত
প্রদেশে, বহু বহু গ্রামে নগরে হইয়া গিয়াছে। তাহাতে
হিন্দু যোগ দিয়াছিল, মুসলমানও অনেকে যোগ দিয়াছিল।

ভারতবর্ষে রাজনৈতিকমতিমান অধিকাংশ লোক যে
আইনটার অপকৃত্ততা বুঝিয়াছে ও তাহা চায় না, তাহা আর
একবার প্রমাণিত হইল।

—

ভারতসচিবের ভদ্রিমা ও মন্ত্রিস্বের ফেরী

লর্ড জেটল্যান্ডের দীর্ঘ বিবৃতি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী
যাহা বলিয়াছেন, তাহার এক জায়গায় আছে, যে, ব্রিটিশ
রাজনীতিবিশারদেরা ভারতবাসীদের দ্বারা ব্যক্ত তাহাদের
ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের ঘাড়ে একটা আইন চাপাইয়াছেন,
এবং তাহার পর তাহার ব্যাখ্যার ভার কোন নিরপেক্ষ
বিচারকমণ্ডলীর হাতে ছাড়িয়া না দিয়া নিজেদেরই
ব্যাখ্যাটাও ভারতের ঘাড়ে চাপাইতেছেন, এবং এই
ব্যাপারটাকেই বলিতেছেন ভারতবর্ষের আত্মকর্তৃত্ব।

গান্ধীজী ঠিক বলিয়াছেন। কিন্তু শুধু কি তাই?

সবাই জানে ছয়টি প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী
দলের নেতারা মন্ত্রিসভা গঠন করিতে রাজী না-হওয়ায়
তথাকার গবর্নরদিগকে দ্বেষীওয়ালার মত, “কেউ মন্ত্রিস্ব
নেবে গো”, বলিয়া মন্ত্রিস্বের ক্ষেবী করিতে হইয়াছে;
অথচ ভারতসচিব বলিতেছেন, যে, এখন তাঁহার বিবৃতি
হইতে যদি কংগ্রেসওয়ালারা বুঝিতে পাবেন, যে, তাঁহারা
শাসনবিধিটা আগে ঠিক বুঝেন নাই এবং এখন তাঁহার
বিবৃতি হইতে ঠিক বুঝিয়া গান্ধীজী কিংবা আর কোন
কংগ্রেসওয়ালার বড়লাটের সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ
করেন, তাহা হইলে তাঁহার (ভারতসচিবের) খুব কমই
সন্দেহ আছে, যে, বড়লাট এই দেখা করিবার অহরোধটার
দিকে অগ্রসর হইবেন একটা বুঝাপড়ার জন্ত। অর্থাৎ,
সোজা কথায়, যদি গান্ধীজী বা অন্য কোন বড় নেতা মনে
করেন, যে, একটা ভুল ও কলুষ হইয়া গিয়াছে এবং অহুতপ্ত
চিত্তে বড়লাটের দর্শনপ্রার্থী হন তাহা হইলে বড়লাট
মেহেরবানী করিবেন কিনা সম্ভবতঃ তাহা বিবেচনা
করিবেন।—যেন সত্য লজ্জা মন্ত্রিস্ব না করিলে কংগ্রেসওয়ালার
পিতৃমাতৃদায় হইতে উদ্ধার পাইবে না।

প্রবল জাপান ইটালী প্রভৃতির কাছে ব্রিটিশ রাজপুরুষ-
দের ভিজা বিড়ালের মত ব্যবহার এবং পরাধীন ভারতীয়-
দের কাছে প্রভুত্বের ভদ্রিমা নিরপেক্ষ স্বাধীন জাতির
উপভোগ করিতে পারিবে।

—

যুঁষির জোরে জাপান আশিয়ার মধ্যে নহে

দক্ষিণ-আফ্রিকায় একটা আইন হইতে বাইতেছে যাহার

উদ্দেশ্য তথাকার এশিয়াবাসীদের চাকরীতে খেতাজ নারীদের নিয়োগ নিবারণ এবং খেতাজ নারীদের কাজ এশিয়াবাসীদের দ্বারা তত্ত্বাবধান নিবারণ। কিন্তু এই আইনটাতে নির্দেশ দেওয়া হইবে, যে, এশিয়াবাসী বলিতে জাপানীদিগকে বুঝাইবে না।

সাধে কি অনু-এশিয়াটিক বলি, গুঁতোর ভয়ে অনু-এশিয়াটিক বলায়।

মন্ত্রীদেব শৈলবিহার

হাইকোর্টের প্রধান বিচারক ও অন্য বিচারকেরা, এক একটা ডিভিজনের কমিশনার সিভিলিয়ানরা, এবং বড় বড় ইংরেজ সওদাগর ষাহাদের আয় বড়লাটের চেয়েও কম নয়—ইহারা সবাই গ্রীষ্মকালেও সমতলভূমিতে কাজ করিতে পারেন। কিন্তু সিভিলিয়ানরা লার্টসাহেব বা সেক্রেটারী হইলেই তাঁহার আয় গ্রীষ্ম বরদাস্ত করিতে পারেন না—আহেলে-বিলাত লার্টদের ত কথাই নাই। দেশী মন্ত্রীরা গ্রীষ্মের সময় পাহাড়ে যান ছুটা কারণে। লার্টসাহেব যান, স্বতরাং তাঁহার পারিষদদেরও যাওয়া চাই, এবং পরের পরসায় গ্রীষ্মের হাত থেকে রক্ষা পাইতে পারিলে সে স্থবিধাটা ছাড়া উচিত নয়।

জামেনীর বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা

জামেনীর বালকদের ও বালিকাদের বিদ্যালয়ে আগেও ইংরেজী শিক্ষান হইত, কিন্তু তাহা অবশ্যশিক্ষণীয় ছিল না। এখন তাহা আবশ্যিক হইয়াছে। ইহা কতকটা রাষ্ট্রনৈতিক চাল হইলেও ইংরেজী ভাষার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যও যে ইহার দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা মানিতেই হইবে।

জাপানের বিদ্যালয়সমূহেও ছাত্রছাত্রীদিগকে ইংরেজী শিখিতে হয়।

ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিতে তথাকার মাতৃভাষাগুলিকে যে ক্রমশঃ শিক্ষার বাহন করা হইতেছে, তাহা ভাল। সমগ্র ভারতের একটি দেশী রাষ্ট্রভাষা হওয়াও আবশ্যিক। কিন্তু ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের মূল্য আমরা যেন বিস্মৃত না হই,

তাহা শিখিতে ও তাহার চর্চা করিতে আমরা যেন অবহেলা না করি।

আসামের মন্ত্রিসভা

আসামে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, এবং তথাকার বাঙালীরা অসমিয়াভাবীদের চেয়ে সংখ্যায় খুব বেশী—প্রায় দ্বিগুণ। অথচ তথাকার সরদার মন্ত্রী হইয়াছেন এক জন অসমিয়াভাবী মুসলমান, এবং মন্ত্রিসভায় এক জনও বাঙালী নাই।

ঢাকার মেডিক্যাল কলেজ আবশ্যক

বাংলা দেশের লোকসংখ্যা ভারতবর্ষের অন্য প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বেশী, রোগেরও প্রাদুর্ভাব কম নয়। অথচ কলিকাতা ছাড়া বঙ্গের আর কোথাও মেডিক্যাল কলেজ নাই। অন্য কোথাও কোথাও মেডিক্যাল কলেজ হওয়া উচিত। ঢাকা বড় শহর, এবং সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। স্বতরাং সেখানে একটি মেডিক্যাল কলেজ হইলে খুব ভাল হয়। ঢাকার জাশন্নালা মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের কৃতী ছাত্রদিগকে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার যে বঙ্গে যথেষ্ট মেডিক্যাল কলেজের অভাবের কথা বলিয়াছিলেন এবং ঢাকাতেও একটি মেডিক্যাল কলেজ হওয়া উচিত বলিয়াছিলেন তাহা ঠিক কথা।

বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভার কার্যতালিকা

আমরা পূর্বেই এই মত প্রকাশ করিয়াছি, যে, নূতন ভারতশাসন আইন হইতে বতটা ভাল হইতে পারে তাহা করিবার জন্য কংগ্রেসের মন্ত্রিগণ গ্রহণ অনাবশ্যক, কারণ অন্য ষাহারাই মন্ত্রী হউন, এবং গবর্ণররাও, আইনটা যে সম্পূর্ণ ভুলো নহে, তাহা দেখাইবার জন্য, উহার বলে যথাসাধ্য দেশহিত করিবেন বা করিবার ভান করিবেন—তাঁহাদের আশ্বরস্কার জন্য তাহা করা আবশ্যিক। এই জন্য আমরা বরাবর এই মত পোষণ করিয়া আসিতেছি, এবং তাহা

প্রকাশও করিয়াছি, যে, প্রবল বিরোধী দল রূপে কংগ্রেসের কাজ হওয়া উচিত। বর্তমান আইনটার পবিবর্তে প্রকৃত গণতান্ত্রিক আইন ঘাহাতে হয়—ঘাহাতে দেশ পূর্ণ স্বরাজ পায়, তাহার চেষ্টা করা। পূর্ণ স্বরাজ হইলে দেশেব হিত আমরাই কবিতো পারিব, উহা হওয়া না-হওয়া গবর্ণরদের মরজিব উপব নির্ভর করিবে না। গোপালক নিজ স্বার্থ সিদ্ধিব জন্ত গোফকে ভাল খাওয়াইতে ও ভাল ঘরে রাখিতে পাবে। সেই রকমে প্রতিপালিত হওয়া গোফব যোগ্য। অন্তেব দ্বাবা প্রতিপালিত হওয়া মানুসেব উপযুক্ত অবস্থা নহে, নিজেই নিজেব হিত কবিতো পাবা ও করাই মানুসেব উপযুক্ত অবস্থা। এই অবস্থায় ভারতীয়দিগকে পৌহান কংগ্রেসেব কাজ।

বিলাতে সম্প্রতি ইতিপূর্বেই একটা গুজব বটিয়াছে যে, কংগ্রেসীবা যে-যে প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রধান দল অন্ত্যান দল হইতে গঠিত তৎকার মন্ত্রিসভাগুলি এবকম কার্য-তালিকা প্রস্তুত করিবে ও তদনুসাবে কাজ কবিবে ঘাহাতে কংগ্রেসী দল তাহাদের উপব অনাস্থার প্রস্তাব আনিয়া ব্যবস্থাপক সভায় সেই প্রস্তাব ধাৰ্য্য কবিতো না-পাবে; এবং যদি এই প্রকার চা'ল সবেও কংগ্রেসীরা অন্য উপায়ে অনাস্থার প্রস্তাব ধাৰ্য্য করাইতে পাবে, তাহা হইলেও মন্ত্রিসভা পদত্যাগ কবিবেন না এবং গবর্ণরবাও তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে বলিবেন না। আইন অনুসারে গবর্ণরবা তদ্রূপ আচরণ করিতে পাবেন।

এইরূপ একটা চা'ল যে কল্পনাপ্রসূত বা বাজে অসুমান নহে, বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভা কর্তৃক প্রকাশিত তাঁহাদের নিম্নলিখিত কার্যতালিকা হইতে তাহা বুঝা যায়। তাঁহাদের কার্য-তালিকা মোটামুটি এইরূপ :—

(১) রাজনৈতিক কারণে কয়েদীদের ও বিনা-বিচারে অন্তবানদের মুক্তি।

(২) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সর্বত্র আবস্তিক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা।

(৩) কৃষিজাত সামগ্রীসমূহেব মূল্য হ্রাসেব অনুপাতে ধাজনাব নিরিখ হ্রাস, পতিত জমীবা চাষ, এবং রায়তদের ঋণ শোধের ব্যবস্থা।

(৪) সমবায় প্রচেষ্টার বিস্তৃতি।

(৫) রাস্তার বিস্তৃতি।

(৬) জমীতে জনসেচনেব ব্যবহার উৎকর্ষ সাধন।

(৭) মাদক দ্রব্য ব্যবহারের সম্পূর্ণ নিষেধের দিকে ক্রমশঃ অগ্রগতি।

(৮) কাবগানা-শ্রমিক ও অন্ত্র শ্রমিকদের অবদার উন্নতি, শ্রমিকদের সন্তোষ উৎপাদন দ্বাবা শান্তিবক্ষা, পণ্য-বিলের বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ সাধন, স্থপ-চালিত শ্রমিক-সংঘ প্রচেষ্টায় উৎসাহদান, বেকার অবদার যথাসাধ্য প্রতিকার।

(৯) বড় বড় শহরে ও অন্ত্র বাসগৃহবিষয়ক সমস্রাব সমাধান।

রাজস্বমন্ত্রী শ্রীযুক্ত য়ূনাদাস মেহতা বর্ত্তক উপস্থাপিত প্রস্তাবাবলীর ফলে এই কার্যতালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি কংগ্রেসী ছিলেন।

যে-কোন প্রদেশের মন্ত্রিসভাই দেশহিতকর কার্য কবেন, তাহা ভালই। কিন্তু দেশেব লোক ইহা সহজেই বুঝিবে, যে, তাহা কংগ্রেসেব পবোক্ষ প্রভাবে হইতেছে, গবর্ণরদের মবজিতে ও অনুগ্রহে হইতেছে, কিন্তু অবদার বৈপরীত্য ঘটিলেই আমলাতন্ত্র নিজমুখি ধাণে করিবে।

দেশের সম্মুখে সৰ্বদা এই আদর্শ বিয়া রাখিতে হইবে, যে, নিজেব হিত নিজে করিতে পারাই মনুষ্যত্ব; অন্যের অনুগ্রহাবীন স্থবিধা হিত নহে, সেরূপ স্থবিধা গোফর যোগ্য, মানুসেব যোগ্য নহে।

“যুব-মঙ্গল কমিটি”

এমন এক সময় ছিল যখন গবন্মেণ্টকে দেশহিতকর কিছু কবিতো বলিলে গবন্মেণ্টের ইংরেজ কর্মচারীরা বলিতেন, “সব বিষয়েই তোমরা কেন গবন্মেণ্টেব মুখাপেক্ষী হও ? নিজেরা কিছু করিতে পার না ?” এখন কিন্তু গবন্মেণ্ট সব কাজেই হাত দিতে চান। তাহার উদ্দেশ্য দেশের লোকেরা বুঝে।

যে-সব দেশ স্বাধীন এবং যেখানে গণতন্ত্রপ্রণালী অনুসারে দেশের সব কাজ নির্বাহিত হয়, সেখানেও সব কাজেই গবন্মেণ্টের হাত বেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ভারতবর্ষের মত

পরাদীন দেশে ত বাহনীয় নহেই। কারণ, যে-কোন কাজ সরকারী বা আধা-সরকারী আধা-বেসরকারী ভাবে নির্বাহিত হইবে, তাহাতেই সরকারী প্রভুত্ব থাকিবে এবং সরকার দেখিতে বাধ্য হইবেন, যে, দেশের লোকেরা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে কিনা। সে রূপ চেষ্টার বিন্দুমাত্রও প্রমাণ পাইলে তাহা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে দমন করা—অসম্ভব: তাহা মন্বীভূত করা—আমলাতন্ত্র নিজের কর্তব্য মনে করিবে। গবন্মেণ্ট পরাদীন লোকদের প্রকৃত সহযোগিতা চাহিতে পারেন না, আজ্ঞাকারিতাই চাহিতে পারেন।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলা-গবন্মেণ্ট শিক্ষা-বিভাগের দ্বারা “যুব-মঙ্গল কমিটি” নামক একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিটির উদ্দেশ্য পুরুষ-ও-নারী-জাতীয় সমুদয় যুবজনের কল্যাণ সাধন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। উদ্দেশ্যের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা এইরূপ :-

“2. At its first meeting the Committee discussed the terms of reference, and decided that the term ‘Youth Welfare’ was one that applied to every social problem, to all classes and both sexes.”

তাৎপর্য। কমিটি তাহার প্রথম অধিবেশনে স্থির করিয়াছেন, যে, “যুব-মঙ্গল” কথাটি প্রত্যেক সামাজিক সমস্যা, প্রত্যেক শ্রেণীর এবং নবনারী উভয় জাতির প্রতি প্রযোজ্য।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, - গবন্মেণ্ট আমাদের বালক-বালিকা ও তরুণ-তরুণীদের সর্ববিধ ঐহিক (এবং হয়ত পারত্রিক) সদগতি কবিত্তে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। আপাততঃ : কমিটি তরুণ-তরুণীদের ব্যায়াম ও অন্তর সর্ববিধ দৈহিক বলচর্চা সৃষ্টি করিবেন। ছেলেমেয়েরা বেসরকারী রকমে কুর্প্তি করিলে বিগড়িয়া যায়, অতএব তাহাদিগকে সরকারী রকমে তাহা করাইতে হইবে। “বয়স্কাউট”

প্রচেষ্টার মধ্যে আগে হইতেই সরকার ছিলেন। ব্রতচারীর মহাপালকই ত স্বয়ং গবর্নর। এখন অল্প সকল রকম হাত-পা নাড়িবার ব্যাপারও সরকারী কল্যাণ-বেড়াঝাল দ্বারা বেষ্টিত হইবে। এখন আর কাহাবও অকল্যাণ বা বেসরকারী কল্যাণ হইতে পারবে না।

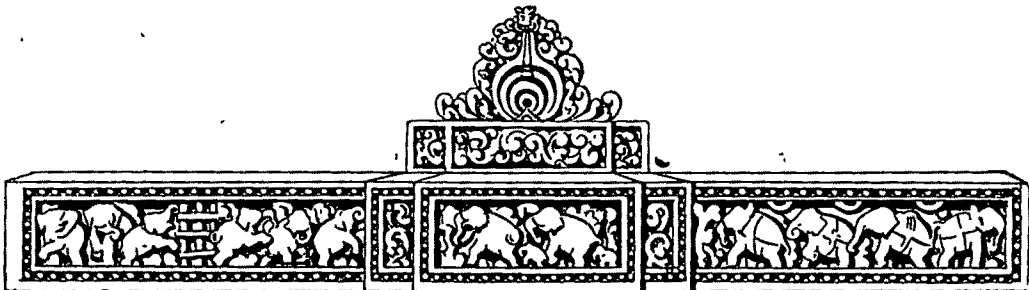
সামাজিক কি কি ব্যাপারে কমিটি হাত দিবেন, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

রায়বাহাদুর রেবতীমোহন দাস

ঢাকাব বিখ্যাত মহাজন ও ব্যবসায়ী রায়বাহাদুর রেবতীমোহন দাস মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ধর্মসম্বন্ধীয় ও শিক্ষাবিষয়ক অনেক প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া গিয়াছেন। প্রতি বৎসর দান করিবার জন্য তাঁহার বজেটে কয়েক হাজার টাকা নির্দিষ্ট থাকিত। তাহা ছাড়াও তিনি দান করিতেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ও সমাজসংস্কারক ছিলেন।

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যার লেখা শেষ করিবার সময় সংবাদ পাইলাম, বিখ্যাত কট্টাষ্ট্র ও সরকারী বেসরকারী বহু বৃহৎ কলেজ আপিস হাসপাতাল প্রাসাদ আদির নির্মাণে যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয় দিল্লীতে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ইমারতের কাজ ছাড়া কারখানা-শিল্পক্ষেত্রেও কৃতী ছিলেন। আমাদের দেশে এরূপ উত্তমশীল, ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের সংখ্যা অধিক নহে।



দেশ-বিদেশের কথা

ভারতীয় বজেট শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

“All despotism is bad; but the worst is that which works with the machinery of freedom.”—Junius.

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে রাজস্ব বিলের আলোচনার শেষ পর্বে শ্রীযুত ভূলাভাই দেশাই ভারতীয় প্যালেমেন্ট-ভবনকে একটা ব্যয়-বহুল প্রহসন বলে উল্লেখ করেছিলেন। কল্পিত স্বাধীনতাবাদ চেয়ে সোচ্চারিত পবাবীনতাই যে ভাল, এ-কথাও তিনি বলেছিলেন। ব্যবস্থা-পরিষদের অধিকাংশ সভাই এ-বিষয়ে শ্রীযুত দেশাইয়ের মতে সায় দিয়েছিলেন এবং অনেকে সরকারী নীতিকে সুস্পষ্ট ভাষায় নিন্দাও করেছিলেন। এই সমালোচকদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যারা অতীত জীবনে সর্বদাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একান্ত ভাবে সমর্থন ক’বে এসেছেন। কিন্তু গবর্নর-জেনার্যাল কর্তৃক রাজস্ব বিলের সমর্থনের সঙ্গে বিপরীত উপর্য উপর্য বনিকা পড়ল, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হ’ল :

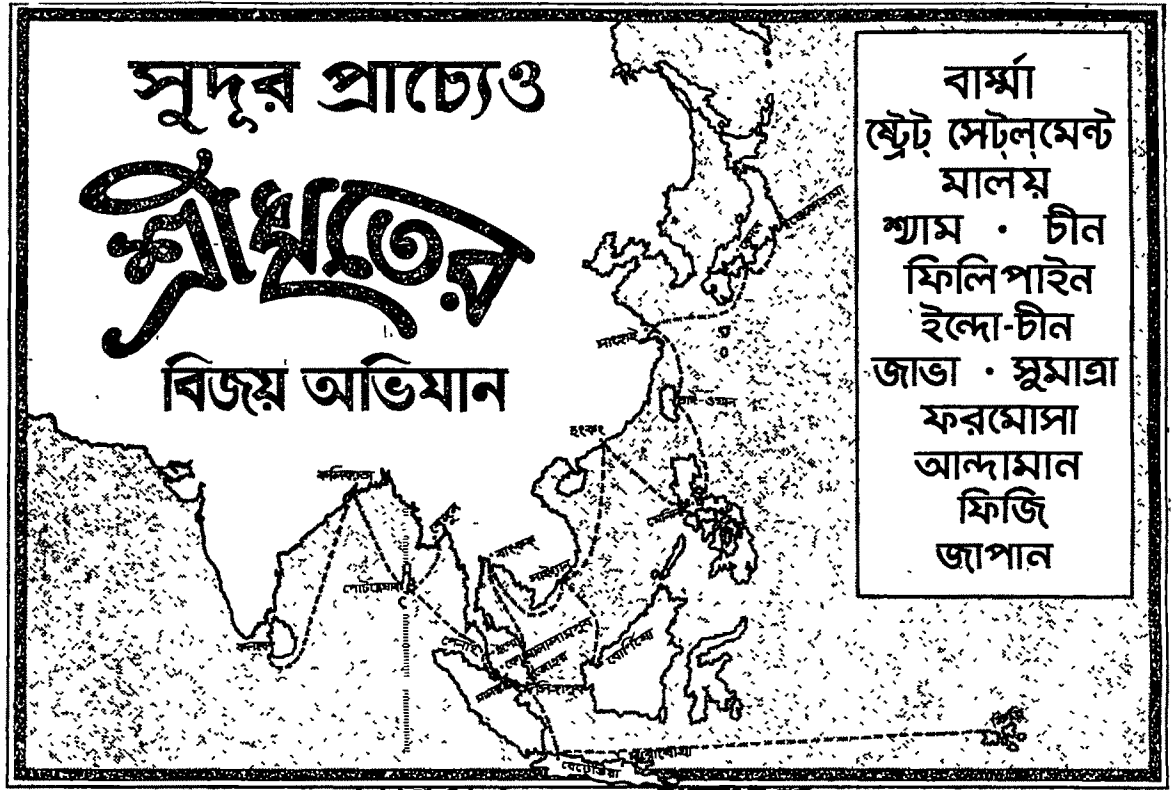
“In pursuance of the provisions in sub-section (1) of section 67-(b) of the Government of India Act, I, Victor Alexander John Marquess of Linlithgow, do recommend to the Assembly that it do pass the Bill to fix the duty on salt manufactured in or imported by land into certain parts of British India, to vary excise duty on sugar leviable under Sugar (Excise Duty) Act of 1934, to vary certain duties leviable under the Indian Tariff Act, 1934, to vary excise duty on silver leviable under Silver (Excise Duty) Act, 1930, to fix maximum rates of postage under Indian Post Office Act of 1898 and to fix rates of income-tax and super-tax in the form herto annexed.—(Signed) Linlithgow, Viceroy and Governor-General.”

সর জেমস গ্রিগেব সঙ্গে যারা একমত হ’তে পাবেন নি, তাঁরা সরকারী অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তন সাধন না করতে পেরে বিশেষ দুঃখিত হয়েছিলেন। দুঃখিত হ’বার কাবণও ছিল; ব্রিটিশ গবর্নেন্ট হয়ত মনে কবে থাকেন যে রাষ্ট্রনৈতিক বিচার-বুদ্ধিতে ভারতীয়েরা সকলেই নাবালাক এবং সেই ভাবেই তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত; কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদগণের মতামত উপেক্ষা ক’রে তাঁদের অভিজ্ঞতার মর্যাদা সবকার ক্ষুণ্ণ করেছেন; কারণ এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়ে তাঁদের মতামতের মূল্য আমাদেব শাসক-গোষ্ঠীর মতামতের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী।

আর্থিক বিষয়ে সরকারী প্রস্তাবাবলী আলোচনা করলে মোটামুটি এই মনে হয় যে তাব মধ্যে কল্পনা চিন্তাশক্তির বা দূরদর্শিতার কোন পরিচয় নেই, হাতের কাছে যে সহজ পথ আছে তাই তারা অবলম্বন করেছেন; আয়-ব্যয়ের নির্ধারণ করবার সময় ব্যয়-সময়ের কথাই গবর্নেন্টের সর্বপ্রথম স্মরণ রাখা

প্রয়োজন। এ-কথা ভেবে নেওয়া উচিত নয় যে, গবর্নেন্টের ব্যয় কখনও অপব্যয় হ’তে পারে না, বা শাসনকার্যের কোন ক্ষতি না ক’রে ব্যয়ভার আর কমান অসম্ভব। ভারতবর্ষে শাসন ও আশ্রয়কার ব্যবস্থার কোন ক্ষতি না ক’বেও সরকারী ব্যয়ভার শতকরা দশ ভাগ পর্যন্ত কমানো যেতে পারে, এই ধারণাই সাধারণের মনে আছে। আমবা ইতিপূর্বে অনেকবার দেখিয়েছি যে দেশবন্ধুর বাবদে এ-দেশে অনেক অধিক ব্যয় হয়ে থাকে। আধুনিক কালে এই কথাই স্বীকৃত হয়েছে যে দেশরক্ষার প্রকৃত ব্যবস্থা কবতে হ’লে, সমস্ত দেশে যত যন্ত্র, মূলধন ও মানব-শক্তি আছে তার সম্যক সংগঠন ক’বা প্রয়োজন, যেন আপংকালে সকল শক্তি দেশরক্ষার যুগপৎ প্রযুক্ত হ’তে পারে। কোনও একটা বিশেষ সীমার মধ্যে কেন্দ্রীভূত, বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত পূর্ণ বৈতন-ভোগী সামরিক দল, আশ্রয়কার চেয়ে অপরকে আক্রমণের জন্যই অধিক উপযুক্ত এবং এরূপ সমন-সবঞ্জামের ব্যয়ভারও অধিক। এই রূপ সেনাদলের তুলনায় জাতিব্যাপী অবৈতনিক সেনাশক্তি আড়ম্বরের দিক থেকে হীন হ’তে পারে, সাম্রাজ্য বিস্তার তদ্বা ক’ম হ’তে পারে—কিন্তু জাতির আশ্রয়কার দিক থেকে জাতীয় সেনা গঠনই মঙ্গলকর। অবশ্য এতে যুদ্ধব্যবসায়ীদের মধ্যে বেকার-সমষ্টি উৎপন্ন হ’তে পারে, এবং ব্যয়বহুল সমরবিভাগের অভিজ্ঞ দ্বারা যারা লাভবান হয়ে থাকে তাদেরও অসুবিধা হতে পারে—কিন্তু আমাদেব জাতীয় মঙ্গলের ক্ষতিবুদ্ধির সহিত ইহাদের কোন সংযোগ নেই। বিভিন্ন বিভাগে কি কি ব্যয়সঙ্কোচ করা সম্ভব, তা এই প্রবন্ধে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু কোন কোন বিভাগে ব্যয় কমিয়ে কবভাব বৃদ্ধি বা নতুন কব ধার্য না ক’রেও বজেটে আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য সাধন ক’বা যেত, এ-কথা সহজেই ভাবা যায়। কোন বিশেষ বিদেশী পণ্যশিল্পের প্রতি পক্ষপাত না-দেখিয়ে, পৃথিবীর বেখানেই সবচেয়ে সম্ভাব্য মালপত্র পাওয়া যায় সেখানকার মাল কিনলেও অনেক খরচ বাঁচত।

করভারের কথা বলছিলাম। করদানের হাত থেকে ফাঁকি (evasion) সন্দেহে যথেষ্ট সন্ধান নেওয়া হয় কি না সন্দেহ। এ-কথা সকলেই জানে যে কোন কোন বাবসায়ীর দল তাদের মূল্য অহুসারে বতটা আয়কর দেওয়া উচিত তা দেন না। হিসাবের খাতায়ই এই সব লোকেরা তাদের আয়ের কথা গোপন রাখেন। অল্প ক্ষেত্রে ঐশ্বর্য ঘোষণা করতে ক্রটি করেন না। এই সব ধনীদেব সন্দেহে বিশেষ অহুসন্ধান ক’রে দেখা কর্তব্য। অনেকে আবাব আয়কব সম্বন্ধীয় আইন না-জানাব দরুন ও নিয়মিত হিসাব না-রাখার ফলে, আইনমত বা আয়কর দেওয়া উচিত তার চেয়ে বেশী আয়কর দিয়ে থাকেন—এ’দের সন্দেহেই ইনকম-ট্যাক্স কলেজের



দুই বৎসর পূর্বে যখন **বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স ও রিসার্চ প্রপার্টি কোম্পানী**র ভ্যালুয়েশান হয় তখনই আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে বাংলার আর একটি বীমা কোম্পানী ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ধরনের হাব, মুদ্রাঙ্কনিত দাবীর পরিমাণ, ফণ্ডের লম্বা প্রভৃতি যে সব লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায় যে একটি বীমা কোম্পানী সম্ভাব্যজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে কি না সেই সব দিক দিয়া বিচার করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছিলাম যে বীমা-ব্যবসায়ক্ষেত্রে সুযোগ্য লোকের হস্তেই বেঙ্গল ইন্সিওরেন্সের পরিচালনা হস্ত আছে।

গত ভ্যালুয়েশানের পর যাত্রা দুই বৎসর অন্তে এই কোম্পানী পুনরায় ভ্যালুয়েশান করিয়া বিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। কোম্পানীর যথেষ্ট শক্তি না থাকিলে অল্পকাল অন্তর ভ্যালুয়েশান কেহ করেন না। বীমা কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে অ্যাকচুয়ারী দ্বারা ভ্যালুয়েশান করা হইতে হয়। অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা না থাকিলে বেঙ্গল ইন্সিওরেন্সের পরিচালকবর্গ এত শীঘ্র ভ্যালুয়েশান করাইতেন না।

৩১-২-৩৫ তারিখের ভ্যালুয়েশানের বিশেষত্ব এই যে, এবার পূর্ববার অপেক্ষা অনেক কড়াকড়ি করিয়া পরীক্ষা হইয়াছে। তৎসঙ্গেও কোম্পানীর উন্নতি হইতে আজীবন বীমায় প্রতি হাজারে প্রতি বৎসরের জন্য ১৬ টাকা ও যেরা দী বীমায় হাজার-৩রা বৎসরে ১৪ টাকা বোনাস দেওয়া হইয়াছে। কোম্পানীর লাভের সম্পূর্ণ অংশই বোনাসরূপে বাটোয়া করা হয় নাই, কিংবা রিজার্ভ ফণ্ড লইয়া যোগ্য হইয়াছে। এই কোম্পানীর পরিচালনভাবে যে বিচক্ষণ ও সতর্ক ব্যক্তির হস্তে হস্ত আছে তাহা নিঃসন্দেহ। বিশিষ্ট জ্ঞানায়ক কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এটর্নী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গত সাত বৎসর কাল এই কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি পদে থাকিয়া কোম্পানীর উন্নতিসাধনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ব্যবসায়জগতে সুপরিচিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বণিকাতা শাখার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ বোষ মহাশয় এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিবেন্ট এবং ইহার জন্য অত্রান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁহার স্নেহ পরিচালনায় আমাদের আস্থা আছে। স্বার্থের বিষয় যে তিনি এই কোম্পানীতে বীমাজগতে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত সুখীন্দ্রলাল রায় মহাশয়কে এজেন্সী ম্যানেজার-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার ও সুযোগ্য সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বোষ মহাশয়ের প্রচেষ্টায় এই বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চলিবে ইহা অবধারিত।

[বিজ্ঞাপন]

হেড অফিস—২নং চার্চ লেন, কলিকাতা।

আবার বেশী সম্ভাগ। যাই হোক, চতুর লোকেরা যে-পরিমাণ আয়কর কাঁকি দিয়ে থাকেন তাব তুলনায় এটা কিছুই নয়। এই কাঁকির সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ অধিক সচেতন হ'লে সরকারের আয় কিছু বাড়তে পারে। একান্ত যদি নতুন কব, বসান বা করভার বাড়ান ছাড়া আয়বৃদ্ধির আর কোন উপায় না থাকে, তা হ'লেও হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই আঁকড়ে ধরাটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বার্ক বলেছেন,

“Taxing is an easy business.—Any projector can contrive new impositions; any bungler can add to the old; but is it altogether wise to have no other bounds to your impositions than the patience of those who are to bear them?”

এই ধৈর্যচ্যুতি ক্রমশঃ ঘটছে, এই কথাই বজেট আলোচনার সময় মনে হরছে। আমাদের দেশের লোকের ধৈর্যশক্তি অসাধারণ বলৈই বিখ্যাত। কিন্তু পবাক্রিত জাতিব সে-মনোবিকারের কথাব আলোচনা থাক। আমাদের যাবা “প্রতিনিধি”-স্থানীয় ব্যক্তি তাঁদের মধ্যে অনেকে ব্রিটিশ সরকারের সকল ব্যবস্থাতেই চিরকাল সম্ভাব্য প্রকাশ ক'রে এসেছেন; এঁদেরও কাল কাল ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল বজেট-আলোচনার সময়। এটা দেখে বিপৎসম্ভাবনা বুঝে সরকারের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তা হয় নি।

চিনির উপর শুদ্ধ (excise duty) বৃদ্ধি শুধু যে প্রকাশ্য ভয় হরছে তা নয়; আলোচ্য ব্যবসায়ের সরকারের আয়কূল্য ববাবব অটুট থাকবে এই প্রত্যাশা ক'রে যাবা এতে অর্থ ও আর্থ-নিয়োগ কবেছেন তাঁদেরও উতাজ হবার কারণ ঘটছে। এক রকম বলতে গেলে সরকারের অল্পবোধে যার জন্ম, সেই ব্যবসায়ের শৈশবাবস্থায়ই তার উপরে শুদ্ধতার চাপিয়ে দেওয়াটাকে বিশ্বাসভঙ্গক কাজ ব'লে আখ্যা দেওয়া চলতে পারে।

কর সম্বন্ধে একটা প্রধান নীতি মেনে চলা উচিত যে, কর বসিয়ে যে আয় হয় মুখ্যত বা গোপন অস্ত্র কোন ভাবে তার চেয়ে বেশী ক্ষতি না হর যার। অবশ্য সরকারী ক্ষতির কথা বলছি না; জাতির ক্ষতির কথাই বলছি। চিনির ব্যবসায়ের সঙ্কট উপস্থিত হর ও লাভ কমে গিয়ে সরকারের আয় কমে যাওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। নতুন শুদ্ধবৃদ্ধির ফলে যে-সব ফ্যাক্টরী উঠে যাবে, তারা একদিনেই উঠে যাবে না—টিকবার জন্ত আপ্রাণ প্রতিযোগিতা করবে—এই প্রতিযোগিতার ফল এমন হব যে তাতে সব চিনির ফ্যাক্টরীরই ক্ষতি হব—যে-সব ফ্যাক্টরী এখন লাভ করছে তারও বাদ যাবে না। এ-ছাড়া পৌণভাবেও দেশের অনেক ক্ষতি হব, হতে বাধ্য। এত বড় ব্যবসার ক্ষতি হ'লে তার জের সরকারী আমদানিতেও পূর্ণরূপে প্রতিকলিত হব নিশ্চয়।

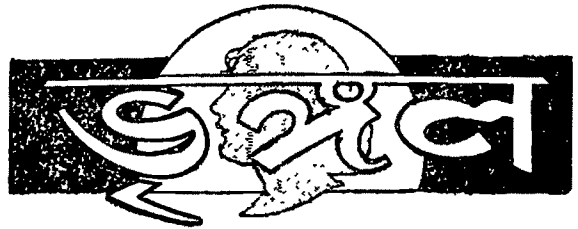
নীতিশাস্ত্রমুদিত আমাদের যে-সব ভোগপ্রবৃত্তি তা থেকে সরকারের বা আয় হর থাকে তার চেয়ে অনেক বেশী হর থাকে মদ-তামাক-আফিম আসক্তি থেকে। কর যদি একান্তই বৃদ্ধি করতে হয় তবে তা লোকের মূন-চিনি ভাত-কাপড়ের উপর ধার্য না ক'রে ব্যসনের ও নেশার উপরই ধার্য করা উচিত। প্রত্যেক বিভিন্ন দোকানকে যদি বিক্রয় অল্পমতি বা লাইসেন্স নিতে বাধ্য করা যায় তাহ'লে অনেক অর্থগম হতে পারে। লাইসেন্স-স্ট্যাম্প বিক্রীর ব্যবস্থা ক'রে এই স্ট্যাম্প বিভিন্ন দোকানে রাখিয়ে লটকে রাখার নিয়ম ক'রে দিলে এই শুদ্ধ সহজে ও অল্প খরচে আদায় হতে

কেশতৈল তো অনেক রকমই আছে,
—কিন্তু.....

যথার্থ কোনটি ভাল বেছে নেওয়াই মুশ্কিল!
কারণ, সবাই লেখেন আমাদেরটাই হচ্ছে
সর্বোৎকৃষ্ট!

আমরা সে রকম কিছু বলতে চাই না,
শুধু জানাতে চাই—

ক্যালকেমিকোর



সাধারণ কেশতৈল নয়। বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত ভৃঙ্গুরাজের রস, আমলা, কুঁচ প্রভৃতি ভারতীয় কেশকল্যাণকর ঔষধের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ও কেশের পক্ষে একান্ত হিতকর কয়েকটি রাসায়নিক উপাদান সংমিশ্রণ হওয়ায় ‘ভৃঙ্গল’ শুধু কেশতৈল নয়, সকল প্রকার কেশরোগেরও মহৌষধ।

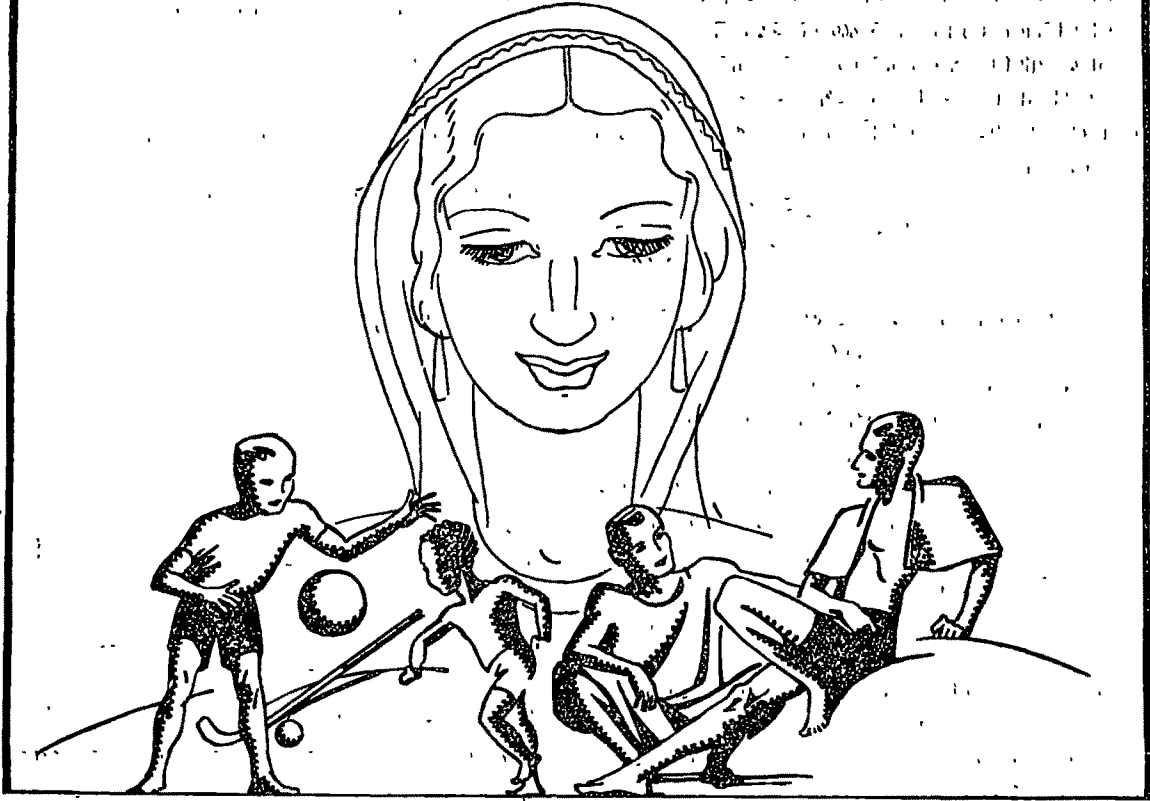


ভৃঙ্গল প্রত্যহ স্নানের সময় কিছুক্ষণ ঘষে ঘষে চুলের গোড়ায় মাখলে চুল উঠে যওয়া ও টাকপড়া বন্ধ হবে, শিরশীড়ার উপশম হবে, মাথা ঠাণ্ডা থাকবে, চুল ঘন কালো ও কুঞ্চিত হবে, চুলের অকাল পকতা নিবারণ হবে এবং রক্তের চাপ হ্রাস করে। ভৃঙ্গলের স্বগন্ধ আনন্দদায়ক ও দীর্ঘস্থায়ী।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

বালিগঞ্জ : কলিকাতা

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব আপনারই



ছেলেমেয়েরা নিজেরা যতটা মনে করে, তার চেয়ে অনেক বেশী তারা আপনার যুথাপেক্ষী, তারা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠছে হয়তো, তবু এখনো তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব আপনারই। এখন যে সব স্ব-অভ্যাস তাদের মনে বদ্ধমূল ক'রে দেবেন সেইগুলিই তাদের সব চেয়ে কাজে লাগবে, যখন তারা বড় হয়ে সংসার-সংগ্রামে নামবে।

সংসারের ঝাঁর আদর্শ কর্তা, তারা সব সময়ই ছেলেমেয়েদের মনে ব্যায়াম, খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে ভালো ধারণা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তাদের ভেতরে চা খানের অল্পরাগ বাঁড়ান যে ভাল-একথা তারা জানেন। এই বিত্তহীন ও ভূখণ্ডের পানীয় পান করে তাদের শরীর ও মনের উন্নতি হচ্ছে—পরে বয়স হ'লে এ অভ্যাসে তাঁদের নিশ্চয়ই উপকার হবে।

চা প্রস্তুত-প্রণালী



চাটিকা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশী দিন। জল ফোটানো চায়ে ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজতে দিন; তারপর পেয়ালায় ঢেলে হুখ ও চিনি যেশান।

দুশজনের সংসারে একমাত্র পানীয়—ভারতীয় চা

পারে; কেউ ফাঁকি দিচ্ছে কি না। পুলিশ সহজেই তার তদারক করতে পারে—এতে আইন-শৃঙ্খলার অভিব্যক্তিও সমরক্ষণের একটা কাজও পেতে পারেন। মদ ও আফিওর উপরও শুদ্ধ আর একটু চড়ানো যেতে পারে।

ফেডারাল ফাইনাল কমিটি (১৯৩১) তামাক-বিক্রয়-অনুমতির ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। দেশলাইর উপরেও তাঁরা কর ধার্য করা বাঞ্ছনীয় বলেছিলেন এবং এটাকে সরকারের একচেটে ব্যবসারে পরিণত করার কথা বলেছিলেন। দেশলাইর উপর ত করভার গুরুত্ব হয়েছে—দ্রিষ্ট লোকেরাই এই আবশ্যিক বস্তুটির উপর গুরুত্ব করভার বহন করে আসছে। এর তুলনায় তামাক বিক্রয়ের উপরও কর ধার্য করা নিশ্চয়ই অধিক গায়সঙ্গত।

সরকারী একচেটে ব্যবসার কথা বলছিলাম। সামরিক ও দেশরক্ষার উপকরণ যদি সরকারী অস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ নিৰ্মাণের ফ্যাক্টরীগুলিতে আরও অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করা যায় তাহলে সরকারের পক্ষে বিশেষ লাভজনক একটি একচেটে ব্যবসা গড়ে উঠতে পারে—সাধারণ শিল্পব্যবসায়ীর এতে কোন আপত্তি হবে না। অস্ত্র-আইন একটু ঢিলে করলে এই ব্যবসার অনেকটা উন্নতি হতে পারে। বিদেশ থেকে অপেক্ষাকৃত সুলভ অস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণের আমদানি সঙ্কীর্ণ করতে পারলে এই ব্যবসায়ের সুপ্রতিষ্ঠা সহজ হতে পারে। আধুনিক সমর-প্রণালী যে পথে চলেছে তাতে আমাদের মনে হয়, ভারতীয় অস্ত্র-আইনে শুধু লোকের স্বাধীনতাই সংকোচ হয়, আর কোন লাভ হয় না; জাতি দেশে বদ্ধ হচ্ছে

না—তাদের অস্ত্র-সংগ্রহে কোন বাধা হয় না—শুধু সং লোকেরাই অস্ত্র-আইনের দরুন নিজের গৃহ-সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে না। সম্ভাব্য স্বদেশী অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতির ব্যবস্থা ও অস্ত্র-আইনের কড়াগাতি কমান এই যুগ্মপন্থায় সরকারী আয় বৃদ্ধি ও দেশের লোকে আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা একাধারে হতে পারে। এতদ্ব্যতীত সমরোপকরণ প্রস্তুত সকল জাতিরই দেশরক্ষার দিক দিয়ে কর্তব্য। কারণ যুদ্ধ-কালে সূদূর ইংলও কিংবা জার্মানী থেকে তার উপকরণ আমদানী করা সহজ বা সম্ভব নয়।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান ভারত-গবর্নমেন্টের রাজস্ব-বিভাগের আয়ব্যয় ও রাজকর আয়বয়ের ব্যবস্থার সমালোচনা। সুরক্ষিত পন্থা না গ্রহণ করে আপাতদৃষ্টিতে সহজ বা তারই অনুসরণ করা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়; কিন্তু রাজস্ববিভাগ সেনীতি মেনে কাজ করছেন না। প্রবন্ধে একথা যদি সুস্পষ্ট হয়ে থাকে ত লেখকের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়েছে।

দেওঘরের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়

ছাত্রদের সর্বোচ্চ মঙ্গল-কামনায় উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ-বিরেকা-নন্দের আদর্শের অনুপ্রাণনায় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। গত বর্ষের কার্যবিবরণীর পাঠে দেখা যায়, এই বর্ষেও বিদ্যালয়টি সুপরিচালিত হইয়াছে। একটি উপাদান-ভবন, একটি ব্যায়ামাগার ও স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থভবনের অভাব এই বিদ্যালয়ের আছে। এজন্য সাধারণের দানের উপরেই এই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নির্ভর।

দেশে ম্যালেরিয়া আছে ॥

ম্যালেরিয়ার মহৌষধ আছে ॥

এপাইরিন

সকল বিজ্ঞ চিকিৎসক অনুমোদিত

ম্যালেরিয়ার মহৌষধ।

রোগের প্রারম্ভেই সেবনীয়।

দুর্বল দেহ-মন সবল করিতে

ফস্ফো-নিউরোটোন

অব্যর্থ টনিক ॥

ল্যাড্‌কো

কলিকাতা

অানে ও প্রসাধনে

ল্যাড্‌কো

সুগন্ধ ক্যাণ্ডেল অয়েল

কা লো প যো গী

অানে নিত্যব্যবহার্য

আনন্দদায়ক সুগন্ধ

সাবান—

ল্যাড্‌কো

গ্লিসারিন সোপ

প্রতি বাস্কে তিনখানি থাকে ॥

ভাল দোকানেই পাওয়া যায় ॥

ল্যাড্‌কো

কলিকাতা



শ্রী অশোকচন্দ্র রক্ষিত

বাঙালীর একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান

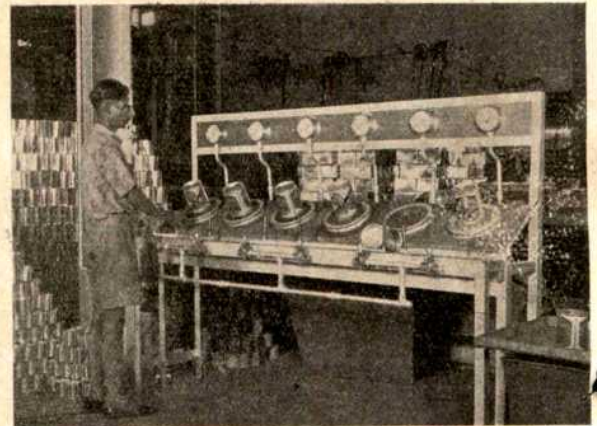
বাঙালীর ব্যবসায়-বুদ্ধিতে আজকাল সকলেরই অবিশ্বাস। সেইজন্য একটি প্রাচীন অথচ এখনও বর্ধনশীল ব্যবসায়ের কথা নিবেদন করিতেছি। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে ৬রামকুমার রক্ষিত কলিকাতায় ঘূতের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইহার পদমর্যাদার সাক্ষ্য বড়বাজারে রামকুমার রক্ষিত লেন আজিও দিতেছে। ইহার পরবর্তী, দানবীর ভবানীপ্রসাদ রক্ষিত, ব্যবসায়ের অনেক উন্নতি করেন, তাহার পর ১২৫৫ সনে, ৬উমেশচন্দ্র রক্ষিত ও তাঁহার পুত্র, “ভারত প্রদক্ষিণ” প্রণেতা, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত ঘূতের ব্যবসায় দৃঢ় ভাবে স্থাপন করেন। “শ্রী মার্কা” ঘূতের প্রবর্তন অষ্ট শতাব্দী পূর্বে ৬দুর্গাচরণ রক্ষিত করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্র শ্রী অশোকচন্দ্র রক্ষিত কর্তৃক পরিচালিত “অশোকচন্দ্র রক্ষিত লিমিটেড” এই দেড়শত বৎসরের চলতি ব্যবসায়েরই পূর্ণ পরিণতি।

বাঙালীর বাবতীয় ব্যবসায় যেরূপে একে একে অবাঙালীর কবলস্থ হইয়াছে, ঘূত ব্যবসায়েও সেই সংগ্রামের সংঘাত হইয়াছে ও হইতেছে। বাঙালীর “সস্তায়” ক্রয় করার প্রবণতা ও উপযুক্ত দ্রব্যের

উপযুক্ত মূল্য না-দেওয়ার ইচ্ছাই বিদেশীকে ভেজাল বেচিয়া কোটি-খর ও স্বদেশীর সর্বনাশ করার একমাত্র কারণ বলিলেই হয়। বলা বাহুল্য এই ব্যাপারে “শ্রী” ঘূতের সুনাম রক্ষা অথচ মূল্য হ্রাস করিয়া বাজার রাখা—ইহা এই ব্যবসায়চালকদিগের যোগ্যতার একান্ত পরিচয়। ক্রেতার সুবিধার জন্য একদিকে “শ্রী” ঘূতের অকৃত্রিমতা বজায়ের জন্য ভেজালকারকদিগের সহিত সংগ্রাম উপরন্তু অবাঙ্গালী ঘূত ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে অদম্য প্রতিযোগিতা ইহাই ইহাদের সাফল্যের কারণ।

ঘূত-ব্যবসায়ীদের মধ্যে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার একমাত্র ইহাদেরই আছে এবং ইহাদেরই প্রচেষ্টায় ঘূত পরীক্ষার মান (standard) বাংলায় অতি উচ্চ অল্প প্রদেশে ক্রেতার সে সুবিধা নাই। এইরূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা থাকায় “শ্রী” ঘূত ভিটামিনপূর্ণ, অথবা জ্বালতি দোষ মুক্ত। ইহার বিশুদ্ধতার জন্যই বাঙালীর মিষ্টান্ন-ব্যবসায়ে এত উন্নতি ও প্রসার সম্ভব হইয়াছে।

বিশুদ্ধতা ও পরিচালকদিগের ব্যবসায়-পটুতারফলে “শ্রী” ঘূত এখন ব্রহ্ম মালয় সিংহল মরিসস্ চীন জাপান প্রভৃতি দূরদেশেও প্রতিষ্ঠা ও বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে। এদেশে বহু সাধারণ ও গভর্ণমেন্ট চালিত প্রতিষ্ঠানেও ইহা একমাত্র নির্ভরযোগ্য দ্রব্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ ব্যবসায়ে সততা যে শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয় তাহা ইহার প্রতিষ্ঠায় প্রমাণিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর ব্যবসায়ে অক্ষমতা-অপবাদও অপনোদিত হইয়াছে। সততা, অত্যাধুনিক পরীক্ষা প্যাকিং ইত্যাদির ব্যবস্থা ও ব্যবসায়ে অক্লান্ত পরিশ্রম ও তীক্ষ্ণদৃষ্টির সহিত ক্রেতার সুবিধার চেষ্টা, এই প্রতিষ্ঠান একাধারে এ সকলের সমন্বয় দেখাইয়াছে।



শ্রী-ঘূতের ফ্যাক্টরিতে প্যাকিং প্রকৃতির আধুনিক ব্যবস্থা



হাটের পথে
শ্রীতারক বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



“সত্যম্ শিবম্ হৃদয়ম্”

“নামস্মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

৩৭শ ভাগ }
১ম খণ্ড }

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

{ ২য় সংখ্যা

পলাতক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে পলায়নের অসীম তরঙ্গী
বাহিছে সূর্য্যতারা
সেই পলায়নে দিবসরঞ্জনী
ছুটেছে গঙ্গাধারা ।
চিরধাবমান নিখিল বিশ্ব
এ পলায়নের বিপুল দৃশ্য,
এই পলায়নে ভূত ভবিষ্য
দীক্ষিছে ধরণীরে ।
পলায়ন-ভীরু পুরী দিনরাত
তোমার সমুখে জোড় করে হাত,
বাঁধা ঘাটে ঘাটে রচে প্রণিপাত,
মাথা হেঁট করে তীরে ।

মাটির কণ্ঠে যেখানে অভয়
মিথ্যা ভাষায় রটে,
সেথা ভিড় করে যত লোকালয়
ভাঙন-লুকানো তটে ।

মুখরিত হয় স্থিতিভিঙ্গার
বন্দনাম্বনি সেখা বার-বার,
কল্লিত করে প্রার্থনা তার
শিল্পিত মন্দিরে।

জলের ছায়া সে দ্রুততালে বয়
কঠিন ছায়া সে ঐ লোকালয়,
একই প্রলয়ের বিভিন্ন লয়
স্থিরে আর অস্থিরে ॥

ধরণী যখন আছিল নবীন
নবীনতা নিয়ে এলে।
ছেলেমানুষবির শ্রোতে নিশিদিন
চলো অকারণ খেলে।
লীলাছলে তুমি চির পথহারা,
বন্ধনহীন নৃত্যের ধারা,
তোমার কুলেতে সীমা দিয়ে কা'রা
বাঁধন গড়িছে মিছে।
আবাঁধা ছন্দে হেসে যাও সরি'
পাথরের মুঠি শিথিলিত করি',
বাঁধা ছন্দের নগরনগরী
ধূলা হয়ে যায় পিছে ॥

অচঞ্চলের অমৃত বরিশে
চঞ্চলতার নাচে।
বিশ্বলীলা তো দেখি কেবলি সে
নেই নেই ক'রে আছে।
ভিৎ ফেঁদে যা'রা তুলিছে দেয়াল
তারি বিধাতার মানে না খেয়াল,
তারি বুঝিল না,—অনন্তকাল
অচির কালেরই মেলা।

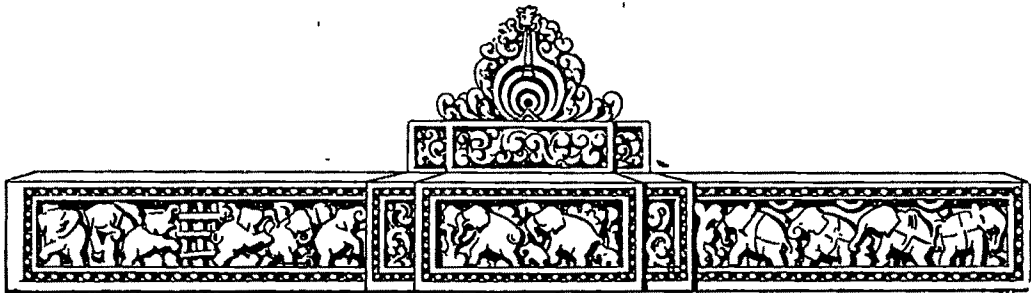
বিজয় তোরণ গাঁখে তারা যত
 আপনার ভারে ভেঙে পড়ে তত,
 খেলা করে কাল বালকের মতো
 লয়ে তার ভাঙা ঢেলা ॥

উধাও বাতাসে মেঘ ভেসে আসে
 বহিয়া রঙীন ছায়া ।
 তোমারি ছন্দে রচিছে আকাশে
 ক্ষণিকের চিরমায়্যা ।
 বনের প্রবাহ তব তীরে তীরে
 সবুজ পাতার বহু নীরে
 কভু ঝড়ে কভু শান্ত সমীরে
 তোমারি ছন্দ ঘাচে ।
 তোমারি ছন্দে পাখীর ওড়া সে,
 তোমারি ছন্দে ফুল ফোটে ঘাসে.
 অনিত্য তা'রা তব ইতিহাসে
 নিত্য নাচনে নাচে ॥

ওরে মন, তুই চিন্তার টানে
 বাধিস্ নে আপনারে,
 এই বিশ্বের সূদূর ভাসানে
 অনায়াসে ভেসে যা রে ॥
 কী গেছে তোমার কী রয়েছে আর
 নাই ঠাঁই তার হিসাব রাখার,
 কী ঘটিতে পারে জবাব তাহার
 নাই বা মিলিল কোনো ।
 ফেলিতে ফেলিতে যাহা ঠেকে হাতে,
 তাই পরশিয়া চলো দিনে রাতে,
 যে স্বর বাজিল মিলাতে মিলাতে
 তাই কান দিয়ে শোনো ॥

এর বেশি যদি আরো কিছু চাও
 দুঃখই তাহে মেলে।
 যেটুকু পেয়েছ তাই যদি পাও
 তাই নাও, দাও ফেলে।
 যুগ যুগ ধরি' জেনো মহাকাল
 চলার নেশায় হয়েছে মাতাল,
 ডুবিছে ভাসিছে আকাশ পাতাল
 আলোক আঁধার বহি'।
 দাঁড়াবে না কিছু তব আস্থানে,
 ফিরিয়া কিছু না চাবে তোমা পানে,
 ভেসে যদি যাও যাবে একখানে
 সকলের সাথে রহি' ॥

১৯ চৈত্র, ১৩৪৩
 শান্তিনিকেতন



গৌড়পাদ

ঐবিধুশেখর শাস্ত্রী

বর্তমানে আমরা সাধারণত ক্রীষ্ণরচাৰ্ঘ ও তাঁহার পরবর্তী অজ্ঞাত আচাৰ্ঘ বা ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাকারদেরই বেদান্তের সহিত পরিচিত হইয়া আসিতেছি, কিন্তু শঙ্করের পূর্বেও বেদান্তের বহু ব্যাখ্যাতা ছিলেন, উপনিষদ্ বা ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি বা ভাষ্যের রচয়িতা অনেকে ছিলেন। বর্তমানে ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করের রচিত যে ভাষ্য আমরা পাই, তাঁহার পূর্বে ইহা হইতেও বড় ভাষ্য রচনা করিয়া ছিলেন ভট্টপ্রপঞ্চ। শঙ্কর নিজেই বলিয়াছেন ইহা অপেক্ষা তাঁহার নিজের ভাষ্য ছোট (“অল্পগ্রন্থ”)। ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্য সম্বন্ধেও এই কথা। শঙ্করের পূর্বে ত্রিবিড়্যচাৰ্ঘের ভাষ্য ছিল, এবং ইহাও শঙ্করের ভাষ্য হইতে বড় ছিল। এইরূপ শঙ্করের পূর্বে ব্রহ্মসূত্রেরও অনেক ব্যাখ্যাতা ছিলেন, যেমন পূর্বোক্ত এই দুই আচাৰ্ঘ ছাড়া বোধায়ন, উপবর্ষ, ব্রহ্মদত্ত, ভট্টমিত্র, ইত্যাদি। প্রচলিত ভাষ্য ও ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে এই আচাৰ্ঘদের কাহারো কাহারো কোনো কোনো বিষয়ে কিছু কিছু মত জানিতে পারা যায়। এই সব সংগ্রহ করিবার চেষ্টা যে মোটেই হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু আরো হওয়া আবশ্যিক। শঙ্করের পূর্বে যে সমস্ত বেদান্তব্যাখ্যাতা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আর এক জন হইতেছেন গৌড়পাদ। শঙ্করের পূর্বের ও পরের বেদান্তকে আমরা যথাক্রমে প্রাচীন ও নব্য নাম দিতে পারি। এই প্রাচীন বেদান্তে গৌড়পাদের স্থান অতি অপূর্ব। ইহার রচিত গ্রন্থের নাম আগমশাস্ত্র। কিন্তু সাধারণত ইহা মাছুকা উপনিষদের গৌড়পাদকারিকা নামে প্রসিদ্ধ। যদিও ইহা আমাদের সংস্কৃত পাঠশালায়

বা টোলেপড়া ও পড়ান হইয়া থাকে, তথাপি, আমার মনে হয়, সাধারণ পাঠকগণের নিকট ইহার গুরুত্ব তেমন অল্পভূত হয় নাই।

ইংবেঙ্গী ১৯২২ সালে কলিকাতায় অখিল ভারতবর্ষীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ-পরিষদের (All-India Oriental Conference) দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন আমার প্রিয় বন্ধু, ও কিছু কালের জন্য সহকর্মী স্বর্গীয় অধ্যাপক সিলভ্যো লেভি (Sylvain Lévi)। আমি ইহাতে আলোচ্য বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবার সুবিধা পাইয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, আগমশাস্ত্র, বিশেষত ইহার চতুর্থ প্রকরণ (অলাভশাস্তি) বৌদ্ধভাবে পূর্ণ। কেবল ইহাই নহে, তাহাতে অনেক বৌদ্ধ শব্দ আছে, এমন কি বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে তাহাতে বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আমার ঐ প্রবন্ধ কয়েক জন পণ্ডিতের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, বৃত্তিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থখানির এখনো যথোচিত ভাবে অনুশীলন হয় নাই। এতদিন পর্যন্ত এই গ্রন্থখানির সমগ্র অংশই নব্য বেদান্ত মতে বৃত্তিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু বস্তুত ইহা করিতে পারা যায় কি না তাহা যথাবিধি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার চেষ্টা কবা হয় নাই।

এই গ্রন্থখানির ভাষ্যকার ক্রীষ্ণরচাৰ্ঘ নামে প্রসিদ্ধ। আমার মনে করিবার কারণ আছে যে, ইনি বেদান্তসূত্রের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার ক্রীষ্ণরচাৰ্ঘ নহেন ২ ইনি এবং ইহার অনুগামিগণ ব্যাখ্যা করিয়া সমগ্র আগমশাস্ত্রে বিশুদ্ধ বেদান্ত দেখিতে পাইয়াছেন। যদিও প্রথম তিন প্রকরণ সম্বন্ধে ইহা সত্য, তথাপি, আমার মনে করিবার কারণ আছে যে, চতুর্থ প্রকরণে তাহা বলা যায় না।

১। ভট্টপ্রপঞ্চ, Hiriyanna : Indian Antiquary, 1924 ; Introduction to Tarakasāngraha. GOS ; ব্রহ্মদত্ত, Journal of Oriental Research, Madras, 1928 ; ত্রিবিড়্যচাৰ্ঘ, Tarakasāngraha, p. 16. শঙ্করের পূর্ববর্তী বহু আচাৰ্ঘের নাম ও পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য—Kane : Pre-Sankara Commentators, Proceedings of the Fifth Oriental Conference, Vol. II.

২। এখানে ইহা আলোচনা কবিত্তেহি না।

৩। ইহাও এখানে আলোচনা কবিত্তেহি না।

চতুর্থ প্রকরণে যে, বস্তুত বেদান্ত আলোচনা করা হয় নাই তৎসম্বন্ধে এখানে অন্ত আর কিছু না বলিয়া এইটুকু বলিলেই চলিতে পারে যে, ইহাতে ব্রহ্ম ও আত্মা এই শব্দ দুটির একটিও চতুর্থ প্রকরণে পাওয়া যাইবে না। উহা বাদ দিলে কেমন বেদান্ত হয় সহজেই বুঝা যায়।

আমার আবো একটি কথা মনে করিবার কারণ আছে। যে, এই চতুর্থ প্রকরণটি একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। অন্তান্ত প্রকরণের দ্বারা ইহা কোনো গ্রন্থের অংশবিশেষ নহে।

কিন্তু এই সব বাহাই বলা যাউক, যতক্ষণ আগম শাস্ত্রের সমস্ত কথা স্মৃতিভাবে আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া দেখা না যাইতেছে ততক্ষণ তাহা গ্রহণ করিতে পারা যায় না। পণ্ডিতগণের এই দিকে মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে আমি আজ এই প্রবন্ধে চতুর্থ প্রকরণের কেবল প্রথম কারিকাটির আলোচনা করিব।

আলোচনার পূর্বে একটা কথা বলিতে চাই। পূর্বে যাহা লিখিয়াছি তাহাতেই বুঝা গিয়াছে, আমি প্রচলিত মতের প্রতিফুলে লিখিতে বসিয়াছি। ইহাতেই অনেকের অসহিষ্ণু হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে। বিশেষত ভাষ্য-কাবের বিরুদ্ধে যখন কিছু বলিতে যাইতেছি, তখন নিষ্ঠাবান বৈদাস্তিকগণ সহজেই কুণিত হইতে পারেন। তাঁহাদের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, জ্ঞানাত্মক যদি সূর্যের সহিত স্পর্শ করিতে পারে, তবেই আমি স্প্রতিষ্ঠিত আচার্যদের সঙ্গে টক্কর লাগাইতে পারি। সে দৃষ্ট আমার নাই। পাগলেরও কথা মানুষ কখনো-কখনো শোনে। তাঁহাদের কাছে আমার অনুরোধ, আমি যেরূপ দেখিতে চেষ্টা করিতেছি সেরূপ দেখা যায় কি না, ইহাই তাঁহারা অপক্ষপাতে ও স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিবেন। আমার নিজের কোনো নির্বন্ধ নাই।

আচার্য গোড়পাদ প্রথম কারিকায় দ্বিপদ-বর (অথবা দ্বিপদ-বর) অর্থাৎ মানবশ্রেষ্ঠকে বন্দনা করিতেছেন। ইনি কে তাহাই আমাদেরগকে নির্ণয় করিতে হইবে। কারিকাটি (৪.১).এই :-

জ্ঞানেনাকাশকল্পেনঃ ধর্মীন্ বো গগনোপমানঃ।

জ্যোতির্ভিন্নঃ সযুক্তঃ বন্দ্যে দ্বিপদাং বরঃ।

‘বিনি আকাশসদৃশ ও জ্যোতি (বিষয়ের) সহিত অভিন্ন জ্ঞানের দ্বারা আকাশসদৃশ ধর্ম (অর্থাৎ বিষয়) -সমূহকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছেন সেই দ্বিপদ-বর (অর্থাৎ মানবশ্রেষ্ঠকে) আমি বন্দনা করি।

এই আক্ষরিক অর্থবাদে কিছুই স্পষ্ট বুঝা যায় না, তাই ভাষ্করাচাৰ্য্য বলিতে হইবে। দ্বিপদ-অথবা দ্বিপদ ‘দ্বীপা-বিশিষ্ট’ এতাদৃশ স্থলে ‘মানবকে’ বুঝায়। দ্বিপদাং বর, অথবা দ্বিপদানাম্ উত্তম (অথবা অগ্র) কিংবা দ্বিপদোত্তম (পালি দ্বিপদোত্তম) একই অর্থ প্রকাশ কবে। এই সকল শব্দকে বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় রূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষণরূপে যথা, “নৈমঘো দ্বিপদাং বরঃ” মহাভাবত, বনপর্ব ৫৭.৪২; দ্বিতরাস্ত্রৈব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, “অভিষ্টৌষি চ যৎ ক্ষতঃ সমীপে দ্বিপদাংবরঃ,” মহাভাবত, আদিপর্ব। বিশেষ্যরূপে অনেক। সংস্কৃত বা পালিতে লিখিত বৌদ্ধসাহিত্যে দ্বিপদোত্তম, (পালি দ্বিপদোত্তম) অথবা পূর্বোল্লিখিত যে-কোনো পর্যায় শব্দ বৃদ্ধকেই বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। এইরূপ নবোত্তম, (পালি নরোত্তম), পুরুষোত্তম (পালি পুরিষোত্তম) বৃদ্ধকেই বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়।

অপব পক্ষে ভাষ্যকার শব্দর আলোচ্য শব্দটিকে পুরুষোত্তম অর্থে গ্রহণ করেন, আব উহার অর্থ হইতেছে ‘নারায়ণ’।

দ্বিপদ-বর শব্দের আসল অর্থ ‘মানবশ্রেষ্ঠ’ ইহা আমরা দেখিয়াছি। নারায়ণকে কি আমরা মানবশ্রেষ্ঠ বলিতে পারি? পুরুষোত্তম বলিতে ‘পরমাত্মা’ অতএব ‘নারায়ণ’ অর্থে ইহার প্রয়োগ সম্ভব। তবে ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, ‘মানব’ বুঝাইতে পুরুষ শব্দের

৫। ঐষ্টব্য ৪৯৬ (ভাষ্যের সহিত)।

৬। ৪২১।

৭। ৩.৩০; ৪.৮৮।

৮। ‘পদ্মো অস্ত দ্বিপদে শং চতুর্পাদে।’ ভাষ্যে, ১০.১৩৫.১।

৯। অভিধানগ্রন্থী পিকা, ১; মহাবঙ্গ, পৃ. ৩০, পৃ. ২৫; হস্তনিপাত, ৮৩, ৯৯৫, ৯৯৮; মহাযুগপতি, § ২৬৭; সমাধি-রাজমুদ্রা, পৃ. ৮, ৫৭ (শেখর হানে অনু্যন ১৩ বার)।

১০। হস্তনিপাত, ৫৪৪ (ঐষ্টব্য ধর্মপদ, ৭৮), ১০২১; মহাযুগপতি, § ১.৪০; মহাবঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৪, ১২৯, ২৩১, ২৬৬।

প্রয়োগ হয়। নরোত্তম শব্দেও আমরা ‘নারায়ণ’কে বুঝি।

এখন আমরা এখানে নারায়ণ বা বুদ্ধকে বুঝিব ইহা নির্ণয় করিতে হইলে কারিকাটিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ভালরূপে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

এখানে প্রধানত দুইটি কথা বিচার করিবার আছে। প্রথম, জ্ঞান-হইতেছে আকাশের সমান, এবং এই জ্ঞান জ্ঞানের বিষয় হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে কোনো ভেদ নাই; দ্বিতীয় হইতেছে ধর্ম অর্থাৎ বিষয় বা পদার্থ-সমূহও আকাশের সমান।

এখন, জ্ঞানকে আকাশের সমান বলিলে আমরা কী বুঝিব একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক। আমাদের গ্রন্থকার ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ উভয়েরই মতে জ্ঞান হইতেছে ‘অসঙ্গ’ অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় বস্তুর কোনো সঙ্গ বা সম্বন্ধ থাকে না; অর্থাৎ ইহা কোনো বস্তুকে গ্রহণ করে না (‘অগ্রহ’ ৩.৩২)। জটব্য—৪.২৬, ২৭, ২২, ২৬, ২৩ এবং লঙ্কা বতারা সূত্র, পৃ ১৫৭—‘অসঙ্গলক্ষণং জ্ঞানম্’।^{১১} যেমন আকাশ অসঙ্গ, কাহারো সঙ্গে আকাশ লাগে না, জ্ঞানও সেইরূপ অসঙ্গ। এই জন্যই বলা হইয়াছে ‘জ্ঞান আকাশসদৃশ’। জটব্য—বোধিচর্যাবতার পঞ্জিকা, পৃ ৩৫৯—‘এবং নিশ্চয়কৃত্বাদাকাশবদ্ অসঙ্গমনাস্পদম্’^{১২} অশেষং বিশ্বমুৎপত্তায়ঃ’

জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ সম্বন্ধে একথা অনেকই জ্ঞানেন যে, ইহা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মত। তাঁহাদের

মতে বাহিরে বস্তুত কোনো কিছু নাই। আমরা যাহা কিছু বাহিরে দেখিতে পাই, বস্তুত তাহা ভিতরেই, বাহিরে আছে বলিয়া কেবল আমাদের মনে হয়। উহা হইতেছে ভিতরে অবস্থিত বিজ্ঞানের পরিণাম। দ্বিষ্টনাগ নিজের আলম্বনপরীক্ষার বর্ষ কারিকায় বলিতেছেন—

যদন্তর্জ্ঞেরূপং তৎ বহির্ব্যবভাসতে ।^{১৩}

‘জ্ঞেয়ের আকারে যাহা ভিতরে আছে তাহা বাহিরের মত বলিয়া প্রকাশ পায়।’

ধর্মকীর্তি স্বকীয় প্রমাণবিশেষে (পত্র ২৭৪ক, পৃষ্ঠা ৭)।^{১৪} এই বিষয়টি সবিশেষ আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন—

সহোপলম্বনিয়মাত্তো নীলতদ্ভিয়েঃ ।^{১৫}

‘নীল ও নীলবুদ্ভি এই উভয়েরই নিরমত এক সঙ্গে উপলব্ধি হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে ভেদ নাই।’

১৪। শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে (২.২.২৮) ও কমলশীল তৎসংগ্রহের (গাইকোয়াড় ও রিচট্যাল সঁরিঙ্গ) স্বকৃত পঞ্জিকা (পৃ ৫৮২) ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই কারিকাটির অপর অর্থ এই—

সোহর্ষো বিজ্ঞানরূপযাং তৎপ্রত্যয়স্যাপি চ ।

জটব্য—

নীল গীতাদি বজ্জ্ঞানে বহির্ব্যবভাসতঃ ।

তত্র সত্যমতো নাশ্চি বিজ্ঞেয়ঃ তদ্বতো বহিঃ ।

—তৎসংগ্রহ পৃ ৫৮২ ।

১৫। এই পুস্তকখানির মূল সংস্কৃত পাওয়া যায় নাই, তবে ইহার তিব্বতী অনুবাদ আছে। তিব্বতীতে ইহার নাম Tshad, ma.rnam.par. nes. pa. ইহা তজুর নামক সংগ্রহের মধ্যে (Tanjur, Mdo, ce, fols. 250^b 6—392^b 1. Cordier III, p. 437.

১৬। ইহাব তিব্বতী অনুবাদটি এইরূপ—

lhan.cig.dmgis.pa.nes.pahi. phyir ।

śūo. dāñ. de. blo. gzen. ma yin ।

Paussin সাহেব দেখাইয়াছেন (Le Boudhisme d'après les sources brahmaniques—Le Muséon, N. S. 1901, pp. 181-182) যে, ইহা আমাদের ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রভুক্তিতে বিরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—আনন্দগিরি ও বাচস্পতিমিত্রের ব্রহ্মসূত্রের (২.২.২৮) টীকা; তাৎপর্যটীকা, পৃ ৪৬৭; সৌতবর্তিকটীকা, পৃ ২৯০; জায়কলনী পৃ ১২৬; অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি পৃ ৯৮; বিবরণপ্রদেয় সংগ্রহ পৃ ৭৫। জটব্য—Indiar Historical Quarterly, Vol. IX, 1933, pp. 979-980

বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদের আলোচনা এক কালে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগুলির সাধারণ বিষয়ের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছিল, যেমন, মীমাংসা শর্শনের শব্দ-কৃত ভাষ্য, ১০.৫; সৌকবর্তিক (নিরালম্ব-ও শূন্য-বাদ) পৃ ২১৭-৩৪৫; ব্রহ্মসূত্র, ২.২.২৮-২৯ ইত্যাদি।

১১। কিন্তু যিপদ, যিপদ, অথবা এইরূপ অল্প কোন শব্দের সহিত সমাস করা কোন শব্দ ‘নারায়ণ’কে বুঝায় বলিয়া আমি জানি না।

১২। নিম্নলিখিত কয়েকটি পৃষ্ঠান্তিতে দেখা যায় যে, কখনো-কখনো জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে। লঙ্কা বতারা সূত্র, পৃ ১৫৭—‘ভদ্রোৎপন্নপ্রধ্বংসি বিজ্ঞানমমুৎপন্নপ্রধ্বংসি জ্ঞানম্; অসঙ্গলক্ষণং জ্ঞানম্ বিবর্তৈচিত্রাসঙ্গলক্ষণং চ বিজ্ঞানম্; অসঙ্গবতাবলক্ষণং জ্ঞানম্; অপ্রাপ্তিলক্ষণং জ্ঞানম্। জটব্য সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপরমিতা, পৃ ৩৯৯—অসঙ্গলক্ষণা। হৃদুতে প্রজ্ঞাপরমিতা। মধ্যমক বৃত্তি, পৃ ৫০০—নিমিত্তালম্বনং বিজ্ঞানং, জ্ঞানেন হি শূন্যালম্বনে ভবিতব্যং। জ্ঞানোৎপাদরূপসংঘতি। জটব্য—৪৯৬।

১৩। Poussin সাহেব দেখাইয়াছেন তিব্বতী অনুবাদের দ্বারা এই পাঠ সমর্থিত হয়—chag. pa. med. pa (অসঙ্গ) ও gnas. med. (অনাস্পদ)।

এই মতবাদ বুদ্ধের নিম্নোক্ত ও তৎসদৃশ উক্তি উপর-
প্রতিষ্ঠিত—

“চিন্তাভ্রমঃ তো জিনপুত্রঃ যদুত ত্রৈধাতুকম্ ।”^{১৭ক}
‘হে জিনপুত্রগণ, তিন লোক বলিয়া বাহা কিছু তাহা কেবল চিন্তা ।’

আরো বলা হইয়াছে, বাহু বিষয় যে বস্তুত আছে তাহা
বালকেরাই মনে করে।^{১৭খ} বাসনার প্রভাবে বিজ্ঞানই
বাহু বিষয়রূপে পরিণত হয়।^{১৮}

আমাদিগকে এখন দ্বিতীয় কথাটি, অর্থাৎ ধর্ম বা বিষয়-
সমূহ আকাশের সদৃশ কেন, ইহা বিচার করিয়া দেখিতে
হইবে। পরমার্থত বাহু বিষয়-সমূহের কোনো অস্তিত্ব
নাই বলিয়া তাহার আরোপিত আকারেই প্রকাশ পাইয়া
থাকে, তাই তাহাদের স্বভাব বলিয়া কিছু নাই (নিঃস্বভাব)
এবং সেই জন্যই তাহার শূন্য। আর এই কারণেই তাহার
আকাশের সদৃশ।^{১৯} শাস্তিদেব স্বকীয় বো ধি চ ধা ব-
তা রে (২.১৫৫) বলিতেছেন—

“সর্বমাকাশসঙ্কাশং পরিগৃহ্যত্বমধিধাঃ ।”

‘বাহার আকার মত তাহার সমস্তকে আকাশসদৃশ বলিয়া গ্রহণ
করুন।’

আকাশ-সদৃশ কেন? প্রজ্ঞাকরমতি পঞ্জিকা য় তাহা
ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, যেহেতু তাহাদের আকার
আরোপিত, যে হেতু তাহাদের কোনো তত্ত্ব নাই
(“সমারোপিততত্ত্বশূন্যত্বাৎ”)।

১৭ক। ব শ ভূ ম ক হ জ, পৃ ৪৯; হ ভা য়িত সং গ্রহ, পৃ ১২;
অ ব র ব জ সং গ্র হে যুত ত ত্ব র ভা ব লী, পৃ ১৮ (জ্যৈষ্ঠ্য Lévi-
Materiux pour l'étude du system Vijnaptimātra, p.43)
বিং শি কা, ১: “বিজ্ঞপ্তিমাত্রসংবৈতৎ”; লঙ্কা ব ত্তা র, ১:৭৭:
“বিজ্ঞপ্তিমাত্রঃ দ্বিভবম্ ।”

১৭খ। লঙ্কা ব ত্তা র, পৃ ২৮৫ -

বাহো ন ক্রিয়াতে হৃদ্যে বধা বাসৈবিক্রিয়াতে ।
বাসনৈলুপ্তিত্ত্বং চিত্তমবধাভাসং প্রবর্ততে ।

এ, পৃ. ২৯৩—

বাসনৈলুপ্তিত্ত্বং চিত্তং ভাবাভাসং প্রবর্ততে ।

১৮। জিং শি ক, ১—

আত্ম ধর্মোপচারো হি বিবিধো বঃ প্রবর্ততে ।
বিজ্ঞান পরিণামোহসৌ ।

স্থিরমতি এখানে লিখিতেছেন—ধর্মণামানন্দ বিজ্ঞানপরিণামাৎ
বহিব্যভাবাৎ ।

১৯। বো ধি চ ধা ব ত্তা র পঞ্জিকা য় (অণু-সম্বন্ধে) বলা হইয়াছে
অতোহভিনিষ্কামাণো নিঃস্বভাবতয়া আকাশঃ শূন্যমেব । পৃ.৫০৩—৫০৫ ।
জ্যৈষ্ঠ্য এ, পৃ ৩৯৫, এবং বিশেষত এই গৌ র পা ধ কা রি কা র ৪.৯৩ ।

নিম্নলিখিত বাক্যটি আমরা অ ষ্ট সা হ প্রি কা প্র জ্ঞা
পা র মি তা য় (পৃ. ২২৭) পাই—

একমেষ হতুতে সর্বধর্মী আকাশগতিকা অনাগতিকা অগতিকা
আকাশসমাঃ । যথাকাশমনাগতবগতমকৃতমবিকৃতমনতিসংস্কৃতমগ্নিতম-
ব্যবস্থিতমহুংপন্নমনিরুদ্ধমেকমেব হতুতে সর্বধর্মী অনাগতা অগতা অকৃতা
অবিকৃতা অনতিসংস্কৃতা অস্থিতা অসংস্থিতা অব্যবস্থিতা অহুংপন্না অনিবদ্ধা
আকাশকল্পদ্বাদবিকল্পাঃ ।^{২০}

‘এই প্রকারই, হে হতুতি, সমস্ত বিষয়েরই গতি আকাশের মত, ইহার
কোথা হইতে আসেও না, কোথাও যায়ও না, যেমন আকাশ কোথা
হইতে আসে না, কোথাও যায় না; ইহাকে করা হয় না, ইহা অবিকৃত,
অনতিসংস্কৃত, ইহা কোথাও থাকে না, কোথাও ব্যবস্থিতও নহে,
ইহার উৎপত্তি নাই, নিবোধও নাই, সমস্ত বিষয়ও এইরূপ, এবং সেই
জন্যই আকাশের সদৃশ, এবং তাহাদের কোনো বিকল্প (অর্থাৎ ইহা
এই বা ঐ ইত্যাদি কল্পনা) নাই ।’

অথবা, জ্ঞান যেমন অসঙ্গ বলিয়া আকাশসদৃশ, ধর্ম-
সমূহও সেইরূপ অসঙ্গ, কারণ তাহাদের বস্তুত অস্তিত্ব না
থাকায় কাহারো সহিত সংসর্গ হইতে পারে না, এবং
এই জন্যই আকাশসদৃশ। মূল গ্রন্থেই (৪.৯৬) বলা
হইয়াছে—

অসঙ্গজ্ঞানসংক্রান্তং ধর্মেষু জ্ঞানমিধ্যতে ।

যতো ন ভ্রমতে জ্ঞানমসঙ্গং তেন কীর্তিতং ।

আকাশ যে অসঙ্গ তাহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক ।

অথবা, ধর্ম সমূহ অসংখ্য, উহাদিগকে গণনা করা যায়
না, এই জন্যও তাহাদিগকে আকাশসদৃশ বলিতে পারা
যায়।^{২১}

২০। নাগার্জুনের সুপ্রসিদ্ধ মূল মধ্যম ক কা রি কা র নীচে
উদ্ধৃত মঙ্গলাচরণটির প্রথম দুই চরণের অধিকাংশই মূল এই ধানে—

অনিরোধমহুংপাদমহুচ্ছেদমশাখতং

অনেকার্থমনানার্থবরনামনির্গমং ।

যঃ প্রত্যত্যা সমংপাদ্য প্রপঞ্চোপশমঃ শিবঃ

দেশনামাস সমুচ্ছত্তং বশ্যে বদতাং বরঃ ।

২১। অ ষ্ট সা হ প্রি কা প্র জ্ঞা পা র মি তা, ২৭৮-২৭৯ :—

সর্বধর্মী অপি হতুতেহ চিন্তা অতুলা অপ্রমেরা অসংখ্যা অসমসমাঃ ।
সর্বধর্মী অপি হতুতেহসংখ্যা গণনাসমভিক্রান্তত্বাৎ সর্বধর্মী অপি
হতুতেহসমসমা আকাশসমত্বাৎ হতুতে সর্বধর্মীণাঃ ।

বো ধি চ ধা ব ত্তা র, ৫.১২ :—

দুর্জনান্ গণনোপমানান্ ।

ইহার পঞ্জিকা য় লেখা হইয়াছে—শত্রবো হি গণনসমত্বাদপার্বভাঃ ।

অথবা, যেহেতু স্বভাবত ধর্মসমূহের উৎপত্তিও নাই নিরোধও নাই, সেই হেতু তাহারা আকাশসদৃশ। লঙ্কা ব ভা রে (১০.১৭২) উক্ত হইয়াছে—

অনিরুদ্ধা অনুৎপাদাঃ প্রকৃত্যা গগনোপমাঃ ।

ধর্মসমূহ ‘নিঃস্বভাব’, স্ব ভা ব বলিয়া ইহাদের কিছু নাই। ২১ক যাহার স্ব ভা ব নাই তাহা আকাশসদৃশ ২২ ।

জ্ঞান ও ধর্মসমূহ কিরূপে আকাশসদৃশ ভাব্যকার তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই। তবে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের যে অভেদ তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। তিনি জ্ঞেয় বলিতে আত্মা ধরিয়া তাহার সহিত জ্ঞানেব অভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার এই ব্যাখ্যাকে অসম্ভব বলিতে পারা যায় না। ২৩

এখানে আবার আলোচনা করিবার আছে। আলোচ্য কারিকাটিতে প্রযুক্ত ধর্ম শব্দের একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। এই শব্দটি এই চতুর্থ প্রকরণে অনূন বাইশ বার ২৪ প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐদৃশ স্থলে এই শব্দটি বৌদ্ধ শাস্ত্রে (সংস্কৃত ও পালি) খুবই প্রযুক্ত হয় ২৫

ইহার ভাবার্থ হইতেছে, ‘বস্তু’, ‘বিষয়’ ‘বাহ্য’ আমরা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গ্রহণ করি’, ‘অর্থ’, ‘পদার্থ’, অথবা ‘প্রমেয়’, আর মূল্যার্থ হইতেছে ‘লক্ষণ’ বা ‘স্বলক্ষণ’, ‘স্বভাব’। ইহা ধারণার্থক ২৬ খাড়া হইতে নিষ্পন্ন। যে হেতু কোনো

বস্তু—তা যে কোন আকারেই ইহা থাকুক,—নিজের অসাধারণ ভাব, বা স্বভাব, বা লক্ষণ অথবা স্বলক্ষণকে ধারণ করিয়া থাকে সেই হেতু ইহা ধর্ম। অ ভি ধ ম’কো শ ভা যো (পৃ. ৬) তাহে—“স্বলক্ষণধারণাদ্ ধর্মঃ।” ২৭ বুদ্ধবোধ ধ ম স জ নি তে (পালি) ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

(১) “অন্তনো পন সত্তাবং ধাবেন্তোতি ধর্মো (= আয়নঃ পুনঃ স্বভাব ধারণরূপীতি ধর্মো) ।

(২) ধারিরন্তি বা পচ্চবেহি (= ধার্ষ্যে বা প্রত্যয়ে) ,

(৩) ধারিরন্তি বা যথাসত্তাবতোতি ধর্মো (= ধার্ষ্যন্তে বা স্বাভাব্যত ইতি ধর্মো) ।”

অর্থাৎ (১) নিজের স্বভাবকে ধারণ কনে বলিয়া ধর্ম, অথবা (২) কারণসমূহের দ্বারা গৃহ্য হয়, কিংবা (৩) স্বভাবানুসারে গৃহ্য হয় বলিয়া ধর্ম ২৮ক

এই অনুসারে বৌদ্ধমতে রূপ, রস, স্পর্শ ইত্যাদি ধর্ম, এবং কেবল ইহারাই আছে, ধর্মী (‘বাহ্য ধর্ম আছে’) বলিয়া কিছু নাই ২৯খ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকেরা বলেন পৃথিবী প্রভৃতি ধর্মী, আর কাঠিষ্ঠ প্রভৃতি তাহার ধর্ম, উভয়ই পরস্পর স্বতন্ত্র। বৌদ্ধেরা বলেন, পৃথিবী বলিতে আমরা কাঠিষ্ঠকেই বুঝি, কাঠিষ্ঠ ছাড়া পৃথিবী বলিয়া আর কিছু নাই।

২১ক। সমগ্র ম ধ্য ম ক শাস্ত্রে এসম্বন্ধে বিপুল বিচার করা হইয়াছে।

২২। বো ধি চ ধী ব ভা র প ক্ষি কা, ৫০৪-৫০৫ :—তৎ কোহয় কারঃ। তত্ত প্রত্যবেক্ষমাণস্ত ভবতি। আকাশসমোহয়ঃ কারঃ। সর্বমেতদ্ আকাশমিতি পত্ততি।

২৩। ঋষ্টব্য ৩৩০—

অকল্পকমজ্ঞ জ্ঞান জ্ঞেয়ান্তিঃ প্রচক্ষতে ।

ব্রহ্ম জ্ঞেয়মজ্ঞ নিত্যবজ্ঞেনাং বিবুধ্যতে ।

২৪। ৪.১, ৬, ৮, ১০, ২১, ৩০, ৪১, ৪৬, ৫৩, ৫৪, ৫৮, ৫৯, ৮১, ৮২, ২১, ২২, ২৩, ২৬, ২৮, ৩১ । অন্ত প্রকরণেও (২.২৫ ; ৩১) ইহার প্রয়োগ আছে, কিন্তু বিভিন্ন অর্থে।

২৫। বধা, অ ষ্ট সা হ ত্রি কা প্র জা পা র সি ভা, পৃ. ৩৯—সর্বধর্মী অপি দেবপুত্রা দারোপমাঃ স্বযোগমাঃ ; ধর্মপদ, ২৭৯—সর্বের দ্বারা অনন্তাতি।

২৬। Bib.Budh.ed. ইহার মূল সংস্কৃত এখনো পাওয়া যায় নাই। তিকতী অনুবাদ আছে। এই বচনটি তিকতী অনুবাদ হইতে পুনর্বার সংস্কৃতে উদ্ধার করা হইয়াছে। তিরস্কর অনুবাদটি এই—raṅgi. mtshan. ŋid.hdzin. paḥi.phyir. chos.te । ঋষ্টব্য ম ধ্য ম ক বৃ ত্তি (Bib.Budh.), পৃ. ৬০৪, ৪৫৭।

২৭ক। উল্লিখিত পালি-বচনটি Expositor পৃ. ৫০ (Pali Text Society) এইরূপে অনুদিত হইয়াছে—“Dhammas may be defined as those states which bear their own intrinsic natures, or which are borne by causes in relation, or which are borne according to their own characteristics.”

২৭খ। বো গ হু ত্তের (৩.১৩) ব্য-স-ভাষ্যে ইহারই উল্লেখ করা হইয়াছে—“অপর আহ ধর্মী ন ভাষ্যিকো ধর্মী পূর্বতদানতি ক্রমাৎ।”

আর্যদেব স্বকীয় চতুঃশতকে (৩০৯) ২৮ বলিয়াছেন—

“কঠিনা দৃষ্টতে ভূমিঃ সাপি কারেন গৃহতে ।

ভেন হি কেবল স্পর্শো ভূমিরেবেতি কথ্যতে ॥” ১১

‘ভূমিক কঠিন বলিয়া দেখা যায়, এবং ইহা শরীর দ্বারা গৃহীত হয়। অতএব বলা হইয়া থাকে যে, এই ভূমি হইতেছে কেবল স্পর্শ ॥’

এ মত প্রবর্তী উপনিষদেও পাওয়া যায়। গর্ভো প নি
ষ দে (১) উক্ত হইয়াছে— “তত্র যৎ কঠিনং সা পৃথিবী ॥”

Stcherbatsky সাহেব নিজের *The Central Conception of Buddhism* নামক পুস্তকে (পৃ ২৬) ইহাই বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

‘If we say “earth has odour, etc.,” it is only an inadequate expression ; we ought to say “earth is odour, etc.,” since besides these sense data there is absolutely nothing which the name could be applied to.’ ১০

এখানে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, অন্ত্যান্ত দর্শনের
জ্ঞায় বৌদ্ধ দর্শনে অবয়ব ভিন্ন অবয়বী বলিয়া কিছু নাই।

২৮। লেখকের নিজের সংস্করণ। চন্দ্রকীর্তির টীকার সহিত এই গ্রন্থখানি
মধ্যে মধ্যে খণ্ডিত আকারে পাওয়া গিয়াছে। স্বর্ণায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
মহাশয় প্রথমে ইহা এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশ করেন। পরে
শ্রীযুক্ত পি. এল. কৈয়া মহাশয় ইহার শেষ নয় প্রকরণ ফরাসী অনুবাদের
সহিত তিব্বতী অনুবাদ ও মূল সংস্কৃত, এবং লুপ্ত মূল স্থলে তিব্বতী হইতে
পুনরুদ্ধৃত সংস্কৃতের সহিত প্রকাশ করেন। ইহার পরে বর্তমান লেখকও
বৈদ্য মহাশয়ের ছাপ আর একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন।

২৯। মূল সংস্কৃত কারিকাটি পাওয়া যায় নাই, ইহা তিব্বতী হইতে
লেখক কর্তৃক পুনরুদ্ধৃত। তিব্বতী অনুবাদটি এই—

Sa. ni. brtan. zes. bya. bar. mathon !
de. yañ. lus. kyis. ḥdzin. par. ḥgyur !
des. na. reg. pa. ḥbañ. zig. ḥdi !
sa. ḥo. zes. ni. bya. bar. brjod !!

অষ্টব্য অ ভি ধ ম্ কো শ ও অ ভি ধ ম্ কো শ ব্যা থ্যা
(Bib. Budh.) পৃ ৬২—“পৃথিবীভাষ্যঃ কতমঃ। কক্খটম্মসিতি।
বিস্তরঃ ॥” অধ্যায়ক বৃ স্তি (Bib. Budh.), পৃ ৬৬-৬৭—“ইহ তু
কাট্টিতাদিবাতিরিক্তপৃথিব্যাদ্যসম্ভবে সতি ন যুক্তোপনিষদ্যবিশেষণভাবঃ।
এক পৃথিব্যাধীনায় যদ্যপি কাট্টিতাদিবাতিরিক্তং বিচার্যমাণং লক্ষ্যং নাস্তি
লক্ষ্যাবতিরেক্ষ চ লক্ষণং নিরাশ্রয় তথাপি সংবৃত্তিরেবেতি ॥”

৩০। তিনি সেখানে অ ভি ধ ম্ কো শ ব্যা থ্যা (২) হইতে
নিম্নলিখিত বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—“পৃথিবী প্ৰসবতীভূত্বে
রূপগন্ধরসস্পর্শভ্যো নাশ্চ দর্শনিত্বং শক্যতে ॥” Cf. Soul Theory,
p. 742.

এই নিমিত্তই নিম্নলিখিত ও তৎসদৃশ বহু কথা বৌদ্ধশাস্ত্রে
দেখা যায়—

“নাস্তীহ সত্ত্ব আত্মা বা ধর্মীভ্যন্তে সত্ত্বত্বকাঃ ॥” ১১

এই ধর্ম আর সাত্ব্যদের তত্ত্ব একই। তত্ত্ব (=
তৎ-ত্ব) ‘তাহার ভাব’, অর্থাৎ ‘তাহার স্বভাব’। এইরূপে
তত্ত্ব বস্তুত গুণ। তাহা হইলেও সাত্ব্যের পঞ্চবিংশতি পদার্থের
এক-একটিকে তত্ত্ব বলা হয়, তত্ত্ব বৎ (অর্থাৎ ‘তত্ত্ববৃত্ত’)
নহে। যখন সত্ত্ব, রজ্জ (স্), ও তম (স্) সমান অবস্থায়
(সাম্যাবস্থা) থাকে তখন তাহাদিগকে এক করিয়া প্র কৃ তি
বলা হয়। প্রকৃতি নিজেই একটি তত্ত্ব, ইহার কোন তত্ত্ব
নাই ১২ সাম্যাবস্থায় স্থিত তিনটি গুণই প্রকৃতি, ইহার কোন
গুণ নাই। তথাপি কখনো কখনো প্রামাণিক গ্রন্থে দেখা
যায় যে, প্রকৃতির তিন গুণ। সাত্ব্যদর্শনে গুণ ও গুণী
অর্থাৎ দ্রব্যের ৩৩ মধ্যে যে কোনো ভেদ নাই
(গুণদ্রব্যয়োত্তাদাত্ম্য) অথবা ধর্ম-ধর্মীর মধ্যে যে কোনো
ভেদ নাই (ধর্মধর্মিণোরভেদঃ) তাহা সুপ্রসিদ্ধ ১৪ অথবা
বুদ্ধ চ রি তে (১২.৭৬) লিখিয়াছেন—

“গুণিনো হি গুণানাং চ ব্যতিবেকো ন বিদ্যতে ।

রূপোক্তাত্ম্যং বিরহিতো ন হৃদিকপলভ্যতে ॥”

বহুবদ্ধু নিজেব বি ল্প স্তি মা ত্র তা সি দ্ধি তে সাত্ব্যের
তত্ত্ব বুঝাইতে ধর্ম শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন ১৪ক

৩১। অধ্যায়ক বৃ স্তি তে (পৃ ৩৫৫) ভগবানের (অর্থাৎ
বুদ্ধদেবের) উক্তি বলিয়া ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩২। অষ্টব্য সা থ্যা সং গ্র হে (চৌধাধ্যা সংস্কৃত সৌবিজ) সংগৃহীত
তত্ত্ব ব্যা ধা র্থী প নী, পৃ ৭২-৯৩।

৩৩। বহুবদ্ধু (অ ভি ধ ম্ কো শ, Poussin, ১.২১০) দ্বার-
বৈশেষিক মতকে অনুসরণ না করিয়া দ্রব্যের লক্ষণ দিয়াছেন—“বিদ্যমান
দ্রব্যম্ ॥” যশোমিত্রে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“যৎ ফলকপতো বিদ্যমান
তদ্র দ্রব্যম্ ॥” বিজ্ঞানভিকুর উপব দ্বার বৈশেষিকের প্রভাব বর্ণেই ছিল।
তিনি লিখিয়াছেন (সা থ্যা দর্শ ন ১.৬১) “অয়ং পঞ্চবিংশতিকো পণ্ডো
দ্রব্যরূপ এব। ধর্মধর্মজ্ঞেদান্ত্ গুণকর্মসামান্যাদীনামদ্রব্যান্তর্ভাবঃ ॥”
তুলনীয়—ধর্মধর্মজ্ঞেদান্ত্ দ্রব্যানামপি ভিন্নাত্তা স্তুতা (১-৬২) ॥”

৩৪। আবার অষ্টব্য সা থ্যা দর্শ নের (২.৫) বিজ্ঞানভিকুর
ভাষ্য। এখানে নিম্নলিখিত দ্রোণকটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

“শক্তিপত্তিমতোর্ভেদং পশ্যন্তি পরমার্থতঃ ।

অভেদং চানুপশ্যন্তি বোগিনস্তথচিন্তকাঃ ॥”

৩৪ক। Stcherbatsky *The Central Conception of Buddhism*, p. 27, n. 2.

আলোচ্য অর্থে ধর্ম শব্দের প্রয়োগ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে কোথাও হয় নাই, ইহা বলা যায় না। আমি একটি অতি-প্রাচীন প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াছি। ক ঠা প নি ব দে (১.১.২১) উক্ত হইয়াছে “অগুরেব ধর্মঃ”। শঙ্করাচার্য ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন “আত্মাখ্যো ধর্মঃ”, অর্থাৎ এখানে ধর্ম বলিতে আত্মা।^{৩৫}

আগমশাস্ত্রের চতুর্থ প্রকরণের এই ও আরও কয়েকটি স্থানে শঙ্করাচার্য ধর্ম-শব্দে আত্মা ধরিয়াছেন। ইহা কষ্ট-কল্পিত মনে হয়। গৌড়পাদ আত্মা বুঝাইতে বহু স্থানেই আত্মা অথবা জীব এই দুই শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।^{৩৬} এই দুই স্বপ্রসিদ্ধ শব্দ থাকিতেও কেন তিনি ঐ অর্থে ধর্ম শব্দ প্রয়োগ করিলেন, এ প্রশ্ন সহজেই মনে হয়।

এই চতুর্থ প্রকরণে অন্যান্য বাইশ বার ধর্ম-শব্দের প্রয়োগ আছে, এবং সর্বত্রই বৌদ্ধশাস্ত্রের স্থায় ‘পদার্থ’ অর্থে ইহাকে ধরিতে পারা যায়। শঙ্করাচার্য যদিও উহার অর্থ আত্মা কবিয়াছেন, তথাপি সর্বত্র তাহা করিতে পারেন নাই। কোনো কোনো স্থলে তিনি তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই। হস্ত তাঁহার মতে তাহা আবশ্যিক ছিল না। এই সকল স্থানে আত্মা অর্থ ধরিতেই পারা যায় না। যেমন, “সর্ব-ধর্ম্য মূখ্য স্বপ্নে” (৪.৩৩), এখানে ধর্ম-শব্দে আমরা আত্মা ধরিতে পারি না। দুই স্থানে তিনি আত্মা অর্থ না কবিয়া লিখিয়াছেন “হৃদ্যাদীন বাহুধর্ম্যান্” (৪.৪১), “বাহু

ধর্ম্যঃ” (৪.৫৪)। এখানে স্পষ্টতই ‘পদার্থ’ অর্থ দেখা যাইতেছে। এক জায়গায় লিখিয়াছেন—“আত্মানোহন্তো চ ধর্ম্যঃ” (৪.৫৮)। আর এক স্থানে (৪.৮২) স্পষ্টই লিখিয়াছেন—‘বস্তু’।^{৩৭}

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। গ্রন্থকাবের নিজেরই কথায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম ও ভাব (=পদার্থ, বস্তু) এই শব্দ দুইটি একার্থক। স্রষ্টব্য—

- (১) অজ্ঞাতস্তেব ভাবস্ত (৩.২০ ক) = অজ্ঞাতসেব ধর্মস্য (৪.৬ ক)
- (২) অজ্ঞাতো হনুতো ভাবঃ (৩.২০ গ) = অজ্ঞাতো হনুতো ধর্মঃ (৪.৬ গ);
- (৩) স্বভাবেনাহুতো যস্য ভাবঃ (৩.২২ গ-ঘ) = স্বভাবেনাহুতো কস্য ধর্মঃ (৪.৭ গ-ঘ)।

এখানে দেখা যাইবে গ্রন্থকার তৃতীয় প্রকরণে যেখানে ভাব শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, চতুর্থ প্রকরণে সেখানে ধর্ম শব্দ লিখিতেছেন। অন্ত্র কোনো প্রকরণে তিনি এরূপ করেন নাই, যদিও করিবার যথেষ্ট স্থান ছিল। মনে হয় এই ঘটনার দ্বারা চতুর্থ প্রকরণেব সঙ্গে বৌদ্ধ মতের সম্পর্ক সূচিত হইতেছে।

এখানে আর একটা কথা ভাবিবার আছে। কারিকাটিতে বলা হইয়াছে যে, গ্রন্থকার সেই মানবশ্রেষ্ঠকে বন্দনা করিতেছেন যিনি ধর্মসমূহকে ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন। এখন যদি ইহাতে নারায়ণকে বঝিতে হয় তবে প্রশ্ন উঠে—ইহার প্রমাণ কি? কোথায় কি প্রমাণ আছে বাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, নারায়ণ জ্ঞেয় হইতে অভিন্ন ও আকাশসদৃশ জ্ঞানের দ্বারা আকাশসদৃশ ধর্মসমূহকে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন? অপব পক্ষে বুদ্ধ যে এরূপ করিয়াছিলেন তাহা বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়।

কেবল ইহাই নহে, চতুর্থ প্রকরণের অন্ত্যন্ত বহু স্থান ভাল করিয়া আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রথম কারিকায় বুদ্ধকেই বন্দনা করা হইয়াছে।

৩৫। পূর্বে আমরা ধেরূপ দেখিয়া আসিলাম তাহাতে আত্মা নিশ্চয়ই ধর্ম হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম শব্দে এখানে আত্মাকে উল্লেখ করা হইয়াছে কি না বিচার্য। আমার মনে হয়, ইহা করা হয় নাই। কারণ এই ২০শ হইতে ২২শ শ্লোকের মধ্যে আত্মাব উল্লেখ নাই। সান্ন্যাস মরিলে তাহার পব. সে থাকে কি না ইহাই বিচার্য, এবং “অগুরেব ধর্মঃ” বলিয়া এই বিষয়টিকে উল্লেখ করা হইয়াছে। “দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতঃ পুরা ন হি হৃজ্জেরমগুরেব ধর্মঃ” (২১) ইহা দ্বারা স্পষ্টই এ কথাটি বুঝা যায়।

৩৬। নিতান্ত চানিয়া ব্যাখ্যা না করিলে এখানে আত্মাকে ধরা যায় না।

৩৭। আত্মা—১.১২; ২.১২, ১৭; ৩.৪, ৭, ৮, ১১, ১৩, ১৪। জীব—১.১৬; ২.১৬; ৩.৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১১, ১৩, ১৪, ৪৮; ৪.৬৩, ৬৮, ৬৯, ৭০।

৩৭। মূল কারিকার অংশ হইতেছে—“যস্য কস্য চ ধর্মস্য।” শঙ্কর ব্যাখ্যা করিতেছেন “যস্য বস্যাচ্চি কন্তনঃ।” এই পাঠ হইতেছে আনন্দাশ্রম গ্রন্থমালার চ-নামক পুথির। কোনো কোনো পুথিতে “বস্তুনঃ” শব্দের পূর্বে ‘দ্রব্য’ শব্দ বোধ করা হইয়াছে।

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক

বিগত সংখ্যায় ১৯২১ সালে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক তিনটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের সমস্ত সম্পত্তি ও দায় গ্রহণ করে। কিন্তু পূর্ব পরিচালকগণই (Directors) নিজ নিজ প্রদেশে পরিচালকরূপে অধিষ্ঠান করিতে থাকেন। প্রাদেশিক পরিচালক বোর্ডের উপরে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বোর্ডের সভ্যগণ বৎসরে একবার কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে সমগ্র ব্যাঙ্কের কার্য পর্যালোচনা করিবার জন্ত সম্মিলিত হইতেন। তিনটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে বেয়ারেবি থাকায় তিনটি ব্যাঙ্কেই এইরূপ সমভাবে কৃতার্থ করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

এই তিনটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের সম্মিলিত মূলধন সাত কোটি টাকা ছিল। এই সব ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের অংশীদাররূপে গ্রহণ করা হয় এবং শেষোক্ত ব্যাঙ্কের মূলধন ১৫ কোটি টাকা নির্দিষ্ট হয়। মূলধনের অতিরিক্ত টাকা নূতন অংশ বিক্রয় করিয়া তোলা হয় এবং প্রাদেশিক ব্যাঙ্কসমূহের অংশীদারগণকে তাহাদের পুরাতন অংশের দ্বিগুণ পরিমাণ নূতন অংশ কিনিবার অধিকার দেওয়া হয়। প্রত্যেক অংশের মূল্য ৫০০ টাকা নির্দিষ্ট হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠিত হয় :—

(১) কেন্দ্রীয় বোর্ডের মনোনয়ন অস্থায়ী বড়লাটের নিয়োজিত দুই জনের অনধিক ম্যানেজিং গবর্নর। বড়লাটের ইচ্ছা উপর তাহাদের কার্যকাল নির্ভর করিত।

(২) অংশীদারগণের প্রতিনিধি স্বরূপ তিনটি প্রাদেশিক বোর্ডের সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং কর্মধ্যক্ষ।

(৩) বড়লাটের মনোনীত কারেন্সী কন্ট্রোলার কিংবা ঐকপ কোন উচ্চ রাজকর্মচারী একজন।

(৪) করদাতা ও সর্বসাধারণের স্বার্থ দেখিবার জন্ত বেসরকারী সভ্য চারিজন।

স্থানীয় বোর্ড স্ব-স্ব প্রদেশে ব্যাঙ্কের সাধারণ কাজকর্ম সম্পাদনে পরামর্শ ও সাহায্য দান করিত। ব্যাঙ্কের মূলনীতি নির্ধারণ করা, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অর্থের পরিমাণ বরাদ্দ করা, ব্যাঙ্কের স্বদের হার ঠিক করা, সাপ্তাহিক আয়ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করা, প্রাদেশিক বোর্ডের কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান করা— এই সব কাজ ছিল কেন্দ্রীয় বোর্ডের অন্তর্গত। জনসাধারণের মূলধনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহাদ্বিগকে একদিকে যেমন বেসরকারী ব্যাঙ্ক মনে করা যাইতে পারে, অন্যদিকে গবর্নমেন্টের বিশেষ আইন-মূলে ইহা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, সরকারী তহবিল ইহাতে রক্ষিত হওয়ায়, সরকারী কাজকর্ম ইহার মারফতে সম্পন্ন হওয়ায় এবং ইহা বহুলাংশে গবর্নমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকায় ইহাকে সরকারী ব্যাঙ্ক বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত এক দিক দিয়া ইহার সাদৃশ্য থাকিলেও, অস্ত্রান্ত্র কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। যথা, বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচা করা, বিদেশ হইতে আমানত সংগ্রহ করা, স্থাবর সম্পত্তি মূলে বা ছয় মাসের অধিক কালের জন্ত টাকা ধার দেওয়া, অন্যান্য দুই জন ব্যক্তির জামিন ব্যতীত শুধু ব্যক্তিগত মাতবরিতে টাকা ধার দেওয়া ইত্যাদি কাজকর্ম ইহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। গবর্নমেন্টের অনুমতি ভিন্ন ভারতের বাহিরে পরিশোধনীয় হুণ্ডি জন্মবিক্রয় করিবার অধিকারও ইহার ছিল না।

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পর গবর্নমেন্টের সমুদয় তহবিল কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে ও তাহাদের শাখা-আগিসসমূহে রক্ষিত হইত। যে যে জেলা বা মহকুমায় ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের শাখা ছিল না,

সেই সেই স্থানে দৈনন্দিন প্রয়োজন অল্পমাত্রী তহবিল সরকারী ট্রেজারিতে রাখিয়া বাকী অর্থ এলাকাভূক্ত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে চালান করা হইত। সরকারী ঋণ সম্পর্কীয় সমুদয় কর্ম, যথা, হিসাবাদি রক্ষা করা, ঋণের স্বয়ং দেওয়া, আবশ্যক হইলে নূতন ঋণ বিলি করা ও ভুক্ত টাকা গ্রহণ করা ইত্যাদি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক মারফতেই সম্পন্ন হইত। এই সব কাজ-কর্মের জন্য ব্যাঙ্ক অবশ্য গবর্ণমেন্ট হইতে একটা কমিশন পাইত। প্রাদেশিক ব্যাঙ্কসমূহের মোট ৫০টি শাখা ছিল। কিন্তু ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার পর আরও ১০২টি শাখা খোলা হয়। যে সব স্থানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা আছে সেই সব স্থানে জনসাধারণ বাহাতে ব্যাঙ্ক-মারফতে অল্প খরচে টাকা পাঠাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বে এক্ষেত্রে সাধারণতঃ শতকরা ১০ আনা কমিশন দিতে হইত। সেই স্থলে শতকরা ৮ আনা কমিশনে টাকা পাঠাইবার সুবিধা সর্বসাধারণকে দেওয়া হয়। পরে উহা আরও হ্রাস করিয়া ২০ আশ আনা করা হয়। পূর্বে অধিক কমিশন দিয়া গবর্ণমেন্ট ট্রেজারি মারফতে এই কাজ করিতে হইত। কিন্তু ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার পর যে যে স্থানে এই ব্যাঙ্ক আছে, সেই সেই স্থানে ট্রেজারি মারফতে টাকা পাঠান গবর্ণমেন্ট বন্ধ করিয়া দেন। বলা বাহুল্য, এই সব ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক বা ট্রেজারির প্রত্যেকবার নগদ টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হইত না। টাকা দাখিল করিয়া প্রেরক একখানা ড্রাক্ট বা 'পে অর্ডার' প্রাপ্ত হইতেন এবং প্রাপক তাহা স্বানীয় ব্যাঙ্ক বা ট্রেজারি হইতে উহা ভাড়াইয়া লইতেন।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ

কিন্তু ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার দ্বারা শাখা ব্যাঙ্কের প্রসার, উচ্চতর ব্যাঙ্কিং প্রথার খানিকটা প্রচার হইলেও, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই; ভারতের জনমত অস্ত্রান্ত্র স্বাধীন দেশের দ্বায় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক স্বাধীনে যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান আশা করিয়াছিল, সে আশা তাহাদের পূর্ণ হয় নাই। সরকারী তহবিলের ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার সর্ববিধ সুবিধা ইহা ভোগ করিতেছিল; কিন্তু যে-সরকারী ইংরেজ কর্তৃক স্বাধীনে থাকায় ইহা হইতে ভারতবাসীরা যথোচিত

সাহায্য ও সহায়ভূতি পাইতেছিল না। বিলাতী কোন ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের উচ্চপদ লাভ বরা দূরের কথা, শিক্ষা-নবিশরূপে প্রবেশ করা পর্যন্ত দুঃস্থ। সবকারী অর্থে পুঁই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে শিক্ষানবিশী কাজে ভারতবাসীকে নেওয়া হইবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া বস্তুত ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ-গণের এই সম্পর্কে কোনরূপ উৎসাহ দেখা যায় নাই। বিদেশী ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে যেমন, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বেলায়ও তেমনি—ইংরেজ ব্যবসায়ী ও বনিকগণ এই ব্যাঙ্কের যেমন সহজে অল্পগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হয়, দেশীয় লোকের পক্ষে যোগ্যতা থাকিলেও উহা লাভ করা সম্ভব হয় নাই। ইহার কারণ অল্পসন্ধান করা কঠিন নহে। ব্যাঙ্কের অধিকাংশ ম্যানেজার বা কর্মধ্যক্ষই ইংরেজ। মফঃস্বলের দেশীয় বণিক বা মহাজনদের সহিত ইহার সাধারণতঃ মেলামেশা করেন না। তাহাদের অবস্থা, তাহাদের অভাব অভিযোগ ইহাদের জানিবার আশ্রয় নাই, সুযোগও হয় না। মফঃস্বলের শাখা আপিসে আমানত বাবদ যে টাকা পাওয়া যায় তাহার সামান্য অংশই স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রয়োজনে নিয়োজিত হইতে পারে। অধিকাংশ আমানতী টাকাই প্রাদেশিক প্রধান কার্যালয়ে প্রেরিত হয়। সরকারী অর্থে ও সরকারী সাহায্যে ব্যাঙ্ক যে প্রচুর লাভ করিয়া থাকে তাহার বোল আনাই ব্যাঙ্ক লইয়া থাকে, ইহাও মোটেই গ্রাস-সক্ত নহে। এই লাভের একটা অংশ গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য হওয়া উচিত ছিল। অস্ত্রান্ত্র দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জাতীয় কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে ভাবে কার্য করিয়া থাকে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক দ্বারা সেই উদ্দেশ্য কোন অংশে সাধিত হয় নাই। বরঞ্চ মফঃস্বলে ইহাদের বহু শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিকে ইহাদের সহিত এক অসম ও অনভিপ্রেত প্রতিযোগিতার মধ্যে গড়িয়া বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছিল। ভারতীয়দের স্বার্থের প্রতি ওদাসীদত্ত, উচ্চ-লাভের দিকে ধরদৃষ্টি—অথচ ভারত-সরকার কর্তৃক ইহার পুষ্টি—এই অবস্থার বৈসাদৃশ্য ভারতীয় জনমতকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে আর একটি বড় অভিযোগ এই ছিল যে, নোট প্রচলন ও তৎসহ মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের ভার স্বরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হায় ইহার হাতে দেওয়া হয়

নাই। স্বর্ণমান তহবিল (Gold Standard Reserve) ও বিলাতের দক্ষিণা (Home Charges) বাবদ ইংলণ্ডকে আমাদের যে টাকা দিতে হয়, সেই টাকা পাঠাইবার ভারও ইহার উপর স্তম্ভ হয় নাই। এই কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কর্তব্য—দেশের ভিতর প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের সূনিয়ন্ত্রণ—ইহার পক্ষে মোটেই সম্ভব হয় নাই। একদিকে গবর্ণমেন্টের হাতে ছিল নোট প্রচলনের ক্ষমতা, নোট ও স্বর্ণমান তহবিল এবং বিলাতের দক্ষিণার টাকা পাঠাইবার অধিকার; অন্যদিকে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের হাতে ছিল ধার বা ক্রেডিট সৃষ্টির ক্ষমতা। ভারতের টাকার বাজারে এই দ্বিবিধ শক্তি কাজ করিতেছিল। ফলে পণ্যমূল্য স্থির রাখিবার জন্য প্রয়োজনমত অর্থ সম্প্রসারণ বা সংকোচন নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হইতেছিল না এবং আর্থিক ব্যবস্থা একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া দেশের কল্যাণার্থ পরিচালিত হইতে পারিতেছিল না। শুধু তাহাই নহে, ভারতের বহির্বাণিজ্যে প্রতি বৎসর যে ছয় শত কোটি টাকার আদান প্রদান হইয়া থাকে তাহার প্রায় চৌদ্দ আনা কাজই ইউরোপীয়েরা করিয়া থাকে। এই বিরাট বহির্বাণিজ্য হইতে কমিশন, দালালি, বীমা কিস ইত্যাদি বাবদ যে প্রভূত অর্থ লাভ হয় তাহার অধিকাংশও ইহারাই পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, যুরোপীয় বিনিময় (exchange) ব্যাঙ্ক হইতে বিদেশী ব্যবসায়িগণ যে আর্থিক সাহায্য ও সুপারিশ লাভ করিয়া থাকে দেশীয় বণিকগণের ভাগ্যে তাহা লাভ করা সুদূরপরাহত। এই সব বিদেশী বিনিময়-ব্যাঙ্ক ও তাহাদের বিদেশী গ্রাহকগণই ভারতের বহির্বাণিজ্যে একাধিপত্য করিতেছে। বিদেশী মুদ্রা কেনা-বেচা সম্বন্ধে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের উপর নিষেধ থাকায় ইহাদের পক্ষে এই ক্ষেত্রে একাধিপত্য করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জনের সুবিধা হইয়াছে। ইহা অনুমান করা হয়ত অসম্ভব হইবে না যে, যুরোপীয় ব্যাঙ্কগুলিকে অসুবিধায় না ফেলিবার জন্যই বিদেশের সহিত অর্থের লেনদেন, ভারতের বাহিরে আমানত সংগ্রহ, বিনা জামিনে দেশ হইতে অর্থ ধার করা, ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। অন্ত্যস্ত বৈদেশিক ব্যাঙ্ক আমাদের দেশে নিরাপত্তিতে আমানত সংগ্রহ এবং সর্ববিধ কার্য্যই করিতে পারিবে; অথচ গবর্ণমেন্ট-পৃষ্ঠপোষিত

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক ভারতের বাহির হইতে টাকা আমানত বা ধার গ্রহণ করিতে পারিবে না, ইহার অস্ত্র কোনরূপ সূক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অন্যান্য দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে “ব্যাক্স” ব্যাঙ্ক বলা হয়। অর্থাৎ এই ব্যাঙ্ক অন্যান্য সকল ব্যাঙ্কের সঙ্কীর্ণ নগদ তহবিল গচ্ছিত রাখে, এবং অন্য সকল ব্যাঙ্কের উপর অনেকটা মুকবির ন্যায় অবস্থান কবে। এইরূপে উহাদের কার্য্যকলাপের উপরও ইহা যথেষ্ট পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। যদিও ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের নিকট অনেক ব্যাঙ্কের সঙ্কীর্ণ তহবিল গচ্ছিত থাকিত, কিন্তু তাহার পরিমাণ মোটেই বেশী ছিল না এবং তৎক্ষণাত আইনসম্মত কোনরূপ বাধ্যবাধকতাও ছিল না। এই সব নানা কারণে এই দেশের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ও টাকার বাজারে পারস্পরিক সম্বন্ধবিশিষ্ট একটা কেন্দ্রীয় শক্তি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত শক্তি পরস্পর স্বাধীনভাবে কাজ করার ফলে, এই কঠিন প্রতিযোগিতার দিনে আমাদের পক্ষে পদে পদে আর্থিক বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা

সেই জন্যই খাঁটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জনসাধারণের তরফ হইতে সমভাবে চলিতে থাকে এবং গবর্ণমেন্টও ভারতের দাবীর স্তায়পরতা ও সুস্বতন্ত্রতা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ১৯৩৫ সালে “রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া” প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের দীর্ঘ দিনের দাবী পূরণ করিয়াছেন। এই নূতন ব্যাঙ্কের গঠনপ্রণালী ও কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে দেশীয় বিশেষজ্ঞগণের কোন কোন বিষয়ে আপত্তি থাকিলেও ইহা যে জাতীয় ব্যাঙ্কের সূত্রপাত করিয়াছে তৎসম্বন্ধে সম্ভবতঃ সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ইহাকে অন্ত্যস্ত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্তায় “ব্যাক্স” ব্যাঙ্ক বলা যাইতে পারে। অন্ততঃ সেই উদ্দেশ্য সাধন করা ইহার অন্ততম মূল নীতি। ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই ব্যাঙ্ক মুদ্রা-নীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক অর্থের বিনিময়, ও ভারত গবর্ণমেন্টকে যে অর্থ ঠালিঙে দিতে হয় তাহা পাঠাইবার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছে। স্বর্ণমান তহবিল (Gold Standard Reserve)

ও নোট তহবিল (Paper Currency Reserve) এই সময় হইতে একত্র করিয়া ব্যাঙ্কের কর্তৃত্বাধীনে দেওয়া হইয়াছে। ভারত-সরকারের নোট এখন এই ব্যাঙ্ক ব্যবহার করিতেছে; কিন্তু যথাসময়ে এই ব্যাঙ্কের নিজস্ব নোট এই সব পুরাতন নোটের স্থান অধিকার করিবে। ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের ক্যাশ তহবিলের নির্দিষ্ট অংশ এই ব্যাঙ্কে জমা রাখিবার পর ইহা মাতব্বর ব্যাঙ্ক হিসাবে দেশের দানন বা ঋণ-নিয়ন্ত্রণের (Credit Regulation) ভার গ্রহণ করিয়াছে। এবং এই বৎসর ৪ঠা জুলাই হইতে ইহা 'ব্যাঙ্ক রেন্ট' ঘোষণা করিতে শুরু করিয়াছে। এক্ষণে এই ব্যাঙ্ক তাহার প্রভূত ক্ষমতার সম্ব্যবহার করিতে পারিলে দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের অর্থাত্তাব অনেকটা দূর করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য, কার্যক্ষেত্রে দেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি উদার সহায়ত্বসম্পন্ন সুপরিচালনার উপর উহা প্রধানতঃ নির্ভর করিবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাঠামো

এখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া'র গঠন-কাঠামো ও ইহার প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বের কার্যসংক্রান্ত ইতিহাস দেওয়া আবশ্যিক। এই ব্যাঙ্কের প্রস্তাবনার সূচনায় প্রথম মতভেদ উপস্থিত হয়,—ইহা সরকারী মূলধনে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক (State Bank) হইবে, কি, সর্বসাধারণের মূলধনে বৌধ ব্যাঙ্ক (Shareholders' Bank) হইবে। অষ্ট্রেলিয়া, লার্টভিয়া, ইস্থোনিয়া প্রভৃতি কয়টি অগ্রদান দেশের কথা বাদ দিলে অল্প কোন বিশিষ্ট দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক নহে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, 'রাজনৈতিক দলাদলির উর্দ্ধে থাকিয়া, গবর্ণমেণ্টের আদায় সমস্যার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে না পড়িয়া, নিরপেক্ষ ভাবে শাস্ত্র আবহাওয়ার ভিতরে দেশের আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ (Currency and Credit Regulation) ইহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। বিশেষতঃ বর্তমান সময়ে শাসক ও শাসিতের মধ্যে মতাস্থব যেকণ প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে রাষ্ট্রের পুরাপুরি কর্তৃত্ব পদে পদে সন্দেহ ও প্রতিফলতা সৃষ্টি করিবার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে সরকারী

আত্মকুল্যে প্রতিষ্ঠিত বৌধ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে এই আপত্তি করা হইয়া থাকে যে, কালক্রমে মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তি এই ব্যাঙ্কের প্রকৃত মালিক হইয়া দাঁড়াইবে এবং ইহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ দেশের সমষ্টিগত কল্যাণ অপেক্ষা বড় হইয়া পড়িবে। এই সম্পর্কে আমরা বিখ্যাত জার্মান মনীষী স্কোলারের (Schmoller-এব) মত উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। তিনি বলেন,

"A great Central Bank performs its functions best when it possesses a certain independence as against the State. But all such independence is lost if the Central Bank is a State Bank and works with State capital. It becomes in that case an easy prey to fiscal forces and tendencies, and serves only the State finance, not the national economy. If, on the other hand, it is a purely shareholders' bank, it will be guided in its economic policy by its Directors who are big shareholders themselves. It is then entirely in the hands of capitalism and tries to earn large dividends which is not consistent with service to the country."

এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া, ১৯২৭ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত নানা অবস্থাবিপর্ধ্যয়ের ভিতর দিয়া প্রস্তাবটি অগ্রসর হয় এবং পরিশেষে সর্বসাধারণের অর্থে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবই গৃহীত হয়। অবশ্য, বৌধ ব্যাঙ্কের উল্লিখিত কুফল নিবারণের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়াই আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

এই ব্যাঙ্কের নির্ধারিত ও বিলি-কৃত মূলধন পাঁচ কোটি টাকা। ইহা নিম্নলিখিত পাঁচটি বিভাগে নিম্নোক্তরূপে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; কলিকাতা—১৪৫ লক্ষ; বোম্বাই—১৪০ লক্ষ; দিল্লী—১১৫ লক্ষ; মাদ্রাজ—৭০ লক্ষ; রেজুন ৩০ লক্ষ। কতিপয় ধনীর হাতে বাহাতে সমস্ত শেয়ার জড় হইতে না পাবে তজ্জন্ত (প্রত্যেকটি ১০০ টাকা মূল্যের) পাঁচটির অধিক শেয়ার কোন প্রার্থীবেই প্রথমতঃ বিলি করা হয় নাই। এই ভাবে বস্টনের পর কোন বিভাগে অংশ অবিক্রীত থাকিলে পাঁচটির অধিক অংশের দাবী পূরণ করা হইয়াছে। অল্প দেশে তাহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অংশ বিদেশীকে ক্রয় করিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধি-

বাসীদিগকে—তাহারা ভারতবর্ষে বসবাস করিতেছেন (ordinarily resident in India)—কিনিতে দেওয়া হইয়াছে।

একশ্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া'র গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। উপরি উল্লিখিত পাঁচটি বিভাগের জন্ত পাঁচটি লোক্যাল বোর্ড গঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকটির জন্ত আট জন সদস্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক এলাকার অংশীদারগণ তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে ভোট দ্বারা পাঁচ জনকে নির্বাচিত করিবেন। অবশিষ্ট তিন জনকে সেন্ট্রাল বোর্ড (যাহা পাঁচটি লোক্যাল বোর্ডের উপর সর্বময় কর্তা হইয়া বিবাজ করিবে) তাহাদের নিজ নিজ বিভাগের অংশীদারগণের মধ্য হইতে মনোনীত করিবেন। এইরূপ মনোনয়ন কৃষি বা সমবায় সমিতির স্বার্থ কিংবা অন্য যে সব আর্থিক স্বার্থ রক্ষা করিবে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন নাই এইরূপ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবে। নির্বাচনের সময় প্রত্যেক পাঁচটি অংশে একটি করিয়া ভোট দিতে পারা যাইবে এবং কোন অংশীদারই—তাহার অংশের পরিমাণ যত বেশী হউক না কেন—দশটির বেশী ভোট দিতে পারিবেন না। ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব যাহাতে কতিপয় ক্ষমতাপন্ন ধনী ব্যক্তির হাতে গিয়া না পড়ে তজ্জন্যই এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিক লাভের লোভে জাতীয় স্বার্থ যাহাতে বিসর্জিত না হয় এবং ধনীরা যে কোন মূল্যে অংশ ক্রয় করিয়া ইহার মালিক হইবার জন্ত প্রলুব্ধ না হয়, সেই জন্ত সাধারণ অবস্থায় শতকরা ৫ টাকার বেশী লভ্যাংশ বিতরিত হইবে না, ইহাও নির্ধারিত হইয়াছে।

সেন্ট্রাল বোর্ড বা কেন্দ্রীয় সমিতি নিম্নলিখিতভাবে সংগঠিত হইয়াছে—

১। একজন গবর্নর ও দুইজন ডেপুটি-গবর্নর। ইহা-দিগকে সপারিসদ বড়লাট মনোনীত করিবেন। এই মনো-নয়ন ব্যাপারে তিনি কেন্দ্রীয় সমিতির সুপারিশ যথাসাধ্য বিবেচনা করিবেন।

২। চারি জন পরিচালক (Directors)—তন্মধ্যে কলিকাতা, বোম্বাই ও দিল্লী লোক্যাল বোর্ড প্রত্যেকে দুইজন (মোট ছয় জন) এবং মাদ্রাজ ও রেঙ্গুন লোক্যাল বোর্ড

প্রত্যেকে একজন, এই ভাবে সর্বসম্মত আট জন, তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত করিবেন।

৩। একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী—ইহাকে সপারিসদ বড়লাট মনোনীত করিবেন।

গবর্নর এবং দুই জন ডেপুটি-গবর্নর ব্যাঙ্কব বৈতনভোগী কর্মচারী হিসাবে কাজ করিবেন এবং তাহাদের সমস্ত সময় ব্যাঙ্কের কাজেই নিয়োগ করিতে হইবে। সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য লোক্যাল ও সেন্ট্রাল বোর্ডের সভ্যগণ এবং গবর্নর ও ডেপুটি-গবর্নর নির্বাচিত ও মনোনীত হইবেন। ব্যাঙ্ক পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব সেন্ট্রাল বোর্ডের উপরেই থাকিবে। লোক্যাল বোর্ড সেন্ট্রাল বোর্ডের নির্ধারিত বা বরাতী কাজমাত্র করিতে পারিবেন। স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে কোন কিছু জানিবার আবশ্যক হইলে সেন্ট্রাল বোর্ড তৎসম্বন্ধে লোক্যাল বোর্ডের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিবেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

রাজনৈতিক প্রভাব হইতে ব্যাঙ্ককে মুক্ত রাখিবার জন্য প্রাদেশিক কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণকে ব্যাঙ্কের লোক্যাল ও সেন্ট্রাল পরিচালক সম্বন্ধ হইতে দূরে রাখা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক সময়ে একদল লোক ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং ১৯২৭-২৮ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ-গৃহে এই বিলটির অপমৃত্যুর ইহাও অন্যতম কারণ।

আমরা দেখিতে পাইতেছি, সেন্ট্রাল বোর্ডের ১৬ জন সদস্যের মধ্যে ৮ জন সদস্য সপারিসদ বড়লাট কর্তৃক মনোনীত এবং বাকী ৮ জন সদস্য অংশীদারগণ কর্তৃক লোক্যাল বোর্ড মারফতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনোনীত সদস্যদের মধ্যে ডেপুটি-গবর্নর দুই জন ও সরকারী কর্মচারীটি বোর্ডের আলোচনায় ও বিতর্কে যোগদান করিতে পারিলেও ভোট দিতে অধিকারী নহেন। তবে গবর্নর সভায় অস্থগত থাকিলে তাহার স্থলাভিষিক্ত একজন ডেপুটি-গবর্নর মাত্র ভোট দিতে পারিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অংশীদার নির্বাচিত এবং বড়লাট-মনোনীত সদস্য-সংখ্যা সমান সমান হইলেও, মোটের উপর সেন্ট্রাল বোর্ডে নির্বাচিত বেসর-কারী প্রতিনিধিগণের ভোটাধিক্য বজায় রাখা হইয়াছে—

লোকাল বোর্ডে ত সরকারী মনোনয়নেব কোন ব্যবস্থাই নাই। শুধু তাহাই নহে, এক দিকে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সকল সদস্যের পক্ষে ব্যাঙ্কের লোকাল ও সেন্ট্রাল বোর্ডের সদস্যরূপে নির্বাচিত হওয়া যেমন নিষিদ্ধ হইয়াছে, অন্য দিকে সরকারী আমলাদিগের বেলায়ও অল্পরূপ নিষেধ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মোটের উপর এই ব্যাঙ্কে সরকারী বে-সরকারী শ্রেণীবিশেষের অসঙ্গত প্রতিনিধিত্ব ও প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া সপারিষদ বড়লাটের অভিভাবকত্বে অংশীদারগণের প্রতিনিধিদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যতটুকু স্বায়ত্তশাসন এই ক্ষেত্রে আমবা লাভ করিয়াছি, দলাদলি না করিয়া তাহার সম্যবহারের উপর আমাদের ব্যাঙ্কিংয়ের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করিবে।

বহির্বাণিজ্য ও বিনিময়-ব্যাঙ্ক

এক্ষেপে ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক ও বিদেশীয় বিনিময়-ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্য-সংক্রান্ত কাজকর্ম করা নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তী কালে ইহাদের স্থলে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার বেলায়ও এই নিষেধই বলবৎ ছিল। লগুনে বা বিদেশে অল্পত্র কোন শাখা না থাকায় দেশীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলির পক্ষেও ভাবতের বৈদেশিক ব্যাণিজ্যের অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়-ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা অল্পকৃত হইতে থাকে। ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কের মধ্যে “ইণ্ডিয়ান ম্পেশি ব্যাঙ্ক”ই সর্বপ্রথম লগুনে একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করে। সিমলার এলায়েন্স ব্যাঙ্কও তৎপরে বিলাতে তাহাদের আপিস খোলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ব্যাঙ্ক ১৯২৩ সালে দেউলিয়া হইয়া যায়। টাটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কেরও লগুনে শাখা আপিস ছিল। কিন্তু ১৯২৩ সালে উহা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সহিত সংযুক্ত হইবার পর এই শাখা আপিস বন্ধ হইয়া যায়। সম্প্রতি মহা আড়ম্বরে লগুন শহরে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুরোপ বা বিদেশে ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কের ইহাই একমাত্র শাখা। ভারতের

ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়তা করিবার উপযোগী ব্যবস্থা ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক কর্তৃক না হওয়ায় বিলাতী ব্যাঙ্কগুলি ভারতে শাখা আপিস প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রধানতঃ এই কার্যের ভার গ্রহণ করে। পরে অল্পাংশ বেশের সহিত ভারতব ব্যাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা ও ইউরোপের অল্পাংশ ব্যাঙ্কও এদেশে তাহাদের শাখা স্থাপন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যাঙ্কের কাজ প্রধানতঃ এই দেশে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, গ্রাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, পেনিনসুলার এণ্ড ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপর কতকগুলি ব্যাঙ্কের শাখা-আপিস সমগ্র এশিয়ার প্রায় বড় বড় নগরেই বহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে লয়েডস্ ব্যাঙ্ক, হংকং এণ্ড সাংঘাই ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, ট্রিকোহামা ম্পেশি ব্যাঙ্ক, গ্রাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউ ইয়র্ক, আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানী, ব্যাঙ্ক অব টিওয়ান, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব পার্সিয়া, ইন্টারগ্রাশনাল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, ব্যাঙ্কো নেশনেইল আন্ট-মেরিনো, টমাস নুক এণ্ড সন্ (ব্যাঙ্কাস) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কের উৎপত্তি

ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ১৮৮১ সালে অযোধ্যা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, ১৮৯১ সালে পাঞ্জাব গ্রাশনাল ব্যাঙ্ক ও ১৯০১ সালে পিপুলনা ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (লাহোরে) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৬ সালের পর বহুভেদে আন্দোলনের ফলে সারা ভারতবর্ষে যখন নতুন স্বদেশী যুগেব বহু উপস্থিত হয়, তখন তাহার উদ্দীপনায় ১৯১০-১১ সাল মধ্যে ছোট বড় ৪৭৬টি যৌথ ব্যাঙ্কের উদ্ভব হইয়াছিল। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যাঙ্কগুলি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ কবে; যথা, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান ম্পেশি ব্যাঙ্ক, বেঙ্গল গ্রাশনাল ব্যাঙ্ক, ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অব মাদ্রাজ, বোম্বে মার্চেন্টস্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ক্রেডিট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, কাথিওয়ার এণ্ড আমেরাবাদ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। উল্লিখিত ১১টি বড় ব্যাঙ্কের মধ্যে ১৯১৩-১৪ সালে ছয়টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়।

সেই সময়ে ছোটবড় মোট দেউলিয়া ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৩টি। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত উহাদের সংখ্যা ১৬১টিতে পৌঁছে। ইহাদের মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল প্রায় সাত কোটি টাকা। লাল হরকিশ লাল প্রতিষ্ঠিত পিপলস ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (দেউলিয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দ) এবং বোলটন ব্রাদার্স পরিচালিত এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব সিমলা (দেউলিয়া ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে) এই দুইটি বিখ্যাত ব্যাঙ্কও ইহাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু এই সম্পর্কে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিরাট পিপলস ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তাহার ১০০ শাখা আপিস সহ যখন দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হয় তখন কোম্পানীর কাগজ বন্ধক রাখিয়াও বিদেশী কিংবা সরকারী প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক হইতে ইহা টাকা ধার পায় নাই। বরং কথিত আছে যে, উহাব দরজা বন্ধ হইলে অনেক খেতাব পুরুষ মনোব আনন্দ গোপন করিতে না পারিয়া ভোজসভার আয়োজন করিয়াছিলেন*। কিন্তু বোলটন ব্রাদার্সের অসাধু আচরণে এলায়েন্স ব্যাঙ্কের পতন হইলে (বিদেশী) আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার্থ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছিল।

ভারতীয় ও বিদেশীয় ব্যাঙ্কের অবস্থার তুলনা

যাহাদের মূলধন ও মজুত তহবিল (Reserve) এক

লক্ষ টাকার ন্যূন নহে এইরূপ ৭৮টি ভারতীয় বৌধ ব্যাঙ্কের হিসাব এক্ষণে আমরা এখানে দিতেছি :-

ব্যাঙ্কের সংখ্যা	মজুত মূলধন	তহবিল	নগদ আমানত	তহবিল
৭৮	৮৬২ লক্ষ	৪০৭ লক্ষ	৬,৬৩০ লক্ষ	৯৫০ লক্ষ

অপর দিকে ভারতবর্ষে যে ১৮টি বিদেশী ব্যাঙ্ক আছে তাহাদের কেবল ভারতীয় আমানতের পরিমাণই ৬৮,১১ লক্ষ টাকা।

আমরা এখানে কয়েকটি বিদেশী ব্যাঙ্কের নিজস্ব মূলধন ও আমানতের হিসাব দিতেছি। ইহা হইতে আমাদের ৭৮টি বৃহৎ ব্যাঙ্কেব সম্মিলিত মূলধন ও আমানত অপেক্ষা ইহাদের প্রত্যেকটির মূলধন ও আমানত কি পরিমাণ বেশী তাহা দেখা যাইবে এবং আমবা কোথায় আছি বুঝিতে পারা যাইবে।

আদায়ী মূলধন মজুত তহবিল আমানত

- ১। লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ক (ইংলণ্ড) ২১ কোটি টাকা অজ্ঞাত ৪৬৫ কোটি
- ২। স্ট্যানাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক (আমেরিকা) ৩৫ কোটি ২৮২ কোটি

আদায়ী মূলধন মজুত তহবিল আমানত

- ৩। যুক্তো-হামা স্পেসি ব্যাঙ্ক-১৫ কোটি ১৯ কোটি ৮৫ কোটি
- ৪। হংকং এণ্ড সাংঘাই ব্যাঙ্ক কর্পোরেশন ১৩ কোটি ২৫ কোটি ৭০ কোটি

নিম্নলিখিত তুলনামূলক হিসাব হইতে ভারতের ও ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা আরো স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হইবে।

দেশ	(১) ব্যাঙ্ক আপিসের সংখ্যা	(২) প্রত্যেক দশ লক্ষ লোকের জন আপিসের সংখ্যা	(৩) প্রত্যেক ২৭০০ বর্গমাইলে আপিসের সংখ্যা	(৪) মাথাপিছু আমানত
(১) ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড-ওয়েল্‌স	১১,২৭৬	২৮৫	৩৬২	৮০০
(২) যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা)	৩০,০০০	২৫৬	২০	১,১৬০
(৩) জাপান	৭,৪৬৫	২২	৮০	১৮৬
(৪) কানাডা	৪,৮৮০	৪৪৮	৩	৬৬৭
(৫) ভারতবর্ষ	৫২৬	২	১	৪

* ইণ্ডিয়ায় কমিশনের সম্মুখে লাল হরকিশ লাল কোম্পানির অজ্ঞাত সমস্ত পণ্ডিত মনোমোহন শালগের প্ররোক্তের জনৈক ইংরাজ ইহা স্বীকার করেন।

† ১৯২৮ সালে ভারতবর্ষে মোট ২৩০০ শহরের মধ্যে মাত্র ৩০৯টিতে কোন ব্যাঙ্ক বা তাহার শাখা বা এজেন্সী ছিল।

ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। বাংলার অবস্থা আরো কাহিল। যে সব ব্যাঙ্কের মূলধন ও মজুত তহবিল একত্রে অনুন পাঁচ লক্ষ টাকা সেই সব ব্যাঙ্ক বিজ্ঞান ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্করূপে গণ্য হইবার অধিকারী। বিদেশী ব্যাঙ্কসহ ৫৮টি ব্যাঙ্ক আজ পর্যন্ত এই মর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র তিনটি বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক। যথা, বেঙ্গল স্টেট ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ব্যাঙ্ক কর্পোরেশন। এই তিনটি ব্যাঙ্কের সম্মিলিত মূলধন ও মজুত তহবিল ১৬ লক্ষ টাকা মাত্র। অর্থাৎ কোন প্রকারে ন্যূনতম যোগ্যতার দাবী ইহাবা পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এখানে একটি কথা নিতান্ত না বলিলে নয়। অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিদেশী ব্যাঙ্ককে আপনার তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক হিসাবে গ্রহণ করে না। কিন্তু এদেশে শুধু বিলাতী ব্যাঙ্ক নহে, সর্বদেশীয় ব্যাঙ্ককেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বাক্ষাতের মর্যাদা ও বাংসল্যের আশুখ্য দানে বাধিত করিয়াছে। ইহাতে একদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব নিকট বিদেশী ব্যাঙ্কের জবাবদিহি কবিলার নূতন দায়িত্ব যেমন খানিকটা উদ্ভব হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনি ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহযোগিতা লাভের স্বযোগও ইহারা দেশীয় ব্যাঙ্কের সহিত সমভাবে লাভ করিয়াছে। এই সব অতিকায় বিদেশী ব্যাঙ্কের সহিত তুলনায় আমাদের ব্যাঙ্কগুলির আকার ও পসার নিতান্তই ক্ষুদ্র। স্বতরাং ইহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনেকটা দৈত্য-বামনের লড়াইয়ের মত। পূর্বে এই সব বিদেশী ব্যাঙ্ক বৈদেশিক বাণিজ্যের কাজকর্মই প্রায় বোল আনা করিত। কিন্তু এক্ষণে তাহারা ভাবতের বিভিন্ন নগরে শাখা আপিস প্রতিষ্ঠা করিয়া আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যক্ষেত্রেও ব্যাঙ্কিঙের কাজকর্ম কবিতে শুরু করিয়াছে। ইহার ফলে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পসার-প্রতিপত্তি লাভ করা আশংক্য কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্যই ভাবতীয় অর্থে পুঁই, অথচ ভারতীয় স্বর্ণে উদাসীন ও বিরূপ—এই সব ব্যাঙ্কের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তরফ হইতে অধিকতর কর্তৃত্ব ক্ষমতা গ্রহণ করা উচিত ছিল বলিয়া অনেকেই মনে করেন।

আমাদের ইতিকর্তব্য

যাহা হউক, যাহা হয় নাই তৎসম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় আমাদের ব্যাঙ্কিঙের কি ভাবে উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিয়া বর্তমান প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতেছি।

আমাদের দেশে অসংখ্য ছোট ছোট ঘোষ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও হইতেছে। বিশেষতঃ বাংলা দেশে ব্যাঙ্কের ছাতার মত ইহাদের উৎপত্তি হইতেছে। ইহাতে প্রতিযোগিতা অসদ্বতরূপে বাড়িয়াছে এবং কাহারও পক্ষে উন্নতি লাভ কবা সহজসাধ্য হইতেছে না। এই সব ব্যাঙ্ক বাহারা স্থাপন করিতেছেন তাঁহাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা যেমন অগ্রচূর, প্রভাব-প্রতিপত্তিও তেমনি সামান্য। এই অবস্থা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। আমাদের কর্তব্য এই সব ছোট ব্যাঙ্কের সমন্বয় সাধন করিয়া কতকগুলি শক্তিশালী ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলা। ইংলণ্ডের Big Five নামে বিশ্ববিখ্যাত পাঁচটি ব্যাঙ্ক আজ দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব করিতেছে।

দ্বিতীয় প্রয়োজন হইয়াছে, যে সব প্রাইভেট ব্যাঙ্কার, মহাজন ও নাছকর আছে তাহাদিগকে আধুনিক রীতিনীতি অনুযায়ী ব্যাঙ্কিঙের কাজে নিয়োজিত করা এবং ইহারা যোগ্যতা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্দিষ্ট সর্গ পূরণ করিতে পারিলে ইহাদিগকে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক হিসাবে বিজ্ঞান ব্যাঙ্কের আওতায় গ্রহণ করা। তাহা হইলে শহরের বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি মঞ্চস্থলের চেক ও ছত্তির টাকা ইহাদের সাহায্যে সহজেই আদায় কবিতে পারিবে, এবং এই কার্যের বিনিময়ে অল্পান্ত্র ব্যাঙ্কেব শ্রায় স্বল্প খরচে টাকা পাঠাইবার অধিকার লাভ করিতে পারিবে।

তারপরে ইহাদিগকে নিম্নলিখিত ভারতীয় ব্যাঙ্কাস' সমিতির সভ্য করিয়া লইতে হইবে এবং যাহাবা তপশীলভুক্ত হইতে পারিবে না তাহাদিগকে সহকারী সদস্য (Associate Members) রূপে গ্রহণ কবিতে হইবে। ইহার ফলে দেশীয় প্রাইভেট ব্যাঙ্কগুলির মর্যাদাই শুধু বাড়িবে না, উহাদের কাজকর্মের রীতিনীতিরও উন্নতি সাধিত হইবে এবং ভাবতের ব্যাঙ্কিং-ক্ষেত্রে একটা সুপরিচালিত সম্বলবদ্ধ শক্তি গড়িয়া উঠিবে—যাহার আবশ্যকতাব কথা বলিয়া শেষ কবা যায় না।

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

ঐতিহাসিক গুণ

[কবি বলেছেন, জীবনচরিতের ভিতরে কবিকে খুঁজতে যাওয়ার চেষ্টা বুঝা, তাঁরা জীবনের মর্মগত সাধনা ও সত্যকে কাব্যসৃষ্টিতে রূপায়িত করে তোলেন এবং সেইখানেই তাঁদের মর্মার্থ পরিচয়। সংসারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুখদুঃখ তাঁদের অন্তরকে স্পর্শ করে, কিন্তু অভিজ্ঞত করিতে পারে না। যে গভীর আনন্দ-লোকের রহস্যপুরীতে অহর্নিশি তাঁদের চিত্তবিচরণ, সেখানকার অসংখ্য অজ্ঞাত কাহিনী তাঁদের জীবনের মূলস্রোতকে রচনা করে তুলছে, বহির্জগতের ঘটনাবলীতে তার কতটুকু ধরা পড়ে? শুধু তার অস্পষ্ট ইচ্ছিত লুকানো থাকে তাঁদেরই কাব্যরচনায়। কবিকে পাওয়া যায়—তাঁর জীবনচরিতে নয়—তাঁরই বচিত কাব্যে। তবু তিনি আমাদেরই মত মানুষ আমাদের চেয়ে যত উর্দ্ধলোকেই বাস করুন, আমাদের এই ধূসামাটিব পৃথিবীকে এবং পার্থিব জীবনকে তিনি কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন না। আমাদের মত তাঁর জীবনেও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সমাবেশ থাকে। সেগুলো আলোচনা করলে কবিকে হস্ত ঠিক ধবোঁঠা যায় না, কিন্তু কবির পশ্চাতে যে-মানুষটি আছেন, তাঁকে আর একটু চেনা যায় এবং এই চেনাপরিচয়ের পথ দিয়ে কবিকে বোঝার পথও সুলভ হয় আসে বলে বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এরূপ অসংখ্য বিচিত্র ঘটনা রয়েছে, যেগুলো সংগ্রহ করতে পারলে বাংলা সাহিত্যের গৌরব ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হবে। তাঁর ৭৭তম জন্মোৎসবের ক্ষুদ্র অব্যবহৃত তাঁরই জীবনের দুটি ঘটনা আজ পাঠকবর্গকে উপহার দিচ্ছি।—লেখক]

১

রবীন্দ্রনাথ তখন দশ-এগার বৎসরের বালক। উপনয়ন সমাধা করে শান্তিনিকেতনে এসেছেন। সেই তাঁর প্রথম শান্তিনিকেতনে আসা। একদিন হরিশ মালী তাঁকে বলল—“বাবু, শিকার করতে যাবে নাকি চল।” শিকার সম্বন্ধে বালক রবীন্দ্রনাথের তখন যে অস্পষ্ট ধারণা, তাতে আছে শুধু নির্ভীক সাহস এবং হুনিপূর্ণ তৎপরতার গৌরব, এর যে একটা নিষ্ঠুরতার মর্মাস্তিক দিকও থাকতে পারে, সে সম্বন্ধে তখনও তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অত্যন্ত উৎসাহে হরিশ মালীর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে চললেন তার সঙ্গে।

শান্তিনিকেতন থেকে মাইল দুয়েক দূরে সুকল গ্রামের পাশে চীপ সাহেবের কুঠির ক্ষণাবশেষ লতাগুলে আচ্ছন্ন।

পিছনে ধোয়াই, তার গা ঘেঁসে চলে গেছে যে পথ, একদিন লোকচলাচলের কলরবে সে ছিল মুখর, আজ সে অনাদৃত, শুষ্ক। নির্জন প্রান্তরের বুকে ভয় প্রাসাদের ঐশ্বর্যকে আশ্রয় করে ঘিরে উঠেছে ঘন বন, সেখানে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বাসা বেঁধেছে নানা জাতের পাখী, মাটিতে ঝোপজঙ্গলের আড়ালে চলাফেরা করছে খরগোস। চূপবালি-খসা জীর্ণ অট্টালিকার শূন্য ঘরে ঘরে মানুষের বসবাসের স্মৃতি ঘন নিশ্চিহ্নপ্রায় অতীত যুগের অন্তরাল থেকে কথা বলে উঠতে চায়, একসম ভাষা গেছে হারিয়ে, তাই দাঁড়িয়ে আছে বোবার মত। চার দিক থেকে লতাজাল এসে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তার পূর্ব ইতিহাসকে। লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন এই লোক-বর্জিত বাড়ীটি তার সমস্ত অস্পষ্ট রহস্যের পরিবেশ নিয়ে রূপকথার ঘুমন্ত রাজপুরীর মত রবীন্দ্রনাথের কিশোর কল্পনাকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে তুলল। তিনি শিকারের কথা, হরিশ মালীর কথা, এমন কি, এই পরিদৃশ্যমান জড় জগতের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হয়ে স্বপ্রাবিষ্টের মত কি যে ভাবেতে আরম্ভ করলেন, তিনিই হস্ত জানেন না।

ঝোপের মধ্য থেকে হঠাৎ একটি সন্ত্রস্ত খরগোস যেমনি বেরিয়ে দৌড়ে গেল অমনি হরিশ মালীর অব্যর্থ লক্ষ্যে তার দৌড় বন্ধ হ'ল। ঘন বনের মধ্যে এই ছোট চঞ্চল প্রাণীটির চকিত পলায়ন-দৃশ্যের এই প্রথম অভিজ্ঞতায় যেমন তাঁকে বিম্বিত করেছিল তেমনি এক মুহূর্তে তার এই হঠাৎ জীবনের অবসান তাঁকে কঠোর আঘাত দিয়েছিল, কেননা এর নিষ্ঠুরতা তিনি ঘটনার পূর্বে স্পষ্ট করে কল্পনা করতে পারেন নি। তার পরে খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘপথ হরিশ মালী এই খরগোসের যতদেহ কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল, বালককে তারই অল্পবর্জন করে চলতে হ'ল। এই পথ তাঁর পক্ষে দুসহ বেদনার পথ হয়েছিল। এই রক্ত-পাতের বীভৎসতা থেকে সেদিন যে নিবেশবাণী তাঁর হৃদয়ে

প্রবেশ করেছিল সে যেন শকুন্তলায় আশ্রমবাসীদের আর্ন্ত
অহ্ননয়েরই মত—ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাতোয়মশ্বিন্ মুহুনি
বৃগ শরীরে। তার পরে তাঁর জীবনে একবার মাত্র যে
শিকার তাঁকে দেখতে হয়েছিল সে বাঘ শিকার। তখন
তিনি ছিলেন তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে
শিলাইঘাটে। খবর এল পাড়ার বনে বাঘ আশ্রয় নিয়েছে।
দাদা চললেন বন্দুক নিয়ে শিকারে। এই বিপদজনক
অধ্যবসায়ে তাঁর বালক ভ্রাতাকে সঙ্গে নিতে বিধা করলেন
না। বোধ করি ভয় ভাঙানোর শিক্ষায় তিনি তাকে দীক্ষিত
করতে ইচ্ছা করেছিলেন। সঙ্গে ছিল রাজবংশী বিখ্যাত
শিকারী ভৃত্য। তার হাত থেকে কোনো দিন কোনো বাঘ
কখনো নিষ্কৃতি পায় নি। বনের মধ্যে একটা মোটা বাঁশের
শাখা কেটে কেটে সোপানের মত করা হয়েছে।
সেই কাটা ডাল বেয়ে গাছে চড়লেন দুজনে। পূর্বরাত্রে
বাঘের জুটেছিল ভূরিভোজন। আরামে জঙ্গলের মধ্যে
বেখানে সে ছিল নিদ্রামগ্ন সেখানে আলোছায়ার ধাঁধায়
তাকে স্পষ্ট দেখা ছুঁসাখা ছিল। শিকারী গাছের তলায়
বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিল। বার বার তার সঙ্কেতের
পব জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঘের দেহের একটা অংশ দেখতে
পেলেন। সাবধানে লক্ষ্য ক'বে বন্দুক ছুঁড়তেই তার
মেরুদণ্ডে লাগল গুলি। সে আর উঠতে পারল না, শুয়ে
শুয়ে ল্যাজ আছড়িয়ে গর্জন ক'রে ঝোপটাকে আন্দোলিত
করে তুললে। আহত বাঘের ছটফটানির মধ্যে কল্পনা ছিল
না, ছিল বার্থ ক্রোধের আক্ষালন। আরও দুই-একটা গুলি
মারার পর যখন নিশ্চিত হ'ল তার মৃত্যু, তখন শঙ্কাবৃত্ত
গ্রামবাসীদের আনন্দ-কোলাহলে মুখবিত্ত হ'ল চার দিক।

২

১৯১৬ ইংরেজী। রবীন্দ্রনাথ শিলাইঘাট থেকে বাটে
পাবনা পেরিয়ে সাহাজ্জাদপুরে যাবেন, কিছুদিন লাগবে।
তাঁর এই নৌ-ভ্রমণের সহযাত্রী হওয়ার জন্য শিল্পী নন্দলাল
বসু, মুকুল ঘোষ ও সুরেন্দ্রনাথ করকে আহ্বান করেছেন।
এক বাটে কবি অন্ত বাটে শিল্পী তিন জন। রবীন্দ্রনাথের
সঙ্গে তখন তাঁদের সামান্য পরিচয়, তাঁর সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠ
যোগ স্থাপিত হয় নি তখনো। নিরুদ্দেশ নদীর বুকে দিনগুলো

কাটছে আনন্দে। অভিধিদের বাতে কিছুমাত্র অস্ববিধে
না হয়, সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাঁদের সঙ্গে তিনি
বিভ্রান্তলাপ করছেন, নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা তুলছেন,
গান শুনিতে তাঁদের আপ্যায়িত বরছেন এবং সব সময়ই
ছুঁধ করছেন যে, অভিধিদের সেবানৃত্তের ভার যিনি সানন্দে
নিতে পারতেন আজ তিনি নেই, তাই কবির অপটু হাতেই
তাঁদের তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব এসে পড়েছে।

একদিন বজরা দুটি তীরে বাঁধা। নন্দলালবাবুরা
ভিতরে বসে গল্পগুজব করছেন, কবিও লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত
নিজের বজরায়। এমন সময় হঠাৎ তীরের দিকে শোনা
গেল 'গুডুম' 'গুডুম' শব্দ। শিকারীর গুলির মুখে নিরীহ
জলচর পাখীদের প্রাপসংশয় উপস্থিত, সজ্ঞত হয়ে তারা উড়ে
পালাতে আরম্ভ করল। বন্দুকের আগুয়াজ শুনেই রবীন্দ্রনাথ
বজরার বাইরে বেরিয়ে এসে গভীরমর্মে হাঁক দিলেন পাইক-
বরকন্দাজকে। তাঁর সেই উত্তেজিত স্বর শুনে নন্দলালবাবুও
বেরলেন ব্যাপার কি দেখতে। দেখলেন, তাঁর চোখে-
মুখে বেদনা ও ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট, দাঁড়িয়ে আছেন
নির্ঝাক, বোকা গেল অভ্যস্ত বিচম্বিত হয়েছেন।

পাইক-বরকন্দাজ আসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঐ
চরটি তাঁর জমিদারীর এলাকাতুল কি না। তারা 'হ্যাঁ,
হুজুর' বলতেই দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ দিলেন, ঐখানে থাকে দেখবে
বন্দুক-হাতে শিকাব করতে এসেছে তাকে একুনি আমার
সামনে নিয়ে এস বজরায়।

হুকুম শুনেই তারা তখনই ছিপথলে রওনা হ'ল সেদিকে।
নন্দলালবাবু সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে ত্যাগলেন। এতদিন রবীন্দ্র-
নাথের যে পরিচয় তাঁরা পেয়ে এসেছেন, তাঁর আজকের
মুষ্টি তার থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রয়োজন হ'লে কবি
রবীন্দ্রনাথও যে শাসনকর্তার কঠিন মুষ্টি ধরতে পারেন, তাই
তাঁরা ভাবছিলেন বিস্মিত হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটির শেষ
পরিণতির জন্য তাঁরা মনে মনে উদ্ভ্রাণ হয়ে উঠছিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই পাইক-বরকন্দাজরা অপরাধীকে
সঙ্গে করে নিয়ে এল। অপরাধী আর কেউ নয়, পাবনা
শহরের এক পুলিশ কর্মচারী। লোকটির কুণ্ঠিত, সঙ্কচিত
কাতরভাব দেখে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রাগ জল হয়ে গেল।
তিনি একটি কথা না বলে বজরার ভিতরে চলে গেলেন।

এদিকে পুলিশ কন্সটারী এসেই মিনতি করে বললে, অপরাধ হয়ে গেছে, আমাদের মাপ করুন। আমি জানতাম না যে, আপনি এখানে আছেন।

রবীন্দ্রনাথ শান্তভাবে বললেন, “দেখ বাপু, আমি যত দিন এখানে আছি, এই নিরীহ প্রাণীদের তোমরা উত্থাপ্ত করো না। এ আমি সহ্য করতে পারি না।”

ইনস্পেক্টর নিষ্কৃতি পেয়ে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললে, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এমন কাজ আর কখনো হবে না। আমি আজ বার কয়েক গুলি ছুঁড়েছিলাম বটে, কিন্তু কোনো প্রাণী হত্যা হয় নি, একটি পাখীও মারতে পারি নি।”

বরকন্দাজ চুপি চুপি নন্দবাবুকে বলল—“ছটা হাঁস শিকার করেছেন বাবু, ছিপে তুলে নিয়ে এসেছি।” পরে অর্থপূর্ণ ভাবে নন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল “হাঁসগুলো রেখে দেব নাকি বাবু? গোপনে সম্ভাবনার করা যাবে, বাবুশায় কিছু জানতে পারবেন না।”

এই প্রস্তাবে নন্দবাবুদের মনের মধ্যে লোভ হয় নি বললে হয় ত সন্তোষের অপলাপ করা হবে, কিন্তু ব্যবহারে তাঁরা সেবারকার মত লোভ দমন করেছিলেন।

‘বোগাযোগ’ উপন্যাসের বিপ্রদাসের জমিদারিতে মধুসূদনের সাহেব-বন্ধুদের পাখীহত্যা নিয়ে আলোচনা আছে; সেটা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

রবিবারের ফর্দ

শ্রীপুষ্প দেবী

সারাটা জীবন খেটে খেটে সারা, তিলেক বিরাম নাই;
রবিবার দিনে একটু জুড়াব, তারি জো আছে কি ভাই?
সকাল না হাতে গৃহিণীর মুখে লম্বা কর্ণ এল,
জিরোবার আশা সাথে সাথে মোর কোথায় মিলায়ে গেল।
অফিসের চেয়ে সেদিনের কাজ ঢের বেশী লাগে কানে,
ঢেকীর আবার স্বর্গ কোথায়? যেথা যায় ধান ভানে।
“কবিরাজ কাছে অবস্থা বলে শুধু আনতে হবে।
শীত পড়ে গেল, গায়ের লেপটা করাবে আর কবে?
চাকরবাকর শীতের কাপড় রোজ চেয়ে চেয়ে সারা;
সময় পাও না আমি বুঝি বটে, বোঝে না তো আর তারা;
ইন্টোজেনাটা আজ এনো ঠিক, কোমরেতে ব্যথা বড়,
জামবাকুও চাই, জান ছেলেমেয়ে আছাড় খেতে কি দড়।
একবার খেও ঠান্ডির বাড়ী, বলছে অনেক করে—
বুড়ো ঠান্ডিদি কিদিনই বা আছে, কোন্ দিন যাবে মরে।
ছোট খুঁকীটার কি যেন হয়েছে, খাচ্ছে না কিছু মোটে;
ডাক্তারখানা নিয়ে যাও দেখি, জানি না কি রোগ জোটে;
কবিরাজে বৈলো বিদ্যুটে ঐ অল্পপান কোথা পাই?
ওটার বদলে সোজাহুজি আর অল্প কিছু কি নাই?

গয়লারে ডেকে শাসিয়ে দিও তো আজ তুমি একবার,
কি জল দিচ্ছে দুখে একেবারে, বড্ড বেড়েছে বাড়।
ওপরের কলে কি জানি কি হ'ল জল আসছে না মোটে,
মিস্ত্রির ডেকে সারাও না আজ? যেতে তো হবে না কোটে।
সাড়ে আটটার অফিসে বেরোও, বাড়ীর রাখ না খোজ,
জান না তো আর কত ঝড়োটে কাটে যে আমার রোজ।
খোকার নতুন মাষ্টারটি তো পড়াতে পারে না কিছু;—
তবু মাসে মাসে কতগুলি টাকা যেতেছে তো ওরি পিছু।
চাকরের হাতে বাজার যে আসে, বলার কথা সে নয়।
টাকার মধ্যে আট আনা তো ঠিক ওরই ট্যাংকেতে রয়।
বাসি পচা মাছ তরকারি খেয়ে পেটে গেল চড়া পড়ে।
আজ রবিবার, পাশেই বাজার, যাও না একটু নড়ে—
মুদীর দোকানে যেও একবার, এন সব বেশী করে,
স্ন্যাকারর কাছে গলার হারটা বহুদিন আছে পড়ে।
তোমার তো আর সময়ই হয় না, অফিস নিয়েই খুন।
এসব কি আর মেয়েদের কাজ, ধরে গেল হাড়ে ঘুণ।
আমার এ জালা, আমার আছেই; তোমার বলি না রোজ;
আজ রবিবার এই কটি কাজ করো দেখি করে খোজ।”

ত্রিবেণী

শ্রীজীবনময় রায়

৫৫

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় শচীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহজে দমদমে সীমা এবং রক্তলালের আন্তানায় খাঁচায় এসে বন্দী হ'ল।

সীমা বললে, “পার্বতী দেবী স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত হ'তে পারেন, শচীন বাবু। তিনি কমলাপুরীতে খোসমেজাজে বাহাল তবিস্তে ফিরে গেছেন। সম্প্রতি কিছু দিন আপনাকে আমাদের এখানে অতিথি হয়ে থাকতে হবে। আমাদের কাজ শেষ হ'লে আপনার সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাবে। আশা করি নির্জনবাসের বিষয় আমাদের এখানে আপনার বেশী হবে না।”

শচীন অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, “মানে?”

“মানে, আপনি এখন আমাদের বন্দী। আপনার পিতৃদত্ত অর্থের কিছুটা দেশের মুক্তি-কণ্ঠে আপনার দক্ষিণা দিতে হবে। তাতে আপনার এবং দেশের দুয়েরই মঙ্গল। মৃত পত্নী এবং নিরুদ্ভিষ্ট পুত্রের উদ্দেশে অবস্থা অর্থ ব্যয় করার চেয়ে প্রজাদের রক্ত তাদেরই মুক্তিকল্পে উৎসর্গ করুন—তাতে প্রজারাও রক্ষা পাবে, আমাদেরও পরিশ্রমের কিছু লাভ হবে।”

“আপনাদের! আপনারা কে?”

“আমরা আপনাদেরই ভাইবোন। যাদের আপনার সরকারের হুনের গুণে এনাকিষ্ট ব'লে অভিহিত ক'রে থাকেন। যারা দেশ ঘর আত্মীয়-স্বজন স্বর্থ-সম্পদ সব ছেড়ে আপনাদেরই মুক্তির জন্ত মৃত্যুপণ করেছে। নিজের দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার অপরোধে যারা শিকারের জন্তর মত বনে জঙ্গলে গৃহহীন অন্নহীন হয়ে বিতাড়িত হ'য়ে বেড়িয়েছে। আমরা পরপদানত দেশের সেই হতভাগ্যের দল। আশা করি আমাদের এই মুষ্টিভিক্ষাটুকু থেকে আপনার রাজসিক দয়ার্জ চিত্ত আমাদের বঞ্চিত করবে না।”

শচীন্দ্রনাথ চুপ ক'রে ভাবতে লাগল। অকস্মাৎ এমন একটা অভাবনীয় বিপদের মধ্যে যে পড়তে পারে এ যেন সে

কল্পনাতেই আনতে পারলে না। এ যেন সত্য নয়—স্বপ্ন। সীমাব অকস্মাৎ আবির্ভাব থেকে আরম্ভ ক'রে তার সমস্ত আচরণ কেন যে তার কাছে এতক্ষণ অস্বাভাবিক লাগে নি ভেবে সে নিজেই অবাক হ'ল। এখন আর নিজেকে মূঢ় ব'লে ভৎসনা ক'রে কোনও ফল নেই। তার প্রাণ পর্যন্ত যে সংশয় এক মুহূর্তের মধ্যে সে-কথা কল্পনা ক'রে মনে মনে তার বুকে একটু যেন দবে গেল। নিভান্ত ভীত-প্রকৃতি না হ'লেও এই নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে প'ড়ে মনোব উদ্বেজিত অশান্তিকে সাম্বনা দানে শাস্ত ক'রে রাখতে পাবছিল না। মহৎ কর্মের অভূহাতে যান! নিষ্ঠুরতায় বা হত্যার প্রবৃত্ত হয় তাদের চিন্তে কল্পনা উত্তেক করবার চেষ্টা যে বাতুলতা মাত্র এ-কথা বুঝতে তার দেবী হয় নি। ভাব প্রথম প্রবৃত্তি হ'ল যে একটা মোটা চেক সহী ক'রে বেরিয়ে গিয়ে পুলিশের হাতে এদের সমর্পণ করে। কিন্তু নিজের ছেলেমানুষী কল্পনাবৃত্তিতে নিজেরই হাসি পেল। প্রথম ত, টাকাটা হাতে না পেয়ে তাবে মুক্তি দেওয়াব কথা পাগলের জল্পনা বই আর কিছু নয়। তার পব পুলিশেব সাহায্য নিলেও এদের সম্বান সে মোবে কেমন ক'রে? নিশ্চয়ই ধরা পড়বার মহৎ আকাঙ্ক্ষায় এরা এখানে অপেক্ষা করবে না। তা ছাড়া ভবিষ্যতে অবশ্যই তারা এর প্রতিশোধেব চেষ্টা না ক'রে ছাড়বে না। স্বতরাং টাকা ত গেলই, প্রাণও এদের হাতে বন্ধক রইল। অতএব হয় এদের দলে নিজেকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া, নতুবা মৃত্যুবরণ, এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা সে দেখতে পেল না। এই হত্যাকারী দলের দম্ভাবৃত্তিতে যোগ দেবার কথা মনে ক'রে যুগ্ম তার অভিজাত চিত্ত কটকিত, তার সর্বশবীরের রক্ত বিক্রোহী হয়ে উঠল। মনে মনে বললে, ‘কখনই না। মৃত্যু স্বীকার করতে হ'লেও না।’ ভেবে দেখলে তার জীবনের কিই বা মূল্য, যার বিনিময়ে এমন জবজব বৃত্তি সে অবলম্বন করতে পারে। কিছই না। সে

কিছুতেই স্বীকার করবে না। চিন্তা করতে করতে সে যেন একটু মরিয়া হয়ে। ভাবলে, 'কি হবে আমার বেঁচে? কত দিন ত এই মৃত্যুকেই কামনা করেছি, দেখিই না কি হয়।'

অনেক ক্ষণ চুপ করে ভাবতে দেখে সীমা আবার বললে, "শচীন বাবু, আপনি শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক। দেশের কথা বিস্তারিত করে বোঝানোর দরকার নেই আপনাকে। সমস্ত স্থিতি সংশয় পরিভ্রাণ করে নেমে আসুন আমাদের মধ্যে; আমাদের দলে অনেক জমিদার গৃহস্থ সভ্য আছেন, আপনিও তাঁদের একজন হয়ে থাকবেন। শুধু আপনার দেয় চাঁদটা ঠিক মত দিয়ে গেলেই আপনার আর কোন দায় থাকবে না। কি বলেন?"

"যদি রাজী না হই?"

"রাজী না-হবার উপায় কি আপনার হাতে? আপনি জানেন যে আপনার বা আমার প্রাণের মূল্য আমাদের কাছে মাত্র রিভলভারের একটা গুলির দাম। তার আবশ্যক কি? আপনারও কমলাপুরী এবং স্বৈশ্বর্ধ্য বজায় থাকুক, আমরাও আপনার কৃপা থেকে বঞ্চিত না হই। এই ত ভাল।"

শচীন চুপ করে ভাবতে লাগল।

সীমা বললে, "তাহলে চেক বইটা দয়া করে বের করুন, আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর তা বাড়াতে চাই নে।"

শচীন্দ্রনাথকে তবুও নিস্তব্ধ হয়ে চিন্তা করতে দেখে সীমা একটু অশ্রুচকিত হয়েই বললে, "শচীনবাবু, আপনার মঙ্গলের জন্তই বলছি আমার কথা শুনুন। বিলম্ব না করে কাজটা সেরে ফেলুন। নইলে আমার এক দাদা আছেন, ঠাঁকে মোটর ড্রাইভার রূপে দেখেছেন, তাঁর হাতে পড়লে আপনাকে বাঁচান দুরূহ হবে। তাড়াতাড়ি করুন, আমার আবার নারীভবনে খেতে হবে, সে দিকে অনেক দিন যাই নি।"

"প্রাণের ভয় মিছে আমাদের দেখাবেন না। আপনাদের যা সাধ্য করতে পারেন।"

"যানে?"

"যানে, আপনাদের হাতে প্রাণ ভিক্ষা নিয়ে নরহত্যার কাজে সে প্রাণ উৎসর্গ করতে আমি স্বেচ্ছা করি।"

সীমা এই উত্তরে একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। তার মৃত্যুঞ্জয়ী চিত্ত মনে মনে শচীন্দ্রের প্রশংসা না করে থাকতে

পারল না। যে ঘুতপুট, আলতাপরায়ণ, হৃদয়বিলাসী জীব কল্পনা করে সে শচীন্দ্রনাথের অহসঙ্কানে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তার বদলে এই বে-পরোয়া লোকটিকে দেখে সে মনে মনে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। কিন্তু পরক্ষণেই তার অন্তর্নিহিত নারী কুতূহলী হয়ে উঠল। ভাবলে, "পার্কতীর উপর অভিমানে নাকি?"

সে একটু মিষ্টি স্বরে প্রায় যেন অল্পবোধের মত করে বললে, "দেখুন, আপনার বীরত্বকে আমি তারিফ করছি। কিন্তু অকারণ-বীরত্বের প্রয়োজন কি? যাদের কাছে আপনার প্রাণটা মূল্যবান তাদের জন্তেও অন্ততঃ প্রাণটা আপনার রাখা দরকার বইকি।"

শচীন্দ্রনাথ "প্রাণটা যাদের কাছে মূল্যবান" কথাটা শুনে একটু অশ্রমন্ত হয়েছিল।

সীমা বলতে লাগল, "আর একটা কথা চিন্তা করে দেখবেন। দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে যে টাকার দরকার, সরকার সেগুলো আদায় করে নেন আশ্রয়ার্থেও পোষা পালনেন। সুতরাং তা আমরা সংগ্রহ করতে বাধ্য হই অর্থবানদের কষ্ট দিয়ে। অর্থবই আমাদের প্রয়োজন—সে-অর্থ আমাদের সংগ্রহ কবতেই হবে। আপনি যদি দয়া না করেন, তা হলে পার্কতীর দেবীরই শরণাপন্ন হতে হবে।"

এই কথায় শচীন্দ্রের মনের মধ্যে একটা আশঙ্কার বিদ্যুৎ বিলিক দিয়ে গেল। মুহূর্ত্তে পকেট থেকে চেক-বই বার করে সে বললে, "আপনাদের কত প্রয়োজন?"

নিজের কৃত্তিখে খুলী হয়ে একটু মুহূর্ত্তে সীমা বললে, "আপাতত দশ হাজার।"

এক মিনিট চিন্তা করে সে লিখতে শুরু করলে। লিখতে লিখতে সে ভাবতে লাগল, "কিন্তু এ জ্বরদস্তির শেষ কোথায়? আমার আতঙ্কের হৃদয় ভাঙিয়ে যদি টাকা আদায় করতে শুরু করে, তাহলে চিরকাল এদের রসদ যোগাবার আতঙ্ক থেকে নিস্তার পাবার উপায় কি হবে? না, এ নির্বুদ্ধিতা সে করবে না। কিছুতেই না। তাকে না পাওয়া গেলে বরং পুলিশে এব একটা কিনারা করতে পারে; কিন্তু চিরকাল এদেব তর্জনীতর তাড়নে লাঙ্গুলাহত কুকুরের জীবন বাপন করা অসম্ভব।" হঠাৎ

চেকখানা ছিঁড়ে ফেলে বরণা কলমটা গুটিয়ে সে পকেটে রাখলে।

সীমা বললে, “বুঝলাম, আপনাকে সদ্‌বুদ্ধি দান ক’রে কোন ফল নেই। কিন্তু পার্কভী দেবীরও ঐ একই দশা ঘটতে পারে। তাঁকে রক্ষা করার কর্তব্য—”

হঠাৎ তীব্র হ’য়ে উঠে শচীন বললে, “আপনারা নিজেদের নিরুন্নতার মূঢ়তার নিতান্তই অন্ধ। পার্কভী দেবীকে চিনলে বুঝতে দেয়ী হ’ত না। যে আপনাদের মত গোপনচারী হস্তাধিকারী কামুকদের ভয় করবার মেয়ে সে নয়। মৃত্যুভয় দেখিয়ে সেখানে কিছু হুঁবিধে হবে না। এটা নিশ্চয় জানবেন।”

সীমা সত্যিই এবারে যেন একটু মুগ্ধিলে পড়ল। নিজ হাতে সে কখনও খুন করে নি। কোন রকমে চিরকাল হত্যা ব্যাপারটাকে এড়িয়ে চলবার দুর্বলতা তার মনের মধ্যে কোথায় যেন লুকিয়ে থাকত। এই জন্তে দিনের পর দিন ক্রমে ক্রমে সে রক্তলালের মনে তার বিরুদ্ধে শক্ততা এবং বিরোধের আগুন জ্বালিয়ে তুলছিল। কিছুমাত্র উত্তেজিত না হয়েও কেবলমাত্র নিরাপত্তার অভ্যুত্থানে নিশ্চিন্তে একটা নিরস্ত্র লোককে অনায়াসে খুন করার বীভৎসতাটা কেমন যেন সে সহ্য করতে পারত না। ফাঁসীর

ইকুমকে চিবদিনই সে বেশী অপরাধ বলে মনে ক’রে এসেছে তাই সে রক্তলালের নিশ্চিত মৃত্যুকবলে এই লোকটিকেও ছেড়ে দিতে যেন পেরে উঠছিল না। তাই সে নিজের অজান্তেই নানা প্রকারে শচীন্দ্রের বিবেচনাবৃত্তিকে সচেতন ক’রে তার প্রাণরক্ষার পন্থার যেন চেষ্টা করছিল। এও তার মনে হয়েছিল যে সাধাবণভাবে প্রেমার্জিত হ’লে জীবনের মায়ী ত্যাগ করা এত সহজে কখনই সম্ভব হ’ত না। সে একটু আশ্চর্য হ’য়ে জিজ্ঞেস করলে, “জীবনের প্রতি সত্যিই কি এত বিতৃষ্ণা আপনার? কিন্তু কেন বলুন ত? আমি সত্যিই আপনার বীরকে আশ্চর্য হয়েছি। সত্যিই আপনাব মৃত্যুচিন্তা ক’রে আপনি একটুও কাতর নন?”

“একটুও না।” ইচ্ছে ক’রেই সে একটু জোর দিয়ে বললে। তার অবস্থার উপর অনিশ্চিতা দেবীর প্রভুত্বের মুষ্টি যে কেমন একরকম ক’রে একটু শিথিল হয়ে এসেছে তা যেন সে অনুভব করলে।

“কেন, বলতে কি আপনার কোন বাধা আছে?”

শচীন্দ্র চুপ ক’রে ভাবতে লাগল। অনিশ্চিতা দেবীর কথার স্বরে পূর্বেকার সেই সূদূরত্ব সেই কঠিনতা যেন একেবারে পরিচিত ও স্পর্শকোমল হ’য়ে এসেছে। ভাবলে যে এনার্কিষ্টদের আমরা কি অদ্ভুত ব’লে ভাবি। স্বপ্নে ছুঁতে স্নেহে কোঁতুহলে তারা যে আমাদের থেকে কোথাও এতটুকু ভিন্ন নয় তা যেন আমাদের ধারণাতেই আসে না। নাতাল যেমন যত ক্ষণ মদের কোঁকে থাকে ততক্ষণই মাতাল; তারপর সে কবি, শিল্পী, বন্ধু, ভাই, স্নেহাস্পদ ইত্যাদি, ঠিক তেমনি। মেয়েটির উপর তার মনে কেমন যেন একটু কল্পনার উল্লেখ হ’ল, এমন কি স্নেহও বলা চলে। নিজেকে ওর চেয়ে অনেক হুঁহু শাস্ত আস্ত হ’লে মনে হতে লাগল। কার শাপে যেন ওর এই বিপ্লবী বসন্ত, এ যেন ওকে মানায় না। ওর অন্তরাখ্যা যেন এর বিরুদ্ধে বিরোধ ক’বে উঠতে চাইছে। ওর বাইরের বিপ্লবী তাকে আমল দিতে চায় না; টুঁটি টিপে তাকে যেন ও বোবা ক’রে রেখেছে। তার মনটা কোমল হয়ে এল। সে ধীরে ধীরে সীমার কাছে একটু একটু ক’রে ঘোঁটামুটি ভাব জীবনের ঘটনা বলে গেল। যখন শেষ ক’রে সে বললে, “মৃত্যুকে কত দিনই যে কামনা করেছি, তা বলতে পারি নে।”

সীমা তখন ভাবছে কলমার কথা। “কি সর্বনাশ, এ যে জ্যোৎস্নার স্বামী! এখন আমি কি করি? রক্তলালের হাত থেকে একে রক্ষা করতে হ’লে এখুনি এঁকে মুক্তি দেওয়া দরকার।” তার একবার ইচ্ছে হ’ল যে ছুটে জ্যোৎস্নাকে গিয়ে এই সংবাদ দেয়। কিন্তু তার দলের কর্তব্য, তার দেশের কর্তব্য তার সকলের আগে। এ কি অলস রসবিলাসিতা তার! ছিঃ! সত্যবানের কাছ থেকে শোনা গীতার শ্লোক সে মনে মনে প্রাণপণে আবৃত্তি করতে লাগল—

“হৃদয়ঃ স্বয়ম্‌দৌর্জাল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরম্পরাং।”

আমার দেশের স্বাধীনতার কাছে আমার ভাই-বন্ধু স্নেহ-মমতা পাপ-পুণ্য ব্যক্তিগত চিন্তা কি ঠাই পাবার যোগ্য? মনে মনে নিজের দুর্বলতার জন্তে নিজেকে কঠিন তিরস্কার করলে। এবং আর অপেক্ষা না ক’রে সে বাইরে চলে গেল।

নিখিলনাথ তার ব্যর্থ অভিযান থেকে ফিরে বাইরে তখন তার জন্তে অপেক্ষা করছিল। সীমা চক্ৰবর্তি বিন্দু ও আনন্দে

তাকে অভিবাদন করে বললে, “ওমা, আপনি কত স্বপ্ন?” তার পর তাব ঝিষ্ট চিন্তাজল মুখ দেখে বললে, “আপনার স্বপ্ন কত করেছে না কি? এ কি চেহারা হয়েছে আপনার এ কয় দিনে?” বলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তার উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগল। “ক্ষুদ্র হৃদয়দোর্ল্যাং” প্রভৃতি আর মনে রইল না।

বল্লভপুর থেকে ফেরবার সময় নিখিল, সমস্ত রাত অস্থিত্তিতে কাটিয়ে অল্পতাপের তাড়নায় অবশেষে ম্যানেজারকে শচীন্দ্রের ও সীমার ভবিষ্যৎ বিপদের কথা এক রকম করে জানিয়েই এসেছিল—ষ্টেশন থেকে একটা চিঠি লিখে এবং বিনা বিলম্বে শচীন্দ্রের সংবাদ নেবার জন্তে অল্পবোধ করেছিল সেই পত্রে।

অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে, এবং নিজেরই নির্বুদ্ধিতায় মনিবের এই বিপদ বুঝে ম্যানেজার চতুর্দিকে টেলিগ্রাম করে সেই দিনই কলকাতায় চলে গেল।

নিখিল সব খুলে বললে। সীমার কলকাতা পরিত্যাগ থেকে স্বরূপ করে নন্দলালের হত্যাকাহিনী পর্যন্ত বলতেই সীমা সক্রোধে বলে উঠল, “কী, নন্দলালকে খুন করেছে? এ নিশ্চয়ই রক্তলালের কাজ। আমার বিনা ছকুমে!—এ স্পর্ধার শাস্তি তাকে পেতেই হবে।”

সীমা যে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয় নি এইটুকুতেই যেন নিখিলের মনের অর্ধেক বোঝা নেমে গেল। সে স্বহাগ পেয়ে খুব আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল, “সীমা, আর কেন। অকারণ নবহত্যা যখন স্বরূপ হ’ল, তখন সংস্রমেব পথে, ভ্রাতৃগণের পথে, মহুয্যস্বের পথে কখনও তোমার বাহিনীকে আর ফেরাতে পারবে না, এটা নিশ্চয় জেনো। যে ব্রহ্ম-হাউণ্ডেব দলকে দেশের স্বাধীনতালাভের মুক্তিযোদ্ধা বলে কল্পনা করছ, তারা মুক্তিপিপাসু নয়, তারা রক্তপিপাসু। তাদের প্রাণ দিয়ে দেশের কাপুরুষতাকে আর বাড়িও না। এখনও ফেরো দেশের এই সর্বনাশের পথ থেকে—”

রক্তলাল যে কখন পিছনের দরজা দিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল তা কেউ দেখে নি। গরিলার মত বিকট একটা মুখভঙ্গী করে সে টেচিয়ে উঠল, “চুপ রও ডাক্তার, মুখ সামলে কথা বল। এ তোমার নাসের আড্ডা নয়। প্রাণ নিয়ে ছুঁচোর গর্ভে ঢুকেছিলে সেই ভাল। প্রাণের মায়

থাকে ত এ রক্তা আর মাড়িও না ব’লে দিচ্ছি। সীমার পেয়ারের ব’লে রক্তলাল তোমায় ছেড়ে দেবে না।”

সীমা রক্তলালের দিকে ফিরে ধমকে উঠল, “রক্তলাল!”

নিখিলনাথ রক্তলালের দিকে ফিরে একটা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বেশ আশ্বে আশ্বে বললে, “রক্তলালবাবু, আমি আপনার গোপীলোক নই তা ঠিক। হুতরাং আমাকে চোখ রাড়িয়ে কোনো ফল নেই। প্রাণের ভয় বার করে প্রাণের ভয় তারাই দেখিয়ে বেড়াব। লুকিয়ে নিরস্ত্র লোককে খুন করা যাদের ব্যবসা, বীরস্বের বড়াই করা তাদের পোষায় না।”

ক্রোধে মুখ বিকৃত করে রক্তলাল আবার কি একটা বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় সীমা এগিয়ে এসে আবার তাকে ধমকে বললে, “রক্তলাল, তোমার স্পর্ধা দিন দিন সম্বের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। তোমাকে কিছু সংযত করা আবশ্যক। কার ছকুমে তুমি নন্দলালকে হত্যা করেছ?”

নন্দলালের হত্যাকে সীমা যে প্রসন্ন চোখে দেখবে না রক্তলাল তা ভাল করেই জানত। তাই সীমার অস্থিত্তিতে সে সীমাকে প্রসন্ন করবার উদ্দেশ্যে বহু পরিশ্রমে সরকারী ট্রেনারী লুঠ করবার বিস্তৃত প্ল্যান করে রেখেছিল। ইচ্ছা ছিল যে এই সংবাদটি দিয়ে সে নন্দলালের হত্যাপর্যটক সীমার মনে লঘু করে আনবে। কিন্তু নিখিলের জন্তে তা ঘটে উঠতে পারল না। ডাক্তার যে সীমাকে প্রাস করতে বসেছে এই চিন্তায় সে নিজেকে সংযত রাখতে পারে নি। কিন্তু শাসন-সম্বন্ধে সীমার কঠোরতার কথা রক্তলালের অবিদিত ছিল না। স্পর্ধা প্রকাশ করে বা সীমাকে লজ্জন করে নিস্তার পাবার আশা তার নেই। তার নিজেরই রচিত কঠোর শাসনবিধি থেকে তারও যে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব তা সে জানত। পুলিশ বা সীমা কারও হাতে ইহু-কলে প’ড়ে মারা যাবার বাসনা তার ছিল না। অনিয়মিত কালের জন্ত গভীর জঙ্গলে এক পরিত্রাণ অট্টালিকার কয়েদখানায় নির্জন কারাবাসের চিন্তা তার মনকে দমিয়ে আনলে। ঐ ছিল তাদের বিশেষ শাসনবিধি। মনে মনে সে সীমা এবং নিখিলের মুণ্ডপাত করলেও বাইরে তৎক্ষণাৎ অস্থিত্ত হয়ে নিজের অস্ত্রায় স্বীকার করে অবনত মস্তকে সেখান থেকে সে বেরিয়ে গেল।

সীমা এক সপ্তাহের মত তাকে কর্তৃত্ব থেকে চ্যুত করেছিল। নিম্নলিখিত ক্রোধে, হিংসায়, প্রতিশোধ-কামনায় তার অন্তরটা দগ্ধ হচ্ছিল। মনে মনে বললে “না, এ প্রহসনের একটা শেষ করতে হবে।”

৫৬

নন্দলালের ভীষণ মৃত্যু প্রত্যক্ষতা বিধবা মালতীর কল্পনাবিশ্ব চিত্তকে এমন সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করেছিল, যে, তার নিজের বৈধব্যের ভবিষ্যৎ সর্বনাশের কোন কাল্পনিক চিত্র তার কাছে কোন বাস্তব তীব্রতা নিয়ে বিভীষিকা দেখাবার অবসর পায় নি। ঘাতকের যে নিষ্ঠুর তীক্ষ্ণ অজ্ঞানতায় তার অতীত স্বার্থপরতার সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়েছিল, নিজের সেই নিঃসহায় বৈধব্যের নিবানধারণ চিত্র তার চিত্তপটে প্রতিফলিত হবার পূর্বে নন্দলালের স্নেহ-লালিত অঙ্গে অজ্ঞানতায় অপরিণীত যন্ত্রণা কল্পনা করে সে প্রথম প্রথম অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়ত।

“তিনি যে এতটুকু যত্ন না সহিতে পারতেন না দিদি। রাজ্যে কোন শত্রু হ’লে ভয়ে ছেলেমানুষের মত আমার কাছে ঘেঁসে আসতেন। উঃ! মাহুয়ে কেমন করে এমন খুন করতে পারে। মাগো!” ব’লে হত্যার বীভৎসতা কল্পনা করে উচ্ছ্বসিত হ’য়ে কাঁদতে থাকত। অহতপ্ত কমল সান্ধার কোন ভাষা খুঁজে পেত না। অশ্রুবিগলিত নয়নে সে অজয়কে ধীরে ধীরে মাসীর কোলের কাছে দিয়ে মালতীর গায়ে হাত রেখে নির্বাক হয়ে পরিপূর্ণ সহানুভূতি স্নেহে তার কাছে বসে থাকত।

অজয়ের প্রতি তাব স্নেহপূর্ণ মোহের আকর্ষণে অঙ্গে অঙ্গে মালতীর সৃষ্টিবিহবেদনার তীব্রতা ক্রমে লঘু হয়ে আসল। তা ছাড়া শোকের ব্যাপকতায় বহুদিন আচ্ছন্ন হয়ে থাকবার মত মানসিক গভীরতা তার ছিল না। তার রিক্ত স্বয়ংকে স্নেহরসে পূর্ণ করে তোলবার সহজধর্মই ছিল তার স্বাভাবিক। অজয়কে সে আরও নিবিড়তর স্নেহে ঘের বৃকের মধ্যে টেনে নিলে। তার শোকদগ্ধ স্বয়ংকে শূন্যতাকে পূর্ণ করার পক্ষে অজয় তার কাছে ক্রমে আরও প্রয়োজনীয় হ’য়ে উঠল। একদণ্ড সে আর অজয়কে চোখের অন্তরাল করতে চাইত না। কমলা চুপ করে দেখত সবই। অজয়

ধীরে ধীরে তার শিশুস্বভাব হৃদয়বিশেষের আশ্বাদে তাব মার চেয়ে ক্রমে তার মাসীর আদরের এবং প্রেমের গন্ধ-পাতী হয়ে উঠল। কমলার আশ্রয়বিহীন চিরদুঃখপীড়িত নারীচিত্তে এতে যেটুকু বেদনার সঞ্চার করত, নন্দলালের হত্যা-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ সেটুকু সে স্বীকার করে নিলে।

দে-শোকের আঘাত প্রথম দিন মালতীর কাছে ছুঁসে ব’লে বোধ হয়েছিল, সেই শোক পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই কেমন করে যে সাংসারিক ও ভবিষ্যৎ চিন্তার আবস্তকের পরিধির মধ্যে এসে আবদ্ধ হ’ল তাবনে অবাক হ’তে হয়।

একদিন সে কমলাকে বললে, “দিদি, তুমি আমাকে দূরে যেতে দিও না। আমি চিরদিন তোমার কাছে থাকব। খোকনকে ত ছাড়তে পারব না।” কমলা মালতীর দুর্দশাব কথা শ্রবণ করে ব্যথিত হয়ে উঠল। বললে, “তোমাকে কি আমি ছেড়ে দিতে পাবি দিদি? খোকনই বা তোমায় ছাড়বে কেন? কী যে হবে তা নিখিলবাবুর সঙ্গে দেখা না হ’লে ত কিছুই বুঝতে পারছি নে। কিন্তু সে যাই হোক, তুমি আমার বড় ছুঁবে বোন যে দিদি। তোমায় ছেড়ে আমারই বা গতি কি?” বলতে বলতে সে অশ্রুমনস্ক হয়ে নিখিলনাথ যে আজ কয়দিন একেবারেই আসেন নি সেই কথাই চিন্তা করতে লাগল।

৫৭

সীমার কাছে অপমানিত হয়ে রক্তলাল বেরিয়ে গেল। ক্রোধে তার মনে প্রতিশোধের অশ্রু উঠছে লেলিহান হয়ে। একটা সামান্য মেয়ের তর্জনীভাঙনে চিরদিন তাকে কুকুরের মত স্থগীত জীবন যাপন করতে হবে একথা মনে করে বাগে হিংসায় সে অস্থির হয়ে উঠেছে। ভাতার প্রয়োজনে সীমা তাকে অপমান করতে সাহস করে। এ-দুঃসাহসের প্রতিফল সে দেবেই। একবার ভাবলে, নিখিলকে শেষ করে এর শোধ তুলবে। কিন্তু ভাতারকে খুন করলে যে সীমার হাতে সে রেহাই পাবে না এই কথাটা চিন্তা করে তার মনটা নিকটসাহ হয়ে পড়ল। সীমার অহুচরদের উপর সীমার প্রভাব অসীম। স্বভাব হত্যা করে তাদের হাত থেকে রক্ষা পাবার আশা তাব

অল্পই। গোপনে নিজেরই দলের লোকের হাতে নিঃশেষে প্রাণ দিতে সে কিছুতেই পারবে না। প্রহুজের মত, সভাবানের মত যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়ে দেশের এবং দেশের মধ্যে একটা চিরস্মরণীয় নাম সে রেখে যেতে চায়, কিন্তু সীমার সঙ্গে যোগ দিয়ে এ কি ভুলই করেছে সে? এই সব জীলোকের কারবারে সেই বীরত্ব দেখাবার সেই সব দুর্জয় বিপ্লবের আশা কোথায়? শেষকালে পুলিশের হাতের হাতকড়ি প'রে স্ববোধ বালকের মত একদিন ফাঁসিতে লটকতে হবে না কি! তা কিছুতেই হবে না। তার আগেই এর একটা বিহিত করতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবার পূর্বে সে এমন একটা কিছু ঘটিয়ে তুলতে চায় যাতে তার চিরদিনের দুরাশা এবং প্রতিশোধের তৃষ্ণা দুই-ই চরিতার্থ হয়।

এর পর যে তার পক্ষে তার হতগৌরব পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হবে এবং সীমার কাছে এই পরাজয় যে তাকে নিঃশেষে পরিপাক কবতে হবে, এ তার পক্ষে অসম্ভব। সীমার কার্যপদ্ধতির এই নিরুপদ্রব বিস্তৃত আয়োজনের গ্রহসন সে সহ্য করতে পারে না। এমনি করে মরা দেশের বৃকে বসে শবসাধনার কি আবশ্যক আছে? ‘মরা’কে বাঁচিয়ে তুলতে হ'লে যে জীবন্ত মাল্লষেব বলি প্রয়োজন। দেশের নাড়ীতে উত্তেজনার রক্তপ্রবাহ না বহাতে পারলে, দেশের নিস্তেজ স্নায়ুজালোর মধ্যে মৃত্যুস্রাব তৃষ্ণা না জাগাতে পারলে নিরর্থক হবে তাদের এই মৃত্যুসাধনা। অনায়াসে অকারণে মরণের তাগুবে ঝাঁপ দিতে না শেখালে জীবনের সাড়া এই মরা-দেশের মধ্যে জাগবে কি করে? হবে না সীমার ঐ ক্ষীণ-প্রাণ নপুংসক প্রতিষ্ঠান দিয়ে। কি করতে পারে সে, যাতে এই বিরাট ইংরেজ রাজত্বের নখাগ্রও ধ্বংস পেতে পারে। ওসব অজুহাত তার কিছু করতে ভয় পাবার নামাস্তর বই আর কিছুই না। কিসেব অহংকারে সে আমাকে তুচ্ছ করে? রজ্জলাল, মৃত্যুভয়ে-পালিয়ে-বেড়ানো কুকুর নয়। মৃত্যুকেই সে চায়, বীরের মৃত্যুকে; প্রবলের বিরুদ্ধে, নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে দুর্জয় লড়াই করে সে মরবে। সীমা-নিখিলের লীলাকুজ সে বস্ত্রশ্রোতে ভাসিয়ে দেবে—তবেই তাব শাস্তি।

দিনের পর দিন এই রকম চিন্তা করতে করতে মাথার মধ্যে রক্তশ্রোত তার উন্মাল হয়ে উঠল। সীমার উপর

প্রতিশোধ এবং একটা সন্মুখ সংগ্রামের দুরন্ত বাসনায় মনে মনে একটা ক্রুর মতলব স্থির করে পুলিশের কাছে ভুলু দস্তের নামে সে একটা চিঠি লিখে পাঠাল। ভুলু দস্ত যে সীমার সন্ধানে উৎকর্ষ একথা তাদের অজানা ছিল না। বিস্তৃত ভাবে সীমা এবং তার প্রতিষ্ঠানের সংবাদ, তাদের বিভিন্ন কার্য-কলাপের, এমন কি শচীন্দ্রনাথের বন্দী হওয়ার সংবাদটি পর্যন্ত, দিয়ে সে জানাল যে দু-এক দিনের মধ্যে সীমার দল দমদমের বাড়ী পরিভাগ করে রাজকোষের উপর তাদের বহুদিনের ঈর্ষিত অভিযান নিয়ন্ত্রিত করবার ব্যবস্থা করেছে ইত্যাদি।

রজ্জলালের দু-একজন বিশ্বস্ত লোক তার দলে ছিল। তাদের সাহায্যে পরদিন এই পত্র রওনা করে দেবাব ব্যবস্থা করে সে নিজেকে কতকটা হুস্থ বোধ করলে এবং নিতান্ত নিরীহভাবে সে দমদমায় সীমার সঙ্গে দেখা করতে গেল। তখন সন্ধ্যা আসন্ন।

সীমা একটু সন্দেহের স্বরে বললে, “রজ্জ-দা, কি মনে করে? মতলব কি?” রজ্জলাল কৃত্রিম ক্ষোভে গম্ভীর হ'য়ে বললে, “রজ্জলাল অত মতলবের ধার ধারে না। সে নিজের সীমা লঙ্ঘন করেছে, তাই তার মন হুস্থ নয়। সে নিষ্কর্ষীর মত নিজের গৃহকোঠারে নির্বাসিত হয়ে আর থাকতে পারে না। তার স্পর্ধা ক্ষমা করে তার নির্বাসনদণ্ড থেকে তাকে অব্যাহতি দাও।”

সীমা বললে, “রজ্জ-দা, আমাদের নিয়ম ত জান। সাত দিন না গেলে ক্ষমা করবার অধিকার ত আমার নেই।”

“তোমার শাস্তি থেকে আমি নিষ্কৃতি চাইছি না সীমা। বাকী দু-তিনটা দিন আমাকে এখানে থাকতে দাও। আমাদের সমস্ত কর্মসূত্র থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকাই আমার সব চেয়ে বড় শাস্তি। এ তিন দিন আমি তোমাদের কোন কাজে বা আলোচনায় থাকব না, প্রতিজ্ঞা করছি।”

সীমা একটু ভেবে বললে “আচ্ছা, কিন্তু কথা দাও যে শতীনবাবুর সঙ্গে কোন রকম বাক্যালাপ করবে না বা তার সম্বন্ধে কোন কিছুতে তুমি হাত দেবে না।”

“তথ্যস্তু, সেই প্রতিজ্ঞাই করলাম।” একটু নত হয়েই যেন সে এই কথা কয়টা উচ্চারণ করলে। তার নতিভঙ্গীতে যে একটু উপহাসের আভাস ছিল সীমা সেটুকু লক্ষ্য করলে

কিন্তু গ্রাহ্য করলে না। ভাবলে, এখানে সে কিছু বেয়াসবী করতে সাহস পাবে না, বরং সকলের চোখের উপরেই থাকবে।

রঙ্গলালের অবশ্য সম্প্রতি শচীন্দ্র সিংহ সঙ্ঘে বিশেষ কিছু কৌতুহল ছিল না। পুলিশবাহিনীর আসন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে কিছু আয়োজন এই স্বযোগে সে সম্পন্ন করে রাখতে চায় যাতে ব্যাপারটা একটা যুদ্ধের আকার নেয়। সীমার অস্থপস্থিতিতে প্রায় অর্ধরাত্রি পর্যন্ত সেই কাজেই সে নিজেই ব্যাপৃত রাখলে।

* * *

নির্জন কক্ষে বন্দী শচীন্দ্রনাথ মৃত্যুর প্রতীক্ষায় সময় অতিবাহিত করতে লাগল। মৃত্যুকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নেবার পব মৃত্যুভয় তার কাছে যেন ছায়া-স্পর্শ অবাস্তব হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুঞ্জয়তার মহিমা যেন তার চিন্তকে গভীর আত্মপ্রসাদের অহুত্বুতিতে পরিপূর্ণ করেছে। হীন মৃত্যুভয় এই মহিমার কাছে লঙ্ঘিত হয়েই যেন তার আভিজাত্যপ্রাপ্ত চিন্তে প্রবেশাধিকার লাভ করে নি। সে নিজেকে সহজ করে নিয়ে আসন্ন মৃত্যুর জন্তে নিশ্চিন্তে প্রস্তুত হবার কৃমিকান্ডরূপ তার নোট বই বার করে কখন একটা উইল, কখন বা কমলাপুবীর ব্যবস্থা এবং কখন প্রয়াগ থেকে সীমার হাতে বন্দী হওয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে অবসর বিনোদনের অভিনয় করতে লাগল।

সীমার কল্যাণে তার আহারনিদ্রার স্বব্যবস্থার জটিল ছিল না। কিন্তু এই নির্জন কারাবাসের ভাববিনিময়-পরিশ্রুত নিঃসঙ্গতায় কয়দিন মাত্র ক্রমাগত কাটাবার পর এক সময় সভয়ে সচেতন হয়ে সে স্পষ্ট অহুত্বব করলে যে এই মহা স্বদীর্ঘ কয় দিনের মধ্যে এক মুহূর্তও সে মৃত্যুচিন্তাবিহীন নিরাময় শান্ত চিন্তে অতিবাহিত করে নি। যেমনই এই সঙ্ঘে তার চেতনা ফিরে এল সেই মুহূর্তেই সমস্ত প্রিয়-পরিজন, তার কর্ম ও ধ্যান জগতের সমগ্র রসাহুত্বুতিপূর্ণ অস্তিত্ব তাদের অপরিবর্তনীয় অমোঘ বিচ্ছেদের বেদনা নিয়ে মৃত্যুকে তার কাছে নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় করে তুললে। দুই হাতে মুখ ঢেকে সে তার খোকন, তার কমলা, তার পার্শ্ববর্তী বিরহে অকস্মাৎ আকুল হয়ে উঠল।

৫৮

রঙ্গলাল চলে যাওয়ার পর সীমা স্তব্ধ হয়ে বসে তার ইতি-কর্তব্য সঙ্ঘে চিন্তা করতে লাগল। শচীন্দ্রনাথের কথা নিখিলনাথকে জানাতে পারলে না। তার দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে জ্যোৎস্নার স্বামী শচীন্দ্রকে মুক্তি দেবার তার কোন অধিকার নেই। তা ছাড়া রঙ্গলালের প্রতি শাস্তিবিধান করার পর তার দলের প্রতি কর্তব্য সাধনব দায়িত্বে নিজের দুর্বলতার উপর সে মনে মনে আরও কঠিন হয়ে উঠল। কতকট নিখিলের সঙ্ঘে তার গোপন আকর্ষণের উত্তেজনায় যে সে রঙ্গলালকে শাস্তি দিয়েছে এ কথা অন্তরে অন্তরে তার চিন্তকে পীড়িত করছিল। শচীন্দ্রনাথ সঙ্ঘে কোন কথা উত্থাপন করবার স্বযোগ সে দেবে না মনে মনে এই রকম স্থির করে সে জ্যোৎস্না এবং মালতীর সঙ্ঘে জানবার জন্তে নিখিলের দিকে চাইলে।

বাইরেব বাগানের দিকে চেয়ে নিখিল চুপ করে বসে ভাবছিল। তারই নাকিশে রঙ্গলালকে শাস্তি দেওয়া হ'ল এই রকম অহুত্বব করে নিখিল অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিল। সীমার সতেজ নির্ভীক আচরণে তার চিন্ত অধিকতর আকুল হ'লেও সীমার কঠিন নির্ধম বিদ্যাসূত্র শক্তির প্রচণ্ডতা তাকে যেন দূরে ছাবেব বাইরে ভয়ঙ্কর সীমার ব্যবধানে সরিয়ে নিয়ে গেল। এই নারীকে বিপত্তরঙ্গপরিবেষ্টিত মৃত্যুপারাবারের সর্বনাশ থেকে শাস্তিময় উপজ্জ্বলে উত্তীর্ণ করবার উপায় সে যেন চিন্তা করে উঠতে পারলে না।

অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে সীমা বললে, “মৃত্যুর কোন প্রতিকার ত করা যাবে না, অন্য কোন রকমে মালতীর যদি কোন উপকার করতে পারি তার জটিল হবে না—অবশ্য, আমাদের সাধ্যে যা সম্ভব। বলুন, কি করা যাবে।”

“ব্যক্তিগতভাবে মালতীর সাহায্য করা যে নিরাপদ নয় তা ত জান। অর্থের অনটন মালতীর সম্ভবত হবে না। জ্যোৎস্না দেবীকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে বেখেছি। তাঁর আত্মীয় স্বজনকেও সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু...” ব'লে সীমার বিপদের কথা বলতে গিয়ে সে সঙ্কোচে চুপ করে গেল। সকলের বিপদ থেকে সীমাকে পৃথক করে

সাবধান করার স্বার্থপরতা সীমার কাছে প্রকাশ করতে তার লজ্জা বোধ করতে লাগল।

সীমা তাব কথা শুয়া ধরে নীরস কণ্ঠে নিজেই বললে, “কিন্তু কিছুদিন এখানে আপনার আর আসা চলবে না, নিখিলবাবু। এই হত্যার অল্পসম্মানে পুলিশ হন্যে হয়ে লাগবে। সুতরাং অকারণে আপনার নিজেকে এই বিপদের মুখে টেনে নিয়ে এসে কোন লাভ নেই। দরকার হলে আপনাকে সংবাদ দেওয়া—”

“আমাব বিপদের কথা এখানে আসছে না। আমি বলছিলাম তোমাদের ঠিকানা বদল করে আপাতত এখান থেকে কিছুদিন অন্যত্র গিয়ে থাকা উচিত। আর যদি শোন তবে বলি যে এই হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতার মধ্যে নিজেকে আব জড়িও না, সীমা। এর দ্বারা দেশের কি মঙ্গল কবা যেতে পারে? এই সব অকারণ হত্যায় দেশের জনসাধারণের চিত্ত তোমাদের অহেতুক নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। কি নিদারুণ, কি করুণ এই—”

সীমা বাধা দিয়ে বললে, “নন্দলালের হত্যা একটা সামান্য ভ্রম মাত্র। আপনার পরিচিত বলে আপনার কাছে এর নিষ্ঠুরতাটা এত বেশী বীভৎস হয়ে উঠেছে। সে যাই হোক, আমি আপনাকে সংবাদ না দেওয়া পর্যন্ত এখানে আপনার আর আসা চলবে না। আপনি যে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন তার জন্যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনি এখন আহ্বন। আমার অনেক কাজ আছে, এখনি আমাকে বাইরে যেতে হবে। মনে রাখবেন, কোন কারণেই এদিকে আর আপনি কিছুদিনের মত আসবেন না।”

এই আদেশের বিরুদ্ধে নিজের আবেদনের আর্জি নিয়ে অগ্রসর হতে নিখিল আর ভরসা পেল না। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মনে শ্রান্ত চরণে সে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে গেল।

সীমাকে এই সর্বনাশের পথ থেকে বাঁচাবার কোন উপায় করতে না পেরে তার মনটা হাহাকার করতে লাগল। কিন্তু সে কি করবে! স্বাধীনতার প্রলোভন বার কাছে তুচ্ছ, প্রেমের মোহ বার কাছে পরিহাসের বস্তু, মৃত্যু নিয়ত থাকে আকর্ষণ করছে, তাকে সে নিরস্ত করবে কোন উপায়ে? হতাশ ক্লান্ত চিন্তে সে নিজের শূন্য গৃহে ফিরে গেল।

সীমা অনেক ক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে চিন্তা করতে লাগল। অসংখ্য বিপদের সম্ভাবনা নিয়েও নিখিল যে তাকেই বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে অত্ননয় করতে এসে তিরস্কৃত ব্যথিত হয়ে ফিরে গেল, তার বেদনা উন্নত সীমাকে অন্তবে অন্তরে পীড়িত করতে লাগল। যে-পথে সে অগ্রসর হয়ে চলেছে তার থেকে নিবৃত্ত হয়ে নিরাপদ পন্থা গ্রহণ করবার উপায় নেই তার। সে কেমন করে নিখিলের উপদেশে আবাব শাস্তির রাজ্যে ফিরে যাবে? চিন্তা করতে করতে সে ক্ষণেকের জন্যে যেন এক পরম বয়সী কল্পনার রাজ্যে উপনীত হ'ল। যেখানে নিখিলের সহস্র মঙ্গল-প্রতিষ্ঠানের কর্শশক্তিরূপে সে পার্শ্বতীর মত নিজেকে দান করে আনন্দময় শাস্তিময় পরম পবিত্রস্থির মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করছে। যেখানে দেশের মানুষের মধ্যে জীবনের স্রোত উচ্ছল হয়ে উঠেছে; কর্মে, আনন্দে, প্রাণে, শক্তিতে দাসত্বের শৃঙ্খল আপনি খসে পড়েছে তাদের অঙ্গ থেকে; যেখানে এই মুক্তি-উৎসবের প্রাদর্শে নিখিলনাথের উৎসাহ-উদ্বীপনা, কৃতজ্ঞতা, আনন্দে উদ্ভাসিত আনন তাকে অভিনন্দিত করছে। সহসা সচেতন হয়ে সে দ্রুত উঠে পড়ল। সে কঠিন ভাবে নিজেকে ভৎসনা করলে, এ সে কোথায় চলেছে! এই কি তার গুরু সত্যবানের পরিশোধ? এই কি তার দাদা প্রফুল্লর শোণিতের মূল্য? “ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তীর্ণ পরম্পং।” নিজেকে সে মনে মনে বারংবার নির্ধাতন করতে লাগল। কিন্তু নিখিলের সেই তিরস্কৃত হতাশাপূর্ণ মুখ তার মনের অন্ততলে জাঁকড়ে ধরে রইল।

৫৩

সীমার কাছে প্রতিহত হয়ে কয়েক দিন পর্যন্ত নিখিল মালতীর বিষয়কর্ম এবং তার ও কমলার ভবিষ্যৎ ব্যবহার উদ্বোধনে নিজেকে নিয়োজিত রেখে সীমার কঠিন ব্যবহার এবং তার বিপদের কথা বিস্তৃত হ'তে চেষ্টা করতে লাগল। অক্লান্ত পরিশ্রমে সে নন্দলালের ব্যবসায়িক ব্যাপার-গুলিকে যথাসাধ্য সুবিস্তৃত করে মালতী ও কমলার নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার ব্যবস্থায় নিজেকে কোন মতে অবসর দিল না। মালতীর বাপের বাড়ীর আত্মীয়স্বজন বড় কেউ ছিল না।

নন্দলালের বৃদ্ধা জননী নিতান্ত অর্থহীন অবস্থায় দেশের বাড়ীতে তাঁর দূরসম্পর্কিত এক ননদের তত্ত্বাবধানে বাস করতেন। তাঁর পক্ষে তাঁর চিবাভ্যন্ত গৃহকোটির ত্যাগ ক'রে কলকাতায় মালতীর কাছে এসে থাকা সম্ভব হ'ল না। মালতীও তার বৈধব্য নিয়ে অজয়কে ছেড়ে দেশের বাড়ীতে কিছুতেই যেতে রাজী হ'ল না। অগত্যা সম্প্রতি কমলা এবং মালতীকে অপেক্ষাকৃত একটা ছোট বাড়ীতে মালতীর গ্রাম-সম্পর্কে এক দ্বিভূজ বৃদ্ধ মাতুলের তত্ত্বাবধানে বাথার আয়োজন ক'রে কয়েক দিন পরে নিখিল একটু অবসর পেল।

অবসর পাওয়ায় সীমার বিপদের ভয় আবার তাকে পেয়ে বসল। কিন্তু কি উপায়ে সে সীমাকে নিরাপদ করতে পারবে তার পথ সে মনে মনে খুঁজে পেল না। ভুলু দত্ত যত দিন পর্যন্ত সীমার সন্ধান না জানতে পারে তত দিন সে এক রকম নিরাপদ এটুকু সে বুঝেছিল; তাই ভুলু দত্তের কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখা প্রায় তার অভ্যাসের মধ্যে হয়ে পড়েছিল। অনন্তোপায় হয়ে তাই সে আজ অনেক দিন পরে ভুলু দত্তের বাড়ীর দিকে যাত্রা করলে—বুলভগের ভাবগতিক বুঝে দেখবার উদ্দেশ্যে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। বিষয়কর্মবিরত পথিকের দল শান্ত চরণে ফিরে চলেছে দলে দলে শান্তিপূর্ণ গৃহনীড়ের পথে। একটা অন্ধ ভিখারী একটা মাটির হাঁড়ি বাজিয়ে পবিত্রাণে গান ক'রে গলার শিরাগুলো ছিঁড়ে ফেলবে এই পণ যেন—“এবার বিদায় দেও মা ঘুরে আসি।” গানের বিষয়, বিপ্লবীদের ইতিহাস ও তার পরিণাম। এক দল লোক অবহিত হয়ে তাই শুনছে। মৃত্যুকে যারা বরণ কবেছে তাদের উপর মনে মনে এই নিতান্ত নিষ্কর্ষ নিতান্ত নিরীহ ভয়ব্যাকুল মুঢ় গডলিকাযুগের কোথায় যেন একটু দরদ আছে। সে দবদের মধ্যে ইংরেজবিষে বা রাজদ্রোহের নামগন্ধও নেই। একটা ছোট ছেলে সেই অন্ধের হয়ে পয়সা কুড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিখিল তার হাতে অভ্যাসমত কিছু দিয়েই ডাবল, “এনার্কিসম-এ সাহায্য করছি না কি।” ভেবেই হেসে ফেলল নিজেকে বিকারগ্রস্ত, মনে ক'রে। হু-এক মিনিটের মধ্যেই একটা কাণ্ড ঘটল। পুলিশের একটি সার্জেন্ট, একজন ছোটবাবু এবং দু-চারটি পুলিশ এসে জনতাকে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়ে অন্ধকে ধ'রে নিয়ে

গেল। অন্ধ, মূর্খ বর্ণজ্ঞানহীন, গান গেয়ে দু-একটা পয়সা পায়—গানের সাহিত্য, ফিলসফি, পলিটিক্স কিছুই সে খার খারে না। নিখিল ডাবলে, “সর্বত্রই এরা বিভীষিকা দেখছে।” ব্যাপারটা হাস্যকর, কিন্তু নিখিলের মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সে ধীরে ধীরে ভুলু দত্তের দরজায় গিয়ে পৌঁছল। সেই দিনই সে রক্তলালের প্রেরিত সীমার সংবাদ লাভ করেছে। সদর দরজায় আজ প্রহরী দু-জন। তার পরিচিত যে-কনেটবলটি সেখানে থাকত, সে সসম্মানে উঠে তাকে অভিবাदन ক'রে জানালে যে “এভেনিং” না ক'বে আজ কারো যাবার হুকুম নেই। পুলিশের বাড়ীতে এ-ব্যাপারটা সামান্যই এবং স্বাভাবিক, তবু কি জানি কেন তার সম্মানিত মনটা বাধা পেয়ে বিমর্ষ হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে কনেটবল এসে জানালে যে হুজুরের যেতে বারণ নেই—সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

নিখিল তার চঞ্চল মনকে ঋণাসাধ্য সংযত ক'রে নিয়ে চেষ্টাকৃত নিরুদ্বেগ মুখে ভুলু দত্তের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলে। ঘরের বাইরেও দু-জন পুলিশ ছিল, তারা দাঁড়িয়ে সেলাম ক'রে তাকে পথ ছেড়ে দিলে। এত পুলিশের প্রাচুর্য্য সে ভুলুর বাড়ীতে পূর্বে কোনদিন দেখে নি। ঘরে প্রবেশ ক'রে তাব মনটা রীতিমত দমে গেল। তবু প্রাণপণে নিজেকে স্বাভাবিক এবং শান্ত রেখে সে এগিয়ে গেল।

পুরো জঙ্গী পোষাকে ভুলু দত্তকে আজ একটা জাঁদরেল বুলভগেরই মত দেখাচ্ছে। মুখভাব তার একটা গোপন উদ্বেজনায় ও আশায় প্রসন্ন, উত্তেজিত এবং যেন উচ্চকিত। সামনে টেবিলের উপর একটা রিভলভার। নিখিলকে দেখে একরাশ কাগজপত্র সরিয়ে সে বললে, “আরে, এস এস। কোথায় ছিলে বল ত এতদিন? তার পব বড্ড শুকনো দেখাচ্ছে যে। তোমার বৌদির সঙ্গে দেখা ক'রে একটু চা-টা খাওগে, আমি আজ ভাই একটু ব্যস্ত। ঘুরেছ বোধ হচ্ছে টে টে করে সমস্ত দিন। কোথায় গিয়েছিলে? ক-দিন আগে তোমার খোঁজ ক'রেছিলাম।” নিখিল ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারে বসে সহস্র স্মরেই বললে, “আর বল কেন? হাসপাতালের জন্তে টাকার জোগাড় করতে একটা বিটুকৈল জায়গায় গিয়ে পড়েছিলাম। তা না মিলল অর্থ, না পেলাম

মহাজনের দর্শন। বাবা, সে কি এখানে। বিশ মাইল
হেঁটে মারতে হয়েছে। তাও যদি কিছু পেতাম।”

“বটে? কোথায় হে, কার দরবারে?”

“আরে, ঐ যে কমলাপুরীর মালিক, বলভপুরের
জমিদার শচীন সিংহী। লোকটা বিস্তর দান-টান করে
স্তনে—”

“কার কাছে?”—বলে বলভগ টেবিলের উপর খাবা
পেতে যেন কান খাড়া করে সোজা হয়ে বসল—যেন
অপ্রত্যাশিত কিছু একটা শুনেছে।

“শচীননাথ সিংহ, বলভপুরের জমিদার। কেন?
অমনি করে উঠলে যে, চেন নাকি?” তার বুকের মধ্যে
তোলপাড় করতে থাকলেও খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে সে কথাগুলো
উচ্চারণ করলে।

তুলু নিজেকে একটু সামলে নিয়ে পুলিশোচিত সংযত
স্বরে বললে, “চিনিই ঠিক, তবে—এ—। দেখা পেলে?”

“না, তবে বলাছি কি? প্রয়াগে না কোথায় যেন
বেড়াতে গেছে। কেন? তার সন্ধান জান না কি?
ব্যাপারটা কি বল ত?”

“সন্ধান? হ্যাঁ, না, তা ঠিক জানি নে, তবে হ্যাঁ
ব্যাপারটা একটু গুরুতর বই কি। তাকে কিড্‌ন্যাপ কবেছে
মনে হচ্ছে। তার ম্যানেজার আজ খবর দিয়েছে। এইটা
নিয়ে পাঁচটা হ’ল। একটারও কিনারা আমাদের
মহাস্বাবা কবতে পারেন নি। এটা আমি নিজে নিয়েছি,
ইচ্ছে করে। তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। আবার কবে
দেখা হয় কি না-হয়। যা কাজ, হাতের তেলোয় প্রাপ্তি
নিয়ে নড়াচড়া।”

বলভগের কথাগুলো যেন কেমন রহস্যে ঢাকা।

নিখিলের চোঁট শুকিয়ে উঠেছে, গলা কাঁঠ হ’য়ে যাচ্ছে।
ভাবছে, “ইস, কি করেছে! এতক্ষণে যদি সীমারা তার

সব শেষ করে দিয়ে থাকে। উঃ, তা হ’লে জ্যোৎস্নার কাছে
মুখ দেখানো অসম্ভব হবে। আমারই দুর্বলতায় বেচারার
প্রাণটা গেল। আমি যদি দেবী না করে আগে পুলিশে
সংবাদ দিতাম।” অহুতাপে সে অন্তরে অন্তরে দম্ব হাচ্ছিল।
তবু সে নিজেকে বহু কষ্টে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে,
“এখুনি বেরছ নাকি?”

“হ্যাঁ এখুনি। বেশ একটু আরোজন করে নিতে হবে
কি না। মনে হচ্ছে, একটা বড় দাঁও মিলে যেতে পারে
তোমার বৌদির কল্যাণে। তুমি একটু ভিতরে যাও, ও
বড় কান্নাকাটি করছে। এখন তোমায় কিছু বলব না।
কাল যদি বেঁচে থাকি তবে সব শুনবে। তুমি ভাই ওকে
একটু শাস্ত করগে। আরে, পুলিশের বৌয়ের চোখ অত
পানসে হ’লে কি চলে? যাই ভাই, প্রার্থনা কর, যেন
আমার বহুদিনের আশা পূর্ণ হয়। হয় এসপার না-হয়
ওসপার, কি বল?” বলে হাহা করে একটা শুক হাসিতে
ঘরটা ভরিয়ে দিলে।

নিখিল স্পষ্ট দেখলে যে একটা অনিশ্চিতফল আসন্ন
ঘটনাব উত্তেজনায় তুলু দস্তর সমস্ত স্নান আজ উত্তেজিত
হয়ে উঠেছে। ঘটনাটা যে কি তা কল্পনা করে নিখিল
তার অহুতাপ প্রায় বিশ্বস্ত হ’ল এবং এখনই ছুটে সীমাকে
গিয়ে সংবাদ দেওয়া দরকার এই কথাই মনে মনে ভাবতে
লাগল। অথচ তুলু দস্ত না বেরলে এবং তুলু-পত্নীর সঙ্গে
সাক্ষাৎ না-করে যাওয়া সন্দেহের উত্তেক করতে পারে ভেবে
অল্প হাসি মুখে বললে, “যাই ভাই, দেখি বোঝাতে পারি
কি না। শুভ্‌লাক।” বলে আর অপেক্ষা না ক’বে নিজের
দুর্দমনীয় উত্তেজনা সামলাতেই বোধ করি তাড়াতাড়ি উঠে
সে ভিতরে গেল।

(ক্রমশঃ)



বাক্সালা বাণান

অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্

মুখবন্ধ

বাক্সালা ভাবাব বাণান সন্ধে কিংবা তাহার সংস্কার সন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই গোটা কয়েক মোটা কথা মনে রাখা দরকার। সকল ভাবাব বাণান সন্ধেই সেই কথাগুলি খাটে।

প্রত্যেক ভাবাবই শব্দাবলীর বর্তমান রূপেব একটা ইতিহাস আছে। শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে সেই ইতিহাস জানা অতি প্রয়োজনীয়। নানা প্রভাবের ভিতর দিয়া, নানা দাত-প্রতিদাতের মধ্য দিয়া, এক একটি শব্দ তাহার বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। হযত মূলতঃ প্রাচীন ভাবাব একই প্রকার শব্দ হইতে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন প্রকাব বাণানেব উৎপত্তি হইয়াছে; আবার হযত মূলতঃ বিভিন্ন শব্দ হইতে ভাঙ্গিয়া চূবিয়া একই বকম বর্তমান রূপেব উৎপত্তি হইয়াছে। যে বকমই হউক, শব্দগুলির বর্তমান রূপ মানিয়া লইতে হইবে।

অবশ্য, এমন হইতে পারে যে এখন পর্য্যন্ত কোন কোন শব্দের রূপের বা বাণানেব ঠিক স্থিরতা (stability) দাঁড়ায় নাই, কোন প্রয়োগই সুপ্রতিষ্ঠিত (settled) হয় নাই, নানা জনে নানা প্রকার লেখেন, ঠিক শিষ্ট-প্রয়োগ বলিয়া কোনটাকেই জোর করিয়া ধরা যায় না। বাক্সালা ভাষাতে এই প্রকারেব অনেক অ-সংস্কৃত শব্দ আছে, যথা: জিনিস, জিনিব; শাদা, সাদা; শহব, সহব; ইত্যাদি। এই সব অনিশ্চিতরূপ শব্দের রূপ সন্ধে একটি কিছু নির্দেশ কবিতে চেষ্টা করা অসম্ভব।

কিন্তু প্রথম কথা মনে রাখিতে হইবে এই যে, যে সমস্ত শব্দের রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং এইরূপ শব্দের সংখ্যাই বেশী, তাহাদেব রূপের বা বাণানেব পবিবর্তন সাধন করিতে চেষ্টা করা—তা যে কারণেই হউক, সরলতা সম্পাদনের খাতিরেই হউক, অথবা ব্যুৎপত্তিগত বা ব্যাকরণগত বিস্তৃতির খাতিরেই হউক—একবারেই নিরর্থক; শুধু নিরর্থক নহে পবস্ত বহুল পবিমাণে অনিষ্টকর। কারণ এইরূপ চেষ্টার শেষে দাঁড়ায় এই যে সুনির্দিষ্ট সুপ্রচলিত বাণানেব স্থানে আবার নানা প্রকার বাণান চলিতে আবস্ত করে। ভাষাকে সুনির্দিষ্ট ও সংবদ্ধিত করিবার দিক্ হইতে দেখিলে ইহা অকল্যাণকর। সরলতা বা বিস্তৃতি অপেক্ষা একরূপত্ব (uniformity) ভাষাব বেশী আবশ্যিক। আসল কথা এই, সুপ্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ বা বাণানকে মানিয়া লইতে, হইবে—ইহার অস্তিত্ব স্বীকাব করিয়া লইতে হইবে,—যদি ব্যাকরণ-দৃষ্টেও হয় তবে ইহাকে নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। সংস্কৃতেব জায় কঠিন ব্যাকরণের নিগড়ে আবদ্ধ ভাষাতেও নিপাতনের অভাব নাই।

যেমন, উদাহরণ দেওয়া বাইতে পারে, বাক্সালাতে স্থলন, সততা, সতীত্ব, সক্ষম, জাগ্রত, প্রভৃতি শব্দ। ভাবাব রূপ সন্ধে বহুল-প্রয়োগ (usage) এবং প্রাচীনতা (antiquity)ই বড় এবং সেরা প্রমাণ। বাণান সন্ধে এইটাই প্রধান কথা।

দ্বিতীয় কথা, ধনিতত্ত্ব সন্ধে। মোটের উপর একথা ঠিক যে ভাবাব রূপের ও ধনিতত্ত্ব মধ্যে নামঞ্জর থাকে উচিত। সব ভাষাতেই মোটামুটি একরূপ নামঞ্জর আছে; নহিলে লোকে লিখিত ভাষা বুঝিতেই পারিত না। কিন্তু যে সব ভাষাব বর্ণমালা অপ্রচুর, যেমন রোমক-বর্ণমালাবলী ভাষা সকল, তাহাদিগকে একই রূপেব হাবা বিভিন্ন ধনি প্রকাশ করিতে হয়, আবার হযত বিভিন্ন রূপের দ্বারা একই ধনি প্রকাশ কবিতে হয়। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃত বর্ণমালা অটোপান্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধনিতত্ত্বেব উপবে প্রতিষ্ঠিত ও সুশিক্ষিত হওয়ায়, এবং সংস্কৃতে একটি ধনিব মাত্র একটি রূপ এবং একটি রূপের মাত্র একটি ধনি নির্দিষ্ট হওয়ায়, এবং বাক্সালা ভাষা সংস্কৃত-বর্ণমালাবলী হওয়ায়, বাক্সালা ভাষাতে ধনিতত্ত্ববিচিত অসামঞ্জর্য্য খুব বেশী নাই। অন্ততঃ ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি রোমক-বর্ণমালাবলী ভাষাব তুলনার অকিঞ্চিৎকব বলিলেই হয়। সংস্কৃত বর্ণমালার কয়েকটি বর্ণের ধনি বাক্সালাতে পবিবর্তিত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই বাক্সালা বাণানে যা-কিছু গোলমাল হয়; যেমন, স্বরবর্ণে (ই, ঈ), (উ, ঊ), ব্যঞ্জন বর্ণে (জ, ঙ), (ণ, ন), (বর্ণীয় ব ও অন্তঃস্থ ব), (শ, ষ, স), ইহাদিগের উচ্চারণ প্রায় এই প্রকাব হইয়া গিয়াছে; স্বরবর্ণ ঞ, ঞ্, ঞ্, ব্যঞ্জনবর্ণ বি, বী, লি-তে পবিণত হইয়াছে; মুক্তবর্ণ ক (ক্+ব) ক্খ-এর সমতুল্য হইয়াছে; ইত্যাদি। কিন্তু সে গোলমাল এমন কিছু গুরুতর নহে যে তজ্জন্ত সমস্ত বাক্সালা শব্দের প্রচলিত রূপ পবিবর্তন কবিয়া বিস্তৃত ধনিতত্ত্বেব অলুচায়া করিয়া গড়িতে হইবে।

তা ছাড়া মনে বাখিতে হইবে যে, কোন জীবন্ত ভাষা, বাহাব উচ্চারণ-বীতি 'দেশে ও কালে সততই পবিবর্তিত হইতেছে; তাহাকে কোন উচ্চারণমূলক (phonetic) কাঠামোতেই বাধিয়া রাখা যায় না। এত বিস্তৃত-উচ্চারণমূলক যে সংস্কৃত ভাষা তাহাকেই রাখা যায় নাই এবং সেই phonetic-নিগড় ভাঙ্গিয়াই যত প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং বর্তমান ভারতীয় ভাষাব উৎপত্তি। অতএব phonetic আকারে বাক্সালা ভাষাকে চালিয়া সাজিবার চেষ্টা করা পণ্ডর্য্য মাত্র।

প্রধান যে দুইটি কথা তাহা বলিলাম; এখন বাক্সালা ভাষাব বাণান সন্ধে ছোট ছোট কয়েকটি কথা বলিয়া মুখবন্ধেব বন্ধব্য শেষ কবিব।

বাঙ্গালাতে সাধু ভাষা ও কথ্যভাষা বা “চলতি” ভাষা, দুই প্রকারের ভাষাই প্রচলিত আছে। সাধু ভাষার কাঠামো মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত। কথ্য ভাষা এই কিছুদিন ধরিয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে। স্বাভাবিকঃই কথ্য ভাষার রূপ অনেকটা অনিশ্চিত অর্থাৎ বহুরূপ। বিভিন্ন জিলায়, যথা ঢাকা, বরিশাল, যশোর, চট্টগ্রাম, ঝিনাইদহ, নদীয়া, বীরভূম, মেদিনীপুর ইত্যাদির কথ্য-ভাষার মধ্যে শব্দগত (dialectical) পার্থক্য ও ধ্বনি-পার্থক্য ত গুরুতর। ইহাদিগের কথা যদি ছাড়িয়াও দিই, তথাপি রাজধানী কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহের কথ্য ভাষাও ঠিক একরূপ (uniform) নহে—বিশেষতঃ ক্রিয়াবিশিষ্ট-গুলি সম্বন্ধে। যেমন, সাধু ভাষার “বলিলাম” শব্দের অনেক রূপ প্রচলিত, বল্লাম, বল্লুম, বল্লম, ইত্যাদি। এই সমস্ত রূপের মধ্যে যদি কোন একটি রূপকে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়—অসম্ভবঃ লিখিবাব সময়ে—তাহা হইলে কতকটা বিশৃঙ্খলা দূর হইতে পারে এবং কিছু উপকার সাধিত হইতে পারে। অজ্ঞাত জিলায় ভাষা সাহিত্যে বড় একটা ব্যবহৃত হয় না; নাট্যকীর পাত্রপাত্রীদের মুখে দুই-এক সময়ে হয় মাত্র, যেমন সংস্কৃত নাটকে নানা জাতীয় প্রাকৃতের ব্যবহার হয়; তাই সে বিষয়ে কিছু কবিবার তেমন আবশ্যকতা নাই। সুতরাং আমাব মনে হয় বাঙ্গালা বাণান সংস্কার আঙ্গকাল সাহিত্যে ব্যবহৃত কথ্য ভাষার রূপবাছলা নিয়ন্ত্রণের দিকেই প্রধানতঃ প্রযুক্ত হওয়া উচিত।

কেহ কেহ বলেন বাঙ্গালাতে সব “ব” “জ”তে, সব “ণ” “ন”তে পরিণত করা উচিত, ইত্যাদি; অসম্ভবঃ যে সব শব্দ বাঁটি (অর্থাৎ তৎসম) সংস্কৃত নহে তাহাতে করা উচিত; এবং তৎসমর্থনে প্রাকৃত পালি প্রভৃতির নজির দেখান। সে সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য প্রথমেরই আমি বলিয়াছি। যে শব্দের বাণান সুপ্রতিষ্ঠিত তাহার পবিবর্তন অবিশেষ, তা ভাষাতত্ত্বের খাতিরেই হউক অথবা ইতিহাসের খাতিরেই হউক। দ্বিতীয় কথা এই যে, ভাষাতত্ত্বের পথ খুব সরল পথ নহে পরন্তু বিষয় গহন পথ, ঐ বিষয়ে নানা মত হইতে পারে। দৃষ্টান্তরূপ বলিতেছি, “ব” স্থানে “জ” লেখা সম্বন্ধে। কেহ কেহ ইহাব সপক্ষে প্রাকৃত প্রয়োগ উল্লেখ করেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সব প্রাকৃতের এ বিষয়ে একবিধ প্রয়োগ নহে। শৌরসেনী মাহাবাহিনী, পৈশাচী প্রাকৃতের “ব” স্থানে “জ” হয় বটে, কিন্তু মাগধী প্রাকৃতের “জ” স্থানে “ব” হয়; যেমন “জায়া” স্থানে “বায়ী”, “জায়তে” স্থানে “বায়তে” [‘জোষঃ’ বরকচি-প্রাকৃত প্রকাশ ১১১৪]। এই সব সংস্কাররূপ যখন আবার “ণ” বর্জন করিয়া সর্বত্র “ন” আমদানী করিতে বলেন, তখন তাঁহারা প্রাকৃত ভুলিয়া বান; ভুলিয়া বান যে এক পৈশাচী প্রাকৃত ভিন্ন সমস্ত প্রাকৃতেরই একমাত্র “ণ” ই প্রচলিত, “ন” নাই [‘নো ণঃ সর্বত্র’ প্রা ২১৪২]। তখন তাঁহাদের প্রাকৃত নিষ্ঠা থাকে কোথায়? এক এক স্থানে এক এক রকম যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজের খেয়াল অল্পায়া প্রচলিত বাঙ্গালা বাণান পরিবর্তনের চেষ্টা করা একান্ত অমৌক্তিক ও অশুদ্ধ।

তাছাড়া, একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে বাঙ্গালা শব্দের বিভক্তিগুলি সংস্কৃত প্রাকৃত প্রভৃতির মধ্য দিয়া নানা-

ভাবে রূপান্তরিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে সত্য, এবং তা ছাড়া নানা বিদেশী শব্দ ও অসংস্কৃত বাঁটি দেশজ শব্দ বাঙ্গালাতে আছে সত্য, কিন্তু সাধু বাঙ্গালা ভাষার বাহা শব্দভাণ্ডার (vocabulary), তাহার খুব বেশী অংশই একেবারে সংস্কৃত হইতে আহৃত; সেই সব শব্দের প্রাকৃতরূপ হইতে বাঙ্গালার লওয়া হয় নাই। আবার অনেক একার্থক ও সূত্র শব্দ আছে, যাহাদের একটি একেবারেই সংস্কৃত, অপরটি মূলতঃ সংস্কৃত হইলেও নানা অপভ্রংশের মধ্য দিয়া আসিয়াছে; যেমন (পক্ষী, পাখী), (হস্তী, হাতী), (হস্ত, হাত), (ঘেটিক, ঘোড়া), ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার যে খুব বেশী পরিমাণেই সংস্কৃতবহুল এবং প্রাকৃত শব্দের রূপের সহিত বাঙ্গালা শব্দের রূপের যোগ যে অতি অকিঞ্চিৎকর তাহা যে কোন শিক্ষিত বাঙ্গালী একটি সংস্কৃত রচনা ও তাহার প্রাকৃত পাঠ পাশাপাশি রাখিয়া পড়িতে চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাঙ্গালাতে “আধ্যপুত্র”ই চলে “অজ্ঞপুত্র” চলে না, “শকুন্তলা”ই চলে “সউন্দলা” চলে না, “শেফালিকা”ই চলে “সেভালিকা” চলে না, “তিষ্ঠ”ই চলে “চিঠ” চলে না।

বর্তমান বাঙ্গালা ভাষা—সাহিত্যের বাঙ্গালা ভাষা—প্রধানতঃ সংস্কৃতমূলক বলিয়াই, দেখা যায় আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঠিক সংস্কৃত নহে অথচ সংস্কৃতমূলক (অর্থাৎ তৎসব) শব্দ প্রচলিত বাণান যথাসম্ভব সংস্কৃতানুযায়ী; অর্থাৎ সংস্কৃতের মূল শব্দ যেখানে যে “ন”, যে “স”, যে “জ”, যে “ই”কার, যে “উ”কার আছে, বাঙ্গালাতে প্রচলিত শব্দের রূপও তদনুরূপ; এবং এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কারণ উচ্চারণের বৈষম্য ঘটয়া থাকিলেও রূপসাদৃশ্য থাকতে শব্দের ব্যুৎপত্তি সহজেই প্রতীত হয়। তা ছাড়া, একই কারণে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক বিধি, যেমন জীলিঙ্গ-বিধি, বহুবচন-বিধি, সন্ধি-বিধি, বাঙ্গালাতেও বহুল পরিমাণে অবলম্বিত হয়। তৎসব বাঙ্গালা শব্দের গঠনে এই যে প্রচলিত রীতি এতদনুসারেই “কণ” হইতে “কাণ”, “স্বণ” হইতে “সোণা” ইত্যাদি, জীলিঙ্গব্যব ই প্রত্যয় প্রয়োগে “মামা” হইতে “মামী”, “কাকা” হইতে “কাকী” ইত্যাদি, পদবিধি প্রয়োগে “রাণী” ইত্যাদি শব্দের বাণান প্রচলিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা হইতে পারে। যখন বাঙ্গালাতে একই ধ্বনিবিশিষ্ট দুইটি শব্দ চলিত আছে, তখন একটির সংস্কৃত মূল শব্দ যদি “ণ” সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে তৎসব শব্দকে “ণ” দিয়া লিখিলে বুঝিবার গোলমাল অনেকটা দূর হয়—শব্দের পার্থক্য বুঝাইবার এই রীতি ইরাক্কী, ফারাসী প্রভৃতি ভাষায় প্রচলিত আছে; দৃষ্টান্তরূপ বলা যায়, “পণ” শব্দজ “পাণ”, “বর্ণন” শব্দজ “বাণান” মুর্দন্য লিখিলে “পা” ধাতুজ “পান”ও তৈয়ারী করা অর্থে “বানান” হইতে ইহাদের তফাৎ সহজেই ধরা পড়ে। সে বাহাই হউক, বাঙ্গালা শব্দের গঠনে সংস্কৃত মূলের সাদৃশ্য যতটা রক্ষিত হয় ততই ভাল; এবং কাৰ্য্যতঃ প্রচলিত সাধুভাষার বাঙ্গালাতে তাহাই মোটামুটি রক্ষিত হইয়াছে।

আর এক কথা লিপ্যন্তর (transliteration) বা অন্ত ভাষার শব্দ, বাঙ্গালাতে লেখা সম্বন্ধে। এই বিষয়ে প্রধান কথা

এই যে এক ভাবার ধ্বনি অল্প ভাবার রূপের সাহায্যে বধাসম্ভব প্রকাশিত করিতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করিতে হইবে; কারণ কোন ভাবার বাবতীয় ধ্বনি এক ধ্বনিবিকার অপর ভাবার সাহায্যে প্রকাশিত হইতে পারে না। যেমন, ইংরাজীতে প্রকৃত দন্ত্যবর্ণ নাই—প্রকৃত দন্ত্য উচ্চারণ পাইতে হইলে ইউরোপ মহাদেশ (continent) এর ভাবা, ফরাসী, ইতালীয় ইত্যাদি ভাবার উচ্চারণ শুনিতে হইবে—তাই ভারতীয় দন্ত্যবর্ণ অর্থাৎ ত বর্ণের বর্ণ ইংরাজের উচ্চারণ করিতে পারে না; “ত” এর স্থানে “d”, “ন” এর স্থানে “d” দিয়াই কাজ চলাইয়া লয়। লৌকিক ভাবার এইরূপই কবিত্তে হয়, এবং তাহাতে অনুবিধাও বিশেষ কিছু হয় না। পণ্ডিতদিগের জ্ঞান অবশ্য লিপ্যন্তরে অনেক উচ্চারণ-বৈষম্যচক (diacritical) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়—সে স্বতন্ত্র কথা। কাম্বোই ইংবাজী কিংবা ফরাসী কিংবা জার্মান শব্দের বাঙ্গালা প্রতিলিপি করিবার সময়ে উহাদিগের প্রতিটি উচ্চারণ ছবৎ অল্পকরণ করিবার নিমিত্ত নূতন অক্ষর রচনা বা চিহ্ন রচনা বিডম্বনা মাত্র। কেহ কেহ বলেন ইংরাজী “z” ধ্বনি বুঝাইবার নিমিত্ত “জ” প্রয়োগ করা উচিত; তাহা হইলে “f” এর জন্ত “ফ”, “v” এর জন্ত “ভ” ইত্যাদি লাগিবে। তাহাতেও সমস্তার শেষ নাই; “zh” ধ্বনি, যথা, “pleasure”, “azure”, “provision”, প্রভৃতি শব্দের ধ্বনি কি প্রকারে বুঝান যাইবে? ফরাসী u কিংবা জার্মান ö বা oh কি প্রকারে বুঝান যাইবে? ইহাকে নিবর্ণক পণ্ডিত্রম ছাড়া কিছু বলা যায় না। উজ্জ্বল আর একটি নূতন অক্ষর কেহ কেহ প্রস্তাব করেন ইংবাজী “sh” বুঝাইতে। এমাবৎ বাঙ্গালাতে “ঠ” দিয়া ইহা বুঝান হইয়াছে—ঠিক প্রতিধ্বনি নহে বটে কিন্তু যথেষ্ট অল্পকরণ প্রতিধ্বনি। প্রস্তাবিত হইয়াছে স ও ট-এর যুক্তাক্ষর। এ বিষয়ে প্রথম মন্তব্য এই যে ইহা অনাবশ্যক; দ্বিতীয় মন্তব্য এই যে যদি এই যুক্তবর্ণের “স” ও “ট” এর ধ্বনি সংস্কৃত ধ্বনি হয় তবে “দন্ত্য” স ও “মূর্ধন্য” ট এর সমাবেশ ধ্বনিসঙ্গতি (phonetics) বিরুদ্ধ—একেবারেই বর্ণ-সঙ্কর; আর যদি বাঙ্গালা ধ্বনি হয় তবে এ চেষ্টা বুঝা, কারণ বাঙ্গালাতে “স” এর উচ্চারণ দন্ত্য নয়—দন্ত্যবর্ণের সংযোগেই দন্ত্য হয়, যেমন “স্ত” “স্থ” প্রভৃতিতে। “শ” এর উচ্চারণও “স” “শ” এই সব সংযুক্ত বর্ণে দন্ত্য হয়; সুতরাং “ষ্ট” দ্বারা কাজ চলিবে না কেন বুঝা যাইতেছে না। মোট কথা এই যে লৌকিক ব্যবহারে অর্থাৎ সাধারণে প্রচলিত ভাবায় ভিন্ন ভাবার ধ্বনি প্রকাশের নিমিত্ত অপ্রচলিত নূতন চিহ্নের অবতারণা অনাবশ্যক ও অবিধেয়—বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি এতলেও অবাঞ্ছনীয়।

আলোচনা

(১) রেকের পর ব্যঞ্জনবর্ণের বিধি।

বাঙ্গালা ভাবার বর্তমান প্রচলিত প্রয়োগে রেকের পর কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের বিধি লক্ষিত হয়; যথা, চ, ছ, জ, ঙ, ঠ, ঙ, ঙ, ঙ, ঙ এবং ঙ। মাত্র নয়টি। কিন্তু যে কয় স্থলে বর্ণবিধি হয়, সেখানে সর্বদাই এইরূপ হইয়া থাকে, শিষ্টপ্রয়োগে ইহাও কোনও ব্যত্যয় নাই; এবং এই সব স্থলে এই বর্ণবিধি বহু

প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। চারি শত বৎসরের প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত শিলালিপিতেও এইরূপ বিধিই অবলম্বিত হইয়াছে।

এই বিধি অবলম্বনের আসল কারণ ধ্বনিতত্ত্বমূলক (phonetic); বেকের পর যে ব্যঞ্জনবর্ণ বসে, তাহার উপর স্বতঃই একটু বেশী জোর পড়ে; আমরা “দুর্দম” শব্দ উচ্চারণ করিতে “দুর্+দম্” এ ভাবে বলি না; “দুর্+দম্” এই ভাবেই উচ্চারণ করি। ব্যঞ্জনধ্বনির উপর এই জোর পড়ে বলিয়াই চলিত কায় আমরা “ধম্ম” “কম্ম” কে “ধম্ম” “কম্ম” এই ভাবে বলি; এই একই কারণে এই সব স্থলে পালি ও প্রাকৃত “ধম্ম” “কম্ম” দেখা হয়। এই ধ্বনিঘটিত (phonetic) কারণেই, সংস্কৃত ব্যাকরণে এইরূপ স্থলে বর্ণবিধি বিকল্পে গৃহীত হইয়াছে, যদিও ব্যুৎপত্তিতে সব সময়ে বিধি আসে না। পাণিনি ব্যাকরণে এবিষয়ে বৃদ্ধি বহিরাছে “অচো রহাভ্যাং থে” [অষ্টাধ্যায়ী ৮।৪।৪৬]। সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণে যে বাণান সঙ্গত, এবং বাঙ্গালা ব্যবহারে যে বাণান একেবারে প্রতিষ্ঠিত (settled), তাহার পরিবর্তন করা অবিধেয়।

কেহ কেহ ছাপার কার্যে কতকটা সরলতা হইবে বলিয়া এই সব স্থলে বর্ণবিধি বর্জনেব পক্ষপাতী। প্রথমতঃ, ছাপার কার্যে অনুবিধা হইবে বিবেচনায় প্রচলিত ভাবার বাণান বদলানর যুক্তি অত্যন্ত অপ্রদেয়—কারণ ভাবার জ্ঞান টাইপ, টাইপের জ্ঞান ভাবা নহে। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালাতে অল্পস্র যুক্তবর্ণ আছে, তিন বর্ণের যুক্তবর্ণও বোধ হয় শতারিক হইবে, যেমন সন্ধ্যা, বজ্র, বজ্র, মন্ত, রক্ত, উজ্জল, ইত্যাদি। সমস্ত যুক্ত বর্ণের ব্যবহার বর্জন করিবার কোন প্রস্তাব কেহ করিতেছেন না; শুধু মাত্র এই নয়টি অক্ষরকে ত্র্যক্ষর যুক্তবর্ণ হইতে ত্র্যক্ষর যুক্তবর্ণে পরিণত করিলেই বিশেষ কি যে সরলতা সম্পাদন হইবে তাহা বুঝা যায় না। বিশেষতঃ বর্তমান বাণান এখন একেবারে প্রচলিত। লাভের মধ্যে হইবে এই যে যেখানে একরূপ (uniformity) ছিল, সেখানে আবার নানাবিধ বাণান চলিবে। তাহা একেবারেই অবাঞ্ছনীয়।

আব এক কথা, রেকের পর যে কয়েকটি বর্ণবিধির কথা উপরে বর্ণিত হইল, তন্মধ্যে “ধ্য” এর সন্ধে আনও কথা আছে। বাঙ্গালা উচ্চারণে “ধ্য” শুধু বর্ণবিধি (reduplication) নহে, ইহার মধ্যে বাঙ্গালা “্য” (য-ফলা) রহিয়াছে, এবং তদনুযায়ী ইহার উচ্চারণ হয়; অর্থাৎ “আধ্য” এর উচ্চারণ “আধ্য্য” এর অল্পকরণ, “আধ্য্য” এর অল্পকরণ নহে। “কাধ্য” ও “নাধ্যনা”, “পাধ্যন্ত” ও “পাধ্যন”, “সুধ্য” ও “ধুধ্যটি” ইহাদের উচ্চারণ অল্পকরণ নহে। বাঙ্গালা ভাষাতে “য” এর উচ্চারণ “জ” হইতে অভিন্ন হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু “য-ফলা”র উচ্চারণ-স্বাভাব্য রহিয়াছে। সে উচ্চারণ ঠিক সংস্কৃত য-ফলার অল্পকরণ নহে, কিন্তু কিকিঞ্চ রূপান্তরিত। যেমন “মন্ত” শব্দ সংস্কৃতে উচ্চারিত হয় “মন্+ন্ত” অথবা “মন্+ই+অ”; বাঙ্গালাতে উচ্চারিত হয় “মন্+ন্ত” বা “মন্+দ”; তর্থাৎ সন্ধিপুত্র ই ধ্বনিটির স্থান-পরিবর্তন (metathesis) হয় মাত্র, এবং তৎকালে ব্যঞ্জনধ্বনি বিধি ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে এই উচ্চারণ খুবই প্রচলিত; পশ্চিমবঙ্গেও “মন্ত” শব্দের উচ্চারণ ঠিক “মন্+দ” শব্দের স্থান নহে; য-ফলার দ্বারা ধ্বনি রূপান্তরিত হইয়া “মোন্” উচ্চারণ

হয়। সে বাহাই হউক, য-কসার যে বিশিষ্ট উচ্চারণ আছে তাহা মানিতেই হইবে; এবং সেই উচ্চারণটি “ব্য”তেও রহিয়াছে। শুধু “ব্য” লিখিলে বাঙ্গালা রীতি অনুসারে উচ্চারণ হইবে “জ্য”, কদাপি “জ্য” হইবে না। সুতরাং এইরূপ লিখিলে ধ্বনিবিচাবে একেবারে ভুল হইবে। কাজেই, “ব্য” রূপ—বাহা বাঙ্গালাতে একমাত্র প্রচলিত রূপ—তাহা রাখিতেই হইবে; এখানে বিকল্পও চলিবে না। অল্প বর্ণান্তরের স্থলে, প্রচলিত বাণানের পরিবর্তে রেকের পর এক-বর্ণান্তরক বাণান বিকল্পে ব্যবহার suggestion হিসাবে দেওয়া যাইতে পারে মাত্র; ইহার অধিক জোব (stress) এবিষয়ে দেওয়া অসঙ্গত। বাহারা এবিষয়ে প্রচলিত বাণান একেবারে বর্জন করিয়া একবর্ণান্তরক বাণানই কেবল বিধান করিতে চাহেন, তাঁহাদের কথা একান্তই অশ্রদ্ধেয়; কাবণ সুপ্রচলিত এবং ব্যাকরণসম্মত বাণান চলিবে না অর্থাৎ অন্তত বলিয়া গণ্য হইবে ইহা হইতেই পারে না।

(২) পদমধ্যে পক্ষমবর্ণ স্থানে অনুস্বার।

বাঙ্গালাতে প্রচলিত রীতি এইরূপ। যদি “ম্”এর পর কবর্গের যুক্তবর্ণ থাকে, তবে “ং”এব ব্যবহারই সচরাচর করা হয়; যেমন, সখ্যা, সগ্রহ, ইত্যাদি। যদি ক-বর্গের একবর্ণ থাকে, কথবা অল্প কোন বর্গীর বর্ণ থাকে (একবর্ণই হউক, কিংবা যুক্তবর্ণই হউক), তবে সেই বর্গের পক্ষম বর্ণ ব্যবহার হইয়া যুক্তাক্ষরে পরিণত হয়; যেমন, সঙ্কলন, শঙ্কর, অঙ্ক, শঙ্খ, অঙ্ক, বঙ্ক, সম্পন্ন, সন্দেহ, সঙ্কর, সম্প্রদান, সম্মানী ইত্যাদি। অন্তঃস্থ বর্ণ বা উদ্ব্যবর্ণ পরে থাকিলে অবশ্যই “ং” হয় (সংস্কৃত ব্যাকরণেব সন্ধিব নিয়মামুসারে)। এই রীতিব কোন পরিবর্তন অনাবশ্যক।

ঠিক সংস্কৃত ব্যাকরণামুসারে পদেব অন্তর্স্থিত “ম্”এর বিকল্পে “ং” অথবা পক্ষমবর্ণ ব্যবহার কবিত্তে নির্দেশ কবিলে, সাধাবণ প্রয়োগে প্রায়ই ভুল হইবাব সম্ভাবনা, কারণ কোনটা পদের অন্তঃস্থ এবং কোনটা অন্তঃস্থ নহে, ইহা বাঙ্গালার সহজে বুঝা যায় না। যেমন “শংকর” লিখিলে “অংক” “অংগ” ইত্যাদি অন্তঃস্থ বাণান প্রচলন হইবার সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং প্রচলিত প্রণালীই সুবিধাজনক।

(৩) বিসর্গান্ত পদ।

সংস্কৃতে যে সকল পদ বিসর্গান্ত, তাহারা বাঙ্গালার দুই আকার ধারণ করিয়াছে। কোন কোনটিতে বিসর্গ উচ্চারণ ত নাই-ই, এমন কি তৎপূর্বস্থ অকারান্ত ব্যঞ্জনও হসন্ত ভাবে উচ্চারণ হয়—যেমন, মনঃ (উচ্চারণ হয়, মন্), তেজঃ (তেজ), আয়ুঃ (আয়ু) ধনুঃ (ধনু), চক্ষুঃ (চক্ষু) ইত্যাদি। বাঙ্গালা প্রয়োগে তাই ইহাদের বিসর্গ বর্জিত হইয়াছে। এই সব শব্দ অধিকাংশই বিশেষ্য। আর একপ্রকার সংস্কৃত বিসর্গান্ত শব্দ আছে ইহার প্রধানতঃ অব্যয় শব্দ এবং “ত্ব”-ভাগান্ত শব্দের সম্বোধন পদ। বাঙ্গালাতে ইহার প্রায় বিসর্গান্ত ভাবেই উচ্চারিত হয়, এবং যেস্থলে তাহা না-ও হয়, সেস্থলেও অ-কার পূর্বে থাকিলে অ-কারান্ত ভাবেই উচ্চারিত হয়, হসন্ত ভাবে হয় না। যেমন, ক্রমশঃ, বস্তুতঃ, প্রায়শঃ, প্রাতঃ, পুনঃপুনঃ, পিতঃ, মাতঃ ইত্যাদি। এই সব শব্দে—এক ইহার ণ্টি সংস্কৃত শব্দ—বিসর্গ থাকাই উচিত; বিকল্পেও বিসর্গ বর্জন উচিত নহে। কাবণ বিসর্গ-বর্জন একেত এসব স্থলে অন্তঃস্থ, তাহ

ধ্বনিবিকৃত। অপরন্ত বিসর্গ বর্জন করিলে বাঙ্গালাতে অকারান্ত শব্দের হসন্ত উচ্চারণের ষৌক থাকতে, কালে “ক্রমশ” এবং উচ্চারণ “লোমশ”, “বস্তুত” এর উচ্চারণ “প্রস্তুত” “পিত” এর উচ্চারণ “পীত”, “প্রায়শ” এর উচ্চারণ “পায়শ”, ইত্যাদির মত দাঁড়াইবে।

(৪) হসন্ত শব্দ।

যে সমস্ত হসন্ত সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত হয় তাহা হসন্তই থাকা উচিত; প্রচলিত ব্যবহারও মোটামুটি এইরূপ। অসংস্কৃত শব্দে হসন্তের ব্যবহার সাধারণতঃ অনাবশ্যক; কারণ অকারান্ত লিখিলে বাঙ্গালার উচ্চারণেব বীতি অনুসারে হসন্ত উচ্চারণ হইয়া যাইবে।

(৫) ই ঙ্গ।

বাঙ্গালা উচ্চারণে “ই ঙ্গ”র বিশেষ পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতমূলক হওয়ায়, ঙ্গ-এব ব্যবহার মোটামুটি সংস্কৃতামুসারী হইয়াছে। অর্থাৎ যে সব স্থলে সংস্কৃতে ঙ্গকার ব্যবহৃত হয়, যেমন, জীলিঙ্গে ঙ্গপ্, প্রত্যয় স্থলে, ইন্ কিংবা শিন্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দের প্রথমার একবচনে, সেই সব স্থলে এবং তদনুরূপ স্থলে অসংস্কৃত শব্দেও ঙ্গকারের ব্যবহারই বাঙ্গালার প্রচলিত রীতি। দুই-এক স্থলে ব্যতিক্রম দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা স্বসামান্য। প্রচলিত এই যে ঙ্গ-কার প্রয়োগের সাধারণ বীতি, ইহাই থাকা উচিত।

যেমন, জীলিঙ্গে সংস্কৃতামুসারী ঙ্গ-প্রত্যয় দ্বাবা যে শব্দ নিষ্পন্ন, তাহা ণ্টি সংস্কৃত শব্দই হউক, কিংবা অসংস্কৃত হউক—ঙ্গ-কারান্ত হওয়া উচিত। যথা, বাঘিনী, ধোপানী, রাধী, মামী, কাকী, জ্যেষ্ঠী, খুঁকী, খুড়ী, মাসী (“মাউসা” বা “মেসো”ব জীলিঙ্গ), পিসী (“পিসা”ব জীলিঙ্গ), ইত্যাদি। তবে যেখানে অল্প প্রয়োগ সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে তাহাই থাকিবে, যথা : ঝি, ঠানুদি, দিদি, বিবি। “মাসী”, “পিসী” মূলতঃ “মাতৃস্বাসা” “পিতৃস্বাসা” শব্দ হইতে উদ্ভূত, ঙ্গ-প্রত্যয় নিষ্পন্ন নহে বলিয়া, কেহ কেহ “মাসি”, “পিসি” লেখেন; এই দুই শব্দে এই কারণে বিকল্পে ই-কার বসিতে পারে।

তার পব, ইন্ বা শিন্-প্রত্যয় নিষ্পন্ন সংস্কৃত শব্দের অনুকূপ (বা দেখাদেখি) শব্দ। ইহাদিগকে মোটামুটি বলা যায় জাতিবাচক, ভাষাবাচক, ব্যবসায়বাচক, দেশ-বাচক, স্বত্ব (possession) বাচক শব্দ; এই সব শব্দও ঙ্গ-কারান্ত হওয়া উচিত; যেমন, “পাখা” আছে বাহার সে “পাখী” (সংস্কৃত অনুকূপ শব্দ, পক্ষী); তেমনই “হাতী”, “ঢাকী”, “টুলী”, ইত্যাদি। বাঙ্গালা বাহাব দেশ সে “বাঙ্গালী”; তেমনই ইংবাজী, ফরাসী, জাপানী, বিহারী, মাদ্রাজী, ইত্যাদি। ব্যবসায়-বাচক, কেবানী, ব্যাপারী (বা বেপারী), দোকানদারী, ওকালতী, ভাস্তারী, ব্যারিষ্টারী, ইত্যাদি। এই সব শব্দ বধন বিশেষণ ভাবে ব্যবহৃত হয় তখনও এই বাণানই বিধেয়; যেমন, ওকালতী বুদ্ধি, গুজরাটী ভাষা, ইংবাজী কারদা, ইত্যাদি। কাবণ একই শব্দের বাণান ভেদ অবিধেয়।

অন্ত্য ঙ্গ-কার ছাড়া অন্তঃস্থ ও শেষ সংস্কৃতমূলক (বা তদ্ভব) তাহাতে সংস্কৃতে যে ব্যবহার তদনুসারেই বাণান করা উচিত; যেমন, কুমীর (কুড়ীর হইতে), শাড়ী (শাটী হইতে), শ্বৈ

(শীর্ষ হইতে) ইত্যাদি । সাধাবণতঃ প্রয়োগও এই প্রকার ; এবং এই প্রয়োগই সুপ্রতিষ্ঠিত কবিলে বিশৃঙ্খলা কম হইবে ।

“কি” শব্দের বাণানে কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলা বর্তমানে উপস্থিত হইয়াছে । কোন কোন লেখক স্থানবিশেষে “কি” শব্দের উপর জোর (stress) বুঝাইবার নিমিত্ত ইহাকে ‘কী’ আকারে লেখেন । যেমন, তুমি কী সুন্দর ! (how handsome you are !) ; আব, তুমি কি সুন্দর ? (are you handsome ?) ; কিন্তু বাঙ্গালাতে প্রচলিত বাণান এ প্রকার ছিল না—এককণ্ঠই ছিল ‘কি’ । এবং এই নূতন বাণানটি যে-কাৰণে অবলম্বিত হইয়াছে সে কারণটিও বিচারসহ নহে । কারণ, এই দুই স্থলে ‘কি’ শব্দের উচ্চারণের যে তফাৎ তাহা প্রধানতঃ জোর (stress), এবং স্বরভঙ্গী (intonation) এর তফাৎ, মাত্রা (quantity) অর্থাৎ ব্রহ্ম দীর্ঘের তফাৎ নহে । Quantity এবং stress এই দুইটি স্বতন্ত্র জিনিষকে গুলাইয়া ফেলা ঠিক নহে । এবং যদি stressএর তফাৎকে quantityর তফাৎ দ্বারা বুঝাইতে হয়—যাহা একেবারেই অবৈজ্ঞানিক—তবে “কে বে হুগরে জাগে” এই বাক্যটির “কে” (stressed) এবং “রে” (unstressed), ইহাদের তফাৎ কি করিয়া বুঝান যাইবে ? বস্তুতঃ বাণান বদলাইয়া intonation কিংবা stressএর পরিবর্তন করা যায় না, এবং কোন ভাষার তাহা করে না ; context ও punctuation ইহাতে উহা বুঝিয়া লইতে হয় । ধকন, ইংরাজীর একটা দৃষ্টান্ত, “John, who is here” ইহার উচ্চারণ এক প্রকার ; “John ! who is here ?” ইহার উচ্চারণ অন্য প্রকার । এ বিষয়ে বেশী বলা বাহুল্য । সুতরাং বাঙ্গালা বাণানে ‘কী’ রূপ বর্জনীয় ।

(৬) উ ট ।

বাঙ্গালাতে উ-সমযিত শব্দ খুব বেশী নাই ; যাহা আছে তাহা প্রায়ই সংস্কৃতমূলক ; সেই সব শব্দে প্রচলিত প্রয়োগ সংস্কৃতানুযায়ী এবং তাহাই থাকা উচিত ; এককণ্ঠ (uniformity) সহজ হইবে । যেমন পূব (পূর্ব হইতে), চূপ (চূর্ণ হইতে), পূরা (পূর্ণ হইতে), পূরাণো (পূরণ হইতে), ইত্যাদি ।

(৭) জ, ষ ।

সংস্কৃতমূলক (তত্ত্ব) শব্দে মূল সংস্কৃত শব্দানুসারে জ কিংবা ষ হওয়া উচিত ; এবং সাধারণতঃ প্রয়োগও সেই প্রকারই প্রচলিত । যেমন, যদ শব্দ মূলক সমস্ত শব্দেই ‘য’ হইবে । কোন কোন শব্দে উক্তবিধ প্রয়োগই আছে, যেমন, ‘কার্য’ হইতে কাজ, কাষ ; ‘পুয়’ শব্দ হইতে পূজ, পূষ, এই সব স্থলে বিকল্প রাখা যাইতে পারে । অ-সংস্কৃতমূলক শব্দে “জ”ই প্রচলিত ।

(৮) ন ণ ।

সংস্কৃতমূলক শব্দে মূল সংস্কৃত শব্দানুসারে ণ কিংবা ন হইবে ; এবং সাধারণতঃ প্রয়োগও সেই প্রকারই প্রচলিত । যেমন, “কণ” হইতে ‘কাণ’, ‘স্বর্ণ’ হইতে ‘সোণ’ ইত্যাদি । অবশ্য সংস্কৃতমূলক শব্দেও যেখানে অন্তবিধকণ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যেমন শোনা (শ্রবণ হইতে), গিল্লী (গৃহীণী হইতে) ইত্যাদি—সেখানে প্রচলিত কণই

চলিবে ; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি সুপ্রতিষ্ঠিত রূপের পরিবর্তন বিধেয় নহে ।

কোন কোন লেখক ন দিয়া আজকাল এই প্রকার শব্দ লিখিয়া থাকেন, তবে তাহা সমীচীন নহে ; শব্দের ব্যুৎপত্তি তাহার রূপ হইতে সহজেই বোধগম্য হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয় । তা ছাড়া ‘ণ’ ত বাঙ্গালাতে প্রচলিত বহু সংস্কৃত শব্দে থাকিবেই কাজেই করেকটি মাত্র শব্দে ণ বর্জন করা কোন অর্থই হয় না ।

আরও একটি কথা এই সম্পর্কে প্রমিধানযোগ্য । বাঙ্গালাতে একই উচ্চারণের দুইটি শব্দ থাকিলে যদি তাহাদের বর্ণভেদ করা যায় তাহা হইলে সুবিধা হয় । এই হেতু পাণ (পূর্ণ-শব্দজ), বাণান (বর্ণন-শব্দজ), ইত্যাদি শব্দকে ‘ণ’ দিয়া লিখিলে ব্যুৎপত্তিও পরিষ্কার হয় এবং পান (পা+অনট), বানান (বৈহারী করা) ইত্যাদি শব্দ হইতে পৃথক্ করিবার সুবিধা হয় । এ বিষয়ে প্রয়োগ উভয়বিধই আছে, ‘ণ’ প্রয়োগ নির্দেশ কবিলে ভাল হয় । তদ্রূপ, ‘মণ’ (ওজন বাচক) এবং ‘মন’ (চিন্ত) এই দুই শব্দেও পৃথক্ বাণান রাখা উচিত এবং প্রচলিত প্রয়োগে পৃথক্ বাণানই আছে । তদ্বারাচাধ্য প্রণীত ‘লীলাবতী’তেও ওজনবাচক ‘মণ’ বাণানই আছে—“মণাভিধানং খয়ুগৈশ্চ সেরঃ”

তাহাড়া সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাবে বাঙ্গালাতে বহুল পরিমাণে ণ্যবিধান পালিত হয়—বাঙ্গালাতে প্রচলিত সংস্কৃত শব্দে ত পালিত হয়ই, অ-সংস্কৃত ও বিদেশী শব্দেও হয়—ইহা খুবই স্বাভাবিক এবং বাণানের বীতির দ্বারা (uniformity) বন্ধায় বাধিবার পক্ষে খুব সুবিধাজনক । তাই ‘ব’ এর পরে, ‘বেক’ এর পরে, ণ দিয়াই বাঙ্গালার সাধারণতঃ লেখা হয়—যেমন, ইরাণী, তুরানী, রিপণ, গ্লেন, গভর্ণমেন্ট, কর্ণেওয়ালিস, ইত্যাদি । এই প্রয়োগের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই । তবে এ বিষয়ে প্রচলিত প্রয়োগেই সর্বত্র মানিতে হইবে ; যেমন, ক্রিয়াবিভক্তিতে ণ ব্যবহার হয় না ; যথা—কল্পন, ধ্বন, করেন, করিবেন, ইত্যাদি ।

‘রাণী’ শব্দেও প্রচলিত প্রয়োগ ‘ণ’ ; ণ্যবিধানানুসারে ইহাই স্বাভাবিক । আব প্রাকৃত প্রয়োগও তাই—রাণী । বস্তুতঃ এক গৈশাচী প্রাকৃত ভিন্ন আর কোন প্রাকৃতেই ‘ন’ নাই, সবই ‘ণ’ [নো ৭ঃ সর্বত্র] প্রাকৃত প্রকাশ ২।৪২] । সম্ভবতঃ ‘রাণী’ শব্দে ‘ণ’ প্রাকৃত হইতে আসিয়া থাকিবে । আর তাহা হউক বা না হউক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কারণ ‘রাণী’ শব্দের ‘ণ’ বাণান একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত—ইহার পরিবর্তন হইতে পারে না ।

(৯) শ, ষ, স ।

সংস্কৃতমূলক (তত্ত্ব) শব্দে মূল সংস্কৃত শব্দানুসারে শ, ষ, কিংবা স হইবে ; যেমন, বাশ (বংশ হইতে), কাঁসা (কাংস্য হইতে), বাঁড় (বণ্ড হইতে), ইত্যাদি । খুব সুপ্রচলিত বাণান পরিবর্তনের দরকার নাই, যেমন সিঁড়ি (‘শ্রেণী’ হইতে) ।

অ-সংস্কৃতমূলক শব্দে বাঙ্গালাতে অনেক স্থলে এই বিষয়ে প্রয়োগেব বিভিন্নতা আছে । যেমন, শহর, সহর ; শাদা, সাশা ; জিনিষ, জিনিস ; খুসি, খুশি ; ইত্যাদি । এই জাতীয় শব্দের মধ্যে যেগুলি বাণান সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, যেমন, রেশম, পশম, সর্ভ,

পোষাক, খোঁয়া, ইত্যাদি, তাহাদের পরিবর্তন অনাবশ্যক। তবে অজ্ঞাত অনিশ্চিত রূপ শব্দের একটা বাধান নিদিষ্ট করিতে পারিলে ভাল হয়। যখন বাঙ্গালাতে ‘শ’ ‘ব’ ‘স’ এর কার্যতঃ একই উচ্চারণ, তখন এই সব স্থলে কেবল ‘স’ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কারণ বাঙ্গালাতে ‘স’ এর প্রয়োগই বেশী। [পালিতে ও মাগধী ভিন্ন অল্প প্রাকৃততে ইহাই করা হইয়াছে, “শবোঃ সঃ” প্রা. ২।৪৩; মাগধীতে সব স্থলেই শ হয়, “বসোঃ শঃ” প্রা. ১।১।৩।] অনেকের মত যে মূল আরবী, ফারসী, ইংরাজী, ফরাসী, ইত্যাদি যে সব ভাষা হইতে এই সব শব্দ আমদানী হইয়াছে, সেই সব ভাষার উচ্চারণমুযায়ী ‘স’ অথবা ‘শ’ হওয়া উচিত। তাহাতে সুরবিধা অপেক্ষা অসুরবিধা বেশী, কারণ সাধারণতঃ বলিতে গেলে, ঐ সব ভাষার শব্দের কি উচ্চারণ ছিল তাহা অনেকেরই জানিবার কথা নহে, মতভেদও যথেষ্ট আছে, স্ততরাং গোলমালই থাকিয়া যাইবে। আর তাছাড়া, ‘স’ কিংবা ‘শ’ বাহাই লেখা বাড়ুক, বাঙ্গালাতে উচ্চারণ একই প্রকার হইবে, কাজেই অ-সংস্কৃতমূলক শব্দে এই ব্যুৎপত্তিমূলক পৃথক্করণ বিড়ম্বনা মাত্র।

(১০) খ, ক্ষ।

‘খ’ ও ‘ক্ষ’ এর উচ্চারণ এক প্রকার নয়; তবে শব্দের আদিতে অনেকটা অল্পরূপ বটে। এখানে, সংস্কৃতমূলক (ভক্তব) শব্দে মূলসংস্কৃত শব্দমুসারেই ‘খ’ অথবা ‘ক্ষ’ হওয়া উচিত। যেমন, খোঁদাই, (খোদন), খোঁড়া (খনন), খোঁড়া (খন্ড), ক্ষেত (ক্ষেত্র), ক্ষাপা (ক্ষিপ্ত), লক্ষ্য (লক্ষণ শব্দ), ইত্যাদি। প্রচলিত প্রয়োগও মোটামুটি এই রকম।

(১১) ঐ, ও।

ঐকার, ওকার সমন্বিত বাঙ্গালা শব্দ কোন কোন স্থলে অই, আউ, ভাবেও লেখা হয়। যেমন বৌ, (বউ), দৈ (দই), সৈ (সই) ইত্যাদি। সর্বত্র হয় না, যেমন, মৌ, দৌড়াদৌড়ি, কুহুর তৌ তৌ করে, হৈঁহৈঁ বৈঁবৈঁ কাও, ইত্যাদি।

যে যে স্থলে দুই প্রকার, বাধানই প্রচলিত, সেখানে উভয়ই চলিতে পারে, যদিও ঐকার ও ওকারই বেশী ধনিসঙ্গত, কারণ ঐ সব ধনি monosyllabic, dissyllabic নহে। অজ্ঞাত ঐকার ও ওকারই হইবে।

(১২) ং, ঙ, ঙ।

অনেকে আজকাল সংস্কৃত যে সব শব্দে ঙ আছে তন্মত বাঙ্গালা শব্দে ‘ং’ কিংবা ‘ঙ’ লিখিতেছেন। যেমন, ‘বং’ হইতে উৎপন্ন “বাংলা” “বাঙালী” কে তাঁহারা লেখেন বাংলা, বাঙালী ইত্যাদি।

এই বিষয়ে দুইটি কথা বলা যায়। ‘ঙ’ এর ধনি বিষয়ে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা আছে, সংস্কৃতে সংযুক্ত বর্ণে ভিন্ন স্বতন্ত্র ঙ-এর প্রয়োগ বড় একটা পাওয়া যায় না, ঙ-এরও তদ্ভিন্ন। প্রাচীন বাঙ্গালাতে ঙ দিয়া “গোসাঞি” লেখা হইত, তাহা এখন একপ্রকার লোপ পাইয়াছে, তৎপরিবর্তে “গোসাই” লেখা হয়। এমত অবস্থায় ‘ঙ’ কে স্বতন্ত্র বর্ণরূপে পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা একটু আশ্চর্য বলিয়াই মনে হয়; এবং “বাঙ্গালী” ও “বাঙালী”তে উচ্চারণের এমন কোন গুরুতর পার্থক্য হয় না, যাহার দ্বারা ঙ ব্যুৎপত্তিমূলক

“বাঙ্গালী” রূপ পবিত্রাণ করিতে হইবে। এত ক্ষুদ্র ধনিবিচার ত সম্ভারকদিগের রেক্ষের পর বর্ণবিষয়ের বর্জনপ্রচেষ্টার সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ততরাং এই প্রকার শব্দে ‘ঙ’ এর ব্যবহার বাঙ্গালী নহে, তবে নেহাৎ বিকল্পে চলিতে পারে।

তার পর ‘ং’ এর কথা। কথ্যভাষায় “বাঙ্গালা” শব্দের বাহা উচ্চারণ, তাহা ‘ং’-এর অমুযায়ী বটে। বলিবার সময়ে ‘বা-ঙ্গা-লা’ এই ভাবে বলা হয় না, “বাংলা” বা “বাঙ্গলা” এই ভাবে বলা হয়। কিন্তু সাধু ভাষায় “বাঙ্গালা” রূপ স্পষ্টপ্রতিষ্ঠিত; তবে বিকল্পে “বাঙ্গলা” বা “বাংলা” চলিতে পারে। কিন্তু পদান্তস্থিত ‘ঙ’ উচ্চারণ বাঙ্গালাতে ‘ং’ ভাবে লেখাই স্পষ্টপ্রচলিত; যেমন, রং, সং, ইত্যাদি। তাই পদান্তে ‘ং’ই বিধেয়।

(১৩) মত, মতো, ইত্যাদি।

বাঙ্গালাতে সাধারণতঃ পদান্তে যদি অসংযুক্ত অকারান্ত বর্ণ থাকে, তবে তাহা হসন্তের দ্বারা উচ্চারিত হয়, কিন্তু সর্বত্র হয় না, অনেক ব্যতিক্রম আছে। এই ব্যতিক্রমগুলি আলোচনা করিয়া হয় ত এক বা একাধিক নিয়ম এবিষয়ে বাহির করা যাইতে পারে; যেমন দেখা যায় যে একপ স্থলে স্বরান্ত উচ্চারণ সচরাচর বিশেষবর্ণেই হইয়া থাকে। কিন্তু অসম্ভবতঃ বাঙ্গালা ভাষাভাষীদিগের পক্ষে এই নিয়ম প্রণয়নের বিশেষ আবশ্যকতা নাই—মোটামুটি ব্যতিক্রমগুলি প্রায় জানাই আছে, অসম্ভবতঃ context হইতে বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু কতক শব্দ আছে যাহাদের একই রূপ কিন্তু বিভিন্ন উচ্চারণ; যেমন, মত, মত (সদৃশ); ভাল, ভাল (উত্তম); পালিত (পদবী), পালিত (পা+পি+চ—স্ত); রক্ষিত (পদবী), রক্ষিত (রক্ষ+স্ত); বার, বার (বাদশ); কাল, কাল (কালবর্ণ); ইত্যাদি। এই সব ক্ষেত্রে কেহ কেহ স্বরান্ত উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য অন্ত্যবর্ণ ওকার দিয়া লেখেন; যেমন, মতো, ভালো, ইত্যাদি। কিন্তু সর্বত্র এই স্বরান্ত উচ্চারণ ওকারান্তের দ্বারা নহে; যেমন, “পালিত”, “রক্ষিত”, প্রভৃতি শব্দে; আর তাছাড়া, context হইতেই এই সব বুঝিতে পারা যায়; বিশেষ চিহ্ন অনাবশ্যক। আর এক কথা, অনেক স্থলে উচ্চারণও প্রায় একরূপ; যেমন, কাল (সময়), কাল (কল্য); চাল (রীতি), চাল (ছাদ); ভাল (শাখা), ভাল (দাইল); ইত্যাদি। সে সব স্থলে যদি একই বাধান দিয়া চলিতে পারে, অপর স্থলে পারিবে না কেন? স্ততরাং ওকার প্রয়োগ অনাবশ্যক বোধ হয়। তাছাড়া ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এখানে বাহারা ভেদ প্রকাশ করিতে চাহেন তাঁহারা ইহার “মণ” ও “মন”, “পাণ” ও “পান”, “বাণান” ও “বানান”, এই সব স্থলে একাকার করিতে উৎসাহী।

(১৪) কথ্য বা চলতি ভাষা (colloquial language)

বাস্তবিক পক্ষে বাধানবৈষম্য বাঙ্গালার সাধু ভাষাতে তেমন বেশী নহে; অসম্ভবতঃ অজ্ঞাত-জীবন্ত প্রচলিত ভাষা, যথা ইংরাজী, ফরাসী, প্রভৃতি ভাষার তুলনায় যৎসামান্য; কিন্তু কথ্য (বা চলতি) ভাষায় যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে, বিশেষতঃ ক্রিয়াপদের বিভিন্ন বিভক্তিতে।

বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত কথ্য ভাষা ধরিলে ত

বিভিন্নতার অন্তই নাই—শুধু বাণানে ও রূপে নহে, উচ্চারণেও; তবে সে সর্বের ব্যবহার লিখিত সাহিত্যে বড় একটা নাই বলিয়া সেগুলির কথা যদি ছাড়িয়াও দিই, তথাপি কলিকাতা ও তদ্ব্যপেক্ষে প্রচলিত যে কথা ভাষা—যাহা সাহিত্যে লেখার ভিতরে আজকাল অনেকটা ব্যবহৃত হইতেছে—তাহার মধ্যেও প্রয়োগের যথেষ্ট বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়।

যেমন, “করলাম” এই সাধুরূপ হইতে করলাম, কর্লাম, কোরলাম, কোলাম, কলেম, করলেম, কোরলেম, কলুম, করলুম, ইত্যাদি।

“করিতেছি” এই সাধুরূপ হইতে করছি, কর্ছি, কচ্ছি, কচ্ছি, কোরছি, কোচ্ছি, কোচ্ছি, কোচ্ছি, ইত্যাদি।

সেইরূপ “করিয়াছিলাম,” “করিতেছিলাম,” “করিত,” “করিবার,” “করিতে,” “করিয়া,” “করিতাম,” ইত্যাদি সাধুরূপ হইতে প্রায় প্রত্যেকটিরই ১১০ টি রূপ কথ্যভাষার লেখাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সব স্থলে যদি কতকটা বাণান নির্দেশ করিতে পারা যায়, তবে সে চেষ্টা সফলপ্রদ ও সার্থক হয়। বাঙ্গালার প্রচলিত সাধু-ভাষার স্প্রতিষ্ঠিত বাণান প্রণালীকে স্মরণনিতত্ত্বের বিচারে কিংবা সরলতা সম্পাদনের খাতিরে পরিবর্তনের প্রয়াসে সময় ও শক্তি ব্যয় করা ততটা আবশ্যক নহে।

(১৫) লিপ্যন্তর (transliteration)।

এই বিষয়ে প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে বিদেশী ভাষার স্মৃতিস্মরণ প্রতিধ্বনি কোন ভাষাতেই প্রকাশ করা যায় না, এবং করা অনাবশ্যক। মোটামুটি অল্পরূপ ধ্বনি প্রকাশ করিতে পারিলেই যথেষ্ট। পণ্ডিত জনের আলোচ্য লিপ্যন্তর (transliteration) এ অবশ্য অনেক উচ্চারণ-বৈষম্যমূলক (diacritical) চিহ্নের সাহায্যে ধ্বনিপ্রকাশের চেষ্টা হয়; কিন্তু সাধারণে প্রকাশিত লৌকিক ভাষায় তাহা হয় না, এবং এই চেষ্টাতে নূতন বর্ণ-বোঝনা করা কিংবা নূতন চিহ্ন আয়দানী করা অবিধেয়।

আমাদের দেশে ইংরেজী শব্দের লিপ্যন্তরই বেশী আবশ্যক হয়। তাই সেই বিষয়েই মোটামুটি কিছু বলিতেছি।

ইংরেজীর অনেক স্বর-উচ্চারণই বাঙ্গালাতে সহজে প্রকাশ করা যায়; যথা, far (দীর্ঘ আ), fall (অ), fate (এ), fine (ই), feet (ঐ), put (উ), fool (ঊ) mow (ও) bough (আউ), boy (অয়) ইত্যাদি। কয়েকটিতে মাত্র একটু গোলমাল হয়; যেমন, but (ব্রু আ)—এস্থলে আ-কার দিয়াই ধ্বনি প্রকাশ করা উচিত, যেমন, বাট। পূর্বে এস্থলে ‘বট’ অর্থাৎ অ-কাব দিয়াই প্রকাশ করা হইত কিন্তু তাহাতে অসুবিধা এই যে বাঙ্গালা অ-এর উচ্চারণ ব্রু আ নহে (অবশ্য সংস্কৃতে “অ”এর উচ্চারণ “ব্রু আ”ই বটে)। তার পর, patএব ধ্বনি—সংস্কৃতে এই ধ্বনিটি নাই তাই তদ্ব্যবহারী symbol বা রূপও নাই। বাঙ্গালার ধ্বনিটি আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র রূপ নাই; যেমন, এক (ak), “এ” বর্ণটি দ্বারা এই ধ্বনি প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কাজেই,

বাঙ্গালা উচ্চারণ আলোচনার মানিয়া লইতে হইবে যে “এ” বর্ণের ছই প্রকার উচ্চারণ আছে, pat এবং pat এর ধ্বনি। তবে বাঙ্গালাতে ব্যঞ্জনবর্ণের পরে ষ-ফলা আকার দিলে প্রায় এতদ্ব্যবহার উচ্চারণ হয় বলিয়, সাধারণতঃ ইংরেজী শব্দের লিপ্যন্তরে ‘ya’ ব্যবহার করা হয়, যেমন, প্যান্ট (pant)। সেই নিয়মই চলিতে পারে। তবে আত্মকরে এই স্বর ধ্বনি বুঝাইতে হইলে, “এ” কিংবা “য়া” এই দুই রীতিই চলিতে পারে। যেমন, acid (এসিড বা য়াসিড),। “অ্যা” কিংবা “এ্যা” অর্থাৎ স্বরবর্ণের সহিত “ya” প্রয়োগ অসমীচীন ও অনাবশ্যক।

অর্ধস্বর ধ্বনি (semi-vowel sound) w, y, বাঙ্গালাতে সহজেই বুঝান হয়—যেমন, work (ওয়ার্ক), yard (ইয়ার্ড)। কেহ কেহ ওয়ার্ড, ইয়ার্ড লিখিতে চাহেন, কিন্তু তাহা সাধারণ বাঙ্গালা রীতিবিরুদ্ধ; কারণ সংস্কৃতের জায় বাঙ্গালাতেও ছইটি স্বরবর্ণের সমাবেশ সচবাচর হয় না—প্রাকৃততেই স্বরবর্ণের সমাবেশের ছড়াছড়ি পাওয়া যায়—এ-বিষয়ে বাঙ্গালাতে প্রাকৃত রীতি অম্লস্বত হয় নাই, সংস্কৃত রীতিই হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যে “ওয়ার্ক” লিখিলে ‘র’-এর ঈষৎ ই-ধ্বনি আসিয়া পড়ে, তাই তাঁহারা “ওয়ার্ক” লিখিতে চান। কিন্তু সে-কথার বিশেষ কোন মূল্য নাই। কারণ বাঙ্গালা প্রয়োগে “র” বর্ণের ছই বকম উচ্চারণই প্রচলিত “ইয়” ধ্বনি, এবং “ত” ধ্বনি। যেমন, পাওয়া, খাওয়া, ইহাদের উচ্চারণে কোন “ই” ধ্বনি নাই, একেবারেই পাওয়া, খাওয়া। সুতরাং “র”এর এই বিবিধ উচ্চারণ স্বীকার করিতে হইবে। কাজেই, “ওয়ার্ক” লেখায় কোনই দোষ নাই। তাই, Edward হইবে এডওয়ার্ড, war-bond হইবে ওয়ার-বন্ড ইত্যাদি।

তার পর ব্যঞ্জনধ্বনি। কয়েকটি ইংরেজী ব্যঞ্জনবর্ণের ঠিক বাঙ্গালা প্রতিধ্বনি নাই। যেমন, f, v, z; ইহাদিগকে নিকটতম ধ্বনি-সংযুক্ত বর্ণ ফ, ভ, জ দ্বারা প্রকাশিত করিলেই যথেষ্ট। এজন্য ফ, ভ, জ, ইত্যাদির অবতারণা অনাবশ্যক।

তাছাড়া কয়েকটি যুক্ত-ব্যঞ্জনধ্বনি ইংরেজীতে আছে, যেমন, zh, st; ইহাদিগকেও নিকটতম ধ্বনিসংযুক্ত বর্ণ “ঝ” এবং “ষ্ট” দ্বারা প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট। অবশ্য “zh” ধ্বনিসংযুক্ত ইংরেজী শব্দ খুব বেশী প্রচলিত নাই; কয়েকটি আছে, যেমন, pleasure, measure, azure, vision ইত্যাদি, চাই এ-বিষয়ে বাঙ্গালার কোন নির্দিষ্ট রীতি অবলম্বিত হয় নাই। কেহ “জ” দিয়া, কেহ “ঝ” দিয়া লেখেন—‘ঝ’ দিয়া লেখাই ভাল। কিন্তু ‘st’ যুক্ত ইংরেজী শব্দ ঢের প্রচলিত আছে, station, street, steamer ইত্যাদি—ইহাদিগকে বাঙ্গালাতে ‘ষ্ট’ দিয়া প্রকাশ করাই প্রচলিত রীতি, এবং এই রীতি পরিবর্তনের কোনই আবশ্যকতা নাই।

কেহ কেহ s ও t এর এই যুক্তাকর অথবা “স্ট” এইরূপ পৃথক ভাবে লিখিয়া এই ধ্বনিটি বুঝাইতে চাহেন। তাহাতে বিশেষ কোন লাভ নাই। কারণ “স্ট” এবং “ট”এর ধ্বনি যদি সংস্কৃতের ধ্বনি হয়, তবে “দন্ত”স এবং “যুদ্ধন্ত”ট-এর সমাবেশ ধ্বনি সঙ্গতিবিরোধী (এই কারণেই জাৰ্মান ভাষায় “stein” প্রভৃতি শব্দে “st”এর উচ্চারণ—“ষ্ট”); আর

যদি বাঙ্গালার ধনি হয়, তবে ইহা পশুশ্রম মাত্র, কারণ বাঙ্গালাতে “দন্ত্য স”এর উচ্চারণ মোটেই “দন্ত্য” নহে, সুতরাং “ব”এর পরিবর্তে “স” আমদানী করিয়া কোনই উন্নতি হয় না। বস্তুতঃ এত শুল্ক ধনি বিচার করিবার জন্য নূতন বর্ণ-বোজনা কোন ভাষাতেই করা হয়না; দুষ্টান্তস্বরূপ বলা বাইতে পারে, যে ইংরেজের “কলিকাতা”কে Calcutta, দিল্লীকে Delhi লেখে, তাহাতে কাহারও কোন অসুবিধা হয় না।

উপসংহার

বাঙ্গালা বাণানের সংস্কার বিষয়ক এই যে সামান্য আলোচনা করা হইল তাহার প্রধান কারণ এই যে সম্প্রতি কিছুদিন ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োজিত একটি কমিটি এই বিষয়ে আলোচনার নিযুক্ত আছেন; এবং ইতিমধ্যে সেই কমিটি এসবক্ষে কতকগুলি প্রস্তাব আনিয়াছেন। সেই প্রস্তাবগুলি প্রথমতঃ বিগত মে মাসে একখানি পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়; এবং কিছুদিন পরে উক্ত পুস্তিকার একখানি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই দুই সংস্করণের প্রস্তাবাবলীর ভিতরে অনেক তফাৎ আছে, সম্ভবতঃ প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত প্রস্তাবাবলীর সমালোচনার ফলেই দ্বিতীয় সংস্করণে কতক কতক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

কিন্তু সত্য কথা বলিতে, কি প্রথম কি দ্বিতীয় সংস্করণে কোনটিতেই ভাষার রূপ নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত পথ অন্বেষিত হয় নাই। ভাষার রূপ সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি যে সর্বাপেক্ষা মোটা কথা ও গোড়াব কথা এই যে, যে রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত তাহা মানিয়া লইতে হইবে। ইংরাজীতে এবং অন্যান্য ভাষার ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়; যেমন, an ewt হইতে a newt, a nadder হইতে an adder, for then once হইতে for the nonce হইয়াছে—আজ যদি কেহ ewt বা nadder বা for then once লেখে তবে তাহাই ভুল হইবে। সৌভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার প্রধানতঃ সংস্কৃতমূলক হওয়াতে সাধুভাষার রূপে ‘বড় একটা’ অনিশ্চয়তা নাই; প্রায়ই একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। উপরেব আলোচনাতেও দেখা গেল যে সাধু বাঙ্গালা শব্দের রূপ-গঠনে কতকগুলি ‘নির্দিষ্ট নীতি’ অন্বেষিত হইয়াছে, খামখেয়ালী ভাবে হয় নাই। সুতরাং সাধুভাষার বাণান সংস্কার বা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার বিশেষ কোন আবশ্যকতাই নাই বলিলে হয়। অথচ এই সাধুভাষার প্রচলিত রূপ পরিবর্তনের দিকেই কমিটির উৎসাহ বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে।

শুধু একেবারে অ-সংস্কৃতমূলক দেশজ ও বিদেশী শব্দ হইতে আগত বাঙ্গালা শব্দ, বাহ্যতে নানা প্রকাব বাণান প্রচলিত আছে (উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে), সেইগুলি নিয়মিত (standardize) করিবার চেষ্টা করিলে কিছু উপকার হইতে পারে। আর সর্বাপেক্ষা আবশ্যক তথাকথিত “চলতি” বা কলিকাতা অঞ্চলে

কথিত ভাষা—বাহা শব্দের ববীজনাথ ঠাকুর মহাশয় এবং তাহার দেখাদেখি আরও অনেকে আজকাল বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিতেছেন—সেই ভাষার রূপের, বিশেষতঃ তাহার ক্রিয়াবিভক্তিযুক্ত রূপের, নিয়ন্ত্রণ করা। এই বিষয়ে বিশৃঙ্খলা খুবই বেশী, সুতরাং তাহা দূরীকরণের প্রচেষ্টা আবশ্যিক।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে বিশ্ববিদ্যালয় বাণান সমিতির প্রস্তাবাবলীর মধ্যে “চলতি” ভাষার সম্বন্ধে মাত্র দুই-একটি প্রস্তাব আছে, আব সমস্তই সাধুভাষার প্রচলিত রূপের পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক। বস্তুতঃ কমিটির অভিযান প্রধানতঃই প্রচলিত সাধু-ভাষার বর্ণস্বত্ব, বিসর্গ, ঙ্গ, ঞ ও ঙ-এর বিরুদ্ধে নিয়োজিত; সর্বা, আর্ষ, পর্বস্ব, কার্তিক, পুনঃপুনঃ, বানি, মামি, বাঙালি, প্রভৃতি রূপের অবতারণাই ইহার নিদর্শন। আরও বিশ্বাসের কথা এই যে প্রথম সংস্করণে চলতি ভাষা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তবু যেটুকু চেষ্টা করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে সেটুকুও পরিত্যক্ত হইয়াছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

ক্রিয়াবিভক্তি “লাম” সম্বন্ধে কথ্য ভাষার লাম, লুম, লেম এই নানাপ্রকার রূপই ব্যবহৃত হয়; প্রথম সংস্করণে বলা হইয়াছে “লাম” রূপটিই বিধেয় এবং অপবগুলি বর্জনীয়; অথচ দ্বিতীয় সংস্করণে বলা হইয়াছে যে “লাম” বিভক্তি স্থানে “লুম” বা “লেম” বিকল্পে লেখা বাইতে পারে। আবাব প্রথম সংস্করণে ছিল যে মত, মত (সদৃশ); ভাল (কপাল), ভাল (উত্তম), ইত্যাদির মধ্যে বাণান-ভেদ অনাবশ্যক, দ্বিতীয় সংস্করণে আছে যে শেবোক্ত শব্দগুলিব বাণানে মত, মতো, ভাল, ভালো ইত্যাদি বিকল্পে বিধেয়। তজ্রপ, দ্বিতীয় সংস্করণে “কি” শব্দের “কী” রূপও বিকল্পে বিহিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় সংস্করণেব এই সব পরিবর্তন কোন কোন বিশিষ্ট লেখকের বাতিরে হইয়াছে; কিন্তু বাতিবে বিকল্প সৃষ্টি ও বাণান বিধান করা ভাষা নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত পথ নহে।

মোটের উপর গাঁড়াইয়াছে এই যে, যেদিকে (অর্থাৎ চলতি ভাষা সম্পর্কে) সংস্কার চেষ্টা দ্বারা কতকটা উপকার সাধিত হইতে পাবিত সেদিকটা প্রকৃতপ্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ছাড়িয়া দিয়াছেন; এবং তৎপরিবর্তে যে দিকটাতে (অর্থাৎ সাধুভাষা সম্পর্কে) বিশেষ কিছুই করিবার নাই, সেই দিকেই কমিটি সমূহ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন এবং সময় ও শক্তির অপব্যয় করিতেছেন। এই প্রণালীতেই যদি বাণান-সংস্কার প্রচেষ্টা চলিতে থাকে, তবে লাভের মধ্যে হইবে এই যে যেখানে আছে শৃঙ্খলা সেখানে আসিবে বিশৃঙ্খলা, যেখানে আছে সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ সেখানে আসিবে বিকল্প, যেখানে আছে স্থিরতা সেখানে আসিবে অনিশ্চয়তা; অর্থাৎ মোটের উপর ফল হইবে বাণান-বিভ্রাট। ভাষা নিয়ন্ত্রণেব ব্যাপারে অত্যন্ত ধীবতা ও সুবিবেচনার সহিত যুক্তিসঙ্গত ভাবে অগ্রসব হওয়া আবশ্যক—শুধু খেয়াল বা জিনের বশবর্তী হইয়া নহে—নচেৎ এই বিষয়ে অবিশ্যকারিতার ফলে ভাষার উপকারের পরিবর্তে অপকারই সম্ভব হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।



সত্যদেহস্কন্ধে শিব
শ্রীমুকুন্দারী দেবী

অবাসী প্রেস, কলিকাতা

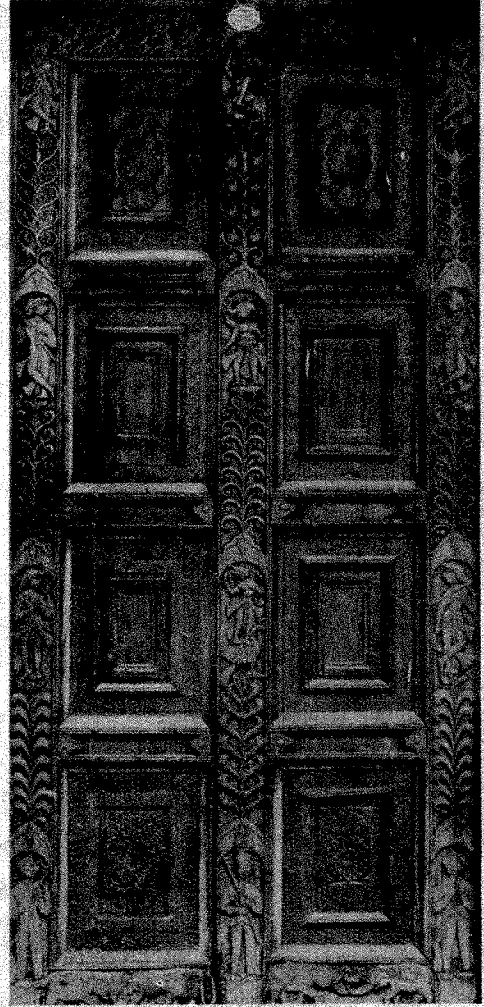
বিক্রমপুরের শিল্পসম্পদ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিক্রমপুর অতি প্রাচীন কাল হইতেই শিল্পসম্পদে শ্রেষ্ঠ ছিল। বিক্রমপুরের শিল্পবিজ্ঞান নানা দিক্ দিয়া নানা ভাবে দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছিল। প্রাচীন বাংলার রাজধানী (বর্তমান রামপাল নামে পরিচিত) বিক্রমপুরের চারি দিকে শিল্পীদের বাসপল্লী বর্তমান ছিল, এখনও তাহার স্মৃতি সেই সকল পল্লীর নামের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ঢাকার প্রসিদ্ধ শঙ্খবাণিকেরা এক সময়ে বিক্রমপুরে বাস করিতেন। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন নির্যায় করিবার কার্পাস বিক্রমপুরের অন্তর্গত পাঁচগাও গ্রামের নিকটবর্তী মাঠে উৎপন্ন হইত।

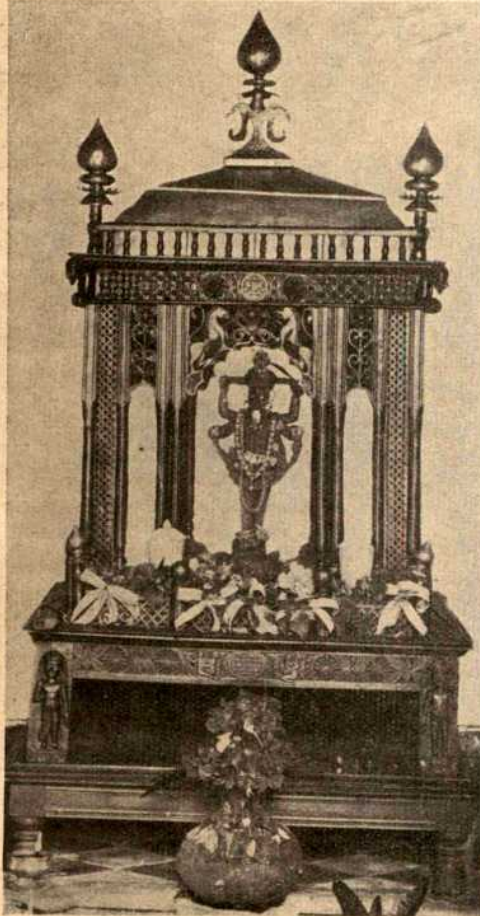
সে বেশী দিনের কথা নয়, সন্তর-পাঁচাত্তর বৎসর পূর্বেও শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ভদ্র-অভদ্র বিক্রমপুরের প্রায় সকলের ঘরেই চরকা ঘুরিত। মহারাজ রাজবল্লভের রাজনগরের পিতলের বাসনের প্রকাণ্ড কারখানা ছিল। সেখানে নানা প্রকারের পিতলের বাসন প্রস্তুত হইত। রাজনগরের ঘটি প্রভৃতির বড় সমাদর ও সুনাম ছিল। এই বাসনের কারখানা যেখানে ছিল সেখানকার নিকটবর্তী লোকেরা দিবারাত্রি শত শত হাতুড়ির ঠক্ ঠক্ ও ধাতু-দ্রব্যের ঝন্ ঝন্ শব্দে অস্থির হইয়া পড়িত। কীর্তিনাশা রাজনগর গ্রাস করিবার পর সেই শিল্পসমৃদ্ধি হ্রাস পাইলেও বিলুপ্ত হয় নাই। দক্ষিণ-বিক্রমপুরে এই শিল্পটি ত্রীহীন হইয়া পড়িলেও বর্তমান সময়ে বাইঘা, হাঁসের কান্দী, পালাং প্রভৃতি স্থানে এই কারবার চলিতেছে। উত্তর-বিক্রমপুরে এই শিল্পটির অবস্থা এখনও সন্তোষজনক। পূর্বে ঢালা পিতল ও তামা পিটিয়া দেশীয় তৈজসাদি প্রস্তুত করা হইত; ইহাতে জিনিষগুলিও যেমন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত, দেশের অনেক অর্থও দেশেই থাকিয়া যাইত। যেমন বিদেশ হইতে পিতল ও তামার চাদরের (পাত) আমদানী হইল, অমনি পুরাতন প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া পরিশ্রম লাঘবের জন্য একটু স্থবিধার লোভে দেশীয়

কারিগরগণ ঐ চাদর দ্বারা সমুদয় জিনিষ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে ধীরে ধীরে শিল্পের অবনাত হইতে আরম্ভ করিল।



কলমা গ্রামের বৃড়াকালী মন্দিরের কাঠের কপাট
শ্রীবিনোদেবের দাশগুপ্ত ও চিত্রশিল্পী শ্রীচিন্তরঞ্জন দাশের সৌজন্যে

বিক্রমপুরের দুয়ালী গ্রাম এই অল্প কয়েক বৎসর হইল পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। দুয়ালী একটি প্রসিদ্ধ পল্লী ছিল। আমি ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান উপলক্ষে কয়েক বার এই গ্রামে গমন করিয়াছি। একটি মারীচি-মূর্তি (ভগ্ন) দুয়ালী গ্রাম হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। পূর্বে এই দুয়ালী গ্রামে ধাতুনির্মিত সুন্দর সুন্দর দেবদেবীর প্রতিমূর্তি ও নানাবিধ ঢালাই জিনিষ বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইত। এই শিল্পটি এক সময়ে যথেষ্ট সমাদৃত ছিল। দেশেও যেমন প্রচুর পরিমাণে কাটতি হইত, বিদেশেও তেমনি হইত। এক সময়ে এই শিল্পটি দুয়ালীর ভদ্রলোকদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। এই ব্যবসায়টি তাঁহাদের অনেকের জীবনোপায়ে একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সহিত



কলমা গ্রামের বড়াকালীর কাঠনির্মিত সিংহাসন
শ্রীবিনোদেবের দাশগুপ্ত ও চিত্রশিল্পী শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের সৌজন্তে

ঐ গ্রামের ভদ্র-শিল্পীরা এই ব্যবসায়টি পরিত্যাগ করায় বিক্রমপুরের ধাতব মূর্তি নির্মাণের শিল্পটি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

আমাদের দেশের অনেক শিল্প লুপ্ত হইবার প্রধান কারণ সামাজিক নির্যাতন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে লোহজঙ্গ হইতে প্রকাশিত 'বিক্রমপুর' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইত। সেই পত্রিকায় দুয়ালী গ্রামের এই শিল্প সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল—

“অনেকে এই শিল্প কার্যটিতে এতদূর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে, সকলেই তদর্শনে বিমোহিত এবং নিঃস্বাতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। আজ সমাজের ভয়ে ঐ গ্রামের কোনও ভদ্রলোক প্রকাশ্যভাবে এই কার্য করিতেছেন না। সকলেই শিল্পের এই অনুষ্ঠানকে এক্ষণে ঘৃণা ও লজ্জার বিষয় মনে করেন। অনেকে এই ব্যবসায় একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই ব্যবসায়টি পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পটির উৎকর্ষেরও অনেক হ্রাস পাইয়াছে। এক্ষণে বলুন দেখি আমরা কি এই শিল্পটির অবনতির কারণ নহি? আজ যদি সমাজ এই শিল্পানুষ্ঠানকারীদের প্রতি এতদূর কঠোর ব্যবহার না করিতেন, তবে এই শিল্পটি আরও কত উন্নতি লাভ করিতে পারিত। তাই বলি,—তুমি যদি ব্রাহ্মণ হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে পার, মসাজীবী হইতে পার, আরও কত কিছু হইতে পার, করিতে পার, ইহাতে যদি তোমার লজ্জা ও ঘৃণা বোধ না জন্মে, সমাজে তুমি উচ্চমুখে চলিতে পার, সমাজের নিপীড়ন সহ্য করিতে না হয়, শাস্ত্রীয়বিধি লঙ্ঘন জন্ত দণ্ডাই হইতে না হয়, তবে এই স্বাধীন ব্যবসায়টির অনুষ্ঠানকারীদের প্রতি তোমার এত ঘৃণা কেন? সমাজই বা কেন ইহাদের প্রতি এরূপ ভ্রুকুটিকুটিল মুখ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাই বলিতেছি দেশীয় শিল্পের অবনতির কারণ আমরাই বেশী। আমরা নিজের পায়ে কুঠার মারিয়া অশ্রের কাঁধে দোষ চাপাইতেছি। (৬ই মাঘ, সন ১৩০০, ১ম ভাগ, ৮ম সন্ধ্যা)।

বিক্রমপুরের অনেক শিল্পই এইরূপ সামাজিক নির্যাতনে বিলুপ্ত হইয়াছে। এক সময় বিক্রমপুর কাঠের কাজের জন্ত বিশেষ বিখ্যাত ছিল। গ্রামে গ্রামে স্ত্রদ্ধরেরা বাস করিত। নৌকা ও জাহাজ প্রস্তুত করিতে তাহারা দক্ষ ছিল। যেদিন পূর্ণগীজ-বীর কার্ডালো তাঁহার ভগ্ন ও জীর্ণ রণতরীগুলি লইয়া বিপন্ন হইয়া বিক্রমপুরের বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায়ের আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছিলেন, সেদিন বিক্রমপুরের রাজধানী শ্রীপুরের স্ত্রদ্ধরেরা অল্প সময়ের মধ্যে সে সমুদয় রণতরী মেরামত করিয়া দিয়াছিল। সেকালে বিক্রমপুরের ‘কোষ’ নৌকা ও ‘জেলিয়া’ জলযুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। আরাকান-রাজের সহিত এবং মোগলদের সহিত নৌযুদ্ধে

কেদার রায় কোষ ও জেলিয়ার সাহায্যে মগ ও মোগলকে পরাজিত ও স্তব্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই কোষ ও জেলিয়া বিক্রমপুরেই নির্মিত হইত। এখনও বিক্রমপুরের নদ নদী ও খালে বিলে নানা শ্রেণীর নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই কাষ্ঠশিল্পের দিক্ দিয়া বিক্রমপুরবাসী সূত্রধরেরা কি কোষতরী নির্মাণে, কি জেলিয়া তরী নির্মাণে, কি বজরা ও ছিপ নির্মাণে অতিশয় সুদক্ষ ছিল। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী সোনারঙ্গের দেউলবাড়ীর নিকটবর্তী পুকুর হইতে প্রাপ্ত এবং রামপালের কাছাকাছি প্রাপ্ত কয়েকটি কাষ্ঠনির্মিত স্তম্ভ এবং তাহার উর্দ্ধ ভাগের চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার একটিতে বিষ্ণুমূর্তি অতি নিপুণভাবে খোদিত রহিয়াছে। কতদিন চলিয়া গিয়াছে, গভীর জলতলে কাদার মধ্যে পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও কাঠের দৃঢ়তাও যেমন রহিয়াছে, তেমনি শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য প্রত্যেকটি কারু নিদর্শনের মধ্য দিয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এমন করিয়া কাঠের গায়ে যাহারা শিল্পমাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছিল, দেবতার সৌম্য শাস্ত সৌন্দর্যের অপূৰ্ণ গাভীর্ঘ্য বিকশিত করিতে পারিয়াছিল, তাহারা যে কত বড় শিল্পী ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করিতেছি।

কলমা গ্রামে শ্রীযুক্ত বিনোদেবর দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে যে কালীমূর্তি আছে তাহা বিক্রমপুরের ‘মক্ষিণা কালী’ নামে পরিচিত। খুব প্রাচীন বিগ্রহ বলিয়া এতদকালে “বুড়া কালী” নামে খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছেন। আনুমানিক ১৭৬০-১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে এই দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। দেবীর সিংহাসনটি কাষ্ঠনির্মিত ও নানারূপ কারুকাৰ্য্যশোভিত বলিয়া বিক্রমপুরের একটি দর্শনীয় বস্তু-মধ্যে পরিগণিত। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই সিংহাসন-নির্মাণ শেষ হয়। বিক্রমপুরের শিল্পী কালীনাথ মিস্ত্রী ইহা নির্মাণ করেন। নির্মাণকাল ও শিল্পীর নাম সিংহাসনের গায়ে খোদিত রহিয়াছে। এই বুড়া কালীর মন্দিরের সম্মুখের দরজার কপাটটিও সূক্ষ্ম কারুকাৰ্য্যের নিদর্শন। ইহা ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তৈয়ারী হয়। ইহার শিল্পীও কালীনাথ মিস্ত্রী। কপাটের উপরিভাগে দেবীপক্ষ ও অম্বর-পক্ষের যুদ্ধের চিত্র খোদাই করা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত গণেশ, কার্তিক, হলধর, শ্রীকৃষ্ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বৃষবাহন শিব (মাথায় গঙ্গা) প্রভৃতি খোদিত চিত্র আছে। সর্ব্বনিম্নে তিনটি সিপাহী রহিয়াছে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, এইরূপ সিপাহীর মূর্তি খোদিত করিবার পদ্ধতি সিপাহী-বিশ্রোহের সমকালে বিদ্যমান ছিল।]

কাছে ও দূরে

শ্রী নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অতি কাছে থাকি
রেখেছিলে ঢাকি
চেতনা মোর,
ঘুমে জাগরণে
ধেন হু-নয়নে
স্বপন-মোর।

দূরে গেছ চলে,
প্রতি পলে পলে
এবার আমি
আপন মায়ায়
ঘিরেছি তোমায়
দিবসযামী।

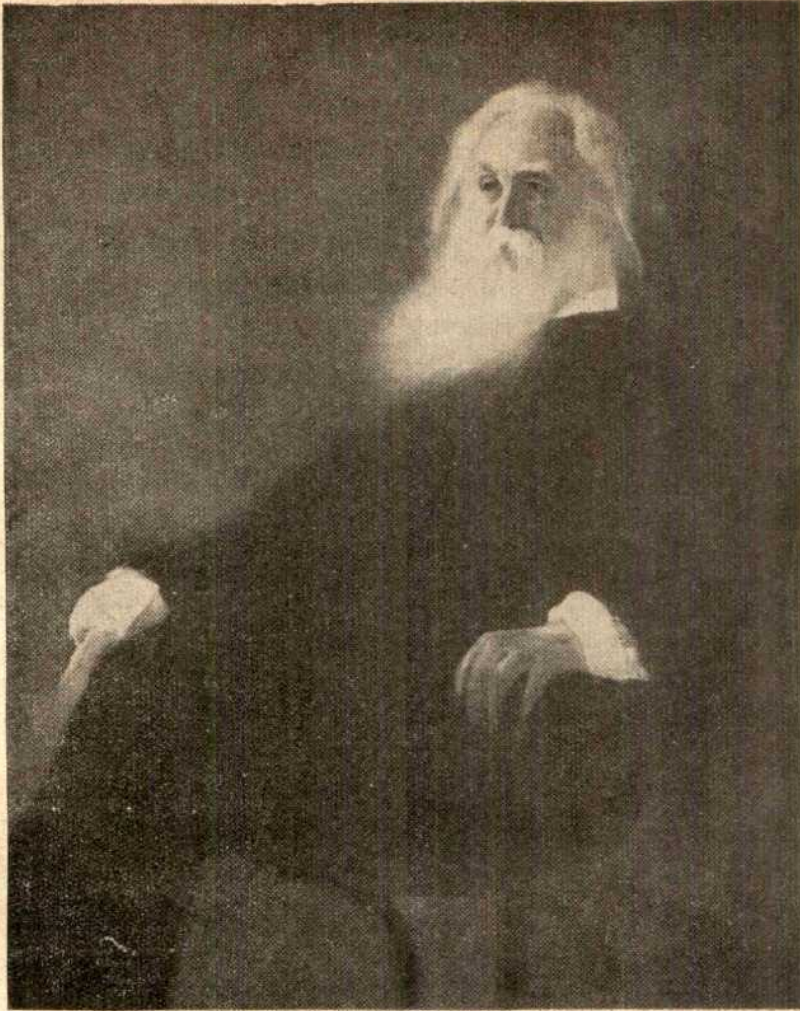
হুইটম্যান

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যের ইতিহাসে হুইটম্যানের আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা। কাব্যের জগতে এমন একটি স্বর তিনি বাজালেন যা সম্পূর্ণ নতুন। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে কাব্যসৃষ্টির উপাদান সংগৃহীত হ'ত রাজা-বাদশাহের অট্টালিকা থেকে ; সাহিত্য তৈরির জগৎ যেতে হ'ত পৌরাণিক দেবদেবীদের কাছে। হুইটম্যান আবির্ভূত হলেন একটা অভিনব দৃষ্টি নিয়ে। তিনি দেখলেন, কবিতা লিখবার প্রচুর উপাদান রয়েছে নিত্য কাছেই—আমাদের প্রতিদিনের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে। আমাদের চোখের সম্মুখেই মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষের জীবনের রঙ্গমঞ্চে এমন সব ঘটনার অভিনয় হয়ে যাচ্ছে যা নিয়ে অনবদ্য বহু কবিতা লেখা একেবারেই অসম্ভব নয়। হুইটম্যানের আবির্ভাবের পূর্বে কবিতালক্ষীর বিচরণের ক্ষেত্র ছিল স্রসজ্জিত প্রমোদশালায় নৃপুত্রের নিকণ, পুষ্পমাল্যের দৌরভ, প্রেমিক-প্রেমিকার অশ্রুত প্রণয়-গুঞ্জ এবং বিলাসের বিচিত্র আয়োজনের মধ্যে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর শেলীর কবিতায় গণতন্ত্রের স্বর অবশ্যই বেজে উঠেছে—কিন্তু মাটির খাটি স্বর এবং মানুষের সহজ গরিমাকে প্রকাশ করবার জগৎ প্রয়োজন ছিল হুইটম্যানের মত অসাধারণ কবির আবির্ভাবের। তিনি বললেন কবি হ'তে চাপ ? বেরিয়ে এস আকাশের তলায় মানুষের বিশাল হাতে। ভোর না হ'তেই ক্রমক চলেছে ভূমি কর্ষণ করতে ; কচি ধানের সবুজ ক্ষেতে হাতে করে কাজ আর মুখে গায় গান। কবিতালক্ষীর আনাগোনা ত এখানেই। ছোট শিশুটি নিদ্রা যায় দোলনায় ; হেমস্তের অপরাহ্নে ধানের গাড়ী নিয়ে চাষী ফিরে যায় প্রান্তর থেকে পল্লীর বৃকে ; মৃগাদের ছেলে আর মেয়েরা গুহ্র জ্যোৎস্নায় সারারাত ধরে মাদল বাজায় আর নাচে ; ভরাগন্ধার গৈরিক জলে জোয়ান জোয়ান ছেলেরা কাটে সাঁতার ; বিলের কালো জলে পানকৌড়ি দেয় নিঃশব্দে ডুব ; মেঠো পথের

ধারে পাতার আড়ালে ফুটে আছে বনমল্লিকা ; মশালের আলোয় রাজপথ আলোকিত ক'রে বর চলে বিবাহ করতে। রাজমিস্ত্রী বারে বারে হাঁক দেয় সুরকির জগৎ ; খেয়াঘাটের মাঝি সারাদিন ধরে করে যাত্রী-পারাপার ; উকীলের চারি দিকে ভিড় ক'রে বসে আছে মক্কেলের দল ; ভাত্তার গভীর মুখে নাড়ী দেখে আর ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চায় ; নতুন বউ ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে পান সাজে ; গৃহস্থের বধু তুলসীমঞ্চে রাখে সন্ধ্যার প্রদীপ ; শয়নের আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কুমারী করে কেশবিজ্ঞাস ; গুহ্র-বস্ত্রে মৃতের দেহ ঢেকে দেয় আত্মীয়স্বজন আর তার উপরে রাখে রাশি রাশি পুষ্প ; সত্তাবিধবা সাক্ষনয়নে বহুকালের অলঙ্কার ফেলে খুলে আর সিঁহুরের দাগ ফেলে মুছে ; পৌষের প্রভাতে গ্রামের ছেলেবুড়ো বন-ভোজনে যায় নদীর তীরে—যেখানে বটের তলায় সারা বেলা থাকে ছায়া ; বিরাট জন-সভায় বক্তার গুরুগভীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে অগ্নিগর্ভ বাক্যের শ্রোত আর শ্রোতাদের ধমনীতে ধমনীতে চঞ্চল হয়ে ছোটো রক্তধারা ; খেলোয়াড় উর্দ্ধ্বাসে ছুটেছে ফুটবল নিয়ে আর অপরাহ্নের আকাশকে বারে বারে মুখরিত ক'রে উঠছে জনতার জয়ধ্বনি ; ছয় ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে জনাকীর্ণ রাজপথে পুষ্পরষ্টির মধ্যে আসে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ; গন্ধার ঘাটে সদ্যস্নাতা পুরনারী নতমস্তকে বরে সূর্য্যপ্রণাম ; পবিত্র হোমাগ্নিকে ঘিরে নবীন পূজারীরা করে মন্ত্রোচ্চারণ আর বীণাপাণির চরণে দেয় পলাশ ফুলের অঞ্জলি ; চাঁপার কলির মত আঙুলের ডগায় চন্দনের ফোঁটা নিয়ে বোন পরিয়ে দেয় ভায়ের কপালে ভাইফোঁটা। এমনি সহস্র সহস্র ঘটনা নিমেষে নিমেষে দিনরাত ঘটে যাচ্ছে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যা অনায়াসে কবিতার উপাদান হ'তে পারে।

The marvellous envelops us and we breathe it like the atmosphere ; but we do not see it.



গুয়াণ্ট ছাইটম্যান

অপল্পের মহিমা রেখেছে আমাদের ঘিরে ; নিঃখাস-প্রথাসের সঙ্গে বাতাসকে যেমন গ্রহণ করি আমরা, তেমনি তাকেও গ্রহণ করছি নিম্নে যে নিম্নে ; কিন্তু তাকে দেখার মত চোখ নেই আমাদের ।

ছাইটম্যানের কবিতার ছত্রে ছত্রে আসন পেয়েছে যারা— তারা দুর্লভ নয়, অলৌকিক নয়। তারা নিতান্ত সাধারণ ব'লেই আমরা তাদের উপেক্ষা ক'রে চলি। কিন্তু দুর্লভ ছিল তাঁর দৃষ্টি। সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে উপলব্ধি করতে হ'লে যে অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন, সেই দৃষ্টি নিয়ে এসেছিলেন তিনি পৃথিবীতে। বাহিরের চোখ দিয়ে দেখতে

পাই যাকে, তাকে ব্যক্তির বা বস্তুর সবটুকু মনে করা ঠিক নয়। রূপ থেকে সব কিছুর আরম্ভ মাত্র। কোথাও কি তাদের সমাপ্তি আছে ? গভীর অহুরাগে যে-অধরে রাবি চুষনের স্পর্শ, সে-অধর কার ? বাছবন্ধনের মধ্যে রক্ত-মাংসের যে-স্থলজীবী ধরা দিয়েছে তার, না অপর কোন সত্তার যার অস্তিত্ব আমাদের ধরা-ছোঁয়ার উর্দ্ধে এবং সমস্ত মলিনতার ও দীনতার পরপারে ? রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ নিয়ে যে বস্তুজগৎ বারম্বার আমাদের চেতনার দুয়ারে করে করাঘাত, তাকে চরম ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে আমাদের কোথায়

যেন বাধে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর পিছনে আছে এমন-একটা-কিছু যার প্রকাশ আকাশের অনন্তকোটি সূর্য্য তারা থেকে আরম্ভ করে সমুদ্রতীরের ক্ষুদ্রতম বালুকণা পর্য্যন্ত প্রত্যেকের মধ্যে, যার অপরিমিত পরিচর্যা প্রত্যেকটি মানুষ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি চড়ুই পাখী পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণি-জগতের পিছনে। এই এমন-একটা-কিছুকেই উপনিষদে বলা হয়েছে অণোরণীমান্ মহতোমহীমান্, অর্থাৎ অণু থেকেও সে অণু, বিরাট থেকেও সে বিরাট এবং এই অনির্কচনীয় কিছুর মহিমাকেই সর্বত্র উপলব্ধি করে সর্ব্ অলিভার লজ লিখেছেন তাঁর *Modern Scientific Ideas* নামক পুস্তকের শেষপৃষ্ঠায়,

Depend upon it that there is some Mind that really comprehends the whole, that can attend to the smallest detail—to every human being, to every bird, every sparrow—and can yet feel at home in the infinitude of space. Nothing too small, nothing too big, for that infinite Mind's understanding and fostering care.

“এমন কোন আত্মা আছেন যিনি সব কিছুকেই নিশ্চয় জানেন। প্রত্যেকটি মানুষ, প্রত্যেকটি পাখী, প্রত্যেকটি চড়ুইয়ের উপরে এই আত্মার সজ্ঞাপ দৃষ্টি। আকাশের অসীমতাও এই আত্মার বাহিরে নয়। ক্ষুদ্র থেকেও যা অভিক্ষুদ্র এবং বৃহৎ থেকেও যা অতি বৃহৎ—সবাইকে জানেন এই সীমাহীন আত্মা এবং সকলের পিছনেই আছে এই আত্মার পরিচর্যা।”

এই অসীম আত্মাকে আমরা যখন অতীতের আলোকে আবিষ্কার করি তখন সমস্ত জগৎ অকস্মাৎ অপাখিব মহিমা নিয়ে আমাদের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ক্ষুদ্র আর ক্ষুদ্র থাকে না, তুচ্ছ হয়ে ওঠে অপরূপ। তখন আর আমরা করুণকণ্ঠে বারম্বার বলি না, জীবন দুঃখময় এবং জগৎ মিথ্যা। অনির্কচনীয় আনন্দে আমাদের রসনা জয়ধ্বনি দিয়ে বলে,

বিধরূপের খেলাঘরে

কতই গেলেম খেলে,

অপরূপকে দেখে গেলেম

হুট নয়ন মেলে।—গীতাঞ্জলি

ওয়ান্ট হুইটম্যান রূপের মধ্যে দেখেছিলেন এই অপরূপকে আর সেই জগুই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তাঁর কাছে দেখা দিয়েছিল বিপুল অর্থ নিয়ে। সকলের জীবনেই এমন এক-একটা অপূর্ণ মুহূর্ত আসে যখন হুঃসহ কোন বেদনা বিদ্রোহের মত চকিতে অন্ধকারের পর্দাকে দেয় বিদীর্ণ করে। নব জাগরণের সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে আমাদের বিস্তিত নয়ন

দেখে সীমার পশ্চাতে অসীমকে, ভেঁড়ের পশ্চাতে চেতনকে। এমন মানুষও আছেন যাদের দৃষ্টি সকল সময়ের জগুই আবরণমুক্ত। পৃথিবীতে ছোট বড় যাই কিছু ঘটুক না, প্রত্যেকটি ঘটনার উপরে তাঁরা দেখেন অনন্তের পদচিহ্ন। বাতাসে ভেসে-আসা গানের একটি চরণ, আকাশের এক কোণে ছোট একটি নক্ষত্র, পাতার অন্তরালে ক্ষুদ্র একটি বনফুল, অপরিচিত হাতের লেখা একখানি চিঠি, প্রিয়তম বন্ধুর আঙুলের একটুখানি ছোঁয়া, পথে যেতে যেতে হঠাৎ দেখা বিয়ল্ল একটি মুখচ্ছবি, আপন জন্মের নয়নকোণে এক ফোটা আঁখিজল এক নিমেষে খুলে দেয় এমন একটি অপরূপ রাজ্যের তোরণদ্বার যেখানে সবই অজুত এবং সবই অনির্কচনীয় আলোকে পরিপূর্ণ। যাদের কাছে জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত, প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা অজ্ঞানার হাতের অঙ্গুরীয়কে বহন করে আনে, তাঁদেরই আমরা বলি কবি আর ঋষি। এঁদের সংখ্যা কোন কালেই খুব বেশী নয়।

হুইটম্যানের আসন এই দুর্লভ পুরুষদের সভায়। তিনি লিখে গেছেন,

Each moment and whatever happens thrills me with joy.

জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত এবং প্রত্যেকটি ঘটনা আমার চেতনায় আনে পুলকের শিহরণ।

A morning glory at my window satisfies me more than the metaphysics of books.

পুঁথিতে দার্শনিক তত্ত্বের স্থল ব্যাখ্যার মধ্যে যে তৃপ্তি পায় না আমার অন্তর, বাতায়নপথে প্রভাতের গুহ্রজ্যোতি সেই তৃপ্তি আনে আমার চিত্তে।

Logic and sermons never convince,

The damp of the night drives deeper into my soul.

ধর্ম্মের উপদেশ শুনে আর স্থায়শাস্ত্রের কচকচি পড়ি কে কবে রাত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে? রাতের ঝিল্লি স্পর্শ আমার অন্তরে আনে সত্যের গভীরতর অহুত্ব।

Why should I wish to see God better than this day?

I see something of God each hour of the twenty-four, and each moment then, In the faces of men and women I see God, and in my own face in the glass, I find letters from God dropt in the street, and every one is sign'd by God's name...

আজ ভগবানকে যেমন করে জানতে পারছি, এর চেয়ে ভাল করে তাকে জানতে পারব আর একদিন—এ মুক্তা কেন?

চলিষ্ঠ বটীর প্রত্যেকটি বটীর এবং প্রত্যেকটি মুহূর্তে আমি পাই ভগবানের আভাস, নরনারীর মুখে আমি দেখি ভগবানের ছবি, মুহুরে নিজের মুখেও দেখতে পাই তাঁকেই,

দেখতে পাই রাতার রাতার ছড়িয়ে আছে তাঁরই হাতের চিঠি আর প্রত্যেকটি পত্রে তাঁরই নামের ঝঙ্কার।

ঠিক এই দৃষ্টি নিয়েই তিনি লিখলেন,

And the cow crunching with depress'd head
surpasses any statue,

And a mouse is miracle enough to stagger sextillions
of infidels.

মাথা নীচু করে ঐ যে গরুটি ঘাস খায় ওর কাছে যে কোন মূর্তির মূর্তি রান হয়ে যায়, ক্ষুদ্র একটি মূষিকের মধ্যেও অনৌকিক এমন কিছু আছে যা নাস্তিকের অবিস্মারকেও টলিয়ে দিতে পারে।

মেটারলিক পড়বার সময় বারে বারে মনে হয়েছে—এ ঘেন হুইটম্যানেরই প্রতিধ্বনি।

Never for an instant does God cease to speak ;
but no one thinks of opening the doors.

তাঁর বাণীর তো বিরাম নেই। কিন্তু মন্দিরের দ্বার খুলে সে বাণী গুনবার মত কান কোথায়?

সৌন্দর্য নেই কোথায়? মহিমা নেই কোথায়? নেই শুধু সেই কবির দৃষ্টি বা ক্ষণিকের পিছনে দেখে শাস্তকে, রূপের পিছনে দেখে অরূপকে, ক্ষুদ্রের পিছনে দেখে বিপুলকে। আমাদের ঘবের বাতায়ন যত ক্ষুদ্রই হোক না, সেই গবাক্ষপথে চোখ রাখলেই দেখতে পাওয়া যাবে অসীম আকাশে তারার প্রদীপ, সূর্য দিগন্তে কার যেন নীল নয়নের ছায়া। এই অসীমকে যত ক্ষণ না দেখি, তত ক্ষণ জীবনে আসে না রূপান্তর। যে অন্ধকারের মধ্যে অসহায় শিশুর মত আমরা কাঁদছি আলোকের দেখা পাবার জন্য, কলহ করে ত তাকে বিতাড়িত করা যাবে না। যে মুহূর্তটিতে আমরা উপলব্ধি করব বিশ্বের সব কিছুর মধ্যে তাঁরই প্রকাশ যিনি অনির্বচনীয়—অমনি অন্ধকার মিলিয়ে যাবে জ্যোতির্ময় পূর্বদিগন্তে, জীবনবীণা বেজে উঠবে ঠিক হুরে, আপন অস্তিত্বের অর্থ পাব খুঁজে এবং আবিষ্কার করতে পারব সব বিছুর মধ্যে একটি অবর্ণনীয় সৌন্দর্য এবং মহিমাকে। নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মত আমাদের চেতনায় এই অসীমের স্মৃতি যখন সর্বক্ষণেব জন্ম জগে থাকে, সকলের মধ্যে সত্য শিবহৃদয়কে অবলোকন করতে আমাদের

নয়ন যখন অভ্যস্ত হয়, তখনই ত সেই অজানার সোনার কাঠির স্পর্শ আমাদের জীবন হয়ে যায় এক নিমেষে রূপান্তরিত। তখনই ত রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমাদের কণ্ঠ ব'লে ওঠে,

জোয়ার অসীমে প্রাণ মন লয়ে
যতদূরে আমি গাই
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু,
কোথাও কিছের নই।

অথবা হুইটম্যানের ভাষায় আমরা বলি,

চিরজীবী হোক তারা, বিকস হয়েছে বাহা!
জয় হোক তাদের বাধের রণতরী ভুবেছে সমুদ্রে।
যারা নিজেরা হারিয়েছে সাগরপথে প্রাণ, তারাও হোক চিরজীবী।
যত সেনাপতি হুকে হয়েছে পরাজিত, যত বীর হেরে গিয়েছে
সংগ্রামে—

সকলের নামে ষাও জয়ধ্বনি।

Have you heard that it was good to gain the day ?
I also say it is good to fall, battles are lost in the same
spirit in which they are won.

হুকে জরী হওয়ার মধ্যে গৌরব আছে—এই কথাই কি এককাল গুনে এস নি? আমি বলছি, হুকে পরাজিত হওয়ার মধ্যেও গৌরব আছে, জয় আর পরাজয়—এ দুয়ের মধ্যে মূলতঃ তফাৎ নেই কোন।

সত্যের যে শিখরদেশে আরোহণ করতে পারলে জীবনের সমস্ত কর্ম এবং সমস্ত চিন্তা সার্থক হয়ে দেখা দেয় আমাদের অহুত্বের জগতে, যে জ্যোতির্ময় শিখরদেশকে লক্ষ্য করে মেটারলিক লিখেছেন,

The heights whence we see that every act and
every thought are infallibly bound up with some
thing great and immortal.

যেখানে দাঁড়ালে আমরা নিশ্চয় ক'বে জানি—মরুপথে যে নদী বিলুপ্ত হ'ল এবং মুকুলে যে ফুল ঝরে পড়ল তাদের কারও মৃত্যু চরম নয়, সেই সত্যোপলব্ধির গিরিশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে হুইটম্যান দেখেছিলেন জগৎক আর জীবনকে। যখন যা ঘটবার প্রয়োজন থাকে, তাই ঘটে। তুল যদি ক'রে থাকি জীবনে, তাও ঘটবার প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তই হ'ল অল্পম। বহু যুগের ওপার থেকে এই যে মুহূর্তটি এল আমার দ্বারে, এই মুহূর্তে যা দেখলাম, যা গুনলাম তাহ সত্য সত্যই তুলনা নেই! হুইটম্যানের ভাষায়,

This minute that comes to me over the past
decillions,
There is no better than it and row.

সর্বপ্রকার পদার্থকে আত্মসাৎ করে উর্বর হবার ক্ষমতা যেমন মাটির মধ্যে আছে, জীবনের ভাল-মন্দ সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে আপনাকে ঐশ্বর্যশালী করবার একটি অদ্ভুত ক্ষমতা তেমনি আমাদের আত্মার মধ্যেও আছে। ভুলভ্রান্তি যতই গুরুতর হোক না কেন, আমাদের আত্মাকে তারা দান করে বহুমূল্য সম্পদ, আমাদের সাধুস্বের অভিমানে করে তারা কুঠারাঘাত, আমাদের শেখায় তারা নত হ'তে, আমাদের মিলিয়ে দেয় তারা সকলের সঙ্গে। এই বিপুল সত্যকে উপলব্ধি করেই দুর্দিনেব অন্ধকারের মধ্যে অস্কার ওয়াইল্ড একদিন লিখেছিলেন,

To regret one's own experiences is to arrest one's own development.

জীবনে যা ঘটেছে তা নিয়ে অনুতাপ করার মানে হচ্ছে আত্মবিকাশের পথকে রুদ্ধ করা।

হুইটম্যানের কথাও এই একই কথা।

What blurt is this about virtue and about vice ?
Evil propels me and reform of evil propels me,
I stand indifferent,
My gait is no fault-finder's or rejector's gait,
I moisten the roots of all that has grown.

পাপ আর পুণ্য নিয়ে এই যে বাতায়ুবার এবং কি কোন অর্থ আছে? ধর্ম আর অধর্ম আমার কাছে উভয়ই সমান, পাপে যেমন আমার প্রবৃত্তি, পুণ্যেও তেমনি আমার অনুরাগ,

ছিন্ন অধেষণের প্রবৃত্তি অথবা বর্জন করবার প্রকৃতি আমার নয়, যা কিছু এসেছে—সকলের মূলে সজল সিঁধন করি আমি।

সব কিছুকে স্বীকার করবার মত এই যে উদার দৃষ্টি, এই দৃষ্টিই হ'ল ওয়ার্ল্ট হুইটম্যানের প্রতিভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

Facts religions, improvements, politics, trades, are as real as before,

But the soul is also real, it too is positive and direct...

বাণিজ্য, রাজনীতি, ধর্ম, প্রগতি আগেও ছিল যেমন সত্য, এখনও আছে তেমনি সত্য, কিন্তু আত্মাও সত্য, তারও অস্তিত্ব আছে এবং সে স্বয়ংসিদ্ধ।

I believe materialism is true and spiritualism is true,

I reject no part.

যে জ্যোতির্ষয় ভবিষ্যতের পানে আমরা অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছি সেখানে বিরোধের সমস্ত কোলাহলের মধ্যে মাহুস স্তনতে পাবে মিলনের গভীর বাণী।

সেখানে দেহকে আমরা অস্বীকার করব না, আত্মাকেও নয়। নরের সেখানে যতখানি মূল্য, নারীরও মূল্য ঠিক ততখানি। বিজ্ঞান আর ধর্ম হাত-ধরাধরি করে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সহোদর দুটি ভাইভগ্নীর মত। মগজের জ্ঞান আর মর্শ্বের অহুভূতি—কারও মূল্য সেখানে কম নয়। সে হ'ল এমন একটা জগৎ যেখানে সব কিছুই মূল্য আছে—কোন কিছুই যেখানে উপেক্ষার বস্তু নয়। যত্ন মানে সেখানে শূন্যতার মাঝে নিঃশেষে বলীন হয়ে যাওয়া নয়—All goes onward and outward, nothing collapses—জীবন মানে সেখানে অক্ষুরক্ত আনন্দের মধ্যে প্রাণের নিত্য বসন্তোৎসব। স্বপ্ন আর চক্ষু, জয় আর পরাজয়, বোঁবন আর বার্তাক্য, ঘর আর পথ, যুদ্ধ আর শান্তি, যুক্তি আর বিশ্বাস, রূপ এবং অরূপ—সব কিছুই মূল্য আছে সেখানে। সে হ'ল সাম্যের জগৎ যেখানে কারও ললাটে নেই অস্পৃহতার ছাপ। কারণ স্পৃহতা আর অস্পৃহতার প্রশ্ন ত সেইখানে—যেখানে নেই দৃষ্টি—সেই দৃষ্টি যা গভীর থেকেও গভীরে গিয়ে পৌঁছয় এবং দূর থেকে স্বদূরকেও অনায়াসে দেখতে পারে। এই যে অনাগত সাম্যের জগৎ—এই জগতের পরিচয় পাই হুইটম্যানের কবিতায়। তাঁর কবিতায় কেবলই জয়ধ্বনি—স্বাধীনতার জয়ধ্বনি, সাম্যের জয়ধ্বনি, অতীতের জয়ধ্বনি, ভবিষ্যতের জয়ধ্বনি, মাহুসের জয়ধ্বনি। যাকে বলছি মূল্যহীন—সে ত বাস্তবিক মূল্যহীন নয়। আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আছে বলেই যাকে যা মূল্য দেওয়া উচিত ছিল, সে মূল্য তাকে দান করতে এত আমার কুঠা! জগতকে এবং জীবনকে দেখছি পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে; সমাজের দশ জনের কাছ থেকে ছেলেবেলা থেকে যা শিখে এসেছি তারই কষ্টপাথরে যাচাই করে সব কিছুর মূল্য বিচার করছি। সেই জন্যই ত এত সঙ্কীর্ণতা, এত সন্দেহ, এত গোঁড়ামির প্রাহুর্ভাব; সেই জন্যই ত যাকে স্বল্প মর্যাদা দান করা উচিত তাকে দান করি প্রচুর সম্মান এবং যাকে প্রচুর মর্যাদা দান করা উচিত তাকে দেখি অলঙ্কার চোখে। সেই জন্যই ত প্রাচীনকে সম্মান করতে গিয়ে হই জীর্ণ আচারের কঙ্কালের পূজারী এবং নবীনকে গ্রহণ করতে গিয়ে হই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য কালাপাহাড়, দেহকে স্বীকার করতে গিয়ে হই ইন্দ্রিয়সক্ত ভোগসরস্ব জীব এবং দেহকে অস্বীকার করতে

গিয়ে হই উৎকর্ষ বৈরাগ্য-পথের মায়াবাদী পথিক; যুক্তির নামে অতীন্দ্রিয়কে করি অবিবাস এবং বিশ্বাসের নামে বিজ্ঞানকে করি অশ্রদ্ধা; সেই জন্তই ত এত বিবেচ, এত অসহিষ্ণুতা, এত অহুদারতা, এত বিবোধগীরণ, এত হানাহানি, বাক্যের এত ঝড় এবং তর্কেব এত ধূলি।

হুইটম্যান বললেন—

I have no chair, no church, no philosophy.

কোন বিশেষ ধর্মের অথবা দর্শনের দ্বারা উড়িয়ে আমি আসি নি।

কারণ যা সত্য তাকে ত কোন একটা বিশেষ মতের গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। কোন অধ্যাপক, কোন ধর্মধাষক, কোন দার্শনিক, কোন পুঁথি সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে অক্ষম। তাকে জানা যায় অহুত্বের চোখে দিয়ে, অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে। সেই দৃষ্টি দিয়ে আমরা যা সত্য বলে জানি তার সঙ্গে শাস্ত্রের মিল নাও থাকতে পারে। হুইটম্যান বললেন, প্রশ্নের জবাব দিতে আমি আসি নি, আমি এসেছি মানুষের মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগাতে। প্রশ্নের জবাব দেবে তারাই গুরুগরি যাদের ব্যবসা।

Not I, not anyone else can travel that road for you,
You must travel it for yourself.

সত্যের পথে তোমার হয়ে আর কেউ চলবে—অসম্ভব।

তোমাকেই চলতে হবে তোমার নিজের জোরে।

আমরা জানি, এই স্বাধীনচেতা কবি পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আব এক প্রান্ত পর্যন্ত অগণিত মানুষের মনে এমন সব মারাত্মক প্রশ্নের তরঙ্গ তুলেছেন যার উত্তর নেই পুঁথির পাতায়, সমাজপতিদের রসনায়, রাষ্ট্রপতিদের তৈরি আইনের গ্রন্থে, স্থনীতি-প্রচারকদের বাঁধা বুলির মধ্যে। এই সব প্রশ্ন জাগাবার জন্য কবিকে জীবিতকালে কম ক্ষতি স্বীকার করতে হয় নি। *Leaves of Grass* ধ্বন প্রথম প্রকাশিত হ'ল তখন আমেরিকা তার শ্রেষ্ঠ কবিকে কোন সম্মানই দান ক'বে নি। এমার্সন প্রথম আবিষ্কার করলেন কবির অসামান্য প্রতিভাকে। সাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তর এনেছে যাদের লেখনী, তাদের অনেককেই প্রথম জীবনে সহ করতে হয়েছে দুঃসহ ক্ষতি আর লাঞ্ছনা। এর কারণ আছে। সমাজের দণের মতের যা প্রতিধ্বনি তাকে আইডিয়া বলা ঠিক নয়। আইডিয়ার মধ্যে থাকবে আগুনের শিখা যা জীর্ণকে পুড়িয়ে দিয়ে ঘটাবে নূতনের আবির্ভাব

আইডিয়ার মধ্যে থাকবে কালবোশেখীর ঝড় যা পুণ্ডিনকে বরিয়ে আনবে নববসন্তের গরিমা। যে আইডিয়া মিথ্যার আর অহুদারের বৃকে ভীতির শিহরণ আনতে না পারে, যার আবির্ভাবে অত্যাচারী ডরিয়ে না গুঠে এবং ক্রীতদাসেব বৃকে আনন্দের শিহরণ না জাগে—সে ত অস্বিকৃতি নয়, সে ত গতানুগতিকের ভ্রমাবশেষ। প্রথম শ্রেণীর যারা ভাবুক, তাদের সাহিত্য এই আইডিয়ারই বাহন। বহুর মধ্যে যে একাকী, অবশ্যে স্ব-ব রোদন, তারই কণ্ঠ বাজে অনাগত ভবিষ্যতের বিজয়গন্ধ্য। ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতায় এই নূতনব জয়ধ্বনি। নবযৌবনের অগ্রদূত তিনি। তার সহচর যারা তাদের কটিদেশে পিঙ্কল আর কুঠার, তাদের দেহে অটুট স্বাস্থ্য আর মনে অসীম সাহস, তাদের চোখে বিদ্যুতের শিখা আর মুখে দৃঢ়তার ছাপ, আরাম আর গতানুগতিকতাকে তারা পশ্চাতে এসেছে ফেলে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে অনাহার আর দারিদ্র্য, শত্রুর ক্ষুধা আর মৃত্যুর ছায়া। নবজগতের এই নির্ভীক উদার কবিকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে যারা, তাদের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, কারণ জগৎ অতিক্রম এগিয়ে চলেছে যে আদর্শের পানে সে আদর্শ সাম্যের আদর্শ, স্বাধীনতার আদর্শ, প্রেমের আদর্শ, মৈত্রীর আদর্শ, ঐক্যের আদর্শ। হুইটম্যানের মত আর কোন্ কবি এমন আবেগ-ভরা কণ্ঠ এই চিরজয়ী আদর্শের জয়গান গেয়েছেন?

ভেবেছিলাম এইখানে এসেই প্রবন্ধের উপসংহার করব। কিন্তু হুইটম্যানের কবিতার আসল বিষয়বস্তুটিই আমাদের আলোচনার বাহিরে থেকে গেছে। এই বিষয়বস্তুটি হ'ল মানুষ—সাধারণ পথের মানুষ। ফরাসী চিত্রশিল্পী দামিয়ার (Daumier) ছবির আলোচনা-প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন, He was content to possess the street and to conquer the future. ওয়াল্ট হুইটম্যানের সম্পর্কেও ঠিক এই কথা অসঙ্কোচে আমবা ব্যবহার করতে পারি। যারা পণ্ডিত, যারা ঐশ্বর্যশালী, যারা আভিজাত্যগর্বে গর্বিত, যারা পীরামীডের চূড়ায় আসীন,—হুইটম্যান তাঁদের কবি নন। পথের মানুষ যার, যারা কাঠ কাটে আর হাল চষে, মাছ ধরে আর নৌকা বায়, শিকার করে

আর গাড়ী চালায়—সেই অশিক্ষিত, উপেক্ষিত জনসাধারণের
কবি হলেন হুইটম্যান।

No shutter'd room or school can commune with me,
But roughs and little children better than they.

যের বন্ধ থেকে অথবা ইস্কুলে পুঁথি পড়ে আমাকে বোঝা বাবে না।
আমাকে বুঝতে পারে তারাই বাসের বলা হয়ে থাকে ছেলেমানুষ আর
চাবানুযো।

I am enamour'd of growing outdoors,
Of men that live among cattle or taste of the ocean
or woods,

Of the builders and steerers of ships and the wielders
of axes and mauls, and the drivers of horses,

I can eat and sleep with them week in week out.

আকাশের তলার জীবন বাগানের একটি নিবিড় আকর্ষণ আছে আমার
কাছে,

যারা রাখাল, বাসের মধ্যে পাই সাগরের অথবা অরণ্যের আশ্রয়,
যারা নৌকা বানায়, জাহাজ চালায়, কাঠ কাটে আর পাখর ভাঙে
আর গাড়ী চালায় তারাই হ'ল আমার প্রিয়,

সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাদের সঙ্গে আমি ঘুমোতে আর খেতে পারি
কিছুমাত্র ক্লান্তি অনুভব না করে।

এই ধরনের লাইন হুইটম্যানের লেখায় প্রচুর, আর এই
সব লাইন পড়ে আমরা বুঝতে পারি, উপেক্ষিত অনাদৃত
মহামানবকে কতখানি ভালবেসেছিলেন তিনি।

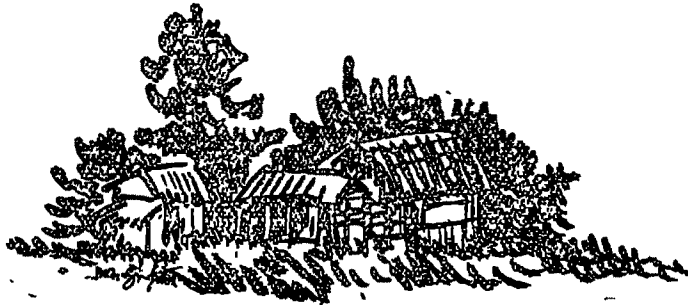
মানুষকে সত্যি সত্যি ভালবাসলে বিদ্রোহী না হয়ে
উপায় নেই। হুইটম্যানের লেখার মধ্যে এই জগ্ৰহী বিদ্রোহের
একটি প্রচণ্ড মনোহর সুরের অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি।
মানুষের দুঃখকে সমস্ত সম্ভা দিয়ে অনুভব করেছিলেন তিনি
অস্তরের শিরায় শিরায় আর এই জগদ্ব্যাপী দুঃখের মূলে
দেখেছিলেন মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার। রাষ্ট্রের আর
সমাজের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী তাই অক্লান্তভাবে
অগ্নি উল্লীর্ণ ক'রে চলেছে বিশ্ববিয়সের অগ্ন্যুৎপাতের মত।

মনস্কণ্ণে তিনি দেখেছিলেন সেই অনাগত জগতের স্বন্দর ছবি
যেখানে মানুষ পেয়েছে সমস্ত শৃঙ্খল থেকে মুক্তি—man
disenthral'd—the conqueror at last, তিনি
জানতেন মুক্ত মানুষের এই আনন্দময় জগৎ আসবে শান্তির
পথে নয়, বীর্যের পথে—সংগ্রামের পথে, স্বাধীনতার পথে।
তাঁর গানের মধ্যে তাই বেজে উঠেছে নটরাজের ডমকধ্বনি।
তাঁর আদর্শ নগরী হ'ল turbulent manly। সেখানে পুরুষ
আর নারীরা সকলের আগে সাহসী—কোন প্রকার
ঔদ্ধত্যকেই ক্ষমা করতে তারা প্রস্তুত নয়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে—সব সময়ে মনে রাখতে হবে—
হুইটম্যানের কবিতায় যে বিদ্রোহের সুর, তার মূলে প্রেম—
যে প্রেমকে তিনি বলেছেন,

The dear love of man for his comrade, the
attraction of friend to friend,
Of the well-married husband and wife, of
children and parents,
Of city for city and land for land.

এই প্রেমের জগতকে সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি দেখে-
ছিলেন—রাষ্ট্রের ঔদ্ধত্য, সমাজের নিষ্ঠুরতা নিশ্চুল
না হ'লে নতুন মানবতার জন্ম অসম্ভব। কবি হাতে
তুলে নিলেন রুদ্রবীণা আর সে বীণায় যে দীপক রাগিণী
তিনি বাজালেন তার প্রতিধ্বনি আজও শুনতে পাই সাত
সাগরের তীরে তীরে। গণতন্ত্রের বিজয়-সঙ্গীত এমন ক'রে
আর কারও বীণায় বাজে নি, মানুষের অন্তর্নিহিত গরিমাকে
এমন ওজস্বিনী ভাষায় আর কেউ প্রকাশ করে নি। তাই
বর্তমান জগতের কবি বলতে হুইটম্যানের নামই সর্বোচ্চ
আমাদের মনে জাগে, এবং সেই জগ্ৰহী তাঁর ভক্তের সংখ্যা
সোশ্যালিস্টদের মত অতি দ্রুত বেড়ে চলেছে।



লক্ষ্মী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

লক্ষ্মীকে নিয়ে কিছুতেই আর পারা গেল না, ওকে এত ক'রে বলি, তুই আমাকে 'কাকা' বলে ডাকবি, তা ও কিছুতেই শুনবে না। ও আমার ছোট ভাই কান্তকে 'রাজা কাকা' বলে, খুড়তুতো ভাই বাহাকে বলে 'ছোট কাকা' কিন্তু আমাকে ডাকবে 'ছেলে',। হয়ত বন্ধুদের সঙ্গে ব'সে গল্প করছি, ও ডাকতে ডাকতে এল. "ছেলে, ছেলে, ও ছেলে!" চটে গিয়ে ধমক দিয়ে বলি, "কি বাপু, ছেলে, ছেলে ক'রে ত মাথাটি খেলে, কি?" বন্ধুরা হেসে বলে, "ছেলে বললে তোমারই বা এত আপত্তি কেন পণ্টু? যে মেয়েলী স্বভাব তোমার, তাতে মেয়ে ব'লে যে ডাকে না এই তোমার ভাগ্য।"

মা ওর সঙ্গে ঝগড়া করেন, "ঈস, ছেলে বললেই হ'ল, ছেলে কার, তোর না আমার!"

লক্ষ্মীর এ সম্বন্ধে কোনই সংশয় নেই, অগ্নান বদনে বলে, "আমার।"

"তোর? তুই পেটে ধরেছিলি না কি? ছেলে যদি তোর হবে, কই তোকে ত মা বলে ডাকে না। মা ত আমাকেই বলে।"

ভাবি, লক্ষ্মী এইবার পরাজিত হ'ল, কিন্তু না, ও তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, "আজ থেকে ছেলে তোমাকে আর মা বলবে না, আমাকে বলবে", পরে আমার হাত ধ'রে টেনে বলে, "ওকে মা বলে না, বিহুঁহিরি, জুজু, ভয়। আমাকে মা বলে, আমি কত হোলদর।"

একে তো ছেলে বে-হাত হয়ে গেল, তার পরে আবার সৌন্দর্যের উপর কটাক্ষ! মা বলেন, "তুই আমার আর-জন্মের সতীন ছিলি, ছেলেও নিয়ে গেলি, আবার আমাকেও কুৎসিত বলিস!"

বৌদি এদের ঝগড়া শুনে হেসে বলেন, "শুধু আর-জন্মের কেন মেজ খুড়ামা, লক্ষ্মী আপনার এ জন্মেরও সতীন।"

বন্ধুরা মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা করেন। 'মাতৃস্ব মেয়েদের সহজাত। প্রিয়া হয় তারা মা হবার জন্তই।' কিন্তু বিপদ আমার। ওব সামনে যাকে আমি মা ব'লে ডাকতে পাব না। কি বলে ডাকব তাও লক্ষ্মী নিজে ঠিক ক'রে দিয়েছে। ডাকতে হবে "জুজু বুড়ী" ব'লে, আর সব সময়ই লক্ষ্মীকে মা ব'লে ডাকতে হবে। কোন সময় লক্ষ্মী বললে আর রক্ষা নেই।

শুধু কি এই। ও যতক্ষণ জেগে থাকবে আমাকে ওর কাছে কাছে থাকতে হবে। ও আমাকে চান করাবে তবে আমি চান করব। ছপুবে বৌদি ওকে ঘুম পাড়িয়ে না রাখলে আমি নদীতে গিয়ে চান ক'রে আসতে পারি নে, ভাতও খেতে পারি নে। ও আমাকে ওর খেলাঘরে ব'সে রান্না ক'রে দেয় ইছরের মাটির ভাত, আমের পাতার মাছ, জলের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে হয় ডাল, এই সব খেয়েই আমাকে জীবিত্ব করিতে হয়।

ছেলের এই স্বভাব করা লক্ষ্মী মার কাছে শিখেছে একবার কি রকম ক'রে চোট লেগে আমার হাত দুটোতে ভয়ানক ব্যথা হ'ল। ঠাণ্ডা লেগে একটু সন্ধিষ্ণুর মতও হ'ল। সবাই বিধান দিলেন, "ভাত বন্ধ।" আমি বিদ্রোহ করলাম। দয়া ক'রে চান না-হয় না-ই করব কিন্তু ভাত না খেয়ে থাকতে পারব না। গোপনে মার সঙ্গে সন্ধি করলাম অনেক বুঝিয়ে বুঝিয়ে, 'সন্ধিষ্ণুর ভাত খেলে কিছু হয় না মা, আর ভাত যদি না দাও আমি তোমাদের সঙ্গে বাসি কিছু খাব না। একেবারে নিজ'লা উপবাস করব।' মা-চান করতে দিলেন না। ঘটি ভ'রে ভ'রে জল নিয়ে মাথা ধুইয়ে দিলেন। খেতে ব'সে দেখি হাত দিয়ে ভাত খেতে পারি নে। মা বলেন, কি আর করবি, আর ছেলেবেলার মত আমিই না হয় খাইয়ে দি।"

চান করান, খাইয়ে দেওয়া, সব লক্ষ্মী কাছে ব'সে লক্ষ্য করলে। পরের দিনই আমার জ্বর সেরে গেল। হাতের ব্যথাও ক্রমে সেবে এল। কিন্তু লক্ষ্মীর কাছে জ্বর আমার কোন দিনই সারল না আর হাতের ব্যথাও ভাল হ'ল না, গায়ে হাত দিয়েই বলে, "উঃ গরম, আজ গাড়ে যায় না। এস ছেলে তোমার মাথা ধুইয়ে দি।" ওর খেলবার ছোট্ট মাটির ঘট্টায় ক'রে জল এনে এনে আমার মাথা ধুইয়ে দেয়। একদিন ত কানের মধ্যেই খানিকটা জল ঢেলে দিল। মহা মুন্সিল! ওর রান্না-করা অন্নব্যঞ্জন আমি নিজে হাত দিয়ে খেতে পারব না। বাঃ রে, আমার হাতে যে ব্যথা, আমি কি ক'রে খাব হাত দিয়ে? ও আমাকে নিজে খাইয়ে দেবে তবে হবে। ইহুরের মাটি হাতে ক'রে ও বলে, "সোনা, লক্ষ্মীছেলে হাঁ কর, হাঁ কর।"

মহা বিপদ। ওর ঐ পরমায় যদি হাঁ ক'রে গিলতে হয় তবেই হয়েছে। বন্ধুরা আমার পরম শত্রু। বলে, "একবার প্রাক্টিস ক'রেই দেখ না, মাটি খেয়ে পেট ভরাতে শিখলে ভবিষ্যতে কোন দিন আর অন্নভাব হবে না। শুনেছি কোন্ সাধু নাকি সাড়ে তিন-শ বছর বেঁচে ছিলেন শুধু মাটি খেয়ে।"

আমি বলি, "তোমরা তাঁর চেয়েও দীর্ঘজীবী হবে তবে মাটি খেয়ে নয়, গাঁজা খেয়ে।"

আমাকে কাছে নিয়ে না গুলে ও কিছুতেই ঘুমবে না। কি দুপুরে কি রাত্রে আমাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে ও নিজে ঘুমিয়ে পড়ে।

বাড়ীর সবাই নিশ্চিন্ত মজা দেখে। লক্ষ্মীকে একটি মাছ-পুতুল ছুটিয়ে দিয়ে মাসে মাসে ওঁদের পুতুল-কেনার খরচ বেঁচে গেছে। তা ছাড়া ঝঞ্জাটও পোহাতে হয় না কিছু।

আমি মনে মনে বলি, "এ আর ক'দিন। আর দিন-পনের মধ্যেই ত আমার জ্বল খুলবে, তখন এর মজা প্রত্যেকেই টের পাবে।"

সত্যি, লক্ষ্মীর আদর-বদ্ব ক্রমশঃ এতই বেড়ে উঠতে লাগল যে আমি দিন গুনতে লাগলাম কবে আমাদের জ্বল খুলবে আর কবে পালাতে পারব। বাড়ীর আর সকলের

কি, তাঁরা সব পরম আরামে, সকৌতুকে চেয়ে দেখছেন, লক্ষ্মীর ছেলেকে নিয়ে লক্ষ্মীর গৃহীণনা। শুধু আমারই প্রাণ রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে।

বর্ষাকালে আমাকে ভান্ডায় থেকে পড়তে হ'ত। সদরদী থেকে ভান্ডা যেতে হ'লে বর্ষাকালে নৌকা ছাড়া কোন উপায় নেই। আমাদের গ্রাম থেকে ছাত্রদের নৌকা অবশ্য অনেকই যায়। কিন্তু সে-সব নৌকায় যেতে দিতে আমাদের বাড়ীর সবারই ভয়ানক আপত্তি। কখন ডুবুটুবে যাবে ঠিক কি! তাই আমি বর্ষার কয়েকটা মাস ভান্ডায় শ্রামাপদ বাবুর বাসায় থেকে জ্বলে যেতাম।

একদিন দুপুর বেলায় লক্ষ্মী তার ছেলেকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে নিজে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে, হঠাৎ লক্ষ্মীর ছেলের ঘুম ভেঙে গেল এবং বাড়ীর চাকরকে ডেকে বললে, "সতরঞ্চি, বিছানা আর বইয়ের বাক্সটা নৌকায় তোল, আমি জামাটা নিয়ে আসছি।"

আগে থেকেই সব প্রস্তুত ছিল। আর কার্তিক দেউড়ীকে দিয়ে একটা বড় রকমের মাটির পুতুলও গড়িয়ে রাখা হয়েছিল আমার বদলী-স্বরূপ।

কিন্তু একদিন ভান্ডায় হাট করতে এল। ওকে ব্রিজাসা করলাম, "লক্ষ্মী বুঝি খুব কঁদেছিল সেদিন, না? আজকাল ওকি খুব কান্দাকাটা করে আমার জগ্ন?" ও বললে, "সেদিন তোমরা হয়ত রাহাদের ঘাটও তখন ছাড়াও নি, ও পট ক'রে জেগে উঠল। একবার ডান পাশে হাত দিয়ে পরে বাঁ পাশে হাত বুলিয়ে গভীর বিশ্রামে বললে, "বাঃ রে ছেলেটা গেল কোথায়।" আমি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর ভাবভঙ্গী দেখছিলাম, হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললে, "দেখেছ রান্না কাকা, ছেলেটা কি ছষ্ট, আমি একটু ঘুমিয়েছি অমনি উঠে পালিয়েছে। দেখি কোথায় গেল। রোদ্ধুরে রোদ্ধুরে শুধু ঘুরে বেড়াবে। এত ছষ্ট ছেলে।" আমি কোন রকমে হাসি চেপে বললাম, "না রে, ছেলে তোমার খুবই শাস্ত। মোটেই রোদ্ধুরে ঘুরে বেড়ায় না। দেখ, গিয়ে দক্ষিণ ধরের বারান্দার এক কোণে চূপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে।" লক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ ছুটে গেল। আমরা একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলাম, হয়ত বা কাকিটা ধরা পড়ে যায়। আর কেউ

সেখানে যেতে সাহস পেল না, আমি চুপি চুপি গিয়ে দেখলাম, না, আমাদের আশঙ্কা অমূলক। পুতুলটার সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী বলছে, “ছুটু ছেলে, আমি একটু ঘুমিয়েছি অমনি উঠে পালিয়ে এসেছি!” মোটের উপর অধিকতর শাস্ত ও হুম্মর ছেলে পেয়ে লক্ষ্মী খুশী হয়েছে। ছেলের পিছনে ওকে আর ছোট্টাছুটি করতে হয় না। বারান্দার কোণটার বঁসে বঁসে সাধ মিটিয়ে ও ছেলের আদরযত্ন করতে পারে।”

আমি বললাম, “দ্বিতীয় একলব্যের কাহিনী শুন্নি ব’লে মনে হয়।”

কান্ড হেসে বললে, “আমাদের চাকলাদার ঠাকুরদাই বলেন ভাল, একটি পুতুলের পরিবর্তে লক্ষ্মী আর একটি পুতুল পেয়েছে। লক্ষ্মীর আপত্তি করবার তো কিছুই নেই, আর জান দাদা, লক্ষ্মী পুতুলটাকে শুধু ছেলেই বলে না, মাঝে মাঝে ডাকে পন্টু। দেখাদেখি বাড়ীর সকলেও পুতুলটাকে পন্টু ব’লে ডাকে।”

লক্ষ্মী তো শাস্ত আর হুম্মর ছেলে পেয়ে ভুলে গেছে। কিন্তু মনে করি নি আমাদের ভোলবার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। কেশব বাবুর হোম-টাস্ক তৈরি করতে করতে বাড়ীর আর সকলের কথা মনে পড়বার আগে এমন কি মা’র কথাও মনে পড়বার আগে মনে পড়ে যায় আমার ছোট্ট মা-লক্ষ্মীর কথা। ওকে কিছুতেই ভুলতে পারি নে। ওর সঙ্গে ‘ছেলে’ ‘ছেলে’ খেলতে ভয়ানক উৎপাত ও বিরক্তি বোধ করেছি, অতীতবাবুর কঠিন প্রশ্নের অঙ্কগুলি কষতে কষতে আজ আবার ওর সেই খেলাঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছা হয়।

এক শনিবার মনটা এতই বিস্তীর্ণ লাগতে লাগল যে বাড়ী না-গিয়ে থাকতে পারলাম না। কিন্তু গিয়ে দেখি বাড়ীতে না-আসাই ভাল ছিল। লক্ষ্মীর খেলাঘর থেকে আমি নির্বাসিত হয়েছি, ওর মন থেকেও। আসল পন্টুর স্থান নকল পন্টু এমন ভাবে অধিকার করেছে যে লক্ষ্মী আমাকে যেন চিনতেই পারলে না। ভয়ানক ঈর্ষা করতে লাগলাম পুতুলটাকে।

কয়েকটা বছর পবে। ভাঙ্গা স্কুলের বেড়া ডিঙিয়ে কলেজে প্রবেশ করেছি বহুদিন, আর কয়েকটা মাস কাটলেই বি-এ ডিগ্রীটা লাভ করে আপিসে আপিসে ঘুরে বেড়ান আরম্ভ করতে পারি। পূজার অবকাশে বাড়ী গেলাম ঠিক এই সময়টায়। কলেজের বন্ধুবান্ধব আর প্রোফেসাররা এতদিন লক্ষ্মীকে আড়াল করে ছিলেন। আজ হঠাৎ ওর দিকে চেয়ে দেখি ওর পুতুলের বাস্তু বহুদিন অন্তহিত হয়ে গেছে। তার স্থান অধিকার করেছে এম্পায়ার রীডার, কে. পি. বোসের এ্যালজেবরা, যাদববাবু এয়ারিথমেটিক, সাহিত্য-চরন, সংস্কৃত-সোপান, এমনি আরও কত কি। ওর কথা-বার্তায়, বেশেবাসে আধুনিকতা সুপরিষ্কৃত। লক্ষ্মীকে ডেকে বললাম, “মা, এক মাস জল নিয়ে আয় তো। খুব তেঁটা পেয়েছে অনেক ক্ষণ ধরে।”

লক্ষ্মী যেতে যেতে বললে, “বুড়ো মাহুকের মত কি সব সময় ‘মা’ ‘মা’ কর সোনা কাকা, আমার ভাল লাগে না। তোমার কথা শুনলে মনে হয় আ-মিও যেন মেজদির মত বুড়ী হয়ে গেছি। আমাকে লক্ষ্মী ব’লেই ডেকো। মা ত তোমার রয়েছেই, ওই বুড়ী মেজদি।”



ব্যায়ামচর্চার সীমানা

শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার

১

প্রত্যেক দেশের মানুষের সুস্থ ও সবল হবার অধিকার শুধু নয়, একান্ত প্রয়োজনও আছে। কারণ জনস্বাস্থ্য সমাজের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে-সমাজের মানুষ দেহের দিক দিয়ে বত হুর্কল, সে-সমাজে যে শুধু রোগ-জরা-মৃত্যুর বাড়াবাড়ি থাকে তা নয়, সমাজ-মনের লক্ষ্যও ছোট ও ক্লম হয়ে যায়। জীবনের ভিত্তি এই রকম খুণ-খরা হ'লে তার উৎকর্ষ যে কোন প্রকারেই হ'তে পারে না এ কথা স্বতঃসিদ্ধ। তাই শরীরপালন আদি সামাজিক ধর্ম বলে নির্ণীত হয়েছে।

এই সামাজিক ধর্ম পালন করার অনেক নিয়ম আছে, তার মধ্যে দৈনন্দিন স্বাস্থ্যরক্ষা করার নিয়ম ও আচারগুলি প্রধানতম। সেগুলি দেহের বল না বাড়ালেও স্বাস্থ্যলাভ সহজ ক'রে দেয়। ব্যায়ামচর্চা করাও এই নিয়মের অন্তর্গত, কিন্তু শারীর-স্বাস্থ্য পালনের মোটা নিয়মগুলির মত অবশ্যকরণীয় নয়।

উন্নততম দেশেরও প্রত্যেক মানুষ ব্যায়ামচর্চাশীল নয়, কখনও তা হ'তেও পারে না। আমাদের দেশের সকল মানুষই যে উত্তরকালে ব্যায়ামানুসৃত হয়ে উঠবে এ কথা মনে করা ভুল হবে, কারণ প্রত্যেক মানুষের আচার নিয়ন্ত্রিত করে তার মনের ভাব, সকল দেশে সকল সমাজেই তা হয়ে এসেছে। হাজার প্রয়োজন হ'লেও এই মানসিক নিয়মের ব্যতিক্রম সহজে ঘটতে পারে না। এই কথা যদি একান্ত সত্য হয় তাহলে বলা যেতে পারে যে কোন দেশেই স্বাস্থ্যচর্চা ব্যাপকভাবে হ'তে পারে না, অথচ ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলিতে স্বাস্থ্যচর্চা এমন কি বলচর্চা ব্যাপকভাবে আছে, তার একটা বিশিষ্ট কারণও আছে। যে-দেশে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতা আছে, সে-দেশের মানুষের সকল প্রয়োজনীয় বস্তুর দাম নির্ণয় করার ক্ষমতা আমাদের চেয়ে বিভিন্ন। আমরা দাম কবে নিতে প্রথমতঃ

সমর্থ নই, এবং যেখানে আমরা কোন বস্তুর দাম ঠিক ক'রে নিতে পারি সেটা গ্রহণ করবার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কারণে আমাদের নেই, কাজে কাজেই ইউরোপীয় জনগণের যে মানসিক ভাব সহজে গড়ে উঠতে পারে, আমাদের বেলায় তা হয় না। আমাদের জাতিগত স্বাস্থ্যহীনতার পারিপার্শ্বিক ও অন্তর্নান্দ্র অহবিধার মত এটি একটি প্রধানতম কারণ। স্বাস্থ্য ও দৈহিক বল এক বস্তু নয়। একটি সঞ্চিত হ'লে অন্যটিও যে সঞ্চিত হবে এ কথা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিরুদ্ধ। স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে আমাদের মানসিক ভাবের উপর নির্ভর করে। স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ে মানসিক ভাব মুখ্য, ও নিয়মপালন করা গৌণ কথা। ইউরোপীয় জাতিগুলির প্রভূত স্বাস্থ্যব কারণ তাদের স্বাস্থ্যের মর্যাদাবোধ ও তজ্জনিত মানসিক ভাব। এই স্বস্থ মনোভাব খেতজাতিগুলির জীবনের লক্ষ্যের সঙ্গে ওভপ্রোতভাবে মিশে আছে। সংস্কারের তালিকায় এইটাই প্রথম ও প্রধানতম কথা।

বলচর্চা করার নিয়মবদ্ধ ধারা ও সেই ধারাহুঁত্বগতিও সকল দেশে আছে, কারণ দেশরক্ষা ও দেশজয় করার জন্ত বলশালী, কর্ষষ্ঠ লোক দিয়ে সেনাবাহিনী গঠিত হয়ে থাকে। এই প্রধান কারণের জন্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রপতিরা O3 মানুষের বিরুদ্ধে বিরাট অভিযান ক'রে থাকেন। উপরিউক্ত কথাগুলি রাজনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক দেশ, উভয়ের পক্ষেই খাটে। মোট কথা, স্বাধীন দেশের লোকদের সঞ্চারক্ষেত্র বৃহৎ, কাজেই রাষ্ট্র বলশালী ও সুস্থ জনসমাজ গড়ে নিতে ব্যগ্র। বৃহত্তর লক্ষ্য ও বৃহত্তমের কল্যাণের জন্ত ব্যক্তিগত মতামত ও সকল দেশের লোক বলি দিয়ে থাকে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় ৫,০০০,০০০ লোক শারীরিক পটুতার সরকারী তকমা প'রে থাকে। নব্য জার্মানিতে

৭,০০০,০০০ নিপুণ ব্যায়ামী সরকারী তালিকাভুক্ত। নব্য ইতালী সংস্কার করবার সময়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার মত সারা দেশে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করেছিল।

স্বাস্থ্য শ্রমিক ধনীর বা কলকারখানার মালিকদের অন্ততম প্রধান বিত্ত। ফোর্ড-গ্রুমথ ধনীদেব প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকর ও চিন্তাবিনোদনকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে।

২

আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলা বর্তমান সময়ে সব চেয়ে বড় সামাজিক বা জাতীয় প্রয়োজন। যে-সব অন্তরায় বা যে-সকল অসুবিধা আছে এ স্থলে তার বিবৃতির কোন প্রয়োজন নেই, কারণ শিক্ষিত ব্যক্তি মাজেই সে-সব কথা জানেন।

আমাদের যুবক-সম্প্রদায়ের এক অংশের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করবার উপযুক্ত মানসিক ভাব গড়ে উঠেছে, এই ভাবটি নতুন। কিন্তু বৃহত্তর অংশটিতে এখনও পূর্বের উদাসীনতা আছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিরও আজকাল কিছু উদ্যোগ দেখা যায়। আলোচনের যতটুকু বেসরকারী তাতে কিছু উৎকর্ষের চিহ্ন আছে, যতটুকু সরকারী তাতে উৎকর্ষ নেই।

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির যে-সব সমালোচনা হয়ে থাকে তার মধ্যে এইটাই প্রধান যে আমাদের শিক্ষার ধারার সঙ্গে জীবনের যোগ নেই, ব্যায়ামশিক্ষার বিষয়েও ঠিক সেই কথাটাই বলা চলে। মানসিক শিক্ষা শারীর শিক্ষার চেয়ে বড় জিনিষ, সেটার থেকে আজকাল কোন মূল্য নেই, শারীর শিক্ষার মূল্য কি হতে পারে? এই কারণে দেশের চিন্তাশীল যুবকদের এতে মন নেই। আমাদের সমাজের কাছে স্বাস্থ্য দেহের কোন মূল্য নেই, রাষ্ট্র স্বাস্থ্যদেহ-সম্পন্ন যুবকদের লক্ষ্য করার কাজে লাগায় না। শ্রমিকেরা স্বাস্থ্য হ'লে কাজে পটুতা বাড়তে পারে বটে কিন্তু তাতে তাদের অর্থ বাড়বে না, কষ্টও ঘোচে না। কাজেই, স্বাস্থ্য-সম্পন্ন হ'লে আপাততঃ মাত্র দুটো সুবিধা হ'তে পারে; এক, জীবনযুদ্ধে যোগ দেবার জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী বল পুঞ্জি করা, এবং দ্বিতীয়, জাতির স্বাস্থ্যের মাপকাঠিটাকে আরও একটু ভঙ্গ করা। এ ছাড়া আর কিছু দেখা যায়

না। উৎকৃষ্ট শক্তি আমাদের কাজে লাগবার কথা নয়, কারণ আমাদের সঞ্চারক্ষেত্র অপরিমিত, এবং কোথাও কোথাও সেই শক্তি বিলুপ্ত হয়ে থাকে। একটা বস্তু থাকলেই তাকে ব্যবহার করতে হবে, দেশে লোকের স্বাস্থ্য গড়ে উঠলে জাতিকে সেটা কাজে লাগতে হবে তার পূর্ণতম বিকাশের জন্য, তা না হ'লে সেটার অপচয় হয়ে লোপ পাবার সম্ভাবনা থাকে। বাংলা দেশের ইতিহাস বাঙালীর স্বাস্থ্যের বলাতে এই সাক্ষ্যই দেয়।

জীবন চার দিক দিয়ে খর্ব হ'লে তার প্রথম প্রভাব পড়ে স্বাস্থ্যের ওপর। ধর্মের গোড়ামি, শিক্ষার গোড়ামি এবং ধারানিবদ্ধ (organised) আন্দোলন-প্রবোধ আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার মূলগত কারণ। পারিপার্শ্বিক হয়ত বদলানো যায়, বাহিরের নিবান্দ্য যা-কিছু মন দিলে তা নিবারণ করা যায়, কিন্তু অন্তরের দারিদ্র্য ও রোগ নিবারণ করা যায় না। সম্ভাব্যতার এই যুগে স্বপ্ন ও আনন্দ কোথাও স্বতন্ত্রকূর্ত নয়, আমাদের ত নয়ই। মন আমাদের একান্ত আবশ্যক যা তা আহরণ করাতেই ব্যাপৃত ও লাস্ত, অবাস্তব যা, তা সংগ্রহ করবার প্রেরণা আসবে কোথা থেকে?

৩

নিজের দেহ গড়া অভ্যস্ত সোচ্চা, অপরের দেহ গড়াও অপেক্ষাকৃত সহজ যদি গোটা কয়েক বস্তুর সমন্বয় ক'রে নেবার ক্ষমতা থাকে। আশাবাদী মানুষের স্বাস্থ্য ও বল সহজেই গড়ে ওঠে, নিরাশাবাদীদের হাজার চেষ্টাতেও হয় না। মনের গড়ন দেহের গড়নের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। কিন্তু দেহগঠন করাই কি সামাজিক মানবের জীবনের শ্রেষ্ঠতম কথা? দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা শুধু এই কথাটাই জানেন যে যে-কোন উপায়েই হোক জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলা দরকার, কিন্তু স্বাস্থ্যের এই লক্ষ্যের সীমানা কোথায়, তার দোষই বা কি এ কথা তাঁদের জানা নেই। আমি সেইগুলি নির্ণয় করব। আমার বিশ্বাস এই সীমানা নির্দেশ করার প্রয়োজন আছে; কারণ বাংলা দেশের ব্যায়ামালোচনের এখনও শৈশব অভিক্রান্ত হয় নি, বিবেচক ব্যক্তির সাবধান হ'তে পারবেন।

ইউরোপের ধারা ব্যাপক ব্যায়ামচর্চার বিরুদ্ধতা করেন

তাঁদের মত এই যে জনকয়েক গরজী ধনী ও রাষ্ট্রপতির।
 নিজেদের বা একটা ক্ষুদ্র সমষ্টির সুবিধার জন্য মানুষকে
 তৈরি করেন কামানের খোরাক ক'রে, দেশের প্রতি বিশেষ
 কোন মমতার কারণে নয়।

গ্রীক-যুগে ব্যায়ামচর্চার যে দোষ পরিলক্ষিত হয়েছিল
 সেটা যৌন। দোষ হ'লেও তাতে জাতিগত কোন ক্ষতি
 হয় নি কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষতি হ'ত প্রচুর।

যুধবদ্ধ সবল মানুষের শক্তি অস্বাভাবিক শক্তির সঙ্গে মিলিত
 হয়ে প্রসারলাভ করতে যায়। মুসোলিনীর ব্যায়ামসংস্কারের
 সহিত আবিসলীনিয়া গ্রাস করার যোগ আছে।

আমাদের দেশে অনেক স্থানে ব্যায়ামচর্চার ও খেলা-
 হুলার সরকারী ব্যবস্থা আছে। ব্যবস্থা প্রয়োজনানুসারে
 কি না, এ ক্ষেত্রে সে-আলোচনা অবাস্তব। এক দিকে সংঘবদ্ধ
 খেলার অনেক সামাজিক গুণ আছে, অন্য দিকে ক্রীড়াপরায়ণ
 মন জীবনের গভীর সমস্তাগুলি অগ্রাহ্য না করলেও, উপলব্ধি
 করতে শেখে না। ক্রীড়াপরায়ণ মানুষ বিশেষ ক'রে
 রাজনীতি প্রভৃতি গভীর বিষয়ের সঙ্গে নিজের যোগস্থাপন
 করতে সমর্থ হয় না। আধুনিক জগতে জনসাধারণকে
 রাজনীতি থেকে দূরে রাখবার জন্য খেলা ব্যাপকভাবে
 ছড়ানো হচ্ছে। (কেপ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্জ
 বার্নার্ড শ'র অভিতার্যণ দ্রষ্টব্য)। যেখানে শুধু ব্যায়াম ও
 খেলা আছে, গভীর কোন বিষয়ের, অর্থাৎ রাজনীতি,
 সমাজনীতি, সাহিত্য, চারুকলা প্রভৃতির অংশলীন নেই,
 সেখানে মানুষ জীবন থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে এবং লঘুচিত্ত
 হয়ে যায়।

ব্যায়াম যেখানে পেশা ব'লে গ্রাহ্য, সেখানেও আত্মবিকিক
 বৈজ্ঞানিক বা গভীর বিষয়ের চর্চার সুযোগ আছে। অন্তর্থা
 কেবলমাত্র শারীরিক বল সংগ্রহ করা মানুষকে এক বলবান
 পশুর পর্যায়ভুক্ত করে এবং সমাজে অপায়ত্ত্বের ক'রে
 রাখে।

বাংলা দেশের চিন্তাশীল যুবক-সম্প্রদায় এই সকল কারণের
 জন্য ব্যায়ামান্দোলন থেকে দূরে থাকেন। রাজবন্দীদের বিষয়ে
 কর্ণেল বার্কলে হিল যে বিশ্লেষণ করেছিলেন, তাতে খেলা বা
 ব্যায়ামের দ্বারা চিন্তাবিনোদন করেন এমন বন্দীর সংখ্যা নাম-
 মাত্র ছিল। সংবাদপত্রে এ কথাও আমরা পড়েছি যে, যেখানে

ব্যায়ামচর্চার সঙ্গে গভীর কোন বিষয়ের যোগস্থাপন কববার
 চেষ্টা হয়েছে, সেখানেই রাজনীতির চর্চা এসে পড়েছে।

বৈজ্ঞানিক নিরিখে বাংলা দেশের ব্যায়ামচর্চা দোষমুক্ত
 নয়, এ কথা সাধারণভাবে বলা যায়; দোষের যথেষ্ট বাহুল্য
 আছে। কিন্তু সে কথা বলা বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়।
 যুবক-মনের নানা প্রেরণা সকল দেশে আছে, বাড়ালী
 হুবকেরও তা আছে। কিন্তু বিকাশের পথ আমাদের স্থলভ
 বা স্থগম নয়। আমাদের ব্যায়ামচর্চা সাইকো-অ্যানালিসিসের
 ভাষায় একটা escape বা নিঃসরণপথ ছাড়া আর কিছু নয়।
 সাধারণ মননশক্তিবাহীন মানুষের অন্তরের প্রেরণার বিকাশ
 লাভের এটি সহজতম উপায়। এই কারণে অল্প কিছু করতে
 পেলে, অথবা অল্পচিন্তা উপস্থিত হ'লে ব্যায়ামের অভ্যাস
 ররে পড়া নিত্যকার ঘটনা।

কলিকাতায় ব্যায়ামশিক্ষা দিয়ে অল্প কিছু উপার্জন
 করার সুযোগ আছে; ব্যায়ামচর্চার এটিও একটি কারণ।
 বস্তুতপক্ষে এই উপার্জনের মূল্য অত্যন্ত কম। এতে
 পরগাছাবৃত্তি বাড়ে।

যতগুলি ব্যায়াম-প্রতিষ্ঠান আমি দেখেছি, তাতে
 জীবনের বৃহত্তর সমস্তাগুলির সঙ্গে অথবা জাতীয় সংস্কৃতির
 সঙ্গে যোগস্থাপন করবার প্রয়াস দেখা যায় না। কোথাও
 কোথাও ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম দেখা যায় মাত্র, এবং এই সকল
 ব্যক্তির সংখ্যাও বাস্তবিকই অত্যন্ত অল্প। কাজেই এই ভিত্তিহীন
 ও জীবনরসবিক্ত আন্দোলনকে স্থায়ী করা অত্যন্ত কঠিন কথা।
 বিদেশে অবস্থা অল্পস্থল; দেশের আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষার
 জন্য পুলিশবাহিনী ও সেনাবাহিনীর স্থায়ীত্বের সঙ্গে এই
 আন্দোলনের যোগ আছে, স্থল কর্মঠ ব্যক্তিদিগকে এই
 বাহিনীভুক্ত করার প্রয়োজনও চিরদিন আছে; আমাদের
 অহরূপ কোন সুযোগ নেই, আন্দোলনটিকে বাঁচিয়ে রাখার
 উদ্বেজনাও চিরদিন থাকবার কথা নয়।

অন্য দেশের অভিজ্ঞতায় যে দোষগুলি পরিশুদ্ধ হয়ে
 উঠেছে, আমাদের নব-আন্দোলনটিকে দোষমুক্ত করবার জন্য
 সেইগুলির আলোচনা করবার প্রয়োজন আছে। আমাদের
 বেলায় আন্দোলনটি রাষ্ট্রীয় কোন আকার নেবে না, এটি
 নিছক সামাজিক আন্দোলন হয়ে দাঁড়াবে বা হওয়া উচিত।
 এই দিক দিয়ে স্থায়ের অথবা দৈহিক বলের মূল্য কোন দিনই

কম হবে না। শুধু আন্দোলনের নেতাদের এইটুকু করা দরকার, যাতে ব্যায়ামের গুণগুলি ক্ষুণ্ণিলাভ করে। মানসিক ও দৈহিক উৎকর্ষের সমতা রক্ষিত হ'লেই আমাদের লক্ষ্য সাধিত হবে।

যে খেলা সাময়িক, সেটা চরিত্রের উপর দাগ দেয় না; যা সাধনাসাপেক্ষ, চরিত্রের সঙ্গে তার যোগ গভীর। সার্কাসী ব্যায়াম সাধনাসাপেক্ষ বটে, কিন্তু লঘুতা-দোষে ছুটে; এই ধরণের সাধনা মানুষকে লঘুচিত্ত করে। বাংলা দেশের ব্যায়ামে এই বিপদটাই সব চেয়ে বেশী।

খেলা ও ব্যায়ামের নামে বাঙালী মেয়েদের সর্বনাশের নৃচনা হয়েছে। মেয়েদের শারীর শিক্ষা দিতে হ'লে অভ্যস্ত গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। ইউরোপীয় মেয়েদের খেলাধুলায় যোগ দেবার কারণে আমাদের দেশেও এই ধুয়া উঠেছে। আমরা ইউরোপীয় মেয়েদের জীবনের আমূল পরিবর্তনের কথা না ধরে উল্টো পথে তাদের চলাটা সজ্ঞ ও কল্যাণকর ব'লে মেনে নিয়েছি। এ-বিষয়ে খুব সাবধান হবার প্রয়োজন আছে।

বিধবা

শ্রীজগদীশচন্দ্র বোষ

আজ নন্দরাণীর বিবাহ। শেষরাত্রে বিবাহের লগ্ন। নন্দরাণী সন্ধ্যাবেলায় মাকে বলিল, “মা, আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি তবে ডেকে দিও, আমি কিন্তু বিয়ে দেখব।”

মা হাসিয়া বলিলেন, “যর পোড়াকপালী, তোর বিয়ে, তুই দেখবি না?”

এক জন প্রতিবেশিনী বলিয়া উঠিল, “আজকের দিনে পোড়াকপালী বলতে নেই নন্দর মা।”

নন্দর মা রাগ করিয়া বলিল, “তোমার সব তাতেই খুঁত ধরা চাই বাছা।”

বলা বাহুল্য, নন্দরাণীর বয়স সবে সাত বৎসর। পয়ত্রিশ বৎসর বয়সের চিরকুণ শ্রীনাথ বিদ্যাস তাহাকে দুই শত টাকায় কিনিয়া লইতেছে। নির্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গেল—নন্দরাণীও যথারীতি গেল তাহার স্বামীর ঘর করিতে।

দশ বৎসর পরের কথা। নন্দর ভাই চৈতন্ত রামাঘরে বসিয়া চাট্টি ভাতে ভাত সিদ্ধ করিয়া লইতেছিল। এমন সময় তাহার এক দেবকে সঙ্গে করিয়া ভরা ঘোবনের পরিপূর্ণ রূপ লইয়া বিধবা নন্দ আসিয়া দাঁড়াইল তাহার উঠানে।

নন্দ চৈতন্তের পায়ের ধূলা লইতেই চৈতন্ত একেবারে

দুই চোখের জল ছাড়িয়া দিয়া কাদিয়া বলিল, “শেষকালে তোর কপালে এই হ'ল নন্দ?”

নন্দ কিন্তু বড়-একটা বিচলিত হইল না। দাদাকে ঠাণ্ডা করিয়া বলিল, “এ নিয়ে কাদাকাট ক'রে লাভ কি দাদা, বিষাতার ওপরে ত কার হাত নেই! তবে এইটুকুই আমার ভাগ্য যে, বিয়ের পরে সেই ভাঙা শরীর নিয়েও তিনি দশটা বছর কাটিয়ে গেলেন।”

চৈতন্ত চোখ মুছিয়া বলিল, “লাভ কিছু নেই বোন, ভা জানি, কিন্তু তোর এই মৃতি আমি দেখব কেমন ক'রে?”

—কিন্তু দাদা, ও কষ্টটা তোমাকে করতেই হবে—আমি আর স্বস্তরবাড়ী কিরে যাব না—সেখানকার সকল সম্পর্ক একেবারে চুকিয়ে এসেছি।”

—তা বোন বেশ করেছিস। থাক—আমার এখানেই থাক।

—কিন্তু বউ কোথায় দাদা?

—তারা ত এখানে নেই রে—সব বাপের বাড়ী গিয়েছে।

—ওঃ এই মাসেই বুঝি ছেলেপিলে হবে?

—হ্যাঁ।

নন্দ চৈতন্তের সংসারে ব্রহ্মিণী গেল। চৈতন্তের বউ

তিন বছরের ছেলে পৌরকে লইয়া বাপের-বাড়ী গিয়াছে—
তাই বাড়ীটাও করিতেছিল খাঁ খাঁ। নন্দ আসিয়া পড়ায়
চৈতন্য ঘেন কতকটা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

২

চৈতন্য বরাবরই নন্দকে বড় ভালবাসিত। এতটুকু বয়সে
নন্দর যে সংসারের সকল সাধ-আহ্লাদ শেষ হইয়া গেল, ইহা
তাহার মনে বড় বিধিত। তাই বাহাতে নন্দ একটু স্বখে
থাকে, মনে কখনও কোন কষ্ট না পায়—সে চেষ্টা সে করিত।

সেদিন খাইতে বসিয়া চৈতন্য বাটির মাছগুলি কেবল
নাড়াচাড়া করিয়া রাখিয়া উঠিয়া বলিল, “আজ তুই আমার
পাতে খাবি নন্দ।”

নন্দ অবাক হইয়া বলিল, “সে কেমন ক’রে হবে দাদা?
মাছের পাতে খাব কেমন ক’রে?”

—যেমন ক’রে খায়।

—না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি—সে হবে না। মাছবে
স্তনলে কি বলবে?

—মাছবে কি বলবে? এই ত? তা বললেই বা।
অন্যায় ত কিছু কচ্ছিস নে যে মাছবের কথায় ভয়।

—অন্যায় নয় তাই বা কে বলতে পারে? শাস্ত্রের
নিষেধ। দোষ না থাকলে কি শাস্ত্রে নিষেধ করে, আর
তাই দেশের লোক মানে? বামুন-কায়েতের বিধবাদের
মেথ ত?

—তুই খাম নন্দ, তর্ক করিস নে। আমি তোর
শাস্ত্রের কথা জানি নে, কিন্তু আমার চোখের ওপরে তুই
ছুটো আতপ চাল আর ঘাস সেদ্ধ ক’রে খাবি, আব আমি
খাব দুখে মাছে—সে কখনও হবে না নন্দ, সে আমি সহিতে
পারব না। শাস্ত্র নিষেধ করতে পারে, কিন্তু আমার মত
ভাইয়ের কাছে শাস্ত্র কি জবাব দেবে? কচি বিধবা বোনকে
আতপ চাল খাইয়ে রেখে যে ভাই নিজে রুই মাছের মুড়ো
নিয়ে খেতে বসতে পারে, সে ছনিম্বার সব পারে রে—তার
মত পাষাণ নেই।

বলিতে বলিতে চৈতন্য কাঁদিয়া ফেলিল। নন্দ তবুও
ধরা গলায় বলিল, “কিন্তু দাদা—”

—না আর কিন্তু নয়—তুই খেতে ব’স নন্দ, আমি
দেখি।

দাদার প্রসাদ নন্দ দেবতার প্রসাদের মত খাইল।
তাহার দেবতার মত দাদা—এমন দাদা কম জনের হয়।
চৈতন্যের জীব নাম নৃত্যকালী। চৈতন্যের স্বভাবটা যেমন
নরম, নৃত্যকালীর মেজাজটা তেমনি একটু চড়া। তার
উপরে নৃত্যকালীর বাবা শ-তিনেক টাকা দিয়া বছর-পাঁচেক
আগে চৈতন্যকে একটা দোকান করিয়া দিয়াছেন, তাহাই
খাটাইয়া চৈতন্য তাহার অবস্থাটা একরূপ ভালই করিয়া
লইয়াছে। নৃত্যকালীর সেইটুকুই গর্ব। তাহার বাপ যদি
টাকা না দিত তাহা হইলে চৈতন্যকে যে আজ জীপুজের হাত
ধরিয়া পথে দাঁড়াইতে হইত—সেটা একেবারে নিশ্চিত।
নৃত্যকালী ফাঁক পাইলে সময়ে-অসময়ে একথাটি স্তনাইয়া
দিতে কখনও ভোলে না। কিন্তু চৈতন্যের সহজে কখনও
ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না, সে সহজ ভাবে ব্যাপারটা স্বীকার করিয়া
লয়—ইহাই তাহার স্বভাব।

৩

তিন মাস পরে নৃত্যকালী কোলের মেয়ে ও গৌরকে
লইয়া কিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার ঘরদোরে নন্দরাণী দিবিয়া
সংসার পাতিয়া বসিয়া আছে। এখানে সে যেন বরাবরই
আছে, এমনই ভাব। নৃত্যকালী সেজন্ত মনে কিছু করিল—
না—ভাবিল নন্দ দু-দিনের জন্ত আসিয়াছে আবার দু-দিন
বাসেই চলিয়া যাইবে। বরং তাহার অল্পপস্থিতিতে সে থাকায়
চৈতন্যের যে সুবিধা হইয়াছে তাই ভাবিয়া কতকটা সন্তুষ্টই
হইল।

এদিকে মাস দুই পরেও যখন নন্দ বাইবার নাম করিল
না, তখন নৃত্যকালী একদিন নন্দকে বলিল, “তোমার স্বস্তর-
বাড়ীর লোকগুলার আঙেল কেমন গা ঠাফুরবি। আজ
পাঁচ-ছয় মাস তুমি এসেছ—লোকটা ম’লো কি রইল একটা
খোজ পর্যন্ত নিলে না? নিজেদের বৌ পরের বাড়ীতে
এমনি ক’রে ফেলে রাখতে তাদের লজ্জা হয় না?”

নন্দ জবাব করিল, “তুমি হয়ত জান না বউ—খোজ
তারা আর করবে না ব’লেই তো এখানে পাঠিয়েছে। আর
আমিও কিরে ঘাব না বলেই তো এসেছি। কিন্তু তুমি পরের
বাড়ী বলছ কি বউ? আপনার ভাইয়ের বাড়ী কি পরের
বাড়ী হ’ল?”

—না পর সত্যি নয়—তবে খণ্ডরবাড়ীর কাছে পর বইকি? সে যাই হোক—তুমি আমার অবাক করলে ঠাকুরঝি—আর খণ্ডরবাড়ী ফিরে যাবে না। লোকে বলে—খণ্ডরের ভিটে মহা তেথ।

—আমার তেখে কাজ নেই বউ। যেখানে আপনার জন নেই—একটু স্থখ-দুঃখ বোঝে এমন কেউ নেই—সেখানে যাব কোন স্থখে? তারা আমার ফেলতে পারে কিন্তু দাদা তো আর আমার ফেলতে পারবে না।”

নৃত্যকালী আর কিছুই বলিল না—মুখ গভীর করিয়া বসিয়া রহিল। নন্দ আর ফিরিয়া যাইবে না;—বলে কি? সেই তো একটুখানি দোকান, তাহার উপরেই সংসারের সব-কিছু নির্ভর। এই স্থল আয়ের উপরে নির্ভর করিয়া আবার একটা আপদ চিরকাল এই সংসারে ঢুকাইয়া রাখিতে চৈতন্ত সাহস করে কেমন করিয়া?

ভাবিতে ভাবিতে চৈতন্তের উপরে তাহার অপরিণীত রাগ হঠতে লাগিল। ঠিক করিল আজ বাড়ী আসিলে একজন্ত ভাল করিয়া শুনাইয়া দিবে।

নন্দ তবু রহিয়াই গেল। নৃত্যকালীর আর আজকাল সঙ্কোচ নাই—প্রায়ই সংসারের কাজকর্ম লইয়া থিটিমিটি করে—মুখের উপরে দুই-এক কথা শুনাইয়া দিতেও ছাড়ে না। নৃত্যকালী ভাবে, চিরটা কাল তাহার খাইয়া পরিয়া মাস্থ্য হইবে—কাজকর্মে ভুলচুক হইলে একটু-আধটু কথাও সহ্য করিবে না—এই বা কেমন! কিন্তু নন্দ সে-সব মুখ বুজিয়া অনায়াসেই সহ্য করে—এ-সব তাহার পাওনা বলিয়াই গ্রহণ করিয়া লয়। মাঝে মাঝে যদি নিতান্ত অসহ্য হয়, তবে দুই-এক বিন্দু চোখের জল হয়ত কেলে—তাও আড়ালে লুকাইয়া।

সারাটা দিনের মাঝে নন্দ পথ চাহিয়া থাকে কখন চৈতন্ত দোকান হইতে বাড়ী আসিবে। সেই সময়টা সে অন্ততঃ কিছু স্থখে থাকে। তাহার দাদার কথা শুনিলে, মুখ পানে চাহিলে—সে সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যায়।

নন্দ কাছে না বলিলে আজকাল চৈতন্তের ভাল করিয়া খাওয়া হয় না—তাহার সহিত অবসর সময়ে একটু কথাবার্তা না বলিলে মনটা ভাল থাকে না। একজন্তও আবার নৃত্যকালীর নিকটে নন্দের কথা শুনিতে হয়।

নন্দের আজকাল আর একটা কাজ বাড়িয়াছে। গৌরটা তাহার বড় বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। নন্দকে সে বলে ছোটমা। এই ছোটমায়ের সজ পাঁইলে সে মায়ের কাছ দিয়াও ঘেঁষিতে চাহে না। তাহার খাওয়ান, ঘুম পাড়ান সকল কাজ নন্দকেই করিতে হয়। প্রথম প্রথম নৃত্যকালী গৌরকে আপনার কাছে টানিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু গৌরের সহিত সে পানিয়া উঠে নাই—তাহার ছোটম না হইলে এক দণ্ডও চলিবার উপায় নাই। দেখিয়া শুনিয়া নৃত্যকালী হাল ছাড়িয়া দিয়াছে।

চৈতন্ত বলে, “নন্দ, গৌরকে তো-কেই দিলাম রে।”

—ইস্ আমার ভারী নয়! তেমার ছেলে কি আমার রোজগার ক’রে খাওয়াবে?

নিকটে দণ্ডায়মান গৌরকে চৈতন্ত হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করে, “হাঁয়ে গৌর, তোর ছোটমকে বোজগার ক’রে খাওয়াবি তো?”

গৌর তাহার ছোটমাকে জড়াটাই ধরিয়া বলে, “আমি তোমাল বোজগার ক’রে খাওয়াব ছোটমা।”

নন্দ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চুমুতে চুমুতে সারা মুখ ভরিয়া দেয়।

নন্দই বরাবর রান্না কবে। কোব কোন দিন নৃত্যকালী আসিয়া স্বামীর পরিবেশন করিয়া যায়। সেদিন রাঙে নৃত্যকালী পরিবেশন করিতেছিল। খাওয়া শেষে চৈতন্ত নন্দকে ডাকিয়া বলিল, “মাছের মাথাটা রইল নন্দ—দেখিস, বেড়ালে থাকে—তুই খাস।”

নন্দ বাধা দিয়া বলিল, “না-না উঠো না দাদা, এত বড় ঝই মাছের মাথাটা একটুও খেলে না দুমি? আমি ও ছাই মুখে ভুলবো না তা বলে দিচ্ছি।”

চৈতন্ত কথা বলিল না—উঠিয়াই গেল। নৃত্যকালী ব্যাপার দেখিয়া রাগে গুম্ব হইয়া ছিল। মুখে একটিও কথা না বলিয়া ঘরে যে মাছগুলি ছিল প্রায় সবগুলিই চৈতন্তের উজ্জিষ্ট পাতে ঢালিয়া দিয়া বলিল, “নাও ভাবছ কি ঠাকুরঝি, খেতে বসো—ও মাথাটুকু অ’র খেতে পারবে না।”

কিন্তু একটু পরেই বড় ঘর হইতে টেচাইয়া বলিতে লাগিল, “এমন তো দেখি নি বাপু কোন কালে! লজ্জাও কি নেই? এদিকে তো বিধবা মাস্থ্য, কিন্তু

মাছ খাওয়ার বেলায় তিন হাত জিব। ছোটলোক আর বলে কাকে !”

কথাগুলি আশ্রয়িত হইলেও বাড়ীর সকলেই শুনিতে পাইল। নন্দ পাতে বসিয়া ভাত লইয়া নাড়াচাড়া করিল— দুই চোখের জলে দৃষ্টি অন্ধকার হইয়া আসিল—একটা ভাতও মুখে গেল না। রাগে অত্যন্ত নন্দ গোরকে কোলে লইয়া সারারাত কাঁদিয়া কাটাইল। এ-বাড়ীতে আসার পর অনেক অগ্রিয় কথা সে শুনিয়াছে—সহণ করিয়াছে—কিন্তু এত বড় মর্মান্তিক তাহার একটিও হয় নাই। হয় রে সংসার! এখানে এমন একটু ঠাঁইও কি তাহার নাই, যেখানে একটু স্থখে স্বচ্ছন্দে সে তাহার জীবনটা কাটাইয়া দিতে পাবে!

ব্যাপার আর বেশী দূর গড়াইল না বটে, কিন্তু পরের দিন হইতেই নন্দ মাছ ছাড়িয়া দিল। চৈতন্য এবার এতদূর গীড়াগীড়ি তো দূরের কথা—এ সম্বন্ধে আর একটি কথাও বলিল না।

চৈতন্যের বাপ-পিতামহ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের গুরুবংশও পরম বৈষ্ণব। চৈতন্য নিজেও প্রত্যহ পূজা-আহিক না করিয়া আহার করিত না। দিন-পনের পরে চৈতন্য এক দিন খবর দিয়া তাহার গুরুদেবকে আনিয়া হাজির করাইল। এবার সে দীক্ষা লইবে। যথাবীতি দীক্ষা হইয়া গেল। গুরুদেব বিদায় লইয়া গেলেন। এদিকে চৈতন্য কিন্তু দীক্ষার দিন হইতেই মাছ খাওয়া ছাড়িয়া দিল। ব্যাপারটিকে ছল করিয়াই চৈতন্য ঢাকিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে ইহার মূল সেই দিনের ঘটনা—যাহার ফলে নন্দ মাছ ছাড়িয়াছে।

নৃত্যকালী সাধ্যমত চেষ্টামেচি করিতে লাগিল কিন্তু চৈতন্য কিছুতেই টলিল না।

নন্দর কাজ আবার বাড়িল—নিজের জন্ত যা হোক চাট্টি সিদ্ধ করিয়া লইলেই হইত, কিন্তু চৈতন্য আসিয়া তাহার হৈসেলে ভর্তি হইল—কাজেই অন্ততঃ একটা ভাল তরকারি রোজ তাহাকে করিতেই হইত।

কিন্তু ইহার ফল এই হইল যে, ইহাব জন্ত নৃত্যকালীর নিকটে তাহাব গমন। বাড়িয়াই গেল। নৃত্যকালী এবার ঠিক বুঝিয়া লইয়াছিল যে, নন্দ যদি আরও কিছুদিন এ-সংসারে থাকে তবে স্বামী তাহার একেবারে আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া

যাইবে। হুতরাং বিষবৃক্ষ আর বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়।

৪

তিন বৎসর পরে নৃত্যকালীর আবার সম্ভান হইবে—তাই মাস-দিনেক পূর্ব হইতেই সে বাপের বাড়ী যাই-যাই করিতেছিল। কাজেই তাহার সম্ভান আগাততঃ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইল। স্থির করিল বাপের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া নন্দকে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এদিকে হঠাৎ একদিন নন্দর ভাস্কর আসিয়া হাজির। নন্দকে তিনি লইয়া যাইবার জন্ত আসিয়াছেন।

কিছু দিন হইতে তাঁহার স্ত্রী নানা অসুখ-বিষয়ে একেবারে অচল হইয়া আছেন—সংসারেও আর লোক নাই; এদিকে তিন চারটি ছেলে মেয়ে—তাঁহাদের তদারক করে এমন মানুষ নাই, কাজেই নন্দকে অন্ততঃ দু-চার মাসের জন্ত একবার যাইতেই হইবে।

নন্দ জানিত বড়-জোর দু-চার মাসের বেশী সে সেখানে কিছুতেই থাকিতে পারিবে না এটা ঠিক। কারণ তাহার প্রয়োজন যখনই শেষ হইবে, তখনই কোন-না-কোন অছিলা করিয়া তাহারা তাহাকে তাড়াইবে। আর না-হয় বাঁটা-লাখি খাইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে।

তবু নন্দ ভাবিতেছিল—কি করিবে। চৈতন্য বলিল, “তাই তো, কি করবি নন্দ? লোকটা তো বড় বিপদেই পড়েছে। আমি বলি একটবার যা—আমি না-হয় মাস দুই পবে গিয়ে আবার নিয়ে আসব।”

নন্দ বলিল, “আমিও ঠিক তাই ভাবছি দাদা—সেই ভাল।”

কিন্তু নৃত্যকালী কপালে চোখ তুলিয়া চোঁচাইতে শুরু করিয়া দিল, “কি, এখন যাবে খস্তুবাবাড়ী! এত দিন বঁসে বঁসে আমার পিণ্ডি গিললেন, আর এখন আমার অসময়ে যাবেন খস্তুবাবাড়ী! আমার গায়ে কি এক রস্তু বল আছে, না আমি কোন কাজ করতে পারি? তা দেখবে কে, আর বুঝবেই বা কে?”

বাস্তবিকই নৃত্যকালীর শরীর ইদানীং অনেকটা কাহিল হইয়াছিল—তাহার উপরে সাত-আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

চৈতন্য চিন্তিত মুখে নন্দকে বলিল, “বউয়ের কথা শুনেছিস তো নন্দ, এখন কি করবি বল তো?”

নন্দ বলিল, “কথাটাও তো বড় মিথ্যে নয় দাদা—তা হ'লে নাই বা গেলাম।”

—কিন্তু তা হ'লে তোর ভাস্কর যে বড় চটে যাবে বে।

—তা যাক্। সেখানে যে আমি তাদের প্রয়োজনের বেশী এক দিনও থাকতে পারব তা মনে ক'রো না। কথায় বলে ‘কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী’।—এও ঠিক তাই। তাদের রাগে আমার কি আসে যায়?

নন্দর ভাস্কর বাইবার সময় শাসাইয়া গেল—এ-জীবনের মত আর কোন দিন সে স্বস্তরবাড়ীর দরজায় পা দিতে পারিবে না—এই শেষ।

নৃত্যকালী বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু গৌর কিছুতেই তাহার ছোটমাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না, কাজেই বাধ্য হইয়া তাহাকে রাখিয়াই যাইতে হইল।

নৃত্যকালীর ছেলে গৌর, সে যে কেমন করিয়া নন্দর এমন বাধ্য হইয়া গেল তাহা ভাবিয়া নন্দ একেবারে অবাক হইয়া যাইত। কিন্তু নিজের স্বস্তরের নিকে দৃষ্টি ফিরাইবার যদি তাহার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, দোষ শুধু একা গৌরের নয়—তাহার নিজের স্বস্তর অলক্ষিতে গৌরের জন্ত যে কতখানি স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে তাহা একবারও সে ভাবিয়া দেখে নাই। একমাত্র গৌরই বুঝি তাহার এ-জীবনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। গৌরকে যখন সে বুকে চাপিয়া ধরে, তখন সে তাহার ব্যর্থ জীবনের কথা, সংসারের সমস্ত অশান্তির কথা, এক নিমেষে ভুলিয়া যায়। সমস্ত ছাপাইয়া জাগিয়া উঠে যে নাতৃস্ব তাহা স্বার্থলেশহীন, নিষ্কলুষ।

আবার কয় মাস পরে নৃত্যকালী নূতন ছেলে কোলে লইয়া কিরিয়া আসিল। এবার সঙ্গে আসিয়াছে তাহার পিতা ও বিধবা এক ভগ্নী।

পনর-বিশ দিন চলিয়া গেল—আবার সংসারে সেই কলহ—সেই রেবারেঘি আরম্ভ হইল। নৃত্যকালী এবার ঠিক করিয়া আসিয়াছিল—বাপকে দিয়া কাজ সারিতে হইবে।

সেদিন চৈতন্যের স্বস্তর দোকানের হিসাবপত্র দেখিয়া

গম্ভীর মুখে সকলকে শুনাইয়া বলিলেন, “ব্যাপার তো বড় সুবিধের নয় বাবাজী, দোকানের বা অবস্থা দেখছি তাতে তোমার সংসার যে কি ক'রে চলবে তাই ভাবছি। আর তার উপরে যদি এমনি বাড়তি লোক এনে সংসারে ঢুকাও, সেটা তো বড় ভাল কথা নয়।”

চৈতন্য স্বস্তরের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল—তাহার মেজাজটাও সেদিন বড় ভাল ছিল না—তাই স্বস্তরের উপদেশ সে নির্বিবাদে গ্রহণ না করিয়া কয়টি কড়া কথা তাঁহাকে শুনাইয়া দিল।

স্বস্তর-মহাশয় অপমানিত হইয়া, তাঁহার বিধবা মেয়ের হাত ধরিয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু অধিক দূর না গিয়া চৈতন্যেরই অন্ত সন্নিক্ত তাহার খুড়তুতো ভাইয়ের বাড়ীতে উঠিলেন। তাহার পরে আরম্ভ হইল নৃত্যকালীর গালাগালি। এবার নন্দের এত দিনের অভ্যস্ত সংযমের বাঁধও ইহার নিকটে হার মানিল।

নৃত্যকালী বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—সে বাপের সঙ্গে আবার চলিয়া যাইবে—চৈতন্য কেমন করিয়া সংসার করে সে দেখিতেও আসিবে না।

চৈতন্য বেচারী এই গুণ্ডগোলের ভিতরে পড়িয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া গেল।

নন্দ আসিয়া বলিল, “আমাকে দিনকয়েকের জন্ত স্বস্তর-বাড়ী রেখে এস না দাদা।”

চৈতন্য বুঝিতে পারিল—ইহা নন্দের কম ছুৎখের কথা নয়। কারণ তাহার ভাস্কর যে ভয় দেখাইয়া গিয়াছে তাহাও ইহারই মধ্যে ভুলিবার কথা নয়।

প্রত্যুত্তরে চৈতন্য একটু মান হানি হাসিয়া বলিল, “কি যে বলিস নন্দ।”

আজকাল তাহার দাদার এই বিস্ময় ভাব—এই যে অশান্তি তাহারও মূল কারণ আবার সে-ই—ভাবিয়া নন্দর মন অত্যন্ত পীড়িত হইতেছিল।

নন্দর এক দূরসম্পর্কের জ্যেষ্ঠামশাই ও জ্যেষ্ঠাইমা কান্ধিতে থাকিতেন। তাঁহারা বহুদিন পরে সকলের সঙ্গে একবাব দেখাশুনা করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

জ্যেষ্ঠাইমা নন্দকে বলিলেন, “এত লাখি-ঝাঁটা খেয়ে এখানে পড়ে আছিস কোন্ সুখে নন্দ? তার চেয়ে কাশী চল

আমাদের সঙ্গে। সেখানে এটা-সেটা ক'রে কত ভদ্র লোকের বিধবা দিন চালায়। কাশীর তুল্য কি আর স্থান আছে ?”

কথা শুনিয়া নন্দ তাহার জ্যেষ্ঠামশাই ও জ্যেষ্ঠাইমাকে চাপিয়া ধরিল—তাহাকে কাশী লইয়া যাইতেই হইবে।

নন্দের কাশী যাওয়া ঠিক হইয়া গিয়াছে। এবার কিন্তু চৈতন্ত তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই।

সেদিন নন্দের বিদায়ের দিন। চৈতন্ত আজ আর দোকানে যায় নাই—সারাটা দিন নির্বাক, নিষ্পন্দ হইয়া বসিয়া আছে। তাহার কাজকর্মের সকল উৎসাহ যেন আজ নিবিয়া গিয়াছে।

নন্দ প্রস্তুত হইয়া নৃত্যকালীকে ডাকিয়া বলিল, “একটু বেরোও বউ, যাওয়ার সময় একটা প্রণাম ক'রে যাই।” কিন্তু নৃত্যকালীর ঘর হইতে বাহির হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

কোথা হইতে গৌর ছুটিয়া আসিয়া নন্দকে জড়াইয়া ধরিল। প্রসন্ন করিল, “তুই কোথায় যাবি ছোটমা ?” নন্দ এই ভয়ই করিতেছিল। তাহাকে কোলে লইয়া চুমু খাইয়া বলিল, “কোথাও যাব না বাবা—তুমি যাও খেলা করগে।” গৌর ভুলিল না—বলিল, “না ছোটমা আমি তোমার সঙ্গে যাব।”

গাড়ীর সময় হইয়া আসিল—জ্যেষ্ঠামশাই ডাকাডাকি

স্বরু করিয়া দিলেন। আর বিলম্ব হইলে হস্ত গাড়ী ধরা যাইবেন না।

এদিকে গৌর কান্না স্বরু করিয়া দিয়াছে—কিছুতেই কোল হইতে নামিবে না।

হঠাৎ ঘর হইতে নৃত্যকালী বাহির হইয়া, নন্দের কোল হইতে গৌরকে ছিনাইয়া লইয়া টানিতে টানিতে ঘরে গিয়া ঢুকিল।

চৈতন্ত বাহিরের ঘরের দাওয়ায় শুষ্ক হইয়া বসিয়া ছিল। নন্দ কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, “চললাম দাদা—মাঝে মাঝে খবর নিও। আমার গৌরকে দেখো।”

বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু চৈতন্ত একটা কথাও বলিল না। সেই যে কোন্ সময়ে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল—তেমনি ঠায় বসিয়াই রহিল।

ঘরের ভিতরে নৃত্যকালী তত ক্ষণ গৌরকে ঠেঙাইতে স্বরু করিয়া দিয়াছে। গৌরের চীৎকারে কান পাতা দায়—“ছোটমা গো—আমায় মেরে ফেললে গো।”

তবু নন্দ এক পা, এক পা করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া আসিল। তাহার পা-ছুখানিতে কে যেন পাষাণ চাপা দিয়া রাখিয়াছে।

জ্যেষ্ঠামশাই বলিলেন, “হেঁটে আয় নন্দ।”

চোখের জল মুছিয়া নন্দ বলিল, “যাচ্ছি—চলুন।”

পুণ্যাহ

শান্তিনিকেতনে চীন-সাঁথের স্বারোবটিন উপলক্ষ্যে

শ্রীশুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

মনে পড়ে দেখেছিহু বৈজ্ঞানিকী পুঁথির পৃষ্ঠায়
অপূর্ব আলোকচিত্র, আঁকাবাঁকা প্রমাণ-সরগী।
স্বভঃক্ষুর্ভ বিকিরণ-কণিকার চরণ-লিখনী।
সে পবনঘন মার্গে ক্ষিপ্ত বেগে অনুরূপা ধায়
বিজলী পরাগরাজি পলাঙ্কন-রেখায় বিতরি।
প্রবল আবহগতের প্রাণস্পন্দ ওঠে যেন জাগি
জড়বাস্পে। তেমনি যে হিমাচল জলধি উত্তরি’

সিদ্ধার্থের মৈত্রীমন্ত্র যাত্রা করেছিল চীন লাগি।
অগমের সেতুবন্ধ কি মহামিলন অভিসারে
রচিলেন শ্রমণেরা অন্তর্গৃহ প্রেরণার বশে,
লুপ্তপ্রায় চিহ্ন তার এখনো বিকীর্ণ চারি ধারে।
সেই মরা গাঙে পুন নুতন প্রাবনধারা পশে,
প্রেমের তরণী আসে চীনাংস্তক উড়ায়ে গগনে
বিশ্বভারতীর ঘাটে আজি এই মজল-লগনে।

চেকোস্লোভাকিয়ার উদ্ধারকর্তা প্রেসিডেন্ট মাসারিক

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন, ডক্টর-ফিল্ম (হামবুর্গ), এম-এ, বি-এল

মহাযুদ্ধের পর হইতে আজ পর্যন্ত ইউরোপে যে কয়জন রাষ্ট্রগঠনকারী জননেতার অভ্যুদয় হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেনিন, মুসোলিনি, হিটলার ও মাসারিক। প্রথম তিন জনের কথা বাঙালী পাঠকের কাছে অতি পরিচিত। ইহাদের চেয়ে চরিত্রে ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও মাসারিক নিজ বুদ্ধি ও চেষ্টায় অষ্ট্রিয়ার হাপসবুর্গ রাজবংশের অধীন চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতায় প্রেরোহিত্য করিয়া এই দেশ ও জাতিকে স্বাধীনতা দান করেন; এই অসাধারণ কৃতকর্ম পুরুষের কিছু পরিচয় দিব।

টোমাস মাসারিকের বয়স এখন প্রায় ৮৬। যুদ্ধের পর নবগঠিত গণতান্ত্রিক চেকোস্লোভাকিয়া রাজ্যের জ্ঞানমণ্ডল অ্যাসেম্ব্লি তাঁহাকে প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন। কনষ্টিটিউশন অনুসারে প্রেসিডেন্টের কার্যকাল ৭ বৎসব পর্য্যন্ত হয় ও কনষ্টিটিউশনে স্পষ্ট নির্দেশ থাকে যে একা মাসারিক ছাড়া আর কোন ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট একাধিক বার নিযুক্ত হইতে পাবিবেন না। মাসারিক কার্যভার গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই জ্ঞানমণ্ডল অ্যাসেম্ব্লি এই হুকুমনামা জারি করেন—“টোমাস মাসারিক যে স্বাধীন গণতন্ত্রের নায়ক তাহার প্রত্যেক চেক প্রজা যেন আজীবন স্বরণ রাখেন যে এরূপ লোকের সামনে বাস করা, এরূপ লোকের মূর্তি দেখা, তাঁহার জ্ঞানময়ী বার্তা শ্রবণ করা আমাদের সকলের গৌরবের বিষয়।”

যুদ্ধের পূর্বে বিবর্ণ সাজসজ্জাহীন স্পেশাল ট্রেনে মাসারিক প্রাণা শহরে প্রথম প্রেসিডেন্ট রূপে যখন পৌঁছিলেন, তখন রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা তাহাদের উদ্ধারকর্তাকে অভিনন্দন করিয়াছিল। হাপসবুর্গ রাজাদের ব্যবহৃত স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত প্রকাণ্ড জুড়িগাড়ী স্টেশনের দরজায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে হাপসবুর্গ রাজপ্রাসাদে (এখনকার প্রেসিডেন্ট-আলয়) লইয়া যাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে;

ছিল। মাসারিক স্টেশনে পৌঁছিয়া জুড়িগাড়ী বিদায় করিয়া দিয়া যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত সামান্য একখানি মোটরে চড়িয়া শহরের মধ্য দিয়া জনতার জয়ধ্বনিতে অভিনন্দিত হইয়া প্রেসিডেন্ট-ভবনে পৌঁছিলেন। মাসারিক দুইবার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়া অসাধারণ জ্ঞানপরায়ণতা ও কর্মঠতার সঙ্গে রাজ্যের কর্তব্যরত্ন করেন; তৃতীয়বার তিনি বার্তাক্যবশত এই পদ পুনঃগ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া তাঁহার সহকর্মী ডাঃ বেনেশকে প্রেসিডেন্টরূপে সুপারিশ করিয়া কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

মাসারিক গাড়েয়ানের ছেলে। তাঁহার পিতা হাপসবুর্গ রাজবাদের অধীনে মঞ্চস্থলে গাড়েয়ানের কাজ করিতেন; সেকালে এদেশে বড়লোকদের চাকরদের অবস্থা প্রায় ক্রীতদাসের মতই ছিল। মনিবের খেয়াল ও হুকুমমত তাঁহাকে সপরিবারে স্থান হইতে দানান্তরে গাড়ী লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। তাঁহার মা আগে ভিয়েনার একটি বড়লোকের বাড়ীতে ঝি-চিরি করিতেন। বড়লোকের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকায় ও তাঁহাদের সংসর্গে ভদ্রজীবন সম্বন্ধে ধারণা হওয়ায় মার ইচ্ছা ছিল ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়া ভদ্রলোক বরেন। মার উচ্চাশা ও অপেক্ষাকৃত আলোকপ্রাপ্ত মন মাসারিককে জীবনে বহু সাহায্য করিয়াছিল। বহু বৎসর পরে প্রাণা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে মাসারিক একবার বলিয়াছিলেন, “আমার সব রকম উন্নতির জন্ত আমি আমার পুণ্যবতী মাতার বহু আশ্রয়প্রার্থী প্রেম ও নিপুণ শিক্ষার কাছে ঋণী; জীবনের বহু দুদিনে মাতাপিতা ও আমার দুই ভাইয়ের ভালবাসা আমার প্রাণে বল সঞ্চার করিয়াছে।”

মাসারিক গ্রামের ইস্কুলে সামান্য লেখাপড়া শেখেন। মার কাছে তিনি জাতিদান ভাষা শেখেন। সেকালে এদেশে

জার্মান ভাষা বিদেশীয় রাজার ভাষা ছিল, শুধু বিশিষ্ট ভ্রলোকেরাই জার্মান জানিতেন, সাধারণ লোকের ভাষা ছিল চেক্‌। তাঁহাকে ইহুদে পাঠাইবার জন্য মাসারিকের পিতাকে মনিবের দ্বারে কাতর প্রার্থনা জানাইয়া অল্পমতি লইতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতা ও সেই জমিদারীর অন্য চাকররা কি ভাবে কঠিন পরিশ্রমে ও ঘোর দাবিদ্রো মনিবের কাছে কুকুরের মত জীবন কাটাইতেন তাহাও মাসারিক বাল্যকালে প্রত্যহ দেখিতেন। অল্প একটু লিখিতে পড়িতে শিখিয়াই মাসারিক না বুঝিলেও নানারূপ বই লইয়া ঘাঁটিতেন। বিভিন্ন দেশের মানচিত্র তিনি কটাব পর কটাব ভ্রম্য হইয়া দেখিতেন, জ্যামিতির অঙ্ক কষায় আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেন। চেক্‌ ও জার্মান বই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ল্যাটিন কথা পাইয়া না বুঝিলেও তাহাতে পুলকিত হইয়া সস্বপ্নে তাকাইয়া থাকিতেন, না জানি উহাতে কি রহস্য আছে! মাসারিক যে নিম্নপ্রাথমিক স্কুলে পড়িতেন সেখানে একবার এক জন বড় পাদরী স্কুল পরিদর্শন করিতে আসেন (সকালে এদেশে প্রাথমিক স্কুলগুলি ক্যাথলিক পাদরীদের হাতে ছিল)। ছেলেদের পাদরীর সম্মুখে নানারূপ আবৃত্তি করিতে হইত। মাসারিকের মুখে আবৃত্তি শুনিয়া পাদরী বলিয়া গেলেন ইহাকে যেন মাধ্যমিক স্কুলে পাঠান হয়, এ ছেলেটি ভবিষ্যতে শিক্ষক হইবে। বলা যত-সহজ, করা তত নয়; ছেকোভিট্‌স্‌ গ্রামে (এখানে তখন মাসারিক-পরিবার বাস করিতেছিলেন) মাধ্যমিক স্কুল নাই, অন্তর পাঠাইবার তাহাদের সজ্জাতিই বা কোথায়? কিন্তু মাতার উচ্চাশা বাধার সীমা মানে না। দরিদ্র মাতা নিজের উত্তমে বাধা দূর করিলেন। দূরবর্তী হুসটোপেট্‌স্‌ নামক এক গ্রামে তাঁহার এক ভগ্নী থাকিতেন। ভগ্নীপতির ছোট একটি দোকান ছিল, এই গ্রামে একটি মাধ্যমিক স্কুলও ছিল। ভগ্নীর বাড়ীতে গিয়া মাতা ব্যবস্থা করিলেন যে মাসারিক মাসীর বাড়ীতে থাকিবেন, মেসোর দোকানে সাহায্য করিবেন। ভগ্নীর একটি ছোট মেয়ে ছিল, মাতা তাহাকে আনিয়া নিজের বাড়ীতে রাখিয়া তাহার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিবেন। এইরূপে মাসারিকের মাধ্যমিক স্কুলের পথ পরিষ্কার হইল। তাঁহার বাপের পুরাতন গাড়োয়ানের পোষাক কাটিয়া

তাঁহার মা একটা “নূতন জুট” তৈরি করিয়া দিলেন। এই পোষাক পরিয়া মাসারিক নূতন স্কুলে ঢুকিলেন। সমপাঠীরা তাঁহার এই নূতন জুট দেখিয়া ঠাট্টা করিত। তাহাতে আবার মাসারিক কোথা হইতে “চেহারা হইতে চরিত্র নির্ণয়” সম্বন্ধে একটা বই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সমপাঠীদের নাক মুখ চোখ প্রভৃতি দেখিয়া সর্বদাই তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ আবিষ্কার করিতেন। এই সব কারণে সঙ্গীরা তাঁহাকে একটু অভ্যুত বলিয়া ঠিক করিয়া তাঁহাকে এড়াইয়া চলিত। এই স্কুলের ভাষা ছিল জার্মান, তাহাও মাসারিক ভাল রকম বুঝিতেন না, তাই প্রথম মাস-কয়েক তিনি প্রত্যেক বিষয়ের দৈনিক পাঠের প্রত্যেক লাইন মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন। সমবয়সীদের সঙ্গে হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মাসারিক শিক্ষকদের সঙ্গে মিশিতে সাগিলেন। একটি ভরূপ শিক্ষক তাঁহার বিশেষ বন্ধু হইলেন। স্কুলের শেষে অবকাশের সময় যখন অন্য ছেলেরা খেলায় মাতিত বা বীয়ারের দোকানে আড্ডা দিত, মাসারিক তখন বই লইয়া ভ্রম্য হইয়া থাকিতেন, অথবা ভরূপ শিক্ষকটির সঙ্গে নানা আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন।

মাধ্যমিক স্কুলে মাসারিক দুই বৎসর পড়িয়াছিলেন, ইহার মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সকালে এদেশে ইহুদীদের সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদের নানারূপ কুসংস্কার ও মিথ্যা ধারণা ছিল। লোকে ইহুদী-বাড়ীর সামনে দিয়া যাইবার সময় রাস্তার ওধার দিয়া যাইত। স্কুলে জন-কয়েক ইহুদী ছেলে থাকিলেও এবং তাহারা ভ্রূ ব্যবহার করিলেও মাসারিক তাহাদের সঙ্গে মিশিবার ভরসা পাইতেন না। একবার ছেলেরা একটা চডুইভ্যাজিতে গিয়াছিল। দলে এক জন ইহুদী ছেলেও ছিল। ছুপুরে থাবার তৈরি দেখিয়া যখন সকলে হুড়াহুড়ি করিতেছে, তখন হঠাৎ ইহুদী ছেলেটির খোঁজ পাওয়া গেল না। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য মাসারিক হৈ হৈ করিতে করিতে তাহার খোঁজে বাহির হইলেন। বাহা দেখিলেন তাহাতে কিন্তু মাসারিক একেবারে নির্বাক হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ছেলেটি খামারের এক নিরালা কোণে দরজার পিছনে দাঁড়াইয়া দেওয়ালে মাথা রাখিয়া ইহুদীদের মাধ্যমিক উপাসনার মন্ত্র পড়িতেছে। এই ঘটনায় মাসারিক বুঝিলেন

তাঁহার সমাজ বাহাকে কাদের বলে তাহাদেরও ধর্মজ্ঞান আছে, তাহারাও ঈশ্বরের উপাসনা কবে, তাহারাও দশ জন ঈষ্টানের মত মাফুষ! ভবিষ্যতে চিরজীবন মাসারিক চেষ্টা করিয়াছিলেন বাহাতে ইহুদীদিগের প্রতি অস্ত্রায় অবিচার না হয়। পরবর্তী কালে তিনি একবার একটি নির্দোষ ইহুদী বালকের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য দলবদ্ধ সমাজের বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়াইয়া সারা দেশের নিন্দা ও অত্যাচার সহ করিয়াছিলেন।

চৌদ্দ বৎসর বয়সে মাসারিক মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রম শেষ করিলেন। কিন্তু বোল বৎসর বয়সের আগে শিক্ষক হইবার স্কুলে ঢোকা যায় না। এই ছুই বৎসর তিনি নিজ গ্রামের স্কুলের সহকারী শিক্ষকের কাজ করিবেন স্থির হইল। সহকারী শিক্ষকের কাজ ছিল ছেলেদের তত্ত্বাবধান করা, ক্লাসের আগে পরে শাস্তি রক্ষা করা। আসলে কিন্তু অধিকাংশ সময়ই মাসারিককে স্কুল-পরিচালকের বাড়ীতে ও রান্নাঘরে চাকর-ঠাকুরের কাজ করিতে হইত। সহকারী শিক্ষকরূপে তাঁহাকে গীর্জার কাজকর্মেরও সহায়তা কবিতে হইত। গীর্জার কাজ করিবার সময়ে ধর্ম সম্বন্ধে, বিশেষতঃ ক্যাথলিক মতবাদ সম্বন্ধে, তাঁহার মনে ঐমান্য প্রাণ জাগিত, পাদরীর সঙ্গে আলোচনা করিয়া তিনি কোন সহজত্ব পাইতেন না। ক্যাথলিকদের মধ্যে বা বিভিন্ন দেশে কেন এত বিভিন্ন মত ও প্রথা প্রচলিত, তাহারও বুদ্ধিবৃত্ত কারণ পাইলেন না। ঈষ্টধর্ম সম্বন্ধে অনেক বই তিনি পড়িয়া ফেলিলেন এবং সন্দেহ না ঘুচিলেও ক্যাথলিক ধর্মে তখনও তাঁহার প্রবীণ অটুট ছিল। একবার জেজুইটদের লেখা প্রোটেস্ট্যান্ট-বাদের উপর একটি আক্রমণ তিনি পড়িয়া এতই উৎসাহিত হইয়াছিলেন যে প্রোটেস্ট্যান্ট-বাদেই বিরুদ্ধে তর্ক ও আলোচনা করিবার লোক খুঁজিতে লাগিলেন। ছুত্থের বিষয় দেশময় ক্যাথলিক, কে প্রোটেস্ট্যান্ট পক্ষ লইয়া তাঁহাব সঙ্গে তর্ক করিবে? অবশেষে এক জন লোক মিলিল, সেই গ্রামের কামারের জাখান জী। মাসারিক কামার-পদীর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জেজুইটদের বই হইতে শেখা তর্ক প্রমাণেব সাহায্যে প্রোটেস্ট্যান্ট-বাদের অসারতা এমনই স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছিলেন যে এই জাখান রমণী স্বধর্ম ত্যাগ কবিয়া অবশেষে ক্যাথলিক দীক্ষা লইয়া-

ছিল। এই সময়ের আর দুটি ঘটনা তাঁহার জীবনে গভীর রেখাপাত করে। তাঁহাদের গ্রামের কাছে রাজাদের শিকারের জন্য রক্ষিত একটি জঙ্গল ছিল। এই বনের হরিণ প্রায়ই গ্রামের শস্ত্র নষ্ট করিয়া যাইত, তবু তাহাদের বাধা দিবার অধিকার তাহারও ছিল না। এক জন বড়লোক শিকারী একবার তাঁর মা'র ছোট সজ্জীর বাগানের উপর দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া বাগানটি নষ্ট করিয়া দিয়া গেল। ইহাতে পিতার রুদ্ধ আক্রোশ তিনি বুঝিলেন। বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন রক্ষকের বাসাও সামনে অনেক হরিণ, পাখী প্রভৃতি শিকার পড়িয়া রহিয়াছে, ভিতরে রাজার গন্ধ ও বড়লোকদের হৈ-হুলা শুনা যাইতেছে। এদিকে খিড়কীর কাছে দেখিলেন, তাঁহারই গ্রামের একদল লোক ছেলেপুলেসহ বড়লোকদের উচ্ছিষ্টের গ্রাস পাইবার জন্য নিজেদের মধ্যে কুকুরের মত কাড়াকাড়ি মারামারি করিতেছে। ধনী-দরিদ্রের এই নিদারুণ বৈষম্যে ক্রোধে তাঁহার হস্ত মৃষ্টিবদ্ধ হইয়া উঠিল, অগ্নিবর্ণ চোখে তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। আর একবার আর একটি বড়লোকের শিকারী দল তাঁহাদের কুটীরের কাছে আসিয়া নিজেদের দামী পুরু পালকের ওভারকোট সেখানে রাখিয়া রুঢ়ভাবে তাঁহাকে সেগুলি পাহারা দিবার হুকুম করিয়া চলিয়া গেল। সেরূপ দামী ওভারকোট তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই, কিন্তু তাঁহার মনে ইচ্ছা হইয়াছিল ছুরি দিয়া কাটির ছিন্নাভিন্ন করিয়া তাঁহার নোংরা জুতা দিয়া সেগুলি মাড়াইয়া নষ্ট করেন। বহুকষ্টে তিনি সে-বার আত্মসংবরণ কবেন। আবেগের আত্মশয্য কাদিয়া ভাসাইয়া না দিয়া যে জ্ঞাত্য ক্রোধ তিনি তখন দমন করিয়া হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন তাহারই প্রেরণায় পরে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্টরূপে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, “বাহাবা খাঁটি কাজ করে তাহারা সবাই সমান—ভাল কামারের কাজ ভাল প্রেসিডেন্টের কাজের চেয়ে কম প্রশংসনীয় নয়।” সেই সময়ে অর্থাৎ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে হাপসবুর্গ-বংশের রাজত্ব চালিত মিলিটারি পুলিশ ও পাদরীদের দ্বাব। ইহারাই সব বিষয়ের হর্ত্তাকর্ত্তা ছিল; রাজত্বের সর্বত্র সন্দেহ ও ভয়; রাজ্যের মোড়ে, হাটে বাজারে, গীর্জায়, সর্বত্র গুপ্তচররা ঘুরিয়া বেড়াইত।

এক দিন মাসারিক স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে আঙুরক্ষেতে আঙুর চুরি করিয়া ধরা পড়িয়া গেলেন। ছেলে নিরুখা হইয়া বসিয়া আছে বলিয়াই ছুটামিতে যোগ দিয়াছে মনে করিয়া তাঁহাব পিতা এক দিন ভোরে তাঁহাকে জাগাইয়া জানাইলেন, গাড়ী প্রস্তুত, তাহাকে এই মুহূর্তেই ভিয়েনায় গিয়া কাজকর্মের চেষ্টা দেখিতে হইবে। মাসারিককে দশ মিনিটেই মধ্যে নিজ সম্পত্তি পুঁচুলিতে বাঁধিয়া লইয়া প্রস্তুত হইতে হইল। টুকিটাকি জিনিষ-তাঁহাব যা ছিল তার মধ্যে তিনি তাঁর প্রিয় অ্যাটলাসখানি লইতে ভুলেন নাই। ভিয়েনায় গিয়া এক কামারের দোকানে তাঁহার চাকরি মিলিল। এখানে-সাবাদিন তাঁহাকে খাটিতে হইত, কিন্তু ছুটি হইলে সন্ধ্যাবেলায় তিনি পথে পথে ঘুরিয়া বইয়ের দোকানের কাচের জানালায় বই দেখিয়া বেড়াইতেন। সামান্য উপার্জনবৎ পয়সা বাঁচাইয়া তিনি আবার একখানি “চেহাবা দেখিয়া চরিত্র-নির্ণয়ের” বই কেনেন; অবসর-সময় অল্প ছোকবাদের সঙ্গে বাজে কথা বা ক্ষুণ্ণিতে যোগ না দিয়া তিনি বইয়ের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন দেখিয়া ছোকরারা তাঁহাকে জ্ঞপ্ত করিবার জন্য তাঁহার এই বইখানি চুরি করিল। এই বইখানি চুরি হওয়াতে মাসারিক মধ্যান্তিক কষ্ট পাইয়াছিলেন। ভিয়েনাতে আরও কিছু দিন কাজ করিবার পূর্ব এই দিনব্যাপী যন্ত্রেব মত কাজে তাঁহাব বিরক্তি বোধ হইল, তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কাজে তাঁহাব আপত্তি ছিল না, তিনি প্রেসিডেন্টরূপে একবার বলিয়াছিলেন, “জিনিয়স্ তাকেই বলি যে কর্মে স্বাভাবিক অনিচ্ছাকে জয় কবিত্তে পারে।” কিন্তু একঘেয়ে যন্ত্রেব মত কাজে তাঁহার প্রীতি ছিল না। ভিয়েনার দুর্ভিক্ষ খাটুনির ফলে তিনি আজীবন শ্রমিকদেব বন্ধু হইয়াছিলেন ও তাহাদের অবস্থা-উন্নতির সহায়ক হইয়াছিলেন। বাড়ী ফিরিয়া কিন্তু আবার কামারের দোকানেই তাঁহার চাকরি মিলিল। এখানেও অবকাশের প্রত্যেক মুহূর্তটি তিনি বই বা খবরের কাগজ পড়িয়া কাটাইতেন। তাঁহার শিক্ষাব আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার এক জন পূর্বতন শিক্ষক তাঁহাকে আর একটি শহরে আবার সহকারী শিক্ষক করিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এখানে মাসারিক ছেলেদের পৃথিবী স্থানের চার দিকে ঘোরে শিক্ষা দিতেছেন জানিয়া ছেলেদের

মা'রা প্রথমে গ্রামের পাদরীর কাছে ও পরে শহরের বড় পাদরীর কাছে নালিশ কবিল যে ছোকরা মাষ্টার ছেলেদের বাইবেল-বিরুদ্ধ শিক্ষা দিতেছে। বড় পাদরী মাসারিককে ডাকাইয়া সব কথা শুনিয়া বলিলেন, ওশিক্ষা যখন বাইবেল-বিরুদ্ধ তখন উহা শিখাইয়া দবকাব নাই। মাসারিক পাদরীর কথায় উহা শিখান বন্ধ করিলেন, কিন্তু নিজের বিশ্বাস ছাড়িলেন না। পবে এক দিন হাটবারে ছেলেদের বাপেবা (গ্রামেব চাষারা) তাঁহাকে ধরিয়া ব্যাপাব জিজ্ঞাসা করিল। মাসারিক তাহাদের কাছে কোপার্ণিকসের তথ্য ব্যাখ্যা করিলে তাহাবা বলিল, মেয়েদের কথায় কান না দিয়া তুমি যা শিখিয়াছ, ছেলেদেরও তাই শিখাইও।

একবার মাসারিক বাড়ী হইতে শহরে ইচ্ছুক যাইবার সময় তাঁহাব মা তাঁহাকে এক রকম ময়দার কেক তৈরি করিয়া সঙ্গে দিয়াছিলেন। ইহার নাম এদেশে ‘কোবলিহি’—খুবই সাধারণ জিনিষ, ফাপানো রুটিব মধ্যে জ্যাম ভরা থাকে। এটি মাসারিকের প্রিয় খাদ্য ছিল। শহরে ঢুকিবার সময় কাষ্টমসের লোক বলিল, “তুমি এ জিনিষ শহরে বিক্রী কবিবাব জন্য লইয়া যাইতেছ, ট্যাক্স দিতে হইবে।” ট্যাক্স দিবার সামর্থ্য ছিল না, কারণ সঙ্গে মাত্র চাবিটা পয়সা সঞ্চ লইয়া তিনি স্কুলে যাইতেছিলেন। ভবভোলা লোক হইলে কেকগুলি কাষ্টমসকে ছাড়িয়া দিত, ভবিষ্যতে বৃদ্ধ-ঋণ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে গরীবকে বিলাইয়া দিত, কিন্তু চেকুরা অভ্যস্ত রিয়ালিষ্ট, মাসারিক পথেব ধারে বসিয়া ইপ্তা-ছয়েকের খোরাক সব কেকগুলি উদরসাৎ কবিয়া শহরে ঢুকিয়াছিলেন। শহরে ছাত্র পড়াইয়া তাঁহার ইচ্ছুলের খরচ চলিত। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ছাত্রদেব কাছে ও বিদেশীয়দের সৈন্তদের সঙ্গে মিশিয়া মাসারিক নানা বকম ভাষাও শিখিতেন। বিদেশীয়দের দ্রববহা দেখিয়া তাঁহার জাতীয়তাবোধ প্রবল হইয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছুলের গ্রীক ও ল্যাটিনের শিক্ষক জার্মান ছিলেন, তাঁহাব গ্রীক উচ্চারণে জার্মান টান ছিল। মাসারিক বলিলেন, জার্মান শিক্ষক যদি জার্মান টানে গ্রীক পড়িতে পাবেন, তবে তিনিও চেক-টানে ল্যাটিন পড়িবেন। ইহা লইয়া শিক্ষকের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব হয় ও শিক্ষক তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়ান।

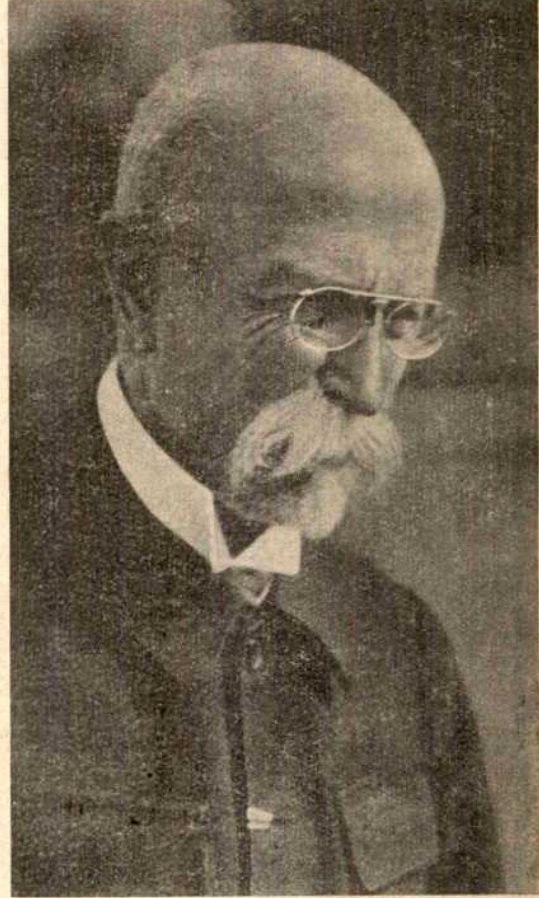
এই সময়ে মাসারিক ঋণীধর্মের সত্যতা সম্বন্ধেও চিন্তা

করিতে আরম্ভ করেন ও ক্যাথলিক মতবাদ সম্বন্ধে সন্দিহান হন। তখন পাদ্রীর কাছে গিয়া মাসারিক জানাইলেন যে তিনি আর পাদ্রীর কাছে পাপস্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিবেন না। পাদ্রী অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া শেষে ছাড়িয়া দিলেন। ব্যাপার স্থলের কর্তার কানে উঠিল, তিনি মাসারিককে ডাকাইয়া ছকুম করিলেন, বিশ্বাস করুন না-করুন তাঁহাকে নিয়ম পালন করিতেই হইবে, কর্তা নিজেও অনেক বিষয় বিশ্বাস করেন না, কিন্তু নিয়মের খাতিরে তাহা পালন করিয়া থাকেন। মাসারিক কর্তাকে তৎক্ষণাৎ জানাইলেন, যে নিজ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করে তাহাকে তিনি অমায়ুষ মনে করেন। ইহার পর হইতে কর্তা মাসারিককে নানা ভাবে নিষাধন করিতে আরম্ভ করিলেন। এক দিন ক্লাসে জানালা দিয়া সূর্যালোক চোখে পড়ায় মাসারিক চোখে কুঁচকাইতেছিলেন। কর্তা বলিলেন, “তুমি আমাকে ভাঙাইতেছ!” মাসারিক অনেক তর্ক করার পর বলিলেন, “ভুল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অল্পবয়স্কের প্রতি বয়স্কানের দোষারোপ করা আমি অজ্ঞায় মনে করি, জ্ঞানগর্ভে ইহাকে মিথ্যা সিদ্ধান্ত বলে।”

এই স্থলে পড়িবার সময়ে মাসারিক যে-বাড়ীতে থাকিতেন সেই বাড়ীর ল্যাণ্ডলেডীর বোনের সঙ্গে তাঁর প্রণয় হয়। তাঁহার সমবয়স্ক ছোকরারা প্রেমের ব্যাপার চালাইত গোপনে, কিন্তু সত্যপ্রিয় মাসারিক ইহাতে নিন্দনীয় কিছু নাই জানিয়া লুকাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু লোকের চক্ষে ইহা দৃশ্য মনে হওয়ায় তাঁহাকে বিশেষ নিষাধন ভোগ করিতে হইল, শত্রু শিক্ষকেরা তাঁহাকে স্থল-কর্তৃপক্ষের সাম্মুখে অপরাধী হিসাবে হাজির করিলেন। মাসারিকের প্রেমে কৈশোরের বিস্ময় আবেগ মাত্র ছিল, আর কোন কলুষচিন্তা। তিনি জানিতেনও না, তিনি সোজাশুজি সব কথা কর্তৃপক্ষের কাছে স্বীকার করিলেন ও ফলে সেই স্থল হইতে বিতাড়িত হইলেন।

ইহার পর মাসারিক আবার ভিয়েনায় গিয়া গৃহ-শিক্ষকতা করিয়া ইস্থলে পড়িতে লাগিলেন ও পরে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইলেন। দর্শনশাস্ত্র তাঁহার পাঠ্য ছিল। বহু কষ্টে তাঁহার মাসিক খরচ চলিত, কিন্তু মাসারিক ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া সময় নষ্ট করিতেন

না, হাতের কাছে যখন যে কাজ পাইতেন তাহাই লইতেন। “সরুদাই প্রথম হইবার চেষ্টা করিও না, অনেক সময় দ্বিতীয় বা তৃতীয় থাকাই যথেষ্ট!”—পরবর্তী জীবনের তাঁহার এই কথা



চেকোস্লোভাকিয়ার উদ্ধারকর্তা মাসারিক

তিনি প্রথম জীবনে ভূগিয়া শিগিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই বিনয় অলসের চেষ্টাহীনতার ভদ্র আবরণ ছিল না, তিনি বলিতেন “পরে কি হইবে, কেমন করিয়া হইবে, ভাবিয়া আমি কখনও বেশী সময় নষ্ট করি নাই। কিন্তু বাল্যকাল হইতে আমার এই দৃঢ় ধারণা যে, যে-লোক বাস্তবিকই কাজ করিতে চায়, তাহার কাছে কি করিয়া, কোথায় বা কখন কাজ করিতে হইবে, তাহা স্বতঃই প্রতিভাত হইবে।” এ সম্পর্কে টমাস কার্লাইলের কথাও স্মরণযোগ্য—

“তোমার অভিসান্ধি যে কর্তব্য তাহাই প্রথমে কর, দ্বিতীয় কর্তব্য নিজেই পরিষ্কার হইবে।”

ভিয়েনার পাঠ শেষ করিয়া মাসারিক লাইপ্‌জিগ্‌ ইউনিভার্সিটিতে যান। লাইপ্‌জিগে তিনি যে ল্যান্ডলেডীর বাড়ীতে থাকিতেন তাহার কাছে শুনিলেন যে শাল্‌টি নাম্নী একটি আমেরিকান ছাত্রী সেই বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিয়া আবার দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। শাল্‌টির গল্প প্রায়ই বাসার লোকের মুখে শোনা যাইত। দিনকতক পরে চিঠি আসিল, শাল্‌টি আবার লাইপ্‌জিগে আসিতেছেন। অল্পে অল্পে মাসারিকের সঙ্গে ইহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইল। শাল্‌টি ধীরবুদ্ধি, চিন্তাশীল ও আনন্দময় প্রকৃতির মেয়ে



চেকোস্লোভাকিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রপতি বেনেশ

ছিলেন। তাঁহারা একত্র পড়াশুনা, ভ্রমণ-আলোচনা করিতেন, মধ্যে মধ্যে অপেরা থিয়েটার প্রভৃতি দেখিতেন। কিছু দিন লাইপ্‌জিগে থাকার পর শাল্‌টি জার্মেনীর অগ্ন্যাত্ত স্থানে বেড়াইয়া আমেরিকায় ফিরিয়া গেলেন। সেখান হইতে চিঠিপত্রে তাঁহাদের বিবাহ-প্রস্তাব স্থির হইল ও শাল্‌টির

অহরোধে ভাবী স্বস্তরের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য মাসারিক আমেরিকায় রওনা হইলেন। সেকালে আমেরিকা কন্টিনেন্ট হইতে স্বদূরের পথ ছিল, মাসারিকের অর্থবলও ছিল অতি সামান্য। বহু কষ্টে উপার্জিত অর্থ বাঁচাইয়া একখানা পুরাতন কয়লাবাহী জাহাজে মাসারিক আমেরিকায় পৌঁছিলেন। শাল্‌টির বাপ বড়লোক না হইলেও তাঁহার অবস্থা মন্দ ছিল না, তিনি মাসারিকের অধ্যাপক হইবার সংকল্প শুনিয়া ও তাঁহার কথাবার্ত্তায় আপত্তি করিবার কিছু না দেখিয়া বিবাহে মত দিলেন। সেকালে এদেশে লোকে বিবাহ করিলে স্বস্তরের কাছে যৌতুক পাইয়া থাকিত, মাসারিক স্বস্তরের কাছে সরলভাবে যৌতুকের পরিমাণ জানিতে চাহিলেন। আমেরিকান স্বস্তর ইহাতে আশ্চর্য ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া জানাইলেন, তিনি জানেন তাঁহার মেয়েকে যে বিবাহ করিবে সে তাঁহার মেয়েকেই বিবাহ করিবে, তাঁহাকে আবার সেজ্ঞা যৌতুক দিতে হইবে এমন অদ্ভুত কথা তাঁহার কখনও মনে হয় নাই! দিনকতক মহা নিরানন্দে কাটিল, সরলপ্রাণ মাসারিকও যৌতুকের কথা ছাড়িবেন না, বাপও তাঁহার জেদ ছাড়িবেন না। মাসারিক শেষে হতাশাস ও বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সম্বল এক পয়সাও নাই, ফিরিবার জাহাজ-ভাড়া তিনি যৌতুক হইতে দিবেন সরলপ্রাণে ইহাই স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন। শেষে শাল্‌টির মধ্যস্থতায় বাপ তাঁহাকে ফিরিবার জাহাজ ভাড়া দিয়া বিদায় করিলেন। স্থির হইল, বিবাহ করিয়া তিনি এখন একাই ফিরিয়া যাইবেন, পরে অবস্থায় কুলাইলে শাল্‌টি তাঁহার সঙ্গে যোগ দিবেন। মাসারিক একাই ফিরিলেন ও আরও কিছুদিন পড়াশুনা করিবার পর গ্রাহা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপকের কাজ পাইলেন। প্রথম প্রথম নবীন অধ্যাপকেরা এদেশে মাহিনা অতি অল্পই পাইয়া থাকেন, ছাত্ররা যে বেতন দেয় তাহাই তাঁহাদের জীবিকার উপায় হয়। পরে শাল্‌টি আসিয়া স্বামীর সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন ও চিরদিন তাঁহার সকল কাজে সহধর্মিণীর ব্রত পালন করিয়াছিলেন। যাহারা সকলেই অক্ষম তাহাদের মধ্যে এক জন একটু সক্ষম হইলে অত্বেরা তাহার সামর্থ্যের মাত্রা বেশী করিয়া কল্পনা করে, বিশেষ যদি তাহাতে নিজেদেরও লাভের সম্ভাবনা থাকে;

গ্রামের গরীবের ছেলে কলিকাতায় সামান্য চাকরি পাইলে গ্রামের লোক মনে করে, ইহার সঙ্গে লার্ড-সাহেবের প্রায়ই দেখাশুনা হয়, ইহাকে ধরিলে নিশ্চয় চাকরি মিলিতে পারে। মাসারিক আমেরিকান মেয়ে বিবাহ করিয়াছেন গুনিয়া তাঁহার দেশের লোক মনে করিল, তিনি নিশ্চয় কোটিপতি ধনুর পাইয়াছেন; তাঁহার মোরাভিয়া প্রদেশের লোকে সমবেত হইয়া তাঁহার কাছে একখানি দরখাস্ত পাঠাইয়াছিল যে যৌতুকের টাকা হইতে মাসারিক যেন মোরাভিয়া প্রদেশের জন্ত একটা রেল-রাস্তা তৈয়ার করাইয়া দেন।

দরিদ্র হইলেও অধ্যাপকরূপে মাসারিক খ্যাতি অর্জন করেন। ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার বিশেষ প্রভাব ছিল। শুধু বিজ্ঞানের চর্চা বা ছাত্র-পড়ানতেই তিনি তাঁহার অধ্যাপকের কর্ম শেষ হইল মনে করিতেন না, ছাত্রদের সর্ববিধ জ্ঞানচর্চার তিনি সহায়ক ছিলেন, সকল প্রশ্নে তাহাদের সঙ্গে তর্ক করিতেন ও তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন। শুধু নিজের বিষয় ছাড়া, মানুষের চিন্তনীয় যত বিষয় আছে, সব বিষয় সম্বন্ধে নিজের মতামত তিনি ছাত্রসমাজে প্রচার করিয়া তাহাদের চিন্তা ও বিতর্ক-বুদ্ধির সহায়তা করিতেন। এজন্য সহকর্মী অনেক অধ্যাপক তাঁহার উপর অপ্রসন্ন ছিলেন। মাসারিকের এই দরিদ্র অধ্যাপক অবস্থাতে তাঁহার একটি ছাত্র মারা যায়; ছাত্রটি ধনী ছিল ও মাসারিককে তাহার সমস্ত অর্থের উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিয়া যায়। মাসারিক এই উত্তরাধিকারস্বত্রে অনেক অর্থ পাইয়া তাহা ব্যয় করিলেন এই ভাবে—বাপের অবস্থা উন্নতির জন্ত তাঁহাকে গাড়োয়ানী ছাড়াইয়া একটি সরাইখানা কিনিয়া তাহার মালিক করিয়া দিলেন; ছোট ভাইকে একটি ছাপাখানা কিনিয়া তাহার মালিক করিয়া দিলেন; বাকী অর্থ দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যের জন্ত বিতরণ করিলেন—নিজের জন্ত এক পয়সাও রাখিলেন না। দর্শনের অধ্যাপক ও মানুষ, দুই রূপেই মাসারিক সত্যানুসন্ধিৎসা, সত্যনিষ্ঠা ও সত্য-প্রকাশকে চরম কর্তব্য মনে করিতেন। “যাহা অসত্য তাহা কখনই মহৎ হইতে পারে না”—ইহাই ছিল তাঁহার মূলমন্ত্র। অসত্য ছিল তাঁহার কাছে অধ্যর্থ, সত্য বলিতে তিনি কাহাকেও ডরাইতেন না, কোন বাধা মানিতেন না, কোনও স্বার্থকে গ্রাহ্য করিতেন

না; তাঁহার সকল শক্তি একমুখী করিয়াছিলেন অসত্য-দমন ও সত্য-প্রকাশের সাধনায়। ইহার জন্ত লাঞ্ছনাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল কম নয়। সে-সময়ে চেক-জাতীয়দের বহু প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, নবোদ্ভূত জাতীয়দের মধ্যাদায় চেকরা নিজেদের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, কলা প্রভৃতির আবিষ্কার ও চর্চা করিতেছিলেন। মাসারিকও এই দলে ছিলেন। এমন সময় এক জন খ্যাতনামা চেক অধ্যাপক কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করিয়া তাহার চেক-উদ্ভব প্রমাণ করিলেন। চেক-জাতি ইহাতে গৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, চেক-সংস্কৃতির প্রাচীনত্বের আর কোন সন্দেহ রহিল না। মাসারিক পুঁথিগুলি পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে পুঁথিগুলি জাল করা, খাটি নয়; পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু উহাতে জালিয়াতির লক্ষণ বর্তমান, হুতরাং অবিশ্বাস্য। জাতীয়তাবাদীরা ইহাতে ক্ষেপিয়া উঠিল, মাসারিককে স্বজাতিদ্রোহী, মিথ্যাবাদী, ঝুটা অধ্যাপক প্রভৃতি বলিয়া গালাগালি করিল, পণ্ডিতে মূর্খ মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। মাসারিক গ্রাহ্য করিলেন না, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ, ভাষাতত্ত্ব, পুঁথিতত্ত্বের যে-সব প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি উহার বিশ্বস্ততা সন্দেহান হইয়াছেন তাহাই লোকসমাজে প্রকাশ করিলেন। এই পুঁথিগুলি সম্বন্ধে আমি পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি, বিশেষজ্ঞদের মতও শুনিয়াছি, এখন সকলেই বিশ্বাস করেন যে সম্পূর্ণ জাল না হইলেও পুঁথিগুলিতে সন্দেহজনক এমন অনেক ভ্রম আছে যাহাতে তাহার পূর্ণ প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। মাসারিক এ-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলে এ দিকটা অপ্রকাশিতই থাকিয়া যাইত, কিন্তু জাতীয় গৌরবের চেয়ে সত্য-প্রতিষ্ঠাকেই তিনি বড় মনে করিয়াছিলেন।

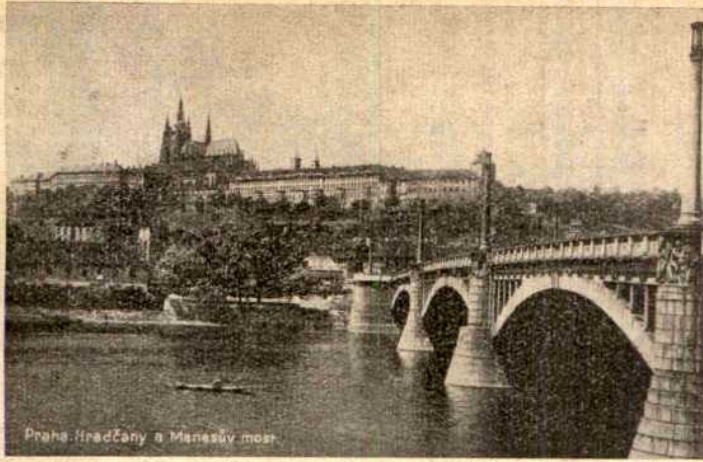
আর একটি ঘটনায় মাসারিকের সত্যনিষ্ঠা তাঁহার জীবন-সংশয়ের কারণ হইয়াছিল। একটি খ্রীষ্টান বালিকার মৃত্যু-সম্পর্কে একটি ইহুদী ছোকরা অভিযুক্ত হয়। ইহুদী-বিশ্বেষ শুধু হিটলারের আবিষ্কার নয়, সারা ইউরোপে ব্যাপকভাবে বর্তমান। লোকে বলিল, ইহুদীদের মধ্যে আত্মগতনিক নরহত্যা (ritual murder) প্রথা প্রচলিত, তাহারই ফলে

ছোকরা অন্তের প্ররোচনায় বালিকাকে হত্যা করিয়াছে। পুলিশ আসামীর বিরুদ্ধে বহু প্রমাণ উপস্থিত করিল, প্রধান প্রমাণ ইহুদীদের আত্মচরিত নবহত্যা। ছোকরার প্রাণদণ্ডের জন্ত দেশবাসী ফেপিয়া উঠিল। মাসারিক এ-বিষয়ে অতৃপ্তান করিয়া প্রকাশ করিলেন যে পুলিশের আনীত অধিকাংশ প্রমাণই অবিদ্যমান এবং আত্মচরিত নবহত্যার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বহুতর শাস্ত্রীয়, ঐতিহাসিক ও লৌকিক প্রমাণ দিয়া তিনি তাঁহার তর্কযুক্তি প্রকাশ করিলেন। দেশের লোক জলিয়া উঠিল, খবরের কাগজে, পথে-ঘাটে, সভা-সমিতিতে লোকে তাঁহাকে দেশ-, সমাজ- ও ধর্ম-দ্রোহী বলিয়া গালাগালি ও অপমান করিল। তাঁহার ছাত্ররা পর্যন্ত তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইল। অপরাধ নিভুল প্রমাণিত না হইলেও বিচারে লোকমতের খাতিরে ছোকরার প্রাণদণ্ড হইল। মাসারিক সমস্ত বিরুদ্ধতা অগ্রাহ্য করিয়া প্রাণদণ্ড রহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে লাগিল তিনি ইহুদীদের কাছে বিস্তর ঘুষ খাইয়াছেন। যাহা হউক, শেষটা চরম বিচারপতিরা প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা করেন।* কিন্তু মাসারিক যে ধনী ইহুদীদের কাছে বহু অর্থ লাভ করিয়াছেন ইহাতে লোকের কোন সন্দেহ রহিল না। এই সময় তাঁহার বড়। বাপ গ্রাম হইতে গ্রাহায় ছেলের বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝা গেল না, কিছুই বলিলেন না, দিনকয়েক শহর দেখিয়া বেড়াইলেন, বড়লোকদের বাড়ীর দরজায় চাকর-গাড়োয়ানদের সঙ্গে বসিয়া পাইপ টানিয়া আলাপ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, অবশেষে একদিন নির্জনে ছেলেকে বলিলেন, “বাপু হে, আমার সরাইখানাটা ভাল চসিতেছে না, তোমার ঐ ঘরের টাকটা হইতে কিছু যদি দাও তবে ব্যবসার আবার উন্নতি করিতে পারি, কিছু জমিজমাও কিনিতে ইচ্ছা হইয়াছে।” মাসারিক সব নির্ধাতন অপবাদ লাঞ্ছনা খাড়া হইয়া সহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের পিতাও যে তাঁহাকে ঘুষখোর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন ইহাতে তাঁহার দৃঢ়তা একেবারে ভাঙিয়া গেল, ভগ্নোৎসাহ

* পরবর্তী কালে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়া মাসারিক এই ইহুদীকে কারামুক্ত করেন।

হইয়া তিনি চাকরি ছাড়িয়া গ্রাহা ত্যাগের সংকল্প করিলেন। পত্নী শাল টি তাঁহাকে বুঝাইয়া ও সাহসনা-উৎসাহ দিয়া তাঁহাকে গ্রাহা ত্যাগের সংকল্প হইতে নিরস্ত করেন।

যাহা হউক, সাধারণের স্মরণশক্তি কম, মিথ্যার শক্তিও বেশী দিন টিকে না। কিছু দিন পরে মাসারিক আবার পূর্বপ্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। ক্রমে তিনি প্যালেমেন্টের সভা নির্বাচিত হইলেন। প্যালেমেন্টের সভা হিসাবেও মাসারিকের প্রধান অবলম্বন ছিল খাতি তথ্য, প্রমাণ ও পূর্ব সত্যবাদিতা। কেহ কেহ তাঁহাকে মাথাগরম গৌয়ার মনে করিত, কিন্তু অধিকাংশ দেশবাসীরই তিনি বিশ্বাসের পাত্র হইলেন। দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার উন্নতির জন্ত তিনি সর্বদা প্রয়াসী ছিলেন। প্যালেমেন্টের সদস্যরূপে একটি ঘটনায় তাঁহার হস্তক্ষেপ উল্লেখযোগ্য। ‘অট্রিয়া ও সাবিয়ার সঙ্গে সে সময়ে রেবারেবি চলিতেছিল। সাবিয়াকে অপদস্থ করিবার জন্ত একটা মিথ্যা মামলার আয়োজন করা হয় ও ঘুষ দিয়া সাজানো সাক্ষী আমদানি করা হয়। প্যালেমেন্টের সাবিয়ান ও ক্রোটয়ান সভ্যরা অধ্যাপক ফ্রিডইয়ু নামক এক জন সাক্ষীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনেন। মাসারিক এই মামলায় সাক্ষ্য দেন। অধ্যাপক ফ্রিডইয়ু বলেন যে তাঁহার মন্তব্য তিনি হাপসবুর্গ রাজদণ্ডের দলিলের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন। মাসারিক আদালতে সাক্ষ্য দিলেন যে, হাপসবুর্গ-বংশের প্ররোচনায় বেলগ্রেডস্থ অট্রিয়ান রাজদূত এই দলিল জাল করিয়াছেন। মাসারিকের এই সাক্ষ্যের ফলে, তদানীন্তন অট্রিয়ান সম্রাটের পররাষ্ট্রসচিব এহরেনটাল লোকচক্ষে বিশেষ অপদস্থ হন। মাসারিক এই সময়ে বেলগ্রেডে গিয়া সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করিতে থাকেন এবং ঐ দলিলগুলি সরকারী দপ্তর হইতে চুরি করান (যোগঃ কর্ম্ম স্বকৌশল!)। ব্যাপার এতদূর গড়াইল যে শেষে এ-বিষয়ের সত্যতা নির্ধারণের জন্ত প্যালেমেন্টের একটি কমিটি নিযুক্ত হয় ও মাসারিক এই কমিটির সম্মুখে অকাটা যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সাক্ষ্য দলিল উপস্থিত করিয়া প্রমাণ করেন যে সেগুলি জাল। কমিটির অতৃপ্তানের সময় মাসারিকের প্রমাণের উত্তরে মন্ত্রী এহরেনটাল বলেন,



প্রাহার রাজপ্রাসাদ—বর্তমানে রাষ্ট্রপতির বাসস্থান

“মশায়, রাজনৈতিক ব্যাপারে অনধিকারচর্চা না করিয়া ভবিষ্যৎশীঘ্র ছোকরাদের ফিলসফি পড়ানই আপনার পক্ষে ভাল হইবে।” মাসারিক উত্তরে বলিয়াছিলেন, “ক্যাবিনেট-মন্ত্রীরূপে একপ মন্তব্য করা আপনার শোভা পায় না; আপনাকে আমি পলিটিক্সে যত নম্বর দিয়াছি, লজিকের পরীক্ষকরূপেও তার চেয়ে বেশী নম্বর দিতাম না।”

তার পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই মহাযুদ্ধের সহায়তায় মাসারিক তাঁহার দেশকে স্বাধীন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার একটি কথায় তাঁহার এ সম্বন্ধীয় কার্যাবলীর মূলনীতি স্পষ্ট হইবে—“সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাই যথেষ্ট নয়, একটি সুচিন্তিত কার্যপ্রণালীই একান্ত আবশ্যক।” মাসারিকের কার্যপ্রণালী হইয়াছিল এইরূপ—মাসারিক অধ্যাপক হওয়ার পর প্রায় প্রত্যেক বৎসর দীর্ঘ ছুটিতে দেশভ্রমণে যাইতেন। চেকোস্লোভাকিয়ায় জাতীয় আন্দোলন খুব প্রবল ছিল, মাসারিক যে ইহার এক জন প্রধান পাণ্ডা তাহাও সকলে জানিত, অষ্ট্রিয়ান গবর্ণমেন্ট তাঁহার উপর সম্বন্ধ দৃষ্টি রাখিতেন। কিন্তু মাসারিক যখন বিজ্ঞানচর্চার জন্ত বিদেশে যাইতেছেন এরূপ ভান করিতেন। দর্শনশাস্ত্র ও তৎসম্বন্ধে অগাধ বিষয়ের বড় বড় বিদেশীয় অধ্যাপকদের সঙ্গে তিনি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পত্রালাপ ও লেখা আদান-প্রদান করিতেন। তার পর সেই সব দেশে নিজে গিয়া এই পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ করিতেন। এক জনের সঙ্গে

ভাল আলাপ হইলে এদেশে পাঁচ জনের কাছে পরিচয় ও সুপারিশ মিলে। এক জন নামজাদা বা প্রতিষ্ঠাবান লোকের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারিলে, সমশ্রেণীর দশ জনে স্বতঃই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করে, ব্যক্তিগত পরিচয় নিকটতর হইলে সম্মানও গভীরতর ও বৃহত্তর হয়। অবশ্য, ইহা জুয়াচুরি ধাঞ্চাবাজির দ্বারা হয় না, বাস্তবিক যোগ্যতা ও চরিত্রবল থাকা চাই এবং মাসারিকের ইহা খুবই ছিল। সেই জন্ত তিনি পণ্ডিত-মহলে সর্বত্র সুপরিচিত হইলেন।

বিদেশ হইতে বহুতার আহ্বান আসিতে লাগিল। দর্শন ছাড়া অল্প বিষয়ের পণ্ডিতদের সঙ্গে ও সেই সূত্রে অল্প বিদ্যাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হইল। এইরূপে বিজ্ঞানের সূত্রে বিদেশের যোগ্য লোকদের মধ্যে তিনি একটি বিশ্বস্ত হিতৈষী-চক্র সৃষ্টি করিলেন। তার পর বিজ্ঞান ছাড়িয়া কাজের কথা অর্থাৎ দেশ স্বাধীন করিবার কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার কাজ চলিতে লাগিল। যুদ্ধ আরম্ভের পর তিনি দেশত্যাগ করিয়া প্যারিসে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন ও আমেরিকা, ইংলণ্ড, ইটালী, রুশিয়া প্রভৃতি ঘুরিয়া পূর্নাক্ষিত প্রতিষ্ঠার বলে উচ্চতম রাষ্ট্রচক্রে গতয়াত করিয়া নিজ দেশের স্বাধীনতায় সকলকে রাজি করাইলেন ও শেষে সকলের কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করিলেন যে, চেকোস্লোভাকিয়া যদি জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ করে তবে যুদ্ধ সমাপ্তির পর মিত্রশক্তির (Allied Powers) চেক স্বাধীনতা গ্যারান্টি করিতেছেন। বিদেশে থাকিলেও তাঁহার এবং তাঁহার দলের সম্বন্ধে অষ্ট্রিয়ান সরকার সর্বদা বহু সতর্ক থাকিতেন, তৎসম্বন্ধে তিনি দেশস্থ দলের সহিত বহু চাতুরীতে নিরন্তর যোগসূত্র রক্ষা করিয়া, দেশের ভিতরের ব্যাপার সুকৌশলে পরিচালনা করাইয়া দেশে বিদ্রোহ প্রকাশ করাইলেন। অষ্ট্রিয়ান গবর্ণমেন্ট ইহাতে বিপদগ্রস্ত হইলেনও

নিজেদের অধিকার ছাড়িলেন না, একটু বেশী ক্ষমতা দিয়া চেকদের ঠাণ্ডা রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মাসারিকের পরিচালনায় দেশবাসী এই নূতন ক্ষমতা অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে লাগিল। তার পর মাসারিক চেকদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া অষ্ট্রিয়ান রাজত্ব অস্বীকার করিলেন ও প্যারিসে নিজেদের জাতীয় প্রতিশনাল গবর্ণমেন্ট স্থাপন করিলেন। বিদেশবাসী চেকদের দলবদ্ধ করিয়া তাহাদের দ্বারা এই প্রতিশনাল গবর্ণমেন্ট তিনি স্বীকার করাইলেন, তাহাদের চাদায় এই গবর্ণমেন্টের ও দেশের বিজ্রোহের খরচ চলিতে লাগিল। বিদেশবাসী চেকদের একটি রেজিমেন্ট গঠন করিয়া ও তাহা-দিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দিয়া অষ্ট্রিয়া-জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে পাঠাইলেন। অষ্ট্রিয়ার অধীন ও অষ্ট্রিয়ার বেতন-ভোগী যে-সকল চেক সৈন্তে কশিয়া, ফরাসী ও ইটালীয়ান সীমান্তে মিত্রশক্তিদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেছিল তাহাদের অনেক রেজিমেন্ট তাঁহার প্ররোচনায় নিজ দল ছাড়িয়া রাতে সীমান্ত পার হইয়া মিত্রশক্তিদের পক্ষে যোগ দিয়া অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করিতে লাগিল। প্যারিসের প্রতিশনাল চেক-গবর্ণমেন্ট মিত্রশক্তির ও স্বীকার করিলেন ও যুদ্ধ-অবসানের পর পূর্ব ব্যবস্থা মত মাসারিকের দেশ স্বাধীন হইল। মাসারিকের এই সব কাজে তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন ডক্টর বেনেশ। বেনেশও চেক ইউনিভার্সিটিতে সমাজতন্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন,

যুদ্ধের সময় ক্রাম্পে ছিলেন প্যারিসের প্রতিশনাল গবর্ণমেন্টে। পরে স্বাধীন চেকোস্লোভাকিয়ার মন্ত্রীসভায় মাসারিক বেনেশকে তাঁহার পররাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত করেন। বেনেশ নিজে চাষার ছেলে।

যে দীর্ঘকাল মাসারিক প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন সে সময়ে তাঁহার সভাপ্রিয়তা, জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতায় দেশের সকলের অচল শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার দীর্ঘ ঋজু দেহে, মুখের প্রত্যেক রেখায় তাঁহার সরলতা, দৃঢ়তা ও চরিত্রবস্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আজ জীবনের সন্ধ্যায় তিনি কণ্ঠ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শহরের বাহিরে বাস করেন, তাঁহার স্বাস্থ্য ও জরায়ুশ্রেষ্ঠা ভাঙিয়া আসিতেছে। দেশে বাড়ীতে ঘরে ঘরে তাঁর মূর্তি ও ছবি, ইহা ফাসিষ্ট ডিক্টেটরের প্রতি ভয়প্রসূত নয়, “আমাদের দেশের উদ্ধারকর্তা ও প্রথম প্রেসিডেন্টের” প্রতি দেশবাসীর সহজ শ্রদ্ধার পূজোপহার।

মাসারিকের প্রবাসকালে তাঁহার স্ত্রী দেশেই ছিলেন, স্বামী প্রেসিডেন্টরূপে কাজ করবার কিছু দিন পরে স্ত্রী মারা যান। ইহাদের দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে। বড় ছেলেটি চিত্রকর ছিল, যুদ্ধের সময়ে লড়াইয়ে গিয়া টাইফয়েডে মারা যায়। ছোট ছেলেটি এখন লণ্ডনে চেকোস্লোভাকিয়ার রাজদূত। বড় মেয়েটি অবিবাহিতা, এখানকার রেড-ক্রসের সভাপতি। ছোট মেয়েটির জেনিভাতে বিবাহ হইয়াছে।

চৈত্র-বেলা

শ্রীমতীশ ঘটক

আমার বাগানভরা প্যাঙ্গি পপি ভালিয়ার মেলা,
আমার আকাশ'পরে করোজ্জল অরুণের খেলা,
আমার বাতাসে কত জুঁই বেলা চামেলীর জ্বাণ,
আমার অপরাজিতা নিত্য আনে সুনীল আস্থান।

আমার পাখীরা সব ভিড় ক'রে ওড়ে আশেপাশে,
বুঁটিওলা লক্কা দুটি আমারেই বেশী ভালবাসে।
দোবাজ, লোটন জোড়, ঘাড়কুলা মক্ষি তার সাথে,
আপন হেমাকে তারা আকাশে পাষণ-কারা গাঁথে।

ও বাড়ীর বুলবুল, মাঝে মাঝে সেও আসে কাছে,
শাপেদার ফাটলেতে ষত ঝিঁঝিঁ বাসা বাধিয়াছে।
একঘেয়ে সারিগানে চৈত্র-বেলা করে স্বপ্নাতুর;
থমকি দাঁড়ায়ে শোনে কাঠবেড়ালীরা সেই স্বব।

আমিও চমকি চাহি। দিগন্তে দিনের চিতাধূম
নিবে আসে। নেমে আসে তোমার জ্বালাঢাকা ঘুম।

রক্ষাকবচ

শ্রীসীতা দেবী

লক্ষ্মীদেবীর ও শনিঠাকুরের বিবাদ চিরপ্রসিদ্ধ। দেবী বাহার উপর কৃপা করেন, অল্পদিনের মধ্যেই শনির দৃষ্টি পড়ে তাহার উপর; চতুর ঠাকুরটি সর্বদাই ছিদ্ৰ খুঁজিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করেন কেমন করিয়া সেই মাহুঘটার সর্বনাশ করিবেন।

মিত্র-বংশের উপর এত দিন কমলার হৃদয় অচলা হইয়া ছিল। জিলোচন মিত্র নিজের চেষ্টায় বিষয়সম্পত্তি গড়িয়া তোলেন। তাঁহার তিন ছেলে—বংশলোচন, বামলোচন আর কমললোচন। তিন জনেই মাহুঘ হইয়া উঠিয়াছেন, এবং পৈতৃক সম্পত্তি উড়াইয়া না দিয়া বরং আবণ্ড ধন-ঐশ্বৰ্য্যে সংসার-তরঙ্গীটিকে বোঝাই করিয়া তুলিতেছেন। বংশলোচন পৈতৃক কারবারটি দেখাতনা করেন, বামলোচন ওকালতী করিয়া বেশ দু-পয়সা ঘরে আনিতেছেন, গৃহিণীর নামে তেজারতির ব্যবসারটাতেও প্রচুর পয়সা উপায় হয়। কমললোচন ভাতার, তাঁহারও পসার-প্রতিপত্তি কিছুমাত্র কম নয়।

মা-যজ্ঞীর কৃপা কিন্তু এ-বংশের উপর খুব বেশী নয়। বংশলোচনের একটি মাত্র ছেলে, বামলোচনের একটি ছেলে একটি মেয়ে, কমললোচনের নামে দুটি ছেলে বটে, তবে ছোটটি বিকলাঙ্গ, জন্মাক্ষ। সে শুধু পিতামাতার মনস্তাপের কারণ হইয়া সংসারে বাঁচিয়া আছে।

‘হঠাৎ কোন্ ছিদ্রপথে শনিঠাকুর এই সংসারে প্রবেশ করিলেন বলা যায় না। বামলোচনের মেয়ে সুষমা ভরা-বোবনে বিধবা হইয়া বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বংশলোচনের ছেলে বিনয় ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া এমন সাংঘাতিক আঘাত পাইল যে তাহাকে আর রাখা গেল না।

বাড়ীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। যক্ষিও তাঁহার। একান্তবর্তী ছিলেন না, তবুও পৈতৃক বসতবাড়ী তিন ভাগে

বিভক্ত করিয়া পাশাপাশিই বাস করিতেছিলেন। কলি-যুগের রাম লক্ষণ না হইলেও ভাইয়ে ভাইয়ে এখনও মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয় নাই। জায়ে জায়ে ঝগড়া-বিবাদটাও খুব প্রবল ছিল না, কারণ তিন জনেবই অবস্থা প্রায় এক রকম, কাহাকেও অপরের ঐশ্বৰ্য্য দেখিয়া জলিয়া মরিতে হইত না।

দুপুর বেলা। কমললোচনের গৃহিণী হৈমবতী মেঝের উপর শীতলপাটি পাতিয়া শুইয়া আছেন। তাহার পাশে বসিয়া একটি প্রোচা বিধবা মাথার চুলে বিলি দিয়া তাহাকে আরাম দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই মাহুঘটি হৈমবতীর বাপের বাড়ীর দূবসপর্কের আত্মীয়া, তাঁহার আশ্রয়েই বাস করেন, সংসারের কাছে সাহায্য করেন।

হৈমবতী খানিক এ-পাশ ও-পাশ করিয়া হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, “নাঃ, এ পোড়া চোখে আর ঘুম আসবে না।”

কামিনী ঠাকুরাণী বলিলেন, “ওমা, এর পর শরীর ভেঙে পড়বে যে? কাল পরশু দু-দিন দু-রাত ত চোখে-পাতায় এক কর নি। এ রকম করলে চলবে কেন?”

হৈমবতী বলিলেন, “এ সব কি আর মানুষের হাতে ধরা গা? যুমুতে চাইলেই ঘুম আসবে কেন? ভয়ে বুকের রক্ত জল হয়ে আসছে না? পাশে দুই ঘরে এই সব কাণ্ড, আমারই বরাতে কি আছে কে জানে? মনে মনে খালি মঃ-মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকছি। কখনও কারও অনিষ্ট করি নি বাপু, কিন্তু তা বললে শুনছে কে? ঐ দেখ আমার অদৃষ্টের নমুনা।

অন্ধ বিমল এমন সময় খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। বলিল, “খিদে পেয়েছে।”

তাহার মা বলিলেন, “দাও ত গা ওকে গোটা দুই আম। এখন এ মাসটা এর কষ্টেই যাবে। অশুচের মধ্যে

খালি খাই খাই করবে, মাছ ছাড়া ত এ ছেলের মুখে এক গ্রাস ভাত ওঠে না।”

কামিনী উঠিয়া গেলেন বিমলকে আম দিতে। সে আম লইয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে বাহির হইয়া গেল। ছেলেটির বয়স প্রায় কুড়ি, কিন্তু দেহ-মন দুই-ই বালকের মত। বুদ্ধিবৃত্তিরও বিশেষ বিকাশ হয় নাই।

কামিনী আবাব ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “আচাষ্য মশাইয়ের কাছে লোক পাঠাবে বলেছিলে, তা পাঠালে না?”

হৈমবতী বলিলেন, “কখন পাঠাই বল। সকাল থেকে দিমির কাছ ছেড়ে কি নড়তে পেরেছি? হতভাগীর কি কপাল মাগো মা! পেটে ধরল ঐ মোটে একটা, এত বড়টা হ’ল, কত সাধ-আহ্লাদ ক’রে এই গেল বছর বিয়ে দিল, আর দেখ এখন দশা! বো আবাগীরই বা কি অদেট।”

কামিনী বলিল, “পোয়াতী, না?”

হৈমবতী বলিলেন, “এই ত সামনের মাসে ছেলে হবে। ঘটা ক’বে মেয়েকে নিয়ে গেল বুড়োবুড়ী, বলে হ’লেই বা আমাদের পাড়াগাঁ, তাই ব’লে প্রথম পোয়াতী মেয়ে বাপের বাড়ী আসবে না?”

কামিনী বলিলেন, “এখন একটি বেটাছেলে হয় তবে না বংশটা থাকে।”

দরজার বাহিরে পাড়াইয়া এক জন চাকর গলা খাঁকারি দিয়া বলিল, “বড দাদাবাবু গোটা তিন টাকা চাইছেন মা।”

হৈমবতী বলিলেন, “তাকে ডাক দিকি এখানে, খালি টাকা আর টাকা। এই ছুপুর রোদে কোথায় বেরবে সে?” চাকরটা চলিয়া গেল।

হৈমবতীর বড়ছেলে অমলের বয়স প্রায় পঁচিশ হইতে চলিল। ছেলেটি কেমন ঘেন অস্থিরমতি। সে একবার গেল এম-এ পড়িতে, আবার গিয়া আইন পড়িতে ছুটিল। মাস পাঁচ-ছয়ের বেশী তাহাও অমলের ধাতে সহিল না, কারবারে শিক্ষানবিশী করিতে সে জ্যাঠামহাশয়ের দোকানে গিয়া ভিড়িল। ঘরে খাইবার-পরিবার কোনো ভাবনা নাই, বাপ এখনও দিব্য কর্মকম আছেন, নিজেরও সংসার হয় নাই, কাজেই উড়িয়া উড়িয়াই তাহার দিন কাটিয়া যাইতেছে।

মায়ের ডাকে অমল ভিতরে আসিয়া দরজার কাছে পাড়াইল। বলিল, “ডাকছ কেন?”

হৈমবতী বলিলেন, “তুই এই ছুপুর রোদে কোথায় যাচ্ছিল শুনি? খালি পায়ে যাবি বা কি ক’রে?”

অমল বলিল, “গাড়ী ভাড়া ক’রে যাব বলেই ত টাকা চাচ্ছি। আমায় পরেশের গুণানে এক বার যেতেই হবে।”

মা বলিলেন, “বাড়ীতে এই বিপদ, আর এখন পরেশ-নরেশ ক’বে হৈ হৈ ক’রে বেড়াবি? লোকেই বা বলে কি? তোর জ্যাঠাইমার কাছে ত আজ সকাল থেকে একবারও যাস নি?”

অমল বলিল, “আমি গিয়ে আর তাঁর কি স্বর্গে বাতি দিয়ে দেব? যা হবার তা ত হয়ে গেছে, দাদা ত আর ফিরবে না।”

মা বলিলেন, “তবু সমাজের নিয়ম মেনে ত চলতে হবে? অগুচের সময় কেউ লোকের বাড়ী বাড়ী ঘোরে না।”

অমল বলিল, “তা আমি চক্ৰিশ ঘণ্টা ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে পারব না। আর যা বাড়ীর আবহাওয়া হয়েছে, কান্নার শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। নিজেই বেঁচে আছি কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছে।”

মা শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ঘাট, ঘাট কি যে বলিস্ তার ঠিক নেই। নে বাপু, তোর টাকা নিয়ে যেখানে খুশী যা। রোদে টো-টো করবি না কিন্তু।”

“আচ্ছা”, বলিয়া টাকা লইয়া অমল চলিয়া গেল। সে স্থবী প্রকৃতির মানুষ, নিজের আরামের উপর অগতের কোনো জিনিষকে স্থান দেয় না। বাড়ীর এই শোকের আবহাওয়া, নিরস্তর কান্নাকাটি, দীর্ঘখাস, তাহার ধাতে সহিতেছিল না। তাই কোনোমতে বাড়ী হইতে পলাইয়া গিয়া সে ঝাটিল। সিনেমায় যাইতে পারিলে মনটা সত্য সত্যই হাল্কা হইত, কিন্তু সেখানে যদি কেহ তাহাকে দেখিতে পাইয়া মাকে বলিয়া দেয়, তাহা হইলে আবার বকাবকির সীমা থাকিবে না। অগত্যা পরেশের বাড়ী গিয়া তাস খেলিয়া দিনটা কাটাইয়া দিয়া আসিবে স্থির করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া যাইতেই হৈমবতী উঠিয়া পড়িলেন। এক জন চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, “যা ত নারান আচাখি মশায়ের বাড়ী; আমার নাম করে বলবি যে সম্বন্ধে নাগাদ একবার নিশ্চয় যেন আসেন। বিশেষ দরকার।”

কামিনী বলিলেন, “এক গেলাস সরবৎ করে আনি দিদি? সকাল থেকে ত দু-গ্রাস ভাত-ভাত ছাড়া মুখেও কিছু দিলে না।”

গৃহিণী বলিলেন, “তা দাও। মনটা বড় উতলা হয়ে রয়েছে বোন। এ একটির মুখ চেয়ে বেঁচে আছি এ সংসারে।”

কামিনী সরবৎ আগেই ভিজাইয়া রাখিয়াছিলেন। এখন দুইটি পাখরের গেলাস আনিয়া চালিয়া চালিয়া তাহা মিশাইতে লাগিলেন। বলিলেন, “বিয়ের ষ্টিয়া ছেলে হ’ল, বিয়ে দাও না কেন? ঘরে মন বসবে কেন? যখনকার যা তা ত চাই?”

হৈমবতী বলিলেন, “আমি ত দিতেই চাই, ওর বাপই মত করে না। বলে এখনও কাজকর্ম কিছুর ঠিক নেই, সাত-তাড়াতাড়ি বিয়ে কেন?”

কামিনী বলিলেন, “তাতে কি? তোমার ছেলে-বোয়ের কি ভাত ছুটবে না? এত সব কার জন্তে? পুরুষমানুষদের স্বভাবই ঐ, কোনো জিনিষ তারা সোজা চোখে দেখবে না। আমার স্বপ্তর ছিলেন ঠিক ঐ ধাতের। দেওর হোঁড়াটা বি-এ পাস করতে পাবলে না, তা আর কিছুতেই তার বিয়ে দিলেন না। অথচ ঘরে খান-চাল ত ছিল, দু-মুঠো খেতে নিশ্চয়ই পেত। তাতে লাভটা কি হ’ল শুনি, ছেলেটা একেবারে বয়ে গেল না?”

হৈমবতী সরবৎ খাইয়া মেঝেতে গেলাসটা নামাইয়া দিয়া বলিলেন, “দেখি আবার বুঝিয়ে স্বজিয়ে। মেয়ে ত আমি এক রকম পছন্দ করেই রেখেছিলাম, নেহাৎ ও’র ‘অমতে এগোতে সাহস পাই নি।’

কামিনী বলিলেন, “ঐ পলাশপুরের মেয়ে ত? রং কিন্তু তার ফরসা না দিদি, এদের পছন্দ হ’লে হয়। তোমাদের বড় বোয়ের পাশে দাঁড়াতে পারবে না। আমি অবিশ্রি সে মেয়েকে ছোট দেখেছি, বয়সকালে আর একটু রঙের জলুপ হবে, তা হ’লেও কতই বা?”

গৃহিণী বলিলেন, “রাখ’ তোমার বং বাপু। রং নিয়ে ত বড়বো’ কতই করলেন, বহর না যেতে হাতের নোয়া ঘুচে গেল। পলাশপুরের ওদের বংশে পাঁচ পুরুষে কেউ বিধবা হয় নি জান? সব বঁটা বৌ মাখায় সিঁদুর নিয়ে চিতায় উঠেছে। ওর ঠাকুরমা সহমরণে গেছে, ঠাকুরদাদার দুই কাকী সহমরণে গেছে। ও-বরের মেয়ে পয়মন্ত হবে তোমার ব’লে দিলুম। আমি রূপও চাই না, টাকাও চাই না। আমার যা আছে তাই কে খায় তার ঠিকানা নেই।”

কামিনীর গায়ের রংটা ফরসা বটে; এজন্য তাঁহার মনে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার অনেকটাই ছিল, যাহাদেয় রং কালো তাহাদের তিনি বীতিমত রূপার চক্ষে দেখিতেন। বৌ, বি, নিজেদের বাড়ীরই হোক বা পাড়াপড়শীর ঘরেরই হোক, তাঁহার সমালোচনার হাত হইতে কখনও নিষ্কৃতি পাইত না। খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রত্যেকের রূপের বিচার কবিত্তে কামিনীর জুড়ি ছিল না। তবে বিধবা ও পরের অশ্রিতা বলিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে মাঝপথে রাশ টানিতে হইত। হৈমবতীর নিজের রং ফরসা নয়, উজ্জ্বল শ্রামবর্ণ বড়জোব বলা চলে। তাই যখনই কামিনী ফরসা রঙের ওকালতী করিতে মাতিয়া উঠিতেন, হৈমবতী প্রায়ই মাঝপথে তাঁহাকে ধমাইয়া দিতেন।

এবারও কামিনীকে খামিয়া যাইতে হইল। গেলাস দুইটা উঠাইয়া লইয়া তিনি ঘব হইতে চলিয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন, “দিদির এক কথা, কালো রং হ’লেই পয়মন্ত হয় আর কি!”

বেলা গড়াইয়া আসিতেছিল, বিকাল বেলায় কাজ আবার ধীরেস্থানে আরম্ভ হইতেছে। অবশ্য, এই সব ছুটিনার জন্ত সকলেই যেন একটু মুগ্ধাইয়া পড়িয়াছে, বি-চাকরস্ব স্ব একটু মনমরা।

বাহিরের দালানটায় বাগতি বাগতি জল চালিয়া ক্ষেমা-বি ঝাঁটা চালাইতেছিল। এইখানে বসিয়া সারাটা সন্ধ্যা হৈমবতী কাটান, ঘরের ভিতরের পাখার হাওয়া তাঁহার ভাল লাগে না। বহুকাল যে শ্রামল পল্লীভবন তিনি ছাড়িয়া আসিয়াছেন, সেই বালিকা বয়সের স্থিতি আবার তাঁহার জাগিয়া উঠে। সেখানে এমনি দাওয়ায় বসিয়া ঝিরঝিরে হাওয়ায় দেহ-মন কেমন জুড়াইয়া যাইত।

কামিনী-ঠাকুরাণী বলিলেন, “নে বাছা শীগগির ক’রে।”

ক্ষেমা বলিল, “শীগগির নেব কি মাসীমা, দেখচি নি কেমন হয়ে আছেন, যেন রাবণের চিতে। ঘড়া ঘড়া জল ঢালতেছি ত তখুনি হস্ ক’রে শুষে যাচ্ছেন।”

“রোদ ত পড়ে এল,” বলিয়া কামিনী ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকিয়া গেলেন। একরাশ ফল কাটিয়া বাছিয়া রাখিতে হইবে, বড়-কর্তার বাড়ীতে ত হাঁড়ি চড়ে না, এ তিন দিন এ-বাড়ী হইতেই ফল, দুধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বাইতেছে। ঐ বাওয়া পর্যন্তই, পুজ-শোকাভূরা গৃহিণী কিছুই মুখে দেন না, কর্তাকে বলিয়া কহিয়া সকলে একটু ছুধ তবু খাওয়াইয়া দেয়, আর সব জিনিষ একেবারে ফেলা যায়। কামিনী একটু ভোজনবিলাসী মানুষ, পোড়া বৈধব্যের জালায় সংসারের অর্ধেক জিনিষ ত তাঁহার মুখে দিবারই জো নাই, কিন্তু বাহাও বা খাইতে পারেন, তাহাও চোখের সামনে এমনি করিয়া নষ্ট হইতে দেখিলে তাঁহার সর্বদা জালা করে। কিন্তু পরের জিনিষ, তাঁহার বলিবার মুখ কোথায়? এত এককাঁড়ি না পাঠাইলে কি চণ্ডী অন্তঃস্থ হয়?

বাহিরে খড়মের খটখট শব্দ শোনা গেল। আচার্য্য মহাশয় নারায়ণের সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কামিনী ভাঁড়ার-ঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, “দিদি, আচার্য্য-মশায় এসেছেন গো।”

হৈমবতী শুইবার ঘর হইতে উত্তর দিলেন, “দালানে আসন দাও, আমি যাচ্ছি।”

“অ. মর, ক্ষেমীর কাজ দেখ, এখনও জল সপ্ সপ্ করছে,” বলিয়া কামিনী বাহির হইয়া আসিয়া পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। “গুলো এখনটা চট্ ক’রে মুছে দে।”

ক্ষেমা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া দালানের একটা কোণ মুছিয়া দিল। কামিনী আসন পাতিয়া ব্রাহ্মণকে বসাইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আবার নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

হৈমবতী আসিয়া আচার্য্য মহাশয়কে যথাবিধি প্রণাম করিয়া আর একখানা আসনে বসিলেন। বলিলেন, “মন বড় উত্তলা হয়ে আছে, আশীর্বাদ করুন যেন সংসারে সব ক’জনকে রেখে যেতে পারি।”

আচার্য্য বলিলেন, “তা ত করছিই মা, দিনরাত ঠাকুবকে ডাকছি। তা যে স্বস্ত্যয়নটার কথা বলেছিলাম, তাতে মত আছে কি?”

হৈমবতী বলিলেন, “আমার অমত কিছু নেই। কর্তার ধরণ জানেন ত, সাহেবী চাল তাঁর সব, তবু আমার কাজে বাধা দেন না তিনি। কিন্তু শ্রাদ্ধশাস্তি না হ’য়ে গেলে ত সে-সব হবে না। তত দিন অমল বিমলের জন্মে মাছুলি কি কবচ কিছু দিলে হয় না? এখনই ধারণ করতে পারে।”

আচার্য্য মহাশয় বলিলেন, “তা নিয়ে দিতে পারি। খরচটা দিয়ে দিও।”

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া, গুটিকতক টাকা লইয়া এবং অশেষ আশ্বাস দিয়া পুরোহিত-ঠাকুর বিদায় হইয়া গেলেন। কর্তার ফিরিবার সময় হইয়াছে, গৃহিণী ফিরিয়া গিয়া শুইবার ঘরখানা শুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন। যতই ঝি-চাকর রাখ, কোন কাজ ঠিকমত হইবার উপায় নাই। ঘরের মেঝেতে দুই ঘা ঝাঁটা লাগাইয়া তাহারা প্রস্থান করিবে, জিনিষপত্রে তিন কাঁড়ি ধূলা জমিয়া থাকিলেও চাহিয়া দেখিবে না। কমললোচন আবার পিটপিটে মানুষ, সারাদিন খাটিয়া সন্ধ্যায় আসিয়া ঘর-দোর নোংরা দেখিলে তাঁহার আব রাগের সীমা থাকে না।

মাঝে দুই-তিন দিন পারিবারিক দুষ্টনার খাতিবে তিনি বাহিরে বাইতে পারেন নাই, কিন্তু আর বসিয়া থাকা চলে না। বোগীরা ক্রমাগত তাগাদা দেয়, নুতন ‘কল্’ ফিরিয়া যায়, এ সব দেখিয়া আর কাঁহাতক সন্ত হয়? তাহা ছাড়া ভাস্কর কর্তব্যপারায়ণ মানুষ, বাহাদুরের জীবন-মরণের ভার হাতে লইয়াছেন, তাহাদের এমন করিয়া উপেক্ষা করা অন্তর্চিত তাঁহার মতে। আজ তাই সকালেই একটু জলযোগ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।

হৈমবতী ঘর-দোর ঠিকঠাক করিয়া চা ও বৈকালিক জলযোগেব আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলেন, কামিনীও আসিয়া যোগ দিলেন। জামাইবাবু মানুষ ভাল, কামিনী তাঁহাকে যথাসাধ্য যত্ন আদর করিতেন। দিদিও যে ভাল নয় এমন কথা তিনি বলেন না, তবে একটু যেন বেশী কঠোর প্রকৃতির, তাঁহার কাছে পান হইতে চুপ খসিবার জো নাই। এতটা আবার আজকালকার দিনে না করিলেও চলে। জামাইবাবুও এই লইয়া কত ঠাট্টা করেন।

ডাক্তারের মোটর আসিয়া বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। চাকর ভাড়াভাড়ি ছুটিয়া গিয়া তাঁহার ব্যাগ নামাইয়া লইল। সেটা তাঁহার বাহিরের রোগী দেখিবার কামরায় রাখিয়া, আবাব পিছন পিছন ছুটিল ভিতরের ঘরে, কর্তার জুতা খুলিয়া দিল, পোষাক ছাড়াইয়া দিল। অন্তঃপর হৈমবতী আসিয়া স্বামীসেবার মনোনিবেশ করিলেন। কামিনী আর কেমা জলখাবার সাজাইয়া-গুছাইয়া দিয়া গেলেন, গৃহিণী বসিয়া খাওয়ার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

কমললোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ বৌঠাকরুণকে কিছু খাওয়াতে পারলে?”

হৈমবতী বলিলেন, “কই আর খেল, কত ধরাধরি ক’রে তবে সববতের গেলসটা মুখের কাছে তুলেছিল, তখনই আবার চীৎকার ক’রে কঁদে শুয়ে পড়ল। খেতে কি আর মুখে রোচে গো, এমন জ্বাতে ঘাও ভগবান দিলেন। সাতটা না, পাঁচটা না, ঐ একটি ছিল সম্বল।” বলিতে বলিতে তাঁহার নিজের গলাও ধরিয়া আসিল।

তাঁহার স্বামী বলিলেন, “বঁচে থাকতে হ’লে না-খেলে চলবে কেন? সমসারে থাকতে গেলে এ-সব সহিতেই হয়।”

হৈমবতী বলিলেন, “তা ত বটে, মাল্লবে কি না সহিছে বল? তবু মায়ের মন সহজে মানে না, এখনও দু-চার দিন সময় নেবে।”

কমললোচন বলিলেন, “পুঁটু কেমন আছে?”

হৈমবতী বলিলেন, “সে তবু দু-চার গ্রাস আজ খেয়েছে, মেজগিরা নাকি তাকে নিয়ে শীগগিরই তীখি করতে যাবে।”

কর্তা বলিলেন, “তা যাক, ঘুরলে ফিরলে শরীর মন দুই-ই খানিক ভাল থাকবে। ছেলেরা কোথায়?”

হৈমবতী বলিলেন, “বিমলকে রতন ছাতে নিয়ে গেছে। আর অমল কিছুতেই বাড়ীতে থাকতে চাইল না, তার বন্ধু পরেশের বাড়ী গেছে। বললুম এমন দিনে বেরতে নেই, তা কে কার কথা শোনে?”

অমলের বাবা বলিলেন, “ছেলেটার কবে যে মতি স্থির হবে তা জানি না। বয়স ত পঁচিশ পার হ’ল, এখনও কোন দিকে ভিড়ল না। আমি ত চিরকাল বাঁচব না, এর পর ক’রে খেতে হবে ত? বিমলকেও দেখবার আর কেউ নেই।”

হৈমবতী বলিলেন, “আমি বচ্চি বিয়েটা দিয়ে দেওয়া যাক। যাড়ে চাপ পড়লে নিজে খেতেই মতিগতি বদলাবে, খীর শাস্ত হ’তে শিখবে।”

কমললোচন বলিলেন, “দেখ যা বোঝ কর, চারি দিকের মধ্যে শুনে আর এ-সব বিষয়ে উৎসাহ হয় না।”

স্বামীকে নিমরাজী মত্ত দেখিয়া হৈমবতী আরও তাগিয়া ধরিলেন, বলিলেন, “ওসব ভাগ্যের কথা, যার কপালে যা আছে। আজ আচাঘি-মশায়কে দুটো রক্ষাকবচের জন্তে ব’লে দিলুম, দুই ছেলের জন্তে। আর পলাশপুরের ঐ মেয়েটি আমার বড় পছন্দ, ওদের বংশে একটুও খুঁৎ নেই। আজও ওদেশে ওর ঠাকুবমা, আইমাম নামে লোকে নমস্কার করে। এমন সতীলক্ষ্মী ক’টা শুক্টিতে আছে? ও বংশের মেয়ে পয়মস্ত হবে, দেখে নিও। মেয়ের নামও রেখেছে সাবিত্রী। আমাদের ঘরে এমন মেয়েই দরকার।”

কমললোচন একটু হাসিয়া বলিলেন, “মেয়ের নাম আর ঠাকুবমা, হিদিমা দেখলেই ত হবে ন, আরও অনেক জিনিষ দেখবার আছে।”

হৈমবতী বলিলেন, “কপ আর নপো ত? ওসব দিকে নজর দিও না বাপু। ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের অভাব কিসের? আর মেয়ের রূপ শ্রামবর্ণ হ’লে কি হয়, মুখে ভারি শ্রী আছে।”

কমললোচন বলিলেন, “কামিনী-ঠাকরুণ ত নাক সিঁটকবেন।”

হৈমবতী মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, “তা আর সিঁটকবেন না? ফরসা রং নিয়ে ত কতই কলেন, পরের দোব ধ’রে পড়ে আছেন।”

কর্তা বলিলেন, “চুপ, চুপ, শুনতে পেলে মনে কষ্ট পাবে।”

গৃহিণী বলিলেন, “সে যাক গে এদিকের এ-সব চুকে-মুকে গেলে আমি তাহলে লোক পাঠাই পলাশপুরে? ঠিক-ঠাক করতে সময় ত লাগবে?”

কর্তা বলিলেন, “আর কিছু দিন যাক না? এই এমন দুটো দুর্ঘটনা ঘটে গেল, এখনই আবার বিয়ের ধুম কি বাড়ীতে মানাবে?”

গৃহিণী বলিলেন, “না গো তুমি আর বাগ্‌ড় দিও না। এই বিয়েটা হয়ে গেলে আমি যেন একটু নিশ্চিন্ত হই।

ছেলের জন্তে আমার সারাদিন বুক ধুকধুক করছে। মেয়েটির কুণ্ডলি ভারি ভাল। জন্ম-এছোত্বী থাকবে ও।”

কর্ত্তা আর কিছু বললেন না। চায়ের পেয়ালা শেষ করিয়া, ইঞ্জিচেয়ারে গিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। চাকর নারায়ণ আসিয়া গড়গড়াটি রাখিয়া গেল।

হৈমবতী আবার একটু এদিক-সেদিক ঘুরিয়া আসিলেন, বড়-জা তেমনই পড়িয়া আছেন, দেশ হইতে তাঁহার বিধবা দিদি আসিয়া পৌছিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া দুর্ভাগিনী জননীর অশ্রুস্রোত আবার উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। মেজ-জায়ের মেয়ে পুঁচু আজ যেন একটু শান্ত, দুপুর বেলা খাইয়া-দাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে, বোধ হয় সুমাইয়া আছে। তাহাকে আর কেহ তোলে নাই।

পরদিনই আচার্য মহাশয় কবচ ছুটি দিয়া গেলেন। যথানিয়মে, যথাকালে হৈমবতী কবচ ছুটি ছেলেদের পরাইয়া দিলেন। অমল প্রথমে যথেষ্ট আপত্তি করিল, কিন্তু মায়ের চোখেব জলের কাছে তাহাকেও অবশেষে হার মানিতে হইল। আচার্য মহাশয় বলিয়া গেলেন, কবচ ভারি শক্তিশালী, ধারণকারী কোনো অনিষ্ট কোনো দুঃখ গ্রহে করিতে পারিবে না। হৈমবতী এত দিনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল, বিনয়ের প্রাক্কথান্ধিতও অবশেষে চুকিয়া গেল। বড় গৃহিণী আর তত কান্দেন কাটেন না, মাঝে গিয়া একদিন অন্তঃসত্ত্বা পুত্রবধূকে দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিনয়ের শেষচিকুটুকু দেখার আশায় যেন উদ্গীর্ব হইয়া দিন গণিতেছেন। মেজগিন্নী পুঁচুকে লইয়া তিন-চার মাসের জন্ত তীর্থে চলিয়া গিয়াছেন।

পলাশপুরে ত লোক ছুটাছুটির বিরাম নাই। দিন ক্ষণ স্থির হইতেছে, কোণ্ঠী মিলান হইতেছে এবং যতই কেন না হৈমবতী দেনা-পাণ্ডার কথাকে উপেক্ষা করুন, সে কথাও কিছু কিছু হইতেছে।

বিবাহে খুব বেশী ধুমধাম করা সাজিবে না, যাহা না হইলে নয়, সেইটুকুই হইবে। হৈমবতী ইহা লইয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন না, কিন্তু মনে মনে দুঃখ আছে। তাঁহার ঘরে আব ত বিবাহ কোনো দিন হইবে না, এই একটিকে লইয়াই সকল সাধ তাঁহাকে মিটাইতে হইবে।

অমলের এ বিবাহে বিশেষ উৎসাহ নাই।

সে শুনিয়াছে মেয়ে হুন্দরী নয়, আধুনিক মতে শিক্ষিতাও নয়। কিন্তু মায়ের সঙ্গে ত পারিয়া উঠিবার জো নাই? বকিয়া-বকিয়া, কাঁদিয়া, তিনি নিজের মত বজায় রাখিবেনই।

কামিনী-মাসীর কাছে গিয়া একদিন সে বলিল, “তোমরা বুঝি খ্রিস্টসারে মেয়ে আর পেলেন না? কেন কলকাতায় মেয়ে ছিল না?”

কামিনী ঠোঁট উন্টাইয়া বলিলেন, “আমরা কি করব, বাছা? তোমাব মায়ের কথার উপর কথা বলতে গিয়ে কে মুখঝামুটা ধাবে? তাঁর ঐ কালো মেয়েই পছন্দ।”

অমল বলিল, “কি কারণে? কালো মেয়ে তাঁর স্বর্গে বাতি দেবে?”

কামিনী বলিল, “তিনিই জানেন, মেয়ের কুণ্ডলি নাকি খুব ভাল, দিদি তাই দেখেই মজে গেছেন।”

“রাবিশ!” বলিয়া অমল ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বিবাহের দিন ক্রমে অগ্রসর হইয়া আসিল। পাকা দেখার দিন সময় করিয়া কমললোচন একবার গিয়া যথাকর্তব্য করিয়া আসিলেন। মা একবার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখতে-টেখতে চাস নাকি রে? কলু ত তাহ’লে জোগাড় করি।”

অমল রাগ করিয়া বলিল, “আমার দরকার নেই, তুমি বসে বসে দেখ গিয়ে।”

কামিনী আড়ালে হৈমবতীকে বলিলেন, “তোমার ছেলের কিন্তু কনে পছন্দ হয় নি দিদি।”

হৈমবতী রাগ করিয়া বলিলেন, “ওর আবার পছন্দ! কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকলে তবে বুঝত কি জিনিষ আমি ওকে দিচ্ছি। তোমরা পাঁচ জনে ওকে আস্কারা দিও না বাপু।”

কামিনী গালে হাত দিয়া বলিলেন, “ওমা শোন কথা, আমরা কেন আস্কারা দিতে যাব? তোমার ছেলে বললে তাই না আমার বলতে আসা? থাক গে, কাজ কি বাপু আমার এ-সব কথায়,” বলিয়া তিনি ক্ষুব্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কর্ত্তা রাগে থাইতে বসিয়া বলিলেন, “সত্যি মেয়েটির মুখে ভারি একটা শাস্ত ত্রি আছে, দেখলে মায় হুয়।”

গৃহিণী উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, “দেখ আমি বলেছিলাম না ?

কর্তা হাসিয়া বলিলেন, “কিন্তু রং সত্যিই কালো, তোমার চেয়েও কাল।”

গৃহিণী বলিলেন, “তা হোক। করসাদের কপাল দেখে অক্লিষ্ট হয়ে গেছে। কালো আছি আছিই, কিন্তু সংসারে কাবও কাছে আজ অবধি মাথা হেঁট করতে হয় নি। এমনি পর যেন আমার কালো বোয়েরও হয়।”

বিবাহ হইয়া গেল। অমল যখন বৌ লইয়া বাড়ী ফিবি, তখন তাহাকে আগের মত অন্তর্ভুক্ত আর অসন্তুষ্ট দেখাইল না। বাস্তবিক নববধূ মুখখানি দেখিবার মত। যেন মুষ্টিমতী লক্ষ্মীঠাকুরাণী। হৈমবতী নিজের গলার দশ ভরির হার দিয়া বোয়ের মুখ দেখিলেন। বরণান্তে বধূ মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া সমাগতা প্রতিবেশিনীকুলকে বলিলেন, “দেখ দেখি বাপু তোমরা, এ-জিনিষ কেউ নিন্দার বলবে ?”

অন্ততঃ তাঁহার সামনে কেহই নিন্দাব বলিল না। আড়ালে অবশ্য সকলে মন খুলিয়াই কথা বলিল, যাহা হউক হৈমবতী তাহা শুনিতে পাইলেন না।

বিবাহে ধুমধাম হইবে না হইবে না কবিতাও নিতান্ত মন্দ হইল না। অমলের মাতামহের পবিবারটি বৃহৎ, একমাত্র দৌহিত্রের বিবাহে সকলে দল বাঁধিয়া আসিলেন। পাড়া-প্রতিবাসী, আত্মীয়, কুটুম্ব ও বিশেষ বন্ধুর দল, কাহাকেও বাদ দেওয়া গেল না। এ বাড়ীর শোকের আবহাওয়াও এই তিন মাসে খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে। বিধবা পুঁটু জোর করিয়া মনকে বুঝাইয়া পড়াশুনায়ে ডুবিয়া গিয়াছে, সে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে চায়। বড়গিন্নীর একটি কুটুম্ব নাতি হইয়াছে, তাহাকে বকে চাপিয়া তিনি বিনয়ের শোকও ভুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। পুত্রবধূকে আব বাপের বাড়ী যাইতে দেন নাই, থোকা এক মুহূর্ত চোখের আড়াল হইলে তিনি অঙ্কার দেখেন।

বৌ আসার পরদিন ঘটা করিয়াই বউভাত হইয়া গেল। ফুলগাওয়া সেই রাত্রি। রাত দুইটার পর হৈমবতী অনেক কষ্টে ভরঙ্গী ও বালিকার দলকে ঘর হইতে বাহির করিয়া নবম্পতীকে ঘুমাইবার সুযোগ করিয়া দিলেন।

অমল বলিল, “বাপ রে বাপ, কে বলে জীবলোক অবলা ? এদের হাতে পড়ে যা নাস্তানাবুদ হ’তে হয় গোরাপন্টনের হাতেও এতটা হয় না।”

সাবিত্রী কিছু করিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

অমল বলিল, “হাসু কি ? যত উৎপাত সব আমার ঘাড় দিয়ে গেল ব’লে বুঝি ?”

সাবিত্রী বলিল, “না, তা কেন ?”

হঠাৎ জানালার ওপাশ হইতে কে বলিয়া উঠিল, “ওমা, লজ্জাবতী লতা ত বেশ বয়ের সঙ্গে কথা কইছে গো।” সাবিত্রী লজ্জা পাইয়া একেবারে চুপ করিয়া গেল, হাজাব সাধিসাধনা করিয়াও, সারারাতের মধ্যে অমল আর তাহাকে কথা কহাইতে পারিল না।

আত্মীকুটুম্বের দল কিছু বৌভাতের পরদিনই চলিয়া গেল না। মেয়েবা এমন করিয়া সাবানিন নববধূকে ছাঁবিয়া ধরিয়া থাকিত যে বেচারী অমল একেবাবেই আমল পাইত না। রাত্রেও এত লোকের খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শুইতে রাত এগাবটা বাজিয়া যাইত। খণ্ডবশান্তী শুইতে যাইবাব আগে কোনো মতেই সাবিত্রীকে তাহার ঘরে পাঠান যাইত না।

হৈমবতী কাণ্ড দেখিয়া মনে মনে বিবস্ত হইতেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন না, সকলে যে তাঁহারই ঘরে অতিথি ! তাঁহার ইচ্ছা ছিল বৌ ছেলে আরও এবটু মেলামেশা করিবার সময় পায়। মেয়েটি সত্যিই অশেষ গুণবতী, স্বভাবটিও মধুর, ভাল করিয়া পরিচয় পাইলে অমল কখনও এমন জীর অনাদর করিবে না। কিন্তু অমল বেচারী ত জীর ধারেকাছে আসিবারই অবসর পায় না ?

দেখিয়া শুনিয়া একদিন তিনি কামিনীর কাছে বলিলেন, “এর চেয়ে সাহেবদের নিয়ম ভাল বাপু, বিয়ের পর ছুটায় নিরিবিলিতে কোথাও গিয়ে মাসখানেক বেড়িয়ে আসে।”

কামিনী বলিলেন, “ওমা, তোমার আবার এ-সব মেম-সাহেবী পছন্দ কবে থেকে হ’ল ?

হৈমবতী বলিলেন, “মেমসাহেবীর সবই কি আর ভাল বলছি, তা ব’লে সব মন্দও নয়। এই দেখ না পনের দিন হ’ল বিয়ে হয়েছে, অম্ব বোধ হয় পনেরটা কথাও বৌমার সঙ্গে বলতে পায় নি। এটা ভাল নয়।”

কামিনী বলিলেন, “বলব নাকি ছুঁড়িদের একটু আগাগ
হয়ে থাকতে ?”

হৈমবতী বলিলেন, “না বাপু, কিছু ব’লে কাজ নেই,
আবার কে কি মনে করবে। আর ক’টা দিনই বা ?”

কয়েক দিন পরেই জোড় ভাঙিতে বরকত্তা মেয়ের
বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। অমল শীতাই ফিরিয়া আসিল।
বউ আরও দিনকতক পরে আসিবে বলিয়া শোনা গেল।

অমল এখন রোজ নিয়ম করিয়া জ্যাঠামহাশয়ের ব্যবসা-
স্থলে যাইতে আরম্ভ করিল। সংসারী হইলই যখন, তখন
সংসার করিবার যোগ্যতা ত অর্জন করিতে হইবে ? কিন্তু
কাজে মন যেন বসিতে চায় না, কেবল উড়ু উড়ু করে।
জীকে রোজ একখানা করিয়া উচ্ছ্বসিত চিঠি লেখে, কিন্তু
উদ্ভব পায় নিতান্ত সাদাসিধা রকমের। সাবিত্রীর দ্বিদি
বৌদি কয়েকটিই আছে, তাহারা দস্তুরমত প্রেমপত্র লিখিতে
অভ্যস্ত। সাবিত্রী অল্পরোধ করিলেই বেশ ভাল রসে-ভরা
চিঠি তাহারা লিখিয়া দিতে পাবে, কিন্তু বেরসিক সাবিত্রীর
ওরকম পরকে দিয়া চিঠি লেখান পছন্দ হয় না, সে নিজে
যাহা পারে তাহাই লেখে।

হৈমবতী ছেলের উন্নতি দেখিয়া খুব খুশী, স্বামীকে
বলিলেন, “দেখলে গো, আমার কথা ফলল কি না ? অমু
বদলেছে না ? বোমা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।”

কমললোচন বলিলেন, “রোস, এখনও মাস পেরোয় নি,
অত সাত-তাড়াতাড়ি সার্টিফিকেট দিয়ে ব’সো না।
আবার রিল্যাপ্স করে কিনা দেখ।”

হৈমবতী বলিলেন, “তোমার মত বাজে কথা। মাহুষের
ভাল-মন্দ দু-দিন দেখলেই বোঝা যায়। অতটুকু মেয়ে ওকি
আর নিজ মুক্তি চাপা দিয়ে চলতে পাবে ? এ-মেয়ে আমি
দেখে-শুনে এনেছি কি না, তাই আর তোমাদের
কারণ ভাল বলতে মন উঠছে না।”

কর্তা আর কথা না বাড়াইয়া নীরবে থাইতে লাগিলেন।
হৈমবতী বলিয়া চলিলেন, “এবার শীগ্গির দিন দেখে
বোমাকে নিয়ে আসতে হবে। ছেলে কেমন যেন মনমরা
হয়ে আছে, হবেই ত। যে বয়সের যা।”

কমললোচন হাসিয়া বলিলেন, “তোমার মত শান্তুড়ী
অনেক কপালপুষ্পে পাওয়া যায়। আমাদের কালে বৌ-

ছেলেকে বেশী বিরহকাতর হ’তে দেখলে মা-বাপরা নিদাক্ষণ
চটে যেত। বিয়ে করেছিল ঐ পর্য্যন্ত, তার বেশী কিছু সবই
বেআইনী ছিল। অমর কিন্তু মন নয় শুধু, শরীরটা একটু
থারাপ ঠেকছে আমার কাছে।”

হৈমবতী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, “কেন গা ? কই
কিছু ত বলে নি আমার কাছে ?”

কমললোচন বলিলেন, “অমনি ভয়ে আধমরা হয়ে যেও
না। বেশী কিছুই হয় নি, ওর ত লিভার কোনো দিনই
ভাল নয়, সেইটাই একটু জানান দিচ্ছে বোধ হয়, চেঞ্জে গিয়ে
কিছুদিন থাকলেই সেরে যাবে এখন।”

হৈমবতী বলিলেন, “তাই দেব পাঠিয়ে, পুজোটা হয়ে
গেলেই। যা আমাদের কপাল, অস্থখ স্তনলেই বৃক্বে রক্ত
জল হয়ে যায়। সবাই মিলে গেলেই হয়, কারণ ত শরীর
ভাল নয়।”

কর্তা বলিলেন, “আমার যাওয়া এবার হবে না, এই
সেদিন কাজকর্ম এত ফাঁক গেল। তার উপর নূতন
ডিস্‌পেনসারিটা সবে খুলেছি, ওটাও শুছিয়ে নিতে হবে।”

গৃহিণী বলিলেন, “তবে ছেলে বউই যাবে, আমারও
যাওয়া হবে না। আমি ঘরের বার হ’লেই ত ভূমি নাওয়া-
খাওয়া সব কিছুর পাট তুলে দেবে, তা হবে না বাপু। আর
ভূমি সঙ্গে না থাকলে থোকাকে নিয়ে কোথাও যেতেই
আমার ভয় করে, ওর ত সারাক্ষণ পলকে প্রলয় হচ্ছে।”

সেদিনকার মত কথাটা এখান পর্য্যন্তই রহিল। কয়েক
দিন পরেই শুভদিন দেখিয়া হৈমবতী বধূকে আনিতে লোক
পাঠাইয়া দিলেন। সাবিত্রী আসিয়া এবার ঘরসংসার
বুঝিয়া গেল। তাহাকে কেহই কাজ করিতে বলে না,
সে যাচিয়া সকলের কাজ করিয়া বেড়ায়। বিজ্ঞেয়া হইতে
আরম্ভ করিয়া কর্তা কমললোচন পর্য্যন্ত বউয়ের প্রশংসায়
পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন। অমল অবশ্য কাহারও কাছে কিছু
বলে না, কিন্তু তাহার ব্যবহারেই বোঝা যায় যে বউয়ের
প্রতি মনোভাবটা তাহার আর যাহাই হউক বিরাগ নহে।
কেবল কামিনী মুখ ফুটিয়া সাবিত্রীর কিছু স্থখ্যাতি করেন
না, তাহার মতে এ-সবই কালো বউয়ের নাম কিনিবার ছল।

অমলের শরীর-থারাপটা কিন্তু এবার সকলেরই চোখে
পড়িতে লাগিল। হৈমবতী ভয়ানক রকম ব্যস্ত হইয়া

উঠিলেন। তাঁহাব তাড়ায় কর্ত্তাও ব্যস্ত হইয়া এধারে-ওধারে চিঠি লিখিয়া ছেলেবোয়ের চেজে যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পূজা অবধি অপেক্ষা করিতেও হৈমবতী নারাজ। ছেলে আর বোই যাইবে, সঙ্গে বাড়ীর পুতান চাকর নারাণ এবং ক্ষেমা যাইবে। গৃহিণী কিছুকাল নুতন লোক রাখিয়া কোনোমতে চালাইয়া লইবেন। পূজা এবার কার্ত্তিক মাসে, হস্ত তাহার ভিতর অমল ফিরিয়াও আসিতে পারে যদি শরীরটা ভাল থাকে।

মা, মাসী সকলে মিলিয়া এক সংসারের জিনিষপত্র বাঁধিয়া ছাঁদিয়া ছেলে বোকে রওয়ানা করাইয়া দিলেন। তাহার। এখনকার মত পশ্চিমে চলিল। যাইবার সময় হৈমবতী প্রণতা বধুকে সাবধান করিয়া দিলেন, “দেখো মা অমুর যেন কোনো অনিয়ম না হয়, আমি যেমন ক’রে সব করি, ঠিক তেমনি ক’রে ক’রো। ছেলের শরীর সেরে আসা চাই।”

বধু মুহূর্ত্তবে বলিল, “সেরেই আসবেন মা।”

বাড়ীটা ইহাব পর বড় যেন খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল। রোজ খবর পান, তবু হৈমবতীর দিন যেন কাটিতে চায় না। পূজার সময়ও ছেলে বো যদি না ফেরে তাহা হইলে পূজা সারিয়া গৃহিণী দিনকতকের মত তাহাদের কাছে থাকিয়া আসিবেন স্থির করিতে লাগিলেন। এখানে চাকরবাকর থাকিবে, কামিনী থাকিবেন, কর্ত্তার আর বিয়লের তেমন কোনো অহুবিধা হইবে না।

সকাল বেলা জ্ঞান করিয়া হৈমবতী পূজার ঘরে ঢুকিতেছেন এমন সময় বাহিরে সোরগোল শুনিয়া তাড়াতাড়ি দালানে বাহির হইয়া আসিলেন। সম্মুখে যে

দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে আতঙ্কে মুচ্ছিতপ্রায় হইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন! অক্ষুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অম, বোমা?”

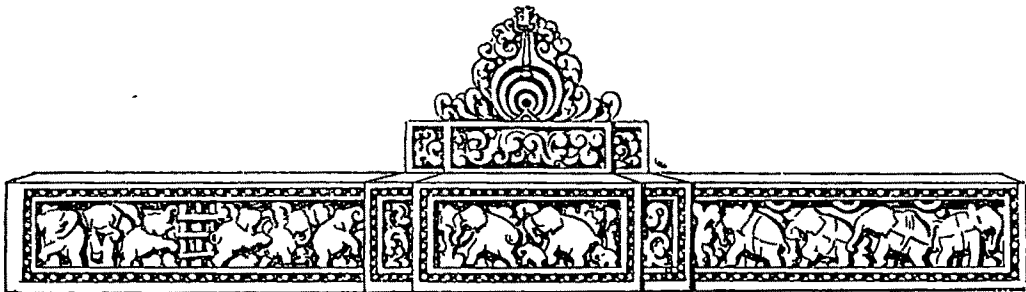
সামনে পাড়াইয়া ক্ষেমা আর নারাণ অজস্রধারে চোখের জল ফেলিতেছিল। ক্ষেমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “দাদাবাবু বাইরের ঘরে ব’সে আছেন মা, ভিতরে আসতে চাইছেন না। আমাদের সোনার বৌদিদিমণিকে বেখে আসতে হ’ল মা।”

তাহার ক্রন্দনে বাধা দিয়া কামিনী বলিয়া উঠিলেন, “কাঁদিস পরে বাছা, কাঁদবার দিন ফুরছে না, বোমার কি হয়েছিল? কই আমরা ত অহুখের খবরও পেলাম না?”

নারাণ বলিল, “অহুখ কোথা মাসীমা? সতীলক্ষ্মী যেন স্বশরীরে স্বর্গে চলে গেলেন। রাজে শোবার ঘরে মস্ত কালী সাপ ঢুকেছিল মা। বিছানায় উঠে দাদাবাবুকে ছোবল দিতে যাবে এমন সময় বোমা জেগে উঠে ডান হাত দিয়ে সাপের মুখ চেপে ধরলেন। আমরা গিয়ে সাপ মারতে না-মারতে তাঁর সময় এসে গেল।”

হৈমবতী আর্দ্রনাদ করিয়া উঠিলেন। এমন সময় খালি পায়ের, শুষ্ক মুখে অমল আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। মায়ের কাছে গিয়া নিজের গলার রক্ষাকবচটা খুলিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, “আচাষিকে ফিরিয়ে দিও মা। তার কবচে কিছু হ’ল না, তুমি যেটি দিয়েছিলে সে আমাকে বাঁচাল, কিন্তু তাকে কেউ ত বাঁচাল না?”

মা কাঁদিতে লাগিলেন, অমল তাহার প্রশ্নেব কোনো উত্তর পাইল না।



চন্দননগরের প্রদর্শনী দর্শনে

প্রত্যক্ষদর্শী

কিছু দিন পূর্বে চন্দননগরে বিংশ বর্ষীয় সাহিত্য-সম্মিলনের যখন অধিবেশন হয়, তখন তাহার সহিত একটি প্রদর্শনীও ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে প্রদর্শনী আকারে ছিল ছোট, আড়ম্বরে সামান্য। তাহার মধ্যে ব্যবসায়ী সাইনবোর্ডের চাকচিক্য ছিল না, ছাওবিলের ছড়াছড়ি, ক্রেতা-বিক্রেতার কলকোলাহল, শিল্পশিল্পীর যান্ত্রিক ডিমন্ট্রেশন্স অথবা বিবিধ বর্ণের বিবিধ আলোকসজ্জা বা দর্শকদিগকে আকর্ষণের জন্য ক্রীড়া-কৌতুকের ব্যবস্থা,—এ-সব কিছুই ছিল না। বিবর্তনের কোন নিদর্শনই তাহা মধ্যে না থাকিলেও, তাহা নিতান্ত সামান্য হইলেও, তাহাতে এমন কিছু ছিল যাহা প্রদর্শনীতে সাধারণতঃ দেখা যায় না। সেখানে কথা নাই, সচীৎকার-ব্যাখ্যা নাই, কক্ষের পর কক্ষগুলিতে একটি প্রাচীন শহরের পরিচয় ও সংস্কৃতির দ্যোতক যাহা কিছু পাওয়া সম্ভব, যাহা দেখান যাইতে পারে, তাহাই ধরে ধরে সাজান ছিল; আর কিশোর ও যুবক স্বেচ্ছাসেবকগণ দর্শকদিগকে তাহা দর্শনের সুবিধার জন্য ও অব্যাদি বাহাতে স্থানচ্যুত না হয় সেজন্য শুধু তাহাদের নির্দিষ্ট স্থানে পুস্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান ছিল মাত্র। তাহা হইলেও তাহা জাহ্নবীতীরে “জাহ্নবী নিবাস” চন্দননগরের অতীত ও বর্তমানের যেন একখানি উজ্জ্বল আলোক্য সদৃশ হইয়াছিল। এই শহরের প্রাচীন এবং বর্তমান সংস্কৃতির পরিচয় দর্শকের চক্ষে দীপ্ত প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রদর্শনী-কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় প্রদর্শিত গ্রন্থের একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে হয়ত সমস্ত বা অধিকাংশ গ্রন্থাদিব কথাই আছে। কিন্তু তাহা হইতে প্রদর্শনীর প্রাণবন্তর বাস্তব পরিচয় পাওয়া যায় না। চন্দননগরের সুদূর অতীতের নিদর্শন সেখানে কিছু ছিল না, কিন্তু দুই শতাব্দিক বৎসর পূর্বে যখন ডাচ, ফরাসী, দিনেমার, ইংরেজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিসকল আকাজক্ষাপূর্ণ হৃদয়ে এই বঙ্গভূমে ভাগীবন্দীহুলে তাহাদের নিম্ন নিম্ন ভাগ্যাধেষণের ও

ক্রমে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য লালায়িত হইয়া নিজেদের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইতেছিল, তখন ক্লাইভ সংশয়-দোহল্যমান মনে ব্রিটিশ গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রথমেই ঐতিহাসিক প্রদর্শনী কক্ষে প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই ক্লাইভ ও দুপ্পের প্রতিরূপিত ও আলোয়ান্না দুর্গপাদমূলে সেই ব্রিটিশ রণতরী টাইগার, কেপ্ট, সলস্-বেরির ছবি এবং নিম্নে টেবিলের উপর চন্দননগর-বিধ্বংসী ক্লাইভের কতিপয় গোলা দেখিয়া সেই যুগের ইতিহাসের ঘটনাবলী, ক্লাইভ ও ওয়াটসনের বীরত্বের সহিত সহায়-সম্পাদহীন ফরাসী গবর্ণর রেনোর বুদ্ধিকৌশল, ফরাসী সৈনিক টেরিয়ার বিখ্যাসম্মতকতা ও চন্দননগরের পতন একে একে সমস্ত যেন নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, আর সেই সঙ্গে মনে হইতেছিল এই ভূমেই সেই দিন আজিকার সঙ্গারী পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অধিপতি ইংরেজের অদৃষ্ট পরীক্ষা হইয়াছিল।

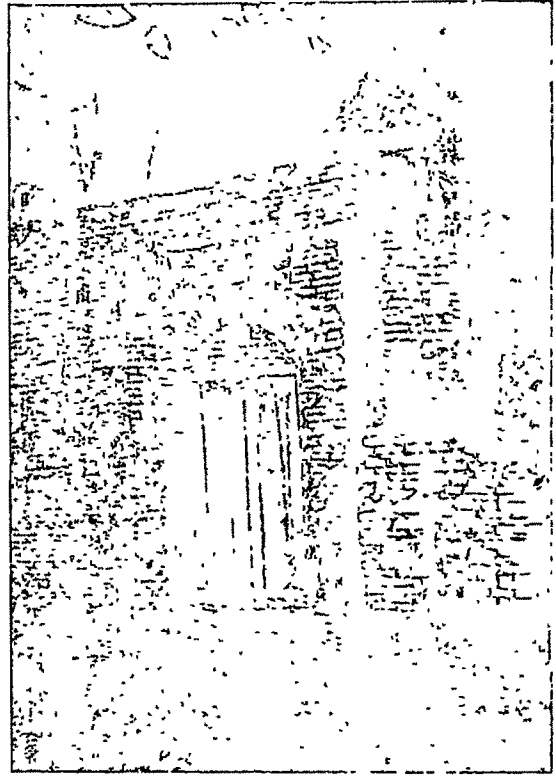
তাঁর পর পার্শ্বেই দেখি কানাইলাল ও যোগেন্দ্রনাথ সেনের ছবি, তাঁহাদের পার্শ্ব শেষ নিদর্শন, তাঁহাদের ব্যবহৃত চশমা, ঘড়ি, স্বহস্তলিখিত পত্র প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থাদি পড়িয়া আছে দুপ্পের রাজোচিত আড়ম্বরের নিদর্শন রজত-নির্মিত আশাসোটার পার্শ্বে। এখন এই উভয়ই আমার মত দর্শকের দৃষ্টিতে যেন একই অবস্থান্তরিত।

মনের মধ্যে অধিকক্ষণ সে কথা ভাবিবার অবসর ছিল না। পার্শ্বে ফিরিয়াই দেখি পশ্চিম দেওয়ালের ঠিক মধ্যস্থলে একটি উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট স্তূপ ভবনবৎ ছবি। উহা অধুনা-লুপ্ত মোবান সাহেবের বাগানবাড়ীর ছবি। চন্দননগরের ভাগীবন্দীতীরে এই বাটার সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠেই একদিন বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতরবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বসবাসের স্থান করিয়া লইয়াছিলেন, আর এই স্থানেই তাঁহার কবীজীবনের শুভ উদ্বোধন হইয়াছিল। উভয় পার্শ্বে দুই খানি ছোট ফোটোগ্রাফ রহিয়াছে। একখানি একটি ভগ্ন

গৃহের, অন্তর্যামি একটি ছোট কুটীরের। কবি ভারতচন্দ্র যখন অজ্ঞাত অথাত অবস্থায় ফরাসী দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট উমেদারী করিতে আসিয়াছিলেন তখন তিনি প্রথমোক্ত দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের উক্ত গৃহেই বাস করিয়াছিলেন। পবে ইন্দ্রনারায়ণের অল্পগ্রহেই কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতাতেই তাঁহার কবিপ্রতিভা জনসমাজে প্রচারিত হইয়া অবশেষে হইয়া রহিয়াছে। অল্প গৃহে কথামূল্য শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবনের কিছু অংশ অতিবাহিত হইয়াছিল। ঋষিবল্লভ ভূদেবের কর্মজীবন চন্দননগরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত যে বিদ্যালয়ে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষের ছবিও দেখিলাম।

অসামান্য রূপলাবণ্যময়ী মাডাম গ্রাণ্ড, যিনি প্রথম যৌবনে চন্দননগরের অধিবাসিনী ছিলেন, তাঁহার রূপবহি ভারত হইতে ফ্রান্স পর্যন্ত তদানীন্তন বহু প্রসিদ্ধ পুরুষকে দম্ব কবিয়াছিল, যে রূপের জ্যোতি সত্বে ন্যেপোলিয়নের সমক্ষেও প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাঁহার প্রতিষ্ঠিতও দেখিলাম। তাহার পর কত প্রাচীন মন্দির, অধুনালুপ্ত কত প্রতিষ্ঠান, কত বঙ্গগৌরব সাধক, দাতা, কর্মবীর, বীর বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসৈনিক প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত; দুপ্প্রে প্রভৃতি চন্দননগরের কত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লোকের হস্তলিপি, ব্যবহৃত সামগ্রী, প্রাচীন মূর্তি, ফরাসী গভর্নমেন্ট প্রদত্ত ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর স্বর্ণপদক, মুক্তিকান্তের বা ফুপ হইতে প্রাপ্ত স্ববহু পাবাণময় মণ্ডলী বুদ্ধমূর্তি, স্বন্দর বিষ্ণুমূর্তি, ধাতুময় হুঠাম দশভুজা মূর্তি প্রভৃতি এই ফরাসী উপনিবেশের লুপ্ত ইতিহাসের কত চিহ্ন কত আকারে দেখিলাম।

সেখান হইতে কক্ষান্তরে গেলাম, সেটি চন্দননগরের সাহিত্য প্রদর্শনী। সারা ঘরটি ছুড়িয়া টেবিলে সম্বিত এখানকার লেখকদের রচিত গ্রন্থসমূহ। তন্মধ্যে দেখিলাম চন্দননগরের ক্ষামার গৌর্য্য কর্তৃক পুনর্লিখিত বাঙ্গালা ভাষার, প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ “রূপারশাস্ত্রের অর্থবেদ” ও তাহার পরিশিষ্ট ১৮৩৬ হইতে ১৮৪০ এক শত পাঁচ বৎসরের গ্রন্থ গণনা। দেওয়ালে দেখিলাম স্থানীয় গ্রন্থকারদের প্রতিষ্ঠিত। একটি স্বতন্ত্র মেঝেতে বহু অপ্রকাশিত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, অন্তর্গত বিবিধ প্রাচীন ও আধুনিক সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকার সমাবেশ। তাহার মধ্যে আছে ইংরেজী ১৮৮২ সালে চন্দন-



দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটার ভগ্নাবশেষ, গোলন্দপাড়া।
কবি ভারতচন্দ্র এই বাটাতে বাস করিতেন।

নগর হইতে প্রকাশিত “প্রজাবন্ধু” হইতে আরম্ভ কবিয়া বর্তমান বাংলার অন্ততম মাসিকপত্র “প্রবর্তক” পর্যন্ত।

এই বিভাগে স্বতন্ত্র বক্ষিত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মুদ্রিত গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথির অপূর্ণ সংগ্রহ দেখিলাম। দেখিলাম ভট্টাচার্য, ভোতা ইতিহাস, হালহেডের ব্যাকরণ, প্রবোধ চন্দ্রোদয়, গঙ্গাজ্যোতিরঙ্গিনী, সমাচার দর্পণ, দিগদর্শন, মনোদীক্ষা স্বধাতরঙ্গিনী, সতীনাটক, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় কৃত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী, কেবীব বাংলা অভিধান, কেবীর রামায়ণ, এবং রাজাবলী প্রভৃতি অনেক দুস্ত্রাপ্য গ্রন্থ ও পুঁথি শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, দশভুজা সাহিত্যমন্দির, চন্দননগর পুস্তকাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হইতে আসিয়াছে; কিন্তু সমস্ত ছাড়িয়া এখানকার মধে যাহা সর্বোপযোগী দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা চুঁচুড়ার শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়

প্রেরিত গীতগোবিন্দেব সচিত্র পাণ্ডুলিপি ও শ্রীবামপুরের শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রেবিত ১১৬৬ সালে লিখিত সচিত্র রাসপঞ্চাধ্যায় পুঁথি। ইহাদেব বহু বর্ষের হুন্দর চিত্রগুলি না দেখিলে তাহার নৈপুণ্য উপলব্ধি করা দুর্লভ।

তার পর শিল্পপ্রদর্শনী, তিনটি বিরাট কক্ষ চন্দননগরের ছোটবড় বিবিধ শিল্পে সজ্জিত, তন্মধ্যে একটি শুধু মহিলা শিল্পেই পূর্ণ। হুন্দর হুন্দর বহু প্রকার নুঁচীশিল্প ছাড়াও চিত্র, বেতের কাজ, চামড়ার কাজ, মাটির কাজ, পুঁতির কাজের বহুল নিদর্শন যাহা এখানে সজ্জিত কবিতা রাখা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা মন্দিরের ছাত্রীদের কাজ সকলের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল।

অপর কক্ষদ্বয়ে পটুয়া অঙ্কিত ও সুবিখ্যাত বসন্তলাল মিত্র, বেণীমাধব পাল প্রভৃতি প্রাচীন ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র, গোবিন্দ কুণ্ড প্রভৃতি স্থানীয় আধুনিক বহু চিত্র-শিল্পীর অঙ্কিত হুন্দর চিত্র, তাঁতের কাপড়, খন্দর, ধাতুনির্মিত দ্রব্য, কামারের কাজ ও প্রসিদ্ধ আসবাবপত্র নির্মাণকারকদিগের কারখানার দারুশিল্পের বিবিধ নিদর্শন, এখানকার তৈয়ারী এসেন্স, সাবান, সিগারেট দিয়াশালাই, ছবির ফ্রেম, ফ্রেটওয়ার্ক, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দাস নির্মিত মুদ্রয় প্রতীমূর্তি ও অস্ত্রান্ত্র মুশিল্পী কর্তৃক প্রস্তুত মাটির কাজ, বাংলাব নুতন শিল্প গ্রাইণ্ডস্টোন, পিউমিক স্টোন, এমরি হুইল, পিউমিক ব্লক, তাপমান যন্ত্র, এসবাজ, কাঠের খেলনা, শাঁখা, স্বাস্থ্যবিষয়ক বিবিধ চার্ট প্রভৃতি শতাব্দিক বিষয়ের বহুসংখ্যক দ্রব্যসম্ভাব্যেব নমুনা রক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি বলিতে হইতেছে, যে-ফরাসভাষা একদিন বঙ্গশিল্পে এ-প্রদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, নানা প্রকার পাড়ের বিভিন্ন ধবণের বস্ত্রাদি থাকিলেও মনে হইল ফরাসভাষার আজ সে-খ্যাতি কোথায়?

দারুশিল্পের কতিপয় উৎকৃষ্ট নিদর্শন, প্রসিদ্ধ মিত্রী নীলমণি নাথের প্রস্তুত অতি হুন্দর দারুময় জগদ্ধাত্রী মূর্তি দেখিয়া এ-শিল্পের পূর্ব গৌরবের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেলেও পূর্বেকার দড়িবা কাজ, গালার কাজ, চুর্কটের কাজ, বঙ্কনেব কাজ এসব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল জিনিষের ধ্বংসাবশেষ কারখানাগুলির ক্ষুদ্র আলোকচিত্রগুলি এখন ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্য হইয়াছে। প্রথম বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত বটকৃষ্ণ ঘোষের যে কাপড়ের কল ছিল তাহা হইতে উৎপন্ন বস্ত্র ও এখানকার বহু প্রাচীন টিকার প্রস্তুতিব কারখানার ঔষধগুলি দেখিয়া এখানকার অধিবাসীদের মনে অবশ্য একটা আশ্মপ্রসাদ আসে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে-সব কারখানা অনেক দিন লুপ্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ফটিকলাল দাস নির্মিত নানাপ্রকার ফ্রেট-ওয়ার্ক ও শ্রীযুক্ত অশ্বৈত দাস বাবাজী কর্তৃক নির্মিত কাঠের চতুর্দোলা ও কতিপয় জীবজন্তু যে শিল্পের উৎকৃষ্ট নমুনা, তাহা দর্শকমাজেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

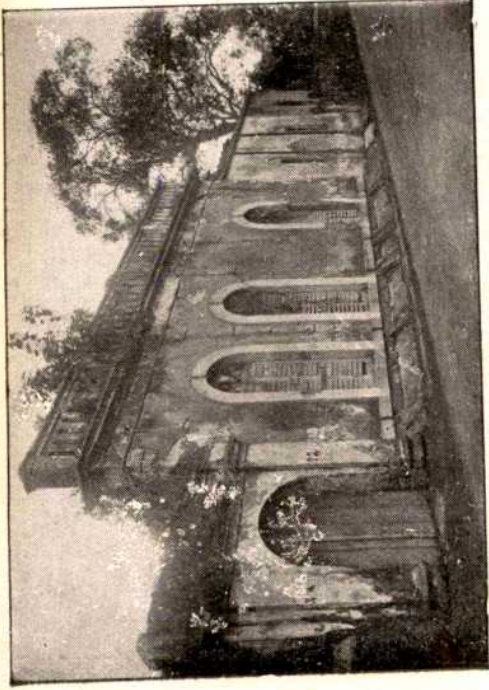
বহু প্রকার স্থানীয় শিল্পনিদর্শন ভিন্নও চন্দননগরের সম্পর্কযুক্ত এমন কতকগুলি দ্রব্য ছিল,—যেমন দুপ্পের বিবাহ বেজিষ্টাব, তাহার লিখিত পত্রের প্রতিলিপি, দাস-বিজয়ের দলিল, দুপ্পে রেণো ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী স্বাক্ষরিত একখানি দলিল, স্থানীয় কোন কোন ব্যক্তিকে লিখিত বকিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হুর্শেচন্দ্র সমাজপতি, চিত্তবঞ্জন দাস প্রভৃতির পত্র। এখানকার লোকের দ্বারা নিহত প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র-চর্ম, কুস্তীব, এখানকার লোকের সংগৃহীত বহুসংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা, বাংলা অক্ষরের ক্রম-বিবর্তন চিত্র, বাংলার সম্পদ-চার্ট, ফরাসী ভারতের বস্ত্রার ছবি অঙ্কিত ও অস্ত্রান্ত্র ডাকটিকিট, প্রকৃতির বহু অদ্ভুত খেয়ালের ফোটোগ্রাফ প্রভৃতি সকল দর্শকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

রাসপঞ্চাখ্যায়ের পুঁথির চিত্রাবলী

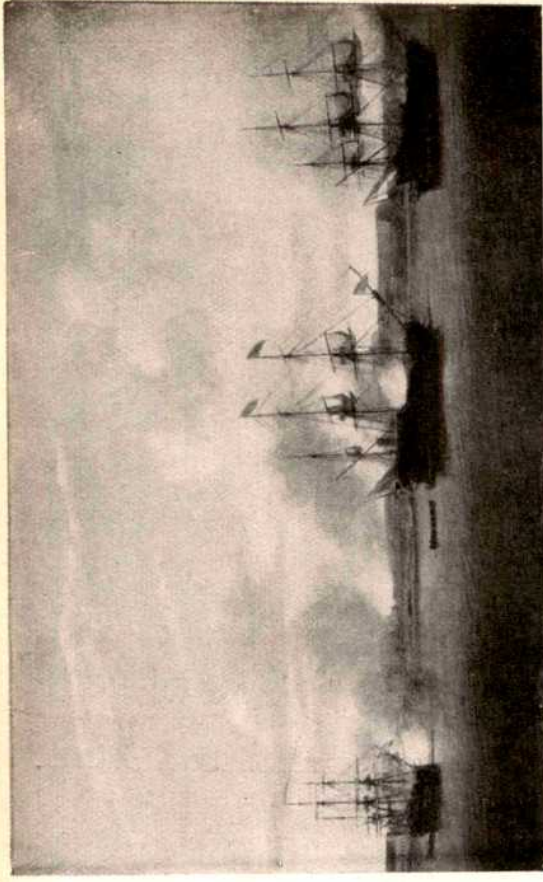




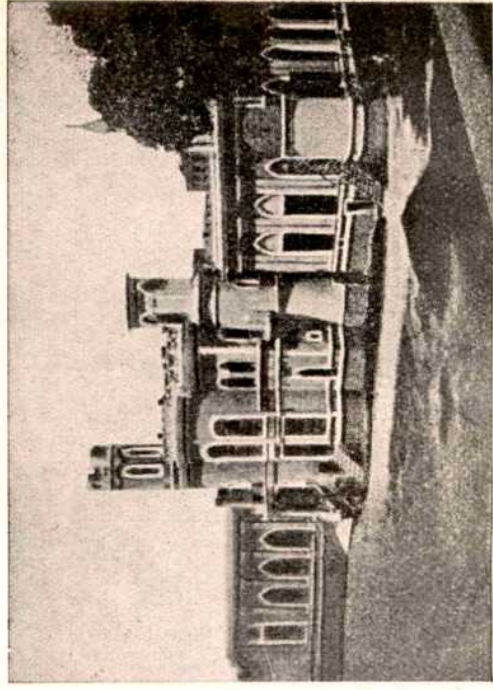
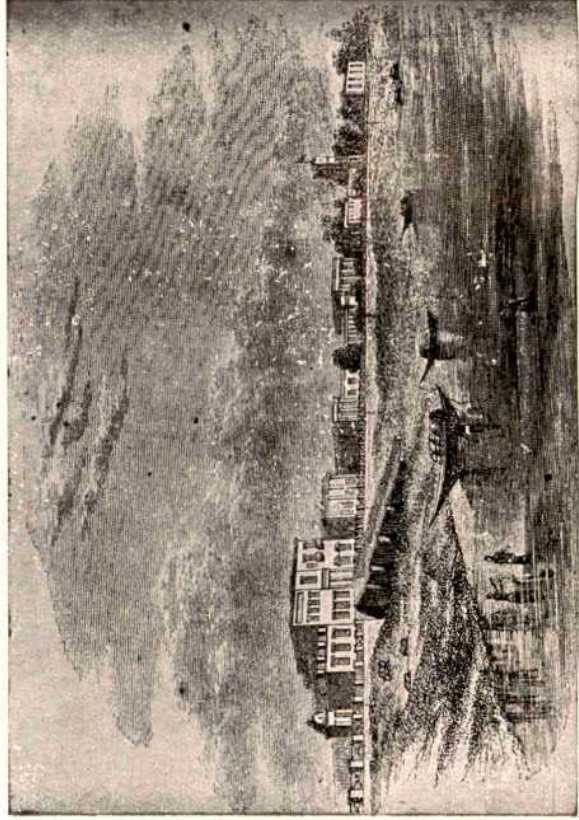
ব্রাহ্মপক্ষাখ্যায়ের পুথির চিত্রাবলী

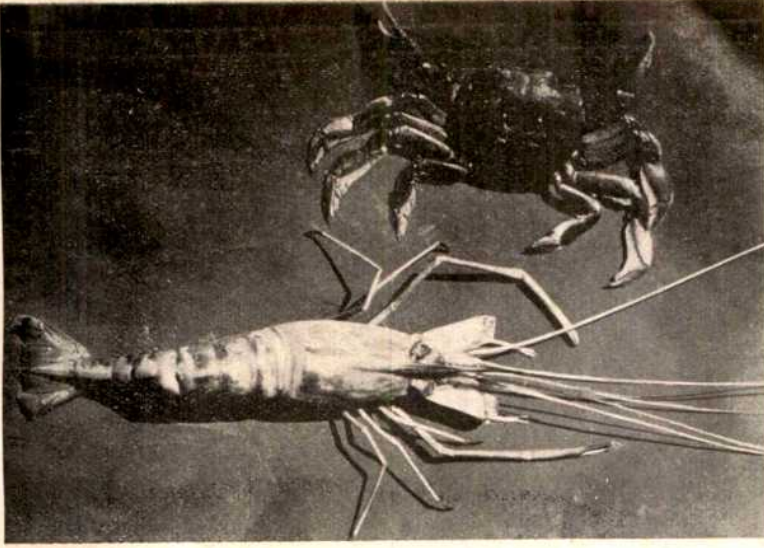


ভূদেব-প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ধানসাতশাখ



ভাগীরথীবক্ষে অলংঘ্য তুর্গের পাদমূলে ব্রিটিশ য়গতরী
টাইগার, কেট ও সলসবের

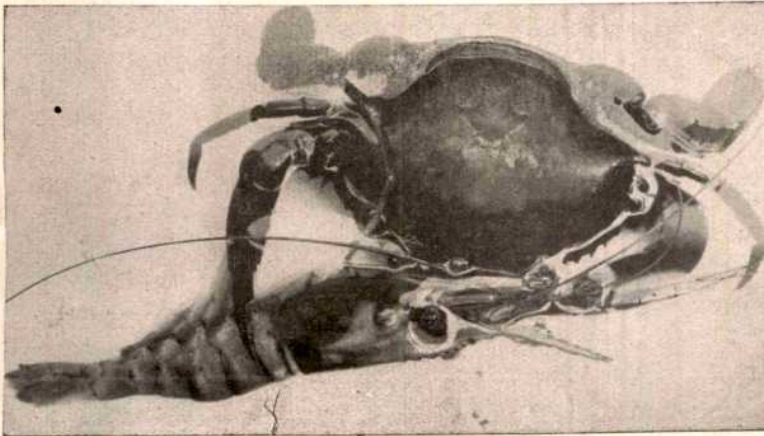




এক পাত্রে রক্তিত চিড়ি ও চিতি-
কাঁকড়া লাটিয়া বেড়াইতেছে



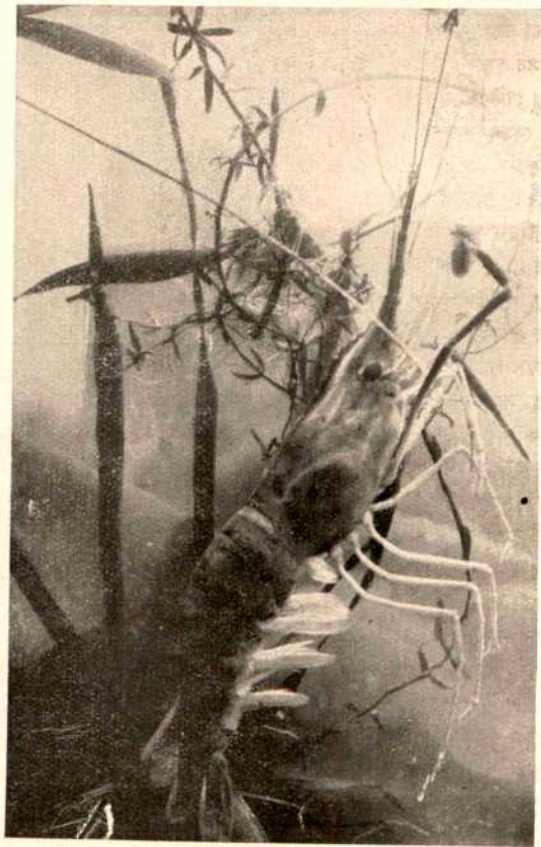
আহারাবেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ
পরস্পর সম্মুখীন হইবার ফলে
চিড়ি ও চিতি-কাঁকড়ার
লড়াই বাধিয়া গিয়াছে



অল্প জলে একই স্থানে রক্তিত চিড়ি ও কাঁকড়ার
মারামারির ফলে চিড়ি কাঁকড়ার
হাতে প্রাণ হারাইয়াছে



জলের মধ্যে চিড়ি ও কঁকড়া আহারাশেষে ব্যস্ত



সাঁড়াশির মত লম্বা দাড়ার সাহায্যে চিড়ি ভাগমান খাও টানিয়া আনিয়া মুখে পুরিবার উপক্রম করিতেছে ; তাহার বিভিন্ন দৃশ্য

সংসার

চিংড়ির জীবনযাত্রা-প্রণালী

সাধারণতঃ অনেকেই চিংড়িকে এক জাতের মাছ বলিয়া মনে করেন। ইহারা মাছের মত জলে বাস করে বটে, কিন্তু মাছের মত কোন রক্তগত আন্দোলন নাই। প্রাণিজগতে কাকড়াকেই চিংড়ির নিকটতম আত্মীয় বলিয়া মনে হয়। পরিণত অবস্থায় উভয়ের দেহের আকৃতিতে যথেষ্ট বৈষম্য লক্ষিত হইলেও শিশু-অবস্থায় পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাকড়ার 'মেগালোপা' বা শিশু অবস্থায় তাহার উদরভাগটি বখন লেজের মত পশ্চাদিকে প্রসারিত থাকে তখন কাকড়া ও চিংড়ির মধ্যে স্পষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরেই কাকড়ার শিশু তাহার দেহের শক্ত খোলসের নীচের দিকে এই লেজটি গুটাইয়া লইয়া গোলাকার হইয়া যায়। চিংড়ি কিন্তু বরাবর এই উদরদেশ প্রসারিত অবস্থায় রাখিয়াই চলাফেরা করে। চিংড়ি ও কাকড়া প্রকৃতি প্রাণীরা 'ক্রাষ্টেশিয়া' শ্রেণীভুক্ত, পরস্পর সম্পর্কিত হইলেও উভয়ের চালচলন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কাকড়া পাশাপাশি হাটে ও সাঁতার কাটে। চিংড়ি কিন্তু ডাঙায় হাঁটবার সময়েই হউক কিংবা জলে সাঁতার কাটিবার সময়েই হউক বরাবর সম্মুখের দিকেই অগ্রসর হয়। কাকড়া যেমন জলে স্থলে সর্বত্রই অতি দ্রুতগতিতে পারে হাঁটিয়া বেড়াইতে পারে, চিংড়ি অতি দ্রুত হাঁটিতে পারে না। মাছ যেমন পাখনা ও লেজের সাহায্যে জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায় চিংড়ির সাঁতার দিবার ভঙ্গী তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহাদের উদরের নিম্নদেশে দাঁড়ের মত পাঁচটি পাতলা উপাঙ্গ আছে। সেগুলিকে দ্রুত সংকলন করিয়া একটানা খানিক দূর সাঁতার দিয়া যায় মাছ। সাধারণ মাছের মত ইহাদের লেজ উর্দ্ধাধঃ ভাবে চওড়া নয়, পাখীর লেজের মত পাশাপাশি ভাবে চওড়া। সাঁতার কাটিবার সময় লেজের পাখনাগুলি প্রসারিত করিয়া ঠিক এরোপ্লেনের ধরণে চলিয়া থাকে, মাছের মত শরীর অঁকিয়া বাঁকিয়া যায় না। কিন্তু সাধারণ চলাফেরার কাজে পায়ের ব্যবহারই বেশী করিয়া থাকে।

কলিকাতা ও তাহার আশেপাশে গলদা বা মোচা, বাগদা, চাপলা, কড়ানে, ঘোড়া, কুচা ও কাদা চিংড়ি নামক বিভিন্ন জাতীয় অসংখ্য রকমারি চিংড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আমাদের দেশীয় কুচো-চিংড়ির মধ্যে বর্ণ-বৈচিত্র্যে বিভিন্ন চিংড়ির সংখ্যাও কম নয়। বিভিন্ন জাতের চিংড়ির দৈহিক ক্রমবিকাশ ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিলেও এখানে সাধারণ ভাবে তাহাদের জীবনযাত্রার কাহিনী উল্লেখ করিব।

বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বিভিন্ন জাতের চিংড়ি পৃথিবীর নানা স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। কয়েক প্রকার চিংড়ি নদী, পুষ্করিণী বা খালবিলের মিঠা জলেই বাস করিয়া থাকে। তাহারা কোন ক্রমে সমুদ্রের নোনা জলে আসিয়া পড়িলেই প্রাণ হারায়, আবার সামুদ্রিক নোনা জলের

চিংড়িরাও মিঠা জলে প্রাণধারণ করিতে পারে না। গভীর সমুদ্রের চিংড়িদের প্রায়ই প্রবল শত্রুদের সঙ্গে একত্র বিচরণ করিতে হয়। এই জন্তই বোধ হয় তাহাদের দেহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুরক্ষা কণ্টকাকীর্ণ, ইহাদিগকে 'কাটাচিংড়ি' বলাই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। অক্টোপাসের মত ভীষণ শত্রুকেও কাটার আঘাতে ইহারা সময়ে সময়ে বায়েল করিয়া দেয়। ইহা ছাড়াও গভীর সমুদ্রে এমন অনেক বিভিন্ন জাতের চিংড়ি দেখিতে পাওয়া যায় বাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু এখানে আমরা কেবল দেশীয় পরিচিত চিংড়িদের বিষয়েই বর্ণনা করিব।

চিংড়ির ডিম নিষিক্ত হইবার পর এক প্রকার আঠালো পলারের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া মায়ের উচ্চদেশে সংলগ্ন থাকে। স্ত্রী-চিংড়ি বুকে ডিম লইয়াই আহারাধেয়ে সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। ডিমের মধ্যস্থিত সঞ্চিত খাদ্যসাহায্যে ক্রম পরিপুষ্ট হইয়া কিছু দিনের মধ্যেই 'নপুলিয়াস' নামক শিশু-অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং জলের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে শুরু করে। তখন ইহাদের আকৃতি এমনই অদ্ভুত থাকে যে কিছুতেই চিংড়ির বাচ্চা বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। নপুলিয়াস অবস্থায় শরীরের উভয় পার্শ্বে ডালপালা-সম্বন্ধিত তিনটি করিয়া পা থাকে, এবং মস্তকের সম্মুখভাগে একটি মাত্র চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়। নপুলিয়াস অবস্থায় কিছু দিন চলাফেরা করিবার পর চিংড়ি-শিশু খোলস বদলাইয়া নূতন এক আকার প্রকার পরিগ্রহ করে। চিংড়ি-শিশুর এই অবস্থার নাম 'জোইয়া'। পরিণতাবস্থায় চিংড়ির খোলায় যেকোনো বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড অংশ দেখিতে পাওয়া যায়, এই জোইয়া অবস্থাতেই তাহা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু জোইয়ার সহিত পরিণত চিংড়ির আকারের বিশেষ কোনই সামঞ্জস্য নাই। এই সময় একটি চক্ষুর স্থলে দুইটি চক্ষু আত্মপ্রকাশ করে। জোইয়া অবস্থাতেই ইহার অস্ত্রাস্ত্র অস্ত্রপ্রত্যঙ্গের উদ্গম হইতে থাকে, এবং আরও কয়েক বার খোলস পরিবর্তন করিবার পর 'সাইজোপড' অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এই সময় ইহাকে অনেকটা পরিণত অবস্থার চিংড়ির মত দেখায়। কেবল উদরের নীচে দাঁড়ের মত পাতলা উপাঙ্গগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। পায়ের অগ্রভাগে আজুলের ছায় কতকগুলি ডালপালা থাকে। ইহাদের সাহায্যে অনায়াসেই জলের মধ্যে সাঁতার কাটিয়া বেড়াইতে পারে। তাহার পর কিছু দিন পর-পর খোলস বদলাইয়া সম্পূর্ণ পরিণত অবস্থা লাভ করে। নোনা জলের চিংড়ির মধ্যেই সাধারণতঃ এইরূপ বিভিন্ন অবস্থান্তর পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মিঠা জলের চিংড়ির ক্রমবিকাশপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অবশ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ব্যবস্থাও পরিলক্ষিত হইতে পারে। মিঠা জলের চিংড়িরাও ডিম বুকে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; কিন্তু ডিম ফুটিয়া নপুলিয়াস বা জোইয়ার আকার ধারণ করে না।

এই অবস্থাপ্রাপ্তি ডিমের মধ্যেই অতিবাহিত হয়। ইহাদের ডিম ফুটিয়া সোণাশুভ্রি "সাইজোপড" শিশু অবস্থায় বাহির হইয়া আসে এবং জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। তাহার পর ক্রমশঃ খোলস বদলাইতে বদলাইতে পরিণত অবস্থা লাভ করে।

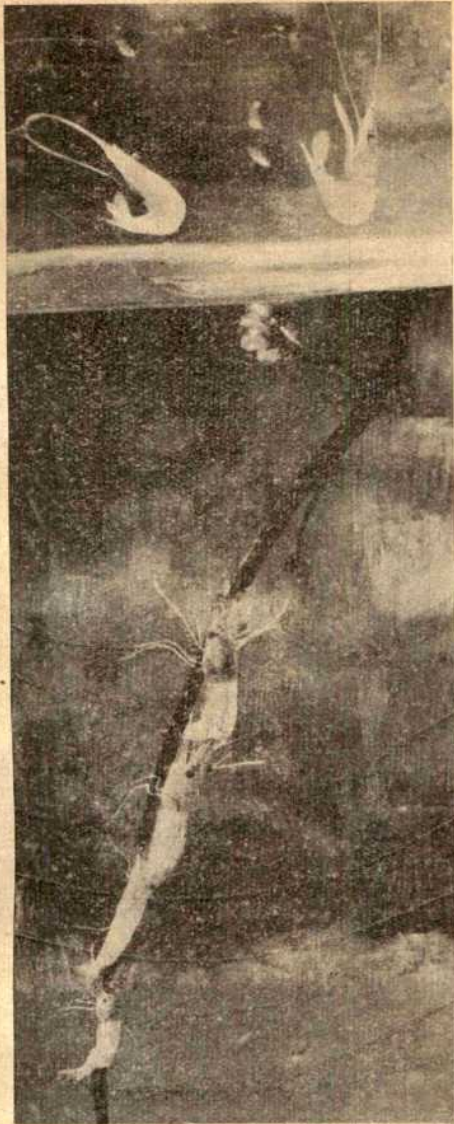
কাঁকড়া সাধারণতঃ জলেই বাস করিয়া থাকে কিন্তু প্রয়োজন মত ডাঙায় উঠিয়াও অনেক সময় কাটায়। চিড়িয়াও সেইরূপ প্রয়োজন মত সময় সময় ডাঙায় উঠিয়া গাটিয়া যায়; কিন্তু কাঁকড়ার মত অতক্ষণ ডাঙায় থাকিতে পারে না। বত কণ শরীর ভিজা থাকে তত কণ ডাঙায় ঘুরিয়া বেড়াইতে ইহাদের কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু শরীর শুষ্ক হইলেই বিপদ। এই জন্য ইহারা প্রায়ই দিনের বেলায় রৌদ্রের মধ্যে ইচ্ছা করিয়া ডাঙায় আরোহণ করে না, এবং ভিজা মাটি বা তর্দমাক্ত স্থানে বেশীর ভাগ চলাফেরা করিয়া থাকে। ডাঙায় উঠিয়া শরীর শুষ্ক হইয়া গেলে ইহারা মুখ দিয়া থুথুর মত ফেনা বাহির করিয়া মুখের বানিকটা অংশ ভিজা রাখিতে চেষ্টা করে।

জলস্রোতের উজান বাহিয়া চলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যেমন মাছেদের মধ্যে দেখা যায়, চিড়ির স্বভাবও ঠিক সেইরূপ। চিড়ি ধরিবার জন্য জেলেরা স্রোতস্থলী খাল বা নালার মধ্যে কিছু দূর ব্যবধানে জানালার গরাদের মত সরু ফাঁকবিশিষ্ট কাঠির বেড়া পাশাপাশি পুঁতিয়া দিয়া তাহার মধ্যস্থলে ফাঁদ বা বৃণি পাতিয়া রাখে। চিড়িরা জলস্রোতে উজান বাহিয়া আসিয়া এই বেড়া অতিক্রম করিতে না পারিয়া কেহ কেহ ফাঁদের মধ্যে ঢুকিয়া আটকা পড়িয়া যায়। অনেকেই কিন্তু সহজে ফাঁদের মধ্যে ঢুকিতে চাহে না, তাহার অভ্যুত কৌশলে ফাঁদ বা বেড়া অতিক্রম করিয়া যায়। পাছে কেহ কোন স্থান দিয়া গলিয়া যায় এই ভয়ে বেড়াটাকে উঁচু পাড়ের সঙ্গে কোথাও একটু ফাঁক না রাখিয়া মিলাইয়া দেওয়া হয়। স্রোতের বিপরীত দিক হইতে আসিয়া চিড়ি বেড়ার গায়ে ঠেকিলেই স্রোতের মধ্য দিকে লাগিয়া বেড়ার গা ঘেষিয়া কিনারার দিকে আসিতে থাকে। কিনারায় পৌঁছিয়া দাড়া ও পায়ের সাহায্যে পাড় বাহিয়া উপরে ওঠে এবং ডাঙার উপর গাটিয়া গিয়া পুনরায় জলে নামে। খালের পাশে উঁচু জমির উপর সময় সময় বৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে সামান্য জল জমিয়া থাকিলে ইহারা ডাঙায় উঠিয়া রাস্তা ভুল করিয়া তাহার মধ্যেই ঘোরাফেরা করিতে থাকে। ইতিমধ্যে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেলেই ঘাসপাতার তলায় আশ্রয়-গোপন করিয়া থাকে অথবা অনাবৃত অবস্থায়ই চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে দিক্‌ভ্রান্ত অবস্থায় একবার কোন একটা চিড়ি রাস্তা পাইলেই পর-পর অনেকেই তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু কাঁকড়ারা যেমন জলের উপরে ও নীচে সমানভাবে দেখিতে পায়, ইহারা ডাঙার উপর সেরূপ কিছু দেখিতে পায় বলিয়া মনে হয় না। কেবল দিশাহারা ভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় মাত্র। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে ইহাদের দৃষ্টিশক্তি কিছু খোলে বলিয়া মনে হয়।

চিড়িরা বড়ই কলহপ্রিয়। জলের নীচে একটির সঙ্গে আর একটির দেখা হইলে প্রায়ই কলহ বাধিয়া যায়, অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বী যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দুই-একটা ছিন্ন ঠ্যাং ফেলিয়া রাখিয়া পলাইতে বাধ্য হয়। খোলস-পরিবর্তনের সময় ছিন্ন অঙ্গ পুনরায়

গজাইয়া থাকে। পলাইতে না পারিলে প্রবলের হাতে মৃত্যু অনিবার্য। বিজিতা পরাজিতের মৃতদেহ ধীরে ধীরে উদরসাৎ করে। স্বজাতির মৃতদেহ ইহারা অতি উপাদেয় বোধে আহাৰ করিয়া থাকে, এমন কি নিজের সমস্তানদিগকে পর্যন্ত বাদ দেয় না। ডিম না-ফোটা পর্যন্ত ইহাদের মাংসেই প্রবল থাকে। সেই সময়ে ডিমের লোভে ইহাদের শত্রুও জোটে অনেক। পূর্বেই বলিয়াছি স্ত্রী-চিড়ি ডিম বৃকে করিয়াই ঘুরিয়া বেড়ায়। সেই সময় ডিম খাইবার লোভে কষ্ট, শিঙ্গি প্রভৃতি নানা জাতীয় মাছ ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়া নাস্তানাবুদ করিয়া থাকে। ইহাদের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত চিড়ি অনেক সময় লতাপাতা অথবা জল-নিমজ্জিত ইট, পাথরের খাজে বা গর্তে এমন নিশ্চল ভাবে আশ্রয়-গোপন করিয়া থাকে যে দেখিলে একটা আবজ্ঞনা ছাড়া কোন প্রাণী বলিয়াই মনে হয় না। ইহাদের লেজে ভয়ানক জোর এবং তাহার মধ্যস্থলে কাঁটার মত সূক্ষ্মাঙ্গ ও শত্রু একটা উপাদ্র থাকে। শত্রু ইহাকে আঁকড়াইয়া ধরিলে লেজ বাঁকাইয়া হঠাৎ এমন জোরে ঝটকা মারে যে এক আঘাতেই শত্রু তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ঝটকা মারিয়া একবারে ছাড়াইতে না পারিলে কাঁটাওয়ালা লম্বা দাড়া সাঁড়াশীর মত এমনভাবে চাপিয়া ধরে যে শত্রু পলাইতে পথ পায় না। অষ্টোপাস-জাতীয় প্রাণীরা যেমন শত্রুর আক্রমণ এড়াইবার জন্য পিচকারির মত জোরে কালি ছুঁড়িয়া জল বোলা করিয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জলের চাপে দূরে ছিটকাইয়া চলিয়া যায়, চিড়িরাও সেইরূপ জলের তলায় কোন প্রবল শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইবামাত্র লেজটাকে ধুকুকের মত বাঁকাইয়া হঠাৎ জোরে সোজা করিয়া দেয়, তার ফলে জলের সঙ্গে থাকা লাগিয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহাদের মুখের সম্মুখস্থ করাতও যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে।

চিড়ির বাচ্চারা কিন্তু শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য অল্প উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। বড় চিড়ি বা অন্য কোন মাছেরা যদি ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসে তবে বাচ্চারা জল হইতে ছিটকাইয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া পড়ে এবং সেখানে মড়ার মত চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। কিছুক্ষণ পরে আবার জলে লাফাইয়া পড়ে। বড় বড় কাচপাত্রে বাচ্চা চিড়িও অন্যান্য মাছ একত্র রাখিয়া দেখিয়াছি—শত্রুর ভয়ে ইহারা কাচের দেয়ালের গায়ে লাগিয়া চুপ করিয়া থাকে, কখনও জলের মধ্যস্থলে আসে না। কারণ মধ্যস্থলে আসিলেই ইহারা পরিষ্কার ভাবে শত্রুর নজরে পড়িয়া যায়; জলের কিনারায়, কাচের গায়ে বা জলের উপরের পর্দার সঙ্গে এমন ভাবে মিশিয়া থাকে যে কোন রকমেই সহজে শত্রুর দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এ অবস্থায়ও শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিলেই জলের উপরে লাফাইয়া উঠিয়া কাচের দেয়ালের গায়ে লাগিয়া মৃতের ন্যায় অবস্থান করে। দেহের চতুর্দিকে যে একটু জল থাকে তাহা শুকাইয়া বাইবামাত্রই আবার লাফাইয়া জলে পড়িয়া যায়। অল্প কোন উপায় না দেখিলে জলের উপরে ভাসমান যে-কোন খড়-কুটার গাত্র সংলগ্ন হইয়া বেমালাম আশ্রয়-গোপন করিয়া অবস্থান করে, পরিষ্কার জলে কখনও যথেষ্ট সাঁতার কাটিয়া বেড়ায় না। ছবিতে দেখা বাইতেছে—একটা বড়



কতকগুলি বাচ্চা চিড়ি অল্প বড় মাছের ভয়ে শালুক-ডাঁটার
গায়ে লাগিয়া আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে,
কতকগুলি আবার লাকাইয়া উপরে উঠিয়া ট্যাঙ্কের
গায়ে লাগিয়া ঠিক মড়ার মত পড়িয়া আছে

কাচের চৌবাচ্চার মধ্যে একটা মাত্র শালুক-ডাঁটার গায়ে ছোট ছোট
চিড়িগুলি সারবন্দীভাবে অবস্থান করিতেছে। জলের উপরে শুক
দেয়ালের গায়েও গোটা দুই চিড়িকে লাগিয়া থাকিতে দেখা
যাইতেছে। পরিষ্কার জলের মধ্যে চিড়িগুলির সঙ্গে একটা
কইমাছ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই মাছটার ভয়ে ইহারা
শালুক-ডাঁটার গায়ে আত্মগোপন করিয়াছে এবং কতক উপরে

লাকাইয়া উঠিয়া দেয়ালে আটকাইয়া রহিয়াছে। এখানে ছবির
একংশমাত্র দেখান হইয়াছে, কাজেই কইমাছটিকে দেখা যাইতেছে
না। অনেক সময় দেখা যায় ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই-এক টুকরা
আবর্জনার গায়ে অনেকগুলি বাচ্চা চিড়ি একটির ঘাড়ে আর একটি
চূপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ এক ইন্ডি হইতে দেড় ইঞ্চি লম্বা
যে-সকল কুচা-চিড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, জীবন্ত অবস্থায় তাহাদের
গায়ের রং প্রায়ই জলের রঙের সঙ্গে মিশিয়া থাকে। কাজেই
তাহাদের পক্ষে শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করা যদিও অনেকটা
সহজ, তথাপি তাহারা নানা প্রকার লুকাচুরির আশ্রয় গ্রহণ
করিয়া থাকে। প্রায় এক ইঞ্চি পরিমিত লাল, কালো ও সবুজ
রঙের কয়েক প্রকার চিড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা
শরীরের রং অনুযায়ী বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদের গায়ে এমন ভাবে
বসিয়া থাকে যে হঠাৎ দেখিয়া উদ্ভিদটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যতীত
আর কিছুই মনে হয় না।

চিড়িদের আহারপ্রণালীও অদ্ভুত। জলের তলায় কোন
খাদ্যদ্রব্য দেখিতে পাইলে সাঁড়াশির মত দাড়ার সাহায্যে কুড়াইয়া
লইয়া মুখে পুরিয়া দেয়। খাবার সময় চিড়িদের দেখিলে ঠিক
টানাদের কাঠি দিয়া খাবার মুখে তুলিয়া দিবার দৃশ্য মনে পড়ে।
খাদ্যসংগ্রহের জন্য দুইটি দাঁড়াই পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া
থাকে। জলের উপরে ভাসমান কোন খাদ্য সংগ্রহ করিতে
হইলে চিড়ি কিছু দূর ভাসিয়া উঠিয়া লতাপাতার আড়ালে
আত্মগোপন করে এবং দূর হইতে দাড়ি বাড়াইয়া তাহা টানিয়া
লইয়া জলের নীচে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে রাখিয়া ধীরে ধীরে
আহার করিয়া থাকে। বঁড়িশিতে টোপ গাঁথিয়া ফাংনার সাহায্যে
তাহা ভাসাইয়া রাখিলে এই ব্যাপার পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাওয়া
যায়। সাধারণতঃ বঁড়িশিতে হেঁচকা টান মারিয়া বেকুরে মাছ
ধরা হয়, সেইরূপ হেঁচকা টানে চিড়ি ধরা পড়ে না। চিড়ি
আন্তে আন্তে আসিয়া সাঁড়াশি বা দাড়ার সাহায্যে টোপ
আঁকড়াইয়া ধরিয়া জলের নীচে নির্জন স্থানে টানিয়া লইয়া বাইতে
থাকে। তখন বঁড়িশির স্রুতা টানের উপর রাখিয়া আন্তে আন্তে
উপরের দিকে তুলিতে থাকিলে চিড়ি টোপ আঁকড়াইয়া স্রুতার
সঙ্গে ধীরে ধীরে উপরে আসিতে থাকে। কারণ সহজে সে খাবার
ছাড়িয়া দিতে চায় না। যখন দেখে যে টোপ টানিয়া আর
নীচে লইয়া যাইবার উপায় নাই এবং আর একটু হইলেই খাবার
হাতছাড়া হইয়া যায় তখন তাড়াতাড়ি মুখে পুরিয়া গিলিয়া ফেলে,
স্রুতা টান থাকিবার ফলে বঁড়িশি তখন তাহার মুখে গাঁথিয়া
যায়।

কোন খাদ্যবস্তু কঠিন আবরণে আবৃত থাকিলে চিড়ি তাহার
নাকের ডগার লম্বা করাতের সাহায্যে আবরণ ফুটা করিয়া ভিতরের
জিনিষ আহরণের চেষ্টা করে। যে-সব পুকুরে কুচা-চিড়ি প্রচুর
পরিমাণে বাস করে সেই পুকুরের জলে নামিয়া একটু চূপ করিয়া
দাঁড়াইয়া থাকিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পায়ের
চতুর্দিকে অসংখ্য কুচা-চিড়ি মিলিয়া তাহাদের সন্মুখ করাতের



চিড়ি-কাঁকড়ার দাড়ার চাপে চিড়িটি
মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে

অগ্রভাগ দিয়া খোঁচাইতে থাকে। শরীরে অসুখ্য স্বস্তি স্বস্তি হুচ বিধিবার মত যন্ত্রণা অনুভূত হয়।

চিড়ি ও কাঁকড়ার মধ্যে নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে মোটেই বনিবনাও হয় না। উভয়ের মধ্যে খাচ্চ-খাদক সম্বন্ধ। তাহা ছাড়া একে অন্নের আধিপত্য মোটেই সহ্য করিতে পারে না। বড় বড় কাচের জলাধারের মধ্যে কাঁকড়া ও চিড়ি

একত্র রাখিয়া দেখিয়াছি—প্রশস্ত স্থানে উভয়ে উভয়কে এড়াইয়া চলে; অপ্রশস্ত ছোট জলাধারে প্রায়ই ঝগড়া বাধিয়া যায় এবং পরস্পর মারামারির ফলে অধিকাংশ স্থলে চিড়িই পরাভূত হয়। কাঁকড়া তাহার মৃতদেহ আংশিকভাবে ভক্ষণ করিয়া থাকে। কাচের জলাধারে একটি চিড়ি-কাঁকড়ার সঙ্গে কয়েকটি চিড়ি রাখিয়াছিলাম। কয়েক দিন পর্যন্ত তাহারা বেশ নিরিবিলিতে কটাইল—কোনই গোলমাল নাই। হঠাৎ একদিন দেখি, কোন রকমে একটি চিড়ির সঙ্গে কাঁকড়াটার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছে। অমনি লড়াই শুরু হইয়া গেল। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই কাঁকড়া তাহার দাড়ার সাহায্যে চিড়ির এক দিকের কয়েকটা পা ভীষণ জোরে চাপিয়া ধরিল। চিড়ি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও ছাড়াইতে পারিল না। অবশেষে কিছুক্ষণ ঐ অবস্থাতেই ছটফট করিতে করিতে ধীরে ধীরে প্রাণত্যাগ করিল। একদিন অল্প জলের মধ্যে একটা সীলা-কাঁকড়া ও চিড়ি রাখিবার কিছুক্ষণ বাদেই উভয়ে ভীষণ মারামারি শুরু করিয়া দিল। চিড়ির দাড়া অপেক্ষা কাঁকড়ার দাড়া বেশী জোরালো ও তীক্ষ্ণ। কাঁকড়াটা তাহার সাঁড়াশির মত দাড়ার সাহায্যে চিড়ির শরীরের মধ্যদেশ এমন ভাবে চাপিয়া ধরিল যে চিড়িটা দুই-চার বার ছিটকাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিয়াই একেবারে নিজীব হইয়া গেল। খানিকক্ষণ বাদে কাঁকড়া মৃতদেহটাকে ছাড়িয়া দিয়া হাত পা গুটাইয়া এক স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভ্রম-সংশোধন

বৈশাখ, ১৩৪৪—“বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থার গতি ও প্রকৃতি”

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৬	১	৯	১৮ই মে	১৮ই জুন
১২৭	১	১০	১৯৩০	১৯৩১
১৩৫	২	২	জুন-জুলাই	আগষ্ট
১৪১	২	৪	১লা	২রা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪—“বাঙ্গালা বাণান”

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০২	২	৩৯	মুদ্রণ	মুদ্রনা
২০৬	২	২৩	পা + বি + চ - ক্ত	পা + বি + চ + ক্ত

বদরীনাথ চিত্রাবলী



শতকর্তন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



তীর্থযাত্রী
দ্বীপ্রিজমোহন জিজ্ঞা



ধানভাননা

অলংখ-বোরা

শ্রীশান্তা দেবী

২১

স্কুল কলেজ থাকিলে সপ্তাহে এক দিনের বেশী হৈমন্তীদের বাড়ী যাওয়া হয় না। এই একটা দিনই ছিল স্বখার প্রাত্যহিক রুটিনের বাহিরে মুক্তির দিন, কাবণ তাহাব মা পীড়িত বলিয়া তাঁহার সঙ্গে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ কি কোন উৎসব-আনন্দে যাইবার সুযোগ তাহার ঘটিত না। এই একটা দিনের জন্ত সারা সপ্তাহ ধবিয়া উন্মুখ হইয়া থাকে স্বখার নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে দিনটা কখনও বাদ পড়িলে এমন কিছু দারুণ নৈরাশ্রের কারণ ঘটিত না। হৈমন্তীর সঙ্গে সপ্তাহের আর ছয়টা দিন ত দেখা হয়ই।

অকস্মাৎ এই দিনটাব আশা-পথ চাহিয়া থাকায় স্বখার আগ্রহ যে অনেক গুণ বাড়িয়া গিয়াছে তাহা সে আপনি দেখিয়া বিনিমিত হইল। একদিন সকালে উঠিয়া সে লক্ষ্য করিল যে, একটা বাজি কাটিয়া যাওয়াতে দুটির দিনের কতটা কাছে সে আগাইয়া আসিয়াছে তাহা সে গুনিতে আরম্ভ করিয়াছে; সন্ধ্যাতেও সে একটা দিন শেষ হওয়ার যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। দিন ও বাজিকে দুই ভাগ করিয়া লইয়া দিনের বারোটা ঘণ্টা কাটিয়া গেলে তাহাব আনন্দ যেন উপছিয়া পড়ে, কাবণ বাজির বারোটা ঘণ্টা ত ঘুমাইয়াই কাটিয়া যাইবে। কখন যে তাহার আরম্ভ সেইটুকু জানিলেই চলিবে, শেষটার জন্ত দীর্ঘ বাবো ঘণ্টা সজ্ঞানে অপেক্ষা কবিত্তে হইবে না।

কিন্তু কেন তাহাব এই আগ্রহ? আগ্রহের কারণ বুঝিয়া আপনাব কাছে আপনাকেই যেন সে অপবাদী বলিয়া মনে করিত। জীবনে উচ্চ আদর্শের, ত্যাগের আদর্শের, প্রতি স্বখার টান ছিল। সে যে তাহার জীবনে বড় কিছু ত্যাগ করিতে পাবে নাই ইহার জন্ত তাহার মনে মনে একটা মন্ত লক্ষ্যও ছিল। তপনের গ্রামের স্কুল দেখিয়া আসিয়া তাহার সেই লক্ষ্যটা অনেকখানি বাড়িয়াছে। ইচ্ছা করে তপনের

মত সেও তাহাব নয়ানজোড় গ্রামের মেয়েদের লইয়া ইচ্ছল পাঠশালা করে, মেয়েদের সভতা ও মহুয্য বৃদ্ধি জন্ত বড় একটা পণ করিয়া কাজে বাঁপ দিয়া পড়ে। কিন্তু স্বার্থপর সে, তাহা পারিতেছে কই? নিকটে যাহারা তাহার মুখ চাহিয়া পড়িয়া আছে, রক্তের সম্পর্কের সেই কমটি মাহুযের স্বথস্ববিধা জুলিয়া দূরের মাহুযের জন্ত জীবনের কিছু অংশও সে দিতেছে কই? আচ তাহার আগ্রহেব অন্ত নাই এই কম্মী তপনের দেখা সপ্তাহান্তে একবার পাইবাব জন্ত। স্বখাব মনে করিতে লজ্জা করে, দুঃখ হয়, যখন সে চমকিত হইয়া নিজের দিকে চায়। সে ত তপনের গ্রাম-গঠনের কাহিনী শুনিবার জন্ত দিনে পর দিন আশাপথ চাহিয়া থাকে না। সে চায় তপনের নবীন ভাস্করের মত উজ্জল স্নন্দর মূর্তিটি বার বার দেখিতে, সে চায় তাহার জলকল্লোলের মত মধুর গভীর কণ্ঠস্বর শ্রাণ ভবিয়া শুনিতে, সে চায় তপনের সহিত আর একটু নিন্ট বন্ধুত্ব মত সম্পর্ক পাতাইতে। যাহার ত্যাগেব এক কণও সে নিজের জীবনে দেখাইতে পারিতেছে না, তাহাব প্রতি এ অহেতুক আকর্ষণকে স্বধা ভীত হইয়া ভাবে এ বুঝি তাহার পতন, এ বুঝি তাহার অলন!

এক এক বার মনে করে হৈমন্তীর বাড়ী এ সপ্তাহে যাইবে না। সে ত তপনের কোন কাজে সাগায্য করে নাই, তবে কেন সে তপনকে দেখিবার জন্ত তাহা সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইবাব জন্ত সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইবে? কিন্তু মনেব এই ক্ষীণ ইচ্ছা টিকে না ওই বিপুল আগ্রহে কাছে। রবিবাব বিকালে স্বধা না গিয়া থাকিতে পার না। তপন কি সব দিনই আসে? সব দিন সে আসে না। স্বধা ঘণ্টা মিনিট গুনিয়া যখন নিরাশ হইয়া বাড়ী ফিরে, তখন রাখে শুইয়া শুইয়া মনে হয় কবে কোথায় তপনের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, কবে সে কি কথা বলিয়াছিল, কোন দিনকার কথাটা

যেন একটু আশ্রয়ের মত, যেন বিশেষ করিয়া স্থারই উদ্দেশ্যে বলা। তাহাদের বাড়ীতে ইতিপূর্বে তপন আসে নাই; আচ্ছা যদি স্থা তপনকে এক দিন এ-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে, তবে কি তপন কিছু মনে করিবে? আসিলে সে স্থার কাছে মস্ত একটা কাজের ভবিষ্যৎ আশায়ই নিশ্চয় আসিবে, কিন্তু যখন দেখিবে স্থা কোন কাজই করিবার স্পষ্ট আশা দিতেছে না, কেবল চা খাওয়াইয়া গান শুনাইয়া বিদায় দিল, তখন স্থাকে কি একটা অপদার্থই না জানি সে মনে করিবে। ভয়ে ভয়ে স্থার সঙ্কল্প মনেই শুকাইয়া বাইত। কিন্তু তবু মন হইতে এ চিন্তাকে সে সরাইতে পারিত না। তপন কি দেশের সেবা ছাড়া জীবনে আর কোন কথা ভাবে না? মাহুষ যে মাহুষের সজ্জ হুঁজিয়া বেড়ায়, মাহুষের বন্ধুত্বের জন্ত ব্যাকুল হইয়া ওঠে, সেই অতি সাধারণ মানব-ধর্ম কি তপনেব মধ্যে নাই? যদি না থাকে তবে সে গানের স্বরব ভিতর দিয়া মাহুষের গ্রাণের কথাকে এমন করিয়া ব্যক্ত করে কি করিয়া? কেন ঐ বিষাদ-মধুর গানগুলিই তাহার কণ্ঠে এমন অপূর্ণ হইয়া ধনিয়া ওঠে? কেন সে জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিদের সন্ধানে না ঘুরিয়া তাহাদের এই ক্ষুদ্র সাক্ষ্যসভার তুচ্ছ হাসিগল্প হাস্য কথার মাঝখানে এমন করিয়া জমিয়া যায়? সেখানে তপন ত মহেশ্বরের মত গুরুগম্ভীর কথা বলিয়া আপনাত মর্যাদা বৃদ্ধির কোন চেষ্টা করে না। স্থার যতই সাধারণ মাহুষ হউক না কেন, বোধ হয় তাহাদের সজ্জ তপনের নিতান্ত মন্দ লাগে না। কিন্তু ঠিক যে কতটুকু ভাল লাগে, মনের কোন্ কোণে কোন্ বন্ধুর জন্ত তাহার কত খানি স্থান আছে তাহা ত কিছু বোঝা যায় না।

ভাবিতে ভাবিতে আপনাত উপর স্থার কল্পনা হয়। এই মাত্র অল্প কিছু দিন আগেই হৈমন্তীর উদাস মনোভাব চিন্তাময় দৃষ্টি দেখিয়া স্থার অভিমান হইত, কেন তাহার মনের বেদনার কথা সে স্থাকে বলে না, কেন সে বন্ধুর সমবেদনার মাঝখানে আপনাত বিষাদের বোঝা নামাইয়া ফেলিয়া মুক্ত হইতে চায় না। আর আজ স্থাও কি তাহাই করিতেছে না? সে ত আরোই বেশী করিতেছে। সপ্তাহান্তে হৈমন্তীর কাছে যখন সে যায় তখন তাহার অঙ্কের বেশী মন পড়িয়া থাকে হৈমন্তীর চেয়ে অনেক

দূরে। অথচ হৈমন্তী মনে করে স্থা বুঝি শুধু তাহারই জন্ত আকুল আগ্রহে এত দূর ছুটিয়া আসিয়াছে। কি জানি স্থার ইহা ভ্রাম্যসঙ্গত কাজ হইতেছে কি না।

স্থা ঠিক করিল একটুখানি কিছু কাজ করিয়া তপনের বন্ধুত্ব লাভের যোগ্যতা তাহাকে অর্জন করিতে হইবে। এই কলিকাতা শহরে ঘরে বসিয়া বাহিরের কিছু কাজও কি করা যায় না? নিশ্চয় যায়। স্থা ও শিবু মিলিয়া তাহাদের বাড়ীর চারতলার চিলেকোঠায় একটা পাঠশালা খুলিবে। নবীর মায়ের ছোট মেয়ে কেনি আর মেথরাসীর মেয়ে সুসি ত রোজ দুই বেলা তাহাদের বাড়ী আসে। এই মেয়ে দুইটাকে লইয়া কাজ সুরু বেশ করা যায়। ইহাদের বর্ণপরিচয় ও ভক্ততা শিক্ষা দিতে পারিলে পৃথিবীর দুইটা মাহুষের ত উপকার করা হয়। স্থা সামান্ত মাহুষ। তাহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট না হইলেও কিছু ত বটে।

শিবু ছল হইতে আসিয়া খাওয়া-দাওয়া সারিয়া মস্ত দুখানা খাতার পৃথিবীর নানা দেশের ষ্টাম্প স্ফুটল করিয়া সাজাইতে ব্যস্ত ছিল। স্থাকে সে বলিয়াছিল তাহার বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে কিছু কিছু ষ্টাম্প যোগাড় করিয়া দিতে। স্থা এত দিন গা করে নাই। আজ সে অকস্মাত বলিল, “শিবু, তুই যদি ভাই, আমার একটা কাজ করৈ’ দিস ত আমি তোকে অনেক ষ্টাম্প এনে দেব।”

শিবু বলিল, “কি কাজ? মার্কেটে সাত বার জুতো বদলাতে যেতে হবে, না ক্লস সিঙ্ক এনে দিতে হবে, না ধোপা নাপিত কাউকে চাটি মারতে হবে? শেষের কাজটা বললেই পারব, অস্ত্রগুলো হ’লে একটু দেবী হবে।”

স্থা হাসিয়া বলিল, “না বাপু না, আমার জুতো এই সব গত মাসে কিনেছি আর ক্লস সিঙ্ক ভ্রম্মদিনে এক বাস্স পেয়েছিলাম গত বাব। ও সব চাই না। ধোপাকে তুমি যদি চাটি মারতে ভালবাস আমার আপত্তি নেই, ও ভীষণ জালাচ্ছে। কিন্তু তা ছাড়াও আর একটা কাজ আছে। আমাদের চারতলার টিনের ঘরে আমি একটা পাঠশালা কবব হুস্তায় তিন সন্ধ্যা। তাতে কেনি আর সুসি প্রথম ছাত্রী। তুই যদি আমাকে একটু সাহায্য কবিস ত একটু কাজ হয়।”

শিবু নাকটা সিটকাইয়া বলিল, “রা—ম—চ—জ্ঞ।

কেনি আর কুসি! পৃথিবীর সেরা ছোট পেট্রীকে পড়াবে আর আমি হাত গুটিয়ে তাদের মাঠারী করব? ওদের টিকি ছেঁড়বার জন্য আমার হাত ত সারাক্ষণ নিস্পৃহ করবে, আর তুমি উপদেশ দেবে যে মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে নেই! তার চেয়ে খোপার ওই নখর ওয়ান পাঞ্জি ছেলেটাকে নাও না। পাড়ার ছেলেদের টিল মেয়ে কেমন বকখাশ্বিকের মত মুখ ক'রে এসে আমাদের বাড়ীতে লুকায়। টিল কাকে বলে তাই নাকি ও জানো না।”

সুখা উৎসাহিত হইয়া বলিল, “আচ্ছা, তুই যদি ওটাকে জোটাতে পারিস, আর ওর ভার নিতে পারিস, তাহলে ত ভালই হয়। পাঠশালার ছেলেমেয়ে বাড়াতে ত হবে।”

কুসির মাকে বলিবা মাত্র সে রাজি হইয়া গেল। “দাও না দিদিমণি, লম্বীছাড়াটাকে মাহুয় করে, তাহলে ত আমার হাড় জুড়ায়। সারাদিন রাত্তায় ধুলো মেখে আর আমাকে শুদ্ধ বাপ মা তুলে গাল দিয়ে ত দিন কাটাচ্ছে। ভদ্র নোকের পায়ের কাছে বসতে যদি পায়, সেও ত ওর সাত-জন্মের ভাগ্যি।”

কিন্তু নবীর মা কেনিকে দিতে অত সহজে রাজী হইল না। মেথরের মেয়ের সঙ্গে তাহার মেয়ে একাসনে বসিয়া পড়িবে শুনিয়া সে ত প্রায় আকাশ হইতে পড়িল। “ঐ কী মেলেছ কাণ্ড দিদিমণি! আমরা গরীব লোক ব'লে আমাদের কি আর জাত জন্ম সব গেছে? মেথরের সঙ্গে পড়তে বসলে আর কোনও কালে কি ওর বেখা হবে, না ওর হাতে কেউ জল ধাবে? বই পড়ে ত মেয়ে চাকরী করবে না আপিসে, কিন্তু জাত গেলে যে সব ধাবে।”

শেষে রকা হইল কুসি আলাদা চটের আসনে বসিবে। কেনি ইচ্ছা করিলে নিজের জন্ত আসন আনিতে পারে অথবা সকলের সঙ্গে মাহুরেও বসিতে পারে।

রজকনন্দনকেও আসন সম্বন্ধে নিজ ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিবার অহুমতি দেওয়া হইল। পাঠশালা স্বল্প দিন দেখা গেল তিন জনেই তিন টুকরা ছেঁড়া চট আনিয়াছে বসিবার জন্য। কিন্তু পাঠারস্তের পর সকলেই ভূমি-আসন বেশী সুখকর মনে করিয়া চটের আসনের মায়া ত্যাগ করিল। দুই-চার বার পাঠশালা করিতে করিতে চট আনার অভ্যাস-টাও ক্রমে তাহার ভুলিয়া গেল। পাড়ার আরও গোটা

দুই ছেলে জুটিয়াছে, সবাই সবাইকান ঘাড়ে পড়িয়া মেজের উপর বসিয়াই পড়া শুনা করে। বে যে মেথর আর কে যে চামার তাহা অত মনে বাধিবার আর কাহারও আগ্রহ নাই।

সুখা ইচ্ছুল ভাল করিয়া সাজাইবার জন্য নিজের ছেলে-বেলার যত ছেঁড়া গল্পের বই একটা ক্রাসিন কাঠের তাকে আনিয়া জড়ো করিয়াছে। দুই-একখানা ছেঁড়া ধারাপাত কি বর্ণ-পরিচয়ের বইও তাহাদের শৈশবের অভ্যাসের অভিক্রম করিয়া এতদিন টিকিয়া আছে। সুখার উৎসাহ দেখিয়া চন্দ্রকান্ত বলিয়াছেন এই বইগুলি সত্য তাঁহার ইচ্ছুলের মণ্ডুরীকে দিয়া বাধাইয়া দিবেন এবং যদি ছাত্রদের কাছে পুরানো বই কিছু পাওয়া যায় তাহাও আনিয়া দিবেন। মহামায়া বলিয়াছেন একটা নতুন হারিকেন লঠন তিনি সুখার ইচ্ছুলে উপহার দিতে রাজি আছেন। হৈমন্তী ত পারিলে তাহার সব বইখাজাই দান করিয়া বসে। সুখা লইতে আপত্তি করাতে সে ছেলেমেয়েদের ইংরেজী বই ও স্নেট পেনসিল জোগাইবার ভার লইয়াছে। শিবু দানখ্যানের ধার ধারে না, তবে সে সপ্তাহে তিন সন্ধ্যায়ই সুযোগ্য শিক্ষকের মত কাজ করিয়া যায়।

পাঠশালার কাজ মহাউৎসাহে চলিতে লাগিল। ছেলে-মেয়েগুলি আকাট মুখ ছিল, এক মাসের মধ্যেই বর্ণ-পরিচয় সারিয়া একটু আখটু পড়িতে শুরু করিয়াছে, ইহাতে সুখার মনে গর্বের ও আনন্দের সীমা নাই, কিন্তু ঐ আনন্দের উপর আরও একটা আনন্দের স্খাও যে তাহার আছে। ছোট বটে তাহার এই কাজটুকু, তবু ইহা তাহার দেখাইতে ইচ্ছা করে তপনকে। শুধু দেখানো বহিলেও ঠিক বলা হয় না, দেখাইবার উপলক্ষ্য করিয়া তপনকে একবার তাহাদের এই ছোট বাড়ীটিতে লইয়া আসিতে, তাহার মুখে দুই-একটা উৎসাহের কথা শুনিতে সুখার যতানি আগ্রহ হয়, আর অন্য কোন কাজে ততখানি হয় না। তপনের মুখের দিকে চাহিয়া সুখা বুঝিতে চায় সুখার একজন্ম তপন সত্যই খুশী হইয়াছে কি না। তপনের বন্ধু বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্যতা সুখা অর্জন করিয়াছে; কিন্তু তাহা কোন উপায়ে সে একবার ভাল করিয়া জানিতে চায়। সুখা মনে করিয়াছিল তপনের প্রিয় কার্যের মধ্যে ভূবিয়া সে তপনকে

লইয়া অলস স্বপ্নের জাল খোনার অভ্যাস তুলিতে পারিবে। কিন্তু দেখিল তাহার এ অল্পমান মিথ্যা; “তপ্ত প্রীতি” ও “তপ্ত প্রিয় কার্য্য” তাহার জীবনে পবনস্বরকে বাড়াইয়াই তুলিতেছে। কাজ ও অকাজের মাঝখানে ঐ চিন্তা যেন তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিতেছে।

মনে মনে কথা বলার অভ্যাস স্থার অনেক দিনের। সে অভ্যাস কিছু মাত্র দূর হয় নাই, কিন্তু তাহাতে একটা পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। আগে স্থার মানস-নাট্যে কথা বলিত অনেক জন, এখন সেখানে ক্রমে দুইটি মানুষই প্রায় সমস্ত মঞ্চ জুড়িয়া বসিয়াছে। স্থা ও তপন মনে মনে প্রতিদিন যত কথা বলে, লিখিয়া বাখিতে পারিলে তাহাতে বহু কাব্য রচনা হইয়া যাইত। অবশ্য, তপনের কথাগুলিও বলে স্থাই, কিন্তু স্থাই তাহা এমন তন্ময় হইয়া শোনে যে, সে-ই যে নাট্যরচয়িত্রী তাহা তাহাব নিজেরই মনে থাকে না। তপনকে লইয়া স্থা মনে মনে চলিয়া যায় তাহাদের সেই শৈশবের নয়ানজোড়ে। সেখানে বিশালকাণ্ড মহা গাছের তলায় কালো পাথরের উপরে বসিয়া তাহার দীর্ঘ-পাড়েব বকেদের সাদা ডানার দ্ব্যতি দেখে আর কত তুচ্ছ কথায় জীবনের মাধুর্য্যকে উপভোগ করে। কথা বলিতে বলিতেই পট পরিবর্তিত হয়, স্থা ও তপন চলিয়াছে রূপাই নদীৰ জলে পা ডুবাঁইয়া ওপারের ধানব ক্ষেতের দিকে। সেখানে তাহাবা সাঁওতাল মেয়েদের নিকট দুখ কিনিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। তপনের অঞ্চলিতে স্থা দুখ চালিয়া দিতেছে। তপন থাইতে থাইতে হাসিয়া ফেলাতে অর্দ্ধেক দুখ মাটিতে পড়িয়া গেল। স্থা সরোষে জ্বলজ্বল করিল, কিন্তু বাগ তাহার আসে না যে। সেও হাসিয়া ফেলিল।

আবার পট-পরিবর্তন। স্থা নয়ানজোড় হইতে হাঁটিয়া বতনজোড়ে যাইতে যাইতে যেন মেঘ করিয়া চাবিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। স্থা অজানা পথে বিপথে চলিয়াছে, অন্ধকারে পথের মাঝখানে ত দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। কে যেন গানের স্বরের ভিতর স্থার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। এত তাহাব পরিচিত কণ্ঠ। ঐ ত তপন। সে বলিতেছে, “স্থা, তোমার এত ভয়!”

মনের ভিতর এই সকল মনগড়া গল্প জমা হইতে হইতে কতক সে ভুলিয়া যাইত, কতক বার বার দেখা দিয়া যেন

সত্য হইয়া উঠিয়া সমস্ত জীবনটা মধুর বসে ভরিয়া তুলিত। আপনি আপনার আনন্দ-নিকেতন গড়িয়া সে তাহার ভিতর স্থাে বিচরণ করিত। কিন্তু জীবনের সমস্তটাই ত স্বপ্ন নয়, অর্দ্ধজাগ্রত মুহূর্তের মালাও নয়। এই স্বপ্নাবেশ চোখ হইতে কাটিয়া গেলে প্রকৃত মানুষটাকে কাছে দেখিতে, বন্ধু বলিয়া জানিতে যে দুরন্ত আগ্রহ তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিত, তাহাকে সে সহজে সামলাইতে পারিত না। কিন্তু প্রকৃতি তাহার শাস্ত বলিয়া বাহিরে কোন প্রকাশ ছিল না।

তাহার মনে পড়িত শৈশবে-দেখা তাহার মাসিমা স্বরধুনীর কথা। মাসিমার স্থতির সঙ্গে রাজির অন্ধকারে শোনা যে সব ছিন্নহৃদয় গল্প ও বেদনার স্বর তাহার মনের ভিতর এখনও জড়াইয়া আছে, তাহাতে মনে হইত যেন আপনাকে সে অনেকখানি স্বরধুনীর সঙ্গেই মিলাইতে পারিতেছে। শৈশবে যে-স্বরধুনীর দুঃখের কথা সে বুঝিতে পারিত না, কিন্তু ষাঁহার ঐকান্তিকতার স্বর, ষাঁহার তন্ময়তার ছবি তাহার মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল, সেই স্বরধুনী এত দিন পরে তাহাব হৃদয়ে জীবন্ত হইয়া উঠিতেন, ছিন্নহৃদয় সে সকল কাহিনী, গভীর মনোবেদনার সে ইতিহাস, আত্ম-বিলোপী সে অনুরাগ যে কেমন ছিল, স্থা তাহা আপনি গড়িয়া লইতে পারিত।

মনে পড়িত মিলিদিদির কথা। মিলিদিদি তাহার এত বিলাস আবাম ছাড়িয়া যোগিনী বেশে যে কোন্ দূরদেশে চলিয়া গেল, সে কি তাহার মত এই গভীর অনুরাগের জন্ম ? একবার মনে হয় তাহার মত এমন করিয়া উচ্চাসনে প্রিয়কে বসাইবাব ক্ষমতা মিলিদিদির নাই, আবার মনে হয় মিলিদিদির মত এমন করিয়া সব ভাসাইয়া চলিয়া যাইবার ক্ষমতা বোধ হয় স্থার নাই।

অনুরাগের ঐশ্বর্য্যে মিলি বড় কি স্থা বড়, কি তাহার মাসিমা স্বরধুনীই বড় ছিলেন, ইহা ভাবিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার কোন প্রয়োজন ছিল না; এই তিন জনের অনুরাগ একই পর্য্যায়ের কিনা তাহাও স্থা সাহস করিয়া বলিতে পাবে না। কিন্তু তবু তাহাব মনে এ সকল কথা বাববার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিত।

মনে পড়িত তাহাদের স্থলে মনীষা ও স্নেহলতার তর্কের বিষয়। সেদিন সে ইহাদের তর্কে ঠিক কোন স্থানটি লইবে

বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু আজ তাহার মন যেন স্নেহলতার দিকেই ঝুঁকিতেছে। বিবাহের আদর্শে প্রেম আগে কি বিবাহ আগে এ সব বড় কথা লইয়া ভর্ক করিতে সে পারিবে না। কিন্তু বিবাহের আগে হউক আর পরেই হউক, ওই একনিষ্ঠ প্রেমের অঞ্জলি পাইবার অধিকার যে প্রত্যেক নারীর জন্মস্বত্ব সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ নাই। প্রত্যেক শিশু যেমন শিশুকণ্ঠে মার মনের নিঃস্বার্থ অনাবিল স্নেহ-ধারায় অভিসিঞ্চিত হইবার অধিকার লইয়াই জন্মায়, তেমনই ভরণ জীবনের প্রথম প্রভাতে কোন একজন পুরুষের নবজাগ্রত পুত্র প্রথম প্রেমের অর্থ্য পাইবার অধিকার লইয়াই প্রত্যেক নারী জন্মায়। বিধাতা কি স্বধাকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন ?

স্বধা নারী-মাধুর্যের প্রতিক্রম নয় সত্য; কিন্তু তবু তাহার ইচ্ছা করে তাহাকে দেখিয়া নারী-মাধুর্যের ও নাবী-মহিমার প্রথম পরিচয়ে বিশেষ একজনের উন্মেষিত নবীন যৌবন বিষয়ে ও পুলক-হিল্লোলে চঞ্চল হইয়া উঠুক; সেই একজন নাবীহৃদয়ের অক্ষয় সৌন্দর্য্য নির্ব্বরের উৎস খুঁজিতে ও সেই সৌন্দর্য্যধারায় আপন অনন্ত তৃপ্তি মিটাইতে বিশ্ব-সংসার ভুলিয়া অন্ধ আবেগে তাহারই দিকে ছুটিয়া আসুক। জীবনে একবার অন্তত এই আনন্দরসটুকু আশ্বাদ করিবার অধিকার তাহার আছে।

বিবাহের কথা, প্রেমের কথা কোন দিন সে ভাবে নাই। কিন্তু ভাবিবার আগেই আপনাব অজ্ঞাতে তাহার মন যে সূর্য্যমুখী ফুলের মত বিশেষ একদিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে। জানি না জীবনে ইহা তাহাকে কোন্ সমস্তার সম্মুখে আনিয়া ফেলিবে। জানি না আনন্দের অধিকার তাহার পূর্ণ হইবে, কি সমস্তার স্থগিপাকে জীবনযাত্রা সফটময় হইয়া উঠিবে ?

তপন স্নন্দর, দেবমুষ্টিব মত অপূর্ণ স্নন্দর। স্বধা ত স্নন্দর নয়, পৃথিবীর মাগকাঠিতে সে ঐ স্তরে পৌছিবীর অধিকার লইয়া আসে নাই। কিন্তু মানুষের সৌন্দর্য্য কি শুধু তাহার দেহে থাকে, স্ত্রীর চোখেই যে তাহার অর্দ্ধেক অধিষ্ঠান। নহিলে এই স্বধাকেই হৈমন্তী একদিন এত স্নন্দর কি কবিয়া ভাবিয়াছিল ? শিশুর অসহায় কচিমুখে জননী যে-রূপ দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যান, সে-রূপ কি শুধু শিশুর মুখের না সে জননীর স্নেহবিগলিত হৃদয়ের যৌগিক রসায়নে

সৃষ্ট ? নারীর নিষ্কলক প্রেমের যে অম্ল্য দীপ্তি, মুগ্ধ প্রেমিকের দৃষ্টির স্পর্শমণিতে তাহাই ত নিমেষে ক্রমা ধরণীর শ্রামাঙ্গিনী মেয়েটিকে উর্ধ্বশী করিয়া তোলে। সে রূপ জগতের সকলের চক্ষে ধবা দিবার জন্ত নয়। সে শুধু তাহারই হৃদয়দেবতাব আরাধনার পুষ্পাঞ্জলি। কৃষ্ণচূড়ার রক্ত স্তবকের মত পথের ধারে গাছ আলো করিয়া ফুটে নাই বলিয়া কি ক্ষুদ্র বৃথিকার রূপ নাই ? শ্রামপত্রের অন্তরালে ঃধু ও গন্ধে বুক ভরিয়া অমল শোভাতে যে লুকাইয়া জলিতেছে, তাহার রূপের মূল্য বুঝিতে গুণীজনের প্রয়োজন আছে।

সে যে নিজের মনের কাছে নিজের হইয়া ওকালতি করিতেছে, ইহা মনে করিয়া স্বধা লজ্জা পাইত, আপনাকে দিক্কার দিত, আবার কাজের মাঝখানে গভীরভাবে ডুবাব চেষ্টা করিত। তাহার কলস্রের পদ্ম, গৃহসংসারের সেবা, চারতলার স্কুলের শিক্ষকতা—সবগুলিকে আবাব দিগুণ আগ্রহে চাপিয়া ধরিত।

২২

যেদিন হৈমন্তী ও স্বধা তপনের ইতুল দেখিতে যায়, সেই দিনই তাহারা সুরেশের নিকট খবর পাইয়াছিল যে মিলি তাহার জীবনের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে। রেজুনে তাহার পিসিমা তাহাকে বছর তিনেক ধরিয়া জর্জেরটের শাড়ী, হাতকাটা জাম্পার ও বুক পর্যন্ত লম্বা ছল পবাইয়া গালে রুদ্র, ঠোটে লিপষ্টিক দিয়া দুই কানেব উপর দুই খোঁপা বাঁধিয়া, কখনও বা জোড়া বিহুনি ছলাইয়া তাহাব পূর্ব্বতন ক্যান্সান-প্রিয়তাকে স্মিরাইয়া আনিবাব অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে কিছুই যে তিনি সমর্থ হন নাই তাহা নহে। প্রথম প্রথম আপত্তির সহিত এই সমস্ত প্রসাধন সহ্য কবিলেও শেষে মিলি ইহাতে সানন্দেই মন দিত। কিন্তু যে-মন লোকসমক্ষে প্রসাধনের ক্ষুদ্র আনন্দে গভীর দুঃখ ভুলিবার চেষ্টা করিত, সেই মনই লোকের চোখের আড়ালে আপনাব অতীত আনন্দ ও বর্তমান চিন্তকে লইয়া ভবিষ্যতের স্বপ্নজাল বুনিত ও দিনের পব দিন গুনিয়া চলিত। পিসিমা যখন সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত কোন ব্যারিষ্টার কিম্বা বিলাত-না-বাগুয়া কোন ধনকুবেরের সঙ্গে গিলির আলাপ করাইয়া দিতেন তখনই মিলি কেমন শামুকের মত তাহার অস্বাভাবিক

গাভীর্থের খোলার ভিতর ঢুকিয়া পড়িত। গান গাহিতে বলিলে সে পদ তুলিয়া যাইত, বাজনা বাজাইতে বলিলে তাহার হাত ব্যথা করিত এবং সকল বিষয়েই পিসিমার কথাকে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিত।

দেখিতে দেখিতে মিলির বয়স প্রায় বাইশ হইল, কিন্তু রেত্ননে তাহার বিবাহ হইবার কোন আশা দেখা গেল না। পালিত-গৃহিণী মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, যেমন করিয়াই হউক মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে। বেশী ভাল করিতে গিয়া শেষ পর্য্যন্ত মেয়ের যদি মোটে বিবাহই না হয়, তখন ও-মেয়ের দশা কি হইবে? তিনি ভলে ভলে ধোঁজ লইতে লাগিলেন স্বরেশ কিছু কাজকর্ম করে কি না। শোনা গেল সে একটা আপিসে একশত টাকা মাহিনায় কাজে ঢুকিয়াছে। অল্প ছোটখাট কাজেও কিছু কিছু করিবার চেষ্টা করে। গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত পালিত-গৃহিণী বলিলেন, “মেয়েটার অদৃষ্টে এই লেখা ছিল।”

দেবরের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি ঠিক করিলেন যে মিলিকে দেশে আনাইয়া স্বরেশের সহিতই বিবাহ দিবেন। কিন্তু নরেশ্বর গেলেন ক্ষেপিয়া। তিনি বলিলেন, “আমি চললাম এক্ষেপে ছেড়ে। তোমাদের যা খুশী তোমরা করগে যাও।”

রঞ্জন বলিলেন, “দাদা ভুলে যান যে তিনি যেমন জেনী, তাঁর মেয়েটিও ঠিক তেমনি হতে পারে। ওর কপালে টাকা নেই তুমি ত বলছই। এই বেলা বিয়ে দিয়ে দাও, তবু স্বামী ভদ্রলোক হবে, সে একটা সাক্ষ্য।”

মিলি আসিয়াছে, তাহার পিতা পলাতক। কিন্তু তৎসঙ্গেও মহা দীর্ঘনিশ্বাসে করিয়া বিবাহের আয়োজন লাগিয়া গিয়াছে। পালিত-গৃহিণী প্রথম শুভদিনেই বিবাহ দিবেন। আর একদিনও অকারণ নষ্ট করিবেন না। বাড়ীতে সকল জাতীয় কর্ম্মরই খুব প্রয়োজন। কাজেই মিলি ও হৈমন্তীর যত বন্ধুবান্ধব আছে সকলেরই সর্ব্বক্ষণ আনাগোনা চলিতেছে। মেয়েরা দু'রে থাকে, গাড়ী না পাইলে তাহাদের আসা শক্ত, হুতরাং তাহাদের চেয়ে ছেলেদেরই বেশী দেখা যায়। তখন, নিখিল, মহেন্দ্র প্রভৃতি দুই বেলাই আসে। আসবাব, খাবার, ফরাস, চোর, আলো, পাখা, চিঠি, কবিতা,

কত রকমের জিনিষের যে ঐ একদিনের ব্যাপারের জন্ত প্রয়োজন তাহার ঠিক নাই। কাপড়-গহনাটা মেয়েদের এলাকায় পড়ে, কাজেই হৈমন্তী ও স্নহা তাহার ভার লইয়াছে। আর বাকি সব কাজই ছেলেদের। চিঠির কাজটায় ছেলেরা ইচ্ছা করিয়া মেয়েদেরও দলে লইয়াছে। নিখিল বলে, “মেয়েদেরই হাতের লেখা ভাল। তাঁরা যদি চিঠির ঠিকানা লিখে দেন, তাহলে আমবা চিঠি ভাঁজ করে পুরবার ভার নিতে পারি।”

হৈমন্তীও এরকম কাব্য-বিভাগে আপত্তি। সে বলে, “তার মানে আপনারা শক্ত কাজগুলো আমাদের দিয়ে করিয়ে, নিজেরা খালি একটু হাত নাড়বেন।”

মহেন্দ্র বলিল, “তা নয়! পৃথিবীতে কাজ পুরুষেরই করে। মেয়েরা কেবল একটু মিষ্টি কথা বলে তাদের মনটা খুশী রাখে।”

মিলি বলিল, “শুধু মিষ্টি কথা বলার ভার নিয়ে যদি সংসারে আমরা একবার বেরোই, তাহলে পরশুরামের পৃথিবী নিষ্কজ্রিয় করার মত দু-দিনে পুরুষজাতি সব জীলোকের মাথা কেটে রেখে দেবে।”

নিখিল বলিল, “বাগরে, বিয়ের কনে হয়ে আপনি পুরুষ-জাতির নামে এমন কথা বলছেন! আপনার চক্ষে কোনো মোহের অঙ্কন আছে বলে ত মনে হচ্ছে না।”

মিলি বলিল, “আছে বলেই ত জেনে শুনেও এমন পাগলামি করছি। ভাল মন্দ সব জেনেও মাছবের নিজের নসন্ধে সর্ব্বদাই মনে কতকগুলো ছুরাশা থাকে।”

নিখিল বলিল, “আচ্ছা, একটা ভাগাভাগি করলে হয় না? আমরা যতক্ষণ কাজ করব ততক্ষণ আপনারা মিষ্টি কথা বলবেন অর্থাৎ গান করবেন, এবং আপনারা যতক্ষণ কাজ করবেন ততক্ষণ আমরা আমাদেরসাধ্যমত মিষ্টি কথা বলব।”

হৈমন্তী হাত জোড় করিয়া বলিল, “দোহাই নিখিলদা, আপনি ওকাজের ভার নেবেন না, তাহলে আমাদের সব ঠিকানা ভুল হয়ে যাবে।”

নিখিল বলিল, “আমি বুঝতে পেরেছি, তখন ছাড়া আর কারুর গান এ সভায় মঞ্জুর নয়।”

তখন লাল হইয়া উঠিয়া বলিল, “না, না, তা কেন? আপনার গানই আজ সকলের আগে শোনা হবে।”

স্বধাও ব্যস্ত হইয়া বলিল, “সত্যি হৈমন্তী, এ তোমার অজ্ঞায়। ওঁর অমন স্থলর গলা, কেন তুমি ওঁকে যা তা বলছ? আপনাকে আজ গান করতেই হবে দেখুন। আপনি গান না করলে আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।”

তপনের অহরোধ নিখিল বিশেষ ধর্মবোধের মধ্যে আনে নাই, কিন্তু স্বধার অহরোধে সে আনন্দে ও লজ্জায় একটু যেন বিব্রত বোধ করিতে লাগিল।

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলিয়া স্বধাও ঘামিয়া উঠিবার যোগাড়। কিন্তু যখন একটা অহরোধের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, তখন মাঝপথে ত থামিয়া যাওয়া যায় না। নিখিল এক তাড়া চিঠি লইয়া সতরঞ্চির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া লাল কালিতে কলম ডুবাইয়া মহা উৎসাহে ঠিকানা লিখিতে আরম্ভ করিল, দেখিয়া স্বধা আবার বলিল, “ওকি, এখন ত আপনার ঠিকানা লেখার পালা নয়, আপনাকে এখন গান শোনাতে হবে। চিঠির তাড়াটা আমার দিন দেখি।”

নিখিল স্বধাকে এমন জোরজবরদস্তি করিতে কখনও দেখে নাই, সে কতকটা নিরুপায় হইয়া এবং কতকটা খুশী হইয়াই কলমটা নামাইয়া রাখিল। বলিল, “আমি ত ভাল গান কিছুই জানি না। কি গাইব বলুন।”

স্বধা বলিল, “আপনি ত সত্যেন দত্তর খুব ভক্ত, তাঁর একটা গান করুন না।”

নিখিলের গলাটা ছিল ভালই, কিন্তু তাহার একটা অপবাদ বন্ধুসমাজে ছিল যে, সে কখনও সঙ্গীত-রচয়িতার সুরের শাসন মানিত না। সকল গানের সুরই নাকি তাহার স্বরচিত। এই জন্তই তাহার গান বন্ধুবান্ধবদের ঠাট্টার বিষয় ছিল। কিন্তু আজ স্বধাকে নাছোড়বান্দা দেখিয়া সে গান ধরিল,

(হার) তোমার আমি কেউ নহি গো,
সকল তুমি মোর।

(আজ) চাইলে তোমায় পাই যে কাছে
নাই যে ভেতন জোর।

(ওগো) হৃদয় তবু হাহাকারে

(কেন) কেবল ডাকে হায় তোমারে

(আমায়) আকুল আঁখি তোমার খোঁজে
খোঁজে আঁখির লোর।

(এই) ভুবন-ভরা শূন্যতা আর হাতে পারি নে
অন্ধ-করা অন্ধকারের অঁচ হেরি নে,

(আমি) সকাল বেলা তেবল ভাবি
কোথাও কিছু নাইক দাবী

(হার) বিনি স্ততার মালা মোলর

(মাঝে) নাইরে বাঁধন তোর।”

স্বধাও হৈমন্তী এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, “কি চমৎকার গানটা!” নিখিল বলিল, “কবির চোখের দৃষ্টি যাবার উপক্রম হওয়ার সময় এ গানটা লিখেছেন শুনেছি।”

মহেন্দ্র বলিল, “কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি যেন,

লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাই কবে,
সুরের ভিতর লুকাইয়া কহ তাহারে।”

মিলি বলিল, “যদি তাই হয়, তাতে আপনাব কি? মাঝখানে অকারণে খোঁচা দিতে আপনার এত ভাল লাগে কেন?”

মহেন্দ্র ও নিখিল এক সঙ্গেই লাল হইয়া উঠিল। মহেন্দ্র তাহার ভিতরেই বলিল, “আপনায় এলাকায় খোঁচাটা একটু লেগেছে বলে বুঝি আপনাব এত রাগ?”

তপন বলিল, “ওহে মহেন্দ্র, শুভদিনে মূর্ত্তিমান নাবদের মত তুমি যত তিস্ত বসেন আন্দানি করছ কেন বল দেখি?”

মহেন্দ্র বলিল, “আমার ছুটুট! আমি যা বলি তাই তোমাদের কানে তেতো শোনায়ে। একজন গণ্যকার আমার হাত দেখে বলেছিল যে আমি মাছুষের মনোহরণ-বিজ্ঞায় খুব পাবদর্শী হব। এটা শোধ হয় তারই প্রথম ধাপ।”

সকলে হাসিয়া উঠিল।

পালিত-গৃহিণী খেরো-বাঁধানো একটা লাল খাতা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিছেন, “ওরে, আজ যে গয়না-কাপড় আনতে যাবার দিন, তোরা চিঠিপত্রগুলো খানিক সেবে একবার বেকবি?”

মিলি নাকিসুরে বলিল, “আমি যেতে পাবব না মা।”

মা বলিলেন, “তোরা কি সব তান্ড অনাছিষ্টি কাণ্ড। আজকাল ত সবাই যায় বাপু। নিজের জিনিষ নিজে পছন্দ করে নিতে দোষ কি?”

হৈমন্তী বলিল, “তুমি বলছ বটে জ্যাঠাইমা, কিন্তু জ্যাঠামশায় ত এখনও তোমাব কথায় সায় দিলেন না।”

পালিত-গৃহিণী বলিলেন, “থাক, থাক, তোকে আর পাকামি করতে হবে না। তুই না হয় যা, গর গয়না কটা উদ্ধার করে নিয়ে আয়।”

হৈমন্তী বলিল, “আচ্ছা, তাই না হয় যাচ্ছি। কিন্তু আমার সঙ্গে কে যাবে?”

ছেলেরা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। নিখিল বলিল, “যাকে আপনি হুকুম করবেন। আমরা সবাই রাজি আছি, কিন্তু যাকে আপনি না নিয়ে যাবেন সেই কাল থেকে কাজে আসা বন্ধ করবে।”

হৈমন্তী বিপদগ্রস্ত মুখ করিয়া বলিল, “তাহ’লে ত সকলকে নিয়ে যেতে হয় দেখেছি। সেই ভাল, এখানকার কাজকর্ম ফেলে সবাই যাওয়া যাক দিদির গয়না আনতে।”

সুখা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “আমি তাই থাকছি। আমার দ্বারা যতটা হয় কাজ এগিয়ে বাধব।”

নিখিল বলিল, “আমি প্রথম আপনাকে সমস্তায় ফেলেছিলাম, আমিও থাকছি।”

হৈমন্তী ভীত মুখ করিয়া বলিল, “আম্মে আম্মে সবাই থেকে যেও না, আমি কি শেষে একলাই যাব।”

তপন ও মহেন্দ্র তখনও ‘না’ বলে নাই, স্বভাব তাহাবাই দুইজনকে যাইবে ঠিক হইল।

তপন চলিয়া গেল, হৈমন্তীও চলিয়া গেল। সুখার ইচ্ছা করিতেছিল সেও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সে যে কাজ করিবে কথা দিয়াছে এখন ত আর কথা কিরানো যায় না। জোর করিয়া খুশী মুখ করিয়া সে কাগজকলম কালি লইয়া বলিল। দলের অর্ধেক মাহুষ উঠিয়া যাওয়াতে মিলিকেও একটু স্নান দেখাইতেছিল। একমাত্র খুশী দেখা গেল নিখিলকেই। সে আবার একতড়া খাম লইয়া কলম চালাইতে চালাইতে বলিল, “দিদি ত উমার তপস্রায় ময়, আর সবাই মহোৎসাহে দিল নৌড়, ভাগ্যিস আপনি বইলেন, নাহ’লে আমি বেচাবী একলা মাঠে মারা যেতাম।”

সুখা বলিল, “এমন উৎসব-আয়োজনের ঘটকে আপনি মাঠ বলেন।” কিন্তু মনে মনে তাহারও উৎসব-গৃহকে আজ শূন্য মাঠ বলিয়া মনে হইতেছিল। হৈমন্তীদের বাড়ীর উৎসব এই কয়দিন ধরিয়া তাহারও নিকট যে উৎসব সমারোহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল তাহা ত এই বাহিরের আয়োজন দেখিয়া নয়। তাহার মনে যে একটা উৎসবের পর্ক আসিয়াছে। এ-বাড়ীতে এই কয়দিন যতবার আসিয়াছে ততবারই তপনের দেখা মিলিয়াছে, তপনের সঙ্গে বসিয়া কাজ করিয়াছে, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়াছে, ইহাই ত উৎসব সমারোহ।

গাম্ভীর্য ভিতর জল ঢালিয়া কিসমিস ভিজাইয়া তাহার সকলে মিলিয়া কিসমিস বাছিয়া ভালায় তুলিত, তোলা রূপা বাসন বাহিব করিয়া সকলে পালিশ করিত। তপনের পালিশ সকলেব চেয়ে ভাল হইত, কারণ তাহার হাত-খাটানো অভ্যাস আছে। কিন্তু বাকি আর সকলেব চেয়ে সুধারই কাজ হইত ভাল, ইহা ছিল সুধার একটা মস্ত আনন্দের বিষয়। অন্তরের হারানোর আনন্দের চেয়ে বেশী আনন্দ ছিল তাহার তপনের প্রায় সমকক্ষ হওয়ার আনন্দ। তপন বলিত, “আমার চেয়ে আপনারই কাজ ভাল।”

অবশ্য, সুখা তা স্বীকার করিত না। খামের ঠিকানা লিখিতে গিয়াও দেখা গেল সুখা ও তপনের হস্তাকরই সর্বশ্রেষ্ঠ। নিখিল বলিত, “তোমরা আমাদের সব বিষয়ে হারাবে ঠিক করেছ?”

এই যে দুইজনকে একসঙ্গে ‘তোমরা’ বলিয়া উল্লেখ করা ইহাতে সুখার মনে পুলকের শিহরণ খেলিয়া যাইত। যে কোন কারণেই হউক না কেন, তাহাবা দুই-এক জায়গায় এক পর্যায়ে ত মাহুষ। এই একজাতীয়তা যদি তাহাদের সর্বত্র হইত।

সুখা আত্মচিন্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছিল। আপনার কথার উদ্ভবের অপেক্ষাও করে নাই। হঠাৎ তাহার চমক ভাঙিল নিখিলের কথায়। নিখিল বলিতেছে, “আপনি যেখানে আছেন তাকে আর মাঠ বলি কি করে? সে ত মালঞ্চ।”

সুখা বলিল, “আপনি সব কথাতে ঠাট্টা করেন।”

নিখিল বলিল, “মহেন্দ্রের মত আমারও কপাল খারাপ।

সে যা বলে সবাই তাতেই চটে যায়; আমি যা বলি সবই আপনাদের কানে ঠাট্টা শোনায়।”

সুধা বলিল, “সেটা মোটেই আপনার ঠিক ধারণা নয়। আমাদের এই দলের মধ্যে একমাত্র আপনিই ত ভাল ক’রে কথা বলতে পারেন। আমি ত না জানি চটাত্তে, না জানি হাসাতে, না জানি খুশী কবতে।”

নিখিল বলিল, “তার চাইতেও ভাল হয়ত কিছু জানেন, সেটা যে কি আপনার নিজের ধরবার ক্ষমতা নেই।”

সুধা বলিল, “আচ্ছা, অত ক’রে আর মানুষকে বাড়াবেন না। খেঁটা আমার যোগ্য নিন্দা সেটা মেনে নিলে কিছু অভদ্রতা হয় না।”

নিখিল বলিল, “আমি হয় ঠাট্টা করি, নয় ভদ্রতা করি, এরকম একটা ধারণা আপনার কেন হয়েছে বলুন ত? এই দুটোর মাঝামাঝি সত্যি কথা বলা ব’লে যে একটা জিনিষ আছে, সেটা কি আমার মধ্যে একেবারেই খুঁজে পাওয়া যায় না?”

সুধা চুপ করিয়াই রহিল, মনে করিয়াছিল বলে, “আমি সামান্য মানুষ, আমার সম্বন্ধে এরকম সত্য কথা বিশ্বাস করতে সাহস হয় না।” কিন্তু কথা আর বাড়াইয়া লাভ কি, মনে করিয়া সেইখানেই থামিয়া গেল।

তাহার মন তখন স্থবিত্তেছিল অল্প চিন্তায়। আজ মিলির বিবাহ, কিছুদিন পরে তাহাদেরও ত পালা আসিবে। এমনই ঘটা করিয়া তাহার বিবাহ হইবে কি? সেই বিবাহ-উৎসবে এমনই প্রত্যাহ কি তপনকে দেখা যাইবে? সুধা আপন মনেই হাসিল। কাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে সে কথা না ভাবিয়া উৎসব-গৃহে প্রত্যাহ তপন আসিবে কি না এইটা তাহার মাথায় ঢুকিল আগে। সে পাগল। আপনার মনের কাছে আপনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া একবার যেন ভয়ে ভয়ে ভাবিল,—আচ্ছা, তপন বর হইলে কেমন হয়? মনে পড়িল

দিন কয়েক আগে রাজে সে নিজের বিবাহের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কিন্তু বরের মুখটা কিছুতেই দেখিতে পায় নাই। তাহার মুখটা মুসলমান বরের বত ঝালর দিয়া ঢাকা ছিল। সুধা সাহস করিয়া তুলিয়া দেখিতে পারে নাই। যদি তুলিয়া দেখিত তপন!

কিন্তু তাহা কি সম্ভব! তখন যে মস্ত বড়লোকের ছেলে। তাহার পিতামাতা আত্মীয়স্বজন কেহ ত সুধাকে চেনেন না। সুধার মত গরীবের কালো মেয়েকে অদৃশ্যতা হারা কেন বউ করিয়া লইয়া যাইবেন? তাহাদের কাহারও কল্পনায়ই ইহা আসিবে না। এই বিবাহ-উৎসবের আগে স্পষ্ট করিয়া তপনের সহিত বিবাহের কথা সুধা কোন দিন ভাবে নাই। আজ তাহা ভাবিয়া দেখিতে মনটা ভয়ে ভাবিয়া পড়িল। যদি তপনের অত্রি কাহারও সঙ্গে বিবাহ হইয়া যায়। তবে তপন ত একেবারে পর হইয়া যাইবে। সুধা কি তাহা সহ্য করিতে পারিবে। চোখ বুজিয়া সুধা এই চিন্তাটাকে মন হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করিল। না, না, তপন বিবাহ করিবে না। সে এমনই করিয়া গরীব-দুঃখীর সেবা করিয়া দেশের হিতচিন্তা করিয়া দিন কাটায়ে। সপ্তাহ-অষ্টে একবার তাহাদের বন্ধুসভায় দেখা যাইবে তাহার প্রসন্ন মুখের দ্যানমগ্নতা। সুধা তাহাতেই খুশী থাকিবে।

নিখিল বলিতেছে, “আপনি বড় কম কথা বলেন। আপনার সঙ্গে গল্প জমাতো যায় না।”

সুধা কাগজের পৃষ্ঠা হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, “হঁ।”

মিলি বাহিরে গিয়াছিল জন্মার মাপ দিতে। যত্নে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “আমাবেও এক তাড়া থাম দাও, আমারও কিছু কাজ করা উচিত।”

তিন জনেই নীরবে কলম চাটাইতে লাগিল।

(ক্রমঃ)



অচল সিকি

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

শ্রীপতিবাবু একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন।

“আ, বলিস্ কি রে! অচল? একেবারেই চলবে না?”

“না বাবু। দেখছেন না, একেবারে সীসে।”

অগত্যা পানওয়ালাকে একটি সল তাম্রমুদ্রা দিয়া পানের খিলিগুলি এবং সেই মেকৌ সিকিটা পকেটে ফেলিয়া শ্রীপতিবাবু পানের দোকান ত্যাগ করিলেন এবং তার আগে বলিয়া গেলেন, “দেখলি ত বাপু, ভালমাহুষ পেলেই সবাই ঠকায়। কে যে কখন আমার ওপর চালিয়ে দিলে টেরই পেলুম না। যাক্ ভগবান আছেন।”

পানের দোকানটা কিছু দূর ছাড়াইয়া গিয়া পানের খিলিগুলি রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া দুঃখিতভাবে শ্রীপতিবাবু কহিলেন, “এ পাইন্স হাজ ডায়েড্ ইন দি ফীল্ড—একটা পয়সা একেবারে মাঠে মারা গেল। কিন্তু কি করব! পানগুলো ক্ষেরত দিতে গেলে বেটা ঠিক বুঝত যে পান-কেনাটা অচল সিকি চালাবার ফন্দী মাত্র। যাক্ দেখি আর এক জায়গায়। ইফ ম্যাট কাষ্ট ইউ জোস্ট সাকসীড,—তার পর কিনা?... একেবারে না পার তো দেখ শতবার।”

বাস্-ষ্ট্যাণ্ডে একটা বাস্ প্রায় ছাড়িতেছিল, আর তাহারই কাছে একটা পান-সিগারেটের দোকান। শ্রীপতিবাবু ভাবিলেন, “নাঃ, এবার আর পান নয়। এবার সিগারেট—যদিও আমার কাছে দুই-ই সমান।” বলিয়া অত্যন্ত ভ্রমভাবে দোকানীকে কহিলেন, “জলদি দে ত বাবা একটা কাঁচি সিগারেট।” দোকানী কাঁচি সিগারেট দিল বটে, কিন্তু সিকিটা নিতে কিছুতেই রাজী হইল না। অগত্যা শ্রীপতিবাবুর আরও কিছু লোকসান হইল, সিকিটা পকেটেই রইল, এবং বাস্টা ছাড়িয়া গেল। শ্রীপতিবাবুর মতলব ছিল এই যে, বাস্ ধরিবার জন্য তাড়াতাড়ির ভাব দেখাইলে দোকানী তাড়াতাড়ি

হয়ত সিকিটাকে মেকৌ বলিয়া নাও চিনিতে পারে। কিন্তু দোকানী কাছ লোক, পান-সিগারেটওয়ালারা সাধারণতঃ বাহুই হইয়া থাকে—তাহাকে ঠকান অত সহজ নয়। লোকটা হয়ত শ্রীপতিবাবুর মতলব বুঝিতে পারিয়াছিল। সে শ্রীপতিবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া মুখে কিছু না বলিলেও এমন বিশ্রীকম হাসিল যে শ্রীপতিবাবুর—শ্রীপতিবাবুরও পর্যাস্ত!—বিশ্রীকম লজ্জা লাগিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া দিয়া ভাবিতে লাগিলেন কি উপায়ে অচল সিকিটাকে চালান যায়। ইতিমধ্যে ত প্রায় এক আনা খরচ হইয়া গেল। নাঃ, এ উপায়ে আর চলিবে না। এ ভাবে পয়সা বাজে খরচ হইতে থাকিলে শেষকালে যদি সিকিটা চালানও যায় তবুও বিশেষ লাভ থাকিবে না।

এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে শ্রীপতিবাবুকে ভালমাহুষ পাইয়া কেহ তাহার কাছে সিকিটা চালাইয়া দিয়াছে—একথা কেহ মনে করিয়া থাকিলে অভ্যস্ত ভুল করিয়াছেন। শ্রীপতিবাবু এত সোজা লোক নহেন যে তাহার কাছে কেহ অচল কিছু চালাইবে। এই অচল সিকিটা তিনি কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। একদিন এক ভদ্র লোক একটা সিকি কোন জায়গায় চালাইতে না পারিয়া অভ্যস্ত চটিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং ‘খেং তেরি’ বলিয়া সিকিটা রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সুযোগমত শ্রীপতিবাবু সেই সিকিটা কুড়াইয়া লইয়াছিলেন। সেই সিকিটাই এই সিকি যাহার গল্প বলিতে শুরু করিয়াছি।

চলিতে চলিতে পথে পুরাতন বন্ধু গজানন বাবুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। বহু দিন আগে এই গজাননের সঙ্গেই শ্রীপতিবাবু বার-বার তিনবার কোর্থ ক্লাসে ফেল করিয়াছেন, এবং তাহার পর পড়া ছাড়িয়াছেন। পুরাতন বন্ধুকে দেখিয়া শ্রীপতিবাবু ভয়ানক খুশী হইয়া গেলেন এবং বন্ধুর পকেটে দু-একবার ঝনঝন আওয়াজ শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন।

পুলকে আকুল হইয়া শ্রীপতিবাবু কহিলেন, “আরে গছ যে! বহুদিন বাদে দেখা হ’ল। কেমন আছ ভাই? কি করছ এখন?”

“আছি কোন রকমে ভাই। দালালী করি।”

“দালালী! ওতে বেশ দু-পয়সা হচ্ছে?”

“দু-পয়সা কেন! তাব বেশীই হচ্ছে। আজকাল চাকরির বাজার জান তো? এ রকম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্যবসায়ের না চুকতে পারলে আজকাল আর সুবিধে নেই। এই তো ধর না, আমার বড় শালাব ছোট ছেলে এম-এ পাস করে চাকরির জন্যে ফ্যাফ্যা ক’বে ঘুরে বেড়াচ্ছে বছরখানেক হ’ল। কোথাও কিছু সুবিধে ক’রে উঠতে পারলে না। শুনতো যদি আমার কথা তো হয়ে যেত একটা হিসে। তা, ভাল কথা তো শুনবে না!...তুমি এখন কি করছ ভাই?”

“চিকিৎসা করি, বোগ সারাই। আমার হতাশ-চিকিৎসালয়ের নাম শোন নি?”

“কই না তো! হ্যা, মাঝে মাঝে বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দেখি বটে। সেই যে ‘গ্যারাণ্টি দিয়া হতাশ রোগীদিগকে আরোগ্য করি। পত্রাদি গোপনে রাখা হয়।’ সেই তো?”

“হ্যা ভাই, ঠিক ধরেছ।”

“এতে কেমন আয় হচ্ছে?”

“চলে তো যাচ্ছে দিকি ভগবানের রূপায়।” বলিয়া শ্রীপতিবাবু পরম রূপায় ভগবানকে ভক্তিভরে প্রণাম কবিলেন।

“কিন্তু তুমি আবার ডাক্তারী পাস করলে কবে হে?”

অবাক হইয়া গজানন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “না কি কোনো কবরেজের ম্যাসিষ্ট্যান্ট থেকে—”

“আরে ছোঃ!” শ্রীপতিবাবু বলিলেন, “ও সব কিছু না। আমার ওষুধগুলো কতক স্বপ্রস্তুত, কতক পেটেন্ট, কতক মহাপুরুষ-প্রস্তুত। তা যাক গে—তোমার জী কেমন আছেন?”

“ধাকাধাকির বাইরে চলে গেছে।” গজাননবাবু বলিলেন। “কিন্তু কি দরকার তার কথা তুলে?”

শ্রীপতিবাবু গজাননবাবুর সহৃদয়ীকে কোনদিন দেখেন নাই। তবু গজাননবাবুকে খুশী করিবার জন্য তাঁহার

জীর মৃত্যুসংবাদ জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া গেলেন। চোখে জল আনিবার বুখা চেষ্টা করিয়া কহিলেন, “আহা হাঃ, বড় সতীলক্ষ্মী ছিলেন। এমন ভাল মানুষ আর হয় না।

তোমার...”

চট্টিয়া গিয়া গজাননবাবু বহিলেন, “ভাল? তুমি কি ক’রে জানলে ভাল? দেখলে না শুনলে না কোন দিন।”

একটু থমকিয়া শ্রীপতিবাবু কহিলেন, “লোকের মুখে শুনে জানি আর কি। সবাই বলে ভাল, তাই—”

“সবাই? কারা বলেছে ভাৎ বল তো?” এইবার গজাননবাবু ক্ষেপিয়া উঠিলেন। ‘নাম কর তো তাদের। আর তাদের ঠিকানাগুলো দাও তো। সব শালাকে এই বকসিং-করা হাতের গাট্টা কাঁকে বলে বুঝিয়ে দিয়ে আসি।...ভাল? ভাল ন হার্ত! যত্নিন বৈচ ছিল জালিয়ে মেরেছে। মরেছে, না আমার হাড়ে বাতাস লেগেছে।’

“আহা হা, অত গরম হও কেন ভাই?” শ্রীপতিবাবু বলিলেন। “যে মানুষ ম’নে গেছে তার নিশ্চয় করতে নেই। ঐ যে কথায় বলে, হোদয়ন দি ম্যান ইজ ডেড...”

শ্রীপতিবাবু ইংরেজী কথাটা অসমাপ্ত রাখিলেন, কেন-না অসমাপ্ত কথার জোর বেশী হয়। মনে মনে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তাঁহার প্রথম অন্তর্ভুক্তি কোন কাজ হইল না, বরং হিতে বিপরীত হইল। পরলোকগতা জীকে প্রশংসা করিয়া গজাননবাবুকে সত্যস্ত খুশী করিয়া পরে আস্তে আস্তে তাহার মন নরম করিয়া আনিবেন এবং সময় বুঝিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিবেন, এই ছিল শ্রীপতিবাবুর মতলব। কিন্তু ..

“যাক্, গতস্ত শোচনা নাস্তি” শ্রীপতিবাবু ভাবিলেন, এবং বলিলেন, “যাক ভাই, অতীতের কথা তুলে আর লাভ নেই। কিন্তু...হ্যা, আদিনি পরে তোমাকে দেখে কি আনন্দই যে লাভ কবলুম ভাই সো আর বলবার কথা নয়। তোমায় দেখে অতীতের কত কামা! কত হাসি—কত কি যে মনে পড়ে যাচ্ছে।...” বলিতে বলিতে, এবং তাহাবই সঙ্গে চলিতে চলিতে, শ্রীপতিবাবু চোখে প্রায় জল আসিয়া পড়িল।

তার পর—“সেই ছুল গালানো, নৌকো বাইচ,

মাঠার মশাঘের কানমলা, সেই বটগাছ—সেই সব ঘেন চোখের সামনে ভাসছে। আমার কি মনে হয় জান ভাই গল্প?—যেদিন চলে যায় সেদিন আর কিরে আসে না।...”

তত ক্ষণে দু-জনে একটা অন্ধকার গলির মোড়ে আসিয়া পড়িয়াছেন। শ্রীপতিবাবু দেখিলেন এইখানেই স্থবিধা। কাজ হাসিল হইবামাত্র বাঁ। করিয়া গলির ভিতর ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবেন কোনও অজুহাতে। এবং অজুহাতের জন্য শ্রীপতিবাবুকে কোনদিনই বিশেষ ভাবিতে হইত না—এ-বিষয়ে তিনি সিদ্ধহস্ত—অর্থাৎ সিদ্ধমুখ ছিলেন।

সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িয়া হঠাৎ কি ঘেন ভাবিয়া শ্রীপতিবাবু কহিলেন, “হ্যাঁ ভাই গল্প, তোমার কাছে একটা সিকির চেঞ্জ হবে?” কারণ ইতিপূর্বে গল্পবাবুর পকেটের আঁগুয়া শুনিয়াই বুঝিয়াছিলেন তাহার পকেটে যথেষ্ট চেঞ্জ আছে এবং সিকির চেঞ্জ থাকার খুবই সম্ভাবনা। দেখা গেল শ্রীপতিবাবুর ওস্তাদ কান তাঁহাকে ভুল আশ্বাস দেয় নাই। গজাননবাবু বলিলেন, “তা হবে।” বলিয়া চারিটি আনি বাহির করিলেন। শ্রীপতিবাবু তাড়াতাড়ি আনি চারিটি লইয়া গজানন বাবুর হাতে সিকিটি দিয়া “তাহ’লে আসি ভাই, আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই” বলিয়া সাঁ। করিয়া গলির ভিতর অদৃশ্য হইবার উত্তোগ করিতেছিলেন। কিন্তু গজাননবাবু দালাল মাল্লব, মাল্লব চরাইয়া খান। কাছ তিনি পানওয়ালাদের চাইতে কম নহেন। সিকিটা হাতে পাইয়াই কহিলেন, “দাঁড়াও হে শ্রীপু, এ কি সিকি দিয়েছ। এ যে একেবারেই তোমার গিয়ে সীসে।”

শ্রীপতিবাবু আর একবার আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, “হ্যাঁ, বল কি? সীসে? নাঃ, ভালমাল্লব পেল দেখছি সবাই ঠকায়। ছুনিয়ায় দেখছি কাউকে বিশ্বাস করা যায় না।”

গজাননবাবুকে তাঁহার চারিটি আনি ফেরত দিতে হইল। গজাননবাবুও সেই পানওয়ালাটার মত এমন বিস্ত্রী রকম হাসিলেন যে এই অনেক দিনের পরে দেখা বন্ধুটির কাছে শ্রীপতিবাবুব অভ্যস্ত লজ্জা করিতে লাগিল। সীতা দেবীর মত ধরনীকে দ্বিধা করিয়া তাঁহার পাতালে প্রবেশ করিতে একবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে না, বুঝিয়া

পাশের গলিতে প্রবেশ করাই তিনি ঠিক করিলেন, এবং যাহা করা ঠিক করিলেন তাহা করিতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব করিলেন না। “এখানে আমার একটু বিশেষ কাজ আছে” বলিয়া তিনি গলিতে ঢুকিয়া পড়িলেন, এবং গজাননবাবু আপনাব কাজে চলিয়া গেলেন।

“উঃ! গল্পটা কি চামার হয়ে উঠেছে আজকাল।” অতঃস্ত দুঃখের সহিত ভাবিতে লাগিলেন শ্রীপতিবাবু। “আমি সিকিটা দিলুম সেটা বিশ্বাস ক’রে নিতে পারল না, বাজিয়ে দেখল। ওঃ! বন্ধু পর্যন্ত আজকাল বন্ধুকে বিশ্বাস করতে পারে না।” সে-পৃথিবীতে বন্ধু পর্যন্ত বন্ধুকে বিশ্বাস করিতে পাবে না সে-পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিয়া কোন লাভ আছে কি না, ইহাই চিন্তা করিতে করিতে এবং পৃথিবীটা যে কি ভয়ানক ধারাপ হইয়া উঠিতেছে তাহা ভাবিয়া শ্রীপতিবাবুর ছুটি চোখ সম্বল হইয়া উঠিল—সারাটা জন্ম ব্যথাই আর্জুনাদ করিয়া উঠিল।

বলা বাহুল্য, গলিটির ভিতর শ্রীপতিবাবুর বিশেষ বা অবিশেষ কোন রকম কাজই ছিল না। কাজেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন বুঝিলেন চামার গজানন অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে তখন গলি হইতে বাহির হইয়া আবার বড় রাস্তায় চলা শুরু করিলেন এবং চলার সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে লাগিলেন, “এবারে কি করা যায়।”

ধানিকটা অগ্রসর হইতেই দেখা হইল মট্টু বাবুর সঙ্গে। শ্রীপতি বাবু ভারী খুশী হইয়া গেলেন, কেন-না মট্টু বাবু অসাধারণ ভালমাল্লব। তাঁহাকে পরম হৃৎসও বলা যাইতে পারে—হাঁস যেমন দুধ এবং জলের মিশ্রণ হইতে দুধটুকুই গ্রহণ করে, মট্টু বাবুও সেইরূপ লোকের দোষ ছাড়িয়া কেবল গুণটুকুই গ্রহণ করিতেন। মাল্লব যে ধারাপ হইতে পারে ইহা তাঁহার ধারণার অতীত, তাঁহার ধারণা এই যে মাল্লবমাত্রই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। ঘোর সভাবুগের মাঝখানে ঘুমাইতে শুরু করিয়া ঘোর কলিযুগের মাঝখানে যেন মট্টুবাবু সবেমাত্র তাহার রিপূতান উইকলকে হার-মানানো ঘুম হইতে জাগিয়াছেন। মট্টুবাবুর কাছে হস্ত সিকির চেঞ্জ আছে, এবং যদি থাকে তাহা হইলে অচল সিকিটা তাহার ঘাড়ে অনায়াসেই চাপানো যাইবে, এ-কথা মনে করিয়া শ্রীপতি বাবুর মন এমন একটা

অবর্ণনীয় অভূতপূর্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল যে গান গাহিবার শ্রবল ইচ্ছা চাপিয়া রাখিতে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল।

কিন্তু একটু গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা না করিয়াই ফস করিয়া সিকির চোখে চাওয়াটা ঠিক ভাল মনে হইল না। কাণ্ডেই একথা-সেকথা বলিতে বলিতে কিছু দূর তিনি চলিলেন মন্টু বাবু সঙ্গে। আর একটা গলির সম্মুখে আসিয়া শ্রীপতি বাবু মন্টু বাবুকে বলিলেন, “ভাল কথা, মন্টু বাবু সিকির ভাঙানি হবে আপনার কাছে?”

মন্টু বাবু একটু আগেই কোন একটু মহৎ ব্যক্তির নিকট হইতে একটা সিকি ভাঙাইয়া লইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, “হ্যাঁ আছে। দুটো দুয়ানি।”

“তাই দিন” বলিয়া অচল সিকিটা মন্টু বাবুকে দিয়া দুয়ানি দুটি নিয়া শ্রীপতিবাবু তীব্রবেগে গলির ভিতর ঢুকিয়া গেলেন। তার পর দুয়ানি দুটির দিকে ভাল করিয়া নজর করিয়া শ্রীপতিবাবু হায হায করিয়া উঠিলেন। এ কি সর্জনশ! দুটিরই চেহারা উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবকের চেহারার মত ব্রান—এমনি শোচনীয় চেহারা যে দেখিলে অতি কঠিন চোখেও অশ্রু আসে।

তত ক্ষণে মন্টু বাবু অনেকটা পথ চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীপতিবাবু উর্দ্ধ্বাশে ছুটিলেন।

এ দুটি দুয়ানির চাইতে সেই সিকিটাই ছিল বরং ভাল। সিকিটা আসলে অপদার্থ হইলেও তাহার চেহারা একটু জলুণ ছিল। এ দুটি দুয়ানির যে তাহাও নাই!

কিছুক্ষণ ছুটিয়া মন্টু বাবুকে পাইয়া শ্রীপতিবাবু যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তাঁহাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া মন্টু বাবু অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হ’ল, শ্রীপতিবাবু?”

“হবে আর কি? আমার ভাঙানির দরকার নেই মশাই। আমার সিকি আমার দিন, আপনার দুয়ানি দুটো আপনি নিন। আবার যেমন ছিল তেমনি হোক।”

অবিলম্বে যেমন ছিল তেমনি হইল। শ্রীপতিবাবু জানিভেন মন্টু বাবু সিবিটিকে নিশ্চয়ই পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। তিনি কহিলেন, “দুয়ানি দুটো আপনাকে স্বেচ্ছা ঠিকিয়ে দিয়েছে। একেবারে অচল।”

“অচল? বলেন কি? তাই নাকি?” মন্টু বাবু অবাক হইয়া কহিলেন। “তাহ’লে লোকটা নিশ্চয়ই ভুল ক’রে দিয়েছে।”

ভুল করিয়া যে এই দুটি অচল দুয়ানি দিয়াছে সে এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া হয়ত কত আপশোষ করিতেছে এ কথা ভাবিয়া মন্টু বাবুর চোখ দুটি অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। তিনি সজল ছল-ছল চোখ দুটি কমালে মুছিয়া ফেলিলেন।...

“নাঃ, এ আর চালানো যাবে না” হতাশভাবে বলিতে বলিতে শ্রীপতিবাবু অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু মুখে এ কথা বলিলেও মন এ কথায় সায় দিল না। অসম্ভবকে সম্ভব করিবার অর্থাৎ অচলকে সচল করিবার উপায় ভাবিতে লাগিলেন।

“হরেন বাঁড়ুঘে সেটলুড ফ্যাক্ট অ্যান্‌সেটলুড করেছিল।” শ্রীপতিবাবু ভাবতে লাগলেন, “আর আমি একটা অচল সিকি চালাতে পারব না? দেখা যাক; ঐ যে একটা হিন্দী কথা আছে না—হাল ছোড়োগা হেঁহি।”

হাল তিনি ছাড়ুন বা নাই ছাড়ুন, ফটপাথের উপর একটা কলার ছোবড়া পড়িয়া ছিল—সেটি তাঁহাকে ছাড়িল না, এবং এই না-ছাড়ার ফলে এক অপ্রত্যাশিতপূর্ব মুহূর্তে শ্রীপতিবাবু দেখিলেন তিনি চীং হংগা ফটপাথের উপর শুইয়া আছেন, প্রায় সমস্ত শরীরেই একটু অদ্ভুত রকমের ব্যথা অনুভব করিতেছেন, এবং তাঁহাব অবস্থা দেখিয়া কয়েক জন বাঙালী ভদ্রলোক সমবেত ভাবে প্রমাণ করিতেছেন যে বাঙালী হাসিতে জানে না, এ কথাটা একেবারে মিথ্যা। এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আসিয়া শ্রীপতিবাবুকে ধরিয়া তুলিলেন। শ্রীপতিবাবু সাঁ। গায়ে, বিশেষতঃ মাথায ও পায়ে, ব্যথা বোধ হইতেছিল। তিনি বুঝিলেন হাঁটিয়া বাড়ী ফেরা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। অগত্যা একটা বাসেই উঠিতে হইল। বানওয়ালার বরাতে ছিল ক’টা পয়সা—বিধিলিপি কে খণ্ডাইতে পারে?

শ্রীপতি বাবু একবার মনে করিলেন বাসের টিকিট কেনার সময় অচল সিকিটা চালাইয়া দিবেন। কিন্তু পাঞ্জাবী কণ্ঠস্বরকে দেখিয়া বিশেষ ভয়সা পাইলেন না। শেষকালে

যদি ধরা পড়েন, তাহা হইলে হয়ত দু-চারিটা গালি শুনিতে হইবে—গাঁটোও খাইতে হইতে পারে। সুতরাং ভয়ে ভয়ে তিনি সাধু হইলেন, অর্থাৎ সচল পয়সা দিয়াই বাসেব টিকিট কিনিলেন।

তখন বাঁকুড়া ও বর্ধমানের অভ্যন্তরীণ দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে। কোন এক মিশনের ভরিত গেরুয়াধারী সেবক বাসে উঠিলেন দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য টাকা তুলিতে। তাঁহার হাতে একটি তাল-বন্ধ-করা কাঠের বাস, যাহার মাথায় একটি সরু ছিদ্র আছে পয়সা গলাইবার জন্য। বাসে গান গাওয়া অস্ববিধা, তাহা না হইলে সেবকটি হয়ত “ভিক্ষা দাও গো...” ইত্যাদি বৃ-কাপানো সুরে গাণ্ডিতে হুক করিতেন। বাসের অভ্যন্তর এবং রাজপথ—এ দুই অনেক তফাৎ। সুতরাং গেরুয়াধারী সেবক ভদ্রলোক গম্ভীর কর্তৃক দুর্ভিক্ষের ভীষণতা বর্ণনা করিয়া বাঙালীর কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাঙালী জাতি বক্তৃতা শুনিতে এত অভ্যস্ত যে বক্তৃতা জিনিষটা বাঙালীর মনে বিশেষ কাজ করে না। কাজেই সেবকটির বক্তৃতা প্রথম কয়েক মিনিট ধরিয়। অরণ্যে রোমন অপেক্ষাও অনর্থক হইল, কেন-না অরণ্যে বোমন করিলে বাঘ সিংহ হয়ত সাড়া দেয়, কিন্তু সেবকটির এই বাসে রোমনে বাসের কেহ সাড়া দিল না। বাস খালিই রহিল।

কিন্তু ভীষণ দুর্ভিক্ষের ভীষণতর বর্ণনা শুনিয়া ত্রিপতি বাবুর কোমল পরহৃৎকাতর হৃদয় আর ঠিক থাকিতে পারিল না। ত্রিপতিবাবু চোখে ক্রমাল চাপা দিয়া বালকের মত কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন, “বলেন কি মশায়? এমন শোচনীয় অবস্থা? অনাহারে শুকিয়ে মরছে মানুষ সেখানে? ছেলের মূত্রে গ্রাস মা কেড়ে নিচ্ছে? উঃ, ধামন্ মশায়—আর যে সহিতে পাবি নে।” ত্রিপতি বাবু উজ্জ্বলিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার এই কান্নায় সেবকটি অভ্যস্ত উৎসাহিত হইলেন। তিনি কোনদিকে কিছু হবিধা করিতে না পারিয়া অগত্যা সেবকজীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন—সে অনেক দিনের কথা। এই দীর্ঘ সেবকজীবনে একরূপ সাক্ষ্যেব আনন্দময় অভিজ্ঞতা তিনি আর কখনও লাভ করেন নাই। আনন্দে তাঁহারও দুটি চোখ সজল হইয়া উঠিল। তিনি দুর্ভিক্ষের অসহ্য কাহিনী

আরও অসহ্য করিয়া তুলিবার জন্য যিশুগ উৎসাহে বক্তৃতা শুরু করিলেন।

“ওঃ! এত কষ্টও ভগবান দেন মানুষকে?” কাঁদ-কাঁদ কর্তে ত্রিপতিবাবু বলিতে লাগিলেন, “আমাদেরই বাংলা দেশের লোক দারুণ দুর্ভিক্ষে হাহাকার করে কাঁদছে, আর আমরা কিনা দিব্বি—ওঃ!” ত্রিপতিবাবু আবার কাঁদিয়া বেসামাল হইয়া পড়িলেন। দেশবাসীর দুঃখে ত্রিপতি বাবু একরূপ অসাধারণ সমবেদনা দেখিয়া বাসের সকলেই নিজেদের ঔদাসীন্যের কথা ভাবিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ কাঁদিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু “চেষ্টার অসাধ্য কিছু নাই” এ কথাটা অনেকে বলিলেও কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। চেষ্টা করিলেই সবাই কাঁদিয়া ভাসাইতে পারে না।

অনেক কষ্টে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া ত্রিপতি বাবু কহিলেন, “বাংলাব ভাইদের, মা-বোনদের এত দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী শুনেও যারা এ বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারে থিক্ তাদের জীবনে...” বলিয়া পকেট হইতে সেই সিকিটা বাহির করিলেন।

“সঙ্গে তো বিশেষ কিছু নেই। বাসভাড়া দিয়ে মাস্তোর এই সিকিটা আছে। তাই দিই এখন।” বলিয়াই যেন সবাই সিকিটা দেখিতে পায় এইভাবে, ঝট্ করিয়া বাসের ভিতর গলাইয়া দিলেন। একটা পয়সা নয়, দুটা পয়সা নয়—একেবারে একটা সিকি! এই অপূর্ণ বদান্ধতা দেখিয়া বাসের সবাই, এবং বাসওয়াল, গেরুয়াবিলাসী সেবক ভদ্রলোকটি অবাক হইয়া গেলেন। পরে যখন ‘সেই জীবনে থিক্’ কথাটার একবার পুনরাবৃত্তি করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের দুর্দশাব কথা ভাবিয়া চোখে ক্রমাল চাপিয়া ত্রিপতিবাবু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিলেন, তখন আশ্চর্যমান রক্ষার জন্য এবং থিক্‌বের হাত হইতে জীবন বাঁচাইবার জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সিকি, আধূলি, দুয়ানি ইত্যাদিতে বাসটি দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠিল।...

বাস হইতে নামিয়া বাড়ীর দিকে চলিতে চলিতে ত্রিপতিবাবু ভাবিলেন, “থিক্—অচল সিকিটা একটা মহৎ কাজে লাগল।”

পুস্তক পরিচয়

জীবন-গানী—ঐবিজয়চন্দ্র মজুমদার। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। ৩২৮ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধান।

এই মূল্যবান পুস্তকখানিতে নিম্নলিখিত শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধগুলি আছে, এবং তাহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ আছে :—

সত্যসন্ধানের পক্ষা, আদর্শসাহিত্য, স্বাধীনতার বাধ, মরণ ভোল, জুজুর ভয় ছাড়, জীবনের দুইটি প্রধান শত্রু, ধর্মবুদ্ধি, উত্তরাধিকার বা হিরেডিস, জাতিভেদ, বিবাহবিধি, লজ্জা ও জুগুপ্সা, ভারত তবু কই, আবার তোরা মানুষ হ, আর্ধ্য নামের দাবি, ধর্মের লড়াই, ভারতগদ্যার। কি এক লেগন নয়, বধু কোথায়।

গ্রন্থকার পণ্ডিত, বাংলা-সাহিত্যের নানা বিভাগে কৃতিত্বশালী মনীষী। ইংরেজীতেও ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিষয়ক কয়েকখানি বই তিনি লিখিয়াছেন। বাঁহারা তাঁহার আলোচ্য উৎকৃষ্ট “জীবন-গানী” বইখানি পড়িবেন, তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার পরিবেশ, আনন্দ পাইবেন, এবং তাঁহাদের মনে নানা বিধে চিন্তাও উদ্ভূত হইবে।

সপ্তপর্বা—সুকলয়িতা ঈশিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী। বিহারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা।

বালকবালিকাধর্মের সংকৃত শিথিলার সুবিধার জন্য এই পাঠ্যগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। পাঠ্যগুলি সেবানাগর অক্ষরে, শব্দার্থ, অনুশীলনী প্রভৃতি বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত। কয়েকটি ছবিও আছে। সুকলয়িতা বিহারতীর এক জন অতিশয় অধ্যাপক।

জগদীশ সঙ্গে ত্রিশ বৎসর—ঈশোসেনচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক ঈশতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্.এ, এম্.বি.এল, ব্রহ্মসোহন কলেজ, বরিশাল। আচাধ্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় ও লেখকের ইহাখানি চিত্র পুস্তকটিতে আছে।

এই পুস্তকে বরিশালের প্রসিদ্ধ ধর্মোচাৰ্য্য বর্গীর জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় আছে। পুস্তকখানির পবনস্তী অংশ “বিদ্রোহী সেবকের পাগলামি” ও “বিদ্রোহী সেবকের আর্থনা” এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। সর্বশেষ লেখকের রচিত “বিশ্ব শতাব্দীর ধর্ম” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আছে।

পুস্তকখানি পাঠ করিলে আচার্য্য মহাশয়ের ধর্মদর্শনীয় মত ও আদর্শ রূপক পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তাঁহার শিষ্য লেখকের ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধেও পরিণয়।

শিক্ষার ধাবা—প্রকাশক ঈশীয়েন্দ্রমোহন সেন, এম্.এ, পিএইচ-ডি, সেক্রেটারী, নিউ এডুকেশন বেলোশিপ, বঙ্গীয় শাখা, ইন্ডিয়ানিকেন্স। প্রাপ্তিস্থান—বিহারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা, এবং নিউ এডুকেশন বেলোশিপ অফিস সমূহ।

এই বইটিতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত “শিক্ষার স্বাধীনতা,” “শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে স্বাধীনতার স্থান” ও “আশ্রমের শিক্ষা,” শ্রীযুক্ত

কিত্তিসোহন সেন প্রণীত “শিক্ষার স্বদেশী বঙ্গ,” এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল বহু প্রণীত “শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান” শীর্ষক প্রবন্ধগুলি আছে।

জ্ঞান, অধিকতা ও মনন দ্বারা বাঁহারা যে যে বিষয়ে লিখিতে অধিকারী তাঁহারা সেই সেই বিষয়ে লিখিলে লেখা যেতল সাবধান, হিতকর, ও মনোজ্ঞ হইবার কথা, এই প্রবন্ধগুলি তজ্জন শিক্ষা সকল দেশেই আবশ্যক এবং সকল দেশেরই একটি বড় সমস্যা; আমাদের দেশে একান্ত আবশ্যক এবং আমাদের দেশের একটি কঠিন সমস্যা। এই কারণে, শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞানবান, মননশীল ও অধিক্ত লেখকদিগের লিখিত এই প্রবন্ধগুলি লিখনপটনকর্ম সকলের এবং বিশেষ করিয়া শিক্ষাদান কার্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের পাঠ্য কবা উচিত।

শতদল—ঢাকা-হল-বাঁকী চতুর্দশসংখ্যা, ১৩৪৪। শ্রীযুক্তশ-চন্দ্র বোম সম্পাদিত।

এই গ্রন্থটিতে ২৯টি রচনা আছে। রচনাগুলি নানাবিধ কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও অভিভাষণ। কয়েকটি ঢাকা নিম্নবিভক্ত কতর হুণ্ডিত অধ্যাপক-দ্বিগের লেখা। “সুশব্দ” এবং “সম্পাদকীয় মন্তব্য”ও ইহাতে আছে।

পরমহংস শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন-চরিত—রাচির যোগদা সংস্কৃত আশ্রমে প্রাপ্তব।

আমেরিকার যে বোগানন্দ্যামী ধর্ম প্রচার করেন, তিনি পরমহংস শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য। তাঁচির বোগদা সংস্কৃত আশ্রম এবং ঐ আশ্রমে রিত ব্রহ্মচর্য্য বিভাগের, এই পরমহংস মহোদয়ের শিষ্য ও অনুশিষ্য-দ্বিগের দ্বারা পরিচালিত। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়।

গল্পের ফোঁড়াবা—(বৃক্ষক্ষর বর্ডিত)। প্রথম বই। ঈশোসেনচন্দ্র সেন, এম্.এ, বি.টি, DPhil in Edn. (London)। প্রকাশক শ্রীযুক্ত সেন, ৪৪ হাজার গোড় কলিকাতা।

ছোট ছেলেরদের জন্য লিখিত এই সচিত্র বইখানিতে ৫৬টি গল্প আছে। গল্পগুলি তাহাদের ভাল লাগিলে এক সেগুলি উপদেশপ্রদও বটে। ছবিগুলিও ভাল।

ড.

বীরভূমের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড (ইংরেজ অধিকার কালের পূর্বে পর্য্যন্ত) শ্রীমৌরীহর দত্ত, বি.এন, সম্বলিত। ১৩৪৩। মূল্য ১/- (বাঁধাই) ১/-। রতন লাইব্রেরী, সিটি, বীরভূম। পৃঃ ১/- + ২১০। ১-টি চিত্র।

পুস্তকখানিতে লেখক জেলার অবস্থান ও সীমানা, প্রাথমিক পরিচয়, প্রভৃতি দিবার পর একটি “ঐতিহাসিক টাইম-লিন” অঙ্কন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু চাইটি কারণে তাঁহাৎ চেষ্টা স্বার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকার যথাব্যবহায়ে ঐতিহাসিক তথ্যের দায় বাচাই করিতে পারেন নাই। ইংরেজিতে বাহ্যক বলে, “ফ্রিটিক্যাল সেল”,

তাহার কিছু অভাব পরিলক্ষিত হয়। সেই ক্ষত গ্রন্থে বহু তথ্য একত্র সন্নিবেশিত হইলেও পাঠকের মনে তাহার দ্বারা বীরভূমের কোনও ধারাবাহিক ঐতিহাসিক চিত্র দৃষ্টিপূর্ণ অঙ্কিত হয় না।

একাদশ অধ্যায়ে তিনি বীরভূমের প্রাচীন সমাজের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা বঙ্গনাগর্য্যে দ্বায়ে দ্রুতল হইয়া পড়িয়াছে। বরং পরবর্ত্তা অধ্যায়ে পুরাতন দলিলপত্র হইতে সে যুগের আরও বাস্তব এবং সত্য পবিচয় পাওয়া যায়। শেষোক্ত অধ্যায়ে একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত কণ হইতে স্তম্ভ।

গ্রন্থের সম্পর্কে একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমবা দ্রুতল হইয়াছি। বীরভূমের ঐতিহাসিক তথ্য ইতিপূর্বেও সংগ্রহের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান এইকাব পুস্তকবিগণের ৭৭ বধ্যবধ্যভাবে খাঁকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

গ্রন্থের বিষয় লেখকের অধ্যবসায় আছে এবং বীর নাট্যস্থলিব প্রতি তাঁহার অনুরাগও বর্ত্তমান। আমরা আশা করি ইতিহাস পর্যালোচনার প্রচেষ্টা জৈনানিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তিনি ভবিষ্যতে তাহাব সংস্কারিত তথ্যরাজির সাহায্যে বীরভূমের একখানি সর্বাসম্পন্ন ইতিহাস রচনা করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

মহাভারতী—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী। প্রকাশক : সেন ব্রাহ্মণ এণ্ড কোং ১৫, কলেজ সোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১।০

যতীন্দ্রমোহনের পরিণত বয়সের কয়েকটি কবিতা লইয়া মহাভারতী প্রকাশিত হইয়াছে। যৌবনের রচনা হইতে এই কবিচিন্তের মধ্য কোম প্রবল সংশয়, কোন একল বিখ্যাত পণ্ডিতের আমরা পাই না। এই কবি প্রদানতঃ বহিঃপ্রকৃতির ও অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং সুসংবদ্ধ গার্ভস্থ জীবনের চিরন্তন মৃৎ দুঃখ, মিলন বিচ্ছেদ আপনার বহুদল স্থল্লর বিধাহীন ভাবায় চিরদিন অসঙ্কেত ব্যস্ত রহিয়া আসিতেছেন। কোন কদিন স্বপ্ন বা গভীর সমস্যা তাহাকে কোন বিন বিভ্রত করে নাই। অজ্ঞ পক্ষাশোর্কে তাহার মধ্যে সেই নিঃসংশয়তা আর নাট, বিধা দেখ দিয়াছে।

‘পক্ষাশোর্কে বন যানে—চলছি তাই বনে,

মনটা তবু থেকে থেকে ছলছে মগ্নে মগ্নে।’

এই কোল বিধাব সোলা ; প্রেম ও বৈরাগ্যের মধ্যে ঘন্থের সোলা। ইহাই কাল কবিচিন্তের হৈম্যকে স্রবৎ অব্যাহত করিয়া তাহার স্তম্ভকে নতুন রূপ দিয়াছে। জীবন ব্যাপারে পূর্কব সেই অসম্বদ্ধ একনিষ্ট দৃষ্টি আর নাই। কালপ্রভাবে বৈরাগ্যটি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে ; অগচ কাবর চিরদিনের সৌন্দর্য্যদৃষ্টি তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে চাঃিতেছে। একদিকে গৃহের টান, অপর দিকে বনের টান ; কবিচিন্ত এই যেটানায় পড়িয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধি করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত।

‘মহাভারতী’তে কবিচিন্ত যে পথে চলিয়াছে, তাহা পূর্কপরিচিত স্থল্লব, আনন্দের বা প্রেমের পথ নহে, তাহার উভয় পার্শ্বে দুঃখ, বন্ধনা, জ্বালা ও বৈরাগ্যের কট দৃষ্টি দেখ দিয়াছে।

‘অগচ ‘মহাভারতী’তে যে বৈরাগ্যের স্রষ্টা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বাংলার কতিপয় চিত্রিত বাউলের একতরঙ্গীয় একতানা বৈরাগ্যের স্রষ্টা নহে। তাহার বৈচিত্র্যে, প্রকাশভঙ্গীর বিশেষ ও বিষয় নির্কষণের ব্যাপকতাও মনে হয়, যেন ক্রত অঙ্গুলি আঘাতে কড়ি কোনলকে স্পর্শ করিয়া গুণ্ডানীয়াত সপ্তরায় ভৈরবীর আগাপ চলিতেছে। এ বৈরাগ্য যেমন নিখার ছাত্রায় শুণ্ডানিপূর্ণ হয় নাই, তেমন সত্যর বধ্যালোকে অতল্লর হইয় উঠে নাই। এই সামগ্র্যত সংশ্লিষ্ট পবিগত কবিচিন্তের পরিদৃষ্ট কৃতিত্ব একাশ পাইয়াছে।

মধুভূত

মুসলিম বীরাজনা—মঈনুদ্দীন। প্রকাশিকা—বেগম রহিমা খানম, আলহাদুয়া লাইব্রেরী, ১৮, মুসলমানপাড়া লেন, কলিকাতা। দাম—পাঁচ সিকা।

ইহাতে বীরমাতা আরশা, বীর্য্যবতী উর্শ্বে আমারা, বীরভগিনী খাওয়ারা, বীরজায় : হামিমা বাসু বেগম, বীরকন্তা মাহতাবান, বীর-বালা সৈয়দ খাতুন, বীর মুল তানা রাজিয়া, বীরাজনা উঃ মুল তানা ও বীরনারী মুরজাহান বেগম প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নর জন মহীয়সী মহিলার বীর্য্যবন্তার কা হনী লিখিত হইয়াছে। লেখা বাল দেশের কিশোর-কিশোরীদের মনোবল্লন করিবে বলিয়াই আমাদের বিবাস। বইয়ের ছাপা-বাধাই ভাল।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বিষ্ণুভগবান ও বুদ্ধভগবান একই কিম্বা দুই ?—২ নং পক্ষাশী রোড, বেনারস সিটি হইতে শ্রীশ্রীচন্দ্র শর্মা কর্ত্তক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৬।

বিষ্ণুভগবান ও বুদ্ধভগবান যে অভিন্ন, ইহাই পুস্তিকাখানিব প্রতিপাদ্য বিষয়। এই অভিন্নতা প্রতিপাদন করিতে লেখক যে-সকল এমন প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা অতীব শিথিল।

শুদ্ধামাধুরী—শ্রীমৎ বামী সমাধিপ্রকাশ আদ্য-লিখিত। প্রকাশক শ্রীমণীন্দ্র ব্রহ্মচারী, পোঃ বহরপুর, করিমপুর। পৃষ্ঠা ৬০। সাহায্য ১০ চারি আনা।

লেখক শ্রীমন্তাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থবর্ণিত কুলীলা ও পৌরাঙ্গলীলার সাহায্যে ওক্ল মধুব ভাবের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এসমস্ত গ্রন্থশেষে করিমপুরের সাধকগণের জগদ্বন্ধুর মধুর-স সিজ জীবনও আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা পদ্য হইলেও কবিত্বময় ও মনে মনে বৈকল্য পদ্যবলীর ছাঁচে ঢালা। ঐতিহাসিক সাধকগণের নিকট যে বইখানি সমাদৃত হইবে, তাহা মনে সন্দেহ নাই। কাগজ ও ছাপা ভাল।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

ব্রিজ সঙ্কেত—হরভনের টেকা কবিত। প্রাপ্তিহান—বুক কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ আনা।

এই পুস্তকে ব্রিজ খেলার প্রাথমিক নিয়ম ও সঙ্কেতগুলি সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শুধু বই পড়িয়া অগস্ত খেলা শেখা যায় না, কিন্তু বাহারী এই খেলাতে নতুন উৎসাহী হইটি তাহাদের কায়ে লাগিতে পারে।

প

ম্যারিষ্টোক্রেসী—ঈনিতাহরি ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক-বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা।

উপন্যাসখানি পড়িতে ভাল লাগিল। গল্প বেশ চমিয়াছে। আগাগোড় পড়িবার আগ্রহ থাকে। পালের চরিত্র আদ্যের সহানুভূতি আকর্ক করে, কিন্তু মিঃ সেন ও ইলাকে বধ্যকিং অধ্যাত্মিক মনে হয়। লেখকের ভাষা সহজ ও সতেজ, তবে নির্দোষ নয়। স্থানে স্থানে ভ্রম-প্রমাদ চোখে পড়ে। মোটের উপর বইখানি প্রশংসনীয়। গল্প বলিবার ভঙ্গী লেখক ভালভাবে আয়ত্ত কবিয়াছেন। কিন্তু যে সমাজ লিখা লেখক তাহার আখ্যানবস্ত গড়িয়া তুলিয়াছেন সেই সমাজের সহিত তাঁহার বাস্তব পরিচয় আছে বলিয়া মনে হয় না। উল্লিখিত চরিত্রগুলির চালচলন ও পারিবারিক জীবনে ম্যারিষ্টোক্রেসীর বৈশিষ্ট্য নাই, যদিও উপন্যাসের নামকরণে সেই সমাজকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়



আলোচনা



“বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালা”

১। “মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দী গ্রামে রামেশ্বর-স্মৃতিভবন নামক অতিথিশালা স্থানীয় ভয়লোকদের উদ্যোগে ও অর্থ-সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে” বলিয়া গত বৎসর ফাল্গুনের প্রবাসীতে বাহা লিখিত হইয়াছে উক্ত প্রকৃত নহে। লালগোলায় দানশৌণ্ড মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথবাবু বায় মতালয়ের আগ্রহে ও সম্পূর্ণ ব্যয়ে দুর্গাশয় ত্রিবেদী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কান্দী কোর্ট ও বিদ্যালয়ের সম্মুখে ৮৮৮ বারামেশ্বর-স্মৃতিভবন মহাশয়ের স্মৃতি স্বার্থে হিন্দু ও মুসলমানদিগের ভক্ত পৃথক দুইটি বাড়িতে দুইটি রামেশ্বর-পাণ্ডুনিবাস ও তাহার সম্মুখে একটি দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

[শ্রীযুক্ত মদনমোহন ত্রিবেদী ও লালগোলা হইতে রামেশ্বর-স্মৃতিভবন সম্বন্ধে অল্পকণ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন]

২। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথবাবু নিকটে ফেরমোহন সাগর নির্মিত একটি বাঙালী ধর্মশালা এবং ত্রিবেদী-কনুগলে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত একটি বাঙালী ধর্মশালা আছে প্রবন্ধে তাগার উল্লেখ নাই।

৩। কান্দী বীবেশ্বর পাণ্ডে ধর্মশালায় স্থাপনিত ৮৮৮ বারামেশ্বর-স্মৃতিভবন সম্বন্ধে “তাঁহাদের বংশের বিবাহাদি ক্রিয়াও এ দেশীয়দিগের দ্রুত অস্বীকৃতি হইয়া থাকে” বলিয়া বাহা লেখা হইয়াছে উক্ত প্রকৃত নহে—যদিও স্মৃতি কাল বঙ্গ বসবাস তেতু ভাষায়, আচায়ে বচন প্রকারে তাঁহারা বাঙালীই হইয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের বিবাহাদি ক্রিয়া এখনও পর্যন্ত বঙ্গদেশবাসী তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই হইয়া আসিতেছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র রায়

২

ফাল্গুনের প্রবাসীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে বর্ণিত ধর্মশালাগুলি ভাড়া লোকের একটি বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালা আছে। এখানকার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ৮৮৮ বারামেশ্বর সাহায্যে মতালয় তাঁর স্বর্গগত পত্নীর নামে “সর্বোচ্চনী ধর্মশালা” একটি বড় রাস্তার উপর (চিট্টোয়ট রোড) কয়েক বৎসর আগে স্থাপন করিয়াছেন। ধর্মশালাটি একটি হাটের মধ্যে কয়েকটি বসতবাড়ীর পাশে অবস্থিত। ঐ বাড়ীগুলির ভাড়া থেকে এর খরচ চাপান হয়। বাড়ীটি দোতলা, স্কেন-পাটখানা ও বাবান্দার বিজলী-বাতি আছে। এখানে হিন্দু মায়েই সাত দিন থাকতে পান। নীচে একটি ঘরে রাজেশ্বর বাবু ব্রহ্মপুত্র শ্রীযুক্তেন্দ্রনাথ সাহায্যে মতালয় স্মৃতি বাঙালী স্বেচ্ছাসেবী দলেব অফিস ও ব্যারামাগার আছে। দুই ব্যক্তির দ্বারা

দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। তবে কোন কোন ধর্মশালায় মত বাসন প্রকৃতি দেবার নিয়ম নেই। ঠেগন থেকে ঠেগ প্রায় কুড়ি মিনিটের ও একা বা টাঙ্গার প্রায় দশ মিনিটের পথ। শুনলাম যে ই. আই. রেলের কর্তাদের লেখা সত্বেও টাইম-টেবলে ধর্মশালাসমূহের তালিকাব মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। ৩৮৮ বারামেশ্বর বাবু এই ধর্মশালা পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করি গেলেন। ধর্মশালাসমূহ একটি শিবালয় আছে। সেখানে প্রত্যহ পূজা ও আরতি হয়। বাঙালী প্রতিষ্ঠিত অপর ধর্মশালাগুলির কর্তৃপক্ষদের চেষ্টা করা উচিত যাতে তাঁদের ধর্মশালাগুলির নাম ও ঠিকানা রেলপথসমূহের টাইম-টেবল প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়।

শ্রীনির্মলচন্দ্র দে

“বিজয়া”

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রবাসীর সম্পাদকীয় মন্তব্যে “বিজয়া” সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে “অনেক হিন্দু বিধা” কবেন পরমাবগতায়ী রাবণ পবাক্ষিত ও নিহিত হইবাব পর রামচন্দ্র যে শক্তিপূজা করিয়াছিলেন বিজয়া অম্বুষ্ঠান সেই ভয়াংকর সমাপনের স্বাক্ষর।” ভগবান বামচন্দ্র বাবণকে নিহত বা পরাভূত করিবার পর শক্তিপূজা করিয়াছিলেন একথা কোথাও বিবরণ নাই। এবং কোন হিন্দু ইহা বিশ্বাস করেন না। শাস্ত্র পুরাণে যথা দেবী-ভাগবত কালিকাপুরাণ, মহাভারত মন্ত্রাভাগবত এবং বৃহৎ নন্দিকেশ্বর-পুরাণে রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর অকালে (শরৎকালে) পূজার কথা বর্ণিত আছে।

দেবী-ভাগবতে ব্যক্ত আছে বামচন্দ্র রাজ্য এবং পত্নীসারা অবস্থায় ভট্টশ্রী হইয়া কিল্কিয়া অবস্থানকালে দেবীর নারদের উপদেশে শাবনীর নবরাত্র ত্রত পালন করিয়াছিলেন। নারদ এই ত্রতের আচার্য্যেব কর্তৃক কবিয়াছিলেন।

কালিকাপুরাণে ব্যক্ত আছে, বামচন্দ্রের সাহায্যার্থে ব্রহ্মা কর্তৃক মতাদেবী বোধিতা ও পূজিতা হইয়াছিলেন। আবান্দনাব পর রামচন্দ্র বিজয়া-দশমী দিনে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন তাহারই অবগণ স্বরূপ বিজয়া উৎসব এদেশে প্রতিপালিত হইতেছে।

রামচন্দ্র একবাব শক্তিপূজা করিয়া নাবীধর্মকারী রাবণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। আমরা প্রতি বৎসর সাড়বরে দেবীপূজা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু নাবীধর্মের সূচী ক্রমশঃ বাড়িয়া বাইতেছে। ইহাতে অসুখমান হয় আমাদের পূজা যথার্থভাবে অস্বীকৃত হয় না। আমরা যে পূজা করি তাহা রাস্তাসিক তথা তামসিক। বাস্তবিক ও তামসিক পূজাতে আমাদের উদ্দেশ্য কখনও সিদ্ধ হইবে না। সাধিকী পূজা ক্রিতে শিখিলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। মা-দুর্গা আমাদের বঙ্গসংবিধান কবিবেন। একালে মা-দুর্গাকে বৈদেশিক সাম্রাজ্যের অধিকার করিয়া আমরা

পূজা কাঠেছি, বাঁহাড়ঘব প্রদশনে আমবা বহু অর্থ অপব্যয় কবিতেছি, এই অর্থ ও উৎসাহ দেশের মঙ্গলার্থ ব্যয় করিলে আমাদের মঙ্গল হইত।

গৃহলক্ষ্মীদিগকে কর্ণে, চরিত্রে এবং নিষ্ঠাপবতার স্নস্ক্রিত করিতে পাবিলে আমাদের দেশেব নারীৰ অপমান লাঘব হইবে। গৃহলক্ষ্মীদিগকে প্রতিমা সাজাইবাব মত না কবিয়া শক্তিশালিনী করিতে হইবে।

নারীবর্ষণকাবীরিগকে কঠোব দণ্ডে দণ্ডিত কবাব সঙ্গে সঙ্গে যে-নারীবা পুরুষেব চবিত্র নষ্ট কবিয়া দেশেব শত শত যুবক ও ক্ষমতাসানী ধনবানকে, বিপথগামী করিতেছে ও হিন্দুৰ পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম ও একাম্ববর্তী প্রথার বিরুদ্ধে অগ্রসব হইতেছে, তাহাদেব কঠোব শাসনেব ব্যবস্থা না কবিলে আমাদের মঙ্গল হইবে না। এ-কালেব শিক্ষিতা মহিলাবা নারীৰ মঙ্গলেব নিমিত্ত নানাবিধ প্রস্তাব ও পদ্ধি অবধাবণ কবিতেছেন। কিন্তু পুরুষেব সম্মুখে নানাবিধ প্রলোভন সৃষ্টি কবিয়া পুরুষেব পুরুষত্ব নষ্ট কবিবাব চেষ্টা ও উদ্ভম নারীদেব সর্বত্র পবিলক্ষিত হয়। তাহাব বিনাশনার্থে কোন স্থানে আয়োজন হইতেছে একপ ওনা যায় কি? পুরুষ নাবীকে আবদ্ধা তথা পবাধীনা কবিয়া বাধিয়াছে সত্য কিন্তু নারী পুরুষকে নানা কোণে পত্তভাবে রাখিয়া দেশের সর্বনাশ করিতেছে, ইহারও প্রতিকার প্রয়োজন।

অগণিষ্ঠাত বৈজ্ঞানিক এডিসনের সহধর্মিণী এক স্থানে বলিয়াছেন, "A woman can make or break a man." তিনি অল্পত্র বলিয়াছেন, যে "মানুষকে বড় কিংবা ছোট কবে, তাব জ্ঞী; উদারচেতা কোন পুরুষকে দেখিলে অনুমান হইবে যে 'তাঁহাব জ্ঞী মহামহিমময়ী।" নব্য ইটালীৰ গঠনকর্ত্তা বীৰ মুসোলিনী বলিয়াছেন যে, জ্ঞীর মাতৃত্ব এবং পুরুষেব বীৰত্ব, এই দুইটি মাৰ।

একালের শিক্ষিতা ললনাদের অজ্ঞায় অপকর্মেব বিরুদ্ধে সঙ্গ্রাম কবা প্রয়োজন। পতিতা নৃত্যকাবীৰ সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, অথবা নগ্নতার বীভৎসতা সমাজে প্রতিভাত হইতেছে, এই সকলের নিবাবণ প্রয়োজন।

শ্রীবৃন্দাবননাথ শর্মা

পদ্মচিহ্ন ও ইসলাম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে অল্পকিট উৎসবেৰ পতাকা ঐ পদ্ম ও স্বস্তিক চিহ্নকিত কবা হইয়াছিল বলিয়া কলিকাতাৰ ইসলামিয়া কলেজেব মুসলমান ছাত্রবৃন্দ উগাতে হিন্দু-পৌত্তলিকতার পঙ্কু পাইয়া ধর্মহানির আশঙ্কায় প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রদের উক্ত প্রতিবাদের কি উত্তর নিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি। এ বিষয়ে প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাব সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত। ঐ পদ্ম ও স্বস্তিক চিহ্ন যে কোন হিন্দু দেবদেবীর প্রতীক নহে, কিংবা কোন হিন্দু দেবদেবীর প্রতীকরূপে যে এ ঐ চিহ্ন উৎসব-

পতাকায় অঙ্কিত হয় নাই—তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি; কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার এই বিবাক্ত আবহাওয়ার কাহারও কাহারও মনে শিল্পরসমা বোধ এককালে অবলুপ্ত হইয়াছে দেখিয়া বিশ্বয় বোধ কবিতেছি। আমাদের বিশ্বয় আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে—তরুণ শিক্ষাধিগণের এবাধিব মনোভাবের বিকাশ দেখিয়া। তরুণ বয়সে মনের যে প্রসার হয় অল্প কালে তাহা সম্ভবপর নয়। ইসলামিয়া কলেজের পাঠাবিগণের বিনে বা বাঁহারা বর্তমান কিংবা অন্তরূপ ব্যাপাবে ইসলাম ধর্মের অপকৃত্ব ও হিন্দু প্রতীষ্ঠার ষড়্ভুজ উল্লাসিত করিতে প্রয়াসী হন, তাঁহাদেব গুত বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পাবি না। সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষার (?) তাঁহারা যথাতথ্য ধর্মের দোহাই দিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মন যে কত দূর সঙ্কীর্ণ ও পঙ্কু করিয়া ফেলিতেছেন, তাহা বুঝিবার সময় অনেক দিন হইল আগিয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাদের নিকট শুধু নৈতিক দোহাই পাড়িয়াই নিরস্ত হইতেছি না। মুসলমানের মসজিদ পদ্মচিহ্ন ধারণ করিয়াও অদ্যাপি ইসলামধর্মের গৌরব-বোধনা করিতেছে, তাহার ছইটি "পাথুরে প্রমাণ" উপস্থিত করিতেছি।

পূবাতম্ব অল্পসঙ্কিস্ত্র ব্যক্তি মাত্রই হয়ত অবগত আছেন পাঠান যুগের বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের যে-সকল মসজিদ অদ্যাপি কালের জুড়ুটি উপেক্ষা করিয়া নিজ অস্তিত্ব রক্ষা কবিয়া আসিতেছে, তাহাদের স্থাপত্যবীতি ও গঠনসৌন্দর্য্য দেশীয় ও বিদেশীয় স্বাভাবিক শিল্পাভিগণিগণের সঙ্গ্রামে সৃষ্টি আকর্ষণ কবিতে সমর্থ হইয়াছে। মুসলমান স্থাপত্যবীতিতে মসজিদগাত্র পদ্ম-পুষ্পানিতে শোভিত কবা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না। তাই তখনকার ও তৎপরবর্তী অনেক মসজিদের বহির্গাত্র ও দ্বারদেশে পদ্ম উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

মসজিদেব বহির্গাত্রই যে এইকপ পদ্ম উৎকীর্ণ হইত তাহা নহে—মসজিদের অভ্যন্তরভাগেও মিহরাবের উপরিদেশ উৎকীর্ণ পদ্মে শোভিত কবা হইত। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে গোড়ের মসলতান সিকন্দর শাহ নির্মিত সুপ্রসিদ্ধ আদিনা মসজিদের মিহরাবেও এইকপ পদ্ম উৎকীর্ণ আছে। পদ্মচিহ্নের সহিত ইসলাম ধর্মে পৌত্তলিকতা প্রবেশের আশঙ্কা থাকিলে স্বাধীন মুসলমান সুলতানগণ কখনই তাহার প্রচলন অনুমোদন করিতেন না। অথচ বাংলার ইতিহাসে এই স্বাধীন সুলতানগণেব যুগই সকল দিক্ হইতেই বাঙালীর স্মরণের যোগ্য, সমগ্র মুসলমান অধিকারেব ভিতব এই সময়েই বাঙালীর প্রতিভা অপূর্ণ প্রেরণায় উদ্ভূত হইয়া শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অভিনব বেশে আত্মপ্রকাশ করে। আজ ইসলাম ধর্মের ক্ষুদ্রতা আশঙ্কায় বাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা কি এই স্বাধীন সুলতানগণেব গৌরবময় কাহিনী জ্ঞাতের তরুণ শিক্ষাধিগণকে বিশ্বত হইতে বলেন? এই প্রসঙ্গে আমরা অজ্ঞাত বহু মসজিদে-পদ্ম-উৎকীর্ণ থাকার বিবরণ উল্লেখ করিতে বিরত থাকিয়া জনৈক ইসলামধর্ম-প্রচাবকের প্রতিষ্ঠিত (পদ্মচিহ্নশোভিত) মসজিদের বিবরণ পাঠকগণের নিকট বিবৃত করিতেছি। বিপ্লব ফাজল

মাসে এই মসজিদ আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত অষ্টগ্রাম একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম এবং হিন্দু মুসলমান বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের বাসস্থান। পূর্বোল্লিখিত গোড়ীয় স্বাধীন সুলতানগণেরও পূর্বে কুতুব নামধেয় জনৈক ইসলামধর্ম-প্রচারক দিঙ্কমহাপুরুষ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া এতদ্ব্যতীত ইসলাম ধর্মের প্রচারকার্য আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মসজিদ অত্যাধিক অষ্টগ্রামে বর্তমান আছে। উক্ত মসজিদের গাত্র ও দ্বারদেশের ইষ্টকশ্রেণী প্রস্তুতি পদ্মে সুশোভিত করা হইয়াছে।

অত্যাধিক এই মসজিদে নিয়মিত জুম্মার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং গ্রামবাসী স্বধর্মনিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভূম্যধিকারী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহাতে বোগদান করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদেরই চেষ্টার ফলে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া জাতির ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। অতঃপর মুসলমান শিক্ষাবিগণের উপদেষ্টারা কি বলিতে চাহিবেন— ইসলামধর্ম-প্রচারক মসজিদগাত্র প্রস্তুত পদ্ম উৎকীর্ণ করিয়া তদীয় ধর্মের মর্যাদাহানি করিয়াছিলেন?

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার



নৃত্যরতি
শ্রীপ্রভাত নিয়োগী



নৃত্যরতি
শ্রীমন্দাকিনী চট্টোপাধ্যায়

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাজুল সাংকৃত্যায়ন

আচার্য দীপকর খোলিং বিহারে নয় মাস কাল অবস্থান করেন, সেই সময় তিনি “বোধিপথ বিহার” নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং কয়েকখানি প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করেন। জংরী প্রদেশে যে তিনি বৎসর যাপন করেন তৎকালে অল্প বয়সে গ্রন্থের রচনা ও অনুবাদ শেষ করিবার পর জয়-পুরুষ-বানর বর্ষে (জ্যৈষ্ঠ, ১০৪৪ খ্রীঃ) তিনি পুরুন্ডে উপস্থিত হন। এই স্থানে অতিশার প্রিয় শিষ্য, গৃহস্থ ডোম-তোন তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সেই সময় হইতে অতিশার মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই শিষ্য ছাত্রের স্তায় গুরুর অনুগামী ছিলেন এবং গুরুর দেহত্যাগের পর, “গুরু-গুণ ধারকর” নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহার জীবন-চরিত লিখেন।

ভোটদেশের কোন কোন স্থানে কিছুকাল ধরিয়া অবস্থান করিলেও আচার্য প্রায় অধিকাংশ সময় ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কিছু ধর্মগ্রন্থ-প্রণয়ন অথবা অনুবাদের কার্য কখনও ক্ষান্ত থাকিত না। অগ্নি-পুরুষ-শূর বর্ষে (সর্বজিত, ১০৪৭ খ্রীঃ) সম-য়ে বিহার এবং লোচ-পুরুষ-বায়্র বর্ষে (বিক্রত, ১০৫০ খ্রীঃ) তিনি যের-বা গিয়াছিলেন; এইরূপে চৌদ্দ বৎসর ভোটদেশে অবস্থানকালে তিনি তিন বৎসর জংরী প্রদেশে, চার বৎসর উই ও চাং প্রদেশে এবং ছয় বৎসর য়ে-থঙ প্রদেশে কাটাইয়াছিলেন। জয়-পুরুষ-অধ বর্ষের (জয়, ১০৫৪ খ্রীঃ) ভোটীয় নবম মাসের অষ্টাদশ তিথিতে (কার্তিক-অগ্রহায়ণের কৃষ্ণ তৃতীয়া-চতুর্থী) য়ে-থঙ বিহারের তারা মন্দিরে ৭০ বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষ নম্বর দেহ ত্যাগ করেন। প্রিয় শিষ্য ডোম-তোন তখন তাঁহার পার্শ্বেই ছিলেন। লাসা হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে ১২৩০ সালের এপ্রিল মাসে আমি এই অতি পবিত্র স্থান দর্শন করি। অতিশার সময় হইতে আজ পর্যন্ত এই মন্দিরের পরিবর্তন অতি অল্পই হইয়াছে, তাহার সাক্ষ্য উহার বিশাল রক্ত-চন্দন স্তম্ভ। এগনও দীপকরের ভিক্ষাপাত্র, ধর্মকারক (কমণ্ডলু) ও খদির কাষ্ঠ

নির্মিত যষ্টি—এই মন্দিরে একটি রাজমুদ্রা-অঙ্কিত পিঞ্জরে সুরক্ষিত হইয়া ভগৎকে জানাইতেছে যে সেদিন পর্যন্ত ভারতের বৃদ্ধ-অস্থিতে কি অদমা সাহস ও কার্যক্ষমতা ছিল।

ভোটদেশের চারিটি ধর্ম-সম্প্রদায়ই আচার্য দীপকরকে একভাবে পূজনীয় জ্ঞান করে। শিষ্য ডোম-তোন-পা প্রবর্তিত তান্ত্রিক ধর্মসম্প্রদায়ের শিষ্যপরম্পরার মধ্যে চাং-পা একজন শিষ্য হইয়াছিলেন, তদনুযায়ী পীত-টুপীধারী লামা-সম্প্রদায় ভোটদেশে ধর্ম ও রাজকার্য দুই বাণীরই প্রদান। ইহার নিজেদের অতিশার অনুগামী বলেন এবং অতিশার শিষ্যপরম্পরা কা-দম্-পা-দিগের উত্তরাধিকারী নবীন কা-দম্-পা বলিয়া বর্ণনা করেন।

আচার্য দীপকর কৃত মূল সংস্কৃত ও মাতৃভাষায় রচিত গ্রন্থসকল লুপ্ত হইয়া গেলেও তাহার অনুবাদ এগনও তিব্বতী ভাষায় সুরক্ষিত রহিয়াছে। ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি ৩৫ খানি বা ততোধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাঁহার তান্ত্রিক গ্রন্থের সংখ্যা ৭০এর অধিক, যদিও তাহার মধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র নিবন্ধও আছে। তিব্বতী ভাষায় বহু গ্রন্থের অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে বজ্রাব-সংগ্রহে ভিন্ন ভিন্ন লোচবার (স্থিভাবী) সহায়তায় অনূদিত নয়খানি গ্রন্থ আছে, তজ্জ্বরের সূত্র-বিভাগে এইরূপ অনুবাদের সংখ্যা ২১টি ও ইহার রত্ন-বিভাগে ৩০এর উপর ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদ আছে।

তিব্বতে শিক্ষা-প্রকরণ গ্রন্থ ও ভিক্ষু এই দুই শ্রেণীর জ্ঞান বিভিন্নরূপে বিভক্ত আছে। ভিক্ষুদিগের শিক্ষার জ্ঞান হাজার হাজার ছোট-বড় মঠ বা বিদ্যালয় আছে, তাহার কোন-কো-টিতে গ্রন্থ বিদ্যার্থী ব্যাকরণ, সাহিত্য বৈদ্য-শাস্ত্র বা জ্যোতিষে শিক্ষালাভ করিতে পারে—এরূপ সৌভাগ্য ধনী বা অভিজাত বংশের ব্যক্তি ভিন্ন অন্ত কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। ইহা সত্য যে কখনও

কখনও সুশিক্ষিত ভিক্ষু পুনরুদার গার্হস্থ্যশ্রমে প্রবেশ করে এবং গৃহস্থশ্রেণী এইরূপে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে, এবং ইহাও সত্য যে মঠে শিক্ষিত ভিক্ষু ধনী গৃহস্থ বালকের শিক্ষক নিযুক্ত হয়, কিন্তু প্রচলিত নিয়মানুসারে যে সকল মঠে বৃহৎ বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় আছে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে গৃহস্থ মায়েই তাহাতে প্রবেশ করিতে পায় না।

তিব্বত ভিক্ষুর দেশ। ইহা সত্য নহে যে সজ্জের ভিক্ষুগণ প্রধান বা মঠাচার্যগণ দেশ শাসন করেন, কিন্তু দেশের জন-সংখ্যার পঞ্চমাংশ গৃহত্যাগী-ভিক্ষুশ্রেণীভুক্ত। কচিং এমন গ্রাম পাওয়া যায় যেখানে দুই একটি ভিক্ষুও নাই বা যাহার পার্শ্বই পক্ষতবাহতে ছোট মঠ স্থাপিত হয় নাই। আট হইতে বারো বৎসর বয়সের মধ্যে ভিক্ষু-সজ্জপ্রবেশার্থী বালকেরা মঠে প্রবেশ করে। অবতারা লামা—অর্থাৎ যাহাদের লোকে কোন প্রসিদ্ধ মহাত্মা বা বোধিসত্ত্বের অবতার বলিয়া জ্ঞান করে—আরও অল্প বয়সে মঠে প্রবেশ করে। এই সকল বালক প্রথমে ছোট ছোট মঠে গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস করে। প্রারম্ভে বিশেষ ভাবে হৃদয় অক্ষর—দাঁড়িযুক্ত ও দাঁড়ি-বিহীন—লিখনের অভ্যাস করানো হয়। হস্তলিপি-অভ্যাসে অধিক সময় দেওয়ায় সুশিক্ষিত তিব্বতীদের লিখন প্রায়ই হৃদয়। পড়ার মধ্যে প্রধান কার্য শ্লোক কঠস্থ করা। তিব্বতী ভাষায় ব্যাকরণ, কাব্য, তর্ক, ধর্মগ্রন্থ সবই শ্লোকবদ্ধ, ইহাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে সেগুলির অভ্যাস ও স্মরণ দুইই সহজ হয়। সাধারণ গণনার অতিরিক্ত গণিত প্রায়ই শিখানো হয় না, কেবল যাহারা জ্যোতিষী বা সরকারী দপ্তরের উচ্চ কর্মচারী হইতে চাহে তাহারা বিশেষভাবে গণিত শিক্ষা করে। বিদ্যাশিক্ষায় বেত্রদণ্ডের সাহায্য খুবই লওয়া হয়। অবতারা লামা ভিন্ন অন্য ছাত্রমায়েই অধ্যাপকের সেবা-পরিচর্যা করে, অন্তরিক্তে বহু অধ্যাপক অনেক দরিদ্র ছাত্রের ভরণপোষণ পর্যন্ত করিয়া থাকেন।

লিখনপঠনে কুশলতা-লাভ ও কিছু ধর্মগ্রন্থ কঠস্থ করিলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয়, তাহার পর ব্যাকরণ, নীতি ও ধর্ম-বিষয়ক শ্লোক পাঠ আরম্ভ হয়। এই রূপে চার পাঁচ বৎসর কাটিলে উচ্চশিক্ষার পথে যাওয়া যায়। যদি মঠে উপযুক্ত অধ্যাপক না থাকে তবে বিদ্যার্থীকে বড় মঠে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। উচ্চশিক্ষা-কেন্দ্রে

যাইবার পূর্বে মধ্যম শ্রেণীর কোনও মঠে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট আমানের মাধ্যমিক শিক্ষার অনুরূপ বিদ্যাভ্যাস করা প্রয়োজন। তর্ক, বৌদ্ধদর্শন এবং কাব্যের প্রারম্ভিক গ্রন্থাদি এই সময় পড়ানো হয়। পুস্তকগুলি কঠস্থ করাই প্রধান কর্তব্য। যদিও বিদ্যার্থীগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পাঠ শিক্ষা করে, পরীক্ষা বা উচ্চশ্রেণীতে উন্নয়নের কিন্তু কোনই ব্যবস্থা নাই, ইহার পরিবর্তে ছাত্রেরা দল বান্ধিয়া স্ব স্ব বিষয়ে শাস্ত্রার্থ প্রভৃতি লইয়া প্রতিযোগিতা করে বা অধ্যাপক ছাত্রকে প্রশংসা করেন, প্রশ্নোত্তর সম্বোধনক না হইলে সেই ক্ষণেই দণ্ডদান করা হয় এবং নূতন বিষয়ে পাঠ স্থগিত রাখা হয়। এক গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত হইলে সেই বিষয়ের উচ্চতর গ্রন্থ পড়ানো হয় এবং বিদ্যার্থী যদি চিত্রণ, মূর্তি-নির্মাণ বা কাষ্ঠ-তক্ষণ ইত্যাদি কলাবিদ্যা শিক্ষা করিতে চাহে তবে তাহাকে সে শিক্ষাও দেওয়া হয়। সকল মঠেই এই সকল বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। উচ্চতম শিক্ষার জন্য চারটি মঠে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। প্রথম গন্-দন (লাসা হইতে দুই দিনের পথ), দ্বিতীয় ডে-পুং (লাসার নিকট, ১৪:৬ খ্রীঃ স্থাপিত), তৃতীয় সে-র (লাসার নিকট, ১৪:১২ খ্রীঃ স্থাপিত), চতুর্থ ট-শি-লুন-পো (চঙ্গ প্রদেশে, ১৪৪৭ খ্রীঃ স্থাপিত)।

তিব্বতের প্রাচীনতম মঠ সম্মুখে লাসা হইতে তিন দিনের পথ। নালন্দার মহান দার্শনিক আচার্য শাস্ত্ররক্ষিত ৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার স্থাপনা করেন, কিন্তু এখন ইহার আর সে প্রাচীন গৌরব নাই। উপরিউক্ত চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ই মধ্য-তিব্বতে স্থিত, এতদ্ভিন্ন পূর্ব তিব্বতের তেবুগী (১৫:৮ খ্রীঃ স্থাপিত) ও চীন সীমান্তস্থিত অম-দো প্রদেশের স্কু-বুম (১৫:৭৮ খ্রীঃ স্থাপিত) এই দুইটিও প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্র। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর জাগীর আছে, উপরন্তু যাত্রীরাও এই সকল মঠকে কিছু দান করা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করে। মঠ হইতে বিদ্যার্থীগণকে অবস্থামত আর্থিক সাহায্যও করা হয়। প্রতিভাশালী ছাত্রের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আছে, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ম-খন-পো (অধ্যক্ষ—ডীন) এরূপ ছাত্রকে অতি স্নেহ ও যত্নের সহিত দেখেন এবং তাহার উন্নতিতে নিজের ও নিজ প্রতিষ্ঠানের গৌরববৃদ্ধি অগ্রভব করেন। মাঝারি ছাত্রকে অনেকটা নিজ পরিবারের বা গুরুর সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়।

এই সকল বিশাল শিক্ষাকেন্দ্রে দূরদূরান্ত হইতে হাজার হাজার বিদ্যার্থী আসে। বৃহত্তর কেন্দ্রে ডে-পুং, সেখানে সাত হাজার সাত শতাধিক বিদ্যার্থী আছে; তাহার পর সে-রা, যেখানে সাড়ে পাঁচ হাজার ছাত্র বিদ্যালভ করে। গন্-দন্ ও ট-শী লুন-পো এই দুই কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে সাড়ে তিন হাজার ছাত্র আছে। ট-শী লামা দেশত্যাগী হওয়ায় ট-শী-লুন-পো কিছু নীচে নামিয়াছে। এই সকল বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের কথা পরে আরও বলিবার ইচ্ছা আছে। এ-সকলে উত্তরের সাইবিরিয়া, পশ্চিমের অস্ট্রাখান (দক্ষিণ রুশ) ও পূর্বাঞ্চলের চীন জেহোল প্রদেশের বহু বিদ্যার্থী দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবিদ্যালয়ের মত ইহাদের ছাত্রাবাস, পুস্তকালয় ও দেবালয় আছে এবং প্রত্যেকটিতে পৃথক জাদুগীর আছে—এমন কি ক্ষুদ্রতম ছাত্রাবাসেও।

উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়ন প্রগাঢ়তর হয়, তবে গ্রন্থাদি মুখস্থ করার পারিপাট্য এখানেও চলে। আমাদের ছাত্রেরা ক্রিকেট ও ফুটবলে যে আনন্দ পায় এখানকার ছাত্রেরা জ্বায় ও দর্শন সম্বন্ধে শাস্ত্রার্থ করায় সেইরূপ উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করে। এখানকার উ-সঙ বা মহাবিদ্যালয়ের ম-খন্-পো (ডীন) যদিও উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিত ও বিদ্বানগণ হইতে গৃহীত হইয়া থাকেন কিন্তু অধ্যাপনার কার্য্য প্রধানতঃ গেব্-গেন্ (লেকচারার) বা গে-শে (প্রোফেসর) গণই করিয়া থাকেন। অধ্যয়ন সমাপনান্তে বিদ্বানগুলীর মত অল্পকূল হইলে বিদ্যার্থী ল্য-রম্-পা, অর্থাৎ ডক্টর, উপাধি পায়। তাহার পর সে নিজ মঠে ফিরিয়া যায় এবং যদি পঠনপাঠনে তাহার অধিক ইচ্ছা থাকে তবে সে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গে-শে বা গেব্-গেন্ হইতেও পারে।

তিব্বতে ভিক্ষুগণেরও শত শত মঠ আছে, সেখানে ভিক্ষুগণের বিদ্যালভের ব্যবস্থা আছে। এই সকল মঠ ভিক্ষু-মঠ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও দূরে অবস্থিত। সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা যদিও এগুলিতে আছে, কিন্তু কোনও ভিক্ষুগণ-বিশ্ববিদ্যালয় নাই এবং ভিক্ষুগণ-বিদ্যাধিগী ভিক্ষু-বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেও পারে না। ইহাদের শিক্ষা প্রধানতঃ সাহিত্য, ধর্ম্ম ও পূজা-পাঠ সম্বন্ধীয় হইয়া থাকে।

যদিও গৃহস্থ-ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে না কিন্তু মঠে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রের গৃহস্থের শিক্ষকতা করায় কোনও বাধা নাই। যে কোন গৃহস্থ-ছাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে গিয়া পুস্তক পাঠ করিতে পারে কিন্তু ছাত্রাবাসে তাহার থাকা নিষিদ্ধ হওয়ায় এই নিয়মে তাহার বিশেষ উপকার হয় না। অতীতকালে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভিক্ষু অতি অল্প ক্ষেত্রেই পুনরুদার গৃহস্থ হয়, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সরকারী কার্য্যে তাহাদের চাহিদা খুবই বেশী। বিশেষ নিয়মাহুসারে সরকারী প্রত্যেক কক্ষক্ষেত্রে একজন গৃহস্থ ও

একজন ভিক্ষু এইরূপ জোড়া জোড়া চাকুরী হওয়ায় ইহাদের উচ্চপদলাভ সহজেই হয়। উদাহরণস্বরূপ আমার বন্ধু কুশো-তুন-দর ভিক্ষুর নাম করা যাইতে পারে, তিনি লাসার টেলিগ্রাফ অফিসের দুই জন অফিসারের অন্ততম।

ধনী বংশের বালকবালিকা নিজ গৃহের লামার নিকট শিক্ষালাভ করে। বালিকাদিগের এই প্রারম্ভিক শিক্ষাতেই সম্ভষ্ট থাকিতে হয়, তবে ভিক্ষুগণ হইবার ইচ্ছা থাকিলে আরও কিছুদূর লেখাপড়া হইতে পারে। সাধারণ জ্ঞানলোকের লেখাপড়ার অভাবই অধিক। ধনীদিগের বালকগণ বিশেষভাবে নিযুক্ত অধ্যাপকের নিকট পড়িতে পারে, সাধারণ শ্রেণীর বালকের পক্ষে যোজ্যোষ্ঠানিগের নিকট অধ্যয়ন বা গ্রামস্থ মঠের পাঠশালা ভিন্ন বিদ্যাশিক্ষার অল্প কোনও পথ নাই। লাসা, শীগচে ইত্যাদি নগরে কোন কোন পণ্ডিত নিজ নিজ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন যেখানে অল্প ব্যয়ে শিক্ষালাভ সম্ভব। এখানে শিক্ষার ক্রম ভিক্ষু শিক্ষালয়েরই মত, তবে দর্শন ও জ্বায় একেবারেই শিখানো হয় না। লাসায় সরকারী কাজকর্ম্ম শিক্ষার জন্য চী-খন নামক বিদ্যালয় আছে সেখানে হিসাব-কিতাব ইত্যাদি রাখার পদ্ধতি শিখান হয় এবং এই বিদ্যালয় হইতেই উপযুক্ত লোক সরকারী পদের জন্য বাছিয়া লওয়া হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে ভোট-সরকার গ্যাফিতে ইংরেজী স্থল স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং অনেক সর্দার তাহাদের বালকদিগকে সেখানে শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া-ছিলেন কিন্তু প্রারম্ভেই অতি উচ্চ বেতনে ইংরেজ ও অন্তঃ শিক্ষক নিয়োগ করায় তাহা বেশী দিন ইংগরা চালাইতে পারেন নাই। দুই-চারিটি বিদ্যার্থীকে সরকারী খরচে ইংলণ্ডেও পাঠানো হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের শিক্ষাও আশানুরূপ না হওয়ায় সে পছাও স্থগিত আছে। সংক্ষেপে তিব্বতে শিক্ষার অবস্থা এইরূপ। অল্প বিষয়ের জ্বায় শিক্ষা-প্রকরণেও বহির্জগতের ছায়া এদেশে বিশেষ পড়ে নাই। তবে ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যে-সকল ব্যবস্থা বর্ত্তমানে আছে সেগুলিতে নূতন বাতাস বহিলে, তিব্বতে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি-বিস্তারে বিশেষ সময় লাগিবে না।

* * *

পূর্বে দিকে চীন হইতে পশ্চিমে লদাখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড তিব্বত দেশ। ইহা পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত এবং গড়ে সমুদ্র হইতে ১২,০০০ ফুট উচ্চ স্থিত। উচ্চতার দরুন এখানে শীতের আধিক্য ও বায়ুমণ্ডল লঘু হওয়ায় এদেশে বৃষ্ণ-গুল্লের অভাব আছে। যে-জুন মাসের গ্রীষ্মকালেও লাসার চারি দিকের পাহাড় তুষারাচ্ছাদিত থাকে, শীতকালের ত কথাই নাই! হিমালয়ের বিশাল প্রাচীর পথরোধ করায় ভারতীয় সমুদ্রের মেঘমালা এখানে স্বচ্ছন্দে পৌছে না, সেই জন্য এদেশে বৃষ্টি কম, তুষারপাতই

অধিক। এ-দেশের শীত যেন অস্থিচ্ছেদ করিয়া দেহে প্রবেশ করে।

ঋতুর কঠোরতা হেতু দেশবাসীদিগকে অধিক পরিশ্রমী ও সাহসী হইতে হইয়াছে। সিংহলের স্থায় এদেশে একটি সারোং (লুঙ্গী)-এ চলে না, এখানে বার মাসই মোটা পশমী পোষাকের প্রয়োজন। শীতকালে তাহাতেও কুলায় না, লোমযুক্ত পশুচর্ম (পোস্তীন) ভিন্ন উপায় নাই। সাধারণ লোকে ভেড়ার চামড়া—লোম ভিতরে চর্ম বাহিরে রাখিয়া—পরিয় থাকে, অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ বক্স শৃগাল, নেবড়ে, নেউল ইত্যাদি নানা জন্তুর চর্ম ব্যবহার করেন, সেগুলির মূল্য অধিক। সংক্ষেপে এদেশে সাধারণ কাপড়ে প্রাণধারণ করা অসম্ভব। চামড়া ও উলের বৃট জুতা (শোম্পা), তাহার উপর গরম পায়জামা, লম্বা গরম কোট (ছুপা) ও মস্তকে ফেণ্ট-হাট—ইহাই এ-দেশের পোষাক। ফেণ্ট-হাটের ব্যবহার পনর-বোল বৎসর মাত্র চলিয়াছে, কিন্তু এখন উহার ব্যবহার বালক বৃদ্ধ, ধনী দরিদ্র সকলের মধ্যেই প্রচলিত। ইউরোপ হইতে লক্ষাধিক পুরনো হাট খোলাই করিয়া কলিকাতায় আসে এবং সেখান হইতে স্বল্প মূল্যে এদেশে চালান হয়।

জীলোকদিগের পায়ে শোম্পা জুতা থাকে। দেহে ছুপা কোট, কিন্তু তাহাতে হাত থাকে না, কোটের নীচে হাতযুক্ত হুতী বা আসামী এণ্ডার কামিজ এবং সামনে কোমরের নীচে বিলাতী 'এপ্রন' জাতীয় বস্ত্রখণ্ড থাকে যাহা ঝাড়নের শব্দ করিবে। তিব্বতী জীলোকের শির-সজ্জায় ও ভূষণে অনেক যত্ন করা হয়। ভোটিয় গৃহস্থের সম্পত্তির অধিকাংশ তাহার জীর মস্তকের উপর থাকে, ইহা বলা বিশেষ অত্যাুক্তি নহে। শিরসজ্জার রূপ হইতে কোন্ জীলোক কোন্ প্রদেশের তাহা বিচার করাও সহজ। টম্বী লামার প্রদেশের (চাঙ প্রদেশ) জীলোকের শিরোভূষণ ধনুকাকার; ইহা মূলতঃ একটি কাঠখণ্ডকে ঝাঁকাইয়া ও তাহাতে কাপড় জড়াইয়া তৈয়ারী করা হয়। ইহার উপর ফিরোজা ও প্রবালের গুচ্ছ ও লহর থাকে, ধনীগৃহে মুক্তার ব্যবহারও নীচের অংশে প্রচুর হইয়া থাকে। গহনাতেও ফিরোজা ও প্রবালের ব্যবহারই অধিক। লাসার জীলোকের শিরোভূষণ ত্রিকোণাকার, ইহার উপর মুক্তা প্রবাল ফিরোজা উপরন্তু পরচুলার বেণীমালা কান হইতে পিঠ পর্যন্ত ঝুলিয়া থাকে। এই পরচুলার কেশ চীনদেশ হইতে আসে এবং লাসার ও তাহার আশপাশের অধিক সভ্য অঞ্চলের জীলোকগণ এক এক জনে পক্ষাশ-ঘাট, এক শত দুই শত টাকা খরচ করিয়া এই বহুমূল্য অলঙ্কারে নিজেদের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কেশরাশি-সংলগ্ন বৃহৎ কর্ণভূষণ, গলায় ফিরোজাযুক্ত বৃহৎ চৌকোণ তাবিজদান—যাহা ভূত-প্রেত-নিবারণ-মন্ত্রে পরিপূর্ণ—তাবিজের পাশ হইতে

বাহ ও কোমর পর্যন্ত ঝুলানো মুক্তাগুচ্ছ, ইহাই এদেশের জীলোকের গহনা। মুসলমান ভিন্ন অন্য সকল জীলোকেই দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ পরিয়া থাকে। শঙ্খটিতে হাত গলাইবার মত পথ থাকে মাত্র, কোন মতেই তাহাকে চুড়ি বা বাল্য বলা যায় না।

* * *

পশমই ভোটদেশের প্রধান আয়ের বস্তু। উল, কস্তুরী, লোমযুক্ত চর্ম (ফর), ইহাই এখানকার প্রধান রপ্তানীর মাল এবং রপ্তানীর পথ প্রধানতঃ ভারতবর্ষের মুখে। গম, জব, যও (ওটস), মটর ও সরিষা এদেশে কিছু কিছু উৎপন্ন হয়। সপ্তমসরে একবার মাত্র ফসল হয়, তাহাও ভিন্ন উচ্চতায় ভিন্ন সময়ে পাকে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে সর্বত্রই ফসল কাটা হইয়া যায়। অক্টোবরে শরৎ ঋতুর আগমনে, গাছের পাতা পীতবর্ণ হইয়া ঝরিতে থাকে।

গম যথেষ্ট জন্মাইলেও ভোটিয়েরা কুটি খায় না। ইহার গম যব ভাজিয়া পিষিয়া সত্ত্বতে (চম্বা) পরিণত করে এবং রাজা হইতে ভিক্ষুক পর্যন্ত সকলেরই ইহা প্রধান খাদ্য। লবণ, মাখন, মিস্ত্রী ইত্যাদি গরম চায়ে দিয়া তাহাতে চম্বা ঢালিয়া হাতে মাখিয়া থাওয়াই ইহাদের প্রথা। প্রত্যেকের পৃথক পেয়ালা থাকে, ইহা প্রধানতঃ কাঠনির্মিত। এই পেয়ালাই তাহাদের রেকাব, থালা, গেলাস ইত্যাদির স্থান পূর্ণ করে। ভোজনের পর জিভ দিয়া চাটিয়া পেয়ালা পরিষ্কার করিয়া বৃকের কাছে চোগার ভিতর তাহা রাখা হয়। দেহ, মুখ, হাত প্রভৃতি ধোত করা কদাচিৎ হয়, এমন কি বিহারের ভিক্ষুদেরও মুখ ও হাতের উপর ময়লার মোটা স্তর জমিয়া থাকে। ভোটদেশে এরূপ লোক অনেক পাওয়া যায় যাহারা আজীবন শরীরে জলক্ষেপ করে নাই।

চা ও চম্বা ভিন্ন ইহাদের প্রধান খাদ্য মাংস এবং অধিকাংশ স্থলে তাহা কাঁচা বা কেবল রৌদ্রে শুকাইয়া খাওয়া হয়। মসল্লা ইত্যাদি দ্বারা মাংস পাক করার প্রথা শহরের ধনীদিগের মধ্যেই আবদ্ধ এবং ইহাও চীন ও নেপালী অফিসর বা সওদাগরদিগের প্রভাবের ফল। অভিজাত বংশের ভোটীয় চীনদেশের রীতিতে দুইটি কাঠশলাকা চামচের মত ব্যবহার করিয়া ভোজন করে এবং তাহাদের খাদ্যের মধ্যে আটা-ময়দাও স্থান পায়। চা এদেশে প্রচুর পরিমাণে পান করে, তাহার অধিকাংশই চীন দেশ হইতে আসে। চীনা চা চাপে জমাईয়া ইটের মত করা হয় এবং যদিও ইহা তিন মাসের পথ হইতে আসে তবুও ভারতের চা অপেক্ষা ইহা সস্তা। এখানে চায়ে দুধচিনির ব্যবহার প্রচলিত নহে। প্রথমে সোডা ও লবণের সহিত চা খুব ফুটাইয়া পরে তাহা বাঁশের বা কাঠের চোঙ্গায় ঢালিয়া মাখনের সঙ্গে মাখিয়া লইলেই তিব্বতী চা প্রস্তুত হইল। ইহা দেখিতে দুধ-মিশ্রণো চায়েরই মত।

মহিলা-সংবাদ

অধ্যক্ষ এ. টি. মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী নীলিমা মুখোপাধ্যায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এসসি. পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞানের অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছেন। ইহার ভগিনী কুমারী রমা মুখোপাধ্যায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এসসি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কুমারী কলাবন্তী বাথিজা

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এসসি. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।



কুমারী রমা মুখোপাধ্যায়



কুমারী নীলিমা মুখোপাধ্যায়



কুমারী কলাবন্তী বাথিজা



শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার

নবনির্বাচিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সনাতা ;
নিখিল-বঙ্গ মহিলা-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভানেত্রী

বিবিধ প্রসঙ্গ

ইংরেজরা ভারতবর্ষে কেন আছে

মিঃ এডুইন বেভান ভারতবন্ধু বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। লণ্ডনে গাওয়ার ষ্ট্রীটে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের যে ছাত্রনিবাস ও ভোজনালয় আছে, ইনি তাহার কমিটির এক জন সদস্য। ইনি গত এপ্রিল মাসে লণ্ডনের টাইমস্ কাগজে ইংরেজদের ভারতবর্ষ দখল করিয়া বসিয়া থাকিবার কারণ সম্বন্ধে যাহা লেখেন, রয়টার তাহা ১৭ই এপ্রিল ভারতবর্ষের দৈনিক কাগজসমূহে টেলিগ্রাফ করেন। তাহার তাৎপর্য এই :—

“যে-কেহ ব্রিটিশ জাতির বর্তমান মেজাজ জানেন এবং আমাদের দেশের সম্প্রতি করেক বৎসরের কোন কোন কাজ বিবেচনা করিয়া দেখেন, তিনিই জানেন, যে, ইহা অসম্ভব কবা অসম্ভব (যে-কণ অসম্ভব মিঃ গান্ধী এখনও করেন বলিয়া বোধ হয়) যে, আমাদের জাতি অন্য দেশের উপর প্রভুত্ব করিবার স্বর্থ বা সুবিধার জন্যই তাহা প্রভুত্ব তৎদেশবাসী জনগণকে ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক। আমরা মিশর হইতে সবিয়া পড়িয়াছি। আমরা ইরাক হইতে সবিয়া পড়ি; সেখান হইতে খুব তাড়াতাড়ি সবিয়াহিলাম বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে, কারণ আমাদের সবিয়া পড়ার পরই তৎথাকার আসীরীয়েবা, যাহাদিগকে রক্ষা করিতে আমরা বাধ্য হিলাম, দলে দলে নিহত হয়।

“ইহা সম্পূর্ণ সত্য, যে, আমাদের জাতি এখনই ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া আসিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু তাহা একারণে নহে, যে, ভারতীয়েরা চরিত্রে, বুদ্ধিতে বা সংস্কৃতিতে মিশরী বা ইবাকীদের চেয়ে নিকৃষ্ট; মোটেই তাহা সত্য নহে। কারণ এই, যে, যে-সব দেশ একদেশ (এক) লাভ করিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তাহাদের মধ্যে কোন দেশই ভারতবর্ষের মত এত বেশী পরিমাণে জাতি (রেস), ধর্মমত এবং বর্ণভেদ জনিত পবনপরিবোধিতা দ্বারা বহুধা বিভক্ত নহে।”

ইংরেজদের ভারতবর্ষ দখল করিয়া বসিয়া থাকিবার কারণ সম্বন্ধে মিঃ বেভান যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নূতন কথা নহে। এরূপ কারণ বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ সহকারে অন্তরেণও আগে বহুবার জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। কংগ্রেসের মন্ত্রি স্বাকীকার সম্বন্ধে ভারত-

সচিব লর্ড জেটল্যান্ড পালেমেন্টে প্রথম যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে ঐ রকম একটা অজুহাতের আভাস থাকায়, আমরা মিঃ বেভানের মন্তব্য ভারতবর্ষে পেঁছিবার পাঁচ দিন আগে প্রকাশিত বৈশাখের ‘প্রবাসীতে’ লিখিয়াছিলাম :—

“ব্রিটেনে অতি দীর্ঘকাল ইহুদী, বোয়ান ক্যাথলিক এবং ননকন্-ফর্মিষ্ট খ্রীষ্টীয়ানদের উপর অবিচার ও অত্যাচার হইয়াছে। অন্য অনেক দেশেও এরূপ পক্ষপাতিত্ব আছে। কিন্তু তথাপি, অন্য কোন তৎপাক্ষিত নিরপেক্ষ জাতি তৎহাদিগকে পদানত করুক, ইহা কোন প্রকৃত স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি চাহিতে পারে না। প্রত্যেক জাতি নিজেকেব দোষ নিজেরাই সন্নিহিত লউক, ইহাই আদর্শ। ইংরেজরা কি নিজেকেব দেশের পূর্বোক্তিত সম্প্রদায়-গুলি প্রতি আচরণের উন্নতি ক’রে নাই? ইংরেজরা যদি ভারতবর্ষে বাস্তবিকই নিরপেক্ষ হইতেন, তাহা হইলেও তাহারা চিরকাল এখানে প্রভুত্ব কবিবেন ইহা বাস্তবিক হইতে পারে না। আমরা নিজেকেব দোষ নিজেরা সন্নিহিত লইব, লইতেছি, এবং ইতিমধ্যে কতকটা লইয়াছিও।”

মিঃ বেভান মনে করেন, না মনে করিবার ভান করিয়াছেন, যে, ইংরেজ জাতির বর্তমান প্রকৃতি ও ব্রিটেনের খুব আধুনিক কোন কোন কাজ বিবেচনা করিলে এ ধারণা জন্মিবে না, যে, ইংরেজরা কেবল প্রভুত্বের স্বর্থ ও মনকার জন্যই ভারতবর্ষ দখল করিয়া বসিয়া আছে। আমরা কিন্তু ইংরেজ জাতির স্বভাবচরিত্রে ইংরেজাধীন জাতিদিগকে স্বাধীনতা দিবার দিকে ঝোঁকের কোন নব আবির্ভাব দেখিতে পাইতেছি না। খুব আধুনিক যে দুইটা কাজের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন, তাহার দ্বারাও তাহার দৃষ্টব্য সমর্থিত হয় না।

ভারতবর্ষের উপর ধেরূপ প্রভুত্ব ইংরেজরা যে ভাবে স্থাপন করিয়াছে, মিশরের উপর সেরূপ প্রভুত্ব সে ভাবে তাহারা কোন কালে স্থাপন করে নাই। ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব যত দীর্ঘ কালের, মিশরের উপর প্রভুত্ব তত দীর্ঘ কালের নয়। ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব যত লাভজনক, মিশরের উপর প্রভুত্ব তত লাভজনক কোন কালেই ছিল না। মিশরের আধুনিক ইতিহাস এই, যে, ইহা আমো

তুবক সাম্রাজ্যের অংশ ছিল, এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর ইহার উপর ব্রিটিশ রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার (ব্রিটিশ প্রোটেক্টরেট) স্থাপিত হইয়াছে ঘোষিত হয়। মিশর হইতে ব্রিটিশ সিংহের থাবা অপসৃত হইয়াছে, ইহা সত্য নহে। মিশরের উপর প্রভুত্ব কি প্রকারের ও কতটা ছিল, তাহা এখন আমাদের আলোচ্য নহে। ঐ প্রভুত্ব যে-সব উদ্দেশ্যে রাখা হইয়াছিল, মিশরের সহিত “সন্ধিতে” সেই সকল উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় রাখা হইয়াছে। এবং ব্রিটেন ও মিশরের সম্বন্ধে বাস্তবতঃ যেটুকু পবিবর্তন হইয়াছে, ব্রিটেন মিশরীয় ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির চাপে তাহা করিতে বাধ্য হইয়াছে, মহামুহুরতের জন্ত করে নাই।

ইরাকের আধুনিক ইতিহাস সংক্ষেপে এই, যে, গত মহাযুদ্ধে ইহা তুবকের অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হয়। তখন ইহাকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া গণনা করা হয় এবং স্থির হয়, যে, লীগ অব নেশন্সের আদেশপ্রাপ্ত কোন শক্তি (“ম্যান্ডেটরি পাওয়ার”) ইহার অভিভাবক হইবেন। ব্রিটেনকে এই অভিভাবকত্ব দেওয়া হয়। ১৯২৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ব্রিটেন ও ইরাকে যে সন্ধি হয় তাহার ফলে ব্রিটেন ইরাককে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া মানিতে অঙ্গীকার করেন। ১৯৩২ সালের ৪ঠা অক্টোবর ইরাক লীগ অব নেশন্সের সদস্য হয় এবং ব্রিটেনের অভিভাবকত্ব শেষ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষের সহিত ব্রিটেনের যে সম্পর্ক, ইরাকের সহিত ব্রিটেনের সে সম্পর্ক কোন কালেই ছিল না। ইরাকের রক্ষণ হইতে ভক্ষণের যে স্বযোগ ব্রিটেন পাইয়াছিল, তাহা প্রকারান্তরে এখনও আছে। ব্রিটেনের “অভিভাবকত্ব” যে ইরাকে লোপ পাইয়াছে, তাহা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ফল, ব্রিটিশ মহামুহুরতের দৃষ্টান্ত নহে।

ব্রিটেন যেচ্ছায়, সদাশয়তাবশতঃ, মানব মাত্রেরই স্বাধীনতার মূল্য ও প্রয়োজন বুঝিয়া, নিজের অধীনতা হইতে কোন জাতিকে ও দেশকে মুক্ত করিয়াছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এরূপ কোন দৃষ্টান্ত নাই। বাহির হইতে ভাসা ভাসা ভাবে দেখিলে যেখানে এরূপ মনে হইতে পারে, সেখানেও একটু তলাইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, যে,

অবস্থার চাপে পড়িয়া ব্রিটেন সদাশয় হইতে বাধ্য হইয়াছে। আয়ারল্যান্ড যদি স্বাধীন হয়, তাহার স্বাধীনতাও ব্রিটেন স্বীকার করবে বাধ্য হইয়া, স্বেচ্ছায় নহে।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, যেখানে যেখানে ব্রিটেন নিজের অধীন দেশগুলিকে ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা বা ভৌমনিয়নত্ব দিয়াছে, সেখানে স্বৈতকার্যেরাই প্রভু; অস্বৈতদিগকে মালিক হইতে ব্রিটেন কোথাও দেয় নাই।

ব্রিটিশ জাতির মধ্যে কতকগুলি লোক আছেন যাহারা পরাধীন দেশসকলের, ভারতবর্ষেরও, স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করেন। কিন্তু তাহারা যদি পালেমেন্টে তাহাদের সংখ্যাভূষ্টি দল গড়িয়া তুলিয়া গবর্নেন্ট হইয়া বসেন, তখন তাহাদের সদাশয়তা টিকিবে কিনা, তাহা ভবিষ্যৎ কালে বুঝা যাইবে।

মিঃ বেভান বলিতেছেন, অধীন দেশের উপর প্রভুত্ব কবার স্বপ্নের বা প্রভুত্ব হইতে উৎপন্ন মনকার জন্ত ইংরেজরা অন্য দেশকে অধীন করিয়া রাখে না। অন্য একটা দেশকে অধীন করিয়া রাখিয়া তাহারা স্থখ পায় কি না, তাহা তাহাদের মনের কথা। তাহাদের মনে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই। অতএব সে বিষয়ে কিছু বলিব না। কিন্তু মনকাটা বাহিবেব ব্যাপার। সে বিষয়ে কিছু বলা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষকে অধীনস্থ রাখিয়া ব্রিটেন প্রধানতঃ তিন রকমে লাভবান হয়।

ভারতবর্ষের সামরিক ও অসামরিক প্রধান চাকরিগুলি হইতে ইংরেজরা খুব বেশী বেশী বেতন, ভাতা ও পেন্সান পায়। যদি সেগুলি প্রতি তাহাদের লোভ না থাকিত তাহা হইলে তাহারা সেইগুলি নিজের হাতে রাখিবার জন্ত নানা অত্যাচার কৌশল ও উপায় অবলম্বন করিত না। সেই সব কাজেব জন্ত যদি যোগ্য ভাবতীয় না পাওয়া যাইত, তাহা হইলে ইংবেজরা বলিতে পারিত, যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কাজ চালাইবার জন্ত তাহারা বাধ্য হইয়া এই সব কাজ নিজেরা কবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা অন্যরূপ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লউন।

ভারতীয় সিভিল সার্বিসেব জন্ত উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইবার নিমিত্ত ইংবেজরাই একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রথা প্রবর্তিত করে। তাহাতে জ্ঞানবিষয়ক

যোগ্যতার পরীক্ষা আছে, দৈহিক যোগ্যতার পরীক্ষাও আছে। তাহাতে ক্রমে ক্রমে ভারতীয়েরা অধিক হইতে অধিকতর সংখ্যায় ইংরেজ প্রতিযোগিতাদিগকে পরাস্ত করিয়া কাজ পাইতে থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে, ইংবেজদেরই নির্দিষ্ট যোগ্যতার মানদণ্ড অনুসারে বিস্তর ভারতীয় দেশের কাজ চালাইবার যোগ্য হইয়াছে এবং পরে আরও অধিকসংখ্যক লোক যোগ্য হইবে। (অবশ্য, আমরা এরূপ যুক্তিনিরপেক্ষ ভাবেই বিশ্বাস করি, যে, আমাদের দেশের কাজ চালাইবার অধিকার আমাদেরই আছে, এবং যোগ্যতাও আমাদের আছে।) কিন্তু ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া প্রভুত্ব করিবার প্রতি ও চাকরিগুলির প্রতি লোভ থাকায়, ভারতীয়দের প্রমাণিত যোগ্যতা সত্ত্বেও ইংরেজরা এখন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সিভিল সার্ভিসের সব কাজগুলিতে লোক নিযুক্ত না করিয়া, মনোনয়ন দ্বারা অনেক ইংরেজ ছোকরাকে ইহাতে ঢুকাইতেছে।

সুতরাং ভারতকে অধীন রাখার মূল্যের প্রতি ইংরেজের বেশ লোভ আছে।

চিকিৎসা-বিভাগের বড় চাকরিগুলি বেশীর ভাগ ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লোকদিগকে দেওয়া হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু ইহাতেও বেশী সংখ্যায় ভারতীয় যুবকেরা কৃত্রিম প্রদর্শন করায় সেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা লোক লওয়া হয় না। যে-কোন প্রকারে হউক, ইংরেজ ডাক্তারদের চাকরি দিতেই হইবে, এই জিন হইতে মূল্যের প্রতি লোভের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ভারতবর্ষীয় সিপাহীরা কোনও দেশের সৈনিকদের চেয়ে সাহসে, প্রশমজিতে, কষ্টসহিষ্ণুতায় ও রণকৌশলে নিষ্ঠুর নহে। গত মহাযুদ্ধে ইউরোপের রণক্ষেত্রেও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষকে বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইংরেজ সৈন্ত রাখা অনাবশ্যক। কিন্তু প্রভুত্বের উপর ও প্রভুত্বজনিত মূল্যের উপর লোভ থাকায়, এক-এক জন সিপাহীর জন্য খরচের চারি গুণ খরচ এক-এক জন ইংরেজ সৈন্তের জন্য হইলেও, বিস্তর ইংরেজ সৈনিক ভারতবর্ষে রাখা হইয়াছে।

ভারতীয়দের মধ্যে সেনানায়কের কাজ করিবার যোগ্য

লোকও বিস্তর আছে। গত মহাযুদ্ধে যখন খুব বেশী সংখ্যায় ইংরেজ সেনানায়কেরা হত হয়, তখন দেশী রাজ্য-সমূহের দেশী সেনা-নায়কেরা এবং ব্রিটিশ-ভারতবর্ষেরও দেশী সেনানায়কেরা ইংরেজদের পক্ষে বহু পরিমাণে সৈন্যদল-পরিচালনার কাজ বেরূপ সাহস ও দক্ষতার সহিত করিয়াছিল, তাহা অন্য কোন জাতির সেনানায়কদের চেয়ে কম নয়। কিন্তু সেনানায়কের কাজগুলিতে ভারতীয় লোক এত কম সংখ্যায় লওয়া হয়, যে, ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন থাকিতে কোন কালেই ভারতবর্ষের সমগ্র সৈন্যদল ভারতীয় নায়কদের পরিচালনাদীন হইবে না।

প্রভুত্ব ও প্রভুত্বজনিত মূল্যের লোভ বশতঃ ভারতীয় সৈনিক বিভাগে ব্রিটেন উপরিলিখিত অস্ত্রায় ব্যবস্থা রাখিয়াছে।

ভারতবর্ষে কারখানা স্থাপন, ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করা, ব্রিটেন হইতে ভারতবর্ষের নহিত ব্যবসা বাণিজ্য চালান, এবং জাহাজ দ্বারা ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষ হইতে যাত্রী ও মাল আনয়ন ও প্রেরণ দ্বারা ব্রিটেন শত শত কোটি টাকা লাভ করিয়া আসিতেছে। নূতন ভারতশাসন আইনে এই লাভ রাখিবার ও বাড়াইবার জন্য নানা ধারা ও উপধারা নিবিষ্ট হইয়াছে। কোন দেশের আইনে অন্য একটা দেশকে লাভবান করিবার ও রাখিবার জন্য এরূপ ব্যবস্থা নাই। ১৯০৫ সালের এই নূতন আইনের এইরূপ যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা পূর্ববর্তী ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনে ছিল না। ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জাহাজ চালান হইতে লব্ধ প্রভুত্ব লাভের উপর ব্রিটেনের লোভ এত বেশী যে, তাহা রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য ব্রিটেন নূতন আইনে অশ্রুতপূর্ব্ব অস্ত্রায় ব্যবস্থা করিয়াছে।

এই সকল ধারা ও উপধারা সম্বন্ধে আমরা আগে আগে মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীতে অনেক লিখিয়াছি। সম্প্রতিও আমরা আমেরিকার প্রসিদ্ধ মানিক 'এশিয়া' পত্রিকার যে সংখ্যায় এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। তাহা ভারতবর্ষে আসিয়াছে।

ব্রিটেন ভারতবর্ষ হইতে অতীত কালে লাভবান হইয়াছেন আর এক প্রকারে। পলাশির যুদ্ধের পর বাংলা দেশ হইতে যে কোটি কোটি টাকা বিলাতে যায়, তাহারই সাহায্যে

বিলাতের নব উদ্ভাবিত নানা কল চলিষ্ণু হয় এবং ব্রিটেন পণ্যশিল্পের ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত মেজর বামনদাস বহুর ‘রুইন্ অব ইণ্ডিয়ান ট্রেড এণ্ড ইম্প্রাইজ’ বহিতে আছে।

ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটেনের লাভের আর একটা মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। বহুপরিমাণে ভারতবর্ষের ও ভারতবর্ষ হইতে লব্ধ জনবল ও অর্থবলের সাহায্যে ব্রিটেন বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। এই সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তাহার ভারতের প্রভু থাকা দরকার। এই কারণে ব্রিটেন হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথটা নিরাপদ রাখা আবশ্যক, আবার পূর্বদিক হইতে সমুদ্রপথে কেহ ভারত আক্রমণ না করে, তাহাও দেখা দরকাব। ভূমধ্য-সাগরে এখন ব্রিটেনের প্রভাব কমিয়াছে, ইটালীর বাড়িয়াছে। কাজেই জলপথে ভারতবর্ষ আসিবার উপায় ছাড়া অন্য উপায়ও ব্রিটেনকে স্থির করিতে হইতেছে। সেই জন্য নানা স্থানে বিমানঘাটির জায়গার কোন-না-কোন প্রকারে অধিকারী হইতে হইতেছে। পূর্বদিক হইতে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ আক্রমণ নিবারণের জন্য সিঙ্গাপুরে রণতরীর বৃহৎ পোতাশ্রয় নির্মিত হইয়াছে।

মিঃ বেভান বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে নানা জাতি (“রেস”) নানা ধর্মমত (“ক্রীড”) ও নানা জাত (“কাস্ট”) থাকায় ও তাহাদের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা থাকায় ব্রিটেনকে ভারতবর্ষে থাকিতে হইতেছে। ইহার অর্থ এই, যে, বিরোধ ঘটিলে তাহা দমন করা ও ধামান, এবং বিরোধের ও বিবোধের কারণের উচ্ছেদসাধন ব্রিটেনের উদ্দেশ্য। দাঙ্গা মারামারি হইলে লাঠি চালাইয়া এবং শেষ পর্যন্ত গুলি চালাইয়া তাহা থামাইবার চেষ্টা কবা হয়, ইহা সত্য। তাহাব পর কতকগুলি লোককে ধরিয়া আদালতে তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার শুনানির পর অনেকের শাস্তি দেওয়া হয়, ইহাও সত্য। লাঠি ও গুলি চালান এবং মোকদ্দমা চালান সাধারণতঃ নিরপেক্ষভাবে হয় কিনা, সে বিষয়ে আলোচনা না করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গে কেবল ইহাই বিবেচ্য, যে, এই সকল উপায় দ্বারা বিরোধের ও বিরোধের কারণসমূহের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে বা হইতেছে কি? হয় নাই, হইতেছে না। কোন দেশে যদি খুব ম্যালেরিয়া জ্বর হয়, তাহা হইলে অনেক

ডাক্তার ও প্রচুর পরিমাণে ঔষধ রাখিলেই যথেষ্ট ব্যবস্থা কবা হইয়াছে বলা যায় না। ম্যালেরিয়া জ্বরটা যাহাতে না হয়, ম্যালেরিয়াব বিষটাই যাহাতে নষ্ট হয়, তাহা আর জন্মিতে না পাবে, এরূপ ব্যবস্থাও করা আবশ্যক। সেইরূপ সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত বিরোধ ও দাঙ্গা মারামারি হয় বলিয়া যথেষ্ট পুলিশ ও সৈন্ত ও তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং ধৃত লোকদের বিচার ও শাস্তির জন্য যথেষ্ট বিচারক ও কারাগার রাখিলেই যথোচিত ব্যবস্থা হইয়াছে বলা যায় না। এরূপ আইন ও সরকারী অস্ত্রবিধ ব্যবস্থা থাকা দরকার যাহাতে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যাঘেব না বাড়িয়া কমে ও লোপ পায়। এরূপ কোন আইন ও অস্ত্রবিধ সরকারী ব্যবস্থা আছে কি? যাহাতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে ঈর্ষ্যাঘেব বাড়ে, এরূপ আইন ও সরকারী অস্ত্র ব্যবস্থা কোন মতেই হওয়া উচিত নয়। কিন্তু নুতন ভারতশাসন আইনে সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত ঈর্ষ্যাঘেব ও অস্ত্র অবাধনীয় মনোভাব নাড়িয়াছে। যোগ্যতা কম বা বেশী যাহাই হউক, প্রদেশ-ভেদে কোন কোন সম্প্রদায় সংখ্যায় বেশী বা কম যাহাই হউক বিবেচনা না করিয়া, সর্বত্র কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকদিগকে নির্দিষ্ট কতকগুলি চাকরি দিতেই হইবে, এরূপ সরকারী নিয়মেও ঈর্ষ্যাঘেব বাড়িয়া চলিয়াছে।

কোন ধর্মসম্প্রদায় তাহাদের কোন ধর্মগ্রন্থান করিতে পারিবে বা না-পারিবে, তাহা নির্ধারণ করিবাব সময় নিষেধ ও অধিকারসঙ্কোচ একই মানদণ্ড অনুসারে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই প্রযুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায়, যে, নিষেধ ও অধিকারসঙ্কোচ হিন্দুদের ভাগ্যেই সর্বত্র বা অধিকাংশ স্থলে ঘটিয়া থাকে। ইহাও দেশের মধ্যে মানসিক-তত্ত্বতা ও ঈর্ষ্যাঘেব বৃদ্ধির একটা কারণ।

ঈর্ষ্যাঘেব বাড়িবার অন্য কারণও থাকিতে পারে। আমরা যে আইন ও নিয়মগুলিকে ঈর্ষ্যাঘেব বৃদ্ধিকারণ বলিয়াছি, ইংরেজদের মতে যদি সেগুলি কারণ না হয়, তাহা হইলেও ঈর্ষ্যাঘেব, ঝগড়া বিবাদ এবং দাঙ্গা মারামারি যে বাড়িয়াছে, তাহা সরকার পক্ষের খুব উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষের দ্বারাও স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারত-গবর্নমেন্টের স্বাস্থ্যসচিব সর্ হেনরী ক্রেক কিছুদিন পূর্বে বলেন, যে, গত পঁচিশ বৎসরে

সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ মনোমালিন্য প্রভৃতি ষেরূপ ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। ভাবভীষদের দ্বারা অহুমিত বা নির্দিষ্ট কারণগুলি যদি সত্য কারণ না হয়, তাহা হইলে সত্য কারণ কি? প্রতিকারই বা কি? ইংরেজ জাতি ব্যাধি নির্ণয়ে ও তাহার চিকিৎসার কি চেষ্টা করিয়াছেন বা কবিত্তেছেন? তাঁহারা বলিতেছেন, ব্যাধিটা আছে বলিয়াই তাঁহারা ভারতবর্ষে আছেন। ব্যাধিটা চিরকাল থাকিবে, এবং হয়ত বাড়িয়া চলিবে এবং তাঁহারাও চিরকাল প্রভু হইয়া থাকিবেন, ইহা বাস্তবীয় হইতে পারে না—অন্ততঃ আমরা আমাদের দিক্ হইতে ইহা বাস্তবীয় মনে করি না। আমরা মনে করি, তাঁহারা যদি বাস্তবিক আমাদের ব্যাধির জন্যই এদেশে আছেন মানিয়া লইতে হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে, যে, তাঁহারা ব্যাধির মূল উচ্ছেদ করিতেছেন এবং সেই সাধু চেষ্টায় অন্ততঃ সামান্য পরিমাণেও কৃতকার্য হইয়াছেন।

মিঃ বেভান কি ইহা দেখাইতে পারেন? অন্য কোনও ইংরেজ দেখাইতে পারেন কি?

আমাদের কথা এই, যে, আমাদের ব্যাধির মত ব্যাধি অন্য অনেক দেশে ছিল, এখনও কোন কোন দেশে আছে। যেখানে যেখানে তাহার প্রতিকার ও উচ্ছেদ হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা সেই সেই দেশের স্বাধীন অধিবাসী-দিগের চেষ্টা দ্বারাই হইয়াছে ও হইতেছে, বাহির হইতে আগত এবং ব্যাধিটা হইতে লাভবান কোন প্রভুজাতি দ্বারা তাহা হয় নাই, হইতে পারে না।

মিঃ বেভান বলিয়াছেন, ইংরেজরা ইরাকের অভিজাবক্স ছাড়িয়া আসিবাব পর তথাকার বিস্তর আসীরীয় (সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দ্বারা) নিহত হইয়াছে। তিনি যাহা বলেন নাই, তাহা আমরা যোগ করিয়া দিতেছি। যথা—সমুদয় আসীরীকে অন্ত কোন দেশে চালান করিয়া দিবার চেষ্টা হইয়া আসিতেছে, নতুবা তাহাবা সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা নিমূল হইতে পারে।

মিঃ বেভানের উক্তির মধ্যে এই ইঙ্গিত আছে, যে, ইংরেজরা ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেলে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা সংখ্যালঘুদিগকে নিমূল বা অন্ত কোন দেশে চালান করিবে। জাতীয় প্রকৃতি হঠাৎ পরিবর্তিত হয়

না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতী প্রকৃতির কি এরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, যে, এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠেরা সংখ্যালঘুদিগকে নিমূল বা বিদেশে চালান করিয়াছে বা করিবার চেষ্টা করিয়াছে? বরং ইতিহাস কি ইহাই বলে না, যে, ধর্মবিষয়ক ঔদার্য ও নানামতসহিষ্ণুতার প্রাচীনতম প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষেই পাওয়া যায়, এবং স্বাধীন ভারতে খ্রীষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিন হইতে ইহুদী, সারীষ, খ্রীষ্টান, পারসীক প্রভৃতি বিদেশি জাতিরা আতিথ্য ও আশ্রয় পাইয়াছে?

—

পুনর মারুতি মন্দিরে সত্যাপ্রহ

পুনর মারুতি মন্দিরে হিন্দুরা ঘণ্টা বাজাইয়া পূজা করেন। মারুতি মন্দির হইতে কিছু দূরে মুসলমানদের একটি মসজিদ আছে। সেই কাবশে মুসলমানেরা হিন্দুদের এই ঘণ্টা বাজাইয়া পূজায় আপত্তি করে। অনেক জায়গায় মুসলমানেরা হিন্দুদের মন্দিরে, এমন কি হিন্দুদের নিজেদের বাড়িতেও, শাখ বাজানতেও আপত্তি করে। কিন্তু মুসলমানদের মহরম পর্বের সময় ঢাক বাজানতে হিন্দুবা আপত্তি করে বলিয়া শুনি নাই, কোথাও করিয়াছে বলিয়া মনে পড়িতেছে না—কবিত্তা থাকিলেও সচরাচর করে না। খ্রীষ্টানদের গীর্জার কাছে মসজিদ থাকিলে গীর্জার ঘণ্টাধ্বনিতে মুসলমানরা আপত্তি করে বলিয়া শুনি নাই। রেলগাড়ীর উচ্চ ও তীক্ষ্ণ সিট্টিং, মোটর গাড়ীর শব্দ, ট্রাম গাড়ীর কর্কশ আওয়াজ বিশেষই অদূরবর্তী মসজিদ হইতে শুনা যায়। কিন্তু এই সমস্ত ধ্বনিতে মুসলমানেরা আপত্তি করে না। আপত্তি কেবল হিন্দুদের ঘণ্টাধ্বনি ও শব্দধ্বনিতে।

কোন দেশে নানা ধর্মসম্প্রদায়ের লোক বাস করিলে সকল সম্প্রদায়েরই ধর্মাহুতান করিনার অধিকার সমভাবে রক্ষিত হওয়া উচিত। কোন অহুতান স্নানীতিবিরুদ্ধ বা সর্বসাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক হইলে তাহা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। ঘণ্টা ও শব্দের শব্দ তাহা নহে। অবশ্য তাহা কাহারও কাহারও অপ্রীতিকর হইতে পারে। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক কানের দ্বারা বিচার করিলে তাহা মহরমের ঢাক, গীর্জার ঘণ্টা, রেলগাড়ীর সিটি বা মোটর গাড়ীর শব্দে

অপ্রীতিকর নহে। মুসলমানদের মতে শাঁখ ও কটোর তাঁহাদের উপাসনায় ব্যাঘাত জন্মে। একপ প্রশ্ন হইতে পারে, যে, উপরিলিখিত অস্ত্র শস্ত্রগুলি দ্বারা তাহা কেন হয় না, বা হইলে তাহাতে কেন আপত্তি হয় না। মুসলমানদের পক্ষ হইতে এই যুক্তিও প্রযুক্ত হইতে পারে, যে, শাঁখ ও ঘণ্টা পৌত্তলিকদের পূজায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া অপৌত্তলিক ধার্মিক মুসলমানদের নমাজে তাহাতে ব্যাঘাত হয়। পৌত্তলিক কে বটে, কে নয়, তাহার বিচার রাষ্ট্র করিতে পারে না। রাষ্ট্র অসাম্প্রদায়িক, রাষ্ট্রের কাছে সব ধর্ম সমান। তা ছাড়া এ তর্কও উঠিতে পারে, যে, যে-কেহ বিশেষ কোন প্রাকৃতিক বা মনুষ্যানির্ধৃত জড় বস্তুকে বেরূপ পবিত্র মনে করে, অস্ত্র-সব জড় বস্তুকে সেরূপ পবিত্র মনে করে না, সে-ই কতকটা পৌত্তলিক। কিন্তু এ রকম তর্কের অল্পসরণ আমরা করিব না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, সব ধর্মসম্প্রদায় ও তাহাদের বিভিন্ন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে ঈশ্বরের যে নিরপেক্ষতা, যে ঔদার্য্য, যে তিতিক্ষা আমরা অমুমান করি, সকল সম্প্রদায়ের ঈশ্বরোপাসকের তাহা অর্জন করিবার চেষ্টা করা উচিত। কোন যুক্তি দ্বারাই প্রমাণ করা যায় না, যে, মসজিদে ঢাকের আওয়াজ পবিত্র আর হিন্দুর মন্দিরের ঘণ্টা ও শাঁখের ধ্বনি অপবিত্র। ইহা প্রমাণ করা আরও কঠিন, যে, নীলামকারীর কটোর আওয়াজ পবিত্র বা অপবিত্র কিছুই নয়, কিন্তু সেই ঘণ্টা বা সেইরূপ ঘণ্টা হিন্দু পূজাতে ব্যবহৃত হইলেই তাহা অপবিত্র ও আপত্তিজনক হইয়া উঠে।

পুনায় হিন্দুদের পূজায় ব্যাঘাত জন্মাইয়া তথাকার ম্যাজিস্ট্রেট অত্যন্ত অস্ত্রায় কাজ করিয়াছেন। তথাকার পুলিশ যে পূজার জন্ত মার্কতি মন্দিরে গমনোন্মুখ হিন্দুদিগকে লাঠি মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ বর্করোচিত কাজ। এই হিন্দুরা কাহারও অনিষ্ট করিতে যাইতেছিল না, শান্তিপূর্ণ ভাবে পূজা করিতে যাইতেছিল। তাহাদিগকে প্রহার করা কাপুরুষতা। তথাকার পুলিশ বলিতে পারে, তাহার ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম লঙ্ঘন করিতে যাইতেছিল। এই হুকুমটাই যদিও ভ্রান্তবিরুদ্ধ, তথাপি তাহা আইনসম্মত বলিয়া মানিয়া লইলেও, পুলিশে লাঠি চালান কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। পুলিশ পূজার্থীদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিত। তাহা হইলে তাহাদের বিচার হইত এবং শেষ

পর্যন্ত জানা যাইতে পারিত ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম ভারতবর্ষের ইংরেজরূপ আইন অনুসারেও ভ্রান্ত হইয়াছিল কি না। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সম্পূর্ণ অহিংস ও শান্ত হাজার হাজার সত্যাগ্রহীকে পুলিশ প্রহার করিত। তাহা নিন্দনীয় হইলেও তাহার একটা কারণ এই ছিল, যে, জেলে আর জামগ: কুলাইতেছিল না! পুনর কঠোর কি অমুমান বা আশঙ্কা করিতেছেন, যে, পুলিশ লাঠি না চালাইয়া গ্রেপ্তার করিলে জেলে মার্কতিমন্দির সত্যাগ্রহীদের জন্ত জামগার অভাব হইবে?

কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের কোন ধর্ম্মাঙ্গাঙ্গী শাস্ত্র ও মনীতি-সম্মত ভাবে করিলে অস্ত্র যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা শান্তি-ভঙ্গ করিবে বলিয়া আশঙ্কা সরকারী কর্মচারীদের হয়, সেই শান্তিভঙ্গকর-মনোবৃত্তি-বিশিষ্ট সম্প্রদায়কেই নিবৃত্ত করা ও রাখা গবর্নমেন্টের উচিত। কোন নগরের, জেলার, প্রদেশের বা দেশের রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের বা কর্তৃপক্ষের শান্তিভঙ্গোন্মুখদের প্রশ্রয়দাতা ও শাস্তিহীনের “দমনকর্তা” হওয়া শুধু যে উচিত নয়, তাহা নহে, তাহা হওয়াতে বিপদ আছে। কারণ, অশান্তদের দৃষ্টান্ত হইতে শান্তরাও কালক্রমে অশান্ত হইয়া উঠিতে পারে। তাহা বাস্তবীয় নহে।

আমরা উপরের কথাগুলি লিখিবাব পূর্ব আশ্র ২৮শে ১ বৈশাখের দৈনিকে দেখিতেছি, পুনায় প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও জননায়ক নরসিং চিন্তামন কেলকর মহাশয় মার্কতি মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি সহকারে পূজা করায় পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহাব পূর্বে আরও অনেক প্রসিদ্ধ ও নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি ঐ কারণে ধৃত হইয়াছেন। কেলকর মহাশয় লোকমাগ্ন্য বালগদাধর টিলকের প্রধান সহকারী ছিলেন। তিনি ৭০ বৎসরের অধিকবয়স্ক এবং সম্প্রতি সার্কজনিক কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছেন। কিন্তু পুনায় হিন্দুদের উপর নিষেধাজ্ঞাটা অত্যন্ত অস্ত্রায় ও অপমানকর বোধ হওয়ায় এই কাজ কাহাকেও না জানাইয়া করিয়াছেন। না জানাইয়া করিবার কারণ, জানাইলে বিশাল জনতা মন্দির-পথে তাঁহার অনুগামী হইত ও পুলিশ হয়ত লাঠি চালাইয়া জনতা ভাঙিয়া দিত।

কেলকর মহাশয় কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন নাই।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্মেলন

গত মাসে বঙ্গের কয়েকটি জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহের শিক্ষকদিগের সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি দেশের শিক্ষাসৌখ্যের ভিত্তিভূত। এই বিদ্যালয়গুলিকে আদর্শায়িত করিতে হইলে তৎসমুদয়ে শিক্ষণীয় বিষয়-সমূহ এবং শিক্ষাপদ্ধতি ও প্রণালীর প্রতি যেমন মনোযোগ আবশ্যক, তাহাদের শিক্ষক মহাশয়দিগকে সঙ্কট ও কার্যক্ষম করাও সেইরূপ আবশ্যক। এই জন্য এই শিক্ষক সম্মেলন-গুলির গুরুত্ব শিক্ষাসম্বন্ধীয় অন্য সম্মেলনগুলির চেয়ে কম নয়। কয়েকটি জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্মেলনের বিবরণ দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে বুঝিতেছি, সব জেলার এই শিক্ষকদের কতকগুলি অভাব আকাঙ্ক্ষা এক, কতকগুলি মতও এক। আমি এইরূপ একটি সম্মেলনে সভাপতিরূপে উপস্থিত থাকায় জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে সমবেত শিক্ষকদের অভাব আকাঙ্ক্ষা ও মত অনেকটা অন্যান্য জেলার শিক্ষকদের সূত্রে। ইহার অধিবেশনে একটি সংবাদসংগ্রাহক এজেন্সীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন ও কিছু কিছু তথ্য টুকিয়া লইয়াছিলেন।

ভিক্টর সম্মেলনের সম্পাদক একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী দৈনিকে উহার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কোথাও কিছু বাহির হয় নাই। সেই জন্য এই সম্মেলনটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সম্পাদক মহাশয়ের প্রেরিত রিপোর্ট হইতে নীচে সংকলিত হইতেছে, সমগ্র রিপোর্টটি মাসিক কাগজে মুদ্রিত করা সম্ভবপর নহে।

গত ২রা বৈশাখ বিখ্যাতরতীর অক্ষয় প্রাতে স্থিত জিনিকেনে জীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বীবভূম জেলার বোলপুর চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে প্রায় ৮০ জন প্রতিনিধি, শান্তিনিকেতনের কয়েক জন অধ্যাপক জিনিকেনের কয়েক জন কর্মী, এবং নিকটস্থ গ্রাম ও বোলপুর হইতে অনেক দর্শক উগাতে উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশন হইয়াছিল একটি খোলা ভায়াগার কতকগুলি আমগাছে ছায়ায় নীচে। স্থানটি আলিপনা, পুষ্পমালা ও পতাকার দ্বারা ভূষিত হইয়াছিল। অধিবেশন প্রাতে সাড়ে সাতটায় সময় আরম্ভ হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতি অধ্যাপক ক্রিহিমোহন সেন অধ্যাপক নেপাচন্দ্র রায়, ও জীযুক্ত কালীমোহন বোধ বক্তৃতা করেন।

সাড়ে দশটার সময় প্রতিনিধিদিগকে জিনিকেনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ দেখান হয়, এবং কুটির ও গ্রামশিক্ষার উন্নতির জন্ত ও গ্রামের

স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতির জন্ত জিনিকেনে কি করিতেছেন বুঝিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে শিক্ষকদের মনে শে ভাল ধারণা জন্মিয়াছিল মনে হয়।

অপরাত্ন আড়াইটার সময় দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। তাহাতে সম্পাদক জীযুক্ত ভারকচন্দ্র ধব গুপ্ত তিন বৎসরের রিপোর্ট পাঠ করেন। আলোচনার পর কয়েকটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তাহা হইতে কয়েকটি নীচে উদ্ধৃত হইতেছে।

২। দেশের বর্তমান অবস্থায় শিক্ষার না বসাইয়া অচিরে অবৈতনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন কার্যে পরিণত করিবার জন্ত এই সভা সরকার বাহাদুরকে অনুরোধ জানাইতেছে।

যদি কব দিতেই হয় তবে যাগাতে প্রত্যেক ছেলেমেয়েই শিক্ষা পাইবার সমান সুবিধা পায় তাহা সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। এই সভা সরকার বাহাদুরের নিকট প্রস্তাব করিতেছে যে, নবপ্রবর্তিত জেলা শিক্ষাবোর্ডের সভ্যনির্বাচনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে ভোটাদিকার দেওয়া হউক।

৪। বাঙ্গালা সরকারের শিক্ষা-বিভাগের নূতন শিক্ষা সংস্কার পবিকল্পনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাসের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে এই সমিতি তাহার ভীত প্রতিবাদ জানাইতেছে।

এই সমিতির অভিমত এই যে, বর্তমান সংখ্যা ঠিক রাখিয়া প্রত্যেক মুনিয়েন একটি কবিতা আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হউক।

৫। এই সমিতি প্রস্তাব করিতেছে যে, বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নতি বিধানার্থ এবং পূর্ব প্রস্তাবিত আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনার্থ শিক্ষা-বিভাগের আর্থিক বজেটে যেন বর্ধিত পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ করা হয়।

৬। এই সমিতি প্রস্তাব করিতেছে যে প্রাইমারী পরীক্ষার্থীর শেষ পরীক্ষার জন্য সকল ছুসেই প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একই নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক গড়াইবার নিয়ম করা হউক।

৭। এই সভা প্রত্যেক ট্রেনিং-পাস শিক্ষককে পঁচিশ টাকা হইতে ক্রম-বৃদ্ধি অনুসারে পঁয়ত্রিশ টাকা বেতন দিতে এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নন ট্রেনিং শিক্ষকের বেতন ন্যূনতম পনের টাকা করিতে স্কুলবোর্ড কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে।

৮। এই সভার অভিমত এই যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী-সংখ্যা যত থাকিবে, শিক্ষকসংখ্যাও তত রাখা আবশ্যক।

৯। এই সম্মেলন সাধারণ বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দানের তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে।

অধ্যাপক শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ হইতে উচ্চ গণিতে বিশেষ জ্ঞানবান এক জন সুপণ্ডিত ব্যক্তির তিরোভাব হইল। তাহার সহিত আমার

পরিচয় দীর্ঘকালব্যাপী। আমি যখন এলাহাবাদে একটি কলেজে কাজ করিতাম, তাহার গোড়ার দিকে, বোধ হয় ১৯০০ সালের কিছু আগে, তিনি তখনও বিবাহ করেন নাই, তিনি এলাহাবাদ গিয়াছিলেন এবং তাঁহার ও আমার বন্ধু গণিতাধ্যাপক উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাসায় ছিলেন। তখন তাঁহার ফোটোগ্রাফীর সখ খুব বেশী ছিল। বরাবরই তাঁহার একটা-না-একটা সখ ছিল ও তিনি কিঞ্চিৎ খেয়ালী ছিলেন। তখন অনেক দৃষ্টের ও অনেক মাহুকের ছবি তিনি তুলিতেন। পরে তাঁহার সখ হয় গোলাপ বাগানে ও গোলাপ ফুলের চাষে। আমাকে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, মিহিঙ্গামে তাঁহার গোলাপ বাগানে যত রকম গোলাপ আছে, ওঅঙ্কলে বা অল্পজ কোন বাগানে তাহা অপেক্ষা বেশী ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গোলাপ নাই। তিনি নিজের ঢাক বাজাইতে অভ্যস্ত ও নিপুণ ছিলেন না বলিয়া এবং তিনি যে বিদ্যার যে উচ্চ অঙ্গের অহুশীলন করিয়া গবেষণা করিয়াছিলেন তাহা শিক্ষিত সাধারণেরও সহজবোধ্য ছিল না বলিয়া তাঁহার খ্যাতির ব্যাপ্তি তাঁহার বিদ্যাবস্তার অমুরূপ হয় নাই। তিনি কেবল গণিতজ্ঞ ছিলেন না, ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনের অধ্যাপকতাও করিয়াছিলেন। তিনি স্বগ্রন্থ ছিলেন। তাঁহা অপেক্ষা কম আয়ের লোকও আজকাল নিজে বাজার করে না, কিন্তু স্ব স্ব অবস্থায় তিনি প্রত্যহ বাজার হইতে তরকারী কিনিয়া আনিতেন। তিনি অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন।

ডাক্তার হরেশচন্দ্র রায়

ইদানিং ভারত ইন্সটিটিউট কোম্পানীর কলিকাতা আপিসের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর ও তাহার পূর্বে নিউ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতা আপিসের জীবনবীমা-বিভাগের ম্যানেজার ডাঃ হরেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে বীমার কার্যে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং সাধারণতঃ ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ে বিচক্ষণ এক জন উদ্যোগী পুরুষকে বাংলা দেশ হারাইল। তিনি নিজের চেষ্টায় সমাজে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তিনি কংগ্রেসওয়াল ছিলেন। কলিকাতার ভারতীয় সাংবাদিক সভার তিনি একজন সহকারী সভাপতি ছিলেন। জীবনবীমার কাজ শিখাইবার

জন্ত তিনি উক্ত বিষয়ে একটি শিক্ষালয় খুলিয়াছিলেন। জীবনবীমা ও অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক একখানি ইংরেজী ও একখানি বাংলা কাগজ তিনিই চালাইতেন। ভারত ইন্সটিটিউট কোম্পানীর কাজ লইবার পূর্বে তিনি “ভারত ম্যাগাজিন” নাম দিয়া একটি মাসিক প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার নিজের জীবন-চরিত ও সমসাময়িক ঘটনা-সমূহেব ইতিহাসবিষয়ে তিনি একটি ইংরেজী বহিঃ লেখক ও প্রকাশক। তিনি দীর্ঘকাল দিল্লী ও মীরাটে ছিলেন, এবং প্রবাসী বাঙালীদের সহিত তাঁহার গভীর সহানুভূতি ছিল। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের গোরখপুর অধিবেশনে তিনিই সম্মেলনকে কলিকাতায় আহ্বান করেন, এবং ইহার কলিকাতার অধিবেশনের সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগিতা ও পরিশ্রমে হইয়াছিল। তিনি সঙ্কল্প ও পবোপকারী ছিলেন। কেহ তাঁহার সাহায্য-প্রার্থী হইলে তিনি যথাসাধ্য তাহার উপকার করিতেন।

বাংলা বানান

বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মূল্যবান ও অবশ্যপাঠ্য “রবীন্দ্র-জীবনী”র কিছু পরিচয় দান উপলক্ষে ঐ পুস্তকের কিছু দোষত্রুটি উল্লিখিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে ‘সর্ব’, ‘পূর্ব’, ‘কর্তৃক’ ইত্যাদি শব্দের বানানে রেকর্ডের নিম্নস্থিত ব্যঞ্জনের দ্বিধ লোপের বিরুদ্ধে কিছু লেখা হইয়াছিল। যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার আছে। ইহা সত্য, যে, আমরা ‘সর্ব’ বলি না, বলি, ‘সর্ব্ব’, স্বতরাং বানান উচ্চারণের অসুযোগী করিতে হইলে, ‘সর্ব’ লেখাই উচিত। কিন্তু আমরা লিখি ‘তর্ক’, কিন্তু উচ্চারণ করি ‘তব্ব্ব’ ‘তব্ব্ব’ বলি না; লিখি ‘স্বর্গ’, কিন্তু বলি ‘স্বব্ব’; ইত্যাদি। অতএব আমাদের বানানে ও উচ্চারণে সকল স্থলে সঙ্গতি নাই দেখা যাইতেছে। তাহা হইলে, আমাদের বোধ হয়, কেবল সেই সব স্থলেই রেকর্ডের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিধ বাখা ভাল যেখানে ব্যুৎপত্তি বুঝাইবার জন্য তাহা আবশ্যক। অন্য সব স্থলে রেকর্ডের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিধ পরিহার করা ভাল—উচ্চারণ যাহাই হউক।

‘বানান’ কথাটি কেহ কেহ লেখেন ‘বাণান’। তাহার

কারণ বোধ হয় তাঁহাদের মতে শব্দটি 'বর্ণন' শব্দ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু উহা কি প্রস্তুত করা, রচনা করা, তৈরি করা যে-‘বানানো’ শব্দটির অর্থ, তাহারই রূপান্তর হইতে পারে না? ইংরেজীতে যেমন word-building শব্দের প্রয়োগ আছে, তেমনি আমবাও মনে কবিতে পারি, ‘বানান’ দ্বারা আমরা দেখাই, কি কি বর্ণের বা অক্ষরের সহযোগে এক একটি শব্দ ‘বানানো’ বা তৈরি করা বা রচনা করা হইয়াছে।

পার্টিকলের ধর্মঘটের অবসান

বঙ্গের সবদার মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সাহেব গবর্নমেন্টেব পক্ষ হইতে কতকগুলি প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় শ্রমিক নেতারা পার্টিকল শ্রমিকদিগকে কাজে যোগ দিতে উপদেশ দিয়াছেন। ধর্মঘটের অবসান হইয়াছে। কিন্তু (২৮শে বৈশাখের দৈনিক কাগজে প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে) এখনও সব কলে সকল শ্রমিক কাজে যোগ দেয় নাই। আশা করা যায়, ফজলুল হক সাহেবের প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইলে সকলেই যোগ দিবে।

ভাবতবর্ষে শ্রমিকদের পক্ষে ধর্মঘট করা পাশ্চাত্য দেশসমূহের শ্রমিকদের ধর্মঘটের চেয়ে গুরুতর ব্যাপার। পাশ্চাত্য দেশসমূহে শ্রমিকসংঘগুলি সুশৃঙ্খল ও সুপরিচালিত। তথাকার সংঘগুলির অর্থবলও আছে। কারণ তথাকার শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা এখানকার চেয়ে ভাল বলিয়া তাহারা সংঘে নিয়মিত ভাবে যথেষ্ট টাকা দিতে পারে। তাহাদের নিজেদেরও কিছু সঞ্চয় থাকে। এই সব কারণে, ধর্মঘটের সময় পাশ্চাত্য শ্রমিকরা কতকটা নিজেদের পুঁজির উপর নির্ভর করিতে পারে এবং সংঘের কাছেও সাহায্য পায়। তথাকার জনসাধারণও অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থা প্রযুক্ত সাহায্য করিতে পারে। তথায় জাতিভেদ কম থাকায়, এবং গণতান্ত্রিকতা ও সর্বসাধারণের মধ্যে পরস্পর সহায়ত্বভূতি ও সহবন্ধতা অধিক থাকায়, পাশ্চাত্য লোকেরা ধর্মঘটদিগকে সাহায্য দানে অধিকতর তৎপর বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষে অবস্থা অন্য রূপ। এই জন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া ধর্মঘট চালান এ দেশে কঠিনতম। এই সমস্ত বিষয় বা অবস্থা বিবেচনা করিলে, চট কলের ধর্মঘট কংগ্রেসওয়াল

ও কমুনিষ্টরা ঘটাইয়াছে, বস্তুতঃ শ্রমিকদের কোন অভাব অভিযোগ নাই, ধনিক ও সবকার পক্ষের এই উক্তি সত্য বলিয়া মনে হয় না। কংগ্রেসওয়াল ও কমুনিষ্টদের প্রভাব যদি বাস্তবিক এত বেশী হয়, যে, কেবল তাহাদের পরামর্শ ও প্রবোচনাতেই দু-লাখের উপর অভাব-আভিযোগশূন্য সুপুষ্ট সুখী শ্রমিক ধর্মঘট কবিতে পারে, তাহা হইলে তাহাও গবর্নমেন্টের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। কমুনিষ্টদের পক্ষে তাহা নাগাইয়া ও তাহাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকাব মোকদ্দমা রুজু করিয়াই তাহাব প্রতিকার হইবে না।

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ও মৌলবী

ফজলুল হক

মৌলবী ফজলুল হক তাঁহার সঞ্চকে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর দুটি উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, সে দুটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। পণ্ডিতজী যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা সংবাদ-পত্রপাঠকেরা অবগত আছেন।

স্বাভিমান বিবাসযোগ্যতা ও সত্যনিষ্ঠা সঞ্চকে পণ্ডিতজীর ও মৌলবী সাহেবের মত থাকিলে তাঁহর পক্ষে ভাল হইত। তাঁহার মনে থাকিতে পারে, গবর্নমেন্ট পঞ্চম পাণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধে বাহ্যিক রিপোর্টে একটা কথা লিখিয়া পরে তাহা প্রত্যাহার করিতে ও তজ্জন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

চটকল শ্রমিকদের প্রকৃত অভিযোগ কিছু আছে মৌলবী সাহেব পণ্ডিতজীকে ইহা বলিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমে স্বীকার করেন। কিন্তু পরে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, যে, তাহাদের কোন কোন বিষয়ে দুঃখ বাস্তবিক আছে। এখন তাহার প্রতিকার হইলেই মঙ্গল।

জাতীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

কোন দেশে জাতীয় স্বাধীনতা থাকিলেই যে তথাকার মানুষদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকিবেই, এমন বলা যায় না। রুশিয়ায়, জার্মেনীতে ও ইটালীতে জাতীয় স্বাধীনতা আছে। ঐ দেশগুলি অল্প কোন দেশের অধীন নহে। কিন্তু ঐ দেশগুলির মানুষদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কম। ব্রিটেনে

জাতীয় স্বাধীনতা আছে, ইংরেজদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও বোধ হয় অল্প যে-কোন দেশের লোকদের সমান—হয়ত বা অল্প যে-কোন দেশের লোকদের চেয়ে বেশী। তথাপি ব্রিটেনেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ আছে। সেই সংঘ ইংরেজদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের ও গবর্নমেন্ট কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ বা আক্রমণ নিবারণের চেষ্টা করে।

পরাজিত ভারতবর্ষে জাতীয় স্বাধীনতা নাই, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সাত্তিশ সীমাবদ্ধ। বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে উহা সাত্তিশ সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। এই জন্ত বঙ্গীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ বিচারাস্ত্রে রাজনৈতিক বন্দীদের ও বিনাবিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত বন্দীদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিতেছেন। কাহারও দুঃখ মোচন করিতে হইলে প্রথমে তাহা জানা ও পরে তাহা সর্বসাধারণের গোচর করা আবশ্যক। বঙ্গীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ এই কাজ করিতেছেন। রাজবন্দীদের পরিবারবর্গেরও বহু দুঃখ আছে। তাহাও সংঘ জানিতেছেন ও জানাইতেছেন।

যদি বিচারাস্ত্রে ও বিনাবিচারে রাজনৈতিক কারণে বন্দীকৃত লোকেরা মনুষ্যোচিত ব্যবহার পায়, এবং তাহাদের পরিবারবর্গও যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য পায়, তাহা হইলেই সংঘের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। বন্দীকৃত লোকদের মুক্তি সংঘ চান। কিন্তু রাজবন্দীদের মুক্তিই সংঘের চরম লক্ষ্য নহে। যে-সব রেগুলেশন, আইন ও অর্ডিন্যান্সের জোবে গবর্নমেন্ট মানুষকে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত বন্দী করিয়া রাখিতে পারেন, সেই সকল ব্যবস্থা রদ হওয়া চাই। দণ্ডবিধিতে সিডিশন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সকল ধারা আছে এবং আদালতের বিচারে সেইগুলির কার্যতঃ প্রয়োগ ঘেঁরুপ হয়, তাহাব পবিত্ত করিয়া তাহা আধুনিক সভ্য সমাজের দণ্ডনীতিবিদদিগের অমুমোদিত বিধির ও তাহার প্রয়োগের অল্পরূপ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বঙ্গে—মানুষের মত মৌখিক প্রকাশের অধিকার, বৈধ কার্ধ্যের ও আলোচনার জন্ত প্রকাশ সভায় সমবেত হইবার অধিকার, পুস্তক ও সংবাদ-পত্রাদিতে মত প্রকাশের অধিকার কম। কেহ মুদ্রাধ্বস্ত স্থাপন বা সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে চাহিলে গবর্নমেন্ট

জমানৎ চাহিতে ও লইতে এবং পরে তাহা বিনাবিচারে বজ্রোপান্ত করিতে পারেন। যে মুদ্রাকর বা সম্পাদকের নিকট হইতে জমানৎ লওয়া হইয়াছে, বিনা বিচারে তাহা বাড়াইবার এবং যাহার নিকট জমানৎ লওয়া হয় নাই, তাহার নিকট বিনা বিচারে জমানৎ লইবার ক্ষমতাও গবর্নমেন্টের আছে। এই সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের অবস্থা ইংলণ্ডের মত হওয়া উচিত।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘের কার্য ইহা অপেক্ষাও বহুদূরপ্রসারী। শুধু কতকগুলি রেগুলেশন, আইন ও অর্ডিন্যান্স রদ এবং কোন কোন আইনের কোন কোন ধারা পরিবর্তিত হইলেই সংঘ সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। গবর্নমেন্ট ঘেঁরুপ অগণতান্ত্রিক ক্ষমতার বলে ঐরূপ সকল ব্যবস্থা করিতে পবিয়াছেন, সেধুপ ক্ষমতাই গবর্নমেন্টের থাকা অবাস্থনীয়। অতএব গবর্নমেন্টকে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক করিতে হইবে, জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে।

আমরা আগেই বলিয়াছি, কোন দেশে জাতীয় স্বাধীনতা থাকিলেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা না থাকিতে পারে, এবং তাহার দৃষ্টান্তও দিয়াছি। ইহাও বলিয়াছি, ব্রিটেনে পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা এবং পৃথিবীর মধ্যে অধিকতম ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকিলেও, সেখানেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ আছে।

অতএব, এখন ত বঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘের প্রয়োজন আছেই, দেশ যখন গণতান্ত্রিক জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিবে, তখনও ইহাব প্রয়োজন থাকিতে পারে।

সকলে ইহাব কার্ধ্যের মহত্ব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহাব সহায় হউন এবং ইহাকে স্থায়ী দৃঢ় ভিত্তি উপর স্থাপিত করুন।

[বঙ্গীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘের পুস্তিকার জন্য লিখিত]

প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় বাঙালী

কয়েক বৎসর হইতে এইরূপ শুনা যাইতেছে এবং ইহা অনেকটা সত্য, যে, সরকারী নানা বিভাগের চাকরিতে কর্মচারী নিয়োগেব জন্য সমগ্রভারতবাসী এবং ভারতবর্ষ ও ব্রিটেন ব্যাপী যে-যে সরকারী পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে বাঙালী ছেলেরা আর আগেকার মত কৃতিত্ব

দেখাইতে পাবিতেছে না। অন্য সব প্রদেশে শিক্ষার ক্রমবিকাশের বশত এবং বাঙালী যুবকদের চাকরিব প্রতি বিতৃষ্ণা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ বাড়িতেও কতকটা ঐক্য অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকিতে পারে। বঙ্গে প্রচলিত শিক্ষার ও পরীক্ষার কিছু কিছু দোষ আছে। বঙ্গে গবর্ণমেন্ট অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় শিক্ষার জন্য ব্যয় কম করেন। বাংলা দেশে দমন-নীতির প্রাদুর্ভাব এ পর্যন্ত কয়েক হাজার যুবক বন্দীকৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে বেশ মেধাবী যুবক অনেক ছিলেন ও আছেন। যে-সব বালক ও যুবক বন্দী হয় নাই, দমননীতির চাপ তাহাদের মনের উপর পড়িয়া তাহারা কুফল বহাইয়াছে। হজু-প্রিয়তা ও হজুকেব আধিক্যে, আরাম-প্রিয়তার আধিক্যে, সিনেমা ও নানাবিধ ক্রীড়ায় আসক্তিতে, বাঙ্গলৈতিক উত্তেজনার আধিক্যে, এবং বাঙালী বড় বুদ্ধিমান ও শিক্ষার অগ্রসর জাতি এই অহঙ্কারে বাঙালী যুবকদের খুব ক্ষতি হইয়াছে। তাহারা অনেকেই জ্ঞানলাভের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করে না।

প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় তাহাদের কৃতকাব্যতার আবেশিক হ্রাস এই সব কারণে ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু বাঙালীর বুদ্ধি কমিয়া যায় নাই। সরকারী হিসাবরক্ষা ও হিসাবপরীক্ষা বিভাগগুলির এবং বাণিজ্যগুরু-বিভাগের সমগ্রভারতবাসী পরীক্ষার নিম্নমুদ্রিত ফল হইতে তাহা অস্বীকার্য হইবে।

ALLAHABAD, April 24.

The results of the combined competitive examination for recruitment to the Indian Audit and Accounts Service, the Imperial Customs Service, the Military Accounts department and the Indian Railway Accounts Service, held in November last has been declared but the names of the candidates selected are not known definitely yet. The table of the results shows that the following obtained the first 20 positions, the names being given in order of merit:—

Akhil Chandra Bose (Rajputana), V. N. Sukul (U. P.), V. V. Vedanta Chari (Madras), Ramanath Krishnamurthy Ayyar (Travancore), Hari Das Dhir, Dharam Swaiup Naka, Kundan Lal Ghei, Som Parkash Nanda, and Tirbhawan Nath Dar of the Punjab, Alum Ali (U. P.), Birendra Nath Banerji and Sachindranath Das Gupta of Bengal, Nirmalendu Roy (Bihar), S. Altaf Husam (Punjab), L. K. Narayanswamy (Assam), H. Krishnamurthi Rao (Madras), Krishna Dayal Bhargava (Ajmer-Merwara), Madan Kishore (U. P.), Abani Mohan Kusari (Bengal) and Bhagwan Das Toshniwal (Ajmer-Merwara).

উপরের তালিকাটিতে দেখা যাইবে, যে, পরীক্ষায় প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে পাঁচ জন বাঙালী। রাজপুতানানিবাসী

এক জন বাঙালী প্রথম স্থান অধিষ্ঠার করিয়াছে। বঙ্গদেশ-নিবাসী তিন জন বাঙালী ও বিহারনিবাসী এক জন বাঙালী এই তালিকায় স্থান পাইয়াছে।

শুধু বাংলা দেশের বাঙালীদিগকেই কেহ যদি বাঙালী বলিয়া ধরেন, তাহা হইলেও সমগ্র ভারতের ৩৫ কোটির উপর লোকদের মধ্যে বঙ্গের পাঁচ কোটি লোকদের মধ্য হইতে তিন জন ঐ তালিকায় স্থান পাইয়াছে। লোক-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে ইহা মন্দ নয়। ৩৫ কোটির মধ্যে ২০ জন হইলে ৫ কোটির মধ্যে তিন জনের বেশী হয় না, কিছু কম হয়। যত লোক যে ভাষায় কথা বলে, সে দিক দিয়া বিচার করিলে দেশ যায়, পর্তুগীশ কোটি ভারতীয়ের মধ্যে পাঁচ কোটিব ত্রিছ বেশী লোক বাংলা বলে। এই পাঁচ কোটি বাংলাভাষীর মধ্য হইতে পাঁচ জন তালিকায় স্থান পাইয়াছে। সংখ্যার অনুপাতে ইহা ভাল। কারণ, পর্তুগীশ কোটির মধ্যে ২০ জন হইলে ৫ কোটির মধ্যে পাঁচ জন অনুপাত অনুসারে বেশী; তিন জন হইলেই যথেষ্ট হইত।

সমগ্র ভাষাতত্ত্বের মুসলমানদের সংখ্যা আট কোটির কিছু কম। তাহাদের মধ্যে দুই জন তালিকায় স্থান পাইয়াছে। বাঙালী হিন্দুর সংখ্যা আড়াই কোটির কম। তাহাদের মধ্যে পাঁচ জন তালিকায় স্থান পাইয়াছে। সাম্প্রদায়িক সংখ্যার অনুপাত দ্রষ্টে বাঙালী হিন্দুরা কম কৃতিত্ব দেখায় নাই।

সমগ্র ভারতের হিন্দুর সংখ্যা চব্বিশ কোটির কম, বাঙালী হিন্দুর সংখ্যা আড়াই কোটির কম। চব্বিশ কোটি লোকদের মধ্য হইতে আঠার জন তালিকায় স্থান পাইয়াছে। আড়াই কোটি তাহাব প্রায় একদশমাংশ। অতএব আঠার জনের মধ্যে দু-জন বাঙালী হিন্দু থাকিলেও নিতান্ত কম হইত না। কিন্তু আছে পাঁচ জন ইহা মন্দ নয়।

বাঙালী যুবকদের অহঙ্কার বড়াইবার উদ্দেশ্যে আমরা এই সব চুলচেরা হিসাব দিলাম ন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ও তাহাতে উচ্চ স্থান লাভ করা একটা খুব বড় জিনিষ নয়। কিন্তু তাহা তুচ্ছও নয়। ছোট বড় চাকরি পাওয়া বড় জিনিষ নয়, তুচ্ছও নয়। বাঙালী ছেলেরা কোন কারণে নিরুৎসাহ না হন, অবনাদগ্রস্ত ন হন বা না থাকেন, আমরা এই চাই।

ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা কি হওয়া উচিত, এই বিষয়ের আলোচনা নূতন নয়। কিন্তু প্রায়টির আলোচনা কলিকাতায় সম্প্রতি দু-তিনটি সভায় হইয়া গিয়াছে, খবরের কাগজেও হইয়াছে। অনেকেই বলিয়াছেন, বাংলারই সাধারণ ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। সাহিত্যের উৎকর্ষ, ভাষার সহজ-শিক্ষণীয়তা, ভাষার সর্ববিধ ভাব, চিন্তা ও তথ্য প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, বর্ণমালার উৎকর্ষ, এবং বহুলোকের দ্বারা ব্যবহার—এই সমস্ত গুণ একসঙ্গে বিবেচনা করিলে বাংলার সাধারণ ও রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী ভারতবর্ষীয় অন্য কোন ভাষার দাবী অপেক্ষা কম নহে। কিন্তু ঠাহারা হিন্দী-উর্দু'র পক্ষপাতী, তাঁহারা এই গুণটির উপরই বেশী জোব দিয়া থাকেন, যে, হিন্দী-উর্দু' অথবা হিন্দুস্থানী ভারতবর্ষে সকলের চেয়ে বেশী লোকের মাতৃভাষা ও সকলের চেয়ে বেশী লোকে বুঝে। ইহা সভ্য কথা, যদিও হিন্দুস্থানীর সমর্থকেবা, উহা কত লোকের মাতৃভাষা ও কত লোকে উহা বুঝে, সে বিষয়ে অভ্যুজ্ঞিপূর্ণ ও মিথ্যা দাবী করিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানী ভারতবর্ষে সকলের চেয়ে বেশী লোকে বলে ও বুঝে, তাহার এই গুণটি ছাড়া আব সব বিষয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতায় আমরা বিশ্বাস করি।

হিন্দুস্থানীর যে রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত, তাহা কংগ্রেসই বেশী জোর করিয়া বলেন এবং কংগ্রেসনেতারা কংগ্রেসের অধিবেশনসমূহে, হিন্দুস্থানী যাহারা বলিতে পারে না, তাহাদের মুখ-খোলা হুসাখ্য করিয়া তুলিয়াছেন। কেহ ইংরেজীতে কিছু বলিতে চাহিলে তাঁহারা দয়া করিয়া তাঁহাকে অনুমতি দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বাংলায় কেহ কিছু বলিতে চাহিলে কি ঘটবে, কল্পনা করিতে পারি না। লীগ অব নেশনালের ভাষা ইংরেজী ও ফরাসী, কিন্তু যে-কেহ নিজেব মাতৃভাষায় সেখানে বক্তৃতা করিতে পারে। আমরা সেখানে জার্মান ভাষায় বক্তৃতা শুনিয়াছি।

বাংলার দাবী কংগ্রেস-নেতাদের কাছে কেহ উপস্থিত করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। করিলেও তাহাতে বাঙালী ছাড়া কেহ কর্পপাত করিতেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। অবাঙালী কংগ্রেস-নেতারা সাধারণতঃ বাংলা জ্ঞানেন না, সুতরাং উহার দাবী তাঁহাদের স্বয়ংক্রিয় হইবে না।

তত্ত্বিম, নানা কারণে বাংলা দেশ, বাঙালী, বাংলা ভাষা ইত্যাদি বঙ্গের বাহিরে লোকপ্রিয় নহে—যদিও বঙ্গ হইতে সংগৃহীত ধন সকলেরই প্রিয়। কেন এইরূপ হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাইবে না; সুতরাং সে চেষ্টা করিব না।

কয়েকটা কথা বাঙালীদিগকে জানান বা মনে পড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। হিন্দীর চেয়ে বাংলার সহিত বিহারের ভাষার সাদৃশ্য বেশী। বিহারের উপপ্রদেশ মিথিলার ভাষা বাংলাব আরও নিকট। মিথিলার ও বাংলার বর্ণমালা এক। অথচ বিহারের লোকেরা নিজেদের ভাষাকে হিন্দী বলেন, এবং বিহারে বাঙালীর প্রতি বিরূপতা খুব বেশী। বিহারীরা বেশী সংখ্যায় বাংলা বুঝেন। আসামের ও বাংলাব বর্ণমালা এক, আসামীয় বর্ণমালায় বেশীর মধ্যে আছে কেবল পেটকাটা ব। আসামের ও বাংলার ভাষার মধ্যে প্রভেদ কলিকাতার ও চট্টগ্রামের কথিত ভাষার প্রভেদের চেয়ে বেশী নয়। অথচ আসামীরা বাংলা ভালবাসে না, যদিও বুঝিতে পারে অনেকেই।

উড়িষ্যার ভাষা ও বাংলা ভাষার মধ্যে প্রভেদ কম। উড়িষ্যার বর্ণমালা পৃথক। কিন্তু বাংলা বর্ণমালায় উড়িষ্যার পুস্তক লিখিত হইলে, তাহা বাঙালীদের বুঝিতে কষ্ট হইবে না। শিক্ষিত উৎকলীয়েরা সাধারণতঃ বাংলা বুঝেন ও বলিতে পারেন। অশিক্ষিত অনেক উৎকলীয় সম্বন্ধেও এ কথা সত্য। অথচ উৎকলে বাঙালী বিরাগ-ভাজন।

বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে বাংলার জ্ঞান বিস্তার করা হিন্দীর জ্ঞান বিস্তার করা অপেক্ষা ভাষার দিক দিয়া সহজতর, কিন্তু লোকের বিরাগ দূর করা অত্যন্ত কঠিন। বিহারে ত হিন্দী বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আদালতে চলিয়াই গিয়াছে। উৎকলে ও আসামে লোকেরা বরং হিন্দী শিখিবে তবু বাংলা শিখিবে না। ইহার জন্য এই সকল প্রদেশের লোকদিগকে দোষ দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নহে।

বাঙালীদের মনে রাখা উচিত, যে, তাঁহারা বাঙালী ছাড়া অন্য লোকদিগকে নিজের ভাষা ও সাহিত্যের গুণগ্রাহী করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই।

আমরা নানা কারণে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য কোন আন্দোলন করি নাই। আমাদের ধারণা, একদম

আন্দোলন সকল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, অধিকন্তু একরূপ আন্দোলন করিলে বাংলার প্রতি বিরুদ্ধতা বাড়িবে। যেমন রাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদী আছে, তেমনি ভাষিক সাম্রাজ্যবাদী আছে। হিন্দুস্থানীর সমর্থকেরা সকলে ভাষিক সাম্রাজ্যবাদী না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ভাষিক সাম্রাজ্যবাদী। মিথিলায় যে মহামহোপাধ্যায় উক্ত গজানাথ ঝার মত ধীর ও শাস্ত মাতৃশ্রম বলিতেছেন, যে, হিন্দী তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, মৈথিলী তাঁহাদের মাতৃভাষা, এক তাঁহার মত সুপণ্ডিত লোকের নেতৃত্বে যে মৈথিলীকে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢালাইবার চেষ্টা হইতেছে, বহু হিন্দুস্থানী সমর্থকের ভাষিক সাম্রাজ্যবাদ তাহার পরোক্ষ কারণ বলিয়া মনে করি।

আমাদের ধারণা এই, যে, যদি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রস্তাব কংগ্রেসমহলে আমল পাইত, তাহা হইলেও হিন্দীকে স্বল্প মাত্রায় প্রেসিডেন্সীতেও লোকদের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত যে দলবদ্ধ সাগ্রহ ও সোৎসাহ চেষ্টা চলিতেছে ও যাহার ফলে ছয় লক্ষ মাত্রাজী ইতিমধ্যেই চলনসই হিন্দী শিখিয়াছে, বাঙালীদের পক্ষ হইতে সেরূপ কোন চেষ্টা হইত না। ইহা স্মরণে কথা নয়, গৌরবের কথা নয়, কিন্তু সত্য কথা।

হিন্দীকে যাহারা রাষ্ট্রভাষা করিতে চান, তাঁহারা অ-হিন্দীভাষীদিগকে হিন্দী শিখাইবার জন্য অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন ও প্রকাশ করিয়াছেন। অবাঙালীদের বাংলা শিখিবার যে অল্পসংখ্যক বহি আছে, তাহার প্রকাশক ইংরেজ, এবং তৎসমুদয় ইউরোপীয়দিগের বাংলা শিখিবার সুবিধার জন্য লিখিত। ভারতীয় অবাঙালীদিগকে বাংলা শিখাইবার জন্য বাঙালীরা কম খানি বহি লিখিয়াছেন জানি না। হিন্দীভাষীদের পক্ষে বাংলা শিখা খুব সহজ। অন্ততঃ তাঁহাদিগকে বাংলা শিখাইবার নিমিত্ত বাঙালীরা কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি? অবাঙালীদিগকে বাংলা শিখানর কথা ছাড়িয়া দিয়া, বঙ্গের বাহিরে যে-সব বাঙালী বঙ্গদেশ হইতে দূরে বাস করেন, তাঁহাদের বাংলার জ্ঞান ও বঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন ও রক্ষার জন্য প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কয়েকটি অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তদনুসারে কোন কাজ হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি।

ভারতীয় এবং বিদেশী অবাঙালীদিগকে বাংলা সাহিত্যের সম্পদের ও উত্তরোত্তর সম্পদ বৃদ্ধির ব্যবস্থার জ্ঞানইবার প্রধান উপায়, ইংরেজী একরূপ সাময়িক পত্রিকা-সমূহে বাংলা পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশ বৈরূপ পত্রিকা ভাষ্যবর্ষের সব প্রদেশে ও ভারতবর্ষের বাহিরে গিয়া থাকে। বঙ্গের একরূপ একখানা ইংরেজী মাসিকে সম্পাদকীয় সমালোচনার্থ বাংলা বহি পাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার কারণ, বাংলা পুস্তক-প্রকাশকদিগের উক্ত মাসিকের সম্পাদকের আবেদনে অমনোযোগ। ঐ মাসিকে গুজরাটি, হিন্দী, তেলুগু প্রভৃতি বহির সমালোচনা বাহির হয়, বাংলা বহির প্রায়ই হয় না। বলা আবশ্যক, উক্ত সম্পাদকের বাংলা বহি পাইবার দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে তাহার কোন লাভ হইত না। বহিগুলি সমালোচকদের হাতে যাইত, ও তাহা দর সম্পত্তি হইত।

আমরা যদি আমাদের সাহিত্যসম্পদ অপরকে জ্ঞানইবার ও অপরকে তাহার অংশী বরিবার নিমিত্ত চেষ্টা না করি, কেবল নিজের ঘবে নিজের সাহিত্যিক গর্ব লইয়া বসিয়া থাকি, এবং সঙ্গে সঙ্গে কোভ অভিমান কোথ প্রকাশ করি, যে, কেন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া অবাঙালীরা স্বীকার করিল না, তাহা হইলে একা মনোভাবের ও বাহ্য আচরণের সম্বন্ধিত প্রশংসা করা যায় না।

আমরা উপরে হিন্দীব রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবীর সমর্থকদিগের অনেকের ভাষিক সাম্রাজ্যবাদের উল্লেখ করিয়াছি। তাহার একটি প্রমাণ এমন এক জন প্রসিদ্ধ নেতার লেখা হইতে দিতেছি যিনি স্বয়ং হিন্দুস্থানীর রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী সমর্থন করেন অথচ স্বেচ্ছায় সমর্থকদিগের মনোভাবের সমর্থন করেন না। তিনি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু। (ইহার নামের ‘বাঁটি অন্তঃস্থ ব’। এখানে আসামীয় পেটকাটা ব ব্যবহাব করিলেই ভাল হয়।)

নেহরু মহাশয়ের ইংরেজী আত্মচরিত হইতে আমাদের দরকারী কথাগুলি আমাদের অমূল্য করিতে হইবে না। ঐ পুস্তকের যে সরল সহজপাঠ্য অনুবান শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার করিয়াছেন এবং যাহা পবিপত্ররূপে ছাপিয়া সুলভ মূল্যে শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র মজুমদার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতেই কথাগুলি লইব। পণ্ডিতজী লিখিয়াছেন,

“হিন্দুস্থানী যে ভারতের সাধারণ ভাষায় পরিণত হইবে,

এ বিষয়ে আমাব বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।” (পৃ. ৫২৫)।

পরে অল্প একটি ঘটনাব প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

“প্রসঙ্গতঃ আমি উল্লেখ করিলাম যে আধুনিক হিন্দী অপেক্ষা, আধুনিক বাঙ্গালা, মারাঠী ও গুজরাটি ভাষা অধিক অগ্রসর, বিশেষ ভাবে আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্যেব মৌলিকতা ও স্বজনী-প্রতিভা হিন্দী হইতে অনেক অধিক।

“এই সকল কথা বহুভাবে আলোচনা করিয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু সভায়, উহা যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে, এ ধারণাও আমার ছিল না, কিন্তু উপস্থিত কোন ব্যক্তি উহার বিবরণ হিন্দী সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশ করিয়া দিলেন।

“আমার বিরুদ্ধে হিন্দী সংবাদপত্রগুলিতে তীব্র প্রতিবাদ উঠিল, যেহেতু আমি বাঙ্গালা, গুজরাটি ও মারাঠী অপেক্ষা হিন্দীকে হীন করিয়া সমালোচনা করিতে স্পর্ধা প্রকাশ করিয়াছি। আমাকে গভীরভাবে অজ্ঞ—এ বিষয়ে আমি অজ্ঞ তাহাতে সন্দেহ কি?—ও আবও কঠিন কঠিন বিশেষণ দ্বারা পবাহত করা হইল। এই বাগদ্বন্দ্ব পড়িবার আমি সময় পাই নাই। শুনিয়াছি কয়েক মাস ধরিয়া, আমি পুনরায় কারাগারে না যাওয়া পর্যন্ত উহা চলিয়াছিল।

“এই ঘটনায় আমাব একটা শিক্ষা হইল। আমি বুঝিলাম, হিন্দী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকেরা অতিমাত্রায়, অসহিষ্ণু এক জন হিতাকাজক্ষীর নিকট হইতেও তাঁহাদের সঙ্গত সমালোচনা শুনিবাব মত বৈধ্য নাই। ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই হীনতাবোধ বহিয়াছে।”

“এক জন হিতাকাজক্ষী” কথায় হিন্দীভাষী জগতে ঝড় বহিয়াছিল। বাঙালীরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা ভারতময় ঘোষণা করিলে কিরূপ তুফানের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পণ্ডিতজীর ভাষায়, “ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই হীনতাবোধ” থাকিতে পারে, কিন্তু সে-কথা বাঙালীরা বলিলে বন্ধা আছে কি? বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী অবাঙালীরা কোন ক্রমেই মঞ্জুর করিবে না, তাহাতে কেবল হলাহল উঠিবে। অতএব ওরূপ চেষ্টা না করিয়া, সেইরূপ চেষ্টাই করা ভাল। যাহাতে বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সে-চেষ্টা, বাংলা সাহিত্যের সর্বোচ্চ সম্পদ বুদ্ধির চেষ্টা, সেই সম্পদের বার্তা বাংলায় সমালোচনা ও সর্বত্র লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠার দ্বারা বাঙালীদিগকে জানান, এবং ইংরেজীতে বাংলা বহির সমালোচনা ও অনুবাদ দ্বারা অবাঙালীদিগকে জানান।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ কেবল আমবা বাঙালীরাই ঘোষণা করি না। শতাব্দিক বৎসর পূর্বে

পাদরী উইলিয়ম কেরী ইহা বলিয়াছিলেন, কয়েক বৎসর পূর্বে কোম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অধ্যাপক ডক্টর জেমস ড্রমণ্ড এণ্ডার্সন টাইমস্ কাগজে লিখিয়াছিলেন, “এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দুটি উৎকৃষ্ট আধুনিক সাহিত্য আছে। তাহা ইংরেজী ও বাংলা”।

মন্ত্রিস্ব সম্বন্ধে কংগ্রেসের দাবী

যে ছয়টি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসওয়ালার সমস্তেরা সংখ্যাভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, তথায় কংগ্রেসী দলের মন্ত্রি-মণ্ডল গঠন করিবার আইনসম্বন্ধে অধিকার আছে। তাঁহারা মন্ত্রিস্বগ্রহণের পূর্বে গবর্নরদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন, যে, মন্ত্রীরা আইনসম্বন্ধে যে-সব কাজ করিবেন, তাহাতে গবর্নররা বাধা দিবেন না। ব্রিটিশ গবর্নরেন্ট গবর্নরদিগকে এরূপ প্রতিশ্রুতি দিবার অঙ্গুমতি দেন নাই, গবর্নরবাও প্রতিশ্রুতি দেন নাই। তাহার পর সরকার পক্ষ ও কংগ্রেস পক্ষ বহু বক্তৃতা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বহু মতবিত্তি পরস্পরের উদ্দেশে নিষ্ক্ষেপ করিয়াছেন। কংগ্রেস পক্ষের শেষ কথা মোটামুটি এই :—“আমরা চাই, গবর্নর আমাদের আইনসম্বন্ধে কোন কাজে বাধা দিবেন না; যদি তিনি কখনও মনে করেন আমরা ঠিক কাজ করিতেছি না, তখন তিনি আমাদেরকে বরখাস্ত করিবেন। তাঁহার সঙ্গে মতভেদ হইলে আমরা কাজে ইন্তকা দিব, এমন নয়; তিনিই সেখানে আমাদেরকে বরখাস্ত করিবেন।”

কংগ্রেস পক্ষের দাবী ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি রীতি সম্বন্ধে এবং সত্য। এই প্রকার প্রতিশ্রুতি গবর্নরদের দিতে না-চাওয়ায় বুঝা যাইতেছে, যে, গবর্নররা চান সব কাজ তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের মত অনুসারে করা হউক, এবং তাঁহাদের মত অনুসারে চলিতে না পারিলে মন্ত্রীরা স্বয়ং পদত্যাগ করিবেন। অর্থাৎ নূতন ভারতশাসন আইন তাঁহাদিগকে যে সর্বোচ্চ প্রভুত্ব দিয়াছে, কথায় ও কাজে তাহা সম্পূর্ণ বজায় থাকিবে। কংগ্রেস ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন, সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। কারণ, ইহা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ জাতির মার্কামারা প্রাধান্য আশ্রয়কর্তৃত্ব হইলেও প্রকৃত আশ্রয়কর্তৃত্ব নহে।

কংগ্রেসের আদর্শ মুসলমান জনসাধারণকে জানাইবার চেষ্টা

মিঃ মোহাম্মদ আলি জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে একটা চুক্তি না হইলে নিজে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত নহেন, অল্প মুসলমানরাও কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করে, এক্ষণে চান না। তিনি প্রকারান্তরে তাঁহার চৌক দফা দাবী কংগ্রেসকে মানাইয়া লইতে চান, অথবা সরকারী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটা মানাইয়া লইতে চান। মোলানা শৌকৎআলি তাঁহার অনেকটা সমর্থন করিয়াছেন। অধিকন্তু মোলানা বলিয়াছেন, কংগ্রেস যদি মুসলমানদের সহযোগিতা চান, তাহা হইলে আসল মুসলমানদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে থাকুন, নতুবা হিতে বিপরীত হইবে। আসল মুসলমানের অর্থ অবশ্য তিনি, মিঃ জিন্না ও তদ্বিধি অন্যান্য ব্যক্তি। অল্প দিকে, আগ্রা-অধোধ্যার মুসলমান কংগ্রেস নেতা মিঃ রাফীদীন কিডোয়াট, অধোধ্যার চীফ কোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান জজ সর্ব ওয়াজীর হাসান, পঞ্জাবের অল্পতম মুসলমান নেতা অধ্যাপক আবদুল মজীদ খান প্রভৃতি মিঃ জিন্নার মত সমূহেব খণ্ডন করিয়াছেন।

কংগ্রেস মুসলমান জনসাধারণের নিকট নিজেব মত ও আদর্শ প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের দলভুক্ত করিতে চান। মুসলমানরা কংগ্রেসওয়াল হইলে তাঁহাদের কোনই ক্ষতি নাই। কংগ্রেসের পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসে মুসলমান বা অল্প কোন অহিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে অনিষ্টকর কোন কংগ্রেসী প্রস্তাবের বা কার্যের বিষয় আমরা অবগত নহি। বরং কংগ্রেস মুসলমানদিগকে সঙ্কট করিবার নিমিত্ত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে এক পা “অ-গ্রহণ” নামক নৌকায় রাখিয়াছিলেন, এবং আর একটা পা বাধিয়াছিলেন “অ-বর্জন” নামক নৌকার উপর। মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব ও আচরণ এক্ষণে, যে, হিন্দু মহাসভার কোন কোন নেতা কংগ্রেসকে ‘ম্যাক্টি-হিন্দু’ বা হিন্দুবিরোধী বলিয়াছেন।

সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকই নির্ভয়ে অনায়াসে কংগ্রেসেব সভ্য হইতে পারেন।

আমাদের আশঙ্কা অল্প রকমের। করাচী কংগ্রেসে ধর্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের যে-সকল ভিত্তিগত

অধিকার (“fundamental rights”) স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা ছোট বড় সকল সম্প্রদায়ের লোকদের পক্ষে যথেষ্ট। তাহার উপর কংগ্রেস যদি এক বা একাধিক সম্প্রদায়কে বিশেষ কোন রকম প্রতিশ্রুতি দেন, তাহা হইলে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক না হইয়া সাম্প্রদায়িক হইয় পড়িবেন। ইতিপূর্বেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অগ্রহণ-অবর্জনহেতু কংগ্রেসে সাম্প্রদায়িকতার হোঁচট লাগিয়াছে। সেই কারণেও কংগ্রেসকে বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে যাহাতে মুসলমানদিগকে দলভুক্ত করিবার আত্যন্তিক আগ্রহে গণতান্ত্রিক আদর্শ হইতে কংগ্রেসওয়ালার বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত না হন।

কংগ্রেসের অবাধ্যতার শাস্তি দিবার হিড়িক

কংগ্রেসের নিয়ম বা নির্দেশ না মানিয়া অবাধ্যতা করার ওজুহাতে আগে বাংলা দেশের কয়েক জনের শাস্তি হইয়াছে ; সম্প্রতি আরও কয়েক জনের হইয়াছে। এবিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত কোন ভয় না থাকায় এবং আমরা বঙ্গের কংগ্রেসী দলাদলির কোন পক্ষেরই সমগ্র উক্তি না পড়ায়, কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া বলিতে পারি, শুধু শাস্তি দ্বারা বঙ্গের কংগ্রেস শক্তিশালী হইতে পারিবে না, মহৎ আদর্শ অনুসারে নিঃস্বার্থ ভাবে মহৎ কষ্ট বাড়াই কংগ্রেসওয়ালারা করিতে পারিলে বঙ্গের কংগ্রেস শক্তিশালী হইবে। দণ্ডনীতিব প্রয়োগ কোন ফলেই করা উচিত নয়, ইহা অবশ্য আমরা বলি না।

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর ব্রহ্মদেশ দর্শন

ব্রহ্মদেশে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সমুচিত সম্বন্ধনা হইতেছে। ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে পুরাকালে ভাবতবর্ষেব সহিত ব্রহ্মদেশের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। মধ্যে সেই যোগস্থত্র ছিল হইয়াছিল ; ব্রিটিশ রাজত্বকালে ব্রিটিশ জাতির অনভিগ্রেত ভাবে, তাহা আবার ক্ষুণ্ণিত হয়। এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও বণিকদের সুবিধায় নিমিত্ত ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করা সত্ত্বেও সেই সংস্কৃতির যোগ রক্ষা করিতে হইবে। ব্রহ্মদেশনিবাসি ভারতীয়দিগকেই

অবশ্য এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকিতে হইবে। ভারতীয় নেতারা মধ্যে মধ্যে এদেশে হইতে ব্রহ্মদেশে গেলে তাঁহাদের উৎসাহ বাড়িবে ও সেই চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা বাড়িবে। চেষ্টা অবশ্য ব্রহ্মদেশীয় নেতাদের সহযোগিতায় করিতে হইবে।

এমন ভারতীয় আছেন যাহারা রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিক দিয়াই নেতৃস্থানীয়। কেহ কেহ কেবল এক এক দিকে নেতা। সকল রকম নেতারই ব্রহ্মদেশে মধ্যে মধ্যে যাওয়া আবশ্যিক।

পণ্ডিতজী ঠিকই বলিয়াছেন, যে, ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষকে তাহার সহায় হইতে হইবে, এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় ব্রহ্মদেশকে তাহার সহায় হইতে হইবে।

এখানে একটা অবাস্তব কথা বলি। ব্রহ্মদেশে যত ভারতীয় আছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঙালীদের সংখ্যা অল্প কোন প্রদেশের লোকদের চেয়ে কম নয়—বোধ হয় বেশী। ব্রহ্মদেশনিবাসী শিক্ষিত সব বাঙালী সরকারী চাকর্যেও নহেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বা অন্যবিধ সার্বজনিক কাজে নেতৃস্থানীয় ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালীর নাম প্রায়ই দেখিতে পাই না। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সর্জনাদি ব্যাপারেও নেতৃস্থানীয় বাঙালীদের নাম চোখে পড়ে নাই। ইহার কারণ কি?

জনসেবাসম্বন্ধীয় কাজে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শ্রাম-নন্দের কথা আমরা বিস্মৃত হইয়া কোন কথা লিখিতেছি না।

ভারতবর্ষ ও চীনের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয়

সম্পর্ক

বহু শতাব্দী পূর্বে ভাবতবর্ষীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য চীনদেশে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সাম্রাজ্যস্থাপক কোন রাজা সম্রাট বা অন্য বোদ্ধার অগ্রদূত বা চর হইয়া যান নাই, কোন প্রভুজ্ঞাতির মাহুষ রূপেও তাহার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বান নাই। ভারতবর্ষীয় ধর্মোপদেষ্টাদিগের অসহায় অবস্থায় নদী, গিরি, অরণ্য, মরুভূমি অতিক্রম করিয়া চীন যাত্রা

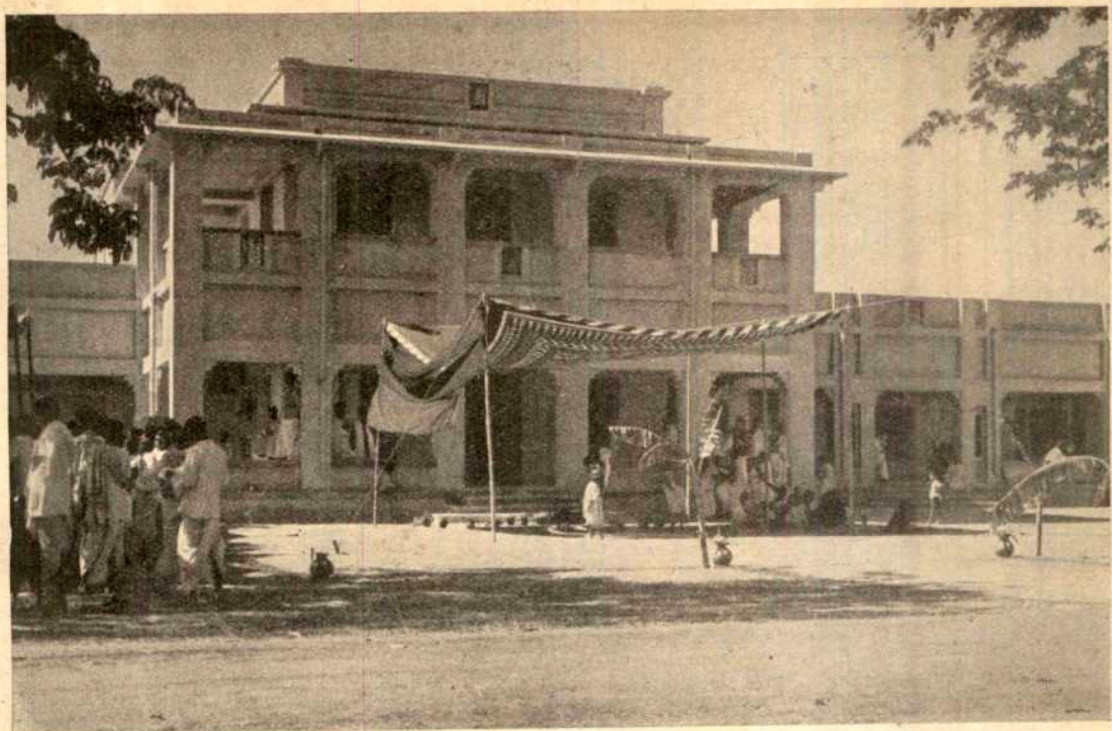
বিস্ময়কর ঘটনা। ধর্ম ভিন্ন অন্য নানা বিষয়েও—সাহিত্যে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যেও—চীনের উপর ভারতবর্ষের প্রভাব লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের উপরও চীনের প্রভাব পড়িয়াছিল।

পুরাকালের এই আদানপ্রদান বরাবর রক্ষিত হয় নাই। আধুনিক সময়ে রবীন্দ্রনাথ কয়েক জন বন্ধুকনিষ্ঠ সহচরকে সঙ্গে লইয়া যে কয়েক বৎসর পূর্বে চীনদেশে গিয়াছিলেন, তাহাই চীন ও ভাবতের প্রাচীন সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রথম প্রয়াস। বিশ্বভারতীতে চীনের ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনাব্যবস্থা সেই চেষ্টার অংশীভূত।

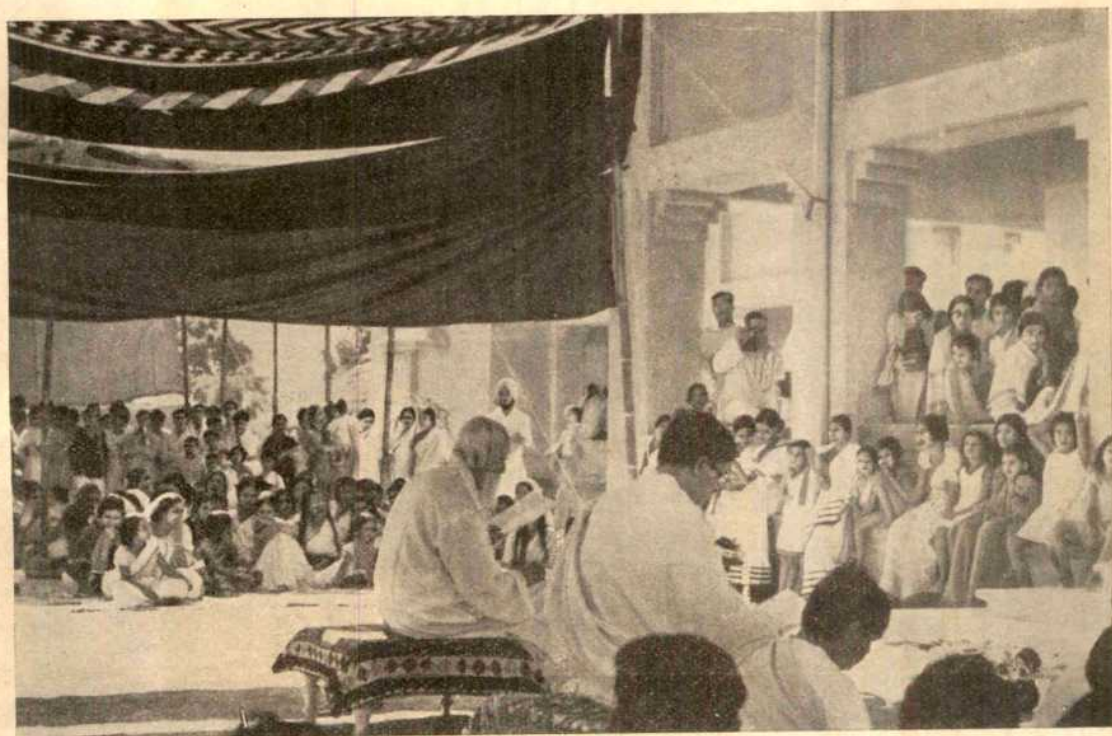
অধ্যাপক তান য়ুন-শান মহাশয়ের অধ্যবসায়ে ও চীনের সেনাপতি চিয়াংকাইশেক প্রমুখ রবীন্দ্রনাথের কয়েক জন চৈনিক বন্ধুর আত্মকৃত্যে শান্তিনিকেতনে একটি চীন-ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১লা বৈশাখ ইহার গৃহপ্রবেশ-উৎসব ষষ্ঠারীতি সম্পন্ন হয়। তত্পলক্ষ্যে বৈদিক মন্ত্রপাঠ ও সঙ্গীতের পর কবি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু প্রভৃতির বক্তব্য পাঠিত হয়। চীনের বাণিজ্যদূত এবং অধ্যাপক তান য়ুন-শান বক্তৃতা করেন। উৎসবে যোগ দিবার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা গিয়াছিলেন। এলাহাবাদ হইতে শ্রীমতী ইন্দিরা নেহরু তাঁহার পিতার বক্তব্য লইয়া আসিয়াছিলেন। অগ্রহস্তাবশতঃ পণ্ডিতজী আসিতে পারেন নাই। তাঁহারই সভাপতি হইবার এবং চীন-ভবনের স্বারোদ্ঘাটন করিবার কথা ছিল।

চুটী জ্ঞাতির মধ্যে মনকষাকষি ঝগড়া বিবাদ যুদ্ধ অপেক্ষা এই ঘটনার গুরুত্ব অনেক বেশী। অথচ ইহার সংবাদ পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হইবার সম্ভাবনা কম।

চৈনিক ভবনটি নির্মাণ করিতে শুনিয়াছি ৩০০০ টাকা খরচ হইয়াছে। পরিকল্পনাটি শ্রীবৃ্ত্ত হরেন্দ্রনাথ করের, নির্মাতা শ্রীবৃক্ত বীরেন্দ্রমোহন সেন। এই ভবনে চৈনিক সাহিত্য আদির অধ্যাপক ও ছাত্রদের থাকিবার স্থান আছে, ইহাতে বহু সহস্র চৈনিক গ্রন্থ থাকিবে, অনেক হাজার বহি ইতিমধ্যেই আসিয়াছে, এবং চীনের ললিতকলার অনেক প্রতিলিপিও ইহাতে রক্ষিত হইবে।

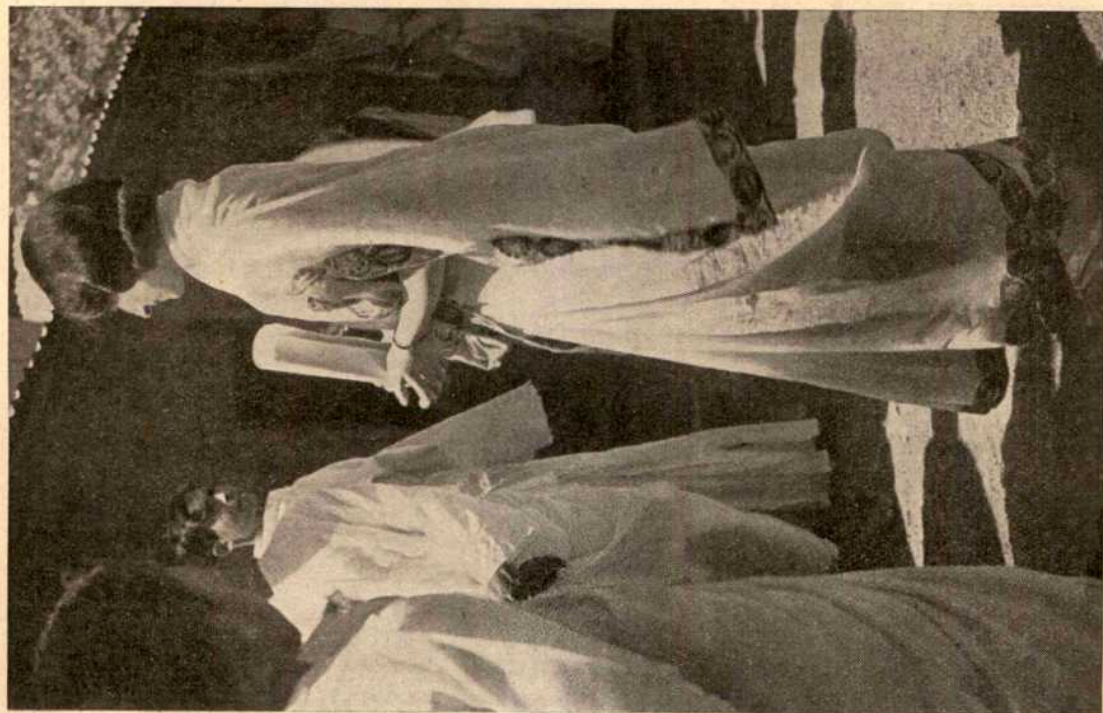


শান্তিনিকেতনে চীন-ভারত সংস্কৃতি পরিষদের উদ্বোধনে নবনির্মিত চীন-ভবন

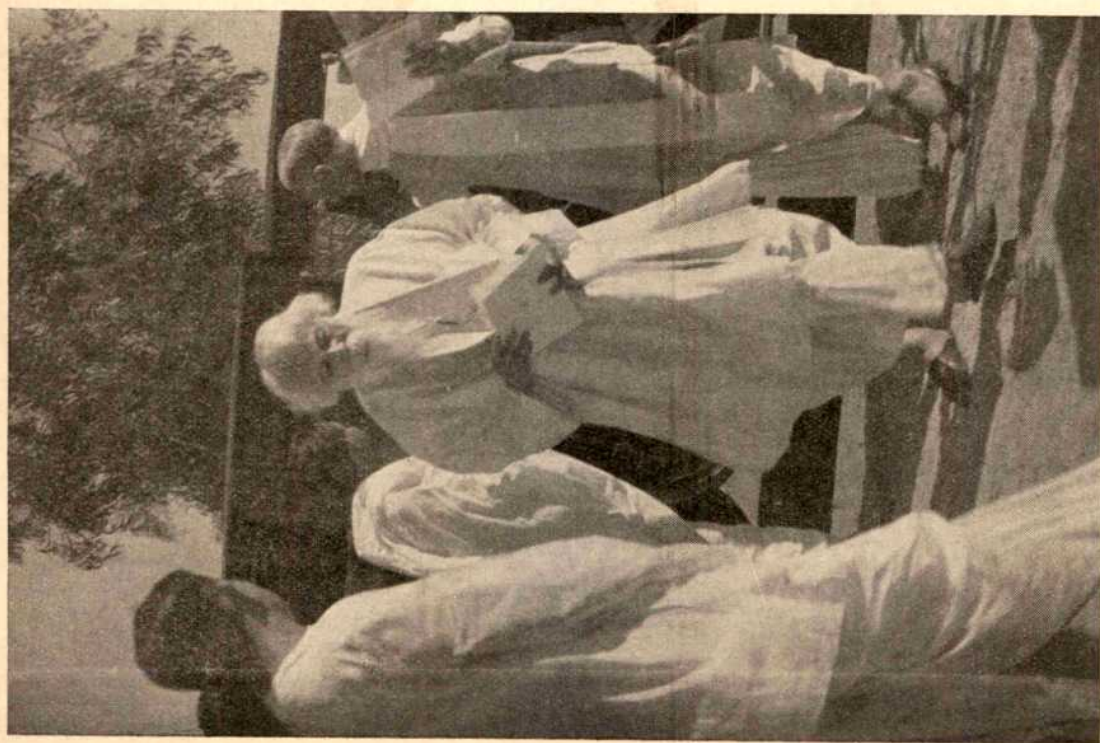


চীন-ভবনের দ্বারমোচন-উৎসব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত কিতিমোহন সেন বেদমন্ত্র পাঠ করিতেছেন [বিখ্যাত ভারতীয় সৌজতে ;



চীন-ভবনের দ্বারোন্মোচন উপলক্ষ্য জবাহরলালের বাণী লইয়া তাঁহার
কন্যা ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীর আগমন



উৎসব-মণ্ডপে রবীন্দ্রনাথের আগমন
বিষভারতীর সৌভাগ্য]

রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব

রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব নানা স্থানে হইয়াছে। তাহার মধ্যে বিখ্যাত্তর আশ্রমিক সংঘের উদ্যোগে কলিকাতায় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র সেনের বাড়ীতে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছিল। এই সভাতে শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিশ্বশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বহু, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত প্রভৃতি এবং অনেক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও অল্প ভদ্রমহিলা ও ভদ্র-লোক উপস্থিত ছিলেন। সভীত ও সভাপতির বক্তব্যের পর মধ্যে মধ্যে আরও গান হয়, শ্রীমতী নীরুপমা দেবী একটি কবিতা পড়েন, তাহার নিম্নিত ও কবিকে উপহৃত একটি স্থলর গুপ্তকাব্য প্রদর্শিত হয়, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, অনাথবাবু ও শাস্ত্রী মহাশয় কিছু বলেন, কবিকে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা যে প্রশংসা গরবের ধূতিদার উপহার দিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হয়, সভাপতি আরও দুই বার কিছু বলেন, এবং জলযোগ ও ফোটোগ্রাফগ্রহণের পর রাজি ৯টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

“ফুকা” প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন

কোন কোন গোয়ালী “ফুকা” দ্বারা মহিষ ও গোকর দুই শেষ ফোটাটি পর্যন্ত ছুঁয়া যায়। এই প্রক্রিয়া স্বাভাবিক, প্রকারজনক ও জুগুপ্সিত। ইহার দ্বারা প্রাপ্ত দুই কখনও স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না। ইহার আরও একটা ফল এই, যে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা যে গোকর বা মহিষের দুই দোহন করা হয়, তাহা প্রায়ই পুনর্বার গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী হয় না। সেই জন্য, অনেক বহুমূল্য ও উৎকৃষ্ট গোকর ও মহিষ, ফুকার দ্বারা আর যখন দুই পাওয়া যায় না, তখন কসাইদিগকে বিক্রী করিয়া ফেলা হয়। এইরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, যে, প্রতি বৎসর এই প্রকারে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ভাল গোকর ও মহিষ নিহত হয় যাহাদের দুই স্বাভাবিক ভাবে দোহিত হইলে যাহারা আরও অনেক বার দুগ্ধবতী হইতে পারিত এবং যাহাদের উৎকৃষ্ট বাছুর অনেক বার হইত। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় শহরে এই জঘন্য ও অনিষ্টকর প্রথা প্রচলিত আছে।

ইহার বিরুদ্ধে আইন আছে কিন্তু তাহা সবেও ইহা চলিতেছে। এই জঘন্য আইন কঠোরতন করাইবার এবং তাহা কঠোরতর ভাবে প্রয়োগ করাইবার নিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে। এই আন্দোলন সর্বসাধারণের সম্পূর্ণ সমর্থন করা উচিত।

কেবল শাস্তির দ্বারাই এই কুৎসিত প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা না করিয়া গোয়ালী-সমাজের মধ্যেও একরূপ আন্দোলন ও প্রচারকাণ্ড চালান উচিত যাহাতে, ফুকা প্রক্রিয়া বাহারা অবলম্বন করে, তাহারা তাহা হইতে নিরস্ত হয়।

“কালান্তর”

রবীন্দ্রনাথের গত জন্মোৎসবের দিন তাহার “কালান্তর” নামক একটি নূতন প্রবন্ধসংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পনেরটি প্রবন্ধ আছে। যথা—কালান্তর, বিবেচনা ও অববেচনা, লোকহিত, লড়াইয়ের মুক, কর্তার ইচ্ছার কর্ম, ছোটো ও বড়ো, বাতায়নিকের পত্র, শক্তিপূজা, সত্যের আহ্বান, সমস্তা, সমাধান, শূদ্রার্থ, হস্তর ভারত, হিন্দু-মুসলমান, ও নারী।

প্রবন্ধগুলি নূতন লিখিত না হইলেও ইহার কোনটিই এমন কোন সমস্তা বা প্রশ্নের বিষয়ে লিখিত নহে, যাহার সমাধান হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সবগুলিরই এখনও উপযোগিতা আছে। সবগুলি একখানি বহির মধ্যে পাওয়া সুবিধাজনক। একটি পাতা উন্টাইতে হঠাৎ চোখে পড়িল,

বা দেবী রাজ্যশাসনে

প্রেক্ষিজ-রূপে সংস্থিত।

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ

নমস্তস্মৈ নমোনয়ঃ।

প্রেক্ষিজ বাইবার ভয়ে ব্রিটিশ ফব্রেরি প্রাদেশিক গবর্ণরেরা মন্ত্রী হইবার বোয়া কংগ্রেসওয়ালদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারিতেছেন না, যে, তাহাদের আইন-সম্মত কাজে বাধা দিবেন না।

“বঙ্গীয় মহাকাব্য”

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয় মহাকাব্যের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়া

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে বারটি সংখ্যা ছিল। সর্বসমেত তেরটি সংখ্যা বাহির হইল। সংখ্যাগুলি পূর্ববৎ পাণ্ডিত্যের সহিত লিখিত ও সম্পাদিত এবং উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত হইতেছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যোগ্য বহু সহকারী সম্পাদক এবং শব্দগুলির সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রবন্ধ লিখিবার অনেক বিদ্বান লেখক সংগ্রহ করিয়াছেন। আশা করি নিয়মিত প্রকাশের আর্থিক ব্যবস্থাও হইয়াছে।

ফ্রান্স-অধিকৃত ভারতে বাল্যবিবাহ নিরোধ

১৮ বৎসরের কম বয়সের বালকের ও ১৪ বৎসরের কম বয়সের বালিকার বিবাহ ব্রিটিশ-ভারতে দণ্ডনীয় হওয়ার পর কোন কোন গোঁড়া হিন্দু ভারতবর্ষের ফ্রান্সের অধিকৃত কয়েকটি স্থানে গিয়া কম বয়সের ছেলেমেয়েদের বিবাহ দিত। বন্ধের কেহ কেহ—বিশেষতঃ মাড়োয়ারীরা—চন্দননগরে গিয়া ইহা করিত। সম্প্রতি ভারতবর্ষে ফরাসী কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ আইনের অনুরূপ আইন পাস করিয়াছেন। অতএব এখন আর ফ্রান্স-অধিকৃত স্থানে গিয়া বাল্যবিবাহ-নিরোধ আইন লঙ্ঘন করা চলিবে না। ফরাসী কর্তৃপক্ষের এই কাজটি বড় ভাল হইয়াছে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতালাভ নিকটত্তর

ব্রিটিশ-পয়ত্রিশ বৎসর আমেরিকার অধীন থাকিবার পূর্বেই ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ তাহার আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহে আত্মকর্তৃত্ব পাইয়াছিল। ১৯৪৬ সালে তাহার স্বাধীনতালাভ নিশ্চিত হইয়াছিল। সম্প্রতি সেই তারিখ আগাইয়া আনিয়া স্থির করা হইয়াছে, যে, ১৯৩৮-৩৯ সালে ফিলিপিনোর স্বাধীনতা লাভ করিবে।

রবীন্দ্রনাথের একটি সুপ্রসিদ্ধ গানে আছে—

“দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?”

প্রতিষ্পত্তি উত্তর দেয়, “কই, ভারত তবু কই?”

নিখিল ভারতীয় প্রাচ্য কনফারেন্সে বাংলা

ভাষার স্থান নাই

ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের ত্রিবন্দ্রম্ শহরে আগামী ডিসেম্বর মাসে নিখিলভারতীয় প্রাচ্য কনফারেন্স হইবে। তাহাতে যে-সকল ভারতীয় ভাষা ব্যবহৃত হইতে পারিবে, বাংলা তাহাদের মধ্যে স্থান পায় নাই। সংস্কৃতির বাহনরূপে বাংলা ভারতীয় কোন ভাষার নিরস্বানীয় নহে। অতএব বাংলার এই অনাদর সমীচীন হয় নাই।

তোকিওর বিশ্বশিক্ষা-কনফারেন্সে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ

আগামী আগষ্ট মাসে জাপানের রাজধানী তোকিও নগরে পৃথিবীর সব দেশের শিক্ষা কনফারেন্স বসিবে। তাহার জন্ম বোম্বাই হইতে এক দল প্রতিনিধি রওনা হইয়াছেন। প্রতিনিধিদের সংখ্যা ৯। এই নয় জনের মধ্যে এক জন পুরুষ, তিনি মাস্তোজী। বাকী আট জন মহিলা, তন্মধ্যে এক জন মাস্তোজী মহিলা, সাত জন বোম্বাইয়ের। দলটির নেত্রী এক জন মহিলা। বাংলা হইতে পুরুষ বা মহিলা কেহ যাইবেন কি? অধ্যাপক কালিদাস নাগকে ছয় মাসের জন্ম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হাওরাঙ্গি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যাপকতা করিতে পাঠাইয়াছেন। তিনি কিরিবার পথে বিশ্বশিক্ষা-কনফারেন্সে যোগ দিবেন।

গোরা সৈন্তদের পাঁচ বার আহার

বর্তমানে ভারতবর্ষে গোরা সৈন্তেরা প্রত্যহ চারি বার আহার করে—অবশ্য ভারতবর্ষের টাকায়। অতঃপর গবর্নেন্ট তাহাদিগকে প্রত্যহ পাঁচ বার খাইতে দিবেন। সিপাহীরা অত বার খায় না, কিন্তু বৃহৎ পৃথিবীর কোন দেশের সৈন্তদের চেয়ে মন্দ করে না।

এক এক জন গোরা সৈন্তের জন্ম বেতনাদি-বাবরে ভারতবর্ষের ব্যয় হয় এক-এক জন সিপাহীর জন্ম-ব্যয়ের চারি গুণ। অতঃপর কত গুণ হইবে?

বাধরগঞ্জ মহিলা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

শ্রীযুক্ত হেমপ্রভা মজুমদারের নেতৃত্বে বাধরগঞ্জ মহিলা সম্মেলনে যে-যে বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে নীচে তাহার অধিকাংশ মুদ্রিত হইল।

(২) কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত স্বাধীনতার অফিস সঙ্গ্রামে যোগদানের জন্য বাধরগঞ্জের নারীদিগকে আহ্বান ; (৩) আর্থিক বিষয়ে অল্পপ্রজীবিত হইতে মুক্তি কামনার কুটির-শিল্পের উন্নতি সাধনের ত্রুট গ্রহণ করিবার জন্য নারীজাতিকে অহুরোধ ; (৪) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ; (৫) বালিকাদের জন্য বর্তমানে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে তাহার নিষ্প্রবাদ এবং জাতীয়তায় ভিত্তিতে উহার সংস্কারসাধনকল্পে আন্দোলন চালাইবার অহুরোধ ; (৬) পল্লীসমূহে অবৈতনিক প্রাথমিক শিল্প-বিদ্যালয় ও শাস্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপনের দাবী ; (৭) বালবিধবাদের পুনর্বিবাহ সমর্থন ; (৮) বিনাবিচারে আটক বন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার দাবী ; (৯) অনভিপ্রেত শাসনতন্ত্র দেশবাসীর উপর চাপাইয়া দিবার প্রতিবাদস্বরূপ সম্রাটের রাজ্যাভিষেক সম্পর্কিত সমস্ত উৎসব বর্জননের জন্য দেশবাসীকে অহুরোধ, ও (১১) সাম্রাজ্যবাদী সঙ্গ্রামের নিষ্প্রবাদ এবং কংগ্রেস স্তম্ভের কং অর্থসাহায্য দানের জন্য দেশ-বাসীকে অহুরোধ।

ভোঁসলা সামরিক বিদ্যালয়

ডাক্তার বি এন্স মুন্সে নাসিকের সামরিক বিদ্যালয় সম্বন্ধে অন্ত্যস্ত কথার মধ্যে জনসাধারণকে জানাইয়াছেন,

আমরা আগামী ১৪ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার শুভ দশের দিন হইতে অধ্বারোহণ ও রাইফেল দ্বারা লক্ষ্যভেদ শিক্ষার কার্য আরম্ভ করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

১৫ই জুন হইতে ভোঁসলা সামরিক বিদ্যালয় খোলা হইবে। যাহারা এই স্থলে ভর্তি হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে দরখাস্ত করিবার জন্য অহুরোধ করা যাইতেছে।—ইউনাইটেড প্রেস

এই বিদ্যালয়ে বাঙালী হিন্দু ছাত্রেরাও ভর্তি হইতে পারেন। তাঁহারাও দরখাস্ত করুন।

রাজা ষষ্ঠ জর্জের রাজ্যাভিষেক

ইংলণ্ড রাজা ষষ্ঠ জর্জের রাজ্যাভিষেক খুব ধুমধামের সহিত হইয়াছে। সেখানে বক্তৃতায়, কাগজেপত্রে, ছবিত্তে সিংহাসনভাগী রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডকে মুছিয়া ফেলা হইয়াছে—যেন একটা গোপনীয় উচ্চ বড়বক্তার দ্বারা ইহা করা

হইয়াছে। কিন্তু বহু ইংরেজ পুরুষ ও নারী নিশ্চয়ই মনে মনে অষ্টম এডওয়ার্ডের কথা ভাবিয়াছে।

ব্রিটেনে সাধারণতন্ত্রবাদী লোক আছে, সমাজতান্ত্রিক আছে, কমুনিষ্টও আছে। কিন্তু মোটের উপর তাহাদের সংখ্যা কম। বেশীর ভাগ লোক রাজা চায়। সুতরাং মনে মনে অষ্টম এডওয়ার্ডের জন্য দুঃখ করিলেও, ষষ্ঠ জর্জের রাজ্যাভিষেক উৎসবে আন্তরিক স্বর্থ ও রাজ্যভগ্নতা ব্রিটেনে বিস্তর লোক অহুভব করিয়াছে। ভৌমীনিয়ন্ত্রণলিতে, অর্থাৎ স্বরাজ্যের অধিকারভোগী দেশসমূহে, খেতকাধেরা মালিক। ইংলণ্ডের রাজা তাহাদের উপর প্রভুত্ব করেন না ও প্রভুত্ব চালান না। সুতরাং তাহাদের তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইবার কারণ নাই।

ভারতবর্ষের কথা স্বতন্ত্র। এখানে বড়লার্ট ভারতীয়দের নিকট হইতে প্রতিনিধিত্বের কোন অধিকার না-পাইয়াও তাহাদের পক্ষ হইতে অনেক কথা বলিয়াছেন। ভারত গবর্নমেন্টের বাণিজ্য-সচিব সর্ব জাফরুল্লা খাঁও তাহা করিয়াছেন। এই সকল কথার মূল্য সবাই বুঝে। তৎসমুদয়ের সমালোচনা করা নিম্প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের লোকেরা রাজা ষষ্ঠ জর্জের রাজ্যাভিষেক উৎসবের সময় তাঁহার প্রতি কোন অসৌজন্য করিতে বা তাঁহাকে অসম্মান দেখাইতে আন্তরিক অনিচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু তাহারা আপনাদের মনুষ্যোচিত অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করিতে চায়। তাহা করিবার অধিকার তাহাদের আছে। এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের প্রধান বাস্তবনৈতিক সভা কংগ্রেস, কারণ দেখাইয়া, সকলকে রাজ্যাভিষেক উৎসবে যোগ দিতে নিষেধ করিয়াছে। কলিকাতা, হাবড়া, এবং অন্ত কোন কোন মিউনিসিপালিটি প্রকাশ্য প্রস্তাব দ্বারা রাজ্যাভিষেক উৎসব বর্জন করিয়াছে।

মজপাঠ, হোম, পূজা, আত্মসবাজী, কাঙালীভোজন, জনতা ভারতবর্ষেও হইবে। তাহার অর্থ ও মূল্য চিন্তাশীল লোকেরা সবাই বুঝে।

বঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

বঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা বিল গোপনে গোপনে প্রস্তুত হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগের বড় কর্মচারীরা—সবাই বা

প্রায় সবাই মুসলমান, কারণ তাঁহারা ইজমতে, ভারতে ও বঙ্গে শিক্ষার অগ্রণী ও অগ্রসরতম—দাজিলিঙে ঝসড়াটা গালিশ করিতেছেন, তাহাতে শান দিতেছেন। গবর্নেন্ট কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গের উচ্চ বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা কমাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদিগকে প্রবেশিকা পরীক্ষার অন্তর্গত শিক্ষা দিবার ও ছাত্রছাত্রী পাঠাইবাব যোগ্য বা অযোগ্য বাল্য নিরীক্ষণ করিবার মালিক থাকায় গবর্নেন্ট নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন নাই। এখন নূতন আইন করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলির কর্তৃক একটা বোর্ডের হাতে দেওয়া হইবে। বোর্ডটা শুধু শিক্ষণী, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে অভিযান শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরই চালাইবেন। উচ্চ বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ বেসরকারী, দেশের লোকের টাকায় চলে। কিন্তু তাহাদের উপর সরকার প্রভুত্ব করিতে চান। অনেকগুলি বেশ কেজো নয়, সত্য। কিন্তু যথেষ্ট টাকা দিলেই কেজো হয়। সরকার তাহা করিবেন না, অনেকগুলিকে উঠাইয়া দিবেন। ছুড়িকের সময় দরিদ্র দেশবাসীরা সামান্য পরিমাণে মোটা ভাত নিরন্নদিকে দিলে যদি কেহ বলে, “এটা ঠিক নয়, আমি কতকগুলি লোককে রাজভোগ দিব, তোমাদের মোটা ভাতের অন্নসত্তা উঠাইয়া দিব—ওরকম খারাপ খাদ্য লোককে দেওয়া উচিত নয়,” তাহা হইলে ব্যবহারটা যেমন হয়, শিক্ষাভূক্তিক্রম এই দেশে অকেজোদের ওজুহাতে বহু বিদ্যালয় উঠাইয়া দেওয়াও সেইরূপ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকাতে যে মাতৃভাষাকে বাহন করিয়াছে, সে ব্যবস্থা মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড সম্ভবতঃ সরকারী হুকুমের রদ করিবে। সম্পূর্ণ রদ যদি না-ও করে, তাহা হইলেও, যে-সব বাংলা বহি চলিবে, বঙ্গসাহিত্যে ও বঙ্গভাষায় অপ্রচলিত বহু আরবী-ফারসী শব্দে তাহা কটকিত করা হইবে। মুসলমানপ্রধান মন্ত্রিসভা ও শিক্ষাবিভাগ “হিন্দু” বাংলা ভাষা বরদাস্ত করিবে না। আরও কি কি অনিষ্ট বিলটার দ্বারা হইতে পারে, তাহা পরে লিখিব, এখন সংক্ষেপে বলা চলিবে না।

বাংলা দেশে উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বড় বেশী এবং বড় বেশীসংখ্যক ছেলেমেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে, এই ধারণাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বর্তমান বৎসরে পঞ্জাবে

প্রবেশিকা ও তত্ত্বাল্য পরীক্ষায় ২২৪৬৮ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৭১৬৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে, বঙ্গের লোকসংখ্যা পাঁচ কোটি অধিক, পঞ্জাবের লোকসংখ্যা আড়াই কোটির কম। অতএব, বঙ্গে অন্তর ৪৫,০০০ ছাত্রছাত্রীর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া উচিত। তাহা দেয় কি?

রেলের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধি

এই তৃতীয়াংশ দেশে সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ বা আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে দরিত্রের উপরই কর্তৃপক্ষের অমুগ্রহদৃষ্টি আগে পড়ে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাড়াইয়া দিয়াছেন। প্রতিবাদ অরণ্যে রোদন।

কৃষ্ণকুমার মিত্রের চিত্র প্রতিষ্ঠা

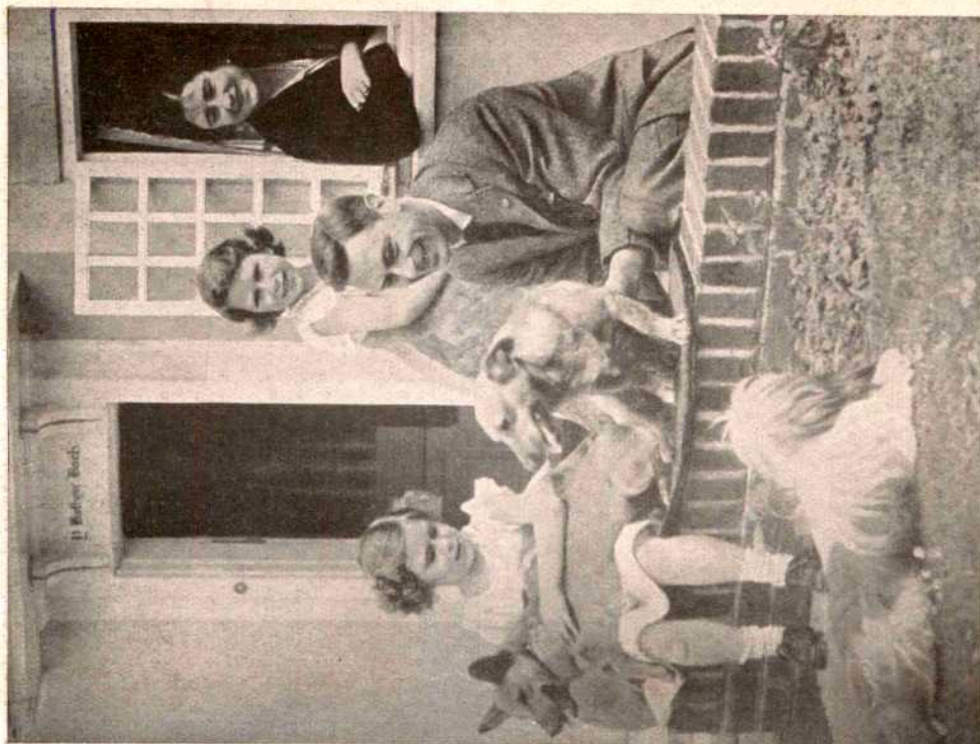
গত মাসে সিটি স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে স্বর্গত কৃষ্ণকুমার মিত্রের চিত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সাহিত্যাচার্য হেরশচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রধান সম্পাদকীয় লেখক শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি বসু, কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু, বঙ্গীয় রাষ্ট্রপরিষদের সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, আনন্দবাজার পত্রিকার বাণিজ্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রবাসী-সম্পাদক প্রভৃতি মিত্র মহাশয়ের ভগবন্তজি, দেশসেবা, সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, যশস্বীহার, অভাব প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে ছাত্রছাত্রীদের কাজ

দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্রাম ও খেলাধুলার দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারিলে তাহা সন্তোষের বিষয় হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সহিত মিশিয়া তাহাদের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিলে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে তাহা কাজে লাগিবে এবং বর্তমানেও সমগ্র জাতির সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সন্তোষ ও সংহতি বৃদ্ধি পাইবে। প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রী এই দীর্ঘ অবকাশে-ছুই-এক জন করিয়া নিরক্ষর লোককে লিখিতে। পড়িতে শিখাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করুন। তাহা সুসাধ্য।



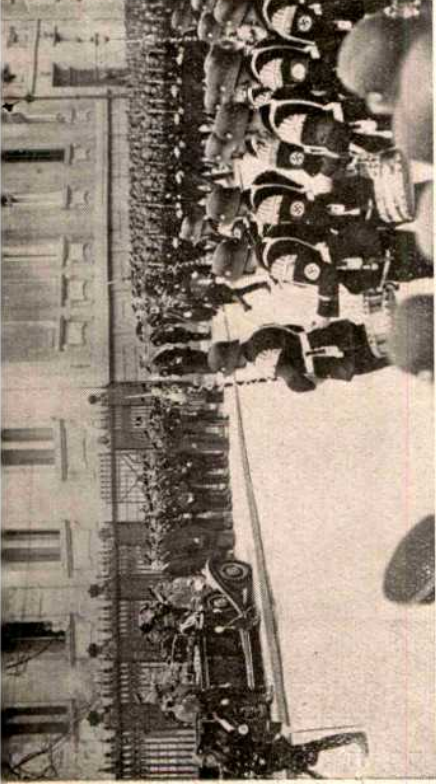
নৌসেনাপতিবেশে সর্দার্ট বর্ড জর্জ



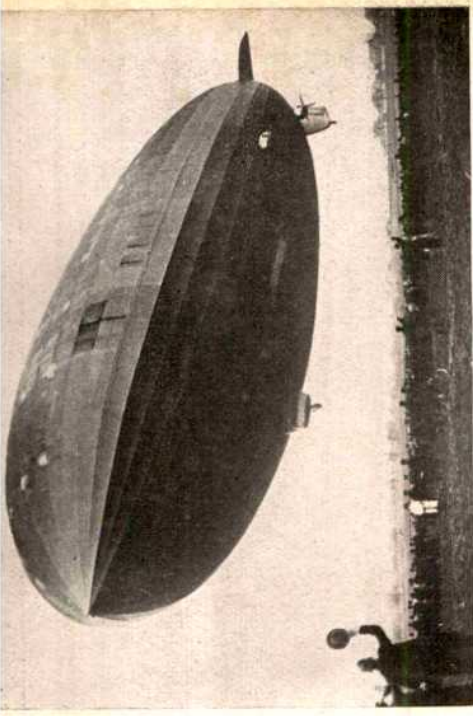
রাজ-পরিবার



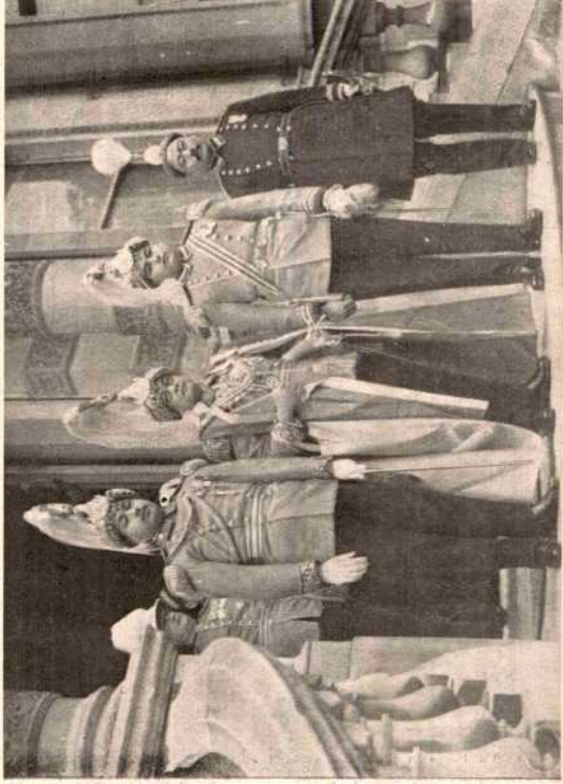
সম্রাট যশ জর্জ ও সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ



বালিনে হিটলারের জন্মোৎসব। হিটলার মোটরগাড়ীতে দাঁড়াইয়া সৈন্যদের
অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন, দেখা যাইতেছে



স্বপ্রসিক্ত জৰ্ম্মন বিমানপোত 'হিগেনবুর্গ' ভই মে দৈবত্বযোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।
ইহার পরিকল্পক ডক্টর একনারের মতে নাস্তী-বিরোধী বড়মন্ত্রের
ফলেই নাকি এইরূপ ঘটয়াছে



সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের রাজ্যাভিষেক লগুনে সমাগত নেপালের প্রতিনিধিবর্গ।
নেপাল সরকার সম্রাটকে "রাজক" উপাধি ভূষিত করিয়াছেন



মাক্সকুমোর শাসনকর্তার ভাতা ও তাঁহার নবপরিণীতা পত্নী



সিংহভূমের অন্তর্গত সেরাইকেলার চৈত্র মাসের অন্তে যে চৈত্র-পূর্বা বা বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহার প্রধান অঙ্গ 'ছো' বা মুখোস নৃত্য।
 তিন দিন ধরিয়া ধনৌদরিত্রিনির্বিশেষে সর্বসাধারণে মিলিয়া এই নৃত্যোৎসব চলে। বিভিন্ন পৌরাণিককাহিনী
 এই নৃত্যের উপজীব্য। এই নৃত্যে শুধু পুরুষগণই অংশ গ্রহণ করেন।

দেশ-বিদেশের কথা

বাণীপীঠ

প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত পরিবারের পুত্রপুত্রীগণকে এবং অসহায় বিধবাগণকে স্বল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ এবং কার্যকরী শিক্ষা দিয়া স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত এই নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির কথা আমরা পূর্বেও লিখিয়াছি। বর্তমানে ইহার ছাত্রীসংখ্যা প্রায় দেড় শত। এই প্রতিষ্ঠানে ম্যাট্রিক, জুনিয়র ট্রেণিং কোর্স, প্রাইমারী এবং অবৈতনিক শিল্পশ্রেণী প্রভৃতি চারটি বিভাগ আছে। অবৈতনিক শিল্প-বিভাগে বয়নশিল্প, রজন-শিল্প, সেলাই, চামড়ার কাজ, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি অর্থকরী শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। গত তিন বৎসরে এই প্রতিষ্ঠান হইতে ৭০টি ছাত্রী শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য বিভিন্ন ট্রেণিং বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই সহায়সম্পদহীনা বিধবা। ইতিমধ্যে প্রায় চৌদ্দ পুনরুৎপাদন ছাত্রী শিক্ষয়িত্রীর সনন্দ পাইয়াছেন এবং

অর্থোপার্জন করিতেছেন। বাংলার কতিপয় জেলা বোর্ড এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তাহাদের জেলার ছাত্রীগণকে মাসিক বৃত্তি প্রদান করিয়া আসিতেছেন। কলিকাতা পৌরসভা এবং বাংলার সরকারী শিল্প বিভাগ হইতেও সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় এই অর্থসাহায্য সামান্য। এই বিদ্যালয়কে মাসিক বাড়ীভাড়া প্রায় আড়াই শত টাকা ব্যয় করিতে হয়। সংলগ্ন ছাত্রীনিবাসে কয়েকটি মেয়েকে বিনা ব্যয়ে থাকিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। অধিকাংশ ছাত্রীই দরিদ্র বলিয়া স্কুলের ছাত্রী বেতন বাবদ সামান্য আয় হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের কক্ষীয় এবং শিক্ষকগণ সামান্য বৃত্তি লইয়া এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিতেছেন। তাহারা দেশবাসীর ধন্যবাদার্থ। অর্থাভাবে প্রতিষ্ঠানের বহু কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। আমরা সহায়দয় দেশবাসীর দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

সুদূর প্রাচ্যেও স্বাধীনতার বিজয় অভিযান

বার্মা
স্ট্রেট সেটেলমেন্ট
মালয়
শ্যাম • চীন
ফিলিপাইন
ইন্দো-চীন
জাভা • সুমাত্রা
ফরমোসা
আন্দামান
ফিজি
জাপান

আপনার অধিকার— আপনার গৌরব



নিজের সংসারে আদর্শ গৃহিণী হওয়া সহজ কথা নয়। খুঁটি নাটি সাত সতেরো এত সব কাজ গৃহকর্ত্রীকে করতে হয়, পুরুষদের কাছে যার জ্ঞান কোনো বাহবা পাওয়া যায় না;—পুরুষদের সে সব চোখেই পড়ে না। কিন্তু সবাই জানে যে সংসারে এমন অনেক কাজ আছে, যা করা বিশেষ করে মেয়েদেরই গর্বের বিষয়। তার মধ্যে প্রধান হ'ল চায়ের নিত্যকার অনুষ্ঠান—মেয়েরাই যার অধিষ্ঠাত্রী। বুদ্ধিমতী মেয়েরা তাই বাড়ীর লোকদের সেই 'আনন্দের পাত্র'টি বিতরণ করতে সব সময়ই সচেষ্ট।

এই স্বাস্থ্যকর পানীয় সংসারে শান্তি ও আনন্দ নিয়ে আসে।

চা প্রস্তুত-প্রণালী



টাক্কা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্ত এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশী দিন। জল ফোটানোর চায়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজতে দিন; তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

দশজনের সংসারে একমাত্র পানীয়—ভারতীয় চা

পরলোকে পুণ্যবতী মহিলা



হেমনলিনী রায় চৌধুরাণী



নীরদবরণী দেবী

নীরদবরণী দেবী চন্দ্রনগরের গোস্বামী ঘাটের প্রসিদ্ধ গোস্বামী-
শর খ্যাতনামা পণ্ডিত প্রভুপাদ ঞ্চামলাল গোস্বামীর পুত্রবধূ
ঐবিনোদবিহারী গোস্বামী মহাশয়ের সহধর্মিণী ছিলেন।

ক্যালকেমিকোর

মার্গো সোপ

শিথ স্বগন্ধি নিমের টয়লেট সাবান
স্নানে ও প্রসাধনে নিত্য ব্যবহারে

চিহ্ন প্রফুল্ল হয়, দেহ নিশ্চল

এবং বর্ণ উজ্জল হয়,

মার্গোসোপ

চর্ম কোমল ও মৃদু রাখে, এক সকল-

প্রকার চর্মরোগ ও সংক্রামক ব্যাধির

আক্রমণ নিবারণ করে

শিশু ও নারীর কোমল অঙ্গের

উপাদান।

স্নানান্তে ব্যবহার করুন

ক্যালকেমিকোর

সর্বোৎকৃষ্ট স্বগন্ধি নিমের টয়লেট
পাউডার।

ব্রেণুকা

ছুলি, মেচেতা, ঘামাচি, চুলকানি
দূর করে।



ক্যালকাটা কেমিক্যাল

বালিগঞ্জ : কলিকাতা

নীরদবরণী দেবী বালবিধবা এবং বাল্য বয়সে নিরক্ষরা হইলেও পরবর্তীকালে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া সাহিত্যসেবা করিয়াছিলেন। তিনি “সুভদ্রা” নামক একখানি নাট্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং ছোট ছোট গল্পও লিখিতেন। কিছুকাল পূর্বে তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

সন্তোষের কবি জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা হেমললিতা রায় চৌধুরাণী কিছুকাল পূর্বে কলিকাতাস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় ও অমায়িকতা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। আত্মপ্রকাশ, যশোলিপ্সা তাঁহার প্রকৃতিবিক্রম ছিল। অন্যের অগোচরে গরীব-দুঃখীকে দান করা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। অনেক দুঃস্থ পরিবারের ভরণপোষণ তাঁহার গোপন দানের উপর নির্ভর করিত। তিনি অগণিত দুঃখী, কাঙাল আতুরের ‘রাগীমা’ ছিলেন।

কুতী বাঙালী যুবক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুতী ছাত্র শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন সরকার, এম. এসসি., পিএইচ. ডি. (লগুন), ডি আই সি লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করিয়া পিএইচ ডি উপাধি লাভ করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। কৃষিক্ষেত্রে সার পদার্থ সকলের অন্নতার সহিত উদ্ভিদের দেহতত্ত্বের কিরূপ



শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন সরকার

ল্যা

ড্

কো

ঃ
ঃ

ক

লি

কা

তা

ঃ
ঃ

গত বৎসরের ছায়

এ বৎসরেও গ্রীষ্মকালে

আপনার নিত্যব্যবহার্যের

সুপরীক্ষিত প্রসাধন দ্রব্যাদি—

ল্যাড্‌কো দ্রব্যাদি

গুণে অপরাজ্য

ব্যবহারে পরম আনন্দ

ও সুখদায়ক ॥

ভাল দোকানেই পাইবেন ॥

ল্যা ড্‌কো'র

সুগন্ধ ক্যাক্টর অয়েল

সুগন্ধ গ্লিসারিন সোপ

লাইম্ জুস্ গ্লিসারিন

রক্তকমল গন্ধ-তৈল

আমলা-অয়েল

ফেস্-ক্রিম

ম্নো

সম্বন্ধ, ইহাই তাহার গবেষণার বিষয় ছিল। আশা করা যায় তাহার অগ্রসরগমনের ফল হইতে ভারতে কৃষিকার্যের উপকার হইবে।

ডক্টর অশোক বসু ১৯৩১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রসায়নশাস্ত্রের বিশেষ চর্চার উদ্দেশ্যে ইউরোপে গিয়াছিলেন। কোল-টার হইতে প্রাপ্ত রং

ও তাহার সাহায্যে রঞ্জন সম্বন্ধে চারি বৎসর গবেষণা করিয়া তিনি জাঞ্চেইনীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট (Dr. Ing.) লাভ করেন। অতঃপর ইউরোপের নানা স্থানে তাহার



মিঃ এ. কে. এম. জ্যোতি
কলিকাতা কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ডেপুটি মেয়র



শ্রীসনৎকুমার রায় চৌধুরী
কলিকাতা কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র

দুঃখহীন নিকেতন—

সংসার-সংগ্রামে মানুষ আরামের আশা ছাড়িয়া প্রাণপণ উত্তমে ঝাঁপাইয়া পড়ে তাহার জীপুত্র-পরিবারের মুখ চাহিয়া। সে চায় পত্নীর প্রেমে, পুত্রকন্যা ভাইভগিনীর স্নেহে বাক্যকে একখানি শান্তির নীড় রচনা করিতে। এই আশা বৃকে করিয়া কী তা'র আকাজক্ষার আকুলতা, কী তা'র উদ্যম, কী তা'র দিনের পর দিন আত্মভোলার পরিশ্রম!

কিন্তু হায়, কোথায় আকাজক্ষা, আর কোথায় তা'র পরিণতি! বাক্যের চৌকাঠে পা দিয়া পোনের আনা লোকই দেখে জীবনসন্ধ্যায় দুঃখহীন নিকেতন গড়িয়া তুলিবার স্বপ্নকে সফল করিতে হইলে যেটুকু অর্থ-সঞ্চয় করিয়া রাখা প্রয়োজন ছিল, প্রতিদিনের হাজার কাজের চাপে, ছোটবড় হাজার অভাব মিটাইতে গিয়া, সেই অতিপ্রয়োজনীয় সঞ্চয় তাহার করা হইয়া ওঠে নাই। এমনি করিয়া আশাভঙ্গের মনস্তাপে বহু লোকেরই জীবনসন্ধ্যাহের গোথলি-অবসরটুকু শান্তিহীন হইয়া ওঠে।

একদিনেই করিয়া ফেলা যায় এমন কোনো উপায়ই নাই, যাহা দরিত্রের এই মনস্তাপ দূর করিয়া দিতে পারে। সংসারের স্বচ্ছলতা ও শান্তি গড়িয়া তুলিতে হয় ধীরে ধীরে—একমাস বা এক বৎসরের চেষ্টায় ভবিষ্যতের যে-সংস্থান হয় না, বিশ বৎসরের চেষ্টায় তাহা অন্নায়াসে হওয়া অসম্ভব নয়। সঞ্চয়ের দায়িত্বকে আসন্ন দায়ের মত দুঃসহ না করিয়া লঘুভার করিতে এবং কষ্টসঞ্চিত অর্থকে নিরাপদ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্তই জীবনবীমার সৃষ্টি। বাহাদের সামর্থ্য বেশী নয়, অথচ সংসারিক দায়িত্ব বেশী, জীবনবীমার অনুষ্ঠান বিশেষ করিয়া তাহাদেরই জন্ত।

সাংসারিক জীবনে প্রত্যেক গৃহস্থেরই যে জীবনবীমা করিয়া রাখা উচিত, একথা সকলেই জানেন। জীবনবীমা করিতে হইলে সকলেরই এমন কোম্পানীতে করা উচিত, ব্যবসায়িকতায় যাহার প্রতিষ্ঠা আছে, ব্যবসার অন্তর্য্যাপ্তে যাহার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বেশী। নিরাপত্তার দিক দিয়া দেখিলে, **বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিমিটেডের** মত বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠানই সর্বসাধারণের পক্ষে শ্রেয়।

বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিমিটেড

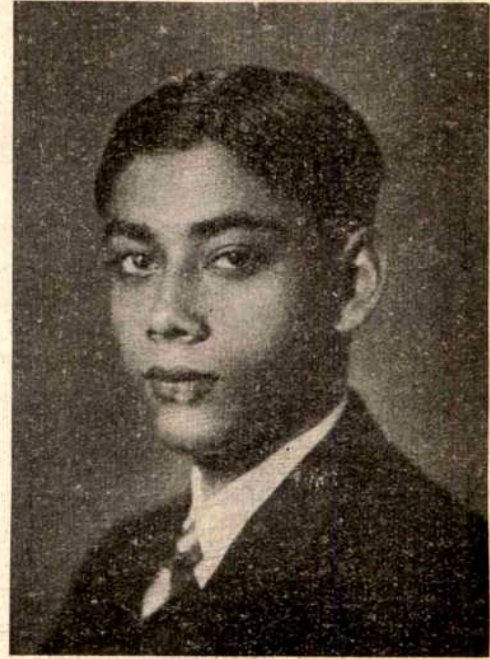
হেড অফিস—২নং চার্চ লেন, কলিকাতা।

অধীত বিষয় সহজে হাতে-কলমে আলোচনা করিয়া কিছুকাল পূর্বে তিনি দেশে ফিরিয়াছেন। ডক্টর বনু সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা শ্রীশরৎচন্দ্র বনু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

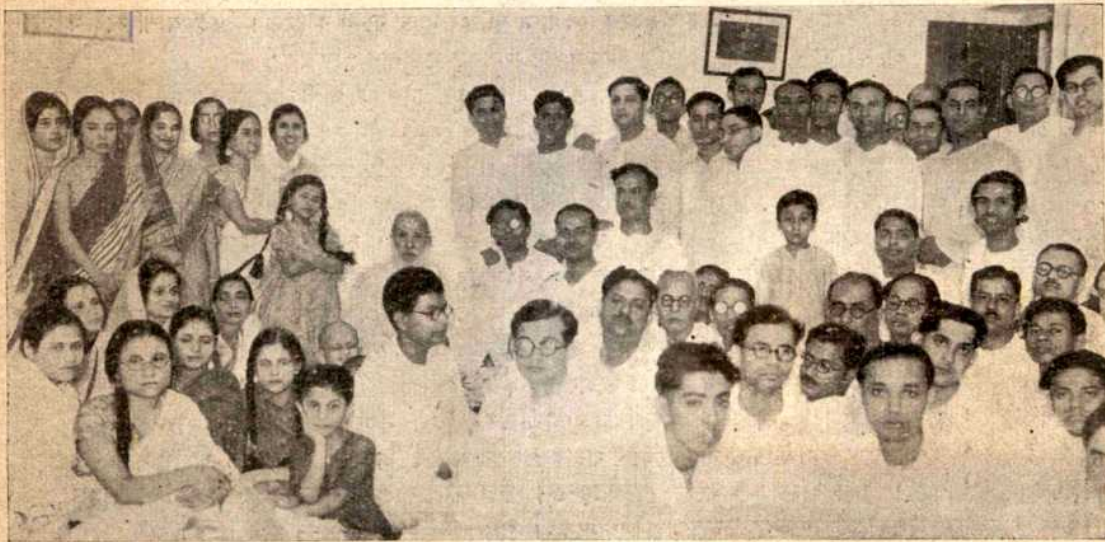


শ্রীসুধাকর বনু

দেবদূত পাব্লিক স্কুলের শিল্পাধ্যাপক, চিত্রশিল্পী ও মূর্তিকার শ্রীসুধাকরবনু খাস্তগীর সম্প্রতি লণ্ডন রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস-এর ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন। খাস্তগীর-মহাশয় শান্তিনিকেতন কলাভবনের পূর্বতন ছাত্র। প্রতীচ্য শিল্পকলার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের জগা তিনি শীঘ্রই ইউরোপ-ভ্রমণে যাইবেন।



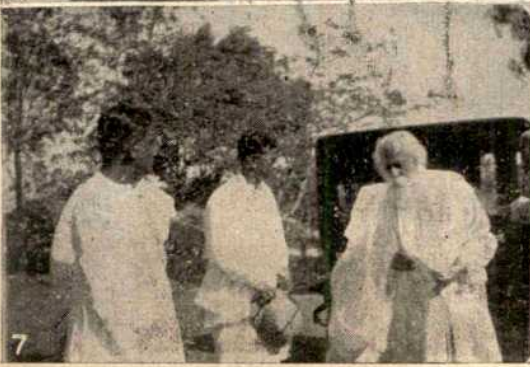
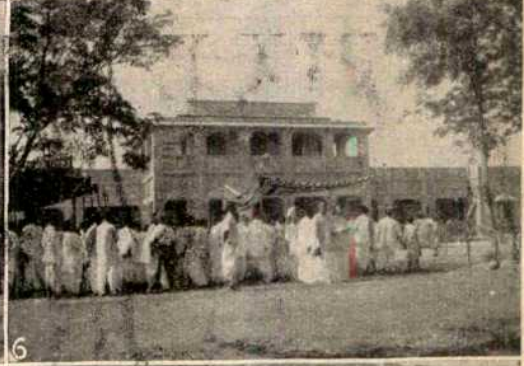
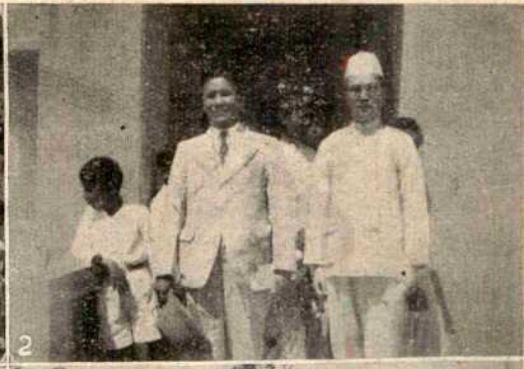
শ্রীঅশোক বনু



শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রজন্মোৎসবে সভাপতি শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকগণ

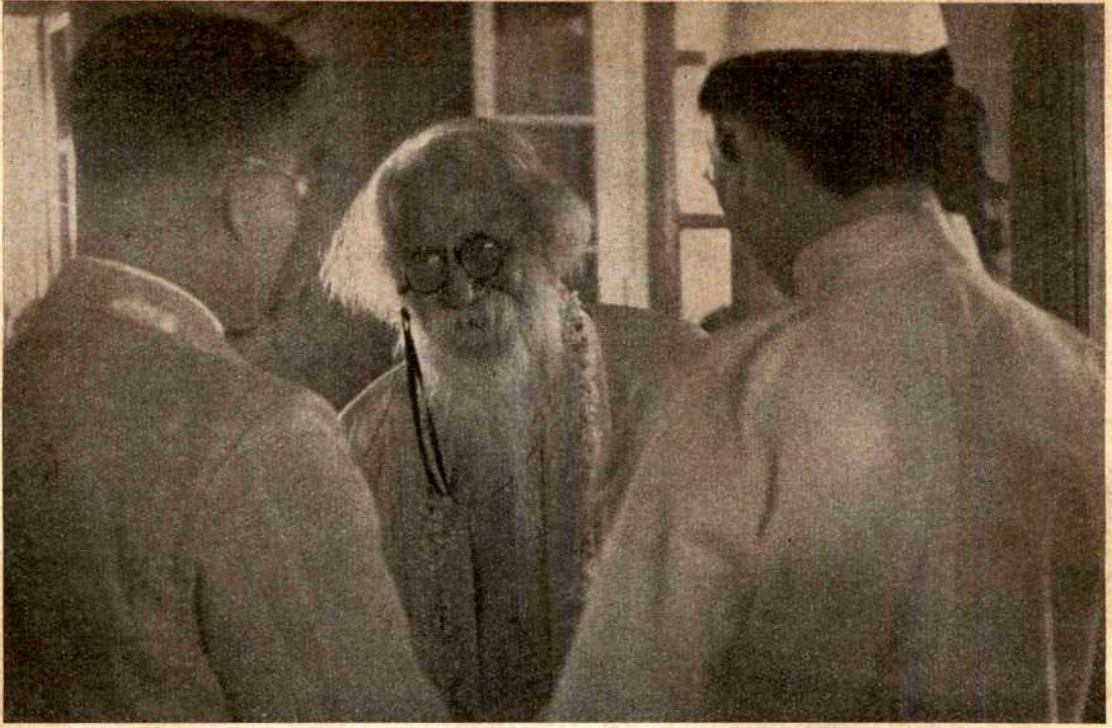
শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সেনের সৌজতে]

[দ্রষ্টব্য, “রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব”, বিবিধ প্রসঙ্গ



১। শান্তিনিকেতনে চীন-ভবনের দ্বারোদ্বোধন-উৎসবে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ২। চীনরাজদূত ও অধ্যাপক তান য়ুন-সান
৩। অধ্যাপক তান য়ুন-সান ও চৈনিক অতিথিবর্গ ৪। চীন-ভবন ৫। ও ৬। উৎসবে সমবেত নরনারীগণ, ৭। উৎসব-
মণ্ডপে রবীন্দ্রনাথের আগমন ৮। উৎসবান্তে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তন

[শ্রী বীরেন্দ্রমোহন সেনের সৌজন্মে



শান্তিনিকেতনে টীন-ভবনের দ্বারোদ্ঘোচন-উৎসবে রবীন্দ্রনাথ এবং চৈনিক অধ্যাপক ও অতিথিবর্গ

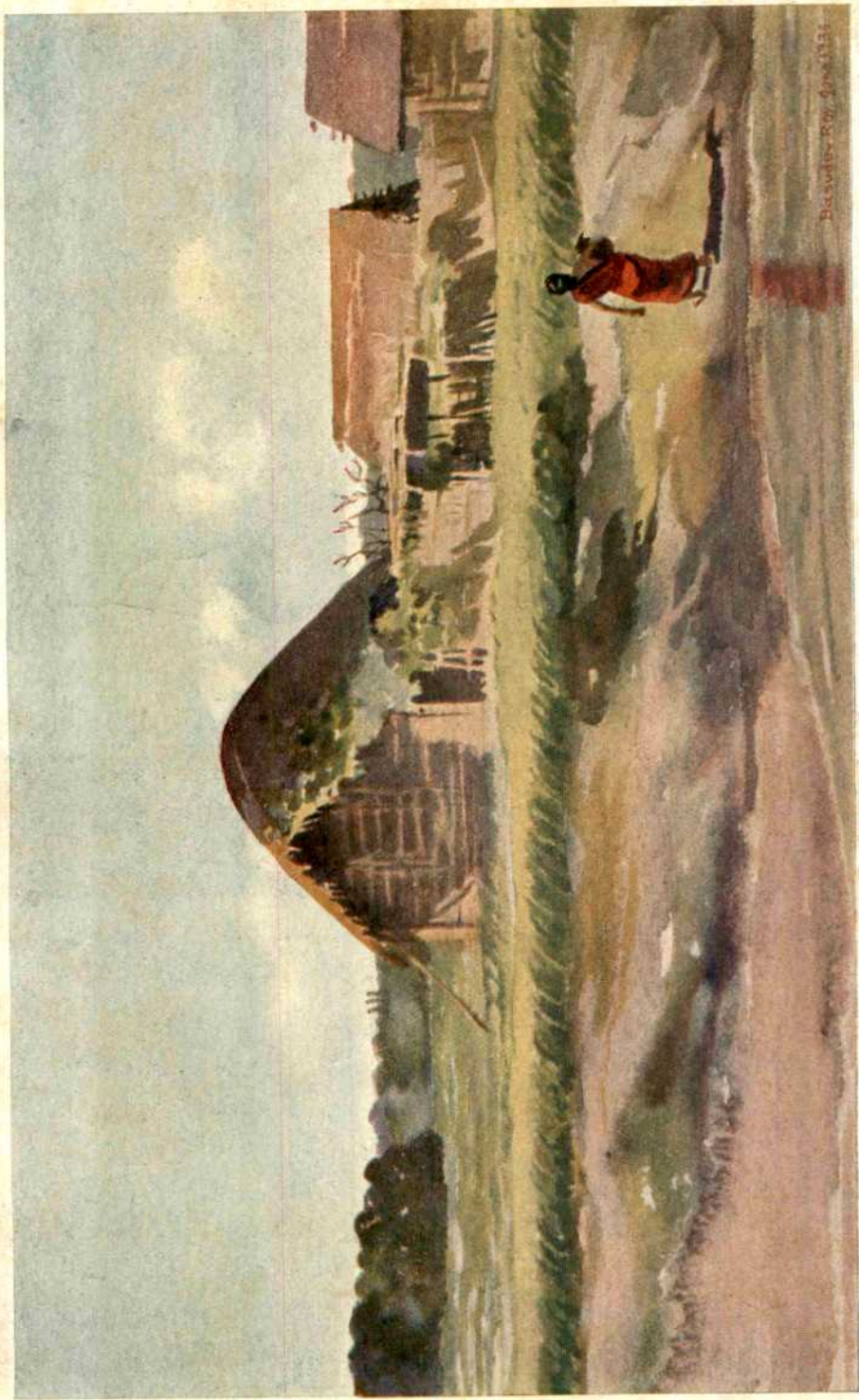


উৎসব-প্রদর্শনে আলিম্পন ও মাল্ল্যার্থ্যরাজি

দ্রষ্টব্য, "ভারতবর্ষ ও চীনের ... সম্পর্ক", [বিবিধ প্রসঙ্গ]

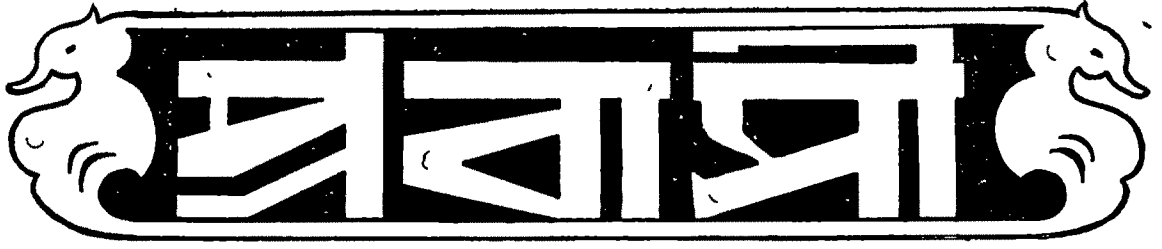
[বিশ্বভারতীর সৌজ্যে

১২০১২ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



পল্লীপথে
শ্রীবাসুদেব রায়

অবাসী প্রেস, কলিকতা



“সত্যম্ শিবম্ হৃদয়ম্”

“নামস্যাশ্চা বলহীনেন লভ্যঃ”

৩৭শ ভাগ }
১ম খণ্ড }

আষাঢ়, ১৩৪৪

{ ৩য় সংখ্যা

জন্মদিন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে হাজারখানা চোখ,
ধ্বনির ঝড়ে বিপন্ন ঐ লোক ।
জন্মদিনের মুখর তিথি যারা ভুলেই থাকে,
দোহাই ওগো, তাদের দলে লও এ মাহুঘটাকে,
সজ্জনে পাতার মতো ষাদের হালুকা পরিচয়,
জুলুক খস্কুক শব্দ নাহি হয় ।

সবার মাঝে পৃথক ওষে ভিড়ের কারাগারে
খ্যাতি-বেড়ির নিরন্তর ঝঙ্কারে ।
সবাই মিলে নানা রঙে রঙীন-করা ওরে
নিলাজমঞ্চে রাখচে তুলে ধরে,
আঙুল তুলে দেখাচ্ছে দিনরাত,
লুকোয় কোথা, আড়াল ভূমিসাৎ ।
দাঁও না ছেড়ে ওকে
স্নিগ্ধ আলো শ্রামল ছায়া বিরল কথার লোকে,
বেড়াবিহীন বিরাট ধূলি'পর,
সেই যেখানে মহাশিশুর আদিম খেলাঘর ।

ভোরবেলাকার পাখীর ডাকে ঠেকল খেয়া এসে
 সব প্রথমেই চেনাশোনার দেশে ;
 নামূল ঘাটে, তখন তারে সাজ রাখে নি ঢেকে,
 ছুটির আলো নগ্ন গায়ে লাগল আকাশ থেকে,
 যেমন ক'রে লাগে ভরীর পালে,
 যেমন লাগে অশোক গাছের কচি পাতার ডালে ।
 নাম-ভোলা ফুল ফুটল ঘাসে ঘাসে
 সেই প্রভাতের সহজ অবকাশে ।
 ছুটির যজ্ঞে পুষ্পহোমে জাগল বকুলশাখা,
 ছুটির শূণ্ণে ফাগুনবেলা মেলল সোনার পাখা ।

ছুটির কোণে গোপনে তার নাম
 আচম্কা সেই পেয়েছিল মিষ্টি স্মরের দাম ;
 কানে কানে সে নাম-ডাকার ব্যথা উদাস করে
 চৈত্রদিনের স্তব্ধ ছুই পহরে ।
 আজ সবুজ এই বনের পাতায় আলোর ঝিকমিকি
 সেই নিমেষের তারিখ দিল লিখি ।

আজ কেন গুর মনে লাগে, এবার যাত্রাশেষে
 নৌকো আবার পাড়ি দিল আরেক ছুটির দেশে ।
 এ-ঘাট থেকে বোঝাই ক'রে চলেছে স্রোত বাহি
 সেই পসরা হিসাব যাহার নাহি ;
 আপনাতে যা আপনি অফুরান,
 ভাঙা বাঁশির মৌন-পারে জমেছে যার গান ।

তাহারে ডাক দিয়েছিল পদ্মানদীর ধারা,
 কাঁপন-লাগা বেগুর শিরে দেখেছে শুকতারা ;
 কান্দলকালো মেঘের পুঞ্জ সজল সমীরণে
 নীল ছায়াটি বিছিয়েছিল তটের বনে বনে ;

ও দেখেছে গ্রামের বাঁকা বাটে
কাঁখে কলস মুখর মেয়ে চলে স্নানের ঘাটে ;
সর্ষে-তিসির ক্ষেতে
দুই-রঙা সুর মিলেছিল অবাক আকাশেতে ;
তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে অন্তরবির রাগে
বলেছিল, এই তো ভাল লাগে ।
সেই যে ভাল-লাগাটি তার যাক সে রেখে পিছে
কীর্ত্তি যা সে গোঁথেছিল, হয় যদি হোক মিছে ;
না যদি রয় নাই রহিল নাম,
এই মাটিতে রইল তাহার বিস্মিত প্রণাম ॥

আলমোড়া

২২ বৈশাখ, ১৩৪৪

বাঁকুড়ার দুটি স্মরণীয় ঘটনা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

(১) অপর্থাপ্ত ধান

সন ১৩৪১ ও ১৩৪২ সালে বাঁকুড়ায় উপরি উপরি দু-বছর বৃষ্টি স্বল্প হয়েছিল। দুর্ভিক্ষও হয়েছিল। ১৩৪১ সালের দুর্ভিক্ষ, জেলার সর্বত্র হয় নাই, কিন্তু কোথাও স্বভিক্ষও ছিল না। এই কারণে ১৩৪২ সালের দুর্ভিক্ষে সর্বত্র হাহাকার উঠেছিল। বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণে আরামবাগ, পূর্বদিকে ও উত্তরে বর্ধমান জেলার উত্তর ভাগ, তদুত্তরে বীরভূম জেলায় অনাবৃষ্টি ও আবহাওয়ায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সে বাতর্জীবাই জানেন। কিন্তু গত বৎসর, অর্থাৎ ১৩৪৩ সালে, যেমন স্বচাক্র বৃষ্টি তেমন স্বচাক্র ধান জন্মেছিল। যেমন বৃষ্টি, তেমন শস্য ; এতে আর আশ্চর্য কি ?

কিন্তু আশ্চর্যের কথা আছে। টোংরা জমিতেও প্রচুর ধান হয়েছিল। আমি গত দশ বৎসর দেখে

আসছি, একবারও এত ধান ফলতে দেখি নি। ধানের গাছও এত লম্বা ও ঝাড়াল দেখি নি। সেই জমি, সেই চাষ, সেই সার ; কিসের হেণে এত ধান হ'ল ? যথাকালের প্রচুর বৃষ্টি ভিন্ন অন্য কারণ পাই না।

বাঁকুড়া নগরে গবর্নেন্ট কৃষি-ক্ষেত্র আছে। সেখানে বৃষ্টিমান যন্ত্র আছে। ইং ১৯৩৪, ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালে, গত তিন বছরের বৃষ্টিমান যথাক্রমে ৬৯.৪৪, ৩৫.০২, ৬৩.৪১ ইঞ্চি। বার্ষিক নির্ধারিত ৫৫ ইঞ্চি। কিন্তু বার্ষিক বৃষ্টিমান দ্বারা প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায় না। কোন মাসে কত, মাসেব কখন কত, এই দুই জানা দরকার। প্রদর্শিত বৃষ্টিরেখ হ'তে জানতে পারা যাবে। কিন্তু কিসের গুণে ধান অপর্থাপ্ত হয়েছিল ? শুষ্ক পরিমাপের গুণ নয়, বৃষ্টিধারার গুণ অবশ্য স্বীকার করতে হবে। কৃষক মাজেই

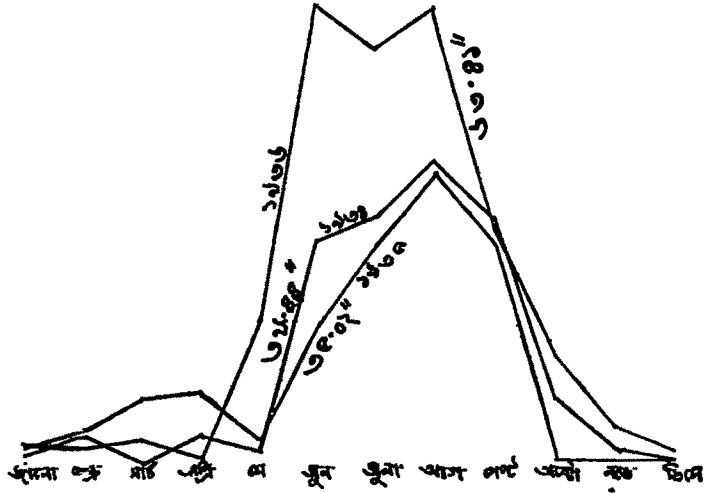
জানে, ধানগাছের গোড়ায় খাল বিল
পুকুরের জল সেঁচা আর গাছ বয়ে
ধারাপাত, ফলে এক নয়।

ঋগ্বেদের ঋষি বৃষ্টিকে অমৃত মনে
ক'রতেন। পঞ্চাবে বৃষ্টি অত্যন্ত অল্প
হয়, কিন্তু বেটুকু হয় সেটুকু অমৃত।
ধাত্তাদি শস্তের প্রতি অমৃত। মাহুবে
নদীর ও কুয়ার জল পেত। দেখছি,
শুক-বায়ু নীরস-মুস্তিকা বাঁকুড়ার
ধাত্তাদির প্রতিও অমৃত।

হঠাৎ মনে হ'তে পারে জমি দু-বছর
প্রায় পতিত ছিল, রোজ ও বায়ুর
গুণে মাটি তেজস্কর হয়েছিল। কিন্তু

বাঁকুড়ার মাটি মাটিই নয়। বাঁকুড়া জেলার সব জায়গায়
নয়। পূর্ব ভাগের মাটি ভাল, কিন্তু তিন ভাগ এইরূপ।
মোটী বালি, পাথুরে বালি, ছোট কোচ, এই সব মিশ্রিত
তাতে শতকে ছুই তিন ভাগ যুষ্টি থাকলে যে মাটি হ',
বাঁকুড়ার টোংরা জমির মাটি এইরূপ। যুষ্টি নাই; রোজ
বায়ু ও বিশ্রামফলও নাই। কোচপাথরকে হাজার রেন
খাওয়াই, সে ফটিক পাথরই থাকে। কচুর মত দেখতে এই
হেতু নাম কোচপাথর। গুঁড়া ক'রলে ধরশাণ বালি হ'তে।
পাথুরে বালি চাঁলের মত বড়। বীরা সর্বদা জুতা প'রে
বেড়ান, তাঁরা এই সূচ্যগ্র বালি ও সূচ্যগ্র কোচপাথরের
উপর দিয়ে জুপা চ'লতে পারবেন না। অনেক চাষী ম'ষ
দিয়ে লাঙ্গল করে। বড় বড় ম'ষ; বর্ষা প'ড়বার কিছুন্নি
পরে দেখি, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চ'লছে। জমির ধরশাণ বালি
ও কোণাল কোচপাথরে চলে' ম'ষের খুরের তলায় ঘা হ',
ম'ষ চ'লতে পারে না।

বাঁকুড়া জেলার সীমা, চ-অক্ষর উপর নীচে ক'রলে যেমন
দেখায়, তেমন। এর পশ্চিমে চ-এর সোজা রেখা, তাইনের
কোণ বর্ধমান জেলায় ঠেকেছে। পশ্চিম ভাগ বিদ্যাচলো
পূর্বপ্রান্ত। কোথাও মাটির সোসর, কোথাও বা কিছু নীচে
পাতা আছে। পর্বতের অসংখ্য শিরা, কোথাও উত্তরদক্ষিণে,
কোথাও কোণাচে রয়েছে। কামরাঙ্গার যেমন শিরা,
পাহাড়েরও তেমন শিরা। সে শিরাই ভেঙেচুরে ভাঙ



ইং ১৩৩৮, ৩৯, ৩৯ সালে বাঁকুড়া নগরে বৃষ্টিমান

হয়েছে। ডাঙ্গা থাকলে ডহরও থাকবে। বাঁকুড়া জেলার
পশ্চিমভাগ ডাঙ্গা ও ডহর, ডহর ও ডাঙ্গা। সংকুতে
পাটোংপাত। এখানে ডাঙ্গার নাম তড়া (তট), আর
ডহরের নাম সোল (জোল)। ডাঙ্গার চালু পাশের নাম
বাইদ (পাতী)। তড়ার ও বাইদের গড়ানি ও খোয়াটি
পড়ে' ডহরের কতকটা ভরাট হয়েছে। বাইদের ক্ষেত পরে
পরে নেমে নেমে সোলে পড়ে'ছে। যা কিছু ধান হয়, এই সোল
জমিতেই হয়। বাইদে আউশ হয়, কিন্তু নাম মাজ। আর
বিস্তীর্ণ তড়া পড়ে' আছে। তাতে কার্তিক মাস পর্যন্ত ঘাস
দেখতে পাওয়া যায়। বাইদেও তাই। তার পর শুক
মরুভূমি। আমি এই নিম্নেজ মরুভূমিকেই টোংরা (তুঙ্গ)
জমি ব'লছি। এ সব জমিতে বৃষ্টিজল দাঁড়ায় না। বাঁধা
আলের নীচে দিয়ে নীচের সোলে চলে' যায়। সে সঙ্গে
মাটিতে যে একটু দ্রাব্য পদার্থ থাকে, যার গুণে ধান হয়,
তাও চলে' যায়। এ সব জমি কৃষিকর্মের যোগ্য নয়।
অল্পদিন পূর্বেও অজল ছিল; এখন লোকে পেটের
দায়ে সে জমির বালি ও পাথর কামড়াচ্ছে। এইরূপ
জমিরই ধানগাছ ও ফলন দেখে আশ্চর্য হয়েছি।
সাধারণ বছরে সোল জমিতে যেমন ধান হয়, এই
নিম্নেজ পাথুরে বাইদ জমিতেও তেমন হয়েছিল।
সে ধান অবশ্য আউশ। কিন্তু কিসের গুণে?

সন ১৩২২ সালে ছুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সেই একই কারণ,

অনার্থি। তার পর হুড়ি বছর চলে গেছে। এর মধ্যে এমন খান হয়েছিল কিনা, জানি না। 'ইনান বোভে' এসব খবর লিখে রাখা উচিত।

গত বৎসরের ধান-বুড়ির দুজিন কারণ মনে আসছে। কিন্তু মনে আসা ও কার্যে প্রত্যক্ষ করা এক নয়।

বাঁকুড়া নগর, বাঁকুড়ার পশ্চিম ভাগের অন্তর্গত। এখানে বিদ্যাচলের পূর্বাঞ্চলের লক্ষণ বর্তমান। সেই ডাঙ্গা আর ডহর। ডাঙ্গা হ'তে ডহর কোথাও আট হাত, কোথাও বোল হাত নীচে। কোথাও কোথাও ডহর ভরাট হয়ে প্রায় ডাঙ্গার সামিল হয়েছে। ডহরে কুআ কাটলে অল্প নীচে জল পাওয়া যায়। না জেনে না বুঝে ডাঙ্গায় কাটলে পাথর কাটতে হয়। অনেক নীচে না গেলে জল পাওয়া যায় না। নগরের উত্তরে ও দক্ষিণে দুই নদী বয়ে গেছে। নদীর তলায় পাথরের চটান। নদীতে জল থাকে না। গরমেই কৃষিক্ষেত্রের দক্ষিণাংশ ডাঙ্গা, উত্তরাংশ বৃহৎ ডহর। ডহরের উত্তর ভাগ হ'তে দক্ষিণাংশের ডাঙ্গা দুতলার সমান উঠে। ক্ষেত্রের পাথর বাছা হয়েছে, মাটি চালা হয়েছে, তবে চাষ হ'চ্ছে। মাটি লাল। এক অতীত যুগে যখন পাহাড় বনাচ্ছন্ন ছিল, তখন বনভূমির বৃষ্টিজল ডহবে জমা হ'ত, লালমাটি ধিতিয়ে প'ড়ত। পূর্বকালের লালমাটি দক্ষিণে মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই লাল মাটিতে পাঁচ সাত ভাগ যুষ্টি আছে। এ মাটি মন্দ নয়। লাল-মাটির গায়ে স্থানে-স্থানে মরুট পাথর বিস্তীর্ণ হ'য়ে আছে। কোথাও চাকড়া, কোথাও চটান। এই পাথর লৌহময়। কিন্তু জল ও পাতা-পচানি পেলে গুঁড়া হ'য়ে যায়, অনেক বছর পরে লালমাটিতে পরিণত হয়। কিন্তু ছোট ছোট কাকর বছকাল থাকে।

এই দুই মাটিই পশ্চিম বাঁকুড়ার মাটি। (১) একটাতেও পাচ (পচাপাত) নাই, জল ধরে না। দু শ., আড়াই শ. বছরের বড়গাছ দূর হ'তে চিনতে পারা যায় না। পাতা ছোট ছোট, ডাল হ'তে যদি বা জটা বুলেছে, সে জটা শূন্যই আছে, তলার মাটিতে ঠেকতে পারে নি। গাছের পাতা তলার পড়ে। যদি সে পাতা সেখানেই থাকে, ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে না ফেলে, তাহ'লে সেখানকার মাটি রসা হয়। কিন্তু তেমন সুযোগ প্রায় ঘটে না। ডাঙ্গায় ঝড় বেশী লাগে।

(২) বর্ষা থেমে গেলে কার্তিক মাস হ'তে মাটি শুখাতে থাকে। আর এমন শুখায় যে কোদাল চলে না, মাটিতে যেন সিমেন্ট মিশেছে। গাঁতিও চলে না। জল ঢেলে, তবে গাঁতি চালাতে হয়। বর্ষাকালে সে মাটিই সপ-সপ করে।

(৩) শুখার দিনে বাতাস এত শুষ্ক হয় যে গাছের গোড়ায় জল ঢাললেও পাতা ঝামার্য যায়। শিকড় জল টেনে পাতায় পৌঁছিয়ে দিতে পারে না।

এই তিন দোষ, দুটি মাটির, একটি বায়ুর, গত বছরের বর্ষাতে কেটে গেছিল। ডাঙ্গা ও বাইদ জমিতে বরাবর জল ছিল, গাছ শুখায় নি। বায়ু ভিজা ছিল, গাছকে গরমে হাঁফাতে হয় নি, গরম জলে গোড়া ডুবিয়ে থাকতে হয় নি। কিন্তু তার পব? মাটি উর্বরা হ'ল কি করে?

জমিতে সার না দিলে খান হয় না। আর সার মানেই গোবর, আর গোবর মানেই সার। খ'ল, হাড়গুঁড়া, বিলাতী মসলা, সে সব 'সার' নয়। গাছের লৌহ। বৃষ্টি-জলে সারের গুণ হ'ল কি করে? খানচাষের পক্ষে যুষ্টির ভাগ কম থাকলেও চলে। বালি-স্ফেও খান জম্মাতে পারা যায়। কিন্তু সার দিতেই হবে। এত সার কোথায় পাওয়া যাবে? জমিতে খনিচা কিবা শণাশ করে' মাটিতে পচিয়ে ফেলবার সময় পাওয়া যায় না। যে বৃষ্টি এ জেলায় চ'লবে না। বর্ষা দেয়িতে নামে, খানচাষেরই সময় বয়ে যায়। অভাব দেখছি, বন কেটে বাঁকুড়ায় সর্বনাশ হয়েছে। খানচাষ ইজের কৃপা ভিন্ন হ'তে পারে না।

(২) মেলেরিয়া-হ্রাস

পশ্চিমবঙ্গ মেলেরিয়ার দ্রুত উৎসর্গ হয়েছে। কি কারণে কে জানে প্রথমে বর্ধমানে আরম্ভ হয়েছিল। সেখান হ'তে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণে আরামবাগ দিয়ে মেদিনীপুরে এবং পূর্বদিকে বর্ধমান ও হুগলী জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কিছু দিন পর্যন্ত পশ্চিমের দেশ রক্ষা পেয়েছিল। তখন বীরভূম ও বাঁকুড়ায় মেলেরিয়া ছিল না।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর সব-উভিজ্ঞান বাঁকুড়া জেলার পূর্বভাগ। এটির প্রকৃতি পশ্চিম হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাটি পাথুরে নয়, ডাঙ্গা ডহরও নাই। এর পূর্বদিকে দামোদর ও বর্ধমান জেলা, দক্ষিণে আরামবাগ। দুটাই

মেলেরিয়ায় খনি। বিষ্ণুপুরে মেলেরিয়া ঢুকতে বৈদ্যনি লাগে নি। 'সেন্সাসে দেখা গেছে, লোক বাড়ি দূরে থাক কমে'ছে। মুখ দেখলেই মেলেরিয়াভোগ বুঝতে পানা যায়। বিষ্ণুপুর হ'তে বাঁকুড়া নগরেও মেলেরিয়া এসেছিল।

আমি আরামবাগের মেলেরিয়ায় কোপ দেখতাম, আর ভাবতাম এই দারুণ রোগ কোনও কালে আপনি অদৃষ্ট হ'তে পারবে কি? কি কারণে এল আর কি কারণে যাবে, কে জানে? একেবারে যাবে কিনা, তাই বা কে বলতে পারে?

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গত বৎসর প্রচুর বৃষ্টি সত্ত্বেও বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়ায় মেলেরিয়া ছিল না। ডাক্তাররা গ্রামে ঘেঁষে অল্প বছর মেলেরিয়া রোগী দেখতেন, কিন্তু গত বছর একটিও দেখতে পান নি। যে যে গ্রাম মেলেরিয়ায় খনি ছিল, সে সে গ্রাম এখন মেলেরিয়া-শূন্য। সেই পচা ডোবা, সেই গড়িয়া, সেই বন, সেই জলময় ধান-জমি, অধিবাসীরা সেই আহা, সেই কর্ম ছিল; কুইনিন-বিতরণ হয় নি, মেলেরিয়া-নিবারণী সমিতি হয় নি; কিন্তু মেলেরিয়া অদৃষ্ট! এই বাঁকুড়া নগরেও মেলেরিয়া ছিল, কিন্তু কোন ডাক্তারে মেলেরিয়ারোগী পান নি। যে দু-একটি ছিল, তারা অল্প জায়গা থেকে এনেছিল। এই অদ্ভুত ঘটনা কি করে' হ'ল? একি ১৩৪২ সালের অনাবৃষ্টি ও শুষ্কতার ফল? কে জানে। যদি তাই হয়, তবে বীরভূম মেলেরিয়াশূন্য হ'য়ে থাকবে। কিন্তু জানি, আরামবাগেও শুষ্ক হয়েছিল, কিন্তু মেলেরিয়া অদৃষ্ট হয় নি। কারণ কি? যদি শুষ্ক ও ধরণ হ'লেই মেলেরিয়া যায়, তাহ'লে কুড়ি বছর পূর্বে যখন বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তার পর বছর

বিষ্ণুপুরে কি মেলেরিয়া ছিল না? গবর্মেণ্ট স্বাস্থ্য-বিভাগের ডাক্তাররা খবর রেখে থাকবেন। কিন্তু জানতে পারলে আশ্বাস পাওয়া যায়, মেলেরিয়া মাহুঘের বিনা চেষ্টায় অদৃষ্ট হ'তে পারে।

বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম ভাগ পাহাড়ের পাথুরে। জাঙ্গল ত বটেই। কিন্তু মেলেরিয়া ছিল না, এখনও নাই। সে সব অঞ্চলের লোকে ঘরে বসে থাকে, এমন নয়। বিষ্ণুপুরে যাচ্ছে, বাঁকুড়ায় আসছে, মেদিনীপুরে আরামবাগে যাচ্ছে, কিন্তু মেলেরিয়া ঢুকতে পারে নি।

আর যদি বলি শুধাতে ও গরমে মেলেরিয়া-বাহক মশককুল ধ্বংস হয়েছিল, তাই বা কি করে' সম্ভব হয়? কারণ গত বছর মশা কমতে দেখি নি। আর বেছে বেছে শুধু মেলেরিয়া-বাহক মরে'ছিল তাও ত সম্ভবপর হয় না। এ সকল বিষয় স্বাস্থ্যবিভাগের ডাক্তারদের তদন্তের ব্যোগ্য।

যদি বাস্তবিক এই স্বসংবাদ সত্য হয়, তাহ'লে এই অবস্থা রাখতে পারা যাবে কি? ডিষ্ট্রিক-বোড ও ইনান-বোড মনোযোগী হ'লে কিছু দিন রাখতে পারবেন। কোন গ্রামে দু-একটি রোগী দেখবামাত্র তাকে কুইনিন খাইয়ে হ'ক, আর যে কোন রকমে হ'ক, শীঘ্র রোগমুক্ত করা উচিত হবে। কিন্তু সে উদ্ভোগ ঘটবে বলে' মনে হয় না। অতএব মেলেরিয়া-নাশের জন্য ইন্ডের অকুপাই এক ভরসা। কিন্তু বিপদ এই, শুষ্ক হ'লে ধান হয় না, লোকে খেতে পায় না। অতিবৃষ্টি হ'লে ধান হয়, পেটে পিলেও হয়। এখন মেলেরিয়ায় লোক তত ক্ষয় হয় না, জীবনমৃত হয়ে থাকে। কিন্তু নিমোনিয়া হ'লে রক্ষা পায় না।



স্বয়ম্বর।

ত্রিবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রাণুর বিবাহ। তিন দিন ধরিয়া বোশনচৌকির বাজনা,—
বাড়ী-ঘর-দুয়ার সুরে সুরে ভরাট হইয়া গিয়াছে। সুর কি
ভাবে মনের মধ্যে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া যেন ঝঙ্ক ঝঙ্ক
করিতেছে।

গায়েলুদের দিন মেয়েদের প্রীতিভোজ। যে-ব্যাপারটি
সুরের মধ্য দিয়া আহুত সেটি যেন রাণুকে আরও পরিপাটি
করিয়া ঘিরিয়া ফেলিতেছে। সে যতই সঙ্কুচিত হইয়া ঘরের
কোণ খুঁজিতেছে, বাড়ীর যত প্রাঙ্গণ, যত আদ্বান যেন তারই
অভিমুখী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—“কোথায় গেল সে ?”
...“ওমা! তুই নিশ্চিন্দ হয়ে একঠায় বসে আছিস ?—
কি বলে গেলাম একুশি ?”...নিমন্ত্রিতদেরও ঐ এক খোঁজ—
“রাণুকেই যে দেখছি না...এই যে !...দেখেছ ? এক দিনেই
কত বদলে যায় ?” ...“হুঁ, পুষলে পাষলে, এবার কাটল
মায়া; কিছু নাঃ, কাকের কোকিলছানা পোষা দিদি .”

শুধু রাণু, রাণু আর রাণু...

বিবাহের দিন সমস্ত ব্যাপারটি তাকে আবও নিবিড়তর
ভাবে ঘিরিয়া ফেলিল। বর আসা থেকে আরম্ভ করিয়া
সবাইকে দেওয়া-খোওয়া, বসান-খাওয়ানার মধ্যে যা কিছু
উৎসব, ব্যস্ততা, টেচামেচি, হাসি, বচসা—সমস্তর মধ্যেই রাণু
যেন কি একটা গুট অলক্ষ্যে উপস্থিত আছে। তার পব
আসল বিবাহের ব্যাপারটি,—রাণু তো সেখানে সর্কেশ্বরী—
সবাইকে যেন নিশ্চিন্দ করিয়া দিয়াছে, ছোট বড়, গুরু লঘু
সবাইকে।

অথচ এই রাণু সেদিন পর্য্যন্ত সংসারের আর সব ছেলে-
মেয়েদের মধ্যে মাত্র অপর এক জন ছিল। সংসারের কাজে-
কাজে আধময়লা কাপড় পরা—খোঁজ পড়িয়াছে ফরমাসের
জন্ত—কাজের অবহেলা কিংবা ভ্রান্তিতে থাইয়াছে বকুনি—
মুখভার করিয়া ফিরিয়াছে; তাও কাজের ভাগিদে কি
মুখটাই বেশীক্ষণ বিষন্ন থাকিবার অবসর পাইয়াছে ?

আদরের কথা ? হ্যাঁ, তা নেহাৎ যখন কাহারও অতিরিক্ত
রকমের ফুরসৎ, বোধ হয় ডাকিয়া এদিক-ওদিক দুটো প্রাঙ্গণ,
দুটো ঘিষ্ট কথা ..

বিবাহ জিনিষটা তাহা হইলে মন্দ নয় !—কেমন করিয়া
যেন মনে হয় একটি প্রদীপ জ্বালার কথা,—গান, উৎসব, শব্দ,
উল্খনির সঙ্গে যেন একটি আরতির দীপ দেবতার সামনে
আলোয় আলোয় বলমল করিয়া উঠিল।

আলোর কিন্তু একটা ছায়ার বিক আছে। ঠিক যেমন
আছে একটা দীপ্তির দিক। এই কথাটি ভুলিলে চলিবে না,
কেন না এই ছায়া-দীপ্তি লইয়াই তো জীবন।

বিবাহবাড়ীর দৃশ্যটা একবার ভাবুন, বিশেষ করিয়া
চারি দিকে নানা বয়সের যে মেয়েগুলি চলাফেরা করিতেছে
তাদের কথা।—সবচেয়ে ব্যস্ত, সবচেয়ে কলোচ্ছ্বসিত, কেহ
না চাহিলেও শুধু নিজের আনন্দের অতি প্রাচুর্য্যে সর্কজ
সঙ্করিতা—মনে হয় এরাই যেন উৎসবের প্রাণ। কিন্তু
সাধারণভাবে এ-কথাটা নভ্য হইলেও একটু লক্ষ্য করিলেই
দেখা যাইবে উৎসবের আলোটি সকলেব মুখে সমান ভাবে
ফোটে নাই। এমন কি একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে
এদের মধ্যে অনেকগুলি গস্তীর, নিশ্চিন্দ, এমন কি বিষন্ন
মুখেরও সন্ধান পাওয়া যাইবে। এইগুলির উপর আলোর
ছায়া পড়িয়াছে। এই ছায়াকে কি বলিবেন ?—হিসসা ?
যাহা ইচ্ছা হয় বলুন, সংজ্ঞায় কিছু আসে যায় না; আমি
এই ম্লানমাটুকুকে ছায়াই বলিলাম। রাণুর বিবাহ উপলক্ষ্যে
এই রকম একটি ছায়াপাতের কথা বলিব; অল্প কথা, কিন্তু
বড়ই কল্পণ।

এই হাস্যোজ্জ্বল উৎসব-রজনীতে একটি মেয়ের চিন্ত
ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে। তার কেন বিবাহ হয় নাই ?
কবে হইবে ? কবে তার চারি দিকে এই বামা, এই

কলোচ্ছ্বাস মুখর হইয়া উঠিবে? বিবাহ!—চিন্তাতেও সমস্ত চিন্তা এক মুহূর্তে ভরিয়া উঠে যেন। রূপকথার এমন প্রত্যক্ষ রূপ আর দেখা যায় না; একটি রজনীর মোহন স্পর্শের মধ্য দিয়া তার সব নগণ্যতা ঘুচিয়া যাইবে; রাগুর মত সেও রাণী হইয়া জাগিয়া উঠিবে। সেদিন আসিবে নিশ্চয়, এই রকম একটি রজনীর সোনার মুকুট মাথায় পরিয়া। কিন্তু কবে?—বিলম্ব তো আর সহ্য করা যায় না...

কিন্তু কাহাকেই বা বলিবে, আর কেই বা বুঝিবে তার মর্শ্বের কথা? সখীদের?—তারা আজ নিজের লইয়াই উন্নত, পরের কথা শুনিবার কি আর অবসর আছে? আর তা ছাড়া তাদের শুনাইয়া ফলই বা কি? তারা তো কোন সুরাহা করিতে পারিবে না।

তবুও চেষ্টা করিয়াছিল।—ওদের বাড়ীর রতি খুব সাজিয়াছে, মাথায় বকবকে জরির কিতা দিয়া রচিত খোঁপা, তাহাতে টকটকে একটা গোলাপ গৌজা; ঘাঘরা-করিয়া-পরা কাপড়ের আঁচল গতির চঞ্চলতায় পিছনে ফুৎফুৎ করিয়া উড়িতেছে, প্রজাপতির পাখনার মত; সিন্ধের কমাল,—কখন ব্লাউসে গৌজা, কখন কোমবে, কখন হাতে। চুলের, কমালের ও কেস-ক্রিমের মিশ্র গন্ধ যেন টেটে তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে।

ইহাকে বলিবার অনেক সুবিধা, তার পর যদি কথাটা ঘুরিতে ফিরিতে বড়দের কানে পৌঁছায়—রতিকে উপলক্ষ্য করিয়া যাহা বলিল তাহা যদি নিজের অন্তরের দূতীর কাজ করে...

“ইস, ভাবনে গেলি রতি!—কি ভেবেছিল বল দিকিন?”

“ওমা, ভাবব আবার কি? বিয়েবাড়ী, সবাই তোর মতন গোমড়া মুখ ক’রে বেড়াবে নাকি?”

“নাঃ, কিছু ভাবছ না! আমি ঠিক জানি মশাই। বলব কি ভাবছিল?—রতি ভাবছে—যদি রাগুর মত আমারও স্বস্তর এসে...”

ভিতর হইতে কে ইঁকিল, “মেয়েদের পাতা ক’রে ফেল...”

রতি সেই দিকে ছুটিয়া গেল, তার নিজের মনের রহস্য আর তাকে শোনান হইল না।

ভাজ অনেক সময় ঠাট্টা করে; এই সময় করিলে একটা উপকার হয়, লজ্জা-লজ্জা উত্তরের ছলে তবুও মনের ভাবটা কতকটা প্রকাশ করিয়া দেওয়া যায়। আজই কিছু বিবাহ হওয়া সম্ভব নয়, তবুও মনের অভিরুচিটা যদি জানা থাকে সবার তো...

তাকে পাওয়াই ছুফর। যদি পাওয়াই গেল তো এত ব্যস্ত যে ঠাট্টা করিবে কি? মরিবার ক্ষয়সং নাই। তবুও একবার মুখটা ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল, “হ্যাঁ রে, গুরুকম শুকনো মুখ ক’রে ঘুরে বেড়াচ্ছিস যে? আজ রাগুর বিয়ে হচ্ছে তাইতেই এই রকম, দু-দিন পরে যখন নিজের...”

“যাও, ঠাট্টা ভাল লাগে না বোদি।”

“ওমা, ঠাট্টা কি লা? দু-দিন পরে রাগু নিজের ঘর করতে যখন যাবে, মুখ শুকনো করা দূরে থাক, কেঁদেও কি ক্লান্তে পারবি?”

আর তবে কাহার কাছেই বা আশা? বাপ, মা এদের কাছে তো আর বলা যায় না? বাকী থাকে দাদু আর ঠাকুমা, একটির বিদায়েই তাঁদের যা অবস্থা, ওখানে তো বেঁধাই যাইবে না। তাহা ভিন্ন ঠাট্টা-বিজ্ঞপের মত মনে ক্ষুধা ফিরিয়া আসিতে ওদের ঢের দেরি এখনও, রাগুর ক্রোড়ে ফিরিবার পূর্বে তো নয়ই।

তখন মনে পড়িল মেজকা’র কথা। ও-লোকটা হালকা প্রকৃতির, কাজের যেমন উপযুক্তও নয়, তেমনি কাজের ভিড়ে ডাকও পড়ে না ওর। প্রচুর অবসর লইয়া কোন নিরিবিলি জাম্জাম গা ঢালিয়া পড়িয়া আছে নিশ্চয়। আর একটা মস্তবড় সুবিধা এই যে বিবাহ-সংক্রান্ত কোন কথা ভাল করিয়া বোঝে না বলিয়া ওর কাছে কথাটা পাড়ায় কোন সঙ্কোচের বালাই থাকিবে না। কেন যে মেজকা’র কথাটা আগে মনে পড়ে নাই!—বোধ হয় অমন অ-দরকারী লোককে টপ্ করিয়া কারও মনে পড়ে না বলিয়াই।

অবশ্য, অতটা বেকার নই আমি; তবুও, লজ্জার কথা হইলেও বলিতে হইতেছে অত কাজের ভিড়েও একটু নির্লিপ্ততা স্বজন করিয়া সেটুকু উপভোগ করিতেছিলাম। নিজের ঘরের বিছানায় শুইয়া, একটু চক্ষু মুদ্রিয়াও।

“মেজকা!” —ডাকে তন্দ্রাবেগটা কাটিয়া গেল।
আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুই এখানে যে ?
মেয়েদের পাভ করা হয়েছে, খেয়ে নিলি না কেন ? রাত
হয়েছে যে।”

“একেবারে খিদে নেই।”

“কেন ?...আচ্ছা, একটু মাখার চুলগুলো ধ’বে আশ্বে
আশ্বে টেনে দে দিকিন।”

একটু পরে।

“মেজকা!”

আলস্যের স্বরে উত্তর করিলাম, “হুঁ।”

“যুমুচ্ছ ?”

উৎসাহিত করিবার জন্ত বলিলাম, “হুঁ। বেশ মিষ্টি
হাতটা রে তোর। জানতাম না।”

“না, সে কথা বলছি না।”

“তবে ?”

আর একটু চুপচাপ গেল। আবাব তন্দ্রাটা বেশ
জমিয়া আসিতেছে।

“মেজকা, আমার বিয়ের জোগাড় ক’রে দেবে ?”

তন্দ্রা ছুটিয়া একেবারে উঠিয়া বসিলাম। এ যে চার-
পো কলি।

কিন্তু কেন তা বলিতে পারি না, কোন রূঢ় উত্তর দিতে
কেমন যেন মন সরিল না। বোধ হয় মনে করিলাম এটা
নিজের নিলজ্জতার নিদর্শন না-ও হইতে পারে ; সম্ভবতঃ
উৎসবের ছোয়াচ লাগিয়াছে ; না হইলে—রাগুর চেয়েও
ছোট—বিবাহের আর ও কি বোধে ?

উৎসবের স্মৃতি ভাঙিতে কেমন কেমন বোধ হইল।
পরে এক দিন না-হয় সমস্ত বিষয়টির অনৌচিত্যটা বুঝাইয়া
দিলেই হইবে। একটু নীবব থাকিয়া বলিলাম, “তোমার
বিয়েটা হয়ে গেলেও তো আমরা আরও নিশ্চিন্দ হতাম।
আজ, না-হয় কাল তো দিতেই হবে ; কিন্তু সে তো আর
অল্প কথায় হয় না মা। দেখলেই তো বাণুব বিয়েতে
খরচের হিড়িকটা ? নিজেদের খরচ তো আছেই, তা
ভিন্ন তোমাদের খণ্ডরেরা তো হা করেই আছেন, অল্প
দিয়ে কি আর পেট ভরান যাবে ? চাই এক কাড়ি
পয়সা...”

“তুমি উঠে বসলে কেন মেজকা ? শোও না ওদিকে
মুখ ক’রে, আমি শুড়শুড়ি দিচ্ছি।”

বুঝিলাম মৃধোমুখি হইয়া প্রসঙ্গটা চালাইতে পারিতেছে
না। আহা, সভ্যই কি এতটা বেহায়া হইতে পারে ?
হোক না এ-মুণ, হোক না সে মদার্প।

একটু প্রসঙ্গভাবেই শুইয়া পাশ ফিবিলাম। বুঝিলাম
ছ-জনেব মধ্যে একটি লম্বু তন্দ্রার পর্দা সৃষ্টি কবিবার চেষ্টা
এটা। ভাল। একটু পরে ডাক হইল, “মেজকা, যুমুচ্ছ ?”
কৃত্রিম জড়িত কণ্ঠে বলিলাম, “না—বল...”

একটু থামিয়া উত্তর হইল, “পয়সা আমি জোগাড় ক’বে
রেখেছি মেজকা, তোমাদের ভাবতে হবে না।”

সর্বনাশ ! আমার বিষয় আমার যেন ঠেলিয়া তুলিয়া
দিল। দুই কহুইয়েব উপর ভর দিয়া অর্জ্জমান ভাবে
উঠিয়া পড়িলাম এবং চক্ষু বিক্ষুব্ধ করিয়া প্রশ্ন করিলাম,
“পয়সা জোগাড় ক’রে রেখেছিল ? সে কি রে ॥ তুই
কবে থেকে এ-মতলব আঁটহিস ? একটা বিয়ের খরচ
জোগাড় করেছিল বলছিল ; সে তো চাউড়খানি পয়সা
নয়।”

নিশ্চয় একটা মস্তবড় বাহাহুরি জাবিল ; না হইলে এ
পরে আর উত্তর দিত না।...আজকালকার মেয়ে !

একটু তেরছা হইয়া বসিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইল।
তার পর ঘাড়টা ঈষৎ নীচু করিয়া বলিল, “অনে—ক
আছে ; অনেক দিন থেকে জমাচ্ছি।”

প্রবল চৌতুল হইল। বলিলাম, “সত্যি নাকি ? নিয়ে
এসে দেখাতে পারিস ? তোর কাছে ; না তোর মার কাছে
আছে ?”

“না, আমার কাছেই আছে, আনিছি।”

আপনাদের অবস্থাটা বুঝিতেছি ; কিন্তু সাক্ষাৎপ্রাপ্ত
আমার তখনকার মনেব অবস্থাটা কল্পনা করিতে পারেন
কি ? বিশ্বাস করিতে আপনাদের বোধ হয় মনের উপর খুব
একটা ট্রেন পড়িতেছে। কিন্তু যা হাওয়া বহিতেছে, সবই
সম্ভব। আজ বাহা শুনিতেছেন, কাল যদি তাহা নিজেই
প্রত্যক্ষ করেন তো কিছুই আশ্চর্য্য হইবার নাই। গুরু-লম্বু
ভেদ আর ইহার রাখিবে না ; তা হ-হতাশ করিলে আর
উপায় কি ?

একটু পরে একটি মাখনের রঙের ক্যাশবাস্ম আসিয়া হাজির হইল। এটা চিনি, গর বাপের দেওয়া; মেয়েটিকে বড় ভালবাসে। অত ভালবাসা, অত আশ্চার্যই বোধ হয় এই পরিণাম।

ভালা খুলিয়া বাস্ফটা সামনে ঘুরাইয়া ধরিয়া দ্বিতহাস্তের সহিত আমার মুখের উপর চক্ষু তুলিয়া চাহিল; বিজয়ের আনন্দে সঙ্কোচের অবশেষটুকুও অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

সত্যই! বাস্কের খোপে খোপে ক্রমাল, জ্বাকড়া আর কাগজের ছোট-বড় একরাশ মোড়ক; একটি জ্যালজেলে ফরসা নেকড়ার গ্রন্থির মধ্যে যেন স্পষ্ট গিনির ধাক্ কিক্মিব করিতেছে !!

ভূমিকাটা এই পর্যন্ত থাক। হ্যাঁ, এটা আমার গল্প নয়, একটা বিজ্ঞাপন মাত্র—এ পর্যন্ত যাহা বলিলাম সেটা তার ভূমিকা।

নিজ বিজ্ঞাপনটি এই :—

আমার একটি সাত বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্রী বর্তমান, নাম ডলী রাণী। ছিপছিপে শ্রামবর্ণ; পিঠের অর্ধেক পর্যন্ত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বেশ। এদিকে মেয়েটি খুব গোছাল, কেননা নিজের বিবাহের জন্তই পাই আখলা পয়সায় অনে—কঙলি তান্ত্রখণ্ড সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে—এতুনে সওয়া এগার পয়সা! সুতরাং একেবারেই যে খালি হাতে কস্তা গ্রহণ করিতে হইবে এমন নয়। হৃদয়বান যদি কোন বরের বাপ থাকেন তো সম্মতি জানাইলে স্থখী হইব।

একটু গোল আছে আবাব এর মধ্যে, সেটাও পূর্বাঙ্কেই বলিয়া রাখা ভাল। শুধু হৃদয় থাকিলেই চলিবে না,—ডলীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা খণ্ডনের খুব কালো রঙের উপর মাখায় খুব চক্চকে একটি টাক থাকা চাই। কি করা যায়? ভিন্নকিচিহ্ন লোকঃ।

তাই, যদি এরূপ জিজ্ঞাসাত্মক কেহ থাকেন তো আশা কবি অবিলম্বেই পত্রাচার আরম্ভ করিয়া বাধিত করিবেন।

কথা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অনাদি সৃষ্টির মহালীলা দ্বন্দ্ব-উৎসব ঘিরিয়া
 যুগযুগান্তব ধরি যেই ধ্বনি উঠে নিশিদিন;
 মন্ত্র হয়ে সাধনায় রূপ নিল মানবের মনে
 লোকলোকান্তর ব্যাপি কালবক্ষে হয়ে র'ল লীন।
 নিম্নে কোটি বস্তু ঘিরি উঠে নিত্য সঞ্চাতের নাদ;
 উর্দ্ধে কোন্ বাতুর তাই দিয়া বাজাইছে বীণা;
 নরকর্মে মূহমূহ যে-স্বনিটি নিত্য থেমি যায়
 গগনের বাক্ষর্যে নিত্য সে যে হয়ে রয় লীনা।

মর্ত্য জপে ধ্যানমগ্ন মনে তার নিবিড় কল্পনা,
 বাস্তবিত্তে ধরিতে গিয়া বন্দী হয় অশ্বরের তলে;
 উর্দ্ধে হাসে ভাবরাজ্য মর্ত্যালোকে ঝঙ্কারিছে ভাষা
 স্মৃতিকা ও শূন্তে এই লুকোচুরি নিত্য খেলা চলে।

শূন্তের অনাদি স্রব মর্ত্যালোকে বাজে হয়ে বাণী,
 শ্রেষ্ঠ সেই কথা যেই তারি বাণী নিত্য দেয় আনি।

ভাষারহস্য

শ্রীবীরেশ্বর সেন

দাদা এবং দদাই একই শব্দ—স্থানবিশেষে ভিন্নরূপে উচ্চারিত হয়, কিন্তু বাঙ্গলা দেশে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দাদা বলে আর আসামে এবং উড়িষ্যায় জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অর্থাৎ পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দদাই বলে। সেইরূপ, বাঙ্গলায় পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কাকা বলে কিন্তু আসামে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ককাই বলে। বাঙ্গলায় তাম্বুলের অর্থ পান কিন্তু আসামে তামূল অর্থাৎ তাম্বুল বলে স্থপারিকে। বাঙ্গলায় নিকটবর্তী স্থান বা বস্তু সম্বন্ধে এখানে, ইহা, এটা, এই প্রভৃতি শব্দ এবং দূরবর্তী স্থান সম্বন্ধে ওখানে, উহা, ওটা, ঐ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয় কিন্তু শ্রীহট্টে নিকটবর্তী স্থান সম্বন্ধে ওখানে, উহা, ওটা, ঐ এবং দূরবর্তী স্থান সম্বন্ধে এটা, ইহা, এই প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। শ্রীহট্টে বাঙ্গলকে বলে আলমারি এবং মাংসের ব্যঞ্জনকে বলে মোরোকা। বিহারের শাহাবাদ জেলায় মাংসকে বলে কালিয়া।

আরও আশ্চর্য্য এই যে মলায়ালাম্ ভাষায় মুখকে চোক্ এবং চক্ষুকে বলে মুখ, কানকে বলে নাক এবং নাককে বলে কান্।

বহুপ্রিয় বাঙ্গালীরা কোতুক করিয়া বলিয়া থাকেন যে যে-সকল প্রদেশে বাঙ্গলায় প্রচলিত অর্থের বিপরীত অর্থ কোনও কোনও শব্দের প্রয়োগ হয় সে দেশে পূর্বে কোনও ভাষাই ছিল না এবং সেই সকল প্রদেশ হইতে কয়েকটি লোক ভাষা শিক্ষা করিতে গিয়া স্ব স্ব প্রদেশে ফিরিয়া যাইতে যাইতে অনেক শব্দের অর্থ ভুলিয়া গিয়া তাহার বিপরীত অর্থ করিয়া স্বদেশবাসীকে ভুল শিক্ষা দিবার ফলে এইরূপ হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালীরা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন যে বাঙ্গালীরা যেমন বিপরীত এবং ভিন্ন অর্থে বহু শব্দ ব্যবহার করেন তেমন আর কোনও দেশের লোকই করেন না। আমরা রাগ বলি ক্রোধকে, কিন্তু রাগ শব্দের প্রকৃত অর্থ অমরাগ বা ভালবাসা যাহা ক্রোধের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা সংবাদ বলিলে

বৃষ্টি সমাচার, বার্তা, খবর, কিন্তু সংবাদ শব্দের প্রকৃত অর্থ কথোপকথন। পূর্বে বাঙ্গলা দেশেও কথোপকথন অর্থে এই শব্দটি প্রযুক্ত হইত পঞ্জিকার হরপার্বতীসংবাদ অনেকেই দেখিয়াছেন। উহার অর্থ হঃ ও পার্বতীর মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল। গীতাক কৃষ্ণার্জুনসংবাদ বলে। ইহা গীতাতেই একাধিক বা উল্লিখিত আছে এবং ইহার অর্থ কৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল।

আমরা শ্রালককে সম্বন্ধী বলি, কিন্তু বাঙ্গলার বাহিরে সম্বন্ধী বলে পুত্র বা কন্যার স্বত্তরকে অর্থাৎ আমরা যাহাকে বৈবাহিক বলি। সংস্কৃত উত্তরচরিত নাটকেও দশরথ এবং জনক-পরম্পর সম্বন্ধী ছিলেন বলিয়া উক্ত আছে।

আমরা ঘর্ম্ম এবং তাহার অপভ্রংশ ঘাম বলি স্বদেশকে। কিন্তু ঘর্ম্ম শব্দে সংস্কৃতে উত্তাপ বুঝায় হিন্দুস্থানে চলিত ভাষার অপভ্রংশে ঘাম বলিতেও উত্তাপ বা গরমই বুঝায়। হিন্দুস্থানীরা “বড়া ঘাম হায়” বলিলে বাঙ্গালীরা যেন এইরূপ না বোঝেন যে ঘেদের কথা বলা হইতেছে। সংস্কৃত ঘর্ম্ম শব্দের সদৃশ গ্রীক থের্ম্‌স্, ইংরাজী ওয়ার্ম্‌, ফার্সী উর্দু বাঙ্গলা গরম শব্দ। আমার বোধ হয় কালিদাস মেঘদূতের ১৬২ শ্লোকে যেদ অর্থেই ঘর্ম্ম শব্দ চালাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। শ্লোকটার ব্যাখ্যা এইঃ—কৈলাস-শিখরে সুরসুবতীগণ একত্রে মেঘ ধরিয় তাহাতে তাঁহাদের নিজের বলয়ের হীরকাংশ দিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া জল বাহির করিতেছিল। সেই ঘর্ম্মলব্ধ মেঘকে বর্ষ তাহারা ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক হয় তাহা হইলে মেঘ যেন গর্জন করিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখায়। টীকাকারেরা সকলেই এখানে ঘর্ম্ম শব্দের অর্থ গরম বলিয় উল্লেখ করিয়াছেন। তথাপি আমার বোধ হয় যে সেই শ্লোকে যেদ বুলিলে অর্থটা ভাল হয়। হিমালয়শিখরে উত্তপ হওয়ার সম্ভাবনা বোধ হয় নাই, অল্প পক্ষে মাথার ঘাম অর্থাৎ ঘেদ পায়ে

ফেলিয়া উপাধ্বনের কথা বলিয়া থাকি, ইংরেজীতে sweat of the brow, হিন্দীতে পেশানীকা পসিনা কথা আছে। অর্থাৎ যাহাতে এমন পরিশ্রম করিতে হয় যে তাহাতে স্বেদোদগম হয়। দেবকন্তারা এক খণ্ড মেঘ ধরিবার জন্য এরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহাদের স্বেদোদগম হইয়াছিল। এই অর্থটাই গরমের সময়ে মেঘ ধরার অর্থ অপেক্ষা ভাল বলিয়া আমাব বোধ হয়। এই শ্লোকে কালিদাস যদি সাহস করিয়া স্বেদ অর্থে মেঘ শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বাঙ্গালী ছিলেন।

আমরা কথোপকথন অথবা পরিচয় অর্থে ‘আলাপ’ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু আলাপের প্রকৃত অর্থ রাগ-রাগিণীর সাধন।

‘আমোদ’ শব্দের অর্থ সুগন্ধ, কিন্তু আমরা প্রমোদ বা রসিকতা অর্থে আমোদ বলিয়া থাকি।

‘প্রশস্ত’ শব্দের অর্থ ভাল, কিন্তু আমরা প্রশস্ত অর্থাৎ চণ্ডা অর্থে শব্দটা প্রয়োগ করিয়া থাকি।

‘সহজ’ শব্দের অর্থ সহজ জ্ঞাত, কিন্তু আমরা অনায়াস বা অল্পায়াস সাধ্য অর্থে সহজ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। অতি সাবধান লেখকেরাও কোন-না-কোন রূপে উক্ত ভুল অর্থে সহজ শব্দের ব্যবহার হইতে মুক্ত নহেন। বাঙ্গলা দেশের এক জন সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আমাকে বলিলেন যে তিনি কখনই ভুল অর্থে সহজ প্রয়োগ করেন না। কিন্তু তাঁহার লেখাতে আমি অনায়াস বা অল্পায়াস অর্থে অর্থাৎ adverb রূপে সহজ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি।

‘সুতরাং’ শব্দের অর্থ বিশেষরূপে বা অধিকরূপে; কিন্তু আমাদের সুতরাং শব্দের অর্থ অতএব বা এই হেতুতে। আমার কখনও কখনও মনে হইয়াছে যে আমাদের ‘সুতরাং’ শব্দ হয়ত প্রথমে a fortiori শব্দে প্রযুক্ত হইয়াছিল।

এক জন প্রধান কবি না-কি শেষরাত্রি অর্থে প্রদোষ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন অথচ শব্দটার অর্থ সন্ধ্যাকাল।

‘আদৌ’ শব্দের অর্থ আদিতে, কিন্তু আমরা মোটেই বা কিছুমাত্র অর্থে শব্দটার প্রয়োগ করিয়া থাকি।

‘হিসা’ শব্দের অর্থ বধ করা, কিন্তু আমরা বেশ পোষণ করাকে হিসা বলি।

‘প্রমাদ’ শব্দের অর্থ ভুল, কিন্তু আমাদের প্রমাদের অর্থ বিপদ। যে ব্যক্তি ভুল করিয়াছে তাহাকে প্রমত্ত বলা উচিত কিন্তু আমরা প্রমত্ত বলি অহংকৃত বা গার্বিত লোককে।

যে কবে সে কর্তা। Nominative-কেও কখনও কখনও কর্তা বলা হয়, কিন্তু আমরা কর্তা বলি অধিকারী অর্থাৎ স্বামীকে। গৃহস্বামীকে বাড়ীর কর্তা বলি। ‘কর্তা’ শব্দের কথা লিখিতে লিখিতে একটা গল্প মনে পড়িল। এক পণ্ডিত কোন স্থানে যাইতে যাইতে দেখিলেন যে পথপার্শ্বে এক বাড়ীতে মহাভারতের কথা হইতেছে। পণ্ডিত কথা শুনিবাব জন্য সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন এবং কথক মহাশয়ের ব্যাখ্যা শুনিয়া বুঝিলেন যে কথক সংস্কৃত কিছুই জানেন না। একটা শ্লোকের ব্যাখ্যা এত অসুতরূপে ভুল হইয়াছিল যে তাহা শুনিয়া পণ্ডিত থাকিতে না পারিয়া কথককে সঙ্কোচন করিয়া বলিলেন, মহাশয় আপনার ব্যাখ্যাটা ঠিক হয় নাই, দেখুন দেখি ঐ শ্লোকের মধ্যে কে কর্তা। কথক শ্রোতাগিকে বলিলেন, তোমবা কি এমন নিকোঁধ এবং মূর্থ আর কোথাও দেখিয়াছ? সমস্ত মহাভারতের কর্তা বেদব্যাস। সমস্তের কর্তা যিনি খণ্ডের কর্তাও অবশ্যই তিনি। সুতরাং এ শ্লোকের কর্তাও অবশ্যই বেদব্যাস। এ সামান্য কথাটাও এ লোকটা জানে না। ইহাকে মহাভারত শুনিতে দেওয়াও অসুচিত। তখন শ্রোতার সাক্ষ্যে মিলিয়া সেই পণ্ডিতকে তাহাদের মধ্য হইতে বাহির করিয়া দিল।

‘যথেষ্ট’ শব্দের অর্থ যত প্রয়োজন ততমাত্র। কিন্তু সংবাদ-পত্রে সর্বদাই দেখিতে পাই যে অভ্যস্ত অর্থে শব্দটা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন নিরপরাধ লোককে ধরিয়া যথেষ্ট প্রহার করা।

বাঙ্গলা দেশে প্রায় সকলেই পট্টিকে (puttik) বলে পুড়ি। ‘ধার্মিক’ শব্দটা ব্যাকরণ অনুসারে মনুষ্যের প্রতি প্রযোজ্য, কিন্তু দুই জন শ্রেষ্ঠ লেখক ‘ধার্মিক কার্য’ লিখিয়াছেন।

পূর্বে যত ব্যক্তিকে ঈশ্বরপ্রাপ্ত বলা হইত। কয়েক বৎসর হইল তাহার পরিবর্তে স্বর্গীয় লেখা হইতেছে। এইরূপ লেখা যে ভুল তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই উপলব্ধ

হইবে। স্বর্গগত অথবা স্বর্গত বলিলে ভুল হয় না এবং সাবধান লেখকেবা তাহাই লিখিয়া থাকেন।

কাহারও মৃত্যু হইলে, বিশেষতঃ পিতা অথবা মাতার মৃত্যুর পর, কয়েক দিন বাঙ্গলা দেশের হিন্দুরা স্বীয় বিশ্বাস অনুসারে অতি গুচি ভাবে থাকেন, মাছ-মাংস খান না, নিম্নজাতীয় লোককে স্পর্শ করেন না, যেখানে সেখানে আহার করেন না অথচ সেই সময়টিকে বলেন অশৌচ—ইহাও একটা মন্তু ভুল। এই বিষয়ে আমি স্থানান্তরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

এক প্রদেশেরই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কোন কোন শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমবা কঙ্কাকে বলি মেয়ে, কিন্তু রাঢ়ে মেয়ে বলে জীকে।

অনেক সময়ে লোকে নিজের দেশের কথা ভুলিয়া যায় এবং সেই সকল কথাব নূতন অর্থ করিয়া থাকে। অবিবাহিত বালক-বালিকাকে আইবড় বা আইবুড় বলিত। কিন্তু গঙ্গাশ বৎসর পূর্বে বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রে আইবুড়-ভাত স্থলে আয়ুবুদ্দাম লেখা হইত, ‘আইবুড়’ শব্দটা যে অব্যুৎ শব্দের অপভ্রংশ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই এবং তাহার অর্থ অবিবাহিত।

এত বড় ঘর বড় আইবড় ঝি

বিবাহ না হইলে পরে লোকে কবে কি।

এই কবিতার ‘আইবড়’ শব্দের অর্থ যে অবিবাহিত তাহা সম্পূর্ণ স্পষ্ট। আবার ‘ঝি’ শব্দের অর্থ যে কঙ্কা তাহাও এখানকার অনেক বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে এক জন বাঙ্গালী টেটস্‌ম্যান পত্রে, ঝিকে মেয়ে বোকে শেখান, এই কথাটার অর্থ করিতে গিয়া ঝি শব্দের অর্থবাদ করিয়াছিলেন maid-servant। বাঙ্গালীরা বাড়ীর চাকরাণীকে ঝি বলিতে আবাস্ত করিয়াছিলেন যেহেতু চাকরাণীর প্রতি কঙ্কার মত ব্যবহার করা উচিত বলিয়া তাহার মনে করিতেন। এই শব্দটিতে বাঙ্গালীদের মনের উচ্চ ভাবই প্রকাশ পায়।

‘অহল্যাজার’ ইঙ্গের একটা নাম। কালে হিন্দুরা এই বৈদিক নামের অর্থ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পৌরাণিকেরা ইঙ্গের নামে এক জঘন্ত কলঙ্ক আরোপ করিয়া এক গল্প সৃষ্টি করিলেন। সেই গল্প এখন সকলেই বিশ্বাস করে।

মহাপণ্ডিত কুমারিলভট্ট দেখাইয়াছেন যে ‘অহল্যা’ শব্দের অর্থ রাজি এবং পরম ঐশ্বর্য্য জ্ঞাপক ইন্দ্ৰ ধাতু হইতে নিঃসৃত ইন্দ্র শব্দ সূর্য্যেরই নামান্তর। সেই সূর্য্য রাজিকে জীর্ণ অর্থাৎ ক্ষয় করেন বলিয়া তাহার এক নাম অহল্যাজার।

পূর্বকালে মাংস দিয়া জাদু হইত। কলিকালে পল-পৈত্রিক অথবা মাংসজাদু নিষিদ্ধ, এই জন্ত বাঙ্গলা দেশে মাংসের বিকল্প করিয়া কলা পোড়াইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং তোমার গুপ্তির জাদু করছি, তোমার পিণ্ডি চট্‌কাছি প্রভৃতি গালাগালি যে পর্যায়ের, কলা পোড়া খাও গালাগালিও সেই পর্যায়ের। বাঙ্গালীরা অনেকই এই শেষ গালাগালিটার ব্যুৎপত্তি জানেন না।

সংস্কৃতের যে কত শব্দের অর্থ বিস্মৃত হওয়ায় সেইগুলি ব নূতন এবং অসম্ভব ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এ প্রবন্ধে আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার স্থান নাই, এই জন্ত আমি ভাষা-বিষয়ে আর একটি মাত্র কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহাব কবিব।

কয়েক বৎসর হইতে মধ্যে মধ্যে শুনা যাইতেছে যে আমাদের বাঙ্গলা ভাষা ত্যাগ করিয়া হিন্দী ভাষা অবলম্বন করা উচিত, এমন কি অন্ততঃ রাজনীতিবিষয়ক আলোচনার জন্ত সমস্ত ভারতে ইংরেজীর পরিবর্তে একমাত্র হিন্দী ভাষার প্রচলন হওয়া উচিত। এইরূপ চেষ্টা কংগ্রেস হইতে ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। এই চেষ্টাটা কেবল যে কখনও সফল হইবার সম্ভাবনা নাই এমন নহে, এইরূপ চেষ্টা হওয়া উচিত বলিয়াও আমি মনে কবি না। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক আমরা সকলেই ইংরেজী শিক্ষা করিয়া থাকি। ইহা যে কেবল অর্থ উপার্জ্জনের জন্ত বরি তাহা নহে, জ্ঞান শিক্ষাব জন্তও কবি। কেননা ইংরেজী সাহিত্য ভারতের যে-কোন ভাষার সাহিত্য অপেক্ষা সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। ইহা সমুদ্রসদৃশ বিশাল এবং গভীর। ইংরেজী ত্যাগ করিলে আমাদের জ্ঞানলাভের পথ রুদ্ধ হইয়া আমাদের সর্বনাশ হইবে। আমাদের উভয় ফুলই নষ্ট হইবে। যোদ্ধাবানি পরিত্যজ্য অঙ্গবানি নিষেবতে ইত্যাদি শ্লোকটা সকলেই জানেন। কেবল ভাষাবিষয়ক উৎকর্ষ অপকর্ষের কথাই ধরা যাউক। হিন্দীতে বাঙ্গলা ভাষা অপেক্ষা বিভক্তির সংখ্যা অনেক, এই জন্ত বাঙ্গলা অপেক্ষা হিন্দীর প্রাধান্য

অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে বাঙ্গলা যেমন অঙ্গহীন, হিন্দীও তেমনই অঙ্গহীন ভাষা। বাঙ্গলার সর্বনামেও যেমন লিঙ্গের পার্থক্য নাই, হিন্দীরও তেমনই। ইংরেজীতে He ও She এবং সংস্কৃত সঃ এবং সা একটা পুংলিঙ্গ আর একটা স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু বাঙ্গলায় এবং হিন্দীতে কেবলমাত্র একটা শব্দেই পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ বুঝায়। হিন্দী ভাষার আরও একটা গুরুতর অসুবিধা শব্দের লিঙ্গভেদ। সংস্কৃত আত্মা, জয় প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ, কিন্তু হিন্দীতে এগুলি স্ত্রীলিঙ্গ। এই জন্তই আমরা ‘গঙ্গামায়ীকী জয়’ শুনিতে পাই—অর্থাৎ জয় শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া তাহার বিশেষণও স্ত্রীলিঙ্গ। হিন্দীতে পুস্তক বহি প্রভৃতি অগণিত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। স্ত্রীবোধক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুংবোধক শব্দ পুংলিঙ্গ হওয়া উচিত। কিন্তু অকারণে শব্দের লিঙ্গভেদ বড়ই হুস্তিহীন। সংস্কৃতে ‘কলত্র’ শব্দের অর্থ স্ত্রী, কিন্তু কলত্র শব্দটা স্ত্রীবলিঙ্গ। ‘দার’ শব্দের অর্থও স্ত্রী, কিন্তু দার শব্দটা পুংলিঙ্গ। এইরূপ হুস্তিহীন লিঙ্গ-সংবলিত হিন্দীভাষা আমাদের নিজেদের ভাষা ত্যাগ করিয়া কেন অবলম্বন করিব? হিন্দীর আর একটা অসুবিধাজনক বিশেষত্ব এই যে উহা বক্রিপদেও কর্তার

লিঙ্গ দিতে হয়। নদীবা বহতী ইহা অর্থাৎ নদী সকল বহিতেছে।

এক জন শিক্ষিত হিন্দুস্থানীর সহিত আমার এই বিষয়ে কথা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, ইংরেজী বিদেশী ভাষা, এই জন্ত ইংরেজীকে আমরা ভারতের সার্বভৌম ভাষা কবিত্তে চাহি না। ভারতের একটা ভাষাকেই সার্বভৌম ভাষা করা উচিত এবং হিন্দী সেই ভাষা হইবার উপযুক্ত, যেহেতু তাহা অধিক লোকের ভাষা। তাঁহার এই উক্তির উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, কেবল বিস্তার দেখিয়াই একটা ভাষা গ্রহণ করা উচিত নহে। ভাষার ধ্বনিসম্ভব স্বগমতা, সর্বাঙ্গপূর্ণতা প্রভৃতি গুণ দেখিয়াই নির্বাচন করা উচিত। সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল এই সকল গুণ দেখিয়া যদি ভাষা নির্বাচন করিতে হয়, তাহা হইলে বোধ হয় খাসিয়া ভাষা সর্বোৎকৃষ্ট। দুই মাসে যে-কোন যুবক ইহা শিখিতে পড়বে। ইহার গঠন স্বাভাবিক এবং ইহাতে বিভক্তির জ্ঞান নাই। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত ভাষাবিদ পণ্ডিতদ্বিগের মত প্রকাশ করিতে অস্বরোধ করি।

হয়ত

“বনফুল”

মুখেতে যে-কথা যায় নাক বলা
চোখেতে সে-কথা কহে
চোখেও যে-কথা পারে না বলিতে
বাতাসে সে-কথা বহে।
সাঁঝের বাতাসে হয়ত আজিকে
তোমার মনের কথা

ভাসিয়া আসিয়া আজি মোর মনে
তুলিয়াছে আকুলতা।

তাই আজি সখি অকারণে বুঝি
মনেতে ফুটিছে ফুল
চোখের সমুখে ছলিছে তোমার
কানের দোতুল ছল।

মহাষ্টমী

শ্রীতারাপদ রাহা

গড়াই হইতে আরম্ভ করিয়া নবগঙ্গা পূর্ণাঙ্ক জলে একাকার হইয়া গেছে। গড়াইয়ের জল কুমারে, কুমারের জল নবগঙ্গায় মিশিতেছে। এক দিন যে এ পৃথিবীতে সবুজ তৃণ ও ধূসর মাটির পথ ছিল লোকে সে কথা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে। মেয়েদের জল আনিতে আর নদীতে যাইতে হয় না, বাড়ীর পাশে যেখানে একটু বেশী নীচু সেইখানে আর একটু খুঁড়িয়া কলসী ভরিবার ও স্নানের জায়গা করা হইয়াছে। যাহাদের বাড়ীর পাশ দিয়া 'নয়ন-জুলি' গিয়াছে তাহাদের আবার একটুও করিতে হয় না, তাহারা নয়ন-জুলিতেই কলসী ডুবাইয়া জল ভরে, নয়ন-জুলিতেই স্নান কবে আবার মাছ খবিতে সেইখানেই 'বিস্তি', 'বেনে', 'দোয়াড়ি' পাতে। দক্ষিণে মাঠের দিকে যেখানে বিল আসিয়া চাষীদের বাড়ীর উঠানে গা ঢালিয়া দিয়াছে সেখানে লোকে তালের ডোঙায় যাতায়াত করে, যাহাদের ডোঙা নাই তাহারা বড় বড় কলাগাছ কাটিয়া বাঁশের গৌড় দিয়া ভেলা তৈয়ার করিয়া লইয়াছে; বাঁশের লগি ঠোকরাইয়া ঠোকরাইয়া তাহাতেই এবাড়ী ওবাড়ী যায়, তাহাতেই হাট করিয়া কিবে।

বড়দের অবসরমানে ছোটরা ভেলা ও ডোঙা লইয়া গলিতে গলিতে খেলা করিয়া বেড়ায়, এত বড় বস্তাতেও তাহাদের রক্ত ঠাণ্ডা হয় নাই।

কিন্তু বড়দের রক্ত একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায়—যখন তাহারা তাকায় মাঠের দিকে। এত বড় যে বিল—'বড় বিলে'—তাহাতে একটু সবুজের আভা নাই, 'গো-বিলে',—'গড়ের-মাঠ'—'পদ্মবিলে'—সবই জলের তরঙ্গে ধু-ধু করিতেছে। মাঠের এত বড় বৈধব্যের বেশ গ্রামের অতি-বড় প্রাচীরেরাও না কি দেখেন নাই, এমন কি বাপঠাকুরদার কাছে শোনেন নাই পর্য্যন্ত।

'আকাল' এবার হইবেই, স্তবরাং যাহাদের একটু বয়স হইয়াছে তাহারা জলের দিকে তাকাইয়া নিজের আর আপন জনের পেটের কথা ভাবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায়

গিঁটওয়ালা কঞ্চি পুঁতির রাখা হা, জলের সমতলে গিঁট; কিন্তু সকালে দেখা যায় গিঁট ছাড়ি জল একটুও কমে নাই, মাঝে মাঝে বরং গিঁট ডুবাইয়া দেয়।

চাষীরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে, আল্লা কি পানিই দিল! ভদ্র-গৃহস্থেরও শঙ্কার বস্তু নাই, তাহাদের অধিকাংশের নির্ভর ঐ দক্ষিণের মঠ, যাহাদের স্বামী পুত্র বিদেশে চাকুরী করে তাহাদেরও তাকাইয়া থাকিতে হয় ঐ দক্ষিণের মাঠের দিকে, স্তবরাং তাহারাও চিন্তিত। ছেলে-মহলেও চিন্তার অস্ত্র নাই—জল যদি এমনিই থাকে তবে দুর্গাপূজায় আমোদ এবার একেবারেই হইবে না,—কলিকাতা হইতে বরেন, স্মৃদীর, প্রতুল সবাই আসিবে, কিন্তু থিয়েটার হইবে কোথায়? পঞ্চবটীর উঠান ত এখন জল থইখই করিতেছে,—বাগটী-বাড়ীও উঠান ত এখন 'বড়-বিলে'র একটি অংশ।

রায়-বাড়ীর মেজবৌ শান্তিলতার স্বামী বিদেশে চাকুরী করেন, তবু সেও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল ভ্রাতার সব সময়েই কুঞ্চিত হইয়া থাকে। বড়বৌ সেদিন তাহাকে মাছনা দিবার জন্য নিতান্ত ভাল মনেই বলিয়াছিল, অত ভাবিস্ নে লো, মেজবৌ, জীব দেছেন যিনি আহাঃ দেবেন তিনি,—আমাব ত সোনার জাগর, কিন্তু এ সারা গাঁয়ের মানুষগুলোর কথা ভাব দেখি একবার।

ঠোঁট উন্টাইয়া শান্তিলতা বলিয়াছিল, মাথার ঘায়েই কুহুব পাগল; নিজের ভাবনা ভাবিবেই থলকুল পাই নে,—আবাব সারা গাঁয়েই ভাবনা! এটো লোকের উপর এতগুলো লোকের পেট,—ভাব দ্যাখো না। তোমার এটো,—আমার চারতে—ঐ রেগা ভাস্কর,—আমরা তিন তিনভে,—চালির দাম ত বাড়লো বলে,—এত সব আঁসে কঁনতে ভাবি দ্যাখো না একবার

বড়বোয়ের স্বামী রসিকেব পক্ষাঘাত হইয়া এক অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে, বাঁ-হাত ও বাঁ-পা তিনি নাড়িতে পারেন না,

মেয়ে পনের উত্তীর্ণ হইয়া বোলয় পা দিয়াছে, বিবাহ না দিলে চলে না, অথচ স্বামী অশক্ত, নির্ভব করিতে হইবে দেবর হেমন্তের উপর—শান্তিলতার স্বামী। তাই কথাগুলি বড়বোয়ের তত ভাল লাগিল না, কথা সে একটাও বলিল না, কিন্তু নিজেরও অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, হাঃ, এবারই পূজায় সে কন্যা উষাকে একখানা ঢাকাই বুটাদার দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে,—ভাগ্যি রাত্ৰা ঠাকুবপোকে সে এ অল্পবোধ জানাইয়া চিঠি লেখে নাই।

ছোটবোী স্হাসিনী এশটি বেতের ধামিতে করিয়া চাল লইয়া এক হাতে পায়ের কাপড় তুলিয়া আধ হাঁটু জল বাঁচাইয়া বাগ্নাঘরে যাইতেছিল। মেজবোয়ের রাগ পড়ে নাই, তাহাকে দেখিয়া আবাব জলিয়া উঠিল, ঐ ত এক জন দাদাদের কথা না শুনে স্হমরী বোী বিয়ে ক'রে আনলেন, কিন্তু খাতি দেয় কেডা—তুনি ? কত দিন ত দুডোবেই পুষ্টি হ'ল—কই এক বছর ত বোজ্জগার করতি গেছেন, এট্টা ফুটো পয়সা দিখে ত সাহায্য কর্তি পারলেন না। গা আমার জলে যায়—

শান্তিলতার মেজাজ দেখিয়া বড়বোী ও ছোটবোী আশ্চর্য হইয়া যায়। স্বামী তার অন্নদাতা, স্ততরাং মেজাজ তার হইবেই, কিন্তু জল বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ তার দিন দিন যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। পরের দেওয়া ভাত যখন খাইতে হয়, তখন কথা তাহার গুনিতে হইবেই, কিন্তু তাই বলিয়া দুঃখ কি লাগে না ? রুগ্ন স্বামীর কানে কথাগুলি পৌঁছিয়াছে নিশ্চয়—বড়বোী যুখ নীচু করিয়া তাহাদের পশ্চিমের ঘবে রপ্তনা হইল। পক্ষাঘাতে তার স্বামীর অঙ্গ হয়ত চিরকালের জন্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কান ও মন হইয়াছে অধিকতর সজাগ।

রাঁধিতে বসিয়া স্হাসেব হুকের ভিতরটা সেদিন কেবলই মোচড়াইতে লাগিল। প্রায় বৎসর ঘুরিয়া আসিল স্বামী তাহাব বিদেশে গিয়াছে, এব মাঝে একখানাবই চিঠি সে পায় নি। এত দিনই সে চাকরি পায় নি—এটা কি সত্যি ? আর কত দিন সে পরের ছদ্মারে দাসী-বৃত্তি করিবে, পরের লাখিকাঁটা খাইবে ? বিশ টাকা মাহিনার চাকরিও কি এত দিন মিলিল না, তাহা দিয়াই যে স্হাস

সংসার করিতে পারিত। একখানা চিঠি লেখার পয়সাও কি তাঁর জুটে না ?—স্হাসের কারা পাইতে লাগিল। কে জানে—হয়ত তাই। সে ত পরের লাখি খাইয়াও দু-বেলা দু-মুঠো খাইতে পাইতেছে, কিন্তু ঐ নিতান্ত অসহায় আয়েসী জীবটি কোথায় কি খাইয়া দিন কাটাইতেছে—কে জানে। যাবাব সময় সে বলিয়া গিয়াছে, ষত দিন কাজ না পাই বাড়ী আসব না, চিঠি লিখব না, তুমি ভেবো না। চিঠি না পেলে জেন—ভাল আছি,—অস্থখ হ'লে খবর পাবে।

কিন্তু স্হাস বোঝে না—বিবাহের পর যে-লোক তার আঁচল ছাড়িয়া এক দিন কোথাও কাটাইতে পারিল না,—এক বৎসব ঘুরিয়া আসিল, এত দিন স্হাসকে না দেখিয়া, তার খবর না লইয়া সে কি করিয়া আছে।

দক্ষিণের ঘব বাগ্নাঘরের কাছে। সেখান হইতে কথা ভাসিয়া আসে, স্হা তার মায়ের কাছে আদ্যার করিয়া বলিতেছে,—তা আমি কিছুতি শোনবো না—তা ক'রে দিচ্ছি,—সিঙ্কের ছাপা শাড়ী আর দুডো চুড়ী,—আর বছর তুমি ফাঁকি দিছো, এবাব কিন্তু আমি কিছুতিই ছাড়বো না।

শান্তিলতা তাহাকে চাপা গলায় ধমক দিল, চুবো।

স্হা চুপ করিল কিন্তু মাণিক আবার স্র ধরিল—মা, আমার এট্টা সিঙ্কেব জামা দেবা,—বাগচীগারে অমূল্যর মত—দেবা—কও।

আর একটি কচি কঠের স্বরও কানে আসিল—মা, আমাল দেবা এট্টা।

মা কি উত্তর দেয়, বোঝা যায় না, হয়ত আদব করিয়া গালটা একটু টিপিয়া দিয়াছে।

স্হাসের মনের আর কোথাও যেন ব্যথা লাগে : অমনি নরম তুলতুলে দুটি গাল...তাহাব দিকে চাহিয়া বুঝি স্হাস আর এক বেদনা কিছু ভুলিতে পারিত। স্হাস স্হাসের মনে হয়—সত্য আসিবে। বিজ্ঞার দিন শেষ বাজ্রে আসন্ন বিরহের কথা শ্রবণ কবিয়া স্হাস যখন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, বাব-বার তার চোখের জল মুছাইয়া মতা বলিয়াছিল—সে আসিবে, যেখানে যেরূপ অবস্থায় থাকে সে পূজায় তাহার স্হাসেব পাশে আসিবে। মা প্রসন্ন হইলে সে স্হাসকে সঙ্গে লইয়া যাইবে। মা প্রসন্ন হইয়াছেন

বলিয়া ত মনে হয় না,—স্বহাসের যা কপাল। একটা ছোট কাজ জুটিলেও কি সত্য এত দিন চিঠি লিখিত না। না লিখুক সে কিরিয়া আশুক, তাহাকে না দেখিয়া স্বহাস যে আর থাকিতে পারে না। পূজার আর কত দিন আছে—মনে মনে স্বহাস একবার হিসাব করিতে থাকে, রান্নাঘরে উনানের পাশে বসিয়া দু-চোখ তাহার কাপসা হইয়া আসে।

আষিনের শেষাংশে নদী ও মাঠের জল কমিতে থাকে। কিন্তু একমায় আর লাভ কি? মাঠে চেষ্টা করিলেও সবুজের একটু আভাস দেখিতে পাওয়া যায় না—তা না থাক—দত্ত-বাড়ীর বৈঠকখানায় ‘মহানিশা’র রিহার্সেল শুরু হইয়াছে। একইটুকু কাদা মাখিয়া নদীতে জল আনিতে বাইবার সময় মেয়েরা দত্ত-বাড়ীর বৈঠকখানার পিছনে দাঁড়াইয়া তাহাদের ভাই, দেওর, স্বামীর কণ্ঠস্বর কান পাতিয়া শোনে।

সন্ধ্যাকালে জল আনিতে গিয়া স্বহাস সেদিন কয়েক বার মহলার আওয়াজ শুনিয়া আসিল। দাঁড়াইয়া মহলা সে একেবারে শুনিতে পারে না : সত্য আজ বাড়ীতে নাই। গত বৎসর সত্য মহলা সারিয়া রাজি করিয়া বাড়ীতে আসিত বলিয়া তাহার কত কষ্ট হইত, কিন্তু সে কষ্ট এবারের তুলনায় কি?—সেদিন রাত্রে শুইয়া শুইয়া স্বহাস কত কথা ভাবিল : সত্য লক্ষণের পাট করিবার সময় উর্শিলা ‘প্রাণেশ্বর’ বলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল,—তাই লইয়া সত্যকে কি ঠাট্টা! কিন্তু ঠাট্টা করিতে গিয়া স্বহাস কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। সত্য প্রথমে বুঝিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া গেল, তার পর যখন বুঝিল, হাসিয়া বুকে টানিয়া লইয়া বলিল—এতেই লাগে?

স্বহাস সত্যর আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিল, জানি নে, যাও।

সত্য কাতুকুতু দিয়া স্বহাসকে হাসাইতে চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিল, যদি আমি আবাব বিয়ে করি—তালৈ কি কর?

স্বহাস রাগিয়া বলিয়াছিল,—তুমি বুঝি মনে কর—আর একজন ঘরে আসলি তার বাদী হয়ে থাকপো,—কুমোরে জল নেই!

সত্য স্বহাসের মুখখান দু-হাতে ধরিয়া ডিজ্জ্‌হারিকেনের স্তিমিত আলোকে তাহার গোথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বিয়েটারের ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিয়াছিল, এত হিংসে!

কিন্তু ঠাট্টাই করুক আর যাহাই করুক, স্বামী তার লক্ষণের পাট আর করে নাই,—বমীর দিনও ত সীতা প্লে হইল।

পাগলী বুড়ী যখন পুঁটলি খুলিয় বসে, তখন তার সাত রাজার ধন মাগিক দেখিয়া দেখিয়া আশ আর মেটে না,—স্বহাস সারা রাত ধরিয়া স্বামীর জলবাসার কথা ভাবিল। দেরি আর সয় না, পূজার আর কত দেরি?

শান্তিলতার ঘুম হইতে উঠিতে একটু দেরি হয়, ছেলে-পিলে লইয়া বাস তার,—স্বহাসই সকালে উঠিয়া ঘরের কাজ সারে, ফেন-ভাত রাঁধিয়া ছোটদের খাওয়ায়, নিজে খায়। কিন্তু সেদিন রৌদ্র উঠিলে মেজবৌ যখন ঘুম হইতে উঠিয়া গেল স্বহাস তখন অকাতরে ঘুমাইতেছে, বাইবার সময় মেজবৌ ঠোট উন্টাইয়া একটা জুকাটি করিয়া গেল।

এত বেলায় স্বহাস কোনদিন উঠে নাই, সারারাত ঘুম হয় নাই, প্রভাতের সময় গোখ দুইটি তার হইয়া আসিয়াছিল। লজ্জিত সন্তুষ্ট স্বহাস ঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখিল, পশ্চিমের ঘরের বারান্দায় বড়বৌ স্বামীর পায়ে তেল মাশিশ করিতেছে, রান্নাঘরের দাওয়ায় সকলে ফেন-ভাত খাইতে বসিয়াছে—উপ ভাতে সিদ্ধ কাঁঠালের বিচিতে তেল-মুন মাখাইতেছে। শান্তিলতা একটা পিঁড়িতে বসিয়া তেল মাখিত মাখিতে উবার উপর তর্জিন করিতেছেন,—বুড়ো খাড়ি মেয়ে হাঁলি, একটু কাজের কাজি হলি নে,—রাঁখে দিলাম, মাঁখে খাতি পারিস নে,—আগে হুনির সঙ্গে লক চাঁকাতি হয় না?

আজ মেজবৌ নিজে ফেন-ভাত রাঁধিয়াছে, আবার তেল মাখিয়া ছপুনের রান্না রাঁধিয়ার জোগাড় করিতেছে,—স্বহাস লজ্জায় মরিয়া ছুটিয়া গিয়া উবাকে বলিল, উবা সরো, আমি মাখ্‌তিছি।

শান্তিলতা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া বলিল—থাক থাক, আর আধিকে দেখাতি হবি নে, শুই পারবে

—পরের ঘরে যা'য়ে ওর আর রাঁধতিও হবি নে,—আর
এত কাল আমরা রাঁধেও খাই নি।

উষা কাঁঠালের বিচি মাখিয়া ভাগ করিতেছিল, মেজবো
তাহাকে ধমক দিয়া কহিল—ভাগ করতিও শেখো নি,—
ওটা—ওটা কার ভাগ হ'ল শুনি,—তোমার ছোট-
কাঁকীয়ার? তোমার ছোট-কাঁকীয়ার অতটুকু হলি হয়
নাকি,—অত এক ড্যাং ভাত গেলা হ'বে নে কেমন ক'রে
শুনি।

মেজবোয়ের স্বামীর উপার্জননের অন্ন তাহাকে গ্রহণ
করিতে হয়—কিন্তু ছুটি ভাত খাইতে দিয়া যে লোকে
এমন করিয়া কথা শুনায, তাহা ভাবিয়া স্বহাসের কান্না
পাইতে লাগিল। ছেলেবেলায় মা বাপ হারাইয়া গরিব
পিসীর কাছে মাছুষ হইয়াছে সে, কিন্তু ভাতের জন্ত কথা
কোনদিন শুনিতে হয় নাই তাব, বরং কিসে দুটি ভাত
বেশী করিয়া খাইবে চিবদিন সেই চেষ্টাই করিয়াছে পিসী।
আজ সে ইহাদের কোন কাজ করিতে পারিল না—
তাহাদের দেওয়া অনাধবের অন্ন সে কি করিয়া গ্রহণ
করিবে? একটা মিথ্যা অন্নখের অজুহাত দেখাইয়া সে
এবেলা উপবাস করিবে কি-না সেই কথাই সে ভাবিতেছিল,
এমন সময় মুক্তি দিল আসিয়া মিস্তি-বাড়ীর মেয়ে
স্বরমা। আহ্লাদে গলিয়া পড়িয়া সে বলিয়া উঠিল, ওগো
রায় বাড়ীর লোকজন, কেমন আছ সব? তার পর স্বহাসকে
দেখিতে পাইয়া, তাহার গলা ধরিয়া বলিল, এই যে
ছোটগিন্নী,—এই দিক্ আসো দেখি, এক ঘড়া জল
দাও, পায়ে যা কাঁদা লাগিছে তা এক ঘটির কাম না
—বলিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে উত্তরের ঘরে লইয়া
গেল। যাইতে যাইতে স্বহাস বলিল, কবে আ'লে?

আমি আবার 'তুমি' হ'লাম নাকি তোর?—স্বরমা
বলিল—বলিয়া তার স্বভোল হাতে একটি চিমটি কাটিল।

স্বহাসের মনটা হালকা হইয়া আসিতেছিল, এত দিন
পরে মনের কথা বলিবার একটি লোক পাইয়া সে কেন একটু
বাঁচিয়াছে, সেও একটি ছুটামির কথা বলিতে যাইতেছিল
এমন সময় মেজবোয়ের স্বর কানে গেল,—চলো ত!—
আমারে একেবারে উদ্ধার করে গেলেই হ'ত—কেডা আবার
ভাত আগলায়ে ব'সে থাকবি?

স্বহাসের স্বচ্ছন্দ ভাব কাটিয়া গেল, স্বরমার বাহুমুত
হইয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, উষা, আমার ভাত কয়টা টা'কে
রাখ মা, আমি পরে খাবো।

স্বরমা তাহাতে আপত্তি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে
আর কিছু বলিতে স্বযোগ পাইল না, রান্নাঘর হইতে
মেজবোয়ের তীরের ফলার মত চোখা-চোখা কথা কানে
আসিয়া বিবিল, রাজরাণী আমাগারে—রাজরাণী হুকুম
করতিছেন,—বুলি, কয়টা দাসী বাদী আছে আপনার
শুনি?—এক বাদী রাঁধে দিল, এক বাদী টা'কে রাখপে—
বাদীই আবার রাণীর খাবারের জোগাড় করতি চলল।
নাথকা এ্যাংহোন সহ-সয়লা নিয়ে পীরিত করতি চললেন—
তবু তোর সোয়ামীর অন্ন যদি খাতি হতো আমাগারে!—
বুলি—

নি-নায়েরের নায়ের বড়

ঠাটা ঢেঁকির বাড়ি বড়—

সেই বিস্তান্ত। পবের সোয়ামীর রোজগার খায়েই এই,—
নিজির সোয়ামীর রোজগার যদি খাতি, তা'লি ত ধরারে
সরা জ্ঞানই করতি নে।

পরের মেয়ে স্বরমা আজ এ-বাড়ীতে আসিয়াছে তাহার
সম্মুখে স্বহাস এতটা প্রত্যাশা করে নাই। স্বরমার সম্মুখে
তাহাকে কটুক্তি করিলে অপমানটা স্বরমারও কম করা হয়
না—স্বহাস ফিরিয়া দাঁড়াইল। বড় ভাস্বর পশ্চিমের
বারান্দায় শুইয়া আছেন, জবাবটা এখান থেকে দেওয়া চলে
না, স্বহাস রান্নাঘরের দিকে আগাইয়া আসিয়া বাঁকা-বেড়া
ছাড়াইয়া আসিল। কাল রাত্রিটা স্বহাসের একেবারে
ভাল কার্টে নাই, এত দিনের সংঘমের বাঁধ ভাঙিয়া স্বহাসের
মুখে কথার বান ছুটিল, দিদি, ঠাটা ঢেঁকির বাড়ি বড়—এ
কথা ঠিক, কিন্তু তাতে লাখি না মারলি ত বাজে না,—
নায়েরও আমার বড় না,—নায়ের থাকলি আর আপনার
এখানে থা'কে লাখি ঝাঁটা থা'তাম না,—দেওব
আপনার রোজগার করতি পারে না, কিন্তু রোজগারের
তল্লাসেই ত এক বছর বাড়ীছাড়া। আপনারাই বলেন,
বয়স তার এই বিশ ছাড়াল, এ-বয়সে আপনাগারে
গায়ের কোন্ ছেলেভা চাকরি করে ঘরে টাকা
আনতিছে শুনি? আপনার সোয়ামীর রোজগার খা'য়ে

পয়সাল করলাম—শুনতি শুনতি কান ঝালাপালা হয়ে গেল—মানষির গন্ধ পালি ডেমাক্ আপনার দশগুণ বাঁড়ে যায়—কিন্তু আপনি বুঁকি হাত দে বোলেন দেখি, তাঁর কয়ডা টাকা আমরা খায়ে থাকি? টাকা যা আসে তা ত আপনি বাক্সে তোলেন। তুই হাটের দিন ছু-চার পয়সার মাছ ছাড়া কি কেনা হয় আমাদের শুনি? আমি জানি খণ্ডর-ঠাকুর স্বগুণে যাবার আগে তিরিশ বিঘে মাঠান্ করে গেছেন, তাঁতে সোনার কসল কলে, বাগিচের আম কাঁঠাল বিক্রি করে টাকা আসে, পাটের টাকা আসে, সে সব ক'নে যায়?—পেট ত আমার এঁটুটি,—পাঁচটি নিয়ে আপনার যদি চলে, তা'লি আমার একার পেটও চলবি—আমার ভাগের আম কাঁঠালের, পাটের দামেই আমার তেল ছুন কাপড়ের দাম চলে যাবি।

স্বহাসের উত্তেজিত ভাব দেখিয়া সুরমা পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মেজবোঁ তেলের বাটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া প্রায় লাফ দিয়া উঠানে নামিয়া আসিল, কি, কি বললি?—ভেদ হতি চাও,—বেশ আশ্চর্য বাড়ী এবার, তাই করে দেবো, দেবো, দেবো,—এই তিন সত্যি রলো।

সুরমা স্বহাসের হাত ধরিয়া টানিল, স্বহাস নড়িতে চায় না, বলে, এ সংসারে চাড্ ডি খাই, তাও মাঙনা না,—সকাল থেকে রাস্তিব দেড় পহর পর্যন্ত বাঁদীগিরি করি—তাই।

বড়বোঁ পশ্চিমের বারান্দা হইতে আমোদেবার কণেক বিরাম দিয়া নামিয়া আসিয়া স্বহাসের হাত ধরিল,—ছোটবোঁ, পাগল হলি তুই, আয় এদিকে আয়—বলিয়া এক প্রকার জোর করিয়াই তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

কদ্ধ আক্রোশে মেজবোঁ চীৎকার করিতে লাগিল, সর্বনাশী,—সর্বনাশী সংসারটারে একেবারে খাবি—ঠাকুরপোর সর্বনাশ করিছে—এবার সংসারটারে খাবি।

স্বহাস বড়বোঁয়ের হাত ছাড়াইয়া আবার ছুটিয়া আসিল, আপনার ঠাকুরপোর কি সর্বনাশ করলাম আমি—শুন।

মেজবোঁ আগাইয়া দাঁড়াইল,—করলি নে? তুই আ'সে তার লেখাপড়া করতি দিলি? তিন তিন বার ফেল করলো সে—এর আগে কোন দিন ফেল করিছে? তোর কপিই ত পুড়ে মলো সে।

স্বহাস এবার কাঁদিয়া ফেলিল—তার নিজের স্বামীর সর্বনাশের কারণ সে—স্বামী তার ফেল সত্যই করিয়াছে—এ কথা সে বগড়া করিতে গিয়াও উন্টাইবে কি করিয়া? বড়বোঁয়ের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, আপনার আমার এ-বাড়ীতে ক্যান আনিছিলেন?

জবাব দিল মেজবোঁ, ওলো ঠাইনি—তোমারে এ বাড়ীতে আমরা কেউই আনি নি, তুমি যারে নজর দিছলে—কিপাদিটি করিছিলে লে—সেই সঙ্গে ক'বে আনিছে।

স্বহাস কি একটা জবাব দিতে বাহঁতেছিল সুরমা তার মুখ আটকাইয়া ধরিয়া বলিল—ফের কথা বলবি ত কিল খাবি,—বড়বোঁদি—ওরে আমাদের বাড়ী নিয়ে চললাম, বিকেল বেলা দিয়ে যাবো—বলিয়া আর কারও কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া জলকান্দাব পথে একরূপ হিড়হিড় করিয়াই টানিয়া লইয়া চলিল।

স্বহাস যখন বৈকালে বাড়ী যিরিয়া আসিল, তখন বাড়ীর সুর একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে—মেজকর্ডা হেমন্ত বাড়ী আসিয়াছেন : মেজবোঁয়ের মুখের কঠিন বেখা নিশ্চেষ্টে মুছিয়া গিয়াছে। একদিন বাঁ পাইয়া—শীর্ণ নীরস পুঁইভাটা যেমনি করিয়া সজীব হইয়া উঠে মেজবোঁয়ের মুখ আজ তাই; স্বহাসকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল,—ওলো তুই আইছিল, আমি শু উবারে পাঠানোর জোগাড় করতিছিলাম,—এমন নেমন্তন্নো খাওয়াও দেখি নি।...উনি ত আ'সেই খোঁজ করতিছেন ছোটবোঁ কই—ছোটবোঁ কই?

মেজবোঁয়ের আকস্মিক এ পরিবর্তনের কারণ জানিবার মত বয়স স্বহাসের হইয়াছে, সেও হাসিল, হাসিয়া ভাস্করের পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

—আ'সো মা লক্ষ্মী, আ'সেই আমি মা লক্ষ্মীরে খুঁজিছি, শরীর ভালই আছে—না মা?

স্বহাস মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ,—লক্ষ্মাও তাহার করিল,—শরীর তাহার তবে এমনই ভাল হইয়াছে যে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয় না যে তুমি কেমন আছ? সুরমা পোড়ারমুখী আবার তাহাকে চুল বাধিয়া স্নো ঘষিয়া সং সাজাইয়া দিয়াছে। নিজের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্যের

কথা শ্রবণ করিয়া মাথা তাহার আরও নীচু হইতে চলিল।

হেমন্ত তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, আচ্ছ। তুমি এখন আসো, মা। স্বহাস চলিতে আরম্ভ করিল, স্বরমা গোড়ারমুখী আবার এমন কাদার পথেও তাহাকে আলতা পরাইয়া দিয়াছে।

হেমন্ত জলচৌকীতে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, ছোটবোয়ের দিকে চাহিয়া, একবার ধূম উল্লসীর্ণ করিয়া পরম স্নেহে বলিলেন, মা লক্ষ্মী ত আমাগারে বাড়ী বাঁধাই পড়িছেন মেজবৌ—আমাগারে আবার ভাবনা কি ?

মেজবোয়ের মুখ ভার হইয়া উঠিল, স্বহাস মুখ না ফিরাইয়াও তাহা বুঝিতে পারিল—তা উঠুক,—ভাস্করের স্নেহে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছে। রান্নাঘরে যাইতে যাইতে সে শুনিতে পাইল ভাস্কর জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—সে পাগলাভা? আসবি কবে—কিছু জান ?

—কেভা জানে।

—চিঠিপত্তর ল্যাখে নি কোন ?

—তাই বা জানবো কেমন ক'রে আমি ?

—খিয়েটার হচ্ছে না গায়ের ?

—হঁ।

স্বহাস একটা প্রাণখোলা হাসি শুনিতে পাইল,—তালি আর না আসে পারতিছেন না বাছাধন !

স্বহাসের মনটার কোথায় যেন একটু স্বস্তি হইতেছিল : অন্ততঃ একটি লোক এ-বাড়ীতে তাহার পক্ষে বলিয়া বোধ হইতেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাদা-ভরা উঠানেই আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের নৃতন কাপড় আসিয়াছে। মাণিক গিছন হইতে স্বহাসের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কাকীমা, কাকাবাবু আসগি কবে ? কাকাবাবু খিয়েটার করবি নে এবার ?

স্বহাস তাহাকে কোলে লইয়া তাহার গালটা একবার টিপিয়া দিল। উষা রান্নাঘরের বারান্দার এক পাশে বসিয়া চুল বাঁধিতেছিল, দাঁতের এক পাশ দিয়া চুলের কিতা কামড়াইয়া ধরিয়া আর এক পাশ দিয়া কহিল, কাকীমা তোমার একখানা খাসা বুটাদার আইছে,—নীল রঙের। আমার একখানা আইছে টাপা রঙের। বড় কাকাবাবু

বললেন—তোর ছোট কাকীর রং ফরসা—তার নীল রঙে মানাবি ভাল।

এক জন তাহাকে এমন করিয়া আদর করে মনে মনে—স্বহাসের আনন্দে কান্না পায়—চিরদুঃখিনী সে, আজ কত দিন পরে তাহার বাপের কথা মনে পড়ে। ভাস্করের এমন স্নেহ পাইয়াছে সে, মেজবোয়ের সকল অপরাধ সে ক্ষমা করে, সকালের সকল শ্রানি ছুলিয়া যায়।

মেজবোয়ের রাগ আর ভেমন নাই, স্বতরাং এবেলা আর সে জিদ করিয়া রাঁধিতে যাইবে না, স্বতরাং স্বহাস রাজের রান্নার জোগাড় করিতে উঠিবে, এমন সময় এক জন ভিখারী একইটু কাদা মাখিয়া “হরেকৃষ্ণ !” বলিয়া উঠানে দাঁড়াইল। নীচেব কাপড় তার উঠাইয়া কোমরে গোঁজা, স্বতরাং কাদা ধুইবার প্রয়োজন বোধ না করিয়াই সে বেহালায় টান দিল,—চারি দিক হইতে ছেলেপিলে ছুটিয়া আসিল। বৈরাগী বেহালায় স্বর দিয়া ধরিল—

—ওরে হিমেম সখা—

বড়বৌ পশ্চিমের ঘরের বারান্দা হইতে বলিয়া উঠিল, বৈরাগী-ঠাকুর শোন !

বৈরাগী থামিল।

—ঘ্যাট্টা আগমনী গাও দেখি।

বৈরাগী বলিল, মা ঠাওরুন, তালি এক ঘটি জল আর একখানা আসন ছান।

উষার চুল বাঁধা হইয়াছিল, সে এক ঘটি জল আর একটা ছোট জলচৌকী আনিয়া দিল। বৈরাগী পা ধুইয়া আসনে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বেহালায় সঙ্গে গাহিল—

গিবিধর হে, এই ত গরৎ আইল,
উমারে আনিবে কবে—থকপে তাই বলা বলা।
হেম শিশির বসন্ত, গ্রীষ্ম বরষারি অন্ত
পক্ষ ভড়ুতে পক্ষ-প্রায় হয়েছিলাম—
দৈজ্ঞেতে পাইব কণ্যে, প্রাণ ছিল সেই ভঞ্জে
হেরিয়ে হইব ধঞ্জে সেই শ্রীমুখ মণ্ডল।
গিবিধর হে—এ—

বৈরাগীর গলা ভাল, গায়ও খুব দরদ দিয়া, শুনিয়া বয়স্কেরা চোখের জল মুছিল। স্বহাস উঠিয়া রান্নাঘরে গেল।

সেদিন রাজে স্বহাসকে উত্তরের ঘরে শুইতে হইল,—

ভাস্কর বাড়ীতে আসিয়াছেন, আজ তার দক্ষিণের ঘরে মেজবোয়ের কাছে শোওয়া চলে না। কিন্তু উত্তরের ঘরের বা অবস্থা তাহাতে দিনের বেলায়ও সেখানে ঢুকিতে গা ছম্‌ছম্ করে। কিছু দিন আগে বস্তায় কুমারের জলের ঢেউ লাগিয়া মেটে পোতা ধসিয়া গিয়াছে, মাণিক একদিন কি খেলার জিনিষ খুঁজিতে আসিয়া এ ঘরে একটা শেয়াল দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রসঙ্গে শোনা গেল এতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ নদীর ওপারে জোঁকার চক্রবর্তী-বাড়ীর দক্ষিণের পোতার ঘরে বাঘ ও সাপ একসঙ্গে নির্বিবাহে বাস করিতেছে। বাঘটাকে এখনও কেহ মারে নাই বটে, কিন্তু সেও কাহাকে কিছু বলে নাই—বস্তায় সেও তার হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া গিয়াছে।

এ সংবাদ স্বহাসেরও জানা আছে, কিন্তু তাই বলিয়া একা সে উত্তরের ঘরে থাকিতে সাহস করে না, কারণ বাঘের চেয়ে হিংস্র জীবও জগতে আছে। প্রথমে কথা হইল উষা তাহার ছোটকাবীয়ার কাছে শুইবে, স্বীকারও সে করিয়াছিল, কিন্তু সন্ধ্যার আগে কেমন করিয়া কে জানে তাহার মতটা হঠাৎ বদলাইয়া গেল। স্বহাস মনে মনে সুতাই একটু বিপদ গণিল।

কিন্তু বিপদে ভড়কাইয়া যাইবার মেয়ে সে নয়। ঘরের এক কোণে সাজানো কাঁঠালের বড় বড় পিড়িগুলি টানিয়া ধসিয়া-ধাওয়া ছিন্নগুলি বন্ধ করিল, তক্তপোষের নীচের হাঁড়িগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া ঘরে এক পাশে রাখিল কতক বা বারান্দায় বাহির করিয়া দিল। এক বছর পরে সে এ ঘরে শুইতে আসিতেছে—এ ঘরে শেষ শুইয়াছে সে গত বিজয়া-দশমীর রাত্রে—পাশে ছিল তার স্বামী। আজ কাজ করিতে করিতে সেদিনের কথা তার কেবলই মনে পড়িতেছে, আব মনে পড়িতেছে তাব বৈরাগী-ঠাকুরের কথাগুলি—

হেন শিশির বসন্ত, গ্রীষ্ম বরষার অন্ত

পক্ষ গড়তে পক্ষ-প্রায় হয়েছিল—

হেরিয়ে হইব দণ্ড সেই শ্রীমুখমণ্ডল।

মা সে হয় নাই, কন্ডার বিরহ সে জানে না, স্বামীর

অদর্শন-মন্ত্রণা যে কি সে কথা ভাল করিয়াই সে জানে। সহসা তার মায়ের কথা মনে হইল, মা বাঁচিয়া থাকিলে সেও বুঝি তাহাকে দেখিবার অস্ত্র এমনি করিয়া পাগল হইয়া উঠিত; তাহা হইলে মেজবোয়ের এত কটুক্তি সে সহ করিত না। স্বহাস সত্যই বড় দুঃখিনী।

স্বহাসের মনের অবস্থা ক্রমেই এমন হইয়া আসিতেছিল যে এখনই হয়ত বিছানা কর রাখিয়া তক্তপোষের এক কোণে বসিয়া নিৰ্জ্জন ঘরে সে কাঁদিতে বসিয়া যাইবে, কিন্তু তাহা আর হইল না, শীতাস্তের দমকা হাওয়ার মত প্রবেশ করিল স্বরমা।

—কই রে—কি কাপড় পালি তুই দেখি!

—কাপড়, কই পাই নি তু—তুমি শুনে ক'নতে?

—চালাকি—এই উষা যে ঘাটে বলে আলো তোমার জরির বুটাদার নীলাঘরী আইছে—রাঙা রঙে মানাবি ভাল?

স্বহাস কোন উত্তর দিল না। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে স্বরমা প্রথমে লক্ষ্য করিতে পারে নাই, এখন তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, তুই কান্ডিতিছিস্ না কি রে, আবার কি হ'ল তোর—এ-ঘরে বিছানা করতিছিস্ ক্যান?

—শোব।

—মাইরি?

ভাস্কর ঠাকুর আটছেন যে, দক্ষিণে ঘবে শোব কেমন ক'রে?

—ভয় করবি না নে?

স্বহাস হাসিল,—ভয় করলি আর কি করব বল।

স্বরমা কহিল, আমি আজ আসে থাকপো, তুই—এক দিন আসে' থাকতি পারব—তার পরে কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, উনি আসতিছেন কি না?

স্বহাস একটু হাসিয়া বলিল, তাই না কি, কবে?

স্বহাসের মুখের দিকে চাহিয়া স্বরমা বলিল, কিন্তু তুই কি আজকের ডাকেও কোন চিঠি পাতি নে?

স্বহাস বলিল, না ভাই একখান ছাড়া চিঠি আর ল্যাখেন নি।

—তোর কি মনে হয় পুজোতে তিনি আসবেন না?

—মিছে কথা ত তিনি আমার কাছে বোলেন নি,—

বুলিছিলেন ত পূজাব সময় দেখা হবি।—স্বহাসেব চোখ
হইতে ছ-ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল।

স্বরমার স্বামী তাহাকে ছাড়িয়া দু-দিন থাকিতে পারে
না, হয়ত কাল পরন্তু আসিয়া উপস্থিত হইবে—স্বহাসকে
সে কি বলিয়া সাধুনা দিবে ভাবিতেছিল—এমন সময় মাণিক
আসিয়া জামরঙের অতি সাধারণ একখানা শাড়ী
স্বহাসের হাতে দিয়া কহিল, কাকীমা, তোমার কাপড় জ্ঞাও।

স্বরমা ও স্বহাস দুই জনই অবাক হইয়া পরস্পরের মুখ
চাওয়াচাষি করিল।

—তোমার এই কাপড় ?

স্বহাস হাসিল, তাই ত দেখুতিছি।

—তবে শোনলাম তোমার নীলাধরী আইছে।

—আমিও ত শুনিছিলাম ভাসুরের মুখে তাই।

—তুইও তাই শুনিছিলি ?—

মাণিক কাপড় দিয়া চলিয়া বাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া
স্বরমা বলিল, মণি শোন।

মাণিক দাঁড়াইল।

স্বরমা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহাব
গায়ে মাথায় হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা মাণিক,
একখানা নীলাধরী শাড়ী আইছিল, দেখিছিস তুই ?

মাণিক মাথা নাড়িয়া জানাইল—হঁ।

—সেখান কি হ'ল রে ?

—সেখান নীলু মাসীমার জন্য মা বাক্সে উঠোয়ে থুইছে।

—তোমার বাবা বুল্লো বুঝি ?

—না, মা ক'লো ওটা মাসীমারে দিবি, বাবা বারণ
করলো, মা শুনলো না। মা কতি মানা ক'রে দেছে।

স্বরমা মাণিককে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা তুমি যাও,
আমরা কারু কাছে কবো না।

কথাটা শুনিয়া স্বহাস শুধু শুক্ক হইয়া রহিল, একটি কথাও
তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

পূজা আসিয়া পড়িয়াছে, স্বহাসেব জীবন আরও তিক্ত
হইয়া উঠিয়াছে। ছোট ভাসুর হেমসেব হাবভাব এ
কয় দিনে অসম্ভব বদলাইয়া গিয়াছে : প্রথম দিন তাহার
নিকট হইতে যে মেহের স্বর স্বহাস অশ্রুত করিয়াছিল, সে

যেন স্বপ্নের কথা। স্বহাসের বিরুদ্ধে অনেক কথা তাহার
কানে গিয়াছে। স্বরমা এত দিন স্বহাসকে আগলাইতে
আসিত, আজ পূজা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার বর আসিয়াছে,
সে রাজে আর আসিতে পারিবে না ; তবুও স্ব-
হাসের কথা কহিয়া রাজিটা এক প্রকার কাটিয়া বাইত !
উবাকেও স্বহাস ডাকিবে না।

আজ সপ্তমী—স্বামী পূজায় বাড়ী আসিবে এ প্রত্যাশা
স্বহাস ছাড়িয়া দিয়াছে, আসিলে এত দিন আসিত।
আশ্চর্য্য !—স্বহাসেব হাসি পায়, এ জগতের সকলেই সমান !
আশা সে আর করে না, তবু তার অবাধ্য পা দুটি মোটর-
লঞ্চের ভেঁপু শুনিলে কর্দমাক্ত পথে নদীর ঘাটে ছুটিয়া
আসে। কলসী কাঁখে লইয়া স্নান করিবার সময় সে এইটিই
বাছিয়া লইয়াছে। শত অভ্যুত্থানে স্নান করিবার সময় সে
পিছাইয়া দেয় এই ভেঁপু শুনিবার আশে।

সপ্তমীর দিনও স্বহাস কলসী লইয়া জলে নামিল।
মোটর লঞ্চ এখনও দূরে রহিয়াছে—স্বহাস গলা পর্য্যন্ত জলে
ডুবাইয়া একদৃষ্টে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। ক্রমে শব্দের
তরঙ্গের সহিত জলের তরঙ্গ তুলিয়া বোট স্বহাসের সম্মুখ দিয়া
ষ্টেশন-ঘাটের দিকে ছুটিয়া চলিল, কে একটা লোক যেন
হাউনি হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বহাসের বুকটা
কাঁপিয়া উঠিল—স্বামী তার কখনও মিছে কথা বলে না—
না, এ সত্য ত নয় ! লোকটি তবুও এই দিকে তাকাইয়া
রাছে—লোকটা বেহায়া ত কম নয়।—এই দিকে তাকাইয়াই
সে চীৎকার করিয়া বলিল, যাবেন একবার, আপনাদের
নজর খবর আছে। স্বহাস পিছনে ফিরিয়া দেখে মেজবো
কলসী কাঁখে করিয়া উপরে দাঁড়াইয়া আছে। লোকটি আরও
কি যেন বলিল, কিন্তু ষ্টেশনের কাছাকাছি আসিয়া মোটর
তখন ঘনঘন ভেঁপু বাজাইতেছে,—কথা কানে গেল না।

স্বহাস একটু যেন বল পাইল, নিজের অজ্ঞাতেই একবার
মেজবোয়ের দিকে তাকাইল।

—আমি যাব বিকেলে খবর আনতি—চন্দ্র-বাড়ীর
ভৈরবের বব ও,—ভৈরবের নিয়ে আ'লো বুঝি—

স্বহাসের মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। ভৈরব না কি
স্বহাসেব চেয়ে সামান্য বড়। স্বামী তার স্বহাসের স্বামীর
সদে একত্র থিয়েটার করিয়াছে, স্বহাসের ইচ্ছা করিতে

লাগিল সে নিজে গিয়াই খবরটা জানিয়া আসে, কিন্তু কি লজ্জা—নিজের স্বামী ?

বিকালে মাণিককে সঙ্গে করিয়া মেজবৌ চন্দ-বাড়ী গেল। স্বহাস অধীর প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতে লাগিল। মেজবৌ হয়ত আসিয়া বলিবে, ঠাকুরপো কাল আসপি,—অতুলিব সঙ্গে দেখা হইছিল তার।—স্বহাস মেজবৌয়ের পায়ে পড়িবে না কি—দিদি আমাবে ক্ষমা করেন,—কত অপরাধ করিছি আপনার কাছে।

কিন্তু মেজবৌ আর আসে না।—স্বরমা সন্ধ্যাকালে দিবা সাজিয়া-গুজিয়া আসিয়া উপস্থিত—সকালে তার বর আসিয়াছে।

—কি গো ছোট গিন্নী,—বুলি খবর কি ?

স্বহাস তার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। অনেক কাল পরে স্বরমা স্বহাসের মুখে হাসি দেখিল : কিছু খবর আইছে বুঝি ?

—না, খবর আনতি গেছেন।

—কেভা ?

—মেজদি।

—মেজদি ?

—হেঁ।

—ক'নে গেলেন তিনি খবর আনতি ?

স্বহাস স্বরমাকে রান্নাঘরের বারান্দা হইতে উত্তরের ঘবে লইয়া গিয়া জ্ঞান করিবার সময়কার সেই ছোট কথাটি ফেনাইয়া ফেনাইয়া বিস্তারিত করিয়া বলিল। স্বরমা বলিল, তাই নাকি ?

স্বহাস মুছ হাসিয়া বলিল, হেঁ।

মাণিকের কণ্ঠস্বর কানে গেল। দুই বন্ধু আবুল আগ্রহে সত্য সংবাদ শুনিবার জন্য কান পাতিয়া রহিল, স্বহাসের বুক ঢিঁড়ি-ঢিঁড়ি করিতে লাগিল, কিন্তু মেজবৌ একটি কথাও উচ্চারণ করিল না। একটু পরে শোনা গেল—বড়বৌয়ের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কথা হইতেছে। স্বরমা শেষে উঠিয়া গিয়া মেজবৌয়ের পাশে দাঁড়াইল।

—কোন খবর পালেন সত্যদার ?

মেজবৌ কোন উত্তর করিল না।

কি কথা বোলেন না বে!—স্বরমা মেজবৌকে বঁকা-বেড়ার ওদিকে আড়ালে লইয়া গেল : সেখানে অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়া কি কথা হইল—স্বহাস দম বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল—এখন প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে হয়—সে বার-বার মা দুর্গার কাছে জানাইল।

স্বরমা গম্ভীর মুখে ফিরিয়া আনিলে স্বহাস তাহার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলা বলিল, প্রাণে বাঁচে আছেন ত ?

স্বরমা স্বহাসের দিকে কাতব দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, হ্যাঁ।

—আলেন না ক্যান ?

—তিনি হাজতে।

—ক্যান ?

—তা, আর না শুনলে।—স্বরমা স্বহাসের পাশে বসিয়া তাহার পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

স্বহাস বলিল, তুমি ব'ল,—পাষণ হয়ে গিছি আমি, বল।

স্বরমা কিছু না বলিয়া স্বহাসের পিঠের উপর নিজের মুখখানা নত করিল।

দুঃখ পাইলে ইঞ্জিয়ের শক্তি বৃদ্ধি প্রথর হয় ; পশ্চিমের ঘব হইতে চাপা গলার কথা কানে ভানিয়া আসিতে লাগিল : এমন কেলেঙ্কারী যে হবি তা আমি আগেই জানতাম,—স্বন্দরের দিক টান কি ঠাকুরপোর।

—এই বংশে শেষে খুনী লোক জন্মালো ?

—না খুন আর করে নি, করতি গিছলো, খুন করলি ত ফাঁসিই হ'ত।

স্বরমাও কিছু স্পষ্ট করিয়া বলিল না, বড়বৌ, মেজবৌও না, তবু সকলের ছোট ছোট আলোচনা হইতে স্বহাস বুঝিল, স্বামী তাহার খবরের কাগজের ফিবি করিয়া দিন চালাইত। যেখানে থাকিত তাহার পাশে স্বন্দবী বিধবা বোন লইয়া আব এক জন গরিব কেব্রানী বাস করিত। সেই স্বন্দবী বিধবা ও তার স্বামীর মাঝে প্রণয় হয়। স্বামী তাহাকে লইয়া পলাইয়া যায়, ধরা পড়ে,—মেয়েটির ভাইকে স্বামী মারিতে যায়, তাব পব হয় মকদ্দমা, ফলে জেল দুই বৎসর।

তিনি প্রথমে স্বহাস পাষণের মতই হইয়া গেল,

এক ফোঁটা চোখের জলও কেলিল না। স্বরমা তাহার পাশেই বসিয়া ছিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পর স্বরমাকে ডাকিতে লোক আসিল। স্বরমা স্বহাসের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, তালৈ ভাই আমি উঠি ?

স্বহাস দু-হাতে স্বরমাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মুখ রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

স্বরমা যখন চলিয়া গেল তখন রাজি এক গ্রহর কাটিয়া গিয়াছে। সে আজ পাশে থাকিলেই ভাল হইত, কিন্তু তাহা ত হইবে না, তাহার স্বামী আসিয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও স্বহাসকে কিছু খাওয়ানো গেল না।

সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া উবা দেখিল কাকীমা ঘরে নাই। সে মনে কবিল, কাকীমা হয়ত একটু আগে উঠিয়া গিয়াছে।

মেজবোঁ উবাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোর ছোট কাকী কই রে।

চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উবা বলিল, আমি উঠে তারে দেখি নি ত।

মেজবোঁ তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া কি যেন খুঁজিল, তার পর তাহা না দেখিয়া ধীরে ধীরে কাঠালের সিঁড়িগুলি এক পাশে সরাইয়া সেধানকার মাটি পা দিয়া আরও খানিক খসাইয়া দিল।

শান্ত গান্ধীর্ষ লইয়া ঘর হইতে একটা গেলাস হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া মেজবোঁ উবাকে বলিল, তোর ছোট কাকী বোধ হয় স্বরমাদের ওহানে গেছে।

হঁতি পারে।

যখন একটু রৌদ্র উঠিয়াছে, দস্ত-বাড়ীর সন্তোষ ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, ঘাটের ভাঁন দিক পিটেপোড়া গাছের ঠিক নীচে যে গহীন জল না—স্যাথানে—ক্যাবোল কাছিম উঠতিছে! শুনিয়া মানিক ও স্বধা ছুটিয়া গেল।

বড়বোঁ খানিক পরে উত্তরের ঘরে গিয়া চীৎকার করিয়া

উঠিল, তোমরা ছোট বৌয়েরও খোঁজ করলে না—এদিক দ্যাখো—বেড়া ত একেবারে ফাঁক।

মেজকর্তা, মেজবোঁ, উবা সকলে ছুটিয়া আসিল।

তাই ত।

মেজবোঁ মেজকর্তার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, কি সর্বনাশ, কেলেঙ্কারীর আর অস্ত রংলো না,—কি দেখতিছো—তোমাদের লালমণ্ যে ছিকলী কাটিছে।

মেজকর্তার চক্ষু ক্রমে কপালে উঠিতেছিল।

বড়বোঁ বলিল, একবার ঘাটটা খোঁজ ক'রে দেখলি হয়,—কাছিম উঠতিছে বলে...কাল বড় দুখখু পাইছে।

উঠানে শব্দ হইল,—ওঃ বৌদি।

বড়বোঁ ও মেজকর্তা আগাইয়া আসিল। উবা চীৎকার করিয়া উঠিল, ওমা,—ছোট কাকা যে।

সত্য একটা বড় কাপড়ের বোঁচকা বারান্দার রাখিয়া বৌদি ও দাদাকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া বলিল, একটা চাকরি এই পুজোর মাঝেই হবার কথা ছিল, তাই কাল অতুলের কাছে খবর পাঠাইছিলাম,—পুজোর আর বাড়ী যাব না। তা কাজভা এখন আর হ'ল না—তাই চলে আলাম। নৌকোর আলাম তাই সকাল সকাল। তার পর সব ভাল ত।

কাহারও মুখে আর কথা সরে না।

কাহারও কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া মেজবোঁ একটা কলসী কাঁখে লইয়া বলিল, তোমরা ব'স আমি স্বরমাদের অথান যে ছোটবোয়ের একটা খবর দিয়ে চট্ট ক'রে ডুবডা দিয়ে আসি—বলিয়া বিদ্রোহ গতিতে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

চন্দ-বাড়ী পূজা। ভৈরব একটা ঘরে বসিয়া নৈবেদ্যের জন্ত কল কাটিতেছিল। মেজবোঁ পাগলের মত ঘরে ঢুকিয়া দোর বন্ধ করিয়া দিল, তার পর ভৈরবের পায়ের উপর পড়িয়া বলিয়া উঠিল, ভৈরব, তুই আমারে বাঁচ।

ভৈরব বঁটা ছাড়িয়া উঠিল, বুক তাহার কাঁপিতে লাগিল: এ কি কর বৌদি, তুমি কি পাগল হ'লে, কি হইছে ?

মেজবৌ চাপা গলায় বলিল, অতুল ক'নে ?

—তিনি ত আজ সকালের মোটরে কলকাতা চলে গেছেন।

মেজবৌ এইবার একটু সামলাইয়া লইল, যা'ক অতুলকে ত সাক্ষী মানিতে পারিবে না।

মেজবৌ ভৈরবের দুটি হাত ধরিয়া এবার আব্দার করিয়া কহিল, এটটা অল্পরোধ রাখতি হবি ভৈবব, চিরকাল আমি কেনা হ'য়ে থাকবো।

ভৈরব হাসিয়া বলিল, কি ?

মেজবৌ বলিল, ঠাকুরপো আজ এই মাত্র বাড়ী আইছে। আমি কাল ঠাকুরপো পূজোয় আসপে না শুনে বাড়ী যা'য়ে ঠাট্টা ক'রে বুলিছিলাম—তার জেল হইছে।

—তা'তে আর কি হইছে ?

—না কিছু হয় নি, ঠাকুরপো আবার জিজ্ঞাসা করতি আসতি পারে কি না !

—তা, আসে আশুক।

—তাই ত কচ্ছি,—যদি আসে তা'লি তোমার একটা কাজ করতি হবি।

—কি, বলো—ভৈরব মেজবৌয়ের অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

মেজবৌয়ের বুকেটা কাঁপিয়া উঠিল, যদি 'না' বলে। তাহার পব জোর করিয়া ভৈরবের হাত ধরিয়া বলিল,—যদি আ'সে জিগ্গেস করে, দিদি লক্ষ্মী,—বলো—অতুলের কথা, বলো উনার বন্ধু কি না—উনি ঠাট্টা ক'রে কইছিলেন—জেল হইছে—বৌদি তাই সত্যি মনে করে গেছেন।

ভৈরব হাসিয়া বলিল, আচ্ছা।

—আচ্ছা না, বল দুগ্গার কিরে।

ভৈরব বলিল, দুগ্গার কিরে।

মেজবৌ এবার হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিল।

দুর্গামণ্ডপে সন্ধ্যাতা শুদ্ধবসনা মেয়েরা পূজার নৈবেদ্য লইয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে—আজ মহাষ্টমী। মেজবৌ গলায় কাপড় দিয়া এক পাশে নত হইয়া প্রার্থনা করিল, যা আজ মহাষ্টমী, যে যা কামনা করে তার সেই বাঁহা পূরণ ক'রো তুমি। ছোটবৌ যে জলে ডুবে মরিছে—এতে যেন

আমাগারে কোন অমঙ্গল হয় না, যা। তুমি ত জান সে মরবি বলে এমন কথা কই নি আমি।

প্রার্থনা নিবেদনকালে মেজবৌ এক মুহূর্ত্ত থামিল, তার পর বলিল, আর—আর ছোটবৌ যখন আর এ জগতে নেই, তখন ঠাকুরপোর মন শাস্ত করে দাও তুমি, আর—আর যা জগজ্জননী গো—আমার ছোট বোন নীলি যেন আমাগারে ঘরে আসে—এবার যেন ঠাকুরপো তারে বিয়ে করতি আর 'না' না বরে।—ভাবাবেশে মেজবৌয়ের চোখ হইতে দু-ফোটা জল মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

প্রণাম শেষ করিয়া মেজবৌ যখন বাড়ী বসুয়া হইল, তখন তাহার শরীর কাঁপিতেছে। এত বড় একটা সৰু হইতে যা তাহাকে রক্ষা করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মনের গোপন কোণে নীলির আগমনী-স্বর ধ্বনিত হইতেছিল। সৌভাগ্যের কথা—স্বহাসের জন্ত এ বাড়ীতে ক'দিবার কেহ নাই, তাহার পর বেড়া ভাঙিয়া মাটি ধসাইয়া ঘটনার যে রূপ সে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাতে বংশের একটু কলঙ্ক হইলেও দোষটা হইবে স্বহাসের—তাহার নহে, দেবরের মনটাও স্বহাসের স্বভাব উপর বিরূপ হইয়া উঠিবে। মেজবৌয়ের মনটা যেন বেশ স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল।

কিন্তু বাড়ীর উঠানে পা দিতেই তাহার দুই চোখ কপালে উঠিয়া গেল। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে। বাড়ীতে যেন আনন্দের মেলা বসিয়াছে, সত্য ও মৃদু দক্ষিণের ঘরে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া গল্প করিয়া চলিয়াছে, স্বামী তাহার পোড়া তামাক ঢালিয়া আবার নতুন করিয়া সাজিতে বসিয়াছেন, মুখখানা তার আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। মেজবৌকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, তুমি কি ভয়ডাই দেখাইছিলে, মেজবৌ। তাই ত বুলি—বৌমা আমার সতীলক্ষ্মী—এমনডা কি ক'রে হবি ?—স্বরমা রাত্তিরে আ'সে বৌমারে নিয়ে গেছে। আচ্ছা দেখ দেখি পাগলীটাব কাণ্ড।—নিয়ে যাবি ত ব'লে যাতি হয়।

উত্তরের ঘরের খোলা জানালার মাঝ দিয়া স্বহাসের আঁচল দেখা যাইতেছে। স্বরমা তাহার পাশে বসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন বলিয়া চলিয়াছে। মেজবৌকে আসিতে দেখিয়াই সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল—বৌদি, কি খাওয়াবেন ক'ন ?

মেজবো তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রথমে একটু খতমত খাইল, তার পর একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—কিন্তু তুই ওরে ক'নে পালি ?

স্বরমা হাসিয়া বলিল, ক'নে আবার পাব ?—এই ঘরেরতে চুরি ক'রে নিয়ে গেছি। বো তোমাগারে চুরি করিছি আমি, কিন্তু ঐ কলসীডা নিয়ে গেছেন—আর এক জন।

আর এক জন তখন দক্ষিণের ঘর হইতে সিংহনাদ করিয়া উঠিল, ওর মিছে কথা শুনবেন না বোদি—গ্রামের জামাই হয়ে আমি কখনও চুরি করতি পারি ?

মেজবো কুমুদের কথায় জবাব না দিয়া সরাসরি ঘরে উঠিল—স্বরমা শোন—তুই যদি ছোটবোরে নিয়ে গেলি—তব্ব এ বেড়া ভাঙল কেডা শুনি ? মাটি ধসকালে কেডা ?

মেজবোয়ের ইজিভটা স্বরমা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, তার পর যখন বুঝিল—হাসি আর তার খামিতে চায় না—যেন কেহ একটা জলভরা কলসী উপড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে।

—হাসি ক্যান পোড়ারমুখী ?

পোড়ারমুখী বলিল, রাগ করবেন না বোদি—এ তালি আপনারই কীর্তি। স্বহাস আর কলসীডারে যখন নিয়ে গিছি তখন বেশী রাস্তির ত হয় নেই, আমগারে বাড়ীর সকলেই জানে। এত দিন পাহারা দিছি, কালও একলা থাকপি কেমন ক'রে—তাই নিয়ে গেছি। ও ঘরেও ত ঐ কলসীটা ছাড়া জিনিষপত্র ছিল না। রাস্তিরে ও রাঙা পিসীর কাছে ছিল—তারে জিগুগেসা করলিই জানতি পাবেন।

হাসি দিয়া আরম্ভ করিলেও প্রসঙ্গ এখন ক্রমেই অপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সত্য দক্ষিণের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। কুমুদও তার গিছু গিছু আসিয়া স্বরমাকে বলিল, এই দিকে আসো—বাড়ী চলো।

স্বরমা পোড়ারমুখীর একটুও লজ্জা নাই, সে কুমুদের আহ্বানে আগাইয়া আসিতে আসিতে মেজবোদির দিকে তাকাইয়া বলিল, কিন্তু বাই বোলেন বোদি—আপনার বরাত ভাল—বো কিরে পালেন, দেওরের চাকরি হ'ল—এবার আমাগারে মিঠেই মোণ্ডা খাওয়ান—মা দুগ্গার ওখানে ষোড়শোপচারে ভোগ দেন—মহাষ্টমী আপনার করাই সাজে।

মেজবো অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিল, চাকরি আবার ক'নে হ'ল ?

হেমন্ত ঘটনাকে একটু সহজ করিয়া লইতে বলিলেন, তা বুঝি শোন নি ?—শোনবা ক'নতে—সত্য আলি ত তুমি ঘাটে গেল। আমাগারে সত্যর বেশ ভাল চাকার হইছে—পূজোর পরেই বা'য়ে আরম্ভ করবি,—প্রথমেই একেবারে তিরিশ টাকা মাইনে। তুমি এক কাজ কর মেজবো—আমি চিনি সন্দেশ আনায়ে দিছি, তুমি থালা বাসনগুলো একবার জল দে নাও—মার ওখানে ভাল দিতি হবি।

মেজবো স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, বাই।

উত্তরের ঘরের বারান্দায় কুমুদের অপহৃত কলসীটার উপর রৌদ্র পড়িয়া জল জল করিতেছিল, মেজবোয়ের ইচ্ছা করিতেছিল ঐ কলসীটা গলায় বাঁধিয়া সে নিজেই একবার ভরা-গাঙের তল কোথা দেখিয়া আসে।



ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা

ঐরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমে একটি মূল কথা উত্থাপিত হয়, তাহা ঐ ইতিহাসের প্রাচীনত্ব লইয়া। প্রথমেই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে ভারতবর্ষের সভ্যতা কত দিনের এবং জগতে অসংখ্য দেশের অসংখ্য স্থপ্রাচীন সভ্যতার তুলনায় ইহার স্থান কোথায়। এত দিন ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটি বদ্ধ বিশ্বাস ছিল যে মানব-সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম স্থান মিশরের কিংবা মেসোপটেমিয়ার বাহা প্রথমোক্ত দেশের নীল নদী কিংবা দ্বিতীয় দেশের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়কে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। শ্রোতবৃত্তী যে শুধু জলশ্রোত বহিয়া আনে তাহা নহে, উহা সভ্যতা-শ্রোতেরও উৎস। নদীর জল ও প্রাবন উভয় অর্কর্ষিত ভূমিকে স্ফুল্ভা স্ফুল্ভা করিয়া সভ্যতার ক্ষেত্র সৃজন করে, কিন্তু সেই নিয়ম অল্পসারে সভ্যতা যে কেবল নীল নদী কিংবা টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের দ্বারা অনুগমন করিয়া পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্রবাহিত হইয়াছে, আর অল্প কোন নদীর ধারে উহার আবির্ভাব হয় নাই, একথা এত দিন প্রমাণের অভাবে নির্ণীত হইতে পারে নাই। কিন্তু সম্প্রতি এই সন্দেহের ভঞ্জন, এই সমস্তার উত্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিন্ধুদেশের মরুভূমিতে পঞ্জাবের প্রাচীন শহর হারাপ্পা ও সিন্ধুদেশের মহেনজোদাড়ো নগরে সভ্যতার যে নিদর্শনসমূহ পুঞ্জীভূত হইয়াছে তাহাব পর্য্যালোচনার ফলে ইহাই সর্ববাদিসম্মত হইয়াছে যে মানবজাতির সভ্যতার উদ্বোধন ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। সুতরাং ভারতীয় সভ্যতা জগতের অল্প কোন সভ্যতার অপেক্ষা প্রাচীন নহে। বাহ্যিক বাস্তব প্রমাণেব পরিচয় পাইবার পূর্বেই কবির অঙ্গদৃষ্টি অনেক দিন আগে এই ঐতিহাসিক সত্যের ঘোষণা করিয়াছে :-

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামর্য তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনম্বনে
জ্ঞান ধর্ম কত কাব্যকাহিনী।

আজ মহেনজোদাড়োর স্থগতীর ভূগর্ভ-নিহিত স্থপ্রাচীন সভ্যতার নানাবিধ উপকরণ-সামগ্রী ও নিদর্শননিচয় এই বাণীর প্রতিধ্বনি করিতেছে।

কিন্তু ঐতিহাসিকের দুর্ভাগ্য যে ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টিকর্তারা তাঁহাদের সৃষ্টির দিন-ক্ষণ-তারিখ কোন রকমে লিপিবদ্ধ কিংবা তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ রাখিয়া যাইবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। অনন্তর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকার জন্ত কালের মহিমার প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ ছিল না। শুধু কাল কেন, বাস্তব ও নশ্বর দৈহিক জীবনের ঘটনাবলীর প্রতি তাঁহারা স্বভাবতই উদাসীন ছিলেন। সেই জন্তই সংস্কৃত ভাষায় রচিত সহস্র সহস্র গ্রন্থের ভিতর অধিকাংশেরই রচনার কাল, এমন কি রচয়িতার নাম পর্যন্ত জ্ঞান যায় না। শুধু বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ কেন, অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভগবদ্গীতা বা শ্রীমদ্ভাগবত পুবাণের গ্রন্থ দর্শন ও ধর্মের সর্বোৎকৃষ্ট অবদানেরও কালনির্ণয় একরূপ অসম্ভব। এদিকে স্কন্দবর্মাদারক্ষাকল্পে শিষ্যের গ্রন্থ গুরুচরণে সমর্পিত হইয়াছে। “ইতি মনু,” “ইতি ভৃগু,” “ইতি কাভ্যায়ন,” “ইতি কোটিল্য” প্রভৃতি বচন নির্দেশের দ্বারাই অনেক পরবর্তী কালে রচিত শাস্ত্র ভক্তশিষ্য-পারম্পর্যের দ্বারা তাঁহাদের আদি গুরু প্রতি আরোপিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে এক গণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য এই দুইটিরই গ্রন্থকার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পরিচিত।

চিন্তা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বাস্তবের প্রতি উদাসীনতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার প্রভাব জাতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই আবহমান কাল হইতে নিম্নমিত করিয়াছে। তাই হারাপ্পা ও মহেনজোদাড়োতে সভ্যতার প্রথম প্রভাতের যে অতুলনীয় নিদর্শন সমগ্র জগতের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটিত করিয়াছে, তাহারও সঠিক কালনির্ণয়ের

জন্ম কোন প্রমাণ ঐ সকল নিদর্শনে নিহিত নাই। সেই প্রমাণেব সন্ধান ভারতবর্ষের বাহিরে যে-সমস্ত দেশের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের আদান-প্রদান ছিল সে-সমস্ত দেশে পাওয়া যায়। এই প্রকারে ভারতবর্ষের ইতিহাসের পুনরুদ্ধার অনেক স্থলে বিদেশে প্রাপ্ত প্রমাণ অবলম্বনে সাধিত হইয়াছে। তাই সর্ব জন মার্শালের রচিত মহেনজোদাড়ো-সম্বন্ধীয় বিপুল গ্রন্থে ভূগর্ভ-খনিত বস্তুর উপকরণ ও নিদর্শন সমাহিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে কালনির্ণয়ের কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ বা ইঙ্গিত সঠিক পাওয়া যায় না। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের কিছুদিন পরেই শিকাগো ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট প্রত্নতত্ত্ববিৎ লইয়া ইরাক দেশে একটি অভিযান প্রেরণ করিয়াছেন। ইহারা বোগদাদের নিকট টেল-আস্মার নামক পুরাতত্ত্বনিদর্শনলাভের একটি আশাশ্রয় ক্ষেত্রে খনন-কার্য আরম্ভ করিয়া দেন। সেখানে প্রথম খননের ফলে ভূমির উপরের স্তরেই নানাবিধ পুরাতন সামগ্রী পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রার উপর একটি লিপি উৎকীর্ণ আছে। লিপিটিতে একটি নাম, যথা, শু-দুর-উল (Shu-dur-ul) উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা আকাদ-এর সারগন-বংশীয় একটি রাজার নাম; ইনি ঐ বংশের শেষ রাজা এবং ইহার কাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০। এই মুদ্রাটির সঙ্গে জড়িত আবার আর একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে যাহা নিঃসন্দেহ ভারতবর্ষের জিনিষ। তাহার প্রমাণ মুদ্রাটিতে এমন কয়েকটি জন্তুর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ রহিয়াছে যাহার বাবিলন-জাত নহে। তাহাদের প্রত্যেকটি ভারতবর্ষের নিজস্ব জন্তু, যথা, হস্তী এবং গণ্ডার। ইহা হইতে নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে এই মুদ্রাটি সেই যুগে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইয়া টেল-আস্মার প্রদেশে নীত হইয়াছিল। এইরূপ আরও অনেক প্রমাণ ক্রমশঃ সেখানে আবিষ্কৃত হইতেছে। এদিকে এই ধরনের মুদ্রা মহেনজোদাড়োর মধ্যবর্তী স্তরে পাওয়া যায়। সুতরাং সেই স্তরের সময় অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০, এইরূপ অনুমান নিঃসন্দেহে কবা যাইতে পারে। ইহা হইতে আরও অনুমান করা যাইতে পারে যে মহেনজোদাড়ো-সভ্যতার উৎপত্তির কাল আরও প্রাচীন; কারণ এই

সভ্যতার উৎপত্তির নিদর্শন নিম্নতম স্তরে নিহিত। মহেনজোদাড়োতে খনন-কার্যের ফলে ভূমির নিম্নে ৪০ ফুটের অধিক নীচের স্তরে সভ্যতার নানাবিধ পরিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেইগুলিকে ভাগ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মনে করেন, যেন সাতটি পৃথক পৃথক শহর সেখানে স্তরে স্তরে সঙ্কীর্ণ রহিয়াছে। সুতরাং মধ্যবর্তী স্তরের আনুমানিক কাল যদি খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ ধরা যায় তাহা হইলে নিম্নতম স্তর ও প্রাচীনতম সভ্যতা ও শহরের কাল অর্থাৎ ভারতের বাস্তব-প্রমাণিত সর্বপ্রথম সভ্যতা যে অন্ততঃ ইহাব এক হাজার বৎসর পূর্বে উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদগণ নিঃসন্দেহেই অনুমান করেন। এই শ্রেণীর প্রমাণের দ্বারাই ভারতের ভাব ও সভ্যতা-ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ কালের অনুবর্তী হইয়া ধারাবাহিক-রূপে প্রকটিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

ভারত যে সভ্যতার আদি উৎপত্তির স্থল তাহার আরও প্রমাণ অন্তরিক হইতেও পাওয়া যায়। সে প্রমাণ ভূতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব-বিদগণের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফল। এই বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণের মতে মাহুঘের সভ্যতা কেন, আদিম মাহুঘই উত্তর-ভারতে হিমালয় অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাণিতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন যে প্রকৃতিদেবী অনেক দিন ধরিয়া যুগের পর যুগ, কল্পের পর কল্প মাহুঘের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করিয়া আসিতে-ছিলেন। বাস্তবিক জড় হইতে জীবনের প্রথম উদ্বেগ যে অণু-পরমাণুতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে মাহুঘের মত উন্নত জীবের উদ্গম যে অপরিণীম কালসাপেক্ষ, তাহার সন্দেহ নাই। ভারউইন-প্রমুখ প্রাণিতত্ত্ববিদগণের মতে যে শ্রেণীর জীব মহুঘাকারে বিকশিত হইল তাহার পূর্বের জীব বানর জাতি। পৃথিবীর ক্রমবিকাশের এক অবস্থায় ভারতের উত্তর ভাগ এক মহাসমুদ্রে বিলীন ছিল। সেই স্থনীল জলধি হইতে যখন হিমালয়ের অভ্যুত্থান সংঘটিত হইতে আরম্ভ হয় তখন বানরজাতি এই অঞ্চলের নিবিড় বন ও বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া এইখানেই এক রকম কেন্দ্রীভূত ও সমবেত হইয়া পড়িয়াছিল। তাব পর যখন হিমালয়ের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সমগ্র অটবী ও বিটপী নিম্নভূমির উচ্চতা ছাড়িয়া উপরের শৈত্যে আসিয়া পড়িল, তখন সমগ্র উদ্ভিদ

সেই শীতে বিনষ্ট হইল। বনের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বন-বৃক্ষাশ্রিত বানরজাতি আশ্রয়হীন হইয়া জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে বাধ্য হইল। এত দিন তাহারা গাছে গাছে বিচরণ করিয়া জীবনধারণ করিতেছিল। এখন নূতন অবস্থায় বৃক্ষশাখা ছাড়িয়া তাহাদের সমতলভূমিতে বাস করিতে হইল। প্রকৃতি-দেবীর এই লীলার নিগূঢ় তত্ত্ব ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। চতুষ্পদ বানরকে তখন সমতলভূমির উপর বিচরণ ও বসবাসের উপায়স্বরূপ দ্বিপদ হইবার জন্ত চেষ্টা করিতে হইল। সেই চেষ্টার ফলেই দ্বিপদ মানুষ জগতে প্রথম আবির্ভূত হয়। সুতরাং হিমালয়ের অভ্যুত্থান শুধু একটি ভৌগোলিক ঘটনা নয়। উহার সঙ্গে মানুষের অভ্যুত্থান ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। হিমালয় শুধু যে ভারতবর্ষকে পূর্ণাবয়ব করিল তাহা নহে, তাহার ভৌগোলিক রূপ ও পরিণতি সম্পাদনের সঙ্গে হিমালয় মানুষ ও মানুষের সভ্যতাকেও সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষই যখন মানুষের প্রথম জন্মস্থান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তখন মানুষের প্রথম সভ্যতা যে ভারতভূমিকে আশ্রয় করিয়াই আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ।*

* উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিয়ে কয়েকটি বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের উক্তি উদ্ধৃত হইল :

(1) "Man and the Himalayas arose simultaneously, towards the end of the Miocene Period, over a million years ago." [Barell]

(2) "As the land arose, the temperature would be lowered and some of the apes, the ancestors of man, who had previously lived in warm forests, would be trapped to the north of the raised area." [Sir Arthur Smith Woodward]

(3) "As the forests shrank and gave place to plains, the ancestors of man had to face living on the ground. If they had remained arboreal, or semi-arboreal like the apes, there might never have been Man." [Thomson and Geddes]

(4) "The common ancestors of anthropoid apes and men probably occupied northern India during the Miocene Period." [Elliot Smith]

(5) "We have to go to the region north and south of the Himalayas to find peoples whose facial characteristics best resemble those of Cro-Magnon men, while their stature and bodily build are best displayed by the Sikha." [Professor Lull]

কিন্তু উত্তর-ভারতই যে মানবজাতির প্রথম লীলাক্ষেত্র ও সভ্যতার উৎপত্তিস্থান তাহার আরও প্রমাণ অল্প আর এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভাবন করিয়াছেন। উদ্ভিদ-বিদ্যার একটি শাখাবিজ্ঞান সম্প্রতি প্রচলিত হইয়াছে। এই নব বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য উদ্ভিদের উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করা। ইংরেজীতে ইহার নাম প্লাস্ট জেনেটিক্স। সোভিয়েট রুশিয়ার কতিপয় বৈজ্ঞানিক এই বিদ্যার বিশেষ অগ্রগণ্য কবিতেছেন। ইহাদের নেতার নাম ভেভিলফ (Vavilov)। ইহারা দেখাইয়াছেন যে মানবের ইতিহাসে যতগুলি প্রধান প্রধান সভ্যতা আবির্ভূত হইয়াছে প্রত্যেক সভ্যতাই কৃষিকর্ম এবং কোন একটি বিশেষ উদ্ভিদকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক সভ্যতাই ক্ষুদ্রিক ও উদ্ভিদমূলক। সভ্যতা ভাবের দ্বারা অল্পপ্রাণিত কিন্তু তাহাকে মাটির আশ্রয় লইতে হইবে আত্মপ্রকাশের স্বত্ব। ভাবের সহিত ভাবের মিলনেই সভ্যতা প্রসূত হয়। ইহা একটি স্থির সিদ্ধান্ত যে ইউরোপের সভ্যতা গমের কর্ণ গড়িয়া উঠিয়াছে, আর আমেরিকা তার বদলে ভুট্টা বা গোধূম (maize) অবলম্বন করিয়াছে, চীনদেশ ও দক্ষিণ-ভারত ব্রীহি-যব-ধান প্রভৃতির আশ্রয় লইয়াছে। এই সকল অম্লোপায়ের মধ্যে গমই সর্বাপেক্ষা বলপ্রদ। রাসায়নিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে গোধূম খাদ্য হিসাবে তত ভাল নয়, কারণ ইহাতে স্বাস্থ্যের প্রধান উপকরণ ভিটামিন পাওয়া যায় না। সেই জন্য গোধূম-প্রসূত-খাদ্য-জীবী জাতি সাধাবণতঃ পেলাগ্রা নামক চর্মরোগে আক্রান্ত হয় এবং অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ হইয়া সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইতে পারে না। দান্য হিসাবে গমই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইউরোপীয় সভ্যতার সর্বাপেক্ষা উন্নতি গমের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভেভিলফ প্রমুখ রুশের বৈজ্ঞানিকগণ সেই গমের উৎপত্তিস্থান অনেক অগ্রসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা আফগানিস্থান ও পঞ্জাব প্রদেশের উচ্চভূমিতে। এই সঙ্গে তাহারা আরও দেখাইয়াছেন যে মিশরের সভ্যতাও গমের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সেই গম ভারতীয় ও ইউরোপীয় গমের মত নয়। উহা ভিন্ন জাতীয় গম। উহার উৎপত্তিস্থান আফ্রিকানিয়া। উহাকে বলে হার্ড ছাইট, আর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় গমের নাম ব্রেড-ছাইট। সুতরাং এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকের গবেষণা দ্বারা নিঃসন্দেহে নির্দ্ধারিত হইয়াছে

যে ভারতবর্ষ মাস্তুলের শ্রেষ্ঠ খ্যাত প্রথম আবিষ্কার করিয়াছে এবং তৎসঙ্গে মানবসভ্যতার ভিত্তি প্রথম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাই, মহেন্দ্রগড়ের ভূগর্ভে যে গমচাঁকের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে সেই গম আধুনিক পঞ্জাবজাত গমের পূর্বরূপ ও মূলস্বরূপ। এই কথা বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিয়াছেন এবং সর্ জন মার্শালের উপরিউক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

উপসংহারে আর একটি কথার উল্লেখ করিতে চাই। অনেকে মনে করেন যে মহেন্দ্রগড়োতে যে প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা না-কি বৈদিক সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন এবং বৈদিক সভ্যতা উহার কাছে স্বর্গী। বৈদিক সভ্যতাই যে ভারতের এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম আদি সভ্যতা তাহার প্রমাণ এখানে অবতারণা করিবার অবসর নাই। বেদবিৎ ভাস্কর লক্ষণস্বরূপ বিশেষ ভাবে এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ দিয়াছেন। এই বিষয়ে আমিও আমার নূতন ‘হিন্দু সিভিলিজেশন’ নামক গ্রন্থে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। ষাঁহার সিদ্ধ-সভ্যতাকে বৈদিক সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীনতর মনে করেন, তাঁহাদের একটি মূল প্রমাণ যে মহেন্দ্রগড়োতে যোগীর প্রতিকৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু স্বথেষ্টে যোগের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক ও সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দুধর্মমতের বিরুদ্ধ। হিন্দু মাত্রেই বিশ্বাস যে স্বর্গের অপৌরুষেয় অতীন্দ্রিয় যোগ-সাধনা-লক্ষ-জ্ঞান-প্রসূত। এই বিশ্বাস যুগে যুগে সর্বশাস্ত্রে ধারাবাহিক প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। বর্তমান ক্ষেত্রে আমি এই বিশ্বাসের ভিত্তি-স্বরূপ স্বর্গের কয়েকটি স্তোত্র মাত্র উল্লেখ করিব। স্বর্গের ১।১৬৪।৪৫ স্তোত্রে যোগীরই উল্লেখ আছে যিনি মনীষী ব্রাহ্মণ বাগ্‌দেবীর বা শব্দ-ব্রহ্মের আরাধনা করেন [‘মনীষিণঃ মনসঃ স্বামিনঃ স্বাধীনমনস্কা ব্রাহ্মণাঃ রবাস্যস্ত শব্দব্রহ্মশোহিগন্তারো যোগিনঃ’ (সায়ণ)]। দশম মণ্ডলের নানা শ্লোকে তপস্কার

উল্লেখ আছে। ১০২।৪ স্তোত্রে সপ্তর্ষির কথা আছে ষাঁহার ‘তপোনিবিষ্ট’ (‘তপসে যে নিষেহঃ’)। ১৫৪।২ স্তোত্রে ‘তপস্কার’ বিধি বর্ণিত আছে, যথা, ‘কচ্ছুচাস্ত্রায়ণ’ বাহার দ্বারা তপস্বী “অনাযুয্য” হন। এই স্তোত্রে রাজস্বয়, অশ্বমেধ, বা হিরণ্যগর্ত-যোগ ইত্যাদিরও ইঙ্গিত সায়ণের মতে পাওয়া যায়। এই সকল উদাহরণ সায়ণাচার্য উল্লেখ করিয়াছেন। স্বর্গের ইহার ইঙ্গিত মাত্র আছে। ১৬৭।১৫ তপের উল্লেখ আছে (‘স্বঃ তপঃ পরিতপ্য অজয়ঃ স্বঃ’)। ১৩৬।২ স্তোত্রে স্বল্পধারী মূনির বর্ণনা আছে (‘পিশঙ্গা বসতে মলা’) যিনি বায়ুর নির্বাধ গতি ও স্বস্থ শরীর তপঃপ্রভার অর্জন করেন এবং যিনি সমাধিস্থ হইয়া থাকেন [‘বাতস্ত এজিৎ (গতিং) মনুষ্যতি’; ‘উন্নতিত। মোনেয়েন (মুনিভাবেন লৌকিক সর্বব্যবহারবিসর্জনোন্নোন্নতিত। উন্নত।) বাতান্ মা তস্মি ববন্’]। পরবর্তী স্তোত্রদ্বয়ে মূনির আরও নির্দেশ আছে। তিনি বায়ুর দ্বায় সর্বব্যাপী (‘অন্তরীক্ষে পততি বিখা ক্রসাবচাকসাৎ’) স্বর্গের দ্বায় সহস্রাক্ষ, স্মৃতিসম্পন্ন দেব-সখা, ও দেবেষিত অর্থাৎ দেবভুলভ দেবেষিত। ১২০।১ স্তোত্রে স্বত ও সভ্যকে তপস্তালব্ধ ফল এবং সমগ্র সৃষ্টিই ব্রহ্মের তপস্কাপ্রসূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (‘স্বতঃ চ সভ্যঃ চাতীকাতপসোদ্যজায়ত’)। স্বর্গের প্রথম মণ্ডলেও ৫৫।৪ স্তোত্রে স্বর্গের কথা আছে, যিনি বনবাসী হইয়া ভগবানের ধ্যান করেন। স্বর্গের ৭।১০৩।১ স্তোত্রে ‘ব্রতচারী ব্রাহ্মণের’ উল্লেখ আছে। স্বর্গের মতে ব্রতচারীর অর্থ ‘অক্রবাণ’ মৌনী (নিরুক্ত, ৯৬)। দশম মণ্ডলের ৭।১১ স্তোত্রে স্পষ্টই যোগের কথা আছে যাহার দ্বারা “পরব্রহ্মজ্ঞানে”র সাধনা করিতে হয়। বস্তুব্যের বিস্তার করার প্রয়োজন নাই। ষাঁহার যোগ-সাধনকে অনাধ্য-সাধন মনে করেন, আশা করি তাঁহার স্বর্গের এই সকল বচন প্রণিধান করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তের পুনর্বিচার করিবেন।



প্রবীণ পুরোহিত

ব্রাউনিঙের বাব্বি বেন এক্সবাহ হইতে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

মোর সাথে হও বুড়া! সর্বশ্রেষ্ঠ বাহা
এখনো যে বাকী আছে তাহা,
—জীবনের উত্তরার্দ্ধ, প্রথমার্দ্ধ সৃষ্ট যার ভরে।
আমাদের পরমায়ু খরিছেন যিনি নিজ করে
শোন বাণী তাঁর,
—“তোমার সম্পূর্ণ ছবি চিত্রলেখা মোর তুলিকার।
যৌবন আবেকমাত্র, হাতখানি রাখি মোর হাতে
চল আগে, দেখ সব শঙ্কালেশহীন আশিপাতে।”

নয়, নয়, তরুণের পুষ্প আহরণ,
মালকে উদ্ভাস্ত বিচরণ।
গোলাপের কোনটরে চমক করিবে?
কোন পদ্মটরে কেলি হাহতাশে তাহারে স্মরিবে?
চাহিয়া নক্ষত্রপুঞ্জ পানে
প্রাণ তার তৃপ্তি নাহি মানে।
“চাহি না রোহিণী কৃত্তিকারে,
আমি চাই যারে
ইহার। ত সে তারকা নয়
হরিবে যে আমার হৃদয়।
এ নক্ষত্র-দীপালির সব শিখাগুলি
নিশ্চিন্ত করিয়া কবে দাঁড়াবে সে তিমিরগুহনখানি যুলি?”

জন্মায় এ যৌবনের দিনগুলি আশা আকাঙ্ক্ষায়
অপচয় করে যারা তাদের ভরি না ভৎসনায়।
আমি প্রজ্ঞা করি হেন নিরাকুল সজ্জন সংশয়,
যারা দীন ক্ষুদ্রাশয়, এ উদ্বেগ তাহাদের নয়।
তারা ত জানে না হায় কারে বলে যৌবন-বেমনা,
নিটোল মাটির তালে দীপ্তি নাহি চালে বহ্নিকণা।

বড় যে দরিদ্র রিক্ত এ জীবন হ’ত নিরবধি,
শুধু মাত্র স্বথভোগ লাগি তার সৃষ্টি হ’ত যদি।
ইঙ্গিতের তুরিতোহন তরে
শুধু ফিরিতাম যদি লোলুপ অন্তরে,
সে ফলার হ’ত যবে শেষ,
রহিত না নয়নের কোনো চিহ্নলেশ।
পাখীর কি থাকে খেদ ক্ষুধা মেটে যবে,
সংশয়বিহীন পশু ভরাপেটে হয়েছে বা কবে?

বল, বল ধন্য এ জীবন,
নিভাস্ত রয়েছি যে যোরা আমরণ
তারি সাথে, না লয়ে যে জ্ঞান শুধু দিতে
গ্রহণ করে না ফল, দেয় শুধু তাহারে কলিতে।
এই মাটিভরা দেহে ঘোটে দীপ্তিকণা,
তাই জানি যে বিধাতা পূরন প্রার্থনা
জ্যোতির ক্ষুরে মোরা তাঁর কাছে যাই,
যারা শুধু নিতে জানে ত দেয়ে এড়াই।
অচল প্রতিষ্ঠা এ বিশ্বাসে
কিছুতেই নাহি যেন নাশে।

সাদরে বরণ করি তবে,
বিমুখতা প্রত্যাখ্যান যত আছে ভবে।
এ ধরার মন্থনতা প্রতি হাতে কক্ষক বন্ধুর
অভ্যাস-কর্কটুর।
যে দংশ অস্থির ক’রে দেহ না ক বসিতে দাঁড়াতে
ছুটি যেন তার বোনাতে।
জীবনের স্বথে যেন তিন ভাগ দুঃখ মিশে যায়,
প্রাণপণ চেষ্টা যেন শ্রমভার কত না ভরায়।

গণনায় না আনি বেদনা
লভি শিক্ষা, আশ্রয় যত না
যাতনার নিষ্পেষণ, নিঃশব্দ-অস্তর
হই অগ্রসর।

প্রাণে উপজয়
কৌতুকের সনে যেন সান্ত্বনার মধু সময়।
জীবনের বিফলতা মাঝে কঠে জয়মালা ধরি,
চেয়েছিহু হ'তে বাহা, সে ব্যর্থ প্রচেষ্টা ওঠে ভরি
প্রশান্তি কুণলে
স্বাধী আমি, পশুত্বের গুরুভারে ডুবি নি অভলে।
সে কি পশু নয়,
আত্মা যার অসি সম রক্ত-মাংসে কোষবদ্ধ রয় ?
বাসনা বাহার
ইন্দ্রিয়ের বনে বনে ব্যাঘ্র সম করিছে বিহার ?
যে মাছুষ, প্রাণ কর তারে,
—দেহের চূড়ান্ত বেগ তাহার আত্মারে
সজীহীন যাত্রাপথে কত দূর লয়ে যেতে পারে ?

তবু যা পেয়েছি তার আছে ব্যবহার
জানি আমি ; কত নাহি করি অস্বীকার
জীবন-সরণি পরে প্রতি বাক্যে বাক্যে
অতীত আমাকে
দিয়াছে যে কত শক্তি কত না পূর্ণতা
কত সার্থকতা।
এ নয়ন শ্রবণ-গাগরি
আমি যে লয়েছি ভরি ভরি।
স্বস্তির ভাঙারে সব রয়েছে সঞ্চিত।

আনন্দ-স্পন্দিত
হিয়া মোর উঠিবে না পুলকে শিহরি,
বলিবে না,—“পেয়েছি শিখেছি কত এই দেহ ভরি।”

একটিমাত্র প্রাণস্পন্দে বলিব না আমি
—“নমো নমঃ, ধন্য তুমি হে জীবনস্বামী।
তোমার পরিকল্পনা পূর্ণরূপে পাই দেখিবারে।

যেথা দেখিতাম শুধু শক্তিমাত্র তাহার মাঝারে
পাই যে প্রেমের নিদর্শন,
বিশুদ্ধ অপাপবিন্দু আনন্দগহন।

নাই শূঁৎ তব রচনার
নরজন্ম ধন্য যে আমার।
হে বিধাতা, ভেঙে চূরে তুমি মোরে গড় পুনরায়,
তুমি যে মঙ্গলময়, নাহিক সংশয়-লেশ তায়।

এই রক্তমাংস স্থখে ভরা,
ফুল-ফাঁদে আছে যেন ধরা
আমাদের অস্তরাত্মা, সে বাঁধনে ধরা তারে টানে।
তবু শান্তি চায় প্রাণ তৃপ্তি নাহি মানে।
চায় সে পশুর এই সুবিপুল ঐশ্বর্যের সনে
অপার্থিব চিন্তামণি ধনে,
—মানবের প্রচেষ্টার উপলব্ধি সার
শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

সদা যেন এ কথা না বলি,
—যদিও এ রক্তমাংস ছলিছে কেবলি,
তবু আমি আশ্রয়বলে করিয়াছি ইন্দ্রিয় বিজয়,
তাই প্রাণ নব নব সিদ্ধিপথে অগ্রসর হয়।
মুক্ত পক্ষে ধায় পাখী স্থখে গান গায়,
তেমনি আনন্দে যেন কঠে উৎলায়
এই বাণী—“যাহা কিছু আছে ভাল সকলি মোদের,
আনন্দকূলা লভে দেহ আত্মা হ'তে, আত্মা পায় অঞ্জলি
দেহের।”

যৌবনের উত্তরাধিকার
তাই দাবী করি আমি সম্মুখে জরার।
জীবনের যুদ্ধ অবসানে
বিধাতার আশীর্বাদ ধরি মোর প্রাণে।
পূর্ণাঙ্গ পশুর পদ পিছু ফেলি হয় অগ্রসর
দেবাত্মসম্মত নর দেবের প্রবর।

বিশ্রামান্তে ছুসাহসভরে
বাহিরিব আরবার অভিনব সংগ্রামের তরে।

নিরুদ্ভিগ্ন নির্ভীক হৃদয়
চয়ন করিব পুন নূতন আয়ুধ বর্ষাচয়।

যৌবনান্তে করিব বিচার
—জয় ক্রিষা পরাজয় ঘটিল আমার।
ভস্মরাশি অপসারি কতটুকু সোনা আছে তলে
দেখিব পরধ কবি তুলানু কি ওজন বলে।
সেই অমুপাতে
স্তুতি নিন্দা বাহা হয় জীবন লভিবে মোর হাতে।
যৌবনে যা ছিল অনিশ্চিত
বার্দ্ধক্যে তাহার মূল্য করিতে পারিব নির্ধারিত।

বেথো মনে, নামে যবে সাঁঝের আঁধার
রুদ্ধ হয় সায়াহ্নের কনক-দ্বার,
আসে সে মাহেন্দ্রক্ষণ, কর্ণগ্রস্থি যবে ছিন্ন হয়,
ধূসর গুঠন তলে যে গৌরব কবরিত রয়
তারে তুলে আনে,
আসে অভ্যন্তর হ'তে অক্ষুট গুপ্তনধনি কানে,
—“আর এক দিনের আমু শেষ হ'ল এবে,
লহ ইহা আপনার পুঞ্জি মাঝে, আর দেখ ভৈবে
কি মূল্য ইহার
জীবনে তোমার ?”

জীবন হয় নি শেষ, তবু আজি যশ্বের অতীত,
বিচারান্তে মীমাংসায় হ'তে হবে এবে উপনীত।
—“এক্ষেত্রে প্রমত্ত হওরা অসঙ্গত নয়।”
“সে মৌন সম্মতি শুধু মিথ্যার আশ্রয়।”
“অতীতের অভিজ্ঞতাবলে,
ভবিষ্যে পেরেছি কবলে।”

গুণ্ড ফল হবে জানি যৌবনের অপটু চেষ্টায়
আঙ্গুরে আপনারে গড়িয়া তুলিতে যদি চায়।
বাঁধা পথে চলা যথা নবীনের ধর্ম কছু নয়,
তেমনি প্রাচীন যেন স্থিতিশীল বৃদ্ধহীন হয়।

প্রতীক্ষায় সহিষ্ণুতা হে প্রবীণ ক'রও অর্জন,
রহিও অকুতোভয়ে মবণেরে কনিতে বরণ।

যথেষ্ট কি নয়
সত্য শিব ভূমা যিনি তাঁর পরিচয়
পেয়ে যদি থাক তুমি অল্পভূতি মাঝে ?
এই হাত-পা যে
তোমারি, তা জান যথা সংঘবিহীন।
যুবজন-জটলার তর্কে অর্ধাচীন
নাহি যেন পারে কছু টলাতে তোমারে,
সঙ্গীহারা ভাবিও না কছু আপনাবে।

কুত্র চিত্ত, উদ্যাব হৃদয়,
ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য মাঝে যেন ভিন্ন রয়।
বিবোধিত হয় যেন তাহাদেব কাছে
অতীতে তাদের স্থান কোন্‌খানে আছে।
আমার বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ করে,
স্বপ্না করি বাহাদুরের অন্তরে অস্তরে,
তাদের, অথবা মোর,—সত্যাত্ম্য কার ?
দিবে শাস্তি প্রবীণের যথার্থ বিচার।

দশে যাহা ভালবাসে আমি তাহা ঠেলি স্বগাভরে,
আমি ছুটি যার পিছু তারে যে অবস্থা তারা করে।
সসম্মানে করি যা গ্রহণ,
তুচ্ছ মনে করি তারা করে তা বর্জন !
আমারি মতন তারা চোখ কান ধরে
তবু এ কী ব্যবধান যোদের ভিতরে !
আমি এক ভাবি হায়, তারা ভবে আর,
কার হাতে বল তবে মীমাংসাব ভার ?

‘কাজ’ বলি বাজে মাল লোকে বাহা বরিছে প্রচার,
নির্ভর রাখিয়া তায় ক'রো না বিচার।
চক্ষে যাহা পড়িল সহজে,
অমনি নগদ মূল্যে তারে কিনিছ যে !

নিম্নভূমি হ'তে বাহা ক্ষুদ্র মানবের হাতে আসে
 তুর্ণ মনঃপূত হয়, মূল্যার্থ্য হয় অনায়াসে।
 মাছবের ক্ষুদ্র মাপে পড়ে না যা ধরা
 বুধা ভাবে মৃৎ নর তাহারে ধর্মব্য জ্ঞান করা।
 অল্পভূতি অগুণ যেথায়,
 সঙ্কল্প নহেক স্থির যেথা দৃঢ়তায়,
 কাজের ঘরেতে শূন্য আছে শুধু যেথা লোকে ভাবে,
 সেথায় কর্মের ফল জন্মা হয় অদৃশ্য হিসাবে।

যে চিন্তা পড়ে না ধরা কর্মের সঙ্কীর্ণ পর্ণপুটে,
 পলাতকা যে কল্পনা ভাবার বন্ধনগ্রন্থি টুটে,
 জীবনে যা ফুটিল না মোর,
 এ জীবন ভোর
 সবার্কার উপেক্ষিত যাহা কিছু আছে মোর মাঝে,
 বিধাতার চক্ষে তাহা অকুণ্ঠিত স্বাক্ষর্যে বিরাজে।
 তাঁর কাছে উপেক্ষা লাভি নি,
 নিজচক্ষে এই ঘট রচিলেন যিনি।

একবার ভেবে দেখ মনে,
 এ উদাহরণে।
 কেন কুমারের চাকে দেয় পাক ক্ষিপ্ৰাবেগে কাল,
 পড়ে আছে তার পরে কেন বল এ মাটির তাল ?
 তোমাবে ত মুখেরাই বলে,
 তাহাদের হাতে হাতে সুরাপাত্র যবে ক্রান্ত চলে,
 “চল-চঞ্চলতা ভবা ভঙ্গুর জীবন,
 পলে পলে হের তার কি পরিবর্তন !
 এই ছিল এই আর নাই,
 হাতে যা পেয়েছ আজ ধরে বাধ ভাই।”

ওরে মৃৎ, মন্দবৃত্তি, যাহা কিছু আছে
 চিরন্তন কাল তারা পূর্ণ করিয়াছে।
 নিরাকৃত হবে না ত তারা,
 হোক না সৃষ্টির স্রোত চির পরিবর্তনের ধারা।
 এই চল-চঞ্চলতা মাঝে
 পরমাত্মা সনে তব আত্মা জেনো ক্রবশে বিরাজে,

তোমা মাঝে পশিয়াছে যারা
 ছিল, আছে, নিত্যকাল রহিবে যে তারা।
 কালচক্র যুদ্ধক যেদিকে
 এ-মাটি ও কুস্তকার চিরদিন রহিবে যে টিকে।

এই নমনীয় যুক্তিকার
 আবর্তন মাঝে কুস্তকার
 দিলেন তোমারে ঠাই ; তুমি এই মুহূর্তটি ধরি
 যতই রাধিতে চাও অবিচল করি
 বর্ণীষ্মভরে জাগে আত্মায় তোমার
 প্রগতি ও প্রবণতা তার।
 তোমারে পরখ করি পাকে পাকে গীড়িয়া গীড়িয়া
 সে তোমারে তুলিছে গড়িয়া।

নাই বা ঘটের পাদমূলে
 শিশুকন্দর্পের দল উদ্ধ পানে হাসিমুখ তুলে
 জটলা বাঁধিয়া আর ক'রে ছুটাছুটি
 সহসা থামিয়া গিয়া পড়ে না-ক লুটি
 এ উহার গায়ে ? যদি নৃ-কপালগুলি শোভা পায়
 কান্নার চৌদিকে তার শুষ্কমুখে কিবা ক্ষতি তায় ?
 উঠুক তাহারা জাগি চাপে স্বকঠিন,
 তবুও হয়ো না শান্তিহীন।

চাহিও না নিয়মুখে চাও উদ্ধপানে,
 জাগুক নয়ানে,
 —সুখার বদান্ত ব্যবহার
 ভোজের উদার ক্ষেত্র, শিখা দীপিকার
 মধু তুর্ধ্যাব
 অভিনব কেনিল আসব
 রক্তরাগ প্রভুর অধরে।
 দেবের ভূদার তুমি দেবতার করে,
 এ ধরার চক্রপরে আর
 কেন দৃষ্টি রাখ বারংবার ?

হে মোর দেবতা, আমি নিরবধি তোমারেই চাই,
 যে তুমি আপন হাতে মানবেরে গড়িছ সদাই।
 তোমার চক্রে ঘূর্ণী সৰ্বাপেক্ষা ভীষণ যখন,
 তোমারে ভুলি নি আমি, ছিন্ন যবে অৰ্দ্ধ-অচেতন
 শৃঙ্খলিত চিত্রবর্ণ যুক্তিকা-বন্ধনে
 তখনো জাগিত মোর মনে,
 —আমার চরম গতি আশা,
 তৃপ্তি দিয়া মিটনো যে তোমার পিপাসা।

কর তবে আমারে গ্রহণ,
 লও তারে নিজ কাজে যাবে তুমি করিলে সজ্ঞন।
 কলঙ্ক তরুর,
 যা কিছু কুৎসিত অবাস্তব
 কর দূর। মোর আয়ু আছে হাতে তব,
 মনের মতন করি গঠন-দৌষ্টব
 দাও নিজ পানপাত্রটিরে।
 আজি শুভ্রশিরে
 জরা মোর যৌবনেরে জ্বানাক্ আনতি
 মরণে যৌবন মোর লভে যেন শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

দ্বিজেন্দ্রলালের রসরচনা ও দেশপ্ৰীতি

শ্রীযতীশ্রমোহন বাগচী

মহাকালের পারের নৌকায় মানুষের স্থান নাই, শুধু তাহার কৃতকর্মের—তাহার কীর্তির স্থান আছে। কবির ভাষায় 'ঠাই নাই, ঠাই নাই, ছোট সে তরী, আমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি'। তুমি আমি সে নৌকায় পার হইতে পারিব না; তবে সোনার কসল যদি কিছু আমাদের থাকে, তাহাই কেবল সেখানে স্থান পাইবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল আজ নাই, কিন্তু তাহার বহুমুখী প্রতিভার কীর্তিকিরণে বঙ্গসাহিত্যাকাশের দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া আছে এবং যতদিন বঙ্গসাহিত্য থাকিবে, ততদিন বঙ্গবাসী তাহার সেই আনন্দালোকে আপনার অন্তরলোক উদ্দীপ্ত করিয়া লইবে।

গুণগ্রাহিতাই গুণী হইয়া উঠিবার সোপান। আজ বিভালাই যে প্রকৃত গুণীর গুণ গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে, বাস্তবিকই তাহা জাতির পক্ষে আশার কথা।

দ্বিজেন্দ্রলালের দানের কথা স্মরণ করিতে গিয়া সৰ্বাগ্রেই তাহার হস্তরসরচনা ও দেশপ্ৰীতির কথা মনে পড়ে। হস্তরস-সৃষ্টিতে, শুধু বঙ্গসাহিত্যে কেন, অনেক সাহিত্যেই, বোধ করি, তাহার তুলনা মিলে না। যে রচনা সম্বন্ধে

গুণগান করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের দ্বারা রসজ্ঞ সমালোচকও 'শুচিশুদ্ধ অনাবিল হাস্যে অবনতশ্রুঙ্গ' রচয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অর্ঘ্যদান করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে প্রশস্ততর প্রশস্তি সম্ভবে না; আমরা এখানে কেবল সেই হস্তরচনার ভাষ্য রচনা করিবার চেষ্টা করিতে পারি মাত্র।

এই হাস্যরসে মানবজীবনের পরম প্রয়োজন। আবার সে জীবন যদি কেবল দুঃখ-দারিদ্র্যেরই দুর্ভোগস্থল হয়, তবে সে জীবন ধারণের পক্ষে হাস্যরসের প্রয়োজন অপরিহার্য। হোক সামান্য, হোক ক্ষণিক, সেই হাসি তাহার বাঁচিয়া থাকিবার পথের পরম পাথর। আমাদের মত বহলাঙ্কিত জাতির জীবনে সে হাসি যেন মৃতসঞ্জীবনীরই কাজ করে।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই হাস্যরসরচনা মূলতঃ জিহবার বিভক্ত। প্রথম, নিছক হাস্য—যাহা কাহাকেও কিছুমাত্র আঘাত না করিয়া অন্তরের সহজ প্রবণ হইতে আপনা-আপনি উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে ও মানুষকে কৌতুকরসে উদ্ভূত করিয়া আনন্দ দান করে।

দ্বিতীয়, ব্যঙ্গহাস্য বা উপহাস—যে হাসি ব্যক্তিগত বা সমাজগত দুর্বলতা ও সন্ধীর্ণতার প্রতি কটাক্ষ করিয়া

উপহাসের উপাদানরূপে উদ্দীপিত হয় এবং যাহা তাহার বিজ্ঞপের বৈজ্ঞাতিক কশাঘাতে মাহুকের সহজ চৈতন্যকে জাগ্রৎ করিয়া তুলে।

তৃতীয়, অট্টহাস্য—ব্যক্তি বা সমাজ, কাহাকেও ঠিক মুখ্য লক্ষ্য না করিয়া যে হাসি আপনাত্মক অন্তরঙ্গ প্রাণপুরুষ বা অন্তরের পরিস্থিতিকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রকাশ্য মধ্যস্থিতিক পরিহাসরূপে হা-হা বা হা-হা-হা করিয়া উঠে। আমাদের এই দ্বিচ্ছিত জীবনের নিরুপায় দুর্দৈবে যাহার জন্ম এবং মহাকাালের অট্টহাস্যের সহিত যাহার কোষায়, বোধ করি, একটা মিল আছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে একই ভাবের বিভিন্ন অভিব্যক্তি জগতে দেখা যায়। হাসির কথা শুনিয়া কেহ-বা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠে, কেহ-বা মুখখানিকে ঈষৎ মিত বিকশিত করিয়া তুলে, আবার কাহারও বা মুখচোখ রক্তাভ হইয়া উঠে মাত্র, হাস্যের অন্ত কোনও চিহ্ন প্রকাশ পায় না। বেদনা-ব্যাপারেও তেমনি। পুত্রহার জননী—কেহ ক্রন্দনের চীৎকার শব্দে গগন বিদীর্ণ করেন, কেহ-বা অব্যক্ত হাহাকারে দরবিগলিতধারে অশ্রু বিসর্জন করেন, আবার কেহ-বা ধূল হইয়া পাখরের মতন বসিয়া থাকেন, চোখে বা মুখে অশ্রুও নাই, শব্দও নাই। এমনও দেখা যায়, শোকের আকস্মিক আঘাতে কিয়ৎকালের জন্য কাহারো মুখে অসংবদ্ধ প্রলাপবাণী ও ভাণ্ডবহাসা দেখা দেয়। দ্বিজেন্দ্রলালের যে হাসির কথা আমরা এখানে বলিতেছি, তাহার সহিত সাধারণ হাস্যের বড় সম্বন্ধ নাই। তাহা অন্তরের সহজ আনন্দপ্রবাহের উচ্ছল অভিব্যক্তি নহে, তাহা রোদনেরই রূপান্তর মাত্র। স্বগভীর দেশপ্ৰীতির অক্ষুট বেদনা রূপ হাস্যরূপে সেখানে যেন শব্দিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা যেন তাঁহার স্বকীয় শক্তির স্তম্ভিগর্ভাবাসে হাসি ও অশ্রু-মিশ্র অপূর্ণ সমজ-মুক্তা। এ-হাসির পরিচয় আমরা শেক্সপিয়ারের ‘কিং লিয়ার’ নাটকে, গিরিশচন্দ্রের ‘প্রফুল্ল’ প্রভৃতি কোনও কোনও নাটকে এবং দ্বিজেন্দ্রলালেরই একাধিক নাটকে, বিশেষ করিয়া, তাঁহার ‘সাজাহান’ নাটকে পাইয়া থাকি।

এইবারে আমরা এই হাস্যজিবেণী হইতে এক-একটি ধারা ধরিয়া অতি সংক্ষেপে উদাহরণযোগ্য আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব।

১। একি হেরি সর্বনাশ, রাম তুই যাবি বনবাস।
ভোরে ছেড়ে যবে না প্রাণ, আমার এ প্রব বিবাস।
যদি নিতান্ত যাবি রে বনে, সঙ্গে নে সীতা লক্ষণে
ভাল দেখে দাবা এক জোড়, ভাল দুজোড় তাস। ইত্যাদি
বনবাসের অপার দুঃখের মধ্যে রামচন্দ্রের মত নর-
দেবতা তাস ও দাবা খেলিয়া তবু অনেক দুঃখ দূর, হইতে
পারে, এই ভরসা।

২। প্রাণ বাধিতে সদাই যে প্রাণাণ্ড।
জন্মিতে কে চাইত, সেটা আগে যদি জানত।
ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট, তার পবেতে যে সব কষ্ট—
বর্ণিতে অক্ষম আরি সে সকল বৃত্তান্ত।
স্নানাদির পর নিত্য নিত্য সুখার জলে যায় যে পিত্ত,
খেতে বসলে চর্কণ করতে করতে পরিশ্রান্ত।
যদিই বা খাই যথাশাখ্য, খেলেই যায় ফুরায় খাদ্য,
পান্ত আনতে লবণ ফুরায় লবণ আনতে পান্ত।
কিনলে পরে কোনো দ্রব্য, দাম চাহে যত অসত্য,
বাতা জুড়ে বসে থাকে পাওনার দুর্দান্ত।
বিয়ে করলেই পুত্র কন্তা আসে যেন প্রবল বজ্র,
পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই যে সর্ববাস্ত।

বাঙালী-জীবনের কি নিখুঁত হাসির নক্সা।

৩। বুড়োবুড়ী দুঃখনাতে মনের মিলে হুখে থাকত।
বুড়ো ছিল পরম বৈক্য, বুড়ী ছিল ভারি শক্ত।
হুত যখন ঝগড়ার টি, হুত প্রায়ই লাঠালাঠি,
ব্যাপার দেখে ছোটোছুট, পাড়ার লোকে পুলিস ডাবত।
হঠাৎ একদিন ‘দুস্তোর’ বলে বুড়ো কোষার গেল চলে,
বুড়ী তখন কেঁদে কেটে করলে চক্ষু লবণাক্ত।
শেষে বছর খানেক পরে বুড়ো বিয়ে এল ঘরে,
বুড়ী তখন রেঁখে বেড়ে তাকে ভারি খুসি রাখত।
ঝগড়ার টি গেল থেমে, মনের মিলে গভীর প্রেমে
বুড়ী দ্বিত দীতে মিশি, বুড়ো গালে সাবান মাখত।

বুড়োবুড়ীর জীবনযাপন ব্যাপারের কি সরল ও সরস
হাস্যকর বর্ণনা।

৪। হোল কি। এ হোল কি।—এত ভারি আশ্চর্য।
বিসেতকেটা টানছে হক, সিগারেট খাচ্ছে ভটচাঁদি।
হোটেলকেটা মুন্সেজ ডাকছেন—‘মধুসূদন কলোয়ারি।
চট চটর দোকান খুলে দস্তর মতন সসারী।

* * *

পক্ষীর মাংস লক্ষ্মীর মতন ছেলেকোয়ার খান নি কে ?
জনবীর পারে এসে বিড়াল বসছেন আশ্বিনে।

* * *

রাখারুক রদমকে নাচছেন গিরে আনন্দে,—
বাখ্যা করছেন হিন্দুধর্ম হরিবোষ আর প্রাণধন যে।

দীনবন্ধুর ভাষায় একাধারে ‘মিল ও মজা’র অপূর্ণ
কৌতুক রচনা। এ সকল গান প্রথম ধারার নিছক হাসি।

দ্বিতীয় ধারার হাস্যরচনাগুলি ব্যক্তি বা জাতিগত দুর্বলতার অথবা সামাজিক রীতিনীতি ও ভণ্ডামির প্রতি কটাক্ষময় ব্যঙ্গকৌতুক।

১। নন্দলাল ত একটা একটা করিল ভীষণ পণ—

খদেশের ভরে, বা ক'রেই হোক রাখিবেই সে জীবন।

* * *

নন্দর ভাই কলরায় মরে, তাহারে দেখিবে কেবা।

সকলে বলিল, 'বাও না নন্দ, কর না ভায়ের সেবা।'

নন্দ বলিল, 'ভায়ের জন্ত জীবনটা যদি দি—

না হয় দিলাম, কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ?

বাঁচাটা আমার অতি দরকার, তবে দেখি চারিদিক' ;—

সকলে তখন বলিল—'হাঁ হাঁ হাঁ, তা বটে, তা বটে, ঠিক'।

* * *

নন্দ বাড়ীর হ'ত না বাহির, কোথা কি ঘটে, কি জানি,

চড়িত না পাড়ী, কি জানি কখন উলটায় পাড়ীখানি।

নৌকা কি সন ডুবিয়ে ভীষণ, রেলো কলিসন হয়,

হাঁটিতে সর্প, কুকুর আর গাড়ীচাপা-পড়া ভয় ;

তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিরে রহিল নন্দলাল ;

সকলে বলিল, ভালোরে নন্দ, বেঁচে থাক্ চিরকাল।

২। আমরা বিলাতভেক্তা ক'তাই, আমরা সাহেব সেজেছি সবাই,

তাই কি করি, নাচার, খদেশী আচার কবিরাহি সব জবাই।

আমরা বাংলা গিয়েছি জুলি, আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,

(আমরা) চাকরকে ডাকি 'বেয়ারা' আর সুটদের ডাকি 'কুলি'

* * *

রাম, কালীপদ, হরিচরণ, — নাম এ সব সেকলে ধরন,

তাই নিজেদের সব 'ডে,' 'ব্রে' ও 'মিটার' করিয়াছি নামকরণ।

৩। পারো তো জন্মো না কেউ বিয়ুৎবারের বারবেলা।

যদি জন্মাও তো সামলাতে পারবেনাকো তার ঠেলা।

বেথ, বিয়ুৎবারের বারবেলাতে আমার জন্ম হৈল,

তাই দিল মোরে, কালো করে রোদে ধরে মাখিবে মাখিরে তেল।

৪। Reformed Hindus এর (রিফর্মড্ হিন্দুজ্ এর)

আমরা curious commodities, human oddities
denominated Baboos ;

আমরা বড়তায় যুগি ও কবিতায় কাদি কিন্তু

কাজের সময় সব হুঁ হুঁ-স ;

আমরা beautiful muddle, a queer amalgam

of শশধর, Huxley and goose।

তৃতীয় ধারায় :—

১। আমি যদি পীঠে তোর ঐ, লাখি একটা যারিই রাগে ;

—তোর ত আশঙ্কা কড়, পীঠে যে তোর ব্যথা লাগে।

আমার পায়ে লাগলো সেটা—কিছুই বুঝি নয়কো বেটা ?

নিজের ছালায় নিজে মরিস, নিজের কথাই ভাবিস আগে।

লাখি যদি না খাখি ত', জন্মেছিলি কিসের জন্যে ?

আমি যদি না যারি ত', মেরে যাবে সেটা অন্যে।

আমার সেটা অশুভ—যদি লাখি মেরেই থাকি,—

লাখি যদি না যারি ত',—না মার্কেও পাড়ান না কি ?

লাখি খেয়ে ওরে চাখা। বরং যে তোর উচিত হাসা—

যে তোর কথাও মাঝে মাঝে, তবু আমার মনে জাগে।

(২) আমরা সব 'রাজভক্ত' রাজভক্ত' বলে চোঁচাই উঠ রবে

কাবণ খেঁটার যতই অভাব, ততই সেটা ব'লতে হবে ;

—আমাদের ভক্তি বা এ— মাদের, পটের, প্রাণের দাঁড়ে ;

দেখে' সে রক্ত-আঁখি, ভক্তি যা তা হুটে পলায় ;

—সাথে কি বাবা বলি, শুঁতোর চেটে বাবা বলার।

(৩) পাঁচ বছর এমনি ক'রে আসছি সরে সমুদায় ;

এইটে কি আর সহিবেনাক—দু'খা শেী জুতার যায় ?

(৪) আমরা ইবাণ দেশের কাজী—

আমরা এসেছি একটা নূতন আইন প্রচার করতে আজি—ইত্যাদি;

এইরূপ অজস্র গান ও হাসির কবিতা হইতে কবির আলোকসামান্য হাস্য-প্রতিভার বিস্তর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল রচনার grim tragic humour—সাম্প্রতিক পরিহাস মানবচিত্তের অন্তস্তল পর্যন্ত বিপর্যস্ত করিয়া তুলে।

Ludicrous বা হাস্যকর ন্যাপারের প্রতি কবির অন্তদৃষ্টি এতই প্রখর যে, দু-একটি কথায় তাহার রূপ যেন মুক্তি পরিগ্রহ করিয়া উঠে। কবি যখন বলেন, “জীর চেয়ে কুমীর ভাল, বলে সর্কশাজী”, তখন পাঠক বা শ্রোতা জীর সঙ্গে হঠাৎ কুমীরের তুলনায় একান্ত বিস্মিত চিত্তে একটা কারণ খুঁজিতে চেষ্টা করে এবং পরক্ষণেই যখন শুনে, “কারণ, কুমীর ধবুলেও ছাড়ে কিন্তু (একবার) ধবুলে ছাড়ে না জী,” তখন ইহার অপূর্ণ মৌলিকতা, যৌক্তিকতা ও মিলের বাহাদুরীতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যায়। আবার যখন, “পালাই ছুটে” উর্দ্ধ্বাসে যেন নাখে খেলে, চান্দ্র এবং পরিবারে সমানভাবে ফেলে,” তখন আমাদের পালাইবার ভঙ্গীটি যে পরিচয় দেয়, তাহা একান্ত উপভোগ্য।

“ইয়েজতাতা হত খতমত অকলহ হীর,—

ভুতভয়গ্রস্ত পগারহ মন্ত মন্ত বীর”

—কি সুরঙ্গ হাঙ্গর দৃষ্ট ! এযনিতর,

“বিলেত বেশটা মটার—সেটা সোনা কপার নয়,

তার আকাশেতে স্থিতি উঠে, মেঘে বুজি হয়।

* * *

সেখা পুঁটি মাছে বিয়োরনাক টিয়ে পশীর ছা,

আর চতুষ্পদ সব জন্তুগণের চারটে চারটেই পা।

ভবে সেখায়, স্বামী স্বীতে খগড়া করে বিগুহ ইংলিশে,
আর করে সাধা হাতে চুরি ডাকাতি সে।
এই ভকাৎ, এই ভকাৎ, এই ভকাৎ মাত্র ভাই,
আর আমাদের সঙ্গে ভাদের কোনই ভকাৎ নাই।”

তখন সামান্য কথায় কবির রসসৃষ্টির পবিচয় পাইয়া
অবাক হইতে হয়।

বাস্তবিকই তাঁহার ‘হাসির গান’ ও ‘আবারে’ বঙ্গ-
সাহিত্যের এক অভিনব সম্পদ। কি রসের দিকে, কি
ভাবার দিকে, ইহা যেন ঝলমল করিতেছে।

তাঁহার হাস্যরস-কবিতার রচনাভঙ্গী এমনই স্বতন্ত্র যে,
তাহা বঙ্গভাষায় এক যুগান্তর আনিয়াছে বলিতে পারা
যায়। আমরা একটিমাত্র উদাহরণে তাহা সংক্ষেপে নির্দেশ
করিতে চাই :—

“হরিনাথ দত্ত চড়ে” ‘কর্ডমেল ট্রেন,
হুগাঁওর ছুটি, খবর বাড়ী যাচ্ছেন—
ভবে এ কথা সভ্য যে হরিনাথ দত্ত
গাটনাতে চাকরী করেন, সে চাকরী কি অর্থ
বলা কিছু শক্ত।” ইত্যাদি

ইহা পদ্য কি গদ্য বুঝা কঠিন। অথচ চলিত ভাষায় এই
অপেক্ষা বর্ণনাভঙ্গী ভাষায় একেবারে নূতন। ভাটপাড়ার
পণ্ডিতসভা, অদল-বদল, নসীবাম পালের বক্তৃতা, গোপীনাথ
দাস, গোমুটায় বাস—প্রভৃতি এইরূপ নানা কবিতার উল্লেখ
করা যাইতে পারে।

এইবারে আমরা কবির অসাধারণ দেশপ্ৰীতির কথা
বলিব। তাঁহার দেশপ্রেম এতই গভীর ও আন্তরিক ছিল
যে, কবির রচনার সহিত ঈহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে,
তাঁহারাই তাহা অবগত আছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের
বহু রচনাই যেমন দেশপ্রেমে ওত্তপ্রোত, দ্বিজেন্দ্রলালেরও
তাহাই। তাঁহাদের মত তিনি দেশোদ্ভবোধের উদ্বোধনে সহস্র
সহস্র নরনারীকে স্বদেশমন্ড্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। “বঙ্গ
আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ”। “তুমি
কি মা সেই, তুমি কি মা সেই চিরগরীয়সী ধাত্রী অমি মা।”
“একবার গাল-ভরা মা-ডাকে, মা বলে ডাক্, মা বলে ডাক্,
মা বলে ডাক্ মাকে” কিংবা, “আবার তোরা মায়াব হু,”
প্রভৃতি গানের ত্রায় বহু পরিচিত গান ভাষায় নাই বলিলেও,
বোধ করি, অতীতি হয় না। বাংলার শহরে, মফস্বলে, হাটে,

হাটে, গঞ্জে, হুগুর পল্লীতে পল্লীতে ইহাদের জোড়া দেখি নাই।
বাংলার জাতীয় সঙ্গীত রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল এক প্রকার
অগ্রাতিথ্যবী। কেবল গীত-রচনায় নহে, বঙ্গবাহীর বীণার
তারে তাঁহার রচিত নূতন হুরের ঝঙ্কারও এক অভিনব দান।

কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাটকে অনেক নাটকীয় ক্রটি
আছে। আজ আমরা সে কথার বিচার করিতে বসি নাই।
দোষ-ক্রটি থাকিলেও, আমাদের বর্তমান যে বক্তব্য, তাহাতে
তাহার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না। আমরা কবির জন্মভূমির
প্রতি যে হৃগভীর প্রীতির কথা বলিয়াছি, নাট্য-রচনার
দৃষ্টিতে তাহা স্থল হয় না।

সেদিন কি দিন ছিল, যখন পাঁচ-ছয় মাস অন্তর
কবির দুর্গাদাস, বাণাপ্রতাপ, মেবার-পতন, সিংহল-
বিজয়, চন্দ্রগুপ্ত, সাহাজান, প্রভৃতি নাটক পর পর
প্রকাশিত ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোককে
দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে; সেদিন কি দিন ছিল,
যেদিন ‘ধনধান্ডে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বহুস্বরা’,
‘ভারতবর্ষ’, ‘বঙ্গ আমার জননী আমার’, ‘আবার তোরা
মায়াব হু’, প্রভৃতি বিচিত্র দেশোদ্ভবোধক গানে মাসের পর
মাস নগর হইতে দূরতম পল্লী পর্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিত।
বঙ্গভঙ্গের যুগের সে সকল কথা মনে হইয়া কবির সেই দেশ-
প্রাণতার উদ্ভাদনা আজিও যেন চক্ষে দেখিতেছি।
রচনায়, অভিনয়-প্রেক্ষাগৃহে, সমালোচনায় এবং
পৃথক ঘাটে এই সকল গানেব প্রচারে আমবা সেদিন কবির
সঙ্গী ছিলাম, তাই বার-বার এ কথা মনে হইতেছে যে,
বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার দেশপ্রেম যেমন উদার তেমনি গভীর ও
অজস্র ছিল। এই দেশপ্ৰীতি তাঁহার এমনই মজাগত ধর্ম
ছিল যে, কর্ণজীবনে এজন্ম বারম্বার তাঁহাকে গুরুতর দুর্ভোগ
ভুগিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ বঙ্গের জাতীয় জাগরণ-যজ্ঞের তিনি
এক জন প্রধান পুরোহিত ছিলেন। এবং মায়াবের মধ্যে
ঈহার জাগিয়া থাকিয়া স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন, তিনি
তাঁহাদেরই এক জন।

‘গীতিক’ কবিতায় তাঁহার হাত কতখানি মিষ্ট ছিল,
ঐর্জন প্রভৃতি সঙ্গীত রচনায় কৃতিত্ব তাঁহার কতখানি,—মন্ড্রে,
আলোথে ও আর্ধ্যগাথায় তাহার পরিচয় আছে। ‘ও কে

গান গেয়ে গেয়ে চলে' যায়, পথে পথে এই নদীয়ায়', কথা এখানে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আর কিছু না হউক, 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে', 'মহাসিঙ্গুর ওপার হ'তে', প্রভৃতি তাঁহার দুই হাতেব এই দুই দিকের অল্পশ্রুত দানই রচনা তাহার সাক্ষী। আমরা কবির যে বৈশিষ্ট্য—হাসির কবিকে বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে, ইহা আমাদের গান, ও কবিতা এবং দেশপ্রীতির কথা বলিয়াছিলাম, তাহারই বিশ্বাস।

জন্মদিন

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

বসন্তে ফুলের প্রাতে
প্রকাশের বেদনাতে, উদ্বেলিত বুক
ষে-পুষ্প আলোতে তুলে মুখ
রুক্ষ বৃক্ষশাখা হ'তে অপূর্ণ অমৃত
দিকে দিকে করে উৎসারিত
সে কি জানে কোথা হ'তে এল এই সুখ
প্রতিক্ষেপে বিকাশ উন্মুখ
কেন এই কোরকের তলে
সুগন্ধ উছলে ?

তরুশাখা চেয়ে রয়
এ-কুসুম তারও নয়
এই রূপ নয়নাভিরাম
কে জাগাল বৃন্তে তার জানে না সে নাম—
অন্তরে গোপন ছিল অনন্তের ধন
প্রভাত-কিরণ
আর বসন্ত-সমীরে
সে ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে মুগ্ধ বনানীরে।

আমার অন্তর হ'তে বাহিরিয়া এল যে রতন
এমনি আশ্চর্য্য তবু
নহে শুধু পুষ্পের মতন।

এ বিকাশ শুধু নয় ক্ষণিকের তরে
নিখিল চাহিয়া আছে এরি মুখপরে।

অপূর্ণ এ দান
পুলকিত করি মিল তহু মন প্রাণ
অন্তরের মাঝে এল একান্ত আমার
এই তবু শেষ নহে তার।

শুধু প্রকাশের লাগি এ প্রকাশ নয়
আপনাতে ফুটে-ওঠা আশন বিশ্বয়।
নব নব অর্থভরা প্রাণ অন্তহীন
সুখে দুখে বিকশিতে হলে প্রতিদিন।
বক্ষে তাব পূর্ণ আছে অক্ষয় ভাণ্ডার
সমাপ্তি হবে না কভু তাব।

যাহা লয়ে আসিয়াছে যাহা আছে বাকী
নিখিল পবন সুখে ভরিবে সে ফাঁকি।

রূপে গন্ধে গানে
আনন্দ অমৃত তার ভরি দিবে প্রাণে।
সে ঐশ্বর্য্য চিন্তে তার নূতন সৌরভে
নব নব রূপ লবে আপন গৌরবে।

গরিপূর্ণ প্রাণ
প্রত্যহ কিরাতে হবে নিখিলের দান।
আজিকার শুভদিন আজিকাব নয়
নব নব কক্ষে তার হবে পবিচয়।
আমার অন্তর হ'তে এই জন্ম তার
নিত্য নব রূপ নিক আনন্দে অপার—

হে বৎস নবীন,
প্রত্যহ সার্থক হোক তব জন্মদিন।

ত্রিবেণী

শ্রীজীবনময় রায়

৬০

নিখিলনাথ যখন সীমার আন্তরায় গিয়ে পৌছল রাত তখন অনেক হয়েছে। এত রাত্রে তাকে আসতে দেখে সীমা আশ্চর্য হয়ে বললে, “আপনি এত রাত্রে যে। কি ব্যাপার? এ কি? আপনার এমন চেহারা হয়েছে কি করে? খাওয়া-দাওয়া হয় নি বুঝি?”

নিখিল নিজের মনের উত্তেজনা কষ্টে দমন করে গভীর স্বপ্ন কষ্টে বলতে লাগল, “সীমা, অত্যন্ত বিপদ উপস্থিত। ইন্সপেক্টর ভুলু দত্তের নাম শুনেছ নিশ্চয়। সত্যদার যত্নের পর তোমাদের অহুসস্থানে সে-ই শ্রীরামপুর গিয়েছিল। তোমাকে পায় নি বটে, কিন্তু তোমাকে ধরবার চেষ্টায় সে এতদিন অপেক্ষা করে ছিল। আজ যেমন করেছে হোক সে তোমাদের আড্ডার সন্ধান পেয়েছে; এবং আজই সে তোমাদের বিরুদ্ধে বেশ বড় একটা চেষ্টা করবে। বিশেষ করে তোমারই উপর তার আক্রোশ। আমার কথা শোনো; এখনি এখান থেকে পালাও। নইলে, ভুলু দত্তকে তুমি ভাল করে জান না, সে কোনো কিছু করতেই পিছ-পা হবে না। তাকে তার নাছোড়বান্দা একগুঁয়েমির জন্তে কলেজে আমরা ‘বুলডগ’ বলে ডাকতাম, সে আমাদের ক্লাস-ফ্রেণ্ড ছিল। আমার একান্ত অস্বপ্ন; অস্বপ্নে ধরা পড়ে প্রাণ হারিয়ে কোন লাভ নেই, সীমা।”

সীমা হেসে বললে, “প্রাণ হারিয়েই ত লাভ। আজ দাখরা প্রাণ দিয়েছে বলে, প্রাণ হারানোর ভয় আমাদের ঘুচে গেছে। কিছু করবার শক্তি বা স্বপ্নোগ আমাদের নেই, তাই প্রাণটাকে পণ করে দেশে প্রাণের সাড়া জাগাবার ব্রত নিয়েছি আমরা। ভুলু দত্তের সব ধরই আমি জানি। কোন একটা কারণে ভুলু দত্তের রূপা আমাদের উপর পড়তে পারে জেনেই আপনাকে এখানে আসতে বারণ করে দিয়েছিলাম। না শুনে আপনি ভাল করেন নি। এখন আপনাকে বাঁচাবার হাতও বোধ হয় আমার নেই। আমা-

দের বাড়ীর চতুর্দিকে আজ সন্ধ্যা থেকেই পুলিশের পাহারা আছে জানবেন। বেরতে গেলেই ধরা পড়বেন।”

নিখিল সন্ত্রস্ত হতাশ হয়ে বললে, “জেনেও পালাও নি কেন তোমরা? এ কি করেছে তুমি? এখন কি উপায় করবে? আমার জন্তে আমি ভাবি না। এ আমার উপ-বৃত্তিই হয়েছে। তোমাদের থেকে আমার অপরাধ ত একটুও কম না। নন্দলালের হত্যা, শচীন সিংহের অপহরণের সম্ভাবনা, এ সব সর্ববাদ জেনেও আমি তার কোন প্রতীকার করি নি। আর আজ এই হত্যাকারী এনার্কিষ্টদের রক্ষা করবার জন্তেই গুপ্তচর হয়ে এসেছি ছুটে। তোমাদের ভাগ্যে যে শাস্তি আছে তার থেকে যদি আজ বঞ্চিত হই, তবে আমার চেয়ে দুর্ভাগ্য কেউ নেই। কিন্তু কোন উপায়ই কি নেই?” নিখিল ইচ্ছে করেই শচীন্দ্রের কথা এড়িয়ে গেল পাছে তার কোন দুঃস্বপ্ন শুনেতে হয়।

সীমা বললে, “উপায় আছে শুধু আমার পালাবার। কিন্তু আমার আরও পাঁচ জন ভাই এখানে আছে, তাদের কি গতি হবে? ওদের ছেড়ে ত যাওয়া চলবে না। পালানো আমার হবে না; নইলে অকারণে পুলিশের হাতে প্রাণ দেবারও আমাদের নিয়ম নেই। আর পালাবার ইচ্ছে আমার নেই; আমাদের নিজেদের মধ্যেই মরণ ধরেছে। নইলে আজকের এই অতর্কিত বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না, নিখিলবাবু!” সীমার স্বর ক্লান্ত গভীর মনস্তাপবাক্যক।

“মানে?”

“মানে, যা বলছি তাই। নইলে যে ব্যবস্থা এবারকার আরোজনে আমরা করেছিলাম, তাতে আপনার ‘বুল ডগ’ সাধ্য ছিল না আমাদের নামগন্ধ পায়। কিন্তু সে যাই হোক, আপনার নিশ্চয় খাওয়া হয় নি। তার ব্যবস্থা কিছু করা যায় কি না আগে দেখি।”

নিখিল ব্যস্ত হয়ে বললে, “সীমা শোনো, খিদেটিদে আমার পায় নি। তুমি ওসব রেখে বাঁচবার চেষ্টা কর।

একদিনের জন্তেও অন্ততঃ আমার অনুরোধ রাখ, সীমা।”

সীমা হেসে বললে, “শ্রীরামপুরে যে পিণ্ডি খাইচেছিলাম, তাই মনে ক’বে বুঝি ভয় পাচ্ছেন? এখানে তার চেয়ে কিছু ভাল ব্যবস্থা করতে পারব। বরং চলুন আমাকে যদি কিছু সাহায্য করতে পারেন। কি বলেন?”

সীমাব পরিহাসেব মধ্যে স্নেহের স্পর্শটুকু পেয়ে নিখিল মনে মনে কৃতার্থ বোধ করলে। কিন্তু এই সমূহ বিপদের সময় সীমার অসীম ঔদাসীনে অত্যন্ত বিচলিত হ’য়ে বললে, “সীমা, আজ রক্ষা পেলে তোমার নিমন্ত্রণ আমাব তোলা বইল। চল, দেখি কোন উপায় করা যায় কি না।”

“বুধা, নিখিলবাবু, চেষ্টার কোন রাস্তা নেই। আপনাকে ত বলেছি যে আমাদের পালাবার উপায় একেবারে বন্ধ। ওসব কথা মিছে ভেবে কোন লাভ নেই আর। তার চেয়ে, আপনি ক্লাস্ত হয়েছেন, চলুন আপনাকে গুইয়ে দিই। আপনি একটু বিশ্রাম ক’রে নিন ততক্ষণ। খাবার হ’লে আপনাকে ডেকে তুলব না-হয়।” ব’লে সীমা তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল।

নিখিল সীমার মৃত্যুভয়হীন এই নিশ্চিন্ত দৃঢ়তার কাছে শেষে হার মানলে। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে ভাবলে, আজ ওর সঙ্গে এক পরিণামের সৌভাগ্যই আমার জীবনের পরম সম্পদ হয়ে থাকুক। শাস্ত চিন্তে মৃত্যু সাক্ষী ক’রে আজ আমাদের মিলন ঘটুক। এমন প্রত্যক্ষ জীবন্ত সত্য সাক্ষ্য কার ভাগ্যে আর জুটেছে।

সীমা সমস্ত পরিপাটি ক’রে বিছানা প্রস্তুত করলে। হাসতে হাসতে বললে, “আমাদের এনাকিষ্ট বলেই চিনে রেখেছেন; তাই আমরা যে মেয়ের জাত সে-কথা আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আপনি শ্রান্ত, চিন্তাক্লিষ্ট, ক্ষুধার্ত হয়ে আমার কাছে এসেছেন, আর আমি কোন মুখে আপনার একটু সেবাস্বল্প না ক’রে বিদায় দেব বলুন ত? আমাদের বাইরের এই কদাকাব রূপটাই আপনারা দেখেন, ভিতরের মাহুঘটার উপর আপনাদের চোখ পড়ে না, না নিখিলবাবু?” ব’লে সে নিখিলের দিকে আব না ফিরেই দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরিপূর্ণ পুলকে, গর্বে, দুঃখে নিখিলের চোখ জলে

ভ’রে এল। সীমার স্নেহ-সংরচিত স্তম্ভ শয্যায় তার ক্লাস্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে নিখিল মুজ্বিত নেত্রে সীমার অন্তরবাসিনী স্নিগ্ধ সত্তাকে নিবিড়ভাবে হৃদয়ে তল্লভব কবতে লাগল। সম্মুখেব বিপদ, পশ্চাতের নিবেকেব তাড়না, সমস্ত জগতেব বাস্তব অল্পভূতি তার কাছে মিলিয়ে এল এবং পরম নিশ্চিন্ত ও স্থনিশ্চিত এক রসালুভূতিতে তার চিত্ত পরিপূর্ণ হ’য়ে উঠল।

* * *

দুশ্চিন্তা এবং সমস্ত দিনেব ক্লান্তিতে নিখিল ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাম্মা শেষ ক’রে সীমা স্থান উঠল তখন রাত একটা বেজে গেছে। সে স্তাভাতাড়ি স্নান সেয়ে শুচি হয়ে তার তল্লদেহলতাটিকে একখানি কৌষেয় বস্ত্রে আবৃত ক’বে নিদ্রিত নিখিলের শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়াল। আজ যেন এই এক রাত্রের আনন্দে তার সমস্ত জীবন যৌবন তাব নিখিল ভুবন নারীস্বের গৌরবে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ যে স্নেহশীল নিঃস্বার্থ মাহুঘটি তারই রনিত স্তম্ভ শয্যায় শুয়ে নিশ্চিন্ত আরামে অপকালের জন্তেও তার পরিবেশিত সেবা সম্ভোগ করতে পেরেছে, সীমার জীবনে এর চেয়ে পরিতৃপ্তির বস্তু যেন কিছুই সে মনে করতে পারে না। আজ সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই মৃত্যুসাস্রের বিশ্বতির স্থলে ওরা দুটিতে যেন একটি চিরস্মরণীয় স্নিগ্ধ কোমল শান্তিনীভ রচনা করেছে। নিখিলের নিদ্রিত শ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে তার চোখ দিয়ে দুই বিন্দু অশ্রু ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ল। সে অশ্রু আসন্ন বিরহজনিত শোকের, না, পরিপূর্ণ আনন্দময় অল্পভূতির, তা কে বলতে পারে। সাবধানে নয়ন মার্জনা ক’রে গিয়ে সে নিখিলকে ডাকল। নিখিল চোখ খুলে দেখলে তার সামনে দাঁড়িয়ে সীমা—সজ্জাত, শুচি-বস্ত্রপরিহিত, স্নানসিক্ত মুক্তবগী, স্তম্ভ, স্তম্ভর, শুচিস্থিতা পূজারিণীর ছবির মত যেন। মনে হ’ল আজকেব এই উৎসব-রজনীব জন্য যেন সে সমস্ত জীবন, জন্ম-জন্ম প্রতীক্ষা ক’রে ব’সে ছিল। সার্থক তার এক রাত্রির পরম রজনী। পরিপূর্ণ পুলকিত স্তম্ভ হৃদয়ে নীরবে উঠে সে সীমার রচিত আসনে গিয়ে বসল। যেন দেক্তার আসনে ভক্তের অর্ঘ্য গ্রহণ করবার সৌভাগ্য তার।

আহার শেষ হ’লে সীমা যুহু হেসে বললে, “নিখিলবাবু,

ভবিষ্যতে এই দুঃস্থ প্রগলভ মেয়েটাকে যদি কখনও মনে পড়ে তবে অনেক দিনের দুর্ভাবহারের সঙ্গে, আজকের কথাটাও একটু মনে করবেন ত ?”

“সীমা, আজকের আনন্দ আমার সমস্ত জীবনের পরম সম্পদ হয়ে রইল। আমার দুঃখ এই যে, এমন অমূল্য জীবনটাকে জগতের সেবায় লাগাতে পাবলাম না। আজ আমার ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে যে, ধ্বংসের দ্বারা মানুষের মুক্তি হয় না, মানুষের মুক্তি তার সৃষ্টিতে। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে তারই ইঙ্গিত ধ্বনিত হচ্ছে। গাছ তার পাতাকে ধ্বংস করে স্থলর হয় না, সে তার অস্তবের পরিপূর্ণ নুতন সৃষ্টির বিকাশের প্রেরণায় পুণ্ড্রনকে ঝরিয়ে দেয়। সেখানে পুরাতনের ধ্বংসের পশ্চাতে থাকে সৃষ্টির লীলা। সেই সৃষ্টির জোয়ারের মুখে পুরাতন আপনি থমে যায়। ধ্বংস করে নিয়ে বাইরের থেকে সৃষ্টি করা চলে না। সৃষ্টির মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতিব মধ্যে তাই ‘এনাকি’ কোথাও নেই। ওটা একটা সৃষ্টিছাড়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ জিনিষ। তোমার মধ্যে-কার সেই স্থলর স্বাভাবিক তেজোময়ী সৃজনশক্তিকে দেশের দুর্দশা মোচনে লাগাতে পারলাম না, এই দুঃখই আমার রয়ে গেল।”

সীমা আজ কোন তর্ক করলে না। তার মন আজ ধে-স্থরে বাঁধা ছিল তর্কের তীব্রতা সেখানে গিয়ে পৌছয় না। সে হেসে বললে, “নিখিলবাবু, আপনি আজ আর আমার কথা ভেবে দুঃখ করবেন না। পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং নিষ্ঠার সঙ্গে যদি এ পথে কাজ করে থাকি তবে বিশ্বাস এবং নিষ্ঠাটুকুর মঙ্গল প্রভাব থেকে আমার দেশ বঞ্চিত হবে না। আপনি আপনার অপরাধে দেশশ্রুতি দিয়ে নুতন মানুষ গড়ে তুলুন—দেশকে বারা শান্তিতে আনন্দে মুক্তির পথে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে আপনার রক্ষার একটা ব্যবস্থা মনে এসেছে, সেইটুকু করতে হয়।”

“আমাব রক্ষা! তোমাদের যা গতি আমি সেই গতিই আজ একান্ত মনে প্রার্থনা করছি। আমি—”

“তা হয় না, নিখিলবাবু। আপনার আরও কর্তব্য আছে। আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে হতভাগিনী জ্যোৎস্নার স্বামীকে উদ্ধার করে তাকে স্থায়ী করবার ভার আপনারই। শুধুন, আপনাকে বলা হয় নি। কিন্তু আর ত সময় নেই।

তাই আপনাকে জানাচ্ছি। শচীনবাবু আমার এখানেই বন্দী আছেন।”

“শচীনবাবু এখনও বেঁচে আছেন ?” নিখিলের একটা দুশ্চিন্তা যেন নেমে গেল।

“হ্যাঁ। আমি ভেবেছি, তাঁর ঘরে আপনাকে একই সঙ্গে বন্দী ক’বে রেখে দিই। তা হ’লে পুলিশ এসে আর আপনাকে আমাদের দলের ব’লে অভ্যাচার কবাব ক’নও কারণ পাবে না।”

নিখিল এবার জোর দিয়েই বললে, “তা কিছুতেই হবে না, সীমা। তোমাকে এই বিপদের মুখে ফেলে এক পাও নড়ব না। মিছামিছি ও অহুরোধ আমাকে ক’রে কোন লাভ নেই।”

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সীমা নিখিলকে কিছুতেই সম্মত করতে পারল না।

এমন সময় স্তব্ধ রজনীকে সচকিত করে একটা বন্দুকের আগুয়াজ গর্জে উঠল। নিখিল জন্তু হ’য়ে উঠে দাঁড়াল।

সীমা হেসে বললে, “বয়ন, আমি আসছি। এ বন্দুক আমাদের ছাদ থেকেই ছোঁড়া হয়েছে। রক্তদার উৎসব শুরু হ’ল। এরই জন্তে বেচারী এত দিন অপেক্ষা করেছে।” ব’লে সে বেরিয়ে গিয়ে সব দরজা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে এসে বসল।

৬১

রত্নলাল তার অহুচরদের নিয়ে সমস্ত রাত যথাসাধ্য বিতৃত আয়োজন ক’বে ছাদে অপেক্ষা করছিল। ভুলু দস্তকে সে যে বর্ণনা দিয়েছিল তাতে একটা প্রকাণ্ড দলের বিরুদ্ধে যে পুলিশকে লড়াই করতে হবে এমন একটা আভাস দেওয়া ছিল। কোন ছোটখাট ছিটকে ব্যাপারে আয়োজনটার গুরুত্ব এবং উত্তেজনা লঘুক্রিয়ায় পরিসমাপ্ত না-হয়, এ-বিষয়ে রত্নলাল চেষ্টার জট করে নি। ভুলু দস্তও প্রকাণ্ড আশায় বিপুল বাহিনী নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

একটা বৃহৎ বাগান। বড় বড় প্রাচীন পাদপশ্রেণীতে রাজে প্রায় অরণ্যের মত মনে হয়। গাছের আড়ালে আড়ালে নিজেদের রক্ষা করে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ও নিরাপদ। বাড়ীর কাছাকাছি

পৌছে একটা স্বল্পাধিক বিস্তৃত উন্মুক্ত অঙ্গন। সেইখানটা-তেই বিপদের সম্ভাবনা জেনে ভুলু দস্ত বাড়ীর চতুর্দিক বেঁটন করে বড় বড় গাছের গুঁড়ির অন্তরালে যথাসম্ভব নিজের বাহিনীকে সংযোজিত করে রাখলে।

শেষরাত্রে দিকে গোপনে অগ্রসর হয়ে অকস্মাৎ আক্রমণ করা যায় কি না ভেবে সে একবার এগোবার চেষ্টা করলে। রঙ্গলাল প্রস্তুতই ছিল। সে বিধামাত্র না করে ছাদের উপর থেকে এক মুহূর্তে আক্রমণ শুরু করলে। দস্ত দেখলে গুলির মুখে এগিয়ে গেলে অকারণে নরহত্যার তথা বলক্ষয়ের সম্ভাবনা। সে আবার হ'টে গাছের আড়ালে চলে গেল এবং নির্বিবাদে ছাদ লক্ষ্য করে গুলি চালাবার হুকুম দিলে। তার ইচ্ছা ছিল যে যদি অগ্রসর হ'তে নাও পারা যায় তবে শত্রুপক্ষের গুলির রসদকে এই উপায়ে ক্রমে নিঃশেষ করে ফেলবে।

তার এই মতলব ব্যর্থ হ'ল না। রঙ্গলালদের গোলাগুলির আয়োজন অত্যন্ত অধিক ছিল না। যুদ্ধ ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতাও কিছুমাত্র নেই। সীমা একদিন ঠিকই বলেছিল যে, “দুঃসাহস তার যতটা আছে, বুদ্ধি যদি তার ততটা থাকত তবে ভারতবর্ষে তার তুলনা থাকত না।” সে প্রথম ভুল করেছিল ছাদের উপর আশ্রয় নিয়ে। মৃত্যু আকাজকা করে যে পুলিশবাহিনী স্ববোধ ছেলের মত মুক্ত অঙ্গনে অকারণে তাদেব বন্দুকের ‘চাঁদমারি’ হ'তে এগিয়ে এসে লড়াই করবে না এটা তার মাথায় আসে নি। ছাদের উপর থেকে গুলি চালাতে গেলে গাছের বিস্তীর্ণ শাখাপল্লবাবলয়কে ভেদ করে যে আক্রমণ করা সম্ভব নয় অথচ বৃক্ষকাণ্ডের অন্তর্ভালে নিজেদের রক্ষা করে শাখাপল্লবের অবকাশ-পথে তাদের প্রত্যাবিধান করা যে পুলিশের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ, সে কথা পূর্বে তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নি। প্রবেশ যখন করল, তখন তার ক্ষীণসংখ্য রসদের আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। পুলিশ যে তাদেব বিষম আক্রমণে হ'টে গিয়ে পেছিয়ে গেল, এই আনন্দেই সে প্রথমটা বিপুল বিক্রমে গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষের আক্রমণও নিবস্ত ছিল না। ছাদের আলিশার প্রত্যেকটি রক্ত লক্ষ্য করে অনবরত গুলির পর গুলি তারা ছাড়ছিল। তাতে ফল নিতান্ত খারাপ হয় নি। রঙ্গলালের

দলের এক জন মৃত ও অল্প সকলেই অল্পবিস্তর আহত হয়েছিল। ঘণ্টা দুয়েক এমনি যুদ্ধ চলবার পর তাদের দলের একটি ছেলে সাহস করে বললে, ‘রঙ্গদা, গুলি ত প্রায় ফুরিয়ে এল। শুদেরও যে বিশেষ অনিষ্ট করা গেছে, এমন ত বোধ হয় না। শেষে কি খালি হাতে গিয়ে শুদেব কাছে ধরা দিতে হবে?’

ধরা দেবার কথাতেই রঙ্গলালের সব চেয়ে আতঙ্ক, সব চেয়ে আপত্তি। সে বললে, “কি করতে চাও বল।”

“নীচের ঘরে চল; জানলা দিয়ে গুলি চালাবে। তাতে না হ'লে বেরিয়ে পড়ব। মরতে ত হবেই?”

রঙ্গলাল উৎসাহিত হ'য়ে বললে, “বেশ ভাই, চল। বিনা রক্তপাতে মরা হবে না।”

যুদ্ধের অভিজ্ঞতা দু-জনেরই সমান

নীচের ঘরের দরজা জানালার আড়ালে বসে নতুন করে তারা আক্রমণ শুরু করলে। অজস্র রক্তপাতে রঙ্গলাল এবং তার সঙ্গীদের দেহ ক্রমে অবসন্ন হ'য়ে আসছিল; কিন্তু উৎসাহের তাদের অন্ত ছিল না। কিন্তু জীবনীশক্তি ক্রমেই তাদের ক্ষয় হয়ে আসছিল। রসদও প্রায় নিঃশেষপ্রায়। ছুটি ছেলে সংজ্ঞা হারিয়ে রঙ্গলালের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। রঙ্গলাল পলকের জন্ম তাদের দিকে ফিরে তাকাল। এতক্ষণে রঙ্গলাল তাদের ভুল বুঝতে পারল। ছাদের উপর থেকে বাড়ীর চতুর্দিকের আক্রমণকে প্রতিহত করা সহজ ছিল। কিন্তু সকলেই ছাদ থেকে নেমে এসে মাত্র একটি দিকের উপর তাদের প্রভুত্ব রইল। এই ত্রুটিটুকু ভুলু দস্তের লক্ষ্য করতে বিলম্ব হয় নি। পশ্চাৎ দিক থেকে বাড়ী চড়াও করার এই সুযোগ সে ছাড়লে না। অল্প কয়েকজনকে সামনে মোতামেন রেখে সে নিজে ঘুরে বাড়ীর পিছন দিক থেকে গিয়ে দরজা ভেঙে বাড়ীতে প্রবেশ করলে।

রঙ্গলাল দেখলে, আর কোন আশা নেই। তখন দুই জনে নিজেদের সমস্ত শক্তি সহিত করে নিয়ে, দরজা খুলে সেই মুক্ত প্রাঙ্গণে অজস্র গুলির মুখে নিশ্চিত মৃত্যুর আলিঙ্গনের মধ্যে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। একটা গুলির চোট খেয়ে তার সঙ্গী অনিল টেঁচিয়ে বললে, “রঙ্গদা, চললাম। শুডু বাই।”

রঙ্গলাল তার শেষ গুলিটা বন্দুকে ভরতে ভরতে

বললে, “না গুড্ বাই নয়, একটু সবুর, এই এলাম ব’লে।”

সীমার দুই চোখ দিয়ে আশ্রন বেরচ্ছে যেন। তার অহুচরদের সে নিজের ভায়েরই মতই ভাল বাসত। অনিল ও রত্নলালের কথা স্পষ্ট তার কানে এল। প্রত্যেকটি মৃত্যু সে যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে। রিভলভারটা হাতে ক’রে সে সোজা হ’য়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তার পর নিখিলের দিকে ফিরে বললে, “এমন কোথাও দেখেছেন? দাদাদের কথা আজ মনে পড়ছে। মৃত্যু যেন একটা মুহূর্ত্তকের পরিহাস। এবার আমাকে বিদায় দিন। প্রার্থনা করুন, যেন ফিরেবার স্বাধীন ভারতে জন্ম নিতে পারি।”

এমন সময় বন্ধ ঘারে ভীষণ তাড়নায় দরজা ভাঙবার উপক্রম হ’ল। সীমা ফিরে রিভলভার একবার দরজার দিকে লক্ষ্য ক’রে দাঁড়াল। তার পর নিখিলের দিকে ফিরে তারই কথার পুনরাবৃত্তি ক’রে হেসে বললে, “কি হবে একটা ছুটো খুন ক’রে, কি বলেন?” সেই মুহূর্ত্তে দরজা ভেঙে পড়ল এবং পর মুহূর্ত্তেই সীমা নিজের বুকের উপর গুলি চালিয়ে দিয়ে নিখিলের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল।

পুলিসবাহিনীর দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না ক’রে পাগলের মত নিখিল হাঁটু গেড়ে সীমার উপর ঝুঁকে পড়েছে। “সীমা, সীমা, এ কি করলে, সীমা। এমনি ক’রে কিসের শোধ নিলে তুমি? সীমা, সীমা, সীমা,” ব’লে সে ক্রমাগত ডাকতে লাগল। মরণোন্মুখ সীমার মুখে অল্প একটু হাসির রেখা ফুটে মিলিয়ে গেল।

ভুলু দত্ত ঘরে ঢুকেই “সীমা” নাম শুনে বললে, “সীমা! কই সীমা?”

নিখিল হাহাহাহা করে একটা উদ্গারের হাসি হেসে দাঁড়িয়ে উঠে ভুলু দত্তকে বলতে লাগল, “বুল ডগ, পারলে না, পালিয়েছে। তোমার দাঁতের ধার আর পরীক্ষা করবার সুযোগ দিলে না। হা হা হা হা।”

“একি নিখিল! তুমি এখানে। তুমিও?”

“হ্যাঁ, আমিও। একটুও দয়া ক’রো না আমাকে, একটুও না। তোমাদের বন্ধুকে কি একটাও গুলি আর বাকী নেই? ওদের চেয়েও অপরাধী আমি। ওদের

অপরাধ বিশ্বাসে, আর আমার পাপ গোডে। কিছু দয়া ক’রো না আমাকে।”

ভুলু দত্ত দেখলে যে নিখিলের মস্তিষ্ক কিছু উত্তেজিত হ’য়েছে। আব বাক্যব্যয় না ক’রে সে তাকে গ্রেফতারের হুকুম দিয়ে অত্যন্ত গভীর চিন্তিত মুখে সে সমস্ত বাড়ীটা অহুসঙ্কানের জন্তে বেরিয়ে গেল।

আজকের অভিযানে ব্যক্তিগত আনন্দের ও জয়ের যে আশ্বাসাদ, তা যেন কিসেব ছায়াপাতে ম্লান হয়ে গিয়েছে।

* * *

দু-এক দিনের মধ্যেই নিখিল শান্ত হয়েছিল। হাজতে একদিন ভুলু দত্তকে ডেকে নিয়ে সে বললে, “আমার একটা অহুরোধ তোমার কাছে আছে; শচীন সিংহ সন্দেহ। যদি হাজতে তাঁকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দাও তবে তাঁকেই সব বলব। নইলে অগত্যা তোমাকেই ব’লে যেতে হবে।”

ভুলু দত্ত বললে, “সে হুকুম ত এখন আমি দিতে পারব না। আমাকে বলতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে তবে বলতে পার।”

নিখিল তখন তাকে জ্যোৎস্নার মোটামুটি ইতিহাস সংক্ষেপ ব’লে বললে, “ভাস্কর হিসেবে বলছি, হঠাৎ শচীনবাবুকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত ক’রো না। তাদের বৃদ্ধ ভৃত্য ভোলানাথ—”

ভুলু বললে, “হ্যাঁ, হ্যাঁ ম্যানেজারের সঙ্গে ঐ নামেব একজন এসেছিল বটে। লম্বাচোড়া বুড়ো মানুষ।”

“হ্যাঁ, তাকে দিয়ে সাবধানে সংবাদ দিও। নইলে, হঠাৎ সংবাদ দিলে ফল ভাল নাও হ’তে পারে। আমার বন্ধু হিসাবে ঐটুকু ব্যবস্থা তুমি ক’রো।” সম্মত হ’য়ে ভুলু দত্ত চলে গেল।

৬২ -

কমলার সংবাদে শচীননাথের চিন্তা যে পরিমাণ আনন্দের উত্তেজনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠবার কথা সেই বাধাবিহীন আনন্দ যেন তার চিন্তে সেই উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা লাভ করলে না। বহুদিনের পর তার একান্ত বাঞ্ছিতের পরমরমণীয় মিলনের

তৃষ্ণা, তার মিলনের স্তূনিশ্চিত সম্ভাবনার আকস্মিক আঘাতে কেমন নিঃশব্দ হ'য়ে পড়ল। এতদিন তার জীবনে যে বিরাট তীব্র বিবাহকে নিজেব চিত্তের একান্ত অবলম্বনরূপে জাগিয়ে-রাখা দুঃসাধ্য-সাধনার আত্মপ্রসাদে সে মগ্ন ছিল, সহসা তাব সেই মহত্বের অধিকারে অপ্রত্যাশিতভাবে বঞ্চিত হয়ে, পাণ্ডার আনন্দের মধ্যেও একটা স্মৃতিছাড়া করুণহ্রস্ববিচ্ছিন্ন নিরবলম্বতা তার চিত্তকে এসে অধিকার করলে। কয়েক মুহূর্ত সে চিন্তালেশশূন্য নিষ্ক্রিয় চিত্তে স্থির হয়ে বসে রইল।

নিখিলনাথের কাছ থেকে শোনা কমলার অভূতপূর্ব কাহিনী শেষ ক'রে ভুলু দত্ত বললে, “শচীনবাবু, নিখিল একটা অহরোখ জানিয়েছে আপনাকে ডাক্তার হিসেবে। আপনি হঠাৎ গিয়ে দেখা করলে আপনার জীব পক্ষে সেটা ক্ষতিকর হওয়া সম্ভব। আচমকা একটা অভাবনীয় আনন্দের ঘা খেলে তাঁর স্মৃতি বিধা তাঁর স্মৃতি স্বেচ্ছাঘাত সহ্য নাও করতে পারে। তাই আপনাদেব চাকর ভোলানাথের সহায়তায় ধীরে ধীরে সাবধানে একটু এগোনো দরকার। আনন্দ-উৎসব ত পড়েই রয়েছে—কি বলেন? কিন্তু কি অভূত ব্যাপার বলুন ত? ভাগ্যিস আমি ঠিক সময়ে গিয়ে পড়েছিলাম, নইলে হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ একেই বলে কার্ক পৌষ মাস কার্ক সর্বনাশ। আমি তা হ'লে আসি এখন। নমস্কার।”

ভুলু দত্তের কথার ধাক্কা যেন সচেতন হয়ে সে অতিরিক্ত ক'রে ভুলুকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল, এবং এক প্রকার লজ্জিত হয়েই যেন নিতান্ত অগ্রাসজিকভাবে কমলার জন্যে এই কয় বছর যে সে কি রকম মনোবেদনা সহ্য করেছে, এবং জী যে তার সমস্ত জীবনের কতখানি অধিকার ক'রে ছিল, এমন কি তাব প্রতি একান্ত প্রেমে সে যে কমলাপুরী-নারী-প্রতিষ্ঠানের স্মৃতিমন্দির রচনা ক'রে একান্ত চিত্তে তারই ধ্যানে নিমগ্ন ছিল এই কথা বলতে বলতে তার স্তিমিতপ্রায় প্রেমকে যেন সে সঞ্জীবিত ক'রে তুলে—

ভুলু দত্ত মনে মনে একটু অশ্রদ্ধাপূর্ণ কৌতুক অহুভব ক'রে ভাবলে, “আচ্ছা বৌ-পাগলা লোক ত! খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। পয়সা থাকলে কত সখই না যায়।”

ভুলু দত্ত বিদায় হয়ে গেলে সে ম্যানেজার এবং ভোলানাথকে থেকে দস্তরমত উচ্ছ্বসিত হয়ে উত্তেজিত কর্তৃ কমলার সংবাদ জানালে। ম্যানেজারকে তখন কমলাপুরী পাঠিয়ে দিলে পার্শ্বতীর কাছে সংবাদ বহন ক'রে এবং একটা বিরাট উৎসবের আয়োজন করতে। এতদিনের হারানো দ্বীপুত্রকে পাণ্ডার আনন্দের নেশায় সে রীতিমত নিজেকে মাতিয়ে তুললে। বললে, “ভোলানা, তোমাকেই ত সব করতে হবে। কি করব না-করব আমি কিছু ভেবে পাচ্ছি নে। এংনি চল, যাওয়া যাক। তুমি কিন্তু মাথা ঠিক রেখ ভোলানা, নইলে আবাব একটা কি কাণ্ড হবে। বুঝতেই ত পারছ।”

ভোলানাথ তার কাছ থেকে প্রথম স্তনেই হেসে কেঁদে একেবাবে অস্থির হয়ে উঠেছিল। “খোকন বাবু? আহা কত বড়টি হয়েছে না জানি। মা কি ছেড়ে যেতে পারে বাবু? আহা মা আমার জগদ্ধাত্রী! মাথায় ক'রে নে আসব'ধন। খোকন বাবু কি চিনতে পারবে? কত পুণি করেছিলাম, বাবু, যে আবার মাকে খোকনবাবুকে ফিরে পেলাম।” ইত্যাদি

শচীন বললে, “ভোলানা, সেই ওরা হারানোর দিন কি রকম গোবাক তোমার ছিল মনে আছে? ঠিক সেই রকমটি সেজে তোমায় যেতে হবে। নইলে,—ওর আবার সব ভুল হয়ে গেছে কি না। কি জানি শেষকালে যদি চিনতে না পারে।”

শচীননাথের নিজের মনে এতদিনকার অদর্শনজনিত অপরিচয়ের যে বিধা সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল ভোলানাথের উচ্ছ্বসিত চিত্তে কমলা সম্বন্ধে সে সন্দেহ তার লেশমাত্র ছিল না। সে সগর্বে বললে, “মা কি ছেলেকে ভুলতে পারে বাবু? দেখো, আমি গিয়ে একবার মা ব'লে ডাকলে সব মনে পড়ে যাবে। কিন্তু খোকন বাবু কি চিনতে পারবে? বড়ই ছেলেমানুষ ছিল কি না।”

খোকন যে চিনতে পারবে না সে সম্বন্ধে ভোলানাথের সম্বন্ধে শচীন্দ্রের মতবৈধ ছিল না। কিন্তু কমলার মন এতদিনের পরও তার প্রতি আসক্ত থাকবে বা তাকে ফিরে পেতে চাইবে তার নিশ্চয়তা কি? এমন কি এতদিনকার বিস্মৃত পরিত্যক্ত গার্হস্থ্য জীবনের বন্ধনকে যে

আবার স্বীকার করে নিতে সে আগ্রহান্বিত হবে তাই বা কে বলতে পারে? শ্রীরামচন্দ্রের উত্তরাধিকারীর মন আধুনিক শিক্ষা যুক্তি এবং প্রেমের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হ'লেও সীতাহরণের গানি এবং অবসাদ বোধ করি সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। তবু কমলার প্রতি তার অভ্যস্ত প্রেমের স্মৃতিপটে কমলার যে নয়নাভিব্যাস সৌন্দর্য এবং একান্ত নির্ভরপরায়ণা নারীর যে চিত্তগ্রাহী মুষ্টি অঙ্কিত ছিল এই অভিনব আবিষ্কারের রহস্যমাধুর্যে অন্তরে অন্তরে তার আকর্ষণ প্রবল হয়ে উঠছিল। সে নিজের বিধার দুর্বলতাকে মনে মনে উপহাস এবং অস্বীকার করে কমলার সন্ধানে যাবার জন্ত প্রস্তুত হ'তে লাগল। এই সমস্ত চিন্তা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, উচ্ছ্বাস এবং মিলনের আয়োজনের অন্তরালে, সর্বক্ষণ নিজের অজ্ঞাতে, পার্শ্বতীর প্রতি তার স্নেহস্বরূপ চিন্তের আকাঙ্ক্ষা যেন বিসর্জন-রজনীর দূরাগত শানাইয়ের স্নিগ্ধকোমল স্বপ্নসমাচ্ছন্ন বেদনার স্বরের মত তার মগ্নচেতনাকে করুণরসধারায় আচ্ছন্ন করে রইল; কিন্তু সে কথা যেন আজ কিছুতেই সে স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষ করতে ভরসা পেল না।

তবু তার মনের মধ্যে অপস্রিয়মান যৌবনের দোলায় অতীত যুগেব সমস্ত স্মৃতিসত্তারপূর্ণ কমলার প্রতি তার প্রেম কমলার প্রস্ফুরিত কমনীয় যৌবনলাবণ্যস্বাতিকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে তার দেহমনকে উন্মুখ করে তুলছিল। কত দিনের কত তুচ্ছ কথা, কমলার একান্ত সমর্পিত প্রেম ও রূপের কত অপরূপ ছন্দোবিলাস, তার সন্তানের তরুণী জননী কমলার সলজ্জস্বভাবশূণ্ড আননের স্নিগ্ধকোমল অরুণিমা, নিশ্চিন্তনির্ভরে উৎসর্গিত পূজার পুষ্পাঞ্জলির মত তার দেহমনহৃদয়ের পবিত্র সৌরভ যেন ক্রমে ক্রমে শতীন্দ্রের চিন্তে তার আসন্ন মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে সজীব করে, উদ্গীব করে তুলতে লাগল। তার দ্বিধা শব্দা সঙ্কোচ আত্মাভিমান দক্ষিণ-পবন-স্পর্শে মেঘের মত অপসারিত হয়ে গেল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধনের অবকাশে সে আজ প্রথম যেন লক্ষ্য করলে তার কপালের রেখা, বিস্তৃত গভীর তার চোখের নিশ্চল সঙ্কচিত দৃষ্টি, সমস্ত মুখের উপর তার আসন্ন যৌবন-বিদ্যায়ের অনিশ্চিত ছায়া। একটা স্নান

হাসিতে তার মুখটা একটু করুণ হয়ে এল। বেশবাসের প্রতি অতিবিক্ত অম্লরক্তিশ্রুত কুর্কটি তাব কোন কালে ছিল না; কিন্তু আজ বিশেষ যত্নে মুখের অবসর যৌবনের কালিমা দূর করে মধ্যের এই কয়েক বৎসর কালের নিষ্ঠুরতার চিহ্ন সে মুছে ফেলতে চায়। বলতে চায় যেন এখনও বিদায় নহে, রহ বন্ধু রহ কণকাল
হে সৌর যৌবন।

বৃদ্ধ ভোলানাথ তার বাবুর কথায় একটুও কান দেয় নি। আজ তার পক্ষে তার জীবনের সব চেয়ে বড় আনন্দের দিন। এত বড় উৎসব শতীন্দ্রের বিবাহের দিনও তার কাছে মনে হয় নি। আজ প্রথম দর্শনেই সে খোকনবাবু মনোহরণ করবার উচ্ছ্বাসিত আশায় তার সব চেয়ে মূল্যবান রঙীন পোষাক সে পরেছে। মাথায় ফিরোজা রঙের পাগড়ী, ধোপহুস্ত কাপড়ের উপর সাদা সাটিনের আটকান, (পায়জামা সে কোনকালে পরতে পারে না), শুঁড়তোলা নাগরা। হাতে একটা রূপারীধানো সোঁটা—দেখলে হঠাৎ একটা পশ্চিমা রাজারাজড়ার মত মনে হয়। তার প্রকাণ্ড দেহও আজ যেন আর ছাঙ্ক দেবায় না।

শতীন্দ্র তাকে দেখে হেসে ফেললে, “ও কি ভোলাদা, করেছ কি, তোমাব বৌমা তোমাকে চিনতেই পারবে না যে! ভাববে কোন রাজাবাদশাই বা এল হঠাৎ।”

ভোলানাথ সর্গর্বে বললে, “চিনবে না কি। চিনতেই হবে যে। আর আমরা নরক মাছ; তা পরেব বাড়ী বাচ্ছি, তারা একবারটি চোখ মেলে দেখুক যে কেমন বাড়ীর বৌরে তারা ঘরে ঠাই দেবার ভাগ্য পেয়েছে। ঘবে ঠাই দেওয়া, সে কি সোজা কথা বাবু?—মা আমার রাজরাণী।”

শতীন্দ্র মনে মনে হেসে ব্যাপারটি বুল; আর কথা বাড়াল না। তাব রাজরাণী বৌমাকে যে লোকেরা সামান্য ভেবে কপা করে আশ্রয় দেবার স্পর্ধা রাখবে এ তার পক্ষে অসম্ভব। তাই আশ্রয়দাতার স্পর্ধাব বিরুদ্ধে এ যেন তার যুদ্ধসাজ।

একটা ট্যাক্সি করে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। ভোলানাথের উৎসাহ যেন বাঁধ মানতে চাইছে না। কি করে এক মুহূর্তেই খোকনবাবু মনটা জয় করে তার পূর্ব গৌরব প্রতিষ্ঠিত রাখবে এই তার এক সমস্ত। সামনের

সীট থেকে ঘুরে বললে, “বাবু, খোকনবাবুর জন্মে একটু মেঠাই কিনে নিয়ে যাই। আর একটা বড় কাঠের ঘোড়া। আমার পিঠে ঘোড়া-ঘোড়া খেলতে বড় ভালবাসত।”

বুদ্ধের কল্পনা খোকনের সেই শিশুকালকে অতিক্রম করে এগোতে পারে না। তার রকম দেখে শচীন্দ্র হেসে বললে, “খোকন কি আর এতটুকুনটি আছে? কাঠের ঘোড়ায় তার মানহানি হবে যে।” তবু সে বুদ্ধের উৎসাহকে স্ক্রল না করে কিছু মিষ্টি, চকোলেট, এয়ারগান্ প্রভৃতি উপহার-দ্রব্য কিনে দিল। কমলার জন্মেও কিছু কিনবার ইচ্ছায় তার মনটা উদগ্রীব হ’লেও দ্বিধায় সঙ্কোচে সে কিছু কিনতে পারলে না। কে জানে কমলার পছন্দ এখন কেমন হয়েছে, হয়ত কিছু দিতে গিয়ে লজ্জাই পেতে হবে। দেবার ত সময় বয়ে যাচ্ছে না।

৬৩

শচীন্দ্র ও ভোলানাথ যখন গিয়ে মালতীদের বাড়ী পৌঁছল তখন দ্বিপ্রহরের দীর্ঘ দিবানিদ্ৰা সমাপন করে মালতীর মাতুল বাইরের ঘরে উবু হয়ে ব’সে, হাঁটু ব কাপড় খসিয়ে একটি খেলো হুকায় তাস্কাট সেবনে আলস্যচর্চায় রত। নন্দলালের হত্যার তড়াসে সর্বদাই তার প্রাণে একটা আতঙ্ক জেগে ছিল। পারতপক্ষে সে নিদ্রার সময় রাত্রে বা দিনে ঘরের জানালা দরজা মুক্ত রাখত না। আজও অভ্যাসমত চতুর্দিক বন্ধ করেই অন্ধকূপের কুমণ্ডলের মত সে তাস্কাট খসে করছিল। কড়া নাড়ার আওয়াজে অকস্মাৎ চকিত হয়ে তার হাত কেঁপে কলকে থেকে জঙ্গল কয়লা বিহানাব উপর পড়ে গেল। বিছানা ঝাড়তে, কাপড় সামলাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে হুকাব জল ফেলে একটা কাণ্ডই বাধিয়ে দিলে সে। নন্দলালের হত্যাকারীদের কেউ যে দরজায় উপস্থিত হতবাং তার যে প্রাণ সংশয়, এ-বিষয় তার সন্দেহ মাত্র ছিল না। কড়া নাড়ার কোনও প্রকার প্রত্যুত্তর দেওয়া সে সমীচীন বোধ করলে না। ভিতরদিকের দরজা খুলে কাপড়ের খুঁট গুঁজতে গুঁজতে সটান সে মালতীর দরজায় গিয়ে উপস্থিত হ’ল।

বাঁট পেতে মালতী অজ্ঞয়ের জন্ত ফল ছাড়িয়ে থালায়

সাজাচ্ছিল। মাতুলও নিত্য এই ফলের অংশীদার। মালতী তার ভাব দেখে অবাক হয়ে বললে, “কি মামা, ব্যাপার কি? কিছু চাই নাকি?”

মালতীকে দেখে কতকটা সম্বিত হিরে পেয়ে, সে বেশ জুত করে দরজার বাইরে একটা মোড়ায় জমে ব’সে বললে, “কাল যে সেই খাজুর দিইছিলে, তা একটু টুক্ হলি কি হয়, খাতি বড় সরেশ। আছে নাকি ছোটো?” বাইরের ঘটনা যে প্রাণিধানযোগ্য তা তার ব্যবহারে প্রকাশ পেল না। ছুটি নারী ও একটি শিশুর সে রক্ষক। দিবা দ্বিপ্রহরে কড়া নাড়ার আওয়াজে যে সে অতঙ্কিত হয়ে পলায়ন করেছে এ-কথা প্রকাশ করা দুঃস্বপ্ন। স্মরণ ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটে নি এই তার ভাব।

মালতী একটু হেসে গোটা কয়েক প্রশ্ন তার হাতে তুলে দিলে। তারই গোটা দুই নে গালে ফেলে দিয়ে রসচর্চায় সবে মন দিয়েছে এমন সময় বিরক্ত ভোলানাথের হাতের কঠিন তাড়নে কড়া কর্কশ নিনাদে পাড়া চকিত করে তুললে। মাতুল দুই হাতে কান ঢেকে মাথা নীচু করে চর্রণের অবসরে বললে, “হম্ন, হম্ন ঐ আবার নাড়তি লেগেছে। হাম্ন, নেছে নেছে, সব কটারে নেছে এবার। হাম্ন, হাম্ন।”

মালতী বললে, “কে ডাকছে যে মামা। কি বকছ বিড়বিড় করে। যাও খুলে দেব গে, কে ডাকে।”

“আরে দেখিছি! বুদ্ধতি পারছ না? নেবে, এবার সব কটারে নেবে। আমারেও ছাড়বে না।

মালতী এতক্ষণে ব্যাপারটা কতকটা বুঝতে পেরে হেসে ফেললে, “ও তাই বুঝি ভয়ে পাগিয়ে এসেছ? ভালা লোককে আমাদের পাহারায় দিয়ে গেছেন নিখিলবাবু। অজয় আয় ত বাবা দেখি, কে। হয় ত নিখিলবাবুই এসে থাকবেন। বাইরে দাঁড়িয়ে, স্কোরা কি ভাবছেন বল ত মামা?”

নিখিলের কথাটা মাতুলের মনে উদয় হয় নি। সে তৎক্ষণাৎ আশঙ্ক হ’য়ে বললে, “ও তাই কও। আমুও ত তাই কই। আমি থাক্তি কোন বোটা আসতি ভবসা করবে। চল চল, আমি যাব এানে। এস ত বাবা অজয়, দোরটা খুলে দেব।”

মালতী চটে বললে, “থাক, তোমার আব আদিকথোতায কাজ নেই। আয় অজয়।”

“আবে, চট ক্যান। চারদিক সামাল দিতি হয় ত?”

* * *

কড়া নাড়া ও গোলমাল শুনে কমলাও বাইরের ঘরের দরজার আড়ালে মালতীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।

অজয় দরজা খুলে ভোলানাথকে দেখে একটু থমকে গেল। প্রকাণ্ড বড়ী পাগড়ী, প্রকাণ্ড চেহারা, চক্চকে পোষাকে ভোলানাথকে দেখে সে সসম্মানে একটু পিছিয়ে এল। উকি মেরে, “এ আবার কেডা!” ব’লে মাতুল ঘরের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিলে।

ভোলানাথ অজয়কে আশ্চর্য্য হয়ে দেখছিল। সেই শিশুকালের শচীন্দ্রনাথ যেন আরও সুন্দর হয়ে ফিরে এসেছে। সেই নাক চোখ, সেই মুখ, গালের উপর তিলটি পর্যন্ত ছবছ এক। দুই হাতে বৃকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তাকে আদর করবার জন্মে ভোলানাথের মন আকুল হয়ে উঠছিল। তবু, বাবুর কথামত নিজেকে সামলে রেখে সে অজয়কে জিজ্ঞাসা কবলে, “খোঁকাবাবু, এটা কি নিখিলবাবুর বাড়ী বাবা?”

“হ্যাঁ।”

ভোলানাথের গলার প্রথম আওয়াজ শুনেই কমলা যেন কেমন হয়ে গেল। অবরুদ্ধ স্মৃতিব ছয়ারে ঘা পড়ল যেন। সমস্ত অতীত যুগের চেনা কণ্ঠস্বর যেন তার স্মৃতিকে মথিত ক’রে চার দিক থেকে মৃত্যুপারের ইতিহাসকে সজীব প্রত্যক্ষ ক’রে তুলতে চাইছে। এই কণ্ঠস্বরের ছায়াপথ অবলম্বন ক’রে পরপারের নির্বাসিত কুল থেকে তাব মনটা পৃথিবীর আত্মীয় লোকের কুলে উপনীত হবার জন্মে আকুল হয়ে উঠছে। কপাল কুক্ষিত ক’বে সে তার মনের অন্ধকাব কক্ষগুলির মধ্যে যেন তার দৃষ্টিকে কঠিন বলে প্রত্যক্ষ করবার প্রবণায় নিয়োজিত করতে চাইছে।

ভোলানাথ ততক্ষণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। সকলেই শুদ্ধ। মালতী সভয় কৌতূহলে এই রাজসিক সজ্জায় সজ্জিত ব্যক্তিটিকে দেখছিল। কমলা ভোলানাথের উকীষ-পরিহিত মুষ্টি দেখে তার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ

সাধন করতে পারছিল না। এমন সময় ভোলানাথের দৃষ্টি কমলের উপর পতিত হ’তেই সে তার পাগড়ী উন্মোচন ক’রে এগিয়ে এল এবং “মা, মাগো, আমায় চিনতে পারছ না মা? আমি যে তোমার ছেলে, ভোলানাথ।” ব’লে আশাসোঁটী জামা-জামিয়ার স্বচ্ছ প্রকাণ্ড দেহ নিয়ে সাষ্টাঙ্গে মাটিতে পড়ে কমলাকে প্রণাম ক’রে উঠে দাঁড়াল। এক মুহূর্তের মধ্যে কমলার স্মৃতির অবরুদ্ধ ঘাব খুলে গেল। সে চীৎকার ক’রে “ভোলাদা!” বলেই হতচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

“কি হ’ল! কি হ’ল! দিদি, দিদি গো!” ব’লে ডাকতে ডাকতে কমলার মাথাটা কোলে তুলে মালতী ব’সে পড়ে বললে “জল, জল। অজয়, বাবা, দৌড়ে একটু জল নিয়ে আয়। ওগো একি হ’ল! দিদি ও দিদি কথা ক’ব?” ব’লে সে হাপাস নয়নে কাঁদতে লাগল। অজয় দৌড়ে গেল জল আনতে।

ভোলানাথ খতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে অদূবে ট্যান্ডিতে উপবিষ্ট শচীন্দ্রকে ডেকে বললে, “বাবু শিগগির এস। মা যেন কেমন হয়ে পড়ছে। ভীষ্মি গেছে।”

মাতুল ব্যস্ত সমস্ত হ’য়ে শুধু “তাইত, তাইত” ক’রে অকারণে সমস্ত ঘর চামচিকের মত ঘোরাঘুরি ক’রে বেড়াতে লাগল।

কমলা—এবং সে অজ্ঞান হয়ে প’ড়েছে শুনে শচীন্দ্রের মনে এতক্ষণ যে দ্বিধা সঙ্কোচ জড়তা ছিল এক নিমেষে সব ঘুচে গিয়ে কুলে উপনীত নিমজ্জমান তরীর আরোহীর যে মনোভাব হয় সেই হতাশা পূর্ণ কুলেব আগ্রহে সে ছুটে এল কমলার কাছে।

মালতীর কোলে শিথিল দেহাৰ্দ্ধ স্তম্ভ ক’রে মেঝেব উপর লুটিয়ে পড়ে আছে কমলা ছিন্নবস্ত্র শতদলের মত মন্দসমীরস্পর্শে আকুঞ্চিত দীর্ঘিকার বারিরাশিব মত ছড়িয়ে পড়েছে তার বিপুল কেশভার। লজ্জা-সঙ্কোচ-ভাবব্যঞ্জনাবজ্জিত দীর্ঘপল্লব-ছায়াবেধাক্রান্ত শুভ্র কম্পোলে নিম্নলিখিত নেত্রে তার মুখ অপূর্ণ শ্রী ধারণ কবেছে। শচীন্দ্র মুহূর্তকাল নির্বাব নিম্পন্দ হয়ে এই অপক্লপ রূপশ্রী নিরীক্ষণ করতে লাগল।

কমলাকে দেখে তার মনেব মধ্যে তার পুরাতন পরিপূর্ণ প্রেম উদ্বেল হয়ে উঠল। তার মনে হ’তে লাগল যে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তার সাধনার ধন যদি এমনি ক’বে তাবে



আশ্রয়
শ্রীযুগপতি বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বঞ্চিত করে যায় তবে সে বিরহ তার পাশে সঙ্ক ক'বা যে কেমন করে সম্ভব হবে তা সে ভেবে উঠতে পারে না। পার্শ্বতীর প্রেম কমলার স্থান পূরণ করতে পারবে না। কখনই না। তার মনে হ'ল, এ নিশ্চয় তারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। পার্শ্বতীর প্রতি তার দুর্বল চিত্তের উন্মুখীনতার জন্তে তাব মনে তীব্র অহুতাপের উদয় হ'ল।

ভক্ততার কথা সে এক মুহূর্তের জন্তে ভুলেই গিয়েছিল। তার পর নিজেকে সংযত করে নিয়ে সে মাতুলকে সম্বোধন করে বললে, “দেখুন, একে আপনারা জ্যোৎস্না ব'লে জানেন। এর নাম কমলা। ইনি আমার পত্নী। আমার সঙ্গী এই এর কাছ থেকে সব জানবেন। আমি একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি তাড়াতাড়ি।”

মাতুল শটীশ্রের পিছন পিছন দরজা পর্যন্ত গিয়ে “তাই ত, তাই ত” বলতে বলতে ফিরে এল।

তাড়াতাড়ি তাব আচকানটা খুলে রেখে একটা পাখা-হাতে ভোলানাথ সজ্জিত অবগুণ্ঠনবতী মালতীকে বললে, “মা, আমাদের লজ্জা কো'র না। আমি মায়ের সন্তান, নক্ষর ভোলানাথ। মা আমার রাজরাণী অন্নপূর্ণা, ছল ক'বে তোমার বাড়ী আচ্ছন্ন নিইছিল।” ব'লে মাতৃসেবায় মন দিলে। বহুক্ষণ চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে বাতাস করতে করতে কমলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একবার শূন্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে আবার চক্ষু মুদ্রিত করে প'ড়ে বইল।

তাব মস্তিষ্কেব স্মৃতিফলকে অতীতের অজস্র ছবি রক্তধারাব বেগে প্রতিকলিত হয়ে চলেছে; সে অজস্রতার বেগ ঘেন তার দুর্বল মস্তিষ্ক সঙ্ক করতে পারছে না। এক-একবার এক-একটা উদ্বেলিত দীর্ঘশ্বাসে তাব জাম্বুব আশ্বিকে প্রকাশ করছে ঘেন। এমনি ভাবে বহুক্ষণ যাবার পর কমলার জ্ঞান ফিরে না এলেও তার নিশ্বাসপ্রশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল।

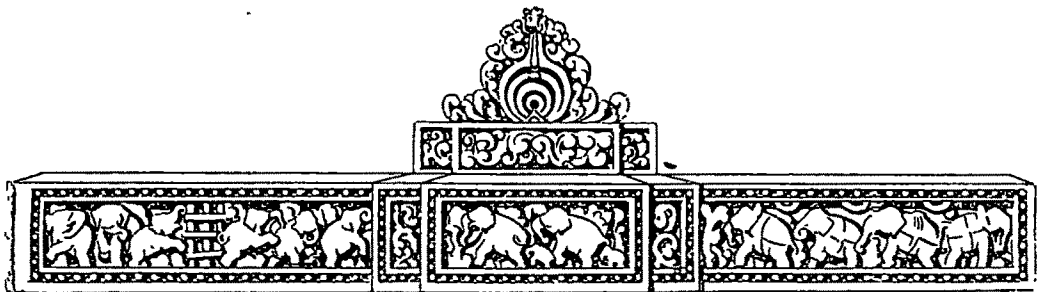
জীবনের ধাবাবাহিক লক্ষণে মাশস্ত হয়েই হোক বা তার এই অস্বস্তিকর অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়েই হোক মালতী অজ্ঞকে কানে কানে বললে, “যা ত বাবা, একটা বালিশ নিয়ে আয়। আমি উঠে মরি জন্তে একটা বিছানা ক'রে বাধি।”

মালতী উঠে ভিতরে গেলে, গ্রামেব খোলা বাতাসে অভ্যস্ত ভোলানাথ এই বহু ঘরে হাঁপিয়ে উঠেই বোধ করি, কিছুমাত্র ভক্ততা না ক'রে মাতুলের দিকে চেয়ে বললে, “ধব দিনি বাবু এটু পাখাটা, জানলা ক'টা খুলে দি। ঘরটা যে একেবাবে পায়রার খোপ ক'রে থু'ছোছে। এ ঘরে ঢুকলে মাহুয যে এমনিতেই ভীর্ণি যায়।”

মাতুল ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে “ঠিক বইছ। জমুউ তা তাই কই। জামুউ তা তাই কই।” বলতে বলতে জানালাগুলি খুলে দিতে লাগল।

এমন সময় ডাক্তার নিয়ে শটীশ্রনাথ ফিরে এল।

(ক্রমশঃ)



গণতন্ত্রের স্বরূপ

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম-এ, পিএইচ-ডি, বার-এট-ল

বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী উদ্ভাবনের জনক ইংলণ্ডকেই বলা হইয়া থাকে। এই গণতান্ত্রিক শাসন-প্রণালী মূর্ত হইয়াছে পার্লামেন্টারী শাসনতন্ত্রে। একরূপ শাসনতন্ত্রের উদ্ভাবন এক দিনে বা হঠাৎ হয় নাই, বহু কালের বিরোধ-বিসম্বাদের পর ইহার পত্তন সম্ভব হইয়াছিল। উক্ত বিরোধ-বিসম্বাদের ফলে একরূপ এক উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের উদ্ভাবন এতকাল সভ্য জগতের প্রশংসা ও আদর লাভ করিয়া আসিয়াছে। ইংলণ্ডের আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় ইউরোপের বহু দেশও অল্পরূপ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টাশীত ও অনেকাংশে সফলও হইয়াছিলেন, এবং যেখানে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, সেখানেও ইহার আদর্শ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যায় নাই। কথিত হইয়াছে, একরূপ গণতন্ত্র শাসনপ্রণালীই ইউরোপকে সভ্যতার এক উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

কিন্তু ইহার এক প্রতিক্রিয়া এক্ষণে উপস্থিত। বিগত মহাযুদ্ধের সময় রুষ বিপ্লোহের পর যে কমুনিজম্ মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে তাহাই উক্ত শাসনতন্ত্রের প্রধান শত্রু ও সমালোচক বলা যায়। রুষ বিপ্লোহের প্রধান নেতা ও কমুনিজমের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা লেনিন্ উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত তাহা প্রকৃত গণতন্ত্র নহে, উহা এক নিছক ক্যাপিটালিস্টতন্ত্র, শ্রমিকদের শোষণের এক বিরাট ষড়যন্ত্র মাত্র। প্রকৃত গণতন্ত্র যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় ত তাহা একমাত্র সম্ভব উক্ত তথাকথিত গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া, এবং তাহা কমুনিজমের দ্বারাই একমাত্র সম্ভব। এই জন্ত গোড়া হইতেই কমুনিষ্টদের অভিযান হইয়াছে উক্ত গণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে। লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যরাও এক্ষণে উক্ত ভাবেরই প্রতিধ্বনি করিতেছেন, তাঁহারা বর্তমান গণতন্ত্রের দোষ দেখাইয়া বতদূর সম্ভব প্রচার করিতেছেন যে ইহার মধ্যে ভাল কিছুই নাই। বর্তমান গণতন্ত্রের যেকোন

এক দার্শনিক ভিত্তি আছে কমুনিষ্টরাও নিজেদের মতকে সম্মানার্থ করিবার জন্ত উহা যে কেবল এক অর্থনীতিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা নহে, উহাকে এক দার্শনিক-ভিত্তির উপরও প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কমুনিষ্ট দর্শন-ঘোর জড়বাদমূলক।

রাশিয়ায় জারদের শাসনকালে যেরূপ অনাচার-অত্যাচার হইত ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যেভাবে নিপীড়িত হইত তাহাতে উক্ত জার-শাসনের ধ্বংসে অনেকেই যে কেবল আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, ইহা পৃথিবীর বহু লোকেরই সহানুভূতি লাভ করিয়াছিল। কমুনিষ্টরা নিপীড়িতদের উদ্ধারের জন্ত চেষ্টাশীত ও বহুপরিশ্রম, এই বলিয়া প্রচার করায় বহু লোকের ইহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া কিছু আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। তাঁহারা আরও প্রচার করিলেন যে, কেবল নিজ দেশে নহে, কমুনিষ্টরা জগতের সর্বত্রই নিপীড়িত ও অধঃপতিতদের উদ্ধারে চেষ্টাশীত ও সহানুভূতি-সম্পন্ন। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে বহু দেশেরই ক্লিষ্ট মানবের অন্তরে উহার দ্বারা নব আশার উদ্বেক হওয়া আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। এই জন্ত ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশেই কমুনিজম্ ভিত্তি গাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু কমুনিষ্টদের প্রোগ্রাম প্রধানতঃ সংগ্রামমূলক হওয়ায় এই নিপীড়িত ও অধঃপতিতদের উদ্ধার সর্বত্রই এক মহা সংগ্রাম ও বিরোধ বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাগ্রত করিয়া তুলে। ইহাতে সর্বত্রই যেরূপ অনাচার-অত্যাচার ঘটিতে থাকে তাহাতে কমুনিজমের ঘোর শত্রুতা জাগ্রত হইতে কালবিলম্ব ঘটে না। ইহাই এক্ষণে ক্যাসিজম্ বা নাৎসিজমের মধ্যে ওতপ্রোত, এবং এই দুই দলের মধ্যে এক্ষণে যেরূপ ভীষণ শত্রুতা ও সংগ্রাম চলিতেছে তাহা দেখিলে সকলেরই আতঙ্ক হয় ইহার ফলে বা জগতের সভ্যতা-বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

বাহা হউক, এ-বিষয়ের আলোচনা এখানে আমাদের

উদ্দেশ্য নহে। এখানে একটা বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হইবে এই যে, জগতে নিপীড়িত বা অধঃপতিতদের উদ্ধার বা অবস্থোন্নতির চেষ্টা এক্ষণে কিছু নূতন নহে। সোশ্যালিজম—বাহা হইতে বর্তমান কম্যুনিজমের উদ্ভব, তাহা জগতে বহুকাল পূর্বেই উদ্ভূত হইয়াছে। সোশ্যালিজমের মূলমন্ত্র এই বলা যায় যে, সকলের মধ্যে ধন বা অর্থের বন্টন সমতদ্ব সম্ভব জ্ঞানসম্মত হয়। বলা যায়, ক্যাপিটালিজমের বিরোধীরূপে সোশ্যালিজমের উদ্ভব বহুকাল পূর্বেই হইয়াছে। বাহাদের চিন্তেই মহানুভবতা ও উদারতা আছে তাঁহারা নিপীড়িতদের দুখে কাতর না হইয়া থাকিতে পারেন নাই, এবং তাঁহাদের চেষ্টাও হইয়াছে জগতে এক্ষণে অসামঞ্জস্য দূর করা। কিন্তু বর্তমান কম্যুনিষ্টদের ও সোশ্যালিষ্টদের মত ও পথে অনেক পার্থক্য আছে। কম্যুনিষ্টদের পক্ষা বা উপায় প্রধানতঃ সংগ্রামমূলক। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে নিপীড়িত বা অধঃপতিতদের উদ্ধারের জন্য শ্রেণীবিরোধ অবশ্যসম্ভাবী ও একান্ত আবশ্যক। ধনিক-সম্প্রদায়ের সমূলে বিনাশ তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং এক্ষণে করিতে পারিলে এক বর্গহীন বা শ্রেণীহীন সমাজ ও রাষ্ট্র স্থাপনের কল্পনা সফল হয়। নিয়ন্ত্রণকে উঠাইতে গিয়া উচ্চ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই ধ্বংসসাধনের চেষ্টাটি ভয়াবহ, ক্যাসিষ্ট বা নাসিরা ইহা নিবারণ করিতে চাহেন। তাঁহারাও যে শ্রমিক ও কৃষাণদের দুখে দুঃখিত নহেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা উচ্চ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধ্বংস চাহেন না। এই জন্যই ক্যাসিষ্টরা কম্যুনিষ্টদের প্রধান শত্রু হইয়াছেন, এবং একে অস্ত্রের ধ্বংস-সাধনে বন্ধপরিবর্তন।

আমাদের দেশেও কম্যুনিজমের ঢেউ ও প্রভাব যথেষ্ট আসিয়া পড়িয়াছে এবং উহার উক্ত ভাবও যথেষ্ট প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের দেশের কম্যুনিষ্টরাও প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে বর্তমান গণতন্ত্র প্রকৃত গণতন্ত্র নহে, উহা ধনিকদের সত্ত্ব, উহাকে ধ্বংস করিয়া উহার স্থানে এক সোশ্যালিষ্ট রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহারা ব্রিটিশ গণতন্ত্রকে ক্যাসিষ্টতন্ত্র নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ এই যে, ক্যাসিষ্টতন্ত্র বৈরূপ গণতন্ত্রের বিলোপ সাধন করিয়াছে, ব্রিটিশতন্ত্রও অস্বরূপ। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, পৃথিবীর কোনও ব্যবস্থাই

সম্পূর্ণ নহে, দোষযুক্ত। যদি এই কথা ধরা যায় ত অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রিটিশ গণতন্ত্রও দোষযুক্ত নহে। কিন্তু একথা সকল নিরপেক্ষ ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বাস্তবিক গণতন্ত্র বলিতে যদি কিছু জগতে থাকে ত তাহাব আভাস ব্রিটেনে ব্রিটিশতন্ত্রেই পাওয়া যায়। গণতন্ত্রের সোজা কথাই অর্থ এই যে, বাহাতে সকল সম্প্রদায়ের মত স্থান পায় ও আদরণীয় হয়। ব্রিটিশতন্ত্রের সহিত বাহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন ইহা কতদূর সত্য। ব্রিটিশতন্ত্র ব্রিটেনে গণতন্ত্রের পথে অধিক হইতে অধিকতর অগ্রসর হইতেছে, এবং ইহা সত্য বলিয়াই ব্রিটেনে আজ অবধি কম্যুনিজম বা ক্যাসিজম কোন মতেরই প্রাবল্য দেখা যায় না, এবং দেখা যাইবে বলিয়াও মনে হয় না। কাবণ, ইংরাজ জাতির এটুকু সহজ বুদ্ধি আছে যে, বর্তমান কম্যুনিজম ও ক্যাসিজম অর্থে গণতন্ত্র যে অস্বীকৃতি বুঝায় ইহা তাঁহারা বুঝেন। ইংরাজ জাতি ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে এত মূল্যবান মনে করেন বলিয়াই ইংলণ্ডে গণতন্ত্র সফল হইয়াছে। অল্প যে-সব দেশে তাহা নাই তথায় গণতন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গিয়া ডিক্টেটরশ্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের বাহারা ব্রিটেনের ব্রিটিশতন্ত্রকে ঘৃণ্য ক্যাসিষ্টতন্ত্র বলেন তাঁহাদের বুদ্ধি ন্যায়সম্মত বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের নিকট একমাত্র, কম্যুনিষ্টতন্ত্রই গণতন্ত্রের স্বরূপ। কিন্তু কম্যুনিষ্টতন্ত্রও যে ক্যাসিষ্টতন্ত্র অপেক্ষা কোন অংশে ভাল নয় একথা তাঁহারা বুঝেন কি-না জানি না। সম্প্রতি আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরে যে নিখিল-আয়ারল্যান্ড শ্রমিক সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে ক্যাসিজমকে নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে একজন শ্রমিক সভা উঠিয়া বলেন যে, কম্যুনিজমকেও নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হউক। ইহা উক্ত সম্মেলনে প্রথমবার প্রস্তাবিত হইল। এতকাল উহারা ক্যাসিজমকেই নিন্দা করিয়া আসিতেছিলেন অ-গণতান্ত্রিক বলিয়া, এইবার কম্যুনিজমকেও অস্বরূপ অ-গণতান্ত্রিক বলিয়া প্রথম নিন্দা করা হইল। ইহা যে অতি সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। ডিক্টেটরশ্ব যেখানে বহাল, সেখানে গণতন্ত্র কখনই থাকিতে পারে না; দুইটি একেবাবেই অসমঞ্জস। অনেকে ক্যাসিজম অপেক্ষা কম্যুনিজম যে অধিকতর শ্রেষ্ঠ এই কথা দেখাইবার জন্য

বলিয়া থাকেন যে, রাশিয়ার লোকেরা বড় সুখী, এ-কথা সত্য নহে। রাশিয়ার সকলেই যদি সুখী হইত তাহা হইলে যে-সব অনাচার-অত্যাচার এখনও ঘটিতেছে, তাহার কোনও স্থান থাকিত না। অবশ্য, এ-কথা বলা যায় যে, জেণী বা সম্রাটের বিশেষ সুখী হইতে পারেন, কারণ রাষ্ট্র-বা সমাজ-ব্যবস্থায় তাঁহারাই অধিকতর সুখ-সুবিধার অধিকারী হইয়াছেন, অথবা অধিকারী হইয়া না থাকিলেও হইবার আশা রাখেন। ইহা ক্যাসিষ্টত্বের পক্ষেও সত্য। মুসোলিনী বা হিটলারের অধীনে তাঁহাদের শিষ্য বা মতাবলম্বী লোকেরা অধিক সুখ-সুবিধার অধিকারী হইয়াছেন বা হইবার আশা রাখেন বলিয়া তাঁহারা সর্বান্তঃকরণে উক্ত শাসনতন্ত্র সমর্থন করেন ও তাহা রক্ষা কবিবার জন্যও

বদ্ধপরিকর। কাজেই লোকের সম্ভাব্য বা সম্ভাব্যের আশা যদি তদধীনস্থ শাসনতন্ত্রের ঔৎকর্ষের পরিচায়ক হয় তাহা হইলে ক্যাসিষ্টত্ব ও ক্যাসিষ্টত্বে কোনও প্রভেদ নাই। সুতরাং উক্তরূপ যুক্তি যে কতদূর অসঙ্গত তাহা সহজেই অল্পমেয়। এ-কথা স্বচ্ছন্দেই বলা যায় যে, গণতন্ত্রের স্বরূপের আভাস আমরা ক্যাসিষ্টত্ব বা ক্যাসিষ্টত্বে পাই না। এই জন্যই ইয়োরোপে এখনও ব্রিটিশ ও ফরাসী তন্ত্র গণতন্ত্র বলিয়া উচ্চ ও সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া আছে। যদিও ফ্রান্সে এক্ষণে ক্যাসিষ্ট গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লোকেরা পূর্বে যে অবাধ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উপভোগ করিতেন তাহার ধ্বংস সাধনেব চেষ্টা হইতেছে ওনট যায়।

কলিকাতা হিন্দু অনাথ-আশ্রম ও হিন্দুর বিবাহ-সমস্যা

শ্রীসরসীলাল সরকার, এম-এ, এল-এম-এস

যে-সকল হিন্দু বালক-বালিকা নিরাশ্রয়, যাহাদের জীবন-ধারণের, খাদ্য ও বস্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহের কোনই উপায় নাই, তাহারা হিন্দু অনাথ-আশ্রমে স্থান পাইতে পারে। দশ বৎসরের অধিকবয়স্ক কোনও বালক বা বালিকাকে আশ্রমে লওয়া হয় না এবং বেস্টালয় হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত কোনও বালিকার বয়স সাত বৎসরের অধিক হইলে সে এই আশ্রমে স্থান পাইতে পারে না।

ছুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের আশ্রমে রাখা যাইতে পারে। মেয়েরা যত দিন বিবাহিতা না হয় তত দিন আশ্রমে থাকিতে পারে। তবে যদি আশ্রমের কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে কোন মেয়ে বিবাহিতা না হইলেও নিজের জীবিকা অর্জন করিবার মত উপযুক্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে আশ্রম হইতে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে।

আশ্রমে সাধারণ ভাবে লেখাপড়া শেখান হয় এবং অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। ছেলেদের পুস্তক বাঁধাই, বেতের কাজ, বস্ত্র-বয়ন ও সেলাই শিক্ষা দেওয়া

হয়। মেয়েদের বস্ত্র-বয়ন, সেলাই এবং অর্থকরী কারুশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়।

আশ্রমে অল্পবয়স্ক কুমারী বালিকারা ভর্তি হয়, সুতরাং তাহাদের বিবাহের ভারও আশ্রমের কর্তৃপক্ষের। এই বিবাহ-সমস্যা আজকালকার দিনের একটি গুরুতর সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানে আর্থিক দুর্দশা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য হিন্দু পরিবারে মেয়ের বিবাহ দেওয়া বড়ই কঠিন হইয়াছে। কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য প্রভৃতি জাতির মধ্যে গৃহে গৃহে অধিকবয়স্ক অবিবাহিতা কুমারী দেখা যায়। লেখক স্বয়ং প্রাচীন হিন্দুসমাজভুক্ত কায়স্থ-কায়স্থ-সমাজের মধ্যবিত্ত পরিবারের অবস্থা তাঁহার ভাল করিয়াই জানা আছে।

ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে আর্থিক অভাবের জন্যই আজকালকার ছেলেরা সহজে বিবাহ করিতে চাহে না। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কায়স্থ-গৃহের কস্তাভারপ্রাপ্ত পিতামাতার দুর্দশা অবগনীয়। কায়স্থ-সভা হইতে প্রকাশিত কায়স্থ

পত্রিকায় একটি ঘটনার বিবরণ বাহির হইয়াছিল, যে, ৭০।৮০ টাকা মাহিনার চাকুর্য্যে কোন কায়স্থ ভদ্রলোকের উপরি উপরি চারটি কস্তার পর পঞ্চম কস্তা জন্মগ্রহণ করিলে মেয়েটিকে গোপনে হাড়িনী খাজীকে দিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং মেয়েটি মারা গিয়াছে এই কথা প্রকাশ করা হইয়াছিল। পরে সত্য ঘটনা প্রকাশ পায়।

হিন্দু পরিবারে কস্তা জন্মগ্রহণ ব্যাপারটিই যে দুঃখের, বিবাহ-সমস্যা তাহার একটি বিশেষ কারণ।

হিন্দু সমাজে এই বিবাহ-সমস্যা এত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে ইহার ফলে সমাজ দিন দিনই অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। স্নেহলতার স্নায় অনেক কুমারী সমস্যা-পূরণের অন্ত উপায় না পাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে ও করিতেছে। অপর পক্ষে আবার কেহ কেহ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহাও একরূপ আত্মহত্যা ছাড়া আর কি? যে-সমাজে কস্তার বিবাহের দায়ে কস্তাকে হাড়িনীর নিকট বিলাইয়া দিতে হয়, সে-সমাজে হিন্দুদের গর্ক করিবার কি আছে? আরও একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। মকম্বলে ডাকাতের সম্বন্ধে অহুসন্ধান করিবার জন্ত পুলিশ একটি মুসলমান গ্রামে যায় এবং তথায় এক মুসলমানের গৃহ হইতে একটি অল্পবয়স্ক হিন্দু যুবতীকে উদ্ধার করে। তাহার পরিচয় লইয়া জানা যায় যে, সে কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া কায়স্থ-কস্তা। তাহার পিতার অবস্থা এখন আর পূর্বের মত নাই, একান্ত বিবাহের বয়স হইলেও কস্তার বিবাহ দিতে পারেন নাই। এই বিবাহ লইয়া তাহার পিতা ও মাতাতে প্রায়ই কথাকাটাকাটি হইত। একদিন কস্তা শুনিতে পাইল, তাহার বিবাহ লইয়া অপর ঘরে পিতা ও মাতার মধ্যে বিতর্ক হইতেছে। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া মাতাকে বলিতেছেন, “মেয়ের বিবাহ শুধু-হাতে হয় না, তাতে টাকা চাই। মেয়ের বিয়ে দিলে সর্বস্বাস্ত্র হয়ে সপরিবারে উপোস করে কি আমরা মরতে বল? তা আমি পারব না, এতে মেয়ের বিয়ে হোক আর নাই হোক।” এই কথা শুনিয়া তাহার মনে এত দুঃখ, রাগ ও অভিমান হইল যে, সে সেই রাগে বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইল এবং অবশেষে এক মুসলমানের হাতে পড়িল।

মেয়ের অবস্থা ইচ্ছা করিয়া কুমারী থাকে না, অথচ বিবাহ না হওয়ার অপরাধে তাহাদের ঘরে বাহিরে লাঞ্ছনা নিখাতন ও নিন্দার সীমা থাকে না। পল্লীর মন্দ ছেলেবা এই হুমুগে যথাসাধ্য উৎপাত করিবার চেষ্টা কবে, ও প্রতিবেশীগণ নিন্দা রটনা করিবার জন্মই উৎস্ক হন। এমন অবস্থা অসহ্য হইলে যদি সে আত্মহত্যা করে তাহাতেও তাহার নিন্দা, এবং ঘরের বাহির হইয়া গেলে তো কথাই নাই।

এখানে বিশেষ করিয়া কায়স্থ-সমাজের কথাই বলিলাম। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব সমাজের অবস্থাও যে ইহা অপেক্ষা ভাল তাহা নয়। আমার হাতে একটি ছাপানো আবেদনপত্র আসিয়াছে, তাহা হইতে কয়েক লাইন এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,

সবিন্যাসবেদন,—একটি দুঃস্থ বর্ধমানিত সন্তান ব্রাহ্মণের কন্যাদার হইতে উদ্ধারের জন্য আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী হইতেছি। এই ব্রাহ্মণ আমাদের এক কলিকাতার শিক্ষিত-সমাজের বিশেষ পরিচিত। কায়স্থের সংসারবাহী নির্বাহ ব্যতীত তিনি কন্যাদার হইতে উদ্ধারের কোনই পন্থা এতদিন স্থির করিতে পারেন নাই বলিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, ইত্যাদি।

“অনাথ আশ্রমে পাঠাইলে মেয়ে বিবাহের দায় হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে,” এইরূপ চিন্তা কোন অভিভাবকের মনে উদয় হয় কিনা আমরা তাহা জ্ঞানি না; কিন্তু যেখানে-নদ্যোজাত কস্তাকে হাড়িনীর হাতে দিয়া পিতা দায়মুক্ত হন (অবশ্য, মাতার এ-ব্যাপারে কোন কর্তব্য ছিল না), সে-সমাজে এরূপ ঘটনাও অসম্ভব নয়।

রাস্তায় কুড়াইয়া-পাওয়া কতকগুলি মেয়ে আলোচ্য অনাথ-আশ্রমে আছে। তাহাদের মধ্যে একটি মেয়ের ইতিহাস হইতে জানিলাম, যখন তাহার বয়স অল্পমান ছয় বৎসব তখন সে একটি বাটি ও একটি পয়স লইয়া দোকানে গুড় কিনিতে আসিয়া পথ হারাইয়া ফেলে। পুলিশ তাহাকে অসহায় অবস্থায় ঘুরিতে দেখিয়া থানায় লইয়া যায়, কিন্তু আশ্রমের বিষয় এই যে কোনও অভিভাবক তাহার অহুসন্ধান করিতে আসিল ন। অগত্যা তাহাকে অনাথ-আশ্রমে পাঠানো হইল। পথে-কুড়াইয়া-পাওয়া মেয়েদের অনেকের ইতিহাস হইতে ইহাই বুঝা যায়, যে, এই সব শিশুর প্রতি তাহাদের অভিভাবকগণের

স্নেহ ও ভালবাসার একান্ত অভাব ছিল। একটুও স্নেহ থাকিলে কেহ ঐরূপ অবোধ বালিকাদের কলিকাতার মত জনবহুল নগরীর পথে একা ছাড়িয়া দেয় না, এবং হারাইয়া যাইবার পর তাহাদের ফিরিয়া পাইবার জন্ত আন্তরিকভাবে চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে না।

এইরূপ পথে-কুড়াইয়া-পাওয়া মেয়ের ভিতর উচ্চবংশের মেয়েও আছে। এক জন নিজের যে পরিচয় দিয়াছিল তাহাতে বুঝা গিয়াছিল যে সে ব্রাহ্মণকন্যা। এই মেয়েটি সংস্কারভাবা ও স্ত্রন্দরী ছিল। লেখাপড়া ও অন্যান্য শিক্ষায় সে বেশ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল। এক জন বাঙালী ব্রাহ্মণ ইহাকে বিবাহ করেন।

পথে-কুড়ানো মেয়ে ছাড়া বেঙ্গালয় হইতে উদ্ধার করা অনেক বালিকা অনাথ-আশ্রমে আসিয়াছে। অনাথ-আশ্রমের অধিকাংশ বালিকাই বেঙ্গালয় হইতে উদ্ধার করা মেয়ে। বাংলা দেশে এইভাবে পাপ-ব্যবসায়ের বলিস্বরূপ কত পবিত্র নিষাপ শিশু উৎসর্গীকৃত হইতেছে, হিন্দু সমাজে কে তাহার খবর রাখে? এ বিষয়ে হিন্দু সমাজের একান্ত ঔদাসীন্য দেখিয়া বুঝা যায় যে, এরূপ কতকগুলি মেয়ে যায় বা থাকে তাহাতে সমাজের কিছু যায় আসে না। ধর্মসাধনা করিয়া নিজের মুক্তির একটা পথ পাইলেই হইল। বেঙ্গালয় হইতে সংগৃহীত এই সমস্ত মেয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের কন্যাও আছে, অনাথ-আশ্রমের খাতাপত্রে আমরা ইহাই কেবল জানিতে পারি। কিন্তু কি কারণে ঐ বালিকা-গুলি বেঙ্গালয়ে বেঙ্গার হাতে গিয়া পড়িয়াছিল তাহার রহস্য কিছুই জানিতে পারি না।

আমি একটি ঘটনা জানি যে, কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবার অর্থাভাবে ও ম্যালেরিয়ায় একেবারে উৎসন্ন হইয়া গেলে পরিশেষে কেবল এক জন বৃদ্ধ ও একটি অল্পবয়স্ক বালিকা সেই পরিবারে অবশিষ্ট স্বরূপ ছিল। বৃদ্ধের আর সংসারে থাকিবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি বালিকাটিকে এক বন্ধু-পরিবারের আশ্রমে রাখিয়া এবং তাহার ভরণ-পোষণ ও বিবাহের ব্যয়ের জন্ত কিছু টাকা তাহাদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া কান্দীধামে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি যাইবার পূর্বে এই গচ্ছিত টাকা আশ্রয়দাতা নিজের জন্তই

খরচ করিয়া ফেলিলেন এবং কন্যাটি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হইতে হইতে অবশেষে বেঙ্গালয়ে স্থানপ্রাপ্ত হইল। বস্তুতঃ এই বাংলা দেশে এরূপ কোন আশ্রম নাই যেখানে শিশুকন্যার একমাত্র অভিভাবক মৃত্যুকালে অথবা প্রবাসে যাত্রার সময় উপযুক্ত অর্থ দিয়া কন্যার ভরণপোষণের ও শিক্ষা এবং বিবাহের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

বেঙ্গাগণ এইরূপ শিশুকন্যাকে ক্রয় করিবার জন্ত বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। আশ্রমের সহকারী অধ্যক্ষ আমাকে বলেন যে, একবার একটি শিশুকন্যাকে বেঙ্গালয় হইতে উদ্ধার করিয়া অনাথ-আশ্রমে পাঠানোর পর এই বালিকাটি যে-বেঙ্গার অধিকারে ছিল সে ইহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্ত মোকদ্দমা করে। যখন মোকদ্দমায় হারিয়া গেল, তখন সে গোপন ভাবে অনাথ-আশ্রম হইতে মেয়েটিকে ফিরাইয়া লইবার জন্ত সহকারী অধ্যক্ষের নিকট দুই সহস্র মুদ্রা ঘুস দিবার প্রস্তাব কবিরিয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ব্যবসায়ের জন্ত মেয়ে সংগ্রহ করিতে পতিভারা কিরূপ ভাবে টাকা খরচ করে। আর এই দরিদ্র দেশে পয়সা খরচ কবিলে মেয়ে সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হয় না।

বিভিন্ন জেলার ম্যাজিস্ট্রেটগণ মধ্যে মধ্যে এই আশ্রমে মেয়ে পাঠাইয়া দেন। একটি মেয়ের ইতিহাস এই যে, ম্যাজিস্ট্রেট তাহার মা ও বাবা উভয়কেই জেলে পাঠান, হুতরাং শিশুটিকে আশ্রমে পাঠানো ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না।

আমি যখন মেডিক্যাল কলেজে কাজ করিতাম সেই সময় কোন রোগিণীর হাসপাতালে মৃত্যু হইলে তাহার যে-শিশু মায়ের সহিত হাসপাতালে ভর্তি হইয়াছিল, খ্রীষ্টিয়ান মিশনারী আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইত, এইরূপ দেখিয়া-ছিলাম। কিন্তু এই আশ্রমে দেখিলাম, সোশ্যাল সার্ভিস লীগের স্থাপয়িতা ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মেয়ে হাসপাতাল হইতে এইরূপ মাতৃহীন একটি ছোট ছেলে ও মেয়েকে এখানে পাঠাইয়াছেন। কলিকাতায় ক্যামাক স্ট্রীটে ভারতবর্ষের শিশুরক্ষণী প্রতিষ্ঠান (Society for Protection of Children in India) হইতেও অনেকগুলি ছেলেমেয়ে অনাথ-আশ্রমে পাঠানো হইয়াছে।

গভর্ণমেন্ট কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন
একরূপ কোন ভুল্লোক কর্তৃক প্রেরিত মেয়ে এই আশ্রমে
খুঁই কম। যে কয়টি মেয়ে একরূপ ভাবে প্রেরিত হইয়া
আশ্রমে আশ্রয় পাইয়াছে তাহাদের তালিকা এই :

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সরোজিনী নামে একটি সাত বৎসর বয়স্কা কায়স্থের
মেয়ে সাতকীরা হইতে শ্রীনীরোদচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রেরিত হয়।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বৃহস্কুমারী নামে একটি ১১ বৎসরের ব্রাহ্মণের মেয়ে
আশ্রমে আসে। প্রেরকের নাম শ্রীদীননাথ মজুমদার।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশবিখ্যাত বঙ্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ ও ৯
বৎসরের দুটি ব্রাহ্মণ-কন্যাকে আশ্রমে পাঠান। ইহাদের নাম শৈলবালা
দেবী ও বিহুৎলা দেবী।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্শ্বতীবালা সবকার নামে সাতো চাবি বৎসরের একটি
কায়স্থ কন্যা আশ্রমে আসে। ইহাকে দেয়াবন হইতে রায় সাহেব
দিশানচন্দ্র দেব পাঠাইয়াছিলেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ কুমারী যামিনী সেনের প্রতিপালিতা দুটি মেয়েকে
তাঁহার বুড়ার পর আশ্রমে পাঠানো হয়। ইহাদের নাম অরুণা ভূপ্ত ও
উমা ভূপ্ত; বয়স বথাক্রমে ৮শ ও ৭গার। বঙ্গীয়া যামিনী সেন হাস-
পাতাল হইতে এই অনাথা বালিকা দুটিকে গৃহে আনিয়া কন্যা-নির্বিশেষে
পালন করেন এবং ষষ্ঠ দিন না মেয়ে দুটির বিবাহ হইত তত দিন তাহারা
মাসিক ১৫ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবে, তাহার উইলে এইরূপ ব্যবস্থা
করিয়া যান।

৪৫ বৎসর এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জন-
সাধারণের পক্ষ হইতে এই দীর্ঘকালে মাত্র সাতটি মেয়েকে
আশ্রমে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার কারণ ঠিক বুঝা
যায় না। হয়ত হিন্দু সমাজে অনাথা বালিকাকে আশ্রমে
পাঠাইবার মত উজোগী লোকের অভাব আছে, অথবা
আশ্রম-কর্তৃপক্ষ গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে যে-সকল মেয়ে
আসে সেই সকল মেয়েকে আশ্রয় দিয়া আর অধিক মেয়েকে
স্থান দিতে সমর্থ হন নাই, এই দুই কারণই হইতে পারে।

হিন্দু সমাজের এই বিবাহ-সমস্যা সম্বন্ধে অনাথ-আশ্রমের
কর্তৃপক্ষগণ কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাই পাঠকদিগের
সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

প্রথমতঃ, হিন্দু সমাজের জাতিভেদ, আবার এক জাতির
মধ্যেও শ্রেণীভেদ, করণীয় ও অকরণীয়ের বিচার, এই গুলিতে
বিবাহের গুণী বিশেষভাবে সংকীর্ণসীমাবদ্ধ হইয়াছে।
ষষ্ঠীয়তঃ, উচ্চ জাতির মধ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্বত্রই
প্রায় বরপণ প্রচলিত, এবং নিম্নজাতির মধ্যে অধিকাংশ স্থলে
কন্যাপণ দিয়া বধূকে গৃহে আনিতে হয়, এই দুই কারণে
বিবাহ-সমস্যা অধিকতর জটিল হইয়াছে। অনাথ-আশ্রম

জনসাধারণের আশ্রম বলিয় ইহাঃ কর্তৃপক্ষ প্রথম প্রথম
সামাজিক প্রথাভঙ্গারে জাতিভেদ বজায় রাখিয়া বিবাহ
দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যেখানে
কন্যাপণ আছে সেখানে মেয়ের জাতীয় পাণ্ডে বিবাহ
দেওয়া কতক পরিমাণে সম্ভব হইয়াছিল; কারণ একপ
স্থলে বরপক্ষ বিনা-পণে কন্যা পাইল, আবার লেখাপড়-জানা
মেয়েও পাইল, কাজেই বিবাহে তাহাদের আপত্তি
হয় নাই। ক্রমশঃ কর্তৃপক্ষ যখন দেখিলেন জাতিভেদ
রাখিতে গেলে মেয়েদের বিবাহ হয় ন, তখন তাঁহারা উচ্চ-
জাতীয়া কন্যাদের নিম্নজাতীয় পাণ্ডের সহিতও বিবাহ দিতে
লাগিলেন। পাণ্ড-নির্বাচনে পালের আর্থিক স্বাতির
দিকেই তাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন, পাণ্ড যেন
বিবাহ করিয়া ভাবী পত্নীব ও সন্তানদের ভরণপোষণ করিতে
পারে। ক্রমশঃ বাংলা দেশে একরূপ পাণ্ড সংগ্রহ ববিতে
পারাও আশ্রমের কর্তৃপক্ষগণের পক্ষে চলি হইয়া উঠিল।

এদিকে বিবাহ না হওয়াতে বিবাহযোগ্যা মেয়েদের
মধ্যে অশান্তি ও বিজ্রোহের ভাব দেখা যাইতে লাগিল।
দু-তিনটি মেয়ে বাড়ীর ড্রেনের নর্দামার জল বাহির হইবার
পথ খুঁড়িয়া বড় করিয়া তাহার ভিতর দিয়া পলাইয়া গেল।
ইহার পর ড্রেন এমন শক্ত করিয়া গাঁথা হইল যাহাতে
আর ভাঙা না যায়। আশ্রমের প্রাচীরের উপর হইতে
পাশের বাড়ীর প্রাচীরের উপর তক্তা ফেলিয়া একটি মেয়ে
তাহাবই উপর দিয়া পলাইল। তাহার পর আশ্রমের
প্রাচীর উচ্চ করা হয়। আর একটি মেয়ে কানিসের উপর
দিয়া পলাইবার চেষ্টা কবে, ইহাব ফলে বাড়ীব চারি দিকে
কানিস ভাঙিয়া ফেলা হয়।

মেয়েদের লোহার গরাদ দিয়া তৈরি দরজাগুলো
আলাদা বাড়ীতে পরিদর্শিকার অধীনে রাখা হইল। সেখানে
গিয়া দু-এক জন মেয়ে বিবাহ-চাপার লইয়া অনশন আরম্ভ
করিল। এই ঘটনায় আশ্রমের কর্তৃপক্ষ ব্যাধ হইয়া পুলিশে
খবর দেন।

মেয়েদের যদি বরের অভাবে বিবাহ না হয় তবে
তাহাদের সম্বন্ধে আর কি ব্যবস্থা করা হইতে পারে, আশ্রম-
কর্তৃপক্ষ অতঃপর সেই সম্বন্ধে বিবেচন করিতে লাগিলেন।

ছেলেদের বিভাগে অনেক উচ্চবর্ণের মেধাবী বালক

শিক্ষালাভ করিয়া স্বযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ-বংশীয় বালক গ্যাডভোর্কেট হইয়া এখন প্রভুত অর্থ উপার্জন করিতেছেন এবং এখনও অনাথ-আশ্রমে অর্থ সাহায্য করেন। তিনিই সহোদর ব্রাহ্মণ-বালক অনাথ-আশ্রমে আনেন। ইহাদের মধ্যে এক জন ডাক্তারী পাস করিয়া গভর্ণমেন্টের চাকুরী পাইয়াছেন, এক জন মার্চেন্ট আপিসে চাকুরী করেন, আর এক জন কম্পাউণ্ডার হইয়াছেন। একটি ছেলে বি-এল পাস করিয়া ওকালতি করিতেছেন, আর এক জন রেলওয়েতে চাকুরী করেন, অপর এক জন রামকৃষ্ণ-মিশনে গিয়া ব্রহ্মচারী হইয়াছেন। এই শেষের তিনটি ছেলে কায়স্থ।

ছেলেরা যদি শিক্ষা পাইয়া এমন উন্নতি করিতে পারে, তাহা হইলে মেয়েরা শিক্ষা পাইয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে কি না সে-বিষয়ে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত, আশ্রম-কর্তৃপক্ষ এইরূপ বিবেচনা করিয়া কয়েকটি মেয়েকে বাহিরে শিক্ষার জন্ত বিভিন্ন শিক্ষালয়ে ভর্তি করিয়া দেন। নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শৈলবালা দেবী শিক্ষিত হইয়া ঘাটালে একটি বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীকাজ পান। বাণী নামে একটি বালিকা বয়ন-বিদ্যার পরীক্ষায় পাস হইয়া চুঁচুড়ার একটি বয়ন-বিদ্যালয়ে কাজ পান। লতিকা ও অপর একটি মেয়েকে লেডি ডকরিন হাসপাতালে নার্সের কাজ শিখিবার জন্ত পাঠানো হয়। উহারা ঐ কাজ শিক্ষার পর মেয়ে হাসপাতালে চাকুরী পান।

ইহারা চাকুরী পাইয়া নিজের উপার্জনে নিজের খরচ চালাইতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু কোন অভিভাবক না থাকিতে এই চাকুরী তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা-স্বরূপ হইল। ইহারা সকলেই কিছু দিন চাকুরী করিবার পর আশ্রম-কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন, ইহা অপেক্ষা বিবাহিত জীবন বৎ তাহাদের পক্ষে সহজ। কারণ অভিভাবকহীনা এই সকল মেয়ের উপর পুরুষের উৎপাত সর্বদাই রহিয়াছে। প্রায়ই প্রেম-নিবেদন উপস্থিত হয়, কিন্তু সে-নিবেদনে বিবাহের কোন প্রস্তাব নাই। কারণ নিবেদনকারিগণের জাতি আছে, সমাজ ও আত্মীয়-স্বত্ব আছে, ইহাদের উপেক্ষা করিয়া তাহারা এরূপ অনাথা কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে না। এইরূপ প্রেম-নিবেদনের উৎপাতে তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

শৈলবালা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিয়া সামান্য বেতন পাইতেন, তথাপি তিনি আশ্রমে মাসে এক টাকা করিয়া সাহায্য করিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন। অবশেষে বর্তমান জেলার এক বয়স্ক বিপন্ন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিবাহ করেন ও তিনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ ছাড়িয়া দেন। ব্রাহ্মণের প্রথম পক্ষের একটি ছেলে ছিল। তিনি ছেলেটিকে সম্বানের গ্রাম স্নেহে পালন করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছু দিন পরে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইল ও বাড়ীর অস্তিত্ব মেয়েদেব ব্যবহারে তাঁহাকে স্বামীর বাড়ী ছাড়িয়া আবার একটি স্থলে চাকুরী জুটাইয়া লইতে হইল। বীণা বয়ন-শিক্ষয়িত্রীর কাজ ছাড়িয়া এক জন পাঞ্জাবী যুবককে বিবাহ করেন। হাসপাতালের নার্স দুটির মধ্যে এক জন একটি সিদ্ধুদেশীয় যুবককে বিবাহ করেন, অপরের সংবাদ জানা নাই।

এই সব ঘটনায় বুঝা যায় আমাদের দেশের ও সমাজের বর্তমান অবস্থায় কোন অভিভাবকহীনা হিন্দু কুমারীর পক্ষে স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জন করা স্বকঠিন। মুখে আমরা যতই হিন্দুসভ্যতা সম্বন্ধে গৌরব করি না কেন, মাতৃ-জাতির প্রতি ঐশ্বর্য প্রদা, সন্তান ও স্নেহ-কল্পণা এখনও হিন্দু পুরুষের মনে জাগ্রত হয় নাই। পুরুষদের উৎপাত হইতে এই সকল অনাথা স্বাবলম্বিনী বালিকাকে রক্ষা করিবার জন্ত হিন্দু মহিলাগণের প্রতিষ্ঠিত যদি কোন সমিতি তাহাদের অভিভাবকত্বের ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে বোধ হয় এ-সমস্যা কতকটা সমাধান হইতে পারে।

অনেক কায়স্থ-বালিকা এই আশ্রমে আশ্রয় পাইয়াছে; আশ্রমের কর্তৃপক্ষগণের মধ্যেও কায়স্থ পরিচালক সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং ইহাদের অনেকেই ধনে মানে সুবিখ্যাত ও সমাজের নেতৃস্থানীয়; তথাপি এই আশ্রমের কায়স্থ-কুমারীগণের বিবাহের জন্ত স্বজাতীয় বর জুটে না, তাহাদের নমঃশ্রু প্রভৃতি জাতীয় ছেলেদের সহিতই বিবাহ হয়।

কায়স্থ জাতির উন্নতির জন্তই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সমাজ ও কায়স্থ-সভা এই দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু অনাথা অসহায় কায়স্থ-কুমারীদিগের সম্বন্ধে তাঁহারা উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন।

আশ্রম-কর্তৃপক্ষ ঘটনাবিশেষে ব্যয়িয়াছিলেন, নারায়ণ-শিলা সম্বন্ধে হিন্দুমতে অসংবর্ধ বিবাহ হইলেও বিবাহের



স্বর্গীয় আচার্য্য প্রাণকৃষ্ণ দত্ত,
কলিকাতা হিন্দু অনাথ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা।



আচার্য্য প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সহধর্ম্মী
স্বর্গীয়া শ্রীমতী কান্তমণি দত্ত, অনাথ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী।

বৈধতা লইয়া অবশেষে গোল বাধিতে পারে। সেই জন্ত এই হিন্দু-প্রতিষ্ঠানে হিন্দু-বিবাহ প্রচলিত হয় নাই। পূর্বে ১৮৭২ সালের তিন আইন অল্পসারে বিবাহ হইত, বর্তমানে (এ আইনের পরিবর্তিত রূপ) ১৯২৩ সালের ত্রিশ অ্যাক্ট অল্পসারে হিন্দু অসবর্ণ বিবাহ হইয়া থাকে।

১৯২৪ সালে যখন আশ্রমে বিবাহযোগ্যা অনেকগুলি অবিবাহিতা কুমারী ছিল, অথচ তাহাদের পাত্র খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়াছিল, তখন আশ্রম-কর্তৃপক্ষ একটি নূতন উপায়ের সন্ধান পাইলেন। সেই সময় সিদ্ধ প্রদেশের এক জন নেতা হীরাসিং মেধাসিং মাসন্দ, অমৃত বাজার পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের নিকট কংগ্রেসের কার্যোপলক্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি কথায় কথায় জানান যে তাঁহার দুই ভাই আছে, বিবাহযোগ্যা বাঙালী মেয়ে পাইলে তিনি বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন, কারণ তাঁহাদের দেশে মেয়ের সংখ্যা কম, বিবাহের জন্ত কত্কা পাওয়া সেই জন্ত অনেক সময় কঠিন হয় এবং পাত্রীর অভাবে ছেলেদের অবিবাহিত থাকিতে হয়। ঘোষ মহাশয় এই কথা অনাথ-আশ্রমের সম্পাদক রায় বাহাদুর

ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয়কে জানান। চুণীবাবু এই সংবাদ শুনিয়া হীরাসিংয়ের সহিত দেখা করেন ও তাঁহাকে বলেন যে তাঁহার আশ্রমে দুটি শিক্ষিতা মেয়ে আছে, তাহারা লোয়ার প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কলারশিপ পাইয়াছে। তবে বিবাহের পূর্বে তিনি ছেলেদের আর্থিক অবস্থা এবং অন্যান্য বিষয়ে সংবাদ লইতে চাহেন। ইহাতে হীরা সিং ই বি রেলওয়ের কন্ট্রাক্টর তাঁহার নিকট-সম্পর্কীয় খুসীরাম রঘুমল মাসন্দার নাম করেন। ইনি কার্যোপলক্ষে বহুকাল কলিকাতায় বাস করিতেছেন, সম্ভ্রান্ত লোক ও চুণীবাবুর পরিচিত। চুণীবাবু খুসীরাম রঘুমলের নিকট পাত্রদের সম্বন্ধে খোঁজখবর লইয়া ঐ দুই সিদ্ধী যুবকের সহিত আশ্রমের মেয়ে দুটির বিবাহ দিয়াছিলেন। এই সময় আশ্রমে যতগুলি বিবাহযোগ্যা কুমারী ছিল ১৯২৫ সালের মধ্যে সকলেরই সিদ্ধী যুবকদের সহিত বিবাহ হইয়া গেল। এই সময় হইতে এ পর্যন্ত আশ্রমের যত মেয়ের বিবাহ হইয়াছে, একটি ছাড়া সকলেরই সিদ্ধী যুবকদিগের সহিত বিবাহ হইয়াছে। এই সব মেয়ে বিবাহিতা হইয়া সিদ্ধদেবে গিয়া সেখান হইতে প্রায়ই আশ্রমে পত্র লেখে। আমি তাহাদের

লিখিত অনেকগুলি পত্র পড়িয়াছি। পত্র পড়িয়া বুঝা যায় যে তাহারা স্বামিগৃহে গিয়া স্থখেই আছে, তাহাদের পারিবারিক জীবনে কোন অশান্তি নাই। এই পত্রগুলিতে বিবাহযোগ্য পাত্রের সংবাদ আছে, যে-পরিবারে তাহার বিবাহ হইয়াছে যদি সেই পরিবারে ভাল পাত্রের বিষয় সে জানিতে পারে তখনই আশ্রম-কর্তৃপক্ষকে তাহা জানায়, এই জন্ত আশ্রম-কর্তৃপক্ষের আর এখন পাত্রের জন্ত অধিক খোঁজখবর করিতে হয় না।

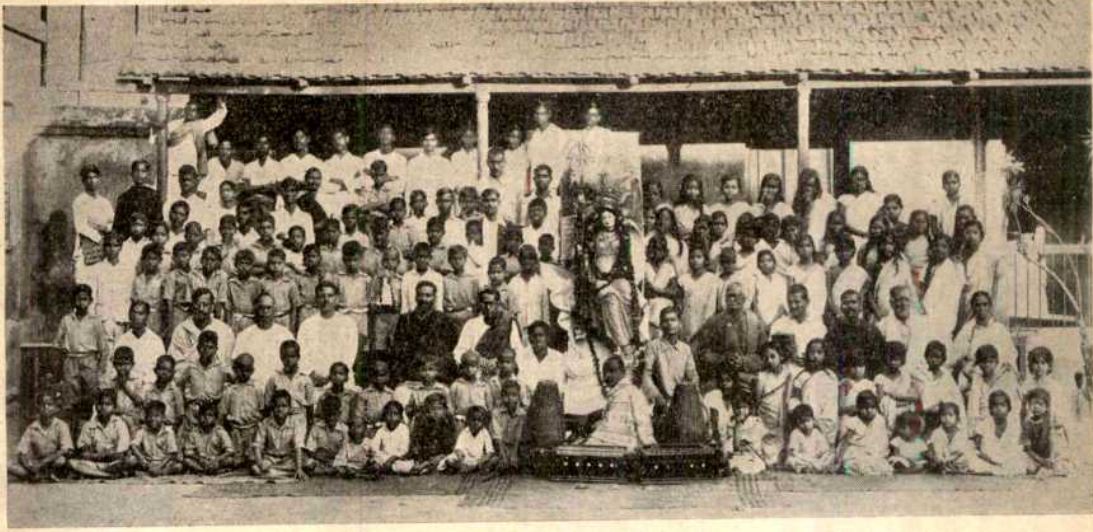
১৯২৪ সালের পর একমাত্র যে মেয়েটির সিন্ধু প্রদেশে বিবাহ হয় নাই সেটিও সম্ভ্রান্ত বংশের কায়স্থ-কন্তা, বাড়ী হুগলী জেলায় বাশবেড়ে গ্রামে। ইহার পিতা জীর মৃত্যুর পর সংসারে আর্থিক অনটন উপস্থিত হইতে দেখিয়া সাড়ে চারি বৎসরের মাতৃহীনা কন্তাকে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করিয়া নিজের পারলৌকিক মুক্তির জন্ত ‘কৃষ্ণলাল স্বামী’ এই নাম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। কোন প্রতিবেশী কন্তাটিকে অনাথ-আশ্রমে পাঠাইয়া দেয়। কন্তাটি বয়স্ক হইবার পর আশ্রম-কর্তৃপক্ষ তাহার বিবাহের চেষ্টা করিলে সে সিন্ধী-বিবাহে অসম্মত জানায়। কিন্তু অনেক অচুসন্ধান করিয়াও তাহার জন্ত কোন বাঙালী পাত্র পাওয়া যায় নাই। অবশেষে বীরভূম জেলার এক কৃষকবারের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হয়। এই পাত্রটি পটার্স বুয়ো নামে একটি চীনা মাটির কারখানায় কাজ করে। বিবাহের পর তাহার স্ত্রী তাহার স্বামীর কাজের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল এবং সেই পল্লীর ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের কার্যও সে গ্রহণ করিয়াছে। এই মেয়েটির জীবনের ইতিহাসে দুটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করি। প্রথম, হিন্দুজাতির পারলৌকিক মুক্তির লোভে ইহলোকের কর্তব্যে অবহেলা অথবা কর্তব্য-বিমূখতা। দ্বিতীয়, কায়স্থ-সমাজের উপবীত গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়-গর্বের মোহ এবং যথার্থ অবনতির প্রতিকার চেষ্টার সম্পর্কে উদাসীনতা।

বিবাহ দিবার পরও আশ্রমের পক্ষ হইতে বিবাহিতা মেয়েদের খোঁজখবর লওয়া হয় এবং কলিকাতার কাছাকাছি স্থানে যে-সমস্ত বিবাহিতা মেয়ে আছে তাহাদিগকে অল্প কোন বিবাহ উপস্থিত হইলে নিমন্ত্রণ করা হয়। পাত্রপক্ষ হইতে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের ও নিমন্ত্রিতা মেয়েদের

ভোজ দেওয়া হয়। আশ্রমের ছেলেমেয়েরা এইরূপ ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষেই মাছ খাইবার সৌভাগ্য লাভ করে। কারণ প্রথমতঃ মাছ দিতে গেলে ব্যয়ে কুলায় না, দ্বিতীয়ত, অনেক জৈনধর্মাবলম্বী মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আশ্রমে চাঁদা দেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থে মাছ কেনায় আপত্তি করেন। তবে বাহির হইতে যদি কোন ভদ্রলোক ছেলেমেয়েদের জন্ত মাছ পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে আশ্রমের ছেলেমেয়েরা মাছ খাইতে পারে।

আশ্রমে সিন্ধী বিবাহ প্রচলিত হইবার পর একটি নিয়ম করা হইয়াছে যে, বিদেশে বিবাহিতা মেয়েরা কিরূপ অবস্থায় আছে, আশ্রমের এক জন কর্মচারী মাঝে মাঝে গিয়া তাহার খোঁজ লইয়া আসিবেন। এই নিয়ম অনুসারে ১৯২৬ সালে সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীরাধিকানাথ চৌধুরী যখন মধ্যপ্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশে যাত্রা করেন তখন আশ্রমের একটি একচক্ষুহীনা বালিকা তাঁহাকে অনুন্নয় করিয়া বলে, “কাকাবাবু, সকলেরই বর জুটল, আমিই কি কেবল প’ড়ে থাকলাম?” রাধিকাবাবু তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে এইবার তাহারও একটি বর খুঁজিয়া আনিবেন। সিন্ধুদেশে গিয়া তিনি একটি অবিবাহিত যুবক পাইলেন, তাহারও এক চোখ কানা। তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া ঐ মেয়েটির সহিত বিবাহ দিলেন।

রাধিকাবাবু প্রথমে ১৯২৬ সালে, পরে আবার ১৯৩৪ সালে সিন্ধু প্রদেশে গিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সিন্ধু প্রদেশের একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, অন্য প্রদেশে পাত্রের বাড়ী গেলে বাড়ীর লোকেরা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বারণ করিয়া দিত যে তাহাদের বধু যে অনাথ-আশ্রমের মেয়ে এবং তিনি যে অনাথ-আশ্রমের কর্মচারী, ইহা যেন প্রকাশ না পায়। প্রকাশ পাইলে তাহাদের মর্যাদা হানি হইবে। কিন্তু তিনি যখন সিন্ধু প্রদেশে পাত্রের বাড়ী গিয়াছেন তখন যেমন আদর-অভ্যর্থনা পাইয়াছেন, এরূপ আর কোন স্থানে পান নাই; পাত্রের বাড়ীর লোকেরা অনাথ-আশ্রমের মেয়ে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে একথা গোপন তো করেই নাই, বরং সগৌরবে সকলের নিকটেই প্রচার করিয়াছে। অধ্যক্ষকে সঙ্গে লইয়া তাহারা পরিচিত ব্যক্তিগণের ও আত্মীয়স্বজনের



কলিকাতা হিন্দু অনাথ-আশ্রমের বালক-বালিকাগণ

বাড়ী বাড়ী লইয়া গিয়া পরিচর করাইয়া দিয়াছে যে ইনিই সেই অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষ, যেখান হইতে বধু আনা হইয়াছে। ইহার পর অধ্যক্ষ অনেক বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ ও জলযোগের আহ্বান ও আদর-আপ্যায়ন পাইয়াছেন। সিন্ধু প্রদেশের কোন পাত্র অনাথ-আশ্রমের দু-একটি বাঙালী বালককে কাজ জুটাইয়া দিয়াছে। অধ্যক্ষ বলেন, সিন্ধু-দেশবাসীর বাঙালী জাতির প্রতি একটি আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাব ও সহানুভূতি আছে যাহা অন্য প্রদেশবাসীর মধ্যে কচিং দেখা যায়।

১৯২৯ সালে ইন্দিরা নামে একটি ২৭ বৎসর বয়স্ক সুন্দরী কায়স্থ-বালিকার সহিত সিন্ধুদেশের এক অবস্থাপন্ন যুবকের বিবাহ হয়। একটি সন্তান হওয়ার পর মেয়েটি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয় ও ১৯৩৪ সালে মারা যায়। ইহার অস্থত্থের সময় আশ্রমের অধ্যক্ষ ইহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি গিয়া দেখিলেন, মেয়েটির স্বামী জীবিতকিৎসা ও সেবার জ্ঞান যথেষ্ট যত্ন ও অর্থব্যয় করিতেছে। মেয়েটি আশ্রমের অধ্যক্ষকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল, এবং অধ্যক্ষের ফিরিবার সময় তাহার কথামত তাহার স্বামী আশ্রমের ছেলেমেয়েদের মাছ খাওয়াইবার জ্ঞান অধ্যক্ষের নিকট দশটি টাকা দিয়াছিল।

আর একটি বিষয় অধ্যক্ষ লক্ষ্য করেন যে, বাঙালী মেয়েরা সিন্ধুদেশে গিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই সেই দেশের ভাষায় পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছে। মাত্র তিন মাস পূর্বে এক জনের বিবাহ হইয়াছে; সিন্ধুদেশে গিয়া অধ্যক্ষ দেখিলেন, এই তিন মাসেই সে চলনসই রকম সিন্ধী ভাষা শিখিয়া ফেলিয়াছে। অনেকে আবার মাতৃভাষা এমন ভাবে ভুলিয়া যায় যে তাহার সহিত বাংলায় কথা বলা কঠিন হয়। অধ্যক্ষ সিন্ধুদেশ পরিদর্শন করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, ঐ দেশে বিবাহ হইয়া বাঙালী মেয়েরা অস্থত্থী হয় নাই, বরং স্বখে-স্বচ্ছন্দেই গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করিতেছে।

আমাদের দেশে হিন্দু সমাজে প্রতি গৃহে কন্যার বিবাহ লইয়া যে কঠিন সমস্যা উপস্থিত, অনাথ-আশ্রমের কর্তৃপক্ষ ৪৫ বৎসর ধরিয়া অনাথা হিন্দু কুমারীগণের বিবাহ-ব্যাপারে সে-সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের চেষ্টা ও পরীক্ষা করিতেছেন। ইহারা সকলেই সমাজের গণ্যমান্ত ব্যক্তি, আশ্রমের মেয়েদের মঙ্গল ভিন্ন এই বিবাহ-সমস্যা সমাধানের পরীক্ষায় তাঁহাদের অন্য কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য নাই। তাঁহারা পরীক্ষার দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন সিন্ধী বিবাহ দেওয়াই সেই সিদ্ধান্ত। হিন্দুসমাজে অনেক মেয়েই আছে

যাহাদের অভিভাবকগণ বিবাহের কোন উপায়ই করিতে পারেন নাই। এমন অবস্থায় সেই সকল মেয়ের যদি সিদ্ধ প্রদেশে উপযুক্ত পাত্র বিবাহ দেওয়া হয় তাহা হইলে বিবাহ-সমস্তা কি কতক নিবারণ হয় না? এ-বিষয়ে সমাজনেতারা কি চিন্তা করিয়া দেখিবেন?

ক্রমশঃ হিন্দু সমাজের যে ক্রিপণ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, ক্রিপণ অতিদ্রুত হিন্দুজাতি ধ্বংসের অভিমুখে চলিয়াছে, তাহা ৬০ বৎসরের আদম-সুমারীর রিপোর্ট হইতে বুঝা যায়। এই রিপোর্টে প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তর বাংলা দেশের হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাণ লিখিত আছে। রিপোর্টটি এইরূপ:

বৎসর	হিন্দু	মুসলমান
১৮৭২	১৭১ লক্ষ	১৬৭ লক্ষ
১৮৮১	১৭২.৫ "	১৭২ "
১৮৯১	১৮০ "	১৮৬ "
১৯০১	২০৪ "	২২০ "

১৯১১	২০৬ লক্ষ	২৪২ লক্ষ
১৯২১	২০৮ "	২৫২ "
১৯৩১	২১৫ "	২৭৫ "

এই তালিকায় দেখা যায়, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা চারি লক্ষ অধিক ছিল। কিন্তু ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু হইতে ৬০ লক্ষ অধিক হইয়াছে। বিবাহ-সমস্তার সহিত হিন্দু সমাজের সংখ্যান্বতর যে বিশেষ যোগ আছে ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং হিন্দু সমাজে আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ প্রবর্তিত করিয়া এই সমস্তা সমাধানের কোন প্রতিকার হয় কি না সে-বিষয়ে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। সেই সঙ্গে সিদ্ধ প্রদেশের সহিত যাহাতে বাংলা দেশের মেলামেশা বৃদ্ধি হয়, যাহাতে বাঙালী মেয়েরা পুরাপুরি সিদ্ধী হইয়া না-যায় বরং সিদ্ধ প্রদেশে বঙ্গদেশীয় সভ্যতার বিস্তার হয়, তাহারও চেষ্টা করা উচিত।

কাশীর মানমন্দির

শ্রীশুকুমাররঞ্জন দাশ, এম-এ, পিএইচ-ডি

হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠ তীর্থ কাশীধামে গঙ্গানদীর তটে মণিকর্ণিকা-ঘাটের অনতিদূরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কাশীর মানমন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। ইহা প্রথমে রাজপুতানার অম্বররাজ মানসিংহ কর্তৃক মণিকর্ণিকা-ঘাটে নির্মিত হয়। যদিও দিল্লীনগরীর মানমন্দিরের জায় ইহা সুন্দর ও সুগঠিত নহে, তথাপি পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে ও গঙ্গাতটে অবস্থিত বলিয়া ইহার বহির্দৃশ্য অনেকাংশে মনোহারী হইয়াছে। রাজা মানসিংহের তিরোধানের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে, তাঁহার সিংহাসনাধিকারী মহাপ্রতাপশালী রাজা জয়সিংহ কর্তৃক এইখানেই গ্রহ-নক্ষত্রাদি দর্শনের জন্য অনেকগুলি যন্ত্র নির্মিত হয়। এই যন্ত্রাদির বিবরণ, ব্যবহার-পদ্ধতি ও বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিশদভাবে বিবৃত হইল।

(১) ভিত্তি-যন্ত্র (a mural quadrant)—মান-মন্দিরে প্রবেশকালে এই ভিত্তি-যন্ত্র প্রথমেই দর্শনপথে পতিত হয়। ইহা ইষ্টক, চূণ ও প্রস্তর দ্বারা নির্মিত একটি প্রাচীর-বিশেষ। মাধ্যাক্ষিকের সমতলেই এই প্রাচীর অবস্থিত। ইহা ৯ ফুট ১ ইঞ্চি দীর্ঘ, ১ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত ও ১১ ফুট উচ্চ। এই প্রাচীরের পূর্ব পার্শ্ব সমান এবং অতি সুন্দর চূর্ণ-রঞ্জিত। পূর্ব পার্শ্বের উপরিস্থিত দুই কোণে বড় বড় দুইটি কীলক প্রোথিত রহিয়াছে। কীলক দুইটি ভূমিতল হইতে ১০ ফুট ৪। ইঞ্চি উচ্চ; আর উহাদের পরস্পরের দূরত্ব ৭ ফুট ৯। ইঞ্চি। যে-বিন্দু দুইটিতে কীলক প্রোথিত, সেই বিন্দু দুইটিকে কেন্দ্র করিয়া এবং দুইটি কীলকের অন্তরকে ত্রিভুজ্য করিয়া দুইটি বৃত্তচতুর্থাংশ (quadrant) অঙ্কিত করা হইয়াছে। এই বৃত্তচতুর্থাংশ দুইটি পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে।

উক্ত কীলক দুইটিকে কেন্দ্র করিয়া তিন-তিনটি সমকেন্দ্রিক ধনু অঙ্কিত করা হইয়াছে; এবং উহার। এমন ভাবে বিভক্ত যে বাহিরের ধনুর এক-একটি বিভাগে ৬ অংশ, তাহার নিম্নের ধনুর (অর্থাৎ দ্বিতীয়টির) এক-একটি বিভাগ এক অংশ, এবং তৃতীয় ধনুর এক-একটি বিভাগ ৬ কলা হইয়াছে।

এই যন্ত্রের দ্বারা মধ্যাহ্নকালে সূর্যের নতাংশ ও উন্নতাংশ অবগত হওয়া যায়। সূর্য মাধ্যাহ্নিকে আসিলে কীলকের ছায়া ধনুর কোন্ বিভাগে আসিয়া পড়ে, তাহা দেখিতে হইবে। কাশীতে থমধোর উত্তরে সূর্য কখনও আসে না; সুতরাং সূর্যের নতাংশ ও উন্নতাংশ দেখিতে হইলে দক্ষিণ দিকের কীলককে কেন্দ্র করিয়া যে বৃত্তপাদ অঙ্কিত হইয়াছে, সেই বৃত্তপাদের বিভাগকেই দেখিতে হয়। এই বিভাগের দ্বারা সূর্যের মাধ্যাহ্নিক নতাংশ, সুতরাং উন্নতাংশও অবগত হওয়া যায়। আরও থমধোর দক্ষিণ দিক দিয়া যে-সকল নক্ষত্র মাধ্যাহ্নিক অতিক্রম করে, সেই সকল নক্ষত্রের মাধ্যাহ্নিক উন্নতাংশও এই বৃত্তপাদের সাহায্যে দৃষ্ট হয়।

আবার, যে বৃত্তপাদের কেন্দ্র উত্তর দিকে অবস্থিত তাহার দ্বারা থমধোর উত্তর দিক দিয়া যে-সকল নক্ষত্র মাধ্যাহ্নিক অতিক্রম করে, তাহাদের উন্নতাংশ অবগত হওয়া যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের পরমাক্রান্তি (greatest declination) ও ইষ্টদেশের অক্ষাংশ (latitude of the place) নিম্নলিখিত উপায়ে নির্ণয় করা যাইতে পারে। সূর্যের মাধ্যাহ্নিকের নতাংশ ক্রমান্বয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় এবং তাহা এক স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়; এখন দেখিতে হইবে, সূর্যের সর্বাধিক অধিক নতাংশ ও সর্বাধিক কম নতাংশ



অম্বরাধিপতি সওয়াই জয়সিংহ

কত হয়। সূর্যের এই অধিকতম ও ন্যূনতম নতাংশদ্বয়ের বিয়োগার্দ্ধই রবিপরমাক্রান্তি (greatest declination of the sun)। অধিকতম নতাংশ হইতে এই রবিপরমাক্রান্তি বিয়োগ করিলে অথবা ন্যূনতম নতাংশে এই রবিপরমাক্রান্তি যোগ করিলে, এই বিয়োগফল বা যোগফলই ইষ্টস্থানের অক্ষাংশ। কাশীতে যখন সূর্য থমধোর উত্তরে একেবারেই আসে না, তখন কেবল এই উপায়ে গণনা করিয়া রবিপরমাক্রান্তি ও স্থানীয় অক্ষাংশ নির্ণীত হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে মহারাজ জয়সিংহ রবিপরমাক্রান্তি ২৩ অংশ ২৮ কলা নির্ণয় করিয়াছিলেন।

এখন ইষ্টস্থানের অক্ষাংশ অবগত হইলে, ইহা হইতে এবং কোনও মধ্যাহ্নে সূর্যের মাধ্যাহ্নিক নতাংশ হইতে অতি সহজেই সূর্যের ক্রান্তি অবগত হওয়া যায়। প্রথমে স্থানীয় অক্ষাংশ ও সূর্যের মাধ্যাহ্নিক নতাংশের অন্তর বাহির করিতে হইবে, এই অন্তরই সেই মধ্যাহ্নে সূর্যের ক্রান্তি। এক্ষণে যদি অক্ষাংশ হইতে নতাংশ অপেক্ষাকৃত অল্প হয় তাহা হইলে ক্রান্তি উত্তর হইবে, এবং যদি অক্ষাংশ অপেক্ষা নতাংশ অধিক হয়, তাহা হইলে ক্রান্তি দক্ষিণ হইবে। এই উপায়ে প্রাপ্ত ক্রান্তি ও রবিপরমাক্রান্তি হইতে সূর্যের ভূজাংশ (longitude) সহজেই বাহির করা যাইতে পারে।

এই যন্ত্রের অতি নিকটে ও পূর্ব দিকে একটি মন্ডল স্থান রহিয়াছে। এক্ষণে কালবশে ইহা অনেকটা রক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। ভিত্তি-যন্ত্রের প্রাচীরের ষতটুকু প্রস্থ, এই স্থানের প্রস্থও ততটুকু; এবং ইহা ১০ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা। এই স্থানের পূর্ব দিকের কোণে দুইটি কীলক প্রোথিত রহিয়াছে এবং কীলকের উপরে এক-একটি ছিদ্র রহিয়াছে। প্রাচীরের পূর্বোক্ত দুইটি কীলকের সম্মুখেই এই কীলক দুইটি প্রোথিত আছে। এই মন্ডল স্থানের কীলক দুইটির মধ্যে দক্ষিণ দিকের কীলকটি উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু উত্তর দিকের কীলকটি পূর্ববৎ রহিয়াছে। কি অভিপ্রায়ে এই কীলক দুইটি প্রোথিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে বুঝিতে পারা যায় না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, কোন পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য ইহাদের প্রয়োজন হইয়াছিল।

এই স্থানের নিকট দুইটি বৃত্ত রচিত আছে। প্রথম বৃত্তটি চূণে তৈয়ারী ও দ্বিতীয় বৃত্তটি প্রস্তর-নির্মিত। প্রথম বৃত্তটির ব্যাস ২ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং দ্বিতীয় বৃত্তটির ব্যাস ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি। ইহা ভিন্ন একটি প্রস্তর-গঠিত সমচতুষ্কোণ নির্মিত আছে। ইহার এক-একটি বাহু ২ ফুট ২ ইঞ্চি দীর্ঘ। এই দুইটি বৃত্ত ও সমচতুষ্কোণের যে কি আবশ্যকতা ছিল, তাহা এক্ষণে ঠিক অনুমান করা যায় না। তবে ইহা হইতে পারে যে, সূর্য্য কর্তৃক শঙ্কুচ্ছায়া ও কোটি-অগ্রা (degrees of azimuth) ইহাদিগের দ্বারা নির্ণীত হইতে পারিত। ইহাদের উপর পূর্বে কতকগুলি চিহ্ন অঙ্কিত ছিল বলিয়া মনে হয়, তাহা এক্ষণে মিলাইয়া গিয়াছে।

(২) যন্ত্র-সম্রাট বা সম্রাট-যন্ত্র। ভিত্তি-যন্ত্রের উত্তর-পূর্ব দিকে একটি বৃহৎ যন্ত্র নির্মিত রহিয়াছে। এই যন্ত্রকে যন্ত্র-সম্রাট বলা হয়। ইহাও চূণ ও ইষ্টক-নির্মিত একটি প্রাচীরবিশেষ। ইহা ঠিক মাধ্যাহ্নিকের সমতলে স্থাপিত। ইহা ৩৬ ফুট দীর্ঘ ও ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত। ইহার উপরিভাগ প্রস্তরমণ্ডিত, ক্রমশঃ-অবনত ভাবে গঠিত এবং উত্তর-ঋতুরা নির্দেশ করিয়া অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ দিক ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চ এবং উত্তর দিক ২২ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চ। এই প্রাচীরকে শঙ্কু (gnomon) বলা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যভাগে উপরে উঠিবার জন্য সোপান-শ্রেণী নির্মিত রহিয়াছে। শঙ্কুর দুই পার্শ্বে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে প্রস্তরনির্মিত দুইটি ধনু অঙ্কিত রহিয়াছে; এই ধনু বৃত্তচতুর্থ অপেক্ষা কিছু অধিক। ইহার দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি, প্রস্থ ৭ ইঞ্চি। এই দুইটি ধনুর প্রত্যেকটির দুই পার্শ্বে ছয়-ছয় অংশ করিয়া ঘটিকা চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই ছয় অংশ ঘটিকাকে আবার ছয় সমান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই শেখোক্ত ষষ্ঠ অংশ দুই ইঞ্চি প্রস্থ। প্রত্যেক ধনুর দুই বৃত্তাকার পার্শ্বের দুইটি কেন্দ্র শঙ্কুর উপরের পার্শ্বে (কিনারায়) অবস্থিত। এই কেন্দ্রগুলির প্রত্যেকটিতে এক-একটি লোহার ছোট কড়া সংলগ্ন আছে। প্রত্যেক ধনুর নিম্নের পার্শ্বের ব্যাসার্দ্ধ ২ ফুট ৮ ইঞ্চি। এই যন্ত্রের ধনুর যে অংশে শঙ্কুচ্ছায়া পতিত হয়, উহার দ্বারা নতখটি অর্থাৎ মধ্যাহ্ন হইতে কত সময় অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাই অবগত হওয়া যায়। মধ্যাহ্নের পূর্বে যদি শঙ্কুচ্ছায়া দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এই ঘটকাসময় উত্তীর্ণ হইলে পর মধ্যাহ্ন হইবে; আবার যদি মধ্যাহ্নের পরে শঙ্কুচ্ছায়া দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ সময়ের পূর্বে মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শঙ্কুচ্ছায়া উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রত্যেক ধনুর দুই দিকে প্রস্তর-নির্মিত সোপান নির্মিত হইয়াছে। সূর্যের শঙ্কুচ্ছায়া যেমন স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়, চন্দ্রের বা গ্রহাদির শঙ্কুচ্ছায়া তেমন স্পষ্ট দৃষ্ট হয় না, এবং ক্ষুদ্র গ্রহাদির ও নক্ষত্রের ছায়া আদৌ প্রতিবিম্বিত হয় না। স্বতরাং চন্দ্র, গ্রহাদি ও নক্ষত্রের নতখটি অর্থাৎ মধ্যাহ্ন হইতে অতিবাহিত সময়

পর্যবেক্ষণ করিবার বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই যন্ত্রের উপরে একটি লৌহ-তার বা একটি সরল নল স্থাপিত করিতে হইবে, ইহার একটি প্রান্ত ধনুর পার্শ্বে থাকিবে এবং অপর প্রান্ত শঙ্কুর উপরে থাকিবে। পরে ধনুর পার্শ্বে যে প্রান্তটি রহিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া দ্রষ্টব্য গ্রহ বা তারকা লক্ষ্য করিতে হইবে। এমন ভাবে লৌহ-নলটি স্থাপন করিতে হইবে যে, ইহার ঠিক মধ্য দিয়া গ্রহ বা তারকাটি দৃষ্ট হইবে। এই প্রকারে ধনুর যে ধারটি অগ্র ধারটির অপেক্ষা নিম্নে অবস্থিত, তাহার যে চিহ্নটি নলের দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে, তাহাই গ্রহ বা নক্ষত্রের মাধ্যাহিক হইতে নতঘটি হইবে। শঙ্কুর পার্শ্বের যে-অংশ ধনুর কেন্দ্র আর নলের প্রান্তের অন্তরে স্থিত, সেই অংশই গ্রহ বা নক্ষত্রের ক্রান্তির স্পর্শজ্যা (tangent of the declination)। সূত্রাং নতঘটি ও ক্রান্তি এই যন্ত্রের দ্বারা অবগত হওয়া যায়। কোন নক্ষত্রের ভূজাংশ (longitude) এই যন্ত্রের সাহায্যে নিম্নলিখিত উপায়ে জ্ঞাত হওয়া অসম্ভবসাধ্য। সূর্য্য অন্তঃগমন করিবার সময়ে মাধ্যাহিক হইতে সূর্য্যের নতাংশ বাহির করিতে হইবে। এই সময় হইতে যে-পর্য্যন্ত না নক্ষত্রটি (যাহার ভূজাংশ বাহির করিতে হইবে) আকাশে স্পষ্ট উদ্ভিত দৃষ্টিগোচর হয়, সেই পর্য্যন্ত যে সময় তাহা স্থির করিতে হইবে। এই সময় মাধ্যাহিক হইতে সূর্য্যের নতঘটিতে যোগ দিতে হইবে। এইরূপে প্রাপ্ত সময়ই সেই সময়ের মাধ্যাহিক হইতে সূর্য্যের নতাংশ। পরে এই সময়ে সূর্য্যের বিষুবাংশ গণনা করিতে হইবে এবং প্রাপ্ত ফলের সহিত মাধ্যাহিক হইতে সূর্য্যের নতাংশ যোগ করিতে হইবে। তাহা হইলে মধ্যালয়ের (culminating point of the ecliptic) বিষুবাংশ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এক্ষণে যন্ত্রের সাহায্যে নক্ষত্রের নতঘটিকা বাহির করিয়া মধ্যালয়ের বিষুবাংশে যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে নক্ষত্রের জ্ঞাতব্য ভূজাংশ পাওয়া যাইবে। পূর্ব-গোলে নক্ষত্র থাকিলে বিষুবাংশ যোগ করিতে হইবে, আর পশ্চিম-গোলে নক্ষত্র থাকিলে বিষুবাংশ বিয়োগ করিতে হইবে।

সম্রাট-যন্ত্রের শঙ্কুর পূর্ব দিকে যুগ্ম ভিত্তি-যন্ত্র (double mural quadrant) নির্মিত রহিয়াছে। ইহার নির্মাণ

প্রণালী প্রথমোক্ত ভিত্তি-যন্ত্রের ন্যায়। প্রভেদের মধ্যে এই যে, এই যন্ত্রে কীলক দুইটির অন্তর ১০ ফুট ৪½ ইঞ্চি।

(৩) বিষুবচক্র-যন্ত্র—সম্রাট-যন্ত্রের পূর্ব দিকে একটি বিষুবচক্র (equinoctial circle) নামক যন্ত্র অবস্থিত। ইহা প্রস্তর-নির্মিত এবং বিষুববৃত্তের সমতলে রক্ষিত। এই যন্ত্রের উত্তর পার্শ্বে ৪ ফুট ৭½ ইঞ্চি ব্যাসের একটি বৃত্ত অঙ্কিত আছে। এই বৃত্তে একটি ব্যাস ক্ষিতিজের (horizon) সমানান্তর, আর একটি ইহার উপর লম্বভাবে অবস্থিত। সূত্রাং ইহাদের দ্বারা এই বৃত্তটি সমান চারি অংশে বিভক্ত। এই চারিটির প্রত্যেকটি আবার সমান ২০ অংশে বিভক্ত। এই বৃত্তের কেন্দ্রে একটি লৌহকীলক প্রোথিত রহিয়াছে। কীলকটি উত্তর-ক্রুর দিকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত। যখন উত্তর-গোলে সূর্য্য বা নক্ষত্র থাকে, তখন কীলকের যে ছায়া পড়ে, তাহা হইতে সূর্য্যের বা কোন নক্ষত্রের নতাংশ অবগত হওয়া যায়। দক্ষিণ-গোলে যখন সূর্য্য বা কোন নক্ষত্র থাকে, তখনকার নতাংশ নির্ণয় করিবার জন্য ২ ফুট ৩½ ইঞ্চি ব্যাসের একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত দক্ষিণ পার্শ্বে অঙ্কিত রহিয়াছে। পূর্বোক্ত বৃত্তের ন্যায় এই বৃত্তকেও দুই পরস্পর লম্ব ব্যাসের দ্বারা চারি সমান ভাগে এবং বৃত্তপাদকে ২০ সমান খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(৪) ছোট যন্ত্র-সম্রাট—যন্ত্র-সম্রাটের ন্যায় আর একটি ছোট যন্ত্র-সম্রাট বিষুব-চক্রের পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই যন্ত্রের শঙ্কু ১০ ফুট ১ ইঞ্চি দীর্ঘ; ইহার প্রশস্ততা ১ ফুট ৩ ইঞ্চি। দক্ষিণ দিকের উচ্চতা ৩ ফুট ৬½ ইঞ্চি, আর উপর দিকের উচ্চতা ৮ ফুট ৩ ইঞ্চি। প্রত্যেকটি ধনুর প্রস্থ ১ ফুট ২½ ইঞ্চি, আর স্থূলতা ৩½ ইঞ্চি; এবং ধনুর নিম্নদিকস্থ পার্শ্বের ব্যাস ৩ ফুট ৫½ ইঞ্চি।

(৫) চক্র-যন্ত্র—সম্রাট-যন্ত্রের নিকটে আর একটি যন্ত্র দুইটি প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত। ইহাকে চক্র-যন্ত্র বলা হইয়া থাকে। ইহা একটি গতিশীল লৌহচক্র, ইহার প্রস্থ এক ইঞ্চি এবং ইহার সমুখ ভাগ ১½ ইঞ্চি গভীর পিতলের পাত দিয়া আবৃত। ইহা একটি অক্ষদণ্ডের চতুর্দিকে পরিক্রম করে; এই অক্ষদণ্ড দুইটি প্রাচীরে সংলগ্ন এবং উত্তরদিগভিমুখে লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত। এই

চক্রের ধার বা নেমি (rim of the circle) ২ ফুট প্রশস্ত। ইহার পরিধিকে সমান ৩৬০ অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে, সুতরাং এক-একটি ছোট বিভাগ ১° ইঞ্চি প্রশস্ত। এই চক্রের কেন্দ্রে একটি কীলক প্রোথিত রহিয়াছে এবং এই কীলকে একটি পিত্তল-নির্মিত কাঁটা (index) সংলগ্ন রহিয়াছে। এই কাঁটা ২ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং কেন্দ্র হইতে অঙ্কিত একটি রেখা এই কাঁটার মধ্যে চিহ্নিত রহিয়াছে।

এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের ক্রান্তি নির্ণয় করিতে হইলে এই চক্র আর কাঁটাটিকে এমন ভাবে স্থাপিত করিতে হইবে যে, ঐ গ্রহ বা নক্ষত্র কাঁটার ঠিক মধ্য-রেখাতে আসিয়া পড়ে। তখন অক্ষের লম্বভাবে যে ব্যাসটি অবস্থিত, তাহা হইতে কাঁটাটি যত অংশ দূরে রহিয়াছে, তত অংশই গ্রহ বা নক্ষত্রের ক্রান্তি। বোধ হয়, এই যন্ত্রে অত্যন্ত বৃত্তও অঙ্কিত ছিল, যেমন অয়নান্ত বৃত্ত, বিষুব বৃত্ত প্রভৃতি। ইহাদের দ্বারা মাধ্যমিক হইতে কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণীত হইতে পারিত। এক্ষণে কালবশে সেই বৃত্তগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং কাঁটাটিও ঝিকিয়া গিয়াছে, সুতরাং এখন আর এই যন্ত্রের দ্বারা গ্রহ বা নক্ষত্রের ক্রান্তি নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

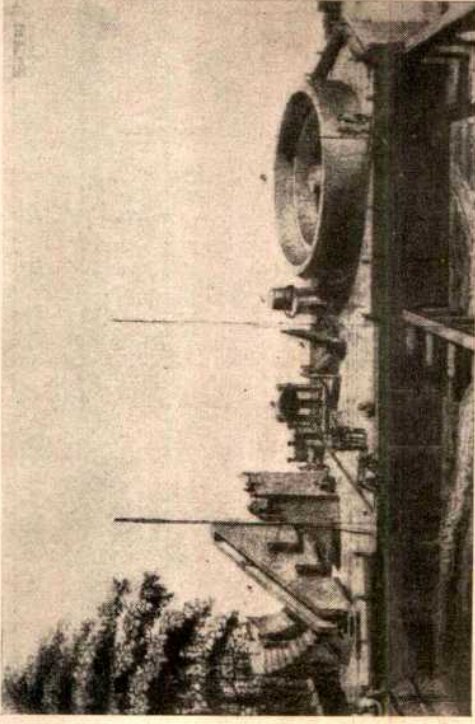
(৬) দিগংশ-যন্ত্র (Alt-Azimuth Instrument) —চক্র-যন্ত্রের পূর্ব দিকে একটি বৃহৎ দিগংশ-যন্ত্র স্থাপিত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে বেলনাকার (cylindrical) একটি স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। এই স্তম্ভটি ৪ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চ এবং ইহার ব্যাস ৩ ফুট ৭ ইঞ্চি। এই স্তম্ভের মধ্যে একটি লৌহনির্মিত কীলক (iron spike) দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ রহিয়াছে। এই কীলকের উপরিভাগে একটি ছিদ্র করা হইয়াছে। এই স্তম্ভের চতুর্দিকে এবং ইহা হইতে ৭ ফুট ৩ ইঞ্চি দূরে একটি বৃত্তাকার প্রাচীর নির্মিত হইয়াছে। স্তম্ভ যত উচ্চ, প্রাচীরও তত উচ্চ। ইহা ১ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত। এই প্রাচীর হইতে ৩ ফুট ২ ইঞ্চি দূরে আর একটি বৃহৎ বৃত্তাকার প্রাচীর নির্মিত রহিয়াছে। ইহা প্রথম প্রাচীরের বিপরীত উচ্চ; ইহার প্রস্থ ২ ফুট ৬ ইঞ্চি। এই দুইটি প্রাচীরের উপরিভাগে কম্পাসের বিন্দুস্থ অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ বিন্দু চিহ্নিত আছে এবং বাহিরের প্রাচীরের উপরে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এই চারিটি বিন্দুতে

চারিটি কীলক প্রোথিত রহিয়াছে। এই যন্ত্রের দ্বারা কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের কোটি-অগ্রা (degrees of azimuth) বাহির করিতে পারা যায়। নিম্নলিখিত উপায়ে কোটি-অগ্রা নির্ণয় করিতে হয়। প্রথমে বাহিরের প্রাচীরের উপরে যে চারিটি কীলক প্রোথিত রহিয়াছে, তাহাদের পূর্ব-পশ্চিমের দুইটিতে একটি সূত্র এবং উত্তর-দক্ষিণের দুইটিতে আর একটি সূত্র বাধিয়া দিতে হইবে। স্তম্ভের কেন্দ্রের উপরে এই দুইটি সূত্রে কে ছেদ করিবে এমন একটি সূত্র লইতে হইবে; এই শেবোক্ত সূত্রের এক দিক স্তম্ভের কেন্দ্রে শক্ত করিয়া বাধিতে হইবে এবং আর একটি দিক বাহিরের প্রাচীরের উপরে টানিয়া আনিতে হইবে। পরে মধ্যবর্তী প্রাচীরের পরিধির উপর চক্ষু স্থাপন করিয়া যে গ্রহ বা নক্ষত্রের কোটি-অগ্রা নির্ণয় করিতে হইবে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এখন চক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভের কেন্দ্র হইতে বাহিরের প্রাচীরের উপরে স্থাপিত সূত্রটি এমন করিয়া সরাইতে হইবে যে, গ্রহ বা নক্ষত্র এবং পূর্বোক্ত সূত্র দুইটির ছেদবিন্দু এই শেবোক্ত সূত্রটির (যাহা সরান হইতেছে) উপর আসিয়া পড়ে। এই অবস্থায় যে সূত্রটি সরান হইতেছে উহা উত্তর কিংবা দক্ষিণ বিন্দু হইতে যত অংশ অন্তর হইবে, তত অংশই গ্রহ বা নক্ষত্রের কোটি-অগ্রা হইবে।

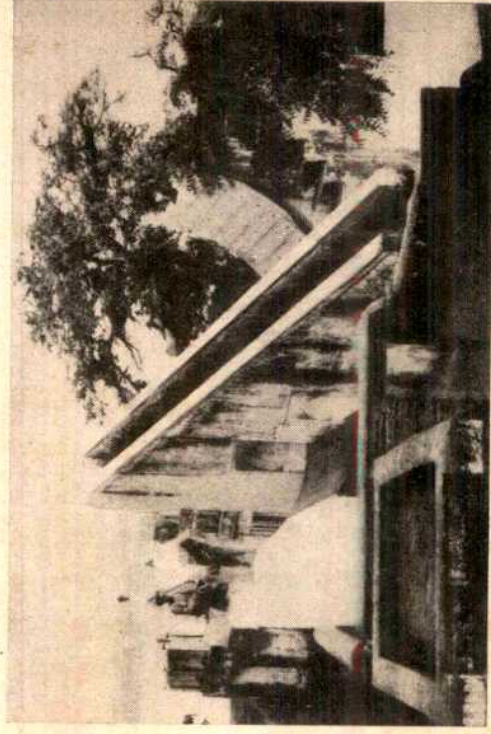
(৭) বৃহৎ বিষুবচক্র-যন্ত্র—দিগংশ-যন্ত্রের দক্ষিণ দিকে আর একটি বিষুবচক্র-যন্ত্র নির্মিত রহিয়াছে। ইহা পূর্বোক্ত বিষুবচক্র-যন্ত্রের তায় গঠিত হইলেও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ইহার ব্যাস ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। কিন্তু ইহা এক্ষণে অক্ষণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কেন্দ্রের কীলকটি লোপ পাইয়াছে, ইহার উপরের চিহ্নাদি অন্তহিত হইয়াছে, যন্ত্রের আর আর বিভাগগুলি মিলাইয়া গিয়াছে, যন্ত্রাদির অংশ স্থানে স্থানে ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং কোথাও কোথাও বা ইহা ঝিকিয়া আসিয়াছে।

(৮) নাভীবলয় বা উত্তর-দক্ষিণ গোলযন্ত্র—বৃহৎ বিষুবচক্র-যন্ত্রের পার্শ্বে এই যন্ত্র স্থাপিত রহিয়াছে। ইহা একটি বেলনাকার গোলযন্ত্র। ইহার অক্ষদণ্ড উত্তর-দক্ষিণ দিক নির্দেশ করিয়া অবস্থিত এবং ইহার উত্তর ও দক্ষিণ মূখ নিরক্ষতলের সমানান্তরালে রহিয়াছে। প্রত্যেক মূখের

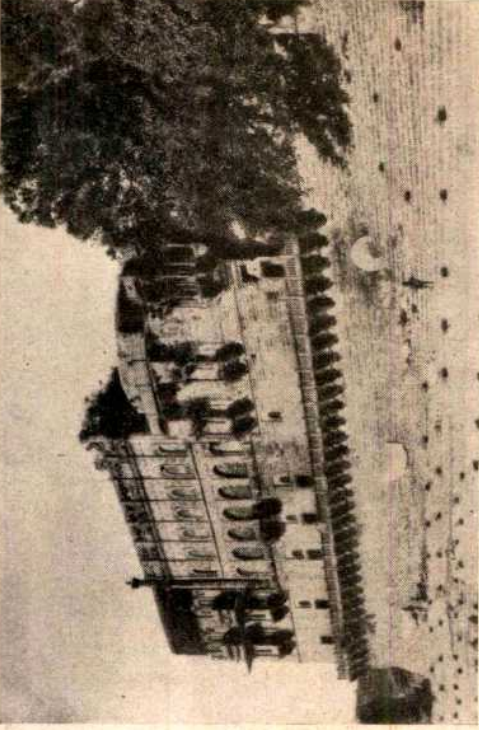
কাশীর মানমন্দির



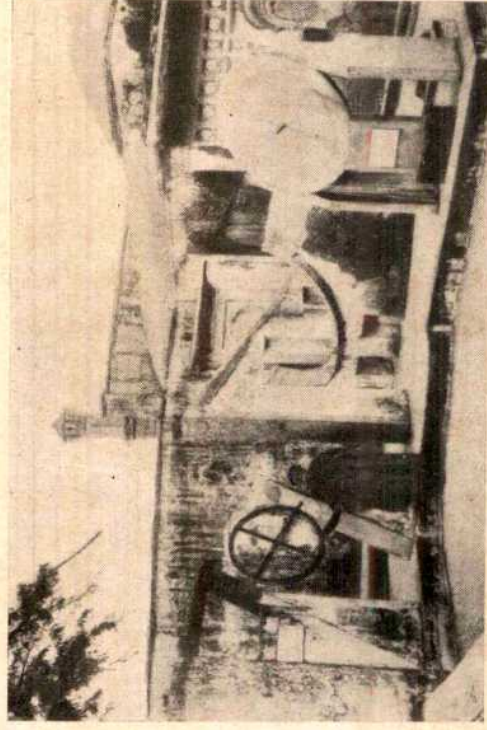
কাশীর মানমন্দিরের যজ্ঞাদির চিত্র (১৭৭৩)



মহাট্ট-যজ্ঞ, কাশী



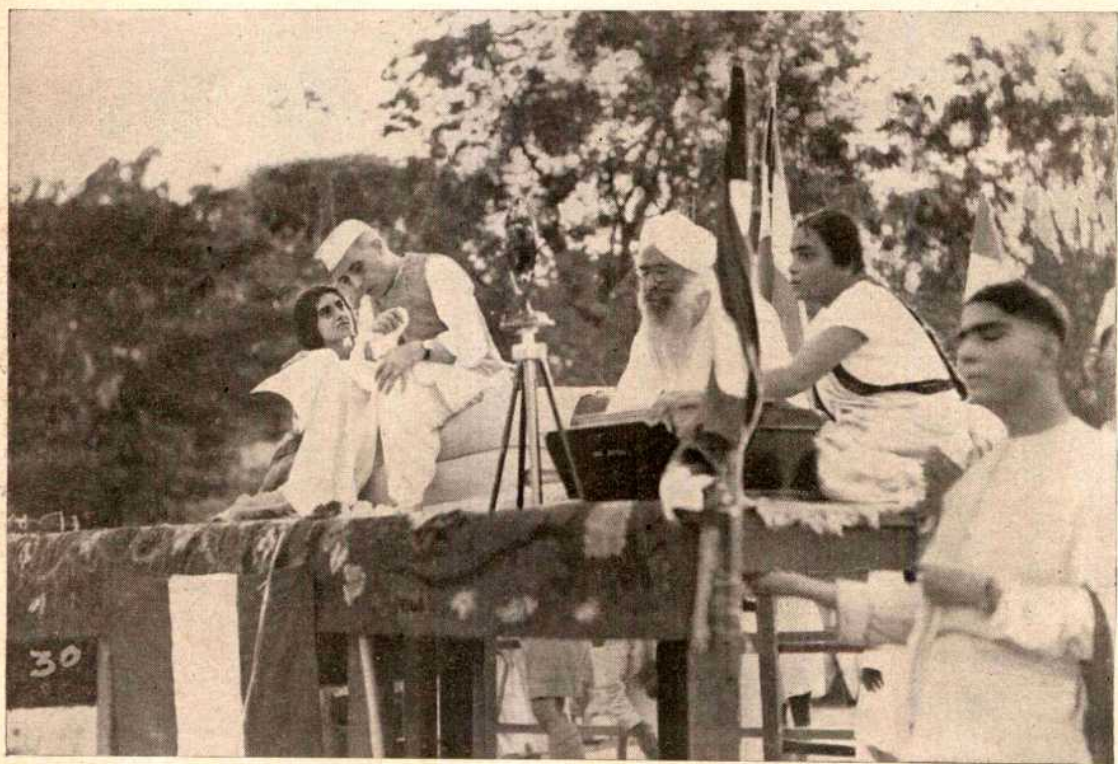
কাশীর মানমন্দির



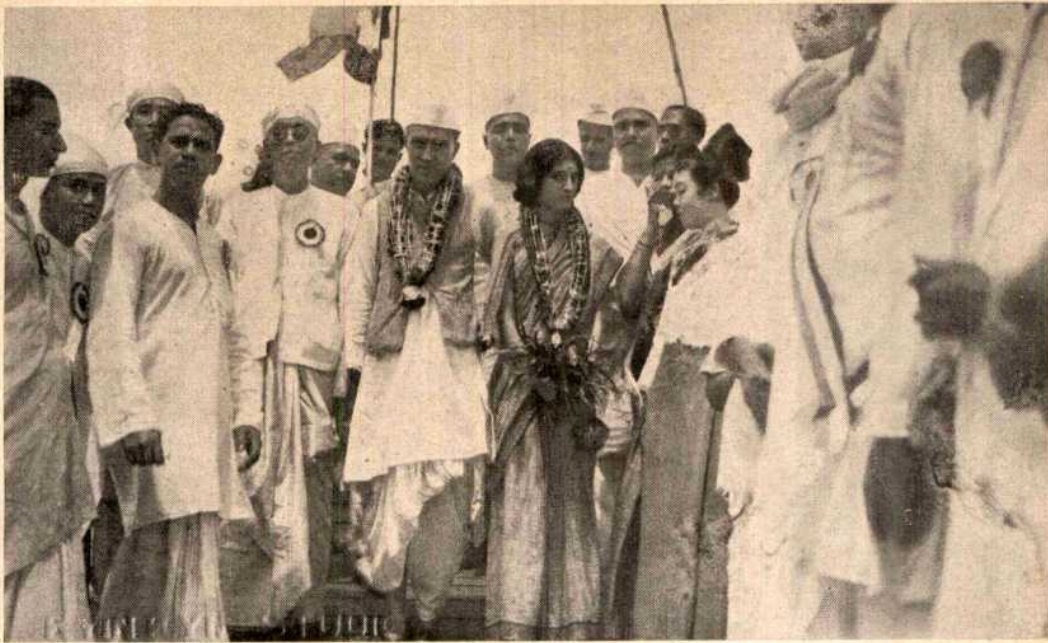
কাশীর মানমন্দিরের যজ্ঞাদির সাধারণ দৃশ্য



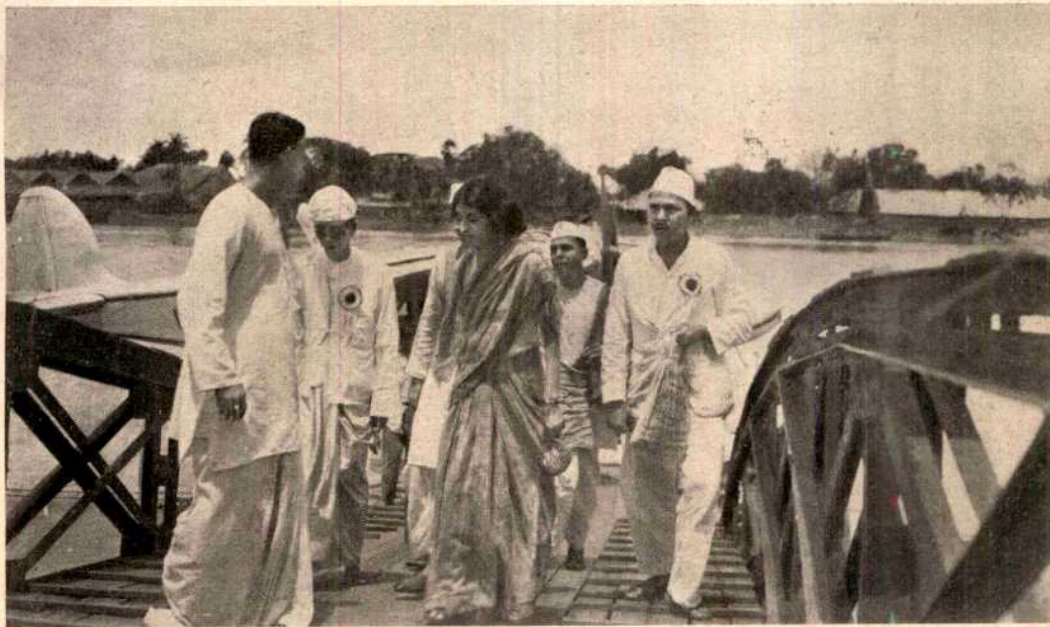
রেঙ্গুনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর অভ্যর্থনা



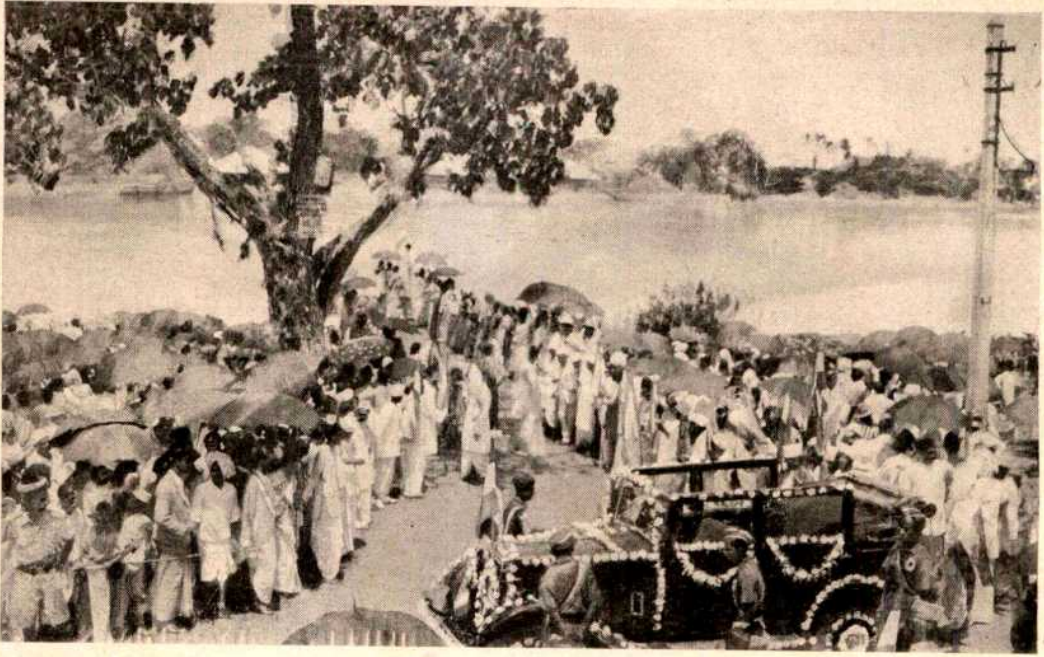
রেঙ্গুনে জনসভায় জবাহরলাল ও ইন্দিরা নেহরু



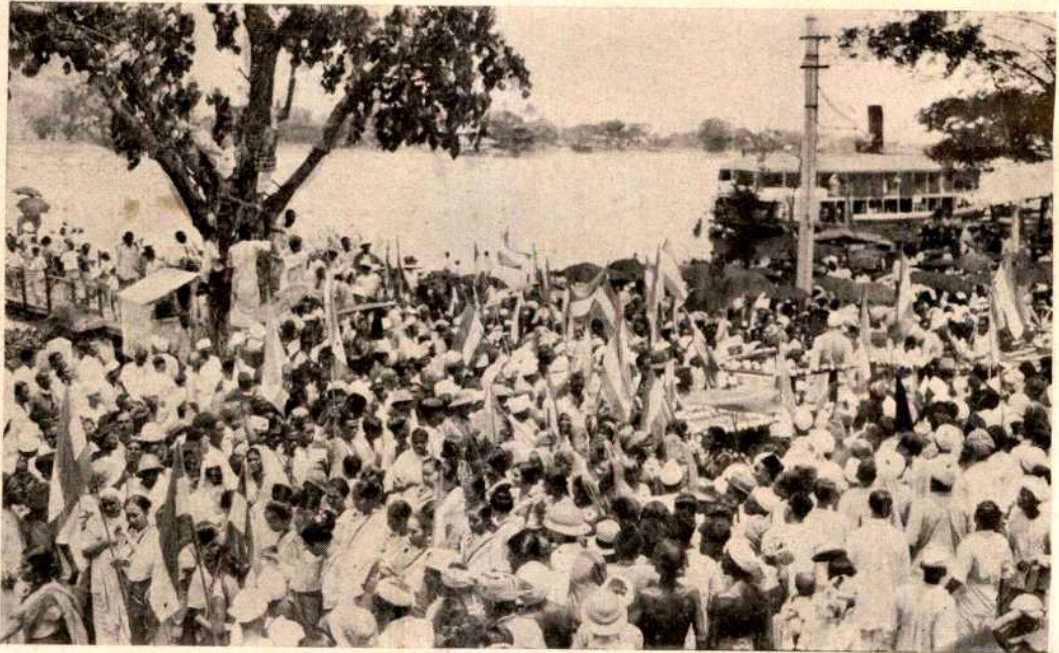
বেসনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু সংবর্ধনা।
অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যবর্গ-পরিবেষ্টিত জবাহরলাল ও ইন্দিরা নেহরু



বেসনে জবাহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা নেহরুর অভ্যর্থনা



বেসিনে জবাহরলাল নেহরুর আগমন-প্রতীক্ষায় স্বৈচ্ছাসেবকবর্গ



বেসিনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর অভ্যর্থনায় সর্বপ্রদেশের স্বৈচ্ছাসেবিকাবর্গ

কেন্দ্রে এবং ইহার লম্বভাবে একটি লৌহশলাকা সংবদ্ধ আছে। ইহার চতুর্দিকে একটি করিয়া বৃত্ত অঙ্কিত রহিয়াছে। বাহিরের বৃত্তটিতে ঘণ্টা প্রভৃতি এবং ভিতরের বৃত্তটিতে ঘটি, পল প্রভৃতি চিহ্ন ক্ষোদিত। ইহা ব্যতীত যন্ত্রটিতে অন্ননাস্ত্র বিন্দুদ্বয় চিহ্নিত রহিয়াছে; কারণ, স্বর্ঘ্য যখন নিরক্ষতলেব উত্তরে থাকে, তখনই কেবল পর্যবেক্ষণের জন্য উক্তব মুখটি ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটিতে এই লিপি ক্ষোদিত আছে—নাড়ীঘলয় বা উত্তর-দক্ষিণ গোল। এই যন্ত্রের দ্বারা জ্যোতিষসমূহ উত্তর গোলার্ধে কি দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত, তাহা অবগত হওয়া যায়। ইহাতে সময়ও নির্ণীত হইতে পারে।

কাশীর মানমন্দিরের ইহাই সংক্ষিপ্ত বিবরণী। এই মানমন্দিরে স্থাপিত যন্ত্রসমূহেব গঠনপ্রণালী ও তাহাদের ব্যবহারবিধি অল্পবিস্তর বিবৃত হইল। এই যন্ত্রগুলি স্বর্ঘ্য-সিদ্ধান্তেব মূলসূত্র অনুসারে নির্মিত হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহাবাজ মানসিংহ এই মানমন্দিরটির নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন। ইহাব গণ্যশ বৎসর পরে মহারাজ জয়সিংহ পূর্বপুরুষেব এই বিশিষ্ট কীর্তিব সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধন করিয়া অনেক নূতন যন্ত্রেব সমাবেশের দ্বারা উহার বিশেষ উন্নতি কবিয়া তুলেন। যদিও ইহার বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের পক্ষে তেমন অল্পুল নহে, তথাপি ইহা জয়সিংহেব রএক অক্ষয় কীর্তি।

স্বস্তির সীমায়

শ্রীব্রহ্মসময় দাশ

জাগরণ মিশে ষেখা স্বস্তিব সীমায়,
সেইখানে চেতনার সর্বপ্রাস্ততীবে
তোমারে কি দেখিলাম দীপ্ত মহিমায় ?—
কনক-কিরণ ফুটে ওই তম্বু ঘিরে !

নিজরূপে অঙ্ককার ধীরে আসে ছেয়ে,
মিলায় সোনার আলো সন্ধ্যা-পারাবারে ;
এ কি ভ্রান্তি ? স্বপ্ন এ কি ?—কি দেখিছ চেয়ে,—
স্বদ্বরের বন্ধু এলে হৃদয়ের দ্বারে !

তন্দ্রাতুর আঁখি দুটি, লম্ব কলেবর,
শিথিল চৈতন্য 'পরে ঘুম আসে নামি ;
বহি আরতির ধ্বনি সমীর মন্থব
জাগরণ-কোলাহল ধীরে গেল থামি।

ভাল ক'রে দেখি নাই, বলি নাই কথা ;
স্বস্তি এসে টানি দিল শুদ্ধ নীরবতা !

শহুরে মেয়ে

শ্রীসীত দেবী

মালতী মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের মেয়ে, ছুই বোনের পর তাহার জন্ম। নিতান্ত মা-ষড়ীর রূপায় তাহার পরে মায়ের কোলে থোকা নিতুব আবির্ভাব ঘটয়াছিল, না হইলে শুধু কস্তা গর্ভে ধাবণ করার লঙ্ঘন মালতীর মাকে চিরকালই মাটির সঙ্গে মিশিয়া থাকিতে হইত। শান্ততী, ননদ, বড় জা, এমন কি নিজের বাপের বাড়ীর লোকের কাছেও তাঁহার লঙ্ঘাব সীমা ছিল না। উভয় বংশের কোন নারীরই নাকি এতবড় ছুঁড়াগ্য কোনদিন ঘটে নাই। নিত্যানন্দ আসিয়া যেন মাকে আকাশের চাঁদ হাতে তুলিয়া দিল, অবাস্তিতা মেয়ের দলের অগৌরব আরও একটু বাড়িয়া গেল বই কমিল না। কাজেই শৈশব ও বাল্য জীবনে মালতীর ঘে আদরের বান ডাকিয়া যায় নাই, তাহা না বলিয়া দিলেও চলে।

কিন্তু হাজার হউক কলিকাতায় তাহার থাকিত ত? আশেপাশে পাড়াপড়শী ঢের, সবাই বাঙালী, তাহাদের কাছে ইাড়ির কোনও খবর লুকাইবার উপায় নাই। সুতরাং নিতাইকে এক সের ছুঁ দিলে, মেয়ে-তিনটাকেও তাহাদের সঙ্গে মুড়ির সঙ্গে মাখিয়া এক-আধ হাতা ছুঁ দিতে হয়। ঠাকুরমা এ-খরচটুকু বাঁচাইতে চান, খেড়ে মিকী মেয়ে সব, ছুঁ-পাটি করিয়া দাত, তাহাদের অত ছুঁ খাওয়ার ঘটনা কেন? সব জিনিষই ত তাহারা খাইতে পারে? উহাদের বয়সে তাঁহারা ছুঁের বাটি ইচ্ছা করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, লোহার কড়াই স্কন্ধ চিবাইয়া খাইয়াছেন, আর এ-মেয়েদের রকম দেখ না, খুঁকীরা আজন্ম খুঁকীই থাকিবেন।

মাও তেমনি। মেয়েগুলির নোলা যা বাড়িয়াছে তাহা বলিবার নয়। সারাক্ষণ খাইতে দিলে অমনি অভ্যাস হইবেই ত? খুঁরবাড়ী গিয়া যখন খালি কাঁটা আর উনানের ছাই খাইতে পাইবে, তখন মায়ের সোহাগ থাকিবে কোথায়? মেয়েছেলেকে সর্বদা পেট কাঁদাইয়া খাইতে দিতে হয়, না হইলে পরজীবনে অশেষ দুঃখ।

এহেন মহীয়সী ঠাকুরমা থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞ বাপ-মায়ের বোকাহিতে মেয়ে-তিনটা দুখ, ভাত, তরকারি, মাছ সবই খাইত।

মালতীর বাপের রোজগাবেই সংসারটা চলে, কাজেই তাঁহাদের মতামত একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে এই ছোট একতলা বাড়ীখানি, কোনওমতে বাখা গুঁজিয়া থাকা চলে। বাহাই হউক, নিজের ঘর, মাসে মাসে ভাড়া গুনিতে হয় না, কল, চৌবাচ্চা লইয়া পাশের ঘরের ভাড়াটের সঙ্গে সারা দিন-রাত ঝগড়াও করিতে হয় না।

পাড়ায় কর্পোবেশনের অবৈতনিক স্কুল আছে, বছর ছয় বয়স হইতে-না-হইতে মালতীও দিদিদের সঙ্গে সেখানে পড়িতে চলিল। আজকালকার দিনে উপাত্তের ত অন্ত নাই। খুঁরবাড়ী গিয়া ঘে-বউকে চক্কিণ ঘটা খালি বাসন মাজিতে ও ভাত সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহাকেও দেখিতে আসিয়া বরপক্ষ প্রথম জিজ্ঞাসা করিবেন, “মেয়ে পড়েছে কতদূর? পানবাজনা জানে কি না?” কাজেই মেয়েকে স্কুলে দেওয়া ছাড়া উপায় কি?

বাড়ীতে থাকিলে না-হয় তিনটাকে গামছা বা মা-খুঁড়ীর ছেঁড়া শাড়ীর টুকরা পরাইয়া রাখা চলে, কিন্তু স্কুলে ত ঘণাপম্বুক্ত বেশভূষা না হইলে পাঠান চলে না? ফ্রক হোক বা শাড়ী জামা হোক, কিনিয়া দিতেই হইবে। অবশ্য, সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে হয় যে, এ দিকে মালতীর মা-বাপ বিন্দুমাত্র বদান্ধতা দেখাইতেন না, যথাসম্ভব খেলো সস্তা জিনিষই দিতেন। একই শাড়ী পরিয়া সরষু আর বিমলা দিনের পর দিন স্কুলে যাইত। শাড়ীর আঁচলে মুখ-হাত মুছিয়া সেটাকে আশ্চর্য চিত্রবিচিত্র করিয়া তুলিত, ভ্রামর পিঠে চুলের তেল আর ময়লা লাগিয়া বেশ পুরু একটি কাল স্তর জমা হইয়া উঠিত, কিন্তু সেদিকে কাহারও

লক্ষ্য ছিল না। মালতীর ঘরে-তৈরি ছিটের ক্রকের অবস্থাও তাহার চেয়ে কিছু উৎকৃষ্ট ছিল না, তবে সেটা মা মধ্যে মধ্যে আনের সময় কাচিয়া দিতেন এই বা রক্ষা।

কিন্তু স্কুলে কত রকম মেয়ে আসে, কত রকম তাহাদের বেশভূষা। তাহারা মাথায় লাল, নীল, হলুদে, কত রকম ফিতা বাঁধে, হাতে গোছা গোছা রেশমী কাঁচের চুড়ি পরে, খুঁটা গণিমুক্তার ব্রোচ, ইয়ারিং ও আঁখিতে গা সাজাইয়া আসে। শতায় আজকাল রং-বেরঙের কত রকম শাড়ী জামা পাঞ্জা যায়, তাহাও যথাসাধ্য জুটাইয়া পরে। সরযু, বিমলা, মালতীই বা দেখিয়া না শিথিলে কেন? তাহাদেরও ত মাহুয়ের প্রাণ?

সন্ধ্যাবেলা বাড়ী কিরিয়াই বিমলা স্বর তুলিল, “কাল আমি ওই শাড়ী প’রে কিছুতে যাব না। সবাই নাক সিঁটকায়, ঘেমা করে। কেন আমরা কি ভদ্র লোক না? এক মাস এক কাপড় প’রে যাব কেন?”

মা এখার-ওখার চাহিয়া বলিলেন, “চুপ কর, এখনি তোরা ঠাকুরমা শুনলে বকবক ক’রে মরবে। কাল ভোরে আমি তোরা শাড়ী সোভা দিয়ে কেচে দেব।”

বিমলা দুই টাট্টু বোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, “কেচে দিলেও আমি পরব না। আমার একটা লাল কাবেরী শাড়ী চাই।”

মা বোচারী মেয়েদের হুখ বুঝিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতাই বা কতখানি? বলেন, “সে পূজোর সময় দেব এখন। যখন তখন কি আর আমরা অত শাড়ী কিনতে পারি?”

বিমলা কিছু বলিবার আগেই সবসু নাকিস্বরে গর্জন করিয়া ওঠে, “রোঁজ রোঁজ একটা তেলচিটে কাপড়ের পাড় দিয়ে চুল বাঁধব কেন? আমার লাল রিবন্ চাই।”

মা এইবারে চটিয়া বলিলেন, “দেব কোথা থেকে? আমার মুখ থেকে? দেখছ না আমি কেমন দিনরাত রিবন্ আর কাবেরী শাড়ী প’রে আছি?”

মালতী তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, “তোমার গায়ে ত গাদা গাদা গয়না? আমাদের তুমি কিছুর দেও না।”

মা দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন, “খুব গাদা গাদা দেখেছিস বাছ। যা হু-এক টুকরো আছে, তা তোমাদের

তিন বোনকে পার করতে কোথায় ভেসে যাবে। এতেই ফুলোত ত বর্তে যেতাম। এখন ভিটেটুকু বজায় থাকে তাহলেই বাঁচি।”

মেয়েদের তখন বিবাহ বা ভিটের ভাবনা বিশেষ কিছু ছিল না। তাহারা সমানে নাকে কাঁদিতে লাগিল। ফল যে একেবারে কিছু না হইল তাহা নহে। বিমলা মায়ের বহুকাল-পরিভ্রান্ত একটা ছেঁড়া গরদের শাড়ীর ছেঁড়া অংশটুকু বাদ দিয়া পবিত্রা ফেলিল। রেশমের কাপড় ত? না-হয় একটা দিক ছেঁড়াই ছিল, সেটা কে বা দেখিতে আসিতেছে? আনন্দের আভিষে মেয়ে সেদিন খাইতেই তুলিয়া গেল।

সরযু কাঁদিয়া কাটিয়া কাকীমার কাছ হইতে সত্যকাবের একটা রিবনই আদায় করিয়া ফেলিল। কাকীমাটির খুব বেশীদিন বিবাহ হয় নাই, কাজেই নববধূজীবনের সম্পদ এখনও কিছু কিছু বাস্তব-প্যাটারার ভিতর আবিস্কার করা যায়।

মালতীকে মা দুগাছা নুতন কাচের লাল টুকটুক চুড়ি কিনিয়া শাস্ত করিয়া দিলেন। এই রকম যখন তখন চলে। কখনও বা হীরা চাহিয়া মেয়েরা জীরা পায়, কখনও বা পায় শুধু চড় চাপড়, গালাগালি। যাহা হউক, দিন এক রকম তাহাদের কাটিয়া যায়, সব সময়েই যে দুঃখে কাটে তাহা নয়। বাহিরের উপকরণের অভাব তাহারা অন্তরের কল্পনার সম্পদ দিয়া পূর্ণ করিয়া তোলে। মা-বাপের স্নেহ যতটুকু পায় ততটুকুই তাহাদের কাছে অমূল্য। তাহা ছাড়া সঙ্গী-সাথীব অভাব নাই, বাঙালীপাড়া, সারাক্ষণই এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিয়া খেলা করিয়া বেড়ান যায়।

কিন্তু এ-সুখই বা বাঙালীর মেয়ের জীবনে কতদিন থাকে? সরযু বারো ছাড়াইয়া তেরোয় পা দিতে-না-দিতেই তাহার বাপ-মায়ের কান ঝালাপালা হইয়া গেল। ঘরে-বাহিরে খোঁটার অবধি রহিল না। “ও মা, মেয়ে যে পেজায় হয়ে উঠেছে গো! বাপ-মায়ের গলা দিয়ে ভাত গলছে কি ক’রে? সময়ে বিয়ে দিলে যে ছেলের মা হত। আমরা ত ও-বয়সে কাকে কোলে ছেলে নিয়ে স্বামীর ঘর করেছি।”

এসব বাক্যবাণ ত নিম্নতই সরযুর মায়ের কানে বসিত হইতেছিল। জ্বালাত উপর তাহার আর-এক জ্বালা

হইয়াছিল শান্তভীর উৎপাত। নান্দনীকে দেখিলেই বুঝা যেন ধনুষ্ঠকারের মত বাজিয়া উঠিতেন, “বাবা, শোহাগ ক’রে খাইয়ে খাইয়ে মেয়ের চেহারা করেছে দেখ না? যেন চব্বিশ বছরের যিকী মেয়েমানুষ। গরীবের কথা বাসি হ’লে মিষ্টি লাগে, তখন বলেছিলাম না যে আদর ক’রে অত গিলিও না গো, গিলিও না। এখন মেয়ের মাথা খুলে ঠেকাও, যদি বাড় কমে।”

কুলো ঠেকাইতে হইল না। ঠাকুরমা, পিসীমা ও প্রতিবেশিনীদের স্বমধুর বাক্যের মহিমায় সরযু এমনই শুকাইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। মা দেখিয়া শুনিয়া এবার বাপের পিছনে লাগিলেন, “মেয়েটার যেমন হোক একটা বিয়ে দিয়ে দাও গো, নইলে বাক্যের জ্বালা দিয়ে দিয়েই ওরা ওকে মেরে ফেলবে।”

বাপ বলিলেন, “বিয়ে দিয়ে দাও বললেই অমনি বিয়ে হয়ে যায় কি না? টাকা কোথায় তোমার?”

গৃহিণী বলিলেন, “গরীবের মেয়েরাও ত আজন্ম আইবুড়ো থাকে না, তাদেরও ত বিয়ে হয়? আমি ত আর জন্ম, ম্যাজিষ্ট্রেট জামাই চাচ্ছি না? আমায় যে ঘরে-বাইরে আতিষ্ঠ ক’রে তুলেছে।”

সরযুর বাবা বলিলেন, “হঁ।” বলিয়া খাওয়া সারিয়া, পাড়ার চৌধুরীদের বাড়ী তাস খেলিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু গৃহিণীর কথাটা তাহার মনে রহিল। পাত্রের সন্ধানে নিজেও মন দিলেন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলকেই অহরোধ-উপরোধ করিতে লাগিলেন।

সরযুর বর জুটিয়া গেল। জন্ম, ম্যাজিষ্ট্রেট সত্যই আসিল না। আসিল যে, সে একটি গবর্ণমেন্ট অফিসেব কেরাণী, বিপত্নীক, প্রথম পক্ষের একটি ছেলেও আছে। বয়স ছত্রিশ-সাঁইত্রিশের কম হইবে না। ভালর মধ্যে এইটুকু যে চাকুরীতে উন্নতির সম্ভাবনা আছে।

জামাই কাহারও পছন্দ হইল না, হইবার কথাও নয়। সরযু বেচারী বিবাহের আয়োজনের মধ্যে এবং গায়ে-হলুদের তত্ত্বের ভিতর কয়েকখানা রেশমের শাড়ী এবং প্রসাধনের কতকগুলি উপকরণ দেখিয়া খানিকক্ষণ খুব খুসি হইল। এত জিনিষ, এত কাপড় জামা তাহার জন্ম? কিন্তু বিবাহের সময় বরের বিশাল ভূঁড়ি, এবং স্বপুট গোঁপ জোড়া দেখিয়া

তাহার সকল আনন্দ কর্পূবের মত উবিয়া গেল। বিবাহের পবদিনই সরযু বাপের বাড়ী ভাগ করিল, এবং আর কোনদিন সেখানে রাত কাটাইবার অল্পমতি পাইল না। তাহাকেই সংসারের গৃহিণীর পদ গ্রহণ করিতে হইল যখন, তাহার কি আর তখন হট হট করিয়া খালি বাপের বাড়ী যাওয়া পোষায়?

বিমলার রংটা একটু মাজাঘষা ছিল, গোধূলির আলোয় পাউডার স্নো মাখাইয়া দাঁড় করাওয়া দিলে করশা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়। কপালটাও বোধ হয় তাহাব দিদির চেয়ে কিছু ভাল ছিল। সরযুর বিবাহের বছর-দেড় পরে, ভগ্নীপতিই তাহার জন্ম একটি বর জুটাইয়া দিল। ছেলেটি মোটের উপর ভালই। বি-এ পাস করিয়া চাকরিতে ঢুকিয়াছে। মাহিনা বেশী নয়, কিন্তু বাড়ীর অবস্থা ভাল। দেশে জমিজমা, বাড়ীঘর আছে। মাত্র একটি ছেলে সে বাপমায়ের, বোন একটি আছে বটে, কিন্তু তাহারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। খণ্ডর বাঁচিয়া আছেন, শান্তভী নাই। বিমলার বিবাহে সকলেই খুসি হইল।

কিন্তু দুই মেয়ে পায় করিতে বাপ মায়ের ত হাঁড়ি শিকায় উঠিবার জোগাড়। গায়ের গহনা দিয়াই কিছু মালতীর মা দুই-দুইটি মেয়ে পাব করিতে পারেন নাই। বাড়ী বাঁধা দিয়া টাকা কর্ক করিয়া আনিতে হইয়াছে। ঋণ শোধ করিয়া বাড়ী যে কোনও দিন মহাজনের কবলমুক্ত করিতে পারিবেন, এ-আশা আর যাহারই থাক, মালতীর বাবার নাই।

ঠাকুরমা ক্রমাগত গজগজ করেন। “মুখপুড়ীদের বিয়ে দিতেই আমার ভিটেমাটি সব উচ্ছন্ন যাবে গো। আমাব সোনার চাঁদ নিতুকে রাক্সসীরা পথে বসাবে গো। এমন শত্রুরও সব ঘরে জন্ম নিরেছিল!”

কিন্তু এখনও মালতীর বিবাহ বাকি। তাহাকে যে কি দিয়া পায় করা হইবে তাহা পিতামাতা ভাবিয়া পান না। বাড়ীখানা বিক্রয় করিয়া ফেলিলে হয়ত হাজার-দেড় টাকা আবও পাওয়া যায়, কিন্তু থোকাকে কি সত্যি পথে বসাইবেন? আর বুড়ী ঠাকুরমা ত তাহা হইলে স্বামীর ভিটার শোকে দাঁড়াইয়া মারা যাইবেন। মালতীর বাবার সামান্য কিছু মাহিনা বাড়িয়াছে, স্বদ মাসে মাসে

দিতেছেন, আসলেরও কিছু হয়ত সামনের বছর দিতে পাবিবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মালতী যে তেরো পার হইয়া চৌদ্দ পা দিতে চলিল! নিতান্ত সে চোটখাট দেখিতে তাই রক্ষা। পাড়াপড়শীর চোখ এখনও তাহার উপর তেমন তীব্রভাবে পড়ে নাই।

মালতীর রংটা আবার তিন বোনের ভিতর সকলের চেয়ে কাল। তবে মুখখানিতে খুব লাবণ্য আছে, বড় বড় চোখ দুটি দর্শক মাত্রকেই মুগ্ধ করে। মাথায় চুলও একরাশ। কিন্তু এসব দেখিতে আসিবে কে? হাড়গিলার মত চেহারা হইলেও যদি চামড়াটা একটু শাদা থাকিত, তাহা হইলে মা-বাপের দুর্ভাবনা অনেকখানিই কম হইত।

বিবাহ যখন হইতেছে না তখন শুধু শুধু ঘরে বসিয়া থাকিয়া লাভ কি? মালতী এখনও স্থলে যায়। কর্পোরেশন স্থলে বতখানি বিদ্যালয় করা যায়, তাহা অর্জন করা তাহার চুকিয়া গিয়াছে। পাড়ায় নূতন একটা হাই ইংলিশ স্থল হইয়াছে, সেইখানেই সে পড়ে। মেয়ে পড়াষ মন্দ না, তাই বাপ সেক্রেটারীকে ধরাধরি করিয়া অর্ধেক মাহিনায় তাকে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। স্থলের গাড়ীতে সে চড়ে না, রিদের সঙ্গে হাঁটিয়াই যায়, বেশী ত দূর না।

এখন আর তাঁহার বাল্যকালের মত পোষাক-পরিচ্ছদের দৈন্ত নাই। তবে খুব যে প্রাচুর্য আসিয়াছে তাহাও নয়। তবু সপ্তাহে সপ্তাহে এখন সে কাপড়-জামা বদলাইতে পান। স্থলে শেলাই শিখিয়াছে, রাউজ সেমিজ চলনসই বকম শেলাই করিতে পারে। দিদিদের কাছ হইতেও যখন তখন এটা সেটা উপহার পায়। ভয়ীপতি দুইজনই ছোট শালীটিকে হনজরে দেখে, কাজেই দিদিরা পূজার সময় ছোট বোনকে একখানা রঙীন শাড়ী কিনিয়া দিতে চাহিলে অল্পমতিব অভাব হয় না।

মালতীর মন এখন কিশোরীর অকারণ আনন্দ ও অকারণ বিষাদে সারাশ্রম দোলায়মান। কেনই যে তাহার চিত্ত একদিন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে তাহা সে বুঝিতে পারে না, আবার কেনই যে আর-একদিন বিশ্বসংসার তাহার চোখে কাল হইয়া যায়, তাহারও কারণ সে খুঁজিয়া পায় না। সে যেন স্বপ্নলোকের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, সব অবাস্তব, সব রহস্যময়। তাহার জাগরণ কিসের অপেক্ষা করিয়া আছে কে জানে?

ম মাঝে মাঝে রাজে ফিশফিশ কবিয়া স্বামীকে বলেন, “ওগে, লতি যে পনেরোয় পড়তে চলল।”

বাপ চট্টিয়া বলেন, “তা চলল ত কি করব? দড়ি বেঁধে তার বয়সটাকে পিছন দিকে টেনে ধরে রাখব?”

মা চট্টিয়া বলেন, “আহা, কি বা কথার ছিরি।”

বাপ বলেন, “চেষ্টা ত কথাসাধ্য করছি। বিনা পয়সার চেষ্টা কি বা হয়? এক জরি সোনাও ত আর ঘর ঘেঁটেলে বেরবে না?”

মা বিষন্ন দৃষ্টিতে নিজের শাঁখাপরা হাত দুইটার দিকে তাকাইয়া থাকেন।

মালতীর দুই দিদি যে-বয়সে ছেলের মা হইয়াছে, সে সেই বয়সেও স্থলে পড়িতে লাগিল। আর একটা বছর যদি মান্বে মান্বে কাটিয়া যায়, তাহা হইলে ত সে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠিয়া পড়িবে। পরীক্ষাটা দিতে পারিলে চমৎকার হয়।

কিন্তু এ-বাড়ীর মেয়ের অদৃষ্টে অতখানি আর সহিল না। তাহারও বিবাহ হইয়া গেল।

মালতীর বড় পিসীমার বেশ অবস্থাপন্ন ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। বাপের বাড়ীর অবস্থা পড়িয়া গিয়াছে, কাজেই বড় মাস্তবের বউ এদিকে বড় একটা আসিতে পাইতেন না। কালেক্টরে দেখাসাক্ষাৎ হইত। স্বামীর সঙ্গে বিদেশেই তাঁহাব দিন বেশীর ভাগ কাটিয়া যাইত। একটা মাত্র ছেলে, সেও বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছে। বউও বড় মাস্তবের মেয়ে, শাস্ত্রীকে খুব যে একটা মানিয়া চলে তাহা নহে।

প্রৌঢ় বয়সে হঠাৎ বিধবা হইয়া মালতীর পিসী কেমন যেন অবলম্বনহীন হইয়া পড়িলেন। স্বস্তরবাড়ীর সংসারটা যেন মরীচিকার মত অকস্মাৎ মিলাইয়া গেল, কিছুতেই আর এদিকে নিজের বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। বহুকাল পরে আবার শোকাতুর চিত্তে তাই তিনি নিজের বাল্যজীবনের ঘনে ফিরিয়া আসিলেন। হাজার হউক, মা ত এখনও বাঁচিয়া আছেন?

দিন কতক অবিভ্রাম কাম্বাকাটির পর মোহিনী-ঠাকুরাণীর মনটা যখন একটু শান্ত হইল, তখন তিনি একবার ভাল করিয়া বহুদিন-পরিভ্রান্ত বাপের বাড়ীর সংসারটার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। সব চেয়ে বড় হইয়া এবার তাঁহার চোখে পড়িল অনুচা মালতী।

মোহিনী মাঝে জিজ্ঞাসা করিলেন, “লতির এখনও বিয়ে দাও নি কেন গা? মন্ত ভাগর মেয়ে হয়েছে যে? আমার শস্তুরের শুষ্ঠীর কোনো মেয়ে ত ন’ পেরিয়ে দশে পা দিতে পায় নি। কর্তা বলতেন, সময় মত মেয়েব বিয়ে না দিলে নিমিস্তের ভাগী হতে হয়।”

মা বলিলেন, “নিমিস্তের ভাগী হ’লেই বা করছি কি? তোকে ছুথের কথা বলব কি মা, ভিটেটুকু স্বচ্ছ বাঁধা পড়েছে বড় ছুই আবাগীকে পার করতে। আমার হীরের টুকুরো নিতু বুঝি এবার পথে বসে। এখনও ত এ রাঙ্কসী বাকি।” গলা নামাইয়া বলিলেন, “শস্তুরের মুখে ছাই দিয়ে এটা ত পনর পুরতে চলল, যতই লুকোই ছাপাই লোকে বিশ্বাস করবে কেন? তা দেবও ত চোখ আছে?”

মোহিনী গালে হাত দিয়া বলিলেন, “ওমা, কোথায় যাব গো। শীগগির একে পার করব, কখন বুঝি বা কি অনর্থ হয়।”

মা বলিলেন, “পাস্তর কোথা? বিনে পয়সায় ত বুড়ো-হাবড়া দোজবরেও ঘরে নিতে চায় না।”

মোহিনী খানিক ভাবিয়া বলিলেন, “ছেলে একটি আছে, তা কি আর তোমাদের পছন্দ হবে? টাকার খাঁইও তাদের বড় নেই, আমি ধরাধরি করলে বিনা পণেই হয়ে যেতে পারে।”

মা বলিলেন, “বলে ও ক্যাংলা ভাত খাবি, না হাত খোব কোথায়? তুই নাম ঠিকানা দে দেখি, কেমন না ওরা মেয়ের বিয়ে দ্যায় তাই আমি দেখব। টাকা নেই বার, তার আবার পছন্দ অপছন্দ কি? কোনমতে মেয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেলে হয়।”

মোহিনী ঠিকানা দিলেন। ছেলে দূর সম্পর্কে তাহার ভাগিনেয় হয়। আই-এ পাস, চাকরি-বাকরি করে না। দেশে জমিজমা বাড়ীঘর সব আছে, তাহাই দেখাশুনা করে। বাবা মা নাই, ছুটি ছোট ছোট ভাই আছে ও কয় জ্যোষ্ঠা-মহাশয় আছেন। সংসার গৃহিণী-অভাবে অচল, তাই তাহারা বড়সড় মেয়ে খুঁজিতেছে। পছন্দমত মেয়ে হইলে তাহারা পণ চায় না। তবে গহনাগাঁটি দু-একখানা, বরাভরণ, বাসন-কোসন এসব চাহিবে বই কি? এ না হইলে কি বিবাহ হয়?

মালতীর মা বলিলেন, “তাই বা আমি কোথা থেকে দিচ্ছি?”

শান্তভী ননদ একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, “তা বললে চলাবে কেন? তিন-তিনটে মেয়ে গর্তে ধরেছ যখন, তখন মাথার চুল বাঁধা দিয়েও টাকা আনতে হবে।”

পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। গ্রাম-সম্পর্কে এক খুড়াকে সঙ্গে লইয়া পাত্র একদিন স্বয়ং আসিয়া মেয়েকে দেখিয়া গেল। তাহার পছন্দই হইল। পাড়াগায়ে এ বউ অমানান হইবে না। বড়সড়, আছে, কাক্সকর্মও শিখিয়াছে। গরীবের ঘরের মেয়ে, নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবে। পণ তাহারা চায় না। তবে মেয়েকে খান-তিনেক গহনা দিতে হইবে, বরকেও আংটি ও রিঙওয়ান দিতে হইবে।

পিসীমা আবার বরের দিকেরও সম্পর্কিতা, তিনি বলিলেন, “কিছু অশ্রাঘ্য বলছে না বাপু। কাজ নাইবা করল, খেতে পরতে দিতে ত পারবে?”

বড় জালায় মালতীর মায়ের কথা ফুটিল, তিনি বলিলেন, “কিছু লুকিয়ে ছাপিয়ে রাখিনি ঠাকুরবি, তুমি বরং বাস্তব জ্ঞান থলে দেখ। কোথাও এক ফুটি সোনা কি রূপো নেই। মা বাড়ী বেচবার নামে আত্মঘাতী হ’তে চান, এখন তোমরাই পাঁচ জনে বল কোথা থেকে আমি গহনা দিই আর বরাভরণ দিই? যেমন ক’রে হোক হাজার টাকা বার না করলে, এসব হচ্ছে কি ক’রে? আত্মীয় ফুটুম সব আসবে, তাদের পাত্রেও দুমুঠো দিতে হবে। মেয়েকেও খানকয়েক কাপড় কামা ক’রে না দিলে সে গিয়ে শস্তুরবাড়ী দাঁড়ায় কি ক’রে?”

মোহিনী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিলেন। গহনাগাঁটি তাহার আছে অনেকগুলোই, কিন্তু পরার দিন আর নাই। পুত্রবধূ উপর তিনি বিন্দুমাত্রও সন্তুষ্ট নন, তাহার দেমাক বড় বেশী। তাহাকে এসব দিয়া যাওয়ার চিন্তা তিনি স্বপ্নেও করেন না। তবে নাতি নাভনী একটি একটি করিয়া ঘরে তাসিতেছে, তাহারা প্রত্যাশা করিবে ত? আর বুড়া বনসে নিজের বলিতে এই ক’থানাই ত, আর কিসে বা জঁহার অধিকার? কাজেই সব বেহাত করা চলে না।

তবু ভাইবোটার বিবাহ না দিলেই নয়, উহার দিকে যে আর চাওয়া যায় না? তাঁহাদের দিনের গহনা ছিল সব

ভারি ভারি, তিনি মাছুষটাও দশাশই চেহারার। তাঁহার একখানা গহনা ভাঙিলে লতির তিনখানা হইবে। ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি ভাঙ্কে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ বাপু, গহনা তিনখানা না-হয় আমি দিচ্ছি, হাজার হ’লেও তোমাদের দায় আমারও দায়। বাপের বাড়ীর দুর্নাম কে শুনতে পারে? বাকিটা জোটাতে পারবে ত?”

এতক্ষণে মালতীর মায়ের বিবর্ণ মুখে হাসি ফুটিল, তিনি হেঁট হইয়া ননদের পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন, “তা দিতে হবেই যেমন ক’রে হোক।”

অতএব বিবাহের দিনক্ষণ দেখা হইতে লাগিল, কথাবার্তা পাকা হইয়া গেল। সরযু আসিল, বিমলাও আসিল। বরের আঁটি সরযুই দিবে বলিল, দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী সে, তাহার একটু খাতির বেশী। বিমলা বিবাহের শাড়ী জামা দিল, লুকাইয়া অল্প কাপড়চোপড়ও কিছু কিছু দিল। মালতীর দুই মামার কাছে আবেদন নিবেদন করিয়া তাহার মা কিছু টাকা আদায় করিলেন, তাহাতে ঘড়ি আর বাসন-কোসন জোগাড় হইল। মালতীর মা গোছানী গৃহিণী, ছেঁড়া কাপড় দিয়া বাট ঘটি প্রায়ই তিনি কিনিয়া রাখিতেন। সেগুলি এবার কাজে লাগিল। কিছু টাকা খার হইল বটে, তবে সে সামান্য, তাহার জন্ম বাড়ী বিক্রয় হইবে না।

মোটের উপর সবাই খুসি হইল এই বিবাহে, বিয়ে ক’নে ছাড়া। তাহার কল্পনার রাজপুত্র বর কোথায় হাওয়ার মিলাইয়া গেল, তাহার বদলে আসিল কি না এই অজ-পাড়াগাঁয়ে ব্যক্তি? মাগো, কি করিয়া সে অমন স্থানে বাস করিবে? সাপে তাহাকে খাইয়া ফেলিবে, ম্যালেরিয়া হইয়া সে মরিয়া যাইবে। ওদেশে ত আনের ঘর নাই, কত কি নাই। মাগো মা, সে বাঁচিবে কি করিয়া? মালতী পাড়াগাঁ কখনও চোখে দেখে নাই, তাহার কল্পনায় সেটা একটা বিভীষিকার রাজ্য হইয়া দেখা দিল। তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল, মুখ ভাব হইয়া গেল।

বিমলা বলিল, “ওকি লো, আজ বাদে কাল বর আসছে, তুই অমন মুখ হাঁড়ি ক’রে বেড়াচ্ছিস কেন? ছেলে ত ভাল শুনলাম।”

মালতী গাল ফুলাইয়া বলিল, “ছাই ভাল! দেখ এখন

ঐ পাড়াগাঁয়ে গিয়েই আমি ম’রে যাব। শহরে বুঝি আর ছেলে ছিল না?”

সরযু বলিল, “বিদ্যুদী মেয়ে কি না তাই তাঁর মন উঠছে না। আমাদের বাপু বাপ-মায়ে যেমন ধ’রে দিয়েছে তেমন নিয়েই আছি। সাথে বলে মেয়ে মাহুষের বেশী পড়াশুনো করতে নেই?”

বিমলা বলিল, “সব তোর বাড়াবাড়ি বাপু, পাড়াগাঁয়ে গেলেই মাহুষ অমনি ম’রে যায় কি না? এই ত ও-বছর পূজোর সময় আমরা মাস খানিক পুরো আমার মামাশুশুরের গ্রামে গিয়ে থেকে এলাম। কই, সবাই কি গেছি ম’রে?”

সরযু বলিল, “যেমন কথা মেয়ের, গরীবের ঘরের মেয়ের অত খোঁট ধরলে চলবে কেন? চল, তোব গহনা এসেছে দেখবি চল। পিসীমার গতরকে ধস্টি, তার বালা জোড়া ভেঙেই লতির চুড়ি, হার আর আঁধালেট তিনটাই হয়ে গেল প্রায়। মাত্র আর দু-ভরি ভাঙতি সোনা দিয়েছেন।” কিন্তু গহনার খবরেও মালতীর মুখের আঁধার কাটিল না।

তা নাই কাটুক, বিবাহ তাহার হইয়াই গেল। বাসর-ঘরে মেয়ের ভীড়ে বর তাহার সঙ্গে কথা বলিবার কোন সুবিধাই পাইল না, স্তবধা মালতী যে কতখানি চট্টিয়া আছে তাহাও সে জানিতে পারিল না।

পরদিন তাহাকে যাত্রা করিতে হইল এই অবাস্তিত বরের সহিত, তাহার পাড়াগাঁয়ের ঘরে। বর, ক’নে, বরযাত্রী সব এক গাড়ীতেই উঠিল। বেশী দূর নয়, কলিকাতা হইতে বট্টা হয়েকের পথ। সঙ্গে মা একটা ঝি দিয়াছিলেন তাই রক্ষা, না হইলে ঘোমটা টানিয়া, ষাড় শুঁজিয়া বসিয়া বসিয়া মালতীর ঘাড়ে মাখায় ব্যথা ধরিয়া যাইত। ঝি থাকাতে সে তবু দু-চারটা কথা বলিল, পোটা দুই মিষ্টি মুখে দিয়া এক গেলাস জলও খাইল। পাড়াগাঁয়েব ষ্টেশনে এমন ছড়মুড় করিয়া তাহাকে নামিতে হইল যে দশ-বার মিনিট তাহার বুকে কেবলই টিপ টিপ করিতে লাগিল।

ছোট্ট ষ্টেশন, মালতী লাল বেনারসীর ঘোমটা ফাঁক করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার চারিদিকে ধানের ক্ষেত, মাঝে মাঝে কুঁড়ের, পুস্কর, বাঁশঝাড়। বিকাল হইয়া আসিয়াছে, পশ্চিমাকাশে একেবারে রঙের প্রাবন। কিন্তু ব্রাহ্মঘাট নাই, গাড়ীঘোড়া কিছু নাই। ঐ সরু আলোর

উপর দিয়া মানুষগুলি যেমন হাঁটিয়া যাইতেছে, তাহাকেও অমনি যাইতে হইবে নাকি? বাপ বে, ঐ কাদার ভিতর যাবি সে পড়িয়া যায়?

কিন্তু হাঁটিয়া তাহাকে যাইতে হইল না। হুম্ হুম্ করিতে কবিতে একখানি পালকী আসিয়া হাঙ্গির হইল। মালতী ৩ বর তাহাতে চড়িয়া বসিল, আর সকলে হাঁটিয়া চলিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার বাড়ী আসিয়া পৌছিল। বাড়ীতে গৃহিণী কেহ নাই, তবে শুভকর্ম নিয়ম মত সম্পন্ন করিতে লোকের অভাব হইল না। পাড়া-পড়শী সকলে আসিয়া জুটিল, রীতিমত বরণ করিয়া বউ ঘরে তোলা হইল। বুড়ো জ্যাঠা মহাশয় এক জোড়া মকরমুখো বাল দিয়া মালতীর মুখ দেখিলেন।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। এখানে ভ বিজ্ঞানীর বাতি নাই, মিটমিটে হারিকেন লণ্ঠনে যতদূর আঁধার ঘূর হয় ততটাই হইল। মালতীর মনের ভিতরটাও কাল হইয়া আসিতে লাগিল। খড়ের চাল, মাটির দেওয়াল ইহার ভিতর মানুষ থাকে কি করিয়া? তবু ভাল যে উঠানে দরমার বেড়া দিয়া ঘিরিয়া নতুন বউয়ের জন্ত একটা স্থান বর হইয়াছে। বরের যে এতটুকু বিবেচনা আছে তাহাতে মালতীর মন একটু কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারিল না।

পাড়াপড়শী ক্রমে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল, খালি রহিয়া গেলেন একজন বৃদ্ধ। ইনি বর স্বরেশ্বরের দূর-সম্পর্কের মাসীমা, বউকে একটু দেখাইয়া শুনাইয়া গৃহিণীপণে অধিষ্ঠিত করিয়া দিয়া তবে যাইবেন। আজ রাতটা ইহারই সঙ্গে শুইয়া মালতীর কাটিয়া গেল। দুই-তিন দিনের গোলমালে সে ক্লান্ত হইয়াছিল যথেষ্টই, কাজেই নতুন ঘরে শোওয়া সত্ত্বেও সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সাদাসিধা ভাবে একটা বৌভাতও হইয়া গেল মালতীকে পরিবেশন করিতে হইল, তা সে ভাল ভাবেই করিল। কলিকাতায় থাকিয়া এত বড় হইয়াছে বলিয়া কি সে কাজ জানে না? কাজ যথেষ্টই তাহাকে করিতে হইয়াছে। বৌভাতে উপহার পাইল সে খানকতক তাঁতের শাড়ী, কাঠের লাল সিঁহর-কোটা এবং গোটা কতক টাকা। তাহার সন্ধিনীদের কাছে যে কত রকম গল্প শুনিয়াছিল, তাহার সঙ্গে কিছুই মিলিল না।

ব্রাহ্মে ফুলশয্যা। এইবার বরের সঙ্গে খানিক আলাপ-পরিচয় হইল। মালতী মনে করিয়াছিল খুব শক্ত হইয়া থাকিবে, এই পাড়ারগেয়ে লোকটার কাছে একেবারেই ধরা দিবে না। কিন্তু হঠাৎ দেখিল মানুষটার মিষ্ট কথাবার্তায় আর আদরে তাহাব মন যথেষ্টই নরম হইয়া আসিয়াছে, বেশ ভাল ভাবেই সে বরের সঙ্গে কথা বলিতেছে।

স্বরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা লতু, পাড়ারগেয়ে থাকতে তোমার খুব কষ্ট হবে না? জন্মে কখনও ত শহর ছেড়ে নড় নি?”

মালতী বিজ্ঞভাবে বলিল, “কষ্ট হ’লেই আর কি করছি বল? নিজের ঘর ত আর ফেঁলে দেওয়া যায় না? আচ্ছা, তুমি আমার ডাকনাম জানলে কি ক’রে?”

স্বরেশ্বর বলিল, “কেন জানব না? আমার কি কান নেই? বাসরে সবাই লতি লতি ক’রে কথা বলছিল না?”

মালতী বলিল, “ও তাই।” কথাবার্তা সে-রাজে আর খুব বেশী অগ্রসর হইল না।

সকালে তাহাদের যেমন সময় উঠা অভ্যাস তাহার ঢের আগে স্বরেশ্বর তাহাকে জাগাইয়া দিল। বলিল, “গাঁয়ের মানুষ খুব ভোরে ওঠে, বিশেষ ক’রে মেয়েরা। মাসীমা পাশের ঘরে খুঁ খুঁ করছেন, শুনছ না? তোমার আর শুয়ে থাকলে ভাল দেখাবে না।”

তা মালতীর ভোরে উঠিতে ভালই লাগে, সে উঠিয়া পড়িল। মাসীমা অবশ্য সেইদিনই তাহাকে কাজেব ঘানিতে জুতিয়া দিলেন না। বলিলেন, “এর পর সবই ত করতে হবে তোমায় মা, তবে দুচার দিন থাক্।”

কাজ না করিলেও সারাদিনের ভিতর মালতীর সঙ্গে আর স্বরেশ্বরের দেখা হইল না। মালতীকে পাড়ার যত বৌঝি আসিয়া ছাঁকিয়া ধরিল। তাহাদের পাল্লায় পড়িয়া মালতীকে পুতুরে স্থান স্বেচ্ছ করিয়া আসিতে হইল। ভয়ে তাহার হাত পা ঠক্ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল, এই বুঝি একেবারে ডুবিয়া মরে। কিন্তু এখানে বাঁচিয়াই সে ফিরিয়া আসিল, অবশ্য দুই-এক চোক জল যে না খাইল তাহা নয়। নানাদিকে অনুবিধা যে তাহার যথেষ্টই হইবে তাহা সে বুঝিতে পারিল। কিন্তু সহ্য করা ছাড়া উপায় কি? সে ত আর বড়মানুষের মেয়ে

নয় যে গাড়ী বাড়ী করিয়া দিয়া বাপ তাহাকে কলিকাতায় বসাইয়া দিবেন ?

রাতে স্বামীকে সে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কখনও কি কলিকাতায় থাক নি ?”

সুরেন্দ্র বলিল, “তা থাকব না কেন, যখন কলেজে পড়তাম তখন ত কলিকাতায়ই ছিলাম। কেন ?”

মালতী বলিল, “এমনি জিজ্ঞেস করছি। তোমার কলিকাতা ভাল লাগে না ?”

সুরেন্দ্র বলিল, “তা যে না লাগে তা নয়। তবে গ্রামও ভাল লাগে।”

মালতী বলিল, “চাকরী-বাকরীর চেষ্টা করলে না কেন ?”

সুরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, “বিভে ত আই-এ পাস, তাতে আর কি জজিয়তি মিলত ? বেয়ারাগিরি করার চেয়ে নিজের জমিজমা দেখাই ভাল মনে করলাম। চ’লে ত যাচ্ছে, কারও কাছে হাত পাততে হয় না। ভাই দুটোকেও পড়াচ্ছি।”

মালতী বলিল, “পাসেই সব হয় নাকি ? কলিকাতায় কত মানুষ টাকার পাহাড়ের উপর ব’সে আছে যারা ম্যাট্রিকও পাস করে নি।”

সুরেন্দ্র বলিল, “তেন কপাল আমার নয়। যাক্ গে, তোমারও কিছুদিন পরে সয়ে যাবে অত ভাবছ কেন ? শহরেরই কি আর সব ভাল ?”

মালতী বলিল, “তা নয় অবিশিষ্ট। কিন্তু অবস্থার উন্নতি করতে ত চেষ্টা করা উচিত ?”

সুরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, “আচ্ছা মেয়ে যা হোক। দু-দিন হ’ল ত বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে সব ফেঁলে ইকনমিস্টের প্রফেসরের মত বক্তৃতা দিতে শুরু করেছে। আর কি কোন কথা নেই ?” বলিয়া সে বধুকে কাছে টানিয়া লইল।

কিন্তু স্বামী ঠাট্টা করিলে কি হইবে, মালতীর মন হইতে যে এ চিন্তা যায় না। স্বামীর প্রতি ভালবাসা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে লইয়া শহরে ঘর বাঁধার সাথ আরও তাহার প্রগাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। সুরেন্দ্রের কাছে বলিতে সাহস হয় না কিন্তু মালতীর প্রাণ এখানে খালি ছটফট করে। পাড়াগাঁ দেখিতে স্বম্বর বটে, কিন্তু এখানে থাকিতে ত ভাল লাগে না। কিছুতে যে সে আরাম পায় না।

কয়দিন পরে জোড় ভাঙিতে মালতী বাপের বাড়ী ফিরিয়া গেল। জলের মাছকে যেন ডাডায় তোলা হইয়াছিল, জলে ফিরিয়া গিয়া সে প্রাণ পাইল। বর দিন-দুই থাকিয়া গ্রামে ফিরিয়া গেল। মালতী এখন কিছুদিন থাকিয়া তাহার পর ভাল দিন দেখিয়া যাইবে।

বিমলা আর সরযু বোনের আসার খবর পাইয়া দেখা করিতে আসিল। মালতীর কোমল গাল দুটি টিপিয়া দিয়া বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, “কি রে লতি, পাড়াগাঁয়ে বব পছন্দ হ’ল ?”

মালতী বলিল, “বর পছন্দ হয়েছে, পাড়াগাঁ পছন্দ হয় নি।”

সরযু বলিল, “তাহলেই হ’ল। ঐ একটা পছন্দ হ’লেই, সঙ্গে সঙ্গে সব পছন্দ হয়ে যাবে।”

সবযুর স্বামী এখন ভাল কাজই করে, বিমলার অবস্থার অবশ্য বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু মালতীর চেয়ে ভাল ত ? কলিকাতা ছাড়িয়া ত তাহাকে যাইতে হয় নাই ? মালতী দুই দিককেই ধরিয়া পড়িল, “ভাই বড়দি, ভাই ছোড়দি, জামাইবাবুদের ধ’রে ওর যেমন হোক একটা কাজ এখানে ক’রে দাও না ? সত্যি বলছি ভাই, ওখানে বেশী দিন থাকতে হ’লে আমি ভেপ্‌সে মরে যাব। সে যা কাণ্ড, জান না ত ?”

বিমলা বলিল, “জানি লো জানি। তাতে কি, দু-দিনে সয়ে যাবে। পবের গোলামী ভারি ভাল কি না ?”

মালতী বলিল, “সংসারে সবাই ত তাই করছে, ও কবলেই বা ক্ষতি কি ? তোমের পায়ে পড়ি ভাই, আমার কথাটা মনে রাখিস।”

সরযু বলিল, “বলব এখন তাকে। কিন্তু কাজ দাও বললেই কি আর কাজ হয় ? এই ত ওর ভাগ্যটা ব’সে ব’সে খাচ্ছে, আজ অবধি কাজে ঢোকাতে পাবলেন না।”

বিমলা বলিল, “তুই ত বলছিস, তোর বর যদি রাজী না হয় ?”

মালতী হাসিয়া বলিল, “সে ভার আমার।” বরকে রাজী করা যে তাহার পক্ষে বিশেষ শক্ত হইবে না তাহা সে ইহারই মধ্যে বুঝিতে পারিয়াছে।

দিদির কথা দিয়া গেল যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

মালতী তাগিদের ক্রটি রাখিল না, ষতবাবই দেখা হয় একই কথা বলে। স্বরেন্দ্রকেও চিঠিতে জানাইয়া দিল যে তাহার চাকরীর চেষ্টা চলিতেছে। স্বরেন্দ্র উত্তরে লিখিল যে স্ত্রী এবং শালীদের চেষ্টা সকল হইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। কত শত এম-এ, বি-এ বলে কাজের অভাবে ফ্যা-ফ্যা করিয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু কাজ একটা জুটিয়া গেল। বিমলা একদিন দুপুরবেলা বেড়াইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁ রে, স্বরেন্দ্র রেলের কাজ করবে?”

মালতী বলিল, “তা করবে না কেন? কেন ছোড়দি, কাজ খালি আছে?”

ছোড়দি বলিল, “আছে ত একটা ছোটমোট। আমার জাঠুতো ভাসুর রেলের কাজ করেন না? তিনি জংশনে থাকেন। চার জন নতুন লোক নেওয়া হবে, এখন মাইনে খুব কম, পঁচিশ টাকা মোটে। মাস-ছয় পরে কাজ পাকা হবে, মাইনেও বাড়বে। বলিস ত স্ববেনের কথা বলি। তাকে অবিশ্রি কাজের জন্তে দরখাস্ত কবতে হবে।”

না হ'লই বা কলিকাতা?—জংশনও মধ্য জায়গা, সেখানে কলের জল, বিদ্যলী বাতি, গাড়ী মোটর সব আছে। এমন কি সিনেমাও আছে। মালতী সেইখানে থাকিতে পাইলেই বর্তাইয়া যায়। স্বরেন্দ্রকে এবার সে বিধিযত আক্রমণ করিল। শুধু চিঠিতে হইবে না মনে করিয়া তাহাকে কলিকাতায় ডাকাইয়া আনিয়া সরাসরি যুদ্ধ নামিয়া পড়িল।

একসঙ্গে অল্পনয়, বিনয়, চোখের জল, মুখের হাসিতে বেচারী স্বরেন্দ্রকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। সে বলিল, “আচ্ছা না-হয় মালগাড়ীর গার্ডের কাজই নিলাম, কিন্তু তুমি একলা থাকতে পারবে? তোমাকে ত আর দশ দিন পরেই ওখানে যেতে হবে?”

মালতী বলিল, “তা আশায় আশায় থাকব এখন। দেওররা এমন কিছু ছোট নয়, জ্যাঠামহাশয়ও রয়েছেন। কাজ পাকা হ'লে ত কোয়টার্স পাবে। তখন সবাই মিলে তোমার কাছে বাব।”

অগত্যা তাই। নববিবাহিতা পত্নী, মুখখানিও বড় সুন্দর, তাহার কথা ঠেলা যায় কি করিয়া? আর চিরজন্ম পাড়াগাঁয়ে ভূত হইয়া থাকিতে মনে মনে স্বরেন্দ্রেরও একটু অনিচ্ছা ছিল।

মালতীও খুশুরবাড়ী গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বামীকেও কর্মস্থলে চলিয়া যাইতে হইল। মালতীর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসে, তবু সে জোর করিয়া ঠেকাইয়া রাখে, এখন ভাজিয়া পড়িলে চলিবে না, ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া তাহাকে শক্ত হইতে হইবে। দিন কোনও মতে কটিয়া যাইবে।

প্রথম প্রথম চিঠিপত্র খুব আসিতে লাগিল। স্বরেন্দ্র

কত রকম বর্ণনা দিয়া লেখে, জায়গাটা কেমন, কর্মচারীদের বাড়ীঘর কেমন, লোকজন কেমন। মালতীর মন কল্পনায় কত ছবি আঁকে। ঐ রকম লাল একটি ছোট বাড়ীতে সে স্বরেন্দ্রকে লইয়া সংসাব পাতিয়াছে, কত সুখে তাহারা আছে।

কিন্তু ক্রমে স্বরেন্দ্রের স্বর বদলাইতে লাগিল। চিঠিও যেন কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। এত খাটুনি তাহার সহ হয় না, নিজের গ্রামেব জন্ত মন কেমন করে। বড় কর্মচারীরা তাহাদের মাহুষের মধ্যেই গণ্য করে না। মালতী যথাসাধ্য তাহাকে সান্ত্বনা দেয়, কিন্তু নিজের মনেও তাহার সন্দেহ মাথা তুলিয়া উঠে। সে ভুলই করিল নাকি?

সকালে উঠিয়া, কাপড় কাচিয়া সব সে রান্নাঘরে ঢুকিতেছে এমন সময় তাহার দেবর একখানা খবরের কাগজ হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিল, বলিল, “বৌদি, ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে।”

মালতীর হাত হইতে জলের ঘটিটা ঠন্ করিয়া পড়িয়া গেল। বিবর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে? কাগজ কোথা পেলে?”

ছেলেটি বলিল, “নহ-খুড়োর কাগজ, তিনি দিলেন।—জংশনে গাড়ীতে গাড়ীতে ভয়ানক কলিশন হয়েছে। লোক ঢের জখম হয়েছে, এক জন নাকি মারাও গেছে।”

মালতী দরজা খরিয়া দাঁড়াইয়া ঠকঠক কবিয়া কাঁপিতে লাগিল। অশ্রুটস্থরে বলিল, “কি হবে ঠাকুরপো?”

ঠাকুরপো প্রায় মালতীরই বয়সী, সে বলিল, “গোটা-চার টাকা দাও, আমি সাড়ে আটটার গাড়ীতে চ'লে যাই। সন্ধ্যা-মধ্যে হয় ফিরে আসব, না-হয় তার করব।”

মালতী বলিল, “আমাকেও নিয়ে চল।”

দেবর বলিল, “সে হয় না, একলাই আমার যাওয়া ভাল।” টাকা লইয়া সে যেমন অবস্থায় ছিল বাহির হইয়া গেল।

বুড়া জ্যাঠামহাশয়কে আর ছোট দেবরকে কোন মতে দুইটা ভাতে ভাত সিদ্ধ করিয়া দিয়া মালতী সারাদিন অনাহারে বসিয়া রহিল। বার-বার ঠাকুরঘরে গিয়া মাথা খুঁড়িয়া প্রার্থনা জানাইতে লাগিল স্বামীকে যেন অক্ষত দেহে ফিরিয়া পায়, সে আর কোনদিন শহরে বাইতে চাহিবে না।

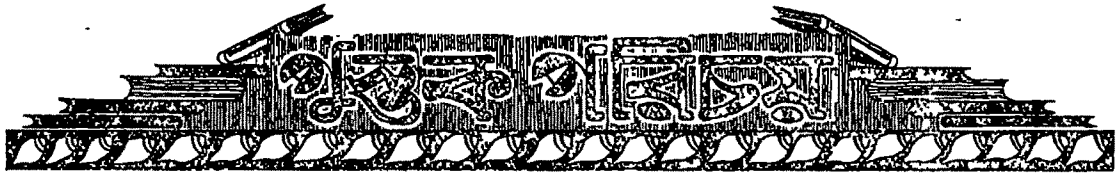
সন্ধ্যার সময় কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ভাইয়ের সঙ্গে স্বরেন্দ্র ফিরিয়া আসিল। তাহার বিশেষ আঘাত লাগে নাই, কিন্তু সাংঘাতিক আঘাতও অনেকের লাগিয়াছে।

মালতী কাঁদিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল, “অমন সর্বনেশে কাজে আর তোমায় যেতে দেব না।”

স্বরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, “ভয়টা কেটে গেলেই আবার মত বদলে যাবে ত? তখন শহরের জন্তে সব স্বীকার করবে।”

মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “না, আমাদের পাড়াগাঁই ভাল। তুমি কাজ ছেড়ে দাও।”

স্বরেন্দ্র বলিল, “কালও যদি এ-মত থাকে, তাহলে না-হয় ছাড়বার কথা ভাবা যাবে।”



শ্রীমন্তগবদগীতা—চতুর্থ সংস্করণ ; মূল, অধরমুখে স্বাক্ষরিত
সমগ্র টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ । ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার কর্তৃক অনূদিত ;
পণ্ডিত শ্রীরাধেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত ; শ্রীবিভূতিভূষণ
দে কর্তৃক ঢাকা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিজিৎ হইতে প্রকাশিত । মূল্য ১/০-
মূল্য সংস্করণ ১০ আনা ।

ইহা গীতার অল্পমূল্যের এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ । পূর্বের ছায় ইহাতেও
শ্রীধরবাসীর টীকা অধরমুখে সন্নিবেশিত হইয়াছে ; সুতরাং ইহাও পাঠক-
গণের সমাদর লাভ করিবে আশা করি ।

শ্রীপ্রিয়ানন্দ্র রায়

ইকুড়ি-মিকুড়ি—শ্রীবিকাশ দত্ত প্রণীত । চাকসাহিত্য কুটীৰ,
মাপিকতলা স্পাব, কলিকাতা । দ্বিতীয় সংস্করণ ।

আরক্তার গল্প, কবি নেটে বৃষ্টি কুট মিল্লীর গল্প, বিল্লীচাঁদব্রণের গল্প,
টং সাহেব আর তাঁর গানের ক্লাস, কোটা কবিরাজ, ব্যাড্ পণ্ডিত—শিশু-
চিন্তের উপভোগ্য কোঁতুক কাহিনী—শহরের ছেলেমেয়েরা পড়িয়া আনন্দ
পাইবে । দ্বৈতলোক্য মুখোপাধ্যায় মহাশয় হইতে শিশুসাহিত্যের এই
ভালো সুত্রপাত,—স্ববুদার রায় মহাশয়ের হাতে ইহা আরও সুবুদার হইয়া
উঠিয়াছিল । ইকুড়ি-মিকুড়ির লেখক এ শ্রেণীর বচনায় হুনাম অর্জন
করিয়াছেন, প্যারচনাথও যে তাঁহার হাত আছে তাহাও পরিচয় এই
ইকুড়ি-মিকুড়ি হইতে পাওয়া যায় ।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

কৈশোরিকা—কবিতাগ্রন্থ । শ্রীরমেশচন্দ্র রায় প্রণীত । ১ নং
রমানাথ মল্লবার ষ্ট্রিটের সরস্বতী প্রেস হইতে প্রকাশিত । মূল্য
১৮ টাকা ।

ভূমিকায় হই জন ভক্তলোক লিখিতেছেন, “আমাদের সনির্বন্ধ
অনুবোধে কবিরাজ...১৬ থেকে ২০ বছর বয়সের লেখা কবিতাব কয়েকটি
ছাপাতে গাঞ্জি হয়েছেন ।” আমরা কিন্তু কোন কবির গল্প একপ ওকালতি
সমর্থন করি না ।

“আমি শুধু ব্যর্থ অর্থ্য বাহি” [‘নাহি’র সঙ্গে মিলাইবার জন্ত]
‘উদ্ভাসন সঙ্গীতেরে সিন্ধু করি চিত্তবন রসে’ [অর্থ্য ?] ‘জীর্ণ আলোক
রহিবে এ-লোকে বাহা কাঁকি’—ইহার সহিত ‘কেন মিছামিছি বহিবে ভরা
এ কলসটাকে ?’ [এক ছন্দে পড়া যায় না] অথবা ‘পথের ভীতিকা’ [অর্থ্য ?]
‘এমন আঁধার বাত’ দিয়া আরম্ভ করিয়া শেষে ‘মুখে জ্যোছনা কিরণ
নাথ’ অথবা ‘অভাব ছুটে আসে প্রাণের পর’ ‘কড়ি আশে পাশে আজও
নাচে’ ‘নাচিত্ত হৃৎ-কেকা এ পোড়া বৃক’ ‘শাখতে বৃথা ধবিবারে চাই
এই বনিকের চট্টে ছাখ’ প্রভৃতি যৌবন বয়সে লেখা সম্বোধন ক্ষম্যযোগ্য
নহে ।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

জীবনায়ন—শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু । পি, সি, সরকার এণ্ড কোং ।
১৮ ভ্রামাচরণ ধ্রু ষ্ট্রিট, কলিকাতা । মূল্য ২০ ।

জীবন তাহার হৃৎ-হৃৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র বর্ণনায় একট
কুতূহলী কিশোরচিন্তে প্রতিফলিত হইতেছে । এই কিশোর অল্প ।
সুন্দরীমানে, অর্থাৎ যে-সময়টা অনভিজ্ঞতার শুচিতা প্রাণশক্তি প্রবল,
সে-সময় এই জীবনের দিকে অ্যাট্রিউট অপরূপ ধরণের । কৈশোর-জীবনের
কণকথার যুগ—অ্যাডভেঞ্চার বা জয়যাত্রা যুগ—অনুভূতির মধ্যে স্বপ্নের
আমোদ—বা হৃৎকে তুলিয়া ধরে এক অতি-বাস্তবতার কোটায় ; হৃৎ-
আশঙ্কাকে প্রাণের উত্তাপে গলাইয়া অবাস্তবের, অগ্রাহ্যের স্তরে নামাইয়া
আনে অসুখমী সন্ধিপনের সঙ্গে জীবন চলে তবত্ব বেগে, অনকুল
বাতাসে পাল-তোলা তরঙ্গের মত । এই জীবনায়নে আবার প্রেমও আছে ;
কিশোর অল্প ভালবাসিল কিশোরী উমাকে । কণকথার প্রেম, বাধ্যবীন
এক অপূর্ণ অনুভূতি ।

যৌবনের সঙ্গে পরিবর্তন আসে । দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায় ।
কল্পরীমূলের মত চিত্ত এক অস্পষ্টানুভূত সত্যের উদ্ভাসনার ব্যাকুল, উদ্ভাসিত
হইয়া পড়ে । এই সময়টি পুরাতনের সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং নুতনের সঙ্গে নব
পরিচয়ের যুগ । কিন্তু এর ট্রাজেডি এই যে নুতনের সঙ্গে যোগসূত্র কখনই
দৃঢ় হয় না ; কেননা জাগ্রত, অভিজিজ্ঞাত মন আর কৈশোরের সেই ভয়ল
মন নয়, সঙ্কল্প-স্থাপনের মন নয় । যৌবনের এই সাধারণ ট্রাজেডি ;
অরুণের মত ইন্টেলেকচুয়াল বা বুদ্ধিবর্ধী মনের পক্ষে এ-ট্রাজেডি আরও
করণ । সব চেয়ে ট্রাজেডি এই যে উমার সঙ্গে প্রেমও এই সময়
বেধন ময় ; কেননা সেটা হইয়া পড়িয়াছে সত্য, আর কণকথার অ্যাড-
ভেঞ্চার মাত্র নয় ।

এই প্রেম প্রতিধান পাইল না । তাহার কারণ উমা (সেও বুদ্ধি-
বিলাসিনী) মনে করে—‘ভালবাসার স্বপ্নের চেয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হচ্ছে
বড় সত্যিকার ।’ উমা বন্ধুত্বের স্বপ্ন রাখিতে চায়, কমরেড হইতে চায় ।

কিন্তু যে ভালবাসিল তাহার জীবনে প্রেম কখনও বিফল নয় । অনেক
সময় বিশেষ করিয়া অরুণের মত জিজ্ঞাসু মনের পক্ষে, প্রতিধান পাইল
কি ন-পাইল, সে কথাটা এক রকম অবাস্তব । সে ভালবাসিয়াছে ।
এই ভালবাসা জীবনের মহা অবলম্বন । তাহা প্রেমাস্পদকে আনিয়া দিতে
পারে নাই, কিন্তু জীবনসত্যের রহস্য প্রস্ফুট করিয়া দিয়াছে । এটা কেমন
করিয়া হব, প্রকৃতির রাজ্যে রাসায়নিক জিজ্ঞাসার মত তাহা অবোধ্য ;
কিন্তু হয়, অরুণের জীবনেও হইল । সে যে-বন্ধন খুঁজিয়াছিল তাহা
না-পাওয়ার ভীত বেধনার মধ্য দিয়া মহামুক্তিব সন্ধান পাইল ।

অবশ-উমার জীবনের সমান্তরালে অরুণের কাকার জীবনটি করণ-
সম্বর । সেখানেও প্রেমের ট্রাজেডি—বেধনার এক অভিনব রূপ । এই
হৃটটি চিত্র পরস্পরকে খুব ফুটাইয়াছে ।

কইয়ের লিপিবদ্ধতা খুব সুন্দর । তবে বর্ণনা ও রিপ্রেজেন্টেশনের
এক এক জায়গায় মাত্রাধিক্য হইয়া যাওয়ার ক্রান্তি আসে । ৩০৪ পাতার
একখানি বই যে-পাঠককে পড়িতে হইবে তাহার ঐচ্ছ্যের দিকে লক্ষ্য
রাখাও আটের একটা অঙ্গ ।

ক্ষণবসন্ত—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী । গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স, ২০৩/১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা । পৃ. ২০৪ । মূল্য ১০ ।

ছোটগল্পের বই। দশটি গল্প আছে। ইতিপূর্বে “মনের গহনে” সমালোচনার, ষষ্ঠটা চোখে পড়িবাছে, সরোজবাবুর লেখার বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় দিয়াছি; একই ধরণের বই বলিয়া আর পুনরুক্তি করিলাম না। সরোজবাবুর ভজ্জেরা, অথবা অল্প দিক দিয়া বলিতে গেলে, বাঁহারা প্রকৃত ভাল গল্পের রসিক তাঁহারা, এই বইখানির নিশ্চয় সমাদর করিবেন। “কৃতজ্ঞতা বড় দ্বন্দ্ব” গল্পটি চলতি ভাষায় লেখা। একই বইয়ে ভাষা বদলি রকম প্রয়োগ না করিলেই যেন ভাল ছিল। সূচী না থাকায় একটু অসুবিধা হয়।

বনফুলের গল্প—শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য ১৫।

১৯২ পৃষ্ঠার ৩৪টি গল্প, এই খেকেই গল্পগুলির কার্য সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা হইবে। অবশ্য শেষে কয়েকটি সাধারণ-গোছের গল্পও আছে এবং সর্বশেষের গল্পটি ৫৭ পৃষ্ঠাব্যাপী—ছোট একটি উপন্যাস বলিলেও চলে।

এক, দুই, তিন পাতার সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র গল্পগুলি যেন এক-একটি ছুঁই ফুলের মত—গন্ধে আর সুসমঞ্জস রূপে একেবারে আনন্দসম্পূর্ণ; এক কণা মধুর চারি দিকে ছুঁইফুলটির মতই এক-একটি ক্ষুদ্র অথচ মর্দঙ্গশীর্ষা আইডিবা আশ্রয় করিয়া প্রস্ফুট। লেখক দয়ম দিয়া জীবনকে দেখিয়াছেন, বুঝিয়াছেন এবং আপাতদৃষ্টিতে বা নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং অকিঞ্চিৎকর এমন সব ঘটনার মধ্যেও রসের সম্ভাবনা পাইয়া সেগুলি সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। সাহিত্যের প্রাণ-বস্তুর সহিত পরিচয় না থাকিলে এটা সম্ভব হয় না। এই যে অতি-অল্পকৈ অল্প কথায় মনোনিয়ম করিয়া সূচীই তোলা, অবজ্ঞাতকৈ বর্ণনায় দিয়া পবিচিত করা, ইহাতেই “বনফুল”-এর কৃতিত্ব। এই ছোটদের পরিচয়-গোয়েই তিনি “বনফুল” নাম লইয়াছেন। এ-নাম তাঁহার সার্থক হইয়াছে।

বড় গল্পটিতেও তাঁর শক্তি অব্যাহত আছে। তবে এটি এ-বইয়ের সন্নিবিষ্ট না করিলেই যেন নির্দোষের ধারাটি বজায় থাকিত।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীতিসংগ্রহ—শ্রীমৎশ্যামকমলেশ্বরানন্দ সঙ্কলিত। প্রাণ্ডিহান—৬৪ নং শত্ৰুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য ৬।

বৈদিক সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিরূপণগুলির সংকলন সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার প্রশংসনীয় প্রয়াস বর্তমানে নানা স্থানে লক্ষিত হইতেছে। আলোচ্য গ্রন্থে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল হইতে তিনটি প্রসিদ্ধ সূক্ত (নাবদীয় সূক্ত, হিরণ্যসর্ভসূক্ত ও পুরুষসূক্ত) ও শতপথব্রাহ্মণের ঋগ্বেদপ্রশংসা নামক অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে পদব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, বিনিয়োগ ও ব্যাকরণবিচারবাদের সাধারণতন্ত্রের অবশিষ্ট অংশ ও ভাঙ্গানুবাদ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। সূত্র, রীতি, প্রলয় ও পরমেশ্বর প্রভৃতি সম্বন্ধে ঋগ্বেদে যে তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহার পরিচয় এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সহজেই পাওয়া যাইবে। স্মৃতবাং ইহা দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসক ব্যক্তির নিকট বিশেষ আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। অজ্ঞাত যজ্ঞের আশ পূর্বক যজ্ঞের মূলও মোটা অক্ষরে সূত্রিত হইলে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত। গ্রন্থমধ্যে বিশেষতঃ মূল অংশে কতকগুলি মুদ্রাকরপ্রমাদ পরিদৃষ্ট হইল। সংস্কৃত অংশের বর্ণবিভাস বিষয়ে বঙ্গ অপ্রচলিত কিছু কিছু নুতন রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। সংযোগস্থলে বর্ণের পক্ষমবর্ণ স্থানে অনুস্বাৰ ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাদ্যলীর নিকট

দৃষ্ট-বিরুদ্ধ। বস্তুতঃ ইহা সর্বত্র (অন্তরিক্ষ, জনরাজি, অযজ্ঞত) ব্যাকরণগুণও নহে। রেকোন্সরবর্ণের দ্বিধবর্জন সম্বন্ধে নিরনানুবর্তিতার অভাব লক্ষণীয়—তাই, ‘কর্তৃৎ’ ও ‘বর্তিৎ’র যুগপৎপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

বৈদিক সাহিত্যে বহুব্যবহৃত লকারের মুখ্যন্যায়কে শুদ্ধ লকার দ্বারা নির্দেশে স্থানে স্থানে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। তাই কেহ কেহ ইহাকে বিন্দুযুক্ত করা যুক্তিসূক্ত বিবেচনা করেন অথবা ‘ড’ ‘ঢ’ বর্ণের সাহায্যে কাজ চালাইয়া থাকেন। বর্তমান গ্রন্থে এরূপ কিছুই করা হয় নাই। আশা করি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে প্রকাশক মহাশয় এই সকল দিকে দৃষ্টি দিবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ভারত ও মধ্য-এশিয়া—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী। ভারতী ভবন, ২৪।এ কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। পৃ. ৬৮+ ১১৬। মানচিত্র + ২৩ ছবি।

আলোচ্য পুস্তকে পাঁচ অধ্যায় ও এক পবিশিষ্ট আছে। তাহাতে ঋষাক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—পঞ্চ-যাটের কথা, মধ্য-এশিয়ার প্রান্তভূমি, কাশ্মীর ও খোঁটান, তুন হোরাংএর পাশে, সূচী ও অরিয়াল। উল্লিখিত স্থানসমূহের প্রাচীন সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সভ্যতা এবং আংশিকভাবে চীন, গ্রীস ও পারস্যের সভ্যতার কোথায় কোথায় যোগ আছে তাহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। পবিশিষ্টে মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণের গবেষণার সূচী ও সামান্য বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

অবীত বিষয়ের প্রতি গ্রন্থকারের আন্তরিক অনুরাগ আছে বলিয়া ইহাখানি মনোহর হইয়াছে। হ্রদ্বত তাঁহার ভাষার চরমপ্রদান শাস্ত্রীয় ভাষার মত সাহিত্যরসের প্রাচুর্য্য নাই, কিন্তু ইহার সাকলীয় গতিতে পাঠকের মনকে কোথাও ক্লান্ত হইতে দেয় না। ছবিগুলি মধ্য-এশিয়ার শিল্পকলার স্থলপ পরিচয় প্রদান করে।

একখানি সূচীপত্র থাকিলে এবং মানচিত্রখানি আবণ্ড হৃদয় হইলে পাঠকের সুবিধা বাইত।

মোটের উপর বইখানি আমরা বাদ্যলী পাঠকসমাজকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

পালিতের বাঁকুড়ার ভূগোল ও ইতিবৃত্ত—শ্রীহরীচন্দ্রমার পালিত প্রণীত। এস. কে. পালিত এণ্ড কোং, পুস্তক-বিক্রেতা, বাঁকুড়া। মূল্য ছয় আনা।

প্রায় বার বৎসর আগে শ্রীমামুজ কর প্রণীত “বাঁকুড়া জেলার বিবরণ” নামে একখানি উৎকৃষ্ট ভাষাবল গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হাজিরে জন্ম লেখা হয় নাই, বর্তমান গ্রন্থখানি বিশেষভাবে সুদের হাজিরে জন্ম লিখিত। একপ চেষ্টা প্রশংসনীয়। ইহাতে জেলার সম্বন্ধে অনেক সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

সুগন্ধ রসায়ন—শ্রীমতীশচন্দ্র রায়, বি এম-সি। প্রাণ্ডিহান : ১৭, বারাগনী বোথ স্ট্রিট, কলিকাতা। পৃ. ৩২। মূল্য ৬।

পুস্তকখানিতে লেখক নিজের অভিজ্ঞতাগ্রন্থত কেশপেতল, পাউডার প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী এবং তাহাদের যথাযথ উপকরণ ও পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাঁহারা এই সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত করিতে আগ্রহবিত, পুস্তকখানি তাঁহাদের যথেষ্ট কাজে লাগিবে।

অ'টি ও আসক্তি—ঐরাঙ্গেললাল দে। আলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা। পৃ. ৫৫+১০, মূল্য আট আনা।

ইহা একখানি রসায়নশাস্ত্রের পুস্তক, কিন্তু নাম দেখিয়া প্রথমে অল্প কণ ধারণার সৃষ্টি হয়। লেখক cohesionকে বাংলায় অ'টি ও affinityকে আসক্তি বলিয়াছেন। পুস্তকের এই অল্প কয়েকখানি পৃষ্ঠার মধ্যেই লেখক—“পুষ্টিতকরণ, রাসায়নিক তৌলবস, ল্যাভোসিয়েরের পরীক্ষা, অগ্নিজ্ঞানের পরিমাণ নির্ণয়, অগ্নিজ্ঞান প্রস্তুত ও তাহার মধ্যে ঘননক্রিয়া, ডালটন অনুবাদ, গ্যাসন্যূসকের আবিষ্কার, আভাগাদব্রোর অণুকণাবাদ” হইতে মার ইন্ডক “Young's Modulus” পর্যন্ত কিছুই বাদ রাখেন নাই। একে নবোদ্ভাবিত পারিত্যায়িক শব্দের বাহুল্য, তাহাতে আগাগোড়া ভাবার অসহনীয় জড়তা—কেবল শিক্ষার্থী নয় বহু প্রবীণ শিক্ষককেও নাকাল করিয়া ছাড়িবে। পরিভাষার একটি নমুনা : লেখক ‘U-Tube’-এর পরিভাষা করিয়াছেন “‘উ’-আকার পাত্র”। ইংরেজী ‘U’ ও বাংলা ‘উ’ অক্ষরের মধ্যে আকৃতিগত কোন সামঞ্জস্য আছে কি?

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বেদান্ত-প্রবেশ—প্রণেতা রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বেদান্তবিদ্যার্যব। জয়নগর, পোঃ জয়নগর-মজিলপুর, বেঙ্গা ২৪-পরগণা। ১৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা।

এই বইখানি গ্রন্থকারের একটি বৃহত্তর বইয়ের ভূমিকাধরূপে লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু আপাততঃ স্বতন্ত্র ভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণভাবে বেদান্ত-তত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং বিশেষভাবে শ্রীমদ্ভাগবত ও বেদান্তের এক্রয় প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

গ্রন্থকারের লেখার ভঙ্গিটি একটি মধ্যযুগীয় বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরের শক্তির বাহিরে আমরা বাঁচিতে পারি না, ইহা টিক; কিন্তু তথাপি আহারে, বিহারে, শয়নে ও স্বপনে—কথার কথার আমরা ঈশ্বরের সোহাই রিয়া অগ্রসর হই না। ঈশ্বরে ভক্তি হ্রাসের জন্ত নয়, আধুনিক রীতিই ইহা। ক্ষেত্রতা বর্জনীয় রূটি অনুসারে প্রতিপদে “ভগবচ্চরণে ভক্তিতেই হৃৎ-প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করতঃ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইজেই” (১ পৃ.) এইরূপ বলা, ভগবদ্-ভক্তির অনাবশ্যক বিমোহণ।

ভাগবত ও বেদান্ত একার্থভৌতিক কিনা, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। অদ্বৈতবাদও বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত, দ্বৈতবাদও তাই; কিন্তু উভয়ে এক ন্দ্র। ভাগবত নিজেই বেদান্তের টাকা বলিয়া এচার করিয়াছেন; গোবিন্দ-ভাষ্য প্রভৃতি এই মত মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদী একান্তে ভাগবতের বিরুদ্ধে কিছু না বলিয়াও এই মত অগ্রাহ্য করিতে পারেন। প্রাচীন কালে তাহা ঘটনাছে, বর্তমানেও অসম্ভব নয়। সুতরাং সকল বিষয়ে আলোচ্য গ্রন্থকারের সহিত মতের এক্রয় আমাদের হয় ত নাই; কিন্তু তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও বিপুল অধ্যয়নশীলতার যে-পরিচয় বইখানিতে আমরা পাই, তাহাৎ প্রশংসা না করিয়া পারি না।

বইখানা বেদান্ত-চর্চায় সহায়ক হইবে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, আর, যে বৃহত্তর গ্রন্থের ইহা অল্প, আশা করি গ্রন্থকার অবিলম্বে তাহাও প্রকাশ করিয়া বেদান্ত-পাঠকের আরও উপকার করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা অকপটে তাঁহার বিদ্যাবিস্তার ও গভীর জ্ঞানের সুখ্যাতি করি।

সমাজ ও সাহিত্য—কাজী আবদুল ওয়হাব এণ্ডীত। মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ৩ নং বঙ্গেশ্বর স্টোর, কলিকাতা। পৃ. ১৮৪ + ১০। মূল্য এক টাকা।

বইখানিতে সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ সমাবিষ্ট হইয়াছে; তবে এই প্রবন্ধগুলির ভিতর একটা সাধারণ স্রব সহজেই অনুভব করা যায়। কাজী সাহেব মানুষের বুদ্ধিব মৃত্তিকামীনের মধ্যে এক জন; এবং প্রধানতঃ এই কথাটাই নানা ভঙ্গিতে তিনি এই বইয়েতে প্রকাশ করিয়াছেন।

দুই-একটি প্রবন্ধের বক্তব্য বিপর্যয় লইয়া মতভেদ অসম্ভব নহে। ‘পথ ও পথে’ নামক প্রবন্ধে চন্দ্রকার ইকবাল সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন, ইকবাল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা হয়ত তাহা স্বীকার করিবেন না। তা ছাড়া, ইসলামের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছেন তাহাও সকল মুসলমানেরই মনঃপূত হইবে কি না, সন্দেহ। তথাপি একথা পাঠক মাঝেই স্বীকার করিবেন যে, কাজী আবদুল ওয়হাব সাহেব এক জন ভাবগ্রাহী এক চিন্তাশীল লেখক; আর তাঁহার ভাবের প্রাণ আছে এবং ওজস্বিতা আছে। বাংলার বর্তমান সম্বন্ধে দিনে এই শ্রেণীর লেখা এবং লেখকের প্রয়োজন প্রচুর।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সরল হিন্দী শিক্ষা—শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী এণ্ডীত। হিন্দীপ্রচার কার্যালয়, ২ নং মহামায়া লেন, কলিকাতা। ২৫৮ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ টাকা।

যে-সকল বাংলাভাষী হিন্দী শিখিতে চান, বহিষ্ট তাঁহাদের পক্ষে উপযোগী। লেখক জ্ঞাতব্য বিষয় সরলভাবে বুঝাইয়া বলিতে পারিয়াছেন এবং শব্দাবলী ও তাহার অনুবাদ, ব্যাকরণ ও তাহার প্রয়োগ ইত্যাদি সমাবেশ করিয়া শিক্ষার্থীদের অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীধনুকুমার জৈন

আকাশ-পাতাল—শ্রীমৌরীন্দ্র মজুমদার। প্রকাশক—স্বপ্নদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

মিলের শ্রমিকদের বস্ত্র-জীবন লইয়া লেখক এই কাহিনী লিখিয়াছেন। পল্লী হইতে শহরে আসিয়া, সরল শ্রাম্যযুবক কানাই অধঃপতনের পক্ষিল শ্রোতে ভাসিয়া গেল, আপন সাথী স্ত্রী গঙ্গাবতীকে অর্থ-আধারের যন্ত্র-বন্ধপ জ্ঞান করিয়া সময়ে-অসময়ে বত প্রকারেই না নির্ধাতন করিতে লাগিল, এমন কি স্ত্রীকে ধনিক কার্মকের কামানলে আহতি দিবার চেষ্টাও তাহার বাধিল না; পরে আপন হাতে গলা টিপিয়া সন্তান পর্যন্ত সে হত্যা করিল। ব্যর্থ ও প্রেমিক কবি রজন্য ঘটনাচক্রে এ মিলেই চাকুরী লইয়া গঙ্গাবতীর আত্মহান অধিকার করিয়া তাহাকে বহু প্রকারে সাহায্য করিতে লাগিল। শ্রমিকদের সম্বন্ধে করিবার জন্ত তাহার এাপপ চেষ্টা ও বনিকের চক্রান্তে কারাবরণ। কারামুক্ত হইয়া দুঃস্থ গঙ্গাবতীকে বাঁচাইবার জন্ত সে টাকা চুরি করিল ও মোটর চাপা পড়িল। দুঃখের আবর্তে চারিটি সন্তান হারাইয়া গঙ্গাবতীও অবশেষে পাগলিনী হইল। দুঃখেই কাহিনীকে যোরাগ করিবার বত কিছু পুষা, লেখক কোনটাই উপেক্ষা করেন নাই, অথচ যে রসজ্ঞান ও লিপিবুদ্ধতা থাকিলে সর্ব-হারাদের বেদনা মানুষের মনে চিরন্তন রেখাপাত করে, তাহারই জ্ঞাব অত্যন্ত বেশী। অনাবশ্যক দীর্ঘ বর্ণনা মনকে পীড়িত করিয়া তুলে

বচন-বিশ্বাসে নাটকীয় ভাব এবং উত্তমপুঙ্খের মত-প্রাধান্য উপস্থাসের রসযুক্তির প্রধান অন্তরায়। ছাপাব ভুল ও উপমার অসামঞ্জস্য কিছু কিছু আছে, কিন্তু ‘আলগোছা’, ‘ছড়িয়ে ঘিষে আস’, ‘দোজিগুচ্ছ’, ‘পিতাব স্নেহময়ী কোল’, ‘চাবকিয়ে দাঁত ভাঙ্গবে’, ‘টটু’, ‘বাকুনী’, ‘পতিব্রতা দেখিও না’, উল্লিখিত হয়ে উতলিয়ে পড়তে লাগলো’, ‘মুচ্ছে-মুচ্ছে’, ‘কিমার মত ক্ষত বিক্ষত’ প্রভৃতি (বাহুল্যভয়ে বেশী উল্লেখ করা গেল না) সত্যিই মারাত্মক (অবশ্য যদি ছাপারই ভুল হয়।)। প্রচ্ছদপটের পবিত্রনাট্য হ্রস্ব।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধের অভিধান—প্রজ্ঞানন্দ স্ববির সঙ্কলিত ও ব্রহ্ম-প্রবাসী চট্টল-বৌদ্ধদের অর্থায়ুকৃত্যে প্রকাশিত। মূল্য ২১ টাকা।

গ্রন্থকার বহু পালি গ্রন্থ হইতে বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী ও দেবদত্তের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেবদত্ত বহুদিন বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন, অবশেষে তিনি সমান, প্রতিপত্তি, সহস্র সমস্ত হারাইয়া দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তীর্থ যাত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। পূর্বকৃত অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার অনুশোচনা উপস্থিত হইলে, তিনি বুদ্ধদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অধীবা হইয়াছিলেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের দর্শনলাভ করিতে পারেন নাই, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিলেন। প্রমোদন ও উপদেশে এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের বাণী সর্বল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থপাঠে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ হয়। গ্রন্থের পবিত্রিষ্টে সাধারণের জ্ঞাতব্য প্রাচীন ভারতের নগর ও জনপদের ভৌগোলিক নির্দেশ আছে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

আই হাঙ্গ—শ্রীকেশবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। স্কন্দাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য ২১ টাকা মাত্র।

রসসাহিত্যিক কেশবদাস বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত; তাঁহার “আই হাঙ্গ” আগ্রহের সহিত পড়িলাম। ইহাখানি পড়িয়া ভালই লাগিল; অবশ্য, কেশবদাসবুর বইগুলি কতকটা একই ছাঁচে ঢালা, তাঁহার হস্তরসও কতকটা একই ধরণের; চরিত্রগুলিও অনেকটা এক রকমের; হস্তরাস মাঝে মাঝে পড়িতে পড়িতে হস্ত রাস্তি আসে। কিন্তু তাহার লক্ষ অপরাধ লেখকের নহে, লেখক যে ছবি আঁকিতে চাহিয়াছেন তাহার উপজীব্য। কেশবদাসবু জীবনটাকে সমগ্ররূপে যেভাবে দেখিয়াছেন সেইভাবে তাহার ছবিটি দিতে চাহিয়াছেন; তিনি তাহা হইতে বাহিয়া সাজাইয়া উপস্থাস রচনা করিতে বলেন নাই। তাঁহার “কোঞ্জীর বলাকল,” “আই হাঙ্গ” প্রভৃতি গ্রন্থগুলিকে উপস্থাস না বলিয় চিত্রসমষ্টি বলিলেই ভাল হয়; এই চিত্রগুলির পরস্পরের মধ্যে যোগ রহিয়াছে, একই জিনিষ বিভিন্ন ছবিতে বার-বার একই রূপে দেখা দিয়াছে; কিন্তু তবুও সেগুলিকে স্বতন্ত্রভাবেও দেখা চলে। “আই হাঙ্গ” একটানা পড়িতে গেলে রাস্তি আসে; কিন্তু অবসররূপে মাঝে মাঝে একটু করিয়া পড়িলে এক-একটি ছবি চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। তখন জীবন যে সাধারণত একান্ত বৈচিত্র্যহীন একথা আর মনে হয় না। অথচ কেহ যদি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে জীবনকে দেখে তবে তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি দেখিবে; সকলেই একই ভাবে জীবনের সহিত বোঝাপড়া করিবার চেষ্টা করিতেছে; সে রঙ্গমঞ্চে নটগুলির বেশ বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু শেষ বোঝাপড়ার মধ্যে প্রকৃতিগত কোন প্রভেদ নাই। লেখকের চোখে জীবননাট্যের সেই দিকটি চোখে পড়িয়াছে যেখানে মানুষ জ্ঞানের তাড়নার জানিয়া-গুনিয়াও সত্যের সহিত আপোষরখা করিয়া চলে, মিথ্যাচারের আশ্রয় লয়। শিবু লেখাপড়া শিখিয়াও “আই হাঙ্গ” বলিত;

তারণ “ছাড” বলিলে ব্যাকরণসম্মত হয় বটে কিন্তু বড়বাবু সম্মত হন না, চাকরি সেলে না। হস্তরাস মিথ্যা বিনয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। জীবনদরদী লেখকের লেখার জীবনের ট্রাজেডির এই ছবি সঙ্গত হইয়া উঠিয়া উঠিয়াছে; তাই তাঁহার হাসির মধ্যে বিজ্ঞপেব কশাঘাত নাই, অশ্রুসিক্ত করুণার রশ্মিসম্পাতে তাহা মধুর হইয়া উঠিয়াছে। হাসি-বাসীর আলোছায়াময় এই জীবনকে বিজ্ঞপ করা সহজ; কিন্তু তাহাকে দ্রব দিয়া দেখা কঠিন। সে দৃষ্ট থাকিলেই তবে এই মিথ্যাচারের পিছনে যে খাঁটি মানুষ আছে তাহা চোখে পড়ে। লেখক সে-মানুষকে দেখিয়াছেন, তাহাকে ভালবাসিয়াছেন, শ্রদ্ধা করিয়াছেন; তাই তাঁহার লেখা ভাল লাগে।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

পাঁচশিশালী গল্প—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি-এ, প্রণীত। কুম্ভাবন ধর এণ্ড সন্স লি: কর্তৃক ৫ নং কলেজ রোয়ার, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য গল্পপুস্তক। ইহাতে সর্বস্বত্ব নবটি গল্প মঞ্জিত হইয়াছে; ইহাদের সকলগুলিই শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা ‘শিশুসাবী’তে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, সম্প্রতি উহার এবং সংবদ্ধ হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় শিশুসাহিত্যের রসিকতা হিসাবে বিশেষ অসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং এই পুস্তকের কয়েকটি গল্প তাঁহার সেই স্থল অঙ্গুর রহিয়াছে; বিশেষতঃ “খোদার উপর কেরামতী” ও “বোকার রোজগার” অতিশয় মনোরম হইয়াছে। কিন্তু দুই-একটি গল্প কিছু নীরস হইয়াছে এক মনে হয় উহার শিশুগণের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে না। শিশুসাহিত্যকে একাধারে চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ বরাই প্রয়োজন এবং সে আদর্শ যেখানে ক্ষুদ্র হইবে, সেইখানেই শিশুসাহিত্য রচনা নিরর্থক। এই হিসাবে লেখকের রচনা প্রশংসালভ্য করিবে সন্দেহ নাই।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

প্রাতিদ্বীকার

খাদ্যবিচার—শ্রীবিষ্ণুদাস চক্রবর্তী সঙ্কলিত। মূল্য এক আনা প্রাপ্তিস্থান—সাহিত্য-ভবন প্রেস, ২৬, মীটারাস ঘোষ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

ভারতীয় মতে খাদ্যবিচার, খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ, পাকত্ব মতে খাদ্যবিচার, ভিটামিন ও তাহার প্রাপ্তিস্থান, আহার সম্বন্ধীয় কয়েকটি বিবিনিষেধ ইত্যাদি এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

উত্থানের পথ—শ্রীমদ্রথনাথ শ্যামব্রত ভট্টাচার্য প্রণীত। মূল্য ছয় আনা। প্রাপ্তিস্থান—১০৫ অপার চিংপুং রোড, কলিকাতা। ত্র্যক্ষর্যশিক্ষাসম্বন্ধীয় পুস্তক।

সোহরাব-রোস্তম—এ এইচ. এস. বসির উদ্দিন, বি-এল, প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী ও ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।

বালকদিগের জন্য লিখিত একাঙ্ক নাটক।

জেজুরের মিত্র-বংশ—শ্রীমদ্রথনাথ মিত্র বর্মা প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—৫ নং ললিত মিত্র সেন, কলিকাতা।

হুগলী জেলার অন্তর্গত জেজুর গ্রামের মিত্র-বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—সন ১০৫০ সাল হইতে সন ১৩৪০ সাল পর্যন্ত।

যুগান্তর

“বনফুল”

১

এককড়ির প্রাপৌত্র, ছ'কড়ির পৌত্র, তিনকড়ির পুত্র বাবু পাঁচকড়ি পোন্ধার স্বীয় পুত্র ছ'কড়িকে লইয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হরিণহাটি গ্রামে পাঁচকড়ি পোন্ধারকে সকলেই যথেষ্ট খাতির কবিত। বস্তুত তিনি উক্ত গ্রামের মধ্যম-স্বরূপ ছিলেন। সকল বিষয়ে তাঁহার মতটাই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইত। সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ কবিবার মত মানসিক স্থিতিস্থাপকতাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। যে-কোন বিষয়ে—সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, সিনেমা, বর্তমান সামাজিক অবস্থা, জীশিক্ষা, পাটের দর, কয়লা-ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ—যে-কোন বিষয়ে স্বকীয় মতবাদ যখন তিনি তর্জ্বনী আফালন করিয়া জাহির কবিতেন তখন হরিণহাটি গ্রামের সকলেই তাহা মাননে মানিয়া লইতেন এবং মানিয়া লইয়া নিজেদের ধস্তা জ্ঞান করিতেন।

অল্প উপায় ছিল না।

পাঁচকড়ি পোন্ধার প্রচুর ধনসম্পত্তিশালী মহাজন এক গ্রামের ইতর-ভ্রম প্রায় সকলেই তাঁহার খাতক। স্তত্রার হরিণহাটি গ্রামে সঙ্গীত, সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি যে-কোন বিষয় সম্বন্ধে বাবু পাঁচকড়ি পোন্ধারের মতামতই চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত। ইহাতে বাহারা বিশ্বাস বোধ করিতেছেন তাঁহাদের কিছুকাল হরিণহাটি গ্রামে গিয়া বাস কবিতো অহরোধ করি। দেখিবেন জল না থাকিলে যেমন পুষ্করিণী অচল, পোন্ধার মহাশয় না থাকিলে হরিণহাটি গ্রামও তেমনি অচল। পোন্ধার মহাশয় তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি উত্তরাধিকারস্থত্রে লাভ করিতে সারা-জীবনটা ভরিয়া নানা প্রকার মতবাদ গঠন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং এই মতবাদগুলি লইয়া যেখানে-সেখানে

যখন-তখন আফালন করিয়া বেড়ানোটাই তাঁহার জীবনের প্রধান বিলাস ছিল। মতবাদগুলির বিস্তৃত আলোচনা এই গল্পের পক্ষে নিশ্চয়োজন। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু জানিয়া রাখুন বাবু পাঁচকড়ি পোন্ধার যে-কোন প্রকার আধুনিকতার বিরুদ্ধবাদী। এমন কি, তিনি বোতামের বদলে ফিতা ব্যবহার কবেন। ফিতা-বাঁধা ক্ষত্থাই তাঁহার সাধারণ স্বভাব। অদ্যাবধি কেহ তাঁহাকে জুতা পরিতে দেখে নাই। খড়মই চিরকাল তাঁহার চরণ রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

এ-হেন পাঁচকড়ি পোন্ধার পুত্র ছ'কড়ির নিকট ঘা খাইলেন। কনিষ্ঠ পুত্র সাতকড়ি মারা যাওয়ার পর হইতে আদর দিয়া দিয়া গৃহিণী ছ'কড়ির মাথাটি এমন ভাবে খাইয়াছেন যে পুত্রটি মুণ্ডহীন কেতুর ত্রায় মর্শাস্তিক হইয়া উঠিয়াছে। যখনই সে কলিকাতায় পড়াশোনা করিতে যায় দূরদর্শী পোন্ধার মহাশয় তখনই আপত্তি কবিয়াছিলেন। বি-এ, এম-এ, পাস করিয়া দশটা মুণ্ড, বিশটা হাত কিছুই গজাইবে না। তর্কের খাতিরে যদি ধরাই যায় যে গজাইবে—তাহাভেই বা কি? এই বাজারে অতগুলো বাড়তি হাত ও মুণ্ড লইয়া হইবে কি! কিন্তু গৃহিণী শুনিলেন না এবং মেয়েমাছবের বুদ্ধিতে পড়িয়া তিনিও মত দিয়া ফেলিলেন—এখন নাও—ছেলে ‘লভে’ পড়িয়াছে!

২

ছেলে যে ‘লভে’ পড়িয়াছে এ-কথাটা প্রথমত পোন্ধার মহাশয় বুঝিতেই পারেন নাই। তাঁহার প্রিয় বয়স্ক মাধব কুতুব সাহায্য লইয়া তবে তিনি পুত্রের পত্রের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

ঘটনাটি এইরূপ :

একদা পাঁচকড়ি পোন্ধার চিন্তা কবিয়া দেখিলেন যে

ছ'কড়ি বয়স বাইশ উত্তীর্ণ হইয়া গেল অথচ তাহার বিবাহ এখনও দেওয়া গেল না, 'ইহা অত্যন্তই অশ্রায় হইতেছে। বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই ছ'কড়ি লেখাপড়ার অজুহাত উপস্থিত করে। কিন্তু পোন্ধর মহাশয় ভাবিয়া দেখিলেন এবং মাধব কুণ্ড ও সে-কথা সমর্থন করিলেন যে জোর করিয়া বিবাহ না দিলে ছ'কড়ি কিছুতেই বিবাহ করিবে না এবং এই যৌবনকালে বিবাহ না কবিলে নানা প্রকাব অঘটন ঘটিতে পারে—বিশেষতঃ কলিকাতার মত শহরে।

পোন্ধর মহাশয়ের স্বজ্ঞাতি ও বাল্যবন্ধু বিশ্বনাথের মেয়েকেই তিনি ছ'কড়ির জন্ত মনোনীত করিয়া রাখিয়াছেন। বহু দিন পূর্বেই বিশ্বনাথের সহিত তাঁহার কথাবার্তা গোপনে পাকা হইয়া আছে।

বিশ্বনাথ কলিকাতায় বেশ ফালাও ব্যবসা করেন, লোকও ভাল, পোন্ধর মহাশয়ের ভাষা পছন্দ। তাছাড়া বাল্যবন্ধু। সর্বোপরি বছর-চারেক পূর্বে বিশ্বনাথ যখন দেশে আসিয়াছিল তখন তিনি তাহাকে এক রকম পাকা কথাই দিয়াছেন। সুতরাং এখানেই বিবাহ দেওয়া ঠিক। মাধব কুণ্ডও এ বিষয়ে এক মত। পাকা কথা দেওয়ার পব হইতেই—অর্থাৎ প্রায় চারি বৎসর ধরিয়া—পোন্ধর মহাশয় ও বিশ্বনাথের পত্রযোগে বিবাহ-সম্বন্ধীয় নানারূপ আলাপ-আলোচনাও চলিতেছিল। পোন্ধর মহাশয় ভাবী পুত্রবধূ সম্বন্ধে বিশ্বনাথকে প্রায়ই লিখিতেন—

“দেখিও ভায়া, মেয়েটিকে যেন কেশিয়ান-দ্রবস্ত করিও না। ইম্মুলে-পড়া হাল-কেশিয়ানি মেয়েদের কাণ্ড-কারখানার কথা শুনিলে গায়ে জ্বর আসে। বউমাটিকে গৃহকর্মনিপুণা কর। আমার সহধর্মিণী এখনও ঢেঁকিতে পাড় দিতে পারেন এবং দশটা যজ্ঞির রায় একাই রাখিতে পারেন। তাঁহার দেওয়া বড়ি ও আমসত্ত্ব গ্রামহুঙ্ক লোক খাইয়া প্রশংসা করেন। দেখিও ভায়া, বউমাটি যেন এই ঢাল বজায় রাখিতে পারে—”

উত্তরে বিশ্বনাথ লিখিতেন—

“ভায়া, তুমি মোটেই চিন্তিত হইও না। মেয়েকে সম্ভারমর্মে স্ননিপুণা করিতে আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি নাই। তোমার বউমা মশলা বাটা, কাপড় কাচা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বপ্রকার গৃহকর্ম নিয়মিত ভাবে কবিয়া

থাকে। সম্প্রতি সে উল-বোনা ও জ্বরির কার্য করিতেও শিখিয়াছে। সেদিন সে একটি রেশমের কাপড়ে রঙীন হুতা দিয়া এমন সুন্দর একটি হংস আঁকিয়াছে যে দেখিলে মতাই অবাক হইতে হয়—”

ইহার উত্তরে পোন্ধর মহাশয় জবাব দিতেন—

“উল-বোনা ও জ্বরির কার্য সাধারণ গৃহস্থালীর কোন প্রয়োজনে আসে না। রেশম বস্ত্রে অঙ্কিত রঙীন হংসই বা কি এমন উপকারে আসিবে বুঝি না। তুমি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, লেখাপড়া শিখিয়াছ, তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার সাজে না। কিন্তু তোমাকে পুনঃ পুনঃ আমি এই অহরোধ জানাইতেছি, বউমাটিকে কেশিয়ান-দ্রবস্ত করিও না। কালের গতিক সুবিধার নহে। মাধব কুণ্ড শবরের কাগজ পড়িয়া আজকালকার হালচাল সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য করে তাহাতে আমাদের মত মূর্খ লোকের আকৈল গুড্ডুম্ হইয়া যায়—”

ফেরত ডাকেই বিশ্বনাথের জবাব আসিত—

“উল-বোনা ও জ্বরির কার্য বন্ধ করিলাম। রেশম বস্ত্রে কোন প্রকার চিত্রাদিও আর আঁকা হইবে না—”

এই ভাবে চারি বৎসর চলিতেছিল।

ছ'কড়ি বিন্দুবিসর্গ জানে না।

সে কলিকাতায় মেসে থাকিয়া পড়াশোনা করে, বিবাহের কথা উঠিলে বলে যে পড়াশোনা শেষ করিয়া তবে সে বিবাহ করিবে—তৎপূর্বে নয়।

কিন্তু মাধব কুণ্ড পরামর্শ অত্যাচারী পোন্ধর মহাশয় ঠিক করিলেন যে জোর করিয়া বিবাহ না দিলে স্বেচ্ছায় ছ'কড়ি বিবাহ করিবে না। আজকালকার ছেলেছোকরাদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা রকমের। এই প্রসঙ্গে মাধব কুণ্ড বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষগুলি লইয়া সবিশেষ আলোচনা করিলেন।

পরদিনই পোন্ধর মহাশয় মাধব কুণ্ড নির্দেশমত ছ'কড়িকে পত্র দিলেন যে আগামী মাসের ১৭ই তারিখে বিবাহের দিনস্থিতি হইয়া গিয়াছে, সে যেন অবিলম্বে বাড়ী চলিয়া আসে।

ইহার উত্তরে ছ'কড়ি যাহা লিখিল তাহাতে পাঁচকড়ি

আকাশ হইতে পড়িলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব যে এত দূর ভয়ঙ্কর হইতে পারে তাহা তাঁহার ধারণার অতীত ছিল। তিনি অবিলম্বে মাথব কুণ্ডকে ডাকিতে পাঠাইলেন। কি করিয়া এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে তাহা তাঁহার মাথায় আসিতেছিল না।

ছ'কড়ি লিখিয়াছে—

“বাবা, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি প্রায় ছয় মাস পূর্বেই বিবাহ করিয়াছি। আপনাকে এ-কথা জানাই নাই তাহার কারণ আপনি জীশিক্ষার ঘোর বিরোধী। মেয়েটি লেখাপড়া কিছু জানে। ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে। আমাকে ক্ষমা করিবেন। যদি অন্তর দেন আমরা উভয়ে গিয়া আপনাদের প্রণাম করিব ও সকল কথা খুলিয়া বলিব।”

কুণ্ড আসিলে তিনি পত্রটি তাহার হাতে দিলেন এবং বলিলেন, “ছ'কড়ি চিঠি। পড়ে দেখ—এর মানে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। পোন্ধর-বংশে এমন কুলদ্বার জন্মায়।”

কুণ্ড নীরবে পত্রখানি পাঠ করিলেন এবং আরও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, “লভে পড়েছে—”

“কিসে পড়েছে?”

“লভে—লভে—মানে প্রেমে—”

পোন্ধর মহাশয় শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, “এব মূলে কি আছে জান?”

কুণ্ড বলিলেন, “পাশ্চাত্য শিক্ষা—”

“না, আমার গিন্নি। ওরই পরামর্শে আমি ছেলেটাকে কলকাতায় পড়তে পাঠাই—দাও চিঠিখানা—”

পোন্ধর পত্রখানি লইয়া ঝড়ম চট্‌চট্‌ করিতে করিতে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণীর সহিত তাঁহার যে বচন-বিনিময় হইল তাহা প্রকাশ করিতে সম্মুচিত হইতেছি।

পরদিন আর এক কাণ্ড ঘটিল এবং তাহার ফলে পোন্ধর মহাশয়কে হরিণহাটি ত্যাগ করিতে হইল। কাণ্ডটি এই—বিশ্বনাথেরও একটি পত্র আসিল। তিনি পরদিন আসিতেছেন।

দিশাহারা পোন্ধর মাথব কুণ্ডর নিকট ব্যস্ত করিলেন যে বিশ্বনাথের নিকট তিনি মুখ দেখাইতে পারিবেন না।

তাঁহার পক্ষে হরিণহাটিতে আশ্রয়গোপন করা আরও শক্ত। কুণ্ড বলিলেন, “চলুন না, এই সময় বৃন্দাবনের তীর্থটা সেরে আসা যাক। এক টিগে দুই পাখীই মববে—” পাঁচকড়ি পোন্ধর তীর্থযাত্রা করিলেন। কুণ্ড সঙ্গী।

৪

দীর্ঘ ছয় মাস পোন্ধর মহাশয় তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। কুণ্ড সঙ্গে থাকতে ভ্রমণটা মনোরমই হইয়াছিল। কিরিবার পথে কানীতে তিনি বিশ্বনাথের এক পত্র পাইলেন। বিশ্বনাথ লিখিতেছেন—

“ভায়া, হরিণহাটিতে গিয়া তোমাব নাগাল পাই নাই। তুমি বাড়ীতে কোন ঠিকানাও রাখিয়া যাও নাই যে তোমাকে চিঠি লিখি। সম্প্রতি শুনিলাম তুমি না-কি কানীতে আছ এবং সেখানে কিছুদিন থাকিবার বাসনা করিয়াছ এবং এই মর্মে হরিণহাটিতে কুণ্ড মহাশয় একখানি পত্রও না-কি লিখিয়াছেন। সেই পত্র হইতে তোমাব ঠিকানা জোগাড় করিয়া তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিবার সময় পাই নাই। এখন অকপটে সমস্ত খুলিয়া লিখিতেছি এবং তোমার মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

“তুমি জীশিক্ষার ঘোরতর বিরোধী বলিয়া তোমাকে আমি জানাই নাই যে আমার মেয়েকে আমি স্কুলে পড়াইতেছিলাম। ভাবিয়াছিলাম তোমার সহিত দেখা হইলে জিনিষটা ধীরেস্থে তোমাকে বুঝাইয়া বলিব। আমি নিজে বিশ্বাস কবি লেখাপড়া শেখা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। ইহাতে নিন্দার কিছু থাকিতে পারে না।

“শ্রীমান ছ'কড়ি কলিকাতায় থাকিতে আমার বাসায় প্রায়ই যাতায়াত করিত এবং কুসুমের সহিত তাহার বেশ ভাবও হইয়াছিল। কুসুম ভবিষ্যতে তাহার পত্নী হইবে ভাবিয়া আমিও তাহাদের মেলামেশায় কোন বাধা দিই নাই। কিন্তু একদিন আমার জ্বর মুখে শুনিলাম যে মেলামেশাটা একটু বেশী রকম ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িতেছে—বিবাহ না দিলে আর ভাল দেখায় না। শ্রীমান ছ'কড়িকে আমি সে-কথা একদিন স্পষ্টতই বলিলাম। তাহাতে সে বলিল যে সে অবিলম্বে কুসুমকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত এবং ইহাও সে বলিল যে তুমি যদি জানিতে পার যে মেয়ে স্কুলে গিয়া

লেখাপড়া শিখিয়া ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে তাহা হইলে কুণ্ড মহাশয়ের প্ররোচনায় পড়িয়া তুমি কিছুতেই বিবাহ ঘটতে দিবে না। তোমাকে ত আমিও চিনি। তুমি একান্তই লোক—হয়ত ঝাঁকিয়া বসিবে। নানারূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া তোমাকে গোপন করিয়াই আমি কুসুমকে শ্রীমান ছ'কড়ির হস্তে সমর্পণ করিলাম। ছয় মাস নির্বিলম্বেই কাটিল। তাহার পর যখন তুমি ছ'কড়িকে পত্র লিখিলে যে তাহার বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে এবং ছ'কড়ি যখন তোমাকে জানাইল যে সে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে তখন আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে এইবার সমস্ত ব্যাপারটা তোমাকে খুলিয়া জানানো দরকার। সেই উদ্দেশ্যেই আমি হরিণহাটি গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলাম তুমি বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছ।

“সমস্ত কথাই তোমাকে লিখিলাম। আমি তোমার বাল্যবন্ধু। আমাকে ক্ষমা করা যদি তোমার পক্ষে নিতান্তই শক্ত হয়, আমাকে না-হয় দু বা মারিয়া যাও। কিন্তু ছেলে-বউকে অবহেলা করিও না। কুসুম স্থলে পড়িলেও সত্যিই গৃহকর্মনিপুণা হইয়াছে। নিজে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার...” ইত্যাদি

৫

বহুদিন পরে পোদ্দার মহাশয় হরিণহাটিতে প্রবেশ করিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার দীর্ঘ অল্পপস্থিতির স্বযোগ লইয়া গ্রামের কয়েকটি ছোকরা বাটাব-ফ্লাই ক্যাশানে গৌফ ছাঁটিয়াছে এবং মল্লিক-বাড়ীর বৈঠক-খানার বারান্দায় বিলাতী মরুম্বী ফুলের কয়েকটি টবও বসান হইয়াছে। পোদ্দার মহাশয় কিছু না বলিয়া কুণ্ডর মুখের দিকে শুধু একবার চাহিলেন।

কুণ্ড হাসিয়া বলিলেন, “সব লক্ষ্য করছি—”

* * *

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পোদ্দার মহাশয় দেখিলেন যে তাঁহার গৃহিণী একটি সুন্দরী বয়সী রচনা করিতেছেন। বৌ।

পোদ্দারকে দেখিয়া পোদ্দার-গৃহিণী অসম্ভব বেশবাস সম্বরণ করিয়া তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বধু ছুটিয়া গৃহমধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল।

গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, “হঠাৎ খবরটবর না দিয়ে এসে পড়লে যে। যাক—এলে ঝাঁচলাম। ভাল ছিলে ত বেশ?”

পোদ্দার মহাশয় এ-সব প্রশ্নের জবাব না দিয়া অদূরে টাঙানো দোলনাটি দেখাইয়া বলিলেন, “ওটা কি?”

“ওমা, ছ'কড়ির খোকা হয়েছে যে। অমলকুমার—”

“কি?”

“অমলকুমার! বৌমা ছেলের নাম রেখেছে অমলকুমার।”

পোদ্দার স্তম্ভিত।

বিশ্বয় কাটিলে তিনি বলিলেন, “অমলকুমারকে নিয়ে থাক তোমরা! আমি কানী ফিরে চললাম—”

বলিয়া তিনি সত্যিই ফিরিলেন।

পথরোধ করিয়া গৃহিণী বলিলেন, “ওমা, সে কি কথা গো—”

“অমলকুমার নাম আমি বরদাস্ত করতে পারব না—”

“বেশ ত তুমিই একটা নাম দাও না।”

“ন'কড়ি—”

“বেশ তাই হবে—”

পোদ্দার মহাশয় ঘুরিয়া দোলনার দিকে অগ্রসর হইলেন।



অলখ-বোরা

শ্রীশাস্তা দেবী

২৫

গহনাব দোকানে নামিয়া গহনার বাস্তুগুলি খুলিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া হৈমন্তী একেবারে তন্ময় হইয়া গেল। মহেন্দ্র বলিল, “তুমি কবিতা পড়, শুনিয়ে লেখও কিছু কিছু এই ত জানতাম। গহনার যে তুমি এত ভক্ত তা ত জানতাম না। বাহিরে যে যেমনই দেখাক, জীলোকেরা এক জায়গায় সব এক রকম। শুধু গহনার গল্প করে আর গহনা দেখেই তারা এক যুগ কাটিয়ে দিতে পারে।”

হৈমন্তী সে কথায় কান না দিয়া একটা মন্ত সরস্বতী-হার দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, “মহেন্দ্র-দা, Isn't it a beauty?” হারের দিকে তিন-চাব মিনিট সে একদৃষ্টে তাকাইয়া বহিল।

মহেন্দ্র বলিল, “স্বন্দব বটে, তবে তোমার চোখ দিয়ে ত আমি দেখতে পাই না। জানি না তোমরা এক ভাল সোনা কি এক সাব মন্তোর ভিতর কি খুঁজে পাও।

হৈমন্তী বলিল, “work of art তারিফ করতে হ'লে মনটাকে তেমনি করে তৈরি করতে হয়। আগে থেকেই গহনাব প্রশংসায় জীর্ণনোচিত দুর্বলতা আছে মনে ক'বে চোখ বুজে থাকলে দেখতে পাবেন কি ক'রে?”

মহেন্দ্র বলিল, “তোমার এই হারটা ভয়ানক ভাল লেগেছে দেখছি, পেলে একটা নাও?”

হৈমন্তী বলিল, “নিশ্চয়, একশ বার নিই।”

মহেন্দ্র একটু মিষ্ট হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “আচ্ছা, দেখি আমি একটা দিতে পারি কি না।”

হৈমন্তী মুখটা লাল করিয়া বলিল, “থাক, আপনাকে আর আমায় সরস্বতী-হার দিতে হবে না।”

গহনা লইয়া তর্কবিতর্কে তপন বিশেষ যোগ দিতে পারিতেছিল না। বাস্তুগুলি গাড়ীতে তুলিয়া সে বলিল, “আমার ইচ্ছা জন কতক বাইরের লোককে দিয়ে মাঝে

মাঝে কিছু বলাব ঠিক করেছি। আজ তাঁদের সঙ্গে আমাকে একবার দেখা করতে হবে। আমি সে কাজটা সেরে রাজে খাবার সময় ঠিক এসে যথাস্থানে হাজির হব। আমাকে খানিক ক্ষণের জন্ত মাপ করবেন।”

তপন গাড়ী ছাড়িয়া পায়ে হাঁটিয়াই চলিয়া গেল। মহেন্দ্র গাড়ীতে উঠিয়া বলিল, “আচ্ছা, গাড়ীটা যদি এক চক্র গড়ের মাঠ দিয়ে ঘুরে যায়, তোমাব আপত্তি আছে?”

হৈমন্তী মহেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, “না, আপত্তি ঠিক নেই, কিন্তু প্রয়োজন কি?”

মহেন্দ্র যেন একটু রাগিয়াই বলিল, “প্রয়োজন আমার এই মাথাটাকে একটু ঠাণ্ডা করা। তোমরা ত আমাকে নারদ মুনি ব'লে নিশ্চিন্ত, কিন্তু আমার ঘাড় থেকে তিস্ত রসের বোঝাটা নামাতে ত কাউকে একটু চেষ্টা করতে দেখলাম না।”

হৈমন্তী অপরাধীর মত মুখ করিয়া বলিল, “আমি কি করব বলুন না, মহেন্দ্র-দা, আমি ত কোন অস্ত্রায় জেনেগুনে করি নি।”

মহেন্দ্র হৈমন্তীর মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, “অস্ত্রায় কব নি বটে, কিন্তু শ্রায়ই বা কি করেছ? আমি যে একটা মানুষ পৃথিবীতে আছি, তোমাদেব দরজায় রোজ এসে ঘুরছি, তা তোমরা কি একবার দেখতেও পাও না? কবিতা পড়ে এই বুঝি মানুষের মন বুঝতে শিখেছ?”

হৈমন্তী চুপ করিয়া মুখ নীচু করিয়া রহিল। মহেন্দ্র জোর দিয়া বলিল, “বল না, তোমারও কি আমাকে একটা বগদুটে তাকিক ছাড়া আর কিছু মনে হয় না? আমি ত তোমাকে কত দিন ধরে পড়িয়েছি, কত কাছে থেকে তুমি আমায় দেখেছ, তখন কি আমি কেবল বগড়াই করতাম? তার চেয়ে ভাল কোন গুণ তুমিও কি আমার মধ্যে দেখ নি?”

হৈমন্তী সহাস্যে বলিল, “ও কি কথা মহেন্দ্র-দা, আপনি

আমাকে কত যত্ন করে মেঘদূত পড়িয়েছিলেন, কত ভাল ভাল কন্টিনেন্টাল বই এনে দিয়েছেন, আমি তা একদিনের জন্তেও তুলি নি।”

মহেন্দ্র হৈমন্তীর কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, “দেখ, আমি তুমি কা করে কথা বলতে জানি না, তুমি ত জানই আমি অসহিষ্ণু মানুষ। তা ছাড়া আমার বসে বসে দিন গোনবার সময়ও নেই। এই বছরই আমি জাখানীতে পড়তে চলে যাব ঠিক হয়েছে। তার আগে আমি আমার অদৃষ্টটা ছেনে নিতে চাই। তুমি কি সে কাজে আমার একটু সাহায্য করবে?”

হৈমন্তী চুপ করিয়াই রহিল। মহেন্দ্র বলিল, “মনে করো না আমার মধ্যে আনন্দ দেবার কোন ক্ষমতাই নেই। এই তেতো খোলার আড়ালে মধুব রসও কিছু আছে। যে দয়া করে কাছে আসবে তাকে স্বধী করতে পারব বলে মনে মনে একটা অহঙ্কার আছে। তুমি আমাকে সে স্ববোধ একবার দিয়ে দেখবে কি হৈমন্তী?”

পথের ধারের কৃষ্ণচূড়া গাছের সারির দিকে হৈমন্তী নিমন্তর হইয়া তাকাইয়াছিল। দক্ষিণ সমীরণ লাল ফুলের তোড়া আর সবুজ পাতার রাশির ভিতর মাতামাতি লাগাইয়াছিল। তাহারও ভিতর ঘামিয়া উঠিয়া হৈমন্তী বলিল, “মহেন্দ্র-দা, এককথায় জবাব আমি দিতে পারব না। আপনাকে আমি পরে বলব।”

মহেন্দ্র বলিল, “অঙ্ক, তোমরা অঙ্ক। পরে বলবার কি আছে এতে? আমাকে কি তুমি এত দিন ধরে দেখ নি? আমার ভিতর কোন যোগ্যতা খুঁজে পাও নি? আরও কি বাজিয়ে দেখতে চাও? বিশ্বাস কর আমার কাছে তুমি যা চাইবে আমি বিনাবাক্যে তা করে যেতে পারব। আমাকে সন্দেহ করবার তোমার কোন কারণ নেই। যদি এত দিনে না বুঝে থাক, আজ একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, বুঝতে পারবে।”

হৈমন্তী বলিল, “মহেন্দ্র-দা, আপনি রাগ করবেন না। কিন্তু সব মানুষের সময় একসঙ্গে আসে না; তাই বলে তার দ্বারা আর একজনের অযোগ্যতা প্রমাণ হয় না। আমরা অঙ্ক বইকে অনেক দিকে। কিন্তু সে অঙ্কতার মায়া কাটিয়ে ওঠবার ক্ষমতাও যে আমাদের নেই।”

মহেন্দ্র বলিল, “সময় যদি না এসে থাকে আমি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করব। দুইখ অনেক সময়ছি, না-হয় আর কিছুদিন সহিব। আমার অযোগ্যতার প্রমাণ যদি না পেয়ে থাক, তবে যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব নয় কেন মনে করছ না? কেন তোমার অঙ্কতাকেই দুই হাতে এমন করে চেপে ধরে রাখতে চাইছ। ওই স্বন্দর চোখ দুটির ভিতর দৃষ্টির এতটা অভাবই কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?”

হৈমন্তী বলিল, “সব কথারই কি সব সময় জবাব দিতে হবে, মহেন্দ্র-দা? আপনার যা শুনতে ভাল লাগবে, তা যখন বলতে পারছি না, তখন শুনতে ধারাপ লাগবে এমন কথা না হয় কিছু নাই বললাম।”

মহেন্দ্র ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, “আমি অদৃষ্টকে অত ভয় করি না হৈমন্তী। অপ্রিয় সত্যই যদি তোমার বলবার থাকে, তবে আমি তাই শুনতে চাই।”

হৈমন্তীর চোখে জল আসিয়া গেল। সে বলিল, “মহেন্দ্র-দা, আপনি আমাদের অনেক দিনের বন্ধু। আমাদের বন্ধু-সভার এত দিনের ব্যবহার, তারও আগে যখন আপনার ছাত্রী ছিলাম, তখন কোনও দিন কি অপ্রিয় কিছু বলতে আমার উন্মুখ দেখেছেন? আপনাকে আমরা ঠাট্টা করি, বটে, কিন্তু সে যে শত্রুর ঠাট্টা নয় তা কি আপনি বোঝেন না? মানুষের বন্ধুত্বের মূল্য সামান্য নয়, কিন্তু সখ্য যা তা সখ্য, তার চেয়ে বেশী সেক্ষেত্রে কিছু আশা করা যায় না। কেন যে কখন চলে না তা বলাও যায় না।”

মহেন্দ্র বলিল, “তুমি যদি আমার সখ্যকে তোমার সখ্যকে স্বীকার কর, তবে সেই সখ্যের চেয়ে আর একটু উপরে ওঠা, তাকে আর একটু বড় করে দেখা কি তোমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব?”

হৈমন্তী বলিল, “মহেন্দ্র-দা, আপনার হাতে ধরে বলছি, আপনি আমাকে আর তর্কে টানবেন না। মানুষ তর্কশাল্য হুটি করেছে বটে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সে তাকে মেনে চলতে পারে না। ঐ দেখুন, আকাশে মেঘ করে আসছে। প্রচণ্ড গরমের পর আজ বোধ হয় বৃষ্টি দেখা দেবে। আমাদের এখনই বাড়ী ফেরা উচিত, না হলে লোকে মনে করবে হয় আমরা ডাকাতের হাতে পড়েছি, নয় গাড়ী চাপা পড়েছি।”

মহেন্দ্র তখনও আপন মনেই কথা বলিতে বলিতে চলিল। সে বলিল, “আমি বেশ বুঝতে পারছি যে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছ। আমার সঙ্গে তোমার সখ্য, সেটা একটা কথার কথা মাত্র। আলাপী সবাইকেই ত লোকে বন্ধু বলে। কিন্তু তোমার মন চলছে অন্য দিকে, না? তুমি কি জান যে আজ চার পাঁচ বৎসর ধরে এই চিন্তাই আমার মনে দিবারাত্রি অন্ধুরের মত ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে? এত দিন বলবার অবস্থায় আসে নি, আজ দিন এসেছে মনে ক’রে তোমায় এ কথা বললাম। কিন্তু আমার দুর্তাগ্য তুমি তার ওজন একটুও বুঝতে পারলে না। মমতার একটু চিহ্নও তোমার মধ্যে দেখলাম না।”

হৈমন্তী বলিল, “আপনি বিশ্বাস করুন, মহেন্দ্র-দা, আমি আপনাকে আঘাত দেবার জন্তে ইচ্ছা ক’রে কোন চেষ্টা করি নি। আপনি আর আমি সিঁড়ির ভিন্ন ভিন্ন ধাপে রয়েছি, কাজেই এ জিনিষকে এক ভাবে দেখে এক উত্তর দেওয়া ত দু-জনের পক্ষে সম্ভব নয়।”

মহেন্দ্র বলিল, “এবারেও ত সেই একই উত্তর। তুমি আমার প্রশ্নের ত জবাব দিলে না।”

হৈমন্তী বলিল, “আজ আমাকে আর পীড়ন করবেন না, লক্ষ্মীটি। একদিন আমি উত্তর দেব, তবে কবে তা বলতে পারি না।”

মহেন্দ্রের কথা ফুরাইতে চাহিতেছিল না। সে বলিল, “তুমি কি জবাব দেবে আমি কি বুঝি নি, হৈমন্তী? আজ যে কঠিন কথাটা আমার মুখের উপর বলতে তোমার বাধ্যছে, সেই কথাটাই একদিন হাঙ্কা করে আমায় জানিয়ে দিতে চাও, তা আমি বুঝছি। তোমরা কথা বলতে জান, নিষ্ঠুর আঘাতকেও নরম কথায় মুড়ে সামনে এনে ধরবে; কিন্তু আমি মূর্খ, আমার মনের শ্রেষ্ঠ কথাটাও তোমায় সাক্ষিয়ে বলতে পারলাম কই? যা বলতে চেয়েছিলাম, মনে হচ্ছে তার কিছুই বলতে পারি নি, মনের যেখানটা তোমায় দেখাতে চেয়েছিলাম তোমার দৃষ্টিই সেখানে আনতে পারলাম না। হয়ত আমারই মূর্খতায় তুমি আমায় কিছুই বুঝলে না। হৈমন্তী, যদি জানতে কত কাল ধরে কত কথা এই বোবা মনের ভিতর জমা হয়ে মাথা খুঁড়ছে, তাহলে হয়ত এতখানি কঠিন হতে না।”

হৈমন্তী আর কথা বলিবার চেষ্টা করিল না। সে আরক্ত মুখ নত করিয়াই কোন রকমে মুহূর্তগুলি গুলিয়া সময় কাটাইতেছিল। মহেন্দ্রের প্রতি তাহাব একটা টান ছিল, তাই নিজের মহেন্দ্রের কষ্টের কারণ হইতে তাহার মনে একটা অপরাধ বোধ হয় খোঁচা দিতেছিল।

বাড়ীতে নামিয়াই ঘন মূক্তির নিখাস ফেলিয়া হৈমন্তী তাহার বেগুনফুলি রঙের মাস্তোজী শাড়ীর উপর কোমরে একটা ফরসা তোয়ালে জড়াইয়া রান্নাঘর হইতে এক ট্রে খাবার ও সরবৎ আনিয়া বসিবার ঘরে হাজির করিল। মহেন্দ্রকে ধাইতে ডাকিয়া কোনও সতৃতর পাওয়া গেল না। সে আজ গহনা বিষয়ে মস্ত বিশেষজ্ঞের মত মিলিকে নানা কথা বুঝাইতে বসিয়াছে।

নিখিল বলিল, “আমরা সেই কখন থেকে বসে বসে হাত চালাচ্ছি, আমাদের আপনি এক গেলাস সরবৎ দিতে পারলেন না, সবার আগে দিতে গেলেন মহেন্দ্রকে। সে ত প্রচুর হাওয়া খেয়ে এল এইমাত্র।”

মহেন্দ্র আজ ঠাট্টার জবাব দিল না। বাড়ালীর গায়ের রঙে মুক্তা যে মানায় না এই বিষয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে সে মিলিকে বক্তৃতা শুনাইতে লাগিল। মিলি বলিল, “না মানায়, না মানাক, আপনার বৌকে না-হয় আপনি একটাও মুক্তো পরতে দেবেন না। আমরা কালো রঙেই প্রাণে যা সখ আছে পরে নেব।”

হৈমন্তী একটা সরবতের গেলাস আনিয়া মহেন্দ্রের হাতের ভিতর গুঁজিয়া দিল। মহেন্দ্র ফিরাইয়া দিতে বাইতে ছিল, নিখিল বলিল, “আর কদিনই বা এত আদরবস্ত্র পাবে, এখন বেশী চাল দেখিও না। বেশ কাটছে এই দিনগুলো! একানবস্ত্রী পরিবারের মত, রোজ একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, কাজ, গল্পগাছা, ঝগড়াঝাঁটি সব নিয়ে জিনিষটা জমেছে ভাল। দুঃখ এই যে, দিন ফুরিয়ে এল।”

মহেন্দ্র এতক্ষণে ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল, “তুমি কার সঙ্গে একাঙ্গে খেতে চাও বল না, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক’রে দেখব কিছু করা যায় কি না। পরোপকার কখনও করি নি, তোমরা মহৎ লোক, তোমাদের উপকার করলে আমারও পুণ্য হবে কিছু।”

মিলি বলিল, “আপনার হাতে অম্বচিন্তার ভার অর্পণ

করতে তাঁর বিশেষ ভরসা নেই, নিজের চেষ্টা নিজেই না-হয় তিনি দেখুন।”

তখন আসিয়া সবে ঘরে দাঁড়াইয়াছে। মহেন্দ্র তাহার দিকে মুখ করিয়া বলিল, “আর তোমাব মতলব কি হে তপন, অন্ন না নিবন্ন?”

তপন বলিল, “মতলব ত মাছবের কতই থাকে। কিন্তু অন্ন কি আর বিধাতা সকলের অদৃষ্টে লেখেন?”

মহেন্দ্র যেন মার খাইয়া পাণ্টা মার দিবার জন্ত উগ্র হইয়া বলিল, “আমাদের মত অভাজনদের অদৃষ্টে না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার মত ভাগ্যবান পুরুষের অদৃষ্ট নিশ্চয়ই সুপ্রসন্ন হবে। বিধাতার বিচারেও পক্ষপাত আছে।”

তপন বিস্মিত হইয়া মহেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল, সামান্য একটা ঠাট্টার কথায় মহেন্দ্রের এত চট্টা উঠিবার কি কারণ হইল? সে যেন কি একটা গায়ের জালা মিটাইবার জন্ত একবার তপন ও একবার নিখিলকে ধরিয়া মাথা ঠুকিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। নিখিল তাহার কি করিয়াছে জানা নাই, কিন্তু তপন ত জ্ঞানত মহেন্দ্রের কোন অনিষ্ট করে নাই। তাহাদের কথা-কাটাঁকাটি প্রায়ই চলে বটে, কিন্তু একে ত তাহাতে তপনের দিকটা হয় খুবই হাল্কা, তার উপর সে সব তর্কের শিকড় ত একটুও গভীর বলিয়া কোন দিন মনে হয় নাই। মহেন্দ্র যে অগ্নিশর্মা হইয়া আসিয়াছে তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। তপন তাহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্ত বলিল, “কি এমন হৃদয়বিদারক ব্যাপার এর মধ্যে ঘটে গেল যে নিজেকে একেবারে অভাজনের দলে চালিয়ে দিচ্ছ?”

মহেন্দ্র বলিল, “হৃদয় টুঁদয় ওসব তোমাদের আছে, গরীব লোকের ওসব থাকে না।”

হৈমন্তী অকারণেই লাল হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। স্বধা তাহা লক্ষ্য করিয়া একটু ব্যগ্র হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের কথাগুলি যে রুদ্ধ অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, তাহা বুঝিতে স্বধার দেবী হইল না। কেন সে এমন কথা বলিতেছে? তাহার মনে কি কোন নিরাশার বেদনা বিঁধিয়া আছে? অথবা হৃদয় কোন আশাই তাহার মনে জাগিয়াছে বাহার পল্লবিত রূপ দেখিবার পূর্বে মনের সংশয়কে সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে সে পারিতেছে না। মহেন্দ্রের মত

এমন প্রকৃতির মানুষেরও কি স্বধার মত অবস্থা? স্বধারই মত কি সে মনে মনে আকাশকুসুম রচনা করিয়া কবিতার ছন্দে ও গানের সুরে আপনার জীবনকাব্যকে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে? হৈমন্তীর উপর বুঝি মহেন্দ্রের মন ঝুঁকিয়াছে?

স্বধার মনে পড়িল আজ কতদিন ধরিয়াই হৈমন্তীকে সে কেমন যেন উন্নত দেখিতেছে, কিন্তু মহেন্দ্রের কথা স্বধার একবারও মনে হয় নাই। চিত্রকরের তুলির মুখ হইতে হৈমন্তী যেন বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে মহেন্দ্রের মত নুষ্ঠিমান তর্কশাস্ত্রের পাণে কি রকম মানাইবে? স্বধার মন এতটুকুও সায় দিল না। মহেন্দ্র সঘন্যে তাহার এ অল্পমানটাকে মিথ্যা মনে করিয়াই সে উহার হাত এড়াইতে চেষ্টা করিল। অথবা মহেন্দ্রব নিজের দিকে সত্য হইলেও হৈমন্তীব দিকে ইহা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু কে সে, বাহার আশায় হৈমন্তী তাহার হৃদয়-শতদলে আসন পাতিয়া নাথিয়াছে, কাহার পিছনে দূরে দূরান্তরে তাহার উতলা মন টাড়িয়া চলিয়া যায়, নিকটের সকল কিছু তুলিয়া? তাহাদের এই ক্ষুদ্র বন্ধু-সভার বাহিরেও ত হৈমন্তীর আনাগোনা আছে। এই ত সেদিন বিকালের চায়ে দেখা গেল নবীন অধ্যাপক বিমলকান্তি দত্তকে আব তরুণ চিকিৎসক খ্যাতনামা অমরপ্রিয় দেবকে। হৈমন্তীর তাহাদের সঙ্গে খুবই আলাপ আছে বোঝা যায়, তাহারা মাঝে মাঝে আসেও এ-বাড়ীতে, হৈমন্তীকেও ত অমরপ্রিয়ের মা ছুদিন নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ভারী সুন্দর শিষ্ট সংযত কথাবার্তা এই ভ্রম-লোকটির। হৈমন্তীর মন এদিকে গিয়াছে কি? কি জানি? স্বধার মনটা কি ভাবিয়া একবার কাঁপিয়া উঠিল। আবাব সে-চিন্তা সে মনে হইতে দূর করিয়া দিল জোর করিয়া। দুই হাতে যেন কি একটা ভদ্রাবহ জিনিষকে সে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে এমনি ভাবে মনটাকে শক্ত করিয়া তুলিল। সেই চেষ্টায় তাহার দুই চক্ষু একবার যেন পলকের জন্ত বন্ধ হইয়া আসিল। আবাব সে আপনার কাজে মন দিল।

মিলি তাহার হাত হইতে কাগজগুলি কাড়িয়া লইয়া বলিল, “আজ বন্ধ কর ভাই, আর ত বেশী নেই। ওক’টা কালকে করলেও চলবে, তোমরা আজ ভয়ানক খেটেছ। একটু গানগল্পে খেলাধুলোয় সময়টা কাটালে হ’ত না।”

মহেন্দ্র বলিল, “আপনার যেমন দিবারাজি গান ভাল

লাগে, আর সকলের তা না লাগতে পারে। অবশ্য, আমি যে সকলের মন জানি না সেটাও ঠিক কথা।”

মিলি বলিল, “গানই যে করতে হবে এমন কথা আমি বলি নি। ইচ্ছে করলে স্কেন্স এণ্ড ল্যাডার্স কিম্বা আগডুম-বাগডুম খেলতেও পারেন। আমি কেবল কান্ন বন্ধ করতে চেয়েছিলাম। সেইটুকু মাত্র আমার উদ্দেশ্য।”

মহেন্দ্র আর কিছু বলিল না। তাহার মনের ভিত্তর মস্ত একটা তোলপাড় চলিতেছিল। বহুদিন ধরিয়া এই যে প্রিয় চিন্তাটিকে ধীবে ধীরে সে পরিণতির দিকে আনিভে-ছিল, তাহা যে এমন একটা বাধার গায়ে আসিয়া বা ধাইবে ইহা সে আশা করে নাই। তাহার বলিবার ভাষা মোলায়েম নয়, ধরণধারণ স্বকোমল নয়, কিন্তু মনে যে তাহার প্রচণ্ড একটা ঝড় উঠিয়াছে ইহা নিশ্চয়ই সে হৈমন্তীকে বুঝাইতে পারিয়াছে। ভালবাসার এতখানি আবেগকে মেয়েনা অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না বলিয়াই মহেন্দ্রের বিশ্বাস, যদি না ইতিমধ্যে তাহার মনে আর কেহ আসন পাতিয়া বসিয়া থাকে। তা ছাড়া, উনিশ-বুড়ি বৎসরের মেয়ের মন একেবারে শূন্য, বালিকার খেলার খেলালে সে ম্লিন কাটাইতেছে, ইহাও মহেন্দ্র বিশ্বাস করে না। হৈমন্তী

কেন বলিল, তাহার সময় আসে নাই? যে এসব কথা এমন গুছাইয়া বলিতে পারে তাহার মনে এ-চিন্তা নিশ্চয়ই প্রবেশ করিয়াছে। নিশ্চয় সে আর কাহারও দিকে মনের মোড় কিরাইতেছে। সেই অমোদগী বালিকা হৈমন্তীকে মহেন্দ্র যখন প্রথমে দেখে তখন ত ইহারা কেহ তাহার ধারে-কাছে ছিল না। তাহার এতদিনেব পরিচয় এতকালের প্রভাবকে অনায়াসে ডিঙাইয়া গেল কে, জানিবার জ্ঞান মহেন্দ্রের মন ছটকট করিতে লাগিল। সভ্য সমাজে সর্বত্রই সভ্য হইয়া চলিতে হয়, না হইলে তাহার মাথাটা সে একবার অন্তত দেয়ালে ঠুকিয়া দিয়া কিছু আনন্দ সংগ্রহ করিত। মূর্খ মানুষগুলার ভিতব ত সব মরুভূমি, কিন্তু বাহিরে ময়তীর নিব্বার ছুটাইয়া অনভিজ্ঞ মেয়েগুলিকে হাত করিয়া লইতে তাহাদের পাণ্ডিত্যের অভাব দেখা যায় না। সত্যকার যোগ্যতা অর্জন করিবার দিকে মন না দিয়া মহেন্দ্রও যদি এই ভূয়া পালিশের দিকে মন দিত তাহা হইলে হয়ত তাহাকে আজ এমন করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইতে হইত না। সম্ভবত

সাহিত্যে তাহার বয়সে এতখানি অধিকার আজকালকার কোন ছেলের নাই, ইংরেজী সাহিত্যের খোঁজই বা তাহার সমান কে রাখে? কিন্তু বিধাতা তাহার কথার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠটাও করিয়াছেন কর্কশ, পথে ঘাটে সব গুয়ান্টার র্যালির মত গানের জামা খুলিয়া প্রেয়সীর পদতলে পাতিয়া দিবার বিদ্যাও সে আয়ত্ত করে নাই, এই সব অপরাধেই হয়ত তাহাকে অযোগ্যতার শাস্তি মাথায় বহিয়া ফিরিতে হইবে।

(২৬)

বেলতলার দিকে প্রকাণ্ড একটা ময়দানওয়ালা বাড়ী। বহুকাল পূর্বে তপনের পিতামহ তাহারই কোন্ মক্কেলের নিকট হইতে মাটির দরে এই জমিটা কিনিয়াছিলেন। বাড়ীর অর্দ্ধেকটা তিনিই করিয়াছিলেন, বাকি অর্দ্ধেকটা তপনের পিতা। তপনেব পিতার বাগানের সখ ছিল বলিয়া বাড়ীটার দিকে খুব বেশী ঝোঁক তিনি দেন নাই, জমি বেচিয়া লক্ষপতি হইবার চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহাব সখ ছিল বড় বড় গাছের; কৃষ্ণচূড়া, সোনাল, বিলাতী নিম, বকুল, কাঠচাঁপা, কনকচাঁপা ইত্যাদি সব রকম বড় ফুলের গাছ পথেব দুই ধারে তিনি লাগাইয়াছিলেন। আম, কাঁঠাল, দেবদারু, ইউক্যালিপ্টসের অভাবও সেখানে ছিল না।

বাড়ীটার বেশীর ভাগ একতলা, দোতলায় খান তিনেক মাড় ঘর। একদিকে চণ্ডা ঢাকা বারান্দা, অন্যদিকে মস্ত চৌকা গাড়ীবারান্দার ছাদ লোহাব রেলিং দিয়া ঘেরা। দক্ষিণের এই গাড়ীবারান্দার দিকে মুখ করিয়া তপনের ঘর। ঘরে খাট নাই, পুরু গদির উপর পাতা বিছানা মস্ত একটা হুচিজিত কাঁধা দিয়া ঢাকা, আর একদিকে হাত ধানিক উঁচু একটা টেবিলেব সামনে বড় একটা পিড়িব উপর সালুর তৈরি ঐ মাপের ছোট একটা তোষক। পাশে একটা কাচহীন বই রাখিবার তাক, দেখিলেই বোকা যায় বইগুলি সর্বদা নাড়াচাড়া হয়। সংস্কৃত ও বাংলা রামায়ণ মহাভারত ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যগ্রন্থ ও গানের বই তাহাতে সাজানো। টেলিষ্ট, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির ছই-চারিখানা করিয়া বই তাহাতে আছে আর আছে গীতা ও উপনিষদ। নীচের

দিকে কৃষক নামক বাংলা মাসিক পত্র, বাগান সম্বন্ধে ইংবেঞ্জী কয়েকটা বই, ও ছুতার, কামার ইত্যাদির যন্ত্রপাতি সমেত স্থচিকণ একটি কার্ঠের বাস। তাকের মাথায় কুমারটুলির গড়া একটি লক্ষ্মীমূর্তিব দুই পাশে দুইটি মাঝা পিতলের ঘটিতে তাক্সা ফুল। নীচু টেবিলটায় বেত পাথরের ছোট একটি রেকাবীতে মোটা মোটা অনেকগুলি বেলফুল। একটা স্থচিকিত মাটির ছোট ঘটে অনেকগুলি কলম ও পেনসিল মুখ উঁচু করিয়া আছে আর একটা রংকরা গোল কার্ঠের কোঁটার নিব, রবার আলপিন ইত্যাদি ভরা। দেয়ালে প্রকাণ্ড একখানি বেখাচিত্র—একটি গ্রাম্য বালিকা কোমরে কাপড় জড়াইয়া ধোড়ো ঘরের বাহিরের দেয়ালে আলপনা দিতেছে, চিত্রকরের নাম লেখা নাই। ঘরের একেবারে কোণে ছোট একটি কার্ঠের আলনায় দুই-চারিটা সাদা জামা কাপড়।

তখন সকালে উঠিয়া গাড়ীবারান্দায় ভোরের সূর্যের আলোর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফুলের গন্ধে বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে, পাখীর ডাকে ইহাকে আর কলিকাতা শহর মনে হইতেছে না। তপনের ইচ্ছা করিতেছিল না যে এখান হইতে সরিয়া যায়। কিছু দিন হইতে তাহার মনটা কেন জানি না কাজে বসিতে চায় না।

মনে হয় তাহার ওই গ্রামের ইচ্ছুল, ওই ক্ষেত বাগান—এ ত তাহার জীবনে কই সত্য হইয়া উঠে নাই। ছেলেবেলা যেমন সে পুতুল লইয়া, খেলনা লইয়া খেলা করিত, বড় হইয়া তেমনি যেন মাছ, ক্ষেত, খামার লইয়া খেলা করিতেছে। পুরুষ বুঝি সারাজীবনই এমনি খেলা করে, নিত্য নূতন নূতন খেলা রচনা করিয়া তাহাকে বড় বড় নাম দিয়া আপনাকে ও পরকে ভোলায়। এই খেলার উন্নাদনাই আশল তাহাদের কাছে। কল্পজনের কাছে কাজ সত্য হইয়া উঠিয়া জীবনের পরতে পরতে মিশিয়া যায়।

দৌড়পারের খেলায় প্রথম হইবার উন্নাদনা ও বাহবা পাইবার নেশা যেমন ছেলেদের মাতাইয়া তুলে, আজ মনে হইতেছে তেমনি একটা বড় ব্রকম বাহবা পাইবার লোভেই যেন সে এ-খেলায় নামিয়াছিল। এখন ইচ্ছা করিতেছে এই পুরাতন খেলা ফেলিয়া দিয়া জীবনের আর এক দিকের আহ্বানের প্রতি সে তাহার মনটা একটু দেয়। এই পাখীর

ডাক, এই ফুলের গন্ধ, এই বসন্ত সঙ্গীত গ্রামের মাটিতে বসিয়াও তাহার জীবনে কি এত দিন মিথ্যা ছিল না? আজ কে যেন এই ইটকাঠে-গড়া কঠিন কলিকাতার বুকে বসিয়াই বসন্তের সিংহদ্বার তাহার চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়াছে। ফলশস্ত্রামলা পল্লীগ্রী তাহার ফলফুলপত্রের ভাল তুলিয়া ধরিয়া এত দিন তাহাকে যাহা দেখাইতে পারে নাই, নগরীর একটি শ্রামাঙ্গিনী বালিকা তাহার স্নিগ্ধ রূপের ভিতর দিয়াই কেমন করিয়া সে অনন্ত সৌন্দর্য্য তপনের দৃষ্টিপথে আনিয়া দিয়াছে। এই রূপের পসরা তাহাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। ইচ্ছা করে ইহারই ভিতর ডুবিয়া থাকিতে, কাজ-কাজ খেলায় তাই আর মন বসে না।

ইচ্ছা করে মাহুঘের গড়া এই ঘড়ির শাসনকে দিন কয়েকের জন্ত উপেক্ষা করিয়া তাহার আনন্দ উপলব্ধির অতলে সব তুলিয়া তলাইয়া যাইতে। কেন কাজের দিন তিনটা না বাজিলে কাজ ছাড়িয়া যাওয়া যাইবে না, কেন বিদায়বেলায় ঢং ঢং করিয়া ঘড়ি বাজিলেই আর সকলের সঙ্গে সমতালে পা ফেলিয়া তাহাকেও আপনায় নিরানন্দ গৃহকোণে ফিরিয়া আসিতে হইবে? ভোরবেলা এই গন্ধ-বিধুর সমীরণের মাঝখানে নীরবে দাঁড়াইয়া কল্পনায় তাহার চুলের মালার গন্ধটুকু অম্লভব করিতে গেলে, সেই শ্রিতহাস্তজড়িত মুখখানি মনে করিতে গেলে কেন তাহার কাজ তাহা সহ্য করিবে না? যে-বন্ধনে আপনাকে আপনি সে স্বেচ্ছায় বাঁধিয়াছে, তাহাই কেন তাহার প্রভু হইয়া জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে?

কিন্তু মন বিব্রোহ করিলে কি হয়? পৃথিবীতে কয়টা পুরুষ মনের ক্ষুধায় তাহার দৈনন্দিন কাজ ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারিয়াছে? ইহা যেন জীলোকেরই ধর্ম্ম। পুরুষ চিরদিন জীলোককে বলিয়াছে,—প্রেমেরই তোমার জীবন, আমার জীবনে উহা দিনান্তের বিশ্রামস্থান মাত্র। নব-যৌবনের এই উন্নাদনা কাটিয়া গেলে তখনও কি তাহাই বলিবে না? আজিকার এই কাজ যদি জীবনে সত্য না হয়, তাহা হইলে শিশুর খেলনার মত তাহা দূরে ফেলিয়া দিলেও নূতন একটা গড়িয়া তুলিতে কতক্ষণ? প্রেম তুলিয়া তখন তাহাতেই হয়ত সে ডুবিয়া যাইবে।

তখন আপনাকে পুরুষধর্ম্ম বুঝাইতেছিল, কিন্তু ভোরের

ফুলদলের সৌরভের ভিতর দিয়া সেই মুখখানির ছায়া ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে বলিতেছিল,—আমাকে তুমি তুলিতে পারিবে না, তোমার সকল খেলা সকল কাজে বাধা দিয়া আমি তোমাকে বসন্ত-সমাবোধের স্বপ্নের মাঝখানে টানিয়া লইয়া যাইব। নারীর জীবনই প্রেমে, পুরুষের নয়। মিথ্যা কথা। তবে পৃথিবীর এত কাব্যে, এত চিত্রে, এত গানে পুরুষই কেন নারীকে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আসিয়াছে? তোমার কর্ত্তর ঐ গানের প্রাণ কে ফুটাইয়া তুলিয়াছে সত্য করিয়া বল দেখি! দু-দিনের উন্নাদনা এই আকুলতা কি আনিতে পাবে?

কিন্তু ফুলের গন্ধে যে ছায়াময়ী তাহার সহিত কথা বলিয়া যায় তাহাব কাছে আপনাব মনেব একটা কথাও তপন বলিতে পারে কই? এ কি তাহার ভীকতা? ভীকতাই বা কি করিয়া বলে? এ তাহার যোগ্যতার অভাব। ক্ষেতে লাঙল চষে সে, সত্যই ত সে কাব্যের নায়ক নহ, প্রেমের দায়িত্ববোধ তাহার আছে, তাহার অমুরাগেব বাতি যথাস্থানে জালিয়া বাখিবার অধিকার কি তাহার আছে? সে বুঝিতে পারে না কি করিয়া আপনার অধিকার প্রমাণ কবা যায়। এই প্রমাণ না দিয়া কাঙালের মত কাছে গিয়া দাঁড়াইতে যে তাহার আত্মসন্মানে লাগে।

এ যদি প্রাচীন উপস্থাসের যুগ হইত তবে বর্ষার তবৎ-সঙ্কল নদীব বৃকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ওই পুষ্পকোমলার প্রাণ বাঁচাইতে সে অনায়াসে যাইতে পারিত; যদি মহাভারতের যুগ হইত স্তম্ভজার মত বনে বসাইয়া না-হয় তাহাকে হরণ করিত, অথবা আপনার ভাগ্য পরীক্ষাব আশায় স্বয়ংবর সভায় ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা দিত, ইউরোপের নাইটদের যুগ হইলে বন্দিনী রাজকুমারীকে উদ্ধার করিতে হয়ত সকল বিপদ বরণ করিত।

কিন্তু এই আধুনিক কলিকাতায় তাহার যে কোন সুযোগই নাই। যে যোগ্যতা এখানকার মাছঘের চোখে তাহার আছে, তাহা যে আর পাঁচ জনেরও নাই একথা ত তপন বলিতে পারে না।

শুধু এইটুকু সে বলিতে পাবে যে তাহাব অন্তরের বাতায়নের মত ওই উজ্জল চোখ দুটির দিকে চাহিলে তপন যে শুভ বৃত্তিকাদলের মত স্বপ্নের ছবিটি দেখিতে পায়

আর কেহ তাহা দেখিতে পায় নাই। ওই শুভ্রতাকে বাহিরের আবরণের অন্তরালে খুঁজিয়া পাইবার ক্ষমতা সকলের নাই। তপন আপনার অন্তরের আলো দিয়াই তাহাকে চিনিয়া বাহির করিয়াছে। আপনার অমুরাগের অঞ্জলি স্তরে স্তরে ঢালিয়া মাটির পৃথিবীর চেয়ে অনেক উর্দ্ধে সে যে-বেদী রচন করিয়া জয়লক্ষ্মীকে বসাইয়াছে সে-বেদী রচনা কনিবার ক্ষমতা সকলের নাই। আপনাদের বাজারদরের তোল-দাড়িতে যাহারা এই লক্ষ্মীপ্রতিমার মূল্য যাচাই কবিব তাহাদের কাছেও সে-প্রতিমা তুচ্ছ নয় তাহা তপন জানে, কিন্তু তপন যে-তুল্যদণ্ডে তাহাকে ওজন করিয়াছে তাহা সভ্যভামার তুল্যদণ্ডের মত। এক দিকে তাহাব অন্তঃকল্মী, অন্য দিকে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকে হার মানাইয়া ওই লক্ষ্মীকপিণীর নামেব অক্ষর কয়টি মাত্র। তাহাব তুল্য শুধু সেই।

বাদের বাঁজে সমস্ত গাড়ীবারাণ্ডা ভরিয়া গিয়াছে। আর বেলা করা যায় না। তপনকে কাজে যাইতেই হইবে। সকাল সকাল গ্রামের কাজ সাবিয়া বিবাহ-উৎসবের আয়োজনে ইন্ধন যোগাইতে আবাব যথাকালে ছুটিয়া আসিতে হইবে। মিলির বিবাহ-সভাকে ঘিরিয়া তাহাদেব সর্বত্র মনের উৎসব-দেবতার। যে মর্ত্যলোকে দেখা দিয়াছেন।

না ভাকিয়া পাঠাইয়াছেন, খাবাব সাজানো হইয়াছে। তপন তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেল। সকালবেলা এক রাশ তাল ভাত মাছ খাইতে সে ভালবাসিত না। পিড়িব সামনে ষ্ঠেত পাথরের থালায় চার খানা লুচি, কালজিরা ও কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন-দেওয়া বিনা মশলার একটা তরকাবি, ছোট একটা বাটিতে ঘন ক্ষীর ও ছোট রেকাবিতে কাটা গোলপী থরমুজা। খাওয়াদাওয়া সারিয়া মোটা এক খানা ধোপ কাপড়ের উপর পাশে ফিতা-বাঁধা সাদা মাবাঠা জামা পরিয়া ও পুরু কাবুলী চটি পায়ে দিয়া তপন কাজে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

গ্রামের ষ্টেশনে তাহার একটা সাইক্ল থাকে, গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাতে চড়িয়াই সে জ্বলে যায়। আবাব ফিরিবাব সময় ষ্টেশনে সেটি জমা রাখিয়া ট্রেন ধরে।

গ্রামের পথে বৃষ্টি-বাদল হইলে কি খানখন্দ পড়িলে

তাহার বাহন তাহারই ক্ষেত্রে আরোহণ করে। তবু মোটের উপর জিনিষটার সাহায্যে তাহার পথ একটু সঙ্ক্ষিপ্ত হয়।

তখন পথে চলিয়াছে, গ্রামের মেয়েরা স্নান সারিয়া জলের কলসী লইয়া বাড়ী চলিয়াছে, মেছুনীর টুকরীতে রুপার মত বক্বকে ছোট ছোট মাছগুলি শালপাতার তলায় ঢাকা দিয়া বেচিতে চলিয়াছে, চাষীরা প্রথম বৃষ্টির পরেই মাঠে লাঙ্গল চষিতে সুরু করিয়াছে, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর প্রথম ধাবান্নানে প্রকৃতির শ্রামশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। তপনের চোখে এই মাটির পৃথিবীকে আজ যেন অনন্ত ঐশ্বর্য-শালিনী মনে হইতেছে। তাহার চোখে সে বুঝি মায়ার অঙ্গন পরিয়া আসিয়াছে। সে বিস্মিত হইয়া ভাবে এই কলসীর ছলছল, এই মলিন অঞ্চলের তলে সিক্ত কেশপাশ, এই লাঙ্গলের ফলার দুপাশে ভাঙিয়া-পড়া মাটির ডেলা, এই পুকুরঘাটের শ্রাওলা-পড়া পাথর সে ত জন্মাবধি দেখিতেছে, কিন্তু তাহা অনবদ্য হইয়া উঠিল আজ এতকাল পরে। একজনের চোখে একদিন এগুলি স্বন্দর লাগিয়াছিল সে জানে, সেই দিন হইতে তখনও ইহাদের স্বন্দর বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে। সেই চোখ দুটি যাহা দেখিয়াছে

তাহাতেই বুঝি আপনার দৃষ্টির অমৃত ব্লাইয়া দিয়া গিয়াছে।

কাল মিলির গায়েহলুদ, পরশু বিবাহ। তার পর এই জমাট উৎসব-আয়োজন ছিন্নভিন্ন ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবে। কহ কাহারও দেখা আর সহজে পাইবে কি না কে জানে? কি ছল করিলে কাহার সন্ধান পাওয়া যায় তাহা নিত্য নূতন করিয়া ভাবিতে হইবে। তবুও হয় ত নিত্য দেখা করিবার সাহস সঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিবে বহু দীর্ঘ কাল। তাহার ভিতর পৃথিবীতে ত কতই অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটয়া যাইতে পারে। পৃথিবীতে শুধু প্রলয়, মহামারী, আকস্মিক দুর্ঘটনাই যে ঘটে তাহা নয়, তপনের অপেক্ষা দুঃসাহসিক মানুষ, যোগ্য মানুষও পৃথিবীতে অনেক আছে। তাহারাই যে ইতিমধ্যে তপনের অন্তরলক্ষ্মীকে জয় করিবার চেষ্টা না করিতে পারে এমন নয়। বাঙালীর মেয়ের পিতামাতাও তাহার ভবিষ্যৎ ভাবেন, তাঁহারাইও হয়ত কত কল্পনাঙ্কনায় ব্যস্ত আছেন, যাহা দুই দিন পরে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার মতই তপনের চিন্তাকাশ অন্ধকার করিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে। ভাবিতে ভাবিতে তপনের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

— ক্রমশঃ

অন্ধ্র দেশ

শ্রীবীরেশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

মাদ্রাজ মেল বেঙ্গলগাড়ায় পৌঁছায় নটা ক্রিশ মিনিটে।

মাইল খানেক দূর হইতেই অসংখ্য আলোর উজ্জ্বল ষ্টেশন দেখিতে পাওয়া গেল। গাড়ী প্ল্যাটফর্মে ঢুকিতেই দূরে বাবাকে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাঁহার পাশে এক অতিশয় স্থূলকায় মাদ্রাজী মহিলাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। তুল ভাঙিল তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া। ট্রেন হইতে নামিয়া বাবাকে প্রণাম করিতেছি,—শুনিলাম, উত্তর বিস্মিত কর্তে মা বলিতেছেন, “ও মা, এ কি চেহারা হয়ে গেছে, বাবা?”

চেহারা যে বাস্তবিক বেশী কিছু খারাপ হইয়াছিল তাহা নয়। আত্মীয়স্বজনের কাছ হইতে দূরে থাকিয়া বাঙালীর ছেলে পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতে থাকিলে শরীর যতটুকু খারাপ হওয়া উচিত তাহার বেশী নয়। যাহা হউক, মা আশ্বাস দিলেন, এখানকার কুষ্ণার জল খুব ভাল; অতি শীঘ্রই আমাকে নূতন মানুষ তৈয়ার করিয়া দিবেন। তাঁহার পানে চাহিয়া সে কথা আমার অবিশ্বাস হইল না। বস্তুতঃ আমি বেঙ্গলগাড়ায় প্রথম দুই মাসেই পচিশ পাউণ্ড ওজনে বাড়িয়াছিলাম, এক পরে কলিকাতায়

আসিলে আমার বন্ধুরা অনেকে আমাকে চিনিতে পারেন নাই।

যথারীতি টিকিট দিয়া এবং মালপত্র লইয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিলাম। বাহিরে গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল ;—অবিলম্বে বাড়ী পৌঁছিলাম, এবং সকাল সকাল আহার সাবিয়া শুইয়া পড়িলাম। দীর্ঘকাল ব্যক্তি জাগরণের পর, মায়েব স্বস্থ-প্রস্তুত বিহানায় একান্ত নিশ্চিন্ত মনে নিশ্রা গেলাম।

অঙ্কু দেশের সহিত এই আমার প্রথম পবিচয়।

পবিচয়টা পাকা করিয়া লইবার জন্ত পরদিন সকালে বাহিব হইলাম।

বাস্তব পা দিয়াই মনে পড়িল,—এ বাংলা দেশ নয়। শুধু তাই নয়, এই দক্ষিণ দেশের আবহিড় সভ্যতা উত্তরা পথের আর্ধ্য (?) সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

বেশ মোটা—এবং সেই জন্ত দেখিতে বেঁটে—অগণিত মহিলা চলিয়াছেন ; মাথায় অবগুঠন নাই ; গতিভঙ্গী দৃষ্ট ও অকুণ্ঠিত। মনে হইতেছে রবিবর্ম্মার অঙ্কিত পোষাণিক চিত্রের ভিতর হইতে এইমাত্র বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাদের অসংখ্য প্রকার বিভিন্ন রঙের শাড়ী ও চাদরের প্রভাষ পথ রঙীন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।...এই বর্ণ-বৈচিত্র্যময় দক্ষিণ দেশের সহিত বাংলা দেশের তুলনা করিয়া মনে আঘাত পাইলাম। বাঙালীর জীবনে সহজ আনন্দের অভাব ঘটিয়াছে।

চোখ ভরিয়া এই বঙের লীলা দেখিতে লাগিলাম।

নীল আকাশ হইতে সোনালী রোদ ঝরিয়া পড়িতেছে।

...বেগুনী পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট শহরটি। লাল টাকির ছাদ-দেওয়া ছোট ছোট জানালাবিহীন বাড়ী, সন্ন সন্ন রাস্তা,—আর চারিদিকে—রঙ—রঙ—রঙ। সবুজ, নীল, হলদে, ফিরোজা, কমলা, লাল—যত রকম রঙ কল্পনা কবা যায়—এই সবরকম রঙের গুড়না বাতাসে উড়িতেছে। কালো রঙের অথবা রক্তবর্ণের শাড়ীব রূপালী জ্বরির পাড় হইতে, মহিলাদের হাতের স্বর্ণ-কঙ্কণ ও কোমরের চণ্ডা সোনার বেণ্ট হইতে সূর্যের কিরণ ঠিকবাইতেছে।...চমৎকার।

কিন্তু ভাবুকতা বেশীক্ষণ রহিল না। বিরক্ত কণ্ঠে মা বলিলেন—“মা গো, হাঁ করে দেখছে দ্যাখো। কেন বে বাপু, আমরা চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে এলাম না কি ?”

কথাটা ঠিক। আমরা উহাদের যতটা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতাম,—উহারা তার চেয়ে ঢের বেশী আশ্চর্য্য হইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া থাকিত। বেচারীদের দোষ নাই। উহারা বাঙালীর নাম বহু শুনিয়াছে, কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয় বেশী পায় নাই।

এক জায়গায় দেখিলাম, অঙ্কু-মহিলাবা পথে কল তলায় স্নান করিয়া জল লইয়া যাঁহেতেছেন। কোমরে হাত দিয়া দিব্য সাবলীল ভঙ্গীতে প্রভাত ঘড়ায় কবিতা জল লইয়া চলিয়াছেন। বঙ্গ-মহিলার কাঁধে কলসী লইয়া ধীর মরাল-গমন নহে। কাঁধে ঘড়া বসাইয়া, কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া, দৃষ্ট-অকুণ্ঠিত স্বন্দর গতিভঙ্গী। চোখে ইহা অপরূপ ঠেকিল ; মনে মনে সংশয় জন্মিল,—হয়ত ইহাদের ভাষায় ‘অবলা’ শব্দটা নাই।

অবস্থা, নিঃসংশয়ও হইয়াছিলাম ; কিন্তু অনেক দিন পবে। একই অবাস্তর হইলেও, ঘটনাটি এখানে বলিতেছি। আমি তখন পিতৃদেবের অধীনে অ্যাসিষ্ট্যান্ট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইয়াছি। রাস্তায় ‘লাইন-মার্ক’ করিতে বাহির হইয়াছি ; এবং সমস্ত সকালটা খাটিয়া, অনেকগুলি ঝাণ্ডা পুঁতিয়া একটা দীর্ঘ লাইন ‘রেঞ্জ’ করিয়াছি। কাজ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছি ; মনে কবিতোছি, এই বাবে ঝাণ্ডাগুলি তুলিয়া খোঁটা বসাইয়া চলিয়া যাইব। কিন্তু বিপত্তি ঘটিল। পল্লীস্থ একটা বালক আসিয়া, হঠাৎ কি মনে করিয়া একটা ঝাণ্ডা তুলিয়া লইয়া প্রশ্নান করিল। আমার সঙ্গে এক জন অ্যাপ্রেন্টিসের ইহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে ছুটিয়া গিয়া ছেলেটার দুই গালে চপেটাঘাত করিল।

ফল ফলিতে দেবী হইল না। ছেলেটাব গগনভেদী চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে চারি দিক হইতে অসংখ্য মহিলা, এবং কয়েকটি পুরুষ ছুটিয়া আসিলেন ; এবং আমাদেরই ঝাণ্ডাগুলি তুলিয়া লইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদের পিটিতে শুরু করিলেন। আমাব দলে পাঁচ জন কুলি, চাব জন অ্যাপ্রেন্টিস এবং আমি নিজে ছিলাম। কিন্তু পাছে জীলোকের গায়ে হাত লাগে, এই ভয়ে তাহাদের দলের পুরুষদেরও মারিতে পারিলাম না।

আমি হিন্দীতে, ইংবেজীতে এবং অবশেষে বাংলায় তাহাদের ব্যাপারটা বুঝাইবার প্রয়াস পাইলাম, কিন্তু তাহারা সে সকল কিছুই বুঝিতে পারিল না ; এবং সম্ভবতঃ সেই আক্রোশেই আবও বেশী কবিতা পিটিতে শুরু কবিল। অতএব দাঁড়াইয়া মার ত খাইলামই ; উপবস্ত্র প্রান, কাগজ-পত্র ইত্যাদি ছিড়িয়া হারাইয়া গেল। নিরুপায়।

এই ব্যাপাবে সব চেয়ে মজাব কাণ্ড করিয়াছিল, আন্স্কার নামে একটি অ্যাসিষ্ট্যান্ট। এই ছেলেটি তামিল ; অতএব অঙ্কুদেশে এও আমার মত বিদেশী। মারামারি প্রারম্ভেই ইহাকে আমি সাইকেলে পিতৃদেবের নিকট খবর দিতে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু মারামারি থামিয়া গেলেও যখন তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন না, তখন খুব আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। কারণটা পরে জানিলাম।



অন্ধ-মহিলারা সাবলীল ভঙ্গিতে প্রকাণ্ড বড়ায় করিয়া জল লইয়া চলিয়াছেন

আয়েকাব ঝড়ের বেগে বাবার কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার বারম্বার প্রশ্নের উত্তরে সে কেবলই বলিয়াছে—“সার, গ্রেট ফাইট!” বেচারী হঠাৎ মেয়েদের হাতে মার খাইয়া এতই উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে আধ ঘণ্টা কাল আর কিছুই বলিতে পারে নাই।

শহরের ঠিক মাঝখানে বিশপস্ হিল একটি ছোট্ট পাহাড়। আমবা স্টেশনে রেলের পুল পার হইয়া গিয়া, বিশপস্-হিলে উঠিলাম। উহাব মধ্য পথে এক বিশপের বাগান। পাহাড়ের চূড়ায় আগে কোনো রাজার একটি প্রাসাদ ছিল,—এখন তাহা ভাঙিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ইট-পাথরের জুপের মধ্যে কোন আয়গায় জায়গায় ছাদবিহীন দেয়ালগুলো খাড়া হইয়া রহিয়াছে।...

...এই যেখানে আমরা রহিয়াছি, এখান হইতে বহু দূরের দৃশ্য দেখা যাইতেছে। দক্ষিণে দুইটি পাহাড়ের মধ্যে অ্যানিকাটের উপর দিয়া লাকাইয়া পড়িয়া কৃষ্ণ চকল গতিতে সমুদ্রের পানে ছুটিয়াছে। তাহার গৈরিক অঞ্চল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। পূর্বে যতদূর দেখা যায়—মাঠ

আর পাহাড়,—পাহাড় আর মাঠ। উত্তরে বেল লাইন। ভারতের সব বড় বড় নগর হইতেই রেল লাইন আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই, যাক্সাজ, লাহোর—সর্বত্রই ট্রেন না বদলাইয়াই এখান হইতে যাতায়াত যায়। পশ্চিমে অর্জুন-হিল। এখানে মহাত্মা পার্থ যুদ্ধে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া পাণ্ডপত অস্ত্র লাভ করেন। তাই নাম হইয়াছে—বিজয়-ওয়াডা (ওয়াডা মানে কি?)। উর্দ্ধে নীলাকাশ আব পায়ের নীচে বিশপস্-হিলকে আঘাটের মত বেটন করিয়া বেজওয়াডা শহর। লাল ছাদ-ওয়ালা ছোট ছোট বাড়ীর মধ্যবর্তী ধূসর বর্ণের পথের উপর রঙীন কাপড় পবিয়া পুরুষ এবং মেয়েরা চলিয়াছে। উহাদের ঠিক পিপড়ার মত ছোট ছোট দেখাইতেছে। দূরে অর্জুন-হিলের গায়ে কনক-দুর্গাব মন্দির। নীচে কৃষ্ণার ধারে শিব মন্দিরের গোপুরম! উঁচু, বৃহৎ গোপুরম। সমস্তই এখান হইতে দেখা যাইতেছে। ...বেশ চমৎকার দেখা যাইতেছে।

পাহাড় হইতে নামিয়া বাজার ঘুরিয়া কৃষ্ণাব তীবে উপস্থিত হইলাম।

...কৃষ্ণা ? কৃষ্ণা ? ভারতবর্ষে যে এমন অপৰূপ নামেই তটপ্ৰাবী নদী আছে,—তাহা হয়ত জানিতামই না।—রেবা, সিপ্রা, কাবেরী, যমুনা,—এ সব নাম তো পরিচিত। কিন্তু কে জানিত এই অন্ধ্র প্রদেশে অৰ্জুন-হিলকে বেঁটন করিয়া কৃষ্ণা প্রবাহিত হইয়াছে।...অ্যানিকাটের উপরে জল, স্থির, মন্থন,—ঠিক বিদ্যুত কাঁচের মত। উহাতে পরপারের ছোট ছোট পাহাড়গুলি পরিকার প্রতিফলিত হইয়াছে।

বাক্সারে ঝটকা দেখিলাম। ইহাই এখানকার মাথুবের একমাত্র বাহন। আমরা ছয় জনে যে কি করিয়া তাহাড়ে আঁটিলাম তাহা আমার তত আশ্চর্য্য বোধ হইল না কিন্তু মা যখন বলিলেন, “এই ঝটকাওয়ালা, তোয়ারেগা পো”—তখন ঐ গাড়ীর ক্ষুদ্র ও শীর্ণকায় অর্থ চালকের ইজিতে যে বিদ্যুৎবেগে ছুটিল তাহা বিশ্বম্ভরক।... একটা কথা মনে হইতেছে। যে কবি লিখিয়াছেন, “বেহাবে বেঘোরে চড়িছ একা” তিনি নিশ্চয়ই দক্ষিণ ভারতে আসেন নাই। না, কখনই আসেন নাই; আঁটি বাজি রাখিতে পারি।

অন্ধ্র দেশেব সহিত আমার এই পরিচয় ধনিষ্ঠতার পরিণত হইতে চলিল। অন্ধ্র দেশ আমার ভাল লাগিয়াছে।..

প্রথম বাহার সহিত আলাপ হইল, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত রামশেখাইয়া। এই ভক্তলোক পরদিন সকালে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি কলিকাতা হইতে প্রত্যাশিত মিষ্টার চ্যাটার্জীর ঘোষ্ঠ পুত্র কি না, এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আমাকে তাঁহার গৃহে ‘ভিনাবের’ নিমন্ত্রণ করিলেন।

তার পরে তিনি তাঁহার সঙ্গী ভক্তলোকটির সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। শ্রীযুক্ত সোমনাথ ভেলেটোর—কবি।

কবি মহাশয় বলিলেন, “নমস্কারম্।”

আমি বলিলাম, “আনন্দিত হলাম। দুঃখের বিষয় আমি আপনাদের ভাষা জানি না। আপনার কাব্য উপভোগের সৌভাগ্য—”

না, তিনি ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখিয়া থাকেন হুখিত হইবার কারণ নাই। মসলিপট্টমে আর একজন আছেন, মিষ্টার ভূষণম্—তিনি শুধু ইংরেজীতে কবিতাই লেখেন না; ছোট গল্পও লিখিয়া থাকেন। রিয়্যালিট ওয়াণ্ডারফুল।

যথাসময়ে ডিনারে উপস্থিত হইলাম। মিষ্টার রামশেখাইয়া গুরু অতিথয় ভক্তলোক। নিজে আসিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। দেখিলাম, তাঁহার গৃহে এই অখ্যাত বঙ্গ-সন্তানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত বাহার সমবেত হইয়াছেন তাঁহারা কেহই সাধারণ লোক নহেন। কবি,



কবি মহাশয় বলিলেন, “নমস্কারম্”

ঔপন্যাসিক, একজন আর্টিষ্ট, ব্যাঙ্গাচার্য্য, কংগ্রেসনেতা, মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার,—এই সকলেই উপস্থিত রহিয়াছেন।

ডিনার চলিতে লাগিল। আয়োজন অগ্রচুর নহে। যথাসাধ্য খাইবার চেষ্টা করিতেছি।...একটা বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। আমার ধারণা ছিল পূর্ববঙ্গে বাহার ঝালেব ব্যবহার বেশী। কিন্তু লঙ্কার ঝালকে পাঁচ-ছয় গুণ তীব্র কবিবার রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্ভবতঃ তাঁহাদের জানা নাই।

কবি বলিলেন, “আমরা অধিক ঝাল খাই না; তামিলরা—ও সে ‘হরিবল’—”

বিনয় সহকাবে বলিলাম, “বটেই তা।” এক আমাবও যে মোটেই ঝাল লাগিতেছে না,—ইহা প্রমাণ করিবার জন্ত এক গ্রাস জলন্ত অন্ধার মুখে পুরিয়া দিলাম। কিন্তু চোখের জল আটকাইয়া রাখিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়াছিলাম; কেহ দেখিতে পায় নাই।

অন্তঃপর রসম্ আনীত হইল। ইহা তেঁতুল, লঙ্কা এবং এক প্রকার গন্ধ-পাতার সংমিশ্রণে প্রস্তুত।

ব্যায়ামাচাষ মহাশয় কহিলেন, এই সমুদ্রতীরস্থ গরম দেশে এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। শরীর বিধ্ব রাধিতে ইহার তুল্য আর কিছুই নয়।

কহিলাম, “নিশ্চয়ই।”

কিন্তু তার পরদিন পর্যন্ত পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ করিয়াছিলাম। ও কিছু নয়; নিশ্চয়ই গরম দেশ বলিয়া—

আহারের পর তাঁহারা আমাকে গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। আমি যখন বাঙালী তখন নিশ্চয়ই ‘টেগোরস্ সঙ’ গাহিতে পারি। সবিনয়ে প্রতিবাদ করিয়া কহিলাম, যদিও আমি বাঙালীই বটে, তথাপি বাঙালী মাত্রেই ‘টেগোরস্ সঙ’ গাহিতে পারে মনে করিলে ‘টেগোরস্ সঙ’-এর প্রতি স্থবিচার করা হইবে না। কিন্তু সে কথা তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন না।

শ্রীযুক্ত রামশেখারীয়া বলিলেন, তিনি বাঙলা ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, এবং বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছেন। আর কবি বাংলা না জানিলেও, অসম্বোধে “জন-গণ-মন অধিনায়ক জর হে”—গানটি তাঁহার নিজস্ব স্বরে (!) গাহিয়া শুনাইলেন। কবি সগর্বে কহিলেন, তিনি এই গানটির “দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ” এই পদটিকে “দ্রাবিড়-উৎকল-অঙ্গু” এইরূপে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন।

নিশ্চয়ই! তাঁহার ত অধিকারই আছে। রবীন্দ্রনাথ ত কেবল মাত্র বাঙালীর কবি নহেন। তিনি ভারতীয় কবি। তিনি যে বাংলা ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন—তাহা না করিয়া যে কোনও ভাষাতেই লিখিতে পারিতেন; তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না। কারণ কাব্য ত আর লিখিত হয় না; উহা ‘রেকর্ডেড’ হয়। উহার কাব্য-গুণ ভাষা-বিশেষের উপর মোটেই নির্ভর করে না।

ঔপন্যাসিক কহিলেন, কয়েক বৎসর হইতে তাঁহাদের শিল্পে ও সাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছে। এ-বিষয়ে বাংলা দেশই তাঁহাদের পথ-প্রদর্শক। ভারতীয় চিত্রকলায় নূতন ভাবে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য বাঙালী শিল্পীদের অঙ্গু জাতীয় কলাশালায় আনয়ন করিয়াছিলেন। আচ্ছা, আপনার বাঙালীর চোখে আমাদের এই ‘রেপেশ্যন্স’ কেমন ঠেকিতেছে? ...না, না, বলুন, আপনার অভিমতের একটা মূল্য আছে বইকি।

আচ্ছা, সি. আর. দাশ যখন মসলিপট্টমে আসিয়াছিলেন, তখন পট্টিভিত্তি সীতারামায়াকে কি বলিয়াছিলেন জানেন কি? আর—

বেশ জমিয়া উঠিতেছে। এই সভায় আমি সি. আর. দাশ, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের সমশ্রেণীর। ...বাঙালী।

ভাল কথা। বিবেকানন্দকে কে প্রথম আমেরিকা

যাইবার টাকা তুলিয়া দিয়াছিল—আপনি জানেন কি? —অঙ্কু দেশ। আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত ত তাঁহার প্রথম কাব্য ‘ক্যাপটিভ লেডি’—এখানেই—এই মাত্রাজেই লেখেন। ..

...একটি মহিলা গান করিলেন। ভাষা বুঝিতেছি না। কেবল আশ্চর্য্য বিচিত্র স্বর এবং দুই-একটা পরিচিত শব্দ মিলিয়া হেমন্ত রাত্রির জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন কুয়াসার দ্বায় একটা অদ্ভুত অর্ধ-পরিষ্কৃত রহস্যলোকের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছে। ...

চমৎকার লাগিতেছে। ...এই সব অমায়িক ভঙ্গলোক। এই অভিনব অঙ্কু-ডিনার। ...এই বিচিত্র রঙীন-বসনা মহিলারা। ... বেশ। ..

দিন কাটিতেছে,—জলের মতন। দীর্ঘকাল ব্যাপী কঠিন পরিশ্রমের পর নিরুবেগ ছোট ছোট দিনগুলি। জীবনের অনাড়ম্বর আনন্দে পূর্ণ ছুটির দিনগুলি।

সকালে ঘুম ভাঙিতে দেৱী হয়। সুবা-আম্মা ‘টি-শা’ লইয়া আসিয়া ঘুম ভাঙায়। চা খাইয়া বাহির হইয়া পড়ি। দল বাঁধিয়া কলরব করিতে করিতে শহরটা বেড়াইয়া আসি।

এতক্ষণে ছেলে-বুড়ো সকলেই যে যাহার কাজে লাগিয়াছে। বড় বড় গরুর গাড়ীতে বস্তা-বোঝাই খাস্ত চলিয়াছে। ক্যানালগুলো নৌকায় কণ্টকাধীর্ণ (!)। একখানা প্রকাণ্ড বজ্রা, দুইটা ছোট ছেলে কেমন গুণ টানিয়া লইয়া চলিয়াছে দেখিলে তুমি নিশ্চয়ই খুশী হইতে। ... বজ্রাখানা অবিচ্ছিন্ন মন্থর গতিতে চলিয়াছে।

ঝুম্ ঝুম্ শব্দ করিতে করিতে একখানা ‘বটকা’ আসিয়া পড়িয়াছে। —“বাণ্ডি—বাণ্ডি—বাণ্ডি”—। পথ ছাড়িয়া দাড়াইলাম। গাড়ীর মধ্যে বুট-পরিহিত দুইটা সাহেব বসিয়া আছে। নীচু ছইয়ের তলায় মাথা হেঁট করিয়া উহার। আমাদের মতন আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে। দেখিলে হাসি পায়।

বাজনার শব্দের সহিত একটি ছোট দল দেখা গেল। দুইটি স্তরুণা বালিকা...তাহাদের পিছনে ‘কয়েকটা’ লোক বাজনা বাজাইয়া চলিয়াছে। বালিকা দুইটি বাড়ীতে বাড়ীতে ঢুকিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া যাইতেছে। বিবাহের নিমন্ত্রণ।

বিবাহের মবন্তম লাগিয়া গিয়াছে। শব্দ-বিল বোধ হয় পাশ হইবে। তাই সকলেই তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়ের বিবাহ সারিয়া লইতেছে। ধর্ম্ম-বক্ষা করিতে ইহাদের ব্যাকুল আগ্রহ। এই মাসের মধ্যেই বোধ হয় সাত হাজার বিবাহ হইবে।

...এই একটি বর চলিয়াছে। দেখিতে অদ্ভুত আট জন লোকের দ্বারা বাহিত একটা তাঞ্জামে বর চূপ করিয়া বসিয়া আছে। বয়স ছয় বৎসরের বেশী নয়। আগে

আগে একমল শানাই, আব পিছনে মেয়ের দল। বিচিত্র বর্ণের, বিভিন্ন বর্ণের শাড়ী কাঁচুলী ও গজাবরণ পরিহিত মহিলার দল। তাঁহাদের কোমবে চণ্ডা সোনাব বেণ্ট, গলায় মোটা হার, পা হরিজীবস্ত্রিত। প্রায় দেড় শত মহিলা বরেব তাজামের পিছনে হাঁটিয়া চলিয়াছেন। বরের সহিত হাঁটিয়া চলিয়াছেন। কেহ কেহ গান ধরিয়াছেন।

... দূরে নীল আকাশের গাজ-সংলগ্ন নীলাভ পাহাড়, আর এই খানে লাল পথের উপর পাটল বর্ণের ধূলি উড়াইয়া বর-ষাজিগী সহ বর চলিয়াছে।...

শীত আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ঠিক আমাদের বাংলা দেশের শবৎ কাল। হাওয়া চালাইয়াছে; উষ্ণরেও নয়, ঠাণ্ডাও নয়, বেশ আরামদায়ক। বারান্দায় বসিয়া চাহিয়া থাকি।... ছবির মত দক্ষিণ দেশ।

ধীরে ধীরে আর একখানি ছবি চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। এই শীতের অপবাহু তাহার উপর কুয়াসা আবরণ টানিয়া দিয়াছে। চোখে জল আসিতে চায়।

কবি আসিলেন। বলিলেন, শ্রীযুক্ত রামশেষাইয়া আমাদের ‘অন্ধ-ভিলেজ’ দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কাল প্রত্যুষে মোটরে বণ্ডা হইতে হইবে। সেখানে প্রথমে আমরা ছেল ও মেয়েদের স্কুল পরিদর্শন করিব, এবং গ্রাম দেখিব। তার পবে অপরাহ্নে মিটিং। তাহাতে শ্রীযুক্ত রামশেষাইয়া সভাপতিব আসন গ্রহণ করিবেন।

মোটরে পৌছিতে প্রায় ঘণ্টা তিনেক লাগিল। দুই ধারে অড়হব আর ‘বেঙ্গল-গ্রাম’-এর ক্ষেত। মাঝে মাঝে ধানের, কচিং আখের ক্ষেতও চোখে পড়িতেছে। আর তাহার ভিতর দিয়া গাভী চলিয়াছে। কাঁচা রাস্তা, কখনো বা পাকা রাস্তা, চষা মাঠ, ক্যানালের পাড়—এই সবের উপর দিয়া শর্ট-কাট করিয়া গাড়ী চলিয়াছে। এই পুরাণো ঝড়ঝড়ে গাড়ীতে ঝাঁকুনির চোটে পরস্পর থাক থাইতে থাইতে চলিয়াছি।

পেনামাকুর ছোট গ্রাম। দুই শত ঘরের বেশী লোক বাস করে না। খড়েব ঘরগুলার মধ্যে মধ্যে দুই-একটা টালি-ছাওয়া পাকা ঘর এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই ছোট গ্রামের মধ্যেই ইহার দুইটা স্কুল করিয়াছে, এবং সকলে বসিয়া আলাপ আলোচনা করিবাব জন্ত জলাশয়ের ধারে একটা স্নানব চাতাল বাধাইয়া রাখিয়াছে। ইহাদের অভিয উদ্যোগী বলিয়া মনে হইতেছে। মেয়েরা অভ্যর্থনা-সঙ্গীত গাহিতেছে। ছেলেরা সসন্ময়ে অভিবাদন করিতেছে। বয়সানগণ আমাদের আহাৰ এবং বিশ্রামের ব্যবস্থায় ব্যস্ত ভাবে ঘুরিতেছেন। সমগ্র গ্রামবানাকে একটা বৃহৎ পরিবার বলিয়া মনে হইতেছে।

স্কুল-পরিদর্শন হইয়া গেল।... ইহার আমাদের মনে করিয়াছে কি? ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইতে চাহে নাকি? আসিয়া পৌছাইতেই ত একবার ‘কফি’ হইয়া গিয়াছে।... এখন এটা মধ্যাহ্নভোজনের আগে সামান্য একটু টিফিন। শালপাতার ঠোঙায় করিয় মসলা-দেওয়া ডালভাজা আর নানাবকম খাবার দিয়াছে। তাহাব ভিতবে অমৃতি আর বৌদে দেখিতেছি। কিন্তু বৌদেতে লতার গুঁড়া দিয়াছে।— অসম্ভব ঝাল।

মেয়েরা গান গাহিয়া সভার উদ্বোধন করিল। ইহারাই সকলে গান গাহিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

বক্তৃতা সবই তেলেগু ভাষায় হইতেছে। দু-একটা কথা ছাড়া আর সবই দুঃস্বাদ্য। উহাবা তালুক বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছে গ্রামের উন্নতির জন্ত সাহায্য এবং পরামর্শ প্রার্থনা করিতেছে।... কিন্তু উপজ্ঞাস কথাটা বার বার কানে আসিতেছে কেন?

একটি বালিকা দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছে। বালিকা বিদ্যালয়েরই ছাত্রী। স্ত্রীম ভঙ্গীতে হাত প্রসাবিত করিয়া বড় বড় টানা চোখ দর্শকদের প্রতি মেলিয়া, বলিতেছে। কি বলিতেছে কিছুই বুঝিতেছি না। কেবল ভাষাহীন সঙ্গীতের মত একটা ব্যাফুলতার আভাস পাইতেছি। কে জানে এই বালিকা কি বলিতেছে।...

সন্ধ্যার অনেক পবে বণ্ডা হইলাম। গ্রামের লোকেরা অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বিদায় দিল। যখন আমরা তাহাদের ছাড়িয়া চলিলাম, তখন তাহারা এই সন্মানিত অতিথিবর্গের নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। পেনামাকুর পিছনে রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম।

চমৎকার রাত্রি! একটা উচু পাড়ের উপর দিয়া মোটব চলিয়াছে। পাশেই ক্যানাল। পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় ক্যানালের জলে গাছের উন্টা ছায়াগুলি স্পন্দ দেখাইতেছে। কুয়াসা একেবাবে নাই। একটু শীত লাগিতেছে।

শ্রীযুক্ত রামশেষাইয়া কহিলেন, “জ্ঞানেন মিষ্টার চ্যাটার্জী, আগে আমাদের দেশে চাষের অভ্যাস অসুবিধা ছিল। এই ক্যানালগুলি কাটানর ফলে কৃষা-ভিত্তিক এখন ধনদাত্তে পূর্ণ।”

কবি কহিলেন, “আজকের আনন্দের স্মৃতি ভুলবার নয়।”

—নিশ্চয়ই! এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

রামশেষাইয়া কহিলেন, “এ-গ্রামটার বিশেষত্ব হচ্ছে— এখানে দলাদলি নেই। আর এখানকাব লোকেরা সব দিকেই খুব অগ্রসর। দুঃখের বিষয় সব গ্রামই এই বকম নয়।”

কবি বলিলেন, “আচ্ছা, আমাদের গ্রামের চেয়ে বাংলা দেশের গ্রাম কি দেখতে সুন্দর ?”

আমি কহিলাম—“বাস্তবিক চমৎকার আপনাদের গ্রাম, আর তার চেয়ে চমৎকার এই সরল উৎসাহী লোকগুলি।”

বাড়ী পৌছাইতে রাজি বারোটা হইল।

শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ রাও-এর সহিত আলাপ হইল—একটা টি-পার্টিতে। চমৎকার বাংলা বলিতে পারেন। রবীন্দ্র-নাথের গ্রন্থাবলী অঙ্কুভাষায় অল্পবাদ করিতেছেন। ভারি অমায়িক ভক্তলোক। অতিশয় মিহি হাসিয়া কহিলেন, “বাংলা লিটারেচারের মত—উচ্চ—গুরুত্ব পূর্ণ—আমাদের তেলেগু লিটারেচারে কি-ই বা আব আছে—।”

কবি কহিলেন, “কেন আমাদেরও ত সাহিত্য গড়ে উঠছে। কত নতুন নতুন লেখক হচ্ছেন। কত আর্টিষ্ট—”

—আচ্ছা, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সেই উপক্ৰাসটার নাম কি ? কঙ্কম-ভরণী—সিন্দূর-কোটা ?—সিন্দূর-কোটা ?—আমরা কঙ্কম-ভরণী নাম দিয়া উহা অঙ্কুভাষায় অল্পবাদ করিয়াছি। চমৎকার বই। আচ্ছা, অবনীন্দ্রনাথ কি রবীন্দ্রনাথের ভাই, না ভাইপো ? আর তার আন্তরিকতা না কি—।

এমনি করিয়া অল্পদেশে আমাব দিন কাটিতেছে। এমনি করিয়া অল্প-জাতিব সহিত পরিচয় নিবিড়তর হইতেছে।

কোন দিন মিনিটোরের টি-পার্টিতে নিমন্ত্রণ পাইতেছি। লর্ড সাহেবের একজন মন্ত্রী,—তাহার সম্মানার্থ শহরবাসিগণ এই টি-পার্টি দিতেছেন। সমাজেব উচ্চতম স্তরের ব্যক্তিগণ এইখানে আজ সম্মিলিত হইবেন।

মাননীয় নিমন্ত্রিতগণ একে একে আসিতেছেন। ইংরেজী, অঙ্ক আর মুসলমানী—এই সব সজ্জার যত রকম সম্মিলণ হইতে পারে,—তাহার সব কয়টাই দেখিতেছি। এক জন ব্যাকার মোটর ড্রাইভ করিয়া আসিলেন। আর একজন বাও-সাহেব টম্-টম্ হাঁকাইয়া আসিলেন। তিনি হাতে একগাছি হাণ্ডার লইয়া যখন লাফাইয়া নামিলেন,—তুমি দেখিলে নিশ্চয়ই হাসিয়া কেলিতে; কিন্তু আমি একটুও হাসি নাই। শপথ করিয়া বলিতেছি—একটুও হাসি নাই।

মাঝখানের সাদা চাদর পাতা টেবিলটায় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বসিয়াছেন। মাথায় জরির পাড়-দেওয়া চমৎকার পাগড়ী,—আর কানে সোনার রিং। তাহার পাশে উপবিষ্ট একটি অতিশয় সুন্দরী মালয়ালী বালিকার সহিত হাসিয়া

হাসিয়া কথা কহিতেছেন। তাহাতে তাহার কানের সোনার রিং ফুলিতেছে।

চা ‘সার্ভ’ করিয়া গেল। ছোট ছোট শালপাতার চৌড়ায় দুইটি করিয়া ভালমুট আর দুইটি কবির চাপা কলা দিয়াছে। কানা-বাঁহিব-করা পিতলের গেলাচে করিয়া বয়রা কফি লইয়া যাইতেছে।—“এ বাঙি—কফি-ই—?”

কোনদিন মন্ডল-গিরিব মন্দির দেখিতে যাই। দুঃখ মোটে আট মাইল। কিন্তু মিটার-গেজ ট্রেনে সময় লাগে এক ঘণ্টাবও উপর। ট্রেনের ধারেই একটি পাহাড়;—তাহার পাদদেশে একটি মন্দির। চারি দিকে চারিটি বৃহৎ গোপুরম্; তাহাদের মাঝখানে ছোট মন্দির। পাহাড়ের গায়ে পাঁচ-শ’ ধাপ সিঁড়ি উঠিয়া আর একটি মন্দির।

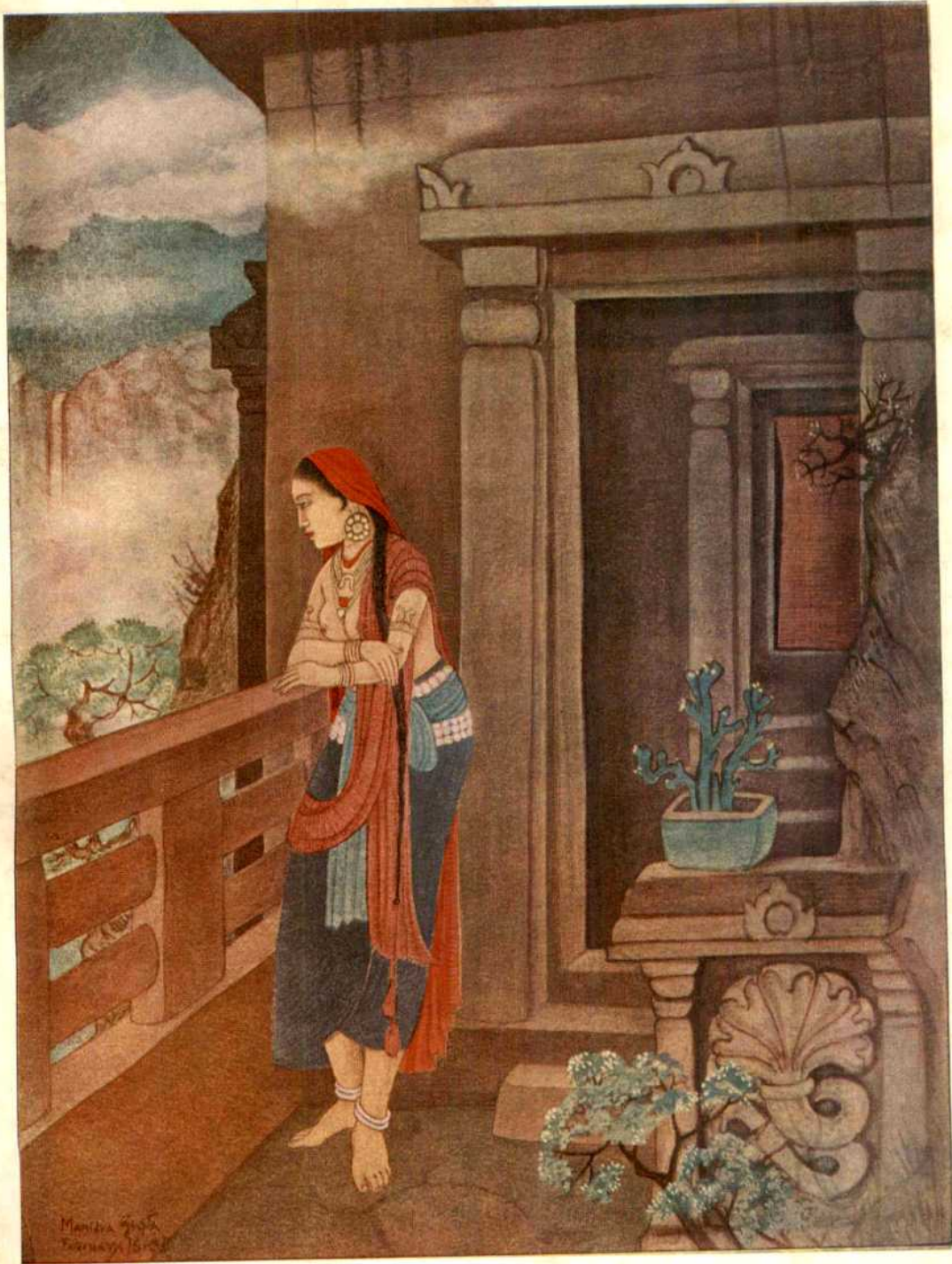
নীচেকার মন্দিরটির গোপুরম্ চারিটি এগারো-তলা দেওয়ালে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি রহিয়াছে। নৃসিংহ-মূর্তি আর গুরুমূর্তি দেখিতেছি।...এখানে একটা সোনার হুম্মান-মূর্তি রহিয়াছে। বীরদ্ব্যজ্ঞক প্রকাণ্ড মূর্তি।

গর্তগৃহের ভিতর অন্ধকার। কিছু দেখা যাইতেছে না। একটি তম্বাকী বালিকা মেঝের উপর সটান পড়িয়া বহিয়াছে। বোধ হয় সে দেবমন্দিরে হত্যা দিয়াছে।

আমরা একটা গোপুরমে উঠিলাম। এগারো তলা উঠিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া থোলা বাতায়নের ধারে বসিলাম প্রায় দেড় শত ফুট উপরে উঠিয়াছি। এখান হইতে বার দুইর পাহাড় দেখা যাইতেছে। পাণ্ডা কহিলেন, এখান হইতে সমুদ্র দেখা যায়। ও—ই যেখানে দূরে মাঠ আর আকাশ মিশিয়া ধূ ধূ করিতেছে—ওই ধানেই সমুদ্র !

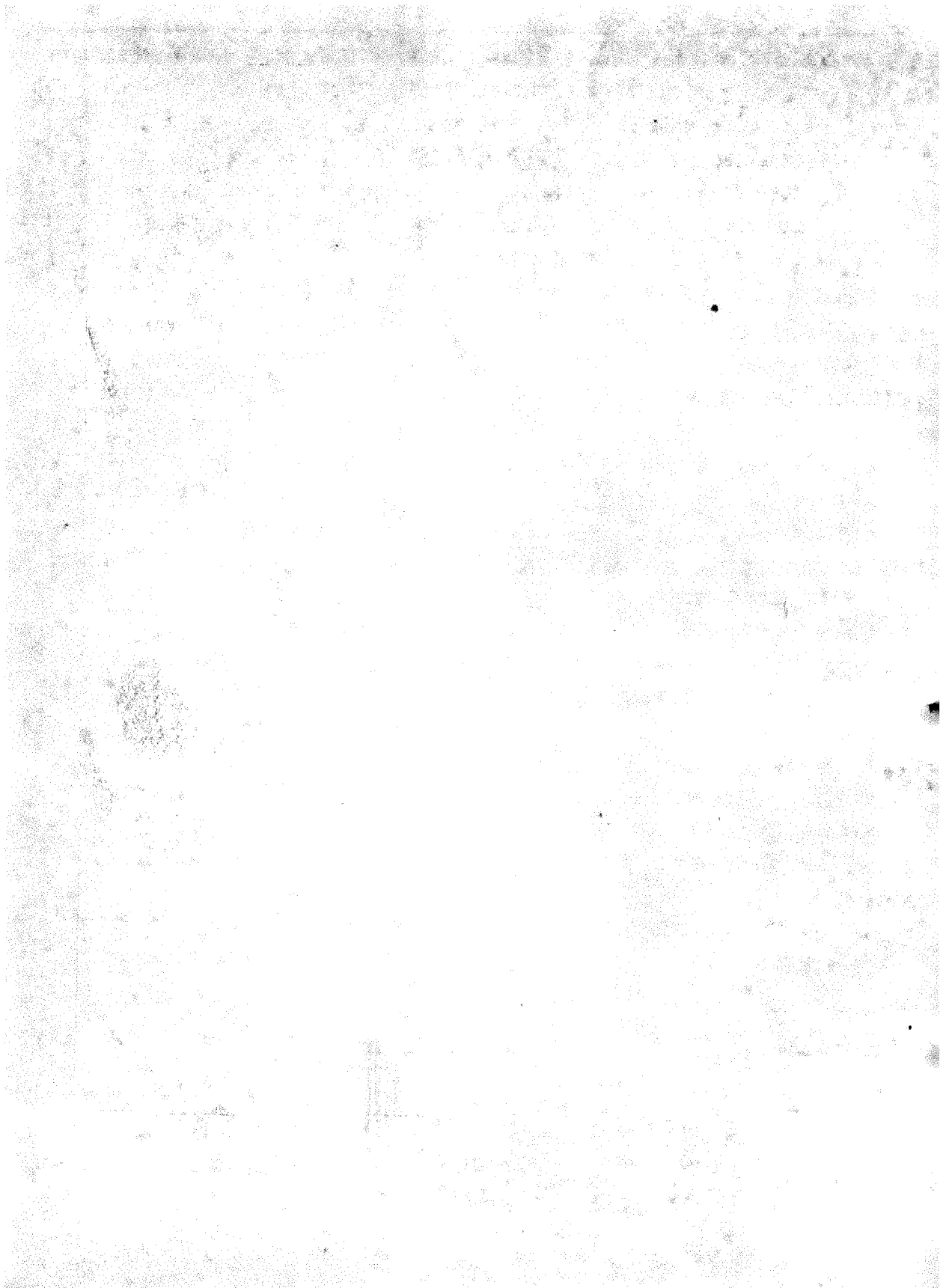
পাণ্ডাজী বলিতেছেন, কিছুদিন আগেও এখানে প্রত্যহ বহু বাজীসমাগম হইত। ধর্মপ্রাণ নরনারীগণেব আনীত অর্ঘ্যভারে মন্দির ভরিয়া উঠিত। দেবতা ফুলের তলা হারাওয়া যাইতেন।

আমার চোখের উপর হইতে একখানা পর্দা সরিয়া যায়।...প্রশস্ত রাজপুত্রের উপর দিয়া অগণ্য নরনারী চলিয়াছে। পথে দুই ধারে বিবিধ অর্ঘ্য সাজাইয়া বিপণিশ্রী, আর তাহার মাঝখান দিয়া বিখ্যাত ভক্তমান নরনারী অসীম আগ্রহে চলিয়াছে। স্বকুমার তম্বাকী বালিকা, গৌরাজী স্বাস্থ্যবর্ত্ত যুবতী এবং শ্রোতা দলে দলে চলিয়াছে। তাহাদের পরিধানে বিচিত্র বর্ণের রঙীন শাড়ী,—অঙ্গে স্বর্ণ আভরণ... ঠিক ছবির মত দেখাইতেছে। উহাদের সকলেই অবগুণ্ঠন হীন মাথায় ফুল পরিয়াছে। উহারা দেবতার নির্মাল্যে মত পবিত্র এবং সুন্দর।



মেঘালোকে
শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



এক-এক জন কৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠ পুরুষ চলিয়াছে। উহাদের পরিধানে বস্ত্র বস্ত্র, কানে কুণ্ডল, হাতে স্বর্ণ-বলয়। কাহারও প্রশস্ত বৃকের উপর উত্তরীয়। তাহার চণ্ডা সোনার পাড় উজ্জল সূর্য-কিরণে জ্বলিতেছে...

ঐ সম্মুখে বিশাল গোপুরম। দেবতা-মন্দিরের প্রবেশ পথ। উহা উচ্চ, প্রকাণ্ড, অপূর্ণ কারুকার্যমণ্ডিত, অতিশয় জমকালো। কিন্তু ভিতরে যেখানে দেবতা রহিয়াছেন, সেই মন্দির অত বড় নয়। সাধাসিধা, অনাড়ম্বর।...বাহির হইতে তাহা চোখেই পড়ে না। এই নিভৃত স্বল্পালোক মন্দির হইতে দেবতা ডাক দিয়াছেন। সে ডাক যাহাদের কানে পৌছিয়াছে তাহারা আসিতেছে। দীর্ঘ পথ বাহিয়া, বৃহৎ গোপুরম অভিক্রম করিয়া তাহারা আসিতেছে, অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে আসিতেছে।...

ভাবুকতা ছুটিয়া গেল, বহু-মহাশয়ের কথায়। তিনি তাড়া দিয়া বলিলেন, “আর দেরি করলে ত্রৈন ধরতে পারব না।” স্বতরাং আমরা কিবিত্তেছি। পথে একটা আতা গাছ হইতে নাম আতা পাড়িয়াছিল বলিয়া একটা জীলোক ধেকপ তাড়া কবিয়া আসিয়াছিল,—সে কথা মনে পড়িলে হাসি পায়। তাহার ক্রুদ্ধ সিংহীর মত মূর্তি এখনো আমার চোখের উপর ভাসিতেছে।

অন্ধ্র দেশে আমাদের অনেক দিন কাটিয়া গেল। এখানকার কাজ শেষ হইয়াছে। এইবারে দেশে ফিরিতে হইবে। ভিতরে ভিতরে আমার বাংলা দেশের জন্ত মন-কেমন করিতেছিল।

লাটলাহেব আসিয়া সোনার তাল খুলিয়া ‘পাওয়ার হাউস’র দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে

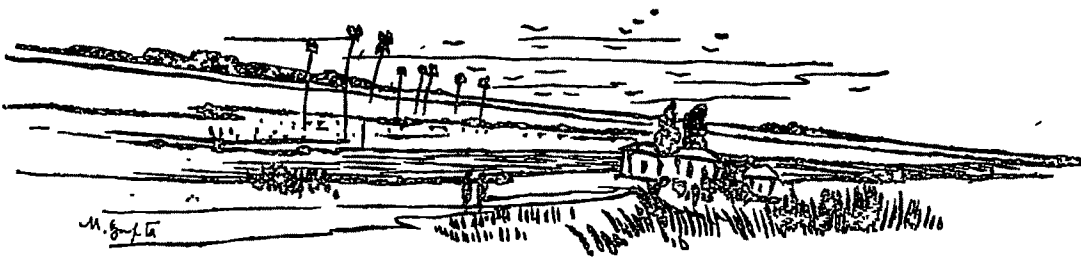
আমাদের বিদায়-ভোজ এবং পিতৃদেবকে বিদায়-অভিনন্দন দিতেছে। আমাদের ছাড়িয়া দিতে ইহারা বাস্তবিকই কষ্ট অনুভব কবিত্তেছে। অবশেষে এক প্রত্যুষে ত্রৈন চড়িয়াম।

ত্রৈন চলিয়াছে। দুই ধারে ছোট ছোট পাহাড়। কচিং তালগাছ আর কলার বাগান। ...দু-একটা ছোট ছেলে আমাদের ত্রৈনেব দিকে তাকাইয়া আছে।

ছাড়িয়া চলিয়াছি। এই সুন্দর সম্পন্ন বর্ণবৈচিত্র্যময় দক্ষিণ দেশ। এই দক্ষিণ দেশ—বাহাব অপূর্ণ সমৃদ্ধির কথা শুনিয়া শিবাজী এই দেশ জয় করিতে প্রলুব্ধ হইয়া ছিলেন। যেখানে মধ্যযুগে মহাপরাক্রান্ত বিজয়নগর সাম্রাজ্য ছিল এবং তাহার সম্রাট ছিলেন রাজচক্রবর্তী কৃষ্ণ-দেবরায়—যিনি বীর্যবান যোদ্ধা হইয়াও শক্তিমান লেখক ছিলেন, কুট রাজনীতিজ্ঞ হইয়াও শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, বাহার সহিত সর্দার বার সহস্র রাণী থাকিতেন এবং চারি সহস্র হস্তী অনুগমন করিত,—যিনি অন্ধ্র দেশের বিজয়মাদিত্য বলিয়া কীৰ্ত্তিত। এই দক্ষিণ দেশ,—যেখানে মাধবাচার্য, সায়ণ এবং শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।...

হয়ত ইহাই রামায়ণে বর্ণিত কিক্কিয়া দেশ! কে বলিতে পারে? এইখানেই তো গোদাবরী নদী রহিয়াছে। পম্পা সরোবর, তুলুভজা—সেও তো এখানেই। ...হয়ত এই কৃষ্ণকায় বিশাল-বক্ষ স্ববর্ণ-কুণ্ডল ও স্বর্ণ-বলয় পরিহিত সরলচিত্ত লোকগুলিই এক বন্ধুহীন, প্রিয়জনের জন্ত কাতর, উত্তরাপথের রাজপুত্রের সহায় হইয়াছিল, তাঁহাকে সাহসনা দান করিয়াছিল, এবং অবশেষে তাঁহার জন্ত সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করিয়া, বৃদ্ধ করিয়া লঙ্কাদ্বীপ জয় করিয়াছিল। ...এই দক্ষিণ দেশ!

পরদিন বেলা বাবটায় কলিকাতায় পৌছলাম। দীর্ঘ-কালের অনভ্যস্ত চোখে বাংলা দেশ নতুন ঠেকিতেছে।



বানান-বিধি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিছুদিন পূর্বে ইংরেজি বানান সংস্কার সম্বন্ধে গিলবর্ট মারের একটি পত্র কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ইংরেজি ভাষার যেমন ক্রমশঃপরিবর্তন হয়েছে, তেমনি মাঝে মাঝে তার বানান সংস্কার ঘটেছে। সচল ভাষার অচল বানান অস্বাভাবিক। আধুনিক ইংরেজিতে আর একবার বানান শোধনের প্রয়োজন হয়েছে এই তাঁর মত। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা একটি সভাও স্থাপন করেন।

ঠিক যে সময়ে বাংলা ভাষায় এই রকম চেষ্টার প্রবর্তন হয়েছে, সেই সময়ে গিলবর্ট মারের এই চিঠিখানি পড়ে আমাদের ভাবিয়ে দিয়েছে। বস্তুত ভাবনা অনেক দিন থেকেই আমাদের পেয়ে বসেছিল, এই চিঠিতে আরো যেন একটু শাণা দিল।

স্বদীর্ঘকালের সাহিত্যিক ব্যবহারে ইংরেজি ভাষা পাকা হয়ে উঠেছে। এই ভাষায় বহুলক্ষ বই ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা ছাড়া ইন্দুলে স্থানিভসিটিতে বক্তৃতামঞ্চ এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত নেই। উচ্চারণের অবস্থা যাই হোক সর্বত্রই এর বানানের সাম্য স্থপ্রতিষ্ঠিত। যে ভাষার লিখিত মূর্তি দেশে কালে এমন পরিব্যাপ্ত তাকে অল্পমাত্র নাড়া দেওয়াও সহজ নয়, ghost শব্দের ghost বানানের প্রস্তাবে নানা সমুদ্রের নানা তীর বামে প্রতিবাদে কী রকম ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতে পারে সে কথা কল্পনা করলে দুঃসাহসিকের মন অস্তিত হয়। কিন্তু ওদেশে বাধা যেমন দূরব্যাপী, সাহসও তেমনি প্রবল। বস্তুত আমেরিকায় ইংরেজি ভাষার বানানে যে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে তাতে কম স্পর্ধা প্রকাশ পায় নি।

মার্কিন দেশীয় বানানে through শব্দ থেকে তিনটে বেকার অক্ষর বর্জন করে বর্ণবিস্থানে যে পাগলামির উপশম করা হোলো আমাদের রাজ্যে সেটা গ্রহণ করবার যদি বাধা না থাকত তাহলে সেই সঙ্গে বাঙালির ছেলের অঙ্গীর্ণ

রোগের সেই পরিমাণ উপশম হতে পারত। কিন্তু ইংরেজ আচারনিষ্ঠ, বাঙালির কথা বলাই বাহুল্য। নইলে মাপ ও ওজন সম্বন্ধে যে দাশমিক মাত্রা যুরোপের অন্তরে স্বীকৃত হওয়াতে ভূরি পরিমাণ পরিশ্রম ও হিসাবের জটিলতা কমে গিয়েছে ইংলণ্ডেই তা গ্রাহ্য হয় নি, কেবলমাত্র সেখানেই তাপ পরিমাপে সেন্টিগ্রেডের স্থলে ফারেনহাইট অচল হয়ে আছে। কাজ সহজ করবার অভিপ্রায়ে আচারের পরিবর্তন ঘটাতে গেলে অভ্যাসে আসক্ত মনের আরামে যেটুকু হস্তক্ষেপ করা হয় সেটুকু ওরা সহ্য করতে পাবে না। এই সম্বন্ধে রাজ্য প্রজায় মনোভাবের সামঞ্জস্য দেখা যায়।

যা হোক তবুও ওদেশে অযথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বুদ্ধির উৎসাহ দেখতে পাওয়া যায়। গিলবর্ট মারের মতো মনস্বীর প্রচেষ্টা তারি লক্ষণ।

সংস্কৃত বাংলা অর্থাৎ যাকে আমরা সাধুভাষা বলে থাকি তার মধ্যে তৎসম শব্দের চলন খুবই বেশি। তা ছাড়া সেই সব শব্দের সঙ্গে ভঙ্গীর মিল করে অল্প কিছুকাল মাত্র পূর্বে গড়-উইলিয়মের গোরাদের উৎসাহে পণ্ডিতেরা যে কৃত্রিম গদ্য বানিয়ে তুলেছেন তাতে বাংলার জিহ্বাপদগুলিকে আড়ষ্ট করে দিয়ে তাকে যেন একটা ক্লাসিকাল মুখোঁস পরিয়ে সাজনা পেয়েছেন; বলতে পেরেছেন, এটা সংস্কৃত নয় বটে, কিন্তু তেমনি প্রাকৃতও নয়। যা হোক ঐ ভাষা নিতান্ত অল্পবয়স্ক হলেও হঠাৎ সাধু উপাধি নিয়ে প্রবীণের গদিতে অচল হয়ে বসেছেন। অঙ্কভক্তির দেশে উপাধির মূল্য আছে।

সৌভাগ্যক্রমে কিছুকাল থেকে প্রাকৃত বাংলা আচার-নিষ্ঠদের পাহারা পার হয়ে গিয়ে সাহিত্যের সভায় নিজের স্বাভাবিক আসন নিতে পেরেছে। সেই আসনের পরিসর প্রতিদিন বাড়ছে, অবশেষে—থাক, যা অনিবার্য তা তো

ঘটবেই, সকল দেশেই ঘটেছে, আগেভাগে সনাতনপন্থীদের বিচলিত করে লাভ নেই।

এই হচ্ছে সময় যখন উচ্চারণের সঙ্গে মিল করে প্রাকৃত বাংলার বানান অপেক্ষাকৃত নিরাপদে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। আমাদের দেশের পূর্বতন আদর্শ খুব বিস্তৃত। বানানের এমন খাটি নিয়ম পৃথিবীর অস্ত্র কোনো ভাষার আছে বলে জানি নে। সংস্কৃত ভাষা খুব স্বল্প বিচার করে উচ্চারণের সঙ্গে বানানের সম্মততার রক্ষা করেছেন। একেই বলা যায় honesty, যথার্থ সাধুতা। বাংলা সাধুভাষাকে honest ভাষা বলা চলে না, মাতৃভাষাকে সে প্রবঞ্চনা করেছে।

প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যখন লিপিবদ্ধ হয়েছে তখন সে যে ছদ্মবেশে সংস্কৃত ভাষা, পণ্ডিতেরা এমন অভিমান রাখেন নি; তাঁদের যথার্থ পাণ্ডিত্য প্রমাণ হয়েছে বানানের সাধারণ্যে।

সেই সনাতন সঙ্কটান্ত্র গ্রহণ করবার উপযুক্ত সময় এসেছে। এখনো প্রাকৃত বাংলায় বানানের পাকা দলিল তৈরি হয় নি। এই সময়ে যদি উচ্চারণের প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান রক্ষা করে বানানের ব্যবস্থা হতে পারত তাহলে কোনো পক্ষ থেকেই নালিশ-ফরিয়াদের যে কোনো আশঙ্কা থাকত না তা বলি নে, কিন্তু তার খাঙ্কা হোতো অনেক কম।

চিঠিপত্রে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার কিছুকাল পূর্বেও ছিল না, কিন্তু আমি যতটা প্রমাণ পেয়েছি তাতে বলতে পারি যে আজকাল এই ভাষা ব্যবহারের ব্যতিক্রম প্রায় নেই বললেই হয়। মেয়েদের চিঠি যা পেয়ে থাকি তাতে দেখতে পাই যে উচ্চারণ রক্ষা করে বানান করাকে অপরাধের কোঠায় গণ্য করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে তাঁদের হুঁস নেই। আমি সাধারণ মেয়েদের কথাই বলছি, বাংলায় বাবা এম-এ পরীক্ষার্থিনী তাঁদের চিঠি আমি খুব বেশি পাই নি। একটি মেয়ের চিঠিতে যখন কোলকাতা বানান দেখলুম তখন মনে ভারী আনন্দ হোলো। এই রকম মেয়েদের কাউকে বানান সংস্কার সমিতিতে রাখা উচিত ছিল। কেননা প্রাকৃত বাংলা বানান-বিচারে পুরুষদেরই প্রাধান্য একথা আমি স্বীকার করি নে। এপর্যন্ত অলিখিত প্রাকৃত বাংলা ভাষায় রস জুগিয়ে এসেছে মেয়েরাই, ছেলেবেলায় যখন রূপকথা

শুনছি তখন তার প্রমাণ পেয়েছি প্রতি সন্ধ্যাবেলায়। ব্রত-কথার বাংলা ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলেও আমার কথা স্পষ্ট হবে। এটা জানা যাবে প্রাকৃত বাংলা যেটুকু সাহিত্যরূপ নিয়েছে সে অনেকটাই মেয়েদের মুখে। অবশেষে সত্যের অগ্ররোধে ময়মনসিংহ গীতিকা উপলক্ষে পুরুষের জয় ঘোষণা করতে হবে। এমন অকৃত্রিম ভাবরসে ভরা কাব্য বাংলা ভাষায় বিরল।

যে প্রাকৃত বাংলা ভাষা সম্প্রতি সাহিত্যে হরিজনবর্গ থেকে উপরের পংক্তিতে উঠেছে, তার উচ্চারণ ওকার-বহুল একথা মানতে হবে। অনেক মেয়েদের চিঠিতে দেখেছি তাঁদের ওকার-ভীতি একবারেই নেই। তাঁরা মুখে বলেন ‘হোলো’, লেখাতেও লেখেন তাই। কোরচি, কোরবো, লিখতে তাঁদের কলম কাঁপে না। ওকারের স্থলে অর্থকুণ্ডলী ইলেকট্রিক ব্যবহার করে তাঁরা ঐ নিরপরাধ স্বরবর্ণটার চেহারা চাপা দিতে চান না। বাংলা প্রাকৃতের বিশেষত্ব বোষণার প্রধান নকিব হোলো ঐ ওকার, ইলেকট্রিক বা অচিহ্নে ওর মুখ চাপা দেবার ষড়যন্ত্র আমার কাছে সত্যত বোধ হয় না।

সেদিন নতুন বানান বিধি অনুসারে লিখিত কোনো বইয়ে যখন “কাল” শব্দ চোখে পড়ল তখন অতি অল্প একটু সময়ের জন্য আমার খটকা লাগল। পরক্ষণেই বুঝতে পারলুম লেখক বলতে চান কালো, লিখতে চান কাল। কতৃপক্ষের অনুশাসন আমি নম্রভাবে মেনে নিতে পারতুম কিন্তু কালো উচ্চারণের ওকার প্রাকৃত বাংলার একটি মূল তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। তত্ত্বটি এই যে দুই অক্ষরবিশিষ্ট বিশেষণ পদ এই ভাষায় প্রায়ই স্বরাস্ত হয়ে থাকে। তার কোনো ব্যতিক্রম নেই তা নয়, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় অল্প। সেই ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত যতগুলি আমার মনে পড়ল আগে তার তালিকা লিখে দিচ্ছি। রং বোঝায় এমন বিশেষণ, যেমন “লাল” (“নীল” তৎসম শব্দ)। স্বাদ বোঝায় যে শব্দ, যেমন টক, ঝাল। তার পরে সংখ্যাবাচক শব্দ, এক থেকে দশ, ও তার পরে বিশ, ত্রিশ ও ষাট। এইখানে একটি কথা বলা আবশ্যিক। আমাদের ভাষায় এই সংখ্যাবাচক শব্দ কেবলমাত্র সমাসে চলে, যেমন একজন, দশঘর, দুইমুখো, তিনহুঁটা। কিন্তু

বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে জোড়া না লাগিয়ে ব্যবহার করতে হলেই আমরা সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে টি বা টা যোগ করি, এর অন্তর্গত হয় না। কখনো কখনো ই স্বর যোগ করতে হয়, যেমন একই লোক, দুইই বোকা। কখনো কখনো সংখ্যাবাচক শব্দ বাক্যের শেষে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়, যেমন হরি ও হর এক। এখানে “এক” বিশেষ্যপদ, তার অর্থ, এক-সত্তা, এক হরিহর নয়। আরো দুটো সংখ্যাত্মক শব্দ আছে যেমন, আধ এবং দেড়। কিন্তু এরাও সমাসের সঙ্গী, যেমন আধখানা, দেড়খানা। ও দুটো শব্দ যখন স্বাতন্ত্র্য পায় তখন ওরা হয় আধা, দেড়া। আর একটা সমাসসংশ্লিষ্ট শব্দের দৃষ্টান্ত দেখাই, যেমন জোড়, সমাসে ব্যবহার করি জোড়হাত; সমাসবন্ধন দুটিয়ে দিলে ওটা হয় জোড়া হাত। “হেঁট” বিশেষণ শব্দটির ব্যবহার খুব সঙ্গীর্ণ। এক হোলো হেঁটমুণ্ড, সেখানে ওটা সমাসের অঙ্গ। তা ছাড়া, হেঁট হওয়া হেঁট করা। কিন্তু সাধারণ বিশেষণরূপে ওকে আমরা ব্যবহার করি নে, যেমন আমবা বলি নে, হেঁট মানুষ। বস্তুত হেঁট হওয়া, হেঁট করা জোড়া ক্রিয়াপদ, জুড়ে লেখাই উচিত। “মাঝ” শব্দটাও এই জাতের, বলি মাঝখানে, মাঝদরিয়া, এ হোলো সমাস, আর বলি মাঝ থেকে, সেটা হোলো প্রত্যয়যুক্ত, ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাজে লাগাতে পারি নে; বলা যায় না, মাঝ গোর বা মাঝ ঘর। আব একটা ফার্সি শব্দ মনে পড়ছে “সাক্”। অধিকাংশ স্থলে বিশেষণ মাত্রই সমাসের অন্তর্গত, যেমন সাক কাপড়, কিন্তু ওটা যে স্বাতন্ত্র্যবান বিশেষণ শব্দ তার প্রমাণ হয়, যখন বলা যায় কাপড়টা সাক। কিন্তু বলা যায় না “কথা এক,” বলতে হয়, “কথা একটা”, কিম্বা, “কথা একই”। বলি, “মোট কথা এই,” কিন্তু বলি নে “এই কথাটাই মোট।” যাই হোক, দুই অক্ষরের হসন্ত বাংলা বিশেষণ হয়তো ভেবে ভেবে আরো মনে আনা যেতে পারে, কিন্তু যথেষ্ট ভাবতে হয়।

অপর পক্ষে বেশী খুঁজতে হয় না যথা, বড়ো, ছোটো, মেঝো, সেঝো, ভালো, কালো, ধলো, রাদা, সাদা, ফিকে, খাটো, রোগা, মোটা, বেঁটে, ফুঁজো, ত্যাড়া, বাঁকা, সিঁধে, কানা, খোঁড়া, বোঁচা, ঝুলো, ঝাকা, হাঁদা, খাঁদা, টেরা, কটা, গ্যাটা, গোটা, ভোঁদা, জাড়া,

ফাপা, মিঠে, ডাঁসা, কষা, খাসা, তোফা, কাঁচা, পাকা, সোঁদা, বোদা, খাটি, মেকি, কড়া, মিঠে, চোখা, বোখা, জাঁটা, ফাঁটা, পোড়া, ভিজ্জে, হাজা, শুকো, শুঁড়ো, বুড়ো, ছোঁড়া, গৌড়া, ওঁচা, খেলো, ছোঁদা, খুঁটো, ভীতু, আগা, গোড়া, উচু, নিচু ইত্যাদি। মত শব্দটা বিশেষ্য, এটে থেকে বিশেষণ জন্ম নিতেই সে হোলো মতো।

কেন আমি বাংলা দুই অক্ষরের বিশেষণ পদ থেকে তার অন্তর্গত লোপ করতে পারব না তার কৈফিয়ৎ আমার এই খানেই রইল।

বাংলা শব্দে কতকগুলি মুদ্রাভঙ্গী আছে। ভদ্রীসঙ্কেত যেমন অক্ষরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যে যুক্ত এগুলিও তেমনি। যে মানুষ যোগেছে তার হাত থেকে ছুরিটা নেওয়া চলে, কিন্তু ভ্রর থেকে ভ্রুটি নেওয়া যায় না। যেমনি, তখনি, আমারো, কাবো, কোনো, কখনো শব্দে ইকার এবং ওকার কেবলমাত্র ঝাঁক দেবার জন্তে, ওরা শব্দের অল্পবর্তী না হয়ে, যথাসম্ভব তার অঙ্গীভূত থাকাই ভালো। যথাসম্ভব বলতে হোলো এই জন্তে যে স্বরাস্ত শব্দে সঙ্কেত স্বরগুলি অগত্যা সঙ্গে থাকে, মিলে থাকে না, যেমন তোমরাও, আমরাই। কিন্তু যেখানে উচ্চারণের মধ্যে মিলনের বাধা নেই, সেখানে আমি ওদের মিলিয়ে রাখব। কেন আমি বিশেষ ভাবে মিলনের পক্ষপাতী একটা ছড়া দিয়ে বুঝিয়ে দেব।

“যেমনি যখনি দেখা দিই তার ঘরে

অমনি তখনি মিথ্যা কলহ করে।

কোনো কোনো দিন কহে সে নোলক নাড়ি’

কারো কারো সাথে জন্মের মতো আড়ি।”

যদি বানান করি যেমনই, যখনই, অমনই, তখনই, কোনও, কারও, দৃষ্টিকটুত্বের নালিশ হয়তো গ্রাহ্য না হতে পারে। কিন্তু “যখনই” বানানের স্বাভাবিক যে উচ্চারণ, ছন্দের অল্পরোধে সেটা রক্ষা করতে চায় এমন কবি হয়তো জন্মাতোও পারে, কেন না কাল নিরবধি এবং বিপুল চ পৃথ্বী। যথা :—

“যখনই দেখা হয় তখনই হাসে,

হয়তো সে হাসি তার খুঁসি পরকাশে।

কখনও ভাবি, ওগো শ্রীমতী নবীনা,

কোনও কারণে এটা বিজ্ঞপ কিনা।”

আপাতত জানিয়ে রাখছি কেবল পদ্যে নয়, গদ্যেও আমি উচ্চারণ অল্পগত করে কোনো, কখনো, যখন, তখন লিখব। এইখানে একটা প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, “কখনই আমি যাব না” এবং তখন আমি গিয়েছিলেম এ দুই জায়গায় কি একি বানান থাকা সম্ভব ?

উপসংহারে এই কথাটি বলতে চাই বানানের বিধিপালনে আপাতত হয়তো মোটের উপরে আমরা “বান্দ্যতামূলক” নীতি অনুসরণ করে একান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে যোগ দেব। কিন্তু এই দ্বিধাগ্রস্ত মধ্যপথে ব্যাপারটা থামবে না। অচিরে এমন সাহসিকের সমাগম হবে ধারা নিঃসঙ্কোচে বানানকে দিয়ে সম্পূর্ণ ভাবেই উচ্চারণের সত্য রক্ষা করবেন।

বানান সংস্কার ব্যাপারে বিশেষভাবে একটা বিষয়ে কতৃপক্ষেরা যে সাহস দেখিয়েছেন সেজন্যে আমি তাঁদের ভূরি ভূরি সাধুবাদ দিই। কী কারণে জানি নে, হয়ত উড়িষ্যার হাওয়া লেগে আধুনিক বাঙালী অকস্মাৎ মূর্ধ্য নয়ের প্রতি অহৈতুক অহুসার প্রকাশ করছেন। আমি এমন চিঠি পাই যাতে লেখক শনিবার এবং শূন্য শব্দে মূর্ধ্য ন দিয়ে লেখেন। এটাতে ব্যাধির সংক্রামকতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কনেল, গবর্নর, জর্নাল প্রভৃতি বিদেশী শব্দে তাঁরা দেবভাষার গন্ধবিধি প্রয়োগ করে তার শুদ্ধতা সাধন করেন। তাতে বোপদেবের সম্মতি থাকতেও পারে। কিন্তু আজকাল যখন খবরের কাগজে দেখতে পাই কানপুরে মূর্ধ্য ন চড়েছে তখন বোপদেবের মতো বৈয়াকরণিককে তো দায়ী করতে পারি নে। কানপুরের কান শব্দের ছোটো ব্যুৎপত্তি থাকতে পারে, এক কণ শব্দ থেকে। ব্যাকরণের নিয়ম অল্পসারে রেক্ষের সংসর্গে নয়ের মূর্ধ্যতায় ঘটে। কণ শব্দের ‘র’ গেলেই মূর্ধ্যতার অস্তিত্বের কৈফিয়ৎ যায় চলে। কানপুরের কান শব্দ হয়তো কানাই শব্দের

অপভ্রংশ। কৃষ্ণ থেকে কান ও কানাই শব্দের আগমন। কৃষ্ণ শব্দে ঋফলার পরে মূর্ধ্য য, ও উভয়ের প্রভাবে শেষের ন মূর্ধ্য হয়েছে। আধুনিক প্রাকৃত থেকে সেই ঋ ফলা হয়েছে টংপাটিত। তখন থেকে বোধ করি ভারতের সকল ভাষা হতেই কানাই শব্দে মূর্ধ্যের আক্রমণের আশঙ্কা চলে গেছে। কিন্তু নতুন উপক্রমণিকা-পড়া বাঙালি হয়তো কোন দিন কানাই শব্দে মূর্ধ্য ন চালিয়ে তৃপ্তিবোধ করবেন। এই রকম ছোটো একটা শব্দ তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে। স্বর্ণের রেফহীন অপভ্রংশ সোনার তাঁরা মূর্ধ্য ন আঁকড়িয়ে আছেন, অথচ প্রবণের অপভ্রংশ শোনা তাঁদের মূর্ধ্যপক্ষপাতী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ব্যাকরণের তর্ক থাক, ওটাতে চিরদিন আমার ছবল অধিকার। কৃষ্ণ শব্দের অপভ্রংশে কোনো প্রাকৃতে কাণ্হ বা কাণ থাকতেও পারে, যদি থাকে সেখানে সেটা উচ্চারণের অল্পগত। সেখানে কেবল লেখবার বেলা কাণ্হ এবং বলবার বেলা কান্হ কখনই আদ্রিষ্ট হয় নি। কিন্তু প্রাকৃত বাংলায় তো মূর্ধ্য নয়ের সাড়া নেই কোথাও। মূল্যায়নকে দিয়ে সবই ছাপানো যায় কিন্তু রসনাকে দিয়ে তো সবই বলানো যায় না। কিন্তু যে মূর্ধ্য নয়ের উচ্চারণ প্রাকৃত বাংলায় একেবারেই নেই, গায়ে পড়ে তাব আলগত্য স্বীকার করতে যাব কেন ? এই পাণ্ডিত্যের অভিমানে শিশুপালদের প্রতি যে অত্যাচার করা যায় সেটা মার্জনীয় নয়। প্রাকৃত বাংলায় মূর্ধ্য নয়ের স্থান কোনো খানেই নেই এমন কথা যে-সাহসে কতৃপক্ষ ঘোষণা করতে পেরেছেন সেই সাহস এখনো আরো কত দূর তাঁদের ব্যবহার করতে হবে। এখনো শেষ হয় নি কাজ। *

* আমি “প্রাকৃত বাংলা” শব্দটি ব্যবহার করে আসছি। সেদিন এর একটা পুর্বাতন নজির পেয়ে আশ্চর্য হয়েছি বুলবুল নামক পদ্যে।





আলোচনা



“বঙ্গে নারী-নির্ধাতন ও তাহার প্রতিকার”

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত

গত বর্ষের চৈত্র সংখ্যা ‘প্রবাসী’তে কাজী আনিসর রহমান মহাশয়ের ‘বঙ্গে নারী-নির্ধাতন ও তাহার প্রতিকার’ সম্বন্ধে যে মধ্যম্পর্নী রচনাটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমবা সুখী হইয়াছি। তবে প্রতিকার সম্বন্ধে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে চাই।

সম্পূর্ণ লেখাটি পড়িয়া মনে হয় লেখক শুধু ইহাই বলিতে চান যে আমাদের দেশের এই ঘৃণ্য কনুবিহিত অত্যাচার কখনই কমিবে না, পক্ষান্তরে আমাদেরই তাহা হইতে রক্ষা লাভ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। উপায়গুলি সংক্ষেপে এই—

- (১) মহিলাদিগকে ছোঁবা ও লাঠি খেলা শিখিতে হইবে,
- (২) পাঙ্গীকে, জাতিভেদ না করিয়া, শাস্তি দিতে হইবে,
- (৩) পাহারাদাবের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এবং

(৪) পল্লীবধূদের সিন্ধবসনাবৃত্তা হইয়া লজ্জার সঙ্কুচিত অবস্থায় গুকুরপাড়ে না আসিতে দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে বাহা প্রয়োজন তাহা তিনি বলেন নাই। আজ বঙ্গদেশ যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে চারি দিক বিবেচনা করিয়া নারীরক্ষা অপেক্ষা পুরুষ-রক্ষাই অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিতেছে। যে-সকল দুর্বৃত্ত অশিক্ষা-বনিকার অন্তরালে আপনাদিগকে লুকাইয়া রাখিয়া ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর অন্ধকারে মগ্ন হইতেছে, তাহাদের রক্ষা করাই আজ আমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কার্য।

ইহাও ত আমাদের ভাবিতে হইবে, যে, সেই আততায়ীগণ আমাদেরই দেশবাসী; সুতরাং তাহাদের বিভীষিকা মনে করিয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আমাদের সুসজ্জিত থাকিতে হইবে না, পাহারাদাবের বন্দোবস্ত করিতে হইবে না, সভাসমিতি খুলিতে হইবে না—পল্লীবধূদের সমস্ত অন্তরালে প্রবেশ করাইবার প্রয়োজন হইবে না, শুধু প্রয়োজন তাহাদের অন্তরেব সেই পাশবিক ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি-লালসাকে নিরুৎসাহ করা। ‘প্রবাসী’র পৃষ্ঠায় আমাদের রচনা প্রকাশিত হউক, আর ময়দানে সভা করিয়া বড় বড় বক্তৃতা হউক—ইহাতে তাহাদের কিছুই আসে যায় না। তাহারা সেই গুকুর-পাড়ের আনাচে-কানাচে সিন্ধবসনাবৃত্তা পল্লীবধূ বোঁজে সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি, এবং নিরাক্ষর পল্লীবালিকার ক্ষুদ্র কুটারের চারি পার্শ্বে সন্ধ্যা হইতে সকাল অবধি ঘুরিয়া মরিবে।

এইবার রহমান সাহেব যে চারিটি প্রতিকারের কথা বলিয়াছেন তাহা লইয়া একে একে আলোচনা করিতে চাই।

(১) আমাদের দেশের মহিলাদিগের লাঠি ও ছোঁবা খেলা শিক্ষা করা সত্যই প্রয়োজনীয়। ইহাতে আত্মনির্ভর, বৃকের

বল ও উপস্থিত বুদ্ধি বাড়ে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ বাধা পাইয়া দুই আততায়ীগণ জন্ম হইয়াছে তাহারও একাধিক উদাহরণ খবরের কাগজে পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থায় ইহা কত দূর সম্ভব সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। দুশ্চরিত্র আততায়ীর নিকট হইতে আপনাব মান রক্ষা করিতে শিরা পল্লীবধূদের হয়ত বা (বিপ্লবী দল-বিবেচিত হইয়া) চরিত্রবান্ পুলিসের হাঙ্গতে বন্দী হইতে হইবে। সাহিত্য ও সংবাদপত্রের ভিতর দিয়া নারীনির্ধাতন-সমস্যা লইয়া দেশ-বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা, শিক্ষিত সমাজে ইহা লইয়া চাকল্য উপস্থিত করা হয়ত বা কিছু মঙ্গলকর হইতে পারে, কিন্তু বলিতে লজ্জা কবে যে সেই সকল শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অপেক্ষা অশিক্ষিত আততায়ীর সংখ্যা আমাদের দেশে অনেক বেশী।

বহমান সাহেব লিখিয়াছেন, “আজ বাঁবা সংবাদপত্রে নারী-নির্ধাতন প্রসঙ্গের উপর দলবদ্ধ ভাবে কোঁতকোঁসাহে হুঁকে পড়েছেন, হয়ত কাল তাঁরাই ওই একই সংবাদে ঘৃণায় ক্রোধে লজ্জায় অস্থির বোধ করবেন।” শিক্ষিত সমাজে যে দুই-চারি জন ভয় দুর্বৃত্ত বাঁচিয়া আছেন কথাগুলি হয়ত তাহাদের পক্ষে খাটিতে পারে। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই, যে, খবরের কাগজে প্রকাশ করিবার পূর্বে আততায়ীদিগকে খবরের কাগজ পড়ান শিখাইতে হইবে, নতুবা এ লেখালেখির কোনই মূল্য নাই।

(২) দ্বিতীয়তঃ তিনি বাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাহার শিক্ষা, সংস্কার ও সমবেদনার পরিচয় পাইয়াছি সত্য, কিন্তু আজ আমাদের “অত্যাচারের বন্ধে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি” করিলে চলিবে না। তাহাদেরও দলে টানিতে হইবে। যে রমণীদের সর্বনাশ করিবার জন্য আজ তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তি-গুলিকে নির্বিচারে প্রদ্রব্য দিয়া চলিতেছে, কাল কি তাহাবাই “গাল-ভরা মা ডাকে” ডাকিতে পারে না? সে শিক্ষাটুকু দিবার কি আমাদের শক্তি নাই? তাহাদের শাস্তি দিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া না লাগিয়া সেই সময়টুকু যদি শিক্ষাপ্রচারে ব্যয় করিতে পারি তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমরাই লাভবান হইব। অজ্ঞানের শাস্তি চাই, কিন্তু যে প্রকারেব শাস্তি আমাদের দেশে প্রচলিত তাহাতে তাহাদের নৈতিক জীবনের পক্ষে উহা হিতকর হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না, পবিত্র শাস্তির ভয়টুকুও তাহাদের থাকিবে না—মরিয়া হইয়া অজ্ঞানের পর অজ্ঞার করিয়া চলিবে এবং সে অজ্ঞানের পরিসমাপ্তি কোথায় তাহাও কেহ বলিতে পারে না। এই ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি-লালসার মূলে তিনটি কারণ রহিয়াছে: (১) মনে শিক্ষা নাই, (২) উদরে অন্ন নাই, (৩) হাতে কাজ নাই। তাই এই পশ্চিম প্রবৃত্তিগুলি তাহাদের পাগল করিয়া তুলিতেছে। আমরা যদি পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষা ও কোন প্রকার কাজে লিপ্ত থাকিবার (কুটারশিল্প প্রভৃতির) ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে

হয় ত ইহার কিছু উপশম হইতে পারে; নতুবা অলস ব্যক্তির মস্তিষ্ক শয়তানের কাবখানা হইয়াই থাকিবে।

(৩) তৃতীয়তঃ তিনি বাহা বলিয়াছেন সে বিষয়ে শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, গবর্ণমেন্টকে এ-বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য অনুবোধ করিবার পূর্বে তাঁহারাই হয়ত আমাদের অনুবোধ কবির বসিবেন যে এইকণ আকারে-অনুরোধ যেন আমরা না-কবি এমনি করিয়াই হয়ত মাসেব পব মাস এসেমব্লিব বৈঠকে অনুবোধ ও প্রতিরোধ চলিতে থাকিবে, অস্ত্র দিকে বিচারালয়-দ্বায়ে বহু নরনারী আশ্রয় ও শান্তির অপেক্ষার সময় কাটাইবে।

গবর্ণমেন্টের আজ টাকা নাই, এবং বাংলা দেশকে লইয়া অনেক বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাঁহাদের চুল পাকিয়া গিয়াছে সুতরাং আব ভাবিবার শক্তি ও অবসর নাই। যদি সত্যই কিছু করিতে হয় তাহা হইলে বক্তৃতা ও লেখালেখি বন্ধ করিয়া শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানকে একত্র হইয়া শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

আমার মনে হয়, আমরা হিন্দু-মুসলমান বাঙালী, বাহারা অল্প-বিস্তর কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহারা এক এক জনে যদি গ্রামে গ্রামে দশ-বারটি ছাত্র সংগ্রহ করিয়া শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত কবি, তাহা হইলে দশ-বার বৎসবে হয়ত বাংলার অবস্থাব পরিবর্তন হইতে পারে; নতুবা দশ শত বৎসবেও কিছু হইবে না। ইহা অতি সহজ তাহা বলিতেছি না, তবে হয়ত সম্ভব।

“বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থার গতি ও প্রকৃতি”

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

‘প্রবাসী’র গত বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় লিখিত বর্তমান “আন্তর্জাতিক অবস্থার গতি ও প্রকৃতি” শীর্ষক প্রবন্ধে কতকগুলি ক্রটিবিদ্যুতি দেখিতে পাইলাম। ১২৬ পৃষ্ঠার বাগল মহাশয় লিখিয়াছেন :—“এমন সময় একপ একটি ঘটনা ঘটিল বাহা পববর্তী বাবতীর আলাপ-আলোচনার মোড় ফিরাইয়া গিল এই ব্যাপারটি হইল ১৯৩৫ সনের ১৮ই মে অন্তরনিরপেক্ষ ভাবে ব্রিটেন ও জার্মানীর মধ্যে ১০০ : ৩৫ আনুপাতিক নৌচুক্তি। এই নৌচুক্তির কথা প্রকাশ হইবা মাত্র সকলেরই টনক নড়িল জার্মানীর চিরশত্রু ফ্রান্স বিচলিত হইল সকলের চেয়ে বেশী। বাহাকে সে এককাল পরমাঙ্গীর বলিয়া মনে করিয়াছে সেই ব্রিটেনকে ছাড়িয়া অভ্যন্তর সে ইটালীর দিকে মুখ ফিরাইল, ইহাব কর্ণধাব মুসোলিনী-কেই বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিল। ব্রিটেন-জার্মানীর নৌচুক্তিব বিরুদ্ধে এই যে ফ্রান্স-ইটালীয়ান আঁতাত, এক-কথায় বলিতে গেলে ইহাই ইটালীর আবিদীনিয়া-বিজয়ের মূলে, রাষ্ট্রসংঘের নিক্ষিপ্ততা তথা ব্যর্থতার মূলে, আবার ইহাই পরবর্তী স্পেন-বিদ্রোহ ও অন্তবিধ ব্যাপার-গুলি সম্ভব করিয়া দিয়াছে।” গত দুই তিন বৎসরের আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্বন্ধে বাহাবা সবিশেষ অবগত আছেন তাঁহার দেখিতে পাইবেন এই কথাগুলিতে প্রকৃত ঘটনা কিম্বদ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাগল মহাশয় লিখিয়াছেন যে ব্রিটেন ও জার্মানীর মধ্যে আনুপাতিক নৌচুক্তি নিষ্পন্ন হওয়ার পর ফ্রান্স মুসোলিনীকে বন্ধ

বলিয়া গ্রহণ করিল ও ইটালীর সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইল। কথাটি আরো সত্য নহে এক প্রকৃত ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে ১৯৩৫ সনের ৭ই জাম্বারী ফ্রান্স ও ইটালী পরস্পর সন্ধি করিয়া সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল; সুতরাং ব্রিটেন ও জার্মানীর মধ্যে নৌচুক্তি হওয়ার পরে ফ্রান্স-ইটালীয়ান আঁতাত হইয়াছে লেখা ভুল। বিশেষতঃ লেখক মহাশয় নৌচুক্তিব তারিখটি পর্যন্ত ভুল লিখিয়াছেন। উহা ১৮ই মে না লিখিয়া ১৮ই জুন লিখিলে শুদ্ধ হইত। ফ্রান্স-ইটালীয়ান আঁতাত ১৯৩৫ সনের ৭ই জাম্বারী সংঘটিত হইয়াছে। ঐ বৎসব ১৮ই জুন ইঙ্গ-জার্মান নৌচুক্তি হওয়ার পব ও আবিদীনিয়া যুদ্ধ আবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আর কোনও ফ্রান্স-ইটালীয়ান সন্ধি হয় নাই।

প্রকৃত ঘটনাটি হইয়াছিল এইরূপ :—১৯৩৫ সনের ৭ই জাম্বারী মঃ সাভাল ও মুসোলিনী আফ্রিকার পরস্পরবেব স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া ফ্রান্স-ইটালীয়ান আঁতাত (a treaty of friendship) স্থাপন করেন। ফ্রান্স ইটালীকে ইটালীয়ান-ইবিজিয়া ও ফ্রান্স-সোমালীল্যাণ্ডেব মধ্যবর্তী কতকটা স্থান এবং জীবুতি হইতে আদিস-আবাবা পর্যন্ত করাচী রেলওয়ে লাইনের কিছু অংশ ও অন্যান্য কতকগুলি সুযোগসুবিধা প্রদান করে। বিনিময়ে ফ্রান্স ইটালীকে ইউরোপে পুনঃ সমব-সম্ভার সম্ভিত চিরশত্রু জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্ররূপে পায়। এই সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হওয়াতেই ফ্রান্স আবিদীনিয়ার ইটালীর কোনও কার্যে হস্তক্ষেপ করে নাই। মহাযুদ্ধের পর হইতে ফ্রান্স নানারূপ সন্ধি ও চুক্তি দ্বারা জার্মানীকে হতমান করিয়া ও জার্মান-ভীতি সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে পারিতেছিল না। নানা কারণে ব্রিটেনেব উপরও সে বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই; তাই ইটালীকে বন্ধরূপে পাইয়া সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কারণ তাহার আশঙ্কা ছিল পাছে ইটালী জার্মানীর সহিত মিলিত হয়। এই সম্বন্ধে ‘মডার্ন রিভিউ’ পত্রিকার ১৯৩৬ সনের জাম্বারী সংখ্যায় শ্রীযুক্ত তাবকনাথ দাস মহাশয় বাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সংক্ষেপে তাহার তাৎপর্য এই—“মহাযুদ্ধ অবসানের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যত দিন আফ্রিকায় ও ভূমধ্যসাগরে ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তত দিন পর্যন্ত ইটালীকেই সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু ফ্রান্স ও ইটালী পরস্পর সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইতেই ব্রিটেন ফ্রান্স-ইটালীয়ান আঁতাত ভাঙ্গিয়া দিতে মনস্থ করিল। কারণ ইটালী ও ফ্রান্স একত্র মিলিত হইলে ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেনের নৌশক্তির প্রাধান্য ধ্বংস করিতে পারিত। ফবাসীর উপর প্রতিশোধ লইবাব জন্য ব্রিটেন ট্রেসা (Tessera) চুক্তি অমাত্র কবিয়া জার্মানীর সঙ্গে নৌচুক্তি করিয় বসিল। এই চুক্তির সর্ব অনুযায়ী জার্মানীর সম্বন্ধে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালীর একযোগে কার্য করিবার কথা ছিল।”

ব্রিটেন যখন দেখিতে পাইল যে ফ্রান্স-ইটালীয়ান আঁতাত স্থগিত হওয়ার ফলে ইটালী পূর্ব-আফ্রিকায় ও ভূমধ্যসাগরে ভব্যতে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে ও তাহার প্রাচ্য সাম্রাজ্যে বাতারাতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, তখনই নিজের স্বার্থ চিন্তা করিয়া জার্মানীর সঙ্গে নৌচুক্তি করিয়াছিল। এই সন্ধি

স্বাক্ষরিত হওয়াব পর Le Temps, Journal des Debats, Le Matin প্রভৃতি ফরাসী পত্রিকাগুলি ও ইটালীয়ান পত্রিকা Popolo d'Italia ব্রিটেনেব বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল। কাবণ এই নোচুক্তি হেসেরাই সন্ধি সর্বেরও বিরোধী ছিল। ইঙ্গ-জার্মান নোচুক্তিব পর ফ্রান্স ব্রিটেন ও ইটালীয় মধ্যে কাহাকে বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিবে এই চিন্তায় অত্যন্ত বিভ্রত হইয়া পড়িল। পবে কি কি কারণে ইটালীকে ছাড়িয়া ক্রমশঃ সে ব্রিটেনের অমুদ্রাগী হইয়া উঠিল তাহা লেখক বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের উত্তর

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ কৃত আমার প্রবন্ধেব প্রতিবাদ পাঠ করিলাম। আমি ১৯৩৫ সনের ১৮ই জুন তারিখে বিবিবন্ধ ইঙ্গ-জার্মান নো-চুক্তিকে বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থাব একটি বিশিষ্ট ব্যাপার বলিয়া মনে করি। ইহাব পবে যতগুলি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যাপার ঘটয়াছে তাহাব জন্য প্রত্যক্ষ ও পর্বোক্ষ ভাবে ইহাই কমবেশী দায়ী বলিয়াছিলাম। এই চুক্তিটিই আমার প্রবন্ধে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল না, সেজন্য আমার উক্তির সমর্থনে যুক্তির অবতারণা করি নাই। আবার “গত দুই-তিন বৎসরের আন্তর্জাতিক ব্যাপারগুলি যাহারা সবিশেষ অবগত আছেন” তাহাদের নিকট ইহাব উল্লেখ তো বাহ্যিক মাত্র; তথাপি আমার এই অভিমত সম্পর্কে যখন প্রশ্ন উঠিয়াছে তখন ইহাব সমর্থনের যুক্তিগুলি উল্লেখ করিতেছি।

শৈলেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, ১৯৩৫ সনের ৭ই জানুয়ারী ফ্রান্স ও ইটালী মধ্যে একটি সন্ধি হয় এবং ইহার কয়েকটি সর্গ বাবা আবিগীনিয়ার ফ্রান্স ইটালীকে কিছু স্বরণ-স্বরণ দান করে। (ফ্রান্স পূর্বেরকাব লগুন চুক্তি অনুসারে লিবিয়ার পার্শ্ববর্তী তাহার উপনিবেশেব থানিকটা, এব্রিডিয়া ও ফবাসী সোমালিল্যান্ডের মধ্যবর্তী থানিকটা, ডুমিয়া দ্বীপ এবং আদিসআবাবা-জিবুতি রেলওয়ের কতকটা অংশ ইটালীকে দেয়—(Keesing's Contemporary Archives, 1934-37, pp. 1502—03.) ইহা সত্য। তবে আবিগীনিয়ার উপর আধিপত্য স্থাপনে গত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালী) তরফ হইতে এত চেষ্টা চলিতে থাকে যে, ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে বিবিবন্ধ উক্ত চুক্তিব আবিগীনিয়া অংশের উপর এই সময়ে ব্রিটেন বিশেষ গুরুত্ব আবেগ করে নাই। যদি বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করাই হইত এবং ফ্রান্সের সঙ্গে ব্রিটেনেব মন-কষাকষি হইত তাহা হইলে এক মাস যাইতে-না-যাইতেই (৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫) ব্রিটেন ফ্রান্স-ইটালীয়ান চুক্তিকে একপ সাধারণ ভাবে অভিনন্দিত করিত না ও ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তিবন্ধ হইত না। এই সন্ধি উক্ত Keesing's Contemporary Archives (পৃ: ১৫৩৪)এ আছে—

“With reference to the Franco-Italian Agreement recently reached in Rome the British Ministers, on behalf of H. M. Government in the United Kingdom, cordially welcomed the declaration

by which the French and Italian Governments have asserted their intention to develop the traditional friendship which united the two nations, and associated H. M. Government with the intention of the French and Italian Governments to collaborate in a spirit of mutual trust in the maintenance of general peace.”

ফ্রান্স-ইটালীয় চুক্তি এইরূপে মানিয়া লইয়া ব্রিটেন ফ্রান্স ও ইটালীর সঙ্গে একযোগে সৈন্ত-সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য জার্মানীকে অমুদ্রাগী করিয়া পাঠায়। জার্মানী সে অমুদ্রাগী উপেক্ষা করিয়া পরবর্তী ১৬ই মার্চ অধিবাসীদের পক্ষে সৈন্তদলে যোগদান বাধ্যতামূলক (conscription) বলিয়া ঘোষণা করে। এইরূপ এক তরফা হেসেরাই সন্ধির সর্গ ভঙ্গ করা ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালী কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিল না। ইহার পরবর্তী ১৩ই ও ১৫ই এপ্রিল ফ্রেমার সম্মিলিত হইয়া ঘোষণা করিল,—

“The three Powers the object of whose policy is the collective maintenance of peace within the framework of the League of Nations, find themselves in complete agreement in opposing by all practicable means any unilateral repudiation of treaties which may endanger the peace of Europe, and will act in close and cordial collaboration for this purpose.” (Keesing's Contemporary Archives, p. 1616.)

১৪ এপ্রিল ফ্রান্স এই সিদ্ধান্ত সহ একটি নোট রাষ্ট্রসম্মুখে প্রেরণ করে। পরবর্তী ১৭ এপ্রিল জেনেভার রাষ্ট্রসম্মুখ-পরিষদে এই বিষয় আলোচনা হয় ও উহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোন সন্ধি এক তরফা ভঙ্গ করা হইলে ভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্রিয়াকর্ম শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালী তাহারও আলোচনা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সন্ধিভঙ্গকারী জার্মানীই ইহাদের লক্ষ্য ছিল। ইহার পবে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালী কাহাকেও না জানাইয়া অকস্মাৎ ১৮ই জুন সন্ধিভঙ্গকারী জার্মানীর সঙ্গে একটা নোচুক্তি করিয়া বসিল। এই চুক্তির কথা প্রকাশ হইবার পর ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ক্রিয়াকর্ম আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলি বাহারা কিঞ্চিৎ বঙ্গসহকারে অমুদ্রাগী করিয়াছেন তাহাদেরই স্বরণ হইবে। ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী, ছোট আঁতাত ইংরেজের এই ডিগ্‌বাজীর তীব্র নিন্দা করিতে থাকে। এই চুক্তি সম্পর্কে প্যারিসেব বিখ্যাত ‘ইকো-ন্য-পারি’ পত্রিকার রাজনীতিবিষয়ক লেখক André Géraud ‘ফরেন অ্যাফেয়ারস’ ত্রৈমাসিকের ১৯৩৫, অক্টোবর সংখ্যায় একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি বলেন,—

“Throughout this diplomatic activity on behalf of European peace British policy was not continuous and uniform...Instead it wandered about, apparently troubled partly by conflicting currents in domestic public opinion, partly by the cool

reception given the proposed treaty [at Stressa] by the Dominions. At one moment the Cabinet adhered to the plan of February 3, at another it abandoned it ;...The indicision of the British Cabinet between February and June will certainly one day have to be examined and described in detail."

উক্ত লেখক আরও বলেন,—

"At Stressa on April 14 and at Geneva on April 17 Great Britain officially censored unilateral repudiation of the signatory of an international treaty. Yet less than two months later Great Britain made herself an accomplice in the denunciation of the naval clauses of the Treaty of Versailles. What is at issue here is not a signature given on June 28, 1919, and which because of the long evolution of events Great Britain now considers void, but a promise given spontaneously as recently as February 3, 1935--nor let us forget that it was Sir John Simon himself who took the initiative in inviting the French ministers to meet him on that occasion. The promise made in February was repeated at Stressa and Geneva under the most formal circumstances. Two months later came the Anglo-German Naval Agreement. (পৃ. ৫৯, ইটালিক্স আমার)

১৯৩৫ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৩-১৪ই এপ্রিল ও ১৭ই এপ্রিল যে-ব্রিটেন ফ্রান্স ও ইটালীর সঙ্গে এতটা এক মত হইয়া জাৰ্মানীর বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিল, দুই মাস পরেই সে সকলের অজ্ঞাতসারে জাৰ্মানীর সঙ্গে একক ভাবে নৌচুক্তিতে আবদ্ধ হইল! ফ্রান্সের জাৰ্মান-ভীতি বহু দিনের। এই জন্ত ব্রিটেন ছাড়া অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গেও চুক্তিবদ্ধ হইতে কসুর করে নাই। তবে ব্রিটেনের উপরই নির্ভর তাহার সব চেয়ে বেশী। এহেন ব্রিটেন যখন জাৰ্মানীর দিকে এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িল তখন ইটালীর সঙ্গে অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা করা ছাড়া তাহার উপায়ান্তর ছিল না। ইহার ফল কি বিবমর হইয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন।

আমার প্রবন্ধের উদ্ধৃত অংশের 'ফ্রান্স-ইটালীয়ান আঁতাত' কথাটি শৈলেন্দ্র বাবু যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, আমি সেরূপ অর্থে ব্যবহার করি নাই। কথাগুলি পূৰ্বাপর মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে ইহা দ্বারা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ধি বা treaty বা entente (আঁতাত)এর বিষয় যে ব্যক্ত করি নাই তাহা বুঝা যাইবে, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে অত্যধিক ঘনিষ্ঠতার কথাই বুঝাইয়াছি। আঁতাত কথাটি এখন 'সন্ধি' অর্থ ছাড়া এরূপ ব্যাপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, আমরা বলি, রাম ও শ্যামের মধ্যে আঁতাত, জাপান-জাৰ্মানীর মধ্যে আঁতাত, ইত্যাদি।

শৈলেন্দ্র বাবু আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদের সমর্থনে উক্ত

তারকনাথ দাসের একটি উক্তির মন্ত উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত দাসের উক্তির মধ্যে কিরূপ অসঙ্গতি আছে তাহার একটি মাত্র উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। তিনি এই মন্ত্বে বলিয়াছেন যে, ফ্রান্স-ইটালীয়ান চুক্তির প্রতিশোধ লইবার জন্ত ব্রিটেন ট্রেসা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া জাৰ্মানীর সঙ্গে নৌ-চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। ১৯৩৫ সনের ৭ই জানুয়ারীর ফ্রান্স-ইটালীয়ান চুক্তি যদি ব্রিটেনকে এতই চটাইবে তাহা হইলে পরবর্তী এপ্রিল মাসে ট্রেসা চুক্তি করাই বা কেন, আবার তাহা ভঙ্গ করাই বা কেন? বস্তুতঃ ১৯৩৫, ১৮ই জুন তারিখের ইঙ্গ-জাৰ্মান নৌ-চুক্তিই যত নষ্টের মূল হইয়াছে।

ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালী ও ব্রহ্মদেশে পণ্ডিত

জবাহরলালের অভ্যর্থনা

শ্রীমূলকুমার দাশগুপ্ত

১

বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে প্রবাসীর সম্পাদকীয় মন্তব্য ও প্রশ্ন ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে কতকটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতে পারে। তথ্যহিন্সাবে ঐ সম্বন্ধে দু-একটি কথা জানান দরকার। সম্পাদকীয় মন্তব্য ও প্রশ্ন আংশিকভাবে সত্য হইলেও পূর্ণ সত্য নহে।

এখানে বাঙালীদের মধ্যে বাহারা নেতৃস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা স্বীকার করা যাইতে পারে যে রাষ্ট্রীয় ও অন্তর্বিধ সার্বজনিক কাজে তাঁহাদের যথেষ্ট পরিমাণ উৎসাহ, উদ্যম, কর্মকুশলতা ও সর্বোপরি স্বার্থত্যাগের অভাব অনুভূত হইয়া থাকে, এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই এই সকল কাজে এখানকার নেতৃস্থানীয় ভারতীয়দের ভিতরে তাঁহাদের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু এখানকার বাঙালী জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া বাঙালী যুবকরা, রাষ্ট্রীয় ও সার্বজনিক অন্তর্বিধ কাজে পশ্চাত্তাপ ত নহেই, বরং ঐ সকল কাজে তাঁহাদের কর্মকুশলতা, সজ্জশক্তি, স্বার্থত্যাগ ও বুদ্ধিমত্তা অস্বাভাবিক ভারতীয়দেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশীয় প্রতিনিধি-সভার বিগত নির্বাচনে এই কথা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালী ও অবাঙালী ভারতীয়দের ইহা একটা সোভাগ্যের কথা যে এখানে সক্রিয় সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা একরূপ নাই বলিলেই চলে। এই কারণেই এখানকার সাধারণ বাঙালীরা ভারতীয়দের ভিতরে বাঙালী কিংবা অবাঙালী বাহাকেই উপযুক্ত মনে করেন, তাঁহাকেই সমর্থন করিয়া নেতৃত্বে বরণ করেন।

পণ্ডিত জবাহরলালের সম্বন্ধনাদি ব্যাপারেও নেতৃস্থানীয় বাঙালীদের নাম এই কারণেই প্রবাসী-সম্পাদকের চোখে পড়ে নাই। যদিও পণ্ডিতজীর সম্বন্ধনার্থে গঠিত কাব্যিকরী সমিতিতে নেতৃস্থানীয় কয়েক জন বাঙালীর নাম ছিল, যে কোন কারণ হউক তাঁহারা ঐ সমিতির কাজে বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগ

দেন নাই। বাঙালী জনসাধারণ—বিশেষতঃ বাঙালী যুবকেরা কিন্তু সব সময়ই আশা করিতেছিলেন যে কার্য্যকরী সমিতির এই নেতৃস্থানীয় বাঙালীরাই অগ্রণী হইয়া বাঙালীদের পক্ষ হইতে পণ্ডিতজীর সম্বন্ধনার আয়োজন করিবেন। সত্য হিসাবে এখানে একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পণ্ডিতজী নিজেই প্রথমে প্রাদেশি অথবা সাম্প্রদায়িক ভাবে কোনরূপ অভ্যর্থনা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন বলিয়াই প্রচারিত হইয়াছিল। বাহা হউক, নেতৃস্থানীয়দের নিশ্চেষ্টতায় ও অবাঙালী ভারতীয়দের বাঙালীর এই ব্যাপারে উদাসীন্দের নিন্দাবাদে অর্ধেকা হইয়া কতিপয় যুবক শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী শ্রীমানন্দজীকে অগ্রণী করিয়া তাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় পণ্ডিতজীর অভ্যর্থনার আয়োজন করেন এবং মাত্র ২৪ ঘণ্টার ভিতরেই সহস্রাধিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিতজীকে মানপত্র এবং তৎসঙ্গে একটি পূর্ণমুদ্রাধার প্রদান করেন। এই সম্বন্ধনা-উৎসব এত সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যে সকলে জানিয়া সুখী হইবেন, পণ্ডিতজী অত্যন্ত সেই রাতেই বিভিন্ন স্থানে বাঙালীদের এই অভ্যর্থনার সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলার ভূয়সী প্রশংসা করেন, এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে বাঙালীদের এই সম্বন্ধনাই তাঁহার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রীতিপ্রদ বলিয়া মনে হইয়াছে।

রেঙ্গুন

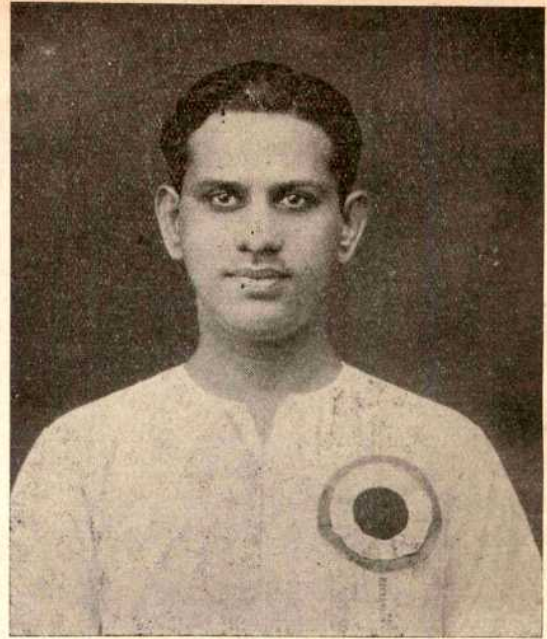
২

বেসিন হইতে শ্রীমতী মিনতি সিংহ বেসিনে পণ্ডিত জবাহরলালের অভ্যর্থনার একটি সচিত্র বিবরণ ও পত্র আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। উক্ত পত্রে শ্রীমতী সিংহ লিখিতেছেন, “...অনেকে মনে করেন যে দেশছাড়া হইয়া বাঙালী ও ভারতবাসীরা, মাতৃভূমির প্রতি তাঁহাদের যে কর্তব্য আছে, দেশনেতাদের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিবার আছে, সে-কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এ-ধারণা অতি ভ্রান্ত, এবং প্রেরিত বিবরণ হইতে সকলেই বুঝিবেন যে ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালী ভারতীয়েরা দেশনেতাদের যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং এ-বিষয়ে তাঁহাদের উৎসাহ এখনও অটুট আছে।”

বিবরণটির সারমর্ম নিয়ে মুদ্রিত হইল। বেসিনে জবাহরলালের অভ্যর্থনার চিত্রগুলি ৩৮৭-৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। —প্রবাসী-সম্পাদক

বেসিনে জবাহরলাল

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর ব্রহ্ম-ভ্রমণের সংবাদে ব্রহ্মের দ্বিতীয় বন্দর বেসিনও নীরব থাকে নাই। পণ্ডিতজীর যথোচিত অভ্যর্থনার জন্ত একটি সমিতি গঠিত হয়। ব্রহ্মদেশের জাতীয় নেতা উ-কুন মহাশয় এই সমিতির সভাপতি, এবং উ-অন-সাইঙ নামক এক জন চীনা ভদ্রলোক ও শ্রীযুক্ত অতুলপ্রতাপ সিংহ সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সমিতিতে বর্ম্মা, বাঙালী, গুজরাতি, পঞ্জাবী, মাদ্রাজী প্রভৃতি সর্বপ্রদেশীয় লোকই সভ্য ছিলেন। এই সমিতির অধীনে শ্রীমতী সুরভি সিংহ একটি স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, এই বাহিনীতে সকল প্রদেশের মহিলাই যোগ



শ্রীঅতুলপ্রতাপ সিংহ

সম্পাদক, জবাহরলাল-অভ্যর্থনা-সমিতি, বেসিন

দিয়াছিলেন। ১৩ই মে পণ্ডিতজী বেসিনে উপস্থিত হন—ঐ দিন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত বিচিত্র শোভাযাত্রার আয়োজন হইয়াছিল। শোভাযাত্রার পুরোভাগে নীল-সার্ট-পরিহিত বর্ম্মা স্বেচ্ছাসেবকগণ, তৎপরে সবুজ-লুঙ্গি-পরিহিতা বর্ম্মা মহিলাগণ, গৈরিকবাসে ভারতীয় মহিলাগণ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ, তাহার পরে শুভবাসে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ দাঁড়াইয়াছিলেন। স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকার দলকে একপভাবে সাজান হইয়াছিল যেন উপর হইতে দেখিলে বর্ণসামঞ্জস্যে একখানি জাতীয় পতাকা বলিয়া মনে হয়। যে-জ্যেটিতে পণ্ডিতজীকে লইয়া সী-প্লেন আসিবে তাহার দুই দিকে লাইন করিয়া শোভাযাত্রা দাঁড়াইল। সাড়ে দশ ঘটিকার সময় পণ্ডিতজীর সী-প্লেন দুষ্টিগোচর হইলে তোপধ্বনি করিয়া তাঁহার আগমনবার্ত্তা বিবোদিত হইল। শঙ্খ ও জয়ধ্বনির মধ্যে পণ্ডিতজী ও তাঁহার কন্যা অবতরণ করিলে শ্রীমতী সুরভি সিংহ ও শ্রীমতী সবিতা দেবী তাঁহাদিগকে বরণ করিলেন ও শ্রীড-সো মিন ও শ্রীড-এনটি তাঁহাদিগকে মালাভূষিত করিলেন। তাহার পর শোভাযাত্রা করিয়া পণ্ডিতজীকে ফায়াতে (প্যাগোডা) লইয়া আসা হয়, সেইখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং ইংরেজী ও বর্ম্মা ভাষায় লিখিত মানপত্র প্রদত্ত হয়। পণ্ডিতজীর সারগর্ভ অভিভাষণের পর পুনরায় শোভাযাত্রা করিয়া পণ্ডিতজীকে চট্ট-দেউলে আনা হয়, এইখানে তিনি বিশ্রাম করেন।

বেসিনে স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী ও ভারতীয় প্রথায় অভ্যর্থনায় পণ্ডিতজী বিশেষ প্রীত হইয়াছেন ও অভ্যর্থনা-সমিতির প্রধান উক্তোক্তা শ্রীযুক্ত অতুলপ্রতাপ সিংহকে সেজন্ত ধন্যবাদ জানাইয়াছেন।

মহিলা-সংবাদ



বরিশাল জেলা মহিলা-সম্মিলনী। মধ্যস্থলে মাল্যভূষিতা সভানেত্রী শ্রীহেমপ্রভা মজুমদার



কুমারী আর. শাহ্,

গত ৮ ও ৯ই মে বরিশালে অধিনীকুমার দত্ত হলে বরিশাল জেলা মহিলা-সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বরিশাল জেলার পিরোজপুর, পটুয়াখালি, ভোলা, ঝালকাঠি, দক্ষিণ শাহবাজপুর, বানরীপাড়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় দেড় শতাব্দিক মহিলা প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। বহু মুসলমান মহিলাও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা অম্বদাহন্দরী বোষ অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী ও শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার সভানেত্রীর কার্য্য নির্বাহ করেন। সম্মিলনে গৃহীত প্রধান প্রস্তাবাবলী জ্যেষ্ঠের প্রবাসীতে মুদ্রিত হইয়াছে। মহিলাদিগের প্রস্তুত কুটারশিল্পের একটি প্রদর্শনীও এই সম্পর্কে খোলা হইয়াছিল।

কুমারী আর. শাহ্, পূনা কৃষি-কলেজ হইতে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন ও এম-এসসি উপাধি লাভ করেন। তৎপরে তিনি বিহারে সাবুর হটিকালচারাল রিসার্চ স্টেশনে কর্ম্ম

নিযুক্ত হন। তাঁহার কৃষিতত্ত্ব-সম্পর্কিত গবেষণা বৈজ্ঞানিক সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি মধ্যপ্রদেশের সরকারী হর্টিকালচারিষ্ট (Horticulturist) নিযুক্ত হইয়াছেন।



শ্রীমতী শোভা দাসগুপ্তা

শ্রীমতী শোভা দাসগুপ্তা ঢাকা বোর্ডের গত ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ছাত্রীদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

আগামী আগষ্ট মাসে জাপানে টোকিও শহরে বিশ্ব-শিক্ষাসম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন হইবে। ভারতবর্ষ হইতে সাত জন মহিলা এই সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্ত যাত্রা করিয়াছেন।



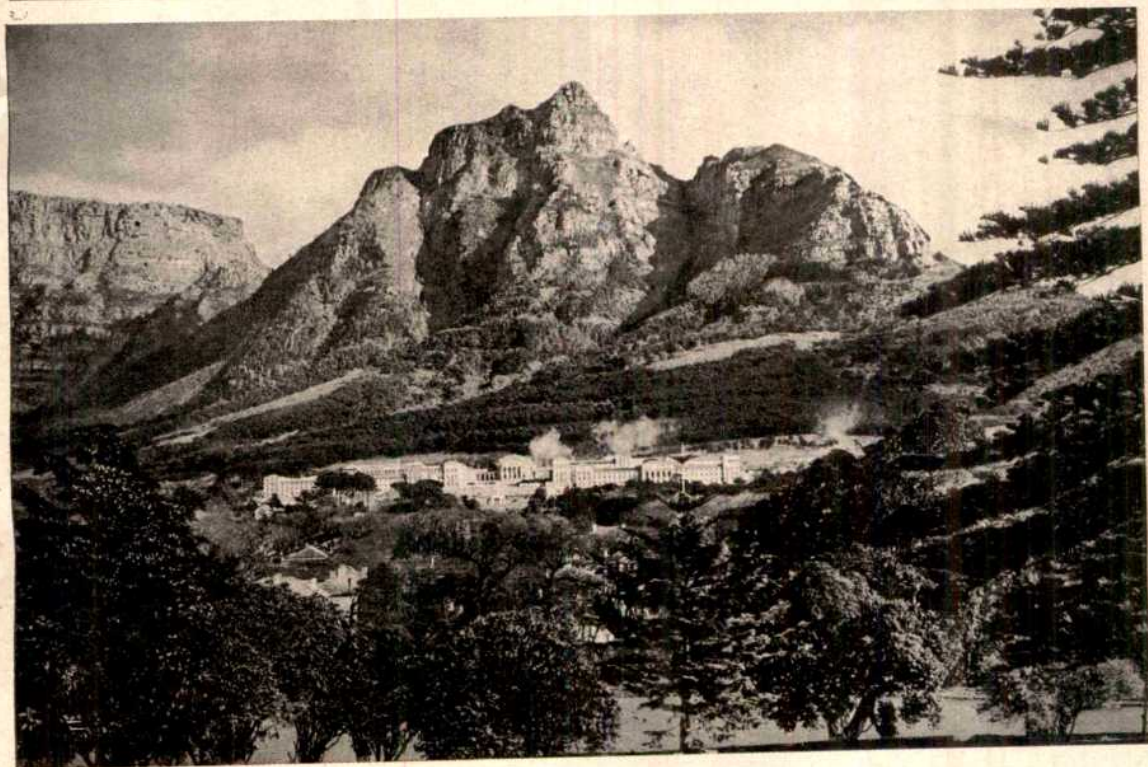
টোকিও বিশ্বশিক্ষাসম্মিলনে ভারতবর্ষের মহিলা-প্রতিনিধিবর্গ



শ্রীমতী সীতা জাহান-আরা

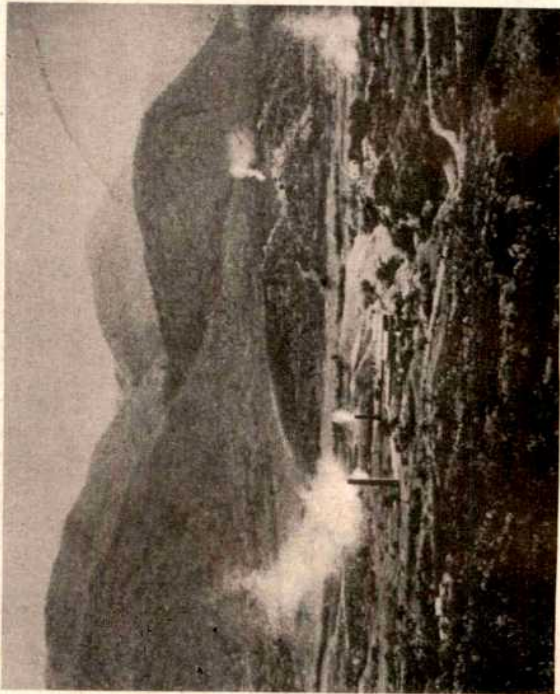
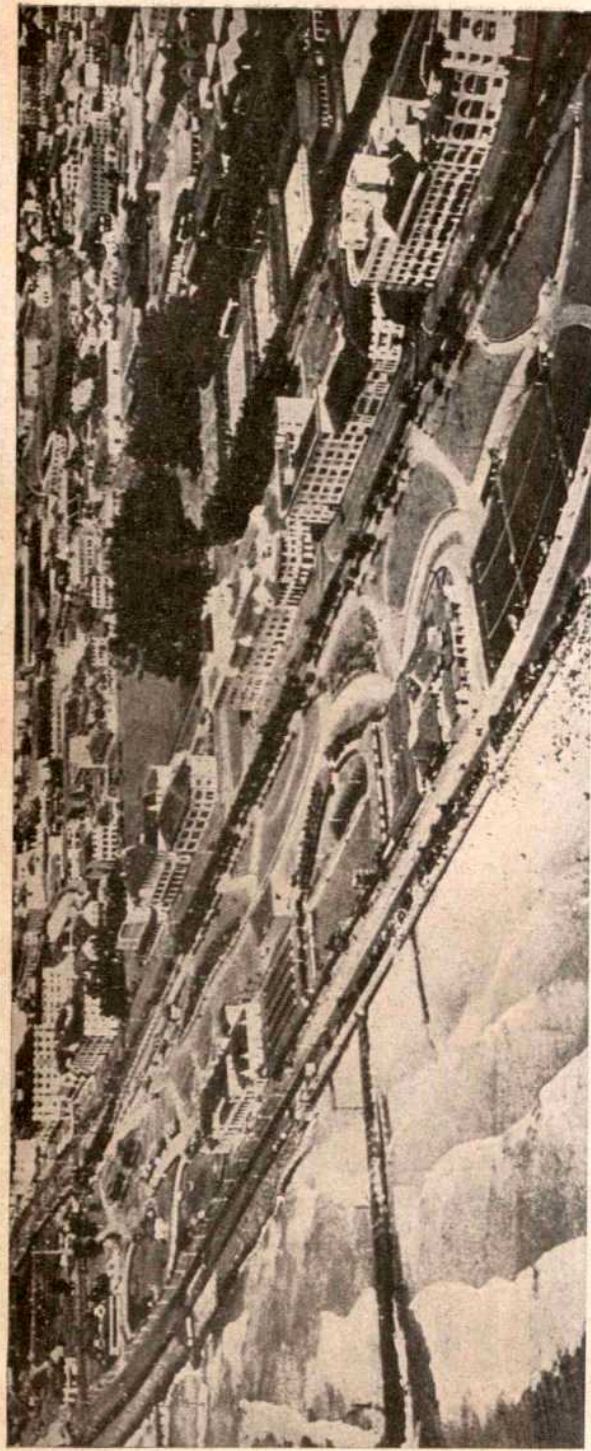
শ্রীমতী সীতা জাহান-আরা পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ছাত্রীদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকা-দেশ



উপরে : উত্তমাশা অন্তরীপ

নীচে : কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়

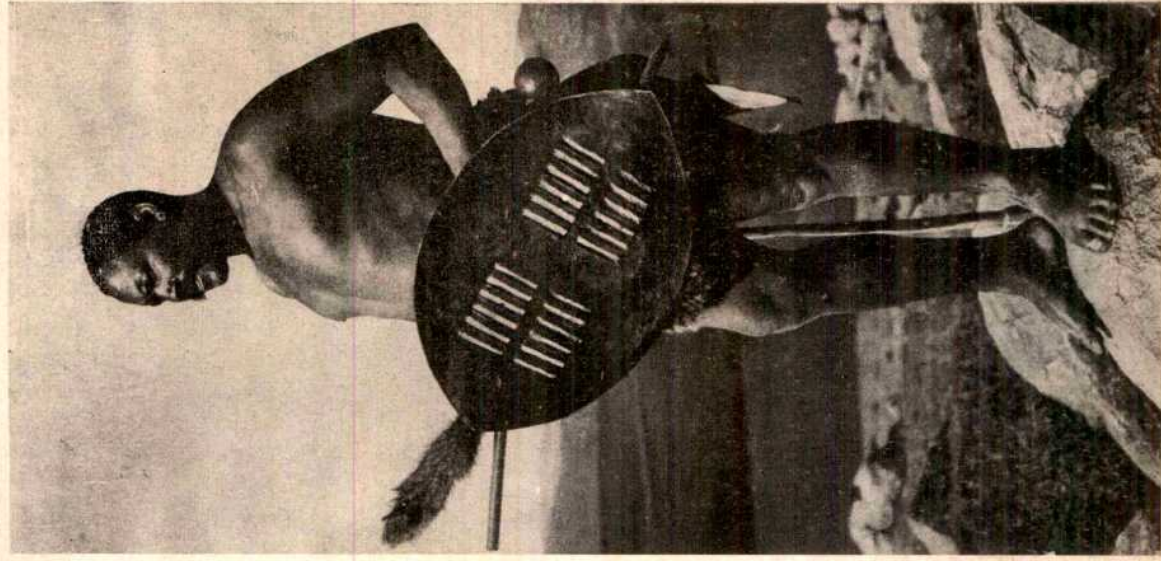
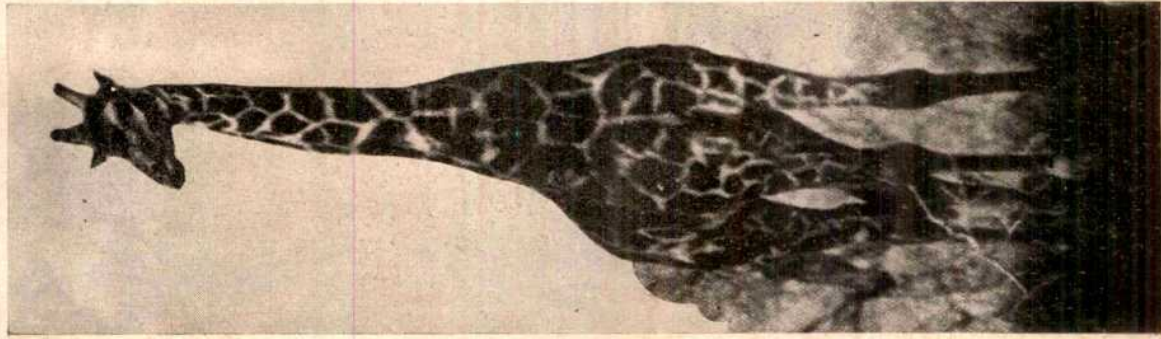


ডারবানের বেলাভূমি

ভিন্সডোলের জলপানি

ক্যাম্প ডি প্রিন্সেস ডারওয়াল্ড

দক্ষিণ-আফ্রিকা-সাহাদেব দেশ



দক্ষিণ-আফ্রিকা-সাহারা ভোগ করিতেছে



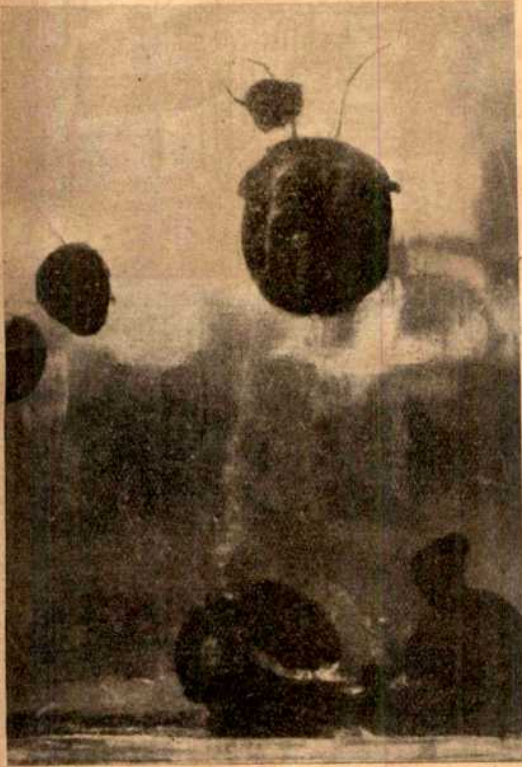
উপরে : এলফ হাউট, জোহান্নেসবার্গ

নীচে : অবসর-বিলাস

সংস্কৃত

জল-শামুক

অস্থিহীনজীবপরিচায়ক শামুক এক প্রকার অদ্ভুত প্রাণী। আমাদের দেশে জলে স্থলে নানা জাতের শামুক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের শরীর কোমল মাংসপিণ্ডে গঠিত। বিভিন্ন জাতের শামুকের মাংসপিণ্ড নানা ভাবে প্যাচান এক-একটা শক্ত খোলায় আবৃত থাকে। অবশ্য, শামুক-জাতীয় অপর কয়েক প্রকারের জীব দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের শরীর কোনরূপ শক্ত খোলায় আবৃত থাকে না। শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত হয়ত এমিবা-জাতীয় কোন জীবের শরীরের চতুর্দিকের শক্ত আবরণের

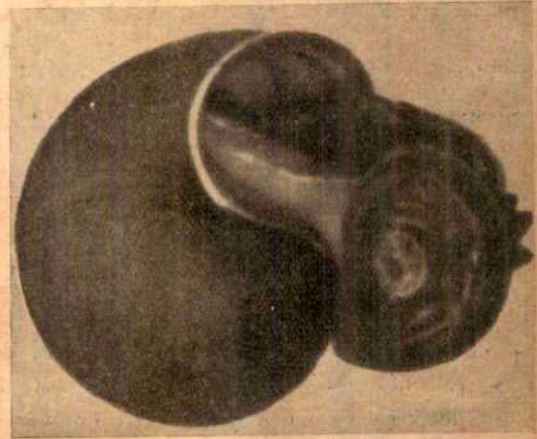


জলপূর্ণ কাচের ট্যাঙ্কে রক্ষিত শামুক আহারাভ্যেগে কাচের গা বাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

ক্রমবিকাশ ঘটিয়া শামুকের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরীভূত শামুকের যে-সব দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের বিরাট আকৃতি দেখিলে বিশ্বাসে অবাক হইয়া হইতে হয়। তাহাদের কোন-কোনটার আকৃতি প্রকাণ্ড এক-একটি

গাড়ীর চাকার মত। তাহাদের বিরাট আকৃতি ও সংখ্যার প্রাচুর্য্য দেখিয়া সহজেই অহুমিত হয় যে, এককালে বোধ হয় শামুকেরাই পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। পরে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া এবং নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া ক্রমশঃ বর্তমান আকার ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু দৈহিক আকৃতিতে যথেষ্ট ক্ষুদ্র হইয়া থাকিলেও আজও পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের শামুকের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়।

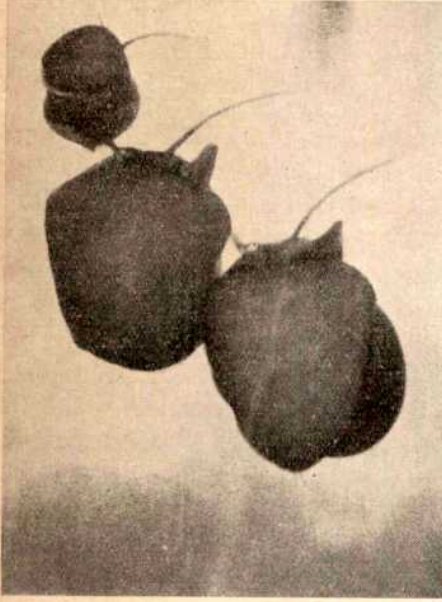
আপাতদৃষ্টিতে মানুষের পক্ষে শামুকের তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত না হইলেও ইহার মাংসের কম প্রয়োজনে আসে না। কাক, চিল, সারস, হাঁস প্রভৃতি পাখীরা শামুকের মাংস যেরূপ উপাদেয়বোধে আহাৰ করিয়া থাকে পৃথিবীর অনেক সভ্য দেশের লোকেরাও তেমন শামুকের মাংস রসনাভূষিকর বলিয়া মনে করে। গ্রীসি প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদের লেখা হইতে দেখা যায় যে, প্রাচীন রোম প্রভৃতি সভ্য দেশের লোকেরা শামুকের মাংস অতি উপাদেয়বোধে আহাৰ করিত। আজকালও সভ্য জগতের লোকেরা শামুক, বিলুপ্ত, গুগলি প্রভৃতির মাংস অতি ভূষিকর সহিত আহাৰ করিয়া থাকে। অতিপূর্বে জল-শামুকই বেশীর ভাগ আহাৰ্য্যরূপে ব্যবহৃত হইত। পরে ক্রমে ক্রমে ডাঙ্গার



শামুককে চিং করিয়া রাখা হইয়াছিল; সে গলা বাড়াইয়া মাটি আঁকড়াইয়া উপুড় হইবার উপক্রম করিতেছে।

শামুকও ব্যবহৃত হইতে থাকে। বর্তমানে জাফানী, ফ্রান্স প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে সুখাদ্য শামুকের চাষ হইতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জমি সম্পূর্ণরূপে বেড়ায় ঘেরিয়া ঐ সকল দেশের লোকেরা তাহার মধ্যে অসংখ্য শামুক প্রতিপালন করে এবং দেশের লোকের

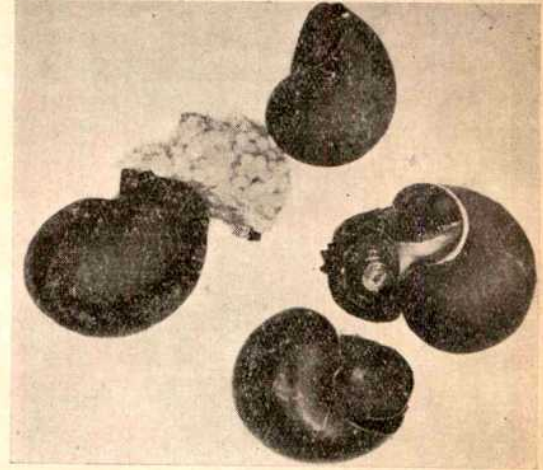
চাহিদা মিটাইয়া প্রতিবৎসর অজস্র শামুক বিদেশেও রপ্তানি করে। আমাদের দেশে কোন কোন অঞ্চলে শামুক, বিহুক, গুগলি প্রভৃতি মাছ-মাংসের মত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কলিকাতার প্রায় প্রত্যেক বাজারে শামুক, বিহুক, গুগলি প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে। তবে অবশ্য ব্যবসায়ের জন্ত শামুক, বিহুক প্রভৃতি প্রতিপালন করিবার রেওয়াজ এখনও প্রবর্তিত হয় নাই।



চলিবার সময় শামুকের পায়ের নীচের দৃশ্য। শুঁড় বাহির করিয়া মসৃণ স্থানের উপর চলিতেছে। মধ্যের ও নীচের শামুক-ছটির ডানদিকে কোণাকার এক-একটি যন্ত্র দেখা যাইতেছে, উহা দ্বারা উহারা জলের উপর হইতে বাতাস সংগ্রহ করে।

আমাদের দেশের খালে বিলে বা অগ্নাচ্ছ জলাভূমিতে যে-সব শামুক দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের ব্যাসের পরিমাণ দুই-আড়াই ইঞ্চির বেশী হয় না। দেখিতে প্রায় বলের মত গোলাকার। খোলের মুখটা কতকটা বাংলা “৫” এর মত। মুখে ঐরূপ আকৃতির একটা আল্গা ঢাকনি আছে। ঢাকনিটি জিহ্বার মত একটা কোমল অঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত। ইচ্ছামত খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারে। মুখের ঢাকনিটা এক পাশে সরাইয়া খোলের ভিতর হইতে শরীরের সম্মুখ ভাগ বাহির করিয়া, চাপটা গোলাকার জিহ্বার মত একটা অঙ্গের সাহায্যে অতি ধীরে ধীরে একটানা চলিয়া বেড়ায়। মসৃণ খাড়া দেওয়াল বাহিয়া উপরে উঠিতেও ইহাদের কোন কষ্ট হয় না। চলিবার সময় জিহ্বার মত গোলাকার পায়ের নীচে হইতে এক প্রকার অজস্র চটচটে আঠালো লাল নিঃসৃত হয়। এই লাল নিঃসৃত হওয়ার ফলেই

ইহারা শুষ্ক ভূমির উপর দিয়া অনায়াসে হাঁটিয়া যাইতে পারে। অগ্নাচ্ছ শুষ্ক ভূমিতে যেখানে সেখানে আটকাইয়া যাইত। চলিবার সময় মুখের সম্মুখ ভাগ হইতে দুইটি বড় ও দুইটি ছোট শুঁড় বাহির করিয়া আশপাশের অবস্থা তদারক করিতে করিতে যায়। বহুদূরে জলাশয় থাকিলেও শুঁড়ের সাহায্যে তাহার ক্ষুধিত টের পায় এবং যে কোন প্রকারেই হউক সেখানে উপস্থিত হয়। চলিতে চলিতে শুঁড়ের উপর হঠাৎ একটু আলো বা ছায়া পাত হইলেই তৎক্ষণাৎ ঢাকনা বন্ধ করিয়া চূপ করিয়া থাকে। একবার



উপরে; শামুক মুখের ঢাকনা খুলিবার উপক্রম করিতেছে

নীচে : ঢাকনা অনেকটা খুলিয়াছে

দক্ষিণে : ঢাকনা সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গলা বাড়াইয়া দিয়াছে

বামে : স্ত্রী-শামুক ডিম পাড়িতেছে

ঢাকনা গুটাইতে পারিলে শত্রু সহজে ইহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। জলের মধ্যে নামিয়া ইহারা প্রায়ই ভাসিয়া থাকে। ইহাদের জলে ভাসিবার ও ডুবিবার কৌশল কতকটা বর্তমান কালের সাবমেরিনের মত। যখন অল্প জলের নীচে ডুবিয়া থাকে তখন শুঁড়ের এক পাশ হইতে একটা মোটা নলের মত যন্ত্র জলের উপরে বাড়াইয়া দেয়। যন্ত্রটা জলের উপরি ভাগের বাতাসের সংস্পর্শে আসিবামাত্রই উপরের দিকটা একটা চুষ্টী বা ফানেলের মত খুলিয়া যায় এবং ভিতরে বাতাস টানিয়া লইতে থাকে। এইরূপে প্রয়োজনানুসারে বাতাস সংগ্রহ হইলে চোটা গুটাইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে। কিন্তু যদি কোনরূপ আশঙ্কার কারণ ঘটে অথবা জলের মধ্যে সামান্য নাড়াচাড়া পড়ে তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ-অকারে শরীরভাঙ্গুরস্থ বাতাস বাহির করিয়া ক্রমশঃ নীচে ডুবিতে থাকে। খুব বেশী ভয় পাইলে একেবারে জলের তলায় ডুবিয়া যায়। ইহারা গলিত জাপ্তব পদার্থ অথবা শেওলা প্রভৃতি উখার মত সারবন্দী ধারালো দাঁতের সাহায্যে কুরিয়া কুরিয়া আহাৰ করিয়া থাকে।

জলে ভাসিতে ভাসিতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় পুষ্ক-শামুকের সহিত ইহাদের মিলন ঘটয়া থাকে। এই মিলনের কিছু দিন পর স্ত্রী-শামুক ডাঙায় উঠিয়া আসে এবং প্রায় জলের ধারে এক সঙ্গে শতাবধিক ডিম পাড়িয়া যায়। ডিমগুলি দেখিতে মটর-বীজের মত গোলাকার এবং সম্পূর্ণ সাদা। ডিমের গায়ে এক প্রকার আঠালো পদার্থ থাকে। হাওয়া লাগিলেই এই আঠালো পদার্থ শুক হইয়া যায় এবং ডিমগুলি পরস্পর আটকাইয়া গিয়া ডেলা বাঁধিয়া থাকে। ডিম ফুটিয়া খোলা সমেত অতি ক্ষুদ্রকায় বাচ্চা শামুক বাহির হইয়া আসে।

আমাদের দেশে সন্দি নামে এক জাতীয় কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা জলেই বাস করিয়া থাকে; কিন্তু শীতকালে জল শুকাইয়া গেলে কোন উঁচু স্থানে অথবা পাকের মধ্যে মুখ হাত পা খোলার ভিতর টানিয়া লইয়া সম্পূর্ণরূপে মুখ বন্ধ করিয়া একেবারে অসাড় ভাবে পড়িয়া থাকে। শক্ত মাটি খুঁড়িলে ইহাদিগকে একটা ধাতব পদার্থ অথবা পাথরের ডেলার মত মাটির নীচে চিৎ

হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। বর্ষা নামিবার সঙ্গে সঙ্গে মাটি ভিজিয়া গেলে ইহারা মাটি হইতে উঠিয়া আবার যথেষ্ট জলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। এই জল-শামুকরাও সেইরূপ সারা শীত ও গ্রীষ্মকাল মুখের ঢাকনি বন্ধ করিয়া অসাড় ভাবে শক্ত ও শুক মাটির নীচে পড়িয়া থাকে। জমিতে লাঙ্গল দিবার সময় লাঙ্গলের মুখে এরূপ অনেক শামুক উঠিয়া আসে। বর্ষাকালে এই সব জমি জলে ডুবিয়া গেলে বহু শামুক-গুগুলির বিচরণ-ক্ষেত্রে পরিণত হয়, আবার জল শুকাইয়া গেলে তাহারা ঐ স্থলেই শুক মাটির সঙ্গে মিলিয়া পড়িয়া থাকে। এই ভাবে তাহারা শীতকাল কাটাওয়া গ্রীষ্মকালের শেষভাগে বৃষ্টি পড়িলেই মুখ খুলিয়া জলের সন্ধানে বাহির হয় এবং যে-কোন অগভীর জলাশয়ের মধ্যে গিয়া দলে দলে জমা হয়।

[এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত চিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত]

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি

গান—“শুভ কৰ্ম্মপথে ধরো নির্ভয় গান”

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

সী রা II গা -সী গা ধা । পাঃ -ধঃ মা পা I রা -মা -জা রা । সা সা মা মা I
শু ভ ক ব ম প থে ০ ধ রো নি ব্ ভ য গা ন্ স ব

I মা -পা পা পা । বপা পা পা পা I মা পা পমা পমা । পা -সী সী রা I
ছ ব্ ব ল স ২ শ য হো ক্ অ০ ব০ সা ন্ শু ভ

I গা -সা গা ধা । পাঃ -ধঃ মা পা I রা -মা জা রা । সা সা মা মা I
ক ব্ ম প থে ০ ধ রো নি ব্ ভ য গা ন্ চি র

I মা মা পা পা । গা -পা না না I না -সী -সী না । সী -ন সী সী I
শ ক্ তি র নি ব্ য র নি ০ তা য রে ০ ল ও

I না-সাঁ সানাঁ সানাঁ । সাঁ-রাঁ রসাঁ রাঁ I মাঁ-জাঁ জমাঁ জমাঁ । রাঁ-নাঁ-সাঁ সাঁ I
সে ই অ ডি বে ০ ক ল লা ০ ট প রে ০ ত ব

I সাঁ-রাঁ সাঁ সাঁ । সাঁ-গাঁ-গাঁ গাঁ I ধগাঁ-নাঁ ধাঁ-ধাঁ । পাঁ-নাঁ-নাঁ পাঁ I
জা ০ ঐ ত নি বু ম ল নু ০ ত ন প্রা ০ ০ ৭

I পাঁ গাঁ গাঁ ধাঁ । গাঁ-নাঁ গাঁ গাঁ I ধাঁ-নাঁ পাঁ-নাঁ । -নাঁ-নাঁ-গাঁ-নাঁ I
তা ০ গ ব তে ০ নি ক দী ০ কা ০ ০ ০ ০ ০

I পাঁ গাঁ গাঁ ধাঁ । গাঁ-নাঁ গাঁ-গাঁ I ধাঁ-নাঁ-পাঁ-নাঁ । -নাঁ-নাঁ-নাঁ-নাঁ I
বি ঘ ন হ তে ০ নি ক শি ০ কা ০ ০ ০ ০ ০

I সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ । গাঁ-নাঁ ধাঁ পাঁ I পাঁ-ধাঁ মাঁ-পাঁ । মাঁ জাঁ-নাঁ-রসাঁ I
নি ষ ঠ র স ং ক ট দি ক স ম মা ০ ০ নু

I সজাঁ জাঁ জাঁ জাঁ । সজাঁ জাঁ জাঁ রসাঁ I সরাঁ-নাঁ রাঁ সগাঁ । সাঁ-নাঁ-সাঁ-রাঁ I
হু ক খ ই হো ক ত ব ০ বিত্ ০ ত ম হা নু "ঙ ভ"

-নাঁ-নাঁ II সাঁ সাঁ সাঁ-নাঁ । -রাঁ-নাঁ রাঁ রাঁ I রাঁ রাঁ রসাঁ রাঁ । মাঁ-জাঁ জাঁ জাঁ I
০ ০ চ ল যা ০ জী ০ চ ল দি ন রা ০ ০ জি ০ ক র

II জাঁ জমাঁ মাঁ মাঁ । রাঁ রাঁ সাঁ I রাঁ রাঁ রাঁ সগাঁ । (সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ) I
অ য় ০ ত লো ০ ক প থ অ হু স নু ধা নু "চ ল"

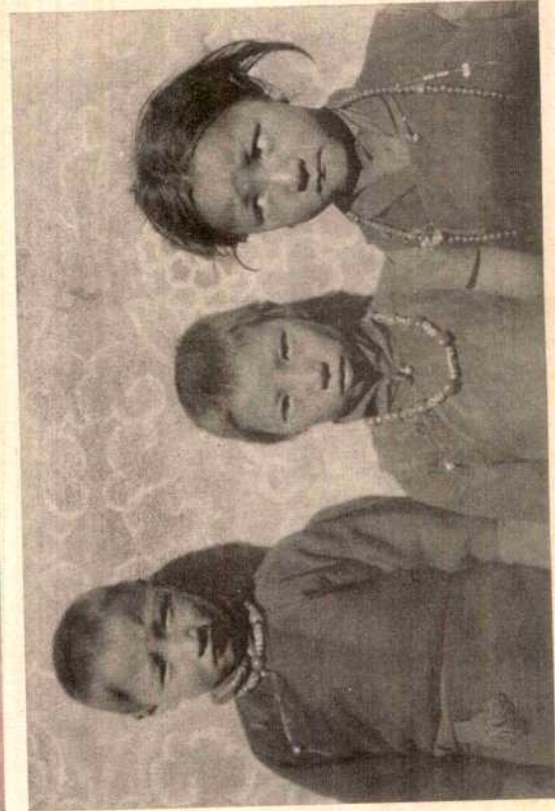
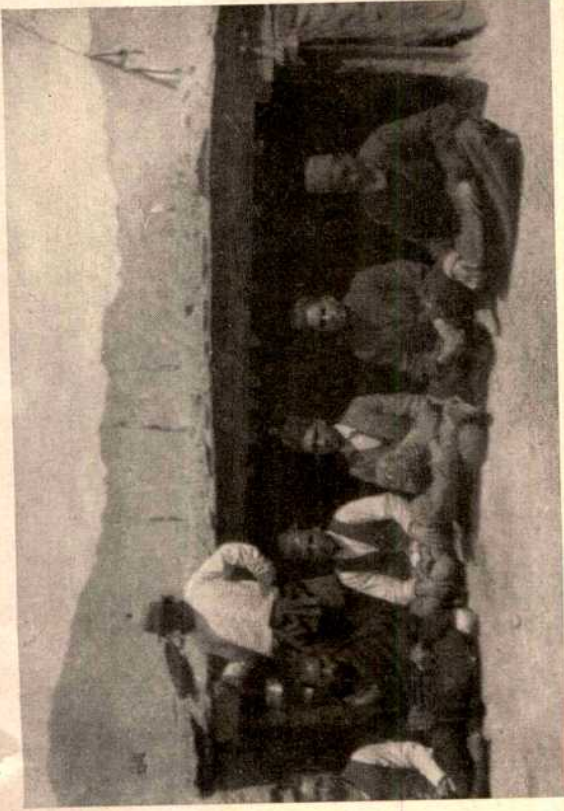
I সাঁ সাঁ-নাঁ-নাঁ I মাঁ পাঁ পাঁ-নাঁ । গাঁ-পাঁ নাঁ নাঁ I নাঁ-সাঁ সাঁ-রাঁ I
ধা নু ০ ০ জ ড তা ০ তা ০ ম স হ ও উ ং

I নাঁ নাঁ-সাঁ-নাঁ I গাঁ সাঁ সাঁ সাঁ । রাঁ রাঁ রাঁ রাঁ I সরাঁ সাঁ রাঁ রাঁ ।
জী বু ণ ০ রাঁ নু তি জা ০ ল ক র দী বু ণ বি

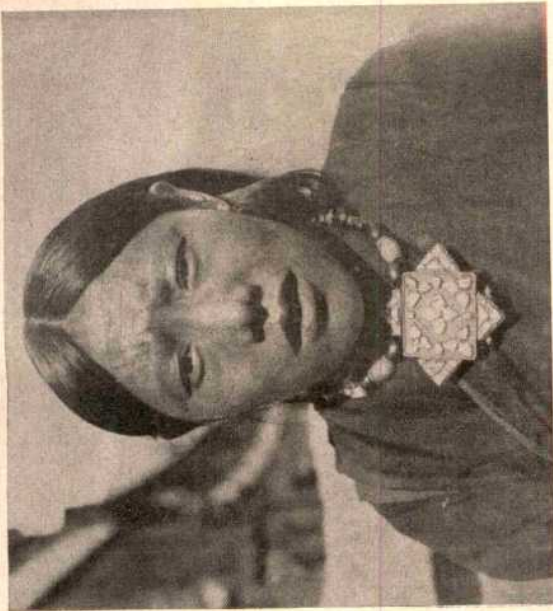
I সঁজাঁ জাঁ জাঁ-নাঁ I জাঁ জমাঁ মাঁ মাঁ । রাঁ-নাঁ সাঁ সাঁ I
দী বু ণ ০ দি ন ০ অ নু তে ০ অ প

I সরাঁ-নাঁ সাঁ সাঁ । সাঁ-নাঁ-গাঁ গাঁ I গাঁ-সাঁ সাঁ সাঁ । সাঁ সাঁ-গাঁ গাঁ I
রা ০ জি ত চি ০ ভে ০ ম ত্ জা ত র ণ জী বু

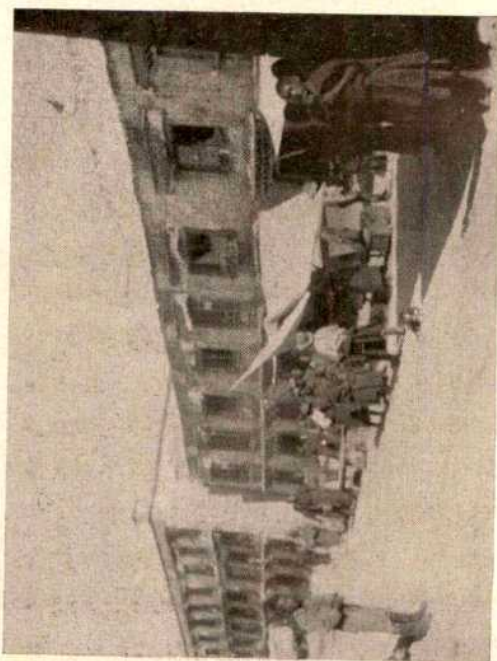
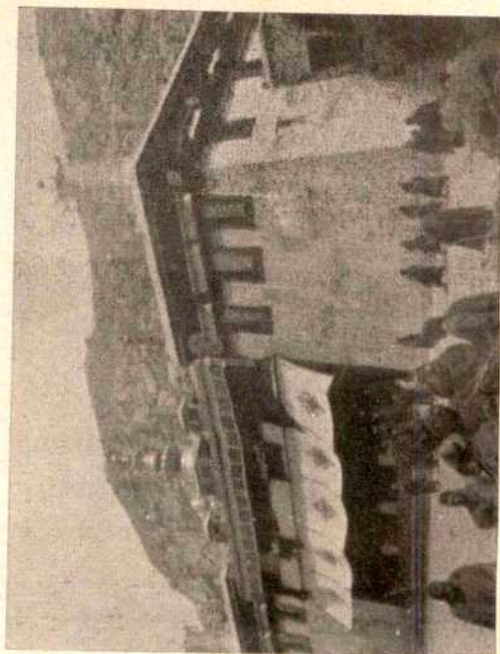
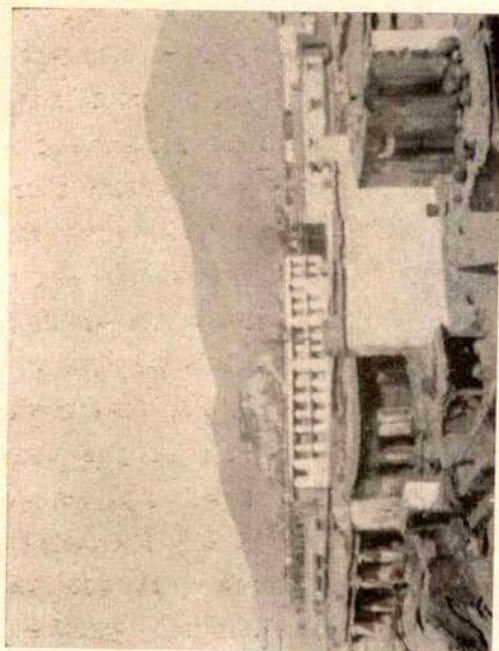
I ধগাঁ-নাঁ-ধাঁ ধাঁ । পাঁ পাঁ-সাঁ রাঁ II II
থে ০ ক র আ নু "ঙ ভ"



‘পানা’র ছাড়ে লাসার নেপালী সওয়াগর
তিব্বতী ভদ্রলোকের পুত্রকন্যাগণ



লাসায় সম্রাট তিব্বতী ভদ্রলোকের পত্নী
সম্রাট তিব্বতী ভদ্রলোক



লাসার দৃশ্যবলী

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

১৪

এদেশে অতিথিসংস্কারের প্রথম পর্য্যয়ে শুক মাস, চা বা কাঁচা মদ (ছং) দেওয়া হয়। চা এখানে ঘরে ঘরে সদাসর্বদাই প্রস্তুত থাকে এবং গৃহস্থ, ভিক্ষু, দোকানদার, সেনানায়ক সকলেরই ইহা সর্বক্ষণ প্রয়োজন। যব পচাইয়া মদ তৈয়ারী করা হয় এবং যদিও এক-আধ হাজার ভিন্ন ভিন্ন সকল ভিব্বতীয় বৌদ্ধ তথাপি পীতটুপী-পরিহিত গেলুক-পা সম্ভ্রদায় ভিন্ন সকলেই অবাধে মদ্য পান করে। মদ্য বিনা ইহাদেব পূজা হয় না, এমন কি গেলুক-পা ভিক্ষুরাও পূজার সময় দেবতার প্রসাদ হিসাবে সামান্য পরিমাণে মদ্য পান করিয়া দেবতার ক্রোধ নিবারণ করে। এদেশে উপোসাখ পঞ্চশীল অষ্টশীল ইত্যাদি ব্রত বা নিয়মের কোন জ্ঞানই নাই, অতি-শিশুও প্রতিদিন মদ্য পান কবে; বস্তুতঃ জগতে এরূপ মদ্যপায়ী জাতি আর আছে কিনা সন্দেহ।

এদেশের উলের কাপড় মোটা, মজবুত ও সুন্দর। এখনও কাপড় বুনার প্রথা পুৰ্বকালের মতই আছে, হুতরাং অল্প প্রসারের কাপড়ই তৈয়ারী হয়, বড় বহরের তাঁত খাটান হয় না। মোজা, দস্তানা, গেঞ্জি প্রভৃতি এখানে বিশেষ হয় না, কেবলমাত্র লাসায় নেপালী সওদাগরদিগের প্রভাবে আজকাল এই সব জিনিষ অল্পখল তৈয়ারী হইতেছে এবং তাহাও নিকট ধরনের। এদেশের উল স্বভাবতই নরম ও চিকণ এবং সেই জন্ত প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার পশম ভারতে রপ্তানী হওয়ায় কাপড়ের দর কিছু চড়িয়াছে, তবে এই চড়া দরও বিদেশের তুলনায় সস্তা।

শিক্ষা বা অন্য অনেক বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইলেও ললিত-কলায় ভিব্বতবাসীর দক্ষতা ও অল্পরাগ প্রশংসনীয়। লাসার নিকটস্থ অঞ্চলে বিস্তর আখুরোট বৃক্ষ জন্মায়, তাহার কাষ্ঠ অতিশয় দৃঢ় এবং মসৃণ। ধনী বৃহৎ ও মঠে-বিহারে আখুরোট-কাষ্ঠের উপর স্তম্ভ ও স্তম্ভের কারুকার্য ইহাদের

কলাইনপুণ্যের পরিচয় প্রদান করে। ত্রিপিটক ও অষ্ট-কথার স্তায় বৃহৎ পুস্তকগুলিও এই আখুরোটের পাটায় খোদাই করিয়া ছাপা হয়।

এদেশের চিত্রকলার সহিত আমাদের অজ্ঞতা ও সিগিরিয়ার শুদ্ধ আর্থা চিত্রকলার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে। ভিব্বতীয়েবা বর্ষসমাবেশে বিশেষ কুশলী, তবে এখন বিদেশী রং প্রচলিত হওয়ায় চিত্রাবলী পূর্বের স্তায় স্থায়ী হইবে কিনা সন্দেহ। এই চিত্র-প্রথাও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নালন্দা ও বিক্রমশীলা হইতে এদেশে আসিয়াছিল। নিয়ম ও রীতির বন্ধনে বাঁধা বলিয়া ভিব্বতীয় শিল্পে আর সেরূপ স্বাচ্ছন্দ্য নাই এবং ভোটাঙ্গ-চিত্রকর-অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতিকৃতি গত্যন্তগতিকতায় কল্পিত প্রতিমাবৃক্ষ চিত্র-মাত্রে পর্য্যবসিত হয় ইহা সত্য, তবুও বর্তমান ভারত বা সিংহলের তুলনায় সে শিল্পের স্থান যে এখনও অনেক উচ্চে তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশেব চাকুশিল্পের বৈশিষ্ট্য তাহার সার্বজনীনতায়। ধাতু বা মুগয় মূর্তি প্রায় সবই অতি সুন্দর। এই বিষয়ের শিক্ষার্থী এখনও প্রাচীন কালের স্তায় বহু বৎসর শিল্পাচার্য্যের সেবাসুশ্রবা করিয়া শিষ্যে ব্রতী থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের শিল্প ও কলার পুনর্জাগরণে ইহাদের বিশেষ সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে যদিও এদেশের শিল্পের ধারা এখন পূর্বকালের স্তায় স্বচ্ছন্দ ও উন্মুক্ত নহে। সত্য বটে, গৃহ, গৃহস্থ ও বস্ত্র—সকলেরই উপর একটা পুরু ময়লার আবরণ, তৎসঙ্গেও ভিব্বতীয় গৃহসজ্জার রুচি নিকট বলা যায় না। ঘরের ছাদে ও জানালায় ফুলের টবের সারি, ঘরের ভিতরে রঙীন ঝালর, আভ্যন্তরীণ গৃহগায়ে রঙীন রেখাঙ্কন, জানালায় জালিদাব কাগজ বা কাপড়ের পাল্লা, চায়ের চৌকীর উপর নানা বর্ণের আঙ্গপনা—এ সকলই ইহাদেব কলা-প্রেমের পরিচয় দেয়।

খাদ্যের পর্য্যয়ে মাংস-মাখন এবং বস্ত্রের জন্ত উল-পশম

ভোটের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক, সেই জন্ত এদেশে কৃষি অপেক্ষা পশুপালন অধিকতর উপযোগী। ভেড়া, ছাগল ও চমরী (ঝাক) এখানকার প্রধান গৃহপালিত পশু। ভেড়া ও ছাগল—মাংস চামড়া ও পশমের সংস্থান ভিন্ন ভারবহন-কাণ্ডেও উপযোগী, বিশেষতঃ দুগ্ধমূল্যে। চমরী, দুধ, মাখন, মাংস ও মোটা পশম দেয়, উপরন্তু উনিশ-কুড়ি হাজার ফুট উচ্চে—যেখানে বায়ুমণ্ডল অতি ক্ষীণ—বিলক্ষণ বোঝা লইয়া অনায়াসময়গতিতে দুগ্ধমূল্যে পর্কতে যাইতে পারে। এদেশে ঘোড়া, খচর ও গাধা বিস্তার আছে কিন্তু ভেড়ার পর্বই চমরী এদেশের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় পশু। এদেশে রেল, মোটর বা অস্ত্র যান নাই, সুতরাং সকল জিনিষই পশুপৃষ্ঠে লইতে হয়। ঘোড়াগুলি ছোট বটে কিন্তু পর্কত-পথের বিশেষ উপযোগী এবং সতেজ ও স্থলর। খচর মঙ্গোলীয় ও চীনদেশের নীলজ্ব অঞ্চল হইতে আসে। গৃহপালিত পশু-মধ্যে কুকুরের স্থান উচ্চ। পশুপালকের প্রধান সহায় এই বিধগত জন্ত। এদেশের অধিকাংশ কুকুরই কৃষ্ণবর্ণ ও নীলচন্দ্র। আকারে ইহার নেকড়ে অপেক্ষা বৃহৎ, ইহাদের সর্বাঙ্গ জন্তকের দ্বারা সজা কর্ণ লোমে আবৃত এবং ইহার স্বভাবতই হিংস্র। পশুপালকদিগের পক্ষে কুকুর অভাবশূন্য এবং গৃহাদির রক্ষণাবেক্ষণে ইহার অতুলনীয়। একটি কুকুর সঙ্গে থাকিলেই গৃহস্থ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, কেননা অপরিচিত লোকের সাধ্য নাই তাহাব এলাকায় পা দেয়। তিব্বতে আগন্তকের পক্ষে এইরূপ কুকুরের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তিব্বতীয়েরা মাংসের সঙ্গে অস্থি পর্যন্ত চূর্ণ করিয়া স্থপ করিয়া খায়; সুতরাং সকাল সন্ধ্যায় সামান্ত সন্তু-গোলা খাইয়া এই সকল প্রভুভক্ত কুকুর দিবারাত্র বক্ষণকার্য কবে। শিকলে বাঁধা বাঘের মতই ইহার ভীষণ এবং ইহাদের নিকট যাওয়া বাঘের খাঁচায় প্রবেশ করার মতই বিপজ্জনক। এই সকল বৃহৎ রক্ষী কুকুর ছাড়া লোমাবৃত ছোট ও স্থলর কুকুর লাঙ্গা ও অস্ত্র স্থানের ধনীদিগের গৃহে থাকে। এখানে তিন টাকায় যে কুকুর পাওয়া যায় দাঙ্কিলিঙে বাট-সত্তর টাকায় তাহা পাওয়া দুষ্কর।

* * *

নেপাল ও তিব্বতের সম্বন্ধ অতি প্রাচীন। খ্রীষ্টীয়

প্রথম শতাব্দীতে তিব্বতেব ঐতিহাসিক যুগের আদ্য। ঐ সময়ই ভোটরাজ শ্রোং-চন-গমো এক দিকে নেপালে নিজ বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া সেখানকার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন, অস্ত্র দিকে চীন-সাম্রাজ্যের বহু প্রদেশ তিব্বতের অধীনে আনিয়া এবং চীন-সম্রাটকে কস্ত্রাদানে বাধ্য করিয়া চীন-রাজকুমারীকেও পরিণয়পাশে আবদ্ধ করেন। শোনা যায় ইহার পূর্বে ভোটদেশে লিখনপদ্ধতি অজ্ঞাত ছিল, শ্রোং-চন সম্রাটটিকে অক্ষর-লিখন শিক্ষার জন্ত নেপাল প্রেরণ করেন এবং তিনিই সেখানে উহা শিক্ষা করিয়া প্রথম তিব্বতী অক্ষর নির্মাণ করেন। নেপাল-রাজকুমারীর সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম এদেশে প্রবেশ করে এবং ক্রমে রাজনৈতিক জয়কে ধর্মক্ষেত্রে পবাক্ষে পবিত্র করে। আজিও নেপাল-ছহিতা তাবাদেরী এদেশে অবতারের দ্বারা পূজা পাইতেছেন। তিব্বতের সভ্যতাব দীক্ষার প্রধান সহায়ক যে নেপাল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নেপাল-উপত্যকার পুরাতন অধিবাসী নেবাবদিগের ভাষা তিব্বতী ভাষার অল্পরূপ এবং ভাষাতত্ত্ববিদেরা উহাকে তিব্বত-বর্মী ভাষার অন্তর্গত বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। তিব্বতী “সিউ মারী” (কেহ নাই) নেবারীতে “সু-মারো”। ইহাতে অসুমান হয় যে তিব্বত ও নেপালের সম্বন্ধ প্রাগৈতিহাসিক।

সম্রাট শ্রোং-চন লাসার রাজধানী স্থাপন করেন এবং তাহার শত বর্ষ পবে ভোটরাজ শ্রোং-দে-চন নালন্দা হইতে আচার্য্য শাস্ত্রবক্ষিতকে আনয়ন করেন। এইরূপে ভারত হইতে ধর্মপ্রচারের জন্ত যে দ্বার উন্মুক্ত হয় তাহা ষাটশ শতাব্দীতে মুসলমান-বিজয়ে নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতিব ধ্বংসকাল পর্যন্ত অব্যবহিত ছিল। সে-সময় বর্তমান কালের দার্জিলিং-লাঙ্গা পথ জানা ছিল না। ধর্মপ্রচার বা বাণিজ্য ব্যাপার সবই নেপালের পথে হইত এবং এইরূপে বহু শতাব্দী যাবৎ নেপাল ভারত ও তিব্বতের মধ্যে ধর্মপ্রচার ও বাণিজ্য এই দুই কার্যেই নেপাল মধ্যবর্তী রূপে বিরাজ করিয়াছে। সংস্কৃত হইতে ভোট ভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থের অল্পবাদে নেপালী পণ্ডিতদিগের হাত ভারতীয় বা কাম্বোজীয় পণ্ডিতদিগের মত সিদ্ধ না হইলেও শাস্ত্রভদ্র, অনন্তপ্রী, জেতকর্ণ, দেব পুণ্যমতি, হুমতি-কীর্তি প্রভৃতি নেপালী বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের

নাম স্বরণীয়। নবম ও দশম শতাব্দীতে বহু গ্রন্থের, বিশেষতঃ তন্ত্র-গ্রন্থের অহুবায়ে ইহাদের পবিচয় পাওয়া যায়। আরও অধিক পরিচয় না পাওয়ার কারণ বোধ হয় সে সময় ভাবত হইতে উচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত পাওয়া সহজ ছিল।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে লাসায় রাজধানী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে নেপালী বণিকেরা আসে। তিব্বতের ইতিহাসের প্রধান উৎস ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মগ্রন্থে বাণিজ্য-ব্যাপারের স্থান বড় নাই, সুতরাং ইহাদেব বিশেষ উল্লেখ তাহাতে পাওয়া সম্ভব বা স্বাভাবিক নহে। রোমান ক্যাথলিক ঐষ্টানদিগের ক্যাপুচিন সম্প্রদায় ১৬৬১ হইতে ১৭৪৫ ঐষ্টাব্দ পর্যন্ত লাসায় প্রচারকার্যে ব্যস্ত ছিলেন। তাহাদের পাদরীদিগের বৃত্তান্তে সেকালের নেপালী সওদাগরদিগের লাসায় থাকার কথা এবং কয়েক জন নেপালীর ঐষ্টান হওয়ার কথা লিখিত আছে। ১৯০৫ ঐষ্টাব্দে ব্রিটিশ “মিশন” লাসায় ঐ পাদরীদিগের গীর্জার একটি দলটা হস্তগত করে। ঐ বৃত্তান্ত লিখিত হওয়ার ৪৫ বৎসর পরে নেপালী সওদাগরদিগেব উপর অভিযানের অভিযোগেই নেপালরাজ ১৭৯০ ঐষ্টাব্দে তিব্বত আক্রমণ করেন।

আজকাল তিব্বতে ব্যবসায়ক্ষেত্রে নেপালী ব্যাপারী-দিগেব কয়েকটি বিশেষ অধিকার আছে। ঐ সকল অধিকার ১৭৯০ এবং ১৮৫৬ ঐষ্টাব্দে যে দুই বার নেপাল-তিব্বতে যুদ্ধ হয় তাহারই ফল। প্রথম যুদ্ধে নেপালী সৈন্যদল গিরিসঙ্কট জয় করিয়া লাসা হইতে সাত দিনের পথ দূরে শিগচীতে (টিন্‌ল্যাম্পো) পৌছায়। এমন সময় অগণিত চীন-সেনা তাহাদেব আক্রমণ করিয়া হটাইতে হটাইতে নেপালে কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত লইয়া যাওয়ায় নেপাল ও তিব্বত উভয়েই চীন-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া শাস্তি স্থাপন করে। এই যুদ্ধ-বিজয়ের উপলক্ষে উৎকীর্ণ চীন-সম্রাটের অনুশাসন এখনও লাসায় পোতলার সম্মুখে বর্তমান। নেপালের বর্তমান মহামন্ত্রি-বংশের সংস্থাপক মহারাজা জঙ্গবাহাদুরের সময় (১৮৫৬ ঐঃ) দ্বিতীয় যুদ্ধ অরুণিত হয়। এই যুদ্ধকালে নেপালরাজের সেনা-দল সীমান্তিত গিরিসঙ্কট পার হইবার পূর্বেই, চীন-সম্রাটের মধ্যবর্তিতায় কয়েকটি সর্বো উভয় দেশের মধ্যে

শাস্তি স্থাপিত হয়। ইহার ফলে ভারত-সরকারকে প্রতিবর্ষে নেপালরাজসদনে দশ হাজার টাকা দিতে হয়। শাস্তিস্থাপনের সর্বমধ্যে এই চারটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :— (১) বিপদকালে পারস্পরিক সাহায্যেব অঙ্গীকার, (২) ব্যবসায়ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে ব্যাপারীদিগেব অবাধ বাণিজ্যের অধিকার, (৩) লাসায় নেপালী রাজদূত নিয়োগের এবং (৪) তিব্বতে নেপালী স্ত্রায়াধীশ দ্বারা নেপালী প্রজার বিচারের অধিকার। এইরূপে, ইয়োরোগীয়েরা চীনদেশে যে-অধিকার পাবে লাভ কবে এবং যাহা দূর করিতে সম্প্রতি চীন এত চেষ্টা করিতেছে, তিব্বতে নেপাল ঠিক সেইরূপ বহির্দেশীয় প্রভুত্ব (extra-territorial rights) লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে লাসায় নেপালী ব্যবসায়িগণ দশটি দলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক দলের এক-এক জন সর্দার নির্বাচিত হইত এবং প্রত্যেকটি সম্মেব একটি করিয়া বৈঠকের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। এই দলপতিদিগের নাম “ঠাকলী” ও বৈঠকের স্থানের নাম “পালা”। যদিও সংখ্যায় এখন সাতটি মাত্র সেই ঠাকলি আছে এবং যদিও দুইয়েরই পূর্ব মাহাত্ম্য বা অধিকার হ্রাস পাইয়াছে, তথাপি তাহাদের “পালা” এখনও বর্তমান। লাসায় নেপালী বণিকেরা প্রায় সকলেই তাত্ত্বিক বৌদ্ধ, সুতরাং এই সকল পালায় তাহাদের তাত্ত্বিক পূজার স্থান আছে এবং সেই হেতু প্রায় প্রত্যেকটিতেই লাসায় লিখিত শত শত বৎসরেব পুরাতন সংস্কৃত পুণ্ডি দশ বিশ খানি করিয়া আছে। এখন নেপাল-সরকারের পক্ষ হইতে লাসায় একজন রাজদূত (বকীল), একজন স্ত্রায়াধীশ (ডীঠা) এবং কিছু সৈন্য আছে। ইহা ছাড়া গ্যাঙ্কী, শীগচী, নেনমু (কুতী) ও কেরঙতেও নেপালী প্রজার বিচার ও তাহাদের অধিকার রক্ষার জন্য এক-এক জন ডীঠা আছে। নেপালী বলিতে কেবলমাত্র নেপালী ব্যবসায়ী বুঝায় না, উপরন্তু তাহাদেব ভোটীয়-রক্ষিতা-জাত সম্ভানদিগকেও ধরা হয়। এইরূপে লাসায় খাঁটি নেপালীর সংখ্যা দুই শতের অধিক না হইলেও সেখানকার নেপালী প্রজার সংখ্যা কয়েক হাজার। নেপালের নিয়ম অনুসারে নেপালীর পুত্র জন্মাইলেই সে নেপালের প্রজা, যদিও এইরূপ ভোটীয় জীব বা জীব পুত্র-

কম্পার তাহার সম্পত্তির উপর কোনও অধিকার নাই। নেপালী সওদাগর ইচ্ছা করিলে কিছু দিতে পারে, নতুবা তাহাদের প্রাপ্য কিছুই নয়। সম্ভান জম্মাইবার পর পিতৃস্ব অস্বীকার করিয়া জীকে দূর করিয়া দেওয়া নেপালী সওদাগরদিগের মধ্যে সাধারণ ব্যাপার। ভিব্বতে বহুভর্তৃক বিবাহের প্রচলন থাকায় ছোট্ট পুরুষের সহিত ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ পাতাইয়া তাহার জীকে গ্রহণ করাও তিব্বতের নেপালী বাসিন্দাদিগের সাধারণ প্রথা। নেপালের রাজনিয়ম অনুসারে কোন নেপালী তাহার জীকে তিব্বতে লইয়া যাইতে পারে না, এই কারণেই এত দুর্নীতির স্রষ্টা। অল্প অনেক বিষয়েও এখানে আগন্তুক নেপালী দেশের আচার-ব্যবহার হইতে ভ্রষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ খাওয়া-ছোয়ার ব্যাপারের কথা বলা যাইতে পারে। নেপালে ছুৎমার্গের জ্ঞান যথেষ্ট আছে, এখানে সে বালাই দেখা যায় না, অবশ্য, মদ্যপানবিষয়ে ছুইটি দেশের লোকের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায় না। পাচক ত ভোটিয়া হয়ই, উপরন্তু মুসলমানের রুটি খাওয়ায় ইহাদের কোন আপত্তি নাই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নেপালী ব্যবসায়ী চমরী মাংস খাইতেও কুঠাবোধ কবে না—তাহারা বলে চমরী “গাই” নহে, যদিও নেপালে ইহা সম্ভব নহে। এই সকল ব্যাপারই নেপালে ভয়ানক অপরাধ বলিয়া গণ্য। সাধারণতঃ এই সব ব্যবসায়ীর পক্ষে তিন-চাব বৎসব পূর্বে দেশে ফিরিবার সুযোগ হয় না, এবং ফিবিবামাত্রই নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে সকলেই বাধ্য।

নেপালী নেবারগণ ব্যবসারে বিশেষ পটু। যদিও পাশ্চাত্য শিকার অভাবে ইহারা সুযোগ-অনুরূপ ব্যবসায়ের প্রসার করিতে পারে নাই কিন্তু এই দেশে বানবাহন আদান-প্রদানের অবস্থার কথা ভাবিলে ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে ইহাদের ব্যবসায়নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। কলিকাতায় নেপালী সওদাগরদিগের অধিকাংশ কুঠির শাখা আছে, অনেকের শীগর্জী, গ্যাঙ্কী, ফরিজোঙ, কুতী ইত্যাদি স্থানেও শাখা আছে। এই ব্যবসায়ের আদান-প্রদানের মধ্যে আমদানী প্রবাল, মুক্তা, বারান্দী ও চীনের বেশমী বস্ত্র, বিলাতী ও জাপানী স্ততার কাপড়, কাচের জব্য, খেলনা প্রভৃতি; বস্তানীর হিসাবে “কবু” কস্তুরী, উল, পশম এইরূপ অসংখ্য জব্য আমদানীর জিনিষ-গুলির উৎপত্তিস্থলের সহিত কারবারের উপায় না জানায় ইহারা

কলিকাতায় সে সব কিনিয়া এখানে বেচে। ইহাদের সৌভাগ্য-যে সেরূপ উদ্যোগী কোন প্রতিদ্বন্দ্বী এখানে নাই, কেননা এখানকার মুসলমান ব্যাপারীদিগেরও কারবারের ধারা এই প্রকার। চীনেব প্রভুত্ব-লোপের সঙ্গে-সঙ্গেই চীনা ব্যাপারীর অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে, ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে ত এদেশে প্রবেশ করাই অসম্ভব।

নেপালী ব্যবসায়ীর মধ্যে এমন কিছু সাধনা আছে যাহাতে সে অল্প পরিশ্রমেই তাহার কারবারেব উন্নতি করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ধর্ম্মমান সাহুর কুঠির কথা বলা যায়। এই কুঠি দেড়শত বৎসব পূর্বে লাসার স্থাপিত হয়, এখন ইহার শাখা গ্যাঙ্কী, ফরি, কাঠমাণ্ডু, লদাখ ও কলিকাতায় আছে। প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার আমদানী রপ্তানী ইহাদের বাঁধা ব্যাপার, মূলধনের প্রমাণও প্রচুর। ইচ্ছা করিলেই চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, চীনা তুর্কিস্তান, সিংহল ইত্যাদি স্থানে ইনি কাঁচবাব চালাইতে পারেন, কিন্তু সেদিকে চেষ্টা বা উৎসাহের অভাব।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে নেপালীরা অতি সং এবং ইহাদের ব্যবহার ভাল। উপরন্তু ধর্ম্ম এক প্রকার হওয়ায় ইহারা লামাদিগকে সম্মান করে এবং মঠে ও মন্দিরে পূজাপাঠে ও দক্ষিণা প্রদান প্রভৃতি ব্যাপারে ইহারা ভোটিয়দিগেরই মত। এই সকল কারণে এবং ইহারা ‘ঘম্বিন্ দেশে যদাচার’ বিষয়ে বিশেষ সিদ্ধ হওয়ায় এদেশে ইহাদের স্থান ভারতে মাড়োয়ারীর বা সিংহলে গুজরাটী মুসলমানের তুল্য। বেশভূষা ও খাদ্য-প্রকরণেও পূর্বে ইহারা ভোটিয়দিগের অনুকরণ করিত। সম্প্রতি ইহাদের মধ্যে একদল “নবীন” হ্যাটকোট বুট ইত্যাদি পবিত্রে আরম্ভ করিয়াছে।

* * *

১৯০৪ সালের ব্রিটিশ মিশনের পর হইতে তিব্বতের প্রধান বাণিজ্য-মার্গ কালিম্পাং (দার্জিলিংয়ের নিকট) হইতে লাসার পথে হইয়াছে। ইহা গ্যাঙ্কী পর্যন্ত ইয়েরজেব রক্ষণাধীন এবং গ্যাঙ্কীতে ব্রিটিশ ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে। গ্যাঙ্কীব পর ভোট-সরকারের নিজস্ব ডাক টেলিফোন ও তার বিভাগ আছে। কিছু চা ও চীনা রেশমী কাপড় ভিন্ন প্রায় সমস্ত আমদানী রপ্তানী এই পথেই হয়। এই পথের এক দিকে (পশ্চিমে) কিছু দূরে নেপাল, অল্প দিকে

(পূর্বে) কিছু দূবে ভূটান। লাসায় নেপালী উকীলের মত ভূটানেরও উকীল থাকে। তিব্বতী ও ভূটানী ভাষা অভ্যস্ত নিকট-সম্পর্কিত; ইহাদের ধর্ম, ধর্মোচরণ ও ধর্ম-পুস্তক এক। ভূটান হইতে কালিম্পং, লাসাব পথ ও লাসা উভয়ই নেপাল অপেক্ষা অনেক নিকটে এবং বাণিজ্যব্যাপারে নেপাল ও ভূটান দুইয়েরই অধিকার এক প্রকাব। এ সকল স্থবিধা সত্ত্বেও ভূটানীরা যে তিব্বতের সহিত ব্যবসারে নেপালীদিগের নিকট হটিয়া গিয়াছে তাহার কারণ তাহাদের ব্যবসায়বুদ্ধির অভাব। ভূটানীদেরও প্রধান ব্যবসায়ক্ষেত্র তিব্বতে কিন্তু নেপালী ও লদাখী মুসলমানদিগের মত দোকানপাট ইহাদের কিছুই নাই। ইহারা নিজেদের দেশের জিনিষ লাসার বাজারে আনে এবং তাহার বিনিময়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় জব্যাদি লইয়াই দেশের পথ দেখে। ইহাদের বাণিজ্যে বিনিময়ের বস্তু প্রধানতঃ একদিকে আসাম ও ভূটানেব এণ্ডী রেশম, অন্যদিকে তিব্বতী পশম ও উলের কাপড়।

লাসার বাজারে শীতের দিনে দেশ-বিদেশের লোক দেখা যায়। উত্তরে মঙ্গোলিয়া-সাইবিরিয়া, পূর্বে চীন ও পশ্চিমে লদাখ এবং নিজ-তিব্বতের প্রতি কোণ হইতে লোকজন এই সময় লাসায় আসে। ভূটানীরাও এ সময় অনেকে এখানে আসে। বিশাল দেহ, জীপুরুষনির্বির্শেষে মুণ্ডিত শির, দীর্ঘ চোঙ্গা ও নগ্ন পদ (বিশেষ শীত ছাড়া)—দূর হইতেই তাহাদের জাতিষ্ম নির্ণয় করিয়া দেয়। ভোটার তাহার ভূটানীদিগের নাম ভ্রগ্-পা (চলিত উচ্চারণে ভুগ্-পা) ও তাহাদের ভাবার নাম ভ্রগ্-মূল। ভূটানীরা ধর্ম্মে বৌদ্ধ ভাবিক এবং তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম্মে এক সম্প্রদায়ের নাম ভুগ্-পা। লাসায় ভূটানী দূতগার ও ফোজ দুই-ই আছে, কিন্তু প্রজার সংখ্যা ও কার্য-পরিমাণ অনেক কম বলিয়া নেপালী দূতগারের সহিত তাহার তুলনা হয় না।

* * *

তিব্বতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট শ্রোং-চন-গাং-বা নেপালবিজয় ও নেপালরাজ অশ্বত্থর্ষাব কন্যা তারাদেবীকে বিবাহ করার পর হইতে এই দুই প্রতিবেশী রাজ্যের পবম্পরের সহিত সম্বন্ধ ইতিহাস ও বাণিজ্যের দ্বারার সহিত সমানে চলিয়া আসিতেছে। সিপাহী-বিদ্রোহের

কিছু পূর্বে নেপালের মহারাজ জয়-বাহাদুর তিব্বতে বৃদ্ধ অভিযান করেন। এই অভিযানের প্রারম্ভে বহু সাকল্য লাভ সত্ত্বেও চীন-সম্রাট মধ্যস্থ হওয়ার জয়-বাহাদুরকে নিবৃত্ত হইতে হয়, তবে ইহার ফলে অল্প বহু অধিকারের সহিত নেপাল প্রতি বৎসর ভেটম্বরূপ ৪০ হাজার টাকা তিব্বত হইতে পাইয়া থাকে। সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত এই দুই দেশের সম্বন্ধ মৈত্রীপূর্ণই আছে কিন্তু ১৯২৯ সালে কয়েকটি ঘটনায় ইহাদের মধ্যে এরূপ মনান্তর হয় যে বৃদ্ধ প্রায় আসন্ন হইয়া উঠে।

নেপালীদিগের বক্তব্য ছিল যে, (১) ভোটার অফিসর ও সেনাগণ অকারণ নেপালীদিগের উপর উৎপাত করে। উদাহরণ স্বরূপ, তাহারা বলে যে নেপালের পূর্বপ্রান্তের নিকটস্থ ধনকুটা নামক স্থানের ভোটার প্রজাগণ ভোটার সৈনিক ও অফিসরের অত্যাচাবে বিরত হইয়া দেশ ছাড়িয়া নেপালের সীমানার ভিতরের এক গ্রামে গিয়া বসতি করে। ইহার পর নেপাল-সরকারকে না জানাইয়া ভোটার সৈন্যসাম্রাজ্য ও সৈনিকগণ সীমানা পার হইয়া এই গ্রাম লুট ও সেখানকার নূতন পুৰাতন সকল প্রজার উপর যথেষ্ট অত্যাচার করে; (২) প্যাকীতে নেপালী দূতবাসের এক জন সিপাহীকে কোন তিব্বতী প্রজা হত্যা করে কিন্তু বহুবার বলা সত্ত্বেও ভোট-সরকার এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন নাই; (৩) তিব্বতে কাববারী নেপালী মাত্রেই তিব্বতী জী আছে এবং নেপালীগণ নিজ অবস্থামত তাহাদিগকে হুৎ-হুৎ রাখে। লাসাব রাজকর্মচারিগণ নেপালীদিগকে বিশেষ ভাবে কষ্ট করার জন্য এই সকল জীলোককে গ্রেপ্তার করাইয়া তাহাদিগের বাবা সরকারী গৃহনির্মাণেব জন্ত পাথর বহাইয়াছে; (৪) নেপালের উত্তর অঞ্চলে বহু ভোটভাষা-ভাষী প্রজা আছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে ব্যবসায়কার্যে তিব্বতে বাস করে। বাহ্যদেশিক অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য তিব্বতী কর্মচারিগণ ক্রমাগত তাহাদিগকে তিব্বতী প্রজারূপে গণনা করেন। এইরূপ ব্যবহারের জলন্ত উদাহরণ স্বরূপ লাসার শর্বা গ্যোলো ব্যাপারীর কথা তাহারা বলে। শর্বা গ্যোলো ধনী ও উন্নতিশীল ব্যবসায়ী ছিল। নেপালীদিগের মতে সে নেপালের প্রজা এবং সে নিজেও এই ধারণা

প্রবৃত্ত হইয়া ভোট দেশের উচ্চ কর্মচারীর এবং পরাজিত লোকদিগের সম্বন্ধে নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিত। ঐ সকল পরাজিত লোক এইরূপ চীকাঠিনীর বিষয় জানিতে পারিয়া ভীতান্ত্র জুহু হইয়া স্ববোগের প্রতীকা করিতে থাকে। কিছুদিন পরে ইহার চক্রান্ত করিয়া ফলাই লামার কাছে আবেদন করে যে, শর্বা গোম্বো ভোট-রাজ-সরকার সম্বন্ধে কটুকাটব্য করিয়াছে। সেই সঙ্গে উহার শর্বার জন্মস্থানবাসী কয়েকটি শত্রুকে হাত করিয়া তাহাদের দিয়া বলায় যে শর্বা বস্তুতঃ ভোট-প্রজা, নেপালী নহে। ফলে শর্বা তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার ও ভোটের কারাগারে আবদ্ধ হয়। লাসাব নেপালী রাজদূত এ-বিষয়ে ভোট-সরকারকে বুঝাইতে অসমর্থ হওয়ায় নেপাল-সরকার স্বয়ং জানান যে শর্বা নেপালী প্রজা। ভোট-সরকার তাহার উত্তরে বলেন যে সে ভোট-প্রজা, সুতরাং তাহার বিষয়ে স্বত্বক্ষেপ করার কোনও অধিকার নেপাল-সরকারের নাই। ইহাতে নেপাল-সরকার ভোট-সরকারকে শর্বার জন্মস্থানে

নিজে কর্মচারী পাঠাইয়া তাহার প্রজাম্বন্ধ নিরীক্ষণ করিতে বলেন। ভোটরাজ এই অল্পরোধ অবহেলা করেন এবং ইতিমধ্যে শর্বা প্রায় দুই বৎসর জেলে পচিতে থাকে।

১৯২৩ খ্রীঃ জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমি লাসায় পৌছাই, সে সময় শর্বা জেলে বা গারমে আবদ্ধ ছিল। আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিপাহী-রক্ষিগণ অসাবধান থাকায় সে পলাইয়া নেপালী দূতাবাসে আশ্রয় লয়। ১৪ই আগষ্ট আমি নেপালী দূতের সহিত দেখা করিতে গিয়া আশিনায় এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ পুরুষকে ঘুরিতে দেখি, শুনিলাম সেই শর্বা গোম্বো। শর্বার পলায়নে যে-সকল ভোটরাজপুরুষ তাহার উপর অগ্রসর ছিল তাহারা বিশেষ লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে তাহার রক্ষী সিপাহী ও কর্মচারীদিগের দণ্ড দেন এবং পরে মহাশুদ্ধর (ফলাই লামার) নিকট আবেদন-অল্পরোধের চূড়ান্ত করেন। ফলে নেপাল-রাজদূতের নিকট আদেশ আসিল, “শর্বাকে এই মুহূর্তে আমাদের হস্তে সমর্পণ কর।”



রাষ্ট্রায়ত্রে
ঐনশলাল বহু



মণিপুরী-রমণী
ঐবীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা

বিবিধ প্রসঙ্গ

মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেস ও মন্ত্রিত্বগ্রহণ

ছয়টি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যেরা সংখ্যায় সর্বাধিক হওয়ায় আইন ও প্রচলিত প্যারলিমেন্টারী রীতি অনুসারে তাঁহাদের নেতাদেরই এই সকল প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার কথা। গবর্ণরেরা তাঁহাদিগকে তাহা করিতে ডাকিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কংগ্রেস-কাঁদ্যনিকাঁহক সভার প্রতিজ্ঞা অনুসারে গবর্ণরদিগের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুতি চান, যে, তাঁহারা ভারতশাসন আইনের অনুযায়ী বাহা কিছু করিবেন, তাহাতে গবর্ণরেরা বাধা দিবেন না, হস্তক্ষেপ করিবেন না। গবর্ণরেরা নানা কারণ দেখাইয়া এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন নাই। সহজেই ও স্বভাবতঃ ইহা অসম্ভব হইয়াছিল, যে, ভারতসচিবের আদেশ বা উপদেশ অনুসারে গবর্ণরেরা একপ কাক্স করিয়াছিলেন। ভারতসচিব লর্ড জেটল্যান্ড এ-বিষয়ে প্যারলিমেন্টে প্রথম যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি প্রতিশ্রুতিদান সম্বন্ধে গবর্ণরদের কাজের সমর্থন করেন, এবং প্রত্নবোধবান্ লোকদের চিরানুষ্ঠান হুরে কথা বলেন। তাহার উপযুক্ত জবাব মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের অন্য কোন কোন নেতা দিয়াছিলেন। লর্ড জেটল্যান্ড প্যারলিমেন্টে এ-বিষয়ে আবার যখন মুখ খুলেন, তখন হুরটা নরম হইয়াছে বুঝা গেল। তাহার পর কংগ্রেসপক্ষ হইতে বলা হয়, যে, গবর্ণরের সহিত মন্ত্রিমণ্ডলের গুরুতব মতভেদ হইলে, গবর্ণর মন্ত্রীদিগকে বরখাস্ত করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করুন। কংগ্রেসের সমালোচকেরা বলেন, “এরূপ প্রতিশ্রুতির কি প্রয়োজন? গবর্ণর যদি আপনাদের কোন কাজে আপত্তি করেন বা বাধা দেন, তাহা হইলে আপনারা ত নিজেই কাজে ইস্তফা দিতে পারেন?” এ-বিষয়ে অনেক খবরের কাগজে বহু আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হইয়াছে। মাসিক পত্রে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হইবে না, স্থানেরও অভাব আছে। আমবা সংক্ষেপে কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, মন্ত্রীর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইস্তফা দিলে, তাঁহারা যে-যে কারণ

দেখাইয়াই পদত্যাগ করুন না কেন, তাহার কদর্থ এই হইতে পারিবে, যে, তাঁহারা কাজ চালাইতে পারিলেন না। অথচ বাস্তবিক তাঁহারা কাজ চালাইতে সমর্থ ও প্রস্তুত ছিলেন। গবর্ণর তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করিলে তাহার সহজ-অর্থ ও ঠিক অর্থ এই হইবে, যে, তিনি মন্ত্রীদিগকে আইনসম্মত এবং বৈধ কাজও করিতে দিলেন না ও দিবেন না।

মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি বলিয়াছেন, যে, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যদিও কর্মচ্যুতির দাবীই কবা হইয়াছে বটে, তবে ব্যক্তিগতভাবে তিনি সম্মত হইবেন যদি মন্ত্রীদিগের সহিত মতভেদ ঘটিলে গবর্ণর তাহাদের ইস্তফা দাবী করেন। কংগ্রেসের সমালোচকেরা বলিতে পারেন, এটা খুব সামান্য ব্যাপার। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে গবর্নেন্ট এই সামান্য জিনিষটুকু কংগ্রেসকে দেন না। এ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের মিলন ঘটাইবাব নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছেন কংগ্রেসই। কংগ্রেস যত দূর অগ্রসর হইতে পারেন, তত দূর হইয়াছেন। এখন গবর্নেন্ট একটু আগাইয়া আসুন না? গবর্নেন্ট যদি সমস্ত সভাই চান যে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করেন, তাহা হইলে সামান্য একটা প্রতিশ্রুতি দিলেই ত চুকিয়া যায়? কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বাহা চাওয়া হইতেছে তাহার দ্বারা গবর্নেন্টের সরলতা ও আন্তরিকতা পরীক্ষিত হইবে।

কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করিলে তাহার ক্ষেত্রে অচল অবস্থার উদ্ভবে গবর্ণররা শাসনবিধি স্বগিত রাখিতে (কন্সটিটিউশন সম্পূর্ণ করিতে) বাধ্য হইবেন। মহাত্মা গান্ধী তাহার জন্ত ও তাহার ফলাফলের জন্ত প্রস্তুত। কিন্তু তিনি তাহা চান না। কারণ, তাহাতে ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে এখন যে স্থপাশেষ ও তিক্ততা আছে তাহা বাড়িবে। তিনি কৃষকের একপ অবস্থা নিবারণার্থ প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন, কিন্তু এমন সময় আসিবেই যখন তাঁহার চেষ্টা নিফল হইবে।

কংগ্রেস বরাবর বলিয়া আসিতেছেন, যে, তাঁহারা বর্তমান কন্সটিটিউশনটা ধ্বংস করিতে চান। কংগ্রেস-দলের

লোকেরা যে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছেন, ধ্বংসই তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার ও তদ্বারা আইনানুযায়ী কাজ করিবার আগ্রহ দেখিয়া সমালোচকেরা নানা কথা বলিতেছেন। কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত না হইলে এবং কংগ্রেস রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে নিজের মতে দৃঢ় থাকিলে, পুনর্ব্বার আইনলঙ্ঘন-প্রচেষ্টার প্রবর্তন ও পরিচালন অবশ্যসম্ভাবী। অহিংস ও সত্যনিষ্ঠ ভাবে সাহস ও অধ্যবসায় সহকায়ে ইহা চালাইবার জন্য দেশ কতটা প্রস্তুত, তাহা গান্ধীজী অল্প কাহারও চেয়ে কম জানেন না। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইলে সেই উপায়ে দেশকে কতটা প্রস্তুত করিতে পারা যাইবে, তাহাও তিনি অল্প কাহারও চেয়ে কম জানেন না। অতএব, বাস্তবঅবস্থানির্বিশেষে কেবল যুক্তির অনুসরণ করিয়া যদিও আমরা কংগ্রেস ও অল্প সকল মনেরই মন্ত্রি গ্রহণের বিরোধী বরাবর ছিলাম এবং এখনও আছি, তথাপি স্বাধীনতা সংগ্রামে যিনি কার্যক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিয়াছেন, এখনও করিতে প্রস্তুত এবং প্রয়োজন হইলে নিশ্চয় আবার করিবেন, তাঁহার রণকৌশলের বিরোধিতা করিবার আশ্পর্শ আমাদের নাই। কারণ, আমরা ঘরে বসিয়া লিখিয়াছি, বক্তৃত্যমঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃত্যও করিয়াছি, কিন্তু অহিংস স্বরাজসংগ্রামের রণক্ষেত্রে কখনও পদক্ষেপ করি নাই, ভবিষ্যতেও করিবার সৌভাগ্য অর্জনের আশা নাই।

কংগ্রেসের প্রতি ভারতসচিবের অনুরোধ

৩১শে মে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রাজ্যে পাল্লোমেন্টের রক্ষণশীল সদস্যদের একটি ঘরোয়া বৈঠক হয়। তাহাতে ভারতসচিব লর্ড জেটল্যান্ড যাহা বলেন, তৎসম্বন্ধে নিম্নমুদ্রিত সংবাদটি ব্রিটিশ বেতার-ব্যবস্থা যোগে ভারতবর্ষে পর দিন আসে।

গতকল্যা রাজিতে পাল্লোমেন্টের রক্ষণশীল সদস্যদের এক ঘরোয়া বৈঠকে ভারতসচিব লর্ড জেটল্যান্ড ভারতের কংগ্রেসী দলকে মন্ত্রি ও গবর্ণমেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য পুনরায় অনুরোধ জানান।

লর্ড জেটল্যান্ড বলেন, “হিন্দুদের মহৎ গুণাবলীতে, বিশেষভাবে তাহাদের গঠনপ্রতিভাতে, আমার স্থায়ী বিশ্বাস আছে। বহু উৎসাহ-হানিকর অবস্থা সত্ত্বেও আমার এখনও এই বিশ্বাস আছে যে, হিন্দুরা

তাহাদের শক্তি ও দক্ষতা ভারতের সেবার নিয়োজিত করিবেন। গ্রেট ব্রিটেন আন্তরিকতার সহিত তাঁহাদিগের সহিত সহযোগিতা করার যে প্রস্তাব করিয়াছে তাঁহারা যেন তাহা অবহেলা না করেন, অথবা গ্রেট ব্রিটেন তাঁহাদিগকে উভয়ের একটি সাধারণ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সহযোগিতার যে অনুরোধ জানাইয়াছে, তাঁহারা যেন তাহা অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান না করেন, একপ অনুরোধ করা কি বেশী হইবে? এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এই দুই জাতিকে যে সমবেত ভাবে কাজ করিতে হইবে তাহা যে কেবল তাহাদের মিলিত চেষ্টা বোধ্য তাহা নহে, পরন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহা তাহাদের স্পষ্ট নিয়তি বা ভাগ্যলিপি। আমাদের উভয় জাতির ইতিহাসের সঙ্কট সময়ে উভয় জাতির নিকট ইহাই আমার আবেদন।”

লর্ড জেটল্যান্ডের নিজের মনের যে ভাব এই কথাগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক তাঁহার স্বয়ং হইতে উদ্ভূত নহে, একরূপ কোন ইচ্ছিত মাত্রও আমরা করিতেছি না। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেন ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন দ্বারা আমাদের সহযোগিতা চাহিয়াছে, ইহা আমরা বিন্দু মাত্রও বিশ্বাস করি না। গ্রেট ব্রিটেন চাহিয়াছে ভারতবর্ষের উপর নিজের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব রক্ষা করিতে এবং ভারতবর্ষ হইতে সকল প্রকারে ধন আহরণের অবাধ উপায় রক্ষা করিতে।

ভারতসচিব মহোদয় গান্ধী সাহায্য দাবীটুকু মানিয়া লইলেই কংগ্রেসের “সহযোগিতা” পাইতে পারেন। মানিয়া লউন না? ইহা মানিয়া লইতে আইনের কোন পরিবর্তন আবশ্যক হইবে না, মানিয়া লইলে আইন কোন প্রকারে লঙ্ঘিত বা পরিবর্তিত হইবে না। ইহা মানিয়া লইলে বুঝা যাইবে যে, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট সত্য সত্যই কংগ্রেসের মন্ত্রি-গ্রহণ ও সহযোগিতা চান, না মানিয়া লইলে বুঝা যাইবে, গবন্মেণ্ট, মন্দ বাহা ঘটাইছে বা ঘটাবে, তাহার দোষটা কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাইতে চান। মহাত্মা গান্ধী ঠিকই বলিয়াছেন,

গবন্মেণ্ট কংগ্রেসের সহিত কথা না চালাইয়া কংগ্রেসেব সম্বন্ধে (পৃথিবীর লোকদের সঙ্গে) কথা চালাইতেছেন। মনে হইতেছে যেন ব্রিটিশ রাজনীতিব্যাপারীরা ও প্রাদেশিক গবর্ণররা জগৎশাসীদিগকে সন্ধান করিয়া কথা বলিতেছেন, কংগ্রেসকে নহে। বক্তব্য, বরাবর যেরূপ হইয়াছে, সেইরূপ এখনও তাহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা যায়, যে, তাঁহারা কংগ্রেসকে অপদস্থ ও

অধ্যাপ্তিভাজন এবং জনগণের সহিত সংযোগচ্যুত ও তাহাদের সমর্থন হইতে বঞ্চিত কবিত্তে চাহিতেছেন।”

লর্ড জেটল্যাণ্ড মাহুয়াটির বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার অভিপ্রায় না থাকিলেও, আমাদের মনের এই প্রশ্নটা চাপা দিতে পারিতেছি না, যে, তিনি হঠাৎ (?) এই সময়ে কেন হিন্দুদের গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশ্য, তিনি এদেশে থাকিতেও হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং হিন্দুর সংস্কৃতিবিষয়ক বহিঃ লিখিয়াছিলেন। ইহাও সত্য, যে, তিনি ভারতশাসন আইনে বঙ্গের হিন্দুদের প্রতি যে ঘোরতর অবিচার করা হইয়াছে, তাহার প্রতিকারের চেষ্টাও কবিত্তেছিলেন। তাঁহাকে ভারতবর্ষের লোকদের মধ্যে বিশেষ করিয়া হিন্দুদের শত্রু বা বিবেচ্যতা বলা যায় না। সুতরাং হিন্দুদের সম্বন্ধে তাঁহার যে উক্তিগুলির আলোচনা হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে ইঙ্গিতে আমরা এরূপ কোন প্রশ্ন করিতেছি না, যে, শত্রু কেমন করিয়া স্থাবক হইলেন। তিনি হিন্দুর গুণগান এখন কেন করিলেন, তাহাই জিজ্ঞাস্য। আমাদের বোধ হয়, যে ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেসী দল ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যাভূমিষ্ঠ হইয়াছে সেগুলি হিন্দুপ্রধান প্রদেশ এবং কংগ্রেসী সমস্তদের মধ্যে প্রায় সবাই হিন্দু; সেই জন্য হিন্দু-দিককে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া তিনি কার্য উদ্ধার করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ‘কথায় চিঁড়া ভিজ়ে না’। কংগ্রেস সামান্য বাহা দাবী করিতেছে তিনি তাহা দিয়া কেলুন না?

তিনি বলিতেছেন, তিনি আশা করেন হিন্দুরা দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। যেন তাহারা কখনও তাহা করে নাই, এবং এখনও করিতেছে না! দেশের সেবা হিন্দুরা ত চিরকাল করিয়া আসিতেছে। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে করিয়াছে, মোগল-পাঠানশাসিত প্রদেশসমূহে মোগলপাঠান যুগে কবিত্তাছে, ব্রিটিশ রাজত্বকালে হিন্দুদের মধ্যে সর্বাঙ্গীন দেশসেবা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত বিখ্যাত অবিখ্যাত অগণিত হিন্দু করিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মিলিত দেশসেবা অবশ্য এখনও প্রয়োজনানুরূপ ও যথেষ্ট হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের চেয়ে অধিক দেশসেবা কোন অহিন্দু করেন নাই।

বোধ হয় লর্ড জেটল্যাণ্ড বলিতে চান, ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের

ও গবর্নরদের প্রতাবাধীন হইয়া নূতন ভারতশাসন আইনটাকে ‘চালু’ করিলে তবে হিন্দুদের দেশসেবা দেশসেবা বলিয়া ইংরেজরা মানিবে। কিন্তু আমরা যাহাকে দেশসেবা মনে করি ও বলি, ইংরেজরা তাহাকে দেশসেবা নাই বা বলিল? তাহাদের মতে দেশসেবক বিবেচিত হইতে অন্ততঃ কংগ্রেসী হিন্দুরা ব্যগ্র নহে।

[বিবিধ প্রসঙ্গের এগার পৃষ্ঠা লিখিত হইয়া ছাপার হরফে উঠিবার পর ১০ই জুন দৈনিক কাগজে পড়িলাম, ভারতসচিব প্যারোমেন্টে বলিয়াছেন, গান্ধীজী ব্যক্তিগত ভাবে যেরূপ প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছেন তাহা দেওয়া যাইতে পাবে না। এ বিষয়ে আমরা পরে কিছু লিখিব।]

—

আগামী কংগ্রেসের সভাপতি কে হইবেন?

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন গুজরাটের যে গ্রামটিতে হইবে, সেখানে কংগ্রেসপুত্রী নির্বাণের চেষ্টা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গান্ধীজীর আহ্বানে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বহু স্থানটি দেখিয়া আসিয়াছেন। বোধ হয় পুরীটি যাহাতে শোভন হয় সে বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ তাঁহাকে আহ্বানের উদ্দেশ্য। এই দিকে আয়োজন যেমন চলিয়াছে, অল্প একটি বড় অয়োজনের লক্ষ্যপাতও তদ্রূপ করা আবশ্যক। তাহা কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি মনোনয়ন।

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে বড় প্রদেশ সাতটি আছে। আগেকার ছোট এবং পরে স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া গণিত ছোট প্রদেশগুলি ধরিলে মোট এগারটি প্রদেশ হয়। যদি এইরূপ মনে করা যায়, যে, প্রত্যেক বড় প্রদেশ হইতে পর্যায়ক্রমে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক, তাহা হইলে গত পনের বৎসরে বাংলা দেশ হইতে দু-জন বাঙালীকে সভাপতি নির্বাচন করা উচিত ছিল। যদি মনে করা যায়, যে, ছোট বড় সকল প্রদেশ হইতেই পর্যায়ক্রমে সভাপতি মনোনীত করা উচিত, তাহা হইলেও গত পনের বৎসরের মধ্যে এক জন বাঙালীকে সভাপতি করা উচিত ছিল। আর যদি মনে করা যায়, যে, ওরূপ পালা বা ভাগ-বাটোয়ারা ঠিক নয়, যে-যে প্রদেশ স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাহস ও অর্থত্যাগের সহিত বিশেষরূপে যোগ দিয়াছে এবং

দুঃখভোগ করিয়াছে, সভাপতি নির্বাচন সেই সব প্রদেশ হইতেই করা উচিত, তাহা হইলেও বাংলা দেশকে ও বাঙালীকে দীর্ঘকাল বাদ দেওয়া যায় না; কারণ, বাংলা দেশের ও বাঙালীর স্থান এ-বিষয়ে কাহারও নীচে নয়। সুতরাং গত পনের বৎসরে অন্ততঃ এক জন বাঙালীকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করা উচিত ছিল। আর এক দিক দিয়া বঙ্গের দাবী বিবেচিত হইতে পারে। ব্রহ্মদেশকে সবে আড়াই মাস হইল ভারতবর্ষ হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ সমেত সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা আগে ছিল পঁয়ত্রিশ কোটি। তাহার মধ্যে বঙ্গের লোকসংখ্যা পাঁচ কোটি। সুতরাং প্রতি সাত বৎসরে এক জন বাঙালীকে সভাপতি করা উচিত। সে হিসাবে গত পনের বৎসরে দু-বার বাঙালীকে সভাপতি করা উচিত ছিল। যদি শুধু ব্রিটিশ-শাসিত ব্রহ্মদেশবর্জিত ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ধরা যায়, তাহা হইলে তাহা পঁচিশ কোটির বেশী হয় না। পাঁচ কোটি তাহার এক পঞ্চমাংশ। সুতরাং প্রতি পাঁচ বৎসরে এক জন বাঙালীকে সভাপতি করা উচিত। সে হিসাবে গত পনের বৎসরে বাঙালীকে তিনবার সভাপতি নির্বাচন করা উচিত ছিল।

কিন্তু বাঙালীকে যে-হিসাবে ষত বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করা উচিত হউক না কেন, বাস্তবিক গত পনের বৎসর এক জন বাঙালীকেও একবারও নির্বাচন করা হয় নাই।

অতএব, আমরা চাই, এবার এক জন বাঙালীকে সভাপতি করা হউক।

কোন প্রদেশকে বাদ দিয়া, ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের বাকী অংশ অগ্রসর হইতে পারে না। কোন প্রদেশও অন্তঃসমুদ্রপ্রদেশনিরপেক্ষ ভাবে অগ্রসর হইতে পারে না। সেই কারণে আমরা বলি, বাংলা দেশকে সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অগ্রসর হউন, বাংলা দেশও অন্যান্য প্রদেশের সহিত সার্বজনিক কাজে যোগ দিয়া অগ্রসর হউন।

তাহার সুযোগ আমরা চাহিতেছি। কংগ্রেসের নীতি ও পন্থা স্থির আব সবাই করিবে, বাঙালী করিবার সুযোগ

পাইবে না, ইহা হইতে পারে না। মধ্যে মধ্যে সভাপতি না হইলে এই সুযোগ যথোচিত রূপে পাওয়া যায় না। অতএব মধ্যে মধ্যে বাঙালীকে সভাপতি করিতে হইবে।

আব একটি কারণে বাঙালীর এখন সভাপতি হওয়া আবশ্যিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে, উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুড়ি একশ বৎসরে বঙ্গের দুঃখ-দুর্দশার কথা আমরা তুলিতে চাই না। গত পনের বোল বৎসবে বঙ্গের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, বঙ্গের উপর যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে ও এখনও বহিতেছে, তাহা বঙ্গের বাহিরের লোকেরা ভাল করিয়া জানেনই না, অগণিত বাঙালীও জানেন না। সেই দুঃখের কথা একবার ভারতবর্ষের জনগণের দরবারে সভাপতির মুখ হইতে বর্ণিত হওয়া চাই। তাহা বাঙালী ভিন্ন কেহ সব জানিয়া বুঝিয়া যথোচিতরূপে দরদেব সহিত বলিতে পারিবে না।

কিন্তু যোগ্য বাঙালী কেহ আছে কি?

না থাকিলে আমরা এত কথা লিখিতাম না।

আমাদের বিবেচনার শ্রীযুক্ত স্বভাবচন্দ্র বসুকে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচন করা উচিত। এই কাজের জন্য তাঁহার যথেষ্ট বিদ্যা ও বুদ্ধি আছে। তিনি কলেজে ভাল ছাত্র ছিলেন, পাস ভাল করিয়াছিলেন। তাহাব পর সিভিল সার্ভিসে পবীক্ষা-প্রতিযোগিতার ফলে সিভিল সার্ভিসে চাকরী পাইয়াছিলেন। সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করিবার ও করাইবার ক্ষমতা তাঁহার বেশ আছে। বস্তুতঃ, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারত-গবর্নমেন্টের স্বরাষ্ট্র-সচিব তাঁহাকে আটক করিয়া রাখিবার কারণ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে, গবর্নমেন্ট তাঁহাকে খুব বুদ্ধিমান এবং দল বাঁধিতে ও সুশৃঙ্খলভাবে দলকে চালাইতে সক্ষম মনে করেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির প্রধান কর্মকর্তারূপে তিনি এই সব গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি খেচ্ছায় সিভিল সার্ভিসের চাকরী ছাড়িয়া দিয়া স্বার্থভ্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। বাহাভে অর্থাগম হয় তিনি এখন এরূপ কোন চাকরী করেন না ও ভবিষ্যতে করিবেন না, এবং পরিবারপালনের ভারগ্রস্ত তিনি নহেন। সুতরাং তিনি তাঁহার সমুদয় সময় ও শক্তি দেশের কাজে নিয়োগ করিতে সমর্থ। দুঃখবরণ ও দুঃখসহনে

মানুষ গড়িয়া উঠে। তাঁহার জীবনে দুঃখভোগ খুব ঘটিয়াছে, এবং তাহা ঘটিয়াছে তিনি দেশের সেবক বলিয়া। ইউরোপে থাকিতে তিনি প্রভুত্বকারী ও স্বাধীনতাকামী বিভিন্ন মনোবৃত্তিশালী নানা দলের কর্তৃপক্ষের সহিত পরিচিত হইয়াছেন। তাহা স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেশের কাজে লাগিবে। ভারতবর্ষের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের সুযোগে বিদেশে কোন্ কোন্ দেশের সহিত কিরূপ চুক্তি করিলে ভারতবর্ষের কতকগুলি খুবক ভিন্ন ভিন্ন রকম শিল্প ও স্বত্বনির্মাণবিজ্ঞা শিখিতে পারে, তাহা তিনি ইউরোপে থাকিতেই অনেক বার লিখিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের সহিত জাতীয় সংস্কৃতির যোগ আছে। যে সকল ভারতীয় ছাত্র ছাত্রী বিদ্যালয়ভেদে জন্ম ইউরোপে আছেন, স্বভাববান্ধু সুযোগ পাইলেই এই সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বুদ্ধ নহেন, প্রৌঢ়ও নহেন। সেই কারণেও তিনি কংগ্রেসী নূতন দলের সমর্থন লাভ করিতে পারিবেন।

—

বিলাতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশার্থী

আগে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে চাকরী পাইতে হইলে কেবল বিলাতে পরীক্ষা দিবার বন্দোবস্ত ছিল। কয়েক বৎসর হইতে বিলাতে ও এদেশে উভয়দিকেই পরীক্ষা লওয়া হইতেছে। তা ছাড়া, গত বৎসর হইতে মনোনয়ন দ্বারাও বিলাতে কতকগুলি লোক লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

লন্ডনের পরীক্ষার জন্ম ১৯৩৫ সালে আবেদন করিয়াছিল ইউরোপীয় ৮৩ জন ও ভারতবর্ষীয় ২৫১ জন; ১৯৩৬ সালে পরীক্ষার্থী ছিল ১৪৫ জন ইউরোপীয় ও ২৪৮ ভারতীয়; কিন্তু এবার, ১৯৩৭ সালে প্রবেশার্থী হইয়াছে ৩২২ জন ইউরোপীয় ও ১৪৯ জন ভারতীয়। ভারতীয় পরীক্ষার্থীদের সংখ্যার ক্রমিক হ্রাসের কারণ, এখন সিভিল সার্ভিসের সব পদগুলি ত পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ দ্বারা করিবে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না, কতকগুলি চাকরী মনোনীত ইংরেজ ছোকরাদিগকে দেওয়া হইবে, কেননা ইংরেজ ছোকরারা প্রতিযোগিতায় ভারতীয়দের চেয়ে মোটের উপর অধিকতর পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেছিল না। এবার

যে ৩২২ জন ইউরোপীয় খুবক পদপ্রার্থী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ৮৯ জন নিয়োগ চাহিয়াছে কেবল পরীক্ষার জোরে, ১০০ জন পরীক্ষা দিবে মনোনয়নও চায়, বাকী ১৩৩ জন কেবল মনোনয়নের অল্পগ্রহে চাকরী চায়। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, ইংরেজ পদপ্রার্থীদের মধ্যে যাহাদের পৌরুষ আছে তাহাদের সংখ্যা কম, যাহারা অল্পগ্রহ চায় তাহাদের সংখ্যা অনেক বেশী

—

ভারতের কার্পাস এবং ম্যাঞ্চেস্তারের সুতা

ও কাপড়

“ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কার্পাস উৎপাদন সমিতি”র বাম্বিক অধিবেশনে লর্ড ডারবি সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

“আমরা ভারতের কার্পাস ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে আমদানী করিতেছি। ইহার দ্বারা ভারতের কৃষকদিগকে সাহায্য করা হইতেছে। ম্যাঞ্চেস্তারের সুতা ও কাপড় যথাসাধ্য ক্রয় করা ভারতবাসীদের কর্তব্য। উভয় দেশের মধ্যে প্রীতির সন্ধি স্থাপিত হওয়া উচিত। কিন্তু কেবল ইংলণ্ডের সদিচ্ছাতে তাহা হইবে না, উভয় দেশের লোকেরই পরস্পরের প্রতি সন্তোষ থাকা চাই।”

ইংরেজরা যে ভারতবর্ষের তুলা কেনে, সেটা নিজের গরজে কেনে; তাহা হইতে কাপড় প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া লাভ করিবার জন্ম কেনে। ভারতীয় কৃষকদিগকে সাহায্য করিবাব অভিপ্রায় ইহার মধ্যে নাই, ভারতবর্ষের প্রতি সন্তোষও ইহার মধ্যে নাই। ইংরেজরা ভারতবর্ষ হইতে যে তুলা ক্রয় করে, সেই রকম তুলা তার চেয়ে কম দামে অল্পর পাইলে সেখান হইতেই ইংরেজরা কিনিত।

ভারতবর্ষের তুলা ক্রয়ের মধ্যে যদি ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের সন্তোষ থাকে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের হাজার হাজার লোককে যে আমরা বেতন দিয়া ও বহু লক্ষ লোককে যে তাহাদের তৈরি জিনিষ কিনিয়া বাঁচাইয়া রাখি ও ধনী করি, তাহার মধ্যেও আমাদের ইংরেজ-প্রীতি আছে! বস্তুতঃ, এই উভয় ব্যাপারের মধ্যে প্রীতির নামগন্ধও নাই। ইংলণ্ড অগত্যা ভারতবর্ষের তুলা কেনে, আমরাও বাধ্য হই মোটা বেতনের ইংরেজ চাকর্যো বাধিতে ও আমাদের চেয়ে অনেক অধিক সজ্জতিপন্ন ইংরেজদের তৈরি জিনিষ কিনিতে।

ভারতবর্ষের লোকেরা যখন নিজেদের পরিধেয় সব কার্পাস-বস্ত্র নিজেরা ভারতবর্ষের তুলা হইতে প্রস্তুত করিতে

পারিবে, তখন সেই অবস্থা সন্তোষকর হইবে। আমাদের কাপড়ের জন্ত যত তুলা আবশ্যক তার চেয়ে বেশী তুলা তখন ভারতবর্ষে জন্মিলে বিদেশী লোকেরা তাহাদের আবশ্যক হইলে কিনিতে পারিবে। “আমরা তোমাদের যত তুলা যত দামে কিনি, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দামে তাহা হইতে উৎপন্ন হুতা ও কাপড় তোমাঙ্গিকে বিক্রী করি, অতএব আমরা তোমাদের বন্ধু, এবং সেই বন্ধুত্বের খাতিরে তোমরা আরও বেশী করিয়া আমাদের তৈরি হুতা ও কাপড় ক্রয় কর,” ইহা বড় চমৎকার যুক্তি। এই প্রকার বন্ধুত্বের এই প্রকার প্রতিদান করিতে বলার মানে, “তোমরা চিরকাল কাপড়ের জন্ত আমাদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাক।” ভারতবর্ষ কাপড় সম্বন্ধে আগে কোন কালেই পরমুখাপেক্ষী ছিল না; ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত নিজেব কাপড় নিজেই উৎপন্ন করিত, অধিকন্তু অনেক কাপড় বিদেশে রপ্তানী করিত।

ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকগণ জানিয়া রাখুন, ভারতবর্ষের স্বরাজ্য লাভে সাহায্য করিলে, অস্তিত্ব তাহাতে সম্মতি দিলে, তাহাব দ্বারা ইংরেজরা ভারতীয়দের প্রতি সম্ভাব দেখাইতে ও তাহাদের সম্ভাব লাভ করিতে পারিবেন, নতুবা নহে।

“হিন্দু” ও “পৌত্তলিক” ভাষা

রংপুরের টাউনহলে কিছু দিন পূর্বে মোলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি হাট্টার সাহেবের নিম্নমুদ্রিত কথাগুলি উদ্ধৃত কবিয়াছিলেন ও তাহার বাংলা অনুবাদ দিয়াছিলেন বলিয়া ‘সঞ্জীবনী’তে দেখিলাম।

“The language of our Government schools in Lower Bengal is Hindu, and the masters are Hindus. The higher sort of Musalmans spurned the instructions of idolators through the medium of the language of idolatry.” অর্থাৎ, “বাংলা দেশে আমাদের সরকারী স্কুলগুলির ভাষা হিন্দু এবং সে ভাষার শিক্ষকেরাও হিন্দু। পৌত্তলিক শিক্ষকদিগের দ্বারা পৌত্তলিক ভাষার মধ্য-বর্তিতায় প্রদত্ত এই শিক্ষাকে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা স্বপার সহিত বর্জন করিয়াছেন।” (অনুবাদ বক্তার)।

ইংরেজী বাক্যগুলি হাট্টারের কোন বহির কোন পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত, তাহা লেখা নাই।

হাট্টার সাহেব ইহলোকে নাই। তিনি জীবিত

থাকিলে তাঁহাকে কয়েকটা প্রশ্ন করা চলিত। বাংলা ভাষাটা “হিন্দু” ভাষা ও “পৌত্তলিক” ভাষা এবং সব হিন্দু “পৌত্তলিক” ইহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও যদি সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, এবং মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা বর্জনের যে কারণ হাট্টার দেখাইয়াছেন, তাহা যদি সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও মুসলমানরা অহিন্দু ও অপৌত্তলিক ইংরেজী ও উর্দু ভাষার সাহায্যে কেন আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে সেরূপ ব্যগ্র হয় নাই, “পৌত্তলিক” হিন্দুরা “পৌত্তলিক হিন্দু” বাংলা ভাষার ও অপৌত্তলিক ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে সেরূপ ব্যগ্র হইয়াছে, তাহা হাট্টারের উক্তি দ্বারা অব্যাহাত থাকে। ধরিয়া লওয়া যাক, হিন্দু শিক্ষকেরা সবাই পৌত্তলিক ছিলেন (যদিও ইহা সত্য নহে), কিন্তু মিশনারী স্কুলকলেজসমূহেব দেশী ও বিলাতী খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা ত অনেকই “অপৌত্তলিক” ছিলেন, এবং প্রথম প্রথম স্বকারী সব কলেজেও অধিকাংশ অধ্যাপক ছিলেন “অপৌত্তলিক” খ্রীষ্টিয়ান ইংরেজ। এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও মুসলমান ছাত্র কেন কম ছিল এবং অধিকাংশ ছাত্রই কেন হিন্দু ছিল, তাহার কারণ হাট্টারের উক্তিতে পাওয়া যায় না।

যদি বলেন, ইংরেজ রাজত্বে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়া যায়, বা মুসলমানরা ধর্মশিক্ষাশূন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে ধর্মহানির ভয়ে তাহা অপৌত্তলিক উর্দু ও ইংরেজীর সাহায্যে অপৌত্তলিক শিক্ষকদের সাহায্যে প্রদত্ত হইলেও তাহা গ্রহণ করে নাই, তাহা হইলে বাংলা ভাষার সাহায্যে হিন্দুশিক্ষকদের দ্বারা প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ না করিবার কারণও ত তাহাই ছিল মনে করা যুক্তিসঙ্গত; “হিন্দু” ও “পৌত্তলিক” ভাষা এবং “পৌত্তলিক” শিক্ষকদিগকে অকারণ এই কারণব্যবহার মধ্যে টানিয়া আনা, অনাবশ্যক এবং সাম্প্রদায়িক বিষেষ জন্মাইবার উদ্দেশ্যে তাহা করা হইয়াছে।

কলেজগুলির শিক্ষার বাহন এখনও “পৌত্তলিক” “হিন্দু” ভাষা বাংলা নহে, আগে ত কলেজে বাংলা পড়ানই হইত না। কলেজী শিক্ষার বাহন অপৌত্তলিক ইংরেজী ভাষা। কলেজগুলিতে দলে দলে মুসলমান ছেলেরা কেন যায় নাই

ও যায় না? যে-যে কলেজে মুসলমান ছাত্রেরা খুব অল্প খরচে শিক্ষা পাইতে পারে, সেখানেও মুসলমান ছাত্র যথেষ্ট কেন হয় না?

এসব প্রশ্নের উত্তর হাট্টারের উক্তিভে পাওয়া যায় না।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবেচ্য জম্মাইবার ও বাড়াইবার চেষ্টার উদ্দেশ্যে যে-সকল মহৎ লোক ছিলেন ও আছেন, হাট্টার তাহাদের মধ্যে নিশ্চয় অন্ততম, একপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর “বোধোদয়” নামক বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকে লিখিয়াছিলেন, “ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ”, “পুত্তলিকার চক্ষু আছে দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে শুনিতে পায় না” ইত্যাদি। এহেন “অপৌত্তলিক” বহি মুসলমান ছাত্রেরা দলে দলে কেন আগ্রহ সহকারে পড়ে নাই? অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ তিন ভাগ ও অন্তান্ত বহির কোথাও পৌত্তলিকতা নাই। আরও অনেক বিদ্যালয়পাঠ্য বাংলা বহির কোথাও পৌত্তলিকতা নাই। পৌত্তলিকতার প্রচারক বা সমর্থক কোন বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকের কংই আমাদের মনে পড়িতেছে না। লক্ষ লক্ষ হিন্দু-বালক-বালিকা এই সকল অপৌত্তলিক বহি পড়িয়া বিদ্যালয়্য করিয়াছে। অধিকতর আগ্রহসহকারে অধিকতরসংখ্যক মুসলমান ছাত্র ঐ সকল বহি পড়িয়াছেন কি? সমুদয় বাংলা সাহিত্যকে ও বাংলা ভাষাকে পৌত্তলিক বলিতে পারে তাহাবাই বাহারা উহার সহিত পরিচিত নহে, বা বাহারা ধর্ম্মাঙ্ক।

বাংলা অনেক গ্রন্থে দেবদেবীর কথা ও উল্লেখ আছে, সত্য। কিন্তু একপ বহিও ত অনেক আছে যাহাতে দেবদেবীর কথা নাই। যে-সব অহিন্দু ইউরোপীয় ইংরেজী ও অন্তান্ত সাহিত্যে গ্রীক, রোমান, টিউটনিক ও স্ক্যান্ডিনেভীয় দেবদেবীর গল্প ও উল্লেখ পড়িতে কোন বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করে না, তাহারা হিন্দু দেবদেবীর কথা না-পড়িতে পারে—তাহাদের সহিত তর্ক করা বুধা। কিন্তু যে-সব বাংলা বহিতে দেবদেবীর কথা নাই, তাহা পড়িতে আপত্তি কি? আমরা অবশ্য দেবদেবীর গল্প বা উল্লেখ সম্বলিত কোন দেশের বা কোন ভাষার বহিই শুধু সেই কারণেই পাঠের অযোগ্য ত মনে করিই না, প্রত্যুত একপ নানা গ্রন্থে কাব্যরস ব্যতীত

বহ উপদেশও পাওয়া যায় ও যাইতে পারে মনে করি। বিশেষ বিশেষ দেবতার উপাসকেরা বা উপাসকদের উপদেশেরা অনেক স্থলে পরমাস্বাদ্যই কোন-না-কোন স্বরূপকে বিশেষ বিশেষ দেবতার রূপ দিয়াছেন। তাহা তাঁহাদের বুদ্ধি ও কল্পনার সীমাবদ্ধতা বশতঃ হইয়াছে। তাহা বাহনীয় নহে। অথও সম্ভারূপে পরমাস্বাদ্য উপাসনাই শ্রেষ্ঠ ও কর্তব্য। কিন্তু একেশ্বরবাদীরাও ত সকলে সেরূপ উপাসনা করেন না বা করিতে পারেন না। আমরা ইহা বহুদেববাদের সমর্থন বা ব্যাখ্যা বা কৈফিয়ৎ রূপে বলিতেছি না। মুখে-একেশ্বর-বাদীদের গবিত ও দাস্তিক না হইয়া কি হেতু বিনয়ী, দীনাস্বা হওয়া উচিত, তাহারই আভাস দিতেছি।

আমরা উপরে উহঁকে “অপৌত্তলিক” ভাষা বলিয়াছি। কিন্তু হিন্দুরা বাংলা ভাষা ব্যবহার করে বলিয়া তাহা যদি “হিন্দু” ভাষা ও “পৌত্তলিক” ভাষা হয়, তাহা হইলে উহঁও হিন্দু বা ব্যবহার করে বলিয়া তাহাও “হিন্দু” ভাষা ও “পৌত্তলিক” ভাষা। আগ্রা-অবোধ্যা প্রদেশেই উহঁর ব্যবহার বেশী। সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ১৪ জন মাত্র মুসলমান, বাকী প্রধানতঃ হিন্দু। বেশীসংখ্যক শিক্ষিত হিন্দু—বিশেষতঃ কায়স্থেরা—উহঁর ব্যবহার করে। অনেক বিখ্যাত উহঁ-লেখক—যেমন পণ্ডিত রতননাথ—হিন্দু। হিন্দু মহাসভার অন্ততম নেতা ভাই পরমানন্দ একখানি বিখ্যাত উহঁ-সংবাদপত্রের সম্পাদক।

বস্তুতঃ হিন্দুরা ব্যবহার করিলেই যদি কোন ভারতীয় ভাষা “হিন্দু” ও “পৌত্তলিক” হইয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সব ভাষাই “হিন্দু” ও “পৌত্তলিক,” এবং সেগুলি যদি সেই কারণে মুসলমান ভারতীয়দের অব্যবহার্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের কোনও ভারতীয় ভাষায় কথা বলা ও লেখা বন্ধ করিতে হয়, এবং আরবী ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু ভ্রূমের বিষয় “পৌত্তলিক” অনেক হিন্দু অতীত কালে তাহা শিখিয়া ও লিখিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ “অশুচি” করিয়াছে, এবং এখনও সেকপ হিন্দু আছে।

যে মুসলমান ধর্ম্ম মুসলমানরা জীবনে মানিয়া চলে, যে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম খ্রীষ্টিয়ানেরা জীবনে মানিয়া চলে, তাহার মধ্যে পৌত্তলিকতা আছে কিনা, তাহার আলোচনা আমরা করিব না। ‘প্রবালী’ ধর্ম্মমত বিচারের কাগজ নহে, এবং

কোন অহিন্দু হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিলে, অহিন্দুকে উল্টা তরুণ আক্রমণ সমুচিত উত্তরও নহে।

প্রত্যেক ধর্মের বিচার হওয়া উচিত তাহার শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের দ্বারা। রামমোহন রায় এক শতাব্দীরও পূর্বে ইংরেজীতে “A Defence of Hindu Theism” নামক পুস্তিকা লিখিয়া এবং বাংলাতেও তরুণ পুস্তিকা লিখিয়া অহিন্দুদিগকে দেখাইয়াছিলেন যে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ উপদেশ পৌত্তলিকতার উপদেশ নহে। ষাঁহার হিন্দুধর্মকে পৌত্তলিক ধর্ম মনে করেন তাঁহার এই পুস্তিকাগুলি এবং রাজনারায়ণ বসুর “হিন্দু-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা” নামক পুস্তিকাটি পড়িয়া দেখিবেন। এই শেষোক্ত বক্তৃতাটিতে খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যে এরূপ সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, যে, উহার সংক্ষিপ্তসার ইংরেজীতে লণ্ডনের বিখ্যাত দৈনিক টাইমসে প্রেরিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাংলা ভাষা যদি “হিন্দু” ভাষা ও “পৌত্তলিক” ভাষাই হয়, তাহা হইলে “অপৌত্তলিক” বাঙালী মুসলমানেরা ও “অপৌত্তলিক” বাঙালী খ্রীষ্টিয়ানেরা কেন এই ভাষায় কথা বলিতেন ও লেখেন, অনেক বহি ও প্রবন্ধও কেন ঐ ভাষাতে লিখিতেন ও লেখেন, হাট্টার সাহেব পরলোকে এই প্রশ্নের উত্তর নিজের মনকে দিবেন; আমরা উত্তর চাই না। কোন ভাষার ছোঁয়াচ শুধু স্থলে সেই ভাষার বহি পড়িলেই লাগে না, তাহাতে কথা বলিলেও ত ছোঁয়াচ লাগে!

পদ্মফুলের ছবি ও “শ্রী”

মৌলানা আকরম খাঁর বক্তৃতা হইতে আমরা আর কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

এতদিন পৌত্তলিকতাব মনোপ্রচার করা হইয়াছিল শুধু পুণ্য-পুস্তকের মধ্য দিয়া। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সন্মান করিলেন এই শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহার যে পতাকা-অভিধানের অমুদ্রিত কবিলেন, তাহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল—কমলদলবিহারিণী কমলার প্রতীক পদ্ম ও শ্রী; আদেশ হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র এই কমল ও কমলা শোভিত পতাকাকে অভিধান করিবেন।

ইহা সত্য নহে, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কখনও পৌত্তলিকতার মহিমা প্রচার করিতেছিল বা এখন করে।

পদ্ম কমলদলবিহারিণী কমলার আসন বটে, “প্রতীক”

নহে; কিন্তু যেখানে পদ্মের ছবি থাকিবে সেখানেই লক্ষী বা সরস্বতীর চিত্র উহা আছে, এরূপ কল্পনা করা উচিত নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকায় কোনও দেবীর ছবি নাই, ছিল না।

ললিতকলা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার সেনাপাধ্যায় মহাশয়ের প্রমুখ্য অবগত হইয়াছি ইসলামিক স্থাপত্যে পদ্ম প্রাসাদ সমাধি মসজিদ আদিতে কোথাও কোথাও আছে। প্রয়োজন হইলে তিনি তাহার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার গত জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে লিখিয়াছেন (পৃ. ২৮০-২৮১) :—

“মুসলমান স্থাপত্যরীতিতে মসজিদগাত্র পত্রপুষ্পাদিতে শোভিত করা সোবাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না। তাই তখনকার ও তৎপরবর্তী অনেক মসজিদেব বহির্গারে ও দ্বারদেশে পদ্ম উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদেব বহির্গারেই যে এইরূপ পদ্ম উৎকীর্ণ হইত তাহা নহে—মসজিদেব অভ্যন্তরভাগেও মিহরাবের উপরিস্থ উৎকীর্ণ পদ্মে স্মরণোচিত করা হইত। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে গোড়েশ্বর সুলতান সিকন্দর শাহ নির্মিত সুলতানি আদিনা মসজিদেব মিহরাবেও এইরূপ পদ্ম উৎকীর্ণ আছে। পদ্ম-চিত্রের সহিত ইসলাম ধর্মে পৌত্তলিকতা প্রবেশের আশঙ্কা থাকিলে স্বাধীন মুসলমান সুলতানগণ কখনই তাহার প্রচলন অমুদ্রিত করিতেন না। অথচ বাংলার ইতিহাসে এই স্বাধীন সুলতানগণের যুগই সকল দিক হইতেই বাঙালীর স্ববর্ণের যোগ্য, সমগ্র মুসলমান অধিকারের ভিতর এই সময়েই বাঙালীর প্রতিভা অপূর্ণ প্রেরণায় উদ্ভূত হইয়া শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অভিনব বেশে আত্মপ্রকাশ করে। আত্ম ইসলাম ধর্মের ক্ষুরতা আশঙ্কায় ষাঁহার অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার কি এই স্বাধীন সুলতানগণের গোববয় কাহিনী জাতির তরুণ শিক্ষার্থীগণকে বিশ্বস্ত হইতে বলেন? এই প্রশ্নে আমরা অস্বস্তি বহু মসজিদে পদ্ম উৎকীর্ণ থাকার বিবরণ উল্লেখ কবিত্তে বিরত থাকিয়া জর্নৈক ইসলামধর্ম-প্রচারকের প্রতিষ্ঠিত (পদ্মচিত্রশোভিত) মসজিদেব বিবরণ পঠকগণের নিকট বিশ্বস্ত করিতেছি। বিগত ফাল্গুন মাসে এই মসজিদ আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। ময়মনসিংহ জেলার বিশোরগঞ্জ উপবিভাগেব অন্তর্গত অষ্টগ্রাম একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম এবং হিন্দু মুসলমান বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের বাসস্থান। পূর্বাশ্রিত গোড়ীয় স্বাধীন সুলতানগণেরও পূর্বে কুতুবনামধেব জর্নৈক ইসলামধর্মপ্রচারক সিদ্ধ মহাপুরুষ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া এতদঞ্চলে ইসলামধর্মের প্রচারকার্য আৰম্ভ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মসজিদ অতাপি অষ্টগ্রামে বর্তমান আছে। উক্ত মসজিদেব গাত্র ও দ্বারদেশের ইষ্টকশ্রেণী প্রস্তুত পদ্মে স্মরণোচিত করা হইয়াছে। অতাপি এই মসজিদে নিয়মিত জুম্মার নামাজ

অমুষ্ঠিত হয় এবং প্রামবাসী স্বধর্মনিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভূম্যধিকারী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহাতে যোগদান করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদেরই চেষ্টার ফলে সরকারী প্রকৃত্ত-বিভাগ এই প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া জাতির ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। অতঃপর মুসলমান শিক্ষার্থীগণের উপদেষ্টারা কি বলিতে চাহিবেন, ইসলামধর্মপ্রচারক মসজিদগাঞ্জে পদ্ম উৎকীর্ণ করিয়া তদীয় ধর্মের মর্যাদাহানি করিয়াছিলেন?”

ভারতবর্ষে অতীত কালে মুসলমানদের দ্বারা তাঁহাদের ধর্মালয়ে পদ্মচিহ্ন ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিলাম। এখন অত্র বর্তমান কালে মুসলমানের দ্বারা মুকুটে পদ্মালঙ্কার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিতেছি। গত ১৯শে মে তারিখের অমৃত বাজাব পত্রিকার কলিকাতা সংস্করণে নবম পৃষ্ঠায় নিম্নমুদ্রিত টেলিগ্রামটি প্রকাশিত হয়।

CAIRO, May 17.

The Egyptian authorities are now busy with the preparation of a crown for coronating King Farouq. The crown will have the symbol of the lotus flower with the three stars and crescent. The work on this is expected to be finished as the coronation of King Farouq will take place somewhere in July next. It will be recalled here that the late King Fuad wanted to have a special crown for himself and had ordered one to be made for him but unfortunately he died three months later. Now King Farouq wanted the new crown to be prepared on the same model as the one ordered by his late august father.

ইহাতে দেখা যাইতেছে, যে, মিশর দেশের ভূতপূর্ব রাজা ফুয়াদ নিজের জন্য পদ্মচিহ্নশোভিত একটি মুকুট নির্মাণ করাইতে চান। তাহা নিশ্চিত হইবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এখন মিশরের বর্তমান রাজা ফারুক তাঁহার পিতার অভিলାষানুসারে পদ্মালঙ্কৃত মুকুট প্রস্তুত করাইতেছেন।

“শ্রী”

এখন “শ্রী” শব্দটি সম্বন্ধে কিছু বলি।

আপ্টো-প্রণীত সংস্কৃত-ইংবেঙ্গী অভিধান হইতে ইহা ব সমুদয় অর্থ উদ্ধৃত করিতেছি।

1. Wealth, riches, affluence, prosperity, plenty.
2. Royalty, majesty, royal wealth. 3. Dignity, high

position, state. 4. Beauty, grace, splendour, lustre.
5. Colour, aspect. 3. The goddess of wealth; Lakshmi, the wife of Vishnu. 7. Any virtue or excellence. 8. Decoration. 9. Intellect, understanding. 10. Superhuman power. 11. The three objects of human existence taken collectively [namely, dharma, artha, and kama]. 12. The Sarala tree. 13. The Vilva tree. 14. Cloves. 15. A lotus. 16. The twelfth digit of the moon. 17. Name of Sarasvati. 18. Speech. 19. Fame, glory. 20. Name of one of the six Ragas or musical modes.

“শ্রী” শব্দের এই কুড়ি রকম অর্থের মধ্যে কেবল দুটি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর নাম। বাকী অর্থগুলির মধ্যে আছে ধনসম্পদ, অভ্যুদয়, প্রাচুর্য, রাজকীয় মহিমা, মানসম্মদ, প্রতিষ্ঠা, উচ্চপদ, সৌন্দর্য, ঐচ্ছল্য, বর্ণ, যে-কোন সদগুণ, সম্মা, বৃত্তি, বোধ, অতিমানব শক্তি, ধর্ম-অর্থ-কাম, পদ্ম, বাণী, ষণ। আপত্তিকারী মুসলমানদের মতে এগুলির মধ্যে কোনটিই কি প্রার্থনীয় নহে। যদি শ্রী বলিতে দুইটি দেবীকে বুঝায় বলিয়া উহার ব্যবহার বর্জ্যনীয় হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত ও বাংলা বর্ণমালার বহু বর্ণ ত্যাগ করিতে হইবে। বিসম্বাদ-ভেই গলদ—“অ”-এরই মানে, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, বৈশ্বানর।

আগেককার মুসলমানেরা যে সবাই নিজেদের নামের আগে শ্রী ব্যবহারে আগন্তি করিতেন না, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাজশাহীর ববেঙ্গ-অমুসন্ধান-সমিতির মিউজিয়ামে রক্ষিত একখানা প্রাচীন পাথরের গায়ে পুরাতন বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় এই লেখাটি উৎকীর্ণ আছে। ইহা প্রায় ৫ বৎসব আগে আমি দেখিয়াছিলাম।

শ্রীবস্তু

শাক পঞ্চপঙ্কা-

শতধিক চতুর্দ-

শ শতাব্দিতে মধ্যে

শ্রীশ্রীমদ্বাহুদ সা-

হ নুপাতঃ সময়ে নু-

র বাজ খান পুত্র ম-

হা পাজাধিপাজ শ্রীম-

৭ ফরাস খানেন সংক্র-

মোক্ষ নিনির্মিত ইতি।

১৪৫৫ শকাব্দে অর্থাৎ মোটামুটি চারি শত বৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীমন্ মহামুদ শাহ নামক এক মুসলমান নৃপতির সময়ে শ্রীমৎ করাস খান নামক এক জন অমাত্য একটি সংক্রাম অর্থাৎ সাঁকো নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পাথরে খোদিত লেখাটি তাহার দলিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, চারি শত বৎসর পূর্বে সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাঙালীরা বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় নিজেদের কীষ্টির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা স্বাভাবিক মনে করিতেন এবং নিজেদের নামের আগে “শ্রী” ব্যবহার ইসলাম-বিরুদ্ধ মনে করিতেন না।

উক্ত লিপিবদ্ধ পাথরটি ধুরাইল গ্রাম হইতে প্রাপ্ত।

বর্তমান সময়েও মুসলমানদের নামের আগে “শ্রী” ব্যবহারের কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বর্তমান বৎসরেব ১৩ই মে প্রকাশিত চতুর্থসংখ্যক কংগ্রেস বুলেটিনে কংগ্রেস ওয়ার্লিং কমিটির ও -নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্যদের নামের তালিকা আছে। তাহাতে নির্বাচনে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান পারসী সকলের নামের আগে শ্রী ব্যবহৃত হয় নাই। যেমন, মুসলমানদের মধ্যে মৌলানা আবুল কলাম আজাদের নামের আগে শ্রী নাই। তাহাতে বুঝা যায়, শ্রীব্যবহারে ঈহাদের সম্মতি আছে, তাঁহাদের নামের আগেই শ্রী সংযুক্ত হইয়াছে। হিন্দুদের শ্রী ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক। মুসলমানদের “শ্রী”-যুক্ত এই নামগুলি পাইলাম :—

Shri Abdul Ghaffar Khan, c/o Mahatma Gandhi, Maganwadi, Wardha (C. P.)

Shri Syed Ahmad, Sohagpur, District Hoshangabad.

Shri V. Abdul Ghafoor, Roshen Company, Vellore, (North Arcot District).

Shri Rafi Ahmad Kidwai, 5 Lalbagh Road, Lucknow.

Shri Muzaffar Husain, 56 Chak, Allahabad.

ইহাবা অল্পাধিক বিখ্যাত লোক। অবিখ্যাত অনেক মুসলমান—বিশেষতঃ বাঙালী মুসলমান—যে নামের আগে শ্রী ব্যবহার করিতেন ও করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। “বিশেষতঃ বাঙালী মুসলমান” বলিতেছি এই অস্ত্র, যে বাঙালী ভক্তলোকের ধরণে ধৃতি পরা ও বাঙালী মহিলাদের

ধরণের শাড়ী পরা যেমন বঙ্গদেশ হইতে নানা স্থানে ছড়াইয়াছে, তেমন “শ্রী”র ব্যবহারও বাংলা দেশ হইতে ছড়াইয়াছে।

কংগ্রেস কমিটি ছটির সদস্যদের তালিকা ছটিতে পারসী ও খ্রীষ্টিয়ানদের নামের আগে “শ্রী”ব্যবহারের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। যেমন—

Shri K. F. Nariman, Readymoney Terrace, New Worli, Bombay 18.

Shri R. K. Sidhwa, Victoria Road, Karachi.

Shri George Joseph, Bar-at-Law, Madura.

মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ না দিবার কারণ

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হইতে ইহার বার সকল ধর্মাবলম্বী সকল শ্রেণীভুক্ত ভারতবাসীর নিকট সমভাবে মুক্ত আছে। এবং কংগ্রেসে কখনও কোন ধর্মসম্প্রদায়ের অস্ববিধাজনক কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। তথাপি যে মুসলমানবা তাহাদের মোট লোকসংখ্যার অল্পপাতে যথেষ্ট সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগ দেয় নাই, তাহার নানা কারণ আছে। তাহাদের অনেক নেতা নিজেদের অস্বিধার জন্ত এবং কোন কোন স্থলে সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির খাতির তাহাদিগকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে। গবর্নেন্ট মুসলমানদিগকে বিশেষ অল্পগ্রহ দেখাইয়া নিবৃত্ত রাখিয়াছে, কেননা হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত স্বাধীনতালাভচেষ্টা ব্রিটেনের পক্ষে অবাঞ্ছনীয়। অনেক মুসলমান নেতা এবং বহু ইংরেজ মুসলমানদের মনে হিন্দুর প্রতি অবিশ্বাস বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার কম হইয়াছে। এই রূপ আরও কোন কোন কারণ দেখাইতে পারা যায়। সম্ভ্রান্তি কিছু দিন হইতে মুসলমান জনগণকে কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কার্যপ্রণালী জানাইয়া তাহাদের মধ্য হইতে বহু ব্যক্তিকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে। তাহাতে, মিঃ জিন্না, মৌলানা শৌকৎআলী, সর্ মুহাম্মদ হাকুব প্রভৃতি মুসলমান নেতারা প্রমাদ গণিতেছেন ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সর্ মুহাম্মদ হাকুব বিলাতের প্রসিদ্ধ দৈনিক ‘ম্যাকেষ্টার গাড়িয়ানে’ একখানা চিঠি লিখিয়া বলিতেছেন,

কংগ্রেসনেতারা যাহাই বলুন, কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের মনের ভাব কিছুই বদলায় নাই—যদিও ছাত্রশ্রেণীর কতকগুলি ভাবপ্রবণ সরলচিত্ত যুবা মুসলমান, সংসারের অভিজ্ঞতা না-থাকায়, স্বাধীনতার উন্নত ধারণার প্রভাবে কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। তাহার পর সর্ব মোহাম্মদ যাকুব বলিতেছেনঃ—

“Since the advent of Mr. Gandhi the Congress has become saturated with Hindu culture, Hindu civilisation and Hindu sentiments. In the present circumstances the Moslems will find it difficult to sign the Congress creed, but we are prepared to co-operate and collaborate on terms of equality with any political organisation in the country which aims at the elevation of our status to that of equal partner in the British Commonwealth of nations by constitutional means.”—Reuter

তাৎপর্য। কংগ্রেসের কার্যক্ষেত্রে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পর হইতে কংগ্রেস হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু ভাবধারায় ভরপুর হইয়াছে। বর্তমান অবস্থায় মুসলমানদের কংগ্রেসের মতসমূহ গ্রহণ করা কঠিন। কিন্তু যে-কোন রাষ্ট্রীয় দল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষকে অস্বাভাবিক সমান মর্যাদাবিশিষ্ট অঙ্গীকার করিতে আইনানুগ উপায়ে চেষ্টা করিবে, আমরা তাহার অস্ত্র সভ্যদের সমান গণিত হইলে সহযোগিতা করিয়া সহশ্রমী হইতে প্রস্তুত।”

সর্ব মোহাম্মদ যাহাই বলুন, প্রকৃত কথা এই, যে, গান্ধীজী কংগ্রেসনেতা হইবার পর হইতে কংগ্রেসের মুসলমান-অনুরাগ বাড়িয়াছে। মুসলমানদিগকে কংগ্রেসনেতারা খুশি করিবার অত্যধিক চেষ্টা করায় হিন্দু মহাসভাব কোন কোন নেতা কংগ্রেসকে হিন্দুবিবোধী পর্যন্ত বলিয়াছে। আমরা এই অভিযোগ সত্য মনে করি না। কিন্তু ইহা সত্য, যে, মুসলমানদিগকে খুশি করিবার জন্য কংগ্রেস গণতান্ত্রিক ও স্বাভাবিক নীতির বিপরীত আচরণ করিয়া সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে অ-গ্রহণ ও অ-বর্জন রূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সর্ব মোহাম্মদ যাকুব এখন যে-কারণে গান্ধীপ্রভাবিত ও গান্ধীচালিত কংগ্রেসে মুসলমানেরা যোগ দিতে পারে না বলিতেছেন তাহা সত্য না হইলেও সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করি, কংগ্রেসে গান্ধীজীর আবির্ভাবের আগে তাহাতে মুসলমানেরা কেন যোগ দেন নাই? কেন অতি অল্প সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন? এখন মুসলমানেরা যে রূপ

রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারেন তিনি বলিতেছেন, ভারতীয় জাতীয় উদারনৈতিক সংঘ টিক্‌ সেইরূপ দল। তাহাতে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোক যোগ দিতে পারে, এবং তাহাতে মুসলমানকে বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বী লোককে হিন্দুদের চেয়ে বা অন্য কোন ধর্মের লোকদের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করা হয় না; সকলকে সমান ও সমনাগরিক মনে করিয়া সমান অধিকার দেওয়া হয়। (কংগ্রেসেও সকল ধর্মের লোকদের মর্যাদা ও অধিকার সমান।) উদারনৈতিক সংঘে মুসলমানেরা কেন যোগ দেন নাই?

প্রকৃত কথা এই, যে, সর্ব মোহাম্মদ যাকুবের মত মুসলমান নেতারা নিজেদের প্রতি ও নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রতি গবর্নমেন্টের অস্বগ্রহ বজায় রাখিতে চান। এই জন্য তাঁহারা এমন কোন রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইতে চান না, ইংবেজ আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা হ্রাস এবং ভারতবর্ষের উপর ব্রিটেনের প্রভুত্ব হ্রাস সাধার লক্ষ্য।

পঞ্জাবে জলসেচনের জন্য আবার নব্ব কোটি টাকা ব্যয়

১৯৩৩-৩৪ সাল পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের জন্য লাভজনক (productive) কৃত্রিম খাল খননে মাত্রাজে ১৭,৭০,০২,৩৬৭ টাকা, বোম্বাইয়ে ২৬,৬২,৮২,৩৮৮ টাকা, বঙ্গে ১,১০,৩৭,০৫৩ টাকা, আগ্রা-অযোধ্যায় ২২,১৮,২০,২৬২ টাকা, এবং পঞ্জাবে ৩৩,৭০,৫৭,০৬৭ টাকা মূলধন ব্যয়িত হইয়াছিল। তাহাব পর ঐ উদ্দেশ্যে আরও কত মূলধন অন্তর্ভুক্ত ব্যয় করা হইয়াছে, তাহার হিসাব এখনও বাহির হয় নাই। কিন্তু ইহা জানি, বঙ্গে এমন কিছু ব্যয় হয় নাই যাহাতে বাংলা দেশ জলসেচনবিষয়ে উল্লিখিত প্রদেশগুলির অতি সামান্যরূপেও সমসুবিধাভাগী হইয়াছে মনে করিতে পারে। অথচ বঙ্গের বহু জেলায়—বাকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতিতে—জলের অভাব খুবই অস্বভূত হয়। বঙ্গের প্রতি স্নানজরের অভাবের নানা কারণ আছে। সবগুলি জানি না, যাহা অস্বভূত করি তাহাও বলা সহজ নয়। একটা কারণ এই ধারণা, বাংলা জলের দেশ, নদীর দেশ। সে কথাটা পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলার পক্ষে সত্য, অধিকাংশ জেলার পক্ষে সত্য নহে। আর একটি কারণ, ব্রিটেনের,

ইংরেজদের, যে-যে শস্য বেশী দরকার, যেমন তুলা ও গম, তাহা ইংরেজরা অন্য কোন কোন প্রদেশ হইতে যথেষ্ট জলসেচন ব্যবস্থা দ্বারা পাইয়া থাকে; সুতরাং বঙ্গের দিকে দৃষ্টি নাই। বঙ্গের জম্ম কিছু না-করিবার একটা সোজা অজুহাত ও কৈফিয়ৎ আছে—সরকারী তহবিলে টাকা নাই। অথচ বাংলা দেশ হইতে বরাবর পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের সৈয় খুব বেশী রাজস্ব আদায় হইয়া আসিতেছে, এখনও হয়। বঙ্গের রাজকোষে টাকার অভাবের কারণ, বাংলা দেশে সংগৃহীত রাজস্ব হইতে ভারত-গবর্ণমেন্টের খুব বেশী পরিমাণ টাকা—প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ—টানিয়া লওয়া। বাংলা গবর্ণমেন্টের দারিদ্র্যের ইহাই একমাত্র, অন্ততঃ প্রধান, কারণ।

ব্রহ্মদেশে ২,০৬,০৫,৫১১ টাকা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৭৫,৮৯,০৬১ টাকা খরচ হইয়াছে। মোট ব্যয় সমগ্র ব্রিটিশ ভারত ও ব্রহ্ম হইয়াছে ১০১,১৩,৯৪,৭১৭ টাকা। সমগ্র ব্রিটিশ ভারত ও ব্রহ্মদেশের এক-পঞ্চমাংশ লোক বঙ্গে বাস করে। সে হিসাবে বঙ্গে জলসেচন পূর্ন-কার্যের জম্ম নানকল্পে 'কুড়ি কোটি টাকা ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হইয়াছে এক কোটি। কোম্পানীর আমল হইতে বঙ্গের টাকার প্রভূত অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের নিমিত্ত ও অস্ত্রাস্ত্র কার্যে বঙ্গের বাহিরে ভারতের অস্ত্র-নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছে। সেই জম্ম বঙ্গের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে নাই।

উপরে যে-অঙ্কগুলি দিয়াছি, তাহা হইতে দৃষ্ট হইবে, যে, জলসেচন ব্যবস্থার জম্ম সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হইয়াছে পঞ্জাবে। সম্প্রতি চই জুন লাহোর হইতে প্রেরিত সংবাদে জানা গেল, ঐ প্রদেশে আবও দুটি জলসেচন-প্রণালীর ব্যবস্থার জম্ম আনুমানিক নয় কোটি টাকা গবর্ণমেন্ট ব্যয় করিবেন।

অস্ত্র সকল প্রদেশেই সুবিধা ও ঐশ্বর্য বাড়ুক। তাহাতে বঙ্গের কোন দুঃখের কারণ নাই। কিন্তু কি অপরাধে বাংলা দেশ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে ও ইংরেজ জাতিককে খুব বেশী পরিমাণে টাকা দিয়াও তাহার বিনিময়ে উপযুক্তরূপে সুবিধা পায় না, তাই ভাবি।

বঙ্গে যাতায়াতের অসুবিধা

যাত্রীরা হাবড়া ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে উঠিয়া কোথাও না নামিয়া দিল্লী লাহোর পেশাওয়ার বোম্বাই মাদ্রাজ যাইতে পারে, কিন্তু বঙ্গে কলিকাতা হইতে নিকটবর্তী কোথাও যাইতে চাহিলেও অত সহজে যাওয়া যায় না। আর্থিক দিক দিয়া—এবং অস্ত্র দিক দিয়াও—বঙ্গের ও বাঙালীর উন্নতি না হইবার ইহা একটি কারণ। আমরা যেন এই বিশাল সচল সরাচকল পৃথিবীতে পাড়ারগেয়ে ও স্থাপুৎ হইয়া আছি। আমাদের গত মাসের একটু অভিজ্ঞতা হইতে বঙ্গের কোন কোন স্থানে যাতায়াতের অসুবিধার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

আমাদিগকে কার্ঘ্যোপলক্ষে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল যাইতে হইয়াছিল। সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত গেলাম রেলওয়ে ট্রেনে। সেখানে ষ্টীমারে উঠিয়া চারাবাড়ী ঘাট পর্যন্ত গেলাম জলপথে। সেখানে নামিয়া সামান্য ২৫ মিনিটের পথ হাঁটিয়া আলিসাকান্দা গ্রামে গেলাম। সেখান হইতে বিম্বাকৈর যাই পাড়ীতে। অস্ত্র সকলের মত হাঁটিয়া যাইতেও পারিতাম, কিন্তু বন্ধুরা হাঁটিতে দিলেন না। রাত্রি ও পর দিন বিকাল পর্যন্ত বিম্বাকৈরে থাকিয়া সেখান হইতে মোটর বাসে টাঙ্গাইল রওনা হইলাম। যানটির চেহারা বর্ণনা করিব না। চালক আমাদের অধিকাংশ মাল লইলেন না। তাহা দ্বিতীয় খেপে বাকী যাত্রীদের সঙ্গে গিয়াছিল। শুনিলাম, বিম্বাকৈর হইতে টাঙ্গাইল ৪ মাইল দূরবর্তী—ঠিক কত দূর জানি না। রাস্তা ভাল হইলে ইহা ১০।১৫ মিনিটে যাওয়া যায়, কিন্তু বোধ হয় ষাট দুই লাগিয়াছিল। কাঁচা রাস্তা। মধ্যে মধ্যে কাদায় গাড়ীর চাকার কতকটা ডুবিয়া যাইতেছিল। কখন কখন গাড়ী একপ কাঁত হইতেছিল যে মনে হইতেছিল এবার বুঝি গাড়ী উর্গিয়া যায়। তিন জায়গায় বাঁশের সেতু প্রায় ভাঙিয়া যাওয়ায় আমাদিগকে নামিয়া পদব্রজে তাহা অতিক্রম করিতে হইল। একটা জায়গায় সাঁকোর বাঁশ এত নামিয়া গিয়াছে যে গাড়ী কেমন করিয়া পার হইল জানি না। ইহার পূর্ব একটা নদী পার হইতে হইল হাঁটিয়া; যেখানে পার হইলাম নদীতে সেখানে এক ফোঁটাও জল ছিল না। গাড়ী কেবল চালক ও তাহার সহকারীকে লইয়া পার হইল।

টাঙ্গাইল হইতে ফিরিবার সময় শুনিলাম, বিম্বাকৈর

হইতে যে রাস্তা দিয়া টাঙ্গাইল আসিয়াছিলাম, টাঙ্গাইল হইতে সে রাস্তা দিয়া চারাবাড়ী ঈমার ষ্টেশনে যাওয়া বাইবে না, অল্প পথ ধরিতে হইবে। তাহাই করা হইল। টাঙ্গাইল হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে একটা নদী পর্যন্ত আসিলাম। মধ্যে একদিন ঝড়ঝুটি হওয়ায় নদী জলপূর্ণ। খেরানোঁকায় পার হইলাম। ওপারে সেই মোটর বাস। তাহা অল্প রাস্তা দিয়া সন্তোষ নামক গ্রামের পাশ দিয়া আমাদিগকে লইয়া চলিল। অদূরে কয়েকটা প্রাসাদ দেখিতে দেখিতে চলিলাম। কোন শ্রী নাই, জনাকীর্ণতা নাই। দেখিয়া দুঃখ হইল। জমিদাররা বোধ হয় কলিকাতায় থাকেন। চারাবাড়ী ঈমার ঘাট হইতে প্রায় মাইল খানেক দূরে পৌঁছিয়া মোটর বাস থামিল। আর রাস্তা নাই। আমরা হ্যাট্টিয়া ঘাটে পৌঁছিলাম। মাল সব ভারবাহী ঘোড়ার পিঠে আসিল। এখানকার এই রীতি।

আমি কোন অসুবিধা বোধ করি নাই। কিন্তু বড় সময় নষ্ট হয়, খরচও বাড়ে। ছেলেপিলে পরিবারবর্গ লইয়া যাহারা যাওয়া-আসা করেন, তাহারা নিশ্চয়ই খুব অসুবিধা ভোগ করেন।

যতগুলি জায়গায় যাহাদের আশ্রয়ে ছিলাম, তাহাদের আতিথেয়তার কেবল এই খুঁতটি ধরা যায়, যে, তাহারা অতিথিদিগকে যেমন বাক্যবিশারদ সেইরূপ ভোজননিপুণও মনে করেন। টাঙ্গাইলে সকল সম্প্রদায়ের যে-সকল লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হইল তাহাদের সৌজন্য মাহুতকে তৃপ্তি দেয়, কৃতজ্ঞ করে। এসব দিক দিয়া দুঃখ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু পথঘাট এমন কেন? এ অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান ধনী জমিদার ও ব্যবসাদার আছেন। খুব বিশ্বস্তস্বভাবে অবগত হইলাম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেরও আর বেশ আছে। রাস্তাঘাট সম্বন্ধে বাংলা-গবর্নমেন্ট ও বঙ্কর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি নিজেদের কর্তব্য যথাশাখ্য করেন নাই।

একটা অবাস্তব কথা বলি। শুনিলাম, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নুতন ব্যবস্থায় বালিকা-বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্যদের কি পুরস্কার হওয়া উচিত, ঠিক করিতে পারিতেছি না।

জমীর খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

খবরের কাগজে দেখিলাম, বঙ্কর জমীর খাজনা ও প্রজাদের অধিকার সম্বন্ধে নানা রকম পরিবর্তনের পরিকল্পনা চলিতেছে। বঙ্কর ও আরও দু-একটি প্রদেশে খাজনার যে স্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, প্রাদেশিক গবর্নর তাহার কোন পবিবর্তনসাধক কোন আইনে সম্মতি দিতে পারেন না, তাহাকে গবর্নর-জেনার্যালের নিকট উহা পাঠাইতে হইবে। আবার গবর্নর-জেনার্যালও সম্মতি দিতে পারেন না। তাহাকে উহা বিলাতে, ইংলণ্ডেশ্বরের বিবেচনার জন্ত, পাঠাইতে হইবে। ইংলণ্ডেশ্বরের সম্মতি প্রাপ্তি ভারত-সচিবের ও ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলের সম্মতির উপর নির্ভর করে। বিষয়টি প্যারলিমেণ্টে উপস্থিত করিতে হইবে কি না, জানি না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোন পরিবর্তনে গবর্নর ও গবর্নর-জেনার্যাল যে সম্মতি দিতে পারিবেন না, ইহা তাহাদের প্রতি ইংলণ্ডেশ্বরের উপদেশাবলীর দলিলে (Instrument of Instructions-এ) আছে।

প্রজাদের অবস্থার উন্নতি হওয়া নিশ্চয়ই উচিত। তাহাদের উপর অত্যাচারও নিবারিত হওয়া উচিত। কিন্তু জমীদারী প্রথা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিমূল করিলেই তাহা হইবে কি? জমীদাররা রায়তদের নিকট হইতে যত খাজনা আদায় করেন, গবর্নমেন্ট তার চেয়ে কম খাজনা লইবেন কি? অনেক জমীদারের কর্মচারীরা জমীদারদের জ্ঞাতসারে ও ছদ্মবেশ বা তাহাদের অজ্ঞাতসারে প্রজাদের উপর অত্যাচার করে ও খাজনা অপেক্ষা বেশী টাকা আদায় করে শুনিয়াছি। রায়তদের নিকট হইতে গবর্নমেন্ট সাক্ষাৎ চাবে খাজনা আদায় করিলে নিয়মসম্মত সরকারী কর্মচারীরা অত্যাচার করিবে না কি? আমরা জমীদার নহি, রায়তও নহি। এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। জমীর খাজনাব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমীদারী প্রথা উঠাইয়া নিবার সপক্ষে একটা এই যুক্তি শুনিয়াছি, যে, তাহা হইলে প্রভূত আয়-বিশিষ্ট অথচ ধনী বিলাসী উদ্যমহীন অলস এক শ্রেণীর লোকের পরিবর্তে বঙ্কর উদ্যমশীল, পরিশ্রমী, ব্যবসাবাণিজ্যে নিরত এক শ্রেণীর লোকের অভ্যুদয় হইবে। তাহা হইলে ভাল।

বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতেছে, তাহার মূলে সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীদের চেষ্টা থাকিতে পারে; কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাও আছে। কারণ, বঙ্গে অধিকাংশ জমীদার হিন্দু, অধিকাংশ কৃষক ও রায়ত মুসলমান।

বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু পঞ্জাবে খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা হইতেছে। তাহার একটা কাবণ বোধ হয় এই, যে, বঙ্গে জমীদাররা (অধিকাংশ স্থলে হিন্দু) খাজনা আদায় করে, পঞ্জাবে গবর্নেন্ট খাজনা আদায় করে ও মধ্যে মধ্যে বাড়ায়।

বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগ ও ধর্মমূলক সম্প্রদায়ভেদ

ধর্মের এই একটা নিদা সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীরা করিয়া থাকে, যে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ খুনাখুনি দাঙ্গা যুদ্ধ প্রভৃতি বহু দেশে হইয়াছে ও হয়। তাহার বলে, যে, মানুষ যদি বৃত্তি অনুসারে, আয়ের উপায় অনুসারে, শ্রেণী ও দল বাঁধে, তাহা হইলে এক এক শ্রেণী ও দলে নানা ধর্মের লোক থাকিবে, হতরায় তাহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থাকিবে না। ইহা হইতে পারে না বলিতেছি না। কোন কোন স্থলে ইহা হইয়াছে। কিন্তু স্থল-বিশেষে আবার ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের কৃষক বা কারখানার মিলের মজুরেরা বা অন্ত্র বৃত্তির লোকেরা কি আলাদা আলাদা দল বাঁধে নাই?

সাম্প্রদায়িকতার আশুনে শ্রেণীগত বিদ্বেষ ইচ্ছন ভোগাইয়াছে, বা শ্রেণীগত বিদ্বেষের আশুনে সাম্প্রদায়িকতা ঘি ঢালিয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে বিয়ল নহে। মহাজন ও খাতক আলাদা আলাদা শ্রেণী। পঞ্জাবে ও বঙ্গে অনেক স্থলেই মহাজন হিন্দু এবং খাগী কৃষক মুসলমান। মহাজন ও খাতকে উভয় প্রদেশে যে অসন্তোষ, তাহার মধ্যে শ্রেণীগত বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দুই-ই থাকায় বিরোধের ভীষণতা বৃদ্ধি পায়। পঞ্জাবে মহাজন খুন অনেক হয়। বঙ্গে মধ্যে মধ্যে বাহা হইয়া থাকে, তাহা বাঙালীর অবিদিত নহে।

বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগ যে ধর্মমূলক সম্প্রদায়ভেদ অপেক্ষা পৃথিবীতে শাস্তিস্থাপনের প্রকটতর উপায়, ইতিহাস ত একরূপ

বলিতেছেন না। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব একরূপ সাক্ষ্য দেয় না। রুশিয়ার অভিজাত ও ধনিকদের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকদের কৃষকদের ও মজুরদের যুদ্ধের চেয়ে কোন ধর্মমতভেদমূলক যুদ্ধ কোথাও ব্যাপকতর ও নিদারুণতর হইয়াছিল বলিয়া অবগত নহি। রুশিয়ায় এক শ্রেণী অন্ত্র শ্রেণীকে একেবারে নিমূল বা নির্বাসিত করিয়াছে। স্পেনে দুই শ্রেণীতে অতি নিষ্ঠুর যুদ্ধ চলিতেছে। জার্মানীতে, ইটালীতে নিষ্ঠুর উপায়ে এক শ্রেণী অন্ত্র এক শ্রেণীর উপর প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু তাহার এখন প্রকট তাহার আগ্নেয়গিরির উপর আসন পাতিয়া বসিয়া নাই, কে বলিতে পারে? শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ শাস্তির দিক দিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধের চেয়ে বিন্দুমাত্রও ভাল নহে। ভারতবর্ষে বাহারা জমীদারে কৃষকে ধনিকে শ্রমিকে বিবোধে কোনও পক্ষ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সঘনো আমরা কিছু বলিতে চাই না; কারণ উদ্দেশ্যটুকি নিশ্চিত জানা সুকঠিন, অসম্ভব করা সহজ। তাহা ভাল হইতে পারে। কিন্তু এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, যে, এই বিরোধ হওয়াতে দেশে শাস্তি স্থাপিত হইয়াছে বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধ একটুও কমিয়াছে, ইহা মনে করিলে বা বলিলে ভ্রম হইবে।

ধর্মমতঘটিত বিরোধ এখনও পৃথিবীতে আছে। কিন্তু ইহা বোধ হয় সত্য, যে, সেরূপ বিরোধেব উগ্রতা কমিয়াছে। এখন কোন ধর্মের লোকসমষ্টিই অন্ত্র ধর্মের লোকসমষ্টিকে পুড়াইয়া বা অন্ত্র প্রকারে মারিয়া ফেলা উচিত বা আবশ্যক মনে করে না। অতীত কালে ইউরোপের খ্রীষ্টিয়ানেরা যেমন প্যালেষ্টাইনে জুজেন্ড নামক ধর্মযুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা বহু শতাব্দী হয় নাই, ভবিষ্যতে আর কখনও হইবে বলিয়া মনে হয় না। মুসলমানদের দ্বারা জেহাদ বস্ত্রভাষা হইয়াছে তাহা অতীত যুগের কথা। এখন জেহাদের কথা কেহ কেহ বলিলেও কোনও মুসলমানপ্রধান স্বাধীন দেশের গবর্নেন্ট যে ভবিষ্যতে জেহাদ করিবে তাহার সম্ভাবনা কম।

কিন্তু আর্থিক যে শ্রেণীবিভাগ, ধন-উৎপাদক ও ধন-ভোক্তার মধ্যে যে ভেদ, শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে যে ভেদ, কৃষক ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে ভেদ,

অভিজ্ঞাত ও সাধারণ লোক এবং মধ্যবিত্ত ও সাধারণ লোকের মধ্যে যে ভেদ—তাহা হইতে উৎপন্ন বৃদ্ধ বর্তমান খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে অশ্রুতপূর্ব ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। এই বিরোধের প্রকৃত অবসান, বাহিরে অবসান এবং মাহুষের হৃদয়ে অবসান, কেমন করিয়া হইবে, জানি না। কেবল আশা করি মাত্র, ভগবানের দিকে চাহিয়া।

জ্ঞানে, ধর্মে, বুদ্ধিতে কেহ উন্নত হইতে চাহিলে অল্প কাহাকেও বিন্দুমাত্রও বঞ্চিত না করিয়া তিনি উন্নত হইতে পারেন। এক জন বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, সত্যবাদী, সাধ্বিক, স্নায়পরায়ণ, নানা সদগুণশালী হইলে তাহা অল্প কাহারও জ্ঞানী ও সদগুণশালী হওয়ার ব্যাঘাত জন্মায় না। আধ্যাত্মিকতা, সাধ্বিকতা, মহত্বাশু, যে-কোন সদগুণ, জড়বস্তু নহে, যে, কেহ বা কোন শ্রেণীর লোকেরা তাহা অর্জন করিলে অন্যের ভাগে কম পড়িয়া যাইবে। সুতরাং ধর্মজগতে সকলেই যথাসাধ্য উন্নত এবং আত্মা ও হৃদয়-মনের সম্পৎশালী হইতে পারেন। কিন্তু জড়পদার্থের আকারে যত রকম সম্পত্তি আছে, তাহা সীমাবদ্ধ। ভূমি, শস্ত্র, টাকাকড়ি, বস্ত্র, অলঙ্কার, তৈজসপত্র, ঘরবাড়ী, বান-বাহন, পশু প্রভৃতি সব মাহুষকে সমান সমান করিয়া ভাগ করিয়া দিবার কোন উপায় এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কৃষিধাতোও সকলেই সমান সমান নহে, সকলের সম্পত্তি সমান নহে; কাহারও কম, কাহারও বেশী। সর্বত্র এইরূপ। জড়সম্পত্তির প্রকৃতিই এইরূপ, যে, এক জন বেশী পাইলে অল্প জনের ভাগে কম পড়ে। কিন্তু আত্মিক সম্পদের প্রকৃতি এরূপ নয়, যে, এক জন ধার্মিক হইলে অল্পকে অধার্মিক বা কম ধার্মিক হইতে হইবে, এক জন বীর হইলে অল্পকে কাপুরুষ হইতে হইবে, এক জন সত্যবাদী হইলে অল্পকে মিথ্যাবাদী হইতে হইবে, এক জন সংযমী ও মিথ্যাকারী হইলে অল্পকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে হইবে,....। প্রত্যেকেই অপর কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া ধার্মিক, বীর, সত্যবাদী, সংযমী, ...হইতে পারেন, হইবার চেষ্টা করিতে পারেন।

দারিদ্র্য বাহাতে না-থাকে, অন্ততঃ খুব কম, তাহা আমরা চাই। প্রত্যেক মাহুষের সুস্থ শরীরে বাচিয়া থাকিবার এবং জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবার অধিকার বাহাতে কার্যতঃ বীকৃত হয়, আমরা এরূপ সামাজিক ও

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চাই। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য দ্বারা উৎপাদিত ধনের ন্যায্য বন্টন আমরা চাই। ভূম্যধিকারী ও ধনিকের বিলাসিতার ব্যবস্থা পর্যন্ত হইতে পারিবে, আর কৃষক ও শ্রমিকের ভাগ্যে পড়িবে কদম্ব অস্বাস্থ্যকর বাসগৃহ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অল্পপুষ্ক খাদ্য ও বস্ত্র, রোগে চিকিৎসার অভাব, এবং সন্তানদের যথেষ্ট শিক্ষার সুযোগের অভাব—এরূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিলোপসাধন করিতে হইবে।

কিন্তু এই বিলোপসাধনের চেষ্টা ঈর্ষান্বেষ পরিহার করিয়া করিতে হইবে। জড়সম্পদকে পরমার্থ না ভাবিয়া আত্মিক সম্পদ ও হৃদয়মনের ঈর্ষ্যাকে পরমার্থ মনে করিতে হইবে। দারিদ্র্য, রোগ, নিরানন্দ ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এইরূপ মনের ভাব লইয়া না চালাইলে সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীরা যে সংগ্রাম চালাইতেছেন তাহাতে জগতে অশান্তি বাড়িতেই থাকিবে।

ধর্মজগতে, কম হইলেও, মিলনের ভাব দেখা যাইতেছে। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের কোটা হইতে ধর্মসমূহের পাল্‌মেণ্ট সর্বধর্মমতের কংগ্রেস প্রভৃতি নামের ধর্ম সম্বন্ধীয় সভায় নানা ধর্মের লোকেরা সমবেত হইয়া নিজ নিজ ধর্মমত শিষ্টভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ও গণতন্ত্রবাদী, ধনিক ও শ্রমিক, পুঁজিবাদী ও শ্রমিক-নেতৃত্ববাদী, পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী, কাসিট ও পুঁজিবাদী—সম্ভাবে ইহাদের কোন পাল্‌মেণ্ট বা কংগ্রেস জগতে এখনও হয় নাই। কখনও হইবে কি?

কংগ্রেস ও হিন্দুসমাজ

কংগ্রেসের সহিত কোন ধর্মসম্প্রদায়েরই বিরোধ নাই। কংগ্রেস ইচ্ছাপূর্বক বা জ্ঞাতসারে কোন সম্প্রদায়ের ক্তিকর ও অকল্যাণকর কিছু করেন না। কিন্তু ইহা সত্য, যে, যে-সকল প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যায় ন্যূন, সেখানে হিন্দুদের অস্ববিধা, হিন্দুদের প্রতি অবিচার ও অত্যাচার, হিন্দুনারীদের প্রতি অজ্ঞাতার প্রভৃতির প্রতিকারের জন্য কংগ্রেস বিশেষ কিছু করেন না। (আমরা যাহা জানি তাহা হইতে আমাদের ধারণা যেরূপ হইয়াছে তাহাই লিখিলাম। আমরা

যদি ভাষ্য হই, সভ্য সংবাদের ও তথ্যের দ্বারা আমাদের ভ্রম কেহ দেখাইয়া দিলে বাধিত হইবে।)

অবস্থা এইরূপ হওয়ায় পঞ্জাব ও বঙ্গে হিন্দুর দুর্গভিত্তে বিষয় ও উদ্ভিগ্ন অনেক হিন্দু, রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য সম্বন্ধে কংগ্রেসের সহিত একমত হওয়া সম্ভব, কংগ্রেসে যোগ দিতে চান না। আমাদের বিবেচনার তাঁহারা এরূপ না-করিয়া কংগ্রেসের সহিত যুক্ত থাকিলে ফল অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে। কংগ্রেসে হিন্দু স্বাধীনতা (nationalist) মত ও প্রভাব যথাসম্ভব প্রবল ও স্পষ্ট হওয়া উচিত। কংগ্রেসের গত করাচী অধিবেশনেব ঠিক পূর্বে নিউ দিল্লী হইতে হিন্দু মহাসভার কার্যনির্বাহক কমিটি মহাসভাব রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যে বর্ণনাপত্র (manifesto) বাহির করেন, তদপেক্ষা অধিক গণতান্ত্রিকতা সম্মত ও স্বাধীনতাসম্মত ম্যানিফেস্টো কংগ্রেসও কখনও বাহির করেন নাই। সেই ম্যানিফেস্টো হিন্দু মহাসভা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এ পর্যন্ত তাহা পরিবর্তন বা প্রত্যাহার করেন নাই। যে-সকল হিন্দু ঐ ম্যানিফেস্টোর আদর্শে বিশ্বাস করেন, কংগ্রেসের সভ্য হইতে তাঁহারা কোন বাধা অনুভব করিবেন না। তাঁহারা সকলে কংগ্রেসের সভ্য হইলে, আগ্রহ ক্রমিষ্ট সভ্য হইলে, দেখিবেন, কংগ্রেস হিন্দুর কল্যাণের প্রতি কখনও উদাসীন থাকিতে পারিবেন না।

গান্ধীজীর দাবী সম্বন্ধে ভারতসচিবের উত্তর

মন্ত্রীদের সহিত গবর্নরের মতভেদ হইলে গবর্নর মন্ত্রীদিগকে পদত্যাগ করিতে অহরোধ করিবেন, গান্ধীজী এই দাবী করিয়াছিলেন। সে বিষয়ে ভারতসচিব চই জুন পালেমেণ্টে এক বক্তৃত্য বলেন,

He understood that Mr. Gandhi's statement involved that, if there was a serious difference of opinion between the Ministers and the Governors where the Governors' responsibility was concerned, the Governors should dismiss or call for the resignation of the Ministers. He did not think it would really be wise or in accordance with the intention of Parliament to lay down in those circumstances that the Governor must necessarily call for the resignation of the Ministers. If that had been

the intention of Parliament it would have said so in the act itself and the last paragraph of the section defining the Governors' position would have said, 'and so far as any special responsibility of the Governor was involved he should exercise his individual judgment regarding the action to be taken.'

Lord Zetland asked why did Parliament lay down the Governors' duties in those words. He added surely because Parliament contemplated that even if the disagreement was a serious one that could not be bridged, it might very well be that the Governor would either wish to retain the Ministers and assent to the rest of their programme, or the Ministers, while disagreeing with the Governor, would wish to continue in office. Of course the Governor could always dismiss the Ministers and equally the Ministers could resign. Surely it would be better to leave it to the Governors or Ministers until the case arose. Then the circumstances would be apparent and each party would decide which course it desired to pursue.

Lord Zetland said that it was much better to leave the matter open rather than to come to any sort of agreement that in any case in which there was a serious disagreement between the Ministers and the Governors the latter should automatically have to dismiss the ministers.

ভারতসচিব বলেন, যে, গবর্নরের বিশেষ দায়িত্বশঙ্কিত কোন বিষয়ে মন্ত্রীদের সহিত তাঁহার গুরুতর মতভেদ হইলে গবর্নর মন্ত্রীদিগকে পদচ্যুত করিবেনই বা তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে বলিবেনই, এরূপ নিয়ম করা বাস্তবিক প্রাজ্ঞোচিত বা পালেমেণ্টের অভিপ্রায়ের অধরূপ হইবে না। পালেমেণ্টের উদ্দেশ্য এই প্রকার হইলে, তাহা আইনেই লেখা থাকিত, কিন্তু আইনে তাহা নাই।

গবর্নর ও মন্ত্রীদের মধ্যে মতভেদের স্থলে কিরূপ রীতি প্রথা বা কার্যপ্রণালী নির্দেশ করা সমীচীন ও প্রাজ্ঞোচিত, সে বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে। সমীচীন ও প্রাজ্ঞোচিত যে কি, তাহা স্থির করিবার মত বুদ্ধি ইংরেজদেরই আছে, ভারতবর্ষে কংগ্রেসের প্রধান নেতা গান্ধীজীরও নাই, ইহা মানিয়া লওয়া যায় না। যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহা সমস্তই ভারতশাসন আইনে লেখা নাই। তাহা যদি থাকিত,

তাহা হইলে ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে, আইনটার উপর আবার উপদেশাবলী দলিল (Instrument of Instructions) গবর্নর-জেনার্যাল ও গবর্নরদিগের আচরণ নিয়মিত করিবার জন্য প্রণীত ও প্রকাশিত হইত না।

ভারতসচিব ঐ বক্তৃতায় আরও বলেন, যে, মতভেদ হইলেও হয়ত দলবিশেষে গবর্নর মন্ত্রীদিগকে তাঁহাদের কাজে বহাল রাখিতেই ইচ্ছা করিবেন, বা মন্ত্রীরাও গবর্নরের সহিত মতভেদ সত্ত্বেও স্বয়ং পক্ষে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে চাহিবেন।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই, যে, গান্ধীজী সব প্রদেশে কংগ্রেসী সকল মন্ত্রীর আচরণ সব স্থলে একই প্রকার করিবার নিমিত্ত দাবীটি করিয়াছিলেন। সকল মন্ত্রীর জন্য কংগ্রেস একই নীতি ও নিয়ম নির্দেশ করিয়া না দিলে গবর্নররা নানা উপায়ে (বাহ্যিক ফল লাভের আশা দিয়া বা অব্যাহতি কুফলের ভয় দেখাইয়া অর্থাৎ প্রলোভন ও সন্ত্রাসন দ্বারা) কোন-না-কোন মন্ত্রীর বা মন্ত্রিমণ্ডলের দুর্বল মুহূর্তে তাহাদিগকে হাত করিতে পারেন। একটা বড় দলকে পরিচালিত করিতে হইলে দলের সকলের সব অবস্থায় সমভাবে পালনীয় ও অহুসরণীয় কতকগুলি নিয়ম ও রীতি নির্দিষ্ট করা আবশ্যিক। তাহা করিলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও বিবেচনা কিছু খর্ব করা হয় বটে, কিন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত দল চলে না। যুদ্ধের সময় রণক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তিগত যুক্তিতর্কের অবসর থাকে না, সকলকে নির্বিচারে আদেশ মানিতে হয়, দলের সমষ্টিগত কাজও সেই ভাবে করিতে হয়। যেমন কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের সমষ্টিগত দাবী সমষ্টিগত দরকষাকষি (ইংরেজীতে collective bargaining) পছন্দ করেন না, তেমনি ভারতবর্ষের মালিক ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিব্যাপারীরা ভারতীয় কোন রাষ্ট্রনৈতিক দলের সমষ্টিগত কোন দাবী বা নিয়মে রাজী হইতে অনিচ্ছুক। আলাদা আলাদা এক একটা ভারতীয় মানুষের সঙ্গে কারবার তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক।

তাহা হইলে ভারতীয় মানুষগণ দলের জোর ও সাহসের সুবিধাটা পায় না, তাহাদের এক এক জনকে অপেক্ষাকৃত সহজে হাত করা যায়।

ভাবভ্রমশাসন আইনটা গবর্নরদিগকে স্বাধীনভাবে নিরঙ্কুশ ও ক্ষমতাসালী করিয়াছে। এখন ভারতীয়দের খুব বড় এক জন নেতাও যে তাঁহাদিগকে আগে হইতে একটা নিয়মে ও

রীতিতে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করিবেন, ইংরেজ কোন রাষ্ট্রনীতিব্যবসায়ী কেমন করিয়া তাহা সম্বন্ধ করিবেন?

মহাত্মা গান্ধী ত বলিয়াছিলেন, তাঁহাব যে দাবী ভারতসচিব চাই যে নামঞ্জুর করিলেন, তাহা তাঁহার শেষ কথা। এখন দেখা যাক, তিনি কি বলেন করেন, কংগ্রেসই বা কি করেন।

—

রাষ্ট্রনীতির রঙ্গমঞ্চে অভিনয়

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন প্রণয়নের আরম্ভজন যখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতে ব্রিটেনের রাজনৈতিক চালিয়াত্তেরা জগৎবাসীকে নানা উপায়ে জানাইয়া আসিতেছিল যে ভারতীয়দিগকে তাহাদের দেশের কাজ চালাইবার সব ক্ষমতা দিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। আইনটা পাস হইয়া যাইবার পর বার বার জগৎ প্রচারিত হইতেছে, যে, ভারতীয়দিগকে প্রায় স্বাধীন ও স্বশাসক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ ইহা নিশ্চিত যে যাহারা এসব কথা বলিতেছে তাহারা তাহা সত্য মনে করিতে পারে না, কারণ তাহারা স্বাধীন দেশের ও জাতির মানুষ হিসাবে স্বাধীনতার ও স্বশাসনের মানে বুঝে।

কিছু দিন হইতে প্যারিসে এই ধরণের প্রশ্ন হইতেছে, যে, ভাবতবর্ষের প্রদেশগুলির শাসনকার্য সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে কি প্যারিসে সভ্যেরা ঐশ্বর্য করিতে পারেন না, করিলে কি ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষ হইতে কোন উত্তর দেওয়া হইবে না? প্রশ্নকর্তারা বা তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া এইরূপ উত্তরই আদায় করিতে চান, যে, সাধারণতঃ প্যারিসে ভারতবর্ষের প্রাদেশিক শাসন-কার্য-ঘটিত কোন প্রশ্নের জবাব দিতে ভারতসচিব বা সহকারী ভারতসচিব বাধ্য থাকিবেন না।

গত চাই যে বোম্বাইয়ের অধ্যক্ষ ভূতপূর্ব গবর্নর লর্ড লয়েড হাউস অব লর্ডসে নিত্যন্ত ভাল মানুষের মত এই রকম প্রশ্ন করেন। ভারতসচিবও মোটের উপর এই মর্মে জবাব দিয়াছেন, যে, প্রাদেশিক সব কাজের ভার প্রাদেশিক মন্ত্রীদের হাতে চলিয়া গিয়াছে, তাহারা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী, শাসনকার্য সম্বন্ধীয় কোন কিছু জানিতে

হইলে এখন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় মজীদিগকে স্থানহীনে হইবে, ব্রিটিশ পাল্‌মেণ্টে এখন আর তদ্বিব্যক প্রস্তোত্তরের স্থান নহে, ইত্যাদি। অর্থাৎ এ-যাবৎ ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিতে কোন অত্যাচার, জুলুম, ভবনদণ্ড, অবিচার, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি হইলে তৎসম্বন্ধে পাল্‌মেণ্টে প্রশ্ন হইতে পারিত এবং তাহার একটা (প্রশ্নই অসম্ভাবকর কৌশলপূর্ণ) উত্তর পাওয়া যাইত। তাহাতে কোন প্রতিকার হউক বা না-হউক, ব্যাপারটা প্রকাশ পাইত ও জানা যাইত। অতঃপর তাহাও হইবে না। কারণ, আমরা নাকি স্বশাসক হইয়াছি ও আমাদের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলার মারফৎ আমরা মজীদিগের ও গবর্নমেন্টের কৈফিয়ৎ লইতে ও তাহাদিগকে জবাবদিহি অর্থাৎ দায়ী করিতে পারিবে! বাবাস ব্রিটিশ রাজনৈতিক চালিয়াতী! পাল্‌মেণ্টে একটা প্রশ্নোত্তর-টিলে ছুটা পানী শিকার করা হইল। ব্রিটেন ভারতবর্ষকে স্বরাজ দেন নাই, কোন অ-ব্রিটেনের একরূপ সন্দেহ থাকিলে তাহা বিনাশ করা হইল (যদিও রাস্তবিক সন্দেহটা বেশ বাচিয়াই রহিল ও থাকিবে) এবং ভারতীয়দের ব্রিটিশ পাল্‌মেণ্টে প্রতিকার পাইবার ইচ্ছার ও আশার প্রাণবধ করা হইল। এই শেখোক্ত জীবহত্যাটাকে পুণ্যকর্ম মনে করা যাইতে পারে। কারণ প্রতিকারের ক্ষমতা কোন জাতির নিজের হাতে না-আসিলে প্রকৃত প্রতিকার কখনও হয় না। পরমুখাপেক্ষিতার মস্তকে লগুড়াঘাত বত হয়, ততই ভাল।

কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের উন্নতিচেষ্টা।

সংস্কৃতের বিশেষ চর্চার জন্য সংস্কৃত কলেজ ও স্কুল রক্ষা, আরবী ও ফারসীর বিশেষ চর্চার জন্য কলিকাতা মাদ্রাসা রক্ষা—ইহার অর্থ বৃদ্ধিতে পারি। কিন্তু সাধারণ বৈরূপ শিক্ষা সাধারণ সরকারী, সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত, ও বেসরকারী কলেজসমূহে দেওয়া হয়, শুধু তাহা দিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য সরকারী ব্যয়ে কলেজ চালান অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে অর্থের অপব্যয় হয়, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে

সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা প্রসার লাভ করে। এই সকল কারণে আমরা কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনের সমর্থক নহি। কিন্তু ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, এবং পরিচালিত হইবেও। সুতরাং, কলেজটি যদি রাখিতেই হয়, তাহা হইলে ভাল অবস্থায় রাখা উচিত। সেই জন্য শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রী, মোলবী ফজল হক, কলেজটির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন, এই শুভব স্তম্ভব। শুভব এই, তিনি অমূল্যমান ছাত্রদিগকেও ইহাতে পড়িতে দিবেন। তাহা হইলে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্রদের মধ্যে বন্ধুত্ব হইতে পারিবে ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা কমিতে পারিবে। ছাত্র পাইবার ক্ষেত্র বিস্তৃততর হইলে ভাল ছাত্র পাইবার সম্ভাবনা বাড়ে, এবং ভাল ছাত্র থাকিলে অন্য ছাত্রদের ও অধ্যাপকদের উৎসাহ বাড়ে। একরূপ শুভবও রটিয়াছে, যে, ভাল অধ্যাপক পাইবার জন্য যদি হিন্দু অধ্যাপকও লইতে হয়, মোলবী ফজল হক তাহা লইবেন। বস্তুতঃ খ্রীষ্টিয়ান ইংরেজকে যদি লওয়া চলে, তাহা হইলে হিন্দু বাঙালীকে কেন লওয়া চলিবে না?

ঢাকায় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন

ধবরের কাগজে এইরূপ শুভবও বাহির হইয়াছে, যে, মোলবী ফজল হক প্রতিবৎসর শরৎকালে ঢাকায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন করাইয়া ঢাকাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার দ্বিতীয় রাজধানীর সম্মান দিতে চান। আমরা এই প্রস্তাবের বিরোধী নহি। কিন্তু তিনটি বাধা আছে। একটি, ব্যয়বৃদ্ধি। কলিকাতায় অধিবেশন করিলে যে-সব লক্ষ্যকে পাথেয় ও ভাতা দিতে হয় না, ঢাকায় অধিবেশন করিলে তাহাদিগকে পাথেয় ও ভাতা দিতে হইবে। আর্থবজ্ঞিক সরকারী অতিরিক্ত ব্যয়ও কিছু হইবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, কয়েক শত সদস্য ঢাকায় গিয়া থাকিবেন কোথা? নকলের গচ্ছল অবস্থার বা সাধারণ অবস্থারও আশ্রয় ঢাকায় নাই, যথেষ্ট হোটেল নাই, অল্প কয়েক দিনের জন্য ঢাড়া লইবার মত যথেষ্টসংখ্যক বাড়ীও খালি পাওয়া যাইবে না। তৃতীয় প্রশ্ন, ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন করিবার মত বড় হল ও সমস্ত আপিস-কক্ষাদি কোথায়? সূর্যবন্ধ ও আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশ থাকিবার সময় যে-সব

বড় বড় সরকারী বাড়ী নির্মিত হইয়াছিল, সেগুলি ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হইয়া গিয়াছে।

যদি আপিস আদালতের এবং স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূজার ছুটির সময় ঢাকায় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন করা হয়, তাহা হইলে কোন কোন বাধা অভিক্রান্ত হইতে পারে বটে; কিন্তু যখন আর সবাই ছুটি ভোগ করিবে, তখন মন্ত্রীদিগকে, ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ও সদস্যদিগকে এবং ব্যবস্থাপক সভা-সম্পর্কিত সরকারী কর্মচারীদিগকে পরিশ্রম করিতে বলা চলিবে কি?

রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন

ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে যে একটা নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা তথাকার লোকেরা মন্দ ও ভাল দুই দিক দিয়া বুঝিতে পারিতেছে। মন্দ দিক্, ভারতবর্ষের সহিত যোগরক্ষা কঠিনতর করা হইয়াছে,—যেমন রাষ্ট্রীয় ভাবে ব্রহ্মকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, উভয় দেশের মধ্যে ডাকমাণ্ডল বৃদ্ধি করিয়া, ব্রহ্মের ভাষা না জানিলে তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রীদের অধ্যয়ন অসাধ্য করিয়া, ইত্যাদি। ভাল দিক্ দিয়া নূতন অধ্যায় আরম্ভ কর হইয়াছে, দমননীতি স্থগিত ও কতকটা বর্জন করিয়া।

ব্রহ্মদেশের কতকগুলি ছাপাখানা ও সংবাদপত্রের জমানং তাহাদিগকে ক্ষেত্রত দেওয়া হইয়াছে। বেআইনী বলিয়া ঘোষিত এক শত সভাসমিতির বিরুদ্ধে ঘোষণা প্রত্যাহত হইয়াছে। দুই শত পাঁচাত্তর জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ২৭০ জন, ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে ব্রহ্মে যে দীর্ঘকালব্যাপী বিদ্রোহ ও যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে ধৃত হইয়া বিচারান্তে কারারুদ্ধ হইয়াছিল। অল্প পাঁচ জনও বিচারান্তে জেলে প্রেরিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের গবর্নমেন্ট আশামান দীপে বন্দী আরও ৪৫ জনকে মুক্তি দিতে সঙ্কল্প কবিত্বছেন।

ভারতবর্ষে, বঙ্গে, যত রাজবন্দী আছে, তাহাদের অধিকাংশ বিনাবিচারে স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইয়া আছে। যে-সব রাজবন্দী বিচারান্তে কারারুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা

ব্রহ্মদেশের বিদ্রোহীদের যত গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই—ভারতবর্ষে সেক্ষণ কোন বিদ্রোহ ও যুদ্ধ অধুনা হয় নাই। অতএব, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া ব্রহ্মদেশের উদ্রুপ বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া অপেক্ষা কঠিনতর কাজ নয়।

বঙ্গে রাজবন্দীদিগকে, অন্ততঃ কতকগুলিকে, মুক্তি দিবার কল্পনা জল্পনা আলোচনা চলিতেছে। বঙ্গের মন্ত্রীদের কাহারও এদিকে আগ্রহ নাই বা দৃষ্টি নাই, নিশ্চয় করিয়া এরূপ বলিতে পারি না, এরূপ অনুমান করাও সহজ নহে। কিন্তু তাঁহাদের আগ্রহ বা দৃষ্টি যে আছে, কেবল গুজব দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইবে না। কাজে কিছু হইলে প্রমাণ পাওয়া যাইবে। মুক্তি সকলকেই দেওয়া উচিত এবং বাহাদিগকে বিনাবিচারে বন্দী করিয়া রাখিয়া সকল দিক দিয়া পক্ষ ও ক্ষতিগ্রস্ত করা হইয়াছে, তাহাদিগকে ২৩ বৎসর ভাতা দিয়া উপার্জক হইবার সুযোগ দেওয়া উচিত। ইহা ন্যূনতম ক্ষতিপূরণ। একটু কোথাও কিছু বেআইনী কাজ হইলেই আবার মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও বা অনেককে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করিবার কুনীতি ও কুরীতি বর্জন করিতে হইবে। বস্ত্তঃ বিনাবিচারে স্বাধীনতা হরণের কুনীতি বর্জিত না হইলে দেশের উন্নতি হইবে না।

রাজবন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া মন্ত্রীদের পক্ষে সোজা কাজ, ইহা আমরা মনে করি না, বলি না। টিকটিকি-বিভাগের কর্তারা ইহাতে সহজে সম্মত হইবেন না, জেলার শাসককর্তারা ও পুলিশও সহজে রাজী হইবেন না। রাজবন্দীদিগকে খালাস দেওয়া হইলে বঙ্গে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটাইবার লোকের অভাব না থাকিতে পারে বৈরূপ ঘটনা দ্বারা মন্ত্রীদিগকে বেকুব বনিতে হইতে পারে। এই লোকগুলা স্বয়ং সন্ত্রাসক না হইতে পারে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়াও মন্ত্রীদিগকে সাংসে ভর দিয়া শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনৈতিক পথের পথিক হইতে হইবে। সন্ত্রাসনের উচ্ছেদ অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু বঙ্গে প্রচলিত দমননীতিও বর্জনীয়।

বঙ্গীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ (Bengal Civil Liberties Union) বিনাবিচারে বন্দীকৃত পুরুষ ও নারীদের ও তাহাদের আত্মীয়স্বজনদের দুঃখদুর্দশা সর্ব-

সাধারণের ও গবর্নমেন্টের গোচর করিতেছেন। রাজবন্দী-দিগকে যেভাবে মুক্তি দিবার ক্ষমতা রটিয়াছে, তদ্বিষয়ে সংঘ বাহা বলিয়াছেন তাহা অস্বাভাবিক নহে।

'ইউনাইটেড প্রেস' সংবাদ প্রচার করিয়াছেন যে, মন্ত্রীরা এক হাজার রাজবন্দীকে মুক্তিদান ও তাঁহাদিগকে এক বৎসর পর্যন্ত মাসোহারা দানেব প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন। কলিকাতার সমস্ত প্রধান প্রধান সংবাদপত্র এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তি না দেওয়া হইলে এবং বাহাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হইয়াছে, তাহাদের সকলের উপর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহত না হইলে বাঙ্গালার জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইবে না। তাহারা মনে করে, ইতিপূর্বেই গবর্নমেন্টের তাহা করা উচিত ছিল। গোয়েন্দা বিভাগের নির্দেশক্রমে রাজবন্দীদিগকে ক্রমে ক্রমে মুক্তি দানের নীতি অনুসরণ করা হইলে পুরাতন নীতিরই পুনরাবৃত্তি করা হইবে। সংবাদপত্রসমূহ সরকারী প্রস্তাবেব বিকল্পে যে-সকল মুক্তি দেখাইয়াছেন, আমরা তত্বপূর্ণি আরও একটি মুক্তি দেখাইতেছি। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে গোয়েন্দা-বিভাগের সুপারিশক্রমে বিশেষ এক ধরণের এক হাজার রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং তাঁহাদিগকে মাসোহারা দেওয়া হইবে। এই মাসোহারা বেতনেরই নামান্তর; গোয়েন্দা-বিভাগ যদি রিপোর্ট দেন যে, মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী অসদাচরণ করিয়াছেন, তবে খুব সম্ভব সেই মাসোহারা বন্ধ করিয়াও দেওয়া হইবে। অনেক ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা নামমাত্র ভঙ্গের অপরাধেও অন্তরীণকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে; অথচ পুলিশের লোকদের আচরণবশতঃই অন্তরীণ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেহ রাজবন্দী হইলে বা কারাদণ্ডিত হইলে, তাহার নির্ধারিত হইবার যেরূপ সম্ভাবনা থাকে, তাহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া তাহাকে মুক্তি দিলে যে তাহার নির্ধারিত হইবার তদপেক্ষা অধিকতর সম্ভাবনা থাকে, তাহা আমাদের ৭ নং বিবৃতিতে দেখান হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, কোনও বিশেষ ধরণেব রাজবন্দীকে মুক্তি দিয়া তাহাকে মাসোহারা দেওয়া হইলে, সুকৌশলে তাহার ত অধোগতি সাধন করা হইবেই, বাহাদিগকে মুক্তি ও মাসোহারা দেওয়া হইবে না, তাহাদেরও তাহাতে অধোগতি হইবে। স্বদেশ-প্রেমের জন্য বাহা ইতিপূর্বেই কান্নিক ও মানসিক হুঃখ ভোগ করিয়াছে, তাহাদের পৌরুষ যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাদের মেরুদণ্ড যেন ভাঙিয়া না পড়ে। আমরা মন্ত্রিমণ্ডলের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ কবিতোছি এবং অস্বরোধ করিতেছি যে, সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হউক ও পদমর্যাদা অনুসারে প্রত্যেককে অন্ততঃ

এক বৎসরের জন্য উপযুক্ত মাসোহারা দেওয়া হউক। বন্দীদের পারিবারিক অবস্থা, পোষ্য-সংখ্যা এবং বন্দীদের ফলে তাঁহাদের নিজের স্বাস্থ্যেব অবস্থা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া মাসোহারা নির্ধারণ করা কর্তব্য।

সুভাষবাবুকে কংগ্রেস-সভাপতি করিবার প্রস্তাব

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি করিবার যে প্রস্তাব আমরা এবার প্রবাসীতে করিয়াছি, তাহা আগে ১লা জুনের মতীর্ষ বিভিন্ন পত্রের করিয়াছিলাম। সে বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় এই টেলিগ্রামটি ২৯শে জ্যৈষ্ঠ বাহির হইয়াছে :—

(নিম্ন সংবাদদাতার তার)

করাচী, ১১ই জুন

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে আগামী হরিপুর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করিবার জন্য 'মতীর্ষ রিভিউ' যে প্রস্তাব করিয়াছেন করাচীর কংগ্রেস-নেতাগণ উহা সমর্থন করিতেছেন। এখানে আলোচনার প্রকাশ যে সিদ্ধ প্রাদেশিক বাঙ্গীর সমিতি সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহার পক্ষে ভোট দিবে; কারণ রাজনীতিক অবস্থা পরিষ্কার হওয়ার কংগ্রেস-সভাপতিপদের অপর প্রার্থী মিঃ সি রাজাগোপালাচারী তখন মন্ত্রাজের প্রধান মন্ত্রী হইবেন।

এই প্রস্তাব আহম্মদাবাদেও সমর্থিত হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতিরক্ষা

যাঁহারা সভ্যকার কবি, তাঁহাদের স্বদেশবাসীরা তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষাকল্পে কিছু না করিলেও তাঁহাদের কাব্য তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষা করে, তাঁহারা কবিতায় জীবিত থাকিয়া মানুষকে, আনন্দ দিতে ও মানুষের হিত করিতে থাকেন। অতএব, কবির স্বদেশবাসীরা তাঁহার জন্য কিছু করুন বা না করুন, তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না। কিন্তু কৃতজ্ঞতার খাতিরে, নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন হিসাবে, তাঁহাদের কিছু করা উচিত। তাহাতে তাঁহারা যে নিজে উপকৃত হন না, এমন নহে। বাড়ালীদিগকে ইহা বলার প্রয়োজন আছে, যে, কবিদের শ্রুতকণ্ঠলি পড়া উচিত। কেবল বাড়ালীর ও বঙ্গসাহিত্যের নড়াই করিবার জন্য কবিদের নাম উচ্চারণ ও শ্রুতগর্ভ জগণান যথেষ্ট নহে।

কৃষ্ণনগরে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্ত, তাঁহার রচিত কিছু গান গাহিবার ও শুনিবার জন্ত এবং তাঁহার স্মৃতিতে আলোচনা করিবার জন্ত গত মাসে কৃষ্ণনগরে সভার অধিবেশন ও উৎসব হইয়াছিল। প্রাতে তাঁহার পৈত্রিক বাসভবনে প্রারম্ভিক অংশ অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ন ও সন্ধ্যার পর খোলা জায়গায় সভা হয়। তাহাতে বহুসংখ্য মহিলা ও ভক্তলোক সমবেত হইয়াছিলেন।



কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মৃতি-উৎসব

ইহাতে মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল স্মৃতিতে কৃষ্ণনগরের লোকেরা আগে হইতেই সচেতন ছিলেন বা এখন হইয়াছেন। সেই জন্ত একটি প্রস্তাব তথাকার কাহারও কাহারও নিকট করিয়াছি। দ্বিজেন্দ্রলালের পৈত্রিক ভবনটি এখন বেমেরামত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাঁহার পিতার বংশধরেরা কেহ সেখানে বাস করেন না। অনেকখানি জায়গার মধ্যে বাড়ীটি অবস্থিত, এক সময়ে সেখানে বেশ সুন্দর বাগান ছিল বুঝা যায়। আমাদের প্রস্তাব এই, যে, বাড়ীটি যখন কোন শরিকই ব্যবহার করিতেছেন না, তখন সকল শরিকের সম্মতিক্রমে উহা কোন সার্বজনিক কাজের জন্ত উৎসর্গীকৃত ও ব্যবহৃত হউক। উহাকে ব্যবহারযোগ্য করিতে হইলে ভাল করিয়া মেরামত করা আবশ্যিক। তাহার জন্ত খুব বেশী টাকা দরকার হইবে না। আবশ্যিকমত টাকা চাঁদা করিয়া তোলা হুঁসখ্য নহে। মেরামত হইয়া গেলে উহাকে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য্য একটি গ্রন্থাগারে ও পাঠগৃহে পরিণত করা যাইতে পারে। উহাতে বালিকা ও মহিলাদের শিক্ষালয় স্থাপিত হইতে পারে। কিংবা অন্য কোন রকম প্রতিষ্ঠান উহাতে স্থান পাইতে পারে।

সাত বৎসর পরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন চন্দননগরে হইয়া গিয়াছে। আগামী অধিবেশন কৃষ্ণনগরে হইবে স্থির হইয়াছে। এই অধিবেশন দ্বিজেন্দ্রলালের পৈত্রিক

ভবনের উদ্যানে করিলে এবং অধিবেশনের কোন এক দিন ভবনটি সার্বজনিক কোন কাজে উৎসর্গীকৃত হইলে, কৃষ্ণনগর বিখ্যাত কোন কোন লেখকের জন্মস্থান অন্যান্য গ্রাম ও নগরকে একটি অলঙ্করণীয় দৃষ্টান্ত দেখাইতে সমর্থ হইবেন।

বি-এ পরীক্ষায় ছাত্রীদের কৃতিত্ব

এবার বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে কেহ প্রথম শ্রেণীর অনার্স (সম্মান) পান নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মানপ্রাপ্তদের তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, অষ্টম ও নবম স্থান ছাত্রীরা দখল করিয়াছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড

প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে নূতন ক্রিয়াকর্ম ব্যবস্থা গবন্মেণ্ট করিতে চান, সে বিষয়ে ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী তাঁহার প্রস্তাবাবলী একাধিকবার সর্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। আমরা মাসিক কাগজের সম্পাদক হইলেও তাঁহার মুদ্রিত প্রস্তাবাবলী পাইয়াছিলাম। ঠিক জিনিষটি হাতে পাওয়ায় আলোচনার সুবিধা হইয়াছিল। ঠিক জিনিষটি সম্মুখে না রাখিয়া সমালোচনা করিলে ভুল

হইতে পারে, এবং সরকারী প্রস্তাবক বা প্রস্তাবকেরা বলিতে পারেন, “তুমি যে রকম প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়াছ সে রকম প্রস্তাব ত করা হয় নাই।”

নানা কাগজে দেখিতেছি, বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী একটি সেকণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড গঠন করিতে চান। প্রস্তাবটি নূতন নয়। এই মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কি ভাবে গঠিত হইবে, তাহার সরকারী ও বেসরকারী সভা কত জন হইবেন, কি প্রকারে তাঁহারা নির্বাচিত বা মনোনীত হইবেন, বোর্ডের কর্তব্য ও অধিকার কি কি হইবে, তাহার অধীনস্থ জেলাবোর্ডগুলি কি ভাবে গঠিত হইবে ও তাহাদের কর্তব্য ও অধিকার কি হইবে তাহাও কোন কোন কাগজে দেখিয়াছি। মূল কাগজপত্র কিন্তু আমাদের হাতে আসে নাই। সেই জন্য সাধারণ ভাবে কিছু মন্তব্য করিতেছি।

ইতিপূর্বে বঙ্গের বার শত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় কমাইয়া চারি শত করিবার সরকারী প্রস্তাব যে তরফ হইতে উত্থাপিত হইয়াছিল, আলোচ্য মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের প্রস্তাবও সেই তরফ হইতে হইয়াছে। এই জগু ইহাকে ভয়ের কারণ মনে করি। কারণ, বঙ্গে স্থানবিশেষে এক-আধটা বেশী উচ্চ বিদ্যালয় থাকিলেও মোটের উপর স্থূল কমানর চেয়ে বাড়ানরই দরকার আছে। কিন্তু প্রস্তাবিত বোর্ডের হাতে স্থূলকে রেকগিস্ত্রান দেওয়া না-দেওয়া বা তাহা প্রত্যাহার করার ক্ষমতা থাকিবে, এবং বোর্ডের যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাসের দিকেই ঝোঁক থাকিবে তাহা উহার ইংরেজ জনকের প্রবৃত্তি হইতেই অনুমিত হয়। বোর্ড এইরূপ প্রবৃত্তিজাত না হইলে, বঙ্গে বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার উৎকর্ষ ও বিস্তৃতি সাধনের ইচ্ছা ইহার মূল আদি ও প্রধান কারণ হইলে আমরা বোর্ড গঠনের সমর্থক হইতাম। কেন-না, বঙ্গীয় উচ্চ বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য তাহা করিবার মত লোকবল, অর্থবল ও আইনবল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই। কিন্তু অনুমোদনযোগ্য মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড না হইলে, উচ্চ বিদ্যালয়গুলির ভার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে আপাততঃ থাকাই শ্রেয় বলিয়া মনে করি।

বোর্ডের সদস্যদের মনোনয়ন ও নির্বাচন যে প্রকারে হইবে তাহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ঢুকান হইয়াছে। আমরা ইহার বিরোধী। যোগ্যতম লোকদিগকেই সদস্য করা

উচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে সদস্যদের চারিত্রিক, জ্ঞানগত ও শৈক্ষিক যোগ্যতাই বিচার্য, ধর্মমত বিবেচ্য হওয়া উচিত নয়।

যদি ধর্মসম্প্রদায় অনুসারে সদস্য লইতেই হয়, তাহা হইলে যে সম্প্রদায় যত বিদ্যালয় চালাইতেছেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যে সম্প্রদায় যত টাকা দিতেছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া এক এক সম্প্রদায় হইতে নির্দিষ্ট অনুপাতে সদস্য লওয়া উচিত। মন্দের ভাল হিসাবে আমরা ইহা বলিতেছি। এই প্রণালীরও আমরা সমর্থক নহি।

বোর্ডে উনত্রিশ জন সদস্য থাকিবেন; চৌদ্দ জন গবন্মেণ্টের নিযুক্ত ও মনোনীত, পনের জন নির্বাচিত। কিন্তু বেসরকারী সদস্যদের এই সামান্য সংখ্যাধিক্য ভ্রান্তিজনক। বস্তুতঃ এংলো-ইণ্ডিয়ান এডুকেশন বোর্ডের প্রতিনিধি এবং বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশন স্কাউটাইসরী বোর্ডের প্রতিনিধি সরকারী সদস্যদের পক্ষেই সাধারণতঃ ভোট দিবেন, এবং যাহারা নির্বাচিত সদস্য হইবেন গবন্মেণ্টের প্রভাব বশতঃ তাহাদের মধ্যেই কেহ কেহ নামে বেসরকারী কিন্তু বাস্তবিক সরকারী অনুগ্রহার্থী থাকিবেন। এরূপ সরকারী প্রভাবাধীন বোর্ড আমরা চাই না।

এই মত আমরা কেবল ভাল লাগা না-লাগার জগু পোষণ করি না, এবং প্রকাশ করিতেছি না। শিক্ষাতথ্য-জিজ্ঞাসু প্রত্যেক বাঙালী জানে, ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির মধ্যে কেবল বঙ্গেই মোট শিক্ষাব্যয়ের অধিক অংশ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকেরা ও সর্বসাধারণ বহন করেন, গবন্মেণ্ট বহন করেন কম অংশ; অন্যান্য প্রদেশে গবন্মেণ্টই অধিক অংশ বহন করেন। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, “বাদ্যকারের মজুরীটা যে দেয় গতের ফরমাইস করিবার অধিকার তাহার।” বঙ্গে কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বিপরীত ব্যবস্থা কায়েম হইতে যাইতেছে। বেশীর ভাগ টাকাটা দি ও দিব আমরা, কিন্তু প্রভুত্ব ও মুকুতিয়ানা করিবেন সরকারী লোকেরা! ইহা কখনই ন্যায্যসঙ্গত নহে। বেসরকারী লোকদেরই ক্ষমতা বেশী হওয়া উচিত। বঙ্গে যত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে তাহার অধিকাংশ বেসরকারী, জনসাধারণের ব্যয়ে স্থাপিত ও পরিচালিত।

এই কারণে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের প্রধান

শিক্ষকদিগকে যে আপনাদের মধ্য হইতে কয়েক জন সদস্য নির্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহার অনুপাত সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা অনুসারে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। অধিকাংশ সদস্য বেসরকারী স্কুলগুলি হইতে নির্বাচিত হওয়া উচিত। মোট তিন জন সদস্য হেডমাষ্টারেরা নির্বাচন করিবেন। ইহা যথেষ্ট নহে, এবং সদস্যের ভাগ-বাঁটোয়ারার পক্ষেও ইহা অস্ববিধাজনক। হেডমাষ্টার-প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ান উচিত। বলা হইয়াছে, তিনজন হেডমাষ্টার-প্রতিনিধির মধ্যে এক জন মুসলমান হওয়া চাই-ই। আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা আমদানী করার বিরুদ্ধে আগেই মত প্রকাশ করিয়াছি। আবার সেই কথা বলিতেছি। যদি সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা করিতেই হয়, তাহা হইলে ১২০০ স্কুলের মধ্যে যত স্কুল মুসলমানরা চালান, তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা তদনুসারে নির্ধারিত হওয়া উচিত। তাহারা ১২০০ বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪০০ বিদ্যালয় চালান না, সুতরাং তিন জন হেডমাষ্টারের মধ্যে এক জন মুসলমান হইবেন, ইহা গ্রাহ্যসঙ্গত নহে।

বিদ্যালয়সমূহের অনুমোদন, রেকগ্নিশন, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে বোর্ডকে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত জেলায় জেলায় জেলাবোর্ড গঠনের আমরা বিরোধী। এরকম পরামর্শ ত স্কুল পরিদর্শন বিভাগের ইনস্পেক্টররাই দিয়া থাকেন। জেলাবোর্ড-সকলে স্থানীয় শাসন ও পুলিশ বিভাগের কর্তাদের প্রভুত্ব ও প্রভাব সর্বাভিভাবী হইবে। বিদ্যালয়সমূহে হাকিম ও পুলিশের রাজত্ব কায়ম করার আমরা বিরোধী।

অনুমোদন, রেকগ্নিশন ও সরকারী সাহায্য পাইতে হইলে কি কি সর্ত্ত ও নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহা বিশদভাবে লিখিত থাকা উচিত; এবং কোন বিদ্যালয় ঐ ঐ সুবিধা না পাইলে বা পূর্বে প্রাপ্ত উক্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইলে, তাহার কারণগুলিও পরিষ্কার ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত হওয়া উচিত। গোপনীয় অপ্রকাশ্য অপ্রকাশিত কোন রিপোর্টের উপর কোন কাজ হওয়া অসঙ্গত।

রেজুন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বন্দ্ব

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাহারও কাহারও মধ্যে কখন কখন শিক্ষণীয় বিষয়ের ও পরীক্ষার মান (standard) ও কাঠিগ লইয়া ঝগড়া হয়। এ বলে আমি বড়, ও বলে আমি বড়। কিছুদিন আগে মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ে এইরূপ ঝগড়া হইয়াছিল। অল্পকাল পূর্বে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতার ব্যাচিলর অব কমার্স পরীক্ষা ও উপাধি তাহাদের সমতুল্য বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত হন।

এখন রেজুন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরোধ হইয়াছে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এইরূপ :—

১৯৩৭ সালের পরীক্ষা পর্যন্ত ব্রহ্মনিবাসী বাঙালী ছাত্রদিগকে তথাকার এংলোভার্মাকুলার স্কুলগুলিতে এবং এংলোভার্মাকুলার হাইস্কুল পরীক্ষা পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে তাহাদের মাতৃভাষা হিসাবে লইতে দেওয়া হইত। কিন্তু ১৯৩৮ সালের পরীক্ষায় ব্রহ্মনিবাসী বাঙালী ছাত্রদিগকে ব্রহ্মের স্কুলগুলিতে আবশ্যিকভাবে বাংলা ব্যতীত নির্দিষ্ট একটি মান অনুযায়ী বর্মী ভাষাও (Burmese of a prescribed standard) পড়িতে হইবে।

আর একটি নিয়ম হইতেছে এই, যে রেজুন বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ ও আই-এসসি কোর্সে বর্মীভাষা সাধারণতঃ অবশ্যপাঠ্য বলিয়া গণ্য হইবে; তবে যে সকল ছাত্র ব্রহ্মের বাহির হইতে (অথবা ব্রহ্মের এমন কোন অঞ্চল হইতে) আসিবে, যেখানে বর্মী ভাষায় সাধারণতঃ কথা বলা হয় না, তাহাদিগকে বর্মী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজীতে একটা বিশেষ পরীক্ষা দিতে হইবে। ঐ পরীক্ষার জ্ঞাত রেজুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা এই-রূপ :—

বঙ্গদেশস্থ বর্মী ছাত্রদিগকে অথবা সাময়িকভাবে যে সব ছাত্র বাংলায় আসে তাহাদিগকে ম্যাট্রিক অথবা আই-এ ও আই-এসসি পরীক্ষায় বাংলা, উর্দু অথবা হিন্দী অবশ্যপাঠ্যরূপে পড়িতে হইবে। রেজুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক অথবা হাই স্কুল পাশকরা ছাত্রগণ যদি ইংরেজীতে একটা বিশেষ পরীক্ষা পাস না করে, তবে তাহাদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ অথবা আই-এসসি পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। যে সব ছাত্র কলেজে ভর্তি হইয়া পরীক্ষা দিবে তাহাদের সম্পর্কেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। নন-কলেজিয়েট হিসাবে যাহারা পরীক্ষা দিবে, তাহাদিগকে ইংরেজীতে এই বিশেষ পরীক্ষা দিতে হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ হিসাবে এইরূপ নিয়ম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; কারণ, বর্মী খুব কম ছাত্রই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত কলেজে পড়ে বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেয়। অত্ৰ দিকে ব্রহ্মদেশে বাঙালীর সংখ্যা কয়েক লক্ষ এবং বাঙালী ছাত্রও কয়েক হাজার হইবে। রেজুন বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের খুব অসুবিধা করিয়া দিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে ভারতবর্ষের (ও ব্রহ্মদেশের) সমুদয় প্রধান ভাষাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া রেজুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদারনীতি অবলম্বন করা উচিত ছিল।

যে-মাত্র যে-দেশে বসবাস করে, তাহার সেই দেশের ভাষা জানা উচিত বটে। কিন্তু হঠাৎ একটা নিয়ম জারী করা উচিত নয়। রেজুন বিশ্ববিদ্যালয় যে-নিয়ম করিয়াছেন তাহা একান্ত আবশ্যক বিবেচিত হইয়া থাকিলে তাহা এখন

প্রকাশ করিয়া ১৯৪২ বা ১৯৪৩ সাল হইতে অবশ্যপালনীয় হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করিলে ঠিক হইত।

বঙ্গের লবণশিল্প

বঙ্গের লবণশিল্প সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্বে যে সরকারী বিবৃতি ও বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছিল, তাহা সম্ভোষণক মনে করি না। তাহাকে এ-বিষয়ে শেষ কথা মনে করা যাইতে পারে না। যে-জিনিষ আগে বঙ্গে প্রচুর প্রস্তুত হইত ও যাহার ব্যবসা চলিত, তাহা প্রস্তুত হইতে পারে না, এখন বলিলে তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বঙ্গে লবণপ্রস্তুতিকার্যে ব্যাপ্ত ব্যক্তিগণ এবিষয়ে সরকারী ভাবগতিক স্বভাবতই উৎসাহজনক মনে করেন নাই। বাংলা গবন্মেণ্ট লবণশিল্প হইতে প্রাপ্ত টাকার কিছু অংশ ভারত-গবন্মেণ্টের নিকট হইতে এই সর্ব্বে পাইয়াছিলেন, যে, তাহা বঙ্গে লবণশিল্পের উন্নতিসাধনার্থ ব্যয়িত হইবে। এই সর্ব্ব যথাযথ পালিত হইয়াছে বলিয়া বঙ্গের লবণ-কারখানাগুলারা মনে করেন না। তাহারা বঙ্গের উপযোগী প্রণালী শিক্ষা বা উদ্ভাবন করিয়া কাজ চালাইতে থাকুন।

বঙ্গের ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালী ও অবাঙালী

অনেক বাঙালীর একটা ধারণা আছে, যে, অবাঙালীরা বঙ্গে আসিয়া বাঙালীদের ব্যবসাপুলা দখল করিয়া বসিয়াছে। ইহা অনেক ক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সত্য নহে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার কিছুদিন পূর্বে বক্তৃতায় ঠিক বলিয়াছিলেন, যে, (ব্যবসায়ীর চোখওয়ালা ব্যবস'-বুদ্ধিসম্পন্ন অবাঙালীরা) বঙ্গে অর্থ উপার্জনের কোন কোন নূতন পথ নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছে। বাঙালীরা চাকরী ওকালতী প্রভৃতিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ ও আবদ্ধ রাখায় সে পথ জানিত না, দেখিতে পায় নাই।

ব্যবসাবাণিজ্যে রুত্বী হইতে হইলে বুদ্ধির যতটা দরকার, বাঙালীর তাহা যথেষ্ট আছে; কেবল সেটা ব্যবসাবাণিজ্যে খাটান আবশ্যক। আর চাই খুব পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হওয়া। কোন ব্যবসাকেই ছোট মনে করা উচিত নয়। অনিশ্চিতকে ভয় করিলে ব্যবসাতে সাফল্য লাভ করা যায় না।

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত না হইলে কোন জাতি ব্যবসাবাণিজ্যে বড় হইতে পারে না সত্য। কিন্তু পরাধীনতা সম্বন্ধে অবাঙালীরা ব্যবসাবাণিজ্যে যতটা অগ্রসর হইতেছে, বাঙালীদেরও ততটা অগ্রসর হওয়া উচিত।

“প্রত্যেক শহরে উদ্ধার-আশ্রম চাই”

ভারতের নানা প্রদেশে নারীহরণের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া এলাহাবাদের শ্রীমতী এল আর জুংলী (কাশ্মীরী মহিলা) একটি আবেদনে বলিতেছেন, “প্রত্যেক শহরে উদ্ধার-আশ্রম চাই।” অতি সত্য কথা।

ভারত-রক্ষা সম্বন্ধে ভারতের ভূতপূর্ব জঙ্গী লাটি

সর্ ফিলিপ চেষ্টেও ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি মাসাধিক পূর্বে লণ্ডনে এক বক্তৃতায় ভারতীয়দের উদ্দেশে দেশরক্ষা বিষয়ে বলিয়াছেন, “one day you may have to stand on your own legs for quite a long time,” “একদিন তোমাদিগকে খুব দীর্ঘকালের জন্য নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইতে পারে।” অর্থাৎ তখন ব্রিটেন আর ভারত রক্ষা করিতে পারিবে না, তোমাদিগকে করিতে হইবে। তামাসা মন্দ নয়! ভারতবর্ষের সব প্রদেশের লোকেরা দেশরক্ষা বিষয়ে নিজের পায়েই ত দাঁড়াইতে চাহিয়াছে। সর্ ফিলিপের মত লোকেরা অধিকাংশ প্রদেশের লোকদিগকে সৈনিক হইতে দেন নাই। তাহাদিগকে পঙ্কু করিয়া রাখিয়া এখন বলা হইতেছে, নিজের পায়ে দাঁড়াও!

বঙ্গের বাহিরে ফল রক্ষার চেষ্টা

ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেই ঋতুবিশেষে এমন অনেক ফল জন্মে যাহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত হইলে সারা বৎসর ব্যবহৃত হইতে পারে এবং দূরবর্তী স্থানে চালানও হইতে পারে। বোম্বাই প্রদেশে আম রক্ষার জন্য বৃহৎ কারখানা হইতেছে। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে প্রতি বৎসর এলাহাবাদে ফলরক্ষণ শিখাইবার নিমিত্ত শ্রেণী খোলা হয়। তাহাতে অনেক পুরুষ ও মহিলা রক্ষণ-প্রক্রিয়াগুলি শিখিয়া নিজ নিজ পরিবারের জন্য ফল রক্ষা করে, ছোটখাট ব্যবসাও করে। পণ্ডিত মূলচাঁদ মালবীয়া এই ফলরক্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক। বঙ্গেও এইরূপ চেষ্টা হওয়া উচিত। এখানেও নানা রকম ফল জন্মে। বঙ্গে ফল-রক্ষণের কারখানা একটিও নাই, এমন নয়। কিন্তু আমরা যতটা জানি, ফলরক্ষণ কোথাও রীতিমত শেখান হয় না।

সিনেমাতে নৃত্য

কলিকাতা মিউনিসিপালিটি সিনেমাতে নৃত্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। যাহাতে পাশববৃত্তি উত্তেজিত হয় বা প্রশ্রয় পায়, এরূপ নৃত্য নাতিশয় নিন্দনীয়। সিনেমার ফিল্মে অনেক সময় গল্পের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গ-রহিত নৃত্য দেখান হয়। অনেক স্থলে তাহা স্বকচি ও স্থনীতির বিরুদ্ধ। নৃত্যকে সম্পূর্ণ স্থনীতিসঙ্গত ও স্বকচিসঙ্গত রাখিতে হইলে কটিদেশের অব্যবহিত নিয়ন্ত্রনীয় দেহাংশের সঞ্চালন ও ভঙ্গীসমূহ সর্ব্বপ্রথমে বর্জনীয়। অনেক সভায় কেবল দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য বালিকা ও কিশোরীদের এরূপ নৃত্য দেখান হয় যাহা বাই-নাচের কতকটা অনুরূপ। ইহা নিন্দনীয়। নৃত্য স্বকচিসম্মত হইলেও যে-সব সভার কাজের সহিত নৃত্যের কোনই সঙ্গতি, সংলগ্নতা ও সম্পর্ক নাই, তথায় তাহা প্রদর্শিত হওয়া অসঙ্গত।

দেশ-বিদেশের কথা

লক্ষ্মী-প্রবাসী বাঙালীর নববর্ষোৎসব

পশ্চিমাকলে অবাঙালীদের নববর্ষোৎসব নামে কোন অমুঠান নেই বলেই আমরা যখন পাঁচ বৎসর পূর্বে কবি অতুলপ্রসাদের নেতৃত্বে “বৈশাখী সম্মিলনী” নামে নববর্ষোৎসব আরম্ভ করি তখন এ প্রদেশের খবরের কাগজগুলিতে “Bengali New Year Celebrations” ইত্যাদি বর্ণনা পড়ে এদেশের লোকদের সত্যিই চমক লেগেছিল। আমার অনেক অবাঙালী বন্ধু পরিহাস করে বলে-ছিলেন, “তোমরা কি খ্রীষ্টান যে নববর্ষোৎসব কর ইত্যাদি...”। প্রবাস-জীবনে এরূপ অমুঠানের সার্থকতা কত তা এখানে আলোচনা করব না। এইটুকু বললেই হবে যে এই ধরনের সম্মিলনীর দ্বারা প্রবাসী বাঙালী নিজের সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য সহজে বজায় রাখতে পারে।

লক্ষ্মী “বৈশাখী সম্মিলনী”র ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন এবার এপ্রিল ১৭-১৮ই স্থানীয় বেঙ্গলী ক্লাবের “অতুল নাট্যমন্দিরে” সুসম্পন্ন

হয়েছে। দু’দিনই আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা মনোরম হয়েছিল, ও আবৃত্তি সঙ্গীত, নৃত্য, বঙ্গকৌতুক ব্যায়াম-কৌশল ও অভিনয় প্রমোদসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম দিন স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাপ্রসঙ্গের অধ্যক্ষ স্বামী দেবেন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে এক জানগড় বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয় দিন রায় বাহাদুর শ্রীশ্রবন্ধনাথ ঘোষ সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। প্রবাসী বাঙালীর বর্তমান সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে তাঁর সূচিন্তিত অভিভাষণ বিশেষ চিত্তগ্রাহী হয়েছিল।

প্রথম দিনের আমোদসূচির মধ্যে বিশেষ প্রশংসা পেয়েছিল শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় ছয়টি ছোট ছোট মেয়ের (মীরা নন্দী আরতি চট্টোপাধ্যায়, মণিকা দেবী, শেফালি দেবী, আরতি সান্যাল, রেখা মৈত্র) অপরা নৃত্য ও কৃষ্ণ-গোপী নৃত্য, কুমারী বাণী মজুমদারের আবৃত্তি, দিল্লীর

সুদূর প্রাচ্যেও স্বাধীনতার বিজয় অভিযান



বাম্বা
স্ট্রেট সেটেলমেন্ট
মালয়
শ্যাম • চীন
ফিলিপাইন
ইন্দো-চীন
জাভা • ফরমোসা
আন্দামান
ফিজি
জাপান

চৌষটি শিল্পকলার একটি

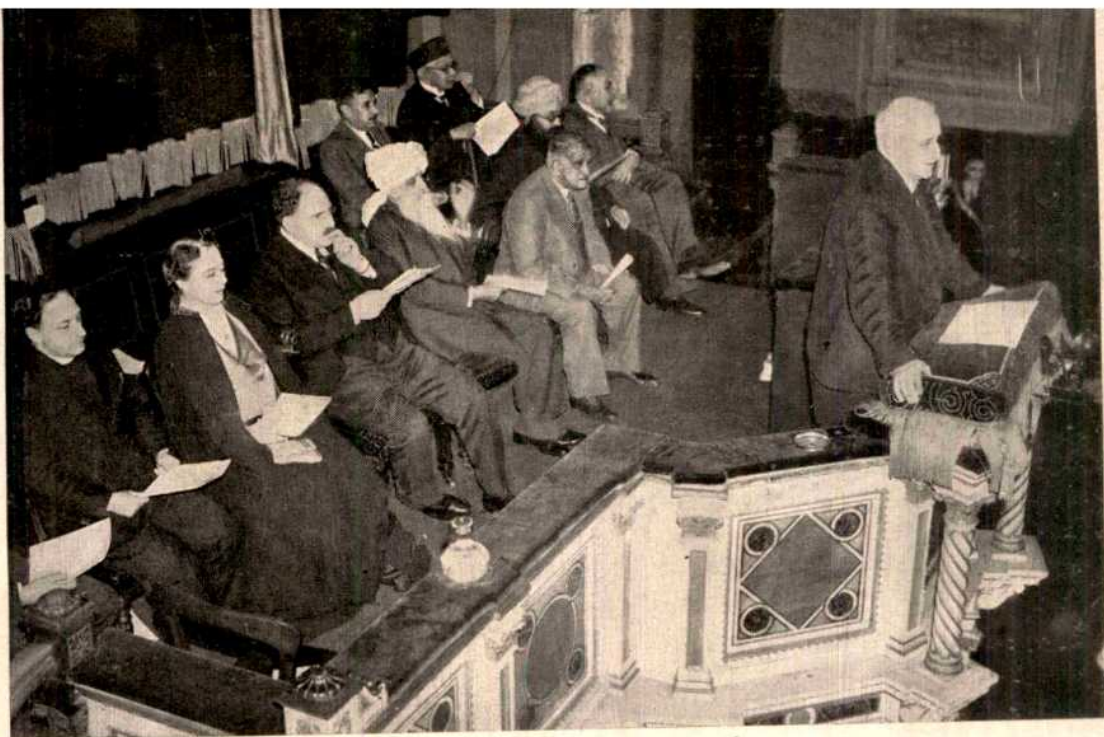


ভালো ছবির আবেদন হৃদয়ে গভীর ভাবে গিয়ে পৌঁছায়। যারা তার মর্থ্য বোঝে তেমন সমঝদারকে সে ছবি অসীম আনন্দ দেয়। ছবি, গান, কবিতা,—এগুলি একই ধরণের আনন্দের উৎস। অবশ্য শিল্প-সৃষ্টি ক'রে পৃথিবীকে আনন্দ দেওয়ার দুর্লভ প্রতিভা খুব কম লোকেরই আছে। কিন্তু সাধারণ অনেক কাজও ত সুন্দর ও শোভন ভাবে করা যেতে পারে! নিখুঁত ভাবে উপাদেয় চা তৈরী করাও একটি চাক্কলা;—আমাদের দেশে উৎপন্ন চায়ের তেমন উপাদেয় একটি পেয়ালা পান ক'রেও অশেষ আনন্দ ও আরাম পাওয়া যায়।

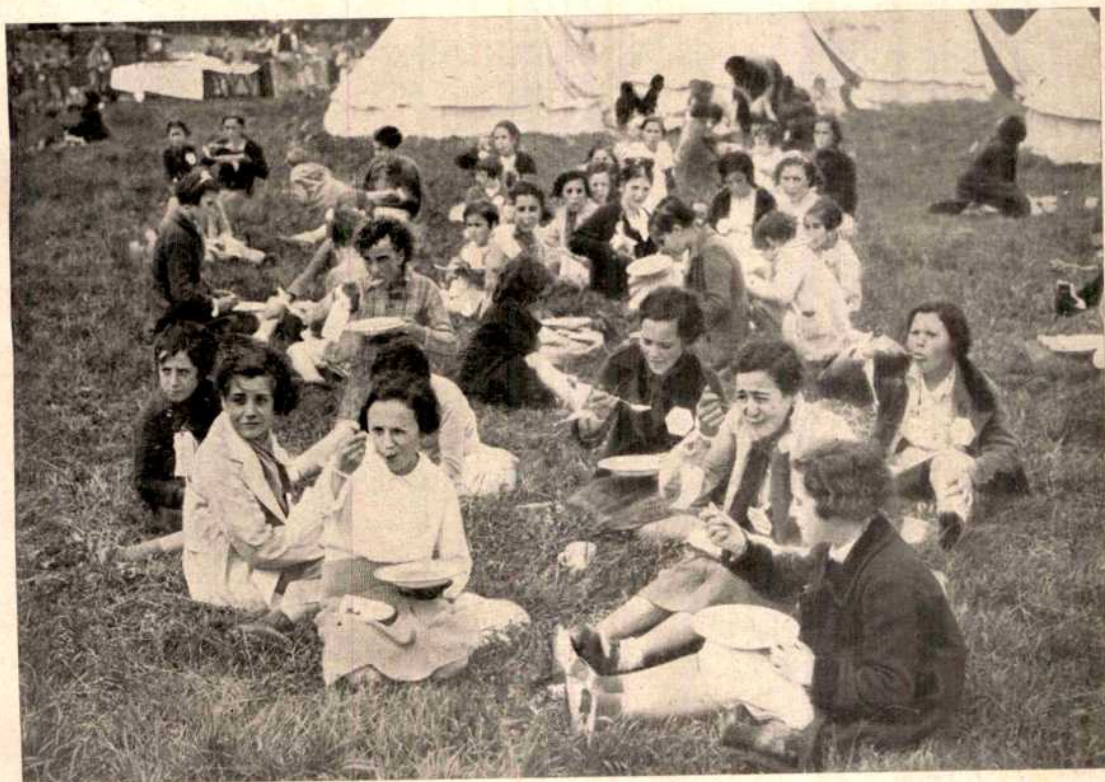
চা প্রস্তুত-প্রণালী

টাটকা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশী দিন। জল ফোটামাত্র চায়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজতে দিন; তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

দশজনের সংসারে একমাত্র পানীয়—ভারতীয় চা



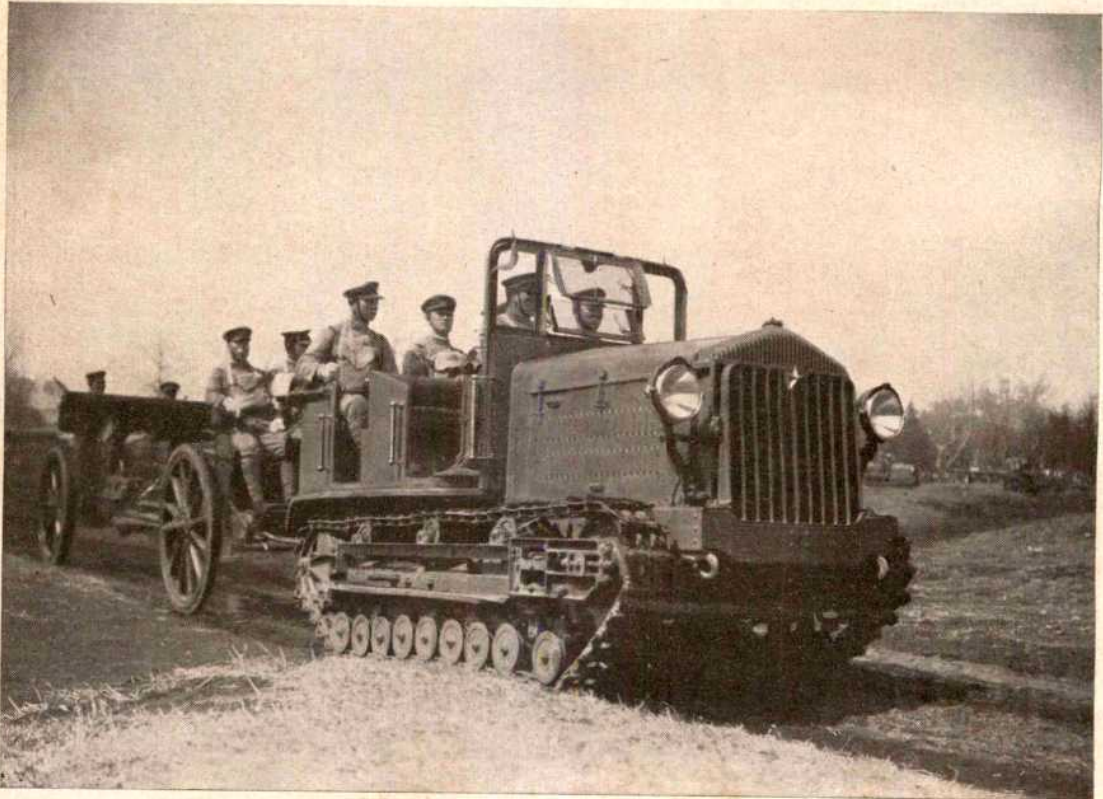
বিশ্বধর্ম সম্মেলনের তৃতীয় আন্তর্জাতিক অধিবেশন, লণ্ডন। সভাপতি জর্জ ল্যান্সবারি বক্তৃতা দিতেছেন



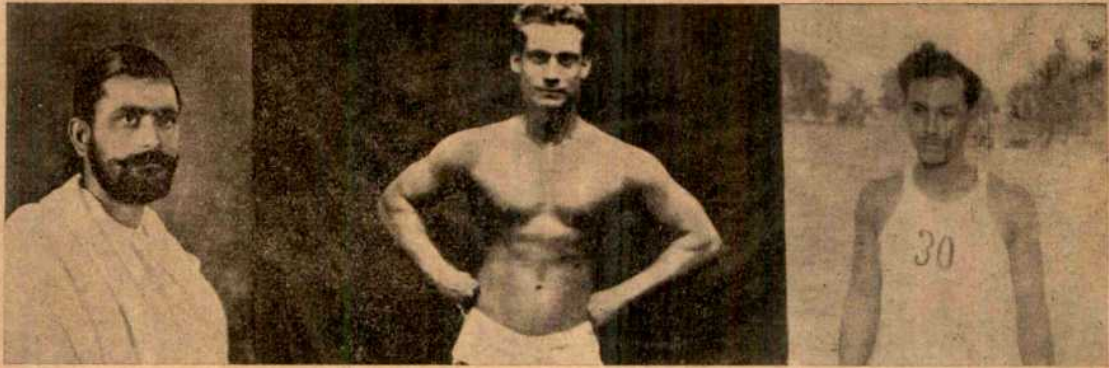
স্পেন হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত শিশুদের শিবির, সাউদাম্পটন। বহুকাল পরে সুখাচ্যোর মুখ দেখিয়া ইহাদের আনন্দের অবধি নাই



কোয়ান্টং-এর নবনিযুক্ত গবর্নর, শাংহাইর মেয়র টে-চেন শাংহাই পরিত্যাগের পূর্বে সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন



জাপানী সৈন্যদের উৎসব উপলক্ষে কৃত্রিম বুদ্ধায়োজন



বংশীবাদক শ্রীহন্দু মুখোপাধ্যায়
দিল্লী

ব্যায়ামকৌশলী শ্রীবিজয় মিত্র
কানপুর

আর. পি. গঙ্গোপাধ্যায়
ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন

লেডী আরউইন কলেজের সঙ্গীতশিক্ষক শ্রীহন্দু মুখোপাধ্যায়ের মনোহর বংশীবাদন, শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিল্পী শ্রীকিরণ ধরের প্রযোজনায় "মহাপ্রয়াণের পথে" নামক কৌতুক-নাট্যিকার অভিনয় ও কুমারী ডলি বন্দ্যোপাধ্যায় কুমারী শ্যামলী চট্টোপাধ্যায়, কুমারী ডলি দত্ত, ও শ্রীঅবনী মুখোপাধ্যায়ের বিবিধ নৃত্য।

দ্বিতীয় দিনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল দিল্লী লেডী আরউইন কলেজের নৃত্যশিল্পী শ্রীবিবি রায় ও তাঁর সুরযোগ্য ছাত্র শ্রীসহু

বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দ্র, গন্ধর্ভ, ও কিন্নর নৃত্য। তাঁদের অভিনব নৃত্য ও ইন্দুবাবুর বাঁশী এবার সম্মিলনীর উৎসব-সমারোহ বিশেষ সমৃদ্ধ করেছিল। কাণপুরের শ্রীবিজয় মিত্র পেশী-সংযমন-কৌশল দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করেন। লঙ্কোর শ্রীঅশ্বিনী মিত্র দুটি স্থল লৌহদণ্ড দস্ত ও গ্রীবার চাপে বাঁকিয়ে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেন। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল ও অতুলপ্রসাদের গান সখ্যে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়



এই দারুণ গরমের দিনে—

আরামে থাকা যায়, যদি প্রতিদিন স্নানে ও প্রসাধনে

ক্যালকেমিকোর

সুগন্ধি নিম টয়লেট সাবান

মার্গোলোপ

ব্যবহার করা হয়, এবং স্নানান্তে হুঁবেলা মাথা হয়

ক্যালকেমিকোর সুগন্ধি নিমের টয়লেট পাউডার

রেণুকা

ব্যবহারে ছুলি, মেচেতা, ঘামাচি, চুলকানি দূর হয়

এবং বর্ণের শুজ্জল্য বৃদ্ধি করে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল—বালিগঞ্জ, কলিকাতা



ইন্দ্র-নৃত্য
শ্রীবি রায়, দিল্লী

গন্ধর্ব-নৃত্য
শ্রীমতু বন্দ্যোপাধ্যায়, দিল্লী



সম্মিলনীর কম্পৌবন্দ

ও শ্রীসুনীল ঘোষের কৌতুকাভিনয় স্মরণ হয়েছিল। শেষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের “কালিদাস” শ্রীসুভদ্রা সেনের প্রযোজনায় সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। বাংলার বাইরে রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রশংসার সহিত অভিনয় করা কুতিত্বের পরিচায়ক। শিল্প-প্রদর্শনী

ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। তাছাড়া, বাঙালী যুবকদের জ্ঞান এবার সর্বপ্রথম লক্ষ্যে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা আরম্ভ করা হয়েছে সম্মিলনীর উপলক্ষে।

শ্রীমদলাল চট্টোপাধ্যায়

ল্যা

ড্

কো

ক

ক

লি

কা

তা

কো

গত বৎসরের গ্রায়
এ বৎসরেও গ্রীষ্মকালে
আপনার নিত্যব্যবহার্য
সুপরিষ্কৃত প্রসাধন দ্রব্যাদি—

ল্যাড্‌কো দ্রব্যাদি
শুণে অপরায়ে
ব্যবহারে পরম আনন্দ
ও সুখদায়ক ॥
ভাল দোকানেই পাইবেন ॥

ল্যা ড্‌কো'র
সুগন্ধ ক্যান্ডার অয়েল
সুগন্ধ গ্লিসারিন সোপ
লাইম্‌ জুস্‌ গ্লিসারিন
রক্তকমল গন্ধ-তৈল
আমলা-অয়েল
ফেস্‌ক্রিম
নো



কুমারী হিরণ্যসী বসু

ক্রীড়াপটু কুমারী হিরণ্যসী বসু

সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী হিরণ্যসী বসু ১৯৩৬-৩৭ সালে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি স্পোর্টসে যোগদান করিয়া বহু পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। কুমারী হিরণ্যসী বসু প্রিন্টিং, বার্নিং, হাই-জাম্প ও লো-হার্ডলে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ১৯৩৬-৩৭ সালে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত স্পোর্টসগুলিতে যে সকল ভারতীয় বালিকা যোগদান করিয়াছিলেন, কুমারী হিরণ্যসী বসু তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

বিধবা-বিবাহ

ভঙ্গলবাড়ী হিন্দুসভার প্রচারের ফলে ও সহায়তায় ১৩৪৩ সালে নিম্নলিখিত বিধবা-বিবাহগুলি সম্পন্ন হইয়াছে।

দুঃখহীন নিকেতন—

সংসার-সংগ্রামে মানুষ আরামের আশা ছাড়িয়া প্রাণপণ উত্তমে বাঁপাইয়া পড়ে তাহার জীবন-পরিবারের মুখ চাহিয়া। সে চায় পত্নীর প্রেমে, পুত্রকন্যা ভাইভগিনীর স্নেহে বুকবুকে একখানি শান্তির নীড় রচনা করিতে। এই আশা বৃকে করিয়া কী তা'র আকাঙ্ক্ষার আকুলতা, কী তা'র উদ্যম, কী তা'র দিনের পর দিন আত্মভোলার পরিশ্রম!

কিন্তু হায়, কোথায় আকাঙ্ক্ষা, আর কোথায় তা'র পরিণতি! বার্ষিকের চৌকাঠে পা দিয়া পোনের আনা লোকই দেখে জীবনসন্ধ্যায় দুঃখহীন নিকেতন গড়িয়া তুলিবার স্বপ্নকে সফল করিতে হইলে যেটুকু অর্থ-সঞ্চয় করিয়া রাখা প্রয়োজন ছিল, প্রতিদিনের হাজার কাজের চাপে, ছোটবড় হাজার অভাব মিটাইতে গিয়া, সেই অতিপ্রয়োজনীয় সঞ্চয় তাহার করা হইয়া ওঠে নাই। এমনি করিয়া আশাভঙ্গের মনস্তাপে বহু লোকেরই জীবনসন্ধ্যাহের গোধূলি-অবসরটুকু শান্তিহীন হইয়া ওঠে।

একদিনেই করিয়া ফেলা যায় এমন কোনো উপায়ই নাই, যাহা দরিদ্রের এই মনস্তাপ দূর করিয়া দিতে পারে। সংসারের স্বচ্ছলতা ও শান্তি গড়িয়া তুলিতে হয় ধীরে ধীরে—একমাস বা এক বৎসরের চেষ্টায় ভবিষ্যতের যে-সংস্থান হয় না, বিশ বৎসরের চেষ্টায় তাহা অল্লাহসে হওয়া অসম্ভব নয়। সঞ্চয়ের দায়িত্বকে আসন্ন দায়ের মত দুঃসহ না করিয়া লঘুভার করিতে এবং কষ্টসঞ্চিত অর্থকে নিরাপদ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই জীবনবীমার সৃষ্টি। যাহাদের সামর্থ্য বেশী নয়, অথচ সাংসারিক দায়িত্ব বেশী, জীবনবীমার অনুষ্ঠান বিশেষ করিয়া তাহাদেরই জন্য।

সাংসারিক জীবনে প্রত্যেক গৃহস্থেরই যে জীবনবীমা করিয়া রাখা উচিত, একথা সকলেই জানেন। জীবনবীমা করিতে হইলে সকলেরই এমন কোম্পানীতে করা উচিত, ব্যবসায়িক যাহার প্রতিষ্ঠা আছে, ব্যবসার অনুপাতে যাহার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বেশী। নিরাপত্তার দিক দিয়া দেখিলে, **বেঙ্গল ইন্সুরেন্স এণ্ড লিমিটেড** প্রপার্টি কোং লিমিটেডের মত বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠানই সর্বসাধারণের পক্ষে শ্রেয়।

বেঙ্গল ইন্সুরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিমিটেড

হেড অফিস—২নং চার্চ লেন, কলিকাতা।

নমঃ ব্রাহ্মণ—৫, গণপাল—৪, গোপ—২, কুদ্রপাল—৪, হৈহয় কত্রিয়—৫, মাহিষ্য—২, পাল—২, কায়স্থ—১, কুদ্রজ ব্রাহ্মণ—২, মোট ২৭টি বিধবার পুনর্বিবাহ হইয়াছে। ১৩৩৪ হইতে ১৩৪৩ সাল পর্য্যন্ত এই সভার সহায়তায় ১০৩টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে।

শ্রীমলিনীরঞ্জন চক্রবর্তী

সম্পাদক, জঙ্গলবাড়ী হিন্দুসভা, ময়মনসিংহ

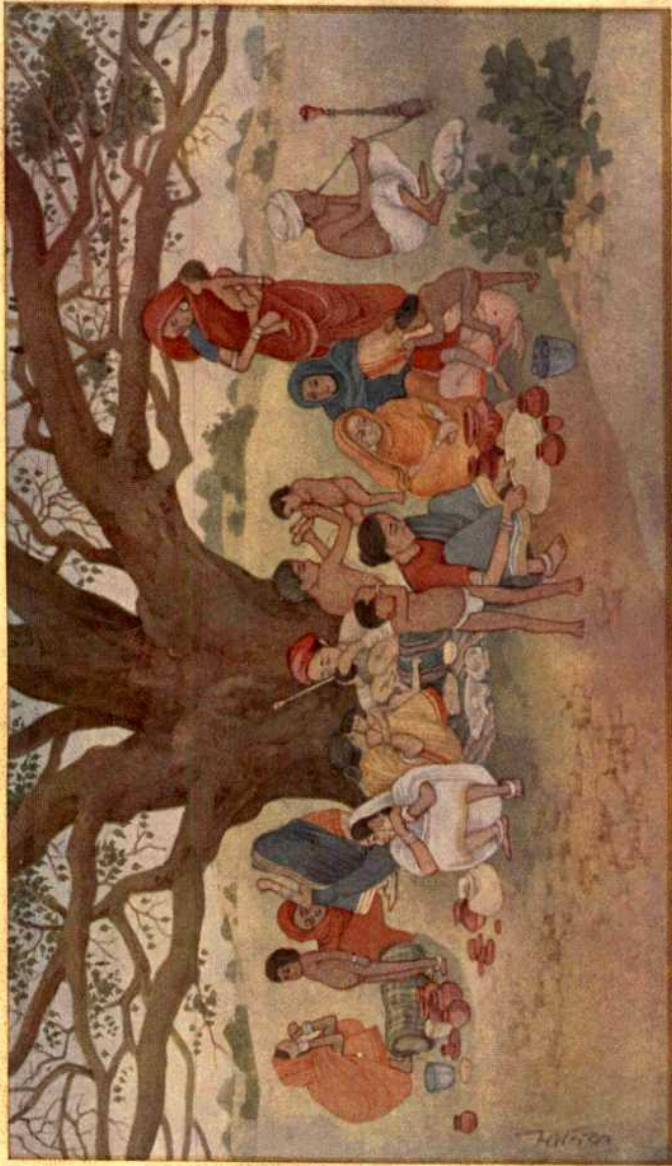
নেত্রকোণায় রবীন্দ্রজয়ন্তী

ময়মনসিংহ-নেত্রকোণাতে প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরদক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয় এই বার্ষিক জয়ন্তীর প্রবর্তন করেন এবং এই উৎসব-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া এই অঞ্চলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার ও জন-প্রিয়তা দিন দিন বাড়িতেছে।

গত ২৫শে বৈশাখ নেত্রকোণায় কবির সপ্তসপ্ততিতম জন্মোৎসবের মাস্টিক পর্ব শ্রীযুক্ত সুধরঞ্জন রায়েব সভাপতিত্বে সুরচক্রভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে ১লা জ্যৈষ্ঠ একটি সঙ্গীত-সাময়িকার আয়োজন করা হইয়াছিল, তাহাতে সভাপতি ছিলেন ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু চক্রবর্তী। এবারকার উৎসবের বৈশিষ্ট্য ছিল সঙ্গীত ও আবৃত্তির পর কবির আধুনিকতম গীতিনাট্য 'পরিশোধ' অভিনয়। শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার এবং স্থানীয় রবীন্দ্রজয়ন্তী সমিতির যুগ্মসম্পাদক ক্রিখিলচন্দ্র বর্দন ও শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারের উজোগে উৎসব সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

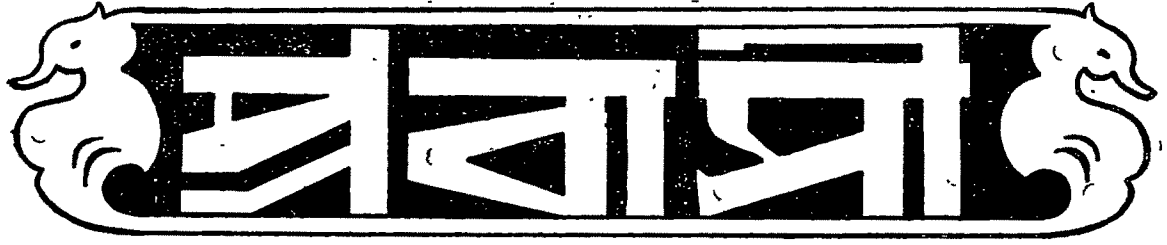


অষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইসচ্যান্সেলর
উড়িয়া-জয়পুরের মহারাজা
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী কর্তৃক গঠিত মূর্তি



তীর্থযাত্রী
ঐতিহাসিককাল বঙ্গোপাধ্যায়

কবাসী প্রেস কলিকাতা



"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নাম্যাম্হা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৭শ ভাগ }
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৪৪

{ ৪র্থ সংখ্যা

ক্যাণ্ডীয় নাচ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সিংহলে সেই দেখেছিলাম ক্যাণ্ডিদলের নাচ ;
শিকড়গুলোর শিকল ছিঁড়ে যেন শালের গাছ
পেরিয়ে এলো মুক্তি-মাতাল ক্যাপা
ছন্ধার তার ছুটল আকাশ-ব্যাপা ।
ডালপালা সব ছড়ুদাড়িয়ে ঘূর্ণি হাওয়ায় কহে—
নহে, নহে, নহে,—
নহে বাধা, নহে বাঁধন, নহে পিছন-ফেরা,
নহে আবেশ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা,
নহে মুহু লতার দোলা, নহে পাতার কাঁপন,
আপ্তন হয়ে জ্বলে ওঠা এ যে তপের তাপন ।
ওদের ডেকে বলেছিল সমুদ্রের ঢেউ
আমার ছন্দ রক্তে আছে এমন আছে কেউ ।
স্বপ্না ওদের বলেছিল, মঞ্জীর তোর আছে
স্বন্ধারে যার লাগাবে লয় আমার প্রলয় নাচে ।

ঐ যে পাগল দেহখানা, শূণ্ণে গুঠে বাহু,
 যেন কোথায় হাঁ করেছে রাহু,
 লুক্ক তাহার ক্ষুধার থেকে চাঁদকে করবে আণ,
 পূর্ণিমাকে ফিরিয়ে দেবে প্রাণ।
 মহাদেবের ভপোভঙ্গে যেন বিধম বেগে
 নন্দী উঠল জেগে,
 শিবের ক্রোধের সঙ্গে
 উঠল অঙ্গে ছুঁদার্মি তা'র প্রতি অঙ্গে অঙ্গে
 নাচের বহিঃশিখা
 নিদ্রা নিভীকা।

খুঁজতে ছোটো মোহ-মদের বাহন কোথায় আছে
 দাহন করবে এই নিদারুণ অনন্দময় নাচে।
 নটরাজ যে পুরুষ তিনি, তাগুবে তাঁর সাধন,
 আপন শক্তি মুক্ত করে ছেঁড়েন আপন বাঁধন।
 হুঃখবেগে জাগিয়ে তোলেন সকল ভয়ের ভয়,
 জয়ের বুতো আপনাকে তাঁর জয় ॥

আলমোডা
 জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪



কাব্যবিচারে প্লেটো

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

প্লেটোর নাম শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। তৎকালীন সজ্জেকটসের শিষ্য প্লেটো জগতের এক জন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর। সজ্জেকটসের চিন্তাধারা এথেন্স নগরীতে যে বিপ্লব আনয়ন করছিল তা তখনকার সমাজ সহ্য করতে পারে নি; তাই তারা জ্ঞানের সাধক পবিত্রচেতা সজ্জেকটসকে ধর্মানাশ করবাব অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিষপানের দণ্ড দান করেছিল। তাতে তাঁর দেহের মৃত্যু হ'ল, কিন্তু তাঁর আত্মা অমর হয়েই রইল। বিশ বছর বয়সে প্লেটো সজ্জেকটসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে প্রায় দশ বছর তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে এথেন্স নগরীর একাডেমাস কুঞ্জে তিনি নিজের টোল প্রতিষ্ঠা করেন এবং জীবনের অবশিষ্ট চল্লিশ বৎসর কাল এইখানেই অধ্যাপনায় অতিবাহিত করেন।

প্লেটো মুখ্যতঃ দার্শনিক কিন্তু তাঁর রচনাবলীর সঙ্গে ষাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে প্লেটো সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। 'কথোপকথন' এবং 'সিম্পোসিয়াম' গ্রন্থ দুখানির রচনারীতি, ভাষার সৌন্দর্য, ভাবপ্রকাশের আশ্চর্য সরস ভঙ্গী, এবং বার্তালাপরীতির উৎকর্ষ তাঁকে নিত্যকালের জন্ত সাহিত্যিকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে রাখবে। প্লেটোর আলোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল সজ্জেকটসের ভাব ও চিন্তাধারাকে এবং তাঁর বিশিষ্ট চিন্তারীতিটিকে ভাষায় নিবদ্ধ করা এবং সেই ভাবধারাটিকে পরিপুষ্ট করা। সজ্জেকটসের চিন্তার মূলসূত্র ছিল তিনটি : প্রথম, মানবজীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে দোবশুভতা (virtue), একে পূর্ণতাও বলা যেতে পারে; দ্বিতীয়, জ্ঞানই এই পূর্ণতার নামান্তর, অর্থাৎ যার জ্ঞান হয়েছে সে কখনও অসং বা অন্তায় কৰ্ম করতে পারে না; তৃতীয়, এই জ্ঞানপ্রাপ্তির ইন্দ্రిয় হচ্ছে বুদ্ধি (intellect)। এই সূত্র অনুসরণ করে প্লেটো 'রিপাব্লিক', 'রাজনীতিজ্ঞ' এবং 'শাসন-শাস্ত্র' নামক তিনখানি গ্রন্থে তাঁর মতবাদটিকে পরিষ্কৃত করে দেখিয়েছেন।

প্লেটোর বচনা সবই কথোপকথনের ভঙ্গীতে রচিত। এ-পদ্ধতি কিছু প্লেটোর উদ্ভাবিত নয়; তাঁর পূর্বে এই কথোপকথনের ভঙ্গীতে এক রকমের হাশ্বরসাত্মক কমেডি লেখার রীতি ছিল। প্লেটো এই পদ্ধতির সাহায্যে হাশ্ব-রসাত্মক চিত্র না এঁকে, তাঁর গুরু সজ্জেকটসের ভাবধারাটিকে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। এই সব মতবাদের কতখানি সজ্জেকটসের আর কতখানি তাঁর নিজস্ব চিন্তার ফল তা বলা কঠিন। সে যাই হোক, প্লেটোর লেখায় যে-সব মত সজ্জেকটসের নামে প্রকাশিত হয়েছে এখানে আমরা তার জন্ত প্লেটোকেই দায়ী করে আযাদের আলোচনায় অগ্রসর হব।

বিপ্লবিক গ্রন্থে প্লেটো একটি আদর্শ রাষ্ট্রসমাজেব পরিকল্পনাকে রূপ দিয়েছেন। তাঁর অভিনব মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; রাষ্ট্রনীতির আলোচনার মূলে প্লেটোর একটি আদর্শ মতবাদ আছে এবং প্লেটোকে তা নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছে, কিন্তু তা নিয়ে আলোচনা আমাদের লক্ষ্য নয়। রিপাব্লিক গ্রন্থে এবং অন্তর্ভুক্ত আর্ট অর্থাৎ চাক্ষুশ ও কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে প্লেটো তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন; এখানে তার পরিচয় দেওয়াই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্লেটোর কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে মতামতের সুক্তিগত ভিত্তি বুঝতে হ'লে তাঁর জীবন-দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। সেই জন্ত এখানে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ দার্শনিক মতবাদের সামান্য বিবৃতি আবশ্যক। রিপাব্লিকের সপ্তম অধ্যায়ে তিনি এই মতবাদটিকে একটি স্বন্দর রূপকের সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন যে, ইন্দ্రిয়গ্রাহ্য যে-সব বস্তুকে আমরা সত্য ব'লে জানি ও মনে করি সে-সব বস্তু বস্তুতঃ সত্য নয়, সত্য বস্তুর খণ্ড অল্পকৃতি মাত্র। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটি স্পষ্ট হবে। রাম, জাম, হরি এরা সকলেই মাছ; এদের দেখেই মাছ

সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়েছে মনে হয়। কিন্তু রাম, শ্রাম, হরি এদের কারও মাঝেই মাহুয়ের সব বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য নিঃশেষিত নয়, হতেও পারে না, অথচ অন্য একটি মাহুয যত্নকে দেখেও আমাদের মাহুয ব'লে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। এই জন্য প্লেটো বলেন যে রাম, শ্রাম, হরি ইত্যাদি সকলেই 'মাহুয'-ভাবের এক-একটি প্রতিকল্প মাত্র। ভগবান আসল 'মাহুয'-ভাব রূপটিকে সৃষ্টি করেছেন; এই জগতে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জগতে আমরা কেবল তারই নানা রকমের অসম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই মাত্র। ভাবকপের রাজ্যটি ইন্দ্রিয়জগতের বহু উর্দ্ধে। আমাদের অমর আত্মা জন্মের পূর্বে সেই ভাবজগতে ইন্দ্রিয়জগতের সকল বস্তুভাবরূপটিকে প্রত্যক্ষ কবেছে ব'লেই এখানে এসে ইন্দ্রিয়-জগতে এই ছায়ামূর্তিকে জানতে পারে। ভাবজগতই সত্য জগৎ, শাশ্বত এবং নিত্য। বিস্তুত বুদ্ধির উজ্জল আলোকে আমরা সেই ভাবমূর্তিকে দেখতে পাই। হুতরাং প্লেটোর মতে ইন্দ্রিয়জগৎ একটা ছায়া-সত্যের জগৎ, এখানে কোন বস্তুকেই তার সত্য রূপে দেখা যায় না, যেতে পারে না।

অতএব এই ছায়াব জগতের কোন কিছুই ব্যাকুল হওয়া মাহুযের লক্ষ্য হ'তে পারে না। মাহুযের লক্ষ্য সত্যজ্ঞান অর্জন করা; সত্যজ্ঞান হলেই মাহুযের হৃদয়ে অবিচল শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, মাহুয হাসিকান্নার দুঃখস্বপ্নের উর্দ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। 'দুঃখেষু হুয়িরমনাঃ হুখেষু বিগতস্পৃহঃ' এই ষ্টোইক (Stoic) আদর্শই প্লেটোর কাম্য। নিরুদ্বেগ অচঞ্চল মনের অবস্থাই হ'ল মাহুযের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্লেটো কাব্যকলার প্রয়োজন নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন।

এই জগতের সমস্ত বস্তুই যেমন শাশ্বত ভাবজগতের একটি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ছায়ামাত্র, তেমনি কাব্য এবং চিত্রশিল্পও হচ্ছে এই ইন্দ্রিয়জগতেরই একটা অসম্পূর্ণ অল্পকরণমাত্র। অল্পকৃতি মাত্রই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ফল। যে একটা ফলের ছবি আঁকবে তার পক্ষে ফল সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, বাইরের রূপটাই তার অল্পকরণের বস্তু। স্থান-কাল-পাত্রভেদে প্রত্যেক বস্তুই প্রতীয়মান রূপের ভিন্নতা ঘটে, হুতরাং শিল্পী প্রতীয়মান

রূপের অল্পকরণ ক'রে প্রাকৃত জনকে মুগ্ধ করলেও, একথা স্বীকার্য যে শিল্পীব পক্ষে বস্তুর সত্যজ্ঞান অনিবার্য নয়, এমন কি প্রয়োজনও নয়। তার পব শিল্প মাত্রই—যথা চিত্র ও কাব্য—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অল্পকরণ হওয়ায় তা অল্পকরণের অল্পকরণ এবং এই জন্য সত্য থেকে অনেক দূরে। তাই প্লেটো বলেন যে কবি এবং চিত্রকরেরা অল্পকরণ করেন কতকগুলি মিথ্যা প্রতীতির, হুতরাং কখনও তাঁরা সত্যজ্ঞান দিতে পারেন না। অল্পকরণ একটা প্রমোদ মাত্র, কোন গভীর সাধনা নয়।

চিত্রশিল্পী কোন বস্তুকে তার পারিপ্ৰেক্ষিক অল্পবায়ী স্বাক্ষরে বাধ্য; তাতে বস্তুর বাস্তবিক আয়তন সম্বন্ধে কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, কেবল প্রতীয়মান আকৃতি (বা অক্ষরাত্মক সাক্ষ্য অল্পবায়ী মিথ্যা) নিয়েই তার কারবার। অল্পকরণ ব্যাপারটাই প্রথমতঃ ভ্রান্ত, তার ওপর প্রতীতি অর্থাৎ ভ্রান্তির অল্পকরণ হওয়ায় প্লেটো চিত্রশিল্পকে দ্বিগুণিত মিথ্যা ব'লে মনে করেন।

কবি সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা যে এর চেয়ে ভাল তা নয়। প্রথমতঃ, কাব্যসাহিত্যকে প্লেটো তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। ভাষায় কবি তাঁর বস্তুব্যাকে দুটি উপায়ে প্রকাশ করতে পারেন এবং ক'রে থাকেন; প্রথম হ'ল অল্পকরণ-মূলক অর্থাৎ নাটকীয় পদ্ধতিতে চরিত্রবিশেষের মাঝ দিয়ে, আর দ্বিতীয় হ'ল বিবরণমূলক অর্থাৎ ভ্রষ্টার বর্ণনা দ্বারা। তাতে কাব্যের তিনটি শ্রেণী দাঁড়াল; প্রথম, অল্পকরণ-মূলক ট্রাজেডি এবং কমেডি, যাতে কবি গোপন থেকে কতকগুলি কল্পিত মানবচরিত্রের বার্তালাপ এবং কর্মের দ্বারা বস্তুব্যাকে পরিস্ফুট ক'রে তোলেন; দ্বিতীয়, কবি কতকগুলি ব্যাপারকে নিজের মুখে বর্ণনা ক'রে যান; এই শ্রেণীতে প্রাচীন কালের প্রাশস্তিগীতি (Dithyrambus), এবং আধুনিক কালের গীতিকবিতা এবং কাহিনী পড়তে পারে; তৃতীয়, মহাকাব্য যাতে কোথাও কোথাও নাটকীয় ভঙ্গীতে বার্তালাপও আছে, আবার কোথাও কোথাও কবির নিজস্ব বর্ণনাও আছে। আধুনিক গল্প-উপন্যাসও এই শ্রেণীতেই পড়ে। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কোন শ্রেণীর কাব্য উৎকৃষ্ট তা নিয়ে প্লেটো আলোচনা করেছেন। সে কথা পরে বলব।

কবি ভাষায় প্রকাশ করেন মানবজীবনেরই একটা প্রতিচ্ছবি বা অল্পকৃতি।

“Poetic imitation imitates men acting either voluntarily or involuntarily, and imagining that in their acting they have done either well or ill, and, in all these cases, receiving either pain or pleasure.”

কাব্যসাহিত্য সমালোচনায় নাটকীয় সাহিত্য এবং মহাকাব্যই বিশেষ ভাবে প্লেটোর লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয়। তাই তিনি উদ্ধৃত অংশে বলছেন যে কাব্যে কবি দেখান কতকগুলো মানুষকে যারা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কতকগুলো কাজ করে এবং তারা ‘ভাল করেছি,’ ‘মন্দ করেছি’ এই রকম মনে করে এবং সুখ কিংবা দুঃখ ভোগ করে থাকে। ফল কথা, কবি মানুষেরই বাস্তব জীবনের একটা অল্পকৃতি রচনা করে থাকেন।

এখানে প্লেটোর সমালোচনাটি লক্ষ্য করবার বিষয়। তিনি বলেন যে প্রাকৃত মানুষের প্রায় প্রত্যেক কর্মই নৈতিক দ্বিগোত্র। প্রত্যেক কর্মের মুখেই তাকে একটা দোটাটান পড়তে হয়; এক দিক থেকে বিচার এবং নিয়ম (সংযম) তাকে টেনে ধরে আন আর অন্য দিক থেকে প্রবৃত্তি তাকে দুর্দমনীয় প্রলোভন দেখিয়ে আকর্ষণ করতে থাকে। বিচার এবং জ্ঞান মানুষকে শাস্ত করে; জ্ঞানী মানুষের কর্ম বৈচিত্র্যহীন এবং সাধারণ মানুষের নিকট দুর্বোধ্য। কিন্তু প্রবৃত্তি তাকে মানুষের কর্মে আসে বহুল বিচিত্রতা, যদিও তা অমূল্যবান নয়। প্রাকৃতজন কিন্তু প্রবৃত্তিমূলক কর্ম দেখতেই ভালবাসে এবং কবিও তাই মানবাত্মার প্রবৃত্তি পরিচালিত বিচিত্র রূপ (the passionate and the multiform part of the soul) দেখাতেই চেষ্টা করেন। কবি মানুষের প্রবৃত্তিকে (যা বিচাবিবোধী) উত্তেজিত এবং পুষ্ট করেন আর বিচাববৃত্তিকে নষ্ট করেন। এই জন্যই কবি জীবনের অল্পকরণের দ্বারা এক ব্রহ্ম মিথ্যাকেই অল্পকরণ করেন। সুতরাং কবির রচনা আদর্শ মানব-সমাজের পক্ষে কিছুতেই কল্যাণকর হতে পারে না।

কি ট্রাজেডিজ, কি কমেডিজ—উভয় প্রকারের নাটকই যে মানুষের সত্যলাভের অন্তরায় তা প্লেটো যুক্তিপূর্ণভাবে দ্বারা প্রমাণ করেছেন। ট্রাজেডির লক্ষ্য হচ্ছে কোন

ভালমানুষের দুর্গতির অবস্থা দেখিয়ে আমাদের মনকে দুঃখের দ্বারা অভিভূত করা এবং হৃদয়কে কষ্টগ্রস্ত গুলিয়ে দেওয়া। প্লেটো বলেন, পবের দুর্দশায় দুঃখ করতে যদি আমরা অভ্যস্ত হই তা হলে নিজের দুঃখেই বা অভিভূত হবাব প্রবণতা হবে না কেন? অথচ দুঃখের দ্বারা অভিভূত হবাব সাধনা মানুষের নয়, মানুষের সাধনা হচ্ছে দুঃখকে জয় করবার।

কমেডির লক্ষ্য হচ্ছে হাস্যরসের সৃষ্টি করা; কোন-না-কোন মানুষের দ্বারা অসুস্থিত অসদাচরণের প্রতি সহানুভূতি না ঘটলে হাস্য সৃষ্টি হতে পারে না। পরের দ্বারা অসুস্থিত অবাস্তবীয় কর্মের দিকে তাকিয়ে এই যে আনন্দ উপভোগ, তা কখনও জীবনের আদর্শ হতে পারে না।

“It nourishes and waters those things which ought to be parched and constitutes as our governor those which ought to be governed in order to become better and happier.”—Republic Bk. X.

তবে কি প্লেটো কোন রকম কাব্যসাহিত্যেই প্রয়োজন স্বীকার করেন না? পূর্বেই যে তিন শ্রেণীর কাব্যের কথা বলা হয়েছে সেটা প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে, বিষয়বস্তু দিক থেকে নয়। প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে মহাকাব্য-শ্রেণীর রচনা যে মনোরঞ্জন করে এবং প্রাকৃত জীবনের অল্পকৃতিমূলক নাট্যসাহিত্য যে শিশু এবং জনসাধারণকে অত্যন্ত আনন্দ দেয় সে কথা প্লেটো মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তথাপি রিপাব্লিকের আদর্শ রক্ষার জন্য প্লেটোকে যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই এই সমস্ত কাব্যকে বর্জন করতে দেখি।

“But nevertheless let it be said that if any one show reason for it, that the poetry and the imitation which are calculated for pleasure ought to be in a well-regulated city, we for our part shall gladly admit them, as we are at least conscious to ourselves that we are charmed by them. But to betray what appears to be truth were an unholy thing.”—Republic, Bk. X.

কি করণ সভানিষ্ঠা!

প্লেটোর মতে যা-কিছু মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে অল্পকরণীয় নয়, নাটকেও তার অল্পকরণ কোন সং ব্যক্তিই

করতে পারে না। এই কারণে প্লেটো মহাকাব্যের পক্ষপাতী, কেননা মহাকাব্যের অধিকাংশই বর্ণনাত্মক এবং যেখানে আদর্শ আচরণের চিত্র থাকে তা যদি নাটকীয় ভঙ্গীতে রচিত হয় তা হ'লে তার অলঙ্করণ ক'রে কথক বা অভিনেতা সং ভাবের দ্বারাই অলুপ্তানিত হবেন। অলঙ্করণ যদি করতেই হয় ত সাহসী, সংযত, পবিত্র, স্বাধীনচেতা ব্যক্তির জীবনের অলঙ্করণই বাহ্যনীয় (Republic, Bk. III)।

প্লেটোর নিকট সাহিত্যের প্রকাশরূপ (form) বড় কথা নয়, সাহিত্যের বিষয়বস্তু বা ভাবই (thought) হচ্ছে প্রধান বিবেচনার কথা। সাহিত্যের ভাব প্রকাশের মধ্যে যে গুরুতর নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে সে-কথা প্লেটো কিছুতেই বিস্মৃত হ'তে পারেন নি।

ভাবাবেগ, প্রবৃত্তি এ সব জীবনে চাঞ্চল্য আনে, জীবনের সামঞ্জস্যকে নষ্ট ক'রে দেয়। প্লেটো যে গ্রীক ছিলেন সে কথা মনে রাখা দরকার। গ্রীকের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা প্লেটোর শিরায় শিরায়, কিন্তু তাই ব'লে তিনি সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাকে সামঞ্জস্যহীন, ছন্দহীন বিলাসে পরিণত করবার পক্ষপাতী খোটেই ছিলেন না। বুদ্ধিকে তাই তিনি জন্মের উপরে স্থান দিয়েছিলেন। এক দিকে তিনি যেমন সঙ্গীতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন এই ব'লে যে সঙ্গীতশিক্ষা হচ্ছে অত্যন্ত দরকার,

“...because that the measure and harmony enter in the strongest manner into the inward part of the soul, and most powerfully affect it, introducing decency along with it into the mind, and making everyone decent if he is properly educated, and the reverse if he is not.”—Republic, Bk. III.

তেমনি এ কথাও বলতে হয়েছে যে আমরা কখনও গায়ক হতেই পারব না যদি সংযম, ধৈর্য, উদারতা প্রভৃতি সদৃশ্য আমাদের মধ্যে না থাকে।

আর্টের সঙ্গে শিল্পীর চিত্তোৎকর্ষের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে ব'লেই প্লেটো মনে করতেন। গ্রীকশিল্পে আমরা যে পরম জন্মের সামঞ্জস্য, স্বযম এবং অচল স্থৈর্য্য দেখতে পাই তাহা গ্রীকচিত্তেরই উৎকর্ষের প্রতিচ্ছবি। প্লেটোর মতে শিল্পের রূপ, ছন্দ, সামঞ্জস্য শিল্পীর চরিত্রগত উৎকর্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

ভাবে সম্বন্ধ। যেখানে চরিত্রে নেই সামঞ্জস্য, নেই সম্বন্ধ, নেই চিন্তার স্পষ্টতা, নেই সংযম, সেখানে শিল্পহৃষ্টিতেও ছন্দহীনতা, রূপের অস্পষ্টতা, রচনাব সামঞ্জস্যহীনতা দেখা দেবেই।

“...and the impropriety, discord, and dissonance are the sisters of ill expression and ill sentiment and their opposites are the sisters and imitations of sober and good sentiment.”—Republic, Bk. III.

স্বব-মনের উপর সাহিত্যের প্রভাব গভীর ব'লেই প্লেটো ববি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের উপর এত কঠোর হয়েছিলেন। সমস্ত রকমের শিল্পীদের লক্ষ্য করেই তিনি বলেছেন,

“But we must seek out such workmen as are able by the help of a good natural genius to trace the nature of the beautiful and the decent that our youth dwelling as it were in a healthful place, may be profited at all hands; whence from the beautiful works something will be conveyed to the sight and hearing, as a breeze bringing health from salutary places, imperceptibly leading them on directly from childhood to the resemblance, friendship and harmony with right reason”—Republic, Bk. III.

চরিত্রের উপর শিবজন্মের এত বড় প্রভাব স্বীকার করছিলেন ব'লেই প্লেটো সঙ্গীতকেও এত বড় স্থান দি়েছিলেন; কিন্তু সঙ্গীতেও স্ববসম্বন্ধ এবং ছন্দ ছাড়া ভাবাবেগ (sentiment) ব'লে একটা বস্তু আছে। তাই এখানেও প্লেটো সেই সব ভাবাবেগ এবং তাদের প্রকাশক সুর এবং ছন্দকে বর্জন করবার কথা না ব'লে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত দুঃখের সঙ্গে প্লেটো কবিকে তাঁর নব সমাজ থেকে নির্বাসিত করতে বাধ্য হয়েছেন। একমাত্র ভগবৎ-স্তুতি আর সংকর্ষের প্রশস্তিকাব্য ছাড়া আর কোন কাব্যকেই প্লেটো অস্বমোদন করতে প্রস্তুত হন নি।

কোনও এক জন্মের পক্ষে একটি বিষয়কেও সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান কত কঠিন। অথচ কবিকে তাঁর কাব্যে, নাটকে কত রকমের চরিত্র এবং বিষয় নিয়েই আলোচনা করতে হয়, কত বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন বৃত্তির মাহুষেব জীবনকে অঙ্কিত করতে হয়। নানা বুদ্ধিপরিম্পরার সাহায্যে প্লেটো তাঁর ক্রিপবলিক গ্রন্থে কবির এই সমস্ত চেষ্টাকে মিথ্যা অলঙ্করণ

বলে প্রমাণ করেছেন এবং কবি যে কে-কোন বিষয়ে সত্যজ্ঞান-বর্জিত এবং কেবল বাহ্যিক ভাবের অনুকরণকারী তা দেখিয়ে কবিকে বর্জন করবার যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু প্লেটে মনে মনে কবির বচনকে এ রকম মিথ্যা মনে করড়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন বলেই মনে হয়। হোমারকে নিন্দা করেও তিনি মনে মনে হোমারের রচনায় মুগ্ধ ছিলেন এবং তা যে মিথ্যা জ্ঞানের ফল তাও স্বীকার করতে পারেন নি। প্লেটোর আয়ন (Ion) বা ইলিয়াড নামক কথোপকথন-নাট্য থেকে আমরা তাই তাঁর যুগে অল্প রকমের উক্তি পাই। এখানে তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যদিও কবি-পক্ষে নানা বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া প্রাকৃতিক উপায়ে অসম্ভব, তবু কবি যে দৈব শক্তির প্রেরণায় নানা বিষয়ে গভীর এবং

সত্য অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়ে থাকেন, তা প্লেটোকে স্বীকার করতে হয়েছে। তাই তিনি বলছেন,

“For the authors of those great poems which we admire, do not attain to excellence through the rules of any art but they utter their beautiful melodies of verse in a state of inspiration and, as it were, possessed by a spirit not their own.”—Ion.

“For a poet is indeed a thing ethereally light, winged and sacred, nor can he compose anything worth calling poetry until he becomes inspired, and, as it were, mad, or whilst any reason remains in him. For whilst a man retains any portion of the thing called reason, he is utterly incompetent to produce poetry or to vaticinate.”—Ion.

জলমিশ্রিত খাঁটি দুগ্ধ

শ্রী রামপদ মুখোপাধ্যায়

অনেক শহর এবং পাড়াগাঁয়ের জল-খাইয়া এমন এক জায়গায় বদলি হইলাম যেখানে পান করিবার মত ভাল জলও অপ্রাপ্য নহে।

নিত্যন্ত পাড়াগাঁ; মানুষের অপ্রাচুর্য ও বনের বিস্তৃতি প্রথম দর্শনেই মনকে ভয়ে ভরাইয়া তুলে। দশ মাইলের মধ্যে রেল-লাইন নাই, সপ্তাহে একদিন হাট বসে, হাই স্কুল বাইতে হইলে দেড়কোশব্যাপী প্রকাণ্ড এক মাঠ এবং মাইলব্যাপী বন পার হইয়াও নিস্তার নাই, সামনে এক নদী পড়ে; খেয়ার কড়ি দিয়া সেটুকু পার হইতেই হয়। অতঃপর এমন জায়গায় পোষ্ট আপিস আছে। এবং পোষ্ট আপিস আছে বলিয়াই এই কাহিনীর সূত্রপাত।

প্রথম হইতেই শুরু করি। চাকরি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বায়াবরবৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে, কোথাও একটা বছর ধীরেস্থানে বাস করিতে পাইলাম না। সম্মুখপানে সে অনবরত অগ্রসর হইবার তাগিদ দিতেছে; সেই তাগিদেই এক দিন এই

অখ্যাতনামা পল্লীতে আসিয়া পৌছিলাম। রেল-স্টেশন হইতে গল্পীর দূরত্ব দশ মাইলেরও বেশী। অবশ্য, গাড়াওয়ান বলিয়াছিল, ‘কোশ দুই, বাবু।’ সে কোশ অধিকাংশ স্থলে ‘ভালভাড়া’ হইতে বাধ্য। কোশ ‘ভালভাড়া’ হইলেও গাড়ীর ভাড়া ‘গিনিরোঁয়া’ হয় না, এইটুকুই বা সাঙ্গনা। শহরেব ‘পাথর-বগুয়া’ মাইলেব মধ্যে যে সাঙ্গনাটুকু নাই।

কিন্তু এই তেপান্তরের মাঠে এমন একখানি গো-যান যে মিলিবে এ ছরাশা স্বপ্নেও ভাবি নাই; কাজেই গাড়াওয়ানকে জিজ্ঞাসা কবিলাম, “তোমরা রোজ ট্রেনের সময় হাজির থাক বৃদ্ধি?”

গাড়াওয়ান হাসিয়া বলিল, “না বাবু, গাঙ্গুলী বাবু বললেন, ম্যাটের আসবে আজ, মধু তুই বা।”

সবিস্ময়ে বলিলাম, “কিন্তু আমি ত কাউকে আসবার কথা জানিয়ে চিঠি লিখি নি মধু?”

মধু পুনরায় হাসিয়া উত্তর দিল, “এজ্ঞে ঠাকুর যে মোদের
‘অন্তর্ধামিনী’। তিনি সব বুঝতে পারে।”

“কিন্তু তিনি কে — তাই যে জানি নে।”

“গেলেই জানতে পারবা, বাবু। তিনি না থাকলে গাঁয়ে
কেউ ভিষ্টতে পারতো! কত নেকানিকি করে ডাক
‘আপিস বসালে।’

মধুর বাক্যশ্রোতের মধ্যেই আমি সপরিবারে গো-যানে
চাপিয়া বসিলাম এবং আশু বিপদের দায় হইতে রেহাই
পাইয়া সেই ‘অন্তর্ধামিনী’ গাঙ্গুলী ঠাকুরের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা
জ্ঞানাইলাম।

* * *

গ্রামের প্রান্ত সীমায় ছেঁচাবেড়া দিয়া ঘেরা ছোট এক-
খানি বাড়ী। বাড়ীতে খান তিন চার কুঠরি আছে, সব
ক-খানিই খড়ের চালা। বাহিরের বড় ঘরখানিতে বসে
পোষ্ট আপিস, ভিতরের ছোট কুঠরি দুখানি মাষ্টারের বাস-
গৃহ অর্থাৎ কোয়ার্টার। চাকরি লইয়া অবধি বহু বানগৃহের
আশ্বাদ লওয়া গিয়াছে, হুতরাং চালা দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত
হইলাম না।

বাহ্যকে অবসর দিতে আসিয়াছি তিনি বাহিরের বড়
চালাখানিতে অর্থাৎ আপিস-ঘরে দড়ির খাটিয়ায় কাঁথা মূড়ি
দিয়া পড়িয়া ছিলেন। ভাত্র মাসে কাঁথামূড়ি দেওয়ার অর্থ
মফস্বলবাসীদের বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিতে হয় না।
ভাত্রলোক মাসের প্রথম হইতেই ‘সিক’ রিপোর্ট করার ফলে
মাসকাবারে ‘রিলিক’ আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

খাটিয়ার পাশে উঁচু টুলে যিনি বসিয়াছিলেন তিনিই
আমাদের ‘অন্তর্ধামিনী’ গাঙ্গুলী মহাশয়। বয়স ৫৫।৪৬,
চেহারার জোলুখ আছে। ফরসা এবং গোলগাল। স্থূল-
হেতু খর্বাকৃতি। মাথায় টাক এবং মুখে হাসি; লোকটি
সৌম্যদর্শন।

আমাকে দেখিয়াই চিনিলেন এবং স্বস্তকর সলাটে
ঠেকাইয়া বলিলেন, “নমস্কার। পথে অনেক কষ্ট হয়েছে
নিশ্চয়, কিন্তু উপায় কি বলুন?”

পরে গো-যানের পানে চাহিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,
“পরিবার নিয়েই এসেছেন? বেশ, বেশ। যান, ওঁদের
বাড়ীর ভেতরে যেতে বলুন। এঁর কেউ নেই,—ব্য:চিলায়

কিনা। তাই দেখুন না, নিজে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিন-
রাত রুগীর পাশে বসে আছি। এদিকে আপিসের কাজ
তাও আমার করতে হয়। বিদেশবিকৃতি—আমরা না
দেখলে কে দেখে বলুন?”

প্রথম দর্শনেই লোকটির উপর শ্রদ্ধা হইল। বিদেশে এত
বড় সাহায্য ঈশ্বরের দয়া ছাড়া মেলে না। এই রুগ লোকটির
সেবা যত না হউক, পোষ্ট আপিসের কাজগুলি সারিয়া দিয়া
উঁহার ভবিষ্যতের ভাবনাটুকু যে দূর করিয়া দিয়াছেন সে-
জন্ত ভাবায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা চলে না। রোগ দু-দিন
পরে সারিয়া যাইবে, কিন্তু চাকরি গেলে ইহজীবনে সে-খন
আর মিলিবে না।

নমস্কার করিতেই হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিলেন, “থাক,
ভায়, থাক। ওরে বিন্দু, বিন্দু, বৌমাদের বাড়ীর ভেতর
নিষে যা। হাতমুখ ধোবার জল তোলা আছে ত? ঘর-
ঘোর সব দেখিয়ে দে। আর দেখ, চট করে রাখু ঘোষকে
খবর দে—সেরটাক দুখ এখনই চাই। ছোট ছেলে রয়েছে,
দুখ না হলে ত চলবে না।”

বিন্দু মেয়েদের ঘরদোর চিনাইয়া দিয়া দুখের খোজ
গেল। গাঙ্গুলী আমাকে বলিলেন, “এক ঘণ্টা পরে আপিস
খুলবে। তুমি তাই হাত মুখ ধুয়ে কিছু জলটল খেয়ে
এখানে এসে বস। আমি ততক্ষণে একে টেশনে পৌঁছে
দেবার ব্যবস্থা করি। এই গাড়ীতে না গেলে ট্রেন ধরতে
পারব না।”

রুগ ব্যক্তি হাত নাড়িয়া বলিল, “চার্জ বুঝিয়ে দিতে
হবে।”

গাঙ্গুলী হাসিয়া বলিলেন, “চার্জ! বলে আপনি বাচলে
বাপের নাম! এই যে ক-দিন বেহঁস হয়ে পড়েছিলে—
চোরডাকাতে সব লুটেপুটে নিলে কি করতে? কাকে
বুঝিয়ে দিতে চার্জ? ভারি ত পাঁচ সিকের হিসেব, তার
আবার বুঝিয়ে দেখা? নাও, চটপট সই কর, তুমিও সই
কর ভায়া। ফিরে এসে আমিই বুঝিয়ে দেব চার্জ—সিন্দুকের
চাবি আমার কাছেই রইল।”

গাঙ্গুলী মহাশয় রোগীকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন,
আমি এখার ওখার ঘুরিয়া ডাকঘরের সম্পত্তি দেখিতে
লাগিলাম।

যে-ভ্রমলোক অফিসের চার্জে ছিলেন তিনি কখনও বলিয়াই ঘরখানিতে বিশৃঙ্খলা বর্জন্য। পূর্বে কোণে জুপাকৃতি ফর্ম এবং তার গায়েই অনেকগুলি ব্যাগ। এখানে-ওখানে গালা ও বাতির টুকরা ছড়ানো, সিল-মোহর মেঝের গড়াগড়ি খাইতেছে। টেবিলটার উপর কালির দোয়াতটা উন্টানো এবং একমাত্র ব্লটিংখানির কোথাও সাঁদা রং নাই। ঘরের ঘড়িটা দম দেওয়ার আলস্ত হেতু বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মেঝের পোতা লোহার সিঁদুকটা যে আছে উহাই যথেষ্ট।

বাড়ীর মধ্যে না গিয়া এইগুলির শৃঙ্খলাবিধানে মনোনিবেশ করিলাম। টানা-ভ্রমার খোলাই ছিল, টানিয়া দেখিলাম—খাম, পোষ্টকার্ড ও টিকিটগুলির মধ্যেও যথেষ্ট গোলমাল। উহারই মধ্যে খানকতক মনিঅর্ডারের ফর্মও গৌড়া রহিয়াছে। একখানি ফর্মে চক্ষু বুলাইতেই সক্ষু আমার কপালে উঠিল। আনাড়ী গাঙ্গুলী করিয়াছেন কি? তিন দিন আগেকার ফর্মগুলি ডেসপ্যাচ করেন নাই। আর মনিঅর্ডারের মাণ্ডল বা লইয়াছেন তা পোষ্ট আপিসের কোন আইনেই লিপিবদ্ধ নাই। জিগ টাকার মাণ্ডল লইয়াছেন চার আনা—দশ টাকার এক আনা। খাম, পোষ্টকার্ড ও টিকিট বোধ হয় শাক-বেগুনের মতই বেচিয়াছেন। ছোট খাতায় কোন হিসাব পর্যন্ত নাই।

কিন্তু সেজন্য ভ্রমলোককে দোষ দেওয়া চলে না। পরের হইয়া খাটিয়া চাকরিটুকু যে বজায় রাখিয়াছেন এই যথেষ্ট। যথাসময়ে ভাক চালান দিয়াছেন ও বিলির যবস্থা করিয়াছেন, জিনিষ কিনিতে আসিয়া কেহ খালি গতে ফেরে নাই বা মনিঅর্ডারে ব্যর্থমনোরথ হয় নাই। এমন করিয়া হউক, অভিযোগ তাহাদের মিটাইয়াছেন।

জমার খাতা ও মজুত মালে মিলাইয়া এক টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনা কম হইল, মনিঅর্ডার কমিশনেও এক টাকা শর্ট। এই ত গেল মোটামুটি হিসাব। লোহার সিঁদুক না খুলিলে ক্যাসের ভাগ্যে কি আছে কে বলিবে? অল্প মাহিনা, ফাজেই চিন্তিত হইয়া পড়িলাম।

এমন সময় ছেলে আসিয়া ভাকিল, “বাবা, গল্পা এসেছে।”

ঘরের ছয়ার বন্ধ করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

* * *

আমাকে দেখিয়া গল্পা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। লোকটির বয়স হইয়াছে। গলায় ত্রিকঙ্গী তুলসীর মালা, কপালে ও কানে ছোট কয়েকটি কোঁটা, বেশ ভক্তিমান। বলিল, “দুধ বা দেব বাবু এ তল্লাটে কোথাও এমনটি পাবেন না। খেঁড়ো গাইয়ের দুধ—খেতে যেন মধু। যতটুকু খাবেন খোকার, ততটুকু রক্ত বাড়বে। কিন্তু দামের বেলায় বাবু, পাঁচ সেরের বেশী হবে না।” শহরে টাকায় তিন সের দুধও কিনিতে হইয়াছে, পাঁচ সেরে আপত্তি করিব কেন?

বলিলাম, “দেখি তোমার দুধ?”

গোয়লা হাসিমুখে ভাঁড় তুলিয়া ধরিল।

কিন্তু ভাঁড় নাড়ানাড়িতে দুধে যে কেনা জমিয়াছে তাহাতে ভেজাল কিছু বোঝা গেল না, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়াই রহিলাম।

ঘোষের পো খপ করিয়া আমার ডান হাতখানি টানিয়া ভাঁড়ের মধ্যে চুবাইয়া দিল এবং হাসিমুখে কহিল, “দেখ বাবু।”

সাদা হাত দেখিয়াও এইটুকু বুঝিলাম, দুধ খাটি হইতে পারে কিন্তু একটু বেশী মাত্রায় তরল যেন। সে-কথা বলিলাম।

ঘোষের পো বলিল, “ওই ত বাবু খেঁড়ো গাইয়ের মজা। দুধ গাভলা অথচ খেতে মিষ্টি। আপনারা দেবতা, আপনাদের কি ঠকাতে পারি! রাম! রাম! সে ব্যবসা আমার দ্বারা হবে না। এতে যদি দু-বেলা পেট ভরে না জোটে, নাই জুটল। দুধে জল দিলে কি হয় জানেন? গাময় দুধের রংই বার হয়। রাম! রাম! ধম্পথে থাকলে আদ্যেক রাত্রিরে ভাতের ভাবনা? রাখে কৃষ্ণ।”

জুতরাং রাধু ঘোষই বাহাল হইল।

* * *

গ্রামখানি ছোট হইলেও পোষ্ট আপিসে ভিড় নেহাৎ মন্দ জমে না। একমাত্র পিওন বিপিনকে খাম-পোষ্টকার্ডের বাজ সাঙ্গাইয়া দিয়া বলিলাম, “বাইরে বসে বেচ গে।”

বিপিন খুশী মনে বলিল, “এ-কদিন গাঙ্গুলী ঠাকুর বাক্সোয় হাত দিতে দেয় নি, আর খন্দেবের সঙ্গে কি দর-কষাকষি। যেন কোঠার (পাটের) বাজার পেয়েলেন। আরে কোম্পানী আইন করেছে—এক পয়সা কম হ’লে রক্ষে আছে! হ’লও তেমনি, লাভের গুড় পিঁপড়ের খেলো। আজ আট বছর পিওনি করছি—হ্যাঁ, লেখাপড়া জানলেই আর এ-কাজ করতে হয় না।”

এ-বেলার কাজ এক রকমে চলিয়া গেল, গাঙ্গুলী মহাশয় আসিলেন না। লোহার সিন্দুকটা একবার খুলিয়া জিনিষ-গুলি মিলাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতাম।

বৈকালে পোষ্ট আপিস বন্ধ করিব কিনা ভাবিতেছি এমন সময় হাসিতে হাসিতে গাঙ্গুলী আসিলেন ও আপন স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট স্বরে বলিলেন, “ছুটোয় ফিরে ওবেলা আর আসতে পারলাম না, ভাই। বুড়ো মানুষ, চারটি না-থেকে ও একটু না-মুন্ডিয়ে—তার ওপর দু-দিন রাত জাগা...তা ভায়া, কাজকর্মের অহুবিধা কিছু হয় নি ত? হবে কোথেকে, শুছিয়েই ত রেখেছিলাম সব।”

একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম, “না তেমন অহুবিধে কিছু হয় নি—কেবল—”

গাঙ্গুলী খাস্ত হইয়া বলিলেন, “হা, ভাল কথা। রাধু ঘোষ দুখ দিয়ে গেছে ত? বাজারহাটের অহুবিধা—”

“আজ্ঞে, সে সব কিছু হয় নি। কেবল পোষ্ট আপিসের ক্যাশ—”

গাঙ্গুলী পরম নিশ্চিন্তের মত হাসিলেন, “আরে রায় বল—ক্যাশ! তোমাদের পোষ্ট আপিসের ছোকরাদের ওই এক ভাবনা—ক্যাশ! ভাবি ত ন-শ পঞ্চাশ টাকা আছে সিন্দুকে—কেবল ভাল তুলে হাতব্যথাই সার। শোন ভবে। সে-বার সদব জেলায় খুলল কৃষিপ্রদর্শনী। আমাদের গা থেকে চাষারা আমায় করলে প্রেসিডেন্ট। ভাল ভাল জিনিষ খুঁজে-পেতে পাঠানো গেল তাতে—আর চাঁদা যা উঠল তাও জমা রইল আমার কাছে। বড় কম টাকা নয়, তিন-শ কুড়ি টাকা ন-আনা দেড় পয়সা। একজিবিশন শেষ হয়েছে আজ তিন বছর—টাকা আমার কাছে এখনও জমা আছে। তার হিসেব রাখতে হয় আমাকে, জান?”

গাঙ্গুলী যেন দম-দেওয়া গ্রামোফোন; কোন বিষয়ের কিছু পাইলেই হইল, শেষ বক্তব্য না বলিয়া থামিবেন না।

কিন্তু আমি কথার স্রোতে খেই হারাইলাম না। ক্যাশ ন-শ পঞ্চাশ টাকার না হইলেও দামিষ যথেষ্ট। পোষ্ট আপিসের সারপ্রাইজ ভিজিটের ঠেলা কল্পে জানি, একটি পয়সার ঘাটতি হইলে জেলখানার দরজা আপনা হইতে ফাঁক হইয়া যায়।

বলিলাম, “সে জ্ঞান নয়। আপনি কাজ করেছেন পরের উপকারই করেছেন, কিন্তু মনিঅর্ডারের ফী কিছু কম নিয়েছেন।”

পরম বিন্ময়ে চক্ষু কপালে তুলিয়া গাঙ্গুলী বলিলেন, “আ, বল কি! কম নিয়েছি ফী? আরে, মাষ্টার হোকরা যে শুয়ে শুয়ে আমায় সব ব’লে দিত। হা আমার কপাল! জরের ঘোরে মানুষের এমন ভুলও হয়।” সভ্য সভ্যই তিনি কপালে করাঘাত করিলেন।

বিরত হইয়া বলিলাম, “আহা-হা! আপনার বোষ কি! আপনি কি জানেন ওর। ও সামান্ত পয়সা, ওতে কিছু যাবে আসবে না। তা ছাড়া ধাম-পোষ্টকার্ড বিক্রীর পয়সাও কিছু কম পড়েছে।”

“অবে ত ভাল করেই পিণ্ডি চটকেছি দেখছি। হা তোর বরাত! চাষাদের হয়ে একজিবিশনে গিয়েও অমনি ভুল ক’রে মরেছিলাম। যে হৈ-হৈ হট্টগোল—আলো, বাজনা, নাচ, গান, খন্দেরের ভিড়—দশ-দশটা টাকা পকেট থেকে দিলাম গুনাগার, তার পর মরি কেঁদে। চাষারা বলে—কাঁদ কেন দেবতা, দশটা টাকা বইত না।...আবার বলতে হুঃখুঃ হয়, হাসিও পায়—ওই যে টাকা জমা আছে আমার কাছে প্রত্যেক মাসে ওর স্বদ কেলে দিই কিনা। প্রায়ই ভুল। ছ-আনার জায়গায় দিয়ে বসি দশ আনা, পোনে হয়ে যায় চোক। তা ভায়া, কত গরমিল হ’ল?”

“বেশী নয়—প্রায় গোটা-তিনেক টাকা।”

গাঙ্গুলী পুনরায় কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, “এ ত গেল তিন দিনের ক্যাশ—যা ডুয়ারে ছিল। আরও সাত দিন পিণ্ডি চটকেছি যে। খোল, খোল, ভায়া সিন্দুব তোমার ক্যাশ মেলাও ত। ক্যাশের যে এত হাঙ্গাম ত কে জানত!” বলিয়া বৃহৎ চাবিটা ঠকাস করিয়া টেবিলের

উপব রাখিলেন। হিসাবে গাঙ্গুলীর তুল হয় নাই, সমস্ত মিলাইয়া পুরাপুরি দশটি টাকাই কম হইল। গাঙ্গুলী সেই যে হাঁ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, পোষ্ট আপিসেব বাতি না নিবানো পর্যন্ত রাম গঙ্গা কিছুই বলিলেন না। বাতি নিবাইয়া তাঁহাকে ডাকিবামাত্র প্রচণ্ড এক দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ভয়কণ্ঠে বলিলেন, “কি হবে, ভায়া?”

বলিলাম, “ক্যাশ পূরণ করে রাখতেই হবে—যেমন ক’বে হোক।”

গাঙ্গুলী হতাশার ভঙ্গী কবিয়া বলিলেন, “তাই ত! এই রাত্তিরে কার কাছে হাত পাতি বল? এক-আধটা নম্র, দশ-দশটা টাকা।”

পবেব উপকার করিতে গিয়া ভদ্রলোকের এই দুর্গতি। ঘাটতির কথা জানাইয়া নিজেই আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেল। এমন উপকারী বন্ধু না বলিতে তেপান্তরের মাঠে যিনি গরুর গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন, পাছে কোন অসুবিধায় পড়ি এই জন্ত ঘরদুয়ার সাফ করাইয়া, ঝির ব্যবস্থা করিয়া, গয়লা ডাকাইয়া, আনাড়পাতি চাল-ডাল কাঠকুটা কিনিয়া আত্মীয়ের অধিক পরিশ্রম করিয়াছেন,—সামান্য কয়টা টাকার কথা। তাঁহাকে না জানাইলেই যথেষ্টোচিত কাজ হইত।

তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলাম, “আপনি কিছু ভাববেন না, আমার কাছে যা আছে দিয়ে ঘাটতি পুরিয়ে রাখব—পরে ও-ভদ্রলোকের কাছ থেকে চেয়ে নিলেই হবে। আমাদের কাজের গলতিতে আপনি কেন ‘সাক্ষার’ করবেন?”

গাঙ্গুলী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, না, দোষ ত আমারই। না জেনে সব কাজে যেমন এগিয়ে যাই, তেমনি ফলও ফলে হাতে হাতে। অথচ লোকসান হবে—জেনেও কারু ছুৎ-কষ্ট দেখলে মনটা আমার বোঝে কই? যাই হোক ভায়া, আজ তুমি দাও, যেমন ক’রে পারি ও-টাকা আমি শুধবই। বোগা লোককে চিঠি লিখে এ-বিষয় না জানানোই ভাল।”

“আপনি কেন দেবেন?”

তিনি খপ্প করিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, “ধর্মতঃ এ দায় আমারই। না জেনে আঙুনে হাত দিলে হাত

কি পোড়ে না, ভায়া? পোড়ে। তেমনি না বুঝে লোকসান যদি ক’রে থাকি, সে দায় আমার। থবরদার কথাটি কয়ে না। এই পৈতে ছুঁয়ে বসছি,—এ দায় আমার, আমার, আমার। এ লোকসন আমাকেই পোষাতে হবে, না হ’লে ধর্মের কাছে আমি খাটো হয়ে যাব যে ভাই। তবে দু-দিন দেরি হ’তে পারে।”

পর্যর্থে অমানবদনে ক্ষতি স্বীকার কবিয়া এক মুহূর্তে গাঙ্গুলী আমার কাছে দেবতা হইয়া গেলেন।

হঠাৎ তাঁহার পায়ে হাত দিতেই তিনি আমাকে বুক জড়াইয়া ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে যুহু ভৎসনা বরিয়া কহিলেন, “পাগল।”

* * *

পরের দিন গাঙ্গুলীবাড়ী হইতে বড় এফটা বারকোশে কবিয়া যে সিধা আসিল তাহা আমাদের ক্ষুদ্র সংসারের চাব দিনের খোরাক, এবং তার পর উপযুক্ত পরি কয় দিনই গাছেব লাউ, কুমড়ার ভাঁটা, পুঁইশাক, পুকুরের মাছ, গরুর দুধ, এমন কি এক দিন মাসও আসিয়া হাজিব। আপত্তি বুধা।

গাঙ্গুলী যুহু ভৎসনা করিয়া বলিতেন, “তি বলব, আমার যদি একটা ছোট ভাই থাকত ত এমন আপত্তি কবত না। আপত্তি করলেই মনে হয়, যাকে আপন কবতে চাই—সে দুবে সরে দাঁড়ায়।”

কথামুখে দুটি চোখ তাঁহার অশ্রুত-রাক্ষাস হইয়া উঠিত, কোঁচাব খুঁটে চোখ ঢাকিয়া তিনি খানিক চুপ করিয়া থাকিতেন।

ইহার পর যাহার এতটুকু জ্বদয় আছে সে কি অযাচিত উপঢৌকনে কোন আপত্তি তুলিতে পাবে?

গ্রামের অধিকাংশই চাষাভূষা—লোকগুলি সরল। খাম-পোষ্টকার্ড কিনিতে আসিয়া বা মনিঅর্ডার ও পার্সেল করিতে আসিয়া তাহাদের গ্রাম্যমূল্য কথাবার্তায় বড়ই আমোদ উপভোগ করিতাম।

এক দিন বিপিনের অসুখ হওয়াতে নিজেই খাম-পোষ্ট-কার্ডেব বাস্স লইয়া বসিয়াছিলাম। অশ্ববুড়ো-গোছের একটি লোক একটা টাকা ফেলিয়া দুখানি পোষ্টকার্ড চাহিল। পোষ্টকার্ড ও পয়সা ফেরত দিতেই লোকটা সিকি দুখানি-

গুলি গুলিয়া বাজাইয়া লইল; পয়সার এ-পিঠ ও-পিঠ দেখিল এবং আমার দিকে চাহিয়া কি কেন বলিবার চেষ্টাও করিল।

মাথা তুলিয়া তাহার বিশ্বয়ভাব লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিলাম, “কি গো মোড়লেব পো, দাঁড়িয়ে কেন? পয়সা মিলেছে ত?”

সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “এজ্ঞে না কর্ত্তা, এই তিনটে পয়সা বেশী দিচ্ছে আপনি।” বলিয়া হাত বাড়াইয়া পয়সা তিনটি আমার টেবিলেব উপর রাখিল।

সবিস্ময়ে বলিলাম, “না হে কর্ত্তা, তোমারই ফুল। দুখানা কার্ডেব দাম ছ-পয়সা কেটে নিয়ে সাড়ে চোদ্দ আনা ফেরত দিয়েছি তোমাকে।” কথাশেষে পয়সা কয়টি তাহাকে ফেরত দিলাম।

সে অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিল, “বল কি বাবু, এবার খান-চালের দর কমেছে বলে কোম্পানী বুঝি কার্টেব দর ছত্তা (সত্তা) করেছে?”

হাসিয়া বলিলাম, “না কর্ত্তা, ও-দাম শীগ্গির কমে না, বাড়ে না। অনেক বছর ধরে এই দাম চলছে।”

সে খানিকক্ষণ অবাক হইয়া আমাব পানে চাহিয়া বলিল, “তবে যে গাঙ্গুলী ঠাকুর সেদিন বললে, একখানা কার্ট পাঁচ পয়সা—দুখানা ন-পয়সা?”

“তিনি বুড়ো মানুষ, জানেন না, কি বলতে কি বলেছেন।”

“তাই বটে। বড় ভাল মনিষি গো। ঠাকুর না থাকলে মোদের গেরামের যে কি অবস্থা হ’ত।”

প্রফুল্ল মনে সে চলিয়া গেল।

মনি-অর্ডারের কমিশন দিয়াও অনেকে বিস্মিত ভাবে আমাকে প্রশ্ন করিল, কোম্পানী কবে হইতে গরিবের মুখ চাহিয়া দাম কমাইয়াছেন এবং খান পাট চাল প্রভৃতির মূল্য হ্রাসের সঙ্গে ইহার কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না?

সকলকেই এক উত্তর দিলাম এবং কাহ্নাশেষে মনের মধ্যে অল্প একটু মেঘ আসিয়া জমিল। দশ দিনের হিসাবে গাঙ্গুলী যে গোলমালটুকু করিয়া বসিয়াছিলেন, ইহাদের কথা হইতে বোঝা যায়, তাহাতে ক্যাশ শর্ট পড়িবার কথা নহে, উপরন্তু অনেক বাড়িবার কথা। অজ্ঞতাবশতই

যে গাঙ্গুলী এইরূপ হিসাবের গোলমাল করিয়াছেন তাহা ত মনে হইতেছে না। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে সে-কথা তাঁহাকে জানাইলাম।

তিনি, অভিযোগ গুলিয়া খানিক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে আপন স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া বলিলেন, “মুখ্য ব্যাটারী বলেছে বুঝি ওই কথা? হা আমার কপাল! আমি বলে কোথায় দু-আনার জায়গায় চার পয়সা নিয়ে ক্যাশের গিণ্ডি চট্টকেছি! বলি, আহা গরিব মানুষ দিক দু-পয়সা কম—দয়া ধর্ম্ম করতে গিয়েই ত তোমার কাছে দেনদার হয়েছি, ভায়া। আর ওবা বলে গাঙ্গুলী ঠাকুরে নিয়েছে? হাত্তোর কলিকাল রে।”

অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, “না, না, তা বলে নি ওরা। ওরা জিজ্ঞাসা করছিল—খান-চালের দর কম হওয়াতে খাম-পোটকার্ডের দাম কমেছে বুঝি?”

গাঙ্গুলী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

“বলছিল বুঝি? মুখ্য ব্যাটারী। বললে না কেন, হা কমেছে। চাষার বুদ্ধি কি না, মহাজনে জোঁকের মত রক্ত চুষে খাচ্ছে—টাকায় দু-আনা স্বদ—আর খাম-পোট-কাডে’ ছুটো একটা পয়সা দিতে মাখায় বাজ পড়ো। হাত্তোর ভালমানুষের নিকুটি করেছে। নিতে হয়, দু-পয়সা বেশী ক’বে আদায় করাই উচিত। এই আগিস-বসানোর কম পবিত্রম—কম ধরচ! কত কলম ভেঙেছে, কালি ফুরিয়েছে, কাগজ কিনতে হয়েছে? জানে ওরা? হাড়হাবাতে মুখ্য চাষার দল জানে সে-সব কথা?”

গাঙ্গুলীর অহৈতুক হাসি ও অকারণ ক্রোধ দেখিয়া আমি বিব্রত হইয়া পড়িলাম। কহিলাম, “বাই বলুন, বড় সরল ওরা।”

গাঙ্গুলী স্বতপুষ্ট পাবকলিখার মত দপ করিয়া জলিয়া উঠিলেন, “সরল! ভারি সরল! দেখ নি ত ভায়া জমিদারেরা খাজনা দেবার সময়! অন্মনবদনে মিথ্যে কথা বলে, কাছার খুঁটে টাকা লুকিয়ে কাছা জুড়ে দেয়, ভাগের জমি থেকে রাতারাতি খান সরিয়ে গোলা ভর্ত্তি কবে। নিমকহারাম বেইমান সব।” রাগ করিয়া গাঙ্গুলী উঠিয়া গেলেন।

* * *

গাঙ্গুলী ত রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন, বাড়ীর মধ্যে গিয়া

দেখি, সেখানকাব আকাশেও মেঘ যথেষ্ট। গৃহিণী আসনশিঁড়ি হইয়া বসিয়া ছোট ছেলোটিকে দুধ খাওয়াইবার জন্ত কুস্তি-কসরৎ করিতেছেন। দামাল ছেলে হাত-পা নাড়িতেছে আর নবোদগত চারিটি দাঁতে মাড়ি চাপিয়া দুগ্ধপানের প্রবল আপত্তি জানাইতেছে, কিছুক দিয়া গাল ফাঁক করিয়া দুধ খাওয়াইবাব মুহূর্ত্তে চীৎকারও যা করিতেছে তাহাতে ব্রহ্মবন্ধু বিদীর্ণ হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। আমাকে দেখিয়া কিছুক ফেলিয়া ছেলের পিঠে ছুঁম করিয়া একটি কিল বসাইয়া গৃহিণী মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, “যেমন হতচ্ছাড়া ছেলে তেমন তোমার রাথু গয়লাব দুধ! ছেলে বাবে কোন্ স্বাদে?”

কচি ছেলের জিহ্বা যে এতটা স্বাদ বোঝে তাহা জানিতাম না। কিন্তু সেজন্ম ততটা আশ্চর্য্য বোধ না করিলেও দুধের ভেজাল অপবাদ আমাকে কম আশ্চর্য্য করিল না। গৃহিণী বলেন কি! রাথু ঘোষ—গলায় যার তিন থাক মোটা তুলসীর মালা, মুখে যার ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ছাড়া কথা নাই, যার খেঁড়ো গাইয়ের পাতলা দুধ চিনিব পানার মত মিষ্ট...না, বেশী করিয়া জল মিশাইয়া গৃহিণীই হয়ত এই বিলাট বাধাইয়াছেন। সত্য সত্যই বলিয়া ফেলিলাম, “খোকার দুধে আজ বেশী জল দিয়েছ বোধ হয়।”

“হাঁ তোমার রাথুব কল্যাণে জল আর দুধে ঢালতে হয় না। মুখপোড়া বাতাসা মিশিয়ে দুধ মিষ্টি ক’বে রাখে। যেমন মুখ মিষ্টি, তেমন মিষ্টি জলো দুধ। মরণ!” কিন্তু অভিযোগ বুঝা।

রাথুকে ছাড়াইয়া আর যাহাকে রাখিব সে যে আধ সের দুধে আধ সের জল মিশাইবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি! এই ছোট্ট গাঁয়ে অনবরত গয়লা বদল করিবার সুযোগই বা কই? শেষে দু-চার জন মিলিয়া ধর্ম্মঘট করিলে যেটুকু সাদা রং মিলিতেছে তাহারও দক্ষা শেষ! যাহা হউক, গাঙ্গুলীকে বলিয়া কাল ইহার প্রতীকার হয় কিনা দেখিব।

চিন্তিত মনে ঘরের মধ্যে ঢুকিতেই কাপড়ের খন্ খন্ শব্দ কানে গেল। খান কাপড়ের আধ-ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় এক জন মহিলা মেঝের উপর বসিয়াছিলেন, আমাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া হয়ত তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

প্রথম দৃষ্টিপাতে চোখে পড়িল, তিনি ঈষৎ স্থূলকায়া এবং অপরিচিতাও বটে।

পিছাইয়া আসিতেছিলাম, মহিলাটি যত্নস্ববে কাপড়ের খসখসানি চাপা দিয়া কহিলেন, “একটু শিড়াও, বাবা, একটু কথা আছে।”

দাঁড়াইতে হইল।

বলিলেন, “ভূদেব তোমাব সঙ্গে খুব মেশামিশি কবে দেখতে পাই, তাকে আমার হয়ে একটি কথা জিজ্ঞেস করবে, বাবা?”

“কে ভূদেব, জানি না ত।”

“ওই যে থাকে তোমরা গাঙ্গুলী মশায় বল। তাকে একবার জিজ্ঞেস ক’রো তো বাবা, আর কত কাল হা-পিত্যেশ ক’রে বসে থাকবো? তিন বছর হয়ে গেলে হাতচিঠি তাঁবাদি হয়ে যাবে যে। আমি বিধবা মানুষ, আদালত কোন্ মুখো কখনও দেখি নি, তিনি ভাল চান ত এক মাসের মধ্যে টাকাটা যেন ফেলে দেন। বলবে ত, বাবা? একটু থামিয়া বলিলেন, “আর টাকা যদি না-ই দিতে পাবে হাতচিঠি যেন বদলে দেয়। আজ নয়, কাল নয়, এখন মেয়েব অস্থখ, তখন জামাই মব মর, ও-সব কথা আর কত দিন শুনব? আমায় ত কেউ উপায় ক’রে দিতে নেই।”

মহিলাটি চলিয়া গেলে জীকে জিজ্ঞাসা করলাম, “ব্যাপার কি?”

জী বলিলেন, “মেয়ের বিয়ের সময় গাঙ্গুলী মশায় ঠর কাছ থেকে টাকা ধার করেন, আজও শুধতে পারেন নি। উনি ত বলেন বুড়োর টাকা আছে, না শোধবার মতলব। নইলে দোতলা ঘব উঠছে, পুকুর কাটানো, বাগান তৈরি, যেনো জন্মি বচ্চক রাখা—কোনটা না করছেন, যত বায়নাকা টাকা শোধ দেবার বেলায়? কি জানি বাপু, তোমাদের কাণ্ড! মেয়েমানুষের টাকা কেলে দিলেই ত লোটা চুকে যায়।”

পরের দিন সকালে সে-কথা গাঙ্গুলীকে বলিতেই তিনি হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “কাগজে হুদখোর মহাজনের যে-সব কীড়িকানী বেরায় তা সত্যি কি মিথ্যে আপন চোখে পরখ কর, ভাই। ভাল লোকেরই মরণ! কেন দোতলা ওঠে সে-খবর লোকে জানবে

কোথেকে। জামাই বাড়ী এলে শুতে দেবার একখানা ঘর নেই, তাই ধারের ওপব ধার ক'রে ঘব তুলতে হয়েছে। লোকে পুকুর কাটানো, বাগান কেনাই দেখে, ভেতরের খবব ত রাখে না। এই যে আজ সাত সকালে তোমাব কাছে ছুটে এলাম কেন? জামাই মাস্থানেক ধ'রে ভুগছেন, রোগ কি ধরা পড়ে না, অথচ দিন দিন শুকিয়ে সলতেটি হয়ে যাচ্ছেন। শহর থেকে ভাল ডাক্তার না আনাতে মেয়েটা সারা জন্ম ঘাড়ে পড়বে। তাও শাক-ভাত বা জোটে তাই না-হয় দিলাম, কিন্তু মনের কষ্ট? সে কি যুচবে সারা জীবনে? তাই ত ভায়া, তোমার কাছে এলাম, দশটা টাকা আমার চাই, আসছে মাসের পয়লাই দিয়ে দেব।”

বলিতে বলিতে তিনি খপু করিয়া আমার হাত ধরিয়া ঝব ঝব করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। ‘না’ বলিবার কোন পথই আর রহিল না।

* * *

কিন্তু আশ্চর্য—সেই দিন হইতে গাঙ্গুলী মহাশয়ও বিরল হইয়া উঠিলেন। না বলিতে দশবার আসিয়া যিনি তত্ত্ব-তন্মাস করিতেন, তামাকের ধোঁয়ায় আর খোসগন্ধের ঠাসবুনানিতে যিনি পোষ্ট আপিসের ঘর সর্কক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেন—এই কম দিন অল্পপস্থিতিতে তাঁহাকে বেশী করিয়াই মনে পড়িল। ফাঁকা জীবনের পক্ষে তাঁহার সাহচর্য্য যে কত প্রয়োজন, সে-কথা বলিই বা কাহাকে? ভাবিলাম, রুগ্ন জামাইয়ের সেবাপ্রসঙ্গ লইয়া ভ্রমলোক হস্ত বড়ই বিরত হইয়া পড়িয়াছেন,—একবার সন্ধান লইতে দোষ কি।

সন্ধ্যাবেলায় কাজ শেষ করিয়া জলযোগ করিয়া হারিকেন জ্বালাইয়া গাঙ্গুলীবাড়ীর উদ্দেশেই চলিলাম। বাড়ীর সামনে খানিকটা ফুলের বাগান, খানিকটা ফলের। চীনা-জুই গোলাপের মাঝখানে লাউভাঁটা দিবা লতাইয়া চলিয়াছে, মরগুম্বী ফুলের পাশে পালঙ থাকের ক্ষেত, স্বর্ঘ্যমুখী ও সবুজ ট্যাংডস গায়ে গায়ে শোভা পাইতেছে। সখ ও সক্ষয় দুটি জিনিষ একই সঙ্গে নজরে পড়ে। রাজি বলিয়া সে-সব বিশেষ দেখা গেল না, কেবল বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে ‘ছ-তিন-নয়ের’ কোলাহল শোনা গেল। গাঙ্গুলী মহাশয়ের গলাটাই সপ্তমে উঠিয়াছে, পাশার পড়তা

বোধ হয় তাঁহারই দিকে। উপরে রুগ্ন জামাতা অথচ নীচে এই হৃদয়ভেদী উল্লাসধ্বনি? আমাকে দেখিয়া গাঙ্গুলী ঈষৎ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন ঘেন। কিন্তু সে-ভাবে তাঁহার বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। হাসিয়া বলিলেন, “আহুন, আহুন, মাষ্টার মণায়। পূর্বের স্থিতি যে আজ পশ্চিমে উদয়?”

লঠনের দম কমাইয়া মেঝের উপব রাখিতে রাখিতে বলিলাম, “জানেন ত আমাদের কাজ?”

গাঙ্গুলী প্রাণখোলা উচ্চহাসি হাসিয়া বলিলেন, “ঠিক, ঠিক।”

বলিলাম, “আপনার জামাই কেমন আছেন?”

গাঙ্গুলী পাশার বোঁকেই হস্ত বলিলেন, “জামাই! কই তার ত কিছুই হয় নি। এই পোয়া বার তের—পোয়া বার তের—ছুতোরি পছুরি।”

“কেন, তাঁর যে অস্থখ বলে—”

“ও—হ্যাঁ।” পাশার বে-পড়তায় কিংবা অল্প হেতুতে মুখখানি তাঁহার কেমন ক্যাকাশে বোধ হইল। একটু ধমিয়া ঢোক গিলিয়া বলিলেন, “তা সে সেবে উঠে বড়ী চলে গেছে। তবে কি জান, ভায়া, তোমার ইয়েটা এখন দিতে পারছি নে—দিন পনের মেরি হবে বোধ হয়।”

“কি বিপদ! আমি কি সেই জন্ত এখানে এলাম? কে কেমন আছেন, আর ত পায়েব ধুলো দেন না, তাই জানতে এলাম।”

“আমাদের আর থাক-থাকি, ভাই। আছি এই পর্য্যন্ত। চার দিকে অভাব-অভিযোগ, তোমাদের মত বাঁধা মাইনে হ'ত ত বুক ফুলিয়ে বলতে পাবতাম, ‘কুছ পরোয়া নেই’। ওরে খেদি, খেদি, তোর ডাক-কাকা এসেছে রে—পান নিয়ে আয়। পান...সে পাঞ্জা—সে পাঞ্জা—ছুতোরি কচে বার।”

পান খাইয়া, খানিক পাশা খেলা দেখিয়া ও তাঁহাকে পান্ডুলি দিবার অনুরোধ জানাইয়া উঠিলাম। আসিবার সময় আলোটা উজ্জাইয়া দিয়া বাড়ীটা আবছা বতটা দেখা যায় র্ত্তেখবার চেষ্টা করিলাম। উপরে যদি একখানি ঘর হয় ত স্বদখানি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বড়ই বলিতে হইবে, নীচের ঘরও ত অনেকগুলি, অথচ জামাই আসিলে ঘরসঙ্কলান হয় না।

* * *

দু-তিন দিনের মধ্যে গাঙ্গুলী কিন্তু আসিলেন না। শুনিলাম, তিনি বড়ই ব্যস্ত আছেন। আবার কোণার মাসব্যাপী স্বদেশী মেলা বসিবে—সেখানে ভাল জিনিষ পাঠাইবার আয়োজনে মাতিয়াছেন।

বিপিনই খবরটা দিল, “ওনেছেন বাবু, গাঙ্গুলী যে আবার মেলায় চলল। আজ দেখে এলাম চাষাবাড়ী ঘুরে ঘুরে টাকা আদায় করছে।”

“টাকা আদায় কেন? তাঁর কাছে ত জমা আছে অনেক টাকা।”

“উনি বলছে সে-টাকা জমা থাক, এবারেও চাঁদা চাই। খরচ-খরচা বাদ দিয়ে যা থাকবে দুই টাকা মিলিয়ে গায়ে একটা মন্দির পিতিষ্ঠে করে দেবেন। গুণ্যি কাজে গাঙ্গুলী খুব ওস্তাদ কি না।”

“মেলায় জিনিষ নিয়ে গেলে চাষাদের কি লাভ হয়, বিপিন?”

“নাভ কহু। অনেক সায়েব-বিবি আসে, জজ-বাগিষ্টর, বাবু, মা-ঠাকুর। হাত দিয়ে জিনিষ টিপে দেখে কত স্তুতোত করে। কেউ মেডেল দেয়, কেউ কাগজে খানিক লিখে দেয়। গাঙ্গুলীর বাক্সে এত জমা আছে; কাগজ আর মেডেল। নাভ ওইটুকু।”

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমার গাঙ্গুলী কেমন লোক, বিপিন?”

বিপিন চিঠির তাড়ায় ঘটঘট শব্দ করিয়া ষ্টাম্প দিতে লাগিল—উত্তর দিল না।

“বল না, বিপিন?”

“কি বলব, বাবু, আপনি কি জান না? দিনরাত্তির মেশামেশি, হাসি-গল্প, তামাক টানা—”

হাসিয়া বলিলাম, “তাহ’লেও আমি বাইরের লোক, তোরা এ-গাঁয়ের বাসিন্দে—”

বিপিন রাগ করিয়াই উত্তর দিল, “বাইরের লোকের অত খবরেই বা দরকার কি বাপু।”

তাহাকে আর একটু রাগাইবার জন্তই বলিলাম, “আমার ত মনে হয় খুব ভাল লোক। এত ভাল যে বেঁকা বললেই হয়। তিন পয়সার পোষ্টকার্ডখানা ছ-পয়সায় বেচেছেন।”

বিপিন ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে রাগ প্রকাশ করিল, “তবে আর কি, কোম্পানীর ক্ষেতি করে ভারি আমাব ভাল বে! কই নিজের ত এক পয়সা হুদ ছাড়তে দেখি নে। বলে—

জ্বাকা জ্বাকা কথা কর

এক পোণ দিয়ে তিন পোণ নেয়।

আমাদের উনিও তাই।”

“বলিস কিরে, গাঙ্গুলী টাকা ধার দেয়?”

“না, তা দেবে কেনে, দান-খয়রাত করে। মুখে দিনরাত ধান শুকোয় বলে কি...না, থাক বাবু—তুমিই আবার তামাক টানতে টানতে কখন বলবে ওই কথা, আব আমার প্রাণ থাক।”

শত চেষ্টায়ও বিপিন আর মুখ খুলিল না।

গাঙ্গুলীর স্বরূপ কিছু কিছু বুঝিয়াছি, কিন্তু তিনি যে অতখানি ইহা ত স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই, অথবা এই মুহূর্তে তাঁহাকে মন্দ ভাবিয়াই বা করিতেছি কি? তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবার জন্ত মনেব মধ্যে যথেষ্ট ব্যাকুলতা রহিয়াছে। নিঃসঙ্গ জীবন মাছবের পক্ষে অসহ্য। যেখানে চৈত্রেয় ছপুবে পুরুর শুকাইয়া পাকে পরিণত হইয়াছে, তৃষ্ণা দূর কবিবার অম্ল উপায় না থাকিলে পৈকো-জলই পরম রমণীয় জানে পান করা ছাড়া গভাস্তব কি।

* * *

পনর দিন কাটিল, এক মাসও কাটিল—গাঙ্গুলী আসিলেন না। অবশেষে এক দিন বদলির পরোয়ানা আসিল।

আর এক বার গাঙ্গুলীর সন্ধানে চলিলাম।

পথেই দেখা। হাসি ও কুশল-প্রশ্নের পালা সাজ করিয়া কহিলাম, “একখানা গরুর গাড়ী যে ঠিক করে দিতে হবে, দাদা? কালই রওনা হচ্ছি।”

গাঙ্গুলী মুখে চোখে উল্লাসের চিহ্ন অপরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। এক গাল হাসিয়া বলিলেন, “ক-দিনের ছুটি মিলল?”

“ছুটি নয়, একেবারে রওনা—মানে বদলি।”

মুহূর্তে তাঁহার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল। স্নানহাশ্বে কহিলেন, “মাস-দুই এমন ব্যস্ত ছিলাম, তোমাদের খোজ নিতে পারি নি, ভাই। আহা, কত কষ্টই না হয়েছে।—

গিয়ে এই বুড়োবই নিশ্চয় করবে ত? তা আমার অদৃষ্ট, শেষ কোন জিনিষেরই রাখতে পারি নে। এই দেখ না, চাষারা এসে ধরলে, 'না' বলতে পারলাম না। শত কাজ কেলে ওদের ভাল নিয়েই যেতে আছি। ছি ছি, নেহাৎ অমাত্যের মত কাজ হ'ল। ছোট ভাইটির মত ছিল—একবার এসে খোঁজখবর নিতে পারি নি—এ দুঃখ আমার মলেও যাবে না, ভাই।”

“না, না, কষ্ট কিছুই হয় নি, বরং আপনার স্বস্তি—”

“ছাই যত্ন! সঙ্কশের ছেলে তাই বলছে ও-কথা। খুব কষ্ট গেছে—খুব কষ্ট হয়েছে তোমার। আর কি পা দেবে এই হাঘরের দেশে? কেনই বা দেবে তুমি!”

“তা ঘুরতে ঘুরতে দশ-পনের বছর বাদে আসতেও পারি।”

“হ্যাঃ—সবাই বলে ওই কথা। তোমাকে নিয়ে হ'ল চার। কেউ কি কিরে এলেন আর।” একটু থামিয়া বলিলেন, “তা ভায়া, অপরাধী ক'রে রেখে গেলে এই বুড়োকে।”

“কেন, কেন, কিসের অপরাধ?”

“মনে ক'রে দেখ। দশ আর দশ কুড়ি টাকা—”

“কুড়ি কিসের? পোষ্ট অ্যাপিসের যে-দশ টাকা গরমিল হয়েছে—সে দায় স্বায়ত্তঃ ধর্মতঃ আপনার নয়।”

গাঙ্গুলী হাসিবার ভঙ্গীতে বলিলেন, “নয়? ভাল, আর দশ যা তোমার কাছ থেকে ধার নিয়েছি, তা শোধবার উপায় কি হবে? আর তিনটে দিন কি থেকে যেতে পার না?”

“না দাদা, হাকিম নড়ে ত হকুম নড়ে না। টাকার জন্ত ব্যস্ত হবেন না, আমি পৌছে ঠিকানা দিয়ে আপনাকে চিঠি দেব, যখন সুবিধে হয় পাঠিয়ে দেবেন।”

গাঙ্গুলী হাসিতে ঝাটিয়া পড়িলেন, “তা বটে। তা বটে। তোমরা পোষ্ট অ্যাপিসে কাজ কর, তোমাদের টাকা পাঠাতে ত আর ফী লাগবে না। এখানে দেওয়াও যা,

ডাকে দেওয়াও তাই, অর্থাৎ দেখ টাকা শোধের ভাবনায় এক-দিন ভাল ক'রে যুক্ত পারি নি।”

গাঙ্গুলীর ভুল (?) আর ভাঙিলাম না, শুধু বলিলাম, “গাড়ী একখানা ঠিক ক'রে দেবেন, কাল খাওয়া-দাওয়া ক'রেই রওনা হব।”

“নিশ্চয়, নিশ্চয়। নতুন মাষ্টার যে-গাড়ীতে আসবেন সেই গাড়ীতেই রওনা হবেন।” বলিয়া গাঙ্গুলী আনন্দে কি আশু বিয়োগ-বেদনায় জ্ঞানি না, প্রথম দিনের মতই আমাকে বুক চাপিয়া ধরিলেন। টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল আমার জামার উপর পড়িল।

* * *

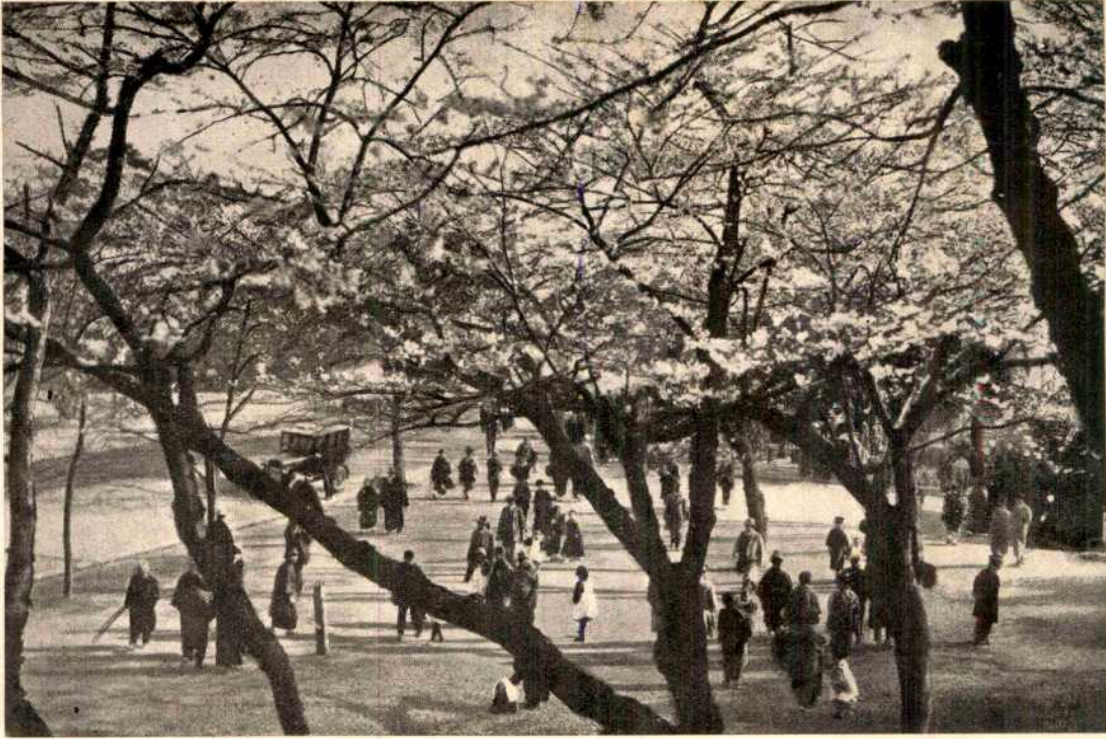
কাঁচ-কাঁচ শব্দে গঙ্গর গাড়ী চলিতেছিল।

খড়ের বিছানায় শুইয়া আকাশপানে চাহিয়া এলোমেলো কত কি ভাবিতেছিলাম।

সংসারে থাকিতে হইলে শুধু খাঁটি জিনিষ লইয়া কারবার চলে না, যেমন খাটি সোনার খাদ না মিশাইলে গহনা হয় না। গাঙ্গুলী স্বদেশী মেলায় নিজ গ্রামের কৃষিজাত দ্রব্য লইয়া চলিয়াছেন, প্রাথমিক, মেডেল অনেক মিলিবে। ইতিমধ্যে প্রকৃত দেশভক্ত বলিয়া খ্যাতিও তাঁহার বখেট রটিয়াছে।...রাখু ঘোষ দুধের পুরা দামই আদায় করিয়াছে, ধর্মের নামে শপথ ও ক্রন্দন যুগপৎ চলিয়াছিল।...পোষ্ট অ্যাপিসের তহবিলে মাঝে মাঝে অমন হিসাবে গরমিল হয়।...বিধবার হাতচিঠি বদল না হইলেও আমার দশটি টাকা একদিন ফিরিয়া পাইব, বড়জোর কমিশনটা বাদ যাইতে পারে। গাঙ্গুলী কি কথার খেলাপ করিবেন? ভবিষ্যতে তিনি বা-ই করুন, বর্তমানে এ আশা পোষণ করিতে দোষ কি! মন্দ জানিয়াও সব জিনিষ এক দণ্ডে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় কি?

বাধু ঘোষের দুখে আর আমাদের জীবনে যে যথেষ্ট মিল রহিয়াছে।

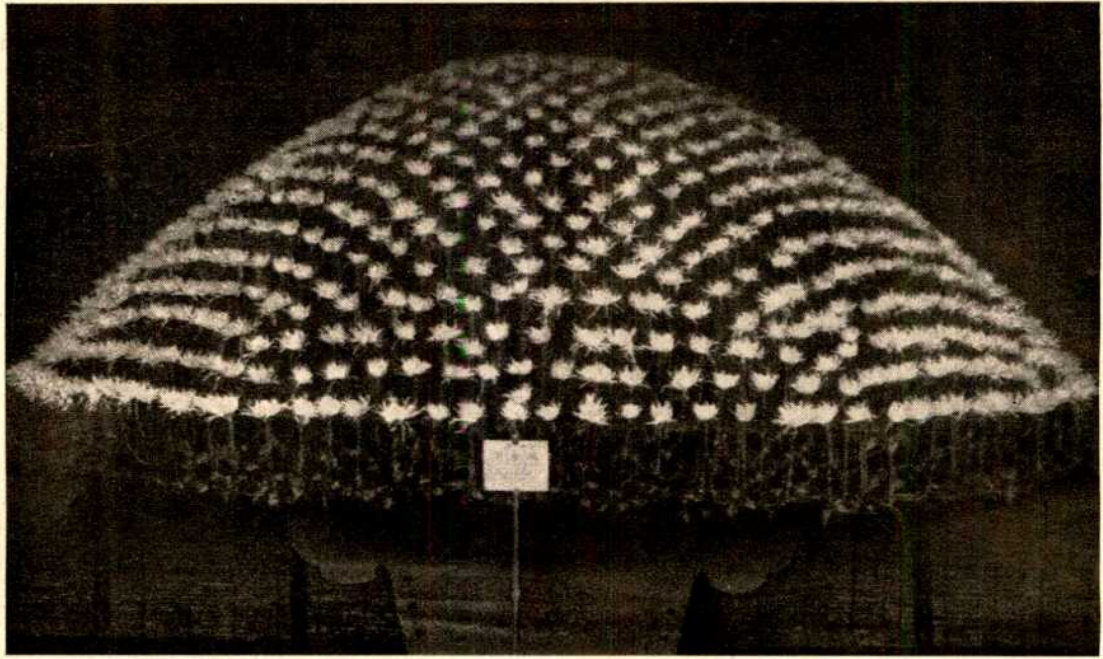




টোকিওর একটি উদ্যানে চেরীফুল-দর্শনার্থী নরনারীগণ



চেরীফুলের উৎসবে নৃত্যগীত



জাপানের চন্দ্রমল্লিকা। একই গাছে ৬০৫টি ফুল ফুটিয়াছে



বিচিত্রে পত্রপুষ্পে সজ্জিত ফুলদানি



ফুল সাজাইতে রত তরুণী

জাপানে ফুল সাজানো মহিলাদের সম্বন্ধে শিক্ষণীয় একটি বিশিষ্ট শিল্প বলিয়া পরিগণিত।

ফুল, পাতা, এমন কি ছোট ছোট ফল সহ ভালও এই কাজে ব্যবহৃত হয়।

জাপানের পুষ্পোৎসব

শ্রীচাক্রবাল মিত্র

জাপানকে 'ল্যাণ্ড অব ফ্লাওয়ারস' বা ফুলের রাজ্য বলা হয়। কারণ বার মাসই এখানে কোন-না-কোন ফুল ফুটে দেশটাকে আলো করে রাখে। এসব ফুল যে শুধু লোকের বাগানে ফোটে তা নয়, মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে, রাস্তার দু-ধারে, নদীর দু-তীরে এক-এক ঝুতুতে এক-এক রকম ফুল ফুটে দেশটাকে ফুলের রাজ্য করে তোলে। এক-একটি জায়গা বিশেষ বিশেষ ফুলের জন্য বিখ্যাত। প্রতি মাসে যখন যেখানে ফুল ফোটে জাপানীরা সুন্দর সুন্দর পোষাক পরে দলে দলে সেখানে যায় ফুলের উৎসবে।

১লা জানুয়ারি এদের নববর্ষের উৎসব। এই সময় প্রচণ্ড শীতে কোন গাছে ফুল ফোটে না, দু-একটি গাছ ছাড়া কোন গাছে পাতা থাকে না। সেজন্য তারা ফুলের বদলে বাঁশ ও পাইনগাছ কলাগাছের মত দরজার দু-পাশে লাগিয়ে বাড়ী-ঘর সাজায়। জাপানে পাইনগাছ দীর্ঘজীবন ও সৌভাগ্যের প্রতীক, আর বাঁশগাছ সোজা হয়ে ওঠে বলে তাকে সরল ও সাধু ব্যবহারের সহিত তুলনা করা হয়। নববর্ষে প্রত্যেক বাড়ীতে বামন-জাতীয় পাইন, বাঁশ ও প্রামগাছ চৌনমাটির পায়ে সাজিয়ে রাখে, এটি নববর্ষে শ্রেষ্ঠ উপহার ও স্বথসৌভাগ্য-সম্পদের প্রতীক। এই গাছগুলি এক হাত দেড় হাতের বেশী লম্বা হয় না, সামান্ত মাটিতে অনেক দিন পর্যন্ত জীবিত থাকে এবং সেই বামন প্রামগাছে কিছুদিন পরে সুন্দর ফুল ফোটে।

ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এদের আসল ফুলের উৎসব আরম্ভ হয়। এই সময় প্রামফুল ফোটে, শুকনো ডালে হঠাৎ এক দিন সুন্দর শাদা ফুলগুলি ফুটে চারি দিক আলোকিত করে। দুই মাস শীতে যখন চারি দিক বরফে ঢাকা, সেই সময় এই ফুল ফোটে বলে একে বলেছে সাহস ও অধ্যবসায়ের প্রতীক। এই সকল গুণ যেন পায় এই আশা করে জাপানে অনেক মেয়ের নাম রাখে 'উমে' অর্থাৎ প্রামফুল। সমুদ্রের

ধারে আতামী বলে স্থান প্রামফুলের শোভার জন্যে বিখ্যাত; ছুটির দিনে সবাই প্রামফুলের উৎসব করতে সেখানে যায়। টোকিওর কামাইদোতে সিঙ্গেল মন্দিরে অনেক কালের পুরনো প্রামগাছকে সম্বন্ধে এমন ভাবে তৈরি করেছে যে, মাটিতে লতার মত একে-বৈকে গিয়েছে, সাপের মত দেখতে মনে হয়। কতকগুলি গাছের ডালপালা খানিকটা লতিয়ে খানিকটা উপর দিকে মাথা উঁচু করে আছে, সেজন্য তাদের নাম দিয়েছে অর্দ্ধশায়িত ডাগন।

তার পর মার্চ মাসে পীচফুল—এ হচ্ছে শান্তি, সৌম্য, নম্রতা, বিনয় ও সৌজন্যের প্রতীক। এই মাসে 'হিনা-মাৎসুরী' বা মেয়েদের ফুলের উৎসব হয়; পীচফুলের সঙ্গে এই উৎসবের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। জাপানী মেয়েদের পুতুলের উৎসব পীচফুল ছাড়া সম্পন্ন হয় না, মেয়েরা নিজেরা জীবনেও এই ফুলের মত শান্ত, নম্র ও বিনয়ী হবার কামনা করে।

এপ্রিল মাস আসে চেরীফুলের ঐশ্বর্যসম্ভার নিয়ে। চেরীফুল ছাড়া জাপানকে কল্পনা করা যায় না; জাপানের আর একটি নাম তাই চেরীল্যাণ্ড। পৃথিবীর কোথাও চেরী-ফুলের এরকম সৌন্দর্য দেখা যায় না। দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার দর্শক জাপানে আসে শুধু এই চেরীফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে।

এখানে যত বিভিন্ন জাতের চেরীগাছ আছে, অল্প কোন দেশে সে রকম দেখতে পাওয়া যায় না। পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে চেরীর বন ত আছেই, তাছাড়া যাতে সকলে সব জায়গায় এই ফুল ফুটে দেখে আনন্দ লাভ করতে পারে, সেজন্য বহুকাল থেকে এরা এই চেরী-গাছ শহরের মধ্যে, রাস্তার দু-ধারে, বাগানে, পাকে, মন্দিরের চত্বরে, নদীর দু-ধারে সারি করে পুতে দিয়েছে। নানা উপায়ে ফুলগুলিকে আরও সুন্দর করবার, নানা জাতের ফুল স্থাপি করবার চেষ্টা করেছে। এক টোকিও



পুষ্পিত চেরীগাছ

ও তার চার পাশের গ্রামে ২২০০০ চেরীগাছ আছে। এপ্রিল মাসে পত্রহীন ডালে যখন এই সুন্দর ফুলগুলি ফুটে ওঠে, তখন টোকিও শহর এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করে। টোকিওতে 'উয়েনো' পার্কে অসংখ্য জাতের চেরীগাছ আছে। এদোগাওয়া নদীর ধারে দু-মাইল ধরে একটি-পাপড়িওয়ালা চেরীগাছের সুন্দর বীথিকা রয়েছে। আস্থকাইয়ামা পাহাড় চেরীগাছের জন্ম প্রসিদ্ধ।

হুমিদা নদীর ধারে, দুই মাইল ধরে, এক হাজার চেরীগাছের সুন্দর বীথিকা। এখানে বিয়াল্লিশ জাতের গাছ আছে, ফুলে বিচিত্র রঙের আভা, এমন কি সবুজ আভাও দেখা যায়।

'ইয়ামা-সকুরা' (ইয়ামা=পাহাড়; সকুরা=চেরী) বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়ে খুব বেশী জন্মায়। এগুলি বনফুলের মত ফুটে পাহাড়-পর্বতকে নন্দন-কানন করে তোলে। এই ফুলের উৎসব, এই ফুল দেখতে যাওয়াকে এরা বলে 'ওহানামি' (হানা=ফুল; মি=দেখা)। এটা সামাজিক জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ।

চেরীগাছ সবচেয়ে সুন্দর দেখায় ভোরবেলা যখন প্রথম সূর্যের কিরণ তার উপর এসে পড়ে। আর এই ফুল আধফুটন্ত অবস্থায়, অর্থাৎ যখন ফুলগুলির দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ ফোটে আর এক-তৃতীয়াংশ কুঁড়ি থাকে, দেখতে ভাল। কিন্তু সবচেয়ে পাহাড়ী চেরীগাছ দেখতে ভাল, কারণ

সুন্দর কচি লাল পাতায় ভালগুলি ভরে যায় ও শাদা ফুলে তাদের স্বিষ্ট শ্রী দান করে।

টোকিওর কাছে কোগানাই ব'লে একটি গ্রামে চেরীগাছের উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। এখানে দুই মাইল লম্বা চেরী-বীথিকা আছে। গাছের তলায় নানা রকম খাবার, চা ও সাকের (এক রকম মদ) দোকান বসে। রাত্রে গাছে গাছে কাগজের লঠন ঝুলিয়ে দেয়, সুন্দরী মেয়েরা প্রজাপতির মত নানা রঙের পোষাক পরে ঘুরে

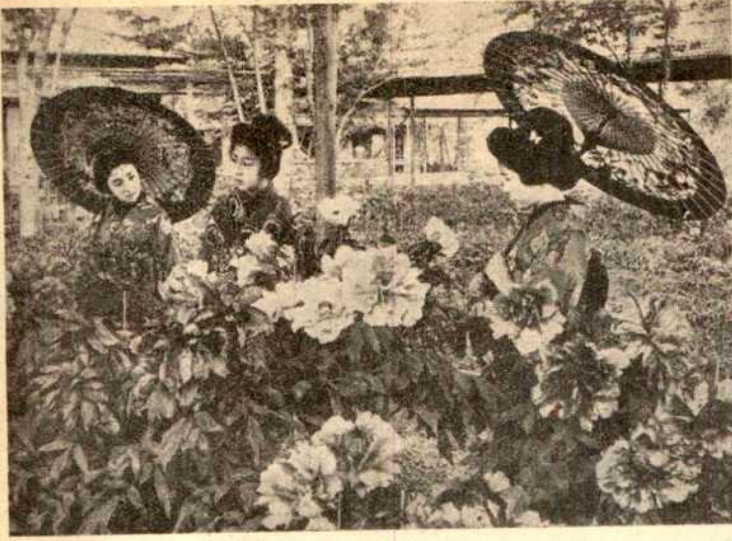
বেড়ায়। লোকেরা দাড়ি গৌরব প'রে সং সেজে ও কোন কোন গায়কের দল রাস্তা দিয়ে বাজনা বাজিয়ে মজার হাসির গান ক'রে যায় ও সমস্ত লোককে মাতিয়ে তোলে। সকাল থেকে রাত অবধি এখানে হাসির ফোয়ারা ছোটে। বুড়ীরা তাদের বার্ককা ও জরা ভুলে গিয়ে সারাদিন নেচে কাটিয়ে দেয়। ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী সবাই চেরীগাছের উৎসবে যোগ দেয়। দুঃখ দৈন্ত কষ্ট সব দূরে ফেলে দিয়ে সবাই আসে চেরীগাছের উৎসবে।

সৌন্দর্যের উপাসক জাপানীরা চেরীগাছকে জাতীয় ফুল ব'লে গণ্য করে। ফুলের রাণী হয়ে চেরীগাছ বিরাজ করছে। সাহিত্য, কলা ও শিল্পে এই ফুলই বেশী স্থান পেয়েছে।

মিয়াকো-ওদোবী অর্থাৎ চেরীনাচও চেরীগাছের মত একটি দেখবার জিনিষ। এলা এপ্রিল থেকে কিয়োটোতে এই নাচ আরম্ভ হয় ও এক মাস ধরে চলে। সুন্দরী নর্তকীরা বহুমূল্য বিচিত্র কিমনো পরে ও পুরাতন প্রথমত মন্তকভূষণে সজ্জিত হয়ে সামিসেন বা জাপানী বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে তালে তালে নাচে।

মে মাসে ফোটে পিওনী (Peony) উষ্টেরিয়া (Wistaria) ও এজেলিয়া (Azalea)।

জুন মাসে আইরিস (Iris) ফুল ফুটলে ছেলেদের আনন্দ, কারণ পীচফুল দিয়ে যেমন মেয়েদের পুতুলের



পিওনী ফুল

উৎসব হয় তেমনি আইরিস ফুলে হয় ছেলেদের একটি উৎসব।

আইরিস ফুলের পাতা দেখতে ঠিক তলোয়ারের মত। ছোট ছেলেদের মনে তলোয়ারের মত এই পাতা সাহসী ও বীর হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয়।

জুলাই-আগষ্ট মাসে সমস্ত খাল বিল পুকুর ভ'রে যায় পদ্মফুলে। পার্কে, মন্দিরের প্রাঙ্গণে যেখানে ছোটখাট জলাশয় আছে সেখানেও এই ফুল ফুটে সবাইকে মুগ্ধ করে। এই ফুলকে উপলক্ষ্য করে কোন উৎসব নেই। সকলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য নিয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রতীক এই ফুল দেখতে যায়। তার পর শরৎকালের সঙ্গে সঙ্গে মেপ্লগাছের পাতা খসবার আগে সব পাতা লাল হয়ে যায়। মেপ্লের সৌন্দর্য পাতায়; রাস্তার দু-ধারের ও পাহাড়ের গায়ের সব মেপ্লগাছ যখন লাল পাতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন তাকে আর পাতা ব'লে চেনা যায় না। মনে হয়

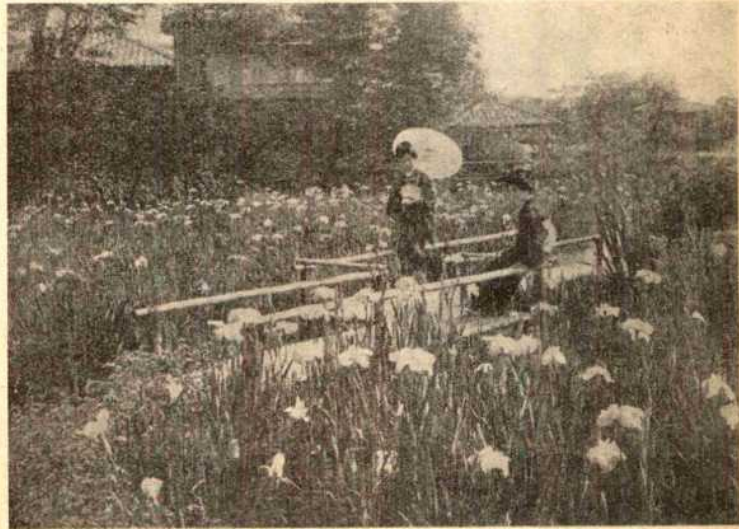
লাল ফুল ফুটে আছে। পাহাড়ে পাহাড়ে এই মেপ্লপাছ চিরসবুজ পাইনের সঙ্গে এমন ক'রে মিলিয়ে আছে যে সবুজে ও লালে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এত বড় জাপান দেশ, তার পাহাড়-পর্বত ক্ষেত-খামার সবই হৃন্দর বাগান; এমন কি এদেশের ধান এবং চাষের ক্ষেতও দেখবার জিনিষ।

নবেম্বর মাসে আসে চন্দ্রমল্লিকা। ঘোলটি পাপড়যুক্ত চন্দ্রমল্লিকা রাজার শিরোভূষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রাকালে জাপানীরা চন্দ্রমল্লিকার অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করত। প্রবাদ আছে, এই ফুলের উপরকার কয়েক ফোঁটা

শিশিরবিন্দু খেলে দীর্ঘজীবন লাভ করা যেত।

বড় বড় পার্কে চন্দ্রমল্লিকার প্রদর্শনী ও পুরস্কার-প্রতিযোগিতা হয়। কত বিভিন্ন প্রকারের যে ফুল হয় তার ঠিক নেই, কোনটা গোল একেবারে বলের মত, কোনটা পদ্মের মত, কোনটা আনারসের মত, কোনটা সাপের ফণার মত। তাদের রঙেরই বা কি বাহার—সাদা, গোলাপী,



আইরিস-বন

সোনালী, হলদে, হালকা সবুজ আরও কত রং। চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না।

এদেশের মালীরা সতত চেষ্টা করে কি ক'রে গাছে অনেক ফুল ফোটাবে। নানা আকারে তাকে বাড়িয়ে তোলে। একটি গাছে এক-শ কুড়ি-পঁচিশটি পর্যন্ত বড় ফুল হ'তে দেখেছি। এক রকম চন্দ্রমল্লিক গাছে এক হাজার দেড় হাজার ছোট ছোট ফুল তারার মত ফুটে থাকে। মালীর সারা দিনের যত্ন, তত্ত্বাবধান ও পরিশ্রমে এটা সম্ভব হয়। টোকিওতে একটি প্রকাণ্ড বাড়ীতে চন্দ্রমল্লিকার উৎসব হয়। সেটা একটা দেখবার জিনিষ। চন্দ্রমল্লিকার গাছ দিয়ে মালুঘ, ঘোড়া, জাহাজ, নৌকা, ট্রাম, বাড়ীঘর পর্যন্ত তৈরি করে। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না কি ক'রে এটা সম্ভব হ'ল।



টবে উৎপন্ন চন্দ্রমল্লিকা

প্রথমে তার দিয়ে কাঠামো করে, তার পর গাছগুলি যত বড় হ'তে থাকে, তাদের কাঠামোর সঙ্গে আটকে দিয়ে বাড়তে সাহায্য করে, আস্তে আস্তে গাছগুলি কাঠামো অনুযায়ী রূপ নেয়। এখানে বিভিন্ন রকমের ছোটবড় চন্দ্রমল্লিকার গাছ

এনে রাখা হয়। তাছাড়া ছোট ছোট ফুল দিয়ে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নানা রকম মূর্তি ক'রে তাদের পোষাক তৈরি করে। এমন কি ছোট ফুল দিয়ে নানা রকম প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যন্ত তৈরি করে। আর এই সঙ্গে অনেক রকম জিনিষ ও খাবারের দোকান বসে। চন্দ্রমল্লিকার উৎসবে থিয়েটার, ম্যাজিক ইত্যাদি আমোদ উপভোগেরও ব্যবস্থা থাকে। এই রকম ক'রে সারা বৎসর ধরে কোন-না-কোন ফুলের উৎসব চলে। এই জন্তাই বলে জাপান ফুলের রাজ্য।

এরা শুধু ফুলের উৎসব করেই ক্ষান্ত নয়, ফুল কি ক'রে সাজাতে হয় সেটাও এদেশের মেয়েদের একটা বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। সাধারণ মেয়েরা ত এ-বিজ্ঞা শেখেই, বড়ঘরের মেয়েরাও এটা আয়ত্ত করতে না পারলে তাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শুধু ফুল সাজান শেখবার জন্তাই অনেক শিক্ষালয় আছে। কি রকম ক'রে ফুল সাজাতে হয়, ফুল অনেক দিন রাখতে হ'লে ফুলের ডাঁটাগুলি একটু পুড়িয়ে জলে ভুনে দিয়ে রাখলে কেমন ক'রে অনেক দিন রাখা যায়, গাছের পাতাসহ ডালও কেমন সুন্দর ক'রে ধুয়ে মুছে ছেঁটেকেটে সাজিয়ে রাখা যায়—এই সব বিষয় শেখান হয়। আমাদের অনেকের ধারণা অনেক ফুল না হ'লে বাড়ী সাজান যায় না, কিন্তু ছ-চারটি ফুল দিয়ে একটি ফুলদানি এমন ক'রে সাজান যায় যে ঘরটির তাতেই শোভা হয়। আমাদের দেশে অনেক গাছ আছে যার পাতা দেখতে সুন্দর, সে পাতাও ভাল ক'রে সাজাতে পারলে সুন্দর দেখায়।

আমাদের দেশেই কি ফুলেরই অভাব? বিভিন্ন ঋতুতে আমাদের দেশের মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে ঝিলে-ঝিলে কি ফুলের কম সমারোহ? আমাদের যদি এদিকে একটু লক্ষ্য থাকত তাহ'লে আমরাও আমাদের দেশকে ফুলের রাজ্য ক'রে তুলতে পারতাম।

দেশ-বিদেশ থেকে লোকে জাপানে যায় চেরীফুল, চন্দ্রমল্লিকার শোভা দেখতে—সেটা বছরদিনের যত্ন ও পরিশ্রমেই সম্ভব হ'তে পেরেছে। আমাদের কৃষকৃড়া, অশোক, পলাশ, শিউলি কিছু কম সুন্দর নয়। আমরা যদি এর যত্ন করি, দেশকে সুন্দর ক'রে তোলবার চেষ্টা করি, তাহ'লে আমাদের দেশেও দেশ-বিদেশ থেকে কত পুষ্পবিলাসী দর্শক এসে ভিড় করতে পারত।

স্রোতের মুখে

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

আজিকার কথা আজিকেই বল, বল,
কালিকে সে-কথা হবে বড় পুরাতন।
যে-প্রেমে আজিকে আঁখি দুটি ঢল ঢল
ফুরায়ে যে যাবে ফুরাইলে দুটি ক্ষণ।
সন্ধ্যামালতী সন্ধ্যার কোল ভরি
প্রভাতে শিথিল অবশ পড়ে যে ঝরি।
শেফালির মালা গাঁথিয়া কণ্ঠে ধরি
রাখিবে কি আজীবন ?
আজিকার কথা আজিকেই বল, বল,
কালি যে সে-কথা হবে বড় পুরাতন।

আজিকার বাখা আজিকেই ভুলে চল
কালিকে সে-বাখা হবে বড় পুরাতন।
আঁখির পাতায় অশ্রু যে টল টল
মুক্তা তো নয় রবে না সে চির-ধন।
বাদলে বাদলে গিয়াছে ধরণী ভরি
পিছে পিছে তার আলো ঝলমল করি
বীশরী বাজায়ে আসে যে শরৎ, হরি'
নিতে তনু-প্রাণ-মন।
আজিকার বাখা আজিকেই ভুলে চল
কালি যে সে-বাখা হবে বড় পুরাতন।

আজিকার স্থখে আজিকেই গেয়ে চল
কালিকে সে-স্থখ হবে বড় পুরাতন।
ঠোটের কিনারে আজি যেই হাসি—বল
ধরিয়া রাখিতে পারিবে কি সারাক্ষণ ?

তুণে তুণে যেই শিশির শিহরে মরি
গুণায় যে যাবে কিছা পড়িবে ঝরি ;
কোন গভ-স্থখ শুধু মনে স্মরি স্মরি
রাখা যায় আজীবন।
আজিকার স্থখে আজিকেই গেয়ে চল
কালি যে সে-স্থখ হবে বড় পুরাতন।

আজিকার মালা আজিকেই গোঁথে তোল
কালিকে সে-মালা হবে বড় পুরাতন।
স্থখ-স্বরে আজি নদী চলে ছল ছল
সেথায় কালিকে ধুঁ মরু কাটাবন।
আজিকে ফাগুনে পৃথিবীর বুক মরি
মরকত-চুনি-নীলা-রঙে গেছে ভরি,
উদাস উষর বৈশাখ অবতরি
জালি দিবে হতাশন।
আজিকার মালা আজিকেই গোঁথে তোল
কালি যে সে-মালা হবে বড় পুরাতন।

আজিকার কথা আজিকেই বল, বল,
কালিকে সে-কথা হবে বড় পুরাতন,
আজিকার এই 'আজি'টা কোথায়, বল,
কাল খুঁজে পাবে, পাবে এই হিয়া মন।
হায় যে সকলি স্রোতের টানেতে সরি
চলে চলে যায়—নৃতনের নব তরী
প্রতি ক্ষণে আসে নব নব বেশ ধরি
নিষে নব আয়োজন।
আজিকার কথা আজিকেই বল, বল,
কালি যে সে-কথা হবে বড় পুরাতন।

আমাদের জনশক্তি ও কর্মশক্তি

শ্রীশুশীলকুমার বসু

গত ১৯৩১ সালের লোকগণনার সময় ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৫,২৮,৩৭,৭৭৮ জন। ১৯২১ হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছিল শতকরা ১০.৬ হারে। কাজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ভারতের জনসংখ্যা বর্তমানে ৩৭ কোটির কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ লোক ভারতবাসী। দেশসমূহের মধ্যে জনশক্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় স্থানীয়। চীনের রাষ্ট্রিক সীমা ও সংহতির অনিশ্চয়তার কথা এবং লোকগণনার ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করিলে এ সন্দেহ করা অত্যাশ্চর্য হইবে না যে, জনসংখ্যার দিক দিয়া ভারতের স্থান সর্বোচ্চ হইবার আশা আছে।

অনেক শক্তিশালী স্বাধীন দেশের জনসংখ্যা অপেক্ষা ভারতের একটি ছোট প্রদেশে অধিকসংখ্যক লোক বাস করে। এক রাশিয়া এবং জার্মানী ব্যতীত ইউরোপের কোন দেশের জনসংখ্যা বাংলা অপেক্ষা বেশী নহে। যে শক্তিশালী দেশগুলি সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার মধ্যে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্স এবং ইটালী অপেক্ষা বাংলার জনসংখ্যা অধিক।

কিন্তু আমাদের এই বিপুল জনশক্তিতে কর্মশক্তির পরিমাপ বলিয়া মনে করিলে বিশেষ ভুল করা হইবে।

আমরা সহজে এ কথা মনে করিতে পারি যে, ভারতের কর্মশক্তি রাশিয়া বাদে সমগ্র ইউরোপের প্রায় সমান; শক্তিশালী দেশগুলির কাহারও চার-পাঁচ গুণ, কাহারও ছয়-সাত গুণ, কাহারও আট-নয় গুণ এবং এমন কোন দেশ নাই (এক চীন ব্যতীত) ভারতের কর্মশক্তি অন্ততঃ যাহার আড়াই-তিন গুণ হইবে না।

কিন্তু জনসংখ্যার সঙ্কেত অনুসারে ভারতের কর্মশক্তি নির্ণয় করা যাইবে না।

অনেকে হয়ত বলিবেন, ভারতবাসীরা কর্মক্ষেত্রে যে বিশেষ পশ্চাৎভর্তী রহিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের শক্তির দৈন্তের

পরিচয় নহে। ইহার দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, তাঁহাদের কর্মক্ষমতা অব্যবহৃত রহিয়া গিয়াছে, অথবা অপব্যয়ে তাহা নষ্ট হইতেছে। তাঁহাদের শক্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে, এবং তজ্জন্ত তাঁহাদিগকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারিলে, তাঁহারা আত্মশক্তি প্রমাণে সমর্থ হইবেন। দেশে আজও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিস্তার ঘটে নাই, অজ্ঞতা ও অশিক্ষা দেশ জুড়িয়া আছে, জনশক্তির অর্দ্ধাংশ নারীরা অবরোধের মধ্যে নৈপথে রহিয়া গিয়াছেন। এই সকল ত্রুটি সংশোধিত হইলে তবে শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার হইতে পারিবে। এ সকল অপেক্ষাও আমাদের বড় দৈন্ত হইতেছে যে, সংঘবদ্ধ হইবার, অনেকে মিলিয়া একসঙ্গে কাজ করিবার শিক্ষা বা ক্ষমতা আমাদের একেবারেই নাই। ভারতবাসীরা যদি সংঘবদ্ধ হইতে পারিতেন, তবে কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহারা অনেক বেশী সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন এবং প্রমাণ করিতে পারিতেন যে কর্মক্ষমতায় তাঁহারা কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন।

সম্ভবতঃ ইহারা ইতিহাসের নজির দেখাইয়া বলিবেন যে, প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যাধুনিক কাল পর্যন্ত সংখ্যালব্ধ সংঘবদ্ধ জনমণ্ডলী কর্তৃকই পৃথিবীর ইতিহাসের গতি নির্ণীত হইয়াছে। বর্তমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তিন-চতুর্থাংশ লোক ভারতবাসী, অথচ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তাঁহাদের স্থান কোথায় তাহা আমরা জানি। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শিখেরা ও মুসলমানেরা যে গুরুত্ব পাইয়াছেন তাহার মূল রহিয়াছে তাঁহাদের সংঘবদ্ধতার শক্তি। ভারতবর্ষে প্রথম যুগে ক্ষত্রিয়দের আধিপত্য, এবং পরবর্তী যুগে রাজপুত, শিখ ও মহারাষ্ট্রীয়দের আধিপত্যের দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হয়। পাঠানেরা যখন ভারতবর্ষ জয় করেন তখন সমগ্র আফগানিস্থানের জনসংখ্যা, অথবা যে-সকল স্থান হইতে মুসলমান আক্রমণকারীরা সৈন্ত সংগ্রহ করিতেন

তাহার সম্মিলিত জনসংখ্যা ভারতের জনসংখ্যার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র ছিল।

এ সকল নজির এবং যুক্তি সম্পর্কে এ কথা বলা যায় যে সংঘবদ্ধতা পূর্বোক্তদের শক্তি ও সাফল্যের অন্ততম প্রধান কারণ হইলেও এবং আমরা অধিকতর সংঘবদ্ধ হইতে পারিলে সর্বদিকে আমাদের অনেকটা সাফল্য হুনিশিত হইলেও, সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সত্য যে সংঘবদ্ধ হইলেও এবং অগ্নাত্রুটি সংশোধিত হইলেও আমাদের দেশের একটা নিদিষ্টসংখ্যক লোক যত সময়ে যতটা কাজ করিতে পারিবেন, অগ্নত দেশের ঠিক তত লোক ততটা সময়ে তরপেক্ষা অনেক বেশী কাজ করিতে পারিবেন, শ্রাস্ত না হইয়া অগ্নাত্র দেশের লোকের পক্ষে যত ক্ষণ কাজ করা সম্ভব, আমাদের দেশের লোকের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে, এবং অগ্নাত্র দেশে জনসংখ্যার অল্পপাতে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা আমাদের দেশের অল্পরূপ সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইবে। এ কথা ভারতের অগ্নাত্র প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা সম্পর্কে অধিক সত্য।

পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা যে আমাদের দেশের লোকের কর্মক্ষমতা কম, ইহা শুধু অল্পমানের কথা নহে। ১৯২৬-২৭ সালে ইনটারন্যাশনাল টেকস্টাইল ইউনিয়নের যে-সকল প্রতিনিধি ভারতবর্ষ পরিদর্শন করেন, তাহারা বোম্বাই প্রদেশের কাপড়ের কলসমূহে নিযুক্ত ভারতীয়ের ৩৪ জনের কাজকে ল্যাক্সায়ায়ারের ১২ জন লোকের কাজের সমান বলিয়া ধরিয়াছেন। অগ্নাত্র প্রামাণ্য লোকে অবশ্য ভারতীয় যোগ্যতার মাপ ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী ধরিয়াছেন। টাটা স্টীল ওয়ার্কসের কর্তৃপক্ষ এক জন ভারতীয় শ্রমিককে এক জন ইউরোপীয় শ্রমিকের দুই-তৃতীয়াংশ বলিয়া ধরিয়া থাকেন, অর্থাৎ ৩ জন ভারতীয় শ্রমিক ২ জন ইউরোপীয়ের সমান কাজ করে বলিয়া ধরা হয়।

শুধু বাঙালী শ্রমিকের হিসাব লইলে তাহাদের কর্মক্ষমতা আরও ন্যূন বলিয়া দেখা যাইত। প্রায়ই রোগভোগের ফলে ক্ষীণ এবং অনাহারে অপুষ্টি শরীর যে আমাদের ক্ষীণ কর্মশক্তির কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য দেশের লোক অপেক্ষা আমাদের দেশের লোকের শরীর যে অপটু ও দুর্বল তাহা আমরা জানি। কিন্তু চারি পাশে ক্ষীণ শরীর দেখিতে দেখিতে আমাদের চোখ অভ্যস্ত হইয়া

গিয়াছে বলিয়া অপুষ্টি ক্ষীণ শরীরকেই আমরা সাধারণ স্বস্থ শরীর বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কাজেই আমাদের স্বাস্থ্য ও শারীরিক গঠনের প্রকৃত অবস্থাটা বিদেশীর দৃষ্টির কাছে এবং তাহাদের তুলনামূলক বিচারের কাছেই সত্যসত্য ধরা পড়িতে পারে। কোন বিখ্যাত পুস্তকের ইংরেজ লেখক এদেশবাসীর স্বাস্থ্য দেখিয়া বলিয়াছেন,—

“এক পঞ্জাব ব্যতীত, কৃষকদিগেরও (আমাদের দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে ইহারাই সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ।—লেখক) শারীরিক শক্তি ইউরোপীয় শ্রমিকের প্রায় অর্ধেক। ...শহরের কুলীরা এবং দরিদ্রতর জেলাগুলির গ্রামবাসীরা আকারে খর্ব, তাহাদের শারীরিক গঠন শোচনীয় রকমের ক্ষীণ এবং পেশী-সকল নিতান্ত অপুষ্টি—এক কথায় ইহার মালুমের ভগ্নাংশ মাত্র। প্রকৃতি এমন এক ক্ষীণাবয়ব জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহারা সর্বনিম্ন পরিমাণে প্রোটিন ও ভিটামিন খাইয়া স্বল্প কালের জন্ত তাহাদের দুঃখময় জীবন ধারণে সমর্থ হয়। ভারতীয়দের আয়ুষ্কাল গড়পড়তা ২৩.৫ বৎসর, বিলাতের অধিবাসীদের পক্ষে এই অঙ্ক ৫৪ বৎসর।”

মনে রাখিতে হইবে যে, ক্ষীণ শরীরের এই বর্ণনা বাঙালীদের সম্পর্কে নহে, ভারতের যে-সকল স্থানের স্বাস্থ্য ও অধিবাসীদের শরীর আমরা ভাল বলিয়া জানি, এ উক্তি তাহাদের সম্পর্কে।

ইহা গেল এ দেশের কর্মরত স্বস্থ লোকদের কাজ করিবার কম ক্ষমতার কথা। কিন্তু আমাদের রোগ-প্রবণতার কথা ও শক্তিক্ষয়কারী নানা ব্যাধির উৎপাতের কথা হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, পাশ্চাত্য দেশের এক জন পূর্ববয়স্ক কর্মক্ষম ব্যক্তি বৎসরের যতটা সময় সুস্থ থাকিতে পারেন আমাদের দেশে স্বস্থ থাকিবার সময় তদপেক্ষা অনেক কম এবং শহর অপেক্ষা পল্লীতে, অগ্নাত্র প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায়, ও সমাজের অগ্নাত্র শ্রেণীর তুলনায় কৃষকদের পক্ষে এই কথা অধিক সত্য। অগ্নাত্র সভ্য দেশের লোকেরা যে-সকল ব্যাধির হাত হইতে অনেক দিন পূর্বে মুক্তি পাইয়াছেন, সেই সকল ব্যাধি আমাদের যত লোককে বৎসরের যতটা সময় অকর্মণ্য করিয়া রাখে এবং তাহার ফলে আমাদের কর্মশক্তির যে মোট অপচয় ঘটে তাহার পরিমাণ বিপুল। অনেক ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী ভাবে বা অনেক দিনের জন্ত যে ইহা আমাদের কর্মশক্তিকে পঙ্গু করিয়া রাখে, উৎসাহ-উত্তম হরণ করে, তাহার প্রত্যক্ষ

ও পরোক্ষ প্রভাবেও আমাদের কর্মশক্তির কম অপচয় ঘটে না। সব সময়েই আমাদের অনেক লোক কোন-না-কোন অন্তর্থে ভুগিয়া থাকেন বলিয়া এবং রোগে অকর্মণ্য লোকের সংখ্যা অত্যধিক বলিয়া, জনসংখ্যার অল্পপাতে অত্যন্ত দেশ অপেক্ষা এদেশে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা অনেক কম।

অগ্রবর্তী দেশগুলির গড় আয়ুষ্কাল আমাদের দেশের দুই হইতে আড়াই গুণ। আমাদের দেশে গড় আয়ু কম; তাহার অর্থ এই যে, দীর্ঘায়ু লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, পূর্ণবয়স্কদের সংখ্যাও কম এবং অল্পবয়স্কদের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা এত অধিক যে, গড় হিসাবে দীর্ঘায়ু ও মধ্যায়ুদের গড় আয়ুর পরিমাণ কমিয়া গিয়া এত নিম্নে পৌছিয়াছে। তুলনায় অনেক অধিক সংখ্যক লোক পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই মারা যান বলিয়া, এদেশে অপ্রাপ্তবয়স্কদের আন্তর্জাতিক সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। এই অপ্রাপ্তবয়স্কদের একটা বড় অংশ (যাঁহারা অকালে মারা যান) জনসংখ্যার অল্প বৃদ্ধি করিলেও, শক্তি বৃদ্ধি করে না, বরং এক হিসাবে শক্তি হ্রাস করে। যাঁহারা কর্মক্ষম হইবার পূর্বেই মারা যান, তাঁহাদের কর্মের দ্বারা দেশ কিছুমাত্র লাভবান হয় না; অথচ, তাঁহাদের লালনপালন করিবার জন্য যে শক্তি ব্যয়িত হয় তাহা সহজে অত্যাধিক প্রযুক্ত হইতে পারিত। এই অপব্যয়ের মধ্যে আমাদের অনেকখানি কর্মশক্তি একেজো হইয়া আবদ্ধ হইয়া আছে।

যাঁহারা বৃদ্ধ বা পূর্ণ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকেন অল্পপাতে তাঁহাদের সংখ্যা কম হওয়ায় তাঁহাদের প্রতিপাল্যের সংখ্যা

অত্যন্ত বেশী থাকে এবং ইহাদিগকে বাওয়াইবার পরাইবার হুহু রাখিবার ও যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদের এতটা শক্তি ব্যয় করিতে হয় যাঁহাতে শক্তি, উদ্যম, অধ্যবসায় ও দায়িত্ব সাপেক্ষ কোন কাজ করিবার মত ক্ষমতা তাঁহাদের আর অবশিষ্ট থাকে না।

নারীরা আমাদের জনসংখ্যার অর্দ্ধাংশ। অবরোধের মধ্যে থাকায় তাঁহাদের শক্তি ত অব্যবহৃত থাকিয়াই যাইতেছে। তাঁহারা পূর্ণ সুযোগ পাইলেও, যে-সকল কারণে পুরুষদের কর্মশক্তি অপেক্ষাকৃত কম, সে-সকল কারণে তাঁহাদের পক্ষেও সমভাবে বর্তমান থাকিত। অধিকন্তু, বালা-মাতৃত্ব, নানা সামাজিক কুপ্রথা, স্বাস্থ্যের উপর অবরোধের ফল প্রভৃতির জন্য পুরুষদের অপেক্ষা তাঁহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় এবং পুরুষদের অপেক্ষা অত্যন্ত দেশের তুলনায় তাঁহাদের কর্মশক্তি আরও কম। শিশু, মারাঠা প্রভৃতি যে-সকল বলিষ্ঠ জাতির পুরুষেরা শারীরিক শক্তিতে অত্যন্ত দেশের পুরুষদের সমান, তাঁহাদেরও নারীদের স্বাস্থ্য আশাহুরূপ নহে বলিয়া বিদেশীদের চোখে ঠেকিয়াছে।

কাজেই, আমাদের জনসংখ্যাকে আমাদের কর্মশক্তির পরিমাপ বলিয়া ধরা যায় না। আমরা যখন আমাদের বিপুল সংখ্যার কথা সগৌরবে উল্লেখ করিয়া থাকি, তখন মনে আমাদের বিপুল কর্মশক্তির কথাই জাগিয়া থাকে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে হয়ত আমাদের কর্মশক্তি একটি ছোট দেশের সমান হইবে মাত্র।

আলোকের পুত্র

শ্রীহেমলতা দেবী

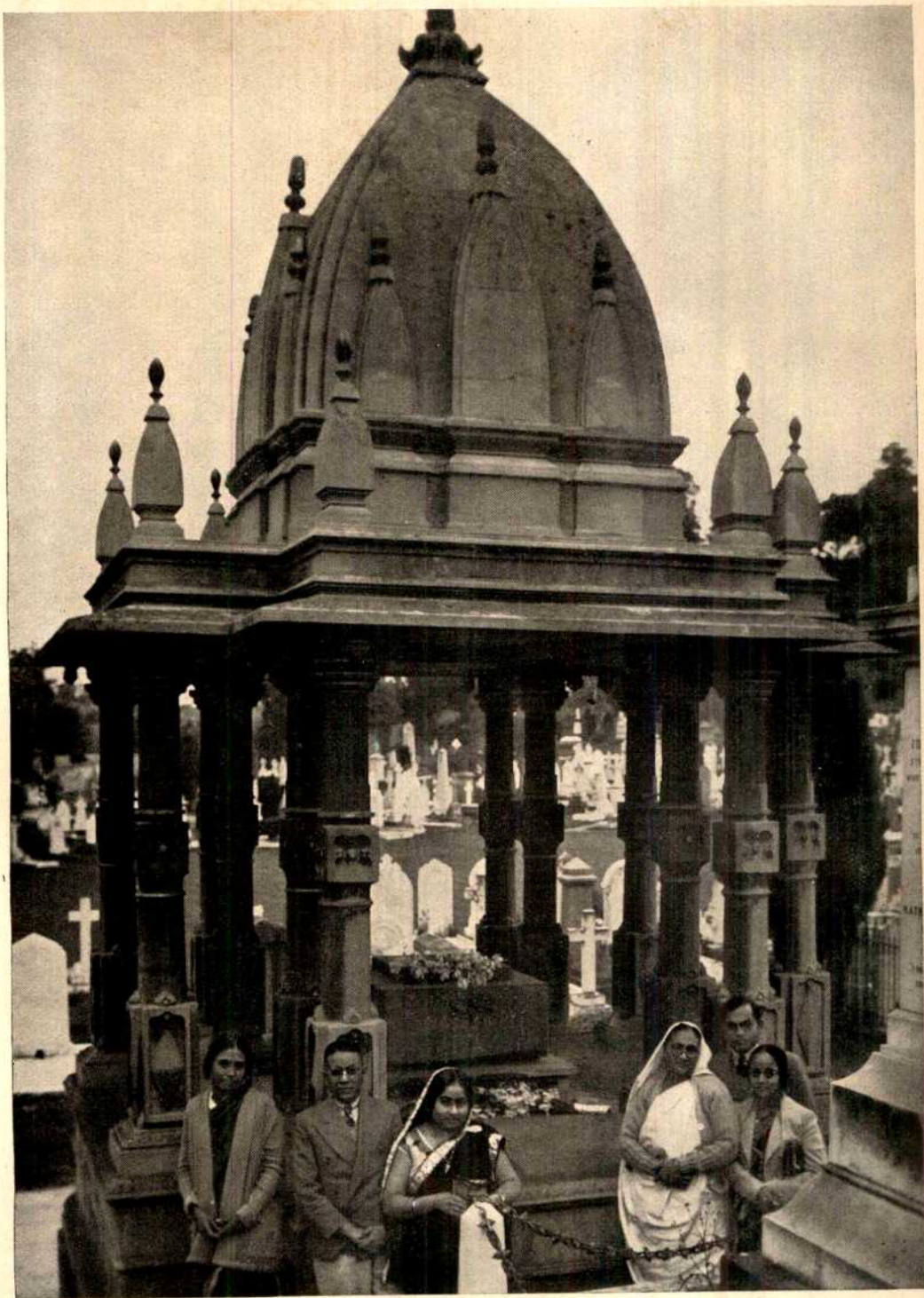
ব্রিটলে রাজা রামমোহনের সমাধিদর্শনে

চক্ষু মোর করিলে দর্শন।
কভু কি ইহার লাগি দেখিলে স্বপন?
ভেবেছি কত না কথা দূরান্তরে থাকি,
লোকান্তরে হ'তে তাই আনিলে কি ডাকি,
যেথা তব অঙ্গরেণু হরতি বিলায়ে
মাটি সাথে মাটি হয়ে রয়েছে মিলায়ে;
নিবিড় পরশে যার ধনু হ'ল প্রাণ,
পিতৃগুরু, বংশগুরু, হে গুরুপ্রধান।

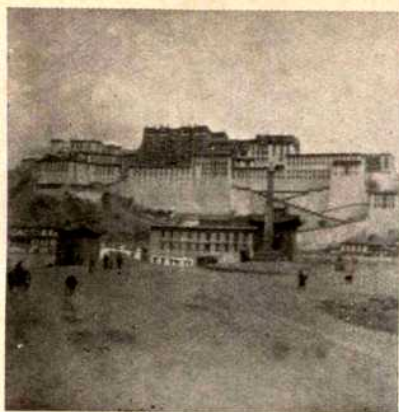
নিরীক সমাধিতল—বিস্মৃত বেদনা,
পরশিতে চায় সেই অপূর্ণ চেতনা,
মানব-ত্রৈক্যের রূপ উঠি যাহে ভাসি
তমসার পারে আনে আলোকের রাশি।
বিবেক-বিধৌত চিন্তে সত্তা-সমস্বয়
আলোকের বরপুত্র দৃষ্টি জ্যোতির্ময় ॥

ব্রিটল

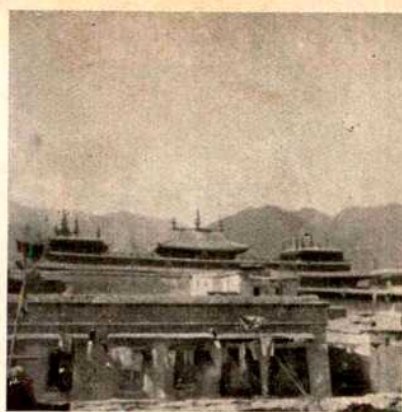
৫. ৬. ৩৭



ব্রিষ্টলে রাজা রামমোহন রায়েব সমাধি-মন্দির



দলাই লামার প্রাসাদ, লাসা



সে-রা বিজ্ঞানতন, লাসা



লাসার একটি কুপ



লাসার একটি পথ



লাসার রাজপথ

["নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

কনে-দেখা

শ্রীআশালতা সিংহ

লীলার স্বামী অ্যাসিসট্যান্ট-সার্জেন্ট, বড় বড় শহরে বসনি হন। পাড়াগাঁয়ে পৈত্রিক বাড়ীর সহিত সম্বন্ধ প্রায় নাই বলিলেও চলে। দ্বীও থাকেন স্বামীর চাকরির জায়গায়। অনেক দিন পরে দেশের বাড়ীতে আসিয়াছেন, বড়দাদার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে। লীলার এখানে চমৎকার লাগিতেছে। তাহার গভীর ডাবুক প্রকৃতি পল্লীর দ্বন্দ্ব শাস্ত আবহাওয়ার সহিত তারি চমৎকার খাপ খাইয়াছে। এখানে পরনিম্মা আছে, কোন্দল আছে, অথবা লোকের গায়ে পড়িয়া ঝগড়া আছে, কিন্তু লীলার বিশ্লেষণশীল মন এসকলের মাঝেই নিজেকে জড়াইয়া না ফেলিয়া বিচার করিয়া দেখিতে পারে। দর্শকের মত জীবনপ্রবাহের অভিনয়ে লিপ্ত না হইয়াও তাহার স্রোতের গতিবিধি বিচ্ছিন্ন হইয়া উপভোগ করিবার চুলভ ক্ষমতা তাহার ছিল।

সকালবেলার চায়ের বাসন সন্মুখে লইয়া বড়বৌ চা তৈয়ারী করিতেছেন, আশেপাশে অনেকেই সমবেত হইয়াছেন। লীলা এ-বাড়ীর মেজবৌ। চায়ের পেয়ালাগুলি সে জল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া সামনে আগাইয়া দিতেছিল।

বড়বৌ কহিলেন, “আহা থাক না মেজবৌ। তুমি দু-দিনের জন্ত এসেছ, তোমার দিবারাজ এত পরিশ্রম করবার কি দরকার? ঐ ত এত লোক রয়েছে। দে না নীলু চায়ের বাসনগুলো সব ঠিকঠাক করে।”

নীলু গুরুত্ব নীলিমা এ-বাড়ীর একটি বিধবা অন্নবয়সী আত্মীয়া। সে তটস্থ হইয়া লীলার হাতের কাজ কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিতেই লীলা মুহুমধুর হাসিয়া কহিল, “দু-দিনের জন্ত আসি নি তাই বড়দি, আমি যে মনে করেছি গরম কালটা এখানেই কাটিয়ে বর্ষার গোড়ার দিকে ফিরে যাব। যান উনি একাই ফিরে। পশ্চিমের সেই গরমের কল্পনাও তোমরা করতে পারবে না বড়দি।”

লীলা একে বড় চাকুরো কৃত্তী স্বামীর দ্বী, তত্পরি বহু দূর পশ্চিম প্রবাসে থাকে। তাই তাহার সম্বন্ধে সম্মম এবং নানা প্রকার অলৌকিক গুণব সত্যকে বহুদূরে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল।

অসীমা বড় বড় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, “আচ্ছা মেজ কাকীমা, তুমি কি এখানে থাকতে পারবে?”

“কেন পারব না রে?”

কেন যে পাবিবে না সে বিষয়ে অসীমা কোনই সন্দেহের দ্বিত্তে পারিল না। কিন্তু লীলার চূর্ণকুন্তল স্বেদসিক্ত হইয়া কপোলের উপর পড়িয়া আছে, তাহার গলার সৰু এক টুকরা চেনহার এবং হাতবিভাসিত মুখখানি—এ সমস্ত লইয়া তাহাকে যেন আশেপাশে সকলের হইতে বড় স্বদূর বলিয়া মনে হয়। এই গায়ে এই পচা ঝাঙলাধরা পুতুর এই দলদলির হিংস্র আবহাওয়ায় তাহাকে মানায় না।

অসীমার মা অবাক স্বরে কহিলেন, “শোন, মেয়ের কথা শোন একবার। নিজের স্বত্তরেব ভিটে, এখানে থাকতে পারবে না কেন শুনি? হ'লই বা চাকুরে-বাকুরে বড়লোক, নিজের ঘর বলতে তো এই।”

ক্রমে চায়ের পর্ব চুকিয়া আসিল, কেবল ছেলের দল তখনও এক-একটা গেলাস বা বাটি হাতে লইয়া কল্প স্বরে আবেদন জানাইতেছিল, “আমি আর একটু চা নেব বড়মা, আমাকে আর অন্ন দাও কাকীমা।...”

অতি অল্প বয়স হইতে চা খাইলে লিভার খারাপ হয় এই কথাটা নানা প্রকারে ছেলেদের বুঝাইতে বুঝাইতে লীলা বেশী দুধ দিয়া পাতলা চা ঢালিয়া দিতেছিল।

বিধবা খুড়শাঙড়ী দোস্তা দিয়া পান সাজিতে বসিয়াছিলেন। মুকব্বির স্বরে কহিলেন, “হ্যাঁ, মেজবৌমা, তুমিও যেমন বাছ। এই ছাংলা ছেলেগুলোকে আবার তত্ত্বকথা বোঝাতে এলে। গুরা ত সব কথাই বুঝতে পারছে তোমার, আর সব শুনে ব'সে আছে।...বা যা তোরা সব

বাইরে গিয়ে খেলাধুলো কর গে।” তিনি একটা প্রবল হকার ছাড়লেন।

নিমেষে ছেলের দল গেলাস-বাটি হাতে অন্তর্ধান হইল।

লীলা একবার ব্যথিত দৃষ্টিতে উর্দ্ধ্বাসে পলায়নপর ছেলের দিকে চাহিয়া অল্প কাজে মন দিল। ততক্ষণে বড় বড় খামা-চুপড়ি বাঁট-বারকোশ বার হইয়াছে। তরকারি কুটিবার কাজে ইতিমধ্যে কয়েক জন বসিয়া গিয়াছে। তরকারি কুটিতে বসিয়া মেয়েদের আলোচনা যেমন জমে এমনটি আব কিছতেই জমে না।

ও-পাড়ার চাটুস্বরের মেয়ে বিমলার কথা উঠিল। মেয়েটির বয়স সত্তর পার হইতে চলিল অথচ এখনও কোথাও বিবাহের ঠিক হয় নাই। পল্লী-ইতিহাসে এমনতর ভ্রাবহ কাণ্ড আরও দুই-চারিটা যে না ঘটয়াছে এমন নয়। এই যে সেদিন মিত্তিরদের মনোরমার আঠার বছরে বিবাহ হইল। হ্যা...পাকা আঠার বছর বয়স। ন-খুড়ীমাকে ঠকাইবার জো কি। তিনি হিসাব করিয়া সমস্তই বলিয়া দিতে পারেন। যে ভাজে তাঁহার বিখ্যাত দু-বছরেরটি হইয়া মারা যায় সেই ভাজের পরের ভাজে মনোরমার জন্ম হয়। তবেই দেখ না কেন হিসাব করিয়া খাড়ী মেয়ের বয়সখানা, মা-মাগী যতই কেননা কমাইয়া বলুক। তার পর বোসেদের দামিনী...তাহারও কোন্ না বোল পার হইয়া বিয়ের ফুল ফুটনাছিল। কিন্তু উপস্থিত তাহার সমালোচনা-কেন্দ্রের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কারণ যত বড় বয়সেই হোক, উপস্থিত তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিমলা...মাগো অবাক কাণ্ড। ঐ ত বাপের অবস্থা, আজ খাইতে কাল নাই, তবুও মা-মাগীর দেমাক দেখ না, পাত্র পছন্দ হয় না। য-হয় একটা খুঁজিয়া-পাতিয়া মেয়ে উদ্ধৃষ্ট করিয়া দে, তা নয় উনি আবার বর্ণবিচার করিতে বসিলেন।

লীলা বোলের আলুব খোলা ছাড়াইতে ছাড়াইতে কহিল, “কিন্তু খুড়ীমা, যেখানে-সেখানে মেয়েকে বিয়ে দিলে তার পরে সারাজীবনই ত কষ্ট। তার চেয়ে যদি ভাল পাত্র খুঁজতে একটু দেরিই হয়ে যায়, ক্ষতি কি?”

খুড়ী মা চট্ করিয়া একটা প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না, কারণ লীলাকে সকলেই একটু সমীহ করিয়া চলিত। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার মতেরও যে খুব একটা পরিবর্তন হইল

তা নয়। সেই দিনই দুপুরবেলায় আনের ঘাটে হরি পালিতের লীকে তিনি হাত-পা নাড়িয়া বিধিমতে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, “হ্যা, দেখো তোমরা, আমি ব’লে দিলাম ঐ মেয়েটি কম নয়। সোয়ামীর সঙ্গে বিদেশে বিদেশে ঘোর, বলতে গেলে একেবারে স্নেহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ আমাকে বলে কি না বিমলার বিষয়ে যদি ওর মা-বাপ দেরি ক’রেই থাকে, বেশ করেছে। মেয়েমানুষের বিয়ে ভাল পাত্র দেখে দিতে গেলে অমন দেরি হয়েই থাকে। কে বলেছে?...ও মা, বুঝতে পারছ না, আমাদের বাড়ীর মেজবোমা, লীলেবতী না কি নাম।”

প্রত্যুত্তরে প্রতিবেশিনী গালে হাত দিয়া তাঁহার বিন্দ্রয়ের যাত্রা যথোপযুক্ত ভাষায় ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, এমনটি যে হইবে সে বিষয়ে আগে হইতেই তাঁহার সন্দেহ ছিল। এখন ঐ মেজবোয়ের পাকায় পড়িয়া বাড়ীর অন্ত ঝি-বৌজলা এক রকমের না হইয়া গেলে বাঁচি!

২

রায়েদের গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দ জীউর প্রস্তরনির্মিত মন্দির গ্রামের মধ্যস্থলে। সন্ধ্যারতির সময় স্ববিস্তৃত আটচালার গ্রামের সকল জীলোকেই প্রায় আরতি দর্শন করিতে আসেন। আরতির যথানির্দিষ্ট সময়ের অনেকক্ষণ আগে হইতেই তাঁহারা আসিতে সুরু করেন, সন্ধ্যা মজলিসে এমন সকল কথার আলোচনা হয় যাহার সহিত ভগবানের আরতির কোনই সম্পর্ক নাই।

লীলাও আরতি দেখিতে আসিয়াছে। আসিয়া দেখিল, আটচালার পূর্ব কোণে একটি মেয়ে অতিশয় নিমন্ত্র এবং সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া আছে। মেয়েটির বয়স বছর জিশ বা দু-এক বছর বেশী হইবে। সখবা। আধময়লা লাল-পাড়ের শাড়ী পরনে। দুঃখদৈতের সঙ্গে অবিরত লড়াই করিয়া একটা ক্লশ কঠোরতার ছাপ মুখে দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। সে লীলার একটু কাছে সরিয়া বসিয়া কহিল, “ভাই তুমি নাকি ভারি স্মন্দর স্মন্দর সেলাই জান। আমার মেয়ের শিখবার বড় সখ, কিন্তু স্ববিধে পায় না। সে যদি দুপুরে তোমার বাড়ী যায়, অবসরমত একটু শেখাবে?”

“আপনার মেয়ে? কি নাম তাঁর?”—লীলা প্রশ্ন করিল।

“বিমলা। তুমি বোধ হয় চেন না। কিন্তু নাম শুনেই বুঝতে পারবে।”—বিমলার মা একটুখানি হাসিয়া আবার বলিলেন, “অসম্ভব বুঝতে পারবার কথাই ত বটে। মুখে মুখে যা আলোচনা চলেছে।”

লীলা এতক্ষণে বুঝিতে পারিল, এই সেই বিমলা যাহার কথা লইয়া সকালবেলায় এত আলোচনার টেউ বহিয়া গেল। যুদ্ধ হাসিয়া সে বলিল, “আমি যেটুকু জানি নিশ্চয় শেখাব দিদি। আমি তো দু-মাস এখন এখানেই রইলাম। তাকে আসতে বলবেন।”

বিমলার মা আর কোন কথা বলিল না। কিন্তু তাহার শীর্ণ মুখের উপর একটি কৃতজ্ঞতা এবং নিঃশব্দ প্রীতির ছায়া ভাসিয়া গেল। তখন আরতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, আর কোন কথাবার্ত্তাব অবসর হইল না। তথাপি লীলা যেন কেমন করিয়া বুঝিতে পারিল এই স্বল্পভাষিনী সাধারণ মেয়েটির মধ্যে অসামান্যতা কিছু আছে, যাহাতে তাহাকে অদূরে সমাগতা ঐ সব মহিলামণ্ডলীর সহিত এক করিয়া দেখা যায় না কিছুতেই।

পরের দিন ষাওয়া-দাওয়ার পর লীলা নিজের ঘরে বসিয়া রবীন্দ্রনাথের গল্পশুধ হইতে “রাসমণির ছেলে” গল্পটি বাহির করিয়া পড়িতেছিল, এমন সময় ছয়ারের কাছে একটা ছায়া পড়িল। সে বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিলে বিমলা ঘরে ঢুকিল। বয়স তাহার পনের-ষোলর বেশী কিছুতেই হইবে না। চমৎকার স্ত্রী দেখিতে। আর সবচেয়ে লীলার ভাল লাগিল চোখে মুখে একটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিব আভা, যে-বস্তুটা এখানে এত মেয়ের সহিত আলাপ হইয়াছে কাহারও মধ্যে সে লক্ষ্য করে নাই। সকলেরই মধ্যে প্রাণহীন একটা জড়তার ভাব। এই জড়ত্বের স্থল অবলম্বন অনেক স্থলরী মেয়েকেও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে পারে নাই। বিমলার বেলায় কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। সে স্থলরী খুব নয়, কিন্তু তাহার জোড়া ভুরুতে, ঘনকালো তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টিতে অত্যন্ত সপ্রতিভ বুদ্ধির একটা রশ্মি বিচ্ছুরিত। লীলার সম্মুখস্থ বইটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে সে যুদ্ধস্বরে কহিল, “রাসমণির

ছেলে গল্পটা আমি যে কতবার পড়েছি। এত ভাল লাগে।”

লীলা বিস্মিত হইয়া কহিল, “তুমি এ সব বই পড়?”

বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু সে লজ্জিত হইল। মনে হইল, হয়ত বিমলা মনে করিতে পারে জগতের ভাল বই একমাত্র সে ছাড়া আর কেহই উপভোগ করিতে পারে না। কিন্তু বস্তুত সেরূপ মনোভাব লইয়া সে জিজ্ঞাসা করে নাই। এখানে মেয়েদের মুখে অহরহ যে ধরণের আলোচনা ও পরস্পরসার প্রবণতা লক্ষ্য করিয়াছে তাহাতে অবাক হইয়া মাঝে মাঝে সে ভাবিয়াছে, ইহার কখনও কি তারার আলোর দিকে তাকায় না?

বিমলা নতমুখে কহিল, “আমার মা যে খুব ভাল লেখাপড়া জানেন। তিনিই অনেক যত্নে আমাদের শিখিয়েছেন।”

“সে আমি তাঁর সঙ্গে অল্প একটুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলেই বুঝতে পেরেছিলুম।”—লীলা সেলাইয়ের কলের চাবিটা খুলিতে খুলিতে বলিল।

সেদিন ছপুরবেলায় অনেকক্ষণ ধরিয়া একত্রে সেলাই করিতে করিতে বিমলার সঙ্গে লীলার অনেক কথাই হইল। এই শাস্ত সপ্রতিভ অনুচা মেয়েটির মধ্যে একটা তেজ এবং প্রবল আত্মাভিমান রহিয়াছে, অথচ যেখানে সত্যকার সহানুভূতি থাকে মানুষ অজ্ঞাতসারেই সেখানে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেয়। তাই বিমলা নিজেকে যথাসম্ভব চাপিয়া রাখিয়াও কখন এক সময় লীলাকে বলিতেছিল, “দেখুন, আমার নিজের কথা বাদ দিলে, আমার অনেক বয়স অবধি বিয়ে হচ্ছে না বলে লোকে যা তর্ক বলছে, তাতে আমাব এক বিদ্মুও আসে যায় না। কিন্তু এই সব নির্দয় সমালোচনায় আমার মাকে ব্যথা পেতে হয়।”

একটু পরে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। নতুন করে কহিল, “আপনার কাছে কয়েকটা ইটকাট শিখে নেব। কিন্তু তার জন্তে মাঝে মাঝে এলেই হবে। রোজ যদি আসি আপনারও বোধ হয় অস্ববিধে হবে।”

“না অস্ববিধে কিছুই হবে না। তুমি রোজই এস। ...আমি সারা দুপুর একা থাকি। উনি তো নিজের কাজের জায়গায় কিরে গেছেন। আমারই ধরণ সময় কাটে না।”

বিমলা মুখ নীচু কবিয়াছিল। মুখ তুলিয়া হাসিয়া ফেলিল।

“হাসলে কেন?”

“বুঝতে পারলেন না? সত্যি?”

“না।”

“আমি এখানে রোজ যদি আসি, হয়ত আপনাকে অনেক অপ্রীতিকর কথা শুনতে হবে। দরকার কি?”

শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর যেন অভিযানে ছল ছল করিয়া উঠিল। আর বিশেষ কিছু না বলিয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

৩

বিকালবেলায় গুরুরে গা ধুইতে গিয়া লীলা একাকী একটি ছায়াচ্ছন্ন বনপথ দিয়া বিমলাদের বাড়ীতে গিয়া উঠিল। বিমলার মা দাঁড়ায় বসিয়া ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিতেছিলেন। বিমলা ছোট একটি নিড়ানি হাতে উঠানের শাকের ক্ষেত এবং বেগুনের চারাগুলির তত্ত্বাবধান করিতেছিল।

লীলাকে দেখিয়া সে হাতের কাজ রাখিয়া স্নিগ্ধ হাস্যে একখানি জীর্ণ আসন পাতিয়া দিল। তার পর আবার আপন কাজে প্রবৃত্ত হইল। বিমলার মা মুহূর্ত্তের তাহার সহিত সামসারিক স্বথদুঃখের নানাবিধ গল্প স্বল্প করিলেন। লীলা দেখিয়া অবাক হইল, তাঁহার ব্যবহার এবং কথাবার্তা কি স্বন্দর সহজ এবং স্বচ্ছ। এক ধনীর গৃহিণী দরিদ্রের কুটীরে আসিয়াছেন বেড়াইতে; তবু না আছে কোন লোক-দেখানো হেঁচো, না আছে কোন বৃথা লজ্জা বা সঙ্কোচের ভান।

বিমলার মা নিজের শৈশবজীবনের কথা গল্প করিতে ছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন এক জন বিখ্যাত অধ্যাপক। ছেলে এবং মেয়েতে কখনও তফাৎ করেন নাই। তাঁদের দুই বোনকে যথাসাধ্য যত্নে শিক্ষা দিয়াছিলেন। হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। তবুও বিমলার মায়ের দ্বন্দ্ব বিবাহ হয়, তখন তাঁহাদের স্বপ্নরবাড়ীর অবস্থা এত খারাপ ছিল না। ওঁর স্বামী তখন কলিকাতার কলেজে বি-এ পড়েন। তার পর ভাগ্যের আবর্ত্তনে সবই বদলাইয়া গেল। সরিকী মামলার অভ্যন্ত জেদী প্রকৃতির স্বপ্নর বিষয়-সম্পত্তির

অধিকাংশই প্রায় উড়াইয়া ফেলিলেন। স্বামীর নিউমোনিয়া ধরিল শক্ত করিয়া। যদিবা অনেক কষ্টে প্রাণটা বাঁচিল, সেই হইতে চিরকাল হইয়া আছেন।

লেখাপড়ার কথা ওঠায় কহিলেন, “দেখুন, ছেলেমেয়ের স্বথদুঃখ সে তো তাদের ভাগ্য। বাপ-মা হাজার চেষ্টা করলেও ভাগ্য বদলে দিতে পারে না। আমার জীবনেই তার প্রমাণ দেখলেন। কিন্তু ছেলেমেয়েকে একটা বস্ত্র মা-বাবা দান করে যেতে পারেন—সেটা শিক্ষা। জীবনে যেমন ভাবে যে অবস্থাতেই থাক, যথার্থ শিক্ষিত হলে অস্বন্দরতাকে সে প্রাণপণে পরিহার করে চলবেই। বিমলাকে ম্যাট্রিক আই-এ পাস না করাতে পারি, এইটুকু শিক্ষাই আমি যথাসাধ্য দিতে চেষ্টা করেছি।”

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বিমলাদের ছোট তুলসী-প্রাঙ্গণে একটি মাটির প্রদীপ মুহূর্ত্ত জ্বলিতেছে। বিমলার মা বলিলেন, “বিমলা যাও তোমার মাসীমাকে পৌছে দিয়ে এস। সন্ধ্যা হয়ে গেল, অচেনা পথ। না-হয় মন্দির অবধি পৌছে দিয়ে এস। সেখানে এতক্ষণ হয়ত আরতি শুরু হয়ে গেছে। আমি আজ আর আরতি দেখতে যাব না। ওঁর শবীরটা ভাল নেই।”

প্রথম স্তরপক্ষের মুহূর্ত্তটুকু জ্যোৎস্না জ্বালাকা রাস্তা ও তেঁতুলের কাড়, বাঁশঝাড়ের উপর পড়িয়া কি এক রকম দেখাইতেছিল। নির্জন রাস্তায় চলিতে চলিতে লীলার মনটি তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। এখানে আসার পর হইতে এখন এমন এক বাড়ীর সহিত আলাপ হইল যেখানে আসা-যাওয়া করিলে যথার্থ তৃপ্তি ও আনন্দ পাইবে। বিমলার মায়ের মুখের কথাটি তাহার বারংবার মনে পড়িতে লাগিল, মা বাপ একটি বস্ত্র সজ্জানকে দান করিতে পারেন, সে এমন শিক্ষা যাহা জীবনে সকল অবস্থাতেই সৌন্দর্য্যকে স্বীকার করে। কোন প্রকারেই যেন অস্বন্দরতাকে মানিয়া না লয়। বিমলাদের বাড়ীর সহিত তুলনা করিতেই এ-কথাটার অর্থ পবিস্মৃত হইয়া উঠে। সেদিন পাশেব বাড়ীতে সেজখুড়ীমাদের ওখানে বেড়াইতে গিয়াছিল। তখন বাড়ীতে একটা হলস্থল বাধিয়া গিয়াছে। সেজ-খুড়ীমা একটা আট হাত শুদ্ধ কাপড় পবিস্মৃত রণরঞ্জিত মৃতিতে ক্ষাতলায় চর্কিবাজীর মত ঘুরিতেছিলেন। তাঁহার

পূজবধু মান ভীত মুখে স্বমুখে দাঁড়াইয়াছিল। ব্যাপার হইয়াছিল, নীচ জাতীয়া বিয়ের মাজিয়া-আনা বাসন আর একবাব ভাল করিয়া জল ঢালিয়া ঘরে তোলা হয়। ছোট বোটি সেই কাজেই রত ছিল। কিন্তু সেজখুড়ীয়ার কেমন করিয়া মনে হইয়াছে যে, যথোপযুক্তরূপে জল ঢালা হয় নাই, অতএব জাতজন্ম সবই গিয়াছে। তুচ্ছ একটা ব্যাপার লইয়া কি তুমুল কলরব, শান্তিভঙ্গ, মনঃকষ্ট! জীবনের সকল মাধুর্য্য অবমানিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

8

মান করিয়া আসিয়া লীলা পান সাজিতে বাসিয়াছিল। বড়বৌ পাশে বসিয়া জাঁতি দিয়া স্থপাবি কাটিয়া শুপাকার করিতেছিলেন। একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, “এত দিন পরে বোধ করি বিমলার বিয়ের ফুল ফুটল। শুনিছি কোন্ এক জায়গা থেকে নাকি দেখতে এসেছে। তারা কাল রাজির ট্রেনে এসেছে। গল্পর গাড়ী ক’রে এখানে পৌছতে সেই যাকে বলে গিয়ে রাত এগারটা। আজ সকালে বুঝি কনে দেখান হবে।”

লীলা উৎসুক হইয়া উঠিয়া কহিল, “তাই নাকি ?

আজ্ঞা কেমন জায়গায় সম্বন্ধ হচ্ছে দিদি ?”

“নোহাৎ মন্দ নয়। পাজিটি ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়েছে। গাঁয়ে অসীম্যমা আছে। মোটা ভাত-কাপড়ের কষ্ট নেই। তবুও কি খাঁই কম! একটি হাজার টাকা পণ নেবে। তা ছাড়া অল্পস্বল্প গয়নাগাটি, বিয়ের খরচ। কত জায়গায় খুঁজে দেখলে। এর চেয়ে কমে কি আর মেয়ের বিয়ে হয়।”

পাড়ার কৌতুহলী মেয়ের দল, বাহারা কোনদিন গ্রামের একপ্রান্তে বিমলাদের গৃহে পদার্পণ করে না, আজ একেবারে দলে দলে ভাড়িয়া পড়িয়াছিল। লীলাও গেল। পাশের ঘর হইতে দেখিল, সম্বরের তক্তপোষের উপর একটি পরিষ্কার চাদর পাতা। বর তাহার এক জন বন্ধুকে লইয়া দেখিতে আসিয়াছে। বিমলা একখানি সাদাসিদে ধোয়ান কালোপাড়ের কাপড় পরিয়া পিতার সহিত গেল। অত্যন্ত বাহুল্যবজ্জিত বেশ। অলঙ্কার বা প্রসাধন কিংবা জর্জেট বেনারসীর একান্তই অভাব। তথাপি ঐ বেশেই তাহাকে কি চমৎকার মানাইয়াছে। শান্ত মুখচ্ছবিতে একটি আত্ম-সমাহিত ভাব। কপালের সিন্দূর-বিন্দুটি জল জল করিতেছে।

জীবনের দুঃখদৈন্যকে জানিয়া শুনিয়া বরণ করিয়া লইয়াও ঐ সিঁড়রের টিপটি যেন একটি রক্তগোলাপ হইয়া ফুটিয়া আছে।

বরের বন্ধু কলিকাতার ছেলে, গ্রাজুয়েট। আজকালকার অত্যন্ত নব্য এবং চতুর যুবক। সমস্ত জিনিষের বাজারদর যাচাই করিয়া বাজাইয়া লইতে পারে। তাই বিশেষ নির্বন্ধ করিয়া তাহাকে এ ব্যাপারে আনা।

বন্ধুটি একটা সিগারেট ধরাইয়া কহিল, “আজ্ঞা আপনি ক’রকম সেলাই জানেন? এম্ব্রয়ডারি, কাম্বীরী ষ্টিচ?... পিক্টোগ্রাফ?...আজ্ঞা বলুন দেখি মাছের কোণ্ডা কেমন ক’রে রাঁধে? মুড়ি ভাজতে জানেন? রাঁধাবাড়া বাটনা-বাটা এসব?...ভাতের স্টেন কেমন ক’রে ঝরাই বলুন দেখি?...আজ্ঞা গান? গান কি এশ্রাজ্য বাজিয়ে করেন, না হার্মোনিয়াম?”

বিমলা বিশেষ কোন কথাই জবাব না দিয়া স্মিতমুখে নমস্কার করিয়া উঠিয়া আসিবার সময় কহিল, “সাধারণ অল্পআয়ের অধিকাংশ বাড়ালী গৃহস্থঘর চালাতে গেলে যা যা শিখতে হয় সেইটুকু মাত্র শিখেছি। তার বেশী জানি নে।”

শোনা গেল, কত পছন্দ হইয়াছে। বরের বন্ধু রায় দিয়াছেন, অত্যন্ত সেকলে, যদিও চেহারা মন্দ নয়। কিন্তু স্বয়ং পাজি বলিয়াছেন, “যাদের দু’খানা হালের জমিতে সংসার চালাতে হয় তাদের জী এশ্রাজ্য বাজিয়ে গান গায়, না হার্মোনিয়ামের সঙ্গে গায়, এ-কথাটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।”

লীলার মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু সেদিন দুপুরবেলায় যথানিয়মিত সেলাই শিখিতে আসিয়া বিমলা একটু হাসিয়া কহিল, “তুমি কেন মিথ্যে দুঃখ পাচ্ছ মাসীমা। ভেবে দেখ বাংলা দেশের নিরানব্বই জন মেয়ের ত এমনই ক’রে অর্দ্ধসচ্ছল সংসারে কায়ক্লেশে দিন কেটে যায়। আমি তাদেরই এক জন—একথা ভাবতে আমাব মনে কোন কষ্ট নেই। কিন্তু এই মনে ক’রে কেবল আমাব হাসি পাচ্ছে যে, বাংলা-দেশে কনে-দেখা বস্তুটা কি রকম প্রহসনের ব্যাপার। মেয়েটিকে যাচাই করতে এসে জ্বরির এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করবেন, তুমি শেলী, কীটস, বায়রণ পড়েছ?...তুমি ঘুঁটে দিতে পার? অথচ এর হাতকরতা, নিষ্কলতা আর অসজ্জতির দিকটা তাদের চোখে পড়ে না।”

মেঘালোকে

ঐযতীন্দ্রনোহন বাগচী

আমাদের মধ্যে ষাঁরা ব্যবসায়ী, ষাঁরা কাজের লোক,— বাহিরের বিষয়বুদ্ধি ষাঁদের প্রথর, তাঁদের হালখাতা হয় শুভ বৈশাখের পয়লা তারিখে; আর ষাঁরা অব্যবসায়ী, অকর্ম্মা, চিন্তাবৃত্তি ও কল্পনা লইয়াই ষাঁদের কারবার, তাঁদের হালখাতা, বোধ করি, আষাঢ় মাসের পয়লায়,—মহাকবি কালিদাস যেদিনটিকে তাঁর বিরহকাব্য মেঘদূতে অমর করিয়া গিয়াছেন। পয়লা বৈশাখের বদলে, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসেই যেন সেই হইতে প্রণয়ীজনের প্রীতিচর্চার শুভসুযোগ সূচিত হইয়া আছে।

মেঘে-মেঘে যেদিন আকাশ ছাওয়া, দিকে-দিকে যেদিন সজল হাওয়া, পথে-পথে যেদিন হুস্তর কাঁদা, বাহির হইবার যেদিন বিস্তর বাধা, প্রাত্যহিক কাজকর্ম্মের কথা তুলিয়া চিত্ত সেদিন স্বভাবতই অন্তর্মুখী হইয়া উঠে এবং আপনার ঘরের কথা, অন্তরের কথা, ভালবাসার কথা, প্রিয়জনের কথা এবং ক্ষমের স্বখচ্ছুরের কথাই তাহার মনে পড়ে। ছড়ানো মনকে মাল্লব যেন সেদিন কুড়াইয়া পায় এবং নিভৃত গৃহের কর্ম্মহীন নশ্বশয্যায় তাই দিয়া সে যেন মালা গাঁথিতে বসে।

এই পয়লা আষাঢ় উৎসব করিবার দিন বটে, কিন্তু সে উৎসব বাহিরের আড়ম্বর লইয়া নয়, অন্তরের অন্তর্ভূতি লইয়া। মৌর্খমৈত্ৰমধর বনভুবঃ শ্রামান্তমালঙ্কর্যে যেদিন, সেদিন নিভৃত নিষ্কুলমিলনের আকাঙ্ক্ষাই রাধার একমাত্র আকর্ষণ। সেদিন অল্প চিন্তার অবসর নাই। “নীল নবঘনে আষাঢ়-গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে, ওরে তোরা আজ যাস্নে ঘরের বাহিরে” যেদিন, সেদিন ঘরই একমাত্র কাম্য।

দিনের সঙ্গে রাজির যে সম্বন্ধ, অশ্রান্ত ঋতুপর্ধ্যায়ের সঙ্গে বর্ষার সম্বন্ধ অনেকটা তাই।

ভরা হুগুরেতে আজ রজনী শ্রাবণ মেঘের গুণে,
সে যে দিবালোক দিল নিবাসে কাজল বসন বুনে;
শালের শ্রামল ছায়ায় পীতল বাহল হাওয়ার
দিবস আজিকে ঘুমায় মেঘের বৃষ্ণ গুনে।

রাজির মত অন্ধকারাবৃত্ত বর্ষাদিনে প্রকৃতির যেন সত্যকার

নেপথ্যবিধান। এমন দিনে পুরাকালের তপোবন-গুরুগৃহে অনধ্যায়ের বিধান ছিল। সংসার-তপোবনের কর্ম্মহীন দিবসেও সেই বিধিই, বোধ করি, স্বাভাবিক ও সুসম্মত।

দিনরাজির প্রভেদ সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

“শক্তিতে আমাদের গতি, প্রেম আমাদের হিতি; শক্তি কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে ধাবিত করে, প্রেম বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে পুঞ্জীভূত করে। শক্তি আপনাকে বিকিপ্ত করিতে থাকে—সে চঞ্চল; প্রেম আপনাকে সংহত করিয়া আনে—সে স্থির। এই জন্ত দিব্যবাসনে আমাদের প্রয়োজন যখন শেষ হয়, আমাদের কর্ম্মের বেগ যখন শান্ত হয়, তখনই সমস্ত আবস্তকের অতীত যে প্রেম, সে আপনার বর্ষার্থ অবকাশ পায়। আমাদের কর্ম্মের সহায় যে ইন্দ্রিয়বোধ, সে যখন অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে, তখন ব্যাঘাতহীন আমাদের চলনের শক্তি বাড়িয়া উঠে; তখন আমাদের প্রেম প্রেম সহজ হয়, আমাদের মিলন সম্পূর্ণ হয়।...আবার যখন দেখি, আমাদের এক ঘর, আমরা আর পাই এবং ঘর বলিয়াই আমরা তাহা পাইতে পারি। দিনে সংসারক্ষেত্রে আমাদের শক্তিপ্রয়োগের স্বপ্ন, রাত্রে তাহা অভিব্যক্ত হয় বলিয়াই নিখিলের মধ্যে আমরা আত্মসমর্পণের আনন্দ পাই। দিনে বার্ষিকসান্নিধ্যের আমাদের কর্তৃত্বাভিমান তৃপ্ত হয়, রাত্রি তাহাকে ধর্ম্ম করে বলিয়াই প্রেম এবং শান্তির অধিকার লাভ করি। দিনে আলোকে পরিচ্ছিন্ন এই পৃথিবীকে আমরা উজ্জলরূপ পাই, রাত্রে তাহা রান হয় বলিয়াই অগণ্য জ্যোতিষ্কলোক উদ্ঘাটিত হইয়া ঘর।”

অশ্রান্ত ঋতুর সহিত বর্ষা-ঋতুর প্রকৃতিগত পার্থক্য, দিন-রাজির এই প্রাকৃতিক প্রভেদের মতন স্থম্পষ্ট—ইহা একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে।

মেঘদূতের

‘মেঘালোকে ভবতি স্থিনোঃপাস্তথাবৃত্তি তেতঃ,
কঠাশ্বেষপ্রণিগিলনে কিং পুনরুৎসাহে।’

প্রণয়বোধের চরম মন্ত্র। এই যে আকৃতি, এই যে অতৃপ্তি, এই যে বিরহমিলনে চিন্তাবিকার, ইহাই প্রেমের সহজ ধর্ম্ম। বৈষ্ণব-কবিতাতেও এই অন্তর্দাহের পরিচয় পাই।

‘কানুর গিরীতি বলিতে বলিতে পাঁজর কাটিয়া উঠে,
শব্দবর্ণিকের কহাত যেমন আগিতে বাইতে কাটে।’

পাপশঙ্কী প্রেমিকচিত্তে সর্বদাই অস্বস্তি, সর্বদাই ভয়।

‘বুকেতে রাখিতে গেলে ঘাসে গলে’ বার,
পিঠেতে রাখিতে লাগে দূরদেশ তার।
বপনে হারিয়ে যায়, জাগ্রতে সুশ্রম,
আপনারে অবিশাস, আপনারে ভয়।’

স্বপ্নাবিষে মিশ্রিত এই প্রেমমর্ষ কথাই মন্ববাকী পাইয়াছে
চণ্ডীদাসের পদে :—যেখানে

‘পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে।
অমিয়া বলিয়া ছানিয়া খাইল তিতায় তিতিল দে’; অথবা
‘পিরীতি পিরীতি সবজন কহে পিরীতি সহজ কথা?
বিদ্যুৎখের ফল নহে ত পিরীতি, মিলয়ে যে বশ্যতথা’ ইত্যাদি।

বিরহ এই প্রেমের নিকষ-প্রান্তর। ইহারই গানে
কবিয়া প্রেমমণির স্বরূপ নির্ণীত হয়। ‘সুজনকি প্রেম হেম
সমতুল। দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল’ ॥

‘সঙ্গ বিরহবিকলে বরষিহ বিরহ ন সঙ্গমত্তা।
সঙ্গে সৈব তথৈকা জিহুবনমপি ভগ্নয় তথিরহে’ ॥

এই যে প্রেমাত্মভূতি, এই যে বিরহতৃষ্ণা,—বর্ষাঋতুই
যেন তাহাকে বিশিষ্টরূপে স্থানিবিড় ও রসঘন করিয়া তুলে।
বাহিরে যখন মেঘে-মেঘে চরাচর আচ্ছন্ন, আলোকাভাবে
কর্ণেস্ত্রিয়গ্রাম যখন অচলপ্রায়,—চক্ষের দৃষ্টিটি পর্যন্ত
অভিভূত, বারিধারার, অবিশ্রান্ত রিমিমিষি বর্ষণশব্দে
প্রাণ যখন প্রায় লুপ্তধর্মী, নাসিকা যখন ধারাপাতজ্বলিত
মেদিনীগন্ধে বিহ্বল, তেমন দিনে, তেমন ক্ষণে মনের যে
মানসিক অভিসার! আপনার জনের জন্ত মন-কেমন না
করিয়া কি সেদিন থাকিতে পারে? তাই বুঝি কবির
কণ্ঠে :—

এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়,—
এমন মেঘঘরে, বাধর স্বরস্বরে, তপনহীন ঘন তমসায়।

বর্ষার সঙ্গে প্রেমের যেন একটা নিত্য সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ
অম্লভূতির। এই অম্লভূতির প্রগাঢ়তায় প্রীতিরস যেন রূপ
পায়, প্রেমের কাব্য যেন মুষ্টি পরিগ্রহ করে। অস্ত্রান্ত
ঋতুর কথা ছাড়িয়া দিয়া, ঋতুরাজ যে বসন্ত, তাহারই কথা
ধরি। পিককণ্ঠে সে যতই মধু ঢালিয়া দিক্, বিচিত্র পুষ্প-
সম্ভারে যতই বর্ণসৌরভের সমারোহ সে সজ্জিত করুক,
মলয়ের মুহুমাকুতহিল্লোলে যতই মানুষ্যের চিত্তবিমোহন ঘটুক
না কেন মর্ষ-সুহাসিনী বুদ্ধিক্ত প্রেমকে সে তেমন করিয়া
প্রবুদ্ধ করিতে পারে না, যেমন বর্ষায় পারে। কারণ, বসন্ত

বাহিরের চোখ ফুলাইবার আয়োজনমাত্র; প্রাণের ভিক্ষা-
পাত্র তাহাতে ভরিয়া উঠে না। সেও, যেন মনে হয়,
‘এহ বাহু, আগে কহ আর’। তাই বুঝি বিদ্যাপতির
‘আজু কাজরে সাজর রাতি,’ এবং সেই সঙ্গে

দুখের নাহিক ওর—

এ ভরা বাহর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির যোর।
স্বপ্নাঘন গরজন্তি সম্ভতি ভুবন ভরি বরিধস্তিরা,
কান্ত পাহ ন, বিরহ দারুণ সঘন ধরপর হস্তিরা।
কুলিশ শরশত পাতমোদিত মধুর নাচত মাতিরা,
মত্ত দ্বাদরী, ডাকে ডাহকী, ফাটি বাওত ছাতিরা।
তিমির বিগ ভরি যোর বামিনী, অধিব বিজরি কি পাতিরা,
বিদ্যাপতি কহে ক্যারসে গৌরাইনু হরিবিনে বিনরাতিরা?

—এ গানের তুলনা নাই। এই গানের শব্দে ও ছন্দে
বাহরধারার রিমিকিমিষনি যেন স্তব্ধলয়ে বাস্তব হইয়া
উঠিতেছে। ভাবে ও রসে বর্ষার একান্ত অন্তরবেদনা
যেন করিয়া করিয়া পড়িতেছে।

ইহার পরেও বুঝি আরও একটি স্তর আছে, বাকী
যেখানে মুক্ হইয়া যায়; বাহা বচনীষ, তাহা অনির্বচনীয় হইয়া
উঠে। তাই, সেখানে আমরা দেখিতে পাই—চণ্ডীদাসের
ভাষায়—

রাধার কি হৈল অন্তরব্যাধ।

ভুক্তি নরনে চাহে যেখানে, কহিতে পারে না কথা।

—সেখানে সকল কথা বন্ধ হইয়া যায়—শব্দশৈথিল্যের ভাষায়
শুধু ‘রসের পাথার, না জানে সাঁতার, ডুবিল শেখর রায়’।

বাহারী বর্ষার সিদ্ধ কবি, যেমন কালিদাস, বিদ্যাপতি,
রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি,—তাহারা যুগপৎ প্রাণের, প্রেমের ও
প্রকৃতির পরিপূর্ণ প্রতিকল্পি আঁকিয়া তাহাকে রূপদান
করিয়াছেন। এবং বর্ষাকে, প্রেমকে ও প্রাণকে তাহারা শুধু
রূপে রূপান্তরিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, একেবারে রসে
রসাক্ত করিয়াছেন।

বর্ষার সেই শ্রামসমারোহাচ্ছন্ন মেঘচ্ছায়ায় বসিয়া আজ
কেতকীকুটজকদম্বপুষ্পসম্ভারে পঙ্কজদেবকে অর্ঘ্যদান করি।

ইংলেণ্ডে ভারতীয় ছাত্র

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়

আমরা ইংলেণ্ড-ফেরত ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে এত পরিচিত এবং তাদের কাছ থেকে এত কথা শুনি যে আমরা পক্ষে তাদের বিষয়ে নূতন কিছু বলা এক রকম অসম্ভব। তবুও সেই পুরনো কথাই আবার পাঁচ জনের কাছে উপস্থিত করছি। শুধু তফাৎ এই যে, সেগুলো আমার চোখ দিয়ে দেখা ও আমার মনের রঙে রঙান।

ভারতীয় ছাত্র এত উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিদেশে যান যে তাঁদের সকলের সম্বন্ধে প্রযোজ্য একটা কিছু বলা একেবারেই সহজ নয়। আমাদের বিভিন্ন প্রদেশ, শহর ও নানা স্তরের পরিবার থেকে প্রায় আড়াই হাজার ছাত্র বিভিন্ন বিষয় অধিগত করবার উদ্দেশ্যে ইংলেণ্ডে যান। বলতে গেলে এঁদের দিকে তাকালে সারা ভারতে একটা রূপ ঘন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কেউ যান আই-সি-এস পৰীক্ষা দিতে; কেউ যান একাউন্টেন্টসির জন্ত; আবার কেউ যান ডাক্তারী, আইন, বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান ও গবেষণার উদ্দেশ্যে; আবার কেউ কেউ যান শুধু আর্টস বিষয়ের ডিগ্রী নিতে। এ ছাড়া আছে নানা রকম টেকনিক্যাল বিজ্ঞান।

অনেকে যান “যা-হয় কিছু একটা” শিখে আসতে—অর্থাৎ বিলেত-ফেরত হ’তে। এঁদের হয়ত এদেশেই পাস করার অভ্যাস কোন দিন ছিল না, অথচ ভাবেন যে ইউরোপে গেলে একটা কিছু হয়ে যাবে। এদেশে এঁরা পড়েছেন ‘হাফ এন্ড আওয়ার উইথ ইংলিশ হিষ্ট্রি, ইকনমিক্স সিবিজ’ ওদেশে গিয়ে ‘কোয়ার্টার অব এন্ড আওয়ার’ সিরিজের সম্বন্ধে ফেরেন। এই শ্রেণীর একটি ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সে দু-বছর লণ্ডনে থেকে নানা রকম বিষয়ের খোঁজ নিল, কিন্তু বিষয়-নির্বাচন করা আর হয়ে উঠল না। বিলেত-ফেরত ছেলেদের বাপ-মায়েরও ধৈর্যের সীমা আছে। এই ছেলেটির বাপ-মা প্রথম প্রথম অনেক কড়া কড়া চিঠি লিখলেন। ফল কিছু হ’ল না।

অবশেষে দেশ থেকে কেবল্ গেল—মাদার সীরিয়াসলি ইল্, কাম্ বাই দি ফাষ্ট বোর্ট। সে এবার মরিয়া হয়ে উঠে ব্যারিষ্টারী থেকে আরম্ভ ক’রে সিনেমা-অভিনয় পর্যন্ত নানা রকম বিষয়েব খোঁজে বেরল। বাড়ীতে লিখল যে, এবার সে সত্যি সত্যিই “যা হয় কিছু একটা” পড়বে। কিন্তু নিষ্ঠুর পিতামাতা টমাস্ কুক্ মারক্ৎ পাঠালেন শুধু একটা পি. এন্ড ও.র বোম্বে পর্যন্ত টিকিট। নিদারুণ বুকফাটা ব্যথা নিয়ে ফিবতে হ’ল তাকে দেশে। হাওড়া স্টেশন ছেড়েছিল চোখের জলে, আবার লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনের শেষ চূড়াও তার চোখের জলে আবছা হয়ে গেল।*

আবছা তারই শুধু একার হয় নি। সেই কথাটাই একটু বিশদ ক’রে বলছি। আমরা যখন এদেশ থেকে যাই, কত সংকল্প নিয়েই না যাই। জগতের সম্বন্ধে ভারতকে, সব চাইতে বড় ক’রে ধরব। জগৎকে আমার কিছু দেবার আছে! দেশাচারকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আচার ব’লে ধরব! দেশের কিছুর জন্তে লজ্জিত হবই না, বরঞ্চ তাকেই আরও উঁচু ক’রে ধরব। পৈতে, গলাজল, গীতা, পুরোহিত-দর্পণ, উপনিষদ, বেদান্ত, ধৃতি ও চান্দব, পাগড়ি, গোলচুপি প্রভৃতি কত না বর্ষে দেহ আবৃত ক’রে আমরা ভারতের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই। আমি যখন ক্রমওয়েল বোডেব ভারতীয় ছাত্রাবাসে উঠলাম, তখন দেখি আমার ঘরে হায়দ্রাবাদেব একটি মুসলমান ছেলে ভোর রাতে পাটি পেড়ে নমাজ করছে। পাটিখানাও দেশ থেকে সে বয়ে নিয়ে গেছে। আচ্চান ও শেরোমানি প’বে আমাদের হিন্দুস্থানী

*প্রায় এমনি অবস্থার আর একটি ছেলে পোর্ট সৈয়দের কাছাকাছি থেকে লণ্ডনে তার বাব্বীর কাছে লিখেছিল, “জাহাজ চলেছে পূব মুখে। মনে হচ্ছে বেন সমুদ্রের উজ্জল-আলোক পেছনে কেলে ঘন অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ ক’রছে।” বলা বাহুল্য, এই চিঠি গেলে তাব বাব্বীও হেসেছিল।



রবীন্দ্রনাথ
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

ভাইরা তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন। জর, পাছে কেউ আমাদেরকে ইংরেজ বলে ভুল করে।

এমনি ক'বে অক্টোবর মাসটা শেষ হয়ে আসে। ইতিমধ্যে শীত প'ড়ে যায়। মেরুদণ্ডের ভেতরের কনকন ক'রে ওঠে। ভারী মোটা কাপড় না হ'লে আর চলে না। যত্নভরে স্বদেশপ্রেম বিলীর্ণ হয়ে যায়। তা ছাড়া, ভারতীয় ছাত্রের 'অ্যালিস ইন ওয়াগারল্যান্ড'-এর ভাবটাও কেটে আসে। কার্টাইট ও বন্ডের দিকে চোখ ধোলে। নীল ও কালো, লাল ও ব্রাউনের তক্তাখটা সে বুঝতে শেখে। ভাবতীয়েরা তখন দক্ষিণ দোকানের জানালা দেখে দেখে বেড়ায়। বাড়ীতে বাড়ীতে ব্রেকফাস্ট টেবিলে ও ক্রমবয়সে রোডে বা গাওয়ার স্ট্রিটের ভারতীয় ছাত্রাবাসে কার্টাইটেব জটির জন্ত পরস্পর পরস্পরকে নিষ্ঠুর পরিহাস করতে আরম্ভ কবে। তখন সবাই এত সচেতন যে সামান্য গাফিলতিও কান্নার চোখ এড়াবার জো নেই। কে টাই-এর নটটা কেমন বেঁধেছে, কে কোন্ মেকারের টুপি পরছে, ওভার-কোটের সঙ্গে কোটেব রং বা জুতাব সঙ্গে মোজার রং ম্যাচ করছে কি না—এই সব দারুণ সমালোচনায় ডাইনিং-হল মুখরিত। ভীষণ সময় এই! এই সময়ে আপনি যদি উৎবে গেলেন ত আপনাব আব ভাবনা নেই, নতুবা চিরদিনেব জন্ত অশ্রদ্ধা আপনার পেছনে পেছনে চলল। পোষাকে হ'ল এই। তার পর আহারে। কে স্বপ্ন খাওয়ার সময় কত জোরে হুড়ুক হুড়ুক পর্ব করছে, কে কাঁটা ভান হাতে ধবেছে ও ছুরি বাঁ-হাতে ধবেছে, এ সব নিয়ে ভাবতীয় মহল জুর বিজ্ঞপের হাস্যরোলে মুখরিত। এ সব বিষয়ে যে আবার একটু বেশী পেকেছে সে সত্য আমদানীকে রাস্তাঘাটে এড়িয়ে চলে, কি জানি পাছে তাকে কেউ ভারতীয় বলে ধরে ফেলে। যাদের এদেশেই কাঁটা-চামচের - সঙ্গে পরিচয় ছিল তারা ত সব আবিষ্টোক্র্যাট।

এ সময় নূতন নূতন উরকারির নাম ও তার পাকপ্রণালী আপনাকে ঠিক ঠিক জানতে হবে, নতুবা অক্ষয় অকীর্ষি। আমাদের সঙ্গে একটি ছেলের পরিচয় হয়েছিল, সে বিলিভী রায়্যাব বই মুখস্থ ক'রে এসে আমাদের তাক লাগিয়ে দিত। তাকে দেখে মনে হ'ত সে যেন কোন হোটেলের শেফের কাজ ক'রে গেছে। অনেকে এই সময় নানা হাস্যকর ভুলেও

পড়েন। যেমন, ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুসন্তান যিনি বাড়ী থেকে প্রতিজ্ঞা ক'রে গেছেন যে-গোমাংস কোনদিন স্পর্শ করবেন না, তিনি মেস থেকে বেছে বেছে ষ্টেকের অর্ডার দেন। জানেন না যে ষ্টেক গোমাংসের নামান্তর মাত্র। ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানও তেমনি প্রাতরাশের সময় প্রাণপণে বেকনকে প্রতিহত ক'রে সসেজের জন্ত লালায়িত হন। যদি জানতেন যে সসেজ শূকরমাংসেব রূপান্তর মাত্র, তা হ'লে কি রকম একটা তোবাম্বনি উদ্ভিত হ'ত সেটা কল্পনার বিষয়। এ সময়ে আরও মজার ব্যাপার হয়। একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তার বয়েস প্রায় একশ-বাইশ বছর। বি-এ পড়তে পড়তে গিয়েছিল। বাপ-মায়ের কনিষ্ঠ সন্তান। কোনদিন একলা শোয় নি। যত দিন দেশে ছিল মায়ের সঙ্গে স্তব। এক রাশ তাবিজতুষ্কা হাতে বেঁধে ভারতসাগর পার হয়ে গেল। রাজিতে একলা ঘরে শুমতে পারে না—ভূতব ভয়ে। দুর্গানাম জপ ক'রে, তাবিজ ধ'বে রাত কাটায়। দেশ থেকে ডাকে ডাকে তাবিজ, কবচ, মায়ের পায়ের ধূলা যায়। একদিন মধ্যবাহে 'বাবা রে মা রে' ক'রে চীৎকার কবতে করতে ল্যাংগলেজীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত। আমি শুনেছি যে এই ছেলোটর যখন ফিরবার সময় হ'ল, তখন ভূত আর তাব ঘাড়ে চাপ্ত না—বরঞ্চ উটো। নানা রকমের পোজের কটো তুলে সে নাকি পাঠিয়েছিল হলিউডে সিনেমা-ষ্টারদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে।

পোষাকের কথা বলতে বলতে একটা কথা মনে হ'ল। পোষাকের দাম সত্যি ক'বে বলা অতিশয় ইতরের মত কাজ। যথা, আপনি যদি সাড়ে তিন গিনি দিয়ে পোষাক করান তবে আপনাকে বলতে হবে দশ গিনি। যদি বার্টন বা ফিস্টি শিলিং টেলস প্রভৃতি সস্তা দরজীর দোকানে পোষাক করিয়ে থাকেন তবে আপনাকে বলতে হবে ওয়েট এণ্ড-এর বড় বড় দোকানের নাম। নইলে জাত থাকবে না।

এই রকম ভাবে দু-এক মাসের মধ্যেই নবেম্বরের দারুণ 'ফগ' আসে ও সাত হাজার মাইল দূরেব দুঃখিনী ভারত-মাতার ছবিখানি অস্পষ্ট ক'রে তোলে। শীতের সময়টি ভারতীয় ছাত্রের জীবনে অতি সঙ্কটময় সময়। সঙ্কটময় দেহের দিক দিয়ে—সঙ্কটময় মনের দিক দিয়ে। প্রকৃতির ক্রন্দনময়ী যুক্তি। স্নেটের মত কালো আকাশ। সারা

দিনরাত টিপটিপ বৃষ্টি। সারা ইউরোপের বরফের উপর দিয়ে আসে পূবে হাওয়া, মেরুদেশের মধ্যে বেঁধে শাণিত ফলার মত। যেখানে লাগে, ফোঁকা পুঁড়ে যায় যেন। রাত্রি এসে কখন বে মেশে দিনের মোহনায় তার দিশে পাওয়া যায় না। ফগ্—ফগ্—ফগ্—কালো, হলুদে, সাদা। বাইরের আকাশে ফগ্—চিন্তাকাশে গভীরতর ফগ্। যার পয়সা আছে ও ছুটি আছে সে পালায় রিভিযেবা, মন্টিকালোঁ, স্পেন, ইটালী—অন্ততপক্ষে ডেভনশায়ার, সাসেক্স। স্বর্ঘ্যদেবও পালান তাদের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-সমুদ্রের উপকূলে। চন্দ্র যদিই বা কোন দিন দেখা দেন ত মনে হয় যেন একটা তারে কুলান কুমড়োব ফালি। রাত্রি আসে তার বিরাট শূন্যতা নিয়ে। গ্যাসের আগুনের সামনে বসে বসে বিদেশী ছাত্র ভাবে, জীবনটা একটা বিরাট আধার—ফাঁকা, অর্থহীন। গ্যাসের আগুনের কুণ্ডলীকৃত রক্তশিখার মধ্যে জেগে ওঠে তার প্রিয় মুখগুলো—তার ক্ষুধার্ত চিত্ত বিধিয়ে যায় ভালবাসার ব্যথায়। মনে পড়ে সেই গঙ্গার জল; মনে পড়ে তরল রোদে-ভরা সেট হাসি-হাসি মুখ বাংলা দেশ,—সবুজ শ্রামল।

গাঙ্গা বারি মনোহারি যুরারি চরণাচুতঃ।

বরষিহ গঙ্গাতীরে শরৎ কর্তৃ কৃশ শুনীতনয়

ন পুনরুৎতরহ গঙ্গা করিষর কোটীধর মৃগতি।

মনে হয় ঐ গঙ্গাতীরে টিক্‌টিক্‌, গিরগিটি, শুকুনো কুকুরের বাচ্চা হ'য়ে থাকুব, তবুও দূর দেশে কোচ্ছিহস্তিযুক্ত রাজা হব না। তার অন্তরের শিরা-উপশিবাগুলো যেন মুচড়ে ওঠে। যদি তাব শক্তি থাকত দেশে কিবে আসত। কিন্তু তখন উপায়-হীন। গিয়েছে সামনের দরজা দিয়ে, খিড়কী দিয়ে কিরবে কেমন ক'রে। একটি ছেলেব সঙ্গে কিছুদিন ছিলাম—বয়স তাব খুব কম ছিল—মনটাও ছিল নরম। রাত আটটা হ'লে বেচারি যেন ছট্‌ফট্‌ করত। কিছুতেই ওর মন পড়াশুনা বসত না। আর একটি ছেলেও দেখা হ'লেই বলত, “জীবনটা বুঝা হ'য়ে গেল। মনে হয় যেন মরে যাট।” যারা এই সময় ঠিক থাকে, তারা শুধু পড়ার চাপে ও পরীক্ষার ভয়ে, অথবা যাদের গোনা দিন ও গোনা টাকা ফুরিয়ে আসছে। কাজ শেষ ক'বে দেশে কিবে আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়াতে হবে। আর কি হাড়ভাড়া পরিশ্রমই তাদের করতে হয়! শুধু ঠাণ্ডা দেশ ও পুষ্টিকর খাবার

পায় ব'লেই বেঁচে থাকে। এদেশে ওরকম খাটা অসম্ভব। কিন্তু যাদের অবসর ও টাকা আছে, তারা ই ধরা দেয় ফাঁদে। আব সারা নগর জুড়ে ফাঁদও আছে কত রকম। কালো আকাশের অন্ধকার পেট থেকে ফুটে ওঠে আগুনের অন্ধরে নানা প্রকারের লালনীল আহ্বান। ক্লাব বলে, আমি তোমার জন্তে গরম ঘর ও নরম হৃদয় নিয়ে বসে আছি। এস আমার কাছে। পাব (Pub) বলে, প্রচুর আগুন পাবে গা গরম করুতে। সত্তা ভাল ভাল খাবার পাবে। আর আকর্ষণ পান করুতে পাবে উষ্ণ পানীয়। নৃত্যশালা পৌ পৌ পৌ ক'রে জেকে বলে—থেক না তোমার ঠাণ্ডা ঘরের কোণায় পুঁড়ে। রুশা নাচের তালে লম্বা রাত খাটো ক'রে দাও। গা ভাসিয়ে দাও ঘোঁষন-জোয়াবে। নাট্যশালা, ছবিঘর, ভোজনালয়—সবাই আপনার জন্ত ভাবছে—আপনার হৃৎকের দবদী! সবাই পাঠাচ্ছে সাদব নিমন্ত্রণ আপনার ঘবেব ব্যথা-ভবা কোণটিতে। প্রতি সন্ধ্যায় সহস্র সহস্র নবনাবী আসছে সেই ডাকে তাঁদের বিভিন্ন জীবনধারা ব'য়ে :—

এ ঘোঁষন-জল-তবদ বোধিবে কে

হরে মুরারে হরে মুরারে।

বিরাট নগর একটা বিরাট মঞ্চভূমি। তাই সেই মঞ্চভূমিতে একটু শীতল ওয়েসিসের খোঁজে আসে লক্ষ লক্ষ নরনাবী। শান্তি কোথায়? শান্তি কোথায়? একটুখানি স্পর্শ—একটুখানি ছোঁয়া—একটু বিনিময়—স্বস্তির ফলকে একটা দাগ আর সব শূন্য—গভীর অন্ধকার।

দেখতে দেখতে আসে বড়দিন। এত দিনে ভারতীয় ছাত্রের জীবনেব গতি খানিকটে ঠিক হ'য়ে আসে। কলেজের প্রথম টার্ম শেষ হয়ে গেছে। পড়াশুনার যার মন বসে, সে তাই নিয়ে আরও ব্যস্ত হয়। ছুটিটার প্রত্যেক মিনিট কাজে লাগিয়ে দেবাব চেষ্টায় থাকে। আর যারা লাইফ দেখতে যায় তারা লাইফের পেছনে পেছনে ছোটো-... গায়েব রং এক পোরল পাতলা হয়ে এসেছে। এখন যুথের দিকে তাকানো যায়। টাইবাঁধা, ছুরিখা, সুপ-খাওয়ার কঠিন পরীক্ষায় এখন অন্ততপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করবে। ইংরেজী কথা এক দিনে বুঝতে শিখেছে—তার কথাও এখন বোকা যায়। ঈষ্টমাস উৎসবে সে পায়

প্রথম হেলথ ডিক্রিডের আত্মদা*। নাচের আসরেও দীক্ষা হয়। তার চিন্তে রঙের ছোপ ধরে।

সুইনবার্ণ তাঁর “এ্যাটলান্টা ইন ক্যালিডন” নাটকে শীতের মাসকে-সীজন্ অব সীজ (Season of Sins) বলেছেন। ভিক্টোরিয়ান কবি যাকে সিন বলেছেন এখন অবশ্য আমরা তাকে সিন আর বলি না। বলি অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞ। যা হোক, শীতের অন্ধকারে মানুষের হৃদয় ধোঁজে রং, শীতের একটানা একঘেয়েমির মধ্যে ধোঁজে বৈচিত্র্য। বড়দিনে ভারতীয় ছাত্র প্রথম চোখ খুলে দেখে যে আরও এক রকম জীবন আছে—যা তার চিবপরিচিত জীবন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তার মন এবার ভারতের উপবাসক্লিষ্ট আদর্শের দিকে মোড় ফেরে। ভোগস্বথের রেসখেলার সে তার থলি উজাড় করে। জীবনের দ্রাক্ষারস নিঃশেষে পান করবে বলে প্রস্তুত হয়। কিন্তু হায়! স্থখ কোথায়? স্থখ কোথায়? দেশে পিতামাতা মন্দিরে মন্দিরে ধর্ম দিচ্ছেন, দর্গায় দর্গায় সিম্বি দিচ্ছেন—কিন্তু শীতের রঙ্গে সে ক্রমশঃ আবহাওয়া হয়ে গেছে। ভাবতের ব্যথার বেহাগ হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে আরব-সাগরের তীরে তীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে। আটলান্টিকের উপকূলে তখন উৎসবের বোধন লেগে গেছে। ‘লা কুকরাচ্চা’র মাতাল হুবে চিন্ত তখন উত্তল।

ইউরোপীয় জীবনে ও প্রকৃতিতে একটা মাদকতা আছে। জীবনে যেমন ঘোবনের উপাসনা, তেমনি প্রকৃতিতেও একটা সজীবতার সাধনা চলেছে। ইউরোপীয় নবনারী আমাদের মত পচিশ হাজার বছরের সভ্যতার চাপে পীড়িত নয়। তারা চলেছে সামনের দিকে বাজাপথেব আনন্দগান গেয়ে। জঙ্গ ও মৃত্যু এ দুটো সত্যকে ক্রবসত্য বলে মেনে নিয়েছে—তাকে এড়াবার কোন বুঝা চেষ্টা করে না। তাই তারা এত মাত্রে রণাঙ্গনে মরণের হোলিখেলায়। তারা জীবনকে দূরে সরায় না, মরণকেও পর করে ভাবে না। তাই তাদের জীবনে এত আনন্দ। তাই তাদের হৃদয় এত হালকা।

* আমি একাধিক বাঁভালী ছেলের কাছে শুনেছি এদেশেই তাদের পান অভ্যাস ছিল। অনেকে আবার সল যে বাবাব কাছে শিখেছে। এরকম বাবা না অবিভি আমি দেখি নি। তাছাড়া বহুকাল ধরে ছাত্র-সমাজের সঙ্গে কুৎসাক সাংঘে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে যে পাশাভাস এত দূর আছে তা আমার জানা ছিল না বা এখনও নেই।

ইউরোপীয় নবনারী রূপ আছে, কপের সাধনাও করতে জানে। শুধু নবনারী কেন? প্রকৃতিই বা কি অপূর্ণ যোহন রূপ ধরে প্রতি বসন্তে, গ্রীষ্মে ও শরতে। সে পাগল-করা রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্য নেই। সবুজ ঘাস আমাদের দেশেও অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন প্রাণমাতান রূপ আমি ইউরোপ ছাড়া আর কোথাও দেখি নি। জানি নে রবীন্দ্রনাথ “সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে” গাঁথা যে বিচিত্র মায়ারূপ দর্শন করেছিলেন তা কোন্ দেশে! কিন্তু আমি একদিন তা দেখেছিলাম লেক উইণ্ডাবমিয়ারের তীরে। আর একদিন ট্র্যাটফোর্ড-অন-এন্ডনে, আরও একদিন লেক লুজার্নের উপকূলে। লেক উইণ্ডাবমিয়ারের মুহূর্ত্তরক্ষণে আন্দোলিত কাচপত্র জলরাগি, পাইন ও ওক গাছের কচিপাতার শৈশবচঞ্চলতা ও আদ্যভাষ, আর দ্বিগন্তব্যাপী সবুজ কাঁচা ঘাস অন্তর্যমান সূর্যের তরল আলোর আমার চোখে কি যে অপরূপ মায়ী সৃষ্টি বরেন্ধিল তা কোনদিন ভুলব না। আর একদিনের কথাও মনে থাকবে চিরদিন—যেদিন আমি ট্র্যাটফোর্ড-অন-এন্ডন দেখতে গিয়েছিলাম। ঘাস—ঘাস—ঘাস—সমস্ত মিডল্যান্ডসের গিরিবনউপত্যকা সবুজের নেশায় মাতাল। সেদিন প্রভাতে আপেল-বাগানের অগণিত গুল্মপত্রকে কে ফেন আবির খেলেছিল। অস্ততঃ একদিনের জন্ত আমাব চিত্ত মাতাল হয়েছিল। তাই বলি এত প্রকারের মাদকতাব মধ্যে যদি আমাদের ভারতীয় ছাত্র একটু পথ হারিয়ে ফেলে, তার জন্ত আপনারা একটু চোখের জল ফেলবেন—স্বণা কববেন না।

আমি অনেক ভারতীয় ছাত্র দেখেছি যারা দিনান্তে এক মুঠো খাবার পায় না—অন্ধকার স্যাংসেতে বেস্মেন্ট ঘরে বাস করে। হয়ত না-খেয়ে খেয়ে সেই প্রচণ্ড শীতে হুরারোগ্য যন্ত্রারোগে আক্রান্ত হয়ে সেই বিশেষে প্রাণ দেয়, তবুও স্বদেশে আত্মীয়স্বজনকে কাছে ক্রিবেতে চায় না। কত কষ্ট করেই যে তাবা দিন কাটায় ভাবলে চোখে জল আসে। কয়েকটা ভারতীয় খাবারের দোকান আছে তাতে ওয়েটার-এর কাজ করে। নতুন কিরি করে টাই ও খেলনা বিক্রী করে—নয়ত মোটর গ্যারাজে মোটরকাব ধুয়ে দিনে বড়জোর এক শিলিং রোজগার করে। কেউ কেউ ডিক্ষা করে। আর দিনের পর দিন না খেয়ে থাকে। যখন

হু-এক আনা পয়সা পায়, মদ খেয়ে তুলে থাকবার চেষ্টা করে, কিন্তু তবুও দেশে আসতে চায় না। তার কারণ, প্রথম, তারা জানে তারা বাবার অপরাধী সন্তান। কত না আশা করে সেই বিদেশে গিয়েছিল। পিতামাতা কত করে তাদের খরচ চালিয়ে চালিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন। কোন লজ্জায় আবার এই মুখ বাপ-মার কাছে--স্বদেশবাসীর কাছে দেখাবে। দ্বিতীয়, ঐ স্বাধীনতা, ঐ যৌবনমত্ততা, ঐ রূপোৎসব, ঐ বিরাট মুক্তি ভারতবর্ষে কোথায় পাবে? কোন মুক্ত বিহঙ্গম আবার খেঁচায় তার পিঞ্জরে ঢুকতে চায়?

ভারতীয় ছাত্রের জীবনে এই যে খোর ট্রাজেডি, এর জন্ত সে-ই যে একমাত্র দায়ী তা নয়। তার পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন যারা তার শিক্ষাব্যাপারে চিরদিনই অন্ধের মত চলিত হয়েছেন তাঁরাই বেলী। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্বের কথাই আমরা সব সময়ে শুনি, কিন্তু পিতামাতার মূর্ততার কথাটা কেউ বলে না। কেননা, সমালোচক সব সময়েই অভিভাবক। বহু ছাত্র কি পড়বে তা ঠিক না করেই বিদেশে যায়। তার পর সেখানে গিয়ে কোন ইউনিভার্সিটিতে স্থান হবে কি না তার খোঁজও আগে থেকে নেয় না। এখানে যাদের বি-এ পাস কববার যোগ্যতা নেই তারা যায় সেখানে বি-এ পড়তে। এখানকার ম্যাট্রিক পাস করে সেখানে ব্যারিষ্টার হ'তে যায়। তার পর লন্ডন-ম্যাট্রিক পাস করার চেষ্টায় কয়েক বছর পয়সা নষ্ট করে ফিরে আসে। তেমনই ইনকম্পোরেটেড একাউন্টেন্ট। বহু ছাত্র যায় একাউন্টেন্ট পরীক্ষা দিতে যারা এখানে অনেক কষ্টে বি-এ পাস করেছে। শুধু ধনীর সন্তান ব'লে প্রিমিয়াম দিয়ে একাউন্টেন্ট ফার্শে ভর্তি হ'তে পেরেছে। ফলে এই হয় যে, যারা নিজ জীবনে এত দূর বেহিনাবী তারা হিসাবের সীমান্তদেশ কোনদিনই অতিক্রম করতে পারে না। আই-সি-এস পরীক্ষার জন্ত যে তিন চার-শ ছেলে প্রতি বছর যায়, তাদের জীবনেরও একই করুণ কাহিনী। জীবনগুলো কেমন করে যে ব্যর্থ হয়ে যায়, তা দেখলে চোখে জল না এসে থাকতে পাবে না। পবাক্ষয়ের টাকা সলাটে বহন করে আবার তারা দেশে ফিরে আসে। কিন্তু যেমনটি গিয়েছিল তেমনটি কি আর সে হ'তে পারে? চিরদিন অপমানিত

সঙ্কীর্ণ জীবন নিয়ে সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কোন দিন আব সগর্বে উন্নতশিরে সমাজের কাছে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না।

কিন্তু যারা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে কঠিন কঠিন পরীক্ষা-গুলো পাস করে আসে তাদেরই বা কি হয়? কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভারতীয় ছাত্র সর্বস্ব পণ করে বিদেশের শিক্ষাভাণ্ডার লুণ্ঠ করতে যায়। সম্মুখে তার দারুণ বিভীষিকা, পশ্চাতে জ্বর ব্যাধ। তার মনটা যেন সন্মাই বাবরের মত। সন্মাই বাবর যখন পঞ্জাব জয় করে দিল্লী পর্যন্ত এলেন, তখন দেখলেন দুর্ধর্ষ বাজপুতবাহিনী হুসজ্জিত অবস্থায় তাঁর জন্ত অপেক্ষা করছে। তাঁর ও তাঁর সৈন্যদের চিত্ত পরাজয়ের ভয়ে কাতর হয়ে উঠল। সকলে বলতে লাগল যে আকগানিস্থানে ফিবে চল। সন্মাই বিস্ময়চকিত নীরবে খোদার কাছে ধরা দিয়ে রইলেন। তাঁর কাছে এল ভগবানের বাণী। তিনি বললেন যে, যদি এক-পা পেছনে ফিরি তবে রাজপুতের হাতে একটিও মোগল সৈন্য প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না। যদি ফিবেতে হয় তবে জয়ের সদর দুয়ার দিয়ে ফিরতে হবে। যে ভারতীয় ছাত্র সহস্র দুঃখ, ব্যথা ও প্রলোভনের মধ্যে নিজ মস্তক উন্নত করে দেশে ফেরে, সে শুধু সেই বাণীটিকে বরণ করে। সে জানে, জীবনে ত সহস্র দুঃখ ও লাঞ্ছনা আছেই, কিন্তু পরাজয়ে চাইতে মরণ ভাল। আবব-সাগরের মধ্য দিয়ে জাহাজ যখন চলে, তখন নৃশংস ক্ষুরের হাঙ্গর তাব পিছনে পিছনে চলে। তারা প্রত্যেক মুহূর্তে এই প্রার্থনা করে, যেন একটি যাত্রীও ডেক থেকে পা পিছলে পড়ে। সর্বদা আগ্রত দৃষ্টি তাদের ঐ ডেকের দিকে। ভারতীয় ছাত্র যে বীর, দৃঢ়চিত্ত, সে জানে যে তার পিছনে পিছনে ভারতসাগরের উপকূল থেকে সচেতন শার্কের দল সারি বেঁধে চলেছে। তাই সে চিন্তকে কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধে। ছদ্মবেশে তার একটি মন্ত্র। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপতন।

আমাদের দেশে একটা চিরন্তন মনোভাব আছে। সেটা হচ্ছে "আমরা বেশ আছি"। আমাদের আর কিছু নতুন শেখবার নেই। আমরা সব জানি। গ্রীক, শক, হুন, পাঠান, মোগল, ইংরেজ বাহুবলে বা বুদ্ধিবলে এই দেশটা জয় করে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করেছে--কঠিন শাস্তি দিয়েছে, তবুও ভারতীয় আত্মা বলেছে--"আমি বেশ আছি," "আমি

সনাতন, সর্বশ্রেষ্ঠ।” “অপরের কাছ থেকে আমার কিছু শেখবার বা জানবার নেই।” সে চিরকাল চোখ বুজে রয়েছে, খেচ্ছায় কিছু শেখে নি, যা শিখেছে তাও বিলম্বে, নয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনিবের হুকুমে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ যে একটা সর্বাঙ্গীণ প্রসারের চেষ্টায় চোখ চেয়ে দেখেছিল, তার ফলে সে জেনেছিল যে তার অনেক কিছু শেখাবার আছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বপণ্ডিতেরা আবার অষ্ট্রিচের মত বালির মধ্যে মাথা গুঁজেছেন। বিদেশযাত্রার সব চাইতে বড় সমালোচক তাঁরাই।

অবশ্য এ-কথা যেনে নিতে হবে যে, ইউরোপ-প্রবাসী ছাত্রদের নিজেকে দোষে তারা দেশবাসীর শ্রদ্ধা হারিয়েছে। বিদেশপ্রত্যাগত ছাত্র ভাল জিনিষ অনেক আনে বটে, কিন্তু আবর্জনাও আনে অনেক। এই আবর্জনার দূষিত গন্ধে দেশের হাওয়া মলিন হয়। তাই যদি সে অপরেব কাছে নিন্দিত হয়, তবে আশ্চর্য বা দুঃখিত হবার কিছু নেই।

আর এক কাবণে ইউরোপ-প্রত্যাগত ছাত্র অশ্রদ্ধাভাজন হয়। যারা এদেশে চোখ বুজে চলে তাদের পক্ষে ইউরোপ গিয়ে কোন লাভ নেই। আমি লণ্ডনবাসকালে এক জন বাঙালী ভ্রমলোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম যিনি ইউরোপ যাবার আগে কোনদিন ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী দেখেন নি, অথচ ইনি ছাব্বিসন রোডে কিছুকাল বাস করেছিলেন। ইনি একটি প্রাচীন ভাষা পাঠ করতেন ও ব্যাকরণের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতেন। এক দিন বিকেলে আমরা দু-জন বেড়াচ্ছিলাম; হঠাৎ গুম্ গুম্ ঠা ঠা শব্দে লাল লাল ভারি ভারি গাড়ীগুলো আমাদের সামনের রাস্তা দিয়ে তীব্রবেগে ছুটে গেল। অন্তর্যমান সূর্য্যোব শেষবন্ধিতে ব্রিগেডবাহিনীর পিতলের হেলমেট জল জল করে উঠল। বিস্ময়ে আমার সঙ্গীর চক্ষু বিস্ফারিত—নাসিকায় ঘন ঘন শ্বাস। উদ্বেগ ও আবেগেব সঙ্গে বলে উঠলেন, “বুড় আরম্ভ হয়ে গেল নাকি?” আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তার মানে?” তিনি শুধু গাড়ীগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। গ্র্যামেরিয়ান হাতে হাঁলে হয়ত এমনি লোকেরই দরকার। কিন্তু এ রকম লোক অত পয়সা খরচ করে বিদেশে না গেলেও পারেন। এঁদের

যারা দেশের সত্যিকার কিছু লাভ হয় না। এঁরা যেমন যান, তেমনটি ফেরেন। যে-লোক ইউরোপীয় সভ্যতাব কঠোর সম্বন্ধে কিছু বদলায় না, সে জড়পদার্থ। প্রাণের ধর্মই এই যে, হয় সে ইচ্ছায় কোন কিছু গ্রহণ কবে, নয় অভিনব শক্তির হাত হাতে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে নতুন নতুন শক্তি সংগ্রহ কবে। যে কোন ভাবেই হোক সে বদলায়। কিন্তু যে বদলায় না, সে হয় কাঠ কিংবা পাথর। তার সনাতন ধর্মের খুঁটিট ধরে চোখে ঠুলি লাগিয়ে এই দেশেই বাস করা উচিত।

আর এক কারণে ইউরোপীয় শিক্ষার দিকে আমাদের দেশের লোকের চিত্ত বিকল্প হয়ে উঠছে। সেটা হচ্ছে সম্ভা ডিগ্রী পাবার লোভ। এককালে ছিল যখন ইউরোপের যে-কোন ইউনিভার্সিটি থেকে একটা ডিগ্রী নিয়ে এলে এদেশে ভাল চাকরি হত। আগাদেব কলকাতা শহরে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির বহু পিএইচ-ডি ও ডি-লিট আছেন। কিন্তু আপনারা বোধ হয় জানেন না যে এঁদের শতকরা নিরেনকই জন বাংলা, সংস্কৃত, পার্সি, ভাবতীয় ইতিহাস ও দর্শন অধ্যয়ন করবাব জন্তে ইংলণ্ড গিয়েছিলেন। এ সব বিষয়ে ইউরোপ যাবাব যে খুব দরকাব আছে তা অনেকে মনে করেন না। নানা কারণে লোকে মনে করে যে এ সব বিষয়ে ইউরোপীয় ডিগ্রী সহজলভ্য। আমার মনে হয়, ইউরোপ গেলে ইউরোপীয় কোন বিষয় শিখে আসা উচিত। তবে এ-কথাও স্বীকার কবতে হবে যে আমাদের দেশে এমন কোন লাইব্রেরি নেই যেখানে কোন গবেষণা চলতে পারে। ছাত্রেরা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বা ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে যে-সব উপকরণ বা সাহায্য পায় তা এদেশে কোথাও পাবে না। তা ছাড়া ইউরোপীয় অধ্যাপকদের এ সব বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য না থাকলেও একটা থরোনেস ও মেথড আছে, একটা দৃষ্টি, একটা প্রপোশন-জ্ঞান আছে, যা যারা ছাত্রদের প্রভূত উপকাব হয়।

মেকী মালের কথা আর তুলব না। সব দেশেই মেকী আছে। যে কোন দিন একটা ফ্যাক্টরির ভেতরের চেহারাটা দেখে নি, সে এদেশে সাজে এক্সপোর্ট। আর এই সব এক্সপোর্ট যারা একবার দেখে তারা বিলেভ নাম গুনলে চটে, ভাবে বুঝি সবই মেকী।

ভারতবর্ষ থেকে যত ছাত্র বিদেশে যায় তার শতকরা ৫০ জনের যাওয়া উচিত নয়। এই ৫০ জন হয় বুদ্ধির দিক দিয়ে অযোগ্য, নয় চরিত্রের দিক দিয়ে অযোগ্য। এরাই ভারতের কলঙ্ক বিদেশে প্রচার করে ও স্বদেশে বয়ে আনে ইউরোপীয় সমাজের যত ব্যভিচার। এদের অন্তর্গত স্বদেশবাসীর কাছে ইউরোপ-প্রত্যাগত ছাত্রের যত নিন্দা। এরা সত্যি সত্যি ছাত্র নয়। ছাত্র নাম নিয়ে বিদেশে যায় বটে, কিন্তু আজকাল ভারতবর্ষ থেকে বহু টুরিষ্ট যেমন ইউরোপে যায়—কেউ স্বাস্থ্যেব খোঁজে, কেউ বিলাসেব লাগসায়, কেউ অল্প মতলবে—এরাও তাই। এদের অনেক বিদ্যালয়ে ভর্তিই হয় না, বা হ'লেও দু-এক টার্ম পড়ে ছেড়ে দেয়। এরা কয়েক জনে মিলে একটা মিউচুয়াল অ্যাডমিরেশন্ সোসাইটি খাড়া করে পবম্পর পরম্পরের প্রশংসা করে দেশে পত্র লেখে। অভিভাবকদের কাছে পরম্পরের গুণাবলী ও কৃতকার্যতা বর্ণনা করে তাঁদের মনে যদি কোন সন্দেহের রেখাপাত হয় তা দূর করে। এমনও হয় যে দুই ভাই কেউ কিছু করে না—অথচ পরম্পরের প্রশংসা করে বাবাকে লেখে। এমনি করে স্বদেশ থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে সবাই মিলে ভাগ করে খায় ও থাকে। এরা থাকেও বহুদিন, শেখেও কম। শিখবে কি? ইংল্যান্ডের সঙ্গে এদের পবিচয় শুধু রাজিবেলা। দিনের বেলা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়।

কিন্তু সত্যিকারের ছাত্র যারা তাদের কি কঠোর ব্রত! কি তুর্গম পথের যাত্রী তারা! তারা এই হয়ত আবাব দরিত্র। সবাসাচার মত তারা এক হাতে সংগ্রাম করে দারিদ্র্যের সঙ্গে—আর এক হাতে নিরাশা ও ভয়ের সঙ্গে। কত আশা ও কত সংকল্প তাদের—কত মনোহর স্বপ্ন তাদের চিন্তকে আকুল করে। যখন আনন্দে সকল দেশ ছেয়ে যায়, তখন আনন্দময়ীর সেই মন্দির-প্রাঙ্গণে তারা ভিখারিণীর মেয়ের মত আঁচল পেতে বসে থাকে। দেখে তাদের জন্মভূমি কত দুঃখিনী—কত তাদের শিখবার আছে—বহন করে আনতে হবে। দেশে ফিরে গিয়ে কত তাদের সংগ্রাম করতে হবে—কত তাদের লড়াইতে হবে—ধূলির উপর স্বর্গ গড়তে হবে। তারা যায় দৈত্যগৃহে কচের মত—তারা যায় স্বর্গ মন্দিরায় রত্নমন্দের মত।

তাদের কি বিজ্ঞান আছে? কিন্তু কি তাদের পুরস্কার? বিদেশে কঠোর সংগ্রাম—স্বদেশেও পদে পদে অকারণ নিধাতন—অহৈতুকী হিংসা। জীবনেব সহস্র বাধা ও সংগ্রামের মধ্যে একটি আশা তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে—তাদের কিছু দেবাব আছে—স্বদেশবাসীকে সেইটি দিয়ে হবে। সপ্ত সিঙ্কুর ওপার থেকে মায়ের রান্না চরণে বেবে ব'লে এনেছে সে একটি নীল কমল, সেইটি দিয়ে হবে। এই তাদের আশা, এই তাদের আকাঙ্ক্ষা।

আমি এতক্ষণ পরিচিত, চিরপুরাতন পথ এড়িয়ে এড়িয়ে চলছি। যে-সব কথা আপনাদের জানা তা আর নতুন করে তুলে কি হবে? কিন্তু আমাব মনে হ'ল যে পুরনো কথা সন্দেহও অনেকের কৌতুহল আছে। প্রায় এক বছর হ'ল দেশে এসেছি, এর মধ্যে আমাকে অনেক অভিভাবক ও বিদেশগমনপ্রয়াসী ছাত্র বহু কেজো কথা জিজ্ঞেস করেছেন। আমাদের কলকাতা শহরে সিনেট-হলে একটা ইনকরমেশন্ ব্যুরো আছে। তার এক জন সেক্রেটারী আছেন। আজকালকার কথা জানি নে, কিন্তু আমি যখন গিয়েছিলাম তখন ত বিশেষ কোন উপকার পাই নি সেখান থেকে। তখনকার সেক্রেটারীর মেজাজ ছিল হাকিমী রকমের। আমি বিলেত যাবার আগে অনেকব কাছে অনেক রকম খোঁজ করে তব যাবার ভবসা করেছিলাম। কিন্তু দু-এক জন ছাড়া আর সকলেই তুল খবর দিয়েছিলেন। ইউরোপ গিয়ে কত খরচ হয়, এক-কথার উত্তর আমি ঠিক ঠিক কোন দিন পাই নি। এক-এক জনেব এক-এক রকম অভিজ্ঞতা। আমি ধনীদেব কথা ভাবছি না। আমাদের মত অবস্থার ছেলেরাও নানা জনে নানা কথা বলেছে। মনে হ'লে হাসি পায়, আমার এক জন বন্ধুকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রথমে গিয়ে কোথায় উঠব। সে তার উত্তরে বলেছিল—গ্রোভনার হোটেল বা ডরচেস্টারে উঠো। সে নিজে যে কোন দিন এসব হোটেলের সীমার মধ্যেও চুকেছিল এ-বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। আমাদের দেশের রাজা-মহারাজার হস্ত সে-সব জায়গায় উঠতে পারেন, কিন্তু কোন ছাত্র এ রকম জায়গায় গুঠে ব'লে শুনি নি। আপনাদের যদি কেউ মঞ্চল থেকে চিঠি লেখে, কলকাতা গিয়ে কলেজে ভর্তি হবার আগে কোথায়

উঠব? আপনারা নিশ্চয়ই গ্র্যাণ্ড হোটেল বা গ্রেট টেম্পল হোটেলের থাকা খাওয়ার দর তাকে পাঠিয়ে দেন না।

ভারতীয় ছাত্রেরা প্রথমে গিয়ে ওঠে হয় গাওয়ার স্ট্রিটের ক্রিষ্টিয়ান ভারতীয় ছাত্রাবাসে, নতুবা কোন জানা লোকের বাসায়, নয় ব্রুস্‌বেরির কোন বোর্ডিং-হাউসে। ২১ নং ক্রমওয়েল রোডে ভারত-গবর্ণমেন্ট বহুকাল একটা ভারতীয় ছাত্রাবাস বেখেছিলেন। কিন্তু এক বৎসর হ'ল ব্যয়বাহুল্যেব অজুহাতে সেটা পরলোকগত সব জুগেন্দ্রনাথ মিত্রের কার্যকালে উঠে গেছে। এ জায়গাটার বন্দোবস্ত খুব ভাল ছিল না, কিন্তু তবুও নতুন ছেলেরদের পক্ষে এটা সাপারগর্ভে একটা পোতাশ্রয়েব মত ছিল। এখানে উঠে ছাত্রেরা সুবিধামত নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ত। ওয়াই. এম. সি. এর অধীন গাওয়ার স্ট্রিটের ইণ্ডিয়ান ট্রুডেন্টস ইউনিয়ন একটি অতি স্থলব স্থান। এ-স্থানটি অনেক ছেলেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মনের গভীর অবসাদের সময় সমব্যথী আরও কয়েকটি লোককে এখানে পাওয়া যায়। এখানকার নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ ও সখ্য বহু ছেলেকে বহু প্রকাবের প্রলোভন থেকে বক্ষা করে। ৩২ নং রাসেল স্ট্রিটের ইণ্টারন্যাশনাল ট্রুডেন্টস হাউসও এই রকম একটি স্থলব স্থান যেখানে ভারতীয় ছাত্র অপর দেশীয় ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে পরিচিত ও বন্ধুত্বহুত্রে আবদ্ধ হ'তে পারে। যারা কোন নির্দিষ্ট কলেজে পড়ে তারা সেখানেই খেলাধুলো ও নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের সুযোগ-সুবিধা পায়। প্রত্যেক কলেজের ইউনিয়ন সোসাইটি খেলাধুলো, গান, অভিনয়, ভ্রমণ, নাচ, পার্টি, ডিবেটি প্রভৃতি দ্বারা নানাভাবে ছাত্রের মন প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করে। প্রত্যেক কলেজকে ছাত্রের ঘরবাড়ী বললে ভুল হয় না, অক্সফোর্ড কেবলু ত বটেই। সকালবেলায় খেয়ে ছাত্র-ছাত্রী ১১.০টার কলেজে যায়। সেখানেই সে রাত আটটা পর্যন্ত থাকে। লাঞ্চ ও চা সেখানেই খায়, সেখানেই সে পড়াশুনা আমোদ-আহ্লাদ করে। কাজেই কলেজের সঙ্গে তার যে একটা আন্তরিক যোগ প্রতিষ্ঠিত হবে, তাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি?

ইংলণ্ডে বর্ণবিষেব বেশ আছে। কিন্তু সেটা ভক্ততার আবরণে ঢাকা থাকে। আমাদের দেশে উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণীয়দের সঙ্গে যে জঘন্য ব্যবহার করে তার তুলনায় তা

কিছুই নয়। অনেক সময়ে আমাদের প্রতি অনেক ধারণা ব্যবহারের জন্ত আমরাই দায়ী। আমরা বিদেশী লোক সে দেশে অতিথি। আতিথ্যার্থ রক্ষা করা আমাদের সর্বদা কর্তব্য। তাদের সম্ব্যবহারের সুবিধা নিয়ে আমরা যদি নানা প্রকারের শঠতা, প্রবঞ্চনা করি তাহ'লে আমাদের প্রতি সম্ব্যবহার করবে কেন? আমি এক জন ছাত্রবে জানতাম। তার বাড়ী-বদলান একটা ব্যবসা ছিল। সে এক বন্ধুব কাছে তার বাক্সপ্যাটরা রেখে একটা বোর্ডিং-হাউসে উঠত। সেখানে ভাড়া বাকী ফেলে, না ব'লে আর একটা বাড়ীতে গিয়ে উঠত। এমন ক'রে সে বহুদিন লগুনে ছিল ও অনেক ল্যাণ্ডলেডীকে ফাঁকি দিয়েছিল। যে-সব বোর্ডিং-হাউস বা ল্যাণ্ডলেডী এরকম ভারতীয় ভাড়াটে পেয়েছে তারা যে ভবিষ্যতে আর অল্প ভারতীয় ভাড়াটে রাখবে না তাতে আশ্চর্য কি? আপার বেড্‌ফোর্ড স্ট্রিটে একটা নাম-করা সুইন্স হোটেল আছে, সেখানে ভারতীয় ছাত্রেরা এমন উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার কবেছিল যে ঐ হোটেলের আর ভারতীয় নেয় না। ঐ রাস্তায় মার্স হোটেল ব'লে আর একটি স্থান আছে সেটা পাবলী ছেলেরদের আড্ডা। এখানে ইউরোপীয় অনেক দেশের লোক থাকে। অধ্যাপক শিশির-কুমার মিত্র কিছু দিনের জন্ত এখানে থাকতেন। তাঁর কাছে ম্যানেজার ও অপরদেশীয় বাসিন্দারা ভারতীয় ছাত্রদের বহু নিন্দা কবেছে। ডাঃ মিত্রও ঐসব ছাত্রের হট্টগোলে ও অসভ্যতায় উত্তাক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভারতীয় ছাত্র যখন অসংযত বা অসাধু ব্যবহার করে, তখন ভুলে যায় যে সে তার কাজের দ্বারা দেশের মুখে কালি দিচ্ছে।

কিন্তু তবুও ভারতীয় বা সমুদ্রপারের বিদেশীয় ছাত্রদের কল্যাণকামনায় কত ইংরেজ পুরুষ ও নারী কত সময় ও অর্থ ব্যয় করছেন। হাম্পট্টেট লেট এণ্ড ওয়েস্ট এসেসিয়েশন—যার কেজ হজ্জেন সঙ্ঘদয়া ভগিনী মিস বাহণ্ট, মিস এণ্ডরুজ ও মিস টারিং; ইউটেন-এর কোয়েকার সমিতি, রেড লায়ন স্কোয়ারের প্রীতিসম্মিলনী ও পুণাশ্রোক ডাঃ মড রয়ডেন-প্রতিষ্ঠিত সিড্ড হাউসে ভারতবন্ধু সভা, এই সকলেই ভারতীয় ছাত্রছাত্রী ও অপরপার ভারতীয় যাত্রীদের বিদেশ-বাসের দুঃখ যাতে লাঘব হয় তার জন্ত প্রাণপণে পরিশ্রম করছেন। যাতে ভারতীয়েরা ইংলণ্ডের ঘরবাড়ী দেখতে

পায়, ইংলণ্ডের লোকদের সম্বন্ধে প্রীতিব ভাব পোষণ করে ও ইংলণ্ডের ভদ্র পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পাবে তার জন্ম তাদের কণ্ড না আয়োজন। মানুষকে একটু আনন্দ বা প্রীতি দান করাই এঁরা জীবনের একমাত্র ব্রত ব'লে গ্রহণ কবেছেন।

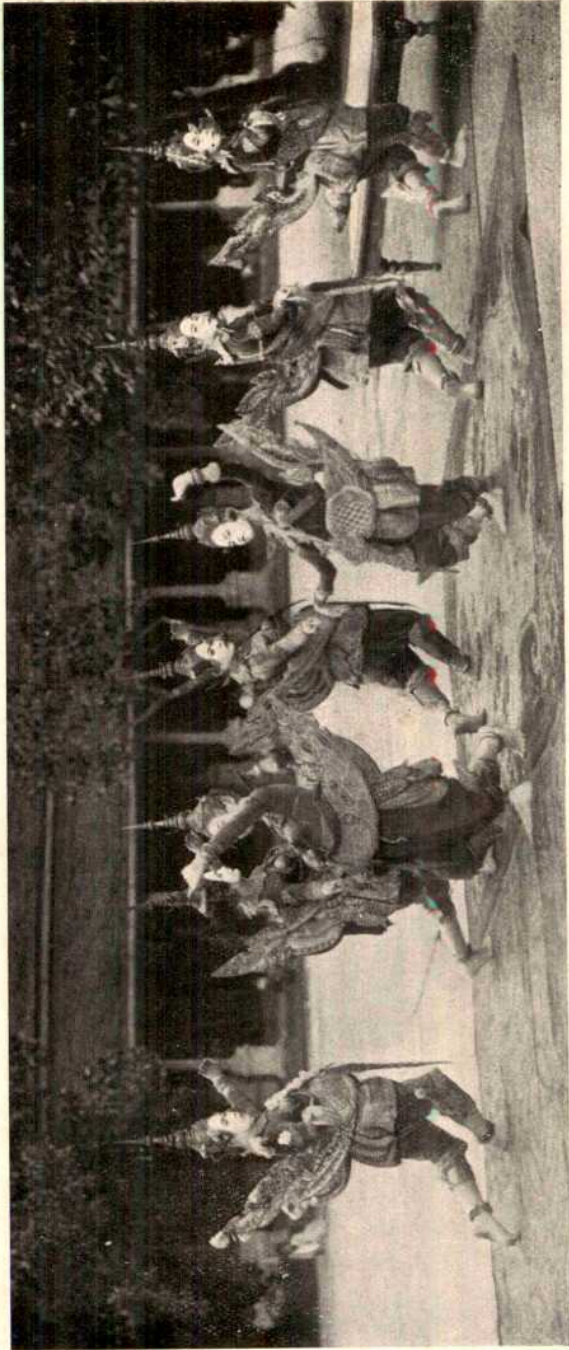
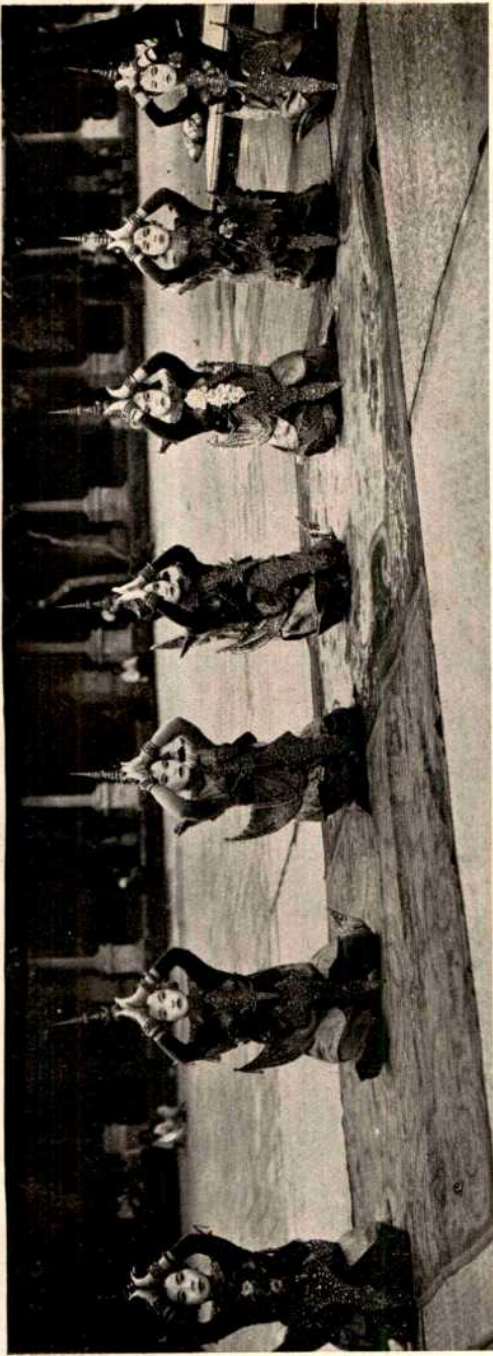
আমাদের দেশেব কোন কোন ধর্মসম্প্রদায় ইংলণ্ডে ধর্ম-প্রচারেব কেন্দ্র খুলেছেন। এঁদের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমঠ খুব অর্থশালী। এঁবা লগুনে ছয় লক্ষ টাকা খরচ ক'রে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা কবেছেন। এঁদের খুব কার্যোৎসাহ। জানি না কোন দিন এঁদের চেষ্টায় ইংলণ্ডের পুরুষবা ছাঁউজাবের বদলে কোঁপীন ও বহির্বাস পরবে কি না, তাদের হ্যাটের তলায় টিকি দেখা যাবে কি না, চন্দনের বসকলি-কাটা মেমেদেব ফ্যাসান হবে কিনা, তবে তাঁবা কিংবা রামকৃষ্ণ মঠ, ও অন্তান্ত প্রচার সমিতি যদি তাঁদের মূল্যবান সময়ের একটু অংশ ভারতীয় ছাত্রদের কল্যাণে ব্যয় করতেন, তবে অনেক ছাত্রছাত্রী হয়ত বেঁচে যেত।

আমি অনেক নিরাশা ও সংগ্রামেব কথা বলেছি। ভারতীয় ছাত্রদের বা ছাত্রনামধাবীদের অনেক দুর্বলতার ছবি এঁকেছি। এব পরে আমাকে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন—অনেকে করেছেনও—যে, ভারতীয় ছাত্রের ইংলণ্ড বা ইউরোপ যাবার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি? আমি মনে কবি যে ভারতবর্ষকে যদি অল্প দেশেব সমকক্ষ হ'তে হয় বা থাকতে হয়, তবে চিবকালই ইউরোপ, আমেরিকাব বা অল্প কোন দেশেব যদি কিছু দেবার থাকে তবে তা

সম্পূর্ণভাবে নিতে হবে। আপনারা সেটাকে অল্পকণ ব'লে নিশ্চা করতে পারেন বা ধার-করা ব'লে বিমুখ হ'তে পারেন। কিন্তু যে জীবন্ত সে প্রতিমুহূর্তে অপরের কাছ থেকে নেয়; জেনে শুনে জোব ক'রে নেয়, তাব জন্য সে লজ্জিত নয়। কেননা সে জানে এ বিশ্বে কেউ কোন দিন অপরের কাছ থেকে না-নিয়ে বড় হয় নি। যে বীর সে বাহুবলে নেয়—আবার পরিপূর্ণতাব প্রসন্নতায় তার ভাণ্ডারের প্রাচুর্য থেকে অল্প দান কবে। সে-ই কৃষ্টিত যে চিবকাল ধনী। প্রাচীন ভাবতের ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা জগতেব একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আমাদের প্রাচীন দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র অমব। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে ভারতে যে নূতন একটি সভ্যতার সৃষ্টি হচ্ছে, সে-সভ্যতা এখনও মূর্খি পবিগ্রহ করে নি, কিন্তু তার পূর্বাভাস আমরা পেয়েছি। সে সভ্যতা শুধু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের বা হিন্দুর হবে না, কিন্তু তার আগমনী বাজবে মন্দিরের ধষ্টাধ্বনিতে, মসজিদেব আজানরবে, গীর্জার গম্ভীব ঐকতানে—সে-সভ্যতা উঠবে বঙ্গ-জ্বলে মূর্চি-মেথবেরও হৃদয় মথিত ক'রে। আর এই সভ্যতাব পূর্বোহিত হবে তারাই যারা প্রাচী ও প্রতীচীব যে পূর্বাতন ভেদ তাকে অস্বীকার করবে। ইউরোপ-প্রভাগত ছাত্রের জীবন ব্যর্থতায় মরুভূমি হয়ে যাবে হস্ত, কিন্তু তার মনে এইটুকু সন্তোষ থাকবে যে সে এক দিন এই পুরাতন নিষেধেব নিগড় ভেঙেছিল—এক দিন সে ভাবতমাতার রথচক্রতে তাব বুকখানি পেতে দিতে চেয়েছিল।

[শিবনাথ স্বতন্ত্রভাবে পঠিত]

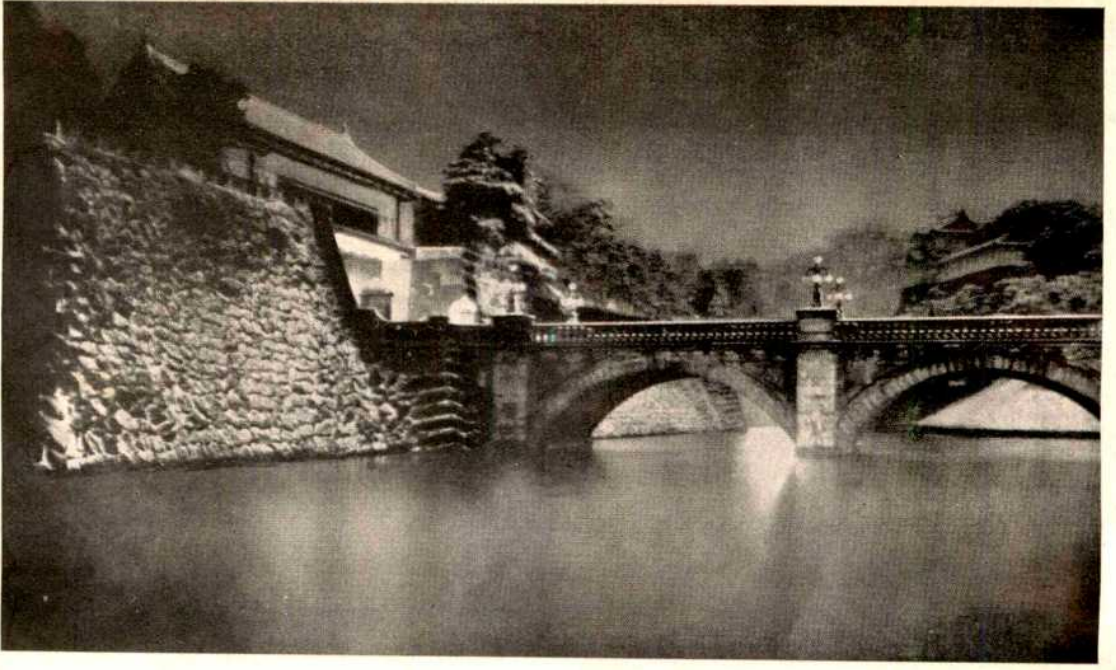




କାଥୋଲିଆର ନୃତ୍ୟ

ନୌଚେ : ଗନ୍ଧର୍ବ-ନୃତ୍ୟ

ଉପରେ : ବିହାରୀ-ନୃତ୍ୟ



জাপান-সহ্যাক্টের প্রাসাদে প্রবেশের সেতু



জাপানের নিম্নত্বগাদীন দ্বীপে জাপানী সভ্যতা বিস্তার । আদিম অধিবাসীদের ঘরবাড়ী দোকানপাটের
বদলে আধুনিক ব্যবস্থার প্রচলন এবং তার ও বেতারের আবির্ভাব হইয়াছে ।

ত্রিবেণী

জীবনময় রায়

৬৪

সীমার কাছে বিদায় নিয়ে পার্বতী কমলাপুত্রে ফিরে গেল। লঙ্কের নিরানন্দ কেবিনে প্রবেশ করে তার মনে বারবার এই কথাটাই আঘাত করে ফিরতে লাগল, যে শতীশের উপর তার প্রেমের আত্মবিক অধিকারকে সে মনে মনে এমন নিঃশব্দে স্বীকার করে নিতে পারে নি যার বলে সমস্ত দ্বিধা সঙ্কট অভিমান পরিত্যাগ করে শতীশের পরিতপ্ত শাস্ত চিত্তকে সে সেবাসমাদরে গ্রহণ করতে সংস্কারবিমুক্ত চিত্তে অগ্রসর হতে পারে। সে তার প্রেমের-পরিণাম-বিচারশূন্য কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে; হ্যাঁ, হয়েছে সে। শতীশের দ্বিধাকূটিত মনকে সে যে অভিমানের বগবত্তী করেছে স্বার্থপর মত তার নিঃসঙ্গতার হৃদয়স্থ অশ্রু-বৈরাগ্যের মধ্যে পরিত্যাগ করতে পশ্চাত্তাপ হয় নি। প্রেমাস্পদের প্রতি তার এই কঠিন নিষ্ঠুরতার মনে তার তীব্র অশ্রুশোচনার সঞ্চার হতে লাগল। কমলার প্রতি শতীশের প্রেমের স্বতি যে কেবল স্বতিমাত্রে পর্য্যবসিত হয়েছে একথা নিশ্চয় করে জেনেও কেন সে শতীশের দুর্বল চিত্তের প্রেমাত্মিনের শাস্তি বিধান করতে প্রবৃত্ত হ'ল? কেন সে অনিশ্চিত দৃঢ়তা এবং প্রেমের নিশ্চিত অধিকারের বলে অনায়াসে অগ্রসর হয়ে তার দয়িতের নিরাশ্রয় ভ্রাম্যমান চিত্তকে পরিপূর্ণ দায়িত্বে নিজের প্রেমের নিঃশব্দ আশ্রয়ের মধ্যে টেনে নিতে বাধ্য পাচ্ছে? এ কি ক্ষুদ্রাশ্রয় বণিকবৃত্তি তার প্রেমে? নিজেকে সে কঠিন তিরস্কারে নিষ্পত্তি করতে লাগল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে যে, আর নয়। এমনি করে নিজের আত্মসম্মানের আবরণে, অকারণে ব্যবধান সৃষ্টি করে আত্মসম্মানের তুচ্ছ প্রসাদ লাভের আকাঙ্ক্ষায় সে চিরদিন সত্যকে স্বীকার করে ফিরবে না আর। এবারে সে শতীশের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করবে নিজেরই প্রেমের অবচলিত মর্যাদায়। সংসারে তার নিজের প্রেমের

মূল্য সে শতীশকে নবজীবনের পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবে নবীনতর গৌরবে।

এই সংকল্প স্থির করে নিয়ে মন তার এক অভিনব আনন্দরসে পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। অশ্রুশোচনার বেদনা দূর হয়ে গিয়ে তার অপরিপুষ্ট তৃষিত চিত্ত রূপে রসে আনন্দে সরস ও সমৃদ্ধ এক নূতন গৃহসংসার সংরচনের মনোহর কল্পনায় নিমজ্জিত হয়ে গেল। মায়েব সংসারের গৃহব্যবহার শৃঙ্খলার কথা সে স্বপ্নে আনতে পারে না। কিন্তু পিতৃগৃহপরিচালনারিক্রমশৃঙ্খলার অভিজ্ঞতা তাব স্থিতিতে সঞ্চিত ছিল, তাকেই কল্পনাকল্পনায়, অবাধ আভিগম্যের সম্ভারে, নিজের ভাবীগৃহশিল্পরচনায় নিয়োজিত করলে।

চিত্তার আবেগে সে কল্পবায়ু কেবিনের অন্ধ কোটর থেকে নিজস্ব হয়ে এসে বারান্দার বেলিঙের কাছে দাঁড়িয়েছিল। বাংলার শান্ত নদীতট; পর্বতশৃঙ্খলা থেকে অকস্মৎ বহির্গত নদীর ধারার মত, আত্মবনচ্ছায়ামুক্ত বিসর্পিত গ্রাম্য পথ; দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের বকে সঙ্কীর্ণ গরুর গাড়ীর আচ্ছাদনের অবকাশে অজ্ঞাত পথিকবধুর উৎসুক ভঙ্গী; সমস্তই আজ তার চোখে রহস্যবৃত সৌন্দর্য-লোকের অপরূপ আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করে তুলেছে।

কমলাপুরী পৌছে সে তার ভাবী জীবনের অনাবিকৃত কল্পরাজ্যের পরিবেশের মধ্যে শতীশকে অভ্যর্থনা করার আনন্দময় পরিকল্পনায় তার অতীত ছুন্দের ইতিহাস বিস্তৃত হয়ে গেল। তার মনে কোন সংশয় কোন দৈন্ত আর তাকে বিচলিত করতে পারলে না। শতীশের বিরহবিধুর জীবনকে সে আবার আশায় আনন্দে উৎসাহে কর্ণের প্রেরণায় উদ্ভূত করে তুলতে পারবে; কমলাপুরীকে পরম্পরের সংহত শক্তির নবীন গতিবেগে আরও বৃহত্তর করে বাংলার নারীদের প্রকৃত কর্ণক্ষেত্র, নিশ্চিত আশ্রয়, এবং স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার প্রতিষ্ঠাতৃমতে পরিণত করতে পারবে। এই চিন্তায় সে অধিকতর উৎসাহে কর্ণে নিজেকে প্রবৃত্ত

করলে। কল্পনার মায়ায় কয় দিন এমনি ক'বে মোহের
আবেশে তার কেটে গেল।

এমন সময় ম্যানেজার এসে পৌঁছল কমলের প্রত্যা-
গমনের সংবাদ নিয়ে। স্বপ্নস্বপ্নের মধ্যে অকস্মাৎ একটা
রুঢ় আঘাতে সে যেন বাস্তব জগতের পরিবেষ্টনের নীরস
গ্লানি নিয়ে জেগে উঠল। এক মুহূর্তের মধ্যে স্বপ্নের ঘোর
কেটে গিয়ে নিজের অসহায়, ভবিষ্যৎ-আশাপরিশ্রুত,
অপমানিত মূর্তি তার চোখের উপর ভেসে উঠল। শতীশের
কাছে অকস্মাৎ সে অকাম্য অস্পৃশ্য হয়ে গেছে। নিজের
বাসনায় রচিত আবর্তের মধ্যে তাকে সমস্ত জীবনে সঙ্গী-
বিহীন নিরবলম্ব ভূখণ্ডের মত আবর্তিত হয়ে কোন্
বিপর্যয়ভাগ্য অন্ধকার ভবিষ্যতের করুণার উপর মুক্তিব
উৎকর্ষায় কালযাপন করতে হবে, তা কে বলতে পারে।

চিন্তার উত্তেজনায় ঘর থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে তার
একটা প্রিয় নির্জন স্থানোত্তরিত থেকে স্থস্থত ক'বে নেবার
জন্তে গিয়ে সে বসল। উৎসবের আয়োজন তাকেই করতে
হবে; স্বতরাং অলস কল্পনাবিলাসে কালাতিপাত করবার
সময় তার নেই। নিজের দুর্বলতার কাছে নিজেকে
বিসর্জন দিয়ে শোক পরিতাপ সন্তোষ করবার স্বভাবও তার
নয়। সে ভেবে দেখলে যে শতীশ ত কোন দিনই তার
কাছে এমন ক'রে আত্মোৎসর্গ করতে প্রবৃত্ত হয় নি যার
মধ্যে তার একান্ত প্রেমের অকুণ্ঠ আনন্দ প্রকাশ পায়।
তাব প্রেমের মধ্যে পার্শ্বতীর প্রতি কর্তব্যের করুণা কি
বহুলাংশে মিশ্রিত নয়? পার্শ্বতীর যে কোন দিনই তাকে
অগ্রসর হবার উৎসাহ দান করতে পারে নি তার গৃঢ় তত্ত্ব কি
এই নয় যে শতীশের চিন্তা কখনও অনন্ত হয়ে তার প্রেমভিক্ষা
করেছে বলে তার মনে হয় নি? নিজের আকাঙ্ক্ষার প্রলোভনে
সে যে শতীশের ভবিষ্যৎকে অবলম্বন করে নি সেজন্তে
সে মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারল না।
অনেক ক্ষণ নদীর ধারে কাটিয়ে সে নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা
নির্ধারণ ক'রে নিয়ে উঠে পড়ল। হেসে বললে, “পূজার
চেয়ে বিসর্জনের উৎসবই আমার জীবনের পুরস্কার হোক।”

শতীশনাথ তাঁর প্রিয়াকে ফিরিয়ে পেয়ে এত দিনের
দুঃখ সার্থক আনন্দে পরিণত করতে পেরেছে, সে কথা কল্পনা
ক'রেও সে নিজেকে সান্ত্বনা দিলে। ভাবলে, ‘শতীশকে

স্বধী করাই ত তার প্রাণের অভিলାষ—তা সে পার্শ্বতীর
ঘরাই হোক বা কমলার ঘরাই হোক তাতে কি আসে
যায়?’ কিন্তু মনেব মধ্যে সর্বহারা নিঃস্বতার বেদনা
অন্তরে অন্তবে তাব জমা হয়ে উঠতে লাগল। সেই
সঙ্কীর্ণমান রিক্ততাব দুঃখকে মনে মনে অস্বীকার এবং
উপেক্ষা করবার প্রয়াসে অতিরিক্ত উদ্যম ও উৎসাহে
অভ্যর্থনা-উৎসবের আয়োজনে সে লেগে গেল। পাছে
কোথাও কিছু জটিল থেকে যায়, পাছে উৎসবের দেয়ালির
উজ্জল আলোকমালার একটি দীপও দীপ্তিহীন দেখায়,
পাছে শতীশের কল্পনায় কোন কারণে, অবহেলা-
জনিত অব্যবস্থার কোন সম্ভেদেব ছায়া তার আনন্দের
উৎসাহকে স্নান কবে, এই আশঙ্কায় সে প্রত্যেকটি
বিষয়, প্রত্যেকটি ব্যাপার সম্পূর্ণ নিজের তত্ত্বাবধানে
অনন্তসাধারণ রুচি এবং পারিপার্শ্বের সঙ্গে রচনা ক'বে
তুলতে তার সমগ্র চিন্তা এবং শক্তি নিয়োগ করলে।
এমনি ক'রে সে তাব বিসর্জনেব মহোৎসবকে মহিমান্বিত
ক'রে তুলতে চেষ্টা করতে লাগল।

এই চেষ্টা যে তার জীবনের সত্যকে শতীশের করুণার
নির্ভরতা থেকে আবৃত করবার প্রয়াস, এই চেষ্টা যে সত্যেব
পরিবর্তে আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার আত্মপ্রত্যারণা, এ-কথা
তার মনে বইল না। এই আহুতির অন্তবালে নিজের
আত্মসন্মানকে প্রতিষ্ঠিত রাখবার এক প্রকার আত্মপ্রসাদ সে
অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে লাগল।

উৎসব-অনুষ্ঠানের কোথাও কোন বিচ্যুতি ছিল না;
পার্শ্বতীর অভিনব কর্মস্থির আনন্দ-আয়োজনে শিথিলতাও
লক্ষিত হয় নি, তবু যে দু-দিন তার। কমলাপূরীতে ছিল তার
মধ্যে শতীশনাথ কেন যে পার্শ্বতীর দৃষ্টিকে প্রাণপণে অন্তরাল
ক'রে ফিরেছে, তা কে বলতে পারে! এই এড়ি-চলার প্রয়াস
পার্শ্বতীর সচেতন দৃষ্টির কাছে কিছুমাত্র অগোচর ছিল না;
কিন্তু পাছে এই সঙ্কোচের আঁকুটুকু তার দৃষ্টির আঘাতে
লজ্জা পায় সেইজন্তে সে তার শতকর্মের মধ্যেও পূর্বেরই
মত স্বচ্ছন্দ পরিহাসে, আলাপে এবং পরামর্শ গ্রহণের অভিনয়ে
শতীশের মনকে নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক সহজ ক'রে তোলবার চেষ্টার
কটি করে নি।

এই দু-দিনের জন্ত নিজের গৃহঘর কমলাদেব ছেড়ে

দিয়ে, নৰ্থদা নায়ী তার কোন কৰ্মচাৰিগীৰ গৃহে, সে নিজেব ব্যবস্থা ক'বে নিয়েছিল; এবং কমলা বা মালতী পাছে কোন কারণে নৃতন পরিবেষ্টনের আড়ষ্টতা কিছুমাত্র অমুভব করে, সৰ্বদাই সেজন্তে সে ভাব সতৰ্ক আত্মীয়তার স্বচ্ছন্দ ভাবকে সজাগ রেখেছিল।

একদা তার নিরবচ্ছিন্ন কৰ্মের মধ্যে একটু অবকাশ পেয়ে শচীন্দ্রের অধেষণে সে তার বাড়ী গেল। শচীন্দ্র অল্পমনে একটা খবরের কাগজ হাতে বাইরের বারান্দায় বসেছিল। পার্ৱতী গিয়ে বললে, “বেশ ত, আমরা খেটে খেটে হুবান হয়ে যাব আর আপনি আড়ালে বসে আরাম ক'রে মজা দেখবেন! সেটি হচ্ছে না। একে আপনি হিরোইনের স্বামী, তাতে কমলাপুৰীৰ প্রতিষ্ঠাতা; আপনি লুকিয়ে থাকলে, আপনাকে ছাড়ব না কি? তা কিছুতেই হবে না। তার পর যত বদনামের ভাগী হব আমি, না?”

শচীন্দ্র অবশ্য এই সহজ সবল কৌতুকের সঙ্গে যোগ রক্ষা করবার প্রাণপণ চেষ্টা করলে।

একটু অবাক হওয়ার ভান ক'বে ছুটু হেসে সে বললে, “কেন! তোমার নাইট-এরাস্ট ভাগীদার ভোলাদা কি তোমায়—?”

কথা শেষ হ'তে না দিয়ে পার্ৱতী কৃত্রিম ক্রোধে তৰ্জ্জন ক'রে বললে, “শাট আপ। ভোষ্ট বি সিলি। এখন উঠুন ত মশাই। বায়না ক'রে ফাঁকি দেবার মংলব, না?”

শচীন্দ্র আবার একটু হেসে বললে, “আবে বুঝতে পারছ না যে, সাড়ম্বরে বার শ্রীচন্দ্রের আয়োজন কবছিলাম তিনি স্বয়ং শ্রাদ্ধবাসবে এসে হাজির। তাই লজ্জার মুখ দেখাতে পারছি নে।”

এই কৌতুক হাস্যের চেষ্টার অন্তরালেও সে সত্যিই তার লজ্জাকে চাপা দিতে পারছিল না এবং পার্ৱতীর কাছে তা অগোচরও ছিল না, তবু পার্ৱতী নিজের দিক থেকে তার কোন আভাস দিলে না।

সে বললে, “না না, সত্যি একটু দরকার আছে। আজ রাত্রে একটা সভার অয়োজন করেছি। আজ শুভা চতুর্দশী কিনা। আজ—”

“তুমি কি ক'রে জানলে?”

“এ ত কলকাতায় শহর না, যে ইলেকট্রিক লাইটের পর্দা

টাঙিয়ে আমরা অমাবস্তা পূর্ণিমা সব আড়াল ক'রে বসে আছি। তা ছাড়া হিন্দু বিধবাদের একাদশী পূর্ণিমা হিসেব ক'রে চলতে হয় মশাই, নইলে আপনারাই নিজেকে বেলা জাম্বাকুড়ে-ফেলে-দেওয়া মহর শাজ্জ ফুড়িয়ে এনে মার মার ক'রে ভেড়ে আসবেন'খন। আপনার আশ্রমটা যে বিধবাদের, তা কি ভুলে গেছেন নাকি।”

“আশ্রমটা যে আমার তা আর ভুলতে দিচ্ছ কই? নইলে—”

“নইলে কি? নইলে ফাঁকি দিয়ে গায়ে হুঁ দিয়ে বেড়াতাম। না? তা হচ্ছে না। শুধুন, একটা মতভেদ ঘটেছে। সভাব জাম্বগাটা কেউ বলছে ফুল দিয়ে আটচালাটাকে সাজিয়ে তার মধ্যে করতে; আবার কেউ বলছে, চন্দনী রাত, নদীর ধাবে খোলা মাঠে করতে। আপনি কি বলেন?”

“আমি বলি, একটা মতভেদ ঘটেছে তাই ভাল, ওর মধ্যে আবার দুটো ঘটিয়ে বিশেষ লাভ নেই।”

“কথার জাহাজ। মতভেদ যে বাড়াতাই হবে, তারই বা মানে কি?”

“বেশ, ওব মধ্যে কোন মতটা দিলে মতভেদ বাড়বে না অর্থাৎ কোনটা তোমার তাই বলে দাও। ব্যস চুকে থাক।”

“আহা, কি আমার বাধ্য ছেলে! আমি ব'লে দিলেই উনি আমার মতে—”

“না না, তা বলছি না। তোমারটা জানলে অন্তর্জাত মত দিতে আর ভুল হবে না। মতভেদ তাহ'লে একটাই থেকে যাবে, আর বাড়বে না। তাই বলছি।”

“থাক, তাই আর বলতে হবে না। এখন চলুন দেখি।”

পার্কতী এমনি ক'বে সহজ স্বাভাবিকতার আবহাওয়া স্বজন করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পার্কতী যে অক্ষুণ্ণ এমন কি আনন্দিত চিন্তে শচীন্দ্রের বিচ্ছেদকে গ্রহণ করেছে এ-কথা মনে মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও, কল্পনা ক'রে একদিকে শচীন্দ্রের অভিমান আহত হয়েছিল; আবার অকস্মাৎ পার্কতীকে শূন্যতার মধ্যে বিসর্জন দিয়ে তারই সামনে কমলাকে নিয়ে “স্বথে স্বচ্ছন্দে বরকলা”র উল্লাসে মত্ত হওয়ার চিত্রটাও তাকে লজ্জিত করছিল। সুতরাং পার্কতীর চেষ্টা সত্ত্বেও সে কিছুতেই নিজেকে বিশ্বস্ত হ'তে পারছিল

না। দুদিন সাধ্যমত পার্শ্বতীর দৃষ্টি সে এড়িয়েই বেতাতে লাগল।

৬৫

তাব পর কিছু দিন অতীত হয়েছে। কমলাপুরী ও বঙ্গভূমির আনন্দ-উৎসবের ফুলপ্রাবী বস্তাকলোচ্ছ্বাস প্রায় জীবনশ্রোতের স্বাভাবিক ধারা-প্রবাহের তটসীমার মধ্যে শান্তরূপ ধারণ করেছে। শচীন্দ্রনাথ নূতন আনন্দে নবীন আশায় নবতর উদ্দীপনার উৎসাহ নিয়ে সংসারে প্রবেশ করেছে। কমলাকে ফিরে-পাওয়ার রূপকে সে নিজের অন্তরের মধ্যে এবং বাহিরের জীবনব্যাপারে পরিপূর্ণ করে উপলব্ধি করবে এই তার পণ। প্রতিদিনেই প্রতি মুহূর্তকে সে কমলার প্রত্যক্ষ অমুভূতি দিয়ে আরত করে গেঁথে তুলতে চায়। তাকে নানাভাবে সাজিয়ে, নূতন নূতন উপহার-দ্রব্যে পরিভূষ্ট করে, অবসরকালে চিত্তবিনোদনের নানা তুচ্ছ আয়োজন করে সে তার হৃদয়ের বহুদিনপরিভ্রান্ত তৃষিত মধুচক্রকে রুদ্ধে, রুদ্ধে পরিপূর্ণ করে তুলতে চায় তাদের মিলনরসমধুপ্রবাহে। প্রমাণ করতে চায় যেন যে, এই দীর্ঘ বিরহ তার চিত্তকে কমলার একান্ত মিলনাকাজক্ষায় উন্মুখ করে রেখেছে, অন্ত হৃচ্ছ আকর্ষণে, অল্প কোনও আনন্দরসে তা তৃপ্ত হবার নয়। উচ্ছ্বাসিত প্রমাণের আবশ্যক কমলার ছিল না, আবশ্যক তারই। সুতরাং এই প্রমাণের আভিষেক কমলার পক্ষে অত্যাচারে পর্দাবসিত হবে কিনা একথা চিন্তা করবার মত মোহমুক্ত অন্তর তার নয়।

কমলা স্বভাবতঃ শান্ত ও অন্তর্মুখী। এই অত্যধিক উচ্ছ্বাসবেগের সঙ্গে ছল রক্ষা করে চলার মত গতিবেগ সে আপনার অন্তরে সংগ্রহ করতে পারে না। তার চিরদিনের শান্ত নির্বাক চিন্তা নানা বিপর্যয়ের আঘাতে আরও প্রকাশ-বিমুখ হয়ে গিয়েছে। বাহিরের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের আবেগে তার নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা যেন হাঁসিয়ে উঠতে চায়। সে শচীন্দ্রের দুর্কীর হৃদয়ের সমাদবকে তার উপযুক্ত মূল্য দিতে পারে না। নিজের দৈন্ত অমুভব করে মনে মনে সে শচীন্দ্রের জন্ত শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বারবার অমুভব করে যে তার কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া না পেয়ে

শচীন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে যায়। শচীন্দ্র যথেষ্ট অবজ্ঞা কোনও নালিশ জানায় না এবং আরও অজস্ররূপে প্রকাশ করে কমলাকে সে অভিভূত করতে চায়। কমলাও তার আদরে, তার উদ্বেল হৃদয়ের প্রাবনে অভিভূত হয়; কৃতজ্ঞতায় তার মন ভবে ওঠে, কিন্তু নিজেকে সে তেমন করে দিতে পারে না।

বস্তুত এত আনন্দের মধ্যেও মন তার সর্বদা স্থব্ধ নয়। সীমার যত্ন, নিখিলনাথের কারাবাস, নন্দলালের নিষ্ঠুর হত্যা এবং সর্কোপরি মালতীর বৈধব্য তার হৃদয়ের উৎসবের আয়োজনে মাঝে মাঝে গভীর ছায়াপাত করেছে। বিশেষতঃ মালতীর ভাগ্যবিপর্যয়ে তার নিজের অদৃষ্টের সৌভাগ্যোদয় বঙ্গনা করে মালতীর প্রতি কল্পনায় এবং এক প্রকার সঙ্কোচে তার মন বিধবা মালতীর চোখের উপর নিজ ভাগ্যের এই অপরাধপূর্ণ দাক্ষিণ্য সন্তোষ করতে যেন নিষ্ঠুরতার লজ্জা অমুভব করে।

শচীন্দ্রের হাত থেকে মুক্তি পেলেই সে মালতীর কাছে গিয়ে বসে। সংসারের নানা কথায় তার অনভ্যস্ত পরিবেশকে তুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। নিজের অনভিজ্ঞতার নিদর্শন দেখিয়ে কর্তৃপক্ষে মালতীকে প্রতিষ্ঠিত করবার এবং তার আজ্ঞাবহ হয়ে চলার অভিনয় করে। এমন করে নিজেকেও সে কতকটা সান্ত্বনা দেয়, মালতীর সঙ্কোচ এবং নূতন জায়গায় অনাস্বীয় বোধের বিধা দূর করবারও চেষ্টা করে।

সরলা মালতী হেসে বলে, “সে কি ভাই, এ সব কি আমি পারি? এ রকম পেছায় বাড়ী ভাই আমি জন্মে দেখি নি। তোমার রাজস্বি তুমিই দেখ।”

কমলা বলে, “তাব চেয়ে বল না যে আমি কেমন নাকাল হই ভাই। দাঁড়িয়ে একটু রক্ত দেখছ। আমি কি ছাই সংসারের কিছু জানি? তা হবে না মিসি, তুমি এরই মধ্যে আমাকে পর ভাবতে শুরু করলে আমি বাঁচি কি করে বলত?”

তার পর হেসে বলে, “ছেলেটিকে ত পর করেছে, ছেলে ত মাসী বলতে অজ্ঞান।”

মালতী বলে, “হ্যাঁ, অজ্ঞান। ভোলাদাকে পেয়ে ছেলে আর বাড়ীর মধ্যে পা দেওয়াই বন্ধ করেছে।”

কমলা হেসে বলে, “ঐ রকম নেমকহারামই ওরা।”

খোকনের চরিত্রেও পরিবর্তন বড় কম হয় নি। মা এবং মাসী দুজনেই এখন অবাস্তব হয়ে পড়েছে। ভোলানাথের আসরেই এখন তার প্রধান আড্ডা। তার উপর তার অন্ত নূতন একটা টাট্টু বোড়া কেনা হয়েছে। তাই নিজেই সে দ্বিবারাত্র একেবারে মেতে আছে। ভোলানাথ বলেছে, “আর অল্প কিছু দিন অভ্যাস করতে পারলেই একেবারে কৌঞ্জে গিয়ে দেপাই হবে।” সেই মহত্বদেষ্ঠে এরার-গান ছোড়ার অভ্যাসও চলেছে।

ভোলানাথের সাহায্যে মালতী কোনও মতে ধরপাকড় করে তাকে আনাহারে প্রবৃত্ত করে। দুধের বাটিতে অর্ধেক দুধ পড়ে থাকে, তেল মাখার খৈর্য তার সয় না। সাবলোক করে পোষাক পরিয়ে দিতে গিয়ে দেবী হ’লে হাত পা ছুঁড়ে অস্থির করে তোলে। মালতী আর তাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারে না। কেবল সমস্ত দিন ছটোপাটি করে সন্ধ্যার সময় যখন চোখ চুলে আসে তখন পোষা বেরাল-ছানাটিব মত বিছানায় এখনও মাসীর কোল ঘেঁসে না শুলে তার চলে না। “মাসী গিঠ চুলকে দাও” বলতে বলতে মাসীর গায়ে কচি হাতটি রেখে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে।

বেকার মালতী অগত্যা ধীরে ধীরে শচীন্দ্রের সংসারের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এবং পরে এক দিন তার কথা বড় আর কারও মনে রইল না।

কেবল মাঝে মাঝে শ্রান্ত বিমূৰ্ছ চিত্ত নিয়ে কমলা তার কাছে এসে বসে। সীমা ও নিখিলনাথের গল্প, হাসপাতালের গল্প, তাদের নূতন পরিচিত বন্ধু পার্কভীর গল্প করে।

মালতী বলে, “পার্কভী ভাই কেমন সায়েব সায়েব। ঘরমোর সব মেমসাহেবদের মত। অত ধোপদুয়ন্ত হ’লে ঘরে ঢুকতে গা ছম ছম কবে। আবার নাইবার ঘরে—”

শুনতে শুনতে অন্তমনা হয়ে কমলা ভাবে শচীন্দ্র তার কাছ থেকে আহত হয়ে শুক মুখে ফিরে গেছে। কিন্তু সে কি করবে? স্বামীর নবীন স্বপ্নাবগের উদ্ধাম বস্ত্রাশ্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়বার শক্তি এবং উৎসাহ সে কেমন করে পাবে?

আসল কথা, শচীন্দ্রনাথ যদি ধীরে স্বপ্নে সম্বর্পণে, কমলার নূতন জীবনের বন্ধনগুলির উপর সহায়ভূতি রেখে, অল্পকাল আবহাওয়া স্বজন করতে পারত, তবে হয়ত একদিন সে তার সরসসিদ্ধ স্বপ্নের স্পর্শ পেয়ে ধস্ত হত। কিন্তু বহু দিনের শুষ্ক তৃষিত পাত্রকে এক মুহূর্তের উত্তেজনার স্বরায় কেনিয়ে তুলে আকর্ষণ পান করে সে মত্ত হতে চায়। বিপুল বাসনার আঘাতে কমলার স্থগ্ন স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলতে চায়। কিন্তু নিজেকে অন্তরাগ করায় অভ্যস্ত কমলার অস্বপ্নের প্রকাশের অক্ষমতার সঙ্কোচে আপনাকে যেন আরও আবৃত করে ফেলে শায়কের মত।

কমলা মনে মনে ভীত হয়ে বেধে যে, যে-শচীন্দ্র পূর্বে তার কাছে পরিচিত ছিল এ যেন সে-শচীন্দ্র নয়। কিসের একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা এর অন্তরে তীব্র হয়ে জাগ্রত হয়ে আছে যার স্বরূপ কমলা কিছুতেই স্থির করে উঠতে পারে না। এই কয় বৎসরের ব্যবধানে তার মধ্যে কিসের একটা তীব্র অভাবের তাড়না সঞ্চিত হয়ে উঠেছে কমলার শান্ত অল্পজুসিত প্রেম যা পূরণ করতে পারছে না। কিসের এই অভাব। কি চায় সে কমলার মধ্যে? কমলা বুঝতে পারে না। একটা অজানা আতঙ্কে সমস্ত শরীর-মন তার সঙ্কচিত হয়ে ওঠে। কেবলই মনে হয় “এ নয়, এ নয়। যার স্বরণে সে এই দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছিল, এর মধ্যে তার সেই শাস্ত, আশ্রয়, শ্রদ্ধা, হৃৎসংযত স্বামিস্থের পরিচয় যেন নেই।” ভাবতে-ভাবতে এক এক সময় তার স্বাভাবিক দুর্বল মস্তিষ্কের কল্পনার ঘোরে তার মনে হয়, যেন কোন এক বাহুমন্ত্রের প্রভাবে সে তার স্বামীর দেশে এসে পড়েছে। সেখানে স্বামী তার নেই, বিদেশে তারই সন্ধানে তিনি ঘুরে ফিরছেন। আর সেই অবকাশে যেন তার স্বামীর ছদ্মবেশে এ কোন অপরিচিত তার প্রেমের ভিক্ষুক হয়ে এসেছে তার কাছে।

অপরিচিত পুরুষের প্রতি এতদিনকার অভিজ্ঞতায় অজ্ঞিত তার স্বাভাবিক বিকল্পতা যেন তার চিন্তে অল্পে অল্পে কি এক রকম বাধার সৃষ্টি করতে চায়; ভয়ে সে দিশা পায় না, তার নিজের মানসিক অবস্থা দেখে। ভয়, পাছে তার মুখে, তার আচরণে কোনমতে এই বিকল্পতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। অথচ শচীন্দ্রের প্রতি তার একান্ত সমর্পিত

প্রাণে সে তাকে তৃপ্ত করবার শক্তি পাবার জন্তে মনে মনে তার দেবতার কাছে কাতর প্রার্থনা জানায়।

কমলাকে হারাবার পূর্বে ত এমন দিন ছিল না। প্রতি-
দিনের তৃষ্ণা শতীশের চিত্তে তখন তীব্র হয়ে জাগত না।
মনে হ'ত না যে কমলা নিজের বাসনায় নূতন নূতন আবেগ
তার মধ্যে জাগিয়ে দিয়ে সম্ভোগের আনন্দকে তীব্রতাব
ক'রে তুলুক। তখনকার দিনে শতীশ কমলাকে নিজের
ইচ্ছায় খেলার পুতুলের মত ক'রে সম্ভোগ ক'রেই স্থ-
পেত অপধ্যাপ্ত। স্থিত আনন্দে, নিরাপত্তিতে, কমলা
যে অবস্থায় শুধু গ্রহণই করত, সেই গ্রহণেই বিকশিত হয়ে
উঠত তার প্রতিদান, নবনারীষবিকাশের মহান সম্পদে।
এখন এই অক্লিষ্ট প্রতিদানে আর সে তৃপ্ত হতে পারে না।
কমলার কাছ থেকেও দুর্দমনীয়, ইচ্ছাময় ব্যক্তিত্বের সাড়া
সে পেতে চায়—যে তাকে নিজের মত ক'রে উপভোগ
কববার উত্তেজনায় নব নব বাসনার আবেগে তাকে গ'ড়ে
নেবে; যে তার কাছে শুধু পোষমানী প্রাণীর আত্মবিসর্জন
নিম্নে উপস্থিত হবে না; যে আসবে নিজের প্রেমের প্রবল
শক্তিতে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইচ্ছাব জয়ধ্বজা বহন ক'রে;
ব্যক্তিত্বের বিপুল সংঘাতে যে তার মধ্যে রূপায়িত ক'রে
তুলতে চাইবে নূতনতর সৃষ্টিকে। কমলার মধ্যে তীব্র
উৎসারিত আত্মার সেই সর্বজয়ী অস্তিত্বের কোন চিহ্ন
সে পায় না—রাজীর মত যে নিজের মনোহর প্রভুত্বের
অপ্রতিহত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

শুষ্ক দারুণও যেমন নিজের অন্তর্নিহিত অগ্নিতে বহিমান
হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে, শতীশের চিত্তও তেমনি
তার নিজের প্রদীপ্ত অন্তর-জ্বালায় নিজেকে দহ ক'রে ক্রমে
নিঃশেষ হয়ে এল। তার মনে হ'তে লাগল যে, কমলা
যেন তার পক্ষে জীবলোকের সম্পর্কশূন্য অনায়ত্তগম্য অস্তিত্ব
মাত্র; যে-মৃত্যুর সমাধিগহবর থেকে সে এই পৃথিবীর আলোর
মধ্যে উঠে এসেছে সেখানকার শোণিতোত্তাপবিহীন স্বপ্নিও
যেন ঐ রক্তমাংসের নারীদেহকে পরিণত করেছে প্রাণহীন
মর্দরপ্রতিমায়—মানবের স্বত্বসম্পদ আশা উজ্জ্বাসের তপ্ত-
জীবনধারা সেখানে প্রবাহিত হয় না; জীবনকে সে উত্তাপ
দান করে না; বিদ্যুৎপ্রবাহে মাহুতকে নূতন ক'রে অভিনব
ক'রে সৃজন করবার প্রাণশক্তি ওখানে স্থপ্ত। ওর মধ্যে

নেই মাহুতের আত্ম-আবরণ থেকে শতদলের মত
সৌরভে সৌন্দর্য্যে বিকশিত ক'রে তোলবার প্রাণময়
সৌরকর।

কমলা এবং শতীশনাথের পরস্পরের সম্পর্কে এই
সমালোচনা ও বিশ্লেষণের দৃষ্টি পরস্পরের মধ্যে, নিজেরের
সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে, যে-ব্যবধান সৃজন ক'রে তুললে তাতে
তাদের বাইরের সংসারযাত্রা স্থলভাবের আক্রান্ত না
হ'লেও অন্তরে অন্তরে অদ্বিতীয় মেঘ এবং অতৃপ্তির বিদ্যুৎ
জমা হয়ে উঠছিল। কমলার স্বভাবত অন্তঃশীলচিত্ত
নিজেকে প্রকাশ করতে বাধা পেয়ে আরও বেশী ক'রে
যেন নিজের আবরণের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলে এবং
শতীশ উত্তরোত্তর নিজেকে প্রতিহত ব্যর্থ অহুতব ক'রে
অশান্ত বিক্ষোভে শান্তি ও সান্ত্বনার পথ খুঁজে ফিরতে
লাগল।

মধ্যে যে কয় বৎসর সে কমলাপুরী প্রতিষ্ঠানবৎ কৰ্ম-
প্রবণতার উৎসাহে, চেষ্টায়, পরিশ্রমে সৃজনের আনন্দ-
রসের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিল, সেই স্বল্পকাল পূর্বের
অলিত অতীতের স্মৃতিসূত্রকে খুঁজে নেবার জন্তে আবার
তার মনের পরিত্যক্ত নিভুতে গিয়ে সে উপস্থিত হ'ল।
কমলাকে ফিরে-পাওয়ার উত্তেজনায় পার্কতীর কথা সে
নস্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে চলেছিল তার মনে; এবং এই মিথ্যাচার
তার সহজ জীবনযাত্রার শান্তি ও সম্ভাবকে উত্তেজনা ও
আভিষেকের বিক্ষোভে কমলার মধ্যে নিজেকে সমাহিত করবার
অবসর দেয় নি। পার্কতীর নিজের হাতে নূতন-ক'রে-
গড়ে-তোলা তার গত কয়েক বৎসরের মনকে আপনার
প্রেমভিনয়ের উত্তেজনার মধ্যে তুলতে চেয়েছিল বলগেই
পার্কতীকে সে কোনমতে বিশ্বস্ত হ'তে পারলে না;
এক দিনে দিনে চিন্তাস্রোত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে পার্কতীর
প্রতি তার চিত্তের গোপন আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে তার কাছে
প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। মনে পড়ল, কমলার অভ্যর্থনা-
উৎসবের সময় সে প্রাণপণে পার্কতীকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা
করেছিল; তবু উৎসবের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে অক্লান্ত
পার্কতীকে সে কখনও জান হতে দেখে নি। যে-দুদিন
তারা কমলাপুরীতে ছিল তার মধ্যে এর জন্তে সে শতীশকে
কখনও অহুযোগও করে নি। বরং তার অতিপিন্ধ

কার্যক্রমের মধ্যে অবকাশ অন্বেষণ করে নিয়ে, কমলা, মালতী ও শচীদেবের সঙ্গে এসে কত গল্প পরিহাস করেছে, সহজ কোতুলপূর্ণ নিলিখ প্রকৃষ্টতায় সরস ক'বে। পরস্পরের বিচিত্র ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছে। কত সহানুভূতি নিয়ে বারবার ক'বে কমলার অলৌকিক রূপলাবণ্যের প্রশংসা করে, সভার দিন নিজে হাতে তাকে সাজিয়ে, তাকে হাসপাতাল প্রভৃতি দেখিয়ে বেড়িয়ে, তার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে কমলার বন্ধুতা সে সহজেই অর্জন করেছে।

কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী অন্বেষণ-উৎসবে তার প্রকৃত নেত্রীত্বের অন্তরালে যে বিকৃত চিত্ত কল্পনা করে লক্ষ্য সে পার্বতীকে এড়িয়ে চলেছিল তারই নিষ্ঠুরতাবৃত্তি আজ বারবার তার মনে এসে আঘাত করতে লাগল। সে সুস্পষ্টভাবে আজ উপলব্ধি করতে পারলে যে তার বিশৃঙ্খল জীবনকে পার্বতী স্নেহে, শক্তিতে, সংযমে, আত্মত্যাগে তিল তিল ক'বে অপকল্প দক্ষতায় গড়ে তুলেছিল। তার ঘে-শোককে ছিন্নমূল শ্রোতের ফুলের মত সে তার ভাববাপ্পাকুল চিন্তণবনের বিলাসের বস্তু করে রেখেছিল, পার্বতী তাকে সার্থক করে মহীয়ান করে তুলেছে। সে বুঝতে পারলে যে সংসারটা নিছক সত্যের উপাদানে গঠিত। এতটুকু মিথ্যার ভর এখানে নয় না। সেই মিথ্যার মুখোশ পরে জগৎকে যত টুকু প্রবঞ্চনা করা যায় তত টুকু প্রবঞ্চিত হ'তে হয় নিজেকেই একদিন। কমলার প্রতি তার প্রেমের গর্বে পার্বতীর প্রতি তার অন্তরের সত্যকে সে প্রাণপণে অস্বীকার ক'বে চলেছে। কিন্তু ঘে-প্রেম দিনের পর দিন, অল্পে অল্পে, লৌকিকতার বাধা লঙ্ঘন ক'বে, মনের অঙ্ককার উদয়াচলে, তার চিত্তাকাশ উদ্ভাসিত করে দেখা দিল, হৃৎ-রাতের পারে সূর্যোদয়েব মত, তাকে জীবনে অস্বীকার করলে জীবন ত তার তমসচ্ছন্ন হয়ে উঠবেই। সে আজ পরিষ্কার ক'বে বুঝতে পাবল যে, ঐ যেনারীপ্রতিষ্ঠানের বিস্তৃত সফলতা বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত একাগ্রতায় সে সম্ভব করে তুলতে পেরেছে, কখনই তা সম্ভব হ'ত না, যদি পার্বতীর সাহচর্য এবং প্রেমের সঞ্জীবনীরসে এই কর্ণের মধ্যে সে অপরিমেয় মাধুর্যের আশ্বাসন লাভ না করত। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই ত জীবনে যা-কিছু সার্থকতা সে লাভ করেছে—কিন্তু কমলাব প্রেম কি সেখানে উপলক্ষ এমন কি অবাস্তব হয়ে ওঠে নি?

কমলার প্রেম ধরিত্রীর মত, বীজকে যে আপনাব হৃদয়ে গুহায়িত করে রেখে দেয়। কমলার প্রেম তার অন্তরকে চায় আবরণের আচ্ছাদনে, নিভৃত, অন্তর্ভূতির সমাধিগহবরে আবৃত করে। যেখানে প্রকাশের উচ্ছাস নেই, প্রফুরণের অবকাশ নেই, জীবনের চঞ্চল গতিবেগ যার মধ্যে স্থপ অথচ প্রাণরসে নিবিড়—চিরন্তন। আর পার্বতীর প্রেম? সে আকাশেব মত, বীজের জীবনপ্রবাহকে যে তামসলোক হ'তে জ্যোতিরূপে আহ্বান করে নেয়। জীবনলীলারসের মাধুর্যকে যে বিকশিত করে, সার্থক করে তোলে পত্রপুষ্পফলে। তার মনে হতে লাগল, এই ত সত্য। কমলার প্রেমের রসধারা কখনই তার জীবনে সার্থক হয়ে উঠবে না, পার্বতীর মুক্তিমন্ত্রের আহ্বানে যদি তাব জীবনবীজ শাখায় পুষ্পে পল্লবে উৎসেব মত উৎসারিত না হয়ে উঠতে পায়, যেদিনার অক্ষ আবরণ ভেদ করে, অব্যাহত আকাশেব পানে, আলোকোজ্জ্বল ধরণীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।

এমনি করে শোভন উপমা এবং গভীর তত্ত্ব আবিষ্কারের মোহে নিজেব পথের সন্ধানে সে প্রবৃত্ত হ'ল। তার ক্ষুধার্ত চিত্তের প্রেমাভিব্যক্তিব আতিশয্যে কমলার প্রতি শ্রাস্ত তার হৃদয় যে পার্বতীব প্রচ্ছন্ন আকর্ষণের মোহে তার দিকে ধাবিত হ'তে চায়, এ-কথা চায় না সে মানতে। না শো না, এ তার মোহ নয়। এ যে তার সার্থকতার অনিবার্য আহ্বানরূপ—পার্বতীর এই আকর্ষণ। এই ত তার জীবনকে পরিপূর্ণতা দান করবে, তার প্রেমের মূলকে বিস্তৃত ও গভীররূপে কমলার অন্তরে প্রবেশের প্রেরণা দেবে।

চিন্তায় চিন্তায় তাকে বিভ্রান্ত করে তুললে। পার্বতীর কাছে নিজেকে নিবেদন করবার আকুলতা তাকে আচ্ছন্ন করে ধরল। সে আর ব'সে থাকতে পারল না। বাড়ীর বিস্তৃত ছাদের উপর বহুক্ষণ সে অস্থির চিন্তে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। বিস্তৃত ঘে-গৃহ তাকে তার জীবনেব সার্থকতা থেকে দূরে সরিয়ে বন্দী ক'বে রেখেছে সেই গৃহের চতুঃসীমানার পরিবেষ্টন সে যেন আবদ্ধ করতে পারছে না। বাড়ীর দেয়ালের গভী তার কাছে প্রতিভাত হ'তে লাগল বন্দীশালার মত। অস্থির হয়ে বেরিয়ে পড়ল সে মুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে যেখানে সমস্তই অব্যাহত; চলা যেখানে

প্রতিপদে প্রতিহত হয় না; মাহুঘের শাসন যেখানে স্বচ্ছন্দ
আত্মার উপর প্রহরী নিযুক্ত করে রাখি নি।

বাড়ী থেকে বেরবার সময় ম্যানেজার নমস্কার করে
বললে, “বাবু বায়সার প্রজারা আজ—”

শতীন তাকে থামিয়ে বললে, “আজ থাক।”

“কাল আসতে বলব কি?”

“না, পরে।”

“আপনি কি যাচ্ছেন কোথাও?”

এই প্রশ্নে সে মুহূর্তকাল থমকে থেমে, ম্যানেজারের
দিকে ফিরে বললে, “হ্যাঁ, কমলাপুরী।”

ঠিক অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও কোন বিশেষ
জায়গায় যাবাব উদ্দেশ্য তার মনে ছিল না। প্রশ্নের
আঘাতেই তাব চাপা-দেওয়া মনের বাসনাটা অকস্মাৎ
মুগ্ধি নিলে। শুধু বোড়াটুকু উপবার অপেক্ষা যেন—তার পর
জলন্ত গুলি উর্দ্ধশ্বাসে ছোট্ট তার লক্ষ্যের দিকে।

“তা নোকো ঠিক ক’বে দেব, বাবু?”

“না।”

“লোকজন কেউ—”

“দবকার নেই।” ব’লে দ্রুতপদে সে এগিয়ে গেল।
ম্যানেজার তার খেয়ালী মনিবটিকে বিশেষ ক’বেই চিন্ত,
হুতরাং আর বেশী ঘাঁটাতে সাহস করলে না। শুধু
কর্তব্যবোধই বোধ করি বাড়ীর ভিতরে সংবাদটি পাঠিয়ে
দিলে।

জনে কমলা চুপ করে রইল। তাব নিজের অদৃষ্টাকাশে
যে একটা কিছু ঘনিমে উঠছে তা সে বুঝতে পারলে।
এ সম্বন্ধে মেয়েদের বর্ষ ইঞ্জিটি প্রবল, এ-কথা মানতেই
হবে।

মালতী উদ্ভিন্ন হয়ে কোলাহল করে বলতে লাগল,
“ওমা, না খেয়েদেয়ে এই রোদে একলা! এ কি খেয়াল
বাপু? তুমিই বা কি মেয়ে বাছা, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে?
তোমায় ব’লে গেছেন? জানতে তুমি যাবে?”

অশ্রুদিকে চেয়ে কমলা বললে, “হ্যাঁ।”

“জানতে, আর একলা যেতে দিলে! ভোলাদাকে না
হয় পাঠিয়ে দাও সঙ্গে।”

“না, থাক।” ব’লে সে ঘরে গেল।

মালতী এইবার যেন কি একটা অল্পভব করে চুপ করলে
কিন্তু মনটা তার খারাপ হয়ে গেল। ‘লোকটা এই
রোদ্দুরে, না খেয়ে, চলে গেল।’

স্বপ্নষ্ট কোন চিন্তার আকার না নিলেও কমলার
মস্তিষ্কের মধ্যে “কমলাপুরী” ও “পার্কতী” এই দুটো কথা
এলোমেলো ভাবে ঘোরাকেরা কবতে লাগল। কিছুতেই
সে ঐ দুটো কথার শব্দসৌমানা ছাড়িয়ে উঠতে পারছিল
না।

রাজে মালতী তার কাছে শুভে এগে এক সময় সে
বললে, “দিদি, থোকনকে নিয়ে তুমি এখানে থাক।”

মালতী কিছু না বুঝতে পেরে বললে, “তার মানে?”

“আমি কমলাপুরী গিয়ে পার্কতীর সঙ্গে কাজ করতে
চাই। এখানে বিনা কাজে ঘরের মধ্যে ব’সে আমার নিঃশ্বাস
বন্ধ হয়ে আসছে। একটা কাজের মধ্যে থাকতে চাই।”

মালতী রাগ করে ঝাঁজিয়ে উঠল, “যত অনাচ্ছি
আবদার তোমার। রাজরাণী হয়েও তোমার মন ওঠে না।
যত খীষ্টানী” ইত্যাদি ইত্যাদি।

কমলা কোন জবাব দিলে না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস
ফেলে পাশ ফিরে শুয়ে রইল। নিঃশব্দ অশ্রুজলে তার
উপাধান সিক্ত হয়ে গেল।

৬৬

গভীর রাত্রি পর্যন্ত পার্কতী তার কাজকর্ম করে
অবশেষে শান্ত হয়ে এসে শুয়ে পড়ত নদীর ধাবের বারান্দায়
তার প্রিয় আরাম-চেষ্টারখানির উপর দেহ এলিয়ে দিয়ে।
তার নিজের বঞ্চিত জীবনকে সে মানবের সেবায় আরো
বেশী করে দেবার এবং কমলাপুরীকে বৃহত্তর নারীকল্যাণের
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার পরিকল্পনা সে প্রস্তুত ক’বেছিল।
কমলাপুরীর স্বল্পপরিসর আশ্রমের যাবতীয় ব্যাপার যজ্ঞ-
চালিতবৎ স্থানিয়কৃত হওয়ায় অবসর এখন তার প্রচুর; অর্থাৎ
ঐটুকু কাজেই সে সম্ভষ্ট থাকতে চায় না। নিজেই সে মুহূর্ত-
মাত্র অবসর দেবে না এই তার পণ। শতীন্দ্রের কর্মসূত্রে
অগ্নিতে নিজেকে আহুতি দিয়ে শতীন্দ্রের সঙ্গে তার বাহ্য
বিচ্ছেদকে সে পরিপূর্ণ মিলনে পরিণত করবে। প্রতিমুহূর্তে
তার প্রিয়তমকে সম্মুখে জেনে প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যের অল্পভূতিতে

সে নিজেকে অল্পপ্রাণিত ক'রে বাথতে চায়। বিধবার নিশ্চেষ্টে পূজা তার নয়, কুমারীর কমনীয় কামনাকেও সে জীবনে চায় না; সাধকের ধ্যানলোকে সে তার দম্বিতের অধীনসত্তার কৰ্মসহচরী। যেখানে তার চেটা বাসনায় কলুষিত নয়, মোহে অবিবেকী নয় এবং শচীশ্বের স্থল সত্তা যেখানে তার স্বতঃস্ফূর্ত অজ্ঞেয় আত্মাকে বঞ্চিত করে না।

এই দুই মাসের মধ্যেই সে নারীজগতের নানা মঙ্গল-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজের যোগসুত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে সে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। তার ইচ্ছা যে ভারতের নানা কেন্দ্রে নিজে উপস্থিত হয়ে সকল প্রগতিশীল কন্নী নারীজুলের সঙ্গে সে প্রত্যক্ষ পরিচয় ও যোগ স্থাপন করবে। সকলের সঙ্গে সহযোগে এক বিরাট নাবীমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে সকলকে অল্পপ্রাণিত ক'রে তুলবে। শচীশ্বের কল্যাণে অর্থের অনটন তার ছিল না। তার অল্পপস্থিতিতে কমলাপুরীর কার্যপরিচালনাব স্ববন্দোবস্ত সে ক'রে রেখেছিল। কাল প্রভূতবে কলকাতায় যাবে বলে স্থির ক'রে সে অন্বেষণ দিয়েছিল লক্ষ প্রস্তুত রাখতে। তার নিখিল-ভারত ভ্রমণের ভূমিকাস্বরূপ কলকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে পরিচিত হতে চায়।

সমস্ত কাজকর্মের অবসানে নিত্যকার অভ্যাসমত সে বারান্দায় তার আসনটিতে এসে বসল। কাল যে বিরাট উদ্দেশ্য নিয়ে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত জগতের মধ্যে নিক্ষেপিত হয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তার নিঃসঙ্গ একাকীত্বের গুরুভার অজ্ঞাতসারে তার চিত্তকে অধিকার ক'রেছিল; এবং চিত্তের গোপন অস্ত্রবলে প্রচ্ছন্নরূপে, তার সমস্ত স্বশাসিত সাধনার আদর্শকে পরিহাস ক'রে, কখন যে শচীশ্বের বিরহবেদনা ধীরে ধীরে অন্তরের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে তা সে লক্ষ্যও করে নি। লগুনে পীড়িত শচীশ্বের সেই অসহায় রোগতাপিত মূর্তি, ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণের অবসরে পরম্পরের ঘনিষ্ঠতার রসায়নে নূতন জীবনে পরম্পরকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলার সেই স্ববর্ণমণ্ডিত ঐদীনগুলির ইতিহাস, কমলাপুরীতে দ্বিধাবিচলিত শচীশ্বের

আত্মসমর্পণের করুণ কোমল রহস্ত, সমস্তই তার চিত্তে গভীর বিরহতপ্ত অশ্রুসঞ্জল বেদনায় আজ প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। নিমীলিত নেত্রের বারিধারা আর ফুলের বাধা মানে না; অসহায় আত্মল চিত্ত তার প্রেমাস্পদের আকাজককেও নিবারণ ক'রে রাখতে পারে না। নিরুপায় অনাথের মত সে নিজের শোকের কবলে নিজেকে বিসর্জন দিলে।

এমনি শাসনমুক্ত, শিথিলগ্রন্থি, বেদনারিধুর চিত্তে অশ্রুবিগলিত মুদ্রিত নয়নে সে শচীশ্বকে তার নিজের সমগ্র চেতনা দিয়ে অল্পভব করবার আবেশে স্থির হয়ে পড়ে রইল।

রাজি পূর্বিমা। সমস্ত জলস্থল আকাশ জ্যোৎস্নার প্রাবনে যেন জ্যোয়ারের সমুদ্রের মত উদ্বেল। ওপারের চাষীগ্রামের সুপুত্রীপ পর্ণকুটির থেকে রোমন্থনস্থবাঘিষ্ট গাভী বকুল্লয় যুহু ঘণ্টাধ্বনি যেন দূর স্বপ্নালোকের রাগিণী বহন ক'রে আনছে। কিন্তু বহির্জগতের এই অল্পময় হৃদয়ের রসস্রোত পার্কতীর গভীর বেদনার তলে আজ নিলীন।

সহসা পদশব্দে চকিত হয়ে সে উঠে বসল। সামনে শচীশ্ব—বিশ্রুত কেশবেশ, উদ্ভাস্ত মূর্তি, স্থলিত চরণ। এ কি স্বপ্ন? চোখকে যেন বিশ্বাস করা যায় না। শাস্ত্রে বলে যে, একান্ত ধ্যানপরায়ণ একাগ্রচিত্তে আরাধনা করলে, দেবতা মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে সম্মুখে আবির্ভূত হন। এ কি তার হৃদয়বাসী দম্বিতের বিগ্রহমূর্তি? এ সময় এ ভাবে। এ কি সম্ভব। কিন্তু এ কি বিধবস্ত, ক্লান্ত, পীড়িত মূর্তি শচীশ্বের। এই শচীশ্ব! যাকে কমলার সাহচর্যস্থখে পরিভূক্ত কল্পনা ক'রে সে মনে মনে সাধনা লাভ করবার প্রয়াস পেয়েছে; যার আগুকাম, সুখভূক্ত আননের হাস্যোজ্জল প্রভা দেখার আশায় সে তার প্রতিষ্ঠানের দ্বারের অপেক্ষা ক'রে আছে—এ ত সে নয়। জ্ঞানিতে অবসাদে শচীশ্ব যেন আর দাঁড়াতে পারছে না—এখনি লগু ভয় ছিন্নমূল হয়ে পড়ে যাবে।

পার্কতী তার এই বঞ্ছাহত মূর্তি দেখে স্থানকাল ভুলে জন্তপদে উঠে তার দিকে এগিয়ে গেল। দুই বাহু প্রসারিত ক'রে শচীশ্ব তার শিথিলমূল কম্পমান দেহকে পার্কতীর

দেহের উপর দৃষ্টি করে বললে, “আমাকে ক্ষমা কর পার্কসী—”

পার্কসী তার মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে, নিজের উপর শাস্ত দৃঢ় নির্ভরে, শচীন্দ্রের অজ্ঞাত ক্রোধের গভীর করুণায়, নিরতিমান নিঃসঙ্কোচে ধীরে ধীরে নিষে গিয়ে তাকে আরাম-চেয়ারে শুইয়ে দিলে। তার পর একটা মোড়া এনে পাশে বসে পরিপূর্ণ স্নেহে তার পীড়িত উত্তপ্ত ললাটে তার বিপর্যস্ত কেশের মধ্যে নিজের কোমল স্নিগ্ধ সান্দ্রনায় স্নিগ্ধ অঙ্গুলি পরিবেশন করতে লাগল।

অনেক ক্ষণ এমনি নিশ্চেষ্টে নির্বাক হয়ে পড়ে থেকে পার্কসীর স্নেহহস্তের সেবায় কতকটা সুস্থ বোধ করে, তার বস্তবের ভূমিকাস্বরূপ শচীন্দ্র ধীরে ধীরে পার্কসীর হাতটা নিজের করতলের মধ্যে টেনে নিলে। সমস্ত রাত্তা সে পদব্রজে অতিক্রম করে এসেছিল। তৃষ্ণায় তার কণ্ঠস্থ যে শুষ্ক হয়ে গিয়েছে এতক্ষণ সে কথা মনে ছিল না। পার্কসীর স্নেহের ছায়ায় নিজের উৎকণ্ঠিত চিন্তা শাস্ত হতেই ক্ষুধাতৃষ্ণার স্বাভাবিক তাড়না তাব মধ্যে জেগে উঠল। তবু এমন অসময়ে অকস্মাৎ আবির্ভাব এবং তার পর স্থল ক্ষুণ্ণিপাসার আবেদন এই দুইয়ের লক্ষ্যায় স্নিত হাতে পার্কসীর দিকে চেয়ে বললে, “রোদ্দুরে যে কষ্ট হচ্ছিল, পথের মধ্যে তা খেয়াল ছিল না। একটু ঠাণ্ডা জল—”

পার্কসী সমস্ত বিশ্বয়ে বললে, “ওকি! আপনি এই পথ হেঁটে এসেছেন এই রোদে? ইস, করেছেন কি? আর এতক্ষণ বলেন নি? এখন একটা অস্থবিস্থ না করলেই বাঁচি। বহন, জল আনছি। স্থান করবেন ত? না না—কিছু সঙ্কোচ করবেন না। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।” ব’লে সে ক্ষতপদে চলে গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই একটা তেপার উপর সাজিয়ে মেয়েদের তৈরি কিঞ্চিৎ মিষ্টায় এবং জল নিয়ে এল। হেসে বললে, “দেখি ত সহিবে না, নইলে ঠোঁট জেলে ছাঁনা লুচি ভেজে দিতে পারতাম। আর অল্প একটু অপেক্ষা করুন।” ব’লে ফিরে গিয়ে এক বালতি জল, একটা মগ, তোয়ালে, সাবান নিয়ে এসে বললে, “উঃ, কি রোদ্দুটাই না খেতে হয়েছে! নিন, একটু হাতমুখটা ধুয়ে নিন। চলুন।” ব’লে শচীন্দ্রের উদ্যত আপত্তির অপেক্ষা না রেখে, তার হাত ধরে নিয়ে কাছে

একটা মোড়ার উপর বসাল। তার পর তোয়ালেটা তার গলায় জড়িয়ে দিয়ে, মাথাটা নিজের হাতে সযত্নে ধুইয়ে দিতে লাগল। শচীন্দ্রের আবেগজড়িত মুহূ আপত্তিতে কোন ফল হ’ল না। হাতপা ধোয়া শেষ হ’লে সে পার্কসীর দিকে চেয়ে স্নেহমিশ্রিত পবিহাসের স্বরে বললে, “নাসেরু টুপি পরেই জন্মেছিলে বোধ হয়। আঃ, কি আরাম যে হ’ল। সমস্ত মাথাটায় যেন আঙুন ধরিয়ে দিয়েছিল।” পার্কসীও স্নেহে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

গৃহ থেকে কমলাপুত্রীর পথে যখন সে নিজাক্ষ, তখন তার মনে সংশয়, সঙ্কোচ এবং পার্কসীর প্রতি নিষ্ঠুরতার অপরাধজনিত ভয়ের অস্ত ছিল না। কিন্তু পার্কসীর চিরজাগ্রত প্রীতির নিদর্শনে তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। তার নিশ্চিন্ত নির্ভয়ের এই প্রথম রমণীয় আশ্রয়টুকু যেন সে নতুন করে আবিষ্কার করলে।

তৃপ্তিমানের পরিতোষে পার্কসীর আনন আনন্দে ব্রৌড়ায় ও জ্বালাবেশে রঞ্জিত হয়েছে। পার্কসীও সেই স্নেহশঙ্কা-লজ্জা-বিজড়িত মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে শচীন্দ্র তার এত দিনের বঞ্চিত হৃদাকে আর সংযত রাখতে পারলে না। হৃদয়ের অন্তস্থল পার্কসীকে আজ সে পেয়েছে অনন্ত রূপে। তার হৃদয় দিতে চায় অন্তরে বাহিরে সেই প্রথম অনন্ততার অভিব্যক্তি। অত্যন্ত সমাদরে দুই করতলেব মাথায় পার্কসীর মুখটা নিয়ে, সম্পূর্ণ বিধাশূন্য সহজ প্রেমের আবেগে সে তাব মুখচূষন করে তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে তার বুকের মধ্যে টেনে নিলে।

আজ পার্কসী কিছুমাত্র আপত্তি জানাল না। তার নিজের মনে বাসনাব বাধা, লেশমাত্র ছিল না; তাই কোনরূপ বাধা স্বজন করে, সে ঐ একান্ত সমপিত সহজ উৎসর্গের দানকে অপমান করলে না।

ঐ যে পুরুষটি আজ তার সমস্ত পৌরুষের অভিমান-বিসর্জন দিয়ে পীড়িত তাপিত চিন্তা নিয়ে একান্ত নির্ভয়ে একান্তরূপে তার কাছে এসেছে তার সহজ মুক্ত প্রাণের স্বাভাবিক প্রেরণায়—এই কথাটাই তার স্নেহকরূপ চিন্তকের মথিত করতে লাগল। আজ সে কমলার প্রেমে বিধা-কুণ্ঠিত মন নিয়ে তার কাছে আসে নি। তার নিঃসংশয় অকুণ্ঠ আত্মবিসর্জনের সেই সহজ প্রকাশের উপলব্ধি-মুহূর্ত্ত পার্কসীর

অন্তর থেকে বাহিরের সমস্ত বাধাকে দূর করে দিলে। যদিও পার্কর্তী জানে না যে কি তার ভূখণ্ড, তবু ভূখণ্ড যে তার গভীর, অসহনীয়, এ-বিষয়ে পার্কর্তীর সংশয়মাত্র ছিল না; এবং শচীন্দ্রকে শাস্ত হুহু নিরাময় ক'বে তোলবাব জন্তে সে নিঃসঙ্কোচে নিজেকে উৎসর্গ করলে।

শচীন্দ্রের জীবনে এই প্রথম, পার্কর্তী তার সমাদবকে প্রত্যাখ্যান কবে নি; এবং আপনাব আত্মোৎসর্গের এই প্রসাদ লাভ ক'বে শচীন্দ্রের হৃদয় আনন্দরসে মধুময় হয়ে উঠেছিল।

তার মনে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে গুনগুন করে শ্রবণ ক'রে কিবছিল,

“তোমার বীণা যেমনি বাজে আঁধার মাঝে
অমনি কোটে তারা।”

ভাবলে, আজ ভূখণ্ডের আঘাতে নিজেকে বিস্মৃত হয়ে পার্কর্তীকে কাছে দিতে পেরেছিলাম বলেইওর মধ্যে এই সাড়া সহজে পেলাম। এই সাড়া যেন জাগিয়ে রাখতে পারি। আব যেন হারাতে না হয়।

আয়ত্ততার প্রলোভন ক্ষীণ আভাসে ধীরে ধীরে তার মনে জেগে উঠেছে। নিজেকে ভোলার এই বিশ্লেষণেব স্ত্রে নিজের সম্বন্ধে আবার সে সজাগ হয়ে উঠতে লাগল।

আহারান্তে পার্কর্তী বললে, “আপনি শ্রান্ত। চলুন, শুয়ে শুয়ে কথা বলবেন। আমি নর্মদার ঘরে গিয়ে শোব'খন।”

ক্লান্তদেহ বিহ্বলচিত্ত শচীন্দ্রকে অধিক অল্পরোধ করতে হ'ল না। পার্কর্তী তাকে সমস্ত শুইয়ে দিয়ে, তার পাশে ব'সে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কোমল শুভ্র শয্যার হৃদয়লব্ধ স্নিগ্ধ জোড়ে আরামে দেহ বিকীর্ণ ক'রে দিয়ে, উচ্ছ্বসিত প্রাণের কলধনির আবেগে সে মুক্ত ক'রে দিলে অজ্ঞপ্র কথার স্রোতে তার হৃদয়ের গোপন উৎস। পার্কর্তী নিঃশব্দে তার কাহিনী শুনে যেতে লাগল। এই দুই মাস যাবৎ কমলাকে ফিরে-পাওয়ার ব্যর্থ প্রয়াসের ইতিহাস থেকে স্বপ্ন ক'রে আজকের পরিতৃপ্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ের নিবিড় আনন্দের অল্পভূতি পর্যন্ত কোন কথাই আজ শচীন্দ্র অপ্রকাশ্য ব'লে মনে করলে না। বলতে বলতে মনের এবং রসনার জড়তা তার দূর হ'য়ে গেল। বললে, “পার্কর্তী, আজ আমার নিজেকে পরিপূর্ণ ক'রে পাবার দিন এল। আমি

অনেক ভেবে দেখেছি, তোমাকে জীবনে না লাভ করলে জীবন আমার জ্যোতির্বিহীন হয়ে পড়বে; কমলাকে পাওয়ার পরিপূর্ণ রূপ আমার কাছে প্রকাশ পাবে না। তাতে কমলাও ব্যর্থ হবে, আমিও। তোমার মধ্যে প্রাণেব বিদ্যুৎ-প্রবাহ অপর্ধ্যাপ্ত স্বল্পনী শক্তিতে বেগবান। তুমি আমাদের আত্মার এই জড়ত্বকে জগতের প্রাণশ্রোতেব মধ্যে টেনে বেব ক'রে আন—নূতন ক'বে গড়ে তোল ক'র্থে, প্রাণে, কল্যাণে। কমলার অন্তরের মধুবসকে উৎসারিত ক'বে তোল; মুক্ত ক'বে দাও আমার জীবনযজ্ঞেব প্রাণে।” বলতে বলতে সে পার্কর্তীকে নিবিড় ক'রে আকর্ষণ ক'রে নিলে নিজের কাছে।

মুহূর্তকাল মধ্যে পার্কর্তী সন্মোহ, শাস্ত অথচ হুনিচ্চিত্ত ভঙ্গীতে শচীন্দ্রের আলিঙ্গনের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, “বড় শ্রান্ত হয়েছেন, এবার ঘুমিয়ে পড়ুন, কেমন? আমি হাত বুলিয়ে দি।”

কথার স্তরে স্নিগ্ধতা ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না, তবু একটা মুহূর্তের সনার চেউ যেন শচীন্দ্রের বুকে গিয়ে লাগল। সে নয়ন মুদ্রিত ক'রে পার্কর্তীকে কঠিন অচঞ্চল গাঙ্গীর্ধ্য ও নিবিড় প্রেমপূর্ণ মধুময় সত্তাকে নিজের পাশে অল্পভব করতে লাগল। ধীরে ধীরে নিজায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ল সে এবং এক পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ শান্তি ও তৃপ্তিতে প্রাণ তাব পূর্ণ হ'য়ে গেল।

শেষ রাতে লঞ্চ ছেড়ে গেছে। শ্রান্ত, বীতভাপ, পরিতৃপ্ত শচীন্দ্রনাথ তখন গভীর নিজায় অচেতন। মনের সাগ্রাম তার শাস্ত, চিন্ত তার নিরাময়, সমস্ত দেহ-মন-আত্ম এক নিবিড় আনন্দরসে পরিপ্লুত।

সকালে বিছানার উপর যখন সে উঠে বসল, বেলা তখন অনেক। পূর্ব রজনীর সুখাবেশ তখনও তার দেহমনের উপর জড়িয়ে রয়েছে। একটি আলসামধুর স্মিতহাস্য লেগে আছে তার গুঠে স্বপ্নের মত সেই স্মৃতিব কুহকে। পার্কর্তী এখনও এসে উপস্থিত হয় নি। রাজিজাগরণের ক্লান্তিতে সে নিশ্চয়ই এখনও নিদ্রিত। শচীন্দ্র শয্যা পরিত্যাগ ক'রে উঠে বারান্দায় গেল। দীপ্ত প্রভাতের উজ্জল কিরণে নদীর চেউ, দিগন্তপ্রসারিত শস্তক্ষেত্র, মেঘলেশবিহীন আকাশের অঙ্গন হাসির জোয়ারে প্রাবিত। বনতুলসীর গন্ধে মন্থর স্নিগ্ধস্পর্শ

মুহুরমীরণে কিসেব যেন ইজিত। সমস্ত চরাচর প্রসন্ন,
মুখ, রোমাঞ্চিত যেন।

পুলকিত স্বপাবিষ্ট নয়নে রেণি ধরে দাঁড়িয়ে মধুকরিত
ধরণীর এই সৌন্দর্য্যসুখা পানে সে আবিষ্ট ছিল অনেকক্ষণ।

“কই পার্বতী ত এল না এখনও। পার্বতী, পার্বতী,
আকাশের নীলিমার মত রহস্যময়ী পার্বতী।”

পার্বতী যে দেহানুবাদিনী নন, শচীন্দ্র এখনও তা বুঝতে
পারে নি।

আবার সে গেল ঘরে ফিরে। বিছানার দিকে একবার
চেয়ে সে চোখ ফিরিয়ে নিলে। কেন কি জানি, আয়নার
নিজেকে দেখবার বাসনায় সে ঘেরাজের কাছে এসে চেয়ে
দেখলে আয়নার ভিতরে। অস্বস্তিবিস্তৃত কেশবেশ, ক্লান্ত আবেশ
নয়নে। অল্প একটু সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সমস্ত
স্থানটা জুড়ে যেন পার্বতীর সত্তার একটি মুহূর্ত সৌরভ। ছোট
ছোট প্রসাধনের জিনিস, এলোমেলো করে ঘেরাজের উপর
রাখা। চন্দনকাঠের একটা বাণবিদ্ধ রাজহাঁস, যন্ত্রণায় স্থললিত
ঐীবা হুয়ে পড়েছে। বোধ হয় কাগজ-চাপা। একটা চিঠি।
একি। তারই নাম লেখা যে। পার্বতীর লেখা পত্র। খুলে
পড়তে পড়তে তার মুখের সেই উদ্ভাসিত তৃপ্ত প্রসন্নোজ্জ্বল
কান্তি কোথায় মিলিয়ে গেল যেন। চিঠিতে লেখা—

“প্রিয়তম, এত দিন তোমাকে নিজের গভীর অন্তরে ঐ
সম্বোধনে ডেকেছি। আজ শেষবার প্রকাশে ডাকছি তোমার
ঐ প্রিয় নামে—তোমারই মুহূর্তেকের পরিপূর্ণ আনন্দানন্দের
অধিকারে।

“এখানে অবসান হয়েছে আমার কাজের। আমার
উপস্থিতিতে অকারণ জটিলতার সৃষ্টি করে লাভ নেই।
তোমাকে পাওয়া আজ আমার পূর্ণ হয়েছে। কমলাব মখে
আমাকে পাওয়া তোমার আজ থেকে শুরু হোক। আমাকে
তুমি অনেক দিয়েছ—তা-ই আমার প্রাণ পূর্ণ করে রইল।
তোমাকে যা দিতে পারি নি, আপন আত্মার ঐশ্বর্য্যে তুমি
আপনরে মধ্যে তা পূর্ণ করে পাও। অন্তের মধ্যে পাওয়ার
অপেক্ষায় তার থেকে বঞ্চিত করে না নিজেকে। তুমি শাস্ত
হও, নিজের অন্তবে প্রতিষ্ঠিত হও, তোমার অন্তরের প্রাণ-
নন্দনে দূর হয়ে যাক তোমার সকল দৈহিক, এই আমার
প্রার্থনা।

“অকারণ অনুসন্ধানের সময় ও অর্থ নষ্ট করে না।
আমাকে খুঁজে পেলো, আমাকে ফিরে পাবে না। তুমি
আমার পরিপূর্ণ প্রাণের চিরসঞ্চিত প্রেম গ্রহণ কর।

পার্বতী।”

সমাপ্ত

সংশয়

ত্রিনিশ্বলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তোমাতে বেসেছি ভাল, এ কি শুধু তোমারি সম্মান ?
নিত্য নব ছন্দে তব উদ্দেশ্যে গাহিলাম গান,
নানা কল্পনার বর্ণে চিত্তপটে আঁকিয়াছি ছবি,
কিছু কি তাহার মোর সৃষ্টি নহে ? আমিও যে কবি।
প্রস্তুত জীবন তব, সে আশারি প্রেমের গৌরব ;

তোমাতে করিতে রাণী শূন্য মোর প্রাণেব বৈভব ?
দূর, বহুদূর হ'তে দেখিয়াছি, আজও দেখি তোমা-
তখনো বলেছি আজও বলি ‘তব নাহিক উপমা।’
জানি না তবুও কেন মাঝে মাঝে মনে ডর পাই
নিকট যেদিন যাব হয়ত দেখিব তুমি নাই।



আলোচনা



“ভাষা-রহস্য”

শ্রীযতীন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী

আবার সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় “ভাষা-রহস্য” শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে “বাক্যের নিকটবর্তী স্থান বা বস্তু সম্বন্ধে এখানে, ইহা, এটা, এই প্রভৃতি শব্দ এবং দূরবর্তী স্থান সম্বন্ধে ওখানে, উহা, ওটা, ঐ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয় কিন্তু শ্রীহট্টে নিকটবর্তী স্থান সম্বন্ধে ওখানে, উহা, ওটা, ঐ এবং দূরবর্তী স্থান সম্বন্ধে এটা, ইহা, এই প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং মাংসের ব্যঞ্জনকে বলে মোরোকা।” শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় কিকপ অভিজ্ঞতা হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন জানি না, কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত এই বিবরণ সম্পূর্ণ ভুল। শ্রীহট্ট বিস্তৃত জেলা এবং তাহার বিভিন্ন অংশে ভাষায় পার্থক্য আছে। আমি শ্রীহট্টেরই অধিবাসী এবং আমার কর্তৃস্থানও শ্রীহট্টে। সৌহার্দ্য ও আত্মীয়তা হুত্রে আমি জেলার সর্বত্রই গিয়া থাকি, কিন্তু কোথাও সেন মহাশয়ের বিবরণের অল্পকুল ভাষা শুনি নাই। এখানে, ইহা, এটা, এই এবং ওখানে, উহা, ওটা, ঐ প্রভৃতি শব্দ “বাক্যের” ও “শ্রীহট্টে” একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং মাংসের ব্যঞ্জনকে যে মোরোকা বলে, ইহা শ্রীহট্টবাসী কোন বাতুলেব প্রলাপেও শুনি নাই।

আর একটি কথায় আমরা মনে আঘাত পাই। প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীই জানেন, শ্রীহট্ট বাংলা দেশেরই একটি অংশ এবং মোগল আমল হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই জেলা বাংলা দেশের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ ছিল। ইংরেজরা রাজনৈতিক প্রয়োজনে, একটি কৃত্রিম সীমারেখা দ্বারা আমাদেরকে আসামের সঙ্গে ছুড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু কি ভাষায়, কি সংস্কৃতিতে, কি আত্মীয়তাহুত্রে, শ্রীহট্টের লোক বাংলার সঙ্গে অভিন্ন। বস্তুতঃ আসামপ্রদেশবাসী প্রকৃত অসমীয়ারা “বঙাল” অর্থাৎ বাঙালী বলিয়া শ্রীহট্টবাসীকে ঈর্ষা করে এবং প্রাদেশিকতাবাদী অসমীয়া নেতাদের “কঙাল-খোদা” আন্দোলন সংবাদপত্র-পাঠকদের অবিরিত নয়। কংগ্রেসী প্রদেশ-বিভাগে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অন্তর্ভুক্ত।

অ-বাঙালী বা বাঙালীদের ভিতরও এই সব খবর বাঁহাদের জানা নাই, সেন মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে তাঁহাদের ধারণা হইতে পারে যে “বিহারের শাহাবাদ জেলার” লোকের জায় শ্রীহট্টের লোকও বুঝি অ-বাঙালী—মানে আসামী। শ্রীহট্ট সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিতে হইলে, তাঁহার লেখা উচিত ছিল “বাক্যের পশ্চিমাংশ বা উত্তরাংশে বা দক্ষিণাংশে এইরূপ ভাষা এবং পূর্বপ্রান্তবর্তী শ্রীহট্ট জেলার অন্তরূপ ভাষা প্রচলিত,” ইত্যাদি

সুতরাং তথ্য এবং বর্ণনা উভয় দিক দিয়াই সেন মহাশয় শ্রীহট্টের উপর অবিচার করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান জ্ঞানী লোক ভবিষ্যতে এই ভ্রম সশোধন করিলে স্বীকৃত হইবে।

“ঢাকায় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন”

শ্রীমুন্নিমল দাস

গত আষাঢ় মাসের ‘বিবিধ প্রসঙ্গে’ ঢাকায় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিত হইয়াছিল, “কলিকাতায় অধিবেশন করিলে যে-সব সমস্যা পোষে ও ভাঙা দিতে হয় না, ঢাকায় অধিবেশন করিলে তাঁহাদিগকে পোষে ও ভাঙা দিতে হইবে।” ইহার উত্তরে এই বলিতে পারি যে, ঢাকা-শহরে ও সন্নিহিত অঞ্চলে নির্বাচন-কেন্দ্র অনেক আছে; এবং সে-সব কেন্দ্র হইতে যাহারা এম. এল. এ. হইয়াছেন, সংখ্যার দিক্ হইতে তাঁহারা নগণ্য নহেন। ঢাকায় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইলে ইহাদের পোষে ও ভাঙা বাঁচিয়া যাইবে। আরও, কলিকাতায় অধিবেশন করিলে কলিকাতায় কেন্দ্রগুলি হইতে নির্বাচিত হন নাই, এই প্রকারের সদস্যরা যেমন বিনা-টিকেটে কলিকাতায় আসা-যাওয়া করিবেন না, তেমন তাঁহাদিগকে ঢাকায় পাঠাইবার জন্ত অর্থব্যয় করিলে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না।

[ইহা ঠিক। কলিকাতা বা ঢাকা, কোথায় অধিবেশন করিলে, খরচ কত কম বা বেশী হইবে, তাহাও কিন্তু বিবেচ্য।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

দ্বিতীয় প্রশ্ন, “কয়েক শত সদস্য ঢাকায় গিয়া থাকিবেন কোথা?” সত্য কথা, কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোটেলগুলির জায় আহা-ও আশ্রয়-স্থান ঢাকা-শহরে নাই। কিন্তু ইহাও সত্য যে, এখানে ঢাকা হল, জগন্নাথ হল ও সলিমুল্লা মুসলিম হল নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে তিনটি হল আছে, আহা-আশ্রয় দানে ইহাদের উৎকর্ষ সম্ভবহীত। আশা করি, হানীয়ার কর্তৃপক্ষ এই তিনটি ‘হলে’ সমস্তদিকেই স্থানাহারের বন্দোবস্ত করিবেন।

[হলগুলিতে যত ছাত্র থাকেন, তাহার উপর আরও কতগুলি লোকের জায়গা তথায় হইবে কি না, এবং হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও গবর্নমেন্ট ছাত্রদের সহিত রাজনীতি-বিশারদদের একত্র বাস ও ঘনিষ্ঠতা অনুমোদন করিবেন কি না, বিবেচ্য।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

তৃতীয় প্রশ্ন, “ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন করিবার মত বড় হল ও সলপ্ত আপিস-কক্ষাদি কোথায়।” উত্তরে বলিতে চাই, নিম্ন-পরিষদের অধিবেশন কার্জন হলে অনুষ্ঠিত হইতে পাবে। উচ্চ-পরিষদের অধিবেশন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের আসেমন্সি হল হইতে পারে। আশা পর্য্যন্ত, এই হল প্রতি বৎসর গবর্নমেন্টের ঢাকা-বাসের সময়ে ‘বল’-নৃত্য,

অমুণ্ডিত হয়। এইরূপ একটি হলে উচ্চ-পরিষদের অধিবেশন করিলে কিছুই ক্ষতি হইবে না, এবং যদি এই হলটিতে অধিবেশন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে কলেজটির বামপার্শ্ব গৃহে যেমন ঢাকা বোর্ড অব ইন্টারমীডিয়েট এণ্ড সেকেন্ডারি এডুকেশনের আপিস বসান হইয়াছে, তেমন দক্ষিণপার্শ্ব গৃহে পরিষদের আপিস বসান যাইতে পারে।

[আমরা ঢাকার অধিবেশনে আপত্তি করি নাই, বরং উহা সম্ভব হইলে সম্ভষ্টই হইব। ছুটির সময় ভিন্ন অন্য সময়ে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন এই দুই প্রাসাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও

গবর্নমেন্ট হইতে দিবেন কি? ছুটির সময় অধিবেশন চলিতে পারে, তাহা তাহা আমরা লিখিয়াছিলাম।—প্রঃ সঃ।]

চতুর্থতঃ, যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি অন্ততম শিক্ষণীয় বিষয়, সুতরাং ঢাকা-শহরে ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন প্রত্যক্ষপূর্বক, ব্যবহারিক রাজনীতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া ছাত্রগণ এমন কি অধ্যাপকেরাও, উপকৃত হইতে পাবেন।

[তাহা পাবেন; কিন্তু গবর্নমেন্ট পারিতে দিবেন কি? —প্রঃ সঃ।]

সিদ্ধকাম

ব্রাউনিঙের 'দি পোপ এণ্ড দি নেট' হইতে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ব্রাউনিঙ-রসিক পণ্ডিতদের অধিকারশের মতে পোপ পঞ্চম সিক্সটাস্ (Pope Sixtus V) এর জীবনচরিত অবলম্বন ক'বে এই কবিতাটি লিখিত। তবে ঐতিহাসিক সিক্সটাস্ ছিলেন রাখাল-বালক, ব্রাউনিঙের পোপ জেলের পো। বিনয়ের ভেকস্বকণ মাছধরা-জালটি পদোন্নতির শেষ পর্য্যায় পর্য্যন্ত রক্ষিত হয়েছিল। পোপ বা মোহন্তের পদোন্নতি শেষ পর্য্যায় পর্য্যন্ত রক্ষিত হয়েছিল। পোপ বা মোহন্তের পদপ্রাপ্তির পরে পূর্বাবস্থার স্মারকচিহ্নটি ধারণ করবার প্রয়োজন আর রইল না, শিকার সংগ্রহের পরে ব্যাধ যেমন ফাঁদটা গুটিয়ে নেয়, এই সহজ কথাটি উপসংহারে কবি পোপের জীবনীতে বলেছেন।

কি বলিছ? মোরা সকলে মিলিয়া মোহন্ত মহারাজ
করিছ যাহারে, একদিন তার ছিল ধীবরের সাজ?
মাছ-ধরা তার গৈত্রিক পেশা, ছিল না অন্য কাজ?

পুঁথি ঘেঁটে ঘেঁটে সে জেলের পো সাধুবাবা হ'ল শেষে,
মঠের পাণ্ডা পুজারী হয়ে সে সবাব মাধ্যম এসে
গাড়িল আসন, মোরা গড় করি শ্রীচরণ-উদ্দেশে।

কেহ হাসে কেহ দেয় টিটকাবি, মারে কহই-এর ঠেলা
এ উহার গায়ে। বামন বনেছে মৎসজীবী-চেনা,
নাহিক লজ্জা, মাছ ধরিবার জালখানি তবু মেলা।

নাহি সঙ্কোচ নাহি কোনো ভয় বিনয়ে নম্র অতি,
জেলেভিত্তি হতে পৌরোহিত্যে এ কি লীলাময় গতি।
পূর্বদশাব শ্রবণচিহ্ন ধরিছেন তবু যতি।

বিপুল প্রাসাদে দেয়ালে-টাঙানো দেবতার ছবি সনে
মাছ-ধরা জাল রয়েছে ঝুলানো; ব্যাঙ্গচন্দ্রাসনে
বসিয়া গুরুজী দেখেন চাহিয়া, দেখে আর সব জনে।

যাহারা মিলিয়া করিল তাঁহারে মোহন্ত মহারাজ,
খড়্গের ধূল লভিবার আশে এল প্রাসাদের মাঝ,
বিন্ময়ভরে দেখে জালখানি দেয়ালে নাহিক আঁজ।

হী-করিয়া যবে চেয়ে রয় যবে হতভম্বের দল,
“জালখানি কোথা?” সাহস করিয়া শুধায় আমি কেবল।
গুরু কন, “বাবা, ধরিয়াছি মাছ, জালে এবে কিবা ফল?”

এক যে ছিল নারী, ও নগরী

শ্রীরজত সেন

দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে ঘরে এসে পড়ল সূর্যের আলো আব এক ঝলক ভোবেব বাতাস। কল্যাণকুমারের নিজাভঙ্গ হ'ল। রাজির ঘুম-সমুদ্র অতিক্রম ক'রে জাগরণের তীরে অবতরণ করবার তার সময় হ'ল। পাশে বেত-পাথরের টেবিল থেকে আয়না তুলে নিয়ে সে মুখ দেখল সমস্ত রাজি কার কাছে ছিল সে? জাগরিত ইন্ড্রি তাকে সেই রাজকন্টার সজ থেকে বঞ্চিত করেছে।

দরজায় কে টোকা মারছে। শয়্যার ব'লে সে ডাকল, 'এস।'

ঘরে যে প্রবেশ করল সে-ই হ'তে পারত কল্যাণ-কুমারের রাজকুমারী। কল্যাণকুমার এক বর্ষার অপরাহ্নে মেঘদূত প'ড়ে শুনিয়েছিল কাকে?

'এসো বৌদি। তুমিই আমার প্রথম চিন্তা।'

'তুমি যে মিথ্যা কথায় অভ্যস্ত এ-কথা আমার জানা আছে।'

'কি সংবাদ? হাতে পত্রিকা কেন?'

'সংবাদ আছে।' তরুণী ব হাসিতে কত যুগান্তরের স্বপ্ন। 'দেখ, আমি তোমার মেঘদূত।'

নির্দিষ্ট স্থানে চোখ রেখে কল্যাণকুমার মুখের ওপর পত্রিকা তুলে ধরলো। শেষ স্তম্ভের গোড়ার দিকে এক খণ্ড ক্ষুদ্র বার্তা প্রকাশিত হয়েছে : মাননীয় বিচারপতি সয়ু কে. সি. গাঙ্গুলীর স্মরণীয় এবং বিদ্রূষী কল্পা কুমারী অশোকা গাঙ্গুলী নগর-জীবনে ক্লান্ত হয়ে নির্জন পল্লীগ্রামের ছায়ানীতল আবেষ্টনে দিন কাটাবেন ব'লে কলকাতা ত্যাগ করছেন। অসংখ্য নিমন্ত্রণ, উৎসব, প্রমোদ-পার্টি ইত্যাদিতে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, অতএব ইত্যাদি ইত্যাদি।

সংবাদ পাঠ শেষ ক'রে কল্যাণকুমার লাফিয়ে উঠে বললে, 'বৌদি ধনুবাদ তোমাকে! আমারও ক'দিন ধ'রে এ-কথাই মনে হচ্ছিল।'

'কি?'

'শহর আর ভাল লাগছে না।'

'অতএব?'

'যাচ্ছি গ্রামে, তার সঙ্গে।'

তরুণ অধ্যাপক আদিত্যনাথের প্ল্যাটিনাম ফ্রেমের চশমার কোথা থেকে এক ঝলক ধুলো এসে লাগল। পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বার ক'রে তিনি চশমা পরিষ্কার করতে লাগলেন। টেবিলের ওপর নানা আবাবের রাশীকৃত পুস্তকের পাতা খোলা। কোন বইয়ে দাগ দিচ্ছেন, কোনটা থেকে নোট লিখছেন। সমস্ত সন্ধ্যাটা তিনি এই কাজ ক'রে আপাততঃ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সময়ের অভাবে পত্রিকাখানা এখনও অপঠিত। দু-হাতে বই ঠেলে রেখে তিনি পত্রিকাখানা টেনে নিলেন। এক স্থানে জটিস্ কে. সি. গাঙ্গুলীর স্মরণীয় কল্পার সম্বন্ধে সংবাদটা তাঁর চোখে পড়ল। গত শনিবারেও অশোকা গাঙ্গুলীর জন্মতিথি উপলক্ষে জটিস্ গাঙ্গুলীর স্বরস্ব অট্টালিকাতে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল। বিচাবপতি মশায় আদিত্যনাথকে যে শুধু স্নেহ করেন তা নয়, সে যে এক জন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং তার সৃষ্টিভিত্ত প্রবন্ধগুলো যে বিলিতি কাগজওয়ালারা রীতিমত পয়সা দিয়ে তাদের কাগজে ছাপে এ-বার্তা-জটিস্ গাঙ্গুলীব অবিস্মৃত নেই।

কাগজটা এক পাশে রেখে আদিত্যনাথ মনে মনে ব'লে উঠল, 'নাঃ, আর পারা যায় না, শহরের এই একঘেয়ে জীবনে ক্লান্তি এসে গেছে! নগরের এ কোলাহলের অনেক দূরে কত মহৎ জিনিষের প্রেরণা পেতে পারি।' আদিত্যনাথ হঠাৎ শিস দিয়ে উঠল।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলে ভবেশচন্দ্র হঠাৎ একটা প্রচণ্ড কিল. মেরে ডাকল, 'বেয়ারা।'

পাশের ঘরে দু-জন কেরাণী, এক জন টাইপিষ্ট সবাই

একসঙ্গে চমকে উঠল; বেয়ারা এল ছুটে। সাহেবের
এ-রকম ভাকবার কায়দায় বেচারি অভ্যস্ত ছিল না।
টুং-টাং করে কলিং-বেল বেজে উঠত আর সেও দু-চার
মিনিট পরে গিয়ে উপস্থিত হ'ত; কিন্তু আজ এ একেবারে
অপ্রত্যাশিত। চাকরি আর রইল না বোধ হয়।

‘হুজুর!’

‘পাখা আউর জোরসে।’ ভবেশচন্দ্র আঙুল দিয়ে
মাথার ওপরে চলন্ত পাখাটা দেখিয়ে দিলে। বেয়ারা
রেগুলেটর শেষ পর্যন্ত ঘুরিয়ে দিলে।

‘আ’, ভবেশচন্দ্র গলার নেকটাইটা ঈষৎ আলগা করে
দিয়ে বললে, ‘ভাল লাগে না ছাই, দিনরাত খালি কাজ!
তুধু টাকা আর টাকা! আশ্চর্য। কি করে মাছ এত
টাকা দিয়ে—?’

সেন এণ্ড লাহিড়ী কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনার
মিঃ ভবেশচন্দ্র সেন হাতের এক বটকায় টেবিলের সমস্ত
কাগজপত্র মাটিতে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দেখা
যাক আজকের সংবাদপত্রে কি আছে। পাশেই আরাম-
কেন্দারায় চিং হ'য়ে শুয়ে ভবেশচন্দ্র পত্রিকা খুলে পড়তে
লাগল, তৃতীয় পৃষ্ঠায় এক জায়গায় দেখল জষ্টিস্ সর্
কে. সি. গাঙ্গুলীর কথা কুমারী অশোকা গাঙ্গুলী কলকাতা
ছেড়ে পল্লীগ্রামে চলে যাচ্ছে। ভবেশচন্দ্র পত্রিকাখানা
ফেলে দিলে ছুঁড়ে। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।
ট্রাউজারের পকেট থেকে সোনার সিগারেট-কেস বার
করে আপন মনে ভাবলে, কি হ'বে আর টাকা রোজগার
করে, কে আছে তার? কার জন্তে সে অহরের মত
দিনরাত পরিশ্রম করে মরছে? আর শহরের এই ধুলো,
ধোঁয়া আর মোটরব হর্প। তার মোটরখানা কালই বেচে
দেবে সে। পাড়াগাঁর মেঠো রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়ী চড়ে
যাওয়ার মধ্যে অনেক মাধুর্য, অনেক সত্যিকারের খিল।
পায়ের কাছে কাগজের ঝুড়িতে একটা লাথি মেরে ভবেশচন্দ্র
বাইরে বেরিয়ে এল।

পরদিনের কাহিনী।

উত্তর কলকাতার কোন এক রাস্তা থেকে কল্যাণকুমারের
টু-সীটারখানা বড় রাস্তায় এসে পড়ল। সকাল আটটা

হ'বে। পথে গাড়ীঘোড়ার বাহুল্য নেই। উড়ে চলল
কল্যাণকুমারের গাড়ী; মন তার উড়ে গেছে আরও আগে।
চাদরের প্রান্ত তার উড়ছে চঞ্চল বাতাসে।

জষ্টিস্ কে. সি. গাঙ্গুলীর বাগানের পুষ্পরাশি আহরিত
হচ্ছে; প্রাঙ্গণ ভাগ করে তারা ধাবে প্রাচীর-অভ্যন্তরে।

‘ঐ বড় গোলাপটা আমার দাও।’ গাড়ী থামিয়ে
কল্যাণকুমার মাণিকে বললে।

সুন্দরন এবং সুবেশ তরুণের আদেশ পালন করে বাগান-
পরিচারক কৃতার্থ হ'ল।

কল্যাণকুমার প্রাসাদোপম অট্টালিকার সিঁড়ি অভিক্রম
করে উপরে উঠে এল। অশোকের সন্ধান পেতে তার
দেরি হ'ল না। পরিষ্কার এক মেয়ে, পরিচ্ছন্ন—পালিশ-
করা নিখুঁত জীবন্ত এক পুতুল। প্রথম দৃষ্টিতে স্তম্ভিত
এবং বিলম্বে বিস্মিত হবার কথা। ওর দেহকে কমনীয় এবং
রমণীয় করে তোলবার জন্তে যে পরিচ্ছন্ন এবং আভরণ
তার উপযোগী, কেবলমাত্র সে-উপকরণ দ্বারাই অশোকা
উন্মেষ করেছে নিজেকে! অভাব নেই, বাহুল্যও নেই।

ওদের সাক্ষাৎ হ'ল। ‘আমি যেন কি ভাবছিলাম, তুমি
আসবার আগে বুঝতে পারি নি।’ অশোকা বললে, ‘এমন
সময়ে তুমি ত আস না কখনও।’

‘ভাবছিলে তুমি,’ কল্যাণকুমার বললে, ‘একা একা
পাড়াগাঁ গিয়ে দিন কাটাবে কি করে। আমি এমন সময়ে
কখনও আসি নি বটে, কিন্তু ভাবলাম এ সময়েই তোমাকে
একটু নিরিবিলি পাওয়া যাবে। আপাততঃ ফুলটা নাও,
তোমারই জন্তে।’

অশোকা হাত বাড়িয়ে ফুলটা গ্রহণ করল, এক মুহূর্ত
তুলে ধরল নাকের কাছে; তার পর অগ্রমন্ডের মত
ঠোঁট দিয়ে মুহূর্ত স্পর্শ করল।

‘তোমার সঙ্গে আরও কথা আছে।’ কল্যাণকুমার
বললে।

‘বল না।’ অশোকা ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গী করল।

‘তোমার সম্বন্ধে সংবাদটা কাগজে দেখেছি; আমিও
হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছি যে আমারও মনটা শান্তি
চায়, আর চায় নির্জনতা! আমাকে তোমার সঙ্গে নাও
অশোকা!’ কয়েক মুহূর্তের ছেদ। ‘আমার মন তোমার

অজানা নেই, আমাকে ধস্ত হবার একটা সুযোগ দাও, পৃথিবীর এক অজ্ঞাত কোণে চল আমরা পালিয়ে যাই ?

কয়েক মিনিটের ছেদ।

‘পরশু ঠিক এমনি সময়ে এস,’ অশোকা বললে, ‘মাঝখানে একটা দিন আমাদের ভাবতে দাও।’

ওদের মধ্যে তাই স্থির হ’ল।

কয়েক মিনিট পবে দেখা গেল কল্যাণকুমারের টু-সীটার ফিরে যাচ্ছে; মাঝখানে একটা মাত্র দিন।

তরুণ অধ্যাপক আদিত্যনাথকে দেখা গেল নিষ্কর্ন ছিগ্রহরে জ্যেষ্ঠ কে. সি. গাঙ্গুলীর বাড়ীতে প্রবেশ করছে। সিন্ধের চান্দর তার মাটিতে লুটছে।

ছিতলের একটি কক্ষের রুদ্ধ দরজায় আদিত্যনাথ যুঁহু করাঘাত করল; কোন শব্দ নেই। ভিনতলা থেকে গ্রামোফোনে গানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এক জন ভৃত্য বারান্দা অতিক্রম করছিল। বহু উৎসব এবং উল্লাস উপলক্ষে এ-বাড়ীতে আদিত্যনাথের উপস্থিতি সে লক্ষ্য করেছে।

আদিত্যনাথ বহু দরজায় পুনরায় করাঘাত করল। ভেতরে অম্পট শব্দ শোনা গেল, দরজা খুলল। আদিত্যনাথকে দেখে অশোকার মুখে উদ্ভাসিত হ’য়ে উঠল এক টুকরো হাসি। পিঠের ওপর দিয়ে রঙীন শাড়ীখানা মেঝেতে লুটছে; চোখে তার তখনও ঘুমের আবেশ। ‘এস না ভেতরে।’ অশোকা আদিত্যনাথকে আহ্বান করল।

আদিত্যনাথের চশমার কাছে সূর্যের আলো চিক্ চিক্ ক’রে উঠল। অশোকার শয়নকক্ষ; ওর পড়াশুনো এবং অলস সময় ক্ষেপণ করবার ঘর স্বতন্ত্র। এ-ঘরে অতিথির কোন আসন নেই। ‘ব’স না বিছানায়’ অশোকা বললে, ‘এমন অসময়ে ?’

‘কিছু মনে কর নি ত ?’ সঙ্কুচিত কণ্ঠে আদিত্যনাথ বললে, ‘এমন সময়ে এসেছি ?’

‘এসে যখন পড়েছ তখন আর উপায় নেই,’ শিথিল হাস্যে অশোকা বললে। গৌর অজ্ঞ তার লুটিয়ে পড়ল শয্যায়।

‘দেখলাম, নাগরিক জীবনে তোমার ক্লাস্তি এসেছে,’ আদিত্যনাথ আর সময়ের অপব্যবহার না-ক’রে বললে,

‘অবিশ্রাম আনন্দের হৈ চৈ আর তোমার ভাল লাগছে না’ আদিত্যনাথের শাস্ত্র নম্র কণ্ঠগুলো হাওয়ার কাঁপতে লাগল যেন।

‘বাস্তবিক আর ভাল লাগে না,’ নিস্তেজ কণ্ঠে অশোকা বললে, ‘দিনরাত পার্টি, পিকনিক, ট্রিপ, ভাস্কি, কি বিস্তী’ এখানকার জীবন। এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচতাম।’

‘চল না আমাদের দেশে।’ আদিত্যনাথ হঠাৎ ধূলীর সুরে বললে, ‘যাবে ? নদীর ধারে গাছপালার ছায়ায় আমাদের বাড়ী, ঘোঁয়া, ধুলো নেই, মোটরের শব্দ নেই, গ্রামোফোন নেই। শুধু নদীর ছলছল শব্দ; প্রকাণ্ড গাছগুলোর সোঁ সোঁ গজ্জন। চল যাই সেখানে আমার ঘরের লক্ষ্মী হবে। শহরের এই তোমাটে রং, এর পৈশাচিক উল্লাসের কবল থেকে চল আমি তোমাকে নিয়ে যাই। আমারও ত অভাব নেই কিছু; অধ্যাপনা থেকে বিশ্রাম নেওয়া যাক; তোমাকে কাছে পেলে পৃথিবী অনেক মহৎ জিনিষ আমার কাছে পেতে পাবে হয়ত। চল আমরা যাই।’

কয়েক মিনিটের ছেদ। ছিগ্রহবে নিষ্কর্ন এই ঘরের মধ্যে আদিত্যনাথের কণ্ঠগুলো শব্দ-সমুদ্র অভিক্রম করেছে বটে, কিন্তু এখনও তারা ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

অশোকা উঠে বসল। বললে, ‘বুঝেছি তোমার কথা, আমি জানি, পল্লীগ্রামের নিঃসঙ্গতায় তুমি আমাকে জাগিয়ে রাখবে, কিন্তু আজ আমাকে দিয়ে কিছু স্বীকার করিয়ে নিও না। একটা দিন আমায় ভাববার সময় দাও; পরশু এস এমনি সময়ে, বলব তোমাকে। এস নিশ্চয়।’ কববী তার আলুলায়িত হ’ল।

সন্ধ্যা অভিক্রান্ত। জ্যেষ্ঠ কে. সি. গাঙ্গুলীর প্রাসাদোপম অট্টালিকার সামনে প্রকাণ্ড একখানা লাল-রঙের গাড়ী অপেক্ষা করছিল। ছইলের ওপর হাত রেখে গাড়ীর মধ্যে উপবিষ্ট এক তরুণ। ফুটবোর্ডে পা রেখে কুমারী অশোকা তার সঙ্গে কথা বলছিল; যুঁহু অম্পট আলাপ, অশোকা মাঝে মাঝে রূপালী কণ্ঠে হেসে উঠছিল; কলকাতার নিষ্কর্ন এক রাস্তা। মাঝে মাঝে দু-একখানা মোটর অভিক্রম করছিল।

দূর থেকে একটা গাড়ী আর্দ্রনাদ করতে করতে এগিয়ে এল, সেদিকে মনোযোগ ছিল না এ ছুটি তরুণ তরুণী। হঠাৎ পশ্চাৎ থেকে মোটরখানা এ-গাড়ীখানাকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল। পা হড়কে গিয়ে অশোকা পড়ল মাটিতে কাৎ হয়ে। গাড়ীর মধ্যে উপবিষ্ট যুবক কোন রকমে একটা সাম্ভাবিতিক আঘাত থেকে সামলে নিলে নিজেকে। যুথের পাইপটা তার ছিটকে পড়েছিল ট্রাইউজারে, তাহাকের অগ্নি-সম্পর্শে ট্রাইউজার চক্ষের নিমেষে কালো হয়ে গেল। গাড়ীর চামড়াটা কোন রকমে বাঁচিয়ে নেমে পড়ল গাড়ী থেকে।

পশ্চাতের মোটর থেকেও যে যুবকটির অবতরণ ঘটল সে আমাদেরই ভবেশচন্দ্র। তার প্রকাণ্ড হাডসন্ গাড়ীর হেডলাইট ছুটো তখনও জ্বলছিল। সেই তীব্র আলোকে অশোকাকে চিনতে তার এক মুহূর্তও লাগল না। সে ছুটে গেল অশোকার সাহায্যে। অশোকা তখন উঠে দাঁড়িয়েছে।

‘গাড়ীটা কি চুরি করে এনেছেন?’ পূর্ব-কথিত যুবক ভবেশচন্দ্রকে ক্ষিপ্ত কর্তে বললে।

‘আজ্ঞে না’, ভবেশচন্দ্র উত্তর দিলে, ‘লাইসেন্সটা সজে রয়েছে, দেখবেন?’

‘রিক্সা টানা খুব সোজা, বজাট নেই কোন!’ অপরিচিত তেমন উত্তর কর্তে বললে।

‘কিছু না-টানা আরও সোজা!’ ভবেশচন্দ্র উত্তর দিলে তার সার্টির কলারটা উটে দিয়ে।

‘আপনাকে আমি পুলিশে দেব, জানেন?’

ভবেশচন্দ্র তার পকেট থেকে ভিজিটি কার্ড একখানা এগিয়ে দিয়ে বললে, ‘এই নিন, এতে নাম-ঠিকানা পাবেন।’ তার পর অশোকার দিকে তাকিয়ে, ‘তুমি যদি শরীরে আঘাত পেয়ে থাক ত তার জন্তে আমায় দোষ দিও না, কিন্তু চল আপাততঃ, তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার, এস।’ অশোকার হাত ধরে ঈষৎ আকর্ষণ করে, ‘ওঠ গাড়ীতে।’ অশোকা উঠে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে ভবেশচন্দ্রও। গাড়ী ব্যাক করতে করতে অপর যুবকের উদ্দেশ্যে সে বললে, ‘আচ্ছা নমস্কার। কাল ত আবার পুলিশ কোর্টে দেখা হচ্ছে।’ ভবেশচন্দ্রের গাড়ীখানা একটা পাক খেয়ে ছুট করে ছুটে চলল।

যান-বহুল রাস্তা দিয়ে ভবেশচন্দ্রের মোটর উর্দ্ধ্বাসে ছুটেছে; রাজির অন্ধকার এসেছে ঘন হয়ে। তান হাতটা হইলের ওপর রেখে বাঁ-হাতে অশোকার একখানা হাত তুলে নিয়ে ভবেশচন্দ্র বললে, ‘শোন ছুটু মেয়ে, তোমার কোন কথা আমি শুনছি নে, আজ আমার কথা দিতেই হবে, না-হ’লে এই যে ছুটুলাম তোমায় নিয়ে আর কিরে আসব না! বল।’

‘কি?’ অশোকা তার দিকে তাকিয়ে ভিজ্জেস করলে।

‘আমাকে বিয়ে কর, মানে এস আমরা বিয়ে করি।’

‘আর একটু আস্তে চালাও না,’ অশোকা আরও কাছে সরে এসে বললে, ‘যা স্পীডে ছুটেছ বিয়ে পর্যন্ত প্রাণে বাঁচব ব’লে মনে হচ্ছে না।’

‘শোন, ঠাট্টা নয়!’ ভবেশচন্দ্র গম্ভীর কর্তে বললে, ‘আজ আর আমার কথা এড়িয়ে যেতে দিচ্ছি নে তোমায়, আমাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি কি? আমি তোমার চাইতে কম বড়লোক নয়; সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় সর্বপ্রথম, চেহারা আমার খারাপ নয়; তোমাকে বিয়ে করবার যোগ্যতা আমার কিসে কম সে-কথা তুমি আমার বল। চিরকুমারী থাকবে এমন কঠিন ব্রত যখন তোমার নেই বা কাউকে মন দান যখন কর নি, তখন কেন আমার বিয়ে করবে না?’

কোন উত্তর নেই।

গাড়ী ছুটে চলেছে ঝোড়ো হাওয়ার মত নগরের প্রান্ত অতিক্রম করে। ছুটে চলেছে রাজির অন্ধকার আর আকাশের অগণিত তারকা। আর ক্ষীণতর হয়ে আসছে দূরের কোলাহল।

‘উত্তর দাও।’ ভবেশচন্দ্রের ব্যাকুল কর্তে প্রতিধ্বনিত হ’ল, ‘চুপ করে থেক না অশোকা। নগরের নিত্য প্রয়োজনে তোমার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে প্রতিদিন; চল আমরা যাই, শাস্ত নিষ্কর্ন এক গ্রামের মধ্যে গিয়ে অল্পভব করি যে আমরা বাস্তবিক বেঁচে আছি। বল, কথা বল অশোকা, অমন চুপ করে থেক না, প্রস্তরমূর্তির সঙ্গে তোমার পার্থক্য আছে।’

আবার কয়েক মিনিটের বিরতি।

‘শুধু কালকের দিনটা আমার ভাবতে দাও,’ অশোকা

বললে, 'পরন্তু রাত্রে তুমি এস আমাব কাছে ; কিন্তু আজ চল, ফেরা থাক, রাত হ'ল অনেক।'

পরদিন কল্যাণকুমারের সকাল, আদিত্যনাথের অপরাহ্ন এবং ভবেশচন্দ্রের সন্ধ্যা অভিবাহিত হ'ল। কোন একটা দিনের আগমন-প্রতীক্ষায় এরা পূর্বে কেউ গ্রহণ গণনা করেছে কি না কে জানে।

দিন অভিবাহিত হয়ে গেল।

পরদিন তিনখানা মোটর পর পর জট্টিস্ কে. সি. গাজুলীর প্রকাণ্ড বাড়ীর গেটের সামনে দাঁড়াল, অসময়ে। ভবেশচন্দ্র এবং আদিত্যনাথের নির্দিষ্ট সময়ে নয়; কিন্তু কল্যাণকুমারের খানিকটা সন্তাবনা তবু ছিল। তখন সবমাত্র ভোর হয়েছে।

মোটর থেকে নেমে তিন জনেই প্রায় একই সময়ে খোলা গেট দিয়ে বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করল। প্রোট জঙ্গসাহেব সংলগ্ন উদ্যানে প্রভাতের মুক্ত বায়ু সেবন করছিলেন। এমনি সময়ে তিন জন যুবককে একসঙ্গে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন, এগিয়ে এলেন নিকটে; স্থিতহাস্তে বললেন, 'এস, এস, মনে হচ্ছে কত দিন তোমরা আস নি, কিন্তু একটু আশ্চর্য্য হচ্ছি তোমাদের তিন জনকে একসঙ্গে ত আমাদের বাড়ীতে কোনদিন দেখি নি।' জঙ্গসাহেব নাকের কাছে সদ্য-আহরিত

গোলাপফুলটা তুলে ধরলেন। কল্যাণকুমার তার ঘড়িতে দেখল সাড়ে-ছ'টা। প্রোফেসর আদিত্যনাথ চশমাটা একবার চাহরের প্রান্তে মুছে নিয়ে দোতলার খোলা জানলার দিকে তাকালেন। ভবেশচন্দ্র নিজের এবং অল্প দুই সহগামীর শুভ ইচ্ছার্থে জঙ্গসাহেবকে বললেন, 'হ্যাঁ, দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আমরা বড় অসময়ে—'

জঙ্গসাহেব যেন উৎসাহ পেলেন, হঠাৎ বললেন, 'কিছু না, কিছু না, আমার ছুট মেয়েটাই তোমাদের আসতে বলেছিল, না? দমদমের বাগানে শিকাব করতে? কিন্তু মেয়ে আমার। সে-কথা কি তার মনে আছে? সে ত কাল রাতেই বাকস-প্যাটরা নিয়ে ট্রেন ধরেছে।'

'কাল রাতে?' কল্যাণকুমার হাঁ করল।

'কিরবেন কবে?' আদিত্যনাথ এক পা এগিয়ে এল।

'গেছেন কোথায়?' ভবেশচন্দ্র এক পা পেছিয়ে এল।

'কোথায় গেছে সে আর কেন জিজ্ঞেস করছ' জঙ্গসাহেব ফুলটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললেন, 'সম্ভ্রান্তি গেছেন কালিম্পাড়ে, সেখানে এক নাচের মজলিসে যোগদান করবে, তার পর সেখান থেকে নাকি সোজা যোধপুৰ; ওখানে যোধপুরের রাজকন্যা এক পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেছে ওকে; কিন্তু ও নেই ব'লে তোমরা আজ অনাদরে কিরে বাবে তা হবে না; এস, আজ আমরা একসঙ্গে চা খাই। এস ভিতরে।



বাংলার কুটীরশিল্পে ঘি-উৎপাদন

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

বাংলায় ভয়সা ঘির ব্যবহার

বাংলার ঘি-ব্যবসা ভয়সা ঘির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাঙালীর নিকট গাওয়া ঘি উপাদেয় কিন্তু উহা দুস্ত্রাপ্য। বোম্বের নিকট অল্প পরিমাণে গাওয়া ঘি ও মাখন গাওয়া যায় কিন্তু তাহার মূল্য অধিক, আবার উহা অনেক সময়েই ভেজাল বস্তু হইয়া থাকে। বাংলায় ঘরে ঘরে রান্নার জন্য প্রায় সর্বতোভাবেই ভয়সা ঘি ব্যবহৃত হয়। বাংলায় মহিষের প্রচলন এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। এই হেতু বাংলায় ভয়সা ঘি মানেই বাংলার বাহির হইতে আমদানী ঘি। কলিকাতা হইয়া এই ঘি বাংলার স্তূপ গ্রামে গ্রামে বিক্রয়ের জন্য আসে। এমনি করিয়া বৎসরে অল্পমান পৌনে দুই কোটি টাকা বাহির হইয়া যায়। যদি বাংলার প্রয়োজনীয় ঘি বাংলাতেই উৎপন্ন হইত; তবে ঘি বাদে টানা দুখের অল্প জিনিষে মোট তিন-চার কোটি টাকার উৎপাদন বাংলায় বাড়িত এবং বাঙালীর শরীর ও শিল্প ইহা দ্বারা পুষ্ট হইত ও বাঙালীর আর্থিক অসচ্ছলতা অপেক্ষাকৃত কম হইত। নানা ভাবে বাংলার প্রায় সমুদয় কুটীরশিল্প নষ্ট হইয়াছে। ভস্ম ও চাবী বেকার হইয়া পড়িয়াছে এবং কর্মহীনতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ঘি প্রস্তুতের ও অল্প গব্যের মত এত বড় একটা কৃষিনির্ভর শিল্প কোনও দেশের পক্ষেই উপেক্ষণীয় নহে। বাংলার পক্ষে উহার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী।

বাংলার কৃষি যখন গাওয়া ঘির দিকে, বাংলা যখন গো-প্রধান দেশ তখন বাংলায় নিজস্ব গাওয়া ঘি কেন প্রচলিত হইবে না, কেনই বা বাহিরের ভয়সা ঘি আমদানী হইতে থাকিবে? বাংলায় এই অশেষ কল্যাণকর শিল্প প্রবর্তন করা সম্ভব এবং যে-সকল অন্তরায় আজ আছে সে সকল অতিক্রম করিয়া কতকগুলি নিয়ম পালন করিলে ইহা দ্রুত প্রসারিত করা যায়।

বাংলার গ্রামে গ্রামে যে সামান্য ঘি উৎপন্ন হয় না তাহা নহে, ভয়সা ঘিও যে বাংলায় একেবারে হয় না তাহা নহে। আবার বাংলার কতক গাওয়া-ভয়সা মিশ্রিত ঘি সুবিধামত গাওয়া বা ভয়সা ঘি বলিয়া বিক্রীত হয়। কিন্তু ব্যবসায়ে উহার স্থান নগণ্য। ব্যাপক ব্যবসায়ের ঘি মাঝেই ভয়সা ঘি। দৈনিক পত্রিকাগুলিতে বাজারদরের তালিকায় ঘির বাজার-দর দেওয়া হয়; এক দিনের পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

ঘির দর:

ভারতী ৫২, মণ, খুসজা ৫৩, মণ, সিকোরাবাদ ৫০, মণ
শ্রী ৫৮, মণ, বুটল ৫৩, মণ, বান্দাসাগর ৫৩, মণ

—‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, ২২শে জুন, মঙ্গলবার

যে দর দেওয়া হইয়াছে, এ সমস্তই ভয়সা ঘির দর এবং এ সমস্তই বাংলার বাহির হইতে আমদানী ঘি। উহা যে ভয়সা ঘি তাহা উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় নাই। কেননা সকলেই জানেন যে বাজারের ঘি মাঝেই ভয়সা ঘি। গাওয়া ঘি হইলেই তাহার বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। যেমন, বাংলায় রান্নার সম্পর্কে তেল বলিতেই আমরা সরিষার তেল বুঝি, উহার উল্লেখ পর্যন্ত নিতপ্রয়োজন—এ তেমনি।

গাওয়া ঘি প্রাপ্তির অন্তরায় ও প্রতিকার

গাওয়া ঘির দুস্ত্রাপ্যতার একটা হেতু শুনিয়া আসিতে ছিলাম যে উহা ভয়সা ঘির মত বেশী দিন টিকে না এবং টিনে বন্ধ করিয়া রাখিলেও উহার স্বাদ ও গন্ধ অল্পকালেই বিকৃত হয়। কিন্তু কথাটা ঠিক নহে। ভাল ভাবে তৈরি গাওয়া ঘি দীর্ঘ দিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। অবশ্য, গাওয়া ও ভয়সা উভয়ের সম্বন্ধেই একথা বলা যায় যে যত টাটকা উহা ব্যবহার করা যায় ততই ভাল। কিন্তু গাওয়া ঘি ভয়সা অপেক্ষা সহজে বিকৃত হয় এ প্রকার পরিচয় আমি পরীক্ষা করিয়া পাই নাই। অবিকৃতি নির্ভর করে

উৎপাদনে কুশলতা, জাল দেওয়া এবং পাত্রাদির পরিচ্ছন্নতা ও বায়ুশূন্যতার উপব।

গাওয়া ঘি বাংলায় উৎপন্ন না-হওয়ার আর একটা বহুজাত কারণ এই যে বাংলায় গাইয়ের দুধই দুগ্ধাপ্য। দুধ পাইতে হইলে বাংলার গো-বংশ উন্নত করা দরকার। এ জন্ত পশ্চিমা বঁড় আমদানী করার চেষ্টাও চলিতেছে। পশ্চিমা বঁড় আমদানী করিয়া যে সত্তর জাতের সৃষ্টি হইবে তাহা কয়েক পুরুষ ধরিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। পশ্চিমের ভাল বঁড় আনিলেই যে বাংলার গরু ভাল হইবে, ইহা ঐক্য সত্য নাও হইতে পারে। কাজেই বঁড় আমদানী করা একটা পরীক্ষণীয় পথ মাত্র। সেই পরীক্ষা নিষ্ফল হইলে কথাই নাই। সফল হইলে বাংলার সমস্ত গরুকে ঐ নূতন সত্তর জাতিতে পরিণত করা যে বিরাট ব্যাপার তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা বা হাতিয়ার আমাদের হাতে নাই।

বাংলায় গো-পালন ও-বৃদ্ধির প্রদ্বের সহিত একটা বিষম উদ্বেগের বিষয় রহিয়াছে, বাংলায় গো-খাদ্যের অভাব। এক কালে বাংলায় গোচারণের মাঠ ছিল, যাহা সেটলমেন্টের হিসাবপত্রে সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া উল্লিখিত ছিল, মাছুষ ও গো সাধারণকে বঞ্চিত করিয়া তাহাও বিলি হইয়া গিয়াছে বা হইতেছে। গোচারণের মাঠ নাই বলিলেই হয়। গো-পালনের ইহা এক বিষম অন্তরায়। যে সকল গরু আছে, খাদ্যাভাবে তাহারা শীর্ণ এবং দুধও নামমাত্র দেয়। ঐ সকল মাঠ বা ইহার বিকল্পে অল্পরূপ জমি দিতে জমিদারদিগকে বাধ্য করিয়া গোচারণের মাঠ সৃষ্টি এবং তাহার পব গাইয়ের দুধ পাওয়ার উপায় করিতে হইলে আমাদেরিগকে অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। বাংলায় গরুর জাত খারাপ এবং বাংলায় গো-খাদ্য কম—এই সকল অন্তরায় মানিয়া লইয়াই আমাদেরিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

কি করিলে বাংলার গো-জাতি রক্ষা করা যায় এবং বাংলার গরুর দুধ বাড়ান যায় এই বিষয় চিন্তা করিয়া ও কিছু কিছু পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি যে, গো-জাতির সর্বপ্রকার উন্নতির জন্ত প্রাথমিক আবশ্যক হইতেছে দুধ বা গব্যের চাহিদা বাড়ান। যে স্থানে চাহিদা বাড়িয়াছে সে স্থানেই ধীরে ধীরে উহা মিটাইবার মত দুধের উৎপাদন

বাড়িয়াছে। ইহার প্রমাণ দই-সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতির খ্যাতিনামা কেন্দ্রগুলি। ঢাকার কোনও অঞ্চলের পাতকীব প্রসিদ্ধ। অহুসঙ্কান করিলে দেখিবেন যে সেই অঞ্চলের গাই অধিক দুধ দেয় এবং পুষ্ট। সেখানকার লোকের অসচ্ছলতাও কিছু কম। উহার কাছাকাছি স্থানে, যেখানে গরুর জাত একই প্রকার এবং গো-খাদ্য সমান দুগ্ধাপ্য সেখানে দেখিবেন চাহিদা নাই বলিয়া গাই কম দুধ দেয়। নাটোরের গব্য প্রসিদ্ধ। নাটোরের কাঁচাগোঁল্লার খ্যাতি সমস্ত উত্তর-বঙ্গকে আকৃষ্ট করে। নাটোরের আট-দশ মাইলের ভিতর স্থানগুলি অহুসঙ্কান করিয়া জানিবেন যে উহার প্রাকৃতিক অবস্থা কিঞ্চিৎ দূরবর্তী অজ্ঞাত স্থানের সমান হইলেও ভুলনায় নাটোরের গাই পুষ্ট ও অধিক দুগ্ধবতী। এইরূপে দেখা যাইবে যে, যেখানেই গব্যের চাহিদা আছে সেই স্থানেই দুধও উৎপন্ন হইতেছে। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, গরুর দুধ দেওয়ার পরিমাণ সাধারণতঃ চাহিদার অনুবর্তন করে। সকল গব্যের চাহিদাব মধ্যে ঘির চাহিদাই অধিক ফলপ্রসূ, কেননা উহার সাময়িক উঠা-পড়া কম। ছানা বা দইয়ের চাহিদা বিবাহ বা পর্বাদি উপলক্ষে বাড়ি কমে; সেই জন্ত যাহারা গো পালন কবে তাহারা সকল সময় সমান দাম পায় না। যেখানে বাব মাসেব জন্ত গোয়াল গৃহস্থের সহিত দুধের বন্দোবস্ত করিয়া লয় সেখানে চাহিদার কম-বেশী অনুমান করিয়া একটা একটানা সন্তা দবে চুক্তি করিয়া লয়। উহাতে দুধের উত্তেজনা পুরা পাওয়া যায় না। গব্যের ভিতর ঘি সর্বাপেক্ষা বেশী-দিন টিকে; সেই জন্ত যেখানে ঘির ব্যবসাই প্রধান, ছানা বা দইয়ের ব্যবসা গৌণ, সেখানে দুধের দাম একটানা চড়া থাকে, গৃহস্থেব আয় বেশী হয়, গরুর যত্ন বেশী হয়, গরু অধিক দুগ্ধবতী হয়।

এমন স্থান কল্পনা করা যাইতে পারে যেখানে গো-খাদ্য কিছুই পাওয়া যায় না, যেখানে গরু রাখাই বিড়ম্বনা। এমন কল্পিত স্থানে গব্যের চাহিদা সৃষ্টি করিলেও কোনও সাড়া না পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ যেখানে লোকে চাষ-আবাদ করিয়া থাকে সেই স্থানে গরুও অবশ্যই থাকিতে পারে, নতুং চাষ-আবাদ সম্ভব হইত না, এবং এইরূপ স্থানে একটানা নির্ভরযোগ্য গব্যের চাহিদা উপস্থিত হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গেই দুধের উৎপাদন বাড়িতে থাকে। এইরূপ ষটাই স্বাভাবিকও বটে। গৃহস্থ নিজে নিরম। গরুকেও স্বর্জ্যাহারে রাখে। গরুর যত্নও কম হয় এবং দুধ কম হয়। যতটুকু দুধ হয় গৃহস্থ তাহা বেচিতে চাহিলে তাহাবও নিয়মিত ক্রেতা নাই। এজন্য গৃহস্থ গরুর যত্ন কম করে, খাদ্য জোগাইবার জন্ত কম ব্যাকুল হয়। কিন্তু যখনই গৃহস্থ দেখে যে গরুকে ভাল করিয়া খাওয়াইলে দুধ বাড়ে, পয়সাও পাওয়া যায়, তখন নানা ফিকির করিয়া সে গরুকে খাওয়াইবার চেষ্টা করে। দুধ বেচিয়া যে পয়সা পায় তাহা হইতেও গরুকে খাওয়াইবার জন্ত ব্যয় করে, ভাল করিয়া জল ঘাস ও জাব দেয়, যত্ন করিয়া চরায়, অনেক সময় ছেলেপিলে বা নিজেদের চেয়ে দুধবতী গাইকে বেশী যত্ন করে। উহাতে গোজাতির উন্নতির সোপান প্রস্তুত হয়। গোজাতির যত্নই গোজাতির উন্নতির প্রথম সোপান। গব্যের নির্ভরযোগ্য চাহিদা সেই সোপান প্রস্তুত করে।

অল্প দিক হইতেও এই দৃষ্টি সমর্থন লাভ করে। পূর্বে যেখানে চিনির কল ছিল না, সেখানে লোকে দু-চার খানা ক্ষেতে মাত্র আখ বুনিত। এরূপ স্থানে চিনির কল বসাইবার সময় জমি নির্বাচনকালে কলওয়াল দেখে যে উহা আখের উপযুক্ত কিনা। যদি অল্পকূল হয় তবে চাষার সহিত পরামর্শ করে না, চুক্তি করে না, সে নিজের বিচারে কল বসাইয়া আখের চাহিদার সৃষ্টি করে এবং চাষার তীক্ষ্ণ স্বার্থবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। আখের চাষে লাভ আছে একথা চাষা যখন জানে তখন চাহিদার মুখে আখ উৎপন্ন করিয়া কলওয়ালার উপর নির্ভর করে। ঠিক তেমনি গব্যের বেলায়। আখ কোথায় হইতে পাবে বা না-পাবে, ইহা লইয়া কত আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু রাজশাহী বা গোপালপুরে মিল বসাইবার পর দেখিতেছি যে চাহিদার চাপে আখ পর্যন্ত খানের মত জলজ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেখানে এক কোমর জলেও আখের ক্ষেত দেখিবেন। যেখানে এক কোমর জল বর্ষায় উঠে সে-ক্ষেতে যে আখ হয় একথা কয়জন জানিতেন আর আজই বা কয়জন জানেন। কিন্তু চাহিদা এমন জিনিষ যে রাজশাহীর কোন্ জমিতে আখ হইতে পারে ইহা চাষাকে চেষ্টা করিয়া শিখাইতে হয়

নাই। চাহিদাই তাহার আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছে ও নূতন পথে প্রবৃত্ত করাইয়াছে।

ঘির চাহিদার স্থিরতা

গব্যের চাহিদার ভিতর ঘির চাহিদাই শ্রেষ্ঠ একথা পূর্বে বলিয়াছি কেননা উহা সাময়িক নয়। কেহ ঘি উৎপাদন করিতে গ্রামে বসিয়া গেলে তিনি জানাইয়া দিতে পারেন যে, যতটা দুধ যেদিন যে জোগাইবে তাহাই লওয়া হইবে। গৃহস্থের যেদিন নিজেব অধিক প্রয়োজন সেদিন দুধ কম দিবে; তাহাতে ক্ষতি নাই। আজ গ্রামে বিবাহ বা উৎসব, দুধ উৎসর্গ হইবে না, ঘি-ব্যবসায়ীর তাহাতে অসন্তোষ নাই— সে কাল দুধ পাইবে। গ্রামের বাহা উৎসর্গ তাহা সে লইবে এবং নিশ্চিতই লইবে। যতটা দুধ উৎসর্গ হউক না কেন সে কোনও দিন কাহাকেও ফিরাইবে না এমন আশ্বাস ঘি-ব্যবসায়ী যত অকুণ্ঠার সহিত দিতে পারে ছানা বা দধির ব্যবসায়ী তাহা পারে না। এই জন্ত দুধ উৎপাদন প্ররোচিত করিতে ঘি-ব্যবসা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ঘির জন্ত যে দুধ লওয়া হয় তাহার মাখন বা ননীই ঘিতে পরিণত হয়, বাকী যে টানা দুধটা পড়িয়া রহিল তাহাব কি হইবে? সে ব্যবস্থা ঘি-ব্যবসায়ীকেই করিতে হইবে। টানা দুধের দই প্রস্তুত করিয়া, ক্ষীর, ছানা, কেজিন বা জমাট দুধ, বাহা হউক কিছু করিয়া উহা ব্যবহার করিয়া দুধের প্রায় অর্ধেক দাম তুলিতে হইবে।

বাংলার গৌ-সম্পদ

পূর্বে বলিয়াছি, অল্পমান যে পৌনে দুই কোটি টাকার ভরসা ঘি বাংলায় আসে উহার পরিবর্তে অতটা গাওয়া ঘি বাংলাতেই প্রস্তুত হইতে পারে। বাংলার গাভীকেই ত এই প্রয়োজনীয় দুধ দিতে হইবে। বাংলায় প্রয়োজন মিটাইবার মত গাভী আছে কিনা দেখা যাক। এজন্য বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রভৃতি যে কয়টি প্রদেশ হইতে বাংলায় ঘি আমদানী হয় তাহার সহিত তুলনা-মূলক আলোচনা করিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হইবে।

১৯৩৪-৩৫ সালের গবর্ণমেন্টের কৃষি-বিভাগের

হিসাবে নিম্ন সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়। ঐ হিসাবে গবাদি পশু, এবং ভিন্ন করিয়া গাভী বাঁড় বলদ বাছুর এবং মহিষের বাঁড় বলদ জী-মহিষ ও বাছুরের সংখ্যা দেখান আছে। উহা হইতে আমি কেবল গাভী ও জী-মহিষের সংখ্যা লইয়া তুলনা করিতেছি।

বাংলা বিহার যুক্তপ্রদেশ পাঞ্জাব
উড়িষ্যা

যত লক্ষ একর জমি চাষ হয়...	২৩৩	২৪১	৩৫৩	২৬৫
যত লক্ষ গাভী আছে ...	৮২	৮৪	১০	১০২
যত লক্ষ জী-মহিষ আছে...	১৬	১৬	১০	১০
প্রতি একশত কর্ঘিত বিঘার				
গাভী ও জী-মহিষের সংখ্যা...	৩৪	৩৪	৩০	২১

এই হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে শত বিঘা কর্ঘিত জমির অল্পপাতে গাভী ও জী-মহিষ আছে বাংলায় ৩৬, বিহারে ৩৪, যুক্তপ্রদেশে ৩০, ও পাঞ্জাবে ২১। বাংলার অল্পপাত সব চেয়ে বেশী অথচ বাংলা সব চেয়ে কম দুধ পায়। বাংলার পরেই, বিহার ও উড়িষ্যার অবস্থা খারাপ। বিহারের সহিত উড়িষ্যা যুক্ত হওয়ায় এই অবস্থা দেখা যাইতেছে, নচেৎ বিহারের অবস্থা বাংলা হইতে ভাল এবং উড়িষ্যার অবস্থা বাংলা অপেক্ষা খারাপ। বিহারেও গরু-মহিষের যত্ন কম। বিহারে জী-মহিষের দুধ লওয়া হয় বটে, কিন্তু মাত্র তিন-চার সের দুধ পাওয়া যায়। তবুও বিহার বাংলায় ঘি পাঠায়। বিহারে মহিষের দুধ হইতে দুই প্রান্তর করিয়া উপরের মাখনটা গালাইয়া ঘি তৈরি করে। পাঞ্জাবে অল্প গাভী-মহিষে যত বেশী দুধ পাওয়া যায় তত আর কোথাও পাওয়া যায় না। পাঞ্জাবে গরুর জাত ও যত্ন দুই-ই ভাল। বাড়ীতে কোনও কিছু ভাল খাদ্য হইলে লোকে যেমন ছেলেপিলেকে তাহা খাওয়াইতে আগ্রহ করে ও খাইলে আনন্দ পায়, পাঞ্জাবের গৃহস্থের গরুর জন্য সেই ধরণের একটা আগ্রহ আছে। কিন্তু বাংলায় এক পাল দুগ্ধশূন্য শীর্ণ দুর্বল গাই অথবা রাখিয়া আমরা নিজেরাও দুগ্ধ পাইতেছি গরুকেও দুগ্ধ দিতেছি। বাংলায় গরুর সংখ্যা যথেষ্ট আছে। বাংলার জমি অল্প কোনও দেশ অপেক্ষা কম উর্বর নয়। বাংলার চাষাও অলস নয়। কিন্তু গো-সেবা যে কি বস্তু তাহা বাংলার চাষা না জানায় বাংলার দুগ্ধ চলিতেছে।

বাংলার গরুকে যত্ন করিলে দিনে দুইবার দোহন করা যায় এবং দুই বারের বিয়ানের পর চার সের ও শেষ দিকে এক সের এবং গড়ে দুই সের করিয়া দুধ পাওয়া যায়। গড়ে এক বিয়ানে দিনে দুই সের হিসাবে ছয় মাস দুধ পাওয়া যাইবে ধরা যায়। বাকী ছয় মাস গরু দুধ দিবে না। তাহা হইলে একটা গাই এক বৎসরে বা এক বিয়ানে ১৮০ দিন দুই সের হিসাবে ৩৬০ সের বা নয় মণ দুধ দিবে।

বাংলার মোট গরুর মধ্যে বিরামী লক্ষ গাই। ইহাদের মধ্যে যদি তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র নিয়মিত দুধ দেয় তবে দাঁড়ায় সাতাশ লক্ষেরও বেশী দুগ্ধবতী গাই। উহারা প্রত্যেকে নয় মণ করিয়া দুধ দিলে বৎসরে ২৪০ লক্ষ মণ দুধ দিবে। ইহার অর্ধেকটায় বর্তমান দুধের আবশ্যকতা মিটাইলে বাকী অর্ধেক অর্থাৎ ১২০ লক্ষ মণ দুধ উৎপন্ন হয়। কুড়ি মণ দুধে এক মণ ঘি হইতে পারে, সে হিসাবে ১২০ লক্ষ মণ দুধে ছয় লক্ষ মণ ঘি হইবে।

রেল ও ষ্টীমার পথে আমদানী ১৯০৪-০৫ সালের গবর্ণ-মেণ্টের দেওয়া হিসাবে পাওয়া যায় যে বাংলায় ঐ বৎসর ঘি আনিয়াছে ৩৪৪ হাজার মণ। উহা হইতে রপ্তানী ৭২ হাজার মণ বাদে বাংলায় ব্যবহৃত আমদানী ঘির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩০ হাজার মণ। কিন্তু রেল ও ষ্টীমার ব্যতীত মোটর যোগে অনেক ঘি আমদানী হয়। উহার হিসাব নাই। উহা কুড়ি হাজার মণ ধরিলে, ঘির আমদানী সাড়ে তিন লক্ষ মণ হয়। আর এক বৎসরে আমরা বাংলার গাই হইতে সমস্ত প্রয়োজন মিটাইয়া ছয় লক্ষ মণ উৎপন্ন ঘি পাইতে পারি। কাজেই বাংলার আমদানী সাড়ে তিন লক্ষ মণ ঘি ঘরেই তৈয়ার করিয়া লওয়ার অন্তরায় কিছু নাই। বাংলার গো-সম্পদ হইতে বাঙালী স্বাধীন করিতে শিখিলে বর্তমান আমদানী পোনে দুই কোটি টাকার ঘি ত নিজে উৎপাদন কবিত্তে পারিবেই, বরঞ্চ অল্প আরও অনেক ঘি রপ্তানী কবিত্তে পারিবে।

বাংলার তিন ভাগের এক ভাগ গাই গড়ে দিনে দুই সের দুধ দিবে বলিয়া আমি ধরিয়াছি। কিন্তু যত্ন করিলে অধিকাংশ গাই ইহা অপেক্ষা অধিক দুধ দিবে ইহাই আমার ধারণা। যত্ন করিলে যে দুধ বাড়ে ইহার পরীক্ষা আমি নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে করিয়া দেখিয়াছি। একটা দৃষ্টান্ত

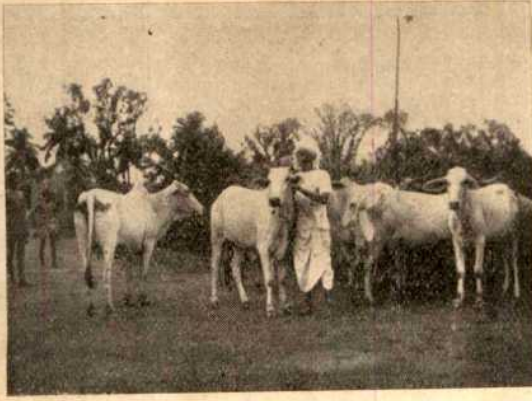
দিতেছি। আমি যখন দ্বিতীয়বার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের কয়েদী হইয়াছি সেই সময় জেল-সুপারিন্টেন্ডেন্ট জেলের গোশালা সঙ্কে উদ্বেগ বোধ করিতেছিলেন। অনেক গরু ছিল, অথচ দুধ না-হওয়ায় মত। একটি সাহেব-কয়েদীর হাতে গোশালার ভার ছিল, তাহার কাজে সুপারিন্টেন্ডেন্ট সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিলেন না। একদিন সুপারিন্টেন্ডেন্ট মেজর পাটনী সঙ্কেচের সহিত প্রস্তাব করেন যদি গোশালায় ভার আমি লই। আমি আগ্রহের সহিত স্বীকার করি। তখন দেখি, গোশালায় মাত্র আট সের দুধ হয় অথচ গোশালে সব মিলিয়া সংখ্যায় গরু আছে চল্লিশটি। বাছুর মরিয়া যাইত। বৎসর ধরিয়া গাইকে খাওয়াইয়া যত্ন করিয়া দুধ পাওয়ার সময় হইলে বাছুর মরিয়া যাওয়ার সমস্ত শ্রম ও ব্যয় পণ্ড হইত। বাছুর মরার মত অপরাধ গোশালায় দ্বিতীয় নাই। সেই অপরাধ পুনঃপুনঃ ঘটিত এবং জেলে বাছুর বাঁচিত না, দুধও হইত না। অল্প কারণও ছিল। উহাদের খাণ্ডেব সংস্কার সাধন করা, বাঁড়ের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি দিই। সংস্কার করিতে প্রতি পদে জেল-আইনের বাধা আসিত। কিন্তু মেজর পাটনী সমস্ত আইনের দায়িত্ব নিজে লইয়া গোপালনের রাস্তা সাফ করিয়া দেন। গোশালার উন্নতি আরম্ভ হয়। নূতন ধরণে খাতাপত্র রাখা আরম্ভ হয়। ফর্ম ও হিসাব-পদ্ধতি বদলাইয়া যায়। গোশালার অবস্থান নিম্ন ভূমিতে ছিল, উহা পরিবর্তন করার চেষ্টা হয়। গো-খাত্যের কট্টাঙ্কনের অত্যন্ত উপাধীন বদ্ধ হয়। কবে কে গর্ভিণী হইয়াছিল তাহা হইতে পূর্বেই প্রসবের আনুমানিক তারিখ স্থির করিয়া প্রসবকালে গরুর যথাযোগ্য যত্ন লওয়ার ব্যবস্থা হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, আমি যখন গোশালার ভার লই তখন দুধের পরিমাণ দৈনিক আট সের ছিল। নয় মাস পরে আমি যখন চলিয়া আসি তখন দুধের পরিমাণ দশ গুণ হইয়াছে—দিনে দুই মণ দুধ হইত। ইতিমধ্যে ইনস্পেক্টর-জেনারেল মিঃ ক্লাওয়ার ডিউ দুইবার আসেন। শেষবারে সমাদরের সহিত বলেন যে আমাকে আর মুক্তি দেওয়াই হইবে না। পরক্ষণেই কৃতজ্ঞভাবে বলেন যে আমি যেন আর জেলে ফিরিয়া না আসি। তাঁহার হাতে কয়েদীকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে খালাস দেওয়ার ঘতটা অধিকার ছিল তাহা ব্যবহার করিয়া

নয় মাসেই আমাকে এক বৎসরের জেল পূর্ণ করিয়া খালাস দেন। তাঁহার কৃতজ্ঞতার কোনও কারণ ছিল না—আমি কয়েদী, কাজ করিয়া গিয়াছি। কৃতজ্ঞতাব হেতু আমাকে পক্ষেই ছিল—তাঁহার যে গো-সেবার অপূর্ণ অবকাশ দিয়াছিলেন সেজন্য। বস্তুতঃ গো-সেবার আনন্দের আতিশয্যে জেল আমার নিকট রম্যস্থান হইয়া পড়িয়াছিল।

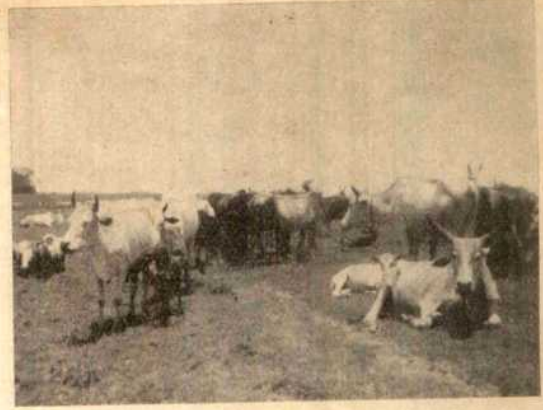
জেলে যেমন সেবা দ্বারা তাত্‌কালিক দুধের পরিমাণ বাড়াইতে পারিয়াছি অল্পকাল তেমনি বিশেষ ফল পাইয়াছি। জেলের গরুগুলি সবই পশ্চিমা জাতের ছিল—অমত্রে খাবাপ হইয়াছিল। দেশী গাইয়ের দুধ দৈনিক আধ সের হইতে দুই সের পর্যন্ত বাড়াইবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছে। আবার এমন গো-বাথান দেখিয়াছি সেখানে পৌষ-মাঘ মাসে বাথানের গাই প্রতি দৈনিক গড়ে চার সের দুধ দাঁড়ায়। জেলে চৌয়ারী নামে একটি গাই আমি থাকাকালে এক-বারকার বিয়ানে মোট পাঁচ হাজার পাউণ্ড বা ষাট মণ দুধ দিয়াছে। খাদি প্রতিষ্ঠানের সোদপুর গোশালায় আমরা পশ্চিমা গাই হইতে এক বিয়ানে ৩৮ হইতে ৪৫ মণ দুধ পাইয়া থাকি। সে-স্থলে একটা দেশী গাই হইতে আমি এক বিয়ানে মাত্র নয় মণ দুধ প্রত্যাশা করিতেছি।

ষি প্রস্তুত—দুধটান

দুধ বা দই মম্বন করিয়া ননী বা মাখন বাহির করা যায়। উহা উপযুক্ত তাপে গলাইয়া ষি হয়। দুধ মম্বন করিয়া বা টানিয়া ষি প্রস্তুত কবা কিছু ক্লেশসাধ্য হইলেও উহাই উৎকৃষ্টতব। সেপারেটর মেশিন ব্যবহার করিলে সহজেই দুধ হইতে ননী তোলা যায়, কিন্তু সকলের পক্ষে সেপারেটর মেশিন বসান সম্ভব বা যুক্তিসূচক হইবে না। হাতে টানার ক্ষমতা দুধ একটু গরম করিয়া তাহার পরে ননী বা পুরুরের জলে পাড়াটা ভাসাইয়া তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হয়। একটা পরিষ্কার কেরোসিনের টিনে ঠাণ্ডা দুধ ঢালিয়া মম্বন-দণ্ড দিয়া টানিতে হয়। উহাতে ননী ভাসিয়া উঠে এবং ননী গালাইয়া ষি প্রস্তুত করা হয়। ননী উঠাইয়া লইলে যে দুধ রহিল উহাই ননী-তোলা বা টানা দুধ।



খাদি প্রতিষ্ঠান গোশালায় গরুর পাল



খাদি প্রতিষ্ঠানের ঘি-উৎপাদন কেন্দ্রের গো-বাধান

ননাতোলা বা টানা দুধ

টানা দুধ একটি শ্রেষ্ঠ খাদ্য। টানা দুধ সাধারণতঃ একটা অবজ্ঞার পদার্থ বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু যি প্রস্তুত করিতে হইলে টানা দুধ ব্যবহার করিতে হইবে এবং উহার যোগ্য মূল্যও দিতে হইবে। টানা দুধ সম্বন্ধে গান্ধীজী সম্প্রতি আমার নিকট হইতে কিছু জানিতে চাহেন। পরে শ্রীযুত মহাদেব দেশাই 'হরিজন' এ-সম্বন্ধে দুইখানি পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন—একখানি বিশ্ববিখ্যাত শারীরিক পুষ্টিবিজ্ঞান-বিশারদ ডাক্তার একরুডের, অপর পত্রখানি আমার।

'হরিজন', ২২শে মে ১৯৩৭

টানা দুধ

[কুমুর পুষ্টি-গবেষণার ডিরেক্টর ডাক্তার একরুড, এক শ্রীযুত মতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের নিকট আমি টানা দুধের সুবিধা-অসুবিধার বিষয় কতকগুলি প্রশ্ন এবং উহা জনপ্রিয় করার উপায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উভয়েই তাহাদের মত জানাইয়াছেন।—মঃ দেঃ]

ডাক্তার একরুডের পত্রের মর্ম

আপনি টানা দুধ ও নাথনের দুধ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন। টানা দুধের পুষ্টি-মূল্য খুব বেশী, কেননা খাঁটি দুধে বাহা আছে এক চর্বিও ভিটামিন 'এ' ছাড়া আর সমস্তই টানা দুধে থাকে। ভাল খাঁটি দুধ টানা দুধের চাইতে ভাল; কেননা উহাতে ভিটামিন 'এ' থাকে। কিন্তু ভারতীয় ছেলেপিলেরা যে খাণ্ড খায় তাহাতে, ভাত বা বজরাই বেশী থাকে, দুধ বা ভিন্ন বড় থাকে না, শাকসব্জীও অল্পই থাকে। তাহাদের প্রায় যে টানা দুধ খাওয়াইলে খুবই ভাল হইবে সে বিষয়ে কোন কথাই নাই। টানা দুধের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে উহা খাঁটি দুধ অপেক্ষা সস্তা।

আমরা অনেকগুলি পরীক্ষায় বিদেশী গুরু-করা টানা দুধের ব্যবহার করিয়াছি। যে সকল ছেলেপিলেকে দৈনিক এক আউন্স করিয়া শুক টানা দুধের গুঁড়া ৩-৪ মাস ধরিয়া খাওয়ান হইয়াছে তাহারা ওজন এবং দেহে

সেই সকল শিশুর চাইতে বেশী বাড়িয়াছে বাহাদিগকে টানা দুধ ছাড়া আর সব ঠিক একরকম খাওয়াই খাওয়ান হইয়াছে। ঐ দুধ যে-ছেলেদিগকে খাওয়ান হইয়াছিল তাহাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছিল। টানা দুধের শুকনা গুঁড়া ৮ গুণ জলের সহিত মিশাইয়া তরল দুধ তৈয়ার করা হইয়াছিল।

গুঁড়া দুধ তরল দুধ শুকাইয়াই প্রস্তুত, এমন গুঁড়া দুধ দিয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে টানা তরল দুধ দিয়াও সেই কাজই হইবে। টানা দুধের অপচয় হইতে দেওয়া কদাচ উচিত হইবে না, একটু চেষ্টা দ্বারাই স্কুলের ছাত্রদিগকে উহা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে ছেলেদিগকে টানা দুধের গুঁড়ার তৈরি দুধ খাওয়াইতে কোনও কষ্ট হয় নাই। উহারা উহা পছন্দই করে বলিয়া বোধ হয়।

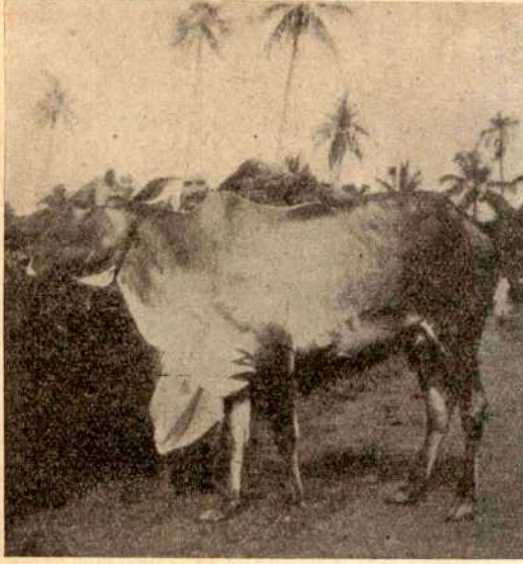
একটা বিশেষ কথা মনে রাখা দরকার যে টানা দুধ শিশুদের একমাত্র খাদ্য হওয়ার যোগ্য নয়, কেননা উহাতে ভিটামিন 'এ' থাকে না। যদি শিশুদিগকে দেওয়া হয় তবে উহার সহিত ভিটামিন 'এ' পূর্ণ কোনও খাদ্য যেমন কডলিভার অয়েল—দেওয়া উচিত। একেবারে কচি শিশুর চেয়ে, বাহারী বড় হইয়াছে সে সকল ছোট ছেলেপিলেকে টানা দুধ দেওয়ার উপকার হইবে, কেননা তাহাদের খাদ্য শক্তাদি দ্বারা প্রস্তুত, শাকসব্জি থাকে না বা কোনও ছানা জাতীয় জাতব পদার্থও থাকে না। এই সকল অবস্থায় একেবারে দুধ না দিতে পারার চেয়ে টানা দুধ দেওয়া অনেক ভাল। ছেলেপিলের পক্ষে উহার উপকারিতা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। সম্ভাবনামূলক বা প্রতীতির খাজের সহিত টানা দুধ দেওয়া ভাল।

লেখকের পত্রের মর্ম

মাখন ও ভিটামিন 'এ' ছাড়া খাঁটি দুধের অপর সমস্ত পদার্থই টানা দুধে বর্তমান। যদি আমাকে গুরু করা দুধের মূল্য নির্দেশ করিতে হয় তবে আমি উহার উপকরণের এই প্রকার মূল্য দিব :

ক মাখন ও ভিটামিন 'এ'— আট আনা
খ ছানা পদার্থ— পাঁচ আনা
গ শর্করা, দাতব পদার্থ
ও ভিটামিন 'বি'— তিন আনা

যদি খাঁটি দুধকে বোল আনা ধরা হয় তবে খ ও গ এর সমষ্টি, টানা দুধের মূল্য আট আনা ধরা যায়। বস্তুত উহা অপেক্ষাও কম দামে বিক্রয় হয়



নীলা

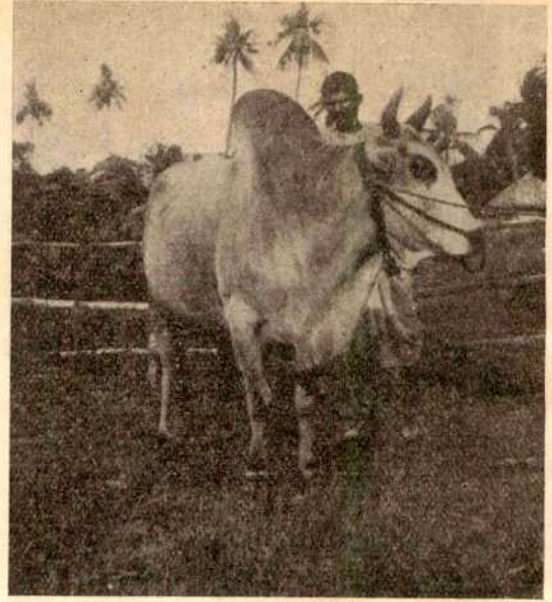
খাদি প্রতিষ্ঠান গোশালার মূলতানী গাই। এক বিয়ানে
দশ মাসে ৪৪৪৫০ ছুধ দিয়াছে।

বলিয়া টানা দুধ গরীবদের পক্ষে একটা মূল্যবান খাদ্য, কেননা মূল্য অধিক
বলিয়া খাটি ছুধ তাহারা পায় না।

টানা দুধ হইতে উৎকৃষ্ট দই হয়, উহা শ্রাব্য মূল্যে বিক্রয়-
যোগ্য। দুধ ব্যবহারের আর একটি শ্রেষ্ঠ উপায়, উহা জমার্ট
করিয়া বিক্রয় করা। কুটীর-আয়োজনেই উহা জমার্ট করা
যায়। উহা হইতে ছানা কাটিয়া বা ক্ষীর করিয়া ননী তেল
ছানা বা ক্ষীর বলিয়াও বিক্রয় করা যায়। যে প্রকারেই
হউক উহা হইতে শ্রাব্য মূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন
হইবে। টানা দুধের উপকারিতা ও খাদ্য মূল্য সন্দেহ
লোকের ঠিক ধারণা হইলে উহার অধিকতর ব্যবহার সম্ভব
হইতে পারে। টানা দুধ বা টানা দুধের দই ছানা ক্ষীর
প্রভৃতি যোগ্য মূল্যে না বেচিতে পারিলে ঘি উৎপাদনে বিঘ্ন
হইবে।

ভয়সা ও গাওয়া ঘি

খাদ্য হিসাবে ঘি বিশেষ করিয়া গাওয়া ঘির স্থান খুব
উচ্চ। গাওয়া ঘি সহজপাচ্য। ইহার তাপমূল্যও খুব
বেশী। ভাল করিয়া গলাইলে ইহাতে দুধের প্রায় সবটা
ভিটামিন 'এ' থাকিয়া যায়। ভিটামিন 'এ' পোষণকারীও
রোগ প্রতিরোধক ও সংরক্ষক। ভিটামিন 'এ'র অভাবে



কৃষ্ণ

খাদি প্রতিষ্ঠান গোশালার মূলতানী বাঁড়। প্রতিষ্ঠানের
গোশালায় জন্মিয়াছে ও পালিত হইয়াছে।

শরীরের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়। কডলিভার অয়েলে ভিটামিন
'এ' আছে বলিয়া ডাক্তারেরা উহার ব্যবস্থা করেন। গাওয়া
ঘি হইতেও অল্পরূপে ফল পাওয়া যায়। কত লোকে
কষ্ট করিয়া কডলিভার অয়েলের মত দুর্গন্ধ মাছের তেল
খাইয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা ভাল ভাবে তৈরি গাওয়া ঘির
উপকারিতার কথা জানেন না। শরীর পোষণের ও অল্প-
বয়স্কদিগের বৃদ্ধি ও মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের বৃদ্ধির জন্য গাওয়া
ঘির মত উপকারী পদার্থ অল্পই আছে। কাহারও এ প্রকার
বিশ্বাস আছে যে গাওয়া ঘির দ্বারা ভাজার কাজ করিলে
জলুতি বেশী যাইবে। কিন্তু এই ধারণা ভুল। কাঁচাপাণের
ঘি হইলেই জলুতি বেশী যাইবে, গাওয়াই হউক আর ভয়সাই
হউক।

গুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও গাওয়া ঘির দর ভয়সা ঘির কাছাকাছি
না হইলে সাধারণের পক্ষে তাহা ব্যবহার করা কঠিন।
খাদি প্রতিষ্ঠান গাওয়া ঘির উৎপাদন হাতে লওয়ার পূর্বে
গাওয়া ঘির নিদিষ্ট কিছু দর ছিল না। কেননা চাহিদাও
তেমন ছিল না। এখন গাওয়া ঘির দর ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত

হইতেছে। বর্তমানে গাওয়া ঘির দর ভয়সা অপেক্ষা প্রতি দের চার আনা মাত্র বেশী। কিন্তু চাহিদা বাড়িলে দুধও বাড়িতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি টানা দুধের দই বা জমাট দুধ প্রভৃতি করিয়া লাভজনক ভাবে বিক্রয় করা যায় তবে ক্রমশঃ বাংলার উৎপন্ন গাওয়া ঘি আমদানী করা ভয়সা ঘির সমান অথবা প্রায় সমান দামে বিক্রীত হইতে পারিবে। তেমন দিন আসিলে বাংলার সমস্ত ঘি বাংলার গাই হইতেই পাওয়া যাইবে।

ঘি শিল্প প্রসারের প্রভাব

যদি কোন একটা কুটীরশিল্পের প্রসার হয়, তবে নানা দিক দিয়া অগ্রাগ্র শিল্প উত্তেজনা লাভ করে। বাংলায় যেদিন ভয়সা ঘির পরিবর্তে গাওয়া ঘির প্রচলন শুরু হইবে তখন দিকে দিকে তাহার উৎপাদনের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকিবে। টানা দুধের বিক্রয় বাড়িবে আবার সেই দই বিক্রয় করিতে কত লোক নিয়োজিত হইবে। দই হইলেই কুমারের গড়া পাত্র চাই। কুমারেরা কাজ পাইবে। নদীপথে দই বহন করার জন্ত হযত কিছু নৌকার প্রয়োজন বাড়িবে এবং নৌকা গড়ায় ছুতার কাজ পাইবে। গরুকে অধিক বিচালি দেওয়ার গরজে চাষা ইচ্ছা করিয়া ধানের জমি ধানকেই ফিরাইয়া দিবে। পাট কম বুনিবে। যাহার দাম কেবল দেশ-বিদেশের দর উঠতি-পড়তি খেলার উপর নির্ভর করে, উৎপাদনের সহিত যাহার দরের সম্পূর্ণ যোগ নাই, পাটের মত এমন দ্রব্যের উপর চাষা যত কম নির্ভর করে তত ভাল। দুধের চাহিদা বাড়িলে পাটের চাষ স্বতই কমিয়া ধানের চাষ বাড়িবে ও চাষার কল্যাণ হইবে।

কেবল বিচালি নয় খইলও গরুকে দিতে হইবে। তাহাতে খইলের চাহিদা গ্রামে বাড়িবে। যে কলুরা আজ, কেবল কলের তেল কিনিয়া বেচে তাহার ঘানি চালাইবার উৎসাহ পাইবে, কলে কলের তেলের ব্যবহার কমিয়া কিছু ঘানির তেলও চলিতে পারে।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়া আশ্চর্য্য পরিবর্তনের সম্ভাবনায় এই উদ্যম পূর্ণ। ডেনমার্ক দুধের ব্যবহার যথেষ্ট হইত কিন্তু যুদ্ধের চাহিদায়, দুধ মাখন হইয়া বিদেশে রপ্তানী হইতে আরম্ভ করে। উহার ফলে শিশুদের ভিটামিনের অভাব ঘটে, চক্ষু হইতে জল পড়িতে, চক্ষু বন্ধ হইয়া থাকিয়া নষ্ট হইতে



গুরা

খাদি প্রতিষ্ঠান গোশালার সঙ্কর গাই—মাতা দেশী, পিতা মূলতানী।
তৃতীয় বিয়ানে দশ মাসে ৩৩/৯৫০ দুধ দিয়াছে।

আরম্ভ হয়, শিশুদের অকালমৃত্যু হইতে থাকে। তখন ডেনমার্কের গবর্ণমেন্ট মাখন রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গেই শিশুদের রোগ ও অকালমৃত্যু বন্ধ হয়।

বাংলায় যদি ১২০ লক্ষ মণ দুধ বৎসরে অধিক উৎপন্ন হয় তাহার ফলে বাঙালী জাতি ৪ কোটি টাকা ঘরে রাখিবে এবং স্বাস্থ্যশীল ও স্বাবলম্বী হইয়া পড়িবে। মস্তিষ্কের অপব্যবহার না করিয়া সম্ভাব্যতার করিবার সামর্থ্য পাইবে। বস্তুতঃ এই ঘি-শিল্পের উত্তম দ্বারা বাংলায় নবজীবনের সূত্রপাত হইতে পারে। আমি যাহা আশা করিতেছি তাহা আকাশ-কুসুম নয়। খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে কিছু কিছু পরীক্ষা করার পর এই প্রকার আশা পোষণ করিতেছি। খাদি প্রতিষ্ঠান আমাদের পরীক্ষার স্বযোগ দিয়াছে। এই সংস্থা খাদির ও কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্ত গঠিত। ইহা ১৮৬৮ সালের ২১ এপ্রিল অল্পসারে দাতব্য সংস্থা (Charitable Trust) বলিয়া রেজিস্ট্রীকৃত। আজ ১২ বৎসর গ্রামশিল্প সংগঠনের কার্য এই সংস্থার ভিতর দিয়াও হইতেছে। এ পর্যন্ত এই সংস্থা হইতে কুটীরশিল্প ও খাদির প্ররোচনার জন্ত তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। কেবল আদর্শ সম্বন্ধে যুক্তি-তর্ক না করিয়া কাজ করিয়া দেখান প্রতিষ্ঠানের

কাম্য। কয়েক মাস হইতে প্রতিষ্ঠানের গাওয়া ঘি প্রবর্তনের চেষ্টায় যে সফলতা লাভ করা গিয়াছে তাহা হইতেই এই আশা করা যায় যে প্রকৃত যোগাযোগ হইলে এই পৌনে দুই কোটি টাকার ঘি ও সমপরিমাণ টাকার টানা দুধের উৎপাদন বাংলা করিতে পারে।

দুধ বাড়ান ও ঘি প্রস্তুতের সমস্ত আবশ্যক উপকরণই বাংলার সাধারণ গৃহস্থের আয়ত্তের মধ্যে। আসল কথা এই যে, গাওয়া ঘির ব্যবহার প্রচলনের জন্ত বাঙ্গালীকে আগ্রহশীল হইতে হইবে। গাওয়া ও ভয়সা ঘির মূল্য সেরকরা চার-ছয় আনা বেশী হইলেও উহা দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে এবং গোপালনের দিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভেজাল ঘি, সস্তা ঘি কিনিতে গিয়া ক্রেতার নিঃসন্দেহ হওয়া আবশ্যক যে ভেজাল জিনিষ তিনি কিনিতেছেন না। ‘বলুর ঘানি’ প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি যে সস্তায় ভেজাল জিনিষ নিবিচারে কেনার ফলে একটা বড় গ্রাম্য শিল্প দিনে দিনে নষ্ট হইতেছে এবং গ্রামগ্রামান্তরে শহরের কলের তেল ও ভেজাল তেল লইতেছে। ঘি-সম্পর্কেও ভেজালের প্রভাব দিলে—অর্থাৎ সস্তা ঘি কিনিতে চাহিলে—এই শিল্প কখনও বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হইবে না। পক্ষশূণ্য জমাট তেলকে ঘির রং ও গন্ধ দিয়া বেমালুম ঘি বলিয়া চালান হইতেছে। ভয়সা ঘি মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় খাটি অবস্থায় আসিয়াও পরে ভেজাল-মিশ্রিত হইয়া বাংলার সর্বত্র চলিতেছে। সে দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাংলায় ভয়সা ঘির আমদানি পৌনে দুই কোটি টাকার হইলেও ভেজাল হওয়ার পর মোট মূল্য অনেক বেশী দাঁড়ায়। গাওয়া ঘি সম্বন্ধে গান্ধীজী ১৯৩৫, ২রা নবেম্বরের ‘হরিজনে’ লিখিয়াছেন :—

মাহারা পারে তাহার ঘি ব্যবহার করিতে ভালবাসে। প্রায় সকল প্রকার মিষ্টান্নেই ঘি থাকে। কিন্তু তবুও হয়ত এই কারণেই ঘিতে সব চাইতে বেশী ভেজাল দেওয়া হয়। বাজারে যত ঘি

পাওয়া যায় তাহার খুব বেশী অংশ নিঃসন্দেহ ভেজাল। কতকগুলি ঘি যদিবা অধিকাংশ ঘিই না হউক, এমন হানিকর পদার্থ দ্বারা ভেজাল দেওয়া হয় বাহা অমাংসাশীরা খাইতে পারে না। তেল দ্বারাও ঘি ভেজাল করা হয়।

মগন-বাড়ীকে আমরা কেবলমাত্র গাওয়া ঘি সংগ্রহ করার জন্ত নির্দিষ্ট করিয়াছি। ইহাতে আমাদের অনেক অসুবিধা হইয়াছে, দামও দিতে হইতেছে খুব। মণকরা ১০০ টাকা দাম, তাহার উপর রেলভাড়া আমরা দিতেছি।

* * *

ব্যক্তিগত লাভের জন্ত ব্যবসা চালাইতে যে কুশলতার প্রয়োগ করা হয় তাহার অদ্বৈক যদি জনসাধারণের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত গোশালা বা খাজদ্রব্যের দোকান চালাইবার জন্ত ব্যয়িত হইত তবে সেগুলি স্বাবলম্বী হইতে পারিত। এই প্রকার অনুষ্ঠানের স্বাবলম্বী হওয়ার পথে একমাত্র বাধা এই যে জনসাধারণ এই সকল অনুষ্ঠানে কুশলতা বা মূলধন নিয়োগ করিতে নারাজ; বরঞ্চ অন্তর্গত খুলিয়া অলস ভিখারীর সংখ্যা বাড়াইতে ধনীর সহনশীলতা ব্যয় হইয়া যায়।...

বাংলায় খাদি প্রতিষ্ঠান গান্ধীজীর কল্পিত এই কার্য হাতে লইয়াছে। কিন্তু ভেজাল-শূণ্য গাওয়া ঘি পাওয়ার দিকে দেশবাসীর সতর্ক সাগ্রহ দৃষ্টি পড়িলে বাংলার আর্থিক অবস্থা ও স্বাস্থ্যের যে বিপুল উন্নতি হইবে সেবিষয়ে সংশয় নাই। বাংলায় ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, কলেরা ও ক্ষয় রোগের প্রকোপ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ডাক্তারখানা ও হাসপাতাল এ সকল রোগ প্রতিবেদন করিতে পারে নাই। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ সকল রোগ ও অত্যন্ত ভাবে অকালমৃত্যু কমিয়া গিয়া বাংলাকে স্বাস্থ্যে শিল্পে আনন্দে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে। পৌনে দুই কোটি টাকার ঘি অল্প প্রদেশ হইতে আমদানী বন্ধ করিয়া প্রায় চার কোটি টাকার ঘি বাংলার কুটীরে বৎসর বৎসর উৎপাদন করা ও তাহার দ্বারা স্বাস্থ্য লাভ করা ও বেকারত্ব দূর করার মত একটা বড় কুটীরশিল্পের দিকে বাঙালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।



পুস্তক পরিচয়

হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প—পরশুরাম রচিত ও শ্রীযুক্তকুমার সেন বিচিত্রিত। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ। মূল্য দেড় টাকা।

বাঙালী পাঠকের নিকট পরশুরামের পরিচয় নিম্নরোজন। প্রচ্ছন্ন স্নেহের ভীত রসে সিন্ধু বিমল রসসাহিত্যের পরিবেশনে ইনি সাক্ষাৎ নলরাজ। আলোচ্য পুস্তকটির একমাত্র দোষ ইহা বড়ই শীঘ্র শেষ হইয়া যায়। “হনুমানের স্বপ্ন” ও “প্রেমচক্র” এই দুইটিই সাহিত্যারসিক মাত্রেই উপভোগ করিবেন। অল্প গল্পগুলিও পাঠককে বিশেষ আনন্দ দান করিবে। এবারকার গল্পসমষ্টিতে আধুনিক ও পৌরাণিক প্রসঙ্গের “ব্যঙ্গ-ভঙ্গ” সংস্বরণই অধিক। পরশুরামের অনুপম ভাবার সমতায় পৌরাণিক ও আধুনিকের মধ্যে সেতুবন্ধ হইয়াছে।

পরশুরামের গল্পগুলি তাহার অন্য কারবারেও তবধ-হিসাবে প্রচলন করা উচিত। দুরারোগ্য “বিষম ব্যাধি”ও ইহার প্রয়োগে উপশম হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্য রোগেও এই বইখানির আটটি গল্প অস্ত্র-রসায়নের কাজ করিবে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেনের অঙ্কিত চিত্রগুলি বইয়ের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

ক. চ.

রাণুর প্রথম ভাগ (গল্পসংকলন)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ১৭৩ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক—রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫১২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। সুপরিচিত বলিলেই সবটা বল হয় না, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং লিপিবদ্ধতার জগৎ তিনি খ্যাতিমান লেখক। তাহার কারবার প্রধানতঃ ব্যঙ্গ-কৌতুকাঙ্কল হাস্যরস লইয়া। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের কারবারীর সংখ্যা বড় বেশী নয়। রবীন্দ্রোত্তর যুগের এ রসের কারবারীর কথা আলোচনা করিতে গেলে স্বর্গীয় প্রভাতকুমারের নাম সর্বপ্রথমে মনে পড়ে। তাহার পর খ্যাতিমান পরশুরাম এবং সুরসিক শ্রীযুক্ত কেশারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আপন আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্বকীয় ভঙ্গীতে এই রসশ্রোতাকে আরও পুষ্ট করিয়াছেন। বিভূতি বাবু তাহাদের পরে আসিয়া সে শ্রোতাকে আরও পুষ্ট করিতেছেন। বিভূতি বাবুর ধারা এক বৈশিষ্ট্য তাহার পূর্বগামিগণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন, একান্তভাবে সে তাহার স্বকীয়। সেই তাহার সব চেয়ে বড় পরিচয়।

বইখানির প্রত্যেকটি গল্প হাস্যোজ্জ্বল মধুর রসে নিটোল আঙুরের মত সুন্দর এবং উপায়ে। চুংখপীড়িত বাঙালীর স্রিয়মান মনে তাহার এ পরিবেশন স্নিগ্ধ অমৃত পরিবেশন, বাঙালী পাঠক-পাঠিকার মুখে পুলকের হাসি ফুটিয়া উঠিবে।

রাণুর প্রথম ভাগ গল্পটি খুব উচ্চশ্রেণীর গল্প—এই গল্পটি পূর্বের প্রবাসীর গল্পপ্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। গল্পটির পরিবেশনের করণ অথচ মনধূর বেদনা মনের মধ্যে এমন একটি রেখা টানিয়া দেয় যাহা মুহিব্বার নয়। অকালবোধন গল্পটি অনুরূপ সুন্দর।

পৃথুরাজ, বি. এন. ডুরুর ব্রাঞ্চ লাইন, একরাত্রি, গল্পভুক্ত প্রভৃতি গল্পগুলিও প্রথম শ্রেণিতে স্থান পাইবার যোগ্য। বিভূতি বাবুর দ্বিতীয়

পুস্তকের অপেক্ষায় বাঙালী পাঠকসমাজ উদগ্রীব হইয়া থাকিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মহারাষ্ট্রীয় উপকথা—শ্রীঅমিতা কুমারী বসু। আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের উপকথা সংগৃহীত হইয়া বাংলা ভাষায় লিখিত হওয়া আবশ্যিক। কতকগুলি হিন্দুস্থানী উপকথা কয়েক বৎসর হইল বাংলায় লিখিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে কয়েকটি মহারাষ্ট্রীয় উপকথা সংগৃহীত হইয়াছে। বইখানি ছেলেমেয়েদের জন্ম তাহাদের উপযোগী ভাষায় লিখিত। আমরা দেখিয়াছি, তাহারা ইহা আগ্রহের সহিত পড়ে। ইহাতে অনেকগুলি ছবি আছে। চিত্রগুলি ইহার আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে।

চ.

মারাঠা জাতীয় বিকাশ—(সরল কাহিনী) সর্ মহনাথ সরকার, এম. এ., ডি. লিট. প্রণীত। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫১২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা, ১৩৪৩। পৃ. ৪৮, মূল্য ৯।

মহারাষ্ট্র দেশের জাতীয় বিকাশের ইতিহাস উদ্ধারের কাব্য বর্তমান যুগের ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বহু কন্মার অশ্রান্ত পরিশ্রমে এই উদ্ধারকাব্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে। এইরূপ কাব্য অল্প সব প্রদেশে এখনও হয় নাই। স্তরমহারাষ্ট্রে ঐ কাব্য কিরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। সেই জন্ম সর্ মহনাথের মত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এই সরল কাহিনী লিখিয়া সাধারণের কৌতুহল বৃদ্ধি করিয়া উপকার সাধন করিয়াছেন। মারাঠা জাতি, শিবাজী, পেশোয়ারগণ এবং মারাঠী ঐতিহাসিক সাহিত্য বিষয়ে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে যে-সব বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া সাধারণ পাঠককে ঐতিহাসিক সাহিত্যের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট করিবে আশা করা যায়।

শ্রীরমেশ বসু

বৈতরণী তারে—“বনফুল”। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। পৃ. সংখ্যা ১৪৪। মূল্য ১০।

ডাক্তারের নিদ্রাহীন চোখের সামনে মৃতের আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; সব অপহৃত অশ্রুরী তাহাদের পরিচয় দিয়া যাইতেছে। আখ্যানজাগের ছকটি এই। পটভূমিকা—বর্ধারজনী, দূরে ভূজঙ্গবলিত একটি ভেকের আর্তধ্বনি।

পাশাপাশি ডাক্তারের নিজের জীবনের বিবাদময় কাহিনী চলিয়াছে।

সমস্ত বইখানির মূলরস করণরস, সঙ্গে সঙ্গে বিভীষণ রসের মিশ্রণ আছে এবং এক-এক জায়গায় তাহাই মুখ্য হইয়া পড়িয়াছে। লেখক জীবনের ট্রাজেডির দিকটা নানা বিচিত্রতায় দেখাইয়াছেন, আর জীবনানতিত একটি অবস্থার মধ্য দিয়া দেখাইয়াছেন বলিয়া সেই ট্রাজেডি

এমন একটি অশুভকর আলোয় ফুটিয়া উঠিয়াছে যাহাকে ইংরেজীতে বলা হয় আনক্যানি (uncanny)।

এই সত্য এক এক স্থানে অসহ, অথচ লেখার এমন মুগ্ধায়া যে অসহ হইলেও তাহা অমোঘ আকর্ষণে টানে।

ভাষা বেশ শুল্লিত, মাঝে মাঝে ছন্দের স্বাক্ষর তাহার স্রষ্টা আরও মিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বালীর ইতিহাসের ভূমিকা — শ্রীপ্রশান্ত
বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ। গ্রন্থকার কর্তৃক পঞ্চাননতলা স্ট্রিট, বালী পোঃ, জেলা হাওড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক আনা।

কলিকাতার সমিহিত অনতিপ্রাচীন কালে পাণ্ডিত্যের জ্ঞান হুপ্রসিদ্ধ বালী নামক স্থানের প্রাচীন ইতিবৃত্তের দৃষ্টদর্শন এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য। তাই ইহার মধ্যে স্থানীয় প্রাচীন পৌরবের সমস্ত নিদর্শনের বিস্তৃত বিবরণ থাকিতে পারে না বা নাই। তবে যতটুকু বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই স্থানটির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মে। আশা করি, গ্রন্থকার ভবিষ্যতে আরও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া একটি বিস্তৃততর ও অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশ করিয়া পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্তি করিবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের এইরূপ বিবরণ সংকলিত হইলে সমগ্র দেশের ইতিহাস রচনার সুবিধা হইবে—স্থানীয় স্কুল-পাঠশালার ছাত্রদের মধ্যে এই জাতীয় পুস্তকের বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করিলে তাহাদের অনেক উপকার হইবে—ইতিহাস আলোচনা করিতে তাহাদের আগ্রহ বাড়িবে।

আয়ুর্বিভক্তার রত্নাকরঃ—কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্রী, তর্কদর্শনতীর্থায়ুর্বেদাচার্য্য প্রণীতঃ। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রকাশিতঃ। কলিকাতা, পি ৪৬নং মাণিকতলা স্পার। মূল্য ৩ টকা।
চিকিৎসাক্ষেত্রে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দর্শনতীর্থ মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থে সরল বিস্তৃত সংস্কৃত ভাষায় আয়ুর্বেদের মূল তথ্য বায়ু, পিত্ত ও কফের রহস্য বিবৃত করিয়াছেন। বায়ু, পিত্ত ও কফের নানারূপ বিকারে মানবদেহে যে বিভিন্ন অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা নির্দেশ করিয়া গ্রন্থকার একে একে সাধারণ ভাবে তাহাদের প্রতীকারের উপায় নিরূপণ করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রামাণ্যবুদ্ধির জন্ম স্থানে আয়ুর্বেদের মূল গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। সাধারণের বোধনৌক্যার্থে প্রত্যেক সন্দর্ভের পর একটি আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ফলে গ্রন্থখানি যে কেবল আয়ুর্বেদের প্রথম শিক্ষার্থীর উপকারে আসিবে তাহা নহে, সাধারণ গৃহস্থও ইহা পাঠ করিয়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক অবজ্ঞাজাতব্য বৈজ্ঞানিক তথ্য জানিতে পারিবেন। হৃৎকের বিবরণ, গ্রন্থের সংস্কৃত অংশ বঙ্গানুবাদের মুদ্রিত হওয়ায় ইহার আশাপ্রসঙ্গ প্রচার বাধাপ্রাপ্ত হইবে—অবাঙালী ইহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিবে। দুর্জহ শব্দের টিপ্সনী সহ নাগরী অক্ষরে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইলে ইহার প্রচার বৃদ্ধি পাইবে—সমগ্র ভারতের আয়ুর্বেদানুরাগী ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার আদর হইবে এবং গ্রন্থকারের শ্রম সফল হইবে। আশা করি, গ্রন্থকার ও প্রকাশক মহাশয় এইরূপ আর একটি সংস্করণ প্রকাশের উপযোগিতা বিচার করিয়া দেখিবেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯ বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের যে দার্শনিক মতবাদ বিবৃত

হইয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ তাহার বাস্তবিক সরল ভঙ্গীতে তাহারই বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বহুবা পড়িফুট করিবার জ্ঞান প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে অগ্গাঙ্ক গ্রন্থ হইতে যাজ্ঞবল্ক্যের অনুরূপ উক্তি উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের উপক্রমাংশে যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যক্তিগত জীবনবৃত্তান্ত ও অদ্বৈতবাদের মূল তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়া পরবর্তী অংশে অদ্বৈতবাদপ্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের মতবাদ উপস্থাপিত ও বিচারিত হইয়াছে। উপক্রমাংশ ব্যতীত গ্রন্থের বাকী অংশ তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদের আলোচনা ও প্রসঙ্গতঃ জগৎ বা জড় যে তাহার অদ্বৈত দৃষ্টিতে মায়ামাত্র তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদ আলোচিত হইয়াছে এবং জীব ও ব্রহ্মের পরস্পরসম্বন্ধ ও জীবের বিভিন্ন অবস্থার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবাদের বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে মুক্তির ধারণা, মুক্তির অবস্থা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের যে সুশৃঙ্খল দার্শনিক সমালোচনা বর্তমান গ্রন্থে করা হইয়াছে তাহাতে উপনিষৎ-সাহিত্যের প্রকৃত রহস্য বুঝিবার সুবিধা হইবে—পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের মতবাদ-বিশ্লেষণ নিমিত্ত রচিত এ জাতীয় গ্রন্থ বাঙালী পাঠকের আদরের বস্তু—বাংলা সাহিত্যের পৌরবের ধন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পারশ্ব-প্রতিভা — মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, এম এ, বি-এল, বি-সি-এস প্রণীত। প্রকাশক—ডাক্তার মোহম্মদ আখতার হোসেন, সিরাজগঞ্জ, পাবনা। প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য পাঁচ টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, মূল্য ঐ।

পারশ্ব-প্রতিভা, প্রথম খণ্ডের ইতিমধ্যেই তৃতীয় সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় পুস্তকখানি কিরূপ লোকপ্রিয় হইয়াছে। ইহাতে পারশ্ব-সাহিত্য, কবি ফেরদৌসী, ওমর খাইয়াম, সেখ সাদী, কবি হাফেজ ও জামালউদ্দীন রুমী এই ছয়টি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। লেখকের ভাষা চমৎকার, গতি সাবলীল, বিদয়-বিশ্লেষণ সুন্দর। ইদানীং মুসলমানী বাংলার মরুমের মধ্যে এরূপ সাহিত্যরচনা বাস্তবিকই সাহসের পরিচয়। কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি, “আলবেকায়ী গিরিশৈলীর পাদমূল হইতে আরব-সাগরের তটদেশ পর্যন্ত প্রসারিত বিশাল পারশ্বভূমি কতকাল পূর্বে সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, ইতিহাস সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহা নির্ণয় করিতে পারে নাই। আর্ধ্য-অধুগিত এই ইরানভূমিতে যখন বেদ ও গায়ত্রীর স্মধুর শোকমালা গীত হইত, আর্ধ্যবধূগণ যখন কাসর-ঘণ্টা নিনাদিত করিয়া গৃহে গৃহে সন্ধ্যা-আরতি প্রদান করিত, সে দিনের ইতিহাস যজুর্বেদও ভালরূপে বলিতে পারে না।”

পারশ্ব-প্রতিভা, দ্বিতীয় খণ্ডে পারশ্বের উর্বর যুগ, ফরিদুদ্দীন আক্ভার, নাসির খসরু ও ইসমাইলী মত, নেজামী, জামী, হুসীমত ও বেদান্ত, হুসীমত ও নিও-প্লেটোনিজম—এই সাতটি প্রবন্ধ সমিষ্টি হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে যেমন পারশ্ব কবিদের ও তাহাদের কাব্যের পরিচয় মিলিবে, দ্বিতীয় খণ্ডে পারশ্ব দার্শনিক কবি-মনীষীদের জীবন ও মতামত আলোচিত হইয়াছে। এই দুই খণ্ড একত্রে পাঠ করিলে মধ্যযুগে পারশ্বের যে অমর কাব্য ও দর্শন-তত্ত্ব সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সঙ্গে শিক্ষিত জনের পরিচয় হইবে। পারশ্ব-প্রতিভা বাস্তবিকই বঙ্গসাহিত্যের পৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কালনিদ্রা—শ্রীচন্দ্র রায় প্রণীত, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

এইটি কয়েকটি ছোটগল্পের সমষ্টি; লেখক চিত্তাশীল ও রসিক প্রবন্ধকাররূপে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুপরিচিত। কথানাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার নূতন প্রবেশ; গল্পগুলি কতকটা, যাহাকে আধুনিক পাঠক বলিবেন, সেকেলে ধরণের, অর্থাৎ নিছক গল্প; তাহাদের মধ্যে মনস্তত্ত্বের সুদীর্ঘ বর্ণনা, চতুর চরিত্রবিশ্লেষণ ইত্যাদি নাই। সকল গল্পের মধ্যে একটি যোগসূত্র চোখে পড়িল, তাহা মানুষের প্রতি লেখকের দরদ, যে-দরদ বেশকাল পাত্রেয় অপেক্ষা রাখে না। সেই দরদই রঙ্গরঙ্গের ভিতর দিয়া তাঁহার অল্প রচনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতে লোকে হয়ত প্রবন্ধকাররূপেই তাঁহাকে স্মরণ করিবে, কিন্তু বর্তমান কালের লোকে তাঁহার গল্পগুলি পড়িয়া তৃপ্তি পাইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এসসি প্রণীত। রামবন্ধু-কাঞ্চালয়, ১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৮। দাম ৮শ আনা।

এই বিজ্ঞানের বৈখানিতে 'আলকাংরার গুণ', 'আবজ্ঞানার দাম', 'জলের কাণ্ড', 'ঘরের কাজে', 'সুখ্যামা', 'বড়ির কথা' প্রভৃতি দশটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ আছে। এই নিবন্ধগুলি অতি সরল ভাষায় ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত। এই সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী পড়িয়া যে তাহার আনন্দ পাইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শেষের প্রবন্ধটির নাম 'ওরা ও আমরা' দ্বিবার সার্থকতা কি বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

লীয়ারের কথা—শ্রীহীনতিরমণ ঠাকুর। প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৯১৭, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

উইলিয়ম শেক্সপীয়ারের কিং লীয়ার অবলম্বনে লেখক বৈখানি ছেলে-মেয়েদের জন্য লিখিয়াছেন। বিশ্বনাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বইগুলির এইরূপ সংস্করণ বালক-বালিকাদের নিকট বিশেষ আদরবীয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। লেখকের চেষ্টা প্রশংসনীয়। বৈখানি পড়িতে ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু ভাষা শিশুবোধ্য হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত বইয়ের ভাষা আরও সহজ ও তরল হওয়া দরকার।

শ্রীহারেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

বাসন্তা গীতা—শ্রীশ্রীচন্দ্র বেদান্তভূষণ ভাগবতরত্ন প্রণীত। ১২ নং পেয়ারাবাগান স্ট্রিট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য আট আনা ও ৮শ আনা। এই সংস্করণের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ত্রিপুরা হিতসাহিনী সভার গৃহনির্মাণ ভাণ্ডারে অর্পিত হইবে।

কাষায়ম গদ্যে লিখিত এই চিন্তাশুদ্ধ বহু বর্ষ পূর্বে 'নব্যভারতে' প্রকাশিত হইলে বহু রসজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বর্তমানে ইহা গ্রন্থকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাবাসু ও প্রভুপাদ শ্রীমৎ সত্যানন্দ গোস্বামী সঙ্কান্তরত্ন এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন।

প্রগতি—শ্রীশ্রীচন্দ্র বেদান্তভূষণ ভাগবতরত্ন প্রণীত। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য আট আনা ও ৮শ আনা। এই সংস্করণের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ত্রিপুরা হিতসাহিনী সভার গৃহনির্মাণ ভাণ্ডারে অর্পিত হইবে।

ভক্তিরসাম্পন্ন এই কবিতাশুদ্ধ ভক্তচিন্তার শ্রীতিকর হইবে। 'পরিচিতি' উপলক্ষ্যে শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী লিখিয়াছেন, "ছন্দবদ্ধ বা রচনারীতিতে বৈচিত্র্য সৌষ্ঠবের ন্যূনতা থাকিলেও তাঁহার উপাসনাময়ের আবির্ভাব নাই; তাঁহার ভগবৎপ্রেমের কবিতাগুলি তাই সরল, স্বচ্ছ ও চিত্তগ্রাহী।" 'পরিচায়িকায়' শ্রীকালিন্দার রায় লিখিয়াছেন, "দেবতার প্রদাদ যেমন ভক্তবৃন্দের মধ্যে বিতর্ক হয়, হাটবাজারে বিকীর্ত্ত হয় না... এই কবিতাগুলিও সেইরূপ ভক্তবৃন্দের জন্য উদ্ভিষ্ট—সাহিত্যের গল্পবাজারের জন্য নহে।"

ঐতিহাসিক গল্প-সঞ্চয়ন—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ও শ্রীহরমণনাথ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান মিত্র এণ্ড কোম্পানী, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. ১০০, মূল্য পাঁচ দিকা। নজির।

এই বহির প্রকাশকের উদ্যোগ প্রশংসার। বালক-বালিকাদের জন্য রচিত পুস্তকের সংখ্যা আমাদের দেশে গত কয়েক বৎসরে অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই একই ধরণের রচনা, তাহাতে বৈচিত্র্য ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের প্রাচুর্য্য নাই। এই বহির অধিকাংশ রচনা হিতকারী ও মনোহরের সমাবেশ হইয়াছে। সর্ব্ব বহুনাথ সরকার-প্রমুখ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের রচিত বহি হইতে কিশোরবয়স্কদিগের চিত্তাকর্ষক ঐতিহাসিক বিষয় ও কাহিনী এই পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে, অনেকগুলি নূতন রচনাও আছে।

পঠন-পাঠনের দোষে ইতিহাস অনেক সময় গণিতের তুল্য হইয়া দাঁড়ায়। এই ধরণের বহি সেই ইতিহাসভীতি দূর করিতে সহায়তা করিবে।

অবশ্য, এই পুস্তকে প্রকাশিত সবগুলি রচনাই উচ্চশ্রেণীর নয়। কোন কোনটতে যে-সকল তথ্য তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহা নির্ভুল নয়। 'বাঙ্গাল গেজেট' ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, —১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে নয়। বাংলা সংবাদপত্র সবকিছু বিশেষ আলোচনার সম্ভ্রতি হির হইয়াছে যে, 'সমাচার দর্পণ' প্রথম বাংলা সংবাদপত্র, —'বাঙ্গাল গেজেট' নয়। "উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের" পূর্বেই ভারতবর্ষের অগ্রাগ্র প্রদেশে সংবাদপত্র দেখা দিতে আরম্ভ করে। কোন কোন রচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, এইরূপ রচনা এই বহির পাঠক-পাঠিকাদের প্রীতিকর হইবে না। 'বাঙালীর বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধে বাঙালীর যে-সব দোষের অপ্রাণ্য গুণের কথা সাধারণ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার যে-কোন একটির সম্বন্ধে কোন কাহিনী একটু বিস্তারিত করিয়া লিখিলে রচনাটী অধিক চিত্তগ্রাহী হইত।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

আদর্শ ফলকর—শ্রীঅমরনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক—প্রাব নাদারী, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ১০ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য থাকিলেও ইহা গ্রন্থকারের অগ্রাগ্র পুস্তকের তায় যথার্থ্য হয় নাই। ইহাতে এমন অনেক কথা আছে বাহা লেখকের অভিজ্ঞতা প্রসূত নহে; অনবিস্তার ভুলও আছে। মোটের উপর বৈখানি ভাল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
প্রণীত। প্রকাশক ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। মূল্য তিন টাকা।

‘শিশু-সাহিত্যিক ও ম্পত্তিত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে যে কথাগুলি বর্তমান বাঙালী সমাজকে নূতন করিয়া
জ্ঞানাইয়াছেন তাহা অতিশয় সম্যকচিত্ত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবন
ও কর্মজীবনের স্মরণ ও স্মৃতিস্তম্ভ আলোচনা এককালে যথেষ্টই ইহা-
ছিল, এবং এই মহাপুরুষের মর্ত্যলীলা একদা সমগ্র দেশে যেভাবে যজ্ঞাগ্নির
বত তাণ্ডর হইয়া উঠিয়াছিল তাহাও স্মরণাতীত নহে; কিন্তু তাহার সেই
অমর ভাব-মূর্তি একদে কেবলমাত্র সম্প্রদায়-বিশেষের গুরু ও প্রতিষ্ঠাতারূপে
পর্যবেক্ষিত হইয়াছে—জাতির ইতিহাসে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে, তাহার আসন ভাল
করিয়া নির্দিষ্ট না হওয়ায়, তাহার সেই মূর্তি ইন্দ্রানীতন কালে যেন
কতকটা আড়ালে পড়িয়াছে—বাঙালী আজ আর তাহাকে তেমন করিয়া
স্মরণ করে না। গত শতাব্দীর বাঙালী-সমাজে যে-সকল যুগ্মকর
প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, বাহাদুর চরিত্র, মনীষা, ও
প্রতিভার বলে বাঙালী জাতির অত্যাধুনীয় অভ্যুদয় ঘটাইয়াছিল, কেশবচন্দ্র
তাঁহাদের অন্যতম—বর্তমানের উপাসক আধুনিক বাঙালীকে সেই কথা
স্মরণ করাইবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। যোগেন্দ্র বাবু পূর্বতন
গ্রন্থ ও অধুনাস্তন বহু রচনা হইতে তথ্য সংকলন করিয়া যে কেশব-কথা
গ্রন্থ করিয়াছেন তাহাতে এই পুস্তকখানি অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমানে এবং
সহজ আবেগময়ী ভাষায় একালের শ্রম-বিমুখ পাঠক-সম্প্রদায়ের জ্ঞানার্জন
ও চিত্তবিনোদনের উপযোগী হইয়াছে; এজন্য লেখককে অভিনন্দিত
করিতেছি।

কিন্তু সমালোচনা-প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা এই স্থানে না বলিলে কর্তব্য-
হইবে। প্রথমতঃ এই গ্রন্থে কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে লেখকের যে একটু
স্পেশিয়াল বা special pleading প্রকাশ পাইয়াছে তাহা না থাকিলেই
ভাল হইত। তিনি কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের উপেক্ষা ও উদ্দাসীনা
প্রভৃতির যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহাতে খতাই মনে হইতে পারে এত
বড় প্রতিভা ও মহৎ সত্বও কেশবচন্দ্র জাতির চিত্ত অধিকার করিতে
পারেন নাই। কথাটা আরো ভাল নহে। কারণ ইহা যদি সত্য হয়,
তবে তাহার কারণ সন্ধান করিতেও হয়; এবং কেবলমাত্র সম্প্রদায় বা
মণ্ডলী-বিশেষের অনুসারতাই তাহার কারণ এমন কথা বলিলে, বাঙালী
জাতি ও কেশবচন্দ্র উভয়ের প্রতি অবিচার করা হয়। গ্রন্থকার কেবল এক
ভরফা পাহিয়াছেন সে কারণসন্ধানের প্রবৃত্তি বা অবসর তাহার ঘটে
নাই। দ্বিতীয়তঃ, লেখক বঙ্গসাহিত্যে কেশবচন্দ্রের ক্ষুদ্র যে অত্যুচ্চ স্থান
দানী করিয়াছেন, এ গ্রন্থে সে পক্ষে যে যুক্তি ও প্রমাণ আছে তাহা আরো
বিস্তারজনক নহে; এবং সে সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা করিয়াছেন তাহাও
গ্রন্থের নামকরণের পক্ষে অতিশয় অপ্রতুল বলিতে হইবে। কেশবচন্দ্রের
মহত্ত্ব—তাঁহার চরিত্রে, তাঁহার অপূর্ব কর্মপ্রেরণায় এবং ভগবৎ-প্রেমের
এক অভিনব আদর্শস্থাপনে। তাঁহার বাগ্মিতা, সংবাদপত্র-পরিচালনা ও
উপদেশদান বা ধর্মপ্রাধান-শক্তি তাঁহার সেই বিশিষ্ট কর্ম-ক্ষেত্রের
সহায়ক হইয়াছিল, এবং এ সকল তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার নিদর্শন বটে।
কিন্তু সে প্রতিভা ঠিক সাহিত্যিক প্রতিভা নহে। তাঁহার বক্তৃতাগুলিতে
ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া
যায়; এবং তাঁহার বাংলাভাষাও এই ইংরেজী প্রভাব—বিশেষ করিয়া
ইংরাজী বাইবেল ও তত্ত্বাত্মীয় সাহিত্যের প্রভাব—অভিনবায় পরিপূর্ণ
হওয়ায়, অবিকাশ স্থলে তাহা বিশদরী বাংলা হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য,
pulpit oratory র মত, তাঁহার ভাষায় একটি অভিনব ভঙ্গী থাকিলেও,
এক বাক্যযোজন হিসাবে তাহা সরল হইলেও তাঁহার সেই রচনা বাংলা
গদ্যসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করে নাই। বরং তাঁহার শিল্পগণ তাঁহার

অনুপ্রেরণায় যে এক ধরনের সাহিত্য রচনা করিয়াছেন তাহাই বিষয়গত
কতকটা উল্লেখযোগ্য। কেশবচন্দ্রের প্রতিভা ঠিকমত ব্রুতিতে পারিলে,
বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার স্থান নইয়া কলহ বা বিতর্কের কোনও কারণ
ঘটিবে না; কারণ সাহিত্যিক রূপে বরণীয় না হইলে তাঁহার মহিমার দ্বাস
হয় না। এই জন্য, লেখক কেশবচন্দ্রকে একেবারে বহিঃক্ষেত্রের সম্বন্ধ
রূপে দাঁড় করাইতে গিয়া একটু অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে তথ্য- ও তারিখ-ঘটিত ভ্রমত্রুটি আছে—তাঁহার অনেকগুলি
অনুবদানতাবণতঃ ঘটনায়ে বলিয়া মনে হয়। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে
গ্রন্থকার এগুলি সংশোধন করিয়া দিবেন। পরিশেষে গ্রন্থকারকে একটি
অনুরোধ জানাইতেছি—কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এই অতিশয় সম্যকচিত্তযোগী ও
চিত্তাকর্ষক গ্রন্থখানি বাহাতে কোনওরূপ ভ্রান্তি উৎপাদন না করে, সেজন্য
পরবর্তী সংস্করণে ইহার নামটো পরিবর্তিত করিলে ভাল হয়; তাহাতে
গ্রন্থের মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না বরং পাঠকের ভাল ধারণাই দূর
হইবে। কারণ, এই গ্রন্থে কেশবের ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, এবং ধর্ম- ও কর্ম-
জীবনের কাহিনীই বিশেষভাবে কীর্ণিত হইয়াছে; এবং তৎসহ বঙ্গসাহিত্য
সম্বন্ধে যে তথ্য ও তত্ত্বালোচনা আছে তাহা যেমন অবাস্তব, তেমনই
কেশবচন্দ্রের সাহিত্যিক পরিচয়ও তেমন গুরুতর নহে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

প্রাপ্তিস্বীকার

বিজ্ঞানে বিরোধ—২য় খণ্ড—বায়ু। শ্রীযুক্তনাথ রায়
প্রণীত। মূল্য ছয় আনা।

বায়ু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

দরদী—খলকার আবদুল বসির, বি-এল, প্রণীত। মূল্য চার
আনা। গ্রন্থকারের নিকট টাঙ্গাইলে প্রাপ্তব্য। কাব্যগ্রন্থ।

বাংলার শ্রমিক—রমণীরঞ্জন গুহ-রায় প্রণীত। মূল্য দুই
আনা। প্রাপ্তিস্থান—২১২, বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

মায়া—শ্রীনারায়ণদাস মুখার্জী প্রণীত। মূল্য চারি আনা।
প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থগৃহ, ৪৯ বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।
ছোটগল্প।

মনঃশক্তি-প্রভাব শিক্ষা—শ্রীরামানন্দ ঠাকুর প্রণীত।
মূল্য বার আনা। প্রাপ্তিস্থান—২৮ বি, আগ্রাভাষা দে লেন, কলিকাতা।

চিঠিতে সাধনা ও উপলব্ধি কথা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম-
চারী সঙ্কলিত। মূল্য বার আনা। আধ্যাত্মিক বিষয়ে চিঠিপত্রের সংকলন।

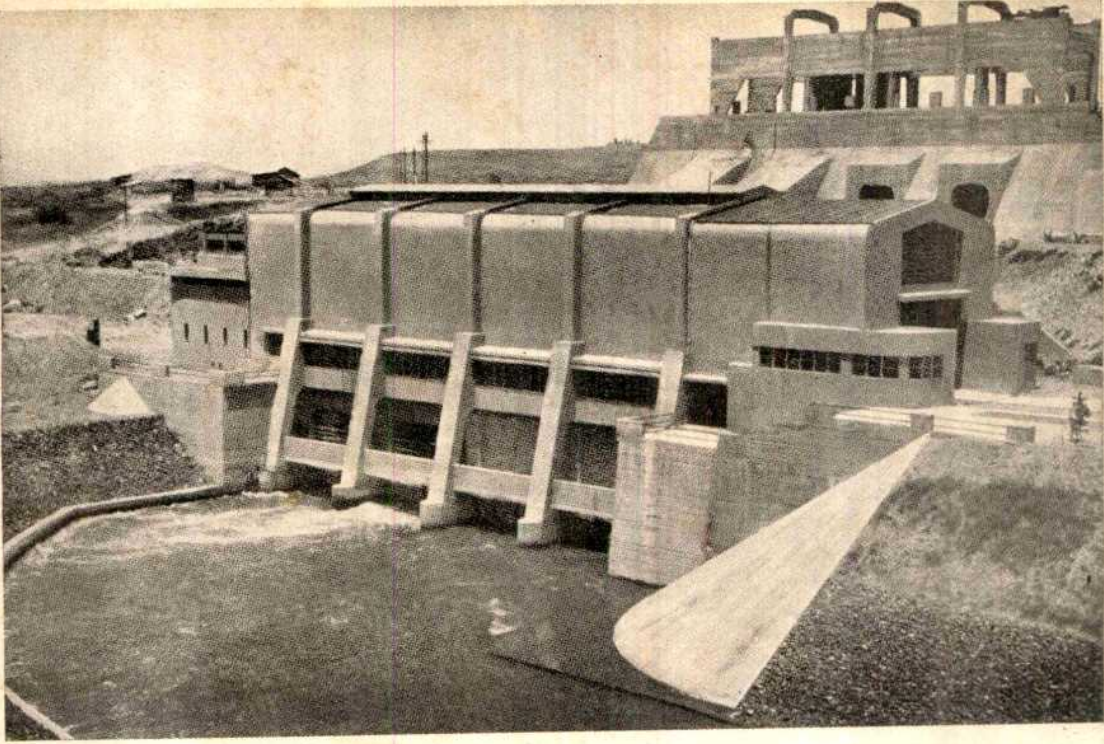
শ্রীমদ্ ব্রহ্মবিজ্ঞান শ্রীশিবেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত।
মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ পুরী, মহেশ্বরী, ময়মনসিংহ।
ব্রহ্ম ও আত্মা, অধ্যাত্মতত্ত্ব, উপাসক ও মুক্তদিগের কর্তব্য প্রভৃতি
বিষয়ের আলোচনা।

সত্যের পথ বা ‘আমি’র সন্ধান—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী
প্রণীত। মূল্য ছয় আনা।

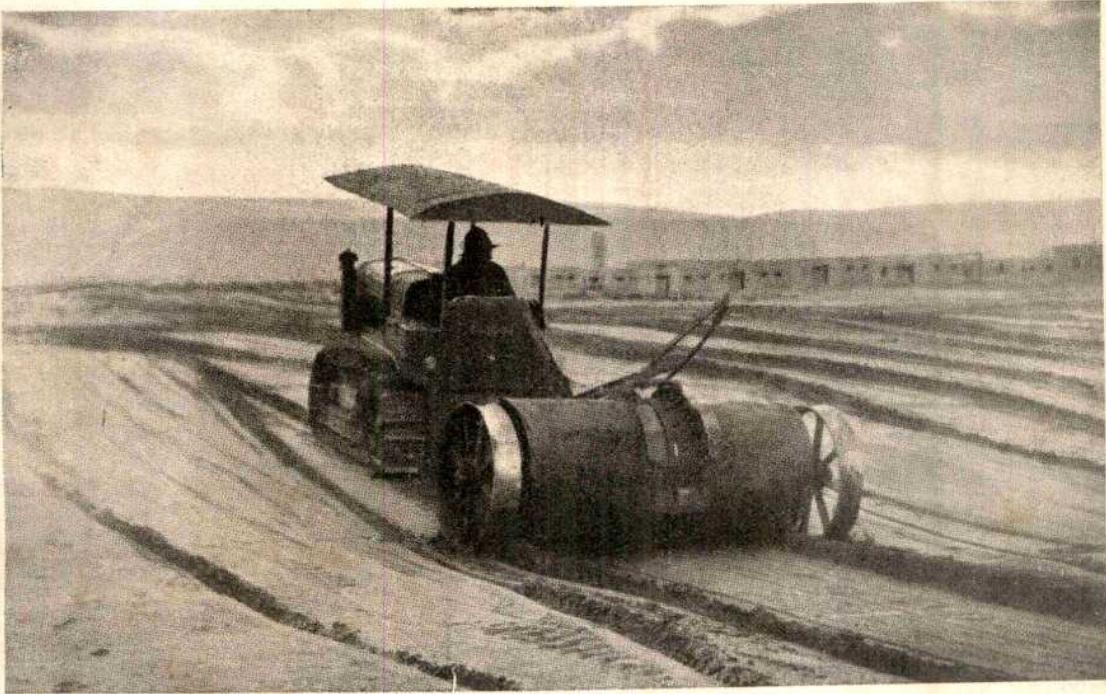
‘আত্মা’ বা ‘আমি’ কি বস্তু, জীবনে উহাকে পাইতে হইলে কি ভাবে
জীবন পরিচালিত করিতে হইবে.....তাহারই নির্দেশ।

সত্তা-গ্রন্থ—গজেন্দ্রমোহন মজুমদার প্রণীত। মূল্য এক আনা।
প্রাপ্তিস্থান—৪১২ নং গোঁসাইপাড়া লেন, কলিকাতা।

পরশমণি—শ্রীমৎ সদাধিপ্ৰকাশ আরণ্য প্রণীত। সাহায্য
দুই আনা।



ইহুদীদের উত্তোগে প্যালেষ্টাইনের অনেক আর্থিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশনে জর্ডনকে কাজে লাগানো হইয়াছে।



প্যালেষ্টাইনের ইহুদী উপনিবেশে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে নিখুঁত পতিত জমিও কাজে লাগানো হইতেছে। প্যালেষ্টাইন-কমিশন সম্প্রতি সুপারিশ করিয়াছেন, প্যালেষ্টাইনের এক অংশে স্বতন্ত্র ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপিত হউক।



প্যালেস্টাইনের যাবাব বেডুইন। পশুপালনই ইহাদের জীবিকার অবলম্বন।



প্যালেস্টাইনের 'ফেলাহীন'—আরব পার্শ্বত গ্রামে ইহাদের বাস, চাষবাস ইহাদের জীবিকার উপায়।



ট্রান্স-জর্ডনের শাসনকর্তা আমীর আবদুল্লা (উপরে) ও তাঁহার রক্ষীবৃন্দ। প্যালেস্টাইন-কমিশন সম্প্রতি স্থপারিশ করিয়াছেন যে প্যালেস্টাইনের এক অংশ ট্রান্স-জর্ডনের সহিত যোগে স্বতন্ত্র আরব-রাষ্ট্র গঠিত হইবে।



মস্কটে ডাক-ধীমার



তুরস্কের বুর্সা নগরের দৃশ্য



সিরিয়ার টেল-বিশের বিচিত্র মুন্সায় গৃহাবলী

বাসা-বদল

শ্রীবিজয় গুপ্ত

কলকাতার ভাড়াবাড়ী। আজ এখানে কাল ওখানে, যেন ঘুর্তী ঝড়ে শুকনো পাতা। এ যামাবর-বৃত্তির শেষ নেই। এর মধ্যে নৃতন্থ আছে, কিন্তু সোয়াস্তি নেই। মাইনে কমে গেছে, চৌদ্ধ টাকা ভাড়া দিয়ে আর পোষায় না। ক'টা রোববার খুঁজে খুঁজে একটা বাড়ী বার করেছি,— বাড়ী নয়, বাড়ীওয়ালার অপ্রয়োজনীয় একটা ছোট ঘর, তারই কোণের একটা সর্কীর্ণ বারান্দায় দরমা-দিয়ে-ঘেরা রান্নাঘর। গরিবদের জন্তে কলকাতার ভাড়াবাড়ীর কি বিচিত্র কৌশল! বাড়ীওয়ালা ভাড়া দিতে চান নি, যেতেই বললেন, 'দেখুন, আমি ঝগাট পছন্দ করি নে, একটি নিরুজ্জ্বল ভাড়াটে খুঁজছি। ভাড়া যে দিতেই হবে এমন কোন কথা নেই, তবে ঝগাট আমি সহ্য করতে পারি নে।'

বললাম, 'ঝগাট আমার নেই, আমরা ছুটি মানুষ।'

বাড়ীওয়ালা একটুচুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তাহ'লে মন্দ নয়—এর আগে একজনদের ভাড়া রেখেছিলাম, তারা রাবণের গুপ্তি—এ একটা ঘরে বস্তার মত গাধাগাদি ক'রে থাকত, আর ছেলেগুলো যেমন গোলমাল করত তেমনি পাজী। তা বেশ আসবেন, কিন্তু ঘরগুলো তারা দাবার পর থেকে অপরিষ্কারই প'ড়ে আছে, উপস্থিত আসতে পারেন, তবে একটু পরিষ্কার—'

'বাধা দিয়ে বললাম, 'দেখুন, ও আমরা ক'রে নেব, কাল সন্ধ্যার আছে, না এলে আবার এক মাস ভাড়া গুনতে হবে।'

বাড়ী ঠিক হয়ে গেল, গুনলাম এর আগে যারা ছিল তারা দিন-পনের হ'ল, বাংলা মাসকাবারেই চলে গেছে। আজ শনিবার, আগিল-ফেরতা বেরিয়ে একটা মস্তবড় অয়োজনীয় কাজ সারা হ'ল।

...বাড়ীটার অনেক দিন ছিলাম। কালই ও-বাড়ীর সঙ্গে সব-সম্পর্ক চুকে যাবে। এত দিনের পরিচয়, এত দিনের

নিষ্ঠতা সব শেষ ক'রে দিয়ে আসতে হবে। আমার যত না কষ্ট হোক, কাকনের তার চেয়ে বেশী হবে। আমার যদি কষ্ট হয় ত সে পান্নালালের জন্ত। পান্নালাল বাড়ীওয়ালার একমাত্র ভাইপো। পান্নালাল নেশাভাষ করে কিন্তু তার মনটি চমৎকার। সেবার কাকনের অস্থিটা খুব বাড়াবাড়ি হ'ল। মাসকাবারের কাছাকাছি, মুখ শুকনো ক'রে সামনের দালানটিতে ব'সে ভাবছি—তাই ত কি হবে যায়। দেখি পান্নালাল গিলে-করা আত্মির পাঞ্জাবী খ'রে বাবু সঙ্গে বেরচ্ছে। আমায় দেখে ব'লে উঠল, 'কি গো রাজুদা, এমন মুখ-শুকনো কেন? হাসতে কি তে মরা জান না?', বললাম, 'ভগবান কি পৃথিবীতে হাসবার জন্ত পাঠিয়েছেন?'

'কেন কি হ'ল?'—পান্নালাল এবটা হাঙ্কা হাসি হাসল।

বললাম, 'চার দিন হ'ল ওর জর হয়েছে, কিছুতেই সারছে না, বোধ হয় বৈকে দাঁড়াবে।...মাসকাবারের মুখ, একটি পয়সা হাতে নেই। দেবে পাঁচটা টাকা?' গলার স্বরটা যেন নিজের কাছেই কল্পণ শোনাল।

পান্নালাল আবার খানিকটা হাসল, বললে, 'তা দিতে হবে বইকি, নিশ্চয়ই। কিন্তু মাইরি বলছি, রোজ রোজ খেনো খেয়ে খেয়ে কেমন মুখ মেরে গেছে, ভেবেছিলাম আজ একটা বিলিতী খাব—তা না হয় নাই হবে, কিন্তু মাইরি ভাই, এই দেখ তোমায় পাঁচ টাকা দিলে আমার খেনোর দামটাও থাকে না।'

পান্নালাল পকেট থেকে বার ক'রে দেখাল।

'দেখ রাজুদা, এই চারটে টাকা নাও ভাই, কাল বরঞ্চ খাপ্পাটাগা দিয়ে খুড়ীর কাছ থেকে কিছু এনে দিয়ে যাব।'

পান্নালাল চারটে টাকা আমার হাতে জুঁজে দিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। একবার দ্বিরে চাইলও না,

জিঞ্জেসও করলে না কবে দেবে। ... সে টাকাটা পান্নালাল আর চায় নি। বোধ হয় ভুলে গিয়ে থাকবে, অথবা কখনও ফিরে চাইবে না বলেই বোধ হয় ও ধার দেয়। আমার যদি কষ্ট হয় ত এই পান্নালালের জন্তেই হবে। সময়ে-অসময়ে ওয় কাছ থেকে কিছু পেতাম বলে নয়, স্বয়ং ওই চমৎকার মনটির জন্তে। অনেক দিন পরে কাঞ্চন সেরে উঠলে ওকে পান্নালালের কথা বলেছিলাম। বজারের পয়সা থেকে অনেক-কষ্টে-জমানো চারটি টাকা এক দিন কাঞ্চন আমার হাতে দিয়ে বলেছিল, ‘ও হয়ত ভুলে গেছে, কিন্তু তোমার ভো মনে আছে, টাকাটা দিয়ে দিও।’—সে টাকাটা তবুও পান্নালালকে দেব-দেব করে দিতে পারি নি।

...এক দিক দিয়ে আমাদের নিষ্ঠুর কঠিন-হৃদয় বলা চলে। এত দিন যাদের সঙ্গে একজু বাস করলাম, তাদের সঙ্গে সব সম্বন্ধ শেষ করে চলে যেতে হবে। একবারও তাদের মনে রইল না। তার পর নৃতন সঙ্গী এল নৃতন প্রভিবেশী হ’ল—তার গেল হারিয়ে। অবচেতন মনের একটি পুরানো পরিচ্ছেদে তারা চাপা প’ড়ে রইল। যদি কখনও কোন স্ত্রে মনে পড়ে ত মনে হবে এ ঘেন মনের অভিশয় বিলাসিতা, কল্পনার অকারণ সৌধীনতা।

আজ রবিবার। দুপুরের আগেই যেতে হবে। সকাল থেকে ক্রমাগত জিনিষ বয়ে ও-বাড়ীতে রেখে এসেছি। জিনিষপত্র এমন কিছু বিশেষ নেই;—আর থাকবেই বা কেমন করে, চৌক টাকা ভাড়া দেবার সামর্থ্য যার নেই, তার জিনিষপত্র বেশীই বা হবে কি করে? স্ব-ঘরে আমরা থাকি সে-ঘরে এক জন ভাড়াটে আসবে বলে ঠিক হয়ে গেছে। আজ দুপুরেই তারা আসবে। তাদের জিনিষপত্র সব যুটেরা বয়ে এনে কলতলার পাশে ছোট দুপুরির মত জায়গাটার জমা করছে। দুটো টিনের স্ট্রটেকস, এক বাঙাল বিছানা, একটা ঝড়িতে কতকগুলো শিশি-বোতল ও তিনখানা হেঁচা মাসিকপত্র। আরও একটা ছোট ঝড়িতে টিনের কোটো কতকগুলো, আচারের ছোট ছোট জার, পুরনো কতকগুলো কালির দোয়াত ইত্যাদি। আমাদের জিনিষপত্র গোছানর ফাঁকে ফাঁকে দেখছিলাম। আজ একান্ত উদাসীন নিষ্পৃহের

মত যে-জায়গা আমরা পরিভ্রমণ করে যাব, কাল সে জায়গাই ওরা আন্তরিকতা ও সহানুভূতি দিয়ে ভরিয়ে তুলবে। ধবংসের শেষই সৃষ্টির সূচনা—একের যেখানে শেষ, অপরের সেখানে আরম্ভ। হয়ত আমরা খেদিকটার বিছানা পাততাম, ওরা সেদিকটার একটা টেবিল রাখবে, এরা হয়ত ঐ কোণে আলমারিটা রাখবে,—বাল্ল-পেটরা সেই উত্তর দিকের দেয়ালের কাছে রাখবে। সবার কৃতি সমান নয়।

...ষাবার সময় হয়ে এল। সেই কোন্ সকালে রান্না হয়েছে, কাঞ্চনের ভাগাদায় শীগগির শীগগির খেয়ে নিলাম। আমরা চ’লে যাচ্ছি,—বাড়ীওয়াল-গিন্নী ওপর থেকে নেমে। এল—পূব দিকের ভাড়াটে মিস্ত্রি-জ্যাঠাইম। এলেন, তাদের মেয়েরা এল—বিন্দু, লক্ষ্মী, কল্যাণী। দোতলার রমণীবাবুয় জী এলেন, তাঁর মেয়ে পুঁটুও এল। পুঁটু নাকি বৌদিকে বড্ড ভালবাসে, তাই দুপুরে না খুমিয়ে বৌদি চ’লে যাবার আগে দেখতে এসেছে। আরও সব অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভীড় করে দাঁড়াল।

বাড়ীওয়াল-গিন্নী বললেন, ‘তা হ’লে চললে?’

কাঞ্চন জবাব দিলে, ‘হ্যাঁ মা।’

বৌয়েরা আধঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, চাপা গলায় বললে, ‘রোববারে রোববারে বেড়াতে এস এখানে।’

পুঁটু এগিয়ে এসে ফ্রকটা টেনে ধরে বললে, ‘এই এমনি আর একটা আমায় করে দিও বৌদি।’

‘দোব, নিশ্চয়ই দোব।’—কাঞ্চন পুঁটুকে কোলে তুলে, হুম খেল। কাঞ্চন ছোট ছেলেমেয়েদের জামা বেশ ভাল করতে পারে। এ-বাড়ীর অনেক ছেলেমেয়ের জামা সে তৈরি করে দিয়েছে। ঘরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম ওদের বিদ্যায়ের পালা। সত্যি, এদের মাঝে কাঞ্চন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, ওদের ছেড়ে যেতে নিশ্চয়ই ওরা বেদনা বোধ হচ্ছে।

মিস্ত্রি জ্যাঠাইমা কাঞ্চনের হাতটা ধরে বললেন, ‘মাঝে-মাঝে এস বৌমা, বুঝলে?’—চোখদুটো তাঁর ছল ছল করে উঠল।

বাড়ীওয়াল-গিন্নী বললেন, ‘কতবার কেমন ঐ জেদ, দুটো টাকা আর কিছুতেই কমাতে পারলেন না।’

লক্ষ্মীর এখনও বিয়ে হয় নি, তার সঙ্গে কাঞ্চনের খুব

ভাব, বললে, ‘তুমি যে সত্যি এ বাড়ী ছেড়ে যাবে, এমন কথা ভাবি নি বৌদি। কাঞ্চন লক্ষ্মীকে জড়িয়ে ধরল, বললে, ‘তোমার বিষেব সময় নেমস্তন্ন ক’রো, আসব ঠাকুবন্নি।’

বাড়ীওয়াল-গিন্নী সেই কথাই ভাবছেন, বললেন, ‘তুমি যাচ্ছ যাও বৌমা, কিন্তু এ ভাড়া তুলে দিয়ে ঐ বাবো টাকাত্তেই আবার নিয়ে আসব তোমায়, তখন কিন্তু না বলতে পারবে না।’

কাঞ্চন জবাব দিলে, ‘না বলবো, আমি ত তাহ’লে বেঁচে যাই।’ কোণে একটা ছোট টুল ছিল, সেই টুলখানার ওপর ব’সে ঘরেব চার দিকটা তাকিয়ে দেখলাম, ঘরটা সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেছে। পূর্ব দিকের জানলার কাছে তক্তাপোষটা ছিল, সেটা পাঠিয়ে দিয়েছি। তার পায়ার তলায় সজ্জিত রক্ষার জন্ত যে ইটগুলো ছিল, সেগুলো প’ড়ে আছে। আজ এত বড় অসজ্জিতর দিনেও ওরা স্বস্তির সজ্জিটুকু রক্ষা করেছে। ইটের ফাঁকে ফাঁকে কাঠের টুকরো দেওয়া ছিল, সেগুলো পর্যন্ত ঠিক আছে। আলমারির চাবটে পায়ার ছাপ এখনও হুস্পষ্ট। সামনের মেঝেলে একটা দেয়ালগিরি টাঙানো থাকত, তাব ভূষোর ছাপটুকু ঠিক শিল্পীর তুলির আঁচড়ের মত দেখাচ্ছে—ঐ দিকে চেয়ে কেমন একটা মায়্য হয়। দোরের সামনের মেঝেলে একখানা রাখাক্ষের বাঁধানো ছবি ছিল, সেখানে পেবেকের দাগগুলো দেখা যাচ্ছে। কি বিরাট শূন্যতা। কাল সন্ধ্যার সময়ও এসে দেখেছি, সমস্ত পরিপূর্ণ। সন্সারের প্রতি খুঁটিনাটি বস্তুটিই ঘর জুড়ে আছে।...রিকশওয়াল অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, ঘন্টির আওয়াজে তার তাগাদার কথা বোঝা যায়। বাইরে বেরিয়ে কাঞ্চনকে বললাম, ‘আর দেরি ক’রো না, চল।’ কাঞ্চন বলল, ‘দাঁড়াও, রান্নাঘরটা দেখে আসি।’ বললাম, ‘আমি দেখছি, তুমি বরঞ্চ এ-ঘরটা একবার দেখে নাও।’

রান্নাঘরে ঢুকলাম। আজ ঠোঙে রান্না হয়েছে, কাজেই রান্নাঘর পরিষ্কার। উনানের শিকগুলো খুলে নিয়েছে, উনানটা দিয়েছে ভেঙে। এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও এতটুকু জিনিষ প’ড়ে নেই, সমস্ত ও খুঁটিয়ে কাঞ্চন ভুলে নিয়ে গেছে। ঘরের চৌকাঠ ভিত্তিয়ে

যেন বেকুতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় ঐখানটায় আসন নিয়ে ব’সে পড়ি, যেমন ক’রে কাল রাত্রিরও ব’সে আহাব শেষ করেছি।

...দোরের কাছে সবাই ঘিরে দাঁড়াল। রমা, লক্ষ্মী, কল্যাণী, বিন্দু এরা সব কাঞ্চনের পায়ের ধুলো নিলে। কাঞ্চন তাদের সবাইকে জড়িয়ে ধ’রে নিবিড় আলিঙ্গন করলে। এইবার বাড়ীওয়াল-গিন্নীর পায়ের ধুলো নিয়ে কাঞ্চন উঠে দাঁড়াল, তাঁরও চোখজুটো হল হল ক’রে উঠেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কেলে ভুলে আদর ক’রে কাঞ্চন পেছন ফিরল। আঁচলে টান পড়তেই কাঞ্চন ফিরে দেখে লক্ষ্মী তার আঁচলটা ধ’বে আছে, চোখজুটো তার জলে ভ’রে গেছে। গলাটা জড়িয়ে ধ’রে কাঞ্চন বললে, ‘ছি, কাদে না।’ লক্ষ্মীর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। কাঞ্চন আঁচল দিয়ে তোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, ‘আবার আসব, তোমার বিষের সময় তিন দিন থাকব, খবর দিও।’

যাবে ব’লে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় পুঁটু কোথা থেকে ছুটে এসে বৌদিব পায়ের মাথাটা লুটিয়ে নিলে। ‘থাক, খুব হয়েছে, পুঁটুরাণী’—ব’লে কাঞ্চন কোলে তুলে চুমু খেলে।

তাড়া দিয়ে বললাম, ‘বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে।’

‘হাঁ হয়ে গেছে’—কাঞ্চন এসে রিক্শন উঠল। রিক্শ-খানা গলি পার হ’ল, তখনও কিন্তু ওরা দোরের কাছে মুখ বাড়িয়ে আছে দেখলাম।

কাঞ্চন বললে, ‘সব জিনিষ আনা হয়েছে, কিছু ফেলে আসি নি ত?’

জবাব দিলাম, ‘ভুলে আসবার ঘো আছে কি, উনানের শিকগুলো পর্যন্ত খুলে এনেছ তো দেখলাম...আচ্ছা উনানটা অমন ক’রে ভেঙে গু’ড়িয়ে দিলে কেন, না ভাঙলে যারা আসছে ওদেব অন্ততঃ কাজে লাগত।’

কাঞ্চন জবাব দিলে, ‘তা বুঝি রাখতে আছে।’

‘কেন রাখতে নেই?’

‘কেন, যা রাখতে নেই, তা নেই।’ কাঞ্চন এত জানে। এই ত সবে তার তিন বছর চিয়ে হয়েছে।

কাঞ্চনের সঙ্গে কথা কইতে কইতে একটু আগে ওর বিদায়ের দৃষ্টটার কথা মনে পড়ল। কতক্ষণ, বোধ হয়

পাচ মিনিট আগেও ওর চোখ দুটো ভিজে উঠেছিল।
বিদায়-পূর্বের বেদনা করুণ হয়ে মনের মাঝে উঠেছিল
জন্মে। এরই মধ্যে কেমন ক'বে ও যে সাংসারিক তৃচ্ছ
কথার শাখা বিস্তার করতে পারল এই ভেবে আমি আশ্চর্য
হয়ে বাই। মেয়েরা পারে, তারা সমরোপযোগী অবসার
সঙ্গে চমৎকার খাপ খাইয়ে নিতে পারে। স্নেহ, বাস
ওদের আছে, কিন্তু তার আভিষেক ওরা প্রকাশ করতে
চায় না। হয়ত একটি অবসর-সময়ে এই বিচ্ছেদ-ক্লান্ত
নিশ্চয়, ও সমস্ত লালনপালন কববে, ওদের পূর্ববর্তী দিনের
কথা স্মরণ ক'রে কলনারাজ্যে বিলাস ক'রে বেড়াবে।

...বেলা প্রায় চারটে, নতুন বাড়ীর দোরের কাছে
রিকশ এসে দাঁড়াল। চাবি খুলে ঘরে ঢুকলাম, জিনিষপত্র-
গুলো সব ঠাসাঠাসি ক'রে রাখা হয়েছে। কাঞ্চন সব
গোছাতে লাগল। দরমা-দিয়ে-ঘেরা সামান্যতর—উঁকি
মেরে দেখি কাঞ্চনের কথাই সত্যি, এরাও নানার
সময় উনান ভেঙে দিয়ে গেছে, শিকগুলো খুলে নিয়ে গেছে।
ঘুরে ঘুরে সমস্ত ঘবটা দেখতে আরম্ভ কবলাম, কাঞ্চন
তত ক্ষণ ঘর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করেছে। ঘরের তাকগুলো
খালি পড়ে আছে। মেঝেটা ধুলোবালিতে অপরিষ্কার।
এক কোণে একটা দাড়াভাঙা চিরুণী, মাথার একটা হরচ-
ধরা কাঁটা, গোটা দুই তিন পেরেক। কাঞ্চন পেরেকগুলো
হুড়িয়ে রাখল, বললে, 'তুলে রাখি, ছবিগুলো টাঙানার
সময় কাজে লাগতে পারে।'

পেরেক, চিরুণী, মাথার কাঁটা এ সব আগের ভাড়াটেনের
স্বত্বচিহ্ন। আমার কেমন ওগুলো বন্ধ ক'রে তুলে বাঁধতে
ইচ্ছে করে। ঘুরতে ঘুরতে দেখি দেওয়ালের গায়ে একটা
ছুঁচ বেঁধা, খানিকটা স্থতোও তাতে পরানো আছে। স্নান
জিনিষ পাছে হারিয়ে যায় ব'লে বোধ হয় দেয়ালে গুঁজে
রেখেছিল,—ওরা বোধ হয় ভাবে নি যে বাড়ী বদল
করবার সময় তুলে যেতে পারে। ওখানে ছেলেদের বইয়ের
একখানা ছেঁড়া মলাট পড়েছিল, সেইটে কেলে দিতে গিয়ে
দেখি দেওয়ালের গায়ে আঁকাবঁকা অক্ষরে লেখা ব্যাঘ্র,
দিদি বড় ছষ্টু, ইতি রেখা। হয়তো এর আগে যারা ছিল,
তাদেরই কোন মেয়ে দিদির নামে এই অভিযোগের লিপি
দেওয়ালে লিখে গেছে। কপাটের গায়ে অনেকগুলো

দাঁড়িকাটা খড়ির দাগ দেখে কাঞ্চনকে বলি, 'দেখ, আগের
ভাড়াটেরা বড় নোংরা ছিল—কিন্তু, কপাটের গায়ে কত
খড়ির দাগ কেটেছে দেখ না।'

'কই দেখি' কাঞ্চন উঠে এল—'ওগুলো নোংরামি নয়,
কেরোসিন তেলের হিসেব। দেখ এক-একটা দাঁড়ি মানে
এক এক বোতল তেল। দেখছ না, কতগুলো দাঁড়ি
দাগ টেনে কেটে দিয়েছে, কতগুলো মুছে দিয়েছে; তার
মানে ওগুলোর হিসেব মিটে গেছে।'

কাঞ্চন ঘর গুলোতে লাগল। রাত্রে আমরা কোন
রকমে বিছানা পেতে শুলাম, যেন ভোরের গাড়ী ধরব
ব'লে মুসাকিরখানায় অপেক্ষা করছি। সমস্ত রাত জিনিষ-
পত্র গুলোয় হয় নি। মাথার কাছে বাস-পেটেরা তিন-
চারটে পুঁচুলি আগোছাল ভাবে পড়ে আছে।

পরদিন সকালবেলা কাঞ্চন ঠিক সময় মত আগিসের
ভাত জোগালে। উনানটা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, তাই
টোভেব সাহায্যে কাজ সারতে হ'ল।

...প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়, আগিস থেকে কিরছি ধূমতলা
দিয়ে। কাশিয়ারেব সঙ্গে আজ ভয়ানক ঝগড়া হয়ে গেছে,
মনটা তাই জটিল। নানান চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
যত বার ঝগড়ার কথাটা মনে হচ্ছে, তত বারই রাগে সমস্ত
দেহটা জ্বলে উঠছে। শুধু কাঞ্চনের জন্তে কিছু বলি নি,
নয়ত ঘা-কতক উত্তম-মধ্যম দিয়ে আজই চাকরিতে ইস্তফা
দিয়ে আসতাম। কি মনে হ'ল, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে
ঢুকলাম। নানান চিন্তা জড়িয়ে ধরতে লাগল। ছেড়ে দেব
এ-চাকরি—কাজের ভাবনা কি। এই ত নিতাই হালদার
ইন্সপেক্টর দালালি ক'রে বড়লোক হয়ে গেল। তাই
করব, ইন্সপেক্টর দালালি, পাটের দালালি, অর্ডার
সাদাই—কত কাজ আছে, অভাব কি। এ-সবে বয় উন্নতির
আশা আছে। জিশ টাকা মাইনের কলম-পিসে কি আব
উন্নতি হবে। ..সামান্য কিছু টাকার দরকার। পাঁচালোক
বলব—দেবে নিশ্চয়ই। ও তো কত টাকা উড়িয়ে দেয়, এই
সামান্য টাকটা দেবে না। একেবারে নয়, ধার হিসেবে।

প্রায় আটটা বেজে গেল। ভাবতে ভাবতে বাড়ীর দিকে
পা চালিয়ে দিলাম। পথের দোকানগুলো খরিন্দারে ভর্তি,

বেচাকেনা বেশ পুরোদমে চলেছে। চাকরির চেয়ে এ অনেক ভাল, বেশ আছে ওবা। ভাবতে ভাবতে কেমন অন্তমনস্ক হয়ে গেছি।

...কলতলার পাশ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। এ কোথায় এসেছি! খেয়ালই নেই, অন্তমনস্ক হয়ে পুনো বাড়ীর সেই ঘরখানায় ঢুকে পড়েছি। একটি মেয়ে একমনে টেবিলের কাছে বসে সেলাই করছে, মাথার ঘোমটা তার মনোযোগের একাগ্রতায় বসে পড়েছে। জুতোর শব্দ পেয়ে চোখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যাঁ গা, আজ এত দেরি হ'ল যে?' বড় মুস্থিলে পড়ে গেছি, ভাবছি পালাব কি না, কিন্তু সে সব ভাববার আগেই ও কিরে চেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এক হাত ঘোমটা টেনে মেয়েটি সভয়ে চীৎকার করে উঠল,—'ওমা! এ কে গো...'

ভয়ে আমার তখন গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। স্বরটা অসম্ভব রকম করুণ করে বললাম, 'দেখুন, ভয়ের কোন কারণ নেই, সবমাত্র কাল এ-বাড়ী থেকে উঠে গেছি, তাই হঠাৎ অন্তমনস্ক হয়ে...' বলতে বলতে পিছু হেঁটে চৌকাঠ ডিঙিয়ে একদোড়ে রাস্তায় এসে পড়লাম।

কি সর্ব্বনেশে বিপদেই পড়েছিলাম। খুব বেঁচে গেছি। কি ভাগ্যি গুর চীৎকারটা কেউ শুনতে পায় নি! মেয়েটি আমাকে তার স্বামী ভেবেছিল। সে ধারণাই করতে পারে নি যে এমন সময় তার স্বামী ছাড়া আর কোন পুরুষ-মাল্লুষ এ-ঘরে ঢুকতে পারে! কাঙ্ক্ষনও হয়তো রান্না শেষ করে অমনি কোন একটা সেলাইয়ের কাজ নিয়ে বসেছে—গেলেই বলবে, 'হ্যাঁ গা, এত রাত হ'ল যে।'...তাড়াতাড়ি গা কেলতে লাগলাম।

নূতন জায়গায় একলা কাঙ্ক্ষনের নানা অস্থবিধা হচ্ছে

নিশ্চয়ই। একা মাচুষ সে,—আজ আমার উচিত ছিল শীগগির শীগগির কিরে ঘব-গুছানর কাজে তাকে সাহায্য করা।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি, বাড়ীওয়াল হেঁকে বললে, 'কে?'

বললাম, 'আমি রাজেন'।

'ও, রাজেন বাবু!'

উপরে উঠে গেলাম। দেখি, কাঙ্ক্ষন তখনও রাঁধছে। জুতোর শব্দ পেয়ে বললে, 'হ্যাঁ গা, ক'টা বেজেছে?'

'সাড়ে আটটা!'

'এত রাত হয়ে গেছে! ঘরদোর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'বে সাজিয়ে-গুছিয়ে বাথতে রাখতে বড্ড দেরি হয়ে গেল!'

উঠে এসে বললে, 'খিদে পেয়েছে খুব?' আমার উত্তরেব অপেক্ষা না ক'বেই বললে, 'পাবে না, সেই কোন্ সকালে ছুটী ঝোলভাত মুখে দিয়ে গেছ।' তাড়াতাড়ি গিয়ে তরকারি নাড়তে নাড়তে বললে, 'নাও, হাতমুখ ধুয়ে নাও, আমার ততক্ষণে হয়ে যাবে!'

সত্যি, কাঙ্ক্ষন সমস্ত ঘরদোর পরিষ্কার করে সাজিয়ে ফেলেছে, যেখানে যেটি মানায়। মনে হচ্ছে, এরা যেন ঐখানেই বহুদিন ধরে আছে। নূতন জায়গা বলে একটুও বাধে-বাধে ঠেকছে না। মেয়েদের রুচি আছে, এরা জানে। কেমন ক'বে তাদের ছোট পৃথিবীটিকে গড়ে তুলতে হয়।

রাত্রে শুয়ে গল্প করতে করতে এক সময় জিগোস করলাম, 'কাঙ্ক্ষন, পুটুর কথা তোমার মনে পড়েছে?'

কাঙ্ক্ষন জবাব দিলে, 'তাড়াতে আমরা, মায়ী ক'রে লাভ কি বল না—আজ আজি কাল নেই!'



অলখ-ঝোরা

শ্রীশান্তা দেবী

(২৭)

মিলির গায়ে-হলুদে মহা কোলাহল। সকালবেলাই সকলের চেয়ে জমাট উৎসব লাগিয়াছে। স্বধা ও হৈমন্তী ত প্রভাতই আছে, তাহার উপর মিলির আনন্দের সনারোহ বৃদ্ধি করিবার জন্য আসিয়াছে স্নেহলতা, মনীষা, ইন্দুপ্রভা, পঙ্কজিনী, ইত্যাদি সখীর দল। আত্মীয়-গোষ্ঠীর দুই-চারিজন মেয়েও জুটিয়াছে। বাকী বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেই নিমন্ত্রণের সময় মত আসিবেন। বিবাহ-উৎসবের দিনে বড় সভায় সামাজিক আইন-কানূনের বাঁধনের ভিতর স্বাধাদের সংঘত হইয়া চলিতে হইবে, আজিকার মরোয়া উৎসবে সেই তরুণী সখীর দল আদিম মানবীদের মত উন্মত্ত উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। তাহারা ভক্ততার নৃশংস টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। এ ঘেন হোলির উৎসবের রং-খেলা। মনীষা ও ইন্দুপ্রভার কিছুদিন পূর্বে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, স্বতরাং তাহারা ই নেত্রী হইয়া এক-একতাল হলুদ লইয়া মেয়েমহলে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া বেড়াইতেছে। যে তাহাদের সম্মুখে পড়িলে তাহার আর রক্ষা নাই, আগাগোড়া তাহাকে রাঙাইয়া দিয়া তবে ছাড়িবে। বহুতাদের ভিতর স্বধা, হৈমন্তী ও স্নেহলতারই সকলের চেয়ে ছুগুতি বেশী। এখনও অবিবাহিতা থাকার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তরূপ মনীষা ও ইন্দুপ্রভার সকল অভ্যাচার তাহাদের সহিতে হইতেছে। মিলির গায়ে হলুদ দিয়াই স্বাধার হাতে বত হলুদ ছিল সব গিয়া পড়িল স্বধা, হৈমন্তী ও স্নেহলতার মাথায়। বেচারী স্নেহলতা জী-আচারের শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, তাই একখানা স্তম্ভর ঢাকাই শাড়ী ও রেশমের পাড়-তোলা ব্লাউস পরিয়া আসিয়াছিল। সখীদের অভ্যাচারে তাহার সখের কাপড়-জামার যা চেহারা হইল তাহাতে সাত ধোপেও সেগুলি আর ভজ-সমাজে পরিবার মত হইবে না।

হৈমন্তী বলিয়াছিল, “বেচারীর ভাল কাপড়খানা নষ্ট ক’রে

দিলে ?” মনীষা দুই হাতে দুই তাল হলুদ লইয়া মাথার দু’টি বাঁধিয়া মুখ নাড়া দিয়া বলিল, “গেলই বা একখানা ভাল কাপড়। এখনও ত ওর বিয়েই হয় নি। বিয়ে হ’লে কত কাপড়-জামা পাবে, একখানার কথা অত মনেও থাকবে না। এই হলুদ গায়ে পড়া কত ডাগি, ওর পরেই বিয়ে এগিয়ে আসবে।”

স্বধা বলিল, “ডাগি হোক বা না-হোক, তোমার মত রণরঞ্জিনীর সঙ্গে ত আর ও পারবে না।”

মনীষা বলিল, “ভুলে গিয়েছিলাম তোমার কথা। এখনও অর্ধেক কাপড় সাদা, আবার পরের হয়ে ওকালতি। দাঁড়া, তোকে একটু ভাল ক’রে ছুপিয়ে দি। স্নেহর মুখখানাও একটু সোনার বরণ না হ’লে ভাল দেখাচ্ছে না।”

ছুটাছুটি হড়াহড়ি অনেক হইল, কিন্তু মনীষার হাত হইতে কেহ নিষ্কৃতি পাইল না।

স্নেহলতা বেচারীর কাপড় ত গিয়াইছিল, তাহার উপর সমস্ত মুখখানাও হলুদে রাঙা হইয়া গেল। স্বধার শাড়ীর গিঠটুকু বাকী ছিল, এবার সেটুকুও রহিল না। পালিত-গৃহিণী বলিতে আসিয়াছিলেন, “ওরে, যারা ভাল কাপড়-চোপড় প’রে এসেছে তাদের শুধু একটা ক’রে কপালে টিপ দিয়ে ছেঁড়ে দিবি, অমন ক’রে সব ধ্বংস ক’রে দিস নে।”

মনীষা বলিল, “তা বইকি জ্যাঠাইমা, বিয়ে মেয়ে-মানুষের একবারই হয়, জেনে শুনে যারা ভাল কাপড় প’রে আসে তাদের কাপড় বাঁচাতে গেলে আমাদের আর ফুটি করা কপালে হয় না। ওদের ত দেবই সং সাজিয়ে, আপনাকেও আজ অমনি ছাড়ব না।”

জ্যাঠাইমা বলিলেন, “ওমা, আমাকেও কি ছেলেমানুষ পেলি ? কুটুমবাড়ীর লোকের সামনে বেরোব কি ক’রে ওই মুক্তি ক’রে ?”

ইন্দুপ্রভা বলিল, “আহা, কুটুমবাড়ীর লোকেরা সব বিলেতের জাহাজ থেকে এই নামল কিনা, গায়ে হলুদ কাপড়

বলে জানে না। আজকের দিনে কাকর কাপড় সাদা থাকতে নেই।”

এমন একটা ছল্লোড়ের ব্যাপার দেখিয়া সতু এবং শিবুও মেয়েদের দলে ভিড়িয়া গেল। অল্প মেয়েদের গায়ে রং দিবার সাহস তাহাদের ততটা ছিল না। কি আর করে? খানিকক্ষণ ছুই বন্ধু পরস্পরকেই হলুদ মাখাইল। স্বাধা, হৈমন্তী ও জ্যাঠাইয়ার গায়ে হলুদ মাখাইবার আর স্থান ছিল না, মনীষা ও ইন্দুপ্রভার কল্যাণে তাহাদের গায়ের রং কিংবা কাপড়ের রং চেনাও শক্ত। তবু শিবু ও সতু সেখানে গিয়াও কিছু ছটোপাটি করিল। কিন্তু তেলা মাথায় তেল দিয়া কি স্বথ? মেয়েদের আশা ছাড়িয়া দিয়া তাহারা বাহির-বাড়ীতে ছুটিল। সকলে বর্দ্ধ মিলাইতে জিনিষ সামলাইতে ব্যস্ত, পিছনে চাহিয়া কেহ দেখে নাই। অকস্মাৎ তপন, নিখিল ও মহেন্দ্রকে সচকিত করিয়া শিবু ও সতু তাহাদের তিন জনের মাথায় এক-এক ঘটি হলুদ-জল ঢালিয়া দিল।

এমন অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া যদিও তাহারা একটু বিস্মিত হইয়াছিল, তবু উপস্থিত-বুদ্ধি যোগাইতে নিখিলের দেরি হইল না। সে ছুই হাতে লাল ও কালো কালির দোয়াত দুইটা তুলিয়া ছুই জনের মাথায় উগুড় করিয়া দিল।

মহেন্দ্র কেবল বলিল, “ছি, ছি, শুভদিনে কালো কালিটা ঢেলে কি বিস্ত্রী কাণ্ড করলে।”

তপন বলিল, “মুষ্টিমান অমঙ্গলদের মাথায় কালো কালি ঢাললেই মাথবের কিছু শুভ হবার সম্ভাবনা থাকে।”

শিবু বলিল, “আমি অত ঠাণ্ডা ছেলে নই, এক দোয়াত কালি ঢেলেই আমার হামিয়ে দিতে পারবেন না। হুচ্চ ঘোষণা আজ আমিই করেছি, আমার প্রতিশোধ নেওয়া সাজে না, না হ’লে আরও অনেক হুদুস্ত ও হুগচ্চি জিনিষ ছুড়তে আমি পারি।”

নিখিল শিবুকে কাছে ডাকিয়া কানে কানে অঞ্চল সজোরে বলিল, “এই কার্তিক গণেশ দুটিকে হলুদ মেখে ত দিবি দেখাচ্ছে। আজ অনেক ফুলের মালা এসেছে। দু-জনের হাতে দু-ছড়া দিয়ে ভিতরে নিয়ে যাও না। হয়ত ওদেরও অদৃষ্ট প্রসন্ন হ’তে পারে। মহেন্দ্র আর তপন দু-জনেরই অবস্থা সঙ্গীন।”

শিবু বলিল, “বাপ রে, ওসব বাদর-মি করতে গেলে আমার সবাই মিলে মেরে শেষ ক’রে রাখবে।”

মেয়েরা উঁকি দিয়া বাহিরের ব্যাপার দেখিল, কিছু আন্দাজ করিল, কিন্তু কেহ কাছে আসিল না।

দুপুরেই নিমন্ত্রিতাদের আহ্বানের পাট, কাজেই ভোরের পালা বেলা বারোটায়ে শেষ করিয়া এই দিকই সকলকে মন দিতে হইল। কলিকাতার মেয়েশক্তি, সহজে ত নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। বাহার বাড়ীতে যে সময়ে নিমন্ত্রণ খাওয়ার রীতি, কিংবা বাহার সন্ধ্যারে যখন ছাড়া বাহিরে যাওয়া চলে না, তিনি সেই সময় আসিবেন। বারোটা-একটার পর হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত যাহার যখন খুশী আসিয় হাজির, কতবার যে খাবার আসন পড়িল তাহার ঠিক নাই। সেদিনকার মত বাড়ীর লোকদের মধ্যাহ্নভোজনটা বাদ গেল; সেই রাত দুপুরে তাহাদের প্রথম ও শেষ আহ্বার। ছেলেরা পাত পাড়িয়া বসিতে না পাইলেও পরিবেশ করার ফাঁকে ফাঁকে সুবিধা পাইলেই বেগুনীভাজা, নুদেশ ও চা দিয়া কঠরাগিকে অনেকখানি সংযত রাখিয়ছিল, মেয়েদের অনেকের ভাগ্যে সেটুকুও জোটে নাই।

মহিলা-সভায় একদল আসিয়াছিলেন বাড়ী হইতে খাইয়া, নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে শুধু গহনা-কাপড় দেখিতে ও দেখাইতে। তাহারা অলঙ্কারের ছাতি চারিধারে ঠিকাইয়া একটু ক্ষুদ্র গতিতেই বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। আর একদল বাড়ীর সকল ঝি-বৌকে একত্রে জুটাইয়া আনিয়া সাধ্যমত খাইয়া ও সাধ্যমত বাধিয়া লইয়া গেলেন। তৃতীয় দল ক্ষুধার মুখে যতখানি ভাল লাগিল মুখে দিয়া, বহুকাল পরে বন্ধুবান্ধবের সহিত সুদীর্ঘ আলাপে মনটা খুশীতে হাক করিয়া মন্থর গতিতে বাড়ী ফিরিলেন।

এই সকল দলের মেয়েদের যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা মিটাইয়া যখন বাড়ীর ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পাত পড়িল তখন বাইবার ইচ্ছা বিশেষ কাহারও না থাকিলেও একসঙ্গে বসিবার আগ্রহেই সকলে বসিল। মনীষা ও ইন্দুপ্রভা পরের বাড়ীর বৌ, তাহাদের সকাল সকাল খাওয়াইয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছে। পঙ্কজিনী ও স্নেহলতার খাওয়া হইলেই এই বাড়ীর গাড়ীতেই তাহাদের পৌছাইয়া দিবে। স্বধাকে কিন্তু হৈমন্তী বাইতে দিবে না। স্বাধা এত বছরের মধ্যে একরাত্রিও

হৈমন্তীর বাড়ীতে কাটায় নাই, আজ তাহাকে থাকিতেই হইবে। হৈমন্তীর একলার ঘরে পুরু গদি-দেওয়া একাঙ পালকের উপর পাখা চলিতেছে, সেইখানে দুই বন্ধুতে শুইয়া আজিকার রাত্রিটা গল্পে কাটাইয়া দিলে কি আনন্দরই না হয়। কতক্ষণই বা আর রাত আছে। এই কয়টা ঘণ্টা এমনি গল্পগুজবে কাটিলে মিলিদিদির বিয়েটা চিরকাল মনে থাকিবে। এই বয়সের গল্প সহজে ত ফুরাইতে চাহে না, তাহা পাখীর মত ডানা মেলিয়া কত দেশদেশান্তরে কাল-কালান্তরে ঘুরিবে।

সুখা রাজী হইল সহজেই। হয়ত এ সুযোগ আর আসিবে না, দুই দিন বাদে হৈমন্তীরও বিবাহ হইয়া যাইবে, তখন আর এ-বাড়ীর সঙ্গে তাহার কিসের সম্পর্ক থাকিবে? জীবনের এই দ্বিতীয় পর্বটা শেষ হওয়ার সূচনা যেন আজ হাওয়া ভাসিতেছে।

শিবু এখন মস্ত ছেলে, সে ঘর-সংসারের কাজ মেয়েদের মতই বুঝিয়া-সুঝিয়া করিতে পারে। সুখা তাহাকে সকাল-হইতেই বলিয়া রাখিয়াছিল, আজ যদি তাহার বাড়ী ফেরা না হয়, শিবু যেন সব কাজকর্ম একটু দেখে। শিবু বলিল, “ওই-টুকু কাজের জন্ত এত ভাবছ কেন? তুমি দু-দিনই থাক না, আমি তোমার তেল ঘি চিনি আটা বেশ সামলাতে পারব।”

কিরে এসে দেখো এখন সংসার ছারখার হয়ে যান নি।” তার পর একটু খামিয়া বলিল, “নিখিল-দারা কি সব বলাবলি করছে; ইচ্ছে কর ত মিলিদিদির সঙ্গে তোমরা দু-জনেও লাগিয়ে দিতে পার, তাহলে আর ভাঁড়ারের চাবি-কিরে নিতে হবে না।”

সুখা একবার চম্কাইয়া উঠিয়া পরক্ষণেই শিবুকে ধমক দিয়া বলিল, “একরত্তি ছেলের বাদরামি করতে হবে না, থাম।”

খাওয়া-দাওয়ার পর সুখা ও হৈমন্তী সেই দক্ষিণের বারান্দাওয়ালা ঘরখানায় শুইতে গেল। বাড়ীতে আজ বাহিরের লোক আরও আছে, কিন্তু হৈমন্তী বেশী ভাগকে জ্যাঠাইমার ঘরে চালান করিয়াছে। নিতান্ত বাহাদের ফুলায় নাই তাহারা বসিবার ঘরে ঢালা বিছানায় স্থান লইয়াছে। হৈমন্তীর ঘরে শুধু সুখা থাকিবে। হলু-পর্কের পর সকলেই নুতন করিয়া সাজসজ্জা করিয়াছিল, সুখা

তেমন ভাল কাপড় আনে নাই বলিয়া হৈমন্তীরই একখানা চাঁপা-রঙের বেনারসী সে তাহাকে সখ করিয়া পরাইয়াছিল। এখন তাহার সব চেয়ে প্রিয় কাপড়।

আলনার উপর বেনারসীখানা রাখিতে রাখিতে সুখা বলিল, “কি সুন্দর শাড়ী ভাই এখানা, আমার কেবলই ভয় হচ্ছিল, কখন বুঝি ভাল ঝোল কিছু একটা ফে'লে বসি। অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড় চড় করে।”

হৈমন্তী তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, “ও, বড় যে মুখে কথা ফুটেছে তোমার! শীগগির অভ্যাস হবে দেখো। দিদির পালা হয়ে গেল, এই বেলা ত তোমার পালা।”

সুখা একখানা ডুরে কাপড় পরিয়া খাটের উপর পা ফুলাইয়া বসিয়া বলিল, “আহা, কি যে বল তার ঠিক নেই। তুমি থাকতে আমি আগে? কোন গুণে শুনি?”

হৈমন্তী সুখার এলো-খোঁপার কাঁটাগুলো খুলিয়া চিরুণী দিয়া তাহার চুলের গোছা আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিল, “গুণ তোমার বোঝবার দরকার নেই। যে তোমায় নিয়ে যাবে সে ভাল করেই বুঝবে কোন গুণে তার ঘর আলো হবে। সত্যি ভাই, তোমার যে বর হবে সে যদি একেবারে সাগর-ছেঁচা মানিকও হয় তবু আমার মনে হবে না তোমার উপযুক্ত হয়েছে।”

সুখা বলিল, “এমন একটি অমূল্য রত্ন কোথায় পাওয়া যায় শুনি? তাও ত আবাব একটি হ'লে হবে না। তোমারই কি আর যেমন-তেমন একটা হ'লে আমি তার হাতে তোমায় দিতে পারব? তোমার আগে সংসার সাজিয়ে দিয়ে তবে ত আমি নিজের কথা ভাবব। তুমি কি মনে কর, তোমায় একেবারে ভুলে সাগর-ছেঁচার সঙ্গে সাগরে তলিয়ে যেতে আমি পারব?”

হৈমন্তী সুখার লম্বা বিছনীর আগাম নীল রঙের চওড়া ফিতা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, “তবে তোমার আর আমার বিয়ে এক দিনে দু-দিকে দুটো সভা সাজিয়ে হবে, কেমন? তাতে রাজী আছ ত?”

সুখা বলিল, “আমার রাজী থাকার উপরেই সব নির্ভর করছে কি না! যা দেখছি, তুমি একলার সভাই শীগগির সাজাবে। সেদিন মহেশ্বরের সঙ্গে তোমার কি একটা মানভঞ্নের পালা হয়ে গেল। কি বল দিখি! তাঁকে

দেখে আমার কেমন যেন লাগল। কিন্তু ভাই যদি তোমার আমাকে বলতে আপত্তি না থাকে তাহলেই ব'লো, আমি জোর ক'রে শুনতে চাইছি না।”

স্বধার চুল বাঁধা শেষ হইয়া গিয়াছিল, হৈমন্তী নিজের চুলগুলো এলাইয়া, দুই হাতে স্বধাব গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার দুই চোখে ভিতর তাকাইয়া, একটু দুটু হাসিয়া বলিল, “তোমাকে বলি নি ব'লে তোমার অভিমান হয়েছে বুঝি? তুমি নাকি আবার রাগ কবতে জান না।”

স্বধা হাসিয়া বলিল, “বাগ কেন কবব? তুমি কি আর আশ্চর্য্য সব কথাই আমাকে বল? বয়স বাড়াব সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের চিন্তা নিয়ে নিজেকে থাকে, তখন যে সব কথাই অল্প লোকের কৌতুহল দেখানো ভাল নয়—এইটুকু কি আর আমি জানি না।”

হৈমন্তী হাসিয়া স্বধার গায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, “ও, তুমি বুঝি এখন অল্প লোক হয়েছ? আচ্ছা, আমি নিজেই অল্প লোককে সব বলব।”

স্বধা বলিল, “এস আগে তোমার চুলটা আমি বঁধে দি। পরে ওসব কথা হবে এখন।”

হৈমন্তী কিন্তু কথা খামাইল না। “মহেন্দ্র-দার ওই ত নারদমুনির মত ধবৎ-ধবৎ, কিন্তু মানুষটা ভাই ভারি সেক্টিমেণ্টাল। তুমি ভাবতেই পার না কি রকম বিপদে গুকে নিয়ে পড়েছিলাম।”

স্বধা বলিল, “কি আবার বিপদে পড়লে? বেশ ত আস্ত ফিরে এলে দেখলাম দু-জনেই।”

হৈমন্তী বলিল, “আস্ত ত এলাম। কিন্তু দ্বিদির বিয়ের গয়না গড়াতে গিয়ে নিজের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হবে তা ত ভাবি নি। মহেন্দ্র-দাকে আমি খুবই পছন্দ করি, গুকে নিয়ে ঠাট্টার স্বরে কথা বলতে যে আমার ভাল লাগে তা নয়। কিন্তু এ সব কথার ছুটা মাত্র স্বর আছে, যদি মত থাকে তবে গভীর স্বর, আর যদি মত না থাকে তাহলেই ঠাট্টা। স্বভাব আমার কথাগুলো ঠাট্টার মত শোনালেও গুকে আমি ঠাট্টা করছি মনে ক'রো না।”

স্বধা বলিল, “বেচাবীর মনের যেটা সত্যি কথা সেটা নিয়ে ঠাট্টা তুমি করছ এ আমি কখনই ভাবতে পারি না।”

হৈমন্তীরও চুল বাঁধা শেষ হইয়া গিয়াছিল। জানালার

দিকে মাথা করিয়া দুই জনে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। বর্ষার জলো-হাওয়া ঘরের ভিতর ছ ছ কবিয়া বহিয়া আসিতেছিল। দুই বন্ধুর বিনিময় চোখে হাওয়াটা ভালই লাগিতেছিল। হৈমন্তী বলিতে লাগিল, “মহেন্দ্র-দা জামানী চ'লে যাবে ব'লে ভয়ানক মাথা গোলমাল ক'রে ব'সে আছে। তার নাকি যাবার আগেই এদিককার সব ব্যবস্থা ক'রে যাওয়া দরকার। কিন্তু দরকার এক জনের হ'লেই ত পৃথিবীতে সব জিনিষ সেই মত হয় না।”

স্বধা হাসিয়া বলিল, “কিন্তু কি তার দরকাব হয়েছে বিশেষ ক'রে? তোমাকে দরকার ত?”

হৈমন্তী একটু লাল হইয়া বলিল, “তাই ত মনে হচ্ছে। আমি ভাই, মহেন্দ্র-দার সম্বন্ধে এ সব কথা কখনও ভাবি নি। ওর কাছে পড়েছি, ওর সঙ্গে বেড়িয়ে গল্প ক'বে কত দিন কাটিয়েছি, ও যেন আমাদেরই এক জন হয়ে গিয়েছে। ওকে দুখ দিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু তবু আমার পক্ষে ওর ইচ্ছা পূর্ণ করা যে সম্ভব নয় এটা আমাকে বলতেই হবে।”

স্বধা বলিল, “তুমি কি তাঁকে কিছুই বল নি? তাঁকে দেখে ত তা মনে হ'ল না। একটা কিছু প্রলয় কাণ্ড ঘটেছেই বরং মনে হ'ল।”

হৈমন্তী বলিল, “স্পষ্ট কথাটা উচ্চারণ ক'রে বলি নি বটে, কিন্তু যতভাবে কথাটাকে এড়িয়ে চলেছি তাতে কার আর বুঝতে বাকী থাকে? মহেন্দ্র-দা রেগেই অস্থির। আমি কি ক'রে যে বাড়ী পালিয়ে আসব ভেবে পাচ্ছিলাম না।”

স্বধা বলিল, “বেচারী মহেন্দ্র-দা! তোমার মত জিনিষের উপর তার যে লোভ হয়েছে তাতে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কথায় বলে বটে জহরীই মাণিক চেনে। কিন্তু সত্যি মাণিক এক্ষেত্রে জহরী না হ'লেও চেনা যায়। সে ত চাইবেই ভাল জিনিষ। তবে সংসারে মেয়ের পছন্দটার কথাও ত ভাবতে হবে? ছেলেবেলা বুঝতে পারতাম না। কিন্তু এখন ত দেখছি...”

স্বধা কথা বলিতে বলিতে খামিয়া গেল। হৈমন্তী তাহাকে নাড়া দিয়া বলিল, “এখন কি দেখছ? বললে না যে বড়।”

স্বধা হৈমন্তীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, “এই মিলিটিকে দেখলাম, তোমাকে দেখছি।” একটুখানি

হাসিয়া স্বধা আবার বলিল, “কয়েক বছর আগেও আমি কি ভীষণ হাবা ছিলাম। বাইরের একটা মাল্লবের জন্তে মাল্লব কি করে যে এত মাথা ঘামাতে পানে, আর কেনই বা এত মাথা-কোটাছুটি তার জন্তে চলে তা ভেবেই পেতাম না।”

হৈমন্তী তাহার চিবুকটা নাড়া দিয়া বলিল, “এখন সব বুঝতে পেরেছ ত ? আর কিছুদিন থাক না, একেবারে হাতে-কলমে শিখবে।”

স্বধা বলিল, “ও সব জিনিষ যত না-শেখা যায় ততই পৃথিবীতে স্থখে থাকা যায়। দেখছ না মহেন্দ্র-দার অবস্থা।”

হৈমন্তী বলিল, “সত্যি, বেচারী বড় জন্তে বড় দুঃখ হয়। মিলিদির বিয়ে হয়ে গেলে ও বোধ হয় রাগ করে আর আমাদের বাড়ী আসবেই না। ও না এলে ওকে খুঁই ‘মিস’ করি আমি।”

স্বধা বলিল, “তবে আব একবার ভেব দেখ না, ওব কথায় রাজী হওয়া যায় কি না। মহেন্দ্র-দা ত হাতে স্বর্গ পাবেন।”

হৈমন্তী স্বধাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাব বুকের ভিতর মাথাটা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, “সে যে আমাব সাখ্যের অতীত হয়ে গেছে ভাই, কোন উপায়েই তা আর হয় না। আমাকে দেখে যে বুঝেছ বল, ঠিক জিনিষটা কি বুঝতে পেরেছ ? বল ত কে সে ?”

স্বধার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। সেখ বুজিয়া যে-সত্যের ছায়ায় একদিন সে এড়াইতে চাহিয়াছিল, তাহা আজ চোখের সম্মুখে আগুনের মত উজ্জ্বল হইয়া জলিয়া উঠিল। তাহাব কথার সুরে যে-হতাশা ধনিয়া উঠিল তাহা হৈমন্তী বুঝিতে পারিল না। সে বলিল, “ঠিক কি করে বলব ভাই ? আন্দাজে যা তা বলতে চাই না।”

হৈমন্তী মুখ না তুলিয়াই বলিল, “তাকে তুমি প্রতিদিনই ত দেখছ। তুমি উদাসীন কবি, তাই এত দিন আমার এত কাছে থেকেও বুঝতে পার নি। আমার সমস্ত মন জুড়ে যে আকাশের আলো রয়েছে তাকে চেন না ? তপন...”

স্বধার বুকের ভিতর হাতুড়ির ঘায়েব মত একটা আঘাত সজোরে লাগিল। এক মুহূর্তে ঘেঁ তাহাব সমস্ত সমজা লোপ পাইয়া গেল। সে শুইয়া না থাকিলে পড়িয়া যাইত। হৈমন্তীর অনেকগুলি কথাই স্বধার

কানে আসে নাই। হঠাৎ সে শুনিলা হৈমন্তী বলিতেছে, “আমি বকুবক করে অনেক বকে গেলাম, তুমি আমার একটা কথারও জবাব দিলে না। তোমাকে এত দিন কিছুই বলি নি বলে খুব কি রাগ করেছে ? এক-তরফা ব্যাপারের কথা বলতে মাল্লবের সব সময় সাহসে কুলোয় না। কোনও দিন বলতে পারব ভাবি নি, আজ তোমার কাছে আপনি কথা বেরিয়ে এস।”

স্বধা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সজাগ হইয়া বলিল, “না ভাই, আমি একটুও বাগ করি নি। আমি কি এমনই মূর্থ যে এতেও রাগ কবব ? তুমি যে আজ আমায় বললে এই ত আমার মহাভাগ্য ! আমাকে যদি তুমি আগের চোখে না দেখতে তাহলে বলতে পারতে না।”

হৈমন্তী বলিল, “যে-কথা কাউকে বলা যায় না, তা তোমাকে বলতে পাবে আমার মনটা হাফা হ’ল। আর যাকে বলা যায় সে নিজে না শুনতে চাইলে আমি ত বলতে পাবব না। কিন্তু তার উদাসীন দৃষ্টি, তাব বিশ্বভোলা ধবণ দেখে মনে ত হয় না যে সে কোনও দিন আমাব একথা শুনতে চাইবে। এ আমাব দুঃখ ও স্থখেব বোঝা আমি একলাই বয়ে বেড়াব।”

স্বধা কথা বলিল না, স্বদীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। হৈমন্তী তাহার বুকের আরও কাছে সবিস্মা আসিল। স্বধা হৈমন্তী বন চুলের উপর ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। চূর্ণ বৃষ্টির কথা হাওয়ায় ভাসিয়া আসিয়া তাহাদের মুখেচোখে পড়িতে লাগিল, কেহ উঠিয়া জানালা বন্ধ করিল না। ঘরের মেঝেতে অঙ্ককাবে জল গড়াইয়া চলিতে লাগিল। বাহিরে বৃষ্টির ঝর-ঝর শব্দে শহবেব শেষবাত্রেব অন্ত সব শব্দ ডুবিয়া গিয়াছে।

স্বধাব চোখেব জলে হৈমন্তীর অর্ধসিক্ত চুলগুলি আরও ভিজিয়া উঠিতেছিল। অকস্মাৎ হৈমন্তী মুখ তুলিয়া স্বধার দিকে চাহিয়া বলিল, “স্বধা, তুমি কান্দছ ? ছি ভাই, তোমার মন এত নরম জানলে তোমাকে কোন কথা আমি বলতাম না। পৃথিবীতে স্থখদুঃখ এক সত্যোয় গাঁথা, তাকে চোখে দেখার স্থখ এত বড় ব’লেই, না-দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনায় আমার এত ভয়। এর জন্ত কেদো না। দুঃখ যদি কম পেতাম তাহলে স্থখও এমন গভীর করে জানতাম না, এটা মনে রাখতে হবে।”

হৈমন্তী স্বধার কপালের উপর একটি চুম্বন করিল। তাহাদের দুই জনের চোখেব জল একত্রে মিশিয়া ঝবিয়া পড়িল।

স্বধা আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, “রাত শেষ হয়ে এল, তুমি যুমোও ভাই, আব আমি কান্দব না। আমাদের নিছক হাসির দিন শেষ হয়েছে, এবার জীবনে আঘাতের পালা, পরীক্ষার পালা। তাতে ভেঙে পড়লে চলবে কেন?”

হৈমন্তী বলিল, “কাল মিলিদির বিয়ে, ভুলে গিয়েছিলাম। চোখের জল ফেঁলে তার অকল্যাণ কবব না। আমার পাগলামিতে তোমাকে স্বচ্ছ কাঁদালাম।”

(২৮)

মিলির বিবাহের পর স্বধা ও হৈমন্তীব সঙ্গে তপন-নিখিলদের দেখাওনা কিছুদিন হয়ত হইবে না, এই জ্ঞান তাহারা সকলেই মনে মনে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। মহেন্দ্র ত মনেব কথা প্রকাশ করিয়াই ফেলিয়াছিল, তপন-নিখিলও ওই কথাই মনে মনে জপ করিতেছিল।

দক্ষিণেশ্বরের বাগানে তোলা বহু পুরাতন একখানা ছবি হইতে একটি মুখ এনলার্জ করা হইয়া তপন আপনাব দেহাজেব ভিতর বাধিয়াছিল। দিনে দুই বেলা সেই ছবির উজ্জল চোখ দুটির দিকে তাকাইয়া সে বলিত, “তোমাকে আমার পূজার অর্ঘ্য আজও নিবেদন করতে পারলাম না। জানি না কত দিনে আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে।”

মিলির বিবাহের দিন ভোরবেলা উঠিয়া তপন ছবিখানি বাহির করিয়াছিল। একটু বেলা হইলেই আজ ও-বাড়ী যাইতে হইবে। তাহার আগে নিরিবিলিতে সে ছবিখানি একবার দেখিয়া লইতেছিল। চাহিয়া চাহিয়া তাহার চোখের তৃষ্ণা মিটিতেছিল না। তপন বলিল, “তুমি এতই স্বপ্নের যে তোমার চেয়ে স্বপ্নের পৃথিবীতে কিছু আছে কিনা এটা ভাববার অবসর কি ইচ্ছাও আমার হয় না।”

হঠাৎ দরজার পিছনে কাহার পদধ্বনি শুনিয়া তপন চমকাইয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল, সহস্র মুখে নিখিল দাঁড়াইয়া। তপন ছবিখানি উল্টাইয়া আবার দেহাজেব ভিতর রাখিল।

নিখিল বলিল, “কার ছবি দেখছিলে দেখি না?”

তপন একটু মুহূর্ত হাসিয়া বলিল, “নাই বা দেখলে! না, দেখলে কিছু ক্ষতি হবে না।”

নিখিল বলিল, “তথাস্তু। তবে ভোরবেলা যা মনে ক’বে তোমার বাড়ী এসেছিলাম তা সত্যিই প্রমাণ হ’ল। ‘হেড ওভার ইয়াস’ ইন লন্ডন, কি বল?”

তপন শুধু হাসিল। নিখিল বলিল, “যৌবনের ধর্ম, তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া শক্ত। আমিও যে পেয়েছি তা বলতে পারি না, তবে ঠিক তোমাদের মত নয়।”

তপন বেশী কৌতূহল না দেখাইয়া বলিল, “নানা রকম হওয়াই ত জগতের নিয়ম। সব যদি এক রকম হ’ত তাহ’লে পৃথিবীতে কোনও নতুনত্ব থাকত না।”

নিখিল বলিল, “আমার ওই ছবি মেয়েকেই ভারী চমৎকার লাগে। কোন দিকে যে মন দেব তা বুঝতে পারি না। তবে আমি জানি, মনটা স্থির করতে পারলে আমার মধ্যে একনিষ্ঠতার অভাব হবে না। যদি একান্তই কাউকেই না পাই, তা হ’লেও আমি বিবাহী হয়ে বেরিয়ে যাব না। নিজের অদৃষ্টলিপিতে সন্তুষ্ট থাকতে আমি জানি। তা ছাড়া যাকে একান্ত নিজের ক’রে চাওয়া যায় তাকে তেমন ক’বে না পেলেও আজীবন বন্ধুত্ব রক্ষা ক’রে যাওয়ার একটা সৌন্দর্য আছে। আমার সম্পত্তি সে হ’ল না ব’লে তাকে একেবারে ভুলতে চেষ্টা কেন করব?”

তপন বলিল, “ভুলতে না চাও ভুলো না; তবে মানুষ যেখানে ছবস্ত আগ্রহে কাউকে চায়, সেখানে না পেলে অধিকাংশ মানুষই বন্ধুত্বের সীমার মধ্যে নিজের মনকে স্বাভাবিক ভাবে প্রথম প্রথম শাস্ত ক’রে রাখতে পারে না। তাই একেবারে পলায়নের পথ তারা ধরে। যার নিজেকে নিজের হাতের মুঠির ভিতর রাখবার ক্ষমতা আছে তার বন্ধুকে সম্পূর্ণ পর ক’বে দেবার প্রয়োজন হয় না।”

নিখিল বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, “আচ্ছা, তবে তাই হবে। এস, তোমার সঙ্গে একটা সর্ভ করা যাক। বেশী ভূমিকা কবব না, আমি জানি তুমি আর মহেন্দ্র দু-জনেই হৈমন্তীকে ভালবাস। হৈমন্তীর মত মেয়েকে সকলেই যে চাইবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু স্বধার মধ্যে যে স্বরণার জলের মত একটা ‘ফ্রেশনেস’ আর নির্মলতা

আছে, সেটার তুলনা হয় না। ওর উপর কান্টি ঢেলে দিলেও এক ফোঁটা দাঁড়াবে না। আবার দেখবে বরফগলা জলের মত বলমল করছে। কিন্তু আশ্চর্য্য যে এ নিজে নিজের এ অপূর্ণ ত্রী কখনও দেখতে পায় না। হয়ত দেখতে পেলে এটা থাকত না।”

তপন একটুখানি হাসিয়া বলিল, “তুমি মন স্থির করতে পার নি বলে ত মনে হচ্ছে না, বেশ ত পেরেছ দেখছি।”

নিখিল বলিল, “তা নয়। পৃথিবীতে অথবা তাব চেয়ে অনেক ছোট গভীর ভিতর একটি মাত্র ভাল জিনিষ অথবা একটি মাত্র আশ্চর্য্য মেয়ে আছে যারা বলে, তার মিথ্যা কথা বলে। ওরা দু-জনেই আশ্চর্য্য হৃদয়ের দু-দিক দিয়ে। কিন্তু হৈমন্তীর কথা আমি বলব না, তোমরা ‘জেলন’ হবে। মাহুস ঘর বাঁধে এক জনকে নিয়ে এবং তাকে এতটা আপনার করে তোলে ও তার কাছে এতখানি পায় যে পৃথিবীতে আর সব আশ্চর্য্য জিনিষ সম্বন্ধে তার মন উদাসীন হয় যায়। অবশ্য, যদি তার ভাগ্য ভাল না হয় তবে এটা ঘটে না।”

তপন বলিল, “আচ্ছা, তাই যেন হ’ল, কিন্তু তোমার আসল বক্তব্য কি?”

নিখিল বলিল, “আমার আসল বক্তব্য হচ্ছে যে তোমরা দু-জনেই ত একদিকে ঝুঁকেছ। কিন্তু মনে রেখো, দু-জনের মধ্যে যে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করবে না, তাকে হাসিমুখে নিজের দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হবে। আমি তোমাদের তৃতীয় ‘রাইভাল’ হ’তে চাই না, তাই আমি চেষ্টা ক’বে দেখব স্বধার কৃপাদৃষ্টি আমার উপর পড়ে কি না। তোমরা কিন্তু ওখান থেকে তাড়া খেয়ে এদিকে আসতে পাবে না। এ কথাটা দিতে পারবে আমাকে? মহেন্দ্রকে এখন বলতে গেলে সে আমার মাথা ভেঙে দেবে, তাই তাকে আপাততঃ কিছু বললাম না, শুধু তোমাকেই বলছি। তুমি এই সহজ কাজটুকু পারবে কি না বল।”

তপন বলিল, “কাজ সহজ হ’লে পারা ত উচিত। তবে তোমার নিজের মনটাকে ভাল করে বুঝে নিয়ে এ-কাজে হাত দিও। পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য্য ও অপূর্ণ জিনিষ থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক মাহুসের পছন্দ ও ভাল-লাগার একটু বিশেষত্ব থাকে। সব ভাল জিনিষই সকলের কাছে ঠিক সমান ওজনে দেখা দেয় না, কাউকে

একটা জিনিষ আকর্ষণ করে বেশী, কাউকে আর একটা। তোমার ভাললাগার মধ্যে ওজনের কম-বেশী কি আর নেই? আমার বুদ্ধি আর মন দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে আমার ত মনে হয় কোথাও একটু কম-বেশী আছেই। যদি তা থাকে তবে তাকে অগ্রাহ্য ক’রো না। যে খুব পেটুক সেও অনেক সুখান্য পেলে তার ভিতর একটা আগে বাছবার চেষ্টা করে। মহেন্দ্রের কথা আমি জানি না, কিন্তু আমি কারুর পারিপার্শ্ব্য হয়েছি এটা তুমি আগে-ভাগে ধ’রে নিও না। তুমি নিজের মনব প্রয়োজন বুঝে কাজ ক’রো। তার পর কোথাও কৃতকার্য্য হ’লে বা না-হ’লে না-হয় আমাকে বলো। তোমার মন যদি হৈমন্তীর দিকে ঝুঁকে থাকে, আমাদের কথা না ভেবে নিজের ভাগ্যপরীক্ষা ক’রে দেখ, যদি স্বধার দিকে ঝুঁকে থাকে তাহ’লে সেখানেও চেষ্টা ক’বে দেখতে পার। আমি তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াব না।”

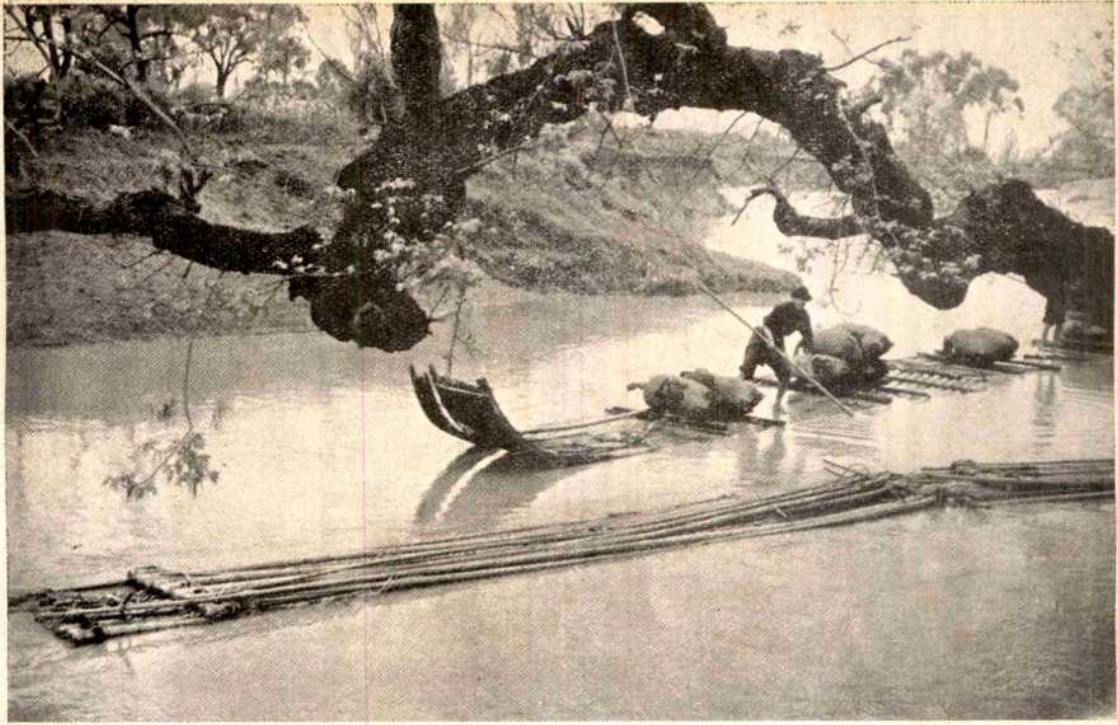
নিখিল তপনের বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া নিজের দুই হাতের ভিতর মুখখানা অনেকক্ষণ রাখিয়া শেষে বলিল, “কাজটা বড় শক্ত। এখন যদি নূতন ক’রে আবার ভাবতে বসি, হয়ত আমার ম্লান সব ওলটপালট হয়ে যাবে। তার চেয়ে যেখানে তিন জনে চুঁসোচুঁসি করবার সম্ভাবনা নেই, সেইখানে যাওয়াই ভাল। সত্যি কথা বলতে কি, আমার পক্ষে উনিশ-বিশ ঠিক করা সহজ নয়।”

তপন বলিল, “তুমি যে এমন অদ্ভুত মাহুস তা জানতাম না। তোমাকেই আমাদের মধ্যে সব চেয়ে স্বাভাবিক আমি মনে করতাম।”

নিখিল হাসিয়া বলিল, “হ্যাঁ, আমি অদ্ভুত সে ত মেনেই নিচ্ছি। তবে আমি জানি পৃথিবীতে আমার মত মাহুস আরও আছে। সে যাই হোক, তোমার কাছে আমি এক মাসের সময় চাই, তার পর আমার ভাগ্যে জয়পরাজয় যাই থাক, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে। তুমি যে দবজায়ই প্রার্থী হয়ে দাঁড়াও না, আমি সেখানে বন্ধুভাবে তোমার সাহায্য করব।”

তপন হাসিয়া বলিল, “আমার কথা অত নাই ভাবলে।”

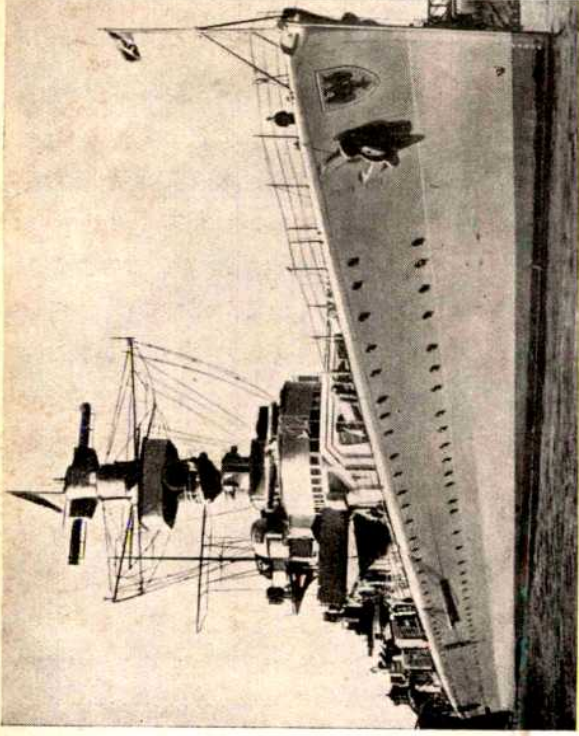
নিখিল তপনের একটা হাত ধরিয়া ঝাঁকাইয়া দিয়া বলিল, “ভাবছি কই? আমিই ত তোমার কাছে সাহায্য-ভিক্ষা করছি।” (ক্রমশঃ)



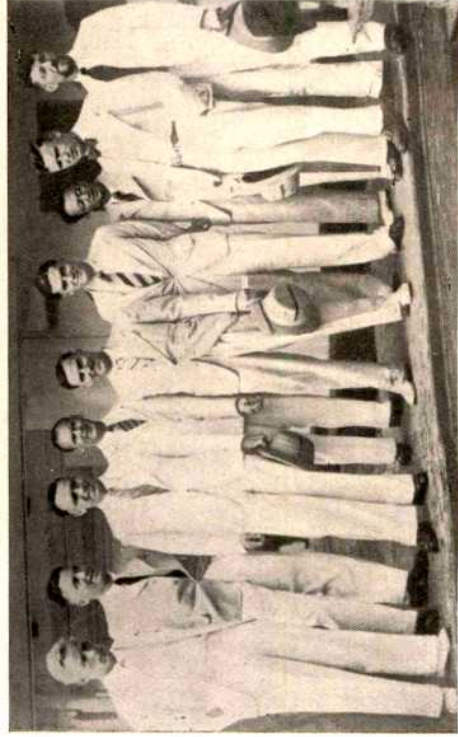
বাঁশের তৈরি চীনদেশীয় বিচিত্র ভেলা



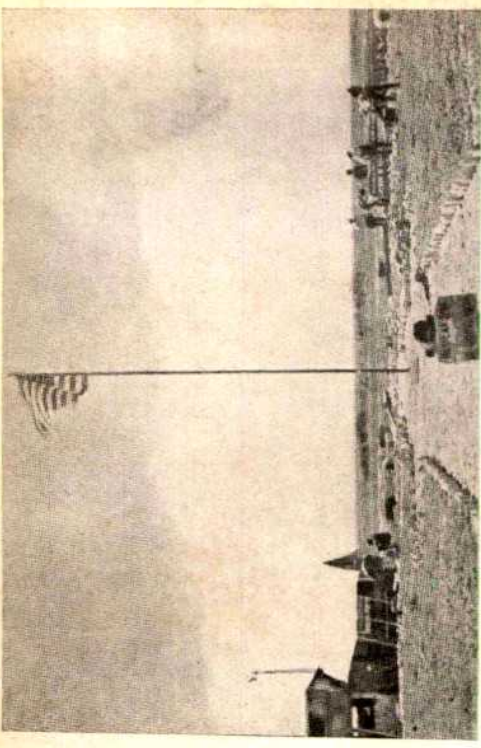
চীনে দক্ষিণ-পূর্ব কান্সুয়র দৃশ্য



জর্মন রণতরী 'ডুমেল্যাণ্ড'—স্পেনের সরকার-পক্ষীয় বিমানপোত ইহার উপর
বোমা ফেলায় জর্মনির প্রতিবাদে নূতন আন্তর্জাতিক বিপদের সূচনা হয়।



নাপ্রাপকৃত-অভিযানে ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্ভাগ্য জর্মন দল



হাঙলাও দ্বীপ—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 'এয়ার-বেস'। এখানে একটি স্থায়ী
'এয়ার পোর্ট'র ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। যিস্ এখেলিয়া
ইয়ারহাউটের বিমান এখানেই নিকরদেশ হইয়াছে।



অন্তর্মণ্ডলিয়ায় যাবাবর জাতির আবাস ও পশুচারণ

বানান-বিধি

শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে লিখিত পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

৩

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,

বানান সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য পড়েছি।

প্রথমেই বলা আবশ্যক ব্যাকরণে আমি নিতান্তই কাঁচা, তার একটা প্রমাণ 'মূর্খত্ব' শব্দে আমার ণ-কার ব্যবহার। এ সম্বন্ধে নিয়ম জানা ছিল কিন্তু বোধ হয় ণ-কারের বাহন স্বীকার করাতে ঐ শব্দটা সম্বন্ধে বরাবর আমার মন প্রমাদগ্রস্ত হয়েছিল। বস্তুত শিক্ষার বনিয়াদের দোষেই এ রকম ঘটে থাকে। ব্যাকরণে আমার বনিয়াদ পাকা নয় এ কথা গোপন করতে গেলেও খরা পড়বার আশঙ্কা আছে।

বাংলা বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করবার জন্ত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলুম। তার কারণ এই, যে, প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার সাহিত্যে অব্যাহত প্রচলিত হয়ে চলেছে কিন্তু এর বানান সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছে দেখে চিন্তিত হয়েছিলুম। এ সম্বন্ধে আমার আচরণেও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায় সে আমি জানি, এবং তার জন্ত আমি প্রশ্রয় দাবি করি নে। এ রকম অব্যবস্থা দূর করবার একমাত্র উপায় শিক্ষা-বিভাগের প্রধান নিয়ন্তাদের হাতে বানান সম্বন্ধে চরম শাসনের ভার সমর্পণ করা।

বাংলা ভাষার উচ্চারণে তৎসম শব্দের মর্যাদা রক্ষা হয় বলে আমি জানি নে। কেবল মাত্র অক্ষর বিজ্ঞানসেই তৎসমতার ভান করা হয় মাত্র, সেটা সহজ কাজ। বাংলা লেখায় অক্ষর বানানের নিজীব বাহন—কিন্তু রসনা নিজীব নয়। অক্ষর যাই লিখুক, রসনা আপন সংস্কার মতোই উচ্চারণ করে চলে। সে দিকে লক্ষ্য করে দেখলে বলতেই

হবে যে, অক্ষরের দোহাই দিয়ে যাদের তৎসম খেতাব দিয়ে থাকি, সেই সকল শব্দের প্রায় ঘোল আনাই অপভ্রংশ। যদি প্রাচীন ব্যাকরণকর্তাদের সাহস ও অধিকার আমার থাকত, এই ছদ্মবেশীদের উপাধি লোপ করে দিয়ে সত্য বানানে এদের স্বরূপ প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে পারতুম। প্রাকৃত বাংলা ব্যাকরণের কেমাল পাশা হবার দুরাশা আমার নেই কিন্তু কালোহর্য নিরবধিঃ। উক্ত পাশা এদেশেও দেহান্তর গ্রহণ করতে পারেন।

এমন কি, যে সকল অবিসংবাদিত তদ্ভব শব্দ অনেকখানি তৎসম-ঘোঁষা তাদের প্রতি হস্তক্ষেপ করতে গেলেও পদে পদে গৃহবিচ্ছেদের আশঙ্কা আছে। এরা উচ্চারণে প্রাকৃত কিন্তু লেখনে সংস্কৃত আইনের দাবি করে। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সমিতি কতকটা পরিমাণে সাহস দেখিয়েছেন, সে জন্তে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁদের মনেও ভয় ডর আছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাকৃত বাংলায় তদ্ভব শব্দ বিভাগে উচ্চারণের সম্পূর্ণ আনুগত্য যেন চলে এই আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যদি নিতান্তই সম্পূর্ণ সেই ভিত্তিতে বানানের প্রতিষ্ঠা নাও হয় তবু এমন একটা অল্পশাসনের দরকার যাতে প্রাকৃত বাংলার লিখনে বানানের সাম্য সর্বত্র রক্ষিত হতে পারে। সংস্কৃত এবং প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা ছাড়া সভ্য জগতের অন্য কোনো ভাষারই লিখনব্যবহারে বোধ করি উচ্চারণ ও বানানের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নেই কিন্তু নানা অসংগতিদোষ থাকা সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে একটা অমোঘ শাসন দাঁড়িয়ে গেছে। কাজ চলবার পক্ষে সেটার দরকার আছে। বাংলা লেখনেও সেই কাজ চালাবার উপযুক্ত নির্দিষ্ট বিধির প্রয়োজন মানি, আমরা প্রত্যেকেই বিধানকর্তা হয়ে উঠলে ব্যাপারটা প্রত্যেক ব্যক্তির ঘড়িকে তার স্বনিয়মিত সময় রাখবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেবার মতো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়-

সমিতির বিধানকর্তা হবার মতো জোর আছে। এই ক্ষেত্রে যুক্তির জোরের চেয়ে সেই জোরেরই জোর বেশি এ কথা আমরা মানতে বাধ্য।

রেকর্ডের পর ব্যঙ্গের দ্বিধা বর্জন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা' নিয়ে বেশি তর্ক করবার দরকার আছে বলে মনে করি নে। যারা নিয়মে স্বাক্ষর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিতের নাম দেখেছি। আপনি যদি মনে করেন তাঁরা অস্বীকার করেছেন তবুও তাঁদের পক্ষভুক্ত হওয়াই আমি নিরাপদ মনে করি। অন্তত তৎসম শব্দের ব্যবহারে তাঁদের নেতৃত্ব স্বীকার করতে কোনো ভয় নেই, লজ্জাও নেই। শুনেছি 'স্বজন' শব্দটা ব্যাকরণের বিধি অতিক্রম করেছে, কিন্তু যখন বিদ্যাসাগরের মতো পণ্ডিত কথাটা চালিয়েছেন তখন দায় তাঁরই, আমার কোনো ভাবনা নেই। অনেক পণ্ডিত 'ইতিমধ্যে' কথাটা চালিয়ে এসেছেন, 'ইতোমধ্যে' কথাটার ওকালতি উপলক্ষ্যে আইনের বই ঘাঁটবার প্রয়োজন দেখি নে—অর্থাৎ এখন ঐ 'ইতিমধ্যে' শব্দটার ব্যবহার সম্বন্ধে দায়িত্ব-বিচারের দিন আমাদের হাত থেকে চলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়-বানান-সমিতিতে তৎসম শব্দ সম্বন্ধে যারা বিধান দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন, এ নিয়ে দ্বিধা করবার দায়িত্ব-ভার থেকে তাঁরা আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। এখন থেকে কার্তিক, কৰ্ত্তা প্রভৃতি দুই ত-ওয়ালা শব্দ থেকে এক ত আমরা নিশ্চিন্ত মনে ছেদন করে নিতে পারি, সেটা সাংঘাতিক হবে না। হাতের লেখায় অভ্যাস ছাড়তে পারব বলে প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না, কিন্তু ছাপার অক্ষরে পারব। এখন থেকে ভট্টাচার্য্য শব্দের থেকে য-ফলা লোপ করতে নিবিকার চিন্তে নিম্নম হতে পারব, কারণ নব্য বানান-বিধাতাদের মধ্যে তিন জন বড়ো বড়ো ভট্টাচার্য্য-বংশীয় তাঁদের উপাধিকে য-ফলা বঞ্চিত করতে সম্মতি দিয়েছেন। এখন থেকে আৰ্য্য এবং অনার্য্য উভয়েই অপক্ষপাতে য-ফলা মোচন করতে পারবেন, যেমন আধুনিক মাধু ও চীনা উভয়েরই বেণী গেছে কাটা।

তৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমি নম্রদের নমস্কার জানাব। কিন্তু তদ্ভব শব্দ অপণ্ডিতের অধিকারই প্রবল, অতএব এখানে আমার মতো মাছঘেরও কথা চলবে—কিছু কিছু

চালাচ্ছিও। যেখানে মতে মিলছি নে সেখানে আমি নিরক্ষরদের সাক্ষ্য মানছি। কেন না অক্ষরকৃত অসত্যভাষণের দ্বারা তাদের মন মোহগ্রস্ত হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সমিতির চেয়েও তাদের কথার প্রামাণিকতা যে কম তা আমি বলব না—এমন কি হয়তো—থাক আর কাজ নেই।

তাহোক, উপায় নেই। আমি হয়তো একগুঁয়েমি করে কোনো কোনো বানানে নিজের মত চালাবো। অবশেষে হার মানতে হবে তাও জানি। কেন না শুধু যে তাঁরা আইন সৃষ্টি করেন তা নয়, আইন মানাবার উপায়ও তাঁদের হাতে আছে। সেটা থাকাই ভালো, নইলে কথা বেড়ে যায়, কাজ বন্ধ থাকে। অতএব তাঁদেরই জয় হোক, আমি তো কেবল তর্কই করতে পারব, তাঁরা পারবেন ব্যবস্থা করতে। মূদ্রাবন্ধ-বিভাগে ও শিক্ষা-বিভাগে শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে সেই ব্যবস্থার দৃঢ়তা নিতান্ত আবশ্যক।

আমি এখানে স্বপ্রদেহ থেকে দূরে এসে বিশ্রামচর্চার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। কিন্তু প্রারম্ভ কর্মের ফল সর্বত্রই অনুসরণ করে। আমার যেটুকু কৈফিয়ৎ দেবার সেটা না দিয়ে নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু এই যে দুঃখ স্বীকার করলুম এর ফল কেবল একল। আপনাকে নিবেদন করলে বিশ্রামের অপব্যয়টা অনেক পরিমাণেই অনর্থক হবে। অতএব এই পত্রখানি আমি প্রকাশ করতে পাঠালুম। কেন না এই বানান-বিধি ব্যাপারে যারা অসন্তুষ্ট তাঁরা আমাকে কতটা পরিমাণে দায়ী করতে পারেন সে তাঁদের জানা আবশ্যক। আমি পণ্ডিত নই, অতএব বিধানে যেখানে পাণ্ডিত্য আছে সেখানে নম্রভাবেই অনুসরণের পথ গ্রহণ করব, যে অংশটা পাণ্ডিত্যবর্জিত দেশে পড়ে সে অংশে যতটা শক্তি বাচালতা করব কিন্তু নিশ্চিত জানব, যে একদা “অন্তে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরন্তর।”

আলমোড়া, ১২/৬/৩৭

২
৬

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,

আলোচ্য বিষয়টি শুরু করবার পূর্বে অপ্রাসঙ্গিক ছোটো কথাটিকে সেরে নেওয়া যাক। আপনি লক্ষ্য করেছেন যে আপনার পক্ষে আমি 'দায়ী' শব্দে হ্রস্ব ইকার প্রয়োগ করেছি।

যদি আপনি ঠিকমতো পড়ে থাকেন তবে আমার পক্ষে বক্তব্য এই যে ঐ শব্দটির স্বরলাঘব আমার দ্বারা আর কখনোই ঘটে নি। আপনার চিঠিতেই প্রথম এই খলন হোলো তার দুটি কারণ থাকতে পারে, এক বেপথু, আর এক জরাজনিত মনোযোগের দুর্বলতা। বোধ করি শেষোক্ত কারণটিই সত্য। আজকাল এরকম প্রমাদ আমার সর্বদাই ঘটে থাকে, সে জন্তে আমি ক্ষমার যোগ্য। আপনার ৭৭ বছর বয়সের জন্তে আমি অপেক্ষা করতে পারব না—যদি পারতুম তবে আপনার পত্রের এই অংশের প্রত্যুত্তর দেবার উপলক্ষ্য তখন হয়তো পাওয়া যেত।

আমি পূর্বেই কবল করেছি যে, কী সংস্কৃত ভাষায় কী ইংরেজিতে আমি ব্যাকরণে কাঁচা। অতএব প্রাকৃত বাংলায় তৎসম শব্দের বানান নিয়ে তর্ক করবার অধিকার আমার নেই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই বানানের বিচার আমার মতের অপেক্ষা করে না। কেবল আমার মতো অনভিজ্ঞ ও নতুন পোড়োদের পক্ষ থেকে পণ্ডিতদের কাছে আমি এই আবেদন করে থাকি যে, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে যেখানেই বানান সরল করা সম্ভব হয় সেখানে সেটা করাই কত ব্যাভাতে জীবে দয়ার প্রমাণ হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবীণদের অভ্যাস ও আচারনিষ্ঠতার প্রতি সম্মান করতে যাওয়া দুর্বলতা। যেখানে তাঁদের অবিসংবাদিত অধিকার সেখানে তাঁদের অধিনায়কত্ব স্বীকার করতেই হবে। অস্ত্র নয়। বানানসংস্কার-সমিতি বেপদেবের তিরস্কার বাঁচিয়েও রেফের পর দ্বিষ বর্জনের যে বিধান দিয়েছেন সে জন্ত নবজাত ও অজাত প্রজাবর্গের হয়ে তাঁদের কাছে আমার নমস্কার নিবেদন করি।

বিশেষজ্ঞতা সকল ক্ষেত্রেই দুর্লভ। ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞের সংখ্যা খুবই কম এ কথা মানতেই হবে। অথচ তাঁদের অনেকেরি অস্ত্র এমন গুণ থাকতে পারে যাতে একোহি দোষো গুণসম্মিপাতের জন্ত সাহিত্য ব্যবহার থেকে তাঁদের নির্বাসন দেওয়া চলবে না। এঁদের জন্তেই কোনো একটি প্রামাণ্য শাসনকেই থেকে সাহিত্যে বানান প্রভৃতি সম্বন্ধে কার্যবিধি প্রবর্তনের ব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকার। আইন বানাবার অধিকার তাঁদেরই আছে আইন মানাবার ক্ষমতা আছে যাদের হাতে। আইনবিদ্যায় যাদের জুড়ি কেউ নেই

দ্বরে বসে তাঁরা আইনকর্তাদের 'পরে কটাক্ষপাত করতে পারেন কিন্তু কর্তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আইন তাঁরা চালাতে পারবেন না। এই কথাটা চিন্তা করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের কাছে বানানবিধি পাকা করে দেবার জন্তে দরখাস্ত জানিয়েছিলাম। অনেক দিন ধরে বানান সম্বন্ধে যথেষ্টাচার নিজেও করেছি অন্তর্কেও করতে দেখেছি। কিন্তু অপরাধ করবার অবাধ স্বাধীনতাকে অপরাধীও মনে মনে নিন্দা করে, আমিও করে এসেছি। সর্বসাধারণের হয়ে এর প্রতিবিধান-ভার ব্যক্তিবিশেষের উপর দেওয়া চলে না—সেই জন্তেই পীড়িত চিন্তে মহতের শরণাপন্ন হতে হোলো। আপনার চিঠির ভাষার ইঙ্গিত থেকে বোঝা গেল যে বানানসংস্কার-সমিতির “হোমরাচোমরা” “পণ্ডিত”দের প্রতি আপনার যথেষ্ট অশ্রদ্ধা নেই। এই অশ্রদ্ধা আপনাকেই সাজে কিন্তু আমাকে তো সাজে না, আর আমার মতো বিপুলসংখ্যক অভাজনদেরও সাজে না। নিজে হাল ধরতে শিখি নি, কর্ণধারকে খুঁজি—যে-সে এসে নিজেকে কর্ণধার বলে ঘোষণা করলেও তাদের হাতে হাল ছেড়ে দিতে সাহস হয় না, কেননা, এতে প্রাণের দায় আছে।

এমন সন্দেহ আপনার মনে হতেও পারে যে সমিতির সকল সদস্যই সকল বিধিরই যে অল্পমোদন করেন তা সত্য নয়। না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু আপোসে নিষ্পত্তি করেছেন। তাঁদের সম্মিলিত স্বাক্ষরের দ্বারা এই কথাই প্রমাণ হয় যে এতে তাঁদের সম্মিলিত সমর্থন আছে। যৌথ কারবারের অধিনেতা সাক্ষরই সকল বিষয়েই একমত কিনা, এবং তাঁরা কেউ কেউ কতব্যে ঔদাস্য করেছেন কিনা সে খুঁটিনাটি সাধারণে জানেও না জানতে পারেও না। তারা এইটুকুই জানে যে স্বাক্ষরদাতা ডিরেক্টরদের প্রত্যেকেরই সম্মিলিত দায়িত্ব আছে। (বিশেষ কৃতিত্ব প্রভৃতি ইন্ডাগাস্ত শব্দে যদি ব্রহ্ম ইকার প্রয়োগই বিধিসম্মত হয় তবে দায়িত্ব শব্দেও ইকার খাটতে পারে বলে আমি অল্পমান করি) আমরাও বানান-সমিতিতে এক বলে গণ্য করছি এবং তাঁদের বিধান মেনে নিতে প্রস্তুত হচ্ছি। যেখানে স্বল্পপ্রধান দেবতা অনেক আছে সেখানে কষ্টে দেবায় হবিষ্য বিধেম। অতএব বাংলা তৎসম শব্দের বানানে রেফের পরে

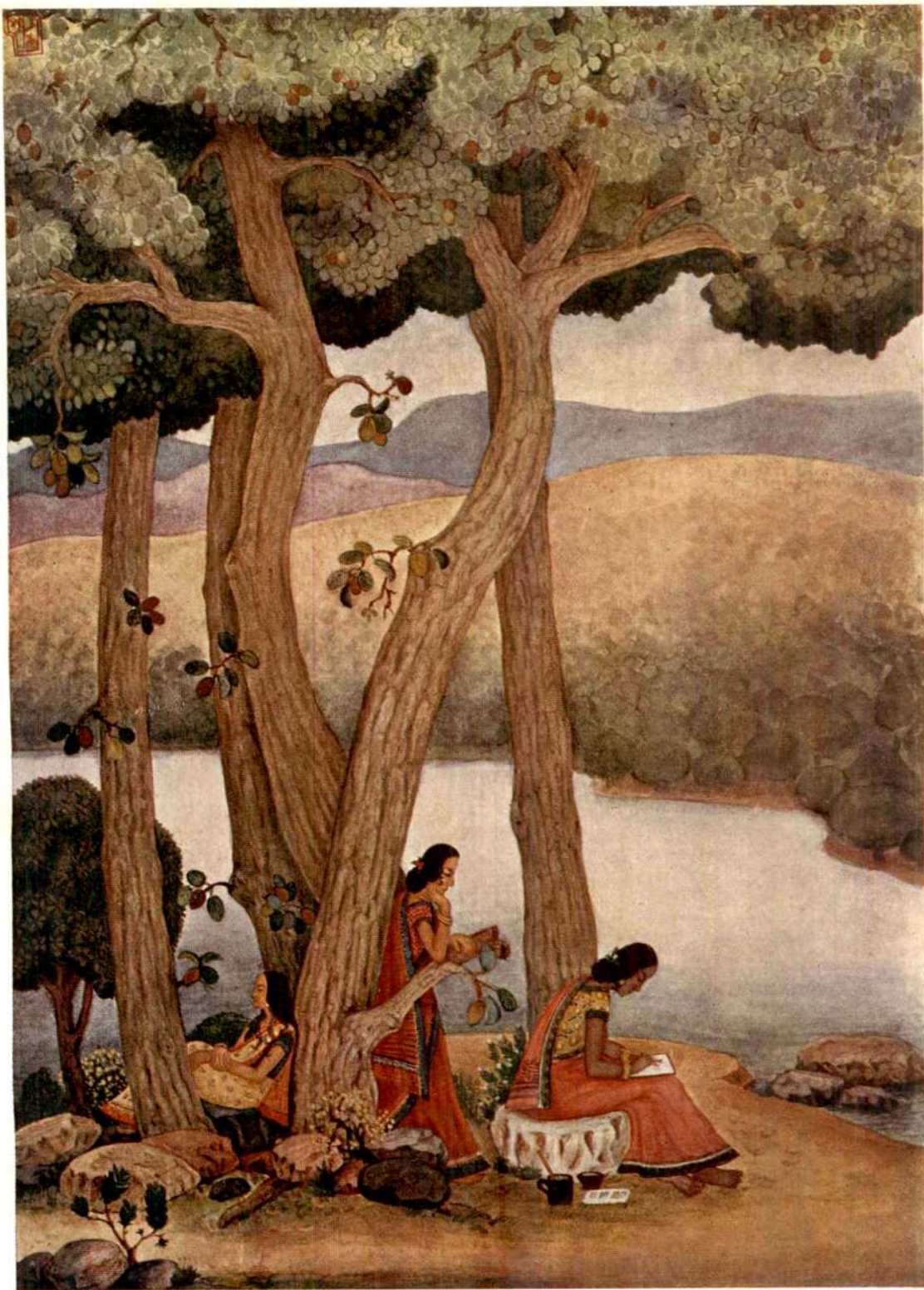
বিশ্ববর্জনের যে বিধান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত হয়েছে সেটা সবিনয়ে আমিও স্বীকার করে নেব।

কিন্তু যে-প্রস্তাবটি ছিল বানান-সমিতি স্থাপনের মূলে, সেটা প্রধানত তৎসম শব্দসম্পর্কীয় নয়। প্রাকৃত বাংলা যখন থেকেই সাহিত্যে প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করল তখন থেকেই তার বানানসাম্য নিদিষ্ট করে দেবার সমস্তা প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রাকৃত বাংলার সংস্কৃত অংশের বানান সম্বন্ধে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ নেই—যারা সতর্ক হতে চান হাতের কাছে একটা নির্ভরযোগ্য অভিধান রাখলেই তাঁরা বিপদ এড়িয়ে চলতে পারেন। কিন্তু প্রাকৃত বাংলার প্রামাণ্য অভিধান এখনও হয় নি, কেননা, আজও তার প্রামাণিকতার প্রতিষ্ঠাই হতে পারে নি। কিন্তু এই বানানের ভিত্তি পাকা করার কাজ শুরু করবার সময় এসেছে। এত দিন এই নিয়ে আমি দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই কাটিয়েছি। তখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রাধান্য লাভ করে নি। এই কারণে সুনীতিকেই এই ভার নেবার জন্তে অনুরোধ করেছিলেম। তিনি মোটামুটি একটা আইনের খসড়া তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আইনের জোর কেবল বৃক্তির জোর নয় পুলিশেরও জোর। সেই জন্তে তিনি দ্বিধা ঘোচাতে পারলেন না। এমন কি আমার নিজের ব্যবহারে শৈথিল্য পূর্বের মতোই চলল। আমার সংস্কার, প্রফেশনালদের সংস্কার, কাপিকারকের সংস্কার, কম্পোজিটরের সংস্কার, এবং যে সব পত্রিকায় লেখা পাঠানো যেত তার সম্পাদকদের সংস্কার এই সব মিলে পাঁচ ভূতের কীটন চলত। উপরওয়ালার যদি কেউ থাকেন এবং তিনিই যদি নিয়ামক হন, এবং দণ্ডপুরস্কারের দ্বারা তাঁর নিয়ন্ত্রণ যদি বল পায় তাহলেই বানানের রাজ্যে একটা শৃঙ্খলা হতে পারে। নইলে ব্যক্তিগত ভাবে আপনাদের মতো বিচক্ষণ লোকের দ্বারে দ্বারে মত সংগ্রহ করে বেড়ানো শিক্ষার পক্ষে যতই উপযোগী হোক কাজের পক্ষে হয় না।

কেন যে মুশকিল হয় তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। বর্ণন শব্দে আপনি যখন মূর্ধন্ত গ লাগান তখন সেটাকে যে মেনে নিই সে আপনার খাতিরে নয়, সংস্কৃত শব্দের বানান প্রতিষ্ঠিত যে মহিম্মি—নিজের মহিমায়। কিন্তু আপনি যখন বানান শব্দের মারুখানটাতে মূর্ধন্ত গ চড়িয়ে

দেন তখন ওটাকে আমি মানতে বাধ্য নই। প্রথমত এই বানানে আপনার বিধানকর্তা আপনি নিজেই। দ্বিতীয়ত আপনি কখনো বলেন প্রচলিত বানান মেনে নেওয়াই ভালো আবার যখন দেখি মূর্ধন্ত গ-লোলুপ 'নয়' বাংলা বানান-বিধিতে আপনার ব্যক্তিগত আসক্তিকে সমর্থনের বেলায় আপনি দীর্ঘকাল-প্রচলিত বানানকে উপেক্ষা করে উক্ত শব্দের বৃকের উপর নবাগত মূর্ধন্ত গয়ের জয়ধ্বজা তুলে দিয়েছেন তখন বুঝতে পারি নে আপনি কোন্ মতে চলেন। জানি নে কানপুর শব্দের কানের উপর আপনার ব্যবহার নব্য মতে বা পুরাতন মতে। আমি এই সহজ কথাটা বুঝি যে প্রাকৃত বাংলায় মূর্ধন্ত গয়ের স্থান কোথাও নেই, নিজীব ও নিরর্থক অক্ষরের সাহায্যে ঐ অক্ষরের বহুল আমদানি করে আপনাদের পাণ্ডিত্য কাকে সন্তুষ্ট করছে, বোপদেবকে না কাত্যায়নকে। দুর্ভাগ্যক্রমে বানান-সমিতিরও যদি গ-এর প্রতি অহৈতুক অনুরাগ থাকত তাহলে দণ্ডবিধির জোরে সেই বানানবিধি আমিও মেনে নিতুম। কেননা, আমি জানি আমি চিরকাল বাঁচব না কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের ভিতর দিয়ে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানে শিক্ষালাভ করবে তাদের আয়ু আমার জীবনের মেয়াদকে ছাড়িয়ে যাবে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে প্রাকৃত বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়েছিল। তিনি প্রাকৃত বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র রূপ স্বীকার করবার পক্ষপাতী ছিলেন এ কথা বোধ হয় সকলের জানা আছে। সেকালকার যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংস্কৃত ভাষায় বিদগ্ধ পাণ্ডিত্য ছিল, তাঁদের কারো কারো হাতের লেখা বাংলা বানান আমার দেখা আছে। বানান-সমিতির কাজ সহজ হোতো তাঁরা যদি উপস্থিত থাকতেন। সংস্কৃত ভাষা ভালো করে জানা না থাকলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা থাকবেই না, ভাষাকে এই অস্বাভাবিক অত্যাচারে বাধ্য করা পাণ্ডিত্যভিমানী বাঙালির এক নূতন কীতি। যত শীঘ্র পারা যায় এই কঠোর বন্ধন শিথিল করে দেওয়া উচিত। বস্তুত একেই বলে ভূতের বোঝা বণ্ডা। এত কাল ধরে সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য না নিয়ে যে বহুকেটি বাঙালি প্রতিদিন মাতৃভাষা ব্যবহার করে এসেছে এতকাল পরে আজ তাদের সেই ভাষাই বাংলা



বনভোজন
শ্রীশাস্তি গুহ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সাহিত্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। এই জন্ম তাদের সেই ঋণটি বাংলার প্রকৃত বানান নির্ণয়ের সময় উপস্থিত হয়েছে। এক কালে প্রাচীন ভারতের কোনো কোনো ধর্মসম্প্রদায় যখন প্রাকৃত ভাষায় পালি ভাষায় আপন আপন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল তখন ঠিক এই সমস্তাই উঠেছিল। যারা সমাধান করেছিলেন তাঁরা অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন; তাঁদের পাণ্ডিত্য তাঁরা বোঝার মতো চাপিয়ে বান নি জনসাধারণের 'পরে। যে অসংখ্য পাঠক ও লেখক পণ্ডিত নয় তাদের পথ তাঁরা অক্লান্তিম সত্যপন্থায় সরল করেই দিয়েছিলেন। নিজের পাণ্ডিত্য তাঁরা নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিপাক করেছিলেন বলেই এমনটি ঘটা সম্ভব হয়েছিল।

আপনার চিঠিতে ইংরেজি ফরাসি প্রভৃতি ভাষার নজির দেখিয়ে আপনি বলেন ঐ সকল ভাষায় উচ্চারণে বানানে সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু এই নজিরের সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি নে। ঐ সকল ভাষার লিখিত রূপ অতি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে, এই পরিণতির মুখে কালে কালে যে সকল অসংগতি ঘটেছে হঠাৎ তার সংশোধন ছুঁয়ায়। প্রাকৃত বাংলা ছাপার অক্ষরের এলেকায় এই সম্প্রতি পাসপোর্ট পেয়েছে। এখন ওর বানান নির্ধারণে একটা কোনো নীতি অবলম্বন করতে হবে তো। কালে কালে পুরোনো বাড়ীর মতো বৃষ্টিতে যৌথ্রে তাতে নানা রকম দাগ ধরবে, সেই দাগগুলি সনাতনশ্রমের কোলিঙ্গ দাবী করতেও পারে। কিন্তু রাজমিস্ত্রি কি গোড়াতেই নানা লোকের নানা অভিমত ও অভিরুচি অঙ্গসরণ করে ইমারতে পুরাতন দাগের নকল করতে থাকবে। যুরোপীয় ভাষাগুলি যখন প্রথম লিখিত হচ্ছিল তখন কাজটা কী রকম করে আরম্ভ হয়েছিল তার ইতিহাস আমি জানি নে। আন্দাজ করছি কতকগুলি খামখেয়ালি লোকে মিলে এ কাজ করেন নি, যথাসম্ভব কানের সঙ্গে কলমের যোগ রক্ষা করেই শুরু করেছিলেন। তাও খুব সহজ নয়, এর মধ্যেও কারো কারো খেচ্ছাচার যে চলে নি তা বলতে পারি নে। কিন্তু খেচ্ছাচারকে তো আদর্শ বলে ধরে নেওয়া যায় না—অতএব ব্যক্তিগত অভিরুচির অতীত কোনো নীতিকে যদি স্বীকার করা কর্তব্য মনে করি তবে

উচ্চারণকেই সামনে রেখে বানানকে গড়ে তোলা ভালো। প্রাচীন ব্যাকরণকর্তারা সেই কাজ করেছেন, তাঁরা অল্প কোনো ভাষার নজির মিলিয়ে কতব্য সহজ করেন নি।

এ প্রশ্ন করতে পারেন বানানবিধিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারকে মেনে নেওয়াকেই যদি আমি প্রেয় মনে করি তাহলে মাঝে প্রতিবাদ করি কেন? প্রতিবাদ করি বিচারকদের সহায়তা করবার জন্তেই, বিদ্রোহ করবার জন্তে নয়। এখনো সংস্কার কাজের গাঁথুনি কাঁচা রয়েছে, এখনো পরিবর্তন চলবে, কিন্তু পরিবর্তন তাঁরাই করবেন আমি কহব না। তাঁরা আমার কথা যদি কিছু মেনে নেবার যোগ্য মনে করেন সে ভালোই, যদি না মনে করেন তবে তাঁদের বিচারই আমি মেনে নেব। আমি সাধারণ ভাবে তাঁদের কাছে কেবল এই কথাটি জানিয়ে রাখব যে প্রাকৃত ভাষার স্বভাবকে পীড়িত করে তার উপরে সংস্কৃত ব্যাকরণের মোচড় দেওয়াকে যথার্থ পাণ্ডিত্য বলে না। একটা তুচ্ছ দৃষ্টান্ত দেব। প্রচলিত উচ্চারণে আমরা বলি কোলকাতা, কলিকাতাও যদি কেউ বলতে ইচ্ছা করেন বলতে পারেন, যদিও তাতে কিঞ্চিৎ হাসির উদ্রেক করবে। কিন্তু ইংরেজ এই শহরটাকে উচ্চারণ করে ক্যালক্যাটা এবং লেখেও সেই অল্পসারে। আপনিও বোধ হয় ইংরেজিতে এই শহরের ঠিকানা লেখবার সময় ক্যালক্যাটাই লেখেন, অথবা ক্যালক্যাটা লিখে কলিকাতা উচ্চারণ করেন না—অর্থাৎ যে জোরে প্রাকৃত বাংলায় আপনারা বস্তু গন্ধ মেশীন-গান চালাতে চেষ্টা করেন, সে জোরে এখানে প্রয়োগ করেন না। আপনি বোধ করি ইংরেজিতে চিটাগংকে চট্টগ্রাম সিলোনকে সিংহল বানান করে বানান ও উচ্চারণে গঙ্গা-জলের ছিটে দেন না। ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করবামাত্রই যশোরকে আপনারা জেসোর বলেন, এমন কি, মিত্রকে মিটার লেখার মধ্যে অন্তর্ভুক্তি অল্পসব করেন না। অতএব তোখে অল্পন দিলে কেউ নিন্দে করবে না, মুখে দিলে করবে। প্রাকৃত বাংলায় যা শুচি, সংস্কৃত ভাষায় তাই অশুচি।

আপনি আমার একটি কথা নিয়ে কিছু হাস্য করেছেন কিন্তু হাসি তো মুক্তি নয়। আমি বলেছিলাম বর্তমান সাধু বাংলা গদ্য ভাষার জিয়াপদগুলি গড় উইলিয়মের

পণ্ডিতদের হাতে ক্লাসিক ভঙ্গীর কাঠিন্দ্র নিয়েছে। আপনি বলতে চান তা সত্য নয়। কিন্তু আপনার এই উক্তি তো সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্তর্গত নয় অতএব আপনার কথাটি আমি যদি সংশয় প্রকাশ করি রাগ করবেন না। বিষয়টা আলোচনার যোগ্য। এককালে প্রাচীন বাংলা আমি মন দিয়ে এবং আনন্দের সঙ্গেই পড়েছিলাম। সেই সাহিত্যে সাধু বাংলায় প্রচলিত ক্রিয়াপদের অভাব লক্ষ্য করেছিলাম। হয়তো ভুল করেছিলাম। দয়া কবে দৃষ্টান্ত দেখাবেন। একটা কথা মনে রাখবেন ছাপাখানা চলন হবাব পরে প্রাচীন গ্রন্থের উপর দিয়ে যে শুদ্ধির প্রক্রিয়া চলে এসেছে সেটা বাঁচিয়ে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করবেন।

আর একটি কথা। ইলেক। আপনি বলেন লুপ্ত স্বরের চিহ্ন বলে ওটা স্বীকার কেননা ইংরেজিতে তার নজির আছে। “করিয়া” শব্দ থেকে ইকার বিদায় নিয়েছে অতএব তাব স্থতিচিহ্ন স্বরূপে ইলেকের স্থাপনা। ইকারে আকারে মিলে একার হয়—সেই নিয়মে ইকার আকারের যোগে “করিয়া” থেকে “কোরে” হয়েছে। প্রথম বর্ণের ওকারটিও পরবর্তী ইকারের দ্বারা প্রভাবিত। বেখানে যথার্থই কোনো স্বর লুপ্ত হয়েছে অথচ অল্প স্বরের রূপান্তর ঘটায় নি এমন দৃষ্টান্তও আছে, যেমন ডাহিন দিক থেকে ডান দিক, বহিন থেকে বোন, বৈশাখ থেকে বৈশেখ। এখানে এই সব লুপ্ত স্বরের স্বরণচিহ্ন ব্যবহার ঘটে নি। গোষ্ঠ্য থেকে গম হয়েছে এখানেও লুপ্ত উকারের শোকচিহ্ন দেখি নে। যে সকল শব্দে, স্বরবর্ণ কেন, গোটা বাক্যস্বর্য অন্তর্ধান করেছে সেখানেও চিহ্নের উপলব্ধ নেই। মুখোপাধ্যায়ের পা-শব্দটি ঘোড় দিয়ে নিজের অর্থরক্ষা করেছে, পদচিহ্নমাত্র পিছনে কেলে রাখে নি,—এই সমস্ত ভিন্নোভাবকে চিহ্নিত করার জন্যে সমুদ্রপার থেকে চিহ্নের আমদানি করার প্রয়োজন আছে কি। ইলেক না মিলে ওকার ব্যবহার করতে হয়, নইলে অসমাপিকার স্থানা হয় না। তাতে দোষ কী আছে।

পুনর্বার বলি আমি উকিল মাত্র, জ্ঞান নই। যুক্তি দেবার কাজ আমি করব, রায় দেবার পদ আমি পাই নি। রায় দেবার ভার ধারা পেয়েছেন আমার মতে তাঁরা প্রাজ্ঞ।

বোধ হচ্ছে আর একটামাত্র কথা বাকি আছে। এখন তখনি আমারো ভোমারো শব্দের ইকার ওকারকে ঝাঁক দেবার কাজে একটা ইচ্ছিতের মধ্যে গণ্য করে ওদুটোকে শব্দের অন্তর্ভুক্ত করবার প্রস্তাব করেছিলাম। তার প্রতিবাদে আপনি পরিহাসের স্বরে বলেছেন, তবে কি বলতে হবে, আমরা ভাতি খাই কুটি খাই নে। দুটো প্রয়োগের মধ্যে যে প্রভেদ আছে সেটা আপনি ধরতে পারেন নি। শব্দের উপরে ঝাঁক দেবার ভার কোনো-না-কোনো স্বরবর্ণ গ্রহণ করে। যখন আমরা বলতে চাই বাঙালি ভাতই খায় তখন ঝাঁকটা পড়ে আকারের পরে, ইকারের পরে নয়। সেই ঝাঁকবিশিষ্ট আকারটা শব্দের ভিতরেই আছে স্বতন্ত্র নেই। এমন নিয়ম করা যেতে পারত যাতে ভাত শব্দের ভা-এর পরে একটা হাইফেন স্বতন্ত্র চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হতো—যথা বাঙালি ভা-তই খায়। ইকার এখানে হয়তো অল্প কাজ করেছে, কিন্তু ঝাঁক দেবার কাজ তার নয়। তেমনি “বুবই” শব্দ, এর ঝাঁকটা উকারের উপর। যদি “তীর” শব্দের উপর ঝাঁক দিতে হয়, যদি বলতে চাই বুকে তীরই বিঁধেছে, তাহলে ঐ দীর্ঘ উকারটাই হবে ঝাঁকের বাহন। দুখটাই ভালো—কিন্তু ভেলটাই খারাপ এর ঝাঁকগুলো শব্দের প্রথম স্বরবর্ণেই। সুতরাং ঝাঁকের চিহ্ন অল্প স্বরবর্ণে দিলে বেথাপ হবে। অতএব ভাতি খাব বানান লিখে আমার প্রতি লক্ষ্য করে যে-হাসিটা হেসেছেন সেটা প্রত্যাহারণ করবেন। ওটা ভুল বানান, এবং আমার বানান নয়। বলা বাহুল্য “এখনি” শব্দের ঝাঁক ইকারের পরে, খ-এর অকারের উপরে নয়।

এখনি তখনি শব্দের বানান সম্বন্ধে আরো একটি কথা বলবার আছে। যখন বলি কখনই যাব না, আর যখন বলি এখনি যাব দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তা ভিন্ন বানানে নির্দেশ করা উচিত। কারো শব্দের বানান দৃষ্টিগোচর ভাববার বিষয় আছে। “কারো কারো মতে শুক্রবারে শুভকর্ম প্রাপ্ত” অথবা “শুক্রবারে বিবাহে কারোই মত নেই”, এই দুইটি বাক্যে ওকারকে কোথায় স্থাপন করা উচিত? এখানে কি বানান কবতে হবে, ফারও কারও, এবং কারওই?

আপনার চিঠির একটা জায়গায় ভাবার ভঙ্গীতে মনে হোলো ক-এ দীর্ঘ ভ্রমকার যোগে যে কী আমি ব্যবহার করে থাকি সে আপনার অল্পমোদিত নয়। আমার বক্তব্য এই যে, অব্যয় শব্দ “কি” এবং সর্বনাম শব্দ “কী” এই দুইটি শব্দের সার্থকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাদের ভিন্ন বানান না থাকলে অনেক স্থলেই অর্থ বুঝতে বাধা ঘটে। এমন কি

প্রসঙ্গ বিচার করেও বাধা দূর হয় না। “তুমি কি জানো সে আমাব কত প্রিয়” আর “তুমি কী জানো সে আমার কত প্রিয়,” এই দুই বাক্যের একটাতে জানা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হচ্ছে আব একটাতে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে জানার প্রকৃতি বা পরিমাণ সম্বন্ধে, এখানে বানানের তফাৎ না থাকলে ভাবের তফাৎ নিশ্চিতরূপে আন্ধান্য করা যায় না।

শ্রীচৈতন্য ও ওড়িয়া জাতি

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্যারয় রাধালাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার উড়িষ্যার ইতিহাস (*History of Orissa*) গ্রন্থে বলিয়াছেন যে ওড়িয়া জাতির অধঃপতনের মূল কারণ শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম। এই কথাটা আজকাল প্রায়ই শিক্ষিত ওড়িয়া ও বাঙালীদের মুখে শোনা যায়। উৎকল-নেতা পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস-প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় ইহাই প্রচার করিয়া থাকেন। রাধালাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত প্রবীণ ও বিচক্ষণ ঐতিহাসিক যখন এইরূপ উক্তি করিয়াছেন তখন ইহা প্রবাস্ত্য বলিয়া অনেকের বিশ্বাস হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ আমাদের আধুনিক শিক্ষিতমণ্ডলীর ধারণা যে ধর্মই একমাত্র ভারতের অধঃপতনের কারণ। তাহার উপর প্রেম ও রসধর্ম ইহারা প্রচার করেন তাহারা যে দেশ ও জাতির সর্বনাশ সাধন করিতেছেন তাহাতে তাঁহাদের আর সন্দেহ নাই। উৎকলের কেশরী-রাজবংশীয় হইতে গঙ্গা-বংশীয় নরপতিবৃন্দের পরাক্রম ও রণকুশলতা কে না জানে? ইহাদের দিগ্বিজয় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। যে-মহারাজা প্রতাপরুদ্র গঙ্গপতির হুকামে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের রাজ-কুলের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, যিনি অমিত বাহুবলে সাম্রাজ্য প্রদেশের নেতার হইতে গোড়দেশের প্রায় সাগর-সন্ধ্য-সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত সাম্রাজ্যের শাসন করিতেন এবং যিনি রণনৈপুণ্যে ও অস্ত্রবিদ্যায় অদ্ভুত কুশলী ছিলেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করিয়া

নিজেকে, দেশকে ও সমগ্র জাতিকে একেবারে হারেক্ষারে দিলেন—ইহাই শিক্ষিত উৎকল-এ বঙ্গ-বাসীর ধারণা। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করাতেই জাতির বীরত্ব-বহিঃ নির্দীপিত হইল—ভেজ গর্জ সব ধর্ম হইয়া গেল, এবং সমগ্র জাতি ক্রমে ক্রমে হতবীর্য, ভীক ও কাপুরুষ হইল। শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে আসিয়া যেন সমগ্র ওড়িয়া জাতির বল, বীর্য, লিহবিক্রম, দিগ্বিজয় ও বাহুবলের আশ্বালন সব লোপ পাইল; সমগ্র জাতির ভিতরে যে সামরিক ভেজবহিঃ ছিল তাহা নির্দীপিত হইল এবং ধর্মের আবরণে একটা জীজনোচিত কোমলতা ও ভীকতা আসিয়া সমগ্র জাতির অধঃপতনের সূচনা করিল। উৎকল জাতি যে সামরিক উন্নাদনায় বীরগর্বে সমরক্ষেত্রে ধাবিত হইত, সে উন্নাদনায় বৈষবধর্মের ভাবোচ্ছ্বাসে পরিণত হইল। স্বতীক্সবুদ্ধি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্বগবেষক রাধালাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন যে উৎকল জাতির ও দেশের এই সর্বনাশের মূল শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম। মহারাজা প্রতাপরুদ্র যদি চৈতন্যের ধর্ম গ্রহণ না করিতেন তবে উক্ত দেশ ও জাতির এতটা অধঃপতন হইত না—তাহারা এতটা নির্দীপ্য হইত না, এতটা জীজনোচিত ভীক ও কোমল হইত না। সত্যই কি তাই? সত্যই কি উড়িষ্যায় এতটা অনিষ্ট করিয়াছেন শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম? সত্যই কি মধ্যযুগে চৈতন্যের ধর্ম উড়িষ্যার গুলোজ্জল বীর্ষ-পটে এতটা কলঙ্ক কালিয়া লেপিয়া দিয়াছে?

উড়িষ্যার মধ্যযুগের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস বিস্তৃত এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া থাকে। খ্রীষ্টচৈতন্যের সমসাময়িক বিবরণ ও উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিবৃত্ত ওড়িয়া জাতির অধঃপতনের অপর কারণ নির্দেশ করে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাখালবাবুর ছায় ঐতিহাসিক পণ্ডিতের এদিকে আরো দৃষ্টি পড়ে নাই। সেই ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের কিস্তি অবতারণা করিয়া আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে রাখালবাবুর এই উক্তি কতটা ভ্রান্তিপূর্ণ, নিরর্থক ও অপ্রামাণিক।

গৌড়ের পাঠান রাজগণ স্বযোগ ও সুবিধা পাইলেই উড়িষ্যা রাজ্য আক্রমণ করিতেন এবং উড়িষ্যার নরপতিবৃন্দও সেইরূপ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিতে দ্বিধা করিতেন না। এইরূপে যুদ্ধের জয় ও পরাজয় অল্পসংখ্যক রাজ্যে সীমা নির্দিষ্ট হইত। যখন পাঠানেরা পরস্পর বিবাদের মত্ত থাকিত তখন উড়িষ্যার রাজাদের সুবিধা ছিল। বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়ের পর গৌড়রাজ্য ক্রমশঃ দিল্লীর বাদশাহদের করতলগত হয় এবং তাঁহাদের অধীনে পাঠান শাসনকর্ত্তা গৌড়রাজ্য শাসন করিতেন। কিন্তু এই ভাবে বেশী দিন চলিল না—ভুগরাল খাঁ গৌড়রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন—কিন্তু বুলবন আসিয়া তাহা অচিরে দমন করিয়া গেলেন। এই ভাবে স্থানে স্থানে বিদ্রোহ হইতে লাগিল। অবশেষে ইলিয়াস শাহ আপনাকে গৌড় বাংলায় স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং বহু যুদ্ধের পর দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে সেই ভাবে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এই ভাবে ইংরেজী-জরোদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী স্থলীয় যুদ্ধ, হত্যা, আত্মকলহ ও যড়যন্ত্রের ইতিহাস। উড়িষ্যার গঙ্গা-বংশীয় রাজারা এই অরাজকতার সময় গৌড়রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভাগীরথীতীর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হুজুরগাঁও হইতে নৌকাযোগে গঙ্গার অপর কূলে খ্রীষ্টচৈতন্য উৎকল দেশে পৌঁছিলেন—ইহা বৃন্দাবনদাস খ্রীষ্টচৈতন্যভাগবতে বর্ণনা করিয়াছেন। হুই রাজ্যের মধ্যে ভাগীরথী প্রবাহিত, কিন্তু তাহার বন্ধ বাজীর পক্ষে নিরাপদ ছিল না। ভলদস্যুর উৎপাত যথেষ্ট ছিল। খ্রীষ্টচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—

“প্রভুর আজ্ঞার ঐশ্বর্য্য মহাশয় ।
কীৰ্ত্তন করেন প্রভু নৌকার বিজয় ।
অনুধ নাইরা বোলে “হইল সশয় ।
বুঝিলাও আজি আর প্রাণ নাহি রয় ।
কূলে উঠিলে সে বাবে লইয়া পলায় ।
জলে পড়িলে সে বোল কুড়ীরেই থায় ।
নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত কিংব ।
পাইলেই ধনপ্রাণ হুই নাপ করে ।
এতক বাবত উড়িয়ার দেশ পাই ।
তাকত নীরব হও সকল গোসাঞি ।”

ইহা ছাড়া—

“হেনমতে মহাপ্রভু সাকীর্জন রসে ।
প্রবেশ হইলা আসি ঐউৎকলদেশে ।
উত্তরিল গিয়া নৌকা ঐপ্রয়াগ ঘাটে ।
নৌকা হইতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে ।
প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্রে গুড় দেশে ।
ইহা যে শুনে সে ভাসনে প্রেরসে ।”

কিন্তু এই ভাবে গৌড়ে উড়িষ্যার রাজ্য থাকিল না। কারণ পাঠানরাজ হুসেন শাহ হতরাজ্য উদ্ধার করিতে দৃঢ়সংকল্প করিলেন। এই ভাবে উড়িষ্যা ও গৌড়রাজ্যের মধ্যে ক্রমাগত শতাব্দীর পর শতাব্দী যুদ্ধ চলিয়াছিল—ইহাও বলকদের ও জাতির দুর্জয়তার একটা কারণ।

Domingo Paes—যিনি সম্ভবতঃ তাঁহার বিবরণ ১৫২০

খ্রীষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—বলিয়াছেন যে,

“And this kingdom of Orya of which I have spoken above is said to be much larger...since it marches with all Bengal and is at war with her.”

প্রতাপরুদ্রকে শুধু গৌড়রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হয় নাই। এক দিকে গৌড়ের পাঠানেরা, অপর দিকে বিজয়নগর এবং অত্র দিকে দক্ষিণের বিজাপুর আদিলশাহী, নিজামশাহী ও কুতবশাহী রাজ্যের মুসলমান আক্রমণ। প্রতাপরুদ্রের পূর্বে রাজসুত্রেরা যখন বিজয়নগর সাম্রাজ্যের কতকাংশ জয় করিয়াছিলেন, তখন দক্ষিণী মুসলমানদের শাস্ত করিতে কিছু কর দিতে হইত। আদিলশাহী দুর্জয় মুসলমানেরা সময়ে সময়ে অধিকতর অর্থাদি সংগ্রহের জন্ত যুদ্ধ করিত এবং মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে সিংহাসনে অধিরোহণের কিছু পরে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইয়াছিল। মাদলাপাঞ্জীতে আছে যে,

এ রাজ্য ৮ অঙ্গে সেতুবন্ধ কটকাই কলে ।
গড় বিদ্যানগর ভাঙ্গি যউরাই দেলে ।

অর্থাৎ মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বের বঁট বর্ষে সেতুবন্ধ আক্রমণ করিল। বিদ্যানগর বেড়া ভাঙিয়া ভূমিসাৎ করিয়া দিল। আবার মহারাজ প্রতাপরুদ্রের রাজত্বের চতুর্দশ বৎসরে দেখা যায় যে চৌড় হইতে পাঠানেরা আক্রমণ করিল। রাজধানী কটকের নিকটে ছাউনি ফেলিল। সে সময় প্রতাপরুদ্র কটকে ছিলেন না, তিনি দক্ষিণে বিজয়নগরের সহিত সংগ্রামে গিয়াছিলেন। বিজয়নগর তখন প্রতাপরুদ্রের দ্বীপুত্রকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং লোকমুখে বন্দী পুত্রের নিধনবার্তাও পাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া গোদাবরীতীরস্থ বিদ্যানগর বিজয়নগরের অধিকৃত। সেই ভীষণ নৃশঙ্ক উড়িয়া রাজ্য একেবারে হুতবল ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কতটা সস্ত্রদান করিয়া প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরের সঙ্গে সন্ধি করিয়া রাজ্যের কিয়দংশ উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধকালে রাজ্যের ভার দিয়া গিয়াছিলেন ভোই বিদ্যাধরের উপর। ভোই বিদ্যাধর ছিল বিশ্বাসঘাতক ও রাজ্যলোভী। গোড় পাতশাহের কোষ যখন কটকে প্রবেশ করিল, বিদ্যাধর তখন সারঙ্গ-গড়ে থাকিল। পাঠানেরা শ্রীক্ষেত্রে ৮পুরীধামে প্রবেশ করিল, তৎপূর্বে শ্রীশ্রীগঙ্গাথকে নৌকাযোগে চিকান্দ্রদের নিকটে পরিত্যক্তহয় লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। পাঠানেরা শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবদেবীমূর্তি সব ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিল। বিদ্যাধর গোড়ের পাতশাহের আশ্রয় গ্রহণ করিল। সংবাদ শুনিয়া ক্রোধে প্রতাপরুদ্র এক মাসের পথ দশ দিনে অতিক্রম করিয়া অমিত বিক্রমে পাঠানদের আক্রমণ করিলেন। মাদলাপল্লী বলেন যে গড়মান্দারণ পর্যন্ত পাঠান-সৈন্যদিগকে তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। শেষে ভোই বিদ্যাধরের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতাপরুদ্র অবরুদ্ধ হন। বিদ্যাধরের মধ্যস্থতায় গোড় ও উড়িয়ায় সন্ধি হয়। সেই সন্ধির মূলে প্রকৃত রাজ্যশাসনভার বিদ্যাধরের উপর অপিত হইল, এবং প্রতাপরুদ্র নামে মাত্র রাজা থাকিলেন। এই সময়ে প্রতাপরুদ্র শ্রীশ্রীনীলচল-নাথকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া অধিকাংশ সময়ে ৮পুরীধামে বাস করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে কটকে যাইতেন। মাহুস দুর্ববহায় বা বিপদে পড়িলে ধর্মের শরণ লইয়া থাকে ইহা নূতন নহে। প্রতাপরুদ্রও তাই করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদিগকে নিহত করিয়া বিদ্যাধর ভোই-রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইরূপে পর পর রাজবংশে হত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, বড়বন্দ ও মুসলমান আক্রমণে সমগ্র ওড়িয়া জাতিতে একেবারে নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলিল। তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব একবার উড়িয়া রাজ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু

কালাপাতাড়ের প্রবল আক্রমণে এবং অন্তর্বিগ্নবে উড়িয়ার রাজলক্ষী অন্তর্হিত হইল। ইহা বৈষ্ণবধর্মের দোষ নয়— ইহা অদৃষ্টের বিকট পরিহাস।

শ্রীচৈতন্য উৎকলে বৈষ্ণবধর্মের নূতন প্রচারক ছিলেন না। তাহার সাক্ষী শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের সেবা শ্রীচৈতন্যের বহু শতাব্দীর পূর্বে প্রচলিত ছিল। প্রতাপরুদ্র সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরে উৎকৌণ শিলালিপিতে ঘোষণা করেন যে উনপঞ্চাশ জন বৈরাগী সাধু শ্রীমন্দিরে জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে গীত গাহিবেন—সেই সময় অপর লোক তাঁহাদের হরের অমুসরণ কবিতা যোগদান করিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের গাহিবার সময়ে কিংবা গীতের পূর্বে কেহ গাহিতে পাবিবেন না। হুতরাং শ্রীচৈতন্যের আমলের পূর্বে প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণব ছিলেন। তাহা ছাড়া পঞ্চাশ বা পঞ্চাশাধা বৈষ্ণবেরা ছিলেন— তাঁহাদের প্রভাব উড়িয়ায় কিছু কম ছিল না। শ্রীশ্রীগঙ্গাথ-চরিতামতে আছে ওড়িয়া ভাগবতপ্রণেতা পঞ্চাশাধার অন্ততম শ্রীজগন্নাথদাস প্রতাপরুদ্র-মহাবীর গুরু ও উপদেষ্টা ছিলেন। স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথদাসকে অনুরোধ করেন। শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে বহুবর্ষ বাসের পরে তাঁহার জীবিত কালেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। প্রতাপরুদ্র শুধু শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন না—তৎকালে জীবিত সকল মহাশয়দেরই তিনি সমাদর, ভক্তি ও অর্চনা করিতেন। যে উড়িয়ার রাজ্যসীমা ভাগীবখী-তীব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা গোড়-উড়িয়ায় সন্ধিকালে রহিল না। গোড়রাজ্য তখন বালেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সন্ধিকালে প্রতাপরুদ্র ও চৈতন্যের মিলন হয় নাই এবং শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মও তখন উড়িয়ায় প্রবেশ করে নাই।

জাতির অধঃগতন হয় আত্মকলহে, স্বার্থপরতায়, অনৈক্যে এবং চরিত্রহীনতায়। অনবরত বৃদ্ধবিগ্রহে কোনও জাতি উন্নত হইতে পারে না। উড়িয়ার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। যদি বিজয়নগর ও উড়িয়া যুদ্ধবিগ্রহে নিরত না হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে দণ্ডায়মান হইত, তবে শুধু উড়িয়া কেন সমগ্র দক্ষিণ-ভারত ও বাংলার ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হইত। ইহা ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেবও ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে ওড়িয়া জাতি বৈষ্ণবধর্মকে অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়াই অন্তান্ত প্রদেশের অপেক্ষা উড়িয়ায় ইসলাম-ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা সর্বাধিক। তথায় সহজে কেহ ধর্মাস্ত্রগ্রহণ করে নাই এবং জোর করিয়া ধর্মাস্ত্র ঘটাইলেও তাহার আবার বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করিতে পারিত। ইহা জাতির দৃঢ়তা রাখেতে কম সাহায্য করে না।

প্রেমের মৃত্যু

শ্রীমুকুমার চক্রবর্তী

প্রাণেব শুদ্ধ রাজি। পুঞ্জীভূত মেঘে
সমাচ্ছন্ন নভস্তল। রহি রহি বেগে
বহিছে পূবালি বায়ু। শ্রামল বনানী
আসন্ন দুর্ধোগ হেরি করে কানাকানি
পরম্পব অশ্রুট মর্শ্বরে। বিল্লীদল
নবীন বরষাপাতে আনন্দ-চঞ্চল
পঞ্চমে তুলেছে তান; প্রস্থপ্ত ধরণী
মৌন মুক; কর্ণক্লান্ত বিপুল সরসী
শুষ্ক, অচেতন। পথ-কুহুরেরা তুলি
কোলাহল, ইতস্ততঃ রচিয়া কুণ্ডলী
অন্ধকারে ভয়ভূপ ইষ্টকের প্রায়
প্রশান্ত হৃদয়ধূলির শয্যায়।
শুধু আমি নিঃপ্রাণীন অপলক আঁখি
জাগি বিভাবরী একা। বাতায়নে রাখি
মোর অতস্ত্র নয়ন ভাবি কত কথা,
কত স্থখ, কত দুঃখ, বিরহের ব্যথা,
স্বপ্ন, প্রেম, নিন্দা, স্তুতি, অপযশ গ্রানি
কত আশা-নিরাশার করুণ কাহিনী
একে একে উঠে ভাসি।

কি জানি কখন

কল্পনার জুত রথে মেয়ে চলে মন
সুদূর অলকাপুরে। বিরহিনী প্রিয়া
হৃদয়-বল্লভ লাগি উৎকণ্ঠিত হিয়া
যেথা একাকিনী নিশি যাপে অশ্রুজলে,
নবীন মেঘেরে যেথা বার্তাবহ-ছলে
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রিয়ার বিরহে
ব্যথিত ব্যাকুল বক্ষ—যে ব্যথায় দহে
অহর্নিশ বক্ষ তার। কল্পনায় হেরি
শোকাচ্ছন্ন সে অলকা—ভবন-ময়ূরী
তুলিয়া আনন্দ-নৃত্য স্বর্ণদণ্ড'পরে
নিস্তব্ধ রয়েছে বসি। পল্ল-সরোবরে
পৃষ্ঠ'পরে চকু রাখি ভুলে অলকেলি
শোকভারে বাক্যহত মবাল-মরালী।
কনক-পালঙ্কোপরি বিবাদ-প্রতিমা
বক্ষবধু, মৃতিমতী শোক, নাহি সীমা
হৃৎসহ সে বেদনার, কোমল অস্তরে
প্রিয়ের বিচ্ছেদ-ব্যথা নিয়ত সম্বরে।

নামিল বাঙ্গল-ধারা—স্বপ্ন গেল টুটি
বাস্তবের নগ্নমূর্ত্তি সম্মুখেতে ফুটি
উঠিল সহসা। আজি বড় নিঃশ্বাসি,
বড় একা, ব্যথা মোর জানে অন্তর্ধামী।
জীবনে যা-কিছু কাম্য, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি,
আনন্দ-উজ্জল ধরা, কোকিলের গীতি
স্বপ্নন আমার কাছে। দূরে, বহু দূরে,
আঁখির আড়ালে রহি মোর অন্তঃপুরে
কামনা ফেলিছে ছায়া, নির্দয় রাক্ষসী,
যত বাঁধিবারে চাই তত উঠে হাসি
নিষ্ঠুর উল্লাসে। জানি, এ শুধুই মায়া,
আমারে ছলিছে আজি মৃতিহীন ছায়া।
অভিশপ্ত বক্ষ আমি—নহে মোর তরে
রক্তত জোছনা-ধারা। যদি প্রেমভরে
কেহ দেয় কণ্ঠে মোর কুহুমের হার,
ঢেকে দেয় অহুরাগে চরণ আমার
ফুলে ফুলে পূর্ণ করি শ্রামল অঞ্চল,
দলিয়া আসিতে হবে চাপি অশ্রুজল
প্রেমের অঞ্জলি সেই।

তাই ভাবি মনে

চিন্তা মোর পরিপূর্ণ কোন্ অন্ধ ক্ষণে
বিশ্বের রিক্ততা দিয়ে? মলয়-হিমালয়
মর্শ্ব যদি দিয়ে যায় হিম্মালার দোল
তবুও রহিতে হবে মুক; যদি দহে
বক্ষ মোর বাসনা-বহিতে, তবু নহে
মোর তরে প্রেমসীর অধর-চূষন,
নহে মোর প্রিয়া সনে প্রেম-সম্ভাষণ।
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, নয়নের ভাষা,
বুকভরা অহুরাগ, যত উচ্চ আশা
মিথ্যা মোর কাছে আজি। ছিন্ন করি মালা,
দলি সে অঞ্জলি তাই চলেছি একেলা
সংসারের মরুপথে ক্লাস্তিহীন যাত্রী,
সম্মুখে ঘনায় আসে দুর্ধোগের রাজি।
নিবাশার ছায়াপাতে জীবন আঁধার,
প্রেমের পরম মৃত্যু আজিকে আমার।
এ জীবন ব্যর্থ, হৃদয় বক্ষের আগুন
নিফল ঘোবন-স্বপ্ন, বিফল কাণ্ডন।



পিঁপড়ে-মাকড়সার জীবন-বৈচিত্র্য

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রাণীজগতে নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গের মধ্যেই অত্যধিক পরিমাণে অম্লকরণপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাহারা এমন নিখুঁত অম্লকরণ-শক্তির পবিত্র দেয় যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াও তাহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য হয়। বিভিন্ন জাতের কড়ি, প্রজাপতি, টিকটিকি, ব্যাং ও অন্যান্য বিচিত্র কীট-পতঙ্গ, পোকামাকড় নানা ভাবে অবস্থান করিয়া অথবা পারিপার্শ্বিক বর্ণাবলীর সহিত দৈহিক বর্ণের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া আশ্চর্যকর সর্বদাই প্রকৃৎ কীট দিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। আবার কোন কোন প্রাণী যেন জন্মগত সংস্কারবশেই অম্লকরণ-প্রিয় হইয়া থাকে, যদিও তাহাদের অম্লকরণ-প্রণালী অনেকটা নিকৃষ্ট ধরণের।

দিনরাত শত্রুর ভয়ে উদ্ভিন্ন থাকিয়া এবং শত্রুর হস্তে নানাভাবে লালিত হইয়া কোন কোন কীটপতঙ্গ এমন অদ্ভুত অম্লকরণ-শক্তি আয়ত্ত করিয়াছে যে তাহাদের শারীরিক গঠন ও প্ৰতিবিধি প্রত্যক্ষ করিলে বিম্বরে অবাক হইতে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, মাকড়সাদের কথা বলি। মাকড়সাদের পদে পদে শত্রু। ঘরের দেওয়ালে, কার্ণিসে, অথবা কপাটের আড়ালে, বোলতার মত আকৃতি-বিশিষ্ট নানা জাতের বিচিত্র পোকাকে মাটি দিয়া বাসা তৈয়ারী করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণত কুমরে পোকা নামে পরিচিত। হাজার হাজার বিভিন্ন শ্রেণীর বিচিত্র মাকড়সার মত, বিভিন্ন জাতের কুমরে পোকায়ও অভাব নাই। মাকড়সাদের প্রধান শত্রু এই কুমরে পোকা। ইহারা সর্বদাই মাকড়সার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং হঠাৎ মাকড়সাকে একবার দেখিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ উড়িয়া গিয়া তাড়া করে, ধরিতে পারিলে কামড়াইয়া মাকড়সার শরীরে এক প্রকার বিষ ঢালিয়া দেয়। ইহাতে মাকড়সটি মরিয়া যায় না বটে, কিন্তু একেবারে অসাড় ও নিষ্পন্দ হইয়া পড়ে। তখন কুমরে পোকা তাহাকে টানিয়া অথবা মুখে করিয়া উড়িয়া বাসার লইয়া যায়। এইরূপে পাঁচ-সাতটা মাকড়সা সংগ্রহ করিয়া এক-একটা কুঠরিতে বাধিয়া প্রত্যেক কুঠরিতে একটা-একটা ডিম পাড়ে এবং কুঠরির মুখ মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়ে। ডিম ফুটিয়া কীড়া বাহির হইলে তাহারা সেই মাকড়সাকুলিকে খাইয়া বড় হইতে থাকে। খাদ্য নিঃশেষ হইলে কীড়া মুখ হইতে স্রুতা বাহির করিয়া গুটি প্রস্তুত করে এবং তাহার মধ্যে নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান কবে। কিছুদিন এই ভাবে থাকিবার পর গুটির মধ্যেই কীড়া পুত্তলীতে পবিণত হয় এবং অবশেষে পূর্ণাঙ্গ কুমরে পোকা হইয়া কুঠরির মুখে ছিঁড় করিয়া উড়িয়া যায়। যে-সকল মাকড়সা জাল বা কাঁদ পাতিয়া অবস্থান কবে তাহাদের

অপেক্ষা বাহারা শিকারাবেশে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদেরই কুমরে পোকায় আক্রমণের ভয় বেশী। এই ভয়শীল মাকড়সারাও বহুসংখ্যক বিভিন্ন শ্রেণী-উপশ্রেণীতে বিভক্ত। হয়ত শত্রুর হস্ত হইতে আশ্রয়কার নিমিত্ত এই জাতের মাকড়সার মধ্যে অনেকেই ক্রমবিকাশের ফলে বিভিন্ন জাতের পিপীলিকার দৈহিক গঠন অতি নিপুণভাবে অম্লকরণ করিয়াছে। ইহাদের অম্লকরণ-শক্তি এতই নিখুঁত যে, গায়ের রং, দৈহিক গঠন এবং চালচলন দেখিয়া সহজে পিপীলিকা ব্যতীত মাকড়সা বলিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এ-পর্যন্ত আমি বিভিন্ন জাতের ত্রিশটির অধিক পিঁপড়ে-মাকড়সার অস্তিত্ব হুঁকিয়া বাহির করিয়াছি। কলিকাতা এবং তাহার আশেপাশে বহুস্থানে বিভিন্ন ধরণের পিঁপড়ে-মাকড়সার অভাব নাই। আমার মনে হয়—যত রকম বিচিত্র পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায় প্রায় তত রকমেরই পিঁপড়ে-মাকড়সার অস্তিত্ব রহিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দুই বা ততোধিক বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সা একই জাতীয় পিপীলিকার দৈহিক গঠন, শরীরের রং বা চালচলন অম্লকরণ করিয়াছে। আশ্চর্যকরমূলক অম্লকরণ-প্রিয়তার প্রসঙ্গে ইহা বলা আবশ্যক যে যদিও কোন কোন জাতের কুমরে পোকাকে কেবল বাহিয়া বাহিয়া পিঁপড়ে-মাকড়সাই সংগ্রহ করিতে দেখা যায় তথাপি এই অদ্ভুত অম্লকরণ-শক্তি ইহাদিগকে নানা ভাবে আশ্রয়কার সাহায্য করিয়া থাকে, কারণ অম্লকরণকারী পিঁপড়ে-মাকড়সারা সাধারণতঃ পিঁপড়াদের মধ্যেই চলাফেরা করিয়া থাকে। ইহাতে পিঁপড়াদের ভয়েও শত্রুরা সহজে ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না এবং অনেক সময়ে ভুলও করিয়া থাকে। লাল, কালো, হলদে ও নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের বহুবিধ পিপীলিকার অম্লরূপ মাকড়সার এ দেশে অভাব নাই। এ স্থলে আমাদের দেশীয় সহজলভ্য নালসো বা লাল-পিঁপড়ের অম্লকরণকারী মাকড়সাদের কথা আলোচনা করিব।

বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্র এবং কলিকাতার আশেপাশে বিভিন্ন অঞ্চলে গাছের উপর লাল রঙের এক প্রকার পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহারা নালসো-পিঁপড়ে নামে পরিচিত। ইহাদের দংশন অত্যন্ত যক্ষণাদায়ক। আম, জাম প্রভৃতি গাছের উঁচু ডালে অনেক সূক্ষ্ম পাতা একত্র জুড়িয়া গোলাকার বাসা নির্মাণ করে এবং হাজার হাজার পিপীলিকা তাহার ভিতর একত্র বাস করিয়া থাকে। আহাৰ্য্যাবেশে সারি বাধিয়া দলে দলে বাতায়ত করে এবং সময় সময় মাটির উপরও নামিয়া আসে। বিবাক্ত দংশনের ভয়ে কেহই ইহাদের কাছে ঘেঁষিতে ভরসা পায় না। ইহারা এমনই দুর্ভয় যে, শত্রু প্রবলই হউক আর দুর্বলই হউক, আয়ত্তের মধ্যে আসিলে তাহাকে আক্রমণ করিবেই, প্রাণের ভয় মোটেই করে না। প্রবল শত্রুর আক্রমণে ইহারা দলে দলে যুত্মকে বরণ করিবে তথাপি বিনা

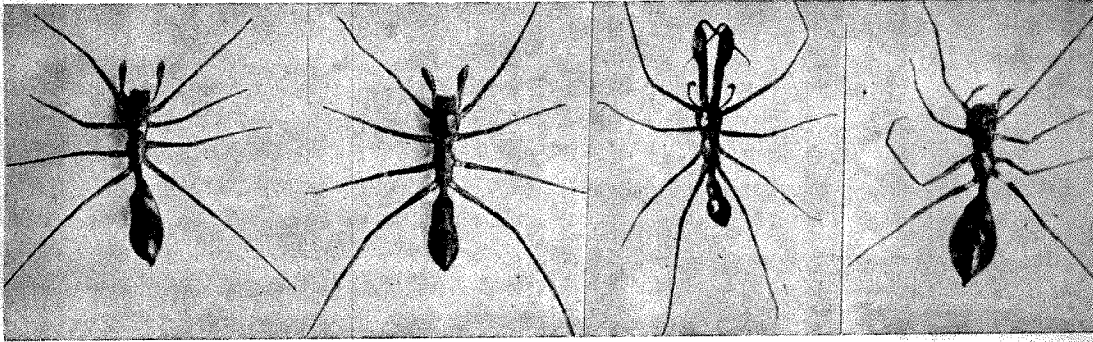
বাধায় তাহাকে একচুল অগ্রসর হইতে দিবে না। ফড়ি বা প্রজাপতিকো কোন রকমে একবার কারদায় পাইলে দলে দলে আসিয়া আক্রমণ করে; কিন্তু তাহাদের তুলনায় অত বড় একটা প্রাণীর সঙ্গে তাহারা প্রথমে বড়-একটা কৃতকার্য হইতে না পারিলেও হতাশ হইয়া পিছু হটে না; একটাই হটক কি দুই-তিনটিই হটক লেজে বা পায়ে কামড়াইয়া ধরিয়া থাকে। ফড়ি এই অবস্থায় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ক্রমাগত ছুটাছুটি করিতে করিতে অবশেষে ক্লান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ইহাদের এই উগ্র প্রকৃতির সুযোগ লইয়া কোন কোন মাকড়সা শত্রুত্ব কাঁকি দিবার ক্ষমতা তাহাদের আকৃতির হৃদয় অম্লকরণ করিয়াছে। এ পর্যন্ত বত দূর জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় তিন জাতীর বিভিন্ন ভ্রাম্যমান মাকড়সা এই নালসো-পিপড়েকে অম্লকরণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে 'প্ল্যাটিলিয়ডস্' নামক এক জাতীয় মাকড়সার অম্লকরণ-শক্তি সম্পূর্ণ নিখুঁত। নালসো-পিপড়ে ও 'প্ল্যাটিলিয়ডস্' মাকড়সার গায়ের রঙে কোনই পার্থক্য বৃদ্ধিতে পারা যায় না; উভয়ের রংই ইটের রঙের মত লাল। একমাত্র গলদেশ ব্যতীত উভয়ের দৈহিক গঠনে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বিদ্যমান। কিন্তু পিপীলিকা ও মাকড়সার পা ও চক্ষুর সংখ্যা সমান নহে। পিপীলিকা প্রভৃতি কীটপতঙ্গের তিন জোড়া পা ও এক জোড়া চোখ থাকে। মাকড়সাদের কিন্তু চার জোড়া পা ও সাধারণতঃ চার জোড়া করিয়া চোখ থাকে। পিপড়ে-মাকড়সাদের মস্তকের উপর চারটি এবং সম্মুখ ভাগে চারটি চোখ আছে। সম্মুখের এই চারটি চোখের মধ্যস্থ দুইটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সম্পূর্ণ গোলাকার এবং মনে হয় যেন মোটরের হেড-লাইটের মত অলিতেছে। এই চোখ দুইটির রং প্রায়ই বদলাইতে দেখা যায়। কখনও উজ্জ্বল নীল, কখনও দীর্ঘ লাল, কখনও বা কালো বলিয়া মনে হয়। পোকামাকড় প্রভৃতি শিকারের এই উজ্জ্বল চোখ দুইটির সামনে পড়িলে যেন ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। মাকড়সা ও পিপীলিকাদের মধ্যে চক্ষু ও গায়ের সংখ্যার পার্থক্য থাকিলেও মাকড়সারা অতি অদ্ভুত কোঁশলে পিপীলিকার সহিত নামঞ্জুর রক্ষা করিয়া চলে। পিপীলিকার মাথার উপর এক জোড়া করিয়া চোঁড় থাকে; কিন্তু মাকড়সাদের ঐরূপ কোন চোঁড় নাই, পিপীলিকার সর্বদাই চোঁড় নাড়িয়া নাড়িয়া চলে এবং এই চোঁড় সম্পৃষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। চোঁড় দেখিয়া সহজেই অস্ত্রাস্ত্র কীটপতঙ্গ হইতে পিপড়েকে চিনিয়া লইতে পারা যায়। অম্লকরণকারী মাকড়সারা অতি সরল ও সঙ্কীর্ণ উপায় এই চোঁড়ের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। চলিবার সময় সম্মুখের দুইখানা পা সর্বদাই তাহারা পিপড়ের চোঁড়ের মত মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়া নাড়াইতে থাকে। একে তো পিপড়ের গায়ের রং ও আকৃতির সঙ্গে ইহাদের কোনই তফাৎ নাই, তাহাতে চোঁড়ের মত করিয়া ঠ্যাং দুইটাকে নাড়াইতে থাকিলে শত্রু মিশ্র কাহারও সাধা নাই যে সহজে এই অম্লকরণকারী মাকড়সাকে চিনিয়া উঠিতে পারে। লাল-পিপড়েরা যেখানে চলাকেরা করে অথবা যে-গাছে বাসা বাঁধে তাহার আশেপাশেই এবং অনেক সময় এক প্রকার তাহাদের দলে মিশিয়াই এই 'প্ল্যাটিলিয়ডস্' মাকড়সারা ঘেরাকেরা করিয়া থাকে। কাজেই সাধারণতঃ লোকে ইহাদিগকে পিপীলিকা

বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের কতকগুলি চাল-চলন পিপড়েরের হইতে স্বতন্ত্র। ইহারা যেরূপ ক্রতবেগে চলাকেরা করিতে পারে নালসো-পিপড়েরা সেরূপ পারে না। সাধারণতঃ আস্তে আস্তে ঘোরাঘুরি করিতে করিতে হঠাৎ কোন কিছু আব্ছাগোছ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়ায় এবং বিপদ বৃদ্ধিলে চক্ষের নিম্নেবে ছুটিয়া পলায় অথবা পাতার আড়ালে আশ্রয়গোপন করিয়া থাকে, কিন্তু নালসো-পিপড়েরা সেরূপ কিছুই করে না। অনেক সময় ইহাদের গতিবিধি দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া ভাবে—দুই-একটা নালসো-পিপড়ের এরূপ অদ্ভুত গতিবিধি কেন? তাহারা বৃদ্ধিতেই পারে না যে, ইহারা মোটেই পিপড়ে নয়। চলিতে চলিতে আবার সময় সময় ঘাড় বাঁকাইয়া এদিক-ওদিক দৌঁধিয়া লয়, নেহাৎ কেহ অম্লসরণ করিলে একান্ত হররাণ হইয়া পাতা অথবা ডালের গায়ে স্ততা আটকাইয়া নীচে ঝুলিয়া পড়ে।

জী 'প্ল্যাটিলিয়ডস্' মাকড়সার আকৃতি, পরিণত ও অপরিণত উভয় বয়সেই ঠিক নালসো-পিপড়ের অম্লকরণ; কিন্তু পুরুষ-মাকড়সা অপরিণত বয়সে ঠিক জী-মাকড়সার মত হইলেও শেববার খোলস পরিভ্যাগের পর সম্পূর্ণ বিপরীত মূর্তি পরিগ্রহ করে। প্রায় ছয় বার খোলস পরিভ্যাগের পর ইহারা পরিণতবয়স্ক হইয়া থাকে। পাকমবার খোলস বদলাইবার পরও জী ও পুরুষ মাকড়সার মধ্যে কিছুই পার্থক্য দেখা যায় না; সবাইকে জী-মাকড়সা বলিয়াই মনে হয়। ষষ্ঠবার খোলস পরিভ্যাগের সময় জীকণী পুরুষ-মাকড়সার হঠাৎ একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় মাকড়সা কিছু স্ততা বুলিয়া তাহার উপর চূপ করিয়া বসিয়া থাকে। তার পর জীকণী পুরুষ-মাকড়সার মস্তকের দিকের শক্ত খোলসটি যেন কঙাওয়াল ঢাকনার মত উঠিয়া আসে। তাহার মধ্য হইতে প্রায় ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই একটা 'ডবল' নালসো-পিপড়ের মত মজ্জুত বিকটাকার প্রাণী বাহির হইয়া আসে। প্রত্যক্ষ না করিলে ইহা বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয় না যে এরূপ একটা ডবল সাইজের প্রাণী, মুক্তের মত এক জোড়া লম্বা চোঁট লইয়া এই ছোট খোলসটার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে। ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত যে আর্যোপান্যাসের সেই কলসীর দৈত্যের কথাই মরণ করাইয়া দেয়। ছোট ছোট বিব-দাঁত দুইটির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসে প্রকাণ্ড মুক্তের মত দুইটি যন্ত্র। কুমীরের লম্বা চোঁটের দুই দিকের দাঁতের মত এই মুক্তের প্রত্যেকটিতে লম্বালম্বি দুই সারি করিয়া দাঁত থাকে। মুক্তের মাথার বাঁকানো লম্বা লম্বা দুইটি স্ফটিকা। এই বৃহৎ স্ফটিকা দুইটিকে মুক্তের খাঁজে ভাঁজ করিয়া রাখে। কাহাকেও আক্রমণ করিবার সময় এই বিরাট চোঁট দুইটিকে পাশাপাশি ভাবে ঠা করিয়া অগ্রসর হয়, বড় করিয়া দেখিলে এই বিরাট মুখগহবরটি দেখিয়া অতি বড় সাহসী ব্যক্তিরও হৃদয় কম্পিত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি—পুরুষ-মাকড়সার সর্বশেববার খোলস পরিভ্যাগ করিয়া এই নব কলেবর ধারণ করিতে ৫।৭ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। এইরূপ অভিনব আকৃতি ধারণ করিবার পর পুরুষ-মাকড়সা প্রায় এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টাকাল চূপ করিয়া বসিয়া থাকে। ইতিমধ্যে শরীর ক্রমশঃ শক্ত হইয়া গায়ের রং গাঢ়

লাল হইয়া থাকে। ইহার পর সে আহারাঘেবণে বাহির হয় এবং স্ত্রী-মাকড়সার সন্ধান করে। ইহার স্ত্রী প্রস্তুত করিতে পারিলেও বাসা-নির্মাণের বড়-একটা ধার ধারে না, পুনরো পরিভ্রমণে বাসা-অথবা স্ত্রী-মাকড়সার সন্ধান পাইলে তাহারই বাসায় অনেক সময় কাটাইয়া দেয়। স্ত্রী-মাকড়সা সাধারণতঃ সবুজ পাতার নিম্নপৃষ্ঠে স্ত্রী বুনিয়া লম্বাটে ধরণের গোলাকার বাসা নির্মাণ করে এবং তাহার মধ্যে দশ-বারটা ছোট ছোট সিরিষার মত হলদে রঙের ডিম পাড়ে। ডিম না-ফোটা পর্যন্ত বাসার উপরেই অবস্থান করে, অবশ্য স্ত্রী-মাকড়সাকে আলাদা করিয়া রাখিলেও সময়মত ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইয়া থাকে। দশ-পনের দিন পরে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। বাচ্চাগুলি

লাল-পিপড়াদের অনুকরণকারী অপর এক জাতীয় লাল মাকড়সা আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের নাম—‘ফরটিসেপস্’ মাকড়সা। ইহাদের দেহের গঠন ঠিক পিপড়াদের মত না হইলেও এমন ভাবে চলাফেরা করে যে, হঠাৎ দেখিয়া নালসো-পিপড়ে বলিয়াই ভ্রম হয়। গায়ের রং নালসোর মতই লাল। শরীরের পশ্চাত্তাগে এমন ভাবে দুইটি কালো ফোটা অবস্থিত যে দেখিয়া ঠিক নালসো-পিপড়ের চোখ দুইটির মতই মনে হয়। ইহাদের অনুকরণপ্রিয়তা ঠিক আশ্চর্য্য-মূলক নহে। পরিণত বয়সে এই ফরটিসেপস্ মাকড়সারা লাল পিপড়াদের শরীরের রস চুষিয়া খাইয়াই জীবনধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের পক্ষে নালসো-পিপড়ে শিকার করা খুব সহজসাধ্য



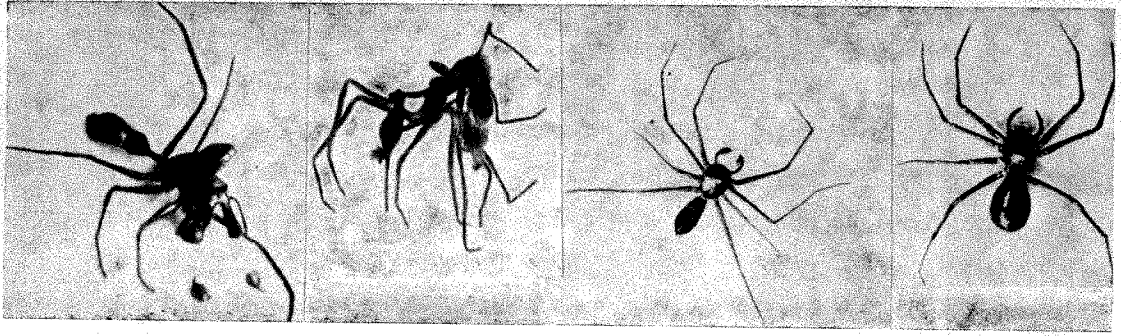
অপরিণতবয়স্ক পুরুষ ‘প্ল্যাটালিয়ডস’ অপরিণতবয়স্ক স্ত্রী ‘প্ল্যাটালিয়ডস’ মাকড়সা। ইহাদিগকে প্রত্যেকেই নালসো-পিপড়ে বলিয়া ভুল করে।

মাকড়সা—ইহাদিগকেও নালসো-পিপড়ে বলিয়া ভুল হয়।

পরিণতবয়স্ক পুরুষ প্ল্যাটালিয়ডস পরিণতবয়স্ক স্ত্রী প্ল্যাটালিয়ডস মাকড়সা। ইহাদের মুখের সম্মুখস্থ লম্বা ঠোঁট দুইটির জন্ত কেহ কেহ ‘ডবল-পিপড়ে’ বলে।

দেখিতে ছবছ ফুদে পিপীলিকার মত। কোন কিছু না-খাইয়া বাচ্চা গুলি বাসার মধ্যে পাঁচ-ষাট দিন অবস্থান করিবার পর আহারাঘেবণে ইতস্ততঃ বহির্গত হয়। পরিণতবয়স্ক মাকড়সা অপেক্ষা এই বাচ্চাগুলি অধিকতর দ্রুতগতিতে ছুটাছুটি করিয়া থাকে। ইহাদের শরীরের গঠন পরিণতবয়স্কদের মত হইলেও গায়ের রং থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। মাথার দিক কালো কিন্তু পিছনের দিক অন্ধক হলে ও অন্ধক কাল—ঠিক ফুদে পিপীলিকার মত। তৃতীয়বার খোলস পরিভ্রমণের সময় পর্যন্ত বাচ্চাগুলি ফুদে পিপীলিকাদিগকে অনুকরণ করিয়া চলে। তৃতীয়বার খোলস বদলাইবার পর হইতেই ইহাদের শরীরের রং সম্পূর্ণ লাল হইয়া যায়। তখন ইহারা উইরাজ নামক আর এক জাতীয় পিপীলিকার অনুকরণ করিয়া তাহাদের সঙ্গেই চলাফেরা করে। চতুর্থ অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চমবার খোলস পরিভ্রমণের পর ইহারা নালসো-পিপড়েকে অনুকরণ করে এবং তাহাদের দলের আশে-পাশেই ঘোরাঘুরি করিয়া থাকে। ইহাদের হালচাল দেখিয়া মনে হয় কেবলমাত্র শত্রুর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের জন্তই এই অনুকরণ-শক্তির উদ্দেশ্য হইয়াছে।

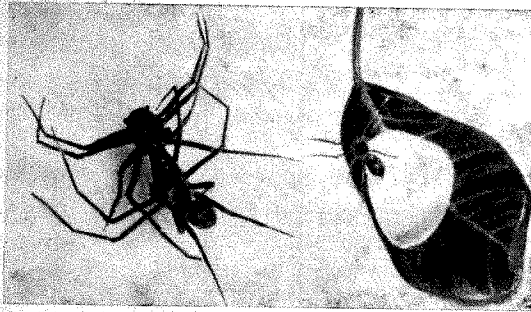
নহে। বিশেষতঃ ইহারা নালসোকে এত ভয় করে যে সহজে ইহাদের কাছে যাইতে ভরসা পায় না। এই জন্তই বোধ হয় ইহাদের অনুকরণপ্রিয়তার উদ্দেশ্য ঘটিয়াছে। যেখানে নালসোরা দলে দলে বিচরণ করে, তাহার আশেপাশেই ‘ফরটিসেপস্’ মাকড়সা সম্মুখের চারখানা ঠ্যাং উঁচু করিয়া চূপ করিয়া বসিয়া থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভাবে ‘ফরটিসেপস্কে’ নালসো-শিকারের প্রত্যাশায় চূপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। এক-স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলেও একটানা চলে না—থামিয়া থামিয়া অগ্রসর হয়। নালসোদের কেহ কেহ দল ছাড়িয়া মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া আশপাশের অবস্থা তদারক করে; আবার নতুন খাদ্যের সন্ধানও কেহ কেহ দল ছাড়িয়া বাহির হয়—কিন্তু বেশী দূর যায় না। দূর হইতে এরূপ দল-ছাড়া দুই-একটা নালসো, ফরটিসেপস্কে দেখিয়া স্বজাতীয় পিপড়ে বলিয়া ভুলক্রমে কাছে অগ্রসর হইলেই আর রক্ষা নাই। ‘ফরটিসেপস্’ সন্যোগ বুঝিয়া তাহার উপর লাকাইয়া পড়িয়াই একেবারে ঘাড় কামড়াইয়া ধরে। তখন অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর মাকড়সার বিবে ক্রমশঃ নির্জীব হইয়া পড়িলে শিকারী তাহাকে মুখে করিয়া



স্ত্রী-জাতীয় বলিয়া প্রতীয়মান মাকড়সা 'প্যাটালিয়ডস' মাকড়সা শেষবারের
খোলস বদলাইয়া পুরুষ-মাকড়সায় মত খোলস বদলাইতেছে।
পরিণত হইতেছে।

'ফরটিসেপস' নামক পুরুষ লাল 'ফরটিসেপস' স্ত্রী-মাকড়সা
মাকড়সা—নালসো-পিপড়ের নালসো-পিপড়ের
অমুকরণকারী। অমুকরণকারী।

কোন নির্জন স্থানে লইয়া গিয়া রস চুষিয়া খাইয়া দেহটা ফেলিয়া
দেয়। সময় সময় ডালের উপর পিপড়ের সারের মধ্য হইতেও
ইহারা এক-একটা পিপড়েকে ছোঁ মারিয়া ধরিয়া আনে; তখন
কিন্তু অগ্নি পিপীলিকার তরুণতরুর পশ্চাদ্ধাবন করে। তখন
বেগতিক দেখিয়া পিপড়েকে মুখে লইয়া স্ততা ছাড়িয়া ডাল হইতে
ঝুলিয়া পড়ে। অমুকরণকারী পিপড়েরা তখন হতভম্ব হইয়া
কিছুক্ষণ নীচের দিকে চাহিয়া থাকে, অবশেষে হতাশ ভাবে
ফিরিয়া যায়।



'ফরটিসেপস'-মাকড়সার
মিলন

স্ত্রী-ফরটিসেপস পাতার
উপর ডিমের থলি
পাহায্য দিতেছে

যে-গাছে নালসো-পিপড়ে বাসা বাঁধে তাহার আশেপাশে
ছোট ছোট গাছের পাতার উপর স্ততা বুনিয়া ইহারা গোলাকার

বাসা নিৰ্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই দেখিতে
প্রায় একই রকম। তবে পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত কৃশ ও ক্ষুদ্র
হয়। ইহাদের মস্তক গোলাকার এবং তাহাতে চার জোড়া চোখ
আছে। কিন্তু মাঝের চক্ষু জোড়াই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং তাহার
সাহায্যেই দেখাশোনা করিয়া থাকে। একযোগে ইহাদের দশ-
পনরটি করিয়া বাচ্চা হয়। বাচ্চাগুলির গায়ের রং জন্মের পর
সাধারণতঃ সবুজাভ থাকে। তার পর দুই তিন বার খোলস পরিত্যাগের
পর সম্মুখের দুই জোড়া পায়ের রং সবুজ ও মেরুজোড়া রঙের মত
ডোবাকাটা দেখা যায়। শেষবার খোলস পরিত্যাগের পর ইহাদের
দেহের বর্ণ সম্পূর্ণ লাল হইয়া যায়, কেবল পায়ের অগ্রভাগ সাদা
হয়। চলিবার সময় থামিয়া থামিয়া যখন পা কাঁপাইতে থাকে
তখন খুব সুন্দর দেখায়।

আমাদের দেশে আর এক জাতীয় লাল মাকড়সা দেখিতে পাওয়া
যায়—ইহারাও আশ্চর্যকাক্সে নালসো-পিপড়েকে অমুকরণ করিয়া
থাকে। ইহারা দেখিতে কতকটা 'ফরটিসেপস' মাকড়সার মত,
কিন্তু পেটের দিকটা প্রায় গোলাকার এবং পিঠের উপর চারদিকে
চারিটি কালো রঙের কুঁজ আছে। মাথাটা একটু লম্বাটে ধরণের।
মাথার উপর দুই সারিতে আটটি চোখ রহিয়াছে। ইহাদিগকে
'রেনাই' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহারা গাছের উপর
ত্রিকোণাকার জাল বুনিয়া অবস্থান করে এবং বোঁটার ঝুলানো
একটি থলিতে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বা ততোধিক ডিম পাড়িয়া থাকে।

[প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত চিত্রগুলি লেখক কতৃক
গৃহীত।]



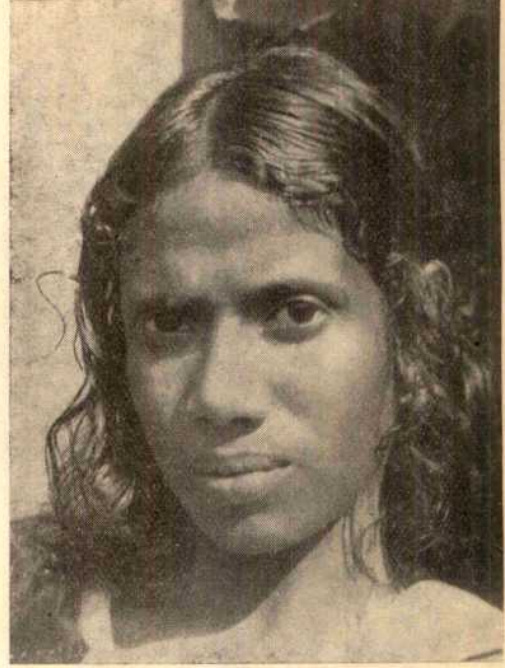
মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী তরুলতা সেন কলিকাতা সেন্ট্রাল কোর্টের
অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।



শ্রীমতী তরুলতা সেন

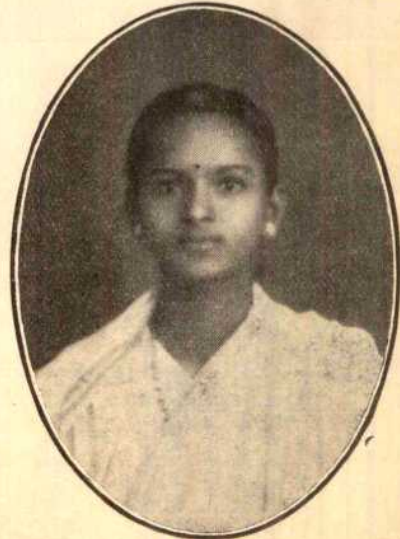
শ্রীমতী মালতী চৌধুরী উড়িষ্যার অন্ততম রাষ্ট্রনেত্রী-
রূপে সুপরিচিতা। সম্প্রতি উড়িষ্যা কৃষক-সম্মেলনে
তিনি সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।



শ্রীমতী মালতী চৌধুরী



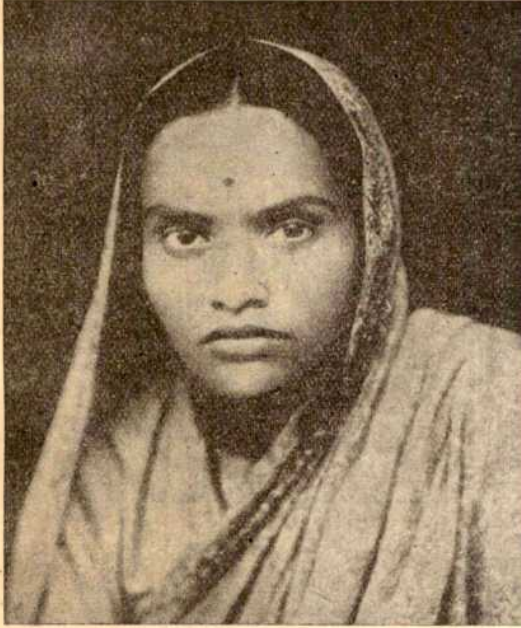
শ্রীমতী মনীষা সেন



শ্রীমতী তারা দেববাস

শ্রীমতী মনীষা সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্নত বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজী অনাসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। (প্রথম শ্রেণীতে কেহই উত্তীর্ণ হন নাই)। শ্রীমতী সেন ইন্টারমীডিয়েট পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী তারা দেবরাস নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইতিপূর্বে অপর কোন পরীক্ষার্থিনী এই কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারেন নাই।



শ্রীমতী নাগাম্মা পাটিল
বোম্বাই ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যা



বেগম হবিব-উল্লা
বুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যা

দ্রষ্টব্য

প্রবাসীর সম্পাদকের বক্তব্য। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল বৈশাখের প্রবাসীতে "বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থার গতি ও প্রকৃতি" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লেখেন, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ তাহার আলোচনা করেন। যোগেশবাবুর উত্তরসহ তাহা আবার প্রবাসীতে বাহির হইয়াছে। শৈলেন্দ্রবাবুর লেখাটি জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতেই বাহির হইতে পারিত। তিনি তাহা যথাসময়ে আমাদের পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি যোগেশবাবুর

কয়েকটি ভুল দেখাইয়াছিলেন। শৈলেন্দ্রবাবুর আলোচনাটির উত্তর দিবার সুযোগ যোগেশবাবুকে দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আলোচনাটি পাঠান হইয়াছিল। যোগেশবাবু শৈলেন্দ্রবাবুর প্রদর্শিত ভ্রমগুলির সংশোধন জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাতেই করায় আবার সংখ্যায় এ-বিষয়ে কিছু লেখা হয় নাই।

এই তথ্যটি জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতেই মুদ্রিত হওয়া উচিত ছিল।
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসীর সম্পাদক।

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃতায়ন

(১৫)

শর্কাকে ভোট-সরকারের হস্তে অর্পণ করার কড়া হুকুম আসিলে নেপাল-রাজদূত নাচার অবস্থায় পড়িলেন। লাসায় ছোটবড় প্রায় এক শত নেপালী কারবার আছে, তাহাদের মালিকের দল এই ঘটনার ফেরে মহা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহাদের বক্তব্য ছিল যে যদি শর্কাকে সমর্পণ করা না হয় তবে ভোট-সরকার জোর-জবরদস্তি করিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহার ফলে নেপাল রাজদূত ও তাহার অহুচর-দিগকে ধরিতে বাধিতে অথবা মারিতে হয়ত কিছু সময় লাগিতে পারে, কিন্তু অত্যাচার নেপালী প্রজার ধন-প্রাণ দুই-ই শেষ হইতে এক প্রহরও লাগিবে না। এই রকম অবস্থায় ২৩শে আগষ্ট প্যারেড-কালে ভোটীয় সৈনিকদিগের নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা বাধে। শহরে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে সৈন্তের নেপাল দূতাবাসে শর্কাকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছে। আর যায় কোথায়? মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত নেপালী সন্ত্রস্ত ও ব্যস্ত ভাবে দোকানপাট বন্ধ করিয়া ছাদে উঠিয়া লুঠপাট ও অত্যাচারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে সময়ের কথা বলিবার নয়। আমি নিজে নেপালীদিগের সঙ্গে ছিলাম এবং অধিকাংশ লোকেই আমাকে নেপালী বলিয়া জানিত। সুতরাং আমি নিজে নেপালীদিগের মনের অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছিলাম।

বেলা দুইটার সময় দোকানপাট বন্ধ হইল। আমাদের লোকজন যেন মহাপ্রলয় আগতপ্রায় ভাবিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল। যাহা হউক, সেই দিন ও রাত বিনা উপদ্রবে কাটিয়া গেলে পরদিন আবার দোকান খোলা হইল। এই ভাবে অনিশ্চিতের মধ্যে কয়দিন কাটিল। ২৭শে আগষ্ট বেলা বারটায় আমি ছু-শিং-শর (যে কুঠিতে আমি আশ্রয় লইয়াছিলাম) দোকানের ছাদে বসিয়া আছি এমন সময়ে দেখিলাম দক্ষিণ দিক হইতে দোকানের সারি ক্ষত বদ্ধ হইয়া আসিতেছে। যে-সকল নরনারী পথের

উপর বেসতি বিছাইয়া ছিল তাহারা কোন প্রকারে নিজেদের জিনিষপত্র উঠাইয়া ঘরের দিকে ছুটিতেছে, কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করিবার পর্য্যন্ত সময় পাইতেছে না। কিছুক্ষণ পরে কোন সরকারী লোকের কাছে শোনা গেল যে শর্কাকে ধরিতে নেপালী দূতাবাসে ভোট সৈন্যদল গিয়াছে।



তিব্বতী কয়েদী, লাসা

শুনিয়াই নেপালীরা বলিল এইবার লুট আরম্ভ হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি প্রায় সকল নেপালী সন্ধ্যাগরই বৌদ্ধ এবং সেই কারণে ইহাদের প্রত্যেকেরই এমন অনেক ভোটীয় বন্ধু আছে যাহারা ভয় অপেক্ষা ভরসারই পাত্র। কিন্তু লুট করে গুলুগুয়, সুতরাং লুটের সময় সে-সব বন্ধু নিজেদের

সম্পত্তি সামলাইতেই ব্যস্ত থাকিবে, তখন নেপালী বন্ধুদের সাহায্য করিবার অবসর কোথায় ?

সন্ধ্যার মুখে সঠিক খবর পাওয়া গেল যে নেপাল-রাজদূত শর্কাকে ভোট-সরকারের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাকে রক্ষা করিবার জন্ত কোন প্রকার সশস্ত্র চেষ্টা করেন নাই। চারি দিকে রাজদূতের বিচারবুদ্ধির প্রশংসা শোনা গেল। দুই-তিন শত নেপালীকে সম্বলিত করার মত গোলাবারুদ ও বন্দুক রাজদূতের হাতে ছিল, বস্তুতঃ চেষ্টা করিলে নেপাল-রাজদূত তাহার পঁচিশ-ত্রিশ জন সৈনিক এবং এই দুই-তিন শত অস্ত্র নেপালী প্রজার সাহায্যে ভোট-সরকারকে বিলম্বিত বেগ দিতে পারিতেন, কেননা নেপালীরা ভোটিয়দিগের তুলনায় অনেক অধিক যুদ্ধকুশল এবং দূতাবাস শহরের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া তাহার উপর গোলা চালাইলে শহরের ক্ষতি অবশ্যজ্ঞাবী; এ অবস্থায় সহস্রাধিক নেপালী প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ কেমন করিয়া করা যায় ইহাই ছিল তাহার প্রধান সমস্যা। শর্কাকে কিছু কালের জন্ত বাঁচাইতে এতগুলি প্রজার ধনে প্রাণে সর্বনাশ করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং শর্কাকে ভোটিয়দিগের হস্তে অর্পণ করা হইল। তাহার উপর শাস্তি বিধান হইল দুই শত বেত্রাঘাত। বেত্রের আঘাতে তাহার দেহ কাটিয়া মাংস পর্য্যন্ত উঠিয়া গেলেও জ্ঞান যতক্ষণ ছিল সে একবারও শব্দমাত্র উচ্চারণ করিয়া কাতরতা প্রকাশ করে নাই। এইরূপ নির্দয় প্রহারের ফলে ১৭ই সেপ্টেম্বর শর্কা গোয়েল্লো মারা যায়।

এদিকে লাসায় বাজার বন্ধ হওয়ায় কেবল শহরে নয় দূরস্থ অঞ্চলেও নানা প্রকার গুজব রটিয়া উপদ্রবের আশঙ্কা বাড়িতেছিল। শর্কা পুনর্বার গ্রেপ্তার হওয়ার পর শহরের কর্তৃপক্ষ কড়া হুকুম জারি করিলেন যে দোকান বন্ধ করিলে বা গুজব রটাইলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। এই বিজ্ঞাপনের ফলে বাজার আর বন্ধ হইল না। এদিকে পূর্ক হইতেই উভয় পক্ষের রণসজ্জা হইতেছিল, এখন তো যুদ্ধ আসন্নপ্রায় দেখা গেল। তিব্বতে সংবাদপত্র নাই, সমস্ত খবরই মুখে মুখে প্রচারিত হয়। তবে ইহা বলিলে ভুল হইবে না যে এইরূপ উড়া খবর বিলাতী খবরের কাগজের খবর অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। ৩১শে আগষ্ট সংবাদ আসিল যে নেপাল ও তিব্বতের এই বিবাদে সিকিমের

ব্রিটিশ রেসিডেন্ট মধ্যস্থ হইতে আসিতেছেন। পরদিন শোনা গেল যে দলাই লামা তাহাকে তিব্বত-প্রবেশের অনুমতি দেন নাই। আমি দজ্জীর দোকানে শীতবস্ত্রের বরাদ্দ দিতে গিয়া শুনিলাম, ভোট-সরকার শহরের যত জিন কাপড় খরিদ করিয়াছেন। শহরে জোর গুজব রটিয়া যে চীন ও রুষ তিব্বতের সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছে। নেপাল হইতে খবর পাওয়া গেল যে ধনকুটা, কুতী, কেরোং প্রভৃতি অঞ্চলে যে চারটি পথে তিব্বতে প্রবেশ করা যায় সে-সকল পথ মেরামত করাইয়া সৈনিকদিগের ছাউনি ফেলা হইয়াছে এবং অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার লাগাইবার জন্ত টেলিগ্রাফের তার ও খাম মজুত রাখা হইয়াছে।

লাসা শহরের কথা আর বলিবেন না! রোজ সকাল দশটায় রাজপথে পণ্টনের কুচ-কাওয়াজ চলিয়াছে। সৈন্যদের যুদ্ধকৌশল বর্ণনার অতীত। প্রায় সকলেই ইউরোপীয় সৈন্যের পরিত্যক্ত রাইফেলের সুসজ্জিত কিন্তু দেখা গেল বন্দুক ছুঁড়িবার সময় সকলেই চক্ষু বুজিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়। ছোট ছেলের দল তো সারাদিনই পথে পথে 'রাইট-লেফ্ট' করিয়া বেড়াইতেছে আবার সৈন্যদের মধ্যেও দুই-তিন জন করিয়া স্থানে স্থানে ঐরূপ রাইট-লেফ্ট চালাইতেছে। এই মন্ত্বে ইহাদের এত আস্থার কারণ এই যে, ভোট-সৈন্যদলের যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষার ভোটিয় প্রোফেসরবর্গ প্রায় সকলেই গ্যাঙ্কীতে দুই-তিন সপ্তাহ থাকিয়া পাশ্চাত্য যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত (!) করিবার সময় ইহা শিক্ষা করিয়াছে। এদিকে কলিকাতা হইতে প্রত্যেক নেপালী কুঠাতে প্রত্যাহই লাসা ছাড়িয়া যাইবার জন্ত 'তার' আসিতে লাগিল। ২০শে সেপ্টেম্বর ছু-শিং-শর কুঠার অধিকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রিরত্নমান সাহ লাসা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ও যাইবার কালে ছোট ভাই ও অস্ত্র সকলকে বলিয়া গেলেন যে অমুক সঙ্কেতযুক্ত তার পাইলেই সকলে যেন চলিয়া যায়, কুঠা বা দোকানে যে লক্ষ লক্ষ টাকার সামগ্রী আছে তাহা রক্ষা করিবার কোন চেষ্টায় তাহারা যেন দেহি না করে। এই মরহুম লাসায় মজোলাীয়া হইতে বহু মুসলমান সওদাগর আসে, শোনা গেল এইবার তাহারা বিক্রয়ের জন্ত যত খচর আনিয়াছিল সবই ভোট-সরকার স্বয়ং ক্রয় করিয়াছেন।

৩রা অক্টোবর শুনিলাম ফৌজের জন্ত লাসায় লোক গণনা চলিয়াছে।

এদিকে দুই সরকারে তারযোগে কথাবার্তা চলিতেছিল। অক্টোবরের গোড়ায় ত্রিপুরার তাহার ভাইকে সব ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার জন্ত কলিকাতা হইতে তারযোগে খবর পাঠাইলেন। ভাই জানমান সাহু বাইতে প্রস্তুত ছিলেন না কিন্তু এদিকে থাকিলে কি ভীষণ ব্যাপার হইতে পারে তাহাও স্পষ্টই বুঝিতেছিলেন। ইতিমধ্যেই কিছু সৈন্ত নেপালসীমান্তে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ছোটবড় জায়গীরদারদিগের জমীদারী-অহুদারী লোক-লস্কর আসিতেছিল। তিব্বতে কৃষিযোগ্য জমীর প্রায় সবই এইরূপ জায়গীরে বিভক্ত এবং যুদ্ধের সময় এই সব জায়গীরদার (তাহাদের মধ্যে অনেক মঠাধিকারীও আছে) নিজেরের এলাকার আয়তন মত সেপাই যোগাইতে বাধ্য। ১৯০৪ সালের ব্রিটিশ অভিযানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এইরূপ জায়গীরের সেপাই নিজেরের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সঙ্গে আনিয়াছিল কিন্তু সে অস্ত্রশস্ত্র আজকালকার যুদ্ধের উপযোগী নহে জানিয়া এখন অস্ত্র-সরবরাহের ভার খোদ ভোট-সরকারই হাতে লইয়াছেন। যাহা হউক এই ফৌজের সেপাই দেখিয়া পুরাণ-বর্ণিত বাবা ভোলানাথ মহাদেবের পণ্টনের কথা মনে পড়িল। কোথাও বাট বৎসরের পিতামহ বসুক-কাঁখে চলিয়াছেন, তাঁর পাশেই নাতির বয়সী পনের বছরের ফাজিল ছোকরা, কাহারো পরনে ছেঁড়া চোগা, পায়ে শতভালিযুক্ত বিলাতী গোরার বুট, কেহবা এই শীতের মধ্যে ‘চাল’ দেখাইবার জন্ত খাকীরঙের পণ্টনী পুরনো সূতী কোট-প্যাণ্টের সঙ্গে ছেঁড়া ভুটিয়া জুতা পরিয়া চলিয়াছে।

৪ঠা নবেম্বর কয়েকটি পণ্টন সীমান্তে চলিয়া গেল। প্রতি দশ-দশ জন সেপাই-পিছু একটি তাঁবু ও চায়ের জন্ত বিরাট তামার পাত্র দেওয়া হইল। এক জন ভোট-ফৌজী অফিসর বলিলেন, “লাসায় যে-সকল সৈনিক আছে তাহারাও যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বাইতে উৎসুক এবং এখানে থাকায় অসন্তুষ্ট।”

আমি বলিলাম, “ইহাদের বীরত্ব প্রশংসনীয়, যত্ন ইহাদের নিকট নববধূতুল্য।” তিনি বলিলেন, “ছাই বীরত্ব! ইহারা জানে লাসা হইতে তিন-চারি দিনের পথ গেলেই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চম্পট দেওয়া সহজ। এখানে থাকা খাওয়ার

কষ্ট, পলাইলে লুণ্ঠপাটের স্তব্ধতা আছে। এদেশে পুলিশ পাহারাও নাই, হুতরাং নিজ ঘরে ফিরিলে পরে পলাতক সেপাই গ্রেপ্তার হইতে পারে। কিন্তু পশ্চিমদেশের লোক পূর্বদেশে পলাইলে তাহাদের চিনিবেই বা কে, ধরিবেই বা কে?”

২০শে নবেম্বর সিংহল হইতে ভদ্র আনন্দের পক্ষে পড়িলাম, তিব্বতের এইরূপ অনিশ্চিত অবস্থা শুনিয়া আমার প্রচণ্ড আচার্য্য উপাধ্যায় শ্রীধরানন্দ মহাশয়ির আনন্দকে খবর লইতে বলিয়াছেন যে আমাকে লাসা হইতে লইয়া বাইবার জন্ত এরোপ্লেন পাঠানো সম্ভব কি না। আমি বন্ধুদের বলিলাম, “হয় মন্দ না, যদি এখানে হাওয়াই জাহাজ আসে। এদেশে লোককে রেলগাড়ী কি ব্যাপার বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় তাহা এক প্রকার ঘরবাড়ী বাহা নোড়াইতে পারে। বাছুর খেলা ছাড়া অন্য কিছু বলিয়া এরোপ্লেন তো বুঝাইতে পারা যাইবে না।”

ভোট-সরকারের টেলিগ্রাফের মেরামতাদি কার্যে সাহায্যের জন্ত ভারতীয় ডাক-বিভাগেব এক জন অফিসর শ্রীযুক্ত রোজমের এই সময় লাসায় ছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সময় একদিন বলিলেন যে ভারত-সরকার তাহার এই দুই বছর মধ্যে যুদ্ধ বাধিতে দিবেন না। কথাটা সঙ্গত, কিন্তু এক দিকে চীন ও রুষের নিকট সাহায্যলাভেব স্বপ্নে বিভোর হইয়া ভোট-সরকার ব্যাপার গুরুতর কবিতা তুলিতেছিল, অপর দিকে এই সব প্রতিফুল আচরণে অভ্যস্ত জুঁজু হইয়া নেপালরাজ তিব্বতের উপর প্রতিহিংসার জন্ত অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। হুতরাং ঘটনার স্রোত মোটেই মিটমাটের দিকে ছিল না। রুষের সাহায্যের প্রসঙ্গে আমি এক দিন এক ভোট-রাজকর্মচারীকে বলিয়াছিলাম, “সে দেশের সঙ্গে আপনাদের তো তার বা ডাকের ব্যবস্থা নাই, কাজেই আপনাদের চিঠি যত্নে পৌঁছিতে পৌঁছিতে নেপালীরা সারা তিব্বতে ছুটিয়া বেড়াইবে।”

এদিকে গুজবের ঘোঁষায় চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। একবার খবর রটিল যে সন্ধি হইয়া গিয়াছে, বীরগজ (নেপাল) হইতে এক টেলিগ্রাম আসিল, “নেপালের সঙ্গে সন্ধি উত্তম, কোন ভয় নাই, কাজ চালাও।” সকল নেপালী এই খবর

পাইয়া আশঙ্ক হইতেছে এমন সময় সন্ধ্যা আসিল যুদ্ধ আসন্নপ্রায়। ইতিমধ্যে নেপালের মহামন্ত্রী মহারাজ চন্দ্রশমসের স্বর্গারোহণ করিলেন। এক সপ্তাহ পরে ২রা ডিসেম্বরে এ-খবর লাসায় পৌঁছিতেই শহরময় বলাবলি চলিল, “দেখেছ লামাদের মন্ববল, কি ভয়ানক পুরুষের ক্ষমতা!” তাহার পরেই ভারতে মহাসমরের সময় সৈনিকেরা যেমন ঠেপনের মিঠাইয়ের বৃত্তি লুট করিয়াছিল, লাসার সৈনিকেরাও তেমনই আরম্ভ করিল। এক জন সেপাই খাওয়ার পরে খাবারের দোকানে পরসা না দিয়া চলিয়া আসিতেছিল, দোকানী দামের প্রশ্ন তুলিতেই দেশরক্ষক বীর তাহার পেটে ছোরার আঘাত দিয়া প্রাণের উত্তর দিল।

১৩৩০ সালের ১৮ই জাহুয়ারী শোনা গেল যে চীন-রাষ্ট্রপতির পত্র লইয়া দূত আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পাঁচ-শ সৈনিকের শোভাযাত্রার এবং বেরূপ পূর্বকালে চীন-সম্রাটের পত্রবাহী দূতের জন্য করা হইত তদ্রূপ নৃত্যগীতাতির ব্যবস্থা হইয়াছে। শুনিলাম, পত্রে তিব্বত ও চীনের সহস্র বৎসরের সম্বন্ধের কথা তুলিয়া ধুনীয়ার সে-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য স্থানিকি প্রতিনিধি পাঠাইবার কথা বলা হইয়াছে। এক সপ্তাহ পরে এক ভোটিয়া কুমারী চীনের সাহায্যবাস্তা লইয়া আসিলেন। ইনি জাতিতে তিব্বতীয়া হইলেও চীনের প্রজাতন্ত্রের (জুয়োমিষ্ট-জের) সদস্য ছিলেন। মোহনিত্রা ভঙ্গ হইলে তিব্বতীয়েরা কি হইতে পারে, ইনি ছিলেন তাহারই নিদর্শন।

এখন চীনের এই ভাব ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিল। বহির্জগতে খবর পৌঁছান সম্ভব যদি না হইত তবে নেপালীরা তিব্বত জয় করিলে কিছু হইত না, কিন্তু এখন ঐরূপ ঘটিলে চীন ও অন্তঃস্থ রাষ্ট্রে রটিবে যে নেপাল ইংরেজেরই অন্ত্র-বিশেষ, সুতরাং ঐরূপ ব্যাপারে বাধা দেওয়া প্রয়োজন। ৭ই ফেব্রুয়ারী খবর আসিল যে দুই বিবাদীর মধ্যে সন্ধি-স্থাপনের জন্য ব্রিটিশ সরকার সরদার-বাহাদুর লে-দন-লাকে পাঠাইতেছেন। এদিকে সন্ধি ও যুদ্ধের উদ্বেগ-উজ্জ্বল তিন মাস কাটিয়াছে; ১১ই ফেব্রুয়ারী সন্ধির প্রমাণ আরও পাওয়া গেল যখন লাসা হইতে বাহিরে যাইবার

সকল পথে সৈনিক পাহারা বসিল এবং কড়া হুকুম জারি হইল যে, কোন নেপালী প্রজা লাসার বাহিরে যাইতে পাইবে না। এত দিন পথে বন্দুক-হাতে সিপাহী চলিতেছিল, এখন তোপ কামান দেখা দিল। গ্যাঙ্কী, শিগ্গী সকল শহরেই এই অবস্থা, সে-কথা পরে জানা গেল। লাসার নেপালীরা এত দিন সন্ধির আশায় এদেশ ছাড়ে নাই, নেপাল ও কলিকাতা হইতে লাসা ভ্যাগের জন্য জরুরি আদেশ-অনুরোধ সবই তাহারা উপেক্ষা করিয়াছে, এখন অবস্থা দেখিয়া তাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিল। ভোটীয়েরা বলিতে লাগিল, “চীনাঙ্গত যখন আসিয়াছে তখন আর ভয় কি? আমরা এখন আর অসহায় নই।”

আজ শুনিলাম লে-দন-লা লাসা হইতে দু-দিনের পথ ছাড়িয়া পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু সন্ধির কোন আশা দেখা গেল না। শোনা গেল মহাশয় (দলাই লামা) পূর্বেই লে-দন-লার উপর অশ্রুস্রব হইয়াছিলেন। এখন সন্ধির কথা দূরে থাক তাহার সহিত দেখা করিতেও স্বীকৃত হইবেন কিনা সন্দেহ। নেপালীরা অদৃষ্টের উপর সকল বরাত ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া রহিল। এদিকে খবর আসিল যে নেপালের নূতন রাণা ভীম শমসের ফাস্তনের পূর্ণিমা পর্যন্ত সময় দিয়া তিব্বতের কাছে জবাবদিহি তলব করিয়াছেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী সরদার-বাহাদুর লে-দন-লা লাসায় পৌঁছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় শোনা গেল, তিনি তিন বট-কাল মহাশয়র সহিত নিভূতে আলাপ করিবার পর ভোট-মন্ত্রিদলের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়াছেন। তার পর প্রতিদিনই ঐরূপ মহাশয়র সহিত বাক্যালাপের খবর আসিতে লাগিল কিন্তু সন্ধির কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। সে বৎসর ১লা মার্চ, মাঘ-প্রতিপদে ভোটীয় নব বৎসর আরম্ভ হইল, কিন্তু লোকের মুখে বা মনে কোন আশার ছায়া পাওয়া গেল না। চারিদিকে অন্ধকারই দেখা গেল। ১১ই মার্চ শুনিলাম, সরদার-বাহাদুরের চেষ্টা সফল হইয়াছে, ভোট-সরকার নেপাল-রাজকে সন্ধিপত্র পাঠাইতেছেন, কিন্তু ১৬ই মার্চ শুনিলাম তিনি বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। পরদিন সে খবরও খণ্ডিত হইল। ১৮ই মার্চে আমার ভায়েবীতে লিখিয়াছিলাম, “যুদ্ধেব সম্ভাবনাই অধিক, তবে বহু বিশেষজ্ঞ বলিতেছেন সন্ধি হইবে।” ১৯শে মার্চ

নেপালী ব্যাপারীদের কাছে কলিকাতা হইতে অল্পরোধ আসিল, “সব ছাড়িয়া যে-কোন উপায়ে পলাইয়া এস।” সব-শেষে ২২শে মার্চ ভোট-সরকার ঘোষণা করিলেন যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। এই ঘোষণায় নেপালী প্রজাদের আনন্দের অবধি রহিল না। ৩০শে মার্চ পথঘাট খুলিয়া দেওয়া হইল।

তিনকতে এই সাতমাসব্যাপী যুদ্ধের বাদল কাটিবার প্রধান কারণ সরদার-বাহাদুর লে-দন-লার যোগ্যতা ও ধৈর্য। তিনকতীয়দিগের কার্যকলাপ, বিচারক্ষমতা, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অতি নূন ও ব্যাপক ছিল, উপবন্ধ তিনি জাতি ও ধর্মে সিকিমী ভোট, স্ততরাং তিনকতীয় জাতির নাড়ীজ্ঞান তাঁহার মধ্যে ছিল এবং তাহাদের সকল বিশেষত্বও তাঁহার জ্ঞান ছিল। যে-সময় তিনি লাসায় আসেন সে-সময় যুদ্ধ অনিবার্য বলিয়াই সকলে জানিত এবং তিনি যে সন্ধি-স্থাপনে সমর্থ হইবেন এ-কথা কেহই বিশ্বাস করে নাই। তিনি তিনকতে না আসিলে কি হইত জানি না, কিন্তু সাধারণতঃ সমক্ষে দাঁড়াইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা ও অপরাধী কর্তৃকারীদের দণ্ডমান আদি নেপালরাজ-নির্দিষ্ট সন্ধি-সর্ত্তসমূহ যে ভোট-সরকার স্বীকার করিতেন না ইহাতে সন্দেহ নাই। লে-দন-লা ইংরেজ হইলে ‘নাইট’ খেতাব পাইতেন এবং বহুতর পারিতোষিকও যে তাঁহার করতলগত হইত ইহা নিশ্চয়, কেননা এই সন্ধি না হইলে চীন-রুষ প্রভৃতি রাষ্ট্রের সঙ্গে ইংরেজের মনোমালিন্য ঘটায় যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। আমি এই সকল ঘটনার বিবরণ যাহা দিয়াছি তাহা অল্প পাঁচ জনের মতই সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কেবল প্রভেদ এই ছিল যে, “অন্ধের দেশে কানা রাজা”—হিসাবে প্রত্যহই অনেকে আমার পরামর্শ লইতে আসিত। যাহা হউক, এই সন্ধির ফলে সহস্রাধিক নেপালী প্রজা এবং তাহাদের সঙ্গে আমিও ধনে-প্রাণে বাঁচিয়া গেলাম।

* * *

আমি লাসায় উপস্থিত হই ১৯২২ সালের ১৭ই জুলাই এবং ১৯৩০ সালের ২৪শে এপ্রিল ঐ রহস্যময়ী নগরী ছাড়িয়া চলিয়া যাই। মহাশয় দলাই লামার নিকট হইতে লাসায় থাকিবার অল্পমতিলাভের পর আমার লেখাপড়ার কাজ

আবস্ত হয়। আমার উদ্দেশ্য ছিল এদেশে তিন বৎসর থাকিয়া অধ্যয়ন শেষ করিয়া চীন জাপান যুঁঝিয়া দেশে ফেরা। তিনকতে আসিবার পূর্বে পুস্তকের সাহায্যে এদেশের ভাষা কিছু শিখিয়াছিলাম এবং লাসার পথে শুধু ভোট ভাষায় কথাবার্তা চালাইতে চেষ্টা করায় এ দেশের কথিতভাষার উপর কিঞ্চিৎ অধিকারও জন্মিয়াছিল, কিন্তু আমাব প্রয়োজন ছিল লিখিত ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করা, কেননা তাহার মধ্যেই আমাদের দেশের সংস্কৃত ভাষার অনেক প্রাচীন অমূল্য রত্ন স্তরক্ষিত আছে। স্ততরাং আমি ঠিক করিলাম যে, যে-সব গ্রন্থের সংস্কৃত ও তিনকতী উভয় সংস্করণই পাওয়া যায় সেইগুলি প্রথমে পড়িয়া ফেলিব। আমার কাছে বোধিচর্যাবতার গ্রন্থের সংস্কৃত সংস্করণ ছিল, তাহাব ভোটীয় অল্পবার ক্রম করিতে এক দিন বাজাবে গেলাম। দেখিলাম, এক জায়গায় কতকগুলি লোক পুঁথির রাশি লইয়া বসিয় আছে। ইহার পূর্ব-বা অর্থাৎ ছাপাওয়ালা এবং পুস্তকবিক্রেতা।

মুদ্রণ-প্রকার প্রথম আবিষ্কার হয় চীনদেশে। শীল-মোহরের পদ্ধতিতে কাঠের ফলকে উল্টা অক্ষর খোদাই করিয়া বোধ হয় ইহাব সূচনা হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভোট-সম্রাট শ্রোং-চন-গম-পো চীন-রাজকন্তকে বিবাহ করিলে চীন ও তিনকতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অদ্যাবধি সে সঙ্ঘর্ষ বর্তমান এবং তাহার ফলে বেশভূষা, পানভোজন আদি সমস্ত আধিভৌতিক ব্যাপারে তিনকত চীনদেশের নিকট ততটা দ্বন্দ্ব—আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ভারতের নিকট তাহার ঋণ যতটা। এই ঘনিষ্ঠতার পথেই তিনকতে চৈনিক ছাপার বিদ্যা আসে। ইহা তিনকতীয়েরা কোন্ সময় আয়ত্ত করে তাহা বলা কঠিন, তবে বিশ লক্ষ শ্লোক-বৃদ্ধ কন-জুর (বৃদ্ধ-২গ্যর—বৃদ্ধবচন-অনুবাদ) এবং তন-জুর (তন-২গ্যর=শান্ত-অনুবাদ) নামক দুই বিরাট সংগ্রহ (দুই এক হাজার শ্লোক ভিন্ন যাহাদের সমগ্র অবশিষ্ট অংশই ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ) পঞ্চম দলাই লামা হুমতি-সাগর (খৃঃ ১৬১৬-১৬৮১) কাঠফলকে খোদাই কবাইয়া ছিলেন বলিয়া জানা যায়। আজকাল প্রায় সকল মঠেই ঐরূপ মুদ্রণ-ফলক আছে, সামান্য দক্ষিণা দিলেই পূর্ব-বা অর্থাৎ মুদ্রাকরণ নিজেদেব পরিশ্রম, কাগজ ও কালির খরচে

সেইগুলি হইতে পুস্তক ছাপিতে পার। ইহারাই পুস্তক-বিক্রেতা। জো-খণ্ড নামে লাসার প্রধানতম ও প্রামাণ্যতম মন্দিরের উত্তর দ্বারের পাশে ঐরূপ কুড়ি-পঁচিশটি পন-বার দোকান আছে।

ভোট-সাহিত্য অধ্যয়নের সময় আমি ঠিক করিয়াছিলাম যে পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ও ভোট শব্দ-প্রতিশব্দ সংগ্রহ করিব, পরে যাহাতে ভোট-সংস্কৃত মহাকোষ লিখিতে পারি। ১৩ই আগষ্ট হইতে ঐ কার্য আরম্ভ করিয়া কয়েক মাসের মধ্যেই বোধিচর্যাবতার, শুদ্ধরাস্ত্রোক্ত, ললিতবিস্তার, সঙ্ঘপুণ্ডরীক, অমরকোষ প্রভৃতি আটখানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া ফেলিলাম। ইহার মধ্যে কয়েকখানি পুস্তক আমার ছিল, অন্তঃগুলির হস্তলিখিত প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি ছু-শিঙ-শাকে মন্দিরে পাই। তখনও আমার স্মৃতি, বিনয়, তত্ত্ব, ভ্রাম্য প্রভৃতির প্রায় পঞ্চাশখানি পুস্তক এবং বহু শত ছোট-বড় নিবন্ধ দেখা বাকী, কিন্তু যথাসময়ের পূর্বেই আমার ভরতে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে হইল। আমার শব্দকাষে পঞ্চাশ হাজার শব্দ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা ছিল, পনের হাজার শব্দ মাত্র তখন সংগ্রহ হইয়াছে, যদিও কোন মুদ্রিত তিব্বতী-ইংরেজী কোষে এত শব্দ এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই।

শব্দসংগ্রহের সময় আমি কন-জুর ও তন-জুর সেখানে আরম্ভ করিলাম। লাসা নগরের মুক্ মঠের কৰ্ম্মনিষ্ঠতা প্রসিদ্ধ, ইহা চোঙ-খ-পার গদ্যীতে আসীন টি-রিন-সোছের অধীন; আমি মঠের হস্তলিখিত তন-জুর পাঠের অল্পমতি পাইয়া সেখানে গেলাম। কিন্তু একে পুস্তকাগার স্বাক্ষর, তাহার উপর অক্টোবরের শীতে সন্ধি-কাশি শুরু হইল, হুতরাং দুই-তিন দিন সেখানে যাইবার পরই গ্রন্থগুলি নিজের বাড়ীতে লইবার অল্পমতি চাহিলাম। অল্পমতি পাইলে পনর-কুড়ি খণ্ড করিয়া পুস্তক ঘরে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলাম। সমগ্র সংগ্রহ ২৩৫টি বেটনীতে বদ্ধ।

আমার আশ্রয় ধর্ম্মমান সাহুর গৃহে তাহার বৈঠকখানার পাশে ছিল। বহুদিন থাকিতে হইবে জানিয়া আমার নিকট খরচ গ্রহণ করিতে সাহসকে রাজী করাইলাম। আমার ঘরটিতে সকালের রোদ আসিত, হুতরাং অপেক্ষাকৃত গরম ছিল, কিন্তু তৎসঙ্গেও শীতের প্রকোপ বুঝিয়া লাসার পুরনো বাজার হইতে ২০-৩০ সাং দিয়া একটি মঙ্গোলীয় পোস্তোন

কিনিলাম, ভিতরে ছাগলের বাচ্চার লোমযুক্ত চামড়া, বাহিরে মোটা লাল চীনা-বেশম কাপড়। যতই মোটা হউক এখানকার শীতের পক্ষে পশমী কাপড় তুচ্ছ। ঐ পোস্তোনের উপর মোলায়েম লম্বাপর্ণময়ূক্ত চুকটু, মাথায় উলের কানটোপ—এই সবে দেহের শীত নিবারণ হইল বটে, কিন্তু অক্টোবর-শেষের দারুণ শীতে আঙ্গুল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। উত্তর পশমের মঙ্গোলীয় দস্তানা পরিয়া লেখাপড়া চলিত। ডিসেম্বরের দ্বিপ্রহরে তাপমান ৪০° ফারেনহাইট মাত্র উঠিত, জাহ্নবীর মাঝামাঝি তাহা ২০° ডিগ্রিতে দাঁড়াইল। দিনে দ্বিপ্রহরে এইরূপ শীত, রাত্রে কিরূপ হইত বুঝিতেই পারেন। জল তো জমিয়াই যাইত, ফাউন্টেন পেন ব্যবহারের পূর্বে লেখাও অসম্ভব হইয়া উঠিল, কেননা শীতে ঘোঁষাতের কালি জমিয়া যাইত। অক্টোবরেই গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িল এবং মাসখানেকের মধ্যে বৃক্ষলতাগুলি সব শুকাইয়া গেল, ভ্রামলতার লেশমাত্রও দেখা যাইত না।

* * *

তিব্বতের রাজধানী লাসা এখন ব্রিটিশ, রুষ ও চীন রাজনীতির লীলাক্ষেত্র। লাসার সে-রা, ডে-পুঙ প্রভৃতি মঠে রুষ-এলাকার মঙ্গোল বাস করে, তাহাদের সকলে বা অধিকাংশই যে রাজনৈতিক কার্যে ব্যস্ত সে-কথা বলা চলে না। তবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে তাহাদের দ্বারা রাজনীতির গুপ্ত চাল চলিতে পারে। আমি ষে-সময় লাসায় ছিলাম সেই সময় এক জন রুষ-মোঙ্গল অভিশয় আড়ম্বরের সহিত তথায় জীবন যাপন করিতেছিল, পরে জানিয়াছিলাম যে সে 'খ্যেত' রুষ, 'লাল' বলশেভিক নহে। ব্রিটিশ-সরকারের তরফে এক জন রায়-বাহাদুর প্রকাশে এবং আরও অনেকে গুপ্ত ভাবে চরের কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। লাসায় পৌঁছিবার পরই প্রকাশ করিয়াছিলাম যে আমি ভারতীয়, চিঠিপত্রের আমার সকল কথাই সোজা ভাবে লেখা থাকিত, হুতরাং আমার প্রতি দৃষ্টি পড়িতে দেরি হইল না। তবে আমি ছিলাম সাংস্কৃতিক বিতর্কী, হুতরাং তিব্বতীয়দের সম্বন্ধে অনধিকারচর্চা করার সময় বা ইচ্ছা আমার হয় নাই। পূর্বোক্ত রোজমেরর সাহেবও প্রথম-সাক্ষাতে আমি কি করিতেছি সে-সম্বন্ধে বহু প্রশ্নাধি করেন, কিন্তু পরে তিনি আমার প্রতি অতি সজ্ঞনের মত ব্যবহার

করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি আমাকে পরিসি-ল্যাণ্ডের সম্য-ছাপা 'নেপাল' গ্রন্থের দুই খণ্ড ধার দিয়া ধন্য করিয়াছিলেন। উক্ত প্রামাণ্য পুস্তকে আমি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া উপকৃত হই।

মহাসমরের পূর্বে তিব্বতীয়েরা যখন চীনাগিকে বিভাঙিত করে তখন সে-দেশে ইংরেজের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। তাহারও কিছু দিন পূর্বে দলাই লামা লাসা ছাড়িয়া ভারতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সে-সময় ইংরেজ-সরকার তাঁহাকে অনেক সাহায্য করেন। এই সকল ব্যাপারের জন্ত দলাই লামা বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকায় ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ইংরেজ এ-দেশে অতি প্রভাবশালী ছিলেন। চীনাগণ বিভাঙিত হইলেও ভোটবাসিগণ জানিত যে চীনারা যখন নিজের দেশের ব্যাপার হইতে মুক্ত হইয়া এমিকে নজর দিতে পারিবে তখন তাহাদের গতি রোধ করা দুঃসাধ্য হইবে। সেই দিনের প্রতীক্ষায় মাঝে পুলিশ ও ফৌজ শক্তিশালী করিবার এক চেষ্টা হয়। পুলিশের ব্যবস্থা করিতে সর্দার-বাহাদুর লে-দন-লা দার্জিলিং হইতে এখানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। চীন আশান (রাজপ্রতিনিধি) যে স্বা-মী প্রাসাদে ছিলেন তথায় তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। পূর্বে এদেশে পুলিশের কোন ব্যবস্থা ছিল না, সর্দার-বাহাদুরকে উর্দা অর্থাৎ ইন্দুনির্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জিনিষের গোড়াপত্তন করিতে হয়। যাহা হটক, পুলিশের ব্যবস্থা করিতে এতটা বজ্রাট পোহাইতে হয় নাই, বিপদ হইল সেনাদলসংগঠনে। তিব্বত বিরাট দেশ, কাশ্মীর হইতে চীন, এবং বর্মা হইতে রুশ ও চীনা-তুর্কানান পর্যন্ত ইহার সীমা বিস্তৃত, এ-হেন এলাকার রক্ষার জন্ত কমপক্ষে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার সৈন্য আবশ্যক। প্রাচীন প্রথা ছিল যুদ্ধেব সময় জায়গীরদারদিগেব সিপাহীদলগুলির একত্র সমাবেশ করা, কিন্তু আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত চীনা-সৈন্তের সম্মুখে সেরূপ 'পাড়াগেয়ে' ভূতের সমষ্টি কম দুর্ব্বল দাঁড়াইতে পারে? কিন্তু সেনাদলকে সুশিক্ষিত ও সংগঠিত করিতে যে-অর্থবলের প্রয়োজন তাহাই বা আসে কোথা হইতে? সমস্ত দেশের জায়গা-জমী ছোটবড় জমীদারীতে বিভক্ত, অধিকাংশ বড় জায়গীর মঠগুলির অধিকারে। মঠ হইতে টাকা চাওয়ায় তাঁহারা জানাইলেন যে

ধর্ম্মকর্ম্ম, পূজাপর্কের খরচই তাঁহারা ফুলাইতে পারেন না, টাকা দিবেন কিরূপে? এই উত্তর অগ্রাহ্য করিয়া ভোট-সরকার চাপ দেওয়ায় মঠের অধিকারিগণ খোঁজ লইয়া বুঝিলেন এ-কার্য ইংরেজ-রাজদূতের প্রেরণায় হইতেছে। বলা বাহুল্য, ইংরেজ-প্রীতির স্রোত তৎক্ষণাৎ বিপরীতমুখী হইল, সন্ন চার্লস বেল এক বৎসর লাসায় থাকিয়া বিফল হইয়া ফিরিলেন। এমিকে টাকার জন্ত জোর তাগিদেব ফলে ভোট-সরকার ও টমী লামাব মধ্যে মনান্তর হওয়ায়, টমী লামা (পন্-ছেন-রিম্পোছে) দেশ ছাড়িয়া চীনদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন, আজিও তিনি প্রবাসে আছেন। ব্রিটিশ-সরকার ভোট-কৌজেব জন্ত মহাযুদ্ধে পরিত্যক্ত কয়েক সহস্র পুরনো রাইফেল সবববাহ করিয়াছিলেন, এখনও তাহার সম্পূর্ণ দাম পাইয়াছেন কি না সন্দেহ।

সর্দার-বাহাদুর পুলিশগঠনে এত দিন কোন বাধা পান নাই, এখন এই বিপরীত হাওয়ায় ঝাপটা তাঁহাকেও ব্যস্ত করিল। পুলিশদল সুসজ্জিত কবিবাব জন্ত তিনি তাহাদের লম্বা টিকি কাটাইয়াছিলেন। ভোটদেশে লামাগণ মূণ্ডতকেশ, অস্ত্র সকলেই মধ্যযুগেব ইউরোপীয় বা উনবিংশ শতাব্দীর চীনাদের মত বেগী ধারণ করে, স্বতরাং এক অজ্ঞাত কবি গান বাঁধিলেন "লেদন লামা ম-রে—পুলিহু ডাবা ম-রে—স্বা-মী গোম্বা ম-রে—ট-শর..." ইত্যাদি, অর্থাৎ 'লে-দন লামা নহেন, পুলিশেরা ভিক্স নহে, স্বা-মী প্রাসাদ মঠও নহে, তবে চুল কাটান কি কারণে?' এই রূপে তাঁহাব বিরুদ্ধে অভিযান-গীতেব সুরে দেশ ছাইয়া গেল। ভোটদেশে খবরের কাগজেব বদলে এইরূপ গানের পালায় সরেস খবর সারা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। লাসার শো-গঙ নামে এক সুপ্রতিষ্ঠিত ও ধনী বংশ আছে। তাহার বর্তমান কর্তা লাসায় সরকারী 'দে-পোন' অর্থাৎ জেনারেল ছিল। ঘরে স্ত্রীর স্ত্রী ও সন্তানাদি থাকা সত্ত্বেও শো-গঙ অস্ত্রতে আসক্ত হয়। তাহাব স্ত্রী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া সমাজে ও আদালতে টানটানি করিয়া শো-গঙকে সর্ব্বস্বান্ত করে। পূর্বেকার রাজসিক ঠাট ছাড়িয়া লাসাব এক কোণে একটি ছোট বাড়ীতে সেই স্ত্রীলোকটিকে লইয়া শো-গঙ দিন কাটাইতে থাকে। এই সময় কোন গুপ্ত কবি সমস্ত

ব্যাপারটিকে গানের পালায় বাঁধিয়া সাধারণে প্রকাশ করে। সমাজে আদালতে এত টানাটানি সবেশে শো-গড় অরান বদনে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু পথে-ঘাটে ঐ শানব গব্বরায় তাহার পক্ষে বাড়ীর বাহির হওয়া পর্যন্ত কিছু মিনের জন্ত বদ্ধ হইয়া গেল।

* * *

লাসার ডাক-ঘর ও তার-ঘর একই ভবনে অবস্থিত। প্রধানে এই বাড়ীটি আছে সেখানে পূর্বে স্তন-দগে-মিং নামে প্রসিদ্ধ মঠ ছিল। উক্ত মঠের এবং বর্তমান অষ্ট তিনটির (কুন-লদে-মিং, ছে-মো-মিং, ছে-মুছোগ-মিং) মোহন্তগণ দলাই লামার নাবালক অবস্থায় ভোটদেশ-শাসনের অধিকার পায়। বিগত চীন-ভাট যুদ্ধের সময় এই মঠের মোহন্ত চৈনিকদের সাহায্য করে, ফলে মোহন্তের প্রাণদণ্ড এবং প্রত্যেকটি ইট খুলিয়া মঠের ভিত্তি লোপ করা হয়। একদিন তার-ঘরে গিয়া খবর নাহিলাম তাহার পাশে লাসার রাজবৈজ্ঞ (এবং লাসার বৈজ্ঞানিকগণের অধ্যক্ষ) থাকেন। দেখা করিয়া বুঝিলাম তিনি জ্যোতিষী ও সারস্বতে অধিকারী। ইনি তখন বাৎসরিক পঞ্জিকার কাঠ-ফলক খোদাই করাইতেছিলেন। কথাবার্তায় বুঝিলাম, যদিও সংস্কৃত ভাষার এক অক্ষরও ইহার জানা নাই তবুও সারস্বতের সমস্ত সূত্র এখনও ইহার কণ্ঠস্থ। এইরূপ আর এক বিদ্বানের সহিত আলাপ হইয়াছিল যাহার সমস্ত চাক্ষু ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ।

ডে-পুঙ মঠ আগেই দেখা হইয়াছিল, ১২ই অক্টোবর সে-রা মঠ দেখা স্থির করিলাম। ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে এক মাস এদেশে ঘুড়ি উড়াইবার সময়। এ-ব্যাপারে নেপালীরা বিশেষ গটু, বোধ হয় তাহারাই এ-খেলা এদেশে আনিয়াছে (কিংবা চীনদেশ হইতে এই ছুই দেশই শিখিয়াছে)। এদেশে আমাদের দেশের মত প্রত্যেক খেলার বিভিন্ন মরশুম আছে। ঘুড়ি কাটা গেলে তাহা ধরিতে দকলে ছুটাছুটি করে। এক দিন শুনিলাম ঐরূপ ঘুড়ি ধরায় এক চাবা (সাধু) ও এক সিপাহীতে ঝগড়া হওয়ায় সিপাহী প্রবব চাবাকে এক পাখরের আঘাতে চিরদিনের জন্ত কাস্ত করিয়াছে।

সে-রা মঠ লাসা হইতে তিন মাইল উত্তরে ফসল কাটা শেষ হইয়াছে, শূন্য মঠের পাশ দিয়া চলিলাম। স্থানে স্থানে চমরী ও বলদ দিয়া মাড়াইয়া শল্যেণ তুষ

ছাড়ানো হইতেছে। ভোটবাসী সাধারণতঃ প্রসন্ন-মন, হুতরাং ফসল ঝাড়া, ঘুড়ি ওড়ানো, চা প্রস্তুত করা প্রভৃতি সকল ব্যাপাবেই গানের ঢেউ উঠিতেছে।

শস্যের ক্ষেতের সারি পার হইবার পূর্বেই বিস্তৃত হাতা-যুক্ত এক বিরাট অট্টালিকা দেখা দিল। চীনা শাসনের আমলে ইহা চৈনিক ভিক্ষুদিগের বাসস্থান ছিল। তখন লোকজনে ইহা গম্গম করিত, এখন নির্জন পূবী। বালুময় প্রাস্তব পার হইয়া পাহাড়ের মূলে পৌছিলাম, সামনে বিখ্যাত সে-রা বিহার। ডে-পুঙ-এর স্তায় ইহাকেও পাঁচ ছয় হাজার লোকের আবাসযোগ্য ছোট শহর বলা চলে। জম-যঙ নামে মহান্ চোঙ-খ-পার এক শিষ্য ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে ডে-পুঙ বিহার নির্মাণ করেন। ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট এক শিষ্য শাক্য-বে-শে সে-রা বিহার স্থাপন করেন। তাহার তৃতীয় শিষ্য এবং প্রথম দলাই লামা গেং-দ্রুন-গ্যাং-ছো ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে টশী-লুন-পো মঠ স্থাপিত করেন। সে-রা মঠ সাড়ে পাঁচ হাজার ভিক্ষুর বাস, তবে ছাত্রসংখ্যার হিসাবে ইহার স্থান ডে-পুঙের নীচে। এখানে পাঁচ জন অধ্যক্ষ (ম্ধন-পো) আছেন কিন্তু ড-ছঙ (এবং ছঙ অর্থাৎ বিদ্যালয়ঞ্চ) তিনটি মাত্র, 'গ্যো' (গ্যোং-ব্যেস-ম্ধন-মঙ), 'ম্যে' (ম্ধন-থোস-বসন-মিং) ও 'ডগ-পা'। সে-রা মঠে ৩৪টি ম্ধন-সন্ আছে। এই ম্ধন-সন্গুলি অঙ্গকোর্ড বা কেশিঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলির মত। উপরিউক্ত বিদ্যালয়-বিভাগগুলির মধ্যে 'গ্যো'তে ২২টি ম্ধন-সন্ ও 'ম্যে'তে ১২টি ম্ধন-সন্ আছে। ডগ-পা-তে বিশাল পাঠশালা আছে, সেখানে বিশেষ তত্ত্ব পড়ানো হয়, কিন্তু ম্ধন-সন্ একটিও নাই। ডে-পুঙ মঠে ঐরূপ ৩৩টি ম্ধন-সন্ আছে, উহা দুইটি বিদ্যালয়ঞ্চও বিভক্ত।

কেশিঞ্জ বা অঙ্গকোর্ডের কলেজগুলির মতই ম্ধন-সনে ছাত্রদের পড়িবার ও থাকিবার স্থান আছে। নিম্নপদস্থ অধ্যাপকদিগের নাম গে-গুর্নে (লেকচারার) ও উচ্চ শ্রেণীস্থদিগের নাম গে-শে (প্রোফেসর)। বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় স্থানে স্থানে চাবি দিকে দেওয়ালে-ঘেবা ফলের বাগান আছে, সেখানে বসিয়া ছাত্রেরা পাঠ কণ্ঠ্য করে কখনও বা ধর্মকীর্তি 'প্রমাণবার্তিক' ইত্যাদির শাস্ত্রার্থ বিচার করে। স্মরণ রাখা উচিত, যদিও এই বিহার নালন্দা ও

বিক্রমশিলা ধ্বংস হইবার দুই শত বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত তবুও উহাদেরই ছাঁচে ইহা নিখিত হইয়াছিল। ভোট-ছাত্রগণ বিক্রমশিলা মহাবিহারে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিল, সম-য়ে বিহার ত একেবারে উড্ড-পুরী বিহারের ন্যায় নিখিত। এইরূপে উক্ত বিহারকে অনেক বিষয়ে নালন্দা-বিক্রমশিলার জীবন্ত নিদর্শন বলা চলে। আজও পড়াইবার সময় সেখানকার অধ্যাপকবর্গ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রপরম্পরায় প্রাপ্ত বহুবন্ধ, দিগ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তি সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থের অবতারণা করেন। হুঃধের বিষয়, এখন এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অর্ধেক একেবারে নিরক্ষর, বাকী অর্ধাংশের শিক্ষা তাহাদের মতিগতি ও অভিরুচির উপর নির্ভর করে। বিদ্যালয়-প্রবেশকালে ছাত্রদের ড-ছঙে নাম লিখাইতে হয় এবং নিয়মিত রূপে সকলের সঙ্গে পানভোজনাদি করিতে হয়, কিন্তু অধ্যয়নে মন দেওয়ার প্রশ্ন আসে না। জন কয়েক ছাত্র ও অধ্যাপকের বিত্তোৎসাহ আছে সন্দেহ নাই, সেটা কিন্তু এখন অপবাদে দাঁড়াইয়াছে। এই সকল ড-ছঙের অধ্যক্ষ খন্-পোগণ পূর্বকালে যোগ্যতা অনুসারে নিযুক্ত হইতেন, কিছুকাল যাবৎ ঐরূপ যোগ্যতার দিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয় না। আমার লাসা-বাসকালে সে-রা মঠে একটি খন্-পোর পদ খালি হয়। সে-রা মঠের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান (স্বাস্থ্যক্ষেপে সে-রা সমস্ত তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া প্রদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে) এক মঙ্গোল গে-শে-কে তাঁহার ছাত্রেরা এই পদের প্রার্থী হইতে বলে। বলা বাহুল্য উমেনার অনেকে ছিলেন, এবং ঐ পদপ্রার্থীদের মধ্যে শাস্ত্রার্থপ্রতিযোগিতায় মঙ্গোল গে-শেই বিজয়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্বাচন ও নিয়োগের সিদ্ধান্তের অধিকার স্বয়ং বলাই লামার হস্তে, সেখানে মহাশঙ্কর মোদাং-দিগকে সম্বলিত করিতে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। মঙ্গোল বিদ্বান তাঁহার ছাত্রদের বলেন যে তিনি যত দূর উচিত ততটা চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু উৎকোচ দিয়া খন্-পো হওয়া তাঁহার বিবেকবিরুদ্ধ। শেষে কি হইল জানি না, কিন্তু সকলেই বলিত যে অন্ত কেহ রৌপ্য-অর্থবলে শাস্ত্রার্থকে পরাজিত করিয়া ঐ পদ পাইবে। আমি নিজে স্নদ-ড-ছঙের খন্-পোর নিকট এক দিন গিয়াছিলাম, তাঁহাকে দেখিলেই

বুঝা যাইত যে খন্-পো নিয়োগে যোগ্যতাব কোন প্রশ্ন আসে না।

এখনও এই সকল বিহারে প্রাচীন সত্যতা এবং সুদীর্ঘ ইতিহাসের সজীব ধারা প্রবাহিত হইতেছে। যদি ইহাদের ক্রটি দূর করা যায় তবে এখানে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা নিয়মিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, তখন ইহাদের দ্বারা রাষ্ট্রের সেবা ও উপকার আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই হইবে। প্রত্যেক বিহারের অধিকারে বিশাল জমিদারী আছে, রাজনীতির ক্ষেত্রেও ইহাদের অধিকার যথেষ্ট, স্বতরাং রাজনৈতিক ব্যাপারেও মঠাধ্যক্ষদের পবামর্শেই মূল্য কম নহে, বড় বড় মঠের মন্দিরে-দেবালয়ে এক মণ দুই মণ ওজনব স্বর্ণ ও রৌপ্যের অসংখ্য দীপ দিব্যদ্রব্য জলে এবং দেবমূর্তি বহুশ্রেণী স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপের সহিত মণি-মুক্তার বাশি বলকিত হইতে থাকে। পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে মঠাধ্যক্ষগণ বিষয়-ব্যাপারেই সমস্ত সময় না দিয়া যদি অবসরের কিয়দংশও যথাকর্তব্য পালনে ব্যয় করিতেন তাহা হইলে এই বিহারগুলি কিরূপ বিস্তার আকব হইয়া উঠিত। মঠের বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ বিনয়কারিকা, অভিসময়ালঙ্কার, অভিধর্মকোষ, মাধ্যমিককাবিকা ও প্রমাণবার্ত্তিকা পড়ানো হয়।

* * *

সে-রায় থাকিতে, ১৩ই অক্টোবর খবর পাইলাম যে রে-ডিঙ মঠের অবতারা লামা এখানে বিদ্যালয়ের জন্ত রহিয়াছেন। অতিশয় প্রধান শিষ্য ভোম-তোন-পা গুরুব যুজুর পর ১০৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মঠ স্থাপন করেন। লোকমুখে শুনিয়াছিলাম, ঐ মঠে ভারত হইতে আনীত সংস্কৃত পুঁথির বেশ বড় রকমের সংগ্রহ আছে; কিন্তু বিশেষ খোঁজ করিয়া জানিলাম মঠের নিকটস্থ প্রস্তবস্তূপে একটি বিশিষ্ট আকার ধারায় লোকে তাহাকেই প্রস্তবময় পুঁথির রাশি বলে। বাহা হউক, এ সমস্তার যথার্থ-সমাধানের জন্ত এই অবতারা লামার সঙ্গে আলাপ করিলাম। অবতারা লামার বয়স আঠার-উনিশ বৎসর মাত্র, তাঁহাকে বেশ তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলিয়া মনে হইল। এদেশে অবতারা লামার শিক্ষাদীক্ষা ভারতের রাজকুমারদেব মত হইয়া থাকে। অবস্থা-অনুযায়ী স্তূত্য ও অস্তুচবর্গ-

সহ ইহার মাহা আড়ম্বরে জীবন-বাণন করেন এবং শিক্ষকের সঙ্গেও রাজকুমারের মতই ব্যবহার করেন, স্বতরাং লেখাপড়া কতটা হয় বুঝিতেই পারেন। অবস্কারী লামা বলিলেন, “পুঁথি বেশী নাই, তবে এক হাত লম্বা ও এক বিষয় পরিমাণ একটি মোটা পুস্তিকা অতিশয় স্বহস্তলিখিত তালপত্রের পুঁথি আছে; ইহা ডোম-তোন-পা স্বয়ং মঠে দান করেন। আমি দেড় বৎসর বাদে মঠে ফিরিয়া যাইব, আপনি আমার সঙ্গে যদি যান তবে সে সবই আপনাকে দেখাইব।” এত দিনে প্রামাণ্য খবর পাওয়া গেল। বাইবার জন্তও মন উৎসুক হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় দেড় বৎসরের পূর্বেই আমাকে দেশে ফিরিতে হইল। ঐ পুঁথিগুলি সত্যি যদি অতিশয় হাতে লেখা হয়, তবে তন্মধ্যে তাঁহার রচিত হিন্দী গীত থাকাও সম্ভব।

২৪শে নভেম্বর, ভোটার দশম মাসের নবমী তিথিতে সে-রা সংস্থাপক জম-ঘণ্ডের মৃত্যুতিথি ছিল। সে রাত্রে নারা শহরে ও আশেপাশের পর্বতগাত্রে বহু দীপ জালনো হইয়াছিল। পর দিন স্বয়ং মহান চোঙ-খ-পার মৃত্যুতিথি, স্বতরাং সেদিন শহর ও নিকটবর্তী পাহাড়ের উপর ছোট-বড় মঠগুলি দেওয়ালীর মত দীপমালায় সুসজ্জিত

হইয়াছিল। মহান সংস্কারকের সম্মান যোগ্যভাবেই দেওয়া হয়। পথে-ঘাটে দীপশোভা দেখিতে বহু লোক আসে, দুঃখের বিষয় সেই রাত্রে যাহারা একেলা বা দুই-এক জন সখীর সহিত বাহির হইয়াছিল এইরূপ অনেক জীবনের উপর অশেষ অত্যাচার হয়। এইরূপ দুঃস্বপ্নাব কারণ বোধ হয় শহরে লড়াইয়ের জন্ত যে-সব সৈন্য একত্র করা হইয়াছিল তাহাদের উপর নিয়ম বা শাসনের অভাব।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এক জন নূতন নেপালী ভীঠা অর্থাৎ স্ত্রীদ্বীপ এখানে বদলী হইয়া আসিলেন। ইনি ইংরেজী জানিতেন, আমার সঙ্গে আলাপ হইলে ইনি ইহার পুত্রকে সংস্কৃত শিখাইয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। ছেলেটি মেধাবী, আমার নিকট পুস্তক ছিল না, স্বতরাং লিখিয়া পাঠাভ্যাস করিত। এই সময় আমার আর এক জন ছাত্র ছুটিল। এ-ব্যক্তি চীনা, অর্থাৎ ইহার পিতা চীনদেশীয় ছিলেন, কিন্তু চীনা ত এখন এদেশে নাই বলিলেই হয়। এই লোকটি অল্প অল্প-চীনা বালকদের পড়াইয়া এবং সরকার-ভরক্ষে চীনা চিঠিপত্র অনুবাদ করিয়া প্রাসাচ্ছাদন করিত। আমার সঙ্গে ব্যবস্থা হইল আমি তাহাকে ইংরেজী শিখাইব, সে তাহাব বদলে আমাকে চীনা শিখাইবে।

ক্রমশঃ

কাব্য-বিচারের নিকষ-পাথর

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কোন কবিতা হৃদয় আর কোন কবিতা অহৃদয় তা নির্ণয় করবাব সহজতম মাণকাটি হচ্ছে পাঠকের ভাল লাগা এবং না-লাগা। গরম জলে হাত লাগামাত্র যেন তার উষ্ণতা আমরা অনুভব কবি, ভাল কবিতা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে তার সৌন্দর্যকেও তেমনি আমরা উপলব্ধি করে থাকি। অনবদ্য কবিতা আমাদের অন্তরে জাগায় এমন একটি আনন্দের অহুত্ব বা অনির্বচনীয়।

পাঠক-পাঠিকার চিত্তে অনির্বচনীয় আনন্দের এই অহুত্বটিকে জাগানোর জন্ত কবিতার মধ্যে থাকা চাই

কতকগুলি গুণ। এই গুণগুলি যেখানে বর্তমান, সেখানে কাব্যের মধ্যে আমাদের চিত্ত পায় অমৃতত্বের আনন্দ।

ভাল কবিতার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে শব্দ-প্রয়োগের অসাধারণ নৈপুণ্য। ভাবার মধ্যে থাকা চাই একটি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি। কবিতার চরণগুলি কানে বাজার সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে, ‘চমৎকার। এমনটি ত কখনও শুনি নি জীবনে। মাটির কোলে এ যেন সঙ্গীতের ইজ্ঞালা।’ ভাবার এই মোহিনী শক্তি মনের মধ্যে ধ্বনির নীহারিকা সৃষ্টি করেই নিঃশেষ হয়ে যাবে না। কারণ শব্দের মাধুর্য্য

দিয়ে পাঠকের হৃদয়কে মুগ্ধ করাই কবিতার একমাত্র কাজ নয়। কথার বাছ বসতে ভাবার সেই অনির্বচনীয় শক্তিকেই বোঝায় যার স্পর্শে আমাদের মনে জাগে স্বতীত চেতনা। যাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের মন ছিল অচেতন, ভাবার তাড়িত-স্পর্শে অকস্মাৎ তারা আমাদের চেতনায় জীবন্ত হয়ে দেখা দেয়। শব্দের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কবি আমাদের অহুভূতিকে করেন জড়তা থেকে মুক্ত। ষে-ছবি কখনও চোখ মেলে আমরা দেখি নি, ষে-গান আমরা কান পেতে কখনও শুনি নি—বাক্যের মেক-জ্যোতিকে আশ্রয় ক'রে আমাদের চিত্তলোকে তারা অপূর্ণ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তার পর থেকে যত বার আমরা সেই ছবি দেখি, সেই গান শুনি, তত বার আমাদের মনের মধ্যে গুঞ্জনিত হয়ে ওঠে কবিতার সেই চরণগুলি যারা অনাবিস্কৃত জগতের হারোদ্ঘাটন ক'রে প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ক'রে দিয়েছিল।

আমাদের বক্তব্য বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করবার জন্য এখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। ‘বর্ষামঙ্গল’ নামক বিখ্যাত কবিতাটির প্রথমই আছে—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হববে
জলসিক্ত ক্ষিত্তিগোরভ-রভসে
ঘনগোঁরবে নবগোঁবনা বরষা
জামগন্ডার সরসা।
গুরুগর্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে,
শিখীদম্পতি কেকা-কল্লোলে বিহরে।
দিখু-চিত্ত হরষা
ঘন গোঁরবে আসে উগ্ধ বরষা।

এখানে শব্দের অপূর্ণ ঐশ্বর্য আমাদের অন্তরে পুলকের শিহরণ জাগিয়েই আপনার ক্ষমতাকে নিঃশেষ ক'রে ফেলে নি। নববর্ষার রূপের একটি বর্ণনা দিয়েই ভাবার শক্তি এখানে লুপ্ত হয়ে গেল না। শব্দের সমারোহকে অবলম্বন ক'রে নূতন বর্ষার এমন একটি মূর্তি আমাদের চিত্তপটে অঙ্কিত হয়ে রইল যা কোন কালেই মুছবার নয়।

‘বলাক’র এই কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত ক'রেও আমাদের বক্তব্য বিষয়টি আরও পরিষ্কার করতে পারি—

শুভ প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে;
নদীর এপারে ঢালু তটে
চাষী করিতেছে চাষ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে।
চলে কি না চলে
ক্লান্তশ্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত
আধ-জাগা নয়নের মত।
পথধানি বাঁকা
বহুশত বরষের পদচিহ্ন জাঁকা
চলেছে মাঠের ধারে—ফসল-ক্ষেতের ঘন মিতা
নদীসাথে কুটারের বহে কুটুম্বিতা।

এখানে নববর্ষার ছবির পরিবর্তে আর একটি ছবিকে কবি ছন্দের সাহায্যে আমাদের মনের মধ্যে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। আগের কবিতায় মেঘের গুরুগর্জন, নীপমঞ্জরীর শিহরণ, শিখীদম্পতীর কেকা-কল্লোল, ভিক্ষে মাটিব সৌরভ প্রভৃতি নানা উপাদানসম্ভার নিয়ে নবীন বর্ষার পরিপূর্ণ রূপ আমাদের চিত্তকে অধিকার করেছিল। পরবর্তী কবিতার চরণগুলিতে ষে-ছবি জাঁকা হয়েছে সেখানে আছে ফসলের ক্ষেত, জনহীন বালুচর, উড়ন্ত বুনো হাঁস, দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের নিঃশব্দ ছায়াবট, বহুবর্ষের পদচিহ্ন-জাঁকা পথধানি এবং আধজাগা নয়নের মত শীর্ণ ও ক্লান্ত শ্রোত নদীটি। এই সমস্ত দৃশ্যকে আশ্রয় ক'রে এমন একটি সম্পূর্ণ চিত্র আমাদের মনস্কক্ষের সম্মুখে মূর্ত্ত হয়ে উঠল যা একেবারেই উপেক্ষার বস্তু নয়। প্রকাশের অনিন্দনীয় ভঙ্গিমা পাঠকের মনে আনন্দের হিল্লোল তুলেই আপনার ক্ষমতার পূজিকে নিঃশেষ হ'তে দিল না। বঙ্গদেশের পল্লী-অঞ্চলের যে-দৃশ্যটি এখানে ফুটে উঠেছে তাও “গরুর ছাট শিং, একটি লেজ এবং চারিটি পা আছে” এই কথাসমষ্টির মত একটি বর্ণনা মাত্র নয়। বর্ণনা এখানে মনের উপরে এমন একটি ছাপ রাখে যা মুছে ফেলা কঠিন। একদা কান্তনের কোন অপরাহ্নবেলায় পদ্মার বুকে চলতে চলতে ষে-ছবিখানি কবির মনের মধ্যে জাগিয়েছিল অপূর্ণ একটি অহুভূতি সেই ছবিখানিকে তিনি ছন্দের মধ্যে রেখে দিলেন শাস্বত ক'রে। কথার এমন বাছ দিয়ে পল্লীর এই নিম্ভূত রূপটিকে তিনি রচনা করলেন যে সেই রূপ শুধু একটি বর্ণনা হয়েই রইল না। কবিতার চরণগুলি পাঠ করবার সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মার তটভূমি, তার খেয়াঘাট আর নীল নদীরেখা, শূন্য মাঠ

আর চণাচবীর কাকলি-কল্লোল নিয়ে পাঠকের অহুত্বের মধ্যে জীবন্ত হয়ে দেখা দিল। সেই তটভূমির বিচিত্র দৃশ্য একদিন যে ‘আনন্দ-বেদনার’ কবির জীবনকে উদ্দাম করে তুলেছিল, সেই আনন্দ-বেদনার নিবিড় অহুত্বভিত্তিতে পাঠকের চিত্তও পূর্ণ হয়ে যায়। কবিতার এই বিশিষ্ট লক্ষণটির দিকে দৃষ্টি রেখেই অ্যাবাক্রম্বি (Abercrombie) লিখেছেন—

Poetry differs from the rest of literature precisely in this : it does not merely tell us what a man experienced, it makes his very experience itself live again in our minds by means of what I have called the incantation of its words.

অর্থাৎ সাহিত্যব অন্তান্ত অঙ্গ থেকে কাব্যের তফাৎ হ’ল শুধু এইখানে : মানুষ যা দেখেছে, যা শুনেছে, যা উপলব্ধি করেছে, কবিতা তার শুধু বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত থাকে না। কথার বাহুকে আশ্রয় করে কবির অভিজ্ঞতা আমাদের অহুত্বের মধ্যে নূতন করে বাঁচে।

এই সভ্যটিকে আরও স্পষ্ট করে দেখাবার জন্য এখানে রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। ‘বধু’ নামক কবিতাটিতে আছে,—

কলসী ল’য়ে কাঁথে পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু সবাই করে ধুধু
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দীঘির কালো জলে সাঁঝে আলো বলে,
ছ’ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে
কোকিল ডাকে তীরে অমিয়-মাধা।
আসিতে পথে ফিরে আঁধার তরু-শিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।

এই লাইনগুলি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শহরের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যগুলিকে কিছুক্ষণের জন্য বিস্মৃত হ’য়ে একটি নূতন জগতে প্রবেশ করি। এই নূতন জগতে রাজধানীর পাষাণ-কাহার পরিবর্তে আছে খোলা মাঠ আর পানীর গান, বনের ছায়া আর দীঘির জল, করবী ফুল আর চাঁদের আলো। যে অপার আনন্দের অহুত্ব নিয়ে কবি দেখেছিলেন বাংলা দেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশিকে আর তাদের রূপ দিয়েছিলেন কবিতায়, উপরের লাইনগুলি পড়বার সময়ে সেই আনন্দের অহুত্ব পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হয়ে যায়। বাসেব ছকার আর ট্রামের বর্ষরধনি, ধূমমলিন আকাশ

আর ইট-পাথরের অট্টালিকাকে তুলিয়ে দিয়ে কবি পাঠকের চিত্তকে এমন একটি অতীতপূর্ব আনন্দের মধ্যে মুক্তি দিলেন যে আনন্দ আকাশের নীলিমার পানে তাকিয়ে থাকার আনন্দ, অরণ্যব শ্রামস্ত্রীর মধ্যে চোখ ছুটি ভুবিয় দেওয়ার আনন্দ।

ঠিক এমন করেই আমাদের চেতনার উপরে অরুণোদয়ের অপরূপ মহিমাটি মনোহর মুক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয় যখন আমরা পাঠ করি—

আকাশতলে উঠল ফুটে
আলোর শতদল।
পাপড়িগুলি ধরে ধরে
ছড়াল দিক-দিগন্তরে,
ঢেকে গেল অন্ধকারের
নিবিড় কালো জল।

আবার যখন পাঠ করি—

শোন শোন ওই পারে বাবে বলে কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।
পূবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
ছুঁল বাহিয়া ওঠে পড়ে চেউ,
দরদর বেগে জলে পড়ি জল ছল-ছল উঠে বাজি রে,
খেয়া পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।

তখনও আমাদের চেতনাকে অধিকার করে এসে দাঁড়ায় বর্ষগম্বীর আঘাতের সেই চির-পরিচিত ছবিটি। শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় লগুন শহরের বুকে কোন বাঙালীর ছেলে যদি উপরের লাইনগুলি পাঠ করে, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যাবে বঙ্গদেশের একটি মেঘকজ্জল দিবসের স্মৃতি যখন আকাশ থেকে জল করে পড়ছে অনিবার, কাপসা হয়ে গেছে ওপারের তরুশ্রেণী, নদীর কূলে কূলে জেগেছে উচ্ছল জলের কলরোদন, বিদ্যায় নিয়েছে খেয়াঘাটের মাঝি, আর একাকী পথিক শূন্যঘাটে প্রাণপণে ডাকছে তাকে পার করে দেওয়ার জন্ত।

ঝরে ঘনধারা নব পল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লীর বাবে,
তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে
এলো পল্লীবা কাছে রে।

এই লাইন কয়টির মধ্যেও শব্দের এমন একটি বাহু আছে যে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন শুনতে পাই, বর্ষগম্বীর

সন্ধ্যায় পিছনের আশ্র-কানন ঝিল্লীরবে মুখরিত হয়ে উঠেছে
আর পল্লবে পল্লবে বাজছে বৃষ্টি-পড়ার স্তম্ভুর ধ্বনি।

ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধাতু ছলে ছলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত
দাহুবা ডাকিছে সখনে,
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।

এ কেবল কথা দিয়ে কথার মালা গাঁথা নয়। এখানে
অশ্বের মোহিনী শক্তির বিদ্যুৎ-স্পর্শে বর্ষার প্রকৃতি
জীবন্ত হয়ে উঠেছে আমাদের চোখের সামনে। ধ্বনির পর
ধ্বনি আমাদের মর্মে ধমন প্রবেশ করতে লাগল, ছবির
পব ছবিও তেমনি মনের মধ্যে জাঁকা হয়ে গেল। কবিতার
চরণগুলি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমবা স্পষ্ট যেন দেখতে
পাই, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে পড়ে আছে দিগন্তব্যাপী
শ্রামল প্রান্তর; শূন্য থেকে পৃথিবীতে নামছে বৃষ্টির ধারা
আর সেই বৃষ্টিধারা প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটে আসছে
দূরের গাছপালাগুলিকে অস্পষ্টতায় ঢেকে দিয়ে; সঙ্গে সঙ্গে
মাঠে মাঠে সবুজ ধানের নৃত্য হয়েছে স্নক, মাথা ছলিয়ে
ছলিয়ে তাদের নাচের আর বিরাম নেই। চোখ বন্ধন
এই দৃশ্য দেখছে, কান তখন শুনেছে শ্রাবণ-মেঘের গুরু-গুরু
ধ্বনি এবং তার সঙ্গে দাহুবীর ডাক।

‘পলাতক’র কালো মেয়ে নন্দরাণীর কুমারী-হৃদয়ের
সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

আমি যে গুর হৃদয়খানি চোখের ‘পরে স্পষ্ট দেখি জাঁকা ;—
ও যেন বৃঁইফুলের বাগান সন্ধ্যা-ছায়ার ঢাকা ;
একটুখানি চাদের রেশা কৃষ্ণপক্ষে শুক নিশীথ রাতে
কালো জলের গহন কিনারাতে।
লাজুক ভীকু ররণখানি ঝিঝি ঝিঝি
কালোপাথর বেয়ে বেয়ে লুকিয়ে ঝরে ঝরি ঝরি।
রাতজাগা এক পাখী,
মুছককণ কাকুতি তার তারার মাঝে মিলার থাকি থাকি।
ও যেন কোন্ ভোবের স্বপন কান্নাভরা,
ঘনঘূমের নীলাঞ্চলের বাঁধন দিয়ে ধরা।

একটি কালো মেয়েব লাজুক ভীকু অকলঙ্ক মনের ছবি
জাঁকতে গিয়ে এই যে উপমার পর উপমার ঐশ্বর্য—এই
ঐশ্বর্যের মধ্যে নন্দরাণী চিরন্তন হয়ে রইল পাঠকের মনে।
স্ববীজনাথের দরদী মনের বিপুল স্নেহের অধিকারিণী

নন্দরাণী অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার চিত্তেও এমন একটি স্থান
অধিকার করে বসল যা কোন কালেই হারাবার নয়।
একেই বলে কথার ষাছু, একেই বলে শব্দের ইন্দ্রজাল
রচনা।

উপবের কথাগুলিকে অল্প রকম করে বললে দাঁড়ায়
এই—আমাদের চোখের সামনে বিশ্বের বিপুল জীবন
দ্বিবানিশি তরঙ্গিত হচ্ছে বিচিত্র মূর্তি নিয়ে। এই বিচিত্র
রূপ সকলের মনকে সমানভাবে নাড়া দেয় না, কারণ দেখবার
ক্ষমতা ত সকলের সমান নয়। কেউ দেখে কেবল বহিরের
চোখ ছুটি দিয়ে; তাদের দেখা হ’ল ভাসা-ভাসা। আবার
কেউ বা দেখে সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত সত্তা দিয়ে। যারা
সমস্ত অন্তর দিয়ে দেখতে পারে তাদেরই দৃষ্টি হ’ল কবির
দৃষ্টি। তাদেরই অভিজ্ঞতা কথার ষাছুকে আশ্রয় করে
কবিতায় কুস্থমিত হয়ে ওঠে। মনের সঙ্গে মনের তফাৎ ত
আর কোথাও নয়, সে তফাৎ শুধু দেখবার ক্ষমতার মধ্যে।
কবিদের মন এমন উপাদানে তৈরি যে সেই মন যাকেই
দেখুক না কেন, তাকে অবলোকন করে অসীম কোতুল
নিয়ে। আকাশের তারা থেকে আরম্ভ করে সকলের
অনাদৃত ‘ছেলেটা’ পর্যন্ত কেউ সেই মনের কাছে তুচ্ছ নয়।
এই প্রসঙ্গে পাঠককে স্মরণ করতে বলি ‘পুনশ্চ’ গ্রন্থের
‘ছেলেটা’র ছবি। ভাড়া বেড়ার ধারে আগাছার মত পরের
ঘরে মানুষ সে। কুল পাড়তে গিয়ে হাত ভাঙে, রথ দেখতে
গিয়ে হারিয়ে যায়, মাঝ খায় দমাদম, ছাড়া পেলেই আবার
দেয় ঘোড়; বস্ত্রীদের কলের বাগানে চুরি করে গায় জাম,
পাকড়াশিদের কাচ-পরানো চোং নিয়ে আসে না বঁলে,
ইছুলে যায় পকেটে নিয়ে কাঠবিড়ালী, হেলে সাপ রাখে
মাষ্টারের ডেস্কে, কোলা ব্যাঙ আর গুবরে পোকা পোষে
সম্বন্ধে, সিধু গরলানির গরুর দড়ি দেয় বেটে। চুরি করে
ইাড়ি খেতে গিয়ে পোষা কুকুরটার যখন দেহান্তর ঘটল তখন
অকস্মাৎ আমাদের দৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হ’ল এই
মাতৃহীন অশান্ত ছেলেটার অন্তরের মাধুর্য। কুকুরের শোকে
দু-দিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে ফিরল, মুখে তার অম্লজল
কচল না। বস্ত্রীদের বাগানে পাকা করমচা চুরি করতেও সে
বিন্দুমাত্র উৎসাহ অহুভব করল না। পাড়াগাঁয়ের একটি
মাতৃহীন অশান্ত বালকের সমস্ত দুঃস্থপনার মধ্য যে-দৃষ্টি

আবিষ্কার করল তার সারল্য-মণ্ডিত শুভ্রহৃদয়ের গোপন সৌন্দর্যকে—সে-দৃষ্টি আছে শুধু কবির চোখে। অন্যের চোখে ঐ ছেলেটা একটা অসভ্য বাঁদের ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধারণের দৃষ্টির সঙ্গে কবির দৃষ্টির এই পার্থক্য হ'ল হেল-টাকে দেখবার ভঙ্গিমা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের কাছে বালক একটা। ছোট বালক মাত্র নয়, সে একটা মহামূল্য সম্পদের মতই আমাদের সামগ্রী। অন্যেও যদি কবির মত ক'রেই তাকে দেখতে পারত, তবে বালক তাদের কাছেও পেত অনাদরের পরিবর্তে অধাচিত্রিত স্নেহ।

তবে দাঁড়াল এই। ভাল কবিতার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে ভাবার অল্পম বাহু। সে বাহু লেখকের অন্তরের অল্পভূতিকে পাঠকের মনের মধ্যে জীবন্ত ক'বে তুলবে। আর ভাবার মধ্যে বাহু নিয়ে আসা তখনই হয় সম্ভব, যখন এই পৃথিবীর সব-কিছুই আমাদের চেতনায় এসে দাঁড়ায় অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে। যে অভিজ্ঞতাই আমরা লাভ করি না কেন, আমাদের চেতনায় তাকে গ্রহণ করতে হবে হৃদয়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ নিয়ে এই বিচিত্র ভ্রূপে ক্ষণে ক্ষণে আমাদের হৃদয়ের ছায়ায় করছে করাঘাত। যাদের জাগ্রত মন মুহূর্তে মুহূর্তে এই আহ্বানে সাড়া দিতে পারে তাদেরই কবিতা আমাদের কল্পনাকে নাড়া দেয়। আমাদের অভিজ্ঞতা যদি কেবল ভাসা-ভাসা হয়, তার মধ্যে যদি ন-থাকে অল্পভূতির তীব্রতা, তবে আমাদের কবিতা কখনও পারবে না পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করতে। পাঠকের চেতনায় উপব দিয়ে আমাদের ভাষার প্রবাহ চলে যাবে ভেতন ক'রে, যেমন ক'রে জলধাবা চল যায় ইসের পাখার উপর দিয়ে।

ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীদের প্রেমসঙ্গীত-গুলির মধ্যে আছে একটি অনির্জনীয় মাধুর্য। এই মাধুর্যের মূলে রয়েছে প্রেমের নিবিড় অল্পভূতি। পাহাড়ের উপত্যকার ঝরনার ধারে শালের বনে যে মুণ্ডা যুবকটি প্রেমে ডুবে তার প্রাণমীম্ব কালো কেশে পবিত্রে দেয় রক্ত-পলাশের গুচ্ছ—তার অল্পভূতির মধ্যে গভীরতার অভাব নেই। এই জুই তার মিলনের আনন্দ অথবা বিরহের বেদনা যখন সঙ্গীতের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, সে সঙ্গীত সহজেই আমাদের অন্তরকে দেয় নাড়া। কলেজে-পড়া শিক্ষিত যুবকের প্রেমের কবিতাগুলির অধিকাংশই যে পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ করে না তার কারণও অল্পভূতিব দীনতার মধ্যে

প্রেম আসে শুধু কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে, জীবনের নিবিড়তম অভিজ্ঞতার সঙ্গে নেই তার নাড়ীর যোগ। এই জুই সেই প্রেম থেকে আসে না কবিতার মত কবিতা। হৃদয়-শুকুন্মলা অথবা রোমিও-জুলিয়েটের ভালবাসার কাহিনী প'ড়ে লেখা হয়েছে যে প্রেমের কবিতা, সে কবিতার মধ্যে মানুষের জীবন্ত অল্পভূতির স্পন্দনকে খুঁজে পাব কোথা থেকে? ইংরেজীতে যাকে বলে experience—সেই experience-এর মধ্যে থাকা চাই হৃদয়ের সবটুকু দরদ, প্রাণের সবটুকু অল্পভূতি। তবেই জীবনের অভিজ্ঞতা ভাবার বাহুকে আশ্রয় ক'রে অল্পম-কবিতা হয়ে প্রকাশ পাবে। নইলে কবিতা হবে শুধু কথার সমষ্টি—তার মধ্যে বন্ধার থাকতে পারে, কিন্তু প্রাণ থাকে না।

অল্পবাদ-সাহিত্যের মধ্যে মূল কবিতার সৌন্দর্যকে আমরা যে খুঁজে পাই না তারও কারণ জীবন্ত অল্পভূতির অভাব। অল্পবাদ অভিজ্ঞতার বিষয়টিকে শুধু প্রকাশ করতে পারে। সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবির অন্তরের যে গভীর অল্পভূতি জড়িত হয়ে আছে অল্পবাদের মধ্যে তা প্রকাশ পাবে কেমন ক'বে? যে কবি আনন্দকে অথবা বেদনাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রথম অল্পভব করেছিল, আপন-অল্পভূতিকে অপরের মনে জীবন্ত রাখাবা জন্ত কি ভাষা ব্যবহার করতে হবে সে রহস্য কেবল তারই ছিল জানা। আর এক জনের অল্পবাদের মধ্যে মূল কবিতার সেই ভাবার মোহিনীশক্তিকে দেখবার আশা করা বাতুলতা মাত্র। আলিপুরের চিড়িয়াখানার বাঘের মধ্যে স্বন্দরবনের বাঘ দেখবার যে আশা করে, তাকে কি বলব? ছোটাই বাঘ সম্ভ্রম নেই, কিন্তু খাঁচাব বাঘ বনের বাঘের অল্পবাদ মাত্র। অল্পবাদে মূলের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ না হয়ে যায় না।

এইবার প্রবন্ধের উপসংহার করি। ভাল কবিতা এমনই একটা দুর্লভ সম্পদ যার সৌন্দর্যকে বিশ্লেষণ ক'বে বোঝানো যায় না। তার মহিমা শুধু অন্তরের উপলব্ধির বিষয়। তবুও কাব্যকে বিচার করবার জন্ত বাহিরের একটি নিকষ-পাথর থাকা মন্দ নয়। সেই নিকষ-পাথর সব সময় নিখুঁত না হ'লেও সেখানে যাচাই ক'রে কাব্যের মূল্য নির্ধারণ করার একটা সার্বকতা আছে। এই প্রবন্ধে এই রকম একটা নিকষ-পাথরে কথাই বলা হয়েছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

কংগ্রেসের মন্ত্রিস্ব গ্রহণ—“বাঙা উঁচা রহে
হমারা ?” না, “She stoops to conquer ?”

বর্ধায় কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির গত অধিবেশনে
নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে।

“The All-India Congress Committee at its meeting held in Delhi on March 18th, 1937, passed a resolution affirming the basis of the Congress policy in regard to the New Constitution and laying down the programme to be followed inside and outside the legislatures by Congress members of such legislatures.”

It further directed that in pursuance of that policy permission should be given for Congressmen to accept office in provinces where the Congress commanded a majority in the legislature if the Leader of the Congress Party was satisfied and could state publicly that the Governor would not use his special powers of interference or set aside the advice of Ministers in regard to their constitutional activities.

In accordance with these directions the Leaders of Congress Parties who were invited by the Governors to form Ministries asked for the necessary assurances.

These not having been given, the Leaders expressed their inability to undertake the formation of Ministries; but since the meeting of the Working Committee on the 28th April last, Lord Zetland, Lord Stanley and the Viceroy have made declarations on this issue on behalf of the British Government.

The Working Committee has carefully considered these declarations and is of opinion that though they exhibit a desire to make an approach to the Congress demand, they fall short of the assurance demanded in terms of the A. I. C. C. resolution as interpreted by the Working Committee resolution of the 28th April. Again, the Working Committee is unable to subscribe to the doctrine of partnership propounded in some of the aforesaid declarations. The proper description of the existing relationship between the British Government and the people of India is that of the exploiter and the exploited and hence they have a different outlook upon almost everything of vital importance.

The Committee feels, however, that the situation created as a result of the circumstances and events that have since occurred warrants the belief that it will not be easy for the Governors to use their special powers.

The Committee has, moreover, considered the views of Congress members of the legislatures and of Congressmen generally.

The Committee has, therefore, come to the conclusion and resolves that Congressmen be permitted to accept office where they may be invited thereto, but it desires to make it clear that office is to be accepted and utilized for the purpose of working in accordance with the lines laid down in the Congress election manifesto and to further, in every possible way, the Congress policy of combating the New Act on the one hand and of prosecuting the constructive programme on the other.

The Working Committee is confident that it has the support and backing of the A. I. C. C. in this decision and that this resolution is in furtherance of the general policy laid down by the Congress and the A. I. C. C.

The Committee would have welcomed the opportunity of taking the direction of the A. I. C. C. in this matter, but it is of opinion that delay in taking a decision at this stage would be injurious to the country's interests and would create confusion in the public mind at a time when prompt and decisive action is necessary.—United Press.

বাংলায় প্রস্তাবটির তাৎপর্য এইরূপ :—

১৯৩৭ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে দিল্লীতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে নতুন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতির ভিত্তি নির্দেশ করা হয় এবং ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্যগণ কর্তৃক তাহার ভিতরে ও বাহিরে অহুসরণের স্বত্ব তর্জতালিকা নির্দিষ্ট করা হয়।

উক্ত অধিবেশনে এই-নির্দেশও প্রদত্ত হয় যে, উক্ত কর্তৃনীতি অনুসারে, যে সকল প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন, ঐ সকল প্রদেশের কংগ্রেসী দলপতিগণ যদি এবিষয়ে সঙ্কট থাকেন এবং প্রকাশ্যভাবে এইরূপ ঘোষণা করিতে পারেন যে, গবর্নর তাহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না বা তাহাদের নিয়মতান্ত্রিক কার্য-কলাপ সম্পর্কে মন্ত্রীদের পরামর্শ গবর্নর উপেক্ষা করিবেন না, তাহা হইলে ঐ সকল প্রদেশে কংগ্রেসীগণকে মন্ত্রিস্ব গ্রহণ করিতে অহুমতি দেওয়া যাইবে।

এই নির্দেশ অনুযায়ী যে সকল কংগ্রেসী নেতৃগণকে গবর্নরগণ মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাহারা গবর্নরদের নিকট হইতে মন্ত্রিস্ব গ্রহণপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতি চাহেন। ঐরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত না হওয়ার নেতৃগণ মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের দায়িত্ব লইতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু কার্যকরী সমিতির গত ২৮শে এপ্রিলের অধিবেশনের পূর্ব লর্ড জেটল্যান্ড, লর্ড ষ্ট্যানলী ও বডলাট ব্রিটিশ গবর্নরদের পক্ষ হইতে এতৎসম্পর্কে মত ঘোষণা করিয়াছেন। কার্যকরী সমিতি বিশেষ সতর্কতার সহিত ঐ সকল ঘোষণা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন এবং এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, তাহাদের ঘোষণায় তাহারা কংগ্রেসের দাবী মানিয়া লইবার পক্ষে কিছুই অগ্রসর হইতে ইচ্ছা প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবের ওয়ার্কিং কমিটির ২৮শে এপ্রিলের অধিবেশনের প্রস্তাবে কৃত ব্যাখ্যা অনুযায়ী কংগ্রেস যে প্রতিশ্রুতি দাবী করিয়াছে, ঐ ঘোষণাগুলি তাহা পূর্ণ করিবার নিকটেও যায় নাই—অনেক দূরে রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল ঘোষণা-বাহীর কোন কোনটিতে ব্রিটিশ গবর্নর ও ভারতীয়দের যে অঙ্গীকারিষের কথা বলা হইয়াছে, কার্যকরী সমিতি তাহাতে সার দিতে অসমর্থ। ব্রিটিশ সরকার এক ভারতবাসীদের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, উহার স্বাধীন বর্ণনা শোষণ ও শোষিতের সম্পর্ক। কাজেই ভারতের জীবন-মরণ বাহার উপর নির্ভর করে এরূপ প্রত্যেকটি বিষয়কেই তাহারা বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিবেন। বাহা হউক, কমিটির অভিমত এই যে,

ঘটনাক্রমে বিবর্তনে এবং অবস্থার পরিবর্তনে বর্তমানে যে অবস্থায় আদিয়া পৌঁছান গিয়াছে, তাহাতে এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, গবর্ণরদের পক্ষে তাহাদের বিশেষ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করা সহজসাধ্য হইবে না।

অধিকন্তু, মন্ত্রিগ্ৰহণ প্রশ্ন সম্বন্ধে কমিটি বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্যদের এবং সাধারণভাবে কংগ্রেসীদের মত বিবেচনা করিয়াছেন। অতএব, কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন ও এই প্রস্তাব করিতেছেন, যে, মন্ত্রিগ্ৰহণের জন্য কংগ্রেসীগণকে কোথাও আমন্ত্রণ করা হইলে, কংগ্রেসীগণ তথায় মন্ত্রি-গ্ৰহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু কমিটি ইহা স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিতেছেন যে, কংগ্রেসের নির্বাচনী ইচ্ছাহারাে বর্ণিত পন্থা অনুযায়ী কার্য করিবার জন্য এবং এক দিকে নূতন শাসনভঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানার ও অন্য দিকে গঠনমূলক কার্যতালিকা অনুসরণের কংগ্রেসী নীতি বহু প্রকারে সম্ভব অনুসরণের জন্যই মন্ত্রি গ্ৰহণ করিতে হইবে এবং মন্ত্রীর পদের ব্যবহার করিতে হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটির অর্থাৎ কার্যকরী সমিতির দৃঢ় বিশ্বাস এই, যে, ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্তে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্মত আছে এবং এই প্রস্তাব কংগ্রেসের এবং নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দিষ্ট সাধারণ নীতির পরিপোষক। এ-বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটি যদি নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দেশ গ্রহণের সুযোগ পাই-তেন, তাহা হইলে ভালই হইত, কিন্তু কমিটির মত এই, যে, বর্তমান অবস্থায় মন্ত্রিগ্ৰহণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বিলম্ব করিলে, তাহা দেশের স্বার্থহানিকর হইবে এবং যে সময়ে ক্ষিপ্ততার সহিত স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন, সেই সময় জন-সাধারণের মনে একটা বিভ্রমের সৃষ্টি করিবে।—ইউনাইটেড প্রেস।

বর্ধায় যে-সকল কংগ্রেসনেতা সমবেত হইয়াছিলেন, কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, তাহারা বলিয়াছেন, কংগ্রেসের পতাকা উচু করিয়া রাখিতে হইবে। তাহা আমাদের পক্ষে সেই হিন্দী গানটি মনে পড়াইয়া দিয়াছে বাহার গোড়ায় বলা হইয়াছে, “ঝণ্ডা উচা রহে হমাবা”। কিন্তু ইহাও ভুলিতে পারা যায় না, যে, কংগ্রেস বলিয়াছিলেন, নূতন ভারতশাসন আইন গ্রহণযোগ্য নহে, উহা কাজে লাগাইয়া যা-কিছু লাভ হয় তাহার আশায় উহা কাজে লাগান উচিত নয়, উহা ধ্বংস করিবারই যোগ্য। সেই জন্য, এক দিকে যেমন “ঝণ্ডা উচা রহে হমাবা” মনে পড়িয়াছে, তেমনি অন্য দিকে মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে কংগ্রেস কি (গোল্ড-স্মিথের নাটকটির নামে স্মৃতি) “শী ইউপ্‌স্‌টু ককার” নীতির অনুসরণ করিতেছেন? কংগ্রেসের মাথাব নতি কি বিজয়গৌরবে মাথা উচু করিবার অগ্রগামী ভঙ্গী?

কংগ্রেস কোন্‌ পথে যাইবেন, তাহা স্থির করা যে অত্যন্ত কঠিন, ঘরে পাখীর নীচে আরামে বসিয়া তাহা অস্বীকার করা সহজ হইলেও, তাহা করিলে সভ্যের অনুসরণ করা হইবে না। কংগ্রেস মন্ত্রি গ্ৰহণ না করিলে তাহার কল

হইবে, ছয়টি প্রদেশে ভাবতশাসন আইন অনুসারে শাসন স্থগিত করিয়া গবর্ণরদের স্বৈরশাসন প্রবর্তন, এবং কংগ্রেস-ওয়ার্ডাদের আবার অহিংস অসহযোগ ও আইনলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হওয়া। কিন্তু লক্ষ্য দেখিয়া মনে হয়, বিগত সংগ্রামের ক্লান্তি ও অবসাদ এখনও দূর হয় নাই। তবে, আমাদের মত যাহারা এই সংগ্রামে যোগ দেয় নাই, তাহাদের পক্ষে এ-বিষয়ে কিছু বলা অনধিকারচর্চা। কিন্তু ইহা বলিলে অন্তায় হইবে না, যে, অসহযোগ ও আইন-লঙ্ঘনপ্রচেষ্টা স্থগিত করার অন্ততঃ এইটুকু বুঝা গিয়াছিল, যে, যোদ্ধারা তখন আর যুদ্ধক্ষম ছিলেন না—তাহা যে-কারণেই হউক। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির প্রস্তাবেই পরোক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে, যে, এখন ব্যবস্থাপক সভাক কংগ্রেসী সদস্যদের ও অন্ত কংগ্রেসীদের অধিকাংশ আইন-তান্ত্রিক মতে কাজ করিতে চান, অহিংস বিরোধের পথে চলিতে চান না—তাহার কারণ যাহাই হউক।

বর্তমান ১৯৩৭ সালের ১৮ই মার্চ দিল্লীতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি কেবল সেই ছয়টি প্রদেশেই ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্যদিগের মন্ত্রি গ্ৰহণ প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছিলেন যেখানে ঐ সদস্যেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং গবর্ণরদের প্রতিশ্রুতি পাইলে তাহাদিগকে মন্ত্রি গ্ৰহণের অনুমতি দিয়াছিলেন। গবর্ণরদের প্রতিশ্রুতি না-পাওয়ায় তাহারা মন্ত্রি গ্ৰহণ করেন নাই।

এখন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্যদিগকে যে মন্ত্রি গ্ৰহণের অনুমতি দিয়াছেন, তাহা কেবল পূর্বোক্ত ছয়টি প্রদেশের সদস্যদিগকেই দেন নাই, সাধারণভাবে ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্যমাত্রকেই দিয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কারণ, যে বাক্যটিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অনুমতিটিকে যেমন গবর্ণরের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি-প্রাপ্তিরূপে সর্ভের অধীন করা হয় নাই, তেমনি ইহাও বলা হয় নাই, যে, অনুমতিটি উক্ত ছয়টি প্রদেশের সদস্যদেরই জন্য। কেবল বলা হইয়াছে, যে, যেখানে কংগ্রেসওয়ার্ডা সদস্যেরা মন্ত্রি গ্ৰহণের জন্য আমন্ত্রিত হইবেন, সেখানে তাহারা তাহা লইতে পারিবেন। যে-সকল প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী দল সংখ্যাগরিষ্ঠ নহে, সেখানেও কোন-না-কোন কংগ্রেসী সদস্যের মন্ত্রি গ্ৰহণের জন্য আমন্ত্রিত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এরূপ আমন্ত্রণের সম্ভাবনা থাকিলেও অন্য একটি বাধা রহিয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে, কংগ্রেসের নির্বাচন-জ্ঞাপনীতে (ইলেকশন-ম্যানিফেস্টোতে) নির্দিষ্ট গঠনার্শ ও বিনাশার্শ, উভয়বিধ, কার্য করিবার নিমিত্তই মন্ত্রি গ্ৰহণ করিতে হইবে। যে-যে ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী সদস্যেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তথাকার সব মন্ত্রীর পদই কংগ্রেসীরা পাইবেন। সুতরাং তাহাদের

পক্ষে কংগ্রেসের নীতির অঙ্গস্বরূপ করা চলিবে—তাহা করিতে গিয়া গবর্ণরদের সহিত তাঁহাদের বিরোধ, ও ফলে মন্ত্রিস্থের অবসান ঘটিবে কি না তাহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যে-সব প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী সদস্যেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নহে, সেখানকার মন্ত্রিমণ্ডলে এক বা একাধিক মন্ত্রী কংগ্রেসী হইলেও, অন্তরা অকংগ্রেসী থাকিবেন। তাঁহাদের সকল বিষয়ে কংগ্রেসের দ্বিমুখ নীতির অঙ্গস্বরূপ করিবার সম্ভাবনা কম—নাই বলিলেও চলে। সুতরাং এই সকল প্রদেশে কংগ্রেসের সভ্যদের মন্ত্রী হওয়া চলিবে না। তা ছাড়া আরও এই একটি বাধা রহিয়াছে, যে, ইতিপূর্বে কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু নিয়ম জারি করিয়া দিয়াছেন, যে, ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী দল অল্প কোন দলের সঙ্গে কো-অলিশন বা সম্মিলন স্থাপন করিতে পারিবেন না।

এ-অবস্থায়, কংগ্রেসী সদস্যদের মন্ত্রিস্থ গ্রহণ হইতে যদি কোন স্বকল-ফলে, তাহার দ্বারা কেবল ছয়টি প্রদেশ উপরূত হইবে, অল্প পাঁচটি প্রদেশ উপরূত হইবে না। পরোক্ষভাবে তাহাদের উপরূত হইবার সম্ভাবনা যে কিছুই নাই, এমন নয়। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল এবং অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলসমূহের মধ্যে যদি দেশ-হিতকর কার্যসম্পাদনে প্রতিযোগিতা হয়, তাহা হইলে কিছু স্বকল হইতে পারে। কিন্তু এরূপ প্রতিযোগিতা যে হইবেই, তাহা কে বলিতে পারে? বর্তমান শাসনবিধি প্রদেশগুলিতে প্রচলিত হইবার পূর্বেও সর্বত্র প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল ছিল। তাহাদের ও বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলসকলের ক্ষমতা ও অধিকারে অবশ্য প্রভেদ আছে। তাহা হইলেও ইহা সত্য, যে, ইতিপূর্বে কোন কোন প্রদেশের মন্ত্রীদের ভাল-চেষ্টা অল্পাংশ প্রদেশের মন্ত্রীগণকে সচেতন ও প্রতিযোগিতামুখ করে নাই। সুতরাং এখন যে কবিবেই এমন আশা করা যায় না।

বস্তুতঃ নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ও গুয়ার্ডিয়ান কমিটি ছয়টি প্রদেশের কথাই ভাবিয়াছেন, বাকী পাঁচটি প্রদেশের কথা তেমন করিয়া ভাবেন নাই। সাধারণ মানবচরিত্র বিবেচনা করিলে ইহাই স্বাভাবিক। কংগ্রেস, নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিতে এবং গুয়ার্ডিয়ান কমিটিতে সেই সকল প্রদেশের কংগ্রেসীদেরই প্রভাব ও প্রাধান্য বেশী যে-সব প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী দল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং তাহারা ঐ প্রদেশগুলির ইষ্টানিষ্টই বিশেষ করিয়া চিন্তা করেন, অন্তঃগুলির কথা তেমন করিয়া ভাবেন না। তাঁহাদিগকে দোষ দিবার জন্ত ইহা বলিতেছি না। তাহারা সকলেই অসাধারণ মানুষ হইলে, নিখিলভারতপ্রেমিক হইলে, অন্তঃর কথাও ভাবিতেন। কেবল ছয়টি প্রদেশেই কংগ্রেসী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবার কারণ এই, যে, ঐ প্রদেশগুলি হিন্দুপ্রধান, এবং হিন্দুরাই প্রধানতঃ উৎসাহী

ও আত্মোৎসর্গপরায়ণ কংগ্রেস-সভ্য। তাহা হইলেও, যুগপৎ কোভুকাবহ ও দুঃখকর একটি ব্যাপার এই, যে, হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলির হিন্দুরা অল্প পাঁচটি প্রদেশের হিন্দুদের অল্পবিধায় এবং উৎসাহিত ও লালিত অবস্থায় যথেষ্ট সমবেদনা অল্পভব ও প্রকাশ করেন না। কিন্তু যে-সকল প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অল্পাংশে থাকেন তাহারা সংখ্যা কম, সব জায়গার মুসলমানদেরই পরম্পরের সহিত যোগ ও সহানুভূতি-হিন্দুদের চেয়ে বেশী।

কংগ্রেস গুয়ার্ডিয়ান কমিটি বলিয়াছেন, গবর্ণরদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা সহজ হইবে না। একপাশীয়াসের কারণ তাহারা খুলিয়া বলেন নাই। অহুমান হয়, ভারত-সচিব, সহকারী ভারতসচিব ও বড়লাটের বক্তৃতা ও মন্তব্যগুলিতে তাহারা ঐ মর্মের আশাস দেওয়ায় কমিটির ঐরূপ ধারণা হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেসী সদস্যেরা একবার মাকড়সার বৈঠকখানায় অর্থাৎ শাসনকলেব মধ্যে আসিয়া পড়িলে, তৎক্ষণাৎ না হউক, কিছু পরে গবর্ণররা যে বিশেষ ক্ষমতাগুলিকে আইনের পৃষ্ঠার মধ্যেই থাকিতে দিবেন, তাহা না হইতেও পারে। তাহারা তখন আইনে পরিকল্পিত তাঁহাদের নিজমুখি ধরিতেও পারেন। গবর্ণরদের গত তিন মাস কোথাও মন্ত্রিমণ্ডলকে অগ্রাহ্য না কবায় কমিটির ঐ প্রকার ধারণা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, কমিটির সভ্যেরা রাজনীতির অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট ও বুদ্ধিমান। তাহারা বুঝেন, যে, এই তিন মাস কোথাও গবর্ণর ও মন্ত্রিমণ্ডলে ঠোকাঠুকি না হওয়ার কারণ, হয় মন্ত্রীর প্রধান প্রধান বিষয়ে গবর্ণরের পরামর্শ অল্পসাবে চলিয়াছেন, নয় সাবধানে সব বিষয়ে গবর্ণরের ও আমলাতন্ত্রের মন জোগাইয়া চলিয়াছেন। পক্ষাবে ত এ-পর্যন্ত মন্ত্রিমণ্ডলের প্রত্যেক সভ্য গবর্ণর সভাপতিত্ব করিয়াছেন। বড়ের কথা ঠিক-জানি না।

কংগ্রেসের দাবী অল্পদায়ী প্রতিশ্রুতি না পাওয়া সত্ত্বেও, কমিটি যে মন্ত্রিস্থগ্রহণের অহুমতি দিয়াছেন, তাহার আর একটি কারণ এই দেখান হইয়াছে, যে, ব্যবস্থাপক সভার সর্বত্র কংগ্রেসীরা এবং অল্প কংগ্রেসীরাও মন্ত্রিস্থগ্রহণের পক্ষপাতী। ইহারা জনপ্রতিনিধি, জনগণ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে ছুটি কাজ করিতে হয়;—সময়বিশেষে জনগণের মত গঠন ও মতকে স্থগিত চালিত করিতে হয়, এবং কখনও বা জনগণের মত অল্পসাবে চলিতে হয়। গুয়ার্ডিয়ান কমিটি জনপ্রতিনিধি। কমিটি ইহাদের প্রতিিনিধি, মন্ত্রিস্থগ্রহণ বিষয়ে সেই জনগণের মতের অল্পবর্জন করিয়াছেন বলিয়াছেন।

কংগ্রেস যখন নুতন আইন অল্পসাবে গঠিত ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে সদস্যরূপে কংগ্রেসীদের প্রবেশ বাছনীয় মনে করেন, তখনই কোন কোন প্রদেশে মন্ত্রিস্থগ্রহণ বলিতে গেলে

অনিবার্য হইয়া উঠে। কারণ, সদস্য নির্বাচিত হইতে হইলে আগে হইতে নির্বাচক ভোটদাতাদিগকে বলিতে হইবে নির্বাচনপ্রার্থী নির্বাচিত হইলে কি করিবেন। এই বলার কাজটি, এই অঙ্গীকার করার কাজটি, করিতে হয় বক্তৃতা দ্বারা ও মুদ্রিত ম্যানিফেস্টো বা মডস্কাপনী দ্বারা। কংগ্রেসী নির্বাচনপ্রার্থীদের পক্ষে বক্তৃতা ও ম্যানিফেস্টো ত বলা হয়, যে, তাঁহারা নির্বাচিত হইলে কৃষকদের ও শ্রমিকদের হুখ দূর করিবেন, ও অন্ত কোন কোন শ্রেণীর স্বেচ্ছকদেরও অভাব অভিযোগে মন দিবেন, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবেন, ইত্যাদি। কংগ্রেসের সভাপতির বক্তৃতায় এবং কংগ্রেসের নির্বাচন-ম্যানিফেস্টোতে নূতন ভারতশাসন আইন বিনষ্ট বা রদ কবিশা গণতান্ত্রিক ও স্বাভাৱিত ধরণের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার, স্বরাজ্যস্থাপনের ও স্বাধীনতা লাভের অঙ্গীকারও ছিল। এই শেষোক্ত অঙ্গীকারগুলি পালন ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ না করিয়াও করা সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে, এবং জাতিকে স্বরাষ্ট্র ও স্বাধীন করিতে পাবিলে সকল শ্রেণীর লোকেরই অভাব অভিযোগ ও হুখে মন দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কিন্তু যে-সকল কৃষক নজর ও অন্ত লোক হুখদূরীকরণের আশায় কংগ্রেসীদিগকে ভোট দিয়াছে, তাহারা ভবিষ্যতে স্বরাজ্য ও স্বাধীনতা লব্ধ হইলে তবে হুখস্বাচ্ছন্দ্য পাইবে, এ আশায় বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদিগকে সত্য সত্য দেখান আবশ্যক, যে, তাহাদের হুখ দূরীকরণের চেষ্টা হইতেছে। ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্যদের পক্ষে একুণ চেষ্টা করা যতটা সম্ভবপর, মস্তিষ্কগ্রহণ না করিলে তাহা করা যায় না। এই জন্তই বলিতেছিলাম, কংগ্রেসের ম্যানিফেস্টোই মস্তিষ্কগ্রহণ প্রকারান্তরে অনিবার্য করিয়াছিল।

এখন কথা হইতেছে, কংগ্রেসী মস্তিষ্কগুলি ম্যানিফেস্টোব অঙ্গীকার রক্ষা করিতে পারিবেন কি?

দেশহিতসাধনে মস্তিষ্কগুলির সামর্থ্য

কংগ্রেসী মস্তিষ্কগুলি ও অন্ত মস্তিষ্কগুলিসমূহের দেশহিত-সাধন-করিবার সামর্থ্য নির্ভব করিবে তাহাদের দেশহিতৈষণার উপর, দেশহিত করিবার মত জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর, প্রাদেশিক ধনভাণ্ডারে যথেষ্ট টাকা থাকার উপর, সেই টাকা ব্যয় করিবার তাহাদের ক্ষমতাব উপর, এবং দেশহিত-সাধনার্থ কোন কোন প্রকার আইন প্রণয়ন করিবার তাহাদের সামর্থ্যের উপর। দেশেব হিত করিবার ইচ্ছা এবং তাহার নিমিত্ত পন্থা নির্দেশ ও উপায় নির্বাচনের মত জ্ঞান ও বুদ্ধি তাহাদের আছে, মানিয়া লওয়া হউক। অন্ত বাহা কিছু আবশ্যক, তাহা আছে কি না বিবেচনা করা যাউক।

দেশহিতসাধনের নিমিত্ত আবশ্যক যথেষ্ট টাকা কোন প্রদেশের ধনভাণ্ডারেই নাই, যদিও বাহা আছে তথাবা কিছু দেশহিত অবশ্যই হইতে পারে। বলের প্রাদেশিক সরকারী কোষে ত যথেষ্ট টাকা নাই-ই।

ভারতশাসন আইনের ৭৮ ধারা অনুসারে গবর্নর প্রতিবৎসর প্রাদেশিক আয়ব্যয়ের একটি বিবৃতি ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করাইবেন। ব্যয় ছুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইবে। একটি ভাগ সেই সকল খরচের বাহার 'চার্জ' প্রাদেশিক রাজস্বের উপর স্থাপিত ("expenditure charged upon the revenues of the Province")। ইহার দফাগুলি উক্ত ধারার ৩ উপধারায় দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশিক রাজস্বের ব্যয়ের এই ভাগটি ব্যবস্থাপক সভার ভোটের দ্বারা বাড়াইতে বা কমাইতে পারা যাইবে না। ইহা রাজস্বের বেশ একটি মোটা অংশ। এই ভাগটির কোন কোন ব্যয় গবর্নরের একার বিবেচনাব উপর নির্ভর করিবে। তাহার বিশেষ দায়িত্বগুলি অনুসারে কাজ করিবার জন্ত কত টাকা আবশ্যক, তাহাও তিনি স্থির করিয়া দিবেন।

তাহার পর দ্বিতীয় ভাগটিতে আসিবে সেই সব খরচ বাহার হ্রাসবৃদ্ধি ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের ভোটের উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু তাহাও চূড়ান্ত ভাবে নহে। প্রথমতঃ ত কোন বরাদ্দের দাবী (demand for a grant) গবর্নরের সুপারিশ ব্যতীত ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন স্থলে তিনি ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা কমান বা নামঞ্জুর বরাদ্দ আবার বজেটে পুনঃস্থাপিত করিতে পারিবেন।

আইনেব এই প্রকার সব ব্যবস্থা হইতে বুঝা যাইবে, যে, যথেষ্ট প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে মস্তিষ্কগুলি দেশহিত-সাধনার্থ নিজ বিবেচনা অনুসারে আবশ্যক টাকা খরচ করিতে পাইবেন না ও পারিবেন না, তাহাদিগকে গবর্নরের মরজির উপর নির্ভর করিতে হইবে।

নূতন ট্যাক্স বসাইয়া বা বর্তমান কোন ট্যাক্সের হার বাড়াইয়া রাজস্ব বৃদ্ধি পথেও বাধা আছে। দেশের লোকদের আরও বেশী ট্যাক্স দিবার সামর্থ্য কত আছে, বিবেচ্য। বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারকল্পে ট্যাক্স বসাইবার ক্ষমতা কয়েক বৎসর আগে প্রণীত একটি আইনে গবলেন্টকে দেওয়া আছে। কিন্তু সেই আইন অনুসারে ট্যাক্স কার্যতঃ বসাইবার চেষ্টার প্রতিবাদ হইতেছে।

নূতন ট্যাক্স বসান বা বর্তমান কোন ট্যাক্সের হার বাড়ান আর এক কারণে সহজ নয়। ইহা করিতে হইলে বৈধ আইনের প্রয়োজন হইবে, তাহার খসড়া গবর্নরের সুপারিশ ভিন্ন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত পর্ধ্যস্ত করা চলিবে না, পাস করা ত দূরের কথা।

ট্যাক্স সম্বন্ধীয় কোন বিল বা অল্প যে কোন রকম বিল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় পাস হইলেই তাহা আইনে পরিণত হইবে না; গবর্ণর, গবর্ণর-জেনারেল, বা ইংলণ্ডের তহা মঞ্জুর না করিবার আইনসম্মত ক্ষমতা আছে। ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধে বড়ের যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, তাহার রদ বা কোন পরিবর্তন যদি কোন বিলে করা হয়, তাহাতে গবর্ণর নিজেই মত দিতে পারিবেন না, ইহা গবর্ণরদের প্রতি উপদেশের দলিলে (Instrument of Instructions to Governors) স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে।

চাষীদের ও কারখানার শ্রমিকদের দুঃখ ও অসুবিধার প্রতিকার করিতে হইলে যে-সকল আইন করিতে হইবে, তাহাতে জমিদার ও ধনিকদের স্বার্থের সহিত সংঘর্ষ ঘটিবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট নিজ শক্তি ও প্রভাব রক্ষার নিমিত্ত এই দুই শ্রেণীর লোকদের আত্মগত্যা ও সমর্থনের উপর কতকটা নির্ভর করেন। জমিদারদের মধ্যে ইংরেজ একেবারেই নাই এমন নয়, এবং ধনিকদের মধ্যে ইংরেজ অনেক। ভারতবর্ষের সাধারণ স্বার্থ এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের স্বার্থের বৈপরীত্যও আছে। এই সব বিবেচ্য বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিলে বুঝা যাইবে, যে, চাষী ও শ্রমিকদের সুবিধার জন্য আইন করিবার ইচ্ছা যদি কোন মন্ত্রিমণ্ডলে থাকে, তাহা হইলেও আইন করা খুব সহজ হইবে না।

ভাঙিবার নিমিত্ত গড়া

নূতন ভারতশাসন আইন ও তাহাতে বিধিবদ্ধ নূতন শাসনতন্ত্র কংগ্রেস গ্রহণের অযোগ্য ও বর্জনীয় এক বিনাশেরই যোগ্য মনে করেন এবং সেই জন্য তাহা বিনাশ করিবার চেষ্টাই করিবেন, ইহা কংগ্রেস সভাপতির মুখ দিয়া ও অন্যান্য প্রকারে বহুবার বলিয়াছেন। সুতরাং এখন সেই আইন ও শাসনতন্ত্র মন্ত্রিসভার দ্বারা কতকটা সচল করিতে যাওয়ায় কংগ্রেসের কথায় ও কাজে কতকটা গরমিল হইতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তথাপি কংগ্রেস বলিতেছেন, মন্ত্রিসভার শাসনতন্ত্রটাকে 'চালু' করিবার জন্য নহে, উহার ধ্বংসাধনেরই নিমিত্ত। তাহার অর্থের কিছু আভাসও সভাপতি এবং অন্ত্র কোন কোন কংগ্রেস-নেতা দিয়াছেন। আভাস এইরূপ। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল এমন সব গঠনমূলক আইন করিবেন, এমন সব গঠনমূলক কাজ করিবেন, যাহার দ্বারা জনগণ বলিষ্ঠ হইবে, উদ্ধৃত হইবে, পচেতন হইবে। সুতরাং জনগণ এখন যতটা কংগ্রেসের সহযোগী আছে, ভবিষ্যতে তদপেক্ষা আরও অহুযোগী হইবে। এই উদ্ধৃত বলিষ্ঠ জনগণের সাহায্যে কংগ্রেস স্বরাজপ্রচেষ্টা-ন্তন উত্তম ও উৎসাহের সহিত চালাইবেন। কংগ্রেসের

সভাপতি নেহরু মহাশয় ইহাও বলিয়াছেন, যে, ফেডারেশনকে বাস্তবে পরিণত হইতে বাধা দিবার চেষ্টা করা, এবং তদ্বারা কমিটিটিউশনটাকে ব্যর্থ ও হান্তকর করা এবং এই প্রকারে ভবিষ্যৎ শাসনবিধি প্রণয়নার্থ জনসভার আহ্বানের জন্য ও স্বাধীনতার জন্য দেশকে প্রস্তুত করা মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্য।

গ্রহণের অযোগ্য ও বিনাশেরই যোগ্য শাসনতন্ত্রের অধীনে কংগ্রেসী ব্যবস্থাপক সমস্তেরা কি কারণে ও উদ্দেশ্যে মন্ত্রিসভা গ্রহণ করিতেছেন, তাহার ব্যাখ্যা আমরা ঐরূপ বুঝিয়াছি। আমরা যদি ঠিক বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে সাম্রাজ্যবাদী বেসরকারী ইংরেজরা এবং ভারতশাসনসংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আমলারা তাহা প্রতিবে ও বুঝিতে পারিবেন না, মনে করি না। রাষ্ট্রনীতি আমাদের চেয়ে তাঁরা কম বুঝেন না। সুতরাং প্রশ্ন এই, শাসনতন্ত্রকে ভাঙিবার উপায়রূপ ব্যবহারের অভিপ্রায়ে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল যদি কিছু গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ করিবার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের হাতে থাকা নাহেও কর্তৃপক্ষ সেই ক্ষমতার প্রয়োগ করিবেন না, ইহা কি আশা করা যাইতে পারে?

কংগ্রেস কর্তৃক ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী কার্য

নিয়ন্ত্রণ

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে কংগ্রেসী দল কি ভাবে কাজ করিবেন, কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল কি প্রকারে গঠিত হইবে, এবং প্রকার বিষয়সমূহের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ভার আছে সাধারণ ভাবে কংগ্রেস প্যানেলমেণ্টারী বোর্ডের উপর। তা ছাড়া, কার্যসৌকর্য্যার্থে বোর্ডের এক এক জন সভ্যের উপর কয়েকটি প্রশ্নের ভার আছে যেমন সরদার বহুভাই পটেল চোখ রাখিবেন বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্য-প্রদেশের উপর, বাবু বাজেন্দ্র প্রসাদ বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের উপর, এবং মোলানা আবুল কালাম আজাদ আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশ, বাংলা, পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুদেশের উপর।

অনেক কংগ্রেস-নেতা মনে করেন এবং কেহ কেহ বলেনও, যে, কংগ্রেসের কোন সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব ও ঘোঁক নাই, অন্ধদেব আছে বা নাকিতে পারে। কংগ্রেস যে অসাম্প্রদায়িক সমিতি, ইহা তাহার নিয়ম-অনুসারে ও সাধারণভাবে সভ্য। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিবার ও সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়াচ হইতে আত্মরক্ষা করিবার শুচিবাই কখন কখন অজ্ঞাতসাবে ও অনভিপ্রেত ভাবে কংগ্রেসকে সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত করে। উপরে বর্ণিত বন্দোবস্তটাকে ইহার দ্বারা পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে মুসলমানেরা সংখ্যাভূষ্টি নহে, কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যেও মুসলমানের সংখ্যা বেশী নয়। কিন্তু পাছে মুসলমানেরা কংগ্রেসকে সাম্প্রদায়িক বলে সেই অপবাদ হইতে আত্মরক্ষার জন্তই কি মুসলমানদিগকে কংগ্রেসে অথবা প্রাধান্য দেওয়া হয়? সরদার বল্লভভাই পটেল ও বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ কেহই যোগ্যতা, শক্তি, ও দেশসেবার মৌলানা আবুল কালাম আজাদের চেয়ে নিম্নস্থানীয় নহেন। তাঁহারা প্রত্যেকে পাইলেন তিন-তিনটি প্রদেশের ভার, এবং আজাদ সাহেব পাইলেন এমন পাঁচটি প্রদেশের ভার যাহার মধ্যে দুটি ভারতবর্ষে সর্বাঙ্গিক জনবহুল। সরদার পটেল ও বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ আজাদ সাহেবের চেয়ে কম নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক নহেন। কিন্তু তাঁহারা হিন্দু বলিষ্ঠই কি একটিও মুসলমানপ্রধান প্রদেশের ভার তাঁহাদের উপর দেওয়া হয় নাই? মুসলমানপ্রধান সব প্রদেশগুলির ভার ত আজাদ সাহেবের উপর দেওয়া হইয়াছেই, অধিকন্তু হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলির মধ্যে সকলের চেয়ে জনবহুল আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশটিরও অভিভাবক তাঁহাকে করা হইয়াছে।

—

পরাদীন জাতি ও আন্তর্জাতিক বিধি

পরম্পর যুদ্ধের সময় সভ্য জাতিরাও অবশ্যকমত আন্তর্জাতিক বিধি (ইন্টারন্যাশনাল ল) লঙ্ঘন করিয়া থাকে। শান্তির সময়ে কিন্তু ইউরোপের প্রবলতম জাতিরাও সেই মহাদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন দেশের লোকদের সম্বন্ধে ব্যবহারেও সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক বিধি মানিয়া চলে। পরাদীন জাতির লোকদের সম্বন্ধে কিন্তু ইউরোপীয় প্রবল স্বাধীন জাতিরা সব সময়ে আন্তর্জাতিক বিধি মানেন না। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। জুমিকাস্বরূপ বলা দরকার, যে, ভারতবর্ষে ফ্রান্সের অধীন যে কর্ণাট জায়গা আছে, তথাকার অধিবাসীরা ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিধি অনুসারে ফ্রেঞ্চদের মতই স্বাধীন নাগরিক। কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাদেরই মত পরাদীন। ফরাসী চন্দননগরের পাঁচ জন যুবক ব্রিটিশ-অধিকৃত স্থানে বন্দী সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে বাচ্চা গবয়েন্ট কর্তৃক ধৃত হইয়া বিনাবিচারে বন্দী হন। তাঁহাদের মধ্যে দুই জন মুক্তাভ্যন্তর করিয়াছেন। এখনও তিন জন বন্দী অবস্থায় ব্রিটিশ-ভারতে আছেন। ইহারা সকলেই ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ধৃত হইয়াছিলেন। বন্দীদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ দেউলী বন্দীশালা হইতে খুলনায় এক গ্রামে ‘অসুরীণ’ হন। কিন্তু তাঁহার দুঃসাধ্য পীড়ার জন্ত তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী জেলে

আনা হইয়াছে।* বন্দী শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় দেউলীতেই আছেন এবং শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাস দমদমার কৃষিশালায় কৃষিকার্য্য শিখিতেছেন।

ফরাসী ভাবতে কথা উঠিয়াছে যে এরূপ ভাবে ফরাসী নাগরিককে অন্তঃ বন্দী রাখা আন্তর্জাতিক বিধি অনুসারে বে-আইনী। ইহার জন্ত ফরাসী নাগরিকগণ একটি সাধারণ সভায় এই বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্ত ফরাসী কংসেই-জেনেরাল সভার সদস্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়কে ভার্য্য করিয়াছেন এবং স্থির করিয়াছেন যে মধ্যে মধ্যে সভা করিয়া বন্দীদিগের মুক্তির দাবী করিবেন ও ব্রিটিশ গবয়েন্ট কর্তৃক এরূপ বন্দীকরণ বে-আইনী বলিয়া আন্দোলন করিবেন।

বন্দীকৃত যুবক তিন জন জাতিতে ফরাসী হইলে বিন-বিচারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তাহাদের কারাবাস ঘটিত না।

এ-বিষয়ে চন্দননগরের ‘প্রজাশক্তি’ গত ১৩ই আষাঢ়ের সংখ্যায় লিখিয়াছেন :—

চন্দননগরের কতিপয় যুবক এবং ফরাসী প্রজা কয়েক বৎসর ধাবৎ বিনাবিচারে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের হস্তে বন্দী। এ শুধু এদেশেই সম্ভব।

এই বন্দীগণের মুক্তিকামনের প্রথম ধারাবাহিক প্রচেষ্টা হয় শ্রীমত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের ম্যারশ্ কালে। এই ব্যাপারটির গুরুত্বের প্রতি তিনি প্রথমে গবর্নর জুভানো এবং পবে গবর্নর সলোমিয়াকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সত্যেন বাবু এবং গবর্নরঘরের মধ্যে অনেকগুলি পত্রব্যবহার হয়। ফলে ফরাসী সরকার বাংলার সরকারের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন। সত্যেন বাবুর চেষ্টার ফলে বন্দী সন্তোষকুমার ভড় ও কানাইলাল পাল মুক্তি পাইলেন। কিন্তু বাকী কয়েক জনের ভাগ্যপরিবর্তন হইল না।

১৯৩৪ সালের কংসেই-জেনেরাল নির্বাচনের পর হইতে ডাঃ হীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এই ব্যাপারটিতে তাহার সকল চেষ্টা নিয়োজিত করিলেন। হীরেনবাবুর চেষ্টার চন্দননগরের এই রাজবন্দীদের ব্যাপারটি সর্বপ্রথম ভারতের অন্তঃ ফরাসী উপ-নিবেশের প্রতিনিধিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সারা ফরাসী ভারতীয় ব্যাপারে পবিগত হইল। কংসেই-জেনেরাল সভার ১৯ জন সভা গবর্নর বাহাদুরের নিকট এই রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী করিলেন। ফলে ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তৎকালীন গবর্নর মঃ সলোমিয়াক বাংলার লাটসাহেব ও পণ্ডিতারী হীরেন্দ্র কনুলাল মহোদয়দের নিকট এই বন্দীদের মুক্তির কৰ্ত্তা তুলিলেন। ১৯৩৫ সালের জাঙ্ঘারী মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলা লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সকল বন্দী ফরাসী প্রজা মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং উক্ত আলোচনার ফলে তিনি

* ইহা লিখিত হইবার পর অবগত হইলাম, গত ৮ই জুলাই শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষকে কি একটি সর্বোপায় করিয়া মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

আশা করিয়াছিলেন কয়েক মাসের মধ্যেই বন্দী করাশী প্রজার মুক্তি পাইবে। বৎসর ঘুরিতে চলিল সেখিয়া হীরেন বাবু গবর্ণর বাহাদুরকে পত্রযোগে আবার বন্দীপ্ৰণের মুক্তি সম্বন্ধে লিখিলেন; উত্তরে গবর্ণর বাংলার লাটের পত্রের কপি পাঠাইলেন। সে পত্রে মুক্তির কোন আশাসই নাই।

এক দিকে বন্দীদের স্বাস্থ্য ভয় হইতেছে—বিশেষতঃ বন্দী কালীচরণের। চন্দননগরে সাধারণ সভার তাহাদের মুক্তির দাবী উপস্থাপিত করা হইল। কালীচরণের বৃদ্ধা মাতা বাংলার লাটের নিকট তাঁহার পুত্রের ভয় স্বাস্থ্যের কথা জানাইয়া তাহার মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। পতীচারীর লাটসাহেবকেও তিনি তাঁহার পুত্রের স্বাস্থ্যের কথা জানাইয়া হীরেন বাবুর মারফৎ দরখাস্ত করিলেন। গবর্ণর আবার জানাইলেন—তাঁহার বখাস্য তিনি করিতেছেন এবং করিবেন। কিন্তু কালীচরণ সেই ব্রিটিশ জেলে রোগশয্যায় সময় কাটাইতে লাগিল।

হীরেন বাবু অন্তোপাস্য হইয়া ক্রান্তের উপনিবেশিক মন্ত্রী ও পরবাস্ত্র-সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে কঁসেই-জেনেরালের অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক করাশী প্রজার এই বিনা বিচারে বন্দীকরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এবং তাহাদের মুক্তির দাবী করিয়া এক প্রস্তাব পেশ করিলেন। মঃ দাভিদ ও মঃ আমব্রোয়াজ এই প্রস্তাব উপলক্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের এই কার্যকে বে-আইনী বলিয়া শুধু ঘোষণা করিলেন না—প্রমাণ করিলেন। কঁসেই-জেনেরালের করাশী গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি মহাশয়ও এই প্রতিবাদ ও মুক্তিদাবী প্রস্তাবের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া প্রতিক্রিয়া দিলেন—গবর্ণমেন্ট বন্দীদের মুক্ত করিতে কোনও চেষ্টার ক্রটি করিবেন না এবং প্রয়োজন হইলে ক্রান্ত উপনিবেশিক মন্ত্রীর নিকট এই ব্যাপার উপস্থাপিত করিবেন। তৎপরে হীরেন বাবু এই ব্যাপার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্ততম সমস্ত মিঃ বি. দাস ও বাংলার অন্ততম নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর গোচরীভূত করেন। তাঁহার উভয়েই নিজ নিজ ব্যবস্থাপকসভায় এই ব্যাপারের আলোচনা করিবেন বলিয়া প্রতিক্রিয়া দিয়াছেন। হীরেন বাবু ইতিমধ্যে ক্রান্তে Ligue des droits de l'homme-এর সভাপতিত্বে এই সকল ঘটনা জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া পত্র দেন ও বিলাতের পার্লামেন্টের শ্রমিকদলের সভ্য মাডি জোল সাহেবকেও এই ব্যাপার জানাইয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করেন, এবং সর্বশেষে বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ কল্লল হককেও বিনা-বিচারে বন্দী এই সকল করাশী প্রজাদের মুক্তির দাবী করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির পরবাস্ত্র-বিভাগের সম্পাদক মোহিয়া মহাশয়ও কালীচরণের ভ্রাতার অনুরোধে চন্দননগরের করাশী রাজবন্দী প্রজাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি কাহাকে করা উচিত, এই প্রশ্নের উত্থাপন এই বৎসর বোধ হয় আমরাই প্রথমে মর্ডার রিভিভুতে ও পরে প্রবাসীতে করি। আমরা শ্রীযুক্ত স্বভাষচন্দ্র বসুর নাম করিয়া-

ছিলাম, কি কি কারণে করিয়াছিলাম, তাহাও বলিয়াছিলাম। তিনি বাঙালী, অথবা বাংলা দেশের কাহাকেও ১৫ বৎসর সভাপতি করা হয় নাই, শুধু এই কারণেই যে আমরা তাঁহার নাম করিয়াছিলাম, তাহা নহে। সমগ্র ভারতবর্ষেও যোগ্যতম কয়েক জন লোকের মধ্যে তিনি। আমাদের প্রস্তাব মর্ডার রিভিভুর নাম করিয়া লাহোরের ট্রিবিউন ও করাচীর একটি কমিটি সন্ধান করিয়াছিলেন এবং অমৃতব্যাজার পত্রিকা ট্রিবিউনের প্রস্তাবের (আমাদের নহে!) সমর্থন করিয়াছিলেন। তন্নিম্ন স্বভাষ বাবুর নাম আহমদাবাদ ও পুনর সমর্থিত হইয়াছিল। আর কোথাও হইয়াছিল কি না, আমরা লক্ষ্য করি নাই।

মাস্ত্রাজ হইতে প্রেরিত গত ৮ই জুলাইয়ের এসোসিয়েটেড প্রেসের একটি টেলিগ্রামে দেখিলাম, মাস্ত্রাজের সভ্যমণ্ডি মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছেন, যে, মহাত্মা গান্ধীকে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হউক। সভ্যমণ্ডি মহোদয়ের প্রস্তাবটি তাঁহার প্রদত্ত মুক্তি-সম্মত নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

‘I suggest that Mahatma Gandhi should be invited to preside over the next session of the Congress. Congress Ministers will have their difficulties at that time next year and his wise guidance as the President of the Congress will be invaluable to them. Moreover, as the sole author of the A. I. C. C. formula on acceptance of office by the Congress, which has been substantially conceded but not completely, he is the best person to guide and counsel Congress Ministers. His presence at the helm of affairs during that critical year will make the Governors of the provinces hesitate many times before they interfere with Congress Ministers. It will also hearten and give tone to Congress Ministers themselves. Above all, his magnetic personality will help the Congress minorities in the other five provinces to become Congress majorities. That is the most urgent and important problem before the country today. An all-India tour by Mahatma Gandhi as the President of the Congress next year will electrify the nation and make provincial autonomy real. Perhaps it will make Federation still-born and will prepare the nation for the last fight for Swaraj. We may even get Swaraj without another fight. I appeal to all fellow-Congressmen in India whole-heartedly to support this proposal.’—A. P. I.

গত-তিন বৎসর বা তাহার আগেও গান্ধীজীর নাম কেন সভাপতিত্বের জন্য প্রস্তাবিত হয় নাই, জানিতে চাই। তখনও—বিশেষ করিয়া এখন তাঁহারই প্রণীত কংগ্রেসের নুতন কল্যাণিউনিয়ন প্রবর্তিত হয়—তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীকে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি করিবার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি সম্বন্ধে কিছু বলিব না; কারণ উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি সম্বন্ধে কিছু বলিলে তাহা অসম্মানস্বাজ হইবে, তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারা যাইবে না। সেই জন্য শ্রীযুক্ত

সত্যমুক্তি যে যে কারণে গান্ধীজীকে সভাপতি করিতে চান, সেইগুলি শুধু পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

তাহা কবিবার পূর্বে বলা আবশ্যক, যে, তিনি রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে হইতে সরিয়া গিয়াছেন, কেবল সঙ্কটসময় ২৪ দিনের নিমিত্ত আসবে নামিয়া নিজের কাজ করিয়া আবার সরিয়া যান। তাঁহাকে কংগ্রেস-সভাপতি করিলে অস্বস্ত্য: একটি বৎসর তাঁহাকে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে থাকিয়া কংগ্রেসের কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। শ্রীযুক্ত নতামুণ্ডি গান্ধীজীকে প্রেরণ করিয়া জানিয়া লইয়াছেন কি, যে, তিনি আবার রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অস্বস্ত্য: একটি বৎসর কংগ্রেসের কাজ করিবেন?

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয়, যিনি যে প্রদেশের মানুষ সেই প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হইলে তাঁহাকে সেই অধিবেশনের সভাপতি না-করিবার যে একটি রীতি বরাবর ছিল, কেবল পণ্ডিত জাহাঙ্গীরলাল নেহরুর লক্ষ্যে অধিবেশনের সভাপতিত্ব বোলায় সেই রীতির ব্যতিক্রম হয়। কিন্তু বার-বার রীতিটা ভঙ্গ করা কি উচিত?

তৃতীয় বিবেচ্য বিষয়, গান্ধীজী কংগ্রেসের সঙ্কটসময়ে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। মন্ত্রিস্থ গ্রহণ বা অ-গ্রহণ সমস্তার মীমাংসা ত হইয়া গেল। তাহার পরও সঙ্কট অবস্থা কি লাগিয়াই থাকিবে? আমরা ইংরেজ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করি, তাঁহারা ইমার্জেন্সী বা সঙ্কট অবস্থার দোহাই দিয়া বিনা বিচারে বন্দী করিবার এবং আরও অনেক কিছু করিবার আইন পাস ও জড়িনাঙ্গ জারি করান। কিন্তু সেই সঙ্কট অবস্থা আর কা'ট না, বৎসরের পর বৎসব চলিয়া আসিতেছে। কংগ্রেসের কর্তারাও কি আমলাতন্ত্রের পথের পথিক হইবেন? ইমার্জেন্সীবাদী হইবেন?

গান্ধীজী সভাপতি হইলে যাহা যাহা করিতে পারিবেন বলিয়াছেন, সভাপতি না হইলেও ত তাহা করিতে পারেন। সভাপতি হইলেই তাঁহার বুদ্ধি, কার্যকারিতা ও প্রভাব বাড়িয়া যাইবে, সভাপতি না হইলে তাঁহার বুদ্ধি, কার্যকারিতা ও প্রভাব কম হইবে, কেন এমন মনে করা হয়? গোলাপ ফুলের নাম অস্ত্র কিছু রাখিলেও তাহার গৌরব কম না।

“আগামী বৎসর কংগ্রেসী মন্ত্রীদেব বড় কঠিন সময় হইবে, তখন সভাপতিরূপে গান্ধীজীর পরিচালনা তাহাদের পক্ষে অমূল্য হইবে।” আগামী বৎসর অপেক্ষা প্রথম ছয় মাসই ত কঠিনতম, অস্বস্ত্য: কঠিনতর, সময় হইবে। তখন সভাপতি গান্ধীজীর চালকন্ড ব্যতিরেকেও যদি কংগ্রেসী মন্ত্রীরা চলিতে পারেন, তাহা হইলে পরবর্তী বৎসর কেন পারিবেন না? সভাপতি না হইয়াও অবশ্য গান্ধীজী এই কয় মাস মন্ত্রীদেবকে পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু এখন যদি

অ-সভাপতি গান্ধীজী সেরূপ পরামর্শ দিতে পারেন, তাহা হইলে অ-সভাপতি গান্ধীজী পবে কেন তাহা পারিবেন না?

“তিনি মন্ত্রিস্থ গ্রহণ সম্বন্ধীয় স্মৃতির একমাত্র রচয়িতা, অতএব তিনি মন্ত্রীদেবকে পরামর্শ দিবার যোগাত্মক ব্যক্তি।” সত্য, কিন্তু তিনি সভাপতি না হইয়াও ত স্মৃতি রচনা করিয়াছেন ও তাহা অস্ত্র কংগ্রেস-নেতারা মানিয়া লইয়াছেন। সভাপতি না হইলে তিনি কেন পরামর্শ দিতে অসমর্থ হইবেন বুঝা যায় না। মন্ত্রীদেব কার্যকালের প্রথম ছয় মাস ত তিনি সভাপতি হইতেই পারেন না। তখন মন্ত্রীদেবকে কে পরামর্শ দিবে?

“তিনি কংগ্রেসের কর্তার থাকিলে গবর্ণরদেবকে মন্ত্রীদেব কাজে হস্তক্ষেপ করিবার আগে অনেক বাব ভাবিতে ও বিধা বোধ করিতে হইবে।” সভাপতি হইলে তবে গান্ধীজী কংগ্রেসের কর্তার হইবেন, এখন কর্তার নহেন, ইহা স্বীকার্য না হইলেও স্বীকার করা যাক। তাহা হইলে, কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের পূর্বের ছয় মাসের মধ্যে, গান্ধীজীর অ-কর্তারূপে আমলে গবর্ণরদেব কি বিনা ভাবনাচিন্তায়, বিনা বিধায় মন্ত্রীদেবের পরামর্শ ও কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন?

“গান্ধীজীর কর্তারূপে মন্ত্রীদেবকে উৎসাহিত করিবে ও বলিষ্ঠ করিবে।” প্রথম ছয় মাস তবে তাঁহার উৎসাহহীন ও দুর্বল থাকিবেন?

“সর্বোপরি তাঁহার চৌধক ব্যক্তিত্ব অস্ত্র পাঁচটি প্রদেশের কংগ্রেস সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত করিতে সাহায্য করিবে। ইহাই এখন দেশের পক্ষে সর্বোপেক্ষা জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।” গান্ধীজীর চৌধক ব্যক্তিত্ব কি তাঁহার সভাপতি হওয়ার উপর নির্ভর করে? তিনি ত দীর্ঘকাল সভাপতি নাই। কিন্তু কংগ্রেসের গত কয়েকটি অধিবেশনে এবং মন্ত্রিস্থ গ্রহণ সমস্তার সমাধানে তাঁহার ব্যক্তিত্ব কি সর্বাভিভাবী হয় নাই? তাহা যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি সভাপতি না হইলেও সকলের চেয়ে প্রভাবশালী থাকিবেন।

“আগামী বৎসর মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস-সভাপতিরূপে সমগ্র ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিলে তাহা জাতিকে বৈদ্যুতিক তেজোময় করিবে, প্রাদেশিক আত্মকর্ষকে সত্য করিবে, হয়ত কেতারেশন যুত অবস্থার ভূমিষ্ট হইবে, এবং জাতিকে শেষ স্বরাজসংগ্রামেব জন্ত প্রস্তুত করিবে, এমন কি আমরা আর একবার যুদ্ধ না করিয়াও স্বরাজ পাইব।” মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস-সভাপতিরূপে সমগ্র ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিলে যদি এই সকল মহা ফল ফলে, তাহা হইলে শুধু অ-সভাপতি মহাত্মা গান্ধীকে তিনি ভারত ভ্রমণ করিলে সেই সকল ফল কেন ফলিবে না, তাহা বুঝা যাইতেছে না।

মহাত্মা গান্ধী যদি আগামী অধিবেশনে সভাপতি হইতে সম্মত হন, তাহা হইলে তাহাতে কোন কংগ্রেস কমিটি

আপত্তি কবিবে মনে হয় না, অধিকাংশ কমিটি ত আপত্তি নিশ্চয়ই করিবে না। কিন্তু শ্রীযুক্ত সত্যমুষ্টির একটি যুক্তিকেও অমূল্য, অকাটা বা প্রবল মনে করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।

গান্ধীজী রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে নূতন চিন্তাধারা ও নূতন কর্ম-পন্থা প্রবর্তিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রভাবে কংগ্রেস তাহা গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেসে এখনও তাঁহার প্রভাব অনতিক্রান্ত, কাহারও প্রভাব তাঁহার সমান নয়—যদিও কোন কোন বিষয়ে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী কেহ কেহ আছেন। হুতরাং এখন কেহ যদি তাঁহাকে কংগ্রেসের আজীবন আয়ত্ন সভাপতি কবিবার প্রস্তাব করেন, তাহাও আশ্চর্যের বিষয় হইবে না। যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া প্রতিবৎসরই তাঁহার নাম প্রস্তাবিত হইতে পারে। কিন্তু অল্প কোন যোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নির্বাচনে বাধা দিবার নিমিত্ত কেহ তাঁহার নাম প্রস্তাব করিলে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিব।

“ভারতমাতা আমাদের সৎ-মা”

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় পঞ্জাবের একটি সদস্যের পদ খালি হওয়ায় গত জুন মাসে সেই পদটির জন্য মোলানা জাম্ব আলি খাঁ নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর তিনি লাহোবেব বাদশাহী মসজিদে একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার একটি অংশের রিপোর্ট লাহোরের ১৫ই জুনের ট্রিবিউন পত্রিকায় নিম্নলিখিত কথায় দেওয়া হইয়াছে।

He claimed that the Muslims were more anxious to win freedom than any other people. The only difference was that they worshipped Islam as their real Mother and Bharat Mata came next in their love, for Bharat Mata was after all their step-mother.”

অর্থাৎ “তিনি দাবী করেন, যে, মুসলমানেরা স্বাধীনতা জিনিয়া লইতে অল্প সব লোকদের চেয়ে অধিক ব্যগ্র। প্রভেদ কেবল এই, যে, মুসলমানেরা ইসলামকে (মুসলমান-ধর্মকে) তাহাদের প্রকৃত মা বলিয়া পূজা করে, এবং ভারতমাতা তাহাদের ভালবাসার পব-বর্তী স্থানীয়; কেন না, যাহাই বলা হউক না কেন, ভারতমাতা তাহাদের সৎ-মা।”

মুসলমানেরা যে অল্প সকলের চেয়ে অধিক স্বাধীনতাকামী, তাহা তাঁহাদের আচরণে প্রমাণিত হইলে তাঁহারা সকলের অগ্রকরণযোগ্য হইবেন।

মৌলানা সাহেবের অল্প কথাকলিতে যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অল্প অনেক মুসলমানেরও আছে বলিয়া অনুমান হয়। তিনি খুলিয়া সভ্য কথা বলায় ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উক্তিতে একটু খুঁৎ আছে। তাহা দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

স্বাধীন ও পরাধীন সভ্যদেশসমূহের লোকেরা আলঙ্কারিক ভাষায়, কণক ভাষায়, নিজ নিজ জন্মভূমিকে “পিতৃভূমি”

বা “মাতৃভূমি” বলিয়া থাকেন। জার্মানরা জার্মানীকে পিতৃভূমি বলেন। আমরা জন্মভূমিকে মাতৃভূমি বলি। এই জন্ম কবিশ্বের ভাষায় জন্মভূমিকে কোন দেশে পিতা কোন দেশে বা মাতা বলা হয়। দেশকেই কবিশ্বের ভাষায়: মাতৃসম্বোধন বা পিতৃসম্বোধন করা হয়, ধর্মকে নহে। ভারতবর্ষের ভারতোত্তম হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতি কোন ধর্মসম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মকে মাতা বলেন না, সম্মতি থাকিলে ও ইচ্ছা হইলে জন্মভূমিকেই মাতৃসম্বোধন করেন। যদি তাঁহারা বলিতেন, হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম বা শিখ-ধর্ম আমাদের মা, তাহা হইলে মৌলানা সাহেবের বলা সাজিত, “ইসলাম আমাদের মা।” কিন্তু যেহেতু ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ সম্মতি ও ইচ্ছা অনুসারে একটি দেশকেই কবিশ্বের ভাষায় মা বলেন, সেই জন্ম মৌলানা সাহেবকেও বলিতে হইবে কোন দেশ তাহাব মা। আমরা যে ভারতবর্ষকে আমাদের মা বলি, তাহা নিতান্ত কবিকল্পনাও নহে। ভারতবর্ষের অল্পজলে বতাসে আমাদের দেহের পুষ্টি ও প্রাণরক্ষা হয় এবং স্বয়ংমনতান্নার খাদ্য প্রধানতঃ এইখানে থাকিয়া ও এইখান হইতেই আমাদের পাই। ভারতবর্ষের বাহিরের বিশ্বের সহিতও আমাদেরও যোগ আছে। কিন্তু ঘনিষ্ঠতম যোগ ভারতবর্ষের সহিত। এই জন্ম ভারতবর্ষ আমাদের মা।

‘Vernacular’ মানে কি দাস-ভাষা

আমরা গত বৎসব কার্তিক মাসে প্রবাসীতে এবং নবেম্বর মাসের মধ্যার্ধ্বে বিভিন্নভাবে উপরিলিখিত প্রশ্নের আলোচনা কবিয়াছিলাম এই জন্ম, যে, মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত সত্যমুষ্টি ভাবতীয় ব্যবস্থাপক সভায় vernacular-এর অর্থ দাস-ভাষা এই ধূয়া তুলিয়া সরকারী রিপোর্ট কাগজপত্র ইত্যাদিতে উহাব ব্যবহার বন্ধ করিবার দাবী করিয়াছিলেন। সম্মতি কলিকাতার Advance কাগজে ও একটি বাংলা কাগজে দেখিলাম, আবার সেই যুক্তি ও দাবীর পুনরুত্থান হইয়াছে। ইংরেজী আমাদের মাতৃভাষা নহে। এই জন্ম কোন ইংরেজী কথাব মানে কি তাহা জানিতে হইলে কোন ভারতীয় রাজনীতিব্যাপারী কথ্য প্রামাণিক মনে করা চলে না, প্রসিদ্ধ ইংবেজী অভিধান দেখিতে হয়। সকলের চেয়ে প্রামাণিক ইংবেজী অভিধান আমেরিকায় ওয়েবস্টারের অভিধানের নূতন সংস্করণ, এবং ইংলণ্ডে মারের অক্সফোর্ড অভিধান, যাহা ইংরেজী বৃহত্তম অভিধান। এই দুটি অভিধানে vernacular মানে দাস-ভাষা এক্রপ কিছু লেখা নাই। যাহা লেখা আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। ওয়েবস্টারে আছে :—

Vernacular, adj. [L. vernaculus born in one's house, native, fr. verna a slave born in his master's house, a

native, of uncert. origin.] 1. Belonging to, developed in, and spoken or used by, the people of a particular place, region, or country; native; indigenous;—now almost solely of language; as, English is our vernacular tongue; hence, of or pertaining to the native or indigenous speech of a place; written in the native, as opposed to the literary language; as, the vernacular literature, poetry; vernacular expression, words, or forms.

Which in our vernacular idiom may be thus interpreted. Pope.

2. Characteristic of a locality; local; as, a house of vernacular construction. "A vernacular disease." Harvey.

3. Of persons, that use the native, as contrasted with the literary, language of a place; as, vernacular poets; vernacular interpreters.

Vernacular, n. The vernacular language, esp. as a spoken language; one's mother tongue; often the common mode of expression in a particular locality or, by extension, in a particular trade, etc.

মাতের অক্সফোর্ড অভিধানে আছে :—

Vernacular

[f. L. *vernacul-us* domestic, native indigenous (hence *jt. vernacolo*. Pg. *vernaculo*), f. *verna* a home-born slave, a native.

Adj. 1. That writes, uses, or speaks the native or indigenous language of a country or district.

2. Of a language or dialect. That is naturally spoken by the people of a particular country or district; native, indigenous.

3. Of literary works, etc. Written or spoken in, translated into, the native language of a particular country or people.

4. Of words, etc. Of or pertaining to, forming part of, the native language.

5. Connected or concerned with the native language.

6. Of arts, or features of these: Native or peculiar to a particular country or locality.

7. Of diseases: Characteristic of, occurring in, a particular country or a district; endemic. Obs.

8. Of a slave: That is born on his master's estate; home-born. rare.

9. Personal, private.

B. sb. 1. The native speech or language of a particular country or district.

2. A native or indigenous language.

3. transf. The phraseology or idiom of a particular profession, trade, etc.

অতএব পাঠকেরা দেখিবেন, vernacular মানে দাস-ভাষা নহে; ইহাব মানে কাহারও মাতৃভাষা। ওয়েবস্টার প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি পোপের লেখা হইতে এই অর্থে বাক্যটি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পর্যাপ্ত দেওয়া হইয়াছে।

ওয়েবস্টার শব্দটির ইংরেজী যে-কয়টি অর্থ দেওয়া হইয়াছে 'দাস-ভাষা' তাহার একটিও নহে। বরং অর্থ বুঝাইবার ক্ষমতা বলা হইয়াছে, "as, English is our vernacular tongue," "যেমন, ইংরেজী আমাদের বন্যাকুলার ভাষা।" আমেরিকানরা বা ইংরেজরা দাস নহে। শব্দটির অর্থ দাস-ভাষা হইলে আমেরিকান বা ইংরেজ কোন কোষকাব একপ দৃষ্টান্ত দিতেন না।

শব্দটির সঙ্গে দাসের সম্পর্ক কেবলমাত্র এইটুকু যে, উহার ব্যুৎপত্তিবলে বলা হইয়াছে, যে, উহা বের্না (verna) হইতে উৎপন্ন যাহার মানে 'নিজ প্রভুর গৃহে জাত দাস,' 'নেতিভ,'

কিন্তু তাহার পরেই বলা হইয়াছে, ইহাব উৎপত্তি অনিশ্চিত।

কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি বা উৎপত্তি যাহাই হউক, প্রচলিত অর্থ কি তাহাই দেখিতে হইবে। সংক্ষিপ্ত অক্সফোর্ড অভিধানও দেখিলাম, শব্দটির দাস-ভাষা অর্থ পাইলাম না। খ্রীষ্টিয়ান শব্দটি প্রথমতঃ অবজ্ঞাসূচক ছিল, কোয়েকার শব্দটি বিজ্ঞপায়ক ছিল। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে এখন অবজ্ঞা ও বিজ্ঞপের ভাব জড়িত নাই। বাইবেলের লাতিন অনুবাদকে ইংরেজীতে 'ভলগেট' (Vulgate) বলে। এই কথাটি, এবং 'নীচ' 'অভদ্র' যাহার মানে সেই 'ভলগার' (Vulgar) কথাটার উৎপত্তি একই লাতিন কথা হইতে। কিন্তু সে কারণে কেহ ভলগেট শব্দের অব্যবহার ইচ্ছা করে না।

চীন ও জাপানে আবার যুদ্ধ

চীন ও জাপানে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, এই সংবাদ অতিশয় ভয়াবহ। ইউরোপে নামে কেবলমাত্র স্পেনের গবর্নেন্ট ও স্পেনের কাসিট বিদ্রোহীদের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ ইউরোপের দুটি শক্তিশালী দেশ, ইটালী ও জার্মেনী, বিদ্রোহীদের সাহায্য করিতেছে। রাশিয়া স্পেনের গবর্নেন্টকে অস্ত্রস্বল্প সাহায্য করিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। ইংলণ্ড কোন প্রকারে অ-হস্তক্ষেপ (Non-intervention) নীতির ব্যপদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে কোন পক্ষে যোগ দিতে বিরত আছে। তথাপি, অনেকে মনে করে, জার্মেনী ও ইংলণ্ড প্রস্তুত হইলেই ইউরোপে একটা মহাযুদ্ধ বাধিবে। কে কোন পক্ষ অবলম্বন করিবে, তাহা এখন অনুমানের বিষয়। ইউরোপের অবস্থা ত এইরূপ। এশিয়ার বড় দুটি জাতির মধ্যে যুদ্ধ শুধু এই কারণেই দুঃসংবাদ যে যুদ্ধে বহু নরহত্যা ও অস্বাভাবিক অনর্থপাত ঘটে। অধিকন্তু ইহা এই কাবশেও দুঃসংবাদ, যে, ইহা শীঘ্র থামিয়া না গেলে অল্প অনেক দেশও—যথা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মেনী ও ইটালী—ইহাতে জড়িত হইতে পারে। তাহা হইলে ইহা পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধে পরিণত হইবে।

চীনের প্রতি যুদ্ধারা জাতি ব্যবহার হয় একরূপ কোন সর্বে যুদ্ধ মিটিয়া গেলে বড় ভাল হয়। কিন্তু সালিসী করিবে এমন কোন প্রবল জাতি আছে যাহার এতটা মানবপ্রেম, ভ্রাতৃত্ব ও নিঃস্বার্থতা আছে এবং যাহার একপ শক্তি আছে, যে, তাহার নিষ্পত্তি উভয় পক্ষ স্বচ্ছন্দচিত্তে মানিয়া লইবে, কিংবা মানিয়া লইতে বাধ্য হইবে? এমন কোন জাতি বা জাতি-সমষ্টি ত দেখিতেছি না। সুতরাং যদি এখন চীনের যথেষ্ট শক্তি থাকে বা ভবিষ্যতে চীন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার অঞ্চলবিশ্বের ও স্বাধীনতার

পুনরুদ্ধার ও রক্ষা আততায়ী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘারা হইতে পারিবে, নতুবা নহে।

অল্প কোন দেশের সাহায্য ব্যতিরেকে চীন ও জাপানে জায়গাজত সর্বো সন্ধি হইলে সকলের চেয়ে ভাল হয়।

—

আমাদের প্রতিবাদ মিথ্যা হইল

অনেক মাস পূর্বে যখন লর্ড জেটল্যাণ্ড বলিয়াছিলেন, ভারতীয় নেতারা যদিও এখন নতুন ভারতশাসন আইনটি অগ্রহণীয় বলিতেছেন তথাপি তাঁহারা উহা গ্রহণ করিবেন ও তদনুসারে দেশের কাজ চালাইবেন, তখন আমরা তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার কথাই সত্য হইল। রাজনীতিব্যাপারীদের মানসিক বিবর্তন তিনি আমাদের চেয়ে ভাল বুঝেন।

—

নিষিদ্ধ পুস্তক—সেকালের ও একালের

একটা ধারণা চলিত আছে, এবং তাহার সমর্থক শাস্ত্র-বচনও আছে শুনিয়াছি, যে, শূত্র ও নারীদের বেদ শ্রবণ ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। পুঁথিতে ও-রকম নিষেধ থাকিলেও, বাস্তবিকই কোন কালে প্রত্যেক নারী ও প্রত্যেক শূত্র বেদ শ্রবণে ও অধ্যয়নে বঞ্চিত ছিল কি না জানি না। একালে ত ও-নিষেধের কোন মানেই নাই। কারণ, বেদ ছাপা হইয়া গিয়াছে; যে-কেহ কিনিয়া বা সাধারণ লাইব্রেরীতে গিয়া তাহা বা তাহাব অনুলবাস পড়িতে পারে।

বেদের জ্ঞান কেন ষিদ্ধদের মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার কারণ আলোচনা করিব না। কেবল ষিদ্ধদের বিরুদ্ধে একটা যে স্বার্থপরতাপ্রসূত অভিসন্ধি আরোপ করা হইত, এবং হয়ত এখনও হয়, তাহারই উল্লেখ মাত্র করিব—তাহার সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলিব না। সে অভিসন্ধিটা এই, যে, বেদ জানিলে মানুষগুলা বড় হয়, অতএব শূত্র ও নারীদেরকে বড় হইবার সেই উপায় হইতে বঞ্চিত রাখা চাই।

আজকাল আমাদের গবর্নেন্ট কোন কোন ইংরেজী বহি ভারতবর্ষে আসিতে দেন না, তাহা আনা নিষিদ্ধ। যদি হঠাৎ আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে গবর্নেন্ট তাহা জানিতে পারিলে যেখানে পান বাজেয়াপ্ত করেন। ইহার কারণ কি? খরিয়াল ওয়াং যাক, সেকালের ষিদ্ধেরা অধিষ্টি ও নারীরা পাছে মানুষ হইয়া যায় সেই জন্তই তাহাদিগকে বেদের জ্ঞানে বঞ্চিত রাখিতেন। একালে কিন্তু যে-সব ইংরেজী বহি গবর্নেন্ট “নিষিদ্ধ” পর্যায়ে ফেলেন, সেগুলি ত বেদ নয়—যদিও বেদ ছাড়া অল্প বহি পড়িয়াও লোকে মানুষ হয়। এবং আমরা পাছে মানুষ হইয়া যাই সে ভয়ে গবর্নেন্ট সেগুলি নিষিদ্ধ কেন করিতে যাইবেন? সরকার বাহাদুরের

যদি এরূপ অভিশ্রয় থাকিত যে আমবা যেন মানুষ না-হই, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, পাঠশালা, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন—এসব ত কিছুই হইতে দিতেন না।

তাহা হইলে এই সকল বহি ভারতবর্ষে কেন “নিষিদ্ধ” হয়? বহিগুলা পাঠকদের পক্ষে অনিষ্টকর? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সেগুলি ত ইংরেজ পাঠকদের পক্ষেও অনিষ্টকর। কিন্তু ইংলণ্ডে ত সেগুলি নিষিদ্ধ নয়। যে-অনিষ্ট হইতে ইংরেজ গবর্নেন্ট আমাদিগকে বক্ষা করিতে চান, সে-অনিষ্ট হইতে নিজেদের জাতিভাই ইংরেজদিগকে বক্ষা করিতে চান না, তাহা ত হইতে পারে না।

তাহা হইলে বোধ হয় বহিগুলা “নিষিদ্ধ” করা হয় এই আশঙ্কায় যে তাহা পড়িয়া আমরা গবর্নেন্টের উন্টাইয়া দিতে বা তাহার আমূল পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিব। হাঁ, এটা একটা ব্রিটিশ গবর্নেন্টের ভাবিবার কথা বটে। কিন্তু এখানেও একটা খটকা বাধিতেছে। গবর্নেন্ট উন্টাইয়া দিবার বা অন্ততঃ তাহার আমূল পরিবর্তন করিবার শক্তি আমাদের চেয়ে ব্রিটেনের লোকদের বেশী আছে; এবং তাহা করিবার পালেমেন্টারী আইনসম্মত ক্ষমতা আমাদের কিছুই নাই, ব্রিটেনের লোকদেরই আছে। সুতরাং কোন বহি পড়িয়া পাঠকদের যদি ভারতবর্ষের গবর্নেন্ট বদলাইবাব ইচ্ছা জন্মে, এবং এরূপ পরিবর্তন যদি গবর্নেন্টের মতে আবাহনীয় হয়, তাহা হইলে বহিখানা ভারতবর্ষে চেয়ে ইংলণ্ডেই “নিষিদ্ধ” বেশী হওয়া উচিত। এই যুক্তির বিরুদ্ধে এই কথা বলা হইতে পারে, ইংরেজ পাঠক কেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গবর্নেন্টের উচ্ছেদ বা পরিবর্তন চাহিবে? তাহার উত্তরে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, সব ইংরেজই কি সাম্রাজ্যবাদী?

যাহা হউক, এ নিষ্ফল আলোচনা এখানেই শেষ করি। যে-কারণে এত কথা লিখিলাম, তাহা এই, যে, রেজিন্ডান্ট রেনল্ডস নামক এক জন ইংরেজের লেখা “The White Sahibs of India” (“ভাবতবর্ষের শ্বেত সাহেবান”) নামক একখানা বহির এদেশে আগমন ও আনয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থকাবের মারফৎ গান্ধীজী কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহার প্রসিদ্ধ চিঠি তৎকালীন বড়লাটকে পাঠাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বহিখানা এদেশের সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদের পক্ষে অপ্রীতিকর। সেই জন্ত তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু মেয়ো বিবির “মাদার ইণ্ডিয়া”ও ত আমাদের পক্ষে অপ্রীতিকর? তাহা কেন নিষিদ্ধ হয় নাই? উত্তরে কোন “নিরপেক্ষ” জাতিব লোক বলিতে পারেন, তোমরা ও ইংরেজরা কি সমপর্ধ্যায়ের জীব? তোমাদের হৃদয়-মন (যদি থাকে) কি ইংরেজদের হৃদয়-মনের মত?

—

আরও দু-এক রকম সাহিত্যিক নিবেদ

সরকারী সাহিত্যিক নিবেদ আরও কয়েক রকমের আছে। দৃষ্টান্ত দি।

রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি আমরা ছাপিয়াছিলাম। তাহা বহি হইয়া প্রকাশিত হইয়া বিদ্যমান আছে। তাহার উপর যে কোন হস্তক্ষেপ হয় নাই, তাহা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু যাই বহিধানির একটি অধ্যায়ের ইংরেজী অনুবাদ মর্ডার রিভিউতে বাহির হইল, অমনি গবয়েন্ট বলিলেন, আর উহার অনুবাদ ছাপিতে পারিবে না। কিন্তু এখন ত আমেরিকায় উহার সমগ্র অনুবাদ শিকাগোর যুনিটি কাগজে বাহির হইয়া গিয়াছে, অনুবাদক বসন্তকুমার রায় উহা পুস্তকাকারেও বাহির করিবেন এবং তাহা ইংলণ্ডেও যাইবে। তাহাতে ভারত বা বাংলা গবয়েন্ট বাধা দিতে পারিবেন ?

সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যিক জর্জ বার্নার্ড শ-এব সোভালিজম্ সম্বন্ধে একটি সুপরিচিত বহি আছে। তাহার পতিবিশি সর্বত্র অব্যাহত—এমন কি ভারতবর্ষেও। কিন্তু যাই বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় “সাম্যবাদের গোড়ার কথা” নাম দিয়া ঐ বহির মর্ম্মানুবাদ বাহির করিলেন, অমনি তাহা বাজেয়াপ্ত হইল।

অতএব, কোন কোন বাংলা বহির ইংরেজী করা নিষিদ্ধ, আবার কোন কোন ইংরেজী বহির বাংলা করা নিষিদ্ধ।

আর একটা নিষেধের কথা বলিয়া কর্দ শেষ করি।

রবীন্দ্রনাথ আছেন—আরও অন্ততঃ বিশ পঁচিশ বৎসর ইংলোকে থাকিয়া জগৎবাসীকে নতুন জিনিষ দিতে থাকুন—এবং তাহার প্রহাবলীও আছে। তিনি ধর্ম্ম, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য, ললিতকলা ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই গতানুগতিকের সমর্থন করেন নাই, গোলে হরিবোল দেন নাই, তথ্য বলেন নাই; বিরুদ্ধবাদ বিরোধিতা অনেক করিয়াছেন। তাহা হইতে পাঠকেরা ভবিষ্যতে অনির্দিষ্ট দীর্ঘকাল তাহার ভাবের ভাবুক হইবে, অনুপ্রাণিত হইবে—কেহ বাধা দিতে পারিবে না। কিন্তু যাই পূর্বোক্ত বিজয় চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ-বাদিতার ব্যাখ্যা করিয়া একখানি বহি ছাপাইলেন, অমনি তাহা “নিষিদ্ধ” হইয়া গেল।

এখন বাঙালীরাই মজী। প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব যদি বাস্তবিক হয়, তাহা হইলে এখন অন্ততঃ বাংলা বহি সম্বন্ধে সুবিবেচনা হওয়া উচিত, অন্ততঃ এরকম বাংলা বহি “নিষিদ্ধ” থাকা বা হওয়া উচিত নয়, যাহার লিখিত বিষয়ের সত্যতা রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কানাইয়াছেন।

দৌলতপুর কৃষি-প্রতিষ্ঠান

খুলনা জেলার দৌলতপুর হিন্দু গ্যাকাডেমী সুবিদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। দৌলতপুরে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত

প্রণালীতে কৃষি ও কৃষিব সহিত সম্পর্কযুক্ত নানা ব্যবসায় শিখাইবার নিমিত্ত একটি প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে। ষাঁহারাই আই-এসসি পরীক্ষার রসায়নী বিদ্যা, গণিত, পদার্থ-বিদ্যা ও উদ্ভিদ-বিদ্যার শিক্ষণীয় বিষয় শিখিয়াছেন, তাহারাই ভর্তি হইতে পারিবেন। এ বৎসর ২১শে জুলাই পর্য্যন্ত ভর্তি হইবার দরখাস্ত লওয়া হইবে এবং ২রা আগষ্ট শিক্ষাব কার্য আরম্ভ হইবে। Principal, Daulatpur Agricultural Institute, Daulatpur, এই ঠিকানায় দরখাস্ত কবিত্তে হইবে। মাসিক বেতন ৪ টাকা, ভর্তি ফী ৪ টাকা, পাচক ও ভূতের বেতন ২, আহাৰ্য্যেব বন্দোবস্ত ছাত্রেরা নিজে করিবেন। ছাত্রনিবাসে থাকিতে হইবে, তাহার কোন ভাড়া লাগিবে না।

শিক্ষিত যুবকদের কৃষির দিকে খুব ঝোঁক হওয়া আবশ্যক। “ফিরে চল মাটির টানে।” যে লোকসমষ্টি মাটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, দুর্বলতা তাহার উপযুক্ত শাস্তি। কৃষি-প্রতিষ্ঠানে ষাঁহারাই শিক্ষা পাইবেন, তাহারাই মজুর নিযুক্ত করিয়া লাভ করিবেন ও সেই লাভের টাকায় কলিকাতায় বাবু সাজিয়া থাকিবেন, প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য এক্ষণে নয়। ষাঁহারাই নিজে খাটিবেন অপরকেও খাটাইবেন, এইরূপ লোক চাই।

রাঁচির বালিকা শিক্ষাভবন

গত বৎসর রাঁচিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনেব অধিবেশন উপলক্ষ্যে তথাকার বালিকা-শিক্ষাভবন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। এখানে বাঙালী বালিকারা শিক্ষা পাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। এ বৎসর ১৭টি বালিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ৪ জন প্রথম বিভাগে, ৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ৩ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আগে রাঁচি বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। আবও অনেক স্বাস্থ্যকর স্থান বাংলা প্রদেশের মধ্যে ছিল। এখন সেগুলি অল্প প্রদেশে গিয়াছে। এখন বাঙালীরা কল্যাণিককে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বাধ্য শিক্ষা দিতে চাহিলে সহজে তাহার সুবিধা পান না। রাঁচি স্বাস্থ্যকর স্থান, এবং এখানকার বালিকা-শিক্ষাভবনে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়। ইহার সঙ্গে একটি ছাত্রীনিবাস থাকিলে অল্প জায়গা হইতে কল্যাণ আসিয়া স্বাস্থ্যের সহিত শিক্ষাও লাভ করিতে পারেন। ছাত্রীনিবাস স্থাপন করিবার ইহাব কর্তৃপক্ষের সঙ্কল্প আছে ও তাহার চেষ্টাও হইতেছে। সঙ্কল্প অনুসারে কাজ হইলে ইহা আশ্রম-বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে। ইহার জন্য রাঁচির বাহিরের বাঙালীদের সাহায্য আবশ্যক। সম্পাদক ক্রীষ্ণ লালমোহন ধর চৌধুরীকে চিঠি লিখিলে তিনি সমুদয় বৃত্তান্ত জানাইবেন।

বঙ্গীয় মৎস্যজীবীদের বিদ্যালয়

গত ২৬শে আষাঢ় চাঁদপুরের অন্তর্গত মেহেরনে বঙ্গীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রাতে প্রধান মন্ত্রী মোলবী আবুল কাশেম ফজল হক মৎস্যজীবীদের বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাহার পর কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী নবাব খাজা হবিবুল্লাহ মৎস্যশিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। শেষে ১১টার সময় রাজস্বসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মৎস্যজীবীদের সভার অধিবেশনে সভাপতির কাজ করেন।

মৎস্যজীবীদের বিদ্যালয়টির জন্য ভূমি ও অন্যান্য যাহা কিছু আবশ্যক হইবে, তাহা মেহেরনের দাস দালাল জমিদারেরা দান করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদভাজন। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

এই বিদ্যালয়ে ৩০০ শিক্ষার্থী বাহাতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটি-কুলেশন পর্য্যন্ত সাধারণ-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিবে।

এই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকেই বিভিন্ন স্তরে মৎস্যসংরক্ষণ, পরিবর্ধন ও বিভিন্ন প্রকারের মৎস্যশিল্প এবং আধুনিকতম অর্থনীতি-শাস্ত্রে ভিত্তিতে মৎস্যব্যবসায়ক্রান্ত ব্যবসায় বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে বাধ্য করা হইবে। এবশ্রুতকালের শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষাদান করাই এই বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য।

ইহার সর্বোচ্চ উন্নতি প্রার্থনীয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অবসর গ্রহণ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অর্দ্ধ শতাব্দী দেশের যুবকদিগকে শিক্ষা দিবার কার্যে ত্রুতী থাকিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে কাজ করিতেন, পেন্সান লইবার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়নবিদ্যার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি কি প্রকারে অধ্যাপনা করিয়াছেন, কেমন করিয়া নিজের গবেষণা ও নিজ ছাত্রদের গবেষণা দ্বারা ঐ বিদ্যাকে পুষ্ট করিয়াছেন, কেমন করিয়া তাঁহার শিক্ষা, দৃষ্টান্ত ও অল্পপ্রেরণায় দেশে কতকগুলি রাসায়নিক ও অন্য বৈজ্ঞানিকের উদ্ভব হইয়াছে, অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেমন কবিয়া দেশে পণ্যশিল্পের প্রবর্তন, কারখানা স্থাপন, নানা স্থানে চরখা ও হাভের তাঁতের প্রবর্তন করিয়াছেন, বন্যাহস্তিকাদিতে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থে কিরূপে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, বাঙালীদিগকে কেমন করিয়া তিনি শিল্পবাণিজ্যকৃষিকার্যে ব্যাপ্ত হইতে অবিরত বলিয়া আসিতেছেন, কেমন কবিয়া তাঁহার তাৎপোচিত জীবন অল্পকরণীয় হইয়া বহিয়াছে—এই সকল এবং তাঁহার সখ্যে আরও অনেক কথা এখন হুবিদিত।

তিনি গত পনের বৎসর তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতার মাসিক বেতন ১০০০ টাকা গ্রহণ করেন নাই। তাহার সমস্তই নানা প্রকারে বিজ্ঞানের অল্পশীলনার্থে নিয়োজিত হইয়াছে। তাঁহার সরকারী চাকরির বেতন ও পেন্সানও বহু পরিমাণে বিদ্যার্থীদিগকে ও অন্য অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে সাহায্য দিবার নিমিত্ত ব্যয়িত হইয়া আসিতেছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ হইতেও তিনি অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

তিনি অত্যন্ত গ্রামসমূহের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করিবেন। এই কাজ তিনি আগে হইতেই করিয়া আসিতেছেন।

তাঁহার জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয় কাহাকে অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন বা করিবেন, জানি না। যোগ্য লোককেই করা হইয়া থাকিবে বা হইবে।

সব তারকনাথ পালিতের যে প্রভূত দান হইতে রসায়নাদির অধ্যাপকদিগের বেতন দেওয়া হয়, তাহার ঈর্ষ-ভীতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে, যে, তাঁহার স্বদেশ-বাসীদের মধ্যে বিদ্যুৎ ও কলিত বিজ্ঞানের জ্ঞানবিস্তার দাতার উদ্দেশ্য ("the object of the Founder is the promotion and diffusion of scientific and technical education and the cultivation and advancement of Science, pure and applied, among his countrymen by and through indigenous agency")। ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়ার দ্বারা এই কাজ হয় বটে। অধিকন্তু, সর্বসাধারণের বোধগম্যভাবে অন্তরের জ্ঞানলাভার্থ যদি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদিগের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে আরও ভাল হয়।

ভারতীয় ললিতকলার অধ্যাপকের পদ

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম "রাণী বাগেশ্বরী ভারতীয়-ললিতকলা-অধ্যাপক" নিযুক্ত হন। তিনি ১৯২১ সালে নিয়ম অনুসারে পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। তাহার পর আবার ১৯২৬ সালে নিযুক্ত হইয়া ১৯২৯ পর্য্যন্ত তিন বৎসর কাজ করেন। অবনীন্দ্র বাবুর পর ১৯৩২ পর্য্যন্ত আর কোন ললিতকলা-অধ্যাপকের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে নাই। ১৯৩২ সালে মিঃ শহীদুল্লাহ বর্মা পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগের পূর্বে আমরা দেখাইয়াছিলাম, যে, তাঁহার অন্তরূপ যোগ্যতা থাকিলেও, "ভারতীয় ললিতকলা"র অধ্যাপনা ও তদ্বিষয়ক গবেষণা করিবার যত জ্ঞান ও যোগ্যতা তাঁহার নাই, এবং যোগ্য ও যোগ্যতর অন্য লোক আছেন। তথাপি, স্থপারিশের জোরে তিনিই পদটি পান।

সম্প্রতি তাঁহাকে তাঁহার ষাট বৎসর বয়স হওম্ব পর্যন্ত পুনর্নিযুক্ত করা হইয়াছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় আছে, যে, প্রথম নিয়োগের পর নিয়োগটি স্থায়ী করা যাইতে পারে। ‘may be made permanent’), কিন্তু এরূপ লেখা নাই। যে, স্থায়ী করিতেই হইবে। “May”র জায়গায় “shall” থাকিলে নিয়মটির মানে তাহাই হইত।

যাহা হউক, গত পাঁচ বৎসরে সুহৃদ্বর্দী মাধব “ভারতীয়” ললিতকলা বিষয়ে কি জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন, কি গবেষণা করিয়াছেন, কি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, যাহার প্রভাবে তাঁহার পদ স্থায়ী হইল, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বসাধারণকে তাহা জানান নাই। ক্যালিফোর্নিয়ায় এই বাগেশ্বরী অধ্যাপকদের যে সব কর্তব্য লেখা আছে, তাহার মধ্যে দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি।

(a) To devote himself to original research in the subject in which he has been appointed with a view to extend the bounds of knowledge.

(b) To take steps to disseminate the knowledge of his special subject with a view to foster its study and application.

পূর্বেই লিখিয়াছি, বর্তমান অধ্যাপক ললিতকলা বিষয়ে মানবের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর করিবার নিমিত্ত কি গবেষণা করিয়াছেন, সর্বসাধারণ তাহা অবগত নহে। তিনি উঁহাব জ্ঞান সর্বসাধারণকে বিতরণের জন্য কি করিয়াছেন, তাহাও অজ্ঞাত। অবনীন্দ্রবাবু বাংলায় কতকগুলি বক্তৃতা করিতেই যাহা শুনিবার অধিকার সকলেরই ছিল। বর্তমান অধ্যাপক ছাত্রদিগকে তাহাদের শ্রেণীতে হয়ত পড়ান—নিশ্চয়ই পড়ান কি না জানি না। কিন্তু সর্বসাধারণের প্রোতব্য তাঁহার বক্তৃতাবলীর কথা মনে পড়িতেছে না।

যোগ্য লোক থাকিতে অযোগ্য বা কম যোগ্য লোকের নিয়োগ নিষ্পন্নীয়।

“সে”

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের একখানি নূতন সূচি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। নাম, “সে”। একটু বিস্তারিত পরিচয় পরে দিবার ইচ্ছা রহিল। এখন কেবল বলি, ভারি মজার বই। লেখা ও ছবি দুই-ই কবির হাতের। ইহার মজা ছেলে বুড়ো উভয়েই পাইবে। নিগূঢ় রস ও রহস্যের সন্ধান বোধ করি বুড়োরাই বেশী পাইবে।

বাংলা দেশে এক সময়ে আমাদের কবি ও ঔপন্যাসিকদিগকে কোন-না-কোন বিলাতী গ্রন্থকারের সদৃশ বলিলে সম্মান করা হয়, এইরূপ একটা দারুণ ছিল—এখনও আছে কি না জানি না। অমুক বঙ্কিমচন্দ্র, অমুক স্কট, অমুক বায়রণ, অমুক শেল্লী...। সেইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া কেহ যদি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ত বঙ্কিম, এবার কি বেশ ধরিয়াছেন? তাঁহার এই স্বস্থানি

ইংরেজী কোন্ বইয়ের মত? উত্তরের আগেই বলিয়া রাখি, কেহ কাহারও নকল বলিলে নকল বলিয়া অভিহিত ব্যক্তিকে সম্মান করা হয় না, এবং কোন বাঙালী কবি বা অন্ত সাহিত্যিক নকল কবিতা বড় হইয়াছেন ইহা সত্য নহে। অতঃপর প্রশ্নের উত্তরে বলি, রবীন্দ্রনাথের নূতন বইটি কোন ইংরেজী বহির মত নয়। তবে, ইহা ঠিক যে ইহা পড়িতে বসিয়া হঠাৎ ইংরেজী “গ্যালিস্ ইন্ ওয়াশিংটন” মনে পড়িয়া গেল। কেন পড়িল, কেমন করিয়া বলিব? উভয় পুস্তকেই অপ্রত্যাশিত মজা আছে। এবং একটিতে “গ্যালিস্,” অত্যাতিতে “পুপে দিদি”। আর কোন মিল দেখিতেছি না।

বঙ্গীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ

বঙ্গীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ বিনাবিচারে-বন্দীদের ও তাঁহাদের কাহারও কাহারও অভিভাবকদেরও দুঃখ-দুর্দশার বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া সে বিষয়ে দেশের লোকদের প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায় করিয়া দিতেছেন। এদেশে জনমত অহুসারে রাষ্ট্রীয় কার্য নির্বাহিত হইলে এই জ্ঞানের ফলে তাঁহাদের দুঃখদুর্দশার প্রতিকার হইত। তথাপি, এদেশে জনমত অহুসারে শাসিত না-হইলেও, আশা করা যাক, জ্ঞানবিস্তারের কিছু সুফল ফলিবে।

মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের প্রতি কর্তব্য

মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের প্রতি গবর্নমেন্টের কর্তব্য আছে, দেশের লোকদেরও কর্তব্য আছে। তাঁহাদের অনেকের সাময়িক সাহায্যের প্রয়োজন আছে, কিন্তু বাহাতে রোজগার হয় তাঁহাদের এরূপ কাজ জুটাইয়া দেওয়াই প্রকৃত প্রতিকার। কেমন করিয়া ঘণ্টে সেরূপ কাজের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা চাই করিয়া সংক্ষেপে বলা কঠিন।

গোরাদিগকে সেলাম করিতে ছাত্রদিগকে বাধ্য করা

কয়েক বৎসর হইতে গবর্নমেন্টের বিদিত কারণে বাংলা দেশের নানা জায়গায় গোবা সৈন্ত বাধা হয় এবং সেই সৈনিকরা কখন কখন এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় দলবদ্ধভাবে মাঠ করে। এইরূপ উপলক্ষ্যে কোথাও কোথাও ইস্কুলের বালকদিগকে—শুনিয়াছি এক জায়গায় ইস্কুলের বালিকাদিগকেও!—দল বান্ধিয়া ঐ গোরাদিগকে সেলাম করান হইয়াছে। বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের মাথাগুলা কি এমনই অবজ্ঞায় যে সেগুলাকে যার তাব কাছে—বরকন্দাজ পাহারাওয়ালার কাছেও যদি তাদের চামড়াটা কাটা হয়—হেঁট করাইতে হইবে?

শুনা যায় গত ফেব্রুয়ারী মাসে মুড়াগাছা উচ্চবিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার ছাত্রদিগকে এইরূপ সেলাম করাইয়াছিলেন। তাহাতে ঐ ইঙ্কলের কমিটির এক জন সভ্য, ত্রীযুক্ত অমিয়কুমার পাঠক, এম-এ, বি-এল, হেডমাষ্টার মহাশয়কে ভ্রম ভাষায় চিঠি লিখিয়া জানিতে চান; যে, ইহা সত্য কি না, এবং সত্য হইলে যে আদেশ অনুসারে ইহা করান হইয়াছে তাহার একটি নকল যেন তাঁহাকে দেওয়া হয়। হেডমাষ্টার উক্ত সভ্যের চিঠিটি সেক্রেটারীকে ও সেক্রেটারী তাহা তথাকার মহকুমা হাকিম প্রেসিডেন্টকে পাঠান। কিন্তু কমিটির সভ্যটি একাধিক শিষ্ট তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও আদেশের নকল পান নাই, রুট জবাব পাইয়াছেন। হেডমাষ্টারের ২১শে মে তারিখের চিঠিটি এই :—

With reference to your letter dated, Calcutta, the 12th April, 1937, I have the honour to inform you that the requisitions made in that letter being considered important, I referred the matter to the Secretary who, in his turn, referred it to the President. The President, in reply, has instructed the Secretary and the Headmaster to take no notice of such questions and to request you to refrain from disturbing the Headmaster with such unnecessary correspondence.

প্রেসিডেন্টের পক্ষের ৪ঠা মে তারিখের যে চিঠির জ্বরে হেডমাষ্টার এই জবাব দিয়াছিলেন, তাহা এই :—

With reference to your letter No. 17, dated 23rd April, 1937, I have the honour to inform you that no notice should be taken of the requisition. The requisitionist may be asked that I do not consider it to be the duty of the Headmaster or the Secretary to attend to such frivolous queries and the requisitionist may be requested to refrain from disturbing the Headmaster with such unnecessary correspondence.

হাকিম বটে। কি কড়া মেজাজ !

জিন্না-রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংবাদ

সম্প্রতি মিঃ জিন্না ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের মধ্যে একটি হিন্দু-মুসলমান চুক্তি সন্ধক্ষে কিছু চিঠি লেখালেখি হইয়াছে। তাহাতে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই মর্মের কথা বলিয়াছেন, যে, কংগ্রেসপক্ষীয় সকলেরই সম্মতি পাওয়া গিয়াছিল, কেবল মিঃ জিন্না হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ার সম্মতি চাওয়ায় এবং তাহা না পাওয়ায় চুক্তিটা হয় নাই। উক্ত চুক্তি সন্ধক্ষে যখন দিল্লীতে আলোচনা হইতেছিল, আমরা তখন দিল্লীতে ছিলাম। আমরা কংগ্রেসের সভ্য নহি, হিন্দু মহাসভারও সভ্য নহি। তথাপি আমরা এ-বিষয়ের কিছু খবর পাইয়াছিলাম। আমাদের মনে পড়িতেছে, বঙ্গের কয়েক জন কংগ্রেসওয়ালা চুক্তিতে সম্মতি দেন নাই।

বাহা হউক, তাহা আমাদের প্রধান বক্তব্য নহে। আমাদের বক্তব্য এই, যে, কংগ্রেস হিন্দু, মুসলমান এবং

অন্য সকল সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি, ইহা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নহে, কেবল হিন্দুর প্রতিষ্ঠান নহে। সুতরাং যদি মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে কোন চুক্তিতে হিন্দুদের সম্মতি চাওয়া হয়, তাহা হইলে সে সম্মতি হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিন্দুমহাসভা দিতে পারেন, কংগ্রেস পারেন না। কারণ, হিন্দুমহাসভা কেবল হিন্দুদের প্রতিনিধি, কংগ্রেস কেবল হিন্দুদের প্রতিনিধি নহে। এই কারণে, মিঃ জিন্না যে হিন্দুমহাসভার অগ্রতম নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ার সম্মতি চাহিয়াছিলেন, তাহা ঠিকই করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার বাস্তবিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

সর সোরাবজী পোচখানাওয়ালা

সর সোরাবজী নসেরওয়াজী পোচখানাওয়ালা ভারত-বর্ষের প্রধান দেশী ব্যাঙ্ক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায় প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে ভারতবর্ষের দেশী ব্যাঙ্ক ব্যবসার এক জন



সর সোরাবজী পোচখানাওয়ালা

ধুরন্ধরের তিরোভাব হইল। তাঁহার উদ্যম, ব্যবসাবুদ্ধি ও শ্রমশক্তি অসাধারণ ছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান জায়গায় শাখা আছেই, গত

বৎসর লগুনেও একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের কোন দেশী ব্যাকের বিদেশে শাখা স্থাপন এই প্রথম। তাহার উদ্যোগিতার ইহা একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক

শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বহু যে নারীশিক্ষাসমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী ও সম্পাদিকা, স্বর্গত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক তাহার প্রধান কর্মী ছিলেন। তিনি কর্মজীবনের প্রথম অংশে শিক্ষকতা করিতেন ও স্বশিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি লক্ষ্মী শহরের তৎকালপ্রসিদ্ধ “গ্যাড্‌ভোকেট” নামক কাগজের সম্পাদক নিযুক্ত হন। পনের বৎসর উহার



কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক

সম্পাদকতা করিয়া তিনি লক্ষ্মী ত্যাগ করেন। ষাঁহাদের উদ্যোগিতায় গিরিডিতে একটি উচ্চ-বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তিনি তাঁহাদের মধ্যে এক জন প্রধান কর্মী ছিলেন। ১৯১০ সালে ইহা স্থাপিত হয়। ইহার উন্নতি-কল্পে তিনি চারি বৎসর কঠোর পরিশ্রম করেন। কলিকাতায় নারীশিক্ষাসমিতির কার্যে তিনি শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বহুর দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। ১৯১৬ সালে স্থাপিত এই সমিতি কলিকাতায় হিন্দু বিধবাদের শিক্ষার জগ

বিদ্যাসাগর বাণীভবন স্থাপন করিয়াছেন ও চালাইতেছেন। এখানে বিধবারা বিনাব্যায়ে শিক্ষাদাত্রীর কাজ ও নানা প্রকার গৃহশিল্প ও কুটারশিল্প শিক্ষা করিয়া উপার্জনক্ষম হইতে সমর্থ হন। মফস্বলে নারীশিক্ষাসমিতি প্রায় ২০০ বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন ও তৎসমুদয়ের তত্ত্বাবধান করিবার জগ কৃষ্ণপ্রসাদ বাবু বৃদ্ধ বয়সেও গ্রামে গ্রামে কত যে ঘুরিয়াছেন, তাহার বুভুক্ষু সর্বসাধারণ জ্ঞাত নহেন। ফরিদপুরের পালঙে এইরূপ কাজ করিবার সময় তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন। উনিশ মাস এই রোগে শয্যাশায়ী থাকিয়া তিনি ৭০ বৎসর ৭ মাস বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। কর্তব্যপালন ও শ্রমপূর্ব জীবনযাপন তাঁহার একরূপ স্বভাবসিদ্ধ ছিল, যে, তিনি শয্যাশায়ী থাকিয়াও নারীশিক্ষাসমিতির কাজ করিতেন। তিনি সদাপ্রজ্ঞ, অদম্যউৎসাহশীল এবং নির্বিবাদ মানুষ ছিলেন।

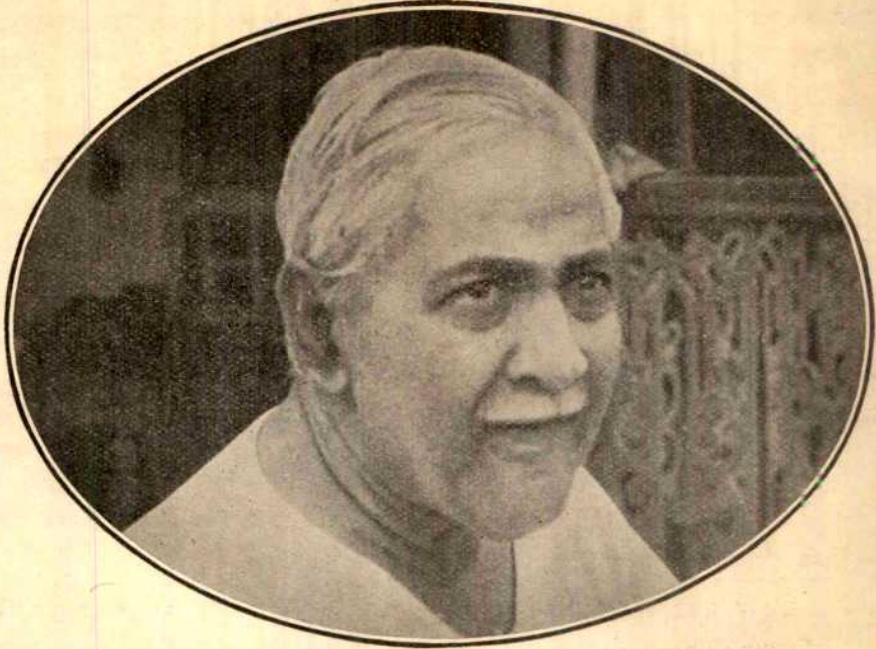
শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর কৃতিত্ব

ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় অনেক যুবক নানা বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করেন। ইংরেজী সাহিত্যেও কেহ কেহ ব্যুৎপন্ন হন। কিন্তু একেবারে আধুনিক যে ইংরেজী সাহিত্য,



শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

যাহার অনেক অংশ এই
বিংশ শতাব্দীতে রচিত
এবং যাহাতে এখনও
নূতন নূতন জিনিষ সংযুক্ত
হইতেছে, সে বিষয়ে
পারদর্শিতা লাভ ইংরেজী-
সাহিত্যাধ্যায়ী খুব কম
বাঙালীই করিয়া থাকেন।
সেই জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের
ভূতপূর্ব সাহিত্যিক সেক্রে-
টারী এবং বিশ্বভারতীর
ভূতপূর্ব অগ্রতম অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী
যে খুব আধুনিক ইংরেজী
সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যয়ন চিন্তা
ও গবেষণা করিয়া দীর্ঘ
প্রবন্ধ লিখিয়া অক্সফোর্ড
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব
ফিলসফি উপাধি পাইয়া-
ছেন এবং তাঁহার প্রবন্ধ
যে তথাকার প্রসিদ্ধ



যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

এক প্রকাশক পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন, ইহা বিশেষ
উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। তিনি ইংলণ্ড ও ইউরোপের অল্প
নানা দেশে সাংস্কৃতিক বহু বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া গ্যাতি লাভ
করিয়াছেন। তাঁহার আর একটি বিশেষ কৃতিত্ব এই, যে,
তিনি অক্সফোর্ডের ব্রেজেনোজ্ কলেজের ফেলো মনোনীত
হইয়াছেন। অক্সফোর্ডের ফেলো এ পর্যন্ত আর কোন
ভারতীয়—বোধ হয় আর কোন এশিয়াবাসী—মনোনীত হন
নাই। এই ফেলোশিপের কর্তব্যস্বরূপ তিনি দেশে ফিরিয়া
আসিয়া হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন।
সম্প্রতি প্যারিসে সভ্য সমুদয় দেশের লেখকবর্গের যে কংগ্রেসের
অধিবেশন (International P. E. N. Congress)
হইয়া গিয়াছে, তিনি তাহাতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধির
কাজ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক গিলবার্ট মারে, সর্ব
মাইকেল শ্রাডলার প্রভৃতি বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তি তাঁহার
যোগ্যতা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের
যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে, যে-কোন সরকারী বা বেসরকারী
কলেজে, ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন, তাহাই
লাভবান হইবে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

শিশুদের বন্ধু, শিশুদের আনন্দদাতা, বহু বালাপাঠ্য
সচিত্র পুস্তকের প্রণেতা, সফলয়িতা ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত

যোগীন্দ্রনাথ সরকার পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। তিনি
ডাক্তার সর্ব নীলরতন সরকার মহাশয়ের চতুর্থ ভ্রাতা
ছিলেন। তিনি ছোট ছেলেমেয়েদিগকে আনন্দ ও জ্ঞান
দিবার নিমিত্ত প্রায় চল্লিশখানি বহি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।
সিটিবুক সোসাইটী নামক পুস্তকের দোকান তাঁহার দ্বারা
প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার পূর্বে অন্নদাচরণ সেন “সখা” নামক
মাসিক পত্র ছোট ছেলেমেয়েদের জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন
বটে, কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যু হওয়ায় শিশুদের জ্ঞান অল্প
বড় কিছু তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই। যোগীন্দ্রনাথ
ছোট ছেলেমেয়েদের জ্ঞান অনেক পুস্তক প্রকাশ করিয়া
গিয়াছেন। তন্মধ্যে, প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে তিনিই
উদ্যোগী হইয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদকতায়
বালক-বালিকাদের জ্ঞান “মুকুল” নামক মাসিক পত্র স্থাপন
করান। তিনি ইহার অগ্রতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন,
এবং প্রবন্ধ গল্প কবিতা ছবি সংগ্রহ করিতে তিনি দক্ষতম
ছিলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভগিনী পরলোক-
গতা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা সরকারও মুকুলের সহকারী
সম্পাদক ছিলেন। আমাদেরও এই কাগজটির সহিত
যোগ ছিল। কয়েক জন বন্ধুর সহযোগিতায় আরও
একখানি মাসিক যোগীন্দ্রনাথ কিছুদিন চালাইয়াছিলেন।
তাঁহার নাম এখন মনে পড়িতেছে না। আমরা যখন
প্রথম সিটি-কলেজে অধ্যাপকতায় প্রবৃত্ত হই, সেই সময়ে

যোগীন্দ্রনাথ আমাদের ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি সিটি-স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

তিনি হান্তকৌতুকপ্রিয়, নিবিবাদ, ঈর্ষাঘ্নেশূন্য মানুষ ছিলেন। তাঁহার স্বভাব বালকের মত ছিল বলিয়াই তাহাদের মনোরঞ্জে তিনি এরূপ সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিশু-সাহিত্যে তাঁহার বহিঃশক্তি এখনও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি “বন্দেমাতরম্” নাম দিয়া “স্বদেশী” ও “জাতীয়” সংগীতের একটি সংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহা খুব সমাদৃত হইয়াছিল। মূল্য খুব কম রাখায় উহার বিক্রী বেশ হইত। কিন্তু পুলিশের নজর উহার উপর পড়ায় যোগীন্দ্র বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহার বিক্রী বন্ধ করিয়া দেন।

কলিকাতা তাঁহার ভাল লাগিত না। গিরিডিতে তিনি বাড়ীঘর, বাগান, পুকুর করিয়াছিলেন।

তিনি প্রায় ১৪ বৎসর পক্ষাঘাতে ভুগিয়াছেন। তাহার মধ্যেও তাঁহার প্রিয় কাজ করিতেন। অল্প নানা ব্যাধিও তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্য ও মানসিক বল অপরাজিত ছিল। ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

প্যালেস্টাইন ত্রিখণ্ডিত করিবার প্রস্তাব

প্যালেস্টাইনে আরবদের বাস, ইহুদীদেরও উহা প্রাচীন পিতৃমাতৃভূমি। আরবরা প্রধানতঃ মুসলমান, কতক খ্রীষ্টিয়ান। ইহুদীরা বহু শতাব্দী পূর্বে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং প্রায় সর্বত্র নির্ধাতিত হয়। তাহারা বহু বৎসর হইতে একটি স্বজাতীয় বাসভূমি পাইবার চেষ্টা করিতেছে। ব্রিটিশ জাতির সাহায্যে তাহারা তাহাদের পূর্ব পিতৃমাতৃভূমি প্যালেস্টাইনকেই জাতীয় বাসভূমি করিবার স্বযোগ পায়, এবং দলে দলে সেখানে আসিয়া ঘরবাড়ী করিতেছে ও চাষবাস বাণিজ্য কারখানা-পরিচালন করিতেছে। তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় ও তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় আরবদের আশঙ্কা ও ঈর্ষ্যা বাড়িয়া চলিতে থাকে। ক্রমে তাহা দাঙ্গা হাঙ্গামা রক্তপাতে পরিণত হয়। ব্রিটেন লীগ অব নেশন্সের নিকট হইতে

প্যালেস্টাইনের অভিভাবকত্ব পাইয়াছেন। আরব-ইহুদী দাঙ্গা হাঙ্গামা দমন ও বিরোধ ভঙ্গন তাহাকেই করিতে হইতেছে। ব্রিটেন একটি রয়্যাল কমিশন বসান। সেই কমিশন তাহার রিপোর্টে প্রস্তাব করিয়াছেন, যে, প্যালেস্টাইনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইবে। এক ভাগ আরবদিগকে ও এক ভাগ ইহুদীদিগকে দেওয়া হইবে, এবং বাকী এক ভাগ ইংরেজদের হাতে থাকিবে। ইহাতে আরব ইহুদী কেহই সন্তুষ্ট নয়। আরবেরা বলে, তাহাদিগকে উর্বর ভূমি ও সমুদ্রতটস্থ বন্দর-গুলি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, ইহুদীরা বলে তাহাদিগকে আরবদের চেয়ে ছোট ভূখণ্ড দেওয়া হইয়াছে এবং এরূপ সব জায়গা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে যাহাতে এখন চাষ হয় না কিন্তু যাহাতে সৈঁচের বন্দোবস্ত করিলে প্রভূত শস্য হইতে পারে। উভয় পক্ষেরই ইহাও একটি অভিযোগ যে ব্রিটেন সব বন্দর এবং অল্প ঘাঁটি নিজের হাতে রাখিয়াছে। কিন্তু তা বলিলে কি হয়? আরব ও ইহুদী যদি ঝগড়া করে, তাহা হইলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন নিজের সুবিধা কেন দেখিবে না, এবং নিজের সাম্রাজ্য নিরাপদ করিবার চেষ্টা কেন করিবে না? গৃহবিবাদে ফল এইরূপই হয়।

প্রাপ্তবয়স্কদিগের শিক্ষা

বাংলা-গবর্নমেন্ট নিরক্ষর ও অজ্ঞ প্রাপ্তবয়স্ক লোকদিগের শিক্ষার যে ব্যবস্থা রেজিস্ট্রেশন-বিভাগের ইন্সপেক্টর-জেনারালের প্রস্তাব অনুসারে মঞ্জুর করিয়াছেন, নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্ক লোকদিগকে লিখনপঠনক্ষম করা তাহার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ, এই কথাটির স্পষ্ট উল্লেখ আমরা তাহাতে মুক্ত দেখিতে চাই। নিরক্ষর ব্যক্তির লিখনপঠনক্ষম হইলে জ্ঞানলাভের জন্ম সম্পূর্ণরূপে অন্তের মুখাপেক্ষী না থাকিয়া নিজেও পড়িয়া কিছু শিখিতে পারিবে। এই জন্ম তাহাদিগকে লিখনপঠনক্ষম দেখিতে চাই।

মোহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জয়

মোহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব কলিকাতায় ফুটবল লীগ খেলায় এবারেও বিজয়ী হইয়াছেন। ইহার পূর্বের তিন বৎসরও তাহারা লীগ খেলায় জয়লাভ করিয়াছিলেন। অল্প কোন ক্লাব এ-পর্যন্ত এরূপ কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারেন নাই। তাহাদের এই কৃতিত্বে ক্রীড়ার ক্ষেত্রে দেশ গৌরবাশ্রিত হইয়াছে।

বাঙালীর দ্বিতীয় পাটকল

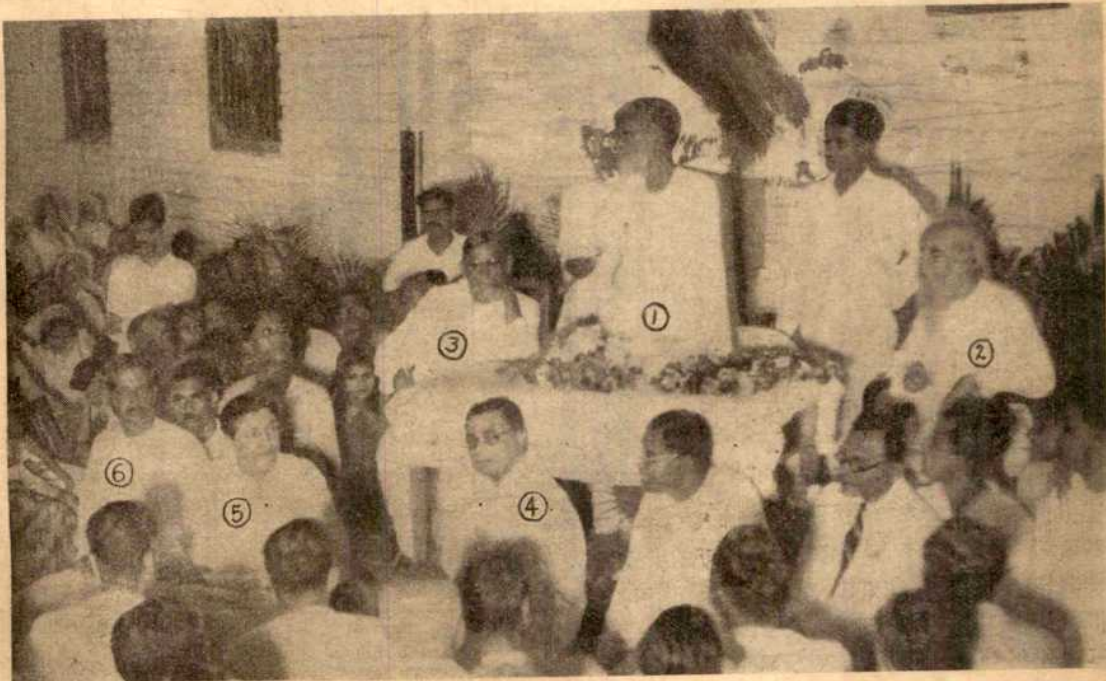
গত ২০শে আষাঢ় হাবড়ার নিকটবর্তী স্থানে শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস কর্তৃক স্থাপিত ভারত জুট মিলসের উদ্বোধন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাদিত হয়। তাহার আগে এই পাটকলের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দত্ত একটি উচ্ছ্বাসপূর্ণ অথচ স্ফুটন্ত তথ্যে পুষ্ট বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা হইতে জানিতে পারি, আলামোহনবাবু এক সময়ে “থই মাথায় ক’রে কলকাতায় রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করেছেন”।

এই নিঃস্বৈর্য্য একদিন তজ্জ্বাঘোরে স্বপ্ন দেখল যে বাঙালী যদি ইণ্ডাস্ট্রিতে না নামে তা হ’লে তার আর বাঁচবার পথ নেই। এই ইণ্ডাস্ট্রির নেশায় পাগল হয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। প্রথম তৈরি করলেন রেলগাড়ী ওজনের যন্ত্র, তার পর ছাপবার কল, চামড়া কব করার কল, পাট কলের নানা যন্ত্র। যখন এই সব তৈরি করেন তখনই তাঁর মনের কোণে ছিল বাঙালীর নিজস্ব একটি জুট মিল তৈরি করার স্বপ্ন।

১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে বিজয়া দশমী তিথিতে যখন তিনি মিলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধু-বান্ধবের দল। দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে দুর্ব্বার গতিতে ছুটে চলেছেন গম্ভীর সন্ধানে। হঠাৎ পথের মাঝে কালবৈশাখীর ঝড়

উঠল—মেঘের অন্ধকারে পথের আলো গেল নিবে—চারি দিকে শুধু নিকব কালো অন্ধকারের লুকোচুরি চলতে লাগল। তাঁর বন্ধু-স্থানীয় ধারা ছিলেন তাঁরা ধীরে ধীরে তাঁকে সেই অন্ধকার-বাহুর মধ্যে ফেলে সরে পড়লেন। সঙ্গে তখন তাঁর রইল মাত্র দু’-তিনটি সংসার-অনভিজ্ঞ ছেলে। তাদের হাত ধরেই তিনি সেই ঝড়ের রাতে চলেছেন। একদিনের জ্ঞান চলা বন্ধ করেন নি। সেই ঝড়ের রাতে আমাদের পথ চলার কষ্ট দেখে ধারা কাতর হয়ে ঘরের বার হলেন আলো-হাতে, তাঁরা হচ্ছেন স্বনামধন্য রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বসু, রাধিকামোহন সাহা, জীবনকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি। এই মিল-প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে তাঁদের দান যে কারও চেয়ে কম নয় তা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি। আরও একটা আনন্দের কথা এই যে ভারতবর্ষে জুট মিল তৈরি করার খরচের যে হিসাব পাওয়া যায় তাকে অনেক পশ্চাতে ফেলে আমরা চলে গিয়েছি। সাড়ে আট লাখ টাকায় দু-শ তাতের মেশিনারী, বাড়ী প্রভৃতি হয়েছে। আমাদের শেয়ার বিক্রী হয়েছে সাড়ে সাত লাখ টাকার, আর ডিবেঞ্চার বিক্রী হয়েছে তিন লাখ টাকার। মোট সাড়ে দশ লাখ টাকার মধ্যে সাড়ে আট লাখ টাকা ইমারতে ও যন্ত্রে খরচ হয়েছে। হাতে যে দু-লাখ টাকা আছে তা হচ্ছে কাজ চালাবার পুঁজি। যে দু-চার খানা মেশিন এখনও এসে পৌঁছয় নি তার দাম দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

১৮৫২ সালে কলকাতার উপকণ্ঠে ভাগীরথীর তীরে স্বর্গীয়



ভারত জুট মিলসের উদ্বোধন-উৎসব

(১) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, (২) শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, (৩) রায় দেবেন্দ্রনাথ বসু বাহাদুর, বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের চেয়ারম্যান, (৪) শ্রীহরিন্দ্র মজুমদার, ডিরেক্টর, (৫) শ্রীরজনীকান্ত দত্ত, সম্পাদক, (৬) শ্রীচন্দ্রলাল মল্লিক

বিশ্বস্তর সেনের টাকায় অক্ল্যাণ্ড সাহেব জগতের প্রথম পাটকল স্থাপন করেন। আজ বাংলার বিদেশীর পরিচালিত পাটকল হচ্ছে ৬৫টি, আর ভারতীয়দের হচ্ছে মাত্র ১৩টি। এই মিল-গুলিতে পঞ্চাশ কোটির উপর টাকা খাটছে। কিন্তু বলতে পারেন, যে-ইগুস্ত্রীর গোড়াপত্তন করেছিল বাঙালী, সেই ইগুস্ত্রীতে বাঙালীর



শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দত্ত

কয় টাকা আছে? যদি বাঁচাই আমাদের প্রয়োজন হয়, তা হ'লে সারা হুনিয়া জুড়ে যন্ত্রশিল্পের যে অভিয়ান চলেছে, সেই অভিয়ানে তাল ঝুঁকে আমাদেরও চলতে হবে। তা যদি না পারি, তা হ'লে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি,

“পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা কেনা

আর চলবে না,

বকনা বাড়িয়া ওঠে, ফুয়ায় সত্যের যত পুঁজি,

কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি—

তুফানের মাঝখানে

নূতন সমুদ্রতীর পানে

দিতে হবে পাড়ি।”

রজনীবাবুর বক্তৃতা শেষ হইবার পর, “স্বদেশী”র যে আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ে মৃতিপরিগ্রহ করিয়াছেন, তিনি বক্তৃতা করেন। স্বদেশী কোন প্যাশিল্পের উদ্বোধন করিবার তিনি অগ্ৰতম যোগ্যতম ব্যক্তি। তাঁহার বক্তৃতার তাৎপৰ্য্য এই—

মধ্যে মধ্যে আলামোহন দাসের কথা শুনেছি। এক ব্যক্তি পাটকলের যন্ত্র নির্মাণ ক'রে পাটকল স্থাপন করতে যাচ্ছে শুনে ভাবতাম, লোকটির মাথা খারাপ আছে। পরে যখন গুনলাম মালগাড়ী ওজনের বড় বড় যন্ত্র তৈরি ক'রে বড় বড় রেলকে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার যন্ত্র বেচেছেন, তখন বুঝলাম এর মধ্যে সারবস্ত

আছে। আমার এখানে এসে মনে হচ্ছে আমি শান্তিতে মরতে পারব। এক ব্যক্তি প্রথমে ফেরিওয়ালাগিরি করেছে ও এখন পাটকল স্থাপন করল, সে যে বাঙালী, এ সহজে বিশ্বাস হয় না। আমাদের মাড়ওয়ারী ভাতাগণ সামান্য অবস্থা হ'তে উন্নতি করেন। ইউরোপ ও আমেরিকায়ও তা করে। এখন মনে হচ্ছে বাঙালীর এই অসামান্য প্রতিভা নর্দামায় যাবে না। হয়ত বিধাতা বাঙালীকে বড় করবেন। উচ্চশিক্ষার মোহ ও চাকুরীর আকাঙ্ক্ষা আমাদের যুবকদের মনের তেজ কমিয়ে দেয়। ভাগ্যে মাঝে মাঝে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন নাই, তাই এত কিছু ক'রে গেলেন। আলামোহন বাবুও বেশী লেখাপড়া জানেন না, তাই অসাধ্য সাধন করেছেন। রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ (যুধি তার পিঠে মেয়ে), পাটের সেই বল্লভ মার্ক, রেলির সঙ্গে যা প্রতিযোগিতা করত, তা আজকাল দেখি না কেন? তার প্রায়শ্চিত্ত তুমি এই পাটের কলের চেয়ারম্যান হয়ে করলে। ইংরেজদের এক বার্ড কোম্পানীর ১১টি প্রকাণ্ড পাটকল। মাড়ওয়ারীদের বড় বড় কল। হুকুমচাঁদ মিল ভারতের ও বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম পাটকল। বাঙালী এতদিনে ছুটি পাটকল করল।

বাঙালীর কম কথা বলবার সময় এসেছে। আমাদের মাড়ওয়ারী ভাতারা কি কখনও গোলদীঘিতে বক্তৃতা করেছেন, না শুনেছেন? তাঁদের হুকুমচাঁদ, বিড়লা, সুরজমল পাটকল করেছেন। মাড়ওয়ারী ভাতারা সেদিন ৫ কোটি টাকা মূলধনের ব্যবসায়ের পত্তন করলেন। লর্ড জেটল্যান্ডের পুত্র তার এক ডিরেক্টর। আমাদের এরূপ জিনিষ কই?



শ্রীআলামোহন দাস

অতঃপর আচাৰ্য্য রায় একটি স্থইচ টিপিয়া মিলের সব তাঁতগুলি চালাইয়া দিলেন। সব তাঁত আলামোহন বাবুরাই নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহারা মূদ্রাযন্ত্র, ওজনের কল প্রভৃতিও নির্মাণ করেন।

দেশ-বিদেশের কথা

আরবের পুনর্জন্ম

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সাধারণের নিকট আরব একটি রহস্যপূর্ণ দেশ বলিয়া মনে হয়। 'আরব্য উপক্ৰাস'-এর বহু চমকপ্রদ কাহিনী এই দেশটিকে যুগে যুগে রহস্যের আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। আরবের বাস্তব রূপ জানিতে কাহার না আগ্রহ? গত পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, আরবভূমি অতি দ্রুত যুগধর্মের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। এই কাহিনী বাস্তবিকই উপক্ৰাসের মত।

দিকে দিকে ধর্মের বার্তা প্রচারও তখন আরম্ভ হয়। এই সময় আরবের একটি বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে। ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র পশ্চিম, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ ইউরোপ ও স্কটল্যান্ড পর্বাস্ত ছড়াইয়া পড়ে। ইসলামের বিজয়বার্তা বক্ষ ধারণ করিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যও ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করিয়া পরোক্ষভাবে তুর্কী করূপে ইউরোপে নব্য-যুগের হুচনা সম্ভব করিয়া দিয়াছিল ইজিহাসপাঠক মাঝেই তাহা অবগত আছেন। আরবভূমিও শক্তিশালী মুসলমান তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীন হইয়া যায়।

আরবরা কিন্তু স্বাধীনতাকে ধর্মের মতই প্রাণ দিয়া



সৌদী আরবের সৈন্যদল

আরব মুসলমান দেশ। যাবার বেতাইন এখানকার প্রধান অধিবাসী। ইহাদের নিদিষ্ট বাসস্থান নাই। প্রাচীন কালে শিক্ষা ও সভ্যতায় উন্নত হইলেও শেষ যুগে তাহার চিহ্ন বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। এই জাতি কিন্তু আগাগোড়া দুর্দর্ষ ও সংগ্রামপ্রবণই রহিয়া গিয়াছে। তখন মহম্মদের আবির্ভাব হয় নাই। সেই অতীত যুগেও কিন্তু ইহারা রোম সাম্রাজ্যের নিকট মস্তক বিলাইয়া দেয় নাই। আরবের উত্তর দিকে ভূমধ্যসাগরতীরে কতকটা ফালির মত জায়গা অধিকার করিয়াই সঙ্কট থাকিতে হইয়াছিল, পরে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হইলে আরবেরা নব্য প্রেরণা লাভ করে,

ভালবাসে। ইহাকে রক্ষার জন্য তাহারা বিযর্জন না-দিতে পারে এমন কিছুই নাই। প্রবল তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীন হইলেও তাহারা স্বাধীন চিন্তাবৃত্তি কখনও হারায় নাই। বস্তুতঃ আরবের দুর্বদ্রাস্তে তুর্কী শাসন প্রবর্তিত হইবার অবকাশ পায় নাই। ইতিমধ্যে জগতে শিল্পবাণিজ্য, শাসনপদ্ধতি প্রভৃতিতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। বিজ্ঞান দ্রুতকৈ নিকট করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের অর্জিত জ্ঞান এখন আর সেই সেই দেশেরই সম্পত্তি রহিল না, বিশ্বের সর্বত্র তাহা ছড়াইয়া পড়িবার সুবিধা পাইল। তুর্কী এককালে ইউরোপে আতঙ্কের কান্না হইয়াছিল বটে, কিন্তু

পরবর্তী কালে তাহা ক্রমশঃ হীনবীৰ্য্য হইয়া পড়ে। ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান তাহাকে পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। সে তখন ইউরোপের 'রুগ্ন মল্লয্য' বলিয়া পরিগণিত হইল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক-বর্জিকা ত আর একটি দেশের একচেটিয়া সম্পত্তি

প্রিয় আরবদের মধ্যে পৌছাইতেও বিলম্ব হইল না। বিগত ১৯০৮ সনে তাহাদের মধ্যেও স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা হইল। দেশ-শাসনে



আমীর আবদুল্লাহ, ট্রান্স-জর্ডানের শাসক

নয়। তুরস্কের যুবক সম্প্রদায় কিন্তু ক্রমশঃ ইহা দ্বারা উদ্ভাসিত হইল। তাহাদেরই চেষ্টায় স্থলতানের স্বৈরশাসনের পরিবর্তে একটি সংস্কৃত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই আন্দোলনের ডেউ স্বাধীনতা-



রাযেব বে নাশাশিবি

জেরদালেমে আরব-রক্ষা সমিতির সভাপতি

আরবদের দাবী স্বীকৃত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল, তুর্কীর পরিবর্তে আরবী ভাষাই রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া গণ্য হইল। এখানে

সুদূর প্রাচ্যেও স্বাধীনতার বিজয় অভিযান

বাম্মা
স্ট্রুট সেটেলমেন্ট
মালয়
শ্যাম • চীন
ফিলিপাইন
ইন্দো-চীন
জাভা • সুমাত্রা
ফরমোসা
আন্দামান
ফিজি
জাপান

বলিয়া রাখা আবশ্যক যে তুরস্কের যুব আন্দোলনের সাফল্য উপলক্ষ্যে কথিত হইল যদিও আরবের এই স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হয়

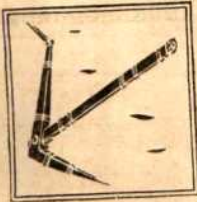


হজ আমীন এল-হুদেনী, গ্র্যাণ্ড মুফতি

তথাপি ইহার সপক্ষে ইংরেজ ও ফরাসীদের প্রচারণাও কম সাহায্য করে নাই।

স্বাধীনতাপ্রিয় আরবজাতি অল্পেই সন্তুষ্ট হইয়া রহিল না, অধীনতার নাগপাশ বিমুক্ত হইবার জন্ত আন্দোলন চালাইতে লাগিল। এই সময় মহাসমর বাধিয়া গেল। ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি মিত্রশক্তিবর্গের চেষ্টা হইল, শত্রু তুরস্কের বিরুদ্ধে ইহাদিগকে উদ্ভাওয়া দিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করা। তাহারা ইহাতে সফলকাম হইয়াছিল। তাহাদের এই কার্যে প্রধান সহায়ক হইয়াছিলেন কর্ণেল টি. ই. লরেন্স। আরবভূমি, বিশেষতঃ উত্তর-আরবকে, তিনি কিরূপে তুর্কীর বিরুদ্ধে এক করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা বহু পুস্তক-পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। লরেন্স সাহেবের পরবর্তী কার্যকলাপে বুঝা গিয়াছিল, তুরস্কের নাগপাশ বিমুক্ত করিয়া যুদ্ধান্তে ইহাকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করা হইবে—আরবকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। হুদাঈ সন্ধির পর কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি যখন দেখিলেন তাহার এই প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হইবার কোনই আশা নাই তখন তিনি সরকারী চাকরি ত্যাগ করিলেন, সরকারী পদক-পুরস্কার সকলই ফিরাইয়া দিলেন, এমন কি নাম পর্য্যন্ত বদল ইয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি বিমানপোতের ইঞ্জিনিয়ারের কাজ শিখিয়া নিজেকে 'এয়ার-ম্যান শ' বলিয়া পরিচয় দিলেন।

কর্ণেল লরেন্সের এবিধ প্রতিবাদের প্রত্যক্ষ ফল কিছু না ফলিলেও পরোক্ষভাবে ইহা দ্বারা আরবদের সুবিধা হইয়াছিল।



খাদি প্রতিষ্ঠান বাংলার ঘি



পোনে দুই কোটি টাকার ভান্সা খি অথ প্রদেশ হইতে বাংলায় আসে ও খরচ হয়

বাংলার গাই হইতে এই সমস্তটাই—এই পোনে দুই কোটি

টাকার ঘি ও টানা দুধ হইতে আর দুই কোটি

মোট প্রায় চার কোটি টাকার

গব্য দ্বত উৎপন্ন হইতে পারে

খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে

এই সম্মান পাওয়া গিয়াছে

কেবল গাওড়া খি কিনুন ১৫০ সের

ভান্সা খি অপেক্ষা মাত্র ১০ সেরে বেশী

বাংলায় নূতন শিল্প স্থাপ্তি করুন

বালীগঞ্জ, লেক রোড
ভবানীপুর

— খাদি প্রতিষ্ঠান —
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ফোন—বি,বি, ২৫৩২

হাওড়া, মাণিকতলা
হামবাজার

সিরিয়া প্যালেষ্টাইন মাত্র নিজ নিজ তাঁবেদারিতে রাখিয়া মিত্র-শক্তিবর্গ আরবের অগাধ অংশকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে একরূপ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। মেসোপটেমিয়া ইরাক নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হইল। টাংসজর্ডানিয়াও অল্পরূপ স্বাভাব্য লাভ করিল। ওদিকে দক্ষিণ-পূর্ব আরবে সুনীতিপন্থী ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের নেতাকপে ইব্ন সৌদ ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উল্লিখিত কয়েকটি অঞ্চল বাদে সমগ্র আরবের একচ্ছত্র অধিপতি হইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ইহাতে মিত্রশক্তিবর্গের আতঙ্ক উপস্থিত হয় নাই। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, ইংরেজরা বরং নানা ভাবে ইব্ন সৌদকে সাহায্যই করিয়া আসিতেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আরবে ইমেন যদিও কতকটা স্বাভাব্য বজায় রাখিয়াছে তথাপি ইব্ন সৌদের প্রাধিকার স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। গত বৎসর ফ্রান্স কর্তৃক সিরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। বর্তমানে একমাত্র প্যালেষ্টাইন ছাড়া সমগ্র আরবভূমি স্বাভাব্য লাভ করিয়াছে বলা যাইতে পারে।

তৎপর হইত কি না সন্দেহ। সে যাহা হউক, এবং যে কারণেই হউক, আরব আজ একটি সংহত, শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে।



সৌদী আরবের রাজা ইব্ন সাউদ

ইউরোপে কতকগুলি রাষ্ট্র গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। একারণ ইহাদের সমগ্র আরবভূমিতে মৈত্রী ভাব বজায় রাখিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়া স্বাভাবিক। হইয়াছেও তাহাই। লরেন্সের প্রতিবাদের ফলে ইহাদের চোখ খুলিয়াছিল বটে, কিন্তু বর্তমান অবস্থার উদ্ভব না হইলে ইহারা আরবের প্রাধিকার লাভে এতটা

ইহা শুধু মুসলমান সমাজের পক্ষেই গৌরবের বিষয় নহে প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী দেশ ও জাতিই ইহাতে আশ্বাসিত হইবে। সাম্রাজ্যবাদীরা আরবকে সাম্রাজ্যের একটি মস্ত বড় ঘাঁটি বলিয়া ব্যবহার করিবার আশা হয়ত হৃদয়ে পোষণ করিতেছে, কিন্তু

ল্যা

ড্

কো

ঃ
ঃ
ঃ

ক

লি

কা

তা

ঃ
ঃ

গত বৎসরের গ্রায়
এ বৎসরেও গ্রীষ্মকালে
আপনার নিত্যব্যবহার্যের
সুপরীক্ষিত প্রসাধন দ্রব্যাদি—

ল্যাড্‌কো দ্রব্যাদি
গুণে অপরাজেয়
ব্যবহারে পরম আনন্দ
ও সুখদায়ক ॥
ভাল দোকানেই পাইবেন ॥

ল্যা ড্‌কো'র

সুগন্ধ ক্যাক্টর অয়েল
সুগন্ধ গ্লিসারিন সোপ
লাইম্‌ জুস্‌ গ্লিসারিন
রক্তকমল গন্ধ-তৈল

আমলা-অয়েল

ফেস্‌-ক্রিম

স্নো



ক্যালকেমিকোর
স্নিগ্ধ সুগন্ধি সুশীতল কেশতৈল



যদি তথাকথিত “মহাভূঙ্গরাজ কেশতৈল” প্রভৃতি ব্যবহারে হতাশ হয়ে থাকেন
ক্যালকেমিকোর “ভূঙ্গল” ব্যবহারে তৃপ্ত হবেন।

বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদীয় মতে প্রস্তুত মহাভূঙ্গরাজ তৈলের সঙ্গে আমলা, কুচ প্রভৃতি আরও কয়েকটি
কেশকল্যাণকর ভৈষজ্যের সুসঙ্গত সংমিশ্রণের ফলে ক্যালকেমিকোর কেশতৈল “ভূঙ্গল” অতুলনীয়
হয়ে উঠেছে।

নিয়মিত ব্যবহারে মাথার খুসকি, মরামাস যায়। মাথা ঠাণ্ডা থাকে, শিরঃপীড়া ও কেশরোগ
সারে। চুলের অকালপক্বতা নিবারণ হয়। চুল ঘন কালো কৃষ্ণিত ও কোমল করে। চক্ষুর জোতি
বাড়ে। রাতি প্রশ্রয় কমে, স্বপ্নে মন প্রফুল্ল থাকে। কর্ণে উৎসাহ আনে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল—বালিগঞ্জ, কলিকাতা



দুঃখহীন নিকেতন—

সংসার-সংগ্রামে মানুষ আরামের আশা ছাড়িয়া প্রাণপণ উত্তমে বাঁপাইয়া পড়ে তাহার স্ত্রীপুত্র-পরিবারের মুখ চাহিয়া।
সে চায় পত্নীর প্রেমে, পুত্রকণ্ঠা ভাইভগিনীর স্নেহে বকুবকে একখানি শান্তির নীড় রচনা করিতে। এই আশা বুকে করিয়া
কী তার আকাঙ্ক্ষার আকুলতা, কী তার উদ্যম, কী তার দিনের পর দিন আশ্রমভোলা পরিশ্রম!

কিন্তু হায়, কোথায় আকাঙ্ক্ষা, আর কোথায় তার পরিণতি! বান্ধকের চোকাঠে পা দিয়া পোনব আনা লোকই ক্ষেপে
জীবনসম্ভ্রম দুঃখহীন নিকেতন গড়িয়া তুলিবার স্বপ্নকে সফল করিতে হইলে যেটুকু অর্থ-সঞ্চয় করিয়া রাখা প্রয়োজন ছিল,
প্রতিদিনের হাজার কাজের চাপে, ছোটবড় হাজার অভাব মিটাইতে গিয়া, সেই অতিপ্রয়োজনীয় সঞ্চয় তাহার করা হইয়া
ওঠে নাই। এমনি করিয়া আশাভঙ্গের মনস্তাপে বহু লোকেরই জীবনসাম্রাজ্যের গোপালি-অবসরটুকু শান্তিহীন হইয়া ওঠে।

একদিনেই করিয়া ফেলা যায় এমন কোনো উপায়ই নাই, যাহা দরিদ্রের এই মনস্তাপ দূর করিয়া দিতে পারে। সংসারের
স্বচ্ছলতা ও শান্তি গড়িয়া তুলিতে হয় ধীরে ধীরে—একমাস বা এক বৎসরের চেষ্টায় ভবিষ্যতের যে-সংস্থান হয় না, বিশ
বৎসরের চেষ্টায় তাহা অল্লাহ্মাসে হওয়া অসম্ভব নয়। সঞ্চয়ের দায়িত্বকে আসন্ন দায়ের মত দুঃসহ না করিয়া লঘুভার করিতে
এবং কষ্টসঞ্চিত অর্থকে নিরাপদ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্তই জীবনবীমার স্রষ্টি। যাহাদের সামর্থ্য বেশী নয়, অল্পচ
সংসারিক দায়িত্ব বেশী, জীবনবীমার অমুষ্ঠান বিশেষ করিয়া তাহাদেরই জন্ত।

সাংসারিক জীবনে প্রত্যেক গৃহস্থেরই যে জীবনবীমা করিয়া রাখা উচিত, একথা সকলেই জানেন। জীবনবীমা করিতে
হইলে সকলেরই এমন কোম্পানীতে করা উচিত, ব্যবসায়ক্ষেত্রে যাহার প্রতিষ্ঠা আছে, ব্যবসায় অল্পপাতে যাহার সঞ্চিত অর্থের
পরিমাণ বেশী। নিরাপত্তার দিক দিয়া দেখিলে, **বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড লিমিটেড**
প্রপার্টি কোং লিমিটেডের মত বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠানই সর্বসাধারণের পক্ষে শ্রেয়।

বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিমিটেড

হেড অফিস—২নং চার্চ লেন, কলিকাতা।

স্বতন্ত্র আরব শেষ পর্যন্ত যে ইহাতে রাজী না-ও হইতে পারে তাহার সম্ভাবনাও রহিয়াছে।

ইব্ন সৌদের অদম্য চেষ্টার ফলে আরবে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। কে ভাবিয়াছিল যুদ্ধপ্রিয় স্বাধীন অশিক্ষিত বাঘাবর জাতি আবার মনুষ্যসমাজে বাসা বাঁধিবে? মরুময় আরবভূমিতে রেলপথ, মোটর রাস্তা নিখিত হইবে ইহাই বা কে ধারণা করিয়াছিল? ইব্ন সৌদের আমলে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। বাঘাবর উপজাতিগুলি তাঁহার শাসনাধীন হইয়া সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করিতেছে। বর্তমান যুগোপযোগী নানা সুখস্বচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা তাহাদের জন্য করা হইতেছেই, তাহারা বাহাতে সুখস্বচ্ছন্দ্যলাভের অধিকারী হইতে পারে সেজন্যও সবিশেষ আয়োজন করা হইতেছে। ইহাদের সম্মানসম্মতিদের শিক্ষার ব্যবস্থা ইহান মধ্যে একটি। কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে, রাস্তাঘাট নির্মাণ করিয়া লোকের বিভিন্ন অঞ্চল যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্য সহজসাধ্য করা হইতেছে। রেল, মোটর, মোটর লরী, বাস প্রবর্তিত হইতেছে। ডাক-বিভাগ, তার- ও বেতার-বিভাগ খোলা হইয়াছে। ইহারা এখন হাজার মাইল দূরের খবর মুহূর্তমধ্যে পাইয়া থাকে। গানবাজনা, আমোদ-প্রমোদের ভ্রু কথাই নাই। এক কথায় সভ্য জগতের যতপ্রকার সুখসুবিধা আছে আরবগণ বর্তমানে সকলই উপভোগ করিতেছে।

কিন্তু ইহারা এত সুখসুবিধার মধ্যে থাকিয়া ক্রমশঃ হীনবোধ হইয়া পড়িতেছে না ত? একপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। মিত্রশক্তিগুলির আওতায় বদ্ধিত হইলেও তাহারা দেশরক্ষার কথাও ভাবিতেছে। আরবদের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহারা সেকালের ছোরা-তলোয়ার ছাড়িয়া কামান-বন্দুক চালনা শিক্ষা করিতেছে। যুদ্ধ-ট্যাঙ্ক কি পদার্থ তাহা এখন তাহারা ভাল রকমই জানে। বিমানপোতও আরবে আমদানী হইয়াছে। বিমানপোতে আরোহণও তাহাদের কম আনন্দ নয়। বিমানবাহিনীও ছোটখাট আকারে গঠিত হইয়াছে। সুস্তরং দেশরক্ষা ব্যাপার ইহারা এখন আর পরমুখাপেক্ষী নয়।

আরব বলিতে একটি উপদ্বীপের কথা আমাদের মনে জাগিলেও বস্তুতঃ মিশর হইতে ইরাক পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডকেই আরব-ভূমি বলা যাইতে পারে। কারণ এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সকলেই এক জাতি ও এক আরবী ভাষাভাষী। আজ মিশর স্বাধীন হইতে চলিয়াছে। সিরিয়ার স্বাধীনতাও স্বীকৃত হইয়াছে। ইরাক নছর বংশের পক্ষেই স্বাভাব্য লাভ করিয়াছে। ইব্ন সৌদের নেতৃত্বে আরব উপদ্বীপ আজ ঐক্যবদ্ধ সংহত। প্যালেষ্টাইনই একমাত্র পরাধীন রহিয়াছে। বর্তমান অবস্থার চাপে পড়িয়া মিত্র-শক্তিবর্গ আরবের স্বাভাব্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে বলিয়া সকলের ধারণা। যে কারণেই হউক, আরবের পুনর্জন্মলাভ বাস্তবিকই আশাপ্রদ।

[প্যালেষ্টাইনে ইহুদী ও আরবদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ ও তাহার প্রতীকার সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য ১৯৩৬ সালের আগস্ট

মাসে যে রয়্যাল কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল সম্প্রতি তাহার প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে প্যালেষ্টাইনের এক অংশ ট্রান্স-জর্ডানের সহিত সংযুক্ত করিয়া একটি স্বতন্ত্র আরব রাজ্য গঠিত হউক; পবিত্র-তীর্থ জেরুসালেম ও বেথলেহেম নূতন একটি ম্যাণ্ডেটের অধীন থাকুক, এবং প্যালেষ্টাইনের অপর অংশ স্বতন্ত্র ইহুদী রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হউক। এই প্রস্তাবে কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হন নাই।]



ডাঃ এস. কে. চন্দ্র

লাগ অবশেষের অধীনে শিল্পাপুরে ম্যালেরিয়া-নিবারণ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়া সম্প্রতি দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

দ্রষ্টব্য

গত আষাঢ়ের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয়ের “কলিকাতা হিন্দু অনাথ-আশ্রম” সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকে এই আশ্রম সম্বন্ধে তথ্যার্থী হইয়াছেন, কেহ কেহ আমাদের নিকটও পত্র লিখিয়াছেন। লেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে আশ্রমের ঠিকানা দেন নাই। আশ্রমের ঠিকানা—১২১, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা। ঐ ঠিকানায় আশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ অবগত হওয়া যাইবে।



ঘাটে
শ্রীসত্যরঞ্জন মজুমদার

আবাসী প্রেস, কলিকাতা

স্রবাস্রা

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

৩৭শ ভাগ }
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৪৪

{ ৫ম সংখ্যা

শনির দশা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধবুড়ো ঐ মানুষটি মোর
নয় চেনা ।
একলা বসে ভাবছে, কিহা
ভাবছে না
মুখ দেখে ওর সেই কথাটাই
ভাবছি,
মনে মনে আমি উহার
মনের মধ্যে নাচি ।

হয়তো বা ওর মেঝো মেয়ে পাতা ছয়েক ব'কে
মাথার দিবি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল ওকে
আদরিণী উয়ারাণীর বিষম স্নেহের শাসন,
জানিয়েছিল, চতুর্থীতে খোকার অন্নপ্রাশন ;
জিদ ধরেছে, হোক না যেমন করেই
আসতে হবে শুক্রবার কি শনিবারের ভোরেই ।

আবেদনের পত্র একটি লিখে
 পাঠিয়েছিল বুড়ো তাদের কতাবাবুটিকে ।
 বাবু বললে, হয় কখনো তা কি ?
 মাসকাবারের বুড়ি বুড়ি হিসাব লেখা বাকি ।
 সাহেব গুনলে আগুন হবে চ'টে,
 ছুটি নেবার সময় এ নয় মোটে ।
 মেয়ের জুখ ভেবে
 বুড়ো বারেক ভেবেছিল কাজে জবাব দেবে ।

সুবুদ্ধি তার কইল কানে, রাগ গেল যেই থামি
 আসন্ন পেন্সনের আশা ছাড়াটা পাগলামি ।
 নিজেকে সে বললে ওরে, এবার না হয় কিনিস
 ছোট ছেলের মনের মতো একটা কোনো জিনিস ।
 যেটার কথাই ভেবে দেখে, দামের কথায় শেষে
 বাধায় ঠেকে এসে ।
 শেষকালে ওর পড়ল মনে জাপানি বুঝবুঝি,
 দেখলে খুসি হয়তো হবে উমি ।
 কেইবা জানবে দামটা যে তার কত,
 বাইরে থেকে ঠিক দেখাবে খাঁটি রূপোর মতো ।
 এমনি করে সংশয়ে ওর কেবলি মন ঠেলে,
 হাঁ-না নিয়ে ভাবনাস্রোতে জোয়ার ভাঁটা খেলে ।
 রোজ সে দেখে টাইম-টেবিলখানা,
 ক'দিন থেকে ইন্টিশনে প্রত্যহ দেয় হানা ।
 সামনে দিয়ে যায় আসে রোজ মেল,
 গাড়িখানা প্রত্যহ হয় ফেল ।

দ্বিধায় দোলা বিমর্ষ ওর মুখের ভাবটা দেখে
 এমনিভরো ছবি মনে নিয়েছিলেম এঁকে ।

কৌতুহলে শেষে

একটুখানি উলখুসিয়ে, একটুখানি কেশে

বসে তাহার কাছে

শুধাই তারে, বাড়িতে কি মন্দ খবর আছে।

বললে বুড়ো, কিচ্ছুই নয় মশায়,

আসল কথা, আছি শনির দশায়।

তাই ভাবছি, কী করা যায় এবার

ষোড়দোড়ে দশটা-টাকা বাজি ফেলে দেবার।

আপনি বলুন, কিনব টিকিট আজ কি ?

আমি বললেম, কাজ কী ?

রাগে বুড়োর গরম হোলো মাথা,

বললে, থামো, ঢের দেখেছি পরামর্শদাতা।

কেনার সময় নেই যে এবার

আজিকার এই দিন বই,

কিন্‌ব আমি, কিন্‌ব আমি,

যে করে হোক কিনবই ॥

আলমোড়া

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪



সংস্কৃতব্যাকরণের প্রাচীন ও নবীন পদ্ধতি

ঐবিধুশেখর ভট্টাচার্য

ব্যাকরণ না শিখিলে চলে না, ইহা শিখিতেই হইবে; কিন্তু কিরূপে শিখিতে হইবে ইহাই প্রশ্ন। এ প্রশ্ন নূতন নয়, পাণিনির মহাভাষ্য লিখিতে গিয়া পতঞ্জলি বলিতেছেন, শব্দানুশাসন তো করিতে হইবে, কিন্তু কিরূপে? পে, অথ, পুরুষ, হস্তী, শবুনি, যুগ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি রূপে এক-একটি শব্দ পাঠ করিলে হয় কি? হয় না; কারণ ইহা ঠিক উপায় নয়। শোনা যায় বৃহস্পতি ইন্দ্রকে এইরূপ এক-একটি শব্দ পাঠ করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন—দেবতাদের পরিমাণে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত, কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই। বৃহস্পতি ছিলেন অধ্যাপক, ইন্দ্র ছিলেন ছাত্র। আর দেবতাদের পরিমাণে হাজার বৎসর ধরিয়া পড়ান হইয়াছিল, তবুও শব্দপাঠ শেষ হয় নাই। আর আজকাল যদি কেহ দীর্ঘকাল বাঁচে তো এক শত বৎসর বাঁচিতে পারে। এই এক শত বৎসরে কি হয়? বিদ্যা ঠিক উপযুক্ত হয় চার প্রকারে; বিজ্ঞাকে লাভ করা, নিজের তাহা পাঠ করা, অন্তর্ভুক্তও পাঠ করান, আর তাহাকে কাজে লাগান। এ অবস্থায় বিজ্ঞাকে পাইতেই আরু শেষ হইয়া যায়। অতএব একরূপে শিক্ষা করিলে চলে না। কিসে চলে? এমন সামান্য ও বিশেষ লক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে অল্প বয়সে মহা-মহা-শব্দসমূহ বুঝিতে পারা যায়। ইহাই অল্পসরণ করিয়া পাণিনি প্রকৃতির ব্যাকরণে শব্দসমূহের লক্ষণ দেখান হইয়াছে।

আজকাল আবার প্রশ্ন উঠিয়াছে—এই সমস্ত ব্যাকরণে যাহা বলা হইয়াছে, যে পদ্ধতি দেখান হইয়াছে, অবিকল তাহাই অল্পসরণ করিতে হইবে, অথবা তাহা অপেক্ষ কোন উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি থাকিলে ইহাই অবলম্বন করিতে হইবে? বিজ্ঞানীদের জন্য এই কথাটাই নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্ক্তিতে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে। এ লেখাটি বিশেষজ্ঞদের জন্য নহে।

এখানে সংস্কৃত ব্যাকরণের কথা আলোচিত হইতেছে,

কিন্তু তাহা হইলেও ইংরাজী জানা ছাত্রদের আলোচনার সুবিধা হইবে তাবিয়া দুইটি ইংরাজী ক্রিয়া পদের উপমা দিতেছি। সকলেই জানে *go* খাত্ত হইতে *present tense*-এ *go*, *past tense*-এ *went*, ও *past participle* *gone*। এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় *go* হইতে *went* কিরূপে হয়, তবে তাহার উত্তরে বলিতে হইবে *go* হইতে উহা হয় নাই, উহা হইতেছে এ একই গমন অর্থে প্রযুক্ত *wend* খাত্ত হইতে, *go* খাত্তর *past tense*-এ প্রয়োগ নাই। বলা হয় *be* খাত্তর উত্তম পুরুষে (*first person*) *present tense*-এ *am*, *past tense*-এ *was*, *past participle* *been*। বুঝা যায় *be* হইতে *been* হইতে পারে, কিন্তু কিরূপে *am* ও *was* হইল? বলিতে হইবে এই তিনটি পদই স্বতন্ত্র তিনটি খাত্ত হইতে হইয়াছে; যথা, (১) *Aryan es-*, *Gk. L. O Teut. es-*, *Skt. as-* (অস্), ইহার অর্থ ‘হওয়া’ (‘to be’); (২) *O Teut. wes-*, *Skt. vas-* (বস্), ইহার অর্থ ‘থাকা’ (‘to remain’); আর (৩) *Gk. phu-*, *L. fu-*, *Skt. bhū-* (ভূ) ইহার অর্থ ‘হওয়া’ (‘to become’). ইহাদের মধ্যে *am* হইয়াছে (১) প্রথম খাত্ত হইতে (*Gk. es-mi*, *Skt. as-mi*); *was* (ও *were* প্রকৃতি) হইয়াছে (২) দ্বিতীয় খাত্ত হইতে; এবং *been* (ও *being*) হইয়াছে (৩) তৃতীয় খাত্ত হইতে। যাহারা ইংরাজী ভাষা বা তাহার ব্যাকরণ ভাল করিয়া পড়িতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এইরূপই বিচার করিয়া পাঠ করা উচিত। অজ্ঞা তাহাদিগকে বিশেষজ্ঞ বলা যাইতে পারে না।

উল্লিখিত পদগুলি আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রত্যেকটি খাত্তর ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মানুসারে স্বতন্ত্রক সম্ভব সমস্ত পদই ভাষায় প্রযুক্ত হয় নাই, বিশেষ-বিশেষ পদেরই প্রয়োগ হয়। তথাপি সাধারণ শিক্ষার্থীর সুবিধা হইবে তাবিয়া কেবল অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া

বৈয়াকরণগণ বস্তুত ভিন্ন-ভিন্ন ধাতুর পদকে একটি ধাতুরই পদ বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃতের ঠিক এইরূপ। কোন-কোন ধাতুর পূর্ণ রূপাবলী বস্তুত না থাকিলেও তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে উহার মধ্যে অপর ধাতুর পদ অতি কৌশলে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা আমরা পরে বিশদ ভাবে দেখিতে পাইব।

ধাতুর স্থায় নামেরও এইরূপ করা হইয়াছে। এক শব্দের রূপকে অন্য শব্দের রূপ বলিয়া দেখান হইয়াছে। ইহা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে, ইহার স্থানে উহা আদেশ হয়। আদেশ শব্দের চলতি মানে ‘হুকুম’। বলা হয়, গত্যর্থক $\sqrt{ই}$ ধাতুর স্থানে গা আদেশ হয়। কিন্তু আদেশ করিলেই যে উহা হইবে তাহা হয় না। ঈশ্বরও যদি আদেশ করেন যে, আশ্বিন দিয়া কাপড়গুলি ডিজাইতে হইবে, তবে তাহাও হইবার নহে। তাই শত আদেশ থাকিলেও $\sqrt{ই}$ $\sqrt{গা}$ হইবে না।

কোন-কোন পাঠক ব্যাকরণের আদেশকে এইরূপ ‘হুকুম’ মনে করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। কাহারো কাহারো মতে এতাদৃশ স্থলে আদেশ শব্দের অর্থ ‘বিকার’। ‘বিকার’ বলিতে অপর আকার বা অবস্থা। এই ব্যাখ্যা আংশিক ভাবে ঠিক। ইকার স্থানে যকার আদেশ হয়, অথবা যকার স্থানে ইকার আদেশ হয়, ইহা বলিলে ইকার বা যকারের যথাক্রমে যকার বা ইকার এই বিকার হইতে পারে, হয়। কিন্তু যদি বলা হয় যে, (গত্যর্থক) ই-ধাতু স্থানে গা আদেশ হয়, তবে কখনই তাহা হইতে পারে না। ইকারের বিকার গা ইহা একবারেই অসম্ভব। তাই কেহ-কেহ বলেন আদেশের অর্থ হইতেছে ‘পাঠ’; অর্থাৎ ইকার-স্থানে যকার, বা যকার-

স্থানে ইকার, কিংবা ই-ধাতু স্থানে $\sqrt{গা}$ পাঠ করিতে হইবে। ইহা পূর্বের ব্যাখ্যা হইতে ভাল, কিন্তু একবারে ঠিক নহে। কেন ঐরূপ পাঠ করিব? ইহার সম্ভাবজনক উত্তর নাই। পরে আমরা দেখিতে পাইব, কেবল একটা (কাল্পনিক) সুবিধা মনে করিলে সংস্কৃতব্যাকরণসমূহে এইরূপ অনেক করা হইয়াছে। ইহাতে পাঠকবর্গের মনে শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা বরাবর থাকিয়া যায়। ইহা সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে ক্ষমা করা যাইতে পারিলেও যাত্রার বিশেষজ্ঞ, অথবা বিশেষজ্ঞ বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের পক্ষে উহা ক্ষমার্হ বলিয়া মনে হয় না। নিয়ে আমরা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখি।

পাণিনির (৬.১.৬৩) ও অন্তান্ত অনেকের ব্যাকরণে বলা হইয়াছে যে, দ্বিতীয়ার বহুবচন প্রভৃতিতে $\sqrt{পা}$ প্রভৃতি শব্দের স্থানে $\sqrt{দ}$ প্রভৃতি আদেশ হয়।^৩ এখানে $\sqrt{পা}$ ও $\sqrt{দ}$ এই দুইটি স্বতন্ত্র শব্দ বলিলে কোন ক্ষতি দেখা যায় না। এইরূপ পদান্তি, পদগ, পদ্বি প্রভৃতি (৬.৩.৫২-৫৪) শব্দে $\sqrt{পা}$ শব্দের যোগ দেখা অপেক্ষা যথাসম্ভব $\sqrt{পদ}$ ও $\sqrt{দ}$ শব্দের যোগ দেখাই সম্ভব। এই প্রকার দন্ত ও দন্ত্য না সা (না সিকা) ও নস্ ইত্যাদিকে স্বতন্ত্র ভাবে ধরা যাইতে পারে। ইহাদের সম্বন্ধে যাহাই হউক, ঐ ব্রহ্ম অমুসারেই উদক স্থানে উদন্ আদেশ করিবার কাবণ নাই। উদন্ একটি যে জলবাচী স্বতন্ত্র শব্দ তাহা উদন্ত (উদন্-বৎ অর্থাৎ যাহাতে প্রচুর উদন্ ‘দন্ত’ আছে) এই পদ দেখিলেই বুঝা যায়। এইরূপ অত্র পদও আছে, যেমন, উদন্ত (ঋষেদ, ২. ৭. ৩) ‘জলবন্ত’; উদন্তা ‘গিপাসা’ (উপনিষৎ ও লৌকিক সংস্কৃতে, উদন্ত ‘জলপ্রাণী’ (ঋষেদ, ৫.৫৭.১); ইত্যাদি। তাই বলিতে হয়

২। পতঞ্জলি বলিবেন অত্রত্রং হৎ।

৩। পদ-দন্-নো-মাস্-স্থন্-হস্ প্রভৃতিষু।

৪। দন্ত স্থানে দন্ত আদেশ করিতে গিয়া পাণিনিকে অনুন আরও চারিটি স্তত্র করিতে হইয়াছে :— বয়সি দন্তস্ত দন্ত্। ছন্দসি চ। জিয়া সংজারাম্। বিভাষা শ্রাব্যাকাত্যাম্। ৫. ৪. ১৪১—১৪৪।

১। সমস্ত ধাতুরই যে সমস্ত পদ ভাবার পাওয়া যায় না, যাক (নিরুক্ত, ২. ২.) প্রথমে ইহা ধরিয়া দেন। তিনি বলেন, কোন কোন প্রদেশে ধাতু ক্রিয়াই আকারে প্রযুক্ত হয়, আবার কোথাও কোথাও ধাতু হইতে উৎপন্ন নামপদ প্রযুক্ত হয়। যেমন কৰোজ দেশে গত্যর্থক $\sqrt{শ}$ ব্ ধাতু ক্রিয়াক্রমে দেখা যায়, কিন্তু আর্থেরা শ ব এই পদ প্রয়োগ করেন। প্রাচ্য দেশসমূহে ছেদন-অর্থ $\sqrt{দা}$ (দো) ধাতু ক্রিয়াক্রমে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু উদীচ্য দেশসমূহে দা ত্র এই নামপদ পাওয়া যায়। ইত্যাদি। পতঞ্জলিও (১. ১. ১.) এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন।

করিতে হইয়াছে। “ইয়ো দ্বীটো অ স্ব ভি : (ঋ ঋ দ, ১.৮৪.১৩)। এখানে অ স্ব ভি : হইয়াছে অ স্ব ন্ শব্দ হইতে। “অ স্ব স্ব স্ব যদ্ অন স্বা বিভক্তি” (১.১৬৪.৪)। এখানে প্রথম ও তৃতীয় পদটি অ স্ব ন্ হইতে। এইরূপ দ্ব দ্ব ৭ (“অচ্ছিন্নস্য দ্ব দ্ব তঃ”—৬. ৪৮. ১৮); স ক্ থা নি (৫.৬১.৩); অ ক্ স্ব ৭ (“অ ক্ স্ব স্ব : কর্ণবস্তু : সখায়”—১০.৭১.৭; “ভজ্ঞ পশ্চম অ ক্ ভি :”—১.৪২.৮)।

সংস্কৃতসাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে উহাতে একই অর্থে (১) প থ, (২) প থি, ও (৩) প স্ব ন্ এই তিনটি পৃথক্ শব্দ আছে। (১) প থ্ হইতে হইতে প থঃ, প থা ইত্যাদি; (২) প থি হইতে প থি ভ্যাং ইত্যাদি; ১৪ এবং (৩) প স্ব ন্ হইতে প স্ব ন্ ম্ ইত্যাদি। ১৫ কিন্তু এই সবকেই এক জায়গায় গাঁথিয়া কৃত্রিম উপায়ে পদ সমূহের সাধন প্রণালী দেখান হইয়াছে। ১৬

একই ধাতু (✓জ্ ‘বয়োহানি’, হইতে উৎপন্ন হইলেও প্রত্যয়ের ভেদে জ রা ও জ র সৃ শব্দ ভিন্ন। রূপও ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন। তথাপি বলা হইয়াছে ১৭ অরাদি বিভক্তি পরে থাকিলে জ রা শব্দেব স্থানে বিকল্পে জ র সৃ আদেশ হয়।

ম ঘ ব ন্ ও ম ঘ ব ৭ এই দুইটি শব্দও প্রত্যয়ের ভেদে (-বন্ ও -ব ৭) ভিন্ন, তথাপি বলা হইয়াছে বহু স্থলে প্রথমটির স্থানে দ্বিতীয়টি আদেশ হয়। ১৮ মা ঘ ব তী অথবা মা ঘ ব ত হইয়াছে ম ঘ ব ন্ হইতে, ইহা বলা ঠিক নহে।

অ ব ন্ ও অ ব ৭ শব্দকেও একত্র যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯ অ ব ন্ হইতে অ ব া পৌ হয়, কিন্তু অ ব ঙ্গো হইতে পারে না।

পূর্বেই বলিয়াছি ও প্রাচীন শাস্ত্রার্থদের কথা উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছি যে, সব ধাতুরই ব পর ভাষায় পাওয়া যায় না। তথাপি বৈয়াকরণেরা বহু ধাতুর সমগ্র রূপাবলী দেখাইবার জন্য এমন অনেক কল্পনা করিয়াছেন যাহা সমর্থন করা চলে না। এই সমস্ত কল্পনার সাধারণ পাঠকেরা সহজেই ভ্রমে পতিত হন। আরো কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। গতার্থক ✓ই ধাতুর লুঙ্ লকারে, গিজন্তে ও সনস্তে প্রয়োগ নাই, ইহা স্পষ্ট না বলিয়া বলা হইল যে, লুঙ্ লকারে ঐ ধাতুর স্থান ✓গা আদেশ হয় (২. ৪. ৪৫) ২০ আর যদি ‘অববোধন’ (বুঝান) অর্থে বুঝায় তাহা হইলে গিজন্ত ও সনস্তে তাহার স্থানে ✓গ ম্ আদেশ হয় (২. ৪. ৪৬-৪৭) ২১ কিন্তু গ ম য় তি ও জি গ মি ব তি পদ ✓গ ম্ ধাতুরই, ✓ই ধাতুর নহে ইহা বলিলে কোন ক্ষতি হইত না ২২

এইরূপ আধর্ধাতুকে ‘ইওয়া’ অর্থে ✓অ স্ ধাতুর স্থানে ✓ভূ (২. ৪. ৫২) ২৩, ‘বলা’ অর্থে ✓ক্র ধাতুর স্থানে ✓ব চ্ (২. ৪. ৫৩) ২৪, ও ✓চ হ্ ধাতুর স্থানে ✓ধ্যা (২. ৪. ৫৪) ২৫ গতার্থক ✓অ জ্ ধাতু স্থানে ✓বী (২. ৪. ৫৬-৫৭) ২৬, এবং ‘ভোজন’ অর্থে ✓অ দ্ ধাতু স্থানে লিট্-প্রভৃতিতে ✓ঘ স্ আদেশ (২. ৪. ৩১-৪০) ২৭ সম্ভব নহে।

✓পা স্থানে পি ব, ✓ভ্রা স্থানে জি ব্র, ✓স্থা স্থানে তি ঠ আদেশ হয় (৭. ৩. ৩৮), ইহা না বলিয়া ঐ কয়টি ধাতু অভ্যন্ত বা দ্বিকৃত হয় ইহা বলিলেই ঠিক হইত।

১৪। প থি হইতে বৈদিক ভাষায় প্রথমবার বহুবচনে প থ য়, এবং বঙ্গীর বহুবচনে প থী নাং পদ পাওয়া যায়।

১৫। আবার প থ শব্দও আছে যেমন প থে স্থা (৫. ৫০. ৩; ১০. ৪০. ১৩) ‘যে পথে থাকে’। অতি প্রাচীন ভাষায় (ঋগ্বেদে) আমরা প স্থা শব্দও পাই, বস্তুত ইহা হইতে প্রথমবার একবচনে প স্থাঃ, বহুবচনেও প স্থাঃ, এবং দ্বিতীয়বার একবচনে প স্থা ম্ পদ পাওয়া যায়।

১৬। পার্শ্বিনি, ৭. ১. ৮৫-৮৮।

১৭। জরায় জরস্ অন্ততবতাম্। ৭. ২. ১০১।

১৮। মঘবা বহুলম্। ৬. ৪. ১২৮।

১৯। অবর্ণস্তসাবনঞঃ। ৬. ৪. ১২৭।

২০। ইণো গা লুঙি।

২১। গৌ গমি রববোধনে। সনি ৭।

২২। অধ্যয়নার্থক ✓ই ধাতুরও গৃহ্যত্ব এইরূপ। ইডন্ত। গাঙ্ লিটি। বিভাষা লুঙ্ লঙোঃ। শৌ চ সশ্চঙোঃ। ২. ৪. ৪৮-৫১।

২৩। অন্তেভূঃ। কিন্তু বৈদিক ভাষায় লিটে অা স্, অা স্ তুঃ; অা স্, ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। আবার লৌকিক সংস্কৃতে ঈহাম্-অা স্, ইত্যাদিও স্পষ্টপ্রসিদ্ধ।

২৪। ক্রবো বচিঃ।

২৫। চক্ষিঙঃ খ্যাঞ্। বা লিটি। ২. ৪. ৫৫।

২৬। অজ্জের্বাঞপোঃ। বা যৌ।

২৭। অদো জঙ্ঘির্ন্যপুতি কিত্তি। লুঙ্ সনোর্বস্। ইত্যাদি।

ধাতুপাঠে ও ব্যাকরণে জ ক্, জা গৃ, দ রি ত্রা, চ কা স্ (দী দী ও বে বী) এই কয়টিকে স্বতন্ত্র ধাতু স্বীকার করিয়া ইহাদিগকে অভ্যন্ত সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে (৬.১.৬)২৮। কিন্তু অভ্যন্ত সংজ্ঞা কেন? অভ্যন্ত বলিলেই তো হইত। √ঘ স্ ধাতুর অভ্যাস-ব দ্বিত্ব করিয়া জ ক্; এইরূপ √গৃ হইতে জা গৃ, √ত্রা হইতে দ রি ত্রা, √কা স্ হইতে চ কা স্, (√দী হইতে √দী দী, √বী হইতে বে বী) ইহা বলিলেই চণিত। জ ক্ প্রত্যয়কে আমরা ধাতু বলিতে পারি না। কারণ শব্দের যে অংশকে আর ভাগ করা চলে না তাহাকেই আমরা ধাতু বলি। কিন্তু জ ক্ প্রত্যয়কে ভাগ করা চলে। ইহাদের অন্তর্গত √শা স্ ধাতুর অভ্যন্ত সংজ্ঞা সমর্থন করা যাইতে পারে।

বলা হইয়াছে √দৃ শ্ স্থানে প ঙ্ (< √স্প শ্) আর √স্ স্থানে ধা ব আদেশ হয় (৭.৩.১৮), কিন্তু √স্প শ্ ও √ধা ব্ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধাতু। √স্প শ্ হইতে স্প ঙ্, স্প শ (‘চর’), ও প স্প শা (ব্যাকরণ-মহাত্মায্যের প্রথম আঙ্কিক) পদ লৌকিক সংস্কৃতে আমাদের পরিচিত। √ধা ব্ ধাতুও সকলের জ্ঞান। √দা হইতে দ দ্য তি প্রত্যয় হইতে পারে, ইহার স্থানে য চ্ছ আদেশ সঙ্গত মনে হয় না, ইহা হইতেছে √য স্ হইতে, যেমন √গ স্ হইতে হইয়াছে গ চ্ছ তি। কি করিয়া এখানে চ্ছ দেখা দিল তাহা এখানে ব্যাখ্যা করিয়া কাজ নাই; উহা ভাষাতত্ত্বের বিষয়, তাহা আমরা আলোচনা করিতেছি না।

√ব ধ্ ধাতুর পদ বৈদিক^{২৯} ও লৌকিক সংস্কৃতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। √হ ন্ ধাতুও খুব প্রসিদ্ধ। তাহা হইলেও √হ ন্ ধাতুর স্থানে কখন কখন^{৩০} √ব ধ্ আদেশ করা হইয়াছে।

বৈয়াকরণগণ বলেন, অ (নঞ), হ্রস্ব, ও হ্র শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস হইলে প্র জা ও মে ধা শব্দ বন্ধাক্রমে

প্র জ স্ ও মে ধ স্ হয়।^{৩১} যেমন হ্র প্র জ স্, হ্র মে ধ স্ ইত্যাদি। ইহা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা যেমন প্র জা শব্দ আছে, তেমনি প্র জ স্ শব্দও আছে, সেইরূপ যেমন মে ধা শব্দ আছে, তেমনি মে ধ স্ শব্দও আছে। পাণিনি নিজের ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যথেষ্ট (১, ১৩৮. ৩২) আছে বহু প্র জ স্ (“বহুপ্রজা নিষ্ঠাতিমাবিবেশ”)।^{৩২}

এইরূপ ধ ম্ ও ধ ম্ ন্ (“তানি ধ ম্ ণি প্রথমাভ্যসন্”; “অতো ধ ম্ ণি ধারয়ন্,”—ঋগ্বেদ, ১. ২২ ১৮ ই; ইত্যাদি ইত্যাদি) উভয়ই আছে। প্রিয় ধ ম্ ন্, কল্যাণ-ধ ম্ ন্ ইত্যাদি স্থলে ধ ম্ ন্ শব্দেরই সহিত সমাস, ধ ম্ শব্দের সহিত নহে। অতএব এরূপ স্থলে ধ ম্ শব্দের পর অ ন্ প্রত্যয় হয়,^{৩৩} ইহা বলিবার কোন কারণ নাই।

গাভীর ‘পালান’ অর্থে উ ধ স্ ও উ ধ ন্^{৩৪} এই উভয় শব্দই যখন পাওয়া যায় তখন বহুব্রীহি সমাসে উ ধ স্ শব্দ স্থানে উ ধ ন্ আদেশ হয়,^{৩৫} ইহা না বলিলেই ভাল হইত।

‘ধৃ’ অর্থে ধ হ্র স্ ও ধ হ্র ন্ শব্দ বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে চলে। অতএব বহুব্রীহি সমাসে ধ হ্র স্ শব্দ স্থানে ধ হ্র ন্ আদেশ হয়।^{৩৬} এইরূপ বলার কোন লাভ নাই, বরং ক্ষতি আছে।

৩১। কথাটা ঠিক এইরূপ না হইলেও বাহা বলা গিয়াছে তাহার তাৎপৰ্য এইরূপ। মূল কথাটি এই—নিত্যমসি, প্রজামেধয়োঃ। ৫. ৪. ১২২। পূর্বস্বত্রের অল্পবৃত্তি—নঞ, হ্রস্বভাঃ।

৩২। বহুপ্রজঙ্ঘনসি। ৫. ৪. ১৩২।

৩৩। ধর্মাদিনিচু কেবলাৎ। ৫. ৪. ১২৪। ঠিক এইরূপেই জ ঙ্ ও জ ঙ্ ন্ উভয় শব্দই আছে বলিলে পরবর্তী সূত্রটির (জ্ঞাতা স্তরিতভৃগসোমেভাঃ। ৫. ৪. ১২৫) প্রয়োজন হইত না।

৩৪। ঋগ্বেদ, ১. ১৫২. ৬; ইত্যাদি অনেক। বৈদিক ভাষায় কখন-কখন আবার উ ধ স্ শব্দও পাওয়া যায়।

৩৫। উধাসাহনঙ্। ৫. ৪. ১৩১।

৩৬। ধম্বশ্চ। ৫. ৪. ১৩২। সংজ্ঞা বুঝাইলে এই বিধান বৈকল্পিক (বা সংজ্ঞায়াম্। ৫. ৪. ১৩৩)। তাই শত ধ্ হ্রঃ ও শত ধ্ বা হ্রই হইতে পারে।

২৮। জঙ্কিত্যাদয়ঃ ষট্।

২৯। ব ধ তি, ব ধেৎ, ইত্যাদি।

৩০। হনো বধো লিঙি। লু ঙ্টি চ। ২. ৪. ৪২-৪৪।

ব্যাকরণে^{৩৭} বলা হইয়া থাকে উৎস শব্দ স্থানে উপ
হয়, আর তাহার পর -রি ও -স্তাৎ প্রত্যয় হওয়ায় যথাক্রমে
উপরি ও উপরি ঠাৎ পদ হইয়া থাকে। দুয়ের ও
অধিকের মধ্যে কোনটি বেশী নীচে হইলে তাহাকে যেমন
যথাক্রমে অধর ও অধম, অথবা অবর ও অবম
বলা হয়, এইরূপ উচু বৃদ্ধিতে হইলে যেমন যথাক্রমে উত্তর
ও উত্তম বলা হয়, তেমন যথাক্রমে উপর ও উপম
শব্দও হয় উপ শব্দ হইতে। উৎসের সহিত এখানে কোন
যোগ নাই। উপর হইতে উপরি, ইহা হইতে
উপরি ঠাৎ। সম্ভবত উপরে হইতে উপরি, যেমন
বেদে অস্ত্রে হইতে অস্তি।

বলা হয় পশ্চাৎ পদটি নিপাতনে সিদ্ধ। বিশেষ
করিয়া বলা হয়, অপর শব্দের স্থানে পশ্চ হয়, এবং তাহার
পর আৎ প্রত্যয়ে পশ্চাৎ হইয়া থাকে।^{৩৮} আরও বলা
হয় যে, অধ শব্দ পরে থাকিলেও অপর হইয়া থাকে
পশ্চ^{৩৯} এবং এইরূপে হয় পশ্চাধ। এ সবই কল্পনা-
মাত্র। বস্তুত পশ্চ একটি মূল শব্দ, ইহারই পঞ্চমীর এক
বচনে পশ্চাৎ। পশ্চ শব্দ বৈদিক ও লৌকিক উভয়
সংস্কৃতেই প্রসিদ্ধ। বেদে ইহার তৃতীয়ার এক বচনে হয়
পশ্চাৎ^{৪০} পশ্চ হইতে পশ্চিম হয়। এই পদ আমাদের
সকলেরই জানা। কিন্তু কিরূপে ইহা হইল? বার্তিককার
বলিলেন পশ্চাৎ শব্দের উত্তর ইম (“ডিম্চ”) প্রত্যয়
করিয়া।^{৪১} একটা উত্তর দেওয়া হইল, কিন্তু ঠিক উত্তর
ইহা নহে। আসল কথা হইতেছে এই যে, ইহা পশ্চ
শব্দের উত্তর (পশ্চাৎ শব্দের উত্তর নহে) ম (-ইম)
প্রত্যয়েব যোগে হইয়াছে।

৩৭। উপর্যুপরি ঠাৎ। ৫. ৩. ৩১। উৎসোপভাবো
রিলিষ্টান্তিলো চ।—ঐ মহাভাষ্য।

৩৮। পশ্চাৎ। ৫. ৩. ৩২। এই শব্দেরই বা ত্তিকে উক্ত
হইয়াছে—“অপরন্ত পশ্চতাব আতিশ্চ প্রত্যয়ঃ।”

৩৯। “অধে চ। অধে চ পরতোপহপরন্ত পশ্চতাবো
বক্তব্যঃ।” ঐ মহাভাষ্য।

৪০। পশ্চা দধ্যা বো অযন্ত ধাতা। ঋধে দ, ১. ১২৩. ৫।

৪১। অঙ্গাদিপশ্চাড্ ডিম্চ স্তব্ধঃ। অস্ত্রাভেতি বক্তব্যম্।
—৪. ৩. ২৩।

সংস্কৃতে বলা হয় ‘উত্তরাদ্ বসতি’ ‘দক্ষিণাদ্ বসতি’।
ইহাদের অর্থ যথাক্রমে ‘উত্তর দিকে বাস করিতেছে’ ও ‘দক্ষিণ
দিকে বাস করিতেছে।’ উত্তর রাৎ ও দক্ষিণাৎ কি করিয়া
হইল? বলা হইয়া থাকে এখানে উত্তর ও দক্ষিণ শব্দের
উপর আৎ প্রত্যয় করা হইয়াছে। অধরাৎ শব্দ সম্বন্ধেও
এই কথা।^{৪২} ইহা না বলিলেই ভাণ হইত। বস্তুত ঐ
পদগুলি পঞ্চমী বিভক্তির এক বচনে হইয়াছে। প্রয়োগ-
অনুসারে উহাদের অর্থ ব্যাখ্যা করিলেই পর্যাপ্ত হইত।
বলিতে পারা যায় যে, যদিও ঐ সমস্ত পদ পঞ্চমী এক
বচনে হইয়াছে, তথাপি কোন কোন স্থানে তাহার পঞ্চমীর
জ্ঞায় প্রথমা ও সপ্তমীরও অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে।

বলা হয় ‘দক্ষিণেন (এইরূপ উত্তরেণ, অধরেণ)
বসতি’ অর্থাৎ ‘দক্ষিণ দিকে (উত্তর দিকে, নীচেব দিকে)
বাস করিতেছে।’ এখানে দক্ষিণেন কিরূপে হইল?
উত্তর দেওয়া গিয়াছে দক্ষিণ শব্দের উত্তর এন প্রত্যয়ের
যোগে।^{৪৩} বস্তুত এইরূপ স্থলেও দক্ষিণেন ইত্যাদি
তৃতীয়ার এক বচনে। সপ্তমীর অর্থে তৃতীয়ার প্রয়োগ পালি
ও প্রাকৃতেও প্রচুর।

‘দক্ষিণা বসতি,’ ‘উত্তরা বসতি’ (‘দক্ষিণ দিকে
বাস করিতেছে, উত্তর দিকে বাস করিতেছে’)। এইরূপ
স্থলে দক্ষিণা, উত্তরা পদ কিরূপে হ? এই প্রশ্নের উত্তরে
বলা হইয়া থাকে, এখানে ঐ দুই শব্দের পরে আ প্রত্যয়
হইয়াছে।^{৪৪} কিন্তু বস্তুত এখানেও ঐ দুই পদ তৃতীয়ার
এক বচনে হইয়াছে। অথবা বলিতে পারা যায় উহা দক্ষিণা
ও উত্তরা শব্দের সপ্তমী বিভক্তির পদ, যেমন ব্যোম্ নি
অর্থে ব্যোম্ (‘স্বপাৎ স্লুক্’ ৭. ১. ৩৩) অবস্ত
ইহা বৈদিক প্রয়োগ। আমার মনে হয় এখানেও বৈদিক
প্রয়োগই চলিয়া আসিয়াছে।

কখন কখন প্রয়োগ করা হইয়া থাকে ‘দক্ষিণা হি
বসতি,’ ‘উত্তরা হি বসতি’ (‘দক্ষিণ দিকে বাস করিতেছে,
উত্তর দিকে বাস করিতেছে’)।

৪২। উত্তরাধরদক্ষিণাদতিঃ। ৫. ৩. ৩৪।

৪৩। এনবস্ত্রতরন্ত্রামদুবেহপঞ্চম্যাঃ। ৫. ৩. ৩৫। এই শব্দ-
অনুসারেই অন্তর বলিতে হইয়াছে—‘এনপা দ্বিতীয়া। ২. ৩. ২১।

৪৪। দক্ষিণাদাচ। ৫. ৩. ৩৬। উত্তরাচ। ৫. ৩. ৩৮।

উত্তর দিকে বাস করিতেছে)। ব্যাকরণে বলা হইয়াছে দক্ষিণ ও উত্তর শব্দের পরে আ হি প্রত্যয় করিয়া ঐ পদ দুইটি হইয়াছে।^{৪৫} কিন্তু মনে করা নাইতে পারে যে, তৃতীয়ার এক বচনে (অথবা পূর্বোক্তরূপে সপ্তম্যার্থে) নিম্ন দক্ষিণ ও উত্তর শব্দের পর হি শব্দ যোগ করায় ঐ পদ দুইটি হইয়াছে। পূর্বে দক্ষিণ ও উত্তর শব্দ স্বতন্ত্র ছিল, হি শব্দও স্বতন্ত্র ছিল, পরে আর স্বতন্ত্র গণ্য না হইয়া তাহারা যথাক্রমে দক্ষিণ হি, উত্তর হি এইরূপ এক-একটি শব্দে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। ন আর হি (উভয়ই উদাত্ত) দুইটি স্বতন্ত্র পদ, কিন্তু বৈদিক ভাষাতেই দেখা যায় ন হি একটি পদ হইয়া গিয়াছে। একটি পদ হইয়াছে ইহার প্রমাণ এই যে, ন হি শব্দের কেবল হি হইতেছে উদাত্ত। (একটি পদের মধ্যে একটি মাত্র স্বব উদাত্ত হয়।) এইরূপ ন ও ই দ্ (উভয়ই উদাত্ত) একত্র মিলিয়া নে দ্ হইয়া গিয়াছে। লৌকিক সংস্কৃতির চে দ্ (চে ৭) হইতেছে বস্তুত চ ও ই দ্ এই উভয়ের মোগে। উত্তর শব্দের উকার ছিল উদাত্ত, কিন্তু উত্তর হি শব্দের কেবল আকার উদাত্ত। ইহাতে বুঝা যায় এই শব্দটি একটি পদ, স্বতন্ত্র দুইটি পদ নহে। দক্ষিণ হি সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

ব্যাকরণে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব, অধর, ও অবর শব্দের উত্তর অস্ ও অস্তা ৭ প্রত্যয় হয়, এবং তাহা হইলে উহাদের স্থানে যথাক্রমে পূর্ব, অধ, ও অবস্

আদেশ হয়।^{৪৬} এখানে বক্তব্য এই যে, যদি ভাষার দিকে লক্ষ্য করা যায় তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে, অস্তা ৭ ('অস্তাতিঃ') প্রত্যয় না বলিয়া আমাদের তা ৭ (অথবা ব্যাকরণের রীতিতে তা তি) প্রত্যয় বলা উচিত। নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যাইবে—
প্রাক্তা ৭, উদক্তা ৭, তাব ৭ তা ৭; আবার আরা ৭ তা ৭, উত্তরা ৭ তা ৭, পরাকা ৭ তা ৭; আবার পশ্চা ৭ তা ৭। আমবা ইহাও পাই—পূরতা ৭, অধস্তা ৭, অবস্তা ৭; তাছাড়া পরস্তা ৭, বহিষ্ঠা ৭, আর ইহারই সাদৃশ্বে উপরিষ্ঠা ৭। পুরস্, অধস্, ও অবস্ (বৈদিক) প্রসিদ্ধ, পরস্ শব্দও প্রসিদ্ধ (যেমন লৌকিক সংস্কৃতে পরঃ শত, পরঃ সহস্র শব্দে), বহিস্ শব্দও সকলের জানা। ইহাদের উত্তর - তা ৭ প্রত্যয় করিলে ঐ পূর্বোক্ত পদগুলি সিদ্ধ হয়। পুরস্, অধস্, ও অবস্, না ধরিয়া যথাক্রমে পূর্ব - অস্, অধ - অস্ ও অব - অস্ কল্পনাটা বড় বেশী বলিয়া মনে হয়। তবে পূর্ব - অস্ ইহার অল্পকালে বোধ হয় কিছু বলা যায়, তুলনীয়—পূরা (পূর্ব - আ), পূর্বব (পূর্ব - ব)। অধ ও অধস্ দুই-রূপই আছে। অধর, অধম এই দুই শব্দে আমরা অধ পাই। তেমনি অব ও অবস্ দুইই আছে। অবর ও অবম শব্দে অব পাওয়া যায়। তাছাড়া অব উপসর্গ স্প্রসিদ্ধ।

এবার এখানেই শেষ করা যাউক। বারান্তরে আরও কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

৪৫। আহি চ দূরে। ৫. ৩. ৩৭। উত্তরাচ। ৫. ৩. ৩৮।

৪৬। পূর্বাধরাবরাণামসি পূর্বধবশ্চৈবাম্। অস্তাতি চ। বিভাবাববস্ত। ৫. ৩. ৩৯-৪১।



হুট্ট মোক্তারের সওয়াল

শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইঙ্গ্রাজের রাজত্বের যজ্ঞের সমারোহের মধ্যে কুৎসন্ত্রের স্থচনা হইয়াছিল, জেতায় লঙ্কাকাণ্ডের স্থচনাও রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের সমারোহের মধ্যে। পুষ্পনগরের মর্দঙ্গলনিবাসী কীটের মত এক একটা সমারোহের আনন্দ-কোলাহলের অন্তবালে লুকাইয়া থাকে অশান্তির স্থচনা। কঙ্কণ গ্রামেও একটি অল্পরূপ ঘটনা ঘটয়া গেল। কঙ্কণ গ্রামের ধনী অধিবাসীদের দানে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারই উদ্বোধন-অহুষ্ঠানের সমারোহ উপলক্ষে হুট্ট মোক্তারের সহিত কঙ্কণার বাবুদের বিবাদ বাধিয়া উঠিল।

বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম কঙ্কণ, কঙ্কণার ধনের প্রসিদ্ধি এ দেশে বহু বিস্তৃত এবং বহু প্রসিদ্ধ। দূর হইতে কঙ্কণার দিকে তাকাইলে কঙ্কণাকে পল্লীগ্রাম বলিয়া মনে হয় না; কোন বিশিষ্ট শহরের অভিজাত পল্লী বলিয়া মনে হয়। বহুকাল হইতে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, কঙ্কণায় না কি মা-লক্ষ্মী বাঁধা আছেন। কোন অতীত কালে মা-লক্ষ্মী ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন; সহসা তাঁহার হাতের কঙ্কণ খসিয়া পথের ধুলার মধ্যে পড়িয়া যায়, সেই কঙ্কণের মমতায় আত্মও তিনি কঙ্কণ গ্রামের মধ্যে ঘুরিতেছেন। কঙ্কণ হইতেই গ্রামের নাম কঙ্কণ।

প্রবাদ চিরকাল প্রবাদই, কিন্তু প্রবাদ রটিবার একটা হেতু সর্বত্রই থাকে, এ ক্ষেত্রেও হেতু একটা আছে। কঙ্কণ গ্রামের মুখুজ্জব বাংলা দেশের মধ্যে খ্যাতিমান ধনী। বাংলাব বহু স্থানেই তাঁহাদের টাকা ছড়ান আছে। বহু জমিদার-পরিবাহী মুখুজ্জবের ঞ্গণদায়ে আবদ্ধ। তাহার উপর মুখুজ্জবরা নিজেবাও জমিদার।

মুখুজ্জব-পরিবাহ এখন জনে বহুবিদ্যুত কিন্তু তাহাতেও তাহাদের ধনের পরিমাণ কমে নাই। সম্ভতিবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হুদও সমানে বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকে অবশ্য বলে,

মুখুজ্জবের সিন্দুক টাকার বাচ্চা হয়, কিন্তু সেটাও প্রবাদ। কঙ্কণাব বাবুদের হুদের কারবার লক্ষ লক্ষ টাকার।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এমন একখানি ধনীর গ্রাম তবুও গ্রামের মধ্যে না-আছে জ্বল, না-আছে ভাস্করখানা, এমন কি হাট-বাজার পর্যন্ত নাই। থাকিবার মধ্যে আছে থান-দুই মিষ্টির দোকান, কিন্তু মুড়ি-মুড়কি মজা-বাতাসা ছাড়া আর কোন কিছু দোকানে পাওয়া যায় না। অন্য কোন মিষ্টায় রাখিতে বাবুদের নিষেধ আছে, দোকানীরাও রাখে না।

বাবুবা বলেন, ‘মিষ্টি থাকলেই ছেলেরা থাকে, আর মিষ্টি খেলেই ছেলেদের পেটে কুমি হবে।’

দোকানী বলে, ‘আজ্ঞে সবই ধার, রেখে কি করব বলুন। খাজনায় আর কত কাটান যাবে। তা ছাড়া আমার দোকানে বাকী বাড়লে বাবুদের খাতায় খাজনার হুদ বাড়বে।’

হাটের কথায় কঙ্কণার বাবুবা বলেন—‘হাট তো হ’ল লক্ষ্মী নিয়ে বেসাতি। মা-লক্ষ্মী চঞ্চলা হবেন যে!’ জ্বলের কথায় তাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, বলেন, ‘সর্বনাশ! মায়েব সতীন ঘরে আনব। ছেলেরা বাইরে লেথাপড়া শিখে আত্মক, কিন্তু কঙ্কণায় সরস্বতীর আসন বসান হবে না।

ভাস্করখানার বিরুদ্ধেও এমনই ধারা যুক্তিতর্ক নিশ্চয় প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে যুক্তিতর্ক জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট টিকিল না। সাহেবের আদেশে বাবুদের চাঁদায় কঙ্কণায় এক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

সেই দাতব্য চিকিৎসালয় উদ্বোধনের দিন। সে এক মহাসমারোহের অহুষ্ঠান। ভাস্করখানার নূতন বাড়ী-খানির সম্মুখেই চাঁদোয়া খাটাইয়া দেবদারুপাতা ও রঙীন কাগজের মালায় মণ্ডপ সাজান হইয়াছে। থানার জমাদাব-বাবু হইতে জেলার জজ-ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সকলেই

আসিয়াছেন। সদরের ও মহকুমার উকীল-মোক্তারও অনেকে উপস্থিত আছেন। ভালকুটি গ্রামের মুচিদের ব্যাঙ বাজনা পর্যন্ত ভাড়া করা হইয়াছে। আবাহন, বরণ, পুষ্পবর্ষণ, মাগ্যদান, স্তবগান শেষ হইতে হইতেই করতালিধ্বনিতে আসর বেশ জমিয়া উঠিল। সভ্য-মণ্ডলের একটা দিক্ অধিকার করিয়া সারি সারি চেয়ারে চোঁগা চাপকান পাগড়ী আখটি চেন ঘড়িতে স্থশোভিত হইয়া মুখ্জে-কর্তারা বসিয়া আছেন। কয় জন তরুণবয়স্কের পরিধানে ছোট কোট টাই, চোখে চশমা। কর্তারা প্রত্যেক অঙ্গষ্ঠানের শেষে ঘাড় নাড়িয়া মুহু মুহু হাসিতেছিলেন।

অন্তঃপর আসিল বক্তৃতা-পর্ব। এইবার আসরটা যেন ঝিমাইয়া পড়িল। দেখা গেল সকলেই হাততালি দিবার লোক—বক্তৃতা দিবার লোক কেহ নাই। অবশেষে জেলার কোজদারী আদালতের এক জন উকীল উঠিয়া এই কল্যাণিত বংশটিকে কল্পতরুর সহিত তুলনা করিয়া বেশ নিনিকটা বলিয়া আসরের মানরক্ষা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে করতালি-ধ্বনিতে আসর যেন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

তার পর সভা আবাব নিস্তব্ধ। সভাপতি জেলার জজসাহেব চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন—‘বলুন, কেউ যদি কিছু বলবেন।’

কেহ সাড়া দিল না।

আবার সভাপতি বলিলেন, ‘বলুন, বলুন যদি কেউ বলতে চান।’

রামপুত্র মহকুমার বৃদ্ধ মুন্সেফ বাবু এবার হুটুবাবুকে অগ্ররোধ করিলেন, ‘হুটুবাবু, আপনি কিছু বলুন।’

হুটুবাবু (হুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়) রামপুর মহকুমার মোক্তার, সমবয়সী না হইলেও হুটুবাবুর সহিত মুন্সেফ বাবুর ঘনিষ্ঠ হৃদয়তা। হুটুবাবু হাতজোড় করিয়া বলিলেন, ‘মাফ করবেন আমাকে।’

সভাপতি কিন্তু মাফ করিলেন না, তিনি অগ্ররোধ করিয়া বলিলেন, ‘না-না, বলুন না কিছু আপনি।’

হুটুবাবু এবার মোটা ছদ্মভূমি চাদরখানা খুলিয়া চেয়ারের হাতলের উপর রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর আরম্ভ করিলেন, ‘সভাপতি মহাশয়, এবং মহাশয়গণ, আপনারা সকলেই বোধ হয় জানেন যে শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর তার

মুখে প্রথমে দেয় মধু। লোকে বলে, আমার মা না কি আমার মুখে নিমফুলের মধু দিয়েছিলেন। আমার কথাগুলো বড় তেতো। সেই জন্তেই আমি কোন কিছু বলতে নারাজ ছিলাম। তবে ভরসা আছে ব্যঙ্গনের মধ্যে উচ্ছেরও একটা স্থান আছে এবং দেহে রসাদিক্য হ’লে তিক্তভক্ষণই বিধেয়, সেই জন্তেই বসন্তে নিষভক্ষণের ব্যবস্থা। ককণা-গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হ’ল আমাদের ধনী মুখ্জে বাবুদের দানে, খুব সুখের কথা আনন্দের কথা—ভাল অবস্থা বলতেই হবে। কিন্তু আমার বার-বার মনে হচ্ছে, এ হ’ল গরু মেরে জুতো দান আর জুতো-জোড়াটা ঐ মরা গরুর চামড়াতেই তৈরি। এ অঞ্চলের সেচের পুকুরের সেচ বন্ধ করেছেন এই বাবুরা—ফলে অজন্মাহেতু অনাহারে চাষী আজ দুর্ভিক্ষ—রোগের সহজ শিকার হয়েছে। সুদের হুদ তস্য হুদ তাদের কাছ থেকে আদায় ক’রে তাদের পথে বসিয়ে—।’

সমস্ত সভাটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সভায় উপস্থিত মুখ্জে বাবুরা বসিয়া বসিয়া ঘামিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের হাসি তখন কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহারা পাষাণ-মূর্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের দিকে চাহিয়া সভাস্থ ভক্ত-মণ্ডলীও কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন।

হুটুবাবু তখন অনেকটা অগ্রসব হইয়াছেন, তিনি বলিতে-ছিলেন—‘আমার পূর্বের বক্তা মহাশয় এঁদের কল্পতরুর সঙ্গে তুলনা করলেন। আমার মনে হয় তিনি এঁদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসিকতা করেছেন, কারণ বাস্তব সংসারে কল্পতরু অলীক বস্তু—আকাশ-কুসুমের পুষ্পাঞ্জলির মতই হাস্যকর। আমার মনে হয় এঁদের তুলনা হয় একমাত্র খেজুরগাছের সঙ্গে। মেসোপটেমিয়ার খেজুরগাছ নয়—আমাদের খাঁটি দেশী জাঁটিনার খেজুরগাছের সঙ্গে। তলায় ব’লে ছায়া কেউ কখনও পায় না, ফল—তাও জাঁটিনার, আর আলিঙ্গন করলে ত কথাই নেই, একেবারে শরশয্যা। এঁদের সুদের হার চক্রবৃদ্ধি হারে, এঁদের প্রজ্ঞাব জন্তে বরাদ্দ দোকানে বরাদ্দ—আধ পয়সার মুড়ি, আধ পয়সার বাতাসা, আর কেউ যদি কাকুতি-মিনতি ক’রে সুদ-মাফের জন্তে জড়িয়ে ধরে তবে কথার কাঁটায় তার শরশয্যাই হয়। তবে ভরসার মধ্যে

আমাদের ‘হৈসো’—খেজুরগাছের গলা কাটবাব জন্তে খাঁটি ইম্পাতে তৈরি অস্ত্র—এই এঁরা।”

হুট্টাবু এবার সরকারী কর্মচারীবৃন্দের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, এটা বলা হইতেছে তাঁহাদিগকে।

“খেজুরগাছের কাছে রস আদায় করতে হ’লে হৈসো না হ’লে হয় না। হৈসো চালালে গল্ গল্ ক’রে মিষ্ট রসে খেজুরগাছ কলসী পূর্ণ ক’রে দেয়। আজ তেমনই এক কলসী রস আমাদের বিলাতী গান-মেওয়া কানুনগরী হৈসো এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের কল্যাণে এ চাকলার লোকে পেয়েছে, তাতে তাদের বুকফাটা তৃষ্ণার খানিকটা নিবারণ হবে। এ জন্তে হৈসো এবং খেজুরগাছ দু-তরফকেই ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।”

হুট্টাবু বসিলেন। কিন্তু করতালিঙ্গানি বিশেষ উঠিল না, মাত্র কয়টা অবোধ ছেলে সোৎসাহে হাততালি দিয়া উঠিল। এতক্ষণে সভাস্থ সকলে হাতের উপর বারকয়েক হাত নাড়িলেন, কিন্তু শব্দ তাহাতে উঠিল না। তার পর সভা-প্রাঙ্গণ নিঃশব্দ, সকলেই কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছিলেন। সমস্ত সভাটা বায়ুপ্রবাহহীন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষারাত্রির মত ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে। মুখ্জে বাবুরা মাথা হেঁট করিয়া রুদ্ধ রোষে অঙ্গগরের মত স্থলিতেছিলেন। কোন মতে সভা শেষ হইয়া গেল, অভ্যাগতরা সকলে বিদায় হইয়া গেলেন, তার পর মুখ্জেরা মাথা তুলিলেন। মাথা তুলিলেন বিষম অঙ্গগরের মতই—হুট্ট মোক্তারকে ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাবা আপন আপন অন্তরে প্রবেশ করিলেন।

* * *

সংবাদটা কিন্তু হুট্টাবুর নিকট অজ্ঞাত রহিল না, যখন সময়ে রামপুরে বসিয়াই তিনি কঙ্কণার সংবাদ পাইলেন। বুদ্ধ মূলেকবাবুই তাঁহাকে সংবাদটা দিলেন, কথাটা তাঁহারই কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সংবাদ শুনিয়া হুট্টাবু হাসিয়া হাতজোড় করিয়া কাহাকে প্রণাম জানাইলেন।

মূলেকবাবু বলিলেন, ‘বাবুদের প্রণাম জানাচ্ছেন না কি?’

—না, মহর্ষি দুর্কাসাকে প্রণাম জানালাম।

—তা হ’লে বলুন নিজেকেই নিজে প্রণাম করলেন, লোকে ত আপনাকেই বলে কলিযুগের দুর্কাসা।

হুট্টাবু বলিলেন, ‘না। তা হ’লে কোন দিন লক্ষ্মীর দস্ত চূর্ণ করবার জন্ত সাগরতলে তাকে আবার একবার নির্কাসনে পাঠাতাম।’

* * *

হুট্ট মোক্তার ঐ এক ধারা মাছ। তিনি যে সেদিন বলিয়াছিলেন, ‘আমার ম আমার মুখে নিমেষ মধু দিয়েছিলেন’ সে কথাটা তাঁহার অতিরঞ্জন নয়, কথাটা না হউক তাঁহার ইঙ্গিতটা নিঃসন্দেহ। বালাকাল হইতেই ঐ তাঁহার স্বভাব।

প্রথম জীবনে বি-এ পাস করিয়া হুট্টাবু স্কুল-মাষ্টারী গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে মনে ক’মনা ছিল শিক্ষকতার একটি আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়া যাইবেন। কিন্তু ঐ স্বভাবের জন্তই তাঁহার সে কামনা পূর্ণ হয় নাই, শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া মোক্তারী ব্যাসায় অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন।

ঘটনাটা ঘটয়াছিল এইরূপ : সে-বার পূজার সময় তাঁহার গ্রামের ধনী এবং জমিদার চাটুজ্জেরদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া তাঁহার স্ত্রী নাদিয়া কেলিয়া বলিল, ‘আর আমি কোথাও নেমস্তন্ন খেতে যাব না।’

হুট্টাবু কি একথানা বই পড়িতেছিলেন, তিনি মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন—‘কেন?’

এ ‘কেন’র উত্তর তাঁহার স্ত্রী সহজে দিতে পারিল না, বলিতে গিয়া বার-বার সে কাঁদিয়া ফেলিল। বিরক্ত হইয়া হুট্টাবু বই বন্ধ করিয়া ভাল করিয়া উঠিয়া বসিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া বহু কষ্টে অন্তশেষে জানিলেন, তাঁহার স্ত্রী দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রামের বক্রিফু ঘরের সালকারা বধূদের পংক্তিতে খাইতে বসিয়াছিল, ফলে পরিবেশনের প্রতিটি দফাতেই সে অপমানিত হইয়াছে। যে ভাবে গৃহকর্ত্রী ও দাসীর প্রতি প্রত্যক্ষেই হই ধারাব ব্যবহার হইয়া থাকে সেই ভাবেই সে দাসীর মত ব্যবহারই পাইয়াছে।

হুট্টাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; তার পর আপন মনেই বলিলেন—দুর্কাসা মিথ্যে তোমায় অভিসম্পাত দেয় নি। সে ঠিক করেছিল।

তাঁহার জী কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর মূখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। ছটুবাবুর দৃষ্টি তাহার মূখের উপর নিবদ্ধ হইতেই সে আবার কাদিয়া ফেলিল।

ছটুবাবু বলিলেন, ‘আচ্ছা, দুটো বছর সময় আমাকে দাও। এর প্রতিকার আমি করব।’

তাঁহার পরই তিনি মোক্তারী পরীক্ষার ক্ষমত প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিলেন। এক বৎসরেই মোক্তারী পাস করিয়া তিনি রামপুর মহকুমায় প্র্যাকটিস আরম্ভ করিয়া দিলেন। তৃতীয় বৎসরের পূজায় সধবা-ভোজনের সময় একটা অতাবনীয় কাণ্ড ঘটয়া গেল। মাছ পরিবেশন চলিতেছিল, পরিবেশক ছটুবাবুর জ্বর পাতার নিকট আসিতেই সে প্রকাণ্ড একটা টাকার তোড়া কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়া সশব্দে নামাইয়া দিয়া বলিল, ‘এই এঁদের সমান গহনাই আমার হবে, এই তার টাকা। এখন ওঁদের সমান মাছ আমাকে না দাও—একখানার চেয়ে কম আমাকে দিও না।’

পরিবেশকেব হাত হইতে মাছের বালতিটা ধসিয়া পড়িয়া গেল। তার পর গ্রাম জুড়িয়া দেশ জুড়িয়া সে এক তুমুল আন্দোলন। লোকে ছটুবাবুকেই দোষ দিয়া ক্রান্ত হয় নাই তাহার উদ্ধতন পুরুষগণকেও দোষ দিয়া বলিয়াছিল, বিছুরটির ঝাড়—গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত সর্বোচ্চে হল। জালা-ধরান ওদের স্বভাব।

ছটুবাবুর পিতামহ ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত লোক, কিন্তু পাণ্ডিত্যের খ্যাতির তুলনায় অগ্রিয় সত্য ভাষণের অখ্যাতি ছিল বেশী। সে-আমলের কোন এক রাজবাড়ীতে ভ্রাতৃ উপলক্ষে শাস্ত্র-বিচারের আসরে সুবরাজ তাঁহার নাসিকাগ্র প্রবেশ করাইয়া কোড়ন দিতে দিতে গীতার একটা শ্লোক আওড়াইয়া উঠিয়াছিলেন—‘মশায়, স্বয়ং ভগবান বলে গেছেন, যদা যদাহি ধর্মশস্ত্র—’

ছটুবাবুর পিতামহ বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, ‘জিহ্বার জড়তা দূর হয় নি আপনার, আরও মার্জনা দরকার, যদা যদা নয়, যদা যদা।’

ছটুবাবুর পিতার নাম ছিল ‘কুনো কালিপ্রসাদ’। তিনি বিজ্ঞান বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন না বা অন্য কোন বিশেষত্বও তাঁহার ছিল না। সমাজে তাঁহার কোন প্রতিষ্ঠাও হয়

নাই, সেজন্ত দাবিও কোন দিন তিনি করেন নাই। কিন্তু সমস্ত জীবনটা তিনি ঘরের কোণে বসিয়াই কাটাঁইয়া গিয়াছেন। শত্রুতা তিনি কাহারও সহিত কোন দিন করেন নাই, কিন্তু তবু লোকে বলিত—কি অহংকার লোকটার।

যাক, ওসব পুরাতন কথা।

ছটুবাবু কঙ্কণার জমিদারদের শপথের কথা শুনিয়া বিচলিত হইলেন না। এদিকে কঙ্কণার বাবুরা তাঁহাদের চিরাচরিত প্রথা প্রতিশোধ গ্রহণের পন্থা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চর বিফলমনোরথ হইয়া কিরিয়া সংবাদ দিল ছটুবাবুর ঞ্জ কোথাও নাই। বাবুরা সংবাদ লইতে-ছিলেন কোথায় কাহার কাছে ছটু মোক্তারের হাওনাট বা তমহুক আছে। থাকিলে সেগুলি কিনিয়া ঞ্জজালে আবদ্ধ ছটুকে আয়ত্ত করিয়া তাহাকে বধ করিতেন।

মুখুজ্জদের বড়কর্তা অনেকক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া তাঁহার কর্মচারীকে প্রহর করিলেন, ‘লাট কমলপুরের জমিদারদের এখন অবস্থা কেমন?’

কমলপুরেই ছটুবাবুর বাড়ী, তাঁহার জমিজমা, পুকুর, বাগান যাহা কিছু সম্পত্তি সমস্তই কমলপুরের এলাকার মধ্যে সরকার উত্তর দিল, ‘অবস্থা অবিশ্রু তেমন ভাল নয়, তবে ওই চলে যায় কোন বকমে সব। ছোট এক ঘরের অবস্থা একেবারেই ভাল নয়।’

কর্তা বলিলেন, ‘তবে কিনে কেল তাদের অংশ। টাকা বেশী লাগে লাগুক। ই্যা, তবে আমাদের সকল সবিককে, একবার জিজ্ঞাসা কর।’

* * *

মাস-চারেক পর।

সন্ধ্যার সময় ছটুবাবু সন্ধ্যা উপাসনা করিতেছিলেন। তাঁহার জী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছটুবাবু কিন্তু দেখিয়াও দেখিলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া জী বলিল, ‘ওগো, কমলপুর থেকে আমাদের মহাভারত মোড়ল এসেছে।’

ছটুবাবু চোখ বুজিয়া ধানে বসিলেন।

জী বলিল, ‘তাকে না কি কঙ্কণার বাবুরা মারধর করেছে, তার পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে নিয়েছে, গরুগুলো খোঁয়াড়ে দিয়েছে।’

হুট্টাবু মুদ্রিত নেজেই নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার জী এবার বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল। নিয়ম-মত সন্ধ্যা উপাসনা শেষ করিয়া হুট্টাবু উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া জীকে বলিলেন, ‘কই দুধ গরম হয়েছে?’

জী আসিয়া দুধের বাটি নামাইয়া দিল, হুট্টাবু বলিলেন, ‘দেখ ভগবানকে যখন মাহুধ ডাকে তখন তাকে চঞ্চল করতে নেই।’

জী বলিল, ‘বেচারার যে হাপুস নয়নে কান্না; আমি আর থাকতে পারলাম না বাপু। মুখের খাবার বেচারার চোখের জলে নোস্তা হয়ে গেল।’ মুখ ধুইয়া পান মুখে দিয়া হুট্টাবু বাহিরের ঘরে আসিতেই মহাভারত তাঁহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল। হুট্টাবু তাহার হাতে ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, ‘ওঠ ওঠ। কি হয়েছে আগে বল, তার পর কাদবে।’

মহাভারতের কান্না আরও বাড়িয়া গেল।

হুট্টাবু এবার অভ্যস্ত কঠিন স্বরে বলিলেন, ‘বলি, উঠবে না কি?’

কঠোরের রুচতায় ও কথার ভজিমায় মহাভারত এবার সসঙ্কোচে উঠিয়া বসিয়া কল্পণভাবে চোখের জল মুছিতে আরম্ভ করিল।

হুট্টাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, ‘কি হয়েছে বল!’

—আজ্ঞে, কঙ্কণার বাবুরা আমাব পুকুরের সমস্ত মাছ— এই হালি পোনা তিন ছটাক, এক পো ক’রে—।

—তিন ছটাক, এক পো এখন বাদ দাও। তোমাব পুকুরের সমস্ত মাছ কি হ’ল তাই বল!

—আজ্ঞে, জোর ক’রে বাবুবা ধরিয়ে নিলেন।

—তার পর?

এ প্রশ্নে মহাভারত অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হুট্টাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, ‘আর কি করেছেন?’

—আজ্ঞে, আমাব গরু-বাছুর সব জোর ক’রে ধ’রে খোঁয়াড়ে দিয়েছেন।

—আর?

এবার মহাভারত আবাব ফোপাইয়া কাদিয়া উঠিল,

কাদিতে কাদিতেই বলিল, ‘চাপরাসী দিঘে ধরে বেঁধে আমাকে—।’

আর সে বলিতে পারিল না।

হুট্টাবু বলিলেন, ‘হুঁ। কিন্তু কারণ কি? কিসেব জন্ত তোমার ওপর বাবুরা এমন করলেন?’

কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে মহাভারত বলিল, ‘আজ্ঞে আমাকে ডেকে বাবুরা বললেন, হুট্ট মোক্তারের জমিজমা সব তুমিই ভাগে কর শুনেছি। তা তোমাকে ওসব জমি ছেড়ে দিতে হবে। হুট্ট মোক্তারের জমি এ চাকলায় কেউ চষতে পাবে না।’

হুট্টাবু বলিলেন, ‘হুঁ, তার পর?’

—আজ্ঞে, আমি তাইতে জোড়হাত ক’রে বললাম, ছজুব তা আমি গারব না। তিনি বেরামভন—ভাল লোক—আমরা তিন পুরুষ ওনারের জমি করছি—পুরনো হুনিব। — তাতেই আজ্ঞে—।

কান্নার আবেগে তাহার কণ্ঠের রুদ্ধ হইয়া গেল, সে নীরবে রুদ্ধবাক্ হইয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

হুট্টাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ‘হুঁ। তোমাকে মামলা করতে হবে মহাভারত। ধরচপত্র সমস্ত আমার, আসা-বাওয়া আদালত-খরচা সব আমি দেব, তুমি মামলা কর।...দেখ—ভেবে দেখ। কাল সকালে আমাকে জবাব দিও। আর সে যদি না পার, তুমি আমার জমি ছেড়ে দাও। তাতে আমি একটুও দুঃখ করব না। ক্ষতি যা হয়েছে—তা আমি তোমার পূরণ ক’রে দেব।’

তার পর তিনি লঠনের আলোটা বাড়াইয়া দিয়া খান-কয়েক বই টানিয়া লইয়া বসিলেন। গভীর মনোমোগের সহিত আইনগুলি দেখিয়া বই বন্ধ করিয়া যখন উঠিলেন, তখন মহকুমা শহরটিও প্রায় নিশ্চল হইয়া আসিয়াছে, অদূরবর্তী জংসন ষ্টেশন ইয়ার্ডে মালগাড়ীব শাটিঙের শব্দ গভীর এবং উচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারত তখনও পর্যন্ত নির্বাক হইয়া হুট্টাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই হুট্টাবু বলিলেন— ‘তুমি তখন থেকে ব’লে আছ মহাভারত? জল তো খেয়েছ—কই তামাক-টামাক ত খাও নি?’

মহাভারতের চোখ তখনও ছলছল করিতেছিল, সে

তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ঈশ্বর লজ্জিতভাবে বলিল—‘অজ্ঞে এই যাই।’

হুটুবাবু বলিলেন, ‘তোমার ক্ষতি বা হয়েছে সে আমি পূরণ ক’রে দেব, কিন্তু অপমানের ক্ষতি পূরণ ত ক’তে পারব না। সেজন্যে তোমাকে মামলা করতে হবে, রাজার দোরে দাঁড়াতে হবে।’

মহাভারত এবার আবার কানিয়া ফেলিল, হুটুবাবুর কণ্ঠস্বরের স্পর্শে তাহার শোক যেন উথলিয়া উঠিল, বলিল, ‘আজ্ঞে বাবু ছোট কচি মাছ, এই বছরের হাসি-পোনা—এক পো, তিন ছটাকের বেশী নয়।’

হুটুবাবু এবাব বিরক্ত হইলেন না, ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, হাসিলেন না, বলিলেন—‘যাও, তামাক-চাঁবাক খেয়ে ভাত খেয়ে নাও গিয়ে।’

মহাভারত চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

ভিতরে গিয়া হুটুবাবু জীকে বলিলেন, ‘আজ থেকে আর আমার বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা হবে না।’

সবিস্ময়ে জী বলিয়া উঠিল—‘সে কি? ও কি সন্দেহে কথা।’

হুটুবাবু বলিলেন, ‘না—হবে না।’

জী প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

* * *

মোকদ্দমা দায়ের হইয়া গেল।

হুটুবাবুর পরিচালনাশুণে, তাহার ভীষ্মধার প্রাণে প্রাণে সমগ্র ঘটনার উপরের সাজান আবরণ খান খান হইয়া খসিয়া পড়িয়া সত্যের নয়মূর্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাহার উপর তাহার স্বপ্ন এবং দৃঢ় বুদ্ধিতর্কের প্রভাবে কঙ্কণার বাবুদের গোমস্তা ও চাপরাসীকে বিচারক পেশী স্থির না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদের প্রতি কঠিন দণ্ড বিধান করিলেন। দেশময় একটা শাড়া পড়িয়া গেল। কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না, কঙ্কণার বাবুরা জজ-আদালতে আপীল করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বুদ্ধ মুন্সেফ বাবু আসিয়া বলিলেন, ‘হুটুবাবু, যথেষ্ট হয়েছে, এইবার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন।’

সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হুটুবাবু বলিলেন, ‘বলেছেন কি আপনি?’

—ভালই বলছি। বিরোধের ত এইখানেই শেষ নয়, ধরুন জজ-আদালতেও যদি এই সাক্ষ্যই বাহাল থাকে, তবে ওঁরা হাইকোর্ট যাবেন। তার পব ধরুন নতুন বিবোধ বাধতে পারে। ওদের ত পয়সার অভাব নেই। লোকে বলে কঙ্কণায় লক্ষ্মী বাঁধা আছেন।’

হুটুবাবু বলিলেন, ‘বিরোধ ত আমার ওই লক্ষ্মীর সঙ্গে। ওই দেবতাটির অভ্যাস হ’ল লোকের মাথার ওপর পা দিয়ে চলা। তাঁর পা দুটি আমি মাটির খুলোয় নামিয়ে দেব।’

মুন্সেফবাবু বলিলেন, ‘ছি-ছি, কি যে বলেন আপনি হুটুবাবু।’

হুটুবাবু উত্তর দিলেন, ‘ঠিকই বলি আমি মুন্সেফবাবু, কিন্তু আপনার ভাল লাগছে না।’

তার পর হাসিয়া আবার বলিলেন, ‘না লাগবারই কথা। লক্ষ্মীর পা যে আপনাব মাথায় চেপেছে, পায়ে পথ ত সঙ্কীর্ণ—রথ চলবার মত বাজপথ তৈরি হয়ে গিয়েছে। টাকটি আপনার বেগ প্রশস্ত।’ মুন্সেফবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, ‘কথাটা বলেছেন বড় ভাল। উঃ বড় বলেছেন মশাই।’

তার পর কিন্তু আর ও প্রসঙ্গে তিনি কোন কথা বলিলেন না। হান্ত পরিহাসেব মধ্যে সন্ধ্যাটা কাটিয়া গেল।

কিন্তু লক্ষ্মীর পরাজয় এত সহজে হয় না, জজ-আদালতেব আপীলে মামলাটা ডিসমিস হইয়া গেল। হুটুবাবু মুখ রাঙা করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যের অপমানে পরাজয়ে ক্ষোভ ও লজ্জার তাহার আর সীমা ছিল না। কিন্তু বিস্মিত তিনি হন নাই। জজ-আদালতেব উকীলের সওয়াল শুনিয়াই তিনি এ পরিণতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সম্বর হইতে রামপুরে ফিরিয়া বাসায় আসিয়া সন্ধ্যায় নিয়মিত সন্ধ্যা-উপাসনায় বসিয়াছেন এমন সময় বাড়ীর বাহিরে বোধ করি খান-দশেক ঢাক একসঙ্গে তুমুল শব্দে বাজিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই তাহার জী বিস্ময়-বিহ্বলের মত আসিয়া বলিল, ‘ওগো, কঙ্কণার বাবুরা দোরের সামনে ঢাক বাজাতে হুকুম দিয়েছে। খেই খেই ক’রে নাচছে গো সব।’ হুটুবাবু কিছুমাত্র চাক্ষু্য প্রকাশ

করিলেন না, যেমন খ্যানে বসিয়াছিলেন তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিলেন।

মাসখানেক পর কক্কাণ বাবুদের বাড়ীতে আবার একটা সমারোহ হইয়া গেল। কুক্কেজের যুদ্ধে হৃদ্যোধন বৈপাশন হ্রদে আত্মগোপন করিলে পাণ্ডবেরা সমারোহ করেন নাই, কিন্তু হুই মোক্তার পরাজয়ের লজ্জায় মোক্তারী পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় পলাইয়া গেলে কক্কাণ বাবুরা বেশ একটি সমারোহ করিলেন। সেই সমারোহের মধ্যে তাঁহারা ঘোষণা করিলেন—বেটাকে ঢাক বাজিয়ে মোক্তারী ছাড়ালাম, এই বার টিন বাজিয়ে গাঁ থেকে তাড়াতে হবে।

বড়কর্তা বলিলেন, ‘তার আগে ওই বেটা মহাভারতকে শেষ কর, আঠার পর্বের এক পর্বও যেন বেটার না থাকে।’

* * *

বৎসর তিনেকের মধ্যেই কক্কাণ বাবুদের সে প্রতিজ্ঞাও প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল। মহাভারত সর্বস্বান্ত হইয়া মনে মনে নিষ্কৃতির একটি সহজ উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্য গোঁয়ার মহাভারত, কিছুতেই বাবুদের পায়ে গড়াইয়া পড়িল না। হুই মোক্তার সেই দেশ ছাড়িয়াছেন আজও কেনে নাই। স্ত্রী আছেন তাঁহার পিজালয়ে।

সেদিন জমিদারের হিতৈষী গ্রাম্য মণ্ডল আসিয়া মহাভারতকে বলিল, ‘ওরে, বাবুদের পায়ে গিয়ে গড়িয়ে পড়। জলে বাস ক’রে কি কুমীরের সঙ্গে বাদ করা চলে?’

ছদ্মমতি মহাভারত উত্তর দিল, ‘কুমীরে বাদ করলেও খায়, না-করলেও খায়। তার চেয়ে বাদ ক’রে মরাই ভাল।’

মণ্ডল বিরক্ত হইয়া বলিল, ‘আলম্বী ঘাড়ে ভর করলে মাল্লবের এমনি মতিই হয় কি না?’

মহাভারত বলিল, ‘আলম্বীই আমার ভাল দাদা, উনি কাউকে ছেড়ে যান না।’

মণ্ডল অবাক হইয়া গেল, অবশেষে বলিল, ‘তোমার দোষ কি বল, নইলে—ব্রাহ্মণ—জমিদার—’

মহাভারত অকস্মাৎ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া হাত-পা নাড়িয়া ভক্তি করিয়া বলিল, ‘চণ্ডাল—কসাই—চণ্ডাল—কসাই।’

দিন দুই পরই গভীর রাত্রে মহাভারতের ঘরের জীর্ণ চালে আগুন জলিয়া উঠিল। নারী ও বালকের আর্ষ চীৎকারে লোকজন আসিয়া দেখিল, মহাভারতের ঘর জলিতেছে, কিন্তু মহাভারতের সেদিনে জ্ঞাপন নাই, সে একজন দীর্ঘকায় কালো জোয়ানের বৃকে নির্মম ভাবে চাপিয়া বসিয়া আছে। বহু কষ্টে লোকটাকেই সর্ব্বাঙ্গে মহাভারতের কবল মুক্ত করা হইল। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—জল।

মহাভারত লাফ দিয়া গিয়া জলত চালের একগোছা খড় টানিয়া আনিয়া বলিল—খা।

ঐ লোকটাই মহাভারতের ঘরে আগুন দিয়াছে, লোকটা কক্কাণ বাবুদের চাপরাসী। মহাভারত তাহাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করিল। পরদিন সে অত্যন্ত হঠচিতে দণ্ড গৃহের অন্নার লইয়া তামাক সাজিয়া শব্দ তৃপ্তি সহকারে তামাক টানিতেছিল, এমন সময়ে যে তাহাকে ডাকিল—মহাভারত।

মহাভারত বাহিরে আসিয়া দেখিল জমিদারের গোমস্তা দাঁড়াইয়া আছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, ‘মিটমাট আমি করব না হে। কি করতে এসেছ তুমি?’

গোমস্তা হাসিয়া বলিল, ‘আরে শোন—শোন—’

কোন কিছু না শুনিয়াই তাহার মুখেব কাছে দুই হাতের বুড়া আঙুল ঘন ঘন নাড়িয়া মহাভারত বলিল, ‘খট খট লবডক—খট খট লবডক—মার আমার করবি কি?’

গোমস্তা মুখ াল করিয়া ফিরিয়া গেল, যাইবার সময় কিন্তু বলিয়া গেল, ‘জানিস বেটা চাষা—পৃথিবীটা কার বণ?’

দিন দুয়েক পরেই রামপুর হস্তে হুইবাবু পুতান মুহুরীট আসিয়া মহাভারতকে লইয়া চলিয়া গেল।

সেই দিনই দ্বিপ্রহরে রামপুরের জোজদারী আদালতে মহাভারতকে সঙ্গে লইয়া হুইবাবু উর্বীলের গাউন পরিয়া আদালতে প্রথম প্রবেশ করিলেন। তিনি উকীল হইয়া ফিরিয়াছেন। তিনি এত দিন কলিকাতায় আইন পড়িতেছিলেন।

* * *

এবার কক্কাণ বাবুরা বেশ একটু চিন্তিত হইয়া

পড়িলেন। ছুটুবাবুর তখিরে তদারকে স্বয়ং এস-ডি-ও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া গেলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত কক্কাপার বাবুদের নায়েব গোমস্তাকে পর্য্যন্ত আসামী-শ্রেণী-ভুক্ত করিয়া মামলাটা দায়রা আদালতে বিচারার্থ পাঠাইয়া দিলেন। ছুটুবাবু নিজেও সমরে গিয়া বসিলেন, শুধু বসিলেন নহ—সরকারী উকীলের সহযোগে নিজেই মামলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই নানা জনে বহু বিনীত অছুরোধ এবং বহু প্রকারে লোভনীয় প্রস্তাব লইয়া ছুটুবাবুকে আসিয়া ধরিয়া বলিল, ‘মিটিয়ে কেনুন—তাতে আপনারই মর্যাদা বাড়বে।’

ছুটুবাবু বলিলেন, ‘বড়লোকের সঙ্গে গবিরের কণাড়া কি আপোবে মেটে? কোন কালে মেটে নি—মিটাবও না।’

শেষ পর্য্যন্ত বলিলেন, ‘বাবুরা যদি ঢাক কাঁধে ক’রে আদালতের সামনে বাজাতে পারে, কি মহাভারতের বরষ চালে উঠে নিজেরা চাল ছাওয়াতে পারে, তবে ন-হয় দেখি।’

প্রস্তাবকারীরা মুখ কাল করিয়া উঠিয় গেল, কিার চলিতে লাগিল। সাক্ষী-সাবু শেষ হইয়া গেলে সবকারী উকীলের সম্মতিক্রমে ছুটুবাবু প্রথমে সওয়াল আরম্ভ করিলেন। সে যেন অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরির মুখ খুলিয়া গেল। গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ প্রদীপ্ত ভাষায় সমগ্র ঘটনা যেন চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল—প্রবালর অভ্যাচারে দুর্ব্বলের হাহাকার যেন রূপ পরিগ্রহ করিল। বিবাদের মূলমন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই অগ্নিদাহ পন্থায় প্রতিটি ঘটনা সাক্ষীদের উক্তির সহিত মিলাইয়া দেখাইয়া অবশেষে বলিলেন, “আজ সমস্ত পৃথিবীময় ধনের মন্ততায় মস্ত ধনীর অভ্যাচারে পৃথিবী জর্জরিত হয়ে উঠেছে। এই বিচারামীন ঘটনাটি তার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় যে ধনী অপরাধে ধনীর অছগ্রহণুই দুর্ব্বলের উপর দণ্ড বিধান করা ছাড়া আজ ধর্ম্মাধিকরণের গত্যন্তর নেই। কিন্তু সে বিচার এক জন করবেন, বিনি সর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্বজ্ঞ বিরাজমান, সর্ব্বনিয়ন্তা—তিনি এর বিচার অবশ্যই করবেন। সে বিচারের রায়ের সামান্য একটু অংশ আমরা জানি, দৈবের পুত্র মহামানব বীণ্ড্রীষ্ট জানিয়ে দিবে

গেছেন, তিনি বলেছেন—It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the Kingdom of God.”

[ধনীর স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অপেক্ষা স্ত্রীমুখে উটের প্রবেশও সহজ]

তাঁহার সওয়ালের পর সরকারী উকীল আর কিছু বলা প্রয়োজন মনে করিলেন না। বিচারে অপরাধীগণের কঠিন দণ্ড হইয়া গেল। বিচারশেষে ছুটুবাবু বাহিরে আসিতেই তাঁহার মুহুরী বলিল, ‘তিনটে মামলার কাগজ নিয়ে মক্কেল ব’সে আছে।’

ছুটুবাবুর মাথায় তখনও ঐ মোকদ্দমার কথাই ঘুরিতেছিল, তিনি ললাট কুঞ্চিত করিয়া মুহুরীর দিকে চাহিলেন।

সে বলিল, ‘একটা দায়রা, আর দুটো এস-ডি-ওর কোর্টের মামলা। কি বলেছি চার টাকা ক’রে—।’

গিছন হইতে এক জন পুরাতন মোস্তার-বন্ধু আসিয়া অভিনন্দন জানাইয়া বলিল, ‘চমৎকার আগ্রহমেন্ট হয়েছে। এবার কিন্তু ছেঁড়া জুতো জামা-পান্টাও ভাই। আমার হাতে একটা কেস আছে—তোমাকেই ওকালত-নামা দেব। মক্কেল কিন্তু গরিব।’ ছুটুবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, ‘পাঠিয়ে দিয়ে। পয়সার জন্তে কিছু এসে যাবে না।’

* * *

বিচিত্র পৃথিবী, কিন্তু সে বৈচিত্র্য অপেক্ষাও পৃথিবীর বুকের ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা বিচিত্রতর এবং বিস্ময়কর। সেই বিচিত্র দ্বারার গতিতেই কক্কাপার বাবুদের সহিত ছুটুবাবুর বিরোধ অকস্মাৎ একটা অসম্ভব পরিণতিতে আসিয়া শেষ হইয়া গেল।

পনের বৎসর পর। সেদিন হঠাৎ কক্কাপার বাবুদের জুড়িটা আসিয়া ছুটুবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গাড়ীবারান্দায় দাঁড়াইল। গাড়ীর ভিতর হইতে নামিলেন কক্কাপার বৃদ্ধ বড়কর্তা, তাঁহার পুত্র এবং সেজতরকের কর্তা। ছুটুবাবুর দারোয়ান কায়েদ-মাফিক সেলাম করিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুই জন থানসামা আসিয়া সসন্ত্রমে অভিবাদন করিয়া বাড়ন দিয়া আসনগুলি ঝাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ

কর্তা ঘরের চারি দিক চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, ‘তাই তো হে, ছুট্ট যে আমাদের ইঞ্জপুত্রী বানিয়ে ফেলেছে—এঁা। বাঃ—বাঃ—বাঃ বলিহারি—বলিহারি।’

কর্তার পুত্র এক জন খানসামাকে বলিলেন, ‘একবার উকীলবাবুকে খবর দাও দেখি—বল ককণার বড়কর্তা সেজকর্তা এসেছেন।’

ছুট্টবাবু বিস্মিত হইলেন, এবং অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, ‘আহুন, আহুন, আহুন! মহাভাগ্য আমাব আজ।’

বড়কর্তা বলিলেন, ‘সে তো না বলতেই এসেছি হে, এখন বসতে দেবে কি না বল, না তাড়িয়ে দেবে।’

ছুট্টবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, ‘দেখুন দেখি, তাই কি আমি পারি, না কোন মাহুষে পারে?’

বড়কর্তা মুচকি হাসিয়া বলিলেন, ‘আজ তোমার সঙ্গে সওয়াল করব, দাঁড়াও। দেশের মধ্যে তো তুমি এখন সব চেয়ে বড় উকীল—এ-জেলা ও-জেলা থেকেও তোমাকে নিয়ে যায়—দেখি কে হারে?’

ছুট্টবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ‘বেশ এখন বসুন।’

বড়কর্তা বলিলেন, ‘ধর, তোমার বাড়ী ভিখারী এসেছে, তাকে বসতে বলে আর কি আপ্যায়িত করবে, যদি ডিন্কেই তাকে না দাও।’

ছুট্টবাবু জোড়হাত করিয়া বলিলেন, ‘আমার কাছে আপনারা ভিক্ষে চাইবেন, এ যে বড় অসম্ভব কথা, আশঙ্কার কথা। এ যে বলির দ্বারে বামনের ভিক্ষে চাওয়া। বেশ আগে বসুন।’

বড়কর্তা বার-বার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ‘উঁহ! আগে তুমি বল যে দেবে, তবে বলি—নইলে যাই।’

ছুট্টবাবু বলিলেন, ‘বেশ বলুন, সাধের মধ্যে যদি হয় তবে দেব আমি।’

বড়কর্তা বলিলেন, ‘তোমার ছেলেটিকে আমাকে ভিক্ষে দিতে হবে, আমার নাতনীটিকে তোমাকে আশ্রয় দিতে হবে।’

তাঁহার পুত্র আসিয়া ছুট্টবাবুর হাত দুটি চাপিয়া ধরিল, ছুট্টবাবু বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সেজকর্তা বলিলেন, ‘তোমার ছেলে খুব ভাল, বি-এতে এম-এতে ফাষ্ট হয়েছে, তুমিও এখন মস্ত ধনী, বড় বড় জায়গা থেকে তোমার ছেলের সম্বন্ধ আসছে—সবই ঠিক। কিন্তু ককণাব মুখুজ্জেনের বাড়ীর মেয়ে ধনে কুলে মানে অযোগ্য হবে না। রূপের কথা বল না, সে তুমি নিজে দেখবে।’

ছুট্টবাবু বড়কর্তার এবং সেজকর্তার পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন, ‘আপনাদেব নাতনী আমার বাড়ী আসবে—সত্যিই সে আমার সোভাগ্য।’ বমারোহের মধ্যেই যে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল—সমা-বাহের মধ্যেই তাহার অবসান হইয়া গেল।

* * *

বিবাহ শেষ হইয়া গেল।

অতীত শেষ হইলেও উৎসবের শেষ তখনও হয় নাই। সমাগত আত্মীয়স্বজনদের সকলে এখনও বিদায় লয় নাই। কয়েকটি হাভাতে অতিলোভী আত্মীয় বিদায় লইবে বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের ছেলেগুলাব জ্বালায় ছবি, ফুলদানীগুলি ভাঙিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

ছুট্টবাবু প্রাতঃকালে একখানা ইঞ্জি-চেয়ারে শুইয়া তামাক টানিতে টানিতে ঐ কথাই ভাবিতেছিলেন। নিয়মের ব্যতিক্রমে, অপরিমিত পরিশ্রমে শবীর তাঁহার অস্থূল—বেশ একটু জ্ববও যেন হইয়াছে। চকবটা আসিয়া সংবাদ দিল—তাঁহার ফাউন্টেন পেনটা পাওয়া যাইতেছে না। ছুট্টবাবুর রক্ত যেন মাথায় চড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহিণীকে ডাকিতে বলিলেন। গৃহিণী আসিতেই তিনি বলিলেন, ‘রতনপুরের কালীর মাক, পারুলের জামা-ঠাকরুণকে আজই বাড়ী যেতে বলে দাও।’

সবিস্ময়ে গৃহিণী বলিল, ‘তাই কি হয়? নিজ থেকে না গেলে কি যেতে বলা যায়! আপনার লোক—।’

ছুট্টবাবু বলিলেন, ‘আপনার জনর হাত থেকে আমি নিস্তার পেতে চাই বাপু, মোহাই তোমার বিদেয় কর শ্রমের। বরং কিছু দিয়ে খুয়ে দাও—চলে যাক ওরা, নইলে ঘরদোর পর্যন্ত ভেঙে চুরমার ক’বে দেবে।’

গৃহিণী একটু বিব্রত ভাবেই স্বামীর দিকে চলিয়া গেলেন। ছুট্টবাবু ক্রান্তভাবেই জ্বোরে শুইয়া বোধ করি

পরিজ্ঞাপেরই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষুধা পেরে মুহুরী আসিয়া একখানা রায়ের নখি সম্মুখের টেবিলটার উপর নামাইয়া দিয়া বলিল, ‘রায়ের নকলটা কাল চেয়েছিলেন। কিন্তু বাজে খরচ কিছু বেশী হয়ে গেল।’

হুটবাবু সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। একটা দয়রা মোকদ্দমার রায়ের নকল। মোকদ্দমাটার হুটবাবু অপ্রত্যাশিত ভাবে পরাজয় ঘটয়াছে। তাঁহার অনেকটা শূন্য যুক্তি বিচারক অজ্ঞানভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। জ্ঞান বুদ্ধিত করিয়া তিনি রায়খানা তুলিয়া লইলেন। মুহুরীটি চলিয়া গেল। রায়খানা পড়িতে পড়িতে হুটবাবুর মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল। বিচারকের মন্তব্য এবং নিজের পদ্ধতির বক্রগতি দেখিয়া তাঁহার ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। দাক্ষণ উদ্বেজনাবশে রায়খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া ঘরের মধ্যে পাগচারি আরম্ভ করিলেন। উপরের ঘরটাতেই দুমদাম ছটপাট শব্দে। ঐ আওয়াজের ছেলেগুলি যেন মগেব উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হুটবাবু অভ্যস্ত বিবস্ত্রিতরে উপরের দিকে চাহিয়া বসিলেন, ‘ভগবান, রক্ষে কর!’ চাকরটা ঘরের মধ্যে আসিয়া কতকগুলো চিঠি টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। চিঠিগুলো দেখিতে দেখিতে একখানা অতি পরিচিত হাতের লেখা খাম দেখিয়া সাগ্রহে খুলিয়া ফেলিলেন। হাঁ—পুরাতন বন্ধু সেই বৃদ্ধ মলেকবাবুরই চিঠি। এই বিবাহে আসিতে অক্ষমতার জন্য ক্ষমা চাহিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

“ধাবার বাতিক অসম্ভব রূপে প্রবল হ’লেও বাতের সঙ্গে যুদ্ধে উঠতে পারলাম না, পরাজয় মানতে হ’ল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই আপনার ছেলে ও বোঁমাকে আশীর্বাদ করছি। ডাকযোগে আশীর্বাদীও কিছু পাঠালাম গ্রহণ করবেন।”

পরিশেষে লিখিয়াছেন, “আজ একটা কথা বলব, রাগ করবেন না। একদিন আপনি বলেছিলেন ম’-সম্মীর অভ্যেস হ’ল লোকের মাথার ওপর দ্বিগুণ পথ কবে চলা। তাঁর চরণ দুখানি আপনি পথের ধুলোয় নামাব বলেছিলেন। কিন্তু টেনে টেনে নিজের মাথাতেই চাপালেন যে! লজ্জা পাবেন না, চরণ দুখানি এমনই লোভনীয়ই বটে, মাফ না ধরে পারা যায় না! মাথায় কি দেবীর রক্ত-রক্তের

উপযোগী রাজপথ তৈরি হয়েছে, বলি টাক পড়েছে—টাক!”

চিঠিখানার কথাগুলি যেন তাঁর মত তাঁহার মস্তিষ্কে গিয়া বিধিল। উত্তেজিত অস্থির মনের মধ্যে অকস্মাৎ একটি অভূত মুহূর্ত আসিয়া গেল। সমগ্র জীবনটা এই মুহূর্তের মধ্যে ছায়াছবির মত তাঁহার মনশ্চক্ৰ সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল। এই ঘর এই ঐশ্বর্য সমস্ত যেন কুৎসিত ব্যাধি হিহি করিয়া হাসিতেছে। আবার মনে হইল, ঘরের দেওয়ালে ঝুলানো ছবিগুলির মধ্যে সমস্তগুলিতেই মলেকবাবুর ব্যঙ্গ-হাস্য-বক্র মুখ ভাসিয়া উঠিয়াছে! রতনপুরের কালীর মা—পাকলের শ্রামাঠাকরুণ উপরতলায় বিজয়োন্নাসে কি তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে।

তিনি ধর ধর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একখানা আসনে বসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। চাকরটা শঙ্কিতভাবে ডাকিল, ‘বাবু!’ কোন উত্তর নাই। দেখিয়া শুনিয়া চাকরটা চীৎকার করিয়া উঠিল।

ডাক্তার আসিয়া বলিল, ‘ব্রেন ফীভার।’

তিন দিনের দিন হুটবাবু মারা গেলেন। মৃত্যুর পূর্বে সামান্যক্ষণের জ্ঞান জ্ঞান ফিরিয়াছিল। প্রবীণ ব্যক্তিগণের অহুরোধে তাঁহার পুত্র তাঁহাকে বলিল, ‘বাবা, ইষ্টমেবতাকে স্মরণ করুন।’

স্মির দৃষ্টিতে চাহিয়া জ্ঞান বুদ্ধিত করিয়া হুটবাবু বলিলেন, ‘মনে পড়ছে না।’

এক জন বলিলেন, ‘তুমি সরে বস, তোমার মাকে বসতে দাও। উনি বলে দিন কানে কানে ইষ্টমন্ত্র।’

গৃহিণী আসিয়া অশ্রুস্রব্ধকণ্ঠে স্বামীর কানে ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। কিন্তু ততক্ষণে হুটবাবু আবার জ্ঞান হারাইয়া প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রলাপের মধ্যেও তিনি যেন কোন মোকদ্দমার সওয়াল করিতে ছিলেন—

“My Lord, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the Kingdom of God,” [ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ অপেক্ষা হুচের মুখে উঠের প্রবেশও সহজ]

প্রাচীন ভারতের নারী-কবি শীলা ভট্টারিকা

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, পিএইচ-ডি (লণ্ডন)

জগতে কোনও জাতি যখন বড় হয়, তখন সে জাতি কেবল পুরুষ বা কেবল নারীকে নিয়ে বড় হয় না, হতে পারে না। নারী-শিক্ষার বাধা ঘটিয়ে নাবীর স্বভাবতঃ বর্জনকূল মজলপথ কণ্টকসঙ্কুল করার দীনহীন প্রচেষ্টা করে প্রাচীন ভারতসামাজিক নিজেকে পছন্দ করার উন্নত অভিপ্রায় কখনও জ্ঞাপন করে নি।

এ প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের শুধু এক জন মহিলা কবির কথা বলব—তার নাম শীলা ভট্টারিকা। তিনি হ্রদয়োৎসৃষ্টিতে বহু শতাব্দী ধরে ভাবগ্রাহীবৃন্দে প্রতিরঞ্জন ও জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করেছেন।

রাজশেখর^১ ও ধনদেব^২ শীলার জন্ম-পাঠ ও ভক্তি-গর্ভ বন্দনা জ্ঞাপন করেছেন। সাহিত্য-মহারথীরাও তাঁর বাণী উদ্ধৃত করেছেন। স্বতঃই তাঁর আবির্ভাব-সময় আমাদের হৃদয়ে কোতূহলের সঞ্চার করে।

শীলা ভট্টারিকার “কঃ কোমারহরঃ স এব হি” ইত্যাদি কবিতা রাজানক রুদ্রক তাঁর অলঙ্কারসর্বস্ব নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এই পুস্তক খ্রীষ্টীয় ১১৫০ অব্দে রচিত হয়। খুব সম্ভবতঃ এ পুস্তকের আরও কিছুকাল আগে কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয় নামক গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। এখানেও এ কবিতাটি

দৃষ্ট হয়।^৩ “ইন্দ্রমুচিতিমক্রমচ্চ পুংসাং” ইত্যাদি কবিতাটি শীলা ভোজরাজের সঙ্গে শারি-কৌড়া করতে করতে কথোপ-কথনচ্ছলে রচনা করেন—শার্দ্ধধর-পত্নীভিঃ একপ কথিত আছে।^৪ সুতরাং তিনি ভোজরাজের সমসাময়িক ছিলেন। আবার দেখা যায়—কবি রাজশেখর শীলার নাম উল্লেখ করেছেন।^৫ সুতরাং শীলা রাজশেখরের সমসাময়িক বা পূর্ববর্তিনী ছিলেন। আমবা জানি য় রাজা মিহিরভোজ রাজশেখরের সমসাময়িক (যদিও বয়সে কিছু বড়)। নিশ্চয় এ ভোজরাজের সঙ্গেই শীলা কথোপকথন করছিলেন। সুতরাং শীলা খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

শীলার যুগের কবিশেখর রাজশেখর বলেছেন—সংস্কার আশ্রয় ধর্ম; তাই কবিশেখর নারী ও পুরুষের সমান অধিকার; শোনাও যায়, দেখাও যায়—রাজহুহিতা প্রভৃতি অনেক মহিলা-কবি রয়েছেন।^৬ নারীদের কবিশ-শক্তির উচ্চ আদর্শে অতপ্রাণিত, বৈষ্ণব প্রভুদেবী লাটী হুভদ্রা প্রভৃতি মহিলা-কবিদের প্রাণের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানকারী রাজশেখরের “দেখা যায়” এই কথা সবচেয়ে বড় সার্থকতা এক দিকে যেমন তাঁর অন্তঃসুরচারিণী কবি অবন্তি-সুন্দরী, অন্য দিকে তেমনি তাঁর রাজসভার শ্রেষ্ঠ নারীকুল-শোভা শীলা ভট্টারিকা।

(১) জঙ্কনের স্থক্তি-মুক্তাবলী-সংগ্রহ, ভাণ্ডারকার সংগৃহীত হস্তলিখিত ৩৭০ নং পুঁথি (পূনা ১৮৮৪-৮৫), ফলিও ২৩ খ; ভাণ্ডারকারের রিপোর্ট (১৮৮৭-৯১), ১৬ খ।

(২) শার্দ্ধধর-পত্নীভিঃ, কবিতা-সংখ্যা ১৬৩।

(৩) পরবর্তী পাদটীকাগুলি দেখুন।

(৪) কাব্য-মালা সীরিজে (১৮৯০) হর্গাপ্রসাদকৃত সংস্করণ, পৃঃ ১২৭-২৮, ২০০। অজ্ঞাত অলঙ্কার-গ্রন্থেও এ জ্যোক্ত উদ্ধৃত হয়েছে; যথা, বিবেচন পণ্ডিতের অলঙ্কার-কৌজ্ঞভ, পণ্ডিত শিবদাসের সংস্করণ (১৮৯৮), পৃঃ ৩৩৬; শিখড়পালের রসার্ণব-সুধাকর, ত্রিবেঙ্গায় সংস্করণ, (১৯১৬), ১৫৩ পৃঃ; রাজহুহিমণি বীক্ষিতের কাব্য-দর্পণ, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সংস্করণ, পৃঃ ১৩-১৪; বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণ, কাণের সংস্করণ, পৃঃ ৩।

সকল দেশের ও সকল জাতির কাব্যের প্রাণ প্রেম। কবি শীলা ভট্টারিকাও এ চিরপুরাতন এবং চিরনবীন বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। নর-নারীর প্রেম ও তদুচ্চব

(১) বিল্লিওথেকা ইতিহাস, গ্রন্থাব ২০৮, পৃঃ ১৫২।

(২) কবিতা-সংখ্যা ৫৬৪। এই কবিতা যমুন্দের কাব্য-প্রকাশ (বাণহট্টের সংস্করণ, পৃঃ ৩৪১) ৩ অজ্ঞাত অলঙ্কার-গ্রন্থেও উদ্ধৃত হয়েছে।

(৩) জঙ্কনের স্থক্তি-মুক্তাবলী-সংগ্রহ, ভাণ্ডারকার সংগৃহীত হস্তলিখিত ৩৭০ নং পুঁথি (পূনা ১৮৮৪-৮৫), ফলিও ২৩ খ।

(৪) কাব্য-মীমাংসা, বড়োদা সংস্করণ (১৯১৬), পৃঃ ৫৩।

ঈর্ষা, মান, বিরহ প্রভৃতি কবির পীযুষ-বাণীতে মধুব ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

ছটি কবিতায় কবি নারীর প্রতি নারীর অন্তর্লীন এক সদাআত্মপ্রকাশোন্মুখ সন্দেহ ও ঈর্ষার একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেছেন। নায়িকা নায়কেব কাছে দূতী প্রেবণ করছেন। সে দূতী তাঁর অতি প্রিয় ও বিশ্বস্ত সখী, তথাপি তাঁর সন্দেহের অভাব নেই। দূতীকে প্রিয়েব কাছে পাঠাবার সময়ে নায়িকা বলছেন—দূতি! তুমি চঞ্চল, সেও যুবা ও চঞ্চলচিত্ত, তোমাব সঙ্গে তার দেখা হবে নির্জন কাননে, দশ দিকও অন্ধকার হয়ে আসছে, বসন্ত-বাতাস মন হরণ করে বইছে, আমার কাছ থেকে মধু-নিলনের বার্তা বহন করে তুমি তার কাছে যাও, তেমার দেবতার! তোমাকে রক্ষা করুন।^১ আবাব দূতী যখন ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল, তখন নায়িকাব সন্দেহাশ্রুণ ও ঈর্ষাদৃষ্টি চিত্ত বাধা মানল না—তিনি তখনই দূতীকে জেবা আরম্ভ করে দিলেন—দূতি! তেমাব দীর্ঘশ্বাসের কি কারণ, বেগী চলে পড়েছে কেন, মুখ ঘর্ষাশ্রু কেন। দূতীও তাত্তাতাড়ি উত্তর দিল—স্তরিত প্রত্যাবর্তন হেতু, শুভবার্তা হেতু, ইত্যাদি। তথাপি নায়িকা মুখের উপর বঁলে দিলেন—দূতি! বাজে অজুহাত দিচ্ছ, তোমাব অধরযুগল যে স্নান পদ্মের আকার ধারণ করেছে, সে সম্বন্ধে তোমার কি বলবার আছে? স্নানকোমল চিত্তবৃত্তির বাজ্যে নারীর হৃদয় প্রেমের শেষ সৌমানাটুকু পর্যন্ত অকাতরে অহুযোগে অধিকার ক'বে সগৌরবে বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান কবে, পুরুষ একেজ্ঞে যেন কোণঠাসা। কিন্তু পুরুষে পুরুষে যে প্রীতির সৌখ অঙ্গলিহ হয়ে মাথা তুলে খাড়া থাকতে পারে, নারীতে নারীতে এ সম্পর্কের গঠন সে তুলনায় একেবাবে হুঁড়ে-

ঘব—তাব পাতার ছাউনির ভিতর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। নারীব-হৃদয়—শতদল উড্ডীয়মান রবির আবির্ভাব-গৌরবে এমন এক দিকে বুকে পড়ে যে তা অন্য সব দিকের প্রতি আত্মবিস্মৃত হয়ে যায়—তাতে তার পূর্ব-সঞ্চিত স্নেহপ্রীতির শিশির-কণা কিছু বা ঝবে যায়, কিছু বা রবি-রশ্মিতে শুকিয়ে যায়। এতে নারীর অগৌরবের কিছু নেই, এটি স্বাভাবিক। এই বৃহত্তর সত্য বিশ্লেষণ করতে করতে এ সত্যও ধরা পড়ে যে দৈনন্দিন কার্যক্ষেত্রে পুরুষ পুরুষকে যে-পরিমাণে বিশ্বাস কবে, নারী নারীকে সে-পরিমাণে কবে না, প্রেমের রাজ্যে তো কথাই নেই। কবি শীলা তাঁর নারীহৃদয় দিয়ে এই কথা উপলব্ধি করেছেন।

আর একটি কবিতায় শীলা একটি মজার কথা বলেছেন—সেটি হচ্ছে পুরুষেব মান। কাব্যে নায়িকার মানের কথাই সর্বত্র দৃষ্ট হয়—নায়ক মানিনী নায়িকার মান ভঙ্গ কবেন। কিন্তু শীলাব কবিতায় বিরহজর্জরিত-তনু নায়িকাই নায়কের মান-ভঙ্গে রত। নায়িকা বলছেন—হে নাথ! বিরহানলে শরীর আমার জলে গুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, নিষ্করণ ঘমও আমায় তুলে আছে, তুমিও মানব্যাগ্রিশ্রু হ'লে—এমন ক'বে কুহুমকোমল নারী আমি কি করে বেঁচে থাকি?*

মহিলা-কবি যে পুরুষের মানের কথাই শুধু বলেছেন তা নয়, পুরুষের বিবহ-অবস্থাও বর্ণন করেছেন। কবি বলেছেন—প্রিয়া-বিরহিত ব্যক্তিব হৃদয়ে চিন্তা সমাগত হয়েছে, তা দেখে নিজা ঐ ব্যক্তিকে ছেড়ে পলায়ন করেছে। অজ্ঞাত রাজ্যিতে নিজা থাকে একেশ্বরী দেবী হয়ে, আজ তার স্থান চিন্তা এসে অধিকার করেছে; তাই চিন্তাকে সতীন ভেবে নিজা সেই কৃত্তর পুরুষকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না।^২ বিরহী পুরুষের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে নারী-কবির এ আত্মনিয়োগ স্মধুব।

একটি স্মধুর কবিতায় কবি অসতী নারীর চাপল্য ও তরলতাপূর্ণ জীবনের বিষময় কল দেখিয়েছেন। যে-নারীর

(১) সুভাষিত-রক্ত-সাব, হস্তলিখিত পুঁথি, বয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল—১০৫৬-১৩-সি-৭, ফলিও ৪০ (ক), কবিতা-সংখ্যা ৫৪, ইত্যাদি।

(২) সুভাষিত-সার-সমুচ্চয়, হস্তলিখিত পুঁথি, বয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল—১০৫৬-১৩-সি ৭, কলিও ৪৫ (খ); বঙ্গভদেবের সুভাষিতাবলী, কবিতা-সংখ্যা ১৫৫০; ইত্যাদি।

(৩) শালধর-পদ্মতি, কবিতা-সংখ্যা ৩৫৭২।

(৪) বঙ্গভদেবের সুভাষিতাবলী, কবিতা-সংখ্যা ১১১৭।

চিন্তা বহুপুরুষাভিমুখ, তার জীবনে স্থিরতা, স্থখ, শান্তি, কিছুই নেই। স্বথের পিছনে সে ছোট্টে, স্থখ তাকে দেখে সহস্র যোজন দূরে ছুটে পালায়। কবি বলেছেন, সেই তরুণ জীবনের প্রণয়ী ও বর, সেই চৈত্র-রজনী, সেই উন্মীলিত মালতী-সৌরভ বিমিশ্র প্রেমোদ্বীপক কদম্বানিল, সেই রেবা-তর্ক, তথাপি অসতী নারীর মন ছোট্টে আর এক জন, আর এক জন করে বহর পিছু, মন তার আপাতমনোরম স্বথের চাকচিক্যের পেছনেই লেগে থাকে। যে স্মৃতিগুলির কথা কবি বলেছেন, তার প্রত্যেকটির মূল্য এক-খানা প্রণয়িনীর কাছে স্বজীবনের চেয়েও কোটি কোটি গুণ বেশী, বিশেষতঃ সেই রেবা-তর্ক যে পথে চিত্রকূট-আত্রকূট-ভেদী যক্ষের মূহমূহ দীর্ঘবাস সমীপের বৃকে বৃকে প্রিয়ার জঙ্ঘা অলকার পথে দশার্ণের দিকে ছুটে চলেছে। স্নেহের বৃকে স্মৃতির প্রতি কণা মাণিক হয়ে জল জল করে শোভা পায়; উত্তর জীবনের একটানা দুঃখদৈন্তেও তা প্রভাহীন হয় না। নিভাস্ত অধস্তা সে—বার বর্তমান সমস্ত সঞ্চল, এমন কি স্মৃতির সঞ্চল স্বীয় উদ্দাম প্রবৃত্তির স্বল্প মূল্যে সাধারণ নিলামে বিক্রী হয়ে যায়।

রাজশেখর বলেছেন, শীলার ও বাণভট্টের লেখ্য শব্দ ও অর্থের সমানতা হেতু তাঁদের রচনা পাঞ্চালী রীতির অন্তর্ভুক্ত।^{১০} অবশ্য, রাজশেখরোক্ত পাঞ্চালী রীতির এই লক্ষ্য দর্পণকারাদির মত হ'তে ভিন্ন।^{১১} দর্পণকারের মতে পাঞ্চালী রীতি বৈদর্ভী ও গোড়ী রীতির মধ্যবর্তী ও সমস্ত লক্ষণও তাই—সমাসের দিক থেকে পাঁচ বা ছয়

পদের সমাসই পাঞ্চালীতে বাহনীর।^{১২} শীলার রচনায় মাধুর্য্যব্যঞ্জক বর্ণের ব্যবহার অধিক। তাঁর রচনা হকুমার অর্থযুক্ত এবং সমাসবিহীন বা অসমাসযুক্ত। ফলতঃ আমাদের প্রাপ্ত কবিতাগুলির উপর নির্ভর কবতে গেলে কবিকে শেষোক্ত মতে বৈদর্ভী রীতির অন্তর্ভুক্ত করতে ইচ্ছা করে।

কবির রচনা প্রাঞ্জল ও প্রসিদ্ধ অর্থের অল্পবর্তন হেতু প্রসাদগুণ বিশিষ্ট, বাক্যে ও বস্তুতে রসাদিক্যহেতু অত্যন্ত মধুর^{১৩} ও কষ্টকল্পনার অভাবহেতু অর্থব্যক্তিগুণে স্তম্ভিত। কবি কোথাও সন্দ্বিগ্নের^{১৪} আশ্রয় গ্রহণ করেন নি—অর্থাৎ এক বস্তুঃ ধর্ম অস্ত্র বস্তুতে আরোপ করে ভাব প্রকাশের চেষ্টা করেন নি।

কবিকে দু-এক ক্ষেত্রে অঙ্গীলতাগোষে অভিযুক্ত করা চলে।^{১৫} অগ্রজ এ-বিষয়ে আলঙ্কারিকের মতদ্বৈধ ঘটবে। একটি কবিতায়^{১৬} দ্বিতীয় পাদে অধিক পদ প্রয়োগ ও প্রকমভজ দোষ ঘটেছে।

শীলার কবিতায় অলঙ্কার-প্রয়োগের আধিক্য নেই; প্রত্যুত অর্থাস্তরঙ্গ্যাস^{১৭} বিভাবনা বিশেষোক্তি বিমিশ্র সন্দেহসঙ্কর,^{১৮} অভিযোক্তি^{১৯} ও ভুক্তি অর্থালঙ্কার ও

(১) সাহিত্য-দর্পণের উপস্থাপিত সংস্করণের ৪৫৩ পৃষ্ঠায় লক্ষণ দেখুন।

(২) প্রসাদ ও প্রসাদব্যঞ্জক শব্দ: সাহিত্য-দর্পণ, উপস্থাপিত সংস্করণ, ৪৫৫-৫৬ পৃঃ; কাব্যাদর্শ, ১ম সর্গ, ৩৫-৪৬ শ্লোক।

(৩) লক্ষণ: কাব্যাদর্শ, ১ম সর্গ, ৫১ শ্লোক।

(৪) লক্ষণ: কাব্যাদর্শ, ১ম সর্গ, ৭৩ শ্লোক।

(৫) লক্ষণ: কাব্যাদর্শ, ১ম সর্গ, ৯৩ শ্লোক।

(৬) যথা, শাক্তধর-পদ্ধতি, ৫৬৪ নং কবিতা।

(৭) যথা, শাক্তধর-পদ্ধতি, ৫৬৭ নং কবিতা।

(৮) সুভাবিত-রত্ন-ভাণ্ডাগার, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২১৪ পৃ.

(৯) যথা, বল্লভদেবের সুভাবিতাবলী ১১২৭ নং কবিতা।

(১০) যথা, শাক্তধর-পদ্ধতি, ৩৭৬৮ নং কবিতা। কোন কোন আলঙ্কারিক এ কবিতায় ফুট অলঙ্কারের অভাব দেখতে পান—যথা, বিশ্বনাথ কবিরাজ, কাণের সংস্করণের ৩ পৃঃ; রাজ-চূড়ামণি দীক্ষিত, কাব্য-দর্পণ, স্তব্ধকণ্য শাস্ত্রীর সংস্করণ, ১৩ পৃঃ, ইত্যাদি।

(১১) যথা, বল্লভদেবের সুভাবিতাবলী, ১৬৩৩ নং কবিতা; সুভাবিত-সার-সমুচ্চয়, হস্তলিখিত পুঁথি, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ১০৫৬৬-১০-সি ৭ নং পুঁথি, কলিও ৪০ (খ), ৫৪ নং কবিতা।

(১) বর্তমান নর্দদা নদী।

(২) শাক্তধর-পদ্ধতি, কবিতা-সংখ্যা ৩৭৬৮; হরি কবির সুভাবিত-হারাবলী, হস্তলিখিত পুঁথি, (পিটাসন, দ্বিতীয় রিপোর্ট, ৫৭-৬৪), ২৭৮; জঙ্ঘনের স্তম্ভি-সুভাবলী-সংগ্রহ, পিটাসনের তৃতীয় রিপোর্ট, ৩৭০ নং পুঁথি, পৃঃ ১২৬ (খ); ইত্যাদি।

(৩) জঙ্ঘনের স্তম্ভি-সুভাবলী-সংগ্রহ, ভাণ্ডারকর-সংগৃহীত হস্তলিখিত ৩৭০ নং পুঁথি (পুনা ১৮৮৪-৮৫), কলিও ২৩ (খ); ইত্যাদি।

(৪) সাহিত্য-দর্পণ, নির্ণয়-সাগর প্রেসের ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩৬৭-৪৬৮; শিখড়পালের রসার্ণব-সুধাকর, ১ম বিলাস, ১২৯ শ্লোক।

অল্পপ্রাস, ১ যমক ২ প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের প্রয়োগে কাব্য-শোভা স্ফুটভাবে বার্তিত হয়েছে।

শাক্‌ল-বিক্রীড়িত, অমৃষ্টভ, পুষ্পিতাশ্রা, হরিণী স্রুতি
ছন্দ কবির প্রিয় ৩

কবির কাব্যোদ্যানের মাত্র কয়েকটি ইতস্ততঃ ইন্দ্রিও
পুষ্পের সৌরভে আমাদের হৃদয়-মন ভাবাবেশে এত আত্মত
হরে আসে যে আধুনাল্প সম্পূর্ণ উদ্যানের স্পষ্ট সাক্ষতি,

(১) যথা, শাক্‌ধর-পঙ্কতি, ৩৫৭২ নং কবিতা।

(২) যথা, বঙ্গভদ্রবের সুভাবিতাবলী, ১৬৩৩ নং কবিতা।

(৩) শাক্‌ল-বিক্রীড়িত—যথা, শাক্‌ধর-পঙ্কতি, কবিতা-
সংখ্যা ৩৭৬৮এ ; বঙ্গভদ্রবের সুভাবিতাবলী, ১৪৪০ নং কবিতায়।
পুষ্পিতাশ্রা—যথা, শাক্‌ধর-পঙ্কতি, ৫৬৪ নং কবিতায়।

সমগ্র সৌন্দর্যের-কথা ভাবতেই আমাদের চিত্তে একটা
অজানা শিহরণ জাগে।

কবি শীলা বহুকাল আগে নারী-শিক্ষার যে অতুল
কীর্তিসৌধ নির্মাণ করে গেছেন, তার তুলনা কেবল ভারত-
বর্ষেই মেলে, জগতেব আর কোথাও পাওয়া যায় না,
সংস্কারভাবে এ সব সৌধ যদি আমরা জীর্ণ দীর্ণ করে না
কেন্দ্রতাম, তা হ'লে নারীর জ্ঞানকুশলতা ও কৃতিত্বে—
কি বর্তমানে, কি ভবিষ্যতে—জগতের কোনও জাতি
আমাদের সমকক্ষ হ'তে পারত না। অতীতের যা অবশিষ্ট
আছে, তা নিয়েও বর্তমানে আমরা অগণ-সভায় শ্রেষ্ঠ স্থান
অধিকার করবার প্রয়াস করতে পারি।

সার্থক চেষ্টা

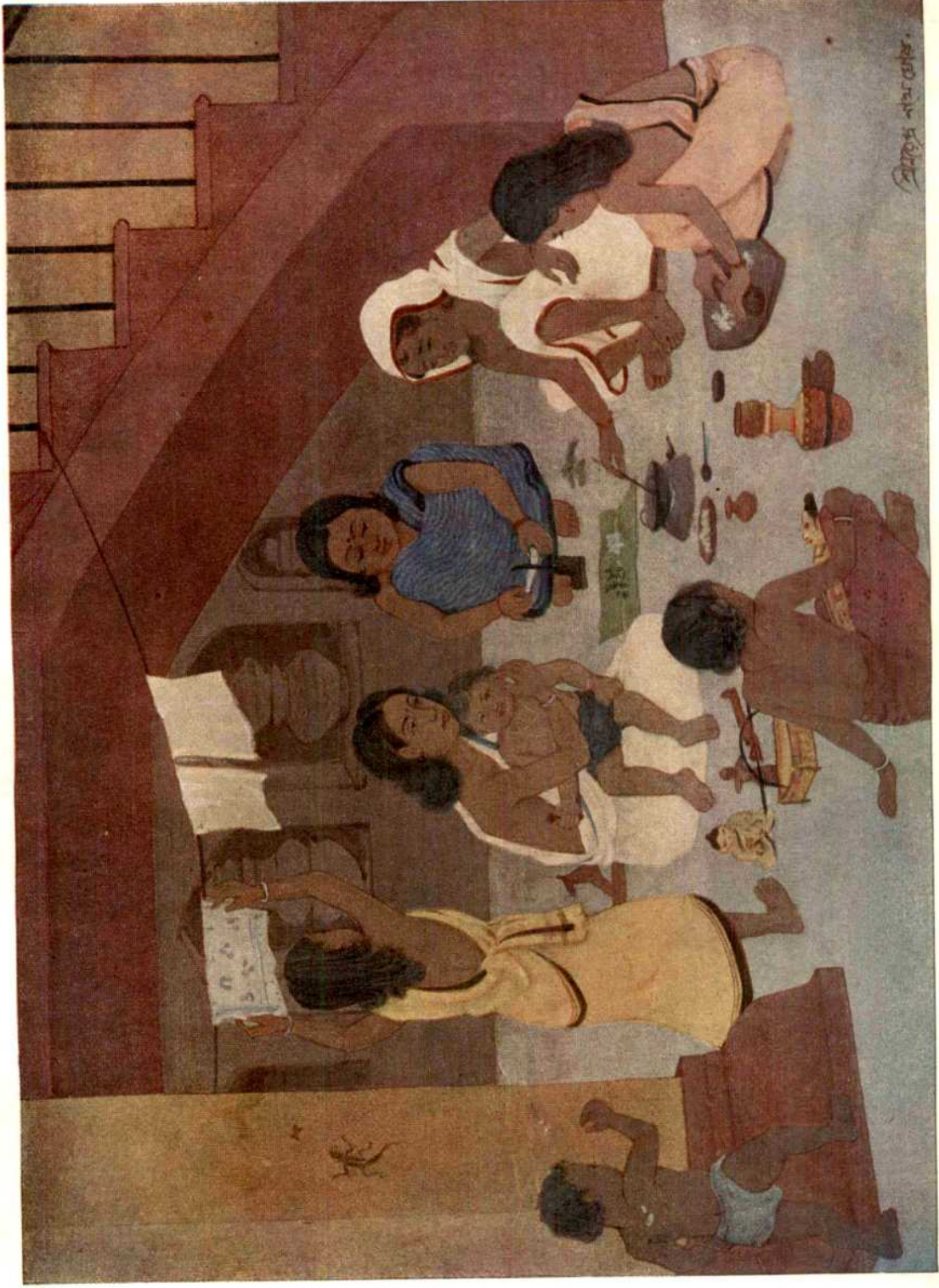
ঐচ্ছিকাকান্ত রায়চৌধুরী

নয়নের নীরে মম বিকশিত তব শতদল,
নহে সে ত লবণাঙ্ক অশ্রু, সে যে শিশিরের বারি
ছিল ছ-নয়নে মোব সৌর-কিরণের হেমকারি
কনক-সিকনে তার তলু তব করে বলয়ল।

বান্দল-আসারে মম সাগরের শুভ্র কেনরাশি,—
মাধুর্যের পুষ্পপুঞ্জ ছন্দে ছন্দে উঠে গো বিকশি,

তোমার পেলব দল পুষ্প ফুলে উঠিছে উজ্জ্বলি,
চুষ দিল সর্ব অঙ্গে তার প্রভাতেব সূর্য আসি।

প্রোমে মোর ছিল ওগো স্নিগ্ধ জ্যোতি হেমবর্ণ আলা
নাহি ছিল তাহে তীব্র কামনার বহিভরা ব্যথা,
প্রশ্রুট প্রণয় লয়ে এলে তাই নামি এই মর্ন্তো
রঞ্জিত প্রেমের রাগে নয়ন-দীপ্তিতে শাস্তি ঢালা,
কপোলের রাতিমায় তব স্বপনের শয্যা পাভা ;
তোমারে ফুটাতে গিয়ে, ফুটে উঠি আমি প্রেম-সর্ভে।



খোনাশর
বিনয়চন্দ্র ঘোষ

সারাহ

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

হরিচরণ বাবুর বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁহার মাথার চুলের অনেকগুলি আজ স্থানভ্রষ্ট, এবং যে কয়টি এখনও কোন রকমে টিকিয়া আছে, সেগুলিতে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। বয়সের অল্পপাতে শরীরের বাধুনি এখনও শিথিল হয় নাই, এ-কথা হরিচরণ বাবু নিজেরই ভাল করিয়া জানেন। রজার্সের বাড়ী তাঁর চাকরির ইতিহাস রক্ত-জরাজীর্ণ পার হইয়া স্ববর্ণের পথে পা দিয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে হরিচরণ বাবু আপিস কামাই করিয়াছেন মাত্র দিন দুড়ি-বাইশ। প্রথম বার দিন-সাতকের জন্ত ; —একমাত্র জালিকার বিবাহ-ব্যপদেশে সাত দিনের ছুটি লইয়া তাঁহাকে মুন্সের বাইতে হইয়াছিল। শস্তরবাড়ী তাঁর মুন্সের শহবে। আপিসে অল্পপস্থিত থাকিয়া রজার্স কোম্পানীকে ঠকাইয়া বেতন লইবার বাসনা হরিচরণ বাবুর ছিল না ; কিন্তু গৃহিণী সভাবালা সে-বার নাছোড়বান্দা। তিনি স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে পূজায় তাঁর গরদের শাড়ী না হইলেও চলিবে, সাবেক তগাজোড়া ভাঙিয়া হাল-ক্যাসানের আমলেট না বানাইলেও কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু মুন্সের না গিয়া তিনি নিরস্ত হইবেন না। সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটি মাত্র বোন—ইত্যাদি।

স্বতরাং হরিচরণ বাবুকে সে-বার স্বস্থ শরীরে এবং সজ্ঞানে আপিস কামাই করিতে হইয়াছিল। পরের ব্যাপারটা নিতান্তই দৈবাধীন। হঠাৎ একটু সর্দি-কাশি যে এমন মারাত্মক হইয়া উঠিবে সে-কথা হরিচরণ বাবু ভাবিতে পারেন নাই। সকাল হইতে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি না দিয়া তিনি ট্রাম ধরিবার জন্ত ছুটিলেন। রজার্স কোম্পানীকে ফাঁকি দেওয়া হইল না বটে, কিন্তু বিকালের দিকে দেহের উত্তাপ সত্যি সত্যি বাড়িয়া গেল। তার পর রাত্রিতে বাসায় কিরিয়া হরিচরণ বাবু প্রায় অচেতন হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার আসিলেন, গুহু আসিল, আইসবাগ আসিল—সমস্ত মিলিয়া ব্যাপারটা

এমনই জটিল হইয়া উঠিল যে হরিচরণ বাবু ভুল বকিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে-মাত্র তাঁহার আপিসের চাকরিটা টিকিয়া গেল। হরিচরণ বাবু সারিয়া উঠিলেন।

এ-সব অনেক দিন আগের কথা তার পর হরিচরণ বাবুর হাতে একটা গোটা সেক্সনের ভারই আসিয়া পড়িয়াছে। মাহিনা বাড়িয়াছে, এবং সেই সঙ্গে খরচও বড় কম বাড়ে নাই। আগে হরিচরণ বাবু গলাবস্ত্র জিনের কোট পরিয়া যাইতেন, এখন সেই কোটের উপর পাকানো উড়ুনী পর্যন্ত তাঁহাকে বাঁধিতে হয়। পৌনে দুই শত টাকা মাহিনার বড়বাবুর পক্ষে সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে যাতায়াত সমীচীন নয় মনে করিয়া হরিচরণ বাবু একদিন একটা মাসুলি টিকিটই কিনিয়া ফেলেন। সেই ব্যবস্থা আজও চলিতেছে।

ন'টা বাইশ মিনিটের সময় ট্রাম যখন ঠিক কালীতলার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, সেই সময় প্রতিদিন যারা ঠেলাঠেলি করিয়া কোন মতে ট্রামে উঠিয়া একটু জায়গা খুঁজিয়া লন, তাঁদের মধ্যে আমাদের হরিবাবুর 'বেণ্ডলার এটেণ্ডেন্স' একেবারে ফাষ্ট প্রাইজ। এ-কালের ছোকরাদের মধ্যে যারা আপিসে বা ব্যাঙ্কে চাকরি করে, তারা সবাই হরিচরণ বাবুকে চেনে। পরিচয় নাই, নামও জানা নাই, তবু ট্রাম যখন কালীতলার মোড়ে আসিয়া থামে, তখন সবাই বুঝিতে পারে যে, এইবার তিনি ট্রামে উঠিবেন। কোন মতে বসিবার মত একটু জায়গা করিয়া লইতে পারিলেই হরিচরণ বাবুর পকেট হইতে প্রকাণ্ড একটা কোটা বাহির হইয়া আসে—গোটা দুই তিন গান পর-পর মুখের মধ্যে চলিয়া যায় এবং সঙ্গে খানিকটা গৃহজাত দোস্তা। পকেট হইতে ভাঁজকরা থাকী এতখানি রুমাল বাহির করিয়া হরিচরণ বাবু রুমালের ঘর্ষ বিন্দুগুলি সমস্তে মুছিয়া ফেলেন। তার পর কি যন্ত্রে জানি না, হাতের রুমাল পকেটের মধ্যে আশ্রয় লইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের পাতা গভীর ঘূমে আচ্ছন্ন হইয়া আসে, ট্রামের ষ্টেপেল, লোকজনের

ওঠানামা, পথচারী জনতার কোলাহল, মোটরের হর্ষ... কিছুতেই তাঁর তজ্জার কোন ব্যাঘাত ঘটে না। মনে হয়, এই সময়টুকু ছাড়া জীবনে তাঁহার বিশ্রাম করিবার অবসর নাই...বাড়ী আর কর্মস্থলের মধ্যে এই স্বল্প ব্যবধানটুকুই তাঁহার সমস্ত অবকাশ ও স্বপ্ন...

বিকালের ব্যাপারটা একটু অস্ত্র রকম। ট্রাম ধরিবার তাড়া নাই বলিয়াই বোধ হয় হরিচরণ বাবু আপিস হইতে বাহির হন সকলের শেষে। খাতাপত্রগুলি গুছাইয়া, কাগজ মিলাইয়া, আপিস-ঘরের দরজা-জানালাগুলি ঠিকভাবে বন্ধ হইল কি না দেখিয়া লইয়া যখন তিনি রজাস' কোম্পানীর আপিসের তিনতলার ফ্লাট হইতে নামিয়া আসেন, তখন পথের দুই ধারে সারি সারি আলো জলিয়া উঠিয়াছে। পথে আলো জলিতে দেখিয়া তিনি বাড়ী ফিরিবার সময় ঠিক করেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম ঘটে কদাচিৎ।

কখনও বা ট্রামে পরিচিত কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। কখনও বা হয় না। যে-দিন সন্ধ্যা ছুটিয়া যায়, সে-দিন হরিচরণ বাবুর বাড়ী ফিরিবার কথা আর যেন মনেই থাকে না। গল্পে এবং আলোপে সমস্ত পথ যেন ব্যালান্স-শীট অপেক্ষা রমণীয় হইয়া উঠে। আলোচনার বিষয়বস্তু অবশ্য বিবিধ—একটু বৃষ্টি হইলেই কালীতলার কাছটায় কি বিজী জল জমিয়া উঠে, কর্পোরেশনের কর্তাদের এ সব দিকে নিজেদের দৃষ্টি রাখা নিতান্তই কর্তব্য, কলিকাতার শহরে পয়সা ফেলিয়া সিনেমা দেখিবার জন্য এত লোক কোথা হইতে আসে, তাঁহাদের সহপাঠী রামাভুজ মিত্র আঠারো টাকায় পোষ্ট-আপিসে চুকিয়াছিল, আজ কিন্তু তার মাহিনাটা গিয়া পৌছিয়াছে ছয়-শ'র কাছাকাছি,—‘তোমার বড়মেয়ের ছেলপুলে ক’টি?’ ‘মেজছেলেটাকে ইঙ্কলে দিলে, না, এখনও পাড়ায় পাড়ায় তেমনি ভাকাতি ক’রে বেড়াচ্ছে?’...এমনই বিবিধ প্রসঙ্গে এবং প্রশ্নে পথ যেন দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়। স্ত্রামবাজার ট্রাম-ডিপোর কাছাকাছি হঠাৎ সচকিত হইয়া হরিচরণ বাবু ফিরতি ট্রাম ধরিবার জন্য নামিয়া পড়েন।

পরিচিত কাহারও সহিত যেদিন দেখা হয় না, সেদিন হরিচরণ বাবু হয় পুরা দামে একখানি বৈকালী কাগজ, কিংবা

আধা দামে সেই দিনের প্রাতঃকালীন কাগজ কিনিয়া ফেলেন। পার্শ্ববর্তী কাহারও হাতে যদি দৈবক্রমে সেদিনের একখানা কাগজ দেখিতে পান, তাহা হইলে পয়সা খরচ করিয়া কাগজ পড়িবার প্রয়োজন আর হয় না। কেমন একটু সৌজন্ত এবং বিনয় প্রকাশ করিয়া কাগজখানি তিনি তৎক্ষণাৎ চাহিয়া লন। পাতা উন্টাইতেই সর্বোপরি তাঁহার চোখ পড়িয়া যায় শেয়ার-মার্কেটের রিপোর্টগুলির উপর। বস্তুতঃ নারীহরণের মামলার চিন্তাকর্ষক বিবরণের তুলনায় এগুলি তাঁহার নিকট অনেক বেশী লোভনীয় মনে হয়। তাঁহার জন্য সকলের চেয়ে বড় খবর থাকে শুধু বিশেষ একটি পাতায়। জলবিদ্যুৎ চা-বাগানের শেয়ারের উপর এবার কত পার্সেন্ট ডিভিডেণ্ড মিলিতে পারে তাহারই একটা আনুমানিক হিসাব কষিতে কষিতে তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। কুমারধুবীর শেয়ারটা হঠাৎ একটু নামিয়া গেলে তিনি যাবতীয় অংশীদারের হইয়া দুঃখবোধ করিতে থাকেন। এই বিশেষ-পৃষ্ঠার অতিভূচ্ছ বিবরণটুকুও যখন শেষ হইয়া যায়, তখন হরিচরণ বাবু বাধ্য হইয়া অস্ত্রান্ত পৃষ্ঠাগুলির প্রতি মনোনিবেশ করেন। খবরগুলি সব দিন পড়িয়া দেখিবার সময় নয় না, হেড-লাইনগুলির উপর একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি যেন সব বুঝিয়া ফেলেন। তাঁহার টোন্টের প্রান্তে অবিবাহিতের একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দেয়। ট্রেনে ডাকলুঠের সংবাদ পড়িয়া বিস্মিত হইবার বয়স হরিচরণ বাবুর কবে কাটিয়া গিয়াছে; মনে মনে একটু হাসিয়া হরিচরণ বাবু ভাবেন : খাসা লিখিয়াছে। লিখিবার ক্ষমতা আছে, মাথায় কল্পনা আছে ছোকরাদের। নহিলে কাগজ বিক্রী হইবে কেন?

বাড়ী ফিরিয়া মুখ হাত ধুইতে কোন দিন আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। তার পর কাপড় ছাড়িয়া হরিচরণ বাবু আস্থিক বসেন। আস্থিক সারিয়া উঠিতে উঠিতে রাত ন’টা। তার পর ছেলেমেয়েগুলির একটু খোঁজখবর, যখন যেটি সবচেয়ে ছোট তাহাকে কোলে লইয়া একটু আদর, বড় ছেলেমেয়েগুলির পড়াশুনার জন্য মাঠার যথাসময়ে আসিতেছেন কি না সে-সম্বন্ধে একটু কৌতুহল প্রকাশ—তার পরেই আহা—পর্ক! আহা—দাদি শেষ হইবার পূর্বেই চাকর আসিয়া

গড়গড়াট ঠিক মাথার শিয়রে রাখিয়া যায়; হাত-মুখ ধুইয়া হরিচরণ বাবু প্রোক্ষলিত কলিকার দিকে চাহিয়া অপরিণীম আনন্দ বোধ করেন। সকালে আপিসের তাড়ায় তামাক খাওয়া হয় না; সুতরাং তামাকের স্বগন্ধে নিজের পূর্ব-মুহূর্তগুলিকে স্মরণিত করিবার কল্পনায় হরিচরণ বাবু বোমাক্তিত হইয়া উঠেন বলিলেও খুব বেশী বলা হয় না। তার পর এক সময়ে গড়গড়ার নল কেমন করিয়া জানি না, তাঁহার মুখ হইতে খসিয়া বালিশের উপর পড়িয়া যায়, তদ্বার যোবে হরিচরণ বাবু পাশবালিশটা আরও একটু কাছে টানিয়া আনেন, চাকরটা আসিয়া সেই অবসরে নলটা সবাইয়া নীচে নামাইয়া রাখে, সম্ভবপে মশারিটা টানিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়...

রজার্স কোম্পানীর সেক্সন্-ইন্-চার্জ হরিচরণ বাবুর দিনযাত্রা ঠিক এমনি করিয়াই নির্বাহ হইতেছিল। কিন্তু এক দিন আপিসের খোদকর্তা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে বয়সের প্রতি বিবেচনা করিয়া এইবাব তাঁহার অবসর গ্রহণের সময় হইয়াছে। অবশ্য, কোম্পানী তাঁহার প্রতি অবিচল করিবে না, থোক-থাক কিছু টাকা তাঁহাকে দেওয়া হইবে—

হরিচরণ বাবু আপত্তি করিলেন; বয়স যে তাঁহার সত্যই রিটায়ার করিবার মত হয় নাই সে-কথা প্রমাণ করিবার জন্ত সাহেবের সম্মুখে এমন ভাবে হাত-পা নাড়িতে লাগিলেন যে মনে হইল, সত্যই বুঝিবা তাঁহার বৌবন কিরিয়া আসিল। কিন্তু সাহেব ভীষণ কড়া লোক, যাত্র দুই মাস আগে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হইয়া খাস স্কটল্যান্ড হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন—কোন প্রমাণই তাঁহার নিকট গ্রাহ্য হইল না। চাকরির মেয়াদ নিশ্চিত হইয়া গেল। আব তিন মাস পরে তাঁহাকে অবসর লইতে হইবে।

হরিচরণ বাবু সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজের টেবিলে আসিয়া বসিলেন। মাথার উপর পাখাটা সমানভাবে ঘুরিতেছে, কিন্তু হরিচরণ বাবুর পক্ষে পাখার হাওয়া যেন এখন যথেষ্ট নয়। বেয়ারাকে ডাকিয়া হরিচরণ বাবু এক গ্লাস জল দিতে বলিলেন। গ্লাসের জলে চোখ মুখ একবার ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইল। তার পর ফাইলগুলি লইয়া হরিচরণ বাবু নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন।

ভাবিলেন, আজ হইতে ঠিক তিন মাস পরে এইখানে বসিয়া ফাইলগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিবার কোন অধিকারই তাঁহার থাকিবে না। তখন এই স্রোরে বসিয়া কাজ করিবে তাঁহারই সহকাযী রাখাকাজ চাটু-ম্বা।

তা হোক, দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই—হরিচরণ বাবু নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। বিশ্রামের বয়স না হোক, প্রয়োজন ত হইয়াছে। চিবকাল তাঁহাকে টাকার জন্ত এই ঘানি টানিয়া যাইতে হইবে এমনও ত কোন কথা নাই। হঠাৎ মোটর চাপা পড়িয়া মারা গেলো চাকরি এমনি ভাবে শেষ হইয়া যাইত।

তিন মাস দেখিতে দেখিতে কাটা গেল। তার পর হরিচরণ বাবু যেদিন পাণ্ডা-গাওয়া চুকাইয়া লইবাব জন্ত আপিসে গেলেন, সেদিন রজার্স কোম্পানীর ক্যাণ্টের চেয়ারাই যেন বদলাইয়া গিয়াছে। কেবানীন্দো হরিচরণ বাবু টেবিলে খুঁজিয়া পাইলেন না; দেখিলেন বেয়ার বা আপিসের চেয়ার-গুলি লইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। এত দিনের কারবাব সত্যই উঠিয়া গেল কি না ভাবিতে ভাবিতে হরিচরণ বাবু সাহেবের কামরার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যাক, তাঁহাকে তবু যথাস্থানে পাওয়া গিয়াছে

হরিচরণ বাবু সাহেবের সামনে গিয়া দাঁড়াইতেই সাহেব তাঁহাকে হাত বাড়াইয়া চেয়ারে বসিতে বলিলেন। ত্রিশ বছর চাকরি করিলেও এমন একটা গর্হিত কাজ করিবার দুঃসাহস তাঁহার কোন দিন হয় নাই। তবু আজ সাহসে ভর করিয়া তিনি সাহেবের কথা রাখিয়া ফেলিলেন এবং সেই মুহূর্তে তাঁহার মনে হইল, তিনি আর ম্যাকরজার্স জুনিয়ারের চাকর নহেন।

সাহেব কুশল প্রণামির পর মোটা টাকার একটা চেক লিখিয়া হরিচরণ বাবুর হাতে দিলেন এবং কথায় কথায় ইহাও জানাইয়া দিলেন যে তাঁহার ছেলেরাও যথেষ্ট বয়স হইয়া থাকে তাহাকে এই আপিসে পাঠাইয়া দিলে তাহার জন্ত তিনি চেষ্টা করিবেন না। হরিচরণ বাবুর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া উঠিল, চেকের চার ‘ডিজিট’ের অঙ্কটাও যেন অস্পষ্ট হইয়া আসিল; ধন্যবাদ

জানাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুখ দিয়া তাঁহার কথা বাহির হইল না।

সাহেব পুনশ্চ কহিলেন, আপিসের ঠাকুর পক্ষ হইতে তাঁহাকে ‘ফেয়ারওয়েল’ দিবার সামান্য একটু আয়োজন হইয়াছে, সুতরাং তিনি যেন হঠাৎ বাড়ী চলিয়া না যান।

এ-পর্যন্ত সাহেবের সদাশয়তা হরিচরণ বাবুর ভাগ্যে লাগিতেছিল, কিন্তু এবার তিনি বিরক্ত বোধ করিতে লাগিলেন। মুখ ফুটিয়া সাহেবকে বলিয়াই ফেলিলেন যে ইহার কোন প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু বিদায়-অভিনন্দনের আয়োজন তখন অনেক দূর আগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং হরিবাবুর আপত্তি টিকিবার কথা নয়। কিছুক্ষণ পরেই ঘটা করিয়া তাঁহার কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি আপিসস্থল লোকের সম্মুখে বিজ্ঞাপিত হইল। ফুলের মালা আসিল, রূপালী কাগজের উপর ছাপা বিদায়-অভিনন্দন পাঠ করা হইল, যথারীতি উদ্বোধন-সঙ্গীত হইয়া গেল এবং স্বয়ং সাহেব পর্যন্ত ছোটখাট একটি বক্তৃতা দিয়া ফেলিলেন। প্রকাশ হইল-ঘরের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ-বাট জন করোনী ও বেয়ারার মধ্যে হরিবাবু নিকোথের মত বসিয়া রহিলেন। মনে হইল, নিজের অন্ত্যেষ্ট-উৎসবই তিনি যেন নিজের চোখে দেখিতে আসিয়াছেন। যে-ছোকরা এই সভায় পঠিত অভিনন্দনপত্রখানি রচনা করিয়াছে, তাহার নাম জানিতে পারিলে তিনি বোধ হয় মনে মনে তাহাকে অভিশাপ দিতেন এবং ক্ষমতায় ফুলাইলে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া বাইতেন। অথচ তাঁহাকেই আবার এতগুলি লোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিদায়-অভিনন্দনের একটা জবাবও দিতে হইল। ভাগ্যের পরিহাস যে এমনই শোচনীয় মূর্ত্তি লইয়া দেখা দেয় সে-কথা এত দিন পরে হরিচরণ বাবু যেন উপলব্ধি করিলেন।

তিন-চার দিন কোন মতে বাড়ীতে কাটিয়া গেল। রজাস কোম্পানীর চেকখানি ব্যাঙ্কে গিয়া কাশ করিতে হইল, তার পর প্রেস সিডনের বাড়ী হইতে শেয়ারের দর আনাইয়া, টাকাটা কোথায় নিরাপদে ইনভেস্ট করা যায়, হরিবাবু তাহারই একটা হিসাব করিতে লাগিলেন। কিন্তু

ইহাও জল্প সময় কতক্ষণই বা লাগিতে পারে? সমস্ত কাজ শেষ হইবার পরেও হাতে যেন অনেকখানি সময় থাকিয়া যায়। ট্রামের মাছলির মেয়াদ তখনও শেষ হয় নাই, বার-চারেক ড্রামবাজার-এসপ্লানেড ঘুরিয়া আসিলেও ঘণ্টা-দেড়েকের বেশী সময় লাগে না; উপরন্তু পরিচিত লোকজনের সহিত দেখা হইয়া গেলেই হরিচরণ বাবু যেন রীতিমত বিব্রত বোধ করেন। পৃথিবীস্থল লোক এখনও দশটা পাঁচটা খাটিয়া খাইতেছে, অথচ স্বস্থ সবল শরীর লইয়া তিনি ইহারই ভিতর বাড়ীর গভীর মধ্যে বসিয়া নৈকর্ষের সাধনা করিতেছেন, ত্রিশ বছরের করোনীগিরির পর একথা হরিচরণ বাবুর মনে হইয়া এমন কিছু বিশ্বয়কর নহে।

সন্ধ্যার মুখে হরিচরণ বাবু এক দিন পার্কে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে নিকর্ষজীবনের করুণ রূপ দেখিয়া তাঁহার যেন ভয় ধরিয়া গেল। কেউ হাতে রূপা-বাঁধান লাঠি লইয়া প্রায় সামরিক ভঙ্গিমায়া পা ফেলিতে ফেলিতে বিশ-ত্রিশ বার পার্কটি প্রদক্ষিণ করিতেছেন, কেউবা শীত পড়িবার আগেই বালাপোষ গায়ে জড়াইয়া এ-বৎসর শীতের প্রকোপ বড় ভীষণ হইতে পারে সে-সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন, কেউবা তাঁহার সময়ের বড়সাহেবের কড়া মেজাজের সবিস্তার পরিচয় দিয়া উৎসুক শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে ভীতিসঞ্চারের জন্ত ব্যাকুল। দেখিয়া শুনিয়া হরিবাবু সেদিন আধ ঘণ্টার বেশী পার্কে থাকিতে পারেন নাই। পার্কটা তাঁহার কাছে পিঁজরাপোলের মত মনে হইয়াছিল; পৃথিবীতে বাহাদের কাজের কোন বালাই নাই, কর্ম জীবনে বাহাদের অবসর মিলিয়াছে, তাহারাই যেন তাহাদের ক্লাস্ত নিঃশ্বাসে সন্ধ্যার আকাশকে প্রতিনিয়ত ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। মরিতে হইবে বলিয়া কত না ইহাদের দুশ্চিন্তা এবং সেই নিশ্চিত মৃত্যুকে দিনকয়েকের মত ঠেকাইয়া রাখিবার জন্ত কি করুণ তাহাদের প্রয়াস। সেদিন হইতে হরিচরণ বাবু আর পার্কের দিকে বাইবার চেষ্টা করেন নাই।

বাড়ীর আবহাওয়াও যেন দিন-দিন বিরক্তিকর হইয়া উঠিতে লাগিল। বাড়ীটি হরিচরণ বাবুর পৈতৃক সম্পত্তি। ছেলেবয়সে যেদিন তিনি প্রথম রজাস কোম্পানীতে চাকরি করিতে গিয়াছিলেন, সেদিন মনে করিয়াছিলেন,

বিশ-পঁচিশ বছর পরে যেদিন এই দাসত্বের অবসান ঘটবে সেদিন এই বাড়ীটিকে তিনি নতুন করিয়া গড়িবেন। ইহার অস্থিতে এবং মজ্জায় যে স্ববিরত্বের ছাপ লাগিয়া আছে তাহা ঘুচাইতে হইবে। সামনের দিকে একটা গাড়ী-বারান্দা বাহির করিতে হইবে, উপরে ঘর তুলিতে হইবে আরও দুই-তিনখানি। ঘরগুলির সামনে পড়িবে গাড়ী-বারান্দার ছাদ। সেই ছাদের উপর লতায় পাতায় এবং ফুলে স্নিগ্ধ একটি বাগান তাঁহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। হাদের মাঝখানে পড়িবে গোটা-কয়েক শাদা বেতের চেম্বার। বন্ধুরা আসিয়া সেখানে জটলা করিবে। ছেলেরা ফুল লইয়া করিবে কাড়াকাড়ি। হরিচরণ বাবু প্রশান্ত উদ্যোগে তাহাদের দুরন্তপনা কমা করিয়া যাইবেন। কিন্তু জিশ বৎসর পরে সত্যই যেদিন তাঁহার কর্মজীবনের উপর যবনিকা পড়িল, সেদিন সে-কল্পনাকে তিনি মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইলেন না। এত কাল রজার্স কোম্পানী যেন তাঁহার এবং তাঁহার এই বাড়ীর মধ্যে প্রকাণ্ড একটা আড়াল হইয়া ছিল। সে আড়াল ঘুচিয়া যাইতে হরিচরণ বাবু চারি দিকে ভাল করিয়া চাহিবার সময় খুঁজিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি তখন এক রকম হইয়া গিয়াছে।

সংসারের ছোটখাট কতকগুলি দাবিদার এতকাল হরিচরণ বাবুকে বহন করিতে হয় নাই; যেমন ধোপা, নাপিত, দৈনিক বাজার-খরচ—ইত্যাদি। এখন সেগুলি একে একে তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল। আগে টাকা দিয়াই তিনি নিষ্কৃতি পাইতেন, এখন কোন্ ছেলটার ক-খানা কাপড় রজকালয়ে গেল সে হিসাব পর্যন্ত তাঁহারই হাতে আসিয়া পড়িল। ছোট মেয়েটা হয়ত সবে জর হইতে উঠিয়াছে, তাহার জন্ত হজির রুটি এবং সিডী নাছের ঝোলের ব্যবস্থা পর্যন্ত তাঁহাকে করিয়া দিতে হইবে।

সত্যবালা বলিলেন, বাঁচলাম বাপু এত দিনে, নিজের সংসারের ভার এইবার নিজের হাতে নাও।

হরিচরণ বাবু কেবল মুখ তুলিয়া গৃহিণীর দিকে চাহিলেন। সত্যবালার সীমন্তের দুই পাশের চুলে স্তম্ভতার আভাস। চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে। মুখে ক্লান্তির ছায়া। অনেক দিন, অনেক দিন হরিচরণ বাবু ভাল করিয়া এই মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখেন নাই।

কিন্তু সেদিন চাহিতে গিয়া তাঁহার মন হইল, কুড়ি বৎসর আগের সেই নব-পরিণীতা মেয়েটি যেন কবে মরিয়া গিয়াছে। সংসারের ঢাকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাঁহার নিষ্ঠ হইতে সে বৃষ্টি সরিয়া গিয়াছে বহুদূরে। কাছে টানিয়া তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে না। চারি দিকে তাহার ছেলেমেয়েদেব ভিড়, ঝি-চাকরের ভিড়, প্রতিদিনের প্রয়োজন্যের ভিড়। অবকাশকে অহরহিত করিয়া ভুলিবার ক্ষমতা আর তাহার নাই।

এখন অবসরবেলায় সত্যবালা তাঁহার নিকট বন্ধিমের নভেলের কোন কঠিন-অংশের ব্যাখ্যা অন্ত্রিত আসিবে না এবং শুনিতে আসিলেও ব্যাখ্যা করিবার মত উৎসাহ এবং আবেগ তিনি খুঁজিয়া পাইবেন না। অবসর পাইলে সত্যবালা তবু পাশের বাড়ীতে গিয়া মল্লেক-গৃহিণীর পুত্রবধূর এত দিনেও সন্তান হইল না কেন, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সময় কাটাইতে পারিবে। কিন্তু তিনি?

ছেলেদের মুখের দিকে চাহিয়া এ-কথা তাঁহার এক দিনও মনে হইল না যে তাহাদের জীবনে তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল। বড়ছেলেটা গোটা দুই টিউশনি করে এবং সন্ধ্যার সময় বি-কম পড়িতে যায়। সমস্ত দিনের মধ্যে ঘণ্টা-দুই তাহার দেখা মেলে। রাজিতে যখন পড়িয়া এবং পড়াইয়া বাড়ী ফেরে তখন হরিবাবু শুইয়া পড়িয়াছেন। ঘরের মধ্যে আসিয়া কোন দিন কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সময়ও তাহাব হয় না। আর ছেলেমেয়েগুলির মধ্যে কেউব জ্বলে যায়, কেউবা কলেজে। সকালে প্রাইভেট টিউটর আসেন। তার পর যে বাহাব জ্বল-কলেজে চলিয়া যান। বিকালে হয় ফুটবল, নয় সিনেমা। মেয়ে দুটি এবড়ী ওবাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। মাস শেষ হইবার পুখে কয়েক দিন তাহাব সহিত সময় করিয়া দেখাসাক্ষাৎ করে, নির্দিষ্ট দিনে মাহিনা চাই। বই কিনিবার সময় মাঝে মাঝে তাহাদের পিতৃভক্তির পরিচয় একটু মেলে, এই পর্যন্ত ছেলেবেলা হইতে তাহারা বাবাকে দূর হইতে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহারা জানে, বাবা ভীষণ কাজের মানুষ; কাজেব তাগাদা ভিন্ন অকাজের বোঝা লইয়া অপ্রয়োজনে তাঁহার কাছে বেঁধিবার সাহস তাহাদের হয় না। সেজন্য তাহাদের মা

আছেন। কি কৌশলে তাঁহার নিকট সিনেমা বা ফুটবল খেলা দেখিবার টিকিটের পয়সা আদায় করিয়া লওয়া যায় সেটা তাহারা এত দিনে ভাল ভাবেই অভ্যাস করিয়াছে, এবং ছেলেদের এই সব ছোটবড় উপদ্রব সহ্য করিবার মত উৎসাহ এবং অধ্যবসায় সত্যবালার আছে।

হরিবাবু প্রতিবেশীদের সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে-ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও কোথায় যেন ফাঁক থাকিয়া গেল। প্রতিবেশীদের মধ্যস্থ এবং অপরাধের দাবার আড্ডায় হরিচরণ বাবু নিঃসঙ্গ বোধ করিতে লাগিলেন। খেলিবার অধ্যবসায় তাঁহার ছিলই না, উপবাস মাত্র দুই জন খেলোয়াড়কে বিরিয়া আর আট-দশ জনের সহিত দল বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার উৎসাহও তিনি পাইলেন না। অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে কাজকর্মের তাগাদা যাহাদের নাই, হরিবাবু দেখিলেন তাহারা আলস্য এবং কর্মবিমুখতা কেমন অনায়াসে অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছে। খবরের কাগজের পাতায় আইন-আদালতের বিচিত্র বিবরণগুলি পড়িতে পড়িতে সমস্ত সকালটা কাটাওয়া দেওয়া ইহাদের পক্ষে যেমন সহজ, খবরের কাগজ যেদিন হাতের কাছে মেলে না, সেদিন অমুক সরকার হইতে অমুক বস্ত্র কলঙ্কব আত্মমানিক কাহিনীর বিচিত্রতর রস উপভোগ করিতে করিতে সময় কাটাওয়া দেওয়াও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হয় না। কিন্তু জিশ বছর ধরিয়া হরিচরণ বাবু ঠিক ইহার উল্টা দিকে চলিয়া আসিয়াছেন, হুতরাং যাহাদের তিনি নিকটে আনিবার চেষ্টা করিলেন, তাহারা তাঁহাকে দূরে বাঁধিয়া দিল।

খবরের কাগজের উপর হরিচরণবাবুর আস্থা ছিল না। তবু সেদিন সকালে উঠিয়া তিনি সেজ ছেলেটাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, আজ থেকে ইংরিজী কাগজ একখানা রোজ আমার চাই, বুঝিল ?

বেশী কোন কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল না। ছেলেটি তখনই পয়সা লইয়া ছুটিয়া বাহির হইল, নগদ দামে একখানা কাগজ কিনিয়া আনিল এবং আগামী কাল হইতে রোজ সকালে বাড়ী বসিয়া বাহাতে কাগজ পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া আসিল।

হরিচরণ বাবু সেদিন সমস্ত দুপুর বিছানায় পড়িয়া কাগজ পড়িলেন। খবরগুলি একে একে পড়া হইল, সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিও এক সময় ফুরাইয়া গেল, এমন কি 'ওয়ারেন্টেড' কলাম এবং বিজ্ঞাপনগুলি পর্যন্ত তিনি বাদ দিলেন না। পরদিন সকালে কাগজওয়ালার ডাক শুনিয়া হরিচরণবাবু বাহিরে আসিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, ডান পায়ের হাঁটুর কাছটা যেন কন্ কন্ করিতেছে। ঠাণ্ডায় বা শুইবার দোষে এমন হওয়া বিচিত্র নয় মনে করিয়া হরিচরণবাবু ব্যাপারটা গ্রাহ্য করিলেন না; বাহিরে গিয়া কাগজওয়ালার সহিত কথাবার্তা কহিলেন এবং কাগজ লইয়া পড়িতে স্বক করিলেন। বেলা বাড়িতে লাগিল, কিন্তু হাঁটুর ব্যথা কমিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। হরিচরণ বাবুর মুখে চিন্তার ছায়া পড়িল। কিছুক্ষণ তিনি রোদে পা হুড়াইয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলেন, তার পব চাকরটাকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন ভাল করিয়া তেল মাশিণ করিবার। ব্যথা কিন্তু গেল না।

দুপুরবেলায় সত্যবালার সহিত দেখা হইল। সেই মাত্র ভাঁড়াব-ঘরে ঢাবি দিয়া তিনি লেপের ওয়াড় শেলাই করিতে বসিয়াছেন। হরিচরণ বাবু বিমর্ষ, কল্লম মুখে তাঁহার নিকটেই বসিয়া পড়িলেন। এমন ব্যাপার অনেক দিন হয় নাই। সত্যবালার লক্ষ্য করিতে লাগিল...

হরিচরণ বাবু সবিস্তারে পায়ের ব্যথার ইতিহাসটা তাঁহার কাছে খুলিয়া বলিলেন। তিনি মনে মনে কল্পনা করিয়া আসিয়াছিলেন যে তাঁহার হাঁটুর এই কষ্টকর অবস্থার কথা শুনিয়া সত্যবালা আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পড়িবেন, এখনই ভাস্কর ডাকিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু সে-রকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

সত্যবালা বলিলেন, দিন-রাত বাড়ী বসে থাকলে এমনই হয় বইকি মাছঘের। দেখ দেখি, বাঁড়ুজোদের বড়কর্তাকে। বয়সে তোমার চেয়ে দু-দশ বছরের বড়ই হবেন, তবু রোজ সকালে উঠে পায়ের হেঁটে বান গঙ্গান্নান করতে। মাছঘের নড়াচড়া একটু চাই-ই, নইলে বাতে ধরবে যে।

যে-আশঙ্কাটা হরিচরণ বাবু এতক্ষণ সমস্তে এড়াইয়া চলিতেছিলেন, সত্যবালার মুখের কথায় সেটা যেন একেবারে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। হয়ত শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে বাতেই ধরিল, নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না।

কথাবার্তায় ছেদ পড়িল সেইখানেই। হরিচরণ বাবু বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। না, রোজ সকালে উঠিয়া, দেড় মাইল রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিবার মত উৎসাহ তাহার কোন দিন হইবে না। কিন্তু উপায়ই বা কি? ঘরে বসিয়াই কি শেষ পর্যন্ত একদিন তিনি বাতে পড়ু হইবেন?— সে ত আরও অসহ!

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় মেজছেলে ছুজ হইতে কিরিবার পর হরিচরণ বাবু তাহার হাতে একখানি চিঠি-সমেত থাম

দিয়া বলিলেন, চুপি চুপি এটা ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ো আর দেখি বাবা। কাউকে কিছু বলিস নে যেন।

ছেলেটি থামখানি লইয়া বাহির হইয়া গেল। কাহাকেও সে কিছু বলিল না বটে, কিন্তু চিঠির গন্তব্যস্থানটা কোথায় সেটা দেখিয়া লইতে সে ভুলিল না। না ভুলিলেও ব্যাপারটা তাহার ঠিক বোধগম্য হইল না। সে শুধু দেখিল, কাল হইতে যে কাগজখানা তাহাদের বাড়ীতে আসিতেছে তাহারই কন্সারে, বস্তু নথর দি। তাহার বাবা চিঠি লিখিয়াছেন। কেন লিখিয়াছেন স-কথা বুঝিবার বয়স তাহার নয়।

অন্তরীনের পত্র : ভারত-শিল্পের অনুশীলন

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ও শ্রীঅর্কেশ্বরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

মাতৃবরেণ্য,

আমি আপনার কাছে কিঞ্চিৎ সাহায্যপ্রার্থী। বর্তমান বেকারের যুগে এ কথা শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠা আশ্চর্য নয়। তাই প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে আমি তথ্য-কথিত বেকার নই। সরকারী তাতায় কোন রকমে আমার দিন গুজরান হয়ে যায়। কাজেই সম্প্রতি পেন্টভরাবাব চিন্তা আমার নেই। অব দিন আমার কাটে বিনা কাজেই বটে। অথচ শরতানের কারখানা-ঘর করে তোলবার জন্তে মস্তিষ্কটাকে তার হাতে সঁপে দেওয়াও কোন কাজের কথা নয়। তাই আর কোন কাজ না পেয়ে বই পড়াই সার করতে হয়েছে— দিনরাত পড়া, আর পড়া—এই নিয়ে থাকি।

কিন্তু একটা হুসখুস প্রণালীতে পড়ে যে কোন একটা বিষয় সম্বন্ধে ভাল করে জানবার চেষ্টা করব, সে উপায় নেই। এক ত হুসখুস প্রণালী সম্বন্ধে কোন বিশেষজ্ঞের উপদেশ-লাভের সুবিধা আমার নেই। দ্বিতীয়তঃ, বই কিনে পড়বার সজ্জিতও বিশেষ নেই, তবে কলকাতার ইন্সটিটিউট

৪/৬/৩৭

লাইব্রেরী থেকে মাসে মাসে চার খানা করে বই পাওয়ার ব্যবস্থা আছে—এই যা। তার ফলে যদিও সময়মত ও আবশ্যক-মত সব বই মেলে না, তবু ৭৭ খানা বইয়ের নাম লিখলে দু-এক খানা অন্ততঃ পাওয়া যায়।

এখন আসল কথাটা বলি। আমি শিল্পকলা সম্বন্ধে ভাল করে জানতে ও বুঝতে চাই—বিশেষ করে ভারতীয় শিল্পকলা। কিন্তু এ সম্বন্ধে ভাল বই কে আছে, কোন্ বইয়ের পরে কোন বই পড়া উচিত, পড়ার সময়ে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে অর্থাৎ অধ্যয়নের সূত্র রীতি কি, এ সব বিষয়ে আমি কিছুই জানি নে। তাই বিশেষজ্ঞের উপদেশ আবশ্যক। আমি যত দূর জানি, তাতে শিল্পকলার বিশেষজ্ঞ সমালোচক হিসেবে ভারতীয়দের কারও নাম করতে হ'লে এক জুমারসামী ও আর এক আপনি। এন. সি. মের্টা, কানাইলাল ভট্টাচার্য ও আরও দু-এক জনের নাম কাগজে পড়ি বটে, তবে তাঁরা বোধ হয় নাম করবার মত নয়। সে যাই হোক, এঁদের কারও সঙ্গেই আমি পরিচিত নই। তাই এঁদের কাছে আমার চিঠি লেখা চলে

না। আপনার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও একটা সন্ধ্যা আছে—
আপনিও বাঙালী, আমিও বাঙালী। তাই ভরসা ক'রে
আপনাকেই লিখছি। আপনার অমূল্য সময়ের উপর ভাগ
বসাজি ব'লে আশা করি কষ্ট হবেন না। আমার বিশেষ
ক'রে দরকার বইয়ের নামেব তালিকা ও কৌন্থানার পরে
কৌন্থানা পড়তে হবে, তা জানা। এ ছাড়াও যদি অল্প
কোন রকমে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন, বিশেষ বাঞ্ছিত
হব। আমি যে সব বই পড়েছি তাব একটা তালিকা অপর
পৃষ্ঠায় দিলাম। ইতি

বিনীত নিবেদক

জীমনোরঞ্জন গুপ্ত

1. A. K. Coomarswamy—History of Indian & Indonesian Art.
2. E. B. Havell—Indian Sculpture and Painting.
3. L. Binyon—Painting in the Far East, 4th Edition.
4. N. C. Mehta—Studies in Indian Painting.
5. R. D. Banerji—Eastern Indian School of Mediæval Sculpture.
6. J. H. Cousins—Modern Indian Artist.
7. Mukul De—My Pilgrimage to Ajanta and Bagh.
8. B. Barua—Barhut, Bk. 1 (Stone as a story-teller)
9. Gladstone Solomon—The Women of the Ajanta caves.
10. C. L. Woolley—The Development of Sumerian Art.
11. Margaret Dobson—Art Appreciation.
12. Joseph Pijoan—History of Art, vol. I.
13. O. C. Ganguly—Indian Architecture.
14. " " —Love Poems in Hindi.
15. Four Arts Annual, 1935-36 and 1936-37.
16. Hirananda Sastry—Indian Pictorial Art as developed in Book-Illustrations.

১২জুন ১৯৩৭

সবিনয় নিবেদন,

আপনার অল্পগ্রন্থলিপি পেয়ে সম্মানিত ও আনন্দিত
হয়েছি।

যেদিন থেকে আপনি দেশ-মাতৃকার স্বরূপ দেখবার
প্রচেষ্টায় ধ্যানের আসনে বসেছেন, দেশের সভ্য-রূপ, দেশের
দিব্য-প্রতিমা, যে অদ্ভুত ও অলৌকিক চাক্কলা ও কারুকলার
মধ্যে লুক্কায়িত আছে,—সেই শিল্প-দেবতার সাক্ষাৎ
পরিচয়ের প্রতিজ্ঞা নিয়ে যেদিন আপনি ভক্তের আসনে
বসেছেন, দেশ-ভক্তির শ্রেষ্ঠ আসন আপনি অধিকার
করেছেন, দেশের শিল্পের ভক্ত—আপনাকে আমি নমস্কার
করি। যারা দেশের চাক্কলা ও কারুকলাকে দৃষ্টির পথে
জদয়ঙ্গম করছেন, যারা দেশের শিল্প-দেবতাকে সৃষ্টির পথে
সার্থক ক'রে তুলছেন, মূর্তিমান ক'রে তুলছেন, আমি তাঁদের
কাছে মাথা নত করি। আজ, আপনি দৃষ্টির পথে শিল্প-
দেবতাকে অহুসঙ্কান করছেন, কাল হয়ত সৃষ্টির পথে
অহুসঙ্কান করবেন, স্মরণ্য আপনি আমার নমস্কার, আমি
আপনাকে আবার নমস্কার করি।

আমি সারা জীবন কায়মনোবাক্যে দেশের শিল্প-
দেবতাকে পূজা কবতে চেষ্টা করেছি, আমার ভাগ্যে আজও
তাঁর দর্শনলাভ ঘটে নি। শুনেছি, এই দিব্যদৃষ্টি বহু
সাধনায় পাওয়া যায়। আমার পূজা ও সাধনার শক্তি অতি
সামান্য, সেই জন্য আজও সিদ্ধিলাভ ঘটে নি।

আপনি আমার কাছে শিল্পসাধনার উপদেশ চেয়েছেন।
আপনাকে উপদেশ দেবার অধিকার আমার নেই। মাত্র
এক জীবনের স্বল্প চেষ্টায় যেটুকু পেয়েছি, অথবা পেয়েছি
ব'লে মনে করেছি, সেইটুকুই আপনাকে জানাব।

আজীবন দেশের ও বিদেশের শিল্প সন্ধ্যা শত শত
পুস্তক পড়েছি। আমার বিশ্বাস শিল্পদেবতাকে পুঁথির পথে
পাওয়া যায় না। পটে, প্রতিমায়, মন্দিরে, মূর্তিতে, আসনে,
বসনে, রেখায়, নক্সায়, রূপে, বর্ণে,—দৃষ্টির পথে তাঁকে নিরন্তর
চাক্কু করতে হবে। চোখের ভিতর দিয়ে তিনি মরমে
পশেন, কানের ভিতর দিয়ে, অক্ষরেব ভিতর দিয়ে নয়, শব্দের
ভিতর দিয়ে নয়। তিনি নিরক্ষরের দেবতা, রেখা-বর্ণে
তাঁর প্রকাশ।

কোনও কোনও শিল্প সন্ধ্যায় পুস্তকে কিছু কিছু
হাকটোনের ছাপা প্রতিলিপি থাকে। কিন্তু এই প্রতিলিপি
আসল মূর্তি বা চিত্রের অতি অল্প অংশই আমাদের দিতে
পারে।

ভাল ফটোগ্রাফ কিংবা বহু মূল্যের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছাপা বর্ণ-প্রতিলিপি (colour-facsimile) অনেকটা আমাদের দিতে পারে। কিন্তু সাধারণ সস্তা দামের পুস্তকে, উচ্চ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিলিপি দেওয়া সম্ভব হয় না।

ইউরোপে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎকৃষ্ট চিত্রের হুবহু নকল ছাপা হয়। কোন কোন ভারতীয় চিত্রের উৎকৃষ্ট বর্ণ-প্রতিলিপি ছাপা হয়েছে। আমার মতে যাদের পক্ষে আসল চিত্র দেখবার সুযোগ নেই—এই সকল শ্রেষ্ঠ পদ্ধতির প্রতিলিপি বিশেষ উপযোগী। অনেক বই পড়ে, বা হাফটোন প্রতিলিপি ঘেঁটে যা না পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক বেশী—এই শ্রেণীর হুবহু প্রতিলিপিতে আছে।

বিশেষজ্ঞের রচিত পুস্তকে শিল্পের তত্ত্বাংশ, দার্শনিক অংশ, শিল্পের উৎপত্তি, জীবন-চরিত, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, কালনির্ণয় ইত্যাদি নানা অবাস্তব কথা থাকে। তাহার দ্বারা শিল্পের স্বরূপনির্ণয় ও রসাস্বাদন হয় না। সাক্ষাৎ দৃষ্টির পথে, ছবি ও পুস্তকের সঙ্গে মিতালি পাতাতে হবে। পুঁথির পাতায়, কিংবা খেলো হাফটোনের ছবিতে—শিল্পের মহিমা প্রায় খুঁজে পাওয়া যায় না। আসল প্রতিমা ও আসল চিত্র অনবরত দেখতে দেখতে তবে আমাদের দৃষ্টিশক্তি, শিল্পকে বুঝবার, তাহার রূপের যথার্থ অবাস্তবের সামর্থ্য গড়ে ওঠে। তত্ত্বাংশের লিখিত কথা-কাটাকাটির মধ্যে শিল্পের দেবতা অন্তর্হিত হন। শিল্প-সাধনার পথ নির্বাক আরাধনার পথ। সাক্ষাৎ দৃষ্টির পথে তাহার রূপের আরাধনা করতে হবে। রূপ-বিদ্যা চক্ষু-গ্রাহ্য বিদ্যা। পুঁথি পড়ে এই বিদ্যা দখল করা যায় না। অনেক গান শুনতে শুনতে তবে সঙ্গীতের রসবোধশক্তি গড়ে ওঠে। অনেক ছবি দেখতে দেখতে তবে ছবি দেখবার, তার বস আশ্বাদন করবার শক্তি জন্মায়। ভারতের মন্দিরানু তার শিল্পকলার মধ্যে নিহিত আছে। তার স্বরূপ দৃষ্টির অধিকারলাভ, মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা, শ্রেষ্ঠ অধিকার। আপনারা সাধক, আপনারা ভক্ত, আপনারা সেই অধিকার নিয়ে জন্মেছেন। আপনারা সাধনার বলে ভারতের শিল্পদেবতার জ্যোতিঃদর্শন এক দিন নিশ্চয় লাভ করবেন। আমি দুর্ভাগ্য, আমার ভাগ্যে তা ঘটল না। আপনারদের মধ্যে যদি আপনার মত ভারতের শিল্পের ভক্ত ও সাধক

অনেকে থাকেন, (আমার বিশ্বাস—হয়ত অনেক আছেন),—তাদের সাধনার সহায়তার জন্য পুঁথি বদলে ভাল ভাল ছবির প্রতিলিপির পোর্টফলিও পাঠানর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জানবার তৃষ্ণা বেশী হ'লে, তৃষ্ণার তৃপ্তির সুখ-বারির কখনও অভাব হয় না, এই আমার বিশ্বাস। তৃষ্ণা তীব্র হয়ে যখন গর্জন ক'বে ওঠে, অকোশের বর্ষণ তখনই সুলভ হয়। আপনারা যদি এক-ত্রোগে এই চিত্র-চর্চার সুযোগ দাবি করেন—সরকারের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি হবে বলে আমার মনে হয় না। আপনারা আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে মাঝে মাঝে ছবির সুরূপ (Portfolio of pictures) পাঠানর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আপনি ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে অনেক পুস্তক পড়েছেন। আরও দু-চার খানা পুস্তকের ফর্দ নীচে লিখে পাঠালুম, এবং এই সঙ্গে আমার লেখা দু-চার খানা পুস্তিকা ও প্রবন্ধ পাঠালুম। যদি ভাল লাগে পড়ে দেখবেন। আমি সাহিত্যিক নই, সুতরাং পণ্ডিত সনাজে আমার রচনা পঠনীয় নয়।

আপনারা কারাগার বরণ ক'রে যে মুক্তি পেয়েছেন, কর্মের বন্ধন থেকে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য যে মোক্ষ লাভ করেছেন, বহু চেষ্টাতেও আমরা ত্র্যাক্ষিত স্বাধীন ও মুক্ত পুরুষ—তাহার কিছুই পাই নি। মধ্যে মধ্যে ছবি, পুস্তক ও পুস্তকের প্রাচীর নির্মাণ করে, রূপ সাধনার শৃঙ্খল নির্মাণ ক'রে, সামাজিক ও কর্মজীবনের মুক্ত ক্ষেত্র হাতে পাליয়ে এসে, আপনার কুঠরির মধ্যে খেচ্ছার কারাবরণ করি। কিন্তু আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও কর্মজীবনের সহচরগণ দৌবারিকেন মুক্তি গ্রহণ ক'রে, ওয়ার্ডারের খাঁকী প'রে, আমার স্বরচিত চোরা-কুঠরি বা প্রিসন-সেল থেকে ক্রমাগত টেনে ব'র করে, তথাকথিত মুক্তির পথে, কর্মের অবরোধের পথে, সাধনার বাধার পথে। আমার এক বন্ধু আছেন, তিনি সর্বদাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন যেন তিনি তাঁর হাত প' কেটে দিয়ে, চলা-ফেরার পথ বন্ধ করে দিয়ে—তাঁকে আসল মুক্তি দেন। চীনদেশে এক জন ভারতের ধর্ম-সাক্ষি গিয়েছিলেন ধর্ম প্রচার করতে। অনেক মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত ক'রে, শেষ জীবন তিনি তাঁর সাধন-মন্দিরে একটি ক্ষুদ্র কুঠরিতে

নিজেকে কারারুদ্ধ করে আমরণ ধ্যানে বসেছিলেন।
কর্ণের ভাকে তাঁর শেষ জীবনের যোগ-নিজ্ঞা ভাঙে নি।

আপনারা কারাগৃহেব দেবতা, আপনারা আমার
আশীর্বাদ করুন যেন আমাব নিজের রচিত কারাগৃহ—
সাধন-মন্দিরের মধ্যদা লাভ করুক, আমার ক্ষুদ্র সাধনা
সিদ্ধির পথে সার্থক হয়ে উঠুক।

আপনি ভারতীয় শিল্পের ভক্ত, আপনি আমার নমস্কার।
আপনাকে আবার নমস্কার।

বিনীত

শ্রীঅর্ধেকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

২। ৭। ৩৭

মান্নবরেম্ভ,

আপনার প্রেবিত পুস্তক, পুস্তিকা এবং বিশেষ করে
একান্ত আন্তরিকতাপূর্ণ ও সাহিত্যিক ভাব-রসে ভরপুর
আপনার চিঠিখানার জন্তে শত শত ধন্যবাদ। “আমি
সাহিত্যিক নই” বলে আপনি যতই সাফাই গাইবার চেষ্টা
করুন না, আপনার প্রবন্ধ, পুস্তিকা ইত্যাদি ছাড়াও এই
চিঠিখানাই নৈমক-হারামি করে আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য
দিয়েছে। “সাহিত্য মান্নবের মনের মধ্যে পরিচয়েব
সৌমিত্র”—এই কথাটা যাব কলম থেকে বেরিয়েছে,
সাহিত্য-সত্য তার অস্ত্র পরিচয় বাহ্যিক মাত্র। তবে
পণ্ডিত সমাজে আপনার রচনা পঠনীয় কি না, সে কথার
জবাব ধারা পণ্ডিত, তাঁরা দেবেন—আমার সে গুণ্ডিত্য কাক
নেই।

আপনি যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়ে আমাব মত একটা
সাধারণ লোককে বার-বার নমস্কার জানিয়েছেন, তার ফলে
চিত্রগুপ্তের খাতার পাতায় নিশ্চয় আমার অনিবার্য নিয়ম-
গমনের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। সনাতনী চিত্রগুপ্ত কি
আর ‘শেষের সে দিনে’ জ্ঞাতি বলে খাতির করবে?—
করবে না। তবে কথা এই যে আমি সে জন্যে কিছু মাত্র
ভয় পাই নে—বোঝার উপরে এক গাছি তুণের ভার বই ত
নয়? নরকে যদি যেতেই হয়, তবে তার জন্তে অনেক
কাবণই জমা হয়ে আছে। কিন্তু নমস্কারটা আপাততঃ যে
বাস্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করে দেওয়া হয়েছে, তার বিধান-যে

এটা নিতান্তই অর্ধেক। তবে, তৃণ হ’তেও স্থনীচ হয়ে
যদি অমানীকে মান দিতে চেয়ে থাকেন, তাহলে তার ফলে
যে হবি-সকীর্ভনের পথ খোলা হবে, তা আমার খরচায়
(at my expense) হ’ল, মনে রাখবেন এবং তাতে করে
যে পুণ্যার্জন হবে, আমারও তাব ভাগ পাবার দাবি
রইল।

তবে আপনার অমন উচ্ছ্বসিত নমস্কারের উপলক্ষ হ’লেও
প্রকৃত লক্ষ্য যে আমি নই—এ কথাটা বুঝতে পারি নে,
এতটা আহাম্যক নই। এর সবটাই যে কলাদেবীর পাদপদ্মে
আপনার প্রাণের ঐকান্তিক ভক্তির পুষ্প-অর্ঘ্য, তাতে
কিছুমাত্র তুল নেই। শিল্পকলার প্রতি যে আপনার
কতটা প্রীতি, কতখানি দরদ, ও, কি একনিষ্ঠ ভক্তি, এতেই
তার পূর্ণ পরিচয় বিশেষ করে স্পষ্ট হয়েছে।

অথাপি আমি একটা কথা বলব—বেদাদবি মাপ
করবেন। কথাটা এই যে আপনার বিনয়-প্রকাশের রকমটা
সম্বন্ধে আপত্তি জানাতে চাই। আপনি এক বিষয়েব
বিশেষজ্ঞ। অবনীন্দ্রনাথ যেমন ‘বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট’-এর
স্থাপনিতা, আপনিও তেমনি ‘বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট’-
ক্রিটিসিজম’ প’ড়ে তুলবেন—এইটে আমরা প্রত্যাশা করি।
তাতে এক দিকে যেমন একটা কাজের মত কাজ হবে—
বাংলার এক দিকের একটা মস্ত অভাবের পরিপূরণ হবে, অস্ত
দিকে তেমনি দেশ-বিদেশে বাংলার সম্মান বাড়বে নবীন যুগে
নব সংস্কৃতির পতাকা-বাহক হিসেবে। কিন্তু ধারা অগ্রদূত,
বেশী বিনয় করে কথা বললে, তাতে তাঁদের কথার মূল্য
কমে—বিশেষ করে অস্ত প্রদেশের লোকের কাছে। সেটা
মোটাই কাম্য নয়।

ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু জানতে বুঝতে
চাই। আপনি লিখেছেন—বই পড়ে তা হবে না। আপনার
কথার মানে আমি যা বুঝছি, তা এই যে, কি শিল্প-সৃষ্টি
(creation), কি শিল্প-আলোচনা (criticism)—
উভয়েরই মূলে রস-বোধ এবং শিল্প-রসজ্ঞ হওয়ার একমাত্র
উপায় হচ্ছে—“সাক্ষাৎ দৃষ্টির পথে ছবি ও পুতুলের সঙ্গে
মিতালি পাতানো”—আসল না মিললে, অস্তঃ উচু দরের
প্রতিলিপি। এই যদি হয়, তবে এ-রসে রসিক হওয়া আমার
কর্ম নয়। যেহেতু আমার পক্ষে তার স্বযোগ-স্ববিধা করে

নেওয়া একেবারেই অসম্ভব। আপনি যে আশা করছেন—
আমি হয়ত কোন দিন শিল্প-দেবতাকে সৃষ্টির পথেও
অনুসন্ধান করব; তা আবও হৃদয়পরাহত। এত দিন ভুলও
কখনও সে পথের কাছ ঘেঁষেও চলি নি। অথচ এ ছুনিয়ার
সঙ্গে কারবার সে নেহাৎ আজকের কথাও নয়। কারবার যত
দিনের, তার অঙ্কেকটা গেছে পরীক্ষা-পাসের চেষ্টায়। অপর
অঙ্কেকের তিন-চতুর্থাংশ গেছে জেলে জেলে। বাকী
সময়টুকু কেটেছে বাজনীতির কচকচি ও রুজি-রোজগারের
দাপাদাপিতে। ছবি ও পুতুলের সঙ্গে কোন দিনই আমার
দেখা-সাক্ষাৎ নেই। কোন শিল্প-প্রদর্শনীর ছায়াও মাড়াই নি
কোন দিন। এমন কি, এত বছর কলকাতায় থেকেও
একটি বারের তরেও থিয়েটারে, কিংবা খেলার মাঠে যাওয়া
হয়ে ওঠে নি বেউদা সময় নষ্ট হবে ব'লে। এই সব কারণে
জীবনটা বড়ই একপেশে হয়ে গ'ড়ে উঠেছে। বয়সটা যা
হয়েছে, তাতে এখন বন-গমনের উচ্ছোগ করলেই হয়—বড়-
জোর আর দু-তিন বছর জের টানা চলে। এখন আবার
আগাগোড়া ভোল ফিরিয়ে জীবনটাকে নতুন ক'বে শিল্প-
সৃষ্টির উপযুক্ত করে তোলা—তা কি আর সম্ভব? বাজনীতির
ঘোঁট পাকাবার ফাঁকে ফাঁকে কখনো মনে হয়েছে—দেশ
বলতে কি বুদ্ধি—আমাদের সংস্কৃতি বলতে কি বুদ্ধি?
তার ফলে পুরনো ভারতের পুঁজি খুঁজতে গিয়ে আর্ট-সাপ
বেরিয়ে পড়েছে এবং তার বিক-ক্রিয়াও কিছু কিছু আরম্ভ
হয়েছে। তাই ছ-চার খানা বই পড়েছি।

এখন বই-পড়া সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।
১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসের পরে ও-দেশের কতকগুলি
প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান দেখতে বেবিয়েছিলাম—তীর্থ করতে
অবশ্য নয়। তীর্থের পবে আস্থা হারিয়েছি অনেক
আগে, গয়ায় তীর্থ করতে গিয়ে। সে কথা থাক। ফেরার
পথে রামেশ্বর ষ্টেশনে যখন ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ
ঘোষ মহাশয় বললেন, “ও মনোরঞ্জন! যুরলাম ত
অনেক, কিন্তু দেখলাম কি?” তখন আমি জবাব
দিয়েছিলাম, “দেখবার যে কিছু নেই, তা ত দেখলেন?
একটা বিষয় সম্বন্ধে অন্ততঃ ল্যাঠা চুকলো।” অথচ সেবারে
কাকি, মহাবলীপুরম্, তাজোর, ত্রিচিনাপল্লী, শ্রীরঙ্গম,
মাছরা, রামেশ্বর প্রভৃতি যে-সব স্থান দেখেছিলাম, সেখানে

ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের অনেকগুলি এখনও আঁট
অক্ষুণ্ণ আছে। দেখেছি সবই, অথচ শিল্পকলার সাক্ষাৎ
মেনে নি কোথাও। না দেখেছি ভল্লের চোখে—না কলা-
রসিকের চোখে। কিন্তু এখন কয়েকখানা বই প'ড়ে বুঝতে
পারছি যে অমর বাবুর ল্যাঠা যদি সত্যি চুকেও থাকে, তবু
আমার ল্যাঠা চোকে নি—মনে হচ্ছে, এখন যদি আর
একবার যেতে পারতাম তবে হয়ত সত্যি দেখবার মত কিছু
দেখতে পেতাম।

আসল ছবি ও আসল পুতুল কিংবা সে সকলের খুব ভাল
প্রতিলিপি দেখা যে অত্যাশঙ্কক, তাতে সন্দেহমাত্র নেই।
কিন্তু আমার মনে হয়, আমার মত অনভিজ্ঞ বহুসঙ্কীর্ণের
পক্ষে বই প'ড়ে আর্ট সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা ক'বে না নিলে,
আর্টের রস গ্রহণ করা মুশিল। বই প'ড়ে শিল্প-সৃষ্টি হয় না
সে আমি বুঝি। সত্যিকারের শিল্প-সৃষ্টি হয়ত কতকটা
(unconscious creation) অব-চেতন মনের গভীরতা থেকে
উদ্ভূত হয়ে আপনার গরজে আপনি ফুটে ওঠে কমল হয়ে
চৈতন্য-সরোবরের প্রকাশ্যতায়। কিছু শিল্প-সৃষ্টির আত্মপরিচয়
যাও নেই—যে চায় শুধু শিল্পের মর্মস্বার্থটি বুঝতে ও সম্ভব
হ'লে তার রসের ভাঙার লুটতে, সে লোকের পক্ষে তা
কেমন করে সম্ভবপর হবে, ভাল মন্দ বুঝবার ক্ষমতা না
থাকলে? ছবি দেখে সবাই—ভালও তাদের লাগে বটে;
কিন্তু উচ্চতর শিল্প-সৃষ্টির রস-গ্রহণ সম্ভব কি শিল্পের তত্ত্বাংশ
ও টেকনিক সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকলে? প্রথম-
শিক্ষার্থীর পক্ষে এ সব নটখটে বিষয়ের ভিতরে হোঁকা শিকাব
অসম্ভব নয় মনে করেই বোধ হয় আপনি বইপড়া সম্বন্ধে
উৎসাহ দেন নি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার মনে বটটুকু রুচি
জেগেছে, তার উৎস কোথা থেকে উৎসারিত জ্ঞানেন?—
আমবা আজ যদিও পতিত, তবু আমাদের পেরেব করার
কিছু আছে কি না, তা জানবার আলাজ্ঞা থেকে। তাই
শিল্পের তত্ত্বাংশ, উৎপত্তি, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে
জানবার আগ্রহই আমাব বেশী।

তবে আমি যে এরসের রসজ্ঞ হতে চাই নে, তা নয়,
বরং সেদিকে একটা ঝোঁক আছে আশ্বে ক্রমেই বাড়ছে।
বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে যা সম্ভব, তা করার চেষ্টাও
আমি করি। বই প'ড়ে ও তা- ভিতরকার খেলো

হাকটোনের ছবি দেখেও আমি আনন্দ পাই। আমার মনে হয়—কোন ভাল ছবির একটা ভাল সমালোচনা পাওয়া গেলে, হাকটোনের ছবি থেকেও তার রস বেশ কিছু পাওয়া যায়—অন্ততঃ রস-বোধেব ক্ষমতা তাতেও খানিকটা বাড়বার সুযোগ পায়। কেননা, ছবির অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটিপূর্ণতার ক্ষমতা হয়ত মনের খানিকটা আছে। চোখ ছবি দেখে যেমনটি তেমন, কিন্তু মন তাকে কল্পনায় মণ্ডিত করে নিয়ে আরও খানিকটা সৃষ্টি তার সঙ্গে যোগ করে, তবে গ্রহণ করে। তা ছাড়া আমার ত আর কোনও উপায়ই নেই। আসলের তো কথাই নেই—ভাল প্রতিলিপিই বা আমি কোথায় পাব? এখন আপনি যে মাঝে মাঝে ছবির পোর্টফোলিও পাঠাবার প্রস্তাব করেছেন, তা কার্যে পরিণত করতে পারলে, আশা করা যায়, কিছু সুবিধা হবে।

আপনার এ-প্রস্তাবের জন্তে আমি আপনার কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সবকার আমার চিত্র-চর্চার কি সুযোগ করে দেবে? নিজের পয়সায় করলে এ-চর্চায় হয়ত তাদের আপত্তি হবে না। কিন্তু তাদের কাছে এ জন্তে পয়সা চাইতে গেলে, জবাব পেতে দু-মাস কেটে যাবে—তার পরে হয়ত দু-মাস পরে এক পসলা ফুৎ, অল্পতাপ ইত্যাদির বর্ষণ হয়ে সব চূকেবুকে যাবে। তবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর বই পাওয়ার যে তারা ব্যবস্থা করেছে, সে জন্তে ধন্যবাদ দিই।

সবাই মিলে চিত্র-চর্চার সুযোগ দাবি করতে বলেছেন। কিন্তু 'সবাই' বলতে এখানে আমরা দুটি মাত্র প্রাণী। কাজেই তা হবে না। তবে আপনি দয়া করে রেলওয়ে পার্সেলে যদি পাঠিয়ে দেন—C/o Superintendent, Central Prison, P. O. Nasik Road (By Station—Nasik)—এই ঠিকানায়, তবে আমি এখানে মাগুল দিয়ে রাখতে পারি এবং পরে আবার মাগুল-শোধ পার্সেলে পাঠিয়ে দিতে পারি। এ ছাড়া যদি অন্ত কোনও ব্যবস্থা আবশ্যক মনে করেন, তবে তা জানাবেন। একরূপ আনা-নেওয়া অবশ্য তিন মাসে একবারের বেশী সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। ঠেকা অবশ্য টাকার, তা বলাই বাহুল্য।

আপনি হয়ত আমার চিঠি পড়ে নিরাশ হবেন—আমা হাতে কিছু হবার নয়—এই মনে করে। কিন্তু

আপনাকে একটা লোভ দেখাতে পারি। আট বারা সৃষ্টি করে, তাদের সকলের সৃষ্টিই কিছু আর উচ্চদের নয়। উচ্চদের স্রষ্টা দু-এক জন। বাকী সবাই সাধারণ পর্যায়ভুক্ত। তবু তাদের দানের মূল্যও কম নয়। কেননা, তারা প্রচলিত শিল্প-রীতির পরিপূর্ণতা আনয়ন করে—বিশেষ করে তারা প্রবাহ রক্ষা করে এবং প্রবাহ রক্ষিত হয় বলেই মাঝে মাঝে তার উপরে বড় বড় ঢেউ জেগে উঠতে পারে। তার পরে যেখানে আর্টের আদর নেই, ভাল জহবী নেই, সেখানে অল্পকূল আবহাওয়ার অভাবে আর্ট ক্ষুণ্ণ পায় না। তা ছাড়া এক যুগের সমালোচনার কল, পরের যুগে পায়। আলোচনার ফলে রুচি জন্মায়—রুচি বদলায়। তার ফলে নতুন সৃষ্টি সম্ভব হয়। কিন্তু সকলেই ত আর উচ্চদের সমালোচক বা ভাল জহরী হতে পারে না। অধিকাংশ লোকেই মোটামুটি ভাবে খানিকটা বুঝে নিয়ে আর্টের আদর করে। আদর করাটাই বড় কথা। যারা করে, তারাই অল্পকূল আবহাওয়ার প্রবাহ রক্ষা করে। আপনাকে যে লোভ দেখাতে চাচ্ছি, তা হচ্ছে এই যে আমি হয়ত এই দিকে খানিকটা কাজে আসতে পারি, যদি এ-বিষয়ে আমি নিজে কিছু শিক্ষা পাই। যাদের সংগ্রহে আমি আসব, তাদের যাতে আর্টের প্রতি টান বাড়ে, সে-চেষ্টা যে আমি অবশ্যই করব, তা বলাই বাহুল্য।

আমরা কারাগৃহের দেবতা? তা বটে—সনাতনীর কালী মাই—উচ্চবর্ণ ভিন্ন কারও প্রবেশ নিষেধ, অথবা হুঁটো জগন্নাথ—দারুভূত মুরারি হয়েই ত আছি। আপনার বন্ধুটি হাত পা কেটে দেওয়ার প্রার্থনা করেন—অর্থাৎ হুঁটো জগন্নাথ হতে চান। কিন্তু এ-কথা আমি জোর করেই বলতে পারি যে জগন্নাথ যদি কথা বলতে পারতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর এ বিকলাঙ্গ হস্তাঙ্গদ মূর্তির জন্তে ঘোরতর আপত্তি করতেন। তবে তিনি জগন্নাথ—ভক্তের অভাব নেই—রথে চড়িয়ে টানবার লোকও অগণিত। কিন্তু আপনার বন্ধুটি ত আর জগন্নাথ নন—যা প্রার্থনা করেন, তা পূর্ণ হলে টেরটি পাবেন। আমরা কিন্তু তাঁর দলে নই। এত দিন যদিও দশ হাত দশ পায়ের জন্তে প্রার্থনা করি নি (কারণ পাছে তা গজিয়ে উঠে একটা বীভৎস ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়—এই ভয়!) তবে দশ হাতে বড়টা

কাজ করা যায় ও দশ পায়ে যতটা পাড়া বেড়ান যায়, তা যদি পারতাম, তবে হয়ত কতকটা আকাঙ্ক্ষা মিটত। তাই বিধাতার কাছে কোনও দিন দেবতা হওয়ার প্রার্থনা করি নি। কিন্তু নাছোড়বান্দা বিধাতা সেই ববই দিয়ে দিলেন। এখন জলে জল ঢেলে দেবতার পূজা চলছে—হিন্দুর পূজার বিলিভী নমুনা। কি আর করা যায়, বলুন।

দেবতা হ'লেও আপনাকে আশীর্বাদ করতে পারি, তেমন সঙ্গতি কল্পে বিধাতা কিছু দেন নি। সাত বছরের গুরুপুত্রের পা বাড়িয়ে চরণায়ুত দেবার মত ধুঁটতাও এখন পর্যন্ত জন্মায় নি। তবে যে সাধনায় আপনি প্রবৃত্ত, তাতে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করুন—আপনার সিদ্ধিতে আমার বাংলা দেশের মুখ উজ্জ্বল হোক—এ প্রার্থনা একান্ত মন-প্রাণেই করি। ইতি—

নিবেদক শ্রীমনোবঞ্জন গুপ্ত

সবিনয় নিবেদন,

আপনার সুদীর্ঘ পত্র পেয়ে বড়ই আনন্দিত হয়েছি।

আমি আপনাকে ব্যক্তিগত অভিনন্দন জানিয়েছি তার জন্য আপনি প্রতিবাদ করেছেন। আমি 'ভক্তি'কে ও 'ভক্ত'কে বড় আসন দিতে চাই। ভগবানের চেয়ে ভগবানেব ভক্ত বড়। তা ছাড়া ভারতবর্ষে ভারত-শিল্পের ভক্ত সংখ্যায় এত কম (সমস্ত ভারতে ৬ জনেব বেশী আছে কিনা আমি জানি না), যে, নূতন ভক্তের সম্মান পেলে আমরা আনন্দে আত্মহারা হই। নবীন উপাসককে অভিনন্দন জানাতে হয়ত মাজাজ্ঞান হারাই। আমাদের মন্দিরে উপাসকরা বড় আসতে চান না। আমরা উদগ্রীব হয়ে নূতন ভক্তের আশায় বসে আছি। নূতন ভক্ত ও নূতন উপাসক আমাদের বড় আদরের মানুষ, আমাদের সম্মানেব বস্তু। ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনার মন্দিরে নূতন উপাসকের সম্মান ও সমাদরের মালা-চন্দনের বহর কত হবে—তার বিচারক নূতন উপাসকরা নন, যারা তাঁকে 'স্বাগত' করবে তাহার বিচারের ভার তাদের উপরই দিতে হবে। গৃহস্থেব চোখে, প্রত্যেক অতিথির যথাযোগ্য মূল্য আছে,—এই মূল্য-বিচারের অধিকার অতিথির নয়, গৃহস্থের।

ভারতের শিল্প-সমৃদ্ধে আমার অভিজ্ঞতা সঙ্ক্ষে আমি বিনয়ের 'ভণিতা' করি নি। অতি-বিনয় দাস্তিকতার নামান্তর। স্তব্রায় অতি-বিনয়টা পাপ। যে কোনও বিষয়ে—জ্ঞানের রাজ্যে যে যতটা এগিয়ে যায়—জ্ঞানের

বিভূত পরিধি হৃদয়ঙ্গম ক'বে সে ততটা বুঝতে পাবে,—তার নিজের জ্ঞানের পরিধিটি কত স্থর, কত ক্ষুত্র। যে যত এগুতে পারে তার আত্মগরিমা তত ছোট হয়ে আসে। এই জ্ঞানসমুদ্রের বিশালতার আঘাত আমাদের অহঙ্কার সঙ্কুচিত হয়,—এই অহঙ্কারের সমোচ বিনষ্টের 'ভণিতা' নয়, নিজের শক্তি ও জ্ঞান সম্বন্ধে নিষ্ঠুর সত্যবোধ। ভগবানের আশীর্ব্বাদে, 'বিশ্বরূপ' দেওতে পেলেন, অর্জুনের মত আমরা আমাদের ক্ষুদ্রতা, স্বল্পতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারি।

ভারতের কলাশিল্পের নিদর্শন, ভারতের নানা স্থানে, আপনি প্রাচীন পুরাকীর্তির অবশেষে অনেক চক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছেন। যারা বেশী বয়সে দেখতে আরম্ভ করেন, চোখের 'মর্চে' ছাড়াতে অনেক দিন লাগে। অল্প বয়সে যখন মানুষের রূপ-রস-বোধশক্তি প্রথমে ৫ হুতীক্স থাকে, তখন শিল্পবস্তুব অন্তরের সৌন্দর্য্য অতি সহজে ব্রতাক্ষ করা যায়। বেশী বয়সে, রূপবোধ-শক্তি-প্রয়োগের অভাবে, আমাদের ঐ শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—দৃষ্টিশক্তির উপর 'ছানি' পড়ে। কেতাবী বিদ্যার চাপ আমাদের রস-বুদ্ধি শুষ্ক হ'তে থাকে। বেশী বয়সে এই শুষ্ক শক্তিকে সরস ও মঞ্জবিত করতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তবে চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই।

ক্রমাগত ছবি দেখতে দেখতে ছবি দেবার তৃতীয় চক্ষু একদিন খুলে যায়। বৃত্তিঅর্কব বাধা আপনি থসে পড়ে। বৃত্তিঅর্কের চাবি দিয়ে, অর্থাৎ প্রাঙ্গ ও পুথি প'ড়ে, আর্টের ছয়াব খোলা যায় না, আর্টের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। বৃত্তির পথে তাকে পাওয়া যায় না,—ভক্তির পথে, দৃষ্টির পথে সে দেখা দেয়।

একটি প্যাকেটে রেজিষ্ট্রি ক'বে কয়েকখানি ভাল প্রতিলিপি পাঠাচ্ছি। চেষ্টা ক'রে শুনুন যদি এদের মধ্যে কিছু রস পান। আত্যন্তিক ভক্তির সক্ষে কোনও জিনিষই রুক্ষ বা অবরুদ্ধ থাকে না। ভক্তের ভগবান। আপনি ভক্ত, শিল্পের ভগবান আপনার হরভলগত। আমরা মন্দিরের চারি ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভগবানের বর্নন এখনও মেলে নি।

আপনি যেদিন ভারতের শিবের দেবতার সাক্ষাৎ পাবেন—অনুগ্রহ ক'রে একবার 'পিছন' ফিরে পথের সম্মানটা বলে দেবেন—আমরা আপনার পথ অনুসরণ করব।

বিনীত

২ জুলাই ১৯৩৭

শ্রী অরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

তুমি মৃত্যুর শাস্ত মহাদান

শ্রীঅশোক চৌধুরী

ওগো সাড়া দাও, বারেক দাঁড়াও আসি
আমাদের মাঝে এই ধরণীর বুকে ;
এস, ফিরে এস, এ মহাতিমিররাশি
অপসারি এস, হাসিয়া নকৌতুকে ।
চেয়ে দেখ সবে ধূলায় পড়িয়া হায়,
আর্জকর্থে তোমারে কিরায়ে চায় ;
এস এস ফিরে মহাতমিরা নাশি ।

কাল ছিলে তুমি সকল ভুবন জুড়ে
ঐ ছোট ঘরে বিশ্ব যে ছিল লীন ;
আজ কোথা তুমি, বল—কত কত দূরে ?
নিখিল ভুবন আজি যে সংজাহীন ।
সবার প্রেম সবার কামনা দিয়ে
বাঁধিতে নারিত্ব ; অবোধ বাসনা নিয়ে
শুধু কাদি যোরা অসহায় নিশিদিন ।

স্নেহে করুণায় চিরদিন সবা লাগি
কণা কণা ক'বে নিজেরে করেছ দান ;
তোমার সেবায় নিয়ত রহিত জাগি
বেদনায় ভরা আপনারে ভোলা প্রাণ ।
আজিকে কেমনে পাশরিয়া প্রিয়জনে
রয়েছ আড়ালে একাকী অন্তমনে ?
স্তনিতে কি পাণ্ড ? কে দিবে গো সন্ধান ?

এত আতুলতা এত ভালবাসা তব,
সে কি শুধু ছিল দু-দিনের খেলাঘরে ?
খেলার পুতুল তাজিয়া কি অভিনব
নবীন ভুবনে গেলে চলি হেলাভবে ?
তুহিন-মৃত্যু নিষ্ঠুর কঠিন বলে,
ছিন্ন করিয়া জীবনপদ্মদলে,
চিহ্ন কি তার মুছি দিল অন্তরে ?

না না মিথ্যা এ। সবার চিন্তমাঝে
আজি যে তোমার প্রকাশ নিরন্তর ;
এক মুহূর্ত পাশরিতে পারে না যে
তব প্রেমরূপ—জীবনের নির্ভর ।
আজি হেরি তাই সকল ভুবন ছাপি
তোমারি পরশ প্রাণে উঠিতেছে কাঁপি,
বেদনাবিধুর সঙ্কল্প মনোহর ।

বল একবার “এই ত রয়েছি আমি ।”
তব স্নেহমাখা কণ্ঠ স্তনাও সবে ;
নিবিড় স্তূপায় ভরি দাও দিনযামী,
অলখ প্রেমের নিত্য মহোৎসবে ।
রূপ-অরূপের স্বপ্ন ছর্নিবার,
জীবন-মরণ মিশে হোক একাকার,
অশ্রুত তব বাণীর বাঁশরী-রবে ।

জীবনে যখন ছিলে আমাদের মাঝে,
পাণ্ডয়ার মাঝারে না-পাণ্ডয়ার ব্যবধান
ছিল ক্ষণে ক্ষণে ; তোমার সকল কাজে
তোমার প্রেমের পাই নি ত সন্ধান ।
দেশের কালের ছিল সন্তপ্ত বাধা,
পেয়েছি কখনো, কত বা লেগেছে ধাঁধা ;
শাস্ত আজ তুমি মৃত্যুর দান ।

তোমার সেবার মোহন অন্তরালে,
রেখেছিলে সবে নিত্য বিরহী ক'বে ;
সোহাগে আমরে লোভন স্বপনজালে,
অন্ধে ভুলায়ে রেখেছ মোহের বোরে ।
আজিকে ঠেলিয়া রাখিবে কেমনে, হায়,
স্নেহ-লোভাতুর ভিক্ষুরে ছলনায় ?
বাঁধা যে পড়েছ অমোঘ মরণ-তোরে ।

নয়নেব বাধা বচনের ধাঁধা দিয়ে
গড়েছি তোমারে মাটির প্রতিমা করি ;
আত্মবিলাস বাসনা-কলুষ নিয়ে
আপন-পূজায় আছিহু জীবন ভরি ।
আজি ঘুচিয়াছে মিথ্যা পূজার ভান ;
দেবতার তব মিলিল কি সন্ধান—
মহামৃত্যুর অকুল সিদ্ধ তরি ?

তিমির-ছায়ার খুলে গেছে আজ মনে,
মরণ আজিকে নির্দম নহে আর ;
জীবনের বাধা ঘুচে গেল কোন্ 'থনে
জীবনে-মরণে হ'ল আজ একাকার ।
তুমি যে রয়েছ নিখিল ভুবন বিবে
আমার মরণ-বিস্মরণের তীরে
মহাজীবনের রচিমাছ পারাবার ।

ডিস্‌গাস্‌টিং

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

প্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা হয় হিন্দুস্থান রেইবেস্টে। ছবি দেখে ক্ষুধার উল্লেখ হওয়ায় এই মহাপরিচয়ের স্বযোগ লাভ কবেছিলাম। আমাব সঙ্গে যে বন্ধুটি ছিল, সেই আলাপ কবিয়ে দিলে।

—এঁকে চিনিস্‌ ?

—না।

—সে কি বে। অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের ইনিই হচ্ছেন একমাত্র লোক,—যাঁর নাম বাংলা দেশের প্রত্যেকটি লোকই জানে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, আব গান রচনায় এঁর জুড়ি নেই। ‘জিনিয়াস্‌’ একটা।— উত্তেজনা বন্ধ হওয়া চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে।

সামনে চেয়ে দেখি যাকে নিয়ে আমাদের এত মাথা-ব্যথা, তিনি পরম নিশ্চিন্তে একখানি কাটলেটেব সদৃশ-সাধনে ব্যস্ত। ভদ্রলোকের বয়স বোধ করি ত্রিশের নীচেই। সমস্ত মুখে একটি ক্লাস্তির কালিমা, সে কালিমা ‘ক্রীম’ ঘষে তোলা যায় না।

—আলাপ করবি ? বন্ধু বললে।

—চল্‌। দাঁড়া, ওঁর নামটাই যে শোনা হয় নি আমার। সেটা বল্‌।

—জিদিব সরকার।

দু-জনে এসে যখন ওঁর টেবিলের সম্মুখে বসে পড়লাম, উনি স্নান একটু হেসে বললেন—স্বাহ্ন। থাকেন কিছু ?

—না, ধন্যবাদ। আমি বললাম।

—তবে সিগ্‌রেট নিন। এই বঁলে ভদ্রলোক পকেট থেকে একটি টিন বার ক’বে আমাদের সামনে ধরলেন। খুলে দেখি তাতে গোটা পাঁচ-ছয় ‘পাসিং-শো’ পড়ছে।

জিদিববার মুহূর্তমধ্যে বলে উঠলেন—আর বলেন কেন।

গিয়েছিলাম বেলেঘাটা একটু দরবাবে। পথে আমার সিগ্‌রেট মেল ফুরিয়ে। আর নে মশায় এমন একটা জায়গা, যে-দোকানেই যাই—এক ‘পাসিং-শো’ ছাড়া আব দ্বিতীয় সিগ্‌রেট নেই। অবশেষে ঘোণের দ্বায়ে—মানে এ ত আর সখ ক’রে খাওয়া নয়,— তাই কিনতে হ’ল। ডিস্‌গাস্‌টিং।

এর পর দু-একটা অলস কথাবার্ত্তার পর তিনি বললেন— এই কাকেরটার উপর আমার মশায় কি যে ক্যান্সি, বোজ একবার ক’রে না এসে পারি নে। কিছু খাই আব না খাই—অস্বস্তি: এক খানা ফাউল কাটলেট ত খেয়ে যেতেই হবে।

—আপনাকে বোধ হয় আমি হাতীবাগানে দেখেছি। আমি বললাম।

—খুব আশ্চর্য্য নয়। কারণ আমি ঐদিকটাতেই থাকি।

—অথচ রোজ আসতে হয় এদিকে।

এ-কথার উত্তরে জিদিববার একটু রহস্যময় হাসি হাসলেন। তার পর বললেন—নে-শতক্‌ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকলে আপনি এ-রকম কথা বলতেন না। এই রকম কাটলেট যদি ভায়মণ্ডহারবারে খাওয়া যেত তবে বোজই আমি সেখানে যেতাম। এ-সম্বন্ধে সম্ভ্রাতি আমি কিছু আলোচনা করেছি আমার ‘পিন্নামিনী পিন্না’ নামে একটি গল্পে। পড়্‌ দেখবেন।

—কোন কাগজে বেরছে ?

—সূর্য্য-সাহারায়। এ মাসের

—আচ্ছা দেখব।

—দেখবেন। তাতে আমি বলেছি যে, আমাব ভাল-লাগার বস্তু যেখানে যত দূরেই থাক না কেন, চিরকাল সে আমার চাওয়ার ঐকান্তিকতার কাছে অনাবিকৃত

থাকবে না। এই পৃথিবীর যে-কোন প্রান্ত থেকে আমি তাকে খুঁজে বার করব। তবেই সে আবিষ্কারের গর্ভ হবে আমার।

—সে ত ঠিক কথা।

—এ-রকম অনেক নূতন কথাই ওর প্রত্যেকটি অক্ষর ভর্তি। না, না, আমি আপনাদের রামা শ্রামাব মত—সহজ হাততালির বুলি কপচাতে ভালবাসি না। নইলে সেদিন দেখেছিলাম কে এক দিগিজ—ডিস্‌গাস্‌টিং।

—আচ্ছা আজ উঠি, ত্রিদিববাবু। রাত হয়েছে।

—চলুন আমিও যাব ঐদিকেই।

এর পরে ঠিক মাসখানেকই হবে বোধ করি। ত্রিদিববাবুর সঙ্গে আর দেখা হয় নি। অথচ মজা এই যে লোকটাকে আমি এক দিন দেখলেও তাকে ভুলি নি। ওর চলা-বলার মধ্যে যেমন ছিল একটা স্বাভাবিক-সৃষ্টির চেষ্টা, তেমনই ওব চোখের মধ্যে দেখেছিলাম এবটা বুড়ুক্কে উঁকি মারতে। আমার কেবলই মনে হয়েছে এই লোকটা সাধারণের সামনে যা বলে—ওর সমস্ত বলা সেইটাই নয়, তার বাইরে এমন একটা কিছু সত্য আছে যেটার ও প্রাপণে কর্তরোধ ক'রে রেখেছে। নইলে ওর দৃষ্টির মধ্যে এত ক্লান্তি কেন?

হঠাৎ এক দিন দেখা হয়ে গেল। হাতীবাগানের বাজারে ভজলোক একটা ছেঁড়া গামছা নিয়ে বাজর করছিলেন...আচমকা আমার সঙ্গে দেখা। চেয়ে দেখলাম ভানহাতে একটা কচুপাতায় জড়ানো গম্বা-ছুয়েকেব-ছুতো চিড়ি আর বাঁ-হাতের মুঠায় ধরা সেই জীর্ণ গামছাটি। তার ভেতর দিয়ে চার গাছি সজনে ভাঁটা মাথা উঁচু ক'বে দাঁড়িয়ে।

—বাজর হয়ে গেল? আমি বললাম।

ভজলোক চমকে আমার দিকে চাইলেন। তার পর বললেন—আর বলেন কেন? লারা জীবনে আমি নিজের বাজার কক্ষনো করলাম না, এখন পরের বোঝা ঘাড়ে পড়েছে। এক বুড়ী—মশায়, ওই ফুটপাথে আমাকে ধবে বসল—মশা ক'বে তার বাজারটা ক'রে দিতে হবে। এত লোক থাকতে জগতে হঠাৎ আমাকেই বা সে পরোপকারী

বলে ঠাওরাল কেন—বুঝতে পারলাম না। কিছু জানি নে দাদা, মার্কেটিঙের আমি কিছু জানি নে। ওটা ছেলেবেলা থেকে চাকরদেরই কাজ বলে জেনে এসেছি। ডিস্‌গাস্‌টিং। থাক গে—কেমন আছেন?

—ভাল আছি। আচ্ছা আসি এখন। আপনার তো আবার আপিস যেতে হবে—কেমন?

—আপিস। ত্রিদিববাবু এখানে আবার সেই বহুস্তম্ভ হাসি হাসিলেন।—আপিস আমাকে যেতে হয় না। লাভ কি বলুন—উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রে? আমার 'বেহুইন' কবিতাটায় আমি ঠিক এই আইডিয়াটাকেই ফোটাতে চেয়েছি।

—আচ্ছা আমি আজ আসি ত্রিদিববাবু, আমাব আবার আপিসেব বেলা হয়ে যাচ্ছে। নমস্কার।

—ও। আপনাকে বুঝি দৌড়তে হবে। আচ্ছা নমস্কার। আমি দেখি সেই বুড়ীটা আবার কোন্ দিকে গেল...

এর পরে আরও কিছু দিন কেটে গেছে। গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম থেকে নামতেই দেখি ত্রিদিববাবু রান চোখে চাব দিকে চাইছেন। চুলগুলো রুক্ষ—ঠাঁট হুটো শুকনো, কাপড়-জামাটাও বিশেষ পরিষ্কার নয়।

—নমস্কার ত্রিদিববাবু! পেছন থেকে বললাম।

—কে? ও, আপনি? নমস্কার।

—এ-রকম শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে যে। ব্যাপার কি?

—হঠাৎ একটু মুষ্কিলে পড়েছি মশায়। অবশ্য, মুষ্কিল আর কি? বাড়ীতে গেলেই ম্যানেজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ বাই দি বাই, আপনার কাছে পাঁচটা টাকা আছে?

—আছে। কেন বলুন ত?

—তাঁহলে আমার দিন। মানে, ব্যাপারটা কি জানেন?

সেই যে বুড়ীটা—যার বাজার ক'রে দিয়েছিলাম সেদিন, সে আমার কাছে কিছু সাহায্য চেয়েছিল তাই। আমার হয়েছে দু-দিন থেকে জ্বর, চেহারা দেখছেন না? হঠাৎ আজ বিকেলে মনে হ'ল, তাই ত। বুড়ীটা হয়ত না খেয়ে আছে! শুয়ে থাকতে পাবলাম না, পাঁচটা টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু এই মোড় অবধি এসে টের পেলাম

ব্যাগটি পকেট থেকে অঙ্কড়ান করেছে। আবার বাড়ী যাব, আবার টাকা আনব, এই অস্থির শরীরে সে হালামাও ত কম নয়, তাই বলছিলাম যদি আপনার কাছে থাকে, তাহলে—। অবিশিষ্ট কালকেই—

—না, না সেজ্ঞে ভাববেন না—এই নিন।

—থাকস! আচ্ছা আমি যাই ভাই। বুড়ীটা আবার—
ডিসগাস্টিং! জিদিববাবু জুতপদে চলে গেলেন।

মনে কি রকম খটকা লাগল। জিদিববাবুকে এত চঞ্চল হতে এর আগে ত দেখি নি। আশ্বে আশ্বে ওর অস্থিরতা করলাম...

অঙ্ককার নোংরা গলির মধ্যে জিদিববাবু ধে-বাড়ীটার প্রবেশ করলেন সেটি একটি খোলার বাড়ী। রাস্তার দিকে একটি ছোট্ট জানলা-মত আছে, তারই নীচে গিয়ে চূপ ক'বে দাঁড়ালাম। একটু পরেই স্তনতে পেলাম জিদিববাবু কাকে যেন বলছেন—

—টাকা পেয়েছি গো। কি কি আনতে হবে বক? ...
আঃ! কাদে না রমা! কেঁদে কি হবে বল? খোকন
খুঁমিয়ে পড়েছে?

—হ্যাঁ, একটু আগেও আমার কাছে এসে কাঁদছিল
আর বলছিল যা, ভাত না দাও, আমার চাটু মুড়ি দাও;
খিদেয় পেট জলে গেল যে। ... ওর আর দোষ কি বল?
এই বয়সেই ও উপোস করতে শিখেছে।

কিছুক্ষণ আর কোন কথা শোনা গেল না।

—ওকে তুলে দাও, আমি আগে দোকান থেকে ওকে
কিছু ধাইয়ে আনি। আর কিছু খাবারও নিয়ে আসি,
তুমিও খাও, তার পর আশ্বে আশ্বে রান্না করলেই হবে।
ভেবে কোন লাভ নেই রমা, ভেবে কিছু হবে না। এই
রকম ভাবে ধে-কটা দিন কাটে।

এর উত্তরে রমা মেয়েটি আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে
উঠল।

প্রায় মাস-তিনেক পরে একটি সন্ধ্যা—

সেই গ্রে ব্লিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে জরদা কিনছি। আমি
অবশ্য জরদা খাই না, কিন্তু মাসখানেক হ'ল যিনি আমার

অঙ্কাদিনী হয়েছেন, তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। বলেই এই
যত্ন ক'রে জরদা কেনা। হঠাৎ কানে এল—

—বল হরি হরিবোল!

পেছনে চেয়ে দেখি চার জন লোকে একটি সখবার
মৃতদেহ বয়ে নিয়ে চলেছে। কি অপূর্ণ স্মরণীয় যে ছিল
সে, মুতাপাণ্ডুর মুখমণ্ডলে এখনও তার চম্পট স্বাক্ষর
রয়েছে। বয়স বোধ হয় বছর-বাইশের বেশী হবে না, পায়ে
আলতা আর মাথায় জলছে সিঁদুর; রোগে রোগে তার
শরীরে আর কিছুই নেই, তবু এই শ্মশানঘাটার কারুণ্যও
সে তার মহিমা হারায় নি। হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল তার পেছনে
পেছনে চলেছে জিদিব। বুড়ীটার মধ্যে কি রকম ক'রে
উঠল—ওর সেই রমা নয়ত? ... ছুটে গিয়ে ওর কাছে
দাঁড়ালাম।

—জিদিববাবু!

জিদিববাবু আমাকে দেখেই যেন একটু চমকে উঠলেন,
তার পর সামলে নিয়ে বললেন—আর বলেন কেন, পাড়ার
একটি মেয়ে, নাম রমা, আমাকে বড্ড ভালবাসত, হঠাৎ
মাবা গেল, তাই সঙ্গে চলেছি।

—আপনার চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন?

—সেই জব। কিছুতেই ছাড়ে না। নীলরতন,
বিধান রায় বাদ নেই কেউ। ভাবছি কান্দীবটামীর
অকলে চেপ্তে যাব। ডিসগাস্টিং!—ও, হ্যাঁ দেখুন, আপনার
টাকাটা—

—সে জ্ঞে ভাববেন না। আপনার সঙ্গে এই ছেলেটি
কে?

জিদিববাবু একটি বছর পাঁচ বয়স-ব ছেলের হাত ধরে
নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার কথা শুনে তার দিকে চেয়ে
একটু স্নান হেসে বললেন—এ? ঐ রমারই ছেলে।
আচ্ছা আসি এখন, নমস্কার!

জিদিববাবু চলে গেলেন। অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাঁর
যাওয়ার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময় দেখতে
পেলাম, তিনি কৌচার খুঁট তুলে সেই রমার ছেলেটির
চোখটা মুছিয়ে দিলেন। আরও মনে হ'ল, বোধ হয় তিনি
নিজের চোখের উপরও কৌচার খুঁট। একবার ঠেকালেন।
কিন্তু,—না, হয়ত ভুল দেখে থাকব।

এক বৎসরে

শ্রীশ্রীরামনাথ মৈত্র

ব্রাউনিঙের 'ইন্. এ ইয়ার' চইতে

১

জানি আমি এ-জীবনে আর
দেখিতে পাব না কত মুখখানি তার
প্রাণে ভরা আগেকার মত।
ভালবাসা যদি তার হয় হিম-হত,
আমার আকৃতি আশা সকলি বিফল
জানি, দৌড়ে ভুলবন্ধে স্বাতন্ত্র্যে রহিব অবিচল।

২

কোন কথা কোন আচরণে
হ'ল বীতরাগ হেন? কর-পরশনে
অথবা এ-গ্রীবর ভঙ্গীতে
কি আছে, যা বিমুখতা আনে তার চিত্তে?
ইহারাই অম্মুরাগে তাহার জন্ম
ভরেছিল। বুঝি না কিসে যে প্রেম নির্ঝাপিত হয়।

৩

মনে পড়ে, যবে একমনে
সেলাই করিতে ব্যস্ত, কিছা চিত্রাঙ্কনে
রহিতাম, কি সিন্ধু দৃষ্টিতে
চাহিত সে, মুখ যেন জ্বলিবে সঙ্গীতে।
কহিতাম কথা যবে, কানে শুনিবার
আগে তার গাল ভরি আভাস স্ফুটিত শোণিমার।

৪

বসিত সে মোর পদমূলে,
এক বায়ু হু-জনার নিঃশ্বাসে উথলে
—এ আনন্দে হ'ত সে মশ-শুল।
প্রেম মোর উথলিয়া, মাধুরীর ফুল
প্রাণিত করিত যেন! স্নেহে মরিতাম
সেই মধুরিমা তারে দিয়া যদি যেতে পারিতাম।

৫

কহিত সে,—“বল একবার,
সবচেয়ে প্রিয়তম তুমি যে আমার।”
কহিতাম তাবে, স্নেহে ভাসি
—“দেখ বুঝি নিজ প্রেমে, কত ভালবাসি।”
“আজি আমি অকলঙ্ক, বৃকে লগ্ন মোরে,
মোর ইহপরকাল থাক্ বাধা ওই বাহুতোরে।”

৬

সত্য বাহা, করিলে স্বীকার
অপরাধ হয় ভায় কত কি কাহার?
সর্ব্বশ্ব সে দিয়াছিল মোরে,
ধন, রূপ, এ যৌবন তার হাত ভাংরে
দিহু আমি; ভালবাসা দিল আমারে সে,
মোর যাহা কিছু ছিল সব তারে দিলাম নিঃশেষে।

৭

যে বিক্ষোভ জাগাহ্ন সে বৃকে,
ছিল সাধ, প্রশমিব তারে তৃপ্তি-স্থখে,
তার কাছে রহিব না ক্ষণ,
বাসনা পুরাতে তাই কার্পণ্য করি নি।
সোনা ফেলি ধূলি যদি লয় সে মুঠায়,
আকাঙ্ক্ষার ধন তারে দিয়াছিহু, কি আশ্চর্য্য তায়?

৮

আরবার ভালবাসে যদি।
প্রেম তার দীপ্ত যদি রয় নিরবধি,
স্বপ্নাভীত ধনে শুধি ঋণ।
আরো প্রাণ পাই যদি তারে অহুদিন
দিই ঢালি। তার পর বুঝি মানিবে সে
হাসিমুখে,—কত্ব হেন আত্মদান করি নি নিঃশেষে।

৯

“কি বেদনা এত দিন ধরি
সহিয়াছে প্রিয়া মোর মরমে গুমরি।”
পুরুষের স্বতন্ত্র প্রণয়,
এ মন সকলবাড়া সৃষ্টিছাড়া নয়।
হাসিতে সে পারে বটে। “বৃষুদের প্রায়
পুরুষের করম্পর্শে নারী কি নিমেষে কেটে যায়?”

১০

প্রিয়তম, এ মোর বেদনা
স্বপ্নায়ু যে। যথা ইচ্ছা পূরাও বাসনা।
বিশ্বাস করিছে টলমল,
বিচার-বিমুক্ত চিত্ত বড় যে দুর্ব্বল।
হিমে ভরা বৃৎপিণ্ড পুরুষের প্রাণ
হোক চূর্ণ, তার পর? কি হেরিব? সে কি ভগবান?

বন্দার বনে-জঙ্গলে

শ্রীসুখমা বিদ

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষাংশে যেদিন আমাদের ব্রহ্মযাত্রার সময় আসন্ন হ'ল, সেদিন চোখের জল সঞ্চরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল—বিপৎসঙ্কুল পথের ভাবনায় নয়, গৃহকোণের শিশুদের জন্ত। যদি রেঙ্গুন প্রভৃতি বন্দার বড় বড় শহরে যাবার অভিলাষ থাকত তবে আমরা তাদের সঙ্গে নিতাম, কিন্তু বন্দার বনে-জঙ্গলে আমাদের ঘুরতে হবে অনেক দিন; তাই তাদের নিতে সাহস করলাম না।

সবার কাছে বিদায় নিয়ে ভারাক্রান্ত মনে জাহাজে উঠলাম। পাথরের প্রাচীরঘেরা নগরীর সীমানা ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে আমাদের জাহাজ তৃণ-শম্পে-ভরা মাঠের কোল বেয়ে গঙ্গার সঙ্কীর্ণ বুক থেকে উদারতর মোহানার দিকে এগিয়ে চলেছে। আমরা ডেকের উপর বসে আছি চোখের সামনে থেকে শ্রামল বনরাজি ও ধরণী ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হচ্ছে।...

আমাদের জাহাজটা ছিল প্যাসেঞ্জার বোট, তিন দিনে রেঙ্গুন পৌঁছায়।... সেদিন ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে

আমরা রেঙ্গুনের বন্দরে প্রবেশ করলাম। জাহাজ থেকে দেখা যাচ্ছিল তীরের 'পরে সুন্দর শহর—লোকজন, বাড়ীঘর এবং প্যাগোডায় মিশে এক অপূর্ব দৃশ্য,—আর জলে দেখা যাচ্ছিল, বন্দীদের শাম্পান, অসংখ্য ষ্টীমার এবং জাহাজ। রেঙ্গুনের যেটুকু আভাস পেলাম তাতে শহরটা দেখবার প্রলোভন আরও বেড়ে যায়।

বন্দরে পৌঁছাতেই এল পুলিশ, ডাক্তার। জিনিষপত্র পরীক্ষাও শেষ হ'ল। জাহাজ থেকে নেমে এসে দেখি আমাদের বন্ধু ডাঃ রায় মোটর নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

পূর্বেই বলেছি, বন্দার গভীর জঙ্গলের মধ্যে যাব

বলেই আমরা এবার বেরিয়েছি। শহরে তাই বেশী দিন থাকতে পারলাম না। এই অল্পদিন থাকার জন্তেই বোধ হয় রেঙ্গুনকে আমার আরও ভাল লেগেছিল। প্রথম দর্শনেই রেঙ্গুনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সুন্দর সবুজ গাছে ভরা শহর, বিচিত্র তার হর্ম্যরাজি। কোথাও নারিকেলকুঞ্জ, কোথাও সারি সারি সুপারিগাছ, চোখের সামনে একটা ছবি ঐকে যাচ্ছে। আমরা এখানে থাকতেই



জঙ্গলের পথে রাত্রিবাণের বাংলা

একটা প্রদর্শনী হয়। তাতে ম্যাগালে, মেমিও প্রভৃতি নানা শহর থেকে প্রদর্শিত ব্রহ্মদেশের বিচিত্র শিল্পের নমুনা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। বাঁশ দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিষ এরা প্রস্তুত করে।

রেঙ্গুন শহরে আরও ভাল লেগেছিল সেধানকার বাঙালী-সম্প্রদায়কে। এখানে দু-দিনেই তাঁরা আমাদের এমন আপনার ক'রে নিয়েছিলেন যে ভুলেই গিয়েছিলাম, আমরা এখানে প্রবাসী। পরস্পরের মধ্যে বাতে বন্ধিতা বৃদ্ধি পায়, সেজন্তে মাসের প্রত্যেক জ্যোৎস্নাপক্ষে এঁরা এক দিন 'মুনলাইট পিকনিক' করেন। আমাদের ভাগ্য



বেস-ক্যাম্পের বাংলোর সম্মুখে মাল বাহাই ও ওজন হইতেছে

সুপ্রসন্ন থাকায় আমরা যখন রেজুনে পৌঁছেছিলাম তখন জ্যোৎস্নাপক্ষ ছিল। তাই সকলের সঙ্গে মিশে রয়্যাল লেকে 'স্যাণ্ডেল পয়েন্টে' আমরা আনন্দের সঙ্গে পিকনিক ক'রে হাসি গান ও গল্পে, সে-রাত্রি যেমন উপভোগ করেছিলাম, তার স্মৃতি অনেক দিন মনে থাকবে।

প্যাগোডার দেশে এই রকম হৈঁচৈ ক'রে অল্প সময়ের মধ্যে যা-কিছু দেখা যায় তাই দেখে তিন-চার দিনের মধ্যেই আমাদের মৌলমিনের দিকে ধাওয়া করতে হ'ল। ইচ্ছা রইল ফেরার পথে বর্মার এই সুন্দর শহরের নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় নেব।

১লা মার্চ রাত দশটার ট্রেনে আমরা মৌলমিনের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। শ্রামদেশের সীমান্তে আমাদের গন্তব্যস্থলে যেতে হ'লে, মৌলমিন থেকে এক শত মাইল দীর্ঘমার গিয়ে চাইন-সেকজিতে পৌঁছতে হয়। সেখান থেকে এক শত মাইল গরুর গাড়ী, হাতী বা ঘোড়ার পিঠে চেপে বর্মার নিবিড় জঙ্গলে-ঘেরা খনির দেশে পৌঁছান যায়।

রাতে রেজুন থেকে বার হয়ে পরের দিন সকালে 'গালফ অব মার্চান' নামক ষ্টেশনে নেমে, ফেরি-দীঘারে নদী পার হয়ে মৌলমিনে উপস্থিত হ'লাম। শহরটি বড় নয়, কিন্তু দেখলে একখানি সম্পূর্ণ ছবি ব'লে ভ্রম হয়। এর মাঝখানে একটা পাহাড় আর তার মাথায় একটা প্রকাণ্ড প্যাগোডা;

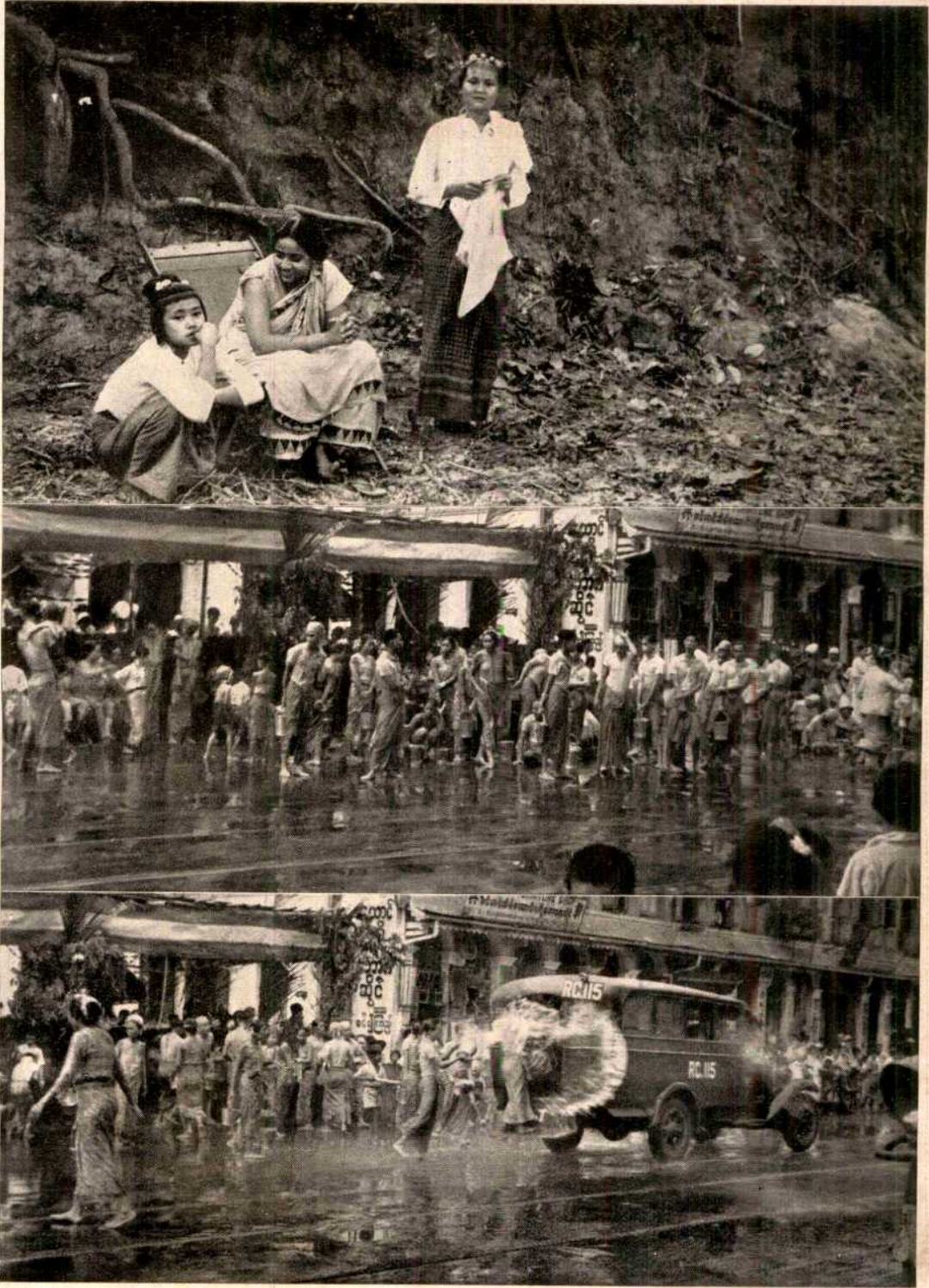
এক ধারে তার নদী, অপর দিকে বাড়ীঘর এবং সুন্দর সুন্দর রাস্তা। যতই দেখি ততই মুগ্ধ হই।

শহরের মধ্যে একটি ধর্মশালা আছে—তার নাম, রায় বাহাদুর রুকমানন্দর ধর্মশালা। বড় চমৎকার দেখতে এটি। ভেতরটি যেমন পরিষ্কার তেমনি আলো এবং হাওয়ায় ভরা। বিদেশীরা এখানে অবধি পাঁচ দিন পর্যন্ত থাকতে পারেন। প্রত্যেক ঘরের পাশে রান্নাঘর এবং ঘরে ঘরে কল আছে। সেই কলে দিনরাত জল থাকে।

এখানকার মিউনিসিপালিটির সেক্রেটারি মিঃ ভৌমিকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি এবং প্রবাসী বাঙালী মাত্রেরই জন্তে যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করেন। তিনি তাঁর মোটর পাটিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের শহর প্রদক্ষিণ করবার জন্তে। এখান থেকে ৬ মাইল দূরে রায় বাহাদুর রুকমানন্দর একটি সুন্দর বাগান-বাড়ী আছে। অনেকটা অসমতল জায়গা নিয়ে এই মনোহর বাগান-বাড়ীটি অবস্থিত। বাগানের ভেতর দিয়ে একটা নদী গেছে—আর সেই নদীতে মাঝে মাঝে বাঁধ দিয়ে, লেকের মত ক'রে তাতে সাঁতারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেখানে বোট প্রভৃতিও রাখা হয়েছে জলবিহারের জন্তে। এ রকম পাঁচ-ছয়টি লেক আছে আর প্রত্যেক লেকের ধারে একটি ক'রে সুন্দর কাঠের বাংলো। ইচ্ছা করলে এই বাংলোয় থেকে পিকনিক করা যায়।

আমরা মৌলমিনে তিন দিন থেকে ৫ই মার্চ সকালে দীর্ঘমারে চাইন-সেকজির দিকে রওনা হলাম। দীর্ঘমার চলেছে নদীর মধ্যে দিয়ে—তার দু-ধারে পাহাড় এবং জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে দ্বীপের সন্ধানও মেলে। পূর্বেই বলেছি এ-পথটা মাত্র এক শত মাইল, তাই বিকেল ৪টার ভিতর এখানে পৌঁছতে পারা যাবে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে এ-সংবাদ পাওয়া গেল। তীরে মাঝে মাঝে চূণের পাহাড় লক্ষ্য করছি—তার কোনটার মাথায় বা প্যাগোডা দেখা

বন্দার বনে-জঙ্গলে



উপর হইতে : দুইটি কেরিগ বালিকার সঙ্গে লেখিকা ॥ ব্রহ্মদেশের জলখেল ॥ রেঙ্গুনে জলক্রীড়া ॥



উপর হইতে : অরণ্যের পথে ॥ গোয়ানে কৰ্মস্থলের পথে ॥ জঙ্গলে খনির দৃশ্য, মাল-বাছাই ॥

যাচ্ছে। বাতাসে মাঝে মাঝে
ঝাঁজর-ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে।
মন্দিরের ভেতর হুত উপাসকের
দল গাইছে—বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি।
দূর থেকে ভারতবর্ষের সেই ধর্মবীরের
চরণোদ্দেশে প্রণাম জানালাম, যার
ধর্ম-জ্যোতিতে বর্ষার এই অখ্যাত
অঞ্চলও উদ্ভাসিত।

সেখান থেকে দৃষ্টি নেমে এল এবার
নদীর মাঝখানে। দেখি, বড় বড় কাঠ
ভাসিয়ে কতকগুলি মাঝি মনের আনন্দে
গান গাইতে গাইতে মৌলমিনের
দিকে চলেছে। বর্ষায় কাঠের ব্যবসায়



জঙ্গলের পাশে ফরেস্ট বাংলোর রাজিযাপন

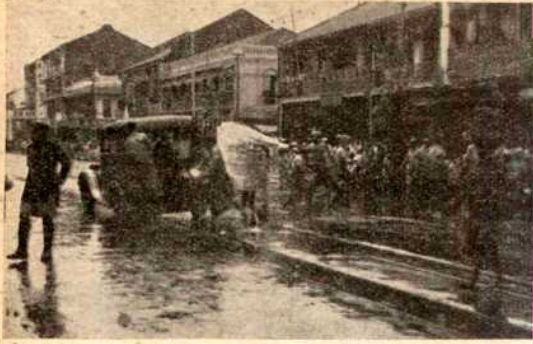
খুব ব্যাপক। এখানে অধিকাংশ লোক নদীপথে কাঠ
চালান দিয়ে যথেষ্ট খরচ বাঁচায় ও লাভ করে থাকে।

নিয়মিত সময়ে আমরা চাইন-সেকজিতে এসে
পৌঁছলাম। এ একটা সদর গ্রাম। এখানে বহু লোকের
বসবাস। পোষ্ট-আপিস, কোর্ট প্রভৃতিও আছে এবং
প্রত্যহ সকালে বাজার বসে। এখানে একটি ব্রহ্মদেশীয়া
মহিলার বাসায় আগে থেকেই আমাদের জন্মে ঘর ভাড়া
নেওয়া হয়েছিল। এই মহিলাটি আমাদের খুব আদর-
বৃত্তে আপ্যায়িত করেছিলেন। তিনি নিজে আমাদের
সঙ্গে থেকে ফুজি-চঙে নিয়ে যান। এদেশে প্যাগোডায় ও
ফুজি-চঙে গেলে, মোমবাতি জ্বলে, ধূপ ও ফুলে প্রত্যেকে
আপন আপন ইচ্ছামত বুদ্ধদেবের সামনে দাঁড়িয়ে পূজা
ও প্রণাম করে থাকেন। আমাদের দেশের মত পাণ্ডা বা
পুরোহিতের হাড়োহাড়ি নেই বা ষোড়শোপচারে পূজার
আয়োজনও নাই। দেখলাম, অনেকেই প্যাগোডায় গিয়ে
মালা জপ ও শুব পাঠ করছেন। কেউবা আপনার ইচ্ছামত
চার দিক বাঁট দিচ্ছেন ও জল ছিটিয়ে যাচ্ছেন। ফুলের
তোড়ায় কেউবা বুদ্ধদেবের চরণযুগল ভূষিত করে দিচ্ছেন।

এদেশে চট্টগ্রামের অনেক মুসলমান বাস করে।
তাদের অধিকাংশই বর্ষা মেয়ে বিয়ে করে এখানে স্থায়ী
হয়েছে। তারা এখানকার নানা রকম ব্যবসায়ের সঙ্গে
ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। আমরা এখানে দু-এক দিন থাকার

পর পুনরীকৃত যাত্রার আয়োজন করতে লাগলাম। এই সব
মুসলমান গাড়োয়ানদের কাছ থেকে বারোখানা গরুর গাড়ী
ভাড়া করে এবং কুলি-মজুর দরোয়ান প্রভৃতি সর্বসমেত
চল্লিশ জন লোক সঙ্গে নিয়ে আমরা এইবার গভীরতর
জঙ্গলে আমাদের প্রকৃত কর্মস্থলের উদ্দেশে চাই মার্চ
ভোর ষাটার সময় রওনা হলাম। এতক্ষণ ছিলাম
লোকালয়ে, মনে শঙ্কা ছিল না, এখন একটা অজানা ভয়
মুহূর্ত্তেকের জগ্রে হৃদয়ে দোলা দিয়ে গেল।

আমাদের এই এক শত মাইলের যাত্রায় প্রথম ছেদ
পড়ল দুপুরবেলায়, যখন একটা শীর্ষকায়া ঝরণার সন্ধান
মিলল। বনবক্ষে শীতল ছায়ায় ক্লান্ত গো-মহিষ
ও মানবের দল, মরুবক্ষে আরামের সন্ধান পেল।
সঙ্গে ছিল রান্নার উপকরণ; বনের কাঠে, ঝরণার
জলে এবং ক্ষুধার্ত্তদের ঐকান্তিকতায় উদরের তৃপ্তি
সাধনে খুব বেশী সময় লাগল না। দ্বিপ্রহরের সূর্য্যকে
ফাঁকি দেবার জগ্রে গাছের তলায় সতরঞ্চি বিছিয়ে
আমরা স্নিগ্ধ হাওয়ার শরণাপন্ন হলাম। তার পর বেলা
তিনটা নাগাদ আবার চলল গো-যান সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। চাইন-
সেকজি থেকে ৫০ মাইল পর্য্যন্ত পনর-কুড়ি মাইল অন্তর
ফরেস্ট বাংলা পাওয়া যায়। প্রথম রাত্রি আমরা মেটা কাট
বাংলোয় কাটিয়ে পরের দিন ভোরের বেলায় সেই ভয়াবহ
গো-যানে অধিকৃত হলাম।



রেঙ্গুনে জলজীড়া

মেটাকাট থেকে বেরিয়েই পাহাড় এবং জঙ্গলে ভরা একটা গিরিসঙ্কট পার হ'তে হয়। এই সঙ্কীর্ণ পথে প্রায় এক মাইল গিয়ে আমাদের গরুর গাড়ী নিবিড় জঙ্গলে পড়ল। এই জঙ্গলের মুখেই মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন ক'রে পরে অগ্রসর হব ভেবে আবার একটা পাগলা-ঝোরার সন্ধান করলাম। এখানে একটা সামান্য দুর্ঘটনা ঘটে। যদিও কতকগুলি গাড়ী আমাদের সঙ্গে এসেছিল কিন্তু রসদের গাড়ী পড়েছিল পিছিয়ে। প্রায় দু-ঘণ্টা অপেক্ষা করেও যখন তাদের সন্ধান পেলাম না তখন অজ্ঞাত গাড়োয়ানদের পাঠালাম তাদের খোঁজে। তারা গিয়ে দেখে, ঢালু পাহাড় বেছে বেছে আমাদের রসদের গাড়ীর সঙ্গেই রসিকতা করেছে। সেই বন্ধুর পথে গাড়ী গেছে উণ্টে আর গাড়োয়ান ছিটকে এক ধারে পড়ে আছে। টুকরিতে যে-সব ফল এবং তরীতরকারি ছিল তা কর্মমস্কিত পথে প'ড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। গাড়োয়ানটির বুকে সামান্য আঘাতও লেগেছিল। সেই উণ্টানো গাড়ী সোজা ক'রে যখন আমাদের দলবল ফিরে এল, তখন সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় তখন আমরা কাতর, সঙ্গে সামান্য বা কিছু ছিল তাই দিয়ে সবার ক্ষুন্নিবৃত্তি করা হয়। পথের এই অনিবার্য বিপদের জন্তে আজ আমরা আর বেশী দূর যেতে পারি নি। তিন-চার মাইল যাবার পরে 'কমথ' ফরেস্ট বাংলোর সন্ধান পাওয়া গেল। সেখানে রাত্রি-যাপনের পর, পরের দিন বেলা বারটা নাগাদ চাইডো গ্রামে পৌছলাম।

চাইডো একটি সমৃদ্ধিশালী এবং বৃহৎ গ্রাম; বহু

লোকের বাস। এখানকার ফরেস্ট বাংলায় আমরা সকলে উঠলাম। মেটাকাট থেকে চাইডো পর্য্যন্ত রাস্তা যে কি বিপজ্জনক তা চোখে না দেখলে কখনও ধারণা করা যায় না। প্রতি মুহূর্তেই গাড়ী উণ্টে যাবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের গাড়ী দু-বার এমন গড়িয়ে এসেছিল যে আমরা আজও ভাবি, কেমন ক'রে জখম না হয়ে আমরা ফিরে আসতে পেরেছি। চড়াইয়ের সময় পিছন থেকে অনেকবারই কুলিদের গাড়ীটা ঠেলে দিতে হয়েছে।

চাইডোতে এসে আমরা দু-দিন বিশ্রামের জন্তে রয়ে গেলাম। ব্যবসায়-সংক্রান্ত আমাদের যা দু-একটা কাজ ছিল তা মিটিয়ে আমরা আবার শ্রাম-সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলাম। পাহাড়-ঝরণা এবং গভীর জঙ্গল, সূর্য্যের আলোও সেখানে পথ হারিয়ে যায়; প্রকৃতির এই নির্জনতার এক-টানা স্রের মন আবিষ্ট হয়ে ওঠে।

চাইডোতেই গ্রাম শেষ হ'ল। এখান থেকে আমাদের কর্মস্থল আরও ৫০ মাইল দূরে। এই ৫০ মাইলের মধ্যে আর কোন গ্রাম বা জনমানবের সমাগম নেই। এপথে ফরেস্ট বাংলোরও কোন সন্ধান নেই। আমাদের কাজের সুবিধার জন্তে স্থানে স্থানে রাত্রিবাসের উপযোগী ঘর আমরা করিয়ে নিয়েছি। সেখানেই আমাদের কর্মচারীরা যাওয়া-আসার পথে রাত্রিকালে বিশ্রাম করে।

এখানে নানা রকমের বড় বড় গাছ মাথা উঁচু ক'রে কত দিন ধরেই না বিরাজ করছে। কতকগুলি গাছ শুকিয়ে গেছে, কতকগুলি কালের স্পর্শে এবং ঝড়ের প্রভাবে ভেঙে পড়ে আছে। বাঁশ, বেত এবং নানাবিধ লতায় পথ কি রকম দুর্গম ও জঙ্গলময় হয়ে আছে তা ধারণা করা যায় না। নিবিড় জঙ্গলের অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গো-যান দিনের পর দিন চলছে—মনে করতে পারি নে, রৌদ্রের আলো স্পষ্টভাবে এপথে এক দিনও দেখেছি কি না।

আমাদের গাড়ীর আগে আগে কুলিরা চলেছে, দা, কুড়ুল, করাত, বর্শা এবং বন্দুক নিয়ে, কারণ এখানে বীধা রাস্তা ব'লে কিছু নেই; তারা চলেছে জঙ্গল কেটে কেটে গাড়ীর পথ করতে করতে। কোথাও বা গাছ প'ড়ে আছে স্রুমুখে, আর কোথাও বাঁশঝাড় চলার পথে মূর্ত্তিমান বিঘ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। এসব সাফ ক'রে এগিয়ে যাওয়ায়

কষ্টও আছে আনন্দও আছে। চাইভো থেকে দু-তিন দিন এমনি চলে অবশেষে আমরা আমাদের কর্মস্থলে এসে পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। জায়গাটি বড় চমৎকার। দুই দিকে উঁচু পাহাড় গর্কোন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে, আর তারই মাঝখানে এই উপত্যকা। এক দিকে পাহাড়ের গা বেয়ে একটি স্রোতস্বতী বয়ে যাচ্ছে। সেই সমতলভূমিতে আমাদের বাঁশের বাংলো—তার বেতপাতার ছাউনি। চারি দিকের পাহাড়ে জঙ্গলে কত রকমের অসংখ্য পাখীর কলরব দিন-



আমাদের কর্মস্থলের বাংলো

রাতকে মুখরিত করে রেখেছে। এখানে সকালবেলায় প্রাতরাশ শেষ করে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াইতাম ও প্রয়োজনমত কাজের তদারক করতাম। বিকেলে স্বামী তাঁর বন্দুক নিয়ে শিকারের আশায় নিবিড়তর জঙ্গলে যেতেন, আমিও তাঁর সঙ্গী হতাম। সন্ধ্যায় ক্লাস্তদেহে ফিরে এসে বাংলোয় বসে কর্মচারীদের সঙ্গে গল্প করতাম।

এখানে কেরিণ, চট্টগ্রামের মুসলমান ও শ্রামদেশীয় বহু নরনারী কাজ করে। এর মধ্যে কেরিণরাই কর্মী। এরা দেখতে অনেকটা ভূটিয়াদের মত। নাক চওড়া এবং চেপ্টা। গায়ের রং ফর্সা। এদের গ্রামগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং এরা খুব অতিথিবৎসল। এদের প্রত্যেক গ্রামে একটি করে জিয়া (অর্থাৎ অতিথিশালা) আছে। তা ছাড়া যদি কোন অচেনা পথিক তাদের বাড়ীতে আসে, তারা তাদের যথাসাধ্য চাল, ছুন, শুকনো মাংস ইত্যাদি দিয়ে অভ্যর্থনা এবং পরিতুষ্ট করে, রাত্রিবাসের জন্তে ঘর ছেড়ে দেয়। আমরা যখন তাদের গ্রামের মধ্যে দিয়ে আসি (আমাদের পথে কয়েকটা কেরিণ-বস্তি পড়েছিল) তখন কেউবা ডাব, কেউবা মুগী নিয়ে এসে আমাদের উপঢৌকন দেয়। কেরিণ ও শ্রামদেশীয়েরা সব রকম জীবজন্তু খায় এবং বড় জানোয়ার হলে তার মাংস শুকিয়ে রেখে দেয় ভবিষ্যতের রসদ হিসাবে। এসব বিক্রী করে লাভবানও হয় তারা।

একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। ঢোলের শব্দ ও গানের আওয়াজ খুব শোনা যাচ্ছে। কুলিরা বললে যে এই গ্রামের লুজির (মোড়লের) ছেলের বিয়ে হচ্ছে। আমরা গাড়ী থামিয়ে বিয়ে দেখতে গেলাম। দেখতে পেলাম, এক জায়গায় অনেক বরাহ বলি হয়েছে ও অপর জায়গায় সেগুলি পোড়ান হচ্ছে। গ্রামের সকল লোক এক-সঙ্গে এখানে মিলেছে। মদ খাচ্ছে, গানবাজনা করছে আর বরাহ-মাংস চিবচ্ছে। আমাদের এরা অভ্যর্থনা করে নিয়ে বসাল। বর-কনেকে সাজিয়ে বৈথাল। এদের প্রথা, মেয়ে যত দিন কুমারী থাকবে তত দিন একটা সাদা রঙের মোটা আলখাল্লা-ধরণের জামা পরে থাকবে এবং বিয়ের পরদিন থেকেই রঙীন জামা ও লুঙ্গি ব্যবহার করবে। এদের মেয়ে-পুরুষ সকলের মুখেই সর্কদা পাইপ লেগে আছে। বেশ সৌখীন জাত এরা। আমোদে হাসিতে গানে সব সময়ে ভরপুর।

এরা বাঁশের ভিতরের ফাঁপা জায়গায় চাল ও জল দিয়ে ভাত রাগ্না করে। তার নাম কাউনি ভাত—খেতে মন্দ লাগে না। এরা এক দিন নিমন্ত্রণ করে আমাদের খাইয়েছিল।

এই রকম ভাবে দিন যখন আমাদের নানা আমোদ এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে কাটছিল, তখন এক দিন আমার স্বামী একটা বাঘ শিকার করেন। কেরিণরা সেই বাঘের

মাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি আরম্ভ করে দিলে। কতক তারা রাগা করে খেয়ে শেষ করল—কতক ভবিষ্যতের দুর্দিনের জন্তে শুকিয়ে রাখল। আশ্চর্য্য এই জাত, কি না খায় এরা। ব্যাঙ তো দেখছি এদের উপাদেয় খাদ্য। এদেশের ব্যাঙগুলির ঠ্যাং শরীরের চাইতে দ্বিগুণ লম্বা। কেরিগরা রাতের বেলায় মিডাই (এরা পচা কাঠ ও গর্জন তেল দিয়ে তৈরি মশাল) জেলে পাশাড়ের গর্তে এবং নালায় ব্যাঙ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়।

সভ্য জগৎ থেকে বহু দূরে এই আনন্দময় ধামে অগ্নাধ শান্তির মধ্যে সপ্তাহ দুই কাটাবার পর দেশে ফিরবার দিন আমাদের ঘনিয়ে এল। হস্তর জঙ্কল-সমুদ্র পার হয়ে যখন আমরা আবার মৌলমিনে ফিরে এলাম, তখন আমাদের অবস্থা প্রায় অর্দ্ধমৃতের মত। আট-দশ দিন পরে আমরা রেঙ্গুন যাত্রা করি। ইচ্ছা ছিল এখান থেকে পেঙ্গু, ম্যাণ্ডালে, মেমিও প্রভৃতি শহরে বেড়িয়ে তবে দেশে ফিরব। কিন্তু রেঙ্গুনে এসে দেখি এখানে বেশ গরম পড়েছে। তা ছাড়া শরীরও দুর্বল থাকায় আমরা আর কোথাও যাওয়া সমীচীন বোধ না করে এখানেই স্থিতিলাভ করলাম।

চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে এখানে এক প্রকার জল-খেলা হয়—ঠিক তেমনই ভাবে, যেমন আমরা ফাগ খেলি। জল-খেলার সম্বন্ধে এদের দেশের রীতি এই যে, এরা বৎসরের শেষে, মেয়েপুরুষে, যার যে-বারে জন্ম সেই বারের নামে নাম-করা টুলে বসে পাঁচ-রকম ফুলের পাতা, মাথা-ঘসা ইত্যাদি দিয়ে স্নান করে। স্নানের পর নূতন পোষাক পরে তানাখা (এই দেশীয় চন্দন) মেখে বেশভূষা করে বর্ধাকে আহ্বান করে। তাদের বিশ্বাস, এই সব ক্রিয়া এবং ক্রীড়ার পর অঝোর ধারায় বর্ষা নামে এবং তাতে করে তাদের শরীর এবং মন থেকে গত বৎসরের পাপতাপ সব ধুয়ে মুছে যায়; সেই সঙ্গে দেশেরও মঙ্গল হয়। কৃষকদের ধাত্ত রোপণ এবং আবাদের প্রচুর হুবিধা হয়।

এরা সব এক-এক দিন এক-এক রকম পোষাক পরে। রাস্তার ধারে বড় বড় ট্যাক বসিয়ে তাতে জল ভরে এবং কখনও কখনও তাতে বরফ মিশিয়ে ঠাণ্ডা করে গাড়ী, ঘোড়া, ট্রামবাস, এবং পথচারী পথিকদের সর্কাক ভিজিয়ে দেয়। কেউ এতে প্রতিবাদ করে না। ছ-সাত দিন এই সমারোহ চলে এবং তার ফলে না কি এক দিন বৃষ্টিও

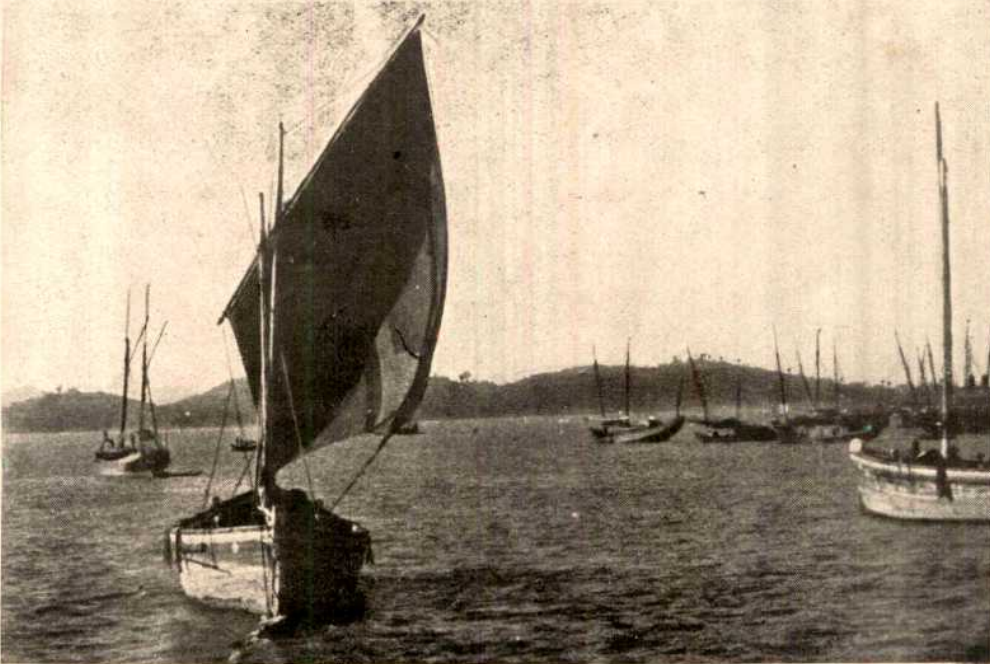
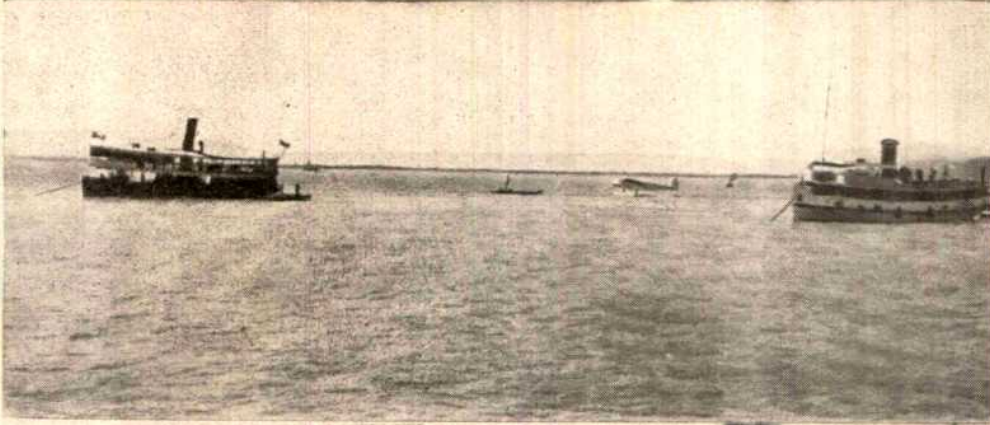
নামে। বালুতি বালুতি জল লোকের গায়ে ঢেলে ওরা অন্তত আমোদ উপভোগ করে। বাইরের নানা শহর থেকে লোকে পয়সা খরচ করে এই জল-খেলার আনন্দ উপভোগ করতে আসে। শেষের দিনে গাড়ী করে এরা একটা শোভাযাত্রা বার করে।

সোয়েডাগন প্যাগোডা সম্বন্ধে আগেই কিছু বলেছি। এই প্যাগোডার দেশে এসে আর একবার সে অপরূপ দৃশ্য না-দেখে মনে শাস্তি পাচ্ছিলাম না। এ-সব প্যাগোডা যেন দুর্গবিশেষ। এর ভেতরে যাবার চারি দিকে চারিটি ফটক আছে। সেই ফটক পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে প্রায় দশ মিনিটের রাস্তা গেলে তবে মধ্যস্থলে পৌঁছান যায়। সিঁড়ির দুই পাশে দোকানের সারি, সেখানে এদেশের যাবতীয় জিনিষ (খেলনা থেকে আরম্ভ করে ফুল প্রভৃতি সবই) কিনতে পাওয়া যায়। মনে হয় যেন ছোট একখানি গ্রাম। চারি দিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মার্কেল পাথরের মেঝেতে স্থলর বসনে আবৃত হয়ে ধনী নিধন বর্ম্মারা দলে দলে, মেয়ে-পুরুষে এসে বসছে। সবারই হাসিখুশী মুখ, আর সেই মুখে তানাখা পাউডার মাখা। কেউবা বঁসে মালাজপ করছে, কেউবা প্রদক্ষিণ করছে। চারি দিকে ছোটবড় নানাবিধ বুদ্ধমূর্ত্তি—কোথাও বা শায়িত অবস্থায়, কোথাও বা দণ্ডায়মান। এখানে একটি বড় ঘন্টা আছে। জনপ্রবাদ, সেটা বাজালে আবার তাকে বর্ম্মায় ফিরে আসতে হবে। ব্রহ্মদেশ ঘোরা আমার অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, তাই মনে ইচ্ছা রইল আবার ফিরে আসব। ঘন্টা বাজালাম, ক্ষতি কি?

এদেশের পোয়ে-নৃত্য দেখতে অতি স্থলর। অনেকে বঁলে থাকেন, এ-নাচ না দেখে গেলে, ব্রহ্মদেশ-ভ্রমণই বৃথা হয়। আমরা স্থানীয় কর্পোরেশনের উদ্যানে এক শনিবার সন্ধ্যায় এই নাচ দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

রেঙ্গুন ছেড়ে দেশে ফিরতে মন তেমন সাড়া দিচ্ছিল না। কিন্তু দেশের মাটি, দেশের জলবাতাস এবং সব চাইতে দেশের লোক আমাদের টানছিল। তাই ১৩ই এপ্রিল শ্রীবুদ্ধের চরণ স্মরণ করে আবার অর্ধবপোতে পাড়ি দিলাম। নব বৎসরের প্রারম্ভেই যখন গঙ্গার সুপরিচিত জেটিতে আপনার জনের স্মিত মুখ দেখতে পেলাম, তখন বাস্তবিকই প্রসন্নতায় আমাদের সমস্ত মন ভরে উঠেছিল।

ব্রহ্মদেশের দৃশ্যাবলী



মৌলমিনের বন্দর। (মধ্যে) মৌলমিন হইতে কক্সবাজারের পথের দৃশ্য।



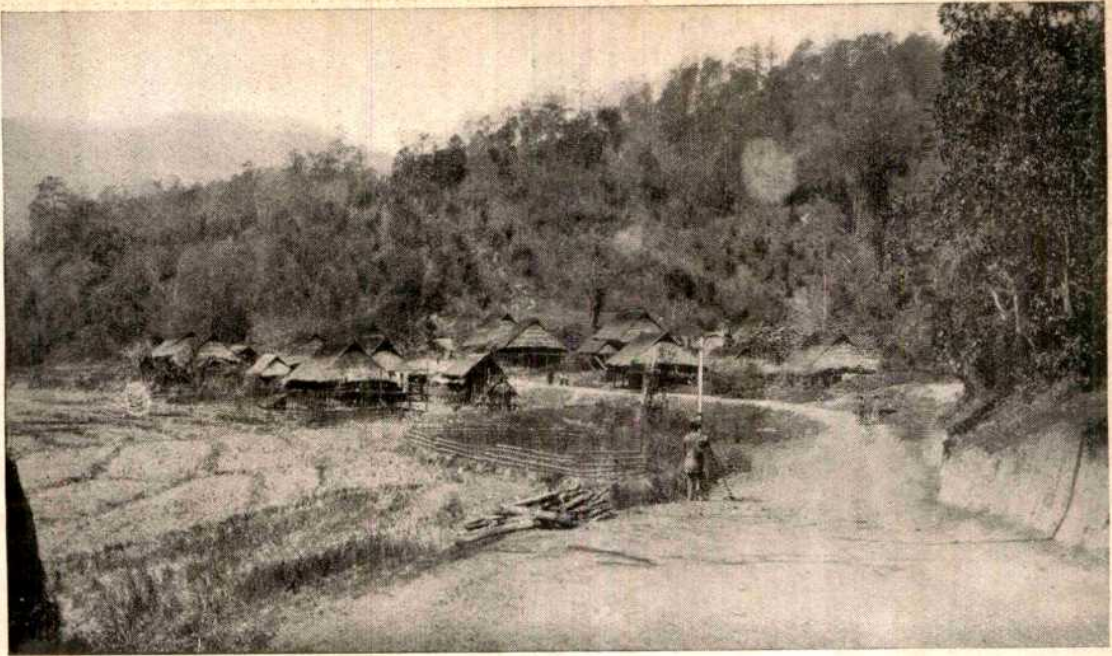
ব্রহ্মের প্যাগোডায় বুদ্ধমূর্তি



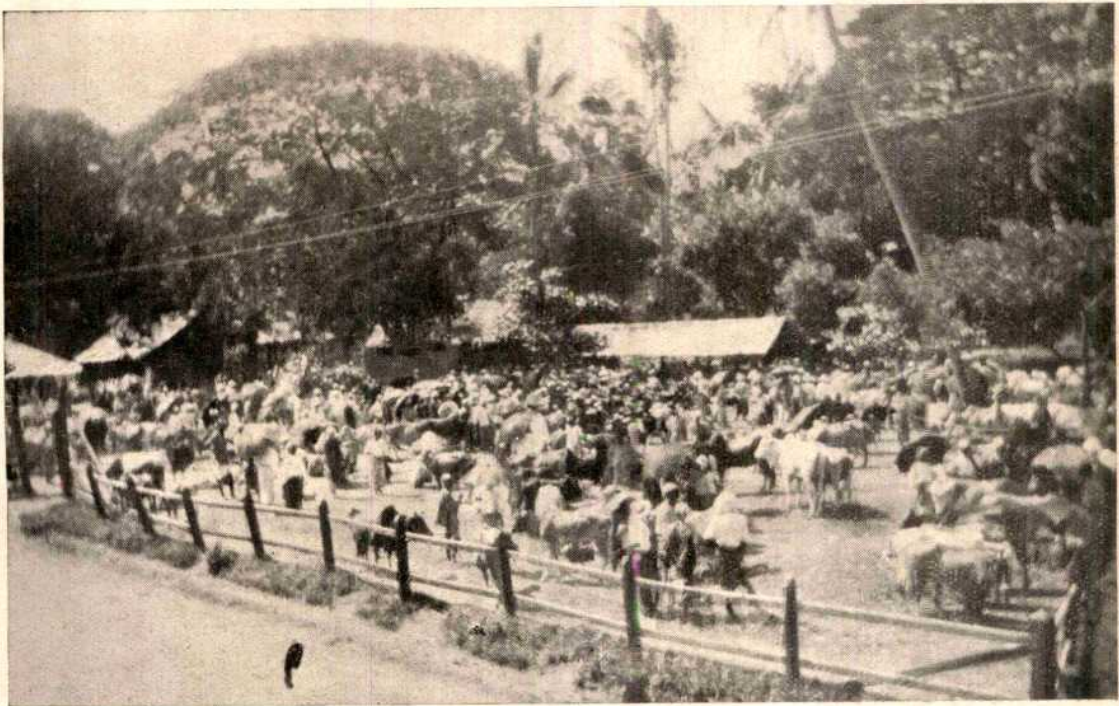
ব্রহ্মদেশের রাখাল



ব্রহ্মের চাষী



ব্রহ্মদেশের একটি গ্রাম



ব্রহ্মদেশের একটি পশুবিক্রয়শালা



ব্রহ্মদেশের একটি গ্রামের বাজার



ঘরমুখো চাষীদল

শেষত্রঙ্গ-যুদ্ধে বীর বাঙালী সৈনিক

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ইংরেজ যখন উত্তর-ব্রহ্ম জয় করে তখন এক জন বাঙালী ব্রহ্মের শেষ রাজা খিবর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হরিয়া ফেলিয়াছিলেন। বোধ হয় অনেকে ইহার নাম জানেন—ইনি ফরিদপুর-নিবাসী শ্রামলাল চক্রবর্তী (সরকার)। আমি ম্যান্ডালয় অবস্থানকালে তাঁহার লিখিত আত্মকাহিনী নকল করিয়া আনিয়াছি। এখানে শুধু তিনি কিরূপে রাজা খিবর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সম্পর্কে অপূর্ণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, উহাই উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি প্রত্যেক বাঙালী ইহা শুনিয়া গর্ব বোধ করিবেন।

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বের কথা বলিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন :—

“মাগালে আমার দুই বৎসর হইতে চলিল। বর্ষা কথা উত্তম-রূপে অভ্যাস হইয়াছে। বর্ষাদিগের সহিত যেমামিশি, আলাপ-পরিচয়, হাতায়ত ক্রমে বুদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজ্যের নানা তত্ত্ব আমি অনুসন্ধান করিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলাম। বর্ষার দলে মিশিলে এখন আর আমাকে সহসা কেহ বাহির করিতে পারে না। মাগালে আমার বহু বন্ধু জুটিল। আমি অশারোহী সৈন্তদলে প্রথম সোপাইতে ভর্তি হইয়াছিলাম, তাহার ছয় মাস পরে ‘মিথু-ভুজির’ পদে উন্নীত হইলাম এবং আর ছয় মাস পরে ‘মিনগাউ’ অর্থাৎ পঞ্চাশ জন সৈন্তের উপরস্থ সর্দার হইলাম। হরিরাম শর্মা ও আমি এক পদে, কিন্তু বিজুবাম এক শত সৈন্তের উপর। এখন অশারোহণে ও যুদ্ধকৌশলে আমি কাহা অপেক্ষাও হীন নহি।

একদিন কাওয়ার করিয়া কিসিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম যে, একজন ইংরেজ বণিক কয়েক জন মুটের ঘাড়ের মাল চাপাইয়া গিয়া রাস্তায় ফিরি করিয়া বেড়াইতেছে। দেখিয়া একটু কোঁতুল হইলাম। লোকটার চেহারা দেখিয়া বোধ হইল যেন খুব উঁচুনের লোক। আবার ভাবিলাম, কোন উঁচুনের লোক হইলে এইরূপ রাস্তায় মুটে লইয়া ফিরি করিয়া বেড়াইবে কেন? কোঁতুল

বশতঃ অলক্ষিত ভাবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাইতে আরম্ভ করিলাম, ভাবিলাম লোকটা কি কিংকর করে। সে একটা দীর্ঘ রাস্তার শেষপ্রান্তে বসিয়া মুটেদিগকে মোটা নামাইতে বলিয়া পথে চলিবার সময় চারি দিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া যে দিকের যে পথ ও যেখানে বাহা, বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিতেছিল। রাস্তার প্রান্তে গিয়া পকেট হইতে নোটবুক বাহির করিয়া কি কি ফেন লিখিতেছে। পরে একটি ক্ষুদ্র কম্পাস বাহির করিয়া, এবং ঘড়ির মত আর একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র বাহির করিয়া, এই সকল দেখিয়া নোটবুকে সমস্ত লিখিয়া, পুনরায় অস্ত্র দিকে চলিল। অবশেষে নগবে প্রাটারের নিকট আসিয়া তথায় অনেকক্ষণ দেখিয়া নিরীক্ষণ করিয়া কি কি লিখিয়া লইল। সে যখন চলিতে থাকে, তখন যেন পা ছড়াইয়া লম্বা লম্বা পদক্ষেপে চলিতে থাকে। তখন আমার বোধ হইল যে, এই প্রকার একপদক্ষেপকে এক ষ্টেপ বলে। ইহাধারা রাস্তার দুই দুই মোটামুটি স্থির করিতে পারা যায়। এই মত পণ্য বিক্রয় করিয়া অবশেষে মাগালের প্রসিদ্ধ জো জো বাজারের নিকট রাস্তার ধারে এক উচ্চ দ্বিতল কাঠময় ঘূহের উপর চলিয়া গেল। মালবাহী কুলিগুলি মালসহ নিম্নতলে থাকিল।

আমি কিন্তু পাকে পাকে থাকিয়া সমস্ত লক্ষ্য করিয়া অবশেষে কুলিদিগের কাছে গিয়া বসিলাম। আমাকে বর্ষা জানিয়া বেহই তত গ্রাহ্য করিল না, কুলি ভিন্ন সবে একটি মাত্রাজী বস আছে। ইংরেজীতে বেশ কথা বলিতে পারে। এই কুলিগণ “খেমিয়া” “দিগ লাগে” প্রভৃতি দুই-চারিটি নগ্মা কথা মাত্র জানে, এবং তাহাদের এক জন সামান্য দুই চার কণা হিন্দী জানে। আমি তাহাদের নিকটে বসিয়া পাস বর্ষার মত পুন চিবাঁইতে চিবাঁইতে এবং চুপুট টানিতে টানিতে ক্ৰিডাসা করিলাম, এই সাহেবের নাম কি? তাহাতে ইহারা আমার কথা বুঝিতে না পারিয়া পরস্পর কোঁরজী ভাবায় কি কি “আগা গুরু গুরু” শব্দে কথা বলিতে লাগিল। কারণ কুলিগুলি সকলই কোঁরজী। অবশেষে এক জন বলিল, “হামলোক নেহি জান্ডা”—তখন আমি হাত দ্বারা ইঙ্গায়া করিয়া সাহেবের কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। তখন তাহারা আমার প্রবলের মর্ম বুঝিল। কিন্তু বরাট তামিল ভাষায় কি কি বলিয়া পরে “Do not tell him the master's name.” তার পরে হেড কুলিটি বলিল “Yes, Colonel Sladen told me not to tell his name to anybody.” ইহাদের পরস্পর বাক্যালাপ শুনিতে শুনিতে আমি যেন বেলুটিয় মত ভাবাচাকা খাইয়া বসিয়া রহিলাম। তখন আর এক জন কুলি কহিল, “না মনেবু, তোরা তোরা” অর্থাৎ তোমার কথা বুঝি না, যাও, যাও।

আমি তখন আঙুলে আঙুলে ঊঠিয়া চলিয় গেলাম। মনে মনে

* ইহারা বাঙালী পোনা, প্রায় ৫০০ শত বৎসর হরিয়া বংশাধিকার উত্তর-ব্রহ্ম বাস করিয়া আসিতেছেন।—লেখক

ভারি সম্ভেদ হইল যে, “কর্ণেল সোডন” এই সাহেবটার নাম।
কর্ণেল এক জন উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্মচারী। তিনি কেন মালের
ফিরি করিয়া বেড়াইতেছেন? ইহার মধ্যে অবশ্য কোন গুরুতর
বহুত আছে। চিন্তা করিতে করিতে মনে মনে ধারণা হইল যে,
এই লোকটা এক জন দ্বন্দ্ববোধী সদাগর, ইহার বেচাকেনা সব মিথ্যা,
ইহার পঞ্চাচাটের মাগ, কপ্পাস ও ব্যারোমিটার (বায়ুমান যন্ত্র)
প্রভৃতি দ্বারা গুণনির্ণয় ও স্থানের উচ্চতা প্রভৃতি লিখিয়া লইবার
উদ্দেশ্য কি? ইহার কাবণ অসুস্থতার জন্ত ব্যস্ত হইলাম এবং
আমার চিন্তাশীল স্বভাববশতঃ কিছুকালের জন্য মন যেন এই চিন্তায়
জড়িয়া পেল।

বাড়ীতে গিয়া বকুদ্দাম শব্দা ও বিবস্তর শব্দকে গোপনে এই কথা বলিলাম তাহার কেহ প্রাহ্ন করিল না। তাহার বলিল যে, ও প্রকার কত সাহেব আসে যায়। কে কাহার খবর নেয়। মনে মনে ভাবিলাম যে, এই প্রকার ঔদাসীন্ম ও চিন্তাশূন্যতাই আসিয়াবাসীর মৃত্যুর কারণ হইয়াছে।

পরদিন জো জো বাজাবের রাস্তা দিয়া বাটিতে বাইভেছি এমন সময় একটি বন্দী ভদ্রলোক সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। লোকটা যেন চেনা-চেনা বলিয়া বোধ হইল। নিকটবর্তী হইলে তাঁহাকে স্পষ্ট চিনিলাম। সেই সীমারে আসিবার কালীন যে ইংরেজী-জানা একটি বন্দী ভদ্রলোকের কথা বলিয়াছি, ইনি তিনি। আমি তাঁহাকে সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোথায় থাকেন ?

তিনি আমার মুখের দিকে অঙ্গকণ্ঠ তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, "Hallo Babu Chakravarty, you are here! I see now you have become a proper Burman. I believe you have taken a Burmese wife too, therefore you dress like a Burman. What are you doing here?"

আমি বলিলাম, I am doing some business here.
No fear, I have not taken any wife yet.

আমি যে কি করি, কোথায় থাকি, তাহা তাঁহাকে বলিলাম না। তিনিও কোথায় থাকেন, কি করেন, আমাকে বলিলেন না। পরস্পর নানা বাক্যে আলাপ করিয়া বিদায় লইলাম। এই লোকটাকে সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া আবার সম্মেহ হইল। ইহাদের গুপ্ত তথ্য আবিষ্কারের লব্ধ ব্যস্ত হইলাম। ভাবিলাম এও এক জন গোয়েন্দা হইবে। কি করিয়া এই দুইটা লোকের কার্যের রহস্য ভেদ করি, তাহা জানিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে মনে ভাবিলাম যে কোন স্ত্রীলোক দ্বারা ইহাদের সংবাদটা জানা দরকার। মনে মনে ভাবিলাম, আচ্ছা ধর্ম দেবীকে একবার লিঙ্গাঙ্গা করিয়া দেখি, তাহার দ্বারা এ গুপ্তচরের কার্য সিদ্ধ হইতে পারে কি না ?

ধর্ম দেবীর সঙ্গে আমি বাহ্যিক যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে তাহার ধারণা হইয়াছে যে, আমি তাহাকে ভালবাসি এবং তাহার প্রেম-জ্বালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু আমার আসল মনের ভাব সে জানে না। ধর্ম দেবীকে আমার প্রস্তুত জানাইলাম। তাহাতে সে আমার মনস্তত্ত্বের জন্ত দৌত্যকার্যে সম্মতি প্রদান করিলে, সদাগর সাহেব যে বাড়ীতে তাহার ঠিকানা তাহাকে বলিয়া দিয়া, সাহেবটি এখানে কি করে, বর্ম্মাটি কে, এবং বাড়ীওয়ালা ইহাদের মতলব জানে কি না ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তর জানিবার জন্ত তাহাকে বেণ করিয়া বলিয়া দিলাম। সে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া অনুসন্ধান চলিল।

পরদিন ধর্ম দেবী যাহা অল্পসঙ্কানে জানিতে পারিয়াছিল, তাহা আমাকে বলিল। নিম্নে তাহা লিখিত হইল :—

‘বে বাড়ীতে সাহেব থাকেন, সে বাড়ীর মালিকের নাম ড মে। ড মের স্বামীর নাম উ-মহ। উ-মহ রাজকুমারদিগের এক জন কার্যকারক ছিলেন। রাজা খিব তাঁহার জ্ঞাত্বিবর্গকে সম্মলে বিনাশ করার পর উ-মহকে তাঁহার বিক্কে বড়ফক্সকারী মনে করিয়া তাঁহাকেও হত্যা করেন। সে ঘটনা আজি ৪৭ বৎসর হইল। ড মের মাত্র একটি কন্যা আছে, তাহার নাম মা-ছ-মে। সে আমাদের পরিচিত লোক। তাঁহার বাড়ীতে গিয়া ওকথা-সেকথার পর সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। মা-ছ-মে কহিল, সাহেবের কালা নাম কি, জ্বানি না, বর্ম্মা নাম মতোটু। তিনি এখানে বিলাতী রেশমী কাপড়সকল বিক্রয় করিবার জন্ত আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে বেচাকেনা করিতে বড় দেখি না। এখন বাড়ীতে থাকেন, তখন সর্বদা লিখিতে দেখি এবং সময় সময় নজা প্রস্তুত করিতে দেখিয়া থাকি। আমি এখন কালা অক্ষর জ্বানি না, তখন সে যে কি লেখা, তাহাও বলিতে পারি না। তাঁহার সঙ্গে অনেকগুলি ছোট ছোট বস্ত্র আছে। সে সকল টেবিলের উপর দেখি। কোন কোন দিন অনেক রাত্রি জাগিয়াও লিখিতে থাকেন। অবসরমত আমাদের সঙ্গে নানা আলাপ করিয়া থাকেন। বর্ম্মা ভাষা তিনি লিখিতে ও পড়িতে ভালমত পারেন। আমাদিগকে সময় সময় শহরের লোকদিগের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, রাজবাড়ীর কথা এবং রাজার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কে কে, তাহা আস্তে আস্তে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন। আমরাও বাহা জ্বানি, তাহা তাঁহাকে বলিয়া দিয়া থাকি। রাজপুত্রীর হত্যার কাহিনী এবং আমার পিতার হত্যার বিষয় প্রভৃতি শুনিতে বড় আগ্রহ প্রকাশ করেন।

সাহেবের যে আসল কি মতলব, তাহা আমি জানি না, আমার মা বোধ করি জানেন। তিনি আমাকে কোন কথা খুলিয়া বলেন না। কিন্তু আমার অগোচরে কোন কোন সময় সাহেবের সঙ্গে গোপনে কথা বলিতে শুনিয়াছি।

বর্ষা ভদ্রলোকটির নাম মংগ-জান। বাড়ী মৌলমিনে। তিনি সাহেবের কেরাণী করিয়া করেন, বর্ষা ভাবার বত লেখাপড়া এবং তরলতা তাহা সেই কেরাণী করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন শহরের নানা সুবাদও তিনি সাহেবকে দিয়া থাকেন। সাহেবের সঙ্গে তাঁহার ইংরেজীতে কথা হয়, সুতরাং তাহা আমি বুঝি না। মা-ছ-মে আরও বলিল যে, সাহেব নাকি কিন্-উল-মিকি ও তাগুদি-উল-মিকির সঙ্গে কয়েক বার গোপনে সাক্ষাৎ করিয়াছেন।’

*পূর্বাক্ত - বাঙালীপৌরা বিষ্ণুদ্বারম শস্যের কথা । লেখক
ইহাদেরই আশ্রিত ছিলেন ।

ধর্ম দেবীর মুখে সাহেবের পুরা পরিচয় না পাইলেও আডাসে অনেক বুঝিলাম এবং আমার অনুমান যে সত্য, ভাবে বুঝিলাম। সাহেব এক জন ছদ্মবেশী শত্রু, তাহা বুঝিতে আর বাকী বহিল না। তবে সাহেব কি নক্সা আঁকেন এবং কি লেখেন তাহা জানিবার সাধ্য নাই। তখন মনে মনে এক ফন্দি আঁটিলাম যে এই বর্মীর সাথে সাহেবেব কি কি কথা হয়, তাহা শুনা দরকার।

এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে মা-ছ-মের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। সে আমাকে অপরিচিত লোক মনে করিয়া প্রথম প্রথম সজুচিত হইল এবং আমার নাম কি এবং কি চাই, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। আমি আমার নাম বলিলাম এবং কহিলাম যে, আমি কিছুই চাই না, কেবল বেড়াইতে আসিয়াছি। মা-ছ-মে আমার নাম শুনিয়া আদর করিয়া বসিতে দিল এবং চুসুট ও পানের ডিবা আনিয়া সম্মুখে রাখিল। সে বলিল, আপনার নাম মা-মিয়া দেবীর মুখে শুনিয়াছি, মা-মিয়া (ধর্ম দেবী) সহস্র মুখে আপনার প্রশংসা করিয়াছে। আপনার বিজ্ঞাবুদ্ধি, স্বভাবচরিত্রের বিবর, বখনই দেখা হয় তখনই বলে। তা আপনি যে দর্য করিয়া আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন, সে আমার সোভাগ্য। মাঝে মাঝে এরূপ বেড়াইতে আসিলে বড় সুখী হইব। আমি মা-ছ-মের নিকট ধর্ম দেবীর মুখে আমার গুণ-পানের কথা শুনিয়া লজ্জিত হইলাম এবং বলিলাম, না, আমার প্রশংসার যোগ্য এমন কোন গুণ নাই। এই প্রকার নানা কথাবার্তার পর তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলাম এবং বলিলাম, অবসরমত মাঝে মাঝে বেড়াইতে আসিব, এখন বখন পরিচয় হইল তখন আর আসিতে বাধা কি?

মা-ছ-মে যুবতী কুমারী। আমিও যুবক কুমার। আমাকে করেক বার তাহার বাড়ীতে বেড়াইতে বাইতে দেখিয়া সে মনে করিল, ইংরেজীতে তাহাকে love বলে, আমি বুঝি তাহাকে সেইরূপ ভাল-বাসি, এবং তাহার সঙ্গে পরিণয়-সম্বন্ধ স্থাপনের মতলব করিয়াছি। এরূপ মনে করিতেই বুঝি তাহার আকর্ষণটা আমার উপর বৃদ্ধি পাইল। কারণ এটা ব্রহ্মদেশের নিয়ম, যদি কোন যুবতী কোন যুবককে পছন্দ করে, তাহা হইলে সে তাহাকে ডাকিয়া বাসায় নানা খোসগল্প করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। যুবকেরও যদি তাহার প্রতি ঝোঁক হয়, তাহা হইলে হয়ত এই প্রকার করেক বার বাগ্ম্য-আসা করিলেই পরস্পর ভালবাসা ও প্রণয়ের কথা হয়, পরে উভয়কেই উভয়ে চায়, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া বিবাহের কথা ঠিক হয়। ইহাতে ব্রহ্মদেশীয় সমাজে কোন দোষ নাই।

দুই-তিন বার তাহার বাড়ী বাইবার পর আর এক দিন সন্ধ্যার পর তথায় বেড়াইতে গিয়া বলিলাম এবং মা-ছ-মের সঙ্গে নানা গল্প করিতে আরম্ভ করিলাম। মা-ছ-মের মা তথা হইতে উঠিয়া কার্যান্তরে আসিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, (ইংরেজীতে) —তুমি কি আজ কিন্-ওয়ান্-মিকে দেখিয়াছ?

বর্মী—হাঁ মহাশয়, আমি তাহাকে আজ দেখিয়াছি এবং আপনি আমাকে বাহা বলিতে বলিয়াছিলেন তাহা তাহাকে বলিয়াছি।

সাহেব—তোমাকে সে কি বলিল?

বর্মী—আপনাকে ইহা জানাইতে বলিল যে ইংরেজকে সাহায্য করিতে সে সাধ্যাতীত চেষ্টা করিবে।

সাহেব—তুমি কি করিয়া জানিলে যে সে তোমার কথা রাখিবে। বর্মী—তিনি ইহা পক্ষে লিখিয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন।

সাহেব—বেশ, তাহা হইলে উহা আমি শীঘ্রই পাইতে চাই, কেননা আমি এখানে বেশী দিন থাকিতে চাহি না। আমি অস্বাচ্ছ কার্য শেষ করিয়া কেলিয়াছি।

বর্মী—বখনই ইহা দরকার মনে হরিবেন তখন আপনারা পরস্পর এক জায়গায় দেখা করিবেন।

সাহেব—হাঁ, ইহাই ঠিক—কোথায় দেখা হইবার উপযুক্ত স্থান?

বর্মী—আমি জানি না, তবে আমি কিন্-ওয়ান্-মিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিব।

সাহেব—আচ্ছা, বত শীঘ্র পার ঠিক করিয়া কেলিবে। তুমি এখন বাইতে পার এবং কল অবশ্য দেখা করিবে। ইহার পর মং বাতান প্রস্থান করিল। আমিও বাড়ী ফিরিলাম। মনের কথা প্রকাশ পাইল, সাহেব রাজ্যে খবর বিজ্ঞে সর্বনাশের প্রস্তাব করিতেছেন, তাহা বেশ বোঝা গেল মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, হায়! সিদ্দাকদৌলা, মিরজাদার ও রুইবের অভিনয় এত কাল পরে এদেশেও হইতে চলিল।

আমার মনে আজ হইতে আর একটি চিন্তা ঢকিল। ব্রহ্মদেশে এরূপ অভিনয় আরম্ভ হইল কেন? এই সকল চিন্তা করিতে করিতে কোন কোন দিন রাত্রিকালে নিদ্রা হইত না। স্বাধীন ব্রহ্মের পরিণাম চিন্তা করিয়া অস্থির হইলাম। আবার ভাবিতাম, এ বিষয়ে এত চিন্তা করি কেন? আমি এক জন নগণ্য 'কাল' বইত নয়। বাহাদের দেশ বাহাদের রাজ্য, তাহারা যেন বোধ হয় নিশ্চিন্ত ভাবে সুখে নিদ্রা বাইতে ছ। অবশ্য, ষড়যন্ত্রকারি-গণ সর্বদাই দেশের সর্বনাশে ব্যস্ত আছে। বাবু তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ না হইবে তাহা তাহারা নিরস্ত হইবে না, কিন্তু বাহাদের সর্বনাশ হইবে তাহারা কোথায়? তাহারা কি ভাবিতেছে?

কখন কখন মনে বিরক্তি উৎপন্ন হইত লাগিল। মনে মনে ভাবি, হুঁ হউক, পরের চিন্তা আমার নকন? এ আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা বইত নয়। এই সকল চিন্তা করিয়া আমার পোতা মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করি, কিন্তু মন তাহা মানে না। মনের অন্তস্তল হইতে আবার যেন প্রত্যাশার আগিরা উঠে। মন আবার বলে, কেন আমি ত ভারতবাসী এবং ইহারাও ব্রহ্মবাসী। ইহারা আমার প্রতিবেশী, আমার ধর্মে ইহারা দীক্ষিত, আমাদের শাস্ত্রে ইহারা পণ্ডিত, আমাদের ভাষা লইয়া ইহারা জ্ঞানী, আমাদের শিল্প লইয়া ইহারা শিল্পী এবং আমাদের রক্ত-মাংস ইহাদের সঙ্গে জড়িত। কারণ প্রাচীন কালে বহু ক্ষত্রিয় নরপতি যে আসিয়া এখানে রাজ্যাধিকার বিস্তার করিয়া, রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, প্রাচীন নরপতিগণের নাম ও ধর্ম-মন্দির প্রভৃতি হইতেই তাহার স্মৃতি স্মৃতি প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে আমি ইহাদের মঙ্গল কামনা করিব না কেন? এই জন্তই ত আসিয়াদেশবাসী জাহান্নমে গেল, একে অস্ত্রের জন্ত ভাবে না। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। যদি পরস্পরের জন্ত সহানুভূতি থাকিত, তাহা হইলে বুঝি আজ ভারত, ব্রহ্ম ও শ্রাম প্রভৃতি দেশের এ প্রকার দুর্দশ ঘটিত না। হায়! আমার মত যদি সকলেই এই প্রকার চিন্তা করিত তাহা হইলে দেশের এ-দুর্দশ হইত না। সকলের একতা ও সহানুভূতি থাকিলে

বুঝি এত জুগুতি হইত না। এই গুণের অভাবেই বুঝি আমরা শেয়াল কুকুরের জায় সম্মান লাভ করিয়া থাকি।

এই সকল কথা পাগলেব মত চিন্তা করিতে করিতে কখনও বিস্ময় শব্দীর নিকট, কখনও কখনও বা বর্ষা বঙ্গুগণের নিকট এই সকল রাজনৈতিক তত্ত্ব আলোচনা করি, কিন্তু বুঝা, কেহ সে সকল কথায় কর্ণপাত করে না।

এদিকে বর্ষার সিঁদুরকোলা খিব বেশ নিশ্চিন্ত মনে রমণীমণ্ডল-পরিবেষ্টিত হইয়া মহানন্দে কালযাপন করিতেছেন, রাজ্যের বাহিরে ও ভিতরে কি কি কাণ্ড হইতেছে তাহা তাঁহার হৃদয় দেখিবার ও শুনিবার অবকাশ নাই, অথবা তাঁহাকে জানাইবাব লোক নাই।

“বিবাদের মনন থাকিলে স্ত্রজলাভের অভাব থাকে না”—আশু বোধে-বর্ষা কোম্পানী বর্ষা রাজ্যের নিকট হইতে যে সর্ব্ব কাঠ কাটিবার পাঠা লইয়াছিলেন, তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই সর্ব্বের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বহু পরিমণ কাঠ কাটিয়া কেনেন এবং নিয় বর্ষায় ঢালান দেন। এই বে-আইনী কার্য করার রিপোর্ট রাজ-দরবারে পৌঁছে। এই অপরাধের জন্য অপরিণামদর্শী রাজা উক্ত কোম্পানীকে তেজ্রি লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড করেন এবং এই জরিমানার টাকা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি আদেশ করেন। আর বাবে কোথায়? ইংরেজ-পক্ষ হইতে মহা তজ্জন গর্জন আবহ হইল। নিকোঁধ রাজা বিশ্বাসঘাতক মস্তিগণ কর্তৃক ভ্রান্ত পথে নীত হইলেন। তাঁহার রাজ্য যে মহাশক্তিশালী, তাঁহার বাহ্য যে অজ্ঞেয় এবং কালারা (বিদেশী মাত্রই কালা) যে নগণ্য, এই কথায় তিনি মত্ত হইয়া রহিলেন। এদিকে কিন্তু ঝড়ের পূর্বে যেমন বায়ুমণ্ডল নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করে, তক্ষ-রাজ্যাকাশও সেই ভাব ধারণ করিয়াছে। বুদ্ধিমান লোক সাবধান হইয়া নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইতে চেষ্টা করে, কিন্তু সূর্যের চৈতন্য ঝড় আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত আর হয় না।

আমি এক দিকে খিবর বিপদ চিন্তা করিতে লাগিলাম, অপর দিকে ধর্ম্ম দেবীর প্রেমজালে জড়িত হইবার আশঙ্কা তইল। মা-ছ-মেব বাড়ী সেই দিন হইতে আর বাই নাই, তবে ধর্ম্ম দেবীর হাত কি করিয়া এড়াই, সেই ভাবনা হইল। কথায় বলে “বার যেমন ভাবনা, তার ভেতন সিদ্ধ হয়”। আমার পক্ষেও তাহাই ঘটিল।

ইতিমধ্যে এক দিন হঠাৎ ছকুম হইল যে, এক শত অশ্বরোহী সৈন্ত ও চারি শত পদাতিক সৈন্তকে মিন্‌হা দুর্গে বাইতে হইবে। বিষ্ণু শর্মাও মিন্‌হা বাইবে।

নির্দিষ্ট দিনে পদাতিক সৈন্তগণ কতকগুলি সামরিক নৌকাবোহণে মিন্‌হা যাত্রা করিল। আমরা অশ্বরোহী সৈন্তগণ স্থলপথে চলিলাম। মাণ্ডলে পরিত্যাগ করিবার সময় কেমন সঙ্কট ভাবের উদ্বেগ হইল। ধর্ম্ম দেবী ও তাহার মাতা আমাকে মাণ্ডলে থাকিবার জন্যই পুনঃপুনঃ জেদ করিতে লাগিল, কিন্তু আমি তাহা-দিগকে অনুন্নয় বিনয় করিয়া কহিলাম, আমি তথায় অল্পকালের জন্য বাইতেছি শীঘ্রই মাণ্ডলে ফিরিয়া আসিব। আমার মিন্‌হা বাইবার কথা শুনিয়া ধর্ম্ম দেবীর মুখমণ্ডল মলিন ও হাস্তশূন্য হইল। বাইবার কালীন সে নিশ্চিন্তে অশ্রু-বিসর্জন করিল, তাহা আমি মাত্র দেখিলাম; তাহার অশ্রুবর্ষণদৃষ্টে আমারও গুদ চক্ষু আঁচ হইয়া উঠিল, এবং অবশেষে টপ করিয়া এক বিন্দু জল পড়িয়া গেল।

লোকে দেখিবে ভরে ফিরিয়া ক্ষমাল দ্বারা চক্ষুটি মুছিয়া তাহার দিকে দুই-এক বার তাকাইয়া সবেগে বাহির হইলাম।

আমরা ১৮৮৫ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে মিন্‌হা দুর্গে উপস্থিত হইলাম। নিত্য নূতন সংবাদ সকল প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিল। ইংরেজের যুদ্ধজাহাজ সকল আসিতেছে। শীঘ্রই যে যুদ্ধ হইবে, তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। যুদ্ধ করিব, যুদ্ধ দেখিব, কেমন করিয়া গুলিগোলায় লোক সকল পাতিত হয়, তাহা এখন স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ উপস্থিত হইল।

নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে ঠিক সংবাদ শুনিতে পাইলাম যে, ইংরেজের এক নৌ-বাহিনী রেজুন হইতে আসিতেছে, এবং স্থলপথে আর এক বাহিনী টংগু হইতে মাণ্ডলে অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। এই সংবাদে আমাদের কেঁদার সাড়া পড়িয়া গেল।

দূর হইতে নৌ-বহরের চুজির ধ্বজ দৃষ্ট হইল। ক্রমে জাহাজগুলি অতি ধীরে ধীরে, অতি সতর্কতার সহিত আসিতেছে, তাহা শূঁঠ দেখা গেল। ইংরেজের নৌ-বহর কেঁদার তোপের পাল্লাব মধ্যে উপস্থিত হইলে মিন্‌হা দুর্গ হইতে ভীমরবে তোপধ্বনি হইল। তোপের গোলা গিয়া ইরাবতীর জলে পড়িয়া নদীর জলকে উজ্জলিত করিয়া তুলিল, আর তোপের শব্দ চতুর্পার্শ্ববর্তী পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইল। অমনি ইংরেজের গানবোটি হইতে ভীষণ বেগে অগ্নি উদ্গীরণ হইতে আরম্ভ হইল। দুই পক্ষের তোপধ্বনিতে মেদিনী যেন ক্ষণকালের জন্য কম্পিত হইয়া উঠিল। একটি আশুনের পিণ্ডসম গোলা আমাদের উপর পড়িয়া ভাঙিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। অনেকে আপন আপন বোড়াসহ ধরাশায়ী হইল। আমিও বোড়াসহ ধরাশায়ী হইলাম। আমার বোড়াটি পড়িয়া ধড়ফড় করিতে করিতে অচিরে পক্ষব্যাধ হইল। অচিরে লক্ষ্য করিলাম, আমার বাহু হইতে অল্পশ রক্তধারা নির্গত হইতেছে। তখন আমার হাঁস হইল, আমিও জখম হইয়াছি। মাথা হইতে রুমাল লইয়া বাহুখানা কশিয়া বাঁধিলাম। দূরে চাহিয়া দেখি বিষ্ণুরাম শর্মাও ভূমিতলে পড়িয়া ছটকট করিতেছে, সেও গোলাঘাতে পড়িয়া গিয়াছে।

আমি বিষ্ণুকে পিঠে করিয়া কিছু দূরে এক পাহাড়ের আড়ালে জঙ্গলের মধ্যে লইয়া গেলাম। আমাদের সেনাপতি দুই জন দ্রুত-গামী অশ্বরোহী মাণ্ডলে পাঠাইলেন। মিন্‌হা দুর্গে শত্রুহস্তে পতনের সংবাদ এবং বহু সৈন্ত হতাহত হইয়াছে, সে সংবাদ পাঠাইলেন এবং আরও লিখিলেন যে, বহু সৈন্ত ও ভাল তোপ না হইলে শত্রুর গতিরোধ করা অসম্ভব।

ইতিমধ্যে আমাদের সেনাপতির নামে রাজাজ্ঞা আসিয়া উপস্থিত হইল যে, “তোমরা যুদ্ধ কবিও না, ইংরেজ আমার সঙ্গে বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে, ইংরেজ-বাহিনীকে বাধা দিও না।” এ সংবাদ কিন্তু সেনাপতি বোমিয়ার-প্রেরিত দূত-মারকত নহে, কেননা, এই সময় মধ্যে দূতঘরের মাণ্ডলে পৌঁছান অসম্ভব। এই রাজ্যদেশ মিন্‌হা-যুদ্ধের পূর্বে হইতেই প্রেরিত হইয়াছে। সকলেই সন্দেহ হইল, এ রাজ্যের আদেশ নহে, নিশ্চয়ই রাজ্যের শত্রুপক্ষীয় কোন মন্ত্রী দ্বারা এই জ্ঞান আদেশ বাহির হইয়াছে। তখন মনে মনে ভাবিলাম যে, এখানেও দেখি, পলাশীর যুদ্ধের একটি অভিনয় হইয়া গেল।

আমি সেনাপতির আদেশ লইয়া তুলি করিয়া বিক্ষুব্ধ লইয়া মাগ্লাসে বাজা করিলাম। দশ মিনে মাগ্লাসে পৌঁছলাম। মাগ্লাসে পৌঁছিয়া দেখি, হায় "সে রামও নাই, সে অবোধাও নাই।" শহর সোয়া ও কালা সেপাইতে পূর্ণ। গুনিলাম রাজা বিবকে বন্দী করিয়া রেজুনে পাঠান হইয়াছে। আমি এখন বিক্ষুব্ধ লইয়া কোথায় দাঁড়াই? এই এক মহাভাবনা হইল। অহুস্ফান কবিত্তে করিত্তে একটি বুঝার মুখে গুনিলাম, বিখন্ডর ঠাকুর মাগ্লাসে গিয়াছে। একখানি ডিকী ভাড়া করিয়া মাগ্লাসে অভিমুখে বাজা করিলাম। তথায় পৌঁছিয়া বিখন্ডর শর্দার বন্দী নামে তাঁহাকে খোঁজ করিয়া, তাঁহার খেদনে থাকেন, তথায় উপস্থিত হইলাম।

আমি অনেক দিন পবে জ্ঞান করিয়া পেট ভরিয়া আহার করিয়া কতকটা ক্ষুধ হইলাম। বর্ষ দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম বিখন্ডর, হরিরাম প্রভৃতি পাহাড়র নীচে কি পরামর্শ করিতেছেন। ইহার কিছুকণ পরই বিখন্ডর শর্দা দুই পুত্রসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আমাকে দেখিয়া মহা খুশী হইলেন। আরও কহিলেন যে, "নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু-বিজয়ী হও, দীর্ঘজীবী হও।" তুমি যেভাবে বিক্ষুব্ধ রক্ষা করিয়া এখানে আনিয়াছ, তোমার সে জ্ঞানের প্রতিশোধ এ জীবনে দিতে পাবি না। তুমি ধন্ত ছেলে, বাঙালীর ঘরে যে এমন সাহসী ও কর্তব্যপরায়ণ ছেলে জন্মিতে পারে, তাহা পূর্বে জানিতাম না। কিন্তু তোমার কার্য দেখিয়া আমার পূর্বের সন্দেহ দূর হইল। আমার বিক্ষুব্ধ যে বাঁচিবে সে আশা নাই, তবে তোমার জন্ত অবশ্যে মারা পড়িল না, ইহাই স্মরণে বিষয়।"

তাহার নিকট গুনিলাম, এদিকে রাজাকে জানাইয়াছে যে ইংরেজ রাজত্ব আপনায় সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ইংরেজের রাজ্য এবং রাজার রাজ্যমধ্যে অনেকগুলি জটিল বিষয়ের মীমাংসা করাই ইংরেজের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। সরলবুদ্ধি নির্বোধ রাজাও সেই বিশ্বাসে মস্তিগণের কথার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই আপনাব বোকামির পুরস্কার পাইলেন। তখন তাঁহার চৈতন্য হইল, যখন ইংরেজ সেনাপতি তাঁহাকে মহারাষ্ট্রি ভিক্টোরিয়ার দস্তখতি প্রেরণার পরোয়ানা দেখাইয়া বলিলেন যে, "আপনি আমার হাতে বন্দী হইলেন।" মুহূর্ত্তমধ্যে ইংরেজ সৈন্তগণ রাজপ্রাসাদ ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সেনাপতি তাঁহাকে অর্ধ ঘণ্টামাত্র সময় দিলেন। এই অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে তিনি বাহা বাহা সঙ্গে লইতে পারেন, তাহা লইয়া প্রস্তুত হইলেন। যে রত্নপর্ভা ব্রহ্মদেশের অধীশ্বর তিনি, বাহার রাজ্যে অসংখ্য স্বর্ণধনি, বহুসংখ্য মূল্যবান রুবি ও জেড পাথরের খনি, তাঁহার ঘরে কি বহু মূল্যবান ধনরত্নের অভাব। কি ফেলিয়া কি লইবেন, ভাবিয়া অস্থির। পরোয়ানা দেখিয়াই চক্ষুস্থির। ইংরেজের সখাতা, সরলতা ও স্তায়বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াই তিনি নির্বাক। বুকের মুখে প্লেডেনের কথা গুনিয়া আশ্চর্য্যাক্রান্ত হইলাম। তিনি পলিটিক্যাল অফিসার হইয়া আসিয়াছেন তিনি ইহার পূর্বে আরও কয়েক বার মাগ্লাসে আসিয়াছেন। বুকের মুখে খাঁটি কথা গুনিয়া আমার পূর্বের যে ধারণা জন্মিয়াছিল এবং যে ধারণা মনে জাগিত, তাহা প্রমাণিত হইল।

এদিকে বিক্ষুব্ধ শর্দার অবস্থা ক্রমে যোরতর হইয়া উঠিল।

ক্ষণকাল মধ্যে তাহার ঝাসটুকু পড়িয়া গেল, বীর পুরুষের আত্মা নবরবেহ ছাড়িয়া অমরধামে চলিয়া গেল। আমাদের আর শোক করিবার সময় নাই। সকলেই সশস্ত্র ও শত্রুতার চিন্তিত। পরদিন আমি ও হরিরাম দুই জনে সেগুনী বাইতে আনিষ্ট হইলাম।

ইতিমধ্যে এক দল শত্রুসৈন্য সেগুনী দখল করিয়াছে, এক দল সোয়েবা অভিমুখে বাজা করিয়াছে, এবং মাগ্লাসে হইতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্তের দল নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। সেই জন্ত আমাদের সেনাপতিগণ আপন সৈন্তসকল লইয়া পাহাড়ের আড়ালে জঙ্গলাদির মধ্যে আড়াল স্থাপন করিয়াছেন। রসদ-পাট্টির দল গুরুর গাড়ী সহ অতি ধীরে ধীরে চলিতেছে। বিপক্ষ সৈন্তের কোন অভিধান বা রসদ-পাট্টি সৈন্তসকল বিপদসঙ্কুল স্থান দিয়া বাইবার সময় তিন দলে বিভক্ত হয়। অগ্ররক্ষক, মধ্যরক্ষক এবং পশ্চাৎ-রক্ষক দলসকল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চলিতে থাকে। আমাদের শর্দার বো-উর জ্ঞান মাত্রই নাই। আমি তাঁহাকে এ-বিষয়ে জানাইলাম এবং বলিলাম যে আমাদের সৈন্তদেরও সেইরূপ তিন দলে বিভক্ত হইয়া শত্রুর তিন রক্ষক দলকে আক্রমণ করা কর্তব্য। নচেৎ সমস্ত সৈন্ত শত্রুর এক দলকে আক্রমণ করিলে অপর দুই দল আমাদের উপর পড়িয়া আমাদেরিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে পারে। তিনি আমার কথা সঙ্গত মনে করিয়া তাহাই করিলেন।

এই সময়ে এক মহাকুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়া গেল। শত্রুদের মধ্যে আন্তরক উপস্থিত হইয়া এক মহা গোলাযোগ আরম্ভ হইল, শত্রুসৈন্তের অনেকে হতাহত হইয়া পরাশারী হইল। আমরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া মহোন্মাদে ক্যাম্প-অভিমুখে চলিলাম। আমি সেনাপতির নিকট প্রস্তাব করিলাম যে বিপক্ষ শত্রুর প্রতি দয়া প্রকাশ করা মহেশ্বের পরিচায়ক। যদি বাস্তবিকই ইহাদিগকে হত্যার ন্যকর্য করা হইয়া থাকে, তবে অজ্ঞ হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

বন্দীদের মধ্যে সাহেব দুই জন ইংরেজীতে আমার সম্বন্ধে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিরিকীটি বলিল, "এই ব্যক্তি অতি দয়ালু, এ না থাকিলে আমাদের সকলকেই হত্যা করিয়া ফেলিত। ইহার জন্তই আমরা প্রাণে বেঁচে আছি।" তখন যেতাজিটি বলিল, "এই ব্যক্তিকে বন্দীর মত বোধ হয় না, ইহাকে বিদেশীর মত দেখায় অসত্য বন্দীর অন্তঃকরণ এতাবশ্য প্রশস্ত ও দয়ালু হইতে পারে না। হৃৎকের বিষয়, এ হিন্দী বা ইংরেজী জানে না। আমরা কেমন করিয়া ইহার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব? আমি ইহাদের কথা গুনিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে আমাদেরিগের স্তম্ভচর আসিয়া সবাদ দিল যে, "রসদ-পাট্টির লুটের ও সেগুনী-আক্রমণের সবাদ মাগ্লাসে পৌঁছিলে তথায় মহা হলভুল পড়িয়া গিয়াছে। বহু সৈন্ত মাগ্লাসে হইতে আসিতেছে এক জঙ্গলে আমাদের আত্মা আছে অহুমান করিয়া এই দিকে যে সৈন্ত আসিবে, তাহা ভাটব বুঝিলাম।" বন্দীদিগকে বলিলাম যে যদি তোমরা প্রতিজ্ঞাপূর্ণ স্বাক্ষর কর যে, আমাদের কোন কথা প্রকাশ করিবে না এবং যে সকল বন্দী দেশের জন্ত যুদ্ধ করিতেছে তাহাদিগের প্রতি কখনও শত্রুতাচরণ করিবে না, তাহা হইলে তোমাদের জীবন রক্ষা হইবে, নচেৎ বন্দীরা তোমাদিগকে হত্যা করিবে।

আমার ইংরেজী বোল শুনিয়া সাহেবটির ভাব লাগিল, সকলেই আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। খেতাবটি আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া কহিল যে, “Are you not Baboo Chakrabuty?” তখন ফিরিজিটি লজ্জায় ত্রিমাণ হইয়া বলিল, “No doubt he is our old friend. What a set of fools we are, that we could not recognise him earlier?” আমি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলাম, “No man, you made a mistake, my name is Kala.” তখন খেতাবটি কহিল, “Do not humbug any more, you are caught now.”

খেতাবটির নাম লরিয়ার। সকলেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, আমি কি জন্ত এই ডাকুর দলে যোগ দিয়াছি। এই কথার উত্তরে কহিলাম যে, আমি পূর্বে রাজসরকারের অধারোহী সৈন্তদলে চাকর ছিলাম, এখন রাজকীয় সৈন্তের সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছি। সন্ধ্যার পর অন্ধকারের মধ্যে কয়েদীপণকে লইয়া চলিলাম। তাহাদিগকে নদীর তীরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিলাম। আমি লরিয়ারকে কহিলাম, “Where is Captain Renny now?” তাহাতে সে বলিল, “He is at present in Mandalay.” আমি বলিলাম, “Please tender my best salaam to him.” আমার এই কথার লরিয়ার ও অপর দুই জনেই লজ্জিত হইল। লরিয়ার বলিল, “Baboo forget and forgive. We are seriously guilty to you in many respects, I think it is God’s punishment that I have got injury in my thigh from your own hand. I did not know that you possess such a noble heart and high character. You are really a true hero. You could very easily take revenge and vindicate our misbehaviour to you. We are really ashamed for our past treatment to you. You are an honourable exception to your nation and I believe any nation ought to be proud of your courage and character.”

এই যুদ্ধের পর আমার সাহস, যুদ্ধকৌশল ও রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বো-হলাবু আমাকে প্রমোশন দিলেন। আমার নাম হইল বো-ফালা বা সর্দার ফালা। এক শত অধারোহী সৈন্তের কর্তা হইলাম আমি। বো-হলাবুর নাম হইতে বো-ফালার নাম আরও বেশী জাহির হইল এবং সকল সৈন্তই আমাকে অতি স্নেহের ও সম্মানের চক্ষে দেখিতে লাগিল। সর্দারগণও আমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য করিতেন না।

গুপ্তচরের মুখে ইংরেজ-সৈন্তের আগমনবার্তা শুনিয়া আমার বর্তমান আড্ডা পরিত্যাগ পূর্বক, আরও দশ মাইল দূরে, চতুর্দিকে পাহাড় ও জঙ্গল বেষ্টিত এক সমতলে আড্ডা করিলাম। তুঙ্গী মং আউয়ের গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে আমরা শত্রুকে আক্রমণ করিব, সংকল্প করিলাম। ইতিমধ্যে ফালাসৈন্ত বীর-দাপে মেদিনী কাঁপাইয়া আসিতেছে, তাহা দৃষ্ট হইল। শত্রুসৈন্ত ফিরিয়া

মাটিতে পড়িয়া আমাদের সৈন্তের উপর গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মধ্যবর্তী দল ফিরিয়া পশ্চাত্তী দলকে সাহায্য করিতে চেষ্টা পাওয়ার, তাহাদের উপর এবং অগ্রবর্তী দলের উপর একযোগে শত শত বন্দুকের গুলি পড়িতে আরম্ভ করিল। ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু যুদ্ধে আমরা জয়ী হইলাম। বিশ জন ফালা সৈন্তকে বন্দী করিলাম।

যুদ্ধের পর কয়েক দিবস শান্তিতে কাটিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের চর-মুখে জানিতে পারিলাম যে ত্রাণাদিনের দিক হইতে বহুসংখ্যক ফালা সৈন্ত আমাদের দিকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। রাত্রিকালে আমাদের গুপ্তমন্ত্র-সভা বসিল। মন্ত্রণায় ঠিক হইল যে, আমরাও তিন দলে বিভক্ত হইয়া ফালাদিগের তিন স্থানের কেদা রাত্রিকালে আক্রমণ করিব। ফালারা তিন দিক হইতে আমাদের দিকে আক্রমণ করিতে আসিবে, আমরা ত্রুত পথ দিয়া গিয়া তাহাদের কেন্দ্রাসকল আক্রমণ করিব। আমার সৈন্ত-দিগকে সিপাহীদিগের রাইফেল দিয়া কেন্দ্রাঙ্কব বন্দোবস্ত করিলাম। রাত্রি প্রভাত হইল।

আমি অন্ততঃ চাউ-মিউর অঞ্চলে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলাম। এ স্বাধীনতার পরিণাম আমি জানিলেও, আমার মনের সখ মিটাইবার জন্ত নিজেকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। আমি মনে মনে গর্বিত হইয়া উঠিলাম। গ্রামবাসিগণ কোন হুকুম তামিল করিতে বিলম্ব করিলে বা আপত্তি করিলে, তাহাদিগকে শাসন করিতে লাগিলাম। তবে অথবা কাহারও প্রতি অভ্যয় না হয়, সেজন্ত কড়া হুকুম জারি করা হইল। সৈন্তগণের রসদের উপযুক্ত মূল্য লোকসকলকে দিতে আদেশ করিলাম। লোকশাসন ও বিচারের সুমধ্যম করিয়া তুলিলাম।

তিন দিন পরে গুপ্তচর আসিয়া সন্বাদ দিল যে, চাউ-মিউ কেন্দ্রার ছুরবছার কথা মাগালে পৌছিয়াছে এবং তথা হইতে ৫০ জন গোরা এবং এক শত সিপাহী এক স্তীমারে আসিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে দুইটি তোপও আসিতেছে। আজ আমার তিন দিনের স্বাধীন রাজত্বের স্বপ্ন ভাঙিল। যেমন নিশ্চেষ্টে জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া অন্ধকারে রাজত্বলাভ হইয়াছিল, সেই মত অন্ধকারে নিশ্চেষ্টে চাউ-মিউর রাজপাট পরিত্যাগ করিয়া আবার বনবাসী হইলাম।

দুই রাত্রি পথ চলিয়া শোরেবা হইতে ১৬ মাইল দূরে বো-শোরের আড্ডায় উপস্থিত হইলাম এবং তথায় বো-হলাবু ও বো-শোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। চাউ-মিউর কেন্দ্রা অধিকারের কথায়, আমার কৌশল, সাহস ও বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন। তাঁহাদিগকে রাইফেলসকল দেখাইলাম। সমস্ত বন্দী সৈন্তগণ সমস্তম্বে জাহ্নু পাতিয়া আমাকে অভিবাদন করিল। এবং সকলে বলাবলি করিতে লাগিল যে আমার মত লোক সমস্ত বন্দী সৈন্তের ভিতর এক জনও নাই। আমন্ত্রণসো শুনিয়া লজ্জিত হইলাম।

ইহার পর জেল ভাঙিয়া কয়েদী খালাস করি। এদিকে শোরেবা হইতে সন্বাদ আসিল। গত রাত্রি জেল ভাঙিয়া কয়েদী খালাসের ও শোরেবা আক্রমণের সন্বাদে শহরে মহাতরু উপস্থিত

হইয়াছে। ইহাতে তাণ্ডাউ বস্তিতে বেঁ ডীষণ যুদ্ধ হইল তাহা অবর্ণনীয়। সে বীভৎস দৃশ্য। যুদ্ধের পূর্বে রণমণ্ডে মত্ত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, কিন্তু যুদ্ধান্তে হতাহত সকলকে দেখিয়া প্রাণে বিবাদের ছায়া আসিয়া পড়ে। কাহারও বা ধমনী হইতে অজস্র রক্তপাত হইতেছে, কাহারও বা শিবচক্ষু হইয়াছে, উর্দ্ধ্বাশ উঠিয়াছে, কাহারও প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে, কাহারও বা নিম্পন্দ শরীর, মাত্র হৃদপিণ্ড একটু থুঁক থুঁক করিতেছে। এ কি দৃশ্য। এ দৃশ্য যে দেখে নাই, আমাব বর্ণনা পাঠ করিয়া তাঁহার সম্যক ধারণা হওয়া কঠিন।

যুদ্ধান্তে রাজিকালে আমাদের আবার মজ্জনা আরম্ভ হইল। কেহ কেহ এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া মহা উল্লসিত হইলেন। কিন্তু আমার প্রাণে উল্লাস স্থান পাইল না। আমি মনে মনে বুঝিলাম, এই আমাদের চরম জয় এবং উল্লসিত পরাকাষ্ঠা। আমি কহিলাম, আর যে আমরা জিতিব এমন আশা করি না।

এবারকার বিপক্ষের সৈন্যের তুর্গতির কথা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া এক দিকে যেমন আমাদের নাম ও ষণঃ চতুর্গুণ প্রকাশিত হইল, অপর দিকে বিপক্ষেব ক্রোধ ও কোপ তাদৃশ বৃদ্ধি পাইল। এইবারকার শেষযুদ্ধে জীবনপণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াও ক্রমে ক্রমে ধরা পড়িলাম। স্তব্ধতা সন্ধ্যার পর আমরা সকলে পরামর্শ করিতে লাগিলাম এখন কি করা এবং কোথায় যাওয়া। অনেকেই মত, আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করা নহে। অনেকেই বলিল যে, আপনি

যথায় বাইবেন, আমরা তথায় বাইব, এবং আপনার যে দশা হইবে, আমাদেরও তাহাই হইবে। আমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, বো-হল্লাবু ও বো-উ মারা গিয়াছেন এবং বো-শোরে গুপ্ত হইয়াছেন। আমি এক জন বিদেশী লোক মাত্র। কোন গ্রাম-বাসীর উপর আমার কোন প্রতিপত্তি নাই। তবে এদেশী লোকের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতেছি বলিয়া অনেকে আমার নাম মাত্র জ্ঞাত হইয়াছেন। এই গ্রামের লোকের যে ভাব, তাহাতে বোধ হইতেছে যে এদিকে যত বাইব, কোন গ্রামের লোকই আমাদের আশ্রয় দিবে না এবং আর যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিব এমন আশাও নাই। আমার নিজের প্রস্তুত-করা সৈন্যসকল যখন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল তখন অস্ত্র জেলায় অপরিমিতভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আর ইচ্ছা হয় না। তবে আমার শেষ কথা এই যে, বাহার উদ্দেশ্যে তোমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমাদের পক্ষে তাহা পরিত্যাগ করা সম্ভব মনে করি না। আমার কথা স্বতন্ত্র কারণ আমি বিদেশী লোক। আশা করি, স্ত্রায়ণথে থাকিয়া স্ত্রায়মত যুদ্ধ করিবা। দম্যবৃত্তি করিয়া কলঙ্কিত হইবা না এবং বাহার স্বদেশের জন্ত যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাদের নামে কলঙ্ক আরোপ করিও না।”

[রামলাল সরকারের আশ্রয়, বর্তমানে শান্তালয়বাসী জীবুল মতিলাল সরকার মহাশয়ের গৃহে প্রাপ্ত মূল পাণ্ডুলিপি হইতে এই বিবরণ লেখক কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে।]

অভিষেক

ক্রীশ্নুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজারাগী বসিলেন রত্নসিংহাসনে
পরিবৃত পাণ্ডুমিত্রপারিষদ-মণ্ডলে—
মজ্জপাঠ করে পুরোহিত ; সমুচ্চ ভাবণে
সুকারে সচিব স্তম্ভি ; পথে পথে চলে
জনস্রোত অধীর-চঞ্চল ; শঙ্কিত আকাশ
কামানের গম্ভীর গর্জনে ; বাজে ভেরী,
ঘোরে সৈন্যদল ; ঐশ্বর্যের উল্লস প্রকাশ
দীনহীনে করে ব্যঙ্গ, ক্ষুণ্ণচিত্তে হেরি।

হোথা হের রাজ্যভাগী মহান প্রেমিক
দরিত্রের হৃদি-সিংহাসনে ; চিত্ত হরে
প্রেম তার—অতুল সুবনে ; দিগ্বিদিক
গাহে গান, বাজে শব্দ সাগরে সাগরে—
‘প্রেমিকেরে রক্ষা করো ভগবান’ বলি—
‘প্রেমেরে করিও রক্ষা হে ঠাকুর’ বলি।

বাঙালীর ব্যবসায়

জৈনৈক সাধারণ ক্রেতা

আমি ব্যবসায়ী নহি। এক জন সাধারণ বাঙালী ক্রেতা মাত্র। এই দিক্ দিয়াই ব্যবসায় বাঙালীর কয়টি ক্রটি-বিচ্ছাতির কথা বলিতে চাই।

সোজস্ত ব্যবসায়ের একটা বড় অঙ্ক। বাঙালী ব্যবসায়ীর এই দিকটার ক্রটিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। কয়টা উদাহরণ দিই। কিছু দিন পূর্বে এক জন বাঙালীর দোকানে একটা খেলনা কিনিতে গিয়াছিলাম। উপরেব সাইনবোর্ড দেখিয়া বুঝিলাম, দোকানের মালিক এক জন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাঙালী। দোকানের ভিতরে উপবিষ্ট এক জন বাঙালী ভদ্রলোক বাহিরে দণ্ডায়মান আর এক জন ভদ্রলোকের সহিত গল্প করিতেছিলেন। দোকানের একটা মাত্র কর্মচারী অনেকগুলি ক্রয়ার্থীর চাহিদা-জব্ব জোগাইতে ব্যস্ত। দুই-একবার চাহিয়া জিনিষ না পাইয়া দোকানের ভিতরের ভদ্রলোকটিকে বলিলাম। তিনি কর্মচারীটিকে জিনিষ দিতে বলিলেন। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভদ্রলোকটিকে দ্বিতীয় বার অহরোধ করিলাম। এবার তিনি আর কোন উত্তর দিলেন না। অহুমানে বুঝিলাম এই ভদ্রলোকটিই দোকানের শিক্ষিত মালিক। নিজ হস্তে ক্রয়ার্থীকে জিনিষ জোগান সম্মানহানিকর মনে করেন।

কলিকাতায় একটা বড় বাঙালীর দোকান হইতে কাঠের জিনিষপত্র খরিদ করিতাম। একবার একটা চেয়ার কিনিয়া দেখি, তাহার হাতল ভাল বসিতেছে না। কোম্পানীকে খবর দিই। কোম্পানী বলে যে চেয়ার তাহাদের কারখানায় পাঠাইতে হইবে। ইহাতে আমার ব্যয়াদিক্রয়ের উল্লেখ করিয়া এক জন মিস্ত্রী পাঠাইতে অহরোধ করি। কোম্পানী পুনরায় একই উত্তর দেয়। শেষে নিজ ব্যয়ে এক জন মিস্ত্রী ডাকাইয়া চেয়ার ঠিক করিয়া লই। ইহার পরেও ঐ দোকান হইতে জিনিষ কিনিতাম। শেষবার কয়েকটি জিনিষে অনেক গল্প বাহির হয়।

কোম্পানীকে অহুযোগ করিয়া পত্র লিখি। গৌজামিল উত্তর পাই। পরে পুনরায় দেখা করিয়া আমার অহুযোগের বিষয় বলি। উত্তরে সৌজস্তের অভাব পবিস্মৃৎ হয়। ইহার পর হইতে সে দোকান ছাড়িয়াছি। এক জন বোম্বাইওয়ালার দোকান হইতে জিনিষপত্র খরিদ করিতেছি।

একটা ফ্যান সারাইতে দেওয়া হয়, এক জন বাঙালীর দোকানে। চাব-পাঁচ টাকা লইল। চার-পাঁচ দিনের মধ্যে ফ্যান বিগড়াইল। লোকটিকে খবর দেওয়া হয়। সে আসিয়া ঠুঁকঠাক্ কবিয়া মেবামত করিয়া দিয়া যায়। দু-তিন দিন পরে আবার ফ্যান বিগড়ায়। এবার খবর দিলে আর লোকটি আসিতে চায় না। বলে ফ্যান দোকানে পাঠাইয়া দিতে হইবে। অল্প বাঙালী মিস্ত্রী ডাকা হয়। একই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি হয়।

শেষে এক সাহেব কোম্পানীকে দিয়া ফ্যান সারাইয়া লই। খরচা চতুর্গুণ লইল। কাজ হইল সম্পূর্ণ নির্দোষ। মাস দুই পরে পুনরায় ফ্যানের কিছু ক্রটি বোধ হয়। সাহেব কোম্পানীকে পত্র লিখি। তাহার পত্রপাঠ মিস্ত্রী পাঠাইয়া দেয়। মিস্ত্রী তিন-চার ঘণ্টা খাটিয়া ফ্যান পুনরায় সম্পূর্ণ সম্ভাবজনক ভাবে সারাইয়া দিয়া গেল। এক পরসাদ দিতে হইল না। উপরন্তু মিস্ত্রীর কাজে সন্তুষ্ট হইয়াছি কি না মিস্ত্রী তাহা লিখাইয়া লইয়া গেল।

দ্বিতীয় দফায় জিনিষের ক্রটির কথা ধরা যাক্।

যার অল্প যে জিনিষ ক্রয় সে উদ্দেশ্য বিফল হইলে স্বদেশী জিনিষ কিনিতে অহরোধ করা বুধা। কয়টা দেশী (টর্চের) ব্যাটারী কিনিয়াছিলাম। কিছু দিনের মধ্যে দেখি, ব্যাটারী টর্চের ভিতর জমিয়া নষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাব পর আর দেশী ব্যাটারী কিনিয়া পরীক্ষা করি নাই।

দেশী জুতার কালি কিনিয়াও ঐরূপ অভিজ্ঞতা হইয়াছে।
কয়েকটি বহুবিজ্ঞাপিত দেশী মোত্রে গায়ে খড়ি পড়িতে
দেখিয়াছি। একটিতে স্বগন্ধের বিনিময়ে দুর্গন্ধ পাইয়াছি।

একটি বিখ্যাত দেশী কোম্পানীর দস্তমঞ্জনে মাড়িতে
কোম্বা পড়িয়াছে।

কয়েকটি দেশী ‘ক্রিম’ গ্রীষ্মকালে গলিয়া নষ্ট হইতে
দেখিয়াছি। হঠাৎ একটা বিদেশী ক্রিম একদিন ব্যবহার
করিয়া দেশী ও বিদেশী বস্তুর পার্থক্য দেখিয়া আশ্চর্য্যাবিত
হইলাম।

এক টিন উচ্চ মূল্যের দেশী চা কিনিয়া, তাহাতে সাধারণ
মূল্যের চা হইতে কিছুমাত্র পার্থক্য বুঝিতে পারিলাম
না।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করি।

ব্যবসায়ে সকল হইতে হইলে নিত্য নূতনত্বের আবশ্যক
হয়। এই নূতনত্ব প্যাকিং ও বোতলের নূতনত্ব নহে।
ক্রমের বিষয় বাঙালী ব্যবসায়ীর ধারণা এই স্তর অতিক্রম
করে নাই।

বিদেশী ফাউন্টেন পেনের নিত্য নূতনত্বের কেমন
প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলে আমার বস্তব্য
পরিশ্রুট হইবে।

পূর্বে যেরূপ টিনে চা ভর্তি করিয়া বিক্রয় করা হইত,
“ভ্যাকুয়াম” প্যাক করিয়া তাহা বিক্রয় করা হইল, ব্যবসায়ে
লাভজনক নূতনত্ব।

পূর্বে যে হারিকেন লগুন বিক্রয় হইত, নূতনতর লগুনে
তাহার কয়েকটি বিষয়ে নূতনত্ব পরিশ্রুট হইতেছে।

মোটর গাড়ীর তীব্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নিত্য নূতনত্ব
লাগিয়াই আছে।

মোটর উপর, যে-বিষয়ে যে-অভিবিধা বা ক্রটি লক্ষিত
হয়, সেই অভ্যাসে পরিবর্তনসাধনরূপ নূতনত্ব সাধনই
হইতেছে ব্যবসায়ে লাভবান হইবার নূতনত্ব।

বাঙালী ব্যবসায়ক্ষেত্রে সব মাত্র নামিয়াছে। স্বতরাং
ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে তাহার এখনও অনেক দেরি আছে
বলিয়া মনে হয়।

আর একটি কথা বলিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার
করিব।

ব্যবসায়ীর জিনিষের উপযুক্ত বিজ্ঞাপন দিতে হয়।
বাঙালী ইহা ভাল রূপ জানে বলিয়া মনে হয় না।

প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই কিছু কিছু পুস্তক নিয়মিত
কিনিতে পারেন। কিন্তু তাহার হৃদি অল্পস্বামী পুস্তকের
প্রকাশ তাহার নজরে আনা আবশ্যক। বোম্বাইয়ের এক
বিখ্যাত ব্যবসায়ী বিবিধ পুস্তকের বর্ণনা সম্বলিত বিজ্ঞাপন
আমাকে নিয়মিত পাঠাইয়া দেন। তাহার ফলে আমি
আমার প্রয়োজনীয় ও রুচি অল্পস্বামী পুস্তক তাহাদের নিকট
হইতে আনাইয়া লই।

ঐরূপ কারণে আমি পঞ্জাবের এক ব্যবসায়ীর নিকট
হইতে ঔষধ আনিয়া ব্যবহার করি।

ঠিক ঐরূপ কারণে বোম্বাইয়ে এক দোকান হইতে
অল্প বিবিধ দ্রব্য মাঝে মাঝে আনাইয়া লই।

ঐ সকল বস্তু নিশ্চয় কলিকাতা বাঙালীর দোকানেও
পাওয়া যাইবে। কিন্তু বাঙালী ব্যবসায়ী এখনও ক্রয়ার্থীর
নিকট তাহার দ্রব্যাদির বিজ্ঞাপ্তি উপযুক্ত ভাবে প্রচার
করিতে শিখে নাই।

এই সব বিষয়েও হৃদয় বোধহি ও পঞ্জাব প্রভৃতির
ব্যবসায়ীদের নিকট বাঙালীর অনেক শিখিবার আছে।

[সম্পাদকের মন্তব্য। লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন, তাহা
অবশ্য সকল বাঙালী ব্যবসায়ীদের প্রতি প্রযোজ্য নহে।
কিন্তু কাহারও প্রতি প্রযোজ্য না হওয়াই বাঙালীর।]

অসময়

ত্ৰিমৈত্ৰেয়ী দেবী

এখনও আমার হয় নি সময়,
হয় নি রজনী ভোর ;
তবু নন্দনগন্ধ মাখিয়া
এসেছ বৎস মোর ।
অমল ধবল নবনী কোমল
তরুণ অঙ্গভার,
যে অমৃত লয়ে এসেছ আলয়ে,
প্রকাশিছে কিছু তার ।
জ্যোৎস্না বরিছে, গগন ভরিছে,
নব আনন্দভারে,
ঐ মৃণ্ময় ফুল চেয়ে রয়,
দেখে যেন আপনারে ।
হৃদয় ভরিয়া এসেছ নবীন,
জুবন ভরেছ গানে,
রুদ্ধ বা ছিল, হ'ল কি মুক্ত,
আকাশ এল কি প্রাণে ॥
তবু মনে হয়, এ নহে সময়,
এখনও রয়েছে বাকী
মুচাতে আমার মনের আধার
পুরাতে দৈত্য়-কাঁকি ।
ঐ স্নকোমল স্পর্শের তবে
কঠিন এ-কোল মোর,
এখনও ভাগ্য করে নি যোগ্য
লভিতে অঙ্গ ভোর ।
এখনও হৃদয় স্তম্ভন নয়,
অনেক দৈত্য়-রানি
লোভ মোহ পাপ ছোট ছোট সাপ
করিভেছে হানাহানি ।
অপূর্ণ মন ক্ষুদ্র জীবন
ঘিরেছে তুচ্ছভায়,
হেরি মনোলোভা স্বর্গের শোভা
প্রাণ করে হায় হায় ।
মোর 'পরে ভার প'ড়ে তুলিবার
এ রূপ বিশ্বমাঝে ;

শুধু নহে আশা, দিতে হবে ভাষা
যাহা কিছু রহিয়াছে ।
যেন মোর মায়া নাহি আনে ছায়া :-
যেন মলিনতা মম
আড়াল না-করে, রূপে রসে ভরে
বিকচ পুষ্প সম ।
এই পাণ্ডুরা তোরে অন্তর ভ'রে
এইখানে শেষ নয়,
দিনে দিনে তব কাজে নব নব
হবে মম পরিচয় ।
দেবদুল'ভ এই সৌরভ
আমাব স্পর্শ পেয়ে.
বিমুক্ত পথ না ভবে জগৎ
স্বগন্ধে দিক ছেয়ে ।
ব্যর্থ এ চাওয়া বুক ভ'রে পাণ্ডুরা,
তবে সবই মিছে হয়
তাই চেয়ে মুখে প্রাণ কাঁপে বৃকে
অন্তরে লাগে ভয় ।
শুধু ভালবাসা নাহি আনে আশা,-
সে এক অন্ধপথ,
তারই সাথে সাথে হবে যে মুচাতে
তুচ্ছ বা মনোরথ ।
ঐ অল্পম হাসি দেখে মম
বৃকে বৃকে লাগে বল,
শুধু মনে হয় যদি হেরি হয়,
চোখে ভ'রে আসে জল ।
বন্দী রয়েছি নিজ শৃঙ্খলে,
হয় নি রজনী ভোর,
তবু নন্দনগন্ধ বহিয়া
এসেছ বৎস মোর ।
চেয়ে মোর মুখে মনে হয় স্নেহ
যেন এ আশীর্বাদ,
ভাঙিয়া ভক্তি লভিব মুক্তি,
এনেছে সে সংবাদ ॥

বর্ষায়

জীবিত্ত্বমূল মুখোপাধ্যায়

সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই বৃষ্টি নামিয়াছে, আড্ডা জমিল না। তিন জনে ছাড়া-ছাড়া ভাবে সময় কাটাইতেছিল—তারাপদ তাস ঘাটিতেছে, রাখানাথ সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখিতেছে, শৈলেন হাত দুইটাকে বালিস কবিতা চিৎ হইয়া শুইয়া শুন্-শুন্ করিতেছে।

তারাপদ বলিল, “তোমার মাথার কাছে জ্বালনা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে শৈলেন।”

শৈলেন বলিল, “আম্বক, বেশ লাগছে; স্বপ্নে-আরাম যখন সম্পূর্ণ ভাবে নিজের আয়তায়, তখন ইচ্ছে করেই একটু একটু অস্থবিরে ভোগ কবায় বেশ একটা তৃপ্তি আছে,—রাজারাজ্যের সখ করে হেঁটে চলার মত।”

রাখানাথ একটি সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী করিল—“কবি।”

তারাপদ বলিল, “তাইলে আর একটু অস্থবির তৃপ্তি ভোগ করতে করতে তুমি না-হয় শুভেনকে ডেকে নিয়ে এস, চার জন হ’লে দিবা আরাম করে তাসটা খেলা যায়।”

রাখানাথ বলিল, “আমি গিয়েছিলাম তার কাছে; সে আসবে না।”

“কেন?”

“তার দাদার শালী বেড়াতে আসবে।”

“আম্বক না?”

“বলে, এ অবস্থায় আমার বাড়ী ছেড়ে যাওয়াটা নেহাৎ অভদ্রতা হবে না?”

তারাপদ জু কুণ্ডিত করিয়া বলিল, “ও...অভদ্রতা।”

আবার চুপচাপ; শৈলেন শুনশুনানিটুকুও থামাইয়া দিয়াছে। একটু পরে তারাপদই আবার মৌন ভঙ্গ করিল; প্রশ্ন করিল, “তোমরা ভালবাসা জিনিষটার বিশ্বাস কর?”

রাখানাথ বলিল, “যখন ভূতে কবি তখন ভালবাসা আর কি দোষ করেছে,—দুটোই যখন ঘাড়ে চাপবার জিনিষ। তবে সব সময় কবি না বিশ্বাস। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, পোডো বাড়ী কিংবা একটানা মাঠের মাঝখানে একটা পুরনো গাছ—একলা প’ড়ে গেছি—এ-অবস্থায় ভূত বিশ্বাস কবি; আর ভালবাসার কথা,—কবির ভাষায় এ-রকম ‘অখোর-রবা শাওন রাত্তি’—তোমার চা-টি দিবা হয়েছিল, আর ওদিকে বাড়িতে খিচুড়ী আর মাংসের খবর

পেয়ে এসেছি, ভবিষ্যতেব একটা আশাস রয়েছে, এ-রকম অবস্থায় মনে হচ্ছে যেন প্রেম বলে একটা জিনিষ থাকা বিচিৎ নয়...এমন কি দাদার নেই—শালীব জন্তে একটা বিরহের ভাবও মনে জেগে উঠেছে যেন।”

তারাপদ প্রশ্ন করিল, “কবি কি বল?”

শৈলেন বলিল, “আমি যে রয়েছি, আরও প্রমাণ দিয়ে স্পষ্ট করে বলতে গেলে—এখন, এ-ঘরে হাতে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি—এটা বিশ্বাস কর?”

“করি বইকি—না করে উপায় কি? বিশেষ করে বৃষ্টির ছাটের সঙ্গে সঙ্গে তোমার শৈলেনবাবের প্রমাণ যখন...”

“তাইলে ভালবাসাকেও বিশ্বাস করতে হবে তোমাদের, কেন-না, আমি আব ভালবাসা সম-স্থিত, ইংরেজীতে তোমরা যাকে বলবে co-existent।”

তারাপদ তাস ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, “বটে! তা তোমার জীবনে যে একটা রহস্য আছে সে-সন্দেহ বরাবরই হয় বটে, তবে অ্যাষ্টি-শুকদেবের মত—আমি অ্যাষ্টি-জাইন্টের নজীরে কথাটা ব্যবহাব করলাম—অ্যাষ্টি-শুকদেবেব মত তুমি যে রমণী-প্রেম নিয়েই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছ এতটা জানা ছিল না। ব্যাপারটা ভেঙে বল একটু।”

“বয়স যখন সাত-আটের মাঝামাঝি সেই সময় আমার ভালবাসার সূত্রপাত। ঠিক কোন লগটিতে আবস্ত হয়েছিল বলতে পারি না। অন্তিমেরা কান্য-কাহিনীতে যা বলেন তা থেকে মনে হয় ভালবাসা জীবনের একটা নির্দিষ্ট রেখা থেকে আবস্ত হয়, যেমন মাঠের ওপর একটা চূণের রেখা কিংবা কোদালের দাগ থেকে আবস্ত হয় বাজির দৌড়। ঐ যে শোন প্রথম দর্শন থেকেই প্রেম কিংবা হাতের লেখা দেখেই ভালবেসে ফেলা, ও-সব কথা নিতান্তই বাজে। প্রেমকে একটি ফুল বলা চলে—এব আরম্ভটা পাজির এলাকাতুল্য নয়। কবে যে কেলগত মধুকণাটুকু জমে উঠেছে, আর তাকে ঘিরে কচি দলগুলি কুণ্ডিত হয়ে উঠবে তার হিসেব হয় না; আমরা যখন টের পাই তখন যাত্রা-পথে অনেক দূর এগিয়েছে—সেটা বিকশিত দলের ব্যাকুল গন্ধের স্বগ...”

“এক দিন ঠাকুরমার কাছে গঠ শুনতে শুনতে আমি

ব্যাপারটুকুর সন্ধান পেলাম। সেদিনও বড় দুর্ভোগ ছিল, ঝড়ঝাপটার ভাগ্যটা আজকের চেয়েও বং বেশী। রাত্রিপূর অরুণকুমার কত দীর্ঘ পথ পিছনে রেখে, কত দীর্ঘতর পথ সামনে করে চলেছেন। আহা! নেই, নিজা নেই; ভয় নেই, শঙ্কা নেই; সঙ্গী, বৃকের মধ্যে একটি রূপের স্বপ্ন। যাত্রাপথের শেষে সাগরের অতল তলে মাণিকের ভোরণ পেরিয়ে তাঁর পক্ষীরাজ ঘোড়া পৌছল রাজকুমারী কঙ্কাবতীর প্রবাল-পুরীর ধারে।

“এতটা হ’ল সাধারণ কথা, যাত্রাপথের দৈনন্দিন ইতিহাস।

“সেই বিশেষ রাত্রে অরুণকুমার আমি যখন সেনার কাঠি ছুঁয়ে

তারাপদ প্রদত্ত করিল, “তুমি আবার কেমন করে বয়স আর অবস্থা ভিত্তিতে অরুণকুমার হয়ে পড়লে?”

“সাত-আট বছর বয়সের একটি মস্তবড় ছবিখা এই যে, সে-সময় বয়স আর অবস্থা সম্বন্ধে কোন স্বেচ্ছা থাকে না, স্মৃতিরাজ্য থাকে মনে ধরে নির্বিকারিত তার মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে পড়া চলে। এখন তুমি যে অমুক আর তোমার বয়স যে সাঁয়জিশ, এই চেতনা তোমার চারি পাশে গভী সৃষ্টি করে তোমাকে একান্ত পক্ষে “তুমি” করে রেখেছে,—একটু গভী কাটিয়ে রাজপুত্র কোটালপুত্র হয়ে নেওড়া তো দূরের কথা, মুহূর্ত কয়েকের জন্ত যে নিজেকে ছেলেবেলা থেকেই ঘুরে আসবে সেটাও দুষ্কর হয়ে ওঠে। জীবনের সাত-আট বছর বয়সটা হ’ল রূপকথারই যুগ এই তরলভাব জন্ত, যেমন সাঁইজিশ-আটজিশ বছর সময়টা তার নির্বিকারিতের জন্ত সাহেব, বড়বাবু প্রভৃতির মধ্যে মৃৎ বুজ চাকরি করবার যুগ।...যাক, গল্পটাই শোন; বর্ষা কেটে গেলে বায়ুমণ্ডলের এই ভিজ্জে-ভিজ্জে আমেজের ভাবটি যখন কেটে যাবে তখন আমি গল্পটা যে চালাতে পারব—এতে সন্দেহ আছে, কেন-না, তখন নিজেকে যা কলছি তা নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারব কি না সন্দেহ আছে।

“সে-রাত্রে অতিমাত্রা বিন্মিত হয়ে দেখলাম সেনার কাঠি ছোঁয়াতে রূপের পালকে যে জেগে উঠল সে রাজকুমারী কঙ্কাবতী নয়—সে হচ্ছে আমার সেজবোঁদিনির সই নয়নতারা।

“কঙ্কাবতী নয়—হাসিতে যার মুক্তা বার, অশ্রুতে যার হীরে গলে পড়ে। সে তাঁদের বরণ কস্তুর মেঘের বরণ চুল। জেগে উঠতেই যার চোখের দীপ্তিতে সাত মূলে আলো ঠিকরে পড়ে, সাত সখীতে যাকে চামর দোলায়, যার জন্তে সপ্তবীণায় ওঠে সপ্তহরের মুর্ছনা।

“তার জায়গায় আমার হৃৎকের দিকে চোখ মেলে চাইলে নয়নতারা, - যাকে বিনা উগ্র সাধনায়ই আমি প্রত্যাহার

কাজে-অকাজে রোজই দেখছি। আমাদের বাড়ীর কাছেই বোসপাড়ায় রেলের ধারে তাদের বাড়ী। সামনে পানাকু ঢাকা ছোট্ট একটা পুকুর, তাতে একটা বকুলগাছের ছায়ায় বাণাভাঙা সিঁড়ি নেমে গেছে। ঘাটের সামনেই খানিকটা দুর্বাধাসে ঢাকা জমি,...সেখানে শীতের শেষে বকুলে আর সজনেফুলে কায়ার-গন্ধে মাখামাখি হয়ে প’ড়ে থাকত। তার পরেই একটা রকের পিছনে নয়নতারাদের বাড়ী—খানিকটা কোঠা, খানিকটা গোলপাতার। মোট কথা, সাগরতলের প্রবাল-মহলের সঙ্গে তার কোনই মিল ছিল না।

“না ছিল স্বপ্ন কঙ্কাবতীর সঙ্গে নয়নতারার কোন মিল। প্রথমতঃ, নয়নতারা ছিল কালো—যা কোন রাতকস্তারই কখনও হবার কথা নয়। তবুও যে সে সে-রাত্রে আমার গল্পরাজ্যে অমন বিপর্যয় ঘটালে কি করে, তা ভাবতে গেলে আমার মনে প’ড়ে যায় তার দুটি চোখ। অমন চোখ আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি। তোমরা বোধ হয় স্বীকার করবে করসা মেয়ের চেয়ে কালো মেয়ের চোখই বেশী বাহারে হয়—সবুজ আবেষ্টনীর মধ্যে কালো জলের মত। পরে আমি ভাল চোখের লোভে অনেক কালো মেয়ের দিকে চেয়েছি, কিন্তু অমন দুটি চোখ আর দেখি নি। তার বিশেষত্ব ছিল তার অদ্ভুত দীপ্তি; উগ্র দীপ্তি নয়, তার সঙ্গে সর্বদাই একটা হাসি-হাসি ভাব মিশে থেকে সেটাকে প্রসন্ন করে রাখত। নয়নতারা বেজায় হাসত—বেহাগার মত। যখন হাসত তখন তার কালো শরীর থেকে যেন আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকত; যখন হাসত না, আমার মনে হ’ত তখনও যেন খানিকটা আলো আর খানিকটা হাসির অবশেষ ওর চোখে লেগে রয়েছে। আমি সে-দুটি চোখ বর্ণনা করতে পারলাম না, তা ভিন্ন শুধু চোখ নিয়ে প’ড়ে থাকলে আমার গল্প শেষ করাও হয়ে উঠবে না। আমি একবার শুধু সে-চোখের তুলনা পেয়েছিলাম,—কতকটা; মাহবুবের মধ্যে নয়, পৃথিবীর কোন জিনিষেও নয়। যদি কখন শীতের প্রভাতে উঠে চক্রবালরেখার উপরে শুকতারার দেখ তো নয়নতারার চোখের কথা মনে ক’রো; অর্থাৎ সে অপার্থিব চোখের তুলনা পৃথিবী থেকে অনেক দূরে—স্বর্গের কাছাকাছি।

“রেলের দিকে দেয়াল-দিয়ে-আড়াল-করা পানাপুকুরের ধারের জায়গাটিতে নয়নতারার সময়বয়সী মেয়েদের আড্ডা জমত। পুরুষের মধ্যে প্রবেশাধিকার ছিল শুধু আমার, কারণ কয়েকটি কারণে আমি ঠিক সেই ধরণের ছেলে ছিলাম নবপরীতাদের যারা খুব কাজে লাগে। প্রথমতঃ, বয়সটা খুব অল্প; দ্বিতীয়তঃ আমি ছিলাম খুব অল্পভাবী যার জন্তে বাইরে বাইরে আমার খুব হাঁদা বলে বোধ

হ'ত, আর তৃতীয়তঃ আমার পুরুষ-অভিভাবক না থাকায় বাড়ীতে আমাব অবসর ছিল স্বেচ্ছাচর এবং ইচ্ছামত পাঠশালার বরাদ্দ থেকেও সময় কেটে অবসর বৃদ্ধি করবার মধ্যেও কোন বাধা ছিল না। ফলে ওরা যে আমার শুধু দয়া ক'রে কাজে লাগাত এমন নয়, আমি না হ'লে ওদের কাজ অচল হয়ে যেত। সবচেয়ে বেশী এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল চিঠি নিয়ে; এক কথায় আমি এই সংসদটির ডাক-বিভাগের পূর্ণ চার্জে ছিলাম বলা চলে। খাম-টিকিট নিয়ে আসা, চিঠি ফেলে আসা, এমন কি প্রয়োজন-বিশেষে পোষ্ট আপিসে গিয়ে পিয়নের কাছ থেকে আগেভাগে চিঠি চেয়ে নিয়ে আসাও আমার কাজের সামিল ছিল; আর পাঁচ-সাত জন নবোদ্যাতর খাম, টিকিট, চিঠির সংখ্যাব আন্দাজ ক'রে নিতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না নিশ্চয়ই। এ ছাড়া বাজার থেকে এটা-ওটা-সেটা এনে দেওয়াও ছিল,—চিঠির কাগজ, কালির বড়ি, মাথার কাঁটা, ফিতে, চিরুণী...আড়ালে ডেকে বলত—‘পতি পবমগুরু’—লেখা দেখে চিরুণীটা নিবি শৈল, লক্ষ্মী ভাই...আর এদের সামনে যখন ব'কব—‘ও চিরুণী কেন মরতে নিয়ে এলি’ ব'লে, তখন চুপ ক'রে থাকবি—থাকবি তো?—ছুটো পয়সা নিয়ে ভালপূরী আলুর দম কিনে খেও, যাও...ভাগ্যিস শৈল ছিল আমাদের।’...

“এ ছাড়া সময়ের কাঁচা ফল, এবং সেগুলিকে তরুণীদের কাঁচা রসনার উপযোগী করবার নানা রকম মসলা আহরণ করাও আমার একটা বড় কাজ ছিল।...বাধানাথ, ও রকম নিঃশাস ফেলেলে যে? হিংসে হচ্ছে?”

রাধানাথ বলিল, “নাঃ, হিংসে কিসের? এই আমিও তো আজ তিন ঘণ্টা ধ'রে গিন্নীর ব'দ মিলিয়ে মিলিয়ে মাসকাবারি কিনে নিয়ে এলাম—মসলা, তেল, গুগু, বালি...গল্প চালাও।”

“সেদিন ঠাকুরমার গল্পে নয়নতারা কঙ্কাবতীর জায়গা দখল ক'রে মিলন-বিরহ, হাসি-কান্না, মান-অভিमानে সমস্ত গল্পটির মধ্যে একটা অপরূপ অভিনবস্থ ফুটিয়ে তুললে। রূপকথা আর সত্যের সে অদ্ভুত মিশ্রণ আমার আজ পর্যন্ত বেশ মনে আছে। সেদিন অরুণকুমারকে বিদায় দিতে কঙ্কাবতীর চোখে যখন মুক্তা ঝরল তখন আমার সমস্ত অন্তরাঙ্গা রেলের ধারের সেই বকুলতলাটিতে এসে অসহ্য বেদনা-ব্যাকুলতা নিয়ে ডোরের জন্ত প্রতীক্ষা করতে লাগল।

“কিন্তু আশ্চর্যের কথা—অবজ্ঞা, এখন আর সেটাকে মোটেই আশ্চর্য ব'লে ধরি না—তার পরদিন সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকেল গেল, সন্ধ্যা গেল, নয়নতারাদের বাড়ীর দিকে কোনমতেই পা তুলতে পারলাম না। কেমন যেন মনে

হ'তে লাগল, কালকের রাজের রূপকথাটা আমার চারি দিকে ছড়ান রয়েছে—ওদের সামনে গেলেই সব জানাজানি হয়ে বাবে। এখন লক্ষণ মিলিয়ে বুঝতে পারছি সেটা আব কিছুর নয়; নূতন ভালবাসার প্রথম সন্ধান।

“সেজবৌদি বললে—হ্যাঁ শৈলচাকুরপো, আজ সমস্ত দিন তুমি ও-মুখো হও নি য? নয়ন তোমায় খুঁজছিল।

“রাজি ছিল, আমি লক্ষ্যটা ঢাকলাম, কিন্তু কথাটা চাপতে পারলাম না, বললাম—যাও, খুঁজছিল না আবও কিছু।

“সেজবৌদি বললেন—ওমা! খুঁজছিল না? আমি মিছে বললাম? তিন-চার বার খোঁজ ক'রেছিল, কাল সকালে-বেশ একবার।

“বললাম—আমার ব'য়ে গেছে

“ব'য়ে গেছে ত বেশ না, আমায় বলতে বলেছিল, বললাম।—ব'লে বৌদি চলে গেলেন।

“সেদিন ঠাকুরমার ছিল একাদশী, গল্প হ'ল না,—অর্থাৎ তার আগের রাতে যে আগুনটুকু জ্বলছিল তাতে আর ইন্ধন জোগাল না। পরের দিন অনেকটা সহজভাবে নয়নতারাদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলাম। সে তখন মেঝের উপুড় হয়ে চিঠি লিখছে। জিজ্ঞাসা করলাম—আমার ডেকেছিলে নাকি...কাল?

“নয়নতারা মুখ তুলে ব'ী-গালটা ফুঁকিত ক'রে বললে—যা যাঃ, দায় প'ড়ে গেছে ডাকতে, উনি না হ'লে যেন দিন বাবে না। দুটো চিঠির কাগজ এনে উপকার করবেন, তা...

“ওদের চড়টা-আসটাও মাঝে মাঝে হজম করতে হয়েছে, কিন্তু সেদিন এই কথা দুটোতেই এমন রুচি আঘাত দিলে যে মনেব দারুণ অভিமானে বই-জোট নিয়ে সেদিন পাঠশালায় চলে গেলাম,—মনে বৈরাগ্য উদয় হ'ল আব কি—জানই ত পাঠশালাটা হচ্ছে ছেলেবেলার বানপ্রস্থভূমি। সেখানে আগেব দিন-চারেক অল্পপস্থিত থাকবার জন্তে এবং সেদিনও ঘেরি হবার জন্তে বেশ একটোট উভয়-মধ্যম হ'ল।

“এর ফলে বাল্য-মোহেব কচি শিখাটি প্রায় নির্বাপিত হয়েই এসেছিল, কিন্তু পাঠশালা থেকে ফেরবার পথে যখন রেল পেরিয়েছি, পুকুরের এপারে চালচিড়ের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে নয়নতারা ডাকলে। আমি প্রথমটা গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, তার পর নয়নতারা আর একবার ডাকতেই আগেকার দু-দিনের কথা, সকালের কথা, এবং পাঠশালার কথা একসঙ্গে সব মনে হুড়োহুড়ি ক'রে এসে কি ক'রে জানি না, আমার চোখ দুটো জলে ভরিয়ে দিলে। নয়নতারা বেরিয়ে এসে আমার হাতদুটো ধরে আশ্চর্য হয়ে বললে—ওমা, তুই কাদছিস শৈল? কেন বে, আয়, চল।

“বাড়ী নিয়ে গিয়ে খুব আদর-যত্ন করলে সেদিন। জুটো-নারকেল-নাডু-আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে এসে বললে—তোরা জন্তে চুরি ক’রে রেখেছিলাম শৈল, খা। জেঁকে সত্বে বড় ভালবাসি শৈল, তুই বিশ্বাস করবি নি। জেঁকে রাগেব মাখায় তাড়িয়ে দিয়ে মনটা এমন হুঁ করছিল।... যুয়ে আশুন নস্তের, অত খোশামোদ করিয়ে, একটা নাটাইয়ের দাম আদায় ক’রে, যদিবা কালকে চিঠির কাগজ দিলে এনে, আজ কোন মতেই চিঠিটা ফেলে দিলে না রে। গ’লে নাক এমন হুঁমন গতর—বেইমানের।

“এদিক-ওদিক একটু চেয়ে শেমিজের মধ্যে থেকে এফটা-গোলাপী খাম বেব ক’রে মিনতির স্বরে বললে—সত্বে তোকে বড় ভালবাসি শৈল—বললে না পেতায় বাবি। এই চিঠিটা ভাই—বইয়ের মধ্যে হুকিয়ে নে। আর, একটু স্বরে গিয়ে পোষ্টাপিসে ফেলে দিয়ে বাড়ী যেও; রেজিটার একটু কড়া, কষ্ট হবে? হ্যাঁ, শৈলব আবার এক-কষ্ট কষ্ট। নস্তে কিনা এগারটা বেজে গেছে, বারটার সময় ডাক বেরিয়ে যাবে শৈল, লক্ষ্মীটি...

“আমি এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,—পুকুরধারে, শানের বেঞ্চার পিছনে, বকুলগাছের আড়ালে আমাব কাঁধে বাঁ-হাতটা দিয়ে নয়নতারা ঝাড়িয়ে আছে, আমার মুখের উপর ভাগর ভাসা-ভাসা চোখ দুটি নীচু ক’রে,—তাতে চিঠির গোপনতার একটু লজ্জা, খোশামোদের ধূঁমামি, বোধ হয় একটু অস্বস্তিও নেহ, আর একটা কি জিনিষ—একটা অনির্কটনীয় কি জিনিষ যা শুধু নবপরিণীতাদের চোখেই দেখেছি, আর যা এই রকম চিঠি-লেখা, চিঠি-পাওয়ার সময় যেন আরও বেশী ক’রে ফুটে ওঠে।

“এইখানে আমার ভালবাসার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় শেষ হ’ল, এই ফিরে যেতে যেতে আবার ঘুরে আসার।... তোমাদের ঐ বয়সের মেয়েদের মজলিসের কোন অভিজ্ঞতা আছে?”

তারাপদ বলিল, “না।”

রাধানাথ বলিল, “কি ক’রে থাকবে বল? গার্জেনেব কটকারণে মাহুয় হয়েছি। চন্দ্র সর্করা বইয়ের অক্ষরসম্বন্ধে থাকত, অক্ষরের রূপে যে মুগ্ধ ছিলাম তা নয়,—বই থেকে চোখ তুললেই বাবা কিংবা পাঁচ কাকার কেউ-না-কেউ চোঁখ পড়তেন। ছুটিছাটায় যদি দুই-এক জন বাইবে গেলেন তো সেই ছুটির স্বযোগে মামা পিসেমশাইদের দল এসে আমাব ভবিষ্যতের জন্ত সন্তর্ক হয়ে উঠতেন। তাঁরা ছিলেন উচ্চ-পক্ষ মিলিয়ে সাত জন। শেষবারে এই তের জনে মাথা একত্র ক’রে বিয়ে দিলেন একটি নিষ্কটক মেয়ের সঙ্গে, যার বাণের সম্পত্তিতে ভাগ বসাবার জন্তে না ছিল বোন, না-ছিল এতটা ভাই যে একটি শালাজেরও সম্ভাবনা থাকবে।... নাও, ব’ল

যাও, আবার মজলিস। এত কড়াকড়ির মধ্যে যে একটা মেয়ে কোন রকমে ঢুকে পড়েছে এই ঢের।”

তারাপদ বলিল, “রাধানাথ চটেছে,—তা চটবার কথা বইকি...”

শৈলেন বলিল, “নয়নতারাদের মজলিসের কথা বলতে যাচ্ছিলাম। আগে বোধ হয় এক জায়গায় বলেছি যে এ-মজলিসে আমার মুক্তগতি ছিল। ছিল বটে, কিন্তু এর পূর্বে আমি আমার ছাড়পত্রের পূর্ণ সম্ব্যবহার করতাম না। তার কারণ ওদের কথা সব সময় ঠিকমত বুঝতামও না আর বুঝলেও সব সময় রস পেতাম না। আমার নিজেরও বয়স-স্বলভ নেশা ছিল,—মাছ ধরা, ট্রেনের পাখার দিকে চেয়ে ট্রেনের প্রতীক্ষা করা, এবং ট্রেনের ধোঁয়া দেখা দিলে লাইনে পাখব সাজিয়ে রাখা, ঘুড়ি ওড়ান, এই সব। কিন্তু এবার থেকে আমার মস্ত একটা পরিবর্তন দেখা দিল,—মাছ, ঘুড়ি, ট্রেনের প্রতী পক্ষপাতিত্ব গিয়ে সমস্ত মনটিনয়নতাবাদের মজলিসে, নয়নতারার,—বিশেষ ক’রে নয়নতারার আশ্চর্য্য চোখ দুটিতে কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল। সে যখন তাস খেলত আমি তার সামনে কাকর পাশে একটু জায়গা ক’রে নিয়ে ব’সে থাকতাম। নয়নতারা তাস দিচ্ছে, পিঠ ওঠাচ্ছে; তার চুড়িগুলি গড়িয়ে একবার মণিবন্ধের নীচে, একবার কল্লইয়ের কাছে জড়াজড়ি ক’রে পড়ছে। কখন সে তার আনত চোখের ওপর লু ছুটি চেপে চিন্তিতভাবে মাথা দোলাচ্ছে, তার কপালের কাঁচপোকাকার ময়ূবকঙ্কি বঙেব টিপটি ঝিকঝিক ক’রে উঠছে, আমি ঠায় ব’সে ব’সে দেখতাম। তখন ছিল কাঁচপোকাকার টিপের যুগ, এখন বেচারি আর স্বন্দব কপালে ঠাই পায় না, তার নিজেরই কপাল ভেঙেছে। ...আমি প্রতীক্ষা করতাম—জিতলে কখন নয়নতারার পান-খাওয়া ঠোঁটে হাসি ফুটবে; হারলে সে যে আমার কাছে মেয়েটিকে চোখ রাড়িয়ে কটুমল বলবে সে-দৃশ্যও আমার কাছে কম লোভনীয় ছিল না। একটা কথা আমি স্বীকার করছি,—আজ যে-ভাবে বয়সের দূরত্ব থেকে নয়নতারাকে দেখছি, সে-সব দিন যে ঠিক সেই ভাবেই দেখতাম তা নয়। তখন তার সমস্ত কথাবার্তা, চালচলন, হাসি-রাগ আমাব কাছে এক মস্তবড় বিস্ময়কর ব্যাপার ব’লে বোধ হ’ত,—যে বিস্ময়ে মনের উপর একটা সম্মোহন বিস্তার ক’রে মনকে টানে। এ-দিক দিয়ে দেখতে গেলে মনোবিজ্ঞানের নিস্তির ভৌলমত আমার মনোভাবটাকে ভালবাসা না ব’লে ভাল-লাগা বলাই উচিত ছিল। আমি ভালবাসা ব’লে যে জ্ঞক করেছি তার কারণ এব মধ্যে ঐ মনস্তত্ত্বেরই পরখ-মত কিছু কিছু জটিলতা ছিল, সে-কথা পরে যথাস্থানে বলব।

“সেদিন তাসের মজলিস ছিল না, একটা বই পড়া

হচ্ছিল। বইটা যে ভাগবত কিংবা মহাসংহিতা নয় এ-কথা বোধ হয় তোমাদের ব'লে দিতে হবে না। আমি যে বসেছিলাম এটা ওরা গ্রাফের মধ্যে আনে নি, তার প্রধান কাবণ ওরা নিজেরের খেরালে সেদিন খুব বেশী রকম মশগুল ছিল, আর দ্বিতীয় কারণ—আগে বোধ হয় বলেছি—ওরা সাধারণতঃ আমায় এ-সব বিষয়ে জড়পদার্থের সামিল বলেই ধরে নিত। সেদিন আবার আমি একেবারেই জড়পদার্থ হ'য়ে গিয়েছিলাম, কেননা, নয়নতারাকে সেদিন যেন আরও অপক্লপ দেখাচ্ছিল। আমি বোধ হয় বইটাও স্তনছিলাম না, সেই জন্তে, তার বটতলা-মার্কা চেহারা মিলিয়ে মোটামুটি তোমাদের কাছে তার কুলশীলটা জানাতে পারলাম, তার নাম-খামটা দিতে পারলাম না।

“এর মধ্যে একটি মেয়ে—নামটা বোধ হয় তার স্থা কি এই রকম কিছু, ঠিক মনে পড়ছে না—আমার দিকে চেয়ে বললে—শৈল, ভাই, বা না, আমার সেই কাকটা...দেখি হয়ে যাচ্ছে...”

“অপর এক জন জিজ্ঞাসা করলে—কি কাজ রে ?

“স্থা বললে—কিছু না।

“সেই মেয়েটা টোট উল্টে ভ্র নাচিয়ে বললে—ওরে স্বাবা! ‘শুধু আমি জানি আর আমার মন জানে!’ ... জিগস ক'রে অপরাধ হয়েছে, মাফ চাইছি।

“তার রাগটা পড়ল আমার উপর। নাকটা হুঙ্কিত ক'রে বললে—তা তুই এখানে কচ্ছিস কি রে? আরে গেল। তুই কি বুঝিস এসব ?

“অন্ত এক জন বললে—তোর পাঠশালা নেই ?

“কে উত্তর দিলে—পাঠশালা তো গুরুমশাই এসব কথা বলবে না, বলে তো ছু-বেলা ছেড়ে তিন বেলা গিয়ে সেখানে থায়ে দেয়। ও মিন্মিনেকে চিনিস না তোরা।

“কথাটার জন্তেও এবং আমার মুখের ভাবাচ্যাকা ভাবটার জন্তেও ওদের মধ্যে একটা হাসি প'ড়ে গেল।

“এক জন বললে—ওর আর মোষ কি ? ওদের জাতটাই হ্যাংলা ; কি রকম ক'রে চেয়ে রয়েছে দেখ না। যেন পায় তো সবগুলোকে এক এক গেরাসে গিলে খায়।

“আবার একচোট হাসি। তারই মধ্যে বললে—কাকে আগে ধরবি রে ?

“আবার হাসি, আরও জোবে ; সব ছলে ছলে গড়িয়ে পড়তে লাগল, ঝড়ে ঘনসন্নিবিষ্ট গাছগুলো যেমন এলোমেলো ভাবে পরস্পরের গায়ে লুটোপুটি খায়।

“হাসিতে যোগ দিলে না শুধু থল। সে গম্ভীরভাবে বললে—আগে ধরবে নয়নকে ; সেই থেকে ঠায় ওর মুখের দিকে কি ভাবে যে চেয়ে আছে। কি বয়সটে ছেলে গো মা ! নয়ন আবার দেখেও দেখে না।

“এখন বুঝতে পারছি, তাকে ফেল নয়নতারাকে দেখবার জন্তেই তার এত আকোশ। শূর আসল নাম ছিল ক্ষণপ্রভা। সে ছিল খুব ফরসা, স্বতঃ-স্বন্দরী। এই রঙে-নামে তার চরিত্রের মধ্যে ঈর্ষান্ন ভাবটা প্রবল ক'রে তুলেছিল।

“নয়নতারা যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল ; কিন্তু তখনই সে-ভাবটা সামলে নিয়ে বললে—দেখতে হয়ত তোকেই দেখবে, আমার মত কাল কুচ্ছিক দেখতে যাবে কেন !

থল বললে—আমায় দেখলে ঠাস ঠাস ক'রে ছোঁড়ার ছু-গালে চার চড় কষিয়ে দিতাম—নাম দক্ষিণে।

“নয়নতারা ততক্ষণে সপ্রতিভ ভাবটা বেশ কিরিয়ে এনেছে। চকিতে জন-মিমে বললে—পট ভরে খাওয়ার পরেই দক্ষিণে হয়, আমায় দেখলে পেটও ভরবে না, দক্ষিণেও নেই।

“এটা প্রথমে ছিল না, ঠাট্টা কেন-না, রঙেই স্বন্দরী হয় না। হাজার গুমর থাকা সত্ত্বেও থলু যে এটা না-জানা ছিল এমন নয়। সে মুখটা ভাব ক'রে হইল।

“তুলনায় নয়নতারাই সবচেয়ে স্বন্দরী ব'লে—বিশেষ ক'রে কালো হয়েও স্বন্দরী ব'লে—থলু দলেও কয়েক জন মেয়ে ছিল। তার মধ্যে স্থা এক জন। সে অবজ্ঞাভরে ঘাড়টা একটু বেকিয়ে বললে—ঠাট্টা কর নয়ন ; কিন্তু থলুর মত হ'তে পারলে বর্ষে তেতিস—আমি হক্ কথা বলব।

“নয়নতারা গাম্ভীর্য্য মুখভার একেবারেই সঙ্কর করতে পারত না। গুমটটা কাটিয়ে মজলিসটার হাসি ফোটাবার জন্তে মুখটা কপট-গম্ভীর ক'বে বললে—ওমা সে আর যেতাম না ! সঙ্গে সঙ্গে থলুর দিকে হলে প'ড়ে বললে—আয়, তো থলু একটু গায়ে গা ঘষে নি।

“কল কিছু উল্টো হ'ল। ‘হয়েছে’ ব'লে থলু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে মজলিস ছেড়ে চলে গেল। ষানিকটা চুপচাপ গেল, তার পর নয়নতারা হঠাৎ রোগ উঠে আমার দিকে চেয়ে বললে—কের যদি তুই কাল থেকে এখানে এসেছিস ত তোর আর কিছু বাকী রাখব না। তুই মেয়েদের মুখের দিকে ই ক'রে কি দেখিস রে ?... ঠা টিপলে দুখ বেরয়...

“সবার হাসিঠাট্টা, ধমকানির মত আমার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল, কান-কান হয়ে বললম—আমি বক্ষণও দেখি না।

“নয়নতারা বললে—দেখিস ; নিশ্চয় দেখিস, তোর কোন গুণে ঘাট নেই। না যদি দেখিস ত এই যে ধনী এক ডাই মিথ্যে ব'লে গেল, বোবাব মত চুপ ক'বে গেলি কেন ?

“স্থা শরীর ছলিয়ে ছলিয়ে উঠে প'ড়ে বললে—থলু মিথ্যে

বলে নি; দেখে ও ডাবড়া-ডাবড়া চোখ বের করে। পাঁচ বছরেরই হোক আর পঞ্চাশ বছরেরই হোক—বেট-ছেলেই ত? আমাদের চোখে কেমন লাগে তাই বলি; থাকলেই বলতে হয়, তার চেয়ে না থাকাই ভাল বাবা।

“সেদিন আড্ডা আর জমল না। কয়েক জন খয়ের সঙ্গে মঠেকোর জন্তে গেল; বাকী কয়েক জন কথাটা নিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া করলে, তার পর আকাশে মেঘের অবস্থা দেখে একে একে উঠে যেতে লাগল। আমার অবস্থা হয়ে পড়েছিল ন যবৌ ন তন্তৌ; আমাদের পাড়ার ননী উঠতে আমি কোন রকমে দাঁড়িয়ে উঠলাম।

“ননী মেয়েটি ছিল অত্যন্ত চাপা। সে যে কোন দিন কোন দলে, টপ্ করে বোঝাবার উপায় ছিল না। বোঝা যেত একেবারে শেষের দিকে, যখন সে নিজের নির্দ্বিকার স্বপরিহার করে তার অভীক্ষিত দলের একেবারে শেষ এবং মোক্ষম কথাটি বলে উঠে যেত। আমি উঠতেই বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে—তুইও যাচ্ছিস নাকি?

“বললাম—হঁ।

“তা হ’লে দয়া করে এগিয়ে যাও; ভাব করে সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই—আমি তোমার ভাবের লোক নই। .. না-হয়, তুই পরেই আগিস্থান; দিব্যি দু-চোখ ত’রে দেখ না ব’সে ব’সে, আর ত কেউ বলবার রইল না—ব’লে চাবির খোলো-বাঁধা আঁলচটা বনাৎ করে গিঠে ফেলে হন হন করে চলে গেল।

“আমি খানিকটা জড়ভরতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। ননী বেশ খানিকটা চলে গেলে শচী বললে—মুয়ে আঙুন, গোমড়ামুখী!

“শচীও চলে গেল। বৃষ্টি তখন থামো-থামো হয়েছে। আমি পা বাড়াচ্ছি, নয়নতারা বললে—ভিজ্জে যাবি শৈল, একটু থেমে-যা; চল, বাড়ীর ভেতর।

“সেদিনটি আমার স্পষ্ট মনে আছে, আশা করি কখনও অস্পষ্ট হবে না। তখনও ভাল করে বিকেল হয় নি, কিন্তু আকাশে গাঢ় মেঘের জন্তে মনে হচ্ছিল যেন সন্ধ্যার আর দেরি নেই। মজলিস যখন ভাঙল সে সময় রেলের ওপারে বনের আড়াল থেকে একটা আরও কালো মেঘের চেউ যেন মেঘলা আকাশটায় ভেঙে পড়ল, মনে হ’ল দিনটাকে অতি শীঘ্র রাত করে তোলাবার জন্তে কোথায় যেন মস্ত বড় তাড়াহুড়ো প’ড়ে গেছে। একটু পরেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামল।

“রেলের দিকে নয়নতারাদের দুটো ঘর, একটা বড়, একটা অপেক্ষাকৃত ছোট। নয়নতারা একটু এদিক-ওদিক করে এসে রেলের দিকে জানলাটির চৌকাঠের পাশে বসল।

আমায় বললে—তুই এইখানটার বোস শৈল, ভাগ্যিস যাস নি, না?

“বললাম—হ্যাঁ, ভিজ্জে যেতাম।

“জানলাটা দিয়ে অল্প অল্প বৃষ্টির ছাট আসছিল, নয়নতারা হঠাৎ ষড়্টিহুটি মেয়ে একটু হেসে বললে—একটু একটু বৃষ্টি এসে গায়ে লাগলে কিন্তু বেশ লাগে, তোর ভাল লাগে না শৈল?

“বললাম—না, ভিজ্জে যেতে হয়।”

রাধানাথ বলিল, “তখন তাহ’লে তোমার মাথায় একটু স্নবুদ্ধি ছিল বলতে হবে, এখন দেখছি...”

শৈলেন বলিল, “ভুল বলছ, তখন বৃষ্টিতে ভেজা বরং একটা রীতিমত উৎসব ছিল আমার পক্ষে, কিন্তু সে-সময় যা বললাম তা শুধু নয়নতারার কথা ভেবে,—তার ভেজা দেখে আমার কষ্ট হচ্ছিল।”

তারাপদ বলিল, “এত দূর?”

শৈলেন বলিয়া চলিল—“নয়নতারা ব’সে ব’সে অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি দেখতে লাগল।...তার মুখের আখখানা দেখতে পাচ্ছি,—কি রকম অন্তমনস্ক হয়ে মুখটা একটু উচু করে ব’সে আছে, মুখটাতে একটা ছায়া পড়েছে, বৃষ্টির ছাটের ছোট ছোট ষড়্টি মুখের এখানে-সেখানে, চোখের কোঁকড়ান পাতার ভগায়, কপালের চুলে চিকচিক করছে। হঠাৎ কি ভেবে বললে—চার দিক মেঘে ঢেকে গেলে মনে হয় সকাই—যে যেখানে আছে—সব যেন এক জায়গায় রয়েছে, না রে শৈল?

“এখন মানে বুঝি, তখন একবারেই বুঝি নি; তবুও এত উদ্বিগ্ন আর অন্তমনস্ক ছিলাম যে কিছু না ভেবেই ব’লে দিলাম—হ্যাঁ।

“নয়নতারা বোধ হয় নিজের ঘোরে বলেছিল কথাটা, কোন উত্তরের অপেক্ষায় বা আশায় নয়। আমার দিকে একটু চেয়ে রইল। আরও খানিকক্ষণ চুপচাপের পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—মেঘ তোর কেমন লাগে শৈল?

“সামান্য যেন একটু কুঠা, তার পরেই বললে—মেঘ কালো কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি, বিদ্যায় বরং ঢের স্মন্দর...

“আমি উত্তর দিলাম—বেশ লাগে মেঘ।

“ঠিক মনে পড়ছে না, তবুও যেন বোধ হচ্ছে নয়নতারার চোখের তারা একটুখানির জন্তে কি রকম হয়ে গেল। হ’তে পারে এটা আমার আত্মকের সম্মুখ মনের ভুল বা অপনৃষ্টি, কিন্তু এই রকম বর্ষা পড়লেই সেদিনকার সেই ছবিটি যখন ফুটে ওঠে, দেখি নয়নতারার চোখ দুটি যেন একটু নয়ন হয়ে উঠল।

“একটু পরে আবার বললে—ক্ষণপ্রভা মানে বিদ্যায়—ঐ যে খেলে গেল...খনির নাম...

“আমি সরস্বতী দেবীর অতটা বিরাগভাজন হ’লেও কি ক’রে জানি না—এই অসাধারণ কথাটার মানে অবগত ছিলাম। সেইটাই পরম উৎসাহে বলতে যাব এমন সময় নয়নতারার হঠাৎ জানলা থেকে নেমে এসে আমার সামনে ব’সে পড়ল, এবং আমার মুখের পানে কি এক রকম ভাবে চেয়ে ব’লে উঠল—তুই আমার অত ক’রে দেখিস কেন রে শৈল ? আমি তো কালো !... ”

“এখন আমিও বুঝছি, তোমরাও বুঝছ আসল ব্যাপারটা কি—অর্থাৎ নয়নতারাকে সেদিন বর্ষায় পেয়েছিল, নবোদার মন পাড়ি দিয়েছিল তার দম্বিতের কাছে ;—আকাশে ওদিকে বর্ষা, সে এদিকে মনে মনে শূঁকার করছে, তার পরে আমার চোখের মুকুরে নিজের রূপটি দেখে নিয়ে সে যাবে,—সে কালো, তাই তার অপূর্ণতার ব্যথা, গহ্বর সঙ্গে তুলনা। ”

“সেদিন আমি একথাটা বুঝি নি, বোঝবার সম্ভাবনাও ছিল না। সেদিন এই বুঝলাম যে আমার জন্মেই নয়নতারার এ প্রব্রট করছে, সে বলছে—তোমার যদি ভাল লাগে তাহ’লেই আমার রূপের আর জীবনের সার্থকতা—আমার সমস্ত জীবন-মরণ নির্ভর করছে তোমার একটি ছোট উত্তরের উপর।... ”

“আমি তখন যা ভেবেছিলাম তা শুঁচিয়ে বলতে গেলে এই দাঁড়ায় যে সেদিন নয়নতারার আমার আমার বয়সের গাভী থেকে তুলে নিয়ে আমার পৌরুষের জয়টীকা পরিবে দিলে, আমার হ’ল প্রেমের অভিষেক। ”

“প্রবল কুণ্ঠায় এবং কেমন একটা সশঙ্ক আনন্দে আমি মুখটা নামিয়ে নিলাম, উত্তর দিতে পারলাম না। উত্তর দিলে কথাটা তখনই পরিষ্কার হয়ে যেত, কেন-না, নয়নতারার সেদিনকার নিষ্কৃতে যেমন নিঃসঙ্কোচে আরম্ভ করেছিল তাতে সে সুরিয়ে ফিরিয়ে তার বরের কথা এনে কেলত। যদি বলতাম—তবুও—অর্থাৎ কালো হ’লেও তুমি খুব স্বন্দর—সে হয়ত বলত—তোমার কথার সঙ্গে ‘ওর’ কথা মিলে গেছে, শৈল,—মেনে কি না তাই দেখবার জন্মে জিজ্ঞেস করছিলাম।—কিন্বা এই রকম কিছু, কেন-না এই ধরণেরই একটা কথা তার মনে ঠেলে উঠছিল। ”

“কলে, সত্যের আলোয় যে ধারণাটা তখনই নিরর্থক

হয়ে যেতে পারত, মিথ্যার, অর্থাৎ ভ্রান্তির অন্ধকারে সেটা আমার জীবনে একটা অপূর্ণ সার্থকতা লাভ করলে। আমার ভালবাসার তত্ত্ব এত দিন শূন্য তুলছিল, আশ্রয়-শাখা এগিয়ে এসে তাকে স্পর্শ করলে। বোধ হয় এত দিন আমার শুধু ভাল লাগছিল মাত্র, সেদিন থেকে আমি নিঃসন্দেহ ভালবাসলাম, আমার ভালবাসবার ইতিহাসে দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হ’ল। ”

তারাপদ বলিল, “তোমার গল্পট মন্দ লাগছে না, তবে স্ত্রিনিষট্টাকে ভালবাসা বলায় স্পর্কার গন্ধ আছে, যদিও এ ভ্রান্তির জন্ত আমরা তোমার ক্ষমা করতে রাজী আছি, কেন-না ভ্রান্তিই কবির ধর্ম। ”

রাধানাথ বলিল, “কেন-না, কবি মিথ্যার ভ্রান্তিই। ”

শৈলেন বলিল, “না, সেটা ভালবাসাই, কেন-না এবার থেকে যা লক্ষণ সব প্রকাশ পেতে লাগল তা ভালবাসার একেবারে নিজস্ব জিনিষ—ট্রেড-মার্ক দেওয়া। একটি গুরুতর লক্ষণ দাঁড়াল—দেখ। ”

“হ্যাঁ, তার আগে সেদিনকার কথাটা শেষ ক’রে দিই। উত্তর না পেয়ে নয়নতারার আমার মুখটা ছোটো আঙুল দিয়ে তুলে ধ’রে বললে—তোমার বুঝি আবার লজ্জা হ’ল ? ”

“বোধ হয় তার প্রশ্নের জটিলতটা উপলব্ধি কবলে এতক্ষণে। একটু কি ভাবলে, তার পর আমার হাতটা ধ’রে একটু গলা নামিয়ে বললে—আমি তোকে ও-কথাটা জিগোস করেছি, কাউকে বলিস্ মি যেন শৈল, বলবি না তো ? বোস্, আমি আসছি—ব’কে চলে গেল ; অবশ্য আর এল না সেদিন। ”

শৈলেন একটু চুপ করিল। রাধানাথ বলিল, “বুড়ি তোমার কবিশ্বরের গোড়ায় জল জোপাচ্ছে বটে শৈলেন, কিন্তু ওদিকে তারাপদের কার্পেটটা ভিজিয়ে তার সমূহ অপকার করছে, আতিথেয়তায় ত্রুটি হয় ব’লে বোধ হয় ও-বেচারার...”

তারাপদ তাকাতাড়ি প্রতিবাদ করিতে বাইতেছিল, শৈলেন বলিল, “দাঁও বন্ধ ক’রে। ”

বন্ধ জানালার উপর ধারাপাতের জন্ত মনে হইল বুড়িটা যেন হঠাৎ বাড়িয়া গেল। শৈলেন চোখ বুজিল, যেন কোথায় ভলাইয়া গিয়াছে। তারাপদ আর

রাধানাথ বুঝিল সেদিন নয়নতারাকে যেমন বর্ষায় পাইয়াছিল আজ ঠিক সেই ভাবে পাইয়াছে শৈলেনকে। শৈলেনের গল্প আর বাহিরের বর্ষা বোধ হয় তাহাদের ভিতরের গতাংশও কিছু কিছু তবল করিয়া আনিয়াছিল, তাহারা শৈলেনের মৌনতার আর বাধা দিল না।

একটু পরে যেন একটা অতল তরলতা হইতে ভাসিয়া উঠিয়া শৈলেন বলিল, “হ্যাঁ, কি বলছিলাম? ঠিক, ঈর্ষার কথা। যখন আমার ভাল-লাগার ষাঁদ মরে গিয়ে সেটা ভালবাসায় দাঁড়াল, সেই বরাবর থেকে একটি নির্দোষ, নিরীহ লোক আমার শত্রু হ’য়ে দাঁড়াল,—সাক্ষাৎ ভাবে আমার কাছে কোন অপরাধ না ক’রেও। এই লোকটি নয়নতারার স্বামী অক্ষয়।

“অক্ষয়ের পরোক্ষ অপরাধ এই যে সে নয়নতারাকে বিবাহ করেছে। ঘটনাটি প্রায় এক বৎসরের পুরনো, কিন্তু এত দিন এতে ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না, কেন-না, অক্ষয় এত দিন একটি নির্বিশ্রাম নৈপথে অবস্থান করছিল। বর্ষায় সেদিন নয়নতারার যে নৃতনতর আলো ফুটে উঠল সেই আলোতে হঠাৎ অক্ষয় ছুনিরীক্ষ্য ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অনেক কথা, যা কখনও ভাবিও নি, তা শুধু ভাবনার নয়, একেবারে ছুর্ভাবনার বিষয় হয়ে উঠল। নয়নতারা আমার খুবই ভালবাসে—আমার জন্মে নারকেল-নাড়ু চুরি ক’রে রাখে, ছেঁড়া কাপড়ের রুমাল তৈরি ক’রে তাতে রেশমের ফুল তুলে দেয়, ঘুড়ির, ভালপুরির পয়সা জোগায়, গুরুমশাইয়ের বেতের দাগ পড়লে আমার গিঠে হাত বুলিয়ে রুচিকর ভাষায় গুরুমশাইয়ের আদ্যাশ্রমের ব্যবস্থা করেছে—জীবনের অমূল্য সম্পদ এসব; কিন্তু তার সামান্য একটি চিঠি পাবার কি পাঠাবার আগ্রহ আজ হঠাৎ এসবকে যেন নিশ্চিভ, অকিঞ্চিৎকর ক’রে দিলে। সে আগ্রহটা আমার প্রতি তার সাক্ষাৎ আচরণের কাছে সামান্যই একটা ব্যাপার—কে পৃথিবীর কোন্ এক কোণে পড়ে আছে, তার সঙ্গে ছুটো অক্ষরের সম্বন্ধ, কিন্তু এটাও আমার অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। যোল আনার মধ্যে সাড়ে পনের আনা আমিই পাচ্ছি, কিন্তু ওরিকে যে ঐ ছুটো পয়সা যাচ্ছে ওটুই বরদাস্ত করা—যতই দিন যেতে লাগল—ততই আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল।

“ঠিক এই সময় একটি ব্যাপার ঘটল যা অবস্থাটিকে ঘনীভূত ক’রে তুললে।

“একদিন স্বপ্নার একটা খুব জরুরি চিঠি ভাকে দিতে যাচ্ছি। স্টেশনটা ছাড়িয়েছি, এমন সময় স্টেশনের গেট দিয়ে অক্ষয় বেরিয়ে এল। সেই ট্রেনে নেমেছে। চুল উকুখু, মুখ শুকনো। আমার দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে বললে—এই যে শৈলেনভায়া!—মানে—ইয়ে—এরা সব কেমন আছে বলতে পার? ”

“তখন ‘এরা’-র মানে আমি বুঝি, না বুঝাই অস্বাভাবিক, বললাম—ভাল আছে।

“অক্ষয়ের মুখটা যেন অনেকটা পরিষ্কার হ’ল। আমার হাতটা ধ’রে জিজ্ঞাসা করলে—পথিা পেয়েছে?—কবে পালে?—ঐ্যা?

“আমি বিস্মিত হয়ে চুপ ক’রে রইলাম, তার পর বললাম—কই, তার তো অস্বখই করে নি।

“—অস্বখ করে নি। তবে?—ব’লে অক্ষয়ও থানিকটা আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে চাইলে, আস্তে আস্তে চোখ ঘুরিয়ে কি ভাবলে, তার পর তার মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, দেখ কাণ্ড। আচ্ছা তো!... তুমি বুঝি চিঠি ফেলতে যাচ্ছ?—কোন্ দময়ন্তীর?

“নয়নতারাকে লেখা পত্রে অক্ষয় আমার সম্বন্ধে প্রায়ই উল্লেখ করত—‘হংসদূত’ ব’লে, তা নিয়ে চিঠি পড়বার সময় চর্চা হ’ত। স্বতরাং দময়ন্তী কথাটার অর্থ বুঝতে আমার অস্ববিধে হ’ল না। বললাম—স্বধাধিদির।

“ঐ তো লেটার-বক্স,—যাও ফেলে দিয়ে এস। এক সঙ্গে যাওয়া যাবেখন।

“ভালবাসা যখন জন্মে আসছে, তার মধ্যে অক্ষয়ের এসে পড়াটা আমার মোটেই প্রীতিকর হয় নি। কিন্তু কিরে আসতে আসতে যখন শুনলাম নয়নতারার ঐ মিথ্যাচরণের জন্যে তাকে কি নাকালটা ভোগ করেই চ’লে আসতে হয়েছে তখন আমার মনটা খুবই খুশী হয়ে উঠল। বেচারী আপিস থেকে বাড়ীও যেতে পারে নি; যখন স্টেশনে, তখন ফাষ্ট-বেল হয়ে গেছে, ছুটতে ছুটতে শানবাধান প্রাটিকর্মে পিছলে পড়ে গিয়ে হাঁটুটা গেছে কেটে, হাতটা গেছে ছ’ড়ে; কাপড়ে রক্তের দাগ দেখিয়ে বললে—এই দেখ কাণ্ডটা।

“এটার আকস্মিকতাটা আমি আর ধরলাম না ; আমার মনে হ’ল দারুণ দুর্ভাবনায় ফেলা থেকে নিয়ে প্রাটকর্সে আছাড়-খাওয়ার পর্যন্ত সমস্তই নয়নতারার কীর্তি,—সং কীর্তি। আমার মনটা নয়নতারাব উপর প্রসন্নতায় ত’রে উঠল এবং অক্ষয়কে চিঠি লেখবার জন্তে, আর তার চিঠির প্রতীক্ষা করবার জন্তে যে মনে মনে একটা অস্তিমান এবং আকোশের ভাব ঠেলে উঠছিল সেটা একেবারে কেটে গেল। বুঝলাম—এত যে চিঠি তার মধ্যে এই নিতান্ত অবাস্তবীয় জীবটিকে প্রাটকর্সে আছাড় খাওয়ার বার একটা পূর্চ অভিসন্ধি জমে উঠছিল। অক্ষয়ের প্রতি আমার মনের ভাবের সঙ্গে নয়নতারার মনের ভাবের এ-বকম আশ্চর্য মিল দেখে তার সঙ্গে বেশ একটা নিবিড়তর ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি করলাম।

“তার পরদিন দুপুরের মজলিস বেশ জমার্ট রকম হ’ল—প্রায় ফুল হাউস্। কিন্তু কথাবার্তা প্রমোদনের বেশীর ভাগই চাপা গলায় হওয়া এবং বিতর্কের ভাগটা কম থাকায় গোলমাল বেশী হ’ল না। আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি পুকুরের ওপারে কামিনীতলায় ব’সে মাঝে মাঝে হাসিব হব্বা শুনছিলাম আব অক্ষয়কে আমার এই নির্কাসনের জন্ত দায়ী ক’রে মনের নির্কাসপ্রায় রাগের শিখাটিকে আবার পুষ্ট ক’রে তুলছিলাম।

“প্রথম পর্ক শেষ হ’লে তাস পড়ল। নয়নতারা আমার বাড়ী থেকে কি একটা আনতে বললে ; এনে দিয়ে আমি দলের পাশে আমার জায়গাটিতে বসলাম। স্বধা একবার আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে—ছেলেটা কি গো।—তাড়ালে যায় না।

“কে বললে—জাতই ঐ রকম। এর পরে একবার ‘তু’ ক’রলে হাঁটু ছেঁচে, রক্ত-মাখামাখি হয়ে ছুটে যাবে।... আহা...

“তাসের দান দেওয়ার মধ্যে হাসির হব্বা ছুটল। খানিকক্ষণ কাটল।

“নয়নতারার চোখের আর একটা বিশেষ এই ছিল যে, নীচের দিকে চাইলে চোখের স্বপুষ্ট, মন্থণ পাতা দুটি এমন নিরবশেষভাবে চোখ দুটিকে ঢেকে ফেলত যে মনে হ’ত যেন সে চোখ বুজে আছে। পরে পঙ্কলেশা উপলক্ষ্যে

আমি এই জিনিষটিকে কিশলয়ে-ঢাকা কুঁড়ির সঙ্গে তুলনা করেছি। বেশীক্ষণ এই ভাবে চিন্তা করলে মনে হ’ত যে সে ঘুমচ্ছে ; কিন্তু তার চোখের গুহনই অপরের চোখে এই দৃষ্টবিলম্ব ঘটাত ব’লে কেউ বড়-একটা টুকত না। সেদিন কিন্তু হাতের তাসের দিকে নজর রেখে প্রায় মিনিট দু-তিন ওরকম ভাবে থাকবার পর নয়নতারার মাথাটা হঠাৎ সামনে ঢুলে পড়ল। থম্ব লগলে—ওমা, নয়ন, তুই যে সত্যিই ঘুমচ্ছিস লা। আমরা ছােছি...

“নয়নতারা একেবারে হকচকিয়ে উঠল ; প্রথমটা অপ্রতিভ ভাবে বললে—খ্যাং, কই যাঃ... সূজ সঙ্গে যুথটা বিরক্তিতে কুঞ্চিত ক’রে বললে—ন তাই, সারাবাত জাগিয়ে রাখা ভাল লাগে না। কবে যে যাবে—আপদ...

“এইটুকুই যথেষ্ট ছিল ; আমার মধেকার নাইট—যে-বীরকে তোমরা কক্কাবতীর সন্ধানে পাতালপুরীতে দেখে থাকবে—প্রতিহিসায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। আমি আপদ-বিদ্যায় একেবারে বহুপরিব্রাজক হয়ে উঠলাম।

“সেদিন সন্ধ্যার সময় আমার মধ্যে হাত গলাতে গিয়ে ছুটি লুকান বিছুটি-ডগাব সংস্পর্শে ঘণ্টা, আর স্বত্তর-বাড়ীতে সে-ঘণ্টা চেপে রাখবার ভজ্ঞতায় মাঝে প’ড়ে অক্ষয় অস্থির হয়ে পাগলি করলে খানিকটা। তার পরে বোধ হয় ডাক ছেড়ে কাঁদবার সুবিধার জন্তে বেড়াতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যেই জুতোয় পা ঢোকাবে—‘উ’ ক’রে এক রকম চীৎকার ক’রেই পা-টা বের ক’রে নিলে—একমুঠো শেয়াল-কাঁটার পা-টা সজারুর মত হয়ে উঠেছে।

“বাড়ীতে একটা হৈ-হৈ প’ড়ে গিয়ে সকলে সাবধান হয়ে পড়ার আর তখন কিছু নুতন উপজব্ব হ’ল না ; কিন্তু অক্ষয় সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে যেই বাড়ীতে ঢুকবে, অন্ধকারে একটা ঢিল বোঁ ক’রে তার কানের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং সে চীৎকার ক’রে চালচিলের বেড়া টপকানোর আগেই আর একটা সজোবে এসে তার মাথায় ল’গল।

“সে-সময় হাজার তল্লাস ক’রেও আত্মতন্ত্রী কে ঠাওরাতে পারা গেল না বটে, কিন্তু তোমাদের বোধ হয় বুঝতে বাকী নেই যে সে মহাপুরুষটি কে।

“তোমাদের যদি নিজের নিজের গা- হাত দিয়ে বলতে বলা হয় ত নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে বাহ্মন কলিকাতা-

বাসীরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ছুটি জিনিষকে বেশী ভয় করে,—সাপ আর ভূত; আর তাদের বিশ্বাস ওদিকে লিখ্যা আর এদিকে দমদমার পরে সমস্ত ভুভাগ এই দুই উপজবে ঠাসা। অক্ষয় যখন নিঃসন্দেহ হ'ল যে এটা বাড়ীর কাকর ঠাট্টা নয়, তখন তার আর সন্দেহ রইল না যে সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে ভৌতিক। সে রাতটা নিরুপায়ভাবে কোন রকমে কাটালে এবং তার পরদিন দুপুরে—অর্থাৎ রাত্রি হবার এবং তার সঙ্গে সেই উৎকট রকম ঠাট্টাপ্রিয় অশরীরীর আবির্ভাব হওয়ার ঝাড়া পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পূর্বে সে বেচারি হাবড়া-মুখো গাড়ীতে গিয়ে বসল।

“সেদিন আমি ওদিকে যেতে পারি নি—শেতলা-তলায় যাত্রার আসরের জন্তে কাগজের শেকল তৈরি করতে ধরে নিয়ে গেল।

“তার পরের দিন কিছু সকালেই আমি বিজয়ী বীরের মত গিয়ে নয়নতারাদের বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। সে নিশ্চয়ই সমস্ত রাত নিরুপজবে ঘুমিয়ে এতক্ষণ উঠেছে। এইবার গিয়ে তার জ্ঞাপকর্তা যে কে সেটা জানিয়ে বিন্ময়ে, আছন্দে, কৃতজ্ঞতায় তাকে অভিব্যক্ত করে ফেলতে হবে।

“গিয়ে যা দেখলাম ত্যতে আমার নিজেরই বিশ্বাসের সীমা রইল না।—পুকুরঘাটের শেষ রাণাটিতে, মুখ ধোওয়ার জন্তে বাঁ-হাতে খানিকটা ছাই নিয়ে নয়নতারার নিরুপ হয়ে বসে আছে। চুল উল্লুখ, মুখটা খুব শুকনো, চোখ দুটো ফুলো-ফুলো আর রাঙা।

“আমি গিয়ে বসতে একবার ফিরে দেখলে, তার পর চিবুকটা হাঁটুর ওপর রেখে, চোখ নীচু করে বসে রইল।

“প্রথমটা মনে হ'ল অক্ষয় সব আকোশ নয়নতারার উপর মিটিয়ে গেছে। কি ভাবে যে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। চেয়ে আছি, হঠাৎ দেখি তার দু-চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল নামল। আশ্চর্যের ভাবটা চাপতে না পেরে ব'লে উঠলাম—কাঁদছ যে তুমি।—কাঁদছ কেন ?

“—যাঃ, কাঁদছি কোথায় ?—ব'লে নয়নতারার জাঁচল তুলে চোখ দুটো মুছে ফেললে। একবার, দু-বার, তার পর বাঁ-ভাড়া বস্ত্রার মত এত জোরে অশ্রু নামল যে আর জাঁচল সরাতে পারলে না, চোখ দুটো চেপে ধরে বসে রইল।

একটু পরেই ফোঁপানির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটা ছলে ছলে উঠতে লাগল।

“খানিকক্ষণ এইভাবে গেলে বেগটা যখন কমে এল, জাঁচলের মধ্যে থেকেই কান্নার ভাড়া ভাড়া স্বরে বললে—
অত কাকুতিমিনতি করে, মিথ্যে অহুধের কথা লিখে নিয়ে এলাম শৈল, মার খেয়ে গেল। কে মারলে বল দিকিন ?
—কার কি করেছিল সে ?— নিরীহ, নির্দোষ মাহুয...

“আর বলতে পারলে না, ভেঙে পড়ল।

“ঠিক সেই সময়টিতে নয়নতারার কান্নার মধ্যে বিনিময়ে-বিনিময়ে কথাগুলো শুনে, এবং কতকটা নিজের অপরাধের জ্ঞানের জন্তেও আমিও কান্নাটা থামাতে পারলাম না বটে, কিন্তু সেই দিনই কোন একটা সময় থেকে, নয়নতারার এই রকম পক্ষপাতিত্বের জন্তে অক্ষয়ের উপর বিবেচ আর হিসার ভাবটা একেবারে উৎকট হয়ে উঠল। ছেলেবেলার চিন্তাগুলো ঠিক গুলিয়ে মনে আসে না, অস্তিত্ব বা মনে আসত তা এত দিনের ব্যবধান থেকে গুলিয়ে বলা যায় না। শুধু মনে পড়ছে এই পক্ষপাতিত্বের জন্তে—যেটা নিছক নয়নতারায়ই ঘোষ—আমি নয়নতারার উপর না চটে চটলাম অক্ষয়ের উপর। লোকটাকে যে নয়নতাবা আসবার জন্তে সত্যিই কাকুতিমিনতি করে লিখেছিল—প্লাটফর্মে আছাড় খাওয়াবার অভিজ্ঞায়ে যে ডাকে নি—তাকে যে নয়নতারার নির্দোষ বলে—এই সব হ'ল অক্ষয়ের অমার্জ্জনীয় অপরাধ; আর সবচেয়ে বড় অপরাধ হ'ল তার বিবাহ করাটা, যার জন্তে সে তাকে কাকুতিমিনতি করে ডেকেছে, আর আমি অত কষ্ট করে তার মাথা ফাটালে তাকে নির্দোষ বলেছে, তার জন্তে চোখে জল ফেলেছে।”

শৈলেন চুপ করিল। তারাপদ প্রশ্ন করিল, “তোমার গল্প শেষ হ'ল নাকি ? উপসংহার কোথায় ?”

শৈলেন বলিল, “ভালবাসা ত গল্প নয় যে উপসংহার থাকবে,—বইয়ের দুটি মলাটের মধ্যে তার আদি-অন্ত মুড়ে রাখা যাবে। তবুও যদি ভালবাসাকে গল্প-উপজ্ঞাসের সঙ্গেই তুলনা কর তো বলা যায় তার উপসংহার নেই, অধ্যায় আছে; সে কোন এক অনির্দিষ্ট সময়ে একবার আরম্ভ হয়, তার পর অধ্যায়ের পর অধ্যায় সৃষ্টি করে তার অক্ষুরন্ত গতি।...”

“সে সময়ের অধ্যায়টিই না-হয় শেষ কর।”

“সেটার শেষ ছিল একটা সামান্য চিঠি। একদিন নয়নতারা আমার অক্ষরের নামে একটা চিঠি ডাকে কেলে আসতে দিয়ে হঠাৎ থমকে মুখের দিকে চেয়ে বললে—‘হ্যাঁ রে, তুই চিঠি খুলে পড়িস্ নে তো? খবরদার; আর এই ৭৪৥ দেওয়া রইল,—বুকে ব্যথা হবে।’

“আমার যে বুকে একটা ব্যথা ছিলই নয়নতারা সে খবর রাখত না।

“এর আগে কখনও কারুর চিঠি খুলি নি, কিন্তু সেদিন আমি পোষ্টাশিসের রাস্তাটা একটু ঘুরে বাড়ী এলাম এবং একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে চিঠিটা খুললাম।

“৭৪৥এর দিবিটা আমার হাতে হাতে ফলল। সে যে কি বিনিয়ে-বিনিয়ে লেখা চিঠি—কত ব্যাকুলতা, কত আদর, কত আশ্বাস, কিরে আসবার জন্তে কত মাথার দিবি!—এবার নয়নতারা ডাকে বুকে করে রাখবে, যে শত্রুতা করেছে তার সমস্ত অত্যাচার নিজের সর্বান্ধে মেখে নেবে; অক্ষয় কিরে আহুক,—নয়নতারার চোখে ঘুম নেই—কৈদে কৈদে স্বপ্ন হয়েছে—এসে একবার দেখুক অক্ষয়, একবার দেখুক এসে তাব অত আদরের নয়ন কি হয়ে গেছে...

“এত চায় সে অক্ষয়কে?—কোডে, জঁর্ষায় অসহায়তায় আমার বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা ঠেলে উঠতে লাগল। সেদিন টিল কুড়বার সময় কি করে একটা পুরনো জামা শাবল হাতে উঠেছিল। কি ভেবে সেইটেরই সম্ভাবহার করি নি। সেই আপশোষে ছটকট করতে লাগলাম।

“বোধ হয় সেদিনকাব টিল ছোড়বার কথা মনে হওয়ার জন্তেই মনে পড়ে গেল যে অক্ষয় সমস্ত কাগুটা ভৌতিক মনে করেই তাড়াতাড়ি পালিয়েছিল। আমাব মাথায় একটা স্বপ্ন আসে জুটল।

“আমি আগে আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে কালি-কলম নিয়ে এলাম এবং আমার লেখার খাতা থেকে খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে খুব জোরে টিল ছুঁড়তে পাবে এই রকম জবরদস্ত ভূতের হাতের উপযোগী মোটা মোটা অক্ষরে, চন্দ্রবিন্দুসম্বৃত্ত ভূতোচিত শুদ্ধ ভাষায় লিখলাম—খবরদার এবার এলে একেবারে ঘাড় মটকে তোর রক্ত খাব—এবং আমি যে ভূত এটা প্রমাণ দিয়ে ভাল ক’বে বিশ্বাস করবার জন্তে জুড়ে দিলাম—আমি খামের মধ্যে ঢুকে সব পড়েছি। আমার সঙ্গে টালকি?

“তোমরা হাসছ? কিন্তু এর পবেই আমার অবস্থা অতিশয় করুণ হয়ে উঠল, কেন-না, এ-ভূতের নামখাম পরিচয় বের করতে খুব বেশী রকম বিচক্ষণ রোজ্জার দরকার হ’ল না। তার ভূতপূর্ব কীর্তিও সব ধরা পড়ে গেল—ভূতপূর্বই বল কিংবা অভূতপূর্বই বল।...বুট্টাটা কি থেমে আসছে?”

শৈলেন আবার খানিকটা চুপ করিল। তার পর বলিল, “এর কয়েক দিন পরে এসে বাবা আমার বিদেশে তাঁর কর্মস্থানে নিয়ে গেলেন। তা’র পর আর নয়নতারার সঙ্গে দেখা নেই।”

তারাপদ বলিল, “কিন্তু কি যেন অক্ষুর অধ্যায়ের কথা বলছিলে?”

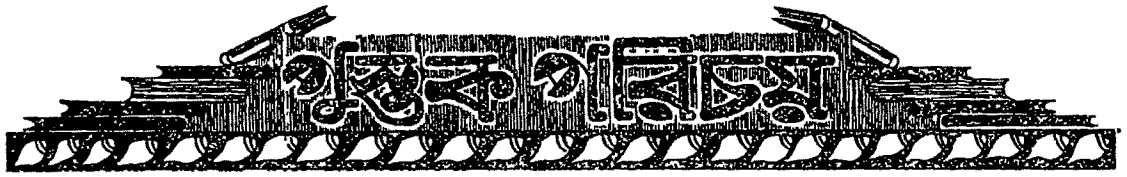
শৈলেন বাহিরেব ত্রিযমাণ বর্ষা’র বিলম্বিত মূলক কান পাতিয়া শুনিতেছিল, আত্মসমাহিত ভাবে বলিল, “হ্যাঁ, তবে একটু ভুল হয়েছিল,—অধ্যায় নয়, সর্গ,—জীবনের পাতা একটির পর একটি পূর্ণ ক’রে ভালবাসার করুণ গাথা সর্গের পর সর্গ সৃষ্টি ক’রে চলেছে...”

রাখানাথ বলিল—“তুমি কবি, হিসাবেব গল্পকে নিশ্চয় এড়িয়ে চল; তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমার আট বৎসরের সময় নয়নতারার বয়স যদি পনের বৎসর ছিল তো তোমার এখন পঁয়ত্রিশ বৎসরে সে বিয়াল্লিশ বৎসর অভিক্রম ক’বে...”

শৈলেন উঠিয়া বলিল, বলিহ, “ভুল বলছ তুমি,—নয়নতারার বয়স হয় না। আমার প্রেম তার স্ফুটনোন্মুখ বোঁবনকে অমরত্ব দিয়েছে। তার পরের নয়নতারা—সে তো আমার জীবনে নেই। আমার নয়নতারা এখনও সেই পুকুরঘাটটিতে সখীপবিত্র হয়ে বসে; রূপে, রসে, পূর্ণতায় উজ্জ্বল। তার কত দিনের কত কথা, ভাবী, তার আশ্রয় চোখে—পবমাস্রধ্য চাউনির খণ্ড খণ্ড স্মৃতি আমার জীবনে এক-একটি অখণ্ড কাব্যের মধ্যে রূপ ধ’রে উঠেছে। যখন আমি থাকি প্রাক্কল—ত্রিশ বৎসরের দীর্ঘ ব্যবধানের ওপাবে দেখি নয়নতারা হাসিতে, কপট গান্ধীর্ঘ্যে কিংবা অকপট কৌতুকপ্রিয়তায় বলমল করছে; তার চিহ্ন চুলে নীচে, বোরাল গালের প্রান্তে পারসী মাকড়িটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে;—আমি যখন থাকি মৌন, বিমর্ষ, তখন বিবেলে নয়নতারার আকাশ ঘিরে বর্ষা নামে—রেলের ধাবের রূটিতে মেঘের উপর চোখ তুলে নয়নতারা নির্ঝাঁক হয়ে চেয়ে থাকে, মেঘবিলুপ্ত সাক্ষ্য সূর্যের মত কানের পারসী মাকড়ি কেশের মধ্যে ঢাকা, আমার দিকে ফেরান গালটিতে একটা অশ্রুবিন্দু টলমল ক’বেছে...

“আমি জীবনে আর কাউকেই চাই নি, আমার জীবনের চিরপটে নয়নতারাকে অবলুপ্ত ক’বে আর কারুব ছবিই সৃষ্টিতে পায় নি। পনের বৎসরের অটুট বোঁবনশ্রীতে প্রতিষ্ঠিত ক’রে তারই ওপর নিবদ্ধ দৃষ্টি আমি তাকে অভিক্রম ক’রে আমার পঁয়ত্রিশ বৎসরে এসে পড়েছি—সূর্য যেমন বোঁবনশ্রামলা পৃথিবীতে অভিক্রম ক’রে অপরাহ্নে হেলে পড়ে। আজকের এই বর্ষায় কি তোমরা কথাটা অবিশ্বাস করতে পারবে?”

তারাপদ বলিল, “আমরা স্বয়ং তোমার বিশ্বাসের জন্তে ভাবিত হয়ে উঠছি—কেন-না, বর্ষাটা গেছে থেমে।”



স্মরণ-গরল—ঐমোহিতলাল মজুমদার এগীত এবং ২৫১০, মোহন-বাগান রো, কলিকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

বাংলার কবি প্রয়সেব হইতে বৃহৎ বাকাটি আহার্য কবিবা ঐযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার তাঁহার কাব্যগ্রন্থখানিকে যে-নামে অভিহিত করিয়াছেন, সেই নামকরণে বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম কবিতাটি “স্মরণ-গরল”।

আমি মরনের রচিষু দেউল—দেহের দেহলী ‘পরে,
পঞ্চশরের প্রিয় পাঁচ ফুল সাজাইষু ধরে ধরে।

কিন্তু

দেহেরি মাঝবে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত ?

দেহের ভিতর দিয়া দেহাতীতের এষণা—এই কাব্যগ্রন্থের মূলকথা। বিবিধ কবিতার মধ্যে বিচিত্রভাবে এবং অনবদ্য ছন্দে এই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম ভাগের ইংরেজী কাব্যে যে-দেহকে অবহেলা করা হইয়াছিল, বিশেষ শতাব্দীর ভাবুকগণের নিকট তাহা আর নিতান্ত তুচ্ছ ও হেয় নহে। সারা জীবনে আমাদের সম্মান শেষ হয় না। সীমা হইতে আমরা সীমান্তের উপনীত হই। যাহার স্রষ্টা আমাদের হাট্কার তাহা হস্ত রূপকে অতিক্রম করিয়া যায়। তবুও রূপ সত্য।

আমি কবি—অন্তহীন রূপেব পূজারী,
আমারো যে আছে প্রিয় হৃদয়ের চির-তৃপ্তাহারী,
এ কথা বুঝাই করে, বুঝাতে কি পারি ?

কিন্তু সে শুধু বাহিরের নহে, প্রিয়র রূপ শুধু প্রিয়র নিজের নহে,
আমারি এতদ্য ভাই হেরি আমি তার দেহাধারে।

তবু, শুধু রূপ লইয়া মন সন্তুষ্ট হয় না, মন চাহে মনের প্রতিদান,
‘দেবদালী’ ‘হৃদয় রুঠাম পাণ্য-দেবতাকে’ সম্বোধন করিয়া কেনার
তাঁহার বলিতেছে,

চিরদিন তুমি চাহিবে এমন অপলক অচপল ...
কতু তলিবে না ? টুটিবে না যোর নিয়তির পৃথল ?

যে আনন্দ জীবনাতীত, জীবনের আনন্দ কি তাহা অপেক্ষা অল্প ? ‘শেষ
আরম্ভিতে’ কবি বলিতেছেন,

সের হতে সের পৃথ্বীশরীর পূজকে বেগধ্বান,
প্রাণের পানীর সেই হরাসার আমি যে করেছি পান।

গ্রন্থখানিতে এতদৃষ্ট গীতি-কবিতা, আঠারটি সনেট এবং ‘প্রেম ও ফুল’ (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব) নামক একটি বড় কবিতা আছে। শব্দচরনে মোহিতলালের কৃতিত্ব অনগ্রসাধারণ। ‘রূপ-মোহ’, ‘বিভাবরী’, ‘নারী-ভোজ’, ‘রক্ত-বোধন’, ‘চাঁদের বাসর’, ‘প্রেম ও জীবন’, ‘শেষ আরম্ভ’ প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কল্পনা ও ভাবুকতার সঙ্গে স্নানাবেশের মিলন একান্ত উপভোগ্য। ‘কবিতাজীবী’র তৃতীয় সনেটের শেষ শ্লোক এই,

যে হর কুরায়ে গেছে, কিরিবে না কতু এ ভুবনে,
আজিকার গানে তার কিছু নিব—আমি সেই কবি।

‘স্মরণ-গরল’ কবির পুস্তকখানি অল্প বাখিয়াছে।

প্রাচীন গীতিকা হইতে—ঐপ্রমথনাথ বন্দী এগীত এবং ২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা হইতে কাত্যারনী বুক ষ্টল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

বইখানিতে তিনটি কথ-কবিতা আছে—‘মহেরা’, ‘মহা-কেনারামের মুক্তি’, ‘মল্লয়’। পাশ্চাত্য সাহিত্যে আর্থার ও শার্লিয়ান সংক্রান্ত প্রাচীন উপাখ্যানগুলিকে অবলম্বন করিয়া আধুনিক কালের নানা কবি নানাবিধ নূতন কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের দেশেও পৌরাণিক আখ্যান লইয়া নাট্য ও কাব্য রচনার প্রথা আছে। ‘মহম্মদসিহ-গীতিকা’ হইতে গল্পগুলি সংগ্রহ কবিরা ঐপ্রমথনাথ বন্দী নিজস্ব ভঙ্গীতে যে কথ-কাব্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা কবিত্বের পাঠকের মনকে বিমুগ্ধ করিবে।

পরাগপাটলমাখা তারকার মধুমক্ষী স্তত
কনক চাঁপার মধু সযতনে রেখেছিল আনি
ছালোকের দিব্যচক্রে ; হৃদ্বিধব রসভারে নত
সে মধু মাধুরীমদ লক্ষ্যশ্রোতে ক্ষরিছে নিরত
বর্ণায়িত ত্রিভুবনে ; হার সৌম্য, হে ওষধিপতি,
বুকে চাপি কাঁদে বিব চিরন্তন বেদনার ক্ষত।

কথা ও কাব্যের প্রবাহ অবাধ এবং অকুণ্ঠিত, বর্ণনার ধারা সৌন্দর্য্য এবং
অজস্রতার পরিপূর্ণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপেব প্রকাশের দ্রষ্ট শব্দগুলি অধীব।

প্রেম কাঁদে একাকিনী বাসরের ফুলশয্যালীনা ;
রূপ সে বিদ্যারল্লী, অবিরাম অধরে অঙ্গুলি ;
জীবনের দগু পল ক্ষরে যেন ম’ল্য সূত্র বিনা।

অথবা

উঠিল নিঃশ্বাস
অগাধ অরণ্যভলে আশ্রম উর্বলী
গল্পবের মর্দরণে।

অথবা

শাল্লী রঞ্জন রাঙা দিখধর নয়নেব কোণ ;
অধর-আসবগন্ধ-উন্মাদনে এমত ছালোক।

এমনই উপমা-প্রয়োগে, শব্দসম্পদে, রসে এবং মাধুর্য্যে কাব্যখানি
মনোহর।

ত্রিশৈলেন্দ্রকুমার জাহা

রিয়লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। নব-
জীবন সংঘ, ২২০-ডি আপার চিংপুর রোড, কলিকাতা। এক টাকা।

কবি না হইলে কবিকে বুঝিয়া উঠা কঠিন ব্যাপার ; পাঠক বতর্ভ
নীরস হউন, তাঁহাকে কবিকল্পনা বুঝিবার দ্রষ্ট অন্ততঃ সাময়িকভাবে
কবির সমর্থ হইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথকে আমরা যে কখনও কখনও
“দুঃসহ” “দুর্বোধ” “হেয়ালি” বলিয়া বেলিয়া রাখি, তাহার কারণ শালি
দেওয়ার লোভ, এবং কল্পনা ও সরসতার অভাব। বিজয়লাল নিজে কবি
বহু বিচিত্র রসের গ্রাহক। তাঁহার রবীন্দ্রভক্তিও বধেই, হস্তরাং
রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা উপভোগ্য হওয়ারই কথা। আলোচ্য

এয়ে বিজয়লাল দুই বোন, মালক, বাঁশরী, চার অধ্যায় ও শেষের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের এই কয়টি উপাঙ্গসমূহে আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা পরম উপাঙ্গের হইয়াছে। বিজয়লালের লেখা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি পড়িতে আবার ইচ্ছা করে।

তথু একটি বিষয়ে আপত্তি আছে,—কবির নামের পূর্বে ‘রিয়লিষ্ট’ এই উপাধির প্রতি। নিরুপাধি রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট। বাঁশরীর মধ্যে এক জারগার আছে, ‘রিয়লিষ্ট মেয়ের’। লেখক কোন্ অর্থে রিয়লিষ্ট কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন? বিজয়লাল ভূমিকায় লিখিয়াছেন, “এবারে তাঁর লেখা সম্পর্কে আলোচনা করছি কেবল মনোবিকলনতত্ত্বের দিক থেকে।” ফ্রয়েড যে নব্য বিজ্ঞান পড়িয়া তুলিয়াছেন তাহার বিচার বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের পরিচয় গ্রন্থের বিষয় এই পুস্তকে পাইলাম না। মনে হইল, মেয়েরা রিয়লিষ্ট হইলেও রবীন্দ্রনাথ রিয়লিষ্ট নহেন,—বলিও তিনি মানুষের হৃদয়ে যে কত রকম লুকাচুরি তাহার জ্ঞানে ও অজ্ঞানে খেলে তাহা তিনি জানেন। মহামায়ার খেলা শ্রেষ্ঠ মনোবিদ্যের কোনও কালেই অজ্ঞাত নহে, তাই বলিয়া ‘রিয়লিষ্ট’ বিশেষণে সকলকেই—রবীন্দ্রনাথকে তো নহেই—বিশেষিত করা যায় না। রসিকের বাদ দিয়, রাসকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে বোঝা যে ‘অসম্ভব’ তাহা চক্ষুর সামনে দেখিতেছি; ফ্রয়েড না হইলে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা কঠিন, অতঃপর কি ইহাই গুনিতে হইবে?

প্রিয়রঞ্জন সেন

প্রেম ও পাছুকা—শ্রীন্দ্রগোপাল সেনগুপ্ত। রসজ্ঞ সাহিত্য সংসদ, ২৭ সাহানগর রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য ১।০

হাস্যরসাত্মক ছোট গল্পের বই, আটটি গল্প আছে, সবগুলি চিত্র-সম্বিত। মোটামুটি কলা চলে হাস্যরসের উত্তম পাত্রপাত্রী এবং ঘটনা-সংঘাতের অসামঞ্জস্যের মধ্যে। এই জিনিষটি ধরিবার মত হুস্ন অমুহুরিত লেখকের আছে এবং সেই জন্য অনেক স্থানে প্রকৃত হিটমার বেশ ভাল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সঙ্গে আর একটি জিনিষের যোগ হইলে বেশ ভাল হইত—তাহা সংঘর্ষ। ইহার অভাবে পাত্রপাত্রী এবং ঘটনা-সমাবেশ সব স্থানে হাস্যরসের হুস্নতা বজায় রাখিতে সমর্থ হয় নাই। কয়েক জারগার হুস্নতা ব্যক্তিগত আক্ষেপ অপ্রিয় হইয়াছে। এ জাতীর জিনিষ বাদ দিলেই লেখক ভাল করিবেন।

বইয়ের চিত্রগুলি ভাল, তবে প্রচ্ছদপটের চিত্রটি দৃষ্ট-আকর্ষক হইলেও লুকচুরি পরিচায়ক হয় নাই।

মনের গহনে—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী। রসজ্ঞ সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা। মূল্য ১।০

এখানি রসজ্ঞ সাহিত্য সংসদের প্রকাশিত ছোট গল্পের বই, পাঁচটি ছোট গল্প আছে। এমন অনাড়ম্বর অথচ মিষ্ট ভাবায় লেখা গল্প প্রায় চোখে পড়ে না। বর্ণনাগুলি এতই সজীব যে বইখানি শেব করিয়া মনে হয়, বই পড়া নয়—যেন নিজের সব দেখিয়া শুনিয়া ফিরিয়া আসিলাম। কাহিনীগুলির ঘটনাস্থল পল্লী-বাংলা। তাহার নিত্য জীবনের রূপ (সব ক্ষেত্রে সুকণ নয়) বর্ণনাধীনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে “ম্যালেরিয়া” গল্পটি সঘনো বোধ হয় শত প্রশংসা করিলেও যথেষ্ট হয় না। ম্যালেরিয়ার একটি নিম্ন স্বরূপ আছে। অস্ত্র ব্যাধির মত তাড়াতাড়ি করিয়া সে অরসিকতার পরিচয় দেয় না; অস্ত্র অস্ত্রে জীর্ণ করিয়া সংসারের কপাস্তর ঘটায়—কিশোরকে করে শিশু, যুবাকে করে কিশোর—অস্থির শিশু, অস্থির কিশোর মায়ের বুকে একটা অসাড়তার প্রলেপ দেয়; সবচেয়ে গুস্তাটি তাহার—বাড়ীর কর্তা বিধবা পিসিমাকেও

নয় বৎসরের কচি ধুকীর মত কণ্ঠস্বরের সাজী করিয়া তামাশা দেখে। গল্পটি পড়িতে পড়িতে চোখে অশ্রু জরিয়া উঠে, মাঝে মাঝে অশ্রুতীব্রতা হাসির কাপনে ঝরিয়া পড়ে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিক্রমপুরের মেয়েলি ব্রতকথা—শ্রীমতী হিরণবালা দেবী কর্তৃক সংগৃহীত, দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহ, ৬৬ নং পাথরহাটী, যোগলচৌলী ঢাকা। ১৯৪৪, মূল্য ১।০

ব্রতকথা বাংলার মেয়েদের নিজস্ব জিনিষ ছিল। উহাতে বাংলা ভাবার এবং রচনা-বীতির একটি বিশেষ সজ্ঞা আছে। এই প্রাদেশিক ব্রতকথাগুলি লিখিয়া রাখিবার প্রয়োজন অনেক উপলব্ধি করিয়াছেন এক গ্রন্থও প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকর্তা নিজে এবং অন্যান্য লেখকের বচনা হইতে ৩৪টি ‘কথা’ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে দেখিয়া আমার হৃদয় হইয়াছে। এইরূপ পুস্তক হইতে বাংলার সামাজিক জীবনের বহু তথ্য সংগ্রহ করা বাইতে পারে। ‘কথা’গুলির আরম্ভে গ্রন্থকর্তা ব্রতগুলির পরিচয় দিয়াছেন। বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত প্রাদেশিক শব্দগুলির অর্থ দেওয়া হইয়াছে। এই ভালিকার সমস্ত প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ নাই, যেমন, টেটন, নড়িয়া, হুপুলা, হালা, বোন্দা প্রভৃতি। এই গ্রন্থে কতগুলি ধ্বংস প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শনও সংগৃহীত হইয়াছে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চল হইতেও এইরূপ সংগ্রহ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীরমেশ বসু

তীর্থভ্রমণ—শ্রীসুরেশ্বর রায়। রাম এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি ভারতের কয়েকটি এসিষ্ট তীর্থের পরিচয় ও পথব্যবহার ইতিবৃত্ত। অনেকগুলি মন্দিরে হাবি আছে। ভাষা সহজ ও সবল। ভ্রমণকাহিনী হিসাবে বইখানি পড়িতে মন্দ লাগে না। তবে লেখকের পারিবারিক ইতিহাস এমন গুরুত্বপূর্ণভাবে কাহিনীর সহিত জড়িত যে, বইখানিকে সাহিত্যক্ষেত্রীভূত করিতে মন সায় দেয় না।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ রায়গ মুখোপাধ্যায়

জঙ্গ বাহাদুর (নাটক)—শ্রীসজ্জন চৌধুরী। ১১৫ নং বরাণসী রোড, ঢাকা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ টাকা।

নাটকখানি নেপালের ইতিহাস লইয়া রচিত। কিন্তু রচনা নিতান্ত বিশেষত্বহীন। এই ধরণের বার্ষিক রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশের কোন অর্থ হয় না, তবে লেখকের আত্মস্তুতি হয় এই পর্য্যন্ত।

বাধার জোয়ার (নাটক)—শ্রীজীলাল বাগ কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

তিন অঙ্কে সমাপ্ত সামাজিক নাটক। লেখক নাট্যকার হইবার প্রচেষ্টা না করিলেই ভাল কবিতেন। তাহার সমাজের সহিতও পরিচয় নাই—লেখকনীতিও শক্তি নাই। শাস্ত্রব্রতী জীবনের সহিত পরিচয় না থাকিলে—নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে গেলে সে রচনা কখনও সার্থক হয় না।

দিল্লীর লাড্ডু (গ্রন্থন)—ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রাণ্ডিস্থান বীণা লাইব্রেরী। ১২ কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা।

লেখক লোক হাসাইবার জন্য প্রাণপ্রণ চেষ্টা করিয়াছেন—উদ্ভট

সজ্জিহীন রসিকতা ও ঘটনাসংস্থান, এমন কি বহুদানে অলীল রসিকতা এবং অলীল গান দিতেও কল্প করেন নাই। সোহা হাসিবে—কিন্তু সে লেখকের বার্ষ চেষ্টা দেখিয়া। একপ কটির পুস্তক প্রকাশিত না হওবাই বাহিনীর।

শ্রীতারাম্বর বন্দোপাধ্যায়

বৃহত্তর ভারতের পূজাপার্বণ—বারী সন্ধানন্দ কর্তৃক প্রণীত এবং চাত্রা বাতায় রোড, শ্রীরাধপুর হইতে শ্রীমন্তেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

বারী সন্ধানন্দ গিরি তীর্থযাত্রার বহির্গত হইয়া বৃহত্তর ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সরল ভাষায় নিজের অভিজ্ঞতার কল এই পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছেন। ভারতকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইলে বৃহত্তর ভারতের সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, নীতি, শিল্প ও কলা প্রভৃতির বিবরণ জানি আবশ্যক। অনেকের মধ্যে এই বিবরণ জানিবার একটা উৎস্রক্য দেখা দিয়াছে। বারী সন্ধানন্দ গিরি যবদীপ, শ্রাম, বলিদীপ, কাবোজ প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত স্থানসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া উহাদের ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ঐ সকল দেশের নানা সেবগুণের চিত্র প্রকাশিত হইয়া পাঠকের কৌতুহল চরিতার্থ করিয়াছে। এমন সহজ ভাবে বিবরণগুলি বর্ণিত হইয়াছে যে, উহা পাঠকের মনে একটা মনোরম প্রভাব রাখিয়া যায়। বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে এই পুস্তকে অনেক বিবরণ পাওয়া যায় ইহার জন্য বারীজী পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এইরূপ পুস্তকের প্রয়োজন বহু অধিক, বাংলা ভাষার উহার তত বেশী অভাব। হতয়া নানা দিক দিয়া এই পুস্তকের বহুল প্রচাৰ বাহিনীর।

শ্রীশুকুমাররঞ্জন দাশ

অভীভূতের সন্ধান—(আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক তথ্যের আলেখ্য), প্রথম সর্গ—শ্রীসোণীমোহন রায় (মৈত্র) লিখিত। শ্রীমতী বৃণালকুমারী রায় (মৈত্র-হুহিতা) কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় লেন, হাওড়া। পৃষ্ঠা ১৫০+১৫। মূল্য এক টাকা।

লেখক এই পুস্তকে একটি ধারাবাহিক গল্প অবলম্বন করিয়া, 'শ্রী-পুরুষের সমস্যাযাত্রার ধারা', 'হুটাব-শিল্প', 'পান্নাজীবনের আদর্শ', 'জাতিভেদপ্রথা', 'হিন্দুধর্ম ও তাহার শিক্ষা-নীতি', 'নারী-প্রগতি', 'পান-পার্কিং' প্রভৃতি নানা বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, এবং যুক্তি-সম্বন্ধে আমাদের এতলিত আচাঙ্গ্যস্থানগুলি সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থকাবের সহিত সকল বিষয়ে একমত না হইলেও তিনি যে এ বিষয়ে অনেকাংশে সকলকাম হইয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পরিশিষ্টে পণ্ডিত দুগাধাস লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনী ও তাঁহার 'পৃথিবীর ইতিহাস' ও 'চতুর্বেদ' নামক গ্রন্থদ্বয়ের আলোচনা আছে। বইখানি পাঠকগণের দিকট আদৃত হইবে আশা করি।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

সুভদ্রাজী — ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীললিতামোহন সাহা। প্রকাশক ডি. এন্. লাইব্রেরী। দাম এক টাকা।

লেখক ভূমিকার বলিয়াছেন, এই পুস্তকে প্রাচীন কালের এক আর্ধ্য-নারীর মহান চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে এবং এই গুণবতী নারীর আধ্যাত্মিক জীবনকালের গল্পে পরম হিতকর বলিয়া গৃহীত হইবে।

লেখকের উক্ত সার্থক। প্রায় বাইশ শত বৎসর পূর্বের সামাজিক সংস্থানের মনোরম চিত্র হিসাবে আধ্যাত্মিকটি অমূল্য। বর্তমান প্রেরণ-পঞ্জিল জীবনযাত্রাব আবর্ত হইতে কিঞ্চিৎ ক্ষণের জন্য মুক্তি পাইয়' যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়া। লেখকের ভাষা অনাড়ম্বর, বর্ণনাভঙ্গী মর্দঙ্গপর্ণা। একপ গ্রন্থের বহুল প্রচার সর্বশা কায়া। শুধু জীবনকালের মত, আবালবৃদ্ধবনিতার মনেই একপ গ্রন্থ সাহ্যপ্রদ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবে।

শ্রীমণীশ ঘটক

ব্রাউনৌ পঞ্চাশিকা—শ্রীমন্তেন্দ্রনাথ মৈত্র, এম-এ (ক্যাটাব), আই-ই-এস প্রণীত এবং ১৩৩১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা হইতে উদ্ভাস চট্টোপাধ্যায় এও সঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

রসের নিবেদন তাঁহার কাছেই সার্থক যিনি রসিক। শ্রীমন্ত হুবেন্দ্র-নাথ মৈত্র রসজ্ঞ কবি। ব্রাউনিঙের কাব্য তাঁহার মন অন্তরে যে ভাব ও চিন্তা উদ্ভূত করিয়াছে, যাক্তভাবার ছন্দে মৈত্র মহাশয় তাহাই নিপিন্ধ করিয়াছেন। অনুবাদ মাত্রই কঠিন। দেহান্তরে আত্মার স্ফোরের মত। বিশেষতঃ ব্রাউনিঙের কবিতা তাঁহার নিজস্ব ভাবের রচিত, সে ভাবের ভঙ্গী অনন্তসাধারণ, বেগ প্রবর, উপলব্ধ, বহুবর্ণপঞ্চাশী। ব্রাউনিঙের বদ্যেও তাঁহার এই প্রকাশভঙ্গি অপরিসীম। সেখনিবিষ্ট বাস্তব ঘটনাক্রমে বহুধর্মিত তাঁর বিদ্যাদীপ্তির মত যে আকর্ষণিকতা প্রতীক্ষামান মনকে সচকিত এবং আলোকিত কবি তোলে সেই মহম-প্রকাশের তড়িৎরূপে ব্রাউনিঙের বাক্যরীতি ছিলিত। ইংরেজী সাহিত্যেও এ পদ্ধতির আর পুনরাবৃত্তি হয় নাই। ভক্ত-পুজিত হইলেও কাব্যবাহ্যে ব্রাউনিঙ তাই চির-একাকী। তাঁহার কবিতা সুর-প্রধান নহে। একটি বিরাট বিরাটের মত প্রকাশিত হইয়া ব্রাউনিঙের ভাববাণি মনের আকাশকে প্রবর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। বদ্যে ভাষা ও ছন্দেব আবরণে মণ্ডিত করিয়া শ্রীমন্ত হুবেন্দ্রনাথ মৈত্র এই অধিতীর কবির ভাবগুণিসমূহকে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার অনুবাদের শব্দে মহমা ও লাগিত্যের অভাব নাই। গ্রন্থমুদ্রিতে এই নববেশসম্মিত ভাবগুণিগণকে নূতন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার পব পূর্বপরিচিতের সহিত নবপরিচয়ের অন্তর উৎকল হইয়া উঠে।

The Last Ride Together কবিতাটি ধরা যাক। অপরূপে বা অবাবোহে যাত্রা, 'অপরিজ্ঞমা', বোড়া ছুটাইয়া চলা প্রভৃতি কথা দিয়া বাংলার ছোট *ride* শব্দটির অর্থ প্রকাশ করিতে হয় : এখচ এই শব্দটির উপর সমগ্র কবিতাটির অনেকখানি নির্ভর করে। এই সব বাবা কাটাইয়া হুবেন্দ্রনাথ এই কবিতাটি বাংলায় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নাম দিয়াছেন, 'শেববার'।

অপরূপে বোরা দুজন্য

ছুটি যদি নিরবধি, গতিবেগ যদি না ফুরায়,

এ অমর প্রাণ যদি নবতর হয় পলে পলে

প্রাণতন রূপে ভাব নবরূপে কোঁটে দলে দলে,

কণ যদি চিরন্তন হয়... ইত্যাদি।

'মুদেবি' প্রভৃতি গল্প-কবিতার তিনি অনেকটা স্বাধীনতা পাইয়াছেন। *Love Among the Ruins*, *Two in The Campagna*, *Evelyn Hope*, *Love in a Life*, *Life in a Love*, *My Last Duchess*, *James Lee's Wife* প্রভৃতি ব্রাউনিঙের শ্রেষ্ঠ পঞ্চাশটি কবিতা তিনি মূল্যবান বাংলায় এবং হৃদয়র হৃদে রূপান্তরিত করিয়াছেন। কবি হুবেন্দ্রনাথ মৈত্রের এই অনন্তসাধারণ চেষ্টা অসামান্য হয় নাই। কঠিন, কর্কশ, কুশস্তার পর্ত্তপ্রায় মধ্যে পার্বত্য আবির্ভাবের

মত ব্রাউনিঙের কাব্যে প্রেমের প্রকাশ। এই প্রেম-কবিতার অনেকগুলি সহিত বাংলার পাঠক-সমাজের পরিচয় হাপন কবাইয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র সাহিত্যরসিকগণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। 'ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা' এই সম্পর্কে তাঁহার প্রথম আরোজন। এই আরোজনে তাঁহার রসজ্ঞ জ্ঞান, কাব্যশক্তি, প্রকাশনৈপুণ্য ও আনন্দময় চরিত্র সাধারণ পরিচয় পাইয়া আনন্দলাভ করিয়াছি।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ভারত কোন্ পথে?—শ্রীবারীন্দ্রবাহার বোম্ব প্রণীত। ১৯৩৬ সাল। ৪-বি, কুম্ভাবন পাল বাই-লেন, ভানবাজার হইতে গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১০ আনা। পৃঃ ১০৫।

"ভারত কোন্ পথে?" মানে শুধু ইহা নয়, ভারত কোন্ পথে চলিতেছে। ইহার আরও একটি অর্থ হইল ভারতের পক্ষে কোন্ পথে চলা উচিত। বারীনবাবু তাঁহার পুস্তকে দুইটি বিষয়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষের রাজনীতিকক্ষেে চরকা ও অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, নরাস্বাধ এবং কমুনিজমের নতুন পাশ্চাত্য ধারার বিষয় আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে এই সকলের পশ্চাতে খাঁটি রাজনৈতিক জ্ঞান বা কর্তৃত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার পিছনে আছে বুদ্ধির অপরিশুদ্ধতা, বিজ্ঞাতীরের প্রতি বিশ্বাস, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অন্ধ বোধ অথবা নিজেদের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ কর্তব্যবিমুখতা। তিনি বিচারকালে আরও একটি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বারীনবাবু মানবের একদে বিধাস করেন, তত্ত্বের কেবলমাত্র দৈবী শক্তিই যে মানবের স্থায়ী কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ ইহাই তাঁহার ধারণা। সেজন্য তিনি সর্ববিধ হিংসা ও অসহযোগিতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন হিংসা মানুষের আত্মরিক শক্তি, মানবকল্যাণের সৌধনিকেন্তন গড়িবার ক্ষমতা অস্তবের নাই। সে ভাঙিতেই জানে, গড়িতে পারে না। সেইজন্য তিনি বাস্তব অসহযোগিতা বর্জনের কথা বলিয়াছেন এবং অকলমে লিখিয়াছেন—

"শ্রীঅরবিন্দের জাতীয় শিক্ষা, দেশবন্ধুর গল্পসংগঠন, মহাত্মাজীর অর্থনৈতিক (নৈতিক?) প্রচেষ্টা ও অস্পৃশ্যতা-নিবারণ সবই সমান ব্যর্থতার পটভূমিতে হইয়াছে, কারণ এঁরা সকলেই উপেক্ষা করেছিলেন দেশের শাসন-শক্তিকে, ব্যবস্থাপক মণ্ডলীকে, legislative ও executive শক্তিকে। তারা দেখিলেন হাওয়ার রাজপ্রাসাদ গড়তে, তাবের চোরাবান্দুর উপর দেশবন্ধুর ভিত্তি রচনা করতে...এই কর্তব্যনাশ মনোবৃত্তির চাই আও অবমান, নেতার ও শাসকে আশা ধরকার সহযোগিতা। তা' নইলে দেশব্যাপী গঠন আকাশকুহর হইবে থাকবে। দেশের শাসন-শক্তি যে নিতান্তই দেশের, জাতির ধন-জন বলেই তা গঠিত ও পুষ্ট, —তা হাজার বিশেষীর সাহায্যই সেখানে থাকুক, এই মোটা কথাটা দেশের কর্মী ও নেতাদের বুঝবার দিন এসেছে। যারা তা' বুঝতে চায় না তারা চায় না দেশে খাঁটি কাজ..." তিনি আরও বলিয়াছেন, "কবে কোন অতীত যুগে বনিক (বণিক?) কেণ কয়েকজন ইরোজ এসে অরাজকতার অবসরে পতিত এদেশ জয় করেছিল বলে সমগ্র ইরোজ জাতিকে যুগা করা বা শাস্তি দেওয়া...অসম্ভব আক্রমণের বংশপরম্পরায় রক্তের নেশা blood feud এরই সঞ্চার।" সে বিষয়ে পরিহার করিয়া আমাদিগকে বুদ্ধিতে হইবে "যুগ-সেবতা বা জাতির জীবন-সেবতা তার নিগূঢ় বিধানই ইংলও ও ভারতের মিলন ঘটয়েছে, তাব পিছনে আছে

এক অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।" "আজ যদি এরা অকালে চলে যায় তাহলে এতগুলি বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, শ্রেণী ও বর্ণের অরণ্য এই দেশে চলে যে রক্তারক্তি, হানাহানি, গৃহ-বিচ্ছেদ, তার চিত্র সর্বত্র এখনই মুদ্রিত দেয়োগ্যমান।"

ইহা বারীনবাবুর বকীর মত, বুদ্ধি নয়। অতএব তাহা লইয়া তর্ক করা চলে না। যার মত গোধন করিবার অধিকার সকলেরই আছে, হয়ত যুগ-সেবতাই তাঁহাকে সে-মত গোধন করিবার প্রত্যাশে দিয়াছেন। যাক সে কথ। তবে সমালোচক হিসাবে বারীনবাবুর পুস্তকে একটি বিষয় লইয়া আমরা শিখা অপেক্ষা অসামান্য বেশী অনুভব করিয়াছি। রাজনৈতিক ব্যাপারে বারীনবাবু সাম্যের উপাসক নন, তিনি বলিয়াছেন যে তিনি সাম্যের পূজারী। ভাবাব ক্ষেত্রেও তিনি যে সাম্যসাম্যবিধান করিয়াছেন তাহাতে আনন্দিত না হইয়া উপায় নাই। একদিকে তাৎক্ষণিকগতমূল্য 'আরশীলু' 'নবতর', 'মহানতর', 'স্বপ্নগামল', 'গঠন কোপা', অপর দিকে ধর্ম এবং যোগিগণের দ্বারা ব্যবহৃত 'ক্ষমপত্র' (২৭?), 'প্রাণকমল', 'মহতি (মহতী?)', 'বিনতি', 'সিংহ' প্রভৃতি শব্দে অগুণ বোঝানো ঘটয়াছে। তবে একটি বিষয়ে আগাগোড়া সাম্যের ছাপ থাকিয়া গিয়াছে, তাহা বানানের ব্যাপার লইয়া। বারীনবাবু বরাবর স্বপ্নকে 'গুপ্ত' লিখিয়াছেন, শতাব্দীকে 'শতাব্দী' লিখিয়াছেন, উচ্চসেব ব-বলা বাদ দিয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ ও পুনরাবের পরিবর্তে 'পুনঃপুনঃ' ও 'পুনরাব' ব্যবহার করিয়াছেন। এক কথায় তাঁহার ভাবাব মধ্যে সাম্যভাব এবং সাম্যবাদ উভয়েরই উৎকৃষ্ট উদাহরণ মিলিতেছে।

সাতসাগরের পারে—কুমারী যমলা নন্দী। ১০ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। পৃঃ ১২০, ৪৭ ছবি। দাম দুই টাকা।

লেখিকা ১৯৩১ সালে আন্তর্জাতিক কলোনিয়াল একজিভিশন উপলক্ষে প্যারিসে ছয়মাসকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। পরে নৃত্যশিল্পী উদ্বোধকরের সঙ্গে ইউরোপে বহু স্থানে ভ্রমণ করেন। পুস্তকখানিতে তাঁহার প্রবাসের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

লেখিকার বিশেষ কোনও বৃত্তিভঙ্গী নাই। তত্ত্ব তিনি বিশেষ কাব্যোপলক্ষে স্তব্ধকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন বলিয়া গভীর ভাবে কিছু সেখিবারও সময় পান নাই। কিন্তু মোটের উপর ইউরোপ দেশটি তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল।

আমরা আশা করি পুস্তকখানি সাধারণ পাঠকের কাছে আদৃত হইবে।

কেদার-বদরীর পথে—শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী। ১৯৫, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রিট, কলিকাতা। পৃঃ ৮×১৪৪ পৃঃ। মূল্য এক টাকা। ভ্রমণ-কাহিনীর সাধারণ বই। তাহা স্বরূপে, পড়িতে ভালই লাগে। ঝাঁহারা কেদার-বদরীর পথে বাজা করবেন তাঁহাদের উপযোগী অনেক সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

দুই-একখানি ছবির সম্বন্ধে গোল বাস্তিতেছে। ২৬ পৃঃ "পার্বত-গুহার" যে-ছবি মুদ্রিত হইয়াছে তাহা ভুবনেশ্বরের পার্শ্বস্থিত উদ্বোধনীর বিখ্যাত ব্যাভ্রভঙ্কার ছবি। ১২ পৃঃ "হরিদ্বারের দৃশ্য" বলিয়া যে ছবিটি নীচের দিকে ছাপা হইয়াছে তাহা মধ্যভারত নন্দীদাতার অবস্থিত উকারেশ্বরের মন্দির। আমরা আশা করি এগুলি ভ্রান্তিজনক ছাপা হইয়াছে।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

জড়ের রূপ

শ্রীঅশোককুমার বসু

চিরদিনই মানুষ প্রকৃতির রহস্যাবগ্ঠন মোচন করিতে চাহিয়াছে—মানুষের সংস্কার তাহার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির নিকট বার বার পরাজিত হইয়াছে। পূর্বকাল হইতে মানুষ গ্রহ-নক্ষত্রের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ ইহার উপদানের কথা কল্পনা করিতে আরম্ভ করিল। আজ বৈজ্ঞানিকের সাধনার বলে জড়কণার অসামান্য রূপের বিশ্বয়কর আভাস পাওয়া গিয়াছে—একটি কণার ভিতর যেন এক বিশাল ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে।

যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে যে এই পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ ক্রিতি, অপ, ভেদ, মন, ব্যোম এই পাঁচটি মূল উপাদানে গঠিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান-জগতে এক নূতন যুগ আসিল। 'কারলাইল ও নিকলসন দেখাইলেন যে, বিদ্যুৎ-প্রবাহ দ্বারা জলকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন (জলজান এবং অগ্নিজান) এই দুইটি বায়বীয় পদার্থে পরিণত কর যায়। ইহাতে প্রমাণ হইল যে রাসায়নিক কিংবা জড়-ক্রিয়া (physical process) দ্বারা কোনও মূল উপাদানকে (element) বিভ্ৰষ্ট করা যায় না। তাহার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরমাণুবাদ গড়িয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাওয়া গেল, সর্বসমেত ২২টি মূল উপাদান আছে। একটি উপাদানের পরমাণু অল্প উপাদানের পরমাণু হইতে ভিন্ন এবং প্রত্যেক পরমাণুর একটি বিশেষ ওজন, রাসায়নিক বিশেষত্ব এবং বিশিষ্ট বর্ণচ্ছত্র (spectrum) আছে। কিন্তু বর্ণচ্ছত্রের বিচ্ছিন্ন জটিলতায় এবং এই অণবিক সম্বন্ধের কোনও সহজ অনুপাত না থাকায় পরমাণুর সরল গঠনের সম্বন্ধে বিজ্ঞান-জগৎ সন্দেহান্বিত হইয়া উঠিল। গত শতাব্দীতে মেনডেলিফ এবং লোদার মেয়ার সমস্ত মূল পদার্থকে একটি বিশেষ তালিকায় বিভিন্ন পর্ধ্যায়ে সাজাইলেন। ইহার মধ্যে আটটি উল্লম্ব (vertical) ঘর আছে—সমস্ত পরমাণুর জড় এবং রাসায়নিক চরিত্র এক শ্রেণীর, সেই

উপাদানগুলি এক একটি উল্লম্ব ঘরে সাজান হইল। বাম দিক হইতে ডান দিক পর্য্যন্ত আনুভূমিক (horizontal) ভাবে এক একটি করিয়া স্থান-সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে—ইহাকে পরমাণবিক সংখ্যা (atomic number) বলে। এই সংখ্যা অনুসারে আনুভূমিক ভাবে বাম দিক হইতে ডান দিকে গেলে ক্রমশঃ আণবিক ওজনের সঙ্গে তাহাদের রাসায়নিক-এবং জড়-বিশেষত্ব বদলাইয়া যায়—কিন্তু যখন একটি আনুভূমিক শ্রেণী শেষ হয় তখন আবার উল্লম্ব ঘরে ফিরিয়া আসিলে পূর্বের ছাত্র অণুর বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে পারা যায়। এই জন্ত এই তালিকার নাম দেওয়া হইয়াছে পুনরাবৃত্তিক তালিকা (periodic table)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সর্ব উইলিয়ম ক্রুক একটি নিম্ন চাপের বায়ুতে পূর্ণ নলের ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত করিয়া অপূর্ণ রশ্মি লক্ষ্য করিলেন, এবং এই রশ্মি বায়ুচাপের তারতম্যের উপর নির্ভর করে দেখা গেল। সর্ব জে. জে. টমসন বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে বিদ্যুৎ-কণাই হইতেছে এই রশ্মির কারণ—ইহার বৈদ্যুতিক চরিত্র ঋণাত্মক (negative) এবং ইহার ওজন জলজান-পবমানুর ১৮০০ ভাগেব এক ভাগ মাত্র। ইহার নামকরণ হইল বিদ্যুতিন। এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞান-জগতে নব নব আবিষ্কারের প্রেরণা আসিল।

রাদারফোর্ড এবং বোর পরমাণুর এক অভিনব চিত্র আঁকিলেন। একটি ধনাত্মক ভরকে (mass) কেন্দ্র করিয়া বিদ্যুতিনগুলি অবিশ্রাম তাহাদের নির্দিষ্ট কক্ষ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এদিকে তাপ-রশ্মির সমস্ত সমাধান করিতে গিয়া মনোবী প্লাঙ্ক পূর্বপ্রচলিত মতের বিরোধিতা করিয়া বলিলেন যে একটি চলন্ত বিদ্যুতিন অবিশ্রাম রশ্মি বিকীরণ করে না—ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে এক এক বলক শক্তি নির্গত হয়, এবং এই শক্তি নির্গত রশ্মির ক্রান্ততার (frequency) সহিত সমানুপাতিক (proportional)।



লর্ড রাদারফোর্ড

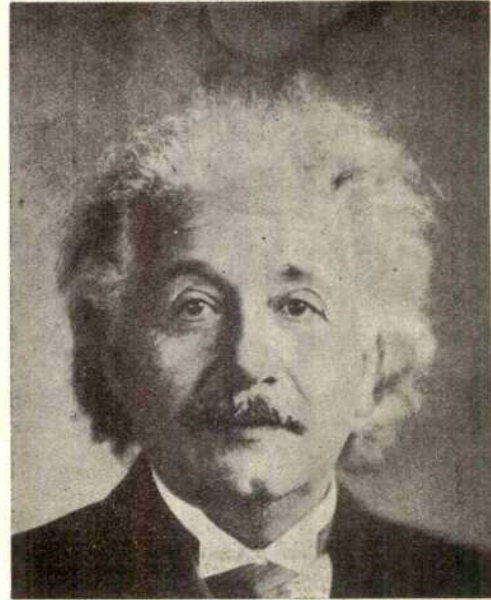
প্রাক্তের এই তথ্যকে ভিত্তি করিয়া বোর আরও একটি মত প্রকাশ করিলেন—যত ক্ষণ একটি বিদ্যুতিন কোনও নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুরিতেছে তত ক্ষণ তাহা কোনও রশ্মি বিকীরণ করে না—কিন্তু যখনই ইহা একটি কক্ষ হইতে আর একটি কক্ষে যায় তখনই দুইটি কক্ষের শক্তির বিয়োগ-ফল তাহা হইতে নির্গত হয়।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকবাদ বিজ্ঞান জগতে আবার পরিবর্তন আনিল। এত দিন ধারণা ছিল যে ভর ধ্রুবক (constant)। নিউটনের এই মতের বিরুদ্ধে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে ভর বেগের উপর নির্ভর করে। এই নবপ্রমাণিত মতের দ্বারা সমারফেল্ড প্রমাণ করিলেন যে, বিদ্যুতিন শুধু যে বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে তাহা নহে, উপবৃত্তাকারেও ঘুরিতেছে।

এই সময় কম্পটন দেখাইলেন যে একটি এক্স-রশ্মি একটি কার্বন-ফলকের ভিতর দিয়া প্রেরণ পূর্বক রশ্মি-বর্ণ বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে দুইটি রশ্মির আবির্ভাব হইয়াছে—একটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য (difference of wave-length) একেবারে পূর্বের ত্রায় এবং আর একটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য দীর্ঘতর। প্রতি পরমাণুর সর্ববহির্কর্তী কক্ষে

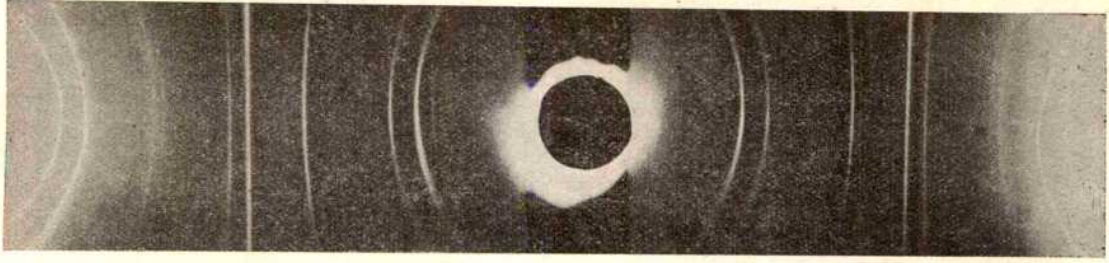


প্লাঙ্ক



আইনষ্টাইন

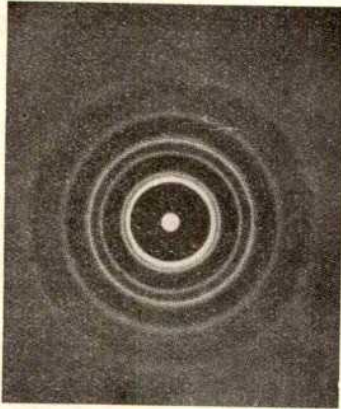
যে-সকল বিদ্যুতিন অবস্থান করে তাহাদের বন্ধন-শক্তি খুব কম। এইরূপ অনেক বাধাহীন (free) বিদ্যুতিন পরমাণুর মধ্যে অবস্থান করিতেছে। এক পরিমাণ (Quantum)



ঋণাত্মক-ধনাত্মক বিদ্যুতিনের পথরেখা। অধ্যাপক হরপ্রসাদ দত্ত কর্তৃক গৃহীত আলোক-চিত্র

এক্স-রশ্মি যখন বিদ্যুতিনকে আঘাত করে তখন সেই বিদ্যুতিন ঐ রশ্মির খানিকটা শক্তি গ্রহণ করে এবং অবশিষ্ট শক্তিটুকু দুইটি বলের ধাক্কার ত্রায় আর এক দিকে চলিয়া যায়; ফলে দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সৃষ্টি হয়। এখানে কম্পটন এক্স-রশ্মির কণা-চরিত্র কল্পনা পূর্বক তাহার তথ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এদিকে ডিভ্রলি, জি. পি. টমসন প্রভৃতি মনোবিগণ নানা বাদান্তবাদ ও পরীক্ষা দ্বারা এই সমস্তকে আরও জটিল করিয়া তুলিলেন। আমরা জানি যে সূর্যের আলোক সাধারণতঃ একটি বিশেষ শক্তির তরঙ্গ। একটি আলোক-রশ্মি যখন কোনও সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যায় তখন সেই পথের প্রতিবিম্বের (image) দুই পার্শ্বে সারি সারি আলো-



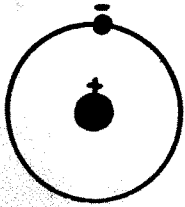
বিদ্যুতিন-রশ্মির আলোক-চিত্র : ধর্পপাতের দ্বারা প্রতিবিক্ষিপ্ত

ছায়ার সৃষ্টি হইয়া আলোকের তরঙ্গবাদ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে। ঠিক এমনি ভাবেই যখন একটি স্ফটিকের ভিতর দিয়া বিদ্যুতিন-রশ্মি প্রেরণ করা হয় তখন একটি উজ্জ্বল কেন্দ্রকে বৃত্ত করিয়া আলো-ছায়ার সৃষ্টি হয়। আলোক-

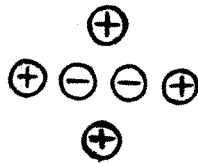
চিত্রের সাহায্যে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে লাউয়ে (Laue) এর আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছিল যে স্ফটিক মাত্রেরই বিশেষত্ব এই যে ইহাদের পরমাণু (atom) গুলি একটি বিশেষ প্রণালীতে একই ভাবে সাজান থাকে এবং দুইটি পরমাণুর মধ্যে যে-স্থল ফাঁকা থাকে তাহাই ঐ অল্পপাতে ক্ষুদ্র তরঙ্গের আলোছায়া সৃষ্টি করিবার পক্ষে যথেষ্ট। ইহাতে প্রমাণ হইল যে বিদ্যুতিন একটি তরঙ্গ। পূর্বেই কম্পটন-প্রতিষ্ঠিত তথ্যের ফলে তরঙ্গের কণা-রূপ জানিতে পারা গিয়াছিল, এখন কণার তরঙ্গ-রূপও প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহা হইলে বিদ্যুতিন কি কণা এবং শক্তি উভয়ই? একটি নূতন বিজ্ঞান (ওয়েভ-মেকানিক্স) গড়িয়া উঠিল। ইহার পর হইতে প্রত্যেক ব্যাপারই তরঙ্গ-তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা হইতে লাগিল।

এইবারে আমরা ক্রমশঃ পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিব। আমরা জানি যে কয়েকটি তেজো-বিকীরক পদার্থ আছে—তাহারা সাধারণতঃ তিন প্রকার রশ্মি নির্গত করে, ক-রশ্মি, খ-রশ্মি ও গ-রশ্মি। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে ক-রশ্মি ধনাত্মক, খ-রশ্মি ঋণাত্মক এবং গ-রশ্মি এক্স-রের ত্রায় তেজ মাত্র। পূর্বেই বলিয়াছি যে ঋণাত্মক বিদ্যুতিন একটি কেন্দ্রের চতুর্দিকে অবিরাম ঘুরিতেছে। কিন্তু এই কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত? ইহার আকার এবং বিশেষত্বই বা কিরূপ? পরমাণুর মধ্যে আছে ধনাত্মক বিদ্যুৎ, সে কথাও সত্য, কারণ বিদ্যুতিন ঋণাত্মক এবং অণুর বৈদ্যুতিক সাম্যের জন্য ধনাত্মক কেন্দ্রের কল্পনা অবশ্যসম্ভাবী। রাদার-ফোর্ড ক-রশ্মিকে একটি পাতলা ধাতুর পাতের ভিতর দিয়া প্রেরণ করিয়া দেখেন যে ঐ রশ্মির অধিকাংশই কোনও

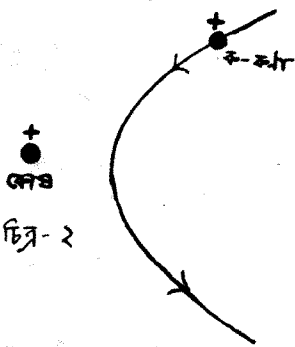
রকম দিক পরিবর্তন করিতেছে না—কিন্তু কয়েকটি আবার সম্পূর্ণভাবেই দিক পরিবর্তন করিতেছে। ইহার দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে পরমাণুর ভিতর এমন কোনও বস্তু আছে যাহার ভর প্রায় ক-কণার (alpha-ray) ভরের সমান এবং উহা ক-কণারই দ্বায় ধনাত্মক। এইগুলি হইতেছে পরমাণু-কোষ (atomic nucleus)। রাদারফোর্ডের এই সুন্দর পরীক্ষার ফলে বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণুর বহু রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আরও কয়েকটি পরীক্ষার ফলে বৈজ্ঞানিকেরা বলিলেন যে ওজনই পরমাণুর প্রধান বিশেষত্ব নহে। পরমাণবিক সংখ্যাই (atomic number) রাদারফোর্ডের পরীক্ষিত ব্যাপারের প্রধান কারণ; ইহা পরমাণু-কোষের বৈদ্যুতিক চার্জের সমান এবং ইহা পারিপার্শ্বিক বিদ্যুতিনের সংখ্যা ও পরমাণুর রাসায়নিক এবং জড়-ব্যবহার নির্ণয় করে। এইবারে আরও গভীর ভাবে পরমাণু-কোষের দিকে দেখিতে হইবে।



চিত্র-১



চিত্র-৩



চিত্র-২



চিত্র-৪

১। হাইড্রোজেন অণু

২। একটি ক-কণা পরমাণু-কোষের নিকট আসিবার সময় দিক-পরিবর্তন করিতেছে।

৩। হিলিয়াম-কোষ।

৪। আধুনিক কোষের চিত্র—দুইটি নিউট্রন এবং দুইটি প্রোটন পাশাপাশি রহিয়াছে।

হিলিয়ামের পরমাণবিক সংখ্যা হইতেছে ২ এবং ভর হইতেছে ৪। বৈদ্যুতিক সাম্য রক্ষা করিবার জন্য পরমাণু-কোষের বাহিরে মাত্র দুইটি বিদ্যুতিন আছে। তাহা হইলে কোষের মধ্যে আরও দুইটি ধনাত্মক বিদ্যুতিন থাকিবে—মোট চারটি প্রোটন এবং দুইটি বিদ্যুতিন।

সর্ব্বাধুনিক পরীক্ষায় দেখা যায় যে প্রোটন এবং বিদ্যুতিন স্বাধীনভাবে পরমাণু-কোষের মধ্যে থাকিতে পারে না। বেশীর ভাগই ক-কণারূপে থাকে। বিদ্যুতিনের চৌম্বক ভ্রামক (magnetic movement) কল্পনা করিয়া ধারণা হইল এই যে যদি পরমাণু-কোষের মধ্যে কোন বিদ্যুতিন থাকেও তবে তাহার বিশেষত্ব বাহিরের বিদ্যুতিন হইতে পৃথক। পরমাণু-কোষের মধ্যে বাধাহীন বিদ্যুতিনের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে আর একটি মত এই : আমরা জানি যে সমান চার্জ বিকর্ষিত হয়—তবে কিরূপে পরমাণু-কোষের স্থায়িত্ব সম্ভব? তখন এই মত প্রকাশিত হইল যে খুব সম্ভব অতি নিকটে ঐ বিকর্ষণ আকর্ষণে পরিণত হয়। রাদারফোর্ড প্রভৃতি এক নতুন তথ্যে ইহার সমাধান করিলেন। তাঁহাদের মতে পরমাণু-কোষের চারি পাশে একটি পোটেন্সিয়াল (potential) প্রাচীর আছে। যখন বিদ্যুতিনকে কণা কল্পনা করা যায় তখন উহা ঐ পোটেন্সিয়াল প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ—কিন্তু তরঙ্গ কল্পনা করিলে উহা অনায়াসে ঐ প্রাচীর ভেদ করিতে পারে। এই তথ্য অনুসারে কোনও বিদ্যুতিন কোষের মধ্যে থাকিতে পারে না। তবে কিরূপে খ-রশ্মির আবির্ভাব হয়? তখন নীল বোর বলিলেন যে বিদ্যুতিন কোষের মধ্যে অবস্থান করে না সত্য, কিন্তু তেজ বিকীরণের বিচূর্ণ-ক্রিয়াতে উহা সৃষ্টি হয়।

আবার আমরা আমাদের পূর্ব্ব আলোচনায় ফিরিয়া যাইব। পুনরাবৃত্তিক তালিকার পরমাণবিক ওজনের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে অনেক উপাদানের পরমাণবিক ওজন পূর্ণসংখ্যা নহে—যথা, ম্যাগনেসিয়াম ২৪.৩২ ইত্যাদি। পরীক্ষাদ্বারা এই তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। দুইটি পরমাণু-কোষের চার্জ সমান কিন্তু বিভিন্ন। ইহাদিগকে ইংরেজীতে আইসোটোপ

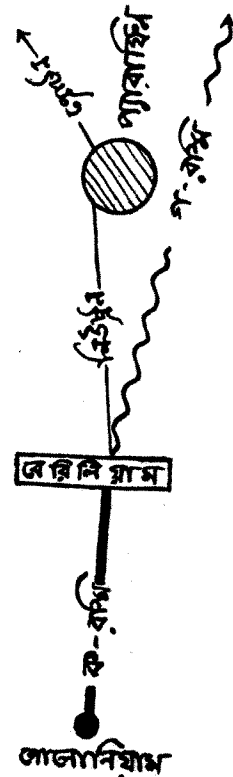
(isotope) বলে, (গ্রীক ভাষায় isos অর্থে সমান; topos অর্থে জায়গা, স্থান—অর্থাৎ যে সমস্ত মূল উপাদান পুনরাবৃত্তিক তালিকায় সমান স্থান অধিকার করে)। কোনও রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা ইহাদের বিভিন্নতা লক্ষ্য করিবার উপায় নাই। সর্ব জে. জে. টমসন এবং অ্যাম্‌স্টনের বিশেষ পরীক্ষার ফলে ইহাদের ভরের বিভিন্নতা হ্রদের ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। দুইটি আইসোটোপের সংমিশ্রণে ঐরূপ খণ্ড পরমাণবিক ওজন অসম্ভব নহে।

হিসাবের ফলে দেখা গিয়াছে যে, যে-শক্তিদ্বারা পরমাণু-কোষ এইরূপে রহিয়াছে তাহা প্রচণ্ড। কিরূপ বলের সৃষ্টিতে এইরূপ সম্ভব হইয়াছে? এবং এই বলের প্রভাবে কিরূপে এতগুলি কণা এইটুকু জায়গার মধ্যে ভীড় করিয়া রহিয়াছে? পরমাণু-কোষের মধ্যে প্রোটনের সংখ্যা অধিক পরিমাণে থাকিয়া কেনই বা কোষকে ধনাত্মক করিয়াছে? ঋণাত্মক পরমাণু-কোষ কি সম্ভব নহে? অন্ততঃপক্ষে এমন পরমাণু-কোষ যাহার মধ্যে প্রোটন এবং বিদ্যুতিন সমান সংখ্যায় অবস্থিত?

বিজ্ঞান-জগতে কোনও কিছু মাপিতে কিংবা হিসাব করিতে গেলে একটি একক (unit) প্রয়োজন। এত দিন পর্যন্ত অন্নজ্ঞান এবং জলজ্ঞান পরমাণু-কোষ (প্রোটন) যথাক্রমে পরমাণবিক ওজন এবং পরমাণবিক গঠনের একক রূপে স্বীকৃত হইত। কারণ ধারণা ছিল যে জলজ্ঞান এবং অন্নজ্ঞান বৃষ্টি খাটি পদার্থ। কিন্তু এই বিশ্বাসে আঘাত পড়িল যেদিন প্রমাণিত হইল যে জলজ্ঞান এবং অন্নজ্ঞান আইসোটোপের সংমিশ্রণ। অত্যাশ্চর্য মূল উপাদানের আইসোটোপের ভরের মধ্যে যে বিভিন্নতা থাকে তাহা সামান্য—কিন্তু জলজ্ঞানের অতিবিরল আইসোটোপের ভর সাধারণ জলজ্ঞানের দ্বিগুণ। ইহার নাম দেওয়া হইল ভারী জলজ্ঞান অথবা ডয়ট্রন (Deuteron)। (গ্রীক ভাষায় প্রোটন অর্থে প্রথম—ডয়ট্রন অর্থে দ্বিতীয়)। ইহার চার্জ এক এবং ভর দুই। ইহাকে সংক্ষেপে D বলা হয়। আমরা জানি যে জলজ্ঞান এবং অন্নজ্ঞানের দ্বারা জল গঠিত। যখন ভারী জলজ্ঞান পাওয়া যায় তখন ভারী জলও নিশ্চয়ই পাওয়া সম্ভব। বাস্তবিকই এখন ভারী জলও পাওয়া যায়। ইউরে (Urey)

বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণপূর্বক এই ভারী হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব নিখুঁত ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাদারফোর্ড নিউট্রনের (Neutron) অস্তিত্ব কল্পনা করিলেন। জগতে কল্পনা প্রথম পথ আঁকিয়া দিয়া যায়, পরে হয় সেই অনুসারে কাজ হয়। একথা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বার বার প্রমাণিত হইয়াছে। বোর-এর হাইড্রোজেন-পরমাণুর চিত্র-অনুসারে ধনাত্মক ভরের চতুর্দিকে একটি বিদ্যুতিন অবিশ্রাম ঘুরিতেছে। যদি কোনও উপায়ে ইহা কোষের মধ্যে আসিয়া পড়ে তবে উহার চার্জ শূন্যে পরিণত হইবে, কিন্তু ভর সমানই থাকিবে—কারণ বিদ্যুতিনের ভর নগণ্য। ১৯৩১ সালে জার্মানীর বোঠে এবং বেকার ভেজোবিকীরণকারী পদার্থ পোলোনিয়ম একটি বেরিলিয়াম পাতের সংস্পর্শে রাখিয়া দেখাইলেন



কুরি-জোলিওর পরীক্ষা—প্যারাক্সিন হইতে প্রোটন নির্গত হইতেছে।

যে খুব বেগবান ক-রশ্মি বেরিলিয়াম-কোষের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক উহাকে চূর্ণ করে এবং একেবারে নূতন রশ্মি নির্গত করে। গাইগার পরীক্ষা করিলেন যে ঐ রশ্মি খুব পুরু

পদার্থও ভেদ করিতে সমর্থ—ইহার তরঙ্গাস্তর গ-রশ্মির তরঙ্গাস্তর অপেক্ষাও ক্ষুদ্র এবং প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন। কুরি এবং জোলিও ঐ রশ্মিকে হাইড্রোজেন-সমন্বিত প্যারাফিনের মধ্য দিয়া প্রেরণ করিয়া দেখাইলেন, ইহা প্রোটন নির্গত করিতে সমর্থ। তাহাদের মতে কমপটন-এফেক্টের স্থায় ইহা হাইড্রোজেন-কোষের সংঘাতে বেগ দান করে। এই রশ্মি পূর্ণাপেক্ষা শক্তিমান বলিয়া লক্ষিত হইল। এইরূপে বিভিন্ন পদার্থ অহুসারে ইহার শক্তির বিভিন্নতা লক্ষিত হইল। চ্যাডউইক তখন এই সমস্তার মীমাংসা পূর্বক দেখাইলেন যে বেরিলিয়াম-রশ্মি গ-রশ্মি নহে, উহা বিদ্যুৎহীন কণামাত্র—বিভিন্ন পরমাণু-কোষের সংঘাতে তাহাদের বেগ দান করে। ইহার ভর রাদারফোর্ডের পূর্ব কল্পিত জল-জানের ভরের সমান বলিয়া প্রমাণিত হইল। ক-রশ্মি বেরিলিয়াম-কোষের ভিতর প্রবেশ পূর্বক নিউট্রন নির্গত করে।

কিন্তু একটা বিষয়ে সকলেরই মনে একটু খটকা বাধিল। ঋণাত্মক বিদ্যুতিনগুলির ভর এত কম অথচ ধনাত্মকের মধ্যে সর্কীপেক্ষা ক্ষুদ্র যে প্রোটন তাহার ভর ১৮৩৬ গুণ হইল কিরূপে? তাহা হইলে কি ধনাত্মক-কণা আরও ক্ষুদ্র হওয়া সম্ভব? ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে একই তথ্যের মীমাংসার ফল বাহির হইল। ঠিক ঋণাত্মক বিদ্যুতিনের স্থায় এক প্রকার বিদ্যুতিনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল যাহার ভর বিদ্যুতিনের ভরের সমান কিন্তু চার্জ ধনাত্মক। লেনিনগ্রাডের স্কোবেলজীন স্বজন-রশ্মি (cosmic ray) দ্বারা ইহা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই স্বজন-রশ্মি এক প্রকার রহস্যময় রশ্মি। এই জগতে কিছুই স্থির নাই; এমন কি মহাশূণ্যও অস্থির। স্বল্প নক্ষত্র হইতে আলোক-তরঙ্গ আসিয়া সমস্ত শূন্যকে অনবরত অস্থির করিয়া তুলিতেছে।

সূর্য হইতে অনবরত বিদ্যুতিন-রশ্মি নির্গত হইতেছে। এই বিদ্যুতিন রশ্মি যখন এই পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া পড়ে তখনই “অরোরা”র অদ্ভুত দৃশ্যের আবির্ভাব হয়। বাস্তবিক এই বিদ্যুতিন-রশ্মি পৃথিবীতে আমাদের নিকট আসিয়া পৌছায় না; বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অল্প কোনও বস্তুর ভিতর দিয়া আসিবার সময় গ-রশ্মির স্থায় এক

প্রকার রশ্মি নির্গত করে, তাহাই আমাদের নিকট আসিয়া পৌছায়। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের কয়েক জন মার্কিন এবং যুরোপীয় বৈজ্ঞানিক বেলুনে চড়িয়া দেখিলেন যে একটি স্বরক্ষিত বিদ্যুত-মাপ-যন্ত্র ক্রমশঃ ইহার বৈদ্যুতিক চার্জ হারাইয়া ফেলিতেছে।

স্কোবেলজীন এই স্বজন-রশ্মির আলোকচিত্র, খুব শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে রক্ষিত উইলসন-আধারের (Wilson-chamber) মধ্যে লইয়াছিলেন, এবং চিত্রে যে সমস্ত রেখা পাইয়াছিলেন সেগুলির বক্রতা এবং বিশেষত্ব



মিলিকান

লক্ষ্য করিয়া কণার ভর এবং চার্জ পরিকল্পনা করা কঠিন নয়। ক্যালিফোর্নিয়ার মিলিকান এবং এণ্ডারসন ও ইংলণ্ডের ব্র্যাকেট অতি সহজ পরীক্ষা দ্বারা আরও গভীর ভাবে ইহার মীমাংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। দুইটি শক্তিমান চৌম্বক মেরুর মধ্যে রক্ষিত একটি বায়বীয় পদার্থ-পূর্ণ আধারে (chamber) যখন স্বজন-রশ্মি সম্পাত করা হয় তখন এণ্ডারসন প্রথমে লক্ষ্য করিলেন, কয়েকটি রেখার বক্রতা, ঋণাত্মক বিদ্যুতিনের দ্বারা এত দিন যাহা লক্ষিত হইতেছিল তাহার বিপরীত। এণ্ডারসন ইহার নাম দিলেন ধনাত্মক বিদ্যুতিন (Positron)। অল্পদিনের মধ্যেই অল্প উপায়ে



তাম্রের দ্বারা প্রতিবিক্ষিপ্ত (Diffracted) রঞ্জন-রশ্মির আলোক চিত্র । লেখক-কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র

পজিট্রন উৎপন্ন করা সম্ভব হইল। যখন কোনও লঘু পদার্থ গ-রশ্মিদ্বারা আঘাত করা যায় তখন উইলসন-চেম্বারে বিদ্যুতিন-দ্বয়ের আবির্ভাব হয় এবং ইহাও বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয় যে ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক বিদ্যুতিন একই স্থান হইতে নির্গত হইতেছে। এণ্ডারসন এবং কুরী প্রভৃতি দেখাইলেন যে এই দুইটি বিদ্যুত-কণার যুক্ত শক্তিমূল গ-রশ্মির শক্তির সমান। র্যাকেট বলিলেন যে গ-রশ্মি-কোষের অভ্যন্তরে প্রথর বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে দুইটি বিপরীত চরিত্রের কণায় বিভক্ত হয়। একটি শক্তির

পরিমাণ পদার্থে পরিণত হইল। আবার ইহার বিপরীত ব্যাপারও ঘটিতে দেখা গেল একটি ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক কণা পরস্পরের সংঘাতে পরস্পরকে ধ্বংস করিয়া ফেলে এবং ইহার পরিবর্তে এক প্রকার রশ্মি নির্গত হয়। তাহার নাম অ্যানিহিলেশন র্যাডিয়েশন (annihilation radiation)। পদার্থ ধ্বংস হইয়া শক্তিতে পরিণত হয় এবং শক্তির ধ্বংসের ফলে পদার্থের জন্ম হয়—এই সত্য আজ তত্ত্ব মাত্র নহে, একেবারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত।

আলোচনা

শ্রাবণের প্রবাসীতে বিবিধ-প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ সরকার সন্ধ্যা লিখিত বিষয়ে দুই একটি ভুল রহিয়াছে। মনখী কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮০০ শকে সূর্য্যপ্রথম 'বালকবন্ধু' নামে শিশুদের জন্য একখানা পাক্ষিক পত্র প্রকাশ করেন। প্রায় ১২ বৎসর পরে উহা মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়। 'সখা' নামক ছেলেদের মাসিকপত্র ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রমদা বাবু মাত্র দুই বৎসর উহার সম্পাদকতা করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর ১৮৮৫ ও ১৮৮৬ এই দুই বৎসর কাল পর্যন্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উহার সম্পাদক ছিলেন। অন্তর্দ্বাচরণ সেন মহাশয় ১৮৮৭-১৮৯২ সন পর্যন্ত 'সখা' সম্পাদন করেন।

শিশু-সাহিত্যের পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকার সম্পাদন সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নাম সর্বপ্রায়ে উল্লেখযোগ্য।

ত্রিশুধাংশু গুপ্ত

[আমরা বাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাতে "ভুল" কিছু আছে মনে করি না। তবে, উহা বাংলা শিশু-সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস নহে, এবং পর-লোকগত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সন্ধ্যা কিছু লিখিতে গিয়া শিশু-সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা আমাদের অভিপ্রত্যয় ছিল না, এবং তাহা লিখিবার প্রয়োজনও ছিল না। যোগীন্দ্র বাবুর ঠিক আগে কে কি করিয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ মাত্র আমরা করিয়াছিলাম। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বালকবন্ধু' পত্রিকা সন্ধ্যা আমরা অনেক বার অনেক কথা বলিয়াছি।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

অলখ-বোরা

শ্রীশান্তা দেবী

২২

রাজির অঙ্ককারে একলা সুধার কাছে আপনার মনের কথা বলিয়া হৈমন্তী বুঝিতে পারে নাই দিনের আলোতে পাঁচ জনেব সম্মুখে একথা ভাবিতে তাহার কি রকম লাগিবে। পবদিনই মিলির বিবাহ। চারিদিকে মহা ব্যস্ততা; হৈমন্তীও যে কিছু কম ব্যস্ত ছিল তাহা নয়। কিন্তু আজ তাহার সুধা তপন মহেন্দ্র সকলের সম্বন্ধেই মনে একটা প্রবল সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইচ্ছা করিতেছে বিবাহ-উৎসব কেলিয়া দিন কতকের মত কোথাও পলাটয়া যায়। কিন্তু সে উপায় ত নাই। যথাসম্ভব দূরে দূরে থাকিয়াই কোন রকমে তাহাকে দিনটা কাটাতে হইবে।

ছেলেদের অবস্থা ঠিক সে রকম না হইলেও সকলেই আগের দিনের তুলনায় একটু যেন সঙ্কুচিত। নিখিল তপনের নিকট সঙ্কুচিত, তপনও সুধা হৈমন্তীকে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলিতেছে, পাছে নিখিল তাহার কোন ব্যবহার কি কথায় বিশেষ কিছু অর্থ ভাবিয়া বসে, পাছে সে মনে করে যে তপন তাড়াতাড়ি আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছে। মহেন্দ্রও রাগে এবং অভিমানে আজ কয়দিনই একটু বেশী গম্ভীর হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছে। সুধা ত মনে করিয়াছিল সকালবেলা উঠিয়াই সে বাড়ী চলিয়া যাইবে। সেখানে নির্জনে নিজের মনের সঙ্গে বা-হয় একটা বোঝাপড়া তাহাকে স্মর করিতে হইবে। কিন্তু আজ মিলিদিবির বিবাহ। আজ বাড়ী চলিয়া গেলে লোকে তাহাকে বলিবে কি? সে কি কৈকিয়ৎ দিয়াই বা বাড়ী যাইতে পারে? বাড়ীতে অকস্মাৎ অঘটন ত কিছু ঘটে নাই। তাছাড়া এখানে সে আজ অনেক কাজের ভার লইয়াছিল, সে সব কাজই বা কাহার ঘাড়ে কেলিয়া দিয়া যাওয়া যায়! তাহাকে আজ সকলের সঙ্গে মিলিয়া হাসিমুখেই সমস্ত কর্তব্য ও আনন্দ-কোলাহলে যোগ দিতে হইবে। মনের একটা দিকে

একেবারে চাবি বন্ধ করিয়া উৎসবের মাঝখানে তাহাকে নামিতেই হইবে।

কিন্তু একই বাড়ীতে যাহার সহিত প্রত্যেক কাজেই দেখা হইবে তাহাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া থাকিবে সে কি করিয়া? চোখ বুজিয়াও যাহাকে সুধা দেখিতে পায়, চোখের সম্মুখে তাহাকে দেখিয়া কে ভুলিয়া থাকিতে পারে? তপনের গ্রীক দেবতার মত সুন্দর মুচ্ছবি তাহার মানস দর্পণে যে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে তপন কি আশ্চর্য্য সুন্দর! সুধার মতই আর পাঁচ জনের যদি তপনকে ভাল লাগিয়া থাকে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। সুন্দরকে কাহার না ভাল লাগে? মানুষ ত রূপের চাবি দিয়াই মানুষকে প্রথম ষাটাই করে। পরিচয় পাইবার আগেই মানুষের চোখ অপরের একটা মূল্য নির্ধারণ করিয়া রাখে ইহারই সাহায্যে। সুধাও কি তাহাই করিয়াছে? শুধু রূপের মোহেই কি সে এমন করিয়া আপনাকে জড়াইয়া কেলিয়াছে? নিজের সম্বন্ধে একথা ভাবিতেও তাহার মাথা হেঁট হয়। যদি ইহা সত্য হয় তবে আপনার এ-মোহ সে চূর্ণ করিয়া চোখের জলের সহিত বিসর্জন দিবে।

সুধা আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নীরবে আপনার মনেই নানা উপায় খুঁজিতে লাগিল। সে ভাবিতে চেষ্টা করিল যেন কোনও ভয়াবহ রোগে তপনের ঐ দেবকান্তি কালিমায হইয়া গিয়াছে, যেন আত্মস্থিক অগ্নির উৎপাতে তপনের মুখশ্রী আর মানুষের চিনিবার উপায় নাই। তখনও কি সুধা এমনই করিয়া ঐ বিগতশ্রী তপনের ধ্যান করিতে পারিবে? শঙ্কিত হইয়া সুধার মন যেন ‘না’ ‘না’ বলিয়া উঠিল। যে-তপন তপনই নয়, সম্পূর্ণ অন্ধ মানুষ, তাহাকে কি করিয়া সে এমন করিয়া ধ্যান করিতে পারে? কিন্তু তখনই লজ্জায় ধিকারে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

এই তাহার ভালবাসা ? রূপের মুখোসটুকুকেই কি শুধু সে ভালবাসিয়াছিল, মুখোস খুলিয়া লইলেই আর সেদিকে কিরিয়া তাকাইবে না ? তবে তাহার এ ভালবাসার মূল্য কি ?

কানে আসিয়া বাজিল জলকল্লোলের মত তপনের মধুর গভীর কণ্ঠস্বর। স্বধা ওই কণ্ঠস্বর কি ভুলিতে পারে ? যদি পুড়িয়া ঝলসিয়া যায় ওই দেবকান্তি, যদি স্বধার দুই চক্ষুও অন্ধ হইয়া যায়, তবু বুকের দরজার আসিয়া আঘাত করিবে ওই পরিচিত কণ্ঠের মন-মাতানো স্বর। স্বধা শুধু রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয় নাই। তাহা হইলে এত সংক্ষেপে রূপহীনতার ভয়কে কাটাইয়া উঠিতে পারিত না। মন প্রথম শাসনে শঙ্কিত হইয়াছিল বটে ; কিন্তু পলকের মধ্যে সে ভয় কাটাইয়া উঠিতেছে কিরূপে ? আপনার মন্ব্যবসে স্বধার বিশ্বাস আর একটুখানি দৃঢ় হইল, আপনার প্রতি অবজ্ঞা তাহার মন হইতে দূর হইয়া মনটা অনেকখানি হাল্কা বোধ হইল। তপনের কণ্ঠস্বরও যদি বিধাতা হরণ করিয়া লন, তবুও তপনকে সে ভুলিবে না, এ-কথা বলিবার যোগ্যতা যেন তাহার থাকে, মনে এই প্রার্থনা তাহার জাগিয়া উঠিল।

হৈমন্তীর প্রতি গভীর ভালবাসা ও মমতায় স্বধা আপনার প্রেম বিশ্লেষণ করিয়া আপনাকে পরীক্ষা করিতে বসিয়াছিল। যদি তাহার প্রেমকে সে রূপের মোহ বলিয়া বুঝিতে পারে, তবে তখনই যেন হৈমন্তীর পথ উন্মুক্ত রাখিয়া দিয়, সে আপনি সরিয়া যাইতে পারে। কিন্তু পরীক্ষায় নামিয়া দেখিল আপনাকে ওই হীনপর্যায়ভুক্ত মনে করিতেই তাহার প্রেম যেন বিগুণ বলীয়ান হইয়া উঠিতেছে। মাহুষের রূপ-বোঁদন ছুদিনের, কিন্তু প্রেম অবিনশী এ-কথা সে বহুবার পড়িয়াছে শুনিয়াছে, কিন্তু বয়োধর্ম এ-কথা কখনও ভাবিবার ইচ্ছা কি অবসর তাহাকে দেয় নাই। আজ যেন প্রৌঢ়স্বের তত্ত্বজ্ঞান তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠিল—পুষ্পের সৌরভ ক্ষণিকের হইলেও অনন্তের কথা তাহার মধ্যে জাগিয়া আছে, ঝরা ফুল হারানো ফুলের স্মৃতির ভিতরেও সেই ক্ষণিক সৌরভ চিরদিন থাকে। মাহুষের যে-রূপ আজ অতীতের গহবরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, একদিন তাহা সত্য ছিল, তাহাকেই এই ক্ষম-

স্বপ্নের মধ্যে চিরদিন সত্য বলিয়া দেখিবে এ ক্ষমতা কেন তাহার থাকিবে না ? তপনকে এমন করিয়া ভালবাসাতেই ত স্বধার ভালবাসার গৌরব।

কিন্তু হৈমন্তী ? সেও কি এমনই করিয়া ভালবাসে নাই ? স্বধার ভালবাসা পার্থিব অর্থে হৈমন্তীর দুঃখকামনা নয় কি ? মাহুষ ভালবাসার যে প্রতিদান চায়, পরস্পরের ভালবাসা পরস্পরকে জানাইবার নিবেদন করিবার যে চিরপুরাতন অপূর্ণ আনন্দটুকু চায়, তাহার ভিতর তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নাই, তাহাতে ভাগ-বাটোয়ারা চলাইতে ত সে পারে না। কিন্তু বিধাতা যে তাহার ভাগ্যে তৃতীয় ব্যক্তিকে লিখিয়াছেন। স্বধা যদি সাধারণ মাহুষের মত ভালবাসার আদান-প্রদানের আনন্দ কামনা করে তবে সে ত হৈমন্তীর দুঃখকামনাই করিতেছে। তপন স্বধাকে ভালবাসুক এই ইচ্ছাই ত হৈমন্তীর দুঃখকামনা। হৈমন্তী স্বধার মনের কথা জানে না, সে যদি আকুল আগ্রহে তপনকে চায়, তাহাকে পাইবার চেষ্টা আগ্রহ করে, তবে তাহাকে প্রেমধর্মের অক্ষুণ্ণ কামনাই বলিতে হইবে। কিন্তু স্বধা যে হৈমন্তীর মনের কথা জানিয়াছে, স্বধা যে এত দীর্ঘ দিন ধরিয়া হৈমন্তীকে এমন গভীরভাবে ভালবাসিয়াছে, সে যদি হৈমন্তীর মত কামনা করে, তবে আপনাকে যে অপরাধী মনে হয় আপন দেবতার নিকট। তপনকে আপনার অধিকারের গভী দিয়া বিরিয়া রাখিতে চাওয়া তপনের কাছে যে কথা একদিন শুনিবার আশা সে করিয়াছিল সে কথা আর শুনিতে চাওয়া হৈমন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে কি তবে ভুলিতে হইবে ?

উৎসব-আয়োজনের মাঝখানে স্বধার চোখে জল আসিল। মিলি তাহার জীবনের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল শুধু বৈধের জোরে, শুধু আপনার দৃঢ়চিত্ততার জোরে। হয়ত স্বধাও একদিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে বৈধ ও দৃঢ়চিত্ততার জোরে। কিন্তু মিলির মত পুরুষের কি তাহার জীবনে আসিবে ? আজ ত তাহার পথ সে কোথাও দেখিতে পাইতেছে না। কেন বিধাতা তাহাকে এমন কঠিন পরীক্ষায় ফেলিলেন বাহাতে জীবনের প্রথম সুখস্বপ্নের মধ্যেই তাহাকে ত্যাগের মন্ত্র জপ করিতে হইবে ? তাহার যে সোনার স্বপ্নের মধ্যে বিধাতার সৃষ্টির কি বিধানের

কোন অশ্রুচাচরণ নাই, কোন মানুষ কি জীবন অমল কামনা নাই, তাহা এক মুহুর্তে তাহারই মনের কাছে এমন অপরাধ হইয়া উঠিল কেন? কেন ইহা হইতে মুক্তির উপায় সে খুঁজিয়া পাইতেছে না?

শৈশবের স্বপ্নে একদিন যেমন সে তলাইয়া গিয়াছিল, তাহার এ যৌবন-স্বপ্নেও সে তেমনই করিয়া ডুবিয়া যাইবে বলিয়া কত মায়ায়, কত সাধে, কত রহস্তে ইহাকে সে অপূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল। এই প্রথম ধাপের পবন হস্ত কত দীর্ঘ দিনের দীর্ঘ পথ পড়িয়াছিল বিশ্বয়ে আনন্দে ও সৌন্দর্য্যে অপরূপ। কিন্তু মরীচিকার মত কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে সে স্বপ্ন কাননের ছায়া?

তপনের মনে স্থা কি হৈমন্তী কাহারও সম্বন্ধে কোনও চিন্তা উঠিয়াছে কি না, জীবনে সঙ্গীর কোন প্রয়োজন কি আশ্রয় সে অনুভব করিয়াছে কি না স্থা কিছুই জানে না। হইতে পারে সে এ-বিষয়ে কিছু ভাবে না, যদিও স্থার সে-কথা বিশ্বাস হয় না। তবে যাহার জীব প্রমাণ সে কিছু পায় নাই তাহা বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করাই ভাল। হইতে পারে মহেন্দ্রের মত সেও ওই উপকথার রাজ-কন্যাটিকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ভালবাসিয়াছে। স্থা তাহা জানিবার জন্ত ব্যগ্রতা দেখাইবে না। আপনি যখন তাহা স্থার নিকট প্রকাশ হইবে তখন ত সে জানিতেই পারিবে।

ভোরবেলা কখন বিছানা ছাড়িয়া হৈমন্তী চলিয়া গিয়াছিল, ভোরের সামান্য একটু ঘুমের মধ্যে স্থা তাহা জানিতে পারে নাই। সকালে বিছানা হইতে উঠিয়া এই সব চিন্তায় ঘরের বাহির হইতে তাহার দেবী হইয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি তৈয়ারী হইয়া লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। হয়ত নীচে কাজকর্ম শুরু হইয়া গিয়াছে, কত সোকজন আসিয়া পড়িয়াছে। হয়ত তপন নিখিলরাও আসিয়া কাজে লাগিয়াছে। সে সকলের চেয়ে দেবী করিয়া নীচে নামিলে লোকের কাছে বলিবে কি?

সকলেই কাজে ব্যস্ত দেখা গেল। কিন্তু আজ কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেছে না। হৈমন্তী তরকাবি কোটার মোটেই অভ্যস্ত নয়। হয় লেখপড়ার কাজ, না-হয় ঘর সাজানো, এই দুইটার একটাতেই তাহার হাতবশ বেশী। কথা ছিল বাসরঘর সাজাইবার ভার সে লইবে,

তাহার কথামতই ছেলেরা ঘর সাজাইবে। কিন্তু অকস্মাৎ সকালে উঠিয়া সে বলিল, “আমার অত ছড়োছড়ির কাজ ভাল লাগছে না। আমি এক জয়গায় ব’সে তরকারি কুটি। স্নেহ এসেছে, গর বেশ টেই আছে, ওই ঘর সাজাতে সাহায্য করতে পারবে।”

অগত্যা তপন মেহলতার সান্নায়েই ঘর সাজাইতে লাগিয়াছে। যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সারিয়া সে চলিয়া যাইবে। আজ এ-বাড়ী নেশীক্ষণ সে থাকিবে না, হুরেশের বাড়ীতে বরষাজীব অদর-অভ্যর্থনাব কাজেও তাহার প্রয়োজন আছে। সেখানে কাজ করিবার মানুষ বিশেষ কেহই নাই। এত দিন সকলে মিলিয়া মেঘের বাড়ীব কাজে মাতিয়াছিল, একটা দিন অন্ততঃ কিছুক্ষণ বরের বাড়ীর কাজও করা দরকার। নিবাহ ব্যাপারে কন্ডার স্থান যতই উপরে হউক, বরের অন্ততঃ সভা জাঁকাইয়া একবার আসার আয়োজন ত আছে।

সভায় চেয়ার সাজানো ও কর্পেট পাতার কাজে নিখিলেব খুব যে প্রয়োজন ছিল তাহা নয়, কিন্তু সে গিয়া জুটিয়াছে সেইখানে। যত মুটের মাংস হইতে চেয়ার নামাইয়া ও কর্পেটের রোল খুলিয়া সে সম্বাস্ত হইয়া উঠিয়াছে। হৈমন্তীদেব গ্রামের আত্মীয় আর দুই-তিনটি ছেলে তাহার সহিত কাজে মাতিয়াছে; মানুষগুলি একেবারেই অচেনা বলিয়া নিখিলের সমুচিত ভাবটা অনেকখানিই এখানে কাটিয়া গিয়াছে।

মহেন্দ্র গিয়া শুরু করিয়াছে আহারের ঠাই করার কাজ। হাত জুড়িয়া আসন পাতা, ফুটা গেলাস বাছিয়া ফেলা, ছোট ছেলেমেয়েরা ছেঁড়াশাকড়ায় করিয়া সব পাতা মুছিয়াছে কিনা তদারক করা, এই সব নানা কাজ। এখানে বেশীর ভাগই কুটোকাচার দল। স্থা আর সকলেব অপেক্ষা মহেন্দ্রকেই আজ বেশী নিবাপদ মনে করিয়া এইখানেই গিয়া জুটিল।

কিছুক্ষণ দুই জনেই নীরবে কাজ করিল। তার পর মহেন্দ্রই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, “আপনাদের সভায় আমিই ছিলাম হংস মধ্যে বকো যথা, এবার ত আমি চললাম, আপনারা নিষ্কটক হবেন।”

স্থা বলিল, “এর মধ্যে আপনি আবার কোথায় চললেন?”

মহেন্দ্র বলিল, “আমি খুব শীগগিরই আশ্রয়ী চল যাইছি। আগে মনে করেছিলাম কিছু দিন পরে গেলেও চলবে। এখন ভাবছি যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই ভাল। আপনার বন্ধুবান্ধবদের জানিয়ে দেবেন তাদের চক্ষুশূল কেউ আর থাকবে না।”

সুখা বলিল, “আপনি কি যে বলেন তার ঠিক নেই। আপনার সঙ্গে আমাদের কি ওই রকম সম্পর্ক? আমার ত কোন দিন তা মনে হয় নি।”

মহেন্দ্র বলিল, “আপনার না হতে পারে, আমারও এক সময় মনে হত না। কিন্তু এখন যতই দিন যাচ্ছে ততই সকলের স্মৃতিচূড় দেখে তাই মনে হচ্ছে।”

চুখের ভিতরও সুখার হাসি আসিল। মহেন্দ্র “বন্ধুবান্ধব, সকলে” ইত্যাদি সকল কথাতেই গৌরবে বহুবচন বলাইতেছে।

কাজ কেলিয়া সে একবার ভাঁড়ার-ঘরের দিকে চলিল। হৈমন্তী তাহাকে এড়াইয়া চলিতেছে সুখা বুঝিয়াছিল, তবু মহেন্দ্র-বেচারার বিদায়বার্তাটা তাহার নিজের মুখেই হৈমন্তীর শোনা উচিত মনে করিয়া সুখা তাহাকে একবার ছাদে ডাকিয়া আনিবে ঠিক করিল।

মস্ত বড় একটা পাকা কুমড়াকে ছুইখানা করিবার চেষ্টায় হৈমন্তী তখন ব্যস্ত। পালিত-গৃহিণী তাহার কাজে বাধা দিতেছিলেন, কারণ জীলোকের নাকি লাউ কুমড়া ছুখানা করা শাস্ত্রে বারণ আছে। শাস্ত্রের কথা অমান্য করিবার জন্যই হৈমন্তীর জেদ বেশী।

সুখা আসিয়া বলিল, “একবারটি উপরে এস দেখি। ছাদে একটা কাজ আছে।”

কুমড়াটা তখনকার মত রাখিয়া হৈমন্তী সুখার পিছন পিছন চলিল। একবার সে জিজ্ঞাস্যদৃষ্টিতে সুখার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু সুখা কোনই জবাব দিল না।

ছাদের দরজার পাশে চিলেকোঠার মহেন্দ্র বড় বড় জালায় জল বোঝাই করাইতেছিল, উড়ে ভারীদের চীংকার-চোঁচোমেচিতে ছাদ তখন মুগ্ধরিত। অকস্মাৎ সুখা ও হৈমন্তীকে সেখানে দেখিয়া মহেন্দ্র কুঠরির বাহিরে বাহির হইয়া আসিল।

সুখা বলিল, “জালার ভিতর একটা ক’রে কর্পূরের ছোট

পুঁটলি ফেলে রাখলে কেমন হয়? অনেকে বলে ওতে জল স্থগ্ধিও হয়, আর জলের দোষও কেটে যায়।”

হৈমন্তী বলিল, “ভাল হয় বলেই ত আমারও মনে হচ্ছে।”

“আচ্ছা, পাঁড়াও আমি কিছু কর্পূর জোগাড় ক’রে আনি।” বলিয়া সুখা তখনই তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

সুখা চলিয়া যাইতেই মহেন্দ্র বলিল, “হৈমন্তী, তুমি সেদিন থেকে আমার সঙ্গে আর কথা বল না, আমার উপর তুমি খুব রাগ করেছ, না?”

হৈমন্তী বলিল, “রাগ কেন করব? রাগ আমি এক কৌটাও করি নি। আপনি কিছু অজায় কাজ ত আর করেন নি। আপনার সঙ্গে আমার যদি কোন বিষয়ে মতভেদ হয় তাতে কিছু রাগ করবার কারণ আছে ব’লে আমি মনে করি না।”

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, “এটা ঠিক মতভেদ নয়। আমি তোমার দরজায় প্রার্থী হয়ে পাড়িয়েছিলাম; তুমি দরজার প্রার্থনা শুনতে রাজি নও এই তোমার আমার ঝগড়া। কিন্তু তা ব’লে আর কি এদিকে ঘিরেও তাকাবে না?”

হৈমন্তী বলিল, “আপনার সব বাড়াবাড়ি কথা। আমি রোজই ত আপনার সঙ্গে কথা বলছি। কোন দিন কথা বলিনি বলুন।”

মহেন্দ্র বলিল, “হ্যাঁ বল বটে, পাঁচকোড়নের এককোড়নের মত। ওটা আমাব সঙ্গে কথা বলাও যত আর ভেমো গোয়ালার সঙ্গে বলাও তত। আমি কানে তোমার গলার ঘরটা শুনতে পাই, এতে যদি আমার সঙ্গে কথা বলা হয় তবে নিশ্চয়ই বল।”

হৈমন্তী ম্লান হাসিয়া বলিল, “কি করব মহেন্দ্র-দা, আপনি আমার কিসে রাগ করে বসবেন; তাছাড়া ওইরকম সব কথার পর আমার কি রকম অপ্রস্তুত লাগে আগের মত বক্তৃতা করতে।”

মহেন্দ্র হঠাৎ কথার স্রব বদলাইয়া বলিল, “হৈমন্তী, তুমি কি তোমার ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেলেছ? আমার একথা-টুকুর অন্তত ঠিক জবাব দিও।”

হৈমন্তী বলিল, “না, আমি কিছু ঠিক করে ফেলিনি। কোনদিন ঠিক করে ফেলব কি না তাও জানি না।”

মহেন্দ্র বলিল, “তবে আমি মনে একটু ক্ষীণ আশা রাখতে পারি না কি?”

হৈমন্তী বলিল, “একবার ত ওসব কথা হয়ে গিয়েছে মহেন্দ্র দা। আমার অনেক কাজ রয়েছে, আমি এখন নীচে বাই। আবার কেন মিথ্যা কথা কাটাকাটি ক’রে আপনাকে রাগাব?”

মহেন্দ্র বলিল, “না, তুমি এখন নীচে যাবে না। তোমাকে কয়েকটা কথা শুনে যেতেই হবে।” তুমি আমার কথার জবাব দেবে না জানি, তবু আর একবার বলছি যদি আমার উপর বিন্দুমাত্র করুণাও তোমার হয়ে থাকে আমি চলে যাবার আগে আমার সেটা জানতে দিও। আর এক মাসের মধ্যেই আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তার ভিতর তোমার সঙ্গে দুই একদিনের বেশী বোধ হয় দেখাই হবে না। আমার ছুরদুট তার ভিতর প্রসন্ন হবে এমন আশা করি না। কিন্তু জেনো যতদিন তুমি নিতান্তই না পর হয়ে যাচ্ছ তত দিন যেখানেই থাকি না কেন তোমার আশা আমি ছেড়ে দেব না।”

হৈমন্তী বলিল, “আপনাকে কোনও কাজে কি চিন্তায় বাধা দেবার অধিকার ত আমার নেই, আমি আর কি বলব? আমি নিজেকে এমন মূল্যবান মনে করি না, যার জন্য মিথ্যা আশায় আপনাব মত মানুষের এত দীর্ঘকাল নষ্ট করা উচিত। আপনি বিদ্যালয়ের আশায় বিদেশে যাচ্ছেন, বিভা আপনার মনের এ-সব কোভ ভুলিয়ে দিক, এই প্রার্থনা করি।”

মহেন্দ্র বলিল, “তোমার গুড্ উইশেসের জন্য অনেক ধন্যবাদ। তবে আমার মনের কোভ আমার জিনিষ, আমি ভুলি না-ভুলি সে আমার ভাবনা। সে-বিষয়ে তোমার কোন সাহায্য আমি চাইছি না। একটা কথা তোমায় বলে রাখি, যদি ইচ্ছা হয় আমার এই অল্পরোখটুকু রক্ষা ক’রো। আমি ত শীগগিরই চলে যাব, আমি চলে যাবার আগে কি পরে যদি তুমি নিজের সম্বন্ধে পাকা বন্দোবস্ত কিছু করে ফেল আমাকে দয়া করে জানিও। যত দিন তোমার কাছ থেকে খবর না পাব তোমার সম্বন্ধে দুরাশা আমার মন থেকে যাবে না।”

হৈমন্তী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিল, “যদি জানাবামত কিছু ঘটে তবে জানাব। কিন্তু কেন আপনি বিশেষ করে ওই দিকে ঘোঁক দিচ্ছেন? আমি একলা কিছুকাল পৃথিবীতে বাস করতে কি পারি না?”

মহেন্দ্র বলিল, “তুমি করতে পার, তবে তোমাকে একলা না থাকতে দেবার লোক ঢের আছে।”

হৈমন্তী বলিল, “কে বলেছে আপনাকে এ-কথা?”

মহেন্দ্র বলিল, “কে আবার বলবে? আমি কি চোখে দেখতে পাই না? তপন নিখিল সন্তনেরই মনে ওই এক চিন্তা। আমি চলে গেলে ওদের পথ পরিষ্কার হবে।”

হৈমন্তী বৃকের ভিতর ছুঁক ছুঁক করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া শুধু বলিল, “আপনার মাথায় এতও আসে।”

মহেন্দ্র হৈমন্তী বৃক আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল, “না এসে উপায় কি হৈমন্তী? তুমি ছাড়া আমার যে যিভীয় চিন্তা নেই। তোমাকে আমাব চোখের উপর থেকে হরণ ক’রে নিয়ে যাবে তার খোঁজ আমি করব না ত কে করবে?”

হৈমন্তী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্র তাহার দুইটা হাত আপনার দুই মূঠার ভিতর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “হৈমন্তী, যদি মানুষের একাগ্রতার কি সাধনাব কোনও মূল্য থাকে, তবে তোমাকে আমি আমার ক’রে পাবই, তুমি যতই কেন মুখ ঝিরিয়ে সার য়াও না। আমি দূরে চলে যাচ্ছি, কিন্তু আমার সমস্ত মন এইখানে তোমাকে ঘিরে পড়ে থাকবে, তুমি অস্বস্তি কববে, তুমি ভুলে যেতে পারবে না।”

হৈমন্তীর ছুইখানা হাত মহেন্দ্রের হাতের ভিতর ঘামিয়া ও কাঁপিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে হাত ছুইখানা ছাড়াইয়া লইল।

৩০

উৎসব-সমারোহ শেষ হইয়া গিয়াছে। মিলি সুরেশ তাহারের ক্ষুদ্র গৃহে নৃতন সংসার পাতিয়াছে। তাহার এখনও ঘর-সংসার গুছাইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ইতিমধ্যেই একটা কর্তব্যের দ্বায়ে তাহারের একটু ব্যস্ত

হইয়া উঠিতে হইয়াছে। মহেন্দ্র সত্যসত্যই দুই বৎসরের জন্ত জায়াশ্রী চলিয়া যাইবে। মিলিদের বিবাহে যে কয়জন প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছিল, মহেন্দ্র তাহাদের মধ্যে এক জন। মহেন্দ্রকে বিদায়-বেলা একটু আদর অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীতে না থাকিলে ভদ্রতা হয় না।

আজ মহেন্দ্রের বিদায় উপলক্ষ্যে স্বরেশ তাহাদের ছোট দলটিকে নিজের বাড়ীতে ডাকিয়াছে। বাড়ীতে আসবাব খুব বেশী নাই, কাজেই ঘরের মেঝেতে ফরাস পাতিয়া বসিবার জায়গা করা হইয়াছে। হেলান দিয়া বসিবার জন্ত যথেষ্ট ডাকিয়া নাই, মিলি আজ বিছানা হইতে মাথার বালিশ-গুলি তুলিয়া আনিয়া ফরাসের উপর সাজাইয়াছে। বাড়ীতে ত্রৈ মাত্র একটা, কিন্তু দানসামগ্রীতে বড় বড় থালা গোটা দুই পাওয়া গিয়াছে। সেই থালার উপরেই খাবারের রেকাবীগুলি সাজাইয়া খাবার পরিবেশন করা হইবে ঠিক হইল। মিলির হাতে একটা থালা-স্বরেশের হাতে আর একটি। রেকাবীগুলি কিন্তু কাঁসার পাওয়া যায় নাই, সেগুলি কাচেরই। তাহাদের জলখাবারের দুইখানা মাত্র কাঁসার রেকাবী আছে, তাহাতে পান মশলা সাজাইয়া টি-সেটের কাচের প্লেটগুলিই কাঁসার থালার উপর সাজান হইয়াছে। নিখিল বলিল, “তোমাদের ঘরের সাজসজ্জা সবই বেশ বেশী রকম হয়েছে, কেবল এই টি-সেটটা ছাড়া। এটা খাঁটি সাহেবের দোকান থেকে আমদানি।”

মিলি বলিল, “আমার পাখরবাটি জামবাটি সবই আছে, দিশি মতে তাতে চা দিতে পারতাম, কিন্তু খাবারগুলো ত হাতে হাতে তুলে দিতে পারি না; তাই রায়ে পড়ে বিলিটী সেটটাই বার করতে হল।”

নিখিল বলিল, “ফুলকাটা মাটির সরা পাওয়া যায়, তাইতে খাবার দিয়ে আর টেশনের হিন্দু চায়ের মত মাটির ভাঁড়ে চা দিলে কিছু মন্দ হ’ত না।”

মহেন্দ্র বলিল, “মাহুঘের স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে দেখতে হ’লে ওইটাই সব চেয়ে ভাল প্রথা বলতে হবে। একবার উচ্ছিষ্ট বাসন আর না ব্যবহার করা এক মাটির জিনিষ ব্যবহার করলেই হয়।”

স্বধা বলিল, “পাতার বাসন আরও ভাল। আমাদের দেশে পাতার থালা বাটি সবই লোকে ব্যবহার করে।

এখানে শহরের মাঝখানে গাছই নেই ত পাতা কোথা থেকে আসবে?”

তপন বলিল, “গাছ নেই ব’লে পাতার অভাব আছে মনে করবেন না। বাজারে গেলেই যত পাতা চান কিনতে পাবেন। তবে আপনাদের দেশের মত শালপাতা নয়, কলার পাতা।”

হৈমন্তী বলিল, “পাতার বাসন, পাতার আসন দিয়ে একদিন পিকনিক করলে মন্দ হয় না।”

তপন বলিল, “দল যে রকম ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, এখন কি আর চট করে পিকনিক হবে?”

নিখিল হাসিয়া বলিল, “তা না হয় হৈমন্তী দেবীর গৃহ-প্রবেশের সময় আমরা সবাই পাতার বাসন গাঁথতে বসে যাব।”

হৈমন্তী বলিল, “অত হুদুর্ ভবিষ্যতের কথা না ভেবে সম্প্রতি একটা কিছু করবার ব্যবস্থা করলেই ত ভাল হয়।”

নিখিল বলিল, “যে রকম দিনকাল পড়েছে তাতে আপনাদের ভবিষ্যৎকে হুদুর্গরাহত মনে করবার কোন কারণ দেখছি না।”

হৈমন্তী বলিল, “আচ্ছা, আপনি মন্ত ভবিষ্যৎজ্ঞা হয়েছেন, আপনাকে আর বেশী ভবিষ্যৎবাণী করতে হবে না।”

নিখিল তবুও হাসিয়া বলিল, “ভব-ব্যারেলড্ গানের সামনে পড়লে মাহুঘের প্রাণ আর কতক্ষণ টেকে? আপনি কি এতই বজ্রকঠিন?”

তপন ও মহেন্দ্র দুই জনেই নিখিলের দিকে কটমট করিয়া তাকাইল। হৈমন্তী মুখ লাল করিয়া একবার তপনের দিকে চাহিয়া দেখিল। তপন তখন চোখ নামাইয়া মাটির দিকে চাহিয়া আছে। মহেন্দ্র গম্ভীর স্ববে বলিল, “স্বরেশ-দা, তোমাদের প্রোগ্রামে এর চেয়ে ভাল আলোচ্য বিষয় কি কিছু নেই? যদি নিতান্তই কিছু না থাকে, না-হয় গ্র্যামোফোনটা বাজাও, যাবার আগে গোটা কয়েক ভাল গান শুনে যাই।”

মিলি বলিল, “গ্র্যামোফোনের গান শোনবার আগে কিছু আনারসেব সরবৎ খেয়ে দেখুন, প্রোগ্রামে একটু বৈচিত্র্য অল্পভব করতে পারেন।”

নিখিল ভরসা পাইয়া বলিল, “এমন ভাল জিনিষের কথা আগে বলেন নি কেন? তাহলে ব্রহ্মতেজে ভঙ্গ হবার সম্ভাবনাটা আমার একটু কমত।”

মিলি খালার উপর কতকগুলি কাল পাথরের উচু উচু বাটি বসাইয়া সরবৎ আনিয়া হাজির করিল। স্বরেশ সেই সঙ্গেই তাহার পোর্টেবল গ্রামোফোনে রেকর্ড লাগাইয়া দিল,

“এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শুভ মন্দির মোর—”

নিখিল চীৎকার করিয়া উঠিল, “স্বরেশ-দা, কর কি, কর কি! এখুনি আদালতে তোমার নামে নালিশ রুজু হয়ে যাবে।”

স্বরেশ বলিল, “এটা ত আমার ‘অনারে’ হচ্ছে না, তোমাদের জন্তেই হচ্ছে। তোমাদের তিন তিন জনের ভাবনার কাছে আমার একলার স্বথক্শ অতি তুচ্ছ জিনিষ।”

মিলি বলিল, তার চেয়ে ওই গানটা দাও না—

“এমন দিনে তারে বলা যায়

এমন ঘন ঘোর বরিষায়—”

স্বরেশ বলিল, “আচ্ছা, একে একে সবই হবে। যত-গুলো বর্ষার গান আছে সব ক’টাই পরে পরে লাগিয়ে দেব।”

সরবৎ চা ও নিউমার্কেটের ডালমুটের সঙ্গে বহুক্ষণ গ্রামোফোন ও কণ্ঠসঙ্গীত চলিল। বহুদিন পরে যেন তাহাদের ছাদের সভা আবার স্বরেশের ঘরে জাঁকিয়া উঠিল। মহেন্দ্র ইউরোপীয় জী লইয়া দেশে ফিরিলে তাহাদের সভাকে কি রকম অবজ্ঞার চক্ষ দেখিবে তাহা লইয়া স্বরেশ রাসিকতার সূচনাও একবার করিয়াছিল, কিন্তু কাহারও নিকট উৎসাহ পাইল না।

তখন রাজি হইয়াছে। বাহিরে টিপ টিপ করিয়া একটানা বৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু ধারাবর্ষণ নাই। হৈমন্তী বলিল তাহার গাড়ীতে সে তাহাদের দলের সকলকে পৌছাইয়া দিতে পারে।

মহেন্দ্র ও তপন দুই জনেই সম্মত হইয়া বলিল, “এইটুকু টিপটিপে বৃষ্টিতে গাড়ী চড়বার কিছু দরকার নেই। আমরা এমনই বেশ পাড়ি দিতে পারব। প্রায় সবটাই ত ড্রামে যাব, দুই-চার পা খালি হাঁটা।”

স্বরেশ বলিল, “ওহে নিখিল, তুমি ত চিরকালের শিভালরাস জেক্টলম্যান, এত রাতে বর্ষার দিনে ভঙ্গ মহিলাদের একলা ফেলে পালান তোমার উচিত নয়। তুমি না হয় যাও ওঁদের পৌছে দিয়ে এন।”

নিখিল বলিল, “আমায় হুকুম কালেই যাব। আমার ওতে মাস্ত বৃদ্ধিই হয়, হানি কিছু হয় না।”

মহেন্দ্র বলিল, “যাক্, এই স্ববোধে নিজের দর কিছু বাড়িয়ে নিলে। তোমারই স্থানম ঠাক। সবাই মিলে গাড়ীতে ভিড় করলেও এখন ত আর আমাদের যশ হবে না।”

মহেন্দ্র ও তপন ছাতা মাথায় দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। নিখিল স্থা ও হৈমন্তীর সঙ্গে গাড়ীতে উঠিল।

হৈমন্তীর গাড়ী, কাছেই স্থাকে আগে নামাইয়া দেওয়া ভঙ্গতা। স্থাকে বাড়ীর দরজায় ছাতা ধরিয়া পৌছাইয়া দিয়া আসিয়া নিখিল বলিল, “এবার আপনাদের বাড়ী চলুন।”

হৈমন্তী বলিল, “আর আপনি?”

নিখিল বলিল, “আমি ত মস্ত লোক: আমার জন্তে আবার ভাবনা? আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আমি সোজা নৌড় দিয়ে বাড়ী গিয়ে উঠব।”

হৈমন্তী তাহাতে রাজী হইল না। তখন ঠিক হইল হৈমন্তী নামিবার পর ঐ গাড়ীতেই নিখিল বাড়ী বাইবে।

গাড়ীতে নিখিল ও হৈমন্তী ছাড়া আর কেহ ছিল না। বর্ষার বিষম রাজি। মাহুদের মনে বাহিরের চেয়ে ভিতরের কথাই বেশী বড় হইয়া উঠে এমন সময়ে। হৈমন্তী ভাবিতেছিল আপনার অদৃষ্টচক্রের কথা। মন তাহাকে টানিতেছে এক দিকে, কিন্তু তাহার জন্ত উদ্ভাস্ত হইয়া উঠিল আর এক জন। এই সমস্তার মাঝখানে আঙ্গ আবার নিখিল অকস্মাত নৃতন কি একটা ঠাটা করিয়া বলিল। মহেন্দ্রও ত সেদিন এই ধরণেরই কথা বলিয়াছিল। হৈমন্তীকে একলা না থাকিতে দিবার ঘোড়ের নাকি অভাব নাই। তপন ও নিখিলেরও নাকি ওই একই চিন্তা। নিখিলের বিষয়ে কথাটা সম্পূর্ণই আনন্দ বলিয়া মনে হয়। না হইলে সে নিজেই আবার হৈমন্তীকে ডাটা করিবে কেন? কিন্তু মহেন্দ্র ও নিখিল দুই জনেই ত বলিতে চাহে যে

তপনেরও মন এই দিকে। নিখিলকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করা কি হৈমন্তীর উচিত? যদি নিখিল তাহাকে কিছু মনে করে? জীলোকের পক্ষে এই জাতীয় প্রশ্ন করা ঠিক শালীনতার পধ্যায় পড়ে কি না হৈমন্তী ঠিক করিতে পারিতেছিল না, অথচ তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল নিখিলের ঠাট্টার কারণটা জানিবার জন্য। এ-কথাটা জানা তাহার নিতান্তই দরকার। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে শুধু যে হৈমন্তীর মনটা ঠাণ্ডা হইবে তাহা নয়, মহেন্দ্রকেও একথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয়ত যাইবে। বেচারী মহেন্দ্র কেন বীর্ষকাল ধরিয়া ওই ভাবনার পিছনে মূগিয়া মরিবে? হৈমন্তীও পথ খুঁজিয়া হায়রান হইয় গেল কি করিয়া মহেন্দ্রের নিকট হইতে সে লুকাইতে পারে। দূর দেশে মহেন্দ্র যাইবে বটে, কিন্তু তাহাতেও সে হৈমন্তীকে নিষ্কৃতি দিবে না নিশ্চয়ই।

হৈমন্তী বলিয়া বসিল, “আপনি মিলিদির বাড়ীতে আমায় সকলের সামনে গুরুত্ব ঠাট্টা কেন করছিলেন? বাইরের লোকও তা ছিল।”

নিখিল বলিল, “আমি তা কাকুর নাম করি নি। আর যিথেষ্ট কথাও যে বলেছি তা মনে হয় না। তা থাকগে, আর ওসব কথা কখনও ভুলব না, এবারকার মত আমায় মাপ করবেন। মহেন্দ্রের কথা আমি ঋণ সত্য বলে অবশ্য বলতে পারি না, কিন্তু তপনের বাড়ীতে আমি এ-কথা তাকে বলেছিলাম, সে তা স্বীকার করে নি।”

হৈমন্তী একটু ঘেন-বিরক্ত হইয়া বলিল, “এটা কি আপনাদের একটা আলোচনার বিষয়?”

নিখিল লজ্জিত হইয়া দুই হাত জোড় করিয়া বলিল, “না, না, সে কি কথা? সে কি কখনও হতে পারে? তপন আমার বিশেষ বন্ধু, আমি তার মন জানিবার জন্য একবার মাত্র এ-কথা বলেছিলাম। না হলে সে কখনও নিজেকে এ-কথা উচ্চারণ করে নি। তার বরং প্রতিজ্ঞাই আছে এ-বিষয়ে কথায় কি ব্যবহারে কিছুকাল কোন মানুষের কাছেই সে কিছু প্রকাশ করবে না।”

হৈমন্তী আর কৌতূহল দেখাইতে পারিল না। যে

আলোচনার জন্ত নিখিলের প্রতি সে বিরক্ত হইতেছিল নিজেই তাহার সম্মুখে নানা প্রশ্ন করা তাহার অত্যন্তই অশোভন মনে হইল। কিন্তু তবু তাহার মনে এ প্রশ্ন জাগিতেছিল, নিখিলের মনে যদি এই কথাই আছে, তবে সে কাহারও কাছে কিছু প্রকাশ করিবে না কেন? তাহার কাছে প্রকাশ করাটা সকলের আগে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, সেও কেন বাদ যাইবে? নিখিলের কথা সত্য তা? মিথ্যা? কথাই বা অকারণ কেন নিখিল বলিবে? হয়ত তপনের সবল কাজেই নিজস্ব এই রকম একটা ধারণা আছে। সে তা ঠিক সাধারণ আর পাঁচ জনের মত ব্যবহার কোন কাজেই করে না।

নিখিলের কথাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হৈমন্তীর মন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল; সংশয়কে সে মনে স্থান দিতে পারিতেছিল না। পৃথিবীতে বাহা এত দেশে এত কালে সত্য হইয়া আসিয়াছে, তাহা তাহার বেলাই কেন সত্য হইবে না? একজনও স্পষ্ট করিয়া বলিবার আগে উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে মানবপ্রেমের ইতিহাসে ইহা কি এমনই অভূতপূর্ব ঘটনা? ইহাই তা স্বাভাবিক, ইহাকেই সত্য বলিয়া হৈমন্তী বিশ্বাস করিবে। সে ছেলেবেলায় বিলাতী আবহাওয়ার মানুষ হইয়াছিল বলিয়া পুরুষজাতিকে যে রকম বিলাতী উপভাষার নায়কের মত মনে করে, বাঙালীর ঘরের স্বল্পবাক্য যুবক তপন সে রকম না হইতেই তা পারে। মনের কথা হৈমন্তীর কাছে প্রকাশ করিতে হয়ত তাহার অনেক দিন লাগিবে। কিন্তু হৈমন্তীর মনে তপনের প্রতি প্রবীর্ণ জন্মিলেও অভিমান হইল। নিখিলের কাছে এ-কথা স্বীকার করিবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল? এই একটি কথা তাহার কি তপনের মুখে সর্বপ্রথম শুনিবার অধিকার ছিল না? না-হয় সে দুই দিন পরে শুনিবে, কিন্তু নিখিলের কাছে শোনাও চেয়ে সে শোনার মূল্য যে অনেক বেশী ছিল। তপনের স্বাদেশিকতার আইনে কি বলে তপনই জানে, কিন্তু নিখিলের মাঝখানে আসিয়া পড়াটা হৈমন্তী কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছে না।

ক্রমশঃ

অষ্ট্রিয়া-দৃশ্যাবলী



সাল্‌সবুর্গ—জার্মান, রোমান ও স্লাভ সংস্কৃতির ত্রিবেণীসঙ্গমস্থল



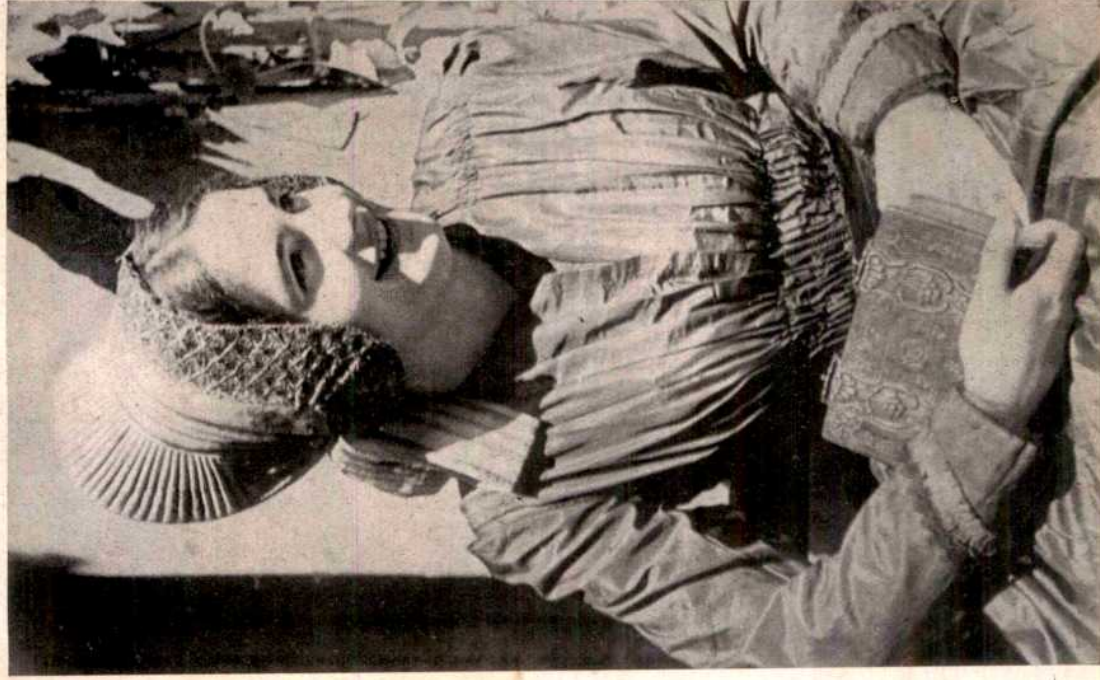
সাল্‌সবুর্গ। অষ্ট্রিয় বাগ্‌যন্ত্র 'হার্মোনিকা'-সহযোগে গ্রামবাসীদের নৃত্যোৎসব



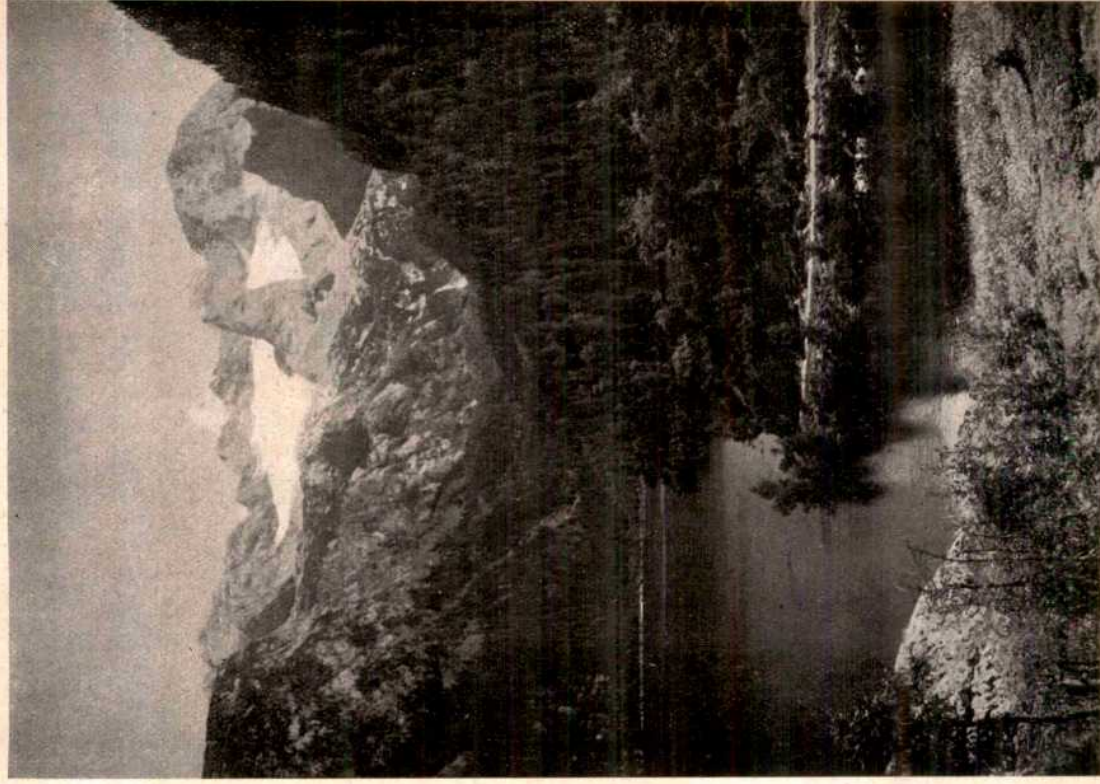
ভিয়েনা



অষ্ট্রিয়ার দক্ষিণ-অঞ্চলে ষ্টাণ্ডবার্গে স্নানযোগে স্বাস্থ্যলাভার্থীদের জনতা



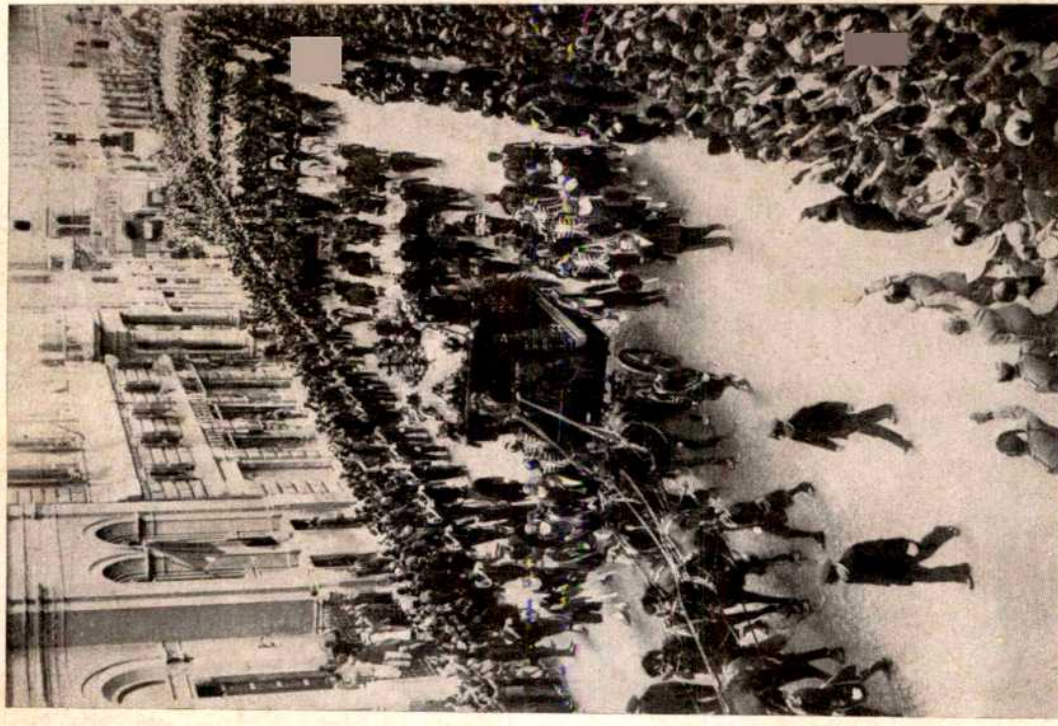
অস্মিয় তরুণী



অস্মিয়র একটি পার্বত্য সরোবর



বিশ্ববিখ্যাত স্করসাধক, পোলায়োর সন্তান শোপার স্মৃতিস্তম্ভ



পরলোকে মার্কনি। রোমের রয়্যাল একাডেমি হইতে সেট
মেরী গীজার পথে জনসঙ্গুল শব্দাত্মা।

ভক্তিবিশ্বের বীজ ও বিকাশ

পণ্ডিত সাতানাত তত্ত্বভূষণ

‘প্রবাসী’র বিগত বৈশাখের সংখ্যায় “ঋষিকাহিনী ও ঋষিপন্থা” শীর্ষক প্রবন্ধে উপনিষদ ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণের আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রেমের মত যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করেছি। তাতে আত্মপ্রেমের কথা অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এ-প্রবন্ধে সে বিষয় কিছু বিশেষভাবে বলব। বৃহদারণ্যক উপনিষদের “মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে” (২।৪ ও ৪।৫) আত্মপ্রেম সম্বন্ধে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যা বলেছেন তাই ঐ উপনিষদের প্রথমাধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণে সংক্ষেপে বলা হয়েছে, যদিও সেখানে যাজ্ঞবল্ক্যের উল্লেখ নেই। শ্রুতিটি এই—

“তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাং প্রেয়ো বিত্তাং প্রেয়োহন্তম্যং সর্বশ্রাদ্ধ অন্তরতরং বদ্ অগ্নম্ আত্মা। স বোহনাম্ আত্মনঃ প্রিয়ং ক্রবাণং ক্রয়াং প্রিয়ং রোংস্ততীতীথয়ো হ তথৈব শ্রাদ্ধ আত্মানম্ এব প্রিয়ম্ উপাসীত। স য আত্মানম্ এব প্রিয়ম্ উপাস্তে ন হাশু প্রিয়ং প্রমা-
যুকং ভবতি। (৮)

—“এই যে অন্তরতর আত্মা, ইনি পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, এই সমুদায় অপেক্ষাই প্রিয়। যে ব্যক্তি আত্মা অপেক্ষা অন্ত বস্তুকে প্রিয়তর বলিয়া মনে করে, তাহাকে যদি কোন (আত্মজ্ঞ) ব্যক্তি বলেন, ‘তোমার প্রিয় বস্তু বিনাশপ্রাপ্ত হইবে’, তিনি এপ্রকার বলিতে সমর্থ, এবং এই প্রকার ঘটবেই। সুতরাং আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যে আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করে, তাহার প্রিয়বস্তু নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না”।

“মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে” এই আত্মপ্রেমতত্ত্ব কিছু বিস্তারিত আকারে ব্যাখ্যাত হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাত্মম পরিচ্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়ে তাঁর সম্পত্তি মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামী তাঁর দুই পত্নীর মধ্যে বিভাগ করে দেবার প্রস্তাব করলেন। মৈত্রেয়ী ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী, কাত্যায়নী স্ত্রীপ্রজ্ঞা অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ে অভিজ্ঞা। মৈত্রেয়ী নিজ প্রকৃতি অনুসারে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভগবন্, এই সমুদায় পৃথিবী যদি বিস্তৃত হইত, আমি কি তদ্বারা অমর হইতে পারি?” যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, “না, উপকরণবান্ ব্যক্তিদিগের যেমন জীবন, তোমার জীবনও সেই প্রকার হইবে। বিস্তৃত হইবে অমৃতত্বের আশা নাই।” মৈত্রেয়ী বললেন,

“যেনাহং নামুতা শ্রাং কিমহং তেন কুর্ধ্যাম্? যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রহ্মীতি।”

—“যাহা দ্বারা আমি অমৃত হইতে পারিব না, তাহা দ্বারা আমি কি করিব? ভগবান্, অমৃতত্ব সম্বন্ধে যাহা জানেন, তাহা আমাকে বলুন।”

ব্রহ্মর্ষি সম্যাস অবলম্বন করতে প্রবৃত্ত। মনে হইতে পারে যে তিনি ব্যক্তিগত প্রেমের অতীত। কিন্তু মৈত্রেয়ীর কথার উত্তরে তিনি যা বললেন তাতে দেখা যায় তাঁর হৃদয় পত্নীপ্রেমে পূর্ণ। তিনি মৈত্রেয়ীকে বললেন, “তুমি আমার প্রিয়ই ছিলে, (এখনও) প্রিয় বাক্যই বলিতেছ।” এই ব্রাহ্মণেরই দ্বিতীয় আকারে (৪।৫) তিনি বলছেন, “তুমি প্রিয়ই ছিলে, (এখন) প্রিয়ত্ব বর্দ্ধিত করলে।” এই বলে তিনি তাঁর প্রেমতত্ত্ব নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন। এই তত্ত্বের সার কথা এই যে আত্মপ্রেমই মূল প্রেম, যেমন আত্মজ্ঞানই মূল জ্ঞান। আত্মা নিজেকে ভালবাসে, নিজের সুখ চায়, শ্রেয়ঃ চায়। যাতে নিজের সুখ ও শ্রেয়ঃ সাধিত হয়, এমন ব্যক্তি বা বস্তু চায় এবং এমন ব্যক্তি বা বস্তু পেলে তাকে ভালবাসে। এই তত্ত্ব যাজ্ঞবল্ক্য নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। তিনি বলছেন,—

“ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জাযায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্ত কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্ত কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে বিত্তস্ত কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্ত কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্ত কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্ত কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবতি, আত্মনস্ত কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবতি। ন বা অরে সর্বস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।”

—“অয়ি, পতির প্রতি প্রীতিবশতঃ পতি প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জগ্গই পতি প্রিয় হয়। অয়ি, জায়ার প্রতি প্রীতিবশতঃ জায়া প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জগ্গই জায়া প্রিয় হয়।” ইত্যাদি

এইরূপে পুত্র, বিত্ত, ব্রাহ্মণজাতি, ক্ষত্রিয়জাতি, বর্গাদি লোক, দেবতা, নানা প্রাণী, সর্ববস্তু, এই সমস্ত এই সমস্তের প্রতি প্রীতি বশতঃ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্তই, আত্মার স্বখও শেষের সাধনরূপেই, প্রিয় হয়। যে সকল বস্তু আত্মার বা শেষ সাধনের উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না, সে সকলের প্রতি প্রীতি আকৃষ্ট হয় না, বরঞ্চ ঘৃণা বা উপেক্ষাই হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান ও আত্মার সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধজ্ঞান যতই স্পষ্ট ও উজ্জল হয় ততই দেখা যায় কোনও ব্যক্তি বা বস্তুই আত্মার অতিরিক্ত নয় এবং আত্মস্বখ ও আত্মশ্রেয়ের প্রতিফল নয়। সুতরাং আত্মজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রেমও প্রসারিত হয় এবং ক্রমশঃ “আত্মনস্ত কামায় সর্বঃ প্রিয়ঃ ভবতি”—আত্মপ্রীতি বশতঃ সকলই প্রিয় হয়, কেহই ঘৃণার পাত্র থাকে না, “ততো ন বিজুগুপসতে”। (ঈশা ৬)। আত্মবিকাশের নিম্নাবস্থায় কেবল নিজ পরিবারের ব্যক্তিদিগকেই আপন মনে হয়। ক্রমশঃ নিজ বর্গ, নিজ সম্প্রদায়, নিজ জাতি, নিজ দেশ, পর দেশ, সমগ্র মানবজাতি, প্রিয় হয়ে ওঠে। প্রেমের প্রসারের সঙ্গে প্রেমের স্বচ্ছতা এবং গাঢ়তাও বাড়ে। প্রথমতঃ কেবল শারীরিক স্বখ-স্বাস্থ্যই প্রিয় ব’লে বোধ হয়। ক্রমশঃ বিদ্যা, নৈতিক পবিত্রতা, নিঃস্বার্থ প্রেম, ভগবদ-ভক্তি প্রভৃতি স্বচ্ছতর, উচ্চতর বিষয়, প্রিয় হয়। অবশেষে একটি সর্বদ্বন্দ্বী উন্নতি বা মুক্তির আদর্শ জীবনব্যাপী সাধনের বিষয় হয়ে আত্মার সমক্ষে দণ্ডায়মান হয়।

এই তত্ত্ব সম্যকরূপে বুঝলে ব্রহ্মকে আর নির্বিষয়, নির্কিংশেষ, অচিন্তনীয়, অনির্কল্ণীয় সত্তামাত্র ব’লে বোধ হয় না। তিনি যেমন অন্তরতম, তেমনি প্রিয়তম হয়ে দাঁড়ান। যে আত্মপ্রেম পরপ্রেমরূপে, বিশ্বপ্রেমরূপে, বিকশিত হয়, তা তো ব্রহ্মেরই নিজপ্রেম, ব্রহ্মেরই জীবপ্রেম। জ্ঞানে যেমন জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের, বিষয়-বিষয়ীর, ভেদাভেদ অবশ্যস্বাভাবী, প্রেমে তেমনি প্রেমিক ও প্রেমপাত্রের ভেদাভেদ অবশ্যস্বাভাবী। একান্ত অভেদ, একান্ত নির্কিংশেষ, যদি কোন বস্তু থাকতো, তবে তার স্বখ, তার শ্রেয়ঃ, ব’লে কোন বস্তু থাকতো না। স্বখ-সাধনের, শ্রেয়ঃ-সাধনের, ভিতরে ভেদাভেদ অবশ্যস্বাভাবীরূপে বর্তমান। সসীম জীব, যে নিজ স্বখ, নিজ শ্রেয়ঃ সঞ্চয় ক’রে সাধনের চেষ্টা ক’রে,

তা ভুলে যায়, এমন ভাবে ঘুমিয়ে যায় যে কাঙ্ক্ষ্যতঃ তার ব্যক্তিষ্ট কিছুই থাকে না, তার ভিতরে যদি সর্বজ্ঞ, অভোলা, অনিষ্ট, চিরজাগ্রত, পূর্ণ প্রেমিক পুরুষ না থাকতেন, তবে সে পুনরায় জাগত না, তার সঞ্চয় পুনরায় স্রবণ হ’ত না, সঞ্চয়সাধনের চেষ্টা পুনরায় হ’ত না, সঞ্চয় সাধিতও হ’ত না। আমাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় এই জীব-ব্রহ্মের, পূর্ণ ও অপূর্ণের, ভেদাভেদ বর্তমান। এই ভেদাভেদ-বোধ থাকতেই আমাদের ধার্মিকতা, আমাদের ধর্মনিষ্ঠা, আমাদের আন্তিকতা; আর এই বোধ না থাকতেই আমাদের ধর্মহীনতা, নিষ্ঠাহীনতা, নাস্তিকতা।

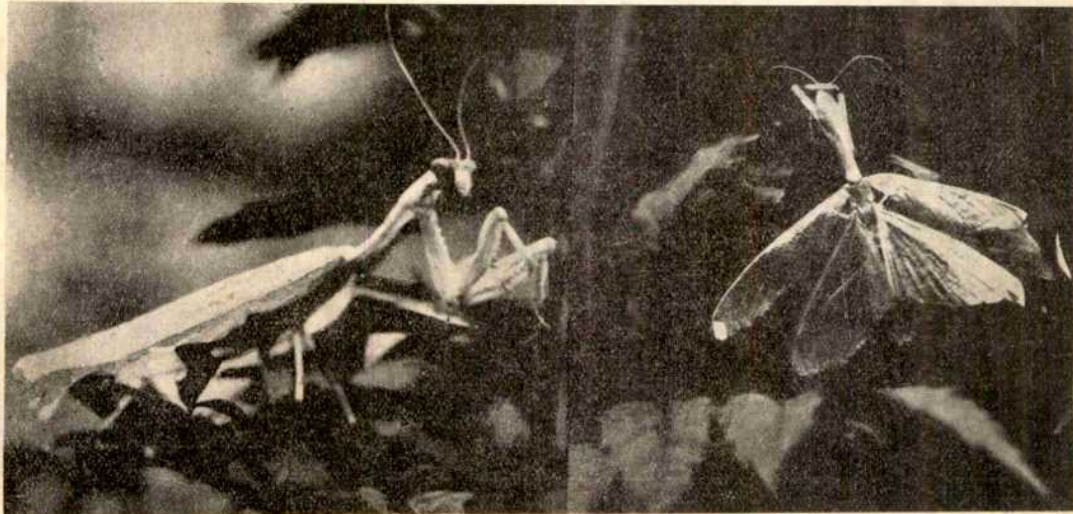
‘বিষ্ণুপুরাণ’, ‘ভাগবত’ প্রভৃতি বেদান্তমূলক ভক্তিগ্রন্থ-সমূহে উপনিষদ-ব্যাখ্যাত আত্মপ্রেমকেই ভগবদ-প্রীতি ও ভগবদ-ভক্তিরূপে উপদেশ করা হয়েছে। কিন্তু এই আত্মপ্রেমকে যখনই নির্বিষয়, নির্কিংশেষ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তখনই ইহা প্রকৃত প্রেমভক্তির আকার ছেড়ে নির্বিষয়, নির্কিংশেষ, অচিন্ত্য, অনির্কল্ণীয় সত্তামাত্র লীন হবার ইচ্ছারূপে প্রকাশ পেয়েছে, আর এই ইচ্ছাকে মুমুক্শুত্ব, মুক্তির ইচ্ছা, রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে সকল পৌরাণিক বেদান্ত-ব্যাখ্যাতৃদিগের এই লঘবাদ বর্জন ক’রে কাঙ্ক্ষ্যতঃ বেদান্তই বর্জন করেছেন এবং প্রেমভক্তির সাধন সসীম মানুষেই আবদ্ধ রেখেছেন, তাঁদের হাতে প্রেমভক্তি বিকৃত আকার ধারণ ক’রে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রভূত অনিষ্ট সাধন করেছে। বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদে স্পষ্টরূপে ভেদাভেদ দর্শন ক’রে ইহাকে ভক্তিসাধনের ভিত্তি করলে উক্ত উভয়বিধ অনিষ্ট পরিহার করা যায়। বেদান্তমূলক ভেদাভেদবাদই প্রকৃতপক্ষে ভক্তিধর্মের বীজ। এই বীজকে কর্ম, প্রেম, জ্ঞান, রূপ সাধনত্রয়দ্বারা পোষণ করলেই ভক্তিধর্ম পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে ব্যক্তিগত, জাতিগত ও অন্তর্জাতীয় জীবনকে সফল ও সার্থক করে। বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানে, আত্মপ্রেমে, যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই ঈশ্বরকে অধিক হ’তে অধিকতর অন্তর, হৃদয় ও মনুর ব’লে অনুভূত হয়, এবং এই আন্তর্য্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য মানবপ্রেমে প্রসারিত হয়। ফলতঃ ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেম মূলে একই বস্তু। সাধনক্ষেত্রে একে অন্তে চিরসঙ্গী, চিরসহায়।

সংসার

গঙ্গাফড়িং

কীটপতঙ্গাদি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে গঙ্গাফড়িংয়ের মত এমন অদ্ভুত চালচলন ও শারীরিক গতিভঙ্গীবিশিষ্ট অপরূপ প্রাণী মহা বড়-একটা নজরে পড়ে না। সাধারণ কীটপতঙ্গশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহারা অভিব্যক্তির কোন ধারা অবলম্বনে এবং কিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া বর্তমান আকৃতি ও প্রকৃতি অর্জন করিয়া লইয়াছিল তাহার ইতিহাস বিস্ময়োদ্দীপক হইবে সন্দেহ নাই। জীবজগতের ক্রমবিকাশের ধারা পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আণুবীক্ষণিক আদি জীবেরা কেবল আহার-বিহারেই ব্যাপৃত থাকে। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় পূর্বাঙ্কে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা তেমন কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। শত্রুর আক্রমণ স্পর্শেন্দ্রিয়-গোচর হইলে শরীর সঙ্কুচিত করিয়া প্রাণরক্ষার চেষ্টা করে মাত্র। দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাবই ইহার প্রধান কারণ হইতে পারে; কিন্তু স্নানির্দিষ্ট দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাব হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহারা সর্বদাই আলো-অঁধারের তারতম্য অথবা অন্তিম অনুভব করিয়া থাকে। তথাপি উন্নতশ্রেণীর কুমিকীটের মত ইহাদিগকে আত্মরক্ষার্থ তেমন সচেষ্ট দেখা যায় না। ইহাদের শত্রুর সংখ্যা যে কম, তাহাও বলা চলে না। সমজাতীয় শত্রু কম হইলেও অপেক্ষাকৃত উন্নতশ্রেণীর শত্রু অসংখ্য। তবে হয়ত ইহাদের বংশবৃদ্ধির হার ও সহজ উপায় এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবের উদরে প্রবেশ করিয়াও

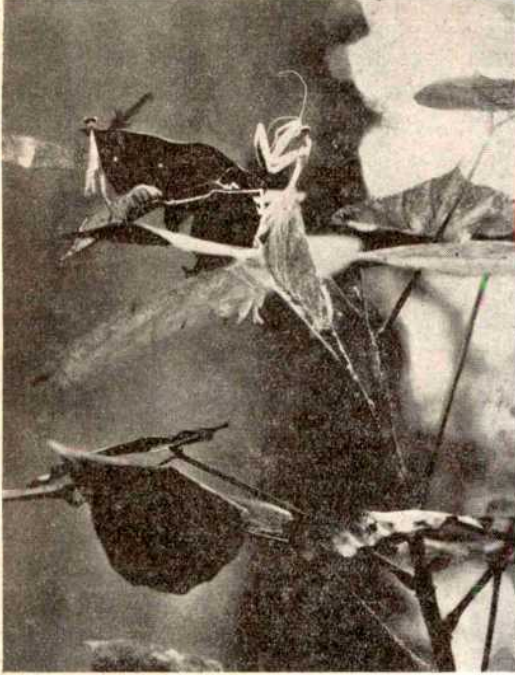
সময়ে সময়ে বংশবৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা এই ক্রটির পরিপূরক হইয়াছে। তার পর 'প্রোটোজোয়া' প্রভৃতি আর এক ধাপ উন্নত স্তরের জীবের বেলায়ও দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রকৃত-প্রস্তাবে আক্রান্ত না হইলে তাহারাও প্রতিক্রিয়ার কোন লক্ষণই প্রকাশ করে না; কিন্তু আক্রান্ত হইলে এক দিকে ছুটিয়া পলাইতে চেষ্টা করে। বিপদ এড়াইবার জ্ঞান পূর্বাঙ্কে স্থান তাগ বা অজ্ঞ কোনরূপ আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। এইরূপ যতই উন্নততর জীবের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই দেখিতে পাওয়া যায় যে দর্শনেন্দ্রিয় অভিব্যক্ত হইয়া স্নানির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছে এবং গতিবিধির স্বাধীনতা ও পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দূর হইতে শত্রুর গতিবিধি টের পাইয়া, আক্রান্ত হইবার পূর্বেই সাবধান হইবার উপায় অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু এত দূর উন্নত হইলেও কীটপতঙ্গ প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণী কোন কোন বিষয়ে বৃদ্ধিবৃদ্ধির উৎকর্ষের পরিচয় দিলেও ইহাদের শরীর ও অস্থান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি এমন ভাবে গঠিত যে সমুখ দিকের বিপদআপদ বা শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া পূর্বাঙ্কে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে; কিন্তু পিছনে বা আশপাশের অবস্থা তদারক করিবার ক্ষমতা খুবই কম। কারণ কীট-পতঙ্গাদির চক্ষু বিভিন্ন ভাবে উন্নত ধরণে গঠিত হইলেও ইচ্ছামত ঘাড় বা মাথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চারি দিকের অবস্থা পরীক্ষণ করিবার শক্তি নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সাধারণ কীটপতঙ্গ-শ্রেণীভুক্ত হইয়াও গঙ্গাফড়িং, মনুষ্য প্রভৃতি সর্বোন্নত প্রাণীদের



সবুজ গঙ্গাফড়িং। শিকারার্থে ব্যাপৃত।

গঙ্গাফড়িং ডানা মেলিয়া উড়িয়া বাইবার
উপক্রম করিতেছে।

জায় মাথা ও ঘাড় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এমন কি গলা বাড়াইয়া ও হেলাইয়া দোলাইয়া চতুর্দিকের অবস্থা তদারক করিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। দূর হইতে আবছাগোছের কিছু একটা



তীরচিহ্নিত স্থানের কড়িটিকে শিকার করিবার জন্ত
সঁড়াশি উদ্যত করিয়া গঙ্গাফড়িং প্রস্তুত।

পা বা হাত ছুইখানি প্রসারিত করিয়া মাথা উঁচু করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। বস্তুটা কি তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলে—লম্বা কাঠির মত গলাটি হেলাইয়া দোলাইয়া এদিক-ওদিক বেশ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করে, কিন্তু পরিকার ভাবে না বুঝিয়া সহসা নিকটস্থ হয় না। ইহাতেও সুরবিধা না হইলে মাথাটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চারি দিকের অবস্থা বিশেষ ভাবে তদন্ত করে। জিরাফের লম্বা গলা যেমন বহুদূর হইতে কোন নির্দিষ্ট স্থানের অবস্থা লক্ষ্য করিবার সহায়তা করে, ইহাদেরও ঠিক তেমনি। সমগ্র শরীরের প্রায় অর্দ্ধেক লম্বা, কাঠির মত গলা উঁচু করিয়া ইহারা জিরাফদের মতই দূর হইতে শিকার অথবা শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে। তখন ইহাদিগকে দেখিয়া মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হয়—নিম্নশ্রেণীর পতঙ্গ-জাতীয় প্রাণী বলিয়া কিছুতেই ধারণা করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিভিন্ন আকৃতির গঙ্গাফড়িং দেখিতে পাওয়া যায়। সম্মুখের পা দুইখানি অনবরত প্রার্থনার মত মন্থয্যের যুক্ত-হস্তের মত ভাঁজ করিয়া রাখে বলিয়া সাধারণতঃ ইহারা “প্রার্থনার মত ম্যাটিস” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এদেশে ইহাদিগকে গঙ্গাইলাস বা গঙ্গাফড়িং বলিয়া থাকে। ফড়িঙের সঙ্গে ইহাদের দৈহিক আকৃতির অনেকটা সামঞ্জস্য থাকিলেও গঙ্গাফড়িং নামের তাৎপর্য ঠিক বুঝা যায় না। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে ইহাদিগকে “সাপের মাসী” বলিয়া থাকে এবং সাধারণ পতঙ্গ হইতে ভিন্ন ইহাদের অত্যদ্ভুত চালচলন দেখিয়া কতকটা ভীতিবিমিশ্রিত চোখে দেখে। সাপ যেমন ফণা তুলিয়া এদিক-ওদিক ছলিতে থাকে—ইহাদিগকেও ঠিক সেইরূপই দেখায়। বোধ হয় এই কারণেই ‘সাপের মাসী’ নামকরণ হইয়াছে।

পৃথিবীতে এপর্যন্ত প্রায় আট শতের উপর বিভিন্ন জাতীয়



গঙ্গাফড়িং শিকারটিকে সঁড়াশি দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া
আহারের উদ্যোগ করিতেছে।

দেখিতে পাইলেই যুক্তকরে প্রার্থনার মত মন্থয্যের

বামে, শুকপত্র-অনুকরণকারী পুরুষ গঙ্গাফড়িং; দক্ষিণে,
সবুজ, গঙ্গাফড়িং। উভয়ে দেখা হইবামাত্র
লড়াই বাধিবার উপক্রম হইয়াছে।

গঙ্গাফড়ি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। আমাদের সেশেই প্রায় বিশ-পঁচিশ বকমের বিভিন্ন শ্রেণীর গঙ্গাফড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কচি কলাপাতার মত সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িই সন্ধিক পরিচিত। এই প্রসঙ্গে আমরা সবুজ গঙ্গাফড়িও বিবরণে আলোচনা করিতেছি। ইহারা প্রায় আড়াই হইতে তিন ইঞ্চি লম্বা হয়। ইহাদের দেহের আকৃতি অদ্ভুত; অত্যন্ত সাধারণ ফড়ি বা পতঙ্গের মত নহে। পেটের দিক প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা। সৰু কাঠি মত গলাটিও এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি লম্বা হয়। বড় বড় চোখও হালকা ত্রিকোণাকার মস্তকটি যেন এই কাঠির মাথায় আঁতরাতে স্থাপিত রহিয়াছে। মাথার দুই পাশে শিঙের মত দুইটি শুঁড় আছে। কাঠি অগ্রভাগে মস্তকের ঠিক নিম্নেই এক জোড়া চ্যাপ্টা পা। এই পা-জোড়া বড়ই অদ্ভুত। উপরে নীচে করাতের দাঁতের মত সাব-বন্দীভাবে অনেগুলি কাঁটা সম্বলিত। এই পা-জোড়া ঠিক সাঁড়াশির মত করিয়া হাতের কাজ করে। সর্বদাই দুইখানি পা জোড় করিয়া প্রাণীর ভঙ্গীতে অবস্থান করে। পেটের সম্মুখভাগে বাকী চার-খানি পা। ইহাদের গঠন সাধারণ কট-পতঙ্গের পায়ের মত। প্রান্তভাগে শূক শূক ঝাঁকানো নথ আছে। এই চারিখানি পায়ের সাহায্যে ইহারা লতাপাতার উপর চলাফেরা করে। সম্মুখের পা দুইখনির সাহায্যে শত্রুর আক্রমণ, শিকাব ধরা বা আহাৰ্য্য গলাধঃ-করণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। শিকার একবার এই সাঁড়াশির মত পায়ের কবলে পড়িলে আর পলাইবার উপায় থাকে না; তার পর শিকার মুখের কাছে লইয়া ঠিক হুমুমানের মত ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা নানা জাতীয় ফড়ি, কট-পতঙ্গ প্রভৃতি খাইয়া উজাড় করিয়া ফেলে। কোন কোন দেশে এমন গঙ্গাফড়িও দেখিতে পাওয়া যায়, বাহারা ছোট ছোট পাখী, ব্যাং, টিকটিকি প্রভৃতি ধরিয়া খাইয়া থাকে। এদেশীয় সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট স্বজাতীয়দের খাইয়া থাকে। জী-গঙ্গাফড়ি সুবিধা পাইলে পুরুষদিগকে ধরিয়া খাইয়া ফেলে। ইহারা সাধারণতঃ লতাপাতার মধ্যে শিকাব অবস্থানে ধাঁটিয়া বেড়ায়; প্রয়োজন বোধ করিলে ডানা মেলিয়া দূরতর স্থানে উড়িয়া যায়। ইহাদের পায়ের রং সবুজ লতাপাতার মধ্যে এমন ভাবে মিশিয়া থাকে যে, শত্রু কিংবা শিকার কেহই ইহাদিগকে অস্তিত্ব টেব পায় না। শিকাব দেখিতে পাইলেই অতি সন্তপণে নিকটে আসিয়া সম্মুখের সাঁড়াশি উঁচাইয়া নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে, এবং সুবিধামত আক্রমণ করিয়া সাঁড়াশি দিয়া চাপিয়া ধরিয়া ফেলে। এদেশীয় গঙ্গাইলান্-গঙ্গাইলয়েডস্ ও সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িগুলি শিকার ধরিবার ক্ষমতায় সময়ে সময়ে অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। লতাপাতার শুষ্ক বা পল্লবের উপর এমন ভাবে বসিয়া থাকে যেন এক জাতীয় ফুল বা কচিপাতার মত মনে হয়। মুহূর্ত্তকালে ফুল বা পাতাগুলি যেমন আঁতে আঁতে নোলে, ইহারাও সেইরূপ গলা নাড়িয়া আঁতে আঁতে নোলে খাইতে থাকে—অত্যন্ত কটপতঙ্গেরা প্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া ঐস্থানে অব-তরণ করিবারাই গঙ্গাফড়িওর কবলে পড়িয়া প্রাণ হারায়। সাধারণতঃ গঙ্গাফড়িওর অমুকরণশক্তি অত্যন্ত প্রবল এবং নিখুঁত। ব্রেজিল-দেশীয় এক জাতের গঙ্গাফড়ি উই ধরিয়া গায়, একজাত তাহারা উইয়ের চেহারার অমুকরণ করিয়া থাকে। আমাদের

দেশীয় সবুজ, কাল-জোরাটা ও ধূসর রঙের গঙ্গাফড়িকেও লতা-পাতার মধ্য হইতে চিনিরা বাহির করা দ্রুত। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক জাতীয় গঙ্গাফড়িকে হাতে ধরিয়াও বুরিতে পারা যায় না যে ইহারা শুষ্ক পত্র না জীবন্ত প্রাণী। এমনই ইহাদের দেহের কারিগরি যে দেখিলে অবাক হইয়া গাফিতে হয়। ছবিতে দেখা যাইতেছে এইরূপ এক জাতীয় পুরুষ-গঙ্গাফড়িকে সবুজ গঙ্গাফড়িওর নিকটে একই গাছে ছাড়িয়া দেওয়াতে লড়াই বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। লড়াইয়ের কালে অবশেষে গঙ্গাফড়িটিকে সবুজ ফড়িটির হাতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে নালা, ডোবা ও পুকুরের মধ্যে অনেকটা গঙ্গাফড়িওর অমুকরণ ধূসর রঙের এক জাতীয় পতঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মুখের সম্মুখে হাতের মত ভাঁজকরা দুইখানি সাঁড়াশি আছে; ইহার সাহায্যে তাহার শিকার ধবে এবং গঙ্গাফড়িওর মত ডানাও আছে—প্রয়োজন-মত এক জলাশয় হইতে অল্প জলাশয়ে উড়িয়া যাইতে পারে। শিকার ধরিবার কৌশলও ঠিক গঙ্গাফড়িওর অমুকরণ। ইহাদিগকে অনেকে মেছো-গঙ্গাফড়ি বলিয়া থাকে। কাবণ মাছই ইহাদের প্রধান শিকার।

জী-গঙ্গাফড়ি সুপারি মত এক দিক নুচলো একটি গুটার মধ্যে ডিম পাড়িয়া তাহা গাছের ডালে আটকাইয়া রাখে। এক-একটা গুটার মধ্যে ২৫৩০ হইতে ৩০০০টা পর্য্যন্ত ডিম থাকে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই ডিম ফুটির বাচ্চাগুলি গুটা হইতে বাহির হইয়া আসে। আকৃতি-প্রকৃতিতে বাচ্চাগুলিকে দেখিতে পরিণত-বয়স্কদের মতই, কিন্তু ইহাদের ডানা থাকে না। আবহ স্থানে রাখিয়া ইহাদের ডিম ফুটাইয়া দেখিয়াছি—দলবদ্ধ ভাবে ইহাদের চালচলন ও গতিভঙ্গী অত্যন্ত কৌশলোদ্ভাবক। আলিপুরের গুণ্ডালায় নীল-গলাওয়লা সারসগুলির গতিভঙ্গী বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন; কেহ এক দিক দিয়া অগ্রসর হইলেই উহা বা সকেলেই গলা বাড়াইয়া হেলি-চুলিয়া একসঙ্গে এক দিকে সরিয়া যায়। একটিতে বেষ্টন করিবে অপবগুলিও ঠিক গড্ডলিকা-প্রবাহের মত সেইরূপই করিবে। এই গঙ্গাফড়িওর বাচ্চাগুলিও ঠিক সেইরূপ—এক দিক দিয়া একটু ভয় দেখাইলে বা কোন কিছু আগাইয়া ধরিলে সারসগুলির মত গুল বাড়াইয়া ও হেলিয়া চুলিয়া দলবদ্ধভাবে অপর দিকে ছুটিয়া যায় এবং এক স্থানে জটলা করিয়া মাথা ও লম্বা গলা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অতি অদ্ভুত ভঙ্গীতে শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকে। বায়ুক্ষেপে আফ্রিকার জঙ্গলের জিরাফের দলকে বেষ্টন ভাব ছুটিতে দেখিয়াছি—গঙ্গাফড়িওর বাচ্চাগুলির একযোগে পলায়ন দেখিতেও অনেকটা সেইরূপ।

গঙ্গাফড়ি সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নানাবিধ অদ্ভুত ধারণা ও কুসংস্কার প্রচলিত আছে। প্রাচীন গ্রীকেরা ইহাদিগকে দৈবশক্তিসম্পন্ন এক অদ্ভুত প্রাণী মনে করিত। তুর্কী ও আরবীদের ধারণা যে ইহারা সর্বদা মক্কাব দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনায় রত থাকে। ইহাদের অদ্ভুত আকৃতি-প্রকৃতি হইতেই এই সব নানাবিধ ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

[এই প্রবন্ধের চিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত।]

মাটির বাসা

ক্রীসীতা দেবী

(১)

রাত আটটার বেশী হয় নাই, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে ইহারই মধ্যে চারিদিক্ নিরুন্ম। মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক বা দূরে শিয়ালের ডাক শোনা যায়, বা ঝিঁঝিঁপোকের ঝঙ্কার নীরবতার সাগরে যুদ্ধ তরঙ্গ তুলিয়া যায়। কৃষ্ণপঙ্কজের রাত্রি, নিকষ কালো অন্ধকারের শ্রোতে গ্রামখানি যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। গৃহস্থবাড়ীতে কোথাও বা প্রদীপ জ্বলিতেছে, কোথাও বা ঘর আঁধার, সব কয়টি মানুষই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শীতকাল, সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে যাহা হউক কিছু খাইয়া, কাঁথা লেপ যাহার বা জুটিল তাহাই পায়ে দিয়া শুইয়া পড়িতে পারিলে সকলে বাঁচে। বড় শহর নয় যে দিনকে রাত করিয়া কোনও লাভ হইবে। দিনের বেলা অনেক কাজ থাকে, রাতে ঘুমানো ছাড়া আর যে কি করা যায় তাহা পাড়াগাঁয়ের লোক খুঁজিয়া পায় না। নিত্য আমোদ-প্রমোদের কোনও ব্যবস্থা এখানে নাই, নিত্যস্ত কাহারও বাড়ী বিবাহ, অন্নপ্রাশন বা পৈতা কিছু থাকিলে কয়েকটা দিন হৈচৈ করিয়া ইহাদের কাটে ভালই। পড়াশুনার অভ্যাস কাহারও বিশেষ নাই, হুতরাং অনর্থক তেল পোড়াইয়া লেখাপড়া করিতে কেহ তেমন বসে না। ওসব সখ যাহাদের আছে, তাহারা গ্রামে থাকিবে কোন দুখে? বড় বড় শহরগুলি তাহাদের জন্ত পড়িয়া আছে। গ্রামের স্কুলে যাহারা পড়ে, তাহাদেরও রাত্রিতে পড়িবার প্রয়োজন পরীক্ষার আগের সপ্তাহ ছাড়া আর কোনও সময়েই হয় না।

তবু মল্লিকদের বাড়ীর বড় ঘরখানায় এখনও আলো জ্বলিতেছে। এই ঘরখানি এ-বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ভাল, আরও ছোট ছোট দুখানি ঘর আছে বটে, কিন্তু বিশেষ লোকজনের ঠেলাঠেলি না হইলে সেগুলিতে কেহ শুইতে যায় না। জিনিষপত্রের সর্বদাই সেগুলি ঠাস।

কতক বা দরকারী জিনিষ, নিত্য ব্যবহার্য্য, কতক একেবারে অকেন্জো ভাঙাচোরা সাতকেলে পুরানো, তবু প্রাণ ধরিয়া গৃহস্থ সেগুলিকে বিদায় দিতে পারে নাই। সেগুলির সঙ্গে কত হারানো প্রিয়জনের, কত বিগত স্বপ্নের দিনের সহস্র স্মৃতি জড়িত। তাই তাহারা এখন ঘব জুড়িয়া আছে। বড় ঘরখানিতে মল্লিক-গৃহিণী সব কয়টি ছেলেমেয়ে লইয়া শয়ন করেন। কর্তা নিত্যস্ত শীত বা বর্ষা পড়িলে তবে ঘরে ঢোকেন, ভিতরেব দিকের দাওয়ায় তাহার তক্তাপোষখানি সদাসর্বদা পাতা থাকে।

মৃণাল আলো জালিয়া জিনিষ গুছাইতেছে। কাল দশটার গাড়ীতে তাহাকে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে। পূজার ছুটি শেষ হইয়া গেল, তাহার স্কুল খুলিতে আর মাত্র দুই দিন দেরি। এবার পূজা পড়িয়াছিল কাঠিকে, কাজেই ইহারই মধ্যে রীতিমত শীত দেখা দিয়াছে।

অনেক দিনের পুরানো রংচটা একটা ষ্টীল ট্রাকে মৃণাল নিজের বই খাতা, কাপড়চোপড় সব গুছাইয়া রাখিতেছিল। মামীমা তখন পাশের ঘরে কি যেন করিতেছেন, হাঁড়িকুড়ি নাড়ার শব্দ মাঝে মাঝে পাওয়া যাইতেছে। ছেলেমেয়ে চারিটিই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ইহার জাগিয়া থাকিলে কাহারও সাধ্য হয় না কোনও কাজ নিরিবিলিতে করিবার। গুছানো জিনিষ অগোছাল করিতে, জিনিষপত্র বাড়ীময় ছড়াইতে, প্রতি কাজে বাধা জন্মাইতে ইহার অধিতীয়। ছোট খোকা কান্নকে তাহার মা কোমরে গামছা বাঁধিয়া তক্তাপোষের খুরার সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া তবে রান্নাবান্নার কাজ করিতে পারেন। না হইলে তেলে ঘিয়ে মিশাইয়া, দুধের কড়া উল্টাইয়া কেলিয়া, বাটনা লইয়া পায়ে মাখিয়া এবং তরকারির ডালা হইতে কাঁচা লক্ষ তুলিয়া খাইয়া, সে বিধিমনে তাহাকে সাহায্য করিতে থাকে। তাহার বড় বোন দুটিও ছুটামিতে অধিতীয়, তবে বেশী বাড়াবাড়ি

করিলে গিঠে দুই-চার ঘা বসাইয়া দিয়া তাহাদের বাড়ীর বাহির করিয়া দেওয়া যায়। ঘরের ভিতর যে দুঃস্থপনা অসহ্য বোধ হয়, খোলা মাঠে, পুকুর-বাটে, জমিদারের পুরানো আমবাগানটায় তাহা দিয়া মানাইয়া যায়, কাহারও গায়ে তাহাতে কোঁচা পড়ে না। টিনি আর চিনির হাত পা ছড়িয়া যায়, মাঝে মাঝে কাটিয়াও যায়, পবনের ডুবে শাড়ীতে অনেক জায়গায় খোঁচা লাগে, ধূলাকাদায় মাখামাখি হইয়া সেগুলি পরার অবোধ্য হইয়া যায়, কিন্তু এ সব লইয়া কেহ মাথা ঘামাইতে বসে না। দুপুরবেলা মায়ের সঙ্গে পুকুরবাটে গিয়া স্নান করিয়া তাহারা আবার বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া আসে, কাদামাখা শাড়ীগুলিও মায়ের লক্ষ্মী-হস্তের স্পর্শ পাইয়া আবার শাদা ধবধবে হইয়া উঠে। টিনির বয়স হইবে বছর সাত, চিনি এখনও পাঁচের গণ্ডী পার হয় নাই। টিনির বড় ভাই গোপাল তাহার চেয়ে অনেক বড়, বছর চৌদ্দ তাহার বয়স হইবে। গ্রামের স্কুলের পড়া তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে, বেলা আটটার ভাত খাইয়া সে পাশের গ্রামের হাইস্কুলে পড়িতে যায়, বেলা একেবারে গড়াইয়া গেলে তবে ফিরিয়া আসে। গোপালের পর মল্লিক-গৃহিণীর যে-মেয়েটি হইয়াছিল, বাঁচিয়া থাকিলে সে এতদিনে বারো বৎসরের হইত।

মৃণাল মল্লিক-মহাশয়ের ছোট বোন শৈলজার মেয়ে। তাহার পাঁচ বৎসর বয়সে মা মারা গিয়াছে। বাবা মৃণালমোহন বছর দুই পরেই আর একটি বিবাহ করিয়া বসিয়া, ভাঙা সংসার আবার পূর্ণ বিক্রমে জোড়া লাগাইতে সমর্থ হইয়াছেন। দ্বিতীয় গৃহিণী অনেক ছেলেমেয়ের মা। মৃণালকে এই নূতন সংসারে মানায় না। নূতন মাও তাহাকে খুব বেশী স্বনজরে দেখেন না।

মা মারা যাইবার পর সে মামার বাড়ীতেই মানুষ হইতে ছিল। প্রবাদ-বাক্যের মামীর মত হুড়কা ঠাণ্ডা দিয়া মৃণালকে তাহার মামীমা আপ্যায়িত করিতেন না, বরং শাস্তিশিষ্ট বলিয়া এই মেয়েটির প্রতি তাঁহার একটা পক্ষপাতই ছিল। মৃণাল দেখিতে সুন্দরী নয়, অস্বস্তি বাঙালীর ঘরে তাহাকে কেহ সুন্দরী বলিত না, কারণ তাহার রংটা ছিল শ্রামবর্ণ। বিবাহের সময় মৃণাল যে আত্মীয়স্বজনকে অধি জলে ফেলিয়া দিবে এ-বিষয়ে সকলে একমত।

তবু মামা মামী এই শ্রামবর্ণ মেয়েটিকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন।

দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবার পর মৃণালমোহন চক্ষুলাঙ্কার খাতিরে একবার মৃণালকে লইয়া বাইতে আসিলেন। মৃণালকে পাঠাইতে মামা মামীর একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বাহার মেয়ে সে যদি জোর করে তাহা হইলে তাঁহারা ধরিয়া রাখেন কি করিয়া? অনেকখানি ভয়মিশ্রিত কৌতুহল লইয়া মৃণাল তাহার বাবার সঙ্গে নূতন মায়ের সংসারে আসিয়া ঢুকিল।

সংমা অবশ্য উপকথার সংসার হত এক গ্রামে সতীনঝিকে খাইয়া ফেলিতে চাহিলেন না, তবে খুব যে তুটু হইলেন তাহাও নয়। যথেষ্ট বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল আসিয়াই বাহাতে ঘরের গৃহিণী হইতে পারে সেই রকম বয়স মেয়ে দেখিয়াই মৃণাল বিবাহ করিয়াছিলেন প্রিয়বালা আসিয়াই ঘর-সংসার বুঝিয়া লইলেন। বেশ সম্পন্ন সংসার, বাড়ীখানা মৃণালের নিজের, অবশ্য পাকা-বাড়ী নয়। গোয়ালে গরু, মরাইয়ের ধান, ঘরের ভিতরে জিনিষপত্র সবই আছে। তবে গৃহিণী-অভাবে সংসার বিশৃঙ্খল। সতীন যেন প্রিয়বালার জন্ত সংসার পাতিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রিয়বালা নিপুণ হাতে ঘরগৃহস্থালী সাজাইতে লাগিলেন। এ তাঁহার এক রকম ভালই হইল। অতি-দরিদ্র ঘরের মেয়ে তিনি। তাঁহার বাপ-মা এতই গরীব যে এই অতি সাধারণ গৃহস্থ ঘরে আসিয়া পড়িয়াই প্রিয়বালার মনে হইতে লাগিল কত যেন ধন-ঐশ্বর্য্যে ভাঙারে আসিলেন। তাঁহার রূপ ছিল না, বিজ্ঞাও ছিল না। নিতান্ত দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ বলিয়াই মৃণালমোহন অমন ঘরে বিবাহ করিলেন, না হইলে ফিরিয়াও ডাকাইতেন না। তাঁহার আশা ছিল যে কৃতজ্ঞতার খাতিরে অস্বস্তি নূতন বৌ মৃণালকে একটু স্বনজরে দেখিবেন।

কিন্তু “যে-বেটা সতীনে পড়ে, তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।” মৃণালকে দেখিয়াই প্রিয়বালার মনে সুপ্ত সতীন-বিশেষ জাগিয়া উঠিল। মৃণালের মাই এ-সংসার পাতিয়া গিয়াছেন, এখনও তাঁহার হাড়ের চিহ্ন এ-সংসার হইতে মুছিয়া যায় নাই। কত ভৈরবসংগ্রহ, কত ছোট বড় জিনিষ,

তাহারই বিবাহের সময়কার পাণ্ডা, এখনও সেগুলি নূতন বহিরাছে। এ-সব দেখিয়া কি যুগাক দিনে দশ বার সেই হারানো গুলশাকীকে স্মরণ করেন না? ভাবিতেই প্রিয়বালার মনে যেন কাঁটা ফুটিয়া বাইত। খাইতে বসিয়া মনে হইত, এই থালা বাটি গেলাস, সবই ত সত্যীনের সঙ্গে আসিয়াছিল। শুইতে গিয়া মনে হইত, এই খাটেই শৈলজাও শুইতেন নিশ্চয়। নিজে বিবাহের সময় কিছুই পান নাই, শাঁখা-শাড়ী দিয়া তাহার পিতা কষ্টানায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, তাহা না-হইলে প্রিয়বালা বোধ হয় এ-সব জিনিষে আগুন লাগাইয়া দিতেন। কিন্তু মনে যতই কাঁটা ফুটুক, এইগুলি দিয়াই তাহাকে নিজের সংসার গুছাইয়া পাতিতে হইল। ভালর মধ্যে ইহাবা জড় পদার্থ, ইহাদের মুখে ভাষা নাই, চোখে দৃষ্টি নাই। কেহ যদি ইহাদের ভুলিতে চায়, ইহারা জোর করিয়া অতীতের দৃতি জাগাইয়া দেয় না। প্রিয়বালা জোর করিয়াই সব কথা ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, স্বামীকেও আদর-স্নেহে যতটা পারেন একেবারে নিজের করিয়া লইবার চেষ্টারও ক্রটি ছিল না।

কিন্তু যুগল তাহার সংসারে একটা মুক্তিমতী উৎপাতের মত আসিয়া উপস্থিত হইল। এ-সে যুতা শৈলজার চোখ-মুখ গলার স্বর সব চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে। নিজে কিছু নাই বলিল, কিন্তু কালো চোখের দৃষ্টিতে, গলার স্বরে, হাত নাড়ার স্ক্রুমার ভঙ্গীতে সে দিনে দশ বার করিয়া তাহার পিতাকে মনে পড়াইয়া দিতে লাগিল যে সে শৈলজার মেয়ে। প্রিয়বালা মনে মনে জ্বলিতে লাগিলেন। যুগলকে মুখে কিছু বলিতে পারেন না, হাজার হউক সবে মাত্র তিনি এ-সংসারে আসিয়াছেন, তাহার দাবী আর কতটুকু? ইহার মা ত তবু পাঁচ-ছয় বৎসর স্বামীর ঘর করিয়া গিয়াছেন, সন্তানের জননীও হইয়া গিয়াছেন। মরিয়াও এখনও তিনিই জিভিয়া আছেন।

প্রিয়বালা যুগলকে মুখে কিছু বলিলেন না বটে, তাহাকে খাইতেও দিতেন, লোকদেখানো যত্নও করিতেন, কিন্তু সংসারটা তাহার নিজের কাছে বিশ্বাস হইয়া গেল। তাহার খাইয়া স্বপ্ন নাই, শুইয়া স্বপ্ন নাই। চোখের দৃষ্টিতে মনের ঝাঁঝ যেন ঠিকরাইয়া পড়ে।

যুগাক ব্যাপার দেখিয়া দমিয়া গেলেন। দুই বৎসর

একলা লক্ষীছাড়া জীবন যাপন করিয়া তাহার অকৃতি ধরিয়া গিয়াছিল। তাই বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং আর কিছু না পান, আরাম পাইয়াছিলেন। শৈলজাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে লইয়া প্রথম সংসার-রচনার যে অনির্বচনীয় আনন্দ তিনি লাভ করিয়াছিলেন, এই দ্বিতীয়বার পাত্তা সংসারের মধ্যে, প্রিয়বালার সাহচর্যে সে আনন্দ অবশ্য তিনি প্রত্যাশা করেন নাই, পানও নাই। আরামটুকুর খাতিরই তিনি নীচু ঘরে, অর্ধের প্রত্যাশা না-রাখিয়াও বিবাহ করিয়াছিলেন।

নিশ্চিন্ত আরামের চেয়ে অধিক কাম্য তখন তাহার আর কিছুই ছিল না। সেই আরামই যদি টুটিয়া যায়, প্রিয়বালা যদি রাগ করিয়া হস্তনিতে টক দিয়া দেন এবং উগ্মনা হইয়া বিছানা ঝাড়িতে ভুলিয়া যান ও ভাল কথা বলিলেও ঝকার দিয়া উত্তর দেন, তাহা হইলে বিবাহ করিয়া আর লাভ হইল কি? তাহার চেয়ে মেয়ে যেমন মামার বাড়ীতে ছিল তাই না হয় থাকুক। এমন ত নয় যে সেখানে কিছু অবস্থ হয়? মামা, মামী দুই জনেই তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, তাহাবা ত যুগলকে এখানে পাঠাইতেই চান নাই। খরচও যুগাক দিতে রাজী, যদি মল্লিক-মশায় নিতে রাজী থাকেন। সারারাত ধূলাবালিভর্তি বিছানায় শুইয়া, যত ঘুমের ব্যাঘাত হইতে লাগিল, ততই মেয়েকে অবিস্ময়ে মামার বাড়ী পাঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প যুগাকের মনে দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

সকালে উঠিয়াই তিনি বলিলেন, “আমি বলি কি, খুকি তার মামার বাড়ীই থাকুক এখন কিছুদিন।”

প্রিয়বালাও ত তাই চান, কিন্তু তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেলে লোকে বলিবে কি? তাই বলিলেন, “এই সবে এল, ছদিন না থেকেই চলে যাবে? লোকে আমায়ই ত ছববে, বলবে সংমা-মাগী ঘরে ঢুকেই পর ক’রে দিলেক গা।”

যুগাক মনে মনে বলিলেন, “নিতান্ত মিথ্যা বলবে না,” কিন্তু হরমোরাগীর মুখের উপর আর সেকথা বলিতে তাহার সাহস হইল না। বলিলেন, “না, তা বলবে কেন? বলে ত ঘরেই গেল। আমরা কারও খাইও না, পরিও না। খুকির একলা এখানে ভাল লাগে না, মামার বাড়ীতে ভাই বোনে মিশে বেশ থাকবে। তোমারও খাটুনি বাড়়ে

ও থাকলে।" অতএব মৃণাল আবার কিরিয়া চলিল। কিন্তু বাইবার সময় নিজের অজ্ঞাতে সংমাকে আরও ভাল করিয়া চটাইয়া দিয়া গেল। শৈলঙ্গার পোষাকী কাপড়-চোপড়, আট গাছা সোনার চুড়ি, একটি হৈসো হার, এক জোড়া অনন্ত আর কানের একজোড়া কানবালা, এই বাড়ীতেই একটি ছোট বাসে তোলা ছিল। সাবধানতার খাতিরে মৃণাল আবার তাহা গুহবার ঘরে বড় আমকাঠের সিঁদুকটার ভিতর ঢুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। সিঁদুকের চাবি নুতন গৃহিণীর হাতে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু ছোট বাসের চাবিটা কৰ্ত্তা তাহার হাতে দেন নাই। প্রিয়বালা বুঝিতেন যে জিনিষগুলির উপর আইনতঃ তাহার কোনও অধিকার নাই, সতীনের মেয়ে যখন বাঁচিয়া আছে। কিন্তু যে-আইনী কাণ্ডও ত জগতে কম হয় না? তাহার প্রেমের বস্ত্রায় ভাসিয়া গিয়া স্বামী হয়ত কোনদিন ঐ বাসটি তাহার হাতে তুলিয়া দিবেন, এ আশা তাহার মনে একেবারেই যে ছিল না তাহা বলা যায় না। কিন্তু মৃণাল যখন বিছানা কাপড়-পুটুলি রাখিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, তখন মৃণাল সেই ছোট বাসটি হঠাৎ সিঁদুক হইতে বাহির করিয়া তাহার পাশে রাখিয়া দিলেন। বলিলেন, "খুব সাবধানে নিয়ে যাস্ মা, তোর মায়ের সব জিনিষ আছে ওর মধ্যে। গিয়ে মামীমার হাতে দিস, তিনি তুলে রাখবেন।"

গরুর গাড়ী গ্রাম্য পথে ধূলা উড়াইয়া চলিতে লাগিল, মৃণালও নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে ঢুকিলেন। মৃণাল সাগ্রহে পথ দেখিতে বেধিতে চলিল, কতক্ষণে পথটা যে শেষ হইবে কে জানে? মামার বাড়ী কিরিয়া যাওয়ার তাহার লেশমাত্র আপত্তি ছিল না। নুতন মায়ের সংসারে আসিয়া অবধি তাহার প্রাণ আইটাই করিতেছিল। তাহার সমস্ত মন পড়িয়া ছিল মামার বাড়ীর দিকে। বাবা তাহার কাছে প্রায় অপরিসীম ছিলেন, ছুই জনের ভিতর ভালবাসার বন্ধনও বিশেষ দৃঢ় হয় নাই।

মামীনা সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলাইয়া তুলসীতলায় প্রণাম করিতেছেন এমন সময় মৃণাল কিরিয়া আসিল। মামীমার কোলের হৃদয় মুখে তখন সবে ভাষা ফুটিয়াছে, সে বলবৎ তুলিল, "তি ডি, আঃ আঃ।"

মামীমা আসিয়া মৃণালকে কোলে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "হয়ে গেল বাপের বাড়ী বেড়ানো?"

মৃণাল কাঁকড়া চুল দোলাইয়া বলিল, "হঁ"। তাহার পর ভাইবোনদের সঙ্গে খেলায় ভিড়িয়া গেল।

তাহার পর মৃণালকে আর কোনও দিন বাপের বাড়ী বাইতে হয় নাই, মৃণালও আর তাকে ডাকেন নাই। প্রিয়বালার সংসারে এখন তাহারই পল্লিপূর্ণ দখল, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে তাহার। এ-বাড়ীতে যে শৈলঙ্গার কস্তার আর কোনও স্থান নাই তাহা মৃণাল ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন। জোর করিয়া এখন মৃণালকে এখানে জায়গা দিতে গেলে গৃহবিপ্লব বাধিয়া যাওয়া নিশ্চিত। তাহাতে মৃণালেরও স্বর্থ হইবে না। কাজেই মৃণাল মামার বাড়ীতেই থাকিয়া গেল। বাবার কাছ হইতে মাসে মাসে কিছু খরচ পাইত, একেবারে পরের পলগ্রহ তাহাকে হইতে হইল না।

বছর দশ বয়স পর্যন্ত সে-প্রাণেই ছিল। তাহার পর মৃণালের নিকট হইতে অল্পরোধ আসিল, মেয়েকে ঘন কলিকাতার কোনও স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়, আজকালকার দিনে মেয়েছেলেরও লেখাপড়া লেখা বিশেষ দরকার। মৃণাল অনেক ভাবিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি ধনী মানুষ নহেন এবং কস্তার সম্মান্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। টাকাকড়ি খরচ করিয়া কল্প জনের বিবাহ দিতে পারিবেন কে জানে? একটাও যদি মানুষ হইয়া নিজের পথ নিজে করিয়া লইতে পারে ত মন্দ কি?

মৃণাল কাদিতে কাদিতে বোর্ডিং চলিল। কেন যে তাহার প্রতি এই দৃষ্টবিশ্বাস হইল তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। বৎসরের ভিতর যে দুই-তিন মাস মামার বাড়ী কাটাইতে পারিত, সেই মাস-কয়টির প্রত্যাশায় তাহার বৎসরের বাকি দিনগুলি কাটিয়া যাইত ক্রমে সহিয়া গেল, অল্প মেয়েদের সঙ্গে ভাব হইল, রাজধানীতে বাস করার সুবিধার দিকও যে আছে তাহাও বুলিল। তবু প্রাণের টান এখনও তাহার সেই শৈশবের লীলাভূমির প্রতি। এখনও ছুটির শেষে বোর্ডিংে ফিরিতে তাহার কান্না পায়।

(২)

পাশের ঘরে মামীমার কাজ এতক্ষণ শেষ হইল। একটা বড় হাড়ি, মুখে তাহার পরিষ্কার জাক্কাড়া বাঁধা, ও একটা

বোতল হাতে করিয়া শুইবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।
মৃণাল পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল, “ওতে কি
মামীমা?”

মামীমা তাহার পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন,
“এবার আর বেশী কিছু ক’রে দিতে পারলাম না মা, যা
জালাতন করে খোকাটা। খানকতক চন্দ্রপুলি আর কীরের
প্যাড়া দিলাম, খাস, আর এই বোতলটার গাওয়া ঘি দিলাম,
পাতে খেতে পারবি। কলকাতার খাওয়া খেয়ে মেয়ের
বা ছিরি হচ্ছে, হাড় ক’খানা পোনা যায়। দেখি, বড়দিনের
সময় যদি আনতে পারি।”

মৃণাল বিষমভাবে বলিল, “তখন কি আর বোর্ডিং থেকে
ছাড়বে মামীমা? প্রাইজ আর স্পোর্টের জন্তে ধ’বে রাখতে
চাইবে।”

মামীমা বলিলেন, “চিঠিপত্র লেখালেখি ক’রে দেখা যাবে
তখন। দেড়টা মাস বই ত নয়, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।
ক’খানা কাপড় নিলি দেখি?”

মৃণাল বাস্তব খুলিয়া উপরের বই খাতাগুলি উঠাইয়া
ফেলিয়া কাপড়-জামাগুলি মামীমাকে দেখাইতে লাগিল।
মামীমা বলিলেন, “মোট দশখানা কাপড়, তাও সব আট-
পৌরে, কোথাও যেতে-আসতে হ’লে কি পরবি? তোর
সেই ধর্যের রঙের জামদানি শাড়ীটা কি হ’ল? বেশ ছিল
কাপড়খানা, বেশী পুরনো ত নয়?”

মৃণাল বলিল, “প্রাইজের সময় গেল বছর সেটা নষ্ট হয়ে
গেল যে মামীমা! মেয়েরা সবাই ঢের কাপড় দিয়েছিল
ষ্টেজ সাজাতে, আমিও ওখানা দিয়েছিলাম। কে একরাশ
কালি উন্টে কলে সেটার দফা সেয়ে দিলে।”

মামীমা বলিলেন, “তা বেশ; তারা সব শহরে বড়
মানুষের মেয়ে, তাদের ত ওসব গায়ে লাগে না? আমাদের
যে কত কষ্ট ক’রে এক-একটা জিনিষ করতে হয়, তা ওরা
বুঝবে কি ক’রে? তা এরকম জাড়াবোঁচা হয়ে ত খাওয়া
যায় না? আমার গরমের শাড়ীখানা বেব, নিয়ে বাবি?”

মৃণাল বলিল, “না মামীমা, তুমি তাহ’লে কোথাও যেতে-
আসতে কি পরবে? তোমার ত আর নেই?”

মামীমা খানিক চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর
বলিলেন, “তাহ’লে এক কাজ কর, তোর মায়ের বাক্সটা খুলে

গোটা দুই শাড়ী বার ক’রে নিয়ে যা। ওগুলো তোরই ত,
পরবার কথা, বেশীদিন বাসে বসে হয়ে প’ড়ে থাকলে নষ্ট হয়ে
যাবে।”

মৃণাল বলিল, “ওগুলি নিয়ে পরতে কেমন যেন কষ্ট হয়
মামীমা।”

মামীমা বলিলেন, “তা হোক, তুই পর, তোর জন্তেই
রেখে গেছে। তার আশ্রাটা খুলি হবে। গহনা ক’খানাও
তোর সঙ্গে দিয়ে দেব ভাবি, তার পর আবার মনে হয়
বিয়েব জন্তে রেখে দিলেই ভাল। আমরা ত আর তখন
বেশী কিছু দিতে পারব না, তোর বাপও বেশী হাত উপড়
করবে বলে মনে হয় না।”

মৃণাল নত মুখে বলিল, “ওসব এখন থাক, গয়না-টয়না
স্বুলে তত কেউ পরে না।”

মামীমা সিন্দুরের ভিতর হইতে ছোট বাক্সটি বাহির
করিয়া আনিলেন। আঁচলে-বাঁধা চাবির তাড়া হইতে-
বাছিয়া বাছিয়া একটা পুতান মরিচাপড়া চাবি বাহির
করিয়া বাক্সটি খুলিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, “দেখ কি নিবি,
বেছে নে।”

বাক্সটি খুলিতেই ভিতর হইতে একটি মুহু সৌরভ বাহির
হইয়া আসিল। মৃণালের মনে হইতে লাগিল, তাহার
পরলোকবাসিনী মাতার অঙ্গনৌরভই যেন তাহার পরিত্যক্ত-
পরিচ্ছদগুলি হইতে বাহির হইতেছে। মাকে তাহার মনে
পড়ে না, শুধু একটা ছায়ামূর্তি মধ্যে মধ্যে তাহার স্মৃতিতে
ভাসিয়া উঠে, হয়ত সেটি মায়েরই ছবি। মামীমার কাছে
তিনিয়াকে, মায়ের মুখ আর স্নেহের গঠন তারি স্মরণ ছিল,
অমন চোখ নাকি গ্রামে কাহারও ছিল না। রং অবজ্ঞা
করসা ছিল না।

বাক্সটিতে থান আট নয় শাড়ী, দুটি লেগ-বসানো জামা,
রঙীন সেমিজ গোটা দুই তিন, তা ছাড়া টুকিটাকি আরও
কয়েকটি সৌখীন জিনিষ। পল্লীযুবতীর বিশ বছরের
জীবনের সঞ্চয়, কতই আর বেশী হইবে? একটি আখখালি
এসেলের শিশি, ভিতরের এসেল জলের মত ফিকা হইয়া
গিয়াছে, একটি তরল আলতার শিশি, একটি কাগজের
মোড়ক, তাহাতে গোলাপী পাউডার। উহা শৈলজার
বিবাহের সময় কেনা। সিন্দুর-কোঁটা দুইটি রহিয়াছে।

একটি লাল রং কবা কাঠের, অত্রটি স্বামীর উপহার, রূপার। বড় একটি রূপার ডিবার ভিতরে তাহার গহনা কয়খানি বহিরাছে। ডিবাটিও বিবাহের দান-সামগ্রীর জিনিষ। গোটা দুই বই শৈলজা বিবাহে বা বৌভাতে উপহার পাইয়াছিল। সেগুলির পাঠাও কাটা হয় নাই, যেমন আসিয়াছে তেমনই তোলা আছে। বাজের এক কোণে ত্রাকড়ায় বাঁধা কালজিরা, আর এক কোণে গুটি চার কর্পূরের দানা। কাপড়ে পোকামাকড় না লাগে তাহারই জন্ত মামীমাব এই ব্যবস্থা। সবার উপর পাট-করা একটি ফিকা সবুজ রঙের অল্পদামী শাল, সেটার স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

মামীমা কাপড়গুলি হাত দিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, “ঠাকুরঝির বড় যত্ন ছিল জিনিষপত্রের; এমন গুছিয়ে রাখত যে দেখে স্থখ হ’ত। আমার আর ওর কত কাপড় একসঙ্গে কেনা হ’ত, আমারটা দু-দিন না যেতে যেতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, ওর খানা থাকত যেমনকে তেমন, পাট ভেঙে যে পরেছে তাও বোধ হ’ত না। নে, কোনগুলো নিবি নে।”

মুণাল কাপড়গুলি এক-একখানি করিয়া বাস্তব হইতে বাহির করিয়া পাশে রাখিতে লাগিল। একখানি লাল বালুচরী শাড়ী, ইহা তাহার মায়ের বিবাহের কাপড়। লাল জমির উপর বড় বড় রেশমের ফুল তোলা। ফুলগুলি ফিকা সোনালী রঙের, আঁচলাটি বড়ই বাহারের, কত ছবিই যে নিপুণ কারিগর কাপড়ের গায়ে বুনিয়া দিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। ফুল আছে, বাগান আছে, বাঘ-সিংহ আছে, পাখি-বেহারা আছে। মুণাল শিশুকালে এই শাড়ীখানি দেখিয়া বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। বারবার নরম রেশমের গায়ে হাত বুলাইয়া শাড়ীখানিকে সে আদর করিত। এমন স্নিগ্ধ রং, যেন দুই চক্ষু জুড়াইয়া যায়। আর ছবিগুলিই বা কি সুন্দর! কলিকাতা যাইবার পর কত রকম সুন্দর দামী শাড়ী দেখিয়াছে, কিন্তু এত সুন্দর তাহার চোখে আর কিছুই লাগে নাই। কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া সে একটি কথা বলে নাই, কিন্তু মনে মনে তাহার সঙ্কল্প ছিল, তাহার নিজের বিবাহ যদি কোনও দিন হয় তাহা হইলে এই শাড়ীখানি পরিয়াই যেন হয়।

আর একখানি হালকা নীল-রঙের পার্শীশাড়ী মখনলের

ফিতার উপর রেশমের কাপড়-করা পাড় বসানো। এ-ধরণের শাড়ীর আজকাল বাংলা দেশে আর চলন নাই। মুণালের এ-শাড়ীখানিও ভারি ভাল লাগিত কলিকাতার মেয়েরা এই শাড়ী পরিলে নিশ্চয় তাহাকে ঠাট্টা করিবে, না হইলে মুণাল কাপড়খানি লইয়া যাইত।

আর একখানি লালপেড়ে গরম, ইহাও তাহার বয়সী মেয়েরা বিশেষ পবে না, গিন্নীবান্নী ম’হুযকেই উহা মানায়। তবু এই কাপড়খানিই মুণাল নিজের বাজের ভিতর তুলিয়া লইল। ইহা পরিলে ক্লাসের মেয়েরা বড় জোর তাহাকে ঠাকুরমা বলিয়া ফ্যাপাইবে। তাহার বেশী কিছু করিবে না।

আর একখানি সেই রকমই চওড়া পাড়ের তসরের শাড়ী, ইহা মুণাল এবার রাখিয়া দিল, পরে-কোনও সময় লইয়া যাইবে। আর দুখানি শান্তিন্দ্রী শাড়ী, পাড়গুলি সুন্দর, তাহাই বাড়িয়া বাহির করিয়া লইয়া সে বলিল, “এবাব বাস্কাটা বন্ধ করে ফেল মামীমা, আর কাপড় চাই না। ঐ তিনখানা পোষাকী কাপড়েই আমাব চের হবে। কোথায়ই বা আমি যাই?”

মামীমা ছোট বাস্কাটিতে তালা বন্ধ করিয়া আবার তাহা সিন্দুকে তুলিলেন। একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “পাউজারটা নিবি? তোদের বার্ডিঙের মেয়েরা মাখে না এ-সব?”

মুণাল হাসিয়া বলিল, “মাখেবেন কেন মামীমা, খুব মাখে। এক-একজন এত মাখে যে ম’হুয হয় যেন ময়দার বত্বা থেকে সবে বেরিয়েছে। আমরা কিন্তু ভারি লজ্জা করে। যতই পাউজার মাখি, যে কেলে রং সেই কেলেই থেকে যাবে।”

মামীমা হাসিয়া বলিলেন, “তবে থাক, নিস্ নে। ও সব শহরের মেয়েদেরই মানায় তুই স্বতকাল কলকাতায় থেকেও শহরে হ’তে পারলি না। বে-দিন মুখের-গিন্নী বলছিল তার মেয়ে চিঠিতে লিখেছে, ‘আজকাল কলকাতায় ভক্তলোকের মেয়েরাও নাকি মুখে রং স্বেদে বেড়ায়।’

মুণাল বলিল, “বেড়াই ত, আমিই কত দেখেছি। আহা, যা ছিরি সব বেরোয়।”

মামীমা বলিলেন, “কালে কাশে কতই হবে মা।

বাক্যে, তুই এখন শো গিয়ে, অনেক ভোরে কাল উঠতে হবে।”

মৃণাল বাস্ক বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল। ঘরের ছই দিকে দুইখানা বড় বড় খাট, তিন-চার জন করিয়া মানুষ এক-একটাতে বেশ শুইতে পারে। সম্প্রতি এখন এক খাটে শোয় মৃণাল, টিনি আর চিনি। অন্তর্ভুক্ত মামীমা গোপাল আর কান্নকে লইয়া শয়ন করেন।

দুইখানা খাটেই মশারি টাঙানো, পাড়াগায়ে মশার উৎপাত ত আছেই, তাহার উপর সাপেরও অভাব নাই, কাজেই মশারি বারো মাসই খাটানো থাকে। মামীমা বলিলেন, “নে তুই চুকে পড়, আমি মশারি গুঁজে দিচ্ছি। চিনির আবার যা পাতলা ঘুম, কানের কাছে একটা মশা জন্মন্ করলেই সে উঠে বসবে। না-হয় এমন পা ছুঁড়বে যে কাউকে আর ঘুমতে হবে না।”

মৃণাল বিছানায় উঠিয়া পড়িল। জায়গার অভাব নাই, টিনি চিনি এক কোণে বিভালছানার মত পরস্পরকে আঁকড়াইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া আছে।

মামীমাও হারিকেন লঠনটা নিবাইয়া শুইয়া পড়িলেন। মৃণালের ঘুম আসিতেছিল না। আসন্ন বিচ্ছেদকাতর মনটা তাহার কেবলই ছটফট করিতেছিল। কিন্তু মামীমা সারাদিন খাটিয়া খুটিয়া শ্রাস্ত হইয়া শুইয়াছেন, এখন বক্বক করিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া রাখা ঠিক নয়। খানিক বাদে এ-পাশ এ-পাশ করিতে করিতে মৃণালও ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোরের দিকে কেমন একটু শীত শীত করিতে লাগিল। চিনি গড়াইতে গড়াইতে মৃণালের কোলের কাছে আসিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, সে গাড়ে দিতে চায়। মৃণালের ঘুম ভাঙিয়া গেল, মাথার কাছে একখানা নজ্জাকাটা কাঁথা ছিল, তাহাই টানিয়া আনিয়া সে বেশ করিয়া চিনির গায়ে জড়াইয়া দিল। চিনি আবার নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতে লাগিল। মৃণালের বালিশের তলায় একটা ইলেকট্রিক চর্চ থাকিত, সেটা বাহির করিয়া পাশের টেবিলের উপর আলো ফেলিয়া দেখিল, পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। ভোর হইতে আর দেরি নাই। উঠিয়া পড়িলে কিনা ভাবিতে লাগিল, এখন আবার ঘুমাইতে স্বপ্ন করিয়া লাভ নাই। কিন্তু শীতের রাত, লেপের মায়া সহজে

ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। শুধু শুধু অন্ধকার ঘরে জাগিয়া থাকিতেও ইচ্ছা করে না।

কিন্তু ইহারই মধ্যে মামীমারও ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মিহু উঠেছিল নাকি?”

মৃণাল বলিল, “উঠি নি, তবে জেগে আছি। যা শীত, আরও আধ ঘণ্টা। খানেক পরে উঠব। সব এখন পাঁচটা।”

মামীমা বলিলেন, “আচ্ছা তুই শো, আমি উঠি। দেখতে দেখতে স্নিগ্ধ উঠে যাবে, তোকে সকাল সকাল ছোটো র্বেশে দিতে হবে ত? না খেয়ে ত আর যাওয়া হয় না? রাখী ছুঁড়িকে ভোরে আসতে বলেছিলাম আজ, এলে এখন বাঁচি।”

মামীমা বিছানা ছাড়িয়া নামিয়া পড়িলেন। মৃণালও বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, “আমিও উঠলাম মামীমা, আমার আর শুতে ভাল লাগছে না।”

বাহিরে তখনও আকাশের গায়ে তারা স্তুতিয়া আছে। মামাবাবুরও ঘুম ভাঙিয়াছে, তিনিও উঠবার যোগাড় করিতেছেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সাড়া পাইয়া বলিলেন, “ধন্তি সখি বাপু তোমার। এই দারুণ শীত, হাত পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, কেমন করে এই খোলত বারান্দায় শুয়ে থাক তাই ভাবি।”

মল্লিক-মহাশয় বিছানায় বসিয়া অন্ধকারে পা বাড়াইয়া চট জুতা ধুঁজিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, “শীতে আমার কিছু এসে যায় না, কিন্তু আকাশ দেখতে না পেলে আমি বাঁচি না। বর্ষার দিন ক’টা আমার যে কি কষ্টে কাটে তা আর বলে কাজ নেই।”

মৃণাল বলিয়া উঠিল, “দ্বিমিমাও এমন ছিলেন, না! মামাবাবু? তিনি ত ঘরে শুতেই পারতেন না? বৃষ্টির সময়ও না।”

মল্লিক-মহাশয় চট পরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, “মায়ের জন্তে ত সব সময় একটা জানালার দু-একটা গরাদে কাটা থাকত, ঘরে শুলেও মাথাটা সেই ফাঁক দিয়ে বার করে রাখতেন। তিনি মারা যাবার পর ভোর মামীমা আবার সে জায়গাগুলো শিক বসিয়ে বন্ধ করে দিবে।”

মামীমা বলিলেন, “যা বেরাল আর ভায়ের উৎপাত, বন্ধ না করে করি কি? টিনি চিনিও ঠাহরমার খাত

পেয়েছে খানিক খানিক, মশারির ভিতর কিছুতে স্ততে চায় না।”

খিড়কির দরজার শিকলটা ঠিন্ ঠিন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। মামীমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “যাক্ রাধী এসেছে, বাঁচা গেল। আর কোনও কাজকে ভরাই নে বাছা, কিন্তু এই শীতের ভোবে ঘাটের কনকনে জলে নামতে আমার ঘেন রক্ত হিম হয়ে যায়।”

মল্লিক-মহাশয় উঠানে নামিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। ভোরের অস্পষ্ট আলো তখন সবে জন্মট অন্ধকারকে একটুখানি ভরল করিয়া আনিতেছে। দেখা গেল, দুইটি নারীমূর্তি আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। মল্লিক-মহাশয় লঠনটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, জীলোক দুইটি ভিতরে ঢুকিয়া আসিল।

মামীমা বলিলেন, “রাধীর মাও এসেছিঁ দেখি।”

রাধীর মা বুড়ী বলিল, “রেতেভিতে মেয়াদটারে একলা ছাড়ি কাম্বে মা ঠাকরন? শিয়াল দেখে উ বড় ভবায়, তাই সাথে এলাম।”

মামীমা বলিলেন, “তা বেশ করেছিস, নে এঁটো সফড়ি বাসনগুলো উঠিয়ে নে। আমি কাপড় ছেঁড়ে উল্লনটা ধরাই।”

শান্তুড়ী বাঁচিয়া থাকিতে শীতকালে তাঁহার কি কষ্টটাই বাইত, মনে করিয়া গৃহিণীর হাসি আসিল। স্বান না সারিয়া ভাঁড়ার বা রান্নাঘরের ত্রিসীমানায় বাইবার জো ছিল না। শান্তুড়ী এমনই মন্দ মানুষ ছিলেন না, কিন্তু আচারনিষ্ঠা ও স্ততিবাই বড়ই বেশী ছিল তাঁহার। মামীমাকে একরাশ চুল লইয়া ভোরেই ডুব দিতে হইত বড় পুকুরে, আর ঘোমটার অন্তরালে সারাদিন সে চুলের কাঁড়ি শুকাইতও না, সেও এক কম জ্বালাতন ছিল না। এক-এক সময় রাগ করিয়া কাঁচি হাতে লইয়া বলিতেন, “দেব একেবারে এ জ্বালা শেষ করে।” কিন্তু স্বামীর নির্দোষাতিশয্যে তাহা কোনও দিনই করা হয় নাই। স্বামী

বারণ না করিলেও তিনি কত দূর যে চুল কাটিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল, কাবণ সধবা-মাহুষের এমন কাণ্ড করা যে অতি অলক্ষণ, সে জ্ঞানের তাঁহার অভাব ছিল না।

রাধী ও রাধীর মা বাসন তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। মামীমা বাসি কাপড় ছাড়িয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া গেলেন। যুগল বারান্দায় উদ্বেষ্টবিহীন ভাবে ঘুরিতে লাগিল।

অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে, পূর্বদিকের আকাশে মুক্তার জ্বায় টলটলে স্বচ্ছতা ক্রমে আগুনের রঙে রাঙিয়া উঠিতেছে। এমন স্থলর সকাল কলিকাতায় কেন হয় না? পাঁচতলা চারিতলা বাড়ীর আড়ালে সূর্যোদয় কোথায় হারাইয়া যায়, কেহ বুঝিতে পারে না। বুঝিতে চায়ও না বোধ হয়। কলিকাতায় দিনকে রাত ও রাতকে দিন করাই ত আভিজাত্যের লক্ষণ। সেখানে যে মত বেলা অবধি ঘুমাইয়া থাকিতে পারে, সে তত ভাগ্যবান। এতদিন কলিকাতায় বাস করিয়াও কিন্তু যুগলের ভোরে-উঠা রোগ সাবে নাই। বোভিঙে সর্বদা সকলের আগে সে উঠিয়া পড়ে। তখনও কোনও বচা পড়ে না, কাজেই আসন্ন মনে সে বাবান্দায় ঘুরিয়া বেড়ায়, নীচে নামিবার তখনও হুকুম নাই।

মামীমার রান্না ইহাবই মধ্যে চড়িয়া গিয়াছে। টিনি, চিনি, কাছ সবাই উঠিয়া পড়িল, যুগলকে তখন লাগিতে হইল তাহাদিগকে সামলাইবার কাজে। সে যখন থাকে না, তখন এই ছুরন্ত শিশুগুলি মাকে ন-জানি কি জ্বালানোই জ্বালায়। চিনি বড় হইলে তাহাকে সে কলিকাতায় লইয়া বাইবে একথা যুগল প্রায়ই মামীমাকে বলে। তিনি শুধু হাসেন। যুগল জানে, এসবে মামীমার মত নাই। মেয়ে-ছেলের উচ্চশিক্ষার যে কি প্রয়োজন তাহা মামীমা বুঝিতে পারেন না। যুগল পরের মেয়ে, তাহার উপর জোর নাই, তাই তাহার বাপের ইচ্ছামত তাহাকে জ্বলে পড়িতে দেওয়া হইয়াছে। মামীমার মেয়ে হইলে এতদিনে মাথায় লাল চেলীর ঘোমটা টানিয়া সে খণ্ডরবাড়ী চলিয়া যাইত, একথা যুগল নিশ্চয় করিয়া জানে। ভাবিতেই তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠে।

কবি ছইটম্যানের বাণী

ক্রীক্টিমোহন সেন শাস্ত্রী

ছইটম্যান-স্মৃতিসভার সম্পাদক মহাশয়কে লিখিত পত্র

আপনার তাগিদ পত্রখানি পরন্তু পাইয়াই একটা লেখার হাত দিয়াছিলাম। আপনি আমার একটি পুরাতন প্রবন্ধের কথা জানিতে চাহিয়াছেন। ‘প্রবাসী’তে ১৩:৩ সালে তাহা বাহির হইয়াছিল।

সেই প্রবন্ধটির নাম হইল “চরৈবেতি চরৈবেতি”। ঋতুদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচয়িতা ঋষি ঐতরেয় তাঁহার প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সপ্তম পঞ্চিকার তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে ঋষি স্তন্যশেপের উপাখ্যানের মধ্যে এমন পাঁচটি শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন যাহা মানবসাধনার নিত্য সচলতার, নিত্য অগ্রসর হওয়ার একটি শাস্ত্র মহামন্ত্র। প্রত্যেকটি শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত আছে—হে রোহিত, “তুমি চলিতে থাক, চলিতে থাক”—অর্থাৎ “চরৈবেতি চরৈবেতি”। সেই জন্তই সেই প্রবন্ধটির নাম দেওয়া হইয়াছিল “চরৈবেতি চরৈবেতি”।

তার প্রথম শ্লোকেই আছে—

“প্রেতেশ্ব সর্বে পাপমানঃ শ্রেয়ঃ অপথে হতাঃ”

যে ব্যক্তি নিত্য অগ্রসর হইয়া চলে তাহার আর নিজের পাপ প্রভৃতি সব খুঁচরা সমস্তা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। তাই ঐতরেয় বলিলেন, “তাহার সকল পাপ তাহার চলিবার উদ্যমের জন্মে আপনি হতবোধ হইয়া সেই চলার মুক্ত পথে শুইয়া পড়ে।” “প্র-পথ” হইল সেই পথ যাহা নিত্য আমাদের দিকে সন্মুখ দিকে লইয়া চলে। এই বাণীটি কবি ছইটম্যানের বিখ্যাত “Open Road”-কেই স্মরণ করাইয়া দেয়। “চরৈবেতি চরৈবেতি” প্রবন্ধে উল্লিখিত, ঐতরেয়-ভাষিত পাঁচটি বাণীই সেই হিসাবে অপরূপ। সেই জন্ত আমি এই দুই দিন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বাছা বাছা সব বাণীগুলি সাজাইয়া ঋষির অন্তরের মহা-

ন্যত্যটির দ্বারা আমাদের চিত্ত-মন-প্রাণকে উদ্বোধিত করিতে চাহিয়াছিলাম।

দুই দিন ক্রমাগত খাটিয়াও তাহা লেখা পূর্ণ হইল না যদিও অনেকটা লেখা ইতিমধ্যে হইয়াছে। আর অত বড় একটা বিষয়কে এইরূপ যেমন-তেমন ভাবে সারিয়া দেওয়ার অর্থই হইল সেই বিষয়টিকে অপমান করা। তাই আমি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সেই ভিতরের কথাটি পরে ভাল করিয়া সবার কাছে উপস্থিত করিব। ইতিমধ্যে তাহার চাহেন তাঁহারা আমার (প্রবাসীতে লেখা) “চরৈবেতি চরৈবেতি” নামক পুরাতন প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিতে পারেন।

এই ক্ষেত্রে আর একটি কথাও মনে আসিতেছে, তাহাও এখানেই বলা ভাল। ঋষিদের সমস্তা ছিল তাঁহাদের সমস্ত জীবনের পূর্ণতার সাধনা। সেই সাধনা যে কেমন করিয়া সত্য হইবে তাহা তাঁহারা নানা ভাবে পরখ করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন। তাই তাঁহাদের বাণী—

“কস্মৈ দেবার হবিষা বিধেম”

“আমাদের প্রকার আহুতিটি কোথায় সমর্পণ করি?”

বাগদায়ে, ইষ্টকা-ব্যবস্থায়, তপস্যায়, কৃচ্ছ্রচারে, ব্রহ্মচর্যে, ধ্যানে, মননে, নিমিধ্যাসনে, যোগে নানা ভাবে তাঁহারা নিজেরদের সেই পূর্ণতাকেই ব্যাকুলভাবে খুঁজিয়াছেন। এই খোঁজার পথে আত্মবলিকরূপে কিছু কিছু যে “বাণী” বাহির হইয়া পড়িয়াছে তাহা তাঁহাদের সাধনার মুখ্যবস্তু নয়, তাহা একান্তই গোপন। তাঁহাদের প্রধান কথাই হইল মানবজীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার জন্ত ব্যাকুল সন্ধান ও সাধনা।

আর সাহিত্যিকদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা চান “বাণী”কেই পূর্ণ প্রকাশ দিতে। প্রকাশের নিখুঁত সম্পূর্ণতাই

(perfection of expression) হইল তাঁহাদের পরম ও চরম লক্ষ্য। আমাদের কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট প্রভৃতি কবিও এই দলের মধ্যে। পাশ্চাত্য দেশের শেক্সপীয়ার, মিলটন প্রভৃতিও এই দলের। মানবজীবনের পরিপূর্ণ সমগ্র সার্থকতার সাধনা তাঁহাদের নহে। তাঁহাদের চাই গন্তে গন্তে ছন্দে কাব্যে সাহিত্যের পূর্ণ প্রকাশ। হুইটম্যানও এই দলেই।

ঋষিদের পক্ষে বাণীতে প্রকাশটি হইল গৌণ, আর সাহিত্যিকদের পক্ষে তাহাই তাঁহাদের সব-কিছু। কাজেই সাহিত্যিক কবি ও ঋষিদের পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে অবিচার হওয়ার সম্ভাবন আছে।

মানবসাধনায় ভিন্ন ভিন্ন “লোক” আছে। আমি কাব্যলোককে উপেক্ষা করি বা তুচ্ছ করি এমন নহে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও যেন না ভুলি যে আমাদের প্রাচীন ঋষি ও সাধকদের লোক ছিল একেবারে ভিন্ন। এই দুইয়ের মধ্যে যেন গোল না পাকাইয়া বসি।

ঋষিদের সাধনাতেও এক-একটি যুগ আসিয়াছে তাহা হইল পুরাতন আচার সাধনা প্রভৃতির নিরর্থক জড়ভার হইতে মুক্তির জন্য বিজ্রোহ। সেই বিজ্রোহের বাণী আমরা দেখি মাঝে মাঝে সংহিতায় ও উপনিষদের ঋষিদের কণ্ঠে, গীতায়, ভাগবতে, মধ্যযুগের সাধকদের বাণীতে, আউল বাড়ল দরবেশদের গানে। ঐতরেয়ের কোন কোন বাণীতে উপনিষদের বাণীর মতই প্রাচীন বন্ধনের প্রতি বিজ্রোহের ভাব দেখা যায়। বিজ্রোহের একটি প্রচণ্ড উদ্যম তার মধ্যে থাকিতে এক এক সময় সাহিত্য-হিসাবেও সেই সব বাণী আমাদের কাছে এত উপাদেয় লাগে। কিন্তু এই ভাললাগাই তাহার শেষ কথা নয়। তাঁহাদের জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য যে সাধনপথের সন্ধান,

তাঁহাদের সর্ব্বম উৎসর্গ করিয়া জীবনের সমগ্রতাকে সার্থক করিবার যে ব্যাকুলতা, তাহা যদি বথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারি তবে কিছুই হইবে না।

হুইটম্যান এক জন বিজ্রোহী কবি। পূর্ববর্তী সাহিত্যে ছন্দ-রীতি বর্ণনাভঙ্গী প্রভৃতির যে পাৰাণ-প্রাচীর রচিত হইয়াছিল তিনি তাহাতে বিদ্রোহীর মত প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। সাহিত্য-জগতের মিথ্যা আভিজাত্যের উপর তাঁর বজ্রাঘাতে এমন একটি সাহিত্য-রঙ্গ সৃষ্ট হইল যাহাতে এক এক সময় ভারতীয় সেই সব বিজ্রোহী সাধক ঋষিদের কথা স্বতই মনে আসে। সেই জন্যই আমি হুইটম্যানের প্রচণ্ড বিজ্রোহ-বাণী শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সেই সব বাণীর মধ্যে বিজ্রোহী ঋষিদের বাণীর মতই একটি অপূর্ণ শক্তি আছে। তাই আজ তাঁর জন্মদীপ্তি দিনে কবি হুইটম্যানকে নমস্কার করি। সেই শ্রদ্ধা নমস্কার গঙ্গার তীর হইতে হৃদয় আমেরিকাতে যাত্রা করুক। তবু যেন কখনও না ভুলি ঋষি ও কবি এক নহেন। ঋষির সাধনা হইল সমগ্র জীবনের সাধনার পরিপূর্ণতা, সাহিত্যিকদের সাধন হইল বাঙালীর সাধনার চরিতার্থতা।

তবু উভয় দলের বিজ্রোহীদের বাণীর মধ্যে এমন একটি সমজাতীয়তা আছে যে একের কথা শুনিলে স্বভাবতই অন্বেষক কথা মনে আসে। তাই হুইটম্যানের জন্মদীপ্তি তিথিতে আজ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঋষির কথা জমাগতই মনে আসিতেছে—
“আগে চল, আগে চল, তোমার চলার উদ্যমে চলার বেগেই, সম্মুখে, তোমার মুক্ত পথে, তোমার সব পাপ শুইয়া পড়িবে হতবীৰ্য্য হইয়া। পাপতাপের নব ছোট ছোট সমস্তা লইয়া আর বুঝা মাথা ঘামাইতে হইবে না। আগে চল, আগে চল।”

শ্রেয়স্ত সৰ্বে পাপান্ধঃ ক্রমেণ প্রপথে হতাঃ

চরবেতি চরবেতি—(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭, ৩, ০)



নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যারন

১৬

ভিবর্তে খবরের কাগজ নাই কিন্তু প্রতি সপ্তাহে “মৌখিক বার্তাবহ”তে এমন অনেক গুজব ও খবর রাষ্ট্র হয় যাহাতে জনসাধারণের মন তৃপ্ত হয়। ১২শে জাহুয়ারি খবর পাওয়া গেল যে জনৈক চি-টুঙ (ভিক্স-অফিসর) এবং তাহার প্রিয়পাত্রী “কনছি লম্বর” গ্রেপ্তার হইয়া লাসায় আসিয়াছে। এই চি-টুঙ তিন বৎসর যাবৎ সপ্তম দলাইলামার স্তুপাগারের অধ্যক্ষ ছিল। এখানকার নিয়ম যে কোন দলাইলামার দেহান্ত হইলে পোতলা প্রাসাদের কোন গৃহে তাহার জন্ত বৃহৎ অর্থরোপ্যময় স্তুপ নির্মাণ করা হয় এবং তাহার জীবদ্দশায় তাহাকে যে-সব মণিমুক্তা ও অস্বাস্থ্য-বহুমূল্য দ্রব্য ভেট দেওয়া হইয়াছিল সে-সবই সেই স্তুপমধ্যে প্রোথিত ও রক্ষিত থাকে। প্রতি তিন বৎসর অন্তর এইরূপ প্রত্যেক স্তুপে এক জন ভিক্স কর্মচারী (চি-টুঙ) অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৬৪১ খ্রীঃাব্দে পঞ্চম দলাইলামা স্তমতিসাগর (১৬১৬-১৬৮১ খ্রীঃ) ভোটিরাজ্য নিজ অধিকারে পাইয়াছিলেন। তখন হইতে বর্তমান জ্যোতিষ দলাইলামা মুনিশাসনসাগর (খুব-বুডন-গ্যা-ম্ছো, জন্ম ১৮৭৪ খ্রীঃ) পর্যন্ত আট জন দলাইলামা দেশে অধিকার পাইয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সপ্তম দলাইলামা ভজকল্পসাগর (ক্স-বসঙ-গ্যা-ম্ছো, জন্ম ১৭০৮ খ্রীঃ) পূর্বরূপে সংসার-বিরাগী সাধু ছিলেন। চিত্তে ইহার হস্তে শাসন-চিহ্ন চক্রের বদলে পুষ্পক দেওয়া আছে ; ইনি প্রাসাদ ছাড়িয়া, কোন রাজসেবক বা অশুচর সঙ্গে না লইয়াই পর্বতে বাস করিতেন। চীন ও তিব্বত—উভয় দেশেই ইহার সম্মান সমরূপ ছিল।

সপ্তম দলাইলামার স্তুপে রক্ষিত মহামূল্য ধনরত্নাদি গন্ত তিন বৎসর উক্ত চি-টুঙ-এর হস্তে প্রাপ্ত ছিল। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে দাক্ষিণিও হইতে কয়েকটি তুটিয়ানী স্তম্বরী রূপ-জীবিকার চেষ্টায় ও-দেশে যায়। তাহাদের

মধ্যে কনছি লম্বর ও এই চি-টুঙের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তাহা সকলেই জানিত। আশ্চর্যের বিষয়, কনছি প্রকাশ্য-ভাবে পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের মুক্তাময় শিরোভূষণ পরিয়া বেড়াইলেও উচ্চতম অধিকারীদিগের সন্দেহ হয় নাই যে উক্ত চি-টুঙ স্তুপ হইতে মণিরত্ন বিক্রয় করিতেছে। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে, তিন বৎসর পর যখন তাহার বদলির সময় ঘনাইয়া আসিল, তখন সে প্রাণ বাচাইবাব জন্ত পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিল। সে এবং কনছি লম্বর নিকোদেবের মত ঘোড়ায় চড়িয়া চীনদেশের পথে রওয়ানা হয়। যদি তাহারা দাক্ষিণিও যাইবার চেষ্টা করিত তবে দশ দিনের মধ্যেই তাহাদের কার্যসিদ্ধি হইয়া যাইত, কেননা, তাহারা পলাইবার তিন সপ্তাহ পরে উচ্চতম কর্মচারী-দিগের হুঁস হয় যে এই চি-টুঙ কার্যস্থলে নাই। আরও নিকোদেবের মত তাহারা প্রায় দুই সপ্তাহ লাসা এবং আশপাশের জায়গায়, বন্ধুবান্ধবের ঘরে, পানাহারে ও প্রমোদে কাটায়। যখন খবর পাওয়া গেল যে খোজ আরম্ভ হইয়াছে তখন তাহারা চীনদেশের পথে, লাসা হইতে তিন-চার দিনের রাস্তায়, এক নির্জন পর্বতময় অঞ্চলে লুকাইয়া থাকে। কয়েক দিন লুকাইয়া থাকিবার পর ঋতুর সন্ধানে এক গ্রামে যাইবার সময় দু-জনেই গ্রেপ্তার হয়।

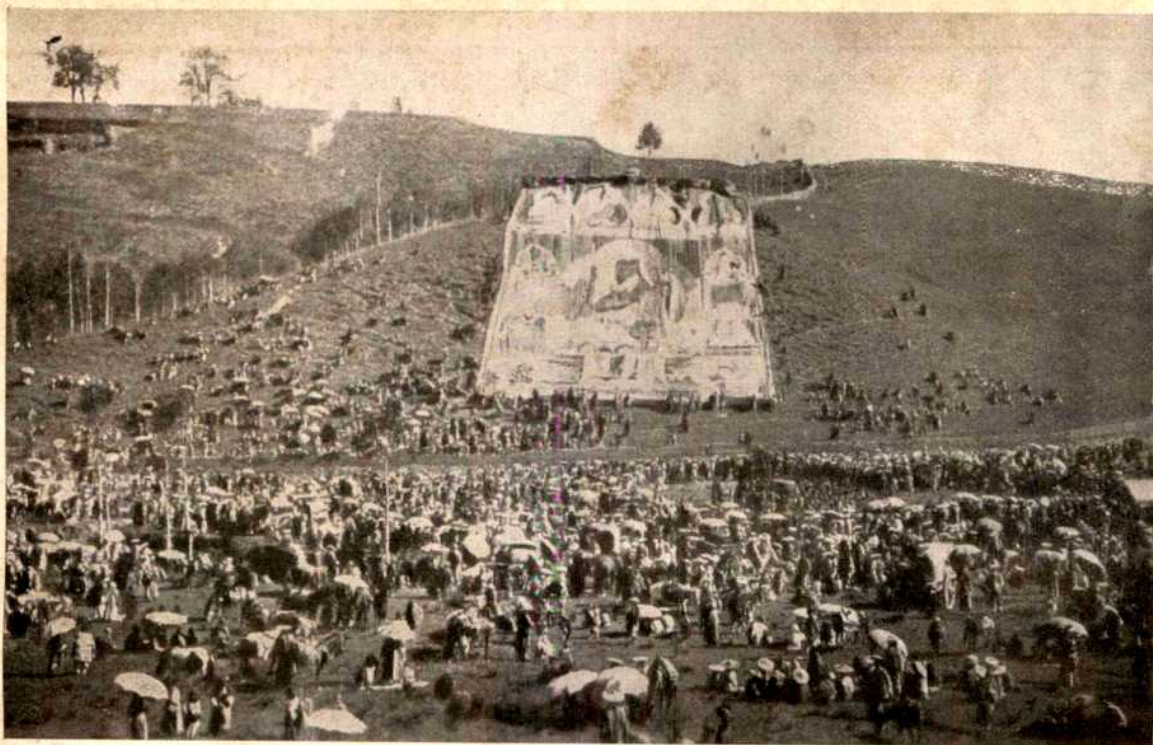
লাসায় আসিলেই প্রথমে দু-জনের উপর নির্ভরমভাবে বেত চলিতে আরম্ভ করে। চি-টুঙ ও কনছি সহজে কিছু কবুল করে না, বরঞ্চ বন্ধুবান্ধবের রক্ষার চেষ্টাই করে। কিন্তু “মারের চোটে ভুত ছাড়ে,” স্বতরাং নিরস্তর প্রহারের ফলে তাহারা লোকজনের নাম বলিতে আরম্ভ করে। দামী জিনিষের অধিকাংশ তত দিনে কলিকাতা—কি হয়ত সমুদ্রপারে লণ্ডন-প্যারিসে—পৌছিয়া গিয়াছে। একটি অতি মূল্যবান মুক্তার মালা লইয়া এক সওয়াগর লাসা ছাড়িয়া নেপাল চলিয়া যায়, সেই মালার প্রাংশা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তবে অল্পখয় করিয়া অনেক মণিরত্ন চি-টুঙের



লাসার উত্তর দ্বার



পশ্চিম-তিব্বতের বিহার



মহান চোং-খ-পার জন্মস্থলে (কুম্বু বিহারে) উৎসব।
উৎসবে বিরাট চিত্রপট টাঙানো হয়।



ভিক্তের সিদ্ধনদের থেয়া

বন্ধুবান্ধবের নিকট ছিল, তাহাদের সকলের সন্মানশ হইয়া গেল। পঞ্চাশ-বার্ট টাকার জিনিবের জন্ত তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। এইরূপ যখন চলিতেছে তখন (৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যায়) আমি ছু-শিঙ, কুঠিতে আমায় ঘরে বসিয়া রাজপথে অনেক ঘোড়া চলার শব্দ শুনিতে পাইলাম। দেখিলাম, মহাশঙ্কর সর্বোচ্চ কর্মচারী দৌ-নিবু-ছেনপো এবং তা-লামার সঙ্গে নেপাল-রাজদূত ও সৈন্যসামন্ত সকলেই মোতীরদ্ব সওদাগরের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। চি-টুঙ এখানে একটি বহুমূল্য পেয়াদা দেওয়ার কথা বলিয়াছিল এবং এখন স্বল্প তন্মাসীর সাহায্য করিয়া সেটি বাহির করিয়া দিল। শোনা গেল, পলাইবার সময় উহার ছই জনে ছই রাজি ঐ দোকানে একটি বড় সিন্দুকের মধ্যে লুকাইয়া ছিল। মোতীরদ্ব গ্রেপ্তার হইয়া নেপালী গায়দে চলিল। লাসার প্রধান থানার কোতোয়াল ও মোতীরদ্বের একই জী ছিল, কোতোয়াল ও তাহার জীও জেলে চলিল।

* * *

গত ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার এদেশে থাকা বা ন-থাকা সম্বন্ধে কিছু ঠিক করিতে পারি নাই। লক্ষ্য হইতে পত্র পাইয়াছিলাম যে আমাকে পুস্তক-ক্রয়ের জন্ত টাকা পাঠানো হইবে, আমি ক্রয় শেষ করিয়াই যেন চলিয়া আসি। প্রথমে আমি সে প্রস্তাবে রাজী হই নাই, কিন্তু যখন চাব মাসেও কোন বিহারে থাকিবার ব্যবস্থা হইল না এবং নেপাল-ভিক্রমত স্বত্বের আশঙ্কা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল, তখন আমি সেই প্রস্তাবই সমর্থন করিয়া পত্র দিয়াছিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার, যখন নিরাশায় মন ক্লিষ্ট তখন নৈরাশ্রই চতুর্দিকে, যখন আশার সন্ধ্যার আরম্ভ হয় তখন তাহাও অতিমাত্রায় আসে! পুস্তক-ক্রয় ও প্রত্যাগমনে স্বীকৃতি-পত্র পাঠাইবার পরেই মহাশয় আনন্দ লিখিলেন যে আমার প্রথম পত্র সিংহলের এক প্রসিদ্ধ দৈনিক “দিন-মিন্” (দিনমণি) প্রকাশ করিয়াছে এবং জানাইয়াছে যে তাহারা প্রতি পত্রের জন্ত ১৫ টাকা বা ততোধিক দিতে প্রস্তুত। প্রতি সপ্তাহে একটি লেখা লিখন ও প্রকাশ কোনটাই ছুই নহে এবং তাহাতেই আমার অর্থ-সমস্যা সমাধান সম্ভব। পরের পত্রেই আমাকে পুস্তক-ক্রয়ের জন্ত টাকা পাঠানো হইতেছে এই সংবাদ আসিলে আমাকে প্রত্যাগমনের জন্ত

প্রস্তুত হইতে হইল; এমন সময় (১১ই ফেব্রুয়ারি) আচার্য্য নরেন্দ্র দেব লিখিলেন যে, কাশী বিদ্যাপীঠ আমাকে মাসিক ৫০০ টাকা বৃত্তি ও পুস্তক-ক্রয়ের জন্ত এককালীন ১৫০০ টাকা দেওয়া মঞ্জুব করিয়াছেন, সুতরাং আমার এদেশে বাস ও অধ্যয়নের আর কোনও সমস্যা নাই। লাসার এখন তিন বৎসর থাকিয়া অধ্যয়ন করার কোনই বাধা রহিল না কিন্তু এ সকল ব্যবস্থা তিন সপ্তাহে দেবিতে হওয়ায় আমাকে প্রতিশ্রুতি-মত ফিরিতে হইবে। কিরূপে এই সমস্যা পূরণ করা যায় ভাবিতেছি এমন সময় লক্ষ্য হইতে টেলিগ্রাম আসিল যে ছু-শিঙ, কুঠির বলিকাতার শাখায় ২০০০ টাকা তারযোগে পাঠান হইয়া গিয়াছে।

এখন পুস্তক সংগ্রহেই মনোনিবেশ করিলাম। ভিক্রমতী টাকার মূল্য কমিতেছিল, সুতরাং আমান খরিদ করা সহজ হইল। আমার পুস্তক-ক্রয়ের কথা প্রচার হইলে ক্রমেই নতুন, পুরাতন, হস্তলিখিত, মুদ্রিত সকল প্রকাব পুস্তক এবং ছই-চারিখানি চিত্রপটও নানা দিক হইতে আসিতে লাগিল। প্রথমে আমি চিত্র-জন্মে রাজী ছিলাম না, কেন-না আমার চিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান বা সংগ্রহেচ্ছা কোনটাই ছিল না, কিন্তু ছই-দশটি দেখিতে দেখিতে সেদিকে আমার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক দিন ঐরূপ তেরটি চিত্র-পট আমার কাছে আসিল। বিক্রেতা প্রতি চিত্রের জন্ত এক দোজ (২৫ টাকা) মূল্য চাহিল। নেপালী বন্ধুরা বলিলেন, দাম বেশী চাহিতেছে, কিন্তু ছই-এক দিন পরে সেগুলি হাতছাড়া হইবার ভয়ে আমি ঐ দামেই ক্রয় করিলাম। তখন সে চিত্রগুলির ঐতিহাসিক বা নগদ মূল্য সম্বন্ধে কিছুই বুঝি নাই কিন্তু পবে প্রকাশ পাইল যে লণ্ডন ও প্যারিসের চিত্রশালাগুলি ঐ তেরটি চিত্রের জন্ত পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা নিতে প্রস্তুত, কেন-না, ঐ সংগ্রহে বারটি ঐতিহাসিক পুরুষের (প্রথম হইতে সপ্তম দলাইলামা, প্রথম ভিক্রম-সম্রাট চোঙ-খ-পা প্রভৃতির) চিত্র আছে এবং ত্রয়োদশ ছবিখানিও অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের স্বন্দর চিত্র। চিত্রগুলির মধ্যে একটির পৃষ্ঠের লিখন হইতে প্রকাশ পাইল যে এই সকল চিত্রই সপ্তম দলাইলামার সময় (খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাবল্ডে) অঙ্কিত হইয়াছিল। আমি সবিস্ময় প্রায় দেড় শত চিত্র সংগ্রহ করিয়াছিলাম,

অল্পাধো তিন-চারখানি মারবুর্গ ধার্মিক-সংগ্রহালয়ে ঋতু-বর প্রক্ষেপের রুদলুক্ অটো মারফৎ পাঠাইয়াছিলাম, আরও দুই-চারিটি প্রতিশ্রুতি-অনুযায়ী অল্প বন্ধুবান্ধবকে দিয়া-ছিলাম, বাকি ১৪০খানি চিত্রপট পার্টনা মুজিয়মতে দান করি, সেগুলি সেখানেই স্থরক্ষিত। পুস্তকের মধ্যে থম্ (পূর্ব-ভিববত) মকোলিয়া ও সাইবিরিয়ায় ছাপা পুস্তকও সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

* * *

১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি পঞ্চম দলাইলামা হুমতি-সাগর মকোল-রাজ জম্মি খা কর্তৃক ভিববতের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পূর্বে পঞ্চম দলাইলামা ডে-পুঙ বিহারের এক ড-ছাঙে খন-পো অর্থাৎ অধ্যক্ষ পণ্ডিত ছিলেন। পঞ্চম দলাইলামা নিজের মঠের খ্যাতি বৃদ্ধির জন্ত প্রতি বর্ষে নববর্ষ-প্রারম্ভের ২৪ দিন পর্যন্ত লাসায় ডে-পুঙ মঠের ভিক্ষুদিগের রাজত্বের অধিকার দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেন এবং অদ্যাবধি সেই নিয়ম স্তম্ভন আছে। শাসনের জন্ত দুই জন অধ্যক্ষ, এক জন ব্যাখ্যাতা এবং অল্প লোকজন নিযুক্ত হয়। ঐ ২৪ দিন লাসায় সরকারী পুলিশ, আদালত প্রভৃতির অধিকার থাকে না এবং নেপালী ভিন্ন অল্প সকল দোকানদারকে কিছু শুদ্ধ দিয়া লাইসেন্স লইতে হয় এবং এই ব্যাপারে তুলনাস্তি হইলেই জরিমানার অল্প থাকে না। জরিমানা প্রদেশে সর্বদাটে আছে, লোকে বলে এখানে জেল-দণ্ড হয় না, কেন-না, তাহাতে সরকারের কোন অর্থাগম নাই। সরকারী সকল উচ্চপদই ত অর্থবলে ক্রয় করিতে হয়।

অধিমাৎ এক সময় না হওয়ায় ভোট ও ভারতীয় চান্স বর্ষ একসঙ্গে আরম্ভ হয় না। এইবার ভোট স্বর পয়লা মার্চে পড়ে এবং এই বৎসরে দুইটি নবম (শুক্ল) মাস ছিল। ডে-পুঙ মঠ হইতে ভারপ্রাপ্ত শাসককর্তাকে দলাইলামার নিকটে ২৪ দিন লাসা শাসন করিবার পরওয়ানা লইতে হয়। ২রা মার্চ দেখিলাম রাস্তাঘাট শুধু পরিষ্কার নহে, উপরন্তু প্রত্যেককে নিজ গৃহে বা দোকানের সম্মুখস্থ অংশে খেত মুস্তিকায় “চৌকা” কাটাইয়া সাজাইতে হইয়াছে। সেই দিনই লাসার অস্থায়ী শাসকত্ব ঘোড়ায় চড়িয়া সদলে লাসায় আসিয়া, আবার

বাসস্থানের পূর্বদিকে কিছু দূরে এক চত্বরে, নাগরিক-দিগকে আহ্বান করিয়া ২৪ দিনের জন্ত নূতন শাসন পদ্ধতি ঘোষণা করিয়া পোতলার প্রাচীন জো-খঙ মন্দিরে যাইলেন। শাসক-নির্বাচনে বোধ হয় মানসিক অপেক্ষা দৈহিক বিজুতির উপরই অধিক লক্ষ্য রাখা হয়, কেন-না, ইহার দুই জনই ছিলেন বিরটিকায় পুরুষ। ইহাদের সজ্জের রক্ষীবর্গ সাড়ে-চার হাত লম্বা ও তিন-চার ইঞ্চি ব্যাসের লগুড় লইয়া “ফা ক্যু কো। গী কো মা শমো” (হটে যাও। টুপি খোলো) বলিয়া চীৎকার করিয়া চলিতেছিল। কাহারও যদি তুলক্রমে আত্ম-পালনে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হইল ত তৎক্ষণাৎ তাহার পৃষ্ঠে ৩ মস্তকে উক্ত প্রচণ্ড “দুঃখভঞ্জন ঔষধ” পড়িল।

দলাইলামার “পোতলা” প্রাসাদে এই উপলক্ষ্যে মেলা বসে। দর্শকগণ সমতলভূমির অভাবে অলিগলি, সিঁড়ি, ছাদ ইত্যাদি সকল স্থানেই ভীড় করিয়া থাকে। চাক্-টি ৩ খাবারের দোকানও অনেক বসে। আমরা দেখিলাম একটি বিশ-পঁচিশ হাত উঁচু ধামের উপর এক জন বাজীকর খেলা দেখাইতেছে, চারি দিকে লোকে লোকারণ্য, এবং বহু মহাপুরুষ তাহার বৈঠকের খিড়কিতে ছববীন-হস্তে বসিয়া আছেন। ফিরিবার সময় দেখিলাম ডে-পুঙ মঠের স্বেচ্ছাসিক ভিক্ষু পিপীলিকার মত সারিবন্দীভাবে মোটবাট লইয়া পোতলার সম্মুখ দিয়া লাসায় আসিতেছে। শুনিলাম ইহার চব্বিশ দিন লাসায় থাকিবে। এই নববর্ষ-উৎসবে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার দর্শক ও তীর্থযাত্রী লাসায় আসে, স্তত্রাং রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা ছাড়াও অনেক ব্যবস্থা করিতে হয়। পানীয় জলের ব্যবস্থা অতি অপরূপভাবে করা হয় নববর্ষের কয়দিন পূর্বে হইতেই জল-সরবরাহের নালীর জল দিয়া শহরের যত গর্ভ পূর্ণ করা হয় বাহাতে সাধারণ জুপগুলি জলশূন্য না হয়। ব্যবস্থা উত্তম কিন্তু দুর্ভেদ্য বিষয় জলভর্তি করার পূর্বে সেই গর্ভগুলি পরিষ্কার করা হয় না, স্তত্রাং যত পণ্ডুর গলিত দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার মল-আবর্জনা এই জলে ভাসিয়া চতুর্দিক দুর্গন্ধে পূর্ণ করে এবং সেই জল মাটিব ভিতর দিয়া চুইয়া শহরের সাধারণ ব্যবহার্য অগভীর কাঁচা জুপগুলিতে যাত্রায় নানা প্রকার ব্যাধিরও প্রকোপ বাড়ে। এই সময়

লাসায় প্রায় বিশ হাজার আগন্তুক ভিক্ষুর আগমন হয় এবং তাহাদের সেবার জন্য চায়েব সদাক্ষতে দিনে তিন-চারি বার মাখনযুক্ত চা ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়।

* * *

১লা মার্চ আমি তের শত বৎসরের পুরাতন জো-খঙ্ মন্দির দেখিতে গেলাম। জো-খঙ্ শব্দের অর্থ “হামি-গৃহ”। এখানে স্বামী বলিতে সেই প্রাচীন চন্দনকাঠের বুদ্ধমূর্তিকে বুঝায় যাহা মধ্য-এশিয়াব পথে ভারত হইতে চীনদেশে গিয়াছিল এবং যাহা লাসা-সংস্থাপক সম্রাট শ্রোং-বর্চন-স্গম্-বো কর্তৃক ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে বিজয়-অভিযানের ফলে চীনরাজদূতহার সঙ্গে যৌতুক হিসাবে তিস্ততে আনীত হইয়াছিল। সম্রাট লাসা নগরের কেন্দ্রে নিজ প্রাসাদ ও রাজকাঞ্চালয়ের সঙ্গে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এই মূর্তি স্থাপন করেন, হুতরাং এদেশে বৌদ্ধধর্ম এই মূর্তির সঙ্গে আসিয়াছিল বল: যায়। ইহাব প্রতিপত্তি এদেশে এখনও এতই প্রবল যে লাসার আধুনিক অবনত অবস্থায়ও এখানকার ব্যাপারীরা পর্যন্ত জো-বো নামে সহজে শপথ করিতে চাহে না—যদিও কথায় কথায় জি-রত্ন শপথ করিতে তাহারা প্রস্তুত—এক করিলে সে কথা তাহারা নিশ্চয় রাখে। জো-খঙ্ মন্দিরের উত্তর দ্বারের এক দেওয়ালে ছোট ছোট হুম্বর অক্ষরে আঙ্গিনার অভ্যন্তরস্থ ছোট-বড় সকল মন্দিরের ইতিহাস লিখিত আছে। এইরূপ ইতিহাস-লেখ এদেশের বহু সুপ্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দিরের দ্বারদেশে থাকে। ভারতের প্রধান তীর্থ ও মন্দিরে এইরূপ থাকিলে স্বাভাবিকের বিশেষ অবিধা হইত।*

মন্দিরের পরিষ্কার ও দেওয়ালের গায়ে অনেক হুম্বর চিত্রাবলী রহিয়াছে, কোনটা কোন প্রসিদ্ধ মঠের প্রাচীন দৃষ্ট, কোনটায় স্বর্ণরঞ্জিত বুদ্ধ নিজের পূর্বজন্মের আখ্যান বলিতেছেন। কোথাও ভগবান বুদ্ধের অন্তিম জীবনের দৃষ্টাবলী অঙ্কিত আছে, কোথাও বা ভারতের অশোক অথবা ভোটের শ্রোং-বর্চন স্গম্-বো চিত্রে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। সমস্ত চিত্রই হুম্বর এবং যদিও সকল মূর্তিই সহস্রাব্দিক বৎসরের মলিনতার স্তরে ভূষিত, কিন্তু তাহাদের অজ-

প্রত্যয়ের মান, তাহাদের মুখমূর্তা এবং রেখার লালিত্য অল্পমম। প্রত্যেক দেবগৃহে অসংখ্য স্বর্ণরৌপ্যময় দীপ অবিরাম জ্বলিতেছে, রৌপ্য দীপের মধ্যে একটির ওজন আট শত ভরি, সেটি গত বৎসর তুটান-র-জ পাঠাইয়াছেন। বহুমূল্য প্রস্তর ও ধাতু ত চতুর্দিকে ছড়ানো আছে। ভগবান বুদ্ধের এই প্রধান মূর্তি তিন চন্দন ও অস্ত্র কাঠের অনেক মূর্তি আশপাশের দেবালয়ে রহিয়াছে। প্রাচীন ভোটের কয়েক জন সম্রাটের মূর্তিও এখানে আছে, তাহার মধ্যে প্রধান দেবালয়ের দ্বিতলে সম্রাট শ্রোং-বর্চন ও তাহার নেপাল ও চীন দেশীয়া মহিবীষ্মের মূর্তি প্রসিদ্ধ। বস্তুত এই মন্দিরের প্রতি অধুপরিমাণুতে ত্রয়োদশ শত বৎসরের ঐতিহাসিক কীর্তি পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম এক প্রশস্ত আগারে তিন চারি শত ভিক্ষু উচ্চাসনে বসিয়া ধর-স্বরে স্তব পাঠ করিতেছেন। ইহাদের বস্ত্র মলিন ও জীর্ণ এবং প্রত্যেকের সম্মুখে লৌহময় ডিকাপাজ। শুনিলাম ইহার লাসার সর্কাপেক্ষা কর্মনিষ্ঠ ভিক্ষু এবং ইহার মুক্ত ও র-মো-ছে বিহারে থাকেন।

৪ঠা মার্চ শুনিলাম মুক্ত মঠে কো-রং-এর লামা ধর্মোপদেশ দিবেন এবং দেখিলাম বহু লোক আগ্রহের সহিত তাহা শুনিতে যাইতেছে। এই কো-রং-এর লামা অতি বিদ্বান এবং তিস্ততের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্মব্যাখ্যাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। লোকে ইহাকে সর্বজ্ঞ বলিয়া প্রশংসা করিয়া ইহার মনোহর শিক্ষাপ্রদ উপদেশের সহিত নববর্ষের ২৪ দিনের জন্য নিমুক্ত সরকারী উপদেশক মহাশয়ের ব্যাখ্যানের তুলনা করিতেছিল। সরকারী উপদেশক বেচারার দোষ কি? সে ত অনেক ভেট অনেক ভাষামোদের ফলে এই পদ লাভ করিয়াছে। যাহা হউক কৌতূহলের বশে এক দিন তাহার উপদেশ শুনিতে গেলাম। শুনিলাম উপদেশক মহাশয় বলিতেছেন, “তাকিনী মাতার অদ্ভুত শক্তি, তাহাকে প্রণাম করা উচিত, তাহার পূজা দেওয়া উচিত। বজ্রযোগিনী মাতার অদ্ভুত ক্ষমতা ও প্রভাব, উহাকে পূজা ও নমস্কার করা উচিত।” ইহাই তাহার উপদেশের মূল কথা।

* অবিধা হইত সম্ভব নাই; কিন্তু তাহা হইলে নানা প্রকার রূপ-কথার বিলোপে পাণ্ডাগিরের বিশেষ অবিধা হইত।—সম্পাদক।

নূতন রাজত্বের নূতন লাইসেন্স লগ্নার দক্ষন কয় দিন বাজার এবং দোকানপাট বন্ধ ছিল, সেগুলি খোলায় পর এই মার্চ সারা শহর পরিষ্কার করিবার ও সাজাইবার ঘটা পড়িয়া গেল। শুনিলাম পরদিন সকাল সাতটার মহাশুদ্ধ দ্বাই-লামার শোভাযাত্রা বাহির হইবে। পরদিন শোভাযাত্রা দেখিতে গিয়া দেখি পথের দুই ধারে ভিড় করিয়া লোক দাঁড়াইয়া আছে এবং কড়া পাহারাও বসিয়াছে। শোভাযাত্রায় সর্বপ্রথমে ছাত্রকার লাল টুপি পরিয়া মন্ত্রীদেব অহুতবর্গ আসিল, তাহার পর আসিলেন মন্ত্রিগণ, তাহার পরে আরে চলিলেন চি-টুঙ (ভিক্স-অফিসর), কুট (গৃহ-অফিসর), নাগরিক বেশে সেনাপতি, সেনাপতির বেশে ছ-ক মন্ত্রী, দুই জন কোঁজী জেনারেল (সুদে-ম্পোন), সৈনিক অফিসর বেশে সর্দার বাহাদুর লে-মন্-লা এবং তাহার পর বেশমী পর্দায় ঘেরা পালকীতে মহাশুদ্ধ (বলা বাহুল্য, অস্ত্র সকলেই প্রায় ঘোড়ায় সওয়ার ছিল) এবং সঙ্গে নেপালী মোজল ও চৈনিক-বেশে বহু সৈন্যগাম্ভ।

* * *

সিংহলে কিরিবার আয়োজন করিতে হইল, পুথি পুস্তক প্রভৃতি কেনা চলিতেছিল কিন্তু পথে সৈনিক পাহারা তখনও ছিল এবং নেপালের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কাও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, স্বতরাং প্রত্যাবর্তনের সকল ব্যবস্থা ঠিক করা বাইতেছিল না। সেই জন্ত ৭ই মার্চ জং-রী-রিনপোছের নিকট গিয়া তাঁহাকে চারিটি বিষয় দ্বাইলামার নিকট নিবেদন করিতে অনুরোধ করিলাম, যথা—(১) সম্মুখে বাইবার অহুমতি, (২) পোতলার যে-সকল পুস্তক মহাশুদ্ধর অহুমতি ব্যতীত ছাপা হয় না সে সকল ছাপাইয়া দিতে অহুমতি, (৩) গুতের-গির ছাপা একটি করিয়া সম্পূর্ণ স্বন-শুভর ও শুন-শুভর, ও (৪) ভারত-প্রত্যাবর্তনের জন্ত একটি ছাড়পত্র। তিনি বলিলেন, প্রথম দুইটি বিষয়ে আদেশ পাওয়া সহজ, তবে শেষের দুইটির সম্বন্ধে বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

এই সময় লাসায় তুষারপাত চলিতেছিল। সেখানে তুষারপাত বেশী হয় না, কিন্তু মাটির ছাদ, স্বতরাং রোর প্রথর হইবার পূর্বেই তুষাররাশি ছাদ হইতে সরাইতে হয়। ২৪ দিনের রাজত্বের মধ্যে ছাদের বরফ পথে ফেলিলে

জরিমানার ব্যবস্থা আছে স্বতরাং লোকে তাহা উঠাইয়া কোণে অলিগলিতে ফেলিল। ২৫শে মার্চ, পুরাতন শাসন যেদিন কিরিয়া আসিল সেই দিন, প্রায় ১৬ আঙুল পরিমাণ বরফ পড়িল। লোকে বলিল সৌভাগ্যের বিষয় ২৪ দিনের রাজত্ব নাই এবং পথে ঘাটে ছাদের বরফ শুপাকার করিয়া ফেলিয়া রাখিল।

* * *

নববর্ষের সময় শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ তর্কযুদ্ধ হইয়া থাকে। ১০ই মার্চ জো-খড্ মন্দিরে শাস্ত্রার্থ দেখিতে গেলাম। মন্দির-প্রাঙ্গণে পণ্ডিতগণ শিষ্যমণ্ডলী লইয়া বসিয়াছিলেন, দুই জন বৃদ্ধ উচ্চাসনে বসিয়া মধ্যস্থরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। প্রশ্নকর্তা নিজ আসন হইতে উঠিয়া ঐ দুই বৃদ্ধকে বন্দনা করিয়া প্রশ্ন করিবার জন্ত অহুমতি লইল এবং পবে ধর্মকীর্তির প্রমাণ-বার্তিক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল। প্রশ্ন করিবার ধরণ বিচিত্র ছিল। প্রশ্ন করিতে করিতে সে কখনও অগ্রে কখনও পশ্চাতে পদক্ষেপ করিয়া, প্রতি প্রশ্নেব শেষে সজোরে হাতে হাত চাপাড়াইতে ছিল এবং এক এক প্রশ্নমালা শেষ হইলে তাহার জপমালা লইয়া ধুক হইতে বাণ মোচনের স্তায় নাট্যমুদ্রায় অন্তর্ভুক্ত করিতেছিল। তাহার স্ব-পক্ষের বিদ্যার্থী ও পণ্ডিত অতি প্রসন্নমুখে তাহাব তর্কযুক্তি শুনিতেছিল, উত্তর-পক্ষীয় ছাত্রবর্গ বিদ্যার্থীদের বিচিত্র টুপি পরিয়া শান্ত ও স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। এক পক্ষের ছাত্রের তর্ক অবতারণা শেষ হইলে বিপক্ষের ছাত্রও মধ্যস্থকে বন্দনা করিয়া তর্ক থগুন করিয়া পূর্ব-পক্ষকে তর্কে আক্রমণ আরম্ভ করিল। আক্রমণের সময় ঠিক পূর্ববৎ যুদ্ধের অহুকরণে পাক্ষেপ, বাগক্ষেপ ইত্যাদি চলিল। এইরূপ তর্কের মধ্যে নাট্যাভিনয় কোথা হইতে আসিল জিজ্ঞাসা করায় এক বন্ধু বলিলেন, “ইহা নালন্দা বিক্রমশিলা হইতে আসিয়াছে, স্বতরাং ইহার জন্ত দায়ী তোমরা।” আমি মানিতে রাজী হইলাম না, কেননা, ইহা সত্য হইলে ভারতে কানী ও মিথিলার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ প্রশ্নার কোনরূপ চিহ্নাবশেষ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত।

১২ই মার্চ লাসার পঞ্চকোশী আরম্ভ হইলে আমিও গেলাম। এই পঞ্চকোশীতে নগরের অতিবিস্তৃত পোতলা

প্রাসাদ, মহাশঙ্কর উদ্যান-গৃহ নোবুলিং-কা এবং অল্প অনেক অট্টালিকা আদি আছে, স্বতরাং পরিক্রমা প্রায় পাঁচ মাইল পথের। দেখিলাম, কেহ কেহ (এক নেপালী সওদাগরও ছিল) দণ্ডবৎ হইয়া পরিক্রমা করিতেছে। পরিক্রমা শেষ হইলে র-মো-ছে-কে মন্দির দেখিতে গেলাম। ইহা জ্যো-খঙ্ মন্দিরের সমসাময়িক। সাধারণত তিব্বতে দেব-মূর্তি মূর্তিকার উপর কঠিন প্রলেপ (প্লাষ্টার) দিয়া করা হয়। এখানে কিছু প্রস্তরের কাজও দেখিলাম। আরও দেখিলাম বুদ্ধমূর্তিকে মুকুটে ভূষিত করা হইয়াছে। শুনিলাম মহান্ সংস্কারক চোঙ-খ-পা এই প্রথার প্রবর্তন করেন। বস্তুত এই প্রথা চোঙ-খ-পা ভুলক্রমে প্রচলিত করেন। কারণ বুদ্ধদেব ভিক্ষু, তাই তিনি স্বয়ং ভিক্ষুদের ভূষণাদি ধারণ নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। তবে এই প্রথা ভারত-নেপালেও বহু শতাব্দী স্বাবৎ চলিয়া আসিতেছে।

১৪ই মার্চ প্রাতে নগর-পরিক্রমার পথে বিশেষ আয়োজন চলিতেছে দেখিলাম। পথের পাশে কাঠের স্তম্ভ বসাইয়া তাহার উপর আড়ভাবে তক্তা লাগানো হইতেছে। সারাদিন স্তম্ভগুলি পর্দায় ঢাকা থাকায় সেখানে কি হইতেছে জানা গেল না। স্থানান্তরে অল্প পূর্বে পর্দাগুলি সরাইলে দেখিলাম প্রত্যেকটি স্তম্ভের উপর হৃদয় দ্বিতল মন্দির-বিমান তৈয়ারী হইয়াছে এবং সেগুলির গবাক্ষ ও অলিন্দে মাখনের তৈরি হৃদয় হৃদয় দেবমূর্তি বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত পরিক্রমা-পথ এইরূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। বোধ হয় ললিতকলাকে ভূমিসাৎ করার মত ঈশ্বরভক্তি ভারতে প্রবল হইবার পূর্বে সেই পুণ্যভূমিতেও ভোটদেশের স্তায় সার্বজনীন কলাহারাগ ছিল। এখন তিব্বতের তুলনায় ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশেও ললিতকলার আসন এত উচ্চ নহে, ভারতের কথায় কাজ কি?

বস্তুত এথেষে কলাশিল্প অতি সুব্যবস্থিত। একটি পিত্তলমূর্তি-নিখাণে তিন জন দক্ষ কারিগরের কলাকৌশলের প্রয়োজন—প্রথম ব্যক্তি হাঁচ প্রস্তুত করে, দ্বিতীয়টি ঢালাই করে এবং শেষ ব্যক্তি মূর্তি খোদাই পালিশ ইত্যাদি করে।

১৫ই মার্চ, আসল নববর্ষের দিনে লাসার লোকে পরস্পরের মঙ্গলকামনায় মঙ্গলগীতি গাহিয়া ও উপহার পাঠাইয়া উৎসব করিতেছিল। তবে দ্বিপ্রহরের পরে গান ও গান

দুইয়েরই মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া গেল। আজ আমার সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ অণু (খুড়া) মহাশয়ও কিশোরের তায় কিশোর-কিশোরীদিগের মধ্যে মহা উল্লাসে নৃত্য করিয়া দিন কাটাইলেন। এক দিকে হাতধরাধরি কবিতা সারি-বন্দী ছন্দ-সাজটি জ্বীলোক এবং তাহাদের সন্মুখে একরূপ এক সারি পুরুষ, সারির উভয় প্রান্তে জী ও পুন্স আবাব হাত ধরিয়া দুই সারি যুক্ত করিয়া দুইটি চন্দ্রাকান অর্ধবৃত্ত রচনা করিয়া গানের তালে তালে নাচিতে থাকে।

নৃত্যকলা দেখা সমাপ্ত হইল, এইবার চিত্রকলার পালা। ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও সিদ্ধপুরুষের কয়েকখানি চিত্র আমার প্রয়োজন ছিল। এক জন তরুণ বাজ-চিত্রকর নিকটেই আছে জানিতে পাবিয়া তাহার নিকট চলিলাম। দেখিলাম, তাহাব হাত ভাল এবং সেই কারণেই সে বাত্র বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সে পাঁচ জন রাজ-চিত্রকরের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। শহরে আরও অনেক চিত্রকর আছে, ট্যাক্সের বদলে তাহাদেব এই রাজ-চিত্রকরগণকে কাগজ কাপড় রং ইত্যাদি চিত্রণের সরঞ্জাম জোগাইতে হয়। পাঁচ জন রাজ-চিত্রকরের মধ্যে দুই জন বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ কেবল তত্ত্বাবধান করে। অল্পদের তিন বৎসর অন্তর চব্বিশটি চিত্র মহাশয়কে দিতে হয়। ইহার জন্ত তাহাদের জায়গীর নির্দিষ্ট আছে যাহাতে ভ্রবণপোষণের ভাবনা না থাকে। ভিক্ষু-চিত্রকরদিগের জন্ত একরূপ ব্যবস্থা বা নির্দিষ্ট কার্য কিছুই নাই। তরুণ চিত্রকর কুশলী কিন্তু ভোট দেশের চিত্রকলার কঠিন বিধি-বিধান তাহাব প্রতিভা জড়তাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

২৩শে মার্চ সপ্তদশ শতাব্দীর সৈনিকদের মিছিল বাহির হইল। প্রথমে সাজোয়া পোষাক পরিহিত ধর্ম্মরূপ ও ভূগীর যুক্ত, টুপিতে গালক, ঘোড়সওয়ারের দল চলিল, পরে বিচিত্র পোষাকে পলিতাযুক্ত-গাদা-বন্দুল-সজ্জিত পদাতিক-শ্রেণী। রাস্তা দেশী বান্ধবের গঞ্চে ও গাদা-বন্দকের শব্দে আমোদিত ও মুগ্ধ হইয়া গেল। এই সকল ধর্ম্মরূপী ও খজাধারীর পিছনে প্রাচীন রাজবেশে সজ্জিত কয়েক জন লোককে দেখা গেল। কথিত আছে ভোট দেশেব সকলে সামন্তরাজকে হারাইয়া দিবার পরে :৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে এই তারিখে মোঙ্গল-বিজেতা গু-শী খাঁ পঞ্চম দলাইলামাকে তিব্বত রাজ্য প্রদান করেন।

২৪শে মার্চ অস্থায়ী রাজত্বের শেষ দিন, অতি প্রত্যবে মৈত্রের রথযাত্রা হইল। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে শঙ্খ বাঁঝার লইয়া টুপি-পরিহিত ছাত্র-ভিক্ষুর দল চলিল, পবে চারিচক্রের রথে আকৃষ্ট মৈত্রের সুন্দর প্রতিমা, পিছনে দুটি হাতী। এই হাতী দুটি শৈশবে এদেশে আসিয়াছে, শীতের দেশে ইহাদের কষ্ট নিশ্চয়ই হয় কিন্তু বড়ই তোমাকে ইহাদের রাখা হয়।

* * *

বুদ্ধের আশঙ্কা দূর হইলে ৩০শে মার্চ পঞ্চাট খুলিল। আমি আমার চিত্রপট পুথি সব ক্রত জড় করিয়া দেশে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। মোকল ভিক্ষু ধর্ম-কীর্ষি আমায় সকল কাজে অনেক সাহায্য করিলেন। ইনি ছয়-সাত বৎসর যাবৎ সে-রা মঠে স্নায়শাজ্ঞ পাঠ করিতেছিলেন। দৃঢ়শরীর এবং অধ্যয়নে মেধাবী এই ভিক্ষুকে আমি সিংহল লইয়া যাইব স্বীকার করিয়াছিলাম। সম্প্রতি তাঁহার সঙ্গে আচার্য শান্তরক্ষিত-স্থাপিত (৮২৬ খ্রিঃ, সম্রাট টি-শোং-মে-চন-এর সাহায্যে) এদেশের প্রথম বৌদ্ধবিহার সম্মুখে দেখিতে যাইব স্থির হইল। লাসা হইতে সম্মুখে স্থলপথে ত বাওয়া যায়ই, জলপথে চামড়ার নৌকায় লাসার নদী উ-ই-ছু দিয়া চাঙ-ছুর (চাঙ-স-পো=ব্রহ্মপুত্র) সম্মুখে এবং ব্রহ্মপুত্রের কোড়ে সম্মুখে হইতে তিন চার মাইল দূরের ঘাটে বাওয়া যায়। আমরা জলপথে বাওয়াই স্থির করিলাম। প্রত্যেক দিন নৌকা পাওয়া যায় না। এই এপ্রিল খবর পাইয়া আমরা দুই জন নৌকার ঘাটে গিয়া একটি কা (চামড়ার নৌকা) আরোহণ করিলাম। সঙ্গে এক বৃদ্ধা সহযাত্রিণী এবং এক জন তেইশ-চব্বিশ বৎসরের যুবক। আমি প্রথমে ভাবিয়াছিলাম ইহারা মাতাপুত্র, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ঐরূপ কোন কথা প্রকাশে বলি নাই, কেন-না যাত্রার দ্বিতীয় দিনে ধর্মকীর্ষি বলিলেন এদেশে ঐ দুইটির মত অনেক স্বামী-স্ত্রী আছে, কারণ ধনী বৃদ্ধা বিধবার যুবক পতির অভাব হয় না।

এদেশের নৌকা উজান চলে না, স্রোতের সঙ্গেই চলে এবং ফিরিবার সময় নৌকার কাঠ ও চামড়ার খোল পৃথক করিয়া গাধার পিঠে বোঝাই করিয়া আনা হয়। এইরূপ চামড়ার নৌকা শুধু হালকা নহে, নদীগর্ভস্থ পাথরে ঠেকিয়া বানচাল

হওয়ার ভয়ও ইহাতে কম। আমরা যাইতে যাইতে কয়েক বার ঐরূপ প্রস্তরের ঘর্ষণ অল্পভব করিয়াছিলাম। নৌকার মাঝি ও লক্ষ্যের প্রধান কাজ নৌকাকে নদীর খরস্রোত স্থানের উচ্চল জল ও প্রস্তররাজি হইতে তফাতে রাখা।

পথে প্রথর শীত-বাতাসে এবং কাঠকাটা রোজে কষ্ট যথেষ্ট ছিল। আমার ও ধর্মকীর্ষির সঙ্গে দুইটি পিস্তল থাকায় অস্ত্র ভয় ছিল না। আমাদের প্রতি সন্ধ্যায় তীব্র নিকটস্থ কোনও গ্রামে রাজি যাপন করিতে হইত। এক গ্রামে এইরূপ রাজি-যাপনের সময় শুনিলাম বৃদ্ধার যুবক-পতির উপর দেবতার আবেশ হইয়াছে। শুনিলাম ইহাদের পেশা তাই এবং পরদিন অনেক বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার পর দেখিলাম স্বামী-স্ত্রী বিলক্ষণ উপহার ও ভেট লইয়া ভক্তবৃন্দের সহিত আসিতেছেন। তৃতীয় দিন অপরাহ্নে তিব্বতের প্রাচীনতম বৌদ্ধ সম্প্রদায় নিগ্-মা-পাদিগের অন্ততম মঠ 'মোজ'-ডক' দেখা দিল। ইহা ব্রহ্মপুত্রের পাশ্বে একটি পর্বতশিখরে স্থাপিত।

ব্রহ্মপুত্রের স্রোত সেকপ প্রথর নহে, উপত্যকাও বিস্তৃত। দুই ধারে অনেক গ্রাম ও উদ্যান দেখা গেল। সন্ধ্যার সময় একটি শিলাময় পাহাড়ের নিকট পৌছিলাম। সকলে সপ্রস্তুতাবে বলিল এই পাহাড় ভোট দেশের নহে, অতি পবিত্রজ্ঞানে ইহাকে ভারত হইতে আনা হইয়াছে। বায় দিকে নদীগর্ভে তিনটি ছোটবড় শিলা ছিল, শুনিলাম সেগুলি সো-নম, ফুন ও সুম (মাতা-পিতা-পুত্র) এবং 'কিম্বদন্তী' আছে যে, সেগুলিও ভারত হইতে আগত। তবে ইহা ত সত্যই যে এ-সকলের নিকটেই সম্মুখে বিহার যাহা ভারতের পণ্ডিতেরা এদেশের অল্পকরণে নির্মাণ করিয়াছিলেন। রাজ্যে নদীর মধ্যের এক দ্বীপে আমরা নৌকা বাঁধিলাম, সে দ্বীপে উপর ঐরূপ আর একটি বিশাল শিলা রহিয়াছে যাহা উচ্চতায় প্রায় ১৫০ ফুট হইবে। এদেশে উৎসবের সময় বিহারের কোন উচ্চ ও বিস্তৃত দেওয়ালে বিশাল চিত্রপট বিলম্বিত করা হয়। এই শিলাটির সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে সম্মুখে বিহার নির্মাণের সময় ঐরূপ চিত্রপট টাঙাইবার স্থান প্রয়োজন হইলে এই মহাশিলা ভারত হইতে আনা হয়। জুন জুলাই মাসের প্রাবনে

যখন এই দ্বীপটি ভূবিদ্যা যায় তখন ঐ বিরাট ত্রিকোণাকার শিলাটি মাত্র জাগিয়া থাকে।

পরদিন প্রাতে যাত্রা করিয়া আমরা জম্-লিঙ গ্রামে পৌঁছলাম। কিছু দূরে এক নালায় কাছে নেপালের বৌদ্ধ স্তূপের মত একটি স্তূপ দেখা গেল। ব্রহ্মপুত্রের এই উপত্যকা অঞ্চল যথেষ্ট গরম এবং এখানে বহু আখরোটের বৃক্ষ আছে। চেষ্টা করিলে আরও অনেক ফল এখানে অনায়াসেই উৎপাদন করা যায় কিন্তু সনাতন ধর্মের কৃপায় তাহা হওয়া সম্ভব নহে। নৌকার মাঝি বলিয়াছিল এখান হইতে সম্-য়ে লইয়া যাইবার লোক জোগাড় করিয়া দিবে কিন্তু কার্যতঃ তাহার কোনও লক্ষণ না দেখায় আমরা স্থির করিলাম যে ভিন মাইল পথ মাত্র ব্যবধান পার হইয়া বিহারেই আশ্রয় লইব।

ব্রহ্মপুত্র ও উই-ছু নদীর ত্রিবেণীর উত্তরের অঞ্চলকে এদেশে উই-মুল (মধ্যদেশ) ও দক্ষিণে ছু-শরের নিকট ত্রিবেণীর নীচের অঞ্চলকে লুহো-খা (দক্ষিণ দেশ) বলে। ব্রহ্মপুত্রের উপর পশ্চিম অঞ্চল টাঙ্গীলামার চাঙ প্রদেশ ও পূর্ব দিকে লুহো-খা প্রদেশ। বর্তমান (এখন গত) দলাইলামা ও টাঙ্গীলামা উভয়েই এই প্রদেশে জয়গ্রহণ করিয়াছেন।

নৌকা হইতে নামিয়া পাহাড়ের ধার দিয়া সম্-য়ের দিকে চলিলাম। পথে পর্বতগাত্র হইতে খোদিত ছোট ছোট স্তূপ দেখিলাম, বেরূপ আমাদের দেশের গুহা বিহারে আছে। এই সব দেখিতে দেখিতে দুই ঘণ্টা চলিবার পর সম্-য়ে বিহার দেখা দিল। সমতল-ভূমির উপর চারি দিকে দেওয়াল-ঘেরা এই বিহার বস্তুতই ভোট অপেক্ষা ভারতেরই কথা মনে করাইয়া দেয়। বিহারের চতুর্দিকে ফলহীন বৃক্ষের বাগানও আছে।

পশ্চিম দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে পরিক্রমায় চীনদেশের কালোচশমায়ুক্ত এক ভিক্ষুর সঙ্গে দেখা হইল। ইনি সিকিম দেশের লোক এবং উর্গেন-কুশো নামে পরিচিত। তিনি কিছুক্ষণ অভিশয় প্রীতির সহিত কথাবার্তা কহিবার পর তাঁহার লোককে সঙ্গে দিয়া আমার থাকিবার ব্যবস্থা

করিয়া দিলেন। সেদিন কেবলমাত্র আরম্ভে প্রান্তি দূর করিলাম।

ভোট দেশের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সম্-য়ে বিহার আচার্য শাস্তরক্ষিত উডন্তপুরী বিহারের অল্পকরণে করাইয়া ছিলেন। উডন্তপুরী নির্মাণ করেন মহারাজ ধর্মপাল, তাঁহার শাসনকাল ৭৬১-৮০২ খ্রিঃ পর্যন্ত। সম্-য়ে নির্মাতা সম্রাট্ টি-সোঙ দে-চন্ ভোট শাসন করিয়াছিলেন ৭৩০-৮৪ খ্রিষ্টাব্দে, এবং সম্-য়ে নির্মিত হইয়াছিল ৭৫১-৬৩ খ্রিষ্টাব্দে। ভিতরের চারি কোণের চারি ইষ্টকময় স্তূপ (স্তূপ-শিখরে এখনও প্রাচীন ভারতের স্তূপের স্তম্ভ ছত্র বিরাজ করিতেছে) নিশ্চয়ই নবম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। আশেপাশে বহু চন্দ্র-সূর্য্যযুক্ত বজ্রধানী স্তূপ বহিয়াছে, এবং সকলের মধ্যে গুচুগ্-লগ্-খঙ্ বিহার রহিয়াছে। একবার এখানের প্রায় সকল অট্টালিকাই অগ্নিদগ্ধ হইয়া যায়, পরে একাদশ শতাব্দীতে র-লোচ-ব পুনর্নির্মাণ করেন। বিহার প্রায় চতুষ্কোণ এবং ছয়-সাত হাত উচ্চ দেওয়ালে ঘেরা, ইহার চার প্রধান দিক-কোণে চারটি দ্বার আছে। মধ্যস্থলে প্রধান বিহার বাহার চারি দিকের পরিক্রমায় ভিক্ষুদিগের জন্ম দ্বিতল আবাস আছে। মূলবিহার প্রায় সমস্তই দাক্ষিণ ও জিতল, নীচের তলায় বুদ্ধমূর্ত্তি প্রধান। বাহিরে আচার্য শাস্তরক্ষিতের বুদ্ধাবস্থার মূর্ত্তি আছে, সঙ্গে তাঁহার ভোট দেশীয় ভিক্ষু শিষ্য বৈরাচন ও গৃহস্থ শিষ্য সম্রাট্ টি-সোঙ-দে-চন্ এই দুই জনেরও মূর্ত্তি আছে। শত বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করার পর বিহারের পূর্ব দিকের এক পাহাড়ে এক স্তূপ নির্মাণ করিয়া তাঁহার দেহ না জালাইয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। সার্ব্ব দশ শতাব্দীর উপর ঐ স্তূপ হইতে তিনি নিজহস্তে রোপিত এই ক্ষেত্র দর্শন করিবার পব, চল্লিশ বৎসর পূর্বে ঐ জীর্ণ স্তূপ ভাঙিয়া যায়। স্তূপের ভিতর হইতে তাহাব কঙ্কাল ও করোটি বাহির হইয়া পড়িলে এখানের লোকে তাহা সমস্তে আনিয়া এক কাচময় আধারে স্থাপন করিয়া বিহারের প্রধান বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে রাখিয়া দেয়। যখন আমি সেই আধারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার সেই বৃহৎ কোনোটি দেখিলাম তখন আমার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। ৫৫ বৎসর পার হইবার পর দুর্গম হিমালয় পার হইয়া ধর্মবিজয়, এবং তত্পরি

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উজ্জ্বল মৰ্পণ নির্মাণ (বড়োদার ছাপাখানার রূপায় ইহা এতদিন পরে আবার জগতে প্রচার হইতেছে এ এক আশ্চর্য ব্যাপার।

বিহারের দ্বিতীয় তলে অমিতায়ু মূর্তি রহিয়াছে দেখিলাম, তৃতীয় তল শূন্য। তাহার পর “রীপ”গুলি দেখিতে গেলাম। প্রথমে জম্বুদ্বীপ, এখানে অবলোকিতকল্প-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার নিকট দ্বীপনির্মাতা রাণী নেতুঙ-চুন-মো চন্দনকাষ্ঠে বিরাজ করিতেছেন। তাহার পর গ্যাংবু-মিঙ (ভারতদ্বীপ)। এইখানে সেই সৰ্বস্ব ভারতীয় পণ্ডিতগণ থাকিতেন ষাঁহাদের পরিভ্রমের ফলে সহস্র ভোটগ্রহে এখনও মানব-দানব ও কালের অন্ডাচারে ভারত হইতে লুপ্ত প্রাচীন ভারতীয় বস্তুরাজি ভোটভাষায়

বর্তমান। ইহাদের সংস্কৃত গ্রন্থের সংগ্রহ দেখিয়া ১০৪৩ খ্রীষ্টাব্দেও আচার্য্য দীপকর শ্রীজ্ঞান বিম্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন—এখানে অনেক পুস্তক দেখিতেছি বাহা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও দুস্তাপ্য। হুংধের বিষয়, পরবর্তী নিকোষদিগের সময় ঐ অমূল্য গ্রন্থরাজি অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়। এখন ষাঁহারা এই বিহারের রক্ষক তাঁহাদের কথা না বলাই ভাল। আমার পক্ষে এদেশের তাম্রমুদ্রাব ভার লইয়া চলাচল করা দুঃস্বপ্ন ছিল, সুতরাং কয়েকখানি চিত্র ও পুস্তক এখানে সংগৃহীত হইল। কিছু বেশী অর্থ সঙ্গে থাকিলে আরও অনেক জিনিষ পাইতে পারিতাম।

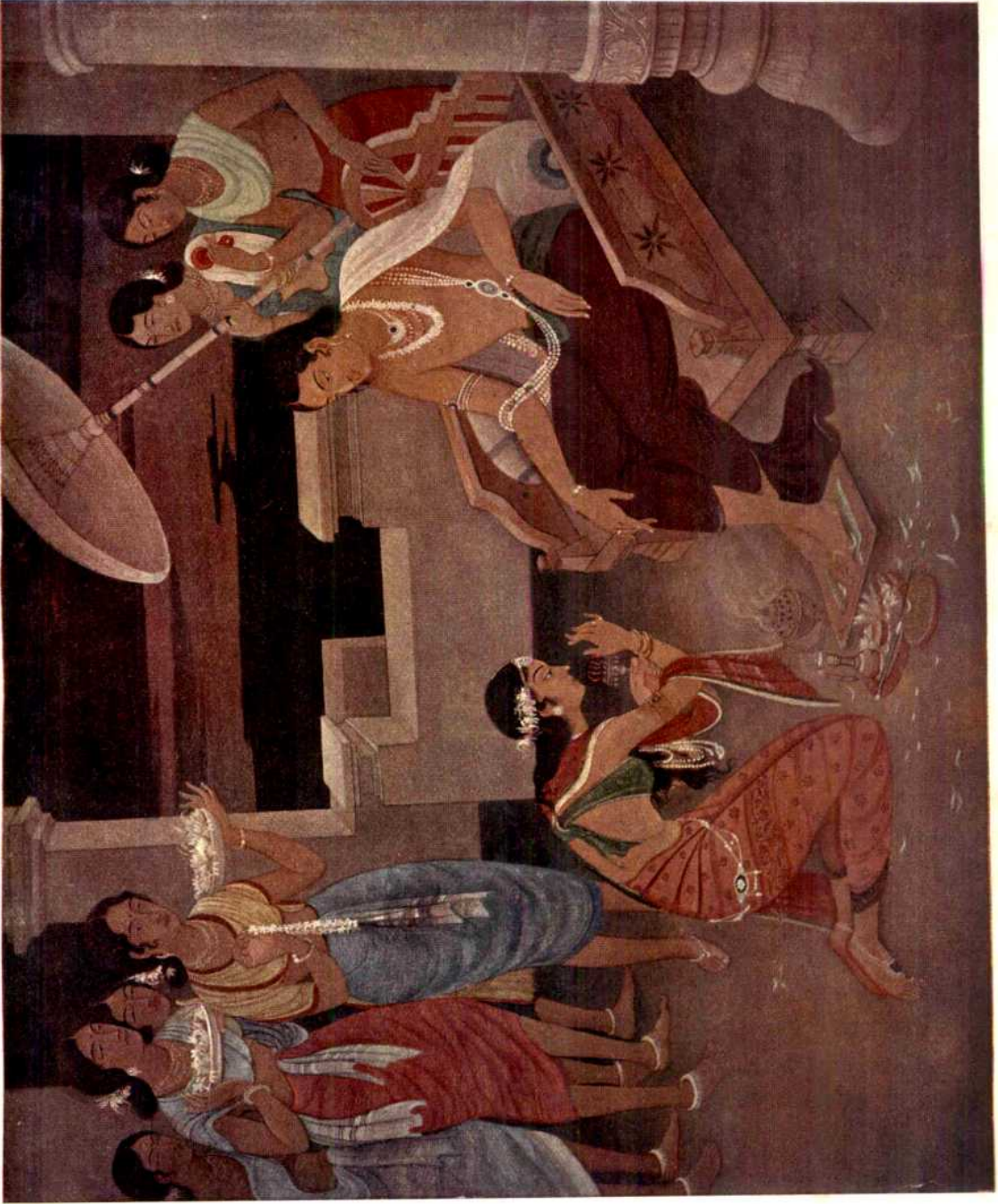
ক্রমশঃ

চিত্র-পরিচয়

“প্রিয়-প্রসাধন”

পুঙ্করবা কেশী দানবেব হাত হইতে উর্কশীকে রক্ষা করিলে ও তৎপর তাঁহারা পরস্পর অল্পরক্ত হইলে পুঙ্করবার পাটরাণী রাজার প্রতি অভিমানবশত প্রস্থান করিলেন। পুঙ্করবার সহিত রাষ্ট্রের বিবাদভঞ্নের কাহিনী এই চিত্রে বর্ণিত আছে :—“এমন সময় চোটা আসিয়া খবর দিল, রাজ্যব কাছ হইতে গিয়া অবধি রাণী উপবাস করিতেছেন। তাঁহার এক ব্রত আছে, সেই ব্রত আজ সাক্ষ হইবে। কিন্তু রাজার নিকট না আসিলে সে ব্রত আজ উদ্ঘাপন হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। তাই তিনি অল্পনয়-বিনয় করিয়া একবার দেখা করিবার ভঙ্গ বড ব্যস্ত হইয়াছেন।

ব্রতের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, ‘তিনি আসুন।’ রাণী আসিলেন ; সঙ্গে অনেক চোটা অনেক পুজার জিনিষ লইয়া আসিয়াছে। রাণী রাজাকে পূজা করিলেন। ফুল দিলেন, মালা দিলেন, চন্দন দিলেন, ভাল ভাল খাবার জিনিষ দিলেন।...রাণী আরতি কবিলেন। পুজার অঙ্গ শেষ হইলে গলায় কাপড় দিয়া বলিলেন, ‘আজ অবধি আমার স্বামী বাহাকে ভালবাসিবেন, আমিও তাহাকে ভালবাসিব ; সে আমার ভগিনী হইবে। এই আমার ব্রত। এই ব্রতের নাম প্রিয়-প্রসাধন।’—হবপ্রসাদ শাস্ত্রী



প্রিয়-প্রসাধন
শ্রী হৃদয়-ভূষণ ওপ

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতে “প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব” ব্রিটেনের
সুবিধা

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের যে ভারতশাসন আইন হইয়াছে তাহার খসড়া প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কয়েক বৎসর ধরিয়। ভারতবর্ষে ও ব্রিটেনে নানা আলোচন হইয়াছিল। ভারত-বর্ষে সাইমন কমিশন ও তাহার সহায়ক একাধিক কমীটি বসিয়াছিল। ব্রিটেনে তথাকথিত ভারতস্বত্বীয় গোলটেবিল কনফারেন্স বসিয়াছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্স এবং হাউস অব লর্ডসের একটি বাছাই-করা সম্মিলিত কমীটিরও বহু অধিবেশন হইয়াছিল। এই জয়েন্ট সিলেক্ট পার্লামেন্টারী কমীটি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহাতে নির্দিষ্ট পলিসি অর্থাৎ নীতি অনুসারেই ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইন প্রণয়িত হয়। এই রিপোর্টের এক স্থানে আছে, যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রধান কীষ্টি ও কৃতিত্ব ভারতের একত্ব সম্পাদন, অর্থাৎ কিনা, ইংরেজরা ভারতবর্ষের প্রভু হইবার আগে ভারতবর্ষ কেবল একটা ভৌগোলিক নাম মাত্র ছিল; অনেকগুলো আলাদা আলাদা দেশের সমষ্টির নাম ছিল ভারতবর্ষ, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন একত্ব ছিল না, ইংরেজরা প্রভু হইয়া তবে সেগুলোকে এক রাষ্ট্রে পরিণত করায় তবে সেগুলার সমষ্টিগত ভারতবর্ষ নাম সার্থক হইয়াছে। এখানে এ বিষয়ে কোন তর্কের উত্থাপন করিব না।

এইরূপ কথা বলিবার পর অল্প একটি প্যারাগ্রাফে কমীটি বলিয়াছেন, যে, তাঁহারা ভারতবর্ষের এই ব্রিটিশ-সম্পাদিত একত্বকে কমাইতে, বলিতে গেলে নষ্ট করিতে যাইতেছেন।* কি প্রকারে ও কেন এরূপ করিতে যাইতেছেন? ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলিকে আত্মকর্তৃত্ব দিয়া

ইহা করা হইতেছে, এবং তাহা করা হইতেছে এই জন্য, যে, যাহাতে প্রদেশগুলি স্বাধীনভাবে নিজ নিজ পথে বিকাশ লাভ করিতে পারে।

প্রদেশগুলি যদি বাস্তবিক আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিত, যদি তাহাদের ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের প্রাদেশিক আয়ব্যয় ও আইন-প্রণয়ন সম্বন্ধে চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে প্রদেশগুলিকে আত্মকর্তৃত্ব-দানের উদ্দেশ্যে যাহাই হউক, তদ্রূপ আত্মকর্তৃত্ব অনেকটা মূল্যবান হইত। কিন্তু যে-কেহ ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন পড়িয়াছেন তিনিই জানেন, কোন বিষয়েই প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির চূড়ান্ত ক্ষমতা নাই। প্রাদেশিক গবর্নরের, তাঁহার উপর সমগ্র ভারতের গবর্নর-জেনার্যালের এবং তাঁহার উপর ভারতসচিবের মরজির উপর প্রাদেশিক মন্ত্রীদিগের ও ব্যবস্থাপক সভার কার্যকারিতা নির্ভর করে। প্রথমতঃ, গবর্নর সম্মতি দিলে বা বাধা না-দিলে, এবং তাহার পব গবর্নর-জেনার্যাল ও ভারতসচিব বাধা না দিলে, মন্ত্রীরা কিছু করিতে পারেন, ব্যবস্থাপক সভাও কিছু করিতে পারেন। ভারতশাসন আইন দ্বারা যে ভারতবর্ষকে দুই স্বশাসন-অধিকার দেওয়া হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রথম প্রথম কর্তৃপক্ষ বাধা না-দিতে পারেন। কিন্তু যে-ক্ষমত, যে-অধিকার অপরের মরজি-সাপেক্ষ, অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, তাহাকে স্বশাসন-ক্ষমতা বা স্বশাসন-অধিকার কী যার না।

যাহা হউক, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের জয়েন্ট সিলেক্ট কমীটির এই রিপোর্ট অনুসারে যে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব গবর্নরশাসিত প্রদেশগুলিকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রকৃত আত্মকর্তৃত্ব বিবেচিত হইবার যোগ্য হইলেও তাহার দ্বারা যে ব্রিটিশ ভারতের একত্ব নষ্ট হইয়াছে বা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। সবে ত প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের যুগ আৰম্ভ হইয়াছে। এখনই দেখুন, এক এক প্রদেশের রাষ্ট্রীয় বা সরকারী কাজ এক এক

* Joint Committee Report on Indian Constitutional Reform, Vol. I, Pt. 1, p. 14.

রকমে সম্পাদিত হইতেছে। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দ্বারা শাসিত প্রদেশগুলিতে তবু কাজের ধারা ও নীতিটার একটি মোটা বা সাধারণ রকমের একত্ব আছে। কিন্তু তাহার সহিত অবশিষ্ট পাঁচটি প্রদেশের শাসনকার্যের ধারা বা নীতির এক্য কোথায়? কেবলমাত্র একটি দৃষ্টান্ত লউন। কংগ্রেসী মন্ত্রীদেব শাসিত প্রদেশগুলিতে রাজনৈতিক বন্দী-দিগকে মুক্তি দেওয়া, প্রেস ও সংবাদপত্রের জমানৎ ফেরত দেওয়া, বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত সমিতি ও প্রতিষ্ঠান-গুলির বিরুদ্ধে ঘোষণা প্রত্যাহার করা, যাহাদের নামে গবর্নমেন্টের পক্ষ থেকে রাজদ্রোহের মোকদ্দমা চলিতেছিল মোকদ্দমা প্রত্যাহার করিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া—এবংবিধ নানা কাজ কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ছয়টি প্রদেশে করিতেছেন বা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। যে পাঁচটি প্রদেশে মন্ত্রীরা কংগ্রেসওয়াল নহেন, সেখানে এরূপ কাজ ত হইতেছেই না, বরং তাহার বিপরীত কাজ হইতেছে। বঙ্গে বিনাবিচারে সন্দেহভাজন লোকদিগকে বন্দী করিবার ও বন্দী করিয়া রাখিবার প্রথার সমর্থন গবর্নর ও প্রধান মন্ত্রী উভয়েই করিয়াছেন। বিনাবিচারে বন্দীকৃত লোক-দিগকেও একসঙ্গে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না, ইহাই অকংগ্রেসী বাংলা-গবর্নমেন্টের মত। কাহাকেও কাহাকেও ছাড়িয়া দেওয়া যায় কিনা, প্রত্যেকের কাগজপত্র দেখিয়া তাহা কর্তৃপক্ষ স্থির করিতেছেন, এইরূপ কথিত হইয়াছে। বিচারান্তে দণ্ডিত রাজনৈতিক কর্মীদেরকে ছাড়িয়া দেওয়ার বিষয় তাহারা বিবেচনাও করিতেছেন না বলিয়া মনে হয়। বঙ্গে প্রেস ও সংবাদপত্রের জমানৎ ফেরত দেওয়া দূরে থাকুক, যে-বিষয়ে যেরূপ একটি প্রবন্ধের জন্ত ‘ম্যাডভাল’-সম্পাদকেব শাস্তি হইয়াছে (যাহার বিরুদ্ধে আপীল এখন হাইকোর্টের বিচারাধীন), সেই প্রবন্ধটির কয়েক দিন পরে এবং প্রথমোক্ত প্রবন্ধটির জন্ত মোকদ্দমা হইবার অনেক দিন আগে লিখিত অন্য একটি প্রবন্ধের জন্ত ম্যাডভালের নিকট হইতে জমানৎ লওয়া হইয়াছে, এবং বঙ্গমতীর নিকট হইতে পূর্বে গৃহীত জমানতের পাঁচ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত কোন সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঘোষণা বঙ্গে প্রত্যাহৃত হয় নাই। রাজদ্রোহ, বিদ্রোহ বা উদ্যেগে বড়োদের অভিযোগে দায়ের

কোন মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়া হয় নাই—সেরূপ মোকদ্দমা চলিতেছে।

অজ্ঞাত অনেক বিষয়েও ছয়টি প্রদেশ ও পাঁচটি প্রদেশে পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে। যথা—উড়িষ্যার মন্ত্রীরা ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের নিন্দা করিয়া তাহা নাকচ করিবার একটি সুপারিস্ পাস করিবেন স্থির করিয়াছেন। তাহাদের সুপারিস্ আরও এই হইবে, যে, মূল ভাবত-শাসনবিধি রচনা করিবার নিমিত্ত একটি কমিটিউয়েন্ট্-ম্যাসেমেন্ট আহ্বান করা হউক। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল ঠিক ঐ ধরনের নিয়মিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্নর তাহা করিতে দেন নাই।

“This Assembly is of the opinion that the present constitution under the Government of India Act, 1935, is reactionary, undemocratic and anti-national and totally unacceptable to the people of India and that steps should be taken to secure framing of the constitution based on national independence by the people of India through the medium of a constituent assembly elected on adult franchise.”

ব্যবস্থাপক সভা সঞ্চায় নিয়মাবলীতে এবং স্থায়ী আদেশ-সমূহে গবর্নরদিগকে যে-সব ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রয়োগ দ্বারা সার্বজনিক কোন বিষয়সঞ্চায় প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করিতে না-দেওয়া এই প্রথম হইল।

বিহারে সভাসমিতিতে পুলিশের উপস্থিতি বন্ধ করা হইয়াছে। ভাকে প্রেরিত চিঠি প্রেরক ও প্রাপকের অজ্ঞাতসারে খুলিবার পড়িবার ও তাহার নকল রাখিবার প্রথা কোন কোন কংগ্রেসী মন্ত্রীশাসিত প্রদেশে রহিত হইয়াছে।

মাদ্রাজের কংগ্রেসী গবর্নমেন্ট সমুদয় কর্মীদের দ্বারা দিতে সংকল্প করিয়াছেন। অকংগ্রেসী কোন গবর্নমেন্ট-এরূপ কোন সংকল্প করেন নাই। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মাসিক ৫০০ টাকা বেতন লইতে সংকল্প করায় মাদ্রাজের দেশী ও ইংরেজ সরকারী কর্মচারীদের অনেকে যেচ্ছায় নিজ নিজ বেতনের শতকরা সাড়ে বারো টাকা কম লইতে সংকল্প

করিয়াছেন, শুনা যাইতেছে। অকংগ্রেসী মজীদার শাসিত কোন প্রদেশে এরূপ কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। যাক্ষাৎ কেবল কংগ্রেসী গবর্নেন্ট নেশার জন্ত সুরা এবং তাড়ি প্রভৃতি বিক্রয় ও সেবন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা সালাম জেলায় এই শুভ কার্যের সূত্রপাত করিবেন। অকংগ্রেসী কোন গবর্নেন্ট এরূপ কাজ করেন নাই।

ছয়টি প্রদেশে যাহা হইতেছে, তাহার বিপরীত অবস্থা কেবল যে বাংলা দেশেই ঘটিতেছে তাহা নহে, অন্তর্ভুক্ত এইরূপ হইতেছে। বঙ্গের যেমন ১৪৪ ধারার প্রয়োগ হইতেছে, সেইরূপ অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। সম্প্রতিও করমসিং ধৃত নামক এক ব্যক্তি পঞ্জাব হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, এবং রাজেশ্বর, শিবকুমার শারদা, ও বিজয়কুমার নামে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া লাহোর দুর্গে আটক করা হইয়াছে।

অতি অল্প দিন হইল কংগ্রেসী মজীরা কাজের ভার লইয়াছেন। ইতিমধ্যেই তাঁহাদের শাসিত প্রদেশগুলি ও অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির শাসনকার্যের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে। কালক্রমে এই পার্থক্য বাড়িয়াই চলিবে। অবস্থাটা এইরূপ দাঁড়াইতেছে এবং আরও স্পষ্টভাবে ভবিষ্যতে দাঁড়াইতে পারে যেন ছয়টি প্রদেশ ভারতবর্ষের অংশ নহে, ভারতবর্ষে অবস্থিত নহে; কিংবা যেন ছয়টি এক দেশে অবস্থিত, বাকী পাঁচটি অন্তর্ভুক্ত দেশে অবস্থিত; ছয়টি একবিধ শাসনতন্ত্রের অধীন একটি রাষ্ট্র, পাঁচটি অন্তর্ভুক্ত শাসনতন্ত্রের অধীন অন্তর্ভুক্ত একটি রাষ্ট্র।

এই জন্তই বলিতেছিলাম, তথাকথিত প্রাদেশিক “আত্মকর্তৃত্বের” দ্বারা যে ভারতবর্ষের একত্ব বিনষ্ট করিবার কথা জর্জেট সিলেক্ট প্যারলিমেন্টারী কমিটির রিপোর্ট আছে, তাহার বাস্তব রূপ দৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ছয়টি কংগ্রেসী প্রদেশের লোকেরা, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরা, ও হস্ত মজীরাও পাঁচটি প্রদেশের লোকদের সহিত কোন কোন সময়ে কোন কোন অবস্থায় সমবেদনা প্রকাশ সম্ভব করিবেন। কিন্তু তাহাতে অকংগ্রেসী প্রদেশগুলির সামান্য উপকারও হইবে কি না সন্দেহহীন। ভারতবর্ষের লোকেরা আবির্ভাব, স্পেন ও প্যালেটাইন সম্বন্ধেও ত

উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাতে সেই সব দেশের লোকদের বুকে বল বাড়ে কিনা, জানি না।

প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের গুণাবলী ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞেরা এই নূতন আবিষ্কার করেন নাই। তাহ পূর্বেই, গত খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতেই, তাঁহারা ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বর্গত মেজব বামনদাস বহু মহাশয় কর্তৃক প্রণীত “কল্লি-ডেস্ট্রন অব দি ক্রিস্টিয়ান পাণ্ডার ইন ইণ্ডিয়া” নামক পুস্তক হইতে এ বিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করা যায়।* ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞেরা ভারতবর্ষে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের এই একটি গুণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, প্রদেশগুলি তাহা পাইলে সমগ্রদেশব্যাপী কোন একটা সাধারণ অভাব-অভিযোগ থাকিবে না, সুতরাং ভারতব্যাপী প্রবল কোন আন্দোলনও হইবে না, অতএব এরূপ অবস্থা ব্রিটিশ প্রভুত্বের ক্ষতি হইবে।

* “Before the Parliamentary Committee on the Colonization and Settlement of the Britishers in India, Major G. Wingate, who appeared as a witness on 13th July, 1858, on being asked,

“7771. You speak of the dangers that arise from a central government; and you say that it leads to a community of aims and feelings that might be dangerous” answered: “Yes, I think that if there be any one subject in which the whole population of India would be interested, that is more likely to be dangerous to the foreign authority than if a question were simply agitated in one division of the empire; if a question were agitated throughout the length and breadth of the empire, it would surely be much more dangerous to the foreign authority than a question which interested one Presidency only.”

He gave expression to the feeling which was uppermost in the minds of the Britishers at that time, not to do anything which might “amalgamate” the different creeds and castes and provinces of India. So everything was being done to prevent the growing up of a community of feelings and interests throughout India which would make the peoples of India politically a nation” (pp. 76-77).

জম্বেট পার্লামেন্টারী কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে এক দিকে যেমন ভারতবর্ষের একত্ব বিনাশ বা হ্রাসের কথা বলিয়াছেন, তেমনিই কেন্দ্রীয় ফেডার্যাল গবর্নেন্ট স্থাপন দ্বারা ভারতবর্ষের অখণ্ড রক্ষার কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি বিসদৃশ জিনিষকে এক জায়গায় রাখিয়া দিলেই সেগুলার অখণ্ড সত্তা রক্ষিত, উদ্ধৃত বা প্রমানিত হয় না। ফেডার্যাল ব্যবস্থাপক সভায় ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশসমূহের অধিবাসীদের প্রতিনিধি থাকিবে, আবার দেশী রাজ্যসমূহের শৈবশাসক রাজা-মহাবাজা-নব-নিজামদের মনোনীত লোক থাকিবে। দেশী রাজ্যসমূহের প্রজারা সে সব লোক নির্বাচন করিবে না—এই প্রজাদের কোনই অধিকার নাই ও থাকিবে না। সুতরাং এই অসুত ফেডার্যাল ব্যবস্থাপক সভায় সেকলে শৈবশাসকদের আজ্ঞাবহ লোকেরা থাকিবে, আবার কতকটা এংলে গণতান্ত্রিক রীতিতে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের লোকদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিও থাকিবে। তেলে জলে যেমন মিশ খায় না, তেমনি শৈবশাসন ও গণতান্ত্রিকতাকেও মিশ খায় না। যে ব্যবস্থাপক সভাতে এমন ভিন্নধর্মী দু-বকম জিনিষের একত্র সমাবেশ হইবে, তাহার দ্বারা ভারতবর্ষের একত্ব ও অখণ্ড রক্ষিত হইতে পারে না।

উপরে “কতকটা একলে গণতান্ত্রিক বাঁতি” শব্দগুলি প্রয়োগ করিয়াছি। তাহার কারণ, ভারতবর্ষে ঠিক গণতান্ত্রিক রীতি অসুত হয় নাই। এদেশের মানুষের পরিচয় ভারতশাসন আইনে এ নয়, যে, তাহারা এদেশেই মানুষ। ১৯৩৫ সালের সাবা ভারতশাসন আইনটার কোথাও অধিবাসীগণকে ভারতীয় বা ইণ্ডিয়ান বলা হয় নাই। এমন কথা বলা হয় নাই, যে, ভারতীয়েরা এত জন প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে। বাংলা, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের লোকদের স্বত্বকে যে-সকল ব্যবস্থা আছে, তাহাতে তাহাদের নির্বাচনাধিকার প্রভৃতির উল্লেখের সময় বাঙালী, মরাঠা, পঞ্জাবী প্রভৃতি নামের প্রয়োগ নাই। ব্রিটিশ আইনের চক্ষে সমগ্র ভারতে আমরা ভারতীয় নহি, নিজ নিজ প্রদেশে আমরা বাঙালী, মরাঠা, পঞ্জাবী, বিহারী, উৎকলীয়, আসামী, অন্ধ্রদেশীয়, হিন্দুস্থানী, সিদ্ধী, তামিল প্রভৃতি নহি। সর্বত্র আমরা হিন্দু বা মুসলমান বা শিখ

বা বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টিয়ান বা জৈন বা আদিম নিবাসী, কিংবা শ্রমিক, বণিক, জমিদার ইত্যাদি।

সুতরাং কেবল যে তথাকথিত প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের দ্বারাই ভারতবর্ষের একত্বের ও অখণ্ডত্বের হ্রাস বা বিনাশ হইতেছে তাহা নহে, অজ্ঞাত উপায়েও তাহা সাধিত হইতেছে।

—

আশুমানের বন্দীদের প্রায়োপবেশন

আশুমানের ১৮৭ জন বন্দী স্বেচ্ছায় অন্নগ্রহণ ত্যাগ করিয়াছে, এই সংবাদে হৃদয়হীন মানুষ ছাড়া আর সকলেই বিচলিত হইবে। প্রত্যেক মানুষের কাছেই তাহার প্রাণ অতি প্রিয় ও মূল্যবান—অন্তের চক্ষে তাহা বাহাই হউক না কেন। এই জন্ত খুব প্রিয় বুঝাইতে প্রাণপ্রিয়, প্রাণাধিক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। গুরুতর কারণ না-ঘটিলে মানুষ প্রাণের মামা ছাড়িয়া কোন কিছুর জন্ত প্রাণপণ করে না। উল্লাহদের আত্মহত্যার কথা এখানে হইতেছে না। হঠাৎ ১৮৭ জন মানুষ একসঙ্গে উল্লাহ হইয়া যায় নাই।

এই বন্দীদের প্রায়োপবেশনের কারণ বহু পরিমাণে একটা সরকারী জ্ঞাপনী হইতে বুঝা যায়। তাহাতে লিখিত হইয়াছে, যে, এই ১৮৭ জন ও আরও কয়েক জন বন্দী ভারত-গবর্নেন্টের নিকট অল্পদিন পূর্বে একটি আবেদন পাঠাইয়া তাহাতে এই এই অসুযোগ জানায়, যে, সমগ্র ব্রিটিশভারতে (১) সমস্ত বিনা-বিচারে বন্দী, বিচারান্তে দণ্ডিত রাজ-নৈতিক বন্দী, এবং রাজবন্দীগণকে খালাস দেওয়া হউক; (২) সমুদয় দমনমূলক আইন রদ করা হউক, এবং অস্তবায়িত করিবার সব আদেশ প্রত্যাহত হউক; (৩) আশুমানের কারাকন্ড সমুদয় রাজনৈতিক বন্দীকে দেশে ফিরাইয়া আনা হউক এবং ভবিষ্যতে আর কোন রাজনৈতিক বন্দীকে আশুমানের প্রেরণ করা বন্ধ করা হউক; এবং (৪) সমুদয় রাজনৈতিক বন্দীকে “বী” শ্রেণীর (দ্বিতীয় শ্রেণীর) কয়েদী বলিয়া গণ্য করা হউক।

সরকারী জ্ঞাপনীতে জানান হইয়াছে, যে, ভারত-গবর্নেন্ট এই আবেদন না-মঞ্জুর করিয়াছেন। না-মঞ্জুর করিবার কারণ এইরূপ বলা হইয়াছে—

The Government of India are in no circum-

stances prepared to entertain mass petitions from convicted prisoners, particularly mass petitions on questions of broad policy of a general character, and accordingly they had no choice but to reject the petition in question.

তাপর্য। কোন অবস্থাতেই ভারত-গবর্নেন্ট বিচারালয়ে দোষী প্রমাণিত ও দণ্ডিত কয়েদীদের নিকট হইতে সমষ্টিগত বা দলবদ্ধ আবেদন গ্রহণ ও বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নহেন—বিশেষতঃ সাধারণ বকমের ব্যাপক শাসননীতিবিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে দলবদ্ধ আবেদন। সুতরাং ঐ আবেদন না-মঞ্জুর করা ভিন্ন ভারত-গবর্নেন্টের পন্থান্তর ছিল না।

ভারত-গবর্নেন্ট আশুমানের আবেদনকারী বন্দীদের আবেদন এই কারণে না-মঞ্জুর কবিয়াছেন, যে, তাহা বিচারালয়ে দণ্ডিত বন্দীদের দলবদ্ধ আবেদন এবং তাহা সাধারণ বকমের ব্যাপক শাসন-নীতিবিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে আবেদন। আবেদনকারী বন্দীদের সমষ্টিগত আবেদন অগ্রাহ্য হইবার পর তাহারা যদি প্রত্যেকে ঐ আবেদন আলাদা আলাদা পাঠাইত (এবং আবশ্যক হইলে তাহার ভাষা একটু পৃথক পৃথক কবিয়া দিত), তাহা হইলে দলবদ্ধ ও সমষ্টিগত আবেদনের বিরুদ্ধে গবর্নেন্টের যে আপত্তি, তাহা খণ্ডিত হইত কি না এবং গবর্নেন্ট আবেদন-গুলি গ্রহণ ও বিবেচনা করিতেন কি না জানি না। এক এক জনের আলাদা আলাদা দরখাস্ত যদি গ্রহণ ও বিবেচনার যোগ্য হয়, তাহা হইলে সেই দরখাস্তে বহু ব্যক্তি দস্তখত করিলে তাহা কেন সেই কারণেই অগ্রাহ্য হইবে? বরং অনেক লোক কোন প্রার্থনা জানাইলে প্রার্থনার বিষয়টি গুরুতর, ইহাই ত মনে করা স্বাভাবিক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ও পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত লক্ষ লক্ষ লোকের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। এক এক জনের পৃথক পৃথক প্রার্থনা বিবেচনা করা যদি ধর্মনীতিসংগত ও বৈধ হয়, তাহা হইলে বহু ব্যক্তির সম্মিলিত প্রার্থনা বিবেচনা করা ধর্মনীতিবিরুদ্ধ ও অর্থেহ হইতে পারে না। জেলের বাহিরের লোকদের সম্মিলিত প্রার্থনা বিবেচনা করা যদি ধর্মনীতিবিরুদ্ধ ও অর্থেহ না হয়, তাহা হইলে বিচারালয়ে দণ্ডিত বন্দীদের তদ্রূপ প্রার্থনা কেন বিবেচনার অযোগ্য হইবে?

আবেদনটি অগ্রাহ্য করিবার অন্ত এই কারণ গবর্নেন্ট

বলিয়াছেন, যে, উহা ব্যাপক শাসননীতিবিষয়ক প্রশ্ন-সম্বন্ধীয়। কিন্তু উহা জমীর খাজনা, শাণিজাতক, বা এরূপ কোন প্রশ্ন সম্বন্ধে নহে যাহার সহিত আশুমানের বন্দীদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই; উহা এরূপ প্রশ্ন সম্বন্ধে যাহার সহিত তাহাদের নিজের স্বার্থ দুঃখ ও ভাগ্য জড়িত। সে-রকম বিষয়ে তাহারা কেন আবেদন করিতে পারিবে না বুঝা যায় না।

তাহার পর ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, ঐ বন্দীরা যে অল্পরোধ জানাইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে জনসাধারণের পক্ষ হইতেও করা হইয়াছে, এবং দুই-একটি অল্পবোধ অল্পবায়ী কাজ, তাহারা অল্পরোধ জানাইবার আগেই, কোন কোন প্রাদেশিক গবর্নেন্ট কর্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছে; যেমন, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান। পরে এই বিষয়ে আরও কিছু লিখিতেছি।

আশুমানের ১৮৭ জন বন্দী প্রারোপবেশন করায় সর্বত্র জনগণের মন বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহা প্রথম প্রকাশ পায়, কলিকাতার টাউন-হলের বহু জনাকীর্ণ সভায় যাহাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মন্তব্য পাঠ করেন। মহাকবিরা যেমন তাঁহাদের অনেক রচনায় মানুষের স্বয়ং-মনেব নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করেন, রবীন্দ্রনাথ সেইরূপ তাঁহার বাণীতে জনগণের মনের কথা তাঁহার অনলুকরণীয় ভাষায় ব্যক্ত কবিয়াছেন। বন্দীদের নিকট সভা হইতে এই টেলিগ্রাম গিয়াছে, যে, দেশ তাহাদের অল্পরোধ সমর্থন করে। এই সভার পর কলিকাতায় আরও সভা হইয়াছে। ছাত্রদের শোভাযাত্রা হইয়াছে, এবং মঞ্চস্থলেও নানা স্থানে সভা হইয়াছে। সর্বত্র যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থাপিত ও গৃহীত হওয়া সমীচীন।

প্রারোপবেশক বন্দীদের সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব বন্দীর ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পক্ষে ৭৫ এবং বিরুদ্ধে ১৫০ জন সদস্য ভোট দেওয়ায় তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। প্রস্তাবটির পক্ষে অনেক সদস্য—বিশেষতঃ খ্রীষ্টান জামায়াতের মুখোপাধ্যায়—যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। জামায়াতবাদীরা, প্রস্তাবটি কি ভাবে দেখিতে ও বুঝিতে হইবে, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয় দেন। তাহা সম্বন্ধে যে এত বেশীসংখ্যক সদস্য তাহার বিরুদ্ধে ভোট দেন, তাহার কারণ, উহাকে একটা সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন, দলাদলির

ব্যাপার মনে করা হয়; যেন “ইংরেজ বনাম কালা-আদমী” মোকদ্দমা হইতেছে, যেন মজ্জিমগুলের সমর্থক দল এবং মজ্জিমগুলের বিরোধী দলের একটা ঝগড়া হইতেছে, এইরূপ মনে করা হয়। বিষয়টি যে ভ্রাম্যবুদ্ধির দিক হইতে যে উনার মানবিকতাপ্রণোদিত হৃদয়-মন লইয়া বিবেচনা করা উচিত ছিল, তাহা করা হয় নাই। অধিকাংশ মুসলমান সদস্ত হয়ত ভাবিয়াছেন, প্রায়োপবেশকেরা ত সবাই বা প্রায় সবাই হিন্দু; অতএব আমাদের তাহাতে কি ভানে যায়? ইংরেজ সমস্তেরা ভাবিয়া থাকিবেন ইহা বিশোধী কালা-আদমীদের ব্যাপার, তাহাদিগকে সাহেস্তা করাই উচিত।

কাগজে দেবিলাম, প্রায়োপবেশকের সংখ্যা ১৮৭ হইতে ২৫০-এ পৌছিয়াছে। পরে হয়ত আরও বাড়িবে। অনেক উপবাসীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। জোর করিয়া খাওয়াইবার চেষ্টায় বা অন্য কারণে কত জনের প্রাণ সংশয় হইবে বা প্রাণ যাইবে, বলা যায় না।

গবর্নেন্টকে ও জনগণকে মনে রাখিতে হইবে, যে, এই বন্দীরা প্রথমেই প্রায়োপবেশন করে নাই; তাহারা প্রথমে দরখাস্ত করিয়াছিল, তাহা মঞ্জুর না-হওয়ায় তাহারা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তাহারা যে বিচারান্তে দণ্ডিত ও বন্দীকৃত কয়েদী, এই কথার উপর জোর না-দিয়া, এই কথাটি ভুলিয়া গিয়া, কেবল ইহাই বিবেচনা করা উচিত, যে, কতকগুলি মানুষ কোন কারণে মৃত্যু পণ করিয়াছে। সেই কারণগুলি বিবেচ্য।

আগেই বলিয়াছি, তাহারা প্রথমেই প্রায়োপবেশন করে নাই; প্রথমে দরখাস্ত করিয়াছিল, তাহা মঞ্জুর না-হওয়ায় প্রায়োপবেশন করিয়াছে।

মানুষ একা একা বা দলবদ্ধ ভাবে যদি রাষ্ট্র বা শাসন-সংস্কীর কোন পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন, তাহা হইলে তাহা ঘটাইবার একাধিক পন্থা ও উপায় আছে। শাস্তিপূর্ণ বা অহিংস একটা রীতি তদর্থে আন্দোলন ও কর্তৃপক্ষের নিকট তদর্থে আবেদন প্রেরণ। ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই উপায়ে সিদ্ধিলাভ না-হওয়ায় কিংবা জনগণের এই উপায় অবলম্বনে বাধা দেওয়ায় বা তাহারা এই উপায় অবলম্বন করিবার সুযোগ না-পাওয়ায়,

সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বিপ্লবচেষ্টা হইয়াছে, এবং তাহা কখন বা সফল কখন বা ব্যর্থ হইয়াছে। এই যে দ্বিতীয় উপায় ইহার পশ্চাতে এই মনোভাব থাকে, যে, “কর্তৃপক্ষ আমাদের কথা শুনিবেন না, সুতরাং আমরা বল-প্রয়োগদ্বারা আমাদের কথামত কাজ করিতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করিব কিংবা কর্তৃপক্ষের উচ্ছেদসাধন করিব।” ভারতবর্ষে বর্তমান যুগে প্রথম উপায়ই অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির, কেহ বা অহিংসা তাঁহাদের ধর্মের একটি সার অংশ বলিয়া, কেহ বা সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বিপ্লব বর্তমান অবস্থায় অসাধ্য ও অসমীচীন বলিয়া, আবার অন্য কেহ বা উভয়বিধ কারণে, দ্বিতীয় উপায় অর্থাৎ সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ অবলম্বনের বিরোধী। আমরাও হিংসা-মূলক বিপ্লবচেষ্টার বিরোধী। তৃতীয় উপায়, অন্তর্কে দুঃখ না দিয়া, অন্তের প্রাণবধ না করিয়া, নিজের দুঃখ সহ্য এবং প্রয়োজন হইলে মৃত্যুকে বরণ করা। ইতিহাস-প্রথিত বিদ্রোহ ও বিপ্লবসমূহে বিদ্রোহীরা যেন কর্তৃপক্ষকে বলিয়াছে, “তোমরা আমাদের কথা শুনিবে না, অতএব তোমাদিগকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত বল প্রয়োগ করিব, দুঃখ দিব, প্রয়োজন হইলে তোমাদের বিনাশসাধন করিব।” এই প্রকার মনোভাব রাষ্ট্রনীতিকক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বর্তমান নেতৃবর্গের অল্পমোদিত নহে। তাঁহারা, প্রয়োজন হইলে কর্তৃপক্ষকে দুঃখ না দিয়া অথচ দুঃখ বরণ করিয়াছেন, কারাবরণ করিয়াছেন, লাঠির আঘাত সহিয়াছেন; তাঁহাদের দলের লোকেরাও তাহা করিয়াছেন। কর্তৃপক্ষীয় কাহাবও প্রাণ বধ না করিয়া তাঁহারা কেহ কেহ নিজে মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত। তপশীলভূক্ত জাতিদের এবং অন্য হিন্দু জাতির প্রতিনিধি নির্বাচন একেবারে পৃথক হইবে, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রথম ব্যবস্থায় এইরূপ একটা বিধি ছিল। মহাত্মা গান্ধী হিন্দুসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করিবার এই বিধি ও উপায়ের প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদ নিফল হওয়ায় তিনি পুনঃ জেলে প্রায়োপবেশন করেন। তখন কর্তৃপক্ষ সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা প্রথম যেভাবে করা হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিবর্তন করেন।

আমরা আগে বলিয়াছি, আগামানেব বন্দীরা যাহা করিয়াছে, তাহার বিচার করিতে হইলে, ইহা ভাবা উচিত

নয়, যে, তাহারা কয়েদী; তারা উচিত, যে, তাহারা মাহুয, হুতরাং অস্ত্র মাহুযের পক্ষে যে উপায় অবলম্বন নিষিদ্ধ নহে, তাহারা বন্দী বলিয়াই তাহা নিষিদ্ধ হইতে পারে না। গবর্নেন্টও বলিতে পারেন না, “আমরা প্রায়োপবেশকদের কোন কথা শুনিব না, শুনি না।” কারণ, গবর্নেন্ট প্রায়োপবেশক মহাত্মা গান্ধীর কথা কিছু শুনিয়াছেন। অবশ্য, এ কথা উঠিতে পারে, যে, সবাই ত মহাত্মা গান্ধী নয়। কিন্তু কোন অহরোধ বা প্রার্থনা যদি সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহা হইলে অজ্ঞাত ও অখ্যাত লোকেরা করিয়াছে বলিয়াই বিবেচনার অব্যোধ্য হইতে পারে না।

বন্দী-প্রায়োপবেশক কাহারও কথা গবর্নেন্ট কখন শুনিবে নাই, ইহাও ঠিক নহে। যতীন্দ্রনাথ দাস জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের দুর্গতি দূর করিবার জন্য প্রায়োপবেশন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে গবর্নেন্ট কিছু করেন নাই বটে, কিন্তু তাহার আত্মবলিদানের ফলে যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে গবর্নেন্টকে রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে কিছু নূতন ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল—যদিও যতীন্দ্রনাথ দাস যাহা কিছু চাহিয়াছিলেন, সব এখনও করা হয় নাই।

আমরা এমন কথা বলি না, যে, অ-বন্দী বা বন্দী কেহ গবর্নেন্টকে কিছু করিতে বলিয়া সফলকাম না হইলে যদি তাহার পর প্রায়োপবেশন করেন, তাহা হইলে গবর্নেন্টের তাহা অবশ্যই করা উচিত। আমরা বলি, বন্দী বা অ-বন্দীর আবেদন, প্রার্থনা বা অহরোধ যুক্তিসঙ্গত হইলে গবর্নেন্টের তাহাতে কর্পাত করা উচিত—আবেদক প্রায়োপবেশন না-করিলেও করা উচিত, করিলেও করা উচিত। যদি আবেদন যুক্তিসঙ্গত না-হয়, যদি প্রার্থিত বস্তুটি দেশহিতকর ও জনহিতকর না হয়, তাহা হইলে, কেহ প্রায়োপবেশন করুক বা না-করুক, গবর্নেন্ট সেরূপ আবেদনে কর্পাত করিতে বাধ্য নহেন; কিন্তু আবেদন অগ্রাহ্য করিলে তাহার কারণ বিশদভাবে জনগণকে বুঝাইয়া বলা কর্তব্য।

“তুমি বা তোমরা প্রায়োপবেশন করিয়াছ, অতএব সেই কারণেই আমরা কিছু করিব না,” কর্তৃপক্ষের মনেব ভাব এরূপ হওয়া উচিত নয়। এই ভঙ্গীর পশ্চাতে যেন এই

মনোভাব রহিয়াছে, যে, গবর্নেন্ট বন্দীদের আবেদনে কর্পাত করিলে লোকে ভাবিবে গবর্নেন্ট ভয় পাইয়াছে, গবর্নেন্টকে দুর্বল ভাবিবে, অতএব লোকের মনে বাহাতে এরূপ ধারণা না-জন্মে সেই জন্য প্রায়োপবেশকদের কোন কথা কর্পাত না-করা উচিত। এজন্য মনোভাব ও যুক্তিকে “ছেলেমানুষী” বলা যাইতে পারে। কে না জানে, যে, সকল দেশের গবর্নেন্টই নিজ নৈঃপ্রভুত্ব এবং নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত হাজার হাজার লোকের জীবনমরণকে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করিতে অভ্যস্ত ও সমর্থ। দুই শত বা আড়াই শত বন্দীর প্রায়োপবেশনে ভীত হইয়া গবর্নেন্ট একটা কিছু করিবেন, কারাগার, বা করিয়াছেন, যুট ব্যক্তিরাই এরূপ ভাবিতে পারে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা-গবর্নেন্টের পক্ষ হইতে এইরূপ কথা বলা হইয়াছে, যে, “যত ক্ষণ প্রায়োপবেশন চলিবে, তত ক্ষণ কিছু করা হইবে না।” কিন্তু ইহার উত্তরে স্মরণ করাইয়া দিতে পারা যায় যে, প্রায়োপবেশন যখন বন্দীর করে নাই, যখন ভারত-গবর্নেন্টের কাছে তাহারা শুধু দাব্যপূর্ণ করিয়াছিল তখন বাংলা-গবর্নেন্টের উপরওয়ালার ভারত-গবর্নেন্ট ত কিছু করেন নাই। এখন প্রায়োপবেশন হাড়িয়া দিলে, বাংলা-গবর্নেন্টও যে উপরওয়ালার ভারত-গবর্নেন্টের পথের পথিক হইয়া না, তাহার প্রমাণ কি আছে? তবে যদি সৌভাগ্যক্রমে ও স্ববুদ্ধিবশতঃ বাংলা-গবর্নেন্ট কিছু করেন, তাহা হইলে তাহা প্রায়োপবেশনের ফল বা অংশতঃ তাহার ফল মনে করা যাইতে পারিবে—তাহা গবর্নেন্টের ভয়ের ফল কখনই মনে করা উচিত হইবে না। ঝরং ইহাই মনে করিতে হইবে, যে, এতগুলি লোক যাহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে বা হইয়াছিল তাহা খুব গুরুতর ব্যাপার বুঝিয়া গবর্নেন্ট তাহার সম্বন্ধে সুবিবেচনা করিয়াছেন

বস্তুতঃ, বন্দীদের প্রায়োপবেশনের উদ্দেশ্য গবর্নেন্টকে ভয় দেখান নহে, উদ্দেশ্য গবর্নেন্টকে তাহাদের অহরোধগুলির গুরুত্ব অল্পত্ব করান—আমরা এই রূপ বুঝিয়াছি। অহরোধগুলি তাহাদের নানা দৃষ্টপীড়িত নিরাশ মনের খেয়াল মাত্র নহে, তাহাদের স্থিতিচরায় সেগুলি মাহুযের প্রকৃত জীবনপদবাচ্য জীবনের বহিত জড়িত। এইটি

গবর্নেন্টকে অহুত্ব করা হইবার নিমিত্ত তাহার প্রায়োপবেশন করিয়াছে মনে হয়। ভারতবর্ষে অ-বন্দী আমরা অনেকে কাগজে লিখিয়া, সভা করিয়া সমিতির অধিবেশন করিয়া গবর্নেন্টকে ঐরূপ অহুত্ব জানাইয়াছি বটে; কিন্তু গবর্নেন্ট সেই সব অহুত্বের দৃষ্টি না-করিলে আমরা প্রাণ রাখিব না, বিষয়গুলি এক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি নাই—অন্ততঃ মনে যে করি তাহা কোন প্রমাণ দিই নাই। বাংলা-গবর্নেন্টের পক্ষ হইতে যে বলা হইতেছে, যে, প্রায়োপবেশন বন্ধ না হইলে তাঁহারা কিছু করিবেন না, তাহার মানে কি এই, যে, প্রায়োপবেশন না-করিলে তাঁহারা বুদ্ধিভূক্ত কথা শুনে ন। তাহা হইলে অ-বন্দীদের ঠিক ঐরূপ অহুত্বগুলিতে এত দিন কর্পাত করেন নাই কেন? যদি বন্দীর প্রায়োপবেশন ত্যাগ করিলে এখন কর্পাত করেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, প্রায়োপবেশনরূপ চাপের প্রয়োজন ছিল। জনগণের (তাহার মধ্যে আমরাও আছি) নবের উপরও যদি এই প্রায়োপবেশনের চাপের ফলে বিষয়গুলির ঠিক গুরুত্ববোধ জন্মে, তাহা হইলে বন্দীদের প্রায়োপবেশন বন্ধ হইবে না। যথেষ্ট গুরুত্ববোধ জন্মিলে জনগণ ভাল-করিয়া প্রতিকার চেষ্টা করিবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, “তবে কি আপনি প্রায়োপবেশনকে অস্ত্রের মন প্রভাবিত করিবার একটা বৈধ উপায় মনে করেন?” উত্তরে বলি, “সাধারণতঃ, মোর্টের উপর ইহাকে শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিসঙ্গত উপায় মনে করি না।” কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলি, যে, আমাদের মত বাহারা পৃথিবীতে কোন বস্তুর জন্তই প্রাণপণ করে না, তাহারা, বাহারা কোন-না-কোন ইষ্টবস্তুর জন্ত প্রাণপণ করে তাহাদিগকে পাতি দিতে অধিকারী নহে। আবার প্রশ্ন হইতে পারে, “তাহা হইলে কি বিচারান্তে অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত ও দণ্ডিত এই কয়েকদিগকে মানবহিতৈষী স্বদেশপ্রেমিক বীর মনে করিতে হইবে?” উত্তরে নিবেদন করি, “আমরা অ-বন্দী, আমরা কখনও আদালতের বিচারে অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত ও দণ্ডিত হই নাই, অতএব আমরা সকল বিষয়ে ঐ বন্দীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব, এবং তাহাদের মধ্যে ভাল কিছু থাকিতে পারে

না, এই প্রান্ত অহুত্ব ত্যাগ করুন। এক-একটি মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিচারকের উচ্চ আসনে বসিবেন না। কোন মানুষ বন্দী বা অ-বন্দী, দশ জনের চক্ষে পাপী বা পুণ্যাত্মা বলিয়া বিবেচিত, তাহার বিচার না-করিয়া তাহার কাজটি ভাল না মন্দ, অহুত্বটি ভাল না মন্দ, তাহাই ভাবিয়া দেখুন;—নাই বা সে মানবহিতৈষী স্বদেশ-প্রেমিক বীর হইল। আমেরিকার কবি ল্যাংগেল যে বলিয়া গিয়াছেন,

‘Right for ever on the scaffold,
Wrong for ever on the throne’.

তাহা সর্বত্র সর্বদা ও সাধারণতঃ সত্য না-হইলেও দণ্ডিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে অদণ্ডিত ব্যক্তিদের বিনয় মনোভাব উৎপাদনে সাহায্য করে।”

রাষ্ট্রীয় বা শাসনস্বত্বীয় পরিবর্তন ঘটাইবার জন্ত যে তিনটি পথ ও উপায়ের উল্লেখ আগে করিয়াছি, আশামানের বন্দীরা তাহার মধ্যে প্রথম উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। তাহাতে সিদ্ধকাম না হইয়া তাহারা তৃতীয় উপায় অবলম্বন করিয়াছে। প্রথম বা তৃতীয়, কোন পথই ধর্মনীতিবিরুদ্ধ অবৈধ উপায় নহে। তবে, কথা উঠিতে পারে, গবর্নেন্ট কিছুই করিবেন না, ইতরায় তাহাদের প্রাণপণ করা বুধা এবং যদি তাহাদের প্রাণ যায়, তাহাও হইবে বুধা; অতএব, প্রায়োপবেশন না-করাই উচিত ছিল। কিন্তু আমরা ত গবর্নেন্টের অনেক কাজের ও অনেক না-করার বাচনিক প্রতিবাদ করি। এই বন্দীরা যদি অস্ত্রের ক্ষতি না-করিয়া নিজেদের প্রাণান্ত কার্যগত প্রতিবাদ করিতে দৃঢ়নয়ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার আমার কি বলিবার আছে? দুঃখভারপীড়িত নিরাশ জীবন এই ভাবে উৎসর্গ করা যদি তাহারা শ্রেয়ঃ ভাবিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার ইচ্ছা আমাদের মনে থাকিলেও উপদেশ দিবার অহুত্ব নাই, এবং এ কথা বলিতেও আমাদের সঙ্কোচ বোধ হইতেছে, “তোমরা প্রায়োপবেশন ত্যাগ কর, আমরা তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা প্রাণপণ চেষ্টা করিব।” কারণ, সেরূপ চেষ্টা হইতেছে বা হইবে কি? যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, তাহা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, কিন্তু তাহা যথেষ্ট, বলিতে পারি না।

প্রায়োপবেশক বন্দীদের আবেদনের বিচার

যেহেতু আশুমানের বন্দীরা প্রায়োপবেশন করিয়াছে, অতএব তাহাদের সমুদয় অহরোধ রক্ষা করিতে হইবে, ইহা আমরা বলি না। অল্প দিকে ইহাও বলি না, যে, যেহেতু তাহারা প্রায়োপবেশন করিয়াছে, অতএব তাহাদের আবেদন বিবেচনার অযোগ্য। দুর্বল পক্ষই একপ ভাবে ও বলে। আমাদের মতে, তাহাদের আবেদনের যে-যে অহরোধ শ্রায়া, তাহা পালন করা কর্তব্য। অতএব তাহাদের অহরোধ-গুলির শ্রায়াত্ব অস্বাভাব্যতা বিচার করা উচিত। একপ আলোচনা করিবার পূর্বে স্বরাষ্ট্রসচিব খাজা সর্নাভিমুদ্দিনের ব্যবস্থাপরিষদে উক্ত একটি কথা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

খাজা সাহেব বলেন, “বাপ-মা শিশুকে মারিলে শিশু যদি ভাত খাইতে না-চায়, তাহা হইলে বাপ-মা কি কবিয়া থাকেন? যে-সব বাপ-মা শিশুর দাবীতে সাহায্য দেন, তাঁহাদের শিশু বড় হইয়া যায়। এই উপমা বর্তমান ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।” আমাদের মতে প্রযোজ্য নহে। কারণ, (১) গবর্নেন্ট অ-দণ্ডিত ও দণ্ডিত জনগণের প্রতি সেরূপ স্নেহবিল ও যত্নবান নহেন, বাপ-মা শিশুর প্রতি যেরূপ হইয়া থাকেন। (২) কোন বাপ-মা বড় শিশুকেও বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়া আশুমানের পাঠাইয়া দেয় না; খুব কঠোর শাসক পিতা শাস্তির একটা অঙ্গস্বরূপ হয়ত বাড়ীরই একটা ঘরে শিশুকে কিছুক্ষণ বদ্ধ করিয়া রাখে। (৩) আশুমানের বন্দীরা শিশু নহে। (৪) তাহারা প্রহারের ফলে অর্থাৎ নিজেরা দণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া প্রায়োপবেশন করে নাই, ভাত খাইব না বলে নাই; এবং তাহাদের “দাবী”তে সাহায্য না দিলে তাহারা উপবাস ভাগ করিবে না, গোড়াতেই এমন কথা বলে নাই। তাহারা ভারত-গবর্নেন্টের নিকট তাহাদের আবেদনে কতকগুলি অহরোধ কবিতাছিল। ভারত-গবর্নেন্ট সেই আবেদন সরাসরি অগ্রাহ্য করায় তাহারা প্রায়োপবেশন করিয়াছে। ভারত-গবর্নেন্ট তাহাদের আবেদন সরাসরি না-মঞ্জুর না-করিয়া যদি অন্ততঃ বলিতেন, তাহাদের আবেদন বিবেচনা করা হইতেছে বা বিবেচনার জন্য কমিটি নিযুক্ত হইতেছে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহারা প্রায়োপবেশন করিত না।

সংক্ষেপে প্রায়োপবেশকদের “দাবী” চারিটি। (১) সমুদয়

‘অন্তরীণ’ (‘ডেটেল’), রাজবন্দী, এক বিচারান্তে দোষী প্রমাণিত ও দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি। (২) সমুদয় দমনমূলক আইন রদ করা এবং ‘অন্তরীণ’ করিবার সমুদয় আদেশ প্রত্যাহার। (৩) আশুমানের বর্তমান সময়ে কারাক্ষম সমুদয় রাজনৈতিক বন্দীদিগকে দেশে আনয়ন এবং ভবিষ্যতে আর কাহাকেও তথায় না-পাঠান। (৪) সমুদয় রাজনৈতিক বন্দীকে “দাবী” (অর্থাৎ দ্বিতীয়) প্রেরীভুক্ত করা।

এই সমুদয় “দাবী”, একসঙ্গে ন হইলেও, আলাদা আলাদা কোন-না-কোন সময়ে কংগ্রেস-নেতারা ও উদারনৈতিক সংঘের নেতারা করিয়াছেন। তাহারা আশুমানের বন্দীদের প্রায়োপবেশনের আগে তাহা করিয়াছেন। গবর্নেন্ট তাহাদের কথায় কান দেন নাই। দেশের হিত চান কেবল গবর্নেন্ট-নাম-ধর কয়েকজন বিশেষী-প্রমুখ ব্যক্তি, দেশের হিত বুঝেন কেবল তাহারা, ভারতীয় নেতারা চান না ও বুঝেন না, ইহা স্বজ্ঞসিদ্ধ নহে। অতএব আশুমানের বন্দীদের দাবী বিবেচনার অযোগ্য নহে।

তাহারা এইরূপ দাবী করিবার আগেই যুক্তপ্রদেশের (কংগ্রেসী) গবর্নেন্ট ও অন্ত কোন কোন (কংগ্রেসী) গবর্নেন্ট রাজনৈতিক বন্দীদিগকে খালাস দিয়াছেন। অন্ত কোন কোন (কংগ্রেসী) গবর্নেন্ট এ-বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। সুতরাং এই “দাবী”টি কেবলমাত্র অগ্রাহ্য হইবারই যোগ্য নহে।

দমনমূলক আইনসমূহের মধ্যে যেগুলি রদ করিবার ক্ষমতা ভারতশাসন আইন অল্পসারে প্রাদেশিক গবর্নেন্টসমূহের আছে, কংগ্রেসী গবর্নেন্টসমূহ তাহা রদ করিবেন, কংগ্রেসের প্রস্তাব এবং নির্বাচন-জ্ঞাপনী (ইলেকশন ম্যানিফেস্টো) অল্পসারে ইহা আশা করা যায়।

ভারতশাসন আইন অল্পসারে সমুদয় দমনমূলক আইন রদ করিবার ক্ষমতা ভারত-গবর্নেন্টের আছে। সুতরাং ভারত-গবর্নেন্টকে তাহা বহিতে অহরোধ করিয়া আশুমানের বন্দীরা অযৌক্তিক বা অসম্মত কোন কাজ করে নাই।

১৯২১ সালে, যখন সর্ উইলিয়ম ভিকেন্ট ভারত-

গবয়েন্টের স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন, তখন ঐ গবয়েন্ট যথাবোধ্য অল্পসঙ্খ্যান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যে, তাঁহারা আশ্রয়মান দীপপুঞ্জকে আব দণ্ডিতদের নির্বাসনস্থানরূপে ব্যবহার করিবেন না। সর্ব উইলিয়ম ডিফেন্স বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন, রাজনৈতিক বন্দীদেরকে ও সর্ববিধ বন্দীদেরকে সেখানে হইতে ভারতবর্ষে আনা হইবে। সর্ব উইলিয়ম বলেন, এই প্রকারে ভারতশাসনের একটি ‘ব্লাট’ বা কলঙ্ক মুছিয়া কেলা হইবে। ভারত-গবয়েন্ট এখন যাহাই বলুন, ১৯১৬ বৎসরের মধ্যে আশ্রয়মান-নরক ভূষণে পরিণত হয় নাই; এবং গত বৎসর গবয়েন্ট কর্তৃক প্রেরিত রাজস্বাদা হুসরাজ আশ্রয়মান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেদিনও বলিয়াছেন, বন্দীদের তথায় বাস নরক-বাসের তুল্য।

যুক্তপ্রদেশের গবয়েন্ট ভারত-গবয়েন্টকে অহরোধ করিয়াছেন, যে, যুক্তপ্রদেশের দণ্ডিত কয়েদীদের মধ্যে যাহারা আশ্রয়ানে আছে তাহাদিগকে যুক্তপ্রদেশে ফিরাইয়া আনা হউক এবং ভবিষ্যতে যুক্তপ্রদেশের কাহাকেও তথায় আর যেন পাঠান না হু। বিহার-গবয়েন্টও এইরূপ অহরোধ করিয়াছেন।

অতএব আশ্রয়মানের বন্দীদের তৃতীয় দাবীটি অব্যোক্তিক নহে।

সমুদয় বন্দীকে একশ্রেণীভুক্ত করিয়া সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদন বাসগৃহ প্রভৃতির ব্যবস্থা উন্নততর করা হউক, এই “দাবী” বহুবার ভারতবর্ষের বহু নেতা করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের গবয়েন্ট সম্প্রতি তাঁহাদের যে কৃত্য-তালিকা (প্রোগ্রাম) প্রকাশ করিয়াছেন, জেলসমূহের এবং কয়েদীদের অবস্থার উন্নতি তাহার অন্তর্গত।

রাজনৈতিক বন্দীরা সাধারণতঃ সেই শ্রেণীর লোক যাহাদিগকে ‘ডব্রলোক’ বলা হু। গবয়েন্ট যখন কয়েদীদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেনই এবং যে নিজের বাড়ীতে বেরূপ গ্রাসাচ্ছাদনে অভ্যস্ত তাহাকে জেলেও কতকটা সেইরূপ গ্রাসাচ্ছাদন দেওয়া যখন এই শ্রেণীবিভাগের উদ্দেশ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, তখন রাজনৈতিক বন্দীদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে কেলাই সম্ভব।

“দাবী”গুলি সম্বন্ধে আমাদের শেষ একটি বক্তব্য আছে।

যে-সকল সজ্ঞা দেশে গণতন্ত্রমূলক স্বশাসন প্রবর্তিত আছে, তথায় সাধারণ কয়েদী অল্প দেশেরই মত, অস্বাভাবিক, আছে। আমাদের দেশে যত রকম আইন, রেগুলেশন, অর্ডিন্যান্স প্রভৃতির প্রয়োগ দ্বারা যত মানুষ দণ্ডিত ও কারাবদ্ধ হয়, ঐ সব দেশে তাহা হয় না। এই ক্ষমতা রাজনৈতিক বন্দী নামক এক শ্রেণীর বন্দী তথায় নাই, বা খুব অল্পসংখ্যক আছে। কোন দেশ স্বশাসন-অধিকার পাইলে তথাকার পূর্বেকার আমলের রাজনৈতিক বন্দীরা, সমস্ত বিদ্রোহ অপরাধে দণ্ডিত কয়েদীরা পর্যন্ত, খালাস পায়—সর্ব জন আশ্রয়মানের পরামর্শে আদালতগণেও পাইয়াছিল। কংগ্রেসী প্রাদেশিক গবয়েন্ট যে ছয়টি প্রদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে, তথাকার কংগ্রেসী নেতারা মনে করেন তাঁহারা স্বশাসন-অধিকার পাইয়াছেন। এই ক্ষমতা ঐ সব প্রদেশে রাজনৈতিক বন্দীরা খালাস পাইতেছে এবং স্বশাসক দেশেব অন্তান্ত সুবিধাও তথায় প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। গত ২১শে জুলাই বন্দীরা ব্যবস্থাপরিষদে স্বরাষ্ট্রসচিব খাজা সর্ব নাজিমুদ্দিন বলেন, “আমি সদস্যদের নিকট এই নিবেদন কবিতোছি, বর্তমান শাসনতন্ত্রে আমরা সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছি; এক্ষণে শাসনকার্যের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের।” তাহা হইলে বাংলা দেশও স্বশাসন-অধিকার পাইয়াছে। সুতরাং অল্প কোন দেশ ঐ অধিকার পাইলে তথায় বেরূপ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে, বঙ্গের সেইরূপ পরিবর্তন ঘটুক, এরূপ অহরোধ বা “দাবী” অব্যোক্তিক বা বিবেচনার অব্যোক্তিক নহে।

এখানে বলা আবশ্যিক, যে, আমাদের মতে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন ভারতবর্ষকে বা তাহার প্রদেশগুলিকে স্বশাসন-অধিকার দেয় নাই, যদিও সরকারী মত বলে, যে, দিয়াছে।

কোন দেশ স্বশাসন-অধিকার পাইলে রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার যে রীতি আছে, তাহার কারণ এই, যে, তাহারা দেশের ক্ষমতা স্বশাসন-অধিকার অর্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল—যদিও অবশ্য তাহা বে-আইনী উপায়ে করিয়াছিল।

বঙ্গের বজেট

বঙ্গের বজেট প্রতি বৎসর আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমাদের বহু বৎসর হইতে আছে, এবং সেই ইচ্ছা থাকায় বজেট সম্বন্ধে প্রায় প্রতি বৎসরই দু-চার কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু বজেট আলোচনা ভাল করিয়া কবিবার উপায় আমাদের নাই। যে সরকারী মুদ্রিত কিস্তীখ্যাল টেটমেন্টটিতে সমুদয় আয়ব্যয় বিস্তারিত দেওয়া থাকে, তাহা আমরা পাই না, এবারেও পাই নাই। অর্থসচিবের তদ্বিষয়ক বক্তৃতা এবং খবরের কাগজে ব্যবস্থাপক সদস্যদের কোন কোন মন্তব্যের কোন কোন অংশ অবলম্বন করিয়া দু-চার কথা লিখিব।

স্টেট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে বাংলা দেশে যত রাজস্ব সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে, তাহাব সম্পূর্ণ সুবিধা বাংলা দেশ কখনও পায় নাই। ঐ রাজস্বের কোটি কোটি টাকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য ব্যয়িত হইয়াছে, এবং বঙ্গের বাহিরের কোন কোন প্রদেশের স্বাধীনতাই বঙ্গের বিস্তার টাকা খরচ করা হইয়াছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সংগৃহীত নানা প্রকারের রাজস্বকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, তখন ভাগটা এমন ভাবে করা হয়, যে, বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের খুব বেশী অংশ কেন্দ্রীয় অর্থাৎ ভারত-গবন্মেণ্ট গ্রহণ করেন। লর্ড মেটন প্রধানতঃ এই বিভাজনের কর্তা বলিয়া ইহাকে মেটন বন্দোবস্ত বলা হয়। অল্প যে-কোন প্রদেশের চেয়ে বঙ্গে অধিক রাজস্ব সংগৃহীত হইলেও, এই বন্দোবস্তের ফলে, বাংলা দেশের সরকারী ব্যয়ের জন্য বাংলা-গবন্মেণ্টের হাতে মুক্তপ্রদেয়, মাদ্রাজ, গুজাব ও বোম্বাই অপেক্ষা কম টাকা থাকিবে। যেন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। তাহাব পর দ্বিহ্ন হয়, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-গবন্মেণ্টের হাতে আগেকার চেয়ে কিছু বেশী টাকা থাকিতে দেওয়া হইবে। এই যে বেশী টাকা ইহা ভারতবর্ষের অল্প কোন প্রদেশে সংগৃহীত রাজস্বের অংশ নহে। ইহা বাংলা দেশে সংগৃহীত রাজস্বেরই অংশ। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন জারি হইবার পূর্বে বাংলা দেশকে তাহার রাজস্ব হইতে যতটা বঞ্চিত করা

হইত, এখন ততটা বঞ্চিত করা হইবে না, প্রভেদ এই মাত্র। কিন্তু বঞ্চিত এখনও করা হইতেছে। অবস্থাটা এইরূপ, যে, যদি বাংলা দেশ একটা পৃথক স্বাধীন দেশ হইত, তাহা হইলে তাহার রাজস্ব সম্পূর্ণ তাহার হাতেই থাকিত। কিন্তু উহা ভারতবর্ষের অংশ বলিয়া এবং ভারতবর্ষ পবায়ীন বলিয়া, বঙ্গের গবন্মেণ্টকে গরীব সাজান হইয়াছে ও গরীব সাজিতে হইয়াছে। নতুন বস্তুতঃ বাংলা দেশ আর্থিক বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী, অল্প কোন প্রদেশ বা দেশের মুখাপেক্ষী, নহে।

বঙ্গের তহবিলে যে এবার বেশী টাকা আসিয়াছে, তাহার বলে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরাঙ্গন সরকার কিছু উদ্বৃষ্ট দেখাইতে পারিয়াছেন,—এই বেশী অর্থাগমের প্রশংসা তাহার প্রাপ্য নহে, তাহার বেরান্দা মন্ত্রীদেব বা লাট-নাহেবেরও প্রাপ্য নহে। এই প্রশংসা যেমন বঙ্গের মন্ত্রি-মণ্ডলের প্রাপ্য নহে, তেমনই আফগান আমলেব মন্ত্রীদেব বার্ষিক ৬৫০০০ টাকার চেয়ে তাহারা যে কম বেতন লইতেছেন তাহার প্রশংসাও তাহারা দাবী করিতে পারেন না। কারণ নূতন ব্যবস্থাপক নজা ও ব্যবস্থা-পরিষদের নানাবিধ ব্যয় আগেকার আমলে ব্যয়ের চেয়ে বার্ষিক এক লক্ষ ঘাট হাজার টাকা বেশী হইয়াছে। তাহার পর বোধ হয় পাল্‌মেটোরী সোল্টোরী প্রভৃতির ব্যয় আছে। ১১ জন মন্ত্রী প্রত্যেকে ৬৪০০০ চাহিলে টাকা কোথা হইতে আসিত? তাহাদিগকে ক্ষান্ততা কম টাকা লইতে হইয়াছে। কিন্তু এই কমও কংগ্রেসী মন্ত্রীদেব মাসিক ৫০০ বেতনেব তুলনায় খুব বেশী। কংগ্রেসী মন্ত্রীদেব বাড়ী ও গাড়ীভাড়া খরিলেও তাহাবা ঘোঁটা যত টাকা গ্রহণ করেন, বঙ্গের মন্ত্রীদেব বেতনেব তুলনায় তদ্ব্যপেক্ষ অনেক কম।

বঙ্গের মন্ত্রীদেব মধ্যে তাহারও তাহারও আর্থিক অবস্থা একপ যে তাহারা ৫০০ বেতনে, এমন কি বিনা বেতনেও, কাজ করিতে পারিতেন। কিন্তু হস্তেবা তাহাতে রাজী হইতেন না। এবং কেহ কম বেতন লইবার জেদ করিলে অন্তরা বলিতেন, “ভায়া, তুমি অল্প ঋণ দেখ; তোমার সঙ্গে আমাদের পোষাবে না।” এই কারণে বঙ্গের কোন কোন মন্ত্রী কম বেতন লইয়া যে বাহবা হইতে পারিতেন, তাহা পাইতেছেন না।

যেমন কোন কোন বিষয়ে প্রশংসা বৃদ্ধির অর্থসচিব ও অন্ত্র মন্ত্রীদিগেব প্রাপ্য নহে, তেমনি কোন কোন নিন্দা হইতেও তাঁহারা অব্যাহতি দাবী করিতে পারেন। রাজস্বের একটা মোটা অংশ গবর্ণর আইন অনুসারে কতকগুলি ব্যয়ের জন্য আলাদা করিয়া রাখিতে বাধ্য। তাহার উপর মন্ত্রীদের কোন হাত নাই, ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থা-পরিষদও তাহাতে হাত দিতে পারেন না। ইহা মনে রাখিলে বুঝা যাইবে, যে, ব্যয়সংক্ষেপের এই একটা সীমা আছে। তাহার পর, বেঙ্গল ইম্পিরিয়্যাল সার্ভিসের চাকরি, যেমন সিভিলিয়ান ম্যাজিস্ট্রেট, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদির, সিভিলিয়ান জজের, জেলার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও তাহার উপরেব পুলিশের কর্মচারীর পদ, জেলার আই-এম্-এস সিভিল সার্জনের পদ, শিক্ষা-বিভাগের মোটা বেতনভোগী ডিরেক্টর প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক ইন্সপেক্টরের পদ, সেনা-বিভাগের বড় কর্মচারীদের পদ, ইত্যাদির বেতন মঞ্জুরী কমাইতে পারেন না। এই দিক দিয়াও ব্যয় সংক্ষেপের একটা সীমা আছে। অবশ্য, কংগ্রেসনেতা, উদারনৈতিক নেতা ও অন্ত্র অনেকের মতে এই সব দিকেই ব্যয় কমান যাইতে পারে এবং কমান উচিত। কিন্তু কমাইবার ক্ষমতা আইন ভারতসচিবের হাতে দিয়াছে, ভারত-গবর্নেন্ট, প্রাদেশিক গবর্নেন্ট বা প্রাদেশিক মন্ত্রীদের হাতে দেয় নাই। অতএব, যথেষ্ট ব্যয়সংক্ষেপ যে হইতেছে না তাহার জন্য ভারতশাসন আইন দায়ী, ভারতসচিব দায়ী, প্রাদেশিক মন্ত্রীরা দায়ী নহেন। কিন্তু যে-যে দিকে ব্যয়-সংক্ষেপের যে সীমারেখা আইন টানিয়া দিয়াছে, সেই সীমার মধ্যে থাকিয়াও কতকটা ব্যয়সংক্ষেপ অবশ্যই হইতে পারে। ব্যয় কত কমান যায়, তাহা বলিতে হইলে বিস্তারিত ফিন্যান্সিয়াল টেটমেন্ট সম্বন্ধে থাকা আবশ্যক। তাহা আমরা পাই নাই। ছয়টি প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ব্যয় যথান্যথ্য কমাইতে চেষ্টা করিবেন। অ-কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ভয়ে ভয়ে কাজ করেন, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সে ভয় নাই। অতএব কংগ্রেসী মন্ত্রীরা নিজেদের বেতন ছাড়াও অন্ত্র যে-যে দিকে ব্যয় কমাইবেন, তাহা জানিতে পারিলে অ-কংগ্রেসী মন্ত্রীরা কি করিতে পারিতেন, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহাদেরও কোন ফিন্যান্সিয়াল

টেটমেন্ট আমাদের হস্তগত হয় নাই। অবশ্য, প্রত্যেক প্রদেশেব রাজনৈতিক ও অন্ত্রবিধ অবস্থা এক নহে। কিন্তু ইহা মনে রাখিলেও সাধাবশতঃ ইহা বলা অন্ত্রায় হইবে না, যে, বৃদ্ধির পুলিশ-ব্যয়, সাধারণ শাসন-ব্যয় এবং আবণ্ড কোন কোন ব্যয় কমান যাইতে পারে। বৃদ্ধির মন্ত্রীরা আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ কেবল এইটুকু বলিতে পাবেন, যে, তাঁহারা কাজের ভার লইবার পূর্বে ব্যয় নানা দিকে যে-সীমায় পৌঁছিয়াছে, তাহার অন্ত্র তাঁহারা দায়ী নহেন এবং পূর্বে ব্যয়েব পরিমাণ প্রথম বৎসরেই খুব কমান যায় না। ইহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও ইহা বলা একটুও অন্ত্রায় হইবে না, যে, ব্যয়সংক্ষেপের জন্য যেরূপ চেষ্টা করা উচিত ছিল, তাহা তাঁহারা করেন নাই।

অর্থসচিবের বজেট-বক্তৃতার দ্বিতীয় পর্বেশিটে ১৯৩৭-৩৮ সালের বজেটে আগেকাব বৎসব অপেক্ষা যত বেশী ববান্দ যে-যে বিভাগে করা হইয়াছে, তাহার তালিকা দেওয়া হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ নিচে সঙ্কলিত হইল।

বিভাগ।	১৯৩৭-৩৮-এব ববান্দ।	পূর্বাংকক্ষা ববান্দ-বৃদ্ধির পরিমাণ।
শিক্ষা	১,৩৭,৭০,০০০	৪,৯০,০০০
চিকিৎসা	৫৪,৪৫,০০০	২,৫৭,০০০
সাধারণ স্বাস্থ্য	৩৩ ৯৮,০০০	৬ ৮৮,০০০
কৃষি	১১,৭৪,০০০	১,৩৮,০০০
সমবায় স্বপদান	১৩ ৯৪,০০০	২,২৫,০০০
পশুশিল্প	১৬,৬৯,০০০	২,১০,০০০
স্বপদালিনী বোর্ড	১৬,৬২,০০০	১৪,৪৬,০০০
নতন হাবড়া পুলের		
অন্ত্র সাহায্য	৪,০০,০০০	৩,০০,০০০
রাস্তা বিস্তার	২২,২৩,০০০	৬,০৯,০০০
সিভিল ইমাবৎ আদি	১,০৪,৯২,০০০	২১,৮১,০০০

শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি পশুশিল্প রাস্তাবিস্তার প্রভৃতির জন্য যাহা ববান্দ করা হইয়াছে এবং ববান্দ যাহা বাড়িয়াছে, তাহা মোটেই যথেষ্ট না হইলেও, “নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল”।

অর্থসচিব স্বীকার করিয়াছেন,

“I may freely admit that our means are still far from adequate for the needs of national reconstruction.”

‘আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি, যে, জাতীয় পুনর্গঠনের

জন্ত যত আর আবশ্যক, আমাদের আর তাহা অপেক্ষা এখনও অনেক কম।”

ব্যয়সংক্ষেপ দ্বারা জাতীয় পুনর্গঠনের জন্ত যথেষ্ট টাকা পাইবার পথ ভারতশাসন আইন রাখে নাই, এবং সে-পথ ক্রমশঃ না থাকিলেও কেবল সেই উপায়ে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাইত না। নূতন রকমের ট্যাক্স বসাইয়া আর বাড়ান সহজ নহে এবং দ্বিবিভ্র দেশে নূতন ট্যাক্স বসাইলেও তাহা হইতে বেশী আয় হইবে না। বঙ্গের সরকারী আয় বৃদ্ধির উপায়ের আলোচনা সংক্ষেপে করা যাইবে না। সুতরাং সে-চেষ্ঠা এখানে করিব না।

সন্ত্রাসন দমনের ব্যয়

সন্ত্রাসন দমনের ব্যয় বাবদে অর্ধ কোটির উপর টাকা বজেটে বরাদ্দ করা হইয়াছে। অর্থসচিব বলিতেছেন, যদি সমুদয় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সদ্য সদ্যই ৫৪ লক্ষ টাকা বাঁচিবে না। কারণ, “অস্ত্রবীণদের মুক্তি ও গবর্নেন্ট-বিপর্যাসক সমুদয় প্রচেষ্টার তিরোভাব একার্থবোধক নহে এবং দুটি একসঙ্গে ঘটিব না। একপ মুক্তি দিতে পারিবার কিছু কাল পর পর্যন্ত সন্ত্রাসন-প্রচেষ্টার পুনরাবির্ভাব কিংবা অন্তবিধ বিপর্যাসক প্রচেষ্টার আবির্ভাব নিবারণকল্পে কিছু বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে।”

ইহা হইতে এই অনুমান করা অসম্ভব হইবে না, যে, বাংলা-গবর্নেন্টের মতে সন্ত্রাসন ও অন্তবিধ বিপর্যাসক প্রচেষ্টার জড় মরে নাই, মূল বা বীজ নষ্ট হয় নাই। উহার জড়, মূল বা বীজ কি বা কোথায়? গবর্নেন্টের মতে তাহা কি, তাহা গবর্নেন্ট বলিতে পারেন। কিন্তু মনের কথা খুলিয়া বলা ত কোন দেশের গবর্নেন্টেরই রীতি নহে। অনেক সময় তাহাদের আচরণ হইতে তাহাদের মতের আভাস সংগ্রহ করিতে হয়। বাংলা-গবর্নেন্টের কার্যকলাপ হইতে মনে হইতে পারে, যে, বঙ্গে সন্ত্রাসন-বাদের উৎপত্তি ও স্থিতির প্রধান কারণ, বঙ্গীয় যুবকবর্গের অধিকাংশের বেকার অবস্থা। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বেকার-সমস্যার সমাধান না হইলে, দমনার্থ কঠোরতম আইনের প্রয়োগ ও প্রয়োজনাত্মক পুলিশ কর্মচারী

নিয়োগ সম্বন্ধে বিপর্যাসক সম্মানবৎ প্রতীতির তিরোভাব ঘটবে না। কিন্তু বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্ত গবর্নেন্ট কি করিয়াছেন, করিতেছেন, করিবেন? কতকগুলি যুবককে ছাড়া, সাবান, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি করিতে শিখাইলেই বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে না। বস্তুতঃ “আনন্দবাজার পত্রিকা” অনুসন্ধান ও বিস্তারিত সমালোচনা যাবা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে, সরকারী পণ্যশিল্প-বিভাগের এই চেষ্টা বার্থ হইয়াছে। এখনও ইহার সফলতা বোঝা প্রতিবাদ দেখি নাই।

বড় বড় পণ্যশিল্পের কাবধানা এবং বড় বড় ব্যবসা বঙ্গের বাড়ালীরা স্থাপন ও পরিচালন না করিলে বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে না। বঙ্গের অধিবাসীরা বাহিরে প্রস্তুত বা উৎপন্ন কাপড়, লোহালক্ষড়, চিনি, লবণ, সূত, তৈল ও তৈলবীজ প্রভৃতি কিনিবার জন্ত প্রতি মাসে বহু কোটি টাকা খরচ করে। বঙ্গের প্রকৃত নিঃস্বার্থ বেতাদের দ্বারা পরিচালিত জাতীয় গবর্নেন্ট কখনও বঙ্গে স্থাপিত হইলে এই গবর্নেন্ট জাপানের জাতীয় গবর্নেন্টের মত নানা উপায়ে উক্ত সকল পণ্যশিল্প ও ব্যবসা স্থাপন ও পরিচালনে আর্থিক ও অন্ত নানাবিধ সাহায্য করিবেন। বঙ্গের স্বাভাবিক ত বলিয়াছেন, বাংলা দেশ অশাসক হইয়াছে। তিনি পণ্যশিল্প ব্যবসা ও কৃষি বিষয়ে জাপানী নীতি অনুসরণ করুন না? কিন্তু বলি কহাকে? তিনি পুরুষাণুক্রমে বঙ্গ বাস করিয়াও বোধ হয় বাংলা বলেন না, পড়েন না।

ছোট ছোট ক্ষুদ্রশিল্প প্রভৃতির সাহায্য দিবার নিমিত্ত একটা আইন হইয়াছে ও কিছু টাকারও বরাদ্দ হইয়াছে জানি। কিন্তু বাহিবের বিরাট প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে গড়িবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে।

অর্থসচিব বলিয়াছেন, সরকারী নানা বিভাগে আবও দশ হাজার লোককে নিয়োগ করা হইবে। ইহা ভাল। কিন্তু ইহাতেও বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে না।

বঙ্গে বহু যুবকের বেকার অবস্থা সন্ত্রাসনবাদেব জড়, সরকারী এই মত অবলম্বন করিয়া সামান্য কিছু বলিলাম। আমাদের মত কিন্তু অন্ত প্রকার। আমরা মনে করি, বিপর্যাসক প্রচেষ্টা-সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে রাষ্ট্রনৈতিক কারণে। লর্ড কার্জনের আমলেব আগে যে ব্রিটিশ

গবর্নমেন্টের কাজ দেশের লোকদের মত অনুসারে নির্বাহিত হইত, তাহা নহে। কিন্তু লর্ড কার্জনই দেশের লোকের মতকে অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিয়া চলিতে ও তাহাকে দমন করিতে আরম্ভ করেন। তাহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ দেশের লোকদের স্বমত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টার ও বিজ্রোহী ভাবের সূত্রপাত হয়। দমন-ব্যবস্থাও উত্তরোত্তর কঠোরতর ও ব্যাপকতর হইতে থাকে।

সম্ভ্রান্তপ্রচেষ্টা ও অন্তান্ত বিপর্যাসক প্রচেষ্টার জড় খুঁজিতে হইলে রাষ্ট্রনীতিঘটিত এই সকল ব্যাপারের মধ্যে খুঁজিতে হইবে। সম্ভ্রান্তবাদ-উৎপাদনে বেকার অবস্থা রাষ্ট্রনৈতিক কারণের উত্তরসাধক হইয়াছে বটে। তাহারও উচ্ছেদ আবশ্যক বটে। কিন্তু বিপর্যাসক সব প্রচেষ্টার মূলীভূত কারণ স্বশাসন-অধিকারের অভাব। স্বশাসন-অধিকার কাৰ্য্যভ্যন্তরীণ ও প্রতিষ্ঠিত না-হইলে বিপর্যাসক কোন প্রচেষ্টার বীজ সম্পূর্ণ নষ্ট হইবে না। এই প্রকার সকল প্রচেষ্টা বিনষ্ট করিবার যথাসাধ্য আয়োজন ও চেষ্টা করিয়াও যে বাংলা-গবর্নমেন্ট আশঙ্কা করিতেছেন, যে, তাহাদেব পুনরাবির্ভাব ঘটিতে পারে, তাহা দ্বারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্বীকৃত হইতেছে, যে, জনগণের স্বশাসন-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই।

কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের ও মন্ত্রিসভার নাই, ভারত-গবর্নমেন্টেরও নাই। কর্তা ছয় হাজার মাইল দূরবর্তী প্রধানতঃ বণিগ্ৰুতি-ও প্রভুস্বপ্ন ব্রিটিশ জাতি।

বাংলার টাকা বাংলাকে ধার দিয়া সুদ গ্রহণ

বঙ্কের বজেট-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, যে, বঙ্ক সংগৃহীত রাজস্বের খুব বেশী অংশ ভারত-গবর্নমেন্ট লইতে থাকায় বাংলা-গবর্নমেন্ট দরিদ্র হইয়া পড়ে। ঘাটতি পূরাইয়া আম-ব্যয়ের সমতা সাধন ও রক্ষার নিমিত্ত এই গবর্নমেন্ট ভারত-গবর্নমেন্টের নিকট টাকা ধার লইতে বাধ্য হন। ভাবত-গবর্নমেন্ট বাহা স্বর্ণস্বরূপ বাংলা-গবর্নমেন্টকে দেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা বাংলা দেশ হইতেই লইতে-ছিলেন। সুতরাং বাংলার টাকা বাংলাকেই ধার দিতে লাগিলেন বলিলে অস্তায় বা মিথ্যা কিছু বলা হয় না। এই অপূর্ণ ঋণের সুদস্বরূপ ভারত-গবর্নমেন্ট বাংলা-

গবর্নমেন্টের নিকট হইতে লইয়াছেন ১৯০২-০৩ সালে বার লক্ষ, ১৯০৩-০৪ সালে আঠার লক্ষ, এবং ১৯০৪-০৫, ১৯০৫-০৬ ও ১৯০৬-০৭ সালে বাইশ লক্ষ করিয়া— মোট ছিয়ানব্বই লক্ষ টাকা। সব্ব অটো নীমেঘারের প্রস্তাব অনুসারে ভাবত-গবর্নমেন্ট বাংলা-গবর্নমেন্টকে এই ঋণদায় হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

বেকার-সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

ইহা সুবিদিত এবং ইহা বাঙালীদের একটা চর্ধ্যামিশ্রিত অভিযোগেরও বিষয়, যে, অনেক অ-বাঙালী নিঃস্ব ব্যক্তি বঙ্ক আসিয়া পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা ও বুদ্ধিবলে নিজের ব্যয় নির্বাহ ত করেই, অধিকন্তু পরিবার-প্রতিপালনে-নিমিত্ত ‘দেশে’ টাকা পাঠায়, সঞ্চয় করে, এবং কেহ কেহ অতুপতি লক্ষপতি ক্রোরপতি হয়। ব্রিটিশ জাতির প্রণীত আইন এবং অন্তান্ত ব্যবস্থা ও রীতি বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ ব্যবসাবাগিজ্যেব শ্রীবুদ্ধিসাধক এবং ভাবতীয়দের ব্যবসা-বাগিজ্যের অবসাদজনক হইলেও, অ-বাঙালী ভারতীয়েরা বঙ্ক উপার্জক, সঞ্চয়শীল ও বিত্তশালী হয়, অথচ সমর্থ ব্যসের বুদ্ধিমান বাঙালীরা বেকার ও দরিদ্র থাকে; ইহা হইতে বাঙালী-চরিত্রে কিছু খুঁৎ আছে অনুমান করা অস্তায় নহে। এই খুঁৎ যদি বঙ্কের মাটি জলবায়ু, বঙ্কের ম্যালেরিয়া এবং আমাদের পূর্বজদিগের চাকরিজীবিতা মসৌজীবিতা বচনজীবিতা হইতে জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলেও আমরা যে তাহার সংশোধন ও পরিহার কবিত্তে যথেষ্ট চেষ্টা করি না, ইহা আমাদের দোষ। ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেই প্রশমীল হইতে পারা যায় এবং সঙ্কপায়ে উপার্জনশীল হইবার নিমিত্ত দৈহিক শ্রমকেও, লজ্জার কারণ মনে না-করিয়া, স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

তুই তুমি আপনি সে তিনি

যাহারা কাজ করিয়া উপার্জন করিতে চায়, সব দোষটা যে তাহাদের তাহা নহে। আমরা পূর্বে কখন কখন এক্রপ লিখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে, যে, পুলিশ-বিভাগে যে ভ্রমলোকের ছেলেরা কাজ করিতে অনিচ্ছুক তাহার একটা কারণ তাহারা উপরওয়ালাদের নিকট হইতে শিষ্ট-ব্যবহার

পায় না। সমান বেতনের মুহুরী, কেরানী, পেয়াদা, আরদালি, চাপরাসি, কনেটবল, গুরুমহাশয় সমান শিক্ষিত ও সমান সামাজিক মর্যাদা-বিশিষ্ট হইলেও, গুরুমহাশয়, কেরানী ও মুহুরীকে “আপনি” বলিয়া সম্বোধন করা অনেকের অভ্যাস, কিন্তু চাপরাসি পাহারাওয়াল প্রভৃতিকে “তুমি” বলা অভ্যাস। আপনি বলা অবশ্যই ঠিক। মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী লক্ষপতি বণিক-জাতীয় কোন কোন ব্যবসাদারকে নিজের ভ্রাতৃগণ দারোয়ানকে “পায় লাগি দারোয়ানজী”, বলিয়া অভিবাদন কবিত্তে শুনা গিয়াছে। পাচক ব্রাহ্মণকে ছাত্রদের কোন কোন মেসে ও কোন কোন ভক্তলোকের বাড়ীতে “আপনি” বলিয়া সম্বোধন করিবাব বীতি ছিল। এখন হয়ত কোথাও নাই।

বস্তুতঃ ভাবার মধ্যে, তুমি তুমি আপনি এবং সে ও তিনি, এই প্রকার বিভিন্ন সর্বনামের উৎপত্তি ও প্রয়োগে সুবিধা যাহাই হউক, অসুবিধাও অনেক হইয়াছে। ইহাদের পরিবর্তে যদি শুধু তুমি বা আপনি এবং শুধু তিনি বা সে শব্দের প্রয়োগ থাকিত, তাহা হইলে তাহাতে অনেক সুবিধা হইত ও তাহা গণতান্ত্রিক যুগের অধিকতর উপযুক্ত হইত।

যাহাকে খুব স্নেহ করা হয়, খুব নিজের মনে করা হয়, বর্তমান রীতি অনুসারে তাহাকে “তুমি” বলিলে কোন দোষ হয় না। কিন্তু বাড়ীর চাকর বা আফিসের চাকরকে কি কেহ এত স্নেহ করেন, যে, তাহাকে তুমি বলিলে এই সম্বোধন তাহার মনে লাগিতে পারে?

সামাজিক ব্যবহার ও অল্প পারিশ্রমিকের কাজ

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকারের সংখ্যা এত বাড়িয়াছে, যে, আমদের কারবার সামান্য হইলেও এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটর নিকট হইতেও আমরা একরূপ চিঠি খুব কম পাই না যাহাতে লেখকেরা কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে যে-কোন সামান্য কাজও করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

অনেক সরকারী আফিসে, মিউনিসিপালিটি ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের আফিসে, সওদাগরী আফিসে, ডাকঘরে, বেসরকারী নানা দোতানে ও আফিসে অল্প বেতনের এমন বিস্তার কাজ আছে, যাহাব পারিশ্রমিক বাস্তবিক অল্প বেতনের কেরানী-গিবি গুরুমহাশয়গিরি প্রভৃতির চেয়ে কম নয়। কিন্তু

‘ভক্ত’ শ্রেণীর ছেলেরা এই সব কাজ করিতে চায় না। তাহার একটা প্রধান কারণ এই সকল কাজকে মিনিয়াল বা ভূত্যাশ্রেণীর কাজ মনে করা হয়।

সমাজ-মন হইতে এই মনোভাব অবিলম্বে দূরীভূত হওয়া আবশ্যক।

মুটে মজুব দারোয়ান পেয়াদা চাপরাসি মাঠের চাষী—কাহারও যাহাতে অমর্যাদা হয় বা অমর্যাদা সূচিত হয়, একরূপ সম্বোধন ও ব্যবহার অবিলম্বে সম্পূর্ণ রহিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক।

সকল মানুষেরই মর্যাদা যাহাতে রক্ষিত হয়, বঙ্গীয় সমাজে সর্বত্র এইরূপ কথাবার্তা ও ব্যবহারই শিষ্ট বলিয়া চলিত ও স্বীকৃত হইলে, অল্প অনেক সুবিধা ত হইবেই, প্রকৃত গণতান্ত্রিকতা ও স্বাভাবিকতা ত বাড়িবেই, অধিকন্তু এই লাভও হইবে, যে, বঙ্গের শিক্ষিত যুবকেরা অল্প বেতনের নানা রকম চাকরিও গ্রহণ করিতে এবং অল্প মজুরীর দৈহিক শ্রমের কাজও করিতে এখনকার চেয়ে কম হুষ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইবেন।

ব্যবসা ও বাণিজ্য এবং ভূমি ও আপনি

এইরূপ গল্প চলিত আছে, যে, এক ‘ভক্তলোক’ তাঁহা অপেক্ষা বহুগুণে ধনী এক জ্ঞানবানকে প্রশ্ন কবিত্তা—ছিলেন, “ওহে ষ্টারিক, শুনিছি তোমার একটি ছেলে নাকি বি-এ পাস কবেছে ও তুমি তার জন্তে একটা কেবানীগিবি-টির চাচ্ছ? তুমি ত ওরকম মাইনের অনেক লোককে কর্মচাবী বাখতে পার, তোমার এ খেয়াল কেন?” জ্ঞানবান কবজোড়ে নিবেদন করিলেন, “আম্মে মশাই, আমাকে ত কেউ আপনি বলে না, ছেলেটাকে যদি বলে সেই চেষ্টা কচ্ছি।”

বস্তুতঃ নানা প্রকারের ছোট বড় ব্যবসা যাহারা করেন, তাঁহাদিগকে কেন যে সম্মান করা হইবে না, তাহার কোন সম্ভব কারণ নাই। তাঁহাদের মর্যাদাবৃদ্ধি বেকার-সমস্যা সমাধানের অন্ততম পন্থা উপায়।

বিলাতে টাকাওয়াল শুড়ীরা পর্যন্ত লর্ড হইয়া অভিজাতশ্রেণীভূত হয়। আমাদের দেশে আমরা তা চাই না। এ রকম উন্নয়নের আশা পক্ষপাতী নহি।

বরণ অবনমন আবশ্যক। এক জন ভ্রমলোক, বংশে তিনি শুঁড়ী, কিন্তু ডাক্তারী পাস করিয়া একটা জাহাজ কোম্পানীর লাইনে জাহাজে চিকিৎসকের কাজ করেন, একবার আমাদের আগিকে এই মর্মে চিঠি লিখিয়াছিলেন, “মশায় আমাদের জা’তকে, শুঁড়ী জা’তকে, আপনারা অস্পৃশ্য অপাংস্ত্র্য করে রেখেছেন, সেই সব শুঁড়ী-জাতীয় লোককেও জলচল করেন নাই যারা মদ বিক্রী করে না, কিন্তু মুখোজ্যে চাটুজ্যে লাহা গৌসাই সেন প্রভৃতি যারা মদ বিক্রী করে বা ক’রত, তারা সমাজে বেণ উঠে স্থানেই থাকে। যদি আপনারা মদবিক্রীতা শুঁড়ীদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে পারতেন এবং তাদেরকে সমাজে একটু স্থান দিয়ে বলতেন, ‘জোমরা মদ বিক্রী ছাড়,’ আমরা দল বেঁধে ‘প্রোহিবিশন’ (নেশার জন্তে মদ বিক্রী বন্ধ করা) চালিয়ে দিতে পারতুম।” তা তাঁহারা পারিতেন কিংবা পারিতেন না, তাহা এখন আলোচ্য নহে, কিন্তু সেখক মহাশয়েব কথাগুলির অন্তর্নিহিত সত্য প্রাণধানযোগ্য।

সার্বজনিক শিক্ষা ও বেকার-সমস্যা

কেহ কেহ হয়ত মনে করেন, দেশে শিক্ষার বিস্তারই বেকার-সমস্যার আবির্ভাবের একটা প্রধান কারণ। সেই জন্য শিক্ষাবিস্তারকে বেকার-সমস্যা সমাধানের একটা উপায় বলিলে তাঁহারা হাসিতে পাবেন। কিন্তু যে-সকল সভ্য দেশে শিক্ষার বিস্তার আমাদের দেশের চেয়ে বেশী হইয়াছে, যেখানে আমাদের দেশের চেয়ে অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা বেশী জন গ্র্যাডুয়েট, যেখানে নিত্যশিক্ষিত ছাড়া নিরক্ষর কেহ নাই, সেখানেও আমাদের দেশের মত এত বেশী লোক কর্মহীন উপার্জনহীন অলস জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয় না। একথা সত্য, যে, আমাদের দেশে বড় লোক পুস্তকগত বিদ্যাসাপেক্ষ কাজ চায়, তাহাদের সকলকে নিযুক্ত রাখিবার মত তত কাজ নাই। কিন্তু তাহারা নিরক্ষর থাকিলেই যে তাহাদের কাজ জুটিয়া যাইত, এমন নয়। অতএব নানা বকম শিক্ষা দেওয়া চাই। কাজে নানা রকম সৃষ্টি করা চাই।

শিক্ষা বন্ধ করিলে চলিবে না। বরণ এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে মানুষ কাজ পাইতে পারে, না-পাইলে কাজের সৃষ্টি করিতে পারে। এই বিষয়ে সমাজকে ও রাষ্ট্রকে মানুষের সহায় হইতে হইবে।

তাঁহারা আমাদের দেশের সাধারণ জুল-বলেজে শিক্ষা পাইয়াছেন অথচ বেকার আছেন, রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের অনেকের কাজের ব্যবস্থা করিতে পারেন। অবিলম্বে সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের জন্ত যদি যথেষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, যদি এরূপ ব্যবস্থা করা যায়, যে, উদ্ভব

ও বিকলাঙ্গ ছাড়া পাঁচ-ছয় বৎসরের অধিকবয়স্ক কোন বালকবালিকা শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিবে না, তাহা হইলে অবিলম্বে এত হাজার বিদ্যালয় খুলিতে হইবে, এবং তাহাব জন্ত এত হাজার শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক হইবে, যে, শিক্ষিত বেকার অনেকেরই কাজ জুটিয়া যাইবে। তাহাতে প্রেসের, পুস্তক-রচনার ও প্রকাশকের কাজের, দপ্তরীর এবং কাগজের ব্যবসারও এত উন্নতি ও প্রসার হইবে, যে, তাহাতেও আরও অনেকের অন্ন হইবে।

বলিতে পাবেন, এত বিদ্যালয় স্থাপনের জন্ত ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের বেতন দিবার জন্ত টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে? উত্তর এই, যে, একটা যুদ্ধ বাধিলে ত সরকার বহু কোটি টাকা খণ করিয়া যুদ্ধ চালাইয়া থাকেন; নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ চালাইবার জন্ত বহু কোটি টাকা আবশ্যক খণ করুন এবং তাহার হ্রদ এবং আসল পরিশোধের কিস্তি দিবার ব্যবস্থা করুন—একটা সিঙ্কিং ফণ্ড করুন। অনেক সভ্য দেশে অনেক অত্যাশঙ্কক বড় কাজ এই প্রকারে নির্বাহিত হয়। আমাদের দেশেও হইতে পারে। কেবল ইচ্ছা, সাহস ও বুদ্ধি থাকিলেই হয়।

“লোকশিক্ষা-সংসদ”

মৌলবী আজিজুল হক শিক্ষামন্ত্রী থাকিবার সময় যে “শিক্ষাসংসদ” হইয়াছিল, তাহার সংস্বে রবীন্দ্রনাথ “শিক্ষার স্বাতন্ত্র্যবর্ণ” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই মুদ্রিত প্রবন্ধেব শেষে ‘পুনশ্চ’ শিরোনাম দিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি ও অন্ত কিছু কথা মুদ্রিত হইয়াছিল।

দেশের যে সকল পুঙ্খ ও জীলোক নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাঁদের জন্ত ছোট বড় প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেরই অসমর্থতা ঘবে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবেন। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যন্ত তাঁদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট করে তাঁদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিধিতভাবে তাঁদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হতে পাবে। এই পরীক্ষার যোগে যে সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে। এই উপলক্ষ্যে পাঠ্য-পুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে।

কবি অন্তর্য লিখিয়াছেন—

একদা আমাদের দেশে কানী প্রভৃতি নগরে বড় বড় শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে দেশের সংস্কৃতিরক্ষা ও শিক্ষার্চনা নানা প্রণালীতে পরিব্যাপ্ত ছিল গ্রামে গ্রামে সর্বত্র। আধুনিক কালের শিক্ষাকে কোনো উপায়ে এদেশে তেমন করে যদি প্রসারিত করে না দেওয়া যায় তবে এ যুগের মানবসমাজে আমরা নিজে

বিদ্যাগত বোগ বন্ধ করতে পারব না; এবং না পারা আমাদের সকল প্রকার অকৃতার্থতা ও অপমানের কারণ হবে এ কথা বলা বাহ্যিক।

এই সমুদয় কথায় ব্যক্ত কবির অভিশ্রুত অমুসারে বিশ্বভারতী “লোকশিক্ষা-সংসদ” গঠন করিয়াছেন। বিশ্ব-ভাবতীর কর্মসচিব শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শাস্তিনিকেতন হইতে লিখিয়াছেন—

দেশের জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে বর্তমান যুগের শিক্ষার ভূমিকা করিয়া দিবার যতটুকু চেষ্টা আমাদের দ্বারা সম্ভব সেই কাজে আমরা বিশ্বভারতী হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পাঠ্যবিষয় ও গ্রন্থের তালিকা আমরা নির্দিষ্ট করিয়া দিব। যথেষ্ট মনোযোগপূর্বক পাঠ্যবিষয়ের অল্পশীলন হইয়াছে কিনা এই প্রশ্নব্যাপী নানা কেন্দ্রে পরীক্ষার দ্বারা তাহার প্রামাণ্য গ্রহণ হইবে। এই সকল কেন্দ্রে স্থাপন ও পরীক্ষার ভার গ্রহণে বাহাবা উৎসাহ বোধ করেন, তাহার আপন অভিমতসহ পত্র লিখিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাইলে উপকৃত হইব।

পরীক্ষা তিন ভাগে বিভক্ত; প্রথম—আদ্য, দ্বিতীয়—মধ্য, তৃতীয়—উপাধি। প্রথমতঃ আদ্য পরীক্ষা গৃহীত হইবে। তাহার বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ভারতশাসনপদ্ধতি ও সাধারণ জ্ঞান, পাটীগণিত, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, গৃহস্থালী। প্রশ্নপত্রের সংখ্যা আট। পাঠ্যপুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের শিক্ষিত বাঙালী মহিলা ও পুরুষেরা উৎসাহী হইয়া বিশ্বভাবতীর এই মহতী প্রচেষ্টাটিকে সাফল্যমণ্ডিত কবিবার চেষ্টা কবিলে দেশের বিশেষ উপকার হইবে।

ওয়ার্ল্ড হুইটম্যান স্মৃতিসভা

গত ৩২শে আষাঢ় কলিকাতার সিটি কলেজ হলে প্রবাসীর সম্পাদকের সভাপতিত্বে আমেরিকার কবি ওয়ার্ল্ড হুইটম্যানের স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে বহু বিদ্বজ্জনের ও ছাত্র-ছাত্রীমণ্ডলীর সমাবেশ হইয়াছিল। এই অমুষ্ঠানের উত্তোগে সমস্ত প্রকাশ করিয়া অনেকে চিঠি লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :—

ও

কল্যাণীয়েষু

শ্রীর ক্লাস হুইট তার উপরে কাকের ভিড়—চিঠি লেখার কর্তব্যে সর্বদাই ত্রুটি হচ্ছে।

তোমাদের হুইটম্যানের কাব্যালোচনার প্রচেষ্টা জরাজীর্ণ হোক, এই ইচ্ছা করি। প্রকাশ একটা খনি, ওর মধ্যে নানান কিছুই নির্বিচারে মিশাল আছে, এ রকম সর্বশালী বিমিশ্রণে প্রচুর শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন—আদিম কালের বস্তুদ্বারা সেটা ছিল—তার

কারণ তখন তার মধ্যে আগুন ছিল প্রচণ্ড—এই আগুনে নানা মূল্যের জিনিষ গলে মিশে যায়। হুইটম্যানের চিত্তে সেই আগুন বা তা কাণ্ড করে বসেছে। জাগতিক সৃষ্টিতে যে রকম নির্বাচন নেই, সংঘটন আছে, এ সেই রকম, জন্মোৎসব সব লগুভণ্ড—মাঝে মাঝে এক-একটা স্বপ্নের রূপ লুটে ওঠে আবাব যায় মিলিয়ে। যেখানে কোন যাচাই নেই, সেখানে আবর্জনাও নেই, সেখানে সকলের সব স্থানই স্বস্থান একদোড়ে সাহিত্যকে লঙ্ঘন করে গিয়েছে এই জন্তে সাহিত্যে এর জুড়ি নেই—যুগেরতা অপরিমেয়—তার মধ্যে সাহিত্য অসাহিত্য দুই সঞ্চরণ কবছে আদিম যুগের মহাকার জন্তদের মতো। এই অরণ্যে ভ্রমণ কবতে হ’লে মরিয়া হওয়ার দরকার। ইতি—৩০ আষাঢ় ১৩৪৪।

রবীন্দ্রনাথের পত্র ও অন্তঃস্থ পত্র পাঠিত হইবার পর,

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় হুইটম্যানের কোন কোন কবিতার অনুবাদ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি সমাদ্দার ও অধ্যাপক মণিমোহন ঘোষ কবির বিখ্যাত কবিতা “Oh Captain, My Captain... ..” আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত গিবীন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীযুক্ত শ্রীশীল ঘোষ কর্তৃক রচিত একটি গীত গান করেন। গানটি বিশেষভাবে এই উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল। অতঃপর অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “ওয়ার্ল্ড হুইটম্যান—বিদ্রোহী ও গণতান্ত্রিক” শীর্ষক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহা “চারণ কবি হুইটম্যান” নামক পুস্তিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।

অতঃপর পণ্ডিত ক্ষিত্তিমোহন সেন মহাশয়ের প্রবন্ধ-পত্রের কিয়দংশ পাঠিত হয়।

ইহার পর সভাপতি কিছু বলেন। তাহার কোন কোন কথার তাৎপর্য নীচে দেওয়া হইল।

কবি হুইটম্যানকে বুঝা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে গেলে তিনি ছিলেন খনি মন্ড; তাঁর মধ্যে সব রকমই আছে মিশিয়ে। সেই জন্ত কেহ হয়ত এক জিনিষ পাবেন, অপর কেহ হয়ত ঠিক তার উল্টো জিনিষ পাবেন। তিনি ছিলেন পায়ো-নীয়ার। পায়োনীয়ারের কাজ হচ্ছে যে-খনি দিয়ে সৈন্তেরা অভিযান করবে তার রাস্তা তৈরি করা। হুইটম্যান সাহিত্যে এই রকম পায়োনীয়ারের কাজ করে গেছেন। তিনি লিখেছেন যে কবিতা তার মধ্যে মূলো, মাটি, এবডো-খেবডো নানা রকম জিনিষ আছে—তার মধ্যে সব সময় লালিত্য পাওয়া যায় না; সেই জন্ত সেই লালিত্যের সন্ধানে যদি কেহ তাঁর কবিতা পড়তে চান, তা পাবেন না।

তিনি ছিলেন ভবিষ্যতের অগ্রদূত; সেই জন্ত তাঁর কবিতার মধ্যে আমরা পাই আগমনীর ধ্বনি। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের কবি। তিনি বলেছেন, সমান স্বাধীন সব মানুষকে পেতে হবে এবং দিতে হবে; তা দেবার জন্ত বা পাবার জন্ত যদি কিছু ভাঙতে হয়, ভাঙতে হবে। তিনি বলেছেন—আমি সে রকম কিছুই চাই না, যার মত আর কিছু অন্য লোকে না পেতে পারে। জায়বিচার, জাতিতে জাতিতে মৈত্রী, এই ভাবটাই তিনি প্রচার করেছেন।

তিনি বড়বড় চাল প্রভৃতিকে পৃথিবীর শান্তি ও অগ্রগতির পরিপন্থী মনে করতেন। রাজনীতির তলায় যে নৈতিক শক্তি রয়েছে, তার উপরই তিনি বিশেষ জোর দিতেন। তিনি মনে করতেন, যে, সমস্ত গবর্নমেন্টের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতাব্যবস্থা ও আত্মসম্মানের গর্ব বাতে বিকশিত হয় তার পথ করে দেওয়া। তিনি নারীকে পুরুষের সমান বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন,—It is as great to be a woman, as to be a man. তিনি আরও বলেছেন যে,—Nothing is greater than to be the mother of men. তিনি মনে করতেন যে,—The best of every man is his mother. তিনি বলতেন,—বড় শহর তাকেই বলে, যেখানে বড় পুরুষ ও বড় মহিলা থাকেন এবং তাঁরা যদি প্রেমের মধ্যে থাকেন, তবে সেই হবে মহানগরী। মনের স্বাধীনতাকে তিনি খুব বড় বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন,—Without emancipation of mind political freedom is more than useless.

ছইটিম্যান চলেছিলেন একটা আদর্শ লক্ষ্য করে। আমাদেরও উচিত হবে আদর্শ লক্ষ্য ক'বে নিরলস গতিতে চলা—এই রকম যদি একটা কিছু আমরা করতে পারি, তবেই ছইটিম্যান স্মৃতিসভা ক'বা সার্থক হবে।

অভিযোগী শ্রমিক ও বিত্তহীন

‘মধ্যবিত্ত’ বেকার

ভারতবর্ষের বড়লাটেরও কিছু অভাব-অভিযোগ নিশ্চয়ই আছে। বাংলার লার্ড, সিভিলিয়ান কমিশনারগণ, প্রধান মন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীরা—ইহাদের সকলেরই অভাব-অভিযোগ আছে। এই সব অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের নিমিত্ত আন্দোলন হইতে পারে। কিন্তু করে কে?

আর্থিক হিসাবে ইহাদের চেয়ে নিম্নস্তরের দুই শ্রেণীর অভাব-অভিযোগগ্রস্ত লোক আছেন যাহাদের সম্বন্ধে, বেশী বা অল্প, আন্দোলন ও খবরের কাগজে লেখালেখি হইয়া থাকে। কারখানার শ্রমিকদের জন্য আন্দোলন খুব হইয়া থাকে ও হইতেছে। ‘মধ্যবিত্ত’ বেকারদের জন্য আন্দোলন প্রায় হয় না বলিলেই চলে। শ্রমিকদের অবস্থা নিশ্চয়ই আরও উন্নত হইতে পারে ও হওয়া উচিত। কিন্তু তাহাদের ও ‘মধ্যবিত্ত’ বেকারদের মধ্যে প্রভেদটা মনে রাখা উচিত। এই শ্রমিকরা বেকার নহে, তাহাদের কিছু উপার্জন আছে, তাহাতে তাহাদের প্রাণাচ্ছাদন চলে, এবং উন্নত কিছু তাহারা বাড়ীতে পাঠায়—তা যত কম বা বেশীই হউক। শ্রমিকরা প্রায়ই নিরক্ষর। শিক্ষার জন্য তাহাদের পিতামাতা এক পয়সাও ব্যয় করেন নাই, তাহারা শিক্ষার জন্য কোন পরিশ্রম করেন নাই। ‘মধ্যবিত্ত’ বেকাররা নামে মধ্যবিত্ত, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাহারা বিত্তহীন। তাহারা

শিক্ষালাভের জন্য অনেক টাকা খরচ ও অনেক বৎসর পরিশ্রম করিয়াছে। তাহাদের কোন উপার্জনই নাই, সুতরাং উন্নতও নাই। তাহারা কেহ কেহ আত্মহত্যা করে। কোন শ্রমিককে রোজগারের অভাবে আত্মহত্যা কবিত্তে হয় না।

অথচ শ্রমিকনেতারা শ্রমিকদের মধ্যে অভিজ্ঞত, কিন্তু মধ্যবিত্ত বেকারদের সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট ও নির্বাক। ইহার কারণ কি? বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেরই দুঃখ-ভগতি দূরীকরণের চেষ্টা অবশ্যই হওয়া উচিত, কিন্তু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বেকারবা বাদ পড়ে কেন?

কাশীপ্রসাদ জায়সবাল

স্বপ্নিত ডক্টর কাশীপ্রসাদ জায়সবালের মৃত্যুতে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধীয় গবেষণার ক্ষেত্রে এক জন বিদ্বান বুদ্ধিমান স্থনিপুণ কর্মীবিরোধিতা হইল। তাঁহার বয়স মাত্র ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ব্যারিষ্টারী করিতেন। তাহাতে তাঁহার পসাবও খুব ছিল। হিন্দু আইন ও ইনকম-ট্যাক্স আইনে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয় কাজ ছিল ঐতিহাসিক গবেষণা। তাঁহার গবেষণা ও স্মরণশক্তি ফলে প্রাচীন ভারতেতিহাসের অনেক তমসচ্ছন্ন যুগে আলোক পড়িয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তাঁহার “হিন্দু পলিটি” নামক গ্রন্থ অপূর্ব। তাহা পড়িলে বুঝা যায়, প্রাচীন ভারতে সব রকম শাসনপ্রণালীর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ইহার অনেক কথা তিনি প্রথমে মর্ডার রিভিউ কাগজে প্রকাশ করেন। বিহাব এণ্ড উড়িয়া রিসার্চ সোসাইটিজ্, জার্ণালের তিনি সম্পাদক ও প্রাণ ছিলেন। তিনিই উজ্জ্বল হইয়া ভিক্টু রাহুল সাংস্কৃত্যায়নকে তিরস্কাতে পাঠান। তিনি নবীন গবেষকদিগকে ডাকিয়া তাহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় কবিতেন এবং তাহাদের গবেষণায় মূল্যবান কিছু দেখিলে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

কৃষ্ণনগরে বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

ইহা সম্মেলনের বিষয় যে এ বৎসর কৃষ্ণনগরে যে বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে, ইতিমধ্যেই তাহার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। নদীয়া জেলার লোকদিগকে এ বিষয়ে একটি কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া অসম্ভব হইবে না। এই কাজটি শুধু কৃষ্ণনগর শহরের লোকদেরই কাজ নয়। নদীয়া জেলায় যে-কেহ থাকেন, নদীয়া জেলায় যে-কেহ অত্র থাকেন, ইহা তাহাদের সকলেরই কাজ। যিনি যে ভাবে পারেন, কাজটি সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করুন।

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার

কলিকাতার দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার একটি জনহিতসাধক প্রতিষ্ঠান। ইহা পনের বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ বসু ইহার পৃষ্ঠপোষক মুকুন্দি এবং শ্রীযুক্ত সর্ব হরিশঙ্কর পাল ইহার কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি। এই সমিতি জাতিধর্ম-নির্কিশেষে অভাবগ্রস্ত, দুর্গত, বিপন্ন ও পীড়িত লোকদের নানাবিধ সাহায্য করেন, এবং কলিকাতার বস্ত্রীগুলিব উন্নতির চেষ্টা করিয়া থাকেন। চাল সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি পবিবারকে সমিতি প্রতি সপ্তাহে চাউল দেন। পূজার সময়ে ও আবশ্যিক-মত অন্ত্র সময়েও বস্ত্রদান ইহার আব একটি কাজ। ইহার চিকিৎসা ও ঔষধবিতরণ বিভাগ হইতে গত ১৯৩৬ সাল ৬৯৭৫০ জন রোগী এলোপ্যাথী মতে এবং ৬৮৭৯৫ জন রোগী হোমিওপ্যাথী মতে ব্যবস্থা ও ঔষধ পাইয়াছিল। কেন কোন রোগীকে সমিতি দ্রুতপথ্য দিয়াছেন। স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশমনী ইহার আর একটি কাজ। ইহার সাহিত্য-বিভাগের লাইব্রেরি ও পাঠাগার অনেকের অধ্যয়নস্পৃহা তৃপ্ত করে। সমিতি 'মাতৃমঙ্গল', 'শিশুমঙ্গল', 'বসন্তরোগ ও তাহার প্রতিকার', এবং 'আমাদের খাদ্য'—এই পুস্তিকাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। সমিতির কার্য প্রশংসনীয়। সর্বসাধারণ ও কলিকাতা মিউনিসিপালিটি ইহাকে আরও সাহায্য করিলে ইহার হিতকর কার্য আরও ব্যাপক ও সুসঙ্গত হইবে। এইরূপ সমিতি কলিকাতার সব পাড়ায় ও মফস্বলে থাকা উচিত। ইহার ঠিকানা—১২-৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট।

ধীবরদের উপর অত্যাচার

গত মাসে একটা সংবাদ বটিয়াছিল, যে, চাঁদপুরের ধীবররা ধর্মঘট করিয়াছে এবং তাহার কলে কলিকাতায় মাছ রপ্তানী কম হওয়ায় মাছের আমদানী কম হইয়াছে। প্রকৃত কথা তাহা নহে। ইজারাদারদের অত্যাচারে মৎস্যজীবীরা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করে, ধর্মঘট করে নাই। ইহার নিবপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া উচিত। ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ে প্রশ্নও হওয়া উচিত।

মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতি কেন রেজিস্ট্রারী হইবে না ?

আইনে আছে, যে, মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতি থাকিলে মাছ ধরবার ইজারা সেইরূপ সমিতিতেই দিতে হইবে, সেসকল সমিতি না থাকিলে তবে অন্য লোককে দিতে হইবে। চাঁদপুরে মৎস্যজীবীদের একটি সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু কো-অপারেটিভ বিভাগের রেজিস্ট্রার

তাহাকে রেজিস্ট্রারী করিতেছেন না, সুতরাং সেই সমিতি ইজারা পাইবার চেষ্টাও করিতে পারিতেছে না। রেজিস্ট্রার কেন এরূপ করিতেছেন, তাহার কারণ অসম্ভব হওয়া উচিত, এবং এ বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন হওয়া উচিত।

বঙ্গীয় মৎস্যজীবী বিদ্যালয়

চাঁদপুরের অন্তর্গত মেহেরনে যে মৎস্যজীবী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে মৎস্যজীবীর হেলেরা কেবল প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা পাইবে, এমন নহে,

এই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকেই বিভিন্ন স্তরে বঙ্গীয় সংরক্ষণ পরিবর্তন ও বিভিন্ন প্রকারের মৎস্যশিল্প এবং আধুনিকতম অর্থনীতি-শাস্ত্রের ভিত্তিতে মৎস্য-ব্যবসা-সংক্রান্ত আবশ্যিক বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে বাধ্য করা হইবে। এবং প্রত্যেকের শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষাদান করাই এই বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য।

ইহার সর্বসাধারণ উন্নতি ও সাফল্য বাঞ্ছনীয়

বিহ্টায় রেলওয়ে দুর্ঘটনা

পাটনার নিকটবর্তী ঈষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের বিহ্টা স্টেশনের কাছে গত মাসে যে ভীষণ রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, এরূপ দুর্ঘটনা ভাবতবর্ষে আর কখনও হয় নাই। রেলওয়ে-কর্তৃপক্ষের হিসাব-মতই শতাধিক ব্রীপুঙ্খ ও শিশুর মৃত্যু হইয়াছে, এবং দুই শতের অধিক ব্যক্তি আহত হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদের পবিবারবর্গকে এবং আহত ভবিষ্যৎ ব্যক্তি-গণকে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। ঈষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে সবকারী বেলওয়ে। কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার যে তদন্ত করিতেছেন, তাহাতে সর্বসাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। এই জন্য সর্ব আবদুল হালিম গজনবী ও সর্ব স্কাউটিন আহমদ ইহাব তদন্তের জন্য সবকারী ও বেসবকারী সদস্য লইয়া একটি তদন্ত-কমিটি গঠন করিবার জন্য বেঙ্গল-গে বোর্ডকে অনুরোধ করিয়াছেন। এরূপ কমিটি গঠিত হওয়া নিশ্চয় উচিত।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক-সম্মেলন

গত মাসে কলিকাতায় আচার্য ব্রহ্মচন্দ্রের মহাশয়ের সভাপতিত্বে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বহুনা দেখে যথেষ্টসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। যন্ত্রণা বিদ্যালয় আছে, তাহাদের অবস্থা ভাল নয়। বিদ্যালয়গৃহ বিদ্যালয়েব আসবাব, শিক্ষাদানপ্রণালী, শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ, পাঠ্য-পুস্তকাবলী—এই সমস্তই অসন্তোষজনক। লাইব্রেরি কোন বিদ্যালয়েব আছে কিনা সন্দেহ। প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদিগের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। শহরের গৃহ-ভূতাদের আয়ও তাহাদের আয়ের চেয়ে অধিক। বাংলা

দেশের লোকসংখ্যা অল্প প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বেশী ; কিন্তু বাংলা-গবর্নেন্ট বড় প্রদেশগুলির চেয়ে শিক্ষার জন্ত ব্যয় করেন কম। ১৯৩৪-৩৫ সালে মাদ্রাজ, বোম্বাই, বৃহত্ত্রদেশ, পঞ্জাব ও বঙ্গের গবর্নেন্ট শিক্ষার জন্ত যথাক্রমে ২৫৫৩৭৮০, ১৭৬৪৩৫৪৭, ২০১৭৬১৩০, ১৫৯৯২৮৮৫, এবং ১৩৬১৯৪৪৫ টাকা খরচ করেন। বঙ্গের লোকসংখ্যা পঞ্জাবের ও বোম্বাইয়ের দুই গুণেরও অধিক। শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ সংঘবদ্ধ হইয়া প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পরিত্যাগ করিয়া ক্রমাগত চেষ্টা করিতে থাকিলে কিছু ফল ফলিতে পারে। বালবদের শিক্ষার অবস্থার চেয়ে বালিকাদের শিক্ষার অবস্থা আরও শোচনীয়। শ্রীমুক্তা মীরা দত্তগুপ্ত, বেগম হাসিনা মোর্শেদ, বেগম মোমিন, এ-বিষয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। —

বঙ্গীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ

প্রধানতঃ বিনাবিচারে দণ্ডিত ব্যক্তিদের এবং কিয়ৎ পরিমাণে বিচারান্তে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদীদের দুর্দশা সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, যে, আশুমানের বন্দীরা সবাই নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপবাধে দণ্ডিত হইয়াছে, বঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিবের এই উক্তি সর্বাংশে সত্য নহে। —

পল্লী-উন্নয়নের জন্ত ভারত-গবর্নেন্টের দান

পল্লী-উন্নয়নের জন্ত গত বৎসর ভারত-গবর্নেন্ট বাংলাকে ১৭ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন, এ বৎসর আঠার লক্ষ টাকা দিয়াছেন। এক-একটা গ্রামে অল্প অল্প টাকা নানা কাজে খরচ করিলে কোন ফল পাওয়া যায় না। সুতরাং গত বৎসরে ১৭ লাখ টাকা কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, তাহা কেহ লক্ষ্য করিতে পারে নাই। এ-বৎসরের টাকাও এক্ষেপে ছড়াইলে কোন ফল হইবে না। দুই-একটা জেলায় দুই-একটা কাজে টাকা ব্যয় করিলে কিছু ফল হয়। এই ভাবে প্রতি বৎসর কাজ করিলে কালক্রমে সমগ্র বাংলা দেশ কিঞ্চিৎ উপকৃত হইতে পারে। —

আসাম হইতে শ্রীহট্ট বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা

বাংলাভাষী এবং প্রাকৃতিক বঙ্গের অংশ শ্রীহট্টকে আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্ত অসমীয়ারা ব্যগ্র। তাহার প্রকৃত কারণ, শ্রীহট্টবাসীরা অধিকতর শিক্ষিত ও উদ্যোগী। তাহারা বাংলা বলে বলিয়াই যদি তাহাদিগকে তাড়াইতে হয়, তাহা হইলে কাছাড়, গোয়ালপাড়ার অনেক অংশ এবং ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকার যে-যে অংশে বাঙালী বেশী সেই সকল অংশ আসাম প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাংলা দেশে জুড়িয়া দেওয়া উচিত। তদ্বিত্ত মানভূম জেলা, সিংভূম জেলার অনেক অংশ, সাঁওতাল পরগণা জেলার অনেক অংশ প্রভৃতি বিহার প্রদেশ হইতে বাংলার মধ্যে আনা উচিত। —

নৌকায় চক্ষুচিকিৎসালয়

একটি নৌকাকে চক্ষুচিকিৎসার ঔষধ ও সরঞ্জামে পূর্ণ করিয়া ডাক্তারসহ পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় গবর্নেন্ট পাঠাইতেছেন। ইহাতে লোকের উপকাব হইতেছে। যে-সব জেলায় জলপথে যাতায়াতের সুবিধা নাই, তথায় বড় মোটর-বাস গাড়ী এইরূপ সজ্জিত করিয়া ডাক্তারসহ ঘুরাইয়া বেড়াইলে উপকাব হইবে। —

বঙ্গের বাহিরে ‘বন্দেমাতরম্’ ; বঙ্গে

‘গন্ধে কাতরম্’ ?

“বন্দেমাতরম্” গানের উৎপত্তি বঙ্গে। বঙ্গে এই গান গাওয়া বা এই শব্দ দুটি উচ্চারণ করিয়া পূর্বে অনেকে প্রস্তুত ও কারারুদ্ধ হইয়াছেন। এখন বঙ্গে বাহিরে ছয়টি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার কার্যারম্ভ হইয়াছে “বন্দেমাতরম্” গান করিয়া। বঙ্গে তাহা হয় নাই। বৎ তাহার বিপবীত দমননীতিব পুনরুত্থান হওয়ায় লোকে তাহার ‘(উগ্র) গন্ধে কাতরম্’। —

বোম্বাইয়ে কংগ্রেসীদের গৃহবিবাদ

বাংলার কংগ্রেসীরা গৃহবিবাদের জন্ত এখনও কুখ্যাত হইয়া রহিয়াছে—যদিও কংগ্রেসী দলদলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে মিঃ নারিমানকে প্রধান মন্ত্রী বা কোন মন্ত্রীই না-করিয়া মিঃ থেরকে প্রধান মন্ত্রী করায় তথায় খুব দলদলি ও ‘হাটে হাড়ি ভাঙা’ চলিতেছে। —

আবগারীর আয় হইতে শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ।

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, প্রাদেশিক গবর্নেন্টগুলি আবগারীর আয় হইতে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করেন অর্থাৎ কতকগুলি লোককে মাতাল করিয়া প্রদেশের কতক বালকবালিকাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। চমৎকার ব্যবস্থা। তাঁহার মতে এবং সকল দেশহিতকারীর মতে সুরাপান ও নেশার জন্ত সুরাবিক্রম বন্ধ করা উচিত। তাহা হইলে শিক্ষার কি হইবে ? তিনি বলেন, শিক্ষালয়গুলিকে স্বব্যয়নির্বাহকম করিতে হইবে। ধনী ছাড়া অন্ত সকলকেও শিক্ষা দেওয়া উচিত, সুতরাং শিক্ষালয়গুলিকে স্বব্যয়নির্বাহকম করা সম্ভবপর নহে। প্রাদেশিক রাজস্ব অন্ত উপায়ে বাড়াইয়া শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে। আমরা আগে কয়েকটি প্রদেশের গবর্নেন্টের শিক্ষার ব্যয় দেখাইয়াছি। বড় প্রদেশগুলির আবগারীর আয় ১৯৩৩-৩৪ সালে কত হইয়াছিল, তাহা নীচে লিখিত হইল।

প্রদেশ।	লোকসংখ্যা।	আবগারীর আয়
মাদ্রাজ	৪৬৭৪০১০৭	৪,২৮,৮২,৮৬১ টাকা
বোম্বাই	২১৯৩০৬০১	৩,৬৪,৩৭,৩৩৯ "
বাংলা	৫০১১৪০০২	১,৩৪,০৬,০২২ "
বৃহত্ত্রদেশ	৪৮৪০৮৭৬৩	১,৩০,৯২,৪২৬ "
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৯৫৫৫৫৫	১,৩৫,৫৫,৫৫৫ "

দেশ-বিদেশের কথা

স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

বাংলার যে সকল কৃতী সন্তান বঙ্গের বাহিরে স্বীয় শিক্ষা, সাধনা ও চরিত্রের বলে সকলের নিকট বিশেষ সম্মান লাভ করিয়া বাঙালীর গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম-এ, এলএল-বি, ডি-এসসি, ডি-লিট, এক-আর-এস-এ, আই-এস-ও অন্ততম ছিলেন। কয়েক মাস পূর্বে ৭৩ বৎসর বয়সে ইনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে কালীধামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা বাগবাজারের এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। এই বংশের কালীপ্রসাদ চক্রবর্তীর নামে, বাগবাজারে একটি রাস্তা রহিয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতামহ রাধানাথ চক্রবর্তী ইংরেজী ও ফারসী উভয় ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি দৃষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণ-বিভাগের দেওয়ানের উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাধানাথ সপরিবারে কালীতে আসিয়া

বসবাস করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতা কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী কালীর কুইন্স কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া, যুক্তপ্রদেশে মুসক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

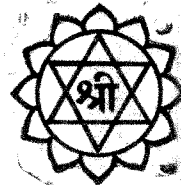
জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাল্যে কালীর মহারাজা জয়নারায়ণ হাইস্কুলে ও কুইন্স কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৭৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া তিনি এলাহাবাদের নবপ্রতিষ্ঠিত সরকারী ম্যার সেটাল কলেজে প্রবেশ করেন। এই কলেজ হইতে তিনি বিশেষ প্রশংসার সহিত এক-এ, বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এম-এ তে কাষ্ট্রাস অনার্স পাইয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম হইয়াছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ২০ বৎসর ছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানে এম-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক লাভ করিয়াছিলেন। পরে জ্ঞানেন্দ্রনাথ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষা এলএল-বি পাস করেন এবং তাহাতেও সর্বপ্রথম স্থান প্রাপ্ত হন।

কলেজের শিক্ষা শেষ হইলে, ১৮৮৪ অব্দে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বেরলি



পাথিরাও
ভেজাল নাঁচাইয়া
খাদ্য সংগ্রহ করে -
আপানিত
করিনেনই !

শ্রী স্মৃতে
ভেজাল নাই





জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৯০ পর্যন্ত এ কলেজের গণিত ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন।

১৮৯০ সালে জ্ঞানেন্দ্রনাথ উকিলরূপে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যোগদান করেন, এজন্য তাঁহাকে প্রথমুবার পূর্বে জেলাকোর্ট শিকানবিশী করিতে হয় নাই। তিনি এলএল-বি পরীক্ষায় যেরূপ অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিয়াই হাইকোর্ট তাঁহাকে এই বিশেষ সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত দক্ষতা ও অসামান্য আইন-জ্ঞানের বলে তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই পশার জমাইয়া ফেলেন। প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার আইন-জ্ঞানের বিশেষ প্রশংসা করিলেও, এই পেশা তাঁহার মত চরিত্রের-লোকের উপযোগী না হওয়ায়, তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন।

১৮৯৩ সালেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ 'পার্লামেন্ট অফ্‌ রিজলিন্স'এর অধিবেশনে হিন্দুপ্রতিনিধি রূপে আমেরিকায় গমন করেন। এই সময় তাঁহার মিসেস্‌ এ্যানি বেসাণ্টের সহিত সৌহৃদ্য জন্মে— এই সৌহৃদ্য প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল অক্ষুণ্ণ ছিল। আমেরিকায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনেকগুলি প্রধান শহরে তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শিক্ষা-বিভাগের কার্যে তাঁহার প্রকৃতির উপযোগী হওয়ায়, ভারতে ফিরিয়া আসিয়া, জ্ঞানেন্দ্রনাথ যুক্তপ্রদেশের বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকের পদ গ্রহণ করেন।

এই সময়ে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

ল্যা
ড্
কো
ঃ
ক
লি
কা
তা
ঃ

রমনীকে রমনীর করে

কুঞ্চিত ও সুদীর্ঘ কেশদাম—



কেশ সুদৃঢ় ও সুদীর্ঘ করিতে

ক্যান্টর অয়েলের কার্যকারিতা সর্ববাদিসম্মত

ল্যাড্‌কোর

সুগন্ধি ক্যান্টর অয়েল

উৎকৃষ্ট তৈল হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে

প্রস্তুত ও মধুর সৌরভ সংযুক্ত

কাণ্ডেও তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল তাহার প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন।

১৯২০ সালে জ্ঞানেন্দ্রনাথ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন এবং তিনি ব্যবস্থাপক সভারও একজন সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ঐ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁহাকে নব-প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের পদ প্রদানের প্রস্তাব করা হয় এবং তিনি তাহা গ্রহণ করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ১৯২৬ সাল পর্যন্ত বরাবরই ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৬ সালে পুনরায় তাঁহাকে সর্বসম্মতিক্রমে ভাইস-চ্যান্সেলর পদ প্রদানের প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু যাহা ভঙ্গের জন্ত তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই।

১৯১২ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে লণ্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যস্থ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন এবং রয়্যাল সোদাইটির শতবার্ষিকী উৎসবেও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইংলণ্ড ও স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ সকল পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

তাঁহার অন্তরঙ্গজীবনের প্রগাঢ়তার বিষয় ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কেবল তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুরাই তাঁহার জীবনের গভীর দিকটার কিছু ইঙ্গিত পাইতেন। শিশুর হ্রাস মরলতা, নিরহঙ্কারতা, সম্পূর্ণ স্বার্থহীনতা, কঠোর আত্মসংযম তাঁহার চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল।

পরলোকে মার্কনি

১৮৭৪ সালে ইটালীর অন্তর্গত বোলোনা শহরে গুলিয়েলমো মার্কনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন ইটালীয় এবং মাতা ছিলেন ইংরেজ মহিলা। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিকোচিত ছিল। তিনি অসামান্য উদ্ভাবনী-প্রতিভাবলে ভবিষ্যৎজীবনে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক জগতে স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ম্যাক্সসোয়েল আলোকের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তরঙ্গের সম্বন্ধ গণিতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। হেনরিক্ হাৎজ্ সর্বপ্রথম হাতে-কলমে ঐক্লপ বৈজ্ঞানিক তরঙ্গের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার পর অলিভার লজ এবং জর্জকীশচন্দ্র বহু প্রভৃতি মনীষিগণ বহু দিক হইতে হাৎজ্-তরঙ্গের গুণাবলী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৯০১ সালে ঐ সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল একত্র করিয়া মার্কনি সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ-তরঙ্গের দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদের আদান-প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন। সর্বপ্রথম মার্কনিই দীর্ঘ এবং অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া সংবাদ-প্রেরণের অনেক সুবিধা করিয়াছেন। ১৯০৬ সালে তিনি আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উদ্ভাবন করেন—যেমন, জাহাজ এবং উড়ো-জাহাজগুলি যখন পরস্পরের খুব নিকটে আসে তখন আসন্ন বিপদের বাতাস বিদ্যুৎ-তরঙ্গের দ্বারা (আলোক কিংবা বর্ণালীর দ্বারা) সংকেত জ্ঞাপন। তাঁহার অগাধ গবেষণাও মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে।

বাংলার
গাওয়া ঘি
ব্যবহার করিয়া,
এই আমদানী
রোধ করুন।

পান্ডার বিহার হইতে মাদ্রাজ মুক্তপ্রদেশ
বাংলায়
ভয়সা ঘি
আসিতেছে লক্ষ লক্ষ মণ।

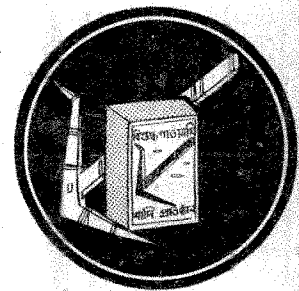


প্রতিষ্ঠানে বাংলার
গাওয়া ঘি
১৮০/০ সের

সুস্বাদু, স্বাস্থ্যপ্রদ
বাংলার ও বাঙ্গালীর
পুষ্টিসাধক

খাদি প্রতিষ্ঠান

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ফোন—বি,বি, ২৫৩২
ভবানীপুর, বালীগঞ্জ, হাওড়া, মাণিকতলা,
লেক রোড, আমবাজার।



প্রসাধনে

ভাইটামিন—এফ!

— ক্যালকেমিকোর —

সমত্ব-পরিশোধিত সুগন্ধ মধুর ক্যাপ্টর অয়েল



মার্কনি

১৯০৫ সালে তিনি ইটালীয় মন্ত্রণাসভার সভ্য নির্বাচিত হন এবং ১৯০৯ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯৩২ সালে তিনি কেলভিন পদক প্রাপ্ত হন। তিনি ইটালীর জাতীয় গবেষণা সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং সাধারণ অর্থে বৈজ্ঞানিক না হইলেও উচ্চস্তরের উদ্ভাবন-কর্তা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পৃথিবী ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

অ. কু. ব.

যুরোপের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের দীর্ঘ কাল গবেষণার ফলে অধুনা নিঃসন্দেহরূপে জানা গেছে যে চুল পাতলা হ'য়ে যাওয়া, চুলের গোড়া আলগা হওয়া, অকালে চুল পাকা ও টাক পড়ার একমাত্র কারণ কেশমূলে ও শরীরে ভাইটামিন-এফ এর অভাব! ক্যালকেমিকো তাই এঁদের সর্বোৎকৃষ্ট ক্যাপ্টর-অয়েল এখন থেকে অমূল্য কেশকল্যাণকর উপাদান ঠিক রেখে এবং তৎসহ ভাইটামিন-এফ সংযোগ ক'রে প্রস্তুত করছেন। 'ক্যাপ্টরল' ব্যবহারে টাকপড়া বন্ধ হয়। চুল ঘন ও চিকণ হয়।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

বালিগঞ্জ : কলিকাতা

বীরসিংহে বিদ্যাসাগর স্মৃতিবার্ষিকী

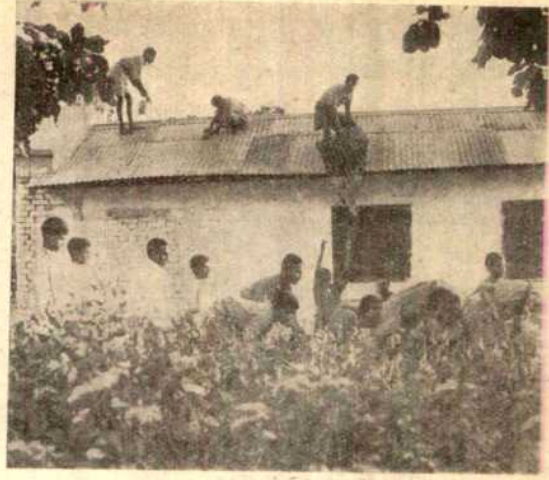
গত ২৯শে জুলাই বুধসপ্তিমবার বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহে তাঁহার ৪১শ মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদ ও জিলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বি. আর. সেনের উদ্বোধনে স্থানীয় ও নিকটবর্তী গ্রামসমূহের প্রায় তিন হাজার লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্ত সমবেত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে প্রায় দেড় হাজার কাঙালীভোজন করান হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস একটি হৃদীর্ঘ অভিভাষণে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের ও বিদ্যাসাগরী ভাবার বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

বীরসিংহে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্ত শ্রীযুক্ত বি. আর. সেনকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়।

পরলোকে সারদাচরণ ঘোষ

সম্প্রতি ময়মনসিংহের খাতনামা বাবহারজীব সদান্ন। সারদাচরণ ঘোষ মহাশয়ের দেহান্ত ঘটিয়াছে। ঘোষ-মহাশয় বিচক্ষণ আইনজ্ঞ, সাধুপ্রকৃতি, নিরহঙ্কার ও দরিদ্র ছাত্রের বন্ধু ছিলেন। ময়মনসিংহে ঘোষ-মহাশয়ের শোকসভায় সর্ব বহুনাথ সরকার মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বঙ্গীয় গবন্মেণ্টের উচ্চতম আইন-পরামর্শদাতাদের নিকট হইতে তিনি অবগত আছেন যে ঘোষ-মহাশয় ময়মনসিংহের সরকারী উকীল হইলেও প্রায় সমস্ত জটিল দেওয়ানী মোকদ্দমাতেই বঙ্গীয় সরকার তাঁহার পরামর্শ লইতেন। সরল জীবনযাত্রা ও উচ্চ চিন্তা তাঁহার জীবনে একত্র হইয়াছিল।

তিনি এক সময় ময়মনসিংহ সাহিত্য-পরিষৎ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ও ময়মনসিংহের (অধুনালুপ্ত) "আরতি" মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন।



তাজহাটের বয়-স্কাউটগণ গৃহসংস্কার
ও জঙ্গল-পরিষ্কারে রত

তাজহাট রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাজহাটের রাণীসাহেবার প্রেরণায় তাজহাটে একটি রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। তাজহাটের স্কাউট-মাস্টার শ্রীভবানীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে তাঁহার বালকদল, তাজহাটের পুরাতন বিজালয়ের দক্ষাবশিষ্ট গৃহ ও জঙ্গলাকীর্ণ প্রাঙ্গণ দ্বহস্তে

পরিষ্কার করিয়া এই মনোরম আশ্রমটি নির্মাণে সাহায্য করে। সম্প্রতি এই সেবাশ্রমের উদ্বোধন-উৎসব রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম. কে. ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিবরণ ও তৎসহ মুদ্রিত চিত্র শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল রায়ের নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি।

দুঃখহীন নিকেতন—

সংসার-সংগ্রামে মানুষ আরামের আশা ছাড়িয়া প্রাণপণ উত্তমে কাঁপাইয়া পড়ে তাহার জীবপুত্র-পরিবারের মুখ চাহিয়া। সে চায় পত্নীর প্রেমে, পুত্রকন্যা ভাইভগিনীর স্নেহে বুকবুকে একখানি শান্তির নীড় রচনা করিতে। এই আশা বৃকে করিয়া কী তা'র আকাঙ্ক্ষার আকুলতা, কী তা'র উদ্যম, কী তা'র দিনের পর দিন আত্মভোলার পরিশ্রম!

কিন্তু হায়, কোথায় আকাঙ্ক্ষা, আর কোথায় তা'র পরিণতি! বার্ষিক্যের চৌকাঠে পা দিয়া পোনের আনা লোকই দেখে জীবনশঙ্কায় দুঃখহীন নিকেতন গড়িয়া তুলিবার স্বপ্নকে সফল করিতে হইলে যেটুকু অর্থ-সঞ্চয় করিয়া রাখা প্রয়োজন ছিল, প্রতিদিনের হাজার কাজের চাপে, ছোটবড় হাজার অভাব মিটাইতে গিয়া, সেই অতিপ্রয়োজনীয় সঞ্চয় তাহার করা হইয়া ওঠে নাই। এমনি করিয়া আশাভঙ্গের মনস্তাপে বহু লোকেরই জীবনসময়াক্ষের গোধূলি-অবসরটুকু শান্তিহীন হইয়া ওঠে।

একদিনেই করিয়া ফেলা যায় এমন কোনো উপায়ই নাই, যাঁহা দরিত্রের এই মনস্তাপ দূর করিয়া দিতে পারে। সংসারের স্বচ্ছলতা ও শান্তি গড়িয়া তুলিতে হয় ধীরে ধীরে—একমাস বা এক বৎসরের চেষ্টায় ভবিষ্যতের যে-সংস্থান হয় না, বিশ বৎসরের চেষ্টায় তাহা অসম্ভব হওয়া অসম্ভব নয়। সঞ্চয়ের দায়িত্বকে আসন্ন দায়ের মত দুঃসহ না করিয়া লঘুভার করিতে এবং কষ্টসঞ্চিত অর্থকে নিরাপদ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্তই জীবনবীমার সৃষ্টি। যাহাদের সাবর্থা বেশী নয়, অথচ সংসারিক দায়িত্ব বেশী, জীবনবীমার অল্পষ্ঠান বিশেষ করিয়া তাহাদেরই জন্য।

সাংসারিক জীবনে প্রত্যেক গৃহস্থেরই যে জীবনবীমা করিয়া রাখা উচিত, একথা সকলেই জানেন। জীবনবীমা করিতে হইলে সকলেরই এমন কোম্পানীতে করা উচিত, ব্যবসাক্ষেত্রে যাহার প্রতিষ্ঠা আছে, ব্যবসার অল্পপাতে যাহার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বেশী। নিরাপত্তার দিক দিয়া দেখিলে, **বেঙ্গল ইনসিওরেন্স এণ্ড লিফটল প্রপার্টি কোং লিমিটেড** মত বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠানই সর্বসাধারণের পক্ষে শ্রেয়।

বেঙ্গল ইনসিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিমিটেড

হেড অফিস—২নং চার্চ লেন, কলিকাতা।



শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু



শ্রীআমোদরজন সেন



শ্রীবিধুরজন সেন

প্রবাসী বাঙালীর কথা

বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত কোলাপুর রাজ্যের রাজারাম কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু কোলাপুর স্টেট হাইতে শিক্ষা-বিষয়ে উচ্চ গবেষণা জন্ম ইউরোপে প্রেরিত হইয়াছেন।

কোলাপুর রাজ্যে তিনিই প্রথম বাঙালী অধ্যাপক, এবং প্রথম বাঙালী কর্মচারী।

লক্ষ্যের কবিরাজ শ্রীমতীশচন্দ্র সেন কবিরজন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীআমোদরজন সেন এবং পৌত্র শ্রীবিধুরজন সেন লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের এম-এসসি পরীক্ষায় যথাক্রমে গণিতশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান এবং পদার্থ-বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সত্যতার গুণে বিহার অঞ্চলে যে সকল প্রবাসী বাঙালী উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন ক্ষীরোদেধর বসু তাঁহাদের অকৃতম। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সদাশয়তা ও পরত্যাগাতরতা প্রভৃতি বিবিধ গুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধাজ্ঞান ছিলেন।

কাশীতে স্বর্গতা বামাজিনী দেবী

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর মাতা শ্রীযুক্তা বামাজিনী দেবী সম্প্রতি ৯৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি গৃহস্থান্ত্রমেই তপস্বিনী ছিলেন বলা যাইতে পারে। বস্ত্রালঙ্কারের অভাব তাঁহার



ক্ষীরোদেধর বসু

না থাকিলেও তিনি ভোগবিলাসে নিম্পূহ ছিলেন। দাম-দাসী পাচক-পাচিকা ধাকা সম্বন্ধে তিনি গৃহকর্মে সর্বক্ষণ মনোযোগিনী ও শ্রমশীল ছিলেন। পর-আপন জ্ঞাতিধর্মনির্কির্ষে তিনি সকলকে ভালবাসিতে জানিতেন। আদর-অভ্যর্থনা স্বত্ব-সেবায় মুক্তপ্রাণ ও মুক্তহস্ত ছিলেন। অবস্থান্ত্রযায়ী দানে অকুণ্ঠ ছিলেন। অতিথিসেবায় হঠাৎ রাত্রি দ্বিপ্রহরেও অভ্যাগতকে স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করাইতে পরিতৃপ্তি ছিল। তিনি সত্যবাদিনী ছিলেন,



হংসোয়াজি মন্দিরে বাঙালী চিত্রকরের শিল্প-প্রদর্শনী
 বামে : জাপানের বিখ্যাত শিল্পী আরাই সান
 দক্ষিণে : শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।



কাশীপ্রসাদ জায়সরাল
 ['বিবিধ প্রসঙ্গ' ভ্রষ্টব্য]

কখনও অনূত বাক্য উচ্চারণ করেন নাই ; মান-অভিমান তাঁহার মনকে মলিন করে নাই। আত্মীয়বন্ধু দাসদাসী সকলকেই তাঁহার অন্তরের স্নেহ দিয়া পরিচর্যা করা স্বভাব ছিল। তিনি সংসারের সকল কার্য অক্ষুণ্ণ চিত্তে সমাধা করিয়া বেলা দ্বিপ্রহরে নিরন্তর হইয়া পূজায় বসিতেন। পূজাশেষে যখন ললাটে 'চন্দনবিন্দু' সিঁধ্য সিদ্ধুর ও কেশে নির্মাল্য ধারণ পূর্বক দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেন তখন যেন স্বর্গের শোভা মর্ত্যে প্রকাশ পাইত।

বাঙালী অধ্যাপকের সম্মান

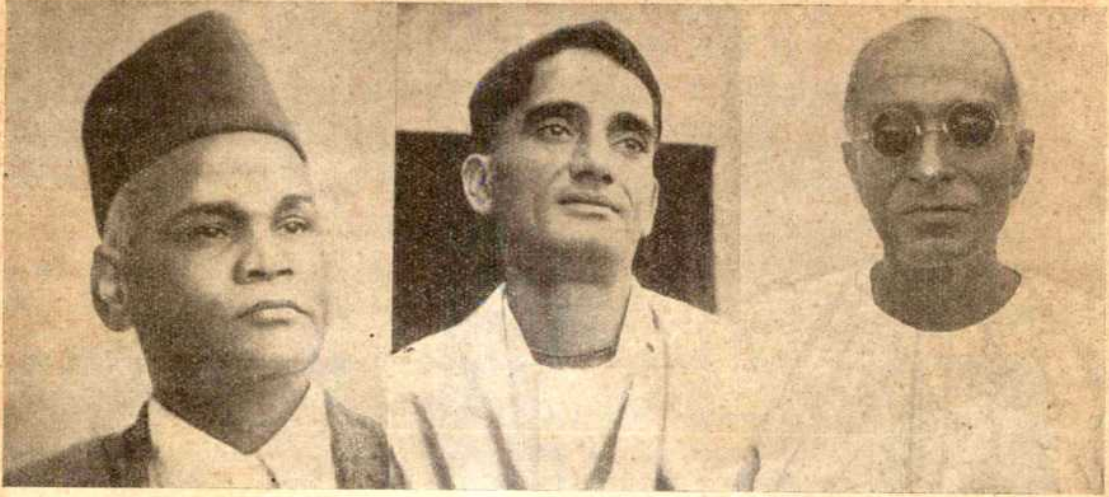
বড়োদা কলেজের ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ মুজ্তাবা আলি পিএইচ. ডি. "ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ধারা" সঙ্কে করেকটি বক্তৃতা দিবার জন্ত বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

চীন ও জাপানে বাঙালী শিল্পী

শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যাপক শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় জাপান ও চীনের শিল্পকলার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের উদ্দেশ্যে কিছুকাল পূর্বে ঐ সমুদয় দেশে গিয়াছিলেন। হংসোয়াজি মন্দিরে তাঁহার চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী হয়। সম্প্রতি তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

কলাভবনের ছাত্র শ্রীকিরণচন্দ্র সিংহও সম্প্রতি চীনদেশে গিয়াছেন।

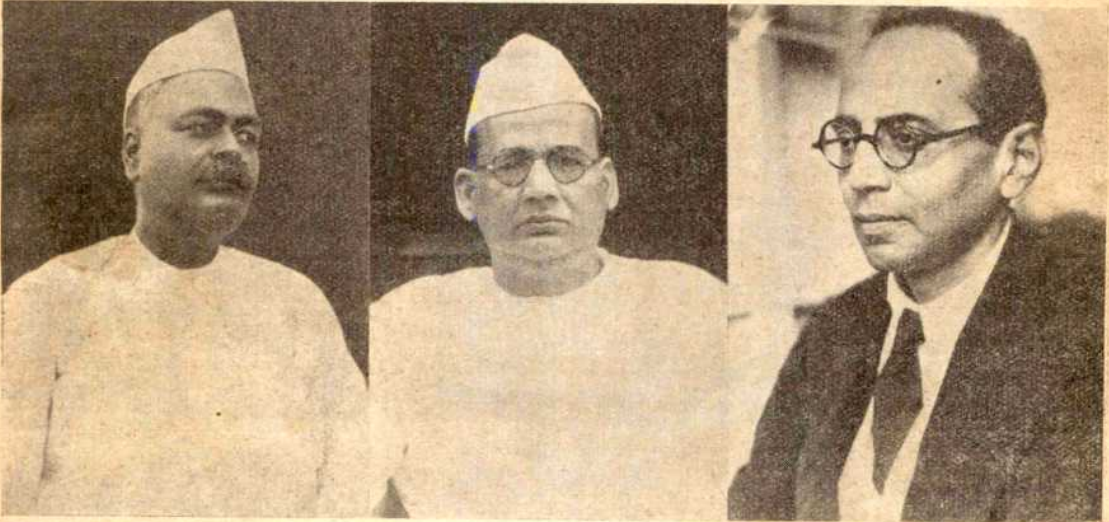
কংগ্রেস-গরিষ্ঠ প্রদেশ সমূহের প্রধান মন্ত্রীগণ



শ্রীযুক্ত এন. বি. খারে
মধ্যপ্রদেশ

শ্রীযুক্ত বিখনাথ দাস
উড়িষ্যা

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী
মাদ্রাজ



শ্রীযুক্ত গোবিন্দবল্লভ পণ্ড
যুক্তপ্রদেশ

শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ
বিহার

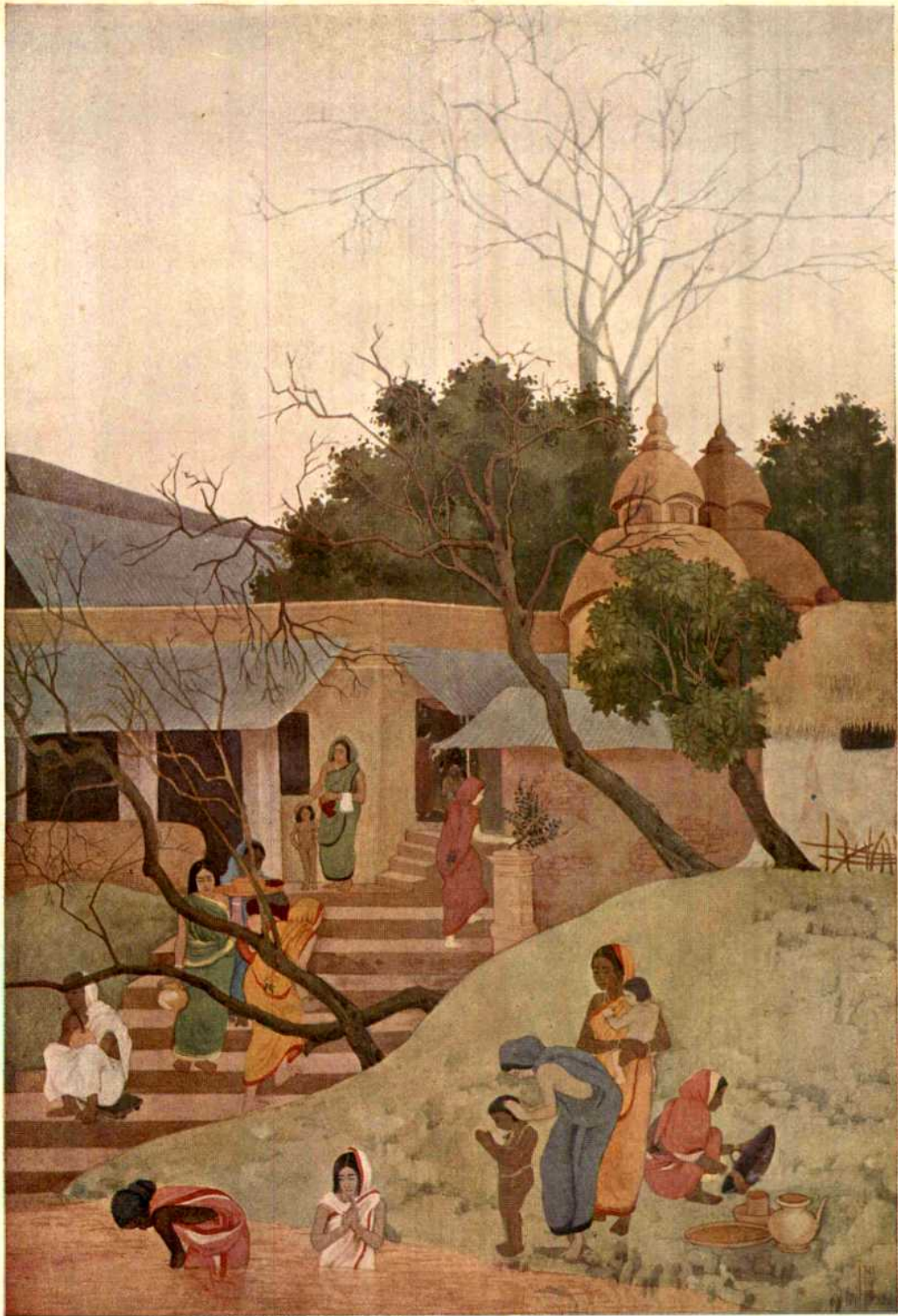
শ্রীযুক্ত বি. জি. গোস্বামী
বোম্বাই

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

যাহারা কলিকাতার বাহিরের ব্যাঙ্কের চেক দ্বারা টাকা বা বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাহারা অল্পগ্রহণপূর্বক ঐরূপ প্রত্যেক চেকের সহিত অতিরিক্ত ১০% আনা ব্যাঙ্কিং-চার্জ স্বরূপ যোগ করিয়া বাধিত করিবেন।

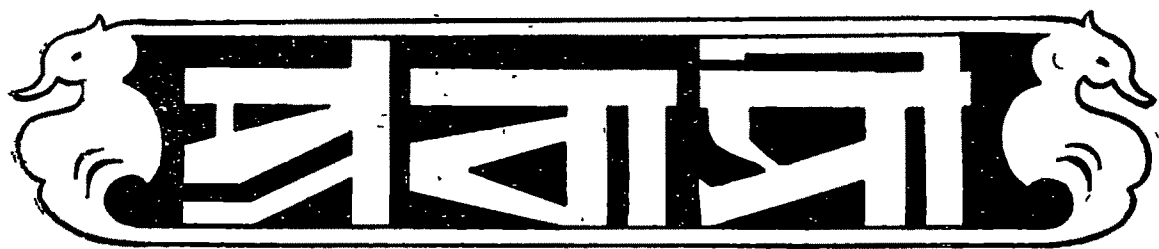
কার্য্যাধ্যক্ষ—প্রবাসী কার্যালয়

১২০২, আগার সাকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমণিকচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



মন্দিরের ঘাট
শ্রীমহাপিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নামস্যাশ্চা বলহীনেন লভ্যঃ”

৩৭শ ভাগ

৩য় খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৪৪

{ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

নতুন কাল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোন সে কালের কণ্ঠ হতে এসেছে এই স্বর—

“এপার গজা ওপার গজা মধ্যখানে চর।”

অনেক বাণীর বদল হোলো, অনেক বাণী চূপ,

নতুন কালের নটরাজা নিল নতুন রূপ।

তখন যে সব ছেলেমেয়ে শুনেছে এই ছড়া,

তারা ছিল আরেক ছাঁদে গড়া।

প্রদীপ তারা ভাসিয়ে দিত পূজা আনত ভীরে,

কী জানি কোন্ চোখে দেখত মকরবাহিনীরে।

তখন ছিল নিত্য অনিশ্চয়,

ইহকালের পরকালের হাজার রকম ভয়।

জাগত রাজার দারুণ খেয়াল, বর্গি নামত দেশে,

ভাগ্যে লাগত ভূমিকম্প হঠাৎ এক নিমেঘে।

ঘরের থেকে খিড়কি-ঘাটে চলতে হোত ডর,

লুকিয়ে কোথায় রাজদম্ভার চর।

অভিনাতে গুণ্ড পালাগান,
 বিনা দোষে নেবীর কোপে সাধুর অসম্মান ।
 সামান্য ছুতায়
 ঘরের বিবাহ গ্রামের শত্রুতায়
 গুপ্ত চালের লড়াই যেত লেগে,
 শক্তিমানের উঠত গুমর জেগে ।
 হারত যে তার ঘুচত পাড়ায় বাস,
 ভিটেয় চলত চাষ ।
 ধর্ম ছাড়া কন্নো নামে-পাড়বে যে দোহাই
 ছিল না সেই ঠাই ।
 ফিস্ফিসিয়ে কথা কওয়া সঙ্কোচে মন ঘেরা,
 গৃহস্থবো, জিব কেটে তার হঠাৎ পিছন ফেরা ;
 আলতা পারে, কাজল চোখে, কপালে তার টিপ,
 ঘরের কোণে জ্বলে মাটির দীপ ।
 মিনতি তার জলেহুলে, দোহাই-পাড়া মন,
 অকল্যাণের শঙ্কা সারাক্ষণ ।
 আয়ুলাভের তরে
 বলির পশুর রক্ত শিশুর লাগায় ললাট 'পরে ।
 রাত্রিদিবস সবধানে তার চলা,
 অশুচিতার ছোঁয়াচ কোথায় যায় না কিছুই বলা ।
 ওদিকেতে মর্মে বাটে দস্যুরা দেয় হানা,
 এদিকে সংসারের পথে অপদেবতা নানা ।
 জানা কিস্তি না-জানা সব অপরাধের বোঝা,
 ভরে ভারি হয় না মাথা সোজা ।

এরি মধ্যে গুণ্ডগুনিয়ে উঠল কাহার স্বর—
 “এপার গজা ওপার গজা, মধ্যখানে চর ।”
 সেদিনো সেই বইতেছিল উদার নদীর ধারা,
 ছায়া-ভাসান দিতেছিল সাঁঝ-সকালের তারা ।
 হাটের ঘাটে জমেছিল নৌকো মহাজনৌ,
 রাত না যেতে উঠেছিল দাঁড় চালানো ধনি ।

শাস্ত্র প্রভাত কালে

সোনার রৌজ পড়েছিল জ্বলেডিঙির পালে ।

সন্ধ্যাবেলায় বন্ধ অ'-সা-বাওয়া,

হাঁসবলাকার পাখার ঘায়ে চমকেছিল হাওয়া ।

ডাঙায় উঠুন পেতে

রাগ্না চড়েছিল মাঝির বনের কিনারেতে ।

শেয়াল ক্ষণে ক্ষণে

উঠতেছিল ডেকে ডেকে ঝাউয়ের বনে বনে ।

কোথায় গেল সেই নবাবের কাল,

কাজির বিচার, সহর কোতোয়াল ।

পুরাকালের শিক্ষা এখন চলে উজান-পথে,

ভয়ে-কাঁপা যাত্রা সে নেই বলদটানা রথে ।

ইতিহাসের গ্রন্থে আরো খুলবে নতুন পাতা,

নতুন রীতির সূত্রে হবে নতুন জীবন গাঁথা ।

যে হোক রাজা যে হোক মন্ত্রী কেউ র'বে না তারা,

বইবে নদীর ধারা,

জ্বলেডিঙি চিরকালের, নৌকো মহাজনী,

উঠবে দাঁড়ের ধ্বনি ।

প্রাচীন অশ্বখ আশা ডাঙায় জলের 'পরে আশা,

সারারাত্রি গুঁড়িতে তার পাল্লী রইবে বাঁধা ।

তখনো সেই বাজবে কানে যখন যুগান্তর

“এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যখানে চর ।”

আলমোড়া

২৫ মে, ১৯৩৭



প্রচলিত দণ্ডনীতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ একটি বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে বন্দীদের হৃদয়ে দরদ জানাবার জন্তে তোমরা সভা আহ্বান করেছ। সম্ভ্রান্তি আমাদের দেশে বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ দিনে দল বেঁধে আন্দোলন করবার একটা রীতি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তাতে কিছুক্ষণের জন্তে নিজেদের নাগিশ উপভোগ করবার একটা নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। সেটার রাষ্ট্রীয় সার্থকতা যদি কিছু থাকে তো থাকুক কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে এই রকম পোলিটিকাল দশা পাণ্ডার উত্তেজনা উত্তেজিত করা আমাদের এখানকার কাজের ও ভাবের সঙ্গে সঙ্গত হয় বলে আমি মনে করি নে।

দেশের বিশেষ অল্পরোখে ও প্রয়োজনে আমার বা বলবার সে আমি আজকের বাইরে যথোচিত জায়গায় বলেছি, আজ আমার এখানে কিছু যদি বলতে হয় তবে আমি বলব প্রচলিত দণ্ডনীতি সম্বন্ধে আমার সাধারণ মন্তব্য।

মনে আছে ছেলেবেলায় পুলিশকে একটা প্রকাশ্য বিতীর্ষিকা বিভাগের অন্তর্গত বলে মনে করতুম। যেমন স্বাভাবিক মানবজীবনের সঙ্গে দৈত্য দানব ভূত প্রেতের সহজ সামঞ্জস্য নেই এ যেন সেই রকম। তাই তখন মনে করতুম চোরও বুঝি মানুষজাতির স্বভাবগতির অত্যন্ত বাইরেরকার বিকৃতি। এমন সময়ে চোরকে স্বচক্ষে দেখলুম; আমাদেরই বাড়ি থেকে অত্যন্ত জন্ত হয়ে দরওয়ানদের লক্ষ্য এড়িয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বিস্মিত হয়ে দেখলুম, সে নিতান্ত সাধারণ মানুষেরই মতো, এমন কি তার চেয়ে দুর্বল।

আমার সেদিনকার চমক আজো ভাঙবার সময় আসে নি। যারা যে কারণেই হোক আইন ভেঙে অপরাধীর শ্রেণীতে গণ্য হয়েছে তাদের সম্বন্ধে এমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে তাদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার কবতে মন বাধা পায় না। ধরে রেখেছি তারা

আমাদের মতো নয়, আর যারা আমাদের মতো নয় তাদের প্রতি আচরণ অত্যাচার হয়ে উঠলে সমস্ত সমাজেরই যেন সমর্থন পাওয়া যায়। সমাজের গূঢ় অন্তরে যে নির্দয় প্রবৃত্তি আছে তাই চবিতার্থ করবার উপলক্ষ্য হয়ে ওঠে এরা।

আমার আর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি, এ ঘটেছিল পরের বয়সে। একদিন কোলকাতার রাস্তায় যেতে যেতে দেখলুম, পুলিশ এক জন আসামীকে—সে অপরাধ করে থাকতেও পারে নাও পারে—কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে সমস্ত রাস্তার জনতার মাঝখান দিয়ে। মানুষকে এমন জন্তর মতো করে বেঁধে নিয়ে যাওয়া এতে আমাদের সকলেরই অপমান। আমার মনে এটা এত যে লেগেছিল তার একটা কারণ এরকম কুদৃশ্য আমি ইংলণ্ড বা যুরোপের আর কোথাও দেখি নি। এর মধ্যে দুটো আঘাত একত্রে ছিল—এক হচ্ছে, মানুষের প্রতি অপমান, আর এক, বিশেষভাবে আমার দেশের লোকের প্রতি অপমান, এক হচ্ছে আইন ভাঙা অপরাধীর প্রতি নির্দয়তা, আর এক, আমাদের স্বদেশীয় অপরাধীর প্রতি অবজ্ঞা। স্তব্ধতা সেই অবজ্ঞার ভাঙ্গি আমরা সকলেই। আমাদের দেশেই বিধিনির্দিষ্ট দণ্ডপ্রয়োগের অতিরিক্ত অপমান প্রয়োগ সমস্ত জাতকে লাহিত করে।

নির্দয় প্রণালী যে কার্যকরী এই ধারণা বর্বর প্রবৃত্তির স্বভাবসঙ্গত। পাঠশালা থেকে আরম্ভ করে পাগলাগারদ পর্যন্ত এর ক্রিয়া দেখা যায়। এর প্রধান কারণ মানুষের মনে যে বর্বর মরে নি নির্দয়তায় সে রস পায়। সভ্য দেশে সেই রসসন্তোগের স্থান সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। তার কারণ কালক্রমে মানুষ খানিকটা সভ্য হয়েছে, সেই খানিকটা সভ্য মানুষ আপনার ভিতরকার বর্বর মানুষকে লজ্জা দেয় এবং সংযত করে। যেখানে সেই সংযমের দাবী নেই সেখানে বর্বর সম্পূর্ণ ছাড়া পায়, নির্দয়তাই বৈধ হয়ে

গঠে। জেলখানায় মহাযাশের আদর্শ বর্বরের দ্বারা প্রতিদিন স্পীড়িত হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

সমাজের ছোট প্রবৃত্তি শোখনের কতব্যতা অনেক বেশি অতিক্রম করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার বর্বর ধর্ম যদি জেলখানা আশ্রয় করে না থাকত তা হোলে ওখান থেকে দণ্ডবিধির দুর্বিসহ উগ্রতা লঙ্ঘিত হয়ে চল যেত। পাপকে সমাজের যে-কোনো জায়গাতেই ছোটো বড়ো যে কোনো আকারেই প্রাশ্রয় দেওয়া যায় তলে তলে সে আপন সীমা বাড়িয়ে চলতে থাকে। তারই কুৎসিত দৃষ্টান্ত দেখতে পাই আধুনিক যুরোপে। সেখানে সভ্যনাম-ধারী বড় বড় দেশে শাস্তিদানের দানবিক দস্তবিকাশ নির্মম স্পর্ধার সঙ্গে সর্বত্র সভ্যতাকে যে রকম বিজ্ঞপ করতে উদ্যত হয়েছে তার মূল রয়েছে সকল দেশেব সব জেল-খানাতেই। অনেক কাল থেকে অনেক খরচ করে সমাজকে মাহুষের রক্ত খাইয়ে পুষে রাখবার জন্তে বড়ো বড়ো পিঞ্জর রাখা হয়েছে। হিংস্রতার ঠগিধর্ম-উপাসক কাসিজমের জন্মভূমিই হচ্ছে সভ্যতার আত্মবিরোধী এই সব জেলখানায়।

এই সব শাসনকেন্দ্র আপন আশেপাশে মহাযাশের কী রকম বিকৃতি ঘটাতে থাকে তার একটা দৃষ্টান্ত অনেক দিন পরে আমি আজো তুলতে পারি নি। চীনযাত্রাকালে আমাদের জাহাজ পৌছল হংকং বন্দরে। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলুম এক জন চীনা ফেরিওয়াল জাহাজের যাত্রীদের কাছে পণ্য বিক্রি করবার চেষ্টা তীরে এসেছিল। তাদের নিষেধ করবার নিয়ম হয়তো ছিল। সেই কতব্য পালনের উপলক্ষে দেখলুম আমাদের স্বদেশীয় শিখ কনস্টেবল তার বেগী ধরে টেনে অনায়াসে তাকে লাথি মারলে। রুচতা করার দ্বারা ঔদ্ধত্যের যে আনন্দ আদিম অসংকৃত বুদ্ধির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে দণ্ডনীতির অসভ্যতাই তাকে অব্যবহৃত করবার সুযোগ দেয়।

মনে মনে কল্পনা করলুম এক জন যুরোপীয়—সে ফেরিওয়াল নয়, হয়তো সে চোর, সে প্রতারক, সে দুর্বৃত্ত, —তাকে ঐ শিখ কনস্টেবল গ্রেফতার করত, কতব্যের অল্পরোধে মাথায় এক ঘা লাঠিও কসাতে পারত কিন্তু তাকে

কানে ধরে লাথি মারতে পারত না। ঐ কনস্টেবল নিষেধ করেছিল ফেরিওয়ালকে, লাথি ফেরেছিল সমস্ত জাতকে। অবজ্ঞাজ্ঞান জাতির মাহুষ কেবল যে অপমান ভোগ করে জানে, সহজেই তার সম্বন্ধে দণ্ডের কঠোরতা প্রবল হয়ে ওঠে। হয় যে তার কারণ মাহুষের গৃঢ় দুশ্রবৃত্তি এই সকল ক্ষেত্রে বর্বরতার রসসন্তোষের সুযোগ পায়।

বেগী ধরে টেনে লাথি মারতে বরা অকুণ্ঠিত সেই প্রেণীয় রাজাহুচব এদেশে নিঃসন্দেহ অনেক আছে। যে কারণে চীনে তাদের দেখেছি সেই কারণ এখানেও প্রবল। সেই অবজ্ঞা এবং তার আত্মমলিক নিঃসন্তা স্থায়ীভাবে এদেশের আবহাওয়াকে ব্যাধিগ্রস্ত করেছে একথা আমরা অস্বস্তব করি।

এই প্রসঙ্গে আর এক দিনের কথা আমি বলব। তখন শিলাইদহে ছিলাম। সেখানকার জেলেদের আমি ভালোবাসি করেই জানতুম। তাদের জীবিকা জলের উপর। ডাঙার অধিকার যেমন শাকা, জলের অধিকার তেমন নয়। জলের মালেকরা তাদের উপর যেমন তেমন অত্যাচার করতে পারত;—এই হিসাবে চাষীদের চেয়েও জেলেরা অসহায়।* একবার জেলের কর্তার কর্মচারী এসে অনধিকারে কোনো নৌকা থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ তুলে নিল নিজের ডিঙিতে। এরকম ঘটনা সর্বদাই ঘটত। অজ্ঞায় সহ করে যাওয়াই যাব পক্ষে বাঁচবার সহজ উপায় এইবার সে সহিতে পারল না, দিলে সেই কর্মচারীর কান কেটে। তার পর রাজি তখন দু'পহর হবে, জেলেদের কাছ থেকে আমার বোট লোক এল, বললে, সমস্ত জেলেপাড়ায় পুলিশ লেগেছে। বললে, কঠোর আচরণ থেকে আমাদের ময়েদেব ছেলেদের রক্ষা করুন। তখনি একটি ভক্তব্রোককে পাঠিয়ে দিলাম। সরকারী কাজে বাধা দেবার ভয়ে নয় কেবল উপস্থিত থাকবার জন্তে। তাব অস্ত্র শক্তি নেই, কিন্তু ভক্তব্যবহারের আদর্শ আছে। উপস্থিতি দ্বারা সেই আদর্শকে প্রকাশ করেই অজ্ঞায়ের সে প্রতিবাদ করতে পারবে।

আমাদের দেশের কারাবাসীদের সম্বন্ধেও তার বেশি

* এইরূপ অত্যাচার চাঁদপুরে কিছুদিন পূর্বে হইয়াছে।

—প্রবাসী-সম্পাদক

আমাদের কিছু করবার নেই। আমরা জানাতে পারি কোন্টা ভয় কোন্টা ভয় নয়, মানবধর্মের দোহাই দিতে পারি। কিন্তু জানাব কাকে, দোহাই দেব কার সামনে দাঁড়িয়ে। জানাতে হবে তাদেরই দ্বারা বেগী ধরে চান দেবার দলে, দ্বারা মধ্যবর্তী, দ্বারা বিদেশী রাজ্যশাসনের আধারে স্বদেশীর প্রতি অসম্মান ভরে তুলতে কুশিত হয় না।

একটা কথা মনে রাখতে হবে, কোনো অপরাধীকে দণ্ড দেবার পূর্বে আইনে বাঁধা অত্যন্ত সতর্ক বিচারের প্রণালী আছে। এই সভ্যনীতি আমরা পেয়েছি ইংরেজের কাছ থেকে। এই নীতির 'পরে আমাদের দাবী অত্যন্ত হয়ে গেছে। এক সময়ে সরাসরি কাজির বিচার প্রচলিত ছিল। ব্যক্তিগত আত্মজের উপর, পক্ষপাতের উপর যে বিচার-প্রণালীর ভিত্তি ছিল তাকে আমরা অপ্রীতি করতে শিখেছি। এক কথা আজ আমাদের কাছে সহজ হয়েছে যে অপরাধের অপরাধ আরোপের পর থেকেই কোনো অভিযুক্তের প্রতি অত্যাচার করা সহজ ছিল যে-মুগে, সে-মুগের দণ্ডনীতি সভ্য আদর্শের ছিল না; মানুষের স্বাধীনতার অধিকার তখন অনিশ্চিত ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল। সভ্যদেশে এ কথাও স্বীকৃত হয়েছে যে, অপরাধেব নিঃসংশয় প্রমাণের তত্ত্ব প্রমাণতত্ত্বের অত্যাচারের ভিতর দিয়ে বৈধ সাক্ষ্যের সন্ধান ও বিশ্লেষণেব জন্ত অভিজ্ঞ বিচারক ও বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর প্রয়োজন আছে। এই বিশ্বাসের 'পরে যদি আস্থা না রাখি তা হোলে আইন-আদালতকে প্রকাণ্ড অপব্যয়ের খেলা বলতে হবে। এই ব্যবস্থার মধ্যে নিবিশেষে সকল মানুষের 'পরে যে সম্মান আছে এতদিন ধরে সেই নীতিকে প্রচা করতে শিখছি। এও জানি, এত সাবধান হয়েও অনেক ঘটনায় অপরাধের শেষ মীমাংসা হয় নি। বহু নির্দোষী দণ্ডভোগ করেছে।

তবু যদি স্থির হয় যে, বিশেষ স্থলে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে গোপনে সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে, আত্মজের বিচার ও আশু শাস্তি দান অনিবার্য তবে তা নিয়ে তর্ক করতে চাই নে কিন্তু এক কথা বলতেই হবে এমন স্থলে শাস্তির পরিমাণ দুঃসহ না হওয়াই উচিত, এমন হওয়া চাই যাতে বিচারের ভুলে নিরপরাধের প্রতি শাস্তি অতি কঠোর হয়ে অনুতাপেব কাবণ না ঘটে। কেবলমাত্র বন্দিবশাই তো কম দুঃখকব নয় তার উপরে শাসনের ঝাল-মসলা প্রচুর করে তুলে তার তীব্রতা বাড়িয়ে তোলাকে ভো। কোনোমতেই সভ্যনীতি বলতে পারি নে। ঝালমসলা যে কটুজাতীয়, বাহির থেকে তার আত্মজ করতে পারি মাত্র।

যখন বৈধ উপায়ে নিঃসংশয় দোষ প্রমাণ চেষ্টার অহবিধা আছে ব'লে মনে করা হয়, অস্বস্ত তখন এই সংশয়ের ক্ষেত্রে করুণার স্থান রাখা চাই।

কারাগার থেকে অস্তিম মুহূর্তে বাদেব মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে দম্ভারোগে মরবার জন্তে, তারা সকলেই এই বিলম্বিত মৃত্যুদণ্ডের ভোগের নিশ্চিত বোগ্য এমন কথা বিনাবিচারে তোমরা কি নিঃসংশয়ে বলতে পারো যে আমার দেশবাসীর স্বদেশী প্রতিনিধি।

বহুদিনসঞ্চিত একটা দুঃখের কথা কি আজ বলব? অল্প কালের মধ্যে দেশে অনেক বড়ো বড়ো মারকাট খুনোখুনি হয়ে গেছে। দ্বারা চক্ষে দেখেছেন, আত্মীয়-স্বজনসহ তাঁরা অসহ দুঃখ পেয়েছেন। দ্বারা ভিতরের কথা জানেন তাঁদের যোগে যে সব জনশ্রুতি দেশে রাষ্ট্র হয়েছে, দেশের লোক তাকে বিশ্বাস করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ পেয়েছেন। কিন্তু কতৃপক্ষ এই নির্দয় ব্যাপারকে পোলিটিকাল অপরাধের শ্রেণীতে গণ্য করেন নি ব'লে অল্পমানকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বিনা জবাবদিহিতে কারো কোনো দণ্ডবিধান করেন নি। অপর ক্ষেত্রে তাই করেছেন এবং দেশের প্রতিনিধিরা একে জ্ঞান্য ব'লে সমর্থনও করেন। পলিটিক্সে খুনজখম লুণ্ঠপাটের জন্তে দ্বারা দায়ী তারা ঘৃণ্য, অপর ক্ষেত্রেও দ্বারা দায়ী তারা কম ঘৃণ্য নয়। এক ক্ষেত্রে গোপন সন্ধানে তাদের আবিষ্কার করা সহজ, অপর ক্ষেত্রে সহজ নয়, এমন অস্বস্ত কথা বলা চলে না। উভয় ব্যাপারেই শাসনের প্রয়োজন আছে। হয়তো গুপ্ত পাণ্ডচক্রান্তের বিধিনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়—তবুও পাপের হেয়তা ও পরিমাণ কোনো পক্ষেই কম নয়।

পূর্বেই বলেছি দণ্ডপ্রয়োগের অতিকৃত রূপকে আমি বর্বরতা বলি। আমি কোনো পক্ষেই হিংসার মূল্য হিংস্রতা দিয়ে দিতে চাই নে কিন্তু সমাজ ও রাজ্যের তরফ থেকে দিবার দ্বারা বিচারের প্রয়োজন আছে, উভয় পক্ষেই। নির্জন কারাকক্ষবাস বা আত্মমানে নির্বাসন আমি কোনো প্রকার অপরাধীর জন্ত সমর্থন করি নে, দ্বারা দেশবাসীর প্রতিনিধির পদে উচ্চ শাসনমঞ্চে সমাসীন তাঁরা যদি করেন আমি নিচে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতিবাদ করব।

[গত ২২শে শ্রাবণ ঐযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিহারতীর অধ্যাপক এবং ছাত্রী ও ছাত্রদিককে বাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি এই শব্দের আকারে লিখিয়া বিদ্যছেন।—প্রবাসীর সম্পাদক]

গৌড়পাদ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

অম্পর্শযোগ

পূর্বে (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪) যে রূপ আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, গৌড়পাদ নিজের আগম শাস্ত্রের চতুর্থ প্রকরণের প্রথম কারিকায় বুদ্ধকে বন্দনা করিয়াছেন। মনে হয়, দ্বিতীয় কারিকাতেও তাহাই করা হইয়াছে। কারিকাটি এই—

“অম্পর্শযোগো বৈ নাম সর্বসত্ত্বসুখো হিতঃ।

অবিবাদোহবিবুদ্ধস্ত দেশিতস্তং নমাম্যহম্।”

‘যাহা সমস্ত জীবের সুখকর, যাহা হিতকর, যাহাতে কোনো বিবাদ নাই, যাহার সহিত কোনো বিরোধ নাই, সেই অম্পর্শযোগ (যিনি) উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি।’

আমি এখানে ‘যেন’ পদ উদ্ধৃত করিয়া, যিনি অম্পর্শযোগ উপদেশ করিয়াছেন তাঁহাকে নমস্কার, এইরূপ অর্থ বা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। শঙ্করাচার্য ইহা করেন নাই; তিনি বলিয়াছেন এখানে অম্পর্শযোগকে নমস্কার করা হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। আমাদের কাছে প্রশ্ন এই—এই অম্পর্শযোগ কি, এবং কে ও কোথায় ইহা উপদেশ করিয়াছেন? উপনিষদে কোথাও ইহার শব্দত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, যদিও শঙ্করাচার্য স্থানান্তরে (৩.৩২, যেখানে ইহার বর্ণনা করা হইয়াছে) বলিয়াছেন যে, ইহা উহাতে প্রসিদ্ধ (“সুপ্রসিদ্ধমুপনিষৎ”)। স্রষ্টব্য ৩. ৩৭, ৩৮।

কঠোপনিষদে (২. ৩. ১০) আছে—

“যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।

বুদ্ধিস্ত ন বিচর্চতে তামাহঃ পরমাং গতিম্।”

‘যখন মনের সহিত পাঁচটি জ্ঞান (ইন্দ্রিয়) স্থির থাকে, এবং বুদ্ধিরও কোনো চেষ্টা (ক্রিয়া) থাকে না, তখন তাহাকেই তাঁহারা পরমা গতি বলেন।’

অন্যান্য উপনিষদেও এইরূপ উক্তি পাওয়া যায়।^১ কিন্তু

১। যেমন, ব্রহ্মবিশ্বু উপনিষৎ, ৪.৬; মৈত্রী উপনিষৎ, ৬.৩৪, ১। স্রষ্টব্য কারিকা, ৩.৩৮।

যদিও এই সমস্ত উক্তি দ্বারা আলোচ্য অম্পর্শযোগ বুঝা যাইতে পারে, তথাপি উপনিষৎ-সমূহের মধ্যে কোথাও ইহার নাম করা হয় নাই। অম্পর্শযোগের আক্ষরিক অর্থ হইতেছে সেই যোগ যাহাতে স্পর্শ নাই। স্পর্শ বলিতে এখানে স্পর্শ, সংসর্গ। গ্রন্থকার নিজেই অন্তর্ভুক্ত (৩. ৩৭) বলিয়াছেন, ইহা সমাধি। তিনি ইহাকে অচল সমাধি (“সাবধিরচলঃ”) বলিয়াছেন। আমরা এখানে মনে করিতে পারি, বৌদ্ধধর্মে বহুবিধ সমাধির মধ্যে একটির নাম অচল।^২ উল্লিখিত স্থলে গ্রন্থকার ইহার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে ইহাকে যোগিগণের অসম্প্রজাত অথবা নিবিচক্লব সমাধি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমি যতটুকু দেখিয়াছি, যোগশাস্ত্রে কোথাও ইহাকে অম্পর্শযোগ বলা হয় নাই। কেন এই যোগকে অম্পর্শ বলা হইল ইহাই প্রশ্ন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে অম্পর্শবিহার (পালি অম্পূববিহার) নামে নয়টি ধ্যানের উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেব এগুলি উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া বহু স্থানে দেখা যায়।^৩ সেই ধ্যান কয়টি এই—

১। চারিটি রূপ—যান, যথা—

(ক) প্রথম ধ্যান,

(খ) দ্বিতীয় ধ্যান,

(গ) তৃতীয় ধ্যান, ও

(ঘ) চতুর্থ ধ্যান।

২। মহাব্যাপ্তি (সক্কি-নন্দরূপ), ৫৮০.

৩। যোগসূত্র, ১.২, ১৮, ৫১ (ব্যাস-সংস্কৃত ভাষ্যের সহিত)। ব্যাস লিখিয়াছেন—“ন তত্র কিঞ্চ সম্প্রজাত ইত্যসংজ্ঞাতঃ।”

৪। পঞ্চদশী, ২.২৮।

৫। অম্পূবরনিকায় (৮৫), ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১০-৪৪৮: “নব যিমে ভিকৃথবে অম্পূবর ইহার।” নব যিমে ভিকৃথবে অম্পূবরবিহারসমাপত্তিরো দেসিস্সানি ত্ব স্ত্রনাথ।”

৬। শ্রীতোষাদিহেতু যাহা কিছু বিকারপ্রাপ্ত হয়, তাহার রূপঃ যেমন এই স্থল পৃথিবী প্রভৃতি। ইন্দ্রিয় বিপরীত অরূপ।

২। চারিটি অরূপ-ধ্যান, যথা

(ক) আ কা শা ন স্ত্যা য় ত ন (পালি আ ক-
শা ন ঙ্গা য় ত ন),^৭

(খ) বি জা না ন স্ত্যা য় ত ন (পালি বি ঞ্-
ঞা না ন ঙ্গা য় ত ন),^৮

(গ) আ কি ঙ্গা ন্যা য় ত ন (পালি আ কি ঙ্গা-
ঞা য় ত ন),^৯ ও

(ঘ) নৈ ব স ং জ্ঞা না স ং জ্ঞা য় ত ন (পালি
নৈ ব স ঞ্জ্ঞা না স ঞ্জ্ঞা য় ত ন)।^{১০}

ইহার পরবর্তী নবম ধ্যান হইল সংজ্ঞা বেদিত নিরোধ
(পালি স ঞ্জ্ঞা বেদ য়িত নিরোধ)। এই ধ্যানে
সংজ্ঞা ও বেদনা উভয়েরই নিরোধ হয়। বলিয়া ইহার এই
নাম।

বস্তুত ইহাতে যে, কেবল সংজ্ঞা ও বেদনারই নিরোধ
হয় তাহা নহে, সমস্ত চৈত বা চৈতসিক^{১১} ধর্মেরই নিরোধ
হয়। সমস্ত চৈত বা চৈতসিক ধর্মের প্রথম হইতেছে স্পর্শ।
ইন্দ্রিয়, বিষয়, ও বিজ্ঞান এই তিনের সংযোগ
(“ত্রিকসম্মিপাত”) স্পর্শ। স্পর্শ হইলে বেদনাদি অন্তঃপ্রা-
চৈতসিক ধর্ম হয়। স্পর্শ না হইলে ইহারও হয় না।
এই নবম ধ্যানে চিন্তের নিরোধের সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শ নিরুদ্ধ
হয়, স্পর্শ নিরুদ্ধ হইলে বেদনাদি নিরুদ্ধ হয়। তাই এই
ধ্যান বা যোগে স্পর্শ না থাকায় ইহাকে অস্পর্শ যোগ

বলিতে পারা যায়। স্পর্শ বলিতে এখানে স্পর্শপ্রমুখ বেদনাদি
অন্যান্য চৈতসিক ধর্মকেও বুঝিতে হইবে। বেদনার
নিরোধ তখনই সম্ভব যখন স্পর্শের নিরোধ হয়।^{১২}

যোগের এই অবস্থা (বাহা নিরোধ, অসংশ্রজাত,
নির্বীজ, অথবা নির্বিকল্প সমাধি নামে প্রসিদ্ধ)
যে, চিত্ত এবং চিন্তের সমস্ত অবস্থা (অর্থাৎ চৈতসিক ধর্ম-
সমূহ) সম্পূর্ণ ভাবে নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা বুদ্ধযোগ নিজের
বিশুদ্ধি মাৰ্গে (পৃ. ৫৫২) অতি স্পষ্ট করিয়া
বলিয়াছেন।^{১৩}

পূর্বে (৩. ৩৯) বলা হইয়াছে যে, অস্পর্শযোগ
লাভ করা বড় শক্ত, যোগীরা ইহাতে ভয় পান, যদিও বস্তুত
ভয়ের কারণ নাই।^{১৪} ইহা হইতে অস্পর্শ যোগ
শব্দটিকে অল্প এক প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। বৌদ্ধ-
শাস্ত্রে এইরূপ শব্দের বহু প্রয়োগ পাওয়া যায়, যথা—
স্পর্শবিহার,^{১৫} স্পর্শবিহারতা,^{১৬} অস্পর্শ-
বিহার।^{১৭}

স্থিরমতি শেখোক্ত শব্দটিকে জিংশিকা (২৮. ১৮)
এইরূপ ব্যাখ্যা কবিয়াছেন—

১২। সংযুক্তনিকারে, ৪, পৃ. ২২০ (= ৩৬. ১৫. ৪)
ইহা সম্পূর্ণভাবে দেখান হইয়াছে :—“কসুসমুদয়া বেদনাসমুদয়ো
কসুসনিরোধো বেদনানিরোধো,” অর্থাৎ স্পর্শের উদয় হইলে বেদনার
উদয় হয়, আর স্পর্শের নিরোধে বেদনার নিরোধ হয়। এতাদৃশ
স্থলে স্পর্শ শব্দের ব্যাখ্যার জন্য স্তম্ভ্য জিংশিকা. পৃ. ২০, প. ২,
৭, ৯, ১০।

১৩। “কানিরোধসমাপত্তীতি। বা অল্পপূর্বনিরোধবসেন
চিত্তচৈতসিকানাং ধম্মানাং অল্পবত্তি।” স্তম্ভ্য সংযুক্তনিকার,
পৃ. ২১৭ (= ৩৬. ১১. ৫) :—“সঞ্জ্ঞাবেদয়িতনিরোধং সমাপন্নসু
সঞ্জ্ঞা চ বেদনা চ নিরুদ্ধা হোন্তি।”

১৪। “অস্পর্শযোগো বৈ নাম হৃদর্শঃ সর্বযোগিভিঃ।
যোগিনো বিভ্রাতি হাম্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ।”
পঞ্চদশীতে (২. ২৮) ইহাই উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—
“গৌড়াচার্যো নির্বিকল্পে সমাধাবস্তযোগিনাম্।
সাকারজ্ঞানিষ্ঠানামত্যন্তং ভয়মুচিরে।”

১৫। মহাব্যুৎপত্তি, ৮৩৪২, ৮৩৫১; জিংশিকা,
২৮. ১৮, ৩০. ১৫।

১৬। মহাবজ্র, ১. ২৫৬. ১০, ৩২৩. ২০, ৩২৪. ৫; মহা
ব্যুৎপত্তি, ৬২৮৮।

১৭। অভিসময়ালঙ্কারাণ্যাক, ৩২৬; জিংশিকা,
২৪. ১৭, ১৯; ৩০. ১৫, ২০।

৭। মোটামুটি অর্থ, যে ধ্যানের আলম্বন বা বিষয় আকাশের
অনন্ততা।

৮। অর্থাৎ যে ধ্যানের বিষয় বিজ্ঞানের অনন্ততা।

৯। পূর্বোক্ত দুই ধ্যানের বিষয় ছিল যথাক্রমে আকাশ ও
(আকাশের) বিজ্ঞানের অনন্ততা, কিন্তু তাহাদের পরবর্তী এই
ধ্যানে আকাশ ও বিজ্ঞান এই উভয়ই ছাড়িয়া দিয়া কিছুই নহে
(অ কি ঙ্গ ন, ইহা হইতে আ কি ঙ্গ) এই ভাব যে ধ্যানের
বিষয় হয়, তাহাই হইল আ কি ঙ্গা য় ত ন।

১০। অ কি ঙ্গ ন বলিলে তবুও একটা কিছু বুঝা যায়, উহা
একটা সংজ্ঞা। তাই উহাকেও বাদ দিয়া ধ্যান করিতে হয়। এই
ধ্যানের বিষয় বাহ্য তাহাকে সংজ্ঞাও বলা চলে না, অসংজ্ঞাও বলা
চলে না। তাই উহার নাম হইল নৈ ব স ং জ্ঞা—না স ং জ্ঞা য়
ত ন।

১১। চিত্ত ও চেতসু একই। বাহ্য ইহার তাহা চৈত, বা
চৈতসিক।

“স্পর্শঃ স্তূথং তেন সহিতো বিহারঃ স্পর্শবিহারঃ। ন স্পর্শ-
বিহারেহস্পর্শবিহারঃ।”

তর্জ্যং স্পর্শ শব্দের অর্থ স্তূথ, তাহার সহিত বিহার
স্পর্শ বিহার, বাহা স্পর্শ বিহার নয় তাহা অ স্পর্শ
বিহার।

ত্রিকলীতে স্পর্শ বিহার শব্দটির অর্থবাদ হইতেছে
“বদে বর গনস প”। সংস্কৃতে ইহার আক্ষরিক অর্থ হয়
স্তূথ স্থিতি, অথবা স্তূথ ব স্থান, কিংবা স্তূথ ব স্থা।
সংস্কৃতের স্পর্শ বিহার অর্থে পালিতে লেখা হয়
কা স্তূ বিহার। ১৮

এইরূপে দেখিলে অ স্পর্শ যোগে র অর্থ হয়
অ স্তূথ যোগ, অর্থাৎ যে যোগ স্তূথে পাওয়া যায়
না। এই ব্যাখ্যার সহিত গ্রন্থকারের নিজেরই পূর্বোক্ত
(৩. ৩২) কথার^{১৮} স্পষ্ট মিল পাওয়া যায়।

আলোচ্য কারিকাটিতে বলা হইয়াছে যে, এই যোগে
আনন্দ পাওয়া যায় (“সর্বসত্ত্বস্তূথ”)। ইহা বোধ গ্রহেণ
দেখা যায়। সংস্কৃত নিকায়ে (৫. ২২৮=৩৪. ১২. ২০)
পূর্বোক্ত সংজ্ঞা বেদিত নিরোধে ২০ কথায় বলা হইয়াছে
যে, ইহাতে পরম আনন্দের অভ্যুত্থি হয়। ১৯

১৮। সূত্রভাবে বিচার করিলে বলিতে হয় পালির কা স্তূ
সংস্কৃতের স্পর্শ হইতে হয় নাই। ইহা হইতে পালিতে হয়
ক স্তূ ন (ইহা হইতে কা স হইতে পারে, কা স্তূ নহে)। পালির
কা স্তূ স্থানে উদীচ্য বোধ সংস্কৃতগ্রন্থে স্পর্শ দেখা যায়। পালির
কা স্তূ বিহার স্থানে বোধ সংস্কৃতে কখন-কখন স্তূথ স্পর্শ
বিহার দেখা যায়।

১৯। পূর্বোক্ত ১৪শ টীকা দ্রষ্টব্য।

২০। চীনা অনুবাদ অনুসারে ইহা সংজ্ঞা বেদিত নহে,
সম্যগ্ বেদিত।

২১। “ইধানন্দ ভিক্ষু সরবসো নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞায়ত্তনং
সমভিক্ষু সঞ্ঞাবেদয়িতনিরোধয়ুপসম্পজ্জ বিহরতি। ইদং থো
আনন্দ এতমহা স্তূথ অঞ্ঞং স্তূথভিক্ষুত্তরং চ পণীততরং চ।”
ইহার পরবর্তী অংশ (২০) দ্রষ্টব্য। তুলনীয়—অ স্তূত র
নিকায়ে, ৪. ৪১৪-৪১৮=৩৪. ২-৩ :—“কিং পনেন্থ (=নির্বোধে)
আবুসো সারিপুত্ত স্তূথ বদেথ নপি বেদয়িতত্তি। এতদেব থেথ
আবুসো স্তূথ বদেথ নপি বেদয়িতত্তি।” (ছায়া—কিং পুনরত্র
(নির্বোধে) আবুসুন্ সারিপুত্তে স্তূথ বদত্র নান্তি বেদিতমিতি। এতদেব
থদত্র আবুসুন্ স্তূথ বদত্র নান্তি বেদিতমিতি)।

পূর্বে (৩. ৩২) বলা হইয়াছে ২২ যে, এই অ স্পর্শ-
যোগে বোগীরাও ভয় পান, যিনি বস্ত্রত লেখানে কোন
ভয় নাই—

“যোগিনো বিভ্রান্তি হৃদয়ভয়ে হৃদয়নিঃ।”

ভয়ের কারণ কী? কেন তাঁহারা ভয় পান? শঙ্কর
ঠিকই বলিয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন যে, ইহাতে আত্মার
নাশ হয়। ২৩ বস্ত্রতই এই অবস্থার সঙ্গী ও মৃত ব্যক্তির মধ্যে
ভেদ অভ্যন্তর-অন্তর থাকে, কারণ উভয়েরই নিষাস-প্রযাস
থাকে না। তাই আমরা দেখিতে পাই, পরিনির্বাণ-লাভের
একটু পূর্বে বুদ্ধদেব যখন সংজ্ঞা বেদিত নিরোধ যোগে
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তখন আনন্দ মনে করিয়াছিলেন যে,
তাঁহার পরিনির্বাণ হইয়াছে। কিন্তু শবির অস্ত্র ক্রম তাঁহাকে
বলিয়াছিলেন, যে, বুদ্ধদেবে পরিনির্বাণ হয় নাই,
তিনি সংজ্ঞা বেদিত নিরোধ স্থানে আকৃষ্ট হইয়াছেন।
তাঁহার এই কথা যে সত্য তাহা দেখা গিয়াছিল, কারণ
বুদ্ধদেব তাহার কিছু পরে পরিনির্বাণ লাভ করেন। ২৪

মৃত্যু ও সংজ্ঞা বেদিত নিরোধ এই উভয়ের মধ্যে
কতটুকু ভেদ তাহা বুদ্ধ যোগ নির্জের বিহুত্ব মগ্ন
নামক গ্রন্থে (পৃ. ৫৫৮) দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, উভয়ের
মধ্যে সবই এক, ভেদ এইটুকু যে, ঐ ধ্যানস্থিত বোগীর
শরীরে তাপ থাকে, জীবন থাকে, আর ইন্দ্রিয়গুলি অবিকৃত
থাকে, কিন্তু মৃত ব্যক্তির শরীরে ঐ সব থাকে না।

এইরূপে আলোচ্য কারিকার জানা যায় যে, সংজ্ঞা
বেদিত নিরোধ অথবা অ স্পর্শ যোগে র উপদেষ্টা
হইতেছেন বুদ্ধদেব।

পূর্বে প্রদর্শিত নয়টি ধ্যানের (ন ব অ স্তূ পূর্ধ-
বিহার) প্রথম আটটিতে (অর্থাৎ নৈ ব সংজ্ঞা না-
সংজ্ঞা পর্যন্ত) আমরা কোনরূপ বোধ মূল দেখিতে
পাই না, কারণ পালি ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই লিখিত
বোধ গ্রহে পাওয়া যায় যে, আভার কালাপ (পালি
আলার কালাম) ও কত্র করাম পুত্র (পালি

২২। পূর্ববর্তী ১৪শ টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩। “আত্মনাশরূপনিম্ন যোগ মন্তমানা ভয় কুবর্তি।”

২৪। মহাপরিনির্বাণ স্তূত, ৬. ৮-৯ (=দীঘ
নিকায়ে ২, ১৫৬-১৫৮)।

উদ্ধৃতি) বাক্যক্রমে সপ্তম ও অষ্টম পর্যন্ত ধ্যানগুলিকে জানিতেন।^{২৫} ইহারা উভয়েই বুদ্ধদেবের শিক্ষক বা গুরু ছিলেন। তিনি গুরুদেবের নিকট যে ধ্যানের উপদেশ পাইয়াছিলেন তাহার পরে আরও অল্প ধ্যান আছে কিনা তাহার অন্বেষণ করিয়া পূর্বোক্ত নবম ধ্যানটির উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

এখানে একটি কথা অবশ্যই বলিতে হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৩ স্পর্শ শব্দের প্রয়োগ এবং আলোচ্য গ্রন্থের উভয় স্থলে (৩. ৩২ ও এই কারিকায়) শব্দর ও অন্তান্ত ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যা বিচার করিয়া দেখিলে তাহা যে একেবারে অসঙ্গত ইহা বলিতে পারা যায় না। তথাপি মনে করিবার অপর কারণও আছে যে, এই অস্পর্শ যোগের প্রকাশক হইতেছেন বুদ্ধদেব। ব্রাহ্মণ্য যোগশাস্ত্রে যে, প্রথমে ইহা ছিল না তাহা আমাদের

২৫। মজ্জিম নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮-৯ (অরিয় প্যারিয়েসন স্ক্রিপ্ট ১. ৬. ৬); ললিত বিস্তার ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮-২৩৯, ২৪৩-২৪৪; বুদ্ধচরিত, ১২. ৮৩, ৮৮; Kern : Manual of Buddhism, 1896, p. 55.

২৬। - "মাত্রাল্পাঙ্গ কৌন্তের" (২. ১৪), "বাহুস্পর্শ-সমস্তায়া" (৫. ২১), "স্পর্শানু বুদ্ধা বহির্বিহায়" (২. ২৭)।

এই আলোচ্য কারিকাতেই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। এখানে এই যোগের দুটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে অবিবাদ ও অবিকল্প ("অবিবাদোহবিকল্প")।^{২৭} গৌড়পাদ ইহাতে বলিতেছেন যে, তাঁহাদের ইহাতে কোন বিবাদও নাই, বিরোধও নাই। তিনি নিজের বৈদান্তিক হওয়ায় ঐ কথায় ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, ঐ যোগের গ্রহণে বৈদান্তিকদের কোন বিবাদ হইতে পারে না, আর তাহাতে তাঁহাদের মতের কোন বিরোধও হইতে পারে না। ইহাই যদি না-হয় তবে ঐ দুটি বিশেষণ দ্বিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। এই গ্রন্থেরই অন্তর (৪. ৫) বিবাদ না করার কথাটা ("বিবাদামো ন তৈঃ সার্থমবিবাদং নিবোধত") মনে করিলে আলোচ্য স্থলেও ঐ তাৎপর্ষ্যই ধরিতে হয়।

অতএব পূর্বে বেরূপ দেখা গেল তাহাতে বলিতে পারা যায় যে, অস্পর্শ যোগের উপদেশটা হইতেছেন বুদ্ধদেব, এবং তাঁহাকেই এখানে গ্রন্থকার নমস্কার করিয়াছেন।

গ্রন্থের পূর্ব ও পর-বর্তী অন্তান্ত আরও অনেক কথার দ্বারা এই মত সমর্থিত হয়।

২৭। ভুলনীর কারিকা ৪. ৫।

অব্যক্তা

শ্রীমদীশ ঘটক

তাহারা ভুলিয়া যায়, যারা এক দিন
নিবিড় আলোকে বন্ধে হয়েছিল লীন
তপ্ত মধুরাতে। বলেছিল ভালবাসি,
আসন্ন আতুর কণ্ঠে, অক্ষুটে সজ্জাষি।

তাহাদের স্বতির মিছিল মর্যপথে
বিধুর সজ্জায় বিশ্বতির পার হইতে

ভেসে আসে চলমান চিত্রের মতন
মুহূর্তের তরে। মুহূর্তে, নিশ্চেষ্ট
মানসে পড়ে না সাড়া। দিক্চক্রবালে
বেথানে দিনান্তে তুর্ধা শেষরশ্মিছালে
জালায় অপাঙ্গমুক্ত তোমার প্রেক্ষণ,
সেখানে তোমার সাথে মুক্ত সম্ভাষণ
অন্তহীন কাল। এ জীবনে ব্যক্ত করিলে না,
হে পরমা, জানি, তবু তুমি ভুলিবে না।

সুনয়নীর মৃত্যু

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

কলতলায় বাসন মাজিবার কালে সুনয়নী চিঠিখানা পাইলেন।

সদর খুলিলেই ছোট উঠান ও কলতলা একসঙ্গে নজরে পড়ে। জান্না-পিণ্ডন দুয়ার অল্প একটু ফাঁক করিয়া মাজ চিঠিসনেত হাতখানি বাড়াইয়া মুখে অল্পটুকু সন্নিবিষ্ট ‘চিঠি’ শব্দ উচ্চারণ করিয়া দুটি আঙুলের চাপ শিথিল করিয়া দেয়। চিঠি কখনও দুয়ারের কোলেই টুপ করিয়া খসিয়া পড়ে, বায়ুব বেগে কখনও বা উঠানে আসিয়া পড়ে।

আজ অল্প বাতাস ছিল বলিয়া সুনয়নীর পায়ের তলায় আসিয়া চিঠিখানি ঘেন প্রণাম জানাইল।

বাসন মাজিতে মাজিতে সুনয়নী হাঁকিলেন, ‘ওরে স্বধা, স্বধা, চট্ ক’রে একবার এদিকে আয় দেখি মা, একখানা চিঠি এস। সন্ধ্যা হাত, আয় না মা চট্ ক’রে।’

বাড়ীখানি দ্বিতল নহে যে স্বধার নামিয়া আসিতে দেরি হইবে। জীর্ণপ্রায় একতলা দুখানি ঘর, পাশের ছোট কালি বারান্দা হইতে অল্প অল্প ধোঁয়া বাহির হইতেছিল। স্বধা উনানে জ্বাচ উঠাইবার চেষ্টায় ভাঙা হাত-পাখাখানি প্রাণপণে নাড়িতেছিল; কিন্তু পাখায় বাতাসের চেয়ে শব্দ হইতেছিল বেশী ও ধোঁয়ার গাঢ়ত্বও তেমন আশাশ্রয় নহে। উনান স্ফীত না থরিলে বাবার আগিস ‘লেট’ হইতে পারে। সকাল হইতে বেলা নটা পর্যন্ত প্রত্যেকটি মিনিটের মূল্য এ-বাড়ীতে বড়ই চড়া, নটার পর ঘন্টার খবরদারি না করিলেও কিছু যায় আসে না। মায়ের প্রথম ডাক তাই কর্মরতা স্বধার কানে যায় নাই, দ্বিতীয় ডাকে সে পাখা ফেলিয়া ফালি বারান্দাটুকু এক সেকেণ্ডে পার হইয়া উঠানে নামিয়া আসিল ও মায়ের পায়ের তলা হইতে একখান খামেভরা চিঠি তুলিয়া লইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিল।

মনোনিবেশই করিল, সমস্ত চিঠিখানা পড়া শেষ হইলেও মুখে তাহার একটি কথাও বাহির হইল না।

অধৈর্য সুনয়নী বাসনে একরাশ ছাই ঘষিতে ঘষিতে ক্রতকর্তে কহিলেন, ‘দেখ মেয়ের আঙুল, বলি চিঠিখানা দিলে কে?’

মেয়ের কানে মায়ের প্রশ্ন প্রবেশ করিল না, সে-ও পাণ্টা প্রশ্ন করিল, ‘রমলা দেবী কে না?’

সুনয়নী ক্ষণেকের তরে বাসনমাজা থামাইয়া উজ্জল মুখে বলিলেন, ‘রমলা কে জানিস ন? আমাদের রমলা যে, তোর মাসী হয়।’ একটু থামিয়া বলিলেন, ‘তা তোরই বা দোষ কি, জন্ম অবধি মাসীকে দেখিস নি ত কখনও! তুই ত তুই, যে-ঘরে সে পড়েছে চন্দ্রসূর্য্য তার মুখ দেখতে পায় বড়। কলকাতায় সাতখানা বাড়ী, ওরা থাকে জামবাজারের বড় বাড়ীতে।’

তথাপি স্বধার মুখে বিশ্বাসের রেখাগুলি মিলাইল না দেখিয়া সুনয়নী দেবী একগাল হাসির বলিলেন, ‘মাস মাস পাঁচটা ক’রে টাকা মনি-অর্ডার আনছে কার দৌলতে? ওই মাসীর। খুঁড়তুতো বোন ফুল কি হয়—আপনার মেয়ের চেয়ে ভালবাসে তোকে। তাই, তোর পড়ার খরচ বলে মাস মাস ঐ টাকা পাঠায়।’

এতক্ষণে স্বধার মুখের বিশ্বাস ভাব কাটিয়া গেল।

সুনয়নী সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, ‘সে কি লিখেছে রমলা? ভাল আছে ত?’

স্বধা মুখখানি নামাইয়া অত্যন্ত হৃদয়বলে বলিল, ‘তিনি মারা গেছেন।’

সবিশ্বাসে চোখ কপালে তুলিয়া সুনয়নী কহিলেন, ‘মারা গেছে? রমলা? তবে চিঠি লিখলে কে?’

‘তার ছেলে। ছাপানো চিঠি দিয়েছেন—নেমন্তায়ের। এই তাঁর শব্দের দিন।’

২

এই ছুঃসংবাদে আর পাঁচ জনে যেমন করিয়া থক্ক স্থনয়নী কিন্তু তেমন করিলেন না। দূর-সম্পর্কের খুড়তুত বোন; ছেলেবেলাকার স্মৃতির সমুদ্র হাতড়াইলেও তেমন কিছু মণি বা শুষ্কি হাতের মুঠায় উঠে না। রমলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পিতা এ-জেলা ও-জেলা করিয়া ঘুরিতে ও ছুটির অবসরে নষ্ট-শ্রী পল্লীগ্রামে আসার চেয়ে চোন্দ সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যভরা নগরীর অন্ধে আশ্রয় লইতেই ভাল-বাসিতেন। আপন ভাইয়ের সঙ্গেই লোকে সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিতে পারে না, এ ত দূর-সম্পর্কের খুড়তুত ভাই। তথাপি গ্রামের পাঁচ জনের কাছে স্থনয়নীর শ্রিত ডেপুটি-ভাইয়ের গল্প করিতে ভালবাসিতেন এবং পিতৃহৃৎ-প্রাপ্ত ঐ গল্পের বর্ণনামাবেশে স্থনয়নীরও দক্ষতা কিছু দেখা গিয়াছিল। একবার মাত্র রমলার বিবাহে কুটুম্বিতা-স্বত্রে তাঁহার এক হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং বুদ্ধিমতী স্থনয়নী সেই সুযোগ ব্যর্থ হইতে দেন নাই। রমলার শ্রামবাজারের ঠিকানাটা তিনি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন এবং পরে গোপনে আপন ছুঃখময় জীবনের কাহিনী ব্যক্ত করিয়া রমলার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়া-ছিলেন। মাস মাস মেয়ের শিক্ষাব্যয়নির্বাহার্থ কে-পাঁচটি টাকা আসিতেছে তাহা ক্ষীণপ্রায় সবদুঃখকে দূর করিয়াছিল, স্থনয়নীও পাড়ার পাঁচ জনের কাছে গদ করিবার এত বড় একটা সৌভাগ্য লাভ করিয়া থক্ক হইয়াছিলেন।

অতর্কিত ছুঃসংবাদে কাদিবেন কি কাদিবেন না, স্থনয়নী প্রথমটা ঠিক করিতে পারিলেন না। রমলার বিয়োগে তিনি ছুঃখের আঁচ যেটুকু পাইলেন, তাহা এই পাঁচটি টাকার মারফৎ বলিয়াই মনে হইল। প্রতিমাসে পাঁচটি মুদ্রাই আসিত, রমলা দেবী কখনও ভগিনীকে জিপি-মারফৎ প্রণাম পাঠান নাই বা কুশল জিজ্ঞাসা করেন নাই। ধাতুমূর্তির মধ্যে যদি স্নেহ থাকে সম্ভব হয়, তবে রমলা দেবী নিশ্চয়ই স্নেহময়ী ছিলেন, দয়ার প্রস্র উঠিলে তিনি দয়াবতী। তাঁর ধন-সমৃদ্ধির সঙ্গে স্নেহ-মমতার মশলা মিশাইয়া যে-সকল গল্প স্থনয়নী তাঁহার প্রজিবেদীদের এ-যাবৎ উপহার দিয়াছেন, তাহাতে এই ছুঃসংবাদে ন-

কাদিলে সম্পর্কের অসার দিকটাই প্রকাশ হইয়া পড়ে। আবার সাম্প্রতিক কাজ না সারিয়া কাদিবার সময়ই বা কোথায়? নিষ্ঠুর সময় রুঢ় মুহুর্তের সঙ্কেতে আপিস-তাড়নারত মানুষগুলিকে স্বাভাবিক স্বদয়বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া বড়ির মধ্যে টিক্ টিক্ শব্দ করিয়াই চলিয়াছে।

বাসনে দ্রুত হাত ঢালাইতে ঢালাইতে তিনি স্থধাকে বলিলেন, 'চিঠিখানা তুলে রাখ, দেখ্ গে উঠুন আঁচ উঠলো কি না। আব দেখ্, এখনি যেন ছায়ে উঠে এ-কথা কাউকে জানাস নে, যা বলবার আমি বলব।' স্বতরাং আপিস যাইবার পূর্বে একমাত্র স্বামী ছাড়া এ-কথা আর কেহ জানিল না।

৩

সারা দুপুর ও বৈকাল ভগিনী বৃত্তাসংবাদ প্রচার করিয়া স্থনয়নী দেবী ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

কাপড়-কাচা ও গা-ধোওয়া শেষ করিয়া তিনি ঘরে আসিয়া শুইলেন। কিন্তু শুইবামাত্রই মনে হইল, চুপ করিয়া শুইবার অবসরই বা তাঁর কোথায়? এই প্রাচীর দিন, অজ্ঞাত দিন-দুই পূর্বে সেখানে পৌছান দরকার। কাজের বাড়ীতে শুধু থাইতে যাওয়াটা বড়ই বিস্ত্রী দেখাইবে। পাঁচ জনের সঙ্গে আলোপ-পরিচয়, তাদের স্বখ-দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ, কাজের বাড়ীতে দুই-একখানা হাক্ কাজে হাত দেওয়া ইত্যাদিতে কিছু সময়ও ত যাইবে। তার পর ভগিনীপতিকে বলিয়া স্থধার বিবাহের সাহায্য কিছু সংগ্রহ করা—সেও মায়ের পক্ষে অবশ্যকর্তব্য।

শুইবামাত্রই তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং ভাবিলেন, 'স্থধা, স্থধা, একবার এ-ঘরে আর তু, মা।'

স্থধা আসিলে বলিলেন, 'পরন্তু ধোপাবাড়ী থেকে যে কাপড়গুলো এসেছিল, মিল করে রেখেছিল ত?'

স্থধা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'সব মিলে গেছে, কেবল তোমার লালপাড় সিকের শাড়ীখানা দেয় নি।'

স্থনয়নী দেবী প্রচণ্ড বিশ্বয়ে পাড়াইবার চেষ্টা কবিলেন এবং চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটাইয়া ভয়কণ্ঠে কহিলেন, 'সেইখানাই দেয় নি? এখন উপায়?'

সুখা বলিল, ‘দু-চার দিনের মধ্যেই দিয়ে যাবে বলেছে। মরকারী আটপোরে কাপড়গুলো ত দিয়েছে।’

সুনয়নী দেবী মুখ মচকাইয়া বলিলেন, ‘কোনটা মরকারী, কোনটা অমরকারী, তুই তার সব জানিস কি না! খোবা-মাগীর বড় আঙ্কারা, মিনি-পয়সায় কাচেন কি না!’

সুখা প্রতিবাদ করিল, ‘বাঃরে, তার কি দোষ! তুমিই ত কাপড় দেবার সময় বলেছিলে আগে আটপোরেগুলো দিও, ভাল কাপড় দু-দিনেরি হলেও চলবে।’

সুনয়নী দেবী হতাশামাখা ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, ‘তখন কি জানতাম—’ হয়ত মেয়ের কাছে বলিলেও খানিকটা অশোভনতা প্রকাশ পাইতে পারে এই আশঙ্কায় কথাটা ভঙ্গীর মধ্য দিয়াই শেষ করিলেন।

সুখা বলিল, ‘তুমি কি মাসীমার আছে যাবে না কি?’
সুনয়নী উৎসাহভরা কণ্ঠে কহিলেন, ‘যাব না। এক মার পেটের না হোক, বোন ত বটে। তা যাবার দক্ষা তুমিই ত শেষ করে রেখেছ বাছা!’

তাহার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া অশ্রুপতনের আভাস দিল। সুখা প্রতিবাদ করিল না। দোষটা তাহার স্বর্থে চাপাইয়া যা যদি শাস্তি পান, ভাল কথা।

খানিক মৌন থাকিয়া সে অবশেষে বলিল, ‘তার বড়লোক, আমরা গরীব। আমাদের সেখানে যাওয়াটা—’

সুনয়নী দেবী মেয়ের মুখ প্রায়ে জ্বলিয়া উঠিলেন, ‘গরীব বড়লোক বলে সন্দেহটা কি হাত দিয়ে কেউ মুছে ফেলতে পারে? গরীব বলে সে কি আমাদের এত দিন হেনস্থা করেছিল? মাস মাস টাকা পাঠায় নি তোমার লেখাপড়ার জন্তে? জালাস নে, বাপু। একে মরছি রমলার জন্তে, তার তোরা পাঁচ জনে লেগেছিস আমার পেছনে।’ শুইয়া পড়িয়া তিনি ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মায়ের অবস্থা দেখিয়া সুখা বেচারী সকাল হইতেই কেমন বিষন্ন অস্থব করিতেছে। মায়ের গল্প বা কান্নার মধ্যে তাই সে কোন অর্থে খুঁজিয়া পায় নাই। তার কেবলই মনে হইতেছে, এসময়ের মধ্যে কোথায় মস্তবড় একটা অসম্পত্তি রহিয়াছে—বার কথা মা হয়ত নিজেরই জ্ঞানেন না।

যাহা হউক, মাঝে সাত্বনা দিবার ছলে সে বলিল,

‘মাসীমার আছে যাবে—ভাল কাপড় পরে নাইবা গেলে, মা। এ ত আর বিয়ের নেমন্তন্ন যোগ্য নয়।’

সুনয়নী দেবীর মনে কথাটা গাঙ্গিল। মেয়ে বড় হইয়াছে, কিছু লেখাপড়াও শিখিয়াছে, কথাটা বলিয়াছে নেহাৎ বুদ্ধিহীনতার মত নহে। সত্যই ত, তাঁহার আদরিণী ভগিনীর আছে—সেখানে স্নেহময়ী স্মিতির সাক্ষাৎ করিয়া যাওয়াটা খুবই লজ্জার কথা। পাঁচ জনে কিছু না বলুক, নিজের একটা বিবেচনা আছে ত।

সোৎসাহে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া তিনি বলিলেন, ‘কাপড়গুলো এ-ঘরে নিয়ে আর ত, না। দেড়ি গুর মধ্যে ছেঁড়াখোঁড়া না-হয়, রাউজের মিল খান—’

৪

ছেঁড়াও নহে, রাউজের মিল আছে—এমন কাপড় খান-দুই মিলিল।

সুনয়নী স্বামীকে বলিলেন, ‘একখানা গাড়ী ভাড়া ক’বে তুমিই না-হয় আমাকে রেখে এস সেখানে। সুখা রইল, এ-চারটে দিন সে চালিয়ে নেতেন।’ একটু থাকিয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিলেন, ‘সেখানকার ভাবগতিক দেখি, স্থখার বিষে বলে অন্তত শ-খানেক টাকা যদি নিত পারি।’

স্বামী বলিলেন, ‘ট্যান্ডিই তাকি ভাহলে?’

সুনয়নী তাড়াতাড়ি কহিলেন, ‘না, না, যেটার গাড়ীই ভাল। সে বড়লোকের কাণ্ডকারখান, কোথায় কে তার ঠিক নেই; ভাড়া যদি তারা দিতে না আসে তখন স্টা পড়বে আমাদেরই কাঁধে।’

বুদ্ধিমতী সুনয়নীর কথাই ঠিক হইল।

প্রকাণ্ড বাড়ীর প্রকাণ্ড দেউড়িতে জনকয়েক দারোয়ান জটলা করিতেছিল, এ-বাড়ীর ছেলের কাছকেও দেখা গেল না। অবশ্য, ছেলের কাছকেও দেখিসেই তাহার। যে এই বাড়ীরই তাহা সুনয়নী বলিতে পারিতেন না, তবে পরিচয়ের খেই কতকটা হয়ত ধরিতে পারিতেন।

কেহ অন্তর্ধান করিতে আসিল না দেখিয়া সুনয়নী গায়ের দশ বৎসরের পুরাতন শিকের চামরবানার একমুখ মাখায়

তুলিয়া দিয়া স্বামীকে বলিলেন, ‘তুমি যাও, আমি চিনে যেতে পারব’খন।’

গাড়ীভাড়া চুকাইয়া স্বামী ট্রাম ধরিলেন, স্থানীয় সঙ্গর্পণে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিলেন।

সে-কালের বনিয়াদী বড়লোকের বাড়ী। খানিকটা অন্ধকার-ভরা গলি পার হইতেই প্রকাণ্ড ঠাকুরদালানের উঠানে আসিয়া নামিলেন। দালানের বড় বড় কোকরজ্বলি দরবার বেড়া দিয়া ঢাকা, পাছে চামচিকা বা পারাবতহুঁ উহার মধ্যে বাসা বাধিয়া পালকে ও পুরীবে দুর্গন্ধময় করিয় তুলে তাহার জন্ত এই সতর্কতা। পূজার দালানের চারি দিবে চকমিলানো বারান্দাসমেত ঘর। উঠানটিতে ছেলের অনায়াসে বল খেলিবার মাঠ তৈয়ারী করিতে পারে। বিহু আশ্রয়, না দালানে, না উঠানে, না বা চকমিলানো দ্বিতল বারান্দায় লোক দেখা যায়। শোকের বড় যে বাড়ীখানির উপর দিয়া ভাল ভাবেই বহিয়া গিয়াছে, স্থানীয় তাহা বুঝিলেন। রমলার অশরীরী আত্মা হয়ত বা এই জনহীন পুরীর গাভীরে চলাকের করিতেছে। কথাটা মনে হইতেই তাঁহার গা ছম-ছম করিয়া উঠিল এবং চোখ-কন বুজিয়া ঠাকুরদালানের পাশ দিয়া যে-পথ অন্ধরাভিমুখে গিয়াছে তাহার মধ্যবর্তিনী হইলেন। মাঝপথে আসিতেই ও-বাড়ীর কোলাহল কানে গেল। কোলাহলটা কেন বলিয়াই মনে হইল। পূজার বাড়ীতে রমলার আত্মা নির্জন গাভীরে অমর দেহ লাভ করিতেছে, অন্দরে শরীরী রমলা হয়ত বা জাগিয়া বসিয়া আছে। এক পারে মরণ, আর এক পারে জীবন।

অন্দরে প্রবেশ করিবার মুখে স্থানীয় একবার থামিলেন, ভাবিলেন, ভগিনী-পুত্র বা পুত্রবধূ বাহারই সম্মুখে গিয়া পড়ুন না কেন—পরিচয় দিতে তাঁহার বাধিবে কি না? না, বাধিবে না, শোকের পরিচয় পত্র তাহার সঙ্গেই রহিয়াছে। মাতৃ বা স্বজ্ঞহারাণের দেখিলেই চোখের জল দিয়া সেই পরিচয়-লিপি ভাল করিয়া লিখিবেন। ভগিনীর বিয়োগ-দুখে তিনি কাঁদিলেই তাহাদেরও চোখে জল করিবে এবং পরস্পরকে সাঙ্গনা দিবার সুযোগে পরস্পর

নিকটবর্তী হইবেন। বাজে হাসবাসীর সামনে কাঁদিলে কোন ফল হইবে না।

অন্দরে ঢুকিতেই প্রথমে নজরে পড়িল, একটি অল্প-বয়সী বধু কয়েক জনকে কি উপদেশ দিতেছেন। বধুর বর্ণ সাদা, বয়স শাড়ী ও অলঙ্কার-প্রাচুর্যে অস্বাভাবিক হ্রাসাধা। তবে শ্রী আছে, কর্তৃত্বের একটি মর্যাদা তাহার চালচলনে ফুটিয়া উঠিতেছে। যদি না দামী জর্জেট শাড়ী ও অল্প ভরিয়া অলঙ্কার পরিয়া সে থাকিত ত তাহাকেই রমলার পুত্রবধূ ভাবিয়া স্থানীয় কাঁদিয়া আছাড় খাইয়া না পড়ুন—অন্তত মাটিতে বসিতেন! কিন্তু ঐ বধুটি কিছুতেই রমলার পুত্রবধূ নহে। কারণ, এত বড়লোকের ঘরের বউ স্ত্রীমবর্ষের হইতেই পারে না, এবং রমলার বড় আদরের আদরিণী বধু কোন দুখে একতলার স্যাঁত-সেঁতে বারান্দায় পা দিয়া হাসবাসীদের উপদেশ দিতে আসিবে! তা ছাড়া স্বজনবিয়োগে শোকাভূরা বধুর যে ছবিটি স্থানীয় দেবী মনের মধ্যে আঁকিয়াছেন, ইহার সৌভাগ্যগণিত হাসিমাখা মুখখানিতে সেই পরমক্লেশের একটি মাত্র ও ক্লান্ত রেখাই বা কোথায়?

সামনের সিঁড়ি দিয়া তিনি দ্বিতলে উঠিলেন। দ্বিতলে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতেও যেন মরিচা ধরিবার উপক্রম হইল। চণ্ডা বারান্দায় এত বিভিন্ন বয়সের মেয়ে দেখা গেল যে, কে বা এই বাড়ীর বধু, কেবা আমন্ত্রিতা কুটুম্বিনী কিছুই বোঝা যায় না। বর্ষের মধ্যে স্ত্রী আছে, গৌর আছে, দুখে-আলতা আছে। শাড়ী ও বেশভূষায় কেহ রাজেশ্রোণীতুল্যা, কাহারও বা বনিয়াদী চাল, কেহ আধুনিক, কেহ বা একাল-সেকালের মধ্যবর্তিনী। কাহারও মুখে হাসি-কৌতুকের হালকা আলো, কেহ বা বর্ষাসঙ্ক্যার মত স্নান, কাহারও শ্রী গাভীরে ফুটিয়াছে, কেহবা কুয়াশামান শীতের রাজির চাঁদ। মাথা ঘুরিবারই কথা; সহজ পরিচয়ের যোগসূত্রটি কোথায় ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্থানীয় দেবী এক হাট অপরিচিতা রমণীর সম্মুখে পাড়াইয়া তাই ঘামিয়া উঠিলেন। একটি মেয়ে তাহার পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, ‘কে গা তুমি? কি চাও?’ মেয়েটির প্রশ্নে আর পাঁচ জনেও স্থানীয় পানে চাহিল

এবং একসঙ্গেই কৌতূহলভরা বিচিত্র কণ্ঠের কলরব তুলিল। সুনয়নী আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না। সহজ উত্তরটা তাঁহার পক্ষে এমনই শক্ত হইয়া উঠিল যে, কোন কথা না বলিয়া তিনি সেই মেঝের উপরই বসিয়া পড়িলেন এবং ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিলেন।

৬

যখন চক্ষু চাহিলেন, তখন পরিচয়ের পরম লগ্ন বহিয়া গিয়াছে। সে-চক্ষুতে বিশ্বয় ছিল প্রচুর, জল ছিল না এতটুকু, এবং স্ত্রীমবর্ণের সেই বধুটি—যাহাকে একতলায় সর্বপ্রথম দেখিয়াছিলেন—একখানা সোফার উপর বসিয়া তাঁহার নিকে চোখ রাখিয়া পার্শ্ববর্তিনীদের পানে চাহিয়া হাসিয়া হাসিয়া কথা বলিতেছেন দেখিয়া সুনয়নীর বৃত্তিতে বাকী রহিল না, কি সাংঘাতিক ভুলই তিনি করিয়াছেন। গরীবের শোকপ্রকাশের ডাকী আর বড়লোকের শোক প্রকাশের শোভা দুইয়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। গরীবের যেখানে দৈন্ত, বড়লোকের সেইখানে মধ্যাধা। গরীবের হাসির অশোভনতা আর বড়লোকের হাসির শালীনতা—প্রকাণ্ড হলে যেমন মাটির প্রদীপ আর বিদ্যুৎ-বাতি। একই জিনিষ ক্ষেত্র-হিসাবে মানায় ভাল।

সুতরাং না কাঁদিয়াও কৌণকণ্ঠে পরিচয় দিতে হইল, অবশ্য, যতটা পারিলেন করণ রসের খাদ্যটা মিশাইয়া দিলেন।

‘আর মা, আমরা বুড়ো-হাবড়া—আমরা রইলাম পড়ে, ভাগ্যমানী এয়োরাণী রমু আমার ডাংডেডিয়ে চলে গেল! পোড়া যমের কি আক্কেলও নেই, মা। বড় বোন থাকতে ছোট বোনকে টেনে নেয়! আহা! রমু আমার দিদি বলতে অজ্ঞান—’

পাশের একটি সৌন্দর্যময়ী মেয়ে বলিল, ‘আপনাকে ত আমরা দেখি নি কোন দিন—এ বাড়ীতে।’

সুনয়নী শুক চক্রে অকলাগ্র ঘষিতে ঘষিতে উত্তর দিলেন, ‘দেখবে কি, মা! এ-পোড়ামুখ দেবাবার মত ত নয়, আমি অভাগী—’

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। চারি দিকে চাপা ও সকৌতুক হাস্যধ্বনি উঠিল, খতমত খাইয়া সুনয়নী থামিলেন,

এমন কি অসংলগ্ন কথা তিনি বলিয়াছেন যাহাতে কৌতুকের সৃষ্টি হইতে পারে।

সেই মেয়েটি পুনরায় প্রশ্ন করিল, ‘আপনি তাঁর কে হন? বোন বলছেন, কিন্তু তাঁর কোন বোন ছিল বলে ত আমরা শুনি নি?’

সুনয়নী তাড়াতাড়ি বলিলেন, ‘রমু আমার খুড়তুত বোন। তা আপন বোনেও—’

বাধা দিয়া মেয়েটি বলিল, ‘তাঁর খুড়ো কি জোঠা ছিল বলে ত শুনি নি তাঁর মুখে?’

সুনয়নী একটু থামিয়া বলিলেন, ‘আপন খুড়ো ত নয়, দূর-সম্পর্কের—’

‘বুঝেছি।’ বলিয়া মেয়েটি হাসিল।

সুনয়নী তাহার হাসি লক্ষ্য না করিয়াই বলিয়া চলিলেন, ‘আমার দুঃখ রমু বুঝত, তাই মাসে মাসে তার বোনঝির পড়বার অল্প পাচটা করে টাকা পাঠাত। এমন সতী-লক্ষ্মী দয়াবতী বোন—তাকে কি যম—’

কিন্তু করুণ রস জমাইবার অবদান না দিয়া স্ত্রীমবর্ণী বউটি মেয়েটির পানে চাহিয়া মুহূর্তে বলিল, ‘ঠাকুরকি আর জালাস নে, খাতাখানা খোস দেখি। কি নাম আপনার?’

সুনয়নী ক্রমশঃই নিশ্চেষ্ট হইয়া আসিতেছিলেন। ইহারা কল্পনের অর্থ বৃত্তিতে চাহে না, সম্পর্কের খুঁটিনাটি বিচার করে। এচও শোককে সন্তুষ্ট লইয়া যাহুব এমন প্রাপখোলা হাসিই বা হাসে কি করিয়া? শাওড়ী বউয়ের কাছে বালাই হইতে পারেন, মেনের মনে মমতার লেশ মাত্রও কি নাই!

মেয়েটি খাতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে জিজ্ঞাসা করিল, ‘কি নাম আপনার বলুন না?’

সুনয়নীর চিন্তাস্বর হিঁড়িয়া গেল, জ্বন্তে বলিলেন, ‘শ্রীমতী সুনয়নী দেবী।’

খস্ খস্ শব্দে খাতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মেয়েটি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, ‘টাকা কি বরাবর আপনার নামেই যেত?’

‘হাঁ, মা।’

‘এই যে। ৭০।১। বি...লেন, সুনয়নী দেবী।’

জামবর্ণের বউটি জিজ্ঞাসা করিল, ‘রিমার্কের ঘরে কিছু আছে ?’

‘এই যে—’ বলিয়া মেয়েটি মুহূ হাসিয়া এক জাম্বার আড়ল রাখিল।

‘ও’—বলিয়া বউটিও হাসিল।

৭

বউ এবং মেয়ের নির্দেশমত স্নানরূমের বাসা দেখে নিশ্চিন্ত হইল, সেটা একেবারে অন্তরের শেষ। পুরানো দোতলা ঘর, ছয়টি কক্ষ, জানালা একটির বেশী ছুটি নাই। বৎসরে একবার করিয়া গোলা কিরানো হইলেও অত্যন্ত পুরাতন বলিয়া নোনা ধরিয়া সেই চূপ-কামের স্ত্রী দ্বারা করিয়া ছুটিতে পায় না। স্ত্রী না ছুটিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কারণ এই মহলে যাহারা আশ্রয় লাভ করে তাহাদের সঙ্গে বাসভবনের বিশেষ যোগসূত্র থাকে। বাহনীর বলিচাই হস্ত ইহার মনে করেন না।

ঘরের সাজসজ্জা মন্দ নহে। ইচ্ছা করিলে ছোট খাঁট একখানা মিলিতে পারে, ইচ্ছা করিলে মেঝের শয়নের ব্যবস্থাও আছে। জাপানী চিত্র-বিচিত্রিত মাহুর, ধবধবে চামর, বালিশ ও পাতলা ভোবক একখানা করিয়া সকলেই পাইয়াছেন। আর পাইয়াছেন হাত-পা ধুইবার জন্য পিত্তলের ঘটি, মাঝারি বালতি, জলপানের জন্য জুমিনি-য়মের গ্লাস। ঘরের কোণে জলভরা একটি কুঁজা আছে, বিদ্যুৎ-বাতির কল্যাণে দীপাশলাই হাতড়াইতে হইবে না। বেশ ব্যবস্থা। অতিথি-সংস্কারের জন্য এই সার্বজনীন ব্যবস্থাটা স্নানরূমের মনঃপূত হইল না।

একটি মেয়ে আর পাঁচ জনের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে বহুক্ষণ হইতে স্নানরূমকে লক্ষ্য করিতেছিল এবং কিং কিং করিয়া হাসিতেছিল। মেয়েটির বয়স পঁচিশ-তাক্ষি হইতে পারে, জিশ-বজিশ হওয়াও আশ্চর্যের নহে। সম্ভার পারিপাট্যে যেমন বয়স অনুমান করা সময়ে সময়ে ভ্রাস্য হইয়া উঠে, স্ত্রীহীনতার যৌবনের সৌষ্টব তেমনই সব সময়ে প্রকাশ-গৌরব লাভ করে না। মেয়েটির হাসি শোকের বাড়ীতে দুঃখের মতই বোধ হয়।

স্নানরূম অগ্রসর কর্তক্ষে মেয়েটির পানে চাহিবামাত্র সে

সম্মুখে হাসিয়া উঠিল, এবং হাসিতে হাসিতেই তাহার কাছে আসিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ‘আজ এলেন বুঝি ? তা আপনি রমলাদির কে হন ?’

স্নানরূমী প্রশ্ন কৃত্তিত করিয়া মনের অগ্রসরতাকে নীরবে প্রকাশ করিলেন, কথা কহিলেন না।

মেয়েটি দ্রুতখনে হাসি থামাইল না, বরং পূর্বাপেক্ষা মাত্রা বাড়াইয়া কহিল, ‘আর সঙ্গে গল্প করছিলাম উনি সম্পর্কে রমলাদির পিসি। কাল এলেন। আসবামাত্রই সে এক মহামারী ব্যাপার। পড়লেন আছাড় খেয়ে কলতলায়, সঙ্গে সঙ্গে সে কি মড়াকার! সবাই অবাক। ধরাধরি করে নিয়ে এল এই মহলে। বুড়ো মাহুর হস্ত হাত-পা ভেঙে গেছে বলে ডাক্তারকে দেখিয়া হ’ল ধবর। ডাক্তার এসে দেখলেন, হাত-পা ত ভাঙেই নি—কোথাও জাঁচড়াটি পর্যন্ত লাগে নি ঠুঁর।’ বলিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

স্নানরূমী কথা কহিলেন না।

হাসি থামিলে মেয়েটি পুনরায় আরম্ভ করিল, ‘আর ঠুঁর পাশে বসে যিনি হাত নেড়ে কথা কইছেন, উনি মাসী। তিন টাকা মাসোহারা পেতেন, থাকতেন কান্নিতে। তা বোন-বির শোক পেয়ে মাথা এমন খারাপ হয়ে গেছে যে রাতের খাবার লুচি থেকে কাল চারখানা সরিয়ে রেখেছিলেন, আজ সকালে জল খেলেন।’

আবার হুঁকা হাসি।

স্নানরূমী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ‘আমার শরীর খারাপ, আপনি কথা করে ঘরে যান।’

মেয়েটি পা ছড়াইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল ও পূর্বের মতই হাসিতে হাসিতে বলিল, ‘পিস-শান্তড়ীর কথাটা শুনবেন না ? আহা! খাতায় দু-টাকা মাসোহারা ছিল শুনে বা শাপমন্দিটা দিলেন আজ। বলেন, চিরটা কাল চার টাকা করে পেয়েছি—এখন হ’ল দুই ?’

স্নানরূমীর মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইল, ‘তার মানে ?’

‘মানে সোজা। এঁরা কুটুম-বিদায় দেবেন একখানা কাপড়, এই বিছানাপত্র সব আর যে যত টাকা করে মাসোহারা পেতেন—তাকে এককালীন টাকায় দশ টাকা করে। বুঝে-দেখুন পিস-শান্তড়ীর লোকসান কত।’

সুনন্দী শুইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিলেন।

হাসি খামাইয়া মেয়েটি পুনরায় কহিল, ‘আর মাসীর কথাটা শুনুন। ওই যে খয়ের স্মার্ট শাড়ী পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ‘দস্যি’র মত, উনি। ও-মহলে গিয়েছিলেন কাজ করতে। বলেন, ‘কাজের বাড়ী, গতর কোলে ক’বে ব’সে থাক। কি ভাল!’ বউরাণী কি বলেছেন জানেন? বলেছেন, আপনারা নিকট-আত্মীয়, আপনাদের কি খাটাতে পারি। ও-সব ঠাকুর-চাকরের কাজ ওরাই করবে।’

কথটার মানে বুঝিতে না পারিয়া সুনন্দনী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

মেয়েটি হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া কহিল, ‘আপনি ত ভাবি বোকা। বুঝলেন না? পরকে কেউ কি বিশ্বাস করে ভাঁড়ারে হাত দিতে দেয়। আমরা খুব নিকট-আত্মীয় কিনা!’

সুনন্দনী শুইয়া পড়িয়া কহিলেন, ‘আঃ, মাথাটা যা ধরেছে।’ মেয়েটি হাসি খামাইয়া কহিল, ‘টিপে দেব একটু? না, বেশ ত আপনি। ওঁরা বড়লোক, ওঁদের সঙ্গে সত্যিকারের সম্বন্ধ হয়ত গড়ে ওঠে না, কিন্তু আপনার আমার মধ্যে কেন ফাঁক থাকবে? দিই না টিপে?’

সুনন্দনী বিরক্ত হইয়া ঝাঁঝিয়া উঠিলেন, ‘না।’

অপত্তা মেয়েটি ক্ষুণ্ণমনে উঠিল এবং ছদ্মবেশের বাহিরে পা দিয়াই হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ‘কিন্তু বললেন না ত—আপনি রমলাদির কে?’

ঝাঁঝের মুখেই সুনন্দনী উত্তর দিলেন, ‘কেউ নই।’ মেয়েটি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

সুনন্দনী ঝাঁঝের মুখে উত্তর দিলেন বটে ‘কেউ নই’, কিন্তু মন স্থির করিয়া আর একবার সম্বন্ধ-বন্ধনের কথাটা ভাবিতে বসিলেন।

কে বলিল, রমলার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ওই পাতানো মাসী-পিসির মতই মোখিক। রমলার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তিনি চীৎকার করিয়া কান্দেন নাই সভ্য, ইচ্ছা করিলে সেই মুহূর্ত্তে চোখে নদী বহাইয়া কান্দাটা কিছু বিচ্ছিন্ন ছিল না। স্নেহ না থাকিলে রমলা তাঁহাকে মাস-মাস টাকা

পাঠাইত না। আর তিনিও কি ওই দুশীলা পিস্মাশুড়ীর মত কম প্রাপ্তির লোভে রমলার মেয়ে বউকে শাপান্ত করিতে পারিতেন? রমলার মেয়ে ও বউ যদিও ঐ সমস্ত মৃৎসর্ষধ আত্মীয়ের ব্যাহারে আসল-নকলের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার বাসস্থানও এই অতিথিশালায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছে, তবু, আজ হউক কাল হউক, সে ভুল তাহাদের ভাঙিবেই। বাল্যের সাহচর্যে মধু বা বিষ কোনটাই ছুই বোনেব অন্তরে ভরা ছিল না, ঘোবনের কণ্ঠস্বর আন্তরিকতা খানিকটা ছিল বইকি। যে দূর-সম্পর্কের খুড়তুত বোনের ঐশ্বর্য লইয়া তিনি পাঁচ জনের কাছে নিজেকে বিস্ফাবিত করিয়া অভুল আনন্দ ও গৌরব উপভোগ করিয়াছেন, হয়ত নিরালা মুহূর্ত্তে সেই ঐশ্বর্যের অগ্নিশিখা নীরবে তাঁহাকে দগ্ধ করিয়াছে। দগ্ধ করিলেও সেই ভস্মরাশি তিনি কোন দিনই মুখে মাখেন নাই।

বাড়ী ফিরিয়া তিনি প্রতিবেশিনীদের কাছে গল্প কবিতার অনেক কিছু পাইবেন। চোখোচোখি এমন সমাবাহময় প্রাসাদ ও রাণীতুল্য বউঝির দেখা কম ভাগ্যের কথা নহে। তিনি ভাগ্যবতী বলিয়াই এমনধারা একটা রাজসিক ব্যাপারে নিমজ্জিত হইয়াছেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি চক্ষু মুদিলেন ও বন্ধনা করিলেন, এই প্রাসাদের চেয়ে সেই দুখানি স্যাঁতসেঁতে এক তলার চূণবালি-খস। অঙ্ককারময় ঘরের মূল্য কতখানি। তুলনা করিলেন, এখানকার ফরসা চাদর, নূতন মাহুব ও বালিশ-ভোষকের সঙ্গে সেই দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা ছেঁড়া কাঁথা, ফুটা বালিশ ও ছেঁড়া মাহুর। এখানে দিন পাঁচ তরকারি ভাত, রাজিতে লুচি আর সেখানে মোটা চালের সঙ্গে একটিমাত্র তরকারি, এক বেলার আয়োজনে দুই বেলা চলিয়া যায়।

আর লাভের কথা? এই ত্রয় দিন রাজভোগ ছাড়া বিদায়কালের মোটা লাভটা,—এই বিছানা, বালিশ, মাহুর, চাদর, ঐ বালতি, ঘটি, গ্লাস, গামছা। আর পাঁচ টাকা মাসোহারার এককালীন পঞ্চাশ টাকা প্রাপ্তি। কাজ করিতে হইবে না, কান্দিতে হইবে না, চাই কি, ওই পিস্মাশুড়ীর মত শাপমন্দি দিলেও এককালীন টাকাটা কেহ বন্ধ রাখিতে পারিবে না। খাতায় রমলার নিজের হাতের লেখা যে ১০০

কক্ষান্তরে মেয়েটির খিল খিল হাস্তধ্বনি শোনা গেল এবং সুনয়নীর বুকে সেই হাসির শাণিত তীর সজোরে আসিয়া বিধিল। ছটফট করিতে করিতে তিনি উঠিয়া বসিলেন। ঐ হাসির বিষাক্ত তীর বাহির করিতে না পারিলে তাঁহার মৃত্যু বুঝি অনিবার্য! তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, প্রাসাদের সমস্ত প্রসাদ ভোগ করিবেন, অশ্রুচ পঁচ জনের কাছে সে কাহিনী বর্ণনা করিয়া সেই তীর হৃৎকে হৃৎ আর উপভোগ করিতে পারিবেন না। এই

হাসি তাঁহার আত্মপ্রাণে মনোবৃত্তিকে পলে পলে ধ্বংস করিয়া দিতেছে।...

পুনরায় তিনি শুইয়া পড়িয়া দুই হাতে কান ঢাকিয়া রমলার ভালবাসা, সম্পদের আড়ম্বর এবং আপনার লাভকে প্রাণপণে স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, এই পরম প্রাপ্তির উল্লাসকে মনের মধ্যে বৃত্তই নিবিড় করিয়া রচনা করিতে লাগিলেন, সুনয়নীর চোখের কোলের আশ্রিতা ততই যেন বিন্দু রচনায় অদৃশ্য হইয়া উঠিল।

নিবেদন

ঐনিরুপমা দেবী

তুমি কবি

তুমি ঐক ছবি

তুমি গাহ মধুময় গান

সকল মাধুর্য তুমি কর রসবান।

আমি লোভী

আমি নহি কবি

হৃদয় ভরিয়া করি পান

ভাবের নিব্বর-ধারা তব মধু দান।

এই মত আজীবন

তুমি দাও আমি শুধু ভরে নিই মন।

তার পর

একদিন আমার অন্তর

তোমার গানের মায়াঝালে

একান্ত আড়ালে

বুনিয়াছে যে স্বপনখানি,

তব বাণী

আনিয়াছে দূরগত যে মোহন বাণী

গৃহছাড়া মরম উদাসী ;

যে নিবিড় বনানীর ছায়া

স্বপ্নময়ী যে নির্টোল কায়

প্রণয়ের স্বরণের মায়ালোক হ'তে

ভাসিয়া আসিল মনে কল্পনার স্রোতে ;

সে দিগ্ধি উল্লাস,

সে ললিত তরুর বিলাস,

মোর কর-পরশনে

একদিন নিরঞ্জে

রূপান্বিত হ'ল মনে রূপের প্রকাশ।

বুঝিলাম তব গান

নিতে চাহে প্রাণ

নিতে চাহে রসময় রূপ

আমার পরশে কোটে ও তোমার স্রবের স্বরূপ।

অরূপের রসধারা

আত্মহার

ছিল যাহা বাণী অমরায়

ধরা দিল কেন আসি রূপের কারায় ?

ফুলে যাহা অপরূপ রূপ হয়ে রাজে

রসরূপে তাই ফিরি আসি ফলমাঝে

এক দিন ধরা দিয়ে যায় ;

যে মাটি জোগায়

ফুলে রূপ ফলে রসরাশি

অরূপের স্বরূপে বিকাশি

সে মাটির করে নিবেদন

ফল তারি রসধারি মধুর জীবন।

তোমার দানেতে ঋণী হয়ে

কবি আমি আনিয়াছি বয়ে

সেই মোর দান।

আমি দিব তুমি নিবে রাখিবে সম্মান।

দিব্য-প্রসঙ্গ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এম-এ, পিএইচ-ডি

একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালার রাজনৈতিক রক্ষকের অন্ততম শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক দিব্যের চরিত্র ও কাব্যাবলী সম্বন্ধে সম্প্রতি বাঙ্গালী ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে বহু বাদানুবাদ চলিতেছে। কেহ কেহ তাঁহার অল্পকালে, কেহ বা তাঁহার প্রতিফুলে, যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া রায় দিতেছেন। দিব্যের জীবনীর উপাদানের অগ্রাচুর্নাই যে এই মতভেদের অন্ততম প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক ১৮৯৭ সালে আবিষ্কৃত এবং ১৯১০ সালে বেঙ্গল (রয়্যাল) এশিয়াটিক সোসাইটির আনুফুলো প্রকাশিত ‘রামচরিত’ কাব্যই তাঁহার মূল ইতিহাস উদ্ধারের প্রধান উপকরণ। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালেব রাজ্যকালেই এই মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা পালরাজগণের অধীনে উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং তজ্জন্ত সমসাময়িক সভ্য ঘটনা জানিবার তাঁহার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। সুতরাং রামপালের রাজত্বকালের এবং উহার অব্যবহিত পূর্বে ও পরবর্তী ঘটনাবলী সম্বন্ধে ‘রামচরিত’ একটি শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ, ইহা অনায়াসে স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গল্পে কথিত মনুষ্যচিত্রিত সিংহের ছায় ইহা এক পক্ষেবই উজ্জ্বল। তদুপরি ‘রামচরিত’ একটি কাব্য মাত্র। কেবল তাহাই নহে, ইহা রাঘব-পাণ্ডবীয়ের মত একটি দ্ব্যর্থ কাব্য। ইহার শ্লোকগুলি এক পক্ষে দশরথজনয় রামচন্দ্র ও অপর পক্ষে পালরাজ রামপালের প্রতি প্রযোজ্য। যেখানে কবি ঐতিহাসিকের আসন অধিষ্ঠার করেন, সেখানে ইতিহাসের মর্যাদা সম্যক রক্ষিত হইবে, ইহা প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বর্ণনীয় ঘটনার স্থান ও কালের নির্দেশ, ঘটনাপরম্পরার সুস্বচ্ছ বিবরণ, প্রধান নায়কদিগের চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রভৃতি ইতিহাস-শুল্ক সাধারণ লক্ষণগুলি কাব্যে উপেক্ষিত হইবে, ইহাই ত

স্বাভাবিক। রামচরিত কাব্যেও এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ‘রামচরিত’ দ্ব্যর্থ কাব্য হওয়ায় আর একটি ফল হইয়াছে যে, ইহার বর্ণিত তথ্যগুলি রামায়ণের পক্ষে সুবিদিত হইলেও সমসাময়িক ইতিহাসের পক্ষে একান্তই অস্পষ্ট। ফলতঃ এক অসম্পূর্ণ টীকার সাহায্যেই শ্রেণোক্ত তথ্যগুলির অর্থ আমরা কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারি।

এক্ষেণে আমরা দিব্যকে কেন্দ্র করিয়া যে-সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের কথঞ্চিৎ মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইব।

দিব্যের জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা ত্র্যম্বককর্তৃক বরেন্দ্রী গ্রহণ। যে হতভাগ্য পালনৃপতি তাঁহার ‘জনকভূমি’ (অর্থাৎ জন-ভূমির) অধিকার হইতে এইরূপে বঞ্চিত হইলেন, তিনি কি চরিত্রেব লোক ছিলেন? রামচরিতের আটটি পরম্পরসম্বন্ধ শ্লোকে (কূলকে) বর্ণিত হইয়াছে, কিরূপে জনকজনয়া সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃত হইলেন এবং কি প্রকারে পালরাজের ‘জনকভূমি’ বরেন্দ্রী দিব্য কর্তৃক গৃহীত হইল। কূলকের আদ্য শ্লোকটি এই :—

প্রথমমুপগতে পিতরি মহীপালে ভ্রাতরি কন্যাতারু।

বিজ্ঞানীকা [রত] রতে রাশাধিকারিতাং বধতি ॥ ১৩১

রামপালপক্ষে ইহার অর্থ :—‘প্রথমে পিতার পরলোক-গমনের পর ভ্রাতা মহীপাল রাজা হইয়া ‘অনীতিক আরম্ভে’ রত হইলে রামপাল অত্যাধিক মানসিক ক্লেশ প্রাপ্ত হওয়ায়’—। এখানে তর্ক উঠিয়াছে, এই ‘অনীতিক আরম্ভ’ শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া। এক পক্ষ ইহার টীকাসম্মত সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন, মহীপাল নীতিবিরুদ্ধ কার্যে রত ছিলেন। এই মন্ত্রের অল্পকালে তাঁহার আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

লোকান্তরপ্রাপিণো দুর্ন রক্তানোহগ্রজ্ঞানো যসনাং।

পতিভাঙ্করবত্যাহুত্বাৎসহরি গোতনী তেন ॥ ১৩২

ইহার ভাবার্থ:—রামপালের পরলোকগত দুর্নীতি-পরায়ণ জ্যেষ্ঠভ্রাতার বাসনের নিমিত্তই পৃথিবীর রাজি আপত্তিত হইয়াছিল। রামপাল নিজ প্রভাবে উহা উন্মূলিত করিয়াছিলেন। আলোচ্য মতের স্বপক্ষে উক্ত কুলকের অন্তর্গত আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়:—

রামে তু চিত্তকুটম্বিকটোপলপটলকুটুম্বিকটোরম্ ।
ভূনিভৃতমাগতিতে তপস্বিনি মহাশয়েঃসহসে ॥ ১৩২

রামপালপক্ষে ইহার টীকা এইরূপ:—‘চিত্তকুটম্বিকটোপলপটলকুটুম্বিকটোরম্’ অর্থাৎ শিলাকুটুম্বিকটোরম্ কর্ণশং ভূতৃত্যং মহীপালং তপস্বিনি অহুকম্পাহংদশাপম্’। টীকাসম্মত-ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থটেন মহীপালকে বলা হইয়াছে, তিনি অদ্বুত মায়ী স্বজন করিতে পারিতেন ও শিলাময় কুটুম্বিকের (মেরের) মত কর্ণশ ছিলেন। কুলকের আর একটি শ্লোক এইরূপ:—

বজনহানবুহে ভূতনয়াত্রাণবুজদায়াদে ।
বিদ্যাবিলাসচক্ৰমারাবুপকুজকাস্ত্রিতে ॥ ১৩৩

এখানে মহীপালকে ‘ভূতনয়াত্রাণবুজ’ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মুক্তি প্রদায়কসারে টীকাকার ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন ‘ভূতং সত্যং নয়ো নীতং জয়োর (রঃ) কণে বুজঃ প্রসক্তঃ’। ইহার তাৎপৰ্য্য এইরূপ গৃহীত হইয়াছে, মহীপাল সত্য ও নীতির ‘অরক্ষণে’ নিযুক্ত ছিলেন।

এই ত গেল এক পক্ষের মত ও যুক্তি। এই মত অনুসারে মহীপাল দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন, চলপ্রয়োগে তাঁহার অদ্বুত শক্তি ছিল, তিনি শিলাকুটুম্বিকের মত কর্ণশ ছিলেন, তিনি সত্য ও নীতির ‘অরক্ষণে’ সদাই ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রতিপক্ষের মত ও যুক্তি ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পূর্বোক্ত কুলকের আদ্যশ্লোকে ‘অনীতিকারস্বরতে’ শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাকার বাহা বলিতেছেন তাহার তাৎপৰ্য্য এইরূপ। ‘মহীপাল বাড়গুণাবুজ মজীর উপদেশ অবহেলা করিলেন। কিরূপে করিলেন? সম্মিলিত অনন্তসামন্তচক্রের চতুরঙ্গবলসম্বিত সেনাদলের আক্রমণে তাঁহার সৈন্তগণ অতিশয় ভীত হইল। কেহ কেহ হস্তদ্বিত অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। কাহারও কাহারও বহু কুস্তন উন্মুক্ত হইল, কেহ কেহ পলায়নে উদ্যত হইল। বাহাদুর রহিল, তাহার। স্বেচ্ছায় অতিশয় ক্ষতি বরণ করিল। তথানি মহীপাল শৌর্যবীর্যগুণে সম্যক পরিপুষ্ট না হইয়াই সামন্ত-চক্রের চতুরঙ্গবলের সহিত কষ্টভর সমর আরম্ভ করিলেন

এবং তাহাতে নিমজ্জিত হইলেন। প্রতিপক্ষ বলিতেছেন, মহীপালের নীতিবিরুদ্ধ কার্য ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার। আরও বলেন ১২২ শ্লোকে উদ্ধৃত ‘দ্বনয়ভাক্’ শব্দের দ্বারা যুদ্ধ বিষয়ে মহীপালের এই অপরিণাম-দর্শিতাই সূচিত হইতেছে এবং ১৩২ শ্লোকে ‘চিত্তকুট’ ও ‘বিকটোপলপটলকুটুম্বিকটোর’ নামক যে দুইটি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তথায় ‘ভূমিভূতের’ অর্থ মহীপাল নহে, ভূগর্ভস্থ কারাগার মাত্র। পরিশেষে, তাঁহাদের ইহাই মত যে টীকার স্বার্থ পাঠ (‘ভয়োরক্ষণে’র পরিবর্তে ‘ভয়োরক্ষণে’) অনুসারে ১৩৩ শ্লোকের ‘ভূতনয়াত্রাণবুজ-দায়াদ’ শব্দের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, মহীপাল সত্য ও নীতির রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং প্রমাণিত হইল, মহীপাল নীতিজ্ঞ মজীর উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া পলায়নপর বৎসামাত্র সৈন্তের সহিত প্রবল সামন্তচক্রসেনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, ইহাই ছিল তাঁহার নীতিবিরুদ্ধ কার্য। প্রকৃতপক্ষে তিনি সদাই সত্য ও নীতির রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন।

যে দুইটি বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ করা গেল, তাহার স্বার্থ বিচারের উপর নির্ভর করিতেছে দ্বিবেদ্য চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের স্বার্থ ধারণা। যদি মহীপাল সত্য-সত্যই এক জন দুর্নীতিপরায়ণ, চলপ্রয়োগে অভ্যস্ত এবং সত্য ও নীতির লঙ্ঘনকারী রাজা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অধিকার হইতে যিনি বরজীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, তিনি ত মহাপুরুষ। অপর পক্ষে যদি ইহাই সত্য হয় যে মহীপাল সত্য ও নীতির পথ অনুসরণ করিতেই অভ্যস্ত ছিলেন এবং মাত্র এক অসমযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তাহার ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন, সে ক্ষেত্রে দ্বিবেদ্য কার্য প্রশংসনীয় বলিয়া বিবেচিত নাও হইতে পারে। প্রতিপক্ষের অহুকুলে যে একটি যুক্তি আছে প্রথমে তাহারই উল্লেখ করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। টীকাকার উপরে উদ্ধৃত ১২২ শ্লোকে ‘ব্যসনাং’ শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন ‘যুদ্ধব্যসনাং’। সুতরাং মহীপালের ‘যুদ্ধব্যসন’ (অর্থাৎ যুদ্ধে অত্যধিক আসক্তি) ইহার অধঃপতনের মূল কারণ, ইহা নিঃসন্দেহ। এই যুদ্ধব্যসনই তাঁহাকে নীতিজ্ঞ মজীর পরামর্শের বিরুদ্ধে বিশাল সামন্তচক্রের সহিত অসমসংগ্রামে প্রণোদিত করিয়াছিল;

ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। তবে কি প্রতিপক্ষের মতই সমীচীন? যদি তাহাই হইবে, তাহা হইলে ১৩১ শ্লোকে 'জনীতিকারস্বরতে' পদে 'রতে' শব্দের সার্থকতা কি? প্রতিপক্ষ ১৩২ শ্লোকে 'ভূমিস্তৃত' শব্দের যে অপরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহার প্রমাণই বা কোথায়? রামচরিতের টীকা অতিক্রম করিবার আমাদের সামর্থ্য নাই; ইহাই যদি প্রতিপক্ষের সত্য মত হয়, তাহা হইলে শেষোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহার ব্যতিক্রমের কারণ কি? ১৩৬ শ্লোকে মূল পুঁথিতে 'তয়োররক্ষণে' পাঠই আছে, আমাদের বক্তব্য। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অমূল্য সম্পাদন-নীতি অনুসারে ইহার সংশোধিত পাঠ দিয়াছেন 'তয়োররক্ষণে'। কেন দিয়াছেন তাহার কোনও যুক্তি প্রদর্শিত না হওয়ায় উহার বিচার করা অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে টীকাকার 'ভূতনয়াদ্রাণমুক্ত' পদের ব্যাখ্যায় 'মুক্ত' শব্দের অর্থ করিতেছেন 'প্রসক্ত'। উক্ত পদ যদি 'সত্য ও নীতির অরক্ষণে অভ্যধিক আসক্ত' এই স্বাভাবিক অর্থই গৃহীত হয়, তাহা হইলে কবির পরবর্তী উক্তির সহিত ইহার এক সুন্দর সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। যিনি সত্য ও নীতির মর্যাদা লঙ্ঘনে অভ্যধিক আসক্ত, তিনি 'রামপাল আমার রাজলক্ষ্মী অপহরণ করিবে' এই মোহের বশবর্তী হইয়া স্বীয় ভ্রাতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবেন, ইহা ত স্বাভাবিক। যদি রামপাল সত্য সত্যই ভ্রাতার রাজ্য অপহরণে প্রয়াসী হইতেন, তবে তাঁহার নির্ধাতন-হরত সত্যায়ুগ ও নীতিসম্মত হইত। কিন্তু কাহার কথায় মহীপাল ভ্রাতার নিকট এইরূপ সম্ভাবিত বিপদের আশঙ্কা করিলেন? কবি বলিতেছেন—'মান্নি-ক্ষনিনা' অর্থাৎ খল ব্যক্তিদের কথায়। যিনি সত্য ও নীতির অভ্যধিক লঙ্ঘনে অভ্যস্ত, তিনি খল ব্যক্তিদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া নিরপরাধ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অমানুষিকভাবে নির্ধাতন করিবেন, ইহাই ত প্রত্যাশিত। পরিশেষে প্রতিপক্ষের প্রতি আমাদের জিজ্ঞাস্য, মহীপাল যদি কেবল যুদ্ধকাণ্ডেই নীতিবিরুদ্ধ মার্গ আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি কারণে অনন্তসামন্তচক্র তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন এবং কেনই বা তাঁহারা তাঁহাকে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করিলেন?

এই মিলিত সামন্তচক্রের বিরোধের সম্ভাবিত কারণ কি একটু অল্পসন্ধান করিয়া দেখা যাক। 'মিলিতানন্ত-সামন্তচক্রের' প্রয়োগ হইতে অস্বাভাবিক হইতে পারে, এই বিরোধে একটি বা দুইটি প্রদেশে সীমান্ত ছিল না, বাদ্যলার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া ইহা উদ্ভিত হইয়াছিল। এইরূপে সম্মিলিত অভ্যুত্থানের কারণ কি হইতে পারে? আমাদের মনে হয় মহীপাল কর্তৃক সামন্তবর্গের অধিকারের হ্রাস বা বিলোপসাধনের চেষ্টাই ইহান মূল কারণ। যে জনীতিপরায়ণ রাজা খলদিগের কথায় তুলিয়া নির্দোষ ভ্রাতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিত ও কুষ্ঠিত হন নাই, তিনি সামন্তদিগের সমবেত স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াসী হইবেন ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। ইংলণ্ডের ইতিহাসে অসংখ্য ঘটনার অসম্ভাব নাই। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দুর্জিনাসক্ত রাজা এডুয়ার্ড আর্থারকে গোপনে হত্যা করিয়া স্বরাজ্যে অভ্যুত্থানের একরূপ তাণ্ডব-লীলার প্রবর্তন করিলেন যে দেশের অভিজাতবর্গ তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা কেবল স্বদেশীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদের বিশেষত্ব ও তাঁহাদের প্রধান গৌরব।

আমাদের এই যুক্তি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে মহীপালের বিরুদ্ধে সামন্তবর্গের অভ্যুত্থান মূলতঃ তাঁহাদের সমবেত স্বার্থসংরক্ষণের এক বিরূপ প্রচেষ্টা। এই অস্বাভাবিক সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। যদি সামন্তদিগের স্বার্থরক্ষাই এই বিরোধের মূল কারণ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যুদ্ধে জয়ী হইয়া স্ব স্ব কেন্দ্রে অধিকার বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইবেন ইহাই ত স্বাভাবিক। হতরায় মহীপালের ভ্রাতৃত্ব শূন্যপাশ ও রামপাল তৎকর্তৃক অকারণে নির্ধাতনের জন্য যতই তরুণ্যের পাত্র হউন না কেন, তাঁহারা সামন্তবর্গের সহায় হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং এক প্রকার নিরাজয় হইয়া পড়িবেন, ইহাই ত স্বতঃসিদ্ধ। পরিশেষে রামপাল লুপ্ত পৈতৃক রাজ্যের উদ্ধারসাধনে উদ্যত হইয়া পুনরায় সামন্তবর্গের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিবেন এবং উক্ত সাহায্যের মূল্যস্বরূপ তাহাদিগকে ভূমি ও অর্থ দান করিতে বাধ্য হইবেন, ইহাতে

বিশ্বের কোনও কারণ নাই। আমরা রামচরিতে ও সমসাময়িক তাম্রশাসনে যে বিবরণ পাইতেছি, তাহা এই কলিত ঘটনাপরম্পরার সহিত অবিকল মিলিয়া যাইতেছে। মহীপাল সামন্তবিজ্ঞোহে পরাজিত হইয়াও বোধ হয় কিছু কাল জীবিত ছিলেন। সম্ভবতঃ দিব্যের উত্তরাধিকারী জমি কর্তৃক তিনি নিহত হইয়াছিলেন। মহীপালের যুৱর পর তাঁহার দুই ভ্রাতা শূরপাল (অথবা সুরপাল) ও রামপাল পর পর রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, ইহা মদনপালের মনহলি লিপির উক্তি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কামোলি লিপিতে ও রামচরিতে শূরপালের রাজত্বের উল্লেখ না থাকায় মনে হয় তিনি স্বল্পকাল বরেন্দ্রীর বাহিরে কোন প্রদেশে রাজপদ ভোগ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে বিশেষ কোনও সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। পূর্বোক্ত মনহলি লিপিতে কথিত হইয়াছে সত্য, তিনি ইন্দ্র ও স্বপ্নের তুল্য ছিলেন, তিনি সাহসী ও নীতিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার সর্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য স্বাভাবিকবিজয়মাতীশাশালী শত্রুর দ্বারা জাস সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু তথাপি যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভের কোনও কথা বর্ণিত হয় নাই। বোধ হয় তিনি নিজে সাহস ও শৌর্য্যশ্রমে মগ্ন হইয়াও এবং যুদ্ধের প্রচুর উপকরণে সম্বলিত হইয়াও বিশাল শত্রু-বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনও সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। শূরপালের পর রামপাল রাজপদে বসিয়াও প্রথমে বিরূপে হতাশ হইয়াছিলেন তাহা রামচরিতের দুইটি স্তোকে (১৪০ ও ১৪১) স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। কবি বলিতেছেন, রামপাল তাঁহার ভুজবৃগলকে বিকল ধারণ করিয়াছিলেন এবং স্মৃত ও ইষ্টভয় মিত্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও নিজ শৌর্য্যকে বুঝা বলিয়া পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভীষ্টভূমি বরেন্দ্রী হইতে বিযুক্ত হওয়ার রাজপদকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। অল্পমান হয়, যে সামন্তচক্রের সহিত সংঘর্ষে মহীপালের রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের বন্ধন তখনও অটুট ছিল। অতঃপর রামপাল পুত্র ও অমাত্যের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাহান কর্তব্য স্থির করিলেন। তিনি বহু ক্লেশ স্বীকার করিল অর্টবীর সামন্ত ও অন্তঃস্থ রাজগণের অধিকৃত স্থান পর্য্যটন করিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার অল্পকাল এক সামন্তস্ব

গঠন করিলেন। সামন্তগণ তাঁহার নিকট ভূমি ও প্রচুর অর্থলাভে পরিতুষ্ট হইলেন। মহীপালের অনীতিক আচরণ-বশতঃ সামন্তগণ বিজ্ঞোহী হইয়া তাঁহার ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। এক্ষণে রামপাল ও তাঁহার মন্ত্রিগণের রাজনীতিকুশলতায় তাঁহারা রাজার পক্ষভুক্ত হইলেন এবং পালরাজলক্ষীর কেন্দ্র বরেন্দ্রীদেশের পুনরুদ্ধারে তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন।

আমাদের অল্পমান গ্রহণ করিবার পক্ষে আর একটি যুক্তি এই, ইহার দ্বারা সহজে বুঝা যায় কি কারণে পালবংশের এত দ্রুত অধঃপতন সংঘটিত হইল। বরেন্দ্রীর উদ্ধারের পর আপাতদৃষ্টিতে পালবংশের পূর্ব গৌরব ফিরিয়া আসিল। রামপাল চন্দ্রবংশীয় রাজাকে আশ্রয়দান করিলেন এবং মাতুল মথনের সহায়তায় কামরূপ ও অন্তঃস্থ দেশ জয় করিলেন। প্রাচ্যদেশেও বর্মবংশীয় রাজা উৎকৃষ্ট হস্তী ও রথ দানে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সাফল্য নির্দীপের পূর্বে দীপশিখার অস্বাভাবিক উজ্জলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। মহীপালের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সামন্তবর্গ তাঁহাদের অধিকার বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন, বলাই বাহুল্য। ইহার পর যখন তাঁহাদের সহায়তায় রামপাল ভীমের ধ্বংস সাধন করিলেন, তখন বাঙ্গালা এক সামন্তপ্রধান রাজ্যে পরিণত হইল, ইহা সহজেই অনুমেয়। এই জন্তই পৈতৃক রাজ্যে পালনুপত্তিদিগের অধিকার স্থায়ী হইল না। রামপাল সামন্তরাজদিগের সহায়তায় জনকজুর উদ্ধারসাধন করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের অষ্টম রাজ্যাক্ষের এবং রামচরিত কাব্য রচনার কিম্বৎকাল পরে উক্ত ভূমি রাঢ়ের সামন্তবংশোদ্ভূত বিজয়সেনের কবলিত হইল। রামপাল দিব্যবংশের উচ্ছেদসাধনে যে শাপিত অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহাই তাঁহার সম্ভানের পক্ষে কালধন্য হইল।

এক্ষণে দিব্যকর্তৃক বরেন্দ্রীগ্রহণের রহস্য উল্কাটিত করিবার চেষ্টা করা যাউক। যখন মহীপাল তাঁহার ভীত, দ্রুত ও পলায়মান সৈন্য লইয়া অনন্ত সামন্তচক্রের বিশাল বাহিনীর সহিত সমরে নিমজ্জিত হইলেন, তখন দিব্য উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ নাই। সামন্তচক্রের বিজ্ঞোহ ও দিব্যকৃত বরেন্দ্রীগ্রহণ দুইটি স্বতন্ত্র

ঘটনা বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কিন্তু ঐ বিদ্রোহই দিব্যের সাক্ষ্যলাভের মূল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা বাইতে পারে। কিরূপে দিব্য বরেন্দ্রী অধিকার করিলেন? কবি বলিতেছেন, ‘দ্বিত্য’ ও ‘উপধিত্তী’ দিব্য নামক ব্যক্তি কর্তৃক বরেন্দ্রী গৃহীত হইল। এখানেও এক তর্ক উঠিয়াছে ‘উপধিত্তী’ শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া। টীকাকার ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—‘অবশ্যকর্তব্যাত্মা আরম্ভ কর্তব্য ব্রতং ছন্দনি ব্রতী’। এক পক্ষ এই ব্যাখ্যা অল্পসারে অর্থ করিতেছেন ‘ভগ্ন-বিদ্রোহী’। তাঁহাদের মতে দিব্যের বিদ্রোহ করিবার প্রবৃত্তি ছিল না, ঘটনাচক্রে অবশ্যকর্তব্য বলিয়া তিনি রাজদ্রোহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রতিপক্ষের মত এই, দিব্য রামপালের প্রতি অবশ্যকর্তব্যবোধে মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটাইয়াছিলেন এবং গোপনে তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন—অর্থাৎ রামপালের হিতসাধনের ছলে দিব্য মহীপালের মৃত্যুর পর স্বয়ং রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। শেষোক্ত মতই যদি রামচরিত-কারের অভিপ্রেত হয়, তথাপি ইহাকে ঐক্য মত বলিয়া গ্রহণ করিতে ঐতিহাসিক বিধি বোধ করিবেন। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে, রামচরিত এক পক্ষের উক্তি। কিন্তু প্রতিপক্ষের ব্যাখ্যাই কি সমীচীন? রামপাল বিনামোবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্তৃক বৈরূপ অমাহবিকভাবে নির্ধাতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি প্রজাবর্গের অল্পকম্পা আকৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। এমত অবস্থায় যদি দিব্য তাঁহার হিতসাধনের ছলে নিজের সিংহাসন অধিকার করিতেন, তাহা হইলে বরেন্দ্রীর প্রজাবর্গ বিশ্বাসঘাতক অনধিকারী রাজার পক্ষভুক্ত হইয়া তাহাদের সুপ্রাচীন-বংশের বৈধ রাজ্য বিরুদ্ধে কি দণ্ডায়মান হইত?

তবে কি ‘উপধিত্তিন’ শব্দের পূর্বব্যাখ্যাই সঙ্গত? দিব্য উপায়াস্তর না থাকাতে রাজপদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহাই কি সত্য? আমাদের অনুমান হয় যে তাঁহার সন্তুষ্টিগত বা জাতিগত স্বার্থ নহে, পরন্তু বরেন্দ্রীর প্রজাবর্গের কল্যাণসাধনই কবিকর্তৃক বর্ণিত দিব্যের তথ্য-কথিত ব্রত। এই কল্যাণসাধনকেই উপলক্ষ করিয়া দিব্য বরেন্দ্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কবির অভিযোগ। এক্ষণে দেখা যাউক, বরেন্দ্রীর প্রজাবর্গের হিতসাধনের কি অবকাশ

দিব্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। অনন্তসামন্তচক্রের সমরে মহীপাল যখন নিমজ্জিত হইলেন, তখনও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী দুই রাজভ্রাতা সম্ভবতঃ শৃঙ্খলিত অবস্থায় জগদ্বন্দ্ব কারাগারে নিমজ্জিত। সুতরাং দেশে রাজশাসন তখন এক প্রকার বিলুপ্ত। যেখানে যেখানে সামন্তরাজগণ স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই সেই দেশে তাঁহারা শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। বরেন্দ্রীপ্রদেশেও কি এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল? অসম্ভাব্য প্রদেশের তুলনায় বরেন্দ্রীর ইহাই বিশেষত্ব ছিল যে ইহা পালবংশের সৈন্যক রাজ্য। সুতরাং ইহা সম্ভবতঃ পালরাজগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভাবে শাসিত হইয়া আসিতেছিল। এই সম্বন্ধে কি পালবংশের শাসনকালে রাঢ় ও বঙ্গপ্রদেশে খড়্গ, চন্দ্র, শূর, মেন প্রভৃতি বহু স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন বংশের উদ্ভব হইলেও বরেন্দ্রীতে অল্পরূপ বংশ সমুৎপত্ত হয় নাই? যদি সত্য সত্যই বরেন্দ্রী শক্তিশালী সামন্তরাজবিহীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহীপালের জাগ্যবিপর্যয়ের পর তথায় অরাজকতার উৎকট আশঙ্কা আবির্ভূত হওয়া কি অস্বাভাবিক? এই সম্বন্ধে বিপর্য প্রজাবর্গ দিব্যের মত লক্ষীর অংশভাগী অভ্যুচ্ছিত কর্তব্যকারী শরণাপন্ন হইবে, এবং দিব্য তাহাদের রক্ষকল্পে শাসনদণ্ড ধারণ করিবেন, ইহা কি এক বটকল্পনা? ইহাই যদি দিব্যকৃত বরেন্দ্রী অধিকারের সত্য ইতিহাস হয়, তাহা হইলে শত্রুপক্ষীয় কবি উহাকে বিবৃত করিয়া বলিবেন, বরেন্দ্রীর নিরাশ্রয় প্রজাবর্গের রক্ষা দিব্যের প্রেরিত উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁহার প্রেরিত উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য অধিকার, তাহাতে বিশ্বাসের কোনও কারণ নাই।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, দিব্য কি প্রজাদিগের নির্বাচনে বরেন্দ্রীর শাসনভার লাভ করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের প্রত্যক্ষ উত্তর দিবার প্রমাণ আমাদের নাই। কারণ এখানে একদেশদর্শী কবির এক প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাই আমাদের একমাত্র সম্বল। তবে দিব্য ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণ কর্তৃক ভুক্তরাজ্য বরেন্দ্রীর প্রজাবর্গের শ্রদ্ধা ও ভক্তির স্বদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মদনপালেব মনহরি লিপিতে রামপাল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

“এতস্যাপি সহোদরো বরপতির্দিব্য-এব-নির্ভর
কোভাহত—বিধৃত—বাসবভূতিঃ ঐশ্বর্যপালোহিবৎ”

অর্থাৎ অত্মরাক্ষণ-সম্বন্ধে অতিশয় চিন্তাচঞ্চল্যে আশোলিত হইয়াও ইহাও ইচ্ছা দেখান। ঐচ্ছাধারণ করিয়াছিলেন, দিব্যের পক্ষভুক্ত প্রজাবর্গের অতিশয় আক্রমণে আশোলিত হইয়াও রামপাল সেইরূপ ঐচ্ছা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রামপাল দিব্যবংশের প্রজাবর্গের হস্ত হইতে বরেন্দ্রীর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া প্রচণ্ডভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন। পুরাতন রাজবংশের বিরুদ্ধে বরেন্দ্রীর প্রজাবর্গের এইরূপ প্রচণ্ড উদ্যম কি ইহাই স্থচনা করিতেছে না যে, উচ্ছাসের ক্ষয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা নুতন নায়কদিগের প্রতি বর্ষিত হইয়াছিল? ইহার পর বরেন্দ্রী উদ্ধারের পূর্বসূচন-রূপ রামপাল যখন “রাষ্ট্রকুটমণিকা” শিবরাজকে শত্রুরাভ্য আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন, তখন শিবরাজ কিরূপ আচরণ করিলেন? দেবব্রাহ্মণভোগ্য ভূমিরক্ষার জন্তই তিনি বিক্ষ ও গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যাইলেন, তাঁহার অসিবলে বরেন্দ্রী বিপর্যস্ত হইল, তাঁহার প্রতাপে ভীমের রক্ষকবাহু বিনষ্ট হওয়ায় সর্বজাই ভীমের প্রভু বল্প হইল, ফলে কোনও পুরীর অধিবাসিগণ স্বচ্ছন্দভাবে বাস করিতে সমর্থ হইল না। নবস্থাপিত রাজশক্তির প্রতি প্রজাবর্গের অতিশয় অমুরাগই কি আক্রমণকারীর এইরূপ নৃশংস বর্বরতার কারণ নহে? ইহার পর যখন শিবরাজ তাঁহার রক্তাক্ত অভিযানের সাক্ষ্য রাজসমীপে নিবেদন করিলেন, তখনও রামপাল নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। অতঃপর রামপাল যে বিরাট সমরায়োজন করিলেন তাহার বিপুলত্ব হইতে কি ইহাই প্রমাণিত হইতেছে না, যে বরেন্দ্রীর সমস্ত প্রজাশক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল? ইহার পর রামপালের বিশাল বাহিনীর সহিত ভীমের যে যুদ্ধ হইল তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে বিরচিত রামচরিতের নয়াট পরম্পরসম্বন্ধ শ্লোকের (২১২—২২০) উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শ্লোকসমষ্টিতে এক পক্ষে সেতুবন্ধ-রচয়িতা রামচন্দ্র কর্তৃক সমুদ্রবন্ধন ও অপর পক্ষে রণে নিবৃত্ত রামপাল কর্তৃক ভীম নৃপতির বন্ধন বর্ণিত হইয়াছে। ইহার শেষ শ্লোকটি এই—

সম্যগনুগতরসালোচ্যপ্রথমসহোদরেন রাবণে ।

ভীমঃ স সিদ্ধুরগতোবরণং রচয়তা কিংসাবধি ॥ ২২০ ॥

এই শ্লোকটির এক পক্ষের অর্থ, রাক্ষসরাজ রাবণের

‘অপ্রথম’ (অর্থাৎ দ্বিতীয়) সহোদর বিভীষণকে সম্যকরূপে অনুগতভাবে লাভ করিয়া এবং পর্ত্তমালাধারা সেতু রচনা করিয়া রামচন্দ্র ভয়ঙ্কর সমুদ্র বন্ধন করিলেন। অপর পক্ষে ইহার অর্থ, পৃথিবীর দিক্‌সমূহ সম্যকরূপে প্রাপ্ত হইয়া এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রামপাল ভয়ে কাতর হস্তিপৃষ্ঠাক্রান্ত ভীমকে বন্ধন করিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে, শত্রুপক্ষীয় কবি বিভীষণের প্রসঙ্গ উপাধি করিয়াও ভীমের পক্ষে অমুরূপ গৃহশত্রুর উল্লেখ করিতে সমর্থ হন নাই। ইহাই কি ভীমের প্রতি প্রজাবর্গের আন্তরিক অমুরাগের চূড়ান্ত প্রমাণ নহে?

আমরা দিব্যের প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে গিয়া তদীয় কৃতী ভাতৃপুত্র ভীমের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের মনে হয়, দিব্যের কীর্তিকলাপের আলোচনায় ভীমকে বিস্মৃত হইলে কেবল যে তাঁহার প্রতি ঘোর অবিচার করা হয় তাহা নহে, দিব্যের চরিত্রেরও সম্যক বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। কিরূপে ভীম রাজ্যলাভ করিলেন, তাহা রামচরিতের একটি শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে :—

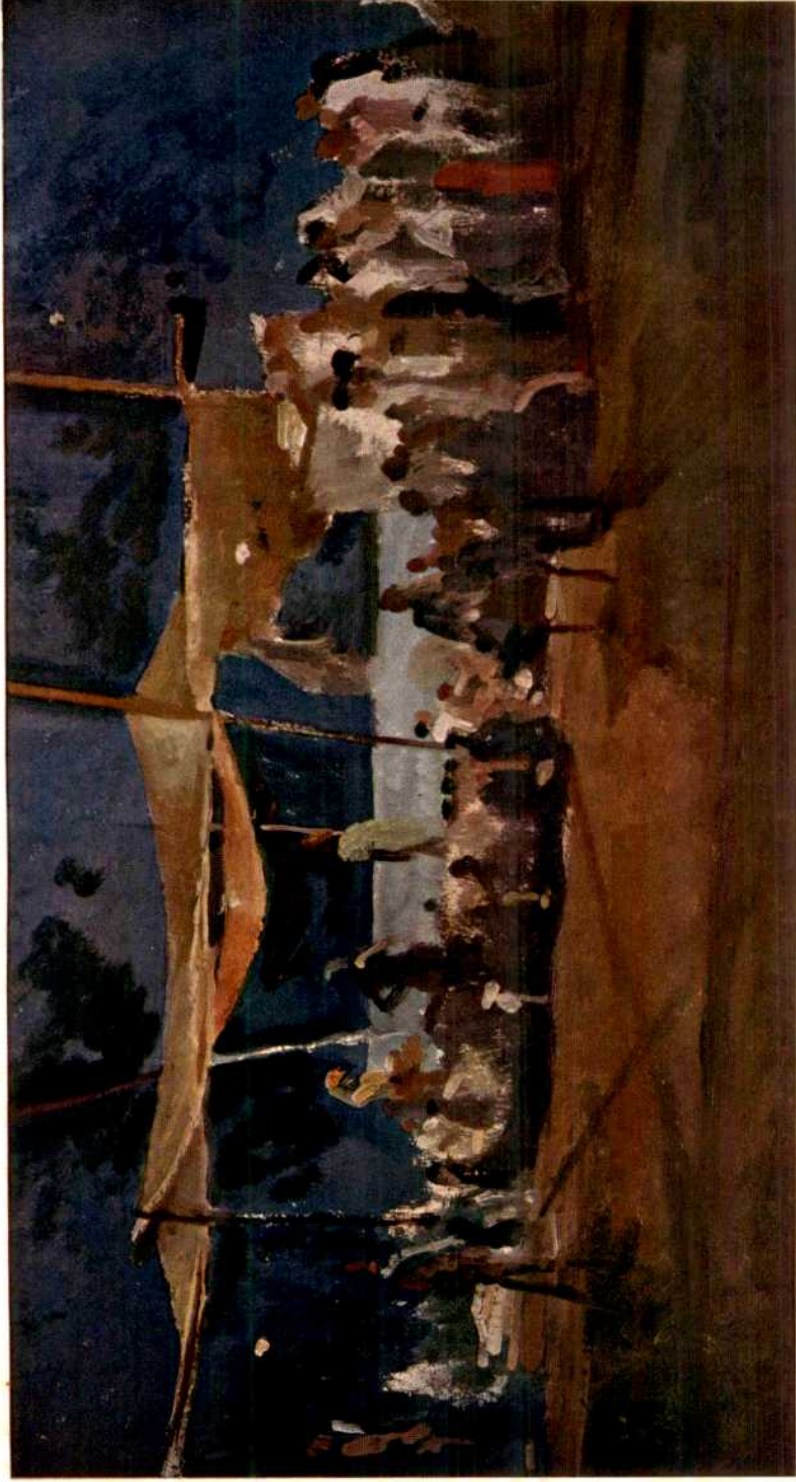
অতঃপুনঃসমুদ্রমুখং চ ভীমস্ত বিবরণপ্রবন্ধতঃ ।

সাত্ত্বিয়ার্য বরেন্দ্রী ক্রিয়াক্ষমস্ত যলু রক্ষসীরাভূৎ ॥ ১৩৩ ॥

রামপালপক্ষে টীকা :—“সাত্ত্বিয়ার্য অভিধায়া নাম্না বরেন্দ্রী অতঃপুনঃ দিব্যোকস্ত যো অমুর্যো রক্ষোকঃ তদীয়তনয়স্য ভীমনায়ঃ রক্ষুপ্রহারিণঃ ক্রিয়াক্ষমস্য অলংকর্ম্মণস্য যথোক্ত-ক্রমেণ রক্ষসীরাভূৎ । স তত্র ভূপতিঃ বর্তমানঃ ।” অর্থাৎ দিব্যের পর তদীয় ভ্রাতা রক্ষোক এবং রক্ষোকের পর তৎপুত্র ভীম বরেন্দ্রীতে প্রভুত্বলাভ করিলেন। কিন্তু কি দিব্য কি রক্ষোক, কাহারও শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দিব্য বাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই, ভীম কর্তৃক তাহা নিপ্পন্ন হইল। তিনি বরেন্দ্রী প্রদেশে স্বীয় প্রভুত্ব সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং ‘রাজা’ উপাধি গ্রহণ করিয়া তাহার বাখাখ্য প্রতিপন্ন করিলেন। এই কার্য সম্পাদনে তাঁহার কিরূপ যোগ্যতা ছিল, তাহা উল্লিখিত শ্লোকে উক্ত। ‘ক্রিয়াক্ষম’ ও ‘বিবরণপ্রবন্ধ’ (অর্থাৎ রক্ষুপ্রহারী) বিশেষণ দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। রামচরিত কাব্যের প্রারম্ভে রামপালের প্রশস্তি-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে :—

হৃদা রাজপ্রবরং [ভূমো] ভূমণ্ডলং গৃহীতবতঃ ।

স নিরাহরদ্বন্দ্বকলয়া সহস্রোদোরিকিঞ্চিঃ স্বাস্থ্য ॥ ১৩২ ॥



কবি-গান
শ্রী প্রহলাদ কৰ্মকাৰ

শ্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

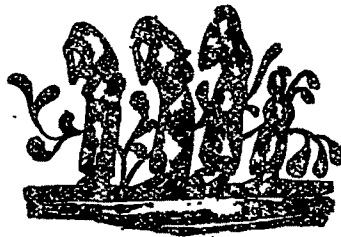
রাজপ্রবর মহীপালের হত্যাকারী এবং তাঁহার রাজ্যের প্রচুর অংশের অধিকারী এই প্রবল শত্রু ভীমনুপতি হইতে অভিন্ন বলিয়া আমাদের মনে হয়। কারণ উক্ত হইয়াছে যে
 ৮/ রামপালই তাঁহার সৌষ্ঠব বিনাশ করিয়াছিলেন। অহুমান
 হয়, ক্রিয়াক্ষম ও রক্তপ্রহারী ভীম যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী মহীপালকে
 নিহত করিয়া স্বয়ং রাজ্যোপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভীমের
 চরিত্রের অন্ত্যান্ত বৈশিষ্ট্য রামপালের সহিত তাঁহার যুদ্ধের
 বর্ণনাগ্রন্থে একটি কুলকে কবিকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ
 লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভীম এখানে স্পষ্টভাবে 'রাজা'
 বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কুলকের কয়েকটি শ্লোক নিয়ে
 উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

বহুপ্রবিশ্ত পানীমানঃ পাতাবমেকমাস্ত্রীরাষ ।
 স্রোতীভূতঃ সপক্ষা রক্ষাঃ ক্ষিপ্রোবধূক্ষিতঃ ॥ ২১১
 বস্মিন্ রত্নানামাশ্রয়ে সরসত্যপি স্বয়ং লক্ষ্মীঃ ।
 তে পারিজাতবাক্ষিপ্রবরকরোদ্রোহমোহপ্যাসন্ ॥ ২১২
 লিম্বরেন লক্ষ্মীলোভেহুতমপ্যলজ্জিতমুনোভিঃ ।
 ত্রিক সত্ততে অ শত্ৰুরাজানং যং সমাসাদ্য ॥ ২১৩
 অজীজিবন্ জগদ্বিলাঃ দধতঃ পারার্থ্যমর্ধিনো ঘনাঃ ।
 তচ্যুতপদমধিক্ষ যন্ত চ কল্পদ্রুমপ্রকৃতেঃ ॥ ২১৪
 স ভবানীসমুপেতো ভুজঙ্গমবিক্রমিতঃ স্বয়ং দেবক ।
 বিজরাজকেতুরাসীদুজ্জ্বলপুণ্যস্য যন্তান্তঃ ॥ ২১৫
 মোহত্যন্ততোবশোভী রাজিতলিভিভিরহতমর্যাদঃ ।
 চকুতপদব্যালোভেন কুতোৎসাহোবহন্ মহাশরভাং ॥ ২১৬

ইহার ভাবার্থ :—ভীম রক্ষসীদিগের রক্ষক ছিলেন,
 তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ রাজগণ ভীম আশ্রয়লাভ করিয়া বিজয়ী
 শত্রুর আক্রমণ হইতে আশ্রয়রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,
 তিনি সরস্বতী ও লক্ষ্মীর আবাসস্থল ছিলেন, তাঁহাকে প্রাপ্ত
 হইয়া পৃথিবী সম্যক লক্ষ্মীলাভ করিয়াছিলেন এবং সজ্জনগণ
 অবাচিত দান অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃতি কল্পদ্রুম-
 স্বরূপ ছিল, তাঁহার বহুসংখ্যক সেবক ও বাচক অশ্বলিতপদে

আকৃষ্ট হইয়া পরোপকারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অশ্বিন জগতকে
 সজীবিত করিলেন, তিনি অধর্ম বর্জন করিয়াছিলেন, ভবানীর
 সহিত ভবানীপতি স্বয়ং তাঁহার অন্তরে বিদ্যাজ করিতেন, তিনি
 কখনও মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই, লোভে কখনও তাঁহার
 প্রবৃত্তি হয় নাই, সুকৃত পথ অনুসরণ করিয়া তিনি মহাশয়তা
 প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে পুণ্যলোক নরপতি স্বীয় চরিত্রগুণে
 প্রতিপক্ষের আশ্রিত কবির নিকট এইরূপ অকুণ্ঠ ও উচ্ছ্বসিত
 প্রশংসা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি ত এক জন
 আদর্শ নরপতি। যে জাতিতেই তাঁহার জন্ম হউক না কেন,
 তিনি ও বাঙ্গালার সমগ্র অধিবাসীর পূজনীয়। আমাদের
 মনে হয় প্রাচীন বাঙ্গালায় তাঁহার সহিত একাসনে বসিবার
 উপযুক্ত আর এক জন রাজা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি
 পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম গোপাল।

যদি ভীম গোপালের মত সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বরমালা লাভ
 করিতেন, তাহা হইলে তিনি হয়ত জীর্ণ পালরাজ্যকে নব-
 কলেবর দান করিয়া পুনরায় বাঙ্গালান চেতনাশক্তি উৎসাহ
 করিতে সমর্থ হইতেন। হয়ত তাঁহার অমোঘ করস্পর্শ
 বাঙ্গালার স্বার্থাঘেযী সামন্তবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রজাশক্তির
 মোহনময়্রে সজীবিত এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম
 করিয়া দিত। এক কথায় বলিতে গেলে প্রাচীন বাঙ্গালার
 ইতিহাসের শেষ অধ্যায় হয়ত বিভিন্ন ও উজ্জলতর বর্ণে চিত্রিত
 হইত। কিন্তু বিধির অশুভনীর নিয়মে তাহা হইল না।
 রামপালের বিশাল বাহিনীর সহিত স্তব্ধবে নবস্থাপিত ক্ষুদ্র
 বরেন্দ্ররাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। ভীম পরাজিত হইয়া
 বন্দী-শিবির হইতে পলায়ন করিলেন এবং পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে
 অবতীর্ণ হইয়া বিজিত ও নিহত হইলেন। তাঁহার পতনের
 সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় পরোক্ষভাবে প্রজাশক্তি প্রতিষ্ঠার শেষ
 উদ্যম ব্যর্থ হইল। ইহাই হইল প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসের
 সর্বপ্রধান 'ট্রাজেডি'।



মৃত্তিকা

ঐতিহ্যবাহী গুপ্ত

পথ চলিতে কত লোকের সহিতই ত দেখা হয়—কয়টা লোকের কথা আমাদের মনে থাকে! ভুবন পোদ্দারও আমার পথের চেনা—মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্ত, কিন্তু আজও মাঝে মাঝে তার কথা আমার মনে পড়ে, আর ভাবি যে লোকটি কেন আত্মগোপন করিয়া নিজেকে ভুবন পোদ্দার বলিয়া চালাইয়াছিল। জানি না কিসের জন্ত, কিন্তু তার প্রবন্ধনা আমাকে যে শিক্ষা দিয়াছে তাহাকে আমি জীবনের একটা বড় অভিজ্ঞতা বলিয়া নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করিতে পারি।

সেই কথাই বলিব—

ছেলেবেলা হইতেই আমার কেমন একটা ভ্রমের নেশা। জীবনের এই সামান্য কয়টা বছরের মধ্যে অনেক দেশই ত ঘুরিলাম, কিন্তু বলিতে লজ্জা হয় আজও আমি আমার জন্মস্থান জান হইবার পর দেখি নাই। ইহার কারণ অকারণ ছুই আছে, কিন্তু তাহা লইয়া মিথ্যা কথা বাড়াইব না।

দিনকয়েক ধরিয়া শরীরটাও ধারাপ যাইতেছিল, তা ছাড়া বাবা সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া তাগাদা করিতেছেন তাঁহার কাছে যাইবার জন্ত। প্রস্তুত হইলাম। ভাবিলাম, এই সুযোগে যদি একবার জন্মস্থানটা দর্শন করিয়া আসিতে পারি।

যাত্রা করিলাম। ঘ্রোনে চলিয়াছি। আশেপাশে বন-বাগাড়, কুঁড়ের, দিগন্তজোড়া দিগন্ত মাঠ লইয়া কবিত্ব করিব না। তৃতীয় শ্রেণীর অসম্ভব ঠাসাঠাসি হইতে আত্মরক্ষা করিতেই ঘামিয়া উঠিয়াছি, তার উপর নিজের লগেজ বাঁচান এবং পকেট বাঁচান। চতুর্দিকেই সমস্ত! এ ছাড়া হকারের জালাময় কঠোর বস্তৃত্ব আছে, ভিথারী-পালের করুণা-আকর্ষণের মর্মস্পর্শী আবেদন আছে—টিকিট-চেকারকে টিকিট দেখাইবার আইন-কাছন আছে। নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিবারও জো নাই।

ষ্টামারে উঠিয়া ভাবিলাম, এইবারে হয়ত দুর্ভোগের অন্ত হইবে। কিছুক্ষণ বেশ নিরুপদ্রবে ছিলামও, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের বোধ করি অভিযোজিত আছে। দেখিয়া শুনিয়া এক কোণে একটু স্থান আবিষ্কার করিয়াছিলাম, কিন্তু স্থানাভাবে পুনরায় গুটিগুটি হইয়া বসিতে হইল। সকলকেই যখন যাইতে হইবে তখন এ ছাড়া আর উপায় কি।

আমার সম্মুখে ষ্টামারের একাংশের প্রায় অর্ধেক জুড়িয়া মোটা দড়ির সাহায্যে সাধারণ হইতে আলাদা ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং ঐ অত্থানি স্থান জুড়িয়া জনআটেক বন্দুকাধারী প্রহরী, জন-বার-চোদ্দ আসামীসহ পরম নির্বিকার চিন্তে বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। কি আর করি, বসিয়া বসিয়া একাধিগিন্তে উহাদের কথোপকথনের মর্মার্থ গ্রহণ করিতেছিলাম এবং মাঝে মাঝে আসামীদের মুখে উহাদের অপরাধের ছাপ অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিলাম। সমস্ত-আশী বছরের প্রাচীন হইতে আরম্ভ করিয়া চোদ্দ-পনের বছরের তরুণ উহাদের মধ্যে ছিল। আশ্চর্য, ইহাদের মধ্যে কেহ নাকি করিয়াছে খুন, কেহ দাঙ্গা, কেহবা সিঁদ কাটিয়া চুরি, অথচ মুখ দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। বিচিত্র এই মানব জাতি। আমার মনের একটা দিক উহাদের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল, কিন্তু অপর দিকটা চোখ রাঙাইয়া দিক্কার দিল, অথচ এমনি মজা তখন পর্যন্ত উহাদের কাহারও স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু আমার ভ্রম মন এরই মধ্যে উহাদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিতে সুরু করিয়াছে। মাহুৎ এমনিই বটে—এমনি করিয়াই মাহুৎের বিচারে মাহুৎ পায় অবজ্ঞা, পায় ঘৃণা।

কিছুক্ষণের জন্ত অস্ত্রমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। শূন্য নীলাকাশে সাধা মেঘের খেলা চলিয়াছিল। নীচে পদ্মার ঘোলা জল আবর্জা রচিয়া ধরবেগে নিজের

পথে চলিয়াছে—স্বাধীন তাহার চলিবার ভঙ্গী। সম্মুখের বাধা ঠেলিয়া পথ চলিবার সংসাহস তাহার আছে।
দুরন্ত দুঃগাহনীর ছেলের মত বেপরোয়া। দ্রক্ষেপ নাই।

নিজের মনের মধ্যে কত সম্ভব-অসম্ভব কল্পনা করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু আমারই মত কোন অল্পসঙ্কীর্ণ ব্যক্তির প্রাণে মুখ ফিরাইলাম। প্রাণ এবং উত্তর দুই-ই আমার কানে আসিল। আমার বিশ্বাস সীমা ছাড়াইল। ঐ অশীতিপর বৃদ্ধ যাহার জীবন-প্রদীপ সামান্য একটু দমকা হাওয়ায় নিবিয়া যাইবে, সে করিয়াছে খুন, তাহাও একটা নয়—জোড়। উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিলাম। প্রাণ হইল—কবিন আর বাঁচবে বুড়ো? যেন খুব একটা রসিকতার কথা হইয়াছে, উশস্থিত অনেকেই টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। প্রাণকারী টংসাহিত ভাবে পুনশ্চ কহিল—কাঁপুনিটুকুও ত পুরোমাত্রায় আছে...ছুরি চালাবার সময় ত হাত কাঁপে নি। তাও এক আঘাত নয়, দু-দুটো।

বৃদ্ধ উদাস চোখে নিরুপায়ের মত চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। বুঝিলাম না এ দৃষ্টির তাৎপৰ্য্য। কিন্তু আমার সমস্ত চেতনা সজাগ হইয়া রহিল উহাদের আলোচনার প্রতি। পুনরায় প্রাণ হইল—একটি ছটাক জমির মায়া আর কাটতে পারলে না। বৃদ্ধ কথা কহিল না বটে, কিন্তু তাহার কেঁটারগত চক্ষু দুইটা বাক বাক করিয়া জলিয়া উঠিল। তাহার মুখে এমন একটা কঠিন ভাব ফুটিয়া উঠিল যাহা যে-কোন লোকের চোখেই ধরা পড়ে। লক্ষ্য করিলাম, ইহাতে কান্স হইয়াছে। ভক্তলোকটি হঠাৎ অতিমাত্রায় সংবত হইয়া পড়িলেন। আমি মনে মনে না হাসিয়া পারিলাম না। কিন্তু বৃদ্ধ সম্বন্ধে আমার মনে একটা অহৈতুক কৌতুহল জাগিয়া রহিল, অথচ কোন তরফ হইতেই আর সাড়া মিলিতেছিল না। জনৈক প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা বুঝিলাম তাহা না বুঝারই সামিল, তবে এইটুকু পরিষ্কার হইল যে লোকটি খুনী আসামী এবং সে একজোড়া খুন করিয়াছে, এ কথা আদালতে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বৃদ্ধ আমার মুখের দিকে চাহিল, বার-কয়েক মাথা নাড়িয়া মুহূর্ত্ত কণ্ঠে কহিল—খামকা ত আর ছেড়ে দিতে পারি নে। সে বুড়ী না-হয় নেই, কিন্তু ছেলেপিলেগুলো ত আছে—তাদের ভালমন্দ দেখতে হবে ত বাবুজী।...

বৃদ্ধ মুহূর্ত্তেব জন্ত খামিল, নিজের কপালের উপর একখানি হাত রাখিয়া কহিল, কপাল বাবু...এর লেখা কেউ খণ্ডাতে পারে না, নইলে একটি কঁরে লাঠির ঘায়ে ওরা সাবাড় হবে কেন? আর আমাকেই বা এই বুড়ো বয়েসে হাজতে যেতে হবে কিসের জন্তে? কঁটা বছর আর বাঁচতুম। বৃদ্ধ ক্ষীণ কক্ষণ হাসি হাসিয়া পুনরায় কহিল, সেই মরতে ত একদিন হ'তই, না-হয় বাপ-ঠাকুর্দার আমলের এক ছটাক জমির জন্তে হান কবুল করেছি। আর এও ঠিক কথা, ছেলেপিলেগুলো এর পরে নিশ্চিন্তে ভোগ করতে পারবে। তরসা কঁরে আর কেউ ঠকাতে আসবে না।

আমি অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া শ্রুতিশ্রব মনোযোগের সহিত বৃদ্ধের কথাগুলি শুনিতেছিলাম। বৃদ্ধ বোধ কবি আমার এ ছলনাটুকু লক্ষ্য করিয়াছিল। ধীরে ধীরে সে বলিয়া চলিল—বাপ-ঠাকুর্দা যা রেখে গেছেন তার উপর এক কাঁচা বাড়াতে পারি নি, এক ছটাক ছেঁড় দি কোন হিসেবে! এর পরে তাঁদের কাছে গিয়ে জবাব দেব কি? বৃদ্ধ খামিল।

মুহূর্ত্তের জন্ত মুখ ফিরাইয়াছিলাম। আমি দেখিলাম, স্পষ্টই দেখিলাম, বৃদ্ধের চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু টলমল করিতেছে। কিন্তু এই স্ববিধ খুনে আসামীব জন্ত অন্তরের কোথাও এক ফোঁটা অহুকম্পার স্থান হইল না। বৃদ্ধ পুনরায় কথা কহিল—ছেলেগুলো সব বড় হয়েছে—বিয়ে-থা দিয়েছি। ওদের জন্তে আমার ভাবনা নেই, কিন্তু বত ছশ্চিন্তা আমার ছোট মেয়েটার জন্তে।

আমার জায় নীরব শ্রোতা বোধ হয় বৃদ্ধ তার বন্দী-জীবনে আর পায় নাই। সে অনর্গল নকিয়া চলিল।

—বাবুজী, আমার কথা শুনে বিরক্ত হবেন না। এই ক'দিন ধরে কথা কহিতে না পেয়ে আমার সব বন্ধ হয়ে যাবার জো হয়েছে। এই বুড়ো বয়েসে মেয়েটাকে নিয়ে হেসে-খেলেই আমার দিন কেটে যাচ্ছিল। একে দু-বছরের মধ্যে ওর মা চোখ বুজছে—সেই থেকেই মেয়েটাকে বুকে পিঠে কঁরে মাহুষ করেছি। আমার কাছেই ওর যত আশ্বাস। খিদে পেলে মুখের দিকে চেয়ে থাকত—নাশিশ জানাতে হ'লে কোলের মধ্যে মুখ ঘষত। ওর মনের কথা তাইতেই আমি টের পেতুম। বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

আমি নিঃশব্দে শুনিতেছিলাম।

বৃদ্ধ পুনশ্চ বলিতে শুরু করিল—পুলিস হাতকড়া দিয়ে টেনে নিয়ে চলল। মেয়েটা আমার আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ল। মাকে শেষ বারের মত একবার বুকে ধরতে চেয়েছিলাম... ওরা দিলে না। বাবুজী, আমার কলিজ ভেঙে যেতে লাগল। মেয়েটার সে কি কারা! বৃদ্ধ কিছুক্ষণের অন্তর খামিল, পুনরায় বলিতে লাগিল—আজ্ঞে আমি শুনেতে পাচ্ছি। বলছিল ‘বাবাগো আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও’।... বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—বুড়ো-মামুষ দেখে হাকিম ষীপান্তরের হরুম দিলেন, ফাঁসিটা আর হ’ল না। এর চেয়ে ফাঁসি হওয়াই আমার ছিল ভাল। বেঁচে থেক্কেই বা লাভ কি। বৃদ্ধ নিরুপায়ের জায় লৌহ বলয়জোড়া দেখিতে লাগিল।

আমি নিজের বসিবার স্থানে ফিরিয়া আসিলাম, অজ্ঞাতে মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল—দুর্ভাগা...

আমার পার্শ্বোপবিষ্ট ভ্রাতৃলোকটি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন—দেখিলাম, আমি ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আসিয়া জুটিলেন। আমার মুখের প্রতি খানিক চাহিয়া দেখিয়া বৃদ্ধ হাসিয়া কহিলেন—খুনে বুড়োর আত্মবিলাপ শোনা হচ্ছিল বুঝি? আমি কিন্তু হাসিতে পারিলাম না। কহিলাম—কতকটা তাই বটে।

আমার গাভীর্ষ্য বোধ কবি তাঁর আত্মসন্মানে আঘাত করিল, তাঁর ভ্রূগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। কতকটা যেন অবজ্ঞাভরেই তিনি কথা কহিলেন—দয়া দেখাতে বা দয়া করতে আমরাও জানি দাদা, কিন্তু এ শ্রেণীর লোককে অহুকা দেখান মানে সোজা-জুজি দুর্নীতির প্রদর্শন দেওয়া।

ইচ্ছা হইতেছিল বলি, কথাটা এমন কিছু নূতন নয়... আমরাও জানি কিন্তু মুখে কোন কথা কহিলাম না। নীরবে তাঁর কথাই মানিয়া লইলাম। তিনি পুনরায় কহিলেন—কত বড় বীভৎসতা বলুন ত... মাত্র এক ছটাক জমির জন্তে এতবড় একটা ছুৰ্চনা।

কথা কহিলাম না। এই সম্বন্ধে বেশী বাড়াহুবাদ করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। কি জানি কেন আমার কানে একটি ম-হারার মেয়ের আর্ন্ত ক্রন্দন আসিয়া বারে বারে আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল, “বাবাগো আমার তোমার সঙ্গে নিয়ে

যাও গো”... হয়ত এ আমার ভাবুকতা কিন্তু যে-কথা আমার সারা অন্তর প্রাণিত করিয়া ফিরিতেছে তাহা প্রকাশ করিতে আমার লজ্জা নাই।

পুনরায় ভ্রাতৃলোকটি কহিলেন—একহাত হবে নাকি? তাস আমার সঙ্গেই আছে। বাড় নাড়িয়া আপত্তি জানাইলাম। মুখে কহিলাম—তাসখেলা আমি জানি নে। তিনি আমার মুখের দিকে খানিক সন্নিহিত ভাবে চাহিয়া থাকিয়া সম্ভবত অন্তর লোকের সন্ধানে উঠিলেন। আমি বৃদ্ধের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলাম। তার সম্মুখে একটি ধামার মধ্যে কতগুলি চিড়া-মুড়কি পড়িয়া রহিয়াছে। আমার সহিত দৃষ্টিবিনিময় হইতেই বৃদ্ধ কথা কহিয়া উঠিল—মেয়েটাকে একটি বেলা নিজে হাতে খাইয়ে না দিলে তার খাওয়াই হ’ত না। কত দিন যে একসঙ্গে খাবার জন্তে ব’সে থেকে মার আমার একটি বেলা খাওয়াই হ’ত না... বৃদ্ধের দু-চোখ বাহিয়া অশ্রুর ধারা নামিয়া আসিল, নিরুপায়ের করুণ ক্রন্দন। বৃদ্ধ পুনরায় অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কহিল—বলুন ত বাবু, এগুলো কি ক’বে খাই। বৃদ্ধ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রহরীদের জানাইল, তাহাকে মুখ হাত পা ধুইতে হইবে। জ্ঞাত হই প্রহরী তাহাকে নীচে লইয়া গেল। কি জানি কেন এক অনাবশ্যক কৌতূহল আমাকেও উহাদের পিছু পিছু টানিয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধ হাত মুখ ধুইতেছিল, আমি অদূরে ইতস্তত পায়চারি করিতেছিলাম। সহসা জলের উপরে একটা ভারী বস্তুর পতনশব্দে চমকিত ভাবে মুখ ফিরাইলাম। প্রহরীদ্বয় হতভম্বের জায় দাঁড়াইয়া আছে—বৃদ্ধ তাহাদের পাশে নাই। সারা ষ্টীমারে একটা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। আসামী পলাইয়াছে। আমি নিঃশব্দে তরঙ্গায়িত জলরাশির প্রতি সচেতন দৃষ্টি মেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কোথায় বৃদ্ধ? তার কোন চিহ্নই নাই। চোখের সম্মুখে ধূম জলশযা—বৃদ্ধ ঘুমাইয়াছে, তার অস্তিত্ব শয্যা ঐখানেই রচিত হইয়াছে। সে পলাইয়াছে কিন্তু তার এই যে মহাপ্রস্থান একি শুধুমাত্র কল্পার প্রতি স্নেহের আকর্ষণ, না অন্ত কিছু। আমার চিন্তাধারা পুনশ্চ এই পথে চলিবার যে স্বার্থ কোন হেতু নাই তাহা নয়। আমার বেশ মনে পড়ে, বৃদ্ধ একবার বলিয়াছিল, মামুষের সবই শেষ পর্যন্ত স’য়ে যায়। আমার

ছেলেরা যদি মানুষ হয় তবে তাদের বোনের ছুখ ঘুচবে, কিন্তু আমার ছুখ ঘুচাতে কেউ নেই। পরের দানা খেয়ে হাজতের মাটিতেই ঘুমতে হবে, দেশের মাটিতে শুতে পাবলাম না। বৃদ্ধ এই পর্যন্ত বলিয়াই থামিয়াছিল।

অকস্মাৎ বৃকের মাঝখানটা আমার টন টন করিয়া উঠিল নিজের এ ভাব-বিপর্যয়ে নিজেকে আশ্চর্য্য হইলাম। হায় রে মান্নবের মন, যখন বৃদ্ধের সহিত একটা সাধারণ কথা বলিতেও আমার ভয় মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহারই অল্প একটা সহজ সহানুভূতি আমার অন্তরে অজ্ঞাতে বাসা বাঁধিতে শুরু করিয়াছিল। হয়ত এত সহজে নিজেকে নিজে চিনিতে পারিতাম না যদি-না বৃদ্ধ এমন করিয়া সকল রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইত। কতক্ষণ ধীরে ধীরে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম হাঁস নাই। পিঠের উপর যত্ন স্পর্শ অল্পভব করিয়া মুখ ফিরাইলাম। আমার পূর্বপরিচিত ভদ্রলোকটি। তিনি একটু হাসিয়া কহিলেন, অনেকক্ষণ ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। ইতিমধ্যে আরও বারকয়েক ঘুরে গেছি।

কহিলাম—কোন দরকার আছে কি ?

তিনি উত্তরে জানাইলেন—না দরকার ঠিক নয়... প্রায় ঘণ্টা ছুই ধরে একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন এই আব কি।

কহিলাম—তা বটে! বেশী কতকগুলি বকিতে আমার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। একমনে বৃদ্ধকে বাচাই করিতে বসিয়াছিলাম। আমার চোখের সম্মুখে বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ যেন অটু হাসিয়া বলিতেছিল—বাবুজী, আমি জিতেছি, আমার দেশের মাটি থেকে কেউ আমার তলায় করতে পারে নি। তা পারে নাই সত্য। বৃদ্ধ তার জীবন দিয়া নিজের শেষ ইচ্ছা পূরণ করিয়া গেল। কিন্তু মেয়েটার কথা কি সে একবারও ভাবে নাই? কয়েক ঘণ্টা পূর্বেও যে মেয়ের কথা বলিতে গিয়া উজ্জ্বলিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিয়াছে, মৃত্যুর পূর্বে কি তার কথা একবারও বৃদ্ধের মনে উদয় হয় নাই? হয়ত হইয়াছে, কিন্তু বাঁচিয়া থাকিয়া একমাত্র ভাবনা ছাড়া অল্প কোন উপায়ই ত তার হাতে থাকিত না। সে তার সাধ্যমত নিজের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার

করিয়াছে। মনের অন্ততঃ একটু আকাঙ্ক্ষাও তার পূর্ণ হইয়াছে। ইহাই বা বৃদ্ধের পক্ষে কয় কি ?

চাহিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোকটি তখনও আমার অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁর এই অনাবশ্যক আত্মীয়তা করিবার প্রয়াসকে আমি ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমি কি ভাবি না-ভাবি—কি নরি না-করি সে খবরে তোমার দরকার কি হে বাপু! অস্বীকার করিব না—আমি রীতিমত বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু মুখে কোন কথা বলিলাম না।

তিনি কি বুঝিলেন জানি না, কিন্তু পুনশ্চ কথা কহিয়া উঠিলেন—আপনি বিরক্ত হচ্ছেন, হয়ত ভাবছেন লোকটি কি বেহায়া—কিন্তু মানুষ মাত্রই কৌতূহলী একথা বোধ করি আপনিও স্বীকার করবেন।

তাহার মুখের প্রতি শানিক চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিয়া কহিলাম—আপনি বোধ করি স্পষ্টই ?

—আজ্ঞে না। ভদ্রলোকটি অবিচলিত কণ্ঠে কহিলেন—আপনি ইচ্ছে করলে আমার প্রশ্নের উত্তর নাও দিতে পারেন, কিন্তু অযথা সম্মেহ কববেন না। ভদ্রলোকটি এক মুহূর্ত্তে অল্প প্রসঙ্গে উপস্থিত হইলেন—আপনি বোধ করি শহরের লোক।

চমৎকার প্রশ্ন। কহিলাম—না, আমার জন্মস্থান হাতিয়া-বীপে।

আমার কথাটার পুনরাবৃত্তি করিয়া ভদ্রলোকটি কহিলেন—বলেন কি।

হাসিয়া উত্তর করিলাম—অবাক হবেন না। হাতিয়া আমার জন্মস্থান হ'লেও আমি শহরবাসী।

তাই বলুন—ভদ্রলোকটি একটু হাসিয়া কহিলেন, সেই জগ্জেই—নইলে যে-দেশে এক ঘণ্টা মাটির জগ্জে মাথার পব মাথা গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে সেই দেশে জগ্জে আপনি এই সাধারণ ব্যাপারে এত বেশী বিচলিত হয়ে পড়তেন না। একটু থামিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন—যদি জন্ম-ভূমিতে কখনও পদার্পণ হয় এ অজ্ঞানকে ভুলবেন না যেন—সুদূরুড়ো বা পারি তাই দিয়ে দু-দিন অতিথি-সৎকার করব। আর দেখিয়ে দেব এই নাটির মায়ায় মানুষ কেমন ক'রে আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকে।

আমি আগ্রহভরে শুনিতেছিলাম। তিনি পুনশ্চ কহিলেন—টেশনে গিয়ে গরুর গাড়ীওয়ালাদের ভুবন পোদ্দারের নাম করবেন, আপনাকে আর দ্বিতীয় কথা কইতে হবে না।

কহিলাম—এত দূরে এসে জম্মুভূমিটা না দেখে কিবছি না তা ঠিক, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যই বিশ্বব্বকর। মাহুয যে কেমন করে এই সামান্ত কারণে মাহুযের মাথা নিতে পারে এ আমি কিছুতেই ভেবে উঠতে পারি নে, অথচ তারাও আমাদেরই মত মাহুয—তাদেরও হুথুথু আছে, তারাও আমাদেরই মত জীপুজ নিয়ে ঘর করছে। আনন্দে তারা হাসে, দুঃখে তারা কাতর হয়।

ভুবন বাবু হাসিলেন, কহিলেন—সত্যি কথা, কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। মাত্র একটি ব্যাপার আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু এমনি ঘটনা এখানে নিত্য জিহ্ন দিন লেগে আছে। হাতিয়া যাচ্ছেন ত...দেখবেন নরেন রায়কে...এক সময় মস্ত ধনী ছিলেন। তার আমানত জমার অঙ্ক আমার জানা নেই, কিন্তু হাতিয়া-দ্বীপের বার আনা মাটির মালিক এক সময় তিনিই ছিলেন। এই মাটির উপর প্রতুষ বিস্তার করতে কত তাঁর আয়োজন... কত তাঁর শঠতা...নিষ্ঠুরতা। কিন্তু আয়োজন তাঁর সম্পূর্ণ হাতে পারল না...

ষ্টীমারের বাঁশী তীব্র রবে বাজিয়া উঠিল। তিনি থামিলেন, কহিলেন—টেশনের আলো দেখা দিয়েছে—আজকের মত আমাদের আলোচনা এইখানেই শেষ হোক। ভুবনবাবু আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া হু হু করিয়া চলিয়া গেলেন। সহজ ভক্তভাজ্ঞানের কোন পরিচয় দিয়া গেলেন না। কিন্তু এই সামান্ত কারণে আর আশ্চর্য্য হইলাম না। মাহুযের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, কিন্তু মাহুয সব সময় চতুর্দিকে নজর রাখিয়া চলিতে পারে না, চলেও না।

নিজের কথাই বলি—

আমি সাধারণ মাহুয, কারণে অকারণে মাহুযকে বিজ্ঞের মত উপদেশ দিতে জড়ি করি না। নিজের সম্বন্ধে সর্বদাই সজাগ। নিজের উপদেশকে নিজেই আমি মানিয়া চলি না—কারণ আস্থা নাই, অথচ নিজের অজ্ঞতাকে চালাইয়া

জ্বীতে কত না জ্বরদগ্ধি, কত না চোখাচোখা ভাবায় উপদেশের ঝড় তুলি।

আর্থিক অসচ্ছলতার দোহাই দিয়া বিবাহ করি নাই—অথচ অপর কেহ এই ওজর দেখাইলে তাহাকে ভীষণ কাপুরুষ জ্ঞানিয়া গালাগালি দিতে একটুও দ্বিধা করি না। মাহুযের হুভাবই এই রকম—বলিব কাহাকে?

আমি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। চাঁদপুর টেশনের হালোর ঝিকিমিকি দেখা দিয়াছে, কিন্তু ষ্টীমার পৌছাইতে এখনও টের দেরি।

চাহিয়া দেখি ভুবনবাবু এক জন পুলিশ-প্রহরীর সহিত বস্ত্রাপনে কি কথা বলিতেছেন। দৃষ্টিবিনিময় হইতেই তিনি যুদ্ধ হাসিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া কহিলেন—আমার আরও কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর আমি আপনার কাছ থেকে পেতে চাই। মানে—উত্তর আপনাকে দিতে হবে।

লোকটির স্পর্ধা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, কহিলাম—অর পূর্বে আমি জানতে চাই এ-ভাবে খামকা মাহুযকে উত্থাপ্ত করবার আপনার কি অধিকার আছে।

এতক্ষণ পরে ভুবনবাবু তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করিলেন, কহিলেন—দেখুন আপনার ধারণাই ঠিক, আমি পুলিশের হোক। যে-কারণেই হোক আপনাকে আমার সম্মেলন করছে। তাছাড়া...ভুবনবাবু একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিলেন—আচমকা বিরক্ত করাই যে আমাদের পেশা।

ভাল জালা। কহিলাম—আপনি প্রশ্ন করতে পারেন। আমি একমনে খোলাখুলি উত্তর দিয়া চলিয়াছিলাম, এর স্থানে আসিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—থামুন মশাই—এতক্ষণ বলতে হয় আপনি নোয়াখালী ষ্টীমার-এজেন্টের যেক্ষেত্রে। খোয়ালা আর ভোলা যার স্বভাব। কিছু মনে করবেন না, এ আমাদের কর্তব্য। মনে সম্মেলন জাগলেই আমরা একটু...ভুবনবাবু হাসিলেন, কহিলেন, তা বলে ফুটন পোদ্দারকে তুলবেন না যেন, এ আমার অহুরোধ হইল।

ভুবনবাবু বিনীত ভাবে নমস্কার করিয়া গেই যে সরিয়া পড়িলেন আর তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিল না। আমি কতকটা

বোকার মত চাহিয়া রহিলাম। মাহুয় হইয়া মাহুয়ের সহিতও সহজ ভাবে মিশিবার উপায় নাই—এমনই কুটিল ছনিষর পারিপার্শ্বিক অবস্থা। অন্তমনস্ক ভাবে তোরঙ্গ-পেটরা গোছগাছ করিতে লাগিলাম। ষ্টীমারের বামী ঘন ঘন বাজিতে শুরু করিয়াছে, উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

ষ্টেশনে নামিয়াও বারকয়েক ভুবনবাবুব খোঁজ করিয়াছিলাম কিন্তু দেখা মেলে নাই, হয়ত আমারই মত কোন ছুঁতাগা তাহার প্রববাণে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। চাকুরীজীবী, কাজ না করিলে প্রমোশন নাই। আমারই মত যুবক সম্মুখে বিরাট ভবিষ্যৎ, কত অগণিত ধাপ তাহাকে ডিঙাইতে হইবে.....নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে কেন।

আবার সেই ট্রেনের ঠাসাঠাসির মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। দীর্ঘ ছ-সাত ঘণ্টা এমনি ঠায় বসিয়া থাকিতে হইবে। আর মুখ খুলিব না ইহা এক প্রকার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি। ভুবনবাবু ভদ্র, তাই পরিচয়ের সামান্য একটু সূত্র ধরিয়াই আমাকে রেহাই দিয়া গিয়াছেন।

লাক্সাম আসিয়া ট্রেন হইতে নামিয়াছি, কাঁধের উপর করম্পর্শ অল্পভব কবিতাম, মুখ ফিরাইয়া দেখি ভুবনবাবু। প্রশ্ন করিলাম—আপনি।

—হ্যাঁ আশ্চর্য্য হবেন না, ভুবনবাবু কহিলেন, পিছু নেওয়াই আমাদের কাজ। আপনি বুঝি এখন নোয়াখালির ট্রেন পরবেন? চলুন একসঙ্গে গোটাছুই ষ্টেশন যাওয়া যাক। আমাদেরও দিনকয়েকের জন্তে দেশে যেতে হবে। একসঙ্গেই যাওয়া যেত, কিন্তু হুজুম এসেছে চিটাপং হয়ে যেতে হবে। তা হোক, তার পরে দীর্ঘ অবকাশ—প্রায় মাসখানেক দেশেই থাকতে পারব। যাবেন আপনি—ভুবন পোন্ধরকে ভুলবেন না যেন।

এইবার লইয়া দ্বিতীয় বার অহরোধ। লক্ষ্য করিলাম কিন্তু হাসিয়া জবাব দিলাম, যাব—হাতিয়া যাওয়া যখন নিশ্চিত তখন আপনাকে ভোলা আমার হাতেই পারে না। দিনসাতকের মধ্যেই আমি যাচ্ছি।

ভুবনবাবু মুহু মুহু হাসিতে লাগিলেন—বিনয়ের হাসি।

স্নাডী ছাড়িবার দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িতেই ভুবনবাবু

সহসা ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িলেন, বড্ড ভুল হয়ে গেছে... আমাকে এঙ্কুনি নামতে হচ্ছে। আমাকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া চোখের পলকে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আমি অবাকবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। লোকটি আগা-গোড়াই কেমন খাপছাড়া। বুঝিলাম না তার বর্তমান শিকার কে—আমিই, না অপর কেহ।

গাড়ীটা ফাঁক ছিল। খানিক ঘুমাইয়া লইলে হইত। নিজের সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ যে সে নিশ্চয় আমার প্রহরায় নিযুক্ত আছে। থাকাবই নজাবনা।

ঘুমাইয়াছিলাম বেশ নিশ্চিন্ত নিরুপজ্জবে। কুলির চাঁৎকারে চোখ বগড়াইয়া উঠিয়া বসিলাম। চাহিয়া দেখি, গন্তব্যস্থানে পৌছিয়াছি। চোখে পড়িল মেঘনা নদীর প্রবল জলোচ্ছ্বাস, কানে আসিল জলের গাঙীর ডাক।

নদীর কূলে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সারি সারি ভিজি বাঁধা রহিয়াছে। ষ্টেশনে লোক আসিয়াছিল, হাত দিয়া ভিজি দেখাইয়া সে আমাকে জ্ঞানাইল, ‘সাম্পানে’ করিয়া আমাদের ষ্টীমার-ঘাটে বাইতে হইল। কিন্তু এই তরঙ্গসঙ্কুল মেঘনাবক্ষে ঐ এতটুকু ক্ষুদ্র ভিজি যে কেমন করিয়া ভাসিবে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এদেশের লোকের কি জীবনের মায়া বলিয়া কোন পদার্থ নাই। আমার ইতস্তত ভাব দেখিয়া সঙ্গী ভদ্রলোকটি একটু হাসিয়া কহিলেন, অল্প উপায় ত আছে—গাড়ীতে যাচ্ছে? দশ মিনিটের পথ ছ-ঘণ্টায় যেতে হবে।

কহিলাম, তাই চলুন—

ভুবন পোন্ধরকে আমি ভুলি নাই। তাহাকে এত সহজে ভোলা আমার পক্ষে সম্ভবও নয়। আমার একঘেয়ে পথ চলায় খানিকটা পরিবর্তন। মোটের উপর তর্কে এবং চিন্তায় সময়টা এক প্রকার স্ফটিয়া গিয়াছে। এবারে পথ চলিয়াছি বাবাকে সঙ্গে কনিয়া—ঠাসাঠাসির বালাই নাই। বাবা কোম্পানীর পরিচালক। ষ্টীমারের শ্রেষ্ঠ কেবিনাট আমার আয়ত্তাধীনে। নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে চলিয়া ফিরিতেছি। সারেং, হুকানী, ড্রাইভার মায় খালাসীরা পর্যন্ত ততস্থ। পদমর্যাদার প্রভাব। এই ব্যবস্থাই সর্ব্বত্র। বাবার পরিচালনায়ও তার এতটুকু ক্রটি লক্ষিত হইল না। হইবার কথাও নয়—তিনিও মাহুয়।

আমি সারেঙের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে চেয়ার ছাড়িয়া দিল। আমি বসিলাম না। শীমার তীব্র মত ছুটিয়া চলিয়াছে, বিরামহীন। সম্মুখে জল আর জল—সীমাহীন অস্তহীন। মাঝে মাঝে সাদা মেঘের পাহাড় জলের অতল তল হইতে ঠেলিয়া উঠিয়া আকাশকে চুষন করিতেছে। আকাশ এবং পাতালের সহিত একটা গভীর যোগাযোগের স্রষ্টি করিয়াছে। দক্ষিণে একটি কাল রেখা দেখা দিয়াছে। স্মরী প্রকৃতির ঠোঁটের পাশে যেন ছোট্ট একটি তিল। চমৎকার মানাইয়াছে—লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছে। মুখ চোখে চাহিয়া দেখিতে ছিলাম। সারেং বলিল, ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে, ঝড় উঠতে পারে..আপনি কেবিনে যান বাবু। কিন্তু আমি তাহার অহরোধ রক্ষা করিলাম না। আমি এখানে থাকি না— থাকায় ঝড়ের কিছুই আসিয়া যাইবে না। মিছামিছি নিজেকে কেন বঞ্চিত করি। নদীর রক্ত মূর্তির সহিত আমার কখনও পরিচয় ঘটে নাই। শুনিয়াছি যে ঘে ঘেঘিরাই মেঘনা নদী মাতিয়া উঠে। কথাটির সত্যতা উপলব্ধি করিলাম। এতক্ষণের শাস্ত জলরাশি হঠাৎ ঘন কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, উর্দ্ধে চলিয়াছে মেঘের দূরন্ত খেলা। চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছি, অকস্মাৎ আমার চোখের সম্মুখে সব অন্ধকার হইয়া গেল। ভয়াবহ আরোহিণীর আর্ন্ত কর্তরোল কানে আসিতে লাগিল। অস্তমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, প্রচণ্ড একটা জলের ঝাপটা আমাকে সম্পূর্ণরূপে ভিজাইয়া দিয়া পিছনে গড়াইয়া গেল। জলের উপর শীমারখানি প্রবলভাবে আছাড় বাইতে লাগিল। আমার সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইতেছিল চোখ বুজিয়া খানিক পড়িয়া থাকি, কিন্তু নদীর অশান্ত পাগল মূর্তি আমাকে অনড় করিয়া রাখিয়াছে। এক দিকে ভয়, অপর দিকে আকাঙ্ক্ষা। আর এক ঝাপটা...তার পরে আর একটা। আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। পা দুখানা ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল—হৃৎস্পন্দন যেন থামিয়া গিয়াছে। সহজ অহুভূতিটুকুও হারাইয়া ফেলিয়াছি। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া চলিল ক্রুদ্ধ বাতাস এবং জলের সহিত মাহুঘের ক্ষুদ্র শক্তির প্রবল সংগ্রাম।

সারেঙের কর্তর কানে আসিল—ভয় পাবেন না বাবু, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। বাতাসেব তেজ নেই।

কি যে আছে, কি যে নাই, তাহা ভাল করিয়া বোধ করিবার মত সহজ বুদ্ধি তখনও আমার মধ্যে ফিরিয়া আসে নাই। বাবার সাড়া পাইলাম,—কাপড়-জামা বদলে আয়। কেবিনের দিকে অগ্রসর হইলাম, সমস্ত শরীর তখন কাঁপিতেছে।

হাতিয়া-দীপে গিয়া শীমার পৌছিল রাত আটটায়, জলাভাবে শীমার ফুলে ভিড়িতে পারিল না। রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইলাম। আরোহিণী একে একে নৌকার নাহায়ে তীরে উঠিয়া গেল। এই আমার জন্মস্থান—এই মাটিতেই আমার সহিত পৃথিবীর প্রথম চেনা। জন্মস্থানের উপর মাহুঘের কোন মোহ আছে কিনা আমি জানি না, কিন্তু দূর হইতে দীপের ষড়টুকু আমার চোখে পড়িয়াছে তাহা একখানি জীবন্ত ছবি বলিয়াই মনে হইল। অতিরঞ্জিত নহে—সত্য।

বাবাকে বলিয়া কহিয়া দীপেই দিনকয়েকের জন্ম রহিয়া গেলাম। জীবন পোদ্দারকে পরদিন স্মরণ করিব মনে মনে স্থির করিয়া সেদিনকার মত ওখানকার সাব-এজেন্ট শশীনাথের তত্ত্বাবধানে রহিয়া গেলাম। কিন্তু বিস্ময় আমার সীমা ছাড়াইল যখন সত্য সত্যই পোদ্দার মহাশয়ের দেখা পাইলাম।

বৃদ্ধ—অর্দ্ধোন্মাদ...

আমি সংশয় প্রকাশ করিয়া কহিলাম—বল কি, ইনিই জীবন পোদ্দার ?

শশীনাথ কহিল—আজ্ঞে ইনিই...কিন্তু আপনি কি পোদ্দার-মশাই সঘন্ডে অল্প কিছু শুনেছেন ?

কহিলাম—দেখেওছি, কিন্তু থাক সে-সব কথা। চাহিয়া দেখিলাম পোদ্দার মহাশয় নদীর তীরে দাঁড়াইয়া শূন্য হস্ত-পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিতেছেন।...

শশীনাথ কহিল—মাহুঘের সাড়া পেলেই সব থেমে যাবে। ওর যত আক্ৰোশ এই মেঘনা নদীর উপর।

ভিজাসা করিলাম—কেন ?

শশীনাথ কহিল—নদীর জালায় মাহুঘ কি আর স্বস্তিতে হুমেতে পারে! সাবেক দিনের হাতিয়ার আজ আছে

কি—সব জলের তলায়। নইলে বুড়োর আজ এই দশা হয়...

শশীনাথ মুহুর্তের জন্ত থামিয়া পুনশ্চ কহিল—এক সময় ঐ বুড়োই ছিল হাতিয়া-বীপের বার আনার মালিক। এক আঙুল জমীর জন্তে কত মাথা গরু পায়ে তলায় গুঁড়ো হয়ে গেছে তার ঠিক নেই—অথচ ভোগ করবার একটা প্রাণীও নেই।

আমি বিম্বিত হইয়া পড়িলাম। চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল এক অশীতিপর বৃদ্ধ, যে এক ছটাক জমির জন্ত ছুটি মাথা লইয়া অবশেষে দেশের মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলিতে আত্মহত্যা করিয়াছে।—এরা সকলেই সমান, শুধু শিক্ষা এবং চালচলনের রকমকমেরে আমরা বিচার করিতে তুল করিয়া বসি।

শশীনাথ পুনরায় কহিল—বুড়োর উপায় নেই...এমনি মুখ মিষ্টি, আর তেমনি চাপা। তবে একটা কথা বুড়ো সকল সময়ই গলাবাজি করে বলত, হাতিয়া-বীপের বোল আনার উপর প্রভুত্ব যেদিন সে করতে পারবে সেই দিন নিবৃত্তি হবে তার বৃদ্ধির স্পৃহা। ওর আশা প্রায় পূরণ হইয়াছিল, কিন্তু মাহুকের অতিবড় লম্বা ভগবান সহ্য করেন না। ও শুধু নিতেই জানে, খেচ্ছায় কিছু দিতে শেখে নি, তাই ওর ভার উপরওয়ালা নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। যেখন ওকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করলে।

কহিলাম—যেখনই বুঝি শেষ পর্য্যন্ত পোন্ধর-মশাইকে সর্ব্বস্বান্ত করে ছাড়ল? শশীনাথ যে ভাবে গল্প ফাঁদিয়া বসিয়াছে তাহাতে কতকণে যে সে তাহা শেষ করিত জানি না, তাই ইচ্ছা করিয়াই আলোচনাটা বন্ধ করিয়া দিলাম। আমার শেষ কথাটা বোধ করি পোন্ধর-মহাশয়ের কানে গিয়াছিল, তাঁহার হাত-পা ছোঁড়া এক মুহুর্তে বন্ধ হইয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে আমার সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন—কোন দিন দেখি নি ত...এখানে নতুন বুঝি... তোমার নাম কি বাবা?...

কহিলাম...

বিমর্ষ কণ্ঠে তিনি কহিলেন—কিছু নেই..বুঝলে বাবা।

সে সোনার হাতিয়া কি আর আছে! সব উড়েপুড়ে গেছে...আর আমি বুড়ো সেই ভাড়া হাটে বসে বোসাতি করছি। বৃদ্ধ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কি করণ মর্মান্বস্ত সে হাসিটুকু...

তিনি পুনরায় কহিলেন—বাবাজী কি এখানে বেড়াতে আসা হয়েছে?

কহিলাম—এটা আমার জন্মস্থান..

বৃদ্ধ পোন্ধর-মহাশয় ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিলেন, কিছুই নেই বুঝলে...তা হোক...যদি একবার বুড়োর ভাড়া কুটারে পায়ে ধুলো দাও ত আনন্দিত হব।

মুখের উপর 'না' বলিতে পারিলাম না, অথচ ইহার ও সেই অশীতিপর বৃদ্ধ খুনে আসামীর মধ্যে আমি কোন প্রভেদ দেখিলাম না। কিন্তু সেই দরিদ্র নিঃশ্রেণীর বৃদ্ধের সহিত একটা ভ্রমভাবে কথা কহিতেও আমার শিক্ষিত মন সঙ্কচিত হইয়া পড়িয়াছিল। এমনি মজা, শুধুমাত্র বর্ণের তফাতে এবং কথা বলিবার ধরণে একে উপেক্ষা করা ত রূপের কথা বরণ আগ্রহের সহিত বলিলাম—আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন...চলুন আপনার সঙ্গে কোথায় যোত হবে। শশীনাথকে কহিলাম—তুমি বরণ যাও, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি। শশীনাথ চলিয়া গেল—আমি বৃদ্ধকে অতসরণ করিলাম।

পথ চলিতে চলিতে পোন্ধর মহাশয় কহিলেন—জিনিসসারে আমার কেউ নেই, এক জী ছাড়া। আর ঠিল মাটি..অনেক...অনেক...মুহুর্তের জন্য বৃদ্ধ থামিলেন, কহিলেন—যখন ছিল তখন কি কারণে, কি অকারণে কাকুর জন্যে একটি পয়সা ব্যয় করি নি—সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিগেছি এক মাটিন নেশায়। কিছু নেই...বুঝলে বাবা, আমার নিজের বলতে কিছু নেই, তাই আজ জীর কথায় উঠি বসি। বৃদ্ধ টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আমি অবাক হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিক চাহিয়া রহিলাম। তিনি কহিলেন—বুঝলে না...নিজের খেয়াবে ত প্রায় নিঃশব্দ হয়েছি...যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা ন-হয় জীর খেয়ালেই থাক...তাই যত রাজ্যের চেনা-অচেনা ছেলেদের নিয়ে গিয়ে খাওয়াই।

বৃদ্ধ মুহুর্তে যেন বদলাইয়া গেলেন,—বলতে পাা হোকরা, স্বপ্ন কোথায় পাওয়া যায়? বৃদ্ধ হো হো করিয়া হাসিয়া

উঠিলেন, হুখ...হুখ...লোকে আমার গালাগাল দেয়... শাপান্ত করে বলে, মাটির মায়ায় আমি অনেক কুলাজ করেছি।...করেছিই ত...এক-শ বার করেছি...কে না করে শুনি! দেশের রাজা থেকে দীনদুখী প্রজাতি পর্যন্ত। তবে আবার এত কথা কেন।

ইহাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া ভাবিতে পারিলাম না। বরং এর মধ্যে যে নিখুঁত সত্য লুকাইয়া আছে তাহা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলাম। কিন্তু ইহা লইয়া ধামক কথা বাড়াইয়া নিজেকে মিথ্যা অপরাধী করিয়া লাভ কি।

দীনদুখী সেই অশীতিপর বৃদ্ধ...যে শুধু শক্তি-অভাবে আত্মবলি দিয়াছে...সে আসিয়া আমার পথরোং করিয়া দাঁড়াইল। আমি ধমকিয়া দাঁড়াইলাম। বৃদ্ধের এতক্ষণে হাঁস হইল। প্রকৃতিস্থ কণ্ঠে কহিলেন—ধামকে কেন বাবা?

কহিলাম—আমার বাপুয়া হুঁতেই পারে না।

বৃদ্ধের কণ্ঠধরে ব্যাকুলতা ছুটিয়া উঠিল, যাবে না? কেন? ইয়ারকি পেয়েছ নাকি? সে বুড়ীকে গিয়ে আমি জবাব দেব কি!

কহিলাম—তা আপনিই জানেন...সে কথা ত আমার ভাববার নয়। আমি মুখ ফিরাইয়া উল্টা পথে চলিলাম—এই একই কারণে আর এক অসহায় বৃদ্ধকে আমি মর্যাদাসিক উপেক্ষা করিয়াছিলাম। সে কথা আমি ভুলি নাই।

পোন্ধর মহাশয় ছুটিয়া আসিয়া আমার দুখানি হাত ধরিয়া করুণ কণ্ঠে কহিলেন—আমাকে ঘেমা কর হুখ নেই...ও সবাই করে, কিন্তু বুড়ী আমার বড় ভালমানুষ, তাকে উপবাসী রেখে না...বলে, একটা কানা খোঁড়াও যদি থাকত নিঃসন্তান কিনা বুঝলে বাবা...তাই ঘটা করে এত আয়োজন ..

অদূরে জলের উপর একটা প্রচণ্ড পতনশব্দ শোনা গেল। সম্ভবত মাটিভাঙার শব্দ। বৃদ্ধ কান খাড়া করিয়া

ভনিলেন, পর মুহূর্তেই আর্দ্রনাদ করিয়া ছুটিয়া অগ্রসর হইলেন, আমার সর্বস্বান্ত করলে...আমায় খুন করলে...যেদে কেলে...বৃদ্ধ পাগলের মত নদীর কিনারায় ছুটিয়া গেলেন। আমার দৃষ্টিশক্তি তাহাকে দ্রুত অহুসরণ করিল।

আকাশে পূর্ণিমার গোলাকার চাঁদ উঠিয়াছে। বামে সীমাহীন নদী...দক্ষিণে বীপের একখানি পরিপূর্ণ ছবি...জাঁকাবঁকা একটি সরু রাস্তা...আর আমি এই নির্জন নদীতটে দাঁড়াইয়া একাকী...কত কথাই ভাবিতেছি...ভাবিতেছি সত্য জগতের কথা...ভাবিতেছি নিজের কথা .. ভাবিতেছি মানব-চরিত্রের রকমারি অভিব্যক্তির কথা।...

পিছমে গলার শব্দ পাইলাম। ফিরিয়া দেখি শশীনাথ। কহিলাম—ভূমি! তোমার ত এ-সময় এখানে আসবার কথা নয়।

শশীনাথ হাসিয়া কহিল—এমন যে হবে তা আগেই জানতুম, তাই দূরে দূরে আপনাকে নিঃশেষে অহুসরণ করেছি। চলুন...

কহিলাম—কিন্তু পোন্ধর মহাশয়?

শশীনাথ কহিল—আজ আর তাঁর দেখা পাওয়া যাবে না। সবই গেছে, কিন্তু স্বভাবটা বুড়ো আজও বদলাতে পারে নি।

প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কথা বাড়াইলাম না, কহিলাম—চল। অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি, কিন্তু অবাধ্য চোখ দুইটা বারে বারে পিছন ফিরিয়া বৃদ্ধকে অহুসন্ধান করিতেছিল। শশীনাথ যত নজিরই দেখাক না কেন, একটা লোক আগাগোড়া ফাঁকির উপর তার জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারে, এ-কথা আমি বিশ্বাস করিলাম না। কিন্তু মনের এই বিপ্লব বাহিরে প্রকাশ করিলাম না। পথ চলিতে লাগিলাম, কিন্তু পোন্ধর মহাশয় সম্বন্ধে একটা কৌতূহল লইয়া ফিরিলাম, লোকটি সত্য সত্যই উন্মাদ!



নিশীথে

শ্রীশুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

হে তারকাবলি,
তোমরা কি মহাশূন্যে জোনাকি কেবলি,
আলোকের কীট শুধু, আঁধারে জলিছ স্পন্দহারী ?
তোমরা কাহারো ?
ওই ক্ষীণ স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলো
কেন এত বাসি আমি ভালো ?
কেন আমি প্রতি সন্ধ্যাবেলা
নীরবে একেলা
চেয়ে থাকি উর্জ্জ্বল ? কেন ওই জ্যোতিষ্ক-জটলা
করে মোরে স্বপ্নাতুর বিস্ময়ে উত্তলা,
হই আশ্বহারা ?
আর কিছু নও, শুধু কিরণকন্দুক, শুধু তারা ?
তিমির সাগরবক্ষে লক্ষ লক্ষ আলোক-তরঙ্গী
ভাসিয়া চলেছে কোথা ? ক্ষুদ্র এই মুন্সায়ী ধরণী
যুগ-যুগান্তর ধরি চেয়ে আছে কুহক-বিহ্বল
কত লক্ষ বরষের অকুরন্ত জিজ্ঞাসা কেবল
চঞ্চল করিছে তারে অন্তহীন কালে পলে পলে !
মাটির শিশুর বক্ষে তাই কি উথলে
সে অনন্ত প্রশ্ন-পরস্পরা
সসাগরা ধরা
লভিল না যে উত্তর, সম্মান তাহার
জ্যোতির্বেত্তা অসামান্ত গণিতে
অলক্ষ্যের বক্ষ হতে সহস্রের পারিবে আনিতে ?
অজ্ঞান তিমিরে
ক্ষণসম অন্ধআঁধি এই আমি, তবু মোরে ঘিরে
মাতৃ কুক্ষি-প্রবাহিনী জীবনের ধারা,
রহস্যে রহস্যে ফুলহারী
উৎলিছে অহর্নিশ নক্ষত্রের কিরণে কিরণে,
কাপিতেছে প্রাণভরা জীবনের স্পন্দনে স্পন্দনে ।

কি প্রশ্ন সে ? কি জিজ্ঞাসা জাগে প্রাণে অসীমের লাগি ?
ক্ষুদ্র প্রাণ হয় যে বিবাগী !
জানি না বুঝি না যারে কাঁচি তার তরে ;
বুঝি যারে, জানি যারে রহস্যসাগরে
তারে আমি দিই বিসর্জন !
জানি সে মরালী মোর অঙ্কুরে করিবে সম্ভরণ
কতু ভুবিবে না,
চির পরিচয় মাঝে হবে সে অচেনা
অসীম রহস্তপারাবারে ।
ভূমার মাঝারে
হারায় সে ক্ষুদ্র সীমা, শাশ্বতী স্থবমা
তাহারে যে করে নিক্রপমা ।
নক্ষত্র দীপালি,
হ'তে যদি আলিসার কণ্ঠশিখা দীপাবলি খালি,
দীপ্তি ঢালি রাতে
পরদিন নিভিতে প্রভাতে,
তাহলে কি বিস্ময়ে গৌরবে
হ'ত কি এ মুগ্ধ হিয়া উদ্বেলিত বাণীহীন স্তরে ?
অন্তহীন দেশকালে অলে কোটি শিখা,
নিকষে হিরণ্যদীপ্তি আলোকের স্বকুমন্ত্র লিখা ।
অক্ষরে অক্ষরে তার বিলিখিত আলোক-পুরাণ
সৃষ্টিস্থিতিগমে অকুরান ।
উর্জ্জ্বল তাই থাকি চেয়ে,
ছ-নয়ন বেয়ে
আনন্দের মন্ডাকিনী করে দরধারে,
তারকার কিরণ-আসারে
মিশে স্বস্তিনিয়ামিত মোর অন্তঃসলিলার বারি ।
মনে হয় কোটি নরীহার পরি স্ত্রীমন্দিরী নারী
নয়নবক্ষে মহাশূন্যে রয়েছে বসিয়া,
থাকি থাকি কণ্ঠহার হ'তে তারা পড়িছে খসিয়া

উদ্ধাবগে ধরাপারে খুপরেখায়,
 বাস্পীভূত বহি-দীপ্তি শূন্যে গলে যায়।
 যদি সে ভ্রমাবশেষ রত্নোপল লাগিত এ বুকে
 মরিতাম হৃদে।
 প্রাণ মোর উড়ে যায় উর্দ্ধপানে অঁধারের পাখী,
 ওই যে জলিছে তারা, তারি পানে স্থির দৃষ্টি রাখি।
 লক্ষ তারকার মাঝে কেন চাই তারে,
 কে বলিতে পারে ?
 প্রথম মেলিয়া অঁধি বেদিন চাহিছ শূন্যপানে,
 করুণ নয়ানে
 দ্বিধাদৃষ্টি ঢেলেছিল সে কি মুখপরে
 বহু স্নেহভরে ?
 মোর সত্তা চেতনায় সে দৃষ্টি কি গিয়াছিল মিশি ?
 তাই প্রতিনিশি
 সে আমারে ভাকে 'আয়' 'আয়',
 কিরণ-রশিত ইসারায় ?
 তাই কি জীবনপথে চলিতে চলিতে
 মনে হয় চকিতে চকিতে,
 জলিছে নিভিছে যেন অন্ধকারে নক্ষত্রনিচয়
 এ বিপুল জনসঙ্ঘে নিত্য যারা ভিড় করি রয়
 আমার চৌদিকে,
 কেহ চায় অনিমেষে, কেহবা নিমিষে ?
 নরনারী কতু নয় এরা,
 শুধু আলোকের বিন্দু অন্ধকারে ঘেরা
 জটলা বেঁধেছে চারিধারে,
 ভেসে যায় কাতারে কাতারে
 তিমির সাগরচ্ছবালে।
 সেই জনতার মাঝে কে যেন কিরণ-ইজ্ঞজালে
 বন্দী করে মোরে,
 কী অটুট জোরে
 পঙ্কি বাঁধা নয়নে নয়নে।

ওই সজ্জাতারাসম দিসন্তের স্বপ্ন গগনে
 মনে হয় তারে,
 নিশান্তের শুকতারকারে
 কেন স্মরি, সে যখন অচল নয়ানে
 চাহে মুখপানে ?

তোমরা ত নয় শুধু তারা,
 তোমরা যে অনন্তের আলোক-ইসারা
 মরতের প্রাণে !

নও শুধু জালাময় জ্যোতিষ্কমণ্ডলী
 নিশান্তে নিভিয়া যাও সারা নিশি জলি।
 তোমরা পেয়েছ প্রাণ নরজন্মে এ মোর অন্তরে
 গুচু চিরঘরে।

বৃন্তহারা অবন্ধন আলোকের ফুল,
 শূন্যে ও গতিতে বহুমূল।

তাই তোমাদের মাঝে কিরি আমি আত্মীয়-সভায়
 যাদেরে বেসেছি ভালো তারা দীপ্তি পায়
 তোমাদের মাঝে।
 রশ্মি রশ্মি বীণা বাজে
 তোমাদের কিরণে কিরণে
 প্রাণের গহনে।

বহু স্মৃতি অল্পভূতি বিস্মুরিত কেনোচ্ছ্বাসরাশি
 তোমরা যে, হৃদয়ের মহাশূন্যে উঠিতেছ ভাসি।
 নভোনীলে ভাসমান আলোকের দীপগুণ নহ,
 দরিদ্র্য ভাসায়েছি জালিয়া যে প্রদীপনিবহ
 তোমরা তাহারি,
 নহ শুধু গগনের স্ক্রজ গ্রহতারা।



নবনারীসমাজে নিবেদন

ঐবিজয়চন্দ্র মজুমদার

নারীজাতির গৌরব বাড়াইবার দিকে নানা উদ্যোগ চলিতেছে; এ-সংবাদ কয়েকখানি পত্রিকায় পড়িয়াছি, আর বিশেষভাবে লোকমুখে শুনিয়াছি,—নিজে দেখিয়া জানিবার সুবিধা আমার নাই। সমাজে নারীদের বিস্তৃত অধিকার দেওয়ার পক্ষে আগে পুরুষেরাই চেষ্টা করিতেন, আর পুরুষ অভিভাবকদের নির্দেশে ও উৎসাহে নারীরা নূতন পথে চলিতেন। শুনিতে পাই—এখন অনেক তরুণ বয়সের নারীরা স্বেচ্ছায় ‘সনাতন প্রথা’ পর্যাণ্ড গোটাঁকতক রীতি ছাড়িতেছেন, পুরুষদের আশ্রয় না লইয়া প্রয়োজনে নানা স্থানে যাইতেছেন, উচ্চতম শিক্ষা পাইবার উদ্যোগে নিজেরাই শিক্ষাশালা বাছিয়া লইতেছেন, আর দেশের কাজের অনেক প্রতিষ্ঠানে আপনাদের রুচি অল্পসারে পুরুষদের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে জুটিতেছেন। যাহারা এইরূপে আপনাদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার অগ্রসর, আমার এই নিবেদনটুকু তাঁহাদেরই কাছে।

সারা বিশ্বের প্রকৃতির মধ্যে আছে এই নির্দেশের ইঙ্গিত ও তাড়না—আছে আমাদের শরীর-মনের উপাদানের মধ্যে এই নির্দেশের ইঙ্গিত ও তাড়না, আমরা আমাদের অসীম বিকাশের সম্ভাবনার দিকে এই টানের জোরে সকল বাধা পরাস্ত করিয়া অবিরাম ছুটিয়া চলিব। আমরা প্রতিজ্ঞা করি ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতা ফুটাইব, প্রতি জীবনের গৌরবরক্ষায় কোন গোলামিতে ঘাড় না পাতিয়া আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিব আর যে আইন বা বিধান প্রকৃতির জ্ঞানে জ্ঞানে অচ্ছেদ্যরূপে গাঁথা আছে, তাহার সঙ্গে জীবনের গতি মিলাইয়া প্রকৃত মনে বাড়াইয়া উঠিব—ইহাই প্রকৃতির আদেশ ও তাড়না; আর সেই তাড়নাব অনুসরণকেই বলি স্বাধীনতার অনুসরণ।

এই স্বাধীনতার পথে বা লক্ষ্যে চলিতে হইলে যে-সকল ছোটখাট কাজ অবশ্য করা চাই, তাহার মধ্যে এই রকমের কাজগুলি পড়ে, যথা—পড়া এড়াইয়া বাহিরের বাতাসে

আসা, সাহস বাড়াইয়া চলাফেরা, যথাসাধ্য জ্ঞানবৃদ্ধির দিকে উদ্যোগ করা, ইত্যাদি। উদ্যোগের ছোটখাট পাঠ্যবিক্ষেপের দৃষ্টান্তে জ্ঞানলাভের উদ্যোগের দৃষ্টান্ত দিয়াছি; হয়ত সেইটি অনেকের মনের মত ন হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যদি মনে রাখেন যে কত উদ্যোগ করিলেও সকলের পক্ষে সকলের ভাগ্যে বহু জ্ঞান সঞ্চয়ের সুবিধা হয় না, আর পণ্ডিত না হইলেও মানব নিজের কর্তব্য পালন করিয়া সমানে স্বাধীনতার পথে চলিতে পারে, তবে স্বাধীনতার পথে চলিবার এই যে ছোট ছোট পদক্ষেপের কথা বলিয়াছি—উহাদের মূল্য লক্ষ্যপথের আদর্শের বিচারে এক কড়া-দু’কড়া বই নয়। স্বীকার করি, যখন জীবনের ছোটখাট কর্তব্য গুরুবুদ্ধিতে পালনীয়, তখন খুব কড়া হইয়া কড়া-ক্রান্তির হিসাব রাখিতে হইবে; তবে সাবধান—আমরা যেন না-হই কড়ায় কড়া আদ কাহনে কান।

যাহাদের কাছে আমার এই নিবেদন, তাঁহাদের খাটি স্বাধীনতালাভের সম্বন্ধ যখন পাকা, তখন নির্ভয়ে দেখাইয়া দেওয়া চলে যে অনেক সময়ে প্রাচীন কুসংস্কার প্রচ্ছন্ন পাপের মত অতর্কিতে মানুষকে গোলামির জালে জড়াইয়া দিতে পারে, অথবা প্রাচীন সংস্কারজনিত ভাবের মোহ মনের তলায় কলুষধারার মত স্বাধীনতার বিরোধী পথে টানিতে পারে। এ-সম্পর্কে সনাতন নিয়মের বিবাহ-বন্ধনের প্রথা খুব উপযোগী দৃষ্টান্ত। যাহারা বিবাহ করিবেন না—আপনাতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বই পুণ্যের গৌরবে জীবনের কাজ চালাইবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই বিবাহের দৃষ্টান্ত খাটিবে না।

বিবাহে জীবনের স্বয়ং ও অধিকার (statue) প্রতিষ্ঠিত বদলায়। আর সনাতন প্রথা যন্ত্রণা-বিধানের বিবাহে জীবনের মৌলিক স্বাধীনতা অনেকখানি হারাষ্টয়া গোলামিব বান্ধন বরণ করিয়া লইতে হয়; বেদ-না, আইনের বিধানে বাধ্য হইতেই হইবে যে—পুরুষ ইচ্ছা করিলেই অঙ্গ বিবাহ

করিয়া পুরাতন জীকে অসহায় ও অকর্মণ্য করিয়া দিতে পারে। পুরুষের যদি অর্থের সচ্ছলতা থাকে তবে মামলা করিয়া জী কিঞ্চিৎ ভরণপোষণ পাইতে পারেন,—তাহা ছাড়া কোনও ধরণের স্বাধীনতা অর্জন বা ভোগ করিতে পারেন না; তবে স্বৈরিনী হইলে পারেন, কিন্তু সে ধরণের অবস্থার কোন বিচার এ-প্রবন্ধে করিব না, আর নব-নারীরাও সে স্থিতি অবস্থার বিচার করা অতি হেয় কাজ মনে করিবেন।

বাহাদের বিবাহ হয় নাই, কিন্তু আইনের বিধানে হইয়াছেন বালীগু তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—বিবাহের এমন অহুষ্ঠান আছে কি-না বাহাতে কোন-একট! বিশিষ্ট ধর্মে দীক্ষা না লইয়া, আর আপনাদের জন্মকালের জাতীয়ত্ব বা ‘হিন্দুত্ব’ বজায় রাখিয়া ব্যক্তিগত প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া বিবাহ করা চলে। উত্তরে বলিব—আইনের বিধানে এইরূপ অহুষ্ঠান আছে। বাহারা শোনা-কথায় এই বিষয়ের আইনের নাম শুনিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয় মনে পড়িতে পারে—১৮৭২ অব্দের তিন আইনের নাম, সেই আইনের বিকল্পে রচিত আইনের নাম, বাহা ব্যারিষ্টার গৌরের উদ্যোগে পাস হইয়াছে। এই দুইটি আইনের ব্যবস্থাতেই বিবাহ হয় একনিষ্ঠ, অর্থাৎ বিবাহিতেরা স্বাম্যমৈত্রিতে একে অন্তকে ছাড়িয়া নুতন বিবাহ করিতে পারেন না,—জীকে আইনের ব্যবস্থায় গোলামির বোঝা বহিতে হয় না। কোন বিশেষ-বিশেষ কারণে এই দুই আইনের ব্যবস্থায় আপত্তি না থাকিলেও কেহ-কেহ সরকারী আইনে বিবাহ রেজেষ্ট্রি করা উচিত মনে করেন না; তাঁহাদের আপত্তির বিচার অল্প দুই-একটি কথার বিচারের পরেই করিতেছি। প্রথমে উল্লিখিত আইন দুইটির কোন-কোন ব্যবস্থার তুলনায় বিচার করিব।

গৌর মহাশয়ের উদ্যোগে বিধিবদ্ধ আইনের নিয়মে বিবাহিতেরা ডাক ছাড়িয়া বলিতে পারেন—তাঁহারা ‘হিন্দু’; সেখানে শব্দের অর্থ বাহাই হোক। এই আইনে বিবাহিতেরা ও তাঁহাদের সন্তানেরা কিন্তু সম্পত্তির অধিকার উত্তরাধিকার প্রভৃতিতে হিন্দু ল নামে প্রচলিত আইনে শাসিত হইবেন না,—

শাসিত হইবেন সেই আইনে বাহাতে এদেশবাসী বিদেশীরা আর ঐষ্ট্রিয়ানেরা শাসিত-হন। তাহা ছাড়া এই আইনে বিবাহিত পুরুষের পিতা ইচ্ছা করিলেই তাহার স্থলে পোষ্যপুত্র লইতে পারেন। ১৮৭২ অব্দের গোড়াকার আইনে বাহাবা বিবাহিত হন, তাঁহারা কিন্তু শাসিত হইতেছেন পাকা রকমে হিন্দু ল অহুসারে, অর্থাৎ ‘জাতিতে’ (ব্রাহ্মণ্য-বিধানের বর্ণে নয়) ‘হিন্দু’ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া। কোনও বিবাহিতের পিতা ব্রাহ্মণ্যধর্ম না-মানার দমন বিবাহিত পুত্রের স্থলে পোষ্যপুত্র লইতে পারেন না। গোড়াকার তিন আইনের বিধানে বলিতে হয়—বিবাহিতেরা হিন্দু রিলিজন্স মানেন না; অর্থাৎ যে সনাতন বিধি বা অহুষ্ঠানে আছে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য আর বাহাতে বিবাহিত পুরুষ ইচ্ছা করিলেই বহু বিবাহ করিতে পারেন তাঁহারা সেই ধর্ম বা রিলিজন্স মানেন না। ইহা না মানায় তাঁহারা জাতীয়ত্বের নামের হিন্দুত্ব হারান না আর কোনও প্রাচীন আইনগত অধিকার হইতে বঞ্চিত হন না। গৌর মহাশয়ের প্রবর্তিত বিধানে ডাক ছাড়িয়া হিন্দু নাম জারি করিলেও বহু অধিকারে বঞ্চিত হইতে-হয়, ইহা বলিয়াছি। গোড়ায় একথাও বলিয়াছি যে, উভয় আইনের বিবাহেই জীজাতির স্বাধীনতা ভুল্যরূপে বজায় থাকে।

গোড়াকার তিন আইন সম্বন্ধে অনেক শিক্ষিতদের মধ্যেও এই ভুল ধারণা চলিত আছে যে এই আইন ব্রাহ্মণের বিবাহের আইন,—যদিও আইনের মধ্যে কোথাও ব্রাহ্মণ্যধর্মের নামগন্ধ নাই। ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ে না জুটিয়া নিজেদের স্বাধীন মত বজায় রাখিয়া এই আইনের মতে বিবাহ করিলে জাতীয়ত্বের হিন্দুত্ব ও একনিষ্ঠ বিবাহ রক্ষা করা চলে, তাহাই বুঝাইলাম। এখানে উল্লেখ করি—বৃহৎপ্রদেশের এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে কয়েক জন অতি বিখ্যাত বনিয়াদি ব্রাহ্মণ-বংশের লোক প্রথম কিস্তির তিন আইন অহুসারে ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দিয়াছেন। ইহারা ব্রাহ্ম নন বা ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ রাখেন না; কেবল তাঁহাদের মতে এই বিবাহে আদর্শ একনিষ্ঠ বিবাহ সম্পাদিত হয় বলিয়াই ঐ আইন অবলম্বিত হইয়াছে।

সরকারী আইনে রেজেষ্ট্রি করিয়া বিবাহ করার জনকতক লোকের আপত্তি আছে; এখন সেই আপত্তির বিচার

করিব। নিজের সামাজিক ব্যবস্থার বেলায় বিদেশী সরকারের আইনের শাসন মানা বাহাদুরের মতে অসম্ভব, তাঁহারা কি স্বীকার করিবেন না যে, সমাজে নৃতন করিয়া কোন বিধি চালাইতে হইলে শাসনকর্তাদের রচিত আইন ছাড়া কোনও রকমে এই অমান্যকারীকে আইনের নিয়মে বাধ্য করা চলে না? যেখানে প্রার্থিত নিয়মভঙ্গের অপরাধীকে একটি অবশুপালনীয় শাসনের অধীন হইতে হয় না, সেখানে নৃতন নিয়মকে কিছুতেই চালাইতে পারা যায় না। কেহ কেহ একথা বলিয়াও থাকেন—সমাজে এখন বহুপত্নী গ্রহণ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়, আর অন্য দিকে বহুপতি গ্রহণের প্রথা একেবারেই নাই। উত্তরে বলিতে পারি যে, কোন অপরাধ অধিক আছে, বা নাই, এ বিচারে কেহ আইনের ব্যবস্থা উড়াইয়া দিতে পারে না। সমাজে সকল শ্রেণীর অপরাধেরই সম্ভাবনা আছে, আব বাহাদুরকে অভিব্যক্তি বিবাসী বা কতব্যনিষ্ঠ ভাবা যায়, তাঁহারও পদস্থলন আছে। এই সকল অবস্থা না থাকিলে উকিলের পক্ষা হইত না,—আদালত টিকিত না। পরোক্ষে কাহারও কাহারও এই রকম উক্তি কথ্য শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের প্রেম বড় পবিত্র; কাজেই বিনা রেজেষ্ট্রিতে কোন আশঙ্কা নাই, আর যদি থাকে—সে কপাল। এই ধরনের অতি কাঁচা ছেলেমানুষী উক্তি তলায় লুকাইয়া আছে প্রাচীন কুসংস্কার-পালনের প্রতি স্নেহ। স্বাধীনতার নামে শত বড়াই করিলেও অতীতে প্রাচীন প্রথার দিকে প্রাণের তলায় এমন ঝাঁক আছে, বাহার উত্তেজনা বা ভাবের মোহে প্রাচীন গোলামির ‘নাক-দড়ি’ ও ‘পান-বেড়ি’-রূপ অলঙ্কার পবিবার জন্ত শরীর উত্থল করে। আমেরিকায় উন্নতির চালকেরা যখন নিগ্রোদের স্বাধীনতার নিশান উড়াইয়াছিলেন, তখন অনেক নিগ্রো বহুকালের গোলামির অভ্যাসে নিজের ইচ্ছায় গলার শিকল খুলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল। আমার এই

নিবেদন বাহাদুরের কাছে, তাঁহারা যখন ‘সনাতন’ শব্দের মোহে আচ্ছন্ন নহেন, আর বাহাদুর ভিতর তাহাকেই বরণ করিতে প্রস্তুত, তখন আশা হয়—তাঁহারা স্ববুদ্ধিতেই সকল কথা বিচার করিবেন,—প্রাচীনের বাস্তব কোন শব্দের মোহাই দিয়া চলিবেন না।

এই প্রসঙ্গে একটা নৃতন ধরনের অল্পভানের উল্লেখ করিতেছি; এমন রিপোর্ট পড়িয়াছি—ইউরোপের কয়েকটি মহিলা ব্রাহ্মণ্য প্রথার গুরুত্বের কাছে দীক্ষা লইয়া একেবারে ধর্ম ও জাতীয়তায় হিন্দু হইয়াছেন আর এদেশের লোককে বিবাহ করিয়াছেন, এই ইউরোপীয় মেয়েরা স্বাধীন বিচারে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অবলম্বন করিতে পারেন, আর খাঁটি প্রেমের আকর্ষণে ভারতের লোককে বিবাহ করিতে পাবেন, কিন্তু তাঁহারা আপনাদের জাতীয়তায় বিসর্জন দিয়াছেন,—জন্মভূমির প্রতি তাঁহাদের কতব্য ঝাড়িয়া ফেলিয়াছেন, শুনিতে শিহরিতে হয়। বিবাহ করিলে এমন ভাবে স্বামীর গোলাম হইতে হইবে যে আপনার জন্মভূমির প্রতি যে প্রেম থাকা চাই, কতব্য থাকা চাই, তাহা পাবে দলিতে হইবে, ইহাও অতিশয় ঘৃণা অতিশয় পাপময়। এমন বহু ইংরেজ আছেন বাহার ঈষ্টিয়ানি মানেন না; ঈষ্টিয়ানি মানেন না বলিয়া তাঁহারা ইংরেজ নন বলা চলে না। বর্ণ ও জাতীয়ত্ব এক নয়। বাহারা ১৮৭২ অব্দের তিন আইনে বিবাহ করিয়া অথবা ধর্ম বিষয়ে নিজের স্বাধীন মতের ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম মানেন না বা মানিবেন না অথবা প্রেমের পবিত্র টানে অন্য দেশের লোককে বিবাহ করিবেন, তাঁহারা যদি ভিল পরিমাণ স্বদেশপ্রেম হারান তবে স্বাধীনতার সাধনার নামে মহাপাতক করিবেন। আমার নিবেদন, যেন নবনারীরা সনাতন সনাতনের বিচার উপেক্ষা করিয়া জীবনবিকাশের জন্ত স্বাধীনতা বরণ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার কথাগুলি সাহুগ্রহে বিচার করিবেন।



মেঘকণা

ঐদীনেশ মুখোপাধ্যায়

আকাশে আজ একটুও মেঘ নেই। রজনীগন্ধার মত
শ্বেতশূল আকাশ দিগন্তের সীমাহীন আঙ্গিনায় গেছে
ছড়িয়ে। কাল-রাত্রির মত দুৰ্যোগময়ী বর্ষার উদ্ভেজন
গেছে থেমে—কোলাহল হয়েছে নিস্তব্ধ, ঝড়ের হাওয়ার
এসেছে ববনিকা। বর্ষাস্নাত আকাশ এখন শান্ত শিশুর মত
মুগিয়ে আছে।

স্বকুমারের ভাল লাগছে। আজ তার ভাল লাগছে
এই আকাশ, এই নির্মল প্রশান্তি আর এই লাবণ্যময়
পরিপূর্ণ স্বচ্ছতাকে। বর্ষাকে সে ভয় করে—শুধু ভয়
নয়, তার সমস্ত দেহ যেন কাঁপতে থাকে এক দীর্ঘ
বিভীষিকার, এক রহস্যময় অসহায়তার। বর্ষা যেন নিয়ে আসে
ওর কাছে এক তীক্ষ্ণ ষড়যন্ত্র—মাকড়সাব জালের মত দুর্ভেদ্য
জালে ও যায় আটকে। বর্ষার মধ্যে সে দেখতে পায় এক
প্রাণের প্রতিরূপ—এক প্রচণ্ড বিপ্লবের সমস্ত ইতিহাস
যেন লুকিয়ে আছে ঐ বর্ষার মধ্যে।

আজ আকাশে এক ফোঁটাও জল নেই। তাই ওর আজ
ভাল লাগছে।

কিন্তু কল্যাণীকে স্বকুমার কিছুতেই ভুলতে পারে না।
কত দিন কত ভাবে কত দিক দিয়ে সে চেয়েছে ওকে ভুলতে,
নিঃশেষে মুছে ফেলতে মন থেকে—পারে নি। স্বকুমারের
চোখের সম্মুখে হুটে ওঠে কল্যাণীর কান্ডল-পরা কালো
বিশাল ছুটি চোখ আর শরতেব শেফালির মত শীতল,
সুন্দর একটি মুখ। সে মুখের মধ্যে একটি উদার
স্বচ্ছন্দ্য সে আজও দেখতে পায়। বর্ষাই ছিল কল্যাণীর
সব চেয়ে প্রিয়, সব চেয়ে আদরের। আকাশে যখন দেখা
দিত মেঘের কোলাহল, চার দিকে যখন ভরে উঠত
অশান্তি মেঘ-চেউ, কালো কালো টুকরো টুকরো মেঘ-
মালা যখন আকাশের গায়ে জনতা সৃষ্টি করত, তখন কল্যাণী
স্বকুমারকে বলত—দেখছ কেমন আকাশ। বৃষ্টি হবে খুব, না ?

—হ্যাঁ।

হাততালি দিয়ে ছোট মেয়ের মত নাচতে নাচতে
মাথা ছলিয়ে গ্রীবা ঝাঁকিয়ে কল্যাণী বলত—চমৎকার হবে।
আচ্ছা এমনি দিনেই হয়ত উজ্জ্বলিনীর কবি মেঘদূত
লিখেছিলেন। না ?

স্বকুমার বলত—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। এমনি এক উদার
বর্ষার রাতে বোধ হয় কবি লিখেছিলেন মেঘদূত।

স্বকুমারের পাশে বসে পড়তে কল্যাণী বলে—আচ্ছা,
কালিদাসের প্রাণেও কি এমনি বিরহ জেগেছিল ? না
জাগলে কেমন করে লিখলেন তিনি এত বড় এক জীবন্ত
কাব্য।

স্বকুমার বললে—উত্তর ত তুমিই দিলে। ঐ দেখ
বৃষ্টি এসে গেছে। জামা-কাপড় কি সব রয়েছে ছাদে।
নিয়ে এস, না-হয় ডাক কাউকে।

কল্যাণী মুখ তার করে বললে—না, থাক না, ভিজুক
একটু। এমন মিষ্টি ঠাণ্ডা বর্ষা! ভিজুক না একটু। রোদ
এলে আপনিই শুকিয়ে যাবে আবার। কিন্তু এই বর্ষা
চলে গেলে হয়ত আর আসবেই না।

—আসবে, স্বকুমার ক্লান্ত স্বরে বললে, আসবে গো
আসবে। বর্ষার চোটে রাস্তায় বেরোনই যাচ্ছে না।
চার দিকে জল থৈ থৈ করছে।

—কি চমৎকার, কল্যাণী বললে, আঃ! আমার নিয়ে চল
না একটু।

—কোথায় ?

চাঁপাফুলের মত কোমল ছুটি পা ছলিয়ে, একটু চোখ
বুজে কল্যাণী বলত : রাস্তায়—রাস্তায় যাব। জলে
ভিজতে আমার ভারী ভাল লাগে।

—এই ত সেদিন সবে জলে ভিজ জর থেকে উঠলে—
আবার !

কল্যাণী দমল না। বেপরোয়া ভাবে বললে—জর ত

এমনিও হয়। না-হয় জলে ভিজ্জেই হ'ল। কেমন জল পড়ছে দেখছ না।

কল্যাণী জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। সমস্ত মন ঘেন কল্যাণীর লাবণ্যে আর প্রাবল্যে উপচে উঠেছে, ধূশীতে ভরে উঠেছে সমস্ত প্রাণ—দেহে লেগেছে শিহরণ।

স্বকুমার ধমক লাগাল—আবার তুমি জলে ভিজ্জছ ?

—ব! একে বুঝি ভেজা বলে ? শিশুর মত সচকিত হয়ে কল্যাণী কলত, এই ত মোটে দুটো ফোঁটা পড়েছে হাতে। দেখ না এসে, মোটে ত দুটো ফোঁটা। অম্মনয় ক'রে আবদারের ভঙ্গীতে আবার বলতে লাগল—তুমিও এস না, হাত দিয়ে ধরতে কি চমৎকার লাগে—এতেই ত বেশী মজা।

অবশ্য ভাবে স্বকুমার বলল—তোমাকে নিয়ে কিছুতেই পারা যায় না। আবার দেখছি অস্থখ টেনে আনবে। আমাকেই ত পোয়াতে হবে হাঙ্গামা। এখানে এসে ব'স লক্ষ্মীটি, কটা দিন যাক। আগে ভাল ক'রে ভাল হয়ে ওঠ। তাব পর যা খুশী ক'রে কিছু বলব না।

মুখ ভার ক'রে কল্যাণী এসে স্বকুমারের কাছে বসল।

পনের দিন স্বকুমার আপিস থেকে ফিরে এসেই শুনল, কল্যাণী বাড়ী নেই। মা বললেন, এত ক'রে বললাম এই জল-ঝড়ে বেরিও না বৌমা কোথাও। শোনে কি আমার কথা ?

—কোথায় গেল ?

—কি জানি, এই জলের মধ্যেই চ'লে গেল। জল দেখলে ঘেন মেয়েটা লাফিয়ে ওঠে।

—তা কোথায় গেছে বলল না কিছু।

—কে জানে। ওর এক বন্ধুর কাছে না কোথায়।

—তুমি বারণ করলে না কেন ?

—তুই কি যে বলিস স্বকু! মা স্ববাক্ বিস্ময়ে বললেন, বারণ করি নি ? কত ক'বে বললাম, যেও না বৌমা, যেও না, এই বাদলার মধ্যে যেও না, শুনল কি ? পা জড়িয়ে ধ'রে বলল—একুনি আসব মা। ওকে ব'লো না, ওর আসার আগেই ফিরব।

স্বকুমার ছাতার সজ্জান ক'রে বলল—একটা ছাতাও নিয়ে যায় নি। বর্ষাতিও ত ছিল। কেমন যে মেয়ে।

মা বললেন—বাট! ও আমার লক্ষ্মী মেয়ে। চব্বিশ ঘণ্টা ঘরে আটকান থাকে—একটু বেড়িয়ে আসতে গেছে, না করতে পারলাম না।

—তা ছাতা নিয়ে গেলেই ত পারত।

—তা কি জানি বাপু! কি যে দিনকাল হয়েছে। ছাতা নিয়ে কেউ বেরতে চায় না।

স্বকুমার গজ গজ করতে লাগল—এতগুলো লোক বাড়ীতে, আর কারও খেয়াল নেই এই বেদিন উঠল অস্থখ থেকে—এরই মধ্যে ছেড়ে দিল। আর কল্যাণীটাও হয়েছে তেমনি, মায়ের কোলে উঠে, পা জড়িয়ে কত কাশদাই না যে জানে।

স্বকুমার ঘেন কল্যাণীকে নিয়ে দস্তামত ঘেমে উঠেছে।

স্বকুমার বিবর্ণ মুখে শুক হয়ে বসে রইল। ছোট বোন মিহুর স্কুলের গাড়ী এসে পৌছতে-না-পৌছতে সে লাফিয়ে এসে ঘবে ঢুকল—বৌদি! ঘরের মধ্যে বৌদিকে দেখতে না পেয়ে বলল—বৌদি কোথায় দাদা।

—জানি নে।

—মার ঘরে ?

—বলছি জানি নে—তবু মার ঘবে। বিকৃত স্বরে মিহুরই কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলল—মার ঘবে।

মিহুর ঠোঁট উলটিয়ে বলল—বারে! তুমি মিহিমিহি আমার বৃকছ কেন ?

স্বকুমার নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ল সব মেয়েদের রকম দেখছি এক, কিছু না বলতেই ছোট বোনটা গর্হাস্ত ক্ষেপে উঠেছে। না, আর টিকতে দেবে না কেউ।

অগত্যা গলা নামিয়ে স্বকুমার বলল—বৌদিকে কেন ?

—দবকার আছে।

—দরকার আছে, স্বকুমার বলল, দরকার আছে সে ত বুঝতেই পারছি। কি দরকার ?

মিহুর বললে—রবি ঠাকুরের দুটো নুতন গান বেরিয়েছে। বৌদি আমার লিখে আনতে বলেছিল।

—এনেছ ?

মিহুর একটা কাগজ বার ক'রে বললে—এনেছি।

—বেশ করেছ।

মিষ্ট বললে—জান দাদা, বৌদি বলছে গান ছুঁই
আমায় শিখিয়ে দেবে। আর বর্ষার গান গাইতে বৌদি
মত কেউ পারে না, ওর চোখে জল এসে যায়—জান
দাদা—

—জান দাদা, ব'লে মিষ্ট আবার কি গল্প স্বপ্ন করছিল।
স্বকুমার রেগে উঠল—আচ্ছা হয়েছে। তুই যা এবার।

—যাচ্ছি ত। তোমার কাছে এসেছিলাম নাকি।
তাড়িয়ে দিচ্ছ যে বড়। মিষ্ট বৌদি দোলাতে দোলাতে চলে
গেল।

—না, ঘরেও থাকতে দেবে না। এরি মধ্যে চোলাও
তৈরি করেছেন একটি। কি মেয়েই যে হয়েছে।
স্বকুমার মনে মনে গজরাতে লাগল—আসুক না আসুক,
বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে।

এদিকে বৃষ্টিটা কখন ধরে গেছে। এবার নিশ্চয় কল্যাণী
ফিরবে। স্বকুমার মনে মনে কি ভেবে জামা গায়ে দিয়ে
তৈরি হয়ে নিল।

মা বললেন—কোথায় যাচ্ছিস স্বকু ?

—দরকার আছে।

—কখন ফিরবি ?

—ফিরতে দেবি হবে। আমি খেয়ে আসব।
নেমস্তন আছে। ব'লে গজগজ করতে করতে স্বকুমার
বেড়িয়ে গেল।

স্বকুমার এদিক-সেদিক বেড়িয়ে বাড়ী ফিরে এল অনেক
রাতে। রাত্তার ভাবতে ভাবতে এসেছে, কল্যাণী আশ
কোন কথা জিজ্ঞেস করলে একটা কথাও উত্তর দেওয়া হবে
না। যেমন মেয়ে তেমনি ব্যবহার করতে হবে। জল
দেখলে যেন মেয়েটা পাগল হয়ে উঠে—স্বকুমার ভেবেই
পায় না, বর্ষার মধ্যে ও কি পায়, এমন ক'রে কেন মেতে
ওঠে।

স্বকুমার এসে বাড়ী ঢুকল। সমস্ত বাড়ীটা যেন
অসম্ভব নিস্তব্ধ হয়ে আছে। স্বকুমার ভাবল, এত রাত
ক'রে কোন দিন সে ফেরে না বলেই বোধ হয় সবাই চিন্তিত
হয়ে আছেন।

কিন্তু বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই সে অবাক হয়ে গেল।

যে মিষ্ট সন্ধ্যা হ'তে-না-হ'তেই ঘুমোয়—এক ঘুম যার হরে
যার রাত দশটার আগে, সেই মিষ্ট কি না বারান্দায় বসে
আইস-ব্যাগে বরফ ভর্তি করছে।

স্বকুমারকে দেখে মিষ্ট বললে—এতক্ষণ কোথায় ছিলে
দাদা। বৌদির ভরানক জ্বর এসেছে।

—জ্বর হয়েছে ? স্বকুমার বিজ্ঞের মত বলতে লাগল,
জ্বর হয়েছে, বেশ হয়েছে। জ্বব যে হবে এ যেন জানাই
ছিল এমনি ভাব দেখিয়ে স্বকুমার আবার বলতে লাগল—
সারা দিন বৃষ্টিতে ভেজার মজা বুঝুক এবার।

মিষ্ট কোন কথায় কান না দিয়ে আগুন মনে কাজ ক'রে
যেতে লাগল।

স্বকুমার বললে—খুব জ্বর হয়েছে নাকি রে ?

—যাও, তোমার সঙ্গে কথা বলব না। বৌদির জ্বর
আর তুমি মজা দেখছ।

—দেখব না ? জলে ভিজবে সারা দিন হৈ হৈ ক'রে—
বললে কথা শুনবে না। হ্যাঁ রে, সত্যিই খুব বেশী জ্বর হয়েছে
নাকি ?

—যাও দেখ না গিয়ে—খুব জ্বর।

স্বকুমার নিজের ঘরে ঢুকল।

মা কল্যাণীর পাশে ব'সে আছেন।

রাত্তার আসবার সময় যেসব প্রতিজ্ঞার মহলা দেওয়া
হয়েছে, তা ঠিক রাখতে হবে। স্বকুমার ঘরের মধ্যে ঢুকেও
কোন দিকে তাকাল না। ধীরে ধীরে অনেক সময় ব্যয়
করে জামা খুলল। জুতোটা অনাবশ্যক ভাবে সাজিয়ে
বাখল অনেকক্ষণ ধরে।

মা বললেন—এত দেরি করে আসতে হয় ! এখন একটা
ডাক্তার ডাক ত।

স্বকুমার বলল—কি আর হয়েছে, একটু জ্বর—ও
অমনিই সেরে যাবে।

—ওরে না, না, অসহিষ্ণু উদ্ভিগ্ন হয়ে মা বললেন—
তুই শীগগির ডাক্তার ডাক। জ্বর বেড়েই চলেছে।

স্বকুমার কঠিন ভাবে ভারি চালে বলতে লাগল—
হবে না। কত ক'রে বললাম। তা এখনও খালি গায়ে
রয়েছে কেন। একটা গরম জামাও গায়ে দিতে পারে নি।

স্বকুমার নিজেই আলমাবি থেকে গরম জামা টেনে বার করে পরিয়ে দিলে কল্যাণীর গায়ে; তার পর ডাক্তার ডাকতে চলল।

ডাক্তার এল। তিনি বুক-পিঠ পরীক্ষা করে চিরাচরিত প্রথায় অভয় দিলেন, ও কিছু না। কোন ভয় নেই—সাবধানে রাখবেন, ঠাণ্ডা ঘেন না লাগে।

স্বকুমার এবার কাছে এসে বসল। মা উঠে গেলেন, ব'লে গেলেন—দরকাব হ'লে ডাকিস্ আমাকে।

মিষ্ণু ঘাবার সময় শাসিয়ে গেল—বৌদিকে কিছু ব'ল না ঘেন।

স্বকুমার কল্যাণীর চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—কেন গেলে? এমন করে বৃষ্টিতে ভিজতে হয়?

কল্যাণীর মুখ এক বিচিত্র অপরূপ আভাষ হেসে উঠল—আমার কি যে ভাল লাগে ঐ বৃষ্টির জল কি বলব। মনে হয়, মনে হয় কত যুগ-যুগান্তর ধরে আমি ঐ জল-তরঙ্গের মধ্য দিয়ে চলেছি—ঐ জলকল্লোল ঘেন আমার কত দিনের পরিচিত। আমি কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারি নে, মনে হয় হৃদয়ের দ্বারে কে ঘেন ঘন ঘন আঘাত করছে—আমি কেমনতরবা হয়ে যাই।

আদর করে গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে স্বকুমার বললে—বেশ ত, বৃষ্টি ভাল লাগে, ঘরে ব'লে দেখলেই ত পার। বৃষ্টিতে ভেজা কি উচিত।

কল্যাণী প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে লাগল—তুমি জান না, বৃষ্টির কি মধুর স্পর্শ, যখন গায়ে এসে লাগে আমাব মনে হয় আমি ঘেন কোন এক বাজ্যে চলে গেছি, যেখানে কোন দুঃখ নেই, কোন কষ্ট নেই, কোন ভাবনা নেই—

স্বকুমার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, জবে প্রলাপ বকছে নাকি।

কথা বললেই কথার গিঠে কথা বেড়ে যাচ্ছে। স্বকুমার বললে—তুমি এবার চুপ করে একটু ঘুমোও। শোন ত লক্ষ্মি—ঘুমোও একটু।

কল্যাণী চুপ করে রইল।

কল্যাণীর কালো কালো রেশমের মত চুলগুলির মধ্যে

হাত বুলোতে বুলোতে বললে—শরীর খুব খারাপ লাগছে?

—না।

—বাতাস করব?

—না। কিছু করতে হবে না, তুমি শুধু একটিনার জানালাটা খুলে দাও।

—জানালা খুলব? বলছ কি তুমি? জলের ছাট আসবে যে।

কল্যাণী বললে—আস্থক না।

—বলছ কি তুমি, স্বকুমার ভয়ে ভাবনায় বিস্ময়ে বলতে লাগল—বলছ কি তুমি! সমস্ত দিন ভিজে এলে, আবাব এখন যদি এমনি কর তবে আমি কি করব বল দেখি? চুপ করে ঘুমোও লক্ষ্মীটি।

কল্যাণী কোন কথা বলল না। চুপ করে পাশ ফিরে শুয়ে বইল।

সমস্ত রাত আব বৃষ্টি হয় নি। কল্যাণীও ঘেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছে, ওদিকে বিবুল সমারোহ নিয়ে দিবসের আলো জেগে উঠল। কল্যাণী ঘুমিয়ে আছে—মুখে ফুটে উঠেছে চমৎকার ক্লান্ত একটি রূপ। সমুদ্রের বৃকে উত্তাল তরঙ্গের পর যেমন দেখা দেয় স্থিৎ সৌন্দর্য।

স্বকুমার কাছে দাঁড়িয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখল, জর বয়েছে বেশ, গা গরম।

কল্যাণী এদিকে জেগে উঠেছে কালো টানা টানা আয়ত চোখ দুটি কচলে বলল—ভোর হ'য়ে গেছে, না?

—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ হ'ল।

—বা! আমাকে জাগাও নি কেন?

—এখন উঠবে কি করে তুমি। তোমার যে অস্থখ।

—অস্থখ! অস্থখ করেছে তাকে কি হয়েছে। সবাই

কি ভাববেন বল ত?

—কিছু ভাববেন না।

—না, ভাববেন না আবার। বৌ-ঝি বুঝি ঘুমিয়ে থাকে এ সময়, আমি উঠব।

—ছইমি ক'র না। চুপ করে শুয়ে থাক।

শরীরে জ্বর—বেশী শক্তি নেই, কল্যাণী আর কিছু বলল না। শুয়ে রইল চুপ করে।

মা এসে বললেন—কেমন আছে বোমা। নিজেই হাত দিয়ে দেখলেন গায়ে, ঠেস, এখনও যে বেশ জ্বর। তুই ডাক্তারকে আবার ডাক দেখি একবার।

—কিছু হয় নি মা। মিছি মিছি ডাক্তার ডেকে এনো না, আমি এমনিই ভাল হয়ে উঠব।

—তা ত উঠবেই মা। তবু অস্থখটা বেড়ে না যায়—তুই যা স্বস্থ। আর দেখ, ভবানীপুরেও একবার ঘাস—খবরটা দে।

কল্যাণী ব্যস্ত হ'য়ে বললে—না না, বাবাকে আবার কেন?

—না বোমা, অস্থখ-বিস্থখে খবর না দিলে কি চলে তুই যা স্বস্থ, আর দেরি করিস নে।

স্বকুমার ডাক্তারকে কল দিয়ে ভবানীপুর হয়ে ফিরে এল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে স্বকুমারের কানে গেল, কল্যাণী গান গাইছে। বর্ষার কি একটা গান বোধ হয় হবে। স্বকুমার মনে মনে ভাবতে লাগল—এই অস্থখ, এর মধ্যে আবার গান চলছে। নাঃ।

ঘরে ঢুকে দেখল—মিছ বসে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে, আর কল্যাণী বিছানার উপর উঠে বসে স্বর করে তাকে গান শেখাচ্ছে,

আজি বরষা মুখরিত শ্রাবণ-বাতি।

স্বকুমার এক ভয়ঙ্কর অজ্ঞান হয়ে উঠল—তোমার না অস্থখ? আর তুমি বসে গান গেয়ে যাচ্ছ।

—বাঃ অস্থখ হলে বুঝি গান গাইতে নেই।

—বর্ষার গান ছাড়া বুঝি আর গান নেই—স্বকুমার বলতে লাগল, বৃষ্টির ভিতর কি পাও বলত? কল্যাণী বর্ষাকে যতখানি ভালবাসে স্বকুমার যেন ঠিক ততখানিই এড়িয়ে চলেতে চায়—কিন্তু কল্যাণীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। অগত্যা ধরল মিছকে—তুই কি হয়েছিস বল দেখি, পরে গান শিখলে হ'ত না। লেখা নেই, পড়া নেই, কিছু নেই, চকিণ বস্টা কেবল টহল! মেরে—

মুখ কাঁচুমাচু করে মিছ বলল : বোদিই ত ডেকে এনেছে। বললে আয়। গান শিখিয়ে দেব আয়।

—আর অমনি ছুটে এলে, এমনি ডাকলে ত টিকিও দেখা যায় না—

—আমি গান শিখতে চাই নি, বোদি আমায় জোর করে শেখাচ্ছে।

—জোর করে শেখাচ্ছে। পাজি মেয়ে কোথাকার। মাস মাস জলের মত টাকা যাচ্ছে—স্কুলের খরচ, আজ নীল শাড়ী, কাল ময়ূর-আঁকা হলুদে কাপড়—আর শিখে শিখে হচ্ছে এই...মা পড়গে, বা

কল্যাণীর উপরে ঝালটা মিছর উপর দিয়েই মিটল।

কল্যাণী বলল—ওকি, তুমি ওকে বকছ কেন। আমিই ত ওকে ডেকে এনেছি।

—পরে শেখালেও ত চলাবে।

—চলুক। তুমি ওকে ব'কো না।

এমনি করে ছুদিন কাটল।

কল্যাণীর জ্বর কমে নি। কিন্তু আগেকার চেয়ে ভাল।

তৃতীয় দিনে সন্ধ্যা হ'তেই আবার চার দিক অন্ধকার করে বৃষ্টি এল। আজকে যেন কল্যাণীকে আব কিছুতেই ধরে রাখা যাচ্ছে না। স্বকুমার শুনেছে, কল্যাণীর জ্বর হয়েছিল এমনি এক গাঢ় নিশীথ রাত্রিতে, সেদিন আকাশের বুকেও নেমে এসেছিল বিদ্যুতের প্রচণ্ড গতিবেগ...ঠিক আজকার মত ঘন কালো রাত্রির উত্তাল ঝড়ো হাওয়ার মধ্যেই কল্যাণীর হয়েছিল জ্বর—নিজের জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সে হারিয়েছিল তার প্রস্তুতিকে।

সমস্ত রাত্রি কল্যাণী একটুও ঘুমোল না। ওর মনের মধ্যে যেন নূতন দিনের সন্ধান জেগে উঠেছে। মাঝে মাঝে কেবল আপন মনে গুনগুন করে গান গায় :

গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি
বাদল-জল পড়ছে বরি বরি
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরাণ-মন সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি
বাদল-জল পড়ছে বরি বরি—

সুকুমার বললে—কল্যাণী! কল্যাণী অমন করছ কেন? ঘুম আসছে না? ঘুমোও না।

কল্যাণী ধানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বললে—
কি বললে? ঘুম? ঘুম আসছে না আমার। আমি ঘুমতে চাই বে। আমার কে যেন ডাকছে।

—কে? কে ডাকছে কল্যাণী?

কল্যাণী ক্যাল ক্যাল করে ধানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল।
বললে—কে!—কে ডাকছে তা ত জানি নে—ঐ বুড়ির শব্দ, আকাশের বিদ্যুৎ, তারান্তরা নিশীথ-রাত্রির অবশুর্জন সবাই ডাকছে, ঐ দেখ হাত বাড়িয়ে সবাই বলাচ্ছে—
আয় আয়।

—কোথাও কিছুই ত নেই—তুমি ঘুমোও।

বাইরে বজ্রের শব্দ হ'ল—

—ঘুম আমার আসছে না—ঐ শোন সবাই মিলে
আমাকে নিতে এসেছেন, আমি যাই।

—কোথায় যাবে? কল্যাণী, অমন করছ কেন। সুকুমার
চীৎকার করে ডাকল মা—মা, মিছ!

কল্যাণী বলে চলেছে—আমি যাব। আমার ছেড়ে
দাও

—কোথায় যাবে?

—ঐ বর্ষার কাছে। শুনছ না আমার ডাকছে? বলে
শুন শুন করে গান আরম্ভ করল—

ডাকিছে মেঘ, ডাকিছে হাওয়া,

সময় গেলে হবে না হাওয়া...

...কল্যাণীর গায়ে যেন নববল এসেছে—সে উঠে
বসকেই—

না ঘরে এলেন?—কি রে?

—ভুল বকছে।

কল্যাণী বলতে লাগল—ভুল! সব ভুল—মা তুমি
জানলাটা একবার খুলে দাও, ওগো তোমার পায়ে পড়ি,
জানলাটা খোল একবার। একটিবার খোল জানলাটা,
কল্যাণী সুকুমারের দিকে তাকিয়ে অস্বরোধের স্বরে বলল—
একটিবার খোল, আর বলব না। খোল—আমি বাইরের
নৃত্যমুখর বর্ষাকে দেখতে চাই—দেখতে চাই তাব রূপ,

তা- অপরূপ বিচিত্র বিকাশ, বে বিকাশে: পায়ে পায়ে
স্বর আর ছন্দ—খুলে দাও না।

কল্যাণী আবার উঠতে চেষ্টা করল। মা বললেন—
খোল না একবার, অমন করছে কেন।

সুকুমার মায়ের দিকে তাকাল। তার পর কল্যাণীর
দিকে ফিরে বলল—বেশ খুলছি, কিন্তু খুলেই বন্ধ করব।
কাড়ি-চোপড় ভাল করে গায়ে দাও।

—খুলবে সত্যি, শিশুর মত কল্যাণী খুলী হয়ে উঠল—
এই দেখ আমি সব ভাল করে গায়ে দিয়েছি

সুকুমার জানলাটা খুলল। খুলতেই বাইরের এক
ঝলক হাওয়া আর বুড়ি এনে ছাপিয়ে পড়ল ঘরের
মধ্যে। কল্যাণী আরাসে চোখটা একটু বুজল—
আ! আমি যাই। ওগো তুমি কাছে এস।—বলতে
বলতে কল্যাণী সুকুমারের পায়ের উপর মাথা রেখে
পাশে গেল।

ততক্ষণে নিরবয়ব দেহে মুক্তা বসুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেই থেকে সুকুমার বর্ষাকে হত করে।

আজকের এই নির্মেষ আকাশ তাই গুর ভাল লাগছে।

ক'দিন ধরে ছিল অনবরত বুড়ি, এত দিন গুর মনে
এনটুকুও শান্তি ছিল না। ও মনে দেখতে পায় কল্যাণী
তার কালো চুল মেলে বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে নামতে থাকে।

আজকের এই বর্ষাবিহীন নির্মেষ আকাশের দিকে
তাকিয়ে সে বেশ আরামে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সুকুমার
স্নেহেতে গেল এক ঋণ কালো মেঘ এগিয়ে আসছে—গৃহ-
প্রাঙ্গণের করবী-বীথি হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ছলে উঠল,
বলল গাছটা বর্ষার আগমনীতে স্নান বিহীন পুলকিত হয়ে
উঠছে। ঝর ঝর করে মেঘমালা গলে গলে মুক্তাবিন্দুর
মত টুপ টুপ করে পড়তে শুরু করল। বাইরে চলেছে
রীতিমত বর্ষার গান। চারি দিকে যেন শুধু কল্যাণীর
প্রতিধ্বনি, তারই রূপ, তারই স্বর।

সুকুমার চীৎকার করে উঠল—ওরে জানলাটা বন্ধ
কর দে, ওরে জানলাটা বন্ধ কর শীগগির কে কোথায়
আছিল বন্ধ কর জানলা।

ডালভাতের ব্যবস্থা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

বাংলার প্রধান মন্ত্রী মহাশয় নিরঞ্জন বাঙালীর ডালভাতের ব্যবস্থা করিবার সমিচ্ছা লইয়া মন্ত্রিসভা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই উপায়-উদ্ভাবনের চিন্তা করিতেছেন। এই প্রবন্ধে বিষয়টির একটু আলোচনা করিলে তাহার এবং দেশনেতৃগণের চিন্তার সামগ্রী হইতে পারে।

বাংলার সপ্তকোটি লোকসংখ্যা এখন রাষ্ট্রবিধানে প্রায় পাঁচ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। সরকারী গণনায় হয় ৫,০১,২২,৫৫০। ইহা হইতে অস্থায়ী অবাঙালী অধিবাসীর সংখ্যা বাদ দিলেও বাংলার স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা ৫ কোটি ধরিয়া লইয়া আলোচনা করা কর্তব্য। এই ৫ কোটি লোকের মধ্যে কত সংখ্যক লোক কি কি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করিয়া থাকে তাহার মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায় ১৯২১-২২ সালের বাংলার বিস্তৃত শাসন-বিবরণীতে। এইখানে তাহার একটু বিশদ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। এই পনর-ষোল বৎসরে হয়ত এই সংখ্যার কিছু পরিবর্তন হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাতে অবস্থার পরিচয় লাভে বিশেষ ব্যাঘাত হইবে না।

কৃষি ৩,৭৪,২৯ হাজার (হাজারের নীচের অঙ্ক বাদ দেওয়া হইল)

খনিজ সম্পদ	২৭	”
শ্রমশিল্প	৩৬,২১	”
বাণিজ্য	২৪,৩৯	”
যানবাহনাদি কার্যে নিযুক্ত	৭,৩৯	”
শাস্তিরক্ষা কার্যে নিযুক্ত		
পুলিস ইত্যাদি	১,৭৭	”
সাধারণ শাসনকার্য	১,৫৪	”
স্বাধীন ব্যবসায় (স্বয়ম চিকিৎসা-আইন-ব্যবসায় ইত্যাদি)	৭,৮৩	”
সঙ্কীর্ণ আয়ের উপর নির্ভরশীল	৩৭	”
গৃহস্থের পরিচর্যায় নিযুক্ত		
চাকর বেহালা ইত্যাদি	৬,৮৮	”
যে বৃত্তিতে দেশে ধন উৎপন্ন হয় না (unproductive)	৪,৫২	”
বিবিধ	২,৮০	”

উপরিউক্ত অঙ্কগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কৃষিকর্ম এবং কৃষকের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া বাংলার $\frac{২}{৫}$ অংশ লোক বাঁচিয়া থাকিবার আশা থাকে। খুব সম্ভব ইহাদের মধ্যে কতক লোকের অল্প উপায়েও উপার্জনের চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এই সংখ্যার আন্দাজ দেওয়া সম্ভব নহে, সরকারী কাগজপত্রেও তাহার পরিচয় নাই। তবে শাসন-বিবরণীতে এইটুকু আন্দাজ আছে যে বাংলার লোকসংখ্যার $\frac{১}{৫}$ অংশ সাধারণ কৃষক। অমশিল্পে নিযুক্ত লোকসংখ্যার পরিমাণ শতকরা ৭২ জন মাত্র। সরকারী শাস্তিরক্ষা এবং শাসনকার্যে নিযুক্ত লোকসংখ্যার পরিমাণ দশমিক ০.৭ জন মাত্র। স্বাধীন ব্যবসায় শতকরা ১২ জন মাত্র। অপেক্ষাকৃত ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে দাসদাসীর কার্য করিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে শতকরা ১২ জন লোক। আর দেশের দুর্দশার চরম প্রমাণ এই যে, প্রতি ১০০ জীপুরুষের মধ্যে এক জন হয় শিক্ষাবৃত্তি, না-হয় অল্প অসহুপায়ে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। সরকারী কার্যে নিযুক্ত লোকসংখ্যার পরিমাণ (হাজারে ৭ জন মাত্র) দেখিয়া মনে হয় এই জন্তই কি আমরা হিন্দু-মুসলমানে কলহ-বিবাদ—প্যাঙ্ক করিয়া হয়রান হইয়া পড়িতেছি? অবশিষ্ট ৯৯ জন অধিবাসীর ডালভাতের ব্যবস্থার কথা এত দিন কেহ হুঁচিড়ার বিষয় বলিয়া আন্তরিকতার সহিত গ্রহণও করে নাই। ভরসাও কথা, এখন এই দিকে কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে বহু লোকের দৃষ্টি ও মননের পরিচয় পাইতেছি।

যখন সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক বাঙালীই কৃষিজীবী, তখন এই প্রবন্ধে এই শ্রেণীর কথাই আলোচনা করা যাক। ১৯২৯-৩০ সালের শাসন-বিবরণীতে বাংলা দেশের কত পরিমাণ ভূমি কোন্ কোন্ কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিল তাহার আন্দাজ দেওয়া আছে। যথা—

ধান	২,০২,২৪ হাজার একর
পাট	২৩,১০ " "
অন্নাশ্রয়াদি	১৭,৮০ " "
তৈলোৎপাদক শস্য	১৩,২৭ " "
ভাতাক	২,৪৫ " "
ইক্ষু	২,০০ " "

মোট ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৫৬ হাজার একর

কৃষিকার্যরত লোকের সংখ্যা যদি ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ হয়, তাহা হইলে উপরের লিখিত বিভিন্ন শস্যের ক্ষত্র নির্দিষ্ট জমির পরিমাণ দেখিলে অল্পমান করা অন্নাশ্রয় হয় না যে ধান এবং পাটের চাষে নিযুক্ত লোকসংখ্যা ৩ কোটি হইবে এবং অবশিষ্ট ৭৫ লক্ষ লোক অন্নাশ্রয় শস্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে। এই অল্পমান নির্ভুল নহে, কিন্তু আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট কার্যকরী।

এখন প্রশ্নটি এইরূপ দাঁড়াইতেছে। এই ২ কোটি ২ লক্ষ একর জমীতে ধান এবং ২৩ লক্ষ একর জমীতে পাট উৎপাদন করিয়া বাংলার ৩ কোটি কৃষক কত টাকা আয় করিতে পারে। প্রথম ধানের কথা ধরুন। প্রতি একরে গড়পড়তা ১৫ মণ ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবশ্য, কোনও জমীতে ধানশস্যের উৎপাদন-হার বেশী থাকিতে পারে, কিন্তু সমগ্র বাংলা দেশের হিসাবে প্রতি-একরে ১৫ মণ ধান অন্নাশ্রয় আন্দাজ নহে। আজকাল এই কম বৎসর ধরিয়া ১৫ মণ ধানের মূল্য ৩০ মাত্র। ইহা হইতে বীজ ধরির ও কৃষিকার্যের যাবতীয় খরচ বাদ দিলাম না। ধরিয়া লইলাম প্রতি-একরে উৎপন্ন ধান হইতে কৃষকগণ ৩০ আয় করিতে পারে। সুতরাং ২ কোটি ২ লক্ষ একর জমীতে ধান উৎপাদন করিয়া বাংলার কৃষক আন্দাজ ৬৬ কোটি টাকা আয় করে। এখন উৎপন্ন পাটের হিসাব দেখা যাক। ১৯২৯-৩০ সালের বার্ষিক শাসন-বিবরণীতে প্রকাশ ঐ বৎসর ২০ লক্ষ একর জমীতে ৮৬,৫৬,৮৩৯ বস্তা পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। এক বস্তাতে ৫ মণ পাট থাকার কথা; সুতরাং কিঞ্চিদধিক ৪ কোটি ৩২ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। পাটের বাজার-দর প্রতি-মণ কমবেশী ৬ টাকা; তাহা হইলে সমুদায় পাটের মূল্য কিঞ্চিদধিক ২৫ কোটি টাকা হয়। এখানেও পাট-আনামের খরচ বাদ দিলাম না, দিলে মূল্যের অঙ্ক

আরও কম হইয়া যায়। এখন ধানের আয় ৬৬ কোটি এবং পাটের আয় ২৫ কোটি—একুনে ৯১ কোটি টাকা বাংলায় ৩ কোটি কৃষক উপার্জন করিতে পাবে। এই ৯১ কোটি টাকা ৩ কোটি কৃষকের মধ্যে বন্টন করিলে প্রতি কৃষকের আয় হয় কিঞ্চিদধিক ৩০ মাত্র। কিন্তু ইহার মধ্যে আর একটু হিসাব রাখিয়াছে। কৃষিকার্যের খরচ আমাদের জানা নাই। সঠিক অঙ্ক পাওয়াও দুষ্কর, তবে ন্যূনতম অঙ্ক ধরিলেও শতকরা : ৩০ কম হইবে না। যদি এই চাষের খরচ বাদ দেওয়া হয় তবে জন-প্রতি আয়ের অঙ্ক হয় ২৭। আর একটা হিসাব এই—বাংলায় প্রজাদের দেয় খাজনার পরিমাণ বাৎসরিক ১৬ কোটি টাকা। হারাহারি ক্রমে ৩ কোটি কৃষকের দেয় খাজনার পরিমাণ প্রায় ১৪ কোটি টাকা হইবে। উপরিউক্ত ৯১ কোটি টাকা হইতে ১৪ কোটি বাদ দিলে অবশিষ্ট ৭৭ কোটি টাকা ৩ কোটি কৃষকের মধ্যে বন্টন করিয়া প্রতি জনের গড়পড়তা আয় হয় প্রায় ২৬ মাত্র। আবাব ব্যাঙ্ক-তদন্ত-কমিটির সিদ্ধান্ত এই যে, বাংলার কৃষকের স্বর্ণভারের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা এবং এজন্য বায়িক দেয় স্বর্ণ শতকরা ১২½ টাকা হিসাবে প্রায় ৮ কোটি টাকা। এখন অবস্থাটা এইরূপ—যে কৃষকের গড়পড়তা আয় ২৬ কি ২৭ সে মানিকের খাজনা এবং মহাজনের স্বর্দ কি আসল কেমন করিয়া দিতে পারে, এবং যদি দিতেও পারে তবে তাহার ভরণপোষণের জন্য বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং স্বর্ণের অঙ্ক তাহার বাড়িয়াই চলিবে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীর প্রতি জনের গড়পড়তা আয়ের আন্দাজ বহু লোকে করিয়াছেন দাদাভাই নৌরজীব মতে বার্ষিক ২০; ইন্দানী আনন্দের মতে ৬৭, বহু ইংরেজের মতে ১১৬। এই সত্ত্বে ইংলণ্ডের জন-প্রতি আয়ের অঙ্ক ১০০০, আমেরিকা যুক্তরাজ্যের ১৯২৫। তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব আমাদের কৃষককুল কত দরিদ্র। গড়পড়তা আয় ন্যূনতম আয় নহে। সুতরাং বাংলায় অনেক কৃষক আছে যাহার বার্ষিক আয় ২৫ টাকারও কম। তাহারা কি প্রকারে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে গিয়া বসবাস না করিলে আমরা বুঝিতে পারিব না।

এখন যিনিই “ভালভাতের” ব্যবস্থার কথা চিন্তা

করিবেন তাঁহাকে সর্বপ্রথমে কৃষকের ঋণ পরিশোধ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার আয়বৃদ্ধির উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে। আয়বৃদ্ধি না হইলে ঋণপরিশোধ হইতে পারে না, তবে যদি গবর্ণমেন্ট কৃষকের সমস্ত ঋণভার নিজের দ্বায়ে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দেন সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আশু তাহার সম্ভাবনা নাই। বর্তমানে কৃষকের ঋণভার লাঘব করিবার জন্য যে আইন করা হইয়াছে তাহাতে কাগজপত্রে লম্বুতার পরিচয় পাইব, কিন্তু যতই লম্বু হউক বহু কৃষক তাহাও দিয়া উঠিতে পারিবে না। যদি তাহাদের আশু আয়বৃদ্ধির উপায় করা হয় তাহা হইলে হয়ত ক্রমে ক্রমে বহু বৎসরে তাহারা ঋণমুক্ত হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের আয়বৃদ্ধির উপায় কি, ইহাই বিবেচ্য।

ইংরেজ আমলের পূর্ব হইতে নানা স্থানে বাংলায় যে-সকল কুটীরশিল্প ছিল তাহারা বহু লোক অন্নসংস্থানের উপায় করিত; কিন্তু কুটীরশিল্পের উচ্ছেদসাধনের পর ঐ শ্রেণীর লোকেরা বাধ্য হইয়া কৃষিকর্মে নিযুক্ত হইয়া পড়ে। কলকাতার উপর অধিক মাত্রায় চাপ পড়ায় কৃষিজমিত আয়ের পরিমাণও অগ্রচুর হইয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ জমির উপর প্রয়োজনাতিরিক্ত লোক নির্ভরশীল হইয়াছে। যে-ভূমিখণ্ড চাষ করিয়া একটি লোক স্বচ্ছন্দে খাইয়া-পরিয়া থাকিতে পারিত, তাহা এখন হয়ত তিন-চার জনে চাষ করিতেছে। সুতরাং সকলের দৈনন্দন উপস্থিত। সুতরাং কৃষিকার্য্য দ্বারা যাহাদের প্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত সংস্থান হইতেছে না অথবা হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকে এই বৃত্তিতে নিরস্ত করিয়া শিল্প ও বাণিজ্যে অর্থোপার্জনের অযোগ্য করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ দেশে কুটীরশিল্প অথবা বৃহৎ কলকাবথানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিরস্ত লোকদের অর্থগণ্যের উপায় করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু ইহা বহুবায়সাধ্য ব্যাপার। বর্তমানে বাজকোষে ইহার জন্য অর্থ নাই।

কর্মণযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমশঃ ধরিদ বিক্রয় বা উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিতেছে। ইহা নিরোধ করিতে হইবে। যাহাকে অর্থনীতিবিদগণ বৃহৎ ইকনমিক হোল্ডিং বলেন, তাহারই স্বজনের চেষ্টা

করিতে হইবে। ইহাও বহুবায়সাধ্য ব্যাপার, কেবলমাত্র আইনের প্রচলন দ্বারা হইতে পারে না।

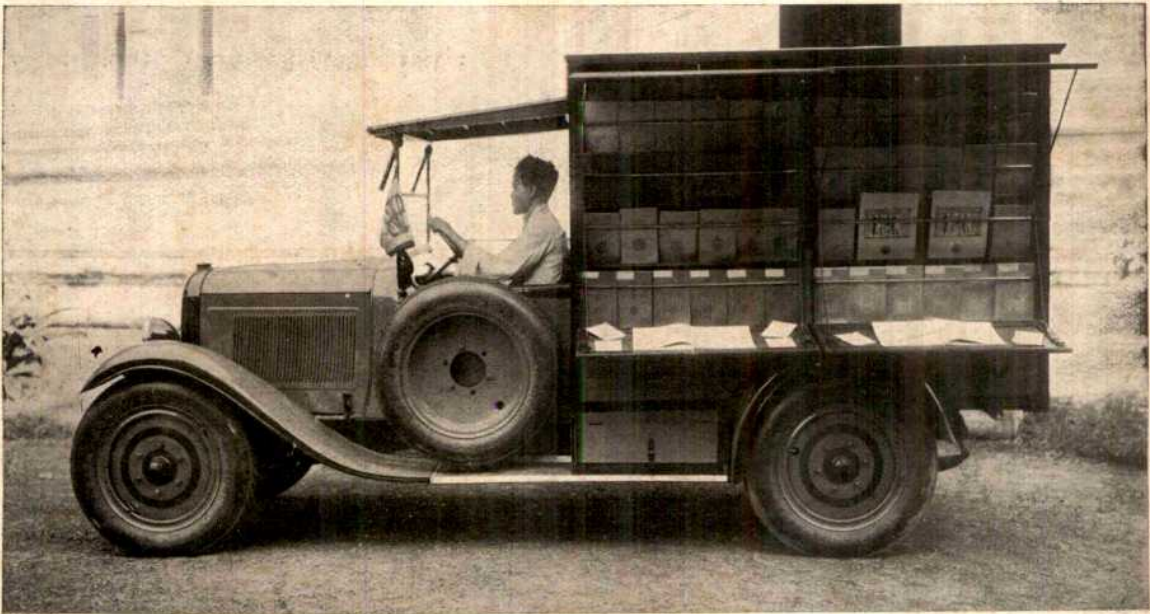
বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া কৃষিজ ফসলের উৎকর্ষ সাধন ও পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহাও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

অবশেষে কৃষকগণ যাহাতে উৎপন্ন ফসলের উচিত মূল্য প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করা সর্বোপযোগী কর্তব্য। অনেকে মনে করেন, রাষ্ট্রবিধানে শস্যাদির মূল্য ইচ্ছানুরূপ নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ বা অর্থনীতিবিদগণ এইরূপ নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষগণ সমস্ত সমুদ্রশীল দেশেই পণ্য-ব্রব্যের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধির জন্য সমরোচিত নীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। তবে এই নীতি তাহারা অবলম্বন করেন হয় অংশীদারগণের লভ্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, না-হয় রাজকোষের অর্থের সমতা-সামঞ্জস্য বা রাজস্ব-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। পণ্য-উৎপাদনকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্যও এই নীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। বাংলার মন্ত্রিগণ এই দিকে একটু চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন এবং কি প্রকারে তাহা সম্ভব বা কার্য্যকরী হইতে পারে তাহা আলোচনা করিতেছি।

পাট বাংলার একচেটিয়া কৃষিজ পণ্য। ইহার চাহিদা ভারতবর্ষের বাহিরেও যথেষ্ট। ইহার রপ্তানী-স্বত্বের উপর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের লোলুপদৃষ্টি এখনও সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নাই। আমার প্রস্তাব এই : গবর্ণমেন্ট বিশেষ আইনের বলে বাংলার সমস্ত উৎপন্ন পাট ক্রয় করিয়া কলিকাতা, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে সরকার-নির্ধারিত গৃহে গুদামজাত করিয়া রাখুন এবং কেবলমাত্র কৃষকের হিতার্থে উহা উচিত মূল্যে চটকলের মালিকদেব এবং ঐ পণ্যের বহির্বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করুন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ গবর্ণমেন্টের জাতীয় খরচ বাদে কৃষকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হউক। এই বৃহৎ ব্যাপারে বহু বেকার শিক্ষিত যুবকের অন্ন-সংস্থান হইবে এবং পাট-চাষীরাও উচিত মূল্য পাইয়া রক্ষা পাইবে। হক-সাহেব এই একটিমাত্র কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া দেখুন না সত্য সত্যই ভালভাভের ব্যবস্থা তিনি করিয়া উঠিতে পারিবেন কি না।

কাম্বোজ

[দেশ-বিদেশের কথা জট্টব্য]

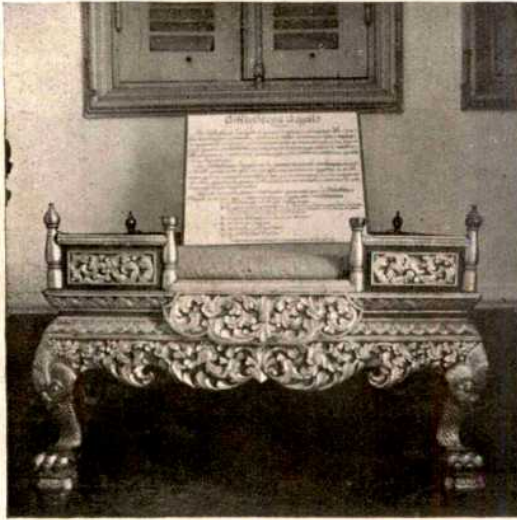


উপরে : কাম্বোজের রাজধানীতে পালি-বিদ্যালয়

নীচে : ইন্দো-চীনে বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানের চলন্ত পুস্তকাগার



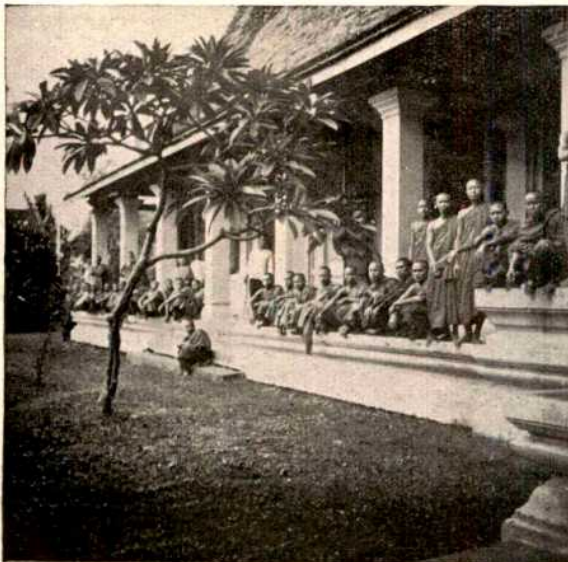
কিশরী-নৃত্য



রয়্যাল লাইব্রেরীর প্রবেশদ্বার



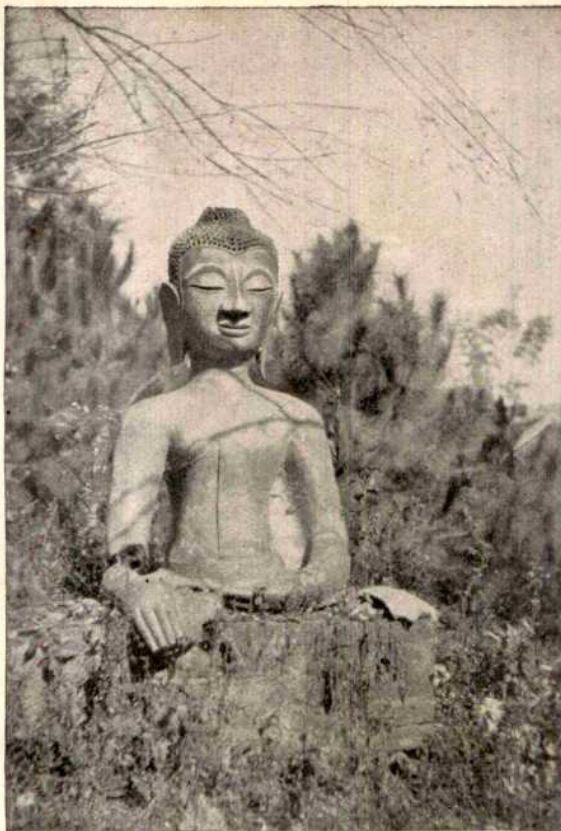
রয়্যাল লাইব্রেরীর চিত্রকর-অঙ্কিত বুদ্ধ-কাহিনী



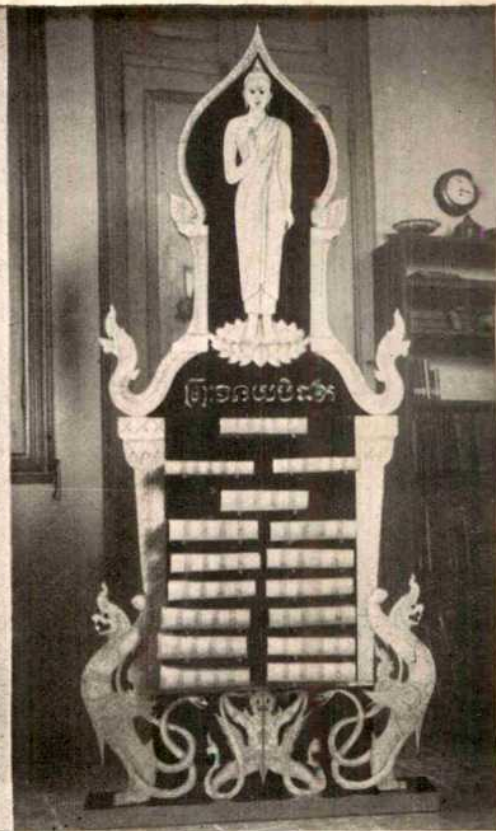
পালি-বিদ্যালয়



বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চা ভবন



অরণ্যমধ্যে বুদ্ধমূর্তি



বিনয়-পিটক গ্রন্থ রক্ষণার্থ বিচিত্র পুস্তকাধার



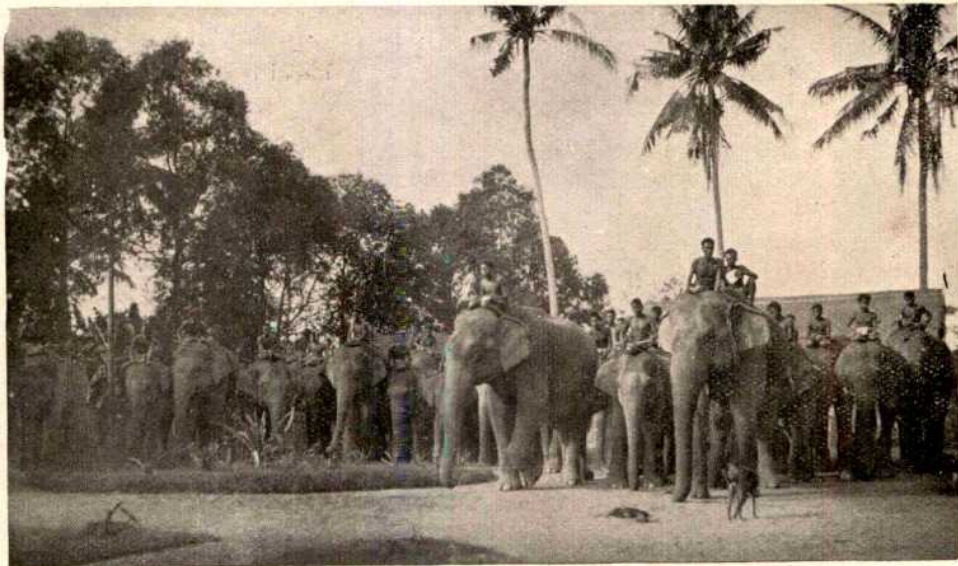
রয়্যাল লাইব্রেরীর সাধারণ দৃশ্য



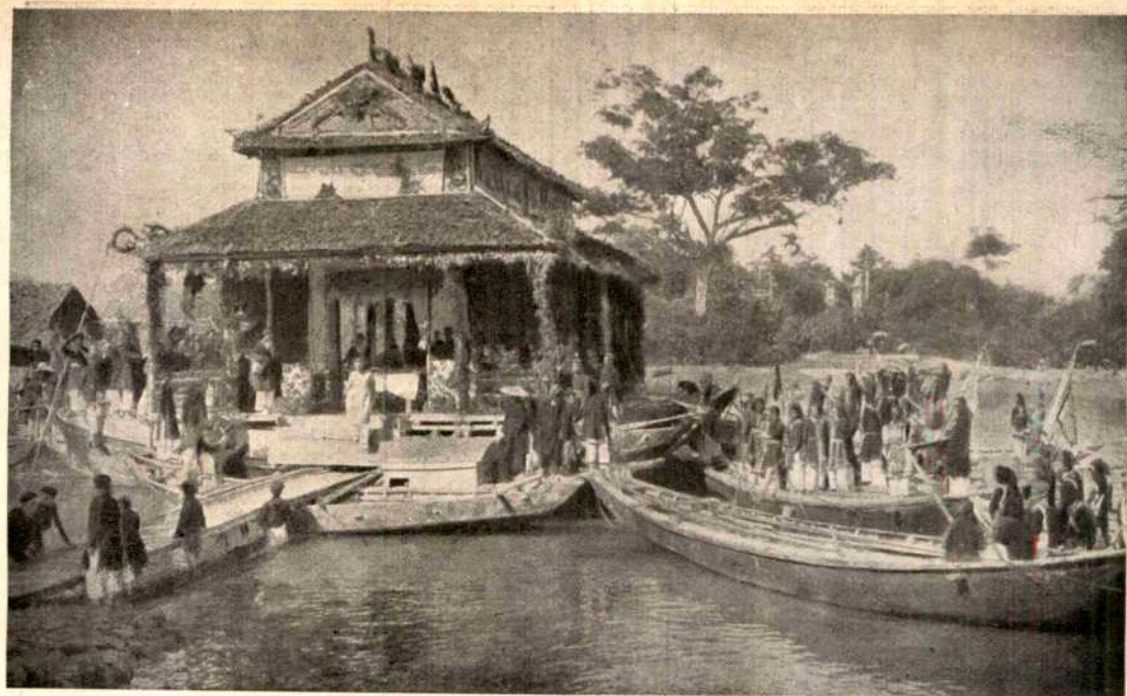
রয়্যাল লাইব্রেরীর সংলগ্ন উদ্যান



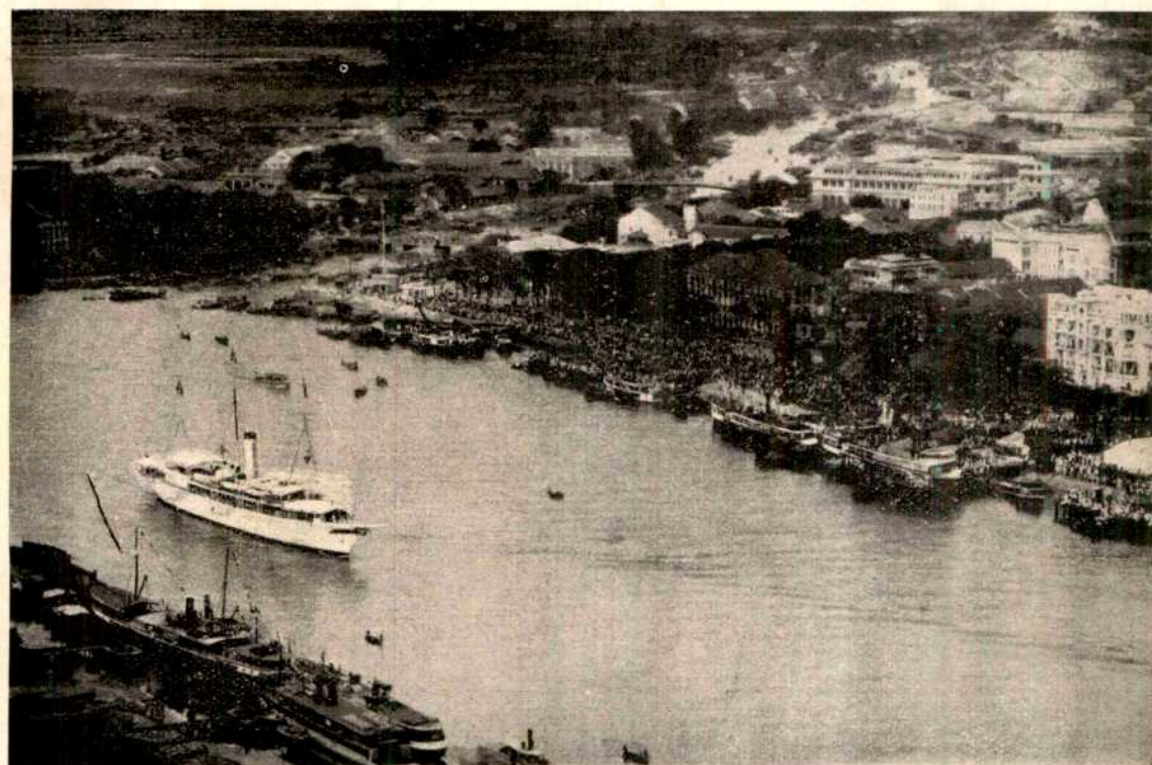
লুয়াং-প্রাবাংয়ের রাজার রাজধানীর প্রধান মন্দিরে আগমন



শ্যাম-লীমাংস্ত শিকারী-দল



হোয়াং-মই-নদীতে পুঙ্গতরী-উৎসব, আম্রাম



রাজতরী "মহাচক্রী" তীরে ভিড়িতেছে। সাইগন।

১৯৩০ খ্রিঃ ১১/১১/৩০



কাফিরস্থানের গৃহে প্রবেশের বিচিত্র ব্যবস্থা



প্রবালখচিত রৌপ্যশিরোভূষণে সজ্জিতা মঙ্গোলীয় বধূ:



‘মিউজি গিমে’র বুদ্ধমূর্তিনিচয়

সংসার

অজগর পুষ্টিবার বিচিত্র অভিজ্ঞতা

সাপ সপক্ষে অনেকেরই ঘণা, ভয়, বিদ্বেষ মিশ্রিত একটা বিসদৃশ ধারণা আছে। অদ্ভুত চালচলন ও দৈহিক গহন, হিংস্র স্বভাব এবং মারাত্মক বিষ ইহাদিগকে সকলের নিকট অপ্রীতিকর করিয়া তুলিয়াছে। সাধারণের মধ্যে সাপ সপক্ষে এমন একটা ভ্রমাবহ ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে সাপ মাত্রই বিষাক্ত বলিয়া লোকে মনে করে এবং কেহই ইহাদের সংস্পর্শে আসিতে চায় না। পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের অসংখ্য সাপ আছে। কিন্তু তাহাদের অনেকেই বিষধর নহে। আমাদের দেশে ও অতীত দেশে বেদেরা ও বায়ুকরেরা অর্থোপার্জনের আশায় বিষাক্ত ও অবিষাক্ত উভয় জাতের সাপই পুষ্টিবার থাকে। অনেকে আবার সখ করিয়াও সাপ পোষে। নিকিষ সাপের মধ্যে বোয়া, চিত্তি, পাইথন প্রভৃতি বৃহদাকৃতির অজগরই সহজে পোষ মানিয়া থাকে।

মাদ্রাজ লয়লা কলেজ মিউজিয়মের কিউরেটর চার্লস লে-র কোতুলোকোপক অভিজ্ঞতার কথা বলি। তিনি নিজে কখনও বিষধর সাপ পোষেন নাই; কিন্তু বৃহদাকার অজগর পুষ্টিবার অভিজ্ঞতার ফলে এই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে ইহাদিগকে নিকিষে পোষ মানানো যায়; অল্পদিনের মধ্যেই ইহারা শত্রু-মিত্র চিনিয়া লয়।

কিছুপে প্রথম তিনি অজগর পুষ্টিতে উৎসাহিত হইয়া উঠেন সেই সপক্ষে তিনি লিখিতেছেন—একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার সাপুড়ের স্ত্রী মাথায় একটা মস্ত বোঝা লইয়া আসিয়া হাজির। তাহার স্বামী বোঝাটা খুলিলে দেখিলাম এক বিরাট পাহাড়িয়া সাপ—প্রায় আট হাত লম্বা একটা পাইথন। পাঁচ শিলিং দিয়া সেই বিপুলকায় অজগরটাকে কিনিয়া রাখিলাম। সাধারণ অবস্থায়, মিউজিয়মের কিছু আয় বাড়াইবার জন্ত ইহার চামড়াটা বেচিয়া ফেলিতাম, কারণ বাগ, জুতা প্রভৃতির জন্ত এই চামড়ার খুবই চাহিদা। কিন্তু এই পাইথনটার পেটে ডিম আছে বুঝিয়া ইহাকে একটা বড় খাঁচার মধ্যে পুরিয়া রাখিয়া, কাক, চিল ও ছোট বড় নানা রকমের ইঁদুর প্রভৃতি নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য জোগাইতে লাগিলাম; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সে ইহার কিছুই স্পর্শ করিল না—দিনের পর দিন উপবাসে কাটাইতে লাগিল।

প্রায় একমাস পরে অজগরটা ডিম পাড়িল—প্রায় পৌনে দুই মাস ধরিয়া পাইথনটা ডিমের চতুর্দিকে কুণ্ডলী পাকাইয়া, কোন খাদ্য গ্রহণ না করিয়া, দিনরাত্রি নিশ্চলভাবে পড়িয়া রহিল। ইহাদের শরীরে এত মেদ জমা থাকে যে অনেক দিন কিছু না খাইলেও ঐ মেদ হইতে দেহরক্ষা হইয়া থাকে। সাত মাস অনাহারে থাকিয়াও একটা পাইথন বেশ জীবিত ছিল।

একদিন সকালবেলায় দেখা গেল—পাইথনটা আর

পূর্বের জায়গায় ডিম আগলাইয়া বসিয়া নাই। ডিম ছাড়িয়া সে খাঁচার অপূর্ণ এক কোণে শুইয়া আছে। দেখা গেল—মাসুকের হাতের মুঠার মত বড় কুড়িটা ডিম রহিয়াছে। প্রত্যেকটি ডিমের মুখে এক-একটা সফ ছিদ্র এবং সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া এক-একটি ছোট মাথা এই অচেনা নূতন জগতের প্রতি আবাক হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে। তাহারা তাহাদের উপরের ঠোঁটের শক্ত স্ফটিক অগ্রভাগের সাহায্যে নিজেরাই ডিমের মুখে ছিদ্র করিয়া লইয়াছে। দুই দিনের মধ্যেই তাহারা ডিম ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। তৃতীয় দিন সকালে দেখিলাম ৪ আউন্স ওজনের, প্রায় ২৪ ইঞ্চি লম্বা স্বপুষ্ট কতকগুলি বাচ্চা পরিত্যক্ত



এগার মাস বয়স্ক পাইথন পরিবেষ্টিত শ্রীযুক্ত লে

ডিমের খোলার আশেপাশে পড়িয়া রহিয়াছে। সাধারণ পাইথনের বাচ্চা হইতে এগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও ভারী ছিল। পরে আর একটি পোষা পাইথনের বাচ্চা হইয়াছিল, সেগুলি এত বড় ও ভারী হয় নাই।

ডিম ফুটিয়া বাহির হইবার পর হইতে ইহার নিজেবাই নিজেদের ব্যবস্থা করিয়া লয়। এই দুইটি পাইথনের মধ্যে প্রথমটির বাচ্চাগুলির স্বাভাবিক সংস্কার অতি নীচুই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—তাহাদের কাছে একটু হাত নাড়িলেই রাগে ফুলিয়া উঠিয়া পরিণত সাপের মতই ছোবল মারিত। দ্বিতীয়টির বাচ্চাগুলি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মেজাজের ছিল। তাহাদের মধ্য হইতেই একটাকে বাছিয়া রাখিলাম। এই বাচ্চাটাকেই পরে বেঞ্জামিন নাম দিয়াছিলাম। এইগুলি পুষ্টিবার এক অসুবিধা—ইহার স্বন-তখন কামড়াইতে চেষ্টা করে; কিন্তু এই বাচ্চাগুলির দাঁত এত ছোট যে চামড়া বিদ্ধ করিয়া আর বেশী দূর বসিতে পারে না। দুইটি পাইথনের এই চল্লিশটি বাচ্চাকে প্রতিদিন আহার জোগান সহজ ব্যাপার নহে—কাজেই ডজন-বানেক বাচ্চা রাখিয়া বাকীগুলিকে বোতলে ভরিয়া সুরক্ষিত করা হইল। দুই তিন দিন পর্যাঙ্ক অতি সম্ভরণে এইগুলিকে কাঁধে, পিঠে মাথায় চড়াইবার ফলে দেখা গেল যে ইহাদের হিংস্র স্বভাব অনেকটা দূর হইয়াছে। দু-চারটা কামড় যে আমরা খাই নাই তাহা নহে; কিন্তু তাহাতে পিন-ফোটার চেয়ে বেশী যন্ত্রণা বোধ হয় নাই।

স্বাধীন অবস্থায় এই বাচ্চাগুলি যে কি খাইয়া জীবন ধারণ করে তাহা আশ্চর্যের বিষয়, কারণ উপযোগী খাদ্য দিয়া দেখা গেল তাহারা খাইতে চায় না। অবশেষে জোর করিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইল। কতকগুলি ব্যাং টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া লইলাম। এক জন পাইথন-শিল্পের মাথা ও লেজ দুই হাতে ধরিয়া থাকিত, আর এক জন সাঁড়াশি দিয়া হাঁ করাইয়া তাহার মধ্যে ব্যাঙের টুকরাগুলি আস্তে আস্তে ঢুকাইয়া দিত। তার পর ধীরে ধীরে বাহির হইতে গলায় হাত তুলিয়া খাওয়া উদরের মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু পরে দেখা গেল, একটা বাচ্চা সমস্ত খাওয়া উদ্গীরণ করিয়া ফেলিয়াছে এবং অপর-গুলিও এরূপ করিবার চেষ্টায় আছে। তখন আবার নূতন ব্যবস্থা করিতে হইল—পূর্বোক্ত উপায়ে খাওয়াইবার পর তাহাদের গলায় চতুর্দিকে এক একটি ফিতা বাঁধিয়া রাখিলাম, যেন ভুক্ত দ্রব্য উদ্গীরণ করিতে না পারে।

পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম—ব্যাঙের ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা এক জাতীয় ছোট ছোট মাছই ইহার সহজে জীর্ণ করিতে পারে। মাস-দুই পরে জোর করিয়া খাওয়ানো বন্ধ করিয়া খাঁচার মধ্যে জীবন্ত ইঁদুর ছাড়িয়া দিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্য ইহাদের শিকার ধরিবার সহজাত সংস্কার। কেমন করিয়া শিকার ধরিতে হয় কখনও তাহা চোখে না দেখিলেও খাঁচার মধ্যে ইঁদুরটি ফেলিবামাত্রই ছুটিয়া আসিয়া ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে লেজ দিয়া শিকারের সর্বাব্দ জড়াইয়া এমন ভাবে চাপ দিল যে ইঁদুরের ইহলীলা শেষ হইল।

এদিকে ক্রমশঃ এতগুলি প্রাণীর আহার সংগ্রহ করা এক বিবশ সমস্যা হইয়া উঠিল। কাজেই উহার মধ্য হইতে কতকগুলিকে বিলি ব্যবস্থা করিয়া আটটা মাত্র রাখিলাম। এই আটটি অজগরের খোরাক জোগানও সহজ ব্যাপার নয়। এত ইঁদুর পাওয়া যায় কোথায়? বর্ধার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাণ্ডিকুট নামক বিড়ালের মত বড় এক জাতের ইঁদুর পাওয়া গেল। ব্যাণ্ডিকুট একটা বিদকুটে ভয়াবহ জানোয়ার—গায়ে ভালুকের মত লোম ও শূকরছানার মত ঘোঁং ঘোঁং শব্দ করে। এইরূপ একটা পূর্ণবয়স্ক ব্যাণ্ডিকুটকে সাপের খাঁচার মধ্যে ছাড়িয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। যদি এটাই সাপকে আক্রমণ করে? হয়ত এটা আক্রমণ করিলে প্রায় দুই হাতেরও বেশী লম্বা একটা পাইথনের পিঠ ভাঙিয়া দিতে পারে। আবার মনে হইল—পাইথনের মত একটা হিংস্র প্রাণীর আত্মরক্ষা করিতে পারা উচিত। ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে ব্যাণ্ডিকুটটাকে খাঁচার মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম। একটি ছাড়া অল্প সাতটি সাপই ফোঁস ফোঁস শব্দ করিয়া খাঁচার চতুর্দিকে নড়াচড়া করিতে লাগিল। অল্পটি (ইহার নাম রাখিয়াছিলাম জ্যাকব) কিন্তু শত্রুর উপর কড়া নজর রাখিয়া অতি সম্ভরণে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন ব্যাণ্ডিকুটটা আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিয়া, লাফাইয়া উঠিবামাত্রই জ্যাকব বিজ্ঞপ্তিতে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে শুল্গেই ধরিয়া ফেলিল। তার পর তাহার শরীরের চতুর্দিকে লেজ জড়াইয়া ফেলিয়া আস্তে আস্তে প্যাচ করিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্যাণ্ডিকুটের মাথা ফুলিয়া পড়িল, জ্যাকব মাথার দিক হইতে আরম্ভ করিয়া শিকারটাকে আস্তে আস্তে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল।

কেহ যেন মনে না করেন ইহার আমাদের একদিনও কামড়ায় নাই। কিন্তু কামড় খাইয়াছি প্রায়ই আমাদের নিজের দোষে। একটি সাধারণ ভুল হইতেছে—পাইথনের মুখের কাছে সোজাসজি হাত বাড়াইয়া দেওয়া। কারণ ইহাদের সাধারণ সংস্কারই এই যে, কোন কিছু সম্মুখে উপস্থিত হইলেই হয় কামড়াইবে নয় জড়াইয়া ধরিবে।

এ কথাটা সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে পোষা অজগরেরা কামড়াইলে তাহাদিগকে সেজন্ত মার বা শাস্তি দেওয়া অযুক্তিত, কারণ দোষ তাহাদের নয়, আমাদেরই। তাহাদের স্বভাবচরিত্র বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে; কারণ তাহাদের স্বভাব সাধারণতঃ অতুরূপ অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ হয় না। কাজেই একটু ভুল করিলেই সঙ্গে সঙ্গে খেসারৎ দিতেই হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইহাদের একটি স্বভাবের কথা বলা যায়—বাকুনি দিলেই ইহার তৎক্ষণাৎ ফণা তুলিয়া ছোবল মারিবেই মারিবে।

সকল অজগরের আহারে কৃচি এক প্রকার নহে। জ্যাকব ছিল খাওয়ার বিষয়ে কতকটা শৃংখিতে মেজাজের—তাহার পছন্দমত খাবার না হইলে সহজে কৃচিত না; কিন্তু তাহার তুলনায় সাইমন (অপর একটি পোষা পাইথন-বাচ্চা) ছিল সর্বভুক—জীবিত কি মৃত সবই সে গলাধঃকরণ করিত; অবশ্য, মৃত হইলেও সেটা টাটকা না হইলে চলিত না। কেবল একটা জিনিষকে সে পছন্দ করিত না—কুকুর-ছানাকে

সে দু-চক্ষে দেখিতে পারিত না। যত ছোটই হউক না কেন কুকুর-ছানা খাঁচার মধ্যে দেওয়ামাত্রই সে ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া খাঁচার চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফাঁস ফাঁস শব্দ করিতে থাকিত। কিন্তু বানর দেখিলে সে লোভ সম্বরণ করিতে পারিত না।

অনেক সাপের স্বজাতিভুক বলিয়া একটা হুনাম শোনা যায়। অজগরদের ভিতর কখন কখন এই অদ্ভুত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সাইমন একবার তাহার ভাই বেঞ্জামিনকে গিলিয়া একপ একটা অদ্ভুত স্বজাতিদেহ-ভক্ষণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল। তবে ব্যাপারটা যে নেহাৎ ভুলক্রমে ঘটিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। ঘটনাটা এই—আমি বেঞ্জামিনকে একটা খরগোস দিয়াছিলাম—তাহার অভ্যস্ত প্রধামত সে সেটাকে মাথা হইতে গিলিতে শুরু করিয়াছিল। অল্প কাল থাকতে প্রায় মিনিট পনের পর ফিরিয়া আসিয়া দেখি—কি ভীষণ কাণ্ড! সাইমন তো সর্বনাশ করিয়াছে। সাইমন বেঞ্জামিনকে প্রায় সম্পূর্ণ গিলিয়া ফেলিয়াছে! বেঞ্জামিনের প্রায় ছয় ইঞ্চি পরিমাণ লেজমাত্র সাইমনের মুখের বাহিরে রহিয়াছে। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, কারণ সেই সময়ে বাধা দিয়া কোনই ফল হইত না।

সাইমনের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল—কোথাও কিছু গুলদ হইয়াছে ইহা যেন সে বুঝিতে পারিয়াছে, কারণ এমন একটা খরগোস তো কখনও তাহার নজরে পড়ে নাই বাহা গিলিতে তাহার এত সময় লাগিতে পারে। হয়ত সে তাহার বন্ধু বেঞ্জামিনকে মোটেই লক্ষ্য করে নাই। বাহা হউক, সে তাহার শরীরের পিছন দিক হইতে সম্মুখের দিকে ভুক্তব্য উদগীর্ণ করিবার মত এক প্রকার অদ্ভুত প্রক্রিয়া করিতে করিতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেঞ্জামিনকে পুনরায় উদরের মধ্য হইতে বাহির করিয়া ফেলিল। বেঞ্জামিনও সাইমনের উদর হইতে বহির্গত হইয়া যেন কিছুই হয় নাই এই ভাবেই চলাফেরা করিতে লাগিল। কেমন করিয়া একপ ঘটনা ঘটিল তাহা অতি পরিষ্কার। যেই বেঞ্জামিন খরগোনাটিকে সামান্য একটু গিলিয়াছে ঠিক সেই সময়ে সাইমন আসিয়া অল্প কয়েক দিক লক্ষ্য না করিয়াই খরগোসটার পিছন দিক হইতে গিলিতে শুরু করে, এবং অতিরিক্ত তাড়াহুড়া করিয়া গিলিবার ফলে বেঞ্জামিনের মুখগত তাহার পেটের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে। তখন ধীরে ধীরে বেঞ্জামিনের সমস্ত শরীরটাই সাইমনের উদরের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। অবরুদ্ধ স্থানে থাকিলেও সাপেরা সহজে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা যায় না—জলের নীচেও তাই তাহারা অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় সাইমনের পেটের মধ্যে এতক্ষণ থাকিয়াও বেঞ্জামিন কোন অস্বস্তি অনুভব করে নাই। তার পর জ্বালা-বস্ত্রের বিষয়ে ইহারা যেন অনেকটা বোধশক্তিরহিত। এমন ঘটনার কথাও শুনা গিয়াছে যে ইঁদুরে এক-একটা জলজ্যান্ত সাপের কোন কোন স্থল হইতে মাংস খাইয়া ভিতরের পাক্রা বাহির করিয়া ফেলিয়াছে—তথাপি তাহাদের লেশমাত্র অস্বস্তি বা যন্ত্রণার কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

শিকারকে হত্যা করিবার জন্য সাপেরা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। অনেকে আবার শিকারকে হত্যা করে

না; গিলিবার সময়ই শিকারের পঞ্চপ্রাপ্তি ঘটে। পাইথনদের শিকার ধরিবার কায়দার মধ্যেও বেশ বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। দূরে শিকার দেখিতে পাইলেই সে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে এবং শিকার কাছে না-আসা পর্যন্ত সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। শিকার কাছে আসিবামাত্রই হঠাৎ শিকারীর জিব অতি দ্রুত কম্পিত হইতে থাকে। এসব লক্ষণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এখনই ছুটিয়া পড়িয়া সে শিকারকে আক্রমণ করিবে। মাথাটা যেন তীরবেগে ছুটিয়া গিয়া ছোবল মারে ও দাঁতে কামড়াইয়া ধরে, আর সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডলী পাকাইয়া যায়। এই সমস্ত ব্যাপার চক্ষের নিম্নে ঘটিয়া থাকে। শিকারের গলা অথবা বৃকের উপর লেজ জড়াইয়া এমন ভাবে চাপ দেয় যে মুহূর্তের মধ্যেই সে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরিণত-বয়স্ক পাইথনেরা শিকার প্রভৃতি ধরিবার সময় যেরূপ করে, বাচ্চা-পাইথনরাও ঠিক সেইরূপই করিয়া থাকে। বাল্যাবস্থায় অজগরেরা কখনও প্রচুর পরিমাণে খায়, আবার কখনও বা অনেক দিন পর্যন্ত উপবাস করিতে বাধ্য হয়। সাধারণতঃ দশ ফুট লম্বা

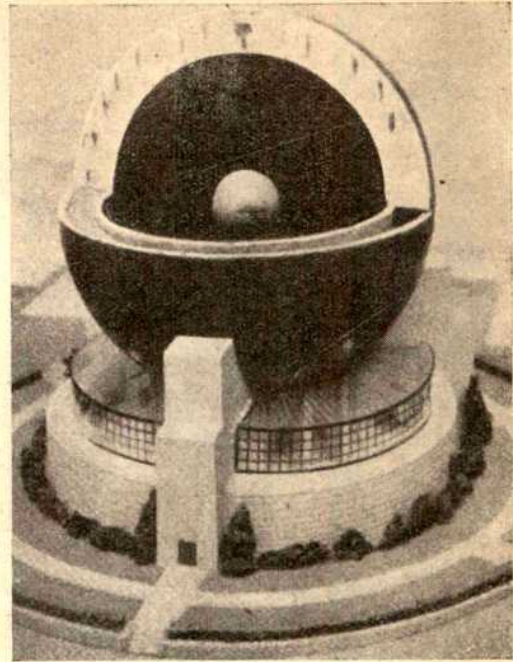


চারিটি পোষা পাইথন বেষ্টিত শ্রীযুক্ত লে

একটা পাইথনকে সপ্তাহে একটা মুরগী অথবা একটা খরগোস দিলেই সে একরূপ সন্তোষ থাকে। একবার একটা শিকার উদরস্থ হইলেই অজগর কুণ্ডলী পাকাইয়া, খাতবস্ত্র পরিপাক না হওয়া পর্যন্ত চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। এই ব্যাপারে প্রায়ই সপ্তাহ খানেক, সময় সময় তারও অধিক দিন লাগিয়া থাকে। শাখীর বড় বড় শক্ত পালক ছাড়া হাড়, ঠোঁট, নখ ও অজ্ঞাত কোমল পালক প্রভৃতি ইহাদের উদরের পাচক রসে একেবারে ভষ্মীভূত হইয়া যায়। মোটের উপর ইহারা যাহা গলাধঃকরণ করিয়া থাকে তাহা হইতে বিন্দু পরিমাণ খাতবস্ত্র অপচয় ঘটে না; ইহাদের পরিপাক-যন্ত্রের এমনই ক্ষমতা যে অসারবস্ত্র হইতেও শরীর পোষণোপযোগী জিনিষ আহরণ করিয়া লইতে পারে। গিলিবার শক্তি ইহাদের অসাধারণ। যে সাপের গলার ব্যাসের পরিমাণ দুই ইঞ্চি সে অনায়াসেই তাহার চার পাঁচ গুণ বেশী মোটা একটা খরগোসকে গিলিয়া ফেলিতে পারে।

কস্মসেরিয়াম

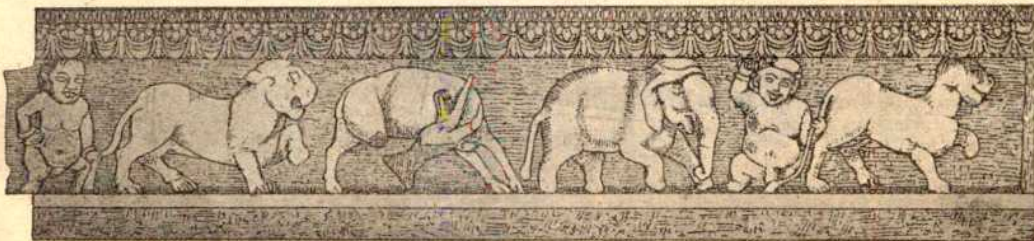
বহুদিন পূর্বে 'প্রবাসী' এবং অজ্ঞাত পত্রিকায় প্র্যান্টে-টেরিয়ামের বিরাট জটিল যন্ত্রের কথা আলোচিত হইয়াছিল। আকাশে গ্রহনক্ষত্রাদির তুলনামূলক গতিবিধি ভবচ্চক্ষের সম্মুখে দেখিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটি স্থানে এই বিরাট যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি পিটার জে. বিটারমান, প্র্যান্টে-টেরিয়ামের ধরণে কস্মসেরিয়াম নামে এক বিপুলকায় যন্ত্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই যন্ত্রের মডেলটি সম্প্রতি নিউইয়র্কের হেডেন প্র্যান্টেটেরিয়ামে প্রদর্শিত হইয়াছে। শূন্যের মধ্যে পৃথিবী কি ভাবে অবস্থান করিতেছে তাহা, এবং তাহার ঘূর্ণনের ফলাফল, কস্মসেরিয়াম দেখিয়া সাধারণ লোকেরাও অতি সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবে। অসীম শূন্যের মধ্যে ২০,০০০ মাইল দূরে থাকিয়া পৃথিবীর দিকে চাহিলে যেরূপ দেখায় এই কস্মসেরিয়ামটি ঠিক সেরূপ ভাবে নিশ্চিত হইয়াছে। কংক্রিট-নির্মিত একটি বিশাল গম্বুজের মধ্যে ১০০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট আর একটি প্রকাণ্ড গোলাকার স্থান আছে। এই গোলাকার স্থানটি পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ অসীম শূন্যের প্রতীক। ইহার মধ্যস্থলে ২০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটি গোলক পৃথিবীর শূন্যে অবস্থানের মত নিরালস্য ভাবে বহিয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। ঠিক যেন তারকাখচিত আকাশের মধ্যে পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর আবর্তন করিতেছে। বাহিরের গম্বুজ ও



কস্মসেরিয়াম

ভিতরের এক শত ফুট ব্যাসবিশিষ্ট গোলাকার স্থানের মধ্যস্থলে কুণ্ডলীর মত দুইটি অবরোহণী চতুর্দিক ঘিরিয়া আছে। এই অবরোহণীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়া দর্শকেরা বিভিন্ন উচ্চতা হইতে পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। আমরা যেমন চন্দ্রের ত্রাসবুদ্ধি দেখিতে পাই, সেইরূপ সূর্য্য হইতে আলো আসিয়া পৃথিবীর কোন অংশ কিরূপ ভাবে আলোকিত হয় তাহা, এবং তাহার ফলে বাহির হইতে চন্দ্রের জায় ত্রাসবুদ্ধি ও অজ্ঞাত অবস্থা অতি স্বস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইবে। গোলকের উপর শহর-বন্দর, নদনদী সমানোপাতিক ভাবে অঙ্কিত আছে। দূর হইতে পরিষ্কার ভাবে দেখিবার জন্য চতুর্দিকেই বাইনোকুলারের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য



সেতু

শ্রী সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বি-এসসি, বি-ই

বৃহৎ নদী, ক্ষুদ্র জলধারা কিংবা পথের উপর দিয়া রাজপথ কিংবা রেলপথ নির্মাণের গঠনই সেতু বা পুল। সমুদ্রমধ্যস্থ দুই দ্বীপের সংযোজক গঠনকেও সেতু বলা হয়, আবার বৃহৎ নালায় উপর কোন গঠনকে ক্ষুদ্র সেতু বলে। সেতু নদীর ঠিক কোন স্থানে অতিক্রম করিবে এবং সেতুর বাহ্যিক আকৃতি কিরূপ হইবে, এই দুইটি বিষয় সেতু-নির্মাণে সর্বপ্রথম লক্ষ্যীয়। আকৃতিনির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেতুর নির্মাণের এবং সংরক্ষণের ব্যয়ও স্থির হয়, সেই সঙ্গে সেতুর আয়-নিরূপণও প্রয়োজন। কিরূপ আকৃতির সেতুর কিরূপ স্থায়িত্ব তাহা অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা গিয়াছে। স্থাপত্য-বিচার দিক দিয়া সেতুর বাহ্যিক রূপের প্রতি ইঞ্জিনিয়ারদের লক্ষ্য রাখিতে হয়। সেতুর মূল্য নির্ভর করে প্রথমতঃ উহার উপরের গঠনকার্যে—প্রকৃত সেতু বলিতে সাধারণে যাহা বুঝিয়া থাকে; দ্বিতীয়তঃ, নিম্নের গঠনকার্যে—স্তম্ভ এবং ভিত্তি প্রস্তুতকরণে।

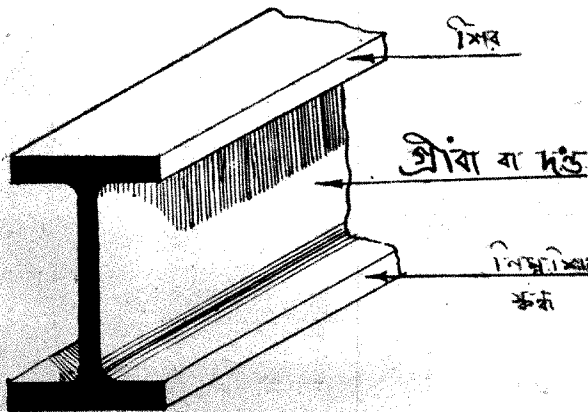
যাহারা সেতুর উপর দিয়া নিত্য গমনাগমন করেন, তাহাদের মধ্যে অল্প লোকই জানেন, যে, সেতু-নির্মাণের মোট ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক কি তদধিক অর্থ ব্যয়িত হয় সেতুর ভিত্তিতে ও নিম্নের গঠনকার্যে। সাধারণের অর্থ এইরূপ

ভালো যাহারা মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করেন সেই ইঞ্জিনিয়ারদের দায়িত্ব কম নহে।

রেলপথ কিংবা যানপথ সেতুর বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিতি অনুযায়ী সেতুকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

- ১। শিরোগামী শ্রেণীর বা ডেক শ্রেণীর (Deck),
- ২। অর্ধমধ্যগামী শ্রেণীর (Half through),
- ৩। পূর্ণমধ্যগামী শ্রেণীর (Full through)।

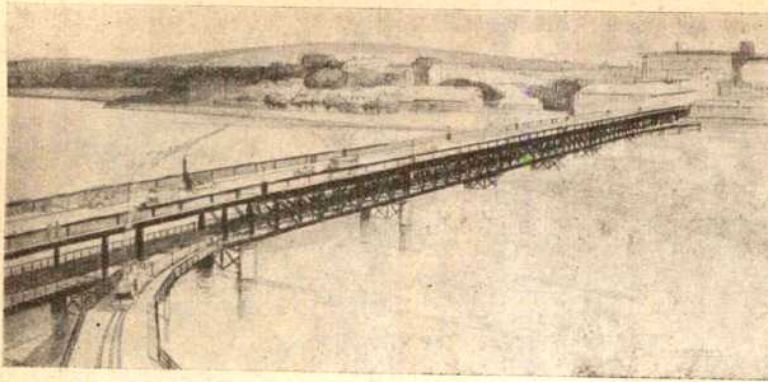
শ্রেণী-বিভাগের আলোচনার পূর্বে গোড়ার কথা একটু অবতারণা করি। ছাদের ভার গ্রহণের জন্য কাঠের কড়ির স্থলে বর্তমানে লোহার কড়ি দেওয়ার অভ্যাস প্রচলন। এই কড়িগুলি সাধারণতঃ ইংরেজী I-এর আকৃতির মত। অর্থাৎ উপরে ও নীচে চেপটা পাত এবং মধ্যস্থলে একটি সরলোন্নত দণ্ড বা গ্রীবা। উপরের পাতটিকে শির এবং নিম্নের পাতটিকে নিম্নশির বা স্বন্ধ এই আখ্যা দিব। সেতুনির্মাণে দুইটি সমান এবং সমান্তরাল গঠন থাকে, প্রত্যেক গঠনকে গাড়ীর বলা হয়। প্রত্যেক গাড়ীরই শির, নিম্নশির বা স্বন্ধ ও গ্রীবা আছে, ইংরেজীতে যাহাকে যথাক্রমে upper flange, lower flange ও web বলে।



১। ডেক বা শিরোগামী শ্রেণীর সেতু।—

যে-সেতুর উপর দিয়া রেলগাড়ী গমনকালে গাড়ীর সম্পূর্ণ ভার উপরের শিরের উপর প্রথমতঃ পতিত হয় এবং রেলগাড়ী সম্পূর্ণ বাহির হইতে দেখা যায় তাহাকে শিরোগামী বা ডেক শ্রেণীর সেতু বা পুল বলে।

২। অর্ধমধ্যগামী শ্রেণীর সেতু।—যখন রেলগাড়ীর ভার গ্রীবা বা দণ্ডের উপর অপতিত হয় তখন তাহাকে অর্ধমধ্যগামী সেতু বলে। এই শ্রেণীর



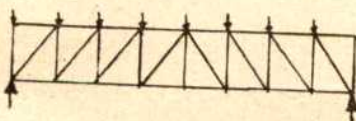
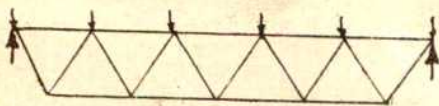
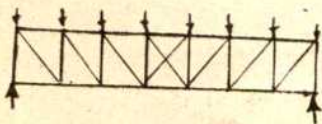
মধ্যগামী শ্রেণীর সেতু

সেতুর উপর দিয়া রেলগাড়ী গমনকালে উহার উপরের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হয়।

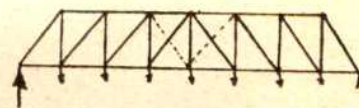
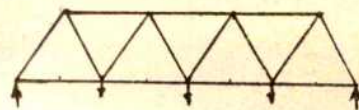
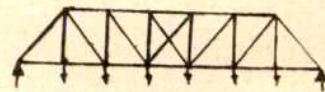
৩। পূর্ণমধ্যগামী শ্রেণীর সেতু।—যখন কোন চলিষ্ণু পদার্থের ভার নিম্নের শিরে বা স্বল্পে স্থাপন হয় এবং গতিশীল পদার্থটি বাহির হইতে দৃষ্টিপথে পতিত হয় না তাহাকে পূর্ণমধ্যগামী শ্রেণীর সেতু কহে।

কোন কোন পূর্ণতত্ত্ববিদের মতে পূর্ণমধ্যগামী এবং অর্ধমধ্যগামী এক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাহার কারণ উপরের শিরে গতিশীল বস্তুর ভার প্রদান করিলে শিরোগামী এবং নিম্নের শিরে ভার স্থাপন হইলে মধ্যগামী। বিভিন্ন আকৃতির সেতু কখন-বা শিরোগামী এবং কখন-বা মধ্যগামী হইতে পারে। (নিম্নে চিত্র দ্রষ্টব্য)

শিরোগামী বা ডেক শ্রেণীর সেতু নির্মাণে অপেক্ষাকৃত অল্প



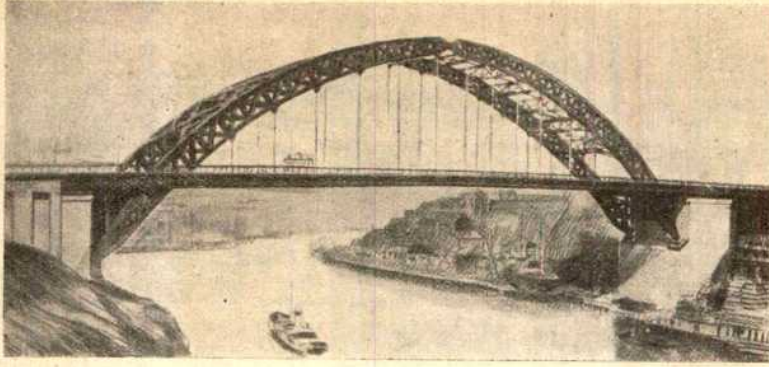
শিরোগামী



মধ্যগামী

অর্থ ব্যয় হয়, বিশেষতঃ রেলগাড়ী-চলাচলের সেতুতে, কারণ এই শ্রেণীর সেতুতে রেলগাড়ীর ভার গাড়ীর উপরের শিরে স্থাপন হয়। তাই কাঠের স্লিপার গোড়াগুড়ি গাড়ীর শিরোদেশে অল্পদূর ব্যবধানে আড়া-আড়ি ভাবে পাতিয়া লৌহশলাকা দ্বারা দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করিলেই হইল, এবং তদুপরি লৌহবস্ত্র সংলগ্ন করিলেই তাহার উপর দিয়া গাড়ী

অনায়াসেই যাইতে পারে। কিন্তু মধ্যগামী শ্রেণীর সেতুতে যেখানে ভার নিম্নের শিরে নিক্ষিপ্ত হয় সেখানে আড়াআড়ি ভাবে গাড়ীর মূল গাড়ীরের গ্রীবায় দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করিতে হইবে এবং তৎপরে মূল গাড়ীরের সমান্তরাল ভাবে লৌহের কড়ি নিবদ্ধ করিয়া তদুপরি কাঠের স্লিপার বসান যাইবে। এই সকল অতিরিক্ত কাজের জন্য খরচ অধিক পড়িয়া যায়। মধ্যগামী শ্রেণীর সেতুতে দুই মূল সমান্তরাল গাড়ীরের দূরত্ব, গাড়ীর প্রস্থের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী করিতে হয়। ইহার ফলে নিম্নের ভারবাহী স্তম্ভের প্রস্থও অধিক করিতে হয়। ইহাতেও ব্যয়াদিক্য ঘটে। কিন্তু শিরোগামী শ্রেণীর সেতুতে দুই মূল গাড়ীরের সমান্তরাল দূরত্ব গাড়ীর চাকার সমান্তরাল দূরত্বের



ওয়েসমাউথ সেতু। দৈর্ঘ্য ৬০০ ফুট।

কিছু বেশী বা সমান। বালীর সেতুতে (উইলিংডন ব্রিজ) গাড়ীর চাকার ভার পাট-গার্ডারের (plate girder) শিরোদেশের কেন্দ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু খ্যাতিনামা পূর্ত্ততত্ত্ববিদগণ বলেন চাকার ভার দুই গার্ডারের ভিতরের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়াই ভাল। উইলিংডন সেতুতে বালীর দিক হইতে জলের দিকে যাইবার অংশে দুইটি ১০০ ফুট লম্বা পাট-গার্ডারের উপর এইরূপ ভাবেই ভার স্থাপিত হইয়াছে।

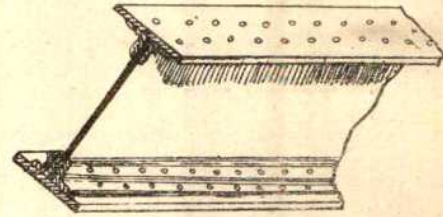
সেতু শিরোগামী শ্রেণীর, না, মধ্যগামী শ্রেণীর হইবে তাহা নির্ভর করে দুই তীরের জমির উচ্চতার উপর আর জল এবং সেতুর মধ্যস্থ মুক্ত স্থান রাখার উপর। যেমন জল হইতে এক স্থলে অর্ধবৃত্তাকারে গমনাগমনের জন্য ৪০ ফুট মুক্ত স্থান রাখিতে হইবে, আর নদীর তীর পর্যন্ত রেলপথের উচ্চতা নদীর জল হইতে ৪৫ ফুট। এখন যদি গার্ডারের গভীরতা ২ ফুট হয় তাহা হইলে আমরা শিরোগামী শ্রেণীর সেতু নির্মাণ করিতে পারি না, কারণ রেলপথের উচ্চতা হইতে জলের উপরিভাগের উচ্চতা ৪৫ ফুট, তাহা হইতে ২ ফুট গার্ডারের গভীরতা বাদ দিলে ৩৬ ফুট মুক্ত স্থান থাকে; কিন্তু আমাদের গকে ৪০ ফুট মুক্ত স্থান রাখিতেই হইবে। অতএব এই ক্ষেত্রে মধ্যগামী শ্রেণীর সেতু নির্মাণ করিতে হইবে। নদীর জলের উচ্চতা প্রাবনের সময় সর্বাপেক্ষা উর্দ্ধ পরিমাপ গ্রহণ করা হয়।

নির্মাণ-প্রণালীর বিভিন্নতার দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সেতু তিন প্রকারে :—১। লৌহ-

চাদর-নির্মিত কড়ি, পাট-গার্ডার ;
২। দৃঢ়ভাবে শলাকাসংলগ্ন লৌহের কাঠাম বা রিভেট-মারা ট্রাস
৩। শঙ্কু-নিবদ্ধ লৌহের কাঠাম বা পিন-দিয়া-জোড়া ট্রাস।

১। লৌহচাদর-নির্মিত কড়ি বা পাট-গার্ডার।—ইহা লৌহের কারখানায় প্রস্তুত I-এর মত কড়ির অনুরূপ মাত্র। টাটানগরে টাটা কোম্পানীর কিংবা ইংলণ্ডের ডরমান-

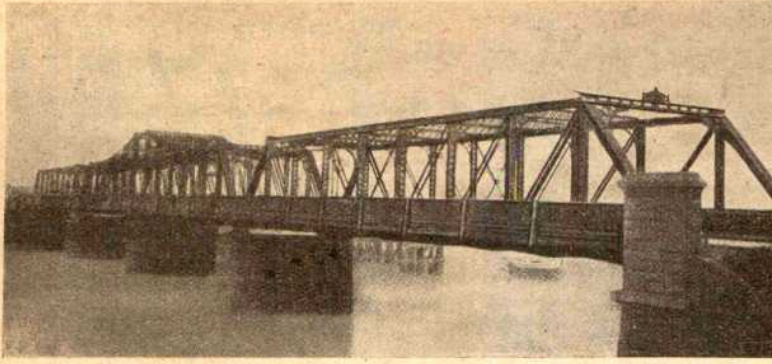
লং কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত সর্বাপেক্ষা গভীর কড়ি হইতেছে ২৪ ইঞ্চি। ইহা অপেক্ষা গভীর কড়ি উদ্ভূত লৌহের চাই হইতে টানিয়া বাহির করা হয় না। কিন্তু ১০ ফুট গভীর I-এর অনুরূপ কড়ি প্রস্তুতের জন্য ১০ ফুট গভীর লৌহের পাত এবং চারিটি স্বদীর্ঘ লৌহের কোণ



পাট-গার্ডার

(angle) দৃঢ়ভাবে শলাকা (rivets) দ্বারা চাদরের উপর ও নীচে দুই দিকে নিবদ্ধ করিয়া দিলে I-এর আকার ধারণ করে। বাহ্যতে গ্রীবার পাতটি ঝুঁকিয়া না যায়, তজ্জন্ত পাতের দুই ধারে দুইটি কোণাকৃতি লৌহদণ্ড শলাকা দ্বারা সরলোন্নতভাবে গ্রথিত হয়। এই কোণাকৃতি যুগ্ম লৌহদণ্ডের গ্রীবার পাতের গায়ে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রমিক দ্রুত, পাতের গভীরতা পর্যন্ত হইতে পারে। এই জাতীয় সেতুতে প্রস্তুত-কারকের কিঞ্চিৎ ক্রটিতে বিশেষ কিছু যায় আসে না।

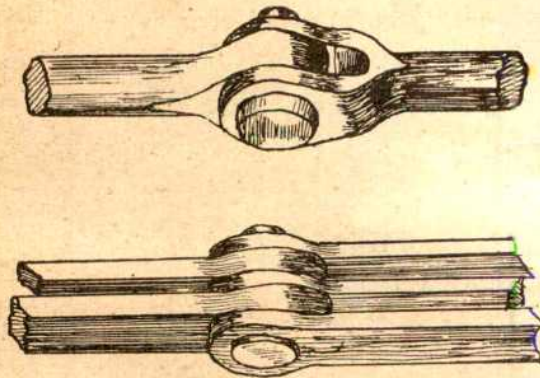
১২০ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ সেতুর জন্য ইহা সম্ভব এবং সহজে প্রস্তুত করা যায়। আর এক সুবিধা যে ইহার সকল স্থানে রং লাগান যায় এবং ফলে সহজে মরিচা পড়ে না। এই কারণে



কার্দিফের ক্রেসেল রাজপথের চিত্র

পাট-গার্ডারের আয়ু সর্বাধিক। ইহাতে কোন অপ্রাথমিক টান (secondary stress) আসে না। ক্রমশঃ জোড়াতাড়ার কাজ খুব অল্পই করিতে হয়—প্রায় সকল কাজই কারখানায় হইয়া আসে।

২। শলাকা-সংলগ্ন লোহের কাঠাম বা রিভেট-মারা কাঠামের সেতু:—ইহা সাধারণতঃ ১০০ ফুট হইতে ১৭৫ ফুট পর্যন্ত জ্যায়ের সেতুর জন্য ব্যবহৃত হইত। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের পর আমেরিকাবাসিগণ আমেরিকা ও কানাডায় ২৫০ ফুট লম্বা সেতু শলাকা সংলগ্ন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছে। বর্তমানে ৪২০ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ সেতুও প্রস্তুত হয়। উইলিংডন সেতুর জলের উপরের জ্যায়ের দৈর্ঘ্য ৩৫০ ফুট, সিন্দুনদের উপর কোব্রী সেতুর জ্যায়ের দৈর্ঘ্য ৩৬০ ফুট ৬ ইঞ্চি, এবং চেনাব নদীর উপর 'আথহুর' যান-চলাচলের

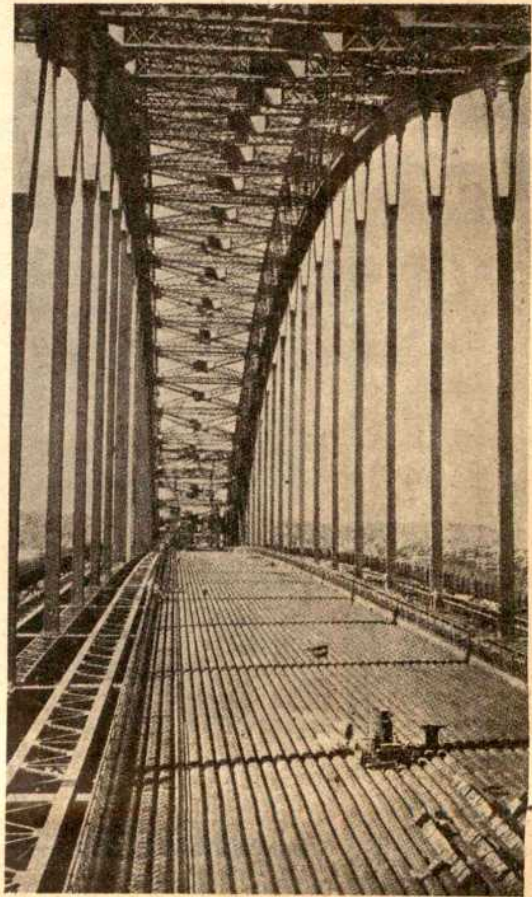


পিন-সংযোজনার চিত্র

সেতুর জ্যায়ের দৈর্ঘ্য ৪৫০ ফুট। ইহাই বর্তমানে ভারতের সর্বাধিক দীর্ঘ জ্যায়ের সেতু।

৩। শঙ্কুনিবদ্ধ লোহের কাঠাম বা পিন-দিয়া-জোড়া ট্রাস:—ইহা সাধারণতঃ ১৫০ ফুট হইতে ২০০ ফুট লম্বা জ্যায়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। পূর্বে আমেরিকায় ছোট ছোট সেতুর জন্য পিন-দিয়া-জোড়া

সেতু নির্মিত হইত। এই প্রকার সেতুর সুবিধা এই যে, ১। ইহা শীঘ্র প্রস্তুত করা যায়, ২। ইহা রিভেট-মারা

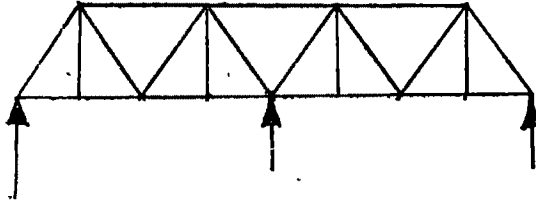


অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী-হারবার সেতু।

সেতু অপেক্ষা অল্পব্যয়সাপেক্ষ, ৩। ইহা অপ্রাথমিক টান হইতে মুক্ত।

বিভিন্ন রীতিতে সেতুর ভার ভিত্তির উপর প্রদান করিবার উপর সেতুকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায় :—
১। সহজভাবে বসান সেতু, ২। অবিচ্ছিন্ন কড়ি-নির্মিত সেতু, ৩। বৃত্তাভাসাকৃতি সেতু, ৪। এক দিক সংলগ্ন ও অপর দিক মুক্ত সেতু, ৫। বুলন সেতু, ৬। বুলন কিংবা খিলানযুক্ত এক দিক সংলগ্ন অথবা দুই দিক মুক্ত সেতু।

১। সহজভাবে বসান সেতু (simply supported girder) :—একটি কড়ি অথবা কড়িদ্ধাতীয় লৌহের গঠনকে দুইটি সমলোম্বত স্তম্ভের অথবা কোন আধারের উপর স্থাপন করিলে কড়ির ভার দুই দিকে ঋজুভাবে স্রুত হইবে, এইরূপ



অবিচ্ছিন্ন কড়ি-নির্মিত সেতু।

সেতুকে সহজভাবে বসান সেতু বলে। সাধারণ ইস্পাতে ৩০০ ফুট এবং নিকেল-মিশ্রিত ইস্পাতে ৭৫০ ফুট সেতু এই শ্রেণীর হইয়া থাকে। ওহিয়ো নদীর উপর সেতুটি ৭২০ ফুট লম্বা জ্যা-বিশিষ্ট।

২। অবিচ্ছিন্ন কড়িনির্মিত সেতু :—যদি একটি দীর্ঘ কড়ি তিন বা ততোধিক ভারগ্রাহী স্তম্ভের উপর স্থাপিত করা হয়, তাহাকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বসান কড়ি বলে। ইহাতে ভার ঋজুভাবে আসে, কিন্তু বক্রীকরণের শক্তি (bending moment) দুই স্তম্ভের মাধ্যমে সহজভাবে বসান কড়ি অপেক্ষা কম।

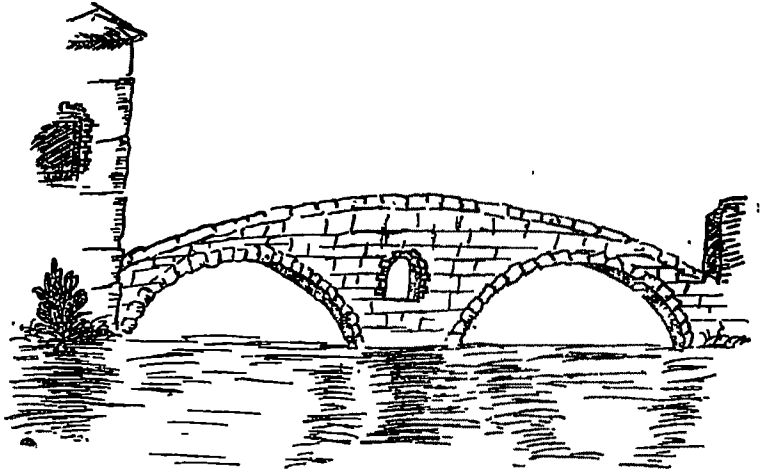
৩। বৃত্তাভাসাকৃতি সেতু :—ইহার আকৃতি বাড়ীঘর খিলানের অতরূপ কিন্তু আকারে বৃহৎ। ইহা ইষ্টক কিংবা

প্রস্তর কিংবা কঙ্করেটক (concrete) কিংবা লৌহের কাঠামর হইতে পারে। ইহাতে ভার কতক ঋজুভাবে এবং কতক পার্শ্বভাবে স্রুত হয়। নিকেল ইস্পাতের তৈয়ারী হইলে ৩০০০ ফুট জ্যায়ের পর্যন্ত করা যায়। নিউইয়র্কের হেলগেট সেতু ৬২৭২ ফুট জ্যা-বিশিষ্ট। পার্শ্বের চাপ পার্শ্বস্থ ভূমি নিরাপদভাবে বহন করিতে পারিলে বৃত্তাভাসাকৃতি সেতুর আশ্রয় লওয়াই সমীচীন।

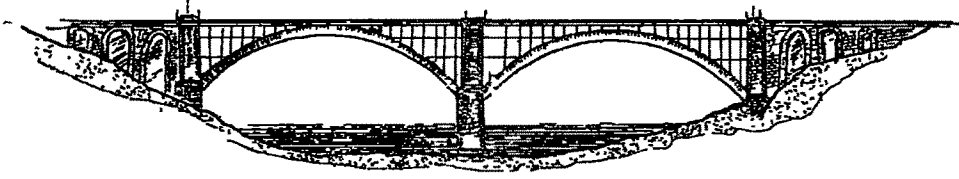
৪। এক দিক সংলগ্ন ও অপর দিক মুক্ত আকৃতির সেতু :—একটি স্তম্ভের গাত্র হইতে কোন গঠন সরলোম্বত ভাবে নির্গত হইলে এবং তাহার উপর কোন ভার স্রুত হইলে স্তম্ভের অভিজগতি হইবে ভারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া। কিন্তু স্তম্ভের দুই দিকে ঐরূপ গঠন বাহিরে নির্গত হইলে ভার ঋজুভাবে স্তম্ভের উপর পড়িবে। আবার কোন গঠন ক্রমিক দুই স্তম্ভের উপর দিয়া দুই স্তম্ভের দুই দিকে নির্গত হইলে তাহাকে উপরিউক্ত সেতু বলে। এক দিক সংলগ্ন ও অপর দিক মুক্ত গঠনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাবীর বাহিরস্থ অলিন্দ বাহার নীচে কোন ভারগ্রাহী গঠন নাই।

উল্লিখিত শ্রেণীর সেতুর প্রাচীন নির্দেশ আপানের নিকো শহরের 'সোগান' সেতুতে পাওয়া যায়। ইহা অস্থায়নিক খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত।

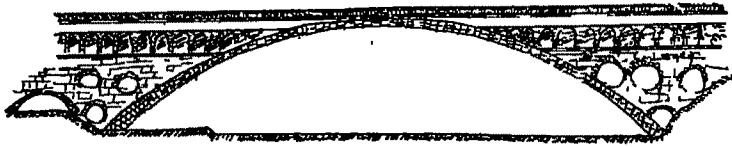
ভারত-সরকারের ইঞ্জিনিয়ার সর্ব এ. এম. রেগুলা পবিকল্পিত সিঙ্কনদের উপর "স্ক্রু সেতু" দৈর্ঘ্য ৮২০ ফুট,



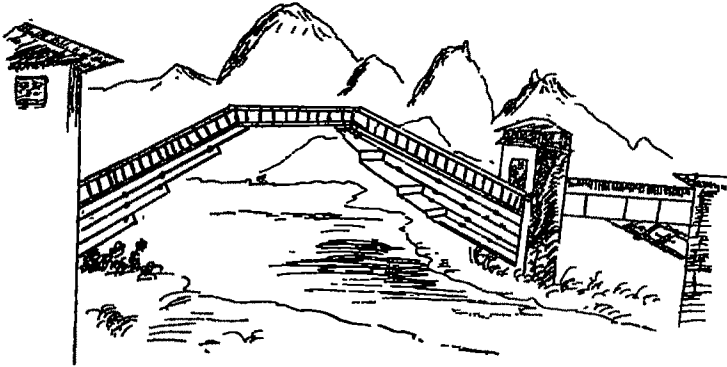
টাইবার নদীর উপর প্রাচীনতম প্রস্তরনির্মিত সেতু। নির্মাণকাল খ্রীষ্টপূর্ব ২১ শতাব্দী। বর্তমানেও ইহা ব্যবহৃত হইতেছে।



দুই ৫১০ ফুট জ্যা-বিশিষ্ট ইন্দ্রাতের খিলান সেতু।



সিরিয়া নদীর উপর ২৯৫ ফুট ব্যবধানবিশিষ্ট ৫০ ফুট উচ্চ প্রস্তর-নির্মিত সেতু। ইহা বর্তমানে প্রস্তরনির্মিত সর্ববৃহৎ খিলান-সেতু।



ভিক্তের গুয়ানানপুরের ১১২ ফুট লম্বা সেতু। নির্মাণকাল—:৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ



কক্রেটক বৃত্তাভাস সেতু।

তন্মধ্যে দুই দিক হইতে প্রসারিত গঠন ৩১০ ফুট করিয়া এবং মধ্যস্থিত দোলারমান গঠন ২০০ ফুট লম্বা। ইহার অংশগুলি বিলাতের কারখানায় প্রস্তুত বলিয়া ইহার ব্যয় অধিক পড়িয়াছে। (৬২৬০০০ ডলার)। হুগলীর কুবিলাই সেতু (১৮৮৬-১৮৯০) উল্লিখিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহার উচ্চতা জলের উপরিভাগ হইতে ৫৩ ফুট। মধ্যস্থ ১২০ ফুট দূরস্থিত দুইটি স্তম্ভের উপর সম্মিলিত অনবিচ্ছিন্ন জ্যামের দৈর্ঘ্য ৩৬০ ফুট।

৫। ঝুলন সেতু:—নদীর দুই তীরস্থ দুই উচ্চ স্তম্ভের

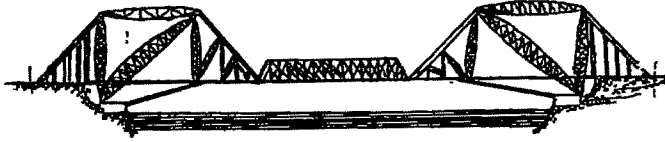
উপর দিয়া দুইটি সমান্তরাল লৌহ রজ্জু বা শৃঙ্খল হইতে দোলয়মা সেতুব নামা ঝুলন সেতু। জানি না, ইহা শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনের পরিকল্পনায় প্রস্তুত কি না? বানর কেমন করিয়া নদী উত্তীর্ণ হয় তাহা অনেকে জানেন। কতকগুলি বানর সম্ভরণ দ্বারা নদী পার হইয়া অস্ত্র দিকের তীরস্থ একটি সুউচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া পরের পর হস্ত দিয়া পদ ধারণ করিয়া লম্বা হইতে থাকে। এইরূপে দুই ধারে দীর্ঘ বানরের রজ্জু দোল খাইতে খাইতে দুই বানর রজ্জুর দুই প্রান্তভাগ ধারণ করিলে ঝুলন সেতু হইল। আর তখনই ছোট-ছোট বানর ও বানরীয়া শিশু বক্ষে করিয়া নদীর অপর প্রান্তে চলিয়া যায়। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে ঝুলন সেতু অতি প্রাচীন আকৃতির সেতু। কিন্তু ইহাকে বৃহত্তর কাজে লাগাইবার জন্য তেমন গবেষণা

হয় নাই। প্রাচীন কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীকে উল্লম্বন করিবার জন্য ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, ভিক্ত প্রভৃতি দেশে এই প্রকার সেতুর প্রচলন ছিল। একটি রজ্জু টাঙাইয়াও ঝুলন সেতু করা হইত। একটি রজ্জুতে কোন পাত্র ঝুলান থাকিত এবং তাহা আর একটি রজ্জু দ্বারা এপার ওপারে টানিয়া লওয়া হইত।

হরিদ্বারের লছমনঝোলা একটি ঝুলন সেতুর উদাহরণ, বালিগঞ্জ লেকের দীপে ঘাইবার জন্য যে সেতু আছে তাহাও একটি ঝুলন সেতু। জিবেপীর নিকট সরস্বতী নদী



বুলন সেতু



হুহুর সেতু

পার হইবার জন্য যে সেতু আছে তাহাও উপরিউক্ত শ্রেণীর।

বিশ্ব জগতের মধ্যে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সেতু আমেরিকার স্তান ক্রানসিঙ্কো সেতু। ইহা বুলন শ্রেণীর। ইহা প্রস্তুত করিতে পূর্ণ চারি বৎসব অতিবাহিত হইয়াছে এবং ব্যয় হইয়াছে ৭৭,২০০,০০০ ডলাব। ইহাতে পাশাপাশি ছয় সার গাড়ী যাতায়াত করিতে পারে। ইহাতে বেলপথের কোন সংস্থান নাই। ইহার দৈর্ঘ্য সাত মাইল।

৬। বুলন অথবা খিলানযুক্ত এক দিক সংলগ্ন ও অল্প দিক যুক্ত সেতু।—বর্তমানে হাবড়ার যে নতুন সেতুর নির্মাণকার্য চলিতেছে, তাহা বুলনমিশ্রিত একদিক সংলগ্ন অন্য দিক যুক্ত শ্রেণীর সেতু। ইহার নদীতীরস্থ দুই দিক হইতে প্রসারিত বাহুর দৈর্ঘ্য ৪৬৮ ফুট এবং মধ্যস্থিত বুলমান অংশের দৈর্ঘ্য ৫৬৮ ফুট। মধ্যস্থিত অংশটি লৌহ-নিগড়ে শৃঙ্খল ভাসমান থাকিবে। ফলে মোট দৈর্ঘ্য ১০৩৬ ফুট। নিম্নে ইহার রেখাচিত্র দেওয়া হইল।

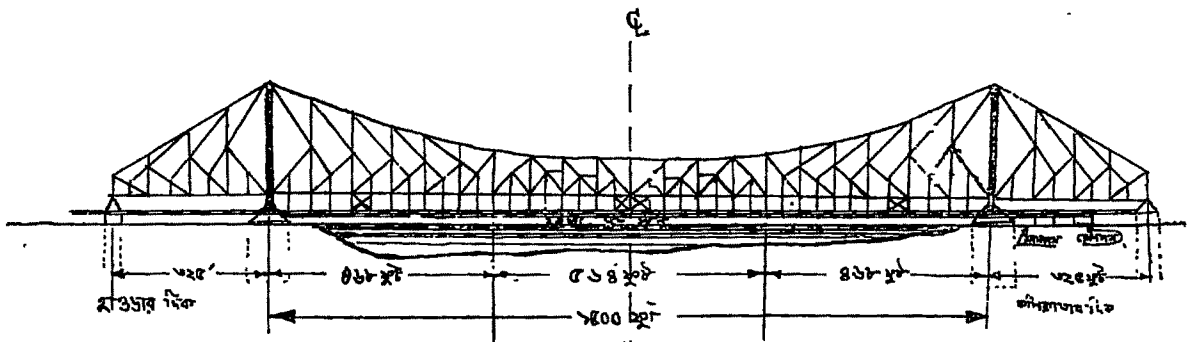
এতদ্বিধা ভাসমান সেতু (Pontoon Bridge), ককরেটক সেতু, আদিককরেটক সেতু, কজাযুক্ত বৃত্তাভাস সেতু প্রভৃতি আছে। ভাসমান সেতু।—ভাসমান সেতুর প্রথম পরিকল্পনা

করেন শ্রীরামচন্দ্র। “শিলা ভাসে ডলে” হওয়া অসম্ভব। যদি তাই সম্ভব হয়, তাহা হইলে শিলাকে ভাসাইবার কৌশল তিনি জানিতেন। তিনি বহু বৃক্ষকাণ্ডের উপর শিলা সংস্থাপন করিয়া ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপের মধ্যে

গমনাগমনের পথ করিয়াছিলেন। সেতুটি ভাসমান বলিয়াই লক্ষ্মণ সীতা-উদ্ধারের পর বাণাঘাটেই কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। তাই কিয়দংশ ভাসিয়া যায় এবং সেতুর কিয়দংশ আজিও বর্তমান। এই পরিকল্পনাই জাৰ্মানীর কার্লসারের মনে ছিল। তাই তিনি বিগত মহাযুদ্ধে স্থির করিয়াছিলেন করাসীকে জয় করিয়া ভোক্তার হইতে ক্যাল পর্যন্ত এই ভাসমান সেতু স্থাপিত প্রস্তুত করিয়া লইয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করিবেন। পুরাতন হাবড়ার পুল ভারতের মধ্যে ভাসমান সেতুর উদাহরণ। হোনারের পুস্তকে এই ভাসমান সেতুর কথা আছে, নৌকা গায়ে গায়ে সংলগ্ন করিয়া প্রাচীন পারস্য, বাবিলন দেশের রাজারা যুদ্ধের সময় সৈন্য পার করিয়া লইয়া যাইতেন। সে আজ ২৫০০ বৎসব আগের কথা।

আমেরিকায় ককরেটক ও আদিককরেটক সেতুর বিশেষ চলন। ভারতবর্ষেও ঐ শ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেতু প্রস্তুত হইতেছে।

কজাযুক্ত বৃত্তাভাস সেতু।—এই বৃত্তাভাসে দুই বা ততোধিক কজা সংলগ্ন করা যায়। এই প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত ওরেমাউথ সেতুর যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা এই শ্রেণীর। উহা দৈর্ঘ্যে ৬০০ ফুট।



হাবড়ার নতুন পুল



আলোচনা



অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান

শ্রীনিলিনীনাথ দাশগুপ্ত

গত বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে পণ্ডিতপ্রবর রাহুল সাক্ত্যায়ন মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে অতীশ দীপঙ্করের বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, “ইহার দুই জনেই (শাস্ত্ররক্ষিত ও অতীশ দীপঙ্কর) সহোদর প্রদেশের রাজবংশে উদ্ভূত। বাঙালী পণ্ডিতগণ ‘অতিশ্য’কে বাঙালী প্রমাণ করেন। বাহা হউক, সহোদর বঙ্গদেশে নয় বিহারে, বিক্রমশিলার নিকটবর্তী অঞ্চলে, মুসলমানদিগের আগমনের পূর্বে এ অঞ্চল ‘ভাগল’ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সহোদর মাণ্ডলিক রাজ্য ছিল; উহার রাজধানী ছিল বর্তমান কলকাতার নিকটস্থ কোন স্থানে.....” (পৃ. ১০৪)।

সহোদর, সাহোদর বা জাহোদর নামক স্থানে অনেক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত উদ্ভূত হইয়াছিলেন, এইহেতু ইহার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজে কিছু কিছু আলোচনাও হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য সিলভা লেভির মতে, সাহোদর হিন্দুস্থান (Le Nepa, ii, p. 177)। ডক্টর এ. এইচ. জাক্স বলেন, সাহোদর পঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্ডি (Antiquities of Indian Tibet, ii, p. 87)। আবার কেহ কেহ বলেন, সাহোদর ঢাকা জেলার সাভার, অথবা যশোহর। নানা কারণে, বিশেষতঃ বাংলার পাল-বংশীয় সম্রাট ধর্মপালদেবকে তিব্বতীয় এক ঐতিহ্যে ‘সাহেরের রাজা’ বলিয়া বর্ণিত দেখিয়া, আমি অল্পমান করিয়াছি, সাহোদর বাংলারই (সম্ভবতঃ পশ্চিম-বাংলার) স্থানবিশেষ (Indian Historical Quarterly, March, 1935, pp. 143-144)। এ সকল অল্পমানের একটিও বথার্থ না হইতে পারে, কিন্তু রাহুল সাক্ত্যায়ন মহাশয় কি করিয়া স্থাননিশ্চিত হইলেন যে সহোদর বিহারে বিক্রমশিলার নিকটবর্তী অঞ্চলে, তাহা প্রবন্ধে বলেন নাই।

অতীশ দীপঙ্করও সহোদরে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, একথা নিতান্তই নূতন। রাহুল সাক্ত্যায়ন মহাশয় এই তথ্য কোন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং সেই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য কি, সে-কথাও বলেন নাই। বাঙালী পণ্ডিতগণ কোনও বাঙালীর রচিত পুস্তক দেখিয়া অতীশকে বাঙালী প্রতিপন্ন করেন নাই, এ বিষয়ে তাঁহাদের উপলব্ধি একাধিক তিব্বতীয় ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ। ইহার কোন-খানিতে পাওয়া যায়, অতীশ “বজ্রাসনের (বোধ-প্লাম্বার) পূর্বে বাংলা দেশে বিক্রমগিরিতে গৌড়ের রাজবংশে” জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোনখানিতে দেখি, তিনি “পূর্বভারতের বাংলায় বিক্রমপুরে” জন্মিয়াছিলেন (Pag-Sam-Jon-Zang, p. xviii)। এ

সকল গ্রন্থ আগাগোড়া প্রামাণিক নহে, এই হিসাবে অতীশের জন্মস্থান সম্বন্ধে এই সকল উক্তি হয়ত বিশ্বাসযোগ্য না-ও হইতে পারে। কিন্তু ত্যোজুরের ক্যাটালগে ‘বোধিমার্গ-প্রদীপ-পঞ্জিকা নাম’ বলিয়া অতীশের স্বরচিত একখানি গ্রন্থের যে বিবরণ আছে, তাহাতে অতীশের বর্ণনায় স্পষ্ট লেখা আছে যে তিনি “বাংলার রাজপরিবারে” জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (Dipankara Srijnana de souche royale bengalie—Catalogue du Fonds Tibétain de la Bibliothèque Nationale, Troisième Partie, par P. Cordier, p. 327)। ত্যোজুরের ক্যাটালগে ‘একবীর সাধন নাম’ বলিয়া অতীশের যে অপর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তাহাতেও আচার্য্য পৈতৃপাত্তিক শ্রীদীপঙ্করকে ‘বাংলার’ (du Bengale) বলিয়া উক্ত হইয়াছে (Ibid., Deuxième Partie, p. 46)। অতএব, অতীশ বাঙালী ছিলেন না, একথা বলিবার হেতু দেখি না। কোনও গ্রন্থে অতীশের জন্মস্থান সহোদর বলিয়া লেখা থাকিলে, উহা দ্বারা আরও প্রমাণিত হইবে যে, সহোদর বাংলারই স্থান-বিশেষ।

“শেষ ব্রহ্মযুদ্ধে বীর বাঙালী সৈনিক”

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএইচ-ডি.

ভাদ্র মাসের ‘প্রবাসী’র ৬৬৭-৭০ পৃষ্ঠায় শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় “শেষ ব্রহ্মযুদ্ধে বীর বাঙালী সৈনিক” শীর্ষক একটি চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে, প্রবন্ধটি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অজ্ঞতাপ্রসূত, এবং উহাতে বাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার সমস্তই ভুল। তিনি পরলোকগত রামলাল সরকার মহাশয়ের যে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে গর্ব অমৃতব করিতে বলিয়াছেন, উহা “আত্মকাহিনী” নহে, উহা একখানি উপন্যাস মাত্র। উহার কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। “আমার জীবনের লক্ষ্য (উপন্যাস)” নামে ঐ গ্রন্থ বহুদিন পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে, এবং আমাদের অনেকের কাছেই উহা আছে। ঐ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী নামক এক জন কাল্পনিক বাঙালী বীরের কাহিনী উপন্যাসসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্যই পাণ্ডুলিপিতে প্রথম পৃষ্ঠাবের উক্তি দেখিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ উহাতে “আমি” বলিতে রামলালবাবু তাঁহাব কল্পনাপ্রসূত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তীকে বুঝাইয়াছেন।

[শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায়ও এই সম্বন্ধে আমাদের নিকট পত্র লিখিয়াছেন]

পুরুষের ঘন

ঐরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিল এক সময়

যখন মেয়েদের উড়ে-পড়া আঁচলেব খারটুকু ছলিয়ে

দিত মন,

তাদের এলোচুলেব অল্প একটু হৌওয়া গারে দিত কাঁটা,

দেখেতে কেমন, বয়স কচি না কাঁচা, ছিল না খেয়াল

কিন্তু লাগত ভালো।

যা ছিল রঙীন আবছায়া একদিন তাই

জমে উঠল মৃতিতে,

মাধুরীর ছায়াপথে ফুটে উঠল কল্পনার একটি তারা,

কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয় আর ঢাকা

পড়ে তার মোহন ছবি,

মনকে ডুবিয়ে দেয় ধ্যানের অতলে,

মায়ায়ুগী তুলিয়ে নিয়ে যায় স্বপ্নের গহনে,

চমক লাগিয়ে দেয় প্রহরগুলিতে

ফেনিয়ে তোলে ভালোবাসার পাগুলামি।

মল্লিকা যখন এল ঘরে

ভাবলুম যৌবনের সেই মরীচিকা

প্রিয়ার দেহ ধরে দাঁড়াল আমার পাশে।

কত তার ছলনা আমি তা বুঝি তবু বুঝি নে।

সে হয় ভারি খুশি।

মোহজালে জড়ালুম নিজেকে,

সোনার শিকল পরলুম পায়ে,

তাকে নিম্ন টেনে এত কাছে

ফাঁক বইল না কোনোখানেই

কল্পনা খরা দিয়েছে হাতে

এই আশায়ে তুক রইল ভরে

কানায় কানায়।

এখন সৃষ্টি হাথড়িয়ে ভাবি সে আছে কি নেই।

যেন হুড়িয়ে পাই ছাকে এখানে সেখানে।

কারো চোখেব চাহনিতে সন্ধান পাই তার,

কারো একটুখানি হাসিতে পুরানো হাসির

বলক লাগে,

কারো আচস্কা হৌওয়ায় স্বপ্ন দেয় জাগিয়ে,

মনে হয় আরেক যুগের আগাঁদা মাংসার মুক্তো সব,

প্রথম প্রেমসীর ছড়ানো পরিচয়ের টুকরো।

পাব কি কখনো ফিরে

স্থাপন করেছিলুম চাকে

স্পর্শে জ্বাণে ধ্যান জ্ঞানে

আমারই প্রিয়ার মাঝে।

মল্লিকা কিছু বলে না, কেহন মুচকে হাসে,

ভাবে, পুরুষের মন সে জানে।

মাটির বাসা

শ্রীসীতা দেবী

(৩)

ভোরের আলো ক্রমেই উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে।
ফুয়াসার স্বচ্ছ আবরণ একেবারে অপসারিত হয় নাই, তবে
ইহারই ফাঁকে ফাঁকে আলোর অঞ্জলি চারিদিকে ঝরিয়া
পড়িতেছে। ছেলেমেয়েরা ঠেলাঠেলি মারামারি বাধাইয়া
দিয়াছে রোদ পোহাইবার জন্ত। ঘুম ভাঙিলে পাড়া-
গাঁয়ের ছেলেমেয়ে আব বিছানায় শুইয়া বিমাইতে চায় না,
তখনই উঠিয়া পড়ে। তাহাদের দামী শীতবস্ত্রের বালাইও
বেশী নাই, কাঁথা মুড়ি দিতে আবাম লাগে বটে, কিন্তু শীতের
হাওয়া যখন খোলা মাঠের উপর দিয়া হু হু করিয়া ছুটিয়া
যায়, তখন এই জীর্ণ বস্ত্রের বর্ণের সাধ্য কি যে তাহাকে
ঠেকাইয়া রাখে? ছেলেমেয়েদের হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়া
যায়। তখন রোদটুকুতে পিঠ পাতিয়া বসা ছাড়া উপায়
কি? অতএব চিনি একখানা বড় পিড়ি পাতিয়া তাহার
উপর উবু হইয়া বসিয়া আছে। সে ঢালাক মেয়ে, আগ্নে-
ভাগে ভাল জায়গাটুকু দখল করিয়া বসিয়া আছে। তিনি
তত ভাল জায়গা পায় নাই, তাহাকে পিড়ি পাতিতে
হইয়াছে একেবারে দাওয়ার সিঁড়ি ঘেঁষিয়া, বেশী নড়াচড়া
করিতে গেলে গড়াইয়া উঠানে পড়িয়া যাওয়া অনিবার্য।
তাই নিজের জায়গায় বসিয়াই দুই-একটা ঠেলা দিয়া সে
দেখিতেছে, যে, চিনিকে তাহার সীমানা হইতে একটু হঠাইয়া
দেওয়া যায় কি না। তবে এখন পর্য্যন্ত চিনি সদর্পে নিজের
রাজ্য রক্ষা করিতেছে, একচুলও নড়ে নাই। তিনজনের
মধ্যে কাছই আছে ভাল, এত সকালেই ত তাহাকে খাটাব
খুরার সঙ্গে বাঁধা যায় না, তাই তাহার মা তাহাকে কোলে
লইয়াই রান্না করিতে বসিয়াছেন। আর একটু বেলা না
হওয়া পর্য্যন্ত সে সেখানেই থাকিবে। শীতের ভোরে
রান্নাঘরের মত আরামদায়ক জায়গা আর আছে কোথায়?
কিন্তু মা বড় একচোখো, চিনি টিনিকে তিনি রান্নাঘরের

দ্বারকাছেও ঘেঁষিতে দেন না। তাহার নাকি অতি
নোংরা, তাহাদের কাপড়চোপড় বাসি।

মৃণাল ইহারই মধ্যে স্নান করিয়া কেলিয়াছে, শীতের
বাধা মানে নাই। এখানে গরম জলে স্নান করার নিয়ম
নাই, যতই শীত হউক, খোলা পুকুর-ঘাটে, কনকনে ঠাণ্ডা
জলেই স্নান করিতে হইবে। এইসব সময় মনে হয়,
কলিকাতায় থাকিয়া আরাম আছে বটে, এক-একদিকে।
চক্ষু, কণ, মন সেখানে সারাক্ষণই পীড়িত হয়, কিন্তু শরীরটা
আরাম পায়। ইচ্ছা না হয়, তুমি চকিণ ঘটা খাট হইতে
না নামিয়াই কাটাইয়া দিতে পার, সব-কিছুর ব্যবস্থাই
হাতের কাছে পাওয়া যায়।

মামীমা কিন্তু শহুরে বাহা-কিছু সমস্তেরই বিরোধী,
বলেন, “মা পো মা, কি কাণ্ড! গা ঘিন্ ঘিন্ করে না গা?
শোবার ঘরের পাশে ও সব কি? কে জানে বাপু, আমরা
পাড়াগেঁয়ে মানুষ ও সব ভাল বুঝি না। তোর দিদিমা
বেঁচে থাকলে অমন বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াতে দিতেন না
তোকে, বা বিচার ছিল তাঁর।”

মৃণাল হাসে, কিন্তু মনে মনে মামীমার কথা স্বীকার
করে না। এত বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া ত সে দেখিল?
সত্যই আরাম এখানে পাওয়া যায়, যদি টাকা খরচ করিবার
ক্ষমতা থাকে। গরীবের পক্ষে অবশ্য কলিকাতা নরকভূম্য।
বিনা পয়সায় এখানে কিছুই পাওয়া যায় না, আলো না,
বাতাস না, আকাশের দিকে তাকাইবার অধিকার পর্য্যন্ত
না। পল্লীজননীর কোল সত্যই মায়ের কোল, এখানে
নৌ-দরিত্রের প্রভেদ তত উগ্র নয়। এখানে ভগবানের
দেওয়া আলো-বাতাস হইতে কেহই বঞ্চিত নয়, খোলা
আকাশের নীচে খোলা মাঠের বৃক্ষ বেড়াইবার
অধিকার সকলেরই সমান। সকাল-সন্ধ্যায় কত যে
বিচিত্র শোভার ভাঙার চারিদিকে উন্মুক্ত হয়, তাহা

প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু মহানগরী যেন রূপকথার বিমাতা, ধনীরা তাহার নিজের সম্ভান, দরিদ্রের সঙ্গে তাহার সতীন-পুত্রের সম্পর্ক। কোনও মতে সুখাচ্ছলে বিষ পান করাইয়া তাহাদের শেষ করিয়া ফেলিতে পারিলেই রাক্ষসী বাঁচে।

পিঠের উপর দীর্ঘ ভিজা চুলের রাশি মেলিয়া দিয়া, রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া যুগল তরকারি কুটিতেছে। মামীমা এক হাতে কত আর করিবেন? তাহার উপর ছরস্তু খোকাটা তাহার কোলে, তাহাকে সামলাইয়া তবে তাহাকে কাজ করিতে হইতেছে। রাধী ঝি নীচু জাতের, বাহিরের কাজ, গোম্বালের কাজ ছাড়া তাহাকে আর কিছু করিতে দেওয়া হয় না। খোকাও আবার পরম কচিবাগীশ, পারতপক্ষে রাধীর কোলে সে যাইতে চায় না।

মামীমা রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, “ও মা মিস্ত্র, ঝোলের তরকারিটা নিয়ে আস, চড়িয়ে দিই, বেলা হয়ে গেল।”

রোজের তেজ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে, কুয়াসার শেষ চিকুচুকুও মুছিয়া যাইতেছে। এখন গাছের মাখায় বাঁশঝাড়ের উপরে পাতলা রেশমের ঘোমটার মত কুয়াসার টুকরা দেখা যায়, খানিক বাদে তাহাও আর থাকিবে না।

বাহিরে হুড়মুড় করিয়া একটা শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার, “হু, হু!”

চিনি ডাকিয়া বলিল, “মিদি তোমার গাড়ী এসে গেছে।”

মামীমা উত্তরে রান্নাঘর হইতে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, “হা ত চিনি, সিধুকে বলগে যা এখন গরু খুলে দিতে। মিসির এখনও খাওয়া হয়নি, কাগড় পড়া হয়নি, তোর বাবা এখনও বাড়ী করেন নি। এখনও ঘণ্টাখানিক ঘেরি আছে।”

চিনি ঘাড়টা এ-ধার হইতে ও-ধারে দোলাইতে দোলাইতে বলিল, “উহু, আমি যাব না ত।”

মামীমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “কেন যাবি না লা? বাড়ী মেয়ে, একে দিয়ে যদি একটু সাহায্য হয়। ও বয়সে আমরা ঘর-কন্নার কত কাজ করেছি।”

চিনি বলিল, “হু, আমি যাই, আর উ আমার জায়গাটি নিয়ে নক।”

যুগল হাসিয়া বলিল, “থাক গে মামীমা, তুমি ওদের ব'কোনা এখন, নিজের নিজের সাম্রাজ্য রক্ষা নিয়ে ওরা ব্যস্ত আছে। আমি সিধুকে ব'লে আসছি। কালকে দাও ৩ আমার কাছে, ওটা ২ তোমায় জালিয়ে মারল।”

খোকাব মিসির কাছে যাইতে কোনও আপত্তি ছিল না, সে হাত বাড়াইয়া চলিয়া গেল।

বাহিরে খোলা মাঠের উপর সিঁহু গাড়ী আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে। অতি সাধারণ ছই-দওয়া গরুর গাড়ী। গ্রামে অল্প কোনপ্রকার যানের ব্যবস্থা নাই। পাশের গ্রামটি বর্ধিষু, সেখানে নাকি একখানা বোড়ার গাড়ী আছে। এ গ্রামেও বেশী পদ্ধানীন বউ-ঝি কেহ আসিলে বা গেলে সেই গাড়ীখানিরই ডাক পড়ে। কিন্তু যুগলের পদ্ধার বালাই নাই, এই গরুর গাড়ীতেই তাহার চলিয়া যায়। হাঁটিয়া যাইতেও তাহার আসক্তি ছিল না, তবে সঙ্গে মাটখাট থাকে এই যা। হুগলকে দেখিয়া সিধু নিজেই জিজ্ঞাসা করিল, “আর কড় ঘেরি গো মিসি? গরুদুটকে খুলে দিব?”

যুগল বলিল, “তাই দাও, এখনও ঘেরি আছে ঘণ্টা-খানিক।”

সিধু গরু-ছইটাকে মুক্তি দিল, দুই আঁটি খড়ও ছুঁড়িয়া দিল তাহাদের সামনে। গরু ঘেরিয়া কালুর বীরশ্বের অনেকখানিই লোপ পাইয়াছিল, সে মিসির ঘাড়ে মুখ গুঁজিয়া ছিল। যুগল তাহাকে লইয়া ঘরের ভিতর চলিয়া আসিল। নিজের জিনিষপত্রের উপন আর একবার চোখ বুলাই-ন লইল। না, আর কিছু করিবার নাই। সবই গোছানা আছে।

মল্লক-মহাশয় বাহিরে গিয়াছিলেন, এই সময় কচু-পাতা মুড়িয়া কিছু টাটকা চুনো মাছ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, “বড় মাছ কিছু পাওয়া গেল না গো, এই ক'টিই তেঁতুল দিয়ে টক ক'রে দিও, বেশ হবে।”

যুগলের মামীমা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া

মাছগুলি স্বামীর হাত হইতে তুলিয়া লইলেন। বলিলেন, “ঐ বেশ, একটু আশ্রয় ত করতে পারবে।”

মৃণালের মনটা ক্রমেই ভার হইয়া আসিতেছে। আর কতটুকু সময় বা বাকি? তাহার পরেই আবার সেই বোজি-বাস। মাসো, প্রাপটা তাহার ঘেন হাঁপাইয়া উঠে। মাছহীনা মেয়ে সে, কিন্তু মামীমার কোলে মাছ হইয়া কোনও দিন সে ছুখ তাহাকে অনুভব করিতে হয় নাই। এই ছোট গ্রামের গণ্ডির ভিতরই যদি তাহার জীবন কাটিয়া যাইত, তাহা হইলে ছুখ ছিল কি? সত্য বটে, তাহা হইলে লেখাপড়া করা তাহার ঘটিয়া উঠিত না, বিশাল জগতের সেটুকু পরিচয় সে পাইয়াছে, তাহাও পাইত না। সেটা যে কতবড় ক্ষতি তাহা বুঝিবার মত বয়স ও জ্ঞান মৃণালের হইয়াছে। তবু মন তাহার ঘেন বুঝিতে চায় না। এই ত গ্রামে কত মেয়ে আছে, যাহাদের অক্ষর-পরিচয়ও হয় নাই, অথচ কি নিশ্চিন্ত হুখে তাহাদের দিন কাটিয়া যাইতেছে। মৃণালেরও কি তেমনই কাটিতে পারিত না? কিন্তু হুখ, শাস্তি, নিশ্চিন্ততা, স্বাধীনতা কিছুই নাই, এমন মেয়েও সে কম দেখে নাই। তাহাদের দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া লইলেই চলে না। যদি শিক্ষাদীক্ষা কিছুমাত্র এই মেয়েগুলির থাকিত, তাহা হইলে পরের হাতে এমন খেলার পুতুল হইয়া তাহাদের জীবন কাটিত না।

মোটের উপর সে স্বীকারই করে যে স্বাবলম্বনের পথে কাড়-করাইয়া দিয়া পিতা তাহার পরম উপকারই করিয়াছেন। পথে অনেক কাটা, তা আর কি করা যাইবে? কোন্ পথে যানাই? এই পথে ত তবু ভবিষ্যতে কিছু হুখের আভাস কল্পনা করা যায়। অন্ত অনেকের ত সেটুকু হুখও নাই। চিনি-টিনিকে লেখাপড়া শিখাইতে তাহাদের মায়ের কেন যে এত আপত্তি, তাহা মৃণাল বুঝিতে পারে না। মামীমা নিজের শাস্তির নীড়টুকু বাহিরে কিছুই দেখিতে চান না, কিন্তু তাহার মেয়েদের অদৃষ্টও যে তাহারই মত সুপ্রসন্ন হইবে তাহার স্থিরতা কি?

মামীমা রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, “ওরে মিল, আমার হয়ে গেছে, ঠাই করেছি, খাবি আচ্ছ।”

খোকাকে কোলে করিয়া মৃণাল রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। চিনি আর টিনিও মাহের টক দিয়া

গরম ভাত খাইবার লোভে তাহার পিছন পিছন আসিয়া ছুটিল। কিন্তু মা তাহাদের একেবারেই আমল দিলেন না, তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দিলেন।

মৃণালের ভাত বাড়িয়া দিয়া খোকাকে গৃহিণী ভায়ীর কোল হইতে টানিয়া লইলেন। মৃণাল খাইতে বসিল। বোজিঙের খাওয়ায় পয়সা যথেষ্ট খরচ হয়, কিছু যে খারাপ খাইতে দেয় বা কম দেয় তাহাও নহে, তবু সেখানে পেট ভরে ত মন ভরে না। অন্ত মেয়েরা রান্না লইয়া, রোজ একঘেয়ে তরকারি লইয়া খুব সমালোচনা করে, মৃণাল ততটা করিতে পারে না, তাহার লজ্জাই হয়। সে যে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, অতি সাধারণ গৃহস্থবরের মেয়ে, তাহা ত সবাই জানে। সে বেশী সমালোচনা করিলে কেহ যদি উলটিয়া বলে, “বাড়ীতে তুমি ছুবেলা কি পোলাও-কালিয়া খেতে গো?” তাহা হইলে সে কি উত্তর দিবে? কিন্তু মন তাহার অন্ত মেয়েদের সমানই খুঁৎখুঁৎ করে।

মামীমা সামনে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। এত সকালে মাছের কত ভাতই বা খাইতে পারে? তবু বারবার অল্পরোধ করিয়া এটা-সেটা পাতে তুলিয়া দিয়া, মামীমা তাহাকে খানিকটা খাওয়াই ছাড়িলেন।

মৃণাল হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় পরিত্তে গেল। গ্রামে যত দিন থাকে, জুতামোজার সঙ্গে তাহার কোনও সম্পর্ক থাকে না, যতই নীত পড়ুক না কেন। কিন্তু কলিকাতার জীবনে এ-সব ত তাহার নিত্য সঙ্গী। তাহাকে জুতামোজা পরিত্তে দেখিয়া চিনি-টিনিও লাকালাকি করে, তাহারাও দ্বিধা মত জুতামোজা পরিবে। হাতধরচের পয়সা জমাইয়া মৃণাল একবার তাহাদের জন্য ছুই জোড়া জুতামোজা কিনিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু ঐ লাকালাকি পর্যন্তই। জুতামোজা পরিলে ত এমন বনের হরিণের মত লাকাইয়া বেড়ানো যায় না? কাজেই জুতামোজা তাকেই তোলা থাকে, আছে যে সেই আনন্দই চিনিদের যথেষ্ট।

বাহিরে গরুর গাড়ী আবার জোতা হইল। মৃণালের নির্দেশমত তাহার জিনিষপত্র গাড়োয়ান এক এক করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল। মামীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যা রে, খান দু-চার চন্দ্রপুলি ছেঁড়া কানিতে বেঁধে দেব? পথে যেতে যদি থিমে পায়?”

মৃণাল হাসিয়া বলিল, “কিছু দরকার নেই মামীমা। এই ত পেট ভরে খেলায়, আর বিকেলবেলায়ই ত পৌঁছে যাব, আবার কখন খাব? আমি ত আর টিনি নয় যে আধ ঘণ্টা অন্তর না খেলে মায়া যাব?”

মনির-মহাশয় চাদর গায়ে দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, তিনি ভাষিকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিবেন। ষ্টেশন মাষ্টারের এক বোন এই ট্রেনে কলিকাতা যাইতেছেন, কাজেই ষ্টেশন পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেই তিনি নিশ্চিন্ত।

মামীমাকে প্রণাম করিয়া, ভাইবোনদের আদর করিয়া মৃণাল গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। মুখটা অল্প দিকে ফিরাইয়া রাখিল, বাহাতে চোখের জল কেহ না দেখিতে পায়। পনের বৎসর বয়স ছাড়াইয়া গেল, এখনও প্রতি ছুটির শেষে বোর্ডিঙে ফিরিতে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠে।

চিনি ডাকিয়া বলিল, “এবার আসবার সময় ভাল ধোঁখে বেশী করে চকোলেট নিয়ে এস।”

তাহার মা তাড়া দিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ, তা আর নয়, দিদি একবারে টাকার ছালার উপর বসে আছে, তোমাদের জন্মে বসন্ত ভরে মিষ্টি নিয়ে আসবে।”

গ্রাম্য পথে ধূলা উড়াইয়া গরুর গাড়ী চলিতে লাগিল। মৃণাল হানিকল্প মুখ ফিরাইয়া লইল, তাহার পর জোর করিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। বাড়ীর দিকে তাকাইয়া দেখিল, মামীমা তখনও কাছকে কোলে করিয়া বাহিরের বাগিয়ায় দাঁড়াইয়া আছেন। চিনি-টিনি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

ছ-খারে অতি-পরিচিত খড়ের ঘরগুলি, আঙ্গিনায় ধূলিমলিন-দেহ বালকবালিকার নৃত্য, ছোট সজীভুম্বর নদীটি, সব একে একে পার হইয়া গেল। ছোট গ্রাম্য বাজারের ভিতর দিয়া এখন গাড়ী চলিতেছে। দুই ধারের পথিক উৎসুক-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছে গাড়ীর ভিতর কে যাই। সকলের আসা-যাওয়া সম্বন্ধে এখানে সকলের কৌতূহল, পল্লীসমাজ যেন একটি বৃহৎ পরিবার, কেহ কাহারও অচেনা, অজানা নয়।

ক্রমে গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনের বাহিরে দাঁড়াইল। একটি লাল পাথরের ঘর, একটা টিনের শেড, আর লাল কাকর-বিছানো প্রকাণ্ড প্র্যাটফর্ম। গোটা-দুই বড় বড়

অথথ গাছ চারিদিকে ডালপাল ছড়াইয়া অনেকখানি জায়গা ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই তলায় হাজীর দল আড্ডা গাড়িয়াছে। এক জায়গায় একখানি লোহার বেঞ্চ, ষ্টেশন মাষ্টারের বোন সেইখানে নিজের ছেলেকে লইয়া বসিয়া আছেন। বরষা ভিতর বড় গরম, পাখার কোনও ব্যবস্থা নাই, কাজেই পারতপক্ষে সেখানে কেহই বসে না।

মৃণালকে দেখিয়া তিনি ডাকিয়া বলিলেন, “এইখানে এস, তবু একটু ছায়া আছে।”

মৃণাল আসিয়া তাঁহার পাশে বসিল। বলিল, “গাড়ী আসতেও ত আর বেশী দেরি নেই।”

ভদ্রমহিলা বলিলেন, “এই এসে পড়ল বলে। এখন একরাশ পোর্টলাপুটলি উঠলে বাচি।”

ট্রেন সত্যি আসিয়া পড়িল। মৃণাল মামাবাবুকে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া গেল। এক মিনিট পরেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

(৪)

কলিকাতা পৌঁছাইতে প্রায় বেলা গড়াইয়া গেল। শীত কালের দিন, চারিটা বাজিতে-না-বাজিতে যেন দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিতে থাকে। তাহার পর নামিয়া আসে নগরের উপর ঘোঁড়ার পর্দা, দুই হাত দূরে মাত্র মাহুঘের দৃষ্টি চলে, রাস্তার আলোহুস্ত বোলাটে দেখাইতে থাকে। মন মুখড়িয়া পড়ে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতর এক অঞ্জলি করিয়া যেন কয়লায় গুঁড়া চুবিয়া যায়।

মৃণাল ষ্টেশনে নামিয়া বলিল, “আমি কি আজ আপনাদের সঙ্গেই যাব, না আমাকে বোর্ডিঙে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবেন?”

তাহার সঙ্গিনীর মৃণালকে বাড়ী পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। তাহার অতি ছোট বাড়ী, শুইবার ঘর মাত্র একখানি। বাহিরের লোক আসিলেই বিপদে পড়িতে হয়। পুরুষ-অতিথি হইলেও না-হয় তাহাকে যেখানে সেখানে শুইতে দেওয়া যায়, কিন্তু এ যে আবার জীলোক!

তিনি একটু অনাবশ্যক ব্যস্ততাব সঙ্গেই বলিলেন, “তোমাকে উনি পৌঁছেই দিয়ে আনুন ভাই, আমি ধোকার

সঙ্গেই বেশ যেতে পারব, চেনা রাস্তা ত? বাড়ীঘর সব এক-ইটু হয়ে আছে, আমি এতদিন ছিলাম না।”

মৃণাল ভাবিল, সে ত মত্ত আয়েসী মানুষ, তাহার স্বভাব আর ভাবনা! কিন্তু বাহার বাড়ী সেই যদি না রাখিতে চায় ত মৃণাল কি আর জোর করিয়া যাইবে? বোর্ডিঙেই যাওয়া যাক। যদিও আজকার রাত্রিটা অন্ততঃ বাহিরে কাটাতে পারিলে তাহার ভাল লাগিত।

বলিল, “তা বেশ, আমাকে উনি দিয়েই আসুন।”

ছুইখানা গাড়ী ডাকা হইল। মৃণাল নিজের অল্পস্বল্প জিনিষপত্র লইয়া একখানাতে উঠিয়া বসিল। ষ্টেশন-মাষ্টারের বোন নিজের ছেলের সঙ্গে লটবহর লইয়া আর-একখানি অধিকার করিলেন। কুলীর চীৎকার, গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি, ট্রাম-বাসের কোলাহলের ভিত্তর দিয়া গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

কি দানবীয় মূর্খি এই কলিকাতা শহরটার। মৃণালের যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না যে আর কয়েকটা মাত্র ঘণ্টা আগে সেই শ্রামল গাছের ছায়ার কোলে সাজানো ছোট্ট স্তম্ভের গ্রামখানিতে সে ছিল। যেন মায়ের কোলের মত শিশু, ভোরের আলোর মত মনোহর। তাহার কাছে কলিকাতা যেন মায়াবিনী রাক্ষসী। চোখ ভুলাইবার মন ভুলাইবার অসংখ্য উপকরণ তাহার কাছে, কিন্তু সে একবার এই মুখোশ খুলিলে হয়, তখন সে সাক্ষাৎ মৃত্যু-রূপিনী পিশাচী। এখানে থাকিতে থাকিতে মানুষ কেন পাখর হইয়া যায় না, তাই মৃণাল ভাবে। পানিকটা হয় বই কি? পাড়াগাঁয়ের মাহুষের মনে যতখানি স্নেহ-প্রীতি থাকে, এখানে ততটা সত্যই যেন থাকে না। অন্ততঃ মৃণালের তাহাই মনে হয়।

মামার বাড়ী হইতে ষ্টেশনে আসিতে মৃণাল চোখকে এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম দেয় নাই, সেই সহস্রবার-দেখা মাঠ, বন, নদী, খেলাঘরের মত সাজানো খড়ের ঘরগুলি, সব অতৃপ্ত চোখে দেখিতে দেখিতে আসিয়াছে। এখানে কিন্তু তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, চোখ বুজিয়া রাস্তাগুলো পার হইয়া যায়। কিন্তু চোখ সে চাহিয়াই রহিল। ভাল লাগুক আর না-ই লাগুক, এই কলকোলাহল, এই মাহুষের আর বিবিধ রকমের গাড়ী-ঘোড়ার স্রোত, ইহার দিক

হইতে মনও ফিরে না, চোখও ফিরে না। দুই দিন বাদেও যদি কোথা হইতে ঘুরিয়া এসে তাহা হইলে মনে হয় কলিকাতা অনেকখানিই যেন অল্প রকম হইয়া গিয়াছে। দোকানপাটের ত নিজ পরিবর্তন হইতেছে। রাস্তাঘাটও থাকিয়া থাকিয়া বদলাইয়া যায়। আর নূতন বাড়ীর ত সংখ্যাই করা যায় না, একটার পর একটা এমন ক্রতবেগে গজাইয়া উঠিতে থাকে, যে, তাহাদের কল্যাণে দেখিতে দেখিতে সমস্ত জায়গাটারই চেহারা বদলাইয়া যায়।

হাঙড়া হইতে বোর্ডিঙে পৌঁছাইতে মৃণালের প্রায় পুরা এক ঘণ্টাই কাটিয়া গেল। তাহার পর নিয়ম মত দরোয়ান আসিয়া গেট খুলিয়া দিল, কোন দিকে গাড়ী লইয়া যাইতে হইবে তাহাও গাড়োয়ানকে দেখাইয়া দিল। মৃণালের সঙ্গীট এইবার নামিয়া পড়িয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। মেয়েরা দুই-চারজন কে আসিয়াছে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। মৃণালকে দেখিয়া দুইজন আবার চলিয়া গেল, মৃণাল অল্প ক্রাসের মেয়ে, তাহার আসা-না-আসায় এই দুইজনের কিছু আসিয়া যায় না, আব দুইজন দাঁড়াইয়া রহিল, ইহারা তাহার বন্ধুর দলের।

মৃণাল-নামিয়া পড়িতেই একজন বলিল, “খুব সময় এসে পড়েছিস, এখনই থাকার ঘণ্টা পড়বে। সারাটা দিন ত্রেনে না-থেকে এসেছিস ত? তোর নিয়ম আমার জানা আছে।”

মৃণাল একটু হাসিয়া তাহাদের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া চলিল, পিছনে যেয়ারা তাহার বাস-বিছানা বহন করিয়া আনিতে লাগিল।

আবার সেই খাঁচায় বন্দী। আর সে মানুষ নয়, কলের পুতুলমাত্র। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে উঠিতে বসিতে হইবে, শুইতে হইবে, ঘুমাতে হইবে। ইচ্ছামত, যখন যাহা খুশী যে মাহুষ করিতে পারে, তাহা একেবারে ভুলিয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু এই জীবনেরও মূল্য আছে, এমন ভাবে কঠিন শাসনের অধীন হইয়া থাকারও প্রয়োজন আছে তাহা স্বীকার না-করিয়া মৃণাল থাকিতে পারে না। কিন্তু মন বুরিতে চায় না, মৃণালের মন অল্প মেয়েদের চেয়ে যেন একটু বেশী

বরমুখী। ছেলেবেলা হইতে আপন ঘর তাহার নাই, পরের ঘরেই সে পালিত, তাই কি ঘরের দিকে এত বেশী তাহার মন পড়িয়া থাকে? বড় হইয়া কি সে করিবে, কেমন ভাবে জীবন যাপন করিবে? ভাবিতে গেলে ঐরকম একটি সুন্দর পঞ্জীভবনের ছবিই কেন সবার আগে তাহার মানস-নেত্রে সম্মুখে ভাসিয়া উঠে? আর কোনও রকম ভবিষ্যতের কল্পনা কেন সে করিতে পারে না?

ছুটির আগে একদিন বেড়াইবার সময় তিন বন্ধুতে গল্প হইতেছিল। আশা বলিল, “বাপ রে, কবে যে এই ঘনিতে ঘোরা শেষ হবে। আর পারা যায় না, এখনও হয়ত পাঁচ-ছটা স্ক্র এরই মধ্যে কাটাতে হবে, ভাবলেই আমার প্রাণ কেন হাঁপিয়ে ওঠে।”

প্রমীলা বলিল, “আমি বাবা এই ম্যাট্রিক পরীক্ষা, তার পর আর এমুখো হচ্ছি নে। অত ব্লু টকিং হয়ে আমার দরকার নেই।”

মৃণাল হাসিয়া বলিল, “ও, সনাতন ধর্ম অবলম্বন করবে বুঝি? সব ঠিক হয়ে আছে নাকি?”

প্রমীলা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, “নাই বা ঠিক হ’ল? ঠিক হ’তে সত্যকথা? আমার বাপু সোজা কথা, একটু পড়াশুনো না করলে আজকাল চলে না, লোকে মুখ্য বলে ঠাট্টা করে, তাই পড়তে আসা। তার পর কলেজের পড়া পড়তে পড়তে গিট কুঁজা হয়ে যাক, চোখে চশমা উঠুক, তখন বা ছিরি হবে।”

আশার বাড়ীর সব মেয়েরাই উচ্চশিক্ষিতা। মা বি-এ পাস, দুই দিদি বি-এ পাস, তাহাকেও যে বি-এ পাস করিতে হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই, এবং তাহাতে আশার বিন্দুমাত্র আপত্তিও নাই। তাই প্রমীলার কথায় চিটখা গিয়া বলিল, “হ্যা গো হ্যা, সবই পড়াশুনোর দোষ। তোমরা স্বাস্থ্যের কোনও একটা নিয়ম মেনে চলতে জানবে না, আর দোষ হবে পড়াশুনোর। আমার মায়ের ত তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, কোনওদিন তাঁকে চশমা পরতে দেখেছিলাম? বড়দি আর মেজদি ত তোর সামনেই এখান থেকে ড্যাং ড্যাং করতে করতে বি-এ পাস ক’রে বেরিয়ে গেল, তাদের গিটে কত বড় কুঁজ ছিল? তাদের কেউ আর পৌছে নি, না?”

আশার বড় বোন বিভা সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, তাঁহার বিবাহ চট্ করিয়াই হইয়া গিয়াছে। মেজ বোন শুভাও বেশ জোর কোর্টশিপ চালাইতেছেন, কাজেই তাঁহাদের কেহ পৌছে না একথা আর কি করিয়া বলা যায়? তবু প্রমীলা হটিবার মেয়ে নয়, বলিল, “হু-একটা ‘এক্সপ্লেণ্ড’ থাকলেই যে জিনিষটা অপ্রমাণ হয়ে যায় তা ত নয়? কত গুণায় গুণায় মেয়ে দেখেছি, উচ্চশিক্ষার ঠেলায় যাদের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য দুইই নষ্ট হয়ে গেছে।”

আশা বলিল, “আর আমি হাজারে হাজারে অশিক্ষিতা মেয়ে দেখেছি যাদের স্বাস্থ্যও নেই, সৌন্দর্য্যও নেই, আছে কেবল বোকার মত লম্বা লম্বা কথা, যা তারা স্বার্থপর পুরুষের কাছে শিখেছে এবং না বুঝে তোতা পাখীর মত আওড়াচ্ছে। আর আছে কোলে, গিটে, কাঁখে, গুণায় গুণায় ছেলে।”

তর্কটা শেষে ঝগড়ায় পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া মৃণাল বলিল, “বাকগে ভাই, ও নিয়ে তর্ক ক’রে কি হবে? তর্কেতে আর কি প্রমাণ হবে? হু-পক্ষেই ত ঢের কথা বলবার আছে।”

আশা বলিল, “আচ্ছা তোর নিজের মতলবধানা কি শুনি? তুই ম্যাট্রিক পাস ক’রেই বিয়ে করতে দৌড়বি, না কলেজে পড়বি?”

মৃণাল বলিল, “সবটাই কি আর আমার হাতে থাকবে ভাই? বাবা রয়েছেন, মামা রয়েছেন, তাঁদের কি মত হবে কে জানে? আমার নিজের অবস্থা ইচ্ছে যে কলেজেই পড়ি।”

আশা বলিল, “তবে দেখ, মৃণাল যে অত পাড়াগাঁয়ের ভক্ত, সেও মুখ্য হয়ে থাকতে চায় না, আর তোর বাড়ী কলকাতায়, তোর এত সাত-জাড়াতাড়ি গোয়ালে ঢুকবার সখ কেন রে?”

প্রমীলা হাসিয়া বলিল, “তা আমার যদি সখ হয় বাপু ত কি করা যাবে? হাই-হীল জুতো প’রে, হাতে ব্যাগ নিয়ে, খট্ খট্ ক’রে ক্লাসে পড়তে যাচ্ছি, কি ডাক্তারী করতে যাচ্ছি, তা ভাবতে আমার একটুও ভাল লাগে না। তার চেয়ে রান্নাবান্না ঘরকন্নার কাজ কবছি ভাবতে ঢের বেশী ভাল লাগে।”

আশা বলিল, “আসল পরেক্টটা বাদ দিয়ে যাচ্ছ কেন?”

প্রমীলা বলিল, “বাদ দেওয়ায়ই আর কি? ঘর-সংসার যখন করব, তখন ঘরের কর্তা একটা থাকবে, সে ত জানা কথা।”

মৃণাল বলিল, “আমার ভাই একটি ছোট স্বন্দর খন্ডের চাল-দেওয়া ঘর, আর চারিদিকে খোলা মাঠ, এই ভাবতেই চমৎকার লাগে। কিন্তু কর্তৃত্বভার ভাবনা এখনও মনে আনতে পারি নে বাপু।”

প্রমীলা বলিল, “তা খড়ের ঘরে কি তুই একলা স্ত্রী পা ছড়িয়ে বসে থাকবি নাকি? যত অনায়াস কথা, চিরকালে খুঁকি এক তুই।”

এই সময় ঢং ঢং করিয়া দ্বাটা পড়িয়া যাওয়ায় বেড়ানো এবং গল্প দুই-ই শেষ হইয়া গেল।

সত্যই মৃণাল ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিত না যে ভবিষ্যৎ জীবনটা কি রকম হইলে তাহার পক্ষে সব ভেদে তথের হয়। শিক্ষা যতদূর পাওয়া সম্ভব সব সে পাইতে চায়, কাহারও গলগ্রহ হইয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে সে চায় না, কিন্তু চিরকাল চাকরী করিয়া কাটাইতেছে ভাবিতেও তাহার ভাল লাগে না। শহরে থাকিতে সে চায় না, পল্লীভবনেই ফিরিয়া যাইতে চায়। কিন্তু সেখানে কেমন ভাবে থাকিবে, কি কাজে দিন কাটিবে, তাহা এখনও তাহার মনে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। কিন্তু অদৃষ্টে তাহার কি আছে তাহা কেই বা বলিতে পারে? মামা-মামী ড উচ্চশিক্ষার একান্ত বিরোধী। বাবা যদিও তাহাকে পড়িতে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু সেটা উচ্চশিক্ষার প্রতি অহরাগবশতঃ নয়, অস্ত্র কোনও উদ্দেশ্যে। মেয়ের ঘনি বিবাহ তিনি না দিতে পারেন, তাহা হইলে সে একেবারে অসহায় না হইয়া পড়ে, সেটা ত দেখিতে হইবে? সেই জন্যই তাহাকে পড়িতে দেওয়া। বিবাহ দিতে পারিলে ত তিনি দিবারই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, এবং মামা-মামীও তাঁহাকে সাহায্যই করিবেন।

ট্রেন হইতে নামিয়া মৃণালের মাথাটা কেমন যেন ধরিয়া উঠিয়াছিল। একবার স্থান করিতে পাইলে হইত। পাড়াগাঁয়ে সে দিব্য শীত উপভোগ করিয়া আসিয়াছে,

কলিকাতায় কিন্তু এখনও বিশেষ শীত পড়ে নাই। কিন্তু বোভিঙে ইচ্ছা করিতেছে বলিয়াই ত আর কিছু করিবার জো নাই? কাজেই হাতখুঁচ ধুইয়া, কাপড় বদলাইয়া সে থাইতে চলিল। আয়োজন বাড়ীর চেয়ে এখানে বেশী, তবু থাইয়া মন উঠে না। প্রতি টেবিলে একজন করিয়া শিক্ষণ্ড্রী মেয়েদের সঙ্গে থাইতে বসেন, কাজেই হাজার অসন্তোষ মনের মধ্যে জমা হইয়া থাকিলেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। ভাল লাগুক বা মন্দ লাগুক, সব কিছু মুখ বুজিয়া থাইয়া যাইতে হইবে।

খাওয়া চুকিয়া গেল, তাহার পর একটা একটা করিয়া দ্বাটা পড়িবে, আর পুতুলনাচের পুতুলের মত মেয়েদের তালে তালে হাত-পা নাড়িতে হইবে। একেবারে শুইবার দ্বাটা পড়িলে তখন এই নাটকের শেষ। কাল হইতে সমানে ক্লাস আরম্ভ হইবে, তখন আর এসব ভাবিবার অত সময় থাকিবে না। মামার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথম কর্তা দিন বড় বেশী খারাপ লাগে, তাহার পর এখানকার কর্মশ্রোতে সে ভাসিয়া চলে, মন লইয়া নাড়াচাড়া করিবার অত সময়ও সে পায় না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গও তাহাকে খানিকটা ভুলাইয়া রাখে। সামনে পরীক্ষা, তাহার ভাবনাও বড় কম নয়। এইবারে বাৎসরিক পরীক্ষায় পাস করিলে সে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠিবে, তাহার পর ত মস্ত বড় পরীক্ষা। তাহা কি মৃণাল পাস করিতে পারিবে, কে জানে? বয়স ত যথেষ্ট হইয়াছে, কেস করিলে ছোট ছোট সব মেয়ের সঙ্গে পড়িতে হইবে, সে এক মহা লজ্জার কথা।

ম্যাট্রিকের পর বাবা তাহাকে পড়াইবেন কিনা কে জানে? মামা-মামী ত এইতেই বিরক্ত। যোল বছরের মেয়ে হইতে চলিল, এখনও বিবাহের নামগন্ধ নাই। দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ ত অনেকেই করে, কিন্তু এমন পর হইয়া কেহ যায় না। নিতান্ত কয়েকটা টাকা না দিলে নয়, তাই কেলিয়া দিয়াই মৃণালের বাবা থালাস। মেয়ের কাছে বৎসরে একখানা চিঠিও লেখেন কি না সন্দেহ, বিজ্ঞার সময় হয়ত লেখেন। মল্লিক-মহাশয়ের কাছে কখনও কখনও একটা করিয়া পোস্টকার্ড আসে, এই পর্য্যন্ত।

মৃণাল জানে, তাহার অনেকগুলি ভাইবোন হইয়াছে,

কিন্তু তাহাকেও সে চোখে দেখে নাই, নামধামও বিশেষ জ্ঞোর করিয়া বলা যায় না। বিমাতা নিশ্চয়ই খুশী কাহারও জানে না। বড় বোনটি বোধ হয় দশ বৎসরের হইবে। মাঝে মাঝে তাহাদের দেখিতে ইচ্ছা করে, এবারে বাবার কাছ হইতে বিজয়ার সময় যে চিঠিখানা বাবাকেও দেখিতে ইচ্ছা করে। যেমনই ব্যবহার করুন, পাইয়াছে, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর তিনি বাবা ত বটে? ভাইবোনগুলিও আপনারই। ভাল নাই। বেশী অস্থির কিনা কে জানে? যুগল চিঠির কিন্তু যুগল জানে এ-সব সাধ পূর্ণ হইবার কোনও উত্তর দিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আর চিঠি পায় সম্ভাবনা নাই। কে তাহাকে সেখানে লইয়া যাইবে? নাই। বাবাও যে তাহাকে দেখিয়া খুশী হইবেন এমন কথা

[ক্রমশঃ]

উন্মুখ

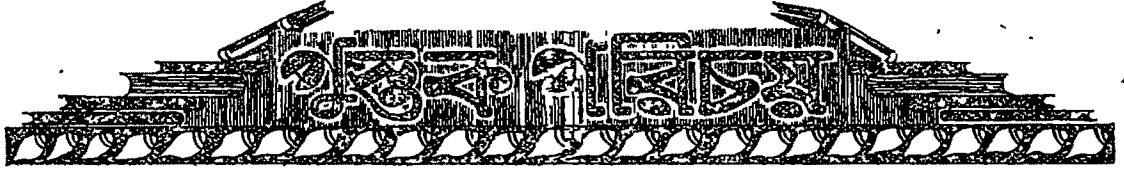
শ্রীশাস্তি পাল

আমার মরমে যে স্বর বাজিছে
বাহির হইতে চায়,—
শত শত রূপে শত শত মুখে
গমকে মুর্ছনায়।
স্বর যে চিনিতে পারে
বিহ্বল করে তারে
বধির ভ্রবণে ধরা নাহি দেয়
পলকে মিলায়ে যায়;
নীলব মুর্ছনায়।

আমার এ-স্বর আপনার হাতে সাধা
ধর গাছারে বাঁধা
নিমেমে নিমেমে ঝঙ্কারি ওঠে
নুপুরের রোলে আধা;
এ যে পরাণে পবাণে বাঁধা।

আমাব এ-স্বর ধনিছে শূন্যে বাতাসে,—
বিরহ-মিলনে হাসি ক্রন্দন হতাশে,
সকল প্রাণের সকাশে।
সকল রাগিণী পরখ করিয়া
মিশিছে আবার বিভাষে;
স্বর ধৈর্যে বিকাশে।

আমার এ-স্বর বলমল করে নিশীথে
ভট-অরণ্যে কল-কল্লোলে মিশিতে।
গ্রাম-প্রাঙ্গণে ছায়াঘন বনে
ঢেলে যায় বারি আপনার মনে,—
বর্ণে বর্ণে নীলনবঘনে
সিঞ্চিত করে তৃষিতে;
ওগো, প্রভাত প্রদোবে নিশীথে।



সঞ্চয়িতা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় সংস্করণ। বিশ্ব-ভারতী-প্রকাশন, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। ডিমাই আর্ট পেজিং, ৬৪০ পৃষ্ঠা। মূল্য—কাগজের মলাট ৪৮, বাঁধান ৫৮।

কবিদ্বিগের কাব্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া কতকগুলি কবিতা নমুনার মত পাঠকসমাজে উপস্থিত করিবার কাজ সাধারণতঃ কবিরা নিজে করেন ন, অন্তেষা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রকার ব্যতিক্রম করিবার কারণ এই বলিয়াছেন, “যাঁরা আমার কবিতা প্রকাশ করেন অনেক দিন থেকে তাঁদের সম্বন্ধে এই অন্তর্ভব করছি যে, আমার অল্প বয়সের যে সকল বচনা স্থলিত পদে চলতে আরম্ভ করেছে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌঁছানি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অবিচার।” “যে কবিতাগুলিকে আমি নিজে স্বীকার করি তার দ্বারা আমাকে দারী করলে আমার কোনো নালিশ থাকে না। বন্ধুরা বলেন ইতিহাসের দ্বারা রক্ষা করা চাই। আমি বলি দেখা যখন কবিতা হয়ে উঠেছে তখন থেকেই তাব ইতিহাস। এ নিয়ে অনেক তর্ক হোতে পারে সে কথা বলবার স্থান এ নয়।”

কোন কবির কাব্য-গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে হইলে অল্প বয়সের সব মুদ্রিত কাঁচা লেখাও প্রকাশ করা, ইতিহাসের দ্বারা রক্ষা করা ছাড়া আর একটি কারণে আবশ্যক মনে হইতে পারে। তাহা কবির কবিত্বশক্তির ক্রমবিকাশ বুঝিবার ও বুঝাইবার সুবিধা। কিন্তু ‘চরনিকা’ বা ‘সঞ্চয়িতা’র মত সংকলন-গ্রন্থে এ প্রকার কাঁচা লেখা দেওয়া অনাবশ্যক, এবং কেহ দিলে তাহার সমর্থন করা যায় না। সুতরাং ‘সঞ্চয়িতা’ হইতে সেরূপ লেখা প্রায় বাদ দেওয়া সমীচীন হইয়াছে। কবির সমগ্র কাব্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে এরূপ সমস্ত লেখাই স্থান পাইলেও কোনও বুদ্ধিমান পাঠক সেগুলির লক্ষ্য কবিকে প্রতিষ্ঠাধীন মনে করিবেন না।

‘সঞ্চয়িতা’, ‘প্রভাতসঙ্গীত’, ও ‘ছবি ও গান’ হইতে কবি “ইতিহাস রক্ষার খাতিরে এই সংকলন” মোট পাঁচটি কবিতাকে স্থান দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “তা ছাড়া ওবেব থেকে আর কোন লেখাই আমি স্বীকার করিতে পারব না।”

পুস্তকখানিতে ২৮৮টি কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। কবি বলেন, “এই গ্রন্থে যে কবিতাগুলি দিতে ইচ্ছা করেছি তার অনেকগুলিই দেওয়া হোলো না। স্থান নেই। ছাপা অগ্রসব হোতে হোতে আরম্ভনের ক্ষীণিতে দেখে ভীত মনে আত্মসংবরণ করেছি। এ রকম সংকলন কখনই সম্পূর্ণ হোতে পারে না।”

তাহা সত্য। কিন্তু এই সংকলনটি কেবল হইয়াছে, তাহাতে ইহা হইতেই রবীন্দ্রনাথের নানাবিধ গুণকাব্য-রচনার প্রতিভা সবথেষে যে ধারণা লাগিবে তাহা ভ্রমসঙ্কুল হইবে না। ইহাতে বহু শ্রেষ্ঠ কবিতা স্থান পাইয়াছে।

বহি খানির ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

রামমোহন রায় ও মূর্তিপূজা—শ্রীঅমরেন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রথম সংস্করণ। পূর্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা। মূল্য আট আনা।

ডবল ক্রাউন বোল পেজিং পৃষ্ঠার (অর্থাৎ প্রবাসীর অর্ধেক আকারের পৃষ্ঠার) ২২২ পৃষ্ঠা। ছাপা ভাল।

এরূপ বড় বহির আট আনা মূল্য খুব কম। গল্পের বহিও কচিৎ এত সস্তা হয়।

কয়েক দিন পূর্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যখন এক জন মুসলমান সমস্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশান ও সীলমোহরের মধ্যে ‘শ্রী-মূর্তিপূজার সমালোচনা’ প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্মকে পৌত্তলিকতা ঘোষণা করিতেছিলেন, তখন ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী দলের নেতা হিন্দু ধর্মাবলম্বী শ্রীমুখ্য শরণচন্দ্র বহু তাহাতে আপত্তি করিয়া এই মর্মেণের কথা বলেন, যে, হিন্দুধর্ম পৌত্তলিক ধর্ম নহে, তাহার শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগুলি পৌত্তলিকতা শিক্ষা দেয় না। শ্রেষ্ঠ হিন্দু শাস্ত্রগুলি যে অপৌত্তলিক, ইহা সত্য কথা। খ্রীষ্টীয় মিশনারিদের আক্রমণের উত্তরে আধুনিক যুগে রামমোহন রায়ই প্রথমে প্রকৃত হিন্দুধর্মের পক্ষ সমর্থন ও পৌরষ ঘোষণা করেন। অথচ ইহা কালের বা অদৃষ্টের বা ইতিহাসের বা অস্ত্র কিছুর দ্বারা পরিহাস, যে, সেই রামমোহন রায় তাঁহার জীবিত কাল হইতে এখন পর্যন্ত হিন্দুধর্মের উল্লেখ পৌরষ ঘোষণা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রশংসা অপেক্ষা নিম্নাই অধিক পাইয়া আসিতেছেন।

হিন্দুধর্মের—এবং অন্য সকল ধর্মেরও—কেন্দ্রীভূত সত্যটির প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা রামমোহনের জীবনের প্রধান কাজ। আটত্রিশ বৎসর পূর্বে বিচারপতি লুৎফালাস স্কোয়াপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে রামমোহন-স্মৃতিসভা হয়, তাহাতে সভাপতি মহাশয়কে গল্পবাহ দিতে উদ্বিগ্ন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন, ঈশ্বরের একমুখ-প্রতিপাদন ও প্রচার-কার্যই রামমোহনের জীবনের মহত্তম লক্ষ্য ছিল।

তিনি নানা হিন্দু শাস্ত্রের নানা উক্তি সাহায্যে কি প্রকারে মূর্তি-পূজার অশ্রেয় ও নিরাকারোপাসনার শ্রেয় প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে সুনিপুণভাবে দেখান হইয়াছে। বাঁহারা মূর্তিপূজার বিবাস করেন, এবং রামমোহনের ভ্রম দেখাইতে চান, তাহাদের এই বহিধানি পড়ি উচিত; আবার বাঁহারা মূর্তিপূজার বিবাস করেন না—যেমন এন্টোষ্টাক্ট খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান, ব্রাহ্ম ও আর্মিয়ানাজীরা—তাঁহাদেরও ইহা পড়ি উচিত। কাহারও “সব জানি” মনে করিয়া জ্ঞান লাভে বিরত থাকা উচিত নহে।

শ্রীমুখ্য সভাপতি চন্দ্রবর্তী ইহার একটি উৎকৃষ্ট এগাব পৃষ্ঠা ব্যাপী হুমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের সময়ের বাংলা অনেকের পক্ষেই এখন দুর্বোধ্য। গ্রন্থকার অনেক স্থলেই রামমোহনের যুক্তি আধুনিক বাংলার পাঠকবিশ্বের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি সমস্ত যুক্তি স্পষ্টরূপে বাজাইয়াছেন। পুস্তকখানি ভারতীয় অত্যন্ত প্রধান প্রধান ভাষায় ও ইংরেজীতে অনুবাদিত হইবার যোগ্য।

বঙ্গীয় মহাকোষ—প্রধান সম্পাদক শ্রীঅমলচরণ বিদ্য-বন্দ্য। প্রকাশক শ্রীসত্যেন্দ্র শীল, ইতিহাস নিসার্চ ইন্সটিটিউটের

অকৈতনিত সাধারণ সম্পাদক। ১৭০, মানিকতলা স্ট্রিট, কলিকাতা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা।

এই মহাকোষের পঞ্চম সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার শেষ
শব্দ 'অমৃত্যু' বোধন সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ পূর্ববৎ দক্ষতার সহিত সংকলিত ও সম্পাদিত হইতেছে।
কেবল বাংলা জানিলেও পাঠকেরা ইহা পড়িয়া সংকুচিতশীল হইতে
পারিবেন।

চারণ কবি ছইটম্যান—ছইটম্যান-স্মৃতিসভা-কবীট, ১৬ই
জুলাই, ১৯৩৭। প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়, ৪, স্যারব্রজেন,
শ্রীমবাজার, কলিকাতা। মূল্য এক আনা। প্রবাসীর পৃষ্ঠার অর্ধেক
মাপের ৪০ পৃষ্ঠা। এষ্টিক কালজে হুমুদিত।

গত ১৬ই জুলাই সিটি-কলেজ হলে যে ছইটম্যান-স্মৃতিসভার অধি-
বেশন হইয়াছিল, তদুপলক্ষে এই পুস্তিকাটি মূল্যে প্রচারিত হয়।
ইহাতে অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ওয়াট ছইটম্যান—
বিদ্রোহী ও গণতান্ত্রিক” শীর্ষক হৃদিত ও হলিধিত প্রবন্ধটি, ছইট-
মানের জীবনকথা বিষয়ে শ্রীমুখ্যকৃত চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ, এক
শ্রীমুখ্য কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়কৃত ছইটম্যানের “Pioneers |
C Pioneers”, “Song of the Broad-Axe” এবং “To A
Foiled European Revolutionaire” কবিতা তিনটির ওজস্বিতাপূর্ণ
অনুবাদ আছে। বিদ্রোহী কথ্যটি গবয়েন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী অর্থে
ব্যবহৃত হয় নাই।

স্মৃতি-কণা—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বোষ সম্পাদিত। মূল্য এক
টাকা। ৩২১০ পদ্যপুস্তক রোড, গুবানীপুর, কলিকাতা, টিকানার
সম্পাদকের নিকট পাওয়া যায়।

ইহার কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ও ছবি উৎকৃষ্ট। “সম্ভানহারি পিতার
নিদ্রার লোকে” রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু বিখ্যাত ও অল্প লোকদের সাহস-
বাক্য ও আশীর্বাদ ইহাতে একসঙ্গে ছাপা হইয়াছে।

ড.

গোঁরা—শ্রীমুখ্যচন্দ্র মিত্র কর্তৃক নাট্যকারে প্রণীত। প্রকাশক
শ্রী কিশোরীমোহন সঁাতরা, বিহারতী গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগ, ২১০
কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ, ১৯৪৪ সাল। মূল্য ১।০।

রবীন্দ্রনাথের হুমুদিত উপস্থাপ গোঁরা যে অভিনয়গোষ্ঠী নাটকের
রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে একথা সম্ভবতঃ অনেকেরই মনে হয় নাই।
মনে হইয়া থাকিলেও এ-কার্য একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই করণীয়, এবং
তাহার পক্ষেই সহজসাধ্য, ইহাই স্বাক্ষরতঃ সকলে ভাবিয়া থাকিবেন।
শ্রীমুখ্য নরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র উদ্যোগী পুরুষ তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি
সাক্ষ্য করিয়া অতি সুসাধ্য কাজে হাত দিয়াছেন, এবং যতটা কৃতকার্য
হইয়াছেন তাহার জন্তই প্রচুর প্রশংসা দাবী করিতে পারেন।

৩০০ পৃষ্ঠার একটি উপস্থাপকে ২০০ পৃষ্ঠার নাটকে রূপান্তরিত করিতে
অব্যয়ই জিনিষটাকে ভাঙিয়া গড়ার প্রয়োজন হইয়াছে, কিন্তু মাল-
মশলার প্রাণ সমস্তই নরেশবাবু মূল গ্রন্থ হইতে অবিকৃত-ভাবে লইয়াছেন,
ইহা অত্যন্ত বুদ্ধির কাজ হইয়াছে। কারণ, একথা বলিলে নিন্দার
মত শোনানো উচিত নয়, যে, পাঁচনিতে যেখানে যেখানে নরেশবাবুর
খবীর রচনার শিশাল দিতে হইয়াছে সেইস্থানগুলিতেই ভাল করিয়া
জোড় বাঁধে নাই। কতগুলি স্থানে মূলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি

লক্ষ্য—রিয়াছি, হরত ইহার প্রয়োজন হয়, কিন্তু এ-বিষয়ে আরও
একটু সাবধান হইলে নরেশবাবু ভাল করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা
বাইতে পারে, লাক্ষ্যকে দিয়া সামনের বছর বি-এ সেওয়াইবার কোনও
বিশেষ স্কলর প্রয়োজন ছিল বলিয়া আশা হইত মনে হয় না। যদি ছিল,
ত তাহাকে দিয়া একটা সেলাইকরা উলের চিরাপাখী বিনয়কে দেখাইতে
আনানো উচিত হয় নাই।

শেরার মধ্যে হুমুদিত গজাণ যেটুকু সেটুকু নরেশবাবু নাটকের
আখ্যায়িকাই ধরিয়া দিয়াছেন, কিন্তু গোঁরা যেটা Thome, যেটা তাহার
মধ্যকার সত্যকারের প্রাণবন্ত, সেটা বোঝাও ভালরূপে ধরা পড়িয়াছে
বলিয়া মনে হইল না। এমন কি গোঁরা-চরিত্রের মধ্যে সে যে প্রধানতঃ
পূর্ববৎ ভারতবর্ষের উপাসক, দেশাচারে প্রতি তাহার প্রচার মূলে
আসছে যে একটা বিদ্রোহ, সে প্রজ্ঞা যে তাহার আশ্রয়-সংস্কারের বিরোধী,
তাহার হিন্দুরানী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ভাবায় যে “নিজের ভক্তিবিবাসের
মধ্যে স্বেচ্ছা নহে”, এই কথাগুলি আর এ-বই স্পষ্ট হইলে মূলের সমান
রক্ষিত হইত। চরিত্রগুলির মধ্যে বিনয় যতটা রবীন্দ্রনাথের বিনয়,
গোঁরা ইনব কারণে ততটা রবীন্দ্রনাথের গোঁরা রূপে প্রকাশ পায় নাই।
পরেসবস্ টিক রবীন্দ্রনাথের পরেশবাবু বহন। আনন্দময়ী, মহিম,
হরিনে-হিনী, প্রভৃতির চরিত্র লেখক ধরিতেও পারিয়াছেন বেশ এক
নাটবে সঙ্গতি ফুটিয়াছেও ভাল।

আর একটি কথা। উপস্থাপটি যখন প্রবাসীতে ধারাবাহিক রূপে
বাহির হইয়াছিল তখন গোঁরা জন্মরহস্ত স্পষ্ট কোনও হুমুদিত ইঙ্গিত
হুমুদিত ছিল না, বই করিয়া ছাপিবর সময় বর্তমানে যেটা বর্ধ
অধ্যায় সেটা রবীন্দ্রনাথ জড়িয়া দিয়াছিলেন। বৃহৎকার উপস্থাপের
পক্ষে ইহার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু নাটকের শেষ পর্যন্ত রহস্তটিকে
অনুমোদিত রাখিয়া প্রকাশ করিলে হরত response বাড়িয়া নাটকটি
আরও একটু বেশী জমিতে পারিত।

স. চ.

স—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট,
কলিকাতা, বিহারতী গ্রন্থালয়। মূল্য, ২।০ টাকা, বাঁধান ৬ টাকা।

‘নন্দনর ফরাসে মাহুব-গড়ার কাজে’ অর্থাৎ নিছক খেলার
মাহুব ভাবির কাজে বইখানি রচিত। এই মাহুবটি রাজা উজীর
কেউ নহে, কেবলমাত্র সে। সে শোভা ও চরিত্রতার সঙ্গে সম্ভব অসম্ভব
সকল প্রেমে ও কালে সম্ভব ও অসম্ভব নানা কাজে ঘুরে বেড়ায়।
তাহাড়া বস, শেরাল প্রভৃতিরও অভাব এ-ইটিতে নেই।

অনেক দিন আগে স্বর্ণায় হুমুদিত রায় ‘আবোল তাবোল’
‘হ ব ব র হ’ প্রভৃতি রচনার মধ্যে ও মধ্যে বাংলায় এই জাতীয় লেখা
অনেক নষ্ট করেছিলেন। এখনও ছোট ছোটদের ‘আবোল তাবোল’
মানসে মাহুতি করে।

‘সে বইটিতে কবিতা বেশী নেই, অধিকাংশই গদ্য। তাকে মোটামুটি
ছই ভাগে ভাগ করা যায়। এক অংশ শিশুদের উপযোগী, বাকিটি
প্রধানতঃ বয়স্কদের। “হুমুদিত বনের কৈশোরাব” প্রভৃতির মত কবিতা
আরও অনেকগুলি বেশী থাকলে ছোট ছোটদেরের হবিধ বাড়ত।
ছবিগুলি ছোটদের বেশ পছন্দ। ভিত্তির পুস্তার রাজা বাটর রাজার
ছবিটি অনেক শিশুর মনোহরণ করেছে। ১৩৭ পৃষ্ঠার ছবিখানিও
শিশুদের প্রিয়। ১০৬ পৃষ্ঠার বন-পথের ছবিটিও শিশুদের নাটকিকেট
পেয়েছে। পাল্লারদের কাহিনী শিশুদের হাতে উচ্চ স্থান পেয়েছে।

বইখানি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত বলে তাদের পছন্দে বধাই বললাম। এর বাঁধাই ও অন্ত সাজসজ্জা সুন্দর।

শতপর্গী—শ্রীহরেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত সনেট-শতক। কলিকাতায় ২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ভবনস্থিত বিশ্বভারতী প্রেস-প্রকাশ বিভাগ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০ টাকা।

বাংলা ভাষার কেতাবী ভাষার অত্যাচার অত্যন্ত বেশী হওয়াতে তাহার বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন কিছুকাল হইতে চলিতেছে। উদ্দেশ্য ভালই, কিন্তু কলে সরলতার কমলধনে কচুরীপানার চাং সজ্জারের মত হওয়াতে বিপদ বাধিয়াছে। বাঁহারি লিখিতে জানেন তাহাদেরও যেখানে চুক্ষে ভয় ছিল আজকাল সেখানে অক্ষর পরিচয় করিয়াই চুকিয়া গড়িতে সাহিত্যিকরা ভয় পান না। ইংরেজী ফরাসী প্রভৃতি ভাষার রূপ যুগে যুগে পরিবর্তিত হইলেও তাহাতে ব্যাকরণ, শব্দের ব্যুৎপত্তি, পদলালিতা, রচনা-সৌষ্ঠব, প্রভৃতি শানিবা চলিতে হয় সাহিত্য রচনার সময়। অবশ্য, কিছুই জানেন না এমন লেখক যে একবারেই নাই তাহা নয়। কিন্তু মোটামুট বাঁধা পথ সেখানে একটা আছে। আমাদের বাংলা ভাষার সেই বাঁধা পথ বানানধর্ম বিপৎসমুদ্র হইয়া যাইতেছে। সংস্কৃত ভাষা হইলেই বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইলেও সংস্কৃতবল্লভ হওয়ার ভয়ে দেবী সরস্বতীর ক্ষেত্র সারা। পৃথিবীর অসংস্কৃত কথা অনার্য্যে আসিয়া ভর করিতেছে। তাহার বাংলা নয় কিন্তু অসংস্কৃত, এই তাহারে ছাড়পত্র। বচন-পদ্ধতিতে ও কোন দেশের ব্যাকরণে বাধা চলে না, তাহা বাংলায় চলিতেছে, কারণ তাহার অসংস্কৃত।

এই রকম দিনে সাহিত্যিকানন্দে-দিশাহারা পৃথক মৈত্র মহাশয়ের কবিতাগুলি পড়িয়া আনন্দিত হইবেন, ভরসাও পাইবেন যে অন্ধের প্রচুর ছাইচাপা পড়াসময়েও বাংলা ভাষার অপূর্ণ দীপ্তি ইঁহার লেখনীর ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিবে। তবে প্রবীণ কবির রচনাভঙ্গীকে প্রাচীন পন্থা মনে করিয়া নবীনের তাহার অনুসরণ না করিতেও পারেন।

এই সনেট-শতকের কতকগুলি কবিতা ত্রিশ বৎসর পূর্বে ও অধিকাংশ গত পাঁচ বৎসরে রচিত। তিনি প্রধানতঃ পেট্রার্কেস ও শেরগীয়ারের চতুর্দশশ্লী কবিতা রচনারীতির অনুসরণ করিয়াছেন, এবং উভয় রীতিতেই সাক্ষ্য লাভ করিয়াছেন। স্বপ্নালু, অঘেৎ(২), ভবমুগে, কৃতজ্ঞতা, মুক্তিকা, বিজয়িনী, চিঠি (২), পলাতক, হ্রস্ব ইত্যাদি কবিতাগুলি হুম্মর ও হ্রস্বিট। অনেকগুলিতে হবিও হুম্মর ফুটিয়াছে। বহু কবিতায় ভাবের প্রগাঢ়তা লক্ষিত হয়। মৈত্র মহাশয়ের নিম্ন লেখনী বহুমুখী হইয়া বাংলা ভাষাকে আরও অলঙ্কৃত করিলে আনন্দিত হইব।

শ্রীশান্তা দেবী

ব্যোমকেশের গল্প—শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক ২০৩১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

এই গ্রন্থে ব্যোমকেশের অভিজ্ঞতার কল চারিটি কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—রক্তমুখী নীলা, অগ্নিবাহ, উপসংহার, ব্যোমকেশ ও বরষ। “ব্যোমকেশের ভায়েরা”—লেখক এই জাতীয় কাহিনী লিখিয়া বসন্তে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় ডিটেক্টিভ গল্পের ও উপভোগ্যের অভাব নাই, তাহাদের অনেকগুলিই যে বৈশিষ্ট্য-বর্জিত, এ কথা অবশ্য-বাক্য, অসম্ভব ঘটনাসম্মিলনে অথবা ঋচিবিরহিত বর্ণনার প্রাচুর্য্যে

সেগুলি স্থপাঠ্য হয় নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র বাবু এক নতুন ধরণের ডিটেক্টিভ কাহিনী লইয়া পাঠক-সমাজেব সমুদ্রে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহার রচনা সরল ও স্থপাঠ্য, তাহার কাহিনী চিত্তাকর্ষক ও মনোমগ্নকর। ব্যোমকেশের গল্প এমন মনোমগ্ন ও মনোমগ্নিত যে উহা বালক, যুবক, যুদ্ধ সকলেব মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ। পরিবারের সকলে মিলিয়া একসঙ্গে পাঠ করিয়া উহা হইতে আমোদ লাভ করিতে পারে, ইহা ব্যোমকেশের কাহিনীর একটা খুব বড় কৃতিত্ব। শালক হোমসের অনুসরণে বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গের ডিটেক্টিভ কাহিনী রচনা করিয়া শরৎচন্দ্র বাবু পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই পুস্তকের চারিটি কাহিনীই বেশ মনোমগ্ন হইয়াছে, “রক্তমুখী নীলা”-এ চোরের শেষ পরিণাম ও “অগ্নিবাহ”-এ বিজ্ঞানাদ্যাপকের কণক উপসংহার পাঠকের মনে বেশ একটা ছাপ রাখিয়া যাব।

টুলাটুলা—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। আশুতোষ লাইব্রেরী কর্তৃক ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য হয় আনা।

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য গল্পপুস্তক। ইহাতে সর্বস্বত্ব সাতটি গল্প আছে, তন্মধ্যে ‘মশারিবি জয়’ পক্ষে আব বাকী কবিতা গল্পে লিখিত। গল্পেরটি ইংরেজী শিশুপাঠ্য গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত বলিয়া মনে হয়, কারণ ইংরেজী শিশুপাঠ্য পুস্তকে এইরূপ ধরণের গল্প অনেক আছে। ইহাদের মধ্যে ‘মশারিবি জয়’ পদ্য গল্পটি সর্বাঙ্গিক। অধিক উপভোগ্য। লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী শিশুদের মনোবঞ্জন করিবে।

তপনকুমারের অভিযান—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী। ৭৪-এ আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০ আনা।

পুস্তকখানি ছোট বালক-বালিকাদের জন্য রচিত। তপনকুমার নামক একটি ‘ম্যাড ভেন্টার’-প্রিয় বালকের কয়েকটি ছোটখাট অভিযানের কাহিনী। পুস্তকের প্রথমার্শ্বে গল্পটি চিত্তাকর্ষক কবিবার যেমন চোঁটা কবা হইয়াছে, শেষে তেমন হয় নাই; স্তব্ধতা ‘ভাব-চুরি’ ও ‘শব-দাহ’ প্রভৃতির বহুল বর্ণনা বেশী উপভোগ্য হয় নাই। গল্পের গতিও নব্বই হইয়া পড়িয়াছে, ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী হুম্মর হইলেও, শেষ পর্যন্ত গল্পটি জমে নাই।

স্পেনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড—আবদুল কাডের, বি-এ, বি-সি-এস প্রণীত। মোস্লেমে পাবলিশিং কনসার্ন কর্তৃক ২৫ ভবানী দস্ত লেন, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ টাকা।

স্পেনের যে যুগে আরবেরা পশ্চিম ইউরোপের অধীশ্বর হইয়াছিল, এই পুস্তকে গ্রন্থকার সেই যুগের ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন। এক সময়ে আরবেরা ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে প্রাচ্য সভ্যতার এক বিরাট কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল; এখনও স্পেন ও পর্তুগালের সাহিত্যে, শিল্পকলার সামাজিক আচার-ব্যবহারে মুসলমান-সভ্যতার প্রভাব সম্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। গ্রন্থকার আরবিসের সেই যুগে পৌরবের এক বিস্তৃতপ্রায় অধ্যায় পাঠক-সমাজের সমুদ্রে উপস্থিত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থকারের বর্ণনাভঙ্গী মনোরম এক ভাষাও প্রাঞ্জল। তিনি মাঝে মাঝে কয়েকটি উদ্ভূত কথা বেশী ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন—তুল্যিক; উহা না কবিলে পুস্তকের সৌন্দর্য্য আরও বর্ধিত হইত। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। কয়েকটি হুম্মর চিত্র পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়া গ্রন্থের সৌন্দর্য্য বর্ধিত করিয়াছে।

শ্রীশরৎচন্দ্র দাশ.

কেলা-ফতে—শ্রীরত্নেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২য় সংস্করণ। রত্নন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। পৃঃ ৫৭, মূল্য আট আনা। বোর্ড বাঁধাই, সচ্ছিন্ন।

ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনকালেব রাজা-বাদশাহের জীবনের ও রাজত্বের অনেকগুলি চিত্তাকর্ষক ঘটনা এই বহিতে শিশুদের মজ্ঞ মনোমগ্ন করিয়া লিখিত হইয়াছে। অনেক উদ্ভট ও কষ্টকরিত এডভেঞ্চারের ও বুদ্ধিকৌশলের কাহিনী অপেক্ষা এই ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি অধিকতর চিত্তাকর্ষক, রচনার গুণে আবণ্ড মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। আমীর খাঁর স্ত্রী সাহিবজীর উপস্থিতিবুদ্ধি ও সাহসেব কাহিনী, শাহজাহান বাদশাহ গরীবের প্রতি দয়ার দৃষ্টান্ত প্রভৃতি সাতটি গল্প এই বহিতে আছে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

মনোমুগ্ধকর—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

ছোট কড় তেত্রিশটি কবিতাব সমষ্টি। কবিতাগুলি যে মুখ্যত গীতি-কবিতা, প্রেমের নামেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। জীবনের বিভিন্ন লগ্নে কবির স্বপ্ন-মুগ্ধের 'কবিতা-কল্পলতা'র ক্ষণে ক্ষণে যে ছায়া পড়িয়াছে এই কবিতাগুলিতে তাহারই প্রতিচ্ছবি আঁকা হইয়াছে। কবিতাগুলির ভাষা মধুর, ছন্দ মূল্যবান। সাবিত্রীবাঁবুর পুরাতন পরিচয় আলোচ্য-প্রেমের দ্বারা মূল্য হইবে না। রবীন্দ্রকাব্যের ভাষা ও ভাবের প্রচুর পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও কয়েকটি কবিতা মনে থাকিয়া যায়। "দুঃখবানসী", "হৃদয় রমা", "সুখমোহন", "অন্তরলীনা", "চন্দ্রাবতী অম্বোরে চুম্বন" প্রভৃতি কবিতা পড়িয়া ছুটি পাইয়াছি।

প্রচ্ছদপটের সজ্জা ছবিখানি দিয়া প্রেমের সৌষ্টব্য হানি করার কি সার্থকতা বুলিয়ায় না।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অতনুর তীর—শ্রীপ্রভাতকিরণ বর। রত্নন প্রকাশালয়, ২৫২, বোম্বাইবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

অতনুর গন্ধরবের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে কে? বোধীর বোধ সেখানে পরাভব মানিয়াছে, সমাজগত সাধারণ মানুষের আদর্শ যে সেখানে জন্ম হইবে এটা একরূপ দুর্ভাগ্য। তবে এই পরাজয়ের মধ্যে যে মানিই আছে তাহা নয়, কেননা, গন্ধরবের বোধের দিকটা অতিক্রম করিতে পারিলে আসে প্রেমের অভিব্যক্তি, যে প্রেম বোধ হয় জীবনের যে-কোন শ্রেষ্ঠ আদর্শের সঙ্গে সমান আসনের অধিকারী।

এই বইয়ের প্রধান চরিত্র বিনায়কের জীবনের মধ্য দিয়া লেখক এই জিনিষটি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে অতিআধুনিক জীবনের একটা দিক যেখানে স্বাধীনতার নামে আসিয়াছে উচ্ছৃঙ্খলতা, ভালবাসার নামে আসিয়াছে বিভীতি। অনেক সিদ্ধান্তীয় ব্যক্তির মতই লেখক সমাজের এই রোগ-কালিমার মজ্ঞ ব্যক্তি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়া এটা দেখিয়াছেন এবং গাঢ় মনো দিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন।

বইয়ের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। লেখক কবি, তাহার উপজ্ঞানসেব কবিত্বের বেশ একটি সুর আছে এবং সেট শুণ্ড ভাবতেই নয়, ঘটনার স্থান-কাল-পাত্র সহোপনেও প্রকাশ পাইয়াছে।

একটা কথা কিন্তু বলা দরকার।—বিভাসাগর, বিবেকানন্দ, পরমহংস-দেবের পানে চাহিয়া যে জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে, অতনুর সঙ্গে যুদ্ধ সেই বিনায়ককে আমরা আরও কিছুকণ মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়া

থাকিতে দেখিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম সে যেন আরেই পরাভব মানিয়া লইয়াছে; তাহাও হুই জায়গায়—সমিতার কাছে, আর, প্রায় সমান্তরালেই নীলার কাছেও।

ছায়াচ্ছন্ন ধরণী—রত্নন প্রকাশালয়। মূল্য ১।০

বইখানি ওয়েন ফ্রানসিস ডাড্লেয়ার কথানি বিখ্যাত উপজ্ঞানসেব অনুবাদ। সাধারণ উপজ্ঞানসেব লিখিত বাহা বুঝা যায় এটি কিন্তু সে জাতীয় নয়। ইহার বিষয়,—জীবনের নানা দ্বন্দ্ব-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আত্মার ঈশ্বরভিত্তিক অভিব্যক্তি। জীবনের স্বপ্ন, দুঃখ প্রভৃতি নানা সমস্যার স্বরূপ নির্ণয়ের মজ্ঞ লেখক এক দিকে ক্যাথলিক ধর্ম এবং অপর দিকে প্রটেষ্ট্যান্ট ধর্ম, খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞান, এবং বিভিন্ন প্রতীচ্য দার্শনিকবাদের অবতারণা করিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত ক্যাথলিক ধর্মকে স্মরণীয় পরাইয়াছেন। বইয়ের চরিত্রগুলি—ক্যাথলিক পুরোহিত, নাস্তিক, স্বপ্নবাদী, দুঃখবাদী প্রভৃতি। বাহ্যিক কেন্দ্র করিয়া বইয়ের বস্তুনিষ্ঠতাবোধ সে এক জন পণ্ড, সে সামান্য একটি দুর্দৈবের মজ্ঞ স্বপ্নবিশ্বাসের মধ্য হইতে একেবারে নৈবাশ্চের চিরাত্মকাবে নিষ্কণ্ড।

তত্ত্ববিচারই বইখানির উপজীব্য হইলেও human interest বা মানবীয়তার অভাব নাই। লেখকের এইখানই বিশেষত্ব। তবুও একথা স্বীকার করিতে হয়, নিতান্ত লঘুচিত্র পাঠকের মজ্ঞ এ বই নয়। কিন্তু লঘুচিত্র লইয়াই কি বাংলার পাঠকসমষ্টি? আমাদের মনে হয়, বইখানির কদর হইবে, কেননা, সাহিত্যের উচিত অর্থে আমরা বুঝি তাহার বহুমুখীনতা,—সে দিক দিয়া উপজ্ঞানসেবও গুরুত্বপূর্ণতাকে কাটাওয়া উঠা উচিত এবং মূল রচনাব অবর্তমানে বহি অনুবাদের মধ্য দিয়াও প্রকাশ্যেবা আমাদের সাহিত্যে এ ধারা প্রবর্তন করেন ত তাহার আমাদের কৃতজ্ঞতার অধিকারী।

অনুবাদ ভালই হইয়াছে, তবে স্থানে স্থানে মূল ইংরেজী ইডিয়ম হইতে আরও একটু মজ্ঞ থাকিলে ভাল হইত।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

অস্পৃশ্য—শ্রীনির্মলচন্দ্র নাগ লিখিত। দি স্কুল সান্দাই কোং, গুটাইলি, চাকা হইতে শ্রীশ্রমচন্দ্র ঘো, বি.এ. কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২১২। মূল্য ১।০ মাত্র।

বইখানিতে তিনটি গল্প আছে—মালিচ ঘের, অস্পৃশ্য, ও কাঠের আত্মকথা। গল্পগুলি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে লিখিত। প্রথম গল্পটিতে শিক্ষা ও সংসর্গের প্রভাবে ভূঁইয়ালির জায় নিম্নশ্রেণীর লোকও কিম্বা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহারই একটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। একটি শিক্ষিতা গৌড়া হিন্দুসম্প্রদায় কিম্বা এক অস্পৃশ্য পরিবারের সংসর্গে আসিয়া অস্পৃশ্যতা বর্জন করিলেন—বিতাণ গল্পটি তাহাবই কাহিনী। তৃতীয়টিতে প্রহরার একটি কাঠখণ্ডের আত্মকথা অবলম্বনে অর্ধ শতাব্দী পূর্বেই বাংলার একটি পল্লীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। 'মালিচ ঘের' গল্পটিতে লেখক চরিত্রহীন নারীর উচ্ছৃঙ্খলতার নর-চরিত্রের অবতারণা না করিলেই ভাল কবিতেন। তাহাতে প্রেমের অঙ্গহানি হইত না, বরং সৌষ্টব্য-বুদ্ধি হইত। 'অস্পৃশ্য'র আখ্যান-বিষয়টি দ্বন্দ্ব-জীবনে সম্ভবপর নয়। বর্ণনা-চাতুর্ঘ্যে 'কাঠের আত্মকথা' প্রথমেই গল্প দুইটি অপেক্ষা অনেক ভাল। লেখকের লিখনশক্তি চলনশক্তি, কিন্তু ভাষা মাঝে মাঝে প্রাদেশিকতা-বোঝে দুট। কথাসাহিত্য-রচনার সিদ্ধান্ত না হইলেও লেখকের সরুদেহ-প্রণোদিত প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

আধেক উড়ে যায় স্বদূর নীলিমায়

ঈর্ষ্যজ্বেয়ী দেবী

নামে নি বরষার শীতল বারিধার
আবাচ্ আসে নি ঘন কালো
গভীর নীলিমায় মাধুরী ভেসে যায়
লাগিয়া নবীন মেঘে আলো ।
স্মৃতি নানা রূপ ধরে সে অপরূপ
স্বদূরে হেসে সে ভেসে যায়
সকল তথাবা রবি কখনো স্নান ছবি
আড়াল করে সে নীলিমায় ।
দেখে সে নানা বেশ নয়ন অনিমেষ
পাহাড় চাহিয়া রয় দূরে
এ মেঘে ঢেকে তার দেহের চাবি ধার
ভাসিতে চায় সে কোন্ স্বরে ।
ধরার হৃদিকুল ভেদিয়া শতমূল
মেলিয়া নিজেরে যেন বাঁধে
কঠিন দেহমাঝে আপন শত কাজে
নিজেরি তরে সে জাল ফাঁদে ।
লভিতে চায় পাখা, তাই কি মেলে শাখা
নিজেরে চায় সে প্রসারিতে ?
জলদ মায়াময় দেখে কি মনে হয়
কী আশা জাগে তার চিতে ?
যে গতি মনোমাঝে বেদনা আনিয়াছে
যে নাচে হৃদয়ে লাগে দোল
স্বদূর দেয় ডাক বাঁশিতে শত লাখ
গতির ছন্দে উত্তরোল ।
পাহাড় দেখে তাব হৃদয় গুরুভার
পাথরে পাথরে বাঁধা কেন ?
স্বদূর ব্যোমে হায় কি আশা ভেসে যায়
হাজার মুবতি একে যেন ।
দেখে সে চলিবার, হৃদ অনিবার
ছোট্টে কী মর্ষ হ'তে নদী

তাঁহার মন আশা, সে বেগে পায় ভাষা
বাধায় মোহন তার গতি ।
বন্ধ মন হায় বাঁকিয়া ছুটে যায়
পাথরে পাথরে নেচে চলে
নিজের জাল ছিঁড়ে মুক্তি পায় কি রে
মর্ষ ভাসায়ে সেই জলে ।
তবুও চায় দূরে উড়িতে স্বরে স্বরে
পরশ করিতে মেঘখানি
তাই সে তরুশাখা করিতে চায় পাখা
দোলায় পাগল বায়ু আনি ।
আমার মনোমাঝে দেখি যে রহিয়াছে
ভাবনা এমনি কত শত
কখনো জাল ফাঁদে আমারে রাখে বেঁধে
হৃদয় গুমরে অবিরত ।
চাহিয়া বহুদূরে সে চায় যেতে উড়ে
সংখ্যাবিহীন বাধা রয়
ছিঁড়িতে লাগে বল কঠিন শৃঙ্খল
তবু কি বাসনা মনোময় ।
হৃদয়ে অপরূপ দেখি যে কত রূপ
আমারে নিয়ে যে চলে খেলা
কখনো ছেড়ে দিয়ে আকাশে যায় নিয়ে
মুক্ত বাতাসে ভাসে ভেলা ।
কাবণে-অকারণে কখনো আনে মনে
অচল গিরির মত স্থিতি
বাঁশীর স্বরে স্বরে সে চায় যেতে উড়ে
বেদনা কি বাজে নিতি নিতি ।
নানান্ মনোরথ খোঁজে যে নানা পথ
নিজেরে তাই এ ভাঙাগড়া
আধেক উড়ে যায় স্বদূর নীলিমায়
আধেক জাঁকড়ি রয় ধরা ।

মহিলা-সংবাদ



শ্রীমতী অনন্দম্বাই কাল্লে
সহকারী সভাপতি, মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভা



ডক্টর শ্রীমতী রমা বহ্নু



শোভনা দেবী



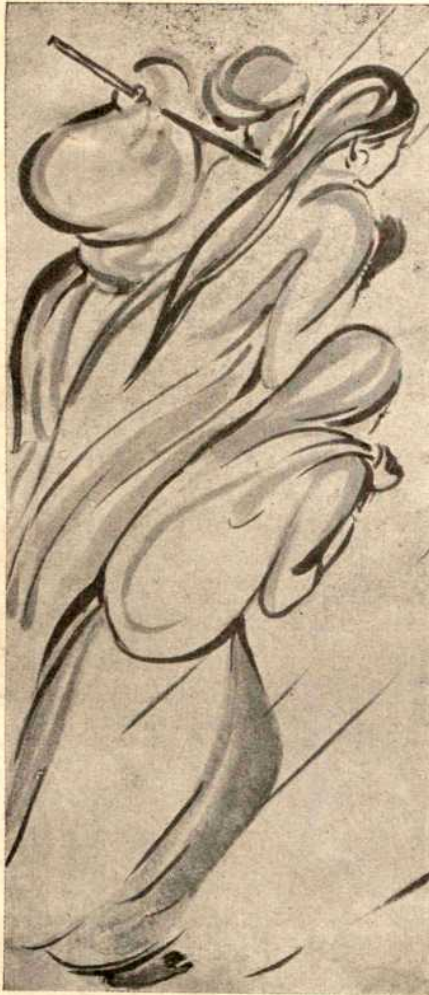
বাম হইতে : শ্রীঅশ্বিনচন্দ্র দত্ত, শ্রীমতী মিলার ও
শ্রীমতী হেমলতা দেবী, ভিয়েনা।

ডক্টর শ্রীমতী রমা বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দর্শনশাস্ত্রে গবেষণা করিতে অক্সফোর্ডে গিয়াছিলেন। তথায় ডি. ফিল. উপাধিলাভ করিয়া সম্প্রতি তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ইতিপূর্বে অল্প কোনও ভারতীয় মহিলা অক্সফোর্ড হইতে ডক্টরেট লাভ করেন নাই।

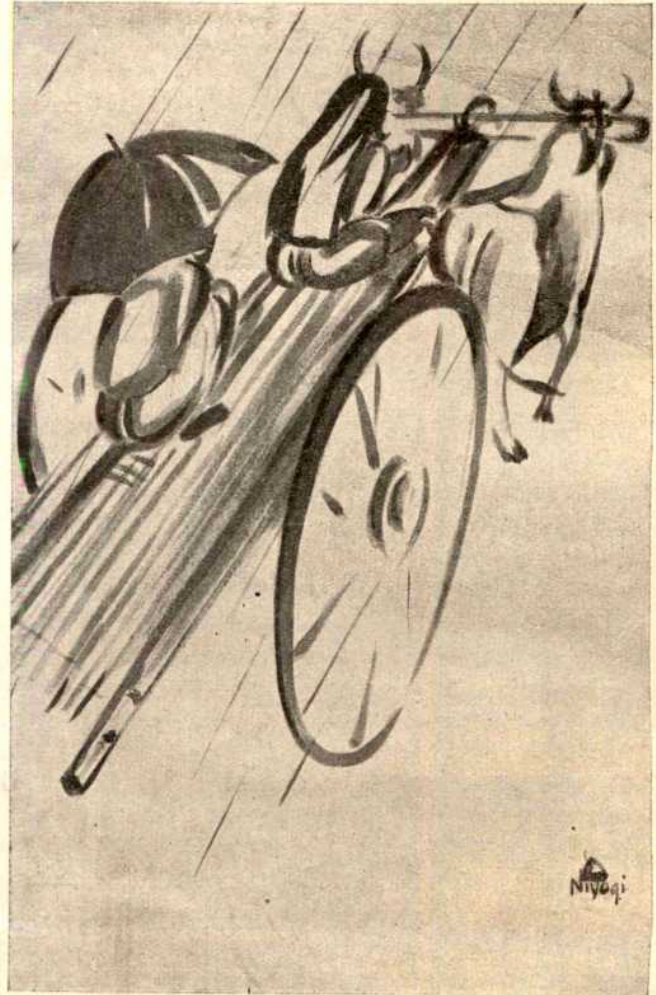
সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমলতা দেবী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ পূর্বক

নারীমঙ্গল-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভ্রাতৃপুত্রী শ্রীমতী শোভনা দেবী সম্প্রতি প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ পাঠকের সমাদর লাভ করিয়াছিল; তন্মধ্যে ম্যাকমিলন কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত 'ওরিয়েন্ট পাল'স' অগ্রতম। অভিনয়ে ও সঙ্গীতে তিনি বিশেষ নিপুণা ছিলেন; ইংরেজী, ফরাসী, ইতালীয়, বাংলা ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল।



পথচারিণী
শ্রীপ্রভাত নিয়োগী



বর্ষায়
শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

সেলমা ল্যাগেরলভ্

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

সুইডেন দেশটি সাহিত্যজগতে বহু খ্যাতনামা লেখক-লেখিকার জন্মস্থান। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা সেলমা ল্যাগেরলভ্ একজন। সুইডেনের ভ্যামল্যাণ্ড প্রদেশের অস্তর্গত মোরবাক নামক স্থানে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি রুগ্না ছিলেন। দৈহিক অসুস্থতার জন্য তিনি সমবয়স্কদের সহিত বয়সোচিত খেলাধুলা হইতে বঞ্চিত থাকিতেন। ছোটবেলা হইতেই তিনি গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন এবং বাড়ীতে অধিকাংশ সময়ই নানা গল্পের বই পড়িয়া আনন্দ পাইতেন।

ভ্যামল্যাণ্ড প্রদেশের ক্রকেন-সারগা হ্রদ সৌন্দর্যের জন্য খ্যাত। এই পার্শ্বত্যা হ্রদটি ৭৩ কিলোমিটার স্থান জুড়িয়া আছে। ইহার এক পাশে সেলমার পিতৃগৃহ মোরবাক অবস্থিত। বড়দের মুখে শোনা, এই হ্রদের তীরবর্তী আপন প্রদেশের অধিবাসীদের প্রাচীন কীর্তি-কাহিনী তাঁহার কল্পনাপ্রবণ মনের উপর গভীর রেখাপাত করিত। অতি অল্প বয়সেই গল্প লেখার ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগ নিজের শারীরিক অসুস্থতা ছাড়াও নানা পারিবারিক অবস্থা-বিপদাঘের মধ্যে কাটিয়াছিল। অদৃষ্ট তখন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিল না—তাঁহার প্রথম জীবনের বহু রচনা পত্রিকা-কাঞ্চালয় হইতে অমনোনীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

উচ্চবিদ্যালয়ে পড়িবার সময় এক দিন শিক্ষয়িত্রী সেলমাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে সেলমা ভাল সুইডিশ লিখিতে পারে না। অভিমানিনী সেলমা তাহাতে অত্যন্ত মর্ষাহত হইয়াছিলেন। সেদিন যখন আবার ক্লাসের ঘণ্টা বাজিল, তখন দেখা গেল তিনি ক্লাসে অস্থগ্নস্থিত। সঙ্গিনীরা খোজ করিতে গিয়া দেখে যে ড্রইং-রুমের এক কোণে সেলমা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার চোখে অবিরল জলের ধারা বহিতেছে। সঙ্গিনীদিগকে দেখিয়াই বাষ্পগদগদকণ্ঠে সেলমা বলিয়া উঠিলেন—

“শিক্ষয়িত্রীকে দেখাইব যে আমি সুইডিশ ভালই লিখিতে জানি, আমার অনেক গল্প লেখা আছে।” যে সেলমা এক দিন ভাল সুইডিশ ভাষা না-লিখিতে পারার দরুন তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, সেই সেলমাই পরে তাঁহার প্রথম বই “গোস্তা বেলিং সাগা” লিখিয়া বিশ্বের সাহিত্য-আঙ্গরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।



সেলমা ল্যাগেরলভ্

যৌবনেই তিনি নিজের সাধনার পথ বাছিয়া লইয়া ছিলেন। তবুও ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুইডেনের দক্ষিণ প্রদেশে ল্যাণ্ডকোনা নামক শহরে মেয়েদের উচ্চ-প্রাইমারী বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তখনকার দিনে ষ্টকহল্‌মের

বিখ্যাত সাপ্তাহিক ‘ইডোন’ সাহিত্য-প্রতিযোগিতার একটা পুরস্কার ঘোষণা করেন। উক্ত কাগজে বিজ্ঞাপন পড়িয়াই সেল্‌মার মনে হইল যে বাল্যকালে আপন প্রদেশের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে শোনা গল্পগুলি এইবার প্রকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। ইহারই ফলে তাঁহার প্রথম রোমান্স “গোস্তা বেলিং সাগা” বাহির হয়। এই পুস্তক লিখিয়া তিনি ইডোন পত্রিকার সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাম সমস্ত স্কান্ডিনেভিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে। এই রোমান্সের প্রধান নায়ক যুবক ‘গোস্তা বেলিং’—এক জন সরলহৃদয় সাহসী ধর্ম্মযাজক। এই যুবক পুরোহিতের জীবনের উদ্দেশ্য অম্পষ্ট। নিজের মন যাঁহা চায়, যাঁহা করণীয়, একাধিক কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত করার শক্তির তাঁহার অভাব; ফলে হৃদয় ভ্রিয়মাণ, অকারণে ক্ষণে ক্ষণে মন উত্তেজিত হইয়া উঠে। এই ভাবে গোলক-ধাঁধার মধ্যে জীবনটাকে কাটাওয়া দিতে গোস্তা বেলিং নারাজ। ফলে, স্বথের আশায় বন্ধুবান্ধবী-পরিবৃত হইয়া স্বথভোগের মধ্যে আনন্দ খুঁজিয়া পাইবার নিফল চেষ্টা। মোরবাকী হইতে অনতিদূরে ফ্রেকেন স্যারগার পরপারে টিলার উপর অবস্থিত মধ্যযুগের প্রাসাদ ‘একেবি’ গোস্তা বেলিং-এর জীবনলীলার প্রধান কেন্দ্র। ফলতঃ ১৮৮০ শতাব্দীর ভ্যামল্যাণ্ডের সামাজিক জীবন এই পুস্তকে চিত্রিত হইয়াছে।

সেল্‌মার আবেগময়ী লেখনী হইতে অনেক গল্প ও উপন্যাস বাহির হইয়াছে এবং সেগুলি বহু ভাষায় অনূদিত হইয়া সমাদর পাইয়াছে। গোস্তা বেলিং-এর পর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ‘জেক্সজালেম’। ইহার প্রথম অংশ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ও দ্বিতীয় অংশ পর বৎসরে প্রকাশিত হয়। স্বইন্ডেনের ভালার্ন প্রদেশে একবার ধর্ম্মান্দোলনের বগ্না আসিয়াছিল। এই আলোড়ন উক্ত প্রদেশবাসীদিগকে যে কি ভাবে অভিভূত

করিয়াছিল, তাহাই প্রথম খণ্ডে চিত্রিত হইয়াছে। অনেক লোক পরিবার-পরিজনদের কথা না ভাবিয়া ধর্ম্মস্বাপেকের দেশ প্যালেষ্টাইনে চলিয়া যায় এবং দ্বিতীয় খণ্ডে সেই আখ্যায়িকাই বিবৃত হইয়াছে। এক দিকে লোকের ধর্ম্মব্যাকুলতা, অপর দিকে পরিবারবর্গ ও দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ—মনের এই দ্বন্দ্ব ভালার্নার ব্যক্তিবিশেষের মুখ দিয়া এমন ভাবে ফুটাইয়াছেন যে যাঁহারা সেই দেশ ও দেশবাসীদের সঙ্গে পরিচিতও নহেন এমন বিদেশী পাঠকদের মনকেও গভীর ভাবে স্পর্শ করে।

স্কান্ডিনেভিয়ার প্রাচীন ও আধুনিক লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে তুলনা করিলে সকলকেই একবারে স্বীকার করিতে হয় যে সেল্‌মার রচনাভঙ্গী একবারে স্বতন্ত্র রকমের। তিনি সত্যি ভ্যামল্যাণ্ড প্রদেশের লেখিকা এবং সেই প্রদেশের প্রকৃতির ও সভ্যতার সম্পদ তাঁহার সমস্ত জীবন ও কল্পনাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। অতীত ও বর্তমান যুগের ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক গল্প, লোকচরিত্র তাঁহার রচনার প্রধান বিষয়বস্তু। ভ্যামল্যাণ্ডের পোবাকপরা নাগরিক-নাগরিকার চরিত্র যথানে বিখ্যমানবের মানসিক প্রগতির সঙ্গে এক সুরে গাঁথা, সেখানেই সেল্‌মার রচনা ও গল্প সত্য হইয়া উঠিয়াছে—বিখ্যাসের অযোগ্য বিষয়ও এমন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে যে শেষ পর্যন্ত সত্যাসত্য বিচারের কথাও পাঠকের মনে স্থান পায় না। সেল্‌মার কল্পনা ও রচনার উৎস এখনও প্রবহমান।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বইন্ডেনের উপশালা-বিখবিন্দ্যালয় আপন দেশের গৌরব সেল্‌মাকে ডক্টর উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার দুই বৎসর পর অর্থাৎ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নোবেল প্রাইজ পান, সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রাইজ কমিটির সভাপদেও তিনি আমন্ত্রিত হন। তিনি স্বইন্ডেনের সাহিত্য-সংসদের সর্বপ্রথম মহিলা সভ্য।

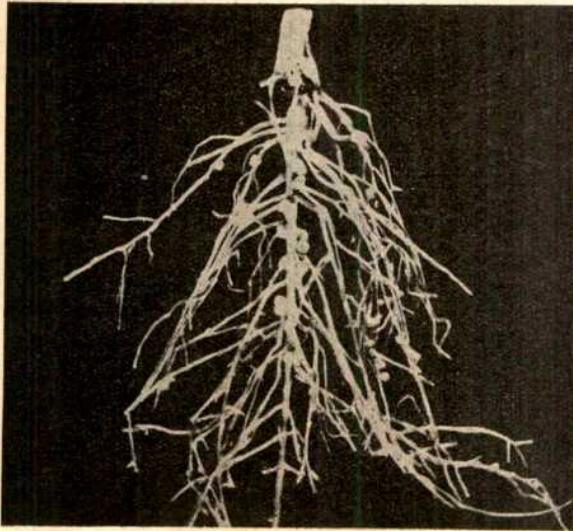


ফলিত রসায়ন চর্চার নূতন দিক

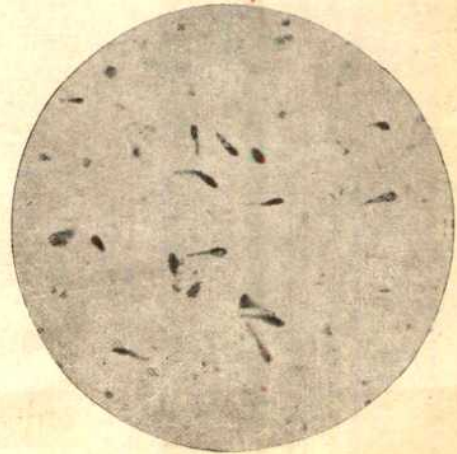
শ্রীকানাইলাল মণ্ডল, এম-এসসি

গত শতাব্দীতে ফলিত রসায়নের পরস্পর-সংলগ্ন দুই শাখা গড়িয়া উঠিয়া দুইটি বিশেষ দিকে পরিণতি লাভ করে। একটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে রং প্রস্তুত, পার্কিন কর্তৃক ১৮৫৬ সালে কোলটার বা আলকাতরা হইতে রং প্রস্তুত-প্রণালীর উদ্ভব হইতেই তাহার সূত্রপাত। অপরটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঔষধ প্রস্তুত বা ঔষধের সিঁহিসিস্। পূর্বে উদ্ভিজ্জ রং ও উদ্ভিজ্জ ঔষধ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত। রসায়ন-বিজ্ঞানের উক্ত দুই শাখা গড়িয়া উঠায় এক দিকে যেমন ইচ্ছামত বর্ণ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইল ও স্বভাবজাত রঙের প্রচলন প্রায় উঠিয়া গেল, অন্য দিকে তেমনি জীবদেহে বিশিষ্টরূপে ক্রিয়া করিতে পারে এরূপ বিশেষ গুণসম্পন্ন ঔষধ প্রস্তুত হওয়ায় স্বভাবজাত ঔষধের পরিবর্তে কৃত্রিম ঔষধগুলি বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। বর্তমান শতাব্দীতে উদ্ভিদ-ও জীবজন্তু- সংক্রান্ত ব্যবহারিক রসায়নের একটি বিশেষ বিভাগ এইভাবেই প্রসার লাভ করিতেছে।

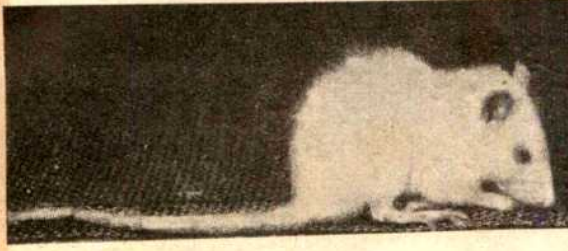
ইহার এক দিক গড়িয়া উঠিতেছে জীবনপোষক কতকগুলি সামগ্রীকে লইয়া। দেহের পুষ্টির জন্য অতি অল্প পরিমাণেও এইরূপ দ্রব্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এখনও পর্যন্ত কেবলমাত্র স্বভাবজাত উক্ত প্রকার দ্রব্যের দ্বারা উদ্ভিদ ও জীবের দেহের পোষণ ও বর্দ্ধনকার্য সাধিত হইতেছে। তবে রসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্যে দ্রব্যগুলি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হওয়ায় ও দেহের উপর তাহাদের ক্রিয়া স্বভাবজাত দ্রব্যের অনুরূপ হওয়ায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী হওয়ায় পূর্ব পূর্ব দৃষ্টান্ত হইতে এরূপ অনুমান করা যায় যে কালে স্বভাবজাত দ্রব্যের পরিবর্তে কৃত্রিম দ্রব্যসমূহ ব্যবহারের প্রসার ও প্রচলন হইবে। প্রসঙ্গক্রমে উভয়ের মধ্যে তুলনায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত জিনিস-গুলি ব্যবহারের এই সুবিধার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন দ্রব্যে নানা প্রকার জটিল প্রকৃতির জিনিস এমন ভাবে মিশিয়া থাকে যে



কলাইগাছের শিকড়ে উৎপন্ন ফোটক ; ইহাতে যে বীজাণু জন্মে তাহা বায়ুর নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদ-থাদে পরিণত করে।



অণুবীক্ষণে এজোব্যাক্টেরিয়া দেখা যাইতেছে



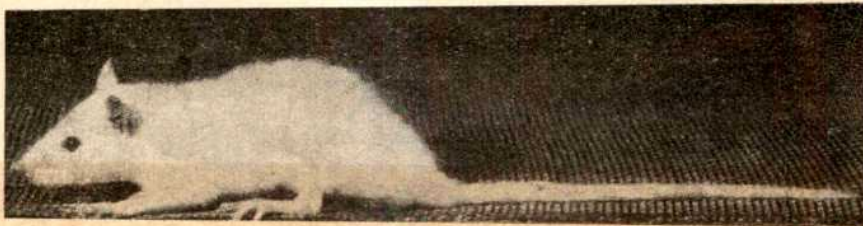
ভাইটামিন এ. লইয়া নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা। ভাইটামিন এ.-বিহীন খাদ্য দেওয়ায় এই ইঁদুরটির লোম কর্কশ হইয়াছে, ওজন কমিয়াছে ও চক্ষুর রোগ জন্মিয়াছে।

তাহাতে একসঙ্গে সকলগুলিই ব্যবহার করিতে হয়, সুতরাং বিশেষ ক্রিয়ার জন্য বিশেষ গুণসম্পন্ন কোন একটি, এবং উহার যতটুকু আবশ্যক সেই পরিমাণ, পাওয়া যায় না, কিন্তু কৃত্রিম দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটি পৃথকভাবে এবং প্রয়োজনমত মাত্রায় ব্যবহৃত হইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, শেযোক্ত দ্রব্যগুলি অনায়াসলভ্য ও স্থলভ হয়; তৃতীয়তঃ, এইগুলির প্রত্যেকটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু গুণের পরিবর্তন দ্বারা বিবিধ আকারে ব্যবহার করা চলে ও অনেক সময় উহাদিগকে বেশী শক্তিসম্পন্ন করিয়া তোলা যায়।

জীবনপোষক জিনিষগুলির এক শ্রেণীর নাম ভাইটামিন। ভাইটামিন এ. বি. প্রভৃতির কথা আমরা সকলেই কমবেশী শুনিয়াছি। উদ্ভিদের পক্ষে পুষ্টিকর অক্সিন (auxin) নামে আর এক শ্রেণীর দ্রব্য গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভাইটামিন এ. বি. প্রভৃতির ছায়া এইগুলিরও অক্সিন এ. বি. ইত্যাদি নাম দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর এইরূপ দ্রব্য জীবজন্তু ও উদ্ভিদ দেহে উৎপন্ন হর্মোন (hormone)। বর্তমানে এই তিন শ্রেণীর জিনিষ লইয়াই গবেষণা চলিতেছে। প্রত্যেক শ্রেণীর

সামগ্রীগুলিকে এখন রাসায়নিক দ্রব্যের সমষ্টি বলিয়া চিনিতে পারা গিয়াছে। প্রতি শ্রেণীর জিনিষগুলি অত্যন্ত জটিল-প্রকৃতির এবং একসঙ্গে মিশিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগকে পৃথক করা, বিশুদ্ধ করিয়া চিনিয়া লওয়া, তাহাদের প্রকৃতি ও গঠন নির্ণয় করা, দেহের উপর তাহাদের ক্রিয়া নিরূপণ করা বিশেষ বৈজ্ঞানিক দক্ষতাসাপেক্ষ। ইউরোপ ও আমেরিকায় বর্তমানে স্বদক্ষ ও বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিকের অভাব না থাকায় এ বিষয়ে গবেষণা সকল দিক দিয়া অতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। অবশ্য, ব্যবহারিক জগতে কাজে লাগিবার মত অবস্থা হইতে এখনও দেরি আছে।

ভাইটামিন সম্বন্ধে কিছু না জানিয়াও অষ্টাদশ শতাব্দীতে নৌ-সার্জেন লিও উহার ব্যবহার করিয়াছিলেন। ব্যবহারিক বিজ্ঞানে এরূপ উদাহরণ আরও পাওয়া যায়। যে-বীজাণুর বিষয় কিছু না জানিয়াও অষ্টাদশ শতাব্দীতে জেনার বসন্ত রোগে টিকা দেওয়া প্রথার প্রবর্তন দ্বারা তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, পরে সেই বীজাণুর আবিষ্কার করিয়া লুই পাস্তুর চিকিৎসাশাস্ত্রে বীজাণুতত্ত্বের নূতন শাখা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। লিও স্বাভি রোগের কতকগুলি রোগীকে লেবুর রস খাওয়াইয়া এবং কতকগুলি রোগীকে তাহা না দিয়া ও অন্যান্য অবস্থা ঠিক সমান রাখিয়া প্রমাণ পাইলেন যে তাজা ফলের মধ্যে এমন কতকগুলি দ্রব্য আছে যাহা অতি অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করিলে রোগ নিবারণ হয় এবং তাহাদের অভাবে রোগের উৎপত্তি হয়। বিংশ শতাব্দীতে উন্নত ধরণের এইরূপ কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষায় ভাইটামিনের আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছে। ভাইটামিন এ. বি. প্রভৃতির প্রত্যেকটি একটি বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য এবং এই রাসায়নিক দ্রব্যটি



খাদ্যে ভাইটামিন এ. পাইয়া এই ইঁদুরটি স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়াছে।



শাহ্‌জাদী
শ্রীপরিভোষ সেন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শরীরের অংশ-বিশেষের অথবা সমগ্র দেহের স্বাস্থ্যরক্ষায় একান্ত প্রয়োজনীয়। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাইতে পারে ভাইটামিন সি। স্কার্ভি-রোগ-প্রতিষেধক এই ভাইটামিন লেবুর রসে পাওয়া যায় এবং সম্প্রতি এক্ষণিক এসিড (l-ascorbic acid) বলিয়া নির্দিষ্টরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভাইটামিন সি-র স্তায় অস্ত্রান্ত্র ভাইটামিনের গঠন-নির্ণয়, ক্রিয়া নিরূপণ ও প্রস্তুতচেষ্টা ক্রমেই সম্ভব হইতেছে। আমাদের দেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজে বর্তমান বসায়নের বর্তমান অধ্যাপক ডক্টর বি. সি. গুহ ভাইটামিন লইয়া কাজ করিয়া এবং কতকগুলি দেশী ফলের ভাইটামিনের প্রকৃতি, পবিমাণাদি ঠিক করিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছেন।

অম্লিন লইয়া পরীক্ষা খুব বেশী দূর অগ্রসর না হইলেও উহা যে প্রকৃতিতে অনেকটা ভাইটামিনের সদৃশ এবং জীবদেহে ভাইটামিনের স্তায় ইহা যে গাছের শাখা-প্রশাখা ও ফল-ফুলের উৎপাদন বাড়াইয়া দিয়া উদ্ভিদদেহে কার্য করে তাহা জানা গিয়াছে। অম্লিন এ. বি. প্রকৃতি ভাইটামিন এ. বি. ইত্যাদির স্তায় এক-একটি রাসায়নিক দ্রব্য (chemical compound)। বিয়োগ-তড়িৎ-জাতীয় (electro-negative) জিনিষ বলিয়া অম্লিনকে গাছেব মধ্য দিয়া তড়িৎ বহাইয়া দিয়া যুক্ত তড়িৎ ক্ষেত্রে চালান যায়। সুতরাং ইচ্ছানুযায়ী গাছের অংশ-বিশেষের গুণ নিয়ন্ত্রণ করা চলে।

সেক্স হরমোন (Sex hormone) লইয়া গবেষণায় কৃতকার্যতা খুবই মূল্যবান। জীবদেহে উপর হরমোন-গুলিকে পৃথক করার চেষ্টা আশাপ্রদ। ক্লজিকা ও তাঁহার সহকর্মীগণ পুং-হরমোনের (androsterone) অহুমিত গঠনের ১২৮টি সমরূপের (isomers) মধ্যে ৪টি কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দুইটি স্বাভাবিক হরমোনের স্তায় ক্রিয়াক্ষম। বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম হরমোনকে স্বভাবজাত হরমোন অপেক্ষা দুই-তিন গুণ বেশী শক্তিশালী করা যায় অর্থাৎ জীবদেহে প্রবেশ করাইয়া দিলে সেগুলি এমন ভাবে ক্রিয়া করে যে তাহাতে দেহের গুণিতকার্য দুই-তিন গুণ বেশী হয়। স্ত্রী-হরমোনের (oesterone) স্তায় ক্রিয়াকারী কতকগুলি

দ্রব্যও বর্তমানে প্রস্তুত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এইগুলিকেও স্বাভাবিক হরমোন অপেক্ষা দুই-তিন গুণ বেশী শক্তিশালী করা গিয়াছে। এদেশের ডক্টর যোগেন্দ্রচন্দ্র বর্দন এইরূপ একটি জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন। আর একটি হরমোন (luteosterone) লইয়াও গবেষণা হইতেছে। হরমোনগুলির মধ্যে সম্বন্ধ-নিরূপণের চেষ্টাও ফলবতী হইতেছে। উপরিউক্ত হরমোনগুলি, অস্ত্রান্ত্র হরমোন, অম্লিন, ও ভাইটামিন লইয়া পরীক্ষায় এমন সব তথ্য ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে যে তাহাতে সকল শ্রেণীর জিনিষগুলিই যে এক সম্বন্ধস্থলে আবদ্ধ একরূপ অল্পমান করিবার কারণ ঘটিয়াছে।

ফলিত রসায়নের আর যে দ্বিতীয় দিক গড়িয়া উঠিতেছে তাহা কৃষি-রসায়ন। রাসায়নিক সার প্রয়োগে শস্যের উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ার ইউবোপ ও আমেরিকায় কৃষি-রসায়নের গবেষণায় উৎসাহ আসিয়াছে। জমিতে সার দিয়া তাহাকে উর্বর করার প্রথা পুৰাতন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দেখা যায় ঐ সকল সার হইতে উদ্ভিদ তাহাদের জীবনধারণ ও পরিপুষ্টির জন্য নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থ গ্রহণ করে। লিবিগের আমল হইতে উদ্ভিদেব গ্রহণ করিতে পারে একরূপ নাইট্রোজেন-যুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য জমিতে প্রয়োগ করা যাইতে লাগিল। প্রথমে স্বাভাবিক ভাবে প্রাপ্ত জিনিষগুলিই ব্যবহৃত হইত। পরে এমোনিয়া ও নাইট্রেট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত হইতে থাকে। বর্তমানে কোন্ রাসায়নিক পদার্থের কেমন অবস্থায় গাছের উপর কিরূপ ক্রিয়া হয় তাহা লইয়া গবেষণায় এবং জীবপু কৰ্ত্ত্বক নাইট্রোজেন-সারের উৎপাদন ও গাছেব শাখা-প্রশাখা, ফুল ফল ও শস্য উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকের কিরূপ দৃষ্টি পড়িয়াছে নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

যে মিত্তিমায়ে সার প্রয়োগ করা হইবে তাহা ক্ষার-জাতীয় কিংবা অম্ল-জাতীয়, তাহার উপর সারের ক্রিয়া অনেকাংশে নির্ভর করে। বিজ্ঞানের ভাষায় নির্দিষ্ট-সংখ্যক পি-এইচ (P. H.) সঙ্কেতের দ্বারা সার কতটুকু ক্ষার-প্রকৃতির বা অম্ল-প্রকৃতির তাহা ব্যক্ত করা হইয়া থাকে। দেখা যায় টম্যাটো প্রকৃতি গাছ ক্ষার মিত্তিম

হইতে এমোনিয়া ও এসিড মিথিয়ম হইতে নাইট্রেট ভালরূপে গ্রহণ করিতে পারে। গাছ যত বড় হইতে থাকে তাহাদের দ্বারা এমোনিয়া গ্রহণ তত কমিয়া যায় এবং নাইট্রেট গ্রহণ বাড়িতে থাকে। জলে দ্রবণীয় চিনিশ্রেণীর জিনিষ ব কার্বোহাইড্রেট সঙ্গে থাকিলে গাছের এমোনিয়া গ্রহণ শক্তি বাড়িয়া যায়। তবে ছোটবেলায় খুব বেশী কার্বোহাইড্রেট থাকিলে উহাতে বাধা জন্মে। কার্বোহাইড্রেট কম থাকিলে এমোনিয়া হইতে গাছের ক্ষতি হয়। উত্তাপমাত্রা কমাবাড়ার সঙ্গেও গাছের খাদ্যগ্রহণের সম্বন্ধ আছে। ৬ পি-এইচে এমোনিয়াম সালফেট ও ৪.৫এ সোডিয়াম নাইট্রেট হইতে আপেল ২° উত্তাপমাত্রায় অল্পকালে সোজা ধরণের প্রোটিন উৎপন্ন করিতে পারে। এমোনিয়া খাদ্যেই এই কার্য ভাল হয়। এই উত্তাপমাত্রায় প্রোটিন শিকড়ের দিকে থাকে বলিয়া গাছের ঐ অংশগুলি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। ২১° উত্তাপমাত্রায় কুঁড়ির দিকে সোজা প্রোটিন বা এমিনো এসিড পাওয়া যায়। ঐ অংশগুলি তখন আবার খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। ধানগাছ কর্তৃক এমোনিয়া গ্রহণ সালফেট, কসফেট, নাইট্রেট ও ক্লোরাইড এই ধারায় ক্রমিতে থাকে। ইক্ষুগাছে নাইট্রেট অপেক্ষা এমোনিয়াম পাতার সবুজ রং ক্লোরোফিল কম উৎপন্ন হয়।

কেমন অবস্থায় কোন্ গাছের কোন্ অংশে কি কি দ্রব্য কিরূপ পরিমাণে থাকে, সে সম্বন্ধেও অনেক বিষয় জানা যাইতেছে। ব্রাক্সফল পাকিলে তাহাতে যে চিনি আস তাহার বেশীর ভাগ ব্রাক্সফলতার প্রধান অংশে সঞ্চিত চিনি। ফলের চিনি গাছের সঞ্চিত চিনির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। ঋতুর পরিবর্তনে ও রোগের দ্বারা গাছের চিনির রকমের ও পরিমাণের বিভিন্নতা হয়।

গাছের পুষ্টিসাধন-ব্যাপারে ও রোগনিবারণে পটা-সিয়াম, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, তাহা প্রভৃতি খাতব দ্রব্যের বিশেষ অংশ আছে। আলোর অভাবে গাছের যে পুষ্টিহীনতা হয় পটাশিয়াম খাওয়াইয়া তাহা অনেকাংশে শোধরান যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কোন কোন জলপদ্মের বেধুকা বাড়াইবার পক্ষে বোরিক এসিড খুব উপকারী। সোহাগায় ছোজার ফসল বাড়ে। অগ্নি এ. বি. প্রভৃতির দ্বায় রেণু হর্মন এমন কি জন্মের হর্মন পঙ্কজ

গাছের ফুল ফল, শাখা-প্রশাখা প্রভৃতি বাড়াইয়া দেয়। ভাইটামিন বি. এবং অগ্নি এ. বি. গাছের এমোনিয়া গ্রহণ কমাইয়া দেয় ও নাইট্রেট গ্রহণ বাড়াইয়া দেয়। ‘থাইরয়েড’ সামগ্রীর ইনজেকশনে ফুল ও ফলের উৎপাদন বাড়িয়া যায়। পাতা বাড়াইতে থাইরক্সিন (thyroxin), মূলের বৃদ্ধিতে ‘এড্রিনালিন’ ও হাইপোফাইসিন (hypophysisin), এবং কচুরীপানার ফুল ফোটানোর ‘ফলিকুলিন’কে ক্রিয়া করিতে দেখা গিয়াছে। ভাইটামিন বি.ও কোন কোন ক্ষেত্রে ফল-কলান কার্যে সহায়তা করে।

বীজাণুর সাহায্যে বাতাসের নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত করা হয়। কতক প্রকার গাছের (leguminous plants) শিকড়ে ফোটারের মত হয়। ইহাতে বীজাণুসকল (rhizobia) বাস করিয়া বাতাস হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহপূর্বক গাছের খাদ্যে পরিণত করিলে গাছ উহা গ্রহণ করে। বর্তমানে বীজাণু-বিশেষ জন্মাইয়া (cultures) জমিতে ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং জমি তাহাতে নাইট্রেট-সারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। গাছ না থাকিলেও কেবলমাত্র বীজাণু নাইট্রোজেন ধরিয়া লইতে পারে বলিয়া এত দিন যে ধারণা ছিল তাহা এখন ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ঐরূপে উৎপন্ন সার জমিতে ছড়াইয়া গেলে অল্প গাছেও উহা গ্রহণ করিতে পারে। উপযুক্ত পরিমাণ কার্বনিক এসিড থাকিলে বীজাণুসকল সর্বাধিক বেশী নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে। সেই জন্ম চিনি থাকিলে ক্রিয়া ভাল হয় (চিনি গাঁজিয়া গেলে তাহা হইতে কার্বনিক এসিড উৎপন্ন হয়।) বাহিরে বীজাণু জন্মাইয়া তাহা জমিতে ছড়াইয়া দিবার সুবিধা এই যে তাহাতে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় বীজাণু থাকে, অপকারী বীজাণুগুলি বাদ পড়ে। উইলসন-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ কৃষি-রসায়নে বীজাণু-সংক্রান্ত গবেষণা করিতেছেন।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিকেরা কৃষি-রসায়নের গবেষণা করিয়া কৃষির উন্নতিসাধনে সাহায্য করিতেছেন, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও এখানে কৃষিকার্যে বিজ্ঞানের সাহায্য কম লওয়া হয়। বর্তমানে গভর্ণমেণ্টের এদিকে কিছু দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং এদেশেও কিছু কিছু কৃষি-রসায়নের

গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। অধ্যাপক ডক্টর নীলরতন ধর সারের ক্ষুদ্র ঝোঁলা শুড় ব্যবহার করিয়া ফল পাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। বিভিন্ন উদ্ভাপমাত্রায় গাছের উপর সারের ক্রিয়া সম্বন্ধেও তিনি পরীক্ষাকার্য্য চালাইতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি রসায়ন-বিজ্ঞানের এই দিকের গবেষণায় হাত দিয়াছেন। কল ভবিষ্যতের গর্ভে। এদেশে ফলিত রসায়নে ডাক্তার শ্রব ইউ. এন. ব্রহ্মচারী কর্তৃক কালাজ্বরের এন্টিমনি-হুটিত ঔষধ 'ইউরিনা স্ট্রিবায়েন' আবিষ্কার ছাড়া

উল্লেখযোগ্য কোন আবিষ্কার এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়নের অধ্যাপকরূপে ডক্টর এইচ কে. সেন কিছুদিন পূর্বে সম্ভার মালকহল প্রস্তুত করিবার প্রণালী বাহির করিয়াছেন বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, কার্য্যে তাহা ফল প্রদান করে নাই। কচুরী পান কে ব্যবহারে আনিবার তাঁহার যে চেষ্টার কথা বহুল প্রচারিত হইয়াছিল তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এখন ঐহারা জীব-ও উদ্ভিদ-সংক্রান্ত রসায়নের পরীক্ষায় নিবৃত্ত আছেন তাঁহাদের গবেষণার ফল দেখিবার আগ্রহ অনেকেই থাকা স্বাভাবিক।

যার লাগি তোর...

শ্রীমনোজ গুপ্ত

মা মারা যাওয়ার পর সিতাংশুর প্রথম মনে হ'ল সামনের বিরাট বাধাহীন যাত্রাপথের কথা। মাকে সে যে ভাল-বাসত না, বা তাঁর মৃত্যুতে আঘাত পায় নি এ-কথা বলা চলে না। আর সকলের মতই সে মাকে ভালবাসত—হয়ত অনেকের চেয়ে বেশী ক'রেই ভালবাসত, কিন্তু সে জানত তার চলার পথে সবচেয়ে বড় বাধা তার মা। নিশার জন্যে সে মোটেই ব্যস্ত নয়—সে বোন; এক দিন তার বিয়ে হয়ে যাবে, তখন তার আর কোন দায়িত্ব থাকবে না। কিন্তু মার সমস্ত ভারই ত তার উপর। ভগবানের উপর তার এক এক সময় ভারি রাগ হ'ত। কত লোকের ত অনেক ছেলেমেয়ে, কেবল তারই বেলায় সে কি না মার একমাত্র ছেলে। যদি একটা ভাই থাকত। তাই মা যখন মারা যান তখন সে জানল তার মুক্তির পথ পাবার আশা আছে। অবশ্য, তাই বলে সে মা'র মৃত্যুকামনা করে নি। সে বিশ্বাস করত, জোর ক'রে কিছু করা চলে না, আর মা'র স্বপ্ন-স্বপ্নের দিকে দেখাও তার জীবনের একটা বড় কর্তব্য। নিজে থেকে যখন সেই বন্ধন সরে গেল তখন সে অবশ্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছিল।

এখন তার খেয়দারি হ'ল নিশার বিয়ে। এর আগে মা যখন একথা বলেছেন তখন সে মোটেই ব্যস্ত হয় নি।

তান প্রধান ভয় ছিল নিশা খুশুবান্ধী চলে গেলেই মা এক পড়বেন আর তার উপর স্বত্ব হ'বে বিয়ে করবার জন্যে অতুরোধ। অসম্ভব! বিয়ে সে করতে পারে না। তাই নিশার বিয়েরও কোন চেষ্টা করে নি, কিন্তু এখন আর সে বাধা নেই। হঠাৎ সে নিশার বিয়ের জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠল যে সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। নিশা দাদাকে বরাবর ভয়ই ক'রে এসেছে; কোনদিন তার কাজের বিষয়ে কোন আলোচনা করতে সক্ষম ক'রে নি। সে চুপ ক'রে রইল। আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই বললেন, “এত ভাড়াভাড়ি কেন? এই তিন দিন মা গিয়েছে, এরই মধ্যে বিয়ে দিলে ও ভাববে তুমি ওর ভাব সহিতে রাজী নও। সিতাংশু কোন জবাব দেয় না—নিজের কাজ ক'রে চলে। সে যা একবার ভাব বলে পরবে কেউ ত ছাড়তে পারবে না।

মা'র অস্থিরতার জন্যে সিতাংশু আগ্নেয় থেকে লগ্ন ছুটি নিয়েছিল। ছুটির প্রথমই মা মারা গেলেন, সে ঠিক করলে এই ছুটির মধ্যেই নিশা বিয়ে দেবে। সারাদিন সে ঘুরতে শুরু করলে। যেখানে ভাল ছেলের সম্ভান পাইত সেখানেই ছোটো, কিন্তু সে ঠিক চায় ত পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সে অবশ্য খুব বেশী কিছু চায় না—সাইলে চলবেই বা কেন? নিশা দেখতে খুব ভাল নয়, লেখাপড়াও বেশী শেখে নি, আর তার জমান টাকাও খুব বেশী নেই। একটি মাত্র বোন, খার ক'রে ভাল বিয়ে দেওয়া লোকের মতে হয়ত বা উচিত ছিল, কিন্তু সে তাতে রাজী নয়। খার শোধ দেওয়া মানে আরও বেশ কিছু দিন চাকরি করা—তাই যদি করবে তা হ'লে আর...কাজেই সে চায় এমন কোন ছেলে যার স্বভাব-চরিত্র ভাল, ভদ্রসমাজে মিশবার মত লেখাপড়া শিখেছে আর নিজের সংসার চালাবার মত রোজগার করে। তার খারপা ছিল এ এমন বেশী কিছু নয়, কিন্তু অন্য অনেক কিছুর মতই বিয়ের বাজারের সঙ্গেও পরিচয় তার কমই ছিল। এ রকম ছেলেরও বাজার-দর দেওয়া তার পক্ষে সহজ নয়, তা সে জানত না।

কোন কিছু ঠিক করতে না পেরে সিতাংশু বড় বেশী বিব্রত হয়ে পড়েছিল। তার এক আত্মীয় একটি ছেলের সন্ধান দিলেন। ছেলেটি তার এক বন্ধুর। অমন স্বন্দর ব্যবহার না কি দেখতে পাওয়া যায় না। আজকালকার দিনে সিগারেটটি পর্য্যন্ত খায় না, বাপের একটিমাত্র ছেলে। তার বাপ থাকেন খুব সাদাসিধে ভাবে কিন্তু বেশ পয়সা আছে। সিতাংশু ভেবে দেখলে, মন্দ নয়। রাজী হ'ল। মেয়ে দেখে তাদের পছন্দও হ'ল, টাকা নিয়েও গোলমাল হ'ল না। ছেলের বাপ মেয়ে দেখে আশীর্বাদে দিন ঠিক ক'রে গেলেন। এত সহজে যে সব ঠিক হয়ে যাবে সিতাংশু তা কল্পনাও ক'রে নি। বিয়েটা কোন রকমে দিয়ে দিতে পারলে হয়। আত্মীয়স্বজন সকলকেই বলতে হবে—কেই বা কি করে? ছেলেকে একবার সে তার আপিসে গিয়ে দেখে এসেছিল, বেশ অমায়িক, লাজুক ছেলে, দেখতেও মন্দ নয়। ঠিক এই রকমটিই সে চাইছিল। এর হাতে নিশা যে স্বপ্নী হবে সে-বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিল না। আসন্ন মুক্তির আশায় সিতাংশু নিঃশ্বাস ফেললে।

* * *

দুপুরবেলা সিতাংশু বাড়ী ফিরল খুব শ্রান্ত হয়ে। সোজা নিজের ঘরে যাচ্ছিল কিন্তু নিশা এত বেলা পর্য্যন্ত তার জন্তে না খেয়ে ব'সে আছে মনে হ'তে তার ঘরের দিকে গেল। তার শরীর ভাল ব'লে মনে হচ্ছিল না, এখনই খেতে যেতে পারবে না, নিশা যেন তার জন্তে অপেক্ষা না করে। ঘরে নিশা ছিল না কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করবার মত অবস্থাও তার ছিল না। সামনে এক জন লোক আছে আর সে যে নিশা ছাড়া আর কেউ হওয়া সম্ভব তাও ভেবে নেওয়ার কোন কারণ নেই, তাই সে বললে, “তুই এখনও খাস নি ত? আমার জন্তে ব'সে থাকিস কেন বল ত?”...কথা তার আর

শেষ করা হ'ল না। যাকে উদ্দেশ্য ক'রে সে কথা বলছিল সে বললে, “নিশা নীচে গেছে, ডেকে দেব কি?”

“না দরকার নেই,—আচ্ছা দাও—তুমি কখন এসেছ?”

“একটু আগে—নিশা আপনার জন্তে বড় ভাবছিল, এইমাত্র নীচে গেল ঠাকুর চলে যাচ্ছে ব'লে।”

“তুমি আজকাল আর এস না, না? তুমি এলে তবু ও একটা সঙ্গী পায়। আমি ত সারাদিন বাইরেই থাকি।”

“ওর বিয়ের পর আপনি...”

“কি করব? বিশেষ কিছু ঠিক করি নি—দিন বে রকম ক'রে হোক চলে যাবে, ভেবে কি করব?”

“নিশা বিয়েতে একটুও স্বপ্নী নয়, আপনার কথা ভেবে।”

“আমার কথা আমিই ভাবতে পারি—আমার শরীরটা বড় খারাপ লাগছে। তাকে ব'লো সে যেন খেয়ে নেয়, আমার জন্তে অপেক্ষা করতে হবে না।”

সিতাংশু চলে যেতেই নিশা এসে ঘরে ঢুকল। জিজ্ঞেস করলে, “দাদা কি বললে অমুদি?”

“তার শরীর ভাল নয়; তুই খেয়ে নিগে যা।”

“কি হয়েছে দাদার?”

“জিজ্ঞেস করি নি।”

“তবে কি করেছ? এতক্ষণ সময় পেয়ে কিছুই বলি না? তোর কি কোন দিন মুখ ফুটে ব'লে না?”

“মুখ ফুটে কি হবে বল? যে পাখর সে কি কখনও আগে? শুধু শুধু নিজেকে ছোট করি কেন? সম্মান যেখানে এক দিন কিরে পাবার আশা আছে, সেখানেই তা হারান চলে।”

“দাদার সঙ্গে কোন দিন সাহস ক'রে কথা কই নি, এবার কিন্তু বলব।”

“পাগল হয়েছিস? কি ভাববেন বল ত?”

“তোর লজ্জা নিয়েই যদি থাকিস তাহ'লে ঠকবি। দাদা কি ঠিক করেছে জানিস? চাকরি ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হবে...”

“তার যদি তাই ইচ্ছে হয়, কে বাধা দেবে বল?”

“তুই না শুকে ভালবাসিস?”

“হাঁ, এক দিকেব—তাই দাম নেই। তিনি আমাকে ত একটুও চান না, হয়ত ঘৃণা করেন।”

“কেন, তোমার অপরাধ?”

“সব সময় কি অপরাধ থাকে। না, না তুই ওসব কথা বলিস নে।”

“আচ্ছা, দাদা যদি সত্যি সংসার থেকে সরে দাঁড়ায় তাহ'লে তোর কি খুব দুঃখ হয় না?”

“কি জানি? তাঁর আদর্শ কত বড়।”

“আদর্শ কি সব সময় ধরা যায়?”

“তবু চেষ্টা করতে ক্ষতি কি—মাহুষের শক্তির ত পরিচয় চেষ্টাতে—সে কতটা সফল হয়েছে তাতে নয়। তুই ত বেশ মেয়ে! ওঁর যে শরীর খারাপ বললাম তা ভুলে গিয়েছিল?”

“না তুলি নি, যাচ্ছি কিন্তু গিয়ে কি করব বল? কোন কথাই শুনবেন না। রোজ বলি এত বেলা পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া না করে বেড়িও না, তা সে কথা কানেই যায় না। কাল থেকে চোখের কি যন্ত্রণা হচ্ছে তাও স্পষ্ট করে বলবেন না।...আমি আসছি, তুই যেন পালাস নি।”

নিশা তার দাদাকে খুব ভাল করেই চিনত তাই বলেছিল, “গিয়ে কি করব?” সে ঘরে গিয়ে দেখলে দাদা তার চোখ বুজে শুয়ে আছে। তার মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় সে অসুস্থ। নিশা শুধু তাকে ভয়ই করে এসেছে—সাহস করে কাছে যায় নি কোনদিন। আজও তার ভয় ভাঙে নি। অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে সে জিজ্ঞেস করলে, “কি হয়েছে দাদা?”

তার দিকে না চেয়েই সিতাংগ বললে, “কিছু না, তুই খেয়ে নিগে যা। কতদিন বলেছি আমার জন্তে তোকে বঁসে থাকতে হবে না।”

নিশা গেল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে চোখ চেয়ে সিতাংগ বললে, “দাঁড়িয়ে রইলি কেন? কি? কিছু হল কি?”

নিশা চোখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল, আস্তে আস্তে বললে, “আমায় তাড়াতে তুমি এত ব্যস্ত হয়েছ কেন দাদা? মা থাকলে কি...”

“মা থাকলে হয়ত ব্যস্ত হবার দরকার হ’ত না কিন্তু এখন হয়েছে। আমার ভবিষ্যতের কিছু ঠিক নেই—তাই তা থেকে তোমাকে আলাদা করে দিতে চাই।”

“তুমি কি তাহলে আর আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না? আমার যে আর কেউ নেই।”

“হ্যাঁ, এখন নেই কিন্তু হবে। যাতে হয় সেই চেষ্টাই ত করছি। তোমার বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার, আমার যতটা সাধ্য সেই রকমই ব্যবস্থা করছি। স্বামী হওয়া-না-হওয়া ত আর মাহুষের নিজের হাত নয়। তোমার বরাতে স্বধ থাকে তুমি স্বামী হবে, আর যদি দুঃখ থাকে, তা থেকে আমি তোমায় বাঁচাতে পারব না।”

“ভাস্করের কাছে গিয়েছিলে চোখ মেখাতে?”

“না, ওসব এ কদিন আর হবে না। পরে যা হয় করা যাবে।”

“বাস্তব তোমার এমন কি কাজ ছিল যে একবার ভাস্করের কাছে যেতে পারতে না?”

সিতাংগ নিশার মুখের দিকে চেয়ে রইল। যে কোন দিন তার কাছে আসতে সাহস করে নি, হঠাৎ তার মুখে এত স্পষ্ট কথা শুনে সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নিশা আত্মপ্রাণণ চেষ্টা করে তাব সব সম্ভব জয় করেছে। যে-কথা সে বলতে এসেছে তা এবার তাকে বলতেই হবে। সিতাংগ কোন কথা বলবার আগেই সে বললে, “তোমার মুখের উপর কোন দিন কোন কথা বলতে সাহস করি নি দাদা, আমার আজকের জন্তে ক্ষমা কর। তুমি এর পর কোথায় থাকবে?”

“তা ঠিক জানি নে—তবে এখানে নয়। এ-বাড়ী ভেঁমার নামে লিখে দেব।”

“আমি আমার জন্তে জিজ্ঞেস করছি নে। বাড়ীর অম্মির দরকার নেই।”

সিতাংগের বিশ্বাসের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। সে জিজ্ঞেস করলে, “তবে কার জন্তে জিজ্ঞেস করছ?”

“অম্মির কি হবে?”

“তা আমি কি করে বলব? তার সঙ্গে আমার এখানে থাকা না-থাকার সম্পর্ক কি? তুমি কি বলতে চাও, স্পষ্ট করে বল ত।”

“তোমায় এত করে বোঝাতে হবে তা আমি ভাবতেও পারি নি। অম্মির সম্বন্ধে কি তোমার কোন দায়িত্ব নেই?”

“আমার কোন দায়িত্ব থাকবার কারণ আছে বলে ত মনে হয় না। তার মা রয়েছেন, দাদা রয়েছেন, দু-দিন পরে তা-বিষে হবে...”

“তুমি চুপ কর দাদা। তার উপর যতটা অগ্রায় কচ্ছ তাই যথেষ্ট—সেটাকে আর লাড়িও না।”

“অন্ত কেউ আমায় এভাবে অপমান করতে সাহস করত না—তোমার অম্মিও না।”

“ঠিক নেই জন্তেই আমি সাহস করছি। ওর চোখের জল কি তোমার চমার পথ একটুও পিছল ক’বে দেবে না?”

“তুমি যাও আর তোমার অম্মিকে বলে দিও, তিনি এখনে না এলে আমি স্থানী হব।”

“কোনদিন তোমার কাছে কোন অপরাধ করি নি দাদা, আশায় ক্ষমা কর। আমি যে একে বড় ভালবাসি, ওর দুঃখ-সহ্য করতে কিছুতেই পারি না।”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সিতাংগ জিজ্ঞেস করলে, “ওদেব প্রতি আমি কি অগ্রায় করেছি তা জানতে পারি?”

“তা ক’দিন আগেও যখন ওদের অত আশা যেন, তখন তুমি কেন তোমার অনিচ্ছা জানাও নি, তাহলেও ত ওরা সাবান হয়ে যেত।”

“কথা মা দিয়েছিলেন, আমি নয়। আমার মতামতের জন্তে ত আর অপেক্ষা করেন নি।”

“কারণ মা জানতেন তুমি তাঁর কথা রাখবেই। এটা ধরে নেওয়া বোধ হয় তাঁর খুব অভ্যাস হয় নি।”

“সব কিছু ধরে নিলে চলে না। মানুষের ব্যক্তিগত মতামতের দাম তার নিজের কাছে অনেক।”

“বেশ, তাহলে তুমি যে ধরে নিয়েছ এ বিষয়ে আমার অমত নেই, সেটা কি রকম হ’ল? আমি মেয়ে, তাই না?”

“তোমার ভার আমার উপর পড়েছে তাই সে ভার নামাতে চাই। তোমার আমার অবস্থা ঠিক এক রকম নয়। কিন্তু এ সব কথা কেন? যা অসম্ভব, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি?”

“কেন অসম্ভব? তুমি কি সত্যিই মনে কর তুমি ওপথে চলাতে পারবে?”

“সে আলোচনা তোমার সঙ্গে করতে ইচ্ছে করি নে।”

নিশার মুখটা লাল হয়ে উঠল, সে বললে, “না, তোমার সঙ্গে আলোচনা করার মত স্পর্ধা রাখি না। শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম।”

“বেশ, এখন যাও আর পার ত যে ক’দিন এখানে আছ, এসব কথা তুলো না। আমি ইচ্ছে ক’রে কারও কোন ক্ষতি করি নি, করতে চাইও নি। কেউ যদি ইচ্ছে ক’রে ছুঁধ পাশ, তাতে আমার হাত নেই।”

* * *

নিশার কোন আপত্তিই টিকল না, তার বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। নিশা বেশ ভাল ক’রেই জানত সিতাংশু যা ভাল ব’লে মনে ক’রে বরাবরই সে তাই করে—কারও কথা তাকে টলাতে পারে না। তবু সে একবার চেষ্টা ক’রে দেখেছিল, কিন্তু এ এক দিন ছাড়া সিতাংশু তাকে অমলার সহজে কোন কথা তুলতে দেয় নি। অমলা তার কাছে এসেছে, হেসে গল্প করেছে কিন্তু নিশা তার দিকে ভাল ক’রে চাইতে পারে নি। তার মনে হ’ত সে যেন নিজেই অমলার কাছে অপরাধী। অমলা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, যা হয়েছে তাই ভাল কিন্তু সে কিছুতেই তা মেনে নিতে পারে নি। তার যেন বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল এ হ’তে পারে না, এ অসম্ভব, এর কোথাও একটা মস্তবড় ত্রুটি থেকে যাচ্ছে।

বিয়ের সময় আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেকেই এসেছিলেন আর তাঁদের যা কাজ, সেই অযাচিত উপদেশ দিতে ছাড়েন নি। মেয়েরা বিয়ের কথা বললে সিতাংশু হেসে উড়িয়ে দিয়েছে; পুরুষরা বললে কথার জবাব না-দিয়ে সেখানে থেকে চলে গিয়েছে। তার রকম মেখে সকলে শেষে ঠিক করলেন ওর মধ্যে এমন কোন রহস্য আছে যা ও লোকের কাছে প্রকাশ করতে সাহস করছে না। কেউ কেউ তার চরিত্র

সন্দেহ সম্বন্ধ করতেও ঝিঝ করেন নি। সিতাংশুর কোন সাই আসত। এক-একবার তার মন হ’ত তাদের সব নিন্দায় ক’রে দিয়ে জঙ্গল দূর করে, কিন্তু তা পারত না। কতক্ষণই বা তারা বিরক্ত করবার অবসর পাবে? এই ত শেষ! শুধু-শুধু কেন লোকের মনে দুঃখ দেয়?

বিয়ের পর সে নিশার স্বামী শরণকে ডেকে বললে, “তোমার হাতে নিশাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ’তে চাই। কোন দিন তার খবর নিতে পারব কি না জানি নে।” সে হঠাৎ আশ্চর্য হ’য়ে গিয়েছিল, জিজ্ঞেস করলে, “কেন?”

“আমি কোথায় থাকব, না-থাকব তার কিছু স্থিরতা নেই। কালই হয়ত এখান থেকে চলে যাব। আর একটা কথা। আমার থাকার মধ্যে আছে এই বাড়ীখানা। যেটাও তোমাদের নামে রেজিস্ট্রী ক’রে রেখেছি—এখানা রেখে দাও। কিছু দিন নিশাকে এ-কথা জানিও না।”

“বাড়ীখানা আমাদের দেবার অর্থ? আপনার নিজের সব্বস্ব কি করেছেন জানতে পারি?”

“না, তার দরকার নেই।”

“আপনার বাড়ীখানাতে যে আমার এমন বেশী দরকার তাও ত কই বলি নি।”

“আমার ওটাতে দরকার নেই, তোমাদের দরকার হ’তে পারে। আর ওটা না-হয় আমার বোনকেই দিচ্ছি।”

“তাকেই তবে দিন গে। তার হ’য়ে ও-দায়িত্ব আমি নিতে পারি নে।”

সিতাংশু তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। সে আজ প্রথম বুঝল সাধারণ লসারী লোকও অর্থের জন্তে সব কিছু ভালে না। এ রকম স্বামীর হাতে পড়ে নিশা কষ্ট পাবে। না নিশ্চয়—সিতাংশুর এতে বড় কম লাভ নয়। তার শেষ দায়িত্বটাও এত সহজে তার বাড় থেকে নেমে গেল দেখে তার আনন্দ হচ্ছিল।

শুধুরবাড়ী যাবার সময় নিশা এসে যখন সিতাংশুকে প্রণাম করল তখন অনেকেই ভেবেছিল, তার চোখে জল দেখতে পাবে; কিন্তু সে বেশ সহজ ভাবে বললে, “যেখানে যাচ্ছ, আজ থেকে সেই তোমার ঘর; সেখানে গিয়ে যদি স্থায়ী হ’তে না পার তাহলে আর কোথাও স্থায়ী হ’তে পারবে না।”

আজকালকার কোন ছেলের কাছে কথমুনির মত উপদেশ শুনবে শরণ তা আশা করে নি। সে ঠিক করতে পারলে না সিতাংশুর এর মধ্যে কতটা অভিনয় আছে।

* * *

সিতাংশুর কাণ্ড দেখে আগিস-মুখ লোক অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার খুব বরাত জোর বলতে হবে যে সে অত

অল্প বয়সে অত বড় কাজ পেয়েছিল আর সেজন্তে অনেকেই তাকে ঈর্ষা করত। কেউ বললে, “লোকটার একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে।” কেউ বললে, “অল্প কোথাও বেশী টাকার লোভ দেখিয়েছে।”

সাহেব তাকে খুব ভালবাসত, অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলে কিন্তু কিছু লাভ হ'ল না। সিঁতাংশ শেষ পর্যন্ত চাকরি ছেড়ে দিলে। নিশা বা শরৎ কেউই সে-কথা জানতে পারলে না।

সিঁতাংশদের বাড়ীর দরজায় চাবি পড়তে সেটা সকলের আগে চোখে পড়েছিল অমলার। নিশার বিয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে তাদের বাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে তা কেউ ভাবতেও পারে নি। অমলা ভেবেছিল সিঁতাংশ কিছু দিনের জন্তে বাইরে কোথাও গিয়েছে তাই সে নিশার খন্তরবাড়ী থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল। অন্ততঃ আট দিনের আগে সে ফিরবে না। নিজেকে সে যতই ভুল বোঝাতে চেষ্টা করুক, ভুল বোঝান অত সহজ নয়।

অর বৌদি তাকে জিজ্ঞেস করলে, “এদেব ব্যাপার কি বল ত ভাই? বোনের বিয়ে হ'ল ত ভাই হ'ল বেশ-ছাড়া...”

অমলা বললে, “আমি তার কি জানি? তুমিও যেখানে আমিও সেখানে।”

“ঠিক তাই কি? ওবাড়ীর কারও জন্তে মাথা না ঘামালেও আমার চলবে কিন্তু তোর...”

অমলা তাকে বাধা দিয়ে বললে, “তোমার পায়ে পড়ি বৌদি. তুমি চুপ কর।”

“ওকি তুই কাঁদছিল? আমি ঠাট্টা করছিলাম ভাই।”

“ও রকম ঠাট্টা মানুষ করে?”

“কিন্তু এ রকম করে তুই ক'দিন থাকবি?”

“তা জানি নে।”

“তোর দাদা যদি জোর ক'বে বিয়ে দিয়ে দেন তাহ'লে কি করবি?”

“তাও জানি নে।”

“ও ছেলেমানুষী ছাড়তে চেষ্টা করাই ভাল। সময়ে সব ঠিক হয়ে যায়। কত মেয়েকে ত দেখলাম, বিয়ের পরে আগেকার জীবনটাকে মস্তবড় ভুল ব'লে স্বীকার করেছে।”

“কি করে পারে বল ত?”

“কেন পারবে না? হিন্দুর মেয়েরা ছোটবেলা থেকে স্বামীর জন্তে মনের মধ্যে একটা স্থান ঠিক করে রাখে, বিয়ে করার পর সেইখানে স্বামীকে প্রতিষ্ঠা করে। বিয়ের আগে যদি কাউকে ভাল লাগে তাকে সে ঠিক ঐ জায়গাটার কিছুতেই বসাতে পারে না।”

“তোমার মত ক'রে ওসব কোন দিন ভেবে দেখি নি ভাই, ও আমি বুঝতেও পারি না।”

অমলার ওসব আলোচনা ভাল লাগছিল না। তার কথা নিয়ে কেউ আলোচনা করে, তাকে সহায়ত্ব দেয় এ সে সহ্য করতে পারত না। ছোটবেলা থেকে সে কখনও কোন বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করে নি; কারও সাহায্য নিতে তার আত্মসম্মানে বাধত।

* * *

শরৎকে সঙ্গে নিয়ে নিশা অমলাদের বাড়ী আসতে সবাই একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। শরৎ অশোকের মাকে বললে, “আপনারা বোধ হয় আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু কি করব বলুন? নিশার কে আছে যে তার কাছে নিয়ে যাব? এখন জানার মধ্যে এক আপনারা, তাই আপনাদের কাছে নিজেকে পরিচিত ক'রে নিতে এলাম।”

অশোকের মা ভারী খুলী হয়েছিলেন; বললেন, “তোমার মত ছেলেকে বলবার কিছু নেই। সিঁতাংশ নিশাকে ছেড়ে দূরে থাকতে পারে, কিন্তু আমরা পারি নে। ছোঁড়াটা কি করলে বল ত?”

“কিছুই ত বুঝতে পারছি নে। তিনি যদি নিজের উন্নতির জন্যে গিয়ে থাকেন তাতে বলবার কিছু নেই, তবু মনে হয় বড় ব্যস্ত হয়ে করার মত কাজ তিনি নেন নি। দু-মশ দিন বাদে ক'লকাতা ছেড়ে গেলে তার কি ক্ষতি হ'ত?”

“বুঝি না বাবা। ওর মা-ই ত ওব শত্রু! শুধু ওকে এসব খয়াল শিখিয়ে যায় নি, অ'বার ঠিক এই সময়টিতে নিজের সুরে গিয়ে ওকে একেবারে নিরঙ্কুশ ক'রে দিয়ে গেল।”

নিশা শবতের সঙ্গে অমলার পরিচয় ক'রে দিলে। শরৎ বললে, “সিঁতাংশবাবুকে আমি মোটেই হিংসে করি না। তাঁর জীবনে অনেক দুঃখ আছে তা না হ'লে কেউ এসব ছেড়ে যায় না।”

নিশা অমলাকে চুপি চুপি বললে, “তোকে একটা কথা বলব ভাই কিছু মনে করিস নি। তুই বিয়ে কর। যে তোর দাম বুঝলে না তার জন্তে...”

“আমি কারও জন্তে কিছু করছি নে। বিয়ে করব ন এমন কথাও আমি বলি নে, আর তা বললেই বা চলবে কেন। নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত শিক্ষা ত পাই নি।”

“সেই মতিই যেন তোর হয় ভাই। যদি কোন দিন তাঁকে এ-পথে ফিরতে হয় তাহ'লে যেন ভাবতে না পারেন কেউ তাঁর জন্তে পথ চেয়ে ব'সে ছিল।”

“যে যায় সে ফেরার জন্ত যায় না।”

“কিন্তু যাওয়াটাই ত আর সবচেয়ে বড় কথা নয়, আর

সব যাওয়াই যে যাওয়ার জন্তে তাও আমি মানি নে—
যাওয়ার লোভেই অনেকে যায়।”

“ও সব কথা থাক। তোদের বাড়ীতে চাবি পড়ল কেন ?
ভাড়া দিয়ে দে না।”

“আমি কেন দিতে যাব ? আমার কি গরজ ?
স্তন্যাম বিয়ের পর আমাদের দান করে দিতে চেয়েছিলেন,
নেই নি, নিলেও আমি কিরিয়ে দিতাম।”

অমলা চেয়েছিল কথাটা ঘুরিয়ে অল্প পথে নিয়ে যেতে,
কিন্তু ত্রিশার কাছে একথাটাও অপ্রীতিকর হচ্ছে দেখে
সে থেমে গেল। তার পর বললে, “সময় পেলেই আসিস।
তোর বর ত বেশ ভাল লোক দেখছি, বললেই কথা
স্তনবে।”

“বিয়ের পর কিছুদিন সব বরই ভাল লোক আর সব
বরই কথা শোনে।”

“না, তোর বর পরেও স্তনবে।”

“তাই নাকি ? একবার দেখেই চিনে নিয়েছিস ?
ব্যাপার ত ভাল নয়।”

“জালাস নে। মা তোর খাণ্ডড়ীকে লিখবেন নিশ্চয়।”

“শুধু লিখলেই ত হবে না। তুই না গেলে তোদের বাড়ী
তারা আমায় পাঠাবে কেন ?”

“আইবুড়ো মেয়ের বুঝি যেখানে-সেখানে যেতে আছে ?”

“আইবুড়ো থাকবার জন্তে ত কেউ মাথার দিবি
দিয়ে না। অশোকদাকে ব’লে যাচ্ছি...”

“আচ্ছা, আর বাহাদুরি করতে হবে না। আমায়
ব্যবস্থা আমি নিজেই করতে পারব।”

* * *

শরৎকে দশটার মধ্যে আপিসে হাজির হ’তে হয়, তাই
ন’টা বাজতে না বাজতে তার ছুটোছুটি শুরু হয়। বিয়ের কবে
হয়ে এসেই নিশাকে স্বামীর কি কি দরকার তা ঠিক করে
রাখতে হ’ত। হঠাৎ দৈনন্দিন নিয়মে বাধা পড়ল দেখে
বাড়ীলুহু সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। ন’টা বেজে
যাবার পরও শরতের দেখা নেই। তার মা এসে নিশাকে
জিজ্ঞেস করলে, “হাঁ বোঁমা, সে আজ আপিস যাবে না
এ-রকম কিছু বলেছিল না কি ?”

তাকে জিজ্ঞেস করায় নিশা একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিল,
বললে, “না।”

“কোথায় গেছে তাও বলে যায় নি ত ?”

“না।”

“ঐ ছেলেই আমায় পাগল করলে। এখন কোথায়
খুঁজতে পাঠাই বল ত ? এ রকম ত সে কখন করে না।”

তার আর বেশী কিছু বলা হ’ল না। শরৎ বাড়ী ফিরল
কতকগুলো কাগজ-বাঁধা বাণ্ডিল নিয়ে। মা কিছু বলবার
আগেই সে বললে, “খুব রাগ করছিলে ত ?”

“তা করব না ? আপিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে...”

“আজ আপিস যাব না।”

“সে-কি ? আপিস যাবি না কেন ?”

“বিদেশ যেতে হবে তাই ছুটি নিয়েছি। এই জিনিষ-
গুলো আর কতকগুলো কাপড় জামা একটা স্ট্রটকেসে দিয়ে
দিতে হবে—বারটার ট্রেনে যাচ্ছি।”

“কোথায় যাচ্ছিস, কেন যাচ্ছিস কিছুই ত বললি না।”

“যাচ্ছি কান্নী পর্য্যন্ত—বিশেষ কাজ পড়েছে ব’লে।”

“বেশী দিন থাকতে হবে না কি ?”

“কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে থাকতে হবে না। বাবাকে
সব বুঝিয়ে বলেছি।”

মা চলে যেতেই শরৎ নিশাকে বললে, “মার কাছে
জবাবদিহি ত শেষ হ’ল, এবার কি তোমার পালা না কি ?”
নিশা কোন জবাব দিলে না দেখে শরৎ বললে, “খুব রাগ
হচ্ছে, না, একা যাচ্ছি ব’লে ? লক্ষ্মীটি কিছু মনে
ক’রো না ; বড্ড দরকারী কাজ তাই যেতে হচ্ছে।”

নিশা স্ট্রটকেস সাম্মাতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বললে,
“বিদ্রোহ নেবে না ?”

“না, দরকার হবে না। এক জন লোকের বাড়ী যাচ্ছি ;
আর ক’দিনের জন্তে ওসব ঝঞ্জাট না বাড়ানই ভাল। হাঁ,
তোমার ইচ্ছে হ’লেই তোমার বন্ধুর কাছে যেতে পার,
বাবা-মা বারণ করবেন না।”

“অমুদির কাছে আমার যেতে সাহস হয় না।”

“এ কয়দিনে সে কথা ত অনেকবারই শুনেছি, কিন্তু
কি উপায় আছে বল ?”

নীচে থেকে মা বললেন, “আর দেরি করিস নি-
ভাত বাড়ি।”

* * *

তখন এলাহাবাদে কুস্তমেলার আয়োজন চলছিল।
সারা দেশ থেকে সাধুর আমদানি শুরু হয়ে গিয়েছিল।
কত রকমের সাধু। কেউ কাঁটার ওপর শুয়ে, কেউ চারদিকে
আগুন জ্বলে দিনরাত তার মাঝে ব’সে, কেউ একটা হাত
উপর দিকে তুলে, কেউ মৌনী, কেউ লোককে গুণ্ধ দিচ্ছেন,
কেউ পাঠ করছেন। সিঁতানু ভেবেছিল তার বরাত
খুব ভাল। ঠিক যে সময় সমস্ত ভারতবর্ষের সাধু-সন্ন্যাসী
একসঙ্গে এসে হাজির হয়েছেন, সেই সময়টিতে সেও মুক্তি
পেয়েছে। সমস্ত দিনরাত সে সাধুদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে—
আজ এক সাধুর কাছে যায়, তাঁর সেবা করে, তাঁর সঙ্গে
কথাবার্তা বলে কিন্তু কোথায় যেন তার মেলে না, তার পর
দিন আর এক সাধুর কাছে যায়। ক’দিনে তার চোঁহা।
এমন বিশ্রী হয়েছিল যে হঠাৎ কেউ তাকে চিনে নিতে পারত
না, কিন্তু সেদিকে তাকাবার তার সময় ছিল না। এ রকম
হুযোগ জীবনে আর আসবে না। তার সবচেয়ে বিপদ

হয়েছিল এই যে, যাকে দেখে ওর শ্রদ্ধা হয়েছিল তিনি শুকে মোটেই আমল দিচ্ছিলেন না; এমন বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন যে সে চেষ্টা করেও তাঁর কাছে বসে থাকতে পারছিল না—তবু সে আশা ছাড়ে নি।

সন্ধ্যাবেলা সিতাংশু গঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। সারাদিন সে বিছু খায় নি, খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার সামনে দিয়ে দু-জন লোক চলছিল। আগে তারা অনেক দূরে ছিল কিন্তু এত আশে আশে যাচ্ছিল যে সিতাংশু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ঠিক পিছনে এসে পড়ল। তারা খুব আশে আশে কথা বলছিল কিন্তু সিতাংশুর বুঝতে একটুও অসুবিধে হ'ল না। তারা দু-জনেই বাঙালী, এক জন স্ট্রট পার্‌সার ছিল।

স্ট্রট-পারা লোকটি বললে, “সাদুজী কুস্তি এসেছেন অথচ ঐ রক্ত নিৰ্জন জায়গায় রয়েছেন কেন বল ত? সাদুদের সঙ্গে খোশাক্ষাৎ করেন না?”

“করেন কি না-করেন কি করে বলব বল? ওঁর কতটুকুই বা জানি? হয়ত রাজে যাওয়া-আসা আছে।”

“তুমি যখন প্রথম-প্রথম ওর ক্ষমতার কথা বলতে, আমার মনে হ'ত তোমায় যাত্ন করেছে।”

“সেই জন্তেই তোমায় নিয়ে গেলাম। দেখলে ত কি অসৌকিক ক্ষমতা!”

“বাস্তবিক, চোখের সামনে লোহার চাকাটা সোনার হ'য়ে গেল, এ যে ধারণাও করা যায় না।” কথাটা বলেই ভদ্রলোকটি একটা সোনার চাকা পকেট থেকে বার করলেন।

অপর লোকটি বললে, “এবার বিশ্বাস কর ত, তোমার সম্বন্ধে তোমায় না-দেখে সব কথা বলা ওর সম্ভব?”

“নিশ্চয়।”

“মজা কি জান? তোমার মত যারা অবিশ্বাসী উনি কেবল তাদের কাছে ঐ রকম এক-একটা অসৌকিক ক্ষমতার পবিচয় দেন একবার মাত্র।”

সিতাংশুর পক্ষে আর চুপ করে থাকা অসম্ভব হ'ল। সে এগিয়ে এসে বললে, “ক্ষমা করবেন, আপনাদের কথার কিছু কিছু কানে এসেছে। সাদুজীর ডেরাটা আমরা ব'লে দেবেন?”

লোক দুটি সিতাংশুকে দেখে চমকে উঠেছিলেন, বললেন, “আজ্ঞে সেটা ঠিক হবে না। তিনি বিরক্ত হবেন।”

“তামি তাঁকে বিরক্ত করব না। কুস্তিও প্রায় সব সাদুকেই দেখলাম, তাঁকেও দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে।”

স্ট্রট-পারা লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি সংসার

ভাগ করেছেন? আশা করি জিজ্ঞেস কবলাম ব'লে কিছু মনে করবেন না।”

“আজ্ঞে না, মনে কিছু করব না। হাঁ, সংসার প্রায় এত রকম ছেড়েই এসেছি।”

“আপনার মত লোক গেলে সাদুজী নিশ্চয় বিরক্ত হবেন না। আচ্ছা, আপনি এক কাজ করুন। কাল সকালে এই জায়গায় ঠিক সাতটার সময় আসবেন, আমরাও যাব, আপনাকে নিয়ে যাব।”

নমস্কার করে সিতাংশু এগিয়ে চলে গেল।

* * *

শহরের বাইরে বেশ নির্জন স্থানে স্বামীজী জটিলানন্দের অদ্বৈতী আশ্রম। স্বামীজী স্বধনু-থবোধের বাইরে গেলেও প্রান্তিক সৌন্দর্যের প্রতি একেবারে উদাসীন নন তা বেশ বোঝা যায়। চেলা-সন্ধ্যের বাংলাই নেই, একটি মাত্র লোক তাঁর সঙ্গে আছে দেখা গেল। স্বামীজীর চুল আর মাড়ি ধবলব সাদা, কিন্তু মুখের দিকে ডাকালে মনে হয় বয়স বেশী হয় নি। সিতাংশু ভাবলে এই ত আসল সন্ন্যাসী। স্বামীজীকে দেখে তার আন্তরিক শ্রদ্ধা হচ্ছিল। সিতাংশু আন-ভাগ গত রাজের চেনা লোক ছাট স্বামীজীকে প্রণাম করত তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, তার পর সিতাংশুকে কাছে ডাকলেন। স্বামীজী ইসারা করতে পিছনের লোক দু-জন চলে গেল। সিতাংশুকে বললেন, “কদিন ত খুব ঘুরলে, কি পেলে?” সিতাংশু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে, “আপনি সে কথা জানেন?”

“কিছু কিছু জানতে পারি, যা তিনি দয়া করে জানতে দেন তার বেশী জানতে চেষ্টাও করি না।”

“মহুস. আমি হতাশ হই নি। দুঃখ দিয়ে তিনি পরীক্ষা করে নেন, একথা আমি বিশ্বাস করি।”

“কর ছেড়ে যে বাইরে এলে, মনে কর কি ঘরের জন্তে কখনও মন কাঁদবে না?”

“আজ্ঞে না।”

“তোমার ত খুব সাহস দেখছি। আমি ত তোমায় সাহস করতে পারব ব'লে মনে হয় না। পূর্বপ্রাণের জন্ত এখনও মাঝে মাঝে মন চঞ্চল হয়?”

“আপনার কথা ত কিছুই জানি না, কিন্তু আমার ত কোম্বাধন নেই।”

“বোনের বিয়ে হয়ে গেলেই কি বাঁধন খুলে যায়?”

সিতাংশুর বিশ্বয় ক্রমশঃ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। স্বামীজী তা বুঝতে পেরে বললেন, “এতেই এত আশ্চর্য হচ্ছে? এ ত খুব ছোট জিনিষ; চেষ্টা করলে সবাই পারে।”

“আমি ঘরে ফিরতে আর চাই না।”

হাসতে হাসতে স্বামীজী বললেন, “ঘর ছেড়ে এসেছ কি যে ফিরতে চাই না বলছ ?”

“বাংলা থেকে এত দূর এসেছি...”

“তোমার দেহটা এসেছে. তুমি আস নি। আচ্ছা, সংসার ছেড়ে এসেছ, না ? তা বাড়ীর দলিল সঙ্গে কেন ?”

সিতাংশু মনে পড়ে গেল সেটা কোর্টের পকেটেই আছে। বিব্রত হয়ে বললে, “যাকে দিতে চাইলাম সে নিলে না, কি করব বলুন ?”

“রাস্তায় ফেলে দিলেই পারতে।”

“রাস্তায় ? যে কেউ হুড়িয়ে...”

“তাতে তোমার কি ? তোমার কাছে ওর দাম থাকা উচিত নয়।”

“তাহলে এটা ফেলেই দি ?”

“ফেলব বললেই ফেলতে পারবে কি ?”

সিতাংশু পকেট থেকে বার করে ঘরের মেঝেয় ফেল দিলে। স্বামীজী হাসতে হাসতে বললেন, “হ’ল না ; ও ত তোমারই রয়ে গেল। কারও নামে লিখে দাও।”

সিতাংশু স্বামীজীর নামে লিখে দিল।

“বেশ ! কিন্তু এ ছাড়া আরও কিছু নেই কি ?”

“কই মনে ত হচ্ছে না ; আপনি বলে দিন।”

“কোন লোকের কথা থাকে মাঝে মনে পড়ে ?”

“আজ্ঞে না।”

“অত তাড়াতাড়ি জবাব দিও না, ভেবে দেখ। মনে হয় না কেউ হয়ত কাদছে, কার উপর হয়ত অত্যাচার করছে ?... আমার যেন মনে হচ্ছে অনেক দূরে কোথাও কেউ তোমার জন্যে কাদছে।”

আমি ইচ্ছে করে কাউকে ছুঁধ দিই নি—কেউ যদি মন-গড়া ছুঁধ নিয়ে কাদে, তার দিকে তাকাতে গেলে পথ চলব কি করে ?”

“কারও ছুঁধেই যদি কাদতে না শিখলে তাহলে পথ চলে লাভ ?”

সিতাংশু জবাব খুঁজে পেল না, কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। স্বামীজী তার দিকে চেয়ে বললেন, “সত্যিই তাতে ছুঁধ দাও নি—অন্ততঃ তার ছুঁধের অন্তে সে কি তোমার মোটেই দারী করতে পারে না ?”

সিতাংশুর মনে হ’ল সন্ন্যাসীর কথাগুলো তাকে অভিভূত করে ফেলেছে ; সে বললে, “আমায় ভাবতে সময় দিন।”

“আচ্ছা, আজ যাও, কিন্তু কথাগুলো স্থির মনে ভেবে দেখ, বিচার করো, তার পর এস।”

সিতাংশু প্রণাম করে চলে গেল। তার সঙ্গীদের খোঁজ নেবার মত মনের অবস্থাও তার আর ছিল না। তার মনে হচ্ছিল, সন্ন্যাসী যাদুকর, তাকে সম্বোধন করেছেন। সে তার কথাগুলো যত ভুলবার চেষ্টা করেছিল সেগুলো তাকে ততই পেয়ে বসছিল। সে ভাবছিল, কয়দিন আগে নিশাও তাকে এই সব কথা বলেছিল, তখন সে তাকে ধমক দিয়েছিল।

* * *

ডাক্তার চ্যাটার্জীর বাড়ীর সামনে রোজ যেমন ভিড় হয় তেমনি হয়েছিল। ভোরবেলা থেকে লোক আসে আর বেলা একটা পর্যন্ত তাঁর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় থাকে না। কত দূর দূর জায়গা থেকে লোক আসে, কাউকে ফেরালে চলে না। এক-এক দিন এত বেলা হয়ে যায় যে তাঁর মারাগ করতে থাকেন। আগে আগে ডাক্তার হেসে উড়িয়ে দিতেন, কারণ তিনি সকাল-সকাল খেয়ে নিলেও তাঁর মার খেতে বসতে তিনটে বাজবেই ; কিন্তু আজকাল আর তা হয় না। মা ছাড়া আরও একজনকে আজকাল তার অন্তে অকারণ কষ্ট ভোগ করতে হয়। শুধু শুধু কাউকে কষ্ট দিতে তিনি রাজী নন।

বেলা দশটা বেজে গিয়েছিল তাই তিনি খুব তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিচ্ছিলেন। যে কয়জন লোক ছিল তাদের মধ্যে শেষ করতে আর বেশী সময় লাগবে না, কিন্তু তাদের মধ্যে শেষ করবার আগেই একটা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল। ডাক্তার চ্যাটার্জী যে একটু বিরক্ত হন নি তা বলা যায় না। তিনি ভেবেছিলেন, ঐ দেশেরই কোন লোক, কিন্তু লোকটি অচেনা বাড়ালী মধ্যে তিনি একটুও আশ্চর্য হলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, “কোথা থেকে আসছেন ?”

“প্রায় ক্রোশ-ছয়েক দূর থেকে।”

“কি হয়েছে বলুন ত ?”

“ঠিক ত বুঝতে পারছি না, তবে চোখে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।”

“আপনি ঘরে একটু বসুন, আমি এখনি যাচ্ছি।”
লোকটিকে পরীক্ষা করে ডাক্তার চ্যাটার্জী জিজ্ঞেস
করলেন, “আপনি কি এদিকেই থাকেন?”

“না, সম্ভ্রান্তি এসেছি।”

“থাকেন কোথায়?”

“কলকাতায়?”

“দেখুন আপনাকে সব কথা স্পষ্ট করে বলাই ভাল।
অনেক আগেই আপনার চিকিৎসা করানো উচিত ছিল।
স্বল্পে সময় নষ্ট করেছেন, আর মেরি করবেন না। কলকাতায়
যান; সেখানে ছাড়া আর কোথাও বোধ হয় এ ‘কেস’
নিতে পারবে না।” একটা ওষুধ দিচ্ছি, ট্রেনে ব্যবহার
করবেন, কষ্টটা একটু কম থাকবে। কিন্তু এক দিনও মেরি
করবেন না।

“অল্প হায়ে যাব না কি?”

“না, না কি বলছেন। কলকাতায় যান, ভাল করে
চিকিৎসা করান, ভাল হয়ে যাবেন। এখানে আমার
ব্যবসাই করি, সব কিছু ত জোগাড় নেই।”

“এখান থেকে পোষ্ট আপিস কত দূরে?”

“কেন? আপনার কিছু দরকাব আছে?”

“একটা টেলিগ্রাম করতে চাই...”

“বেশ ত, আপনি লিখে দিন, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।
আচ্ছা, আপনি বলুন আমি লিখে দিচ্ছি।”

“শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি।”

“আপনি এক জন বাড়ালীর কাছে কি এটুকুও আশা
করেন না? বলুন কি লিখব?”

“...শরৎ রায়,.....অপার সাকুলার রোড...” বাধা
দিয়ে ডাক্তার চ্যাটার্জী বললেন, “শরৎ আপনার কেউ
হয়?”

“শরৎকে চেনেন নাকি?”

“নিশ্চয়। আগে ছিলাম শুধু বন্ধু, এখন হয়েছে ভায়রা-
জাই—গ্রাম-সম্পর্কে আর কি।”

“ঠিক বুঝলাম না।”

“তার স্বস্তরবাড়ীর পাশেই আমার এক শালার বাড়ী
কিনা তাই বললাম।”

“কাদের বাড়ী বলুন ত?”

“কেন? আপনি ওখানে কাউকে চেনেন নাকি?
চেনাই ত সম্ভব! অশোকবাবু...”

“ও! আপনার সঙ্গে পবিত্রিত হয়ে স্থধী হলাম;
আচ্ছা নমস্কার।”

চোখ থেকে চশমাটা খুলতে খুলতে ডাক্তার
চ্যাটার্জী বললেন, “সে কি? এখন কোথায় যাবেন?
ট্রেন...”

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সিভাস্ত বললে,
“আপনিই সেদিন আমার সাধুব কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন
না?”

“সেদিন একজনকে নিয়ে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সে
কি আপনি?”

চোয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সিভাস্ত বললে, “মশায়ের
কি ডাক্তারীর সঙ্গে অন্য ব্যবসায় চল নাকি?”

“তার মানে?”

“মানে বুঝিয়ে দেবে পুলিশ, আমি নই।”

“আপনি আমার বাড়ীতে বসে আমার অপমান করছেন
কোন অধিকারে?”

“একটা জোচ্চোরকে সাধু সাক্ষিয়ে তার কাছে
আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন কোন অধিকারে?”

“স্বামী জটিলানন্দ জোচ্চোর।”

“না? বাড়ীটা জোর করে নিজের নামে লিখিয়ে
নিল।”

“তা আপনি না দিলেই ত পারতেন? আমি ত
আর দিতে বলি নি? বাড়ী দিয়েছেন তা কি হয়েছে?
চাইলেই তিনি দিয়ে দেবেন।”

“হাঁ দেবে! কোথায় পালিয়েছে...”

“স্বামীজী কি তাহলে চলে গেছেন?”

“হ্যাঁ গেছেন! কোথায় যান দেখছি...”

“আপনি তো সংসার ত্যাগ করে এসেছেন। বাড়ীট
যদি জোচ্চোরেই নেয়...”

“চুপ করুন মশাই, জ্বালাবেন না।” সিভাস্ত ঘর
থোক চলে যাচ্ছে দেখে ডাক্তার চ্যাটার্জী বললেন, “বেশ
লোক ত? আপনার নামটা বলুন? ওষুধ দিলাম, খাতার
লিখতে হবে ত, আর দামটা...”

জলন্ত দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চেয়ে সিতাংশু জিজ্ঞেস করলে, “কত দাম ?”

“বার আনা।”

সিতাংশু একটা টাকা কেলে দিয়ে চলে গেল। পছন্দ থেকে ডাক্তার চ্যাটার্জী বললেন, “ও মশাই, চেকটা নিরে যান।” কিন্তু সে ফিরল না।

* * *

শরৎ বাড়ী আসতে তার মা খুব বকতে শুরু করলেন। তার অপরাধ সে গিয়ে মাত্র একখানা চিঠি দিয়েছিল। নিশাও খুব রাগ করেছিল। শরৎ তাকে চুপি চুপি বললে, “ক-দিন বাদে আর রাগ করবে না।”

নিশা কিছুই বুঝতে পারলে না। শরৎ বললে, “দেখ আমাদের এখন কিছুদিন তোমার দাদার বাড়ী গিয়ে থাকতে হবে।”

“কেন ? না সেখানে আমি যাব না।”

“যা বলছি শোন না। তোমার দাদা কলকাতায় আসছেন।”

“দাদা ? সে কি ? তুমি কি ক’রে খবর পেলেন ?”

“আমার এক বন্ধু টেলিগ্রাম করেছে।”

“তিনি দাদাকে চিনলেন কি ক’রে ?”

“কি বিপদ ! চেনা কি অসম্ভব ? সে চেনে তাই লিখেছে।”

সিতাংশু বাড়ী এসে শরৎ আর নিশাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। শরৎ বললে, “কিছু মনে করবেন না, বাড়ীটা পড়েছিল কি না তাই...”

“বেশ করেছ। হ্যাঁ, এলাহাবাদে তোমার কোন চেনা লোক আছে কি ? ডাক্তার...”

“স্বনীল চ্যাটার্জী—সে আমার বিশেষ বন্ধু। চমৎকার লোক...”

“আমার তা মনে হয় না।”

“বলেন কি ? চমৎকার লোক ! সে কি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে ?”

“সে সব অনেক কথা, পরে হবে। নিশা কই ?” নিশা এসে তাঁকে নমস্কার ক’রে কাঁদতে লাগল। সিতাংশু তার মাথায় হাত দিয়ে বললে, “কাঁদছিল কেন ? ফিরে এসেছি ত। শবৎ গেল কোথায় ? আচ্ছা থাক, তুই বোস।”

নিশার সঙ্গে এলাহাবাদেব গল্প করতে করতে কতক্ষণ কেটেছিল বলা যায় না। হঠাৎ সামনে জটিলানন্দকে দেখে সিতাংশুর চমক ভাঙল। সে কিছু বলবার আগেই স্বামীজী বললেন, “তুমি বড় অবিবাসী, সম্মান তোমার হবে না। এই নাও তোমার বাড়ীর দলিল।

দলিলটা দেখে নিয়ে সিতাংশু বললে, “এ কি করেছেন ? কার নামে.....”

“যে সত্যি পাবে তারই নামে লিখে দিয়েছি। অমলাকে কাছে গেলে আশীর্বাদ ক’রে যেতাম।”

নিশা সিতাংশুর কানে কানে বললে, “দাদা, ও সত্যি সম্মানী নয়, দেখ না ওর দাদা চুলের মধ্যে থেকে কাল কাল চুল দেখা যাচ্ছে।”

সিতাংশু টপ ক’রে জটিলানন্দের চুল ধ’রে টান দিলে।

সম্মানীর নৃতন চেহারা দেখে নিশা মাথায় কাপড় টেনে দিলে। সিতাংশু বললে, “তোমার এই কীষ্টি !”

শরৎ হাসতে হাসতে বললে, “না ক’রে কি করি বলুন ; এদিকে নিশা কাঁদছে, ওদিকে অমলা দেবী কাঁদছেন। আর দূরে...”

“দূরে কি ?”

নিশা টানতে টানতে অমলাকে এনে হাজির করলে।



আদিম ধরনী

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য

হে! আদি সরলা পৃথি, সৃষ্টির সবুজ শতদল,
গন্ধে গীতে ছন্দে রসে পূর্ণা তুমি ছিলে মা নির্মল।
অনাদি আনন্দভঙ্গ-গন্ধ হ'তে সাকার শরীরী,
অমরে প্রণব গান উঠেছিল তোরে ঘিরি ঘিরি।
আদিম রঙীন প্রাতে আদিভোরে করি প্রদক্ষিণ,
তোরি শ্রাম কটি-নৃত্যে জেগেছিল ছন্দ মা নবীন।
অরুণ রসের কেন্দ্রে ব্রহ্মরসে দানা বেঁধে অগ্নি,
চন্দ্র-চন্দ্রালী তুই স্বপ্নে মা হলি রূপময়ী।
সৌরজগতের মধুরাসনুত হিম্মোল-স্বপনে,
প্রথম ঝরিল মধু তোরি আদি শ্রামকুণ্ডবনে।
বিন্দু দেহে বহে যেত অবিরল আনন্দের ধার,
উবার কনকবস্ত্রা চন্দ্রমার জ্যোৎস্না-পাথর,
ধূয়ে দিয়ে যেত নিত্য তব শ্রাম-সবুজ প্রাঙ্গণ;
বক্ষে তব নিরুদ্বেগে ছিল ওগো নিম্নাজাগরণ।
বান্ধাবিঘ্নানিহীন তোমার শিশুর চিন্তাকুখা,
তোমারে অধগু করি করিত মা ভোগ তব সুখ।
সে আনন্দসুখা তোরে কে ভরিয়া দিল হলহলে,
তোটি পাকে আজি তুই জর্জরিতা শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে।
তোর মুক্তিকার আজি ভোগলু মানবের পাপে
ক'মবহি জলে উঠি ভরে দিল তোরে তাপে তাপে।
অনন্ত যুগের তাপে বক্ষে তোরে উড়ে অগ্নিধূলি,
দহ মুক্তিকার তব আত্মা আজি উঠেছে আকুলি।
কুণ্ডিত সম্ভান কাঁধে অস্ত্র দিকে বিজ্ঞান-বিলাসী,
যন্ত্রের মালায় বাঁধি করিবারে চাহে তোমা দাসী।

তুই যে শক্তির কন্ডা গর্জ্জে ওঠ আজি একবার,
বক্ষে তোরে ঋষিপুত্র করিয়া উঠুক হৃদয়কার।
দস্তী তমঃরাজসিক-বৃত্তকার অনন্ত বাঁধন
ছিন্ন হোক। বিজ্ঞানের সর্বগ্রাসী কুখা আয়োজন
চূর্ণ হোক রেণু সম। খণ্ড খণ্ড ভাগ করা কাল,
স্নিগ্ধ তব বক্ষ ঘেরি মহাকাশে হটক বিশাল।
তোর মুক্তিকার 'পরে যৌত করি পাগতাপন্নানি,
পুনঃ মা পড়ুক মন্ত্র নব শিশু আনন্দসম্ভানী।
পুত্রকন্ডা পুনঃ তোরে দেবজন্ম লভি দেহে প্রাণে,
জীবন-উৎসব তার মিশাক মা তব ছন্দে গানে।
পুনঃ মাগো স্বর্গ হ'তে দেবদেবী স্থাপাত্র হাতে
বক্ষে তোরে নেমে আসি স্নিগ্ধহাস্তে মানবের সাথে
বাঁধুক মিলন-গ্রন্থি। আবার আত্মক শাস্তি ফিরে,
জড়াইয়া ধরি তব আদিম সে স্বপ্নরাজ্যটিরে।
নদীতীরে শৈলে বনে অপ্সরীরা পুনঃ জেগে উঠি
বীণ বাজাইয়া মাগো মেলে দিক মুক্ত আঁধি ছুটি;
তোর সর্বদেহ 'পরে খুলে যাক বৈকুণ্ঠের দ্বার,
জরা মৃত্যু জয় করি পুত্র তোরে দাঁড়াক আবার;
গীতে গন্ধে সারা সৃষ্টি করিয়া উঠুক গুণরণ,
মুক্ত হয়ে খুলে যাক বক্ষে তোরে অবাধ জীবন।
রঙীন সে স্বপ্নরাজ্যে দাঁড়া মা আবার কাব্যময়ি,
সৃষ্টির সকল মধু বক্ষে তোরে ঝরে যাক অগ্নি।
মা তোরে আদিম গেহে ডেঙে যাক সকল বাঁধন,
অসীম জীবনে পুনঃ মাতা পুত্রে হোক আলিঙ্গন।



বিদেশী রাজকুমার

শ্রীশ্রীল জনা

রূপকথার কুমারী স্বপ্ন দেখিতেছে।...

সোনার বরণ রাজপুত্র আসিবে নিভুতে নির্জন নিশীথে
পক্ষীরাজ বোড়ার চড়িয়া—অদূরের গুবাক-তরুর শ্রেণী
আকুল হইয়া উঠিবে তাহাব আগমনে—আচমকা দম্কা
হাওয়া বনবনান্তে এ-খবরটা জানাইয়া দিয়া আগে আগে
ছুটিয়া আসিবে। ঘুমন্ত পুরীর প্রহরী শুধাইবে—কে যায় ?
...বাতাস কুমারীর ঘরেব ঝাড়লগ্নন হুঁন্ হুঁন্ করিয়া
ঝাঝাইয়া, কুমারীর মেঘবরণ চুল উত্তলা বিস্তৃত করিয়া
কানে কানে বলিবে—জাগো কস্তা জাগো, রাজকুমার
আসিতেছে তোমাকে বরণ করিতে। বন্দিনী কুমারী
তক্ষাচ্ছন্ন তমসায় জাগিয়া উঠে। কুঁচবরণ অঙ্গ তার মেঘ-
বরণ চুল—আনন্দে পরিপাটি করিয়া সাজে—প্রিয়, তাহার
রাজকুমার আসিবে যে। কুমারী কত আয়োজন করে।
ওদিকে ঘুমন্ত পুরীতে সকলে জাগিয়া উঠে। সর্বনাশ,
সকলে জানিতে পারিয়াছে—বন্দিণীর বৃদ্ধি আর উদ্ধার
হইল না। তরবারি ও খড়্গের ঝনঝকারে রণ-দেবতার
আস্থান শোনা যায় যেন। তাব পর...

চন্দ্রলেখা এই রকম একটা গল্প বলিয়া চলিয়াছিল—
হঠাৎ ধম্কাইয়া বলিল—যাঃ, তুলে গোলাম ত। থাম,
মনে করি।...

মনে করিবার আর সুযোগ মিলিল না—ওধার হইতে
দাদা নিমাইচরণের আস্থান আসিল—চন্দ্র রে, হু-ছিলিম
তামাক বেশী দিস—হারামাণিকের মাঠে কুইতে যাব।
জলটা আজ ধরেছে যখন—দূরেরটা সেরে আসি।

শুধু হারামাণিকের মাঠে নয়—এমন আরও অনেক
মাঠে নিমাইয়ের এখনও ধান্ডরোপণের কাজ শেষ হয়
নাই—চাবীদের মধ্যে সে খানিকটা পিছাইয়া আছে।

চন্দ্রলেখা গল্প ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্রোতা
শব্দমালাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—তুই ব'স শব্দ—আমি
আসি...মনে করি তত্তক্ষণ। চন্দ্রলেখা বাহির হইয়া

আসিল—আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, জল থামিয়া
গিয়াছে আজ দীর্ঘ পাঁচটি দিনের পর। আকাশের ঘোর
ঘোর ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে। পুঞ্জীভূত কালো মেঘের
শুধায় সূর্যকে বহুদিন পরে দেখা যাইতেছে। চন্দ্রাকর
নীচির পাড়ে কয়েকটা সারস লাকাইয়া লাকাইয়া পোকা-
মাকড় ধরিয়া থাইতেছিল—হঠাৎ আকাশের দিকে চাহিয়া—
উড়িয়া গেল—বোধ করি বিগত বর্ষাঘন মেঘাঙ্ককার
দিনগুলার কথা আচম্কা মনে পড়িয়া গিয়াছিল।

চন্দ্রলেখা নিমাইয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল—অত জমি
এখনও বাকী—এক জন লোক করছ না কেন দাদা।

নিমাই মুখ ভার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিল লোক কবলে
পয়সা চাই—অত খরচা করব কোথা থেকে। তোর বিয়েব
জন্তে কিছু জমাতে হবে ত।

চন্দ্রলেখার আর শুনিবার খৈর্য রহিল না—হুম্ হুম্
কবিয়া পা ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। নিমাই
সঙ্গেহে তাহার চলনের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া একটু
হাসিল, তার পর বলিল—সত্যি কথা বললেই ত রাগ
হবে। কিন্তু একা মায়া খেটে খেটে মরে যাচ্ছি—আর
পারি না। বলিয়া ফেলিয়াই নিমাই সভয়ে তাড়াতাড়ি
সরিয়া পড়িল, চন্দ্রলেখার নিয়মিত সক্রোধ কান্নাকাটি
শুনিবার জন্ত আর দাঁড়াইতে ভরসা পাইল না। চন্দ্রলেখা
ক্রুদ্ধ হইয়া কি একটা কথা বলিবার জন্য যেন ফিরিয়া
দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু দাদার রকম-সকম দেখিয়া সে রাগিতে
গিয়া হাসিয়া ফেলিল।

নিমাই যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ইহাদের এমনি বিবাদ
মিলনে, হাসি ও রাগে একটা কোলাহলের মধ্য দিয়া সময়টা
কাটিয়া যায়, কিন্তু নিমাই মাঠের কাজে বাহির হইয়া
গেলে চন্দ্রলেখার সময় যেন আর কাটে না। চরকা ঘুরাইয়া,
ফুলা পিজিয়া, পা ছড়াইয়া সশব্দে তেঁতুলের চাটনি কিছুক্ষণ
খাইয়াও অনেকখানি সময় নিঃসঙ্গ নির্জনে রহিয়া যায়।

সেদিন অবশ্য চন্দ্রলেখার ভারাক্রান্ত অবসরের ভয় ছিল না, কারণ গল্পের প্রোতা শঙ্খমালা তখনও দুয়ারে বসিয়া।

চন্দ্রলেখাকে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শঙ্খমালা বলিল—কই গো চন্দ্রদি—বলো গল্প।

চন্দ্রলেখা তুলিয়া-বাঁওয়া গল্পটা কিছুক্ষণ মনে করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া বলিল—ভুলে গেছি রে—মনে ত পড়ছে না। আজ থাক—বরং চল বংশীদা'কে দেখে আসি—জলের জন্তে সকালে আজ যেতে পারি নি। জর হয়েছে—কেউ নেই দেখবার। চল তাকে দু-জনে দেখে আসি।

বংশী ইহাদের প্রতিবেশী—অর্থাৎ এই সব প্রতিবেশীর সাড়া পাইতে হইলে গলা কাটিয়া বাইবার উপক্রম। এত বড় কলমৌলতা গ্রাম কিন্তু বড় জোর বিশ ঘর প্রজার বাস—সকলেরই বৃত্তি চাষ-আবাদ। ফাঁকে ফাঁকে ঘর—প্রতিবেশীর খোঁজ পাইতে হইলে রীতিমত কষ্ট স্বীকার করিতে হয়।

নিমাইচরণের এক পুত্র দত্তদের এই চন্দ্রাকর দ্বীপ চৌকি দিয়া দীঘির পাড়েই কাটাইয়া গিয়াছে—তাহাকেও কাটাইতে হইবে। চন্দ্রাকরে বছর বছর নতুন মাছ ছাড়া হয় এবং কয়েক বছর বাদ দিয়া দিয়া মাছ ধরা হয়—ইহাতে বেশ দু-পয়সা দত্তরা উপার্জন করে। কিন্তু পুতুরটা আবার এমনি ফাঁকা মাঠের মাঝখানে যে চৌকির ব্যবস্থা না করিলে পুত্রে একটা চাঁদা পুঁটিও থাকিবে না। কেহ যদি মাছের বদলে পুতুর চুরি করিয়া লইয়া বাইতে সমর্থ হয় তাহা হইলে কাকপক্ষীতেও খবরটা পাইবে না। তাই পুতুর হইতে বাহাতে বোল আনাই লাভ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে গিয়া নিমাইচরণের বাবাকে কিছু জমি-জায়গা দিয়া দীঘির পাড়েই ঘর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল—এবং সে ব্যবস্থা এখনও আছে।

চন্দ্রলেখা শঙ্খমালাকে বলিল—চল না যাই দু-জনে—কেমন? বংশীদা বেচারী...

বংশীর জর হইয়াছে—দেখিবার তাহার কেহই নাই। নিঃসঙ্গ অবস্থায় একদিন সে এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং আর দশ জনের মত দত্তদের প্রজা হইয়া চাষ-আবাদ শুরু করিয়াছিল। ইহা ছাড়া সে ছোটখাট

একট দোকানও নিজের চালান্বয়ের এক পাশে শুরু করিয়াছিল—বর্ষার প্রারম্ভে চাষের সময়টায় দোকান তাহার বন্ধ থাকিত। এ বৎসর চাষও তাহার বন্ধ ছিল—ম্যানুরিয়ায় তাহাকে কাবু করিয়া ফেলিয়াছে একেবারে। তাহার নিঃসঙ্গ মলিন রোগশয্যায় সে জরের ঘোরে পড়িয়া থাকিত—জর হাড়িলে সামান্য খুঁটিনাটি কাজ-কর্মগুলি কোনো রকমে সারিয়া রাখিত পুনরায় আগামী জরের জন্য। কোনো কোনো দিন চন্দ্রলেখা আসিয়া তাহার সমস্ত অভাব-অভিযোগগুলি একে একে সারিয়া দিয়া বাইত।

সেদিন বংশী যখন জরের ঘোরে পড়িয়াছিল তখন চন্দ্রলেখা শঙ্খমালাকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। বংশীর কোনো সাড়াশব্দ না পাইয়া চন্দ্রলেখা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—বংশীদা কি ঘুমিয়েছে?

বংশী রক্তবর্ণ হুইটা চক্ষু মেলিয়া বলিল—কে চন্দ্র!...উঃ বড় শীত করছে রে!...একখানা কাঁথা দিতে পারিস। এন্টাতে হচ্ছে না।

ক্রমাগত কয়েক দিন জলের জন্য মাটির মেঝে স্যাং স্যাং করিতেছে। সেই ভিজা মেঝের ওপরেই একখানা পাট্টা পাতিয়া একখানা শতছিন্ন কবল গায়ে মুড়ি দিয়া বংশী জরের ঘোরে কাঁপিতেছে। এই লোকটা এই অবস্থায় যে কত অসহায় তাহা ভাবিয়া চন্দ্রলেখার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। ঘরের চার দিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইয় বলিল—কই, কোনো কাঁথা ত দেখছি নে।

বংশী অপ্রতিভ হইয়া বলিল—তাই ত কাঁথা থাকবেই বা কোথা থেকে, কবেই বা আর সেলাই করলাম—আর গুনব কি আমি জানি ছাই। থাক তবে থাক। বংশী কিছুক্ষণ হাঁ হাঁ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পুনরায় বলিল—আমাকে একটা কাঁথা তোর সময়মত সেলাই করে দিন—ত চন্দ্র—যা থরচ পড়বে আমি দেব।

এই বংশী লোকটা বড় অসহায়—এখন ত বটেই, ভ্রূ ছাড়া যখন ভাল ছিল তখনও। অসহায় পুরুষের সংসারিক নিবৃত্তিতা দেখিয়া চন্দ্রলেখার নারীস্বের মায়া গোড়া হইতেই বংশীর উপরে সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই বংশী যখন প্রথম আসিয়াছিল, এই জনবিরল কলমৌলতা গ্রামে যখন প্রথম সংসার পাতিবার উত্তোগ করিয়াছিল, তখন

একদিন সে অতি দুঃখের সঙ্গেই নিমাইকে বলিয়াছিল—
তোমাদের মত আমার একটা ভাল উলুন নাই—রান্না
করতে এমন কষ্ট হয়। তৈরি করতে জানি নে তা কি করব।
কেউ যদি তৈরি ক'রে দিত ত বড় ভাল হ'ত। পরমা-
কড়ি ত দিতে পারব না, তবে একবেলা জন খেটে
দিতাম। দু-পহব আড়াই পহরের সময় খেটে খুটে কিরি,
খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করে একে তার ওপরে উলুনের
জন্তে রান্নার দেয়ি।...এই কথার পর নিমাইয়ের
অল্পমতিক্রমে চন্দ্রলেখা গিয়া বংশীর উনান তৈরি করিয়া
দিয়া আসিয়াছিল এবং সেই হইতে অনেক সময় নিমাইয়ের
অল্পমতির অপেক্ষা না করিয়া এই অপটু লোকটির বহু
কাজ-কর্ম সে করিয়া দিয়া যাইত। আজ আবার কাঁথার
অভাবে বংশীব শীতের কষ্ট দেখিয়া সমবেদনায় চন্দ্রলেখার
অন্তরটা নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিল এবং তাহার মনে
হইল, বংশীর এ-কষ্টের জন্ত যেন সে-ই অনেকটা দায়ী। এই
অবোধ লোকটির ত কোন দিকেই খেয়াল নাই, স্পৃহা
নাই—চন্দ্রলেখারই উচিত ছিল, সময়মত একটা কি ছুইটা
কাঁথা তৈরি করিয়া দেওয়া।

চন্দ্রলেখা চঞ্চল হইয়া বলিল—ঘর থেকে আমি একটা
কাঁথা নিয়ে আসি থাম।

কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রলেখা গোটা দুই কাঁথা এবং বালিশ
সহিয়া কিরিয়া আসিল। ইত্যবসরে শঙ্খমালা আজ আর
গল্প হইবে না—এই দুঃখে চলিয়া গিয়াছে। চন্দ্রলেখা
বংশীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—তুমি একটু উঠে ব'স—আমি
বিছানাটা পেতে দিই।

বংশী কঁদল জড়াইয়া উঠিয়া বসিল। চন্দ্রলেখা বিছানা
পাতিতে গিয়া দেখিল—বংশী যাহা বালিশ হিসাবে ব্যবহার
করিতেছিল তাহা একটা ত্রাকড়া-জড়ানো খড়ের বিড়।
চন্দ্রলেখা হাসিয়া বলিল—এইটে এত দিন মাথায় দেওয়া
হ'ত।

বিছানা পাতা হইলে বংশী আসিয়া কাঁথা ও কঁদল মুড়ি
দিয়া শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুইয়া থাকিবার পর
পুনরায় সে হ' হ' করিতে লাগিল। চন্দ্রলেখা জিজ্ঞাসা
করিল—সাবু-বার্লি কিছু খেয়েছ বংশীদা?

বংশী উত্তর দিল—কে আর তৈরি করে চন্দ্র—থাক

ও-সব। জ্বরে জ্ববে ত শেষ রাত থেকে এ-পর্যন্ত কেটে
গেল। খিদেও নেই।

—খিদে নেই, না তৈরি ক'বে খেতে পারি নি। চন্দ্রলেখা
কোমল কণ্ঠে বলিল, আমিও জ্বলের জন্তে আর কাজের
তাড়ায় সকালে আসতে পারি নি—তোমার যখন এমন
তখন কারুর হাতে একটু খবর দিয়ে পাঠালে না কেন। এমন
লোক আর কোথাও দেখি নি।

বংশী নিরুত্তরে কাঁপিতে লাগিল। চন্দ্রলেখা বলিল—
এক কাজ কর তুমি বংশীদা—জ্বর যে-পর্যন্ত না সারে সে
পর্যন্ত তুমি আমাদের ঘরে থাকবে চল। ভাত্তার-বাদ্য
ভেকে...

বংশী এইবার কথা বলিল নিতান্ত হতাশায়—এ-গায়ে
ভাত্তার-বাদ্য কোথায় চন্দ্র—পাশ-পাশি চার-পাঁচটা
গেরামেই নেই, যা আছে সেই গজের হাটে। কিন্তু তাদের
মানতে অনেক টাকার দরকার চন্দ্র—অত টাকা আমার
নাই। বছরের ধান বছরে কুলায় না, তার পর এ-সনে কি
হবে কে জানে! মহাজনের কাছে মাথা নোয়ালে কি আর
নিজার আছে।

চন্দ্রলেখা বলিল—তবু একটু ওষুধ-টম্বুদ...

বংশী উত্তর দিল—হ্যাঁ, আমাদের আবার ওষুধ—মরলেই
ফুরিয়ে গেল।

চন্দ্রলেখা বিরক্ত হইয়া বলিল—দাদার রোগে তোমাকেও
ধরছে তা হ'লে!

বংশী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া উত্তর দিল—সকলেরই ওই
এক কথা চন্দ্র—গরীব লোক আমরা, মরণই আমাদের শেষ
ওষুধ। তা ছাড়া কপালটা আমার বড় মন্দ—এই যে
জ্বর একটু সেবাবত্ত পাই—এই যথেষ্ট চন্দ্র, এর বেশী কিছু
হাবতে ভগবান আমাকে দেয় নি। এইখানে বেশ আছি।

চন্দ্রলেখা অভিমানভরে বলিল—না দেয় নি। আমাদের
কর গেলে কি তোমার অপমান হবে!

বংশী নিরুত্তর।

কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রলেখা চলিয়া গেল। বংশী তাহারই
কথাগুলি ভাবিতে লাগিল। চন্দ্রলেখার আমন্ত্রণে সে
নানন্দেই সম্মতি দিতে পারিত কিন্তু নিমাইয়ের বিনা মতে
সে কেমন করিয়া ঝট্ করিয়া রাজী হইতে পারে।

বাহিরে তখন আগামী বর্ষার ছুঁচোগে আবার ঘনাইয়া উঠিতেছিল। চন্দ্রাকরের পাড়ে সমস্ত গাছ আতকে যেন পাখুর হইয়া উঠিয়াছে—কৃষ্ণ-সবুজ রঙের পরিবর্তে কেমন একটা ক্যাকাসে রঙের আভা তাহাদের, আকাশে গাং-চিলের দল বাতাসের বেগে অস্থির ভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছে, কালো কালো মেঘের দল তবু তবু করিয়া প্রখর সূর্যের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল—তাহাদের চঞ্চল ছায়াগুলি ক্ষণিকের রৌদ্রদগ্ধ ধরণীর উপর দিয়া ক্ষুণ্ণবেগে ছুটিয়া বাইতেছে, চন্দ্রাকরের গভীর নীল জল বাতাস লাগিয়া আশ্রনার মত সাদা ধব্ ধব্ করিতেছে, কোন বনে একটা ডাহক আতঙ্কিত একটা যুঘুর সঙ্গে সানন্দে পান্না দিয়া চলিয়াছে অশ্রান্ত কণ্ঠে, নারিকেল গাছের শ্রেণীগুলি ডাল-পালা সমেত যেমন ভাবে একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—মনে হয়, এই বুঝি ভাঙিয়া পড়িল। ঝড়ের বাঁশীর স্বরে বর্ষার বিলাসচঞ্চল নৃত্য শুরু হইল।

সন্ধ্যার দিকে বংশীর সুরটা ছাড়িয়া গেল।

এই ছুঁচোগে তাহারই ঘরের বাহিরে নিমাইয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ব্যস্ত হইয়া ছমার খুলিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিল—এমন সময়ে যে নিমাই!

—আর ভাই—টিকতে পারলাম না ঘরে। নিমাই ভণিতা করিয়া বলিল, চন্দ্রব কথা আর শুনতে পারলাম না। চল ভাই চল, তোমার লেপ-কাঁথাগুলো আমাকে দাও।

বংশী সাম্রথ্যে বলিল—কোথায় যাব?

—আমার আস্তানায়। হাসিয়া বলিল—আলসে লোক চন্দ্রর ছু-চন্দ্রের বিষ, কিন্তু তোমার কি সৌভাগ্য, আজও তুমি তার একটুও বহুনি খেলে না, বরং আমিই খেলাম বহুনি।

বংশী আগাগোড়া সমস্ত বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল, তাহাকে লইয়া বাইবার জন্য চন্দ্রলেখা তাহার দাদাকে পাঠাইয়াছে। একটা অশরীরী পুলক বংশীর সারা রক্ত দেহে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইল, এই ঝড়-বাদল মাখায় করিয়া এইক্ষণেই সে ছুটিয়া যায়। যদি মৃত্যু হয় ত সেইখানেই হইবে। নিমাইয়ের তাগাদা পাইয়া বংশী আশ্রয় হইল, বলিল, রুগী মানুষ—এই ঝড়-জলে যাব কি করে ভাই, বরং কাল সকালেই আমি যাব। তোমরা

আছ বলেই বেঁচে আছি রে দাদা—চন্দ্রকে বলো, কাল যাব।

বংশী এক দিন নিমাইকে একান্ত পাইয়া বলিল—সংসারাক বড় ভয় করতাম নিমাই, কিন্তু তোমাদের আশ্রয়ে এসে আমার ভুল ভেঙে গেল।

নিমাই হাসিয়া বলিল—চন্দ্রর এখনও বহুনি খাও নি বংশী—থেকে ফের ভয় পেয়ে যেতে। আমি ত ওর ভয়ে সংসার এখনও করি নি। এক মেঘের যে বহুনি, আরও এক জন এলে সামাল সামাল কাণ্ড। হতভাগীকে বিদায় করতে চাই—বলি, আর মায়া বাড়াস নি চন্দ্র, কিন্তু ও এমন ভাবে ডাকায়!...কখনও বলে, আমাকে ত ডাতে চাও দাদা!—আবার কখনও বলে, তুমি বিয়ে কর—বৌকে আগে ঘর-সংসার বুঝিয়ে দিই...

বংশী বাধা দিয়া বলিল—এবার সোর উঠলে আর দেখি না নিমাই—চন্দ্র আমার ভুল ভেঙে দিয়েছে। তখন তোমার কথায় কান দিই নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ওর হাতের গড়া সংসারে ছুঁখ থাকবে না।

নিমাই উৎসাহিত হইয়া বলিল—আমি বলছি বংশী, তুমি স্থখী ছব—চন্দ্রও আমার স্বখে থাকবে—আমারও কাঁথ থেকে একটা স্তার নামে।

এমন সময় চন্দ্রলেখা এক বাটি নাবু লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। নিমাই কাজের ছুতায় উঠিয়া গেল। চন্দ্রলেখা বংশীর স্বথের কাছে সাবুর বাটিটা তুলির ধরিতে বংশী এক নিখাসে সেটুকু খাইয়া ফেলিল। তান পর একটা ভূপ্তির নিখাস ফেলিয়া বলিল—আরও এক বাটি খেতে পারি।

—আনব?

বংশী হাসিয়া বলিল—না না—এমন বলছিলাম। আচ্ছা চন্দ্রলেখা, তোমার ঋণ আমি শোধ করব কি করে বল ত? চন্দ্রলেখার মুখ চোখ হঠাৎ চক্চক করিয়া উঠিল—বলিল, জানি না। বলিয়াই সে এক মুহূর্ত্ত মাত্র বংশীর দিকে কোঁতক-দৃষ্টিতে ডাকাইয়া ক্ষুণ্ণবেগে চলিয়া গেল এবং ইহাতে তাহার সব জানা প্রকাশ হইয়া পড়িল যেন।

বংশী বসিয়া ছিল—শুইয়া পড়িল। একদিন তাহার স্বপ্নের মত কাটিয়া গিয়াছে। চন্দ্রলেখার পরিচর্যা তাহার

বৈরাগী অন্তরে কেমন এক রকম মধুর স্বাদের তুলিয়া ভবিষ্যতের কত মনোরম ছবির পর ছবি স্রষ্টি করিয়া যায়। বালীর স্বর্ণময় অশ্বজিকর রোগশয্যা স্বপ্ন-স্বপ্নের শয্যা পরিণত হয়।

সেদিন নিমাই মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া খবর দিও, দস্তাবাদের বিরাট জমিদারীর একমাত্র মালিক সহদেব দস্ত চন্দ্রাকরে মাছ ধরিতে আসিবে। আসিবে আনিবে বলিয়াও সহদেব দস্ত যদিও কোনো দিন আসে নাই—তাহা হইলেও কলমীলতার প্রজারা প্রত্যেকবারই তাহার আগমন আশা করিয়াছে। বহু রকম তাহাদের খুঁটিনাটি অল্পবোণ—যেগুলো সেই অনাগত প্রসূর প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা পূর্ণ হয় নাই সেগুলো সকলেই এই সংবাদে এক-একবার মনে মনে ঝালাইয়া লইয়া এবারেও প্রস্তুত হইয়া রহিল। এবার আসিয়া পৌঁছিলে হয়।

নিমাইয়ের উৎসাহ দেখিয়া চন্দ্রলেখা বলিল—আসবে না আরও কিছু। মিথ্যা লাফালাফি।

নিমাই উত্তেজিত হইয়া বলিল—কি যে বলিস্! ঠিক আসবে—তঁার কথা কখনও মিথ্যা হয় না। অমন লোক আর জিজ্ঞাসবনে হয় না।

চন্দ্রলেখা হাসিয়া বলিল—দাদা অত গুণগান করছ—বাবু শুনতে পেলে তোমাকে শেষকালে এখন বারো চকের নায়েব করে দেবে। তার পর আসন্নগত হইয়া বলিল, তবু যদি তাঁকে চোখে দেখতে...।

এ অপমানে নিমাই রাগিয়া উঠিল। বলিয়া চলিল—দেখি নি কি রকম! আলবৎ দেখেছি। লম্বা রকম স্তম্ভর মত চেহারা—গোঁফ জোড়াটা দেখলেই ত মাথা ঘুরে যায়। তার পরেই নিমাই গোলমাল করিয়া কেলিল। কতকগুলো মিথ্যা কথা বলিতে গিয়া, মনের মত অপকল্প করিতে গিয়া আকৃতি বর্ণনা একবার এক রকম বসিয়া পুনরায় তাহার উটনাঙলা বলিয়া চন্দ্রলেখার উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া লাফাইতে লাগিল। কিন্তু চন্দ্রলেখা সে-সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলে পরাজিত নিমাই মুখ কালো করিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল।

পরে কিন্তু চন্দ্রলেখা তাহার দুর্বল মুহুর্তে নিমাইয়ের নিকট পরাজিত হইল। নিমাইয়ের কেমন রোক্তাচাপিত

গিয়াছিল—সে যে সহদেব দস্তকে দেখিয়াছে এ-কথা চন্দ্রলেখাকে স্বীকার করাইবেই।

চন্দ্রলেখা স্বীকার করিল—মুগ্ধ হইয়া শুনিব সহদেব দস্ত সম্বন্ধে কলমীলতা গ্রামে প্রচলিত সমস্ত অপূর্ব গল্প। তাহার রূপমুগ্ধ চক্ষে ছুটিয়া উঠিল অজ্ঞাত সহদেব দস্তের অপূর্ব তরুণ মূর্তি। অঙ্গের বর্ণ যাহার দুধ-আলতার রংকণ্ড পরাজিত করিয়াছে, গভীর উদাস বৈরাগী দৃষ্টি যাহার সদানন্দে ঝলমল করিতেছে, কঠোর স্বর যাহার গহন রাতের দূরগত বাঁশীর সুরের মত ঘর-ছাড়ানো মুগ্ধকর, স্তম্ভময় দেহে শক্তি যাহার অসীম তাহাকে চন্দ্রলেখার ভাল না লাগিয়া পারে কি করিয়া।

চন্দ্রলেখা উৎসুক কণ্ঠে বলিল—সত্যি কি তিনি আসবেন দাদা?

নিমাই বিজয়গর্বে বুক চিতাইয়া বলিল—আসবে বইকি বে। চন্দ্রাকরে কতদিন আজ মাছ ধরা হয় নি—মাছের গায়ে নীল পড়ে গেল। ওই ঈশানকোণের দিকটার ছজুরের সঙ্গে একটা মাচা বাঁধতে হবে—মাছ ওইখানটাতেই থাকবে বোধ হয়। কিন্তু আসল কথা, গরীবের ঝুঁড়েঘরে ছজুরকে ওঠাব কি করে।

চন্দ্রলেখা বিহ্বল হইয়া বলিল—কেন দাদা—তিনি ত কাছারিতে থাকবেন।

—তাই কি হয় রে। নিমাই গভীর চালে হাসিয়া বলিল, জলবর্ষার দিন—মাছ ধরতে সন্ধ্যা ত হবেই। রাতে তিনি কি আর কাছারিতে ফিরবেন।

আয়োজন শুরু হইয়া গেল।

চন্দ্রাকরের ঈশানকোণে মাচা বাঁধা হইয়া গিয়াছে। পুকুর-পাড়ের আগাছা-জলল অঙ্গে অঙ্গে পরিষ্কার হইয়া গেল; সহদেব দস্ত এবার মাছ ধরিতে আসিবেই।

সেদিন কে একজন ঘেন ছোট্ট একখানি ছিপ লইয়া চন্দ্রাকরের এক কোণে বসিয়া মাছ ধরিতেছিল—চন্দ্রলেখা দেখিতে পাইয়া হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া গেল, মাছ এমনি পাঁচ ভূতের হাতে গেলে বাবু কি পুকুর দেখতে আসবেন নাকি।

লোকটি অপ্রতিভ হইয়া বলিল—এই পুঁটি মাছ দু-একটা...

—তা-ই বা ধরা হচ্ছে কোন হিসাবে। চন্দ্রলেখা ক্রিয়য়া দাঁড়াইল। বলিল, হুন খাচ্ছি যার তার কাছে বেইমানী করতে পারব না। তুমি উঠে যাও—না হলে নাযব বাবুকে জানাব।

লোকটি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া গেল। চন্দ্রলেখা ক্রিয়য়া আসিল। সহদেব দস্ত আসিতেছে—এবং তাহারেরই এই ঘরে। চন্দ্রলেখা মাতিয়া আছে। এই কয়দিনে বহুকষ্টে সে রূপশাল ধান সিদ্ধ কবিয়া দুয়ারে বিছাইয়া বিছাইয়া শুকাইয়া লইতেছে—শীতাই আবার ভাল করিয়া ছাঁটাইয়া ভানিয়া লইতে হইবে; সৌখীন জমিদারের মুখে ত অবশেষে মোটা লাগ চালাইতে না।

চন্দ্রলেখা ক্রিয়য়া আসিয়া কাঁথা সেলাই করিতে বসিল। কাঁথাটা সহদেব দস্তের উদ্দেশ্যে সেলাই হইতেছে। বর্ষের দিনে রাঙে হঠাৎ শীত করিলে হয়ত সেই অপবিচিত্র শীতাত্তর লোকটির প্রয়োজনে লাগিতে পাবে। চন্দ্রলেখা অতি-যত্নে কাঁথার উপরে ফুলের পর ফুল—ফুলের ফুলের লড়াপাতা তুলিয়া চলিয়াছে। নন্দা করিতে করিতে চন্দ্রলেখা ভাবিল, বংশীকে সম্ভ্রান্তি সে যে-দুইটা কাঁথা সেলাই করিয়া দিয়াছে সেগুলি থাকিলে তাহাকে আজ আর এত কষ্ট করিতে হইত না। কিন্তু বংশী লোকটা যেদিনই কাঁথা পাইয়াছে সেই দিনই গায়ে জড়াইয়াছে। সেটা ত আর হজুবকে দেওয়া চলিবে না। তাহা ছাড়া রোণীর ব্যবস্থার—যদি বিদেশ-বিদূর্যে তাহার কিছু একটা হইয়া পড়ে।

সহসা চন্দ্রলেখাকে সচকিত করিয়া বংশী ক্রীপাক্রমে ডাকিল—চন্দ্র, একটু জল...

চন্দ্রলেখা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। জল লইয়া বংশীর সম্মুখে উপস্থিত হইতেই বংশী বলিল—আজকাল এত কি কাজ পড়েছে চন্দ্র! ডাকলেও সাড়া পাই নে। বংশীর কঠোর অভিমানের সুব বাজিয়া উঠিল।

উত্তরে চন্দ্রলেখা শুকাইতে-দেওয়া ধানগুলার দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ধানের ওপরে জল অমন ভাবে ফেলল কে!

বংশীর মাথার কাছের দিকে চন্দ্রলেখা ধান শুকাইতে দিয়াছিল। বংশী অপ্রতিভ কণ্ঠে বলিল—ও আমিই ফেলেছি চন্দ্র। হাত লেগে হঠাৎ জলের গেলাসটা উল্টে...

চন্দ্রর আর কোন কথা শুনিবার দৈর্ঘ্য রহিল না। বিপুল বিরক্তিতে সে ভিজা ধানগুলার দিকে চাহিয়া রহিল। ধানগুলো অমনভাবে আজও ভিজিয়া থাকিলে কবেই বা সে এগুলো শুকাইবে, আর কবেই বা ভানিয়া চাল তৈরি করিবে। হজুবের আসিবার দিন ঘনাইয়া আসিল যে।

নিমাই সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ক্রিয়তেই চন্দ্রলেখা জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ দাদা, বাবু আসবেন কবে?

নিমাই বলিল—সবাই তো বলছে পরশু কাছারি বাড়ীতে এসে পৌছবে। তাহলে তার পর দিন সকালে আসবে মাছ ধরতে।

চন্দ্রলেখা চিন্তিত হইয়া বলে—কিছু শালিধানের চিড়ে যে করিয়ে রাখতে হয় দাদা।

নিমাই অপ্রতিভ হইয়া বলে—ঠিক বটে—আমার মনেই ছিল না।

সারা কলমীলতা গ্রামটা হঠাৎ যেন জাগিয়া উঠে—ঠিক এই চন্দ্রলেখার মত। প্রবলপ্রভাপাশিত বিরাট ক্ষমতাসালী সেই অনাগত লোকটি আসিবে—প্রজাদের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দুঃশিক্ষিতা বঞ্চিত জীর্ণ মলিন ফরয়ে লক্ষ রূপে ফেনাইয়া উঠে।

কিন্তু বংশী ওই অনাগত লোকটির সম্বন্ধে কোনো কিছু ভাবিয়া উঠিতে পারে না। রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়া সে কেবল নিজের কথাই ভাবে। তাহার মনে হয়, চন্দ্রলেখা তাহাব যত সন্নিকটে আসিয়াছিল যেন তাহার দ্বিগুণ দূরে সরিয়া গেল। এই কয়েক দিনের মধ্যে তাহার যেন একটা মস্ত ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। সেই অপরিচিত অনাগত লোকটির প্রতি একটা তীক্ষ্ণ-কুটিল দর্শন। তাহার দুই জলন্ত চোখে জাগিয়া উঠে।

অত সব লক্ষ্য করিবার মত চন্দ্রলেখার এখন অবসর নাই। কর্তব্যবস্ত চন্দ্রলেখার হঠাৎ তখন মনে পড়িয়া গিয়াছিল—হাটে একবার যাইতে হইবে এবং দিন থাকিতে

সমস্ত জোগাড় করিয়া রাখিতে হইবে। বিশেষ করিয়া কিছু মহায়া ফুল যেখান হইতেই হোক জোগাড় করিতে হইবে—না হইলে পিঠা সে কি দিয়া গড়িবে।

এমন সময় বংশীর আহ্বান আসে,—চন্দ্রলেখা।...

চন্দ্রলেখার স্বপ্নবিলাস ছুটিয়া গেল। সে উঠিয়া বংশীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আমাকে ডাকছিলে বংশীদা?

বংশী তাহার একাধ্র দৃষ্টি চন্দ্রলেখার মুখের উপরে স্থাপিত করিয়া বলিল, একটু বস না—সারাটা দিন কথা না বলতে পেয়ে মড়ার মত পড়ে আছি।

—এখন কেমন আছ—বলিয়া চন্দ্রলেখা বলিল। তার পর বলিল, আমার এখন মরবার ক্ষুদ্রতা নাই বংশীদা—কথা বলব কি।—এক্ষণি আবার হাটে যেতে হবে। দাদার ত কোনো দিকে কিছু খেয়াল নেই। তুমি ঘর-টরটা একটু দেখো—আমাকে একবার গাঙতুলসীর হাটে যেতে হবে।

বংশী বলিল, জল-বর্ষার দিন—একলা কি ক'রে যাবি চন্দ্র? রাত হয়ে যাবে যে।

চন্দ্রলেখা চিন্তিত হইয়া বলিল—সত্যিই। তা হ'লে যাব না—কি বল? কাল বরং দাদাকে পাঁচখালির হাটে পাঠিয়ে দেব।

বংশী আবার যেন অতীত দিনগুলার স্মরণ খুঁজিয়া পায়। ক্ষুধা না থাকিলেও সে তবু বলে, চন্দ্র, বড় খিদে পাচ্ছে রে।

চন্দ্রলেখা হাসিয়া বলিল—তবু ভাল যে আজ চেয়ে খেলে। কিন্তু চন্দ্রলেখা তুলিয়া গেল যে, আজ কয়দিন বংশী চাহিয়াই খাইতেছে। সেদিন চন্দ্রলেখাকে হঠাৎ দেখিবার ইচ্ছা হওয়ায় বিশেষ কিছু না মনে পড়ায় খানিকটা ছন চাহিয়াই মুখ বিকৃত করিয়া কোনো রকমে খাইয়া কেলিয়াছিল। সাবা বিকালটা বংশী স্বপ্নের মধ্য দিয়া কাটাইয়া দিল।

কিন্তু বংশীর ফিরিয়া-পাওয়া স্মরণ কাটিয়া গেল সন্ধ্যায়।

বংশী তাহার নির্দিষ্ট ঘরে শুইয়া শুইয়া শুনি—ওপাশের স্নানঘরে চন্দ্রলেখা নিমাইকে বলিতেছে, ঘর ত আমাদের ছুটি—বাবু এলে থাকবেন কোথায়।

উত্তরে নিমাই মাথা চুলকাইতে চন্দ্রলেখা বলিল—

বংশীদাকে বরং তার নিজের ঘরে এবার যেতে বল—তা হ'লে আর ভাবতে হবে না।

নিমাই তেমনি মাথা চুলকাইয়া বলিয়াছিল, বংশীকে বলি কি ক'রে।

চন্দ্রলেখা বলিয়াছিল, তা না হ'লে আর উপায় কি। তা ছাড়া যে রোগ, থাকলে বাবুকেও ত ধরতে পারে। না না দাদা—তুমি স্পষ্ট ব'লে দিও।

বংশী সমস্ত শুনিয়া তখনই ঠিক করিয়াছিল, সেই রাতেই সে চলিয়া যায়। কিন্তু হইয়া উঠে নাই—নানা কথা-ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সকালে উঠিয়া নিজেই সে নিমাইকে বলিল, আজকে আমি ঘরে যাই নিমাই—অল্পখটা ত অনেকটা সেরেই এসেছে—আর মিথ্যে থেকে লাভ কি। চাষ ত এবার গেলই—এবার দোকানটা চালাই।

নিমাই অপ্রতিভ হইয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল—বংশী বাধা দিয়া বলিল, না না নিমাই—তা ছাড়া বাবু আসবেন। আমাকেও ত কিছু একটা খাওয়ার জোগাড় করতে হবে—সুয়ে থাকলে ত আর চলবে না তাই।

বংশী চলিয়া গেল।

চন্দ্রলেখা একটু অপ্রতিভ হইল মাঝ—সাময়িক ভাবে।

সকাল গেল—বিকাল আসিল কিন্তু সহদেব দত্ত আসিল না। চন্দ্রলেখা না-আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে নিমাই বলিল, কাল বোধ হয় ঠিক আসবেন রে চন্দ্র—তুই সব জোগাড়-সম্বল ক'রে রাখ।

চন্দ্রলেখার এক দিনের আয়োজন ব্যর্থ হইল।

তার পরদিনটাও প্রায় কাটিয়া যাইতে বলিল—অনাগত লোকটি তবু আসিল না। সারা কলমীলতা গ্রামের প্রজারা কাজকর্ম ছাড়িয়া বুথাই হৈ-চৈ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তৃতীয় দিন ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রলেখা ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বলিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইল—অনাগত লোকটি যেন আসিয়া গিয়াছে এবং তাহার তীব্র দৃষ্টি যেন আসিয়া পড়িয়াছে এই সন্ধ্যাক্রান্ত বিষমবসনা চন্দ্রলেখার উপরে। সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত সরমাস্তরণ চন্দ্রলেখার সারা মেহে তাহার উষ্ণ পরশ দিয়া গেল।

অনাগত আজ আসিবেই। চন্দ্রলেখা পরিপাটি করিয়া আয়োজন করিল। তার পর আয়োজনের থালা হাতে লইয়া অনাগত লোকটির জন্য নিশ্চিষ্ট ঘরে একে একে সাজাইতে চলিল। দরজার সম্মুখে গিয়া হঠাৎ তাহার ভুল হইয়া গেল। মনে হইল, সেই লোকটি যেন ওই ঘবে, চন্দ্রলেখাব শত-বস্ত্র-পাতা ওই বিছানার উপরে শুইয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল লক্ষ্যায় অন্ধের বসন গুছাইতে গিয়া চন্দ্রলেখার হাতের থালা মাটিতে পড়িয়া গেল।

আশায় আশায় ত্রিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

সহদেব দত্তকে আগাইয়া আনিবার জন্য গ্রামের প্রবীণ কয়েক জন গন্ধের হাট পর্যন্ত গিয়াছে—নিমাইও গিয়াছে। চন্দ্রলেখা গুন গুন করিয়া গান গাহিয়া স্নান করিতে চলিল, কিন্তু চন্দ্রাকরের জলে দেহ ডুবাইতেই তাহার মনে হইল, ওই পাশের ওই টেশানকোণে সহদেব যেন বসিয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রলেখার আর ভাল করিয়া স্নান করা হইল না।

বিকাল আসিল—প্রশান্ত কাকুল ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। চন্দ্রলেখা হৃদবৎসারী দৃষ্টি লইয়া খালের ধারে দাঁড়াইল—ভাবিল, হয়ত খেয়ালী সেই সহদেব লোকটি সোজা এইখানেই আসিবে—রূপসীর খালে খালে নৌকা করিয়া।

নিমাই কিন্তু হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। কলমৌলতা গ্রামের সকলেই।

চন্দ্রলেখা ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'ল যায়া? এলেন না?

নিমাই বলিল, না—বারো চকের নায়েবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বাবুর এবার নাকি আর আসা হ'ল না। খেয়ালী মাছ—যখন যা খেয়াল হয়।

চন্দ্রলেখা ভাঙিয়া পড়িল। কেন জানি না, বোধ কবি অনাগত'র নিষ্ঠুরতায় চন্দ্রলেখার চোখের কোণ বাহিয়া জল নামিয়া আসিল—গোপনে আঁচলে সে তাহা মুছিয়া ফেলিল। সহদেবের জন্য যে বরটা সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা হইয়াছিল সেই ঘরে সে ধীরে ধীরে গিয়া ঢুকিল। পূর্বের ছোট জানালাটা খুলিয়া দিল—বামল সন্ধ্যার এক ঝলক বাতাস হু হু করিয়া ঢুকিয়া সহদেবের জন্য পাতা বিছানার চামবটার এক প্রান্ত গুটাইয়া দিল। চন্দ্রলেখা সেই বিছানায় বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে বসিল। সে-চিন্তার কোন ধারা নাই।

শঙ্খমালা এই সময়ে ভয়ে ভয়ে একবার সেই ঘরে উকি মারিল, তার পর ঢুকিয়া চন্দ্রলেখার সম্মুখে আসিয়া বলিল, চন্দ্র-দি—বাবু আসে নি, না?

চন্দ্রলেখা ভারাক্রান্ত দৃষ্টি লইয়া তাহার দিকে চাহিল—কোন উত্তর দিল না। নিমাই এই সময়ে সে ঘরে ঢুকিল। চন্দ্রলেখাকে বলিল, খাবার-টাবার? তৈরি করেছিস সে-গুলো এবার বার কর চন্দ্র।—শঙ্খও আছে, আমাকেও কিছু দে—বড্ড খিদে পেয়েছে। সবটা দি—আজ খাড়া পাহরায় দাঁড়িয়ে আছি।

চন্দ্রলেখা উঠিয়া দাঁড়াইল। মম্বর কণ্ঠে বলিল, বংশীদাঁকেও ডাকবে দাদা—পিঠে খেতে সে স্কড ভালবাসে।

নিমাই সাম্ভর্ষ্যে বলিল, সে কি আর এ-গায়ে আছে নাকি! আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়ার পর কোথায় যে সে গেল—কে জানে! আজ সাত দিন ত দেখা নেই। ঘরদোর সব খোলা, দোকানটাও তেমনি সাজানো, ছেঁড়া কবলটাও পড়ে আছে—খালি তোর সেই জু-খানা কাঁধা নেই। আমাদেরই দে—খেয়ে ফেলি—বলিয়া নিমাই বাহির হইয়া গেল।

চন্দ্রলেখা বসিয়া পড়িল—চোখের কোণ বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া জল নামিয়া আসিল।

এক সময়ে চন্দ্রলেখাকে প্রবৃত্তির দেখিয়া শঙ্খমালা তাহার নোংরা চুলের রাশ ঢলাইয়া বলিল, চন্দ্র-দি গল্প বলো না—সেই গল্পটা, সেদিন যেটা অর্ধেক বলেছিলে...

চন্দ্রলেখা অন্তমনস্ক ভাবে বলিল—ভরসন্ধ্যায় গল্প শুনতে নেই শঙ্খ—দুঃখ হয়।

—না তুমি বলো চন্দ্রদি—শঙ্খ জেদ ধরিয়া বসিল, কিন্তু চন্দ্রলেখা 'মনে নাই', 'মন খারাপ' ইত্যাদি অজুহাত দিয়া এড়াইয়া গেল। শঙ্খমালা ভাবিতে বসিল, কি হইল সেই কুমারীর বাহাকে বিবাহ করিবার জন্য এক রাজকুমার তাহাকে বন্দী করিয়া বাধিয়াছিল। বি হইল সেই জিন্দেশের রাজকুমারেব—বাহাকে কুমারী স্বপ্ন দেখিয়াছিল, যেন সেই সোনার বরণ রাজকুমার তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতেছে। উদ্ধার করিয়া কি—লষ্টা গিয়াছিল। পক্ষীবাজ ঘোড়ায় চড়িয়া এই পৃথিবী ছাড়িয়া ওই মেঘ-পাহাড়ের দেশে কি উড়িয়া গিয়াছিল। না, বন্দিনী রাজকুমারী কেবল স্বপ্নই দেখিয়াছিল।

অলখ-বোরা

শ্রীশাস্ত্র দেবী

৩১

বর্ষা ঘাই-ঘাই করিয়াও যায় না। পথের ধারে খানায় খন্দে জল এখনও খই-খই করিতেছে, কিন্তু তাহার উপর রৌদ্রের হাসিও থাকিয়া থাকিয়া বরিয়া পড়িতেছে। আকাশে কালো মেঘের বুক চিরিয়া সূর্য-কিরণ ঝলসাইয়া উঠিতেছে।

হৈমন্তীর মনেও আলো-অন্ধকারের খেলা এমনই করিয়া চলিয়াছে। নিখিলের একটা আকস্মিক উদ্ভিঙে তাহার মনে নূতন রং ধরিয়াছে, সন্ধ্যের মেঘ বারে বারে ছিন্ন হইয়া আশার দীপ্তি কাটিয়া পড়িতেছে। কিন্তু পরের মুখের কথা মনকে এতখানি নিঃশব্দ করা কি সহজ? হৈমন্তীর মনের কোণের আশার আলোটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে উঠিতেই আবার স্নান হইয়া যায়। তখন হৈমন্তীকে ত কিছুই বলে নাই, তবে তাহাকে নিজের মনের কথা হৈমন্তী কি করিয়া বলিবে? ভদ্রতার শাস্ত্রে শালীনতার শাস্ত্রে ইহা যে নিষিদ্ধ। এমন ত নয় যে তপনের মনের কথা বলিবার কোনই স্বযোগ ঘটে নাই। পৃথিবীতে কত দুস্তর বাধা অভিক্রম করিয়া মানুষ কতবার এ-স্বযোগ আপনি করিয়া লইয়াছে ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। সে তুলনায় তপন ত কত স্বযোগ হেলায় হারাইয়াছে বলা বাইতে পারে। কিন্তু হয়ত সব মানুষ এক রকম নয়। এক ক্ষেত্রে যে বীরশ্রেষ্ঠ, অন্য ক্ষেত্রে তাহার ভীকৃতার সীমা নাই, এমন মানুষ ত কত-শত আছে। তপন কি সেই রকম মানুষ হইতে পারে না? হয় ত তাহাই; না হইলে এই অকারণ নীরবতার প্রতিজ্ঞার কোনও অর্থ হয় না। মানুষ এই সঙ্কোচকে ভীকৃতাই বলে বটে, কিন্তু হৈমন্তীর মন তাহা বলিতে চাহে না।

মিলির বিবাহের পর হইতেই বাড়ীটা কেমন যেন ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। এ-বাড়ীতে কেহই আর আসে না। সুরেশের বাড়ীর পার্টির পর তপন এবং নিখিল একবারও এ বাড়ীতে আসে নাই। একটুখানি খবরের টুকরা কি এককণা আশার ইন্দিভের জন্ত হৈমন্তীর মন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল।

কিন্তু কোথায়ও কোন সাড়া নাই। সূর্য আশিলে তাহার কাছে মনের কথা বলিয়া হয়ত একটু মনটা হাল্কা হইত, অথবা একটুখানি স্বপ্নামর্শ পাওয়া যাইত। কিন্তু সূর্যও এখানে নাই, সে সুরেশদের পার্টির পরদিনই মহামায়াকে লইয়া নয়ানজোড়ে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক কবে যে আসিবে, তাহাও বলিয়া যায় নাই।

মনে এতবড় একটা বোঝা লইয়া এই নিঃশব্দ দিনগুলি হৈমন্তী কি করিয়া কাটাঁইবে? তাহার মন অস্বাভাবিক রকম চঞ্চল হইয়া উঠিল। এতটুকু একটু খাঁটি খবর কি পাওয়া যায় না? তপন ছাড়া আর কে তাহা দিতে পারে? অন্তের মুখের কথা ত হৈমন্তী দুইবার শুনিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মন ত ঠাণ্ডা হয় না। তপনের মনে এদিককার সম্বন্ধে হয়ত কোনও ভুল ধারণা আছে, হয়ত এমন কোনও বাধাকে সে দুরতিক্রমণীয় মনে করিতেছে, বাহা বাস্তবিক কোন বাধাই নয়; তাই যথাস্থানে তাহার মনের কথা আসিয়া পৌঁছিতেছে না। এমন সময় শালীনতার শাস্ত্রে হৈমন্তী যে আচরণ নিষিদ্ধ মনে করিতেছে, বাস্তবিক কি তাহা নিষিদ্ধ? যদি তপনের কোনও ভুল সে ভাঙিয়া দিতে পারে, যদি তাহার কোনও বাধা দূর করিয়া পথ স্বগম করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে সে কার্যে হৈমন্তীর একটুখানি অগ্রসর হওয়াই ত গ্রায়সম্ভত ও মনুষ্যজনোচিত কার্য। হৈমন্তী এই লইয়া আর বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারে না। যদি তাহার একটুখানি অগ্রসর হওয়া ভুলই হয়, তাহাতেই বা কি যায় আসে? মানুষ ভাল ভাবিয়া ভুল কি করে না? ভুল হইবার ভয়ে নিশ্চল বসিয়া থাকিলে শিশু ত কোনদিন হাঁটিতেও শিখিত না। তাছাড়া সে যাহার সম্বন্ধে ও যাহার কাছে ভুল করিবে, সে মানুষটি ত তপন ছাড়া আর কেহ নয়। হৈমন্তীর ভুলের ছুতা লইয়া হৈমন্তীকে লজ্জায় ফেলিবার মানুষ যে তপন নয়, এ-বিষয়ে হৈমন্তীর মনে এক কথাও সন্দেহ নাই।

হৈমন্তী তাহার সেই দক্ষিণের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের অলস গতির দিকে চাহিয়াছিল। এই মেঘ যুগে যুগে কত বিরহীর কাতর দৃষ্টি ও নীরব প্রার্থনা বহন করিয়া গইয়া কিবিদ্যাছে, কিন্তু বাহার নিকট পৌছাইয়া দিবার কথা তাহাকে কি কোনও দিন কোন ইসারা করিতে পারিয়াছে? হৈমন্তীর মন উড়ন্ত মেঘের পিছনে পিছনে ভাসিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু কে তাহাদের পথ বলিয়া দিবে, কে তাহাদের ভাবায় মুগ্ধ করিয়া তুলিবে?

এই বাস্তব জগতের কঠিন লেখনীর কালো আঁচড়েই তাহার হৃদয়ের বেদনাকে রূপ দিতে হইল। সে কালির আঁচড়ে মনের ব্যাকুলতার এক কথাও কি ফুটিল? হৈমন্তী কি যে লিখিল, তাহা তাহার কিছুই মনে রহিল না। মনে হইল আপনাকে সে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, এতখানি না বলিলেও চলিত। কিন্তু কতটুকু বলিলে, কি প্রায় করিলে তখন হৈমন্তীর প্রার্থিত উত্তরটি দিবে, কতটুকু না বলিলেই ভাল দেখাইবে তাহা হৈমন্তী ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সে দ্বিতীয়বার চিঠিখানা পড়িলও না, উত্তেজনার বশে বাহা লিখিল তাহাই ধামে বদ্ধ করিয়া ডাকে দিয়া যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঝাঁপিল। আর দুইটা দিন কাটিলে বাহা হটুক কিছু একটা জবাব ত সে পাইবে। মন এমন করিয়া আর ভাসিয়া বেড়াইতে পারে না, সে একটা স্পষ্ট সত্য আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। তাহার ঈর্ষিত স্বর্গ তাহার হাতের মুঠির ভিতর আসিয়াছে, কি আকাশ-কুসুম শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে তাহা সে জানিতে চায়। নিষ্ঠুর সত্যকে সঙ্ঘ করিবার শক্তির অভাবে মিথ্যার মায়ায় বহুদিন ধরিয়া চোখের সম্মুখে থলুলাইয়া রাখিতে প্রাণ ব্যাকুল হয় বটে, কিন্তু বাহা ছলনা তাহার উপর ভিত্তি করিয়া জীবনকে গড়িতে কি পারা যাইবে? তা ছাড়া হৈমন্তীর মনে আশা আগিয়াছে, নিষ্ঠুর সত্য তাহাকে শুনিতে হইবে না, মধুর সত্যই সে শুনিবে। দু-দিন আগে-পিছের ব্যাপার ছাড়া আর বেশী কিছু সন্দেহকে সে মনে আমল দিবে না।

চিঠি চলিয়া গেল, হৈমন্তী দিন বটা প্রহর শুণিতে লাগিল। কলিকাতার চিঠি কলিকাতাতে দুই-চার ঘণ্টাতেও পৌছায় আবার একদিন পরেও যায়। ঠিক যে

কখন পৌঁছাবে বলা শক্ত হইলেও তৃতীয় দিনে একটা জবাবের আশা করা যাইতে পারে। ডাক-পিয়নের ময়লা খাতি পোষাক আর পাগড়ীটা যতবার পথের ধারে দেখা দিত ততবারই হৈমন্তী জানালার ধারে আসিয়া দেখিত মাল্হুটা তাহাদের বাড়ীতে আসে কি না। ডাকঘর হইতে বাহির হইবার আন্দাজ কত মিনিট পরে যে তাহাদের রাস্তার মোড়ে ওই ময়লা পাগড়ীটা দেখা যায় তাহা এক দিনেই হৈমন্তীর মুখস্থ হইয়া গেল। ডাকবাক্সে চিঠি মাঝে মাঝে পড়িল বটে, কিন্তু তাহা হৈমন্তীর চিঠি নয়।

উৎকর্ষাপূর্ণ নিঃসঙ্গ বিষম দিন কাটিতে চাহে না, এক একটা ঘণ্টা যেন এক একটা যুগ, নুকের উপর দিয়া ভারী কাঁটের শৃঙ্খল টানিয়া টানিয়া চলিয়াছে। চিঠি লিখিয়াই উৎবর্তা যেন দশ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। উত্তরের আশা আছে বলিয়াই নিরাশা এমন করিয়া মনকে গীড়ন করিতে পারিতেছে, চিঠি না লিখিলে এমন করিয়া প্রত্যেকটি মুহূর্ত গুলিয়া প্রতীক্ষা করিবার প্রয়োজন ত থাকিত না। এক বৎসর যতখানি আকুলতা মনের উপর ছড়াইয়া থাকিত, তাল্ল যেন দুই দিনে নিরেট ঠাসা হইয়া ব্যথায় টনটন করিতেছে। হৈমন্তী কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? আর একখানা চিঠি সে লিখিতে পারিবে না। লিখিলে ডাকিয়া খোঁজ করিতে বলা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সুখা এখানে নাই থাকিলেও হয়ত কিছুই করিতে পারিত না। কিছু প্রায় করা যেখানে চলিবে না সেই মিলিদের বাড়ী এক যাত্রা যায়, যদি কথায় কথায় কোন কথা বাহির হইয়া পড়ে।

স্বরেশ ও মিলি দুই জনেই বাড়ীতে ছিল। হৈমন্তী নিলেকে যথাসাধ্য সংযত ও স্বাভাবিক করিবার চেষ্টা করিয়া চিঠি লিখিবার দিন চার পাঁচ পরে সেদিন তাহাদের বাড়ীতে সন্ধ্যায় গিয়া উপস্থিত হইল। স্বরেশ ছুটিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল, “গরীবের বাড়ী এত শীগ্গির তোমাদের পদধূলি আবার পড়বে তা আশা করি নি।”

হৈমন্তী বলিল, “জ্যাঠাইমা না-হয় দেশেই চলে গেছেন। তাই বলে মিলিদির সঙ্গে আমাদেরও কি সম্পর্ক চূকে গিয়েছে? একবারটিও ত আপনারা আর ও রাস্তা মাজবেন না। কাজেই আমি না এসে আর করি কি?”

মিলি সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিল, “না রে না,

আমি কালই সকালে যাব ঠিক করেছিলাম তোর কাছে। কাকাবাবুও আমি না গেলে রাগ করেন জানি। কাল রবিবার আছে, তার উপর উনি সারাদিনই বাড়ী থাকবেন না, আমার ও-বাড়ী যাওয়াই ভাল।”

হৈমন্তী বলিল, “কেন হুশিয়ার কি এখনও আমাদের বাড়ী যাওয়া বারণ? ওঁকেও নিয়ে চল না, অস্ত্র কোথায় আবার কি করতে যাবেন?”

হুশিয়ার বলিল, “পরের দায় এসে ঘাড়ে পড়েছে, না গিয়ে করি কি? কাল ট্রেন থেকে তপনের একটি চিঠি পেলাম তার কোন বন্ধুর অভ্যন্তরীণ কাজ, সে বোধের দিকে যাচ্ছে। কবে কোথায় কত দিন থাকতে হবে তার ঠিক নেই। অকস্মাৎ যেতে হ’ল বলে গ্রামের ইচ্ছুরের ভাল বন্দোবস্ত করে যেতে পারে নি। আমাদের উপর তার দ্বিগুণে একটা বিলম্ববস্থা করবার।”

হৈমন্তী সংক্ষেপে বলিল, “কি ব্যবস্থা করবেন?”

হুশিয়ার বলিল, “তপনের বদলে কয়েক মাসের জন্যে একজন মাষ্টার রেখে দিতে হবে, আর রবিবারে রবিবারে নিখিল আর আমি গিয়ে তদারক করব। ওদের ছুটি এমনিতেই শনিবারে, কারণ সেদিন হাট বসে। কাজেই কাজকর্মের কোন অসুবিধা হবে না। হ্যাঁ, ভাল কথা, তপন কারও সঙ্গে দেখা করে যেতে পারে নি ব’লে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে পাঠিয়েছে। সকলের মধ্যে তুমিও একজন ব’লে তোমাকেও ব’লে রাখছি।”

মিলি বলিল, “দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আর বক্তৃতা না শুনিয়ে ঘরে নিয়ে বসো না। আয় হিমু, তোকে আজ বড় শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। অসুস্থ করেছে না কি কিছু?”

হৈমন্তী বলিল, “না, অসুস্থ কিছু করে নি। বাড়ীতে জনপ্রাণী প্রায় কেউ নেই, একলা একলা বড় খারাপ লাগে। শুধু সতু আর বাবা খাবার সময় একবার করে টেবিলে এসে বসেন, বাকি সময় সবাই নিজের নিজের কাজে।”

ঘরে আসিয়া বসিয়া মিলি বলিল, “সত্যি, সবাইকার ঘেন দেশ ছেড়ে পালাবার ধুম লেগে গিয়েছে। মাকে বাবার জন্যে দেশে যেতেই হত, কিন্তু সুখা বলকাতায় থাকলে তোব সম্ভীর অভাব হ’ত না, তা সেও কিনা ঠিক সময়

বুঝে চলে গেল। তপনবাবুও আর বন্ধুর উপকার করবার সময় পেলেন না, দিন দেখে বেরিয়ে পড়লেন, পাছে কালে-ভায়ে দুই-একটা গানটান শুনিয়ে মাঝবের উপকার করে ফেলেন। মহেন্দ্র-দা ত রবিবার প্রায় সব ব্যবস্থাই করে ফেলেছে, শুনছিলাম দেশ থেকে যাবে এসে হস্তাধানিকের মধ্যেই সে বেরিয়ে পড়বে। যদি দেশ থেকে আসতে দেবী হয়, তাহলে দু’চাব দিনেই সাগর পাড়ি দিতে বেরোতে হবে।”

হুশিয়ার অকস্মাৎ মহোৎসাহে বলিয়া উঠিল, “হ্যাঁ, কথা ছিল বটে, কিন্তু ওইখানে একটা গোলমাল বেধে গেছে। দেশ থেকে ফিরবার পর ওকে পাঠি দেওয়ার সুবিধা হয়ত হ’য়ে উঠবে না ব’লে আমরা আগেভাগে খাইয়ে দিলাম। কিন্তু এখন দেখছি পাঠিটা মহেন্দ্রকে না দিয়ে তপনকে দিলেই ভাল হ’ত। মহেন্দ্র কালই দেশ থেকে ফিরে এসেছে, আমার আপিসে এসেছিল দেখা করতে, বলছে সব কাজকর্ম ভাল করে না শুদ্ধি এত ছড়োছড়ি করে যাওয়া ঠিক হবে না। এ জাহাজটা ও ছেড়ে দিচ্ছে, এর পর কোনটায় বুক করবে নিজের সব সুবিধা বুঝে ঠিক করবে।”

মিলি হাসিয়া বলিল, “তোমার বন্ধুদের সব মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। যার কাজকর্ম ভাল করে গোছান উচিত ছিল সে রাতারাতি কোথায় দৌড় দিল তার ঠিক নেই, আর যার জাহাজ অবধি ঠিক হয়েছিল তারই অকস্মাৎ শুভমতি হ’ল কাজকর্ম গোছাবার জন্যে। এবার বিলেতের টিকিট না কিনে ওকে রাঁচির টিকিট কিনতে বল।”

হৈমন্তী চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিল। তপনেনব খবর পাইবার ক্রীণ আশা মনে লইয়া সে এ-বাড়ী আসিয়াছিল, এমন খবর পাইবে একবার কল্পনাও করে নাই। এই কথাবার্তায় সে কি ভাবে যোগ দিবে? তাহার মাথায় ঘুরিতেছিল সেই চিঠিখানার কথা। পাগলের মত তাহাতে এলোমেলো কি যে সে লিখিয়াছিল তাহার স্পষ্ট কিছুই মনে নাই। উদ্ভেজন্য মুহূর্তে দ্বিতীয়বার পড়িয়াও দেখে নাই। চিঠির জবাব আশ্রক বা না-আশ্রক, তাহা তপনের হাতে পড়িয়াছে মনে এই একটা সাক্ষ্য ছিল। কিন্তু এখন তাহাও ত নিশ্চিত বলা যায় না। হৈমন্তী যখন ঘরে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিল, হয়ত তখন তপন বিদেশযাত্রার জন্য

তল্লী বাঁধিতেছিল। চিঠিখানা তপনের বাড়ী পৌঁছবার অনেক আগেই নিশ্চয় সে কলিকাতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তার পর তাহা কাহাব হাতে পড়িয়াছে কে জানে? মাহুঘের কোড়হলের সীমা নাই। কেহ যদি তপন বাড়ী নাই দেখিয়া চিঠিখানা খুলিয়া থাকে? লজ্জায় হৈমন্তীর মাথা হেঁট হইয়া আসিতেছিল। যাহারা হৈমন্তীকে ভাল করিয়া চেনে না, তাহাদের হাতে এ-চিঠি পড়িলে তাহারা কি-না ভাবিতে পারে। তাহার জীবনে যাহা পূজার ফুলের মত পবিত্র, মাহুঘের মক্ষিকাবৃত্তি তাহাকে কালিমাময় করিতে এতটুকুও ইতস্তত করিবে না।

মিলি আবার বলিল, “হিমু, আমরা এত ব’কে মরছি তুই ত কই কথা বলছিস না। নিশ্চয় তোর কিছু হয়েছে। দাঁড়, চাক’রে আনি, গরম গরম চা খেলে চাঙ্গা হ’য়ে উঠবি।”

পিছন হইতে নিখিল ডাকিয়া বলিল, “আমার জন্তেও এক পেয়লা চা করবেন। অনেক জায়গায় নিরাশ হ’য়ে আজ প্রথম আপনার এখানে একটু আশার আলো দেখছি।”

হৈমন্তী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, এইবার হাসিয়া বলিল, “বিসের সন্ধানে আপনি এত ব্যস্ত হ’য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?”

নিখিল বলিল, “মাহুঘের সন্ধানে। যার বাড়ী যাই সব দেখি ডেসার্টেড। পরন্তু তপনের বাড়ী গিয়ে দেখলাম সে পালিয়েছে। কাল আপনার বন্ধুর বাড়ী নাহস ক’রে গিয়ে দেখলাম, তিনিও নেই। আজ মরিয়া হ’য়ে একটু আগে আপনার ওখানে গিয়েছিলাম, আপনাকেও না-পোয়ে শেষে এইখানে শেষ চেষ্টায় এসেছি।”

হৈমন্তী বলিল, “সবাই কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে, চলুন আমরাও পালাই।”

নিখিল বলিল, “বাস্তবিক, কলকাতাটা একেবারে মিয়োনো মুড়ির মত বিশ্ৰী হ’য়ে গিয়েছে।”

হরেশ বলিল, “হিমু, ওর সঙ্গে আর কথা ব’লো না। আমরা এতগুলো মাহুঘ কলকাতায় রয়েছি আমাদের কি কোন দাম নেই? সুধাই কেবল এখানে সুধা সঞ্চার করতে পারে?”

নিখিল লাল হইয়া বলিল, “না, না, তেমন কোন কথা ত আমি বলি নি। আমার এত স্পর্ধা নেই এবং

এমন অর্কাটীনও আমি নই। লেকে কেন পালাচ্ছে তাই বলছিলাম।”

নিখিল ও হরেশ চেষ্টা করিল, কিন্তু চায়ের মজলিস আজ জমিল না। হৈমন্তীর মনে কেবল একই কথা ঘুরিতেছিল। তাহা ঠিক কি, না বুঝিলেও, নিখিল এটুকু বুঝিল যে মহেশ্বর বিদায়-উৎসবে সে হৈমন্তীকে যাহা বলিয়াছিল তাহারই ক্রিয়া হৈমন্তীর মনে চলিয়াছে। কিন্তু তপনের আচরণে নিখিলের কথা মিথ্যা হইয়া যাইবার জোগাড় হইয়াছে দেখিয়া নিখিল হৈমন্তীর নিকট নিজেতে কতকটা ঘেন মিথ্যাচারী বলিয়াই বোধ করিতেছিল।

ইহাদের কথায় হৈমন্তী বুঝিল তপন দীর্ঘকালও বাড়ী না ফিরিতে পারে। যাক, যদি তপন তাহার চিঠি না পাইয়া থাকে ভালই হইয়াছে; হৈমন্তী যাহা মনে করিয়াছিল তাহা সত্য হইলে এমন নিরাসক্তভাবে তপন চিঠি চলিয়া যাইতে পারিত? নিকটে থাকিয়া নীরবতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা না-হয় বুঝা যায় কিন্তু এমন করিয়া সকল বাঁধন ছিঁড়িয়া নিরুদ্ধে যাত্রার অর্থ সে ত কিছুই বুঝিতেছে না।

৩২

মিলির বিবাহের পর বাড়ী ফিরিয়াই সুধা ঠিক করিয়াছিল মাকে লইয়া সে একবার নয়ানজোড়ে যাইবে। যে আবেষ্টনের ভিতর জন্ম হইতে শৈশবের সকল আনন্দ সে সংগ্রহ করিয়াছিল, যাহার উন্নয় ভিত্তি করিয়াই তাহার জীবন গঠিত, বেদনার দিনে সেইখানেই সে জুড়াইতে বাইতে চায়। মাহুঘের সকল স্মৃতির ক্রন্দনই যেমন ‘মা’কে ডাকিয়া আশ্রয় চাওয়া, এই জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণও তেমনই তাহার আশ্রয়ভিক্ষা। নূতন জীবনে স্বথঙ্কণ যাহা তাহার অন্তরে ঘটিয়াছে তাহা এই শৈশবের নীড় আসিলে কিছুকালের মত অন্তত হাঁসের পাংকের জলের মত তাহার চিত্ত হইতে বরিয়া পড়িবে। অতি ছুনের দিনে আজকাল সে যখন রাত্রির স্বপ্নের কোড়ে আপনার ব্যথাহত চিত্তটি লইয়া পলাইয়া যায়, তখন বহুবার দেখিয়াছে নিজাদেবী তাহাকে পথ ভুলাইয়া লইয়া যান সেই স্বপ্নলোক যেখানে তাহার দিদিমা ভুবনেশ্বরী সকালে উঠিয়া নাতি-নাতিবীর দুধ মাগিতে বসেন, মা পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহ ভুলিয়া

পুকুরের জলে সখীদের সঙ্গে সাঁতার কাটেন, দাদামহাশয় দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে গাড়ী হইতে কোলে করিয়া নামাইতে চান। কোন মায়াস্পর্শে তাহার জীবনের এতগুলি বৎসর পিছাইয়া চলিয়া যায় সে বুঝিতে পারে না। তাহাদের গতির সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া লইয়া পিছু হটিয়া নিঃশব্দে তাহার চলিয়া যায়, স্বধার জীবনের ছোটবড় ব্যাধি কতগুলি রাজির অঙ্ককারে জুড়াইয়া দিবার জন্য। নয়ান-জোড়ের ধুমলেশহীন দিনের আলোও এই রাজির অঙ্ককারকে অনেকখানি সাহায্য করিবে বলিয়া স্বধার বিশ্বাস। তাই স্বধা তাহার পক্ষ মায়েস অনেক অস্থবিধার সম্ভাবনা বুঝিয়াও তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে রাজি করাইয়াছে। তাঁহাকে কেলিয়া গেলে সেখানে ত সে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবে না।

শৈশব তাহাকে যে আনন্দ দিয়াছিল তাহাতে ছন্দের দোল দিবার জন্য ছন্দের কোনও আঘাত ছিল না, কিন্তু যৌবনের আনন্দে ছন্দের বেদনার আঘাত তাহার স্বধকে ছাপাইয়া উঠিতে চলিয়াছে। যদিও এই ছন্দের কষ্টপাথরেই তাহার প্রেমকে সে চিনিয়াছে তবু ইহার হাত হইতে ক্ষণিকের মুক্তি যদি সে না পায়, তাহা হইলে দ্বয়তন্ত্রী তাহার টুটিয়া যাইবে।

শেষবর্ষের ঘনঘটাৎ মধ্যে স্বধা নয়ান-জোড়ে আসিয়া পৌছিল। গরুর গাড়ী করিয়া ঠেগন হইতে যখন তাহার বাড়ী আসিয়া পৌছিল তখন ভরাবর্ষার কালো মেঘ-সাগরের বৃকে চতুর্থীর চাঁদ ছোট একটি আলোর নৌকার মত ভাসিয়া চলিয়াছে। উন্নত তরঙ্গের মত মেঘ কখনও তাহাকে গ্রাস করিয়া কেলিতেছে, কখনও আবার সে জাগিয়া উঠিতেছে মেঘপুঞ্জের অন্তরাল হইতে। এ যেন গঙ্গাধর মহাদেবের জটাঝালে দীপ্যমান শিশু শশী। বর্ষার এই ঘন কালো মেঘজালে ভাসমান চতুর্থীর চাঁদ কবে কোন আদি কবির মনে এ কল্পনা আনিয়া দিয়াছিল কে জানে? স্বধাব মনে হইল, শুষ্ক ধরার প্রাণহানিনী গঙ্গা এই মেঘের জটা হইতে যেমন করিয়া খবিয়া পড়িয়াছিলেন, তেমনই করিয়া তাহার প্রাণেও এই ঘনবর্ষা শাস্তিধারা ঢালিয়া দিতে পারিবে।

গরুর গাড়ী বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। অঙ্ককারে

লঠন-হাতে হাড়ু সাঁওতাল আসিয়া বাস বিহানা নামাইতে লাগিল। মুখখানা কিছুমাত্র স্নান না করিয়া সে প্রথমেই বিনা ভূমিকায় খবর দিল, “করুণাখি মরে গেছে মা।”

মহামায়া বলিলেন, “আহা, কি হয়েছিল বাছার?”

স্বধার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। হাড়ু যে কি জবাব দিল তাহা স্বধা শুনিল না। মুগাধ ও হাড়ু মহামায়াকে ধরিয়া নামাইল। স্বধা লঠনটা উচু করিয়া ধরিল। সেই ছেলেবেলার মুগাধদাদা, এখন মগু এক জন ভ্রাতৃলোক হইয়াছে, বলিল, “স্বধা আর ত ভাগর হয় নি, মামীমা!” কিন্তু স্বধার মনে হইল জীবনের অভিজ্ঞতায় স্বধাই তাহার চেয়ে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। মুগাধদাদার জীবনে এখনও ধান আদায়, গোলা বোঝাই ও জমি বিলি করা বছরে বছরে একই ভাবে ঘুরিয়া আসে, স্বধার জীবন ইহার ভিতর কত দীর্ঘ পথের কাঁটা মাড়াইয়া ফুল জুড়াইয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে।

পিসিমা হৈমবতী অঙ্ককারে ঘরের ভিতর বসিয়া হরিনামের ঝুলি লইয়া মালা করিতেছিলেন। স্বধাদের দেখিয়া মালাটি মাথায় ঠেকাইয়া দেয়ালের পেরেকের গায়ে ঝুলাইয়া বাখিলেন। সেই তাহার তেজস্বিনী পিসিমার মুখে কি একটা অসহায় ভাব যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। যিনি পৃথিবীতে কাহারও সাহায্য ভিক্ষা করেন নাই, কাহারও অভাবে ভয় পান নাই, তিনি যেন এই অঙ্ককারে হাতড়াইয়া সহায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। স্বধার মনটা দমিয়া গেল। নয়ানজোড়কে সে বাহা মনে করিয়া আসিয়াছিল, তাহা ত ঠিক নাই। পৃথিবীতে ছুখ কি শুধু তাহার জন্য, যে সে ছুখের হাত হইতে পলাইয়া বাঁচিবে অপরের স্বখশান্তি দেখিয়া? ছুখ পৃথিবীর নিঃশাস-বায়ুর ভিতর দিয়া, বিশ্বজনের দ্বয়ে ঘুরিয়া কিরিতেছে।

পিসিমার মুখের সতেজ রেখাগুলি বেদনায় যেন ঠোঁটের কোণে চোখের কোণে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, পায়ের জোরে মাটি আব তেমন কাঁপিয়া উঠে না। পিসিমা দুই হাতে স্বধাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিলেন। মহামায়াকে দেখিয়া বলিলেন, “বৌ, তুমি সেদিনের মেয়ে, তোমাকে এমন দেখে বাওয়াও আমার অদৃষ্টে-

ছিল? কত দেখেছি, জানি না আর কত দেখতে হবে?” এই বিষয়ভার আবহাওয়া স্থার ভাল লাগিতেছিল না, সে বলিল, “পিসিমা, আজ রাত হয়েছে মাকে শুইয়ে দিই, কাল দিনের আলোয় অনেক গল্প হবে এখন।”

সে-ঘরে স্থারা ছেলেবেলায় শুইত সে-ঘরটা জিনিষপড়ে ঠাসা পড়িয়া আছে, অনেক কাল তাহা খোলা হয় নাই। স্থারা পিসিমার ঘরের মেঝেতেই বিছানা পাতিয়া শুইল।

রাত্রি হইতেই বৃষ্টি শুরু হইয়াছিল, সারা রাত্রি কানের কাছে নর নর করিয়া বৃষ্টির শব্দ হইয়াছে। কখন যে সকাল হইয়া গিয়াছে স্থা টেরও পায় নাই। বেশ খানিকটা বেলায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, বৃষ্টির এখনও বিরাম নাই। সমস্ত আকাশ কান-ঢাকা ব্যালান্ডা ক্যাপের মত মেঘের টোপর পরিয়াছে; কোনখানে একটুও ফাঁক নাই। তাহা হইতেই বুক বুক বৃষ্টি গুঁড়া বালির মত করিয়া চলিয়াছে। কলিকাতায় এমন বৃষ্টি মাস্তেবের সহ হয় ন, কিন্তু এখানে দিনের আলোয় স্থার মনটা প্রসন্ন হইয়াছিল, এ-বৃষ্টি তাহার ভালই লাগিল।

পশ্চিম দিকের হৃদয়ত ধানের ক্ষেতের পর যে শালবনটা ছিল, এবার স্থা দেখিল কোন্ কাঠের ব্যবসাদার আসিয়া তাহা নির্মূল করিয়া কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। পিছনের নদীর জলরেখা এখন দেখা যায়। বর্ষায় নদীর জল ভাল-কীরের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, ফাঁপিয়াছে যেন ফুটন্ত ঘূষের কড়া। ওপারের বালুব চর ডুবায়া একেবারে সবুজ অরণ্যানীর বৃকে গিয়া ঠেকিয়াছে ক্ষীত রক্তাভ নদী। ঝাঁকে ঝাঁকে বক নদীর দিক হইতে উড়িয়া ওপারে কোথায় চলিয়াছে। তাহাদের শেষ নাই, কোথা হইতে আকাশের বৃকে দ্রোণ্যমান এই বলাকার মালায় একের পর এক করিয়া পদ্মের মত শুভ্র বকগুলি গাঁথিয়া দেওয়া হইতেছে কেহ জানে না। ইহাদের ডানার দ্ব্যতি দেখিয়া দশ বৎসর পূর্বেকার বালিকা স্থা যেন স্বপ্নময় ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল।

মনে হইল ওই শৈশবের দৃষ্টি দিয়া পৃথিবীর সহিত প্রথম যে বিশ্বদ্বন্দ্বন পরিচয়, তাহাই সত্য, তাহাই শাশ্বত, যৌবন-বেদনাব এ কোন্ দ্বন্দ্বময় গহনবনে সে ঘুরিয়া মরিতেছিল? ওদিকে আর ফিরিয়া না চাহিয়া এই হারানো শৈশবে সে যদি আবার চিরঞ্জয়ী বন্দোবস্ত করিতে পারিত তাহা হইলে

জীবন কোনও সমস্তার পদতলে মাথা কুটিতে হইত না, আপন্যার কাছে আপনি নিরস্তর জবাবদিহি করিবার কোন ভাবনা থাকিত না। ওই বর্ষার মো, ওই নদীর জল, ওই বকের ডানার দ্ব্যতি তাহার অঙ্গও সেই অতীতের ধারাতেই চলিয়াছে, কেন মাস্তেব জীবনের মিথ্যা এ দ্বন্দ্বময় পরিনর্জন?

তবু তাহার এ দ্বন্দ্বকে সে ভুলিতে চাহে না, এই ধরণীর সৌন্দর্যের সহিত ছন্দ রাখিয়া তাহা তাহার অন্তরের ঐশ্বর্য হইয়া থাকুক। মাসীমা মুরমুরীর মত মনোমন্দিরেই চির-জাগর প্রদীপ জালিয়া সে মেন্তার আরতি করিয়া যাইবে। সে আরতিতে অশ্রুর অঙ্কুর যদি না থাকিত, দ্বন্দ্বজয়ের গৌরব যদি প্রদীপ-শিখার মত দীপ্তি দিত, তবেই সার্থক হইত তাহার প্রকৃতির ক্রোধে সাধন।

কিন্তু এ গণ টিকে না। বে-মাটিতে দ্বন্দ্বের ফসল ফলিয়াছিল তাহা ছাড়িয়া আসিয়া মনে একটু শৈথিল্য আনিয়াছে বটে, কিন্তু এই মুক পৃথিবীর সহিত প্রাণের কথা বিনিময় যে চলে না।

স্থা দিন গুনিতে লাগিল ক- কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব, কবে মাস্তেবের আবেষ্টনে প্রাণে হাসিকান্নার টেউ আবার তুলিয়া উঠিবে। তপনের আশা সে হারাইয়াছে বিশ্বাস হয় না, ঘুরে আসিয়া মনে হইবে হৈমন্তীর ঘরের সেই রাত্রির কাহিনী সবই বৃষ্টি স্বপ্ন। কি করিয়া তাহা সে বলিতে পাবে না, কিন্তু কোনপ্রকারে হয়ত সে স্বপ্ন তাহার টুটিয় যাইবে।

বটনাবৈচিত্র্যহীন দিন কাটিতে লাগিল। সেদিন ভরা বর্ষান পর সূর্যের আলোতে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। কালো মেঘের গুচ্ছ সাদা হইয় উঠিয়াছে। সূর্য্যরশ্মি মেঘের বৃক চিরিয়া চিরিয়া ভালোব তুবড়ীর মত সহস্রাধী হইয়া কাটিয়া বাহিব হইতেছে, কোথায়ও বা মেঘের মাথায় মাথায় হীরাব মুকুটের মত জল জল করিতেছে। মাঠে পুকুরে ক্ষেতে খালে বিলে জল টল টল করিতেছে। তাহার উপর সূর্যের তিষ্ঠ্যকরশ্মি প্রতিকলিত হইয়া অকস্মাৎ প্রকৃতি যেন একটা বিরট শিশুমহল হইয়া উঠিয়াছে, যেন হাজির দর্পণের ভিতর দিয়া

স্বথের আলো বলমল করিয়া উঠিতেছে। গাছের মাথায় পাতায় পাতায় অলকণার মত জলবিন্দু জলিতেছে। এক স্বথের কোটি প্রতিবিম্ব।

চন্দ্রকান্ত ছাড়া কলিকাতা হইতে এই একমাসে স্থধা কাহারও চিঠি পায় নাই, স্থধা আজ সকলকে এক একখানা চিঠি লিখিয়া খবর লইবে ঠিক করিয়াছিল। কাগজ কলম লইয়া মাতুর পাতিয়া সে তাহার ছেলেবেলার সেই দাণ্ডায় বসিয়াছিল। হাড়ু সাঁওতাল হাট হইতে ফিরিবার পথে মাতুরের উপর একখানা চিঠি ফেলিয়া দিয়া গেল।

স্থধা চমকিয়া উঠিল, এ কাহার চিঠি? এ লেখার ইন্দ ত সে ছুলিতে পারে না। কিন্তু তখন ত কখনও স্থধাকে চিঠি লেখে না। না জানি ইহাতে কি আছে? ভাল না মন্দ, হাসি না অশ্রু, কে বলিতে পারে?

এইখানে এই পথের ধারের দাণ্ডায় বসিয়া সে চিঠি পড়িবে না। কে কখন আসিয়া পড়িবে, কোন্ অসময়ে মিথ্যা প্রলোভন তাহাকে উত্থাপ্ত করিবে কে জানে? স্থধা কাগজ কলম ঘরে রাখিয়া চিঠিখানা হাতে করিয়া সাঁওতাল-পাড়ার দিকে বেড়াইতে চলিয়া গেল।

তখন লিখিয়াছে,

“স্থধা, তোমাকে নাম ধরে চিঠি লিখছি ক্ষমা করো। আর কোনও সন্ধান তোমাকে করতে পারি না, পারব না বলেই আজ চিঠি লিখছি। আমি পলাতক, আরও কতদিন পলাতক থাকব তা জানি না। হয়ত আমাকে নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলেছে বন্ধুমহলে, তুমি শুনে থাকবে। যার মধ্যে কল্পনার স্থান নেই, যা খাঁটি সত্য সেইটুকু তোমাকে বলতে এসেছি। তোমার মনের কথা আমি কিছুই জানি না। না জেনে আমার অর্ধ্য তোমায় নিবেদন করা উচিত কি অল্পচিত্ত ভাবতে বসব না, আমার যা বলবার তা বলা ছাড়া আজ উপায় নেই।

“তুমি জান আমি কথা কম বলি, চিঠিতেও বাক্যজাল বিস্তার করব না। আমার অন্তরের যে মণিকোঠায় তোমার জন্ত দেবতার বেদী রচনা করছিলাম, সেটি যদি তোমায় খুলে দেখাতে পারতাম, আর ভাবার প্রয়োজন হ’ত না।

“কিন্তু মাতৃষের প্রথম যৌবনের অর্ধ্য নিবেদনে সঙ্কোচ একটা বড় জিনিষ। আমার যোগ্যতার কথা তুলব না,

যোগ্যতা যদি থাকতও, তবু এগিয়ে এসে দাঁড়াতে আমার ভীক মন আরও কত দীর্ঘ দিন নিত জানি না। সে ভীকতার শাস্তি আমি পেয়েছি, সঙ্করণ সে শাস্তি, তাই স্বকঠিন।

“তোমার কাছে যা বলি নি, অপবের কাছে তা বলবার স্বযোগ এসেছিল, প্রয়োজনও বোধ হয় ছিল। কিন্তু আমার সঙ্কোচ আমার মুখতা, সেখানেও আমাকে বোবা করে রেখেছিল।

“বিধাতার শাস্তি নেমে এসে পুষ্পমালার রূপ ধরে। এ শুধু আমার শাস্তি নয়, নিরপবাহিনী একটি বালিকারও শাস্তি। বুঝতে পারলাম না ভগবান কেন শাস্তি দিলেন তাকে যার মাথায় তাঁর অনন্ত আশীর্বাদ ঘরে পড়া উচিত ছিল। বেদনায় বুক কেটে আসতে লাগল, তবু গ্রহণ করতে পারলাম না সে পুষ্পমালা। মুখ দেখাব কি করে সেখানে তার এই দুঃখের দিনে? তাই আমি পলাতক।

“একথা সে জানে না, আর কেউ জানে না, শুধু আমিই জানি আর আজ তুমি জানলে। আমার হৃদয়পিড়িত মনেব একমাত্র অন্ন যার ছায়াময়ী মূর্তি, তাকে না জানিয়ে আর থাকতে পারলাম না।

“আমি জানি তুমি একথা কোথায়ও প্রকাশ করবে না। যদি আমার ভুল হয়ে থাকে—তোমার কাছে আসা, তবু তুমি ক্ষমা করো। দীর্ঘদিন পথে পথে ঘুরব তুমি ক্ষমা করেছ এইটুকু সত্যনা মনে নিয়ে। যদি কখনও সময় হয়, যদি কখনও ভাক দাঁও ফিরে আসব।”

স্থধার চোখের জলে চিঠির পাতা ভিজিয়া গেল। এ তাহার স্বথের দিনে দুঃখের অশ্রু না দুঃখের দিনে স্বথের অশ্রু? সে আপনার শূন্য মন্দিরে যে নিভৃত পূজার আয়োজন করিতেছিল, তাহাতে আজ অসময়ে দেবতার আসন টলিল কেন? সে ত ডাকে নাই, সে ত চাহে নাই। যেদিন সে সমস্ত প্রাণ ভরিয়া চাহিয়াছিল, সেদিন কেহ সাড়া দিল না। যেদিন সে পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল, আপনার প্রার্থনাকে আপনি রুদ্ধবাক করিয়া টিপিয়া মারিতে বসিল, সেই দিনই এই সাড়া?

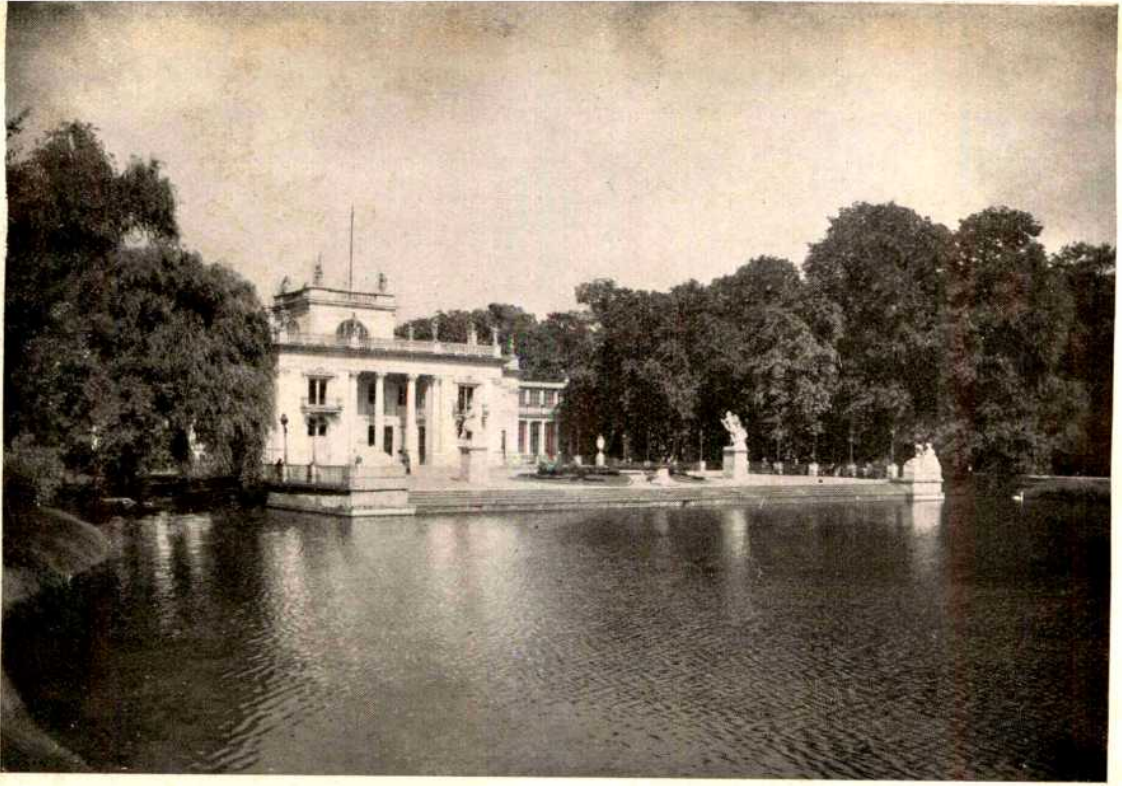
এ-চিঠির জবাব সে কি দিবে? বিধাতা নিজে হৈমন্তীর স্বথের দিন না আনিয়া দিলে স্থধা কি ইহার জবাব দিতে পারিবে?



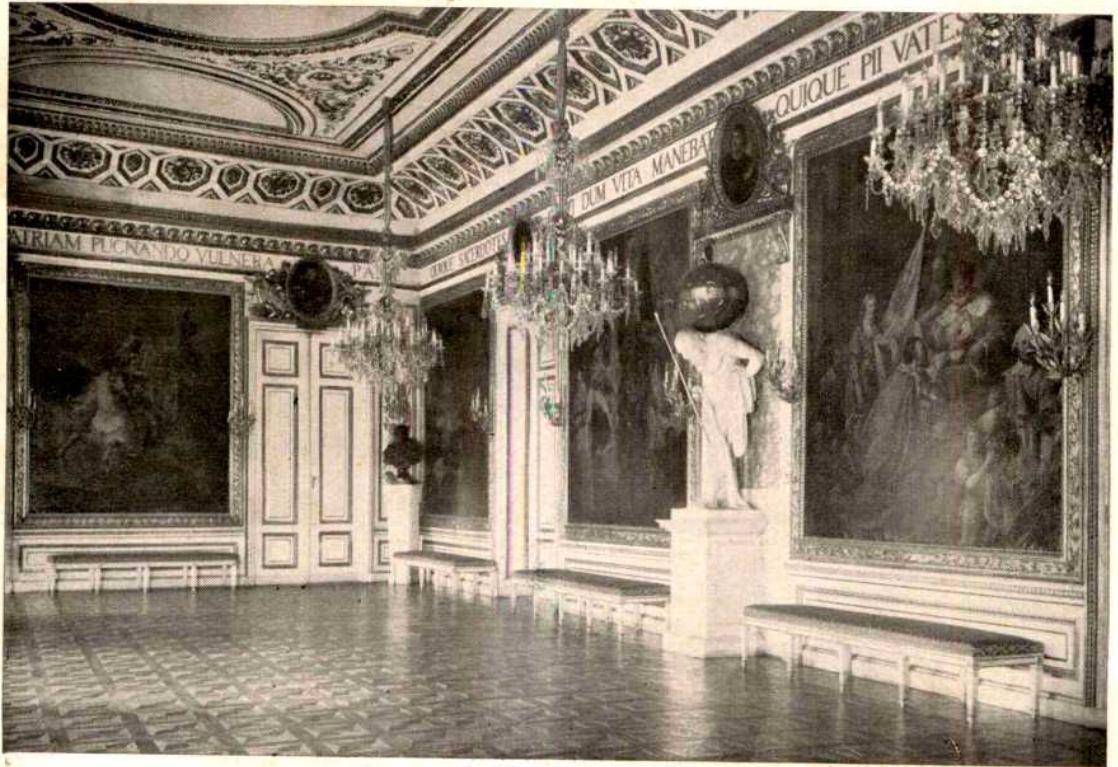
পোল্যান্ডের লোক-নৃত্য



পোল্যান্ডের লোক-নৃত্য



লাজপ্তি প্রাসাদ ও উদ্যান



পোল্যাণ্ডের পূর্বতন রাজপ্রাসাদ ; বর্তমানে রাষ্ট্রপতির আবাস-ভবন

বর্তমান জগদ্ব্যাপী দুর্গতি

(যুরোপের কোনো মরমী ভক্তকে লিখিত পত্র)

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

অনেক দিন হয় আপনার পত্র পেয়েছি। এত দিন উত্তর না-দেওয়া যে কত বড় অন্তার হয়েছে তাই ভাবছি।

এতদিন আমি বাংলার সুদূর সব গ্রামে গ্রামে আউল-বাউল দরবেশ সাধুদের মধ্যে ছিলাম। তাঁদের সাধনা নিত্য কালের, কাজেই কালের তাগিদ সেখানে পরাহত। তাই পত্রের উত্তর না দেওয়ার জন্ত আমাকে ক্ষমা করবেন আশা করি।

এক এক সময় মনে হয় এই সব সাধু-সন্তরা জগতের কি করছেন? জগতে যখন সাদাসিধা ভাবের (simplicity) যুগ ছিল তখন এই সব ভাবুকতা (mysticism) হয়তো বা মানাত। কিন্তু আজ জগৎ জুড়ে যে দুঃখ-দুর্গতির বস্তা চলছে, পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে যে রক্তশক্তির তাণ্ডব লীলা চলছে, তার মধ্যে এই সব ভাবুকতার কি কোনো স্থান আছে? মানবের হাতে মানব-সভ্যতার এই যে নিগ্রহ, এই যে সব দুঃখ-শোক-যাতনা, এর মধ্যে কি এই সব মিস্টিক সাধনা একটা বিলাসিতা নয়?

পৃথিবীতে আগেকার যুগেও যুদ্ধবিগ্রহ ছিল। তখন পরস্পরে অনেক মারামারি কাটাকাটি হয়েছে। কিন্তু সে-সব জিনিষ আজকার বিপদের কাছে কিছুই নয়। আজ যে প্রলয় আসছে বিরাট তার আয়তন, বীভৎস তার ধ্বংসলীলা। যে প্রলয় আসছে তার কাছে সে-যুগের সে-সব যুদ্ধবিগ্রহ অতিশয় তুচ্ছ। এই বিশাল বিনিপাত যখন আসবে তখন এক সঙ্গে তাবৎ মানব-সভ্যতাকে ধ্বংস করে তবে ছাড়বে। এখনকার যুগের সমগ্র মানব-ইতিহাস যেন একটা দারুণ টাইটানিকের মত বিশ্ববিধাতার প্রচেষ্টা নির্ধম্ব ঘা খেয়ে নিঃশেষে ডুবে মরবার দিকে ধেয়ে চলেছে।

জগতে যখন সভ্যতার এতদূর উন্নতি (৭) হয় নি তখন

মানব-সভ্যতা যেন ছোট ছোট নৌকাতে যাতায়াত করত। তখন তার আয়তন, তার পাল-মাস্তুল এত বিপুল ছিল না। যদি গুপ্ত শৈলের আঘাতে কোনো নৌকা ডুবে মরত তবে ক্ষতিটা এমন নিদারুণ হ'ত না, কারণ প্রত্যেকটি নৌকা ছিল আপন ক্ষুদ্রতায় সীমাবদ্ধ।

কিন্তু আজ মানব-সাধনার বিপুল বিস্তার দিন দিন বেড়েই চলেছে। তার এই সব বিস্তার, জাতীয়তা, সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতির নামে দিন দিন আপনাকে ক্ষীত ক'রে তুলবে। জলদৈত্য অক্টোপসের মত তার বজ্রবাহ সারা জগৎকে পাশবদ্ধ ক'রে টেনে আনছে। মানব-সাধনার জাহাজ আজ বিপুলকায়। বিজ্ঞানের বলে তার পালগুলি আজ রসাতল হ'তে অন্তরীক্ষ পর্যন্ত পরিবাণ্ড। সর্বভাবে আজ সে বিস্তারলাভ করেছে। পৃথিবীর যত সব নিগুঢ় শক্তি, সবগুলিকে মুক্ত ক'রে ঐ পালের উপর ঝড়ের বেগে এনে ফেলা হচ্ছে। সবই বিজ্ঞানের কাজ। শক্তির ও বেগের আর অন্ত নেই।

অথচ এই জাহাজে কোনো হাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মানবসভ্যতার জাহাজ আজ কর্ণধারহীন—derelict। ধর্মের বা নীতির কোনো চালনা এরা স্বীকার করতে নারাজ। গুপ্ত যুগ-শৈলে ঘা খেলে এই জাহাজ সমস্ত জগৎকে নিয়ে ডুবে মরবে। তাতে যা প্রলয় হবে, টাইটানিক প্রভৃতির ধ্বংসলীলা তার কাছে কিছুই নয়। তার প্রলয়-সঙ্ঘর্ষে পৃথিবীর সব সভ্যতা চূর্ণবিচূর্ণ হবেই। রক্ষার আর কোনো পথ দেখা যাচ্ছে না। আজকার দিনের বিজ্ঞানের প্রলয় শক্তিকে ঠেকাবার সাধ্য কারো নেই।

পৃথিবীকে আজ এই কর্ণধারহীন এমন এক অন্ধ উচ্ছৃঙ্খল শক্তির হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে যা স্বধু ধ্বংসই করতে জানে; সৃষ্টির সামর্থ্য, প্রাণ দেবার, গড়ে তুলবার, শক্তি যার

নেই। এই মহাপ্রলয়ের পর মানব-সভ্যতার মধ্যে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করবে কে?

আপনার দেশেই হোক কি আমাদের দেশেই হোক, ধর্মের নিগূঢ় নিলয়ে যদি জীবনের সাধনার একটু-আধটু বীজ পড়ে থাকে, এই গর্ষিত প্রলয়ে উপেক্ষিত হয়েও যদি তা কোনো রূপে কোথাও টিকে থাকে, তবে এই প্রলয়ের পর আবার নব সৃষ্টির কিছু আশা করাও যেতে বা পারে। আবার যদি মানব-ইতিহাসকে কেউ গড়তে পারে তবে পারবে মানুষের ধর্ম। কারণ ধারণ করাই হ'ল ধর্মের ভিত্তরকার কথা।

কিন্তু সেই ভরসাও ক্ষীণ হয়ে আসে যখন দেখি ধর্ম তার সহজ সরল স্বরূপটি বিসর্জন দিয়ে আত্মঘাত এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বঘাত করতে উদ্যত হয়েছে। ধর্মও আজ সাম্রাজ্যবাদের চালে আপনাকে বিপুল জগৎ-জোড়া করে তুলতে চাচ্ছে। অর্থাৎ যখন অতি বিপুলতার দোবে মানব-সভ্যতা ডুবতে উদ্যত, তখন ধর্ম কোথায় রক্ষা করবে, না তার অহুসরণ করে সেও সহমরণে মরতে উদ্যত! এমনি অন্ধ পণ করেছে সে! আমাদের দেশেও দেখছি ধর্ম আজ তার প্রাচীন ভারতের সরল আদর্শের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে!

মৃত্যুর আগে অনেক কীটের পক্ষবিস্তার ঘটে। মানব-সভ্যতার সেই পক্ষবিস্তার দেখা যাচ্ছে তার সাম্রাজ্যবাদে। আত্মঘাতের নেশায় মানব-সভ্যতা আজ মত্ত হয়ে দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়েছে। সেই নেশা দেখছি আজ আমাদের ধর্মকেও পেয়ে বসেছে। যাদের আর কোন রকমে সাম্রাজ্যবাদের লীলাভিনয় করবার উপায় নেই তারা ধর্ম দিয়েই সেই সখি মেটাতে, সেই তৃষ্ণাটি পূরো করতে মত্ত হয়ে উঠেছে। তাই আজ সাধকদের (?) ইচ্ছা জেগেছে তাঁদের ধর্মের নামেও এমন একটা বিপুল বিজয়যাত্রার আয়োজন করা যায় কিনা যাতে জগতের অগ্র সব ধর্মকে সেই বিজয়যাত্রাতে বিজিত বন্দীর মত পিছনে সার করে টেনে নিয়ে যাওয়া চলে! এ এক দারুণ প্রলোভন! এর বিরুদ্ধে মুখ ফুটে কেউ কিছু বলুক দেখি! আজ জগতে কোথায় বা কে ডিক্টেটরদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারছেন? মুখ থেকে কথা বের হতে-না-হতে তাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে হবে না?

আমাদের দেশেও এই কথা বলবার মত লোক তুল'ভ।

মেগালোম্যানিয়ার (Megalomania) বিষ-পাগলা কুকুরের বিষের মত। পাগলা কুকুর থাকে কামড়ায় সে যেন আরও বেশি পাগল হয়ে ওঠে। যুরোপের এই বিষ ভারতকে আজ মজ্জায় মজ্জায় যেন আরও বেশি পেয়ে বসেছে। আমাদের শিরায় শিরায় এর দানব-লীলা আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠছে। তার পর যদি কেউ বলতেও উদ্যত হন, তবে তাঁর শ্রোতা নেই। তাই আজ ধর্মের নামে, মতের নামে, ভাষার নামে, সর্ব্ব ভাবে চলেছে সাম্রাজ্যবাদের নানাবিধ অর্থহীন অহুসরণ ও অহুসরণ। ইচ্ছাটা তাই বটে, তবে শক্তিতে কুলোয় না এই বা কথা।

আজ তাই আমাদের দেশেও আমরা ধর্মের নামে ক্রমে অর্গ্যানিজেশনকে পূজা করতে উদ্যত হয়েছি। অর্গ্যানিজেশনটা যত বড়, যেন ধর্মসাধনাও তত বড় হ'ল! এই সবই দাস-মনোবৃত্তি, কিন্তু একথা বুঝায় কে? ধর্মের মর্ম্মকে ছেড়ে এই সব অর্গ্যানিজেশনের পূজার মধ্যে যে একটি ধর্মব্রত নীতির ব্যাভিচার আছে সেই ব্যাথা আজ আর আমাদের অন্তরের শুচিতাকে পীড়া দেয় না! এমন কি, যে-সব ধর্মসাধকেরা অপৌত্তলিকতার গর্ভ করেন তাঁরাও নিজেদের এই অপচেষ্টার মধ্যে পৌত্তলিকতাটা ধরতে অক্ষম।

যদি অর্গ্যানিজেশনেরই পূজা করি তবে ফোর্ডের কারখানা, জগতের ডাক- ও তার-বিভাগ বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই পূজা করা উচিত, কারণ এত বিরাট ও প্রবল অর্গ্যানিজেশন আর কোথায় মিলবে?

আমরা আজ আমাদের পিতামহদের সরল অধ্যাত্ম সত্যগুলি ভুলেই গিয়েছি। কঠোপনিষৎ যে বলছে, “যা ছোট হ'তে ছোট তাই আবার মহৎ হ'তেও মহৎ”, (অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্; ২, ২০) একথা কি আমাদের মনে ধরে? সেখানেই শ্রুতি বলছেন, “সেই সত্য আমাদের হৃদয়ের মধ্যে” (গুহ্যায় নিহিতোহস্ত জন্তোঃ ২, ২০)। খেতামতরও এই কথাই বলেছেন। মুণ্ডক উপনিষৎ বলছেন, “সমস্ত লোক এবং সমস্ত লোক-নিবাসী ষাঁহাতে আশ্রিত তিনি অণু হ'তেও অণু” (ষদগুভ্যোহণু যশ্বিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ; মুণ্ডক, ২, ২, ২)।

কঠোপনিষৎ বলছেন, “তিনিও গুহাহিত” গহ্বরেষ্ঠ (২, ১২) — অর্থাৎ তিনি আমাদের অন্তরের গুহার মধ্যে। অন্তরে তিনি শান্ত, আবার বাহিরেও তিনি স্তব্ধ। তাই খেতাবতর বলেন, “বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠতোকঃ” (৩, ২) অর্থাৎ এই আকাশে তিনি আপন মহিমায় বৃক্ষের স্তব্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠিত। ছান্দোগ্য বলেন, তাঁহাকে “শান্ত উপাসীত” (৩, ১৪, ১)—অর্থাৎ শান্ত ভাবে উপাসনা করিবে। এই জগত্ই তৈত্তিরীয় বলেন, “সত্যং বদ ধর্ম্য চর” (১, ১১, ১)। কতদূর সরল কথা!

“সত্য কথা বল, ধর্মকে আঁহা কর”। এর চেয়ে সহজ কথা আর কি হ’তে পারে। এই ধর্মের স্বল্পও যে পেয়েছে সে মহদভয় হ’তে রক্ষা পেয়ে গিয়েছে—(স্বল্পমণ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ । গীতা ২, ৪০)

ভারতের এই সহজ সরল আদর্শ হ’তে আজ আমরা ভ্রষ্ট হয়েছি। আজ কাগজে, ঘোষণায়, কর্মকাণ্ডে, অনুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে, অগণিত রকমের প্রোপাগান্ডাতে, বিপুলতাকেই আমরা মনে করি চরম সার্থকতা। আমাদের মন যেন আজ এই তীব্র সুরায় মাতাল হয়ে উঠেছে। আমরা আজ সবাই “বিপুলতানানবে”র পূজারী। কাপালিক শাস্ত্রও এই নামে লালিত হ’লে নিজেকে অপমানিত বোধ করবার কথা।

আপনাদের দেশের একটা ভরসা এই, যে, আপনাদের আত্মসম্বল বিপদও যেমন বৃহৎ তেমনি ঐ দেশে নানা স্থানে এমন সব বড় বড় মনীষী আছেন যারা তাঁদের যুগ ও দেশ হ’তে অনেক বড়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, পৃথিবীর ব্যবস্থা ধানের হাতে তাঁরা এই সব মনীষীদের বাণীকে কিছুতেই আমল দেন না। সাধারণ লোকও এমনই মত্ত হয়ে রয়েছে যে এঁদের ভাব ও বাণী তারা বুঝতেই পারে না। কাজেই অনেক দুঃখ-দুর্গতির মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল এই সব অসাধ্য বাণীকে প্রতীক্ষা করতে হবে।

আমাদের এই ত দারুণ দুঃখ! যুরোপের এই বিপুলতার মত্ততা, সাম্রাজ্যবাদের নেশা আমাদের পেয়ে বসেছে, অথচ যুরোপের এই সব মনীষীদের মহিমা আমরা ভাল ক’রে উপলব্ধি ক’রে উঠতে পারছি নে। অথচ আমাদের পিতৃ-পিতামহদের প্রাচীন সরল মন্ত্র ও সাধনাও আমরা হারিয়েছি। তাতেও আমাদের প্রাণ সাড়া দেয় না!

চারি দিকে ঘরেবাইরে যখন এমন দুর্গতি, তখন কোথায় পাই শান্তি? বড় বড় শহর, প্রখ্যাত সব মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠান, সব দিকে চেয়ে দেখলাম, সর্বত্রই সেই সর্বনাশা আগুন লেগেছে।

আর গতি নেই দেখে, এই সব প্রখ্যাত জায়গা ছেড়ে, বাংলার সব অখ্যাত পল্লীর মধ্যে ঘুরে বেড়াছি। কোথায় কোন্ অজ্ঞাত পল্লীপ্রান্তে দুঃখী দরিদ্র নিরক্ষর আউল-বাউল দরবেশ কেউ আছেন, তাঁদের খোঁজেই লেগে আছি। তাঁদের মধ্যে এমন এক এক জনকে দেখতে পাই, যাদের কাছে বসলে অপূর্ব একটি শান্তি অনুভব করা যায়। জগৎ-জোড়া অর্গ্যানিজেশনের প্রচণ্ড চাপ ও দারুণ তাপ সেখানে নেই।

জগতে মৃত্যুর দারুণ অগ্নিবজ্র তো আসছে। তার মধ্যে এঁদের কেউ কেউ কি জীবনের শাখত কিছু কিছু বীজ কোনও প্রকারে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন? যদি পারেন, তবে সেই প্রলয়ান্ধ যখন স্বপক্ষ প্রতিপক্ষ সবাইকে দগ্ধ ক’রে বিদায় নেবে, তখন সেই ভস্ম-প্রান্তরের মধ্যে এঁদের প্রক্ষিপ্ত সেই সব বীজে হয়তো আবার নতুন ক’রে মানব-সাধনার আরম্ভ হ’তে পারবে।

সেই দারুণ প্রাবনের মধ্যে এঁরা যেন প্রত্যেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একটি নোয়ার ভেলা (Noah's ark)। এই ভেলাগুলি কোনটাই বিশাল-আয়তন নয়। বিশাল হ’লে বিপদ আছে, একটি ডুবলেই সব গেল। এঁরা যেন আদি কারণ সলিলে এক একটি ভাসমান বটপত্র, নারায়ণ যার মধ্যে যোগনিদ্রারত। প্রত্যেকটি বটপত্র ভবিষ্যতের অমর বীজে ভরপুর। যত দিন প্রাবন চলবে তত দিন এই সব বীজ ভেসেই বেড়াবে। তার পর যদি এই সব বীজ ক্ষেত্র পায় তবে হয়তো পৃথিবীকে চিরন্তন অথচ চিরনবীন প্রাণ-সম্পদে পরিপূর্ণ করবে। এই দুর্দিনে এর চেয়ে বড় আশা আর কি করতে পারি?

এখন আপনাদের দেশে রমণীয় উষ্ণ ঋতু। এই দিনেও আপনার কাজের অন্ত নেই তা’ জানি। লিখেছেন, আপনি অতি শ্রান্ত। কিন্তু তাতে আপত্তি করলে চলবে কেন? প্রভুও যে আমাদের সদা সেবারত। তাঁর সেবক কি সেবাতে শ্রান্ত বললে চলে?

কবীরের একটি বাণী এই উপলক্ষে আপনার কাছে
উপস্থিত করতে চাই,—

কব্ বাহুবল আপনীর ছাড়্ বিয়ানী আস।

জিসকে অঁগন নদী বহে সে কুঁ মরে পিয়াস।

“নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর কব্ বাহির হইতে অস্ত্র কাহারও
সহায়তা আসিবে সেই ভরসা ছাড়্। ভয় কিসের? বাহার অঙ্গন
দিয়া নিত্যধারা নদী সদা বহিয়া চলিয়াছে, সে কেন আবার মরে
পিপাসায়!”

অনেক দিনের পর পত্র দিলাম। কিন্তু তাতে মনে

করবেন না যে আজই আপনাকে স্মরণ করলাম। প্রতি-
দিনই আপনাকে স্মরণ করি। আপনার কাজ (mission),
আপনার দুঃখ-অশান্তির কথা প্রতিদিনই ভাবি।

পরমাত্মা আপনাকে প্রেম দিন, সেবাতে অমুরাগ দিন,
শক্তি দিন, ব্যর্থতার ভার বহনের মত শক্তি দিন।

আপনি অনেক দূরে, আমি অনেক দূরে, তবু সর্ব-
কায়মনোচিত্তে আপনার শুভ প্রার্থনা করি। আপনার
নিজের শক্তি ও মৈত্রী নিরন্তর আপনার অন্তর ও বাহিরকে
পূর্ণ করে রাখুক, আপনার সকল তাপ হরণ করুক।

মধু-মঞ্জুবা

শ্রীরসিকলাল দাস

পেয়েছি তব পরম রমণীয়

সুধায় ভরা তৃষ্ণাহরা অমৃত-লিপি অনির্বচনীয়।

গেঁথেছ যেন মমতা-ফুলমালা

দরদ-ভরা অন্তরের গভীরতম পরশ-সুধা-ঢালা।

এসেছে তব পত্রখানি বেয়ে

উছল-প্রীতি-বস্ত্রাজল, দিয়েছে মোর পরাণ-মন ছেয়ে।

চিঠিটি তব কতই সুমধুর

কতই প্রীতি মরম-মধু দরদ দিয়ে করেছ ভরপুর।

সাদরে বরি সে মধু-মঞ্জুবা

বিদ্রুি হৃদি-অন্ধকার এনেছে তাহা কনক-রাঙা উবা।

মধুতলে তাই ত এরে গনি

বাখা-দিগ্ধ অন্তরেতে আনন্দের পদ্মরাগ-মণি।

পড়িছ তারে আদরে কতবার,

যতই পড়ি ততই মম হৃদয়-মন আকুলি বার-বার—

বিধুর তব ছবিটি গুঠে ছুটি,

মুখটি তব ককণ-মান বাখা-কাতর সজল আঁখি ছুটি।

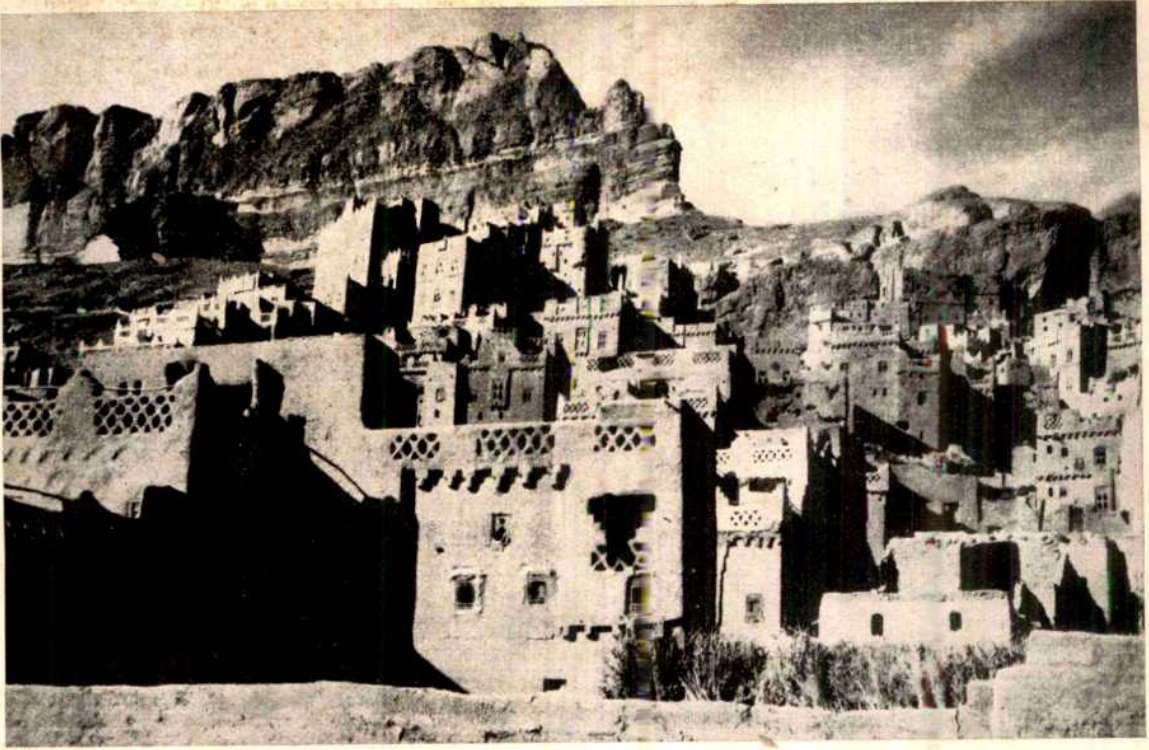
তখন মম পরাণ-তম্বু-মন

তোমার পানে নিগূঢ় টানে অসহ-বেগে টানে যে অমুখন।

মরম-সাখী, পাইতে তোমা পাশে

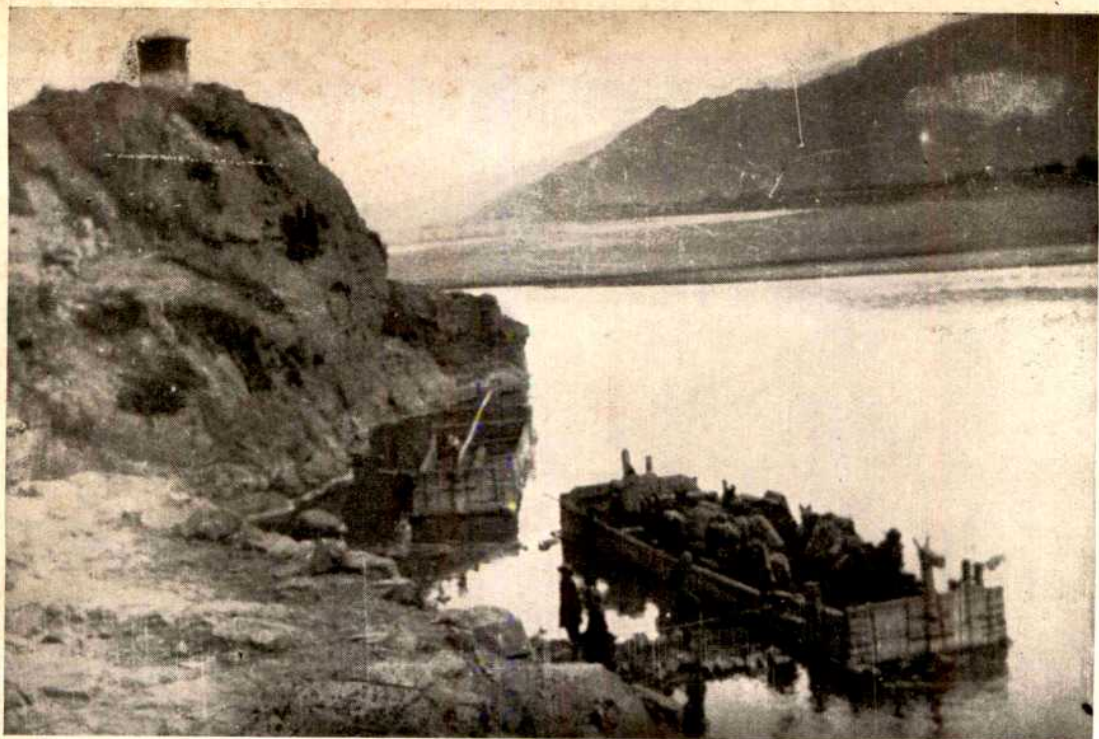
বাসনা জাগে অন্তরের নিতল-তলে তীব্র উচ্ছ্বাসে।





উপরে : পৰ্ব্বতগাত্রে টেরিম নগর

নীচে : হাদ্রামাউটের প্রধান শহর, সেজুন



তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র



দলাই লামার প্রাসাদ

['নিবন্ধ দেশে সওয়া বৎসর' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

১৭

উর্গেন কুশো ঘোড়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১১ই এপ্রিল আচার্য্য শাস্ত্ররক্ষিতের কীৰ্ত্তি সম্মে-য়ে বিহারের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আমরা বিদায় লইলাম। চার-পাঁচ মাইল যাইবার পর হং-গো-চং-গং গ্রামের একটি লোকের সঙ্গে দেখা হইল, সে আমাদের ফিরিয়া যাইবার জন্য অল্পরোধ করিয়া বলিল যে, পথ-থবচের টাকা সে দিবে। কিন্তু আমাদের পক্ষে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না। এখানে পথ চড়াইয়ের এবং রাস্তা ভাল। দুই-তিন ঘণ্টা চলিবার পর নির্জন স্থানে একটি এক-কক্ষযুক্ত গৃহ পাইলাম। এই গৃহে সম্মে-য়ে বিহার-নিৰ্ম্মাতা সম্রাট ঠি-শ্বেং-ল্দে-ব্চন্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আরও চলিবার পর একটি ধ্বংসোন্মুখ গ্রাম এবং তাহার পর হং-গো-চং-গং গ্রাম পাইলাম। শেথোক গ্রামে রাজি বাপন করা হইল। কয়দিন স্নান হয় নাই, ৭ বদিন প্রাতে গ্রামের সেচ-নালায় স্নান করিয়া গ্রাম-কর্ত্তার সৌজন্তে প্রাপ্ত দুইটি ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা বগদান্না হইলাম। পথে চড়াই কম এবং পনর হাজার ফুট উচ্চতান হিসাবে ঠাণ্ডাও কম। কিছু দূর যাইবার পর রাস্তাব ভাঙিনে একটি মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখিলাম, শুনিলাম, ইহা তিব্বত-বিজেতা গুশি খানের মঙ্গোল-সেনার কার্য্য। নক্ষ্যা ৭টায় আমরা লাসার নদী উই-ছু তটে দে-ছেন-জোঙে গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এই গ্রাম চীন ও মঙ্গোলিয়ার সহিত তিব্বতের ব্যাপারিক মার্গে স্থিত।

এখান হইতে গং-দন্ মঠ এক দিনেব পথ। প্রসিদ্ধ সংস্কারক চোং-খ-পা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই মঠকে নিজ পীঠস্থান করেন এবং এখানেই ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হয়। তিব্বতের সংস্কারপন্থী পীতটুপিধারী সম্প্রদায় (টশীলামা ও দলাইলামা এই সম্প্রদায়ভুক্ত) এই মঠের নামে গং-দন্-পা বলিয়া খ্যাত। গং-দন্ মঠ দর্শন আমাদের কার্য্যাবলীর মধ্যে ছিল, স্তবরাং ১৩ই এপ্রিল ধর্ম্মকীৰ্ত্তি

পদব্রজে এবং আমি ঘোড়ায় চড়িয়া সেইদিকে বগদান্না হইলাম। আমার সম্মের পুঙ্খকানি বস্তাবন্দী করিয়া সীলমোহর লাগাইয়া রাখিয়া গেলাম। গং-দন্ মঠ পাহাড়ের শিখরে অবস্থিত, কল্ছে ঝরণা বা নদী নাই, স্তবরাং জলের কষ্ট খুবই, পথেও খেতে চড়াই। চারি দিকে নগ্ন পাহাড়ের সারি।

মঠে পৌছিয়া প্রথমেই যে মন্দিরের ভিতর এক স্তূপে চোং-খপার দেহাবশেষ রক্ষিত আছে তাহা দর্শন করিতে চলিলাম। স্তূপের উপর মঙ্গোল-সর্দার প্রদত্ত শামিয়ানা বিস্তারিত। সজী বলিলেন, এখানে জে-রিন্-পোছেব শির আছে। পরে যে কক্ষে মহান সংস্কারক থাকিতেন সেখানে তাঁহার কাষ্ঠাসন ও যে-সিন্দুবে তাঁহার স্বহস্তলিখিত গ্রন্থরাজি আছে তাহাও দেখিলাম। এ মন্দিরেও স্বর্ণ-রৌপ্যের ছড়াছড়ি। পরে নীচ ১০৮ স্তম্ভে সজ্জিত এক বিরাট উপসোখাগার দেখিলাম, সেখানে চোং-খ-পার সিংহাসন রহিয়াছে। অন্য আব এক স্থলে দেখিলাম এক সিংহাসনের উপর বর্ত্তমান দলাইলামার পুঙ্খপ্রমাণ মূর্ত্তি আসীন। আধকাল এই মঠে তিন হাজার ভিক্ষু থাকে। যে মঙ্গোল ভিক্ষু আমাদের স্থান দিয়াছেন, শুনিলাম, তিনি গুশি খানের বংশজ। চঙ্গল খানের বংশোদ্ভব বলিয়া তাঁহার সমাদরও অধিক।

১৪ই এপ্রিল গংদন হইতে দে-ছেন-জোঙে ফিরিলাম। পথে ধর্ম্মকীৰ্ত্তির পরিচিত এক মঙ্গোল ও তাহার সজিনী এক ধর্ম্ম-দেশবাসিনীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমবা স্থির করিলাম এখান হইতে লাসা কা (চামড়ার নৌকা)-যোগে যাইব। অতিপ্রত্যাষে যাত্রা করিব বলিয়া রাজিটা নৌকার মান্নির কুটাবেই কাটাইলাম। এদেশে যত কুটার দেখিয়াছি তাহার মধ্যে ইহাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা কীর্ণ ও দারিদ্র্যপূর্ণ কিন্তু ইহাতেও তিন-চারিখানি চিত্রপট ও দুই-তিনটি সুন্দর মূর্ত্তি আছে এবং মূর্ত্তিগুলি আমাদের দেশের অনেক বড় মন্দিরের

জয়পুরী মন্দিরের তৈরি বাজে মূর্তি অপেক্ষা বহুগুণে স্থান্য।
যথেষ্ট স্বামী পায় নাই বলিয়া, সকালে মাঝি নৌকা ছাড়িতে
চাহিল না। শেষে ভাড়া দ্বিগুণের উপর কবুল করায় অনেক
বেলায় নৌকা ছাড়িল। নদীপথে দুই পাশের গ্রাম ও পাহাড়ের
শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। দুই ঘণ্টা চলিবার পর
আচাৰ্য্য দীপঙ্কর স্রীজ্ঞানের চরণধূলিপুত হেব-বা পাহাড় দেখা
দিল। দ্বিপ্রহরে লাসা পৌছিলাম।

৫ই এপ্রিল লাসা ছাড়িয়াছিলাম, তখনও শীত আছে।
১৫ই এপ্রিল ফিরিয়া দেখিলাম গরম পড়িয়াছে। আরও
দেখিলাম টাকার দাম চড়িয়াছে। আমার পক্ষে ইহ
সুসংবাদ, কেননা টাকার বদলে তিব্বতীয় টকা অধিক পাওয়া
পুস্তকাদি খরিদ করা সহজ হইল। এখন প্রত্যাবর্তনের মুখ
মালপত্র বান্ধিতে লাগিলাম। দামী চিত্রপট ও পুস্তকাদি
মোমজামায় মুড়িয়া কাঠের বাজে প্যাক করাইলাম। বাজ
প্রথমে চটে মুড়িয়া তাহার উপর স্বাকের চামড়া ঢাকিয়া
সেলাই করাইলাম। ইহার ফলে আমার কোনও জিনিষ
নষ্ট হয় নাই।

* * *

২৩শে এপ্রিল প্রাতে লাসা হইতে বিদায় লইলাম। সপ্তম-
নয় মাস একত্রে থাকার কলে ছুশিঙ-শা কুটির স্বামী
জ্ঞানমান সাহ, তাঁহার পত্নী, তাঁহার সহকারী শুভাঙ্ক
ধীরেন্দ্র বজ্র প্রভৃতি সকলের সঙ্গে অভ্যস্ত ঘনিষ্ঠতা
হইয়াছিল। সে গৃহ ঘেন নিজের বলিয়া মনে হইত।
তাঁহারা সকলে বিদায় দিতে শহরের বাহির পর্যন্ত
আসিলেন। বিদায়ের কথা আর কি বলিব ?

পথের জন্ত দুইটি খচর চৌদ্দ মোজের মূল্যে কিনিয়া
ছিলাম। বহুগুণ বলিয়াছিলেন ইহাতে পঞ্চ-চলার স্থান
হইবে, উপরন্তু কালিঙ্গ বাজারে দাম যা পাওয়া যাইবে
তাহাতে মায় পথের খরচ সবই আদায় হইয়া যাইবে।
বহুদের কাছে বিদায় লইবার পর পোতলা প্রাসাদের সম্মুখ
দিয়া আমাদের সওয়ারী চলিল। এই পোতলা এক দিন
অপ্লেব মত মনে হইত, কয় মাস ধরিয়া ক্রমাগত দর্শন
ইহার মাহাত্ম্য অনেক কমিয়া গিয়াছে। খাওয়া পরা
শোওয়া ইত্যাদির সরঞ্জাম বাদে আমরা প্রত্যেকে এক
একটি পিস্তল লইয়াছিলাম। ধর্মকীর্তি পিস্তল ব্লাইয়া

কার্ড জের মালার উপবীত পরিয়া চলিতেন, আমিও প্রায়
তাই। এ দেশের ডাকাডের উৎপাত খুবই বেশী এবং
আমরা দুইজন মাত্র লোক, সেই জন্যই এত সজ্জা।
আমাদের ইচ্ছা ছিল সো-খঙ গিয়া যেখানে দীপঙ্কর
স্রীজ্ঞান দেহভাগ করিয়াছিলেন সেখানকার সেই তারা-
মন্দির দর্শন করিব। দ্বিপ্রহরে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইয়া
যে-গৃহে লাসা বাইবার পথে ঠাই পাইয়াছিলাম সেখানেই
উঠিলাম। গৃহস্থামী আমাকে চিনিতে পারিল না, যদিও
তাহার বেশ মনে ছিল যে এই পথে কিছু দিন পূর্বে
এক লম্বাখী ভিখারীর বেশে লাসা গিয়াছিল।

কিন্তু বিশ্রামের পর তারা-মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা
করায় শুনিলাম তাহা নিকটেই, স্বতরাং খচরে চড়িয়া
বাইবার প্রয়োজন নাই। ধর্মকীর্তি খচরগুলির দানাপানির
ব্যবস্থায় রহিলেন, পঞ্চপ্রদর্শিকারূপে একটি বালিকাকে সঙ্গে
লইয়া আমি মন্দির দর্শনে চলিলাম। গ্রামের পরই একটি
টিল, তাহার উপর হইতে অদূরে মন্দির দেখা দিল। বস্তুত
মন্দির প্রায় দুই মাইল দূরে, কিন্তু তিব্বতের স্বচ্ছ নির্মল
বায়ুতে এইরূপ নৈকট্য-ভ্রম হয়। এই মন্দিরও অল্প
অনেক মহত্বপূর্ণ স্থানের জায় উপেক্ষিত ও জীর্ণ। ভিতরে
তারা-দেবালয়, বাহিরে বিরাট রক্তচন্দন-কাঠের স্তম্ভাবলী,
তাহাদের শুষ্ক কর্কশ রূপ আট-নয় শত বৎসরের
প্রাচীনত্বের পূর্ণ পরিচয় দিতেছে। এখানকার সাধুসম্প্রদায়
সকলেই বালক। পূজারী বালক ও তাহার সহায়কবর্গও
বালক। আমি দুই-চারি আনা পয়সা বিতরণ করিতে
তাহারা মহা উৎসাহে আমাকে সকল দ্রষ্টব্য দেখাইতে
লাগিল। মন্দিরের ভিতরে দীপঙ্করের ইষ্ট ২১টি তাবাদেবীর
স্থান মূর্তি রহিয়াছে। সেই মন্দিরেই বাম দিকে দলাই-
লামার সীলমোহরযুক্ত বহু লৌহপিল্লের দীপঙ্করের ভিক্ষাপাত্র,
দণ্ড ও তাম্র-জলাধার (লোটা) বস্তুত, সেই সঙ্গে কিছু
রৌপ্যমুদ্রা ও শস্যও রাখা হইয়াছে। মন্দিরের পশ্চাত্তাগে
তিনটি পিস্তলের স্তূপে স্বাভাবিক দীপঙ্করের পাত্র, সিঁদু
কারোপার ছদয় ও দীপঙ্করের প্রিয় শিষ্য ডোম-তোন-পার
বজ্র রক্ষিত। বামভাগে অমিতায়বের মন্দিরের বাহিরের
দুইটি জীর্ণ পুরাতন স্তূপ দেখিতে গিয়া বোধ হইল সন্ধ্যা
আগতপ্রায়, স্বতরাং গৃহের দিকে ফিরিয়া আসিলাম।

২৫শে এপ্রিল রওয়ানা হইলাম। খচর নিজের এবং সেগুলি বলিষ্ঠ, স্বতরাং চার-পাঁচ দিনে গ্যাঞ্চী পৌছানো সম্ভব মনে হইল। এ-অঞ্চলে লাল উলের গুচ্ছে শোভিত যাক ঘারা চাষ চলিতেছিল। দ্বিপ্রহরে ছু-শরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ক্ষেতে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। এখানে গাছের পাতাও খুব বড় হইয়াছে দেখিলাম। এখন আমার আর ভিথারী-বেশ নাই, পরশে পোস্তিনের চোগা, মাখায় ফেণ্ট হাট। ছু-শরের শ্রেষ্ঠ বাড়ীর সর্বোত্তম কক্ষে উঠিলাম, ঘরের অধিকারী মহা যত্নে সেবা করিতে লাগিল। গৃহ-স্বামিনী এক অর্ধ-চীনার স্ত্রী। বহুদিন পতির কোনও সংবাদ সে পায় নাই, স্বতরাং এখন শুনিল আমরা কাম্পিং বাইব তখন অশ্রুসিক্ত মুখে আমাদের বলিল যে, সে শুনিয়াছে, তাহার স্বামী সেখানে আছে এবং আমরা সেখানে কেনও খবর পাইলে যেন তাহাকে জানাই।

পরদিন প্রাতে যাত্রা করিয়া নিকটস্থ ব্রহ্মপুত্রের গেরা-ঘাটে পৌছিলাম। এখানে স্রোতের বেগও অধিক নহে, নদীর বিস্তারও কম। নৌকায় উঠিতে উঠিতে আরও তিনটি সওয়ার আসিয়া জুটিল এবং পার হইয়া আমরা পাঁচজন একত্রে চলিলাম। সঙ্গীদের তাড়াতাড়ি খাফায় দ্রুত চলিতে চলিতে থম-বো-লা চড়াই পার হইলে গারে দেখিলাম এক দিকে ব্রহ্মপুত্রের ক্ষীণ ধারা দেখা যাইতেছে এবং অল্প দিকে ন-গ-চের বিশাল ঝিল। উৎরাই-রর সময় খচর ছাড়িয়া পদ্মক্ষে চলিয়া হম-লুঙ গ্রামে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গীরা সওয়াগর, এ-পথে তাহাদের স্বই পবিচ্ছিত, স্বতরাং রাজিষাপনের ব্যবস্থা সহজেই হইল। পরদিন ঝিলের পাশ দিয়া পথ চলিতে তীব্র শীত-বাতাসে বড়ই কষ্ট হইল। ১৩ হাজার ফুট উচ্চ এই ঝিলের কিনারাও জলনালীতে বরফের চাপ বঁধিয়া আছে। পথ চলা দুক্ল দেখিয়া আমরা পথের ধারে এক গ্রামে আশ্রয় লইয়া আহাঙ্গারাদির পব করেক ঘণ্টা বিশ্রাম করিলাম। কিন্তু হাওয়া সমান তীব্র। আজ কোন উচ্চ "লা" চড়াই নাই জানায় আমি যুখে হাতে ভেসেলিনের প্রলেপ দিই নাই, ফলে শরীরের সকল উন্মুক্ত স্থানের চামড়া শীতে জ্বলিয়া কালো হইয়া গেল। ধর্মকীর্তির সেকপ কিছু হয় নাই। যাহা হউক, কোন গতিকে বেলা সাড়ে তিনটায়

আমরা ন-গা-চে গ্রামে পৌছিলাম। এখানকার ভেড়াব পশম অতি মোলায়েম হয় শুনিয়া আমি একটি কালো রঙের চুকাটু কিনিলাম। শীতের আধিক্য এখানে চাষ আরম্ভই হয় নাই।

২৮শে অতি প্রভাত্যের অজ্ঞকারে আমরা যাত্রারত করিলাম। চারি দিক তুষারাক্রম, আমার সঙ্গিগণও শীতে আড়ষ্ট। দ্রুত চলিয়া সেদিন রাতে লোঙ-মর গ্রামের প্রধান ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় লইলাম। পরদিনও প্রাতে শীতের মধ্যে রওয়ানা হইলাম। তখন ২৯শে এপ্রিল, কিন্তু এ-অঞ্চলের প্রথম শীতে গাছের পাতা জন্মায় নাই এবং সকালে সব জল-প্রাণালী জ্বিয়া বরফ হইয়া আছে। লাসা হইতে যাত্রা করায় সাড়ে পাঁচ দিন পরে সেদিন দ্বিপ্রহরে গ্যাঞ্চীতে পৌছিলাম। এখানে ছু-শিঙ-শা কুটির ব্রাঞ্চ দোকান গ্যা-লিঙ-ছোম্পাতে উঠিলাম এবং দুই রাজি সেখানেই বিশ্রাম করা গেল।

গ্যাঞ্চীতে ইংরেজ-সরকাবো: ট্রেড-এজেন্সীর গৃহকে এখানে কেন্দ্র বলে। বিবার্ট পুরু দেওয়াল, শতাব্দিক সৈন্য, উপরন্ত ইংরেজ-দূতাবাসের জমিতে চাষ করায় জন্ম বহু গুর্খা আছে যাহারা পূর্বে সৈনিক ছিল। তিব্বতের সহিত সন্ধির সর্বান্তিমুখের এদেশে ব্রিটিশ পোলিটিক্যাল এজেন্ট থাকিতে পারে না। সেই জন্য এই ট্রেড-এজেন্ট, তাঁহাব সহকারী এজেন্ট এবং এক জন ইংরেজ ডাক্তার এখানে আছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এদেশে কি ভারতীয়, কি ব্রিটিশ কাহারও বাণিজ্যের অধিকার নাই। একজন মাড়ারী সজ্জন—সৈন্যদের রসদাদির ঠিকা লওয়ায় এখানে থাকেন, তিনিই একমাত্র ভারতীয় "ট্রেড"কারী। এখানকার খরচ কি ভারতবর্ষ দেয়? ব্রিটিশ ডাক- ও তার- ঘব কেন্দ্রার ভিতর। ডাক এক দিন অন্তর আসিয়া থাকে।

১লা মে আমবা দুইজন টশী-লান্পো রওয়ানা হইলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পথ কুয়াসায় ঢাকা এবং তুষারপাত হইতেছিল। রাস্তা ত বিশেষ কিছু ছিল না, স্বতরাং ক্ষেতবে মধ্য দিয়া পথ খুঁজিয়া চলিতেছিলাম। দিগ্ভ্রম হইবার বেশী ভয় ছিল না, কেননা, দক্ষিণে নদী ও বামে পর্বতমালা পথরোধ করিয়াছিল। কিছুক্ষণ পর এক গ্রামে পৌছিলাম। এখন আমি কু-শো (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি), ভিথারী নহি,

স্বতরাং আশ্রয় খুঁজিতে হয় না। একটি বড় বাড়ীতে চা, ভিমসিদ্ধ ইত্যাদি খাইয়া, সেখানে ভৃত্যবর্গকে কিছু ছুড়-রিঙ (মদ্যপানের পরস = বখশিশ) দিয়া পুনরায় চলিলাম। বেলা তিনটায় বরফ পড়া বাড়িল, বাতাসের বেগও তীব্র হইল, আমরা তো-সা গ্রামে আশ্রয় লইলাম। যাইবার সময় এই এক দিনের পথ তিন দিনে গিয়াছিলাম।

২রা মে প্রত্যবে চলিয়া, রৌদ্র-প্রকাশের দুই ঘণ্টার মধ্যে পাতলা কুম্বাসার চাদরে-ঘেরা টশী-লুনপো মহা-বিহার দেখিতে পাইলাম। আগের বারের যাত্রায় পথের দুই পাশে শ্রামল শস্যের ক্ষেত দেখিরাছিলাম। এবার দেখিলাম ক্ষেতে লাজল দিবার উদ্যোগ হইতেছে মাত্র। বেলা একটায় শী-গর্তী পৌছিলাম। আমার পূর্বগরিচিত ঢাকবা সাহ দোকান বন্ধ করিয়া নেপাল চলিয়া গিয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে মণিরত্ন সাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেই তিনি এক গৃহে আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আশ্রয়ের ব্যবস্থা হইলে পরে, যাহার মনিবের নিকট হইতে আমি আদেশপত্র আনিয়াছি সেই থম্-বা সপ্তাগরের সন্ধানে চলিলাম এই উদ্দেশ্যে যে, আমার আবশ্যকমত টাকা-পরস এই স্থিতি হইতে লইতে পারি। সপ্তাগরকে তো খুঁজিয়া পাইলাম, কিন্তু সে পরসাকড়ি দিতে ইতস্ততঃ করিল। সেদিন আমি বিশেষ পীড়াপীড়ি করি নাই, যদিও ব্যাপার দেখিয়া আমি চিন্তিত হইলাম, কেন-না, এখানে টাকা না পাইলে গ্যাকী ফিরিয়া টাকার জন্ত টেলিগ্রাম করিতে হইবে। দ্বিতীয় দিনেও তাহার ঐরূপই ব্যবস্থা দেখিয়া আমি মণিরত্ন সাহকে বলিলাম যে আমার পুস্তক-ক্রয়, শুন্-গুর ছাপানো সবই বন্ধ হইয়া আছে, স্বতরাং আজই উহার নিকট "হা" বা "না" জবাব আনিতে হইবে। তিনি প্রায় করায় সে বলিল, 'পত্র ও সীলমোহর আমার মনিবের, কিন্তু অত টাকা দিতে সাহস হয় না। আচ্ছা, আমি টাকা দিব।' আমার মন প্রশস্ত হইল, কাজের ব্যবস্থা আরম্ভ হইল। কাগজ কালি ইত্যাদি ক্রয় করিয়া ছাপার আয়োজন করিলাম।

স্বর-খণ্ড বিহারে ছাপার খরচ ইত্যাদি স্থির করিয়া এক সপ্তাহ সময় দেওয়া গেল, তাহার মধ্যে ছাপা শেষ করিতে হইবে। মণিরত্ন সাহর ভোটিয়া জ্বর ভাই ঐ বিহারে

ছিহু, স্বতরাং আশা ছিল যে কাজ সময়মত হইবে। পাঁচদিন পরে খবর লইয়া জানিলাম কাজ আরম্ভই হয় নাই। কাজেই আমি সেখানে গিয়া চাপিয়া বসিলাম। কাজ আরম্ভ হইল।- এই বিহার আজকাল টশী-লুনপো বিহারের অধীন, 'ভিক্ত ইহা ১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত এবং টশী-লুনপো বিহার ১৩৪৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। সংস্কারের যুগে এই বিহারের ত্রিভুগণ সংস্কারবাদ মানিয়া লওয়ায় এইরূপ অধীনতা আসে। একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহু পিতল ও চন্দন-বার্ঠের মূর্তি এখানে রহিয়াছে। ভারতীয় মূর্তির আসনের নীচে মোটা পিত্তলব আংটা যুক্ত থাকে, তাহার ভিতরে ঠাণ গলাইয়া মূর্তি বহন করিয়া দূবদেশে আনীত হইয়াছিল। ব-বঙ ও থম্-হম্ মন্দিরে অনেক পুরাতন মূর্তি আছে। মন্দিরের বাহিরে প্রস্তরের পাটায় উৎকীর্ণ ৮৪ সিদ্ধের মূর্তি আছে। পঞ্চম দলাই লামার অমাত্য যি-বঙ এই বিহারের নহ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। এখানকার গ্রন্থসংগ্রহও 'বিরাট। সম্প্রতি টশী লামা প্রবাসে দীর্ঘকাল থাকায় এ ঋত্বকের সকল ব্যাপারেই অনাচার পূর্ণমাত্রায় চলিয়াছে।

আমরা লাসা হইতে এখানে পৌছিবার পরেও যুদ্ধভয়-শান্তির খবর এখানে ঠিকমত প্রচারিত হয় নাই। এদেশের খবরাখবর এইরূপ গুজবগল্পের মধ্যেই চলে, এমন কি দেশের শাসন, কর-আদায় প্রভৃতির ব্যবস্থাও এইরূপ টিলা। এখানের এক লামা মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ ইত্যাদির বিষয় শুনিয়া আমাকে গভীরভাবে বলিলেন, "গন্-তী মহারাজা লোবন রিম্পোছের (ভোট দেশে সর্বত্র পূজিত এক ঘোর তান্ত্রিক লামার) অবতারণা।" তাহাতে আমি বলিলাম, "লোবোন রিম্পোছে মন্দের সমুদ্র পান করিতেন এবং জীলোক সঙ্ঘেও স্বচ্ছন্দবাদী ছিলেন, গন্-তী মহারাজা ঐ বিষয়ে তো সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পোষণ করেন।" লামা মহাশয় এই কথায় একটু থামিয়া পরে বলিলেন, "জয়ান্তরে লোবোন রিম্পোছের মতান্তর হইয়াছে।" ইহার আর উত্তর কি? এখানে সিপাহীরা যুদ্ধের নামে যথেষ্টাচার লাসার সিপাহী অপেক্ষা বহুগুণ বেশী করিয়াছে শুনিলাম। আমার নিজের কাজ কোনমতেই অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া ধর্ম-কীর্তিকে রাখিয়া ১২ই মে আমি শী-গার্ট ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে শুনিলাম, সবকারী কর বাকী থাকায় টশী-লুনপোর

এক ধর্ম-জন (বিদ্যালয়) ভরিমানায় দণ্ডিত হইয়াছে।
অধিকারিগণ বিদ্যালয়ের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সে-টাকা
তুলিতেছেন। আমি সুবিধা দরে ২১টি অতি মূল্যবান
চিত্রপট এই সুযোগে ক্রয় করিলাম। টাকা থাকিলে আরও
ক্রয় করিতে পারিতাম। ১৬ই মে এক স্থানীয় লামা একটি
তালপত্রের পুঁথি বিক্রয়ার্থে পাঠাইলেন। পুঁথি “কুটিল”
অক্ষর দৃষ্টে বুঝিলাম ইহা খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকের
মহামূল্য গ্রন্থ। লামা ইহা আমাকে দান করিলেন। আমি
পূর্বেই লদাখে সন্ধান পাইয়াছিলাম যে টাঙ্গী-ল্যুংপোর
নিকটস্থ এক বিহারে ও স-ক্য বিহারে বহু তালপত্রের
পুঁথি আছে। এবার তাহার চাক্ষুষ প্রমাণও পাইলাম কিন্তু
দুঃখের বিষয়, এ-বিষয়ে অধিক অনুসন্ধান এ-যাত্রায় সম্ভব
হইল না। ১৫ই মে আমার পুস্তক (স্তন-গুয়) ছাপিয়া
আসিল। সেগুলি ও অত্রান্ত পুস্তকাদি উত্তমরূপে বাঁধিয়া
প্যাক করাইয়া গাধার পিঠে চাপাইয়া ফ-রী জোঙ রওয়ানা
করাইয়া দিলাম। এখান হইতে ফ-রী যাইবার সোজা পথ
আছে।

* * *

২১শে মে আমি ও ধর্মকীর্তি যাত্রা শুরু করিলাম।
আমাদের পথেব দুই-আড়াই মাইল অন্তবে প্রাচীন
ভারতের নকলে নির্মিত শা-লু বিহার আছে। আমরা
সেখানে যাইয়া বহু প্রাচীন পুঁথি এবং অসংখ্য চন্দনকাষ্ঠের
এবং পিত্তলব মূর্তি দেখিলাম, সেগুলি পূর্বকালে ভারত
হইতে গিয়াছে। একটি মূর্তি ব্রহ্মদেশের ধ্বংস চীবর-
পবিহিত। বিহার-দর্শনের পর যাত্রা করিয়া সেই রাত্রে এক
গ্রামে থাকিয়া ২২ মে সকাল ১১টায় গ্যাকী-পৌছিলাম।
এক সপ্তাহের স্থলে বাইশ দিন ঈ-গর্চীতে থাকায় ভারত-
প্রত্যাবর্তনে দেবি হইল। আমার কোনও ধবর না পাওয়ায়
সিংহল হইতে ভক্ত আনন্দ চিঠিপত্রে খোঁজ আরম্ভ করিয়া-
ছিলেন। এবার সিংহলে ফিরিয়া আমাকে ভিক্ষুরত
লইতে হইবে। এইরূপ ভিক্ষু-দীক্ষা দেওয়া সংঘের
নিয়মামুসারে দুই-একবার মাত্র হয়। সে সময়েরও
দেবি নাই, সুতরাং আমাকে দ্রুত ফিরিতে হইবে।
একটি খচ্চর পীড়িত হওয়ায় আরও একদিন দেরি হইল।
২৩শে মে দ্বিপ্রহরে প্রত্যাবর্তনের যাত্রা আরম্ভ হইল।

গ্যাকী হইতে ভারতের পথ ই-রেজ-সরকারের দেখা-
স্তানর ফলে ভাল মেরামত থাকে। পথে পুল ও ডাক-
বাংলা আদি আছে, টেলিফোনের ব্যবস্থাও আছে। পথের
গ্রামগুলি অভ্যস্ত দরিদ্র। ২৪শে মে নদীর পাশে পাশে
চড়ছিয়ের পথে চলিলাম, পাহাড় তৃক্ষণশূন্য। পাহাড়ের
স্তর দেখিতে আশ্চর্য্যপ্রায় মনে হয় নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে
মূল্যবান খনিজ আছে। এই সব দেখিতে দেখিতে ও
ধর্মকীর্তির সহিত বাক্যালাপ-ধর্মলাপ করিতে করিতে
৩১ মাইল পথ চলিয়া সন্-দা গ্রামে পৌছিলাম। এ-
গ্রামটি অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন। ইহার পব পথে গ্রাম
বসতি অতি অল্পই দেখিলাম। অধিকাংশ গ্রামই পতনো-
ন্মুখ ক্ষেতগুলিও পরিত্যক্ত। স্বচ উপবে যাইতেছিলাম
শীত ক্রমেই বৃষ্টি পাইতেছিল। পথে একটি প্রাকৃতিক
সর্বোবর দেখা দিল। গ্যাকী হইতে ৬৭ মাইল এইরূপে
চলিবার পর হিমালয়ের হিমাচ্ছাদিত ধ্বল শিখর
দর্শনে বুঝিলাম ভারতমাতার নিকটেই আসিয়াছি।
সম্মুখের এক বিশাল সরোবর নয়ন হৃষ্ট করিতেছিল, যদিও
বৃষ্ণাক্রমে ঝামলিয়ার কোনও চিহ্ন ছিল না। ৭০ মাইল
অন্তিত প্রান্তরের কাছে দোজিঙ গ্রাম এবং তাহার নিকট
তৃক্ষণলাভুমি আছে। দোজিঙ গ্রামে আশ্রয় লওয়া গেল।

গ্রামে কে-গৃহে ছিলাম সেখানে দুই ভগ্নী এক পতির
সহিত বাস করে। এদেশে বহুভর্ষুকাই অধিক, কিন্তু
কম্পে স্থলে দেখিলাম কয়েক ভগ্নীর এক পতি। শুনিলাম,
পুরু- বা জী যে নিজ পিতালয় চাড়িয়া অন্তর্বহরে বাস
করিত রাজী হয় তাহাব পারিতোষিক হিসাবে এইরূপ বহু
পতি বা পত্নী জোটে। এইরূপ ব্যাপারব বৈজ্ঞানিক অর্থ এই
যে, এদেশের জায় অল্পকর স্থানে সম্পত্তি-বিভাগ বোধ করা
একান্ত কর্তব্য, সুতরাং পরিবার মাহাতে পৃথক না হয়
তৎক্ষণ এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়। চারি ভ্রাতার এক জী বা
দুই ভগ্নীর এক পতি হওয়ায় পরিবার একই থাকিয়া যায়,
সম্পত্তি বিভাগের প্রয়োজন হয় না।

এদিকে চাষ অপেক্ষা পশুপালনের চেষ্টাই অধিক।
এখান ছোট ছোট ছাগলও দেখা গেল। কিন্তু লোকে তাহা
বেশী রাখে না, কেন-না, একে তো শস্য হয় না, তার উপর
ছাগল-মাংসে চর্বি কম।

২৬শে মে সকালে রওয়ানা হইলাম। কিছুদূর চলিবার পর মহাসরোবরের শেষ দেখা গেল। তাহার পর বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দূরে তুষারচ্ছাদিত শৈলমালা, নিকটের পর্বত নয় ও শুষ্ক। পথে দেখিলাম তারের খামের উপরে চীনা মাটির ইলেক্ট্রিক প্রায় সবই ভিল ছুড়িয়া ভাঙিয়া দিয়াছে। এ-পথে প্রত্যেক ঘরই লাসা-কালিম্পাংগী ব্যাপারীদিগের চটি বসরাই। সম্মুখে এক বিশাল প্রান্তর, পথ তাহার মধ্য দিয় চলিয়াছে। অল্পদূর বাসস্থান ময়দানে ভেড়া চরিতেছে দেখিলাম। বামের অভ্যুচ্চ খবল শিখর দেখিয়া মনে হইল যদি তাহার উপর উঠিতে পারা যাইত তবে ভারত ও তিব্বতের দৃষ্ট একসঙ্গে দেখিতে পাইতাম। আরও আগে ডাকবাহীদিগের ঘর ছাড়াইয়া একটি ছোট নাল পান হইলাম তাহার পব একটি শুষ্ক খালের পাশ দিয়া দক্ষিণভাগে সমকোণে ঘুরিয়া একঘণ্টা চলিবার পর উৎরাই আরম্ভ হইল। এখন পাহাড়ের রং বদল হইল, ঘাসও অধিক হওয়ায় অনেক ভেড়ার পাল ও দুই-দশটি চমবীও দেখা গেল, কিন্তু বৃক্ষের চিহ্ন এখনও নাই। এই জনশূন্য দেশ ছাড়িয়া ফ-রী প্রদেশে (ফ-রী=বরাহ প্রদেশ) প্রবেশ করিয়া বেলা ৩০ টান আমরা ফ-রী জোড় পৌছিলাম।

এখানেও ছু-শিঙ-শার একটি শাখা আছে এবং সম্প্রতি শুভাঙ্কু ধীরেন্দ্র বজ্র এখানে রহিয়াছেন, স্ততরাং মহা সমাদরে অভ্যর্থনা হইল। এখানকার প্রায় সকল ঘরের মেজের বাহিরের জমি হইতে নীচু এবং নিকটেই জল খাকায় গৃহ-নির্মাণে কাঠই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। নিকটস্থ ববাহাকুতি পাহাড়ের জন্ত এখানকার নাম ফ-রী। পূর্বে পাহাড়ের উপর দুর্গও ছিল, কিন্তু ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ অভিযানের কালে তাহার ধ্বংস হয়। এখান হইতে ভুটান বাম দিকের পাহাড়ের পারে অর্দ্ধদিনের পথ, তাই প্রত্যহই ভুটানীর দল শাক-সজী, আনাজ, ফল ইত্যাদি লইয়া একটি অভ্যন্তরীণ নীচু-ছাদের অঙ্কুর বাড়ীতে হাট বসাইয়া যায়। খবর পাইলাম, আমার মালপত্রের গাঁট প্রায় সবে আসিয়াছে। সত্তরটি খচ্চর ভাড়া লইয়া কালিম্পাং যাত্রার আয়োজন করিলাম। আমার খচ্চরগুলির জন্ত ২৭০ টাকা দর পাইয়াছিলাম, কিন্তু কালিম্পাং আরও অধিক পাইবার আশায় বিক্রয় না-করাই শেষে কালিম্পাং পৌছিয়া

২৪০ টাকায় বেচিতে হয়। নূতন ব্যবসায়ের এইরূপই ফল হয়। ফ-রী উপত্যকায় বর্ষা যথেষ্ট হয়, ঘাসও প্রচুর, কিন্তু শীতের প্রকোপে কৃষি সুবিধার হয় না।

২৯শে মে আমি যাত্রা আরম্ভ করিলাম। ছু-শিঙ-শার ফ-রী শাখার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং সত্বেয়িকারীর ভাগিনেয় কাছা আমার সঙ্গে চলিল। ইহার বয়স মাত্র আঠার-উনিশ ছিল বুদ্ধি-বিবেচনাও বিশেষ ছিল না। এদিকে তিব্বত, ভুটান ও ভারতের যত ধর্মের মিলনস্থল ফ-রীতে তাহাকে সর্বেসর্ব্বা কবা হইয়াছিল। নেপালী কারবারের ধরণ অল্পদূরী হিসাব-কিতাবের কোন কড়াকড়ি ছিল না, যখন হিসাব লওয়া হইল তখন দেখা গেল বহু সহস্র টাকা লোকসান। সকলে বলিল, জুয়া, মত্ত ও জীলোকে সব গিয়াছে। এদেশে মদ্যের বিশেষ দাম নাই, জীলোকও তথৈবচ, উপরন্তু কাছার ভোটাধীনী "জী" বলিল, সে বিশেষ কিছুই নয় নাই, কেন-না, সে বয়সে বড় এবং এই ছোকরার উপর তাহার অত্যন্ত টান ছিল। তখন সকলে বলিল, টাকা জুয়াতেই গিয়াছে। আমি বলিলাম, "দোষ তোমাদের। এক্ষণ অপরিণত-বয়স্কের হাতে এত টাকা ছাড়িয়া দিয়া তাহার প্রলোভন ও কুপ্রবৃত্তির পথ তোমরাই পরিষ্কার করিয়াছ; আর যদি টাকা উড়াইয়াই থাকে তবে আমার টাকা ভাগিনেয় উড়াইয়াছে, স্ততরাং তাহার কি বলিবার আছে।"

যাত্রার পথ প্রথম খানিকটা সমতল, তার পর উৎরাই। এবার ঝরণা ও নিষ্করের ধারার সংখ্যা বাড়িয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে শ্রামল ভূগময় উপত্যকা। তাহার পর উৎরাই ক্রমশঃ নামিতে লাগিল এবং ক্রমে ঘণ্টা দুই-তিন পরে আমরা বনস্পতির রাজ্যে আসিলাম। মনে হইল আমরা যেন অস্ত্র এক লোকে আসিয়াছি। পূর্ণ বৎসরাধিক পরে শ্রাম বনশ্রেণীর শোভা দেখিয়া এবং কাননবিহারী নানাবর্ণের পাখীর কলকূজন শুনিয়া চিত্ত পুলকিত হইল। দেবদারুর শ্রেণীতে প্রথমে ছোট ছোট গাছ পরে বিরাট বনস্পতি দেখা দিতে লাগিল। এখানের লোকজনের চেহারাও হৃদয় এবং তাহাদের শরীর ও বস্ত্র পরিষ্কার। বনের হরিৎ শোভা, বিহঙ্গের কাকলী ও পুষ্পের স্বগন্ধে আনন্দিত মন লইয়া সন্ধ্যার সময়ে আমরা

কলিঙ-খা গ্রামে পৌছিলাম। এই গ্রামে শতাধিক ঘর, এবং গৃহগুলির ছাদ দেওয়াল এবং মেজে—সর্বত্রই দেবদারু কাঠ প্রযোজিত হইয়াছে। কাঠের অভাব নাই, স্থতরাং দিবারাত্র আশ্রয় জলিতেছে। অধিকাংশ ঘরই বিতল। নিম্নতলে পত্তরক্ষা এবং ষিঙলে লোকজনের অবস্থান, দেবতা-স্থান ও ভাণ্ডার রাখাই নিয়ম। তিব্বতের তুলনায় এখানের লোক বহু গুণে পরিষ্কার। এখানের নারীরা গঢ়বাল ও কিনৌরের জীলোকদিগের মত শাড়ী পরে। তাহারা স্বন্দরী, রক্তিমগৌরবর্ণা এবং সুগঠন। হিমালয়ের তিন অঞ্চলের নিবাসিগণ দেবীর বরে সৌন্দর্য্য পাইয়াছে। আমি সৌন্দর্য্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি, কিন্তু আমার মনে হয় ঐ তিন অঞ্চলে বাসভূমি ও অধিবাসী উভয়কেই প্রকৃতিদেবী মুক্তহস্তে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আমার মতে কিনৌরের * জীলোক সর্কাপেক্ষা স্বন্দরী, তাহার পর এই ডোমো প্রদেশের নারী এবং যম্মোবাসিনী। বর্ণ-গৌরবে যম্মোবাসিনী শ্রেষ্ঠা, কিন্তু কিনৌরের মুখশ্রী অতি মনোরম।

এই ডো-মো উপত্যকা অতি মনোহর। যদিও খচ্চর-সাহায্যে জিনিষ সরবরাহ করা এখানকার প্রধান পেশা, এখানে কৃষিকার্য্য খুবই প্রচলিত। এই অঞ্চল ভারত ও তিব্বতের মিলনকেন্দ্র। লোকের মুখাবয়বে আর্য্য- ও মঙ্গোল-রক্তের মিশ্রণ সুস্পষ্ট দেখা যায়। ভারতের কাক (তিব্বতের কাক বৃহৎ চিলের মত পাখী), কোয়েল ইত্যাদি এখানে দেখা দিল।

নদীর পাশ দিয়া পথ চলিয়াছে। এক ঘণ্টা পরে স্যাসিয়া পৌছিলাম। এখানে ইংরেজের কুঠী, তার- ও ডাক-ঘর বাজার ও কিছু সৈন্ত আছে। ১৯০৪ সালের অভিযানের পর ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইংরেজ এই প্রদেশ দখল করেন কিন্তু চীন দেশ সেই ক্ষতিপূরণ টাকায় গণিয়া দিলে পরে ইহা তিব্বতকে কিরাইম দেওয়া হয়। স্যাসিয়ার পর ছোমা গ্রামও স্বন্দর, বড় বড় বরে ও বিশাল বনস্পতিতে পূর্ণ, তাহার পরের গ্রাম রিন-ছেন-গঙ ও বৃহৎ গুগ্রাম। খরচের হিসাবেও তিব্বত অপেক্ষা এখানে বেশী টাকা লাগে। এ-অঞ্চলের পোষাক—নেপালী কালো চুপী, নেপালী পায়েজামা ও কোট।

* প্রাচীন কিন্নর দেশই এখন কিনৌর বা কনৌর নামে পরিচিত।

আজ রাজিবাস হইল থা-গঙ, সরাইয়ে। পথে ধর্ম্মকীর্তি খচ্চরের দল লইয়া আমাদের দলের সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন।

এই সরাইয়ে এক “দেববাহিনী” (বাহার উপর দেবতা আবিষ্ট হন) জীলোক দেখিলাম। আমরা যে-কক্ষে ছিলাম সেখানে এক দম্পতী আসিয়া উপস্থিত হইল। সরাই-অধিকারিণী বৃদ্ধা তন্মধ্যে অতি সন্মমের সহিত জীকে অভ্যর্থনা করায় বুঝিলাম ইহারা সাধারণ লোক নহে। সারাদিন ইহারা চা-পান, ভোজন ইত্যাদিতে কাটাইল, আমি জিজ্ঞাসা করায় বলিল তাহারা ঘ-রী-বাসী, সম্প্রতি কালিম্পঙে ডো-মো-গে-শে নামার দর্শনে চলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় দেখিলাম জীলোকটি সর্কাপ আড়ামোড়া দিতেছে। পুরুষটি কখনও তাহার হাত ধরিয়া শোয়াইবার চেষ্টা করিতেছে, কখনও তাহার মাথায় দেবতামূর্তি ঠেকাইতেছে, কখনও বা হাত ছোড় করিয়া বলিতেছে, “আজ ক্ষমা করুন।” বুঝিলাম, জীলোকটি পেশাদার দেববাহিনী এবং সম্প্রতি দেবতা আসিবার উপক্রম হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সে পুরুষটিকে ঝটিতি সরাইয়া দিয়া পার্থের কক্ষে চলিয়া গেল। আমার কৌতূহল হজমায় পরে গিয়া দেখিলাম, সেখানে স্বন্দর আসনে সেই জীলোকটি আপাদমস্তক বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া বসিয়া আছে এবং তাহার সম্মুখে পাঁচ-সাতটি স্বতঙ্গীপ জলিতেছে। কিছুক্ষণ পরে পুরুষটি একটি চামড়ামোড়া ভোটায়া ডমরু তাহার সামনে ধরিলে সে ধমুকাঙ্কতি কাঠের দ্বারা তাহা বাজাইতে আরম্ভ করিল। তাহার জিহ্বায় যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী আবির্ভূতা হইলেন। সে ক্রমাগত পদ্যো নানা কথা বলিতে লাগিল। প্রথম পদ্যে দেবতা নিজের পরিচয় দিলেন। তাহার পর প্রমোত্তর আরম্ভ হইল। প্রসঙ্গত্বা দুই-এক আনা পয়সা রাখিয়া হাত ছোড় করিয়া নিজ সমস্তা নিবেদন করিলে তাহার উত্তর পদ্যে আসিল, অধিকাংশই কৃতপ্রতশান্তির ব্যবস্থা, মধ্যে মধ্যে ছড়-পানও চলিল। আমি কাছাকাছি বলিলাম, “প্রসন্ন কর তোমার ছেলের অস্থখ, কি করা কর্তব্য?” দুই আনা পয়সা নিবেদন করিয়া “উকিন” মারফৎ প্রশ্ন হইতে উত্তর হইল, নগরদেবতা ঋষ্ট, অগ্র দেবতাকে পূজায় সন্তুষ্ট করিয়া লাগিল মান, তিনি নগরদেবতাকে ক্ষান্ত করিলে ছেলের অস্থখ সারিয়া

বাইবে।" কান্দার বিবাহই হয় নাই, সুতরাং পুত্রের ব্যবস্থা কি করিবে? তবে যেখানে ভক্তের অভাব নাই সেখানে দৈবজ্ঞ-দেববাহীবও অভাব হয় না।

১লা জুন সিকিমের দিকে চড়াই আরম্ভ হইল। চড়াই কঠোর এবং জে-লপ-লা গিরিসঙ্কটে বরফ পাইলাম ইহাই ব্রিটিশ সীমান্ত, সুতরাং ১লা জুনের পেরে আমি পুনর্বার ব্রিটিশরাষ্ট্র প্রবেশ করিলাম। উৎরাই আরম্ভ হইল। এবার সিকিম-রাষ্ট্র আসিয়াছি, কিন্তু কুবচ প্রায় সবই প্রবাসী গোষ্ঠী, চাকরটির অধিকাংশ দোকানও নেপালী। পথের বৃক্ষশ্রেণীর শোভা অবর্ণনীয়, এক মাছির উৎপাতও সেইরূপ। কু-পুক, তু-কো-লা; জেল, পদম-চেঙ হইয়া ওরা জুন দ্বিপ্রহরে যো-লিঙ-ছু-গুঙ পৌঁছিলাম। এখানে অনেক দোকান আছে যাহার মধ্যে একটিতে বহুদিন পবে ভোজপুতী ভাবার মধু বসন্ত শুনিলাম। এখন দ্রুত বাইতে হইবে, সুতরাং পরিচয় দিতে পারিলাম না।

লোহার সেতুর উপর দিয়া নদী পার হইয়া চড়াই ভাঙিতে লাগিলাম। দেখিলাম, এদেশে সিকিমী অপেক্ষা আগন্তুক গোষ্ঠীই বেশী। ৪ঠা জুন কঠিন উৎরাই পার হইয়া সিকিম ও দার্জিলিংয়ের সীমানায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে ডী-লক্ষী-কম্বা বিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড দেখিলাম। আবার চড়াই আরম্ভ হইল, তাহার পরই পে-দোঙ বাজার ও খ্রীষ্টান মিশনের বিদ্যালয়। পথ চলিতে কষ্ট হইতেছিল, কারণ নাল খুলিয়া যাওয়ার আমার পক্ষর খোঁড়া হইয়াছিল, সুতরাং হাঁটিয়াই চলিতেছিলাম। দ্বিপ্রহরের পর অল-গর-হা গ্রামে পৌঁছিয়া এক দোকানে ভোজপুতী ভাবার জল চাহিলাম। দোকানদার ভাবিয়াছিল আমি নেপালী, পরিচয় পাইয়া মহা আশ্চর্যে চা প্রস্তুত করিয়া অশ্রুদের খবর দিতে গেল। আমার জেলার এক মিশ্র

মহারাজ এখানে ছিলেন, তাঁহার মিশ্রাইন আমার পাশের গ্রামের মেয়ে। সুতরাং পান-ভোজনের কিরূপ ব্যবস্থা হইল, বলা বাহুল্য। রাজিরাপনের অমুরোধ কাটাইয়া পুনর্বার রওয়ানা হইয়া সূর্যাস্তের সময় কালিম্পাং পৌঁছিলাম। সেখানে শ্রীশ্রীমতিত ধর্ম্মাচার্যের কাছে উঠিলাম। মালপত্র পুনর্বার প্যাক করাইয়া অধিকাংশ ছুশিঙ-শা-মারফৎ পাঠাইবার ও কিছু-সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা করা গেল। ধর্ম্মকীর্তি এখানকার গরমেই অভ্যস্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। ৬ই জুন ট্যান্সি-যোগে শিলিগুড়ি পৌঁছিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম জুনের গরম তাঁহার পক্ষে অসহ্য। স্নানমানে তাঁহাকে কালিম্পাং ফেরৎ পাঠাইয়া দিলাম।

* * *

কলিকাতার ছু-শিঙ-শার শাখায় গিয়া শুনিলাম লক্ষ্য হইতে আমার জন্য চারি শত টাকা আসিয়াছে। লাসায় তিন হাজার পাইয়াছিলাম। কলিকাতায় তখন সভাগ্রহের কল চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে পার্টনা ও কান্দি গিয়া বজ্রদিগেব সহিত মিলিত হইয়া পুনর্বার কলিকাতায় আসিলাম। সেখান হইতে পুস্তকাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া ১৬ই জুন রওয়ানা হইয়া ২০শে জুন সিংহলে উপস্থিত হইলাম।

* * *

২২শে জুন আমার ও ভদ্রস্ব আনন্দের শ্রামণের প্রব্রজ্যার দিন ছিল। গুরুজনের আদেশে নাম পবিত্র করিয়া রাইল ও গোত্রাচরণে সাংকৃত্যায়ন যোগ করিলাম। ২৮শে জুন কান্দিগরে সন্ধ্যার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমার উপসম্পদা (ভিক্ষুকরণ) পূর্ণ হইল।

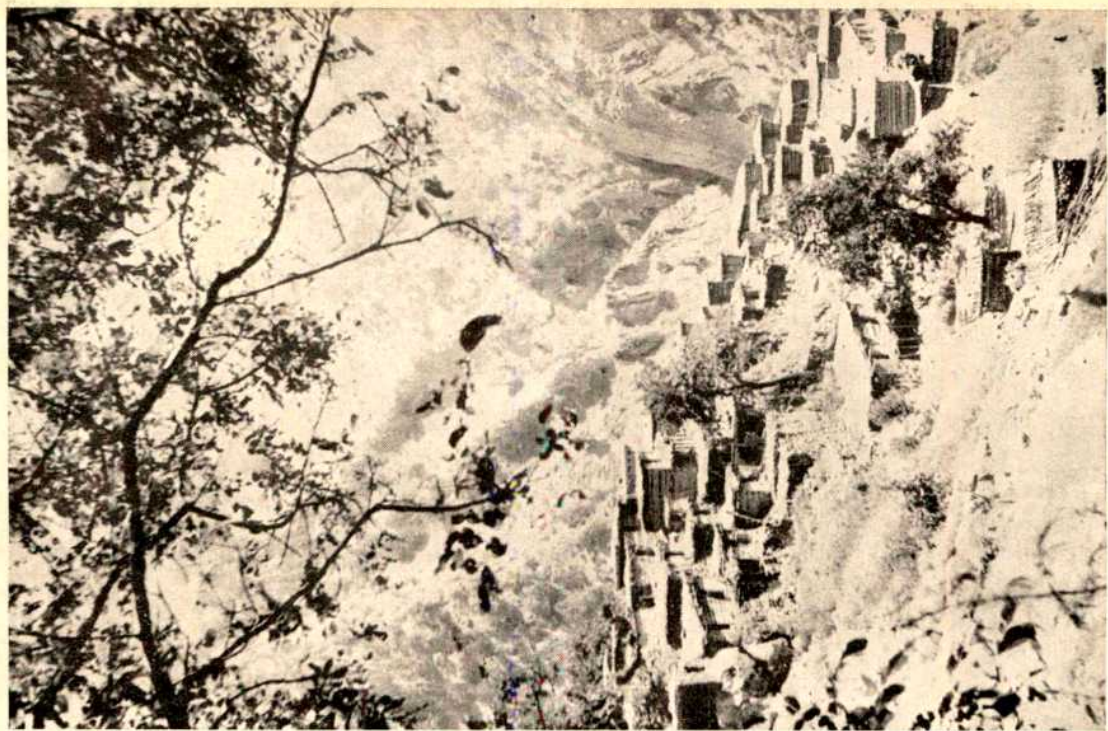
সমাপ্ত



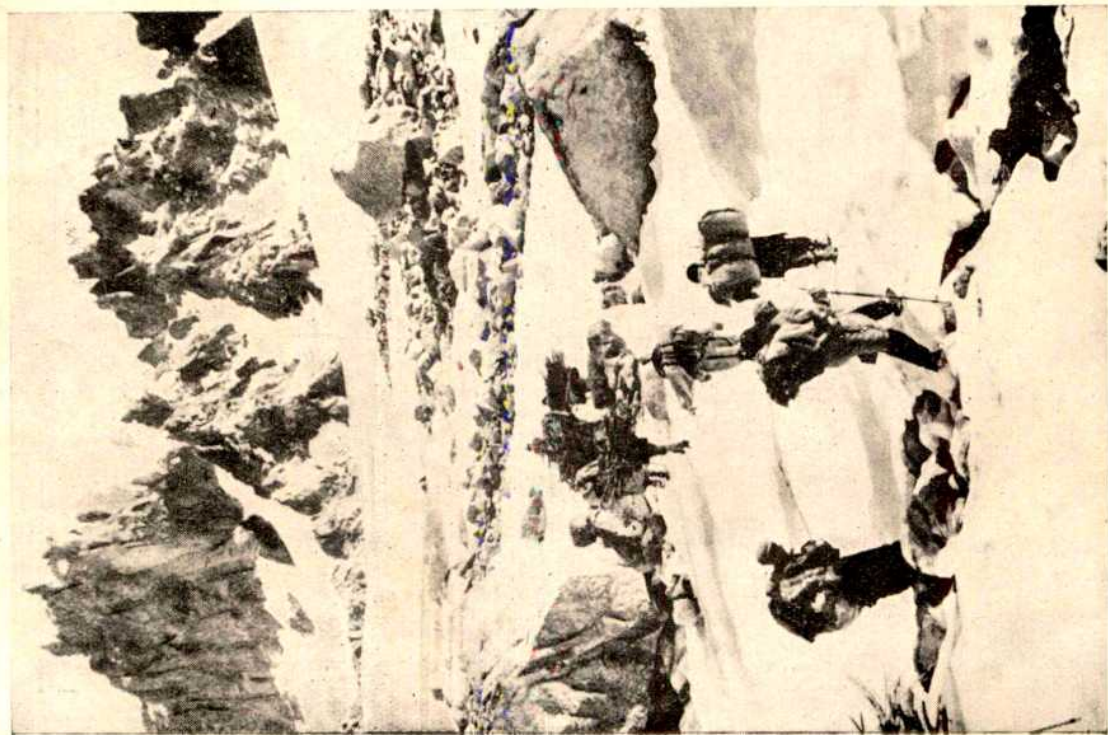
মঙ্গোলীয়দের উৎসব ও ক্রীড়াকৌতুক—উৎসব-মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রীদল



মঙ্গোলীয় উৎসবের যাত্রীদল



কাফিদিহানের পাণ্ডুরক গ্রাম



হিন্দুস্থান পর্বতের উচ্চ সীমায়

বিবিধ প্রসঙ্গ

আবার শ্রী ও সরোজ

পদ্মফুল ও শ্রীর বিকল্পে আধুনিক বঙ্গীয় মুসলমানদের (সকলেরই কিনা অজ্ঞাত) আপত্তি মবিত্তেছে না, মধ্যে মধ্যে চালা হইয়া উঠিতেছে। আমরা এ বিষয়ে কয়েক বার লিখিয়াছি। আবার লিখিতে হইতেছে।

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক জন মুসলমান সভ্য এই সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী সাহায্যের ছাঁটাই প্রস্তাব করেন, যেহেতু এই বিশ্ববিদ্যালয় পদ্মফুল ও শ্রী শব্দটি নিশানে ও সীলমোহরে 'প্রতীক' রূপে ব্যবহার করেন ও যেহেতু এই ছুটি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে হিন্দু পৌত্তলিকতার সহিত জড়িত। পদ্ম ও শ্রী সম্বন্ধে আগে আগে যাহা লিখিয়াছি, আবার আগাগোড়া তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে চাই না। পদ্মফুল মুসলমানেরাও ভালবাসেন, এবং শ্রীর যতগুলি অর্থ আছে তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্য, সম্পদ, অভ্যাস প্রভৃতি মুসলমানদেরও কাম্য। তথাপি যেহেতু শ্রীর মানে হিন্দু দেবীবিশেষও বটে এবং সেই দেবী পৌরাণিক মতে কমলাসনা, অতএব পদ্মের মধ্যে স্থিত "শ্রী" আপত্তিকরক। বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব বলিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে আপত্তি নাই, শ্রীতেও আপত্তি নাই, আপত্তি উভয়ের একত্র সংযোগে। এই কথায় অনেকে হাসিয়াছেন, কিন্তু ইহা হাসির কথা নয়। ডাইনামাইট নামক বিপজ্জনক বিস্ফোরক পদার্থের মূল রাসায়নিক উপাদানসমূহের মধ্যে নির্দোষ নাইট্রোজেন আছে, আবার নির্দোষ গ্লিসারিনও আছে, কিন্তু উপাদানগুলি একত্র করিলেই ভীষণ বিস্ফোরক তৈরি হয় এবং বাঙালীর ছেলেরা করিলে আশুতামানে যাইবার যোগ্য বিবেচিত হয়। সুতরাং পৃথক পৃথক শ্রীতে ও নলিনীতে যাহাদের আপত্তি নাই, তাহারা যদি নলিনীদলগত শ্রীকে ইসলামঘাতিনী ও বিভীষিকাময়ী মনে করে, তাহা বিশ্বাসের বিষয় নহে।

কোন বাংলা শব্দ বা অক্ষর হিন্দু দেবদেবীর নাম হইলেই যদি তাহা আপত্তিকর হয়, তাহা হইলে প্রায় সমগ্র বাংলা

বর্ণমালাকেই বাদ দিতে হয়। অ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় বা প্রায় সমুদয় অক্ষরেরই অর্থ কোন দেবতা।

'প্রতীক' ব্যবহার মুসলমানেরাও করেন। তাঁহাদের নিশানে এবং মৌলানা সৌকৎ আলী প্রভৃতি খিলাফৎ কনফারেন্সের নেতাদের টুপিতে যে চন্দ্রকলা ("ক্রেসেন্ট") দৃষ্ট হয়, তাহাও 'প্রতীক'। তাঁহারা বলিতে পারেন, তাহাও এই প্রতীকের পূজা করেন না। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও ত পদ্মের চিত্রের মধ্যস্থিত শ্রী শব্দটির পূজা করেন না, ধ্যান করেন না।

মুসলমান ধর্মের প্রবর্তন এবং চন্দ্রকলা ইসলামের প্রতীক রূপে ব্যবহারের অগণিত বহুবৎসব গুরু হইতে হিন্দুদিগের দেবতা শিব চন্দ্রশেখর বলিয়া বিবেচিত। তিনি ভাগচন্দ্র, অর্থাৎ চন্দ্র তাঁহার ললাটের ভূষণ। যাহারা চন্দ্রকলাকে ইসলামের প্রতীকরূপে প্রথম গ্রহণ করেন, তাঁহারা যদি জানিতেন যে হিন্দুব এক দেবতা চন্দ্রকলাকে ললাটে ধারণ করেন এবং যদি তাঁহারা সরোজশ্রী-নরোদী বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মত হিন্দুকোবিয়া- বা হিন্দুঅতঙ্ক- গ্রন্থ বা ঈর্ষাপরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে ক্রেসেন্ট বা চন্দ্রকলাকে আপনাদের ধর্মের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন নির্দোষ করিতেন না। আমরা ললাটে চন্দ্রকলা-শোভিত মহাদেবের বোঁধাই অঞ্চলে অঙ্কিত ছবি দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা যে খিলাফৎ কনফারেন্সের কোন সভ্যের ছবি, এক্ষণে অজ্ঞান বলি নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৌত্তলিকতা অপরাধে বরাদ্দ ছাঁটাই প্রস্তাব লইয়া যে তর্কবিতর্ক হয়, তাহাতে যাহারা শোগ দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ ও শ্রী সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। তাঁহার বক্তৃত্য জ্ঞানগর্ভ ও উদ্বেজনা-হীন হইয়াছিল। পাঠকেরা তাহা দৈনিক কাগজে দেখিয়া থাকিবেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের অনেক মুসলমান বাদশাহের মুদ্রায় তাঁহাদের নামের আগে "শ্রী" দৃষ্ট হয়; যেমন শ্রী শের শাহ। আমরা বাল্যকালে

আমাদের মুসলমান সহপাঠী ও বন্ধুদিগকে তাঁহাদের নামের আগে শ্রী ব্যবহার করিতে এবং চিঠিপত্রের শিরোনামে ‘শ্রীহকনাম’ লিখিতে দেখিয়াছি। শুনিয়াছি পল্লীগামের অনেক মুসলমান এখনও তাহা করেন মোহম্মদ ঘোরীর ভারতীয় মুদ্রাতে লক্ষ্মী দেবীর মূর্তি আছে। তাঁহার মুদ্রার উল্টা পিঠে মূলধারী হুসমানের মূর্তি আছে। ইহা লইয়া প্রমথবাবু পরিহাস করিয়া বলেন, যে, মোহম্মদ ঘোরী রসিক পুরুষ, মুসলমানী হুসমানের মূর্তি তিনি মুদ্রায় ছাপিয়া ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে তিনি এমন একটা দেশ শাসন করিতে আসিয়াছেন যেখানে বানর আছে—তিনি বানরদের উপরও রাজত্ব করিতে আসিয়াছেন। এই অর্থটা আমাদের ঠিক মনে হইতেছে না, কারণ মোহম্মদ ঘোরীর সময়ে ভারতবর্ষে বানরের চেয়ে গরু গাধা শিয়াল প্রভৃতিও বেশী ছিল এবং এখনও আছে।

বাংলা দেশে হুসমান নামটি, কি কারণে জানি না, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অবজ্ঞা প্রকাশের অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বঙ্গের বাহিরে অনেক প্রদেশে হুসমান দেবতা বলিয়া পূজিত হন, পুনর মাক্টি-মন্দিরের মত বহু মন্দির নানা স্থানে আছে, হুসমানপ্রসাদ, হুসমানসহায়, হুসমান রাও অনেক সম্রাট ব্যক্তিরও নাম। মোহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষের যে অংশ জয় করিয়াছিলেন, সেখানে হিন্দুরা এখনও হুসমানকে ভক্ত বীর বলিয়া পূজা করেন। সুতরাং মোহম্মদ ঘোরী পরিত্যক্ত হুসমানের মূর্তি মূর্ত্তিত করেন নাই, তাঁহার গম্ভীর কোন অভিপ্রায় ছিল। তাহা আমবা জানি না।

মৌলানা মোহম্মদ আলী এই মর্মেণের কথা বলিয়াছিলেন “সকল অবস্থাতেই মানুষকে অহিংস থাকিতে হইবে ইসলামের উপদেশ এরূপ নহে, কিন্তু আমি কংগ্রেসের সহিত যত দিন যুক্ত থাকিব, তত দিন অহিংস থাকিব।” মুসল অস্ত্র, যুদ্ধের একটা ‘প্রতীক,’ রাষ্ট্রীয় শক্তিরও বটে। মৌলানা মোহম্মদ আলী যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে সহজেই বুঝা যায়, যে, মুসলকে মানিতে ও ব্যবহার করিতে মুসলমানদের মানা নাই, থাকিতে পারে না। তাহা হইলে, মোহম্মদ ঘোরী তাঁহার মুদ্রাতে পৌরাণিক হিন্দু বীরের মূলধারী মূর্ত্তি মূর্ত্তিত না-করিয়া মূলধারী

কোন মুসলমান বীরের মূর্ত্তিও মূর্ত্তিত করিতে পারিতেন—কারণ মূর্ত্তি বা প্রতীক মাত্রেই তিনি বিরোধী ছিলেন না। তবে যে তিনি পৌরাণিক এক হিন্দু বীরেরই মূর্ত্তি মূর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায়, যে, পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে যাহা কিছু আছে সমস্তই মুসলমান ধর্মে বাধে বা আঘাত করে তিনি এমন মনে করিয়া আতকাইয়া উঠিতেন না।

আমরা ‘প্রবাসী’তে আগে লিখিয়াছি, অনেক মুসলমান মসজিদের গায়ে পদ্য খোদিত আছে। প্রাচীন গৌড়ের যে-সব মসজিদ এখনও বিদ্যমান আছে, তাহার কোথাও কোথাও পদ্য দৃষ্ট হয়।

বাংলা সাহিত্যের কোথায় পৌত্তলিকতার গন্ধ আছে, সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত মুসলমানেরা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে ব্যস্ত। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে তাহা থাকিলে দোষ নাই। ইংরেজিতে ‘Votary of the Muses’ বলিলে তাঁহারা তাহাতে পৌত্তলিকতার গন্ধ পান না, কিন্তু বাংলায় ‘বাণীর একনিষ্ঠ সেবক’ শুনিলে তাঁহারা ভীতির ভান করেন। রাইটার্স বিল্ডিংসের সম্মুখভাগে গ্রীক দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। তাহার অস্ত্র ঐ মুসলমানেরা উক্ত সরকারী ইমারত বা উহার চাকরি বয়কট করেন—নাই—কেননা, উহা ত হিন্দু নয়। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের টাকায় ও ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নুতন ডাকটিকিটে পদ্যফুল আছে, কিন্তু তাহাও বয়কট করা চলে না। টাকা বড় ভাল চীজ এবং তা ছাড়া মূল্যের চেয়েও অব্যর্থ শক্তি—প্রতীক গবর্নমেন্টের আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের “প্রতীক”

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের “প্রতীক” একটি ফুল ও চন্দ্রকলা। চন্দ্রকলা ইসলামের “প্রতীক”। কিন্তু হিন্দুরা তাহাতে আপত্তি করেন নাই। কিন্তু যদি তাঁহারা বলেন, উহা তাঁহাদের মহাদেবের শিবোদ্ভূত চন্দ্রকলা, তাহা হইলে মুসলমানেরা আপত্তি করিবেন কি ?

সরোজ ও শ্রী সম্বন্ধে কনফারেন্স:

প্রধান মন্ত্রী ফজল হক সাহেব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়

পদ্ম ও শ্রী প্রতীক সঙ্কে একটি কনফারেন্সের ব্যবস্থা করিবেন বলায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ হাটাইবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যত হয়। কনফারেন্সের ফল যথাসময়ে জানা যাইবে।

মুসোলিনীর মুঘল

ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন মুসোলিনী অনেক দিন হইতে করিয়া আসিতেছেন। এখন তিনি ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ জাহাজ আক্রমণ করাইতেছেন, এইরূপ সম্ভে কেবল ইংরেজরা নয়, ফরাসী ও অন্তরাও করিতেছেন। ‘হ্যাভক’ নামক একটা জাহাজকে সম্প্রতি একটা অজ্ঞাত সবমেরিন্ আক্রমণ করে, তাহার পর ‘উডকোর্ড’ নামক আর একটা জাহাজকে অজ্ঞাত কোন সবমেরিন টর্পেডো ছুড়িয়া আক্রমণ করে। তাহাতে উহার দ্বিতীয় এঞ্জিনিয়ার নিহত হয় ও আট জন অল্প লোক আহত হয় এবং জাহাজটি তিন কটা পরে ডুবিয়া যায়। ইংরেজ ও ফরাসীরা বলিতেছেন, সকলে জোট বাধিয়া ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যপথ নিরাপদ করিতে হইবে।

মাহুষ যদি মুঘল সঙ্গ্রহ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহা ব্যবহার করিবার জন্য তাহার মনটা উসখুস করা আশ্চর্যের বিষয় নয়।

ইটালীর প্রভুর নাম মুঘল হইতে মুসোলিনী হইয়াছে, এরূপ ঘেন কেহ মনে না করেন। ব্যাকরণ অনুসারে এরূপ অনুমানে একটা বাধাও আছে। সংস্কৃত ও বাংলায় নামের শেষে “ইনী” থাকিলে সেটা জীলোকের নাম হয়। তবে আজকাল তার ব্যতিক্রমও হইতেছে। একটা কল্পিত দৃষ্টান্ত লউন। কোন বালকের নাম তাহার পিতামাতা “ভামিনী-রঞ্জন রাহা” রাখিলে পুত্র লায়েক হইবার পর নিজের নাম সহি করেন “ভামিনী রাহা”—লোকেও তাহাকে ভামিনী বলিয়া ডাকে। মুসোলিনীকে কিন্তু কোনক্রমেই কেহ ভামিনী মনে করিতে পারিবে না—যদিও স্বভাবটা তার কোপন বটে।

[এত দূর লিখিবার পর দেখিলাম, আরও একটি জাহাজ টর্পেডো করা হইয়াছে।]

জমিদার ও রায়ত

আগ্রা-অযোধ্যা, বিহার, বাংলা, ও উড়িষ্যা জমিদার ও রায়তের স্বার্থের বৈপরীত্য বহু পূর্বে হইতেই লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান সময়ে আগ্রা-অযোধ্যা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী সদস্যদের সংখ্যাধিক্য হওয়ায় তথায় কংগ্রেস-গব্বেন্ট স্থাপিত হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভাগুলির সদস্য নির্বাচনের সময় কংগ্রেসী প্রার্থীরা বলিয়াছিলেন তাহারা নির্বাচিত হইলে রায়তদের দুঃখ মোচন করিবেন। বাংলা দেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী সদস্যদের সংখ্যাধিক্য হয় নাই বটে, কিন্তু, ভারত-শাসন আইনের ব্যবস্থা অনুসারে মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা অল্প যে-কোন দলের সদস্যদের চেয়ে বেশী, এবং মুসলমান সদস্যদের মধ্যে অনেকেই কৃষক-প্রজা সমিতির সমর্থন পাইয়া নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তন্নিম্ন, বঙ্গে রায়তদের মধ্যে মুসলমান বেশী ও জমিদারদের মধ্যে হিন্দু বেশী, মুসলমান কম। সেই জন্য বঙ্গে জমিদার ও রায়তের দ্বন্দ্ব অনেকটা হিন্দু-মুসলমান বিরোধের আকার ধারণ করিয়াছে। অল্প তিনটি প্রদেশে যেমন কংগ্রেসীদের প্রাধান্তবশতঃ রায়তদের দুঃখমোচনের চেষ্টা হইতেছে, বঙ্গে তেমনি মুসলমানদের ও কৃষক-প্রজাদের প্রাধান্তবশতঃ রায়তদের দুঃখমোচনের চেষ্টা হইতেছে।

রায়তদের দুঃখমোচন একান্ত আবশ্যক ও একান্ত কর্তব্য। কিন্তু জমিদারদের ত্রাণ অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহা করা উচিত। এ বিষয়ে কোনও পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিবার কোন কারণ আমাদের মত এমন অনেক সম্পাদক ও সাংবাদিকের নাই তাহারা কোন পক্ষের জমিদার ছিলেন না এবং এখনও তাহারা জমিদার নহেন, রায়তও নহেন।

জমিদারদের মধ্যে অনেকে অলস ও অত্যাচারী ছিলেন ও আছেন, ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু সকলের সঙ্কে ইহা বলা চল না। অত্যাচার নিবারণ দৃঢ়তার সহিত করা গব্বেন্টের একান্ত কর্তব্য। তাহার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন আবশ্যক হইলে তাহাও করা উচিত। কিন্তু আইন করিয়া আলস্য দূরীভূত করা যায় না। অবশ্য, যদি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপ্লব দ্বারা এমন

অবস্থা ঘটান যায়, যে, যে খাটিবে না সে খাইতে পাইবে না—যেমন স্তন্যপায়ী পাই রাশিয়ায় হইয়াছে, তাহা হইলে আলস্তের প্রতিকার হয় বটে; কিন্তু যদি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা এরূপ হয়, যে, যে খাটিবে না সে খাইতে পাইবে না, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থাও হওয়া চাই, যে, যে খাটিবে সে খাইতেও পাইবে এবং সকল মানুষকেই কিছু কাজ দিতে হইবে, কেহ বেকার থাকিবে না। শুনা যায়, রাশিয়ায় বেকার-সমস্যা নাই; কিন্তু অল্প দিকে ইহাও শুনা যায়, যে, তথায় নুতন আমলেও দুর্ভিক্ষে বহু লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

যাক্ সে কথা।

যে-কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বলে পরিশ্রম না করিয়াও এক এক শ্রেণীর লোকের প্রভূত আয় হইতে পারে, তাহা এই কারণে অকল্যাণকর ও নিন্দনীয়, যে, তাহা আলস্ত উৎপন্ন করে ও তাহাকে প্রেরণ দেয়। আলস্ত বহু দোষের আকর। জমিদারি এরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। উত্তরাধিকারশ্রুত্রে প্রাপ্ত পুঞ্জি দ্বারা কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া বা তাহা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া তাহার হ্রদ হইতে অর্থলাভ এরূপ আর একটি আলস্যজনক প্রথা ও ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষের যে কয়টি প্রদেশে রায়তদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা হইতেছে, তথাকার রায়তদের ও রায়তবন্ধুদের মনের ভাব যেন এইরূপ, যে, জমিদারদিগকে উৎখাত করিতে পারিলেই যেন রায়তদের কল্যাণ স্বতঃসিদ্ধ হইবে। তাহা কিন্তু সত্য নয়। ভারতবর্ষের যে-সব জায়গায় জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধাভোগী জমিদার নাই, সেখানেও প্রজাদের বহু দুঃখ আছে। অতএব রায়তদের উন্নতি বাস্তবিক কিসে কিসে হয় তাহা স্থির করিয়া সমুচিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যেখানে প্রচলন সেখানকার প্রজারা অল্প সব স্থানের রায়তদের চেয়ে কম বা বেশী খাজনা দেয়, তাহাও দেখা উচিত।

যাহারা জমিদারদের স্বল্প লোপ করিতে ইতস্ততঃ করে না, তাহাদের মনে রাখা উচিত, যে, অনেকে নিজে বা অনেকের পূর্বপুরুষ অল্প উপায়ে (ওকালতী, ব্যারিষ্টারী,

ভাজারী, এজিনিয়ারী, ঠিকাদারী, বা কোন প্রকার বাণিজ্য দ্বারা) টাকা রোজগার করিয়া সঞ্চিত টাকা দিয়া জমিদারী কিনিয়াছে। তাহাদের স্বল্প লোপ করিতে হইলে খেসারৎ দেওয়া উচিত। যদি কেহ উত্তরাধিকারশ্রুত্রেই জমিদারী পাইয়া থাকে, যদি কাহারও পূর্বপুরুষ লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে জমিদার হইয়া থাকে এবং তদবধি জমিদারীটাই সেই বংশের সম্পত্তি হইয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে এই উত্তর-বিধ লোকের স্বত্বই বা বিনা-স্বত্বপূরণে কেন কাড়িয়া লওয়া হইবে? কাহারও পৈত্রিক ঘরবাড়ী বা উত্তরাধিকার-শ্রুত্রে প্রাপ্ত ব্যবসা বা উত্তরাধিকারশ্রুত্রে প্রাপ্ত টাকাকড়ি ত তুল্যমূল্য কিছু না-দিয়া কাড়িয়া লওয়া হয় না?

আমরা একথা ভুলিয়া যাইতেছি না, যে, যে-সব রায়ত জমি চষে, তাহাদের পরিশ্রমের ফল তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। তাহা যথেষ্ট অবজ্ঞা করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু কেহ জমি চষিলেই তাহাকে তাহার মালিক গণ্য করা যাইতে পারে না। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

এক জন লোক নিজের টাকার কারখানার বাড়ী নির্মাণ করাইল এবং পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি কিনিয়া কারখানার ঘরে বসাইল। পরে কারিগর ও মজুর লাগাইয়া সে পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিয়া তাহা বিক্রী করিতে লাগিল। কারিগর ও মজুরেরা পরিশ্রম করিয়া পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতেছে বলিয়া কারখানার বাড়ীটী ও যন্ত্রপাতি তাহাদের সম্পত্তি বিবেচিত হইতে পারে না—তাহারা কেবল যথেষ্ট পারিশ্রমিক দাবী করিতে পারে। ইহা সত্য বটে, যে, রাশিয়ার কারখানাগুলি রাষ্ট্রের সম্পত্তি, ব্যক্তিবিশেষের নহে। সেরূপ ব্যবস্থা বিপ্লবের ফলে হইয়াছে। অল্পজ্ঞ ও বিপ্লবের দ্বারা সেরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, কিংবা আইন করিয়া সমুদয় পণ্যশিল্পের কারখানা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইতে পারে। সেরূপ আইন ত্রায়সঙ্গত ভাবে করিতে হইলে কারখানাসমূহের ভূতপূর্ব মালিকদিগকে খেসারৎ দিতে হইবে।

এইরূপ, সমুদয় জমিও দুই প্রকারে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হইতে পারে। বিপ্লবের ফলে হইতে পারে—যেমন শুনা যায় রাশিয়ায় কতকটা হইয়াছে, এবং আইনের দ্বারা জমিদার-দিগকে খেসারৎ দিয়া হইতে পারে। যদি ভোটের জোরে এমন

আইন করা যায়, যে, জমিদারবা কোন ক্ষতিপূরণ পাইবে না অথচ তাহাদের কোন একটা স্বত্ব বা সম্মান স্বত্ব লুপ্ত হইবে, তাহা হইলে তাহা বিপ্লবেরই সমান।

বিপ্লব

“বৈচে থাক্ বিপ্লব” “ইনকিলাব জিন্দাবাদ—” শুনিতে বেশ, খুব হুজুক হয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে কত নরহত্যা, কত রক্তপাত, কত অস্ত্র চুর্কার্য জড়িত থাকে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। আজকাল ধর্মের দোহাই বেশী লোকে মানিতে চায় না। কিন্তু জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ লুপ্ত হয় নাই। যাহা ন্যায়সঙ্গত নহে তাহা করিলে শীঘ্র বা বিলম্বে তাহার প্রতিক্রিয়া হইবেই। নরহত্যা ও রক্তপাত এক পক্ষ করিলে অস্ত্র পক্ষও স্বেচ্ছা পাইলে তাহা করিবে।

বিপ্লবও দু-রকমের হয়। ফ্রান্সে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে বিপ্লবের রক্তপাত হয়, বর্তমান শতাব্দীতে রাশিয়ায় যে বিপ্লব হইয়াছে, তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ লোকদের বিপ্লব। অনেক নরহত্যা করিয়া তাহা ঘটাইতে হইয়াছে। রাশিয়ায় হত্যার জের এখনও মিটে নাই। যে-বিপ্লব রক্তপাত করিয়া ঘটান হইয়াছিল, তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আরও রক্তপাত চলিতেছে।

অন্তবিধ বিপ্লব সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য বিপ্লব নহে, সংখ্যালঘু কতকগুলি লোকের প্রভুত্ব স্থাপন ও রক্ষার জন্য ইহা ঘটয়া থাকে বা ঘটান হইয়া থাকে; যেমন ইটালীতে ফাসিষ্ট বিপ্লব, জার্মেনীতে ন্যাৎসী বিপ্লব। স্পেনে সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন যুদ্ধ চলিতেছে ইটালীর ফাসিষ্ট ও জার্মেনীর ন্যাৎসী প্রভুত্বের মত সংখ্যালঘু এক শ্রেণীর প্রভুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে, এবং সেই জন্য স্পেনের বিজোহীরা ইটালীর ও জার্মেনীর সাহায্য পাইয়া আসিতেছে।

শুধু কারখানার শ্রমিকেরা ও তাহাদের মত লোকেরা বাষ্ট্রের নিয়ন্তা হইবে, কিংবা কারখানার শ্রমিক ও মাঠের চাষীরাই রাষ্ট্রে সর্বস্বত্ব হইবে, আর কোন শ্রেণীর লোক থাকিবে না, এ রকম রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা রাশিয়াতে বা অন্য কোন দেশে এখনও কায়েম হয় নাই; আবার ইটালীর

ফাসিষ্ট প্রভুত্ব বা জার্মেনীর ন্যাৎসী প্রভুত্বও নিরাপত্তা হইয়াছে মনে হয় না। রাশিয়ার বিপ্লবীদের ও কার্ল মার্কস প্রভৃতি যাহাদের মতের অনুসরণ তাহারা করিয়াছে, তাহাদের আদর্শ শ্রেণীবিহীন সমাজ (‘classless society’)। সে আদর্শ রাশিয়াতেও বাস্তবে পরিণত হয় নাই।

বস্তুতঃ, কোন শ্রেণীর লোককে বিনষ্ট বা দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা বা এক শ্রেণীর লোককে প্রভু করিয়া অন্য সকলকে শক্তিহীন ও পদানত করা ও রাখা, যাহা বা সংখ্যায় বেশী তাহাদের মত ও কাজকেই বিনা বিচারে জ্ঞান্য বলিয়া মানিয়া লওয়া—এবমিধ কোন পন্থা, আদর্শ, বা মত গ্রহণীয় ও অনুসরণীয় নহে। কেমন করিয়া যে সামাজিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সমাজকে সুস্থ, জীবন্ত ও প্রগতিশীল রাখা যায়, তাহা বলা বড় কঠিন। যাহার প্রাণ আছে, তাহা বরাবর ঠিক এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। জীবন্ত সমাজে পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবিক। জীবন্ত রাষ্ট্রেও পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবিক। রক্তপাত বিপ্লবের পথে না-গিয়া কেমন করিয়া এরূপ পরিবর্তন করা যাইতে পারে, তাহা নির্দেশ করা কঠিন—যদিও আদর্শ তাহাই হওয়া উচিত। ইউরোপে ফ্রান্স, রাশিয়া, ইটালী, জার্মেনী... সশস্ত্র বল-প্রয়োগ দ্বারা পরিবর্তন সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, পরিবর্তন করিয়াছেও। কিন্তু কোথাও এখনও রক্তপাতের জের মিটে নাই। অন্য কয়েকটি দেশ প্রধানতঃ রক্তপাত ব্যতিরেকেই আধুনিক যুগে পরিবর্তন করিয়াছে—যেমন ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, বেলজিয়ম, ইংলণ্ড...—যদিও এমন কোন দেশ নাই যাহার ইতিহাসে কোন-না-কোন যুগে রক্তপাতসহকারে বিবর্তন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। কিন্তু মাহুকের ইতিহাসের গোড়ার দিকে যাহা ঘটয়াছে, তাহাকে আদর্শ মনে করা যাইতে পারে না। মাহুকের ক্রমোন্নতি বাহনীয়।

ইতিহাসের অনেক ভীষণ বিপ্লবের সহিত জড়রাজ্যে বড় ভূমিকম্প অন্তঃপাত জলপ্লাবনের সাদৃশ্য আছে। জড়রাজ্যে এই সকল উৎপাত বিনাশ করে অনেক কিছু। কিন্তু তাহারা যাহা বিনাশ করে, তাহাব মধ্যে আবর্জনা ক্লেদ রোগ-বীজ... অনেক থাকে। এবং বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন সৃষ্টিও কিছু কিছু হয়। বহু বিপ্লব সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলা যায়।

পাটনায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের

অধিবেশন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আগামী অধিবেশন বিহারের রাজধানী পাটনায় হইবে। বিহার দীর্ঘকাল বন্দের সহিত এক প্রাদেশিক শাসনের অধীন ছিল এবং বঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার বিহারের আগে ও বিহারের চেয়ে বেশী হইয়াছিল। সেই জন্য, রাজদার্য্য উপলক্ষে ও রাজকার্য্যসংশ্লিষ্ট ওকালতী আদি কাজে অনেক বাঙালী বিহারনিবাসী হইয়াছিলেন। তাহার পর, যখন বিহারকে বাংলা হইতে পৃথক শাসনের অধীন করা হইল, তখন বাংলাকে বঞ্চিত করিয়া মানভূম জেলা প্রভৃতি বঞ্চিত কোন কোন অঙ্গকে বিহারের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইল। এই কারণে, ব্রিটিশ গবর্নেন্ট যাহাকে বিহার প্রদেশ বলেন, এরূপ বহু লক্ষ বাঙালী তাহার অধিবাসী পরিগণিত হইলেন যাহাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক শতাব্দী ধরিয়া বন্দের অজীভূত নানা স্থানে বাস করিয়া আসিতেছিলেন।

বিহার প্রদেশে বহু লক্ষ বাঙালীর অবস্থিতির ইহাই ইতিহাস ও কারণ।

যে-প্রকারেই হউক, বিহারে অনেক বাঙালীর বসবাস ঘটিয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক বাঙালী প্রত্যেক বিহারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইলেও, বিহারীদের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধিপূর্ণতায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকিলেও, সমষ্টিগত ভাবে বাঙালীরা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ঐ প্রদেশের লোকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাহাদের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধিতে অগ্রগণ্য অনেক লোক আগে ছিলেন, এখনও আছেন। তাহার বিস্তারিত নহেন। সম্প্রতি সব মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ডক্টর দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি পাটনায় গিয়া তাহাদের দল পুষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পাটনা অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত ও স্মরণীয় করিবার নিমিত্ত যাহা কিছু আবশ্যিক, তাহা বিহারে আছে, পাটনায় আছে। তথাকার বাঙালীরা কিরূপ আয়োজন করিতেছেন, সমগ্র ভারতের বাঙালীরা ক্রমে ক্রমে তাহা জানিতে পারিবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কৃষ্ণনগরে অধিবেশন

ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের সাত

বৎসর পরে চন্দ্রনগরে তাহার অধিবেশন গত বৎসর হইয়াছিল। এ বৎসর কৃষ্ণনগরে তাহার অধিবেশন হইবে। কৃষ্ণনগরের পৌরজনেরা কাজেব আরম্ভ ইতিমধ্যেই করিয়াছেন অবগত হইয়াছি। কৃষ্ণনগর শহর ছাড়া সমগ্র নদীয়া জেলারও যে এ বিষয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, তাহা আগে একবার লিখিয়াছি। তাহারাই সেই কর্তব্যপালনে অবহিত হইলে কৃষ্ণনগরের লোকদের দায়িত্বভার কিছু কমিবে।

কলেজে না-পড়িয়া আই-এ ও বি-এ

পরীক্ষা দেওয়া

কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান নিয়ম অনুসারে কোন ছাত্র যদি কলেজে না-পড়িয়া আই-এ বা বি-এ পরীক্ষা দিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইতে হয়, নতুবা সে পরীক্ষা দিতে পারে না, এবং সে ন্যূনকল্পে ম্যাট্রিকের তিন বৎসর পরে আই-এ এবং আই-এর তিন বৎসর পরে বি-এ পরীক্ষা দিবার অধিকারী বিবেচিত হয়। তাহার পূর্বে নহে। কলেজে না-পড়িয়া অন্ততঃ তিন বৎসর পরে পরীক্ষা দিবার অধিকারের এই যে নিয়ম, ইহা অযৌক্তিক নহে। কারণ, যে কলেজের ছাত্ররূপে পরীক্ষা দেয়, সে নিজের পড়াশুনা করিবার যত সময় পাইতে পারে, যে শিক্ষকরূপে পরীক্ষা দেয় পরীক্ষার বিষয় ও পুস্তকগুলি অধিগত করিবার তাহার তত অবকাশ থাকে না। কিন্তু শিক্ষকতা না করিলে কেহ কলেজে না-পড়িয়া পরীক্ষা দিতে পারিবে না, এইরূপ নিয়ম সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহা একেবারেই অযৌক্তিক, এমন কথা অবশ্য বলা যায় না। কারণ, শিক্ষকের কাজ ভাল করিয়া করিতে হইলে, শিক্ষকের জ্ঞান ক্রমবর্দ্ধমান হওয়া আবশ্যিক এবং এই ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞান পরীক্ষাভাবে উচ্চতর পরীক্ষাদানের যোগ্যতা বাড়ায়। কিন্তু শতকরা কম জন শিক্ষকের জ্ঞান ক্রমবর্দ্ধমান?

অন্ত দিকে, অল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত যে-সব লোক শিক্ষকতা না-করিয়াও পুস্তক, সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র পড়িয়া নিজেদের জ্ঞান বাড়ায়, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক বেকার,

কতগুলি বা কেরানীগিরি ও অন্যান্য কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। ইহাদিগকে আই-এ ও বি-এ পরীক্ষা যথাসময়ে দিতে না-দিবার কারণ কি? এই একটা কারণ উল্লিখিত হইতে পারে, যে, একপ লোকদিগকে পরীক্ষা দিতে দিলে কলের হার বাড়িবে এবং তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপ্তি হইবে। কিন্তু এই অপঘণের সম্ভাবনা যথাসম্ভব কম করা হইতে পারে। প্রায় সকল কলেজেই, অন্ততঃ বড় ও ভাল কলেজগুলিতে, ছাত্রদিগকে আই-এ ও বি-এ পরীক্ষা দিতে পাঠাইবার পূর্বে “টেস্ট” পরীক্ষা করিবার রীতি আছে। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম করিতে পারেন, যে, যাহারা কলেজে না-পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে চায়, তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ কোন কোন কলেজের টেস্ট-পরীক্ষা দিতে হইবে, এবং এই টেস্ট পরীক্ষার কলে যে-সকল কলেজ-ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে পাঠান হইবে, তাহাদের মধ্যে ন্যূনতম-যোগ্যতাবিশিষ্ট ছাত্রদের অন্ততঃ সমকক্ষ হইতে হইবে। এইরূপ নিয়ম করিলে কলের হার বর্তমান সময়ের চেয়ে বেশী হইবে না।

আর একটা আপত্তি এই হইতে পারে, এইরূপ প্রাইভেট পরীক্ষা দিবার নিয়ম করিলে কলেজগুলির ছাত্রসংখ্যা কমিবে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, কলেজের, বিশেষতঃ ভাল কলেজের ছাত্র কমিবে না—বরং যাহাতে ছাত্র না-কমে সেই উদ্দেশ্য প্রত্যেক কলেজকে শিক্ষাদান বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ ও রক্ষার প্রতি সর্বদা অবহিত থাকিতে হইবে। ইঙ্গুলে না-পড়িয়া প্রবেশিকা দিবার নিয়ম থাকায় ইঙ্গুলের ছাত্র-সংখ্যা ত কম নাই। বর্তমান সময়ে অনেক ছাত্র যে অনেক কলেজে পড়ে তাহা একমাত্র বা প্রধানতঃ এই কারণে নহে যে কলেজে অধ্যাপনা ও শিক্ষাদান খুব ভাল হয়;—তাহাদের কলেজে পড়িবার প্রধান কারণ এই, যে, শতকরা কতকগুলি বর্ণ-ব্যাখ্যানে (class lectures) উপস্থিত না-থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদিগকে পরীক্ষা দিতে দিবে না।

উক্ত আপত্তিটা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিলাম। অধিকতর ইহাও বলা আবশ্যিক, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য জ্ঞানবিস্তার, শিক্ষাবিস্তার—তাহা কলেজের সাহায্যে হইবে কি না-হইবে তাহা গৌণ বিবেচ্য বিষয়, মূখ্য বিবেচ্য বিষয় নহে। কতকগুলি কলেজকে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে,

বিশ্ববিদ্যালয়ের একপ কোন দায়িত্ব নাই। অধ্যাপনা ও শিক্ষাদান বিষয়ে নিম্নের উৎকর্ষ চারাই প্রধানতঃ কলেজগুলির টিকিয়া থাকিতে পারা চাই। আমরা জানি, কেবল ছাত্রদে বৈতন হইতে কোন কলেজই ভাল করিয়া চালান যায় না। বিজ্ঞানী পৌরজনের নিকট হইতে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটি হইতে, এবং রাষ্ট্রীয় অর্থকোষ হইতে তাহাদের যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া উচিত।

ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নানা-প্রকার উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ বা সংকীর্ণতর করিতে চাহিতেছে। তাহাদের অভিপ্রায় যাহাই হউক, তাহাদের চেষ্টা সফল হইলে জনকতক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র এবং বাকী কতকগুলি ধনী সন্তান উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাইবে; বাকী সকলে বঞ্চিত থাকিবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দরিদ্রতম লোকদের মধ্যেও উচ্চশিক্ষার বিস্তার। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে কলেজে না-পড়িয়া পরীক্ষা দিবার অধৌক্তিক বাধ্যগুলা দূরীভূত হওয়া আবশ্যিক। জ্ঞানরাজ্যে পৃথিবীর নানা দেশে যাহারা উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দরিদ্র-সন্তানের সংখ্যা কম নহে। তাহাদিগকে নিরুৎসাহ না করিয়া উৎসাহিত করাই উচিত।

কলেজে না-পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার পথ যে প্রশস্ততর করিতে বলিতেছি, তাহা প্রধানতঃ “আর্টসের” ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত বলিতেছি। বিজ্ঞানের—বিশেষতঃ পদার্থ-বিজ্ঞান রসায়নী বিজ্ঞান প্রভৃতি—জ্ঞানলাভের জন্য পুস্তক অধ্যয়ন যথেষ্ট নহে; যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষাগারে অধ্যাপকের পরীক্ষণ দর্শন এবং ছাত্রেরও সহস্র পরীক্ষণ আবশ্যিক। সুতরাং কেহ কলেজে না-পড়িয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দিতে চাহিলে তাহার এই প্রমাণ উপস্থিত করা আবশ্যিক যে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্পমোদিত কোন পরীক্ষাগারে যথেষ্ট পরিমাণ পরীক্ষণ দেখিয়াছে ও স্বক্ক করিয়াছে।

বাংলা ভাষার সাহায্যে জ্ঞানলাভে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত এবং সেই জ্ঞান কে কত দূর লাভ করিয়াছে, তাহার প্রমাণ লইয়া সার্টিফিকেট দিবার নিমিত্ত বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা-সংসদ স্থাপন করিয়াছেন। ইহার কার্য সম্পন্ন হইতে

খাকিলে ইহার প্রাপ্ত পদবী-সম্মানের মূল্য কম হইবে না। ভবিষ্যতে যদি ইহার শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সঙ্গে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য কখনও যুক্ত হয়, তাহা হইলে ইহার পদবীগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন গদবী সমতুল্য হইবে।

নারীশিক্ষা সমিতি

আঠার বৎসর পূর্বে কলিকাতায় নারীশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন হইতে এখন পর্যন্ত প্রধানতঃ শ্রীযুক্তা লেডি অবলা বসুর আন্তরিক নারীহিতৈষণা ও জনহিতৈষণা, আগ্রহ, কৃষ্টিতা, এবং আত্মোৎসর্গের প্রভাবে ইহা চলিয়া আসিতেছে। ষাঠার অর্থ দ্বারা ও অগ্রাশ্রয় প্রকারে এই সমিতির সহায় হইয়াছেন, তাঁহারাও সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

এই সমিতি কয়েকটি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং পরে সেগুলির ভার স্থানীয় কার্ঘ্য-নির্বাহক কমিটির হাতে দিয়াছেন। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় সমিতি বন্ধের নানা স্থানে স্থাপন করিয়া চালাইতেছেন। এই প্রকারে সমিতির দ্বারা সাধারণ শিক্ষার বিস্তার হইতেছে।

আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তার পুরুষদের মধ্যেও অতি সামান্য হইয়াছে। নারীদের মধ্যে যাহা হইয়াছে, তাহা উল্লেখযোগ্যও নহে—যদিও প্রতি বৎসর কতকগুলি ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাওয়ার কাহারও কাহারও এই ভাস্তা ধারণা জন্মিতে পারে, যে, মেয়েদের মধ্যে ‘ভদ্রানক’ শিক্ষাবিস্তার হইতেছে। বস্তুতঃ তাহা হইতেছে না। সেই জন্ত, ছেলেদের শিক্ষায় অবহেলা না করিয়া, মেয়েদের শিক্ষায় এখনকার চেয়ে গবয়েন্টের এবং দেশের লোকদের খুব বেশী অরহিত হওয়া উচিত। কিন্তু সাত্তিশয়-ছত্থের বিষয়, নারীশিক্ষা বিষয়ে দেশের লোকেরা যথেষ্ট মনোযোগী নহেন, গবয়েন্ট ত নহেনই। বজেট-বিতর্কের সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্তা মীরা রত্ন গুপ্ত প্রভৃতি সদস্যরা ইহার প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু “অন্ধ জাগো” বলিলে, অন্ধ বলে, “তিব্বা রাজি কিবা দিন”; এবং যাহারা চক্ষু থাকিতেও না-দেখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহাদের মত অন্ধ কে আছে?

আমরা পুরুষনারীর স্বার্থ স্বতন্ত্র মনে করি না, পুরুষ-নারীর দ্বন্দ্ব অবাঞ্ছনীয় মনে করি। কিন্তু, যে-হেতু এ পর্যন্ত সাধারণতঃ পুরুষেরা নারীদের শিক্ষায় মনোযোগী ছিলেন ও আছেন, সেই জন্ত যদি নারীরা, নিজের পুত্রদের শিক্ষায় অবহেলা না-করিয়া, মেয়েদের শিক্ষাতেই অর্থসামর্থ্য ও সময় প্রদানতঃ নিয়োগ করেন, তাহা হইলে তাহা অল্পচিত হইবে না।

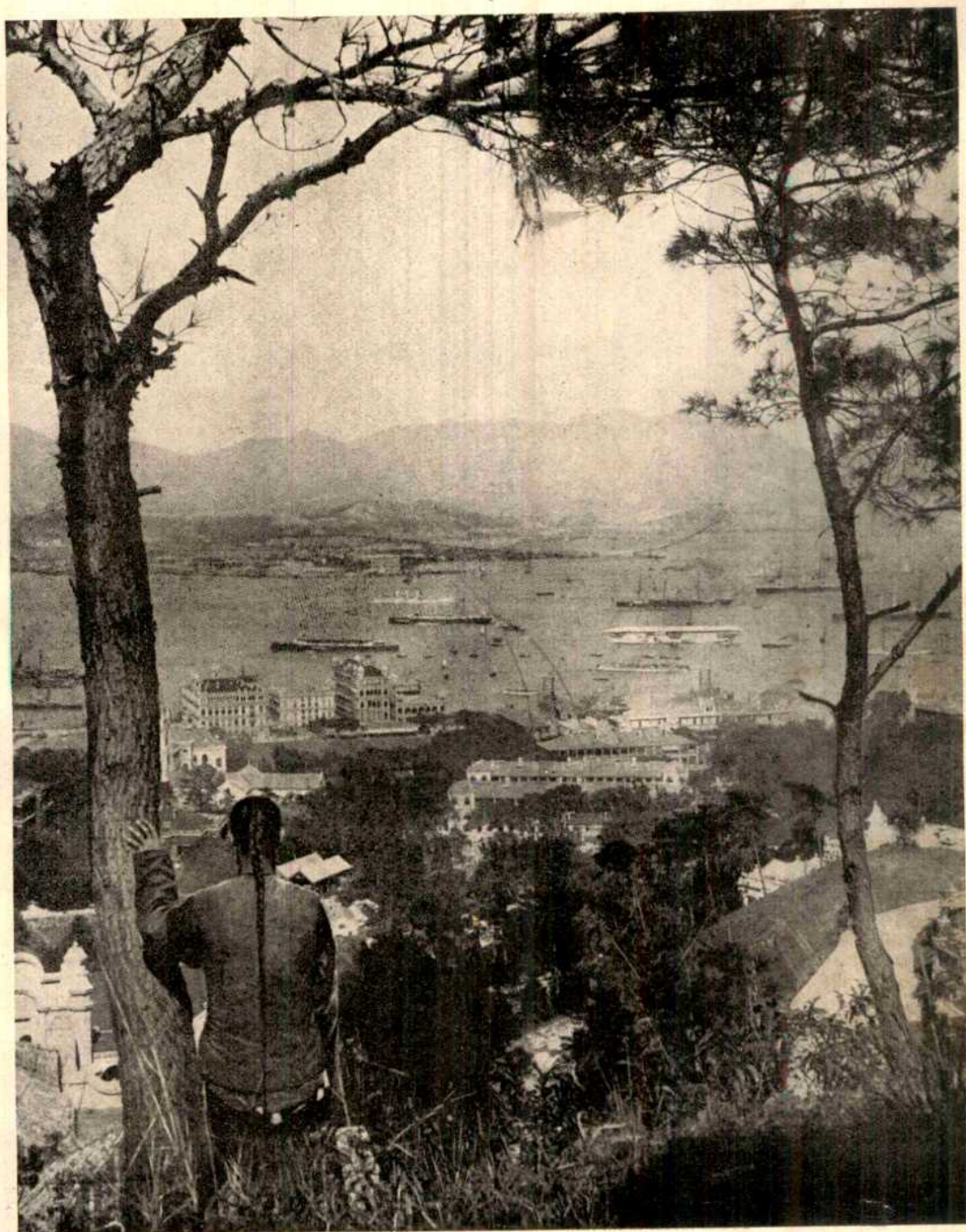
নারীশিক্ষা সমিতি সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত নারীদিগকে এরূপ নানা কুটীরশিল্প শিক্ষা দিয়া থাকেন, যাহাতে তাঁহারা দাবলদ্বী হইতে পারেন এবং দেশের কতক টাকা দেশে থাকে। বস্ত্রবয়ন-বিভাগে স্বতী, রেশমী ও পশমী নানাবিধ বস্ত্রাদি মেয়েরা বয়ন করিয়া থাকেন। সমুদয় উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

বঙ্গে বালিকা-বিদ্যালয় যথেষ্ট নাই, এবং গ্রাম্য বালিকা-বিদ্যালয়সকলে কাজ করিবার মত শিক্ষয়িত্রীও যথেষ্ট নাই। সমিতি প্রতিবৎসরই কতকগুলি ছাত্রীকে শিক্ষা দিয়া শিক্ষয়িত্রী হইবার যোগ্য করিতেছেন।

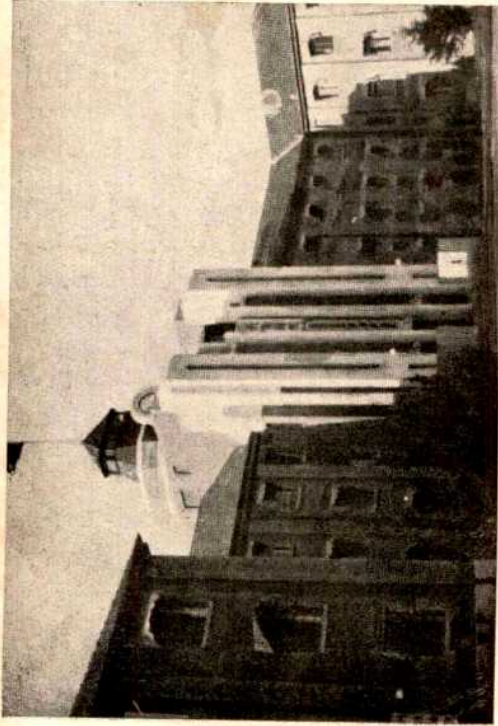
তন্মিত্ত বোঙ্গীর গুপ্তদ্বার কাজ (নিসিৎ) শিখাইবার ব্যবস্থাও সমিতি করিয়াছেন।

বঙ্গে বালিকা বিধবা ও তাহাদের চেয়ে অধিকবয়স্ক বিধবা কত লক্ষ আছে, তাহা বলিলে আমরা স্থায়ীভাবে যথেষ্ট লক্ষা পাইব, এরূপ আশা নাই। তাহা বলিব না। এই বিধবাদের মধ্যে অসহায়্য যে কত, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

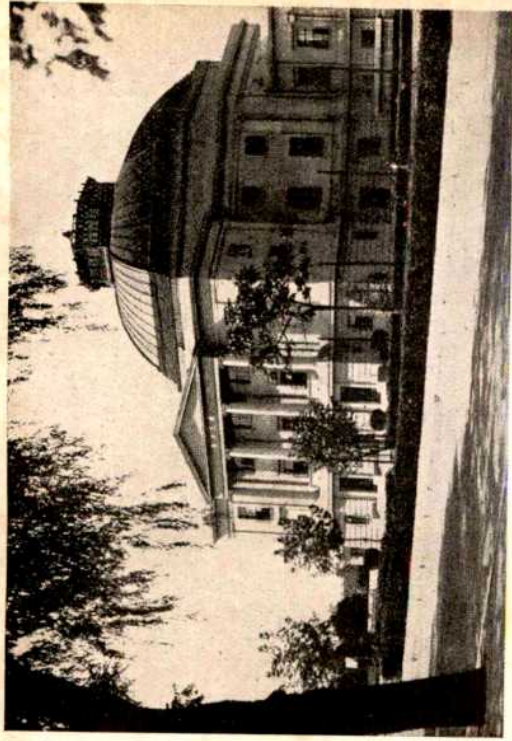
নারীশিক্ষা সমিতি এই অগণিত বিধবাদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক জনকেও আত্মরক্ষায় ও আত্মপালনে এবং সমাজসেবায় সমর্থ করিবার নিমিত্ত পুণ্যাশ্রমিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নামে বিদ্যাসাগর বাণীভবন স্থাপন করিয়াছেন। ইহার ছাত্রীনিবাসে বাষট্টিটি বিধবা বাসস্থান, আহাৰ্য্য ও শিক্ষা পাইয়া থাকেন—তাঁহাদিগকে কিছু দিতে হয় না। শিক্ষার্থিনী আরও অনেকে আছেন, কিন্তু অর্থভাবে সমিতি তাঁহাদের আবেদন লইতে পারেন না। বাংলা দেশে এমন লোক বিস্তর আছেন, যাহারা এক-এক জনে থোক এত টাকা দিতে সমর্থ যাহার স্তন হইতে এক একটি বিধবা ছাত্রীর সমুদয় ব্যয় নির্বাহিত হইতে পারে।



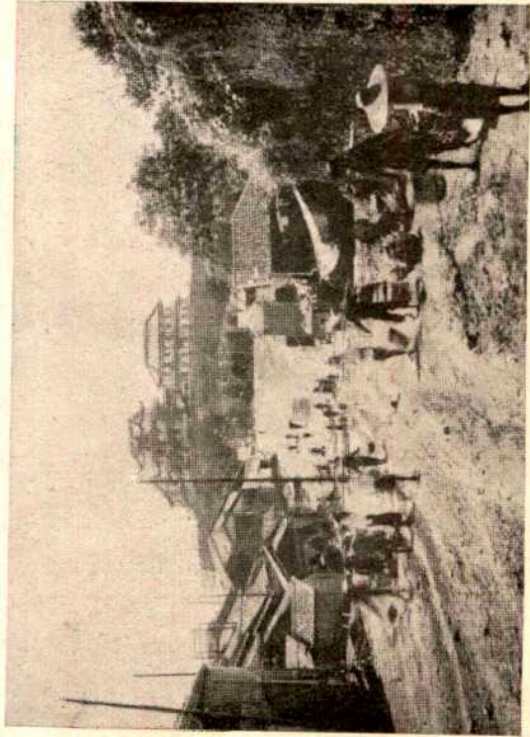
दृश्य



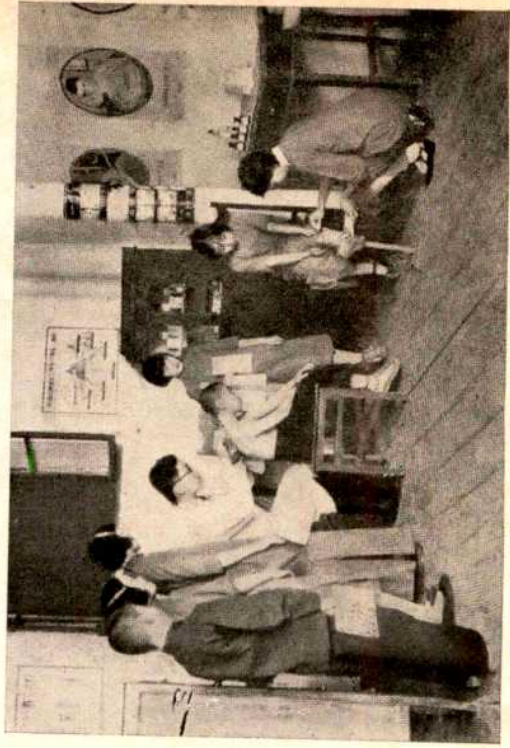
নানকিং—প্রধান বিচারশালা।



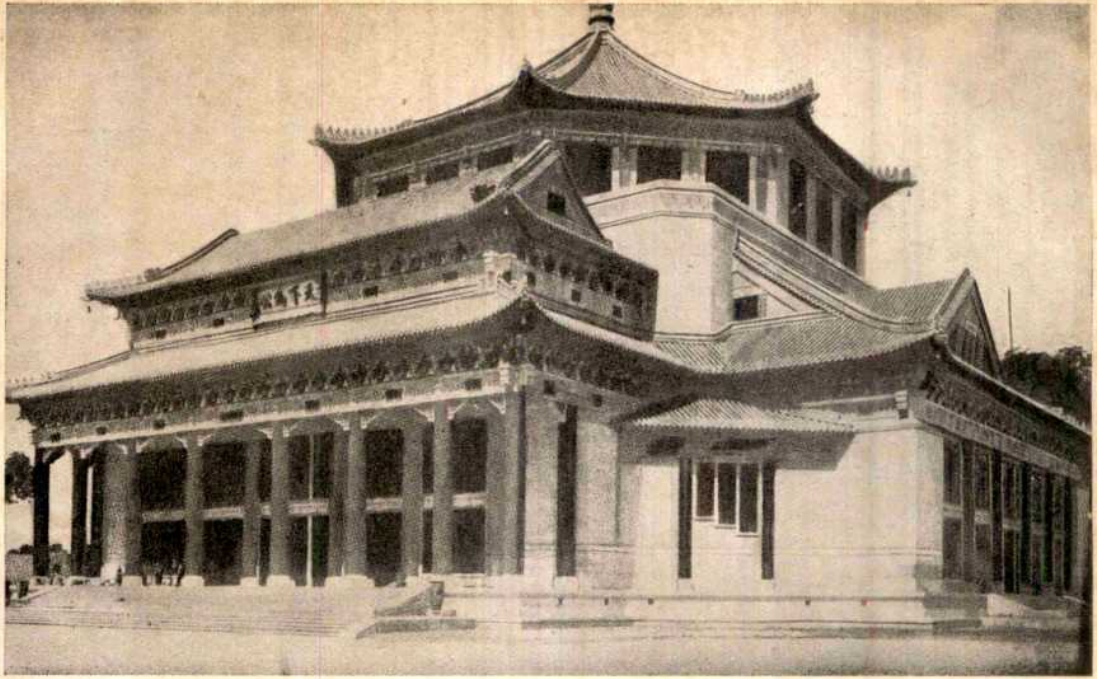
নানকিং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবন



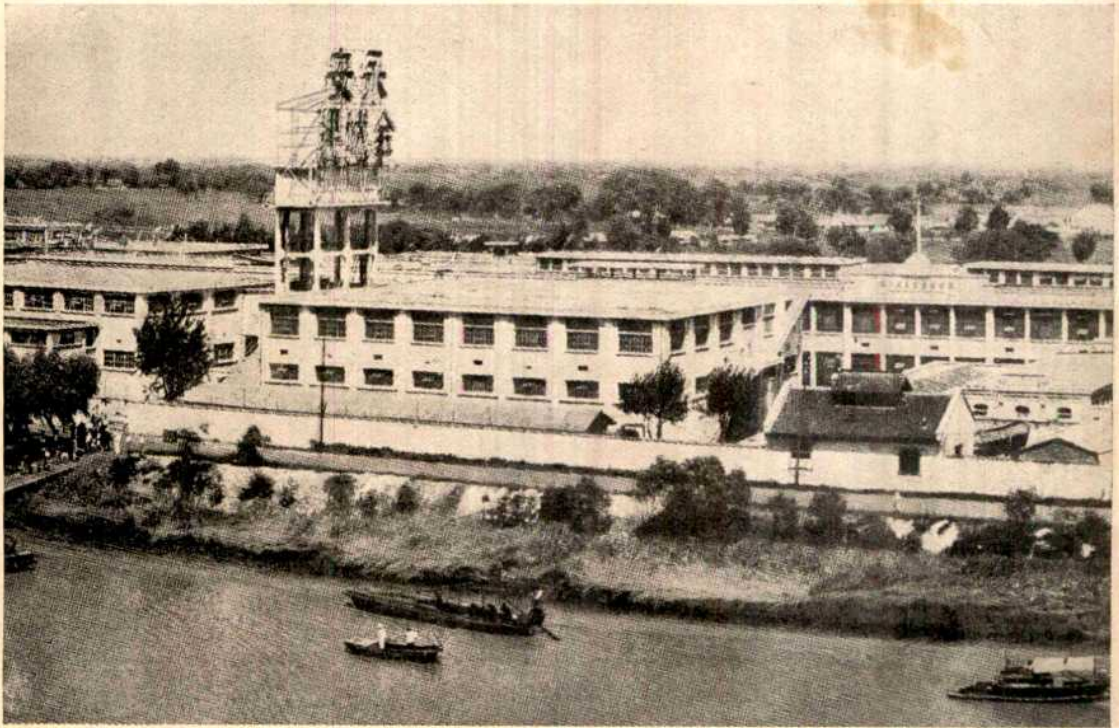
চাংশায় রাজপথ-নির্দাগ



নানকিংয়ের একটি বিদ্যালয়ে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষণ



সুন ইয়াং-সেন স্মৃতিসৌধ, ক্যান্টন



শাংহাইতে বিশাল ও সর্বাধুনিক যন্ত্রাদি-সম্বলিত চীনা কাপড়ের কলের এক অংশ



খেলাধুলার ক্ষেত্রেও চীন পশ্চাৎপদ নহে; কুমারী ইয়াং
সিউং-চিউইং সস্তরগণবিদ্যায় প্রাচ্যে মহিলাদের
মধ্যে অগ্রগণ্যা



জেনারাল চিয়াং কাই শেকের পত্নী; বর্তমান চীন-জাপান
যুদ্ধে চীনের সমর-পরিষদের সদস্যপদে বৃত্তা হইয়াছেন



চীন-জাপান যুদ্ধ। কম্যাণ্ডার জুংজুই



চীন-জাপান যুদ্ধ। মেজর-জেনারাল সোজি কাওয়াবে

কলিকাতার একটি হিন্দুস্থানী বালিকা-বিদ্যালয়

কয়েক মাস হইল কলিকাতার কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে হিন্দু-স্থানীদের একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে দিন উহার দারোয়ানটন হয়, তাহার পর দিন খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম, যে, উহার কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন, বাঙালী ছাত্রী মাত্রকেই উহাতে বিনা বেতনে ভর্তি করা হইবে ও শিক্ষা দেওয়া হইবে। যদি কর্তৃপক্ষ এই নিয়ম করিতেন ও বলিতেন, যে, বাঙালী, হিন্দুস্থানী ও অন্ত্র অবাঙালী সকল ছাত্রীকেই কিংবা সকল গরীব ছাত্রীকেই তাঁহারা অবৈতনিক শিক্ষা দিবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রশংসা করিতে পারিতাম। কিন্তু কেবল বাঙালীর মেয়েরাই এবং প্রত্যেক বাঙালীর মেয়েই কাঙালিনী ও কুপার পাত্রী, কর্তৃপক্ষ অনভিপ্রেত ভাবেও কাঙ্ক্ষ্যতঃ এইরূপ বলায় আমরা কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতে পারি নাই, এবং, যদিও আমরা দরিদ্র বাঙালী জাতি, তথাপি কিকিৎ অপমান বোধ করিয়াছি।

মভার্ণ রিভিযু হইতে অনুমতি ব্যতিরেকে

প্রবন্ধ উদ্ধার

আমরা প্রতি মাসেই দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের কোন-না-কোন দৈনিক পত্র আমাদের অনুমতি না লইয়া আমাদের ইংরেজী মাসিক মভার্ণ রিভিযু হইতে ছোট বড় প্রবন্ধ আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করেন বা অনুবাদ করেন। কোন কোন প্রবন্ধ বহু কাগজে উদ্ধৃত হয়। ইহাদের মধ্যে যাহারা যে-বার খুব বেশী গুস্তাদী দেখান, সে-বার আমাদের কাগজ-খানার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন না। উদ্দেশ্য প্রবন্ধটি নিজের বলিয়া চালান। কেহ কেহ আমাদের কাগজের প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশ করেন এবং প্রথম বা একাধিক কিস্তিতে মভার্ণ রিভিযুর নাম করেন না, শেষ কিস্তিতে প্রবন্ধের শেষে ছোট অক্ষরে আমাদের কাগজখানার নাম ছাপিয়া দেন। যাহারা একবারেই সমস্তটি ছাপেন, তাঁহারা খুব সাধু হইলে প্রবন্ধের নামের নীচে বা উহার নাম ও লেখকের নামের নীচে মভার্ণ রিভিযুর নাম না লিখিয়া সর্বশেষে ছোট অক্ষরে তাহার নামটি ছাপেন। মভার্ণ রিভিযুর

নাম সর্বশেষে ছাপিবার উদ্দেশ্য, কোন প্রকারে সাধুতা রক্ষা; সর্বশেষে ও ছোট অক্ষরে ছাপিবার উদ্দেশ্য, নামটি অনেকের চোখে না পড়িলে প্রবন্ধটি উদ্ধারক কাগজের নিজের বলিয়া পাঠকের ধারণা হইবে।

এই সব সাংবাদিকপ্রবরের ধারণা এই, যে, মাসিক পত্রের প্রবন্ধগুলি যে-কাগজে প্রথম বাহির হয় ও যাহার জন্ত লিখিত, তাহার সম্পাদকের অনুমতি না লইয়াই আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করা চলে, এমন কি মূল সাময়িক পত্র-খানার নাম উল্লেখ করাও উদ্ধারকের দয়াদায়ক! এরূপ আচরণ যে গ্রাহ্যবিরুদ্ধ, তাহা তাঁহারা কি বুঝেন না? পাশ্চাত্য রীতি অন্তরূপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, আমেরিকার ‘দি লিভিং এজ্’ বা জাৰ্মেনীর *Die Auslese* পত্রে যখন আমাদের প্রবন্ধ উদ্ধৃত হয়, তখন গোড়াতেই মভার্ণ রিভিযুর নাম মুদ্রিত হয়।

মধ্যে মধ্যে কৌতুকাবহ ব্যাপার ঘটে। কোন সাধু সম্পাদক মভার্ণ রিভিযুর নাম না করিয়া তাহার কোন প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিলেন, তাহার পর তাহা অন্ত্র খবরের কাগজে উদ্ধৃত হইবার সময় মভার্ণ রিভিযুর নাম উল্লিখিত না হইয়া যে কাগজে উহা বিনা অনুমতিতে ও বিনা ঋণ স্বীকারে উদ্ধৃত হইয়াছিল তাহারই প্রবন্ধ বলিয়া ঋণ স্বীকৃত হইল। মাসখানেক আগেকার অন্ত্রবিধ কৌতুকাবহ একটা ঘটনা বলি। আগষ্ট মাসের মভার্ণ রিভিযুর গোড়াতেই আমরা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর লিখিত মস্তিষ্কগ্রহণ সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। প্রবন্ধটি কলিকাতার ধুরন্ধর কংগ্রেসওয়াল কাগজগুলিও নিশ্চয়ই খুব অকিকিৎকার মনে করিয়াছিল, কারণ কেহই উহার উল্লেখ বা এক আধটা বাক্যও উদ্ধৃত করে নাই। কিন্তু লাহোরের ট্রিবিউনে উহা উদ্ধৃত হয়, এবং দিল্লীর একখানা কাগজ ‘হিন্দুস্থান টাইমস’ উহা ক্রমশঃ উদ্ধৃত করে। উদ্ধৃত করিয়াছিল একেবারে সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পাশে, কিন্তু প্রথম কিস্তিতে কোথাও মভার্ণ রিভিযুর নাম উল্লেখ করে নাই (শেষে করিয়াছিল কি না ঠিক মনে পড়িতেছে না)। এই কিস্তিটি দিল্লীর ঐ কাগজে প্রকাশিত হইবামাত্র কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ দৈনিকের সিমলাস্থিত সংবাদদাতার চোখে

পড়ে এবং সেই ব্যক্তি কলিকাতাস্থ ঐ দৈনিকটির ‘সিমলা-চিঠি’তে (Simla Letter) লেখেন, স্বভাষ বাবু দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইমসে মন্তব্যগ্রহণ সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতেছেন। এবং কলিকাতার ঐ প্রসিদ্ধ দৈনিকটি অপরিবর্তিত আকারে ঐ সিমলার চিঠিটি ছাপেন!! অর্থাৎ কলিকাতার একখানা মাসিকে স্বভাষ বাবু যাহা আগেই লিখিয়াছেন, তাহা সিমলার এক জন পত্রপ্রেসক কলিকাতার দৈনিকে হিন্দুস্থান টাইমসের প্রবন্ধ বলিয়া উল্লেখ করিলেন এবং কলিকাতার ঐ দৈনিক সিমলার লোকটির প্রদত্ত এই সংবাদ ছাপিলেন, যে, গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে দিল্লীর একটি কাগজ স্বভাষ বাবুর একটি প্রবন্ধ ছাপিতেছে। যাহা হউক, সেদিন দেখিলাম, সেপ্টেম্বরের মডার্ন রিভিউতে স্বভাষবাবুর ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আগাগোড়া কলিকাতার ঐ দৈনিকে উদ্ধৃত হইয়াছে। অবশ্য, আমাদের অমুমতি লগ্না হয় নাই। তবে দৈনিকটি দয়া করিয়া সর্বশেষে আমাদের কাগজখানার নাম ছোট অক্ষরে ছাপিয়া দিয়াছেন।

পাক্ষাত্য দেশসমূহে ছোট ছোট প্রবন্ধাংশ বিনা অমুমতিতে উদ্ধরণীয় অনেক মনে করিলেও সকলে তাহাও মনে করেন না। আদ্যোপান্ত কোন প্রবন্ধ বিনা অমুমতিতে উদ্ধৃত করা তাঁহারা রীতিবিরুদ্ধ ও নীতিবিরুদ্ধ মনে করেন—বিশেষতঃ স্বাধীনতার না করিয়া। কোন কোন কাগজের এ বিষয়ে নিয়ম খুব কড়া। আমাদের মনে পড়ে, অনেক বৎসর পূর্বে আমাদের কাছে কেহ অল্প কাগজের একটি পরিহাসাত্মক রচনা পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বহুর উদ্ভিদের প্রাণ সম্বন্ধে গবেষণার বিখ্যাত “পঞ্চ” (“Punch”) কাগজের পরিহাসাত্মক কয়েক পংক্তি কবিতা উদ্ধৃত ছিল। আমরা তাহা ছাপিয়াছিলাম, এবং “পঞ্চ”-এর নামও ছাপিয়াছিলাম। কিছুদিন পরে “পঞ্চ” খেসারৎ দাবী করিয়া ও তাহা না দিলে মোকদ্দমার ভয় দেখাইয়া এক চিঠি লেখেন এবং কলিকাতার সলিসিটর মর্গ্যান এও মর্গ্যান কোম্পানী “পঞ্চ”-এর পক্ষ হইতে আমাদের কাছে হুমকী ও তাগিদ দেন। আমাদের কাছে টাকা দিতে হইয়াছিল—কত মনে নাই, বোধ হয় তিন গিনি—

যদিও আমরা নিজে “পঞ্চ” হইতে কিছু উদ্ধৃত করি নাই, অল্প কাগজ যাহা নিজের প্রবন্ধের মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছিল তাহা আমরা ছাপিয়াছিলাম এবং “পঞ্চ” কাগজের স্বাধীনতা তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

আমরা মধ্যে মধ্যে আমেরিকা ও ইউরোপের কোন কোন দেশ হইতে মডার্ন রিভিউ হইতে প্রবন্ধের অংশ উদ্ধৃত করিবার অমুমতি চাওয়ার চিঠি পাই। কয়েক দিন পূর্বে চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ হইতে এইরূপ একখানি চিঠি একটি চেক ভাষার কাগজের প্রকাশকদিগের নিকট হইতে পাইয়াছি। তাঁহারা আমাদের কোন প্রবন্ধ আন্তোপাস্ত উদ্ধৃত বা অমুমতি করিবেন না, কেবল কোন কোনটির সার সংকলন করিবেন—তাহাও চেক ভাষায়, ইংরেজীতে নহে। এই অধিকারের জন্য তাঁহারা টাকাও দিতে চাহিয়াছেন।

“শেষ ব্রহ্মযুদ্ধে বীর বাঙালী সৈনিক”

ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে এই নামে প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকারের মন্তব্য অল্পমুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধটির লেখক শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের তৎসম্বন্ধে বক্তব্য বিলম্বে পাওয়ায় এখানে মুদ্রিত হইতেছে।

লেখক মহাশয়ের বক্তব্য দেখিয়া স্পষ্টই মনে হইতেছে, যে, তিনি উত্তর-ব্রহ্ম অবস্থান পূর্বক বিষয়টি যথাযোগ্য ভাবে আলোচনা না করিয়াই কেবলমাত্র একখানি পুস্তকের প্রতিপাত্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। লেখকের যদি উত্তর-ব্রহ্ম গমন করিবার কোন সুযোগ ঘটে, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন, যে ডাঃ রামলাল সরকার সম্বন্ধে তথ্য কিরূপ প্রবল জনরব বর্তমান রহিয়াছে। কোন বিদেশীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে বিদেশে এই জনরব একমাত্র কোন বিশিষ্ট কার্যগতিকেই সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। শুধু তাহাই নয়, আমি ডাঃ সরকারের বহু আত্মীয়ের নিকট হইতে যত দূর তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখা যায়, যে, রামলাল বাবু চীনদেশে বহু দিবসাবধি চাকুরী করিয়া তৎসময়ের চৈনিক সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্যও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইংরেজরা তির্যক স্বর্ণপ্রাপ্তির আশায় যে প্রচারকার্য্য চালাইতেছিল, উহাও ডাঃ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি নিজে চীনের বহুবিধ মূল্যবান ফটো গ্রহণ করেন এবং আমাকে শ্রদ্ধেয় ‘প্রবাসী’-সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, যে, ডাঃ সরকার তাঁহার পরবর্তী জীবনে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়কে উক্ত বিষয় বলেন এবং তাঁহার গৃহীত ফটোগুলিও দেখাইয়াছিলেন। ইহার কতিপয় ফটো এখন

‘মর্দারি রিভিউ’তে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি রেজুনে ডাঃ সরকার মহাশয়ের পুত্র রেজুনের বর্তমান জেলের নিকুঞ্জ বাবুর গৃহে ডাঃ সরকার কর্তৃক গৃহীত ঐরূপ প্রায় তিন-চারি শত কৌতুহলোদ্দীপক ফটোগ্রাফ দেখিয়াছি এবং উহার মধ্যে একখানি মান্দালয়ের বাঙালী পৌনাদের চিত্র আমি গত আখিনি মাসের ‘প্রবাসী’র ১৫৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত করি।

এই সময় ব্রহ্ম-সীমান্ত প্রদেশে ডাঃ সরকার এক জন ইংরেজের জীবন চিকিৎসার দ্বারা রক্ষা করেন এবং তজ্জগৎ পুরে এক জন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ ডাঃ সরকারকে ফরিদপুরের একটি প্রদর্শনীতে ‘সরকারী মেডেল’ দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর-ব্রহ্মে বহু বৎসর জীবন যাপন করেন এবং এই সময়েই ব্রহ্মের রাজনৈতিক বিষয়ে যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ইহা তাঁহার কাল্পনিক উপন্যাস নহে। পরবর্তী জীবনে ডাঃ সরকার যখন সরকারী পেন্সানভোগীর জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন তখন উহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহার হয়, কিন্তু হৃৎকের বিষয় নানা কারণে, বিশেষভাবে ব্রিটিশ-রাজের অধীনে চাকুরী করিয়াছিলেন বলিয়া এবং পুস্তক-প্রকাশকের কথামত বাধ্য হইয়া তাঁহাকে মূল ঘটনার সহিত জীবনের অত্যাগ ঘটনার সমাবেশ করিয়া একখানি উপন্যাস আকারে ‘আমার জীবনের লক্ষ্য’ প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। বর্তমানে পুস্তকখানি একেবারেই ছলভি এবং এইরূপ ভাবেই তাঁহার অল্পতম প্রসিদ্ধ পুস্তক ‘চীনদেশে সন্তান চুরি’ প্রকাশিত হয়। ইহাতেও সেই সময়কার চৈনিক সামাজিক জীবনের বহু মূল্যবান চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

আমাকে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়দ্বয়ও বলিয়াছেন যে তাঁহার। যখন উত্তর-ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করেন তখন ডাঃ সরকারের সখ্যে ঐরূপ শুনিতে পান এবং বিশেষভাবে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় উহার সন্ধানেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু বলা বাহিষে পারে যে ডাঃ রামলাল সরকারের উপাধি চক্রবর্তী ছিল; সরকার তাঁহার বংশগত পদবী মাত্র এবং পরবর্তী জীবনে তিনি রামলাল সরকার নামেই সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দীনেশ বাবুর মত শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ ভাবে বিশেষ অহুসন্ধান না করিয়া এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিবার কোন হেতু দেখিতেছি না।

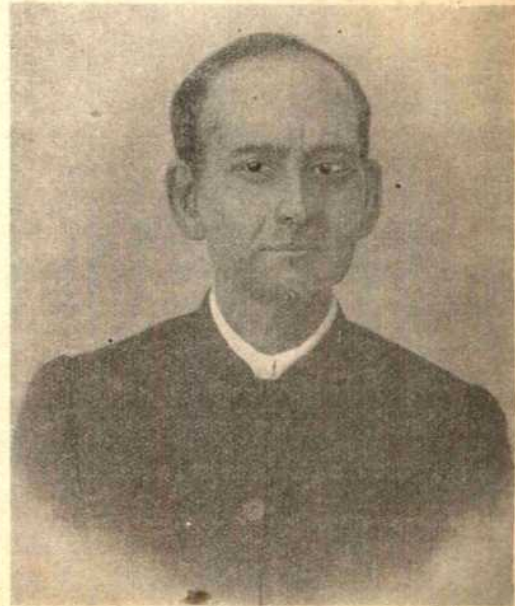
স্বর্গত ডাক্তার রামলাল সরকার মহাশয়ের সহিত আমাদের পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তাঁহার অনেক প্রবন্ধ ও ফোটোগ্রাফ মর্দারি রিভিউ ও প্রবাসীতে মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি খুব অহুসন্ধিৎসু এবং বাস্তব তথ্য ও ঘটনার বৃত্তান্ত সংগ্রহে উৎসাহী ছিলেন। আমরা তাঁহাকে কল্পনাজীবী ঔপন্যাসিক বলিয়া জানিতাম না। আলোচ্য বিষয়টি সখ্যে আমাদের কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকায় দীনেশ বাবু ও অজিত বাবুর বক্তব্য সখ্যে কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু রামলাল সরকার মহাশয় সরকারী চাকরো

ও পরে পেন্সানভোগী ছিলেন বলিয়া সত্য ঘটনাকে উপন্যাসের আকার দেওয়া আবশ্যক বলিয়া তিনি মনে করিয়া থাকিতে পারেন। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে, তিনি ও তাঁহার পুস্তকের নায়ক উভয়েই চক্রবর্তী। তাঁহার নিজের ডাক-নাম স্বগ্রামে কুড়নচন্দ্র ছিল কিনা, জানি না।

অধ্যাপক ললিতমোহন কর

প্রবাসী বাঙালী জগতের বহু অজ্ঞাত নিভৃত কোণে ষাঁহার। স্নিগ্ধ রশ্মি বিকীর্ণ করেন, তাঁহাদের অনেককেই আমরা জানি না। তাঁহাদের মধ্যে এক জনকে জানিতাম। তিনি গোরক্ষপুরের অধ্যাপক ললিতমোহন কর, কাব্যতীর্থ, এম্ এ, এল্ এল্ বি। তিনি আর মর জগতে নাই, প্রয়াগে তাঁহার স্বপ্তর স্বর্গত জ্ঞানী মহাত্মভব শ্রীশচন্দ্র বহু মহাশয়ের গৃহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ললিতমোহন সুপণ্ডিত, হৃদলেখক, ও সুরসিক সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা ও আত্মগোপনের অভ্যাস বশতঃ তাঁহার মনোবা ও পাণ্ডিত্যের কোন সম্যক পরিচয় তিনি রাখিয়া যান নাই। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বহুর সহযোগিতায় লিখিত স্মার্ট অশোকের অল্পশাসনসমূহ সম্বন্ধীয় বাংলা পুস্তকই বোধ হয় তাঁহার বিদ্যাবত্তার একমাত্র মুদ্রিত



অধ্যাপক ললিতমোহন কর

নিদর্শন। সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে তাঁহার বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞান ছিল। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে তিনি গোরক্ষপুর নয়া-দিল্লী প্রভৃতিতে যে-সব বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাহার সামান্য কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। গোরক্ষপুরের অধিবেশন যাহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় স্মরণীয় হইয়া আছে, ললিতমোহন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

এগুলি বাহিরের কথা। ললিতমোহন মাত্রাটী তাঁহার সকল কাজ ও অল্প বাহ্য পরিচয়ের চেয়ে বড় ছিলেন। এরূপ নম্র, ভদ্র, শান্ত, স্থশীল ও সাধুচরিত্র মানুষ খুব বেশী দেখা যায় না। তিনি তাঁহার স্বর্গত খণ্ডের শ্রীশচন্দ্র বহু এবং খুঁড়-খণ্ডের বামনদাস বহু মহাশয়দিগের মত অতিধিসেবাপরায়ণ ছিলেন।

ললিতমোহন ফরাসী চন্দননগরের অধিবাসী।

বিশ্বভারতী বাংলা বহি চাহিতেছেন

বিশ্বভারতীর কর্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা গ্রন্থের লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকমণ্ডলীর প্রতি নিম্নমুদ্রিত নিবেদন প্রকাশ করিয়াছেন।

সবিনয় নিবেদন,

বিভিন্ন সংস্কৃতির অনুশীলন দ্বারা জগতে মৈত্রী বিস্তারের জন্য রথীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বিভাগভবন, শিক্ষা-ভবন, পাঠভবন, শ্রীভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবন ও ত্রিনিকেতন ইত্যাদি জ্ঞান, শিল্পকলা এবং লোকসেবার অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে গ্রন্থভবনও একটি অন্যতম সাংস্কৃতিক চিত্তযোগক্ষেত্র। ইহাতে অধ-লক্ষাধিক গ্রন্থ এবং হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি নানা ভাষায় নানা জাতির বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় বিতরণ করিতেছে। ইটালি, ফ্রান্স, আমেরিকা, চীন, জাপান, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশ নিজ নিজ অমূল্য গ্রন্থরাজি উপহার দ্বারা এই গ্রন্থভবনকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বহু দেশ হইতে বহু ছাত্র, অধ্যাপক, জ্ঞানী ও গুণী আসিয়া এখানে অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়া থাকেন। বাঙালীর শিক্ষা-সভ্যতার কথা তাহার নিজের সাহিত্যের মধ্য দিয়া যাহাতে সকলে প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন, এজন্য বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগারটির বাংলা বিভাগকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন। আনন্দের বিষয়, সম্প্রতি বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যসেবিগণের কত ব্যাঘ্ররোগ এ বিষয়ে জাগরিত হইয়াছে। সাহিত্য-সমিতি “রবি-বাসরে”র এক অধিবেশন উপলক্ষ্যে তাহাদের অনেকেরই এখানে শুভাগমন ঘটে। আশ্রমের জ্ঞান ও কর্মবিভাগগুলি দেখিয়া তাঁহারা বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন।

বিশ্বভারতীকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া, গ্রন্থভবনের বাংলা-বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহারা স্বতঃপ্রসূতভাবে যে প্রস্তাব করেন তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মাসিক পত্রিকা হইতে নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল। [অনাবশ্যকবোধে ইহা মুদ্রিত হইল না।]

আশা করি, বাংলার সহায় লেখক, সম্পাদক ও পুস্তক-প্রকাশকবর্গ উক্ত প্রস্তাবের বিশেষ উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে প্রত্যেক পুস্তকের এক এক খণ্ড উপহার প্রেরণ করিবেন এবং তদ্বারা বিশ্বসভ্যতার মিলনক্ষেত্রে বাংলাদেশও নিজ আসনবিস্তারে পূর্ণ স্বযোগ লাভ করিবে।

পুস্তক, পুস্তিকা বা পত্রাদি শান্তিনিকেতন ঠিকানায় অথবা কলিকাতাস্থ বিশ্বভারতী আপিসে (২১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট) বিশ্বভারতীর কর্মসচিবের নামে প্রেরণ বাঞ্ছনীয়।

প্রত্যেক মুদ্রিত বাংলা বহি একখানি তাহার স্বত্বাধিকারীর বিশ্বভারতীকে দেওয়া উচিত, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমরা বহুপূর্বে একথা বলিয়াছি, আবার বলিতেছি। ব্যবসার দিক দিয়াও ইহাতে লোকসান নাই। অধিকাংশ বহিরই দু-একখানা পোকায কাটে বা অল্প রকমে নষ্ট হয়। অনেক বহি সমালোচনার জন্য এমন অনেক কাগজকে দেওয়া হয় যাহারা তাহার সমালোচনা বা উল্লেখ পর্যন্ত করে না। অতএব, পুস্তকের স্বত্বাধিকারীরা একখানি করিয়া বহি বিশ্বভারতীকে অনায়াসেই দিতে পারেন।

আগুমান বন্দীদের কথা

গবর্নমেন্টের জিদ ছিল, আগুমানের প্রায়োপবেশক বন্দীরা উপবাস ত্যাগ না করিলে, তাহাদের দরখাস্ত বিবেচনা করিবেন না। তাহারা উপবাস ত্যাগ করিয়াছে। তাহা-দিগের মুক্তির অল্প একটা এই আত্মমানিক বাধা ছিল, যে, তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্তন এখনও হয় নাই, অর্থাৎ তাহারা এখনও স্ববিধা পাইলেই হিংসার পথ অবলম্বন করিবে। অবশ্য তাহারা সবাই সন্ত্রাসক বা বিভীষিকাপন্থী ছিল না। যাহা হউক, মহাত্মা গান্ধীর একটি টেলিগ্রামের উত্তরে প্রায়োপবেশক বন্দীরা জানাইয়াছে, যে, তাহাদের মধ্যে যাহারা বিভীষিকাপন্থী ছিল, তাহারাও এখন সন্ত্রাসনের ব্যর্থতা বুঝিয়াছে এবং তাহার দ্বারা দেশকে যে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করা যায় না বরং বিপরীত ফল কলে, তাহা তাহারা বুঝিয়াছে।

অতএব, এখন ভারত-গবর্নমেন্ট এবং অধিকাংশ

আশ্বামান-প্রায়োপবেশকদের বাসভূমি বাংলার গবর্নেন্ট প্রেষ্ট্রীজ না হারাইয়া বন্দীদের দরখাস্ত বিবেচনা করিতে পারেন। আমরা প্রবাসীর গত সংখ্যায় দেখাইয়াছি, যে, বন্দীদের সব অহরোধগুলিই দেশের বহু সভা-সমিতি, নেতা ও সংবাদপত্র আগে করিয়াছিলেন এবং সবগুলিই সফল। এখন যদি অন্ততঃ কয়েকটি অহরোধ বা একটি অহরোধ অহুসারেও কাজ না হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, যে, বন্দীদের অহরোধগুলি বিবেচনা করিবার অভিপ্রায় গবর্নেন্টের ছিল না, গবর্নেন্ট যাহা বলিয়াছিলেন বন্দীদিগকে উপবাস ছাড়াইয়া নিজেদের জিদ বজায় রাখাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। সর্বসাধারণকে একুপ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না-হইলেই মঙ্গল।

বাংলার মজ্জিমগুল বন্দীদের বিষয় বিবেচনা করিবার নিমিত্ত সরকারী ও বেসরকারী লোকদিগকে লইয়া আলোচনা ও মন্তব্য করিবেন। কাগজে দেখিলাম, বঙ্গের বাহির হইতে সব রকমের বঙ্গের বন্দীদিগকে বাংলা দেশে আনা যদি স্থির হয়, তাহা হইলে আশ্বামানের বন্দীদিগকে বন্ধায় এবং দেউলী প্রভৃতির বন্দীদিগকে হিজলী ও দমদমায় রাখা হইবে। তাহা হইলে কাহাকেও মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধে আলোচনা হইবে না কি ?

আশ্বামান বন্দীদের সম্পর্কে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মূলত্ববী প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর ভারত-গবর্নেন্টের পক্ষ হইতে মিঃ মুন্ডি বলেন, কোন প্রাদেশিক গবর্নেন্ট নিজ প্রদেশের বন্দী আশ্বামান হইতে কেবল চাহিলে ভারত-গবর্নেন্ট তাহাতে বাধা দিবেন না। তাহার পর দিনই কিন্তু, কোন গুপ্ত প্রভাবের বশে, ভারত-গবর্নেন্ট ডিগবাজী ধাইয়া এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিলেন, যে, বন্দীরা অনশন ত্যাগ না-করিলে ভারত-গবর্নেন্ট কোন বিষয়ই বিবেচনা করিবেন না, এবং বন্দীদিগকে দেশে আনা না-আনার ও ছাড়িয়া দেওয়া না-দেওয়ার মালিক ভারত-গবর্নেন্ট। এদিকে কিন্তু বলা হইতেছে, প্রদেশগুলি আত্মকর্তৃত্ব পাইয়াছে। প্রাদেশিক বন্দী অবন্দী সকলের উপর প্রাদেশিক গবর্নেন্টের ক্ষমতা না-থাকিলে আত্মকর্তৃত্বের অর্থকি ? যে-যে প্রদেশের যত বন্দী আশ্বামানে আছে, তাহাদের খরচ সেই সেই প্রদেশেব গবর্নেন্টকে দিতে হয়। তাহা

হইলে, যে-যে প্রাদেশিক গবর্নেন্ট তাঁহাদের বন্দীদিগকে ফেরত চাহিয়াছেন, ফেরত না-পাইলে তাঁহারা যদি বলেন আমরা খরচ দিব না, তাহা হইলে ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াইবে ? ভারত-গবর্নেন্ট তাহা হইলে কি বলিবেন, আমবা আপনাদের কথা শুনিব না, কিন্তু আপনারা আমাদের আদেশ অহুসারে খরচ দিতে বাধ্য ?

আশ্বামান বন্দীদের মুক্তির জন্ত আন্দোলন বঙ্গেরই অধিক হইয়াছিল, এবং তাহা এখনও চলিতেছে। অন্ততঃ বিশেষ আন্দোলন হয় নাই এবং তাহা প্রায় থামিয়া গিয়াছে।

প্রায়োপবেশন সম্বন্ধীয় আন্দোলনসম্পর্কে শান্তি

প্রায়োপবেশকদের অহরোধগুলির সমর্থনে কলিকাতার টাউন হলে যে বিরাট সভা হয়, তাহাতে .ষোণ দিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক মহিলা ও পুরুষ কংগ্রেসপতাকা হস্তে টাউন হলের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পুলিশ তাহাতে বাধা দেয় এবং সব পতাকা গুটাইতে বা নীচু করিতে বলে, এবং সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলে। সে হুকুম কেহ শুনে নাই। অনেকে মাটিতে বসিয়া পড়ে। পুলিশ লাঠি চালাইয়াছিল এবং অনেক মহিলা ও পুরুষকে বস্তার মত তুলিয়া পুলিশের বন্দী-গাড়ীতে বোঝাই করিয়া লালবাক্স থানায় চালান করিয়াছিল। মহিলাদিগকে পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বিচারে পুরুষদের দু-জনের শাস্তি হইয়াছে।

পাটনায় ন্যূনকল্পে দশ হাজার চাবী দলবলে সেখানকার ব্যবস্থাপক সভা অভিমুখে ধাওয়া করে। মজ্জিমগুলের পক্ষ হইতে তাহাদের কথা শোনা হয় এবং তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বিদায় দেওয়া হয়। পুলিশের কোন সাহায্য লওয়া হয় নাই, লইবার কোন প্রয়োজন হয় নাই; স্বতরাং লাঠি চালানও হয় নাই। কলিকাতায় পাছে ছাত্রেরা বা অন্তর্যরা দল বাধিয়া ব্যবস্থাপক সভার নিকট গিয়া গোলমাল করে এই সত্য বা কল্পিত আশঙ্কায় পুলিশ কমিশনার সভা-গৃহের চারিদিকের মাইলখানেক জায়গায় শোভাযাত্রা ও জনতা নিষেধ করিয়া হুকুম জারি করেন। সেই হুকুম তামিল করিতে গিয়া পুলিশ টাউন হলের

কাছে লাঠি চালায়, এই তাহাদের কৈফিয়ৎ। পুলিশ কমিশনারের হুকুমটাই ছিল অনাবশ্যক, এবং টাউন হল যাত্রীরা ব্যবস্থাপক সভায় গোলমাল করিতেও যাইতেছিল না। সুতরাং এই যে ব্যাপারটা ঘটিল এবং অকারণ অর্থব্যয় ও শাস্তি হইল, তাহা আমলাতন্ত্রের ও পুলিশের এই বোধের ফল, যে, তাহারা দেশের লোকসেব প্রভু এবং দেশের লোকদের কাছে তাহাদের কোন জবানদিহি নাই।

মহিলা ও ছাত্রীদিগকে যখন পুলিশ বস্তার মত গাড়ীতে ছুড়িয়া দিয়া তোলে, তখন তাহাদের গায়ে হাত দেওয়াটা প্রাচ্য শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ ভাবেই হইয়াছিল। আমরা একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিয়াছি, একটি মহিলার চুলের গোছা ধরিয়া তাঁহাকে মাটি হইতে উঠাইয়া গাড়ীতে বোকাই করা হয়।

গুলিগান, পুলিশের ব্যবহারের সমর্থনে এইরূপ বলা হইয়াছে, যে, বিলাতে সত্রেজের্ট মহিলাদের প্রতিও তথাকার পুলিশ এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু বিলাত বিলাত, ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ। নারীর প্রতি পুরুষের ব্যবহার ও নারীর গায়ে হাত দেওয়া সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ধারণা ও ব্যবহার পৃথক। তন্ত্ৰি, ইহাও মন রাখিতে হইবে, যে, সত্রেজের্টরা স্বয়ং নানাপ্রকারে বল প্রয়োগ করিত। সুতরাং তাহাদের প্রতি বিলাতে পুলিশের যেরূপ ব্যবহারের যেরূপ উপলক্ষ্য দৃষ্টি, টাউন হলের নিকটস্থ রাস্তায় শাস্তভাবে উপবিষ্ট মহিলাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহারের তদ্রূপ উপলক্ষ্য ঘটে নাই।

কাকোরি বন্দীদের অভিনন্দন

আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত কাকোরিতে কয়েক বৎসর পূর্বে একটি রাজনৈতিক ডাকাতি হয়, এবং তাহাতে নরহত্যাও হয়। অপরাধীরা দণ্ডিত হয়। সম্প্রতি মির্জাদ ফুরাইবার পূর্বে তাহাদিগকে খালাস দেওয়া হইয়াছে। তাহারা অনেক বৎসর জেল খাটিয়াছে এবং রাজনৈতিক ডাকাতি ও বিভীষিকাপঙ্কার অত্যাধিক অভ্যুদয় দ্বারা যে দেশের কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণ হয়, তাহাদের মত,

যদলাইয়া, এইরূপ হইয়াছে। অতএব, তাহাদের মুক্তি ভালই হইয়াছে। তাহারা এখন কংগ্রেসের অহিংস নীতি ও কর্মপন্থাব অনুসরণ করিয়া দেশের স্বাধীনতা অর্জন করিতে চেষ্টা করিবে, স্থির করিয়াছে। তাহাদের এইরূপ সুযোগ পাওয়া ভালই হইয়াছে।

কিন্তু বিশাল জনতানানা স্থানে তাহাদিগের যেরূপ নশ্বর্কনা করিতেছে, তাহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। তাহারা দেশের স্বাধীনতাকামী ছিল, এখনও আছে, এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য নিজেদের বিপদকে তুচ্ছ করিয়াছিল। স্বাধীনতার নিমিত্ত এই আগ্রহ ও এই অকুতোভয়তা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য বা অতীষ্ট অস্ত্র কিছুর জন্য দুর্দশ নশ্বর্কনার বিষয় হইতে পারে না। অতীত কোন সময়ে বা আধুনিক কোন সময়ে কোন কোন প্রসিদ্ধ লোক রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যে লুটপাট করিয়া থাকিলে তাহাও নিন্দনীয়—প্রশংসনীয় নহে। তাহারা বড় গায়কদের কেবল মুদ্রাদোষটারই নকল করে, তাহাদেরও কি প্রশংসা করিতে হইবে? কাকোরি বন্দীদের নশ্বর্কনায় যদি শুধু তাহাদের স্বাধীনতাপ্রিয়তারই প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইত, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দুর্কর্মের নিন্দা ঘোষণাও করা হইত বা করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে আমরা এত কথা লিখিতাম না।

বর্বরতা অপেক্ষাও অধম অবস্থায় পতন

সভ্য লোকদের মনে এইরূপ একটা অহংকার আছে, যে, তাহারা অসভ্য বর্বরদের চেয়ে কম নিষ্ঠুর ও অধিক দয়ালু। কিন্তু আধুনিক সময়ে আকাশ হইতে বোমা ছুড়িয়া এবং বিসাক্ত গ্যাস ছড়াইয়া শত্রুপক্ষের যত যোদ্ধার—এবং বিশেষ করিয়া যত নারী শিশু ও অস্ত্র অযোদ্ধার—প্রাণবধ করা হয়, কোন বর্বর জাতি কখনও তাহা করিয়াছে কি? আফ্রিকানিয়ায়, স্পেনে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পবপারে স্থিত উপজাতিদের দেশে, এবং চীন-জাপান যুদ্ধে যাহা ঘটিয়াছে, ও ঘটতেছে, তাহা আমাদের দেশের প্রাচীন যুদ্ধসম্বন্ধীয় রীতি ও নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

লণ্ডনের 'ইনকোয়ারার' নামক সাপ্তাহিকে মিঃ হেনরী হামও লিখিয়াছেন :—

"The Laws of Manu, written in Sanskrit several centuries before the Christian era, present a striking ethical contrast to the merciless warfare of to-day. This ancient code is remarkable for its strong appeal for humane fighting in battle,

The King is to conduct war mercifully and even chivalrously.

When he fights with his foes in battle, let him not fight with weapons concealed, nor with such as are barbed, poisoned, or the point of which is blazing with fire.

Let him not strike one who (in flight) has climbed to an eminence, nor one who has joined the palms of his hands in supplication, nor one who looks on without taking part in the fight.

Nor one whose weapons are broken, nor one who is grievously wounded, nor one who has turned to flight.

Such were the Laws of Manu concerning war : and here we are to-day, with our bombing planes and poison gases, slaughtering even women and children. Heartfelt shame is the only way of keeping back from us those forces of evil which appear to be so urgently seeking to engulf our hearts and minds in such deadly chains of inhumanity to our fellow-creatures as are enough to make the angels weep. Generations unborn will greatly marvel that there ever could have been such a ghastly, hideous, inhuman thing upon God's earth."

তদুপৰ্য্য। খ্রীষ্টীয় শতকের কয়েক শতাব্দী পূর্বে রচিত মহামহিমিত আৰ্যকালকার নিষ্ঠুর যুদ্ধবীতীর বিপৰীত আশ্চর্য্য নৈতিক আদৰ্শ দেখা যায়। দয়াদৰ্শের সহিত যুদ্ধের নিমিত্ত আবেদনের জন্ত এই প্রাচীন ব্যবস্থাপ্রস্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"রজাকে দয়ার সহিত, সদাশয়তাব সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তিনি যেন লুকাইত অস্ত্রের সহিত যুদ্ধ না করেন, কষ্টক বা হলযুক্ত, বিষাক্ত বা অগ্নি-শিখ অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ না করেন। যে শত্রু পলায়নপর হইয়া উচ্চস্থানে আশ্রয় লইয়াছে, যে প্রাণ ভিকার জন্ত কুতাহলি হইয়াছে, যে অযোদ্ধা দৰ্শক মাত্র, বাহ্যর অস্ত্র ভাঙিয়া গিয়াছে, যে অত্যন্ত আহত হইয়াছে, বা যে পলাইতেছে, রাজা এক্রপ বাহাকেও আঘাত করিবেন না।"

মহুর ব্যবস্থা এইরূপ ছিল। আর আমরা এখন বোমা ছুড়িবার এবোল্পেন ও বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা জীবেদ ও শিশুদিগকেও বধ করিতেছি। আন্তরিক গভীর লজ্জাবোধই আমাদেরকে এই সকল অকল্যাণ হইতে রক্ষা করিতে পারে। অনাগত ভবিষ্যতের সম্মুখের অবাক হইয়া ভাবিবে যে ঈশ্বরের পৃথিবীতে কোন কালে এক্রপ বীভৎস, ভয়ঙ্কর, অমানুষিক জিনিষ ছিল।

রাজশাহী কলেজের ব্যাপার

তিনটি মুসলমান ছাত্রকে রাজশাহী কলেজের একটি হিন্দু ছাত্রাবাসে স্থান দিবার আদেশ হয়। হিন্দু ছাত্রেরা তাহাতে অসম্মত হয়। পরে অনেকে 'অনশন-ধর্মঘট' করে। এক বৃহৎ মুসলমান জনতা ভয়প্রদর্শনার্থ হিন্দু ছাত্রাবাস ঘেরাও করে। ইত্যাকার সংবাদ পাঠকেরা খবরের কাগজে পড়িয়াছেন। ফলে বাংলা-গবর্নমেন্ট অর্থাৎ হক-প্রমুখ মন্ত্রি-মণ্ডল কলেজটা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়াছেন। উহার স্থায়ী অধ্যাপকদিগকে বধাসম্ভব অন্তর বদলী করা হইবে, অস্থায়ী অধ্যাপকদিগের চাকরি যাইবে, এবং যদি কখনও আবার কলেজ খোলা হয় সেই জন্য অধ্যাপক-সমষ্টির একটা কঙ্কালাবেশ (a skeleton staff) রাখা হইবে। প্রথমে হুকুম হইয়াছিল, যে, ছাত্রদিগকে অন্তর কলেজে ভর্তি হইবার সুযোগ দেওয়া হইবে। কিন্তু আজ (৭ই সেপ্টেম্বর) কাগজে দেখিলাম, ছাত্রদিগকে অন্তর কলেজে যাইবার সার্টিফিকেট দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শিক্ষামন্ত্রী বা কর্তৃপক্ষীয় অন্তর কেহ হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া সঙ্কট অবস্থার অবসান করিতে পারিতেন। সে চেষ্টা সফল না হইলে, দোষী ছাত্রদিগকে (তাহারা হিন্দু বা মুসলমান যে-ই হউক) শাস্তি দিতে পারিতেন। কিন্তু একেবারে কলেজ বন্ধ করিয়া দিবার, অধ্যাপকদিগকে নানাস্থানী করিবার, ...কি কারণ ঘটিয়াছে? ক্ষমতাপন্ন কেহ কি এইরূপ ভাবিয়া চায়ের পেয়ালায় তৃফান সৃষ্টি করিয়াছেন, যে, যেহেতু বঙ্গে মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে, অতএব মুসলমানদের জন্য সুবিবেচিত বা সুবিবেচিত দ্বারা কিছু করিতে চাওয়া হইবে, হিন্দুদিগকে বাড়ি হেঁট করিয়া তাহা মানিতে হইবে?

আমরা অবগত হইলাম, মুসলমান ছাত্রাবাসেই ঐ তিনটি মুসলমান ছেলের জায়গা হইতে পাবিত। কিন্তু আমরা বাড়ীগুলি দেখি নাই। সুতরাং সে-বিষয়ে কিছু বলিব না।

শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বিভাগীয় তদন্ত করিতে গিয়াছেন। ইহা মোকদ্দমার রায় দিবার পর, কতকগুলি লোককে শাস্তি দিবার পর, বিচার আরম্ভ করিবার মত! অর্থাৎ দ্বাহাকে ইংরেজীতে বলে ঘোড়ার সামনে গাড়ী

রাখা। তদন্তটা আগে করিলে কি কোন শাস্ত্র বা আইন অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইত? অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার। একপ হঠকারিতা সচরাচর দেখা যায় না।

তদন্ত সরকারী-বেসরকারী সভা লইয়া গঠিত কোন কমিটির দ্বারা হইলে ঠিক হইত।

সাধারণতঃ হিন্দুরা মুসলমানদের সহিত মেলামেশা করিতে বা মুসলমানরা হিন্দুদের সহিত মেলামেশা করিতে না চাহিলে তাহাকে সাম্প্রদায়িকতার ফুসল ও অহুদারতা বলা জায়সঙ্গত। কিন্তু এই ব্যাপারটি ঠিক মেলামেশা করিতে অসম্মতি নহে। মুসলমানদের সব ধর্ম হিন্দুদের বৈধ ধর্ম নহে। হিন্দুরা কোন দেবদেবীর পূজা (যেমন ছাত্রদের সরস্বতী-পূজা) করিলে তাহাতে মুসলমানদের আপত্তি হয়, আবার মুসলমানরা গোক কোরবানী করিলে তাহাতে হিন্দুদের আপত্তি হয়। অথচ সকলেরই নিজ নিজ ধর্ম খাইবার ও পূজাপার্বণ করিবার অধিকার থাকা উচিত। এই হেতু হিন্দু ছাত্র ও মুসলমান ছাত্রদ্বয়কে আলাদা আলাদা হাতার মধ্যে স্থিত পৃথক পৃথক বাড়ীতে রাখাই সুপরামর্শ। হিন্দু ছাত্রেরা যে তাহাদের মধ্যে মুসলমান ছাত্রদ্বয়কে স্থান দিতে অসম্মত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গত কারণ ছিল।

রাজশাহী কলেজটি (ছাত্রাবাস নহে) গড়িয়া উঠিয়াছে হিন্দুদের দানে। দাতারা কি নিজেদের বংশের বা হিন্দু সমাজের অন্য কোন প্রতিনিধির কোন ক্ষমতা রাখেন নাই? টাকা দিলেন তাঁহারা, অথচ গবর্নেন্ট-নামধেয় ব্যক্তির নিজ ইচ্ছামত কাজ অব্যাহত করিতে পারিবেন, ইহা বড় চমৎকার বন্দোবস্ত। গবর্নেন্ট কলেজটি চালাইতেছেন, সুতরাং গবর্নেন্টের ক্ষমতা নিশ্চয়ই থাকা উচিত। কিন্তু ঐহারা টাকা না-দিলে কলেজটি হইতে পারিত না, তাঁহাদের প্রতিনিধিদের কোনই ক্ষমতা থাকিবে না, ইহাও জায়সঙ্গত নহে। গবর্নেন্ট কলেজটি উঠাইয়া দিলে দাতাদের প্রতিনিধিরা ভাবতসচিবের নামে নালিশ করিতে অধিকারী হইবেন কি?

ভবিষ্যতে ঐহারা শিক্ষার জন্য গবর্নেন্টের হাতে বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে টাকা দিবেন, তাঁহারা নিজেদের হাতে কোন ক্ষমতাই না-রাখিব,

নিজেদের হাত পা বাঁধিয়া আত্মসমর্পণ না-করিলে ভাল করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার হইতে রাজশাহী কলেজ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য সংকলন করিয়া দিতেছি।

১৮৭২ সালে দুবলহাটির রাজা হরনাথ রায় বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের একটি জমিদারী দান করায় গবর্নেন্ট রাজশাহী জেলা-স্কুলটিকে ১৮৭৩ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন। মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী অত্যন্তব কলেজটির পাকা বাড়ীর সম্পূর্ণ ব্যয় নির্বাহ করেন। ১৮৭৫ সালে ইহাকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিবার প্রস্তাব হয়। রাজশাহী এসোসিয়েশনের মারফতে দীর্ঘাণাতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় দেড় লক্ষ টাকা দান করায় এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয়। ১৮৭৮ সালে বি-এ ক্লাস খোলা হয়। রাজশাহী এসোসিয়েশন আরও ৬০,৭০০ টাকা ঠাঙ্গা তুলিতে সমর্থ হন। তাহাতে একটি নতুন বাড়ী নির্মিত হয় ও তাহাতে কলেজ ক্লাসগুলি স্থানান্তরিত হয়। ১৮৮১ সালে এম-এ ও ১৮৮৩ সালে বি-এল ক্লাসগুলি খোলা হয়। ২০ বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন রেগুলেশন অনুসারে এম-এ ও বি-এল পড়ান বন্ধ হয়।

কলেজটির প্রায় সমুদয় বৃত্তি, পদক ও পুরস্কার হিন্দুদের প্রাপ্য। অথচ নিতুলতার খাতিরে “প্রায় সমুদয়” বলিলাম। “সমুদয়” না-বলিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।

হিন্দু ছাত্রাবাসের ৫টি ব্লকের প্রত্যেকটিতে ৫০ জন ছাত্রের স্থান আছে। মুসলমান ছাত্রাবাসের ব্লক একটি। তাহাতে ৫০ জন ছাত্র থাকিতে পারে। শিক্ষাদাতা অধ্যাপক প্রভৃতির সংখ্যা ৪৭। কলেজটি উঠাইয়া দিলে এতগুলি লোকের ভাবনা ভাবিতে হইবে।

মূল রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নের সভা

যে জনসভায় মূল রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নের ব্যবস্থা হয়, ইংরেজীতে তাহাকে কমন্টিউয়েন্ট এসেমব্লী বলে। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলশাসিত কয়েকটি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় বর্তমান ভারতশাসন আইনের নিষিদ্ধ করিয়া তাহা বর্জনের এবং কমন্টিউয়েন্ট এসেমব্লীর সাহায্যে নতুন রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল-

শাসিত ছয়টি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভাতেই এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইবে। তন্মিত্ত অকংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বারা শাসিত সিদ্ধেশ্বরের ব্যবস্থাপক সভাতেও এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অকংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পতন হইয়াছে ও তাহার জায়গায় কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে। এখানেও বঙ্গটিটিউয়েন্ট এসেমব্লীর অল্পকাল প্রস্তাব গৃহীত হইবার খুব সম্ভাবনা আছে। তাহা হইলে ১১টি গবর্ণরাধীন প্রদেশের মধ্যে আটটিতে বর্তমান ভারতশাসন আইনের পরিবর্তে বঙ্গটিটিউয়েন্ট এসেমব্লীর দ্বারা নূতন রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নের অল্পকাল প্রস্তাব গৃহীত হইবে। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার দ্বারা এবং বর্তমান ভারতশাসন আইন দ্বারা জনমত চাপা দিবার নানা উপায় অবলম্বিত হইলেও জনমত প্রকাশ পাইতেছে।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাতেও এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু বড়লাট সেই প্রস্তাব উত্থাপন নামঞ্জুর করেন।

বঙ্গটিটিউয়েন্ট এসেমব্লী সম্বন্ধে আমাদের একটি আশঙ্কা আছে। যদি উহা কখনও আহুত হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের উদ্যোগেই হইবে। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্বন্ধে যেমন অ-গ্রহণ অ-বর্জন নীতির অম্লসরণ করিয়া দু-নৌকায় পা দেওয়া অবস্থায় দীর্ঘকাল ছিলেন এবং হয়ত এখনও আছেন, তাহাতে আশঙ্কা হয়, যে, বঙ্গটিটিউয়েন্ট এসেমব্লীতেও তাঁহারা পূর্ণমাত্রায় গণতান্ত্রিক আদর্শ রক্ষা করিতে পারিবেন না, হয়ত বা সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ভক্তদের সহিত রক্ষা করিয়া বসিবেন। তাহা অবাঞ্ছনীয় হইবে।

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল

যে ছয়টি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের সংখ্যাধিক্য হইয়াছিল, সেখানে আগেই কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে। তাহার পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও সম্প্রতি কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে। উক্তজনখানেক পরাজয়ের পরেও আসামের মন্ত্রিমণ্ডল মন্ত্রি আঁকড়াইয়া আছেন। শেষ পর্যন্ত তাহারা হয়ত ইস্তফা দিতে বাধ্য

হইবেন, এবং তখন আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইতে পারিবে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা খুব বেশী, হিন্দু ও শিখ খুব কম। তথাপি সেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হওয়ায় মনে হয়, কখনও অসন্তুষ্ট মুসলমান-প্রধান প্রদেশেও কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে।

পূজার ছুটি ও ছাত্রছাত্রীদের কর্তব্য

পূজার ছুটিতে ছাত্রছাত্রীদের নিজের নিজের বাড়ীতে আনন্দ উপভোগ করেন, আমরা ইহা সর্বোচ্চঃ করণে চাই। তাঁহাদিগকে কেবল স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, যে, শ্রেষ্ঠ আনন্দ আমোদপ্রমোদে পাওয়া যায় না। তাহারা দেশের সাধারণ লোকদের সহিত সাক্ষাৎভাবে পবিচিত হইয়া যদি তাঁহাদের অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারেন এবং এই বোধ যদি তাঁহাদিগকে লোকহিতসাধনের প্রবৃত্তি দেয়, তাহা হইলে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবেন।

জনসেবা করিতে হইলে তাহার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হয়। ছুটিগুলি এই প্রস্তুতির সুযোগ দেয়।

জনসেবার একটি উপায় ও অঙ্গ আছে, যাহার নিমিত্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাই তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়াছে। ইহা নিরক্ষর বালক-বালিকাদিগকে লিখনপঠনক্ষম করিয়া তুলে। যদি কেহ কেবলমাত্র একটি বালিকা বা বালককেও লিখনপঠনক্ষম করিতে পারেন, তাহা হইতে তিনি নির্মল আত্ম-প্রসাদ লাভ করিবেন।

পূজার বাজারে বাঙালীর তৈরি জিনিষ ক্রয়

বঙ্গদেশের সেবার আর একটি পথ ও উপায় আছে, যাহা অবলম্বন করিবার নিমিত্ত কোন বাধ্য প্রস্তুতি আবশ্যক হয় না, কেবল আগ্রহ থাকিলেই হয়। আমরা সকলেই এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পালন করিতে পারি, যে, আবশ্যক সব দ্রব্য ক্রয়ে বঙ্গ বাঙালীর দ্বারা প্রস্তুত জিনিষকে প্রথম স্থান দিব, তাহা না-পাইলে অ-বাঙালী ভারতীয়দের তৈরি জিনিষ কিনিব, এবং যাহা একান্ত আবশ্যক নহে এক্ষণে কোন বিদেশী জিনিষ কিনিব না। আমাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-

স্বজন সকলকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া তাহা রক্ষা করাইতে চেষ্টা করিতে পারি।

হুগাপূজা আগতপ্রায়। এখন দরিদ্র বাঙালীতেও ছেলেমেয়েদের জন্য অন্ততঃ এক এক খানা ধুতি শাড়ী কিনিতে হইবে—সজ্জতিপন্ন লোকদের ত কথাই নাই। এখন সকলেরই মনে রাখা উচিত, যে, বঙ্গে বাঙালীদেব দ্বারা ধনের ধুতি শাড়ী ও জামার কাপড় প্রস্তুত হইতেছে, বঙ্গে বাঙালী তত্ত্বাবধায় বেশমী কাপড় ও মিহি সূতী কাপড় বুনিতোছে এবং জিনিষকেন ও নারীশিক্ষাসমিতিও সেই প্রকার কাপড় বুনিতোছে, বঙ্গে বাঙালীদের কয়েকটি মিলে কলের কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল জিনিষ থাকিতে আমরা তত্ত্ব জিনিষ কেন কিনি ?

নানাবিধ প্রসাধনের জিনিষও অনেকে কিনিবেন। সে রকম বিস্তর ভাল জিনিষ বঙ্গে বাঙালীদের কারখানায় বাঙালীদের দ্বারা প্রস্তুত হয়। তাহা থাকিতে অল্প জিনিষ আমরা কেন কিনিব ?

ছাত্রেরা অনেক ভাল কাজ অশ্রুতিত ভাবে করিয়া থাকেন। “স্বদেশী”র ব্যবহার এবং প্রচারও তাঁহারা করিয়াছেন। এখন “বঙ্গদেশী”র ব্যবহার ও প্রচার তাঁহারা করুন।

কম্পাটিটিউয়েন্ট এসেমব্লী সম্বন্ধে আমাদের

আশঙ্কা

আমরা কম্পাটিটিউয়েন্ট এসেমব্লী সম্বন্ধে আমাদের একটি আশঙ্কা কথা আগে লিখিয়াছি। দেখিতেছি তাহা অমূলক নহে। তাহা লিখিত হইবার পর আজ ২৩শে ভাদ্র, ৮ই সেপ্টেম্বর, দৈনিক কাগজে দেখিলাম, যে, বিহারের ব্যবস্থাপক সভায় কম্পাটিটিউয়েন্ট এসেমব্লীর অর্ধাংশ মূল রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নার্থ আহুত জনসভার সমর্থক প্রস্তাব এক জন মুসলমান সদস্যের প্রস্তাব অল্পসংখ্যক সশোধিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। সংশোধনটি এই, যে, সংখ্যালঘু সন্ত্রাস্যগুলিকে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় ঐ জনসভার প্রতিনিধি প্রেরণের সুবিধা দেওয়া হইবে, এবং জনসভা তাহাদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করিবে। অর্থাৎ

কিনা, প্রকাবাস্তরে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাটাকে রক্ষা কবা চাই।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মার্ক-মারা ভারতশাসন আইনে যেটা অস্পষ্ট, কংগ্রেসের মার্ক-মারা হইলেই তাহা কি পরম পবিত্র হইয়া যাইবে ?

গণতন্ত্রের নামে গণতান্ত্রিক আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত কিছু চালাইবাব চেষ্টা করিলে কংগ্রেস দেশের অহিত করিবেন।

“সংবাদপত্রে সেকালের কথা,” প্রথম খণ্ড

ঐতিহাসিক ও সাধারণ পাঠকদিগের পক্ষে প্রয়োজনীয় বহুশ্রমসাধ্য ও সুবিস্তৃত এই পুস্তকখানির ২য় সংস্করণ ১ম সংস্করণ অপেক্ষা তাঁহাদের ব্যবহারের অনেক বেশী উপযোগী হইয়াছে। ইহাব সংকলয়িতা ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংস্করণে জ্ঞাতব্য বহু নূতন বিষয়, ১৮১৮-১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দকালের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয়, অধুনা-অপ্রচলিত কিন্তু তৎকালপ্রচলিত বহু শব্দের অর্থ-সংবলিত সূচী, সম্পাদকীয় কতকগুলি মন্তব্য, এবং শতবর্ষ পূর্বে পাশ্চাত্য শিল্পীর আঁকা বাঙালী সমাজের কতকগুলি চিত্র সম্বিষ্ট করিয়া পুস্তকখানির আকর্ষণশক্তি ও মূল্যবত্তা বাড়াইয়াছেন। ছবিগুলি দেখিলে বুঝা যায়, সেকালের বাঙালী পুরুষ ও মেয়েবা রোগ-পটকা ছিল না।

অমুমত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতি

বঙ্গ ও আসামেব অমুমত শ্রেণীসমূহেব উন্নতিবিধায়িনী সমিতি ২৮ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়। তখন হইতে ইহার কাজ উৎসাহ, নিষ্ঠা ও মিতব্যয়িতার সহিত নির্বাহিত হইয়া আসিতেছে। এই সমিতির এখন ৩২৭টি বিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে বালিকা-বিদ্যালয় ৯০টি। ছাত্রদের সংখ্যা ১০৮১৭, ছাত্রীদের ৪৪৭০; মোট ১৫২৮৭। বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ২টি স্থায়ী ও ১টি অস্থায়ী পরীক্ষাধীন উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়, ৮টি মধ্য-ইংরেজী, ১টি বয়ন-বিদ্যালয়, ১টি সেলাই-বিদ্যালয়, ৬টি নৈশ বিদ্যালয়, এবং অবশিষ্টগুলি উচ্চপ্রাথমিক ও নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়।

বঙ্গদেশে একপ সমিতি আর দ্বিতীয় নাই।

: ১৩৬-৩৭ সালে সমিতির ব্যয় হইয়াছিল ৬৪৮২০ টাকা। ১৩৭২ পাই। সমিতি সরকারী সাহায্য, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্য, সালেঞ্জ ফণ্ড হইতে সাহায্য, এবং জ্ঞানদাল ফণ্ড হইতে সাহায্য পাইয়া থাকেন। আলোচ্য বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে বেতন বাবদে পাওয়া গিয়াছিল ১৭৬০০/৩। এই প্রকার নানা আয় ভিন্ন সমিতি তাহার কার্যক্ষেত্রে গ্রামগুলি হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন ১২০০৩/৪২। শহর হইতে চাঁদা আদায় হইয়াছিল ৩৮৬১।। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র গ্রামবাসীরা যে এই প্রকারে প্রায় তের হাজার টাকা দিয়া শিক্ষাসম্বন্ধে আপনাদের আগ্রহ দেখাইয়াছেন, ইহা খুব উৎসাহজনক।

সমিতির মোট ৬৪৮২০ টাকা ব্যয়ের মধ্যে ৫৮৭৭৭ টাকা বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য দিতে ব্যয়িত হইয়াছিল। আফিস খরচা, ইন্সপেক্টরদিগের ভাতা প্রভৃতির জন্য কেবল ৬০৮৮ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহা সমিতির মিতব্যয়িতার স্পষ্ট প্রমাণ।

স্ব নৃপেন্দ্রনাথ সরকার এই সমিতির সভাপতি, এবং ঘনজ্ঞানদাস বিড়লা, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত সিবিএলিয়ান), অবিনাশচন্দ্র সেন, ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সহকারী সভাপতি, স্বধীরকুমার লাহিড়ী সম্পাদক, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কোষাধ্যক্ষ, এবং হরিনারায়ণ সেন মুখ্য-সম্পাদক। কার্যানির্বাহক কমিটিতে অনেক মহিলা ও ভক্তলোক আছেন। পুরুষদের মধ্যে দু-জন মুসলমান। হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীর “উচ্চ” ও “নিম্ন” পঞ্চাশটির উপর জাতির অন্তর্গত। নমস্কৃতদের সংখ্যাই বেশী—৪২৭৬টি ছাত্র, ২৪২৫টি ছাত্রী এই জাতের। মুসলমান ছাত্র ২২১২ জন, ছাত্রী ৪৪৭ জন। খ্রীষ্টিয়ান ছাত্রছাত্রীও মোট ১৬ জন আছে। সকল জাতির ও ধর্মের ছাত্রছাত্রীদেরই বিদ্যালয়গুলিতে পড়িবার সমান অধিকার। ১৯৩৩-৩৪ সালে সমিতির বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা ৪৪৪ এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৮২৬২ ছিল। পব বৎসর বৃদ্ধি বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়া ৪৩১ হয়, তথাপি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়িয়া ১৮৭৪৭ হইয়াছিল। তাহার পর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ আয়ের হ্রাস। আয়ের হ্রাসের প্রধান কারণ দুটি—ব্যবসাবিধির মন্দা, এবং সমিতির কয়েক জন

উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ও কর্মীর—বিশেষতঃ রায়সাহেব রাজমোহন দাস, স্ব নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের—মৃত্যু। ইহাদের অভাব এখনও কেহ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আয় হ্রাসের এই সকল কারণে আয় অনেক হাজার টাকা কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও কর্মীরা সমান উৎসাহে কাজ চালাইতেছেন।

বিদ্যালয়গুলিই সমিতির একমাত্র কার্য নহে। ইহার কয়েকটি লাইব্রেরী আছে, ম্যাজিক লন্ঠনের সাহায্যে স্বাস্থ্য-রক্ষা, সামাজিক কুপ্রথা উন্মূলন প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার বন্দোবস্ত আছে, এবং বয়স্কদের দল আছে।

সমিতির ১৯৩৬-৩৭ সালের সচিব ইংরেজী রিপোর্ট হইতে অন্যান্য অনেক বৃত্তান্ত জানা যায়। উহা সমিতিব আফিস ২১০-১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে মুদ্রাসম্পাদক শ্রীমুক্ত হরিনারায়ণ সেনের নিকট পাওয়া যায়।

—

“প্রবাসী সম্মেলনী” ও “মধ্যভারতী”

“প্রবাসী সম্মেলনী” “প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সাংবাদিক মাসিক পত্রিকা”। ইহার প্রথম বৎসরের ১০টি সংখ্যা বাহির হইয়াছে। শেষ যে সংখ্যাটি পাইয়াছি তাহার তারিখ আছে ১লা এপ্রিল, ১৯৩৭, এবং মলাটের উপরে ছাপা আছে ‘প্রথম বর্ষ,—১৫জ’। এই কাগজটিতে প্রবাসী বাঙালীদের জীবনচরিত প্রভৃতি যাহা বাহির হয়, তাহা আমরা আগ্রহের সহিত পড়ি। ইহা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইলে এবং স্থলেখক প্রবাসী বাঙালীরা ইহাতে লিখিলে, ইহা স্বাস্থ্য হইবে। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে এমন লোক অনেক আছেন, যাহারা বাংলা লিখিতে বেশ ভাল পারেন, এবং পত্রিকাটির সামান্য টাকাও দিতে পারেন।

প্রবাসী বাঙালীদের আর একটি বাংলা কাগজ আমরা মধ্যভারতের রায়পুর হইতে পাইয়াছি। ইহার নাম “মধ্যভারতী”। ইহা মাসিক পত্রিকা। ইহার একটি সংখ্যা পাইয়াছি। তাহার ভিতরের পৃষ্ঠগুলির মাথায় ছাপা আছে, ১ম বর্ষ—৫ম সংখ্যা, আষাঢ়—১৩৪৪, কিন্তু মলাটের উপর আছে ১ম বর্ষ—৫ম সংখ্যা, আষাঢ় ও জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৪। সম্পাদক মহাশয় কাগজটির প্রকাশে বিলম্বের হেতু দেখাইয়াছেন। ভবিষ্যতে অনিয়ম ও বিলম্ব

না হইলেই ভাল। যথাসময়ে নিয়মিতরূপে কাগজ বাহর করিতে হইলে লেখা ও টাকা যত আবশ্যিক, মধ্যভারতের বাঙালীদের তাহা জোগাইতে পারা উচিত। তাঁহাদের সে সামর্থ্য আছে।

সৈনিক বিভাগের ব্যয়

সৈনিক বিভাগের ব্যয়ের আলোচনা আবার ভাবনীয় ব্যবস্থাপক সভায় হইয়াছিল। ভারতীয় দেশভক্তেরা বলেন, ব্যয় অনেক কমান যায়, ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা বলেন কমান যায় না। দুটা কথাই সত্য। যদি বর্তমানসংখ্যক গেরা সৈন্য পুষিতে হয়, তাহা হইলে ব্যয় বিশেষ কমান যায় না। আর যদি গেরা সৈন্য ও অফিসারদের বদলে দেশী সৈন্য ও অফিসার রাখা যায়, তাহা হইলে সদ্যসদ্যই ন্যূনকল্পে আট কোটি টাকা খরচ কমান যায়। কংগ্রেস স্বরাজ অর্জন করিয়া গোবান্দিগকে তাহাদের দেশে পাঠাইয়া দিতে পারিলে অন্ততঃ আট কোটি টাকা বাঁচাইতে পারিবেন।

ইংরেজী-বিরাগ

এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের আগেকার আমলের ৬ বর্ষমান আমলের এক জনও বড় কংগ্রেস-নেতাকে জানি না, যাহার নিজের রাজনৈতিক জাগরণের ও রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে যাহার উচ্চ স্থান প্রাপ্তির অন্ততঃ গৌণ কারণও ইংরেজী-শিক্ষা নহে। অথচ কংগ্রেসী মহলে ইংরেজীব নিন্দা করা একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার স্বত্বাশ্রয় হয় যখন গান্ধীজী সরকারী ও সরকার-অনুমোদিত স্কুল কলেজ বর্জন করিতে ছাত্রছাত্রীদিগকে বলেন এবং বিশ্বের ছাত্রছাত্রী “গোলামখানা” ছাড়িয়া কোন স্থানী “আজাদখানা”র স্থান পায় নাই। ইংরেজী-বিরাগের জের এখনও চলিতেছে। অস্থায়ী ভাবে শিক্ষা-দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত বোম্বাইয়ের এক কংগ্রেসী মন্ত্রী বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীকে “পচা” (“rotten”) বলিয়াছেন, মাদ্রাজের কংগ্রেসী শিক্ষা-মন্ত্রীর মতে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্তরে উঠিলে তাহাদের উপর ইংরেজীর যে প্রভাব পড়ে তাহা বিষাক্ত (“poisonous”)। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষের সঙ্গে আমাদেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে এবং দোষোদ্ভব-ট-এ আমরা বহুবৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছি। আমাদের ছেলেমেয়েরা ইংরেজী পড়িয়া নকল ইংরেজ বা “মানসিৰ কিরিকী” বনিয়া যায়, ইহা আমরাও চাই না। কিন্তু ইংরেজীর উপর ঝাল ঝাড়িলে কি হইবে? ভারতবর্ষের আধুনিক যে-কোন ভাষার সাহিত্যের চেয়ে ইংরেজী শ্রেষ্ঠ জার্মান প্রভৃতি সাহিত্য বড়, এবং ভারতবর্ষের আধুনিক কোন ভাষার সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াই যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন ও

সংস্কৃতি লাভ করা যায় না। পাশ্চাত্য কোন একটা আধুনিক ভাষার সাহিত্য আমাদের নিজেদের মজলেনব জুতাই পড়িতে হইবে, এবং ইংরেজী পড়িবার সুবিধাই আমাদের বেশী। ইংরেজরা আমাদের অনভিপ্রেত রূপে আমাদের দেশ শাসন করে বলিয়া তাহাদের সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞার ভান বা বিদ্বেষ মুঢ়তা মাত্র। পৃথিবীর বহু স্বাধীন জাতি নিজেদের বড় সাহিত্য থাকা সত্ত্বেও ইংরেজীর চর্চা করে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষাও বাংলায় সাহায্যে হওয়া আমরা চাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যের অহুশীলনও চাই বলিয়া ইংরেজী সাহিত্যকে বাদ দিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত পদবীসম্মান-বিতরণ সভায় তাঁহার বাংলা অভিভাষণে ইহার কারণ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

মাদ্রাজের বিদ্যালয়ে কেন হিন্দী শিখান হইবে

মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী রাজগোপালাচাৰ্য মহাশয় তথাকার বিদ্যালয়গুলির মধ্যশ্রেণীতে হিন্দী শিক্ষা আবশ্যিক করিতে চান। তাহার একটা প্রধান কারণ মাদ্রাজী ছোকরাগণকে তিনি এই বলিয়াছেন, যে, “তোমরা যদি হিন্দী না-শেখ, তা হ’লে ক্ষেত্রেস্ত্রনের আমলে (যখন হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হবে) চাকরি পাবে না।” ভালভাতের ব্যাপারটা ইনি বেশ বুঝেন দেখিতেছি। কিন্তু ক্ষেত্রেস্ত্রন কখন হইবে? এবং তখন হিন্দী না-জানিলে কি অন্ন জুটবেই না?

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

যাহারা বর্তমান আর্থিক সংখ্যা পর্য্যন্ত বাষিক বা বাৎসরিক গ্রাহক আছেন, আশা করি, আগামী এক বৎসর বা ছয় মাসের জন্যও তাঁহারা গ্রাহক থাকিবেন এবং আগামী এক বৎসর বা ছয় মাসের মূল্য ৬০০ টাকা বা ৩০০ সওয়া তিন টাকা মনি-অর্ডার-যোগে পাঠাইয়া দিবেন। মনি-অর্ডার রূপে তাঁহাদের স্ব-স্ব গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ না করিলে টাকা জমা করিবার পক্ষে অসুবিধা হয়।

যাহারা আগামী ১০ই আশ্বিনের মধ্যে টাকা পাঠাইবেন না, তাঁহাদের নামে কার্তিক সংখ্যা ভি.-পি.তে পাঠান হইবে। ঐ সংখ্যা ১৬ই আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। যাহারা অন্তঃপব গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা সে-কথা দিয়া করিয়া ১০ই আশ্বিনের পূর্বেই আমাদের কাছে জানাইবেন।

ভি.-পি.তে আমাদের টাকা পাইতে কখন কখন বিলম্ব ঘটে, সুতরাং গ্রাহকদের ‘প্রবাসী’ পাইতে গোলমাল হয়। মনি-অর্ডারেই টাকা পাঠান সুবিধাজনক। ইতি—

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,
প্রবাসীর স্বাধিকারী।

দেশ-বিদেশের কথা

স্বর্গত শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, বি-এল, বঙ্গদেশে দীর্ঘকাল বিচার-বিভাগে দফতর সহিত কাজ করিয়া জেলা ও মেজুন জজের পদে উন্নীত হন। কয়েক বৎসর জজিয়ত করিবার পর পেশ্যান লইয়া তিনি এলাহাবাদে স্থায়ীভাবে বাস করিতে সঙ্কল্প করেন ও বাটী ত্রয় করেন। কয়েক বৎসর সেখানে বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার ছোট পুত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ গোস্বামী তথাকার হাইকোর্টে ওকালতী করেন।



স্বর্গত শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ

এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির বাঙালী চেয়ারম্যান

এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ আডভোকেট কৈলাসনাথ কাটজ তথাকার মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি যুক্ত-প্রদেশের অন্ততম মন্ত্রী হওয়ায় চেয়ারম্যানের পদ খালি হয়। সর্বসম্মতিক্রমে ঐ পদে এলাহাবাদের অন্যতম আডভোকেট শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ বহু, এম-এ, এল-এল-বি, নির্বাচিত হইয়াছেন। রণেন্দ্রবাবু বহু বৎসর মিউনিসিপাল কমিশনার থাকার মিউনিসিপাল কাজে তাঁহার অতিজ্ঞতা ও দক্ষতা আছে।

তিনি ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে পণ্ডিত মোহীলাল নেহরুর দলের সহিত জেলে গিয়াছিলেন, যুক্ত-প্রদেশের বাঙালী পুরুষদের অগ্নি কেহ তখন এই আন্দোলনে জেলে যান নাই।

পরলোকগত ললিতবিহারী সেন রায় কানী মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন, অগ্নি কোন বাঙালী ঐ প্রদেশে তাহা হন নাই।



শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ বহু

চাঁদপুর লেডী প্রতিমা মিত্র উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়

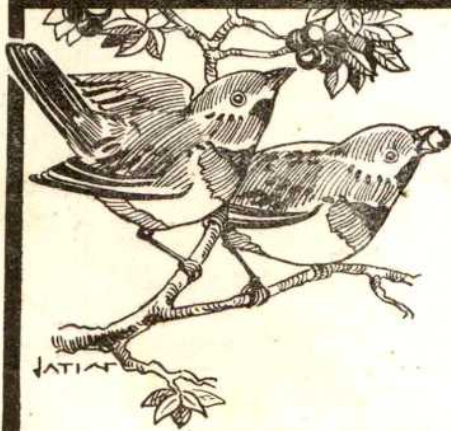
চাঁদপুর ত্রিপুরা জেলার একটি মহকুমা। সেখানে লেডী প্রতিমা মিত্রের নামে একটি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় স্থানীয় একটি বিশেষ অভাব দূর হইয়াছে। তথাকার সব-ডিভিজন্যাল ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত এম. এ. টি. আয়েদার মহাশয়ের উদ্যোগিতায় এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।



লেডী প্রতিমা মিত্র কর্তৃক চাঁদপুর উচ্চ-ইংরেজী
বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-উৎসব



শ্রীযুক্ত এম. এ. এ. টি. আরেফার



পাখিরাও
ভেজাল নাঁচাইয়া
খাদ্য সংগ্রহ করে -

আপানিত
করিবেনই !

শ্রী স্মৃতে
ভেজাল নাই





শ্রীসোরাংশু বসু



শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়



ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়

বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব

শ্রীসোরাংশু বসু লওনে বি-এ উপাধি লাভ করিয়া সম্প্রতি চার্টার্ড একাউন্ট্যান্সী পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রতি দেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতিপদক

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত কি-এ পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম হইয়াছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতিপদক পাইবেন বলিয়া প্রকাশ।

ভয়সা ঘি

আমদানী না করিয়া

বাংলা নিজেই

দুই কোটি টাকার গাওয়া ঘি
প্রস্তুত করিতে পারে

প্রতিষ্ঠান বাংলার
কুটীরে কুটীরে গাওয়া ঘি
প্রস্তুত করাইতেছে



মাদ্রাজ, পাঞ্জাব,
বিহার, যুক্তপ্রদেশ
হইতে

বাংলায়
ভয়সা ঘি

দুই কোটি টাকার আসিতেছে
এই আমদানী রোধ করুন

লাঙ্গল মার্ক গাওয়া ঘি ১৫০/০ সের

খাদি প্রতিষ্ঠান

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ফোন—বি,বি, ২৫৩২
ভবানীপুর, শ্রামবাজার, মাণিকতলা, বালীগঞ্জ,
লেক রোড, হাওড়া।

ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়

ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব সার্জেন্স্ হইতে এল-ডি-এস; আর-সি-এস (ইংলণ্ড) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি পঞ্চাশ গিনি বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজ হাসপাতালের দন্ত-বিভাগে হাউস-সার্জন নিযুক্ত হন। ভারতীয়গণের মধ্যে তিনি প্রথম এই সুযোগ পান।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় বালিন, প্রাণ, ভিয়েনা প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন স্থানের বিখ্যাত হাসপাতালের পরিচালনা-পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিয়া ফলশ্রেণীকিয়া আসিয়াছেন। লণ্ডনে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজে ডাঃ মুখোপাধ্যায় খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রজেন্টস্ ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক ছিলেন। ছাত্রদের নানা সামাজিক কাজেও তিনি অগ্রণী ছিলেন।

ইতিপূর্বে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের দন্ত-বিভাগে সিনিয়র হাউস-সার্জন ও কিছুদিন ডেন্টাল সার্জারির অস্থায়ী অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় ডেন্টাল সার্জারিতে তিনি সর্বপ্রথম প্রাপ্ত হন।

কলিকাতা অনাথ-আশ্রমের নিবেদন

চুর্গোৎসব সমাগত; এই আনন্দের দিনে আপনাদের আশ্রিত কলিকাতা অনাথ-আশ্রমের অনাথ বালকবালিকাগুলি আপনাদের স্নেহপ্রদত্ত নববজ্রাদি লাভ করিয়া যাহাতে পিতামাতার অভাব বিস্কৃত

হইয়। পূজার আনন্দ অনুভব করিতে পারে, অতুগ্রহ পূর্বক তাহা করি জগজ্জননীর শুভ আশীর্বাদ লাভ করুন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। এক্ষণে কলিকাতা অনাথ আশ্রমে ৯৭টি বালক ও ৪৮টি বালিকা ব করিতেছে। নিম্নে তাহাদের বয়সের উপযোগী বস্ত্রের তালিকা প্রা হইল।

ধূতি	মাটি
১০ হাত ৩০ খানি	১০ হাত ২০ খানি।
৯ " ২৫ "	৯ " ১ "
৮ " ২০ "	৮ " ১ "
৭ " ১২ "	৭ " ৮ "
৬ " " "	৬ " " "
৫ " " "	৫ " " "

বস্ত্রাদির পরিবর্তে আর্থিক সাহায্যও সাদরে গৃহীত হইবে।

১২।১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রট,
কলিকাতা।

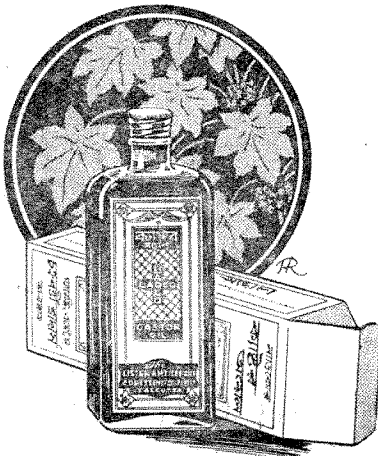
শ্রীহীরলাল সিংহ
সহযোগী সম্পাদক,
কলিকাতা অনাথ আশ্রম

বিচারপতি-পদে ভারতীয়

নবাবজাদা এ. এস. এম. লতিফের রহমান বার-এট-ল, কলিকাতা ছোট আদালতের প্রধান বিচারপতি পদে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পদে ইনিই প্রথম ভারতবাসী।

বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসবে— দেশীয় শ্রেষ্ঠ প্রসাধন দ্রব্য

= ল্যাড্‌কোর =



“প্রসাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা”

সচিত্র পুস্তিকার জন্ত অদ্যই
পত্র লিখুন।

সুগন্ধ নারিকেল তৈল

সুগন্ধ কাষ্টর অয়েল

সুগন্ধ গ্লিসারিন সোপ

লাইম-জুস গ্লিসারিন

ফেসক্রিম :: স্নো

আজ সকল ঘরে ল্যাড্‌কোর

প্রসাধন দ্রব্যের এত আদর কেন—তাহা

আপনি একবার ব্যবহারেই বুঝিবেন !!

কাশীপুর

কলিকাতা

::

::

ল্যাড্‌কো

কেশের পুষ্টি সাধনে—

ভাইটামিন—এফ্

ক্যালকেমিকোর অভিনব প্রবর্তনা!



বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ করেছেন চুলের জেলা চলে যাওয়া, চুলের গোড়া আলুগা হওয়া, চুল পাতলা হয়ে আসা ও টাক পড়ার প্রধান কারণ আমাদের শরীরে ভাইটামিন এফ্-এর অভাব। কেশতৈল ও হোয়ার ক্রীম প্রভৃতি ভাইটামিন এফ্ সংযুক্ত হ'লে উহা ব্যবহারে চুলের পুষ্টি-সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য বাড়ে। এই জন্তে ক্যালকেমিকো তাঁদের প্রত্যেক কেশ প্রসাধনী ভাইটামিন এফ্ সংযোগে প্রস্তুত করছেন।



ভঙ্গল—

মৃদু সুগন্ধি 'মহাভূঙ্গরাজ' কেশ তৈল

ক্যাষ্টরল—

স্নিগ্ধ সুগন্ধি পরিশুদ্ধ ক্যাক্টর অয়েল

কোকোনল—বিশুদ্ধ সুবাসিত নারিকেল তৈল

লা-ই-জু

সুসমা-সুরভিত লাইম ক্রীম গ্লিসারিন

সিলভেস্—

সুরভিত সুন্দর নিম ও পামঅলিভ শ্যাম্পু

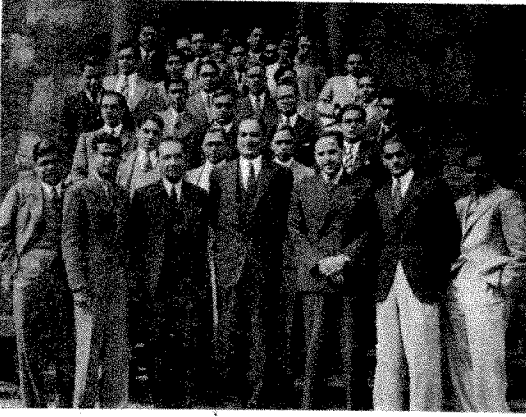
(প্রত্যেকটি ভাইটামিন-এফ্ সংযুক্ত, নূতন লেবেল দেখে নেবেন)



ঃ ক্যালকাটা কেমিক্যাল ঃ

বালিগঞ্জ
কলিকাতা

নবাবজাদা এ. এস. এম. লতিফুর রহমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
একজন ফেলো এবং আর্ট ও আইন ফ্যাকাল্টির সদস্য।



এডিনবরা ভারতীয় পরিষদে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সম্বন্ধনা।

ডাঃ রায় মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান।

চিত্র - পরিচয়

কাষোজ-চিত্রাবলী

বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কাষোজের বৌদ্ধশাস্ত্র-পরিষৎ ও রয়্যাল লাইব্রেরির উদ্যোগে কাষোজের প্রাচীন সংস্কৃতির চর্চা ও পুনরুদ্ধার দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। এই পরিষৎ ও লাইব্রেরি পুনর্গঠিত হইবার পূর্বে কাষোজে বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চা ইত্যাদি মুষ্টিমেয় বৌদ্ধ আচার্যগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাজধানীতে অবস্থিত পালি-বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও উদ্দেশ্য নিয়মিত ছিল না। বর্তমানে এই পরিষদের উদ্যোগে নিয়মিত শাস্ত্রচর্চা, বিশেষভাবে প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ, যত্নসহকারে চলিতেছে। এই সংখ্যায় অন্তর্গত মুদ্রিত, কাষোজের এই পরিষদ ও লাইব্রেরির চিত্রাবলী ও কাষোজের অস্তিত্ব দৃশ্য ও ঘটনার চিত্রাবলী, পরিষদের সম্পাদিকা শ্রীমতী কার্পেলের সৌজন্যে মুদ্রিত হইল।

কবি-গান

এই চিত্রে কবি-গানের আসরের দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে। আসরের মধ্যে কবি-গায়কদের ও সঙ্গীত বাদ্যকরদের দণ্ডায়মান দেখা যাইতেছে, চতুর্পার্শ্বে শ্রোতৃগণ উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান। এই কবিতা-সংগ্রামের উত্তর-প্রত্যুত্তরে কবি-গায়কদের বিশেষ দক্ষতা দেখা যাইতে বর্তমানেও বঙ্গের কোন কোন স্থানে এই গানের অল্পবিস্তর প্রচলন আছে। কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান প্রধান কাহিনী এই গানের উপজীব্য ছিল—আধুনিক কবিগণেরা বর্তমানের প্রধান ঘটনা ও কাহিনী লইয়াও কবি-গান রচনা করিয়া থাকে।

দুঃখহীন নিকেতন—

সংসার-সংগ্রামে মানুষ আরামের আশা ছাড়িয়া প্রাণপণ উত্তমে বাঁপাইয়া পড়ে তাহার জীপুত্র-পরিবারের মুখ চাহিয়া। সে চায় পত্নীর প্রেমে, পুত্রকন্যা ভাইভগিনীর স্নেহে স্বকৃত্যকে একখানি শান্তির নীড় রচনা করিতে। এই আশা বুকে করিয়া কী তার আকাঙ্ক্ষার আকুলতা, কী তার উদ্যম, কী তার দিনের পর দিন আত্মভোলা পরিশ্রম!

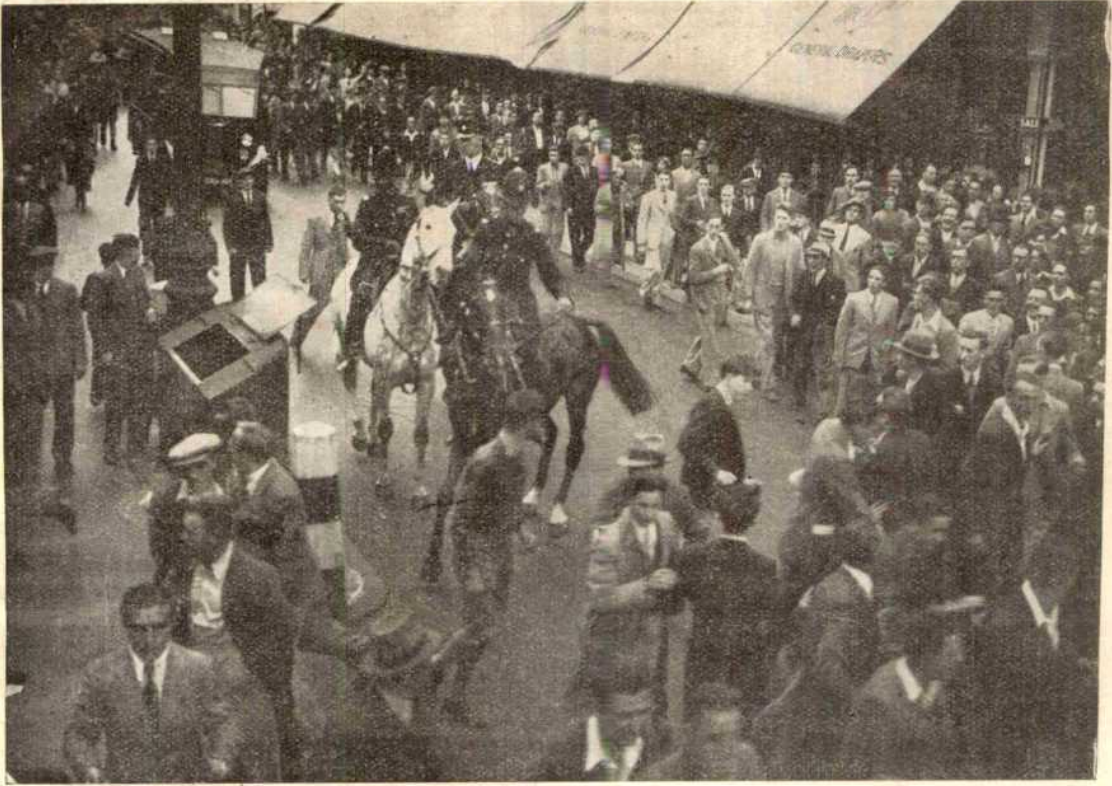
কিন্তু হায়, কোথায় আকাঙ্ক্ষা, আর কোথায় তার পরিণতি! বান্ধকের চৌকাঠে পা দিয়া পোনের আনা লোকই দেখে জীবনসম্মুখ দুঃখহীন নিকেতন গড়িয়া তুলিবার স্বপ্নকে সফল করিতে হইলে যেটুকু অর্থ-সঞ্চয় করিয়া রাখা প্রয়োজন ছিল, প্রতিদিনের হাজার কাজের চাপে, ছোটবড় হাজার অভাব মিটাইতে গিয়া, সেই অতিপ্রয়োজনীয় সঞ্চয় তাহার করা হইয়া ওঠে নাই। এমনি করিয়া আশাভঙ্গের মনস্তাপে বহু লোকেরই জীবনসম্মুখের গোধূলি-অবসরটুকু শান্তিহীন হইয়া ওঠে।

একদিনেই করিয়া ফেলা যায় এমন কোনো উপায়ই নাই, যাহা দরিদ্রের এই মনস্তাপ দূর করিয়া দিতে পারে। সংসারের স্বচ্ছলতা ও শান্তি গড়িয়া তুলিতে হয় ধীরে ধীরে—একমাস বা এক বৎসরের চেষ্টায় ভবিষ্যতের যে-সংস্থান হয় না, বিশ বৎসরের চেষ্টায় তাহা অল্লাহসে হওয়া অসম্ভব নয়। সঞ্চয়ের দায়িত্বকে আসন্ন দায়ের মত দুঃসহ না করিয়া লঘুভার করিতে এবং কষ্টসঞ্চিত অর্থকে নিরাপদ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্তই জীবনবীমার সৃষ্টি। যাহাদের সামর্থ্য বেশী নয়, অথচ সংসারিক দায়িত্ব বেশী, জীবনবীমার অন্তর্গত বিশেষ করিয়া তাহাদেরই জন্ত।

সাংসারিক জীবনে প্রত্যেক গৃহস্থেরই যে জীবনবীমা করিয়া রাখা উচিত, একথা সকলেই জানেন। জীবনবীমা করিতে হইলে সকলেরই এমন কোম্পানীতে করা উচিত, ব্যবসায়িকভাবে বাহার প্রতিষ্ঠা আছে, ব্যবসার অন্তর্য্যাপ্তে বাহার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বেশী। নিরাপত্তার দিক দিয়া দেখিলে, **বেঙ্গল ইনসিওরেন্স এণ্ড রিভেল প্রপার্টি কোং লিমিটেড**ের মত বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠানই সর্বসাধারণের পক্ষে শ্রেয়।

বেঙ্গল ইনসিওরেন্স এণ্ড রিভেল প্রপার্টি কোং লিমিটেড

হেড অফিস—২নং চার্চ লেন, কলিকাতা।



পুলিস-কর্তৃক কাসিষ্ট ও তাহার বিরোধীদের সংঘর্ষে বধাপ্রদান । ট্রাকালগার স্কোয়ার, লণ্ডন ।

এবার পূজায়

নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী সম্পাদিত

সোনার কাঠি

ছলেমেয়েদের মধ্যে হৈ চৈ সৃষ্টি করিবে ।
সামাজ্যাদি লেখকগণের লেখা । প্রসিদ্ধ
শিল্পীর চিত্রাঙ্কন সর্বদিকেই সুন্দর
বিচিত্র অভিনব ।

A. T. Dev's
STUDENTS

FAVOURITE DICTIONARY

Eng. to Beng. ... Rs. 2-12

Beng. to Eng. ... Rs. 2-8

A. B. Patrika : "Supersedes all other cheap dictionaries"

'Orient' : Best specimen of one volume Dictionaries.

Advance : "English Equivalents are praise worthy."

আশুতোষ দেবের

অর্থ পুস্তক

৫০ বৎসর ধরিয়া শ্রেষ্ঠ ।

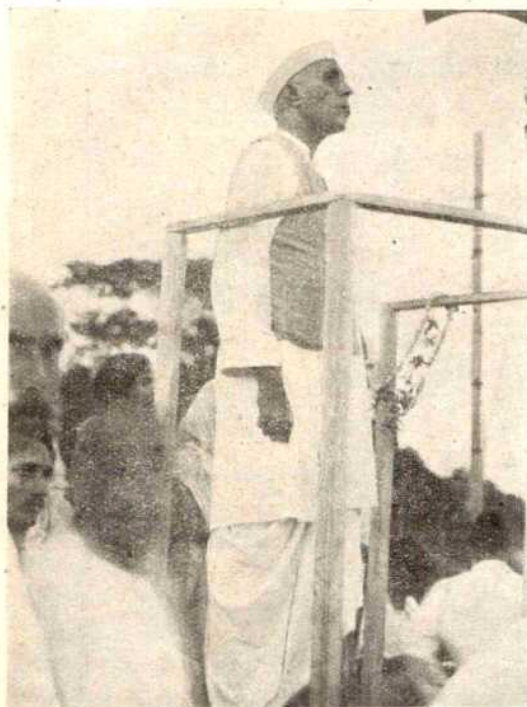
আশুতোষ দেবের

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

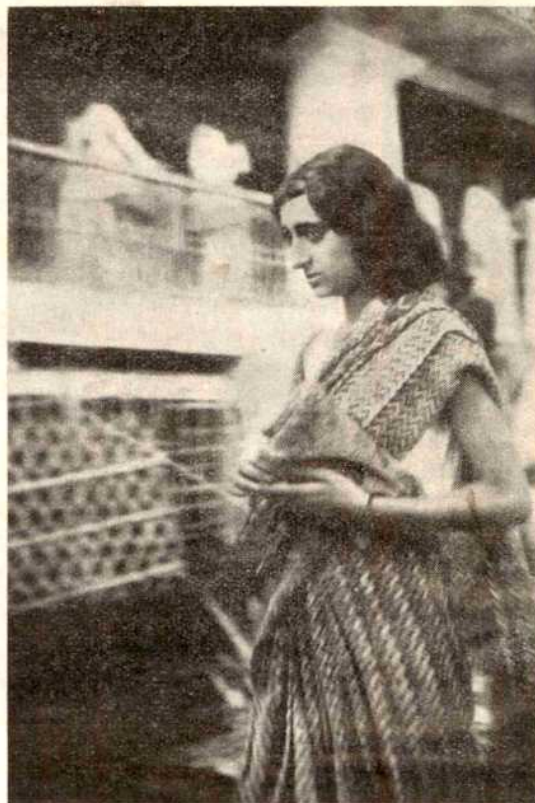
শীঘ্রই বাহির হইবে । দাম ৫।০

দেব সাহিত্য কুটার

২২-৫-বি, কামাপুকুর লেন, কলিকাতা ।



চট্টগ্রামে জরীহরলাল নেহরু'র সম্বর্ধনা



চট্টগ্রামে শ্রীমতী ইন্দিরা নেহরু



নবাবজাদা এ. এস. এম. লতিফুর রহমান



কলিকতায় 'আগামান-দিবস' উপলক্ষে পূত ও পরে মুক্তিপ্রাপ্ত মহিলাগণ

['বিবিধ প্রসঙ্গ' দৃষ্টব্য]